অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

১১শ বর্ষ : ৪র্থ খণ্ড

শুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৩৭৮—শুক্রবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৯

Friday : 4th February 1972 — Friday : 28th April 1972

অমৃত

প্রসাদ

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার (চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১·০২
ষাণ্মাষিক	টাকা ০·৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০·২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪০ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 9th February, 1973 শুক্রবার, ২৬ মাঘ, ১৩৭৯ .52 Paise

প্রচ্ছদ ফটো : শ্রীসুকুমার রায়

কে সেই কৃষ্ণকলি ?

সাহিত্যের পাঠক ও রসিকদের প্রতি আবার একটি বম্বশেল এসেছে। এবার ছুঁড়েছেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের খাস দরবার ব্রিটেনের এক নামজাদা ঐতিহাসিক। তিনি নাকি শেকসপীয়রের ডার্ক লেডির সন্ধান পেয়েছেন। সত্যি সত্যিই কি তাহলে কৃষ্ণকলির রহস্য উন্মোচিত হলো?

সত্যি কথা বলতে, শেকসপীয়র-রহস্য আজো অনেকটা আলো-আঁধারির গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যে লেখা শেকসপীয়রের রচনা বলে চলে আসছে কারো কারো মতে তা নাকি বেকনের রচনা। অর্থাৎ শেকসপীয়র অস্তিত্বকেই সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন সাহিত্যের কোনো কোনো ইতিহাসকার। আবার কেউ বলেছেন না, এ হলো মার্লোর। অনেকে বলেছেন, আসলে সমস্তই লিখেছেন আর্ল। শুধু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এবং বিতণ্ডা চালাতে গিয়ে কোনো পক্ষই যুক্তি আবিষ্কারে কোনো ঘাটতি পড়তে দেন নি। মামলায় দু পক্ষের উকিলই যুৎসই যুক্তি পেশ করে থাকেন। কিন্তু তাতে শুধু টেমসের জলই ঘোলা হয়েছে, শেকসপীয়র-রহস্যও রয়ে গেছে সেই বিশ বাঁও জলের নিচেই।

এবারকার প্রশ্নটি একটু অন্য রকমের। আলাদা স্বাদের। শুধু কবি-সাহিত্যিকদের ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কেই পাঠকের কৌতূহল সীমিত থাকে না। গণ্ডী কেটে তা ধাওয়া করে কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় চিত্রিত বা উল্লেখিত চরিত্রগুলির পিছনেও। জীবনানন্দের 'বনলতা' কে? রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার 'অমিট্রে'টি যে কে তা নিয়ে কি আমাদের কৌতূহল অসীম নয়? অর্থাৎ সাহিত্যের গবেষক বা রসিক প্রত্যেকেরই আগ্রহ রসের দিকে থাকলেও উপকরণ-বিষয়ক নানা জিজ্ঞাসা ও সংশয়ও তাঁদের মনে জাগে। কখনো কখনো সেইসব প্রশ্নের উত্তর মিললে, সংশয়ের মেঘ কেটে গেলে বিচার্য-বিষয়টির পাওয়া যায় নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন ইঙ্গিত। অর্থাৎ রচনাটিরই ডাইমেনশন বৃদ্ধি পায়। ফলে সব লেখারই উৎস-সন্ধানে চলে অভিযান। এরকম অভিযানের ফলে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনারই পাওয়া গেছে বিশেষ তাৎপর্য। মহাকবি শেকসপীয়রের বেলাতেও ঘটেছে তাই। বরং একটু বেশিই। এবং এবারকার প্রশ্নটিও সেই উৎস-সন্ধান-অভিযানেরই [illegible]।

হ্যাঁ, অনেক খোঁজাখুঁজিই চলেছে, শেকসপীয়রকে নিয়ে। কোন্ চরিত্র কার আদলে গড়া, কোন্ কবিতার পেছনে কোন্ চরিত্রের ভূমিকা বা অনুপ্রেরণা, কোন্ লেখাটি কার উদ্দেশে নিবেদিত, কার সঙ্গে গল্প-গুজব, ঠাট্টা-মস্করা করার পর লেখা— এ নিয়ে চলেছে অনেক তর্ক। চলেছে, চলছে, হ্যাঁ চলবেও। ডার্ক উওম্যান এবারকার প্রশ্নের কেন্দ্রমণি।

কে, কে সেই রহস্যময়ী কৃষ্ণকলি? কাকে ঘিরে মহাকবি লিখলেন পঁচিশ-ছাব্বিশটি সনেট? নাকি আরো বেশি লিখেছেন যা আজো পাওয়া যায়নি। যাবে কি কখনো? কে সেই কৃষ্ণা রমণী যিনি রহস্যের জালে বেঁধে ফেলেন কবিকে? মোহিনী মায়ায় বারবার রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করেন কবি-চিত্ত? অপ্রমেয় হৃদয়ের মাঝখানেই যাকে আমরণ বন্দী রাখার অভীপ্সা সেই নারী কি সত্যিই ইতালিরই কন্যা? কিন্তু তাহলে কালো কেন? ইংরেজললনার মতো অমন ফ্যাকাশে-শাদা নন বটে, বরং কিছুটা আঙুরের লালচে আভায় রঞ্জিতই, তা সত্ত্বেও কি কালো হন কখনো ইতালিয় যুবতী? সত্যিই কি সে কৃষ্ণকলি? না, এও কবির লেখনী-শক্তিরই মোহিনী মায়া? ব্রিটেনের ঐতিহাসিক গোয়েন্দার চোখ নিয়ে যতই বলুন, শেকসপীয়রের কৃষ্ণকলি আজো রহস্যময়ী। কবির তৈরি প্রতিমা চিরকালই থাকে তাই। বরং যতোই রহস্যময় থাকে ততোই যেন রসের সন্ধান মেলে, চলে কল্পনার উদ্ভাস। এবং এটাই ভালো। নয়কি?

সুনীল সেন,
কলকাতা—৩৩।

প্রতিমা নির্মাণে এ কোন্ ছেলেখেলা ?

গত দু-তিন বছর ধরেই জিনিসটি চলে আসছে। তবে বছর খানেক হলো এর বাড়াবাড়িটা সম্ভবত সকলেরই নজরে পড়েছে। এবং সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে তা উঠেছে তুঙ্গে।

ব্যাপারটা তাহলে খোলসা করেই বলি। ইদানীং দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের উপকরণ-বৈচিত্র্যে আমাদের মতো সংস্কারবাদী (সত্যিই কি তাই?) লোকের নাভিশ্বাস উঠছে। 'ভারতে প্রথম', 'পৃথিবীতে প্রথম' এর এখন ছড়াছড়ি। যেন সার্কাস দলের বিজ্ঞাপন। দেশলাইর কাঠি, সাবান, ঝিনুক, মোম, সুতো, চীনে মাটির টালি এখন পুরনোর দলে। এবার প্রতিমা নির্মিত হলো কোথাও ধান, তেজপাতা, তিল, চীনে বাদামের খোসা দিয়ে। ধুন্দুলের খোসা, কলাপাতা, সাপের চামড়াও বাদ যায় নি। জানি না, এসব শাস্ত্রসম্মত কিনা? যদি শাস্ত্রসম্মতও হয় তবু এতে আমাদের শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যভাবনার অবক্ষয়ী দিকটাই কি প্রতিফলিত হচ্ছে না? নতুনত্বের ছড়াছড়ি করতে গিয়ে যে-সব কাণ্ডকারখানা চলছে তাকে কোন্ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করব? যদি দেবদেবীর মূর্তি কল্পনাতেও কিছু নতুনত্ব আনা যেত, তাহলে তাকে আমরা শিল্পসুষমার স্বাক্ষর হিসেবেও নয় মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু এতো তা নয়। এতে তো আমাদের কল্পনার ব্যাপ্তি বা ভাবের গভীরতা সৃষ্টি হচ্ছে না। জীবন ও সমাজের কোন নতুন ডাইমেনশানও নেই। সুতরাং দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ নিয়ে এমন ছেলেখেলা একেবারে অসহ্য। বৈচিত্র্য সৃষ্টির তাগিদে বা নতুন একটা কিছু করার ঝোঁকে অবক্ষয়ী ভাবনাকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আমার মতে এসব বন্ধ করা উচিত। শাস্ত্রকারগণ এবং জীবনপ্রত্যয়ী শিল্পীরা কি বলেন?

শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলকাতা - ২৬

চিকিৎসা ব্যবস্থাই রাষ্ট্রীয়করণ হোক

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ওড়িশা থেকে একশোর মতো ডাক্তার নিয়োগের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। এবং একে কেন্দ্র করে চিকিৎসকদের সংগঠন ও সরকারের মধ্যে উঠেছে বিপরীতধর্মী বিবৃতি-বিতণ্ডা। কিন্তু এই ঝগড়া কারো পক্ষেই স্বাস্থ্যের নয়। একথা ঠিক, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকের ভয়ংকর অভাব। এবং কলকাতা ছেড়ে কোনো ডাক্তারই গ্রামে যেতে চান না নানান কারণেই। তার মধ্যে ডাক্তারির সরঞ্জাম ও অন্যান্য যানবাহন প্রভৃতির অভাব অন্যতম হলেও প্রাইভেট প্রাকটিসে যে অজস্র রোজগারের সুযোগ থাকে শহর এলাকায়, তা গ্রামে সম্ভব নয়। ফলে চিকিৎসকদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের প্রতি অনীহা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্যদিকে আজ পর্যন্ত সামাজিক স্বার্থে জাতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে সরকার পরিকল্পনাভিত্তিক এক কদমও এগিয়ে আসেন নি। তাছাড়া ১৯৬৭ থেকেই এ রাজ্যে মেডিকেল পরীক্ষায় সংকট আর বিভ্রান্তি লেগেই রয়েছে। আগে ছ মাস অন্তর পরীক্ষা হত, এখন কোনো কোনো বছরে একটি পরীক্ষাও হয় না। অথচ গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের চাহিদা ভয়ংকর। আমার মতে, গ্রামাঞ্চলে যেমন চিকিৎসার সবরকম সুযোগ সুবিধে সৃষ্টি করা উচিত তেমনি ডাক্তারদের প্রাইভেট প্রাকটিসও বন্ধ করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক দেশে যেমন, চিকিৎসা ব্যবস্থা রাষ্ট্রাধীন আমাদের দেশেও তা অনুসরণ করা উচিত। এবং তা হলে শহরে থাকার কোনো বাড়তি সুযোগ থাকবে না। ফলে গ্রাম-শহরে পার্থক্য আসবে কমে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্য সরকারকেও আরো সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। সামাজিক স্বার্থেই জাতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা দরকার।

সত্যেন্দ্রসুন্দর সেনগুপ্ত,
কলকাতা - ২৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে শিক্ষাবিদ মহলে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যতই দিন যাচ্ছে তার জটিলতা বাড়ছে। ছাত্রদের পড়াশোনা, নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া এবং সময়মত পরীক্ষার ফল বের করা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বৎসর ধরে হিমসিম খাচ্ছেন। ছাত্রদের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে কিন্তু সে তুলনায় এত বৃহৎ ছাত্রগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করে উঠতে পারে নি। সমস্যার মূল সেখানেই। এক সময় ছিল যখন কলকাতাই ছিল পূর্বাঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। তার পরিধি বিস্তৃত ছিল গোটা পূর্বভারতে এবং সুদূর রেঙ্গুন পর্যন্ত। তখনকার দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছিল গৌরবের। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও তা ছিল আবাসিক। পূর্ববাংলার সব স্কুল কলেজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, তখনকার দিনে স্কুলের পরীক্ষাও পরিচালনা করত বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং কাজ তখনও কম ছিল না। তবে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা ছিল কম, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও এত ছিল না।

ক্রমে ক্রমে শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার প্রসার হল। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করে একটি পর্ষদের হাতে দেওয়া হল। পূর্ববাংলা গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে। খণ্ডিত পশ্চিমবাংলায় তৈরি হল অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়। এক কলকাতা শহরের ওপরেই যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হল। বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ এবং বিশ্বভারতী পেল নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু তাতেও কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা লাঘব হল। এখনও ছাত্ররা কলকাতায় পড়বার সুযোগ পেলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য এবং বাপ-পিতামহ যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন সেখান থেকেই স্নাতক হয়, এই মনোভাব শিক্ষার্থীদের কলকাতার দিকেই বেশি টানে। তার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার অঙ্গ ছেঁটেও ছোট হতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন সম্প্রতি এই সমস্যাগুলোর প্রতি সমস্যাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দীর্ঘদিন অবহেলা ও উপেক্ষাই ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে সরকারের কাছ থেকে। একথা স্বীকার করেও আমরা বলব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কর্তব্যঅবহেলাও আজকের পরিস্থিতির জন্য কম দায়ী নয়। ছাত্রদের দোষ দেওয়া হয় তারা পরীক্ষার সততা নষ্ট করে ব্যাপক টোকাটুকির পথ গ্রহণ করেছে বলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন কর্মী, পরীক্ষক ও প্রশাসকও কি এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় নি? পরীক্ষার কনট্রোলারের বিভাগ সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। পরীক্ষক, টেবুলেটর, প্রধান পরীক্ষক সকলেই কর্তব্যে গাফিলতি করে পরীক্ষাব্যবস্থাকে এমন শোচনীয় পর্যায়ে এনে ফেলেছে। দুর্নীতি কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তার একটি দৃষ্টান্ত ডঃ সেন নিজেই উল্লেখ করেছেন। ১৯৭১ সালে বি, ই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাজারে বিক্রী হচ্ছিল। হাতেনাতে কাউকে ধরতে না পেরে কনট্রোলারের বিভাগের একজন অফিসারকে অন্য বিভাগে বদলী করা হয় সেখানে তার পক্ষে 'কুকর্ম করার সুযোগ কম'।

আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহদায়তনই তার সুষ্ঠু প্রশাসনের অন্তরায়। তদন্ত কমিটি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় অন্তত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তিনটি কন্ট্রোলারের বিভাগ থাকা উচিত।' এ থেকেই অনুমান করা যায় কী বিশৃংখল অবস্থায় এত বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে অনেক সাধারণ ছাত্রও, অন্য কোনো জীবিকার অভাবে, উচ্চতর শিক্ষা চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ, ডিগ্রীর ওপরই আমাদের মোহ। কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের আগে দেখা হয় কটা ডিগ্রী আছে। এ জন্যই কোনো রকমে ডিগ্রী অর্জনের জন্য এত ব্যাকুলতা। এই সুযোগ নেয় দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সংখ্যাও বেড়েছে। পাঁচ বছর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট পরীক্ষার সংখ্যা ছিল ১৫৫টি; ১৯৭২ সালে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৮টি। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বৎসরে ছিল তিন লক্ষের ওপর। পাঁচ বছর আগেও তা ছিল দু' লক্ষের কম। এই অনুপাতে প্রতিবৎসর পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার সংখ্যা বাড়বে। কোনো পরীক্ষাই তার নির্ধারিত সময়সূচীতে নেওয়া যায় না এবং নির্দিষ্ট সময়ে তার ফলও প্রকাশ করা যায় না। এভাবে এই অতিকায় শিক্ষায়তন শিক্ষার মানই বা কতদূর বজায় রাখতে পারবে, শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগই বা কতটা দিতে পারবে? আজ বিশেষভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং তার পরীক্ষাপদ্ধতি কীভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায়। কারণ, এর সঙ্গে শুধু ছাত্রসমাজেরই নয়, দেশের ও সমাজের ভবিষ্যৎ জড়িত।

কেন্দ্রের শাসনাধীনে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে হলেও সুনিশ্চিতভাবে অন্ধ্রপ্রদেশে শান্তি ফিরে আসছে। যেটুকু গোলযোগ এখনও রয়েছে সেটুকু সীমাবদ্ধ রয়েছে চারটি জেলার মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছেন যে, অন্ধ্র বিভাগের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে যে সব সমাজবিরোধী ও নকসালপন্থী দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাচ্ছিল তাদের এই আন্দোলন থেকে পৃথক করে ফেলা গেছে।

কেন্দ্রের নিজের সর্ত অনুসারেই এখন অন্ধ্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার সময় এসেছে। নয়াদিল্লীর সর্ত ছিল, আগে অন্ধ্রের গোলযোগ বন্ধ করতে হবে, তার পর ঐ রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

এই আলোচনা আরম্ভ করার আগে দ্বিতীয় আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, অন্ধ্রের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধেই আন্দোলন। শ্রীমতী গান্ধীর ঐ বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আর দেরী না করে অন্ধ্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী কংগ্রেস নেতারা এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, যদিও তাঁরা অন্ধ্র ভাগ করার জন্য আন্দোলন করছেন এবং তাঁদের দাবী মানা না হলে তাঁরা কংগ্রেস ছাড়তেও প্রস্তুত তাহলেও তাঁরা শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর নীতির বিরোধী নন। কংগ্রেস নেতাদের এই বিবৃতির ফলে অন্ধ্রের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে কিছুটা বিভেদ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অন্য দিকে, এই বিবৃতি নয়াদিল্লীকে নিজেদের মুখ রক্ষা করে অন্ধ্রের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বসার সুযোগ করে দিয়েছে।

এখন যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে সেটা হল আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্ধ্রের যে বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বারা সেই বিভাগ কি ঠেকান যাবে? প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্র বিভাগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা এইটুকু নেমে এসেছেন যে, শান্ত, অনুত্তেজিত পরিস্থিতিতে তাঁরা অন্ধ্র বিভাগের প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখতে রাজি আছেন। তবে, তাঁরা এটা চান যে, অন্ধ্র সমস্যার সমাধান যেভাবেই হোক না কেন তাতে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা উভয় অঞ্চলের নেতাদের সম্মতি থাকা দরকার।

অন্ধ্র ভাগ না করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে কিনা সে বিষয়ে বিভিন্ন মহলের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন মহল মনে করেন যে, অন্ধ্র ভাগের সপক্ষে জনমত এমন তীব্র যে, ভাগ না করে এই জনমতকে শান্ত করা যাবে না। এমনিতেই অন্ধ্রে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্ধ্র অঞ্চল থেকে ১৫ জন কংগ্রেস এম-পি পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই অবস্থায় অন্ধ্র বিভাগের দাবী প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল, কংগ্রেসের দিক থেকে একটা বিরাট ঝুঁকি নেওয়া। অন্ধ্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসার আগে কেন্দ্রীয় নেতারা সেকথাটাও অবশ্যই বিবেচনা করবেন।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারকে খুব সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হবে, অন্ধ্র ভাগ হলে অন্যান্য রাজ্যের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি প্রায় সব রাজ্যেই ছোট-বড় নানা ধরনের আঞ্চলিক দাবী-দাওয়া আছে। আজ অন্ধ্র ভাগ করার দাবী মেনে নেওয়া হলে তার ধাক্কা ঐ সব রাজ্যের উপরও এসে পড়তে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা না করে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্র সমস্যার কোন্ চূড়ান্ত সমাধান বাতলাতে পারবেন।

অন্ধ্রের ঐক্য রক্ষা করার শেষ চেষ্টা হিসাবে এখন যে আপোষ প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হচ্ছে সেটা হল এই যে, আপাতত দশ বছরের জন্য অন্ধ্রকে দুই ভাগ করে পৃথক অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন করা হবে। দুটি অঞ্চল পৃথক দুটি রাজ্যে পরিণত হওয়ার পরও উভয় রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল ও একটি মাত্র হাইকোর্ট থাকবে। দশ বছরের ঐ মেয়াদের শেষে দুটি অঞ্চলকে আবার এক করার জন্য গণভোট নেওয়া হবে। আশা এই যে, ঐ দশ বছরের শেষে আর মুলকি বিধি চালু রাখার প্রশ্ন উঠবে না এবং দুই অঞ্চলের ঐক্যের এই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক দূর হয়ে গেলে আবার অখন্ড অন্ধ্র প্রতিষ্ঠায় অসুবিধা হবে না।

অন্ধ্রের পরিস্থিতি একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্যার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

•

ওড়িশা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

ওড়িশা মন্ত্রিসভার এই সম্প্রসারণের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, শিল্পমন্ত্রী নীলমণি রাউত রায়কে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্রীমতী শতপথী যে আটজনকে তাঁর মন্ত্রিমন্ডলীর সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের নাম তিনি বাছাই করেছেন শ্রী রাউত রায়ের সঙ্গেই পরামর্শ করে। শ্রী রাউত রায়ের অভিযোগ ছিল যে, উৎকল কংগ্রেস ছেড়ে এসে যাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাঁরা দলের মধ্যে পাত্তা পাচ্ছেন না। শ্রীরাউত রায় তাঁর এই অভিযোগ প্রকাশ্যেই

তুলেছেন। শ্রীমতী শতপথী এখন সেই ক্ষোভ দূর করার চেষ্টা করলেন।

এদিকে ওড়িশার তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী শতপথীর বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছেন। শ্রীবিজু পট্টনায়কের উৎকল কংগ্রেস, ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট কংগ্রেস ও শ্রীরাধানাথ সিং দেওয়ের স্বতন্ত্র দল মিলে যে ফ্রন্ট গঠন করেছে তার নাম দেওয়া হয়েছে ওড়িশা প্রগতি পার্টি। কটক উপনির্বাচনের মারফত শ্রীমতী শতপথীকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে তাঁর প্রতিপক্ষ অন্য রাস্তা ধরেছেন। শ্রীপট্টনায়ক প্রথমে আশা করেছিলেন যে, উৎকল কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্যদের কংগ্রেস থেকে বের করে এনে তিনি নন্দিনী মন্ত্রিসভাকে বিপদে ফেলবেন। তাঁর সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন তিনি যুক্তফ্রন্ট তৈরি করে আসরে নেমেছেন। ওড়িশা প্রগতি পার্টির যে সতের দফা কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেন্দ্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে কংগ্রেসের "একনায়কতন্ত্রী গোষ্ঠীর" বিকল্প সম্ভাব্য শক্তি গড়ে তোলাই হবে পার্টির উদ্দেশ্য। স্পষ্টতই, এটা ওড়িশা প্রগতি পার্টির পক্ষে বহুদূরবর্তী, অবাস্তব উদ্দেশ্য। তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই যুক্তফ্রন্টের প্রকৃত ও আশু উদ্দেশ্য হল, নন্দিনী মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ঘটান।

ওড়িশা প্রগতি পার্টির শক্তি এখন পর্যন্ত এমন কিছু নয় যাতে কংগ্রেস দুর্ভাবনায় পড়তে পারে। স্বতন্ত্র পার্টির ২৪, উৎকল কংগ্রেসের ১৮ এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেসের ৫, এই মিলিয়ে ওড়িশা প্রগতি পার্টির মোট সদস্য সংখ্যা ৪৮। অন্যদিকে ১৪০ জন সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেসের শক্তি হল ৭৮।

কংগ্রেসের আসল আশঙ্কাটা দল ভাঙার। যুক্তফ্রন্টকে সরিয়ে কংগ্রেস যে ওড়িশায় ক্ষমতা অধিকার করেছিল সে-ও দল ভাঙিয়েই। এখন শ্রীমতী শতপথীকে হঠাবার জন্য আবার দল ভাঙাবার চেষ্টা চলেছে। টাকার খেলাও চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শ্রীমতী শতপথী তাঁর মন্ত্রিসভাকে বাড়িয়ে সেই বিপদের সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ইতিমধ্যে, শ্রীমতী শতপথীর মন্ত্রিসভাকে টিকে থাকতে সাহায্য করার জন্য শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত দিল্লি থেকে ওড়িশায় আসছেন বলে জানান হয়েছে।

●

ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি ও ইন্দোচীন থেকে মার্কিণ সৈন্য অপসারণের পর পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি কি চেহারা নেবে সেই বিষয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা ইতিমধ্যে যেসব সিদ্ধান্তে এসেছেন সেগুলি হল :—

(১) যদিও ভবিষ্যতে আমেরিকা এই অঞ্চলের কোন দেশের বিরুদ্ধে গতানুগতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই তাহলেও এই অঞ্চল থেকে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি এখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে না। জাপান, তাইওয়ান, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস প্রভৃতি আশ্রিত দেশগুলিকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা এশিয়ায় থেকে যাবে। প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েট নৌবহরের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যও আমেরিকা এই অঞ্চলে তার সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখবে।

(২) এশিয়ায় আমেরিকার এই উপস্থিতি চীন-মার্কিণ সম্পর্কের উন্নতির প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং তার সহায়ক হবে। চীনের বর্তমান বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়াকে ঠেকান। এশিয়ায় আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি তার সেই লক্ষ্যের প্রতিকূল নয়, বরং অনুকূল।

(৩) পূর্ব এশিয়ায় নিজের প্রভাব বাড়াবার জন্য বিভিন্ন শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হবে। মার্কিণ যুক্ত[illegible] সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন, এই তিন শ[illegible] চাইবে যাতে শান্তি ফিরে আস[illegible] ভিয়েতনাম আন্তর্জাতিক সম্পর্কের [illegible] নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে চলবে। হয়ত তার বিপ্লব রপ্তানি করার [illegible] ছেড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক [illegible] তার প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা ক[illegible] পারে। সেক্ষেত্রে পূর্ব এশিয়ায় তার এ[illegible] প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে জাপান। ভা[illegible] সোভিয়েটকে খর্ব করা চীনের এ[illegible] প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে। এই উদ্[illegible] সাধনের জন্য সে ভারতের সঙ্গে অধিক স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসুক [illegible] পারে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি দক্ষিণ-[illegible] এশিয়ায় ভারতের স্বাভাবিক প্রাধান্য [illegible] করে সেই জায়গায় ইন্দোনেশিয়াকে বস[illegible] চেষ্টা করতে পারে।

৩-২-৭৩ —পুণ্ড[illegible]

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ ক্যালকাটা জুট ফ্যাব্রিকস শিপার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবে ভাষণ দিচ্ছেন।

ভিয়েৎনামে এইসব শিশুদের যুদ্ধের সময় মা-বাবার কাছ থেকে সরিয়ে আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়। তারপর তাদের ক্রমাগত এক আশ্রয় শিবির থেকে আর এক আশ্রয় শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্লেকুর এমনি একটি আশ্রয় শিবিরের শিশুরা যুদ্ধবিরতির জন্য দিন গুনছে।

কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে, কিম্ব ঘটার কথা ছিল অথচ ঘটেনি, অথবা অনেক দিন আগে ঘটেছিল যা কাল মনে পড়েছে হয়তো কাউকে দেখে অথবা কারো পুরোনো কোনো চিঠি বা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে- তারই উপর এক পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম হলেও প্রবীণ ও নবীন লেখকদের কলমে এই ফিচার বুদ্ধির দীপ্তিতে আ হৃদয়বৃত্তির গভীরতায় লক্ষ্যভেদ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঠকরাও যোগ দিতে পারেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘুম ভাঙতেই কাল সকালে পায়ের দিকের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটায় চোখ পড়েছিল।

লাল কালিতে ছাপা তারিখটা ছাপির দিনের সূর্যোদয়ের রঙে যেন ছোপানো। কিন্তু তার ওপরের কালো অক্ষরের কলঙ্ক-রেখাগুলোই ভাবিয়ে তুলেছিল।

লেখাগুলো অবশ্য আমারই। স্মরণশক্তি একটু দুর্বল বলে ক্যালেন্ডারের পাতাগুলোতেই দরকারী দেখা-সাক্ষাৎ প্রত্যাশা-প্রতিশ্রুতির একটু হদিস লিখে রাখি, দিনের সুরুতেই যাতে মনে পড়ে যায়।

লেখার সুফল অবশ্য সব সময়ে মেলে না। সকালের লেখা বিকেলে ভুলে যাবার ঘটনা একেবারে বিরল নয়।

তার চেয়ে বেশী যা বিপদ বাধে তা হদিস যা দেওয়া থাকে তার পাঠোদ্ধার নিয়ে। লেখবার সময়ও আমার পিঁপড়ের ঠ্যাং মার্কা হরফে প্রাণের আনন্দে বেপরোয়া কটা আঁকিড়ির ইশারা টেনে রাখি। যথাসময়ে তা পড়তে নিয়ে আতস কাঁচেও মাঝে মাঝে কুল পাই না। হরিশের আসবার কথা রিষড়া যাওয়ার আমন্ত্রণ বলে ভুল হয়।

সেই বিপদই হল লাল তারিখের ওপর কালো আঁকিড়িগুলো নিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও কি যে লিখেছি সঠিক কিছুতেই বুঝতে বা স্মরণ করতে পারলাম না। এইটুকু শুধু বুঝলাম যে কিছু একটা প্রত্যাশার ইঙ্গিতই ওখানে আছে। কার যেন আসার বা কি যেন একটা হওয়ার।

কে তাহলে আসছে? আর আসার ব্যাপার যদি না হয় তাহলে কি এমন আর হওয়ার কথা যার সম্বন্ধে উৎসুক ইঙ্গিত ওই কটা অবোধ্য কালির আঁচড়ে দেওয়া?

একটু ভাববার চেটা করতে করতেই জানলাটা খুলেছিলাম পশ্চিমের।

না, আগের দিনের মত কুয়াশার ঘন পর্দায় চোখ আটকে যায়নি। প্রসন্ন উজ্জ্বল সকাল। ওপারের জেলখানার রাঙা দেয়ালের একটা বাঁকে নদী ডিঙিয়ে ভোরের একফালি রোদ পড়েছে। একফালি রোদ, কিন্তু তার ওপর একটু বিশ্বাস রাখলে সে যেন চোখের ওপর ভেল্কিবাজি দেখাতে পারে। দেয়ালটাকে তার সোনালী যাদুতে গালিয়ে জেলখানাটাকে বানিয়ে দিতে পারে একটা ভুলে যাওয়া শতাব্দীর রহস্যপুরী।

ভোরের রোদকে সে ভেল্কি লাগাতে দেবার অবসর কই?

নিচে কড়া নড়ছে। তার সঙ্গে চেনা গলার হাঁক।

কাগজ এসেছে কাগজ!

নিচে থেকে ওপরে খবরের কাগজটা হাতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভোরের সমস্ত মায়াটা কি কেটে গেছে!

তা যাবারই কথা। সমস্ত দুনিয়া যেখানে হঠাৎ হুড়মুড়ে করে ঢুকছে সেখানে ওপারের জেলখানার দেয়ালের একটু রোদের আলো দেখার কি তেতালার ছাদ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে ওঠা বন্যা কলহটাই গায়ে চড়ুইদের আলাপ শোনবার সময় কোথায়!

মনটা খানিকক্ষণ সারা ভূগোলময় ছড়ি ছিল। প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে সূর্যদে যেখান থেকে উঠে এসেছেন সেই সুদ ভিয়েৎনামে। সন্ধির চুক্তিতে স্বাক্ষর পড়ে কাগজের ওপর, কিন্তু মাটির বুকে মরণ সংগ্রাম এখনও নাকি থামতে চায় না। ওদি কানপুরের ক্রিকেটে ভারতের উঁচু মাথা হে হতে হতে কোনরকমে নাকি বেঁচেছে বিশ নাথের পাঁচাত্তরে। কয়লার রাজ্যে এদি হুলুস্থুলু ব্যাপার। চারশো চৌষট্টিটি ক কয়লার খনি রাত পোহাতেই পুরোপু ভারত রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন হয়েছে। এ মধ্যে এক কলমের পাইকা শিরোনামার খে খবরও আছে মেজাজ খুশি করবার। সাহ মরুভূমির এক হাজার আটশ মাইল পা হেঁটে পার হয়েছেন দুজন ভারতের যুব

খবর অমন দু-পাঁচটা তো নয়। আ আরো অনেক। কিন্তু বিশ্বের খবর নি নিতে চোখের সঙ্গে মনটা একসময় ঘ থামটার ওপর আটকে গিয়েছে। হ্যাঁ সেই যাত্রাটা আজো চলছে। গতকাল সন্ধ্যার প ওটা দেখেছিলাম।

এবার শীতটা নিজের রাজপাট ঠিক বজায় না রাখতে পারার দরুণ প্রাণীজগতে টাইমটেবলে একটা গণ্ডগোল হয়ে গে বিশেষ করে কীটপতঙ্গের রাজ্যে এলোমে হয়ে গেছে নিয়মকানুনগুলো। আগের সন্ধ্যার পর একটা আর্শুলাকে নাতিদ

পায়ে আমার ঘরের মেঝে পার হতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। ডিসেম্বরের তিরোধানের পর তাদের পুনরাবির্ভাবের তারিখ ত এউনও আসে নি।

সেই আর্শুলাটিকে খানিক বাদে এক পিপীলিকা বাহিনীর স্কন্ধে ওই থামটির ওপর আরোহণ করতে দেখেছিলাম। ইতিমধ্যে অকাল আবির্ভাবের অসুস্থতায় না কোন দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে তা অবশ্য সন্ধান করিনি।

গত বারেই পিঁপড়েদের পন্ডশ্রমের নমুনা দেখে একটু করুণা বোধ করেছিলাম। থামটির মাঝামাঝি সেটিকে ঘিরে একটি ঈষৎ উঁচু বেড় গোছের আছে। সেইটি পার হবে ওঠবার সময় প্রত্যেকবার পিঁপড়েদের দখল থেকে আর্শুলার লাশটি নিচে পড়ে গেছে। পিঁপড়েরা নির্বিকারভাবে আবার কাঁধ লাগিয়েছে নিচের মেঝে থেকে সেটিকে ওপরে তোলবার জন্যে।

সেই শবযাত্রার রিহার্সাল সকালে তখনও চলছে এবং সমানেই চলবে যতক্ষণ না ঘর পরিষ্কারের প্রয়োজনে কারও সম্মার্জনী এখানে এসে না পৌঁছোয়।

পিঁপড়েদের এ পন্ডশ্রম থেকে কোনো নীতিতত্ত্ব ছেঁকে তোলবার চেষ্টা কিন্তু সত্যি করিনি। চোখটা আবার তখন চলে গেছে ক্যালেন্ডারের রাঙা তারিখটার ওপর।

ভেবেছি কে আসবে আজ? কিংবা কি এমন একটা হবার আশা করতে পারি যা কিছুতেই মনে করতে পারছি না?

তারপর সারা দিনই থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে ক্যালেন্ডারের লাল তারিখটা মনের ভেতর উঁকি দিয়ে গেছে। বেলা বাড়ছে। স্নান করতে গিয়ে উত্তরের জানালাটা ঠান্ডা হাওয়ার জন্যে বন্ধ করতে গিয়েও খুলে ধরে দাঁড়াতে হয়েছে। আমাদের রাস্তাটা অকুলীন। ইঁট সুরকী বালি চুন বিক্রীই তার জীবন। লরী টেম্পো আর গরুর গাড়ির ভিড়ে সেখানে সৌখিন মোটর ভিড়তে চায় না। পৌরকর্তারাও তার কথা বোধহয় ভুলে থাকেন। নির্বাচনের উত্তেজনাতেও কন্টেস্টেন্টেরা মেরামতীর কাজ অর্ধেকের বেশী এগোয় না। সেই রাস্তারও একটা আলাদা রূপ নেহাৎ বাসিন্দে বলেই বোধহয় আমাকে টানে। এমনিতে কিছুই অবশ্য বর্ণনীয় গোছের দেখবার নেই। দূরের কটা নারকেল গাছের মাথা দুলিয়ে নাড়া একটা সজনে গাছের ডাল কাঁপিয়ে হু-হু করে হাওয়া বইছে উত্তর থেকে। আমাদের বাড়ির লাগাও সুরকির গুদামের টিনের বিস্তৃত ছাদে একটা কেঁদো নোংরা চেহারার বেড়াল হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। কটা কাক তার এদিকে ওদিকে একটু দূরত্ব রেখে যেভাবে আড়চোখে তার দিকে নজর রেখে নাচের লাফ দিতে দিতে উড়ে উড়ে বসছে তাতে মনে হচ্ছে মার্জার মশাই-এর লেজটা নিয়ে একটু রসিকতা করা তাদের অসাধ্য নয়। নিচের রাস্তার ধারে সুরকির কলের টিনের দেয়ালের আড়ালে একটা দড়ির খাটিয়া পেতে দুই বুড়ো সর্দারজি তাঁদের সুখদুঃখের গল্পই করছেন নিশ্চয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। তারপর সন্ধ্যা।

দুপুরের পর সারা বিকেল একটা বই-এর মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিলাম। নতুন নয় আগের পড়া বই। বার্ট্রান্ড রাসেলের আত্মজীবনীর প্রথম খন্ড। এক আশ্চর্য মানুষের সংগে একটা বিস্মিত যুগ কাটিয়ে এসে মনের ওপর কেমন একটা আচ্ছন্নতা নেমেছিল।

তারই ভেতর ক্যালেন্ডারের দিকে আমার চোখ গেল।

একবার মনে হল কই কেউ ত আসেনি, হয়নি ত কিছুই।

আজ ভাবতে বসে মনে হচ্ছে, সত্যিই কি হয়নি?

অরণ্যের কুসুমে ফটো: পদ্মকুমার রায়

বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী

প্রণব রায়

প্রকৃতির উপাসক আর্যরা ভারত ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর থেকে যেসব দেবদেবী ভারতীয় জনমানসে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছিলেন এবং আজও যাঁরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন, তাঁদের মধ্যে সরস্বতী যে নিঃসংশয়ে অন্যতমা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বেদের প্রধান তিন দেবতা—অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য কোন্ বিস্মৃত অতীতে তাঁদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছেন; পৌরাণিক যুগে সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের পরিবর্তে তিন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। সেই প্রধান তিন দেবতা থেকে আবার কালে কালে বহু দেবতার সৃষ্টি—ভারতীয়েরা নির্বিচারে এঁদের স্থান দিয়েছেন তাঁদের মনের মণি-কোঠায়। বস্তুতপক্ষে, নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সংঘাতের ফলে জন্ম নিয়েছেন আমাদের বহুল উপাসিত বর্তমান দেব-দেবী, যাঁদের অনেকগুলিই কালিক বিচারে নেহাতই অর্বাচীন—বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘাত বা সঙ্ঘর্ষের ফল। অর্বাচীন যুগের এসব দেবদেবীর অস্তিত্ব কখনই কল্পনা করেননি আর্যেরা, প্রকৃতির বিশুদ্ধ রূপের ধ্যান-ধারণাই ছিল যাঁদের ধর্মচেতনা এবং ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির উৎস।

বর্তমানে আমাদের বহুল উপাসিতা সরস্বতী হচ্ছেন এমন এক দেবী যিনি সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আজও জনমানসে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে আছেন। বৈদিক দেবদেবীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই যুগযুগান্তরের ধর্মীয় সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়েও আপন মহিমায় আজও ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। বৈদিক যুগের অন্যান্য দেবদেবীদের নানাভাবে রূপান্তরী-করণ ঘটলেও আর্যদের উপাসিতা সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীরূপে আমাদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধালাভ করে থাকেন। অবশ্য গোড়ার দিকে তিনি উপাসিতা হতেন নদীরূপে। ঋগ্বেদের যুগে সাতটি প্রধান নদীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। কিন্তু নদীরূপে তাঁর প্রকাশ হলেও সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহবতী দেবীরূপেও ঋষি তাঁকে প্রণতি জানিয়েছেন। দেবী সরস্বতী যজ্ঞানুষ্ঠান-কারীদের প্রজ্ঞাসমূহের এবং সত্যবাক্য ও শোভনবুদ্ধির প্রেরয়িত্রীরূপে বর্ণিত হয়েছেন (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ৩য় সূক্ত)। সরস্বতী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সরস্+বতী বা প্রভূত জল আছে যেখানে বা যে নদীর। সরস্বতী আর্যগণ-অধ্যুষিত এক অতিপ্রসিদ্ধ নদী, যার কূলে কূলে বিস্তৃত হয়েছিল আর্যসভ্যতা। নদীর দুই কূল মুখরিত হতো আর্য ঋষিদের মধুর বেদধ্বনিতে, যাগ-যজ্ঞ সম্পন্ন হতো তার তীরে। সরস্বতীর সুন্দর স্বচ্ছ সলিলে বিচরণ করতো শুভ্র হংসমালা—ঋষিরা পূতসলিলে অবগাহন করে শুদ্ধ হতেন, পবিত্র জলে সম্পাদন করতেন যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া—তাঁদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতো মধুর বেদবাণী। নদী সরস্বতীর দেবী ও

মাতৃরূপটিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতেন তাঁরা। সরস্বতী তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ধনসমৃদ্ধি ও বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। ঋষির কণ্ঠে মন্দ্রিত হয়েছে এই অপূর্ব মন্ত্রটি—

অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব
নস্কৃধি।। (২, ৪১, ১৬)

এর অর্থ হলো, 'সরস্বতি! তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ নদী, শ্রেষ্ঠ দেবী। ধনাভাবে শ্রীহীনের ন্যায় আমরাও শ্রীহীন হয়েছি। মাতঃ, তুমি আমাদের সেই শ্রী বা সমৃদ্ধি দান কর।' এই শ্রী বা সমৃদ্ধি গূঢ় অর্থে বিদ্যা বা জ্ঞান। অবশ্য ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে তাঁকে জ্ঞান ও সত্যবাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেও বলা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকের এক স্থানে সরস্বতীকে যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা যে ধনলাভ হয় তার কারণ বলা হয়েছে। বিশেষ অর্থে এই ধন যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি।

বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞপ্রধান সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হতো, সরস্বতীর তীরে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হতো বলে আর্যগণ তাঁর কাছে প্রার্থনা করতেন এই বিশেষ প্রজ্ঞাকে। তাই নদীরূপে বন্দনা করে তাঁকে আবার জ্ঞানদাত্রীরূপেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্রগুলিতে সরস্বতীকে দেবী ও নদীরূপা—এই দুভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। শেষদিকের মন্ত্রে তাঁর দেবীরূপটি যেন আরও বেশী প্রকট হয়েছে মনে হয়। এমনকি বাগ্দেবতা-রূপেও তাঁকে বলা হয়েছে। সপ্তম-অষ্টম মণ্ডলের কোন কোন সূক্তে অন্যান্য দেব-দেবীর মধ্যে সরস্বতীর যে উল্লেখ আছে তাতে তাঁকে বাগ্দেবীই বলা হয়েছে। কোন কোন ভাষ্যকার অবশ্য ঋগ্বেদের গোড়ার দিকের অনেক মন্ত্রেও সরস্বতীকে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করেছেন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৪ সূক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য সরস্বতী পদের অর্থ করেছেন 'গদ্যপদ্যরূপে যাঁর প্রকৃষ্ট সরণ বা প্রকাশ হয় বা বাগ্দেবতা'। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ১ম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বৃহদ্দেবতাকার শৌনক বলেছেন, সরস্বতীসূক্ত প্রাতঃকালে জপ করলে দ্বিজ বুদ্ধিমান ও বাগ্মী হয়ে থাকেন। দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে বাগ্দেবীর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি সৃষ্টির আদি কারণ এবং রুদ্র, বসু, আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের শক্তির উৎস বলে উল্লেখিতা হয়েছেন। বাজসনেয়ী সংহিতার একস্থানে (১৯, ১২) আছে, সরস্বতী বাক্যের সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করেছিলেন দেবাসুরের যুদ্ধে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, দেবাসুরের দ্বন্দ্বে বৃত্রাসুরবধের সময় সরস্বতী দেবগণকে উৎসাহিত করেছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তাঁকে বাক্‌রূপা বলা হয়েছে—'বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী'।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, পুরাণের যুগে যে সরস্বতী সামগ্রিকভাবে বিদ্যা, বাক্ ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে কল্পিতা হয়েছেন, বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীর সেই গুণগুলির খণ্ড খণ্ড প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নিরাকার ব্রহ্ম-চৈতন্যের উপাসক আর্যগণের কাছে তিনি কখনও নদীরূপে, কখনও মাতৃরূপে, কখনও বা দেবীরূপে জ্ঞান, কর্ম, বিদ্যা ও শুদ্ধ-চৈতন্যের প্রেরয়িত্রী, কখনও বা তিনি ত্রিলোকব্যাপিনী—ইলা (পৃথিবীস্থা বাক্), ভারতী (স্বর্গস্থা বাক্) এবং সরস্বতী (অন্তরিক্ষস্থা বাক্)। অন্তরিক্ষস্থা বা মাধ্যমিকা বাগ্রূপে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪৩ সূক্তের একাদশ মন্ত্রে। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (গণেশখণ্ড ৪০ অধ্যায়) বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'বেদশাস্ত্রযোগমাতা' সাবিত্রী, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বজ্ঞানাত্মিকা দুর্গা এবং সরস্বতী হলেন বাগ্ধিষ্ঠাত্রী দেবী—কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা। সেখানে রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতীকে মূল প্রকৃতির পঞ্চ রূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে উল্লিখিত বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী আজ বাগদেবতারূপে বিদ্যা, বাক ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হচ্ছেন। তবে তাঁর এই শক্তিগুলির সবই কল্পিত হয়েছিল ঋগ্বেদের যুগে। নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানের প্রতিভূরূপে তাঁর শ্বেতরূপের যে বর্ণনা পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, বহু আগেই সরস্বতী নদীর স্বচ্ছ সলিলের মধ্যে সেইরূপ দর্শন করে-ছিলেন আর্যঋষিগণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, আর তাঁদের মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হতো সরস্বতীর শুদ্ধিময়তা, পৌরাণিক যুগের সাধক যাকে অবলম্বন করে দেবী সরস্বতীর একটি পরিপূর্ণ সাকার মূর্তি কল্পনা করে নিয়েছেন।

নানা বর্ণের ছবি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা হাঁটছিল। ওরা কেউ কথা বলছিল না। যেন কথা বলতে সবার ভয় করছে। যতটা এভাবে যাওয়া যায়। পাশের বাড়ি-গুলোর একটারও জানালা খোলা নেই। রাতে এমন কি দিনের বেলাতেও এখানে জানালা খোলা রাখতে আজকাল সকলে ভয় পাচ্ছে। মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি, গাড়ির কালো রঙের বীভৎস এক ছবি সব সময় চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

ওরা হাঁটছিল। এমনভাবে ছ'-সাতজন মানুষের উদাসীন ছায়া ক্রমে গলি পার হয়ে বড় রাস্তায়, বড় রাস্তা ধরে ওরা বেশী সময় হাঁটল না। ওরা দত্তবাগানের কাছে এসেই মিল্ক ডিপোর বাঁ-দিকে সর্টকাটে উঠে যাবে ঠিক করেছে। কারণ, ওরা রেল লাইন পার হয়ে কিছু ফাঁকা জায়গায় চুপ-চাপ বসবে এমন বুঝি কথা আছে—অথবা এক অসহায় হত্যাকাণ্ড ঘটবে, এবং চারপাশে এক অসহনীয় হত্যাকান্ড ঘটবে, এবং চার-পাশে এই অন্ধকার রাত্রি, দূরে পুলিশের বুটের শব্দ শুনে সবারই চোখমুখ সতর্ক হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে ওরা হাঁটছিল। কেউ কথা বলছিল না। আকাশ ভীষণ পরিষ্কার। প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র যেন এখন ইচ্ছা করলে স্পষ্ট গোনা যাবে। লাইট পোস্টের আলো-গুলো বেশ ভালভাবে আলো দিচ্ছে রাস্তায়। ওদের ছায়াগুলো ক্রমে কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছে, কখনও বড় হয়ে যাচ্ছে। আবার কখনও অন্ধকারে উদাসীন ছায়া সব মিশে গেলে ওরা কেমন সতর্ক হয়ে যাচ্ছে।

রেল-লাইনে ওঠার মুখেই বিনয় বলল, তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস।

—বেশীদূর না, সামনে।

বিনয় আবার হাঁটতে থাকল ওদের সঙ্গে। বেশীদূর না, সামনে। এই বলে ওরা ওকে কতদূরে নিয়ে যাবে সে জানে না। ও অনেকক্ষণ থেকে কথাটা বলবে বলে ভেবেছিল অমলকে—তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস, কিন্তু সে তো জানে, যখন সে গত জুলাই মাসের এক বৃষ্টির রাতে, গভীর অন্ধকারে কোন মাঠের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, আর একজনকে বলেছিল, 'এই বেশী দূর না, সামনে, যেন সামনেই কোথাও একটা বড় গাছ আছে, তার নীচে নিরিবিলি ছায়া আছে, সেই ছায়ায় বসে একটু দুঃসাহসিক গল্পের ভিতর ডুবে যাওয়া—

বুঝলে সুজয়, পৃথিবীতে তোমার বেঁচে থাকার আর কোন অধিকার নেই। তুমি ট্রেটর। এবং এই ট্রেটর শব্দটি মাঝে মাঝে ওর কানে এসে কেমন ধাক্কা মারছে। এতদিন পর ওর মনে হচ্ছে সুজয়ের সেই বিনীত চোখ, কোমল আত্মসমর্পণ সব কেমন অর্থ-পূর্ণ ছিল। এতদিন এটা ঠিক মনে যে হয়নি, তা না, ধীরে ধীরেই সে বুঝতে পেরে-ছিল কোথাও কোন গাছের নীচে কেউ দাঁড়িয়ে কেবল বলছে, তোরা আমাকে অনর্থক মেরে ফেলছিস। আমি এসব ছেড়ে দিয়েছি বলে, তোদের বিরুদ্ধে যাইনি। আমার আর ভাল লাগছে না কিছু। আমার যা হয়েছে, তোরা আমাকে না মেরে ফেললে আমি হয়ত এমনি মরে যেতাম।

—তুমি মরতে না সুজয়। এমনিতে কেউ মরেও যায় না।

—মরে যায় বিনয়। বিশ্বাস কর, এখন কেমন রাতে ঘুমোতে পারি না। কেবল চারপাশে সন্দেহ সংশয়। মনে হয় কারা চার পাশে আমার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তামাসা দেখছে। আমি এটা বুঝতে পেরেই সরে এসেছিলাম।

—শুধু এজন্যই তোমার আর বাঁচা উচিৎ হবে না। তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবছ। নিজেকে নিয়ে যারা ভাবে তাদেরও আমরা ট্রেটর মনে করি।

—এটা ঠিক না বিনয়। সুজয় ওদের অবিশ্বাস করতে পারেনি। প্রথম হালকাভাবে নিয়েছিল ব্যাপারটা। ওর ধারণা ছিল, ওকে কাছে রাখার জন্য বিনয় অমল অমিয় সবাই আবার নিয়ে যাচ্ছে। যদি মত পাল্টানো যায়। এবং এভাবেই সুজয়ের সেদিন ধারণা ছিল

না ওরা ডেকে নিয়ে তাকে কোন গাছের নীচে রেখে আসবে।

বিনয় যেতে যেতে বলেছিল, আজকে মনে হচ্ছে অমল, আমরা সুজয়কে গাছের নীচে রেখে না এলেও সে একদিন ঠিক গাছের ছায়ায় চলে যেত।

—সেটা সবাইকে যেতে হয়।

—ওকে অসময়ে যেতে হত।

অমল বলল, এখন মানুষের সবটাই সময়, সবটাই অসময়।

বিনয় এর ব্যাখ্যা চাইল না। সে নিজেকে খুব সাহসী করে তুলছে। যদিও মাঝে মাঝে মায়ের মুখ, ছোট ভাই-বোনগুলির মুখ মনে পড়ছে এবং ওদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা --ওদের অপেক্ষা, তুই কোথায় যাচ্ছিস বিনয়, অমল তোমরা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, অমল তুই তো আমাকে মাসিমা বলতিস, তুই আমার গরমে কত ঘামাচি মেরে দিয়েছিস, একবার তোর মা-বাবা কোথায় উত্তরে বেড়াতে গেল, তুই তো অনেকদিন আমার পাশে শুয়েছিস, একদিকে বিনয়, একদিকে তুই, তোরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বিনয়কে—বলে যা-না। আমরা এই দরজায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব ?

এভাবে মায়ের মুখ মনে হলে সে সুজয়ের কথা মনে করতে পারে। সুজয়ের মা ছিল না। বুড়ো বাবা কোনো প্রেসে প্রিন্টারের কাজ করত বোধহয়। প্রিন্টারের কাজ করলে মানুষের চোখ খারাপ হয়ে যায়—চোখে সে ভাল দেখতে পেত না, এবং এক রাতে সুজয় এসে যখন বলল, বাবা অন্ধ হয়ে গেছে—বাবাকে আমার দেখা দরকার। তুমি তো জানো বিনয়, আমি বাদে এখন আর তার সম্বল বলতে কিছু নেই। আমার কাকা কেন জানি সহসা বাবার ওপর সদয় হয়ে গেছেন। তার দয়ায় আমার একটা চাকরি জোগাড় হয়েছে। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।

বিনয়ের মনে আছে সে এতটুকু যেন শুনতে পায়নি কথাগুলো। ওরা ছিল এভাবে একটা দল—পৃথিবীতে একটা বড় স্বপ্নের ভিতর ওরা মানুষ হচ্ছিল—স্বপ্নটা কে যে কিভাবে গড়ে দিয়ে গেল—সেই শিশুবয়সে কেমন রংগীন কাঁচের ভিতর পৃথিবীকে দেখা যায় ভারি সুন্দর, নদী-নালা মাঠ সব লাল নীল হলুদ—পাখিরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে ফিরে যাচ্ছে, শস্য ভরা মাঠ, কেবল দৌড়াতে ইচ্ছা হয় সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে, বাবা মা, দিদিরা সব আছে চার পাশে, ওরা সুন্দর পৃথিবীতে শিশুদের জন্যে কেবল টফি কিনতে ভালবাসে অথচ সে জানে না, পৃথিবীতে কত শিশু খেতে পায় না, কত শিশুর মৃত্যু হচ্ছে হাতে টফি আসতে না আসতেই, কত শিশু ক্ষুধার্ত, এবং দুঃখ বেদনা হতাশায় কত শিশু মাথার ওপর বড় আকাশ কখনও দেখতে পায় না, সে জানে না বলেই নিজের জন্য এক আশ্চর্য পথ গড়ে নেয়, সেখানে সব আশ্চর্য জীবনের সমারোহ।

ঠিক এইভাবে বিনয়কে কে যেন বলে গেল, শুধু বিনয়কে কেন—এই যারা সবাই বড় আকাশের নীচে বাঁচতে চায়—তাদের বলে গেল, জানো পৃথিবীতে কত মানুষ না খেয়ে মরে যায়? জানো কত মানুষ পৃথিবীতে অচিকিৎসায় মরে যায়, জানো কত কত মানুষ গাছের নীচে দাঁড়ানোর অধিকার পায় না, জানো কত মানুষ ঝড়-বাদলের রাতে একটু আশ্রয় পায় না!

বিনয় অমল আরও সব যারা পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ার স্বপ্ন দেখে থাকে—তারা শুনতে শুনতে মুহ্যমান হয়ে যায়।—এরা কত ?

—এরা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। তারপরই তিনি যেন থামতেন, এক অলৌকিক পুরুষের মত চোখ বুজে থাকতেন কিছুক্ষণ, ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে পায়ের কাছে বসে আছে। তিনি কিছু বলছেন না। পাশের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে—গোপনে এমন সব সভায় কে যেন আসেন এভাবে—এবং এক নতুন পৃথিবীর সংবাদ দিয়ে যায়—যেখানে অধিকাংশ মানুষের সুখ এবং সম্পদের জন্য কিছু মানুষকে গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে দিতেই হয়। এভাবে যখন পৃথিবীতে এই কিছু মানুষের সংখ্যাটা নিঃশেষ হয়ে যাবে, অধিকাংশ মানুষের জন্যই হবে এই পৃথিবী তখন আশ্চর্যভাবে সবাই দেখতে পাবে খুব বড় আকাশের নীচে সবাই বসবাস করছে।

বিনয় বলেছিল, আমরা কত অসহায় এ-ব্যাপারে ?

তিনি এমন ভাবে হাসতেন যে ওদের ভিতরটা কেমন কাঁপত। যখন কাজটা আরম্ভ হয়, তখন এভাবেই আরম্ভ হয়। কোথাও একজন বা দুজন কাজটা আরম্ভ করে দেয়—তারপর একে একে সর্বত্র কি করে যে মানুষের ভিতর সুন্দর পৃথিবী গড়ার বাসনা জাগে। তখন তুমি দেখবে, তোমার পাশে রয়েছে এইসব অধিকাংশ মানুষ, তুমি তাদের, তারা তোমার। কোথাও মিছিল দেখবে, বড় মাঠ, মাঠের শেষে একটা বড় জলাশয়, সেখানে পৌঁছলেই বুঝে যাবে-- আমরা এসে গেছি। তারপর কেমন টেনে টেনে যেন অনেক দূর থেকে বলে চলার মতো অথবা অন্ধকারে কবিতা উচ্চারণের মতো বলতেন, এখন শুধু কাজটা আরম্ভ করে দেবার সময়। ভাববার সময় এখন নয়। এবং এভাবেই ওদের সেই মানুষটার জন্য এক আশ্চর্য ভালবাসা জন্ম নেয়। ওরা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। মাথা গুঁজে বসে থাকে। আর যখন মাথা তুলে ওরা দেখে, দেখতে পায় তিনি নেই। ওদের মনে হত, তিনি হয়ত এখন কোন নগরে বা উপনগরে অথবা সুদূর জনপদে হেঁটে যাচ্ছেন। এ-ভাবেই ওরা একসঙ্গে একসময় কাজ আরম্ভ করে দিয়ে দেখতে পেয়েছিল, চারপাশেই নদীর জল বেশ জোরে নেমে আসছে! এক কঠিন জোয়ারে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অথচ জোয়ারের জল বেশীদিন কেন যে ওরা নির্মল রাখতে পারল না। ঘোলা জলে চার-পাশটায় ঢেকে গেল সন্দেহ, সংশয়, তারপর অহেতুক গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে রাখা।

বিনয় বলল, আর কতদূরে নিয়ে যাবি।

অমল কথা বলল না। সে কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। পাশে যারা আছে তাদের দিকে সে তাকাতে পারছে না। সে এটা একা করছে না, কেউ এ-কাজ একা করে না। দলের পরামর্শেই এমন ঠিক হয়েছে। বিনয়ের পর দলের দায়িত্ব তার কাছে এসে পড়েছে। সে মাঝে মাঝে নিজেও কেমন দিশেহারা হয়ে যায়। অথচ চোখ বুজলেই টের পায় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তার সঙ্গে যেন যোগ দিচ্ছে। সে হেঁটে যাচ্ছে, ওর পায়ের জুতোর সোল খসে পড়ে গেছে। হাত পা মুখ ধুলো ভর্তি। কতদিন ঠিকমত স্নানাহার নেই। চুল রুক্ষ। উপবাসে কোঠরাগত চোখ। এবং জুতো ছিঁড়ে পায়ে ফোসকা, ঘা তবু পা টেনে টেনে চলা। কারণ কতদূর আছে বড় জলাশয়টা কেউ যেন বলতে পারছে না। এবং এভাবে চোখ বুজলেই সে আবার সাহস পেয়ে যায়। তার শক্তি ভয়ঙ্কর অনিবার্য হয়ে ওঠে। সে কেমন শক্ত গলায় তখন হাঁকে, বিনয় তুমি ট্রেটর।

—আমি ট্রেটর!

—তুমি নিয়ম-কানুন সব ভুলে গেছ।

—নিয়ম-কানুন আমি ভুলিনি।

তুমি তো জানো বিনয়, তোমারই এসব কথা, এখানে ঢোকা যতটা সহজ, বের হওয়া তত কঠিন। ঠিক সেই মহারণে অভিমন্যু বধের মত।

—আমি জানি।

—সুতরাং তুমি বুঝতে পারছ, আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

—বুঝতে পারছি।

ওরা আবার নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগল। রেল ব্রীজ পার হলেই দক্ষিণ-পূবে বেশ একটা খালি মাঠ, মাঠের পাশে শহরের হাউজিং স্টেটের কিছু বড় নয়া বাড়ি, রাত বেশ গভীর বলে খুব কম গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ। সি এম ডি এর বড় পোস্টারের নীচে কিছু খুপরি ঘর। ওখানে কুপি জ্বলছে একটা। কেউ হয়ত এত রাতেও জেগে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে চলেছে। এবং নিশীথে এই সুর অনেক দূর থেকে শোনা যায়। ওরা সহসা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল।

যেন ওদের প্রত্যেকের মনে হল, এই যে মানুষটা সারাদিন খেটে-খুটে গভীর নিশীথে তুলসীদাস পড়ে চলেছে, এবং বোধহয় মানুষটার আজ কোন শোকের দিন—সে এ-দিনে সারারাত রামায়ণ পাঠ করে থাকে—ওদের কাছে মানুষটা এক ভিন্ন জগতের মানুষ, ওরা ভেবে পায় না—কি পায় লোকটা এতে। ওর কি জানা নেই পৃথিবীতে পদযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে, এবং সবাইর শুধু এখন সেই পদযাত্রায় যোগদানের কথা।

এভাবে ওরা জানে না, মানুষ তার নিজের বিশ্বাসে এ-পৃথিবীতে বাঁচতে ভালবাসে। তারা এখন যে একজন ট্রেটরকে

হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে বললে, লোকটা ভীষণ অবাক হবে।—বাবু, কার জন্য হত্যা। ওরা বলবে, তোমরা যারা খুপরি করে আছ, যাদের জন্য কোথাও কোন বড় আকাশের কথা লেখা নেই—অদের জন্য।

লোকটার চোখদুটো ভয়ানক বড় হয়ে যাবে। সে তার গামছা দিয়ে চোখ মুছবে—ভাঙা চশমাটা খুলে খুব কাছে গিয়ে ওদের মুখ দেখবে। বাবুরা আপনারা বড় ভাল ছেলে। পরের ছেলে ঘরে নিয়ে যান। মা-বাবার প্রাণ খুব কাঁদছে। তারপর লোকটা বলবে— আমাদের মাথায় ঈশ্বর এতবড় আকাশ দিয়েছেন, তার ওপর আর কি লাগে। লোকটা ভাংগা ভাঙ্গা হিন্দী বাংলায় যেন ওদের এমন বলবে কথা আছে।

ওরা আবার হাঁটছিল। অমলের মনে হয়েছে, সবাই হয়ত এভাবে ভাবছে। নতুবা কেউ এভাবে থমকে দাঁড়ায় না। গভীর নিশীথের এক আশ্চর্য স্বর, কেমন কাঁপা-কাঁপা গলা, সুর ধরে পড়ে যাওয়া—এবং কুপির আলোতে বৃদ্ধের মুখ ওদের কেমন সামান্য সময়ের জন্য চমকে দিয়েছিল।

অথবা এও হতে পারে—কোথাও কোন পুলিশের বুটের শব্দ, অথবা ছদ্মবেশে মানুষটা এখানে একটা খুপরি করে জেগে বসে আছে। কোথায় কি-ভাবে যে ওদের সব খবর ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ওরা ঠিক বুঝতে পারছে না, মানুষটা যে পুলিশের লোক নয় কে বলবে। সুতরাং ওরা এই জায়গাটা খুব দ্রুত পার হয়ে গেল। সামনের রাস্তাটা ভি-আই-পি, ওরা এখানে এসে দাঁড়ালে অনেক উঁচু বাড়িতে একটা লাল মত আলো দেখতে পেল। এই আলো দেখলে ওরা ভীষণ ভয় পায়। যেহেতু ওরা একজন প্রেটরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেই হেতু যাবতীয় যা কিছু, এই যেমন কোন বৃদ্ধের সুষমা মণ্ডিত মুখ, নীল আলো এবং সুর করে রামায়ণ পড়া সব প্রেটরদের কাজ মনে হচ্ছে। ওরা সংশয় এবং অবিশ্বাসে ভুগে ভুগে মুখের চেহারা কেমন কঠিন করে ফেলেছে। চেনা যায় না ওরা কখনও কলেজের একনম্বর বিনয়ী ভদ্র ভাল ছেলে ছিল।

আর ঠিক এ-সময়েই শহরের ওদিকটার এক বড় বাড়িতে শিপু বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নটা প্রথমে ভারি সুন্দর—এই সে যেমন দেখে থাকে, রেলিঙে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের আগে সে যেমন দেখতে পায়—এক নীল জার্সি পরা ছেলে হাতে সাদা বল নিয়ে যাচ্ছে—ওর মোমের মত সাদা পা, আশ্চর্য রঙ শরীরের, ডোরাকাটা প্যান্ট, এবং উরু কি বলিষ্ঠ। সে হাতে বলটা নিয়ে ভীষণ জোরে বল মারছে। আর কি বিস্ময়ের ব্যাপার সেই বলটা এত উঁচুতে উঠে গেছে যে নামছেই না। যেন ওপরে জোর বাতাস, বাতাস সাদা বলটা ঠিক বেলুনের মত ধরে রেখেছে। বলটা তারপর ওদের বাড়ির দিকে বেশ ভাসতে ভাসতে চলে আসছে। বলটা আউট-হাউজের মাথায় এবং পরে যেসব কৃত্রিম পাহাড়ের ছায়ায় বাবা বন-গোলাপের চারা এনে লাগিয়েছেন ঠিক তার ওপরে এসে থেমে গেল। কি কাছে সাদা বলটা, অথচ সে নাগাল পাচ্ছে না। সে দেখতে পাচ্ছে সেই সাদা মোমের মত পা যার, নীল জার্সি গায়ে যার, তার পা শট মেরে উঁচু করার মত পা, সে আর পা নামাচ্ছে না। খুব কাছে সে দাঁড়িয়ে আছে, এবং শিপু দেখতে পাচ্ছে যেন ছেলেটা একতলায় গ্রীণ লোফ থেকে বল শট করে মেরেছে, ওর নীল ডোরাকাটা প্যান্ট পরা বলে এবং একটু লজ্জা বলে সে যা দেখতে পাচ্ছে, ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ওর আর ঘুম আসছিল না। শিপু বুঝতে পারছিল, সে বড় হয়ে যাচ্ছে। ওর ভিতর কি যেন ভাল লাগার ব্যাপার ঘটে যায়। সুন্দর সব জার্সি পরা ছেলে যারা মাঠে যায়, তাদের জন্য মায়া হয়। সে বুঝতে পারছে স্বপ্নে সেই মায়া এক ভীষণ অহংকারী ঘটনা শরীরে ঘটিয়ে দিয়ে গেল।

শিপু ঘুম থেকে উঠে বসল। ঘুম ভেঙে গেলে যা হয়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করা, তার ওভাবে কোনদিন ঘুম ভেঙে যায়নি, সে তার ঢোলা ফ্রকটা আর একটু টেনে দিল যেন ছেলেটা ওর সামনে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। অথচ কাকে যে সে বলবে স্বপ্নটার কথা। পৃথিবীতে সে এমন একটি সুন্দর স্বপ্নের কথা যেন সেই নীল জার্সি পরা ছেলেটাকেই বলতে পারে।

অথচ এই শিপু বিকেল হলেই একটা হলুদ রঙের চেয়ারে দু-পা ছড়িয়ে বসে থাকে। স্কুল থেকে ফিরে সামান্য সময় রেলিঙে দাঁড়াবার অভ্যাস। কারণ সামনে নদী। নদীতে জাহাজ আসে। নদীর ও-পারে কত কল-কারখানা এবং মাথার ওপর আকাশ। নানারকম পাখির ছায়া তখন জলে ভাসে। এইসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত হলে সে এসে তার হলুদ রঙের চেয়ারটায় দু-পা ছড়িয়ে বসে।

শিপু স্কুল থেকে ফিরলেই বাড়িতে সবার ভিতর ভীষণ ব্যস্ততা। মা ডাকেন—শিপু। ময়না ডাকে—শিপু দিদিমণি। সূর্য ডাকে—দিদিম...ণি...ই। সে কোন কিছু খেয়াল করে না। মনের ভিতর একটি সুন্দর খেলা আরম্ভ হলে যা হয়—সে মাঝে মাঝে কি যেন সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে অনামনস্ক হয়ে যায়। কিছু শুনতে তার ভাল লাগে না। রেলিঙে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার নদীর জলে খেলা দেখতে ভাল লাগে। পাখিরা উড়ে গেলে দেখতে ভাল লাগে। চারপাশে ভীষণ কিছু যে ঘটছে শিপু কিছুতেই তখন টের পায় না।

আর এই বাড়িতে অদ্ভুত একটা স্বভাব সকলের। করজোড়ে থাকার স্বভাব। সকাল হলেই, ময়না ভারি মজা করে বলবে, দিদিমণি তোমার ব্রাস। তোমার জল। এখানে তোয়ালে থাকল। সব ঠিকঠাক রেখে দেবার স্বভাব। সকাল থেকেই এভাবে শিপুর জীবন আরম্ভ হয়। শিপুর আলাদা কত বড় ঘর—অলিভ কালারের এত বড় খাট ঘরের ভিতর ভীষণ ছোট মনে হয়। সাদা সোনালি জলে মিনা করা চাদর রোজ বদলে দেবে ময়না। কার্পেটের লাল রঙে কখনও কোন বেড়ালের পর্যন্ত পায়ের দাগ পড়ার নিয়ম নেই। একপাশে বড় একটা প্রাচীন পিয়ানো। বাবার শখ খুব বনেদি পুরনো জিনিস কেনার। মাথার কাছে লম্বা দেয়াল-ঘড়ি। ঘড়িটা সেই কবে থেকে কেবল বেজে চলেছে। ঠিক ওর মতো সে যেমন বুকের ভিতর একটা মাঝে মাঝে ধুকধুক শব্দ শুনতে পায় হাত দিলে টের পায় নিয়ত এটা বাজে—ঠিক তেমনি ঘড়িটা, একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়—দেয়ালে টিক টিক শব্দ আর ঘড়ির কাঁটায় রয়েছে একটা কাঁচের পাখি। পাখির চোখ দুটো দেখলে সেই সুখী রাজপুত্রের কথা মনে হয়। যেন সুখী রাজপুত্র তার রবিন পাখিকে ঘড়ির ভিতরের হৃৎপিণ্ড টিক টিক শব্দ তুলে আনতে পাঠিয়েছিল। আর তখন কাচটা ছিল খোলা। এবং পাখিটা বুঝি ঢুকলে কেউ বন্ধ করে দিয়েছিল কাচটা। পাখিটা সেই থেকে কাচের ভিতর থেকে থেকে কাচের পাখি হয়ে গেছে। ভাল করে দেখলে পাখিটা সম্পর্কে এমনই মনে হয়। আর মনে হয় যেন সব সময় রাজপুত্রের চোখ থেকে একটা দামী পান্না নিয়ে আকাশে উড়তে চাইছে পাখিটা।

সুতরাং শিপু সকালে উঠে চোখ খুললেই দেখতে পায় এক রোদ্দুরের গন্ধ ওর চারপাশে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তখন এই রোদ্দুর দেখতে দেখতে অথবা জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে সে ঘুম থেকে কিছুতেই উঠতে পারে না। উঠতে পারে না ঠিক না, কেন জানি তার উঠতে ইচ্ছা হয় না। কেবল শুয়ে সেই নীল জার্সি পরা ছেলেটার কথা ভাবতে ভাল লাগে। এভাবে অদ্ভুত এক আলস্য সারা শরীরে জড়িয়ে থাকে। চারপাশে সুন্দর এক জগৎ। মা এসে সকাল হলেই চুমো খেয়ে যায়। বাবা এসে আদর করে চুলে বিলি কেটে দেয়। তখন কি সুন্দর লাগে বাবার মুখ! বাবাকে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ। বাবার সারা মুখে কি আশ্চর্য পবিত্রতা মাখানো। মনেই হয় না বাবা কখনও পৃথিবীতে কোন খারাপ কাজ করে বেঁচে থাকতে পারবেন। মাথায় হাত রেখে বাবার যেই বলা, এবারে উঠতে হয় শিপু। রোদ উঠে গেছে। যেন বাবার বলার ইচ্ছা, তুমি না জাগলে শিপু চারপাশের কিছুই জেগে ওঠে না।

ইদানীং শিপুর এসব ভাল লাগছিল না সে যে বড় হয়ে যাচ্ছে—মা বাবা কেন যে টের পাচ্ছে না। কেমন এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা ওকে এসে ঘিরে ফেলছে। ওর সব আছে। মা-বাবা, সূর্য হরিহর, ময়না কুসুম আউট-হাউসের চারপাশে নানা বর্ণের গাছ, কৃত্রিম পাহাড়, একপাল সাদা খরগোশ, এসবের ভিতর সে কতোদিন লুকোচুরি খেলে বেড়িয়েছে, অথচ এখন কিছু ভাল লাগে না। কেবল মাঝে মাঝে বিকেল হলে তার ভাল লাগত। দূরের এক মাঠ, মাঠের খেলা, নীল জার্সি পরা সাদা ফুটবল হাতে এক খেলোয়াড়কে দেখার জন্য সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকত। সহসা মনে হত পাশের রাস্তা দিয়ে কে যেন যায়। সেই নীল রঙের জার্সি, সাদা বল। কিন্তু এখন আর সে আসে না। কতদিন বিকেল হলে শিপু নদীর জলে নানারকম পাখি ওড়ার সময় বাঁ দিকের বড় মাঠটার দিকে তাকাত। সে আসছে—তাকে আসতে দেখলেই শিপু কেমন ভিতরে ভিতরে ভীষণ খুশী হত। এখন সে আর আসছে না। তবু স্কুল থেকে ফিরে শিপুর এখনও এই রেলিঙে দাঁড়াবার স্বভাব। নদীর জলে ঢেউ। ঢেউ কখনও কখনও মাঠ ভাসিয়ে নিত। জোয়ারের সময় ওর কি দাপাদাপি ছিল বল নিয়ে। সাদা জলে ভেসে যাচ্ছে বানের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। সে বাঁশি বাজাচ্ছে। আর সবাই সাদা বলটা নিয়ে কখনও জলে কখনও শুকনো মাঠে কি দাপাদাপি করছে। কিন্তু এখন খালি মাঠ। কেউ আর এ মাঠে খেলতে আসছে না।

তবু শিপুর আশা সে আসবে, সে ফিরে আসবে। আশায় আশায় সে এসে দাঁড়াত রেলিঙে, সূর্য ওপারে অস্ত যেত, জলে নানারকম ছায়া ভাসত, অন্ধকারে শিপু এসে দাঁড়াত—একা। কেউ ডেকে তখন শিপুর সাড়া পেত না।

কিছু সময় নিবিষ্ট থাকলেই দৃশ্যটা চোখের ওপর ভেসে উঠত শিপুর। ওরা সাদা বলটা পায়ে পায়ে খেলতে খেলতে ফিরছে। সবার আগে সেই নীল জার্সি পরা খেলোয়াড়, পরণে কালো প্যান্ট আর পাগুলো সাদা মোমের মতো। কি কারণে ওরা সেদিন না খেলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। কি তাজা আর সজীব সেই নীল জার্সিপরা খেলোয়াড় —অথচ কেন যে ওকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে! সেদিন শিপু বড় একটা আমলকি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ফিরে যাওয়া দেখছিল।

আগে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রক পাল্টে রেলিঙে এসে দাঁড়ালেই মনে হত সুন্দর এক পৃথিবী ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সে প্রতীক্ষায় থাকত। কখন আসবে সেই নীল জার্সিপরা খেলোয়াড়। দলবল নিয়ে আসবে। সে এলেই শিপুর মনে হত এত সরল শিশু বৃক্ষের মতো গাছ কাঁচ কিচ পাতা নিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কথা আছে শিপু যাবে, দাঁড়াবে গাছের নীচে এবং শরতের বৃষ্টিতে ভিজে এক নিরিবিলি ইচ্ছার ঘর তৈরি করবে তারা।

এভাবে শিপু অপেক্ষায় থাকত। কখনও আউট-হাউসের পাশে, কখনও ছোট যেসব ঝোপজঙ্গল আছে ফুলের সেসব পেরিয়ে উঁকি দিয়ে সূর্য দেখার মতো সে প্রতীক্ষায় থাকত—যেন এলেই বলবে, হে নীল জার্সি-পরা খেলোয়াড় এদিকে তুমি একবার তাকাও। দ্যাখো কি মনোরম এই জগৎ। কি শান্ত সব তরুলতা। পৃথিবী আপন মহিমায় এই সৌরমণ্ডলে বেঁচে আছে। এত ভাল ভাল কথা কি করে যে মনে আসে সে
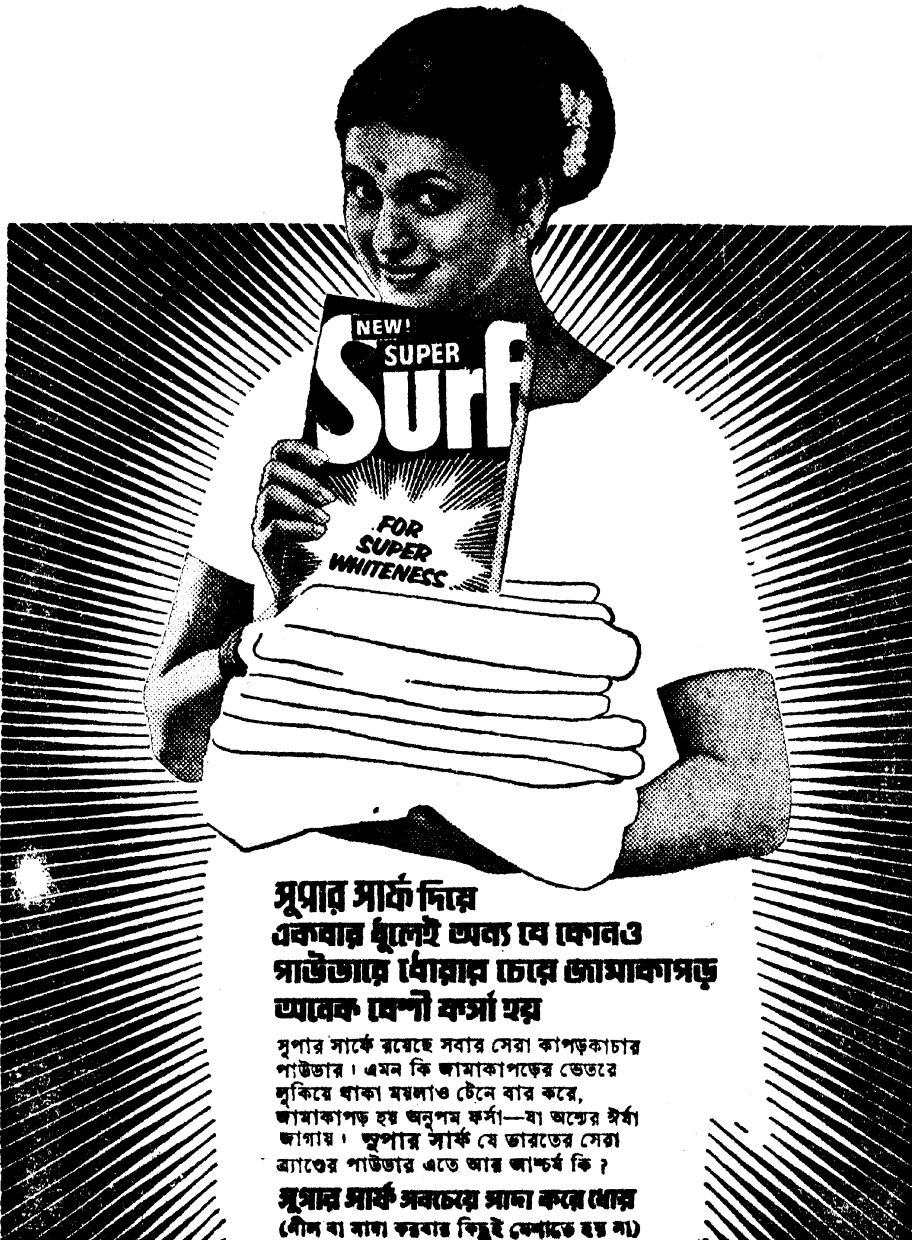
বুঝতে পারে না। ভিতরে ভীষণ কষ্ট। সে কেন আর আসে না। অথচ চোখ বুজলেই শিপু যেন দেখতে পায়—নীল জার্সিপরা খেলোয়াড় আসছে। কালো এ্যাসফাল্টের পথ ধরে সে আসছে। সবুজ মাঠের ভিতর দিয়ে সে আসছে। ওর পায়ে বল। বলটা নিয়ে সে কখনও মাঠের ভিতর লাফাচ্ছে, কখনও ব্যাকভলি করে মাথায় তুলে বার বার হেড্ দিচ্ছে। আবার কখনও দূরে থেকে ছুটে এসে বলে কিক্ করছে। বলটা উড়তে উড়তে এসে পড়েছে একেবারে শিপুর পায়ের কাছে। শিপুর তখন বড় ইচ্ছা দুহাতে বলটা ছুড়ে দেয়। শিপু দুহাতে বলটা ধরতে গেলে বুঝতে পারে সে খুব ঢিলেঢালা ফ্রক গায়ে দিয়েছে, নইলেই সব দেখা যাবে। নীল জার্সিপরা খেলোয়াড় সব দেখে ফেললে, সে জলের ভেতর যে একটা সবুজ স্বপ্ন নিয়ে ডুবে আছে, তার মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু চোখ খুললেই কেবল সে টের পায়, না আর কেউ আসছে না সবুজ মাঠে। মাঠটা ক্রমে আগাছায় ভরে গেল। নীল জার্সিপরা খেলোয়াড় না এলে কেন যে তার কিছু ভাল লাগে না। ভাল না লাগলে যা হয়—সে বইয়ের ভিতর ডুবে গিয়ে অনামনস্ক হতে চায়। কখনও সে পড়তে ভালোবাসে সিনডেরেলা, অথবা সুখী রাজপুত্রের বই। বইয়ের ছবি দেখতে তার ভারি ভাল লাগে। কোথায় কবে যে সেই সব আশ্চর্য দেশের মানুষেরা নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেছে।

অভিনেত্রী জীবনের অভিশাপ—(২)

মীনাকুমারীর বাবা কথাটা জানতে পেরেছিলেন। কিভাবে যে এই গোপন বিবাহের সংবাদ তাঁর কানে আসে তা কেউ সঠিক জানে না। তবে অনেকে মনে করে স্বয়ং বিবাহের পুরোহিত কাজী সাহেবই সংবাদদাতা, কেউ বলে মীনার বোন মধু ভুল করে বলেছিল, নয়ত কাড়ের রান্নার লোকটি এই সংবাদ পরিবেশন করে থাকবে। কারণ মীনা টেলিফোনে আমরোহীর সঙ্গে যে সব কথা বলেছিল রসুইকার বাবুর্চি তা শুনেছিল। আল্লা বখস মেয়ের কাছে সোজাসুজি আসল ব্যাপারটি জানতে চাইলেন, এবং শেষপর্যন্ত মীনাকুমারী পিতার সন্দেহ ভঞ্জন করে স্বীকারোক্তি করল। বলা বাহুল্য পিতা রেগে আগুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। আর সব পিতার মতই 'আগুন হয়ে বাপ, বারে বারে দিলেন অভিশাপ',—তিনি মীনাকুমারীর এই হঠকারিতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মীনাকে তিনি বললেন—তোমার কৃতকর্মের ফলাফল কি ভেবেছ? মীনা নীরবে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। মীনা তাঁর নব-বিবাহিত স্বামীকে সব জানালেন। স্বামী বললেন—'ধৈর্য ধরো।' উভয়েই হয়ত ভেবেছিলেন যে সময় একটু কাটলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিতৃগৃহে তাঁর স্থিতির অবস্থা ক্রমশঃই যে অসহনীয় হয়ে উঠছে কামাল তা বুঝলেন। তিনি মীনাকে বললেন—না হয় বিবাহের চুক্তি তুমি পুনর্বিবেচনা করো। মীনা বললেন—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমরোহী বললেন—অত ঝামেলায় কাজ কি? না হয় তালাক দাও আমাকে।

ইতিমধ্যে মীনার বৈজু-বাওরা চিত্রে অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসিত হল। উভয়ের মধ্যে ইতিমধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল তা স্পষ্ট হল। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মীনা তাঁর স্বামীকে টেলিফোনে জানালেন যে আমরোহীর তালাক বিষয়ক পত্রটি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আমরোহী খুশী হলেন এ সংবাদে।

আল্লা বখস মেহবুব সাহেবের একটি ছবিতে মীনাকে অভিনয় করতে হবে একথা জানালেন। মীনা প্রথমটায় রাজী হলেও—পাঁচদিনের পর সেই স্টুডিয়ো ত্যাগ করে বোম্বাই টকিজে যোগ দিলেন। সেইখানে আমরোহী 'দায়েরা' নামক ছবিতে কাজ করছিলেন। আল্লাবখস আবার ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'আমার বাড়ির দরজা তোমার কাছে চিরতরে বন্ধ হল।'

মীনাকুমারী কয়েকখানি শাড়ি নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলেন মোটরে এবং সিওনে আমরোহীর ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠলেন। তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন হাতের কাজ সারতে।

ফিরে যখন এলেন তখন আমরোহীও ফিরেছেন। মীনাকে দেখে তিনি বিস্মিত। মীনা আলমারি খুলে শাড়িগুলির দিকে আঙুল দেখালে। আমরোহী আনন্দে আত্মহারা।

সেই রাতে সাড়ে দশটার সময় মীনা তাঁর বাবাকে লিখলেন—'বাবুজী আপনি যা কিছু মনে করুন, আমি বাড়ি ছাড়লাম। আদালতে যাওয়ার কথা তুলবেন না। সে তবে ছেলেখেলা। আমি বাড়ির সম্পত্তি কিছুই চাই না, চাই শুধু আমার বই আর কাপড়গুলি। যে গাড়িটা নিয়ে এসেছি সেটি কাল ফেরৎ দেব। আমার কাপড়-চোপড় আপনি সুবিধামত পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে ফোন করবেন।'

আল্লা বখস এ পত্র পেয়ে আতঙ্কিত হলেন। মেয়ের সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মীনা জানালেন যে আমি আমার স্বামীকে ত্যাগ করব না।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে মেট্রো সিনেমায় প্রথম ফিল্ম ফেয়ার এওয়ার্ড পেলেন মীনা, বৈজু বাওরায় গৌরীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য। মীনা বলছেন—'এই দিনটি আমার কাছে অবিস্মরণীয়—আমার অভিনেত্রী জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

পরের বছর আবার ফিল্ম ফেয়ার এওয়ার্ড পেলেন মীনা, 'পরিণীতা' ছায়াচিত্রে

অভিনয়ের জন্য। ১৯৫৫ থেকে কয়েক বৎসর অব্দি মীনা অজস্র ছায়াচিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

এদিকে দাম্পত্য জীবন কিন্তু তেমন স্বচ্ছন্দগতিতে চলল না। বিবাহিত জীবনের আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। কামালের প্রেমাবেগ শীতল হয়ে এসেছে বলে মনে হল। আর সে উত্তাপ নেই। কামাল এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—

'মীনা কল্পনায় ভূত দেখছেন। তিন বছর বিবাহিত জীবনের পর মধুযামিনীর লগ্নে দাঁড়িয়ে আছি এ ছলনা ঠিক নয়। গভীরতার দিক থেকে মীনার প্রতি আমার ভালোবাসা হ্রাস পায়নি। তবে একথা সত্যি প্রতিদিন প্রাতে ঘুম ভেঙে উঠে আমার স্ত্রীকে বলি না—'আমি তোমাকে ভালোবাসি' —আমি জানতাম যে আমাদের সম্পর্ক এমনই গভীর যে প্রতিদিন তার নবীকরণের প্রয়োজন হয় না।'

এদিকে বিবাহিত জীবনের অন্য পথে সংকট সৃষ্টি হচ্ছিল। কাজী সাহেবের আস্তানায় যখন বিবাহের চুক্তি দস্তখত করা হয় তখন কামাল মীনাকে বলেছিলেন, তুমি আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে মাহজবীন হয়ে মীনাকুমারী রূপে নয়। তুমি হবে গৃহস্থ বধূ। মীনা নাকি এইসব সর্ত মেনে নিয়েছিলেন। থলে হাতে করে বাজার করবেন, ঘর সংসার করবেন, সন্তান পালন করবেন ইত্যাদি। তবে যেহেতু তাঁদের পিতৃপরিবারের অবস্থা অতি খারাপ তাই তাঁদের অবস্থা একটু ভালো হলেই তিনি সসম্মানে অবসর নেবেন।'

মীনাকুমারী যে এই সর্ত পালন করেননি তার জন্য শিল্পরসিক সকল মানুষই খুশী হবেন। মীনা তাঁর স্বামীকে জানালেন—ঠিক কথা, বিয়ের আগে একদিন এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আজ আমার কাছে কাজের আকর্ষণ অনেক বেশী, এখন যদি তুমি বল প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে, তাহলে আমি ডিভোর্স চাইব।'

আমরোহী বুঝলেন মীনার কাছে তিনি পরাজিত। তিনি বললেন, বেশ তাই যদি চাও তাহলে তোমাকে তিনটি সর্ত পালন করতে হবে। এক—প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বাড়ি ফিরবে। দুই—তোমার সাজঘরে মেকাপম্যান ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তিন—যে গাড়িতে কাজে যাবে এবং বাড়ি ফিরবে সে গাড়ির যাত্রী শুধু তুমি একা।'

সে রাতে মীনাকুমারী সব সর্ত মেনে নিলেও পরদিনই একে একে সব সর্ত ভঙ্গ হল।

ফলে অভিনেত্রী মীনা যখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে গৃহিণী মীনার ব্যক্তি-জীবনের তরণী তখন ধীরে ধীরে জলে ডুবছে। সন্দেহ আর ছেলেমানুষীর ফলে দুজনের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। এর ফলে সংঘাতের কারণগুলি তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর হতে লাগল। কিন্তু একদিন আমরোহী বিছানার তলায় আবিষ্কার করলেন একটি কালো-খাতা। কি যে লেখা ছিল সে খাতায় তা না জানালেও জানা গেছে এক জায়গায় মীনা নাকি লিখেছিলেন —'আমি কোনোদিন কামাল আমরোহীকে ভালোবাসিনি।'

ভুল বোঝাবুঝির অবস্থা চরমে পৌঁছাল। এই পারস্পরিক কলহের মধ্যে মধ্যস্থ করা সহজ নয়। কামাল স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, একদা যে কিশোরী-টিকে দেখেছিল সাসন হাসপাতালে সে একদিন এত বিচিত্র ও বিরাট হয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে।

মীনাকুমারী মদ্যপান শুরু করে ছিলেন। কবে এবং কোথায় তা সঠিক জানা নেই। যে বস্তুটি তাঁর জীবনের অবসান ঘটিয়েছে সর্বপ্রথম তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন মীনার ডাক্তার সৈয়দ তিরমিজি। মীনার নিদ্রাহীনতার দাওয়াই হিসাবে তিনি স্লিপিং পিল ও এক পেগ ব্রান্ডির প্রেসক্রিপসন করেছিলেন। আর সর্বনাশের সূচনা তখনই।

ঝগড়া, তর্কা-তর্কি, মেজাজ খারাপ—সব কিছুরই দাওয়াই সুরা। একটি ঈদের রাতে মীনা উন্মত্তের মত স্বামীর 'চিকন কুর্তা'—অর্থাৎ সিল্কের সার্ট ছিঁড়ে ফর্দা-ফাঁই করে দেন। কামাল স্ত্রীর এই দুর্ব্যবহারের জবাবে মারলেন থাপ্পড়।

১৯৬৩ এর শেষাশেষি মীনা স্থির করেন, কামালকে তিনি ত্যাগ করবেন। একদিন সকালে কাজে বেরোবার পথে কামাল অনুনয় করেন মনজু (মীনা) আমাকে ত্যাগ কোরো না।'

জিনিসপত্র গোপনে একে একে অভিনেত্রী অচলা সাচদেবের বাড়িতে সরাতে লাগলেন মীনা।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে সলিল চৌধুরীর 'পিঞ্জরে কে পন্‌ছি'র মহরৎ উৎসব। বাকর আলি ও তাঁর স্ত্রী এসে তদারক করছেন সব ঠিক হায় কিনা—বাকর মীনার কেশসজ্জাকারিণী বার্থাকে বললেন—খবরদার মীনার মেকাপ রুমে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না।'

এগারোটায় মহরৎ উৎসব। মীনার দেখা নেই সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। যখন এলেন মীনা তখন তাঁর মেজাজ খারাপ। সোজা গেলেন মেকাপ রুমে। বার্থা মীনাকে বাকরের নির্দেশ জানিয়ে দিল। মীনা ক্ষেপেই ছিলেন, ডেকে পাঠালেন লেখক গুলজারকে। বকরও কাছাকাছি ছিলেন। দেখা হতে মীনা অভিজাতসুলভ 'আদাব' জানালেন। ওঁরা তিনজন চললেন মেকাপ রুমের দিকে।

সিঁড়িতে ঠেলাঠেলি। মীনা চীৎকার করে বলে ওঠেন—কি ভেবেছ আমাকে, পথের স্ত্রীলোক? আমার মেকাপ রুমে কি হয় যে এই নিষেধাজ্ঞা? 'এই বলে গুলজারকে জড়িয়ে ধরলেন মীনা। তখন নাকি বাকর মীনাকে একটা চড় মারেন। নারগিস অন্য মঞ্চে অভিনয় করছিলেন। তিনিও নাকি একটা প্রচণ্ড হল্লা শুনেছেন। বাকর বলেছেন যে তিনি মীনাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। বলরাজ সাহানীকে সাহায্য করার অনুরোধ জানান, কিন্তু সেদিন ঠাণ্ডা মেজাজের মীনাকুমারী একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন। বেরিয়ে যেতে যেতে মীনা বাকরকে উদ্দেশ করে বলেন, কামাল সাহেবকে বলতে আমি আজ আর ঘরে ফিরব না।'

মীনা কথা রেখেছিলেন। তিনি আর ঘরে ফিরে আসেননি।

বলরাজ সাহানী কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

'Meena would have fallen in my estimation if she had meekly submitted to the outrageous insult in the public.'

তাঁর মতে মীনার মত একজন উচ্চ-মর্যাদার শিল্পীকে ফিল্মিস্তানের সেই মহান সমারোহে ভদ্র আচরণ শেখানোর চেষ্টা করাটার উপযুক্ত সময় ছিল না। তিনি বলেছেন—

"I was shocked and ashamed in my country, women could be treated so brutally."

বলরাজ সাহানীর এই মন্তব্যে বোঝা যায় মীনাকুমারীর অভিনেত্রী জীবন অভিশাপে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তার পরিণতি হয়ত যথাযোগ্য হয়েছে।

মনে হয় মীনাকুমারীর দাম্পত্য জীবনের পরিবেশ অনুকূলে না হওয়ায় তাঁর জীবনে একটা অভিশপ্ত—অশুভ ছায়া এইভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, আর শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির পিছনে আছে এই বেদনাদায়ক নেপথ্য কাহিনী।

মীনাকুমারী আজ নেই, তাঁর জীবনের অংশীদার কামাল জীবিত। কামাল মীনার প্রতি সুবিবেচনার পরিচয় দেননি একথা মনে করার অনেক হেতু পাওয়া যাবে বিনোদ মেহতার এই গ্রন্থে।

মীনাকুমারীর জীবনকাহিনী একথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয় মহান শিল্পীদের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের সীমিত গণ্ডীতে ধরা না দেওয়াই হয়ত সব দিক থেকে শ্রেয় পন্থা।

বিনোদ মেহতা এই গ্রন্থের তথ্যসংগ্রহে অনেক অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন এবং উপন্যাসোপম এক আশ্চর্য জীবনী রচনা করেছেন।

—অভয়ঙ্কর

MEENA KUMARI (BIOGRAPHY) BY VINOD MEHTA, Published by JAICO PUBLISHING HOUSE 121, Mahatma Gandhi Road Bombay — Price Rs. 5/- only.

কলকাতায় জাতীয় বইয়ের মেলা

পঞ্চম জাতীয় গ্রন্থমেলা শুরু হয়েছিল গত ২৫ জানুয়ারী, অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ। চলেছে ৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এই মেলার উদ্যোক্তা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা। এবং প্রকাশকদের সারা ভারত ফেডারেশন।

এই উপলক্ষে কলকাতায় সাজ সাজ রব পড়ে গেছল। এসেছিলেন ভারতবর্ষের বড় বড় প্রকাশকেরা। কলেজহল থেকে কবি, সাহিত্যিক, পাঠক, প্রকাশকের আনাগোনার বিরাম ছিল না। কবীর সিংও উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের লোকনাথ ভট্টাচার্য বললেন, এর আগেও আমরা চারবার জাতীয় গ্রন্থমেলা করেছি, দিল্লী, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে। গতবার বিশ্ব গ্রন্থমেলার পাশাপাশি আমাদের মেলা বসেছিল। সেইজন্যে তাকে আর আলাদাভাবে উল্লেখ করছি না। নাহলে, এটি হত ষষ্ঠ গ্রন্থমেলা।

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এই মেলার আয়োজন?

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের কর্মকর্তা লোকনাথ ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করে বললেন, সারা দেশের মানুষকে বইমুখী, আগ্রহী ও চিন্তাশীল করে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এ ব্যাপারে সংস্কৃতির সেতুটি [illegible] জানে। লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মিল ঘটে। যেমন, বই বিক্রী হলে লেখকেরই কেবল লাভ হয় না, আর্থিক দিক থেকেও নিরাপদ বোধ করেন। প্রকাশকের পক্ষেও নতুন প্রকাশন এই জাতীয় মেলায় আসে। এবং যে পাঠক বিজ্ঞাপন দেখে, বই কিনতে ভরসা পান না, তিনিও বইয়ের পাতা উল্টিয়ে নিজের পছন্দমতো বইটি কিনে মেলার সুযোগ পান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হলেও এর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাতে। কিন্তু ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্থাটি পরিচালিত হয় না। বরং জনগণের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

তবু জিজ্ঞেস করলাম, গত চার-চারটি মেলার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কি শিক্ষা পেলেন? এর ফলে কি আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হচ্ছে? পাঠকের দিক থেকে আগ্রহ কেমন?

—ব্যবসা-বাণিজ্য? লোকনাথবাবু বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ আমরা করে দিই না। আলোচনাচক্রের আয়োজন করি, রাইটার্স ক্যাম্প করি—এইমাত্র। তবে দর্শকের সংখ্যা সর্বত্র সমান হয় না। যখন যে-অঞ্চলে মেলা হয়, সেই অঞ্চলের শিক্ষা-দীক্ষা ও পাঠকের মান অনুযায়ী, দর্শক-সংখ্যারও তারতম্য ঘটে। কলকাতার মানুষ বই পড়ে বেশী। সেজন্যে দর্শকও ভালো। গতবার দিল্লীতেও লোক হয়েছিল যথেষ্ট।

আমি ঘুরে ঘুরে গোটা মেলাটাই দেখেছি।

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের আলাদা প্রদর্শনীতে বই সাজানো রয়েছে সাত হাজারেরও বেশী। বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি প্রায় সবকটি উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ভাষার বই-ই আছে। ইংরেজী বইয়ের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক।

কেন?

লোকনাথবাবু বললেন, ভাষার দেয়াল ডিঙিয়ে এখনো আমরা আঞ্চলিক সাহিত্যের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ঘটাতে পারিনি। সেজন্যেই ইংরেজীর প্রাধান্য। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট নিরন্তর উদ্যম চালিয়ে যাচ্ছে এই বাধাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে।

কি রকম?

লোকনাথবাবু বললেন, একই বই ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে আসছে গত কয়েক বছর ধরে। তার ফলে আন্তঃভারতীয় চিন্তার প্রসার ঘটছে। ইতিমধ্যে লেখকেরা সাহিত্য ক্যাম্পে মিলিত হয়েছেন। প্রকাশকেরা বুক-সার্কিটের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় করেন। ধরুন না কেন, এবারের কথাই। এইবার বইয়ের পরিবেশন সমস্যা, সংস্কৃতির কাঠামো, পরিবেশকদের ভূমিকা, [illegible]। [illegible] নিয়ে আলোচনা করেন ডি. এন. ব্যানার্জি, [illegible], সি এম চাওলা, সদানন্দ উৎকল, এম এল বাহ, কে এল মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, শ্যামলাল গুপ্ত, এম এন মালহোত্রা প্রমুখ। এঁদের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই কোনো পথ বেরিয়েছে।

তার ওপরে, অনুবাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দুদিন ধরে।

আমার বিশ্বাস, এর ফলে, পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। অন্য ভাষার সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। এবং জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

বললাম, কিছু বাস্তব উদাহরণ দিন। এমন ঘটনা কি ঘটেছে যে, প্রকাশকেরা আলোচনা করতে গিয়ে অন্য ভাষায় বই অনুবাদে উৎসাহিত হয়েছেন? কিংবা, লেখকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্য ভাষার সাহিত্যিক আদর্শকে গ্রহণ করেছেন?

উত্তর দিলেন, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার শ্রীঅনিল ভৌমিক। বললেন, হ্যাঁ, হয়েছে বৈকি। এবারও চার পাঁচজন প্রকাশক, চার পাঁচটি বইয়ের অনুবাদস্বত্ব কিনে নিয়েছেন। জাতীয় গ্রন্থমেলা, এই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

জানকীনাথ বসুর ভাষায়, এ এক মহাযজ্ঞ। এখানে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের ত্রিবেণী সংগম হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থমেলাকে এভাবেই দেখা উচিত। নাহলে, সার্থকতা বুঝতে পারা যাবে না।

অনিল ভৌমিক বিষয়টিকে আরো বিশদ করে বললেন, বইয়ের মেলায় বই আসে নানা রকম। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রম্যরচনা প্রভৃতি। বিভিন্ন এলাকায় মানুষের রুচি, সাহিত্যের মান, প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গী, পাঠকের চাহিদা—সবই বোঝা যায়, এইরকম একেকটি প্রদর্শনীতে এলে। অনেক লেখক এখানকার বই নেড়েচেড়ে নতুন বই লেখার প্রেরণা পান। অনেক প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যায়। এইভাবে, পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রেও নতুন রুচির অভ্যুদয় ঘটছে। এটা কি কম কথা?

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থমেলায়, বাংলা বই কম প্রদর্শিত হয়নি। দর্শকদের দিক থেকেও উৎসাহ বেড়েই চলেছে। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশী বইগুলির রহস্যভেদ করতে পেরেছেন কজন? আমি তো অনেকগুলি বইয়ের প্রচ্ছদ দেখেও অনুমান করতে পারিনি, কোনটা কি ধরনের বই। গল্প, না, উপন্যাস? প্রবন্ধ, না, রম্যরচনা? হিন্দী, ইংরেজী, অসমীয়া ছাড়া অন্য কোনো বর্ণমালার সঙ্গে পর্যন্ত আমাদের পরিচয় নেই?

গত বছর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লীতে পাঠকের অভ্যাস কিরকম, সেটা জানার জন্য সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, দিল্লীর বেশীরভাগ নাগরিকই হিন্দী বলতে ও লিখতে জানেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে হিন্দীর পাঠকসংখ্যা বাড়ে না। ইংরেজী বই-ই পড়ে বেশী পাঠক। কলকাতায় এই ধরনের একটি সমীক্ষা চালালে কেমন হয়?

—গ্রন্থদর্শী

বইপাড়ায় সংকট ও সংকলন

গিয়েছিলুম বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভার কর্মকর্তাদের খোঁজে। অনেকেই ছিলেন। তবু কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। কে একজন বললেন, যদি জরুরী না থাকে তো ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসুন। সবাই এখন মিটিং নিয়ে ব্যস্ত।

আসব?

—নিশ্চয়ই!

বইপাড়ায় এখন বইয়ের মরশুম: গল্প নয়, উপন্যাস নয়, পাঠ্যবইয়ের বাজার এখন। গোটা এলাকাটায় মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। কেউ দপ্তরী, কেউ গ্রন্থকার। কেউ ছাত্র, কেউ শিক্ষক। হাতে পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের স্লিপ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন, শহর মফস্বলের বিক্রেতারা। তবু বইয়ের বিক্রী সামান্য। দুটো চারটের বেশী কেউই কিনছেন না।

কেন?

জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায়, মানুষের হাতে পয়সা নেই। বই কিনবে কে? সামনের বছর কি হবে, বলা যায় না। সিলেবাস পালটে যাচ্ছে। কাজেই, স্টক রাখতেও সাহসে কুলোচ্ছে না।

অর্থাৎ, অবস্থা অনিশ্চিত।

সব দোকানেই ক্রেতারা আসছে, যাচ্ছে! প্রকাশকেরা উদ্বিগ্ন। এই রকম মন্দা পরিস্থিতি ছিল গতবার। এবং তার আগেরবার। এবং প্রত্যেকবারই প্রকাশকেরা ভাবছেন, এ বছরটা বেঁচে থাকতে পারলে সামনের বছরে নিশ্চয়ই ব্যবসা ভালো হবে। এখন শুধু টিকে থাকার সমস্যা।

অবশ্য ভিন্নকথাও শুনেছি, দু একজনের মুখে। তাঁরা কেউ সুভাষ-স্মৃতি কি মানিক স্মৃতির সম্পাদক। কেউবা লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু কিংবা বাংলাদেশের ওপর বই। কিউবা কিংবা ভিয়েতনামের ওপরে রম্যরচনা। তাঁদের মতে, উত্তেজনা থাকলে পাঠকের মনও তেজী থাকে। বইয়ের বিক্রী ভালো হয়। শান্তির সময়ে কি কেউ যুদ্ধের কাহিনী পড়তে চায়? না, পড়তে ভালোবাসে?

তাই কি?

—হ্যাঁ, তাই-ই। উত্তর দিয়েছিলেন আরেকজন প্রকাশক, বনমালী ঘোষ। তাঁর মতে, প্রকাশকেরা বই বের করেন ব্যবসা করার জন্য। সেখানে ন্যায়-নীতির প্রশ্ন নেই। পাঠকের চাহিদাকে গুরুত্ব না দিলে পাবলিশার মরে যাবে। বইয়ের চাহিদা এবং ধরণধারণ দেখলেই বোঝা যায়, আমাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত, না, অবনত।

সংকট কোথায়

তাহলে বইপাড়ার সমস্যা কি? সংকট কোথায়?— জিজ্ঞাসা করেছিলুম এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্সের শ্রীসুপ্রিয় সরকারকে। দীর্ঘকাল তিনি বইয়ের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত।

বললেন, আসল সমস্যাটা কি জানেন? বাংলা একটি আঞ্চলিক ভাষা। শত চেষ্টা করলেও তার আয়তন বাড়ানো যাবে না। বিক্রী সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তার ওপরে আছে, প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা। তৈরী পাঠকের দিকেই সকলে নজর রাখছেন। পাঠককে তৈরী করার কথা কেউ ভাবছেন না। অথচ, প্রকাশকের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে বাড়তে এক অসহনীয় অবস্থা তৈরী হয়েছে।

সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভাসছিল, গোটা বইপাড়ার ছবিটা।

গরাণহাটার হিন্দু কলেজ এবং বৌবাজারের সংস্কৃত কলেজ যখন গোলদীঘির উত্তর পাড়ে নতুন বাড়ী বানিয়েছিল, তখনই বইপাড়ার অঙ্কুর গজিয়েছিল, কলেজ স্ট্রীটে। ক্রমে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। মাধববাবুর বাজার ভেঙে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। এমনি করেই বইপাড়ায় বইয়ের দোকান বেড়েছে, শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

এখন যদি কেউ বইপাড়ার একটা ব্লু-প্রিণ্ট তৈরী করেন, তাহলে চেহারাটা দাঁড়াবে, অনেকটা কালপুরুষের ছবির মতো। হ্যারিসন রোড যেন দুবাহু ছড়িয়ে আছে, পূবে-পশ্চিমে। পশ্চিমের বাহুটি সংক্ষিপ্ত। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ও শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটকে যদি অসম্পূর্ণ বৃত্তের একটা মাথা ভাবা যায়, তাহলে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ও তার আশে-পাশের গলিঘুঁজিকে মনে হবে দীর্ঘতম একটা শরীর যেন, হাতিবাগান ছুঁইছুঁই করছে।

সুপ্রিয়বাবু কি এই শারীরিক স্ফীতির কথা ভেবেছিলেন?

নিশ্চয়ই। নাহলে তিনি বলতেন না, এককালে বইপাড়ার একটা মস্ত হিণ্টারল্যাণ্ড বা পশ্চাদভূমি ছিল। বাংলাদেশ ছিল অখণ্ড। ছিল ত্রিপুরা এবং আসামের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগাযোগ। এবং সারা ভারতের বাংলাভাষী এলাকার পাঠকেরাও ছিলেন, কলেজ স্ট্রীটের জোগানের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু এখন?

প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে অনেক। অথচ, আশানুরূপ পাঠক বাড়ছে না। আগে, শিক্ষিত মানুষেরাই বই ছাপাছাপির লাইনে আসতেন। এখন খুব একটা শিক্ষাদীক্ষা থাকতেই হবে এমন কথা নেই। এ হয়েছে আরেক সংকট। এমন প্রকাশকও আছেন, যিনি বইয়ের মান নির্ধারণ করা তো দূরের কথা, সামান্য একটা প্রুফও ঠিক মতো দেখতে জানেন না। নাহলে, পাঠক এখনো আছে। তাঁদের খুঁজে বের করা দরকার। আমরা 'পাশ্চাত্যশিল্পের কাহিনী' বের করেছিলুম। এবং সম্প্রতি উৎপল দত্তের 'শেকসপীয়রের সমাজচেতনা' বের করেছি। কোনো বইটি কম বিক্রী হচ্ছে না।

পরিবেশনের সমস্যা

সুপ্রিয়বাবুরই প্রতিধ্বনি শুনেছিলুম, সারস্বত লাইব্রেরীর বিভাস ভট্টাচার্যের কণ্ঠে। বইপাড়ার বিপন্নতার মূলে, অন্য

ফুটপাতে বইয়ের বাজার

অনেক সঙ্কটের মধ্যে, প্রকাশকদের অশিক্ষাকে দায়ী করে তিনি বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কি অমল রায়-চৌধুরীর মতো লোক কি আছেন কোনো প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরিচালনায় চলতো কমলা বুক ডিপো এবং অমল রায়চৌধুরী ছিলেন দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটার।

কিন্তু আজ? বিভাস ভট্টাচার্য বললেন, বই বের করা সমস্যা নয়, পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াও একটা সমস্যা। আগে, গাঁয়ের মাস্টারমশাই, এবং বিক্রেতারা, আসতেন পাঠ্যবইয়ের মরশুমে। বইপাড়ায় লোকজনের যাতায়াত ছিল। কিন্তু সরকার পাঠ্যবইয়ের জাতীয়করণ করে আমাদের বিপন্ন করেছেন। এমন অবস্থা হবে, আমরা ভাবতেও পারিনি। তখন গাঁয়ের মানুষ কলকাতায় এসে কেবল পাঠ্যবই-ই কিনতেন না, দুটো চারটে গল্প, উপন্যাসের বইও কিনে নিয়ে যেতেন। সেই হেতু আমাদের নিজস্ব কোনো পরিবেশনের সূত্র নেই, সেই হেতু বইপাড়ায় হাহাকার দেখা দিয়েছে, ঐ স্বাভাবিকভাবে গড়ে-ওঠা বাণিজ্যিক শৃঙ্খলটি নষ্ট হওয়ার জন্যে।

আক্ষেপ করে তিনি বললেন, বই বের করে কি করবো? আমাদের হাতে এত টাকা নেই যে, নিজেরাই শহর মফস্বলের সর্বত্র পরিবেশন কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারি। অথচ, দিল্লী-বোম্বাইয়ের প্রকাশকেরা বইয়ের ব্যবসায়ে নেমেছেন অনেক টাকা নিয়ে। ওদের আদর্শ, লার্জ স্কেল ইণ্ডাস্ট্রি। আমরা আছি, কুটিরশিল্পের আদর্শ নিয়ে। এইরকম পরিস্থিতিতে, আত্মরক্ষার উপায় কি, তাও যেন ভেবে পাচ্ছি না।

সুপ্রিয়বাবুর প্রস্তাব

সুপ্রিয় সরকার নীরবে থাকার লোক নন। তাঁর চোখে স্বপ্ন কিন্তর। বললেন, এখনই এমন কিছু একটা করা দরকার, যাতে রাজ্য সরকারেরও টনক নড়ে। তাঁরা একথা ভেবে দেখছেন না যে, অনেকদিনের চেষ্টায় ও বিবর্তনে, বইপাড়ার যে-কমপ্লেকস তৈরী হয়েছে, কোনো কারণে তা ভেঙে গেলে, গোটা বাঙালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য দেখা দেবে। আমরাও মানসিকভাবে অবক্ষয়ের পথে চলে যাবো।

তাহলে, কি করা দরকার?

সুপ্রিয়বাবু বললেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কর্মসূচী জানি না। তবু আমি প্রস্তাব রাখছি, পশ্চিমবাংলার শহরে, গ্রামে ও উপশহরের যেখানে যত সাংস্কৃতিক দপ্তর আছে, সেগুলিকে তৎপর করে তোলার জন্য নানা-ভাবে চাপ দেওয়া হোক। লাইব্রেরী এবং শিক্ষার প্রসারে নতুন উদ্যম নেওয়া হোক। বিশেষ করে, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসগুলিকে ব্যবহার করা হোক, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা জাগাবার কেন্দ্র হিসেবে।

ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, পশ্চিম বাংলায় ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস আছে কয়েক শ। সমাজকল্যাণ কেন্দ্রও কম নেই। সেই সব জায়গায়, যদি অফিসগুলিকে একটু ঢেলে সাজানো যায়, তাহলে গ্রামে-গ্রামান্তরে, বইয়ের পরিবেশন কেন্দ্র গড়ে তোলাও কঠিন হবে না। প্রত্যেকটি ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসের সংলগ্ন থাকবে, একটি করে বইয়ের কাউণ্টার। এবং বই ডিসপ্লে করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা।

একটু থেমে বললেন, তাতে সরকারের বাড়তি টাকা খরচ হবে? তাতে কি? প্রকাশকেরা বই বিক্রী হলে যে কমিশন দেবেন, আমার বিশ্বাস, সেই কমিশন থেকে দু' একজন লোকের মাইনে পত্রের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এবং প্রকাশকেরাও নতুন ধরণের বহু বই বের করার ঝুঁকি নিতে পারবেন। কেননা, এই ভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র পরিবেশন কেন্দ্র গড়ে উঠলে, একেকটি বইয়ের এডিশন হতে বেশী সময় লাগবে না। এবং প্রতিটি কেন্দ্র থেকে কোনো একটি বই যদি, দু' কপি করেও বিক্রী হয়, তাহলে এগারো শ' বইয়ের সংস্করণ শেষ হবে, দু' মাসেরও কম সময়ে।

আমি সুপ্রিয়বাবুর প্রস্তাবে শুধু অবাক হইনি, আশার আলো দেখতে পেয়েছিলুম। সেই মুহূর্তে, জাপানের দৃষ্টান্তের কথাও মনে পড়েছিল। ওখান-কার প্রকাশকরা কেউই সরাসরি বই বিক্রী করেন না। সর্বাধিক সাড়ে সাতাশ পার্সেণ্ট কমিশনে, পরিবেশকরা পুস্তকবিক্রেতা-দের কাছে বই পরিবেশন করেন সামান্য কিছু মুনাফা রেখে। তাতে কোনো বই-ই মার খায় না। প্রকাশকেরাও নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি কি সেদিকে পড়বে?

তাঁরা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ব্যবসায়ে নেমেছেন। খাদ্য শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসা চলছে। কিন্তু স্বদেশী সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তারে কি রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেবেন না? প্রকাশকেরা এখন তাঁদের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

ট্রেড না ইণ্ডাস্ট্রী?

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সভার ঠিকানাটার দিকে নজর পড়লে চমকে উঠতে হয়। পোস্টাল জোন হিসেবে, ওটা কলকাতা সাত। অর্থাৎ বড়বাজার এলাকা। অথচ, বড়বাজারী চাল কোথাও নেই। না টাকার লেনদেনে না উৎপাদনের রীতিতে।

'বাক সাহিত্যের' শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিক্রেতা সভার সম্পাদক। তিনি বললেন, আমরা 'বুক ইণ্ডাস্ট্রি' 'বুক ইণ্ডাস্ট্রি' করে চেঁচিয়ে মরলেও, সরকার কিন্তু বইয়ের ব্যবসাকে ইণ্ডাস্ট্রি মনে করেন না। অথচ, ইণ্ডাস্ট্রির অসুবিধাগুলো আমাদের প্রতি মুহূর্তেই আছে। কোনো বিরোধ দেখা দিলে, তা টের পাই।

তাহলে, এটা কি?

—বোধহয় ট্রেড। শচীনবাবু বললেন, বইয়ের ব্যবসাকে যদি ইণ্ডাস্ট্রি মনে করা হতো, তাহলে ইণ্ডাস্ট্রির মতো লোন পেতুম। এবং লোন পেলে, অনেক বড় বড় পরিকল্পনাতেও হাত দেওয়া যেত।

এখন কি পাওয়া যায় না?

—যায়। তবে আমরা সেই সুযোগ বেশী নিতে পারি না। ফন্দি-ফিকিরও জানি না। শুনেছি, দিল্লী, বোম্বাইয়ের প্রকাশকেরা স্কীম-অনুযায়ী ষাট-সত্তর পার্সেন্ট পর্যন্ত সাবসিডি পেয়ে থাকেন। আমাদের কাছে দিল্লী অনেক দূর। কাজেই সরকারী দানের পয়সাও মুঠোয় এসে পড়ে না। কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়।

ফেডারেশন এ ব্যাপারে কিছু করছে না?

শচীনবাবু বললেন, হ্যাঁ। ফেডারেশনই প্রধান ভরসা। ডাকখরচ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমরা সরকারকে লিখেছি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি ওরা সারভে করছেন। এদিকে আমরা ডাকখরচের ভয়ে বইপত্র পাঠাতে গিয়েও পাঠাতে পারছি না। দু' টাকার বই পাঠাতে আরো দু টাকা খরচ হয়ে যায়। এই তো অবস্থা।

ক্লাসিক-গ্রন্থের চাহিদা

'মিত্র ও ঘোষ'-এর অভিজ্ঞতা অন্যরকম। যদ্দূর মনে হয়, নিজের উদ্যমের ওপরে তাঁরা আস্থাশীল। তবে, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, দেশের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে। সুমথনাথ ঘোষ বললেন, প্রেস, কাগজ, দপ্তরী প্রভৃতি সব কিছুই দুর্মূল্য। তার ফলে, বইয়ের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে এ-ও এক আতঙ্ক।

তাহলে কি করবেন?

—কি আর করবো? সুমথবাবু বললেন, তার ওপরে বাড়তি উপদ্রব দেখা দিয়েছে শহরে এবং শহরতলিতে। সিনেমায় লাইন, ক্রিকেটের উত্তেজনা, কালচারাল ফাংশানের সস্তা হৈহুল্লোড়—এসব নিয়েই মেতে আছে যুবকযুবতীরা।

বললাম, তাও তো দরকার? নয় কি? আলি আকবরের অনুষ্ঠানেও তো মানুষের ভীড় হয়!

সুমথবাবু বললেন, দরকার সবই। তবে, হুজুগেপনার বিপদও কম নয়। এর ফলে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। পাঠকের চেতনাও গভীরতর হচ্ছে না। আমি দেখেছি, যেখানে স্বচ্ছলতা বেশী, এবং আদায় অ্যামিউজমেণ্ট নেই, সেখানে বইয়ের চাহিদাও বেশী। যেমন, পূর্ববাংলায়। ওখানে সিনেমা-থিয়েটারের বাহুল্য না থাকায়, মানুষ বইপত্রের ওপর নির্ভর করে বেশী।

তরুণ পাঠকেরা কি তরুণ লেখকদের বই পছন্দ করে না?

—লেখার ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণের আলাদা শ্রেণীবিভাগ নেই। তরুণদের লেখা কেউ পড়তে চায় না। তার কারণ, তাদের লেখায় গল্পের ভাগ কম। বলেছিলেন, মিত্র ও ঘোষের ভানুবাবু।

কেন? তরুণ লেখকেরা কি তরুণ পাঠকপাঠিকার সমকালে বসে, তাঁদেরই সমস্যাকে তুলে ধরতে পারছেন না? আমার তো মনে হয়, এই সময়ের একজন তরুণ লেখকের পক্ষে, তরুণতম পাঠকপাঠিকার ভাষা ও ইচ্ছাকে যতটা সার্থকতার সঙ্গে রূপ দেওয়া সম্ভব, অন্য একজন লেখকের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়।

সুমথবাবু বললেন, আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে। আমরা বিভূতি রচনাবলী বের করছি। বিক্রী কম হয়নি। তারাশঙ্কর রচনাবলী বের করছি। তাও কম বিক্রী হচ্ছে না। আর আমরাই বা বলি কেন? অনেকেই তো এখন গ্রন্থাবলী বের করছেন। কারো বই কি কম বিক্রী হচ্ছে? আমার ধারণা, ক্লাসিকের চাহিদা চিরকালই ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে। কোনো তরুণ লেখক তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না।

চাই বাংলা একাডেমী

বেঙ্গল পাবলিশার্সের মনোজ বসু বললেন, প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলো না। ও'রা ব্যবসায়ী। ব্যবসা ছাড়া কিছুই বোঝেন না।

বললুম, প্রকাশক না থাকলে লেখকেরা বিপন্ন হয়ে পড়বেন যে!

—তা ও'রা যত খুশি বই ছাপুন। তাতে নতুন লেখকদের কোনো উপকার হবে না। ও'রা চান জনপ্রিয় লেখকদের লেখা ছেপে টাকা উপায় করতে। তার বেশী প্রকাশকদের কোনো ভূমিকা নেই। আমি এ'দের হাড়ে হাড়ে চিনি। যদি দেখো, কোনো নতুন লেখকের বই কোনো প্রকাশক ছাপছেন, তাহলেই বুঝবে, কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে।

অর্থাৎ, বিনা রয়েলটিতে পাণ্ডুলিপি জোগাড় করেছেন। না হলে কে আর নতুন লেখকের লেখা ছেপে টাকাকড়ির রিস্ক নেয়।

মনোজবাবু বললেন, আমরা প্রতিভার অপচয় হতে দেব না। শুনেছি, অন্ধ্রে এবং কেরালায় সাহিত্য একাডেমী আছে। বাংলাদেশে আছে, বাংলা একাডেমী। আমরাও অনুরূপভাবে সাহিত্য একাডেমী গড়ে তুলব।

কেন? পশ্চিমবাংলার তরুণেরা কি লিখতে জানেন না? তাঁদের কি প্রকাশকের মুখ চেয়ে থাকতে হবে?

দরকার। সাহিত্যের জন্য, গবেষণার জন্য, আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের জন্যই আমাদের বাংলা একাডেমী তৈরী করতে হবে। সরকারই হবেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক। এই সংস্থা তরুণ গল্পকারদের গল্পের বই ছাপবে, তরুণ গবেষকের গবেষণাপত্র ছাপবে, এবং প্রত্যেককেই উপযুক্ত অর্থ ও সুযোগ এনে দেবে। কেউ বঞ্চিত হবে না। তাছাড়া, আলাপ, আলোচনা, সেমিনার প্রভৃতির ব্যবস্থাও করবে, ঐ প্রস্তাবিত বাংলা একাডেমী।

মনোজ বসু আক্ষেপ করে বললেন, সব রাজ্যের রাজ্য সরকার আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছুতেই ঘুম ভাঙছে না। আমাদের তা ভাঙাতে হবে। যে-সাহিত্যিক শক্তিশালী কলম নিয়ে জন্মেছেন, তাঁকে এনার্জি দেওয়ার কেউ নেই। আমরা আছি। তরুণ লেখকদের ক্ষমতার যে-অপচয় হচ্ছে, তার হাত থেকে, তাঁদের বাঁচাতে হবে।

—শুভঙ্কর পাঠক

আজীবন পাথর-প্রতিমা ॥

কবিতা সিংহ

মা, হাতের উল্টোপিঠে মুছে নিয়েছি শেষবারের মত
দু'চোখ ছাপিয়ে নামা, চোখের জলের বৃথা দাগ
বেণীর সাটিন খুলে উর্ধশ্বাসে ছুটে গেছি আমি
অশ্বক্ষুরে ঝনঝন্ নারীদের দর্পণ ফাটায়ে
খরকরবালে একা পিতার রক্ষিতার মুণ্ড এনে দিতে!

তাই ঘৃণা, দুই চোখ কাজল জানেনি
নারীর শৃঙ্গার ছলা দর্পণের পায়ে পায়ে ক্লিন্ন অধীনতা
কার জন্য এত সাজ? বক্ষ বাঁধা? নীবি?
সমস্ত পুরুষ সেই আদি পিতা, নিষ্ঠুর অশুচি
তোমার স্তনের থেকে ছিন্ন করে ভুবন ঘোরাবে!

মা, আমি কি তেমন হব? রক্ষিতামন্যাস্ফীত স্তনিত শঙ্খিনী?
মেডেলে পদকে স্বর্ণে ব্যর্থ বিজয়িনী?
শয্যায় পুরুষ হত্যা, পিতৃহত্যা শুধু নয় মাতা

রণক্ষেত্রে দেখা হবে সম্মুখ সমরে তীব্র ইস্পাতের অচিত্র-অঙ্গদে।
আমিত শিখিনি মাতা রমণীয় পশ্চাদপসরণ।

মা, হাতের উল্টোপিঠে মুছে নিয়েছি শেষবারের মত
ঠোঁটের কোণার থেকে তোমার দুধের খাঁটি স্বাদ
সেই থেকে সব এত জোলো মনে হলো।
সব দৃশ্য সব প্রেম সব দুঃখ সমস্ত বিচ্ছেদ
উচ্ছৃত অশ্বের ক্ষুরে খান্ খান্ করুণ আস্থায়ী
আমি শুধু ছুটে যাই, ছিলাটান, এক অক্টেভ থেকে
অক্টেভ অন্তরে স্থায়ী রাগে
আর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধী, গ্রীবা ফেরালেই পাই ওই মুখ
গরীয়সী যেন স্বর্গাদপি।

হে আমার আদিপিতা, হে আমার আদিম প্রেমিক
তোমার বিচ্ছেদ দষ্ট যেন কালসর্পদষ্ট দয়িতার ওই মুখ
কোনোদিন তুমি দেখলে না।

এসো মা, তোমায় দেখি, আমি তোর ব্রাত্যকন্যা
আজীবন পাথর-প্রতিমা।

শব্দ নাকি বন্ধ্যা আর ॥

শিশির ভট্টাচার্য

শব্দ নাকি বন্ধ্যা আর
বন্ধ্যা সেই আদিম দেওয়াল,
গ্রানাইট অখণ্ড বিশ্বাসে
অহর্নিশ উচ্চকিত খাড়া।

শব্দ যেন জন্ম আর
মৃত্যু ঘেরা স্বয়ংবৃত সিঁড়ি,
ওঠা কিংবা নামা কিংবা থামা
গভীরতর অন্ধকার ছুঁয়ে।

শব্দ তবু গড়া কিংবা ভাঙা
মাংস মজ্জা মেদ রক্ত রাঙা,
যন্ত্রণাটা নিংড়ে দিয়ে আসা
আকাঙ্ক্ষিত অগুরু নিঃশ্বাসে।

শব্দ মানে অবুঝ অনুভূতি
কিংবা কোন অফল ভালোবাসা,
পুড়িয়ে এসে উড়িয়ে দেওয়া ছাই,
জ্যোছনা কাঁপা নদীর নির্জনতা।

বসে আছি—বসেই আছি ॥

শৈলেন শেঠ

কথা ছিল হাতের কাজটা সারা হলেই ডাক পাঠাবে
আমি নিজেই গিয়ে তোমার হাতের মণিবন্ধের
মাপটা লেব
শঙ্খ বণিক রোজ দুপুরে আমার ঘরেই ধরণা ধরে
কি আর করি, আষাঢ়ে এক গল্প বলেই
সান্ত্বনা দিই
গল্প বলি—মদনদেবের শর-সাধনার; গল্প বলি
গোপন যত প্রথম প্রেমের প্রতিশ্রুতির; বুঝিয়ে বলি
একাই আমি ভুল করিনি—অনেক আগেই
অনেক ছিল
অনেক পরেও অনেক হবে ভুলের বোঝা
সবটা শুনে বণিকমশাই বিজ্ঞ চালে বলল হেসে
প্রমাণ কোথায়?
হঠাৎ মাথায় দুষ্টবুদ্ধি ভর করল; বলেই দিলাম—
অজন্তা আর ইলোরাকে সঙ্গে নিয়ে, কোনার্কের রথ চালিয়ে
যদি পারেন এক্ষুনি যান খাজুরাহো ...
পটের বিবি, ঘটের বিবি—সব বিবিরাই
দুধ জমানো সাধের শাঁখার দেখা পেলেই
বুকের ভারী পাথর ফেলেই
হাত বাড়িয়ে আসবে ছুটে
দোহাই কিন্তু বণিকমশাই
কাজ ফুরোলে ফের আসা চাই
শঙ্খ বণিক ঝোলা কাঁধে সেই যে গেলো
আজ অবধি আর দেখা নেই;
আমি এখন—
তোমার হাতের মণিবন্ধের মাপটা জেনেই
সেই থেকে ঠায় বসে আছি—বসেই আছি।

(১)

কিছুদিন পর্যন্ত দিদি একেবারে নীরব আর বিষণ্ণ হয়ে থাকলো। এটাই স্বাভাবিক, সেই ছোট্টবয়সেও এ জ্ঞান জন্মেছিল, অপমানের বাড়া মর্মান্তিক যন্ত্রণা আর কিছুতেই নেই। তবু আমার কাছেও যে দিদি 'কাঠ' হয়ে রইলো এটাই বড় দুঃখের। আমার পক্ষেও যেন এ এক মর্মান্তিক অপমান।

আজকাল একা একাই ঘুরতাম, কখনো জানলার ধারে কখনো এঘর ওঘর। বাড়িটা তো বড়ই, দাদারা কলেজে চলে যেতো, বাবা অফিসে, মা নিজের ঘরে দিবানিদ্রায় নিমজ্জিত। সব জায়গাগুলোই ফাঁকা।

ছায়া ছায়া দুপুর হলে ছাতেও উঠে যেতাম, কিন্তু মাঝেমধ্যে নতুনই চালাচুটি ক্লান্ত, চিমনির কালো কালো ছাপ ধোঁয়ার মধ্যেও আর আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শূন্য মন নিয়ে একা বসে ছেলেবেলার পুতুলগুলি নেড়েচেড়ে দেখতাম।

বারো বছর পূর্ণ হয়নি তখন।

ছেলেবেলার সুখকে পরম সম্পদের মতো আঁকড়ে ধরছি, এটা হাসির কথা, কিন্তু ধরেছি তাই। মনে হতো এইরকম দুঃখকেই দিদি 'বিরহ বেদনা' বলেছিল।

তার আগে যে যে বাড়িগুলোয় থেকেছি সেই বাড়িগুলোর কথা স্মৃতির সীমানায় আনতে চেষ্টা করতাম।

সবগুলো স্পষ্ট মনে পড়তো না, কোনোটার রান্নাঘরের দাওয়াটা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। যেখানে চার ভাইবোনে পিঁড়ি পেতে ভাত খেতে বসেছি। আমি ছোট বলে মা আমার সামনে বসে মাছের কাঁটা বেছে দিচ্ছেন, ভাত মেখে দিচ্ছেন।

মনে পড়ে যায় কোনো বাড়িটার শোবার চৌকীর মাথার কাছের জানলাটা, যেখান দিয়ে চাঁদ দেখা যেত, আকাশ দেখা যেতো, আবার একটা ঝাঁকড়া মাথা গাছও দেখা যেতো। ভয়ধরানো মূর্তি নিয়ে সে শুধু দাঁড়িয়েই থাকতো না, মাথাটা নাড়তোও। রাত্রে সেই মাথা নাড়া দেখলে সর্বশরীর হিম হয়ে আসতো।

কতো ছোট্টবেলা থেকেই যে দিদি আর আমি আলাদা একটা ঘরে শুই। মার কাছে শোওয়া আমাদের মনে পড়ে না। দাদারা দাদাদের ঘরে, মা বাবা মাদের ঘরে, আমরা আমাদের ঘরে।

সেই জানলাটা আমরা কিছুতেই রাত্রে খুলতাম না, গরমে মরে গেলেও না। একালকার নিতান্ত গরীব গেরস্ত ঘরেও দেখি সদ্যোজাত শিশু থেকে শুরু করে বাচ্চারা আর ফ্যানের নীচে ছাড়া ঘুমোতেই পারে না। একবার সুইচ অফ করলেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়। আমাদের আমলে খুব বড়লোকের বাড়িতে ছাড়া লাইট ফ্যানের কথা কেউ ভাবতেই পারতো না।

ঘরে ওই একটা মাত্রই জানলা, তবু খুলতে সাহস নেই, যদি গাছটা রাত্রে ভূত হয়ে হাত বাড়ায়।

আর একটা বাড়িতে ছাতে ওঠার সিঁড়িটা ছিল রেলিংহীন, আর ছাতটা ন্যাড়া। সর্বদা হাঁ হাঁ করতেন মা, 'ছাতে যাচ্ছিস কেন... ছাতে সাবধান।' কিন্তু সেটা আমাদের নয়, দাদাদের।

আমরা তখন নিজেরাই ওই সিঁড়িটা দেখে ভয়ে কাঁপতাম। ওই বাড়িতেই উঠোনে একটা বড় চৌবাচ্চা ছিল, তার ভিতরকার দেয়ালটা শ্যাওলায় সবুজ, জলের কল থেকে একটা চেরাইকরা বাঁশ দিয়ে সর্বদা জল পড়তো তাতে।

ঝি বালতি ডুবিয়ে ডুবিয়ে জল নিতো। একদিন মেজদা সেই চৌবাচ্চাটায় নেমে 'সাঁতার শিখতে' গিয়ে খুব বকুনি খেয়েছিল মনে আছে।

আর একটা বাড়ি যেটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে, তার উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। চারদিক শান বাঁধানো, গাছটা রয়ে গেছে মাঝখানে। কষা কষা ছোট্ট ছোট্ট পেয়ারা হতো, আর মা কেবল গাছটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে 'পেয়ারা পাতার জল' করে আমাদের মুখ ধোয়াতেন। বলতেন, দাঁত ভাল থাকে। মার নিজের যেটা ভাল মনে হতো, মা সেটা সবাইকে করিয়ে ছাড়তেন।

সে বাড়িতে মাঝে মাঝেই সকালবেলা একটা লম্বা ফর্সা বৈষ্ণব ভিখিরি আসতো, আর খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতো। বাবা তাকে বসিয়ে গান শুনতেন আর চাল পয়সা আলু, এইসব দিতেন।

মা বলতেন, 'তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি! চাল দিলে আলু দিলে, আবার একটা একানি দিলে! একটা একানিতে একসের আলু হয় তা জানো?'

বাবা হেসে হেসে বলতেন, 'শুধু আলু কেন, কত কী হয়! তিন পোয়া চাল হয়, দুটো নারকেল হয়, আমাদের গোয়ালা মার্কা দুধ হয়, একসের কুচো চিংড়ি হয়—'

মা রেগে গিয়ে বলতেন, 'আড্ডাও বসে বসে মহাভারত। যা বলবো, তক্কেই ঠাট্টা।'

আমাদের বাড়িতে গোয়ালা আসতো গরু নিয়ে কী একটা দুর্বোধ্য শব্দে ডাক দিতো, বাবা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন, লোকটা পেয়ারা গাছের গোড়ায় গরুর দড়িটা বেঁধে দুধ দুইতো, বালতিতে দুধ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র একটা শব্দ উঠতো, দিদি তার খেলাঘরের মাটির গরুটাকে দুইবার সময় মুখেই ওইরকম একটা আওয়াজ তুলতো। কেমন করেই যে পারতো। দিদি হাত মুঠো করে পুতুলের সংসারে সন্ধ্যার শাঁখও বাজাতো সেই এতোটুকু বেলা থেকে। দুধের বালতির মধ্যে খড় ডুবিয়ে যে দুধ রাস্তা দিয়ে বিক্রী করতে নিয়ে যেত তাকেই বাবা গোয়ালা মার্কা বলতেন।

যতোক্ষণ গোয়ালাটা থাকতো, মার আর ঘর থেকে বেরোবার উপায় থাকতো না। বেটাছেলেদের সামনে তো মেয়েদের বেরোনো চলে না। চলে গেলে মা বেরিয়ে রাগ করতেন, 'বাব্বাঃ কতো যে দেরি করে! জেলখানায় আটকা পড়ে মরছিলাম।'

তা এমন জেলখানায় আটকা পড়া, জাতিকলে আটকা পড়া অবশ্য মার অনেক সময়ই ঘটতো।

গোয়ালা ছাড়াও কতো সময় কতো লোক আসতো। রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, শিশিবোতল কাগজ! বাড়িওয়ালার ছেলে বাবার কোনো বন্ধু, নানারকম।

এদের তো তাদের বলা যায় না, 'তুমি সরো বাপু, ঘরের মধ্যে একজন জ্ঞাতিকুলে আটকা পড়ে আছেন, এখান দিয়ে রান্নাঘরে যাবেন।'

অতএব ভুগতে মাই ভুগতেন।

আর একজন আসতেন, তিনি নাকি আমাদের দূর সম্পর্কের কোনো পিসে-মশাই। তাঁর সঙ্গে এমনিতে কথা কওয়ায় কোনো বাধা নেই, কিন্তু তাঁর নাকি স্বভাব খারাপ। তাই মা ওঁর সামনে বেরোতে চাইতেন না সহজে।

স্বভাব খারাপ কথাটার অর্থ কি জানা ছিল না, তবে অতীশ পিসেমশাইকে দেখে আমার একদম ভাল লাগতো না। কী রকম বড় বড় আর ছুঁচলো গোঁফ, কী রকম লাল লাল চোখ, দেখে ভয় লাগতো। উনি এলেই দিদি আর আমি সরে পড়তে চাইতাম, আর মা বলতেন, 'বোস এখানে।'

অর্থাৎ আমাদের দিয়ে মা পাহারা-দারের কাজ করিয়ে নিতে চাইতেন। একদিন কী হয়েছিল জানি না, বাবা তাঁকে কী যেন বলেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'আত্মসম্মানবোধ থাকলে আর আসবে না।'

তা হয়তো ছিল তাঁর সে বোধ, সত্যিই আর আসেননি। আমরা বেঁচেছিলাম।

ছোটবেলায় কতো মানুষকে দেখেছি যে ভয় করতো। একটা বুড়ি ভিখিরি আসতো, তার চুলগুলো ডাইনীর মতো ছিল। অবশ্য 'ডাইনী' কেমন দেখতে সেটা জানার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার দাবি করতে পারা যাবে না, তবে ও যে ডাইনীর মতন তাতে সন্দেহও ছিল না।

তা মাও ভয় করতেন বৈ কি। যেই বুড়ির গলার আওয়াজ পাওয়া যেত, 'মা দুটি ভিক্ষে পাই—' অমনি মা আমাদের বলতেন, 'খবরদার বাইরে যাসনে। নজর দেবে!'

নজরলাগা কথাটা শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। অথচ মুস্কিল আসান এলে মা নিজেই একটা পয়সা দিয়ে বলতেন, 'যা দিয়ে আয়। সবাই টিপ নিস।'

টিপ তো নেব, এদিকে সামনে যেতেই বুক ঢিপ ঢিপ! সন্ধ্যে ছাড়া তো দিনে আসবে না কখনো।

বিশালকায় মূর্তি, টকটকে লাল আলখাল্লা পরা, স্ফটিকের মালা গলায়, বড় বড় চুলের উপর টিলের মত একটা পাগড়ি বসানো, এতোখানি লম্বা দাড়িওলা মশাল হাতে করা সেই মূর্তি দেখে, ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত।

যখন সদর দরজার কাছে সেই ভয়াল কণ্ঠের ধ্বনি বেজে উঠতো, 'ইয়া—পীর মুস্কিল আসান!'

তখন ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও কাছে এসে দাঁড়াতেও ছাড়তাম না। কপালে সেই মশালের ভূষোর টিপ না নিলেও তো ভয়ঙ্কর পাপ হবার ভয়।

পাপের ভয়! সে যে মজ্জাগত।

যখন কপালে মুস্কিল আসানের সেই টিপ সমেত হাত ঠেকতো বরফ হয়ে যাওয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, প্রবাহিত হবার ক্ষমতা থাকতো না তার। তাই নিশ্বাসও পড়তো না কিছুক্ষণ!

কক্ষণো তিন চারজনে মিলে ভিন্ন যাওয়ার সাহস ছিল না, একা গেলে যে মুস্কিল আসান চট করে তাকে ধরে ফেলে তার বৃহৎ ঝোলার মধ্যে পুরে ফেলে পিঠটান দেবে, এতে তো কোনো সন্দেহ ছিল না। দাদারও না। বোধহয় মারও না।

তা নাহলে মা কেন পয়সাটা দিয়েই বলতেন, 'ভাইবোনে একসঙ্গে যাও।'

তারপর অবশ্য মানে সে সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর পাড়া পার হয়ে গেলে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিপন্ন করতে চাইতাম, 'আমি মোটেই ভয় পাইনি। এই দ্যাখ্ আমার হাত গরম।'

বাবা শুনতে পেলে হেসে উঠে বলতেন, 'কে ভয় পায়নি শুনি? আমরা এখনো ভয় পাই।'

আরও একটা স্মৃতি ছিল সে বাড়ির। ভয়ঙ্করী নয়, মধুর। বসে বসে সেই স্মৃতিটি ভালো দেখতাম। মনে করলাম সেই রেলের বাঁশীর কথা!

ইঞ্জিন ছাড়ার সময় প্রাণ উদাসকরা অথচ তীব্র তীক্ষ্ণ সেই 'কুউউ' শব্দ! দিদি আর আমি কাছাকাছি ঘেঁসে বসতাম। কিন্তু সেই 'কুউ' ধ্বনি কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া কোনো রেলগাড়ির বাঁশী নয়। সে বাঁশী শহরের মধ্যেই পাক খেতো। এখন ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়, কিন্তু সেটাই ছিল অনেক সুখের মধ্যে একটি বিশেষ সুখ।

রেলগাড়িটা ছিল জঞ্জাল বইবার মাল গাড়ী!

সেটা আমাদের ওই পেয়ারা গাছওয়ালা একতলা বাড়িটার সামনে দিয়েই যাওয়া-আসা করতো। কয়লা বোঝাই মালগাড়ির মতই হতো ময়লা বোঝাই। রাত চারটে থেকে শুরু হতো ঘোড়ায় টানা ময়লা গাড়ির ঝড়াং ঝড়াং শব্দ! সারা শহর থেকে জঞ্জাল কুড়িয়ে এনে বোঝাই দিতো ওই রেলগাড়িতে।

দিদির আর আমার পীঠস্থানই ছিল বাড়ির রাস্তার দিকের জানলা দুটো। সেই অবিশ্বাস্য জঞ্জালের সমারোহ, বেশ আহ্লাদের দৃশ্য বলেই মনে হতো। কারণ শেষ বোঝাই হয়ে গেলেই তো ইঞ্জিন ছেড়ে দেবে, আর আকাশ পাতাল আর আমাদের হৃদয়কে আহ্লাদে বিদীর্ণ করে ধ্বনি উঠবে কুউউ!

তখন দিদির আর আমার অনুভূতির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না।

দিদি বলতো, 'এ বাড়িটায় কী মজা!'
আমি ভাবতাম 'এ বাড়িটায় কী মজা!'

জানলার বাইরে নীচে রাস্তার ওপর সরু রোয়াক, সেই রোয়াকে উঠে আসতো ঘুগনিওলা, ছোলা সেদ্ধ আলু-কাবলিওলা, পাংখাবরফওয়ালা।

পাংখাবরফ তৈরীর সেই আশ্চর্য কৌশল মোহিত হয়ে দেখতাম। কেমন করেই যে ছোট্ট একটু লাল ন্যাকড়ার টুকরোর মধ্যে এক টুকরো বরফ আর একটা কাঠি ঢুকিয়ে মুড়ে নিয়ে তার ওপর খাঁই করে একটা কাঠের হাতুড়ির ঘা মারতো, আর তার থেকে বেরিয়ে আসতো বরফ ঝিরঝিরে বাটিওয়ালা পাখাটি।

সেই অপূর্ব বস্তুটির ওপর ছিটিয়ে ছিটিয়ে গোলাপ জল দিতেও কার্পণ্য করতো না লোকটা, তারপর জানলার শিক থেকে বাড়িয়ে ধরা আমাদের দুই ভাইবোনের দুখানি হাতে দুটি পাখা ধরিয়ে দিয়ে একটি পয়সা নিয়ে হাস্যবদনে চলে যেত।

ওগুলো ছোট পাখা।

বড় পাখা খেতে হলে একটা এক পয়সা

জানলার ওই শিকের ফাঁক দিয়েই চলে আসতো ঘুগনি ছোলা, সেদ্ধ আলুকাবলি, কোনাচে করে কাটা শালপাতার টুকরোয়।

মাঝে মাঝে কাল বিস্কুট এসে যেত মলিন কাগজের টুকরোয় চড়ে। কিন্তু ওই মলিনতা নিয়ে মাথাব্যথা তখন ছিল না।

বাবার ছিল।

বাবা ওই সব অনির্বচনীয় বস্তু সম্পর্কে অনেক গভীর গোপন তথ্য প্রকাশ করে আমাদের মধ্যে ঘৃণা উদ্রেকের চেষ্টা করতেন, তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বাবা কৃতকার্য হতেন না।

এসব তো দুপুরের ব্যাপার, আর বাবা তো তখন অফিসে।

কুলপীটা অবশ্য সন্ধ্যের মুখে, তবে তাকে সাবধান করাই ছিল, বাবু বাড়ি আসার আগে দিয়ে যেতে। এ ষড়যন্ত্রে দাদা মেজদাও থাকতো। না থাকলে অবিশ্যি অসুবিধেয় পড়তে হতো।

কুলপী যে দু' পয়সার কম নয়।

দাদাদের কাছে পয়সা থাকতো, স্কুলের টিফিনের খাতা কেনার। অতএব হাস-পাতালের কুষ্ঠরোগীর গা ধোওয়ানো দুধে তৈরী মালাই কুলপী, এবং 'ইঁদুরের মাংসে' তৈরী পাঁঠার ঘুগনি, আর 'ঘোড়ার ছোলায় তৈরী ছোলা সেদ্ধ, ও 'বাজার ঝেঁটানো পচা আলু' দিয়ে বানানো আলুকাবলি নির্দ্বিধায় সোনা হেন মুখে খেয়ে নিতাম। বিষ? কে বিশ্বাস করে? আর হয়ই যদি, বিষ তো তখন অমৃতে রূপান্তরিত।

তা' সেটা কি শুধুই অবোধ শৈশবে?

অবেলাই কি বহুবিধ বিষ অমৃতবোধে পার করে চলছি না আমরা?

●

আরও ছোটবেলায় পৌঁছে গিয়ে দেখতাম দিদি আর আমি নাগরদোলায় চড়ে পাক খাচ্ছি, ঘুরেছি ভিড়ের মধ্যে ঠাকুর দেখে দেখে।

অবিশ্যি ঠাকুরের সংখ্যা সামান্যই, মা-দুর্গা তখনো তো এমন সার্বজনীন হননি, ভাগ্যবান ধনবান সন্তানদের ঠাকুর দালানেই বিরাজ করতেন।

মনে পড়ে ঠাকুর দেখতে যেতাম, শোভাবাজারের রাজবাড়িতে, শ্যামবাজারের মিত্তির বাড়িতে, কী যেন এক ঘোষ বাড়িতে, ওই অবধি। তিন চারখানা ঠাকুর দেখাই কি সোজা সৌভাগ্য নাকি?

পায়ে নতুন জুতোর ফোসকা, গায়ে তিনদিন ধরে একটিমাত্রই 'পুজোর জামা' কিন্তু তাতে কী? পুজোর বাজনা তো শুধু ঢাকেই আঘাত হেনে 'বোল' ফোটাতো না, হৃদয়দ্বারে আঘাত হেনে দরজা খোলাতো যে।

সেই খোলা দরজা দিয়ে 'আনন্দ' এসে দাঁড়িয়ে বলতো, 'এই যে এলাম।'

মাঝে মাঝে খোকার মার কোলে উঠতেম।

ও পালা করে দিদিকে আর আমাকে এক একবার কোলে নিতো। কিন্তু বুড়ো মানুষ বেশীক্ষণ পারতো না।

তবু সেইটুকুই পরম আহ্লাদের।

খোকার মার সঙ্গে ছাড়া আর কবে কার সঙ্গে 'মাদুগ্গা' দেখে বেড়িয়েছি?

মনে পড়ে না।

মার তো আর ঠাকুর দেখে বেড়াবার প্রশ্ন নেই, দাদারা ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে যেতো, কদাচ বাবার সঙ্গেও।

আমরা মেয়েরা ঝিয়ের ভাগে।

খোকার মা বলতো, 'শক্ত করে আমার আঙুল ধরে থাক খুকীরা, ভিড়ে ছটকে গেলে, আর খুঁজে পাবনি।'

তবু একবার একদিন দিদির হাতের সোনার বালা হারিয়ে গেল।

দিদি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এলো, বললো, 'এমন জোর করে খুলে নিলো কে, হাতে এতো লেগেছে।'

মা তো খোকার মাকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি বকলেন, সে বেচারী হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওকে বকছো কেন?'

মা বললেন, 'কে বলতে পারে ও নিজেই টেনে নিয়ে সাধু সেজে কাঁদছে কিনা। ওকে আমার কেমন বিশ্বাস নেই।'

বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললেন, 'ওকে তোমার বিশ্বাস নেই, অথচ ওর হাতে দু দুটো ছোট্ট মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছিলে?'

মা অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে বললেন, 'বাঃ মেয়ে নিয়ে কী করবে?'

'কী করবে, তা' জানো না? কলকাতা শহরে একটুখানি সোনা বেচার থেকে মেয়ে বেচায় তো অনেক লাভ। ভিড়ের মধ্যে বালা হাতে দিয়ে পাঠানোই অন্যায় হয়েছিল।'

তবু কী বা ভিড় ছিল তখন কলকাতায়?

রাজপথে তো শাড়ীর চিহ্নমাত্র ছিল না।

রাস্তায় মেয়েমানুষ, মানে খেটে খাওয়া মেয়েমানুষরা। তাদের অঙ্গে শাড়ীর জৌলুস কোথায়? নেহাৎই ন্যাকড়া কানি।

ঝিয়ের গায়ে জ্যাকেট ব্লাউস রঙিন শাড়ী এ আর কে কবে দেখেছে সেই কলকাতায়? অতএব কলকাতার রাস্তার ভিড় তখন এক পায়ে হাঁটা খোঁড়ার মতো।

তবু কলকাতার মহিমা কম ছিল না।

কলকাতায় অর্ধেক রাত্রে কড়ি ফেললে বাঘের দুধ মিলতো।

খোকার মা সেই কলকাতার মেয়ে।

সুতোনুটি নয়, গোবিন্দপুর নয়, খাশ কলকাতায় ওর ঠাকুর্দার বাবা এসে বসত শুরু করেছিল।

অতএব কলকাতার মহিমা, খোকার মারও মহিমা।

কথা না কইলে সে বোধহয় বাসন মাজায় জোর পেত না। তাই বাসন মাজার সময় মাথা দোলাতো, আর কথা বলতো, 'কলকেতা কি সোজা শহর মা? ষোলো লক্ষ লোকের বাস এখেনে।'

লক্ষটা যে কী বস্তু, সে অঙ্ক ওর জানা ছিল এমন মনে হয় না, তবু বলতো।

আমরা হাঁ হয়ে সেই মহিমময় অঙ্কের সীমা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করে হতাশ হতাম।

মা হেসে বলতেন, 'কলকাতায় যে ষোলো লক্ষ লোকের বাস, একথা তোকে কে বললো খোকার মা?'

খোকার মা ছাইমাখা হাতটাই গালে দিত।

'ওমা! শোনো কথা! বলবে আবার কে? এ কী কারুর অজানা আছে? বাতাসই বলছে। কলকেতার বাতাস কথা কয়, এ তো মানো? এই ভূভারতে বিলেতের পরই কলকেতা।'

খোকার মার খবরেই আমরা জেনে ফেলেছিলাম, বিলেতে নাকি যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের জন্যেই সব জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে।

খোকার মা যতোক্ষণ বাসনমাজা ছাড়া অন্য কাজ করতো একেবারে নীরব। যেই না ছাই-টাই নিয়ে কলতলায় বসতো, সেই যেন তার কথার কলও খুলে যেতো।

মাথানাড়ার তালে তালে কথার ফুল-ঝুরি।

'কাটা পোনার পোয়া চার পয়সা থেকে দুম করে সাড়ে পাঁচ পয়সায় উঠে গেল মা, গরীব-নোকের আর খেতে হবে না। আমার খোকার মেজ খোকাটা, কাঁটা-মাছের দিক দিয়ে যায় না মা, ওই পোনা খাবার বায়না। কোথা থেকে জোটাবো বল? হাঁসের ডিম চার পয়সা জোড়া। চিনিমিনি খাইনে মা তবে শুনেছি সেও নাকি চোদ্দ পয়সা সের হয়েছে। আচ্ছা এসব জিনিস যুদ্ধুতে কোন কাজে লাগে শুনি? বিলেতে যুদ্ধু লেগেছে, তোরা কলকেতার মানুষ না খেয়ে মর।'

খোকার মার জগতে 'ভারতবর্ষ' বলে কোনো শব্দ ছিল না, ছিল কলকেতা।

যুদ্ধের আরো কত গল্প বলতো খোকার মা।

যুদ্ধের জয়লক্ষ্মী যে মানকচুর পাতার উপর দিয়ে রথ চালিয়ে বৃটেনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এবং জগতের তাবৎ মানকচুর পাতায় সেই রথচক্রের রেখা দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল, এও তো

খোকার মার কথা থেকেই জানা হয়ে গিয়েছিল।

●

মা বলতেন, 'খোকার মা তোমার ছেলে তো বল রঙের মিস্তিরী, নাতিরাও নাকি কাজ-টাজ করে, তা তুমি এখনো অত বাড়ি বাসন মেজে মর কেন?'

খোকার মা অবলীলায় বলতো, 'আর মা একদিন তো ওদের গলগ্রেহ্ হতেই হবে,—যতোক্ষণ চক্ষু-ছরদ আছে, পরের ভরসা করি কেন?'

'তা' ছেলে নাতি, এরা কী পর?'

খোকার মার মাথা দোলানো বাড়তো, 'না তো কী! ভগমানের দেওয়া এই হাত-পা দু'খানা বাদে সবই পর মা। সব্বাই খাইয়ে পরিয়ে একদিন মুখ নাড়া দিতে পারে, এরা কোনো দিন তা দেবে না। বলবে না, 'এই আমি তোকে খাইয়েছি পরিয়েছি। তুই আমার কাছে ধেরো।'

এমন দার্শনিকের মতো উক্তি অহরহ-ই শুনতে পাওয়া যেতো ওর মুখে।

●

ও বাড়ি থেকে আমরা আর একটা বাড়িতে এলাম।

এখানে রেলের বাঁশী নেই, পেয়ারা গাছ নেই, কিন্তু আর একটা জিনিস খুব কাছে ছিল বলে, এক নতুন জগতের ওড়না খুলে পড়লো আমাদের চোখের সামনে।

স্টার থিয়েটারের খুব কাছাকাছি ওই বাড়িটা।

আর বোধহয় মালিক পক্ষের কারো সঙ্গে বাবার ভাব-টাব ছিল।

থিয়েটার দেখতে আমাদের নাকি পয়সা লাগতো না।

অতএব আমাদের যে যেখানে আত্মীয়-বর্গ আছেন, সবাই বাবার 'পাশে' থিয়েটার দেখে যাবেন, এটা স্বাভাবিক।

কোনো দিন জেঠিমারা কোনো দিন মামীমারা কোনো দিন পিসি মাসিরা, এমন কি তাঁদের পাড়াতুতো বোনেরাও।

তখনো আমাদের সাজা পানের ওপর আস্থা রাখা চলতো না বলে, মা নিজেই সারা দুপুর বসে গাদা গাদা পান সাজতেন, এবং অতিথিরা এলেই কৌটোয় পান ঠেসে, আর নিজেদেরকে গাড়ির মধ্যে ঠেসে রওনা দিতেন থিয়েটার দেখতে। বাবা থাকতেন গাড়ীর মাথায়। যতো কাছেই বাড়ি হোক, গাড়ী ছাড়া বেরোনোর প্রশ্ন নেই।

আমি আর দিদি নেহাৎ শিশু ছিলাম বলেই বোধহয় বাড়িতে রেখে যাবার অসুবিধেয় আমাদের সঙ্গে নেওয়া হতো। আর দাদাদের কাছে থাকতেন ওই মহিলা-দেরই সেই সব আত্মীয়রা যাঁরা তাঁদের বয়ে এনেছেন।

ফিরতে তো সেই সকাল?

দাদারাই বা সারা রাত একা থাকবে কী করে?

যাত্রাকালে উৎসাহের অবধি নেই, তিন তলায় তারের জাল মোড়া খাঁচার সামনে গিয়ে বসা হতো, তক্তপোষের মত টানা চওড়া সিট, নম্বরের বালাই টালাই নেই। যে আগে আসতে পারবে তারই সিংহভাগ।

তা অনেকেই তিন চার ঘণ্টা আগে থেকে এসে বসে থাকতো। ছোট বাচ্চাকে শুইয়ে রাখতো বিছানা কাঁথা গুছিয়ে। পা ছড়িয়ে বসার দৃশ্যও বিরল ছিল না। একটু পরেই ঘুমে ঢুলতাম, চোখের সামনের জালগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যে বড় বড় গহ্বর করে রেখেছেন মহিলারা, তার সামনের অধিকার নিয়ে ঠেলাঠেলি করবার ক্ষমতা থাকতো না আর। অন্য কারুর গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমতে থাকতাম।

হঠাৎ হঠাৎ সে ঘুম ছেড়ে যেত একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে,—'ওগো হাতীবাগানের অমুক বাবুর বাড়িগো—ওগো দর্জিপাড়ার অমুক বাবুর বাড়ি গো—ওগো হোগল-কুঁড়ের অমুকবাবুর বাড়ি গো—।

যেই না কানে আসতো 'ওগো সিকদের বাগানের রমেশবাবুর বাড়ি গো'—সেই চাঙ্গা হয়ে বসতাম।

পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানতাম, এবার ওই ঝিটি দুহাত বোঝাই করে নিয়ে আসবে হিঙের কচুরী, আলুর দম, কড়াপাকের সন্দেশ, লেমনেড মিঠে পানের খিলি।

যাঁদের থিয়েটার দেখতে আনা হতো সেইসব অতিথিদের সৎকার করতে হবে তো? সৌভাগ্যের বিষয় ওনাদের সঙ্গে আমরাও সৎকারিত হতাম।

দিদি বলতো, 'লেমনেট' খাজ। তুই খাবি তো খা'।

দিদিকে মহাপ্রভুর অবতার মনে হতো, কারণ আমার ওই ঝাঁজেই আমোদ।

সকালবেলা ঘুম চোখে ঘোড়ার গাড়ি চেপে আসতে আসতে চোখে পড়তো, রাস্তায় জল দিচ্ছে, আকাশে নবোদিত সূর্যের রক্তিমা।

মাথার মধ্যে গতরাত্রের দেখা সেই জরিজড়োয়ায় জমকালো লোকগুলোর চেহারা যেন ঘুরে বেড়াতো। সবগুলোকেই একরকম মনে হতো, নেহাৎ মোটা কি বেঁটে, ভাঁড় সাজাদের ছাড়া। তারাই চিন্তার মধ্যে আধিপত্য করতো বেশী।

আর সেই 'নাকি নাকি' সুরের তীব্র তীক্ষ্ণ গান। ভেবে আশ্চর্য লাগে, মাইক তো ছিল না, তবু তিনতলা পর্যন্ত তো উঠতো সে গান।

বাড়ি ফিরলে মেজদা হয়তো বলতো, 'তোদের কী মজা। সব সময় গিন্নীদের দলে। আর আমাদের? জীবনেও কর্তাদের দলে হতে পাবো না।'

চটপট বলে দিতাম, 'দলে হবার দরকার কী? তোমরা তো নিজেরাই 'কর্তা' হয়ে যাবে। আমাদের মতন বুঝি? কেউ নিয়ে না গেলে কোথাও যেতে পারার উপায় নেই।'

একদিন দিদি বলে উঠলো, 'আমরা ঠিক ওই বাক্সভরা ডলিপুতুলের মতন। দাঁড় করালে চোখ খুলি, শোওয়ালে চোখ বুজি।'

মেজদা চাঁটি মেরে বললো, 'খুব যে কথা শিখেছিস?'

আবার দিদিকে কাঁদতে দেখে বললো, 'ছিচকাঁদুনী দিদি, থামো! রবীন্সন ক্রুশোর গল্প বলবো।'

এই সুখ!

এইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া।

মুখের সামনে আয়না তুলে ধরে নিজেকে দেখার মতো, এই সুখগুলি তুলে তুলে এর স্ফটিক আয়নায় নিজেকে দেখতাম! আনন্দ কানায় কানায় ভরে উঠতো।

এ যুগের শিশুরা হয়তো শুনলে কৃপার হাসি হেসে উঠে বলবে, 'এতেই তোমাদের এতো আহ্লাদ? এই তোমাদের সুখ? কী তুচ্ছ! কী তুচ্ছ!' কিচ্ছু নেই, তবু সুখ?'

কিন্তু ওরাও কি কৃপার পাত্র নয়?

'নিজেকে নিয়ে থাকার সুখ জানে ওরা? জানে না! 'সুখ' আহরণের জন্যে অনেক উপকরণ আহরণ করে আনতে হয় ওদের। তুচ্ছকে মূল্যবান করে তোলবার মন্ত্র জানে না ওরা। আনন্দ আহরণ করতে জানে না—আকাশ থেকে বাতাস থেকে, যা চোখে দেখে তাই থেকে।

তাই ওদের সর্বক্ষণের জন্যে চাই বস্তুর বোঝা, চাই বাহুল্যের ভার, চাই আড়ম্বরের মত্ততা। তবু নেই তেমন আনন্দের দীপ্তি।

সেকালের শিশুর জন্যে আয়োজনের বাহুল্য ছিল না, তবু তার মধ্যে বুঝি আনন্দের অনুভূতি ছিল অনেক বেশী।

সে আনন্দ আপন হৃদয় থেকে উপচে ওঠা।

তুচ্ছের মধ্যে 'পরম'কে পাওয়া, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সুখ, সে কী অভাবী চিত্তের কৃতার্থমন্যতা? না স্বয়ং-সম্পূর্ণ চিত্তের গভীরতা?

অনাদি ডাক্তার রোডের বাড়িতেও সেই শৈশবকে নিয়ে এসেছিলাম। সেই শুধু অকারণ পুলকের সুখ তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভোগ করছিলাম, দিদিটা শুধু শুধু হঠাৎ বড় হয়ে গিয়ে সেই স্বাদটা হারিয়ে ফেললো।

নিজেও হারালো, আমারটাও অনেক-খানি কেড়ে নিলো।

এখন যদি দিদি আমায় ডাকে, 'আয় রুচি একটু খেলি—'

মনে হয় দিদি আমায় করুণা করছে।

যদি দিদি তার খুব একটা প্রিয় বস্তু (হয়তো রঙিন কাচের চুড়ি, হয়তো বিলিতি মুক্তোর মালা) আমায় দিয়ে দিতে চায়, মনে হয় দিদি নিজে বড় হয়ে গিয়ে আমায় নেহাৎ ছোট্ট ভাবছে।

মনটা হুহু করে ওঠে, মাথা নেড়ে বলি 'না।'

দিদি বলে, 'না কেন? আয় না?'

বলে, 'নিবি না কেন নে না।'

আমি আবারও জোরে মাথা নেড়ে বলি, 'ভাল্লাগছে না।'...বলি, 'নিয়ে কী করবো?'

বলবোই তো, সবাই বড় হয়ে যেতে পারে আমি পারি না?

যে সুখের স্বাদ পেতে আর কাউকে দরকার হয় না, সেই সুখের মধ্যে নিমজ্জিত হতে লাগলাম আস্তে আস্তে।

মেজদার ভাঁড়ারে তখন রাশি রাশি বই।

মেজদা 'বিবেকানন্দ'ও পড়ে, 'রবীন্দ্র-নাথ'ও পড়ে, 'শরৎচন্দ্র'কেও ছাড়ে না।

গাদা গাদা ইংরিজি বইও এনে এনে জড়ো করতো, কিন্তু তাতে তো আর দাঁত ফোটাবার সাধ্য নেই, যাতে আছে, তাতেই দাঁত বসাই।

দু' দুবার স্কলারশিপ পেয়েছিল মেজদা, ম্যাট্রিকে, আর আই-এতে।

বাবা বলেছিলেন, 'না ওই টাকা দিয়ে তোমায় পড়া চালাতে হবে না, তোমার যা ইচ্ছে খুশী শখ আছে, তা মেটাও।'

তা' মেজদার ওই বই ছাড়া আর কী ইচ্ছে খুশী শখ আছে? পত্রিকা টত্রিকা অবশ্য আগেও আসতো বাড়িতে, প্রবাসী ভারতবর্ষ, ভারতী। বাবার শখ। মেজদার শখে মেজদা 'নারায়ণ' রাখতে লাগলো, আর মাঝে মাঝেই ফুটপাথের পুরনো বইয়ের দোকান ঘেঁটে এনে এনে হাজির করতে লাগলো, ঢাউস মাপের 'বালক', ক্ষুদে মাপের 'শিশু' মলাট ছেঁড়া 'বঙ্গদর্শন' বিবর্ণ হয়ে যাওয়া 'প্রদীপ' 'মুকুল' 'সখা ও সাথী'।

ছোটদের বই বড়দের বই এ নিয়ে বিচার করতো না মেজদা।

সস্তায় পেলেই হলো।

একবার ছ পয়সা দিয়ে একটা মলাট ছেঁড়া 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' কিনে এনেছিল।

সেইসব পুরনো বইকে মেজদা নিজে হাতে সেলাই টেলাই করে বাঁধাতো, মার্বেল পেপার কিনে এনে মলাট দিতো। মেজদার জন্যে ময়দার আঠা করে রাখা, আমার প্রায় নিত্যকর্মপদ্ধতির মধ্যে ছিল।

এদিকে চিলেকোঠায় আমাদের সেই খেলাঘরে ধুলো জমছে, হাঁড়িকুঁড়ি ভাঁড়ার-ভ্রষ্ট হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, মুদির দোকান লণ্ডভণ্ড!

ছাতে গেলে দিদি প্রায়ই মলিন মুখে বলে, 'এগুলো একদিন ঠিক করতে হবে—' কিন্তু ঠিক করা আর হয়ে ওঠে না। শুধু দিদির সেই প্রাণতুল্য পুতুলের বাক্সটা ঠিকঠাক করে উঁচু দেরাজের ওপর তুলে রেখেছে দিদি।

কদাচ কখনো পেড়ে ওদের নতুন কাপড় টাপড় পরায়। কাপড়ের অভাব ঘটতো না, সংসারে যখনি কোনো শাড়ী ধুতি ছিঁড়তো, মা তার পাড় ঘেঁসা একটা সরু অংশ আমাদের জন্যে দাতব্য করতেন। ধুতি থেকে তো শাদা ধুতি হতোই, শাড়ীর ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো রঙে ছুপিয়ে নিয়ে সুদৃশ্য করা হতো।

মাঝে মাঝে মাও করে দিতেন।

শিউলী ফুলের বোঁটার রঙে, কাপড়ে দেবার 'নীলে' এবং ওই নীলের সঙ্গে হলুদবাটা মিশিয়ে সবুজ রং করে।

কিন্তু এখন দিদি ওই নতুন শাড়ী পরিয়েই রেখে দিতো, বলতে বসতো না 'বড়োবৌমার মেজমেয়েটা তো বড় হয়ে উঠলো, এবার ওর জন্যে একটা পাত্তর দেখা দরকার!'

পুতুলের বিয়ে দেওয়ার সেই আনন্দঘন দিনের স্বাদ আস্তে আস্তে ভুলে যাওয়া হলো।

আর এই সময় এক উপদ্রব শুরু হলো বাড়িতে।

(ক্রমশঃ)

আজকের এই সুগম যাতায়াতের যুগে দেশভ্রমণ দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই কি একটা দেশকে কতোটুকু চেনা যায়? চিনতে হলে শুধু ভূগোল নয় জানা দরকার তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই চার দিক থেকে আলোচনা করা হবে—আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব আমরা।

কোচবিহার—(২)

(২)

১৯৭১ সালের গণনা অনুসারে কোচবিহারের লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ১৪৮। বিগত তিন দশকে কোচবিহারের লোকসংখ্যা মোটামুটিভাবে চার লক্ষ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কিছুটা অস্বাভাবিকই বলা যায়। কারণ ১৮৭২ সালে কোচবিহারে যখন প্রথম লোকগণনা হয় তখন সেখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৬০। আর ১৯৫১ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬ লক্ষ ৭১ হাজার ১৫৮। অর্থাৎ মাত্র এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক বাড়তে সময় লাগে আশি বছর। কিন্তু তারপর মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে, ১৯৬১ সালে কোচবিহারের লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০ লক্ষ ১৯ হাজার ৮০৬ এবং তারও দশ বছর বাদে ১৯৭১ সালে হয় ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ১৪৮। বিশ বছরের ব্যবধানে কোচবিহারের লোকসংখ্যা কেন দুগুণেরও বেশি হয়ে গেল তার ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। তবে উদ্বাস্তু আগমনই এর প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের আমলে ১৮৭২ সালে কোচবিহারে প্রথম লোকগণনা হয়। তখন কোচবিহারের লোকসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৬০। তারপর ১৮৮১ সালের লোকগণনায় রাজ্যের লোকসংখ্যা ৭০ হাজার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬ লক্ষ ২ হাজার ৬২৪। সঠিক গণনা, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সুশাসনের কল্যাণে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও অধিকহারে বহিরাগতের আগমন ঐ এক দশকে ১৩ শতাংশেরও বেশি লোকবৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ১৮৮১-৯১ সালে কোচবিহারের লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৮৮৩ সালের কলেরা মহামারী, ১৮৮৭-৮৮ সালের মড়ক ও ডুয়ার্সের চাবাগানে শ্রমিকরূপে কোচবিহারের বহুলোকের চলে যাওয়া সম্ভবত ঐ লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ। ১৮৯১ সালেও কোচবিহার রাজ্যে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়, ১৮৯২-৯৭ সালে ঘটে খাদ্যসংকট। ইতিমধ্যে ১৮৯৩ সালে গিতলদহ-মানশাহি, ১৮৯৮ সালে মানশাহি-কোচবিহার ও ১৯০০ সালে কোচবিহার-জয়ন্তী... লিপুরদুয়ার রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় কোচবিহার রাজ্যবাসীদের বহির্দেশে নিয়ায় যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদির ব্যাপক আক্রমণও বারবার ঘটতে থাকে। ১৯০৬ সালে মাথাভাঙা মহকুমায় প্রবল বন্যার জন্যও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারপর কোচবিহারের জনসংখ্যায় বরাবরই পুরুষের তুলনায় নারীর, চোখে পড়ার মত সংখ্যাল্পতা দেখা যায়। যেমন ১৯০১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৮৭১, দশ বছর পরে ১৯১১ সালে ঐ সংখ্যা আরও হ্রাস পেয়ে হয় ৮৭৩, তার দশ বছর পরে ১৯২১ সালে একটু বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৭। নারীর সংখ্যাল্পতা এখনও কোচবিহারের জনসংখ্যার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য: ১৯৭১ সালে ঐ জেলায় মোট লোকসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ছিল ৭,৩৫,৭৫৭ আর নারী ৬,৭৬,৩৯১)। উল্লেখিত কারণগুলির জন্য কোচবিহারের জনসংখ্যা দীর্ঘকাল ধরে কমে বেড়ে প্রায় একই থাকে। ১৯৫১ সালে কোচবিহারের লোকসংখ্যা ১৮৮১ সালের তুলনায় মাত্র পঞ্চাশ হাজার বৃদ্ধি পায়। আবার এই বৃদ্ধিও স্বাভাবিক কারণে ঘটে নি। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টেই উল্লেখিত থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) ৯৯,৯১৭ জন উদ্বাস্তু দেশ বিভাগের পর কয়েক বছরে কোচবিহারে এসে আশ্রয় নেয় যাদের সকলকেই '৫১ সালের গণনায় কোচবিহারের লোক বলে ধরা হয়। আবার ঐ জেলার যে ৩১,৪৮৪ জন মুসলিম পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে, তাদের মধ্যে ১৭,০২৬ জন '৫১ সালের গণনার পূর্বেই ফিরে আসে। সুতরাং ১৮৮১ সাল থেকে কোচবিহারে যে লোকসংখ্যা হ্রাস শুরু হয়, ১৯৫১ সালের গণনাতেও তার ব্যতিক্রম হত না যদি না পূর্ববঙ্গের এক লক্ষ লোক ঐ সংখ্যাবৃদ্ধিতে সহায়ক হত। আসাম ও বিহারের বহু লোকও কোচবিহারে এসে বাস করে ঐ জেলার লোকসংখ্যা কিছুটা বাড়িয়েছে। এই সকল কারণে, '৫১ সালের পর মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে কোচবিহারের লোকসংখ্যা দুগুণেরও বেশি হয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। '৬১—'৭১ দশকে কোচবিহারে লোক বেড়েছে পূর্বে দশকের তুলনায় ৩৮-৪৭ শতাংশ, যেখানে '৪১—'৫১ দশকে বৃদ্ধির হার ছিল ৪-৭ শতাংশ।

পরবর্তী সংখ্যায়

প্রত্নসম্পদ ও লোক-সংস্কৃতি

কোন অঞ্চলে হঠাৎ শিল্প তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে সেখানে দ্রুতহারে লোকবৃদ্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু কোচবিহারের শিল্প তৎপরতায় একশ বছরের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ ঘটে নি। সেকারণে ১৯৬১ সালে কোচবিহারের লোকসংখ্যার মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা শতকরা ৩১-৮ থাকলেও, ১৯৭১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় শতকরা ২৮-৫১।

কোচবিহারের মোট ১৪,১২,১৪৮ জন লোকের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ৪,০১,১৬৪, কৃষকের সংখ্যা ২,৭১,০৫৭, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৬০,২৫৮ এবং কারিগর ও অন্যান্য শ্রমিকের সংখ্যা ৬৯,৮২৯। সাক্ষরের সংখ্যা ৩,১০,৫৭৬ যার মধ্যে পুরুষ ২,৩১,৩৩৬ ও নারী ৭৯,২৪০। আনুপাতিক হিসাবে, জেলায় শিক্ষিতের হার ২১-৯৯ শতাংশ: পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩১-৪৩ ও নারীদের মধ্যে শতকরা ১১-৭১ জন লিখন পঠনক্ষম। জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শহরবাসী ৯৬,৭৩২ জন ও গ্রামবাসী ১৩,১৫,৪১৬ জন। '৬১ সালে শহরবাসীর হার ছিল জেলার মোট লোকসংখ্যার ৭ শতাংশ, '৭১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ৬-৮৫ শতাংশ।

মোটামুটি হিসাবে কোচবিহারের লোকসংখ্যার শতকরা ৭১ ভাগ হিন্দু ও ২৯ ভাগ মুসলিম। জৈন, খৃষ্টান, শিখ এমন কি পার্শি, ইহুদি, বৌদ্ধও আছে কিছু কিছু করে কিন্তু শতকরা হিসাবে তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়।

মুসলিমদের একটি বড় অংশ দেশবিভাগের পর চলে যাওয়ায় কোচবিহারের কতকগুলি কাজে দক্ষ কারিগরের অভাব ঘটে। কোচবিহারের মুসলিমদের অধিকাংশ শিয়া। পীর দর্গায় পুজো দেওয়া, মহরমে তাজিয়াসহ মিছিল বার করা তাদের ধর্ম ও উৎসবের অঙ্গ। মুসলিমদের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ওয়াহাবি। যারা সোরাজি নামেও পরিচিত। তারা ধর্মের নামে উৎসব

জেনকিনস বিদ্যালয় : কোচবিহার

পালাপার্বণ গান বাজনা ইত্যাদির ঘোর বিরোধী। মেকলিগঞ্জ, মাথাভাঙা ও দিনহাটা মহকুমায় বহু বর্ধিষ্ণু মুসলিম পরিবারের বাস।

কোচবিহারে যে হাজারখানেক জৈনের বাস, বলা বাহুল্য, তারা সকলেই মাড়োয়ারী এবং ঐ জেলার তামাক ও পাটের ব্যবসার বেশিভাগই তাদের দখলে।

সারা জেলায় খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা তিন শতের বেশি নয়।

হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই বৈদিক শ্রেণীর। বিভিন্ন রাজার আমন্ত্রণে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা কনৌজ, মিথিলা ও আসাম থেকে কোচবিহারে আসেন। আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের রাজ দরবার থেকে ব্রহ্মোত্তর জমি ও বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। খাগড়াবাড়ি, চাকি-গাছ, কামিনীঘাট, ময়নাগুড়ি, বানেশ্বর প্রভৃতি তালুকে বহিরাগত ব্রাহ্মণদের জমি দেওয়া হত এবং পূজা অর্চনা ও টোলে সংস্কৃত অধ্যাপনা তাঁদের বৃত্তি ছিল। মহারাজা নরনারায়ণের আমলে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য 'রত্নমালা' নামে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন তা একদা উত্তরবঙ্গ ও আসামে পাণিনি ও মুগ্ধবোধ অপেক্ষাও বেশি প্রচলিত ছিল। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সমকালীন পণ্ডিত বিক্রমানন্দ তর্কালঙ্কার পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। খাগড়াবাড়ি তালুকটি একদা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ছাত্র ভর্তি টোলে মুখরিত ছিল। সেখানকার খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন মহা-মহাধ্যাপক পণ্ডিত সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ। কিছু রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণও কোচবিহারে আছেন যাঁদের পূর্ব পুরুষরা একদা কোচবিহারের রাজ্য সরকারে বড় চাকরি পেয়ে সেখানে যান। কোচবিহারের জন-জীবনে বহিরাগতরা এখনও বিশেষ প্রভাবশালী। দিনহাটা মহকুমায় বহু কায়স্থ পরিবারের বাস, তাঁদের পূর্ব পুরুষরাও রাজ্য সরকারের প্রভাবশালী কর্মচারী ছিলেন।

১৮৮৮ সালের জুন মাসে, বৃটিশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের স্মরণে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার শহরে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন। সেই কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী একদা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও দুর্লভ ছিল। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন বিশ্বখ্যাত দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

কোচবিহারের হিন্দুদের অর্ধেকেরও বেশি রাজবংশী, তাঁরা তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন মোটামুটি ভাবে বঙ্গীয়-হিন্দুসমাজ প্রভাবিত। তাঁদের অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কোচবিহারের রাজনৈতিক জীবনে রাজবংশীদের প্রভাব সর্বাধিক।

কোচবিহার হিন্দুদের মধ্যে আর একটি সম্প্রদায় হল খেন, যারা সামাজিক মর্যাদায় বাঙলার নব শাখা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনীয়। খেন সম্প্রদায়ের পূর্ব ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে একটি মত, একদা তারা নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে রাজা কান্তেশ্বরের প্রভাবে তাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নীত হয়। কিন্তু খেনরা এই মত সমর্থন করে না। অপর এক মতে, আসামের কলিতা সম্প্রদায় কোচবিহারে এসে খেন নামে পরিচিত হয়। খেনদের সামাজিক রীতিনীতি বর্ণ হিন্দুদের মতো। তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রচলন আছে, মেয়েদের সাধারণত পাঁচ থেকে তের বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। বিধবা বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ খেনদের মধ্যে প্রচলিত নেই। খেনদের আচার অনুষ্ঠানেও ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করেন। খেনদের একটি বড় অংশ শাক্ত, বৈষ্ণবদের সংখ্যাও সামান্য নয়। খেনরা মাহেশ্যি, তেলি, বারোই, সালুয়া ও পাটিয়ার এই পাঁচ কারিগর শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে মাহেশ্যি সর্বোচ্চ শ্রেণীর বলে বিবেচিত।

কোচবিহারের আরও দুটি নিজস্ব সম্প্রদায় হল কুরিসর্জন ও মোরাঙিয়া। কুরিসর্জন শব্দটি সম্ভবত 'কুড়িসজ্জন' থেকে উদ্ভূত। এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী হয় যে, তারা কোচবিহারের মেচ রাজা বিশ্বসিংহের মাতৃকুলজাত। এবং বিশ্ব সিংহ তাঁর মাতৃকুলের কুড়িজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (সজ্জন) কোচবিহার রাজ্যের একাংশে নিয়ে এসে একটি বসতি গড়ে তোলেন যা কুড়িগ্রাম নামে পরিচিত হয়। কুড়িগ্রাম অবশ্য এখন কোচবিহারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের রংপুর জেলার একটি মহকুমা। তবে কুরিসর্জনদের কোন রাজ মর্যাদার দাবি নেই, তারা রাজবংশীদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করে। রিসলের 'ট্রাইবস এন্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে কুরিসর্জনদের সম্বন্ধে বলা আছে—'কুরিসর্জনরা মেচ জাতির একটি অংশ, তাদের মেচকুরিও বলা হয় এবং তেল বেচা তাদের পেশা।' তাদের পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানে সাধারণত বৈদিক ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করেন।

মোরাঙিয়াদের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী হল, মোরাং-এর রাজা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণকে বিবাহ উপলক্ষ্যে দ্বাদশ ক্রীতদাস উপঢৌকন দিয়েছিলেন, এবং ঐ ক্রীতদাসরাই বর্তমান মোরাঙিয়া সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষ। ষোড়শ শতাব্দী থেকে তারা কোচবিহারের অধিবাসী এবং

দীর্ঘকাল ধরে রাজবংশীদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে রাজবংশীদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়েছে। মোরাঙিয়াদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে একদা তাদের গলায় পৈতা ছিল, পরবর্তীকালে রাজবংশীদের প্রভাবে তাদের মধ্যে থেকে উপনয়ন প্রথা লোপ পায়। এই কাহিনী থেকে অনেকে মনে করেন, মোরাঙিয়ারা হয়ত একদা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সুদর্শন, উন্নত নাসা, আয়তচক্ষু মোরাঙিয়াদের সঙ্গে কোচবিহারের চাপা নাক, ক্ষুদ্রচক্ষু স্থানীয় অধিবাসীদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে।

কোচবিহারে আসার আগে মোরাঙিয়ারা চাষ করতে জানত না। তাই প্রথমে তারা লাঙলের বদলে কোদাল নিয়ে চাষআবাদ করত। একারণে যে তালুকে মোরাঙিয়ারা প্রথম বসতি স্থাপন করে সে তালুকটির নাম হয় কোদাল-ক্ষেতি। ধর্মীয় আচরণে ও লোকাচারে মোরাঙিয়ারা বেশ গোঁড়া। তারা অন্য কোন সম্প্রদায়ের হাতে, এমনকি ব্রাহ্মণদের হাত থেকেও অন্নগ্রহণ করে না। বর্ণহিন্দুদের মতো তাদের সাত-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সাত-পুরুষ পর্যন্ত আত্মীয়ের মৃত্যুতে তারা অশৌচ পালন করে। অশৌচ দশ দিনের এবং শ্রাদ্ধ একাদশ দিনে। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই। কুঁড়ে ঘর ছাওয়াই মোরাঙিয়াদের প্রধান জীবিকা।

মেচরা কোচবিহারের রাজবংশের জ্ঞাতিগোষ্ঠী হলেও মেচ সম্প্রদায়ের কোন স্বতন্ত্র উল্লেখ কোচবিহারের সেন্সাস রিপোর্টে নেই। ১৯০৩ সালে লেখা হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির 'দি কুচবেহার স্টেট এণ্ড ইটস ল্যাণ্ড রেভিনিউ সেটলমেন্ট' গ্রন্থে মেচদের সম্বন্ধে বলা আছে কোচবিহারে মেচদের সংখ্যা অনুল্লেখ্য। সুতরাং তারপর অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে মেচরা সম্পূর্ণরূপে কোচবিহারের জনজীবনের সঙ্গে মিশে গেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সেন্সাস রিপোর্টে গারোদেরও কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু কোচবিহারে কয়েকটি দরিদ্র গারো বসতি আছে।

কোচবিহারের নরনারীদের বিষয়ে আলোচনাকালে হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি লিখেছেন—পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত অলস ও কষ্টসাধ্য কাজ এড়িয়ে চলে। মেয়েরা সে তুলনায় অনেক বেশি কর্মঠ এবং গৃহস্থালির সব কাজ তারাই করে থাকে। পুরুষদের প্রধান কাজ হল ঘর বাঁধা ও চাষ করা। কিন্তু সেসব কাজেও মেয়েরা হাত লাগায়। ক্ষেতের আগাছা সাফ করা, রোয়া ও পরিশেষে ফসল কাটা আর ঝাড়াই মাড়াইয়ের কাজে নারীর সহযোগিতা ছাড়া পুরুষদের চলা প্রায় অসম্ভব। তারপর জল আনা, রান্না করার কাজ তো আছেই। অনেক মেয়ে আবার ঘরেই সুতো কাটে, তাঁত বোনে। শিশু ও অসমর্থদের দেখা শুনা, এমনকি এসব কাজের ফাঁকেও পরনিন্দা পরচর্চায় সময়টুকু করে নিতে পারে। সেখানকার পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি বুদ্ধিমতী ও ওয়াকিবহাল এমন কথাও বলেছেন তিনি।

হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির সত্তর বছর আগের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আজকের কোচবিহারবাসীরা, বিশেষ করে পৌরুষের অহমিকা আছে যাঁদের তাঁরা হয়ত একমত হতে পারবেন না। কিন্তু একথা ত মানতেই হবে যে, কোচবিহারের যে সন্তান আজ সর্বভারতে সুপরিচিত, তিনি পুরুষ নন, নারী। জয়পুরের রাজমাতা, সংসদ সদস্যা ও স্বতন্ত্র দলের নেত্রী গায়ত্রী দেবী কোচবিহারের পরলোকগত মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের কন্যা। কেশব সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর পৌত্রী তিনি।

বেশ বাস

কোচবিহারের সাধারণ দরিদ্র মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ খুবই সামান্য এবং প্রায়ক্ষেত্রে তা লেংটিতে সীমিত। একদা কিছুটা অবস্থাপন্ন ঘরেও লেংটি প্রচলিত ছিল। তবে তা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে এবং খাটো ধুতির প্রচলন বাড়ছে। খড়মের ব্যাপক প্রচলন আছে কোচবিহারের ঘরে ঘরে। ছেলেমেয়ে সকলেরই প্রিয় পাদুকা খড়ম। সাধারণ ঘরে মেয়েদের পরিধেয় হিসাবে প্রচলিত বস্ত্রখণ্ড পাটানি নামে অভিহিত। খাটো বহরের প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা পাটানি কোমরে জড়িয়ে বাড়ির বয়সী মেয়েরা কাজ করে। তবে অল্পবয়সের মেয়েরা দেহের উপরিভাগ আচ্ছাদনের জন্য দুটি পাটানি ব্যবহার করে। বাইরে বেরোনোর সময় যুবতী মেয়েরা দুটি পাটানি ছাড়াও একটি চাদর ব্যবহার করে। কোচবিহারের মুসলিম মেয়েদের শাড়ি পরার রীতি হিন্দু মেয়েদের মতোই।

শাক ভাতই কোচবিহারের সাধারণ মানুষের খাদ্য। শুঁটকি মাছের প্রচলন আছে এবং কচ্ছপ অতিপ্রিয় খাদ্য। রাজবংশীদের মধ্যে শুয়োরের মাংস খাওয়ার রীতি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। বুনো হাঁস বা ধরা পেলে রাজবংশীদের আর কিছু না হলেও চলে। হরিণ ও গণ্ডারের মাংস তাদের কাছে পবিত্র মাংস। রাজবংশীদের মধ্যে মশলা খাওয়ার রীতি নেই, সেকারণে তারা শিলনোড়ার ব্যবহারও জানে না। অবস্থাপন্ন কোচবিহারবাসীদের সঙ্গে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাপন্ন মানুষদের খাদ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কোচবিহারের দরিদ্র মানুষদের কুটিরের চাল হয় খড়ের অথবা টিনের। আর দেওয়াল হয় ঘাসের অথবা মাদুরের। পল্লীর কিছুটা অবস্থাপন্ন লোকেরা সাধারণতঃ একটি চৌকো বাস্তুজমির চারদিকে চারটি কুটির নির্মাণ করে, যার দুটি ব্যবহার হয় থাকার জন্য, একটি হয় রান্না ও ভাঁড়ার ঘর এবং একটি হয় গরু ছাগলের গোয়াল। যাদের অবস্থা আরো একটু ভাল তারা শালকাঠের খুঁটি দিয়ে একটি মাচা তৈরি করে তার ওপর কুটির বাঁধে। অবশ্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এখন গ্রামে শহরে সর্বত্র ইঁটের বাড়ি তুলছে এবং বাড়ির ছাদ যদি পেটা না হয় তবে তার বদলে করোগেট টিন অবশ্যই ব্যবহৃত হয়।

বৃত্তি ও জীবিকা

সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক আর ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, স্যাকরা জেলেদের বাদ দিলে কোচবিহারের সব খেটে খাওয়া মানুষই কৃষিজীবী, নয়ত কৃষির সঙ্গে তাদের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একমাত্র এণ্ডি রেশমের মোটা অমসৃণ চাদর বোনা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প তৎপরতা খুঁজে পাওয়া যাবে না কোচবিহার জেলায়, এই চাদর বোনার কাজও প্রায় সবটাই বাড়ির মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাড়ির প্রয়োজনের অতিরিক্ত এণ্ডি চাদর খুব কম ক্ষেত্রেই বোনা হয়, সেকারণে কোচবিহারের এণ্ডির চাদর বাজারে দুর্লভ। এককালে ফুলেপাড়ের ভাল গামছা বুনত এই জেলার তাঁতিরা, কিন্তু তাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কোচবিহারের লোকেদের গামছাও বাইরে থেকে আনতে হয়। ভাল মাটির অভাবে কুমোরের কাজও ভাল নয়। সাধারণ হাঁড়ি সরা হয় কিন্তু কলসি আনতে হয় বাইরে থেকে। দেবদেবীর মূর্তিও আমদানী করতে হত, তবে পূর্ববঙ্গের কিছু মৃৎশিল্পী দেশবিভাগের পর কোচবিহারে এসে বসতি স্থাপন করায় সে অভাব দূর হয়েছে। স্যাকরাদের হাতের কাজও ভাল নয়। তবে কর্মকারদের কাজের সুনাম আছে। কৃষির সরঞ্জাম থেকে শুরু করে গৃহস্থালীর কাজের খুন্তি ছুরি এমনকি খাঁড়া তারা ভালই তৈরি করে। কর্মকারদের তৈরি প্রত্যেকটি জিনিসই হালকা ও মজবুত। কাঁসার কাজ ভাল নয়, একমাত্র মেখলিগঞ্জে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প।

কোচবিহারে শিক্ষাবিস্তার এবং বিভিন্ন খেলা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কোচবিহারের রাজারা একদা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ১৮৬১ সালে কোচবিহারে প্রতিষ্ঠিত হয় জেংকিন্স ইন্সটিটিউশন যা দীর্ঘকাল ধরে উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাইস্কুল রূপে খ্যাত ছিল। ১৮৬৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল কারিগরী শিক্ষার স্কুল, সেখানে কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি সকলের হাতের কাজ শেখার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা হয়। কারিগরদের উৎসাহিত করার জন্য মুক্তহস্তে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন রাজসরকার। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহের অভাবে, কোচবিহার ভারতে যোগ দেওয়ার আগে, স্কুলটি প্রায় উঠে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল।

১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভিক্টোরিয়া কলেজ, যাকে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ করার জন্য চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। একদা উত্তরবঙ্গের মাত্র তিনটি কলেজের মধ্যে একটি ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং আসাম থেকেও ছেলেরা এসে সে কলেজে পড়ত। কিন্তু কোচবিহারবাসীদের মধ্যে উচ্চ

শিক্ষার আগ্রহ জাগতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। কলেজ প্রতিষ্ঠার দু বছর পরে, ১৮৯০ সালের হিসাবে দেখা যায়, কলেজের ১২৪জন ছাত্রের মধ্যে কোচবিহারের ছেলে ছিল মাত্র ছয়জন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া কলেজের হস্টেল-গুলি পূর্ণ থাকত আসাম ও উত্তরবঙ্গের ছাত্রে।

কোচবিহারে বিভিন্ন খেলা জনপ্রিয় করার জন্যও মহারাজাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কুস্তির মানোন্নয়নের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নামকরা কুস্তিগীরদের কোচবিহারে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর। একদা আই এফ এ শীল্ড খেলায় ইউরোপীয় দল-গুলির অত্যধিক প্রাধান্য ছিল বলে শুধুমাত্র ভারতীয় দলগুলির খেলার জন্য কুচবিহার কাপ প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন সেখান-কার রাজদরবার। ক্রিকেট খেলার মানোন্নয়ন-কল্পে বিলেত থেকে নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষকরূপে আনা হত কোচবিহারে। শরীর চর্চা থেকে শুরু করে সব খেলার উন্নতির দিকে সমান উৎসাহ ছিল কোচবিহার রাজদরবারের।

কিন্তু এই সর্বাঙ্গীণ ও সাগ্রহ প্রয়াস বোধহয় খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টেও দেখা যায়, কোচবিহারের চোদ্দ লক্ষ লোকের মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি লোকের হাতেখড়ি হয়নি।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

আপনি কেমন আছেন?
—উত্তর খুবই প্রাঞ্জল—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত!'...কিন্তু প্রাণ রাখার চেষ্টায় যে ওষুধপত্র ডাক্তার না দেখিয়ে নিজেরাই কিনে ব্যবহার করি, আর খাদ্যের নামে যেসব অখাদ্য আমরা খাই, তাতেও কম প্রাণান্ত ঘটে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই অসুখবিসুখ, পুষ্টি ও পরিবেশের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবেন এই বিভাগে।

ডালের হালচাল

পশ্চিম বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে রেশনে চাল গম চিনির মত ডালও পাওয়া যাবে বাঁধা দরে। খুশি হওয়ার মতন খবর।

মাছের দর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়ার পর থেকে সাধারণ গৃহস্থবাড়ির রান্নাঘরে টালমাটাল অবস্থা চলছিল। কোন-দিন একটুকরো মাছ, কোনদিন বা আধখানা ডিমে প্রোটিন পাওয়া যেত ৫-৬ গ্রাম। তাও রোজ নয়। মাঝে মাঝেই নিরামিষ খেতে হয়—বিশেষত বড় সংসারে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা শিশু ও স্কুল-বয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ওদের বাড়ন্ত দেহের হাড়-মাস ঠিকমত গড়তে ও বাড়তে হলে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ মিলিয়ে দৈনিক ৩০-৪০ গ্রাম জান্তব প্রোটিন ও ২০-৩০ গ্রাম উদ্ভিদ প্রোটিন—মোট ৫০-৬০ গ্রাম প্রোটিন একান্ত দরকার। দরকার মানে অপরিহার্য।

এতকাল তবু কোনরকমে চলছিল এক-আধ টুকরো মাছ-ডিমের সঙ্গে প্রধানত ডাল-ভাতে নির্ভর করে। যেসব পরিবারে রোজ ডাল খাওয়ার রেওয়াজ ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা টিংটিঙে লিকলিকে হয়েও বেড়ে উঠছিল।

কিন্তু কিছুকাল ধরে অন্য সব জিনিসের মত ডালের দরও লাফিয়ে লাফিয়ে যেভাবে চড়তে থাকে, তাতে গিন্নীরা চোখে সরষে-ফুল দেখছিলেন। রোজ আর ডাল রান্না সম্ভব হয় না। হলেও পাতলা জলের মত। ফলে ঘরে ঘরে অপুষ্টি জেঁকে বসছিল। সেই অলক্ষ্মীর কু-দৃষ্টি প্রধানত শিশু কিশোর-কিশোরী ও প্রসূতি মায়েদের ওপর। খুব ধীর গতিতে, বলতে গেলে প্রায় অলক্ষ্যে ঘটে যায় বলে এই অপুষ্টি চট করে আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু ঘটছে অনিবার্যভাবে। বয়স অনুপাতে বাচ্চাদের ওজন বাড়ছে না, হাত-পাগুলো সরু সরু, রং ফ্যাকাসে, পড়া মনে রাখতে পারে না, খেলাধুলোতেও মন লাগছে না, বারে বারে অসুখে পড়ছে, ওষুধ খাচ্ছে আবার অসুখ হচ্ছে।

তাই হয়। খাদ্যের প্রোটিন উপাদানটি দেহকে যেমন গড়ে, বৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্ষয় পূরণ করে, তেমনি রোগের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধ শক্তি জোগায়। প্রোটিনের ঘাটতি পড়লে ছোট ছেলেমেয়েরা যে বারে বারে সংক্রামক রোগের শিকার হয়, এবং তাদের মনন-শক্তিরও পূর্ণ বিকাশ হয় না, এটা নিছক তত্ত্বকথা নয়, পরীক্ষিত সত্য।

রেশনে সস্তা দরে ডাল সরবরাহ করা খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। মাছের চেয়ে ডালের প্রোটিন নিকৃষ্ট হলেও মাছে প্রোটিন পাওয়া যায় প্রতি আউন্সে ১৬-১৮ গ্রাম, আর সেই তুলনায় ডালে ১৭-২৪ গ্রাম। কাজেই মন্দের ভাল হিসাবে রোজ ডাল খাওয়ার অভ্যাস আমাদের রাখতেই হবে। ছেলেমেয়েদেরও খাওয়াতে হবে।

প্রোটিন রূপ বদলায় অনেকটা ঠিক মেঘ থেকে অজস্র বারিবিন্দু, আবার অসংখ্য জলকণা মিশে মেঘের মতন। খাওয়ার পর অন্ত্রে গিয়ে প্রোটিন কণা ভেঙে রূপান্তরিত হয় অসংখ্য অ্যামাইনোঅ্যাসিডের অণুতে। এই অ্যামাইনোঅ্যাসিড অণুগুলি শৃঙ্খলা-বদ্ধ হয়ে, মিলে-মিশে আবার তৈরী করে দেহ-প্রোটিন—অস্থি, পেশী, বিভিন্ন উপাস্থি ও দেহযন্ত্র—মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। কিন্তু দেহ প্রোটিনে রূপান্তরিত বা সংশ্লেষ হতে হলে ২০টি 'অত্যাবশ্যকীয়' অ্যামাইনোঅ্যাসিডের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। যে খাদ্যে এই ২০টি 'অত্যাবশ্যকীয়' অ্যামাইনোঅ্যাসিড আছে, তাকে বলা হয় 'সম্পূর্ণ' প্রোটিন। তেমনি এক বা একাধিক 'অত্যাবশ্যকীয়' অণুর ঘাটতি থাকলে সেই

খাদ্যকে বলা হয় 'অসম্পূর্ণ' প্রোটিন। ঘাটতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দেহ প্রোটিন তৈরী হওয়ার কাজ ব্যাহত হবে। মাছ-ডিম-মাংস-ছানা-সয়াবিনের প্রোটিন হল সম্পূর্ণ প্রোটিন। আর চাল ডাল গম বজরা বাদাম ছোলা মটর নারকেল ও অন্যান্য উদ্ভিদ প্রোটিন হল অসম্পূর্ণ। এগুলোতে কোন না কোন অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনোঅ্যাসিডের ঘাটতি আছে।

এখন মনে হতে পারে, ডাল যদি অসম্পূর্ণ প্রোটিনই হয় তবে ডাল খেয়ে লাভ কী? কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত রহস্য ভান্ডার খুলে খুলে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, সয়াবিন ছাড়া অন্য সমস্ত উদ্ভিদ প্রোটিন 'অসম্পূর্ণ' হলেও হরেক রকম উদ্ভিদ প্রোটিন মিলিয়ে মিশিয়ে খেলে 'অসম্পূর্ণ' চরিত্রটি 'সম্পূর্ণ' হতে পারে। যেমন, ডালের সংগে চাল আটা, সাদা তিল, নারকেল, বাদাম, কড়াইশুঁটি, বিন, আলু ইত্যাদি মিশিয়ে দিলে মাছ-মাংসের মত পুষ্টি পাওয়া সম্ভব। রুচির দিক থেকেও এক-একদিন এক একরকম রান্নায় নতুনত্ব আসতে পারে।

ডাল সম্পর্কে কারও কারও মনে কিছু কিছু ভুল ধারণা লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, ছোট বাচ্চারা নাকি ডাল হজম করতে পারে না। তা কিন্তু নয়। অপুষ্টি-জাত পেটের অসুখে ভুগছে এমন বহু শিশুকে সুসিদ্ধ ডাল খাইয়ে দেখা গিয়েছে, অনায়াসেই হজম ও আত্মস্থ করছে ওরা। পেটের অসুখ কমেছে, চেহারা ফিরেছে, ওজনও বেড়েছে। তবে দেখে নিতে হবে, ক্রিমি বা আমাশা বা অন্য কোন রোগ আছে কিনা। থাকলে তার চিকিৎসা করে নিতে হবে আগে। আর ডাল খুব ভাল করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। ডালের খোসাটাই দুষ্পাচ্য।

অনেক মা-ঠাকুমা বাচ্চাদের দেন ডালের জল। জলের ঘন অংশটা থিতিয়ে গেলে ওপরের জলীয় অংশ দু-এক চামচ ভাতে মেখে দেন—যার না থাকে কোন স্বাদ, না থাকে পুষ্টির লেশ। ফলে সেই স্বাদ-গন্ধহীন ডালে শিশুর স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জাগে। এর পর বড় হয়ে ঘন ডাল দেখলেও সে নাক কোঁচকায়। বিতৃষ্ণা তখন মানসিক—যার কারণ শৈশবে অরুচিকর খাদ্য খাওয়ানর চেষ্টা। যে পরিবারে রোজ মাছ-ডিম রান্না সম্ভব নয় সে-বাড়ির শিশু যদি ক্রিমি, আমাশা বা বদহজমে না ভোগে, তবে সাহস করে সুসিদ্ধ ডালের ঘন অংশই খাওয়াতে হবে। অভ্যাস করাতে হবে ক্রমে ক্রমে।

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, আমরা যতরকম ডাল খেয়ে থাকি, তার মধ্যে প্রথম অড়হর ও ছোলা এবং তারপর কলাই মুগ ও মসুরের জৈবমূল্য যা দেহে আত্মস্থ হওয়ার মত সং গুণ বেশি।

রোজ যদি ডাল খেতেই হয়, রান্নার ধরনও মাঝে মাঝে পালটান উচিত যাতে একঘেয়ে না লাগে। প্রথমেই ধরা যাক ডালের বড়া-বড়ির কথা। ডাল করে বেটে ডালের বড়া তৈরি করে ডালনা রাঁধলে অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর এই তরকারিটি ভাত না রুটি দুয়ের সংগেই চমৎকার মজবে। হরেক রকম ডালের বড়ি পূব-পশ্চিম উভয় বাংলার খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বড়ির উপস্থিতিতে যে-কোন তরকারির শুধু স্বাদ বদলায় না, পুষ্টিকরও হয়ে ওঠে। সপ্তাহে দু-একদিন খিচুড়ির কথাটাও মনে রাখা ভাল এই কারণে যে পুষ্টিমূল্য ছাড়াও ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ খিচুড়িভক্ত হয়ে থাকে স্বাদের গুণে।

রান্না করা ডাল ছাড়াও ডালের বরফি বাচ্চাদের প্রিয় খাদ্য। ছোলা বা মুগের ডাল বেটে চিনি দিয়ে পাক করা বরফি ৫-৬ দিন ভালই থাকে। সকালে বিকেলে জলখাবারের সংগে এই বরফি বাচ্চারা চেয়ে খাবে, পুষ্টিও পাবে।

এখন থেকে ডাল রেশনে পাওয়ার ব্যবস্থা যখন হচ্ছে, বয়স্করা প্রতিদিন ২-৩ আউন্স এবং ছোটরা ১-১½ আউন্স ডাল খাওয়ার অভ্যাস আবার চালু করা উচিত শরীর, তাগদ এবং রোগ তাড়ান, সব কিছুর জন্যে।

—অশ্বিনী সামন্ত

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু মন? মনের অসুখও তো সমানই অক্ষম করে দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীব্র তীক্ষ্ম জটিলতার যুগে, অভিজ্ঞ চিকিৎসক 'মনের খবরে' সেই সব মনোব্যাধি ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

মন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। এখানে সেই সব বহুবিধ মতবাদের উত্থাপন করে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আগের প্রবন্ধে মানসিক রোগীর নানা সমস্যার মধ্যে কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করেছি এবং মানসিক রোগ সম্বন্ধে ক্রমে কিছু আলোচনা করবো বলেছিলাম। মানসিক রোগ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে মন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আর এই সম্বন্ধে বলার আগেই নানা মতবাদের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। মনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেও মত প্রচার করা হয়েছে। মাথা না থাকলে যেমন মাথাব্যথার কথাই ওঠে না তেমনই মনের অস্তিত্ব না মানলে মনের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করবারও কিছু থাকে না। আমরা মনের অস্তিত্ব স্বীকার করি। আমাদের মনে খুশির তুফান বয়, মন গানে মাতে, মনে দুঃখ পাই, মনের দুঃখে হারাধনের একটি ছেলে বনে যায়। মন এটা চায় ওটা চায়, মনে রাগ হয়, ভয় হয়, লজ্জা হয়, ভালবাসার পুলক জাগে, মনের আনন্দে নাচি, গান গাই ইত্যাদি আরও কত কি করি। পরীক্ষার সময় জানা তথ্য মনে থাকে না। মনের ভুলে ডালে তরকারিতে নুন দেওয়া হয় না বা দুবার নুন দেওয়া হয়ে যায়। চাবি কোথায় রাখি—দরকারের সময় তা মনে থাকে না ইত্যাদি মনের অনেক কাজ রোজই দেখি। কিন্তু মনকে দেখতে পাওয়া যায় না। মন বস্তু নয়, তাই তাকে পরীক্ষাগারের টেবিলে রেখে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। যা ধরতে দেখতে স্পর্শ করতে পারা যায় না তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা স্বভাবতই কঠিন। মানুষ বহু কঠিন বিষয় আয়ত্ত করেছে। মন সম্বন্ধেও অনেক তথ্য, অনেক তত্ত্ব মানুষ জানতে পেরেছে। সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

প্রথমত ফ্রয়েড মনকে লক্ষণানুসারে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। যথা—সংজ্ঞান (conscious) আসংজ্ঞান (preconscious) ও নির্জ্ঞান (unconscicous) । মনের যে অংশ দিয়ে আমরা জানি, বুঝি, অনুভব করি ইত্যাদি নানা কাজ করি তাকে সংজ্ঞান বলা হয়। সহজাত আদিম বৃত্তিগুলি যেখানে অন্ধকারে আমাদের জানা-বোঝার ক্ষমতার বাইরে থাকে মনের সেই অংশকে নির্জ্ঞান বলা হয়। বিশেষ মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া নির্জ্ঞানের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা যায় না। সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের মধ্যবর্তী স্তরের নাম আসংজ্ঞান দেওয়া হয়েছে। এই স্তরের বিষয় ইত্যাদির খবর অপেক্ষাকৃত কম চেষ্টায় জানতে পারা যায়—কিন্তু নির্জ্ঞানের বেলায় তা সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের মতে মনের আদি অবস্থায় সবটুকুই নির্জ্ঞান ছিল। পরে ক্রমে বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সংজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। আসংজ্ঞানের ওপর দিকে সংজ্ঞান এবং নিচের দিকে নির্জ্ঞান বলা চলে। নির্জ্ঞান থেকে কোনো কামনাবাসনা সংজ্ঞানে আসতে হলে তাকে আসংজ্ঞানের স্তরের মধ্যে দিয়েই আসতে হয় আর এই স্তরেই ইচ্ছা ভাষায় রূপ নেয়। মন বস্তু নয়, তাই এই যে স্তর-বিভাগ এও বাড়ির একতলা, দোতলা, তেতলার মত বাস্তব ভাগ মনের নেই। মনের নানা ক্রিয়া ব্যাখ্যা করবার সুবিধার জন্য এই বিভাগ স্বীকার করা হয়েছে মাত্র। ফ্রয়েডের মতে মনের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সংজ্ঞান আর ন' ভাগ নির্জ্ঞান ও আসংজ্ঞানের স্তর। যে ইচ্ছা আমাদের সংজ্ঞান মনে আসে না তার অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি না। তবু নির্জ্ঞানে যে আমাদের কামনা বাসনা নেই তা বলা চলে না। মনঃসমীক্ষণ দ্বারা নির্জ্ঞানের বহু তথ্য জানতে পারা যায়। বৃত্তিগুলি নির্জ্ঞানের থেকে স্তব্ধ হয়ে বা মরে যায় না। সর্বদাই তারা নিজেদের তাগিদ পূরণের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। সে স্তরে কোনো সময়ের বোধ নেই। তাই কোনটা আগের কোনটা পরের এমন কিছু নির্ণয় করা সে স্তরে সম্ভব হয় না। সংজ্ঞান স্তরের পরস্পর বিরোধী ইচ্ছাগুলিও নির্জ্ঞানে একসঙ্গে নির্বিরোধে বাস করে। সুযোগ পেলেই সংজ্ঞানে তারা বেরিয়ে আসে। এই মতবাদানুসারে মানসিক রোগ চিকিৎসায় কোনো কোনো লক্ষণ গঠনপ্রণালী ব্যাখ্যা করার অসুবিধা হওয়ার পরে ফ্রয়েড তাঁর পূর্ব মতের কিছু সংযোজন ও পরিবর্তন করে মনকে অদস্ (Id) অহং (Ego) এবং অধিশাস্তা (Super Ego) এই তিনটি ক্রিয়াগত বিভাগে গঠিত বলে কল্পনা করেছেন। এদের মধ্যে অদস্ সম্বন্ধে সংজ্ঞানে স্পষ্টতঃ কিছু জানা যায় না। সে স্তরের ক্রিয়াদি আমাদের নির্জ্ঞানে সম্পাদিত হয়। অহংয়ের কিছু অংশ সংজ্ঞানে, বাকি অংশ আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানে কাজ করে। আবার মনের নানা ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নির্জ্ঞান ও আসংজ্ঞানের মধ্যে একটি এবং আসংজ্ঞান ও সংজ্ঞানের মধ্যে আরেকটি প্রহরী (Censor) কল্পনা করা হয়েছে। এই প্রহরী অবাঞ্ছিত ইচ্ছা কামনাদিকে আমাদের সংজ্ঞানে অহংয়ের কাছে আসবার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ফলে অনেক ইচ্ছা আমরা জানতেই পারি না। যে ইচ্ছা আমরা জানি না সেই ইচ্ছা যে আমাদের আদৌ নেই এমন কথা বলা যায় না। আমাদের বহু ইচ্ছা অহং দ্বারা অবদমিত (Repressed) হয়ে নির্জ্ঞানে তাড়িত হয়। মনের অদস্ অংশে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) অবস্থান করে। নানা প্রকার আদিম সহজাত প্রবৃত্তিগুলি তাদের দাবী পূরণের জন্য সর্বদাই তৎপর থাকে। সুযোগ পেলেই সেগুলি আমাদের সংজ্ঞানে অহংয়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। কেবল তখনই মাত্র আমরা ঐ সব ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি এবং সঙ্গত বা অসঙ্গত বিবেচনা করে সেই ইচ্ছার পূরণের চেষ্টা করি বা পুনরায় তাকে অবদমিত করে নির্জ্ঞানে প্রেরণ করি।

এই তত্ত্বকথার জটিলতাকে বাদ দিয়ে বিষয়টা সহজ করে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করি। মনে করা যাক রামের নির্জ্ঞান মনে তার পিতাকে হত্যা করবার ইচ্ছা আছে। এই রকম আক্রমবৃত্তি আমাদের সহজাত। সকলের মধ্যেই এই হত্যা করবার ইচ্ছা কম-বেশী আছে। আমাদের শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে, সভ্যতার যোগ্য হবার জন্য এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বসবাসের প্রয়োজনে, আমরা ক্রমে হত্যার ইচ্ছাকে অবদমিত করে নির্জ্ঞানে প্রেরণ করি। এই অবদমনের ফলে রামও তার নিজের মধ্যে যে এই হত্যার ইচ্ছা আছে তা জানতেই পারে না। যদি কখনও সে ইচ্ছা মনে জাগে তখনও তাকে অবদমিত করার ফলে এই ইচ্ছার অস্তিত্ব সে ভুলে যায়। ফলে রামকে যদি বলা যায়

যে সে তার পিতাকে হত্যা করবার ইচ্ছা পোষণ করে তবে রাম তাতে তাঁর প্রতিবাদ করবে এবং এ কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা সে তাই জোরের সঙ্গে জানাবে। রামের এই হত্যা করবার ইচ্ছা পূর্বে হয়ত আদৌ স্পষ্টরূপে কোনো দিন প্রকাশ পায় নি এমনও হতে পারে। অথবা প্রকাশ পেয়ে অবদমিত হওয়ায় সে সম্বন্ধে তার বিস্মৃতি ঘটেছে এমনও হতে পারে। ফলে সে তা জানে না বা তা একেবারেই ভুলে গিয়েছে। সেই অবাঞ্ছিত ইচ্ছা সম্বন্ধে কেউ উল্লেখ করলে রামের পক্ষে তার তীব্র প্রতিবাদ করাই স্বাভাবিক। রাম এই জন্যই প্রতিবাদ করে। এমন হত্যার ইচ্ছা গর্হিত ইত্যাদি বোধ জাগায় রামের অধিশাস্তা (Super Ego) সে ইচ্ছা পূরণে বাধা দেয়। রাম তাই সেই ইচ্ছাকে তাড়না করে অহং (Ego) ও অধিশাস্তার সাহায্যে অবদমিত করে দেয়। যদি এই অবদমন ক্রিয়া সম্ভব না হতো বা মনের এই ক্ষমতা না থাকত তবে এই হত্যার ইচ্ছা রামকে সারাক্ষণ উদ্ব্যস্ত করে রাখত। তার পক্ষে তখন ধীরভাবে কোনও সহজ প্রয়োজনীয় কর্ম করা অসম্ভব হতো। এই অকাম্য পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে রামের অহং ঐ হত্যার ইচ্ছাকে অবদমন করে দেয়। কেবল এই ইচ্ছাই নয়, আমরা যাকে রিপু বলি, সেই ছয় রিপুর (যথা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য-র) একান্ত প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অহং সর্বদা এই রীতি অবলম্বন করে। যখন অহংয়ের অবদমন ক্ষমতার অপেক্ষা হত্যার ইচ্ছার শক্তি প্রবলতর হয়ে ওঠে, রাম তখন বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে হয়ত হত্যা করে বসে। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে রামের সামাজিক জীবন যাপনের জন্য অহংয়ের (সময় সময় অধিশাস্তার সাহায্যে) এই অবদমন ক্ষমতা থাকা কত প্রয়োজন। রাম হত্যা করতে চায় একথা যেমন সত্য আবার রাম তার পিতাকে ভালবাসে, সে সমাজে আর দশজনের মত সুনাম নিয়ে বাঁচতে চায়, অপরের শ্রদ্ধা, ভালবাসা পেতে চায় এও তেমনই সত্য। সাধারণ মানুষের বাস্তব জ্ঞান ও সমাজবোধ প্রবলতর হওয়ায়, অসামাজিক কাজ সহজে করে না। বিশেষ অবস্থায় অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা কোনও মতবাদের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে রাম যে তার পিতাকে বা অপর কাউকে হত্যা করতে পারে তার উদাহরণ বর্তমান জগতে চারদিকে ছড়ানো আছে। মানুষের নীতিবোধ তখন মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় এই জন্যই আমরা হত্যা করতে পারি। তাতে কোনও দ্বিধা বা পাপ বোধ মনে জাগে না। শত্রুকে বধ করা তখন কর্তব্য মনে হয়। এই জন্য সমাজের মানুষের কাছে উৎসাহ ও সম্মান লাভও হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমাদের অধিশাস্তা পরাজিত হয়ে যায়। তখন আমাদের স্বাভাবিক নীতিবোধ ভেঙে পড়ে। মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত জেনেও মানুষ অনেক সময় বহু দুর্নীতিক কাজ করে থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই কলকাতা শহরেই প্রকাশ্য দিনের আলোতে যা ঘটেছে স্বাভাবিক অবস্থায় তেমন হতে দেখা যায় না। এ থেকে আর একটি বিষয়ও বুঝতে পারা যায়। আমরা বহু চেষ্টায় শিশুকাল থেকে ক্রমে শিক্ষা পেয়ে যে আচরণবিধি আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জীবন যাপনের ধারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করি, অবস্থা বিশেষে, তীব্র কোনোও প্রক্ষোভের (Emotion) ধাক্কায় তা সাময়িকভাবে ভেঙে যেতে পারে। তখন আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি আবার আসরে নেমে তাদের স্বাভাবিক দাপাদাপি শুরু করে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা দ্বারা আমাদের সহজাত বৃত্তিগুলিকে অনেক পরিমাণে আয়ত্তে আনতে পারা যায় কিন্তু তাদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় না। সহজাত প্রবৃত্তির মৃত্যু নাই। কার অহং এই বৃত্তিগুলিকে কতটা সামাজিক পথে চালিত করতে পারে তাই দিয়ে তার জীবনের সামাজিক মূল্যায়ন হবে। সাধারণ মানুষ এই বৃত্তিগুলিকে যেভাবে সামাজিক নানা প্রণালীতে চালিত করতে পারে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ তেমন পারে না। সহজাত বৃত্তিচালিত ইচ্ছা ও অহংয়ের সেই ইচ্ছা দমনের চেষ্টার আংশিক ব্যর্থতার ফলেই মানসিক রোগ হয়।

মনঃসমীক্ষণের মতবাদানুসারে মনের আরও কয়েকটি বিষয় সামান্যতর উল্লেখ করার বিশেষ দরকার আছে। আমাদের সহজাত বৃত্তিগুলি নিজরূপে আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা অবিরাম করে চলেছে, একথা আগে বলা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে এই বৃত্তি থেকে যেসব ইচ্ছার আমাদের মনে সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে সেগুলি আমাদের নীতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদির বিরোধী সেগুলিকে আমাদের সংজ্ঞানে আসার পথে অহং বাধা দেয়। কেবল তাই নয় যাতে সে রকম কোনও ইচ্ছা এসে আমাদের সংজ্ঞানে অশান্তি সৃষ্টি না করে তার জন্য অহং সেই ইচ্ছাগুলিকে অবদমিত করে নির্জ্ঞানেই চেপে রাখার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সব সময় অহংয়ের এই চেষ্টা সার্থক হয় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছাগুলি একা বা সমগোত্রীয় কয়েকটি ইচ্ছা জোট বেঁধে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে অহংয়ের অবদমন শক্তিকে পরাস্ত করে সংজ্ঞানে বেরিয়ে আসে। তেমন অবস্থায় আমাদের নিজেদের ইচ্ছার জন্যে নিজেরাই কুণ্ঠা বা অশান্তি বোধ করি। তখন যথাসম্ভব চেষ্টা করে তেমন ইচ্ছানুসারে কাজ করা থেকে আমরা যথাসাধ্য বিরত রাখি। যদি অহংয়ের সে ক্ষমতাও না থাকে তবে আমরা হঠাৎ হঠাৎ নানা অসংগত অসামাজিক কাজ করে বসি। ছোটদের জীবনে এই পরিণতির দৃষ্টান্ত হামেশা দেখা যায়।

আক্রমবৃত্তির প্রকাশের কথাই ধরা যাক। ছোটবেলা থেকে তো কত রকমে শিশুদের মারামারি না করা, কারো ক্ষতি না করা, শান্ত হয়ে, ভাল হয়ে খেলাধুলো করার উপদেশ দিয়ে থাকি। সে উপদেশ তাদের মেনে চলতেও দেখা যায়, যদিও নিজেদের আক্রম ইচ্ছাকে সামলে চলবার শিক্ষা একদিনেই হয় না। অনেকবার একই নিষেধ একই উপদেশ শুনে শুনে তবে শিশু তা ক্রমে নিজের মনে নিতে পারে আর সেই জন্যই ক্রমে সে নিজেকে সামলে চলতে পারে। কিন্তু যখন দুজনের মধ্যে বা দু দলের মধ্যে বিরোধ বাধে, মতের অমিল হয় বা একের স্বার্থ অপরের দ্বারা নষ্ট হতে বসে তখন কখন কখন মারামারি হয়। পরে আবার তা মিটেও যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত হামেশাই মেলে। আমরা নিজেদের তো ভদ্র শিক্ষিত বলে গর্ব করি, কিন্তু মতবিরোধ প্রবল হলে, স্বার্থে ঘা লাগলে মারামারি, দাঙ্গা, ট্রাম-বাস দোকান রেলগাড়ি ইত্যাদি পোড়ানো থেকে আরম্ভ করে খুন জখম সবই করে থাকি। বৃত্তির মৃত্যু নেই।

এ তো গেল বৃত্তির নিজরূপে প্রকাশের উদাহরণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই আক্রমবৃত্তি, তথা অন্য সব বৃত্তির সমাজগ্রাহ্যরূপে বহু রকম প্রকাশের উপায়ও মন করে। মনের এই বৃত্তির সামাজিকরণ ক্রিয়াকে মনঃসমীক্ষণের পরিভাষায় 'উদ্গতি' (Sublimation) বলা হয়। আক্রমবৃত্তিকে, নিজরূপেই, আমরা সমাজের কল্যাণেও ব্যবহার করে থাকি। যেমন রোগের জীবাণু বিনাশ করা, মানুষের অনিষ্টকারী অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করা, খাদ্যের জন্য প্রাণী বধ করা ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে আক্রমবৃত্তির উদগতি হয়েছে বলা যায় না। কিন্তু যখন আমরা খেলার মাঠে বিপক্ষ দলকে হারানোর জন্য লড়াই করি, ঘরে বসে তাস খেলায় তুরুপ বসাই, দাবা খেলায় সজোরে বিপক্ষের গজ, ঘোড়া, মন্ত্রী মারি বা খোদ রাজাকেই কিস্তি দিয়ে বসি, তখনও কিন্তু ঐ আক্রমবৃত্তিই চরিতার্থ করি। প্রকৃত হত্যার বদলে এই যে খেলার ছলে হত্যা করা হচ্ছে এখানে বৃত্তির উদগতি সাধন করা হয়েছে বলা হয়। চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচারের মধ্যেও এই আক্রম বৃত্তির অংশ থেকে যায়, যেমন থাকে গাছ কাটা, মাটি কাটা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদিতে। পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হলে উৎসাহে যখন তার

দেহে ঘুষি মারি তখনও ঐ বৃত্তির ক্রিয়া বলে তাকে বুঝে নিতে হবে, যেমন বুঝতে হবে—ছোট শিশুকে আদর করতে গিয়ে তাকে জোরে জড়িয়ে ধরা বা বুকে চেপে ধরার বেলায়। মা-ঠাকুমার তৈরী শক্ত তিলের নাড়ু যখন সহজে ভাঙা যায় না তখন যে জোর দিয়ে তা ভাঙবার চেষ্টা হয়, সুপারি ভাঙতে যে জোর দেওয়া হয় তারও মধ্যে ঐ আক্রমবৃত্তির প্রকাশ ধরা পড়ে। দোল আসছে, আমরা রং আবির মেখে হৈ-চৈ করবো। রোজকার জীবনযাত্রায় স্নো-পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করা, শিল্পের নানা রং নিয়ে কাগজে বা ক্যানভাসে লাগানোর মধ্যে আদিম নোংরা ঘাঁটবার বৃত্তির উদ্গত রূপায়ণ বলে মনঃসমীক্ষক-গণ জানতে পেরেছেন। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, শতশত উদাহরণ প্রত্যেকেই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন।

বৃত্তির উদ্গতির প্রকাশ শিল্পে, সঙ্গীতে, কাব্যে সাহিত্যে, তথা মানুষের সৃষ্টিমূলক সব কাজেই দেখতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য ও আর্টের নামে আমরা যা প্রকাশ করি দৈনন্দিন জীবনে তার অনুশীলন সম্ভব নয়। যেমন ধরুন চিত্রশিল্পী বা মূর্তিশিল্পী যে নগ্নচিত্র বা মূর্তি রচনা করে সমাজে প্রশংসা ও জয়মাল্য পেয়ে থাকেন, বাস্তব জীবন যাপনে সে আচরণ সমাজে গ্রাহ্য হয় না। অবশ্য বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অতি আধুনিক সংস্করণে শিল্পীর রূপ রচনা জীবন্ত মানুষের মাধ্যমে সদর রাস্তায় নেমে এসেছে। তবু তাকে আজও সর্বতোগ্রাহ্য আচার বলে মেনে নেওয়া যায় না। কাব্যে সাহিত্যে আর্টের নামে মানুষের মনের বৃত্তিগুলি প্রায় নানারূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আর্ট বলি বা সৌন্দর্যলিপ্সাই বলি, যে নামই আমরা দিই না কেন, বস্তুত সে সবই আমাদের সহজাত নানা বৃত্তির বিশেষ রূপে প্রকাশ। আর্ট, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে অনেকখানি সাহায্য করে। কঠোর অবদমনে সব ইচ্ছাকে রুদ্ধ করে রাখবার চেষ্টাই যদি কেবল মানুষ মন করতো তবে এক সময় তার আভ্যন্তরীণ চাপ এত বেশী হতো যে মানসিক সমতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই অন্তঃ উক্ত নানা উপায় অবলম্বন করে ভেতরের চাপ সাধ্যমত কমিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আমাদের মনের অবস্থাটা কতকটা আজকালের 'প্রেসার কুকারের' মত। একটা সীমা পর্যন্ত ভেতরে চাপ সৃষ্টি হবার পরে যদি আরও চাপ বেড়ে যায় তখন কুকার ফেটে গিয়ে অনর্থ ঘটাবার আগেই ভালভ দিয়ে অতিরিক্ত বাষ্প যাতে বেরিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা থাকে। যদি চাপ আরও দ্রুত বেড়ে যায় যাতে করে ভালভ দিয়ে আবশ্যক পরিমাণ বাষ্প বেরুতে না পারে—তবুও যাতে বিপত্তি না ঘটে তার জন্য আরও একটি নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। যাকে (Safety Valve) বলা হয়। চাপের মাত্রা বেশী বেড়ে গেলে ঐ ভালভ ফুটো হয়ে গিয়ে তার মধ্যে দিয়ে তোড়ে অতি দ্রুত বাষ্প বেরিয়ে গিয়ে পাত্রের ভেতরের চাপ কমিয়ে দেয়। আমাদের মনেরও উত্তেজনা বা চাপ সহ্য করবার একটা সীমা আছে।

মনের এই বৃত্তির চাপ সহ্য করবার শক্তি অসীম নয়। সাধারণের মন সর্বংসহা নয়। সেই জন্যেই চাপ যাতে বেশী বেড়ে গিয়ে বিকার ঘটাতে না পারে তার ব্যবস্থা মন করে রেখেছে ঐ শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে ভেতরের চাপ বাইরে বের করে দেবার সমাজগ্রাহ্য নানা উপায়ে। অনেকের আপত্তি হতে পারে তবু একথা সত্য। আমাদের সাধারণ লৌকিক ধর্মাচরণও মনের এই চাপ কমানোরই এক বিশেষ চেষ্টা। ধর্মের যে অতি সূক্ষ্ম উন্নত ও দার্শনিক অনুশীলন তার মধ্যেও মনের কোনো না কোনো বৃত্তির প্রকাশ লক্ষিত হয়। কাদা থেকে পদ্মের গাছ রস আহরণ করে ফুল ফোটায় বলে পদ্মফুলও কাদা নয়। ধর্মাচরণের মাধ্যমে আমাদের অনেক বৃত্তির চাপ কমে যায়। যেমন যায় উল্লিখিত শিল্পাদি রচনার মাধ্যমে। এদিক থেকেও সাধারণের পক্ষে ধর্মানুষ্ঠানাদি বিশেষ উপকারী এবং মানুষের মনের শান্তি রক্ষার চেষ্টায় বিশেষ এক প্রয়োজনীয় পন্থা। বর্তমান সভ্যতা এই আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের উপর সজোরে কুঠারাঘাত করে চলেছে। ফলে মানুষের মনের সুস্থতা রক্ষার, তার মনের আস্থা রক্ষা করে চলবার একটা বড় পন্থাকেই লোপ করে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তার বদলে অন্য কোনও সকলের পক্ষে গ্রাহ্য উপায় দেখাতে এই সভ্যতা আজও পারেনি। ফলে সংশয়, সন্দেহ, অসন্তোষ যেন আমাদের বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। ভাঙন হয়তো সৃজনশীল অগ্রগতির পক্ষে প্রয়োজন কিন্তু সৃজনহীন ভাঙনের ফলে মনের অবনতি ঘটে। মানসিক রোগ সৃষ্টি তার প্রধান প্রমাণ। মন নির্ভর না করে থাকতে পারে না। বাইরের কিছুর উপর নির্ভর না করতে পারলে নিজের ওপরও যদি নির্ভর করে মন চলতে পারে, তবুও রক্ষা পেতে পারে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে মনের বিকার দেখা দেয়। আগেই বলেছি প্রচলিত ধর্ম নিয়ে যত বিবাদ, মারামারি, হানাহানিই হোক না কেন, তবু সমাজে সাধারণ মানুষের পক্ষে এর বিশেষ উপকারিতা আছে। মনে রাখতে হবে মনের প্রয়োজনেই ধর্ম, শিল্পকলা ইত্যাদির বাহ্যিক রূপ যুগ যুগে বদলে যায়, কিন্তু ভেতরের প্রয়োজন থেকেই যায়। মানুষের এই সব সৃজনের মধ্যেই মানুষ তার বৃত্তির তাগিদকে যেমন প্রকট করে, তেমনই তাকে উদ্গত উন্নত মানে রূপায়িত করবার অপূর্ব শক্তিরও পরিচয় দেয়। মনের এই ক্ষমতা আছে বলেই মানব-সভ্যতা বাস্তব হয়েছে। তা সত্ত্বেও বৃত্তির তাড়নায় যে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প বা আগ্নেয় প্রস্রবণের মত হঠাৎ তীব্র নাড়া দিয়ে সভ্যতার বিশৃঙ্খলা ঘটায়, সভ্যতার নানা গ্লানি ছড়িয়ে দেয়, হিংসা, দ্বেষ, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি প্রবল হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর রেখে আমাদের সজাগ হয়ে চলতে হবে। আগেও উল্লেখ করেছি, বৃত্তি মরে না। এই বৃত্তির শক্তি থেকেই শক্তি নিয়ে সভ্যতার আরও পাকা বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে, ভাঙনকেই ভেঙে সৃজনের গতি বাড়াতে হবে।

আমাদের মনের সহজাত বৃত্তিগুলির সামাজিক প্রকাশের কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। একটা অতি পরিচিত ও অতি সার্থক প্রকাশের কথা বলে এবারের লেখা শেষ করব। দিনের কাজে, জাগ্রত অবস্থায় যেসব বৃত্তির চাহিদা পূরণ হয় না—তাদের রেশ মনে সঞ্চিত থেকে যায়। আমাদের ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে নানা রূপ নিয়ে সেইসব বৃত্তি-মূলক ইচ্ছার অন্তত আংশিক পূরণ সম্ভব হয়। সময় সময় ঘুমের ঘোরে, প্রহরী যখন নিজেও ঝিমুতে থাকে তখন, গোপন চাপা ইচ্ছা আবরণ ছেড়ে তার উলঙ্গরূপে দেখা দেয়। কিন্তু সবসময় তা হয় না। অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই জানেন অধিকাংশ সময় স্বপ্নের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। গণ-সমীক্ষণের বিশেষ প্রণালীতে এই-সব স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ জানতে পারা যায়। স্বপ্ন কোনোটাই অর্থহীন নয়, তার সব-গুলিতেই এক বা একাধিক ইচ্ছা পূরণ হয়। নিজেদের অভিজ্ঞতায় যেখানে আমরা দেখতে পাই দিনে বা রাতে দেখা অধিকাংশ স্বপ্নই একেবারে অর্থহীন, আজগুবি, খাপছাড়া, কিম্ভুতরূপে দেখা দেয়, তবু যখন মনঃসমীক্ষক বলেন সব স্বপ্নের অর্থ আছে আর সেই অর্থের মধ্যে পাওয়া যায় স্বপ্নদ্রষ্টার কোনো না কোনো ইচ্ছার পূরণ বা পূরণের চেষ্টা, তখন তা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না। তবু যে একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না, তা মনঃ-সমীক্ষণ করাতে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে, পরে এ-সম্বন্ধে পৃথক করে বলার ইচ্ছা রইল।

মনের কতগুলি কারণ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। আরও বহু বিষয় আছে যা এই ছোটো লেখায় বলা সম্ভব হল না। পরে কিছু কিছু বিষয় বলতে চেষ্টা করবো।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

লোকে বলে—অবক্ষয়ের যুগ, ভেঙে পড়ার দিন,
কিন্তু সত্যিই কি তাই?
আমরা কি গড়েও তুলছি না?
অন্তত ক্লাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে
যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অন্য চেহারাই
দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো
ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা
করছি, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।
আমাদের নবযুগের যুবসমাজের সেই
অক্লান্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে তুলে
ধরা হবে এই বিভাগে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

জীবনীশক্তির অভাব ঘটলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাকে বেঁচে থাকা বলা যায় না, বলা চলে টিঁকে থাকা। বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীন গ্রন্থাগার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র বর্তমান অবস্থা অনেকটা সেইরকম। হিমালয়ের মত মহান যার ঐতিহ্য, আজ তা ম্রিয়মাণ; নদীর মত প্রাণচঞ্চল এই প্রতিষ্ঠান আজ বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত। অভিযোগের পাহাড় জমে উঠেছে এর ভেতরে বাইরে সর্বত্র। কিন্তু সব কিছুর মর্মমূলে আছে আর্থিক শোচনীয় দুরবস্থা।

বিরাট ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রচণ্ড অবহেলার আসন্ন মৃত্যু প্রত্যক্ষ করলাম পরিষদের অন্দরমহলে ঢুকে। এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। মেঝের ওপরে চেয়ারে টেবিলে স্তূপীকৃত বাণ্ডিল বাঁধা বই এবং না-বাঁধানো ছেঁড়া বই-এর রাশি ফাটলধরা জলপড়া রঙচটা ঝুলধরা অন্ধকার ঘরে ধুলোর পুরু আস্তরণের অন্তরালে শেষ প্রহরের অন্ধকারে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনছে। Mighty minds of old -এর এ এক চরম লাঞ্ছনা! রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরীর মধ্যে মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলকে ঘুমিয়ে পড়া শিশুটির মত চুপ করে থাকতে দেখেছিলেন; কিন্তু আমরা দেখছি তাঁদের যাবার আগে 'নীরব মহাশব্দে'র এ ঘুম হয়তো আর ভাঙবে না! জাতীয় সম্পদের এই অবহেলার বিচার হয়তো কোনোদিনই হবে না, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, সারা দেশে এত লাইব্রেরী, সরকারী সহযোগিতা, বেসরকারী সাহায্যের প্রাচুর্য, অথচ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যেন চির-উপেক্ষিত।

ঊনিশ শতকের শেষ দশকে প্রতিষ্ঠিত এই পরিষদ রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আশুতোষ মুখার্জি, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রখ্যাত মনীষী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় বহু কষ্টে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে; আজ এর অমূল্য সম্পদ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন ভারতের গৌরব। এখানকার মিউজিয়ামে রাখা মনীষীদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি, [illegible] ধাতু ও প্রস্তর-মূর্তির শিল্পনিদর্শন, তৈলচিত্র, চিত্রশালা, ইত্যাদি এবং অন্যত্র রাখা প্রাচীন মুদ্রার ঐতিহাসিক নিদর্শন বিদেশী পর্যটকদেরও আকর্ষণ করে থাকে। সংস্কৃত ও বাংলা-সাহিত্য, ভারতের বহু আঞ্চলিক সাহিত্যিক নিদর্শন, নেপালী, তিব্বতী ইত্যাদি প্রাচীন পুঁথি, ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি প্রত্যেকটি নিদর্শন যেন এক একটি যুগের ইতিহাস। এখানে গ্রন্থের সংখ্যা দু' লক্ষাধিক। পুরানো পত্র-পত্রিকার এত ভাল সংগ্রহ ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারেও নেই। এখানকার প্রকাশনা বিভাগ থেকে বিগত আশী বছর যে সব বই বেরিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক, যুগান্তকারী।

বৌদ্ধগানও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি প্রকাশ করে পরিষদ বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাই পাল্টে দিয়েছে।

ইংরেজ আমলে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সরকারের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সাহিত্য পরিষদকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরিষদ আজ বে-সরকারী স্বাধীন সংস্থা। এর ক্রমবর্ধমান সমস্যাও আজ বহুমুখী ও জটিলতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাজ্য সরকারের উদাসীন দৃষ্টি এর অন্দরমহলে পৌঁছয় না।

সমস্যা এখানে সর্বব্যাপী। পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক মদনমোহন কুমারের মতে সমস্যা এখানে একটি মাত্র এবং তা আর্থিক সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার নামমাত্র সাহায্য দেন, কলকাতা কর্পোরেশন আর্থিক দুরবস্থার জন্যে বিগত কুড়ি বছরে কোন আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন না, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তক প্রকাশ, পত্রিকা প্রকাশ, কর্মচারীদের বেতন ও ঘাটতি ব্যয় বাবদ খাতে মোট ২৬ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে থাকেন বছরে। এই সামান্য টাকায় বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। ফলে মিউজিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ, সাড়ে ছ' হাজার পুঁথি সংরক্ষণ, ৫০ হাজার বই ক্যাটালগিং করা, কিংবা প্রাচীন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। র‍্যাক সেলফ্ আলমারির অভাবে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই নষ্ট হচ্ছে। স্থানাভাবে পত্র-পত্রিকা বা নতুন বই রাখা যাচ্ছে না। মাইক্রোফিলম করবারও কোনো বন্দোবস্ত নেই। এইভাবে চললে ভাবীকালের জন্যে হয়তো অনেক কিছুই থাকবে না, যা থাকবে তাও ধ্বংসযজ্ঞের উচ্ছিষ্ট! সংলগ্ন উত্তরদিকের বস্তী সরকারী প্রচেষ্টায় দখল করে বাড়ী তুলে স্থান সংকুলান করা যায়। অবশ্য আরো সহজে সিলিং সমান বড় বড় আলমারি তৈরী করে আপাতত এ সমস্যার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

একটা সাময়িক সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু তাও অর্থাভাবে করা যাচ্ছে না।

গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ তো দূরের কথা, আর্থিক সমস্যা এখানে এত প্রবল যে এখানকার কর্মচারীদের অতি সামান্য হারে বেতনও সময় মত দেওয়া কষ্টসাধ্য। জনৈক প্রবীণ কর্মচারী পঁয়তাল্লিশ বছর চাকরী করে বর্তমানে বেতন পান ১৪০, টাকা মাত্র। লাইব্রেরী অ্যাসিস্টান্টের প্রারম্ভিক বেতন ৪০।৫০ টাকা। কোন পে স্কেল নেই, ইন্‌ক্রিমেন্ট নেই, স্থায়ী হবারও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। লাইব্রেরী অফিস বেয়ারা কর্মচারীর সংখ্যা ১৪ জন, ভারত-কোষ রচনায় নিযুক্ত আছেন আরো ৬ জন। এই অল্পসংখ্যক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল পাঠক-পাঠিকাদের নানা অভিযোগ, নানা অব্যবস্থা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আর্থিক কারণে গত আট বছরের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি। এই একই কারণে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী পুঁথি রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না।

এখানকার সব কিছু দেখে পরিচালন ব্যবস্থা যে সুষ্ঠু তা মনে হল না। বরং সমস্যার যেটুকু সমাধান করা যেত তা দলাদলির প্রাচীরে বাধা পড়েছে।

পরিষদই প্রথম বাংলা কোষগ্রন্থ প্রকাশ করে। এখন ভারতকোষের পঞ্চম বা শেষ খণ্ড লেখা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী এনসাইক্লোপিডিয়া লিখতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন, অথচ বাংলার মত উন্নত জীবন্ত ভাষায় ভারতকোষ লিখতে সে অনুপাতে সামান্য টাকাই দেওয়া হয়েছে। শুনেছি অন্যান্য প্রদেশেও এই ধরনের বিশ্বকোষ লেখবার জন্যে যথেষ্ট অর্থ সরকার দিচ্ছেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ খণ্ডে বাংলা ভারতকোষ বার করা হচ্ছে, এটা খুবই দুঃখজনক। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা যায়, নগেন্দ্রনাথ বসুর বহু খণ্ডবিশিষ্ট বিশ্বকোষ যদি পুনর্মুদ্রণ করা যায়, তা হলেও কিছুটা অভাব পূর্ণ হত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাঙালীর অবহেলিত সংস্থা। জ্ঞান ও ভাবের ধূমকেতু-প্রতিভার জীবন্ত সাক্ষ্য নিদর্শন আজ ক্ষয়রোগগ্রস্ত, ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কিন্তু বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে! বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নীরব নিগ্রহ ও অসম্মান এখানে নিঃশব্দে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর পেছনে কোন্ অদৃশ্য কারণ ও মনস্তত্ত্ব আছে, তার মধ্যে প্রবেশ না করে বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসা কালের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে শুধু একটি কথা বলেই সচেতন করতে চাই: রোগ সব শরীরেই দুঃখের, কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক।

—সুশান্তকুমার মিত্র

দিনকাল কেমন চলছে,
তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি।
কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব
আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আঁতের
খবর মেলে ধরা হবে এই
বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু
সচেতন হতে পারি।

ঘরণীর সমস্যা ও ভোগ-পরিকল্পনা

অতিঘরন্তী না পায় ঘর—বাস্তব জগতে এই প্রবাদবাক্যের সমর্থন বিশেষ পাইনি। কখনি দেখিনি যে কোন অতিসুন্দরী বর জোটাতে না পেরে শেষপর্যন্ত অনূঢ়াই থেকে গেছেন। তবে আজকের দিনে অতিঘরন্তীর—অর্থাৎ ঘরকন্নাই যে নারীর সর্বস্ব—সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও ভূয়োদর্শনলব্ধ বেশ কিছু জ্ঞান আমার আছে। আপনারও আছে নিশ্চয়। তবে আপনি বোধহয় ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেন নি, আমাকে কিন্তু দেখতে হয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনাকেই বা তলিয়ে দেখতে হল কেন?—তবে লজ্জাজনক কোন তুলনার মধ্যে না গিয়েও অকপটে স্বীকার করব যে এ হল আজকের দিনে অতিঘরন্তী নিয়ে ঘর করার মাশুল।

এই 'আজকের দিনে' কথাটির একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রায় আধ শতক আগে জন্মে যে অর্থনৈতিক জীবন বা অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিলাম তাকে স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা বলা হয়। এই অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভোক্তার সার্বভৌমিকতা—সভরেনটি অব দ্য কনজিউমার। অর্থাৎ কনজিউমার বা ভোক্তা নিজেই ঠিক করে যে কি কি জিনিস কতটুকু পরিমাণে সে কিনবে, এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই সে তার ব্যয়বন্টন—অর্থাৎ তার মোট ব্যয় কিভাবে দ্রব্যাদির মধ্যে বন্টন করবে তা—নির্ধারণ করবে। এইভাবে ক্রয় ও ব্যয়বন্টনের অপ্রতিহত স্বাধীনতার দরুন সমষ্টিগতভাবে ভোক্তারাই হয়ে দাঁড়ায় অর্থ-ব্যবস্থার নিয়ামক। রুচি ফ্যাশন ইত্যাদির পরিবর্তনের দরুন তারা যদি নতুন ধরনের জিনিসপত্র কিনতে চায় তবে উৎপাদকেরা সেই জিনিসপত্রই উৎপাদন করতে শুরু করবে। কারণ উৎপাদকদের লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা করা। যেমন, লোকে যদি ছুঁচোলো-মুখ জুতো বেশী পছন্দ করতে আরম্ভ করে তবে ঐ ধরনের জুতোতেই বাজার ছেয়ে যাবে—বহু দোকান খুঁজলেও হয়ত থ্যাবড়া-মুখ জুতো বাজারে পাওয়া যাবে না। আবার যদি লোকে তুলোর কাপড়-জামার পরিবর্তে নাইলন-রেয়ন-টেরিলিন-টেরিকটের দিকে ঝোঁকে তবে ঐসব উপকরণজাত পোশাক-পরিচ্ছদই বেশী তৈরী হতে থাকবে। এইভাবে বাজারের অবস্থা দেখেই বোঝা যাবে ভোক্তারা কি চাইছে।

ভোক্তার এই পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েই আমি এবং আমার ঘরণী (যিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা ছোট হলেও সমসাময়িক, সন্দেহ নেই) জন্মেছিলাম। এবং এই স্বাধীনতা আমার চেয়ে তাঁরই বেশী কাম্য, কারণ তিনি ঘরণী—ব্যয়নির্বাহের মালিক, আর আমি—জার্মান দার্শনিক নীটশের ভাষায় উপার্জনের অধিকারী মাত্র।

তাই অবস্থাটা যখন পাল্টাতে শুরু করল—ভোক্তার স্বাধীনতা যখন উত্তরোত্তর ক্ষুণ্ণ হতে লাগল, তখন তিনি যতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, আমি ততটা হইনি। কিন্তু তাঁর ক্ষোভই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার অস্বস্তির কারণ—হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার সমস্যা।

কিভাবে অবস্থাটা পালটেছে তা ভেবে দেখেছেন কি? বোধ হয় না। সেইজন্যেই ত বলেছি, আপনি বোধহয় তলিয়ে দেখেন নি কিন্তু আমাকে দেখতে হয়েছে।

ভোক্তার ক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা ঃ

প্রথমেই ধরুন, নেসেসারীজ বা জীবনধারণের জন্যে অপরিহার্য চাল-গম ডাল-চিনি-তেলের কথা। চাল-গম-চিনি না হয় অনেক জায়গাতেই র‍্যাশনিং-এর আওতায়, কিন্তু ডাল-তেল-মসলাপাতি বরাদ্দ-ব্যবস্থার বাইরে। তাই তাদের যোগান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। বাজারে ডাল থাকে ত সরষের তেল থাকে না। সরষের তেল যখন পাওয়া যায় তখন ডাল বাজার থেকে উধাও। সরষের তেলের বদলে একবার বা দুবার শোধিত তিল তেলে যখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি তখনই বাজারে আবার এল সরষের তেল। এর ওপর দামের বাড়াকমা ত আছেই। সরষের তেল হয়ত বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু ছোঁয়া যায় না। মুগের ডাল হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যতম ভোগ্য-কেসি। সুতরাং মটর-মুসুরী-ছোলা কিনেই কাজ চালাতে হয়। এবার বরাদ্দ চাল-গম-চিনির কথা ধরুন। চিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না; চাল যা পাওয়া যায় তা অনেক সময় ভিক্ষের চালের বাড়া, আর বাঙালীর অত গম খেতেও ভাল লাগে না। এক্ষেত্রে ঘরণীর স্বাধীনতা রইল কোথায়? হয়ত তিনি রন্ধনারিদ্যার কোন গ্রন্থ থেকে আনারসের কাটলেট বা ঐরকম কিছু খাবার করতে শিখেছেন, কিন্তু প্রয়োজনমত চিনি নেই, আর বাজারে নেই সরষের তেল! হয়ত পুত্রের জন্মদিনে একটু পরমান্ন রন্ধনের অভিলাষ, কিন্তু চিনির অভাবে তা আর তৈরি করা সম্ভব হল না।

ঘরণীর স্বাধীনতা হল ভোক্তার স্বাধীনতা, কারণ অর্থনীতিতে হাউসহোল্ড বা পরিবারকেই ভোগের একক বা ভোক্তা বলে ধরা হয়, আর আমাদের দৈনন্দিন ঘরকন্নায় কেনাকাটার অন্তত মোটামুটি ভার থাকে ঘরণীর ওপর। (অনেক পাশ্চাত্য দেশে এই ভার দিতে অস্বীকার করা বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম হেতু বলে গণ্য।)

বস্তুত, প্রাচীন অর্থনীতিচর্চা শুরু হয়েছিল এই ঘরণীর সমস্যার দিক দিয়ে। অর্থনীতি বা ইকনমি শব্দের গ্রীক অর্থই—ঘরকন্না পরিচালনার শাস্ত্র। কি করে সীমিত উপকরণের সাহায্যে পরিবারের সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা যায়, সেই শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই শাস্ত্রের লক্ষ্য। পরে অবশ্য এই শাস্ত্রের পরিধি সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়ে নাম হয় পোলিটিক্যাল ইকনমি। সীমিত উপকরণের (বর্তমান দিনে ব্যয়ক্ষমতা) সাহায্যে পরিবারের সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করতে হলে ঘরণীর থাকা চাই ব্যয়বন্টনের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। যদি তিনি মনে করেন, মাছের পরিমাণ একটু কমিয়ে দুধের যোগান কিছুটা বাড়ান হক, তবে তাঁকে তা করতে দিতে হবে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

না, আমি হস্তক্ষেপ করিনি। সীমার মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে আমি চিরকালই স্বীকার করে এসেছি। কিন্তু সমস্যাটা আমাকে নিয়ে নয়, সমস্যাটা হল সম্পূর্ণ বহিরাগত—স্বাতন্ত্র্যবাদী বাজার-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার জন্যে।

স্বাতন্ত্র্যবাদী বাজার ঃ

ব্যয়নির্বাহ ব্যাপারে ভোক্তা স্বাধীন হলে ভোগ্যপণ্যের বন্টন ব্যাপারে এইরকম বাজার আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কি জিনিস পছন্দ করা হবে, তার ভার ভোক্তারই ওপর। এবং অতি প্রাচীন কাল থেকে ভোক্তা এই দায়িত্ব আনন্দের সঙ্গেই পালন করে এসেছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার আগের যুগে এই ব্যাপারে সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্যই ছিল ঘরণীর একমাত্র গর্বের বস্তু।

এই স্বাতন্ত্র্যবাদী বাজারও একরকম র‍্যাশনিং বা বরাদ্দ ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থা কার্যকর হত দামের মাধ্যমে। অর্থাৎ দামই ঠিক করে দিত বিভিন্ন জিনিসপত্রের কে কতটা পাবে, আর দাম নির্ধারিত হত ভোক্তাদের কেনার ইচ্ছা এবং উৎপাদকদের *সর্বাধিক মুনাফালাভের প্রচেষ্টা থেকে। এই কেনার ইচ্ছা আর মুনাফালাভের প্রচেষ্টার* ওপর কোন বাধানিষেধ ছিল না। ফলে জিনিসপত্র ঠিকমত তৈরি হত, ঠিকমত *বাজারে আসত আর ভোক্তারা প্রয়োজনীয় পরিমাণে কিনতে পারত। অ্যাডাম স্মিথের* ভাষায়, যেন এক অদৃশ্য হস্ত—অ্যান ইন-ভিসিবল্ হ্যান্ড—সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত।

কালোবাজার :

যেহেতু ক্রেতাদের চাহিদা ও উৎপাদকদের যোগান অনুসারে দাম বাড়াকমা করত এবং বাজার দামেই সবাইকে জিনিসপত্র কিনতে হত, সেইহেতু কালোবাজারের কোন প্রশ্নই ছিল না। দাম বেঁধে দিলে এবং সেই ধার্য দামে সংশ্লিষ্ট পণ্য পাওয়া না গেলেই কালোবাজারের প্রশ্ন ওঠে। শিশুখাদ্যের দাম বেঁধে দিলে যখন সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে মাল উধাও হয় আর পরিচিত দোকান থেকে বেশী দামে ঐ মাল জোগাড় করতে হয় তখনই তাকে বলে কালোবাজার।

এই কালোবাজার ভোক্তার (এক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর) স্বাধীনতার বিশেষ হন্তারক —আমি তাঁর ব্যাপারে নাক না গলালেও কালোবাজার তাঁর স্বাধীনতা বিশেষ ক্ষুন্ন করেছে। শুধু যে ধার্য দামের বেশী দিয়ে কিনতে হয় তাই নয়, অনেক সাধ্যসাধনা করে অনেক মিষ্টি হাসি হেসে পণ্য সংগ্রহ করতে হয়। কি দুর্দৈব!

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভোগ্যপণ্য বণ্টন :

সেদিন যখন আমার ঘরণী তাঁর ভাই-এর বেবীর জন্যে একটা বেবী ফুড কোনমতে জোগাড় করে বাড়ীতে এসে আমার ওপরই ফেটে পড়লেন : এবার থেকে তুমিই দোকান-বাজার করো, আমার দ্বারা আর হবে না,—তখন তাঁকে শোনালাম সমাজতান্ত্রিক দেশে ভোগ্যপণ্য বণ্টনের কথা। জিজ্ঞাসা করলাম : ধর, যদি এমন হয় যে তোমার বাড়ীর সবাই-এর বয়স, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এবং স্বামীর আয়ের ভিত্তিতে তোমাকে কতকগুলো কুপন দেওয়া হয় যেগুলো তোমাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাঙিয়ে তোমার গৃহস্থালীর জিনিসপত্র কিনতে হবে, তাহলে কিরকম হয়?

শুনে গৃহকর্ত্রী বিজ্ঞজনের মতই প্রতি-প্রশ্ন করলেন : তার মানে সব জিনিসেরই র‍্যাশনিং?—তারপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন : এদেশে চলবে না।

অজ্ঞতার ভান করে জিজ্ঞাসা করলাম : কেন চলবে না?

এবার ঘরণী একবার শুধু মুখের দিকে চেয়ে বললেন : র‍্যাশনের চাল কিভাবে বেছে তবে হাঁড়িতে চড়াতে হয়, সে-খবর ত রাখ না।

আমি কিছু বলবার আগেই তিনি আবার শুরু করলেন : তাছাড়া কার কোন জিনিসের কি পরিমাণ দরকার তার হিসেব করবে কি করে? আমার ত অত গম লাগেই না, কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই চাল কম পড়ে। গম ছেড়ে দিতে হয় কিন্তু বাজার থেকে চাল কিনে মরতে হয়।

জানালাম, কুপন-ব্যবস্থা হলে গম ছেড়ে *দিতে আর চাল কিনে মরতে হবে না, ঐ গমের কুপনের বদলেই পাড়াপড়শীর কাছ* থেকে চালের কুপন পাবে, চিনির কুপনের বদলে জোগাড় করতে পারবে সরষের তেল, এমনকি গমের কুপনের বদলে সিনেমার কুপনও পেতে পার।

এবার ঘরণী মন্তব্য করলেন : ওদেশে যা করে করুক গে, ভাবছি আমাদের দেশে এমন আকাল কেন হল।

দুটি প্রশ্ন :

যখন সমব্যথার ব্যথী তখন আমাকেও ভাবতে হল, কেন এমন হল। এটা কি অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার অবশ্যম্ভাবী ফল, না আমাদের পরিকল্পনার ত্রুটিরই স্বরূপ প্রকাশ?

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমাজতন্ত্র-বাদের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে উৎ-পাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই শিক্ষা সভ্য-জগৎ লাভ করে সোবিয়েত ইউনিয়ন থেকে। ঐ দেশে তিন ও চার দশকে অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার সাফল্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে পরিকল্পনা গ্রহণে প্রণোদিত করে। তারপর অবশ্য অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের দৃষ্টান্তও আছে।

কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার অর্থই উদ্যোগের স্বাধীনতা এবং ভোক্তার স্বাধীনতা উভয়ই ক্ষুন্ন করা, তা ঐ অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা গণতন্ত্রী দেশের হোক বা মনোলিথিক সমাজতন্ত্রী দেশেরই হোক। এই জন্যে হায়েক বলেছেন, গণতন্ত্রী দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল দাসত্বের পথ—রোড টু সার্ফডম।

সর্বাত্মক সমাজতন্ত্রী দেশে ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ভোক্তারা এই দাসত্বকে মেনে নেয়। তাছাড়া এর বদলেও তারা বেশ কিছু পায়—যেমন বেকারত্বের এবং আগামী দিনের ভয়-ভাবনা থেকে মুক্তি। সমাজতন্ত্রী দেশে বেকারত্ব বলে কিছু থাকে না, আর সবাই যাতে জীবনযাত্রার জন্যে ন্যূনতম ভোগ্যপণ্য পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রধানত পরিচালিত হয়। এই জন্য সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থক একজন লেখক বলেছেন : ধনতন্ত্রী সমাজে ভোক্তা তার পণ্য নির্বাচনের স্বাধীনতা নিয়ে কি করবে, কারণ স্বাধীনতা পরে, হয় ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে। এরকম যেখানে বেকারত্ব [illegible] কোন আশা দেখা যাচ্ছে না, যেখানে জীবনযাত্রার জন্যে ন্যূনতম ভোগ্যপণ্য যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে ভোক্তা তার নির্বাচনের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে কেন—এইটেই হল মৌল নীতিগত প্রশ্ন। উপরন্তু আয় ও সম্পদের বৈষম্যমূলক বণ্টন-ব্যবস্থার জন্যে যে ত্যাগের দায়িত্ব এসে পড়েছে সমাজের একাংশের ওপর, আর অপরাংশ টেসে জেতা দলের মত চুটিয়ে তাদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করছে—তাও ভাববার কথা। এটা হল ন্যায়বিচারের বা অ্যারিস্টটলের ভাষায়—বণ্টনগত ন্যায়বিচারের প্রশ্ন।

কেন এমন হল?

এবার বোধহয় বিচার করা যেতে পারে, কেন এমন হল।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে মূলধন-সঞ্চয়ের ওপর দৃষ্টি দেওয়া অপরি-হার্য, কিন্তু এই পর্যায়ে বিনিয়োগ-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প এবং ভোগ্যপণ্য উৎ-পাদনকারী শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভোগ্যপণ্য উৎ-পাদনকে উপেক্ষা করলে দামবৃদ্ধি, বৈষম্য-মূলক আয় বণ্টন ইত্যাদির দরুন সমাজের একাংশের স্বার্থত্যাগের পরিমাণ বেশী হতে বাধ্য। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তাই ঘটেছে।

বলা যায়, প্রথম পর্যায়ে পরিকল্পনা-রচয়িতারা অ্যান্টি-কনজিউমার বা ভোক্তা-বিরোধী লক্ষ্য দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) সোবিয়েত আদর্শ অনুসরণ করে ভারী শিল্পের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ফলে ইঞ্জিনীয়ারিং, রসায়ন প্রভৃতি শিল্পের সম্প্রসারণ যে ঘটেছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিতই হয়েছিল তাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত-সংঘর্ষের পর তৃতীয় পরি-কল্পনার (১৯৬১-৬৬) বেশ কিছুটা রদ বদল করে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে জোরদার করার ব্যবস্থা করা হয়। এর দরুন ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন আরও অবহেলিত হতে থাকে। অবশ্য আপনার-আমার বা আমাদের চেয়ে নীচে যারা সেই সব গৃহস্থের প্রয়োজনীয়তাই উপেক্ষিত হয়েছিল, সকলের নয়। ভোগ্যপণ্য উৎপাদকদের যতটা স্বাধীনতা ছিল তা তারা সেইসব পণ্য উৎপাদনেই নিয়োজিত করেছিল যা বিক্রি করে বেশী মুনাফা করা সম্ভব হয়। এ-ব্যাপারে একজন অর্থনীতি-বিদ উক্তি করেছেন : দরিদ্ররা কিনতে পারে এমন পণ্য উৎপাদনে বেসরকারী উদ্যোগ মোটেই উৎসুক নয়, এই উদ্যোগ সেইসব জিনিসই তৈরি করতে চায় যা দরিদ্রের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। এই প্রসঙ্গে ভারতে ভূত-পূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রদূত অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে : যে-দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশের আয় অত্যল্প, সে-দেশে সস্তায় মোটরগাড়ীর চেয়ে সস্তায় বাইসাইকেল যোগান দেওয়া অনেক বেশী প্রয়োজনীয়, সস্তা রেডিও-সেট

অবশ্যই তৈরি করতে হবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যায় এই রকম রেডিও-সেট সরবরাহ করা না যাচ্ছে ততক্ষণ টেলিভিশনের কথা চিন্তা করাও অন্যায়।'

কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু থেকেই আমরা টেলিভিশনের চিন্তাই করে এসেছি, ভেবে এসেছি পিপলস্ কারের কথা, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুপার-মার্কেটের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেষ্টা করেছি—তাই আজ সাধারণ ভোক্তার এই দুর্দশা—স্মরণীয় এই সমস্যা।

ভোগ-পরিকল্পনা :

এ-সমস্যা কিন্তু বিশেষ বিপজ্জনক, তাই এর সঙ্গে বেশী দিন সহাবস্থান করা সম্ভব নয়, উচিতও হবে না। স্মরণ করা যেতে পারে, এই সমস্যাই ছিল ক্রুশ্চভের পতনের অন্যতম কারণ। বস্তুত, কোন উন্নয়ন-পরিকল্পনাই বেশী দিন ভোগতত্ত্বকে উপেক্ষা করতে পারে না; করলে ভুল করা হবে। আবার নেহরুকে উদ্ধৃত করে বলা যায় : 'সর্বোপরি উন্নয়ন-পরিকল্পনার লক্ষ্য হওয়া উচিত সর্বসাধারণের জন্যে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, কারণ মানুষের নিত্য-কলীন প্রয়োজনীয়তার তালিকায় এই তিনটি জিনিসেরই স্থান হল সর্বাগ্রে।' আমাদের পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে সচেতন থাকলেও উপদেশটিকে ঠিক রূপায়ন্ত করে নিতে পারেননি—অর্থাৎ তত্ত্ব ও ব্যবহারে পার্থক্য থেকেই গেল। তাই আজ এই সমস্যা।

তবে আর দেরী নয়—দেরী করা উচিত হবে না। উচিত যে হবে না, কর্তৃপক্ষও তা বুঝেছেন। এই জন্যে পঞ্চম পরিকল্পনাকে বিশেষ করে ভোগভিত্তিক করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চম পরিকল্পনা সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন পরিকল্পনা না হয়ে যাতে ভোগ-পরিকল্পনাও হয়, সেইভাবেই প্রণয়ন করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমাদের মত দেশে ভোগ-পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় হল দারিদ্র্য দূরীকরণ। দারিদ্র্য বা গরীবীর ধারণা অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক—দুই-ই হতে পারে। আমরা যখন গরীবী হটানোর কথা বলি, তখন অনাপেক্ষিক অর্থেই—অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে নয়—গরীবী বা দারিদ্র্য শব্দটি ব্যবহার করি। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই উদ্দেশ্যে জীবন-ধারণের জন্যে ন্যূনতম কি প্রয়োজন তারই তালিকা তৈরি করে থাকি। ১৯৬০-৬১ সালে এই ন্যূনতমের ভিত্তিতে মাসে প্রত্যেকের ২০ টাকা করে ভোগব্যয়ের প্রয়োজন বলে হিসেব করা হয়েছিল, আর এই ১৯৭২-৭৩ সালে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির দরুন অন্তত ৪০ টাকা করে প্রয়োজন বলে অনুমান করা হয়েছে। যারা মাথাপিছু এই পরিমাণ ভোগ-ব্যয় করতে সমর্থ নয়, তাদেরই বলা হয় 'দারিদ্র্যরেখার নীচে'। ধরা হয়েছে ভারতে ২২ কোটি লোকের মত দারিদ্র্য রেখার নীচে এবং এর সঙ্গে এই রেখার কাছাকাছি যারা তাদের যোগ করলে মোট গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক। কোন কোন অঞ্চলে দারিদ্র্য অবশ্য আরও প্রকট।

দারিদ্র্যরেখার নীচে বা কাছাকাছি যারা আছে, ভোগ-পরিকল্পনায় তাদের ওপর দিকে আনতেই হবে। এই উদ্দেশ্যে বেকারত্ব এবং অর্ধ বা ছদ্ম বেকারত্বের ওপর সর্বমুখী আক্রমণ চালাতে হবে। বিপুল পরিমাণ বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব বর্তমান থাকলে দারিদ্র্য দূরীকরণ যে কোনমতেই সম্ভব নয়, তা সকল সময় স্মরণ রেখে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে অগ্রসর হতে হবে।

তারপর দ্রব্যমূল্য—বিশেষ করে অপরিহার্য দ্রব্যাদির মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করা অপরিহার্য। এর জন্যে প্রয়োজন ঐসব দ্রব্যাদির যোগান বৃদ্ধি করা। কিন্তু উপকরণ-পরিকল্পনা বা রিসোর্স প্ল্যানিং ছাড়া এই প্রচেষ্টায় সফল হওয়া কঠিন। অর্থাৎ সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যউৎপাদনকারী শিল্পগুলিকে পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এর অর্থ সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় নয় এমন সব শিল্পের প্রতি বিভেদাচরণ করা। বর্তমানে তাই করতে হবে। নচেৎ শ্রীলংকার (সিংহল) মত উপকরণ-সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য।

ভোগ-পরিকল্পনায় মজুরি সুদ মুনাফা সম্পর্কেও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন।

একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ :

ভোগ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে শিল্প-ব্যবস্থায় একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ-সাধন অবশ্যই প্রয়োজন। অন্তত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা বেসরকারী উদ্যোগের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকা পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'মনোপলি এনকোয়ারী কমিশন' এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশই দিয়েছে। এ-ব্যাপারে কিন্তু সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত বলে মনে হয়। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিলে যদি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস বা গুণগত অবনতি ঘটে, তবে ভোক্তার স্বার্থ সাধিত হওয়ার পরিবর্তে ব্যাহতই হবে। সুতরাং মতাদর্শ বা রাজনৈতিক প্রচারের বশীভূত না হয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচার করে এই ভাঙার কাজে নামতে হবে।

সামাজিক ভোগ :

পরিবারের ভোগ সমষ্টির ভোগের ওপরও নির্ভর করে। সমষ্টির বা সামাজিক ভোগের পণ্য হল স্কুল-কলেজ হাসপাতাল-ডিসপেনসারী রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির মত সমাজের যৌথ সম্পদ। বাজারে যথেষ্ট মাল কিনতে গেলেই হল না, এইসব যৌথ সম্পদ না থাকলে ভোগের ধারণাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমন, পাকা সড়ক না থাকলে মোটরগাড়ী রাখার কোন অর্থই হয় না। অতএব, ভোগ-পরিকল্পনায় মর্যাদা, দৃষ্টিআকর্ষণ, ইত্যাদির প্রশ্ন দূরে সরিয়ে রেখে সাধারণের জন্যে এই যৌথ সম্পদের ব্যবস্থা আগে করতে হবে। মোট কথা, লক্ষ্য রাখতে হবে, সাধারণ পরিবারের জন্যে কোন্ কোন্ জিনিস বেশী প্রয়োজনীয়। সাধারণ পরিবারের প্রয়োজন মিটলে তবেই সাধারণোত্তর পরিবারের কথা। পুনরুল্লেখের ঝুঁকি নিয়েও বলা যায়, আগে বাইসাইকেল, পরে পিপলস্ কার।

উপসংহার :

বর্তমানের গতিশীল সমাজে কোন নির্দেশ, কোন পরিকল্পনাই স্থায়িত্ব দাবি করতে পারে না। তাই ভোক্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে যাওয়া দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত দেশে এই গবেষণা ভোগ-পরিকল্পনার অংশ বলেই গণ্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এ ঠিক ভোগ-পরিকল্পনা নয়—বিক্রয়প্রসার পরিকল্পনা মাত্র। আমাদের দেশে কাজটা বিপরীত দিক দিয়ে শুরু করতে হবে : প্রথমে ভোক্তাদের রুচিবাঞ্ছা ইত্যাদির ভিত্তিতে কি কি পণ্য উৎপাদন প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করতে হবে। তারপর ঐসব পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শেষে ঐ পণ্য যাতে বাজারে পড়ে না থাকে তার জন্যেও প্রচারকার্য চালাতে হবে।

পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবশ্য শুধু ভোক্তাদের রুচিপছন্দের ওপর নির্ভর করলে চলবে না—স্বাস্থ্য শিক্ষা সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতি চিরন্তন মানকেও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে। যে বিশ্রী অনুকরণপ্রবণতা আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে বিদায় না করতে পারলে পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য—সামাজিক উৎকর্ষসাধন—ব্যর্থ হতে বাধ্য।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

দ্বারপাল ও মকরবাহিনী গঙ্গা

মৃৎপাত্র / নামাজগড়

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

পুণ্য জাহ্নবীর তীরে

সর্বপাপহারিণী গঙ্গা। সমতলে শত-মুখী প্রবাহে বিগলিত করুণা সিঞ্চনে উর্বরা করেছে উপবঙ্গ। বিকশিত করেছে জনপদবাসীর আধ্যাত্ম চেতনা। প্রেরণা ভক্তিমার্গে উন্নীত করেছে তাদের ধর্ম-চিন্তাকে। একদিকে অশান্ত প্রকৃতি, অন্যদিক এ উপমহাদেশের অন্যান্য বৈরী রাজশক্তি। উভয়ের সংঘর্ষে বঙ্গভূমির ইতিহাস এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের কাহিনী; কিন্তু এ প্রসঙ্গে সংগ্রামের মধ্যেও বঙ্গ নর-সমাজ সুপ্রাচীন কালে পত্তন করেছিল এক উন্নত নগর-সভ্যতা।

পুণ্য জাহ্নবীর সমতলে শতমুখী প্রবাহের অন্যতম ধারা আদিগঙ্গার তীরেও সে দূর অতীতে গড়ে উঠেছিল বিস্তৃত জনপদ, কর্মমুখর বন্দর ও অগণিত দেব-দেউল। বঙ্গবাসী স্বকীয় রীতি-মাধুর্যে সার্থক করে তুলেছিল আপন শিল্প-সাধিকে। আজিও আদিগঙ্গার মজাগর্ভের পাড়ে বোড়াল, মালঞ্চ, গোবিন্দপুর, আটিসারা, সূর্যপুর, দক্ষিণ বারাসত, সরিষাদহ, বহড়ু, মঞ্জিলপুর, জলঘাট, সরণী, ছত্রভোগ, খাড়ি প্রভৃতি অগণিত প্রাচীন বসতিগুলিতে ভূকর্ষণ, গৃহ-নির্মাণ, জলাশয় খনন ও সংস্কার কালে মাটির গভীরে সন্ধান মেলে মূল্যবান পুরা-বস্তুর। সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় আদিগঙ্গার মজাগর্ভের তীরে, জয়নগর থানা অঞ্চলে, আবিষ্কৃত হয়েছে এমনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল—সরবেড়িয়া ও নামাজ-গড়।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শহরতলী রেলপথের বারুইপুর জংশনের কাছে কাছারীবাজার বাস-স্টপ থেকে দক্ষিণে জয়নগর মজিল-পুরের পথে বাসে প্রায় ত্রিশ মিনিটের পথ সোজা সরবেড়িয়া। রেলপথে লক্ষ্মীকান্ত-পুর শাখার গোচারণ অথবা সম্প্রতি স্থাপিত হোগলা স্টেশন থেকেও সর-বেড়িয়ায় যাতায়াত করা যায়। বাস চলাচল পথের উপর, তসরআলা সরবেড়িয়া সনাতন বিদ্যালয়ের অদূরে ও মল্লিকঘাটী কালী-বাড়ীর প্রায় বিপরীত দিকে, তিন বৎসর পূর্বে, উনিশশ' উনআশির এপ্রিল-মে

যক্ষিণী/নামাজগড়

মাসে একজন স্থানীয় অধিবাসী ভূমি কর্ষণের সময়ে মাটির প্রায় এক মিটার গভীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রস্তরনির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরের কিছু মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করেন। এ আবিষ্কার সরবেড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাচীনত্বকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছে ও নিম্ন গাঙ্গেয় উপ-ত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ইতিহাসকে নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ করেছে।

সরবেড়িয়া, মল্লিকঘাটী প্রভৃতি অঞ্চলের পূর্ব সীমা দিয়ে এককালে আদিগঙ্গা প্রবাহিত ছিল। দীর্ঘ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আজও আদিগঙ্গার মজাগর্ভের চিহ্ন আছে। মজাগর্ভের বিস্তৃতি দেখে মনে হয়—নদী এককালে এখানে খুব প্রশস্ত ছিল। প্রাচীন নদী-খাত এখনও 'গঙ্গার বাদা' নামে সুপরিচিত। বাদার উর্বরা জমিতে চাষও মোটামুটি ভাল হয়। লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথটি অনেক ক্ষেত্রেই আদিগঙ্গার মজাখাতের উপর দিয়েই নির্মিত হয়েছিল। খৃঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক পর্যন্ত এ নদীপথে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করত। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এ-পথেই নীলাচলে যাত্রা করেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে এ-পুণ্য কাহিনীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভূমি কর্ষণের সময় মাটির গভীরে একটি বিশেষ স্তরে বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড, জীব-জন্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি কখনও কখনও পাওয়া যায়। এ ভূমিস্তরের নিম্নে অন্য আরেক স্তরে কিছু প্রাচীন মানব-সভ্যতার নিদর্শন, বিস্ময়কর কিছু পুরাবস্তু

সন্ধানও মিলেছে। তাতে মনে হয় নানা কারণে এ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসের পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এ অঞ্চল সম্প্রসারিত সুন্দরবনের কবলিত হয়। সরবেরিয়া-মল্লিঘাটী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাচীন মানব-বসতির ইতিহাস আজও প্রত্নতাত্ত্বিকদের খনন-সাপেক্ষ। তবুও বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে প্রাপ্ত কিছু কিছু নিদর্শনের পটভূমিকায় এ-বিষয়ে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করা যেতে পারে।

সরবেরিয়ায় আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তর মন্দিরের নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে কতগুলি বিভিন্ন আকৃতির নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, একটি কারুকার্যযুক্ত ও মূর্তি-ক্ষোদিত প্রস্তর-স্তম্ভ, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের একটি কীর্তিমুখ-শোভিত স্তম্ভশীর্ষ। নিদর্শনগুলি সবই উৎকৃষ্ট মিহিদানার বেলে পাথরের। বিভিন্ন আকৃতির প্রস্তরখণ্ডের সংখ্যা দশ-বারোটি। প্রস্তরখণ্ডের কতগুলি বর্গাকার ও কয়েকটি সমায়ত। প্রস্তরখণ্ডগুলির গায়ে নানা ধরনের 'খাঁজ' ও দু-একটির গায়ে খিলানের চিহ্ন আছে। এ প্রস্তরখণ্ডগুলি খুব সম্ভবত প্রাচীন মন্দিরের তলজঙ্ঘ ও কৌণিক পগের অংশ। ভূমি কর্ষণের সময় মাটির প্রায় এক মিটার গভীরে প্রস্তরখণ্ডগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কারুকার্য ও মূর্তিখোদিত প্রস্তর-স্তম্ভটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অসাধারণ। এটি প্রাচীন মন্দিরের দ্বার বাজুর অংশ বলে মনে হয়। প্রায় দেড় মিটার উচ্চ। চল্লিশ সেণ্টিমিটার প্রশস্ত ও পঁচিশ সেণ্টিমিটার ঘন দ্বার বাজুর প্রশস্ত অংশটিতে অলংকরণে ত্রিস্তর লম্ব প্রক্ষেপণ বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথম থেকে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্তর ভেদের ঘনত্ব যথাক্রমে এক ও দুই সেণ্টিমিটার। বামপার্শ্বের লম্ব প্রক্ষেপণ স্তরের ঊর্ধ্বাংশে জ্যামিতিক নৈপুণ্যে ক্ষোদিত কারুকার্য, মধ্যস্তরটির ঊর্ধ্বাংশে চারটি সম্পূর্ণ ও একটি অর্ধ-সমায়ত কক্ষে মূর্তি উৎকীর্ণ। মূর্তিগুলি দ্বি-পরিসরাকৃতি। প্রথম ও শেষ কক্ষের প্রতিটিতে যুগ্ম নর-নারী মূর্তি ও মধ্যের দুটিতে একক নরমূর্তি। এর ভিতর একটি মুদ্গরধারী। তৃতীয় স্তরের ঊর্ধ্বাংশে লতিকাসম্বৃত পুষ্পসজ্জা। প্রথম স্তরের নিম্নাংশে একটি সহাস্যবদন দ্বারপাল মূর্তি। মূর্তিটি বিশ্রামরত। দুটি করতাল দণ্ডশীর্ষে ও চিবুক করতলে স্থাপন করে দেহভার দণ্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের নিম্নাংশে একটি আভঙ্গ মকর-বাহিনী গঙ্গামূর্তি। মূর্তিটি বিচিত্র অলংকার-ভূষিতা। দেবী-মূর্তিটি একটি ক্ষুদ্রাকৃতি রেখ দেউলের নকসার মধ্যে উৎকীর্ণ। নকসা-মন্দিরটির গণ্ডী ধাপে ধাপে উঠেছে বলে এটি ভদ্র বা পীড়া দেউলের লক্ষণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শীর্ষে বেঁকী, আমলক ও কলসের চিহ্ন এ ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করে। দ্বার বাজুতে উৎকীর্ণ মন্দিরের এ নকসাটি মূল মন্দিরের 'প্রোটোটাইপ' হওয়াও বিচিত্র নয়। মূর্তি-ক্ষোদিত কারুকার্যযুক্ত দ্বার বাজুটি নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পমানের নিদর্শন। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি অনেকে গুপ্তযুগে নির্মিত বলে অনুমান করেন। বর্তমানে এ অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি স্থানীয় এক অধিবাসীর গৃহের আঙিনায় অবহেলিত ও অরক্ষিত অবস্থায় আছে।

সরবেরিয়ার এ ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের কাছে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি জলাশয় আছে। গ্রীষ্মকালে এ পঙ্কিল জলাশয়ের জল প্রায় শুকিয়ে গেলে খুব প্রাচীন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ ও প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। ইঁটগুলি বৃহদাকৃতির। অনেকটা মৌর্য যুগের ইঁটের মতন। জলাশয়ের তলদেশে প্রচুর প্রস্তরখণ্ড আছে বলে স্থানীয় লোকেরা এর নামাকরণ করেছেন 'পাথর-কুচি পুকুর'। প্রায় ৬০-৬৫ বৎসর আগে এ জলাশয়ের গর্ভ থেকে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের বৃহদাকৃতির দেববিগ্রহের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে সেটি প্রত্নস্থলটির পূর্বে মল্লিঘাটী কালীবাড়ীতে কালীমাতা-রূপে পূজিতা। বিগ্রহের ভগ্নাংশে পরবর্তীকালে ধাতুনির্মিত চক্ষু, জিহ্বা ইত্যাদি সংযুক্ত হয়েছে। ভগ্ন মূর্তিটি দর্শনে মনে হয় এটি বিষ্ণু বিগ্রহের কটিদেশের নিম্নাংশ। মূর্তিটির দুই পার্শ্বে বিষ্ণু সহচরী-যুগল শ্রী ও পুষ্টির ভগ্নাংশের চিহ্ন আছে বলে মনে হয়। মল্লিঘাটী কালীবাড়ীর এ তথাকথিত দেবীবিগ্রহ নিয়ে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। দেবীবিগ্রহ নাকি দিনে দিনে তিলে তিলে বৃদ্ধি লাভ করে চলেছেন। মৃত্তিকা-গহ্বরে মূর্তির অন্ত নাকি পাওয়া যায়নি। দুর্ধর্ষ এক ডাকাত, বাদল ডাকাত, তার এক রোমাঞ্চকর কাহিনী এ দেবীবিগ্রহের সঙ্গে জড়িত বলে লোক-কাহিনী আছে। কালীমাতার বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ এখনও সমাপ্ত হয়নি। সরবেরিয়া ও মল্লিঘাটী অঞ্চলের জনগণের মানৎ বা বার্ষিকী, সকল প্রকার কালী-পূজাই এ-মন্দিরে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। অন্যত্র পৃথক পূজার ব্যবস্থা করার রীতি নেই। কালীমন্দিরে বছরে দুটি মেলায় বেশ জনসমাগম হয়। একটি চৈত্র-সংক্রান্তির ও অন্যটি রামনবমীর মেলা।

আলোচিত পুরাবস্তুগুলি ছাড়াও সরবেরিয়া, মল্লিঘাটী অঞ্চলে দীর্ঘকাল কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান করে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কুষাণযুগের মুদ্রার অনুরূপ দু-একটি মুদ্রা, সুঙ্গ যুগের টেরাকোটা হস্তি, প্রাচীন পাত্রের ভগ্নাংশ ও একটি টেরাকোটা ক্ষুদ্রাকৃতির ধনুর্ধর রাজপুরুষের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ শীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় চূড়ামণি পুকুরে এককালে অনেকগুলি প্রাচীন স্বর্ণালংকার আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। একজন বৃদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এগুলি নাকি প্রাচীন দেববিগ্রহের অলংকার ছিল।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে নিম্নবঙ্গের অন্যান্য স্থানের ইতিবৃত্তের মত সরবেরিয়া অঞ্চলেও যে মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে প্রথম জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে উভয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু উদার ধর্মপ্রচারকদের বিচক্ষণতায় এক অভূতপূর্ব সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটে। সরবেরিয়া-মল্লিঘাটীর বৃহৎ বটবৃক্ষের নিচে গাজিতলার দালানে পীর গোরাচাঁদের থান আজও হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বছরে একবার গাজিতলায় বিরাট মেলা বসে। স্থানীয় বাসিন্দারা একে বলেন 'মোল্লাদের মেলা'। মেলায় গোরাচাঁদের থানে সিন্নি দেয়া হয়। উভয় সম্প্রদায়ই এ সিন্নি দিয়ে থাকেন। গাজিতলার একটু উত্তরে বাস-রাস্তার পশ্চিমে ছোট দরদালানে মনসা, শীতলা ও পঞ্চাননের থান। এখানে অনেকে মানৎ করেন, ঢেলা বাঁধেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে সরবেরিয়া-মল্লিঘাটী অপেক্ষা নিকটবর্তী জাঙ্গালিয়া-নামাজগড়ের গুরুত্ব অধিকতর বলে মনে হয়। আদিগঙ্গার মজাগর্ভের পশ্চিম তীরে সরবেরিয়া ও মল্লিঘাটী। জাঙ্গালিয়া-নামাজগড় এ মজাগর্ভের পূর্বতীরে প্রায় সরবেরিয়ার বিপরীত দিকে

প্রস্তর ভাস্কর্য/সরবেরিয়া

অবস্থিত। মজাগর্ভের উপর দিয়ে সরবেরিয়া ও নামাজগড়ের সরাসরি দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার হলেও, সরবেরিয়ার উত্তরে খোলিয়াচণ্ডীর মোড় থেকে পূর্বদিকে রেলপথ অতিক্রম করে বেণীপুর বাজারের বাস চলাচল পথে ঠাকুর্দার হাট, প্রাচীন শ্মশান, ভগ্নপ্রাপ্ত দেউলসমূহ অতিক্রম করে, সাধারণের চলাচল পথে, জাঙ্গালিয়া-নামাজগড়ের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার।

আদিগঙ্গার মজাগর্ভের পূর্বতীর ধরে নদীর সমান্তরাল পথে জাঙ্গালিয়া-নামাজগড় যেতে পথে মাটি ধ্বসে পড়ায় বিক্ষিপ্ত অসংখ্য খোলাকুচি সহজেই পুরাবস্তু অনুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ পথের দুধারে মাঝে মাঝে নাতি-উচ্চ ঢিবি। ঢিবিগুলির উপর কোথায় শ্মশান বা গোরস্থান। দু-একটি ঢিবির মধ্যে জলাশয়ও আছে। কিছু কিছু উঁচু ডাঙায় এখন চাষাবাদ শুরু হয়েছে। কোথাও আবার গঙ্গার মজাগর্ভের পাড়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু ডাঙায় অতি প্রাচীন ও বৃহৎ বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষও নজরে পড়ে।

এ অঞ্চলের ঢিবিগুলির মধ্যে নামাজগড়ের ঢিবিটিই প্রধান। নামাজগড়ের ঢিবির দক্ষিণাংশে মাটির দেয়াল ও খোলার ছাউনী বেশ লম্বা দালানে অধুনা একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢিবির অন্যদিকে মাদ্রাসার বিপরীত অংশে, এনায়েৎউল্লা কাজি পীরের কবর। কাজি পীরের জীবন নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাজি একবার অলৌকিক শক্তিবলে বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। কাজির ক্ষমতায় বিস্মিত হয়ে জায়গীরদার কাজিকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। ঢিবিটির পশ্চিম দিকে প্রায় গঙ্গার মজাগর্ভের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র, পঙ্কিল একটি জলাশয়। স্থানীয় লোকে জলাশয়ের নামাকরণ করেছে নামাজগড়ের 'চৌকো'। বেশ কয়েক বছর আগে চৈত্র মাসে চৌকোর জল শুকিয়ে গেলে মাটি কাটার সময় চৌকো থেকে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের অতি সুন্দর দেবীবিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঢিবির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বস্তু হল বিশালাকৃতি প্রাচীন বটবৃক্ষটি। বটবৃক্ষটির কাণ্ডের চারপাশে কঠিন বাকল ভেদ করে কতগুলি বিলম্বিত চিহ্ন বা গভীর দাগ দেখা যায়। এ গভীর বৃত্তাকার চিহ্নগুলি খুব সম্ভবত এককালে আদিগঙ্গা জলপথে যাতায়াতকারী সমুদ্রগামী জাহাজের শিকল বা কাছির দাগ। এ জাতীয় বৃহৎ বৃক্ষের গায়ে শিকল বা কাছি দিয়ে তৎকালীন দাঁড়টানা ও পালের জাহাজগুলি বেঁধে রাখা হত।

বিভিন্ন সময়ে নামাজগড়ের ঢিবি ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ঢিবি থেকে যে সব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই অসাধারণ। এমন দু একটি পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে বিজ্ঞানভিত্তিক খননকার্য পরিচালনা করলে হয়ত নামাজগড় একদিন বঙ্গভূমির প্রথম সারির প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে স্থান লাভ করবে।

জাঙ্গালিয়া-নামাজগড়ের অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি মধ্যে রয়েছে কতগুলি টেরাকোটা মূর্তি পুতুল, প্রচুর বিচিত্র রূপ ও বর্ণের খোলাকুচি ও টেরাকোটা পাত্র, কয়েকটি শীল ও শীলমোহর ও কয়েকটি প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শন। টেরাকোটা মূর্তি পুতুলগুলির মধ্যে কয়েকটি যক্ষিনী মূর্তি। হস্তিমোটিফযুক্ত ক্রীড়নক, ক্ষুদ্র টেরাকোটা ফলকে পদ্মশোভিত হস্তি, লম্ফমান বানর ও বিশাল শৃঙ্গযুক্ত হরিণের প্রতিকৃতিগুলি খুবই সুন্দর। একটি যক্ষিনী দেহের সূক্ষ্ম কারুকার্য দর্শক নয়নকে মুগ্ধ করে। পাত্রগুলির মধ্যে কতগুলি ধূসর বর্ণ পাত্র পাওয়া গেছে যেগুলি রোমান পাত্রসদৃশ। ঢিবিতে কতগুলি মিনাকরা পাত্রের ভগ্নাংশও পাওয়া গেছে। শীল ও শীলমোহরগুলির মধ্যে নর-নারী প্রতিকৃতি ও দু একটির মধ্যে প্রাক-বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ শীলমোহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। বর্তুলাকার রক্তাভ টেরাকোটা এ শীলমোহরটির একদিকে দণ্ডায়মান একটি মনুষ্য প্রতিকৃতি ও অপর দিকে খুব অস্পষ্ট কয়েকটি অক্ষর। অক্ষরগুলি চিত্রলিপি বলে একজন পুরাতাত্ত্বিক মত দিয়েছেন। প্রস্তর ভাস্কর্যের মধ্যে একটি প্রায় অভঙ্গ বীণাপাণি মূর্তি, বিষ্ণুমূর্তির অপূর্ব কারুকার্যযুক্ত পাদপীঠ ও একটি ভগ্ন কার্তিকেয় মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

লম্ফমান বানর/টেরাকোটা ফলক

নামাজগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা আজও বিশেষ প্রচার লাভ করেনি। তবে এ অঞ্চলের অবস্থান, ভূমিস্তরের বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলি স্থানটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। এখানে অনুসন্ধানকালে কিছু অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ ঢিবিগুলিতেই শ্মশান, গোরস্থান, ভগ্ন দেউল বা পীরের আস্তানা আছে। অনুসন্ধানকারীকে সব সময় সচেতন থাকতে হয় যাতে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে বা সংস্কারে কখনও অহেতুক আঘাত না লাগে।

আদিগঙ্গার মজাগর্ভের পাড়ে মাটির গভীরে আত্মগোপন করে আছে বঙ্গভূমির অতীত ইতিহাসের অনেক নীরব স্বাক্ষর। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য দেবদেউল। প্রাকৃতিক আর ধর্মসংস্কৃতিনাশক বিপ্লবে আজ সবই নিশ্চিহ্ন। এ অঞ্চলে বিজ্ঞানভিত্তিক খননকার্য বা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কিছুই প্রায় হয়নি বলা চলে। বিভিন্ন সময়ে চাষাবাদ, গৃহনির্মাণ, জলাশয় খনন বা সংস্কারের কালে যে সকল মূল্যবান পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে তাও অবহেলায় বিনষ্ট বা অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপে বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু গবেষক বা বঙ্গসংস্কৃতিদরদী এ সকল পুরাবস্তু সংগ্রহ ও রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁদের এ প্রয়াসও সীমাবদ্ধ। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় জাতির অতীত ইতিহাসের এ অমূল্য নিদর্শনগুলি বা পূর্বপুরুষদের পূত স্মৃতিবিজড়িত এ চিহ্নগুলি রক্ষার দায়িত্ব কার!

(আলোকচিত্র : নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা ইতিহাস অনুসন্ধান প্রকল্পের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য কর্তৃক গৃহীত)

॥ ৬ ॥

শেষ রাতে আমি একবার উঠেছিলাম। ঐ পাশের বাথরুমে গেছিলাম।

ছুটির ঘর থেকে সাড়াশব্দ পেলাম না। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে শেষ রাতে। আবার গিয়ে যে শুলাম, সে ঘুম ভাঙল ছটার সময়।

বালিশের নীচ থেকে হাতঘড়িটা বের করে সময় দেখলাম, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

এখনো বেশ ঠান্ডা। পুবের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু রোদ ওঠেনি। চতুর্দিক শিশিরে সাদা হয়ে রয়েছে।

বাবুর্চিখানার দিকে দরজা খুলতেই লালি আর হাসান সেলাম জানাল। একটু গরম জল চেয়ে নিয়ে খাওয়ার ঘরের বেসিনেই দাঁত মেজে নিলাম, মুখ ধুলাম।

ততক্ষণে হানিফ এসে গেছে। মেটে ও মাংস নিয়ে।

বাইরে রোদে চা দিতে বলে, ছুটিকে ডাকলাম।

একবার ডাকতেই ছুটি সাড়া দিল।

বললাম, কি? তুমি জেগে জেগে শুয়ে কার স্বপ্ন দেখছ?

ও বলল, আপনাকে তা বলব কেন?

বললাম, তোমার চা পাঠিয়ে দেব ঘরে লালিকে দিয়ে? না, উঠে চা খাবে?

ছুটি বলল, মুখ ধুয়ে চা খাব।

বললাম, তোমার বাথরুমের পেছনের দরজাটা খুলে দাও, লালি গরম জল এনে দিচ্ছে। এই ঠান্ডা জল মুখে লাগিও না, তাহলে সুন্দর মুখটার চেহারা ম্যাকক্লাস্কি-গঞ্জের রিলিফ ম্যাপের মত হয়ে যাবে।

লালিকে জল দিতে বলে, আমি বাইরে গিয়ে প্রথম রোদে পাইচারী করতে লাগলাম।

রাস্তা ছেড়ে এখনো বাগানে নামা যায় না—সব ভিজে সপসপ করছে। গোলাপগুলোর পাপড়িতে শিশির পড়ে ঠান্ডায় জমে গিয়ে হীরের মত দেখাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে পাখি ডাকছে—। তিতিরের গলা সবচেয়ে জোর শোনা যাচ্ছে।

একটু পরে, কাল রাতের শাড়ি পরেই ছুটি এল।

দরজা দিয়ে বাইরে পা দিয়েই চোখ বড় বড় করে বলল, সুকুদা—কী-ই ভাল জায়গা—দারুণ সুন্দর। ঈস্‌স্ ক—ত গাছ। সত্যি বলছি, আমার এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে সারা জীবন।

আমি হেসে বললাম, থাকো না, কে তোমাকে মানা করেছে। বল, পছন্দ হয়ত এ রকম একটা বাড়ি তোমাকে কিনেই দিই। এ রকম বাড়ি তোমাকে আমি কিনে দিতে পারব। এখানে বাড়ির দাম খুব সস্তা।

ছুটি চা ঢালতে ঢালতে বললো, ও সবে আমার দরকার নেই। এই সব পার্থিব জিনিস আমার ভাল লাগে না।

—কি ভাল লাগে তাহলে? চেয়ার টেনে ওর সামনে বসতে বসতে বললাম আমি।

ও বলল, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন, যতটুকু দিয়েছেন, তা যেন আমার চিরদিন থাকে। ও ছাড়া আর বেশী কিছু চাইবার নেই আমার।

—আমি মুখ তুলে ছুটির দিকে চাইলাম।

ছুটি মুখ নামিয়ে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

আমি বললাম, এ সব কথা থাক। কেমন ঘুম হল বল?

দারুণ। এক ঘুমে রাত পোয়ালো। তারপরই বলল, এখন আমরা কি করব?

এখন, মানে একটু পরে, আরেককাপ চা খেয়ে চান সেরে নাও। তারপর পেয়ারা-তলায় বসে ব্রেকফাস্ট খাও। নাস্তার পরে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। চলো, পাকদন্ডীর পথে তোমাকে স্টেশানে নিয়ে যাব। এখানের স্টেশান দেখবে, কি সুন্দর।

—ওমা, এখানে রেল স্টেশানও আছে না কি?

—নিশ্চয়ই। স্টেশান নেই?

—কোলকাতা থেকে সোজা আসা যায়?

—হ্যাঁ, আসা যায় বইকী।

—কি মজা। দেখি যদি স্টেশানটা পছন্দ হয়, তবে যখন কোলকাতায় যাব পরের মাসে, তখন কোলকাতা থেকে সোজা আপনার এখানে চলে আসব।

আমি বললাম, তা এস, কিন্তু বাড়িতে হেঁটে আসতে হবে। কোনোরকম ট্রানসপোর্ট নেই।

এক জোড়া ঘুঘু ফলসাগাছ থেকে উড়ে এসে ভিজে মাঠে বসল। কি যেন খুঁটে খুঁটে খেল, তারপর উড়ে গেল।

ছুটি পাশের শাল সেগুনের জঙ্গলের দিকে চেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আনমনে ভাবল অনেকক্ষণ, নিজের মনে নীচের ঠোঁটটা অনবধানে কামড়ে ধরল, তারপর বলল, তাহলে আমি চান করেই নিই। আপনি কি অন্য বাথরুমে যাবেন, না আমার চান হয়ে গেলে এ বাথরুমে?

আমার এত সকালে চান করা ঠিক হবে না। তুমি চান করে নাও, তারপর ঐ বাথরুমেই চান করে নেব। আমার সাজ-সরঞ্জাম সব ও বাথরুমেই আছে।

ছুটি যখন চান করতে গেল, আমি তখন লালিকে দিয়ে বাইরের ঘরের বেতের টেবলটা পেয়ারাতলায় বের করিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবল হিসাবে পাতলাম। একটা সবুজ সাদা চেক-চেক টেবল ক্লথ পাতলাম। এ জায়গাটা দুদিন আগে গোবর দিয়ে নিকোনো হয়েছে—পরিষ্কার দেখাচ্ছে জায়গাটা। পেয়ারা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সাদা বেতের টেবল চেয়ারে রোদ এসে পড়েছে। রোদে পিঠ দিয়ে বসতে ভারী আরাম লাগে। এখানে রোজ ব্রেকফাস্টের সময়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে মনে হয় পৃথিবীর যত শান্তি সব বুঝি এইখানে এসে বাসা বেঁধেছে। গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ নেই, টেলিফোন নেই, ইচ্ছা করলেই যে কেউ

শান্তি নষ্ট করবে, তারও কোনো উপায় নেই। যে শান্তি ভঙ্গ করতে আসবে, তাকেও বহুদূর থেকে পায়ে হেঁটেই আসতে হবে।

একটু পরেই ছুটি চান করে বাইরে এল।

একটা সাদা খোলের লাল ও কালো পাড়ের পাছা-পেড়ে তাঁতের শাড়ি পরেছে—লাল টিপ পরেছে বড় করে মাথায়। চুল খুলে এসেছে রোদে শুকোবে বলে। কী ভালো যে লাগছে ছুটিকে, কি বলব।

ছুটি বলল, সুকুদা, খুব আরাম করে চান করলাম।

ছুটি এসে আমার সামনে বসল। ওর চুল, ওর চোখ, ওর নাক, কান, ওর দাঁত, ওর হাতের আঙুল, ওর পায়ের পাতা সব কিছুর মধ্যে এমন একটা পরিচ্ছন্ন দীপ্তি যে ও যখনি চান করে ওঠে তখনি ওর দিকে অপলকে আমার চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ চোখ তুলে ছুটি বলল, কি দেখছেন?

—তোমাকে।

—এতদিনেও কি দেখা শেষ হয়নি আপনার? বোঝা শেষ হয়নি? এখনো কি কোনো সন্দেহ আছে?

—জানি না।

—তবে এমন করে দেখছেন কেন?

আমি বললাম, কথা বোলো না, জানো, এই সকালের পাখি ডাকা, শিশির-ভেজা নরম প্রকৃতির পটভূমিতে তোমার এই সবে-চান-করে-ওঠা নরম শরীর কেমন অদ্ভুত মানিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুমিও বুঝি এই পরিবেশেরই একটি আঙ্গিক। একটুও নড়ো না কিন্তু—তোমাকে দেখতে দাও আমাকে ভাল করে—।

কতক্ষণ যে ওখানে বসেছিলাম জানি না।

এক সময় ছুটি বলল, এখন রোদ বেশ গরম হয়েছে, এবারে আপনি চান করতে পারেন। গরম জল দিতে বলব আমি?

—তুমি এখানে চুপ করে বসোত দশ মিনিট। আমি চান করে দাড়ি কামিয়ে আসছি।

—আপনি কখন দাড়ি কামান?

—সকালে। কেন বলত? হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—আমার......এখনো জ্বালা করছে। বলেই, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দুষ্টমীর হাসি হাসল।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, ঠিক আছে, আজ সকাল, দুপুর, রাত্তির তিন বেলা দাড়ি কামাব।

ছুটি বাচ্চা মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠল। বলল, এ মা! আমি কি তাই বলেছি। আপনি ভীষণ খারাপ।

বাথরুমে আমি দাড়ি কামাচ্ছিলাম, এমন সময় লালি পেছনের দরজা ধাক্কা দিল গরম জল দেবার জন্যে। গরম জলের বালতিটা দিয়ে লালি বলল, মেমসাহেবকা কোই কাপড়া হ্যায় অন্দর? ধুপমে দেনেকা লিয়ে? ওকে বললাম, নেই। পরক্ষণেই আমার চোখ পড়ল, বাথরুমের র‍্যাকে। একটি ভিজে ব্রা লেস-লাগানো সাদা নাইলনের প্যান্টি এবং সরু কোমরের একটি সায়া ঝুলছে র‍্যাকে।

লালিকে বললাম, নিয়ে যাও এসে।

সমস্ত বাথরুমটা ছুটির শরীরের সুগন্ধে ভরে আছে। আসলে গন্ধটা ওর সাবানের। সমস্ত বাথরুমটা গন্ধে ম ম করছে। সেই সুগন্ধি দরজা জানালা বন্ধ করা ঘরে গরম জলে চান করতে করতে ছুটির শরীরের কথা ভেবে আমার সমস্ত শীত চলে গেল। আমার সমস্ত শরীর এই দারুণ হিমেল সকালে এক আশ্চর্য উষ্ণতায় ভরে গেল।

যে শরীরকে আমি ভালবাসি, যে নূপুরের মত নাভিকে আমি কল্পনায় দেখেছি বহুবার, যে মসৃণ রোমশ উষ্ণ কাঠবিড়ালিকে আমার স্বপ্নের মধ্যে আমি বহুবার হাত ছুঁইয়েছি, যে সমর্পণী বুকে আমি বহুবার আমার মাথা এলিয়ে এই দ্বিধা-বিভক্ত জীবনের সব ক্লান্তি অপনোদন করেছি, তারা কল্পনার সব এই সকালে সত্যি হয়ে উঠল। আমার আর একটুও শীত রইল না।

ছুটি ঠিকই বলে, ডাক্তারেরা শুধু শরীরের চিকিৎসা করে, তারা মনের চিকিৎসা জানে না।

ব্রেকফাস্টের পর ছুটিকে নিয়ে বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বললাম, ওই শাড়ি পরে এমন সুঁড়ি পথে যেতে পারবে?

ছুটি লাল আর কালো ফুল-তোলা কার্ডিগানটার বোতাম বন্ধ করতে করতে বলল, একজন রোগী মানুষ যদি পারে, তাহলে একজন সুস্থ মানুষী নিশ্চয়ই পারবে।

গেটের পেছনেই নালাটা। জল যাচ্ছে তিরতির করে। পাথরের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে গাড্ হাতে জল জমে আছে। কুদে কুদে মাছগুলো তিড়িংবিড়িং করছে। চতুর্দিকে সেই হলুদ জংলী ফুলগুলো ফুটেছে। ওদের ফিনফিনে পাপড়িতে সকালের রোদ লেগেছে।

উপরে এখন এক-আকাশ ঝকঝকে রোদ্দুর। পাখিদের চিকন গলা রোদে পিছলে যাচ্ছে।

ঘন পিটিসের ঝোপের মধ্যে দিয়ে খোয়াই-এর লাল পথ উঠে গেছে পেছনের মালভূমির মত টাঁড়ে। পিটিসের ফুলগুলো কমলা-রঙা, কতগুলো আছে লাল। কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ওদের ফুলে।

চড়াইটা উঠেই ছুটি এক দৌড়ে মালভূমিতে পৌঁছে গেল—পৌঁছে গিয়ে মাথা উঁচু করে নিঃশ্বাস নিল—বলল, আঃ।

আমি গিয়ে পৌঁছতেই আমার বাহুতে হাত জড়িয়ে বলল, আপনি যদি আমাকে মেরে তাড়িয়েও দেন, আমি এখান থেকে যাবো না। বলে, সামনের টাঁড়ের দিকে চেয়ে রইল।

সুদূরবিস্তৃত মাঠ—মাঝে মাঝে পিটিস ঝোপ, কুঁচফলের গাছ, হলুদরঙা গোল গোল ফলের ঝোপ (আমি এদের নাম দিয়েছি জাফরানী), মাঝে মাঝে মহুয়া গাছ। বাঁ দিকে নাকটা পাহাড়, কঙ্কা বস্তীর রাস্তা—সামনে দূরে কয়েক ঘর ওরাঁও-এর গ্রাম—আর যতদূর চোখ যায় শুধু হলুদ আর হলুদ। সর্ষে আর সরগুজা লাগিয়েছে ওরা। উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ, নীচে সবুজের আঁচলঘেরা এই হলুদ স্বপ্নভূমি।

ছুটি কথা না বলে তেমনি করে দাঁড়িয়েই রইল।

আমি বললাম, কি? এগোবে না?
ও তবুও কথা বলল না।

আমি ডাকলাম ছুটি, ও ছুটি।

ছুটি আমার দিকে মুখ ফেরাল, দেখলাম ওর দু' চোখে দু' ফোঁটা জল টলটল করছে।

আমি আকাশকে সাক্ষী রেখে ওর দু' চোখের পাতায় চুমু খেলাম।

ছুটি বলল, সুকুদা, বহুদিন পরে আজ আনন্দে আমার চোখে জল এল। সেই যেবার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছিলাম সেদিন আনন্দে কেঁদেছিলাম—মনে আছে, বাবা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন—আমাকে শূন্যে তুলে বলতে লাগলেন, আই এ্যাম সো প্রাউড, আই এ্যাম সো প্রাউড অব উ্য। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

ছুটির চোখে আবার জল দেখলাম।

বললাম, একি, এ আবার কি? আবার কেন?

জল-ভরা চোখে ছুটি হেসে ফেলল, মিষ্টি হাসি। বলল, বাবার কথা মনে পড়ে গেল, তাই। তারপর বলল, জানেন সুকুদা, আপনি যখন আমাকে আদর করেন, তখন কেন যেন আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। বাবা চলে যাওয়ার পর, আপনার মত করে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি।

আমি ওর কোমরে হাত রেখে বললাম, ছুটি, চলো আমরা এগোই—এরপর ফিরে আসতে কষ্ট হবে, রোদ দেখতে দেখতে কড়া হয়ে যাবে।

ছুটি বলল, এক সেকেন্ড দাঁড়ান, প্লিজ, আমি একটু কুঁচফল তুলে নিয়ে আসি, বলেই দৌড়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে তোড়া শুদ্ধ শুকনো কুঁচফল তুলে আনল। বলল, কী দারুণ—না?

তারপর লাল কালো কুঁচফলগুলোকে তোড়াশুদ্ধই নিজের হাত-ব্যাগে পুরে ফেলল।

আমরা যখন শর্ষে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে মাঠ পেরুচ্ছি, তখন হঠাৎ ছুটি বলে উঠল, 'সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।'

—মনে আছে?

—আমি বললাম, আছে।

তারপরই আমাকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, কি হল, আপনি একেবারে চুপ করে আছেন যে?

বললাম, খুব ভালো লাগছে, তাই।
কেন? ভালো লাগছে কেন? টেনে টেনে আন্তরিকতার সঙ্গে ছুটি শুধোল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে বললাম, কেন ভাল লাগছে, তুমি জানো না? কতদিন স্বপ্ন দেখেছি, বিশ্বাস করো, কতদিন স্বপ্ন দেখেছি অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে, যে একটু ভাল হয়ে উঠলে তোমার সঙ্গে এই হলুদে মাঠ পেরোব—ভেবেছি তুমি সঙ্গে থাকলে, তুমি কাছে থাকলে তোমার হাত ধরে একবারের জন্যে এই আকাশভরা আলোয় এই হলুদ মাঠ পেরোতে পারলে আমি চিরদিনের মত ভালো হয়ে যাব আর কখনো কোনো অসুস্থতা আমাকে পীড়িত করবে না।

ছুটি সামনে সামনে যাচ্ছিল, থেমে পড়ে আমার পাশে এল, বলল, দেখবেন, সত্যিই আপনি একেবারে ভাল হয়ে যাবেন। আপনি দেখবেন।

দেখতে দেখতে আমরা সেই সাদা পোড়ো বাড়িটার কাছে এলাম। জর্জ ওর ছেলেকে নিয়ে পথের পাশে মহুয়া গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে ছিল।

জর্জ আমাকে উইশ করল।

আমি শুধোলাম, কি জর্জ? ভূতের উপদ্রব কমেছে, না রাতে এখন এখানেই শুচ্ছ।

ও বলল, না। রাতের বেলা স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে প্যাট প্লাসকিনের কাছে গিয়ে শুই।

একটু এগিয়ে যেতেই ছুটি শুধোলো, কি বলছিলেন, ভূত ভূত?

আমি বললাম, এরা বলে এ বাড়িতে রাতের বেলা নানারকম আওয়াজ শোনা যায়। এই যে ছেলেটি দেখছ এর নাম জর্জ—জর্জ ব্যানার্জি। এ কাজ করত এখানেরই একটি কলিয়ারীতে—তারপর সেখানের এক রেজা কুলিকে বিয়ে করে। বাচ্চাটি জর্জের ছেলে।

—কেন এরকম করল? ছুটি শুধোল।

—ভাল লেগে গেছিল। কাউকে যদি কারো ভালো লেগে যায় ত কি করবে বল? তবে এই বিয়ের জন্যে বেচারাকে যা মূল্য দিতে হয়েছে তা ঐ জানে। রেজাকে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে নাকি চাকরি গেছিল। তারপর চাকরি যাওয়াতেও সব শেষ হয়নি, সমাজ আরো যতরকম প্রতিশোধ নিতে পারে ওর উপর নিয়েছিল।

জর্জ এখন যে-কোনো কাজ করে—টাকা পেলেই হল। কিছুদিন আগে এখানের একটা বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক খারাপ হয়ে যায়, এখানের একমাত্র জমাদার অনেক টাকা চেয়েছিল—যেহেতু সে একমাত্র জমাদার। জর্জ মাত্র ত্রিশ টাকার বিনিময়ে নীচে নেমে বালতি করে সেই ময়লার ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করেছিল।

ইসস, কি দুর্দশা! ছুটি বলল।

বললাম, দুর্দশা বল আর যাইই বল, এ কথা জানার পর ছেলেটার উপরে আমার ভক্তি হল। দোষের কি বল? ভিক্ষাও চায় না, কারো কাছে মাথাও নোওয়ায় না, যা করেছে, ভুল বা ঠিক তা করেছেই, সমাজের ভয়ে, সুখে থাকার বিনিময়ে, নিজের সিদ্ধান্তকে পরমুহূর্তে বাতিল করেনি। তুমি জানো না, গরমের দিনে অনেক সময় জর্জ শুধু পাকা মহুয়া খেয়ে থেকেছে।

জন্যেও, সিনিয়র কেম্ব্রিজ অবধি পড়েছে ও।

আপনি ওর জন্যে কিছু করেন না?

করি, আমি বললাম, আমার সাধ্যমত। আমি এসেই ওকে টুকটাক কাজ দিয়েছি—খেতে বলি আমার সঙ্গে। এতে কতখানি উপকার হয় জানি না ওর, তবে একটা মস্ত উপকার হয় এই যে ও বুঝতে পারে ওকে সকলেই খরচার খাতায় লেখেনি। সমাজে হয়ত কিছু লোক আছে যারা ওর এই সৎসাহসের প্রশংসা করে। কিছু লোকের মনে এখনো ওর জন্যে সহানুভূতি আছে।

ওর স্ত্রী কেমন দেখতে? খুব সুন্দরী বুঝি?

সুন্দরী কিছু নয়, সাধারণ বেঙ্গা মেয়েরা যেমন হয়। একদিন আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। তবে, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

জানো, জর্জ একদিন দুঃখ করে আমাকে বলেছিল, একমাত্র পাদ্রী সাহেব ছাড়া আর কেউ তোমার মত আমাকে সাপোর্ট করেনি। এমনি দুঃখ কষ্ট যা পাবার সেত আমাকেই পেতে হয়েছে, মানে, আমাদের; কিন্তু ওকে ছেড়ে দেওয়ার সহজ পন্থা যে সকলে বাৎলেছেন, তা সহজ হলেও যে সৎ নয়, এ কথা কেউই বলেনি। ও বলেছিল পাদ্রী সাহেব একদিন ওকে বলেছিলেন, যে, ঈফ ই আর এ গুড ক্রিশ্চয়ান, উ শ্যাল নেভার ফোরসেক হার। এন্ড উ সী আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বী আ গুড ক্রিশ্চয়ান।'

ছুটি বলল, বাঃ। এত কষ্ট পাচ্ছে, তবু মেয়েটাকে ছাড়েনি না? তারপর বলল, এখানে দেখছি, দারুণ দারুণ সব ক্যারেক্টার আছে। খুব ইন্টারেস্টিং। আপনি যদি এ জায়গা নিয়ে লেখেন তবে চরিত্রের অভাব হবে না, কি বলেন?

আমি হাসলাম। বললাম, সে কথা কিন্তু সত্যি। এমন পরিবেশ এবং এমন বিচিত্র লোকজন, এদের নিয়ে লিখলে লেখা হয়ত কখনো ফুরাবে না।

দেখতে দেখতে আমরা লাল পোঁচরে চড়াইটা উঠে দীপচাঁদের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে স্টেশনের রাস্তায় পড়লাম।

পোস্টাফিসের গা ঘেঁষে, মুন্সারামের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

ছোট্ট স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম উঁচু নয়। মাটিতেই প্ল্যাটফর্ম। ওপারে ঘন শালবন। আউটার সিগন্যাল জঙ্গলের মধ্যেই। দু'একজন পেয়ারাওয়ালা, আতাওয়ালা বসে আছে সওদা নিয়ে, পানি-পাঁড়ে ট্রেন আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। স্টেশনের এক পাশে কার্নি মেমসাহেবের চা-এর দোকান।

স্টেশন মাস্টারমশাইর ঘরে জোর আড্ডা বসেছে। মাস্টারমশাই, এ, এস, এম, গাঙ্গুলীবাবু, সাহা বাবু, পোদ্দারবাবু, শৈলেন ঘোষ সকলের গলা শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হচ্ছে অন্য স্টেশনের সঙ্গে—'গুমিয়া, হ্যালো গুমিয়া, আমি ম্যাকক্লাস্কি বলছি, বড়বাবু, হ্যালো গুমিয়া, গুমিয়া'।

টক্‌কা-টরে টরে-টক্‌কা, টকা-টরে করে মেসেজ আসছে, মেসেজ যাচ্ছে।

একবার মাস্টারমশাই বাইরে এলেন, এসে আমাকে দেখেই নমস্কার করলেন, আমিও প্রতি নমস্কার করলাম।

বললেন, কি? কাউরে নিতে আইছেন নাকি? তা অইলেই গাইছে—আজও দশ ঘন্টা লেট।

আমি হাসলাম। বললাম, না নিতে আসিনি কাউকে, এমনি বেড়াতে এসেছি।

ছুটি বেড়াতে বেড়াতে মিসেস কার্নির দোকানের সামনে চলে গেছিল। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

আমি যেতেই চোখ বড় বড় করে বলল, কী দারুণ শিঙাড়া ভাজছে দেখুন! খাবেন?

আমি বললাম, তুমি খাও।

না। আপনি একটা না খেলে খাব না আমি।

আমি বললাম, আমার এখন আজে-বাজে জিনিস খাওয়া বারণ।

ও হাত উল্টে বলল, তাহলে আর কি হবে? আমার খাওয়ার ইচ্ছা ছিল খুব।

আমি হেসে বললাম, তুমি ভীষণ মতলববাজ হয়েছ।

ও-ও হাসল, বলল, হইনি বরাবরই ছিলাম, আগে লক্ষ্য করেননি।

ইতিমধ্যে মিসেস কার্নি ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, বললেন, হ্যালো ডিয়ার, তুমি ত অর আন্টির খোঁজও নাও না।

আমি ওর সঙ্গে ছুটির আলাপ করিয়ে দিলাম। মিসেস কার্নিকে আমি ডাকি 'ইয়াং লেডি' বলে। সাতষট্টি বছর বয়সে, এখনো ফুল ফুল টুপী মাথায় দিয়ে লেডিজ সাইকেল চালিয়ে ক্রমাগত সাপরা-কক্কা-হেসালাও করেন।

শিঙাড়া খাওয়াতে খাওয়াতে ছুটিকে বলছিলেন উনি, ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের পুরোনো কথা।

মিসেস কার্নি এক বিস্ময়। ওঁকে যতই দেখি, ততই অবাক হতে হয়। এক সময় ওঁর স্বামী এখানের কলোনাইজেশান সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। গাড়ি ছাড়া চড়তেন না, প্রভাব প্রতিপত্তি সবই ছিল। এখন শুধু স্মৃতি আছে, আর আছে আত্মসম্মান। যে আত্মসম্মানের বলে ছোট্টখাট্টো মানুষটি তাঁর ছোট ছোট নরম হাতে এই কঠোর পৃথিবীর সঙ্গে সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি একা লড়াই করে যাচ্ছেন।

শিঙাড়া শেষ করে মাটির ভাঁড়ে চা খেলাম আমরা দুজনে।

ছুটি ভারী খুশী। বার বার বলতে লাগল, আমি কিন্তু কোলকাতা থেকে সোজা একবার ট্রেনে করে আসব—আপনি বেশ আমাকে নিতে আসবেন স্টেশনে, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে প্যাকদণ্ডীর পথ দিয়ে হলুদ ক্ষেত পেরিয়ে আপনার বাড়ি পৌঁছব।

আমি বললাম, কিন্তু হলুদ ক্ষেত ত চিরদিন হলুদ থাকবে না।

ও মুখ ফিরিয়ে বলল, কোনো হলুদ ক্ষেতই চিরদিন থাকে না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে ত থাকবে। সব থাকবে। এই সকাল, আপনার সঙ্গে ফুল-মাড়িয়ে এই বেড়াতে আসার স্মৃতি। এ সব চিরদিনই থাকবে।

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসেস কার্নিকে বললাম, একদিন বিকেলে আসব স্টেশনে, তারপর আপনার বাড়ি যাব গল্প করতে।

ইয়াং-লেডি খুব খুশী হলেন। বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এসো, খুবই আনন্দিত হব।

আরো কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে, ছুটি বলল, সুকুদা, এবার চলুন ফিরি। ফিরে গিয়ে আপনাকে একটা জিনিস রান্না করে খাওয়াব।

স্টেশনের গেটের কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন শৈলেনের সঙ্গে দেখা।

ও বলল, এই যে দাদা, আমরা এবার থিয়েটার করছি, আপনি থাকবেন ত সে সময়ে?

আমি বললাম, আমি ত এখানেই মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছি। এখন নড়বার নাম পর্যন্ত করব না। কিন্তু কি থিয়েটার?

'পলাতক'। মনোজ বসুর লেখা। সেই যে সিনেমা হয়েছিল না! আমি হিরোর রোল করব। কি দাদা? মানাবে না?

বললাম, নিশ্চয়ই মানাবে। কিন্তু তুমি গান গাইতে পারো ত?

পারি না? গাইব এখুনি?

ওর কথার ধরনে ছুটি মুখ লুকিয়ে হাসল।

আমি বললাম, এখন দরকার নেই। আমি তোমাদের রিহার্শালে আসব একদিন।

—তাত আসবেনই—আর খালি আসলেই হবে না, চাঁদাও দিতে হবে কিন্তু।

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয়ই! চাঁদাও দেব।

স্টেশন ছেড়ে হেঁটে আসতে আসতে ছুটিকে বললাম, এই শৈলেন ছেলেটা ভারী প্রাণবন্ত। সব সময় ও হাসিখুশী, প্রাণ ভরপুর। ও সেদিন কি বলছিল জানো, বলছিল, দাদা তারাশংকরের 'কবি' পড়েছেন? ভাল লাগে না? আহা কি সব গান? 'ভালোবেসে সুখ মিটিল না হায় এ জীবন এত ছোট কেনে?' সত্যি দাদা, আমাদের জীবনটা এত ছোট কেন বলতে পারেন—? আমার ইচ্ছা করে হাজার বছর বাঁচি।

সব শুনে ছুটি বলল, ছেলেটা কেমন পাগল পাগল। এসব ছেলের মন খুব ভাল হয়।

—আমি বললাম, শৈলেন একটা দারুণ কনট্রাস্ট চরিত্র। ওকে ফুলপ্যান্টের উপর পাঞ্জাবী পরে তার উপর র‍্যাপার মুড়ে বসে আড্ডা মারতে দেখলে ওর সম্বন্ধে এক ধারণা হয়, আর ও যখন রেলের উর্দি পরে গম্ভীর মুখ করে স্টেশনের গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট চেক করে, তখন ও অন্য লোক। তখন দেখে বোঝারই উপায় থাকে না যে মানুষটা এমন গান গায় বা পাগলামি করে বেড়ায়, তখন দেখে মনে হয় সৃষ্টির আদি থেকে ও বুঝি এমনি টিকিট চেক করেই আসছে।

ছুটি বলল, শুধু শৈলেন কেন? হয়ত আমরা সকলেই এরকম। আপনি যখন চেম্বারে বসে কাজ করেন, আমি যখন ছাত্রী পড়াই, তখন কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে যে আমরা এমন পাগলের মত ভালবাসতে পারি? সরি সরি, বলা উচিত আমি। আমরা বলা অন্যায় হল।

—আমি জবাব দিলাম না কথার, ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

তারপর ছুটি বলল, ও একেবারে বাচ্চা ছেলে ত?

—বাচ্চাই ত! কতই বা বয়স হবে? বেশী হলে ছাব্বিশ-সাতাশ।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ এলাম।

ছুটি শুধালো, আপনার কষ্ট হচ্ছে সুকুদা? রোদ্দুরে? ছায়ায় দাঁড়ালেই শীত করছে, আর রোদে গেলেই গা পুড়ে যায়, তাই না?

বললাম, তুমি আমার পাশে থাকলে কখনোই আমার কষ্ট হয় না। তুমি জানো, যে হয় না। আসলে তোমারই কষ্ট হচ্ছে।

অনেক কষ্ট আমার সহ্য করতে হয়। এসব একটু-আধটু সখের কষ্টকে আজকাল আর কষ্ট বলে মনেই হয় না।

দূর থেকে সেই হলুদ ফুলের মাঠ দেখা যেতে লাগল। একদল তিতির উড়ে গেল মহুয়াতলা দিয়ে। আশেপাশে কাদের গরু চরছিল নীচের খাদে। গরুর গলার ঘণ্টার টুং-টাং ভেসে আসছিল হাওয়ায়।

আমার সামনে সামনে সেই হলুদ ক্ষেতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ছুটি। আর আমি চলেছিলাম ওর পায়ে পায়ে, চুপ করে। একটা অলস হলুদ সুগন্ধি ছায়া আমার সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে ছিল। আমি স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলেছিলাম।

॥ ৭ ॥

হাসানকে কাল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটি দিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ খুব ভোরে লালি উঠে রান্নাঘরে গিয়ে গরম জল করেছে।

এখানে সাতটার আগে এখন রোদ ওঠে না এবং চামার রাস্তা দিয়ে বাসটা সাতটা অথবা সাতটার আগেই পাস করে যায়। তাই যাদের রাঁচী যাবার, তারা সকলেই একটু আগেই গিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কারণ, বাসে, এই একমাত্র বাসে, যেতে না পারলে সকাল সকাল রাঁচী পৌঁছনোর আশা নেই।

অন্যভাবে যাওয়া যে যায় না তা নয়, রাঁচী থেকে স্টেশনে অথবা টোড়ি স্টেশনে ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে বাস ধরে যাওয়া যায়। খিলাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়া কোনো কয়লার ট্রাক ধরতে পারলে তাতেও যাওয়া যায়। কিন্তু সে সবই অনিশ্চিত এবং ঝামেলার। তাই যখন গঙ্গা বাস দয়া করে চলে, তখন লোকে গঙ্গা বাসকেই ভরসা করে থাকে।

তবে গঙ্গা বাসের দয়া বছরের বেশীর ভাগ সময়েই নাকি ইদানীং হয় না।

ম্যাকলাস্কি থেকে চামা অবধি এই সাত-আট মাইল রাস্তাটুকুকে রোড ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের টার্মিনোলজীতে 'ফেয়ার ওয়েদার' রোড বলে। সেই জন্যে বছরের মধ্যে যে-কদিন বাসের মালিক পক্ষর মতে আবহাওয়া এবং রাস্তা যথেষ্ট ভাল মনে হয়, ততদিন এ-বাস অন্যান্য লাভজনক রুটে চলে। এ-রুটে বাস প্রায়ই থাকে না।

কিন্তু ম্যাকলাস্কিগঞ্জের কয়েকজন বয়স্ক, বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত লোক এবং আমাদের মত কিছু প্রভাবহীন যাওয়া-আসা করা লোকের সুবিধা-অসুবিধার কথা কে ভাবে? বধির কানে নিষ্ফল প্রতিবাদ তুলে সমস্ত রকম অসুবিধাই সহ্য করতে হয়।

এ-বছরে বারো মাসের মধ্যে আট মাস বাস চলেনি এ-রাস্তায়, অথচ প্রাইভেট গাড়ি, ট্রাক, জীপ, সবই সারা বছর, এমনকি ঘোরতর বর্ষাতেও যাতায়াত করে এবং করেছে। এখন শীতের সময়টা বাস চলছে।

চোখ-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পরে ভিতরের ড্রইং-রুমে বসে চা ঢালছিল ছুটি।

আজ সকালে ও একটা কালো শাড়ি পরেছে, সাদা ব্লাউজ, গায়ে সেই ফুলতোলা সাদা শাল।

এখনো ভুরুতে আইব্রো-পেন্সিল ছোঁয়ায়নি। ওর ভুরুদুটি কেমন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, আমি চা বানাচ্ছি, তুমি যাওত, তোমার ভুরু ঠিক করে এসো।

ও প্রথমে লজ্জা পেল, তারপর বলল, আমি না-সেজে থাকলে বুঝি আমাকে ভাল লাগাতে আপনার কষ্ট হয়?

আমি বললাম, না তা নয়? তোমাকে আমি সব সময় তোমার সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় দেখতে ভালোবাসি।

চা-টা ঢালতে ঢালতে ছুটি বলল, অতএব বোঝা যাচ্ছে, আদৌ আপনি আমাকে ভালোবাসেন না। আমার ত মনে হয় যদি কারো কাউকে ভাল লাগে ত যে-কোনো চেহারায়, যে-কোনো অবস্থায় ভাল লাগে। মানে ভালো লাগা উচিত।

আমি জবাব দিলাম না।

ছুটি উঠে পড়ে বলল, ধরুন, আপনার চা। আমি এখুনি আসছি।

ঘরের মধ্যে তখনো অন্ধকার। আমরা আলো জ্বালিয়ে বসেছিলাম।

বাবুর্চিখানায় টুং-টাং শব্দ হচ্ছিল।

ছুটি বলেছিল, কিছুই না-খেয়ে যাবে, তারপর পীড়াপীড়িতে রাজী হয়েছে, শুধু দুখানা টোস্ট আর স্ক্র্যাম্বলড এগস্ ও আরেক কাপ চা খেয়ে ও রওয়ানা হবে বলে।

বাসের এখনো মিনিট-পনেরো দেরী।

বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। চতুর্দিক সাদা হয়ে রয়েছে বরফের পাতের মত রাতের শিশিরে। পাখিগুলোও সব এখনো স্তব্ধ হয়ে আছে।

ছুটির ঘরে আলো জ্বলছিল। আয়নার সামনে ও বসে কি করছিল জানি না। হয়ত এই সাত-সকালে ওকে সাজতে বলায় ও আমাকে ভুল বুঝেছে।

মনে মনে আমি নিজেকেও কম বকিনি, এখনও বকছি। আসলে, এই জড় ও স্থূল সংসারের মধ্যে বাস করে এমন বাড়াবাড়ি সৌন্দর্যজ্ঞান থাকার কোনো মানে হয় না। এই সৌন্দর্য-প্রীতির জন্যে মূল্যও যে কম দিতে হয়েছে তা নয়, কিন্তু ছুটিকে কোনোদিনও অসুন্দর দেখিনি এক মুহূর্তের জন্যও! অসুস্থ না থাকলে, ও কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও আমার সামনে আসেনি না সেজে। অবশ্য না সেজে থাকলেই ওকে আমি সব সময়ই সুন্দর দেখি। ও জানে ওর জানা উচিত, আমি কি বলতে চেয়েছিলাম।

এমন সময় ছুটি ডাকল, সুকুদা, একবার আসুন। দেখে যান একটা জিনিস।

আমি বললাম, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হবে না, এখুনি যাচ্ছি। আপনি আসুন না, এক সেকেণ্ড।

আমি ওর ঘরে গিয়ে দেখি ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়েছে।

ও আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে আয়নায় আমার ছায়ার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, সুখী? বলুন, আপনি সুখী ত?

আমি নীচু হয়ে ওর ডান কানের লতিতে আলতো করে একটা চুমু খেলাম।

ছুটি মুখ নীচু করে ফেলল।

পরমুহূর্তেই যেই মুখ তুলল ছুটি, দেখলাম ওর কাজল-মাখা চোখে কি যেন বলবে বলে অধীর।

ছুটি আমার দু' হাটুতে মুখ গুঁজে অস্পষ্ট অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে এখানে থাকতে দিন, আপনার সঙ্গে, আপনার কাছে থাকতে দিন। আমি বড় একা সুকুদা। আপনি ছাড়া আমার কাছের কেউ নেই। আপনাকে ফেলে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

আমি ওকে দু' হাতে তুলে নিলাম, ও অনেকক্ষণ আমার বুকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, ছুটি—ও ছুটি—পাগলামি কোরো না। চলো চা খাবে চলো।

ছুটি আমার সঙ্গে সঙ্গে ও-ঘরে এলো।

চা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। লালিকে পট নিয়ে গিয়ে আবার চা আনতে বললাম।

ছুটি আমার সামনে বসেছিল, চতুর্দিকের আলোহীন শীতার্ত পরিবেশের মধ্যে আলোকিত উষ্ণ ঘরে।

ছুটি আমার দিকে এবং আমি ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমাদের দুজনের চোখ, দুজনের মন, কী এক আশ্চর্য অপ্রকাশ্য সুস্থ রোমাঞ্চকর উষ্ণতায় ভরে গেল। তারপর সেই উষ্ণতা সেই শীত-সকালে আমাদের মন ভরে দিয়ে উপচে গেল দিকে দিকে; রঙ্গীন রোদ গড়িয়ে গেল শিশির-ভেজা ঢালে ঢালে, পাখি ডেকে উঠলো ডালে ডালে, চতুর্দিকে সঞ্চারিত সদ্যজাত প্রাণের আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

ছুটির জল-ভেজা চোখে এক দারুণ খুশী ঝিলিক দিয়ে উঠল, তারপর দেখতে দেখতে ওর মুখের সব বিষাদ এক পরিতৃপ্তির দীপ্তিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠল।

ছুটি আমার দিকে চেয়ে হাসছিল, আমিও ওর চোখে চেয়ে হাসছিলাম।

আমি গিয়ে বাইরের দরজা খুললাম।

ছুটি চায়ের পেয়ালা নিয়ে আমার গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

আমরা দুজনে সবিস্ময়ে দেখলাম, সমস্ত পৃথিবীতে এই প্রথম ভোরের আশ্চর্যতায় আলো আর শব্দের এক কোমল নরম যুগলবন্দী বাজছে।

একটু পরে লালি চায়ের সঙ্গে খাবার-টুকুও নিয়ে এল।

ছুটি অনিচ্ছার সঙ্গে খেল।

তারপর মালু ছুটির স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল, যদি বাস এসে পড়ে তবে তাকে দু-এক মিনিট রুখবে বলে।

আমি আর ছুটিও বেরোলাম।

ও মুখ নীচু করে হাঁটছিল। কথা বলছিল না মুখে।

একবার বলল, রাঁচীতে কখন পৌঁছব?

বললাম, দশটা নাগাদ পৌঁছে যাবে।

তারপর বললাম, আবার কবে আসবে?

ও বলল, জানি না, দেখি আবার কবে ছুটি পাই। এমনি করে শুধু রবিবারের জন্যে একদিনের জন্যে আসব না। এতে শুধু কষ্ট। এবারে এলে তিন-চারদিন ছুটি নিয়ে আসব।

আমি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে কাল সকালে ছুটির তোলা কুঁচফলের তোড়াটা ওর হাতে দিলাম।

ও হাসল, বলল, ইস্-স্ আমি ত ভুলেই গেছিলাম। ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখব, এখানের কথা মনে পড়বে।

তারপর আর কোনো কথা হলো না।

চারিদিকের নানারকম প্রভাতী পাখির কলকাকলীর মধ্যে আমরা বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দূর থেকে বাসটা আসার শব্দ শোনা গেল।

ছুটি ফিসফিস করে বলল, চিঠি দেবেন কিন্তু। রোজ একটা করে চিঠি লিখবেন আমাকে। বলুন লিখবেন? বলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, রোজ চিঠি পেলে, চিঠি পেতে আর তোমার ভাল লাগবে না। তুমি দেখো, লেখার মত কিছু থাকলে, লিখতে যখনি ইচ্ছা করবে, তখনি লিখব, তুমি দেখো।

—আর ইচ্ছা না করলে লিখবেন না?

—ইচ্ছা করবে, সব সময়ই হয়ত ইচ্ছা করবে, তবুও রোজ লিখব না। তুমি জানো কেন রোজ লিখব না।

—না। আমি জানি না। আমি কিছু জানতে চাই না। আমি রোজ চিঠি চাই।

বাসটা এসে গেল।

গিরধারী স্টিয়ারিং-এ বাঁ হাত রেখে ডান হাত তুলে নমস্কার করল।

ছুটি আমার দিকে ফিরে বলল, আসি। ভাল হয়ে থাকবেন।

বাসভর্তি লোক ছিল, আর কোনো কথা বলার সুযোগ হল না, ওর হাতে হাত রাখার সুযোগ হলো না, বললাম, এসো। তুমি আমাকে চিঠি লিখো।

ও মাথা হেলালো, বাসে উঠে সামনের দিকে জানালার পাশে বসল।

বাসটা ছেড়ে দিল।

অনেকক্ষণ, অনেক অনেকক্ষণ পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, শিশিরের নরম হালকা সুবাস সব ছাপিয়ে আমার ছুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে-যাওয়া কর্তব্যবোধ বাসটার পোড়া পেট্রলের গন্ধে আকাশটা ভরে রইল, আবহাওয়া তার গাম্ভীর্যের গোঙানীতে গাঢ় হয়ে রইল।

ছুটির সঙ্গে আমার অনেকখানি অশরীরী আমি অনবধানে গঙ্গা বাসে মনে মনে ছুটির পাশে বসে উধাও হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

মকবুল ফিদা হুসেনের ছবি দুই নারী
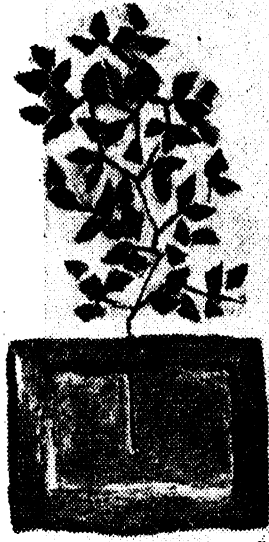
মকবুল ফিদা হুসেন—
শিল্পী ও পদ্মভূষণ

জীবিত ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে মকবুল ফিদা হুসেন-এর শ্রেষ্ঠতা আজও তর্কাতীত না হলেও, খ্যাতির সোপান বেয়ে যে বিন্দুতে তিনি আজ উপনীত, একালে কোন জীবিত ভারতীয় চিত্রকর বা ভাস্কর সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারেননি। একজন ভারতীয়ের ভারতীয়-ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে চিত্রশিল্পের ইন্দ্রিয়ানুগ সার্বজনীন ভাষায় রূপ দেবার জন্য সে ভাষার আত্মীয়করণ করে তাকে নিজস্বতা দান করেছেন হুসেন। আধুনিকতার অন্যতম চারিত্র্য হল সার্বজনীন ভাষার ব্যক্তিকরণ। আধুনিকতার এই নিরিখে হুসেন আধুনিক। আবার বিষয় নির্বাচনে, রূপ-কল্পনায়, প্রতীক ব্যবহারে, রঙের ব্যবহারে হুসেনের বিচরণ ভারতীয় জীবনে ও শিল্পে। ভারতীয়ত্ব ও আধুনিকত্বের এই সমীকরণসিদ্ধিই হুসেনকে সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে দেশে-বিদেশে সর্বাধিক খ্যাতিমান করে তুলেছে। এই শিল্পীর খ্যাতি শুধুমাত্র সমব্যবসায়ী বা শিল্পবোদ্ধাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; হুসেনের শিল্পজগতের দ্বার সবার জন্য অবারিত। হুসেনের খ্যাতির দৃঢ় মূলে কর্ম-নিষ্ঠায়, কারু দক্ষতায়, অনুভূতি-বিশ্বাস-প্রত্যয়ের সততায়, পারিপার্শ্ব সম্বন্ধে মমত্বে, কর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা আত্মীকরণ ক্ষমতায় এবং সহজ হবার চেষ্টায় নিহিত। ক্ষুদ্রচেতা ছিদ্রান্বেষিই তাঁর খ্যাতির মূলে প্রচারবিদের কারসাজি দেখেন।

মকবুল ফিদা হুসেন ১৯১৫ সালে মহারাষ্ট্রের সোলহাপুরে এক গোঁড়া সুলেমানী বোহ্‌রা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই ফারসী ও উর্দু কাব্য পঠন ও লিখন এবং চিত্রাঙ্কনের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পেতে থাকে। পরিবারের লোকেরা চেয়েছিলেন হুসেন মৌলবী হন। ইসলাম ও বিশেষ করে শিয়া ধর্মের বিষাদান্তক মানবিকতার দিক এবং সুফী মরমীয়াবাদ এবং ফার্সী মরমী কাব্যের বিষাদান্তক সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করলেও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্বতা এবং শুষ্কতা তাঁকে প্রতিহত করত। ফলে মৌলবী হওয়া তাঁর হল না। হুসেন নিজেকে চিত্রকর করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এ-সময়ে তাঁরা ইন্দোরের বাসিন্দা। সারাদিন পারিবারিক ব্যবসায়ে কাজের পর, সদাযুবা হুসেন, সন্ধ্যায় লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়তেন পরিচিত পারিপার্শ্বের অর্ধপরিচিত আলো-আঁধারি রূপটিকে রঙে-রেখায় রূপান্তরিত করার জন্য। আর চলত শিল্প-সম্বন্ধে অধ্যয়ন। ঐ বয়সেই ছাপা বইয়ে দেখা রেমব্রান্ডট-এর ছবির আঁধার-আলোর জগৎ তাঁকে আকৃষ্ট করে। এরপর কিছুকাল ইন্দোর এবং বোম্বাইয়ের আর্ট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করেন; কিন্তু বেশীদিন টিঁকে থাকা সম্ভব হয় না। ১৯৩৭ সালে তিনি বোম্বাইতে যান ও সেখানে সিনেমার পোস্টার এঁকে জীবন নির্বাহ করতে থাকেন। ১৯৪১ সালে পোস্টার আঁকা ছেড়ে দিয়ে আসবাবপত্র এবং খেলনা তৈরীতে মন দেন। খেলনা তৈরী করতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি গ্রামীণ-লৌকিক পুতুলের নকশা ও রঙের মৌল গঠন সারল্য এবং অভিব্যক্তিপ্রবণতার দিকে আকৃষ্ট হয়। কখন যে তিনি অভিনিবেশসহকারে ছবি আঁকতে শুরু করেন তা ঠিক বলা যায় না। ১৯৪৭ সালে তাঁর ছবি প্রথম সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়। ১৯৪৮ সালে ফ্রান্সিস নিউটন সুজা এবং রাজার অনুপ্রেরণায় বোম্বাইয়ের প্রগ্রেসিভ পেইনটার্স গ্রুপ-এ যোগ দেন। ১৯৫০ সালে বোম্বাইতে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী মারফত তিনি রসিকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ঐ বছরেই মথুরা ভাস্কর্যের গঠন ঋজুতা ও সারল্যের সংগে ভাবগাম্ভীর্য ও অভিব্যক্তির দ্যোতনা তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং রাজপুত মিনিয়েচর ও বিশেষ করে বাসোলী কলমের চিত্রাবলীর স্বর্ণ

মকবুল ফিদা হুসেনের ছবি জলপরীর ড্রয়িং

ভঙ্গী ও বৈদিক ক্ষেত্রবিভাজন রীতি তাঁর চিত্রকল্পনায় আবদ্ধ করে। ১৯৫১ সালে কলকাতায় এবং প্যারিতে তাঁর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছরেই তিনি চীন ভ্রমণে যান ও প্রবীণ শিল্পী চী পাই-শীর সঙ্গে পরিচিত হন। চী পাই-শীর ছবির রেখার ছন্দ ও গতিময়তা এবং তাঁর ছবিতে সাদা-কালোর বিন্যাস তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। ১৯৫৩ সালে ইউরোপে প্রদর্শনী করতে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ইউরোপীয় শিল্পীদের ছবির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে এবং পিকাসো, ক্লী, মাতিস, ফ্রাঞ্জ মার্ক ও পাউল ক্লের কাজের [illegible] হন। অবশ্য থেকে হুসেন দেশে এবং বিদেশে বারবার জীবনের এবং শিল্পের পাঠশালায় পাঠ নিয়ে অভিজ্ঞতার পরিধি ব্যাপ্ত করেছেন এবং তাঁর শিল্প-রীতিতে অভিজ্ঞতার দর্পণরূপে তা প্রকাশিত হয়েছে। দেশেবিদেশে বহুস্থানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে প্রদর্শনী করেছেন, বহু পুরস্কারের সম্মান পেয়েছেন। ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে "পদ্মশ্রী" খেতাব দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে সাও পাওলো দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি পিকাসোর সঙ্গে একযোগে একটি বিশেষ প্রদর্শনী করেন। সে প্রদর্শনীতে তাঁর ছবির বিষয় ছিল "মহাভারত"। এ-বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারত সরকার তাঁকে "পদ্মভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

মকবুল ফিদা হুসেনের ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীর গোড়া পর্যন্ত আঁকা ৭৭টি ছবির একটি বৃহৎ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন কলকাতার বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট এণ্ড কালচারের কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ থেকে ঐ আকাডেমির কর্তৃপক্ষ বহু আয়াসে এই ছবিগুলি সংগ্রহ করে আনেন। এটি কলকাতায় হুসেনের ছবির তৃতীয় প্রদর্শনী। প্রথমটি হয় ১৯৫১ সালে আলিয়াঁস ফ্রাঁসের উদ্যোগে, দ্বিতীয়টি হয় ১৯৬২ সালে অধুনালুপ্ত আশোক গ্যালারীর উদ্যোগে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তৃতীয় প্রদর্শনীটি এতাবৎকাল পর্যন্ত হুসেনের ছবির প্রদর্শনীগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। কলকাতার শিল্পরসিক দর্শকদের হুসেনের শিল্পকর্মের সঙ্গে এ-পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য বিড়লা একাডেমির কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

প্রদর্শনীটি ৯ই জানুয়ারী থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায় একমাস চলে; ফলে শিল্পরসিকরা একাধিকবার প্রদর্শনীটি দেখার সুযোগ পান।

হুসেনের ছবির শুরুতে অধিকাংশ সময়েই গ্রামীণ ভারতীয় জীবনের কোন বহু-পরিচিত দৃশ্য, অথবা উত্তর, পশ্চিম কিংবা মধ্যভারতের নারী, অথবা বহু-পরিচিত ভারতীয় গাথার দৃশ্যরূপে, বা ঘোড়া অথবা হাতী থাকবেই। বিষয় এবং বিষয়ী অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার একাত্মকরণকে অনেক সময়ে শিল্পবেত্তারা সার্থক শিল্পের প্রাথমিক সর্ত বলে থাকেন। সে সর্তানুসারে হুসেন তাঁর ছবির প্রাথমিক বিষয়সকলকে গ্রহণ করে যে ভাবে তাঁর শিল্পায়ন ঘটান তাতে বিষয়সকল তাদের প্রাত্যহিকতা বর্জিত হয়ে শিল্পী উদ্দিষ্ট মূল্যে মণ্ডিত হয়ে প্রতিভাত হয়। ছবি বহুপরিচিত দৃশ্য অথবা বস্তু বা ঘটনাকে একটি নবমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই মূল্যমানের জনক স্রষ্টা হুসেন। এই নবমূল্যের উৎস স্রষ্টার মন হলেও, সেই মন সমাজ-জীবন নিরপেক্ষ নয়। এই মানস গঠনে জীবন সমাজ-ধর্ম এবং নানাবিধ ধ্যানধারণা সক্রিয়।

পরিচিত দৃশ্যবস্তুর শৈলীকরণে হুসেনের ছবিতে কিউবিজমের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়। গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ শিল্পকর্মে হুসেন কিউবিজমের রীতি অনুসারে দ্বিমাত্রিক আয়তক্ষেত্রের উপর সমশক্তিসম্পন্ন বর্ণ সাজিয়েছেন, বর্ণের পাশে বর্ণ সাজিয়ে আয়তক্ষেত্রের তল বিভাজন করেছেন, জ্যামিতিক কৌণিক প্রথায় রঙ লাগাবার জন্য রূপকল্পগুলি জ্যামিতিক-কৌণিক রূপে পেয়েছে, চিত্রক্ষেত্র বিন্যাস পদ্ধতির গুণে জ্যামিতিক নকশায় পরিণত হয়েছে। এ-সবই কিউবিজমের প্রভাব। কিন্তু হুসেন কিউবিস্ট নন, তাঁর অন্বেষার সঙ্গে কিউবিজমের অভিপ্রেতের কোন মিল নেই। হুসেনের ছবির রেখা গতিসম্পন্ন, তারা শুধু রূপকল্পের সীমা নির্দেশ করে না; সীমার বাইরে বেরিয়ে যেতে চায় ও রূপকল্পকে গতি দেয়। তাঁর ছবির বর্ণপ্রলেপিত ক্ষেত্র একের পর এক বিন্যস্ত হয়ে শুধুমাত্র তল বিভাজন করে না বা ঋজুভাবে রূপাংশের কাঠামো তৈরী করে না, তাঁর তুলি বা রঙ লাগানোর তুলিচালনার গতির দৃশ্যরূপে হয়ে থাকে; সে গতি রেখার শাসনে রূপাংশের অভ্যন্তরে অবস্থান করলেও তার প্রবণতা সীমা-বহির্মুখী। অর্থাৎ তাঁর রেখা এবং রঙেরপুঞ্জের চারিত্র্য কিউবিজমের পরিপন্থী। তবে কেন তিনি কিউবিজমের দ্বারস্থ। ছবির বিষয়কে, ছবির অভিব্যক্তিকে ছবি থেকে আলাদা করে দেখার বিরুদ্ধে ছিল কিউবিজমের [illegible]

হুসেন সেই প্রতিবাদের শরিক। তাঁর ছবির বিষয় এবং অভিব্যক্তিকে যাতে ছবি থেকে অর্থাৎ দৃশ্যরূপ থেকে আলাদা করে না দেখা যায়, ছবির গঠনের মধ্যেই যাতে বক্তব্য লিপ্ত থাকে তার জন্যেই হুসেনের এই কিউবিজম অভিসার। দ্বিতীয়ত হুসেন তাঁর ছবির চরিত্রগুলিকে কখনও ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি; ভারতীয় জীবনে ব্যক্তি কোথায়? চেয়েছেন টাইপ বা ধরণ কিংবা প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লোপ করা তাঁর প্রয়োজন। কিউবিজমের সরলীকরণ রীতিতে তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিলোপকারী টেকনিকের সন্ধান পান; সন্ধান পান এমন এক শৈলীকরণ রীতির যা দিয়ে টাইপ বোঝান যায়। তাছাড়া, বর্তমান সমালোচকের ধারণা—হুসেনের কিউবিজমের সঙ্গে পিকাসো বা ব্রাকের কিউবিস্ট পর্বের অন্বেষার কোনই মিল নেই। কিউবিস্ট গঠনভঙ্গির সঙ্গে লৌকিক খেলনার মিল থেকে তিনি দেখেছিলেন যে খেলনার গঠনভঙ্গির জ্যামিতিক সারল্য সত্ত্বেও রঙের গুণে এবং টাইপ-রূপার ক্ষমতাগুণে তা হয়ে ওঠে অভিব্যক্তিমূলক। কিউবিজমের সঙ্গে ভারতীয় গ্রামীণ খেলনার দৃশ্যগত সাদৃশ্য তাঁকে এই দুইয়ের সমীকরণে পাওয়া এক নতুন রীতির সন্ধান দেয়। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৭-৫৮ পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ ছবিতে এই সমীকরণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ লৌকিক ভারতীয় খেলনার সাহায্যেই তিনি কিউবিস্ট শৈলীকে অভিব্যক্তি সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করলেন। কিউবিজমের এই অভিব্যক্তিমূলক ব্যবহার কিউবিস্ট পর্বের পিকাসো বা ব্রাকের মধ্যে দেখা যায় না। চিত্রনির্মাণ এবং নির্মিত চিত্রশিল্পে দৃষ্টিনন্দন নকশা হুসেনের শিল্পকর্মের অন্যতম অভিপ্রেত হলেও, তিনি চিত্রের অভিব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে চিত্রগুণে সন্নিবিষ্ট রূপকল্পাশ্রয়ী করেই উপস্থাপিত করেন। এই কারণেই তিনি কিউবিজমের কাছে দাসখত লিখে দেন নি। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত তিনটি অসাধারণ ছবি, 'মহাবলী', 'মূর্তি-উপাসক মা' এবং 'ঘোড়ো নিঃশব্দ' কিউবিজমের ধারও ধারে না। অভিব্যক্তির জন্য এই তিনটি ছবিতে সম্পূরক বর্ণ এবং বর্ণান্তর বা টোন (যা কিউবিস্টরা ব্যবহার করেন না) এবং অজ্যামিতিক রেখাংকন ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছবি তিনটি দেখে যে কথা আরও মনে হয় তা হল, হুসেন তাঁর ছবিতে স্থাপিত মনুষ্য-অথবা জীব-রূপকে ভাস্কর্যের ঘন শরীর দেবার জন্যই কিউবিজমের দ্বারস্থ, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। সেই প্রয়োজনেই তিনি আবার মথুরা ভাস্কর্যের মনুষ্যাকারের স্ফীততাকে তার অবলম্বন করতে পারেন: প্রমাণ 'মহাবলী', প্রমাণ 'মূর্তি-উপাসক মা'। হুসেন তাঁর অভিব্যক্তির প্রয়োজনে মহাদেশের সীমা না মেনে যে কোন রীতি থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে তার আত্মীকরণ করতে পারেন।

মকবুল ফিদা হুসেনের ছবি অ্যাগোনি

কোন কোন সমালোচক আবার হুসেনকে 'একসপ্রেশনিস্ট' বলে চিহ্নিত করেছেন। এক্সপ্রেশনিস্ট বলতে যদি মুঙ্ক, নোলডে, "ডের ব্লাউ রাইটের" বা "ডি ব্রুয়েকে" দলের চিত্রকর্মকেই বোঝায় তা হলে হুসেন অবশ্যই একসপ্রেশনিস্ট নন; কারণ এইসব উত্তর ইউরোপীয় একসপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবিতে অঙ্কিত বিষয় গৌণ, অঙ্কিত চিত্রকল্প, রঙ, রেখা, স্পন্দ বিন্যাস ইত্যাদি যে ভাবপরিমণ্ডলের দ্যোতনা বহন করে তাই ছবির উদ্দেশ্য। কিন্তু হুসেনের ছবির ভাবপরিমণ্ডল ছবির বিষয়-উদ্ভূত। অবশ্য যে কোন মূলত অভিব্যক্তিমূলক শিল্পকেই যদি একসপ্রেশনিজমের আওতায় আনা যায় তাহলে হুসেন অবশ্যই একসপ্রেশনিস্ট; সুঙ্গ এবং গুপ্ত পর্বের মথুরা ভাস্কর্য এবং বাসোলী কলমের ছবিও একসপ্রেশনিস্ট।

বিষয়াভিমানী শিল্পী হুসেনের ছবিতে নারী, পুরুষ, ঘোড়া, হাতি, পাখীর ভূমিকা অসাধারণ। হুসেন প্রায় চিরাচরিত রীতিতে এইসব জীবদের শয়ন, বসন, চলন, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাত-পা, চোখ ঠোঁট গ্রীবা ইত্যাদির ভঙ্গি, চোখ, মুখ, ঠোঁট, নাকের আকার, পারস্পরিক সংস্থাপন ইত্যাদি দিয়ে অভিব্যক্তি সঞ্চার করেন। দ্বিতীয়ত তিনি একান্ত ভারতীয় রীতিতে অঙ্গুলিমুদ্রা, হস্তমুদ্রা এবং পদমুদ্রার সাহায্যে অভিব্যক্তি সঞ্চার করেন। অথচ এই সকল মুদ্রা ভারতের নাট্যশাস্ত্রানুসারী নয়; তারা স্বপ্রকাশ।

মুদ্রা, বিশেষ করে হস্তমুদ্রা এবং অঙ্গুলিমুদ্রা হুসেনের ছবিতে প্রায়শই প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। মুদ্রা ছাড়াও রূপকল্প বা রূপাংশকে ড্রইং এবং রঙের সাহায্যে হুসেন প্রতীক করে তোলেন। উত্তোলিত তর্জনী হয় বাধানিষেধের প্রতীক, লিঙ্গের প্রতীক, বদ্ধমুষ্ঠি হয় শোষণ-দম্ভের প্রতীক, লণ্ঠন বা ফুলদানি হয়ে ওঠে পুরুষাঙ্গের প্রতীক, ফণিমনসা অপ্রাপ্ত সম্ভোগের প্রতীক, মাকড়সা কল্যাণকামী কর্মের প্রতীক, ঘোড়া পৌরুষের এবং অতৃপ্ত বাসনার ও হাতি বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রতীক। প্রতীক-প্রবণতা হুসেনের অন্যতম চারিত্র্য। অভিব্যক্তি সৃষ্টিতে এসব প্রতীকের ভূমিকা খুবই বেশী।

রূপকল্পের এবং রূপাংশের পারস্পরিক বিন্যাস এবং একই চিত্রক্ষেত্রে রূপকল্পের বহিরঙ্গ, আয়তনিক সম্পর্ককে চিত্রতলে আমূল পরিবর্তিত করে এবং স্যুররিয়ালিস্টদের কায়দায় মোটিভগুলির অলৌকিক সংস্থাপনার দ্বারা হুসেন প্রায়শই একটি অদ্ভুত ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন।

তবে রঙ হুসেনের ছবির অন্যতম প্রধান উপাদান, যা দিয়ে হুসেন অভিব্যক্তি সৃষ্টি করেন, ছবির ভাবপরিমণ্ডল তৈরী করেন। বর্ণ সঞ্চয়নে এবং বর্ণ বিন্যাসে হুসেন কখনও ভারতীয়, কখনও বা ইয়োরোপীয় রীতিনিষ্ঠ। যখন ভারতীয় তখন তাঁর বর্ণ সঞ্চয়ন রাজস্থানী জীবন থেকে এবং রাজপুত ছবি থেকে। হুসেন অধিকাংশ সময়েই ভারতীয় কায়দায় একগ্রাম বর্ণ ব্যবহার করেন। যখন বর্ণান্তর ব্যবহার করেন তখনও কিন্তু ইয়োরোপীয় কায়দায়

আলোছায়ার খেলায় ঘনত্বজ্ঞাপক বর্ণান্তর ব্যবহার করেন না। কিন্তু তেলরঙ চাপান ইয়োরোপীয় কায়দায়। কোন এক খালাখিলা সমালোচক লিখেছেন হুসেন নাকি ফোভিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত। অথচ হুসেনের রঙ সব সময়ে রূপকল্পের সীমা রেখার সীমা মেনে চলে; রঙের ঘনশরীর থাকে। অন্ধকার রঙ দিয়ে তৈরী দেশ থেকে উজ্জ্বল অথবা উষ্ণ রঙে তৈরী ঘন-শরীর বিশিষ্ট জীব হুসেনের ছবির অন্ধকার থেকে ভেসে আসে; হঠাৎ একটি কৃষ্ণদেহী নারীর নাক এবং ঠোঁট উষ্ণ রঙে অঙ্কিত হয়ে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়; হঠাৎ একটি চাপা-ছাপা রঙের শরীর-বিশিষ্ট মানুষের হাত উজ্জ্বল শাদা হয়ে উঠে যেন কথা বলতে চায় যায় যা ঐ মানুষের পক্ষে বলা স্বাভাবিক ছিল না।

হুসেন একজন আধুনিক শহুরে মানুষ হিসাবে ভারতবর্ষকে দেখেছেন। যে গ্রামীণ ভারতকে দেখেছেন তাতে শহুরে শিক্ষিত ভারতীয়ের আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বিষাদ প্রতিফলিত। সেই গ্রামের ভারত-বর্ষের মানুষেরা একত্রে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অনেক কাজ করে অনেক শব্দ করে কিন্তু কথা বলে না। তারা কেউ ব্যক্তি নয়। গোষ্ঠী জীবনের নানা বাধানিষেধের বাঁধনে থেকে তারা তাদের ব্যক্তিগত কামনা, বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে না; ফলে অতৃপ্ত কামনা বাসনা নিয়ে বিষাদমগ্ন থাকে। অথচ তারা সব কামনা-বাসনার শরীর নিয়ে পৃথিবীতে বাস করে, আশে-পাশে থাকে সে সব চরিতার্থ করার উপাদান। অতএব তারা যখন সব একক তখন এসব অচরিতার্থ কামনা-বাসনার শিকার। কিন্তু নিজেদের স্বীকৃত বাধা-নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ। অতএব নৈঃসঙ্গ এবং বিষাদ তাদের অনুষঙ্গী।

জীবনের এই স্বার্থবোধক দ্বান্দ্বিকতাকে হুসেন চমৎকারভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর ছবির রূপকল্প জোরালো, ভারী ঘনত্বশীল রেখার নিগড়ে বাঁধা থাকে, কিন্তু রঙের পাশেরেখার নিগড় ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায় অথবা রঙ স্বাধীনভাবে রূপকল্পের শরীর গড়ে তোলে কিন্তু সেই রূপকল্পের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। কেউ রূপকল্পের ভিন্নাংশে রঙ হঠাৎ অলৌকিকভাবে ভিন্ন রূপ নেয়। মানসিক দ্বন্দ্ব ... হয়ে যায় এবং ... অন্য সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ব্যক্তির মুখ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে গতিসম্পন্ন রেখা হঠাৎ অপরিণামদর্শী রেখার দ্বারা আক্রান্ত হয়, ঘোড়া ছোটে সামনে সওয়ারী তাকায় পিছনে। বিপরীতমুখী সরল-রৈখিক ছন্দের বৈপরীত্যে এক স্বচ্ছন্দ সৃষ্টি হয়। যে সৃষ্টির উৎস জীবন। হুসেনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, উনি জীবনকে দেখেননি বলে নয়, বিষাদকে চেনেননি বলে নয়, জীবনে স্পন্দনকে দেখেননি বলে নয়, স্পন্দের, বিষাদের কারণটিকে ভুল চিহ্নে চিহ্নিত করেছেন বলে। এই স্পন্দের উৎস মানুষের বাস্তব কর্মে এবং কর্মফল ভোগে। যৌনাকাঙ্ক্ষাজনিত ভোগ-স্পৃহা এবং স্বেচ্ছা-আরোপিত নিষেধের কারণে তার অতৃপ্তিই স্পন্দের এবং বিষাদের উৎস নয়। ধ্যান-ধারণার এই অস্বচ্ছতা হুসেনের ছবিতে কয়েকটি অসংগতির সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল তার ড্রইংয়ের সংগে অভিব্যক্তির চারিত্রের অসংগতি। তাঁর ছবির নির্মাণধর্মী জ্যামিতিক কৌণিক রূপকল্পের সংগে রেখার এবং রূপকল্পের গতিশীলতা ভাল-ভাবে চলে গেলেও, অদৃশ্যমান মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি অচল। ব্যক্তিক নৈঃশব্দ, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ, আতঙ্ক ইত্যাদির নির্দিষ্ট জ্যামিতিক রূপ দৃশ্যমান অবস্থায় দেখা কল্পনাতীত। অথচ সে ব্যাপারটা ছবিতে এসেছে। এসেছে প্রধানতঃ রঙ এবং বিন্যাসের গুণে। তাতেও মনে করতে হয় হুসেনের ছবির রঙের সংগে রূপকল্পের দৃশ্য চারিত্রের কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই। সেটা নিশ্চয়ই দোষ বলে পরিগণিত হবে।

তবু হুসেন নিঃসন্দেহে বড়ো শিল্পী। কারণ বড়ো শিল্পীই নিজের দোষ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন। উপরোক্ত দোষ সম্বন্ধে হুসেন যে সচেতন তার প্রমাণ সেই সব অসাধারণ ছবি যেগুলি তার ব্যতিক্রম, যেমন নীল শাড়ি, নীল ফুলদানি, মহাকালী, মূর্তিশিল্পকার মা, ঘোড়া, নৈঃশব্দ ইত্যাদি। হুসেন বড়ো শিল্পী তার প্রমাণ হুসেনের ছবি নানা জনে নানা কারণে উপভোগ করতে পারে, নানা স্তরে নানা অর্থে মণ্ডিত তাঁর ছবির দৃশ্যাবলী। দৃশ্যগত বৈচিত্র্যও কিছু কম নয়।

বড়ো শিল্পী মানেই এই নয় যে, তাঁর প্রতিটি কাজ মাস্টারপীস হবে। সব বড়ো শিল্পীই জীবনধারণের তাগিদে, অর্থের তাগিদে, অভ্যাস রক্ষার্থে তাঁর নিজেরই বহু কষ্টে বহু নিরীক্ষায় পাওয়া রীতি-কৌশলের প্রয়োগ করেছেন কোন রকম ফর্মুলা অনুযায়ী। এবং তা করে খারাপ কাজ উপহার দিয়েছেন। কিন্তু খ্যাতি বা অখ্যাতি কোনটিই এই ফর্মুলামাফিক তৈরী খারাপ কাজের উপর নির্ভর করে না। হুসেনও সব বড় শিল্পীর মতো বহু ফর্মুলা-মাফিক প্রেরণাহীন কাজ করেছেন। এ প্রদর্শনীতেও সে ধরনের কাজ কম ছিল না। বাজার যে কোন শিল্পের মারক শক্তি, অথচ বাজার-সর্বস্ব সমাজে বেঁচে থাকতে গেলে বাজারও দরকার। হুসেন নিজগুণে তার শক্তিতে তাঁর ছবির জন্য বাজার তৈরী করে নিয়েছেন। এখন বাজার চায় হুসেন যে ধরনের কাজ দিয়ে তাঁর বাজার তৈরী করেছেন, সেই ধরনের কাজই করে যান। ফলে হুসেনকে বহু নিরীক্ষায় পাওয়া রীতি-কৌশলকেই ফর্মুলামাফিক প্রেরণাহীনভাবে ব্যবহার করে ছবি তৈরী করতে হচ্ছে। না করে উপায় নেই। একবার বাজার তৈরী হয়ে গেলে, সেই বাজারজাত সুখে অভ্যস্ত হলে আর তাকে ছাড়া সম্ভব নয়। এ সিন্দবাদের ঘাড়ে বুড়োর মতন।

তবু হুসেন পরীক্ষা-ক্লান্ত নন। নিজের বহুমুখী অভিজ্ঞতাকে বহুমুখীভাবে প্রকাশ করতে তিনি চলচ্চিত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'থ্রু দি আইজ অফ এ পেন্টার' বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ছোট ফিল্ম বিভাগে শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা পেয়েছিল। তারপর তৈরী করেছেন মাণ্ডু, নেপালে গিয়ে তুলেছেন 'অফ গড্‌স এণ্ড মেন', 'ফোক ডান্সেস', 'পেন্টারস স্কেচবুক', নিজের ছবি নিয়ে 'মহাভারত' এবং 'ব্রাউন, ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট'। তার তৈরী ফিল্মকে ছবিরই সম্প্রসারণ বলে ভাবা যেতে পারে। এসব ছবির কোন গল্প নেই, বিষয় আছে। ছন্দ আছে, আছে গতির বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব। ফ্রেমের পর ফ্রেম আসে গল্পের নিয়মে নয়, ছন্দের নিয়মে। সৃষ্টি করে কিছু রূপকল্পের। রেখে যায় কিছু অস্পষ্ট কয়েকটি ধারণা। প্রদর্শনী চলাকালে বিড়লা একাডেমির কর্তৃপক্ষ প্রতি শনিবার রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে ঐ ফিল্ম কয়টির প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

ছ' ফুট লম্বা, দাড়ি, অস্থিবহুল, শুভ্র শ্মশ্রুকেশ হুসেন প্রদর্শনীর প্রথম সাত দিন কলকাতায় ছিলেন। সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারী আর্টিস্ট-এর স্টুডিওতে গিয়ে কলকাতার শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। একদিন বিড়লা একাডেমিতে আয়োজিত কলকাতার শিল্পীদের এক সভায় সবার সঙ্গে আলাপিত হয়েছেন, প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। স্বভাবতঃ স্বল্পবাক কিন্তু অমায়িক এই শিল্পীকে কখনও দূরের লোক বা উপরতলার লোক বলে মনে হয়নি। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন। সেও হুসেনের ব্যক্তিগত অনুরোধে।

—প্রণবরঞ্জন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'ঘোতনও হাসল, বলল, 'একবার হল। আরও ছয় বার হাতে আছে। কে যেন বার সাতেক চেষ্টা করার পর যুদ্ধে জিতেছিল? রবার্ট ব্রুস না? ছেলেবেলায় যা পড়তাম খুব মনে থাকতো। আর একটু পড়াশুনো করলে একজন বিদ্বান হয়ে যেতে পারতাম রে।'

'এখনও তো পড়াশুনো করতে পারিস ঘোতন। ওদেশে তো নাইট ক্লাশ রয়েছে।'

ঘোতন মুখ বিকৃত করে বলল, 'ধুর! ভাল ছেলে হতে কোন দিনই ভাল লাগত না। তোদের দেখে দেখে আরও ঘেন্না ধরে গেছে।'

আমারও হঠাৎ রাগ ধরে গেল। বললাম, 'মানুষের সবচেয়ে বড় সুবিধা, নিজেকে দেখতে পায় না।'

ঘোতন বিরক্ত হয়ে বলল, 'এমন ঘুরিয়ে কথা বলিস, বুঝতে পারি না। একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পরে ভেড়া বনে গেলি, আবার তড়পাচ্ছিস। তোরা সব কী রে। জবরদস্ত পুরুষ হতে পারিস না।' বলে বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে বসল ঘোতন।

হঠাৎ লীলাবতীর হাসির আওয়াজ কানে এল। ও যে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গেই ছিল, ভুলে গিয়েছিলাম। কী অসম্ভব মদ খেতে পারে মেয়েটি। ওর চোখ মুখ ফেটে যেন রক্ত বেরোচ্ছে। বললাম, 'আর থাক, মিস দেশপাণ্ডে।'

লীলাবতী চোখের দৃষ্টি স্থির রাখতে পারছিল না। গ্রীষ্মের তপ্ত বাতাসের মত ওর দৃষ্টি শির শির করে কাঁপছিল। মৃদু হেসে ও বলল, 'ভয় পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, অভ্যেস তো নেই—'

ঘোতন আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কি অভ্যেস নেই ব্রাদার, খাওয়া না দেখা?'

'দুটোই।'

'ধীরে ধীরে সব অভ্যেস হয়ে যাবে। আমি প্রথম যেদিন মদ খেয়েছিলাম, উঃ বাপস, সে কী কান্না! কেঁদে কেঁদে একটা নতুন বেডসীট ভিজিয়েই ফেললাম। তারপর দারুণ এক ঘুম। পর দিন উঠে দেখি, খুব বৃষ্টির পর সকালে রোদ উঠলে যেমন হয় না, ঠিক সে রকম। ভারী নির্মল মনে হল নিজেকে। মনে হল, আমি বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ পবিত্র মানুষ। আমার ভেতরের ময়লা, আবর্জনা যা ছিল, ধুয়ে গেল। সেদিন থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যত দিন বেঁচে থাকবো মদ ছাড়বো না।'

লীলাবতী খিল খিল করে হেসে উঠল।

ঘোতন আবার ওঠার চেষ্টা করল। উঠতে না পেরে বলল, 'দুবার হল। তিনবারের বার ঠিক উঠবো। পাও টলবে না, দেখিস, সবই হোল মনের ব্যাপার। যে লোকগুলো মাতলামো করে উত্তম মধ্যম ধোলাই দিয়ে দেখিস, ওরা স্বাভাবিক লোকের চেয়েও অনেক বেশী স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অবিশ্যি স্বাভাবিক স্বাভাবিক বলে যারা চেঁচায়, তারা যে কী অসম্ভব অস্বাভাবিক, তারা যদি জানতো।'

ঘোতনের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে একটা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর দিন কয়েক পরেই আবার পাটনায় ফিরে যেতে হবে। সেই শয়তান দেশপাণ্ডেটা যদিও মুখে হাসি দেখাবে, তলে তলে ছুরি শানাবে। অনিমেষকে ইদানীং আর ভাল লাগে না। কোথায় যেন ওর কৃপণতা লুকিয়ে রয়েছে, বন্ধু বলে স্বীকার করলেও, পুরো মন খুলতে পারে না। এর জন্যে সব চেয়ে বেশী কষ্ট পায় অবশ্য নিজেই, কিন্তু অপরকেও কম বিব্রত করে না। কিভাকে দেখলে মায়া হয়। কেদারবাবু, তাঁর স্ত্রী সবাইকে দেখলেই কষ্ট হয়, অথচ আমার করার কিছু নেই। আর একটা কথাও ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, পাটনায় গিয়ে আমার মাইনে বেড়েছে সত্যি, কিন্তু এক ছিটে ক্ষমতাও হাতে আসে নি। দেশপাণ্ডে যা করছিল তাই করবে। শুধু সাক্ষীগোপাল হয়ে একটা শয়তানের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে যেতে হবে আমাকে।

হঠাৎ ঘোতনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'দেরী করিস না ঘোতন, যত তাড়াতাড়ি হয় আমাকে নিয়ে চল।'

ঘোতন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল, 'দেখলি তো ইচ্ছে করলে মানুষ কি না পারে। দু-দুবার ইচ্ছা করেই ফেল করেছি। এবার দ্যাখ, টুক করে উঠে পড়লাম। আসলে ভেতরে আরজ থাকা চাই। নে চল, ওকি আপনি যাবেন না?'

লীলাবতী ঘাড় নেড়ে বললো, 'না।'

ঘোতন আমার কানে কানে বলল, 'একেবারে অ্যালকহলিক। কোনদিন লীভার ফেটে মরে যাবে, দেখিস। খুব দুঃখের কথা রে অংশু, এত সুন্দরী একটা মেয়ে এভবে মরে যাবে।'

আমার শরীরে নেশা তখন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। গদ গদ কণ্ঠে বললাম, 'তুই ওর একটা ব্যবস্থা কর, ঘোতন। তুই তো বিয়ে করতেই এসেছিস।'

ঘোতন আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'ক্ষেপেছিস! এক মাতাল আর এক মাতলানীকে বিয়ে করে কখনও! তা হলে এত দূরে গাঁটের পয়সা খরচা করে আসার কি দরকার ছিল, আমি চাই সতী লক্ষ্মী বটতলার বইয়ের মলাটের ছবির মতন। ডাগর ডাগর চোখ, বড় করে কপালের মাঝখানে সিঁদুর, সিঁথির সিঁদুর ফিফথ অ্যাভিনুর মত চওড়া আর সরল। কথা কম বলবে, কাজ বেশী করবে। নে ওঠ, কাজের দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

লীলাবতীকে একলা ছেড়ে যেতে বাধল। ওর একটা হাত ধরে বললাম,

'চলুন, একসঙ্গে এসেছি! একসঙ্গেই যাব।'

"চলুন' বলে লীলাবতী আমার হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর এলোমেলো পা ফেলে রাস্তায় এসে নামল। রাস্তায় পা দিয়েই আমার নেশা ছুটে গেল। সর্বনাশ, কেউ যদি দেখে ফেলে!

ঘোতন মনের কথা যেন বুঝল। সুর করে বলতে লাগল, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর ডেথ।'

ঘোতনের কথায় আমার প্রাণে ভরসা এল। বললাম, 'যত তাড়াতাড়ি হয় আমাকে নিয়ে চল ঘোতন।'

লীলাবতী হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল, 'কোথায় নিয়ে যাবে ঘোতন আপনাকে?'

ঘোতন বলল, 'জাহান্নামে।'

লীলাবতী হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'ভারী সুন্দর জায়গা। কোন চিন্তা থাকবে না, ভাবনা থাকবে না, শুধু হাত পা ছড়িয়ে একটি আনন্দের মধ্যে ভেসে বেড়ানো।'

ঘোতন ফিস ফিস করে বলল, 'ইয়াং-কিনীদেরও হার মানিয়েছে মাইরি।'

আমার হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লীলাবতী। বিড় বিড় করে বলল, 'আগে এত ড্রিংক করতাম না। আজকাল করি কেন করি?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল লীলাবতী। 'কেন করি, কেউ জানে না। একটা আগুন সব সময় জ্বলছে, আমাকে পুড়িয়ে মারছে।' লীলাবতী হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় লোকজনের অভাব নেই। এক্ষুণি ভীড় করে লোক দাঁড়িয়ে যাবে। চেনা জানা কেউ থেকেও যেতে পারে তার মধ্যে। কী কেলেংকারী যে হবে! ভাবতে ভাবতে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। কী কুক্ষণেই না আজ ঘুম থেকে উঠেছিলাম। সকালেই একটা বিভ্রাট লেগে গেল।

রাগটা গিয়ে পড়ল ঘোতনের ওপর। ওকে খিঁচিয়ে উঠলাম, সঙের মত দাঁড়িয়ে কী দেখছিস, একটা ট্যাকসি ডাক।'

ঘোতন যেন দারুণ লজ্জা পেয়ে গেল, 'কী অসম্ভব থ্রিলিং ব্যাপার ভাব তো। ব্রড ডে-লাইটে সুন্দরী স্ত্রীলোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস। একজন আর এক-জনকে ধরে রেখেছিস যাতে না পড়ে যায়। অথচ সবাই তোকে ভাল ছেলে বলে জানে।' ঘোতন আপন মনে হাসতে লাগল।

কাতরভাবে বললাম, 'তোর পায়ে পড়ি ঘোতন একটা ট্যাকসি ডাক।' বলতে বলতে একটা ট্যাকসি এসে সামনে দাঁড়াল। লীলাবতীকে নিয়ে উঠে পড়লাম। ঘোতনও এসে বসল। ট্যাকসি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। রাস্তায় বহুলোক, প্রত্যেককেই দেখতে চাইলাম। চেনা জানা কেউ আছে কিনা।

ঘোতন বলল, 'দেখে কোন লাভ নেই. যে তোকে দেখল, তাকে কোনদিন তুই দেখতে পাবি না। সে এতক্ষণে দ্যাখ গিয়ে তোদের অফিসে গিয়ে সেই মহিলাটির কাছে চুকলি খাচ্ছে।'

লীলাবতী হেসে উঠল।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। অথচ লীলাবতীর সামনে ঘোতনের কথার প্রতিবাদ করতে চাইলাম না। কী কথায় কী কথা বলে ফেলবে ঘোতন। ঘোতন আবার বলল, 'চোরের মত এদিক ওদিক না তাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বসে থাক, ভাল লাগবে। আজকের সকালটা কিন্তু চমৎকার, যদিও সকাল এখন আর নেই।'

লীলাবতী সীটের পিছনে মাথা হেলিয়ে বসেছিল। আড়চোখে লীলাবতীকে দেখে নিয়ে ঘোতনকে বললাম, 'আঃ, এত খাওয়াবার কোন মানে হয় না, এখন উনি বাড়িতে ঢুকবেন কী করে!'

'ঠিক চলে যাবেন। আমার এক বান্ধবী নিউইয়র্ক থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে আসত পুরো মত্ত অবস্থায়। ড্রিংক করলে মেয়েরা খুব স্টেডি হয়।'

'ছাই হয়!' আমার কথা শেষ হতে না হতেই লীলাবতী সোজা হয়ে বসল, আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলল, 'হি ইজ রাইট খুব স্টেডি হই আমরা তখন বিশেষ করে চিন্তার ব্যাপারে। এখন যদি আপনার বন্ধুকে হাতের কাছে পেতাম, এখন গালাগাল দিতে পারতাম। অথচ অন্য সময়ে আমি হেল্পলেস হয়ে পড়ি।'

ঘোতন প্রশ্ন করল, 'কার কথা বলছে রে?'

'আছে একজন। পাটনায় থাকে, আমার কলিগ।'

ঘোতন মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল। বললাম, 'কথা বললি না যে।'

'কী বলবো, মেয়েলী কৌতূহল জিনিসটা আমার নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটা মোটেই নতুন না। ওদেশে আখছার এই ব্যাপার দেখে আসছি। দু দিন কান্নাকাটি হয়, বিমর্ষ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারপর যেকে সেই। সেই পুরনো খেলা। নাচ গান মদ খাওয়া হৈ হুল্লোড়। এসব মেয়েরা খুব সেন্টিমেন্টাল হয়, ভীষণ প্রেম করতে ভালবাসে। বিশেষ করে কোন নীরস পুরুষ মানুষের সঙ্গে যে লোকটা মুখে শুধু বড় বড় কথা বলে, কাজে'—ঘোতন বুড়ো আঙ্গুল নাচাল।

বিষম অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তুই তো ব্যাচিলার। মেয়েদের সম্বন্ধে এত জানলি কি করে ঘোতন?'

'ব্যাচিলার বলেই জানতে পারলাম। সে লোকটা জলে হাবুডুবু খেতে থাকে, সে জানে না জলটা কি রকম। পরিষ্কার না নোংরা, গভীর না স্যালো।'

লীলাবতী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আমার দিকে ফিরে বলল, 'হি ইজ রাইট। যারা নেশা করে তারা প্রেমে পড়তে ভালবাসে।'

লীলাবতী যে ঘোতনের প্রতিটি কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিল, ভাল লাগল না। বললাম, 'যারা মদ খায় না, তারা কি প্রেম করে না?'

ঘোতন বলল, 'করে, রয়ে-সয়ে করে। আর এরা করে বন্যার মত। ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

লীলাবতী হেসে আমার গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। লীলাবতীর চুল এসে মুখে লাগল। নরম চুল। একটা ঘন গন্ধ। চুলের মধ্যে আটকে-পড়া গন্ধটা বুক ভরে নিলাম। মদের বিশ্রী গন্ধটা হারিয়ে গেল।

লীলাবতীকে নামিয়ে দিয়ে আমি আর ঘোতন ডালহৌসীর দিকে চললাম। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির। একটা বাজতে চলল। বললাম, 'বাড়িতে বলে আসি নি। মা, বড়মামী খাবার নিয়ে বসে থাকবে, অথবা চিন্তা করবে।'

নির্বিকার মুখে ঘোতন বলল, 'কেউ চিন্তা করলে ভাল লাগে। মা যতদিন বেঁচে ছিল, কত জ্বালিয়েছি। সন্ন্যাসী হয়ে যেবার চলে গেলাম, জানতাম মা খুব কাঁদবে। ভেবে খুব ভাল লেগেছিল। আমেরিকায় যাওয়ার সময়ও একই কথা মনে হয়েছিল, মা কাঁদছে। আর এখন? আমার জন্যে কাঁদার কেউ নেই।' ঘোতন হঠাৎ চুপ করে গেল।

বললাম, 'বিয়ে হলে বৌ কাঁদবে।'

ঘোতন উত্তর দিল না। চুপ করে বসে রইল। রাজভবনের পাশ দিয়ে গাড়ী উত্তর মুখে চলেছে। এই পথ আমার খুব চেনা। আমার ডান পাশে রাজভবনের নীচু পাঁচিল, ধার ঘেঁষে শ্রেণীবদ্ধ গাছগুলো বাঁদিকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর বাড়ীটা, পিছনে রেড রোড। যদিও রেড রোড দেখা যাচ্ছিল না, আমি কল্পনা করতে পারছিলাম, একটা সরল সোজা রাস্তা, মাথার ওপরে গাঢ় নীল আকাশ, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ছবি চোখের খুব কাছে ভেসে উঠল, প্রকান্ড আকাশ, নীচে টিয়া টিয়া রংয়ের দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, আকাশের গায়ে একটা পাখি। পাখিটা উড়ছে না, শুধুই ভাসছে, মনে হল ঘোতনকে এই ছবিটার কথা বলি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, আমার একান্ত ব্যক্তিগত কথা, আর কাউকে বলা যায় না। বলা উচিত না।

ঘোতন অনেকক্ষণ চুপ করে আছে দেখে বললাম, 'কি রে, কি হল?'

ঘোতন যেন ধড়মড় করে জেগে উঠল। হেসে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু।'

আমার মনে হল ঘোতন মিথ্যে কথা বলল। ও স্মৃতিচারণ করছিল। অনেক ক'টা বছর পিছিয়ে গিয়ে ওর মাকে অনুভব করছিল। এক-একজন মানুষ এরকম হয় কেন বুঝতে পারি না। একটা শক্ত আবরণের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। নিজেদের দুঃখ-কষ্ট কাউকে জানতে দিতে চায় না। অথচ একটু আনন্দ-স্ফূর্তি হলে সবাইকে ভাগ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অনিমেষও অনেকটা এই ধরনের মানুষ। ভদ্র আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু যোতনের মত এত সরল না অনিমেষ। এত ধামখেয়ালীও না।

হঠাৎ বলে উঠলাম, 'অনিমেষের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে ভাল হতো।'

'অনিমেষ কে?'

'আছে একজন। সব সময় একটা খোলের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। তুই যেমন থাকিস মাঝে মাঝে।' ঘোতন কথা বলল না। হাসল। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে আগুন জ্বালল।

বাড়ী ফিরে বাধ্য হয়েই মিথ্যে কথা বলতে হল। মা, বড়মামীমা দুজনেই আমার জন্যে সামনের ঘরে বসেছিলেন। আমি যেতেই বড়মামীমা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন, এত দেরী যে।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'অফিসে গিয়েছিলাম।'

মার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, মা খুব চিন্তিত ছিল। আমাকে দেখে মার চিন্তা যদিও আর ছিল না কিন্তু মা যে নিমেষের মধ্যে রেগে গিয়েছিল, তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় নি। আমার কথা শুনে মার মুখের পরিবর্তন পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল। মা খুশী মনে বলল, 'যাওয়া তো উচিতই।'

আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম। বাস থেকে নেমে একটা মুদীর দোকান থেকে গোটা কয়েক ছোট এলাচ খুব করে চিবিয়ে নিয়েছি। এলাচের গন্ধ বড় বেশী উগ্র হয়ে নাকে আসছিল। পরে মা কিম্বা মামীমা এলাচ খাওয়া নিয়ে কোন প্রশ্ন করে বসেন, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। ভাল করে মুখ ধুলাম। চোখ ধুলাম। চোখ বিষম খর খর করছিল।

খেতে বসে বিশেষ কথা বলতে পারলাম না। বার বার লীলাবতীর কথা মনে হতে লাগল। লীলাবতী মেয়ে হয়ে এত মদ খেয়ে গেল, বাড়ীতে এ নিয়ে কেউ কিছু বলবে না, কিম্বা ওর বাবাকে নালিশ জানাবে না। নালিশ জানালে দেশপাণ্ডে কি করবে? বকবে, ওকে শাসন করবে কিন্তু কোথায় যেন দেশপাণ্ডের প্রচণ্ড দুর্বলতা রয়েছে লীলাবতী সম্বন্ধে। সে কি লীলাবতীকে ভালবাসেন বলে, নাকি আর কিছু। কিন্তু আর কি হতে পারে। বাবা এবং মেয়ের মধ্যে অন্য আর কি থাকতে পারে। চুপচাপ খাচ্ছি দেখে মা বড়মামীকে উদ্দেশ করে বলল, 'পাটনায় গিয়ে ও খুব বদলে গেছে। কি রকম চুপচাপ খেয়ে চলেছে। আগে খাবার সময় এত কথা বলতো যে, আমাকে ধমক দিতে হতো।'

হেসে বললাম, 'মানুষ যে কি চায়। আগের চাইতে খেতে খেতে যেন কথা না বলি. আর এখন চাইছো চুপ করে যেন না খাই।'

মা রেগে গিয়ে বলল, 'মোটেই না। আগেও যা চাইতাম, এখনও তা চাই।'

মাকে চটালাম না। দুদিন পরেই চলে যেতে হবে। কি হবে শুধু শুধু মার মনে কষ্ট দিয়ে। আমার মুখ চেয়েই তো মা নিজের সংসার ছেড়ে অন্য একটা সংসারে পড়ে রয়েছে। আর আমি কিনা মদ গিলে এসে কি রকম হেসে হেসে কথা বলছি। তার ওপর যদি মার মনে দুঃখ দিই নিজেই নিজের কাছে ভয়ানক ছোট হয়ে যাব।

খাওয়া-দাওয়ার পর মা এসে পাশে শুল। আমার বুকে একটা হাত রেখে বলল, 'আমি তোকে খুব বিশ্বাস করি।'

হঠাৎ এমন চমকে উঠলাম, হৃদপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এল। আর একটু হলে দম বন্ধ হয়ে যেত। মা একথা বলল কেন। অবিশ্বাসের মত কি করেছি আমি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল, আমার সামনের আমিটা যেন দুর্ধর্ষ শক্তি দিয়ে আমাকে পিছন দিকে ঠেলতে শুরু করেছে। আমি যেন একটা অন্ধকার গুহার দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছি। দু হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম, 'নিতুদাকে ডেকে কথা দিয়ে দাও, ওর বোন সুষমাকেই বিয়ে করবো আমি। পাটনায় বাড়ী করে তোমাদের নিয়ে যাব।'

আমার মনে হতে লাগল আমার মধ্যে কে যেন খুব মাতামাতি করে চেঁচাচ্ছে, মানুষ বাঁচে কেন? মানুষ বাঁচে কিসের আশায়? মানুষ কি বাঁচে শুধু সে মরতে পারে না বলেই? আর কি কোন উদ্দেশ্য নেই? নিজেকে সার্থক করা, অপরকে বিশেষ করে নিজের খুব প্রিয়জনকে সুখী করা কী তার কর্তব্য নয়? স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সুখে থাকাটা কি মানুষের আশা না?

মা আমার কথায় উত্তর দিল না: অনেকক্ষণ ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, এক সময় মা বলল, 'এখন ঘুমো।'

পাটনায় ফিরে আসার পর থেকে একটা অস্থিরতা ক্রমশই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অথচ কিসের অস্থিরতা, কেন অস্থিরতা জানি না। খাচ্ছি-দাচ্ছি কাজ করছি কিন্তু কেমন উড়ু-উড়ু ভাব। একদিন অনিমেষ তো সোজাসুজি বলেই বসল, 'এবারে এসে অব্দি দেখছি কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে থাকো। কি ব্যাপার?'

ওকে কি বলবো, নিজেই জানি না। দায়সারা গোছের উত্তর দিয়ে কথাটা এড়িয়ে গেলাম। লীলাবতী মাঝে মাঝে অফিসে আসে। কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যায়। ও একদিন ওদের বাড়িতে যেতে বলেছিল। যাইনি। ও-ও আর বলে নি। হয়ত বুঝে নিয়েছিল, বললেও যাব না। কিন্তু কেন যে গেলাম না, নিজেও জানি না। দেশপাণ্ডে মাঝে মাঝে চেম্বারে ডেকে পাঠান। নক্সা খুলে এটা-ওটা বোঝান। নতুন ফ্যাক্টরীর বিল্ডিং তৈরী শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সব বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিছুই মাথায় ঢোকে না। হুঁ না করে সরে পড়ি। জয়ন্ত দেশাই চাকরী ছেড়ে চলে গেছে। এসে ওকে আর দেখি নি। ছেলেটা ভাল ছিল। যশোদার শোকে ভীষণ মন-মরা হয়ে পড়েছিল। পালিয়ে বাঁচতে চাইল। জানি না বাঁচতে পারল কিনা। অনিমেষ একদিন নেমন্তন্ন করে খুব খাওয়াল। বিভা অনেক রকম রান্না করেছিল। খুব যত্ন নিয়ে খাওয়াল। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বিভা ধরে ফেলল। আঁচাবার সময় হাতে জল ঢেলে দিচ্ছিল বিভা। হঠাৎ বলে উঠল, 'মন খারাপ।'

চমকে বিভার দিকে তাকালাম। বিভা শান্তভাবে আমাকে দেখছে। ওর চোখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছিল। ওকে খুশী করার জন্যে বললাম, 'হ্যাঁ, মন খুব খারাপ। এত সব রাঁধলে অথচ কিছুই খেতে পারলাম না।' বলে খুব জোরে হেসে উঠলাম। বিভা হাসল না। সে রকম করেই তাকিয়ে রইল। মনে মনে অনিমেষকে গাল দিলাম, স্বার্থপর। শুধু শুধু বিভাকে মাথা খারাপ বলে বিয়ে দিল না। বিভার মত সুস্থ আর বুদ্ধিমতী মেয়ে কজন আছে!

কেদারবাবু আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন। আগে তবু দু-চারটে কথা বলতেন, এখন ঘর থেকে বেরোলেনই না। অনিমেষের মা একবার বললেন, 'ও'র শরীরটা ভাল নেই, তাই শুয়ে আছেন।'

ভদ্রমহিলার জন্য কষ্ট হয়। শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে হয় বলে। হাওয়ায় কেদারবাবুর ঘরের পর্দা উড়ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে দেখলাম, কেদারবাবু চেয়ারে বসে রয়েছেন, আর খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বসেছিলাম। বিশেষ কথাবার্তা হল না। অথচ আগে যখন এ বাড়ীতে নেমন্তন্ন থাকতো সময় কোথা দিয়ে কেটে যেত। বিভা এসে পান দিয়ে গেল। দুটো পান একসঙ্গে মুখে পুরে দিলাম। বিভা বলল, 'আজকাল দাঁত খারাপ হয় না?' মনে পড়ল, আগে বিভা পান দিতে এলে দাঁতের দোহাই দিতাম। বিভা জোর করে পান খাওয়াত, বলতো, পান খেলে দাঁত শক্ত হয়, হজমও ভাল হয়। বিভার কথার উত্তর দিতে পারলাম না। বিভ্রান্তভাবে তাকিয়ে রইলাম।

ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। ন'টা বলতে গেলে সন্ধ্যে রাত। আগে বারোটার আগে উঠতে ইচ্ছে করতো না। অথচ আজ মনে হল, দারুণ ঘুম পেয়েছে। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বো। অনিমেষ সঙ্গে আসছিল। বললাম 'তুমি যাও। একা একা আবার ফিরতে হবে তোমাকে।'

'আগেও একা ফিরতাম।' মনে হল অনিমেষ হাসল, দুজনে চুপচাপ হাঁটছিলাম, হঠাৎ অনিমেষ বলে উঠল, 'ভাবছি একবার কোলকাতায় যাব। বিভাকে ডাক্তার দেখাবো।'

'বিভা তো খুব ভাল আছে।'

'একটু বেশী ভাল আছে। আর এই বেশী ভাল থাকাটাই বিপদের। শুনেছি, কোলকাতায় নাকি ইউ এন ও থেকে একজন ভাল ডাক্তার আসছে। দেখি যদি সুবিধা করে দেখানো যায়।'

'আমার মনে হয় বিভাকে বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অনিমেষ উত্তর দিল না। ইচ্ছে করেই যেন অবান্তর কথা এড়িয়ে গেল।

হোটেলে ঢুকতেই বেয়ারা খবর দিল আমার জন্যে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভদ্রলোককে কামরায় নিয়ে আসতে বললাম। কিন্তু ও যে এত রাত্তিরে ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আসবে, এবং ব্রহ্মচারীর যে এই অদ্ভুত মূর্তি দেখবো কল্পনা করতে পারি নি। ব্রহ্মচারীকে আর একদিনও উদ্‌ভ্রান্ত দেখেছিলাম। সেদিনও উনি খুব বিপদে পড়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন আমি কিছু করতে পারি নি। আজ মনে হল, ব্রহ্মচারী যে শুধু বিপদগ্রস্ত তাই না, উনি একজন সত্যিকারের বিপর্যস্ত মানুষ। একটা প্রচণ্ড ঝড় যেন গোটা মানুষটাকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিয়েছে।

ঘরে এনে ব্রহ্মচারীকে বসালাম। যতটা সম্ভব কোমল কণ্ঠে বললাম, 'আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয় নিশ্চয়ই আমি তা করবো।'

ব্রহ্মচারী কথার উত্তর দিলেন না। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে প্রবল আবেগে ওঁর পিঠ যে ফুলে ফুলে উঠছিল, আমি তা বুঝতে পারছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে ব্রহ্মচারী সেই ভাবে বসে রইলেন। একটা হাত ব্রহ্মচারীর পিঠে রেখে বললাম, 'পুরুষ মানুষকে অনেক বেশী শক্ত হতে হয়।' ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্যে আবার বললাম, 'তাছাড়া আপনার বিপদ নির্ঘাৎ কেটে যাবে। ফাদার্স কমান্ড রয়েছে যখন—'

হঠাৎ ব্রহ্মচারী মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, মানুষের চেহারা যে কত করুণ হতে পারে একটুক্ষণ আগেও বুঝতে পারি নি। ব্রহ্মচারীর চোখে জল, গোঁফ জোড়া নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে, মুখে হতাশা মাখানো। কিছুক্ষণ আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে বললেন, 'ফাদার্স কমান্ড কিছু না। সব বাজে কথা।'

'বাজে কথা?'

'হ্যাঁ চ্যাটার্জিবাবু। আমার বাবা খুব ছেলে বয়সে মারা গিয়েছেন। অসম্ভব মারধোর করতেন, আমাকে। বুড়ো বয়সে আবার বিয়েও করেছিলেন। স্বপ্নে আর যিনিই দেখা দিন না কেন, বাবা যে আসবেন না সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত।' ব্রহ্মচারী চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন, ওঁর এই চ্যাটার্জিবাবু বলে ডাকাটাও অন্তরঙ্গ শোনাল।

'কিন্তু হল কী আপনার?'

একটা উদ্‌গত আবেগ চাপতে চাপতে ব্রহ্মচারী যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লেন, 'পুষ্প চলে গেল চ্যাটার্জিবাবু।'

'পুষ্প কে?'

আবার দুই হাতে মুখ ঢেকে ছেলে মানুষের মত কেঁদে উঠলেন ব্রহ্মচারী, মানুষে যে এভাবে কাঁদিতে পারে জানা ছিল না। মনে হতে লাগল, বহু দিনের সঞ্চিত কান্না প্রবল বেগে ব্রহ্মচারীর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কাঁদুন ব্রহ্মচারী। কেঁদে কেঁদে হাল্কা হোন। প্রথম দিনে থেকেই, কেন যেন মনে হয়েছিল, ভদ্রলোকের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা বিষাদের সুর ক্রমাগতই বেজে চলেছে, সেই সুরটাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুললেন ব্রহ্মচারী। হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন 'পুষ্প একটি গুজরাটি মেয়ে। ওর অন্য নাম ছিল, পুষ্প আমার দেওয়া নাম, ফুলের মত নিষ্পাপ আর সুন্দর বলে ওকে পুষ্প বলে ডাকতাম।'

'ওকে কি আপনি বিয়ে করেছিলেন?'

আমার প্রশ্নে ব্রহ্মচারী যেন শিউরে উঠলেন। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'ছি, ছি পুষ্পকে বিয়ে করবো কি! কত ভালবাসতো, কত ভক্তি করতো আমাকে।' কথাটা কী রকম অদ্ভুত শোনাল, মুখে প্রশ্ন না করে চোখে সেই ভাষাটা ফুটিয়ে তুললাম। ব্রহ্মচারী যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, বলতে লাগলেন, 'প্রায় বছর দশেক আগের কথা। দেশপান্ডে একদিন ওকে নিয়ে এসে বলল, ব্রহ্মচারিয়া একদিন তোমার বহু উপকার করেছি, আমাদের তৈরী স্পেয়ার পার্টস দরকারের সময় তোমার কাছ থেকে বেশী দামে কিনি, তাছাড়া স্টেশনারী থেকে শুরু করে ডিলার অ্যাপয়েন্ট করা, সব ব্যাপারেই তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিয়ে আসছি। সত্যি কথা বলবো মশাই লোকটা আমার খুব উপকার করেছে। না হলে এত দিনে হয়ত ভেসে যেতাম। যাকগে, যা বলছিলাম, পুষ্পকে এনে তো আমার ঘরজ গুছিয়ে দিল দেশপান্ডে।'

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'পুষ্প কি দেশপান্ডের বিয়ে-করা বউ?'

ব্রহ্মচারী যেন আমাকে ধিক্কার দিলেন, 'বিয়ে-করা বউকে আমার ঘরে এনে তুলবে! সেসব কিছু না। পুষ্পকে ও কোথায় পেয়েছিল, সে-কথা আমাকে বলেনি, আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। সম্পর্কটা যতই বন্ধুর মত হোক না কেন, আসলে আমরা যে দুই আলাদা জগতের মানুষ, সে-কথা দেশপান্ডে যেমন বুঝতো, আমিও বুঝতাম। আজ একটাও মিথ্যে কথা বলবো না। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান মশাই, জীবনে অনেক মিথ্যে বলেছি, কিন্তু পৈতে হাতে নিয়ে সত্য ছাড়া মিথ্যা কখনও বলি না।' সার্টের বোতাম খুলে দুই আঙুলের মাথায় পৈতে তুলে ধরলেন ব্রহ্মচারী। ভদ্রলোক যে কেন হঠাৎ আমার কাছে সত্য প্রকাশ করার এমন জিদ ধরে বসলেন বুঝতে পারলাম না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, উনি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। 'আপনি হয়ত ভাবছেন, আপনার কাছে হঠাৎ সত্যবাদী হয়ে ওঠার জন্যে এমন মে[তে] উঠলাম কেন। প্রশ্নটা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। আমার মনেও এ-ধরনের প্রশ্ন জাগতো। কিন্তু এই প্রশ্নের একটা খুব উত্তরও আছে। প্রত্যেক মানুষের সহজ[া] বৃত্তি হচ্ছে এক সময় না এক সময় নিজে পাপ স্বীকার করে নেওয়া। কেউ কর[ে] গোপনে, কেউ করে প্রকাশ্যে। সাহেব করে চার্চে গিয়ে পুরোহিতের সাম[নে]। কেউবা সেই সুযোগ-সুবিধা সারাজীবন পায় না। পাপের বোঝাটা আজীবন ব[য়ে] বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় চো[খের] জলের মধ্য দিয়ে সেই বোঝা হাল্‌কা ক[রে] নেয়। আমি সেই সুযোগটা এখনই নি[তে] চাই চ্যাটার্জিবাবু। এত লোক থাক[তে] আপনাকেই বা শ্রোতা হিসাবে বেছে নি[লাম] কেন, এমন একটা প্রশ্ন হয়তো আপ[নার] মনে জাগতে পারে। জাগাটা খু[ব] স্বাভাবিক। আসল কথাটা কী জা[নেন], প্রত্যেক মানুষই উপযুক্ত আধার খোঁ[জে]। আমি যা বলবো, তা যেন উপযুক্ত পা[ত্রের] কাছে বলতে পারি। আমার ব্যথা-বে[দনা] সেই মানুষটি যেন পুরোপুরি অনু[ভব] করতে পারে। 'একটা সান্ত্বনা পেতে মানুষ, এই আর কি!' এক নাগাড়ে কথা বলে ব্রহ্মচারী যেন হাঁপিয়ে পড়ে[ন]।

ধীরে ধীরে ওঁর অস্থিরতা অ[নেকটা] কমে এল। অনেক স্বাভাবিক হয়ে এ

তুলি। এতদিন ব্রহ্মচারী নস্যি নেবার সময় আমার দিকে পিছন ফিরে সেই কাজটা সমাধা করতেন। আজ চোখের সামনেই নস্য করে নস্যি নিয়ে নোংরা রুমাল দিয়ে নাকের নীচটা মুছে নিলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে নেশার মৌজ উপভোগ করলেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করলেন, 'লীলাবতী তখন খুবই ছোট। ওর মা হঠাৎ মারা গেল। ছোট মেয়ে কে দেখে-শোনে, সমস্ত দিন একা-একা থাকতে হয়, মন গুমরে থাকে, দেশ-পাণ্ডে একদিন লীলাবতীকে নিয়ে বম্বে চলে গেল। লীলার এক মাসী থাকতো সেখানে। ফিরে এল পুষ্পকে নিয়ে। তখন অবশ্য ওর নাম পুষ্প না। অন্য কিছু। সে নাম আমার মনে নেই।'

দেশপাণ্ডে পুষ্পকে বিয়ে করলেন না কেন?'

'কি জানি। হয়ত লীলাবতী এ বিয়ে মানবে না, চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করবে, তাই। ওর অবিশ্বাস কিনা মেয়েকে। সেই থেকে পুষ্প আমার কাছে ছিল। মাসে মাসে ওর নাম করে দেশপাণ্ডে আমাকে টাকা দিত। সেই টাকা থেকে একটা পয়সাও আমি খরচ করি নি। এই দেখুন,' বলে একটা পকেটের পাশবই আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন ব্রহ্মচারী, খুলে চক্ষুস্থির। চল্লিশ হাজার টাকার ওপরে পুষ্পর নামে জমা রয়েছে পাশ বইয়ে।

বললাম, 'এত টাকা ফেলে চলে গেল?'

ব্রহ্মচারী কান্নার মত করে হেসে বললেন, 'পাঁকে যে পদ্মফুল ফোটে, কথাটা শুধুমাত্র সাহিত্যের কথা না চ্যাটার্জিবাবু। পুষ্পকে না দেখলে কোনদিন হয়তো আমিও বিশ্বাস করতাম না সেই কথা। ও যে কি ভাল আর কত দয়ালু ছিল কি বলবো! একবার আমার খুব জ্বর হল। জ্বরের ঘোরে নাকি খুব ছটফট করছিলাম; পুষ্প আমার মাথা কোলে নিয়ে সমস্ত রাত বসেছিল। মায়েরা যেমন অসুস্থ সন্তান নিয়ে বসে থাকে, ঠিক সে রকম। লখিয়া পরে সে কথা বলেছিল আমাকে। লখিয়া আমার বাড়ির ঝি। ব্রহ্মচারীর চোখে জল চিক চিক করে উঠল আবার।

• হঠাৎ আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। 'পুষ্পর টাকাটা এখন কি হবে?'

ব্রহ্মচারী দেশলাইয়ের মত ফস করে জ্বলে উঠলেন, 'শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ঘুরবো। পুষ্পকে খুঁজে বার করতেই হবে। যেমন করেই হোক বোঝা হালকা করতে হবে।'

'এত বড় জগৎ, অসংখ্য মানুষ, কোথায় খুঁজে পাবেন ওকে?'

'খুঁজে ঠিক পেয়ে যাব।'

'কিন্তু আপনার এই ব্যবসা?'

'কোলকাতায় চিঠি লিখে দিয়েছি। দুই ভাইপো থাকে সেখানে। ওদের আসতে লিখেছি। ভেবেছি, ব্যবসাটা ওদেরই লিখে দিয়ে যাব।'

'কিন্তু আপনার চলবে কি করে রতন-বাবু?'

'একটা মানুষ, চলে যাবে কোন রকমে। নিজের জন্যে ভাবি না। চিন্তা যা কিছু এই বোঝাটার জন্যে, শেষ পর্যন্ত খুঁজে যদি ওকে না-ই পাই, বা ধরুন পুষ্প যদি মরে গিয়ে থাকে, ও খুব অভিমানী কিনা, আত্ম-হত্যা করাও বিচিত্র নয়, তাহলে এটা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যাব।' ব্রহ্মচারী এমনভাবে কথাটা বললেন যে, সরাসরি অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

ব্রহ্মচারী আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'যাবে না! কত অপমান সহ্য করতে পারে একটা মানুষ। লীলাবতী আগেও একবার ওকে অপমান করেছিল। অনেক করে হাতে-পায়ে ধরে সেবারে পুষ্পকে ঠাণ্ডা করে-ছিলাম। কিন্তু এবারে সে সুযোগটাও পেলাম না।' ব্রহ্মচারী আবার ভেঙে পড়লেন।

ওঁর পিঠে একটা হাত রেখে বললাম, 'বিপদ যেমন অতর্কিতে আসে, আবার কেটেও যায়। দেখবেন একদিন পুষ্প আবার ফিরে আসবে।'

ব্রহ্মচারী যেন আমার কথা শুনতেই পেলেন না। মুষ্টিবদ্ধ একটা হাত বাতাসে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলতে লাগলেন, 'আমিও ব্রহ্মচারীর ব্যাটা, আমিও দেখে নেব মশাই। লীলাবতীকে আমিও দেশছাড়া করবো। আমার মনের আগুন ওর মনেও জ্বালাবো।' ব্রহ্মচারীর চোখ জ্বলতে লাগল।

'কিন্তু লীলাবতী তো একজন দুঃখী মানুষ। ওর দুঃখ আর বাড়িয়ে লাভ কি রতনবাবু।'

ব্রহ্মচারী ছেলেমানুষের মত ঘাড় নাড়তে লাগলেন, 'দুঃখী-সুখী বুঝি না। দোষীকে শাস্তি পেতেই হবে। অনিমেষ-বাবুকে সব বলে দেব। আপনি ভেবেছেন সব শুনলে অনিমেষবাবু আর ওর দিকে চোখ তুলে তাকাবে!'

অপরিসীম বিস্ময়ে ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে রইলাম, ধীরে ধীরে ব্রহ্ম-চারী চোখের সামনে থেকে সরে গেল। লীলাবতী এসে দাঁড়াল সেখানে। লীলাবতীর সারা মুখে, কপালে চন্দনের ফোঁটা, কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ। লীলাবতীর চোখের জলে গায়ের ফোঁটাগুলো ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে। লীলাবতী অঝোরে কাঁদছে, আর তাঁর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, তুমি, তুমি, তুমি। ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারতে। কি আশ্চর্য, এমন একটা দৃশ্য যে হঠাৎ দেখবো ভাবতে পারি নি। নিমেষের জন্য চোখ বুজেই আবার তাকালাম। লীলাবতী নেই। ব্রহ্মচারীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমাকে দগ্ধাচ্ছে। ব্রহ্মচারীর একটা হাত ধরে বললাম, 'অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না রতনবাবু। আপনি লীলাবতীকে ক্ষমা করে দিন। আপনি যেমন পুষ্পকে ভালবাসেন, ও-ও তো অনিমেষকে সে রকমই ভালবাসে। শুধু শুধু এত গভীর একটা ভালবাসাকে মেরে ফেলবেন!'

আমার কথা বলার মধ্যে আবেগ ছিল। ব্রহ্মচারীকে হয়ত স্পর্শ করল। নিমেষের জন্য তিনি যেন থমকে গেলেন। আবার বললাম, 'ভাল কাজ করলে মানুষ ভাল ফল পায়। দেখবেন, আপনি ঠিক পুষ্পকে ফিরে পাবেন।'

আমার একটা হাত দুই হাতের মধ্যে নিয়ে ব্রহ্মচারী বলে উঠলেন, 'ঠিক বলছেন?'

'হ্যাঁ ঠিক বলছি। নিজের জীবনে বহু-বার দেখেছি, ভাল কাজ করলে মানুষ ঠিক ভাল ফল পেয়ে যায়। একবার না হয় বিশ্বাস করে দেখুন।' লীলাবতীর জন্যে এই আকুলতা নিজের কানেই অদ্ভুত শোনাল। লীলাবতী আমার আপনজন না, বরং একজন খুব দূরের মানুষ। শুধু যে দূরের তাই না, সত্যি করে বলতে গেলে, আমার শত্রুপক্ষ। যে দেশপাণ্ডে আমার অমঙ্গল ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই করে না, সেই দেশপাণ্ডের মেয়ে লীলাবতী। শুধু-মাত্র মেয়েই না, অত্যন্ত ভালবাসার পাত্রী। বলতে গেলে নয়নের মণি, লীলাবতীকে আঘাত করতে পারলে, সেই আঘাতের তরঙ্গ এসে দেশপাণ্ডের বুকে লাগবেই। সব বুঝতে পেরেও এই মুহূর্তে লীলা-বতীর অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার মধ্যে যেন একটা নিষ্পাপ মানুষ আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, যেভাবেই হোক লীলাবতীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাও।

ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ওঁর মুখে-চোখে অসহায় বিহ্বলতা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ব্রহ্মচারী। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'অনেক মিথ্যে বলেছি, আপনার নামে দেশপাণ্ডের কাছে, অনেক চুকলিও খেয়েছি। যদি পারেন মার্জনা করবেন।' বলে ব্রহ্মচারী আর দাঁড়ালেন না। দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ।

(ক্রমশ)

সারা বছরই কলকাতার চিড়িয়াখানা জমজমাট। বিশেষ করে ছুটিছাটার দিন হলে তো আর কথাই নেই! তবে গ্রীষ্ম বর্ষার তুলনায় শীতকালেই যেন এর জলুস উথলে ওঠে, জনসমাগম হয় বেশী। বড়দিনের সময় বা নিউ ইয়ার্স ডে'র মত বিশেষ বিশেষ দিনগুলিতে এখানে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। নানা জাতীয় লোকের ভিড়ে, আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দ-কোলাহলে গম-গম করতে থাকে সারা চত্বর। কোথাও কেউ সপারিবারে বসে টিফিন-কেরিয়ার খুলে ডিম সেদ্ধ, লুচি, আলুর দম খাচ্ছে, আবার কোথাও কেউ বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি বা চায়ের সঙ্গে গলাধঃকরণ করছে স্যাণ্ডুইচ, পেস্ট্রি, কেক। কেউ বা সাদা-সাপটা চকলেট বা কমলালেবুর কোয়া চুষেই খুশি।

ছেলেমেয়েরা হাতির পিঠে চাপছে, পনির উপর চড়ে কেউ এক চক্কর দিয়ে আসছে। ভিড় বেশী বাঘ-সিংহের ঘরের কাছে। সাপ, পাখীর ঘরেও দলে দলে লোক ঢুকছে-বেরুচ্ছে। এ ছাড়া কচ্ছপ, ক্যাঙারু, জিরাফ, ভাল্লুক, হিপো, পাণ্ডা, ময়ূর প্রভৃতিও মন দিয়ে দেখে অনেকে। তাছাড়া আরও আছে গণ্ডার, জেব্রা, অস্ট্রিচ, উট, বন-মানুষ, সিম্পাঞ্জি ও নানা জাতের বেবুন।

এই জু-গার্ডেন শুধু ছোটদেরই আকর্ষণ করে না, বড়রাও এ থেকে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক পান। অনেকে সকালের দিকে প্রাতঃভ্রমণেও এই মনোরম বিচিত্র বাগানে গিয়ে থাকেন। কি জানি কেন পরিণত বয়সেও এই চিড়িয়াখানা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। নানা মরসুমী ফুলের সমারোহ, সবুজ গাছ-পালার স্নিগ্ধতা আর বিস্তৃত তড়াগের বুকে যাযাবর পাখীদের কলধ্বনি মনকে কলকাতার এই পূতিগন্ধময় পরিবেশ ও যানবাহনের অসহ্য আওয়াজের স্রোত থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও যেন অন্য জগতে নিয়ে গিয়ে ফেলে, শরীরের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার উপর নিরন্তর যে টেনশন চলে, তা যেন কোন ট্রাংকুলাইজার খাওয়ার মত কিছুক্ষণের জন্য প্রশমিত হয় এই চিড়িয়াখানায় এলে।

কলকাতার এই চিড়িয়াখানা সৃষ্টির মূলে যে একজন বাঙালী তা আজ হয়ত অনেকের স্মরণে নেই এবং ইদানীন্তন-কালের অনেকে হয়ত জানেনও না। এই বাঙালী ভদ্রলোকের নাম রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল।

এই রামব্রহ্ম সান্যালের জীবনবৃত্তান্ত ও কলিকাতায় চিড়িয়াখানা সৃষ্টির বিষয় 'প্রকৃতি' নামক পত্রিকার ২য় বর্ষের (অগ্রহায়ণ, ১৩১৫) ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধটি এখানে তুলে দেওয়া হল। রামব্রহ্ম সান্যালের মৃত্যুর পর ডাঃ পরেশ-রঞ্জন রায় কর্তৃক এই নিবন্ধটি লিখিত হয়।

স্বর্গগত রামব্রহ্ম সান্যাল

"বহরমপুরের অন্তর্গত মুহুলা গ্রামে রামব্রহ্মের পিতৃভবন। ইঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ সান্যাল ও মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী। ইঁহারা খুব নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বহরমপুরেরই অন্তর্গত লালগোলা নামে আরও একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এখানে রামব্রহ্মের মাতুলালয়। ইঁহার মাতুল শ্রীনাথ ভট্টাচার্য লালগোলার রাজার গুরু ছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মাতুলালয়ে রামব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেন। রামব্রহ্ম শিশু-কাল হইতেই অতিশয় ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইঁহার জীবন চিরদিনই অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের ছিল। সুতরাং প্রথম জীবনে কোন ঘটনাবৈচিত্র্য নাই। সাধারণ বালকের ন্যায় যথাসময়ে পাঠ আরম্ভ করিয়া অল্প বয়সেই বহরমপুর কলেজ হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিন বৎসরকাল মাত্র অধ্যয়ন করেন। বাধ্য হইয়া অসময়ে পাঠ ত্যাগ করিতে হয়। নানা কারণের মধ্যে অর্থের অস্বচ্ছলতাই প্রধান।

মেডিকেল কলেজে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জুলজি অথবা জীববিজ্ঞান এবং বোটানি অথবা উদ্ভিদবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ও পাঠ করিতে হয়। রামব্রহ্ম যখন এই দুই বিষয় পাঠ করেন, তখন প্রকৃতি পর্যালোচনা করা তাঁহার অভ্যাস হয়। এবং এই সময় হইতেই তিনি পশু-পাখীদের জীবনতত্ত্ব বিশেষ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য বালকদের ন্যায় তিনি শুধু পুঁথি পড়িয়াই যাহা জানিবার তাহা জানা শেষ হইল, এরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। যখন্ সুযোগ ও অবসর ঘটিত তখনই [illegible] পশু-পাখীর জীবনের সকল কথা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, যেখানে গেলে প্রত্যক্ষে এ সব দেখা যায় সেখানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন।

তখন চিড়িয়াখানা ছিল না। সুতরাং যখন ইচ্ছা তখনই ছুটিয়া সেখানে যাওয়া চলিত না। তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি যে, ছুটির জন্য কত আগ্রহে তিনি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। ছুটী হইলেই [illegible] চলিয়া যাইতেন ও দুষ্টু ছেলের [illegible] ঝোপে গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পাখীদের বাসা বাঁধা, ডিম পাড়া, ছানা তোলা, এ সব বিষয় যতদূর সম্ভব মন দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। এই প্রকার পর্যা-লোচনার ফলেই তিনি ক্রমে [illegible] হইতে পারিয়াছিলেন।

এ দেশে তখন জর্জ কিং [illegible] (পরে তিনি সার উপাধি পান) নামে একজন [illegible] উদ্ভিদবিদ পণ্ডিত ছিলেন। [illegible] প্রকৃতি পর্যালোচনেচ্ছু স্বভাব [illegible] ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে [illegible] ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় চিড়িয়াখানা স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন তাঁহার [illegible] রামব্রহ্ম প্রথম কার্যপরিদর্শক নিযুক্ত [illegible] কোথায় কোন্ ঘর, কি রকমভাবে করিতে হইবে এ সব কাজে তাঁহারই আদেশ মত সকল লোক খাটিতে আরম্ভ করে। তিনি ইহার আগে চিড়িয়াখানা কখনও দেখেন নাই, তাঁহার পক্ষে ২৫ বৎসর বয়সে এইরূপ গুরুতর একটি কার্যভার পাওয়া সামান্য গৌরবের কথা নহে। আজকাল চিড়িয়াখানা যেভাবে গঠিত এবং সুসজ্জিত, তাহা য়ুরোপের বিখ্যাত বিখ্যাত চিড়িয়াখানা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। পাখীর ঘরে প্রকৃতির মাঝখানে পাখী যেভাবে থাকিতে যতদূর সম্ভব সেইভাবেই সেই ঘরটিকে সাজান হইয়াছে। বানরের ঘরে...ডালে ডালে বানর যেমন লাফালাফি করিয়া বেড়ায় তারও বন্দোবস্ত রহিয়াছে। গণ্ডার যেখানে সেখানে গেলে...তার কাদায় পড়িয়া গড়াইবার বন্দোবস্ত ঠিক আছে। উটপাখীগুলির জন্য বালুকাময় প্রান্তর সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সাপের জন্য পাথর দিয়া গর্ত ও [illegible]

...দি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জিরাফের ... প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়াতলে বাসস্থান ... হইয়াছে। ভোঁদড়ের জন্য মৎস্য-... ক্ষুদ্র সরোবর সাজান হইয়াছে। কি ... করিয়াছেন তিনি ভাবিয়া পাওয়া যায় ... কেবল বাঘ, সিংহ, নেকড়ের জন্য ...লা নির্মিত হয় নাই, কেন না তাঁহার ...জ্ঞতা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, ঐ ... জন্তুকে যতই স্বাভাবিক অবস্থায় ... যায়, ততই উহারা উহাদের ভয়ংকর ... রক্ষা করিবার পক্ষে সুবিধা পায়। ...জন্তুরই এই একই কথা। তবে ... ও বলবান জন্তুদের যতদূর সম্ভব ...তে রাখাই ভাল। তা ব'লে, ভালুকদের ... কড়াকড়ি নিয়ম করে অস্বাভাবিক ...থায় রাখা হয়নি। ওদের জন্য ডাল-...শুদ্ধ গাছ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বলিতেছিলাম যে, এই চিড়িয়াখানাটি—... ভাল করিয়া সাজান, সুন্দর জায়গাটি; ...নে গিয়া কত বালকবৃদ্ধবনিতা, কত ...লী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, কত আরাম ...রে, সুখ পায়—এই সুন্দর স্থানটি ...টি বাঙ্গালীর কীর্তির স্মৃতিচিহ্ন। ...দিন চিড়িয়াখানা থাকিবে, ততদিন ...ালীর গৌরবের এই কীর্তিস্তম্ভ সকল ...দের হৃদয়ে আনন্দদান করিবে সন্দেহ ...।

১৮৭৫ সন হইতে বহুবর্ষ পর্যন্ত ... কার্য পরিদর্শকই ছিলেন। ক্রমে ... বাগান সাজান হইল, ঘর প্রস্তুত হইল, ... একটি দুইটি করিয়া পশু-পাখী ...তে হইতে আরম্ভ হইল।...১৫ বৎসর ...তে অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র একটি ...রূপে এই চিড়িয়াখানা স্বীয় জীবনের ... অবস্থা অতিবাহিত করিয়াছে। ...পর প্রায় ১৫ বৎসর পরে রামব্রহ্মের ... স্থানটি খুব বাড়িয়া উঠিল। তখন ...মেণ্ট ইঁহাকে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত ...রেন। ইনিই ইহার প্রথম কার্য পরি-...ক ইনিই ইহার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) কিন্তু চিরদিনই ইনিই ...র প্রধান নায়ক ছিলেন।

সমস্ত জীবজন্তুরই জীবন-কাহিনী ...নি এত ভালরূপে বুঝিতেন যে, যে দেশ হইতেই কোন নূতন জন্তু এখানে প্রেরিত হইত অতি সহজে তিনি উহার প্রতি-পালনের ভার স্বহস্তে লইয়া উহার সকল প্রকারের ব্যবস্থা অতি সুন্দর রূপে করিয়া দিতে পারিতেন। ইহাদের জীবন এত সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি পশু-চিকিৎসা বিদ্যা বিশেষ-রূপে অধ্যয়ন করেন নাই, তবু স্বাভাবিক উপায়ে উহাদের রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থাও নিজেই করিতে পারিতেন। এমন কি 'Treatment of Animals in Captivity' পোষা জন্তুদের (চিকিৎসা) নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা ও তাঁহার রচিত 'Hours with Nature' (প্রকৃতির সহিত কালযাপন) নামে আর একখানা গ্রন্থ ইউরোপের জীববিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট অত্যন্ত আদর ও প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

তাঁহার স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই দুইখানি পুস্তক তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ করে। ইহা ছাড়া অতি সহজ ও সুললিত ভাষায় 'বিজ্ঞান পাঠ' নামে একখানা পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।...

তাঁহার মধ্যে যে গুণের সম্ভাবনা আছে তাহার আভাষ পাইয়াই জীব-নিবাস স্থাপনরূপ একটি মহৎ কার্যের ভার অকাতরে তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। এবং অসীম উদ্যমে ইনি এই জীব-নিবাসের অশেষ উন্নতি সাধনে যত্নবান ছিলেন বলিয়াই তাহার একমাত্র পরিচালকরূপে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার গুণের আদর বই আর কি? তারপর বড়লাট হইতে সকলে সরকারী বেসরকারী ইংরেজ ও বাঙ্গালীর নিকটই ইনি চিরদিন সম্মানের আসন লাভ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার গুণের এত আদর করিতেন যে, ১৮৯৮ সনে যখন ইউরোপে জীবতত্ত্ববিদগণের এক মহাসভা হয় যে সভাতে পৃথিবীর বড় বড় ও বিখ্যাত জীববিদগণ উপস্থিত হইয়া জীববিজ্ঞান আলোচনা করেন, সেই মহাসভাতে গবর্ণমেন্ট ইঁহাকে প্রতিনিধি-স্বরূপে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি একাকী কিরূপে কলিকাতায় জীবনিবাস স্থাপন করেন, একথা বর্ণনা করেন। ইউ-রোপে যে কয়েকটি জীব-নিবাস আছে তাহার সকলগুলিই প্রকাণ্ড কমিটি ও দেশের যত বড় বড় জীববিদগণ আছেন সকলের মিলিত যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। আর ভারতের একমাত্র জীব-নিবাস যাহা ইউরোপের জীব-নিবাসের সহিত তুলনায় কোন অংশে নীচ হইবে না, এরূপ একটি জীব-নিবাস একজন মাত্র লোকের চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যমের ফল, ইহা কি কম বিস্ময়ের কথা! সকলে মুক্তকণ্ঠে এবিষয়ে ইহার প্রাধান্য অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে ইউ-রোপের সকল জীব-নিবাস ও জীবসংগ্রহ পরিদর্শন করিয়া ১৮৯৮ সনের মধ্যভাগে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানেও অনেক গণ্যমান্য লোকের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মে। তন্মধ্যে ডিউক অব বেডফোর্ড (Duke of Bedford) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহার পর দেশে প্রত্যাগত হইয়া দুই তিন বৎসর পরই তিনি কার্য হইতে অব-সর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইঁহার মত সুযোগ্য লোককে কি সহজে কেহ ছাড়িতে চায়? গবর্ণমেণ্টও ইঁহাকে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ না করি-বার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সর-কারী নিয়ম অনুসারে ৫৫ বৎসর বয়সে সকলকেই অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইনি কিন্তু তাহার পরও তিন বৎসর সাত মাস কাল কাজ করিয়াছেন। ইহা হইতেই তোমরা দেখিতে পাইতেছ তাঁহার গুণের কত আদর হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার গুণের মর্যাদাস্বরূপ ইঁহাকে অযাচিতভাবে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়া-ছিলেন।"

—জপপক

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী
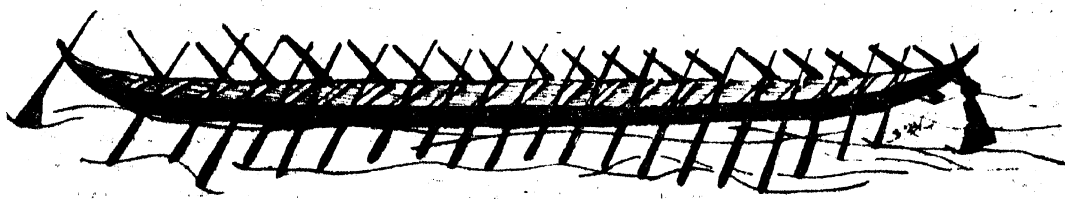
সম্মানিতা

দেশবন্ধু জায়া ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের মাতামহী বাসন্তী দেবী এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ও দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্তের সহধর্মিণী নেলী সেনগুপ্তা এবার সাধারণতন্ত্র দিবসে পদ্মবিভূষণ সম্মানে বিভূষিত হয়েছেন।

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা

অঙ্গনা

স্বামীকে বুঝে চলুন

সংসার বড়ো কঠিন ঠাঁই। কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, সংসার তো নয়—সঙ-সাজ অর্থাৎ আমরা সবাই সঙের মতো। আর সত্যিকথা বলতে কি বিবাহিত জীবনের পরই এই সঙ-সাজা শুরু হয় এবং এই রসিকতা থেকে সংসার রক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নারীর। দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি তারই উপর নির্ভর করে। এজন্য প্রথমেই তাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলো স্বামীর মন বুঝে চলা। তা বলে মন জুগিয়ে চলার কথা বলছি না। সংসারকে সঙ-সাজার হাত থেকে বাঁচানোর এটাই প্রথম শর্ত। স্ত্রীর পক্ষে এ হলো এক বিরাট পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে ভবিষ্যতে দাম্পত্যজীবনের মধু-নির্যাস থেকে কখনো তাকে খুব বঞ্চনা সইতে হবে না।

স্বামীকে বুঝে চলার অর্থ তার প্রতিটি আচার-আচরণ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যথাযথ ওয়াকিবহাল থাকা। পুরুষের জীবনে স্ত্রীর প্রভাব খুবই ব্যাপক। বিয়ের পর পুরুষের জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে তার জন্য মূলতঃ স্ত্রীই দায়ি, তার প্রকৃতি এবং ব্যক্তিত্ব স্ত্রীর প্রভাবে অনেকখানি নতুন রূপ পায়। স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীও স্বামীর ব্যক্তিত্বে এইরকম প্রভাবিত হয়। আসল কথা যে, দুটি ভিন্ন বংশানুক্রম এবং স্বতন্ত্র পরিবেশজাত ব্যক্তিত্ব নতুন জীবনের পথ সন্ধান করে। তাদের মধ্যে নিটোল বোঝাপড়া দরকার। এবং স্ত্রীর দিকে সে দায়িত্ব বর্তায় বেশি। বংশ প্রভাব জীবনের গভীরে শিকড় বিস্তার করে। নারীর ব্যক্তিত্ব সন্তান ধারণে আংশিক প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী হলো পরিবেশের প্রভাব। পরিবেশ অর্থে পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী এবং সমাজ সবই। আবার একই পরিবেশে সবাই এক রকম হয় না। বাড়ির বড় আর ছোট ছেলের মধ্যে তা ভিন্নরূপে বর্তমান। স্বামীর সংসারে স্ত্রীকে প্রথমে এই পরি-বেশের ভিন্নতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এ কাজ খুব একটা সহজ নয়। তবে স্বামী সাহচর্যই এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে। তাই স্বামীকে বুঝে চলাই স্ত্রীর সবচেয়ে সহজ। তা হলেই সর্বদিক মানিয়ে নেওয়া চলে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষেও তা সুখকর।

স্বামীকে বুঝে চলার জন্য কোন বিশেষ মুহূর্ত বেছে নেওয়া সঠিক নয়। কোন এক পরিস্থিতি এবং ঘটনায় স্বামীর কি প্রতিক্রিয়া হলো তা থেকে তা সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। বরং তার কা কর্ম, সঙ্গীসাথী, অবসর বিনোদন মানসিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনু করতে হবে। সন্তান হওয়ার পর এর পরিবর্তন এতে স্ত্রীকে নজর রাখতে হ বিশেষ করে এ সময় স্বামীর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন দা দায়িত্বের মুখে স্বামীর মানসিকত রূপান্তর ঘটে। কোন কোন স্বামী হয় এ সময় এমন উক্তিও করে বসেন যে, চেয়ে বিয়ে না করাই ছিল ভাল। এক জীবনই সুখের। দায়িত্বের উপর দ এসে জুড়ো হতো না। প্রতিদিনের স্বামীর এ এক অন্যরূপ। এ সময় কি স্ত্রীকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। উত্তে হয়ে মুখের মতো জবাব দিয়ে বা জুড়োবার লোভ সংবরণ করতে হবে। অ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে স্বামী এ অযথা চিন্তিত না হন। এবং তাকে সা জোগানোই হবে স্ত্রীর কাজ।

সারাদিন পর স্বামী বাড়ি ফি আসেন। স্ত্রীর কাছেও এই ফিরে আ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দিনের শেষে স্ব যেমন ঘরে ফিরতে চান তেমনি স্ত্রীও স্বামীর সাহচর্য। উভয়ের সমাভিম চিন্তায় এই মুহূর্ত মধুর হওয়া স্বা বিক। কিন্তু এক দিন দেখা গেল স্বাম মনমেজাজ খুব খারাপ, কথায় কথায় তি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। এ পরিস্থিতি স্ত্রীকে সুদক্ষ কাণ্ডারীর মতো হাল ধর হবে। স্বামীর মনোবেদনার কারণ জান হবে। এবং যথেষ্ট সহানুভূতিসহকা স্বামী অফিস বা কাজ থেকে ফেরার স্ত্রীকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আ বাজে কথাবার্তা একদম নয়। হাসিম

স্বামীকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। ক্লান্তি অপনোদনে স্বামী যে ধরণের বিশ্রাম পছন্দ করেন তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। অফিস থেকে ফিরে কেউ লম্বা হয়ে গড়িয়ে নিতে ভালবাসেন। আর সেই সুযোগে হালকা গল্পের বইয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেন। আবার কেউ বা রেডিও শুনতে ভালবাসেন। স্ত্রীকে সেরকমই ব্যবস্থা রাখতে হবে। সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা বলার সময় এখন নয়। এ সব কথা পাড়লেই এখন গোল বাঁধবে। শান্তির বদলে অশান্তির তুফান ছুটবে। স্বামীর মন বুঝে চলার পরিবর্তে তা হবে মন না বুঝে চলা।

স্বামী যেটুকু সময় বাড়িতে কাটায় সেটুকুই কিন্তু তাকে বোঝার পক্ষে সম্পূর্ণ নয়। অনেক স্ত্রী সন্ধ্যার পর স্বামীর বাইরে যাওয়া পছন্দ করে না। তারা ওজর দেখান, এই তো খেটেপিটে এলে আবার এক্ষুণি কোথায় যাবে! আসলে এ সময় স্বামী বাইরে থাকুক এটা তাদের মনঃপূত নয়। আবার স্বামী যদি একরাত্রে বাইরে কাটান তাহলে তো কথাই নেই। স্ত্রী তখন তাকে নানাভাবে সন্দেহ করতে শুরু করবেন এবং কটু কথা বলতেও ছাড়বেন না। এভাবে দু এক কথায় অশান্তি অনেক দূর গড়াবে। আবার এমন অনেক স্বামী আছে যারা গর্বভরে বলে বেড়ায় যে, স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও যাওয়া তারা পছন্দ করে না। স্ত্রীর দোষ-গুণ এখানে কোন প্রশ্ন নয়। যদি এমন হয় যে, স্ত্রীকে নিয়ে বেরুলেই সে কেনাকাটা করতে চায় অথবা আরো নানারকম বায়না ধরে তাহলেই শুধু এ ধরনের কথা উঠতে পারে। তবে স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী যদি কোথাও না যান তাও ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে স্ত্রীর দোষ শুধরে নেওয়া হবে স্বামীর কর্তব্য।

আগেই বলেছি যে, বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর যে রূপ দেখেন সেটা কিন্তু তার অরিজিনাল রূপ নয়। ইতিমধ্যে স্ত্রীর সংস্পর্শে এসে স্বামীর বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। স্ত্রীর সচেতন প্রয়াসে যদি এমন হয় সেটা স্বতন্ত্র কথা। তবে এ ব্যাপারে অনেক সময় তার সজ্ঞান ভূমিকাও থাকে। এ সব ছাড়া এমনিতেই বিয়ের পর পুরুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে। এবং তা হলো অভিভাবকত্বজনিত। সে যে নতুন অভিভাবক পদে বৃত হলো এ সেই পরিবর্তন। এ ছাড়াও আরো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বামীর পরিবর্তন দেখে আপনি দুঃখ প্রকাশও করতে পারেন আবার খুশিও হতে পারেন। আপনি হয়তো লক্ষ্য করলেন যে, আপনার স্বামী আর কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে আগের মতো উৎসাহ প্রকাশ করছেন না। আগে তিনি সব কিছুতেই খুব উৎসাহ প্রকাশ করতেন। এখন যেন কেমন মিইয়ে গেছেন। আবার হয়তো লক্ষ্য করলেন যে, তিনি সব ব্যাপারে আপনার উৎসাহী সহযোগী। তাঁর আচরণে আপনি হয়তো অবাক হয়ে যাবেন। বিয়ের পর আপনি হয়তো স্বামীর সংসার করতে এসে শুনেছেন যে, তিনি নিজে হাতে কোন কাজ তো দূরের কথা সেদ্ধ ডিমও ছাড়িয়ে খাননি। এখন হয়তো দেখছেন যে সেই লোকই ডিম সেদ্ধ করে খাচ্ছেন নিজে হাতে। এবার আপনি নিজের কথা ভাবুন। স্বামীর সংসারে এসে সুগৃহিণী হওয়ার সদিচ্ছায় আপনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। আপনার দিনরাতের ভাবনাই ছিল এই। স্বামী এবং সংসারের সকলকে সুখী করাই ছিল আপনার কামনা। যেকোন কারণেই হোক আপনার কাজে এখন কিছুটা ঢিলেমি এসেছে। এবার এগিয়ে এসেছেন আপনার স্বামী। তিনি বরাবরই আপনাকে সাহায্য করতে চাইতেন। সুযোগ পেতেন না। প্রত্যাশিত সুযোগ আর তিনি হাতছাড়া করতে রাজি নন।

তবে স্বামী যদি ঘরের কাজে সাহায্য না করে তাতে স্ত্রীর তেমন দোষ নেই। এ জন্য সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা উচিত। স্বামীর সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি এবং বিবাহ পূর্ব জীবন সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তা স্ত্রীকে জেনে নিতে হবে। এমন হতে পারে যে, ঘরের কাজে তাকে আগে আর কোনদিন হাত লাগাতে হয়নি। তাই বিয়ের পরও এ ব্যাপারে তার একই রকম ঔদাসীন্য আবার যদি স্বামীর জীবনে কোন সময় প্রবাসে থাকার ঘটনা ঘটে তবে স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবেই সাহায্য করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে স্বামী যদি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আবার তা গুটিয়ে নেন তবে স্ত্রীকে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। এ সব ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষে দোষ থাকা অসম্ভব নয়। এ রকম সংসারে স্ত্রীর জীবন হয়ে ওঠে বিষময়। সব সময় কাজ আর কাজ। আনন্দ বা আরাম বলে কোনকিছু তার জীবনে নেই। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীকে সঠিক পথে নিয়ে আসা। সে জন্য তাকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। স্বামীর মানসিকতা অনুসরণ করে তাকে যথার্থ সংসার পথে নিয়ে আসতে হবে।

প্রথম সন্তান হওয়ার পর স্বামী নিজেকে মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। কারণ, এ সময় স্ত্রীর সবটুকু ভালবাসা সন্তান কেড়ে নেয়। অথচ আগে স্ত্রীর ভালবাসায় তার ছিল একচ্ছত্র অধিকার। ভালবাসা ভাগ হয়ে যাওয়ায় স্বামী মানিয়ে নিতে পারে না। মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়। সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। নানা অসৎ কাজে তার মতি আসে। তাই স্ত্রীর এ সময় খুব সতর্ক থাকা দরকার। ভালবাসা যে ভাগ হচ্ছে এবং সন্তানের যে তাতে স্বাভাবিক অধিকার একথা স্বামী যাতে উপলব্ধি করতে পারে সেদিকে সচেতন থাকতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে দু জনের সমানাধিকার। স্বামীকে বুঝে চলতে হবে। তার মানে এই নয় যে, স্বামীর গুরুত্ব থাকবে। স্ত্রী গুরুত্বহীন হবে। তাই স্ত্রীকে এমনভাবে চলতে হবে যাতে স্বামীর মনে এমন ভাবের সঞ্চার না হয় যে, তাকে ছাড়া সংসার অচল এবং প্রতিটি ব্যাপারে তার একার ভূমিকাই যথেষ্ট। স্বামীর এই অহংভাব সংসারের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ভবিষ্যৎ জীবনেও এর ফলে কোন শান্তি পাওয়া যায় না। তাই এখানে স্ত্রীকে হতে হবে খুবই ট্যাকটফুল। স্বামীকে স্ত্রীর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্টিনা নিকোলায়েভ তেরেসকোভা ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের উৎসবে যোগদানের জন্য নয়াদিল্লী আসেন।

স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর রুচি-অভিরুচিকে জাগ্রত করা। এতে শুধু বর্তমানই সুখের হবে না, ভবিষ্যৎও আনন্দদায়ক হবে। স্বামীর স্বাধীনতার কদর করা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে তার যদি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাইরে থাকার শখ হয় তবে খুব একটা আপত্তি করা উচিত হবেনা। আর এদিকে স্ত্রীকে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে যাতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজেকে প্রতারিত বা বঞ্চিত মনে না হয়।

নানাদিক থেকে স্বামীকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক থাকতে হবে স্বামীর উপর অতিরিক্ত কর্তৃত্ব করা সম্বন্ধে। সব সময় নিজের খুশি স্বামীর উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এর ফলে অশান্তি একদিন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বরং ধীরে সুস্থে দুজনের মধ্যে এক সুষ্ঠু বোঝাপড়া গড়ে তোলা দরকার। একে অপরের কাছে অপরিহার্য এই মনোভাব থেকেই সুদূরপ্রসারী শান্তি সম্ভব। একের উপর অপরের কর্তৃত্ব নয়— পারস্পরিক সুন্দর বোঝাপড়াই দাম্পত্যিক এবং স্বচ্ছন্দ জীবনের আসল চাবিকাঠি।

—প্রমীলা

ওদের নিয়ে ভাবে কে ?

বাসে বসে এক অল্পবয়সী সুশ্রী ভদ্রমহিলা। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। কোলের ওপর বড় বড় দুটো প্যাকেট। আমি উঠে তাঁর পাশে বসতেই তিনি আমার ঘড়ির সঙ্গে তাঁর ঘড়ির সময়টা মিলিয়ে নিতে চাইলেন। বুঝতে পারছিলাম নির্ধারিত সময়টাকে নিয়ে তাঁর বড় ভাবনা।

আমি তাঁর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'কোথায় যাবেন ?'

মহিলাটি প্রথমে আমার কথা বোধ হয় খেয়াল করেন নি। সম্ভবত অন্যমনস্ক ছিলেন। তারপর খেয়াল হতেই বললেন, শ্যামবাজার যাব। ঘটনাটা ঘটেছিল প্রাক-পুজোয়। পুজোর যখন দিন পনেরো বাকি তখনই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'সময় নিয়ে আপনাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে ?'

মহিলাটি মৃদু হেসে বললেন, 'দিনগত পাপক্ষয় করছি। আর পারছি না।'

মহিলাটির কথায় এত হতাশা শুনে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বললাম, 'কোথা থেকে আসছেন ?'

উনি বললেন, 'বসিরহাট।'

মহিলাটির সংক্ষিপ্ত উত্তরে বুঝলাম, তিনি খুব ক্লান্ত। আমার অবশ্য কোন কথাই জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছিল, তবু তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনছিলাম না। তাই সব কিছু জড়তাকে উপেক্ষা করে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম কি ? বড় বড় প্যাকেট দুটোতে কি আছে ?'

মহিলাটি জানলা দিয়ে এদিক ওদিক জায়গাটা দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'যাক এসে পড়লাম। আর বেশী দেরি নেই।' তারপর আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ডাগর ডাগর দুটি চোখ সরাসরি আমার মুখের ওপর মেলে ধরে বললেন, 'রেবা ধর থেকে রেবা মারিক হয়েছি বর্তমানে। প্যাকেট দুটোতে পুজোর রেডিমেড জামা-প্যান্ট আছে। মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। দেখুন না যাবার কথা ছিল চারটেয় আর এখানেই কিনা পোনে পাঁচটা বেজে গেল। ভদ্রলোকের একটা খারাপ ধারণা হতে পারে।'

আমি রেবা মারিকের অস্থিরতা কমাবার জন্যে বললাম, 'কি আর করবেন। ট্রামে-বাসের ব্যাপার। এখানে আমাদের কোন হাত নেই।'

রেবা মারিক মৃদু হেসে বললেন, 'সেটা আর কে শুনছে। আর যদি শুনবেই তবে আর কপালটা এরকম করে পুড়বে কেন ?'

বুঝতে পারছিলাম ভাগ্যতাড়িত হয়ে ভদ্রমহিলা এত অসহায়। প্রতিটি কথায়ই যেন হতাশার সুর। বললাম, 'রেডিমেড সেলাই-এ দিন কাটাচ্ছেন ?'

রেবা মারিক আস্তে 'হুঁ' শব্দ করে থেমে গেলেন। তারপর বললেন, 'জানেন বাবা আদরের বড় মেয়েকে চোদ্দ বছরে বিয়ে দিলেন একটা মাতালের সঙ্গে। অবশ্য সেটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ বাবার অজ্ঞাতে। বাবা জানলে কখনই তাঁর বড় মেয়েকে মাতালের সঙ্গে বিয়ে দিতেন না। বোধ হয় এটা আমার কপালের লিখন। দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়। বরাত ঠেকায় কার সাধ্যি! বছর চারেক মাতাল স্বামীর অকথ্য অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে ঘর করতে লাগলাম শুধু বাবার মুখ চেয়ে। ভাবলাম বুড়ো বাবাকে এটা জানিয়ে আর কষ্ট দেবো না। কিন্তু কষ্ট দেবো না ভাবলেই কি হয়, নিজের কষ্ট সহ্য করারও তো সীমা আছে। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে মাতাল স্বামী সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে ঘরে ফিরে এটা ওটা ফেলে শেষে আমাকে মার-ধোর শুরু করতো। সে কি অমানুষিক অত্যাচার, ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারবো না।'

কথা বলতে বলতে ওর চোখে জল ছলছল করছিল। সামলে নিয়ে বললেন, 'একদিন সব ছেড়েছুড়ে এক রকম প্রায় পালিয়ে চলে এলাম বাবার কাছে।'

আমি কথা শুনতে শুনতে একটু বোধ হয় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, 'বেশ করেছেন। হাত-পা থাকতে পড়ে পড়ে মার খাবার কোন যুক্তি নেই।'

রেবা মারিক বললেন, 'সব জানি। সব চেয়ে বেশি জানি নিজের যোগ্যতা কিছু নেই। বাবার সামর্থ্য এমন কিছু ছিল না যে আমাকে যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারেন। তাই তো মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেছি।'

রেবা মারিক কথা বলতে বলতে গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি চলে এলেন। আমি বললাম 'ভালই করছেন। মুখ বুজে মার খাওয়ার থেকে সাধ্যমত চেষ্টা করে এই যে কাজ করছেন তাতে একটা সম্মান আছে। স্বাধীন কাজের একটা সুখ আর তৃপ্তি নিশ্চয়ই আছে।'

আমার কথা শুনে রেবা মারিক দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন 'কত যে সুখে আর তৃপ্তিতে আছি তার খোঁজ আর আপনারা পাবেন কি করে ? এই কাজে যাও বা দু-চার পয়সা পাচ্ছি তাতে আমার স্বামী আবার ভাগ চায়।'

আমি বললাম, 'তার মানে যে আপনাকে খেতে-পরতে দিতে পারে না—শুধু মার-ধোর করতে পারে সে কিনা আপনার আয়ের অংশীদার ?'

রেবা মারিক কোন কথা আর বলেন নি। বড় বড় প্যাকেট দুটোকে নামিয়ে নিজে ভিড় ঠেলে নেমে গিয়েছিলেন।

পরদিন রেবা মারিকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল আমার সামনেই। এবারের অভিযোগকারিণী হিন্দুস্থানী কাঠওয়ালী লক্ষ্মী। থাকে এক বস্তিতে। সংসারে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেওরের অভাব নেই। স্বামী ফুটপাতে জুতো বিক্রী করে। স্বামী আর ছেলে তার জীবনের অন্তরঙ্গ সাথী। শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামীর মন রক্ষা করে চলতে লক্ষ্মী আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু বিধি বাম। শাশুড়ী একদিন চেলা কাঠ দিয়ে লক্ষ্মীকে এমন মেরেছিল যে বেচারা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। স্বামী সংসারে পাই পয়সা দেয় না। বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। শুধু সম্পর্ক লক্ষ্মীকে মারধোর করে তার রক্ত-জলকরা রোজগারের অংশ নেবার। বেচারা লক্ষ্মী! আমাদের সবার সামনেই ওর সুন্দর স্বাস্থ্য দিনকে দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। অথচ রেবা মারিকের মত ও পালাতে পারে না। ওর মা অতি বৃদ্ধা।

লক্ষ্মীকে নিয়ে যেমন ভাববার কেউ নেই তেমনি ভাববার কেউ নেই আমাদের সমাজের তথাকথিত ঠিকে ঝিদের নিয়ে। যাদের একমাত্র ভরসা স্বামীর অত্যাচার আর বছরে বছরে সন্তানের জন্মদান। অত্যাচারী স্বামী ইচ্ছেমত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যথেচ্ছাচার করতে পারে, তাদের রুখবার কেউ নেই। তাই ওদেরই প্রতিভূ নিমাই-এর মা যখন পাশের বাড়ির দিদিমণিদের পা জড়িয়ে বলেছিল, 'দিদিমণি, সোয়ামীর অত্যাচার আর সইতে পারি না গো। গরু-ছাগলের মত ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাই, কোথায় রাখি—তাই তো পড়ে পড়ে মার খাই। লোকে বলে লেখা-পড়া শিখলে ডিভোর্স করে খাই খরচটা তো আদায় করে আলাদা থাকতে পারতাম। এখন আমাদের তো মার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই গো।'

নিমাই-এর মা যে কথা বলে নিজের দুঃখে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল সেটা তো আরও অনেকেরই মনের কথা। সমাজে অল্পশিক্ষিত অশিক্ষিত এমনি অনেক মেয়েরাই কি স্বামীর অত্যাচারের শিকার নয়? অথচ এদের প্রতিকারের কোন উপায় নেই, কোর্ট পর্যন্ত যাবার এদের সাহস নেই, ক্ষমতা নেই—এদের কথা ভাবে কে ? এরাও তো আমাদের সমাজেরই একটা অংশ, আনন্দের, উৎসবের ভাগীদার।

—অঞ্জলি চৌধুরী

অসম্ভব কিছু?

সবিতা ঘোষ

আবার ভালবাসা পেতে ইচ্ছে করছে। উনিশ বছর হল বিয়ে হয়েছে। আমি বিবাহিতা মহিলা। বয়স? তা সম্প্রতি বেয়াল্লিশ পূর্ণ হল। হাসি পাচ্ছে? তাহলে সবটা শুনলে আরো হাসবেন। আমার স্বামী বর্তমান। সরকারী বড় অফিসার। সুপুরুষ। এবং সত্যিই বলছি যতদূর জানি, আর কারো প্রতি কোন দুর্বলতা নেই। আমি বাঙালী ঘরের বো। খুব আধুনিকাও নই। তবু মনের এই অবস্থা!...

সেই ঘর, সেই বাড়ি। সেই ছেলে, সেই মেয়ে, সেই স্বামী, সবই ঠিক আছে: কিন্তু আমার কাছে আজ সব ছিবড়ে! একটুও রস নেই। আমার বন্ধুরা—স্কুলে, কলেজে, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের সঙ্গে পড়েছি, তাদের যে কজনের খবর জানি, বা যোগাযোগ আছে, তাদের অধিকাংশেরই বিয়ে হয়েছে। স্মৃতির তো দুই নাতি, নাতনী, মেয়ের ঘরের। ছেলে এ বছর এম-এস-সি পাশ করল। অরুণার মেয়ে জামাই বিলেতে। ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজছে। বীণাই একমাত্র অকালে সরে পড়েছে। শুনেছি তার জীবনটি সুখের হয় নি। বিয়ে করেছিল, ডিভোর্স হয়েছিল শেষে। ছেলেমেয়ে হয় নি।... সেই বীণা, সুন্দরী, তন্বী! বীণা ভাল বাংলা কবিতা লিখত। তখনকার যুগে আমাদের মধ্যে সে আধুনিকা ছিল। অসম্ভব শৌখিন ছিল। মনে আছে ইস্কুল জীবনেই বেথুন বোর্ডিং-এ স্নানের ঘরে কত সব সুগন্ধী বিলিতি রঙীন জল, রঙীন গুঁড়ো স্নানের জলে নাকি গুলে নিত। পরে যখন এম-এ পড়ি, ডায়োসেসে থাকি তখন বীণা হঠাৎ এক রাত্রির অতিথি হয়েছিল আমার। বি এ পাশ করেই বিয়ে করেছিল। ওকে দেখে মনে হল পুরোপুরি 'সোসাইটি লেডী' হয়েছে। আমার আতিথ্য নিল। সকালে যাবার সময় বললে—'তুই সতী সেই একই রকম থেকে গেলি! কিছু পরিবর্তন নেই। বেশ আছিস! চলি রে।'... তারপর অনিলা। সে তো ডকটরেট করে সস্বামী বিলেত ঘুরে এসে এখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। একটি ছোট ছেলে আছে নাকি তার। বিধবা হয়েছে—মঞ্জরী। দেখে যদিও মনে হয় না। সরকারী অফিসে বড় চাকরি করে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। পুণাতে ছিল এতোদিন। ওরা যেন একেবারে ফিরিঙ্গী বনে গেছে। স্বামী হারিয়েছে আর একজন—জ্যোৎস্না। তার অবশ্য ম্যাট্রিক পাশের পরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস ওর ছেলেটি সবার বড়। সে কি একটা চাকরি করে। তারপর দুই মেয়ে। একটির বিয়ে দিয়েছে। আর একটি ইস্কুলে পড়ে। জ্যোৎস্না দেখি কালো ফিতে পাড় কাপড় পরে। ম্লান মুখখানি। সংসারটিকেই আঁকড়ে রয়েছে।...

যতদূর খবরাখবর রাখি সকলেরই বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে। আচ্ছা, এরা সব সংসারের কাছ থেকে কি পাচ্ছে? যা চেয়েছে, সবই কি পেয়েছে? আপাতদৃষ্টিতে দেখে তো সকলকেই সুখী মনে হয়। আমাদের তো পাড়ার লোকে বলে আদর্শ পরিবার। আমিও তো এতোদিন তাই মনে করে এসেছি। আজকাল থেকে থেকেই মনে হয়—সত্যিই কি তাই? যা চেয়েছি, সব কি আমার এই একান্ত নিজের সংসার আমায় দিয়েছে? অনেক পেয়েছি সত্যি। অনেকদিন ধরেও পেয়েছি। কিন্তু ক্রমে অনুভব করছি পাওয়া যেন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু কই, চাওয়ার তো আমার শেষ হয় নি। অথবা উল্টোটাও খাটে। আমার দেওয়া, ওদের চাওয়া। ওদের চাহিদাই আজ মিটে গেছে। কিন্তু কি সর্বনাশ! আমার দেওয়া ফুরোচ্ছে না। ওদের জায়গা

নেই রাখবার। আমার স্নেহধারা ঢালবার কিন্তু বিরাম নেই। ওদের নেবার পাত্র উপচে সে দান এখন আমার চোখের সামনেই নর্দমা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমার দেখে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কিছু করবার নেই। আমার দেওয়া থামাতে পারছি না। আমি অসহায়, আমার যে আর কিছু করার নেই! একি বিড়ম্বনা! ভগবান! কেন নিজেকে নিঃশেষে দিয়ে ফেলেছি! অন্য কোন দিকে একটুও আগ্রহ জিইয়ে রাখি নি কেন? ভাবা কি উচিত ছিল না, একদিন এরা বড় হয়ে যাবে! তখন আমার এই স্নেহের বন্ধন তাদের কাছে নাগপাশ মনে হবে।

আজ প্রায় কুড়ি, একুশ বছর পর একজনের মুখ মানসপটে ভেসে উঠছে। বড়বেশী করে সে মুখ মনে পড়ছে। আমার আসল বন্ধু। একান্ত আপনজন। কাছে যারা আছে তাদের সঙ্গে লেনদেনের সম্বন্ধ। হৃদয়ের যোগ কবে ছিন্ন হয়ে গেছে। যন্ত্রের মত তাদের দিয়ে যাচ্ছি। তারা যন্ত্রের মত নিচ্ছে, কিন্তু কিসের বদলে? যে সবার বড়—বাড়ির কর্তা, তার খাওয়া থাকার স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আরো দাবী আছে। সেই বিশেষ দাবীর বদলে আমি নিরাপদে, আরামেও বটে, থাকতে খেতে পাই। এরা কেউ বন্ধু নয়। পরমাত্মীয় বটে, তবু বন্ধু নয়। আসল বন্ধু বুঝেছিল—এই দৈনন্দিন লেনদেনের বন্ধনে নিজেদের বেঁধে রাখা, আমাদের পরস্পরের কারো পক্ষেই আনন্দের হবে না। ভাগ্যিস বুঝেছিল! নইলে আজ তার জোয়াল কাঁধে করে ঘুরে বেড়ান সার হত। বন্ধুত্ব থাকত না।

সেই নামটি তাপস। তাকে আমার আবার চাই। সংসারে নয়, মনোরাজ্যে। নইলে বাঁচব না। সে তো বিলেত থেকে ফিরেই বিয়ে করেছে—এক ইনটেলেকচুয়াল মেয়েকে। বউ অ্যানথ্রোপলজিস্ট। এদের ছেলেমেয়ে নেই। বিদুষী স্ত্রী যখন ভার্সিটিতে ক্লাস নিতে যান, তখন কখনো কি নিভৃতে বন্ধু আমায় স্মরণ করে? ভাবে কি—একবার দেখা হলে মন্দ হত না! বন্ধু নিঃসন্তান। আমার সংসারে আমার স্বামী, ছেলেমেয়ে মনটা এমনি ভরিয়ে রেখেছে যে তার জন্যে একটুও স্থান যদি না থাকে? বন্ধু দূরদর্শী। সে ঠিক জানে, এতোদিনে আমি ক্লান্ত। সংসারের থ্যাঙ্কলেস কাজ করে করে আমি রিক্ত। এখন কাজের অবসরে গালে হাত দিয়ে ঠিক আমার কথাই ভাবছে সতী। কুড়ি বছর দেখা নেই যদিও।

সতীর জীবন খুবই গতানুগতিক ভাবে কেটে যাচ্ছে। সতী অবশ্য এ-রকম ম্রিয়মান ছিল না। সতীর নিজের ভেতরেই একটি আনন্দের খনি আছে। না, তুলনাটা ভাল হল না। নিজের ভেতর একটা পরশমণি আছে। যার স্পর্শে সব তার কাছে সোনা হয়ে যায়।

সতীর জবানীতে আমার এই রকম সহস্র দিনের একটির নিত্যকর্ম বলি। তাহলেই বোঝা যাবে।......

ভোরে ঘুম ভাঙে, তাই ভোরের আলোয় ঘুমন্ত স্বামীর মুখখানাই প্রথম দেখতে পাই। অপলক দৃষ্টিতে প্রতিদিনই খানিকক্ষণ চেয়ে থাকি। মনে মনে বলি—অজয়কে সত্যি সুন্দর দেখতে—না? বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হল, এখনো তিরিশ, বত্রিশ বলে চালানো যায়। একটি চুল পাকে নি। গড়ন কি সুন্দর! কোথাও এতোটুকু বাড়তি চর্বি নেই। যাক্ উঠি। খুব আলগোছে একটা চুমো দিতেই ও ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে ধরল—কি, এর মধ্যেই ভোর হয়ে গেল!" —'ছাড়, উঠতে দাও। বাবলুর আবার দেরী হয়ে যাবে ইস্কুলের।' অন্য ঘরে দুটো তক্তপোষে দু' ভাই-বোন অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। প্রথম মশারি তুলে বাবলুর কাছে গিয়ে—বাপী, উঠে পড় মানিক—বলে গায়ে মাথায় হাত বুলোতেই, চোখ রগড়ে ধড়মড় করে বাবলু উঠে বসে। মা, কাল ছুটি—না? এরপর মুখ ধোওয়া, দুধ পাউরুটি খেয়ে, ইউনিফর্ম পরে—বই গুছিয়ে, টিফিন নিয়ে তিরিশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে মার কাছে আসতেই, মা মুখটা বাড়িয়ে দিলেন। বাবলু একটি চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল—পিঠে স্যাচেল ঝুলিয়ে। বাবলুর এবার ক্লাস ফোর হল। এবার মা মেয়ে মাথার কাছে গিয়ে এক দৃষ্টে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ বসে রইলেন। উস্কো-খুস্কো এক মাথা কালো চুলের মধ্যে দিয়ে ফোটা ফুলের মত মুখখানি দেখা যাচ্ছে। নিষ্পাপ শিশুর মত মুখ। এবার হায়ার সেকেন্ডারী দেবে, ষোল চলছে। সত্যি আমি কি সুখী! এক ছেলে, এক মেয়ে। ঠিক যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি। নিঃসন্তান হলেই বা কি করার ছিল? না, মায়াকেও তুলে দিতে হয়। পরীক্ষার পড়া পড়বে। মাগো, উঠে পড়। বেলা হয়ে গেল।—মাথার চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—মেয়ে আড়মোড়া ভেঙে আমায় জড়িয়ে ধরে কোলে মাথাটা দিয়ে আর একটুক্ষণ শুয়ে রইল।

বাইরে বেরিয়ে পুব আকাশে তাকাতেই মন গানে ভরে উঠল। —নিশার স্বপন ছুটলো রে।...সত্যি প্রতিদিনের দেখা সূর্য প্রতিদিন নতুন। আমার প্রতিদিনের সংসারও আমার কাছে প্রতিদিন নতুন। নিজে হাতে রেঁধে, যে যা ভালবাসে নিজে হাতে খাইয়ে কতো সুখ! কেন আজকালকার শিক্ষিত মেয়েরা সংসার একঘেয়ে বলে? এর মত বৈচিত্র্য কোথায়? নিজের সংসার নিজের সৃষ্টি, নিজের কীর্তি! এর চেয়ে ইস্কুলে কাজ, আপিসে কাজ কি বেশী বৈচিত্র্য দেয়? বেশী তৃপ্তি পাওয়া যায়? কি জানি? নানা রকম পরিবেশে আমিও তো চাকরী করেছি প্রায় সাত, আট বছর। ...

দুপুরে একটু বিশ্রাম, তাই বা কদিন জোটে? ছেঁড়া সেলাই, আচার করা, আত্মীয় বন্ধুদের চিঠি লেখা। তিনটে বাজল কি খাবার করতে ওঠা। কখন মেয়ে ফিরবে, কখন স্বামী ফিরবেন। বাবলুর তো মর্নিং স্কুল। দুপুরে ঘুমোতে চায় না। তাই নিয়ে বেশ দুষ্টমী, জ্বালাতন করে। মা বলে—বাবা, কবে যে তোর দুপুরে ইস্কুল সুরু হবে! তুই ইস্কুলে আটকা থাকবি, আর আমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচব। এমনি করে দুপুর কেটে যায়। কোন দিন ছেলে একটু ঘুমোয়, কোনদিন চক্ষে পাতায় এক হয় না। তবে বাবলু দুপুরের ভেতর কালকের পড়া তৈরী করে রাখে। সন্ধ্যের আর বই নিয়ে বসে না। বাবার সঙ্গে গল্প হয়, ওয়ার্ড মেকিং খেলা হয়। মাও সন্ধ্যেটা ফ্রী রাখতে চায়। প্রতিবেশী কারো বাড়ি গিয়ে হয়তো একটু গল্প করে এল। কোন কোন দিন ছেলেকে নিয়ে সামনের মাঠে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আকাশের তারা চেনায়—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ। আর বলে—জানিস আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাবা এমনি করে আমাদের তারা চেনাতেন।

ক্রমে রাত্রি হলে, ছেলেমেয়ে যার যার বিছানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমচ্ছে। তাদের কোন জানলা খোলা থাকবে, কোন দরজা বন্ধ হবে, মাথার কাছে গেলাসে ঢাকা জল, পায়ের কাছে চাদর সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিজে শুতে যাওয়া। এইভাবে মহা-তৃপ্তিতে দিন কাটছিল। ব্যতিক্রম কি ছিল না? ছিল। কোনদিন কারো অসুখে উদ্বেগ, চিন্তা। কোনদিন ছেলেমেয়েদের বকাবকি। বাবলু তো চাঁটি, চপেটাও যথেষ্ট খায়। কর্তার সঙ্গে কখনো মনোমালিন্য, দিনকতক কথা বন্ধ। আবার ভাব, আবার সংসার করা। কখনো কথা-কাটাকাটি, তা থেকে ঝগড়াঝাটি।

তবু গর্বের অন্ত ছিল না। মনে হত আমিই এ সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। স্বামী উপলক্ষ্য মাত্র। আমার ইচ্ছেতেই সব হয়। আমি যেদিকে চালাই সংসার-তরণী সেদিকে ভেসে চলে।...

আমি হয়তো একটু বেশী ভাবপ্রবণ। আনন্দে দুঃখে সমান অভিভূত হই। মনে আছে মায়া যেদিন ইস্কুলে স্টেজে উঠে প্রথম প্রাইজ নিল, সেদিন আনন্দে মা কেঁদে ফেলেছিল। তাই নিয়ে ছেলেমেয়ে, তাদের বাবার কি ঠাট্টা! আমি যখন তখন ওদের কাছে গিয়ে, হঠাৎ জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে অস্থির করে তুলি। বুক জুড়িয়ে যায়। মনের কোনায় চুপি চুপি ইচ্ছে যায়, ওরাও এমনি আচমকা আমায় আমার কাজের মধ্যে আদর করে যাক। তা অবশ্য ওরা কখনো করে না। ভাবি সকলের আনন্দ প্রকাশের ধারা তো একই রকম নাও হতে পারে। ছেলে কখনো সখনো বাইরে খেলতে খেলতে দৌড়ে এসে পিঠে গুম্ গুম্ করে ঘা কতক কিল কসিয়ে যায়। বুঝি ওটা তার ভালবাসারই প্রকাশ।

একটা জিনিস লক্ষ্য করি, এরা যত বড় হচ্ছে, প্রত্যেকের নিজের জগত গড়ে উঠছে, সে পরিধিতে আমার স্থান নেই। এক নির্জন দুপুরে তাই মনে হল। কিছু না—

পাশের খোলা জানলা দিয়ে স্বচ্ছ
শ দেখা যাচ্ছিল। একটা চিল খুব
য়ে নিঃশব্দে উড়ে যাচ্ছে, ডানাও
না। শুধু বাতাসে ভেসে আছে।
নে হল আমি যেন ঐ চিলটার
নঃসঙ্গ। আমার কেউ নেই। এই
বুকের ধন, স্নেহভালবাসার জন,
মার কেউ নয়। এতে তো দোষের
নেই, এতে অদ্ভুতত্বও কিছু নেই।
তো একটি সংসারের মেয়ে
। আমারও মা, বাবা, থাই বোন সব
। ভাইবোন এখনো আছে, আমার
তাদের জন্যে কতোটুকু স্থান
এই-ই অমোঘ নিয়ম সংসারের।
কিছুই যখন অনিত্য নয়, পৃথিবী
নিত্য নতুনের লীলাক্ষেত্র, তখন
পুরনোকে ছাড়তে ছাড়তে নতুনকে
তবেই।
মার মুঠি হয়তো আলগা হয় নি,—
য়। এই জন্যেই শেষ বয়সে লোকে
ল ভগবানকে নিয়ে থাকতে চায়।
দুঃখ, বৃদ্ধাকে সকলে ভুলে থাকে,
চলে।......

মার মুঠি আলগা হয় নি, কারণ
তো ভগবান নেই। কিন্তু তবু আমার
সেই মুঠি থেকে বেরিয়ে পড়েছে,
অজান্তে, তাদেরও অজান্তেই।......
ন্যে মুঠি শক্ত করে চেপে আছি।

তো পরশুদিন সত্যজিতের গুপী-
ইটা সবাই মিলে দেখতে যাব ঠিক
মায়া বলে উঠল,, 'ওমা, এটা যে
বন্ধুদের সঙ্গে কবে থেকে ঠিক
ছ শনিবারে দেখতে যাব। তোমায়
না? ওদের সঙ্গে না গেলে ওর
র্ট হবে।" ঠিক হল আমরা
দেখে আসব। মায়া বন্ধুদের
যাবে। শীতে একদিন সকলে মিলে
কল গার্ডেনে যাব ইচ্ছে ছিল।
লে গেলেন অফিসার বন্ধুবান্ধবদের
চিড়িয়াখানাটা অবশ্য আমরা চার-
ঘুরে এসেছি সম্প্রতি। সেও যেন
—ওরা যতটা স্ফূর্তি পাবে আমি
ছিলাম, ততটা যেন ঠিক পায় নি।
। বারকয়েক বললে—'মা, উদয়রা
বে, আজ আমাদের ভাল ম্যাচ
আমার খেলাতো হলই না, খেলা
ল না। মায়াও একা একা উদাসীন
। ঘুরতে লাগল। ওদের বাবা
এই বয়সে মেয়েরা ওরকম একটু

য়াখানা থেকে বেরিয়ে ফেরার
তায় এক পাগলী দেখলাম।
। আঁচল লুটিয়ে, খোলা চুলে
হয়ে ছুটে ছুটে চলেছে—"ওরে
কোথায় গেলিরে"—বলে কাঁদতে
বিড়িওলার দোকানের লোক
র ছেলে মাসখানেক আগে লরী
ড় মরেছে। সকলেই এই করুণ
দখে কিছুক্ষণ ম্রিয়মাণ হয়ে রইল।
ত চড়েই যেই সেই পাগলী চোখের
য়ে গেল, অমনি সবাই যেন সব

ঝেড়ে ফেলল। একটু পরই ছেলে বললে—
'বাবা, আইসক্রীম যাচ্ছে, খাব।" মেয়ে
বললে—"মা, মা দেখ—বাড়ির টবে কতো
বড় বড় ডালিয়া হয়েছে।" আমার কিন্তু
ভুবন অন্ধকার। বেড়ানোর আনন্দ সব উবে
গেছে। শুধু ভাবছি—পাগলী কি করে দিন
কাটাচ্ছে। ওর কি ঐ একটাই ছেলে ছিল--
পানু? এখন তবে কি নিয়ে আছে? কিছু
নেই বলেই পাগল হয়ে গেছে। উঃ, শূন্যতা
কি ভয়াবহ। নিজের ছেলে, মেয়ে, তাদের
বাবার দিকে তাকিয়ে ভাবছি, আচ্ছা, ওদের
কি দয়ামায়া কম? না, ওরা বোধহয় খুব
চাপা। আনন্দে, শোকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ
ওদের ধাতে নেই। অধিকাংশ লোকই তো
তাই। আমিই অস্বাভাবিক। আমাকে এই
ভাবপ্রবণতার জন্যে স্থানে, অস্থানে বিব্রত
হতে হয়। গলার ভেতরটা টন্ টন্ করছে।
চোখের পাতা ফেললেই টপ্ করে জল
পড়ে যাবে। লজ্জায় রুমাল দিয়ে চোখটা
মুছেও ফেলতে পারছি না। ধরা পড়ে যাব
কাঁদছি! যেন কি মহা অপরাধ। ওদের
আনন্দ মাটি করতে চাই না। জানলার দিকে
মুখ ফিরিয়ে রইলাম।......

রাত্রে ঘুমিয়ে দেখলাম—পাগলী যেন
আমাদের বাড়ি এসেছে। বাবলুকে দেখে স্ফুর্ত
করেছে তার পানু বলে। বাবলুকে টানাটানি
করছে—"পানু, তুই আমার কাছ থেকে
পালিয়ে এখানে এলি কেন?'...ঘুম ভেঙে
গেল।

• • •

প্রাণের বন্ধু মীরার চিঠি এসেছে।
তার বড় ছেলে ফিজিকসএ ফাস্ট ক্লাস
পেয়ে বি-এস-সি পাশ করল। আমি মীরার
আনন্দের কথা ভেবে আত্মহারা। কি করব
ভেবে না পেয়ে নিজের ছেলেমেয়েকেই
জড়িয়ে ধরে চুমোটুমো খেয়ে অস্থির করে
তুললাম। ওরা বলে—মা, তুমি পাগল
নাকি? মায়া বললে মনে হচ্ছে, তুমিই মীরা
মাসী, আর আমরা দু'জন অম্বরদা।
বাবলু বলে উঠল—আহা, অম্বরদা কতো
বড়! ঐ বুড়োছেলেকে মীরা মাসী কখনই
অমন পচ্ পচ্ করে চুমো খাবেনা না।
বাবলু হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে অভিযোগ
করল—"সত্যি মা, তুমি যখন তখন, এমন
বোকার মত আদর কর, কোলে তুলে নেবার

চেষ্টা কর, বন্ধুরা কোনদিন যদি দেখে
ফেলে?" "কেন, ওদের মায়া ওদের আদর
করে না নাকি?" "না কখনো নয়। তোমার
মত এমন করে না।"

মেয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে
থাকতে থাকতে বললে—"সত্যি মা, তুমি
যেমন ক্ষণে হাস, ক্ষণে রাগ কর, ক্ষণে
কাঁদো, আমাদের ক্লাসের কেউ ওরকম করলে
তাকে সবাই মিলে ন্যাকা বলে ক্ষেপিয়ে
অস্থির করে দেয়।" ওদের বাবাও হাসতে
হাসতে বলে উঠলেন—"হ্যাঁ, তোদের মায়
উচ্ছ্বাসটা বড় বেশী।" ব্যাস। বাপ মেয়ের
এই সামান্য মন্তব্যটুকু হয়তো নির্মল
হাস্য-পরিহাস, কিন্তু আমার কানে যেন
নির্মম হয়ে বাজল। নিজেকে যেন ওদের
চোখে অত্যন্ত খেলো বলে অনুভব
করলাম। একটি সূক্ষ্ম আলপিনের সামান্য
খোঁচায় আমার পরমানন্দের রঙীন
ফানুস-সংসারটি চুপসে গেল। আমি যেন
কিছুতেই আর ওদের সামনে দাঁড়াতে
পারছিলাম না। অপমানে, লজ্জায় কান,
মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। মনে হতে
লাগল এতোদিন ধরে ভস্মে ঘি ঢালা
হচ্ছিল।

কোন স্ত্রী, কোন মতেই প্রতিদানের
আশায় সংসারে নিজেকে বিলিয়ে দেয় না।
প্রকৃতির নিয়মেই মা আত্মদান করে।
কারুর উপকারে না লাগলেও নিজের
গরজে সে নিজেকে দেয়। প্রতিদান না
চাইতে পারে, তাই বলে এটুকু বিশ্বাস
তার থাকে, যাকে দিচ্ছি সে নিয়ে তৃপ্ত হচ্ছে।
আমি অতি মন্দভাগ্য। এতোদিন ভেবেছি,
ছেলে, মেয়ে বাবার ধারা পেয়েছে।
নেহাৎ কাটখোট্টা ভাবতে মন চায় নি।
ভাবতে চেষ্টা করেছি—সুখ, দুঃখ অনুভব
সবই করে শুধু আমার মত বহিঃপ্রকাশ
নেই। আমি যা দিচ্ছি তা শতগুণ হয়ে
আমার কাছে ফিরে না আসুক, ধারণা ছিল,
যথাস্থানে, ওদের হৃদয়ে তা সঞ্চিত
হচ্ছে।......কিন্তু আজ স্তম্ভিত হয়ে
দেখছি—পাত্র ফুটো! এতোদিন ধরে যে
স্নেহধারা ঢেলে গেছি, তা হু হু করে
বেরিয়ে গেছে। আমি টের পাই নি। ওরা
চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে!!

এর পূরবী ছু'য়ে গেল ওর বিভাসকে। ফটো : বিন্দুশেখর বিশ্বাস

একথা ঠিক যে আমার পুত্র, কন্যা ও স্বামী সৃষ্টিছাড়া নিষ্ঠুর লোক. তা তো নয়। অধিকাংশ লোকের মত সুখ, দুঃখ অনুভব নিশ্চয় করে, আমার মত মাত্রাতিরিক্ত নয়। সুতরাং আমিই সৃষ্টিছাড়া! কাজেই এর জন্য যদি আমি মনঃকষ্ট পাই, ওদের দোষ দিতে পারি কি?

যাক, আত্মনিগ্রহের মত ঘৃণ্য অভ্যাস আর নেই। নিজেকে কেবলই 'আহা বেচারী, উহু বেচারী' করে লাভ কি? ওরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করলে কি হবে, ওদের ছাড়াই আমায় চলবে, শুধু চলবে কেন, আনন্দেই কাটাব। মনে মনে একবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সতী। সামান্য একটা মুখের কথায় তো একজনের জীবন-দর্শন বদলে যেতে পারে না!...

আমি যে বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, ঈশ্বর না থাক, মানুষ তো আছে। এই চিরবৈচিত্র্যময় প্রকৃতি তো আছে। এখন বিকেল—ছেলে খেলতে গেল। মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেল। শুধু কর্তা, মনে হল যেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন আমি কিছুটা অপ্রসন্ন হয়েছি তাঁদের মন্তব্যে। তাই একটু বিব্রত, অপ্রস্তুত মুখ করে বললেন—কি হল? চা-টা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, খেলে না? তুমি বুঝি রাগ করলে? আরে, সামান্য ঠাট্টা সহ্য করতে পার না, এই তোমার মহা দোষ!' যাক উনিও পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে. একটি সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সেই আধো-অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনজনকেই দেখতে লাগল—এরা কারা কোথা থেকে এল? এদের তো আমি চিনি না!

বিশ্রী রকম অবসন্ন, অসহায় লাগতে লাগল। অন্তর ভরে শুধু নিজেকে ছি-ছি, ছি-ছি করতে লাগলাম। নিজের মান নিজের কাছে। স্বামী, ছেলে, মেয়ে কারো কাছেই নিজেকে বিকিয়ে দিত নেই। উচিত মূল্য কখনই পাওয়া যায় না। এইভাবে পাগলের মত হেসে কে'দে, উচ্ছ্বাস প্রকাশ কেন করে এসেছি। ওদের মত কেন নিজের আনন্দ, বেদনা নিজের ভেতর চেপে রাখার চেষ্টা করিনি। ওরা তো তিনজনেই একরকম। আমি কেন নিজেকে খেলো করলাম?

আচ্ছা, ন্যাকামি কথাটার ঠিক সংজ্ঞা কি? কথায় কথায় তো শব্দটা আমরা ব্যবহার করি। ন্যাকামির সঙ্গে ভন্ডামির খানিকটা মিল আছে। যা নয় তাই সাজা। ওরা কি মনে করে আমার এইসব উচ্ছ্বসিত ব্যবহার লোকদেখানো। আবার মনে হল—এ আমি কি করছি? কেন সাধ করে দুঃখ পাবার চেষ্টা করছি? আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করি—ওরা কেউ আমায় ভালবাসে না, বা আমার ভালবাসার মূল্য দেয় না? কেন ওদের মিছিমিছি দোষী করছি! ওরা কিছুই না ভেবে এমনিই কথাটা বলেছে। পরক্ষণেই মনে হল—তা নয়, অসতর্ক মুহূর্তে ওদের মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কি লজ্জা! সত্যি মায়া তো সেই তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই বার্ণাড শ, ট. পড়া শুরু করেছে। বয়সের তুলনায় ওর বুদ্ধি অনেক পরিণত। ভাবপ্রবণতা ওদের কাছে হাস্যকর দুর্বলতা! আচ্ছা, ওর কি বয়সকালে—এই মনোভাবের পরিবর্তন হবে না? ওকি কাউকে কোনদিন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে না, বিয়ে করবে না? নাকি ওদের ললিতাদি, অমিয়াদির মত চিরকুমারী থাকবে? ললিতাদি তো ওর আদর্শ!

একা একা আর খানিকক্ষণ এইসব চিন্তা করতে থাকলে পাগল হয়ে যাব। একলা বেশীক্ষণ থাকতে সতীর ভয় ভয় করতে লাগল। অথচ ওদের সান্নিধ্য এখন অসহ্য। বেরিয়ে পড়ি। যন্ত্রের মত শাড়ি বদলে সতী বেরিয়ে পড়ল। গড়িয়াহাট যাবে বলে সোজা

র বাসে গিয়ে বসা। সঙ্গে কিছু মেছে।...
গেলের অর্ডার দেওয়া ছিল। স্টল।

হ দেখে দোকান বন্ধ। বোম্বায়ের মত দিক পায়চারী করে সতী নির্মলার ঠিক হল। জীবনে কোনদিন একা ট ঢুকে এক কাপ চা কায়দা খাই। তদিন প্রায় চা-চা, করেছে, কিন্তু কিন্তু দোকান দাঁড়িয়ে নেড়ে বাড়ি জে চা তৈরী করে খেয়েছি। উনি লছেন—কি আশ্চর্য! কোন দোকানে কটু খেলে নিয়ে ঘোরাঘুরি করলেই কম হয়। কতো লোকেই তো খায়। রেস্তরেন্টে তো মনে হয় ছেলেমেয়েদের ভিড়ই বেশী। কলেজের ছাড়া, তোমার মত গিন্নীবান্নীও তো তোমার দ্বারা কিসসু হবে না!' দ এক কাপ কড়া কফি খাই। ব—হঠাৎ কানে গেল—'আরে, সতী কয়ে দেখি তাপস। 'একি, তুমি এলে? তুমি তো দিল্লীতে থাক? শুনেছিলাম বটে মাস ছয় হল য় এখানে এসেছ। মনে ছিল, না। বাস করবে কিনা জানি না, আজই তোমার কথা ভাবছিলাম।' পারটা একটু সাজানো, গল্পের না? এই বললে—তোমার মনেই আমি বদলী হয়ে কলকাতায় ছাড়া প্রায় কুড়ি বছর হবে দেখা-ই। পত্রালাপ পর্যন্ত নয়। মাঝে বার সে বোধহয় বছর আটেক মরা সপরিবারে আগ্রা বেড়াতে স্টেশনে চাকতে একবার দেখা তা, একা কেন? আর সকলে ছোট একটা নিঃশ্বাস চেপে এখাই। যার যার নিজের কাজ বড় হয়ে গেছে তো! এসেছিলাম নস কিনতে। বাড়িতে চা ফুরিয়ে খুব সুগৃহিণী তো!' চা না রয়ে এসেছি। এখানে এক কাপ ঘুমন্ত ভাবটা কাটিয়ে নিতে 'তুমি দেখছি খুব স্মার্ট হয়ে মনে পড়ে—রেস্টুরেন্টে ঢুকলেই ঠ হয়ে উঠতে। শুধু ভয়, এই উ দেখে ফেললো।' একটু হেসে ভয় তো আর এখন নেই। বাজার করতে এসে এরকম মার দিকে একনজর তাকিয়ে ল—'তা, ভদ্রভাবে বললে বলতে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছে। কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই দীর্ঘ ও কিছুর বদলাও নি। মনে প্রাণে হ কি? আমি তো সাইড কেসটা ধরেছি। ছেলে মেয়ে মনে হল হতে পারত। বিশেষত, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম না। আজ দেখব ভাবিনি কি।' তুমিই ক্ষম? আর নয় কই?'—আমার কি? দয়া আর সেবী। তা, রি-ইউনিয়ন আছে কোথাও

গেছেন। এই তো, কাছেই আমরা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি। প্রায়ই সন্ধ্যায় আমরা এখানে খেতে আসি। কিছু না ভেবেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখন দেখছি আমাদেরও রি-ইউনিয়ন হয়ে গেল!' 'এসো দরজায় দাঁড়িয়ে না থেকে দুটো চেয়ার দখলের চেষ্টা দেখি। যা ভিড়!' তাপস হঠাৎ বলে উঠল—'তার চেয়ে চল একটু এগিয়ে আরেকটা রেস্তোরাঁয় যাই। এখানে বেজায় ভিড়। একটু কথাবার্তা বলা যাবে না।' আমি বললাম—'ওসব নিভৃত নিরালা ইয়ং কাপল বা কলেজের ছেলেমেয়েদের জায়গা। ওখানে গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি? তাছাড়া বড্ড এক্সপেনসিভ।' 'আঃ, তুমি ঠিক তেমনি আছ। খা বলব, তক্ষুনি সেটায় আপত্তি করবে। আচ্ছা, স্বামীর সঙ্গেও কি এমনি কর? কি করে তোমায় সে ভদ্রলোক সহ্য করেন কে জানে?' মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'সবার তো তোমার মত দূরদৃষ্টি নেই। কালি-কলমে লিখে ফেলার এই দায়। এখন জোয়াল টেনে বেড়াতে হচ্ছে।' ও আমার হাতটা ধরে টেনে বললে—'না চল, ওদিকেই যাই। আমার ইচ্ছে করছে। আর কথা বাড়িও না। লক্ষ্মীটি!'

সুতরাং যেতেই হল। সেই রেস্টুরেন্টে বসে স্যান্ডউইচ চা খাওয়া গেল। নিভৃতালাপ আর কি জমবে? খুবই সংযত আড়ষ্ট হয়ে কিছু অতি সাধারণ কথাবার্তা হল বটে, একেবারে চুপ করে তো বসে থাকা যায় না। জিজ্ঞেস করলাম—'কলেজ কেমন লাগছে? ছাত্রদের পড়ানো তো আজকাল ভীতিজনক; শুধুই যান্ত্রিক সম্পর্ক মনে হয়!' ও বলল, 'কাগজের পক্ষ যতটা ফাঁপিয়ে তোলে ততটা নয়। অবশ্য আমি এতোই অল্পদিন এসেছি যে এখনই কোন মন্তব্য করা উচিত হবে না। তবে আমি ক্লাসে বলেছি—বাইশ বছর আগে আমরা এই কলেজের ছাত্র ছিলাম। তখনই প্রথম মাস্টারদের অযথা সম্মান করার প্রতিবাদ জানাতাম। আমি চাই ক্লাসে তোমরা আমার সঙ্গে তর্ক করবে—যেমন সহপাঠীদের সঙ্গে কর। তবে অকারণে অপমান যদি কর, আমার ভাল লাগবে না বটেই। মাস্টাররা তাদের সম্মান রেখে কথা সাধারণত বলে না ঠিকই। তাই কোন ক্ষেত্রে মাস্টারের সম্মান না রাখলে আমাদের খুব কিছু বলার নেই। এই ধরনের কথাবার্তা হয়েছে কিছু কিছু। তারপর? তোমার খবর কিছু বল? লেখাপড়ার ধারকাছে আর না বহুদিন। কি কর সমস্ত দিন? সে যার তো

স্কুলে, অফিসে চলে যায়। সেই শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আর চাকরি করলে না—না? অধিকাংশ মেয়েই একবার ঘাড়ে বসে খাবার সুযোগ পেলে আর নড়ে বসতে চায় না। কিছুদিন পরেই তাই তারা কেমন বোকা বোকা, জড়ভরত হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে আর কোন কিছু আলোচনার থাকেই না! আচ্ছা, আমাদের সাতাই কুড়ি বছর পর দেখা—না? আশ্চর্য, এতগুলো দিন পার হয়ে গেছে ভাবা যায় না তো? তোমার তো একটি ছেলে না মেয়ে কি আছে—না? আগ্রায় দেখেছিলাম, সে তো এখন বেশ বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়। কতো বয়স হল—দশ, বারো বছর?' আমি বললাম—'তুমি যাকে দেখেছিলে সে মেয়ে। তার ষোল বছর চলছে, এবার হায়ার সেকেন্ডারী দেবে। আর একটি ছেলে আছে, সে অনেক ছোট। মোটে আট বছরের।'—'বাঃ, তোমার তাহলে আইডিয়াল ফ্যামিলি! তবে জোর সংসার করছ, বলো? তোমায় দেখে কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না—তুমি শুধু রাঁধছ, বাড়ছ, খেতে দিচ্ছ। যতই সংসার করো, তুমি কোনদিন টিপিক্যাল গিন্নিবান্নী হতে পারবে না।...বেড়াতে টেড়াতে যাও?'—'হ্যাঁ, প্রতি বছর। তোমার সংসারের কথা তো কিছু বললেই না!'—'আমার আবার সংসার কি? আমরা তো দুজন মাত্র। উভয়, অন্তত চাকরি করি দুজনেই। ছুটি পেলে বেড়াতে যাই।' 'নাঃ, এবার ওঠা যাক। ওরা ভাববে।'—'এখানে সেই তাড়া? তখন বলতে বাবা ভাববেন। এখন ওরা!'—'আর কি হবে? সত্যিই এই বোকা বোকা আর জড়ভরতের সঙ্গে কি গল্পই বা করবে?...আচ্ছা, আগেও তো তোমার আর আমার পড়ার সাবজেক্ট আলাদাই ছিল! কি বিষয় নিয়ে এতো বক্‌-বক্‌ করতাম? কথা ফুরতো না তো? আর এখন কথা খুঁজে পাচ্ছি না! ভারী মজার—না?'

উঠতে হল। রেস্তোরাঁর সিঁড়ি একেবারে নির্জন, প্রায় অন্ধকার। তাপস হঠাৎ খুব আলগোছে আমার গালে একটা চুমো খেল। বললে—'তুমি ঠিক আগের মত আছ কিনা পরীক্ষা করলাম। একেবারেই অকারণে কর্তার কাছ থেকে এসব আর নিশ্চয় খুব বেশী জোটে না. এক নাগাড়ে প্রায় কুড়ি বছর সংসার করছ তো?'

আশ্চর্য বাসে বসে সতীর নিজেকে বা তাপসকে কিছু মাত্র অপরাধী মনে হল না। বাড়ি ফিরে একটা তৃপ্তি পেলো। যেন নিজেকে ফিরে পাচ্ছে।

প্রেক্ষাগৃহ

প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে সাহা ফিল্মস নিবেদিত এবং পীযূষ গাঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত জন্মভূমি চিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং সোনিয়া সাহনী

চিত্র-সমালোচনা

সোনালী প্রোডাকসন্স-এর নবতম নিবেদন 'বসন্তবিলাপ' একখানি হাসির ছবি। উপজীব্য—যৌবন বসন্তের বিলাপ বা আকুতি। মফস্বল শহরে চাকুরীজীবী মেয়েদের বোর্ডিং হাউসের নামটি বেছে বেছে 'বসন্তবিলাপ' রাখা হয়েছে কেন, এর থেকে কোন্ হাসির খোরাক পাওয়া যায়, তা মূল-কাহিনীলেখক বিমল করই বলতে পারেন। আমরা দেখতে পাই, ওখানকার অবিবাহিতা তরুণীরা প্রতিবেশী জনকয়েক তরুণের সঙ্গে কোঁদলের সূত্রপাত করলেন ওদের 'বাণীবন্দনা' জ্ঞাপক ব্যানারের দড়ি কেটে দিয়ে। এর জবাব দিল তরুণেরা সরস্বতী পুজোর দিন মাইক্রোফোনের মারফত মেয়েদের নেত্রী অনুরাধার গানের সঙ্গে ওদের নেতা শ্যামের উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তির পাল্লা দিয়ে। প্রতিবাদ জানাতে অনুরাধা নিজে গেল ছেলেদের পুজোমণ্ডপে এবং যতখানি না শোনালো তার চেয়ে বেশী শুনে এল। এর পরের ঘটনা রাস্তায়। শ্যামের অসাবধানতায় অনুরাধার শাড়ীতে খোঁচা লেগে যাওয়ায় অনুরাধা পথচারীদের সামনে শ্যামকে করল না-হক অপমান। এর ওপর ফাউ পাওনা হোলো শ্যামের পথচারীদের টিটকারী। লালুদের বৈঠকখানায় আড্ডায় নানা জল্পনা-কল্পনা চলল এর প্রতিশোধ নেবার জন্য। শেষ পর্যন্ত লালুর বৌদির পরামর্শে ওরা 'বসন্তবিলাপ'-এর দেওয়াল ছেয়ে ফেলল মেয়েদের নামে ছড়া লেখা পোস্টারে রাতের অন্ধকারের আশ্রয়ে। কিন্তু একটু বেশী সাহসিকতা দেখাতে গিয়ে ওরা যখন প্রায় ধরা পড়ে পড়ে, তখন রাম চাটুজ্জের কাছ থেকে চেয়ে-আনা মই এবং মধু গোয়ালার বালতি—দুই-ই ফেলে রেখে ওদের চম্পট দিতে হোলো।—ব্যস, এ পর্যন্ত দলগত ঠোকাঠুকির পালা। এরপর বৃষ্টির মধ্যে যেদিন নবনীতা ওরফে নীতা লালুর সঙ্গে একই সাইকেল-রিকসা চেপে আপিস যেতে বাধ্য হোলো, সেদিন থেকে ওরা অপরদের দৃষ্টি এড়িয়ে শুরু করল মেলামেশা। কিন্তু 'মহুয়া' সিনেমায় একসঙ্গে যাওয়ার কথাটা ওরা চেষ্টা সত্ত্বেও চাপা দিতে পারল না। গুপ্তও ভাইঝি

পৌঁছানোর ফাঁকে আলাপ জমিয়ে
স্কুল-মাস্টারণী পার্বতীর সঙ্গে।
মধ্যকেও দেখা গেল হঠাৎ আলোর
দুনিষ্ঠ হতে পুকুরঘাটে। বাকী রইল
শ্যাম এবং অনুরাধা। ওদের ঝগড়া
র কিছুতেই মিটতে চায় না। ব্যাংক
শ্যাম অযথা হায়রাণ করল অনু
এবং এর বদলা নিল অনুরাধা
ট্যাকস অফিসে তার নিজের চেয়ারে
অনুরাধা সিংহের বিরুদ্ধাচারণ শ্যাম-
র অসহ্য বোধ হতে লাগল। তাই
র্ন্ত সে নিজেই চেষ্টা করে দিল্লীতে
হয়ে যেতে চাইল। মনটা কেমন যেন
করতে থাকে। তাই স্টেশন যাবার
সে একটি ছোট্ট চিঠি পাঠালো
কে; তাতে দুটি অনুরোধঃ এক,
র বাদ-বিসংবাদ ভুলে যাওয়া এবং
ভব হলে একবার শেষ দেখা দেওয়া;
পাওয়া মাত্র অনুরাধা পড়ি-কি-মরি
টল স্টেশন অভিমুখে সাইকেল-
চেপে। কিন্তু বিধি বাম; লেভেল
এসে বাধা পেতে হোলো। যখন
এসে পৌঁছুলো অনুরাধা, তার
ট্রেনটি স্টেশন ত্যাগ করেছে। ওভার
ওপর ছলছল চক্ষু নিয়ে অনুরাধা
ান ট্রেনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে
াখ ফেরাতেই দেখল নীচে ব্রীজের
দাঁড়িয়ে আছে শ্যামসুন্দর। রাধা
আসবে, এই জ্ঞান শ্যামকে যেতে

ন্দ্ব বা বিবাদ থেকেই দ্বন্দ্ব বা
াই প্রচলিত প্রবাদের ওপর নির্ভর-
রোমান্টিক কাহিনীকে একটি
ন হাসির ছবির উপকরণ হিসেবে
রা সঙ্গত হয়েছে কিনা, এ সম্বন্ধে
যথেষ্ট অবকাশ আছে। দেখা গেল,
র কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা
নে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। সহজ,
পরিস্থিতিজনিত হাস্যোদ্রেক
য়েছে। বন্ধুদের চোখকে ফাঁকি
করার চেষ্টার মধ্যে যে-সব হাসির
অত্যন্ত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে
রা সম্ভব ছিল, তাও আবার
বে উপেক্ষিত। মনে হয়, হাস্যরস-
জাত প্রবণতার অভাব আছে চিত্র-
মধ্যে।

াধার ভূমিকাভিনেত্রী অপর্ণা সেনের
থম গানের আরম্ভ হয়েছে 'এক
ঠান্ডা, ধেড়ে খোকাদের পান্ডা',
কথা দিয়ে। —শ্যামবেশী সৌমিত্র
কে ঠিক ধেড়ে খোকাদের দলে
য় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের
কলেও রবি ঘোষ, অনুপকুমার ও
যকে অপর্ণা সেন, সুমিত্রা মুখো-
ও শিবানী বসু যদি সত্যিই ঐ
ত করেন, তাহলে সম্ভবত খুব
না। পরিচালক দীনেন গুপ্ত
ছেন, গুপ্ত-বেশী রবি ঘোষের
রূপে স্কুল-শিক্ষয়িত্রী পার্বতীর
াজল গুপ্তকে নির্বাচন করে।

শ্যাম, লালু, সিধু ও গুপ্ত-এর ভূমিকায় যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, চিন্ময় রায় ও রবি ঘোষ প্রায়শই তাঁদের সংলাপ বলেছেন যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে। বিশেষত যখন তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলেছেন, তখন তা এমনই উচ্চগ্রামে যে, তাঁরা কি বলছেন বোঝাই শক্ত। হাসির ছবিতে অ্যাকটিং কিছুটা লাউড হয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির সুযোগ এখানে নেই এবং সংলাপও কিছুটা দ্রুত বলতে হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এমন গগণভেদী চীৎকার করতে হবে যে, মাত্র কতকগুলি ধ্বনি ছাড়া অর্থব্যঞ্জক কিছুই শ্রুতিগোচর হবে না। অবশ্য বুদ্ধ ঘটকের ছদ্মবেশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বরবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বলব, ঢের স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন এঁদের বিপরীতে অনুরাধা, নীতা, আলো ও পার্বতীর ভূমিকায় যথাক্রমে অপর্ণা সেন, সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, শিবানী বসু ও কাজল গুপ্ত। এঁদের অভিনয় দর্শকরা যথেষ্ট উপভোগ করেছেন। এঁদের মুখের হোলির গান অনুযায়ী প্রয়োজন ছিল, অনুরাধার দলের শ্যামের দলকে হোলিখেলায় পরাজিত করা। এঁরা গেয়েছেন 'লোকেদের মন্দ কথায় ধার ধারবো না, ধরলে আজ তোমায় ছাড়বো না।' অপরাপর ভূমিকায় অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (লালুর দাদা), তরুণকুমার (হোমিওপ্যাথ গিরিজা সাপুই), হরিধন মুখোপাধ্যায় (মেয়েদের হোটেল-বাড়ীর মালিক কান্তিবাবু), শ্যাম লাহা (রাম চাটুজ্জে), কণিকা মজুমদার (লালুর বৌদি), পদ্মা দেবী (শ্যামের অভিভাবিকা), গীতা দে (সিধুর মা) প্রমুখ শিল্পী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে খুব একটা উচ্চমান রক্ষিত হয়নি। বোধ করি, ল্যাবোরেটারীর দোষেই একই দৃশ্যের সকল শটের মধ্যে সমতা নেই। আলোর সঙ্গে সিধুর পরিচয় স্থাপনের দৃশ্যটি ছবিতে অনুপস্থিত। এটা কি চিত্রনাট্যের দোষ, না সম্পাদনার? আলো এবং সিধুর পুকুরঘাটের দৃশ্যটি অত্যন্ত আকস্মিক। ছবির চারখানি গানের মধ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখের 'আগুন, আগুন গানটিই অভিনব ও শ্রুতিসুখকর।

—নান্দীকার

স্টুডিও সংবাদ

শ্রী, প্রাচী এবং ইন্দিরার পরবর্তী ছবি 'আবদাল্লা-মর্জিনা'

আরব্য রজনীর 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'-এর সুবিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ও দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'আবদাল্লা-মর্জিনার' প্রধান চরিত্র দুটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন রবি ঘোষ ও মিঠু মুখোপাধ্যায়। অপরাপর চরিত্রে আছেন

সন্তোষ দত্ত (আলিবাবা), শেখর চট্টোপাধ্যায় (কাশিম) দেবরাজ রায় (হুসেন বা হাসান), জহর রায় (বাবা মুস্তাফা) এবং উৎপল দত্ত (ডাকাত সর্দার)।

খাম্বা প্রোডাকসন্স-এর 'দের হান্ন আশের নদী'

সংগীত পরিচালক সর্দার মল্লিক চিত্র প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। নীতু সিংহ ও নিতীন খান্নাকে নায়িকা ও নায়করূপে নিযুক্ত করে তিনি খাম্বা প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে তাঁর প্রথম ছবি 'দের হান্ন আশের নদী'র মহরৎ সুসম্পন্ন করেছেন শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওতে। কে এ নারায়ণের রচনা অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন হরিশ চাওলা (ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভূতপূর্ব ছাত্র)।

অগ্নিভ্রমর

তামাকা চিত্রম-এর প্রথম ছবি অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত 'অগ্নিভ্রমর'-এর চিত্রগ্রহণ দ্রুত গতিতে নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না দাশগুপ্তা ও স্বয়ং সুরকারের গান রেকর্ডিং করা হয়েছে। গান লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রগ্রহণে আছেন—রামানন্দ সেনগুপ্ত। ছবির নায়ক ও নায়িকা চরিত্রে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য চরিত্রে আরও যাঁরা এখন পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেছেন—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, পদ্মাদেবী, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, বিদ্যা রাও, চিন্ময় রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, অরুণ চৌধুরী, অনুপকুমার ও নবাগত কৌশিক বসু প্রভৃতি। সম্প্রতি প্রায় আটদিন ছবির বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ হয়েছে।

প্যারাডমেড্‌ রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত হাসমামু নাটকের একটি দৃশ্যে সুপ্রকাশ সাহা এবং কল্পনা মুখোপাধ্যায়

বিন্দুর ছেলে

এস এস প্রোডাকসন্সের-এর প্রথম ছবি শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র কাজ গুরু বাগচীর পরিচালনায় শিগগির শুরু হবে। বিন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন মাধবী চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিকাশ রায়। মেগা পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

জীবন রহস্য

তপেশ ঘোষ ও জয়ন্ত দেব প্রযোজিত ও সলিল রায় পরিচালিত জাগ্রত পিকচার্সের 'জীবন রহস্য'র চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সলিল রায় কা... রচনা করেছেন—এবং চিত্রনাট্য রচনা ক... তপেশ ঘোষ। ছবির প্রধান চরিত্রগু... আছেন বোম্বের প্রাণ, মাধবী চ... শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ... দেবী, হরিধন, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ... রায়চৌধুরী, মন্মথ, দিলীপ রায়, কা... মণ্ডল, মৃণাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ...জিতের সুরারোপিত গানে কণ্ঠ দি... আশা ভোঁসলে ও মান্না দে।

রোদন ভরা বসন্ত

এম্পার ফিল্মস-এর সুশীল মুখো... পরিচালিত 'রোদন ভরা বসন্ত' ছবির ... গ্রহণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে ... নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। ছবির ... রচনা করেছেন সলিল সেন। চি... আছেন কানাই দে। শিল্প নির্দেশ... সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে সুধীন ... ও সন্তোষ গাঙ্গুলী। সুর দিচ্ছেন ... মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন ... ভোঁসলে, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও বাসবী। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন-...কুমার ও বাসবী নন্দী। অন্যান্য চরিত্রে ... পর্যন্ত যাঁদের দেখা গেছে তাঁরা হ... উৎপল দত্ত, কালীপদ চক্রবর্তী, পা... বসু, দিলীপ রায়, সাধনা রায়চৌ... শোভা সেন প্রভৃতি। কাহিনীর... 'রোদন ভরা বসন্ত' বাংলা চ... নতুনত্বের দাবী নিয়ে আসবে।

গীতাঞ্জলি ফিল্মস-এর 'লগ্ন এলো'

গীতাঞ্জলি ফিল্মস-এর নবতম ... অরুণকান্তি সাহা রচিত 'লগ্ন এলো' ... প্রথম পর্যায়ের চিত্রগ্রহণের কাজ ... চৌধুরীর পরিচালনায় ২২, ২৩ ... জানুয়ারী ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ... গেছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন কাহি... শ্রীসাহা স্বয়ং। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদ... শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে ... বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ যোশী ও সঞ্জ... এই তিনদিন যাঁরা ক্যামেরার ... উপস্থিত ছিলেন শিল্পী হিসাবে ... হলেন—দিলীপ রায়, জয়শ্রী রায়, ... বরুণ, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী ... চৌধুরী। আসছে মাসে বোলপুরে ... পনেরোদিন বহির্দৃশ্য গ্রহণের ... ইউনিটটি রওনা হবেন বলে জানা ...

শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স-এর 'সারারাত'

রঞ্জিৎমল কাংকারিয়ার প্র... কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখো... বহুপঠিত ও প্রশংসিত 'সারারাত'-... গ্রহণের কাজ এই মাস থেকে ... হবে বলে জানা গেল। আমরা শ্রী... ...ভয়ার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

রূপরূপ-এ 'নিশিকন্যা' :

শতরূপা পিকচার্সের সপ্ত... 'মিষ্টি প্রেমের ছবি' বিভূতিভূষণ ... পাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে অ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়

শিকন্যা' শীগ্‌গির রাধা, পূর্ণ এবং
াত্র মুক্তি পাবে বলে জানা গেল।
রচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ছবির চিত্রনাট্যও
ম করেছেন। সুর দিয়েছেন সুধীন
দাশগুপ্ত। চিত্র-গ্রহণে আছেন রামানন্দ
নগুপ্ত। নৃত্য-পরিকল্পনা শান্তি নাগের।
ত্য-গীতমুখর এই ছবির নেপথ্য-কণ্ঠদানে
ছেন—মান্না দে, আশা ভোঁসলে ও রুমা
গুহঠাকুরতা। ছবির প্রধান চরিত্রালিপিতে
ছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মিঠু মুখো-
ধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার,
ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, প্রসূন
দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি।
রূপা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স ছবিখানির
ম্ব-পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

মঞ্চাভিনয়

অদাকর-এর 'খামোশ' অদালত জারী হৈ'

'স্তব্ধতা, কোর্ট চালু আছে!' এই
য় বিজয় তেণ্ডুলকরের মূলে মারাঠি
কৃতির সরোজিনী বর্মাকৃত হিন্দী অনু-
হচ্ছে : খামোশ, অদালত জারী হৈ!
াকার নাট্যগোষ্ঠী প্রবীণ পরিচালক
কুমারের নির্দেশে এই নাটকখানিকে
কয়েক হপ্তা ধরে ম্যাক্সমুলার ভবনের
উপস্থাপিত করেছিলেন প্রতি শনি-
।

বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই ব্যাপারটা। কয়েক-
পুরুষ ও স্ত্রী যাদের মধ্যে অধিকাংশই
ণ-তরুণী—এক জায়গায় মিলিত হয়ে
কটা অবসর বিনোদনের জন্যে প্রস্তাব
। – এস, আমরা আমাদের মধ্যে এক-
কে দোষী সাব্যস্ত ক'রে একটা বিচার
ার খেলা খেলি। সঙ্গে সঙ্গেই ওদের
ক জনের মধ্যে নিম্নস্বরে কথাবার্তা
নপ্রদানের পরে স্থির হল : স্কুল
য়িত্রী লীলা বেনারেকে ভ্রূণহত্যার
াধে অপরাধী করে ঐ বিচার চলুক।
ল কথা, মিস বেনারে যে খুব নিষ্কলঙ্ক
ত্রব মেয়ে নয় এবং ওর সম্বন্ধে নানা
গুঞ্জন চালু আছে, এইটা জেনেই এই
রের খেলা চালু করা হয়। কেঁচো
তে সাপ বেরুনোর মতোই সাক্ষ্যতদন্তে
া পেল মিস লীলা বেনারে যথার্থই
বাতিকগ্রস্তা; প্রথম যৌবনে তিনি তাঁর
র মামার প্রতি প্রেম নিবেদন করতে
ভর্ৎসিত হন এবং শেষ পর্যন্ত
র অধ্যাপক প্রোফেসার দামলের সঙ্গে
সম্পর্ক স্থাপনের বিষময় ফল স্বরূপ
ণী হয়ে পড়ায় দু'একজন বন্ধুর
বিবাহ প্রস্তাব করে ব্যর্থ মনস্কাম
আত্মহত্যার চেষ্টাতেও বিফল হয়ে
ত্যা করতে বাধ্য হন। বেচারা মিস
কে খেলাচ্ছলে নৃশংসভাবে উৎপীড়ন
ওরাই বন্ধু ও বান্ধবীরা; ওর গোপন
কাশ করে দিয়ে ওরা অফুরন্ত মজা
। বেচারা বেনারে! ওর হৃদয় থেকে

ব্রিটিশ ব্যালে নর্তকী শমসোভা প্রোকোভোস্কি। রবীন্দ্র সদনে ১৫-১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি,
তিনদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

তখন রক্ত ঝরে পড়ছে। ঠিক একটি নিরীহ
পাখীকে এক বন্ধ ঘরে আটক করে ছোটো
ছেলেরা একটি একটি করে তার পালক
উপড়ে নিয়ে যে আনন্দ পায়, বেনারের
চরিত্রে তীক্ষ্ন খোঁচা মেরে মেরেও ওদের
ঠিক সেই আনন্দ! বেচারা বেনারে!

একটি সুনির্বাচিত দৃশ্যসজ্জার পট-
ভূমিকায় নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছেন অদা-
কার নাট্যগোষ্ঠী। প্রবীণ পরিচালক কৃষ্ণ-
কুমারের নির্দেশনায় নাটকান্তর্গত প্রতিটি
চরিত্রই সু-অভিনীত। তবে স্বয়ং কৃষ্ণকুমার
অভিনীত মুখাম্মে চরিত্রটির তুলনা নেই।
সহজ, অনায়াস ভঙ্গীতে প্রধানত ব্যঙ্গাত্মক
সংলাপ কথনে তিনি চরিত্রটিকে জীবন্ত
করে তুলেছেন মঞ্চের উপর। বিচারপতি
কাশীকর রূপে রবি বাজিক চরিত্রাভিনয়ের
একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
তাঁর অভিনয় একেবারে নিখুঁত হত, যদি
তিনি তাঁর বাচনভঙ্গীকে সর্বত্র সমান
রাখতে পারতেন। নায়িকা মিস লীলা

'কেদার রায়' নাটকের একটি দৃশ্যে প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরি মুখোপাধ্যায় ও কুমারী মঞ্জু ভৌমিক

কেদারের ভূমিকায় বৈশাখীর অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি তাঁর সংলাপগুলিকে আর একটু ধীরে সুস্পষ্ট করে বললে আরও ভালো হত। শশী পুরীর সামন্ত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে; বারে বারে নিজের সীমা লঙ্ঘন করতে গিয়ে থেমে যাওয়া খুবই উপভোগ্য। অপ্রতিভ রোকড়ে বেশে অজিতকুমারও সমানভাবেই উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছেন। মিসেস কাশীকর বেশে মীরা আচার্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। পোংক্ষে ও কার্ণিকরূপে যথাক্রমে পবন ঘস্করা ও মদনসূদন যথাযথ।

'খামোশ, অদালত জারী হৈ!' অদালতের একটি সার্থক প্রযোজনা।

নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল : সপ্তাহব্যাপী ব্রতী একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। মোট ২৭টি দল অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধন দিনে লোকরঙ্গের 'গণদেবতা' সমাপ্তি দিনে পপ থিয়েটারের 'ঝুমুর' পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনীত হয়।

দলগত প্রযোজনায় ১ম শিল্পীচক্র, ২য় রাঙারাখী ৩য় অবায়। অভিনেতা ১ম : পরিতোষ আচার্য, ২য়: সন্তোষ সাহা, ৩য় : তপন কাঞ্জিলাল। সহ-অভিনেতা ১ম : পিলু মজুমদার, ২য় প্রদীপ বসু, ৩য় : সুনীল দাস। চরিত্রাভিনেতা ১ম : জ্ঞান গাঙ্গুলী, ২য় ভবেশ কুন্ডু, ৩য় মণ্টু মজুমদার। অভিনেত্রী : ১ম : কল্যাণী চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি : পালাবদল। শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা : বাবলু দাশগুপ্ত। আঞ্চলিক পুরস্কার : কল্যাণকৃৎ। দর্শক পুরস্কার : আনন্দধারা।

'আতগের ধূমকেতুর মৃত্যু' : আজকের নাটক যে স্বকীয় এক নতুনতর বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হতে পেরেছে তার মূলে রয়েছে 'ফর্ম' নিয়ে এক বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'কনটেন্টে'র হয়তো খুব আকর্ষণ নেই, কিন্তু 'ফর্মে'র স্বাতন্ত্র্যের জন্য একটি প্রযোজনা নাট্যানুরাগীদের মনকে গভীরভাবে আন্দোলিত করতে পারে। এই সত্যের আর একটি প্রোজ্জ্বলতর রূপে সেদিন ফুটে উঠলো 'বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন' মঞ্চে। নাটকের নাম 'ধূমকেতুর মৃত্যু'। প্রযোজনা করেন দক্ষিণ কলকাতার 'আতগ' নাট্য সংস্থার তরুণ শিল্পীরা। নাট্যাভিনয়ে এই সব শিল্পীদের দীর্ঘ দিনের পরিণত অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু নাটকের প্রতি নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা তাদের প্রযোজনাকে প্রাণময় করে তুলেছে।

চলচ্চিত্রের অন্যতম নায়ক অমিতাভ সেনের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন কাহিনী এই সংঘাতসমৃদ্ধ নাটকের প্রাণাবেগ সৃষ্টি করেছে। স্ত্রী সুনন্দা, অনীতা, মেয়ে লিলি এরাই এসেছে অমিতাভের জীবনে, সৃষ্টি করেছে সন্দেহ সংশয় আর বেদনার ধূসর গোধূলি। যন্ত্রণার এক নিঃসীম মুহূর্তে অমিতাভ ফুরিয়ে গেল এই পৃথিবীর চাঞ্চল্য থেকে। কাহিনীর মধ্যে কোন নতুনত্ব খুব বেশী না থাকলেও চিরন্তন প্রেম, ভালোবাসার দুরন্ত আবেগ দর্শক মনকে অভিভূত করেছে প্রায় সব সময়েই। মূল কাহিনীটি লেখা শ্রীপ্রভাত রায়ের। নাট্যরূপ দিয়েছেন তরুণ শিল্পী শ্রীরঞ্জন মুখার্জি। নাট্যরূপে শ্রীমুখার্জি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। নাট্য নির্দেশনা ও সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্বও তিনি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রযোজনায় কয়েকটি আবেগদীপ্ত মুহূর্ত সৃষ্টিতে তিনি রীতিমত পরিণত মননেরই স্বাক্ষর রেখেছেন বলতে হবে।

প্রয়োগ পরিকল্পনায় 'ধূমকেতুর মৃত্যু' নাটকটি সত্যিই একটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখতে পারে। অনেক নাট্যমুহূর্তেই দর্শকদের আবেগ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। শেষ দৃশ্যে অমিতাভের মানসপটে সুনন্দার দোলা এবং আলোর বৃত্তে তার কণ্ঠে 'অনুরাগের যে প্রদীপ আমি জেলেছি সে আলোয় তোমাকে আমি অমর করে রেখেছি অমিত' —এই মুহূর্তটি সত্যি যেন ভোলা যায় না।

মঞ্চ-পরিকল্পনা, আলোকসম্পাত ও সঙ্গীত সৃষ্টিতে এ নাটক এক অভিনব আস্বাদ এনেছিল। মঞ্চসজ্জায় সত্যি এক নতুনত্বের আস্বাদ মেলে। বিশেষ করে প্রথম দৃশ্যের স্টুডিও ফ্লোরের এফেক্ট এবং অমিতাভের ঘরের শ্যাডো জানালা এবং জেল গারদ—এই একই সঙ্গে তিনটি [illegible] যেন এক সেতুবন্ধন করেছে। মঞ্চ পরিকল্পনায় নৈপুণ্যের পরিচয় রাখে মিন্টু দেব ও কুমার ঘোষ। আলোক সম্পাতে মনোরঞ্জন ঘোষ শৈল্পিক [illegible] স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তে সঙ্গীত বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। [illegible] নাটকের গতিবেগ সঙ্গীতের শৈল্পিক ব্যবহারে আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি শিল্পীই প্রায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করতে পেরেছেন। অমিতাভ সেন [illegible] মঙ্গলময় ঘোষ আমাদের মনকে [illegible] দিয়েছে। 'সুনন্দা'র ভূমিকায় ইন্দ্রাণী [illegible] দর্শককে বিস্মিত করেছেন, যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁর সকরুণ অভিনয় চরিত্রটিকে পূর্ণতায় ভরে উঠেছে। 'অনীতা' চরিত্র

কোরিয়ার ছবি এ ফ্লাওয়ার গার্ল

সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছেন পদ্মা সেন। সুজিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বিনায়ক চৌধুরী একটি সপ্রতিভ চরিত্রচিত্রণ হতে পেরেছে। 'সুবিনয়' চরিত্রে কুমার ঘোষ মোটামুটিভাবে তাল মিলিয়েছেন, তবে শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন শ্যামলী ঘোষ (লিলি), অসিত রায়চৌধুরী (ইন্দ্রজিৎ বসু), কুশল গাঙ্গুলী (অবনী), শান্তনু ঘোষ (ডাঃ ব্যানার্জি), বামন দেব (প্রকাশ), রঞ্জন মুখোপাধ্যায় (পরিচালক), মিন্টু দেব (মন্টু), অর্জুন মুখোপাধ্যায় (ক্যামেরা-ম্যান), সুস্মিতা দাস (রিঙ্কু), নিতাই নাথ, হাবুল দাস।

উল্বার্ষিকী : শিল্পীচক্রের প্রযোজনায় সম্প্রতি সুশীল মুখোপাধ্যায়ের হাস্য-রসাত্মক নাটক 'উল্বার্ষিকী' পরিবেশিত হল রঙমহল মঞ্চে। শিল্পীদের সাবলীল অভিনয়ের ছোঁয়া পেয়ে সামগ্রিক প্রযোজনাটি সবার কাছেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। নাট্য নির্দেশনায় নিষ্ঠার পরিচয় রাখেন শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যে সব চরিত্রাভিনেতারা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, বারীন রায়, মুকুল রায়, অভয়-পদ দে, সুকান্ত বোস, সমর চক্রবর্তী, সিগাত রায়, রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। মেনকা দাস, দিপালী চৌধুরী, অজন্তা চৌধুরীর অভিনয়েও যথেষ্ট প্রাণের স্পর্শ ছিল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন হিতেশ ভট্টাচার্য, নিতাই চক্রবর্তী, কল্যাণ ঘোষ, বলাই দে, ত্রিশূল পাইন, ব্রজগোপাল দাস, অর্জুন সাহা, রবীন সিংহ, প্রভাত সেন, মুকুল ঘোষ।

বহ্নিশিখা : নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বহ্নিশিখা' নাটকটি সম্প্রতি স্টারে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন কে সি থাপার রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। বীরু মুখার্জির নির্দেশনায় মঞ্চে নাট্য মুহূর্তগুলো অসাধারণ ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন ছন্দা চ্যাটার্জি, হেমলাল কর্মকার, স্বদেশ গোস্বামী, গীতা নাগ, দিলীপ গোস্বামী, সন্তোষকুমার দত্ত, আশুতোষ বসু, প্রদীপ চৌধুরী, সুশান্ত ভাদুড়ী, গৌরীশঙ্কর গুপ্ত, পান্নালাল দত্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সবিতা ব্যানার্জি, অজন্তা চৌধুরী।

নাট্য প্রতিযোগিতা

অশোক ক্লাব আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক নাট্যাভিনয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানাঃ নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল, বজবজ।

নবীন সঙ্ঘের পরিচালনায় তৃতীয় বার্ষিক একাঙ্কিকা অভিনয় প্রতিযোগিতা হবে ১৪ ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানাঃ স্টেশন রোড, ক্যাণ্ডেল, হুগলী।

স্ট্যাণ্ডার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব . অভিনীত হাসখানুঃ স্ট্যাণ্ডার্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা গত ২৯ জানুয়ারী স্টার রঙ্গমঞ্চে

জীবনরহস্য / কল্যাণী মণ্ডল

নিশিকন্যা / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মিঠু মুখোপাধ্যায়

রৌদন ভরা বসন্ত/বাসবী নন্দী এবং দিলীপ রায়

ষষ্ঠ বার্ষিক প্রীতি অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। এই উপলক্ষে প্রবোধ সান্যালের বিখ্যাত উপন্যাস হাসুবানু নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পী অনিল রায়। সভাপতিত্ব করেন স্ট্যান্ডমেডের জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেকটর অমর দাশ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যপ্রযোজনাও কত আকর্ষণীয় হতে পারে এই সংস্থার সভারা প্রমাণ করলেন নাটকটির সর্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় দ্বারা এবং নাট্যপরিচালনার গুণে (শৈলেন মুখোপাধ্যায়)। শিল্পীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফসল অভিনয়নৈপুণ্য নাটকটিকে উপস্থিত দর্শকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলে। বিশিষ্ট চরিত্র রূপায়ণে অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় দেন — সৈকত পাকড়াশী (হিরণ), হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় (মিঃ হামিদ), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জীবেন্দ্রনারায়ণ), সুপ্রকাশ সাহা (কমলাক্ষ), বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় (হাসুবান), কল্পনা মুখোপাধ্যায় (মীরা)।

বিবিধ সংবাদ

গত ২৪ জানুয়ারী পদাবলী সংস্থা ভারতীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ যোগেশ দত্তের ইউরোপ সফরের সাফল্যের পর রবীন্দ্রসদনে একটি একক মূকাভিনয় ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত নয়টি মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। তার মধ্যে দুটি নতুন। তাঁর মূকাভিনয় দেশী ও বিদেশী সমস্ত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। মূকাভিনয়ের শেষে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ডঃ রমা চৌধুরী ও পাহাড়ী সান্যাল উপস্থিত থাকেন।

রুমানিয়া চলচ্চিত্র উৎসব

গেল শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় স্থানীয় লাইট হাউস সিনেমায় সপ্তাহব্যাপী রুমানিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ অপূর্বলাল মজুমদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মান ফ্যাসিজমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪৮ সালে রুমানিয়া চলচ্চিত্রশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে। এরই পর থেকে এই শিল্পটিতে অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়। এই শিল্পে শিক্ষিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়োগ করার প্রয়োজনে ইনস্টিটিউট অব ড্রামা অ্যান্ড সিনেমাটোগ্রাফিক আর্টস স্থাপিত হয়। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও রুমানিয়াতে আজ অন্তত ৭,০০০ চিত্রগৃহ। বছরে তৈরী হয় অন্যূন ২০টি কাহিনীচিত্র, ১৫০টি তথ্যচিত্র ও ৭৫টি সংবাদচিত্র। এ ছাড়া কার্টুন ছবিও প্রস্তুত হয় নিয়মিতভাবে। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবের অন্তর্গত কাহিনীচিত্রগুলির পরিচয় আমরা দেব বারান্তরে।

> গত ৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্বর্ধনা সভার আলোকচিত্র শ্রীতপন দাশ গৃহীত।

বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে 'অশনিসংকেত' আমন্ত্রিত

২২ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত বার্লিন শহরে যে ২৩তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হবে, তাতে বিশেষভাবে প্রদর্শনের জন্যে সত্যজিৎ রায় কৃত 'অশনিসংকেত' আমন্ত্রিত হয়েছে। উৎসব পরিচালক শ্রীরায়কে এই ছবিখানিকে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং ভারত সরকারও এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবিটির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

লগন এলো/সাবিত্রী রায়

দর্শক

'পদ্মভূষণ' ও 'পদ্মশ্রী' খেতাব

১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতের ২৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির সরকারী খেতাবে যাঁদের সম্মানিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে এই দু'জন ক্রিকেট খেলোয়াড়ও আছেন —ভিনু মানকাদ এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার। ভিনু মানকাদ পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ' খেতাব এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার 'পদ্মশ্রী' খেতাব।

ভিনু মানকাদের জন্ম ১৯১৭ সালের ১২ই এপ্রিল। ১৯৪৬ সালের ২২শে জুন মার্চেন্টের সঙ্গে প্রথম উইকেটের জুটিতে মানকাদ তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস মাঠে। তাঁর এই প্রথম টেস্ট খেলায় রান উঠেছিল ১ম ইনিংসে ৬৩ এবং ২য় ইনিংসে ৬৩। এই খেলায় ২টো উইকেট পেয়েছিলেন ১১৮ রানে। মানকাদের শেষ টেস্ট খেলা ১৯৫৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউদিল্লী)। তিনি ১৯৪৭ সালে প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জিকা কর্তৃক নির্বাচিত 'বছরের সেরা পাঁচজন খেলোয়াড়' পর্যায়ে স্থান পেয়েছিলেন। অথচ [illegible] এই সরকারী 'পদ্মভূষণ' খেতাব পেলেন টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর [illegible] চৌদ্দ বছর পর। আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে মুষ্টিমেয় খেলোয়াড় 'ডাবল' খেতাব (১০০০ রান ও ১০০ উইকেট) পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মানকাদ একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড়।

মানকাদের টেস্ট পরিসংখ্যান

খেলা ৪৪, ইনিংস ৭২; নটআউট ৫ বার, মোট রান ২১০৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৩১ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬), গড় ৩১.৪৭ এবং সেঞ্চুরী ৫টা।

বোলিং : বল ১৪৬৮৬, মেডেন ৭৭৭, রান ৫২৩৫, উইকেট ১৬২, গড় ৩২.৩১। এক ইনিংসে ৫টা করে উইকেট ৮ বার এবং একটি খেলায় ১০টি করে উইকেট ২ বার।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

৮টি (৫৫ রানে) : বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

৮টি (৫২ রানে) : বিপক্ষে পাকিস্তান নিউদিল্লী, ১৯৫২-৫৩

ভিনু মানকাদ

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

১৩টি (১৩১ রানে), বিপক্ষে পাকিস্তান, নিউদিল্লী, ১৯৫২-৫৩

১২টি (১০৮ রানে), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫১-৫২

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

৩৪টি (৫৭১ রানে), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫১-৫২

(যে-কোন দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষে রেকর্ড)

এক সিরিজে সর্বাধিক রান

৫২৬ রান (৫ ইনিংসে), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড ১৯৫৫-৫৬

টেস্টে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট

ভিনু মানকাদ তাঁর ২৩তম টেস্ট খেলায় তাঁর টেস্টের 'ডাবল' খেতাব (১০০০ রান ও ১০০ উইকেট) পাওয়ার সূত্রে সব থেকে কম টেস্ট ম্যাচ খেলে এই খেতাব পাওয়ার যে বিশ্ব রেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

টেস্ট সেঞ্চুরী

৫টি : ২৩১ রান (মাদ্রাজ) ও ২২৩ রান (বোম্বাই), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড ১৯৫৫-৫৬

১৮৪ রান (লর্ডস), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫২

১১৬ রান (৩য় টেস্ট, মেলবোর্ন) এবং ১১১ (৫ম টেস্ট, মেলবোর্ন), ১৯৪৭-৪৮

১ম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড

৪১৩ রান : মানকাদ এবং পংকজ রায়, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬

ইঞ্জিনিয়ারের টেস্ট পরিসংখ্যান

(১৯৭২-৭৩ সালের ৪র্থ টেস্ট পর্যন্ত)

খেলা ৩৭, ইনিংস ৭০; নটআউট ২ বার, মোট রান ২০০৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৯ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মাদ্রাজ, ১৯৬৬-৬৭), ক্যাচ ৫৪ এবং স্টাম্পিং ১৫।

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

ভারত সফরে এম সি সি

জামসেদপুরের কীনান স্টেডিয়ামে এম সি সি বনাম পূর্বাঞ্চলের তিনদিনের প্রথম শ্রেণীর খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে গেছে।

প্রথম দিনে এম সি সি প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ৩০৬ রান সংগ্রহ করেছিল। সারে কাউন্টির অল-রাউন্ডার গ্রাহাম রুপ ২৩৫ মিনিটে তাঁর ১২৫ রান করেন। বাউন্ডারী করেন ১৮টা এবং ওভার-বাউন্ডারী ১টা। ১ম উইকেটের জুটিতে টলচার্ড এবং রুপ দলের ১৩১ রান তুলে খেলার ভিত খুবই পাকাপোক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে এম সি সি আর ব্যাট করেনি। পূর্বদিনের অসমাপ্ত ১ম ইনিংসের ৩০৬ রানের (৫ উইকেটে) ওপরই খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪৮ রানের মাথায় শেষ হয়। পূর্বাঞ্চলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (৭০) করেন অম্বর রায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক রমেশ সাক্সেনা (৩৩ রান) এবং অম্বর রায় ১১৬ মিনিটের খেলায় দলের অতি মূল্যবান ৮৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন। চতুর্থ উইকেট জুটি ভাঙার পর শেষ ৬টা উইকেট তাসের ঘরের মত মাত্র ৬ রানে পড়ে যায়। বব কে.টুমের বল মারাত্মক হয়েছিল—২৫ রানে ৫টা উইকেট। খেলার এক সময় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—এক রানও না দিয়ে ৩টে উইকেট। পূর্বাঞ্চলের ১ম ইনিংসের ১৪৮ রানের থেকে ১৫৮ রানে এগিয়ে থেকেও এই খেলায় এম সি সি-র অধিনায়ক মাইক ডেনেস পূর্বাঞ্চলকে 'ফলো-অন' করাতে বাধ্য করেননি। কারণ জয়লাভের থেকে কানপুর টেস্টের আগে এই খেলায় দলের খেলোয়াড়দের ব্যাটিংয়ের অনুশীলন বেশী প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এম সি সি তাদের ২য় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ৩৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে এম সি সি তাদের ২য় ইনিংসের ৯৯ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অবস্থায় পূর্বাঞ্চলের জয়লাভের জন্যে যেখানে ২৪৮ রানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে খেলার বাকি ২৫৫ মিনিট সময়ে পূর্বাঞ্চল ২য় ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ১৭৬ রান তুলেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

এম সি সি : ৩০৬ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রুপে ১২৫ এবং টলচার্ড ৭০ রান। সন্দীপ রায় ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ৯৯ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নট ৩৪ রান। সুব্রত গুহ ৩৬ রানে ৪ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ১৪৮ রান (অম্বর রায় ৭০ এবং রমেশ সাকসেনা ৩৩ রান। কোট্টাম ২৫ রানে ৫ এবং গ্রিগ ৩৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৭৬ রান (৮ উইকেটে। হাজারিকা ৪৬ রান। গ্রেগ ৩৩ রানে ৩ উইকেট)

আমেদাবাদের প্যাটেল স্টেডিয়ামে এম সি সি বনাম পশ্চিমাঞ্চলের তিন দিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এম সি সি তাদের ১৯৭২-৭৩ সালের ভারত সফরে তিনদিনব্যাপী সমস্ত সাধারণ খেলাই (সংখ্যায় পাঁচটি) ড্র করেছে।

পশ্চিমাঞ্চল দলে ওয়াদেকার, গাভাস্কার, ইঞ্জিনিয়ার, সোলকার প্রভৃতি খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেন নি।

পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক দিলীপ সরদেশাই টসে জিতে এম সি সি দলকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। এম সি সি তাদের ১ম ইনিংসের ২৭৯ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। গ্রাহাম রুপে সেঞ্চুরী (১৩০ রাণ) করেন। ১ম উইকেটের জুটিতে ডেনিস আমিস (৬৩ রাণ) এবং রুপে ১২৫ মিনিটের খেলায় দলের ১৩৩ রাণ তুলে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দলের কোন উইকেট না পড়ে ৫ রাণ উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের সময় পশ্চিমাঞ্চল দলের রাণ দাঁড়ায় ২১৮ (৪ উইকেটে)।—এম সি সির ১ম ইনিংসের ২৭৯ রাণের থেকে ৬১ রাণ কম। আশ্চর্য পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়ক চা-পানের সময়ের এই ২১৮ রাণের (৪ উইকেটে) ওপরই খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পশ্চিমাঞ্চলের হেমন্ত কানিতকার এবং অশোক মানকাদ ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৯২ মিনিট খেলে দলের ১১১ রাণ সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল এম সি সি ২য় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১০৫ রাণ তুলে ১৬৬ রাণে এগিয়ে গেছে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে এম সি সি তাদের ২য় ইনিংসের ২০৮ রাণের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন এম সি সি ৮৩ মিনিটে আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে ১০৩ রাণ তুলেছিল। খেলার বাকি ২০৭ মিনিটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৭০ রাণ তুলতে পশ্চিমাঞ্চল ২য় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে এই ২৭০ রাণ তোলা সম্ভব হয় নি। পশ্চিমাঞ্চলের ২য় ইনিংসের ১৯৪ রাণের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়। অসমাপ্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে কানিতকার এবং ঘাবরী ১৩৭ মিনিটের খেলায় ১৪১ রাণ তুলেছিলেন। কানিতকার তাঁর নটআউট ৭২ রাণে ১০টা বাউন্ডারী এবং ঘাবরী তাঁর নটআউট ৭৯ রাণে ১০টা বাউন্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

এম সি সি : ২৭৯ রাণ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রুপে ১৩০ এবং আমিস ... রাণ। শিভালকার ৯৬ রাণে ২ এবং ... ৬৩ রাণে ২ উইকেট)।

ও ২০৮ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টলচার্ড নটআউট ৫১ রাণ। শিভালকার ৭৭ রাণে ৬ এবং যোশী ৭২ রাণে ... উইকেট)

পশ্চিমাঞ্চল : ২১৮ রাণ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চৌহান ৫১, কানিতকার ... আউট ৫৩ এবং মানকাদ ৫৪ রাণ। আর্নল্ড ১৬ রাণে ১, কোট্টাম ৩০ রাণে ১, পোকক ৭৮ রাণে ১ এবং ওল্ড ২ রাণে ১ উইকেট)

ও ১৯৪ রাণ (৪ উইকেটে। কানিতকার নটআউট ৭২ এবং ঘাবরী নটআউট ৭৯ রাণ।

কোচবিহার কাপ

ইডেন উদ্যানে রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ... উইকেটে পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত করে মোট ৪ বার কোচবিহার কাপ জয়ী হয়েছে। চারদিনের বরাদ্দ ফাইনাল খেলাটি ... দিনেই শেষ হয়ে যায়।

প্রথম দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের ... ইনিংস ১০৫ রানে শেষ হলে খেলার ... সময়ে দক্ষিণাঞ্চল দুটো উইকেট খুইয়ে ৬৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের ... ইনিংস ২৪৮ রানের মাথায় শেষ হলে ... ১৪৩ রানে এগিয়ে যায়। এই ... পশ্চিমাঞ্চল ২য় ইনিংসের ... উইকেটে ... রান তুলেও ৮৭ রানে পিছিয়ে থাকে।

তৃতীয় দিনে চা-পানের কিছু ... পশ্চিমাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস ১৯৬ ... মাথায় শেষ হলে দক্ষিণাঞ্চল ২ উইকেট বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫৪ রান তুলে ৮ উইকেটে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল : ১০৫ রান (মজারে ২৩ ... এস আমেদ ১৬ রানে ৪ উইকেট)

ও ১৯৬ রান (রাজীন্দর সিং জাদেজা নট আউট ৮৪ রান। ইমতিয়াজ আ... ৩৩ রানে ৩ এবং হরিহরণ ৩৩ রা... ৩ উইকেট)

দক্ষিণাঞ্চল : ২৪৮ রান (ইমতিয়াজ আ... ৫১ রান। মজারে ২৬ রানে ৪ এবং শাস্ত্রী ৬৭ রানে ৪ উইকেট)

ও ৫৪ রান (২ উইকেটে)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪১ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
মাশুল—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 16th February, 1973 শুক্রবার, ৪ ফাল্গুন, ১৩৭৯ **.52 Paise**

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮৪	চিঠিপত্র		
৮৫	সম্পাদকীয়		
৮৬	দেশেবিদেশে		—শ্রীপদ্মরাগ
৮৯	কালকের দিনটা		—শ্রীবিমলা মিত্র
৯১	নতুন করে	(গল্প)	—শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়
৯৭	জানালা থেকে স্লোটাং		—শ্রীকল্যাণী ভট্টাচার্য
১০০	একবিকেলেই শেষ	(কবিতা)	—শ্রীদিব্যেন্দু পালিত
১০০	গোপিত গন্ধী বর্ণমালা	(কবিতা)	—শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়
১০০	সভ্যতার অবলুপ্তি	(কবিতা)	—শ্রীবিনয় ভৌমিক
১০১	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১০৬	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
১১১	আমরা গড়ে তুলি		—শ্রীসুশান্তকুমার মিত্র
১১৩	আপনি কেমন আছেন		—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
১১৪	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
১১৭	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
১২০	এই আমাদের দেশ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
১২৫	একটু উষ্ণতার জন্যে	(উপন্যাস)	—শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
১৩৪	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
১৩৯	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
১৪১	ফুল ফোটার আগে		—শ্রীশৈলেন রায়
১৪৬	অঙ্গনা		—শ্রীপ্রমীলা
১৪৭	লেডিস কামরা		—শ্রীঅরুন্ধতী সেনগুপ্ত
১৪৮	জীবিকা হিসেবে মডেল		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
১৪৯	স্টুডেন্টস হেলথ হোম : মহান প্রয়াস		—শ্রীপম্পা মিত্র
১৫১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
১৫৯	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

বিলুপ্ত নগরী গৌড় প্রসঙ্গে

'অমৃত'এর ২৮শে পৌষ-এর সংখ্যায় শ্রীউৎপল চক্রবর্তীর 'বিলুপ্ত নগরী গৌড় লক্ষণাবতী...লক্ষৌতি পাঠ করে বড় আনন্দ পেলাম। গৌড়-এর গৌরবে এককালীন তামাম বঙ্গদেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। সেই গৌরব রবি আজ অস্তমিত। ক্ষয়িষ্ণু গৌড় আজ কালের কপোলতলে শেষ বিদায়ের অশ্রুর মতো। সেই গৌড়—লক্ষণাবতী... লখনৌতি সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তীর বিস্তারিত আলোচনা অনেক বঙ্গপ্রেমিককে নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করবে।

উক্ত প্রবন্ধে 'দ্বারবাসিনী' মন্দির ও 'কোতয়ালী দরজা' সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ইংরেজ-বাজার থানার অন্তর্গত যোত্‌ কোতোয়ালী গ্রামের কাছে বড় একটি আমবাগানের মধ্যে আরেকটি দ্বারবাসিনী মন্দির রয়েছে এবং সেখানে এখনও বছরের নির্দিষ্ট তিথিতে সাড়ম্বরে পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এক কালের এই দেবী মন্দিরটি গভীর অরণ্যের মধ্যে ছিল বলে অনেকের ধারণা। মন্দিরটি অতি প্রাচীন এবং স্থানীয় প্রবীণ লোকেদের কাছে জানা যায় যে সেকালে দ্বারবাসিনী ছিলেন ডাকাতদের উপাস্য কালী দেবতা। কিংবদন্তী আছে—কোন ঘটনাচক্রে ডাকাত সর্দারের কিশোরী কন্যাকে দেবী ভক্ষণ করেন। খবর পেয়ে সর্দার মন্দিরের নিকটে পৌঁছুবার আগেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এবং সেই বন্ধ দরজা আজো খোলা সম্ভব হয়নি। ডাকাত সর্দার মন্দিরের ভিতরকার সব ব্যাপার বন্ধ দরজার যে ফুটো দিয়ে দেখে-ছিলেন, সেটি আজো রয়ে গেছে দেখা যায়। আরো জনশ্রুতি আছে যে দেবী সম্ভবত তাঁর এইজাতীয় কাজের জন্য লজ্জিত হন এবং তাঁর ভক্তদের সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্যই মন্দিরের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেন। এই দ্বারবাসিনী মন্দিরটি কয়েক শ বছরের পুরনো এবং গৌড়ীয় যুগের বলে অনেকে অনুমান করেন।

'কোতয়ালী দরজা' প্রসঙ্গে লেখক যা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সংযোজনের অপেক্ষা রাখে। মালদহ শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কালিন্দী নদীর তীরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে—নাম তার কোতয়ালী। সার্থকনামা। গৌড়ীয় যুগে এই গ্রামের সংলগ্ন এলাকায় যে কোতয়ালরা বাস করতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। মালদা শহর থেকে এই গ্রামে আসার পথে যোত্‌ আরাপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে কালিন্দী মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন মিনার নজরে পড়ে। কথিত আছে এটি গৌড়ীয় যুগের। এবং এই মিনারের তলদেশ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথ চলে গেছে সোজা রাজধানী গৌড়ে। জানা যায় জলপথে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য এই মিনার নির্মিত হয়েছিল।

কোতয়ালী গ্রামের যত্রতত্র মাটির নীচ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বহুবিধ পাথরের দেব-দেবীর মূর্তি, এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং শিল্পকলার নমুনা। গ্রামের প্রাচীন ও প্রখ্যাত সেনবাড়ির গৌরাঙ্গ মন্দিরের চাতালে কিছু নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত আছে। গ্রামের আশেপাশে গৌড়ীয় যুগের ধাতব দ্রব্য পাথরের থাম ইত্যাদি নজরে পড়ে। উনিশ-কুড়ি বছর আগে কালিন্দী নদীর তীরে অবস্থিত রক্ষাকালী মন্দিরের কাছে এক স্থানে হঠাৎ সামান্য ফাটল নজরে পড়ে। সেই ফাটল পথে নজর রেখে অনেকেই মাটির নীচে অবস্থিত প্রকৃত প্রাচীন যুগের অট্টালিকার নমুনা দেখতে পান। মাটি খুঁড়ে এই সব উদ্ধার করাতো দূরের কথা...দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই ফাটলটিকে কেউ বা কারা বন্ধ করে দেয়।

এরই কিছু দূরে একটি সুউচ্চ ভগ্নপ্রায় প্রাচীর নজরে পড়ে। প্রাচীরের অপরদিকে এক দিঘি আছে। এই দিঘিকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে। এটিও গৌড়ীয় যুগের কীর্তি। কোতয়ালী গ্রাম অতিক্রম করে পরহাট্টা যাবার পথে তেলীপাড়ার শেষ প্রান্তে দক্ষিণ দিকের এক জায়গায় কিছু ইঁট ও মাটির ঢিবি আছে, আর আছে কতকগুলি থাম। এবং তার আশেপাশে স্তূপীকৃতভাবে জমে আছে লোহার টিনের টুকরো ইত্যাদি। অনুমিত হয় এখানে গৌড়ীয় যুগে কোন কারখানা ছিল। যুক্তিবাদিরা বলেন, কোতয়ালী গ্রামে কোতয়ালরা থাকতেন এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও সারানোর জন্য সম্ভবত এই কারখানা ব্যবহৃত হতো।

শ্রীচক্রবর্তীর প্রবন্ধে 'অমৃতি' গ্রামের উল্লেখ আছে। এই অমৃতি কোতয়ালী থেকে মাত্র ৩।৪ কিলোমিটার পথ। সুতরাং ইংরেজবাজার থানার অধীন যোত্‌ আরাপুর-কোতয়ালী-তেলীপাড়া গ্রামগুলির মাটির উপরে ও নীচে যে প্রচুর গৌড়ীয় যুগের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নারায়ণ সেনগুপ্ত
বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ

'সোনামুখীর মন্দির' এত অবহেলিত কেন ?

শ্রীপঞ্চানন রায় লিখিত 'বাংলার মন্দির' শীর্ষক রচনাগুলি অনেক পাঠককে যথেষ্ট আনন্দ দিচ্ছে। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার সোনা-মুখীর (পৌর শহর) শ্রীধরের মন্দির পঁচিশ চূড়া বিশিষ্ট, টেরাকোটার কাজ সহ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বহু প্রাচীন ও অন্য তথ্য সমৃদ্ধ হলেও উপযুক্ত গবেষণার অভাব রয়েছে। এ ছাড়াও এখানের স্বর্ণময়ী মন্দির, গোবর্দ্ধন বেড়ের মন্দির, বাঁধ পুকুরের ঘাট প্রভৃতি স্থান সম্পর্কে উপযুক্ত লেখকের প্রচেষ্টায় অনেক অজানা তথ্য প্রকাশিত হতে পারে। এ বিষয়ে সমস্ত লেখক ও গবেষককে তথ্য সংগ্রহে সাহায্যের জন্য সর্বদা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

মহাদেব দে
সোনামুখী বাঁকুড়া।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রসঙ্গে

অমৃতের ৪০ সংখ্যায় শ্রীসুশান্ত মিত্রের লেখা 'আমরা গড়ে তুলি' শীর্ষক ফিচারে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' সম্পর্কে আলোচনাটি পড়লুম। লেখাটি ভালো। এই সংস্থার অতীত-বর্তমানের ওপর, লেখক আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন, সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

কিন্তু লেখাটি পড়ে গড়ে-তোলার চেয়ে সঙ্কটের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। বর্তমান অবস্থায় সংস্থাটি কি কাজ করছে, কিভাবে সাহায্য করছে, তার হদিশ যদি আরো ভালো করে জানা যেত ভালো হত।

এই সংস্থাটির সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ-কালের স্মৃতি ও আবেগ জড়িয়ে আছে। উদ্যোক্তাদের চোখে ছিল অনেক স্বপ্ন ও সংকল্প। বাংলাদেশ ও বাঙালী সংস্কৃতির উৎসকেন্দ্র হিসেবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে যাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার পূর্ণ বিবরণ না হোক, আংশিক বিবরণ পেলেও, আমরা উপকৃত হতুম। তাহলে আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হত, বর্তমান সঙ্কটের গভীরতা কতটুকু।

শুনেছি, সাহিত্য পরিষদ বর্তমানে নানারকম সাংগঠনিক জটিলতায় ভুগছে। বর্তমান সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারও হয়তো এই জটিলতার কথা জানেন। কিন্তু সুশান্তবাবুর লেখায় তার সামান্যতম আভাস পর্যন্ত নেই। মদনবাবু তাঁকে কেবল আর্থিক অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। কেন সব কথা খোলাখুলি বললে আপত্তি কি?

সাহিত্য পরিষদের অতীত-ঐতিহ্যের কথা ভেবে, আমার বিশ্বাস, যে-কোনো মানুষই কম-বেশী স্মৃতিমুখর না হয়ে পারেন না। সেজন্যেই, বর্তমান সম্পাদকের কাছেও প্রত্যাশা অনেক। তিনি বলুন, সাহিত্য পরিষদকে গড়ে তোলার ব্যাপারে কি উদ্যম তিনি নিয়েছেন? এই সংস্থাটি নষ্ট হলে, আমাদের একটি অতীতও লুপ্ত হবে। এবং তার দায়ভাগ, শুধু কর্মকর্তাদের নয়, বাঙালী হিসাবে আমরা কেউই এড়াতে পারব না। এবং তখনই আসবে গড়ে তোলার কথা।

—দীপক ভৌমিক, কলকাতা-৩

এক এশিয়ার স্বপ্ন

দিল্লিতে গত সপ্তাহে প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়ার উদ্যোগে এক এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য এই সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা নানা বাস্তব সমস্যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। এ হল পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা। অখণ্ড এশিয়ার রাজনৈতিক ব্যাখ্যার চেয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার বিচার ও বিশ্লেষণই আজ সবচেয়ে জরুরি। সম্মেলনে প্রদত্ত এবং আলোচিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও জনসংযোগকর্তাব্যক্তিদের প্রস্তাব এই বাস্তব সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করবে, এ আশা আমরা করি।

গত মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন রাজনীতিবিদ অখণ্ড পৃথিবীর এক আদর্শবাদী পরিকল্পনা করেছিলেন। যুদ্ধ-বিদীর্ণ পৃথিবীতে সে পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়ে যায় মানুষের বিনষ্ট শান্তির স্বপ্নের মতোই। যুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই স্বপ্নকেই নতুন রূপ দেবার চেষ্টা হয়। গত পঁচিশ বছরে রাষ্ট্রসংঘ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে স্বপ্নকে সার্থক করতে না পারলেও, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে তার সাফল্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা পারস্পরিক নির্ভরতার উপলব্ধি এনে দিয়েছে। আজ আমরা এশিয়ার ঐক্য ও পারস্পরিক সান্নিধ্যের কথা ভাবছি মূলত রাষ্ট্রসংঘের ঐক্যের আদর্শের অনুসরণেই। এশিয়া একটি বৃহৎ, জটিল ও জনবসতিপূর্ণ মহাদেশ। শিক্ষায়, প্রযুক্তিবিদ্যায়, সামাজিক উন্নয়নে সমৃদ্ধ প্রতীচীর চেয়ে সে এক শতক পিছিয়ে আছে। দীর্ঘ শতাব্দী এশিয়ার বুকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার নির্বিচার শোষণ ও অত্যাচার চালিয়েছে। তার রাজনৈতিক অধিকার নিয়েছিল কেড়ে, তার অর্থনৈতিক সম্পদ হয়েছে লুণ্ঠিত। বলা হয়, অধিক জনসংখ্যার জন্যই এশিয়ার অগ্রগতি ব্যাহত। কিন্তু এ কথা কি অস্বীকার করা চলে যে, এশিয়ার দারিদ্র্য দীর্ঘ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শোষণেরই প্রতিক্রিয়া! পৃথিবীর সর্বত্র শান্তির জন্য আকুলতা। অথচ এই এশিয়ারই এক ক্ষুদ্র দেশ ও জাতির ওপর গত পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমী শক্তি তাদের নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে গেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে, ভিয়েতনামে মার্কিন সরকার যে নৃশংস বোমাবর্ষণ ও অত্যাচার করেছে, কোনো শ্বেতাঙ্গ জাতির ওপর তা করতে পারত না। কালো বা পীত বা তামাটে মানুষের প্রাণের কি কোনো মূল্য নেই? এতে আমেরিকা ক্ষিপ্ত কিন্তু এর মধ্যেই পশ্চিমী দেশগুলোর জাত্যাভিমান ও অহমিকা লুক্কায়িত। এই সত্য তাঁরা অস্বীকার করেন কোন্ মুখে?

আমাদের রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে এশিয়ার সকল দেশের মধ্যে কার্যকর ঐক্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই আজ এশিয়ার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। ভিয়েতনামে শান্তিচুক্তি আমাদের সামনে নতুন দায়িত্ব এনে দিয়েছে। এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে আজ যে বোঝাপড়া হয়েছে তাতে আমরা আশা করতে পারি যে, যুদ্ধ ও সংঘাতের যুগ শেষ হয়ে হয়তো বা পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হবে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ডঃ কুর্ট ভাল্ডহাইমও সেই আশার বাণীই উচ্চারণ করেছেন। প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি এশিয়া এতদিন ছিল আত্মবিস্মৃত, পদানত ও পরাহত। গত আড়াই দশকে তার সত্তার নবজাগরণ ঘটেছে। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম এই নবজাগরণের তরঙ্গে দোলায়িত। পারস্পরিক বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক বিরোধ বিস্মৃত হয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যদি এখন কাছাকাছি না আসে তাহলে এই নবজাগরণ হবে ব্যর্থ। আবার তাকে বৃহৎ শক্তির চক্রান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ডঃ ভাল্ডহাইম এশিয়ার গৌরবময় অতীত ও তার বর্তমান জাগরণের উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বিশেষ তাৎপর্যবাহী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আরও বিশদভাবে এশীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এশিয়ার রূপান্তর ঘটাতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে, তার চিরায়ত সমাজের আধুনিকীকরণে এবং তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায়। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ কোনোদিনই এশিয়ার এই জাতীয়তাবাদের মর্যাদা দেয়নি। সে কারণেই গত দুই দশক ধরে এশিয়ায় তাদের ব্যর্থতা এত প্রকট। এশীয় ঐক্যের সূচনা হতে পারে যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামে শান্তি সংরক্ষণে ও তার পুনর্গঠনে সহযোগিতার মাধ্যমে। শ্রীমতী গান্ধী এর ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন তা এশিয়ার দেশগুলোকে বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান বিনিময়ের দ্বারা এশিয়ার ঐক্যবোধকে সম্প্রসারিত ও অর্থপূর্ণ করার সময় এসেছে। পশ্চিমী চিন্তার কাছে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ না করে এশিয়ার মানুষ যদি নিজেদের প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং দেশের সম্পদ পরস্পরের উন্নয়নে প্রয়োগ করে তাহলে আগামী শতক এশিয়ার পক্ষে হবে এক স্বর্ণযুগ। পৃথিবীর ইতিহাসকেও তা করবে সমৃদ্ধতর।

কাঠমান্ডুর সিংদরবারে শ্রীমতী গান্ধী সহ নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব ও রাণী ঐশ্বর্য রাজলক্ষ্মী।

দেশে বিদেশে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভার যে পুনর্গঠন করেছেন সে-বিষয়ে নয়াদিল্লির একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম হলঃ—"আর একবার মধ্য রাত্রে।" এর আগেও যখন শ্রীমতী গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেছেন তখন প্রায় মধ্য রাত্রিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে উপস্থিত হয়ে পুনর্গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যদের তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে দিয়ে এসেছেন এবং তারপর রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রকাশিত ইস্তাহারে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সংবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবারও প্রধানমন্ত্রীর সেই অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়নি, এটা লক্ষ্য করেই দিল্লির সংবাদপত্রে ঐ শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এবারকার এই পুনর্গঠন তেমন বড় ধরনের কিছু নয়। এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় সেটা হল এই যে, শ্রীমতী গান্ধী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গুরু দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে তার উপর আবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ চালান যে একটা দুর্বহ বোঝা, তাতে সন্দেহ নেই। যদিও আইন ও শৃঙ্খলা রাজ্যগুলির এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় তাহলে বড় রকমের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করতেই হয় এবং সেটা করতে হয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মারফৎ। অন্ধ্রে ও আসামে যা ঘটেছে বা ঘটছে সেদিকে তাকালেই বোঝা যাবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপর কাজের চাপ কতখানি। অতীতে আর কখনও প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব বহন করেন নি। বরং, সর্দার প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রভৃতির মত প্রথম সারির নেতারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করেছেন। অপরপক্ষে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীত্বের সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন তাঁকে সেই

দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলেন শ্রীউমাশংকর দীক্ষিত। এই কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে শ্রীদীক্ষিতকে বেছে নিয়েছেন তা [illegible] প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের [illegible] জন্য এমন একজনকে খুঁজছিলেন যাঁর উপর তিনি ষোল আনা আস্থা স্থাপন করতে পারেন। উত্তরপ্রদেশের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীদীক্ষিত নেহরু পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকটতম পরামর্শদাতাদের একজন।

এবারকার পুনর্গঠনে কোন মন্ত্রী বাদ যাননি। একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রীর পদোন্নতি হয়েছে। আর তিনজন নতুন পূর্ণ মন্ত্রী, একজন নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রী আর আটজন নতুন উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রীভোলা প্যাসোয়ানকে পূর্ণ মন্ত্রী হিসাবে ক্যাবিনেটে নেওয়ায় এবং শ্রীললিতনারায়ণ মিশ্রকে রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে পূর্ণ মন্ত্রীর পদে উন্নীত করায় ক্যাবিনেটে বিহারের প্রতিনিধিত্ব বেড়ে তিন হল। শ্রী দেবকান্ত বড়ুয়ার অন্তর্ভুক্তিতে আসামের প্রতিনিধিত্বও বেড়ে এক থেকে দুই হল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিতই রয়ে গেল। শ্রীসিদ্ধার্থশংকর পশ্চিমবঙ্গের ভার গ্রহণ করে চলে আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রতিনিধি নেই। মন্ত্রিসভার সর্বশেষ পুনর্গঠনের পরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পশ্চিমবঙ্গের আসন শূন্যই রয়ে গেল।

তবে পশ্চিমবঙ্গ এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করতে পারে যে, বহুদিন বাদে কিছু কিছু অর্থনৈতিক দপ্তরের নিচের দিকে বাঙালী মন্ত্রীরা প্রবেশ করার সুযোগ পেলেন। সম্ভবত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শচীন চৌধুরির বিদায়ের পর থেকে কেন্দ্রের কোন অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ে এমনকি ডেপুটি মিনিস্টার স্তরেও কোন বাঙালীকে নেওয়া হয়নি। এবার ডাঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে পুনর্গঠিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভার দেওয়া হল এবং শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধ হাঁসদাকে যথাক্রমে শিল্প উন্নয়ন এবং ইস্পাত ও খনি দপ্তরের উপমন্ত্রী করা হল। মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সব মিলিয়ে নতুন ১২ জন সদস্য গ্রহণ করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৩০। এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর আয়তন কখনও এত বড় ছিল না।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর থেকে এই নিয়ে তৃতীয়বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করা হল। এত ঘন ঘন মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে কোন কোন মহল থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন, দেখান হয়েছে যে, গত ছয় বছরে ছয়জন রেলওয়ে মন্ত্রী এসেছেন আর গেছেন। এই ছয়জন হলেন—শ্রী এস কে পাতিল, সি এম পুনাচা, ডঃ রামসুভগ সিং, শ্রীগুলজারিলাল নন্দ, শ্রীকে হনুমন্তাইয়া ও শ্রী টি এ পাই। [illegible] মন্ত্রী হিসাবে শ্রীসুর-[illegible] ছয় মাসও টি'কতে পারলেন না। তাঁর আগে শ্রীমনুভাই শাহ, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, শ্রীদীনেশ সিংহ ও মইনুল হক চৌধুরী, কেউই [illegible] মন্ত্রণালয়ে থাকতে পারেন নি। অনুরূপভাবে শিক্ষা, পূর্ত ও পুনর্বাসন, পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়েও অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মন্ত্রী বদল হয়েছে।

এবারকার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলির পুনর্বিন্যাস। এই পুনর্বিন্যাসের মধ্যে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেটা হল এই যে, ভারী শিল্প নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করে শ্রী টি এ পাইকে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধান প্রধান যাবতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ও বৈদ্যুতিক শিল্প এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় আসবে। [illegible] শ্রীপাইয়ের অধীনে এই মন্ত্রণালয় [illegible] গুরুত্ব লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

•

অখণ্ড এশিয়া সম্মেলনে ভিয়েতনাম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর যে শোরগোল তুলেছেন তার মাত্র একটাই বোধগম্য ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তা হল এই যে, তিনি ভিয়েতনামে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন বলে তাবৎ পৃথিবীতে প্রেসি-

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ কুর্ট ভালডাইমকে দমদমে অভ্যর্থনা জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়। ঢাকা থেকে ডঃ ভালডাইম সস্ত্রীক দমদমে আসেন।

ডেন্ট নিকসনের নামে যে ধন্য ধন্য রব ওঠেনি সেই কারণে তিনি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর সেই গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন শ্রীমতী গান্ধীর কথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়ে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন যদি আশা করে থাকেন যে ভিয়েতনামের যুদ্ধবিরতি সম্ভব করে তোলার জন্য তাঁকে এবং এক-মাত্র তাঁকেই—সকলে বাহবা দেবে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর হতাশ হওয়ার কারণ ঘটেছে। যদিও এটা ছিল আমেরিকার ইতিহাসের দীর্ঘতম যুদ্ধ, যদিও এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের একটা বড় অংশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাহলেও এমনকি খাস আমেরিকা-তেও এই যুদ্ধবিরতির সংবাদে আনন্দের বান ডেকে যায় নি। একটি মার্কিন সংবাদ-পত্রে খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, 'এই যুদ্ধ শেষ হল জয়ধ্বনির মধ্যে নয়, দীর্ঘ-শ্বাসের মধ্যে।'

ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতির সংবাদে সারা পৃথিবী জুড়ে যে মাতামাতি হয় নি, তার প্রধান দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, যে সব সর্তে এই যুদ্ধবিরতি হয়েছে সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে এতই অস্পষ্ট যে, সেগুলির ভিত্তিতে ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই মনে সন্দেহ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেক দিন পর পর্যন্ত এর অনেক তিক্ত স্মৃতি জাগরূক থাকবে। ভিয়েতনামের এই যুদ্ধে সবচেয়ে বড় যা 'মিসিং ইন অ্যাকশন' হয়েছে সেটা হল আমেরিকা তথা সারা পৃথিবীর বিবেক। এশিয়ার একটা ছোট দেশের উপর ইতিহাসের প্রচণ্ডতম বোমাবর্ষণ করা হয়েছে, নারী-পুরুষ অথবা শিশু নির্বি-শেষে কয়েক লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সে দেশের হাজার হাজার নারীকে বারবনিতায় পরিণত করা হয়েছে, ১৫ হাজার অবৈধ শিশুর জন্ম দিয়ে আমেরিকান সৈনিকরা তাদের পরিত্যাগ করে গেছে, আট লাখ লোককে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। অথচ বলতে গেলে সারা পৃথিবীর রাষ্ট্র-নায়করা তফাতে দাঁড়িয়ে এই ঘটনাগুলি দেখেছেন। যে বিবেক ভিয়েতনামের রণক্ষেত্রে হারিয়ে গেছে সেই বিবেক ফিরে পেতে সময় লাগবে। ভিয়েতনামের যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের সেই অপরাধ বোধেরও অবলুপ্তি ঘটে নি।

অখণ্ড এশিয়া সম্মেলনে শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রশ্ন তুললেন, 'ভিয়েতনামীরা যদি ইউরোপীয় হত তাহলে কি ভিয়েত-নামের যুদ্ধ বা বোমাবর্ষণের বর্বরতাকে এত দীর্ঘকাল ধরে সহ্য করা হত?' এখন তিনি সেই সারা পৃথিবীর সেই হারান বিবেকের প্রশ্নই তুললেন। কিন্তু দর্পণে নিজেদের মুখ দেখলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষ : মানবতার বিরুদ্ধে অপ-রাধীর মুখ। তাই তাঁরা সহসা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে হুকুম দিলেন—ভারতে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহানের ভারতযাত্রা স্থগিত রাখা হোক। মাস ছয়েক আগে সেই যে কেনেথ কিটিং সাহেব ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-দূতের পদ ছেড়ে দিয়ে গেছেন সেই থেকে ঐ পদটি খালিই ছিল।

ইদানীং ভারত ও আমেরিকা পরস্পরের সঙ্গে সহজতর সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার পরই ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে ময়নিহানের নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়। এখন ময়নিহানের দিল্লীতে পৌঁছবার তারিখ পিছিয়ে দিয়ে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে সমঝোতার পথে একটি কাঁটা দিল।

৯-২-৭৩ —পুণ্ডরীক

কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে, কিম্বা ঘটার কথা ছিল অথচ ঘটেনি; অথবা অনেক দিন আগে ঘটেছিল যা কাল মনে পড়েছে, হয়তো কাউকে দেখে অথবা কারো পুরোনো কোনো চিঠি বা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে— তারই উপর এক পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম হলেও প্রবীণ ও নবীন লেখকদের কলমে এই ফিচার বুদ্ধির দীপ্তিতে আর হৃদয়বৃত্তির গভীরতায় লক্ষ্যভেদ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঠকরাও যোগ দিতে পারেন।

বিমল মিত্র

—এটা কি লেখক বিমল মিত্রের বাড়ি?

বললাম—হ্যাঁ।

—তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

বললাম—হ্যাঁ, আমিই কথা বলছি—

—আমি নর্দার্ন ব্যাঙ্কের কলকাতা ব্রাঞ্চ থেকে বলছি, আমাদের স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক ফাংশান আছে আসছে মাসের দুই তারিখে, ওই দিন আপনাকে আমরা সম্বর্ধনা জানাতে চাই—

আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম—সম্বর্ধনা? আমি কী করেছি যে আমাকে আপনারা সম্বর্ধনা দেবেন?

ভদ্রলোক তখন গলাটা মিহি করে বললেন—আপনি তো 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন, সেই জন্যেই আমাদের সশ্রদ্ধ......

আমি আরো অবাক। বললাম—সে তো একযুগ আগের ঘটনা, এখন তো ওটা বাসি হয়ে গেছে। তার জন্যে এতদিন পরে আপনাদের এ-আগ্রহ কেন? আর ওটা কি একটা গৌরবের জিনিস—?

ভদ্রলোক বললেন— আপনি অমত করবেন না, আমাদের বিশেষ ইচ্ছে আমরা আপনাকে সম্বর্ধনা জানাই—

আমি বললাম— দেখুন, এই সম্মানের জন্যে আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। যাঁর কৃতিত্ব তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেই আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

—তিনি কে?

বললাম—তিনি আমার প্রকাশক। কলেজ স্ট্রীটে তাঁর অফিস আছে, সেখানেই তাঁকে পাবেন। আসলে তিনি খুব প্রভাবশালী লোক, তিনি অনেক তদ্বির-তদারক করে আমাকে ওই পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছেন।

—তদ্বির-তদারক বলছেন কেন? ওটা আপনার বিনয়!

বললাম—না, বিনয় নয়। আপনারা খবর করুন আমার প্রকাশক তদ্বির-তদারক না করলে আমি কোনও পুরস্কারই পেতুম না, পৃথিবীর কোনও পুরস্কারই বিনা তদ্বির-তদারকে পাওয়া যায় না—

কিন্তু ভদ্রলোক না-ছোড়-বান্দা। তিনিও বিশ্বাস করবেন না, আর আমিও তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারবো না। এমন সময়ে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। আর আমি বাঁচলাম।

আসলে আমি জানি সম্বর্ধনা জানানোর ব্যাপারটা মিথ্যে। 'সভাপতি' বা 'প্রধান অতিথি' জিনিসটা আজকাল পুরোন হয়ে গেছে। ওটাতে সহজে কাউকে রাজি করানো যায় না বলে এই সম্বর্ধনার টোপ গেলাবার চেষ্টা।

তা এ তো গেল সকাল সাড়ে দশটার সময়কার ঘটনা। ভোর সাড়ে চারটে পাঁচটার সময়েই আরম্ভ হয় আমার দিন। কালকেও মনে আছে ঠিক ওই সময়েই ঘুম ভেঙেছিল। অত সকালে ঘুম ভাঙে বলে ঘুমের ওপরেই আমার বরাবরের রাগ! কেন, আর একটু পরে ঘুম ভাঙলে কী এমন ক্ষতিটা হতো। কিন্তু না, সঙ্গে সঙ্গে সারা দিনের কাজের তালিকাগুলো মাথার মধ্যে হুড়হুড় করে ঢুকতে লাগলো। মনে পড়লো ঠিক ছ'টা কুড়ি মিনিটে দৈনিক পত্রিকার হরকরা আসবে। যে সাপ্তাহিক পত্রিকায় এখন ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছি তার কয়েকটা স্লিপ কালকেই তৈরি করেছি, সেটা সে নিয়ে যাবে। কথাটা মাথায় উদয় হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। উঠেই ঘড়ি দেখা প্রথম কাজ। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। তারপর খালিপেটে যে ওষুধটা খেতে হয় সেইটে গলায় ঢেলে দিলাম। আর হাতে সময় নেই। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে এসে দাঁড়ালাম দোতলার বারান্দায়। ঠিক ছ'টা কুড়ি। খবরের কাগজের হরকরা এল। তার হাতে উপন্যাসের দুটো স্লিপ খামে পুরে দিয়ে দিলাম। সাবধান করে দিলাম তাকে। বলে দিলাম—খুব সাবধান, যেন হারায় না ভাই—

সেও প্রতিদিনকার মত বললে—ও হারাবে না, আপনি কিছু ভাববেন না—

প্রতিদিন আমার ওই সাবধান-বাণী আর তারও ওই আশ্বাসদান। বছরের পর বছর এমনিই চলে আসছে। ছোটবেলাতে প্রতি সপ্তাহে একেবারে ছাপাখানার ভেতরে গিয়ে কম্পোজিটারের হাতে পাণ্ডুলিপি দিয়ে এসেছি। এখন বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তা পারি না।

এবার নিশ্চিন্ত। এবার ধীরে সুস্থে কাজ। প্রথমে খবরের কাগজ দুখানা পড়া। আজকাল খবরের কাগজই আমাদের গীতা বাইবেল কোরাণ সব কিছু। যত কাজই থাক ওতে চোখ বুলোতেই হয়। অথচ ভাবি ওই পরিশ্রমটা কোনও বই পড়ায় ব্যয় করলে কত উপকার হতো। কিন্তু উপায় নেই। আমরা রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েছি। আমরা মানে সারা পৃথিবীর এই মানুষরা।

তারপর আমার নিত্যকর্ম। মানে লেখা। মাঝে মাঝে কেবল মনে হয় কেন লিখি। তিরিশ বছর ধরে শুধু ওই কথাই ভাবি, কিন্তু তবু লিখি। কেউ তো আমায় মাথার দিব্যি দেয়নি লিখতে। আমি লেখা ছেড়ে দিলে পাঠকরাও বাঁচে, সম্পাদকরাও বাঁচে, আমিও বাঁচি। আবার ভাবি লেখা ছেড়ে দিলে আমি কী নিয়ে থাকবো? আমার তো আর কিছুই নেই। জীবনে কোনও নেশা-ভাঙও করিনি যে তার মধ্যেই ডুবে বুঁদ হয়ে থাকবো। আর টাকা? ও তো আমার পাঠকরা আমাকে যথেষ্ট দিয়েছে। এই যে কলমটা দিয়ে লিখছি এটা তো তাদের টাকাতেই কেনা। এই যে-চেয়ারটায় বসে লিখছি এটাও তাদের দেওয়া টাকায় কেনা। এমন কি যে-বাড়িতে বাস করছি এও তো তাদেরই দেওয়া টাকায় কেনা।

আবার একটা টেলিফোন এল। আবার সেই সভা। যথারীতি আপত্তি জানালাম। সভা-সমিতিতে গেলে কি আমার লেখা ভালো হবে? যদি বলো ভালো হবে তো যাবো। প্রতিদিন যে-কটা চিঠিপত্র আসে তার মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক হলো সভা কিম্বা পার্টি কিম্বা এই রকম কিছু। সভা করতে গেলে তার শেষ আছে? যেতে হলে তো যেতে হয় সেই কেরল থেকে করিমগঞ্জ পর্যন্ত সব জায়গায়।

সেদিনকার ডাকে কিছু চিঠি এল পাঠকদের। কেউ প্রশংসা করেছে, কেউ গালাগালি দিয়েছে। দিল্লীর প্রকাশক আর

ব্যুরের পত্রিকার সম্পাদকের চিঠি। সব-গুলো সরিয়ে রেখে আবার নিজের লেখায় হাত দিলাম। যাতে পরের দিন কাগজের হরকরা এসে খালি হাতে ফিরে না যায়।

এমন সময় দুটি ছেলে এল। 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট' চাই। আজকাল চাকরির বাজারে এটা নাকি বড় অপরিহার্য। তাদের বিদায় দিয়ে আবার কলম ধরতে হয়।

দেখতে দেখতে কখন যে ঘড়িতে ছোট কাঁটাটা বারোটার ঘরে ঠেকেছে সেদিকে খেয়াল ছিল না। ভেতর থেকে খাওয়ার তাগিদ এলো। খেতে বসবার আগে আবার একটা ওষুধ। খেয়ে ওঠার পর আর দাঁড়ানো কি বসা নয়। একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়া। ওইটেই আমার পড়বার সময়। ঘন্টা-খানেক পড়ার পরই বরাবর লাইব্রেরীতে যেতুম আগে। সেখানেই পুরোদমে চলতো পড়া আর লেখা। এ আমার বলতে গেলে চিরকালের অভ্যেস। সেখানে আমি সম্রাট। সেখানে আমার টেলিফোন নেই, চিঠিপত্র নেই, আত্মীয়-স্বজন-পরিবার কেউই নেই। আছে কেবল আমি আর আমার লেখা।

কিন্তু কাল আর লাইব্রেরিতে গেলাম না। কী রকম যেন ক্লান্তি লাগলো। আজ-কাল এই ক্লান্তিটাই যেন বেশি করে অনুভব করছি। এরই নাম বয়েসের ভার।

দুপুরবেলা আমার প্রকাশককে টেলি-ফোন করলাম। প্রুফ দেখা শেষ। কালকে এসে নিয়ে যেতে পারেন। লেখাও যেমন চলছে, ওদিকে বই ছাপাও চলছে তেমনি একসঙ্গে।

তারপরে এল আর একটা টেলিফোন। আমার গল্পের সিনেমা যিনি করছেন, তাঁর চিত্রনাট্যে এক জায়গায় জট পাকিয়ে গেছে। সেই জায়গাটা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা করতে হলো। আমার সিদ্ধান্তও তাঁকে জানালাম।

তারপর আবার নিশ্চিন্তে লিখতে বসেছি। দুপুরবেলা আমার ঘরের ভেতরটা বড় নিঃশব্দ, বড় নির্জন নিরিবিলি। এসময়ে আর কেউ আসবে না। কাজের মানুষ যারা তারা অফিসে গেছে, তাদের কেউ-কেউ ইউনিয়ন করছে, কেউ বিকেলের সভা-সমিতির আয়োজন করছে। কলকাতার প্রধান রাস্তাগুলোতে তখন মিছিল, মাঠে-মাঠে খেলা। আর একটু পরেই সন্ধ্যে হবে, তখন সিনেমা-থিয়েটারে মানুষের ভিড়। 'অ্যাকা-ডেমি অব ফাইন আর্টস' ভবনে তখন বই-মেলায় লেখক-প্রকাশক-ক্রেতার ভিড়। কল্পনা করতে কষ্ট হয় না যে আরো কত জায়গায় কত মানুষের কত সভা-সমিতি চলেছে। যাঁরা রাজনীতিক তাঁদের দলের লোক বাড়ানোর সমস্যা, যাঁরা সাহিত্যিক তাদের লেখা ছাপানো আর খ্যাতি-প্রচারের সমস্যা, যারা অফিসের কর্মচারী, তাদের ছুটির পর ভিড়ের মধ্যে বাসে-ট্রামে ওঠার সমস্যা। কত লোকের কত সমস্যা। এই সন্ধ্যেবেলা হাজার হাজার সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে সমস্ত কলকাতা শহরটাই কর্মচারী। আর তখন আমার সমস্যা শেষ হলো। তখন ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা বেজেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা আউটরাম ঘাটের সামনে চলে গেলাম। গঙ্গার ধারে ধারে রাস্তাটা দু মাইল তিন-মাইল চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আমার মত আরো কিছু লোক সেখানেও বেড়াচ্ছে। আর গেটের সামনে তেলেভাজা, ঝালমুড়ি, বাদামভাজা, মালাই-কুলপী, পান-সিগারেটের ফেরিওয়ালা...

তেলপুরি, বাটাটাপুরি, মালাই-কুলপী, পান-সিগারেটের ফেরিওয়ার তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। তাদের সামনে প্রচুর খদ্দেরের ভিড়। আমি সমস্ত কিছু ভিড়, সমস্ত কিছু শব্দ, সমস্ত কিছু বেচা-কেনা এড়িয়ে একা-একা হাঁটতে লাগলাম। আর লেখার কথা নয়, আর প্রতিযোগিতার সংগ্রাম নয়, আর খ্যাতি-অখ্যাতির বিড়ম্বনা নয়, শুধু এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে একাকার হওয়া।

প্রায় ঘন্টা দু-এক এই রকম একাকার হওয়ার পরে আবার ফিরে এলাম। তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে ন'টা।

সমস্ত দিন যে-ক'টা পাতা লিখেছি সব-গুলো একটা খামের মধ্যে পুরে তার ওপরে সম্পাদকের নাম ঠিকানা লিখে রেখে দিলাম। কাল ভোর ছ'টা কুড়িতে আবার খবরের কাগজের হরকরা আসবে। আবার আমি তার জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করবো। এমনি করেই তো গত সাতাশ বছর কাটলো।

রাত দশটা বাজলো। খেয়ে নিলাম। প্রতিদিনের মত আবার খানিকক্ষণ পড়লাম। আবার লেখার কথা মাথায় ঢুকলো। তারপর একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসবার আগে আবার সেই চিন্তা। কী করলাম সারা দিনটা। মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের ভালোর জন্যে কী করলাম আমি। কিছুই না। এ-জীবনটা এমনি হয়ত অপচয়ই হয়ে গেল অকারণে। কোটি কোটি মানুষের মত একদিন আমারও জন্ম হয়েছিল এই পৃথিবীতে, আবার তাদেরই মত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলাম।

তারপর আর জানি না কখন ঘুমের বড়ি খাওয়া ঘুমের ঘোরে বিছানায় এলিয়ে পড়েছি।

ওঘর থেকে খুটখাট টুকটাক আওয়াজ ভেসে আসছে। এঘরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সহদেব উৎকর্ণ হয়ে সেই সব শব্দ শুনছে। সহদেব চোখের সামনে খবরের কাগজটা পুরোপুরি মেলে ধরে রেখেছে। যেন পড়ায় কত ব্যস্ত। আসলে কিন্তু একটা অক্ষরও বোধগম্য হচ্ছে না। মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে খবরের কাগজে ডুবে যেতে চাইছে। কিন্তু খুদে খুদে অক্ষরগুলো যেন গুঁড়ি পিঁপড়ের মত সার বেঁধে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। পড়া যাচ্ছে না কিছুতেই। সহদেব নিজের অজ্ঞাতেই আবার পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা নানা রকমের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে চাইছে। ঝ-ন্-ন্-ন্ করে চাবির শব্দ, তারপরই ক্যাঁ-চ করে একটা আওয়াজ। অমলা নিশ্চয়ই চাবি লাগিয়ে আলমারির পাল্লা খুলল। এইবার সব শাড়ি সায়া ব্লাউজ বার করবে।

অমলা আজ চলে যাবে। কোথায় যাবে সহদেব জানে না। জানবার প্রয়োজন নেই, সচেতন মন থেকে কোনো উৎসাহও না। হয়ত গিয়ে আবার সেই মেয়েদের হোস্টেলে উঠবে। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদার সংসারে যখন বনিবনা হল না, অর্থাৎ দাদার নবজাগ্রত অভিভাবকত্ব অমলার জেদী চরিত্র সহজে মেনে নিতে পারল না, তখন দাদার সংসার থেকে বেরিয়ে এসে অমলা মেয়েদের হোস্টেলেই উঠেছিল। তখনই অমলার সঙ্গে সহদেবের আলাপ হয়। তার-পর বছরখানেকের মধ্যেই পূর্বরাগ অনু-রাগের পালা চুকিয়ে বিবাহ। অমলা হোস্টেল ছেড়ে সহদেবের সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে উঠে এল। আবার হয়ত ফিরে যাবে সেই হোস্টেলেই।

কাল রাত্রে তুমুল ঝগড়াটা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কিছু আকস্মিক নয়। বেশ কিছু-দিন ধরে ভিতরে ভিতরে দুজনেই ফুঁসছিল। বিস্ফোরণটা ঘটে গেল। বিয়ের পর প্রথম মাস তিনেক বেশ স্বাচ্ছন্দে কেটেছিল। যেন ঝকঝকে নিস্তরঙ্গ নদীতে অনুকূল পবনে পাল তুলে দিয়ে যুগল নিরুদ্দেশ যাত্রা। মনে হয়েছিল বুঝি এমনিভাবেই চিরদিন কাটবে। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই যেন হাওয়া পড়ে গেল। ধনুকের ছিলার মত ফুলে ওঠা বাঁকা পাল চুপসে ঝুলে পড়ল। নদীতেও দেখা দিল হঠাৎ ঢেউ, স্থানে স্থানে ঘূর্ণি। পরস্পরের আচরণ পরস্পরের কাছে অস্বাভাবিক আপত্তিকর ঠেকতে লাগল। প্রথমদিকে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ভালবাসার পটভূমিতে সহনীয় বলে মানিয়ে নেয়া যাচ্ছিল, সেই সমস্ত স্খলন পতনই ক্রমে অসহ্য অক্ষমনীয় বলে মনে হতে লাগল। মাঝে মাঝে তাই নিয়ে সামান্য কিছু কথা কাটাকাটি এবং তার ফলে পরে কিছুদিন যাবৎ দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ রহিত অবস্থা হতে লাগল। তবে ওরা শিক্ষিত যুবক-যুবতী। কোনোদিনই কোমরে কাপড় বেঁধে গলা ছেড়ে ঝগড়াঝাটি গাল-মন্দ করেনি। উত্তাপ খানিকটা হ্রাস পেলে আবার দুজন দুজনের কাছে এগিয়ে এসেছে। পুরোনো মতবিরোধের বিষয় কেউ আর উল্লেখ করেনি। কিন্তু কাল রাত্রে সেই তুমুল ঝগড়াটা হয়ে গেল। কুৎসিত ভাষায় পরস্পরকে গাল-মন্দ। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ।

সহদেব মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ। তার কাজ-কর্মের কোনো বাঁধাধরা সময় নেই। হয়ত ভোরবেলা উঠেই সে তার পেটমোটা ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেক-গুলো ডাক্তারকে ভিজিট করতে হবে। অমলাকে বলে গেল—'তুমি খেয়ে দেয়ে অফিসে চলে যেও। আমার জন্য খাবার রেখো না। আমি রাস্তাতেই কোথাও লাঞ্চ সেরে নেব। আমার ফিরতে সেই সন্ধ্যা হবে।'

অমলা সহদেবের কথামত আশায় আশায় সন্ধ্যাতেই অফিস থেকে ফিরেছে। অফিসের থিয়েটারের রিহার্সেল ছিল। ছল-ছুতো করে তা কাটিয়েছে। ভেবেছে সন্ধ্যার পরে দুজনে একসঙ্গে বসে চা খাবে। তারপর সহদেবের সকালবেলাকার বাড়িতে না খাওয়ার ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেবে নিজের হাতে পাঁচরকম রেঁধে খাইয়ে। সহদেব অবশ্যই তাকে রাঁধতে দিতে চাইবে না বলবে—লক্ষ্মীর মা-ই রাঁধুক। তুমি আমার কাছে বসে গল্প কর। অমলা তা শুনবে না। চলে যাবে রান্নায়। অগত্যা লক্ষ্মীর মাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে এবং সহদেব রান্নাঘরে চলে এসে এক-খানা পিঁড়ি পেতে বসে তার সঙ্গে গল্প করবে, খুনসুটি করবে, উনুন থেকে কড়া নামানর আগেই রান্না চেখে দেখতে চাইবে।

কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে অমলা দেখেছে তখনও সহদেব বাড়ি আসেনি। তারপরও আসেনি বহুক্ষণ। মনে মনে খুব রেগে গিয়েও অমলা নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে আহা, কাজের মানুষ। কাজে বেরোলে কি সব সময় সময় ঠিক রাখা যায়। রাগে অভিমানে ফুলতে ফুলতে রান্নায় মন দিয়েছে অমলা। রাঁধতে রাঁধতে এক কান পেতে রেখেছে দরজার দিকে। দু-চারবার দরজা ধাক্কার আওয়াজ কল্পনা করে লক্ষ্মীর মাকে দরজা খুলে দিতে বলেছে। কিন্তু সহদেব আসেনি। রান্না শেষ করে লক্ষ্মীর মাকে ছুটি দিয়ে খাওয়ার টেবিলে খাবার সাজিয়ে একা একা বসে হাই তুলেছে, দু-চারটে পত্র-পত্রিকা উল্টে-পাল্টে দেখেছে। কিন্তু সহদেব ফেরেনি।

সহদেব ফিরেছে অনেক রাত্রে। তার চোখ ঈষৎ লাল। পা অল্প টলছে। দেখেই অমলার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে। তবু ফেটে না পড়ে সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করেছে,—'ফিরতে এত দেরী হল?'

সহদেব আঠা মাখান হাসি হেসে বলেছে,—'এই...কাজ ছিল...' তারপর হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধরাচুড়ো পরা অবস্থাতেই খাটের উপর সটান শুয়ে পড়েছে।

অমলা আরো গম্ভীর হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে,—'শুয়ে পড়লে যে! খাবে না?—'

সহদেব শুধু জড়ান গলায় বলতে পেরেছে,—না। খাব না। খেয়ে এসেছি। খিদে নেই—' তারপরই হাঁ করে ঘড় ঘড় নাক ডাকতে সুরু করেছে। অমলা একটু তাকিয়ে দেখেছে ঘুমন্ত সহদেবের দিকে তারপর নিজেও না খেয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। শুয়ে শুয়ে নিদ্রাহীন চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক কিছু ভেবেছে। নিশ্চয়ই সহদেব কোনো সহকর্মীর পাল্লায় পড়ে কোনো বারে বসে আকণ্ঠ পান করেছে, অখাদ্য কুখাদ্য গিলেছে। তার বাড়ির কথা মনে পড়েনি, অমলার কথা মনে পড়েনি। এদিকে কিনা অমলা সহদেবের প্রত্যাশায় বাড়ি বসে বসে চিন্তা ভাবনায় আকুল হয়েছে। অবহেলা বোধের একটা রাগ জ্বালা আস্তে আস্তে বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠেছে। সহদেবের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে একটা কটু গন্ধ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই কটুতা যেন নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে অমলার বুকের জ্বালা আরো উগ্র আরো তীব্র আরো কটু হয়ে উঠেছে।

এমনি একদিন নয়। প্রথম প্রথম কচিৎ কদাচিৎ হত। ক্রমেই তা বাড়তে লাগল। অধিকাংশ দিনই ঘটতে লাগল এমনি ঘটনা। সকালের দিকে যদি বা সহদেব সুস্থ স্বাভাবিক থাকে, রাত্রে কোনোদিনই প্রায় তাড়াতাড়ি ফেরে না। ফেরে অনেক রাত্রে আর প্রায় মত্ত অবস্থায়। ক্রমে সহদেবের আরো কিছু কিছু গুণপনার সঙ্গে অমলার পরিচয় ঘটতে লাগল। সহদেবের রেসের দিকে ঝোঁক আছে, তিনতাসের জুয়াতে আসক্তি আছে। এছাড়া সে মাঝে মাঝে টুরে যায়। তখন দশ-পনের দিন সে একনাগাড়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। কোথায় তখন যাবে, কোথা থেকে যায় কোথায় তার কিছু হদিস পাওয়া যায় না। চিঠি চাপাটিও লেখে না। অমলা একা একা থাকে, রাঁধে বাড়ে খায় দায়, অফিস করে। তার একা একা ভাল লাগে না।

সহদেব টুর থেকে ফিরে এলে অমলা বলে,—'এমনিভাবে ঘর গেরস্থালি সাজিয়ে স্বামী-স্ত্রী খেলার প্রয়োজন কি! যে যার স্বাধীনভাবে বাস করলেই হয়—'

সহদেব বলে, 'তাতে সুবিধে হয় তোমার?'

অমলা ফুঁসে ওঠে,—'আমার সুবিধের কথা থাক। তোমার সুবিধে হলেই হল।'

সহদেব কথা ঘোরায়—'আমার চাকরীই এই! ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। সে কথা জেনেই ত বিয়ে করেছ।'

—'তা করেছি। কিন্তু রেস জুয়া মদের খবরটা জানা ছিল না।'

সহদেব কথার জবাব দেয় না। চুপ করে যায় অমলাও। দুজনেই চুপচাপ থাকে কদিন। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। থাকে যে যার মনে। দুটো বিস্ফোরক বস্তুর মত পাশাপাশি নড়ে চড়ে বেড়ায় কিন্তু ঠোকাঠুকি পরিহার করে চলে সযত্নে। তাতে সহদেবের বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না। বাক্যালাপ চালু থাকা অবস্থায় সহদেব অন্ততঃ যথাসম্ভব শোভনতাটুকু বজায় রেখে চলে। অমলার কাছে কৈফিয়ৎ দেবার অপ্রিয় দায়েও খানিকটা সংযত জীবনযাপন করে। কিন্তু এরকম অবস্থায় তার আর কোনো বাঁধনই থাকে না। বল্গাবিহীন অশ্বের মত যথেচ্ছ বিচরণ করে। ওদিকে অমলা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রাগ ছাপিয়ে রমণীসুলভ গার্হস্থ্যধর্ম মাথা তোলে। চোখের উপর মানুষটাকে মোমবাতির মত পুড়ে যেতে দেখে থাকতে পারে না আর। কোনো ছলে বাক্যালাপের আবদ্ধ পংকিল ক্ষীণ স্রোতটিকে আবার চালু করে দেয়।

কিন্তু অমলা শক্ত জেদী ধরনের মেয়ে। ফলে তার রাগ এবং অভিমানও বেশী। অন্য কেউ তার উপর অযথা কর্তৃত্ব ফলাবে তা সহ্য করার মত মিহি ধাতের মেয়ে অমলা নয়। তা নয় বলেই সে প্রথম সংঘাতেই দাদার সংসার ছেড়েছিল। সহদেবের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহী হয়েও সে যে সহদেবের যথেচ্ছাচার অবহেলা সহ্য করেছে তার এক-মাত্র কারণ সে সহদেবের সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগসূত্রটিকে কিছুতেই ছিন্ন বা উপেক্ষা করতে পারেনি। যদিও সহদেবের সঙ্গে তার আত্মার মিলন কোনো অগ্নিসাক্ষী রেখে বা সপ্তপদ একসঙ্গে অতিক্রম করে অনুষ্ঠান অনুসারে হয়নি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ছোট্ট কুঠরিতে জন কয়েক বন্ধু-বান্ধব শুভানু-ধ্যায়ীর উপস্থিতিতে এবং শিক্ষিত যুবক-যুবতীর সচেতন স্বাক্ষরেই ঘটেছে ব্যাপারটা, তবু অমলা সেইক্ষণে অনুভব করেছিল তার এতদিনের জীবনে এইবার যেন একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল। এক নতুন পটোত্তোলন, একটা নবীন অধ্যায়ের সূচনা।

কিন্তু ক্রমে যতই সহদেবের আচরণ তাকে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ করে তুলতে লাগল ততই যেন খুব ধীরে ধীরে তার জীবন একটা নতুন দিকে মোড় ফিরতে লাগল। এই মোড় ফেরার পিছনে অনেকখানি হতাশা ব্যর্থতা বোধও কার্যকরী হল। অফিস ছুটির পর তার মনে হতে লাগল কি হবে বাড়ি ফিরে। সেই নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ নিরানন্দ ঘরে! যেখানে রাঁধুনি লক্ষ্মীর মা ছাড়া কথা বলার কোনো লোক নেই। পানসে জলো প্রেম কাহিনী পড়া ছাড়া করার কোনো কাজ নেই। অমলা কোনো কোনো দিন অফিস ছুটির পর কোনো সহকর্মিণীর সঙ্গে তার বাড়ি গেল। সেখানে সুন্দর সাজান ঘর দেখে ঘর ভর্তি লোক দেখে লোকগুলোর মনে মুখে হাসি খুশির জোয়ার দেখে তার খুব ঈর্ষা অনুভব হতে লাগল। অমলা আর তাদের বাড়ি গেল না। বরং ইভনিং শো-এর টিকিট কেটে একা একা যে কোনো সিনেমা হলে ঢুকে পড়তে লাগল। রোজ একা সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না বলে কুমারী অবস্থায় যে সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল আবার নতুন করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। সকালে বিকেলে ছুটির দিন দুপুরেও তাদের রিহার্সেল হয়। অমলার একঘেয়ে সন্ধ্যা-গুলো ভয়াবহ ছুটির দিনগুলো আবার ব্যস্ত মুখর হয়ে উঠল।

এবারে যেন একটু টনক নড়ল সহ-দেবের। যদিও সে অমলার পছন্দ অপছন্দের পরোয়া না করে যা খুশী করেছে তবু কিন্তু সে অমলার এই বেপরোয়া ভাব পছন্দ করতে পারল না। ক্রমে দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়াল মেস-হোটেলের রুম-মেটের মত। এ আসে ত ও আসে না। ও এলে এর থাকার কোনো স্থিরতা নেই। কে কি করে কোথায় যায় তাও জানবার বা জানাবার কোনো দায় নেই। ক্রমে দু' চার দিন সহদেব আভাসে ইঙ্গিতে নিজের

অসহিষ্ণুতা উষ্মা প্রকাশ করল। শেষে একদিন সোজাসুজি জানতে চাইল,—'সকাল দুপুর সন্ধ্যে—সময় নেই অসময় নেই—কোথায় যাও, কি কর?'

অমলা গম্ভীর গলায় শুধু বলল,—'সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেব না।'

সহদেব বলল,—'কৈফিয়ৎ চাইছি না। একজন গৃহস্থ বধূর যোগ্য শোভনতা বজায় রাখতে বলছি।'

—'শোভনতা একটা একতরফা ব্যাপার নয়।'

—'পুরুষের পক্ষে যা সাজে মেয়েদের পক্ষে তা শোভা পায় না।'

অমলা ব্যঙ্গভরে বলল,—'স্ত্রী-পুরুষের ঐ পার্থক্যটা—যা তুমি তোমার বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে শিখেছ—ওটা ইদানীং বাতিল হয়ে গেছে—'

সহদেব আর কোনো কথা বলল না। ব্যাস। আবার দুজনের মধ্যে নেমে এল সেই নীরবতার পর্দা। এবারে সব চেয়ে দীর্ঘ-স্থায়ী। তাই বলে অমলা আকারে আচরণে কিন্তু একটুও সংযত হল না। কারণ তাহলে সেটা ভয় পাওয়া হত। আর অমলা ভয় পাওয়ার মেয়েই নয়। তাছাড়া তখন আর সংযত হওয়ার উপায়ও নেই। ওদের নাট্য-সম্প্রদায়ের নতুন নাটক তখন মঞ্চস্থ হতে চলেছে। পুরোদমে চলছে মহড়া। অমলা রয়েছে নায়িকার ভূমিকায়। তার রক্তেও ফিরে এসেছে সেই পুরোনো মাতন। সহদেবের ভ্রূকুটিতে সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে তার পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়।

তারপর সেই ভয়ংকর নীরবতাটা বিস্ফারিত হল কাল রাত্রে। কালকেই অমলাদের নাটক মঞ্চস্থ হল। এতদিনের পরিশ্রম সার্থক। দর্শকগণ ক্ষণে ক্ষণে নাটকের বিশেষতঃ অমলার অভিনয়ের তারিফ করল। নাটকের শেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল দলের সকলে। অমলাকে ফিরে পেয়ে ওদের দল যে আরো শক্তিশালী এবং লাভবান হয়েছে তা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করল।

নাটকের শেষে বড় হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল। খেতে গিয়ে অমলা দেখল পানেরও স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা রয়েছে। পরিচালক গণেশ সোম ওকে সামান্য পান করতে অনুরোধ করল। অমলা এর আগে কোনো দিন এসব খেয়ে দেখেনি। তার সহজাত সংস্কার কাঁটা দিয়ে উঠল। গণেশ সোম কিন্তু বারবার অনুরোধ করতে লাগল মাত্র এক ঢোক খাওয়ার জন্য। নেশা তো নয়। শুধু নিয়ম রক্ষা। সহসা অমলার মনে হল : কেন খাব না। সহদেবও খায়। বেশ করব খাব। অমলা সামনের গ্লাসটা তুলে নিয়ে মুখের উপর উপুড় করে দিল। একটা কটু অচেনা স্বাদে মুখের ভিতরটা জলে জলে উঠল। একটা বিশ্রী গন্ধ। গণেশ সোম প্রসন্ন হেসে নামিয়ে রাখা গ্লাসটা আবার পূর্ণ করে দিল।

গণেশ সোম নিজেই গাড়ি করে বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল অমলাকে। তখন মধ্যরাত। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী যে আগে আসে সে দরজা খোলা রেখেই শুয়ে পড়ে। অপেক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে না। আজও দরজা খোলা ছিল। স্খলিত চরণে অমলা ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল।

সহদেব জেগে ছিল। সে শুয়ে শুয়েই অমলাকে দেখল। তারপর অমলার পদক্ষেপে কিছু বেসামাল ভাব দেখতে পেয়ে কি যেন সন্দেহ করে বিছানার উপর উঠে বসল। বসে বসে অমলাকে দেখতে লাগল। অমলা তখন ভ্যানিটি ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পরনের শাড়িটা এলোমেলো টানে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। সহদেব দ্রুত-বেগে খাট থেকে নেমে এসে অমলার সামনে দাঁড়াল। অমলার দুটো কাঁধ ধরে মুখের

কাছে নাক এনে গন্ধ শ‍ুঁকল। তারপর বিস্ময়ে কোভে জমাট গলায় বলল,—'তুমি ড্রিংক করেছ?'

অমলা তখন চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছে না। টান টান করে চোখ মেলার প্রয়াসে ভ্রু তুলে আধবোজা চোখে সহদেবের দিকে তাকিয়ে বলল,—'হ্যাঁ। করেছি।'

সহদেব উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল,—'কেন? কেন করেছ?'

অমলা ফিক করে হেসে বলল,—'বেশ করেছি।'

—'আবার বলছ বেশ করেছি! বেহায়া কোথাকার। ঘরের বউ মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেলেল্লাপনা করছ। আমি তোমাকে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমলা বলল, —'কি করবে আমাকে? মারবে?'

—'হ্যাঁ মারব। অসভ্য ছোটলোক, রাস্তার মেয়েমানুষ, বেবুশ্যে—' হঠাৎ সহদেব অমলার ফর্সা লাল গালে ঠাস করে এক প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দিল।

মুহূর্তে অমলার নেশা ছুটে গেল। এতক্ষণের সেই জলে ভাসার অনুভূতিটা কাটিয়ে মাথাটা শিরদাঁড়ার উপর শক্ত দৃঢ় হয়ে উঠল। চোখের ঝাপসা দৃষ্টি আবার সরল ও ঋজু হল। সোজা দৃষ্টিতে অনেকখানি তেজ নিক্ষেপ করে অমলা কাটাকাটা ভাবে বলল,—'তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তুমি আমার গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করছ না আজকাল। ইতর অভদ্র কোথাকার।

সহদেব বলল,— 'বউ যদি মদ গিলে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে তবে স্বামীকে গায়ে হাত তুলতেই হয়—'

অমলার কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গে রনরন করে উঠল,—'আর স্বামী যদি ফেরে? তবে স্ত্রীকে কি করতে হয়? পা ধুয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে হয়? না আঁচল দিয়ে বমি পরিষ্কার করতে হয়?'

সহদেব কোনো কথা বলল না।

অমলা আবার বলল,—'কি চুপ করে রইলে কেন? কথা বল। তুমি ভেবেছিলে বিয়ে করে একবার ঘরে তুলতে পারলেই হল। তারপর যা খুশী তুমি করবে আর আমি সতীসাধ্বীর মত শুধু ফ্যাস ফ্যাস করে কাঁদব। তাই যদি ভেবে থাক তবে শুনে রাখ তোমার ধারণা ভুল। তুমি অমলা মিত্রকে চিনতে পার নি...'

অমলা পিঠ টান করে ফণা তোলার ভঙ্গীতে কয়েক পলক সহদেবের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হিস-হিস করে বলল,—'তুমি শুনে রাখ সহদেব মজুমদার, এবার থেকে আমি রোজই মদ খেয়ে বাড়ি ফিরব।'

সহসা সহদেব চীৎকার করে উঠল,—'তাহলে অন্য বাড়ি দেখ। এ বাড়িতে ওসব চলবে না।'

অমলা ধমকে উঠল,—'বর্বরের মত চেঁচিও না!'

সহদেব দ্বিগুণ রবে চীৎকার করে উঠল,—'আলবাত চেঁচাব। একশবার চেঁচাব। আমার বাড়িতে আমি চেঁচাব তোর কিরে—'

অমলা দুই বিস্ফারিত চোখে প্রগাঢ় অবিশ্বাস নিয়ে সহদেবের দিকে তাকিয়ে রইল। ইদানীং সহদেব ইতর অভদ্র হয়ে যাচ্ছিল সে জানে, কিন্তু তার ইতরতা এতখানি নীচু পর্যায়ে নামতে পারে তা তার ধারণা ছিল না। সহদেব যে বস্তিবাসীর মত স্ত্রীকে প্রহার করবে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করবে, তা অমলা সহদেবের শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েও কখনো আশা করেনি। এখন অমলার মুখে আর কথা জোগাল না। শুধু দুই চোখের দৃষ্টিতে রাজ্যের তাচ্ছিল্য অবহেলা নিক্ষেপ করে নোংরা কোনো জীব দেখার মত ঘৃণায় নাক কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর শুধু বলল,—'ঠিক আছে। আমি কালকেই চলে যাচ্ছি।'

উত্তরের প্রত্যাশায় এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে পাশের ঘরে চলে গেল অমলা। ও-পাশ থেকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

তারপর দুজন দু ঘরে রাত কাটিয়েছে। অমলা ঘুমিয়েছে কিনা সহদেব জানে না, তবে সে সারা রাত ঘুমোয় নি। বসার ঘরের কোচে বসে বসে সে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করেছে। যতক্ষণ মাথা উত্তপ্ত ছিল ততক্ষণ সে নিজের আচরণকে নির্দোষ বলেই ভেবেছে। অমলার প্রতি তার ব্যবহারকে যথার্থ ও যথাযথ বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু আস্তে আস্তে যতই সে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে ততই সহদেব তার আচরণের অভব্যতা অভদ্রতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। অনুভব করেছে, আর যাই হোক, অশ্লীল গালি দেওয়া বা গায়ে হাত তোলা ঠিক হয়নি। ভদ্র গাম্ভীর্যের সঙ্গে অমলাকে নিজের অপছন্দ জানিয়ে দিলে তা কতটা কার্যকরী হত, আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ইতর ভাষায় গালি দেওয়াতে তার একাংশও হয় নি। বরং অমলাই নিজেকে সংযত রেখে নিজেকে উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সহদেব ভেবে পাচ্ছিল না অমলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি ভাবে এবং কেন এরকম বিষিয়ে গেল। অমলাকে যখন সে বিয়ে করেছিল তখন এরকম একটা পরিণাম কল্পনাতেও ছিল না। পরস্পর পরস্পরের মন পরিষ্কার ভাবে জেনে নিয়েই তারা বিবাহের শর্তে আবদ্ধ হয়েছিল। অথচ কিছুদিন যেতে না যেতেই কেমন যেন বেসুরো বাজতে লাগল এবং বারবার ছন্দ কেটে যেতে লাগল।

সারা রাত কোচের উপর ঠায় বসে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে সহদেব সেই ক্ষত স্থানটিকে ঠিক-ঠাক খুঁজে পেতে চেয়েছে। ডাক্তার যেমন আহত অঙ্গে আঙ্গুল বুলিয়ে বুলিয়ে আভ্যন্তরীণ আঘাতের যথার্থ স্থানটিকে খুঁজে বার করে ঠিক তেমনিভাবে সহদেব সন্ধানী স্মৃতিচারণের দ্বারা বিগত কয়েকটা মাসকে তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। সন্দেহ নেই বিবাহের ঠিক পরের সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ক্রমে স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু তার যা চাকরী তাতে ত সারা দিন বউ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে চলে না। তার চাকরীর কোনো বাঁধাধরা সময় নেই, অনির্দিষ্ট টুরের প্রোগ্রামে অনির্দিষ্টকাল বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়, মদ্যপান প্রায় অবশ্য করণীয়। কলকাতা থেকে বহু দূরে কোনো হোটেলে শুধু মাত্র রাত্রের জন্য জড়ো হওয়া বিভিন্ন রিপ্রেসেন্টেটিভরা একঘেয়েমি কাটানর জন্য হয়ত জুয়াটুয়াও খেলে। তখন তাদের অনুরোধে কিছুটা বা ব্যক্তিগত তাগিদেও সেই খেলায় সে অংশ গ্রহণ করে। অমলা প্রথম থেকেই এই সব ব্যাপারগুলোকে সহজ ভাবে নিতে পারে নি। অথচ সহদেব কি করতে পারে। পুরুষের পক্ষে অনন্তকাল কোনো কিছুতেই মগ্ন থাকা সম্ভব নয়। সে তার সহজ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবেই। সহদেবও প্রথম উচ্ছ্বাস অন্তে তার স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু অমলার চরিত্রধর্মে রয়েছে সহজাত রক্ষণশীলতা। জীবন যাপনের যে প্রণালী সহদেবের কাছে জল বাতাসের মত অমলার মতে তাই হল উদভ্রান্ততা উচ্ছৃঙ্খলতা। অমলার অপছন্দ সহদেব বুঝতে পেরেছে। মাঝে মাঝে ভেবেছেও যথাসম্ভব অমলার পছন্দমত সুস্থ জীবন যাপন করবে। কিন্তু যথারীতি তা হয়ে ওঠেনি। সকালবেলা ডাক্তারদের ভিজিট করতে বেরিয়ে হয়ত দেরী হয়ে গেছে। কোনো সহকর্মীর সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছে কোনো হোটেলে। সঙ্গে দু-এক পেগ নির্দোষ হুইস্কি। ব্যাস। তারপর রাশ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। প্রাক বিবাহ যুগের মতই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে হয়ত রিপোর্ট করেছে আফিসে, তারপর সন্ধ্যায় সদলবলে কোনো বারে গেছে, বার থেকে বেরিয়ে কোনো অবিবাহিত সহকর্মীর ফ্ল্যাটে মেতে উঠেছে তিন তাসে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত গম্ভীর।

বাড়ি ফিরে দেখেছে অমলা গম্ভীর। অমলা যদি রেগে গিয়ে কিছু গালমন্দ করত, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত, কৈফিয়ৎ তলব করত, তবে হয়ত সহদেবও কিছু সাফাই গেয়ে নিত, কিংবা নেশার ঝোঁকে দু' চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিত অমলার কাছে। কিন্তু অমলার সহজাত শালীনতাবোধ অহংকার আত্মসম্ভ্রম তাকে ঐ ধরনের আচরণ থেকে নিরস্ত করেছে। ফলে সহদেবের পক্ষেও সম্ভব হয়নি উপযাচক হয়ে এগিয়ে গিয়ে অমলার রুক্ষতাকে পরিমাপ

করা। বরং সে অমলাকে ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়ে এড়িয়ে গেছে।

ক্রমে দুজনের মধ্যে ব্যবধানটা বিস্তৃত হয়েছে। কেউ কারো সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো কথা বলে নি। কিংবা খুব নিরুত্তাপ কণ্ঠে দু-চারটে কাটাকাটা প্রশ্ন ও জবাবের লেনদেন হয়েছে। আর ক্রমেই ব্যাপারটা উভয়ের হাতের বাইরে নাগালের বাইরে চলে গেছে। সহদেবের মনে হয়েছে অমলা যেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই নিজেও রাত বেশী করে বাড়ি ফিরেছে, যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অবশেষে আজ অনেক রাত্রে পুরুষের মতই আকণ্ঠ মদ গিলে টালমাটাল পায়ে ঘরে ফিরে এসেছে। একবারও অমলা ভেবে দেখার চেষ্টা করে নি যে দেশের সমাজের সংসারের পরিবেশে পুরুষের পক্ষে যা খুব অশোভন নয় একজন রমণীর পক্ষে তাই চরম লজ্জাকর ও নিন্দনীয়। সব কিছু ভুলে অবজ্ঞা করে অমলা শুধু একটা জিদের বশবর্তী হয়ে সহদেবের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে চেয়েছে।

ফলে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই বিস্ফোরণ ঘটল।

বেশ কিছুক্ষণ হল ওঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। এতক্ষণ বিভিন্ন পরিচিত শব্দের মাধ্যমে সহদেব অমলার চলে যাওয়ার জন্য গোছগাছের প্রস্তুতি বুঝতে পারছিল। এখন সেইসব আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সহদেব কৌতূহলী হয়ে উঠল। তবে কি অমলার আয়োজন শেষ হয়ে যেতে সে গাড়ি ডাকতে গেল। ও ঘরে একটা দরজা আছে যেটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পিছনের ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া যায়। সহদেব নিশ্চিত যে অমলা যখন যাবে ঐ পথেই যাবে। বসার ঘরে কোচে উপবিষ্ট সহদেবের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়ার অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাটা সে বর্জন করতে চাইবেই।

সহদেব খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে কৌতূহলী চোখে পাশের ঘরের দিকে তাকাল। ও ঘরে কোনো সাড়া নেই। কবরের মত নীরব। সহদেবের খুব জানতে ইচ্ছে হল ওঘরে অমলা এখন কি করছে। কিন্তু অমলা দু ঘরের মাঝখানের দরজা ওদিক থেকে এঁটে বন্ধ করে দিয়েছে। আর খোলা থাকলেও সহদেব নিশ্চয়ই সেই দরজা ও ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না।

সহদেব পা টিপে টিপে সন্তর্পণে উঠল। দু ঘরের মাঝের দেয়ালে একটা জানলা আছে। তার পাল্লা দুটো ভেজান। সহদেব মৃদুভাবে পাল্লা দুটো ঠেলল। ওদিক থেকে বন্ধ নেই। আলগাভাবে একটুখানি খুলে গেল। তখন সহদেব খুব সাবধানে খুব ধীরে জানলার পাল্লা আর একটু খুলল ও সেই অনতিপ্রশস্ত ফাঁকে নিজের চোখ রাখল।

অমলার ঘর সহদেবের চোখের সামনে একটা বিশেষ তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা ফটোর মত দৃষ্টিগোচর হল। খাটের উপর বন্ধ সুটকেস, সুটকেসের উপর হোল্ডঅল রয়েছে। খাটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অমলা। সে রয়েছে সহদেবের দিকে পিছন ফিরে। সহদেবের মনে হচ্ছে ঘরখানা যেন অমলাকে নিয়ে অমলার সুটকেস হোল্ডঅল নিয়ে স্রোতের মুখে কুটোর মত তীব্র বেগে ভেসে যাচ্ছে।

অমলা পিছন ফিরে কিছু পড়ছিল বোধ হয়। কি পড়ছিল সহদেব দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু অমলার ভঙ্গীতে প্রগাঢ় মনোযোগ গভীর অভিনিবেশ। সহদেব অবাক হল। এতখানি মনোযোগের সঙ্গে অমলা এখন কি পড়ছে! সহদেব বিস্মিত হতে হতে দেখল পড়তে পড়তে যেন আবেগে উচ্ছ্বাসে দুঃখে বেদনায় অমলার প্রশস্ত পিঠখানা কেঁপে নড়ে উঠল। যেন কোনো গভীর গোপন ব্যথা অমলার বুকের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার তাগিদে ফুলে ফেঁপে উঠছিল। অমলা যেন সন্তর্পণে আবার সেই বিক্ষুব্ধ ব্যথাকে বুকের খাঁচায় পোষ মানাল।

সহদেবের খুব জানতে ইচ্ছে হল অমলা কি পড়ছে। এই সময় অমলার পড়া শেষ হল। চিঠিখানা যেন তার হাত থেকে খসে গিয়ে উড়তে উড়তে আলগোছে খাটের উপর নামল। সহদেব বুঝতে পারছিল না এ কোন চিঠি। অসময়ে অমলা এ পড়ছেই বা কেন? আর কি সে চিঠি যা পড়তে পড়তে অমলা এমন অস্থির অধীর উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

অমলা সহদেবের দৃষ্টির বাইরে সরে গেল। জানলায় চোখ রেখে সহদেব কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু অমলা নয়নপথে ঘুরে এল না। সহদেবের চোখের সামনে শুধু অমলার ছোট চামড়ার সুটকেশ আর হোল্ডঅল নির্নিমেষ হয়ে রইল। দৃষ্টির আড়াল থেকে অমলার অস্তিত্বের কোনো আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি অমলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে নেমে গাড়ি ডাকতে চলে গেল। কথাটা ভেবেই সহদেব দ্রুত এ পাশের জানলায় সরে এল। এই জানলা দিয়ে বাড়ির পিছন দিককার ঘোরান সিঁড়িটা পুরো চোখে পড়ে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সহদেব দেখল গোল হয়ে পেঁচিয়ে নেমে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে অমলা পাক খেয়ে খেয়ে ক্রমে নীচে নেমে যাচ্ছে।

সহদেব আবার দ্রুত জানলা থেকে সরে এল। লঘু ক্ষিপ্র গতিতে ঘর থেকে বাইরে এল। তারপর বারান্দায় দু তিনটে বাঁক ঘুরে চলে এল অমলার ঘরের অপর দরজায়। ঢুকল অমলার ঘরে।

খাটের উপর চিঠিখানা তেমনিভাবেই পড়ে আছে। সহদেব হাত বাড়িয়ে তুলে নিল চিঠিখানা। তারপর চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল। চিঠিখানা সহদেবেরই লেখা। বিস্মিত চকিত সহদেব ভাল করে খুঁটিয়ে চিঠিখানা দেখতে লাগল। অবশেষে নিশ্চিত হল। চিঠিখানা তারই লেখা। অমলাকে। অনেকদিন আগে। তখনও অমলাকে বিয়ে করে নি সে। পূর্বরাগের পালা শেষ করে সবে শুরু হয়েছে প্রণয়পর্ব। পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের কাছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল। প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। একজন আর একজনের কাছে স্বীকৃত গৃহীত। এই সময় যখনই সহদেব অফিসের কাজে বাইরে যেত ট্যুর প্রোগ্রামে প্রত্যহ একখানা করে চিঠি লিখত সে অমলাকে। পত্রোত্তরের প্রত্যাশা না করেই লিখত। কেন না কবে সে কোথায় থাকে তার কোনো স্থিরতা নেই। সুতরাং অমলার তরফ থেকে চিঠি লেখার প্রশ্নই ওঠে না। সেইসব চিঠিতে থাকত প্রথম প্রেমের তীব্র উচ্ছ্বাস প্রবল হৃদয়াবেগ সীমাহীন আকুলতা। সহদেবের ধারণা ছিল সেইসব চিঠি সেইসব দিনের সঙ্গেই হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেইসব অগণন নিখোঁজ

চিঠির একখানাই যে আজ অসময়ে এমনিভাবে পুরোনো কাগজপত্র থেকে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে এসে অমলাকে এমন ব্যাকুল বিহ্বল করে তুলবে তা সহদেব ভাবে নি। ভাবেনি হয়ত অমলাও।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে সহদেব বুকের ভিতরে একধরনের ব্যাকুলতা অনুভব করল। কি যেন ছিল, আজ আর নেই, অথচ থাকলে ভাল হত—এমনি এক হারিয়ে ফেলার বিষণ্ণতাবোধ সমগ্র অনুভূতিকে যেন আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিল। চিঠির ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বাসের যে স্বতোৎসারণ আজ সেই উচ্ছ্বাসের উৎসমুখ বিশুষ্ক পরিম্লান। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে একদা তারই লেখনীমুলে প্রাণের আবেগ এমন অফুরাণ ছিল, বাসনার রঙ এত প্রগাঢ় ছিল, সুখ ও আনন্দে এই গভীরতা ছিল। চিঠি লেখার ঐ আশ্চর্য দিনগুলো যেন এক অবিশ্বাস্য সুখ স্বপ্ন কল্পনার মধ্যাস্থতায় সুন্দর, অভাবনীয়তায় উজ্জ্বল।

একবার পড়া শেষ হলে পুনরায় পড়ল সহদেব। তারপর চিঠিখানা হাতে নিয়েই স্থাণুবৎ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনের মধ্যে অতীত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মত দ্রুত ছায়া ফেলে যেতে লাগল। চোখের সামনে খণ্ড খণ্ড অতিবাহিত সুখের দৃশ্য রচিত হতে হতে আবার মুছে মুছে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। সেই—অমলার সঙ্গে প্রথম আলাপের পরবর্তী দিনগুলো। কত সংশয় সন্দেহ দ্বিধায় দোদুল্যমানতা। অমলার মনেও রঙের ছোপ লেগেছে কি লাগেনি। সেই ভাবনায় ঘুম নেই রাতভোর। অমলার কোনো বিশেষ কথা বা দৃষ্টি অথবা ভঙ্গীর অনুকূল অর্থ করে নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে শিহরিত হওয়া, আবার অমলার অহেতুক গাম্ভীর্যে ভীত ত্রস্ত হয়ে মনে মনে মরে যাওয়া। অনির্দিষ্টতায় ভাসমান সেইসব দিনগুলো যেন তীব্র নেশার ঘোরে অস্থির চঞ্চল। অমলার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো স্থিরতা নেই, অথচ ইচ্ছে হয় সারা দিনমান মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি অপলকপাতে। মাঝে মাঝে অমলা ধরা পড়ে সহদেবের সাবধানে পাতা ছলনার সুনিপুণ জালে। তখন অমলার চোখে ঠোঁটে হাতের মুদ্রায় আঙুলের ডগার উজ্জ্বল নখে সহদেবের সুখ আশা আনন্দ কাঁপে, নাচে, ঝলসে ওঠে।

তারপর অমলার মনের খবর পাওয়া গেল। তখন সহদেব যেন একচ্ছত্র সম্রাট। পূব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ আদিগন্ত তার সাম্রাজ্যের বিস্তার। বহু উর্ধে উড্ডীন তার বিজয় নিশান।। জয়রথের ঘর্ঘর চক্রধ্বনি দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মত বিপুল গম্ভীর। তখন মাঝে মাঝেই দুজনে অফিস পালাত। চলে যেত কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও। সারাদিন ঘুরে বেড়াত একসঙ্গে এলোমেলোভাবে বেপরোয়া সুখে। খেয়ে নিত কোনো হোটেলে। সারাদিন শুধু কথা আর কথা, বলার সুখে শোনার সুখে অর্থহীন দায়হীন বিরতিহীন প্রলাপোক্তি। অনেক রাতে আবার ফিরে আসত কলকাতার খাঁচায়।

পরিশেষে বিবাহ। বিয়ের পরের সেই সংক্ষিপ্ত মিলিত দ্বৈত জীবন। একসঙ্গে বসে একপাত থেকে কাড়াকাড়ি করে খাওয়া; সারারাত জেগে অজস্র কথা বলার পর দুজনেরই অনেক বেলা পর্যন্ত বেহুঁশ ঘুম। ফলে দুজনেরই অফিস কামাই। পরিকল্পনাহীন ছুটির দিনটাকে শিশুর মিষ্টি খাওয়ার মত ভেঙে ভেঙে অল্প অল্প করে উপভোগ—

হায়রে, কোথায় গেল সেইসব দিনগুলো। সেই আশা আনন্দ সুখ শিহরণ। দিনগুলো যেন পাখিধরা নিষাদের মত সব অনুভূতির রঙীন পাখিগুলোকে স্মৃতির খাঁচায় পুরে নিয়ে পা টিপে টিপে হেঁটে চলে গেল। এখন শুধু স্মৃতির ছায়াচ্ছন্ন বিধুর বিষণ্ণ জগতে সেই সুরেলা বন্দী পাখিদের চঞ্চল পক্ষ বিধুনন। সুখের উজ্জ্বল সুন্দর একটা বল নিয়ে দুজনে লোফালুফি খেলা খেলছিল, সহসা যেন তা হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল, মাখামাখি হয়ে গেল ধুলোয় মালিন্যে। কিন্তু কার হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল, মাখামাখি হয়ে গেল ধুলোয় মালিন্যে। কিন্তু কার হাত ফসকে যে পড়ল, কখন কেমন করে পড়ল, তা সহদেব সঠিক জানে না—

সহসা পিছনে পায়ের শব্দ শুনে সহদেব চমকে উঠল। চিঠিখানা হাতে নিয়েই চকিতে ঘুরে দেখল—অমলা। অমলার চোখে বিস্ময় এবং বিরক্তি। স্পষ্টই ঘরে সহদেবের অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে অমলা ক্রুদ্ধ হয়েছে। সহদেব ঘুরতে অমলার চোখের দৃষ্টি সহদেবের হাতের চিঠিতে নিবদ্ধ হল। চিঠির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অমলার মুখের বিস্ময় বিরক্তি ক্রমে মুছে গিয়ে সে ভাবলেশহীন গম্ভীর হয়ে উঠল। নিপাট গাম্ভীর্যের সঙ্গে অমলা বলল,—'আমার চিঠি দাও।'

সহসা সহদেবের মনে হল চিঠিখানার মধ্যে যেন এক দুর্লভ গুপ্তধনের সন্ধান লেখা আছে। তার সেইসব উজ্জ্বল রত্নের মত অনুভূতিরাজি, যা হারিয়ে আজ সে নিঃস্ব রিক্ত, তার অক্ষয় জ্যোতিপুঞ্জ যেন এ চিঠির শব্দে শব্দে বিধৃত। অমলাকে লেখা হলেও এ চিঠি একান্তভাবে তার নিজের সম্পদ। এ চিঠি কাউকে দেয়া যায় না। সহদেব বলল,—'এ চিঠি দিতে পারব না। এ আমার।'

অমলা বলল,—'ও চিঠি আমার। আমাকে লেখা—'

—'কিন্তু আমি লিখেছি।'

অমলা ঈষৎ তপ্তকণ্ঠে বলল,—'চিঠি যে লেখে তার নয়। যাকে লেখা হয় তার।'

—'অত বুঝি না। আমার লেখা চিঠি আমার কাছেই থাকবে।' সহদেব চিঠিখানা ভাঁজ করতে শুরু করল।

অমলার চোখের দৃষ্টি সর্বক্ষণ চিঠির উপরই স্থির ছিল। এখন সহদেব চিঠিখানা ভাঁজ করার মাধ্যমে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করলে তার গাম্ভীর্য টলে গেল। স্পষ্টই সে উতলা হয়ে উঠল। তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে তার সে তার উত্তুঙ্গ উত্তেজনা দমন করতে চাইল। তার চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত। অবশেষে অমলা শীৎকার ধ্বনিতে হিস হিস করে উঠল,—'শয়তান। তুমি আমার সব নিয়েছ। স—ব। কিছু বাকি রাখনি। এখন এটুকু নিয়ে আমাকে ভিখিরি করে দিতে চাও—'

সহদেবকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না দিয়েই অমলা হিংস্র আহত বাঘিনীর মত সহদেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ আক্রমণে সহদেব ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ছিল। অতিকষ্টে সামলাল নিজেকে। তারপর উত্তেজিত ক্ষিপ্ত অমলাকে দুই বাহুর বন্ধনে বন্দী করে ফেলল। সহদেবের বাহু বন্ধনের মধ্যে অমলা জালে আটকান পাখির মত ছটফট করতে লাগল। তার নখের টানে সহদেবের প্রথমে জামা পরে পিঠ ছিন্ন হল। আরো জোরে অমলাকে আঁকড়ে ধরে সহদেব বলল,—'অমলা। অমলা। শোন অমলা। শোন—'

ক্রমে সহদেবের বুকের মধ্যে অমলা শান্ত হয়ে এল। উত্তেজনার উত্তুঙ্গ শিখর থেকে সহসা স্খলিত হয়ে যেন সরাসরি অশ্রু সমুদ্রের কূলে আছড়ে পড়ল। সহদেবের বুকের আড়ালে মুখ লুকিয়ে অমলা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। অমলার চোখের জলে সার্ট ভিজে গেল সহদেবের।

অমলা অনেকক্ষণ কাঁদল। সহদেবের বুকের মধ্যে অমলার মাথা। মাথায় বিগত দিনের বাসি বিস্রস্ত খোঁপা। সহদেবের বুকের খুব গভীরে নিভৃতে কার যেন পায়ের শব্দ। কে এক প্রবাসী যেন আবার ঘরে ফিরে এল। তার সঙ্গে অনেকগুলো রঙ বেরঙের ছোটবড় পুটলি। ঐসব পুটলিতে ঘরের জন্য কত সুন্দর উজ্জ্বল দরকারী সৌখিন উপচার। কি যেন একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি বার বার সহদেবের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। দু একবার চেষ্টা করেও সে কোনো কথা বলতে পারল না। অবশেষে অমলার কানের কাছে মুখ নামিয়ে সহদেব বলার একান্ত আকুতিতে ফিসফিস করে বলতে পারল,—'অমলা। এস আমরা নতুন করে চেষ্টা করি আর একবার। অমলা, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ—'

অমলা জানত না কান্নাতেও এত সুখ আছে।

মানালি থেকে রোটাং

কল্যাণী ভট্টাচার্য

রোটাং গিরিসঙ্কট পার হয়ে তিব্বতীরা যাচ্ছে লাহুলের দিকে

কুলু থেকে মানালি ২৪ মাইল। মানালি কুলু জেলার একটি সুন্দর পার্বত্য শহর। পথঘাট পরিষ্কার। ছিমছাম। এর অরণ্য শোভা অতুলনীয়। পাইন আর দেওদার অরণ্যের যেন আর শেষ নেই। পাহাড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও যেন মাথা তুলে ক্রমাগত নেচে চলেছে। এই সবুজের সমারোহ মানালিকে আরো নয়নাভিরাম করে তুলেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, পাইন অরণ্যের এমন শান্ত সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিনি।

দূরে তুষার শৃঙ্গ। শরতের আলোয় ঝলমল করছে। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু মানালি থেকে সেখানে পৌঁছান সহজ ব্যাপার নয়। বড় জোর তার পাদদেশে গিয়ে একটা প্রণাম জানিয়ে আসা যায়। শহরের ডান দিক দিয়ে বয়ে চলেছে বিপাশা। সুন্দরী বিপাশা। কুলুতে তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সেখানে সে নবযৌবনা। মানালিতে তার আর এক রূপ। এখানে সে দুরন্ত চপলা বালিকা। রোটাং গিরিপথে বিপাশা কুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে।

এই মানালি থেকে একটা পথ গিয়েছে রোটাং গিরিসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে কেলাং হয়ে লেহ পর্যন্ত। এত উঁচু পার্বত্য সড়ক আর কোথাও নেই। বিপাশার পুল পেরিয়ে এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম রোটাং গিরিসঙ্কটে। আগে রহলা পর্যন্ত বাসে গিয়ে বাকি ৫ মাইল পায়ে হেঁটেই যেতে হত। ভীষণ দুর্গম ছিল সে পথ। যেমন চড়াই, তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়ত। ঠাণ্ডায় মুখ ফেটে রক্ত ঝরত। দুঃসাহসী পর্বতারোহী ছাড়া বড় একটা কেউ রোটাং গিরিপথে পৌঁছতে পারত না। আজকাল গিরিপথের উপর দিয়ে বাসের রাস্তা চলে গিয়েছে। মানালি থেকে বাসে চেপেই আজ রোটাং গিরিপথে পৌঁছান যায়। শুধু রোটাং নয়, মানালি থেকে কেলাং পর্যন্ত নিয়মিত বাসও যাতায়াত করে।

মানালিতে তখনো ভালো করে সূর্যোদয় হয়নি। যাত্রীবাহী বাস মেঘলা আবহাওয়ার ভেতর দিয়েই এঁকেবেঁকে উপরে উঠছিল। কিছুক্ষণ পরে রোদ উঠতে চারিদিক পরিষ্কার হল। তখন বাসের যাত্রীদের ভালো করে দেখে নিলাম। এক বিশেষ দলের যাত্রীরাই বাসের অধিকাংশ আসন জুড়ে ছিল। মেয়ে পুরুষ মিলে তারা ছিল ২০ জন। তাদের কথাবার্তায়, আলাপ আলোচনায় ও রঙ্গরসিকতায় বাস মুখর হয়ে উঠেছিল। আমরা সংখ্যায় কম। নির্বাক শ্রোতার মত যাচ্ছিলাম। ওদের আলোচনার বিষয় ছিল মণিকরণ। কুলু থেকে ওরা গিয়েছিল মণিকরণে। সেখানে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে ওরা অনেক তৃপ্তি পেয়েছে। শিখ সন্তদের আতিথেয়তায় ওরা মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। সেই কথাই বার বার বলছিল। বেশ ভালো লাগছিল ওদের মুখে মণিকরণের গল্প শুনতে।

বাস একটানা ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছিল। সেদিকে যাত্রীদের খেয়াল ছিল না। তারা গল্পগুজবে মেতে ছিল। মণিকরণের গল্প তখনো শেষ হয়নি। পার্বতী উপত্যকার মণিকরণ তীর্থের মাহাত্ম্য শোনাচ্ছিলেন এক প্রবীণ ভদ্রলোক। আমাদের মধ্যে অনেকেই এতক্ষণ মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিল। এবার একজন বলে উঠল—নাগর কিন্তু খুব ভালো জায়গা। আপনারা নাগর গেছেন?

ঐ বড় দলের এক তরুণ যাত্রী জবাব দিল—না, আমরা নাগর যাইনি। কি আছে সেখানে? তবে মণিকরণ অনেক ভালো। সে কি উত্তেজনা।

উত্তর হল—মণিকরণ ভালো বটে। তবে নাগরও তো কম ভাল নয়। সেখানে আটশো বছরের পুরনো শিব মন্দির আছে। রাশিয়ান চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক-এর ছবির সংগ্রহ আছে। শিল্পী আর ধ্যানী কেমন করে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন, রোয়েরিকের এই ছবির সংগ্রহ না দেখলে তা বোঝা যাবে না। মণিকরণের মত নাগরও তাই কুলুর আর এক তীর্থ।

নাগরের প্রসঙ্গ উঠতে সকলে মন দিয়ে শুনতে লাগল। যারা এতক্ষণ মণিকরণের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তারাও কিছুটা শান্ত হল। এবার বাসটা বাঁক নিয়ে থেমে পড়ল। নেমে দেখলাম কোঠি এসে গেছে।

কোঠি মানালি থেকে ৭ মাইল। খুব নির্জন জায়গা। কিন্তু ছবির মত সুন্দর। আগে যখন পায়ে হেঁটে রোটাং গিরিপথে উঠতে হত, তখন এই কোঠিতে তাঁবু ফেলতে হত যাত্রীদের। ১৩,৪০০ ফিট উঁচু রোটাং গিরিসঙ্কটের পাদদেশে কোঠিতেও সুন্দরী বিপাশাকে দেখা যাবে। যেখানে হিমাচল প্রদেশের সরকারী বিশ্রাম গৃহ আছে, তার কাছাকাছি একটা ভীষণ গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বিপাশা মানালির দিকে ছুটে চলেছে। এখানে তার গভীরতা প্রায় ২০০ ফিট আর বিস্তার কয়েক ফিট মাত্র।

কোঠিতে মিনিট কয়েক থেমে আবার বাস চলতে শুরু করল। কেবলই ওঠা, যেন স্বর্গের সিঁড়ি অতিক্রম করা। কোঠির পর থেকেই সব কিছু বদলে যেতে লাগল। আবহাওয়া বদলে গেল। গাছপালা বিরল হল। চারিদিকে কেবল ধূসর পাহাড় আর ধোঁয়া ও কুয়াশার ইন্দ্রজাল। বাইরে থেকে হিমশীতল বাতাস আসতে যাত্রীরা কাঁচের জানালাগুলো একে একে বন্ধ করে দিল। বাসের গতিবেগ এবার অনেক কম। কারণ সামনে ভীষণ চড়াই।

বাস যতই উপরে ওঠে যাত্রীদের গল্প-গুজব আলাপ আলোচনা ততই বাড়তে থাকে। মণিকরণ নাগর ইত্যাদির আলোচনা থেমে গেছে। এবার আরম্ভ হয়েছে আপেলের গল্প। কে কোথায় সস্তায় আপেল পেয়েছে। বাগানে গিয়ে আপেল পেড়ে খেয়েছে কুলুর আপেলের সঙ্গে কাশ্মীরের আপেলের তফাত কি—এইসব গল্প।

দেখতে দেখতে রহলা এসে পড়ল। তাহলে আমরা ৮,৫০০ ফিট উপরে উঠে এসেছি। মানালি থেকে রহলার দূরত্ব মাত্র ১০ মাইল। এই ১০ মাইল আসতেই ঘণ্টা দেড়েকের বেশী সময় লেগে গেছে। রাস্তার ডানদিকে পড়ল বিখ্যাত রহলা জলপ্রপাত। প্রায় দু' তিন হাজার ফিট উপর থেকে জলধারা তীব্র বেগে নীচে আছড়ে পড়ছে। রাস্তার বাঁদিকে ধূসর পাহাড়ের সারি তারও এক ভাবগম্ভীর রূপ। যারা পার্বত্য নির্জনতা ভালবাসে রহলা তাদের ভাল লাগবে।

এখানে বাস কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বাস থেকে নেমে পড়েই সবাই চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগল। রহলা জলপ্রপাতের ছবিও তুলল। সত্যি রহলা জায়গাটি ভারি সুন্দর। রঙ আর তুলি দিয়ে আঁকা ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর ছবিও বলা যায়। অবশ্য এমন ছবি হিমাচল প্রদেশের অনেক জায়গায় দেখেছি। রহলার সৌন্দর্য বেশিক্ষণ উপভোগ করা গেল না। বাস ছেড়ে দিল। যাত্রীরা যে যার আসনে এসে বসল। কেউ কথা বলছিল না। এমন কি আগেকার সেই কলমুখো কাছিয়ে তরুণটিও নয়। রহলার নগ্ন সৌন্দর্যে হয়ত আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল সকলে। নিঃসীম নীরবতার মধ্যে বাস মারীতে এসে পৌঁছল।

প্রায় ১১,০০০ ফিট উঁচুতে মারহি একটা সুন্দর মালভূমি। এখানে তিব্বতীদের কয়েকটা চায়ের দোকান আছে। লাহুল থেকে তিব্বতীরা এসে এখানে চায়ের দোকান করেছে। মারহি থেকে কিছু নীচে তিব্বতী উদ্বাস্তুদের বসতিও আছে। পথে আসতে আসতে তাদের কতকগুলো বসতি চোখে পড়েছিল।

মানালি কাছে থাকার জন্যেই হয়ত তারা এসব জায়গায় বসতি করতে পেরেছে। কিন্তু এত উপরে আর এত ঠাণ্ডায় তারা থাকে কি করে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। রোটাং যেতে যেতে কে কখন তাদের দোকানে বসে খানিক বিশ্রাম করবে, চা খাবে, তার জন্যে এই দোকান সাজান। এটাও ভাবতে কেমন লাগে। দিনের মধ্যে কটাই বা তাদের দোকানে লোক আসে?

মারহিতে বেশ ভারী মিষ্টি লাগছিল। চা পর্ব শেষ হয়েছিল তবুও যেন দোকান ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। দূরে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে এক মনে ভাবতে ভাল লাগছিল। এখান থেকেও তুষারশৃঙ্গের ঝিকিমিকি সুন্দর দেখায়। মানুষের উপর হিমালয়ের আশ্চর্য প্রভাব। হাল ছেড়ো এলে মানুষ যেন বোবা হয়ে যায়। হিমালয় মানুষকেও তার মত নীরব করে তোলে। আপন অহং-বোধ বিসর্জন দিয়ে হিমালয়ের সাথে একাত্ম হতে পারলেই বোধহয় তাকে প্রকৃত উপলব্ধি করা যায়। শিল্পসাধক রোয়েরিকের ছবিগুলো দেখে একথা বার বার মনে হচ্ছিল।

বাসে বসে বসে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। মারহি ছেড়ে যে কখন রোটাং গিরিপথে চলে এসেছি, সে খেয়াল ছিল না। বাসটা হঠাৎ থেমে যেতে তন্দ্রার ভাব কেটে গেল। চোখ চেয়ে দেখলাম, যাত্রীরা এক এক করে নামতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই তারা ভারী ভারী গরমের পোশাক পরে ফেলেছে।

রোটাং গিরিদ্বার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৪০০ ফিট উঁচুতে। এক সময় সাধারণ যাত্রীর পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব ছিল। গিরিপথের উপর দিয়ে লাহুল কেলাঙে অনায়াসে যাওয়া যায়। এই গিরিপথে রয়েছে বিখ্যাত বিপাশা কুণ্ড। এখান থেকেই বিপাশার উৎপত্তি।

উচ্চতায় আর বিশালতায় হিমালয় পর্বত যে কত মহীয়ান, এই গিরিপথে এসে দাঁড়ালেই তা বোঝা যায়। হিমালয়ের এই রজতশুভ্র রূপ এর আগেও দেখেছি গাড়োয়ালের কেদারনাথ, বদ্রীনাথ ও তুঙ্গনাথে। সেখানেও এই বনভূমি হিমেল হাওয়া আর তুষারশৃঙ্গের ... কেদারবদ্রীর মালভূমি অপরিসর ... এই গিরিপথ বহু বিস্তৃত। সেখানে দৃষ্টি সহজেই অবরুদ্ধ হয়ে মনটাকে ... মধ্যে গুটিয়ে নেয়। কিন্তু এখানে ... শ্রেণীর ব্যাপকতা দৃষ্টিকে বহুদূর ... প্রসারিত করে মনকে স্বাধীন ... যোগ দেয়। রোটাং গিরিপথে এই ... অনুভূতি।

রোটাং গিরিপথ উত্তর থেকে দক্ষিণ বিস্তৃত। দৈর্ঘ্যে আড়াই মাইল আর প্রস্থে আধমাইল। রোটাং একটি তিব্বতী শব্দ এর অর্থ মৃতদেহের স্তূপ। ... অসংখ্য উচ্চতর গিরিবর্ত্ম আছে ... কিন্তু এমন বিপজ্জনক গিরিবর্ত্ম ... কমই আছে। আকস্মিক তুষার ঝড়ের ... এর দুর্নাম কারো অজানা নয়। এই ঝড়ের কবলে পড়ে বহু মানুষ ও ভারবাহী পশু মারা গেছে এই গিরিবর্ত্মে। ... তিব্বতীরা এর নাম দিয়েছে রোটাং। এই নামেই সে আজ সকলের পরিচিত।

এই নামটি কিন্তু খুব পুরনো ... উইলিয়াম মুরক্রফট ও তাঁর সহযাত্রী ... ট্রেবেক যখন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ... মাসে এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন ... এর নাম ছিল রিতুঙ্কা জোত। ... গিরিশিখরকে বলা হয় জোত। ... লোকেরা রোটাং গিরিপথকে গিরি শিখর বলেই মনে করত।

মুর ক্রফট সে ভুল করেননি। ... বুঝতে পেরেছিলেন এটি একটি গিরিপথ। তবে তিনি রিতুঙ্কা জোত নামটি ... করেছেন। তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

"The Ghat or pass of R... Joth, which is above ... thousand three hundred feet ... forms a gap in the most ... and elevated mountains of ... running with a tolerably ... surface, about quarter of a ... in breadth, for a short dist... between mountains of not ... greater elevation—".

তবে মুর ক্রফট-এর পরে ... জোত নামটি বেশীদিন প্রচলিত ছিল না। কারণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ... ইনফ্যান্টির সার্জেন ডক্টর জে. সি. ... স্পিতি উপত্যকা সমীক্ষণ করতে গিয়ে

...লেন। তাঁর বিবরণ থেকেই প্রথম রোটাং ...টি পাওয়া যায়। তাঁর আসার আগে ...কেই বোধহয় এই গিরিবর্ত্মকে রোটাং ...মে ডাকা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বিপাশার উৎস বিয়াস রিখি—রোটাং গিরিবর্ত্মের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত একটি ছোটো কুণ্ড। পাশেই পাথরের ছোটো মন্দির। পাঞ্জাব কেশরী রণজিত সিং-এর সেনাদল কুলু রাজ্য অধিকার করার পরে এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

মূর ক্রফট যখন রোটাং-এ আসেন, তখন সেই মন্দিরটিতে একটি ছোটো পাথরের মূর্তি ছিল—সেটি নাকি ব্যাসদেবের মূর্তি। এবং সেকালে বিপাশার উৎস কুণ্ডকে ব্যাস ঋষি বলা হত। মূর ক্রফট নিজেও লিখেছেন Byas Rishi ইংরেজদের কৃপায় ব্যাস ঋষি বিয়াস রিখি হয়েছে।

গিরিপথের বাঁদিকে দেখা যায় সুন্দর দশোহর সরোবর। প্রতি বছর ২০শে ভাদ্রের পুণ্য দিনে বহু তীর্থযাত্রী এই সরোবরের তীরে এসে জড় হয়। জনশ্রুতি আছে যে ওই দিনে সরোবরে প্রাতঃস্নান করলে নাকি শরীরের সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে যায়।

প্রায় এক ঘণ্টার উপর গিরিপথে দাঁড়িয়ে।

কি বিশাল নীল আকাশ আর তারই নীচে নিরাবরণ ধূসর গিরিশ্রেণী। মাথার উপরে শুভ্র কিরীট। কোন দিক ছেড়ে কোন দিকে তাকাব, তা কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এদিকে আবার কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সারা শরীর অবশ হয়ে পাহাড়ের কোলে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। দেবতাত্মা হিমালয়ের চরণে মানুষের এটা সশ্রদ্ধ প্রণাম কিনা জানি না।

সকলেরই এক অবস্থা। তবুও তারা শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কি একটা পাবার জন্যে। হিমালয় মানুষকে যে কি দেয়, তা কেউ জানে না। তথাপি শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে বার বার তাকে আসতে হয় হিমালয়ের কোলে। হিমালয়ের এই আকর্ষণ দুর্বার। এই দুর্নিবার আকর্ষণে বোধহয় আমরা হিমশীতল বাতাসের মধ্যেও ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

রোটাং গিরিপথে সর্বদাই এই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। বেলা যত বাড়তে থাকে বাতাসের গতিবেগও ততো প্রবল হয়। তাই দিনের আলো থাকতে থাকতে গিরিপথ পেরিয়ে যাওয়া উচিত। মানালি থেকে তিব্বতী উদ্বাস্তুরা গাধা খচ্চরের পাল নিয়ে গিরিপথ দিয়ে লাহুলের দিকে চলেছে। তাদের কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ঠাণ্ডাতেও তারা কাবু নয়। কেমন সারি দিয়ে জানোয়ারের পাল নিয়ে তারা যাচ্ছে। গিরিপথে তাদের এই যাওয়াটা ভারী সুন্দর। এইভাবে হেঁটে হেঁটেই তারা এসেছে আবার দিনের পর দিন পায়ে হেঁটেই তারা লাহুলে পৌঁছবে। এ এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা।

কুলু আর লাহুলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে এই গিরিপথ। তাই এর গুরুত্বও সমধিক। গিরিপথের দক্ষিণে কুলু মানালি। গাছপালা, ফল ফুলে সমৃদ্ধ, আর উত্তর ও উত্তর-পূর্বে লাহুল ও স্পিতি। নিরাবরণ ধূসর বৈরাগী রূপ। হিমালয়ের এ অঞ্চলটা তিব্বতের মালভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই গিরিপথ পেরিয়ে কয়েক হাজার ফিট নীচে কোকসার। তারপর সেখান থেকে খানিক উত্তর-পশ্চিমে কেলাঙ। কেলাঙ পর্যন্ত বাসে গিয়ে হাঁটা পথে ত্রিলোকনাথ যাওয়া যায়। ত্রিলোকনাথ হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায়। যারা ত্রিলোকনাথ দর্শনে যায়, তাদেরও এই রোটাং গিরিপথ পেরোতে হয়। এ যাত্রায় আর ত্রিলোকনাথ মণিমাহেশ সম্ভব নয়। রোটাং-এর ঠাণ্ডাতেই হিম হয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে ফেরার পথে খানিকটা নেমে গেলে হয়। দু' একটা চায়ের দোকান বসেছে। সেখানে গরম চা পাওয়া যায়।

দু' ঘণ্টার মধ্যেই শরীর কাহিল হয়ে পড়েছিল। ছাউনি ঘেরা চায়ের দোকানে এসে তবে স্বস্তি পেলাম। আর কেউ বাইরে থাকতে চাইছিল না। সবাই ভীড় করেছিল চায়ের দোকানে। পর পর দু' গেলাস চা পানে শরীর তাজা হল। হাত পায়ের জড়তা কাটল। অকটোবরের প্রথমেই এমন ঠাণ্ডা। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে না জানি কত ঠাণ্ডা পড়ে। সারা গিরিপথ তখন তুষার শয্যায় ঘুমিয়ে থাকে। কোনো মানুষের পদক্ষেপ পড়ে না গিরিদ্বারে। নগাধিরাজ হিমালয় আপন ধ্যানে আপনি মগ্ন হয়ে থাকেন। সে রূপ মানুষের দেখার কথা নয়।

বেলা প্রায় একটা। আর রোটাং-এ থাকা যাবে না। এর পর হয়ত আরো জোরে ঝোড়ো বাতাস বইবে। ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য করতে না পেরে অনেকেই বাসে এসে বসেছিল। যারা বাইরে ছিল, হর্ন বাজতে তারাও এসে বসল। যাত্রীবাহী বাসটা এবার নীচে নামতে শুরু করল। এখান থেকে মানালি ঘণ্টা চারেকের পথ।

এক বিকেলেই শেষ ॥

দিব্যেন্দু পালিত

এক বিকেলেই শেষ হয়ে যায় সমূহ শ্রাবণ—
গর্জনবিমুখ মেঘ চেয়ে থাকে; প্লাবনে তোমার
এতো দীর্ঘ অনুদান সত্ত্বেও কখনো শেষ হয় না রোপণ
সন্তানের জন্য বীজ। তুমি তো সন্তানই চাও, চেয়েছো বিনাশ!

এক বিকেলেই শেষ হয়ে যায়। গৃহস্থের ঘর
তুলসীতলার দিকে চেয়ে থাকে; ভাসানে তোমার
অনন্তকালের ফুলশয্যা, ফুল ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও পারো না
বাঁচাতে আশ্রয় সেই—।
তুমি তো আশ্রয়ই চাও, চেয়েছো ভাসান।

শোণিত গন্ধী বর্ণমালা ॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমি তেমন জয় দেখিনি শিখর বেয়ে নেমে যায়নি নিঃশব্দে
উপত্যকায়
অরণ্যে একদিন হারিয়ে যায়নি কুয়াশায় খুলে রেখে
উষ্ণীষ [illegible]
পরিচ্ছদ রত্নখচিত অহংকার

ওই পাহাড়-চূড়া নির্বিকল্প সত্তের আত্মা ঊর্ধ্বমুখী [illegible]
অভ্রান্ত জাগরণ নৈঃশব্দ্যের শেষৌন শ্রাবণ
তেমন [illegible]
শিশুর আঙুলে বৈদূর্য আর চৌরাঙ্গীর [illegible]
কুড়োয় ফের সারাদিনের সঞ্চয়

ওই পাহাড় চূড়ায় বিষাদ কেমন নিশ্চল [illegible] কোন বোধে
কোন [illegible]
আর ফুরিয়ে যাচ্ছে ভ্রমণকাল হায় ভ্রমণকালীন [illegible]
শুক্লপক্ষ [illegible] আমার বিজয়ী সূর্যের আলো কেমন [illegible]
দিনান্তে

আর দাঁড়িয়ে আছি [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible]
সেই মন্দপদে ঘোড়া আসবে এই পথে জয়ের পথে
[illegible]
আছি আর সরে যাচ্ছে সূর্যের আলো দিনান্তের [illegible]
[illegible] এক নিভন্ত শিখর বেয়ে নেমে যাচ্ছে [illegible]

ওইতো সেই ঘোড়া পালিয়ে যাচ্ছে অরণ্যে উপত্যকায় কুয়াশায়
বাড়ি ফেরার পথের উপর রাত্রি নামছে
উলংগ আর বধির একটি [illegible]

সভ্যতার অবলুপ্তি ॥ বিনয় ভৌমিক

নীল আকাশের বুক চিরে আগুন জেলো না আর
বলাকারা চুম্বন করুক ওকে,
রক্তাপ্লুত করো না সুন্দর এই পৃথিবীকে।
রূপসী ঐ চাঁদকে কলঙ্কিত করো না তুমি।।

একি দুঃসাহসিক অভিযান
নাকি মদোন্মত্ত হস্তির তান্ডব নৃত্য?
কৃষ্ণাঙ্গের ধমনীতে বহে নাকি লোহিত শোণিত
জবাব কী দেবে আদম অথবা ইভ!

নিরীহ নিষ্পাপ ভিয়েতনাম শিশু
কেন পায় না প্রকৃতির আলো বাতাসের স্বাদ
কি তার অপরাধ?
কৃত্রিম ঐ সভ্যতা অবলুপ্ত হয়ে যাবে
সারা পৃথিবীটা হয়ে যাবে নেক্রোপলিস।।

(পাঁচ)

সে উপদ্রব বাড়িওয়ালা মদন বসাক।

এমনিতেই বুড়ো কম জ্বালাতুনে নয়, বাড়িতে একটু শব্দ হলেই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে, 'শব্দ কিসের রমেশবাবু?'

বাবা হয়তো বললেন 'কই? কিছুই তো নয়, বোধহয় গরমমশলা গুঁড়োনো হচ্ছে।'

বসাক বলে 'তা ওই গরমমশলা-টশলা-গুলো আমাদের হামানদিস্তেয় না গুঁড়িয়ে, শিলে বেঁটে নিলে হয় না?'

বাবা হেসে ফেলে বলতেন, 'রান্না-টান্নার ব্যাপারে কী হয় না হয় আমি কী জানি বলুন? আজন্মই তো দেখে আসছি গরমমশলা গুঁড়োনো হয়।'

ছাতে কয়লা ভাঙার ব্যবস্থা, তবু একতলা থেকে বুড়ো সে শব্দে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসে, 'ও রমেশবাবু আপনার ঝিকে বলে দিন না, একটু আস্তে কয়লা ভাঙতে।'

বাবা বলেন, 'আমার ঝি তো আপনারও ঝি, আপনিই বলে দেবেন।'

'আমি? ওই দজ্জাল মাগী আমার কথা শুনবে?'

[illegible]

'তাহলে আমার কথাই কী শুনবে?'

শুনবে শুনবে। আপনি হলেন গে, বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাছাড়া বড়লোক মনিব। আমার তো হপ্তা গিয়ে তিন টাকার ঝি। আর আপনার? তিন দুগুণে ছয় তার ওপর আট আনা জলপান! আমার সঙ্গে আপনার তুলনা?'

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা বলে দেব।'

একদিন রান্নাঘরে একটা পেরেক ঠোকা হচ্ছিল, মদন বসাক গায়ে তেল মাখতে মাখতে গামছা পরে এসে ঝনাঝন দরজার শেকল নাড়ছে।

বাবা অবাক হয়ে বলেন, 'এ কী বসাক-মশাই, এ অবস্থায়?'

বসাক উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে, 'স্থির থাকতে পারলাম না রমেশবাবু। দেয়ালে পেরেক পোঁতা হচ্ছে বুঝতে পেরে ছুটে এলাম। এ বাড়ির দেয়াল আমার বুকের পাঁজর রমেশবাবু। এর দেয়ালে পেরেক ঠোকাও যা, আমার পাঁজরে পেরেক ঠোকাও তা।'

বাবা আরও একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাড়িতে বাস করতে হলে, রান্নাঘরে ভাঁড়ার ঘরে একটা পেরেক পোঁতা চলবে না, এ কেমন কথা?'

'বুঝি বিলক্ষণ বুঝি।' কিন্তু তবুও বলি যখনই পুঁতবেন, স্মরণে আনবেন মদন বসাকের পাঁজরে পুঁতছেন। তারপর যদি ইচ্ছে হয় পুঁতবেন।'

বাবা হেসে ফেলে বলেন, 'কী মুশকিল, তা এই কলকাতা শহরে তো শুনি আপনার বারোখানা বাড়ি আছে, এটাই বা হঠাৎ বুকের পাঁজর কেন?'

মদন বসাক একটু অলৌকিক হাসি হেসে বলে, 'বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ে এই কথা বললেন রমেশবাবু? আপনার তো চারটি সন্তান আছে, তা বলে কি কারুর গায়ে একটি আঁচড় লাগলে সয়? সব বাড়িই আমার প্রাণতুল্য। ভাড়া আদায় করতে নই আর কী মাসে তদন্ত করে আসি বাড়ি জখম হচ্ছে কিনা।'

বাবা বলেন, 'ঠিক আছে বাড়িতে বলে দেব, আর যেন পেরেক-টেরেক না পোঁতা হয়।'

কিন্তু এছাড়াও ওর দোতলায় উঠে আসার উপলক্ষ ঢের আছে।

বাবা বাজার করে আসছেন দেখলেই গুটি গুটি পিছু পিছু উঠে আসবে বুড়ো, 'ইলিশ কতো করে জোড়া পেলেন রমেশবাবু? দেড় টাকা? ওরে সব্বনাশ। এক জোড়া ইলিশ দেড়টাকা! এ আপনারই সম্ভব রমেশবাবু।'

বাবা হয়তো হেসে বলবেন, 'আর আপনার পক্ষে সম্ভব নয়? আপনি তো আমাকেই দশবার কিনতে পারেন, আপনি আর এক জোড়া ইলিশ কিনতে পারেন না?'

'নাঃ মশাই! অতো নবাবী আমাদের ঘরে পোষায় না। আপনারা ভাজুন, আমরা ঘ্রানেন অর্ধভোজন করি।'

শুধু ইলিশ বলে নয়। গলদা চিংড়ি, নতুন ফুলকপি, নলেন গুড়ের নাগরী, যা দেখবে বুড়ো দাম জিগ্যেস করবে, আর চোখ কপালে তুলে বলবে, 'ওরে সব্বনাশ। ও কী আর আমাদের কেনা পোষায়?'

তবে তেড়ে উঠে জিগ্যেসই বা করতে আসিস কেন?

আমাদের বাড়িতে যা কিছু ঘটনা ঘটছে, মদন বসাক তার হিসেব রাখছে।

কে গেলো, কে এলো, কোন ছেলেটা কতোক্ষণ বাইরে থাকলো, গিন্নীর বাপের বাড়ির দিকের লোকেরা বেশী এলো, না কর্তার দিকের, এ সবের খোঁজ নেওয়া তিনি তাঁর একটি পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করেন।

দু' বাড়ির ঝি একই মহিলা বলে, তদন্তের সুবিধে ষোলো আনা।

সিঁড়ির দরজায় শেকল নড়লেই আমাদের ভয় হয়, ওই বুঝি বুড়ো এলো।

ক্রমশই যেন বাড়ছে উৎপাত।

আর এখন এক নতুন প্রসঙ্গ শুরু করেছে।

'মেয়ের বিয়ের কিছু করছেন-টরছেন নাকি রমেশবাবু? দিব্যি তো ডাগর-ডোগরটি হয়েছে—'

এই ছিল শুরুর প্রথম পর্ব।

তখন বাবা এ প্রশ্নকে নেহাৎ 'গ্রামতা' বলে অগ্রাহ্য করে মুখে সৌজন্য দেখিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ চেষ্টা-বেষ্টা করছি বৈ কি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ করুন করুন তোড়জোড় করে করুন। আমার বাড়িতে থাকতে থাকতে শুভ কাজটি হলে আমরাও একপাত নেমন্তন্ন খাই।'

বাবা বললেন, 'তা আপনার বাড়ি 'থাকতে থাকতে' বলছেন কেন? আমি তো

বলিনি শিগ্‌গির আপনার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো।'

মদন বসাক দাঁতহীন মুখে দে'তো-হাসি হেসে বলে, 'না না সে কথা বলছি না। আপনার মতন সজ্জন ব্রাহ্মণ ভাড়াটে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আমার পরিবার তাই সব সময় আহ্লাদ করে বলেন, 'হাতের কাছে একটা সদ্‌-বাম্ভন মেলা কি কম ভাগ্যির কথা? এই যে বার বর্তয় একটু মিষ্টি পাঠাতে পাই, সিধে পাঠাতে পাই, বামুনের মেয়েকে এয়ো করে খেতে পাই, এতে সুবিধে কতো।...এর আগে তো দরকারে অদরকারে গরু খোঁজা করে বামুন খুঁজতে হতো।... আচ্ছা আচ্ছা এখন আসি, আপনার ব্যস্তর সময়।' হ্যাঁ ওই একটা উপদ্রবও ছিল বসাক কোম্পানীর।

ওই সব এয়ো টেয়ো করা, মিষ্টি পাঠানো সিধে পাঠানো।

প্রথম দিকে তো মা হক-চকিয়েই গিয়েছিলেন। 'এসব কী? না না ফেরৎ নিয়ে যান, বলে নিবৃত্ত করতেও কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু নাছোড়বান্দা বসাকগিন্নী মার পায়ের ধুলো শুধু মাথায় নয়, জিভে ঠেকিয়ে সেই জিভ কেটে বলেছেন, 'ও বাবা! বাম্ভনের নামে উচ্ছ্যুগ্যু জিনিস ফেরং নিয়ে যাবো আমি? কতো পুণ্য ফলে সর্বদা আপনাদের শিরোধায্য করে বসে আছি। এটুকুর অধিকার দিতেই হবেই'

অগত্যাই সেই সব উপদ্রব মাঝে মাঝেই সহ্য করতে হয়। মিষ্টিগুলো আমরা মেরে দিই, এয়োর লালপাড় শাড়ীটা মা পরেন, আর ওই সিধে নামের বস্তুটা বামুনদিকে পাচার করা হয়।

একটা বড় থালায় ঠিক ভাত বাড়ার মত করে গোছানো থাকে চাল তরকারি ডাল মশলা তেল ঘি ইত্যাদি করে বড়ি পর্যন্ত। দুঃখের বিষয় সবই কাঁচা। বাবা বলেন, 'ওই জন্যেই তো 'সিধে' বলেছে রে! সিধে মানে সহজ তা জানিস তো? রাঁধবার হ্যাংগামা না করে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হলো, তাই সিধে।'

বামুনদি সে সব ছোট ছোট পুঁটলী করে বেঁধে নিয়ে যেতো। সে-ও তো বামুন? তার ভোজনে লাগলেও একই কাজ।

তা এসব তো এক রকম সহ্য হয়ে গিয়েছিল, উৎপাতের নব পর্যায়টিই হলো অসহ্য।

হঠাৎ একদিন এক ঘটকঠাকুর নিয়ে হাজির মদন বসাক।

'এই যে রমেশবাবু এনাকে নিয়ে এলাম। ব্রাহ্মণ শূদ্র, কুলিন ভঙ্গ সব রকম পাত্তর পাত্রী এনার হাতে আছে। কানা মেয়েকে পদ্ম-পলাশ লোচন বলে চালিয়ে দিতে পারেন ইনি, দীন দুঃখীর ছেলেকে রাজার ব্যাটা বলে পরিচয় করিয়ে জমিদারের কন্যে ঘরে এনে দিতে পারেন। মহা করিৎকর্মা লোক। ইদিকে আপনার খাঁইও বেশী নয়—'

বাবা তখন সবে অফিস থেকে ফিরে গায়ের চাদরটি খুলে চেয়ারের পিঠে রেখে চেয়ারটায় বসেছেন, তাড়াতাড়ি উঠে একেবারে হতভম্ব।

'আমি তো আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না বসাকমশাই। ঘটক কিসের?' বাবা হতভম্ব ভাবেই বলে ফেললেন।

মদন বসাক বললো, 'বুঝতে পারছেন না? আপনি যে তাজ্জব করলেন রমেশবাবু? দু দুটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ঘরে থাকতে আপনি কী বলে বুঝতে পারছেন না ঘটক কিসের? আপনার হিতৈষী বন্ধু হিসেবেই আমি—'

বাবা শান্তভাবে বললেন, 'ও: বুঝেছি। আপনার দয়ার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার ঘরে কোনো কানা খোঁড়া মেয়ে আছে বলে তো জানা নেই আমার।'

'আহা-হা ও কথা কে বলছে? ও কথা কে বলছে?'

বসাক বুড়ো হা হা করে ওঠে, 'মেয়েরা তো আপনার রূপসী। ছোটটি শ্যাম বর্ণ বটে, তবে মুখশ্রী আছে। আর বড়টি তো ওই যাকে বলে পরমাসুন্দরী। সে কথা ঘটকঠাকুরকে বলেওছি। ও কথাটি আজ্ঞে ঠাকুরমশাইয়ের গুণ-ব্যাখ্যার বলছিলাম।...যাই হোক এনার হাতে আপনাদের পালটি ঘরের পাত্তর বিস্তর আছে।...আপনার তো দুটিকেই এক সঙ্গে পাত্রস্থ করলে ভাল হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে ওই কালো শুঁটকো ঘটক বুড়োটা (চল্লিশের কাছাকাছি বয়েসের লোক হলেই তাকে 'বুড়ো'র দলে ফেলাটাকে তখন স্বাভাবিক বলেই মনে করতাম।) বলে ওঠে, আজ্ঞে তা যা বলছেন বসাকমশাই। আপনার গে জানুনার চাটুজ্যেরা, কাটোয়ার মুখুয্যেরা, মুড়োগাছার রায় বাঁড়ুয্যেরা—সব বড় বড় উচ্চ ঘর আমার হাতের মুঠোয়।।'

বাবা বললেন, 'মাপ করবেন, আমি গরীব গেরস্ত খেটে খাওয়া মানুষ, ও সব বড় বড় উচ্চ ঘরে মেয়ে দেবার স্বপ্ন দেখি না। আমারই মতন ঘরের ছেলে চেনা জানার মধ্যে খুঁজে নেবো। ঘটকমশাইকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ'—ঘটকমশাই এবং বসাকমশাই একযোগে হাঁ হাঁ করে যা বলে উঠলেন, তার মূল অর্থ হচ্ছে, এতে ওঁর কষ্টের কারণ কিছুমাত্র নেই। বরং গৃহস্তের কন্যাদায় উদ্ধারে সহায়তাই ওঁর ধর্ম, দু দুটি বিবাহযোগ্যা বয়সোত্তীর্ণ কন্যার দায়ে প্রপীড়িত লোকটার অবস্থা দেখেই তাঁরা ইত্যাদি—

বাবা বললেন, 'আপনাদের দয়া মনে থাকবে। তবে ঘটক লাগিয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রথা আমাদের পরিবারে নেই। এমনিই আত্মীয়দের ঘর থেকে জানা চেনায়—।'

তৎসত্ত্বেও ঘটকঠাকুর ছাড়লেন না। তিনি ফড় ফড় করে অনেক কথা বলে, একখানা খাতা খুলে তার থেকে কতকগুলো নাম ঠিকানা আউড়ে বলে গেলেন, 'এসব রত্ন পাত্রের সন্ধান আপনাকে কে দেবে গাঙ্গুলীমশাই? এসব এই যতীন ঘটকের ঝুলিতে, বুঝলেন? আচ্ছা আপনি মনস্থির করুন কোনটিকে দেখবেন আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।'

ওরা চলে যেতেই বাবা দরজাটা বেশ শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন।

এসব কথা অবশ্য আমরা দালানের পাশে সিঁড়ির ধারের ঘরটা থেকে শুনেছিলাম। বাইরের তো বটেই আত্মীয়দের মধ্যেও কোনো ব্যাটাছেলে এলে আমাদের

করে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে হতো। কি বাবা ডাকলে তবে এসে প্রণাম তাম।

অতএব লোক এলেই নির্বাসন দন্ড।

তুতো দাদারা বা ভগ্নিপতি পকীয়েরা এলে তো কথাই নেই। ঘড় ওয়ার পর থেকে এই এক জ্বালা।

'সামনে বেরোনোটা' ছিল বেছে গ্রহে।

মদন বসাক বাড়িওয়ালা হলেও মাকে খেছেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু তাতে কি? আড়াল থেকে তো শোনবার শোনা হয়ে গেল। জানলার াঁক দিয়ে কিছুটা দেখাও।

দিদি চাপা কড়া গলায় বললো, 'বাবা কেন একথাটা বলে দিলেন না, আমার য়ের বিয়ে নিয়ে আপনার এতো মাথা-থা কেন মশাই?...তাই ভাবছি।'

তা বেশী দিন ভাবতে হলো না। একদিন বাবার মত শান্ত ভদ্র জ্জানাশীল মানুষটার মুখ দিয়েও কথাটা নিয়ে ছাড়লেন মদন বসাক।

ঘটক আনার দিন থেকে রোজই উৎপাত বু করেছিলেন, 'কী রমেশবাবু, যাবেন কি আজ? যতীন ঘটককে তাহলে আজ সতে বলি।'

বাবা প্রতিদিনই একটা কিছু বলে ড়িয়ে যান।

হয়তো বলেন, 'এক জায়গায় চেণ্টা ছে।'

হয়তো বলেন, 'আমার এক ভগ্নিপতি টি সম্বন্ধ দিয়েছেন,' হয়তো অমনি র কিছু।

হঠাৎ একদিন রেগে উঠে বলে লেন বাবা, 'আচ্ছা বসাকমশাই, আমার য়ের বিয়ে নিয়ে আপনার এতো মাথা-া কেন বলুন তো? আমি তো সটা বুঝতে পারছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে ওই কিচেল বুড়োটার খর চেহারা বদলে গেল। সেই দেঁতো স চলে গিয়ে ফুটে উঠলো একটা ট হাসি।

হাত কচলানো ছেড়ে হাত দুটো খর সামনে নেড়ে বলে উঠলো, 'ওঃ! তে পারছেন না? তা—না পারাই চব। নিজের বাড়ির মধ্যেকার রহস্যের ই যখন বুঝতে পারেন না। তাহলে স্পণ্ট করেই বলতে হলো মশাই, টা আমার বলেই, আমার মাথা-ব্যথা! লেই জানে এটা মদন বসাকের বাড়ি। নার বয়স্থা কুমারী রূপসী মেয়েরা প্রহর বাড়ির ছাতে। এলো চুলে ঘুরে ছে, অলশের বুক দিয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে গলা খুলে গান পদ্য আওড়াচ্ছে, এতে বদনামটা কার র হচ্ছে?'

বাবা বোধহয় এ রকম কথা শুনতে হবে ধারণাও করতে পারেন নি।

বাবার কথা বলতে একটু সময় লাগলো।

তারপর খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'বাড়িটার দোতলাটা আপনি ভাড়া দিয়েছেন, এটা কেউ জানে না?'

বসাক বললো, 'জানে কি না জানে কী করে জানবো বলুন? বাড়ির দেয়ালে তো লিখে রাখিনি খবরটা?'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কান্ড ঘটলো।

যা ভাবার বাইরে।

দাদা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

দাদা যে বাড়ি আছে তা কেউ জানতোই না। মেজদা বাড়িতে থাকলে বাড়ির টিকটিকিটাও টের পায়, দাদার খবর ওর ঘরের মধ্যে না ঢুকলে পাওয়া যায় না।

মেজদা যে বই পড়ে, সে তার ঘরে ঢুকলেই টের পাওয়া যায়, কিন্তু দাদার ব্যাপার অন্য রকম। দাদাও সর্বদা পড়ে, কিন্তু কী যে পড়ে বোঝা যায় না। দু' একখানা ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা মোটা ইংরিজি বই, দাদার নিত্যসঙ্গী।

দাদাকে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে গেলাম। লজ্জায় মাথা কাটা গেল যেন। বসাকের ওই সব বিচ্ছিরী অভব্য কথা-গুলো দাদার কানে গেছে হয়তো।

গেছে কানে সে তো বোঝাই গেল।

দাদা বেরিয়ে এসেই বাবার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বুড়োর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলে উঠলো, 'তাহলে খবরটা লিখেই রাখুন গে দেয়ালে। মোটা করে আলকাতরা দিয়ে দেগে। এটাও লিখে রাখবেন, ছাতও ভাড়া।'

দাদার মুখ থেকে এমন চড়া কথা?

মেজদা বেরিয়ে এসে যদি বুড়োর নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দিতো, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

কিন্তু দাদা!

দাদাকে আসতে দেখে বাবা সরে এসেছিলেন।

আমের মঞ্জরী—ফটো : রামকিংকর সিংহ

মদন বসাক রেগে লাল হয়ে বললো, 'রমেশবাবু, এটা কী হল?'

বাবা কিছু বললেন না, চেয়ারে বসলেন এসে।

বসাক আবার বললো, 'নিজে আপনি আমায় সাত ঘা জুতো মারলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু ছেলেকে দিয়ে মারালেন, এটা ভালো হল?'

দাদা বললো, 'আবার বাবাকে টানছেন কেন? যা বলবার আমায় বলুন।'

বসাক দাড়ি খিঁচিয়ে বলে উঠলো, 'তোমায় আবার কী বলতে যাবো হে ফচকে ছোকরা? এই তোমার বাবাকেই বলছি, আসছে মাস থেকে আমার বাড়ি ছেড়ে দেবেন। নোটিশ দিলাম।'

এই অপমানে বাবা কেমন যেন হয়ে গিয়ে বলে উঠলেন। 'আসছে মাসে কেন, আসছে কালই—?'

'বাবা!'

দাদা প্রায় ধমকে উঠলো, 'ভাড়ার সময়কার এগ্রিমেন্টে নোটিশ দেওয়া দিইর ব্যাপারে কী লেখা আছে দেখে তবে যা করবার কোরো'। দাদা ঘরে ঢুকে গেল।

'আচ্ছা ঠিক আছে—আমিও মদন বসাক।' বলে বুড়ো নেমে গেল।

এ বাড়িতে আমাদের অনেক দিন থাকা হচ্ছিল।

এই বাড়িটাতেই প্রথম দেখা গিয়েছিল, বাস করবার কিছু দিন পর থেকেই একটি একটি খুঁৎ বার করছেন না।

এমন কি মা যখন হঠাৎ হঠাৎ বলে বসেছেন, 'দুই ছেলের এখন থেকেই দু' খানা আলাদা ঘর হয়েছে ভালই হয়েছে। বিয়ে হলে অসুবিধে হবে না।'

তখন কিছু প্রতিবাদ করেন নি।

অতএব মনে হচ্ছিল বাবা আর সংসার উঠিয়ে মাকে জ্বালাতন করবেন না।

কিন্তু বাবার ছন্ন-ছাড়া গ্রহই বোধহয় বাবাকে আবার ধাক্কা মারলো। নিশ্চিন্ততার স্থির কেন্দ্রবিন্দু থেকে গড়িয়ে দিল অনিশ্চিতের দিকে।

বসাক চলে যেতেই মা অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন, 'হলো তো? কাঙালের কথা বাসি হয়ে খাটলো তো? শুদ্দুরের অপমান গায়ে পেতে নিতে হলো তো?'

বাবা যে তখনো হাতে মুখে জল দেন নি, সে খেয়ালও করলেন না।

বাবা আস্তে আস্তে জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, 'কে বললে গায়ে পেতে নিলাম?'

'তা' নেওয়া আবার কাকে বলে?'

মা যেন ফেটে গেলেন, 'কোন কাল থেকে বলছি মেয়ের বিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দাও, কান করার নাম নেই। তা' নয় ধিঙ্গী মেয়েরা ছাতে উঠে বাহার দিচ্ছেন, গান গাইছেন। বাপ দাদার এতটুকু শাসন নেই। এখন কী হলো?'

'হবে আবার কী?'

বাবা কলঘরে যেতে যেতে বললেন, 'কুকুরের ঘেউ ঘেউতে কান দিতে যাওয়া বুদ্ধি ভ্রংশের লক্ষণ।'

মা আমাদের ঘরে চলে এলেন।

যেখানে আমি শূন্য দৃষ্টি মেলে [illegible] হয়ে বসেছিলাম। আর দিদি একটা [illegible] চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁপছিল।

একটু আগেই দিদি বলছিল 'আমার যা শীত করছে। বোধহয় জ্বর আসছে।'

মা অগ্নি দৃষ্টি হেনে বললেন, 'আবার ঢং করে শোওয়া কেন? [illegible] ছাতে গিয়ে নাচোগে, বাপের মুখ উজ্জ্বল হোক।'

আমি কাতর বচনে বললাম, 'মা দিদির জ্বর এসেছে।'

মা হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেলেন। বসে পড়ে বললেন, 'জ্বর আবার কখন এলো?'

দিদির সেই জ্বর টাইফয়েডে দাঁড়ালো।

কতো দিন যেন ভীষণ বাড়াবাড়ি চললো, দিদি ভুল বকতে লাগলো, মাথায় সর্বদা বরফ চাপিয়ে চাপিয়ে চুলগুলো নষ্ট হয়ে গেল।

মনে আছে ওই উপলক্ষে বাড়িতে যেন একটা মচ্ছব শুরু হয়ে গেল।

আমাদের যেখানে যতো আত্মীয়-জন ছিলেন, সকলেই জনে জনে দলে এক

একদিন করে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে এক ঠোঙা ফল হাতে নিয়ে দিদিকে দেখতে আসতে লাগলেন। মুসাম্বি অথবা আপেলের চল ছিল না তখন এতো, কমলালেবু বেদানা আর গোল ঢাকা মত কাঠের বাক্সয় তুলো বিছোনো আঙুর।

জমতে লাগলো গাদা গাদা, দিদি কী বা খায়?

দিদি সম্পর্কে যে এতো মূল্যবোধ ছিল তাঁদের, তা নয়, তবে বাবা সর্বদা সবাইকে এসব করে থাকেন, এ এক প্রকার তার শোধ।

আমার কিন্তু কাউকে আসতে দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো।

যাঁরা আসতেন, অর্থাৎ আমাদের জেঠিমা খুড়িমা পিসিমা মাসিমা মামীমার দল, তাঁরা একেবারে সংসার গুছিয়ে সারা দিনের মতই আসতেন। রুগীর ঘরে একবার ঢুকে খানিকটা আহা উহু করে, এ ঘরে চলে এসে জমিয়ে আলোচনা করতে শুরু করতেন, এই রকম অসুখে কার কোথায় কি কি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবং কোন কোন লক্ষণটা ভাল নয়।

মাকে ওঁদের কাছেই বসে থাকতে হতো। বামুনদি এলে বামুনদিকে দিয়ে খাবার আনিয়ে চা খাইয়ে তবে ছাড়তেন তাঁদের। আমি একা দিদির মাথায় বরফ ধরে বসে থাকতাম।

বামুনদি একদিন গজ গজ করে বললো, 'তোমাদের পাড়ার খাবার দোকানগুলো খুকীর অসুখে বড়লোক হয়ে গেল।'

কিন্তু উপায় কী?

যাঁরা অতো কষ্ট করে আমার অসুস্থ সন্তানকে দেখতে এসেছেন আমি তাঁদের প্রতি আগ্রহশীল হবো না? কারো মাস কি আসছেন তাঁরা?

তাঁরা তো যথেষ্ট আপত্তি করছেন, মা শুনেছেন?

কিন্তু একথা ভাববার দরকার নেই সবাই তাঁরা হৃদয়হীন ছিলেন!

মোটেই তা নয়।

এমন কথা বলবে এমন পাগলও কেউ নেই।

হৃদয় আছে বলেই তো আসতেন।

মার মনটা প্রফুল্ল রাখতে অতোক্ষণ সময় খরচ করে বসে থাকতেন, অনেকেই যাঁদের নিজের নিজের ভক্তির জায়গা থেকে প্রসাদী ফুল এনে মাথায় ঠেকিয়ে দিতেন, বালিশের তলায় রেখে দিতে বলতেন, চরণামৃত এনে খাওয়াতেন, মাদুলী-মাদুলী এনেছেন কেউ কেউ।

কেউ দুর্গার, কেউ কালীর, কেউ নারায়ণের কেউ বাবা তারকনাথের।

ওদের বিশ্বাস আর বিশ্বাসের মধ্যে সঞ্চারিত করতে অনেক অলৌকিক আরোগ্যের কথাও বলতে শুনেছি। সেই সঙ্গে গল্প গাছাও করতেন, হয়তো রোগীর বাড়ির দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করতেই এই চেষ্টা।

শুধু ওই চেষ্টাটার মধ্যে শুভঙ্করক কিছু আছে কিনা, সেই বোধের অভাব ছিল।

ওঁদের নিজেদের বাড়িতেও বিশেষ করে মামার বাড়িতে দেখেছি খুব শক্ত রোগীর মাথার কাছে বসে পাখা নাড়তে নাড়তে জগতের যাবতীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করতে।

হয়তো এ-ও এক ধরনের আত্ম প্রবঞ্চনা।

রোগের ভয়াবহতাকে চোখ-বুজে অস্বীকার করার প্রয়াস।

টাইফয়েড তো প্রায় মৃত্যু রোগই।

ওর তো ওষুধ নেই।

শুধু সেবা যত্ন ধৈর্য।

যদি ভাগ্যক্রমে বাঁচেও, রোগীর একটা কিছু নাকি না নিয়ে গিয়ে ছাড়ে না। হয় চোখ, নয় কান, নয় বুদ্ধি, নয়তো স্নায়ুর শক্তি।

এই সব তথ্য জানতে পারতাম ওঁদের আলোচনার মধ্য থেকে।

অসুখের খুব বাড়াবাড়ির সময় একদিন হঠাৎ মেজদার সঙ্গে দিলীপদা এলো।

সত্যি বলতে ওকে দেখে আমার গা জ্বলে গেল।

ওকে আমি এ যাবৎ প্রায় শত্রু ভেবে এসেছি।

ওই তো যতো নষ্টের গোড়া, যতো দুঃখের মূল। ওর সেই খামোকা 'কলের-গানের' মতো গান শোনবার সাধ থেকেই তো আমাদের সুখের জীবনটা ওলট পালট হয়ে গেল।

দিদি হঠাৎ 'বড়ো হয়ে গিয়ে' আমায় ছাড়িয়ে গেল, দিদি 'তুচ্ছ' কে তুচ্ছ মনে করতে শিখলো। আমার সুখের দিন ঘুচলো।

সব ওই ছেলেটির জন্যে।

আবার রুগী দেখতে আসা হয়েছে।

এই ছুতোয় বাড়িতে আবার একটা ঝঞ্ঝাট উঠকে।

মেজদারই বা কী এতো দরকার পড়েছিল ওই বুদ্ধি বিবেচনাহীন বন্ধুকে রুগীর ঘরে ডেকে আনবার? দিদিরই না হয় জ্ঞান-গম্যি নেই এখন, তোমার তো আছে!

আমি কাঠ হয়ে দিদির মাথায় আইসব্যাগ নিয়ে বসে থাকলাম।

মেজদা আমায় একবার জিগ্যেস করলো, 'কতোক্ষণ আগে জ্বর দেখা হয়েছে?'

বললাম। একটু আগে।'

'কতো?'

'যা ছিল তাই। চার।'

একটাও বেশী কথা বলবো না। কেন বলতে যাবো? সেই সুযোগে দিলীপবাবু হয়তো বলে বসবেন, 'তুমি সরো রুচি, আমি বরং একটু বরফ দিই।'

তা বললো না দেখছি।

কী ভাগ্যি যে ফলের ঠোঙা নিয়ে আসে নি।

কিছুই আনে নি, বেশীক্ষণ থাকে নি, শুধু একটুক্ষণ দিদির দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে বললো, 'জ্ঞান নেই?'

মেজদা মাথা নাড়লো।

আর হঠাৎ সেই সময় দিলীপদার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনটা কেমন বদলে গেল।

আমার মায়া হলো ওর ওপর।

কী শুকনো শুকনো মলিন মলিন মুখ।

চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা ভয়ানক কষ্টের ছাপ।

একটা নিশ্বাস ফেলে, আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেজদাও ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

বুঝলাম মেজদা গার্ড করে নিয়ে এসেছে ওকে।

একা আসবার সাহস হয়নি।

আহা দিদিটা টেরও পেল না দিলীপদা ওর অসুখ শুনে দেখতে এসেছিল। ভারী মন কেমন করতে লাগলো।

দিলীপদা কিছুই হাতে করে আনে নি, তবু হঠাৎ মনে হলো অনেক কিছু যেন সঙ্গে করে এনেছিল। সেটা রেখে গেল দিদির মাথার শিওরে।

(ক্রমশঃ)

ওদেশা পুঁথি

লণ্ডনের 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার 'লণ্ডনারস ডায়েরী' নামক স্তম্ভটিকে প্রকাশক মহল এক নির্ভরযোগ্য নিরিখ রূপে গণ্য করে থাকেন। সেই স্তম্ভের সোজাসুজি বিচারে ফ্রেডেরিখ ফরসাইথ কৃত 'দি ওদেশা ফাইল' নামক উপন্যাসটি শুধু গ্রেট ব্রিটেনেই ১৫,০০০ হাজার খণ্ড বিক্রিত হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থটি লটারিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে আলেক-জান্দার সোলঝেনিৎসাইনের 'আগস্ট—১৯১৪'—সেই বইটির বিক্রয় সংখ্যা ৭৫,০০০ কপি।

যুক্তরাষ্ট্রের লিটারারি গিলডের নির্বাচনে 'দি ওদেশা ফাইল' গ্রন্থটি নির্বাচিত হয়েছে। স্যাটারডে রিভ্যু ক্লাব, দি পেল বয় বুক ক্লাবও এই গ্রন্থটি নির্বাচন করেছেন এবং রিডারস ডাইজেস্ট' বইটি সংক্ষেপিত করেছেন, এছাড়া 'ব্যানটাম' কর্তৃক পেপার-ব্যাক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছায়া-ছবিতেও এ কাহিনী রূপান্তরিত হচ্ছে। এতসব তথ্য সরবরাহের কারণ উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা কি প্রচণ্ড তার পরিচয় দেওয়া। ১৯৭২-এর এই উপন্যাসটি সর্বজনপ্রিয় হওয়ার পিছনে কি আশ্চর্য কারণ আছে সেকথা জানার আগ্রহ সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। এ উপন্যাসটির বিষয়বস্তুই সম্ভবতঃ এই জনপ্রিয়তার হেতু।

'ওদেশা' নামকরণ করা হয়েছে ব্ল্যাক সী অঞ্চলের বিখ্যাত শহরের নামানুসারে একথা ভাবা অনুচিত হবে। পাঁচটি জার্মান কথার আদ্যাক্ষরের সমন্বয়ে 'ওদেশা' শব্দটি গঠিত। হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের একটি সংগঠনের নাম 'ওদেশা'। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে হিটলারের এইসব কুখ্যাত অনুচর আত্মগোপন করে।

ফ্রেডেরিখ ফরসাইথের প্রথম উপন্যাস দি ডে অব দি জ্যাকল' বিশেষ সাফল্যলাভ করে। তারপর 'ওদেশা'র এসেছে এই বিশ্ব-ব্যাপী সাফল্য। এই উপন্যাসে বাস্তবের সংগে কল্পনাকে মেশানো হয়েছে, একজন পেশাদার ঘাতক চেষ্টা করেছে প্রেসিডেণ্ট চার্লস দ্যগলকে হত্যা করার জন্য। লেখক ধাপে ধাপে তার বর্ণনা করেছেন এবং সেই বর্ণনার মধ্যে আছে আশ্চর্য শিল্পকুশলতার পরিচয়। এ উপন্যাসের এইটাই বৈশিষ্ট্য।

এই উপন্যাসটি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে লেখক সদা সচেতন তাঁর উপন্যাসের ত্রুটি সম্পর্কে। তাঁর সর্বপ্রধান ত্রুটি উপন্যাসটির বিচিত্র বিষয়বস্তু। এমনকি গ্রন্থকার তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জ্যাকল' রচনার কৃতিত্ব টুকুও স্মরণে রাখেন নি।

'জ্যাকল' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল অপেক্ষাকৃত সরল সে উপন্যাসটির অনুসরণ কর্মটির মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। প্রকাশক তাঁর বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন রসখামান সম্পূর্ণ একটি কাল্পনিক চরিত্র। তবে অন্য সব চরিত্র নাকি 'রিয়াল পিপল' বা সত্যকার রক্তমাংসের মানুষ। অবশ্য এই দাবী কিছু পরিমাণে অতিরঞ্জিত মনে হবে। হয়ত এসব চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, যেমন নাৎসী যুদ্ধঅপরাধীদের অনুসরণকারী সাইমন ভাইসেনথাল। তবে, রসখামান বা ভাইসেনথাল দুটি চরিত্রই অবাস্তব। হ্যাঁ, এই গ্রন্থটি কল্পনামূলক উপন্যাস হলেও এর কিছুটা যে বাস্তবভিত্তিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটু লক্ষ্য করে বিচার করলে দেখা যায় কল্পনামূলক এই উপন্যাসটির পিছনে প্রচুর গবেষণার ছাপ আছে। সমকালীন প্রামাণ্য দলিল ও তথ্যাবলীর সাহায্য লেখক বিশেষ দক্ষতার সংগে গ্রহণ করেছেন।

প্রাক্তন নাৎসী বাহিনী মিশর এবং অন্যত্র যেসব কার্যকলাপ করেছেন তার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। অনেক সমাধানহীন প্রশ্ন যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সাধারণের মনে জেগেছিল তার কিছু কিছু জবাবও এই উপন্যাসে আছে।

উপন্যাসটি তথাপি এত জনপ্রিয় হল কেন এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে উপন্যাস হিসাবে 'দি ওডেশা ফাইল' অতিশয় রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজনাপূর্ণ। এ পর্যন্ত এ শ্রেণীর অজস্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ডিটেকটিভ নভেলের মতই সেসব গ্রন্থ জনসমাদর লাভ করেছে। অবশ্য সেই জাতীয় গ্রন্থাবলীর তুলনায় ফরসাইথ কৃত এ উপন্যাস অনেক উচ্চাংগের। আয়ান ফ্লেমিং প্রভৃতি হাল্কা ধরনের উপন্যাস লেখকের সংগে ফ্রেডেরিক ফরসাইথের এখানে পার্থক্য।

বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী হিসাবে 'দি ওডেশা ফাইল' কতখানি গ্রহণীয় এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে ১৯৩৯-এ যা অবিশ্বাস্য ছিল তা পরে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে, এমনকি যুদ্ধের পরবর্তীকালে সেই কালের অনেক ঘটনা অবিশ্বাস্য বলে একালের পাঠকের মনে হওয়া অসম্ভব নয়। তথাপি 'দি ওডেশা ফাইল' এক বিচিত্র কাহিনী।

পিটার মিলার একজন তরুণ জার্মান সাংবাদিক, ঠিক পেশাদার সাংবাদিক না হলেও তার অন্তরে সাংবাদিক উৎসাহের প্রাচুর্য ছিল। নৈতিক সাহস নিয়ে তিনি প্রাক্তন এস এস কাপ্তেন এডুআর্ড রসখামানকে অনুসরণ করেন, রিগা-র একটি বন্দী শিবিরের তিনি ছিলেন কমাণ্ডাণ্ট বা পরিচালক। ব্যাপারটির পিছনে সাংবাদিকের একটা ব্যক্তিগত মতলবের ইঙ্গিত করেছেন লেখক। এই মতলবটির কথা এই উপন্যাসের শেষাংশে পৌঁছে প্রকাশ পেয়েছে। সৌসাদৃশ্যের দিক থেকে ব্যাপারটি এমনি কষ্টকল্পিত যে বিশ্বাস করতে বাধে। তবে এই বিষয় অবলম্বনে যে অজস্র অ-কাহিনীমূলক গ্রন্থ ও স্মৃতি চর্চা প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে তার ছাপ ছড়ানো আছে।

যে কোনো কারণেই হোক হয় লেখকের [illegible] প্রকাশকদের মনেও যে একথা জাগেনি তা [illegible] তাই এই বিষয়ে যে সামান্য ব্যাখ্যাদান [illegible] এই ভাবনা তাঁদের মনে জেগেছে। [illegible] প্রকাশক একটি বিশদ বিবরণ [illegible]—

'Some will be immediately recognised by the reader, others may puzzle the reader as to whether they are true or fictional, and the publishers do not wish to elucidate further because it is in this ability to perplex the reader as to how much is false that much of the grip of the story lies'.

[illegible]কালীন জার্মাণীর আভ্যন্তরীণ [illegible] বিষয়ে অনেক রকম কাহিনী ছড়ানো আছে। এই কারণে 'দি ওডেশা ফাইল' উপন্যাসে বর্ণিত বিষয় বস্তু পাঠকের কাছে অপরিচিত বলে মনে হয় না। যেসব পাঠক এই উপন্যাসের কাহিনী বিষয়ে [illegible] অবহিত তাঁরা সহজেই ফাঁক ধরে ফেলবেন।

[illegible] জার্মাণী এবং ইস্রায়েলের [illegible] বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত কল্পনা ও [illegible] অনায়াসে বাছাই করতে পারবেন। এর [illegible] কল্পনার ছোঁয়া হলেও বাস্তব [illegible] ফরসাইথ নিজে ছিলেন সংবাদ [illegible] বা করসপন্ডেন্ট। তাঁর [illegible] এবং পড়াশোনা আর [illegible] নাৎসী অত্যাচার বিষয়ক [illegible] জার্মাণীর অজস্র ছায়াচিত্র এই উপন্যাসে [illegible] হয়েছে বার বার।

[illegible] শিবিরের অনেক কয়েদী [illegible] [illegible] করল। জনৈক তরুণ [illegible] রিপোর্টার সেই অত্যাচারিত [illegible] ডায়েরীলিপি পাঠ করল। এই রিপোর্টারই [illegible] রসখ্মানকে [illegible] এর ভিতর এসে জড়িয়ে [illegible] ইস্রায়েলীর দল এবং সেই সঙ্গে [illegible]। রিপোর্টার প্রাক্তন এস এস [illegible] মত ভাবভঙ্গী দেখানোর জন্য [illegible] শিক্ষা গ্রহণ করল।

ওডেশার চতুর্দিকস্থ সংগঠনকে সতর্ক [illegible] দেওয়া হল। সংগঠনের অধিনায়ক ওয়ার [illegible] এ সংবাদ পেলেন। আর সংবাদ পেলেন ভলকান, এই লোকটি ইস্রায়েলের [illegible] সাধনে প্রেরণকারী মিসাইলের [illegible]নিক পার্টস্ [illegible] তৈরী করত।

সব কথা বলতে ফরসাইথেরও কেমন [illegible] মনে হয়েছে।

'It is always tempting to wonder what would have happened if......or if not—"

এ এক ক্লান্তিকর অনুশীলন। অন্ততঃ স্বয়ং ফরসাইথের তাই মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন—

Usually it is a futile exercise, for what might have been is the greatest of all the mystries.'

রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সংমিশ্রণে গঠিত 'ওদেশা ফাইল' তাই অনেকটা রহস্য উপন্যাসের মত।

তিনি মন্তব্য করেছেন :

'একথা বলা হয়ত ঠিক হবে যে সেই রাতে মিলার যদি তার রেডিয়োর সামনে না থাকত (যে রাতে জন এফ কেনেডির নিধন সংবাদ আসে, এই ঘটনাটির সঙ্গে উপন্যাসের কোনো সম্পর্ক নেই)—সে হয়ত আধ ঘন্টার জন্য পথের ধারে এসে দাঁড়াত না।

সে হয়ত এম্বুলান্সটি দেখতে পেত না বা সলোমন তাওবর বা এডুআর্ড রসথমানের কথা শুনত না—আর চাল্লিশ মাস পরে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপ হত।'

এই সব দিক থেকে ওদেশায় নতুন কিছু নেই, বা সচেতন পাঠকের কাছে একটু বিসদৃশ মনে হবে। কিন্তু জনপ্রিয় উপন্যাস কেন যে জনপ্রিয় হয় তা বলা কঠিন। জনপ্রিয় উপন্যাসে লেখকের কৃতিত্বের চেয়ে কৌশলটাই বড়ো কথা। ফরসাইথ সেদিক থেকে সার্থক হয়েছেন। তাঁর রচনায় কৌশলের দিকটা প্রবল। এই উপন্যাস পাঠ করতে বসে মনে হয় লেখক তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে সচেতন তাই তিনি কৌশলের সঞ্জীবনী মন্ত্রে উপন্যাসটিকে সজীব করেছেন। হয়ত এই কারণেই তিনি মনে করেন যে আর একখানি মাত্র উপন্যাস লিখে তিনি উপন্যাস লেখকের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। একটি লেখকের তিনখানি মাত্র উপন্যাস পরিমাণেও কম এবং পরিমাপেও।

—অভয়ঙ্কর

THE ODESSA FILE : By FEDERICK FORSYTH : Published by HUTHCINSON Ltd : LONDON : PRICE £2 only :

বাংলাদেশে মাইকেলের জন্মদিন

গত পঁচিশে জানুয়ারী মাইকেল মধুসূদনের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সাগরদাঁড়িতে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম।

বাংলাদেশ তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, মাইকেলের জীবন ও সাহিত্যাদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর জীবন ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদের ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক। বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি সুগভীর ভালোবাসাই তাঁকে আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় বসিয়েছে।

জনাব মিজানুর রহমান বলেন, যে উন্মুক্ত মন, উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাইকেল সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাই আমাদের সাহিত্যে সর্বজনীনতার আদর্শ হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের বনসম্পদ মন্ত্রী জনাব সোহরাব হোসেন। এপার বাংলার বহু কবি, সাহিত্যিকও গিয়েছিলেন মাইকেলকে শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁদের মধ্যে মনোজ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

স্থান ঢাকা। পাবলিক লাইব্রেরী ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মধ্যবর্তী ট্রাফিক আইল্যান্ড। 'কবিতা শিবির' আয়োজিত কবিতা পাঠের আসর বসেছিল খোলা হাওয়ায়। কবিতাকে জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু কেউ-ই কবিতা পড়ে ক্ষান্ত ছিলেন না। না মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, না আলাউদ্দিন আল-আজাদ। তরুণ কবিরা কবিতা পাঠের আগে, দু-চার কথায় ছোট-খাট ভাষণও দিয়েছিলেন। কেউবা শ্লোগান দিয়েছেন, গাড়ী হাইজ্যাক করে লাভ নেই। আসুন আমরা সৌন্দর্য হাইজ্যাক করি।

কবিতা পড়ে শোনালেন ওমর আলী, মহাদেব সাহা, আবু কায়সার, রাজীব আহসান চৌধুরী, রফিক আজাদ, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, এবং আরো অনেকে।

জনৈক তরুণ কবির মতে এই যে আমরা কবিতা পড়ছি, এবং শুনছি, তার কি কোন তাৎপর্য নেই? কবিতাকে ভালবাসি বলেই আমরা নরহত্যা করতে পারি না। নর-ঘাতককে ক্ষমাও করি না। মানুষকে কবিতাপিপাসু করে তুলতে পারলে, অনেক সামাজিক অবিচার, অনাচারও দূর হবে।

সেদিন ঢাকার রাজপথে ছিল জনতার মিছিল। এবং ঐ কবিতা পাঠের আসর ছিল, জনতারই উচ্চারিত প্রতিধ্বনির মতো, কাব্যিক জাগরণের বার্তাবাহী। কলকাতার রাজপথে কি অনুরূপ অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব?

মুর্শিদাবাদের খবর

মুর্শিদাবাদের সাহিত্যিকরা সম্প্রতি একটি সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন, বহরমপুর গ্র্যান্ট হলে। উদ্যোক্তা ছিলেন 'গঙ্গা' পত্রিকাগোষ্ঠী। উপলক্ষ ছিল বঙ্গদর্শনের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে সাহিত্যের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা। অনেকে 'বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র' বিষয়ে ভাষণও দেন।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জেলা শাসক কালীপদ ঘোষ। এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্দুব্রত চট্টোপাধ্যায়। সকালের অধিবেশনে প্রবন্ধ, কবিতা, আলোচনা পড়ে শোনান রেজাউল করিম, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কমল ব্যানার্জি, দীপক দত্ত, মিতা ভৌমিক, ভক্তদাস সাহা, দেবপ্রসাদ সরকার, কুমারনাথ চৌধুরী, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লকুমার দত্ত।

সন্ধ্যায় আয়োজিত 'বঙ্গদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিচিত্রা সাহিত্য বাসর একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। বিষয়: 'বাংলা সাহিত্য পড়ি কেন?' প্রবন্ধটি ফুলস্কেপের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। আয়তন পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী হবে না। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা: কুসুমকুমারী চৌধুরী, সম্পাদক বিচিত্রা সাহিত্য বাসর, ৬৮৭ পূর্ব ঘামাপুর, উষাভিলা, মধ্যপ্রদেশ।

শতবর্ষে প্রভাতকুমার

এক শ' বছর আগেকার ঘটনাকে এক শ' বছর পরে স্মরণ করতে হলে, স্মৃতি-কাতরতার সঙ্গে নস্টালজিয়ার বিষাদ মেশাতে হয়। নাহলে, শতাব্দীর ব্যবধানে যে-মানসিকতার জন্ম, সেই মানসিকতা নিয়ে পূর্বজের ঋণকে যথার্থ মূল্যে স্বীকার করা যায় না। অথচ, আত্মবিস্মৃতির দায়, বড় দায়। এই মুহূর্তে, গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমরা স্মরণ করছি, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। ভবিষ্যতের কাছেও আমরা পরিচ্ছন্ন থাকতে চাই। যে-ঋণে তিনি আমাদের আবদ্ধ করে গেছেন, সেই ঋণের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই, আমাদের সঞ্চয় ও সম্পদের পরিমাণটা উত্তরকালের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রভাত-কুমার এখানে উপলক্ষমাত্র।

১৮৭৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী। প্রভাত-কুমার বর্ধমানে জন্মেছিলেন, মামার বাড়ীতে। এই ঘটনায়, সেদিন বাংলাদেশে চাঞ্চল্য জাগে নি। এমন কি, বাইশ বছর বয়সে যখন তিনি বি-এ পাশ করে ফেললেন, তখনও না। কিন্তু যেদিন, বঙ্কিম চাটুজ্জের নায়িকা রাধারানীর ছদ্মনামে গল্প লিখতে শুরু করলেন 'প্রদীপ'-এর পাতায়, সেদিনই তাঁর পুনর্জন্ম হল, গল্পকার হিসেবে। এবং ভিন্ন দিক থেকে চাঞ্চল্য তৈরী হল, মেয়ে-মহলে। ঠাকুরবাড়ীর মেয়ের চোখেও বুঝি তার সৌন্দর্য ধরা পড়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাবুরা চেষ্টা করেছিলেন, তাঁকে জামাই করে ফেলতে।

সেই সূত্রেই তাঁর বিলেত যাত্রা।

তবু ঠাকুরবাড়ীর মেয়েকে প্রভাতকুমার বিয়ে করেন নি। এই দুঃখের স্মৃতি তাঁকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে। এবং ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় না হয়েও, আমরণ তিনি 'রোবাবাবুর' স্নেহভাজন বন্ধু হিসেবে কাটিয়ে গেছেন।

ঘটনা দুটি তাৎপর্যপূর্ণ।

শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্লটে প্রভাতকুমার গল্প লিখেছিলেন, কোনো এক সময়ে। এবং প্রায় প্রতিটি গল্পেরই প্রথম পাঠক হিসেবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করতেন। যার ফলে, রাবীন্দ্রিকতার বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয়নি। উল্টে এমনও দেখা যায়, একই সময় এবং সমস্যাকে গল্পায়িত করার ব্যাপারে, দুজনেই সমান আগ্রহী।

এর ফলাফল প্রভাতকুমারের পক্ষে ভাল হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যত প্রশংসা করেছেন, রবীন্দ্রানুরাগীরা ততই তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র-নাথের ছায়া আবিষ্কার করেছেন। অথচ, সাহিত্যজীবনের সূত্রপাতে, প্রভাতকুমার আদৌ রাবীন্দ্রিক ছিলেন না। পরেও হয়তো ততটা নন। তবু ইমেজ ঐ রকমই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এখন পুনর্মূল্যায়নের সময়।

তাঁর গল্পের পাঠক হিসেবে, আমরা কেউ জন্মেছি, তিরিশ, চল্লিশ, কিংবা পঞ্চাশ বছর আগে। কেউ বা ষাট, সত্তর বছর আগে জন্মেছেন। সময়ের এই সূত্র ধরে, অনেকটা পিছু ফিরে, তাঁর কালের কাছাকাছি স্মৃতি সংগ্রহ করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব। এবং এই স্মৃতির সজীবতায়, প্রভাতকুমার লালিত হচ্ছেন, শতবর্ষের নয়, তারও অনেক কম সময়ের ব্যবধানে। বঙ্কিমের কালের মানুষেরা এখন কেউ নেই। কিন্তু প্রভাত-কুমারের সময়কে ছুঁয়ে আছেন অনেকেই। অবশ্য, এক্ষেত্রে দূরত্বটা শুধু সময়ের নয়, স্মৃতির নিরপেক্ষতার ওপরেও বহুলাংশে নির্ভরশীল।

বঙ্কিমচন্দ্রের কালে জন্মালে তিনি কি হতেন?

নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্র হতেন না। তার কারণ, প্রভাতকুমারের দৃষ্টি ছিল সমকালের দিকে। আর, গতকালের বিষয়কে উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এবং তাঁরই নির্দেশে, রমেশ দত্ত লিখেছিলেন 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতের' মতো ঐতিহাসিক রোমান্স। তাতে আর যাই থাক, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না। অবজারভেশান ছিল না। না বঙ্কিমচন্দ্র, না রমেশ দত্তে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে, প্রভাত-কুমার, আরো নিকট হয়েছিলেন, নিজের কালের দিকে। সময় ও সমাজের দিকে। তাঁর লেখায়, নিস্তরঙ্গ বাংলাদেশের যে ছবি আছে, তাও সময়ের কাছ থেকে পাওয়া। এখন জন্মালে হয়তো বিক্ষুব্ধ কলকাতাকেই

তিনি গল্পের পটভূমি করে তুলতেন। কখনো সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী লিখতে বসতেন না।

তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটা জিনিস ছিল, যা প্রভাতকুমারের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা নিজস্ব ফিলজফি বা দর্শন ছিল। ঘটনার গতিকে তিনি পাল্টাতে পারতেন। কিন্তু প্রভাতকুমার ছিলেন দর্শক। অবজারভার। ঘটনার গতিকে রোধ না করে, তাকে আত্মসমর্পিতের নিরপেক্ষতায় গ্রহণ করতেন। বিয়ের আগে, মেয়েরা প্রেম করবে? না. বিয়ে-করা মেয়েদের প্রেমে পাপ?—এই দ্বন্দ্বে তিনি ভোগেন নি।

বরং, হাস্যপরিহাসে স্নিগ্ধ, তির্যক এবং নির্দোষ ছিলেন।

আজকের এই অ্যান্টি-স্টোরি, অ্যান্টি-ফিকশনের যুগে, হয়তো এই সারল্যও দোষাবহ হয়ে উঠবে। কিন্তু সেকালে ছিল না। সময় ও সমাজের নির্মল ছবিগুলিকে তিনি ধরে রেখেছেন একেকটি গল্পের মধ্যে। আর্টিস্ট হলে হয়তো, অবনঠাকুরের মতো, বেঙ্গলী স্কুলের প্রবর্তক সাজতেন। নাকি অনেক দুঃখে তিনি নম্র হয়ে গিয়েছিলেন, অক্ষয় বড়ালের মতো, অতুলপ্রসাদের মতো? কোথায় যেন পড়েছি, দুঃখী মানুষেরা ভায়োলেন্ট না হলে, নম্র হয়ে যায়।

তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি'। রাধারানী দেবীর ছদ্মনামে বেরিয়েছিল 'প্রদীপ' পত্রিকায়। এবং নিজের নামে লেখেন 'অঙ্গহীনা'। ঐ একই কাগজে। রচনা এবং প্রকাশকালের দিক থেকে 'অঙ্গহীনা' তাঁর তৃতীয় গল্প। কিন্তু স্বনামে প্রথম। সেই সময়ে তিনি কবিতাও লিখতেন অজস্র। এবং বিলেত যাওয়ার আগেই, বের করেছিলেন দুটো বই—'নবকথা' (১৩০৫) এবং 'অভিশাপ' (১৩০৬)। প্রথমটি গল্প এবং দ্বিতীয়টি কবিতার সঙ্কলন।

তারপর জীবনের অনেক স্তর গেছে। অনেক উত্থানপতনের কাহিনীও এখন লুপ্ত। সেই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে লিখেছেন, ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯০৯), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৬), গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প (১৯২১), যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প (১৯২৮) জামাতাবাবাজী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩১) প্রভৃতি সঙ্কলনের গল্পগুলি। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। পনেরটি। এবং শেষতম উপন্যাস 'বিদায় বাণী'কে তিনি শেষ করে যান নি।

এখন তাঁর উপন্যাসের পাঠক নেই। কিন্তু গল্পগুলি কি পাঠকের মনে সাড়া জাগাবে না? যে-পাঠক গল্পগুচ্ছ পড়ে বিস্মিত হন, তাঁর কাছে কিন্তু প্রভাতকুমারকে এখনো রবীন্দ্রনাথের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে হবে। এবং যে-পাঠক, গতকালের প্রাত্যহিকতায় বীতশ্রদ্ধ, তাঁকে স্মরণ করতে বলি যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর উত্তর-মহলে, তখন একটা ঢেঁকিশালা ছিল। —গ্রন্থদর্শী

হওয়া-না-হওয়া (গল্প সংকলন)—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকুন্দ পাবলিশার্স, ৮৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৪। দামঃ ছয় টাকা।

জীবনযাপনের প্রক্রিয়া বদল হলে উপন্যাসের মতো গল্পেরও কাঠামো বদলায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও হয়তো মানেন যে, জীবন যেখানে গত-প্রাত্যহিকের সমান্তরালে চলে না, গল্পের কাঠামোও সেখানে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কেননা, গল্পকে অনুসরণ করে জীবন এগোয় না। জীবনকে অনুসরণ করেই কাহিনী গতিশীল হয়ে ওঠে।

উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায়, এই সংকলনের অন্তর্গত একেকটি গল্পের নামঃ 'অলোকবন।' যার কয়েকটি চরিত্র যথাক্রমে চিত্ত, যতীন, হরিশ ও চঞ্চলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রায় প্রতিদিনের। তারা ঘর-সংসারের দায়িত্ব নিয়ে বিব্রত। নানা মানুষের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখে। তবু কেউ কারো ঠিকানা জানে না। এইরকম এক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তার দীর্ঘকাল বেঁচে আছে, এই কলকাতা শহরে।

দীপেনবাবু এদের নিয়ে গল্প লিখতে চাননি। বরং গল্পের কাঠামো এবং বিষয়-বস্তুর সম্পর্কে যে ধারণা এতদিন পাঠকের মনে স্থায়ী হয়ে ছিল, তাকে অমান্য করে তিনি মিশে গেছেন প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে। এবং দর্শকের দৃষ্টি ও সহযোগীর মমতা নিয়ে আবিষ্কার করেছেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক নিষ্প্রভ আকাশ।

এখানেই দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থক এবং দুঃসাহসী। নিজের বিশ্বাসকে আরোপ না করেও যতীনের অসহায়তা, চিত্তর দুঃখ এবং হরিশের উচ্চারিত সংলাপকে অনুসরণ করেই তিনি এই গল্পের শরীর ও আবহ নির্মাণ করেছেন, নির্বাচিত ঘটনার আলোয় এবং অনুষঙ্গে। হরিশের মতো নিজেদেরও জানতে ইচ্ছে করে, এই মুহূর্তে আমরাও কি জীবনে এর চেয়ে সফল, সুনির্দিষ্ট, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছি?

দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বাহ্নেই কাহিনীর গতিনির্দেশ করেন না। যেমন করেননি 'পরিপ্রেক্ষিত'-এ, তেমনি 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'তেও না।

'পরিপ্রেক্ষিতে'-এর করবী ও মৃগাংক, দুজনেই সামাজিকভাবে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু দুবেলার দুমুঠো খাবারের সন্ধানে, সারা সপ্তাহ থাকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। দীপেনবাবু সমকালীন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনার উদ্ধৃতি দিতে দিতে তাদের সাপ্তাহিক মিলনের মুহূর্তগুলিকে সজীব করে তুলেছেন, বাস্তবোচিত স্বাভাবিকতায়। যেন মৃগাংকের কণ্ঠস্বর ধার করে, লেখকই বলছেনঃ 'শোনো করবী, আমরা এক আশ্চর্য সময়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। পরিস্থিতির এই বাস্তব জটিলতা বিশ্লেষণে সামান্য ভুল হলে, বাম বা দক্ষিণ, যে-কোনো দিকে ঝোঁক পড়তে পারে। একই সঙ্গে উল্লসিত এবং হতাশ হওয়ার এমন সময় বড় আসে না।'

'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র শিবপদকে অনুসরণ করে দীপেনবাবু দেখেছেন, হাসপাতালের ডাক্তার, দারোয়ান, ট্যাক্সি এবং পথ-চলতি মানুষকে। এই গল্পের শিবপদ কি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই ছদ্মনাম? মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় শুধু এই সঙ্গে নয়, প্রায় প্রতিটি চরিত্রকেই তিনি তৈরী করেছেন, নিজস্ব সত্তার প্রজেকশান হিসেবে। 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। শিবপদ উপলব্ধি করেছে, যেদিন মহাকাশের যাত্রী গাগারিনের আসার কথা, সেইদিন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালেও কলকাতায় আলো জ্বলেনি বিদ্যুতের অভাবে।

তত্ত্ব নয়, ঘটনা। এবং ঘটনা নয় জীবনকে অনুসরণ করতে গিয়েই, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধার করেছেন নগরবাসী নিম্নবিত্তের একেকটি বিশ্বস্ত মুহূর্তের ছবি। 'নির্বাসন' 'উৎসর্গ' 'হওয়া-না-হওয়া' এই গল্পগুলির মধ্যেও পাই সেই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যিনি একই সঙ্গে উদাসীন নিরপেক্ষ, নয় আসক্ত রোমান্টিক এবং অনুসন্ধিৎসু।

এই দৃষ্টি এবং জীবনতৃষ্ণা আছে বলেই, তাঁর কোনো গল্পই যেমন পরিপূর্ণ গল্প নয়, তেমনি কোনো গল্পই নির্দিষ্টভাবে পুরনো ছকে অনুবর্তিত হয় না। এমন কি বিষয়ের দিক থেকেও প্রতিটি গল্পই আলাদা। আঙ্গিকের দিক থেকেও স্বতন্ত্র। সামান্য একটা অভিযোগ উঠতে পারে, 'ফুল ফোটার গল্পটি'কে নিয়ে। উপন্যাসের খসড়াকে কি দীপেনবাবু ছোটগল্প বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন? নাকি ফিচারের বৈশিষ্ট্যকেও আরোপ করেছেন গল্পের ওপর?

এই অভিযোগ মনেহয় শেষ পর্যন্ত টিকবে না। তার কারণ, এই সংকলনের সাতটি গল্পে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, ছোটগল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ঐই আদর্শই অনেককে অনুপ্রাণিত করবে।

রাজবংশী অভিধান—কলীন্দ্রনাথ বর্মন। পঞ্চানন আশ্রম। পোঃ শিলিগুড়ি। দার্জিলিং। দাম : পাঁচ টাকা।

সার, জর্জ এ ব্রাহাম গ্রিয়ার্সন নেপালের মোরং অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষাকে বলেছিলেন রাজবংশীভাষা। বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের বিরাট এলাকা জুড়ে এই ভাষাভাষীরা আজও বাস করছে। এদের ভাষা এখনও মৌখিক রূপে বর্তমান। সম্পদশালিনী রাজবংশী ভাষার লিখন রূপ দেওয়া, আজও সম্ভব হয় নি। বেশ কিছুকাল আগে শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল 'রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' বই লিখে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন। রাজবংশীদের জীবনধারা, ধর্মাচরণ এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে কিছুকাল যাবৎ পত্র-পত্রিকায় লেখা হোচ্ছে;

সম্প্রতি কলীন্দ্রনাথ বর্মন একক প্রয়াসে দীর্ঘকালের পরিশ্রমে রাজবংশী শব্দ সঞ্চয়ন করে জলপাইগুড়ি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। উপভাষা নিয়ে পশ্চিমবাংলায় বিশেষ কোন কাজ হয়নি। যা-কিছু সংগ্রহ, সমীক্ষা ও সমালোচনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়াস। অথচ কাজ করবার মত পণ্ডিতজনের অভাব নেই।

বাংলার একটি অন্যতম উপভাষার পাঁচ হাজার শব্দ সংগ্রহের এই প্রাথমিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শ্রীবর্মন একজন গবেষক মানুষ নন। তিনি সমাজকর্মী মাত্র। যে দুরূহ কাজ স্বেচ্ছায় তিনি পালন করেছেন, তা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। বাংলা উপভাষা নিয়ে যারা উচ্চতর পর্যায়ে কাজ করবেন। বর্তমান বইখানি তাদের প্রয়োজন মেটাবে। পূর্ণাঙ্গ অভিধান না বলে বর্তমান গ্রন্থখানিকে শব্দসংগ্রহ বা শব্দকোষ-জাতীয় গ্রন্থ বলা যায়। বইয়ের শেষ অংশে প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ, ভৌগোলিক বিবরণ, বিশেষার্থক শব্দসমষ্টি এবং ভাষাবিষয়ক তথ্য দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় শ্রীকলীন্দ্রনাথ বর্মনকে বাংলা উপভাষা অভিধান রচনায় পথিকৃৎ বলা যায়। যদিও শ্রীকামিনীকুমার রায়ের লৌকিক শব্দকোষ দুখণ্ড প্রকাশিত হোয়েছে। শ্রীবর্মনের কাজটি স্বতন্ত্রধর্মী এবং বিশিষ্টতায় চিহ্নিত।

হ'ন, এম এল এ হ'ব মন্ত্রী : শংকর বিশ্বাস। পরিবেশক : বি সরকার অ্যান্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২। দাম : ৬-০০ টাকা।

শংকর বিশ্বাসের এই উপন্যাসটির পটভূমি একটু বৃহৎ। আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক ভূমিকা মুখ্য হলেও অন্যান্য দিকও আছে। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নি। অশান্ত সমুদ্রের বুকেও তাদের দেখতে পাই। সেই সঙ্গে মহাভারতের ফাস্টিনস্টির নানা কাহিনীও এসেছে। এর উদ্দেশ্য সে-সময়ের সুবিধাবাদী সমাজকে আক্রমণ করা। জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। আর এসবই হলো লেখকের জীবনের অঙ্গীভূত। উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি লেখকের মনোরম বর্ণনাভঙ্গি। অনায়াস গতিতে তিনি অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন।

রাজা উজীর পরীর দেশে : বন্দনা গুপ্ত। প্রকাশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২, দাম : ৪ টাকা।

গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা শিশুর চিরন্তন। ঠাকুমা-দিদিমাকে ঘিরে কৌতূহলী শিশুর দল গল্প শুনতে বসে। রাজপুত্র, রাজকন্যা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী আর সাত সাগর আর তের নদীর পারের দেশে দেশে রূপকথার রাজ্যে তাঁদের অবাধ বিচরণ। সেই কবে থেকে এ-জিনিস চলে আসছে। মজার ব্যাপার যে, আজো তার কোন পরিবর্তন হয়নি। অনাবিল-হৃদয় শিশু এখনো একই রকমভাবে গল্প শুনতে ভালবাসে। শিশুর সেই আকাঙ্ক্ষায় এবার নতুন জোগান দিলেন বন্দনা গুপ্ত তাঁর 'রাজা উজীর পরীর দেশে' গল্পগ্রন্থে। পৃথিবীর নানা দেশের—যেমন, আন্দামান, নিকোবর, ফিলিপাইন, পারস্য, ইটালী, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিচিত্র উপকথা অবলম্বনে রচিত কয়েকটি গল্প ছোটদের তিনি উপহার দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি সুন্দর। সহজেই তা শিশুদের মন কাড়ে। চরিত্রগুলি তেমনি সুন্দরের সন্ধান দেয়। দেশের সীমা ছাড়িয়ে শিশুদের গল্প শোনানোয় শ্রীমতী গুপ্তের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

মন মহুয়া : দীপ্তিবিকাশ মজুমদার। প্রকাশিকা : ইরা মজুমদার, ১০, ইস-মাইল স্ট্রীট, কলকাতা-১৫, দাম : ৩-০০ টাকা।

লেখক বয়সে তরুণ। এটি সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। ছয়টি গল্পের সংকলন। সবকটি ভিন্ন মেজাজী বর্ণনায় এবং কাহিনী কল্পনায়। তাই সর্বত্রই নতুনের আস্বাদ। 'অপরিচিতা' আর 'মন মধুকর' গল্প দুটি বেশ টানে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

লোকসংস্কৃতি (দ্বিতীয় বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা) : সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : দুলাল চৌধুরী। অ্যাকাডেমি অফ ফোকলোর। ৩০২, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৩১। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লোকসংস্কৃতি চর্চায় আকাদমি অফ ফোকলোরের উদ্যম নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সমীক্ষা ও গবেষণা কাজ চালাতে গিয়ে, এরা বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করছেন। তারই সচিত্র বিবরণ নিয়ে প্রকাশিত হয় লোকসংস্কৃতি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যাটিতে চারটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন নির্মলকুমার বসু, কমলেশ দাশগুপ্ত, শিবেন্দু মান্না এবং তারাশিস মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃতিপ্রিয় বাঙালীমাত্রেরই পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য।

ক্রান্তি (৩য় বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা) : সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৮বি, কলেজ-রো। কলকাতা-৯। দাম দু টাকা।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি-বিষয়ক সিরিয়াস প্রবন্ধের পত্রিকা 'ক্রান্তি'। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচনাগুলি যথেষ্ট মূল্যবান এবং সময়োপযোগী। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হলে বহুজনে উপকৃত হবেন।

লোকে বলে—অবক্ষয়ের যুগ, ভেঙে পড়ার দিন,
কিন্তু সত্যিই কি তাই?
আমরা কি গড়েও তুলছি না?
অন্তত ক্লাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে
যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অন্য চেহারাই
দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো
ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা
করছি, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।
আমাদের নবযুগের যুবসমাজের সেই
অক্লান্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে তুলে
ধরা হবে এই বিভাগে।

রামমোহন লাইব্রেরী

যেতে আসতে রোজই দেখি বাড়িটা। উত্তর কলকাতার মানিকতলার কাছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও রামমোহন রায় রোডের মোড়ে রামমোহন লাইব্রেরীর হলদে রঙের বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত আভিজাত্যে, পরাধীন ভারতের বহু স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী হয়ে। সামান্য কয়েকজন শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বছরে এর জন্ম। মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করাই ছিল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। জনসাধারণ, পত্রিকা সম্পাদক ও সরকারের মিলিত দানে প্রথম বছরেই ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দেড় হাজারের কাছাকাছি। তখন গ্রন্থাগার ছিল ১০।১ অপার সারকুলার রোডের ভাড়াবাড়ীতে। পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। ১৯১৩ সালের শেষে এখনকার নিজস্ব ভবনটি কলকাতা কর্পোরেশনের দেওয়া একখণ্ড জমির ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রমুখ অনেকেই। এঁরা এই প্রতিষ্ঠানের শুধু সভাপতি অথবা সহ-সভাপতিই ছিলেন না, অর্থ দিয়ে গ্রন্থ দিয়ে অথবা অন্যভাবে সাহায্যও করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতা ও আন্তরিকতাও উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কিছু দিনের মধ্যেই এটি একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নবজাগরণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মনীষীদের অবদানে এই লাইব্রেরী হল ধন্য হয়েছে। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯১৭ সালে আত্মশাসন প্রবর্তন চেষ্টার ফলে বহু ভারতবাসী ও শ্রীমতী অ্যানিবেসান্ত বন্দী হলে টাউনহলে তার প্রতিবাদসভা করার অনুমতি মেলে নি। সেদিন ভারতআত্মার মুক্তির অগ্রদূত রামমোহনের নামাঙ্কিত এই পাঠাগার থেকেই উদাত্তকণ্ঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতিকে দিয়েছিলেন অভয়মন্ত্র। তিনি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি এখানেই প্রথম পাঠ করেন এবং 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি এই উপলক্ষে রচিত ও গীত হয়। পাঠাগার হলটি পরাধীন ভারতের মুক্তি-মণ্ডপ হিসেবে দেশবাসীর জ্ঞান ও কর্মসাধনাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

সুকিয়া স্ট্রীটের উল্টোদিকে অবস্থিত এই গ্রন্থাগারের একতলার পুরোটাই হল,—আজকাল গানবাজনা সভাসমিতি নাটক ইত্যাদির জন্যে ভাড়া দেওয়া হয়। দোতলা বলতে আছে শুধু থিয়েটার হলের মত ব্যালকনি বা বারান্দা এবং সেখানেই বসে পড়বার ব্যবস্থা আছে, আলমারির মধ্যে

রামমোহন লাইব্রেরী

রাখা আছে বই। যাঁরা এখানকার সভ্য নন, তাঁরাও এখানে বসে সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা অথবা রেফারেন্স বই পড়তে পারেন। অবৈতনিক পাঠভবনে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ জন এসে পড়াশোনা করেন। ইংরেজী-বাংলা মিলিয়ে এখানে রাখা হয় ৮টি দৈনিক, ২৪টি সাপ্তাহিক, ২০টি পাক্ষিক, ৫০টি মাসিক, বহু ত্রৈমাসিক পত্রিকা এবং বার্ষিক পূজা সংখ্যা। গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট সদস্য, আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য ও গ্রাহক সংখ্যার যোগফল প্রায় ৭৫০ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই সর্বাধিক। গ্রন্থাগার খোলা হয় দিনে দু'বার—সকাল ৭টা থেকে ৯টা এবং বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা। শনিবার বন্ধ থাকে। গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সহকারীর সংখ্যা বাদে এখানে কর্মচারীর সংখ্যা ৬জন এবং পালা করে তাঁরা সকালে বিকেলে কাজ করেন।

এই গ্রন্থাগারে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার গ্রন্থসংখ্যা ৩৩ হাজারের বেশি। তার মধ্যে বাংলা সাহিত্য বিভাগে বইয়ের সংখ্যা সব থেকে বেশি, প্রায় তিন হাজার। এছাড়া আছে রবীন্দ্র-বিভাগ। সেখানে সমগ্র রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র-বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় হাজারখানেক। শিশু বিভাগে বই আছে দু' হাজারের মত। সমকালীন ও অধুনালুপ্ত সাময়িকপত্রের সংখ্যা চার হাজারের কাছাকাছি। গবেষকদের কাছে এগুলি মূল্যবান সামগ্রী।

কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে আলোচনাচক্রের নিয়মিত অধিবেশন এখানে বসতো কিছুকাল আগেও। কিন্তু নানা কারণে আপাতত তা স্থগিত আছে।

পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। রামমোহনের যজ্ঞোপবীত ও কেশ, রামমোহনের লোকান্তরিত দেহ থেকে তোলা ছাঁচে বিদেশে নির্মিত আবক্ষ মূর্তি, তাকে উৎসর্গ করা ১৮১২ সালে ফিলিপাইনের সংবিধান এবং তাঁর লেখবার ঘূর্ণায়মান বিরাট গোলটেবিল।

গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশিবানন্দ মজুমদারকে প্রশ্ন করে জানলুম, এখানকার প্রধান সমস্যা স্থানের অসংকুলান। হল্ তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েই এই দোতলা বাড়ীটি গড়ে ওঠায় এই সমস্যা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তিন তলা তুলতে লক্ষাধিক টাকায় দরকার। আবার হল্ ভাড়া দেওয়া বন্ধ করলে লাইব্রেরী চালানো সম্ভব নয়, কারণ হল্ ভাড়া আর সদস্যের চাঁদাই এই গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাজ্য সরকার প্রচলিত নিয়মানুসারে গ্রন্থাগারিক ও তাঁর একজন সহকারীর মাইনে দিয়ে থাকেন মাত্র। কলকাতা কর্পোরেশন কর মকুব করার প্রস্তাব দিয়েও এখনো অনিয়মিত ভাবে মাঝে মাঝে ট্যাক্সবিল পাঠাচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণে এঁরা রেফারেন্স সেকশন সম্প্রসারিত করতে পারছেন না, পারছেন না কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে, পাঠকদের বসবার জায়গা দিতে; এবং কর্মচারীদের বেতন দিচ্ছেন নামমাত্র। এক কথায় বলা যায়, লাইব্রেরী চলছে ঠিকই, তবে সুষ্ঠুভাবে নয়,—সমস্যা একে জর্জরিত করেছে। এঁরা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থাবেদন করেছেন। অর্থ মঞ্জুর না হলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

প্লাটিনাম জুবিলীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রবীণ অবৈতনিক গ্রন্থাগার সম্পাদক দুঃখ করে বললেন, আরো একটা সমস্যা প্রকৃত উত্তরাধিকারের। এমন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না যিনি সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় পালন করতে ইচ্ছুক। বর্তমান যুগে মানুষ নিজেকে নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত এত বিব্রত যে জনশিক্ষা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করা হয়তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানকার পরিচালকমণ্ডলী নামী লোকের চেয়ে অভিজ্ঞ কর্মক্ষম লোকেরই পক্ষপাতী। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক।

বাংলাদেশের বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির মত রামমোহন লাইব্রেরীও অবহেলিত অনাদৃত সংস্থা। এর অন্যতম প্রধান কারণ—দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সমস্যা দিন দিন যেভাবে জটিলতর হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে তাল রেখে সে অনুপাতে সদস্য সংখ্যা বাড়ছে না। গ্রন্থাগারের সঙ্গে মানুষের জীবনের যে একটা নিবিড় যোগ আছে, সে কথা আমাদের পিতামাতা, সরকার কিংবা গ্রন্থাগার কর্মীরা শেখান না, শেখাবার চেষ্টাও করেন না। অথচ গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষা প্রসারের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম বলা হচ্ছে। এই গ্রন্থাগার ভবন উদ্বোধনের দিন তৎকালীন সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন—

"We shall not be honouring him (Rammohan Roy) truly unless we endeavour to realise his aspirations through the works of this Institution:

কিন্তু আজও কি তা শুধু 'কালো অক্ষরের শৃংখলে কাগজের কারাগারে' বাঁধা পড়ে নেই? গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি মানুষের জীবনে অপরিহার্য হয়েছে? হয়েছে সর্বব্যাপী?

—সুশান্তকুমার মিত্র

আপনি কেমন আছেন?
—উত্তর খুবই প্রাঞ্জল—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।'...কিন্তু প্রাণ রাখার চেষ্টায় যে ওষুধপত্র ডাক্তার না দেখিয়ে নিজেরাই কিনে ব্যবহার করি, আর খাদ্যের নামে যেসব অখাদ্য আমরা খাই, তাতেও কম প্রাণান্ত ঘটে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই অসুখবিসুখ, পুষ্টি ও পরিবেশের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবেন এই বিভাগে।

হার্ট অ্যাটাক অবধারিত নয়

অবাক হওয়ারই কথা। কি পুঁজিবাদী, কি সমাজবাদী—বৈষয়িক সম্পদে উন্নত পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে আজকাল সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন হার্টের ও রক্তনালীর অসুখে, এবং ক্যানসারে। এশিয়া ও আফ্রিকার পরিস্থিতি কিন্তু অন্যরকম। এখানে সংক্রামক রোগেই মৃত্যু হয় বেশি, সেগুলির প্রতিষেধ সহজ। শুধু জাপানের ছবি পাশ্চাত্যের অনুরূপ।

দুশ্চিন্তার কথা হল এই যে, আমাদের দেশেও ঐ দুটি মারাত্মক রোগের প্রকোপ বাড়ছে। বাড়ছে ক্যানসার, বাড়ছে করোনারী ব্যাধি। ক্যানসার দুরারোগ্য হলেও শুরুতে ধরা পড়লে এবং ঠিকমত ও সময় মত চিকিৎসা হলে নিরাময় সম্ভব। কিন্তু করোনারী অ্যাটাক এমন একটা রোগ যাতে কোন কোন ক্ষেত্রে চরম পরিণতি আসে এত আকস্মিক যে অনেক সময় চিকিৎসার সুযোগই পাওয়া যায় না। ক্যানসার দুরারোগ্য, ক্যানসারকে আমরা ভয় করি, শুরুতে ধরা না পড়লে ক্যানসারও মারাত্মক কিন্তু করোনারী যেন সাক্ষাৎ যম। অথচ এমন একটা ভয়াবহ রোগেরও প্রতিরোধ করা যায়।

কোথাও কিছু নেই, ভাল মানুষ, খাচ্ছে দাচ্ছে, অফিস-কাছারি যাচ্ছে, হঠাৎ বুকে একটা অসহ্য ব্যথা, মুখ নীল, কপালে ঘাম, হয়ত কথা বলার আগেই অচেতন। কখনো কখনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বা ডাক্তার আসার আগেই সব শেষ। কেউ বলেন করোনারী অ্যাটাক, কেউ বলেন হার্ট অ্যাটাক। অবশ্য এটা হল চরম অবস্থা। করোনারী অ্যাটাকের পরও বহু লোক বহাল তবিয়তে আছেন। অর্থাৎ আক্রমণটা হতে পারে মৃদু ধরনের—সময় মত চিকিৎসা হলে, রোগী ধীরে ধীরে সেরে ওঠেন, আবার কাজকর্ম করেন।

যে যে নামেই ডাকুন, ব্যথা কম হোক কিংবা বেশি হোক, ব্যাপারটা হার্টের বা হৃদপিণ্ডেরই। মিনিটে ৬০-৭২ বার নিজের কক্ষ থেকে রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে অসংখ্য ধমনী ও ধমনিকার মধ্য দিয়ে। সেই রক্ত জোগাচ্ছে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি। আবার হৃদপিণ্ডের নিজের গায়েও কেশ কিছু ধমনী আছে যাদের নাম করোনারী ধমনী। এরাই হৃদপিণ্ডকে পুষ্টি দেয়। তবেই সে অবিরাম কাজ করতে পারে আমাদের জীবন ভোর, একবার সঙ্কুচিত একবার শিথিল হয়ে রক্ত বা পুষ্টির এবং অক্সিজেনের জোগান দিতে পারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের দেহের সর্বত্র।

কখনো কখনো হৃদপিণ্ডের নিজ দেহের এই করোনারী ধমনীগুলি নিজেরাই অস্বাভাবিক ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। খুব সূক্ষ্ম, সুতোর চেয়েও সরু স্থিতিস্থাপক রবারের নলের মত এই ধমনী ও ধমনিকাগুলির ফুটোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তস্রোত। কোন কারণে ধমনীগুলির স্থিতিস্থাপকতা হয়ত নষ্ট হয়ে গেল অথবা ওদের ভিতরের দেয়ালে পলি পড়ে পুরু হয়ে, ফুটো বুজে এলো। তখন রক্ত চলাচল ব্যাহত হবে, স্তিমিত হবে। এই অবস্থাকে বলা হয় অ্যাথিরোসক্লোরোসিস। বিপদের সূত্রপাত এইভাবেই। রক্তস্রোত যখন ক্ষীণ হয়ে গিয়েও ধিকিধিকি চলতে থাকে, বুকে চিনচিনে ব্যথা হয়—যে ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে বাহুতে, কাঁধে বা পিঠে। সেই অবস্থাকে বলা হয় ইসকিমিয়া। আর যখন হৃদপিণ্ডের কোন অংশের ধমনীতে শোণিত ধারা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়ে পুষ্টি ব্যাহত হয়, তাকে বলা হয় করোনারী থ্রম্বোসিস। তখন পুষ্টি সরবরাহহীন হার্টের সেই অংশে পচন ধরে, ব্যথাও হয় প্রচণ্ড। তখন বলা হয় ইনফার্কসন। তা থেকেই দেখা দেয় হার্ট অ্যাটাক বা করোনারী অ্যাটাকের যত কিছু দুর্লক্ষণ।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অত্যধিক ধূমপান ও মদ্যপান, কায়িক শ্রম-বিমুখতা, অতিভোজন—বিশেষ করে চর্বি জাতীয় খাদ্য প্রাচুর্য, মেদ ও রক্তচাপ বৃদ্ধি, অতি-ব্যস্ত অথবা নিরন্তর উদ্বেগজনক জীবনযাত্রা, অতিশ্রম ও অবসাদ ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী করোনারী ব্যাধির উৎস। পৃথিবীর নানান দেশের সংকলিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব অভ্যাস ও অবস্থা যত বেশি আমাদের ঘাড়ে চেপে বসছে, হার্ট অ্যাটাকের প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুপাতে। একথা মনে করার কারণ নেই যে, করোনারী ব্যাধি শুধু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সের বিপদ। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে, ২৪ থেকে ৫৪ এবং ৫৫ থেকে ৭৪ বছর বয়স যাদের, উভয় ক্ষেত্রেই হার্ট অ্যাটাকের প্রকোপ প্রায় সমান সমান অথবা সামান্য একটু কম-বেশি। বিজ্ঞানী মহল বলছেন, করোনারী ব্যাধির প্ররোচক বিভিন্ন কু-অভ্যাসের বীজ বপন হয় কৈশোর থেকেই। বাপ-মার অবহেলা, শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, অন্ধকারময় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বয়স্কদের উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী জীবনযাত্রা কিশোর জীবনকে এমন অস্বাভাবিক আবেগপ্রবণ ও বেপরোয়া করে তোলে যার পরিণতি পরবর্তী জীবনে দেখা দেয় নানা কুঅভ্যাস ও হার্ট অ্যাটাকের মাধ্যমে। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতির মধ্যেই নিহিত আছে করোনারীর বীজ এবং প্রতিবেধও খুঁজতে হবে সেই সব অসঙ্গতির সমাধান করে। কাজটা জটিল এবং কঠিন হলেও মানুষের অসাধ্য নয়।

এ তো গেল রোগের উৎপত্তি নিদান ও প্রতিষেধের কথা। কিন্তু করোনারী অ্যাটাক হলেই মৃত্যু অবধারিত এমন কথা ভাবার কারণ নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞান এতটা অক্ষমও নয়। হার্ট অ্যাটাকের আকস্মিক বেদনাদায়ক পরিণতি নিবারণ করতে হলে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে আকস্মিকতার অনুপাতে 'অতি জরুরী' ভিত্তিতে—যাতে তড়িৎ গতিতে সর্বাধুনিক সরঞ্জাম সহ চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া হয় রোগীর বাড়িতে, অথবা অবস্থা অনুকূল হলে হাসপাতালের ইনটেনসিভ করোনারী কেয়ার ইউনিটে। আমাদের এই যুগে বিজ্ঞান ও টেকনোলজীর যা উন্নতি হয়েছে তাতে এ ধরনের আয়োজন নিশ্চয়ই সম্ভব। অনেক দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ করোনারী অ্যাটাক যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি দুর্ভাগ্যক্রমে অ্যাটাক যদি হয়ই, যমের সঙ্গে পাঞ্জা লড়াও যায়।

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই,
কিন্তু মন?
মনের অসুখও তো সমানই অক্ষম করে
দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীব্র
তীক্ষ্ন জটিলতার যুগে, অভিজ্ঞ
চিকিৎসক 'মনের খবরে' সেই সব মনোব্যাধি
ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা
করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

কামশক্তি (লিবিডো)

ফ্রয়েডের মতবাদের মধ্যে মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী এবং তীব্রতম প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তাঁর কামশক্তি তত্ত্ব বা লিবিডো তত্ত্বের বিরুদ্ধে। বিগত ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপের ধর্মযাজক, নীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও বহু বৈজ্ঞানিক এই কামশক্তিবাদের বিরুদ্ধে অতি প্রখর মন্তব্য প্রকাশ করে ফ্রয়েডকে কার্যত প্রায় একঘরে করে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন। কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক কিন্তু সামাজিক সব বাধা আপত্তি অস্বীকার করে এই তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে যাচাই করে দেখতে উৎসাহিত হন এবং পরে নিজেদের মনঃসমীক্ষায় এবং মানসিক রোগীদের মনঃসমীক্ষা করে তাঁরা ফ্রয়েডের মতবাদকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নিয়ে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে দু-একজন পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের মতের সবটুকু মানতে না পেরে সরে গিয়ে ফ্রয়েডের মত একটু বদলে নিয়ে আরেক মতবাদ প্রচার করেছেন। যদিও বিরোধের তীব্রতা ক্রমে অনেক কমে এসেছে তবু এই কামশক্তিবাদের বিরুদ্ধে আজও বহু আপত্তি শোনা যায়। এই বিংশ শতকে ধর্মীয় গোঁড়ামি অনেকটা কমে এসেছে বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য আপত্তি কম-বেশী অনেক দেশে আজও আছে। সবচেয়ে অবাক লাগে যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত এমন কি দর্শনশাস্ত্রচর্চাকারীরা পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় মতবাদের সম্বন্ধে এই কামশক্তি বন্ধ থাকার দরুণ একে বর্জনীয় বলেন এবং মনঃসমীক্ষাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখেন। এ সম্বন্ধে পরে দু-চার কথা বলব। তার আগে এই কামশক্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলে নিই।

ফ্রয়েড মনে করেন, আমাদের মন যে মানসিক শক্তির প্রভাবে কাজ করে (এই মানসিক শক্তি অন্য বিদ্যুৎ ইত্যাদি বস্তু শক্তি থেকে পৃথক) তার একটা বড় অংশ কামবৃত্তির দিকে চালনা করে আর বাকি অংশ যা থাকে তা আমাদের অন্য নানা অকামজ ইচ্ছার পূরণে ব্যয়িত হয়। এই মতবাদানুসারে শিশুকাল থেকে এই কামশক্তি মানবজীবনে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে ক্রমে পরিণত যৌবনে তার পূর্ণতা পায়। কাম বলিতে অনেকেই একমাত্র লৈঙ্গিক যৌনক্রিয়াকেই বোঝেন। কিন্তু এই ফ্রয়েডীয় মতবাদে কাম বলতে কেবল লৈঙ্গিক যৌনক্রিয়াকেই বোঝায় না। তিনি বলেন সদ্যজাত শিশুর লৈঙ্গিক কাম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে পারে না—কিন্তু তারও এক বিশেষ রকমের ভোগ তৃপ্তির স্তর আছে যাকে স্বতঃকাম (অটো-এরোটিসিজম) নাম দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় শিশু কেবল মাত্র আরাম বা বে-আরামের স্তরে বাস করে। কোথা থেকে কেমন করে সে সুখ বা আরাম হচ্ছে বা আরামের বিঘ্ন ঘটছে তা সে বুঝতে পারে না। বলা চলে তখন শিশু সামান্যভাবে আরামে থাকবার অনুভূতিই পায়। যখন সে আরাম পায় না তখন তার নানা রকম দেহভঙ্গী বা কান্নাতে তা প্রকাশ পায়। আবার অসুবিধা দূর হয়ে গেলেই সুখে ঘুমোয়। আরও একটু বয়স বাড়লে তখন তার নিজের শরীরের বিভিন্ন সুখ কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে একটু একটু করে সচেতনতা আসে। হাত, পা, মুখ ইত্যাদির নাম না জানলেও কোন অংশ থেকে সুখ পাচ্ছে তা ক্রমে বুঝতে পারে। আর যে অঙ্গ থেকে তার সুখ আসে সেই অঙ্গ সম্বন্ধে ক্রমে বেশী করে সচেতন হয়, তা থেকে বারে বারে সুখ পেতে চায়। কামশক্তি ভোগের এই স্তরকে স্বকাম বা স্বকামজ (নারসিসিজম) নাম দেওয়া হয়েছে। এই স্তরের কামশক্তি শিশুর নিজের দেহকেই কেন্দ্র করে সুখের সন্ধান করে ও সুখ পায়। গ্রীক পুরাণের নার্সিসাস জলে নিজের ছায়া দেখে যেমন তার প্রতি আকৃষ্ট হন—শিশুও নিজের দেহের অঙ্গ থেকে সুখ পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় বলে ঐ পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে মিল দেখে ফ্রয়েড মনের ঐ স্তরকে স্বকাম নাম দিয়েছেন। এই দুই প্রাথমিক স্তরের পরেই এক বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। এখন সেই স্তরের কথা সংক্ষেপে বলি।

স্বতঃকাম ও স্বকাম এই দুই স্তরেই শিশু তার নিজেকে কেন্দ্র করেই সুখ পায়। তারপরেই মন যেন আর নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বয়স যত বাড়ে বাইরের জগতের নানা শব্দ, স্পর্শ জিনিষ, অবস্থা ব্যক্তি প্রভৃতি থেকে যে উদ্দীপনা (স্টিমুলাস) এসে শিশুকে বারে বারে সেদিকে আকৃষ্ট করে; তার ফলে তার মন বাইরের অর্থাৎ নিজ ভিন্ন অপর বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এই স্তরের কামশক্তির নাম দেওয়া হয়েছে অপরকাম (অ্যালো এরোটিসিজম)। এখানে অপর বলতে নিজ ছাড়া অন্য যা কিছু বা যে কাউকে বোঝায়! এই যে শিশুর মন ধীরে ধীরে নিজের গণ্ডির বাইরে আসে তার ফলেই তার পক্ষে ক্রমে বেড়ে ওঠা মনের দিক থেকে, সম্ভব হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় হবার সূচনা হয়। শিশুর মন যদি তার সেই প্রাথমিক স্বতঃকাম বা স্বকামের স্তরেই পড়ে থাকতো তাহলে বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় হওয়া সম্ভব হতো না। নিজেকে নিয়ে যে ডুবে থাকে তার পক্ষে অপরকে দেখবার জানবার সুযোগ থাকে না। এমন কয়েকটি মানসিক রোগ আছে যেগুলির সূচনা ও লক্ষণ এই প্রাথমিক স্তর থেকেই ওঠে। অপরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ তেমন থাকে না। সাধারণের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা প্রতিদিন বহুবার নিজের মুখ আয়নায় দেখে থাকেন। নানারকম করে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে থাকেন। বাইরে কোথাও বেরুতে হলে শাড়ী-জামা গয়না পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে থাকেন। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। মুখের যত্নের নানা প্রক্রিয়া শেষ হতে তাঁদের বহু সময় কেটে যায়। যাঁদের একটু বাড়াবাড়ির দিকে যায় তাঁরা বিকেলে সিনেমা যেতে হলে বা কোথাও বেড়াতে যেতে বা নেমন্তন্ন যেতে হলে কয়দিন আগে থেকে কি শাড়ী-জামা-গয়না পরে যাবেন তার চিন্তায় অস্বস্তিতে থাকেন। বাড়াবাড়ির এই অবস্থাটাও রোগ লক্ষণ। একে সুস্থ অবস্থা বলে মনে করা ভুল। পরে রোগ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আরও বিস্তারিতভাবে বলব, তাই এখন অন্য কথা বলি।

অপরকামের কথা বলছিলাম, ফিরে আসি সেই কথাতেই। বলছিলাম নিজের বাইরে বেরুতে না-পারলে মন বাড়তে পারে না—তার স্বাভাবিক পরিণতি হওয়ার তখন সম্ভব হবে না। মন বাইরের দিকে না চলতে পারলে তার বাইরের জগতের অভিজ্ঞতা হবে না। কোনটা কি, আর কি তার স্বভাব প্রকৃতি গুণাগুণ তা কিছুই সে জানতে পারবে না। ফলে তার দুঃখ, দুর্দশা ও জীবননাশ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। আমাদের বাঁচতে হলেও তো বাস্তব জ্ঞান থাকা চাই। সাধক যত আবেগ ভরেই বলুন না কেন—'মা আমায় দয়া করে শিশুর মত করে রেখো' বাস্তবে যদি মা তাই করে রাখেন তবে আমাদের অবস্থা যে কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরাধীনতায় আমরা অপরের ছায়াতলে বাস করে যে অবস্থায় এসেছিলাম, এখনও বহুলাংশে যে অবস্থায় আছি, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি আক্ষেপ করে বলেছেন—'রেখেছো সন্তান করে মানুষ করনি।' এই মানুষ না-হতে পারার বিপত্তি অনেক—আমরা তো তা নানাভাবেই নিজেদের জীবনে দেখছি।

অপরকামের কথা বলতে গেলে প্রশ্ন জাগে শিশুর এই নিজের সীমা থেকে অপরের দিকে গমন ইচ্ছা কিভাবে, কেমন করে হয়। জন্মের পরেই শিশু বিশেষভাবে মা বা তৎস্থানীয়া কারও উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে বাস করতে বাধ্য হয়, নিজের তখনকার অক্ষমতার জন্যই। ততদিনই সে প্রথমে স্বতঃকাম ও স্বকামে ডুবে থাকে, যতদিন না বাইরের সম্বন্ধে তার কিছু জ্ঞান হয়।

তখনকার তার সুখ প্রধানত নির্ভর করে সময়মত খাবার পাওয়া ও প্রয়োজনমত মলমূত্র ত্যাগ করার উপর। অবশ্য তার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম ভোগ করবার পরিবেশ তার নিশ্চয়ই দরকার। এই সবের দিকেই নজর রাখেন মা বা তৎস্থানীয়া অন্য কেউ। সহজে বুঝবার জন্যে মাতৃস্থানীয়াকেও মা বলেই উল্লেখ করে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের সুখবোধ জাগাতে সাহায্য করে। বাইরের দুনিয়া থেকে কিছু আহরণ করতে হলে নিজের কোনও সাধ মেটাতে হলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য দরকার হয়। শিশুর মুখ দিয়ে খাবার নেবার সময় তার মুখে যে স্পর্শ ও স্বাদবোধ জাগে তা থেকে সুখ সে পায়। খাদ্যবস্তু থেকে ক্রমে সুখের এই সম্বন্ধে মুখের মাধ্যমে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনেক সময় এই মুখের সুখের জন্যই শিশু চুষিকাঠি মুখে রেখে, দুধ না পেয়েও, আরামে ঘুমোতে পারে, শান্তিতে থাকতে পারে। আমাদেরও মুখের আরামের জন্যে অনেক কিছু আয়োজন করতে হয়। খাবারের স্বাদ নিয়ে তাই এত চেষ্টা। শরীর রক্ষার জন্যেই খাদ্যের প্রধান প্রয়োজন। কিন্তু তাকে সুস্বাদু না করতে পারলে খাদ্য আমাদের রোচে না। মুখের সুখ আমাদের একটা বড় সুখ। বলে রাখা ভাল যে সুখ বা দুঃখ আমাদের যতকিছু অনুভূতি, আবেগ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সবই মনের ক্রিয়া। যাকে মুখের সুখ বলা হল আসলে তাও মনেরই সুখানুভূতি। সে সুখের অনুভূতি মুখের মাধ্যমে আমাদের মনে এসে পৌঁছয় বলেই আমরা সহজে তাকে মুখের সুখ বলি। মুখের নিজস্ব কোনও সুখবোধ করার শক্তি নেই। আমাদের অন্য সব সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতির সম্বন্ধেও এই একই কথা মনে রাখতে হবে। এই সুখের দিকে নজর পড়ে পূর্ববর্ণিত স্বকামের স্তরে। পরে ক্রমে যে বস্তু থেকে মুখের সুখ হয় তার দিকেও শিশুর নজর পড়ে। মায়ের স্তনের দিকেও এই কারণেই শিশু আকৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে যার স্তন শিশুকে দুধ দেয় সেই মাকেও তার ভাল লাগে তাকে সে চায়। মাকে শিশু চায় আরও অনেক রকমের সুখ সে তার কাছ থেকে পায় বলে। একজনের কাছে অনেক রকমের সুখ পায় বলে সেই একজনের দিকে তার টান প্রবল হয়ে থাকে। তখন প্রায় সব সুখের আশাই তার মাকে ঘিরে রচিত হতে থাকে। মাকে দিয়েই তার সব দাবী মেটাতে চায়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আরও পরিচয়ের পরিধি বেড়ে যায়। বাইরের দিকে যতই তার মন চলতে সুরু করে ততই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সে লাভ করতে থাকে। আর তাতেই তার মনের পুষ্টি হতে থাকে। মনের এই অপরকামের স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে প্রাক ইদিপস স্তর (প্রি-ইডিপাস স্টেজ)। মায়ের কাছেই তার বড় দাবী, বড় আশ্রয়, ভরসা—এই বোধ গড়ে ওঠে। মাকে একান্ত নিজের মনে করে তাকে আঁকড়ে ধরে। আর কেউ তার মায়ের কাছে ঘেঁষবে তার উপর দখল বিস্তার করবে তা শিশু কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। রাগ, কান্না, জেদ ইত্যাদি নানা প্রকারে সে তার মনের তীব্র আপত্তি জানায়। যে কেউ তার মায়ের উপর ভাগ বসাতে চায় তাকে শিশু শত্রু বলে মনে করতে থাকে। এই কারণেই একসময় পিতা বা তাঁর অবর্তমানে তৎস্থানীয় কেউ যখন মায়ের উপর অধিকার বা প্রভাব বিস্তার করতে থাকে শিশু তাকে শত্রু মনে করে তীব্র বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়। মায়ের প্রতি টান আর পিতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনের অবস্থাকে ফ্রয়েডীয় মতে মনের 'ইডিপস স্তর (ইডিপাস) বলা হয়। এই ইডিপাসের নামকরণ গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই কাহিনীতে শিশু অবস্থায় নির্বাসিত রাজপুত্র ইডিপাস মেষপালকদের মধ্যে বাস করে বড় হয়, দল গঠন করে যুদ্ধে রাজাকে হত্যা করে এবং দেশের প্রথানুসারে রাণীকে বিয়ে করে। না জেনে ইডিপাস তার বাপকে মেরে মাকে বিয়ে করেছিল। মনঃসমীক্ষা করতে গিয়ে মানুষের নির্জ্ঞান মনে এই ইচ্ছা দেখতে পেয়ে ফ্রয়েড একে ইডিপস ইচ্ছা নাম দিয়েছেন। এই মতবাদ নিয়ে সভ্যসমাজে একসময় প্রবল ঝড় বয়ে যায়। আজকাল যদিও তা অনেক পরিমাণে শান্ত হয়েছে। নাটকে, গল্পে, কবিতায় এই ইডিপস ইচ্ছার নানা সার্থক ও বিকৃত বিবরণ প্রচারিত হচ্ছে। তবু দেখা যায় বেশীর ভাগ মানুষ যেন আজও এই ইডিপস ইচ্ছার অস্তিত্ব মানতে চান না, যেমন মানতে চান না মন আর শিশুর সম্বন্ধের মধ্যে কোনও কামের অস্তিত্ব। এ নিয়ে বিরোধ চলছেই। বাইরে যাঁরা মেনে নেন মনঃসমীক্ষণের তাঁদের কাছ থেকে এর বিরুদ্ধে অনেক আপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। এটা যদি বৈজ্ঞানিক সত্য হয় তবে হাজার আপত্তিতেও তা মিথ্যা হয়ে যাবে না।

মন চলতে থাকে। আরো আরো আরোর দিকে তার চাহিদা বেড়ে যায়। এগিয়ে যেতে যেতে বাধা আসে, থমকে দাঁড়ায়, আবার একটা কিছু মীমাংসা করে মন আবার এগিয়ে যায়। তার পাবার সাধের তো অন্ত নেই। একসময় মাকে ঘিরে তার সব আশা আর পূর্ণ হতে পারে না। পিতার বা পরিবারের অপরের শাসনের ভয়ে তার আর তেমন করে মায়ের শরীর আঁকড়ে থাকা সম্ভব হয় না। বাইরের বাধা নিষেধ অমান্য করতে গেলে ভয় হয়। ধীরে ধীরে ইডিপস ইচ্ছার জন্য একরকমের পাপবোধ জাগে। শিশু তখন অনেকাংশে মাকে ছেড়ে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় কাটায়। তাতেই তার বেশী আনন্দ হয়। অবশ্য মাকে সে একেবারে ছেড়ে দেয় না। মায়ের প্রতি ভোগ-লিপ্সা তখন তার অবদমিত হয়ে যায়। শিশুকালে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান থাকে না। তখনকার সেই অপরকামকে সমকামী (হোমো-সেক্সুয়াল) বলা হয়। পরে যখন মায়ের কাছ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় তখন শিশু এই সমকামী অর্থাৎ ছেলে ছেলেদের প্রতি আর মেয়ে মেয়েদের প্রতি বেশী আকর্ষণ দেখায়। তখন ইডিপস মনোভাব বহু পরিমাণে নির্জ্ঞানে চাপা পড়ে যায়। বলা হয়, পাঁচ-ছয় বছর থেকে শিশু নিজের কামবোধকে চেপে অন্য সামাজিক ধরনের খেলাধুলো ও চলাফেরার দিকে মন দেয়। এই সময় থেকে কৈশোরের প্রায় শেষকাল পর্যন্ত মানসিক স্তরকে 'অনুপক্রম কাল' (ল্যাটেন্সি পিরিয়ড) বলা হয়। এই স্তরের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শিশুর নিজ লিঙ্গ থেকে মূত্রত্যাগের সময় বা অন্য প্রকারে ঘর্ষণ থেকে যে সুখ পায় তাকে

যৌবনের পরের যৌনসুখ থেকে পৃথক করে দেখা যায়। ঐ অনুপক্রম কালকে কেবল অবদমনের কাল বলে মনে করলে ভুল হবে। আসলে এই কালে পরবর্তী আসন্ন যৌবনের সব রকমের প্রস্তুতি অবিরাম চলতে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মন যা লাভ করেছে তাই নিয়ে বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে, নতুন নানা জ্ঞান আহরণ করে মন সবল হয়ে উঠতে থাকে। শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ইচ্ছারও বদল হতে থাকে। তারপরে একসময় যৌবনের ফাগুনী বাতাস তাকে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল করে তোলে। ততদিনে শিশুর শিশুত্ব অনেক পরিমাণে দূর হয়ে গিয়ে সে যুবক হয়ে ওঠে। যৌবনে মানুষের সব বৃত্তিগুলিই আবার পরিপূর্ণ তেজে দেখা দেয়, কিন্তু তখন তারা অনেক বেশী পুষ্ট অনেক বাস্তব জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞ অহংয়ের শাসনে এসেছে। তাই বৃত্তির তেজী ঘোড়াগুলোকে সে নিজের আয়ত্বে রেখে প্রবল শক্তি নিয়ে জীবনের স্ফুরণের দিকে এগিয়ে চলে। প্রথম থেকে পূর্ণ যৌবনাবস্থার পরিণতিতে পৌঁছুতে কামবৃদ্ধির যে (লিবিডো ডেভেলপমেণ্ট) বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে মন গড়ে ওঠে তার কোনো পূর্বস্তরে যদি মন বাধা পেয়ে, ভয়ে বা বিশেষ অকার্ষণে আটকা পড়ে যায় তবে যৌবনে তার প্রকৃত সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করা সম্ভব হয় না। পূর্ব পূর্ব স্তরে মনের গঠন যদি স্বাভাবিক সুস্থ না হয় তবে পরবর্তীকালে মনের ঐ দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে নানা মানসিক রোগ দেখা দেয়। বর্ণিত মনের এক এক স্তরের সঙ্গে এক এক শ্রেণীর মানসিক রোগ যুক্ত থাকে।

কামশক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আরও অনেক বিষয় বলবার আছে। ঠিকমত বিষয়টি জানতে হলে আরও অনেক আলোচনা দরকার। কিন্তু তাতে জটিলতা বাড়বে। প্রাথমিক অবস্থায় সে জটিলতা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যেভাবে আমরা মনকে জানতে বুঝতে অভ্যস্ত তা থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। ফলে ইতিমধ্যেই অনেক জটিলতা, অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় জমাবে। এখনই তা বাড়িয়ে তুললে আলোচনা থমকে দাঁড়াবে। যাঁরা আরও বেশী জানতে চান তাঁরা ফ্রয়েডের মূল বইয়ের ইংরাজী সংস্করণ পড়লে অনেক কথাই জানতে পারবেন। তাছাড়া ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ভাষার ত্রৈমাসিক 'চিত্ত' পত্রিকা নিয়মিত পড়লেও অনেক বিষয় জানতে পারবেন। সব পড়েও, শুনেও দেখেছি, নিজের মনঃসমীক্ষণ না থাকলে মনঃসমীক্ষণবাদের তথ্য ও তত্ত্বগুলির ওপর ঠিক ঠিক প্রত্যয় বা আস্থা জন্মায় না। নিজের জীবনের গভীর অনুভূতির সঙ্গে নির্জ্ঞানের থেকে তুলে আনা সত্যকে মিলিয়ে না দেখলে অনেক বিষয়ই বিশ্বাস হতে চায় না। নানা অসামাজিক ইচ্ছাগুলিকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারা যায় না আর এই না পারাটাই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসারে স্বাভাবিক। যা গভীর অনুভূতিতে সত্য, কেবলমাত্র সাধারণ অনুভূতি বা বুদ্ধি দিয়ে তা বিচার করা চলে না। সেই জন্যেই অনেক বুদ্ধিবাদীদের মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে নানা ভুল বোঝা উক্তি, নানা মতামত তাঁদের লেখায় বলায় পাওয়া যায়, যা বাস্তব তথ্যের অজ্ঞতা প্রকাশক।

এই আলোচনায় কামশক্তির যে বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে তা ছেলে শিশুরে কথা মনে রেখেই বলা হয়েছে। মেয়ে শিশুদের বেলায় ইডিপস স্তরে তারা পিতাকে ভালবাসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কি ছেলে কি মেয়ে সকলেই অপরকামের স্তরে প্রথম অবস্থায় মাকেই আশ্রয় করে, তাঁকেই ভালবাসে, তাঁকেই আঁকড়ে থাকতে চায়। ছেলেদের বেলায় সেই আকর্ষণের পরের ভাগেই ইডিপসের স্তর দেখা দেয়। মেয়েদের বেলায় তাদের আকর্ষণ মা থেকে বাপের প্রতি মোড় ফেরাব কারণ সম্বন্ধে আলোচনার জটিলতা এখানে বাদ দেওয়া হল। কেবল এইটুকু বলা দরকার যে মেয়েদের প্রথম থেকে যে মাকে আশ্রয় করে চলা সুরু হয় একসময় তাতে ধাক্কা লাগার ফলে মেয়েদের মানসচরিত্রে একটা আঘাত থেকে যায়। ফ্রয়েডের মতে এই আঘাতের ফলে মেয়েদের প্রক্ষোভজীবনে (ইমোশনাল লাইফ) কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সেই জন্যই মেয়েদের মধ্যে হিস্টিরিয়া অথবা অন্য উদ্বায়ু রোগ (নিউরোসিস) বেশী দেখা দেয়। ইডিপস স্তরের আগের ও পরের স্তরগুলি একই রকমে দেখা দেয়। সামাজিক ও বাস্তবের নানা কারণে মেয়েদের বাপের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মায়ের প্রতি বিদ্বেষটা অনেক পরিমাণে চাপা পড়ে যায়। আবার তারা মাকে আশ্রয় করেই আদর আবদার মেটায়। ছেলেরাও বাপের প্রতি বিদ্বেষকে অবদমন করে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তখন মেয়েদের মায়ের প্রতি, ছেলেদের বাপের প্রতি আক্রোশ প্রকট হয়ে ওঠে। এর ফলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়, এবং কখনো বা মানসিক রোগও দেখা দেয়।

কামশক্তির সব স্তরগুলিই সুস্থ মানসিকতার সহায়ক। কিন্তু মাত্রাধিক্য হলে তা থেকে বিকার দেখা দেয়। যেভাবে স্তরগুলিকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে বাস্তব জীবনে সেগুলি কোনো সুস্পষ্ট রেখায় বিভক্ত বলে দেখতে পাওয়া যায় না। কোনো এক স্তরে তার পরের স্তরের ও আগের স্তরের নানা প্রকাশ কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। যে স্তরে যে লক্ষণগুলি প্রবলতর থাকে সেই অনুসারে সেই স্তরের নামকরণ করা হয়েছে মাত্র। এক স্তর শেষ হলে আরেক স্তরের আরম্ভ হয় এমন মনে করা ভুল। আর একটা জানবার কথা এই যে পরের যে কোনো স্তরে আগেকার পেরিয়ে আসা স্তরের কিছু কিছু লক্ষণ সারা জীবন আমাদের মধ্যে থেকে যায়। অর্থাৎ পূর্ণ যৌবনাবস্থায় পৌঁছানর পরেও বাকি সারা জীবন ধরে শিশুর স্বতঃকাম থেকে আরম্ভ করে আর সব স্তরের কামশক্তি আমাদের মধ্যে থেকে যায়। এই রকম থাকাটাই স্বাভাবিক। কোন স্তরটি কার জীবনে কত বয়সে দেখা দেবে তা সঠিক বলা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে বলা হয়ে থাকে যে শিশুর ভবিষ্যত প্রকৃতি তার পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই গঠিত হয়। এই বয়সের মধ্যে প্রকৃতির যে বীজ রোপিত হল পরের জীবনে তারই গাছ ডালপালা মেলে ফুলে ফলে প্রকাশিত হয়। গোড়ায় গলদ থাকলে পরে তা বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

ফ্রয়েড যে অর্থে কামশক্তি বা কাম কথাটার ব্যবহার করেছেন তার ব্যাপ্তি অনেক। আগেই বলেছি, কাম বলতে ফ্রয়েড কেবল লৈঙ্গিক কাম বোঝাতে চাননি। তিনি শিশুর মায়ের বুকের দুধ খাওয়া, চুষিকাঠি চোষা থেকে আরম্ভ করে যে ইচ্ছা বা কাজে ভোগ আছে সেখানেই কাম আছে বলে মনে করেন। এই কথাটা ভুল করেই অনেকেই মনঃসমীক্ষণের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। ফ্রয়েডবাদকে অনেকে লৈঙ্গিক কামবাদ মনে করেন। অনেক নামকরা শিক্ষক, দার্শনিক প্রমুখের সঙ্গে আলাপ করেও এই ভুলের পরিচয় পেয়েছি। একটু বিচার করে দেখলেই দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষে যেখানে লিঙ্গপূজা প্রচলিত (অন্য বহু আচারের কথা বাদই দিলাম) সেখানে ফ্রয়েডের বহু আগে থেকে শব্দেরও লিঙ্গ বিচার করা হয়েছে, দর্শনে যেখানে কাম শব্দ থেকে নিষ্পন্ন কামনা ও তার সমপর্যায়ের শব্দ বাসনা থেকে (কামনা বাসনা থেকে) আমাদের ক্রোধ মোহ ইত্যাদির সূচনা এবং কামনা বাসনা আমাদের সব কাজে জড়িয়ে থাকে স্বীকার করা হয়েছে। আর সাধারণ জীবনে কামনা বাসনাই আমাদের সব কাজে, চিন্তায় আমাদের চালনা করে বলা হয়। অথচ এদেশেই শিক্ষিত ও বিশেষত পণ্ডিত সমাজ ফ্রয়েডবাদকে, কামসূত্র পড়ার পরেও, কামদুষ্ট বলেন। এদেশের চিন্তাশীলগণ, দার্শনিকগণ কামকে যেভাবে পরিব্যাপ্তি দিয়েছেন, যে দেশে পঞ্চশরকে দগ্ধ করে বিশ্বময় তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেদেশে সেই কামবাদের তুলনায় ফ্রয়েডের কামশক্তিবাদের গণ্ডি সীমিতই বলা চলে। সর্বশেষে মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েড তাঁর এই মতবাদে মানসিক কামশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, শারীরিক কামশক্তি সম্বন্ধে নয়। কাম ইচ্ছার মধ্যে যে মানসিক শক্তি কাজ করে সেই সম্বন্ধেই বলা হয়েছে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

দিনকাল কেমন চলছে,
তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি।
কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব
আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আঁতের
খবর মেলে ধরা হবে এই
বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু
সচেতন হতে পারি।

কালো হীরের কথা—১

দিনকালের হিসেব লিখতে গিয়ে সেই দিনের কথাটাই মনে পড়ছিল। সেইদিনের কথা মানে এক বছর তিন মাস আগের কথা। সেই নাটকের দুই অংক, চরিত্রবিন্যাস এবং ঘটনাবলীর গতিতে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। কোনো পঠিত রহস্য উপন্যাসের মত সবই যেন জানা। সেই জন্যে মঞ্চের পর্দা সরে যাওয়ার পরই কৌতূহলও উবে গিয়েছিল।

সেই অতীত দিনের বা প্রথম অংকের বর্ণনাই এই সংখ্যায় করব।

কালো হীরেঃ

ভূতত্ত্বে নাকি বলে কয়লা আরও প্রস্তরীভূত হয়ে হীরেতে পরিণত হয়। এই জন্যেই কয়লার আর এক নাম কালো হীরে—ব্ল্যাক ডায়মন্ড। যেমন, পূর্ব রেলপথের কয়লাখনি অঞ্চলের একখানি ট্রেনের নামই হল ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস। রত্নমণি বা হীরের নাম শুনলেই মনটা পুলকিত হয়ে ওঠে, আর কয়লা শব্দ কোন দাগই কাটে না। কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাদার চেয়ে কালো হীরে অনেক বেশী মূল্যবান। একেই বলে প্যারাডকস অফ ভ্যালুঃ সোনা জলের চেয়ে অসংখ্য গুণ কম প্রয়োজনীয় হলেও বাজারে সোনারই দাম আছে। জলের দাম নেই বললেই হয়। তাই লোকে কথায় বলে জলের দামে বিকোচ্ছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে না পারা পর্যন্ত সোনাদানার দিকে দৃষ্টিপাত করা ভুল। তেমনি কালো হীরে যোগানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তবেই সাদা হীরের আকাংক্ষা করা যেতে পারে। আমাদের দেশে কালো হীরে বা কয়লা সম্পর্কে সম্প্রতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছেঃ জ্বালানী কয়লার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং কাঁচা কয়লাকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে সরকারী পরিচালনায় আনয়ন।

স্থানাভাবে এক সংখ্যায় নয় দু সংখ্যাতে এই দুই ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব। আর বোধহয় দীর্ঘ কয়লা কাহিনী একবারে শোনানোর চেয়ে দু দফায় শোনানই ভাল। তবে পূর্বাভাষ পর্যায় অভিন্ন হতে পারে।

পূর্বাভাষঃ

গত ৩০ জানুয়ারী কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকায় ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশন প্রচারিত প্রায় আধ পাতা জুড়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—কিভাবে পঞ্চম পরিকল্পনায় কাঁচা কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে তারই বিবরণ। বিজ্ঞাপনটিতে অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়ও ছিল—যথা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন, খনিগুলোর আধুনিকীকরণ, অপচয় পরিহার, প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল, বিজ্ঞাপনটি আত্মরক্ষামূলক— কয়েকদিন আগে খনি ও ইস্পাত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলমের শাসানিরই ফল। মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন, জ্বালানী কয়লা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলেও কাঁচা কয়লা এখনও বেসরকারী উদ্যোগে রাখা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঐ উদ্যোগ সরবরাহ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছে না। এইভাবে চললে সরকার কাঁচা কয়লার খনিগুলোও রাষ্ট্রায়ত্ত করতে দ্বিধা করবে না। তবে আরও বেশ কিছুদিন দেখা হবে।

ঐ ৩০ জানুয়ারী রাত্রেই খবর শোনার জন্যে রেডিও খুলেছিলাম। প্রথমেই শুনলামঃ ভারত সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করে সমস্ত কাঁচা কয়লাখনিগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং এই ব্যবস্থা হল জাতীয়করণের প্রথম বা প্রস্তুতি পর্ব।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কয়েকদিন আগে শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলমের উক্ত শাসানি মেশানো আশ্বাসের কথাঃ এখনই কাঁচা কয়লার খনিগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে না, আরও বেশ কিছুদিন দেখা হবে।

খনি ও ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় এই আশ্বাস দিয়েছিলেন গত ১৯ জানুয়ারী বার্ণপুরে। জানি না খনির মালিকরা এই আশ্বাসে কতটা আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কারণ জ্বালানী কয়লার জাতীয়করণের বেলায় এক বছরের কিছু আগে শ্রীমোহন-কুমারমঙ্গলমের অনুরূপ আশ্বাসের কথা তাঁদের নিশ্চয়ই মনে ছিল। তবুও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তাই তাঁরা ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশন প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ছড়াতে সুরু করেছিলেন।

জ্বালানী কয়লার জাতীয়করণের গুজব অনেকদিন থেকে বাতাসে ভাসলেও ঐ কয়লার খনিগুলোকে সরকারী পরিচালনায় আনা হয় ১৯৭১ সালের ১৭ অকটোবর। এর ঠিক এক মাস আগে বোকারোয় এক শ্রমিক সভায় শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলম ঘোষণা করেন যে জ্বালানী কয়লা খনিগুলোর জাতীয়করণের কথা এখনই ভাবা হচ্ছে না, তবে ছোট ছোট খনিগুলোর একত্রীকরণের পরিকল্পনা আছে।

এই আশ্বাসে খনির মালিকদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন, কেউ কেউ করেন নি। যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন তাঁদেরও অনেকে বেশীদিন আস্থা রাখতে পারেননি, কারণ এবার—আর গুজব নয়—দিল্লী থেকে খবর লিক করতে সুরু করেছিল। কোন কোন মালিক অবিশ্যি 'যা হয় হবে'—এই রকম মনোভাব নিয়েই শেষ পর্যন্ত বসে ছিলেন।

'তিন মৎস্যের উপাখ্যান':

জ্বালানী কয়লাখনির মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রকারভেদ মহাভারতের শান্তি পর্বে ভীষ্মদেব বর্ণিত সেই তিনটি শোল মাছের—অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং দীর্ঘসূত্র (বা যদ্ভবিষ্য)—কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মাছ তিনটি একই জলাশয়ে বাস করত। জেলেরা জল ছেঁচে মাছ ধরবে, এই গুজব কানে আসতেই অনাগতবিধাতা সেই জলাশয় ত্যাগ করে অন্য জলাশয়ে যায়। প্রত্যুৎপন্নমতি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিল, কিন্তু মাছ ধরার সময় জাল কামড়ে থেকে ডাঙায় উঠে লাফিয়ে অন্য জলাশয়ে পালায়। এবং শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে একমাত্র দীর্ঘসূত্র।

জ্বালানী কয়লার মালিকদের মধ্যে অনাগতবিধাতারা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের গুজব শুনতেই যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরাতে সুরু করেছিলেন, প্রত্যুৎপন্নমতিরা এমনভাবে বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন যে, দিল্লী থেকে

ছিদ্র পথে সংবাদ আসতেই কাজ গোছাতে দেরী করেননি। দীর্ঘসূত্রের মত তাঁরাই মারা পড়েছিলেন যাঁরা 'গোছাব গোছাব' করেও গুছিয়ে উঠতে পারেননি।

তবে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশী। তাই ১৮ অকটোবর তারিখে—অর্ডিন্যান্স জারির পরদিন কাস্টোডিয়ান জেনারেল শ্রীকে এস চারীর তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্মচারীরা খনিগুলোর দখল নিতে গিয়ে দেখেন যে অধিকাংশ স্টোরই ফাঁকা। অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতিও হাওয়া, আর ব্যাংক থেকে জানা যায় যে টাকা মোটামুটি সব তুলে নেওয়া হয়েছে। দিন কয়েক পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীচারী বিবৃতি দিয়েছিলেন: কোন কোন খনিতে মালিকরা এক কৌটো গ্রীজও রেখে যাননি, যন্ত্রপাতি ও বহু পরিমাণেই সরানো হয়েছে। এখন কি করে কাজ চালাব তাই ভাবছি

শঠে শাঠ্যং:

প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠে জ্বালানী কয়লার খনির মালিকরা তাড়াতাড়ি যাতে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ব্যবস্থা হয় তার জন্যে দিল্লীতে তদবির সুরু করেন, কারণ বে-সরকারী মালিকানা কিন্তু সরকারী পরিচালনার লোকসানের ভয়ই বেশী থাকে। এই তদবিরেরই প্রসঙ্গে মালিকদের একজন নাকি শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা আপনি এক মাস আগে বোকারোতে ঐ রকম আশ্বাস দিয়েছিলেন কেন? মন্ত্রী মহাশয়ও নাকি সাফ জবাব দিয়েছিলেন: আপনাদের চিনি বলেই ঐ কাজ করতে হয়েছিল। নইলে হয়ত খনিগুলো একেবারে অচল হয়ে যেত।

মোট কথা, খনির মালিকদের অনেকে রাজকন্যাকে বিশ্বাস করেননি, আর রাজকুল শ্রেষ্ঠীকুলকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করে এসেছেন। চাণক্য শ্লোককে কি নতুন কিছুটা করে লেখা হবে?

জ্বালানী কয়লার সংরক্ষণ:

শঠে শাঠ্যং খেলা শেষ হবার ১০ মাস পরে—১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে সরকারী পরিচালনাধীন ২১৪টি জ্বালানী কয়লার খনি এবং ১২টি জ্বালানী কয়লার চুল্লী পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এর বাইরে টাটা ও ইন্ডিয়ান আয়রণের মত বেসরকারী ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের কতকগুলো নিজস্ব খনি ছিল—যাদের বলা হত ক্যাপটিভ মাইনস। এই ক্যাপটিভ মাইনসগুলো এখনও তাদের—অর্থাৎ বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে।

ইংরেজী কোকিং কোলের বাংলা করা হয়েছে জ্বালানী কয়লা। কেন ঠিক জানি না, কারণ সব কয়লাই ত জ্বালানী। আর ননকোকিং কোলকে কাঁচা কয়লা বলে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বোধহয় এই ধরনের অনেক কয়লা একবার পুড়িয়ে তবে ব্যবহার করতে হয় বলেই।

কোকিং কোল বা জ্বালানী কয়লা হল সেই জাতীয় কয়লা যা ধাতু নিষ্কাশনে—বিশেষ করে লোহা ও ইস্পাত তৈরির কাজে লাগে। সেইজন্যে এই ধরনের কয়লাকে ধাতু-নিষ্কাশন কয়লাও (মেটালার্জিকাল কোল) বলা হয়। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় লোহা ও ইস্পাত শিল্পের ওপর জোর দেওয়ার জন্যে জ্বালানী কয়লায় যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানী কয়লারও পরিকল্পিত উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য।

জ্বালানী কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ আমাদের দেশে ঐ কয়লার যথেষ্ট সঞ্চয় হলেও অফুরন্ত নয়। সাম্প্রতিক হিসেব অনুসারে দেশে জ্বালানী কয়লার সঞ্চয় ১৩০ কোটি মেট্রিক টনের মত। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে এই ১৩০ কোটি মেট্রিক টনের ৫০ শতাংশও আমরা কাজে লাগাতে পারব না। সুতরাং জ্বালানী কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় বৃহত্তর ও দীর্ঘকালীন স্বার্থে সংরক্ষণের (কনজারভেশন) দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। প্রধানত এই সংরক্ষণের স্বার্থেই জ্বালানী কয়লার খনিগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

জ্বালানী কয়লার সংরক্ষণ বলতে দুটো জিনিস বোঝায়: উত্তোলন বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ। অর্থাৎ এই কয়লার প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন এবং ধাতুনিষ্কাশন ছাড়া অন্য কোন ব্যবহারে নিয়োগ—কোনটাই চলবে না। উপরন্তু, উৎপাদনের বেলায় যাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রত্যেক খনি থেকে যথাসম্ভব বেশী উৎপাদন করা যায়—শেষ পর্যন্ত মাটির তলায় থেকে গিয়ে যাতে এই রকম কয়লার অপচয় না ঘটে, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। না হলে জাতীয় ক্ষতি—ভাবীকালের ক্ষতি। অভিযোগ করা হয়, বেসরকারী উদ্যোগ জ্বালানী কয়লার এই অপচয় পরিহারের কোন চেষ্টা করেনি। খনিরূপ হংসকে জবাই করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় স্বর্ণ-ডিম্বগুলোকে বের করার কাজেই এই শ্রেণীর খনির মালিকরা লিপ্ত ছিলেন। একে বলে স্লটার মাইনিং।

জ্বালানী কয়লাখনির মালিকরা অবশ্য এই অভিযোগ মেনে নেননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই রকম: স্বাধীনতারও আগে থেকেই কয়লাখনি শিল্প ছিল সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে। কোল বোর্ডের অনুমতি ছাড়া এক টন কয়লাও তোলা যেত না, খনির কোন সিমেও হাত দেওয়া যেত না, আর কোল-কন্ট্রোলারের নির্দেশ ছাড়া কয়লা বাজারে বেচাও সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদের সাফাই গাইবার কোন দরকার নেই, ১৯৬৬ সালের ট্যারিফ কমিশনের রিপোর্টটি পড়ে দেখুন কমিশন কি বলেছে।

পড়লে দেখা যায় কমিশন বলেছে: '১৯৪৫ সালের কয়লাখনি নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলে উৎপাদন ক্রয়-বিক্রয় সব ব্যাপারেই কয়লাখনি শিল্প ছিল মোটামুটি সম্পূর্ণ ভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন।'

অতএব, সংরক্ষণ ব্যাপারে যদি কিছু দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে, তার জন্যে দায়ী খনির তদানীন্তন মালিকরা নন, দায়ী ছিল সরকারী নীতি ও তদারকির ব্যবস্থা।

শুধু অভিযোগ খণ্ডন নয়, খনির মালিকদের নিজস্ব অভিযোগও ছিল। তাঁদের মতে, পরিকল্পনা কমিশন ইস্পাত উৎপাদনের জন্যে কতটা জ্বালানী কয়লা প্রয়োজন তার ঠিক হিসেব করতে না পারার দরুন এই কয়লার অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছিল এবং এই প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনকে কোল কন্ট্রোলারের নির্দেশে এমন এমন কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল যার সঙ্গে ধাতু-নিষ্কাশনের কোন সম্পর্কই নেই। এই কাজ কি জ্বালানী কয়লার ব্যবহার সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? খনির মালিকদের এই ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

উৎপাদনক্ষমতার পর্যাপ্ত ব্যবহার:

জ্বালানী কয়লার ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে আর একটি সরকারী অভিযোগ ছিল, এবং তা হল উৎপাদনক্ষমতার অপর্যাপ্ত ব্যবহার নিয়ে। এ অভিযোগের বিরুদ্ধেও বেসরকারী উদ্যোগের কিছু বলবার আছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১·৯৫ কোটি মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়া হলেও জ্বালানী কয়লাখানগুলোকে কখনও ১·৭০ কোটি মেট্রিক টনের বেশী উৎপাদন করতে দেওয়া হয়নি, কারণ ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যের কাছাকাছিও পৌঁছান যায়নি।

উপরন্তু, জ্বালানী কয়লাকে কখনও লাভজনক দামের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এ অভিযোগ ১৯৬৯ সালে সরকার-নিযুক্ত চারী-কমিটি। স্বীকার করে বলেছে: 'জ্বালানী কয়লার যুক্তিসংগত দামের প্রশ্নই ভবিষ্যতে ইস্পাত কারখানাগুলোর পক্ষে কয়লার অভাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

আপেক্ষিক দক্ষতার প্রশ্ন:

বেসরকারী উদ্যোগ আরও দেখাতে চেয়েছে যে কয়লা তোলায় সব সময়ই এই উদ্যোগ সরকারী উদ্যোগের চেয়ে বেশী দক্ষতা দেখিয়ে এসেছে। যেমন, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৬ কোটি মেট্রিক টন উৎপাদন লক্ষ্যের মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগকে ভার দেওয়া হয়েছিল ৪·৩৫ কোটি মেট্রিক টনের এবং সরকারী উদ্যোগকে (জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন বা এন সি ডি সি) বাকি ১·৬৫ কোটি মেট্রিক টনের। সরকারী উদ্যোগ লক্ষ্যের ধারে কাছে যেতে না পারলেও বেসরকারী উদ্যোগ লক্ষ্যকে অতিক্রম করে

ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে।

উৎপাদন ব্যয়ের দিক থেকেও সরকারী উদ্যোগকে মোটেই সমর্থন করা যায় না। যখন বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে গড়ে এক মেট্রিক টন কয়লা তোলার জন্যে ২০ টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হত তখন সরকারী উদ্যোগে বা জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনের লাগত ঐ এক টনের জন্যে ৯৬২ টাকা। বেসরকারী উদ্যোগের বক্তব্য হল: আপেক্ষিক যোগ্যতা বিচারের জন্যে আর কোন মাপকাঠির প্রয়োজন আছে কি?

জাতীয়করণের পর:

আপেক্ষিক দক্ষতার দিক দিয়ে বিচার করে নয় সংরক্ষণ ও শ্রমিকের স্বার্থেই জ্বালানী কয়লাখনিগুলোর প্রথম পরিচালনা ও পরে সম্পূর্ণ মালিকানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া ভূতপূর্ব মালিকদের বিরুদ্ধে ছিল, শ্রমিক-শোষণের অভিযোগ: তাঁরা মজুরি বোর্ডের সুপারিশ মানেননি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ঠিকমত জমা দেননি, ইত্যাদি। অভিযোগগুলোর অধিকাংশই সত্যি। কিন্তু প্রশ্ন হল: এতদিন এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি কেন? মার এটাই কি প্রমাণ করে না যে আমলাতান্ত্রিক সরকারী তদারকি ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ?

যা হোক পরিচালনাভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই নবগঠিত সরকারী সংস্থা 'ভারত কোকিং কোল লিমিটেড' কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্যে মজুরি বোর্ডের সুপারিশ পুরোপুরি কার্যকর করে। কিন্তু এর ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং কয়লার দাম বৃদ্ধি অনতিবিলম্বে প্রতিফলিত হয় ইস্পাতের দামে। মজুরি বোর্ডের সুপারিশ কার্যকর করে দীর্ঘ-বিলম্বিত ন্যায়বিচারই করা হয়েছে—কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির গতি বৃদ্ধিতেও যে সহায়তা করা হয়েছে তাও অনস্বীকার্য।

অতএব সমস্যা হল অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্বালানী কয়লার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা—অন্তত আর যাতে না বাড়ে তা নিশ্চিত করা।

সম্ভাবনার বিচার:

এই সমস্যার সমাধানেই বর্তমানে সরকারী সংস্থা 'ভারত কোকিং কোল' নিয়োজিত। এই উদ্দেশ্যে পোল্যান্ড থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দলকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে এবং দলটি ইতিমধ্যেই সুপারিশ তৈরির কাজে লেগে গেছে। বেসরকারী সূত্র থেকে জানা যায় যে দলটি ১০০ কোটি টাকার মত নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে জ্বালানী কয়লার উৎপাদন-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণের সুপারিশের সিদ্ধান্ত করেছে। আশা করা যায়, সুপারিশের অধিকাংশই সরকার কর্তৃক গৃহীত হবে, তবে কতটা এবং কত তাড়াতাড়ি কার্যকর করা হবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এদেশে সরকারী উদ্যোগাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে অদক্ষতার চরম দৃষ্টান্ত বলেই ধরা হয়। ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের কার্যসম্পাদন যদি এই সুপ্রচলিত উক্তিরই সমর্থন হয়ে দাঁড়ায় তবে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে জ্বালানী কয়লার রাষ্ট্রায়ত্তকরণে উল্লসিত হবার বিশেষ কোন কারণ থাকবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণই শেষ কথা নয়, ঐ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কেমন চলছে এবং যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে তা সফল হবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তাই হল বিচার্য বিষয়। নইলে অর্থনীতি হয়ে দাঁড়াবে রাজনীতির দাস—চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যে দাসত্বপথ কখনই শুভ হতে পারে না।

জ্বালানী কয়লা শিল্পের জাতীয়করণের মূল লক্ষ্য দ্বিবিধ: পরিকল্পিত, যুক্তিসম্মত উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিল্প প্রসারের স্বার্থে এই দ্বিবিধ লক্ষ্যে পৌঁছোবারই প্রচেষ্টা করতে হবে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে জাতীয়করণকে সাহসিকতার কাজ বলেই ধরা যেতে পারে, কিন্তু সামাজিক ব্যয়ভারকেও উপেক্ষা করলে চলবে না—সাধারণ করদাতার ব্যয়বহনেরও একটা সীমা আছে এবং করলব্ধ অর্থ বিভিন্ন ফলপ্রসূ ক্ষেত্রে ব্যয় করবার সুযোগও আছে।

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন অনন্য সরকারী দায়িত্ব (অবশ্য ঐ সময় যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল তাদের সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়া হবে)। কয়লাখনি শিল্পের উন্নয়নের অনন্য দায়িত্বও এইভাবে সরকারের। তবে এই শিল্পে এতদিন বেসরকারী উদ্যোগের প্রাধান্যই ছিল। জ্বালানী কয়লার, যার ওপর ইস্পাত শিল্প নির্ভরশীল, ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকার মত, অপরদিকে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ইস্পাত-শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল এর পনেরো গুণেরও বেশী। পনের গুণ বেশী মূলধনের কোন সরকারী শিল্প সংস্থাকে বেসরকারী উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু, সম্প্রসারণের দিক দিয়ে এই রকম ক্ষেত্রে ভার্টিকাল ইন্টিগ্রেশান বা উল্লম্ব সংযোজনও প্রয়োজন। তাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রাথমিক বিচারে জ্বালানী কয়লার জাতীয়করণ যুক্তিসংগত কাজই হয়েছে কিন্তু প্রাথমিক বিচার যে কখনই চূড়ান্ত বিচার নয় তাও স্মরণ রাখতে হবে।

উপসংহার:

জ্বালানী কয়লা সমস্যা ঠিক দিনকালের হিসেবের মধ্যে পড়ে কিনা, অনেকে ভাবতে পারেন। কেননা সাধারণের কাছে হয়ত জ্বালানী কয়লা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ কাঁচা কয়লার মত তা সাধারণ মানুষকে সরাসরি স্পর্শ করে না। কাঁচা কয়লার দাম একটু বাড়লেই হয়ত পরিবারের ব্যয়-বণ্টন ব্যবস্থায় গোলযোগের সৃষ্টি হবে, কিন্তু জ্বালানী কয়লার দাম ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ গৃহস্থ তা জানতে পারবে না।

কিন্তু আজ না পারলেও কাল নিশ্চয়ই পারবে—লোহা ও ইস্পাতের জিনিসপত্রের দাম বাড়লেই বুঝতে পারবে কোথায় কি গোলমাল হয়েছে—হয়ত সেটা ঠিক কোথায় তা ধরতে পারবে না। আর লোহা ও ইস্পাতে হল অন্যতম মৌল শিল্প—দেশের শিল্প প্রসার এই শিল্পের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই লোহা ও ইস্পাতের জিনিসপত্রের দাম বাড়া মানে শিল্প সম্প্রসারণ এবং ফলে নিয়োগ পরিকল্পনা ব্যাহত হওয়া—তার মানে আবার কৃষি-যন্ত্রপাতির উৎপাদন ব্যাহত হওয়া—তার মানে খাদ্য সমস্যা—তার মানে... আর ভাবতে পারছি না। এবার চিন্তার ভার আপনাদের ওপর।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

আজকের এই সুগম যাতায়াতের যুগে দেশভ্রমণ দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই না একটা দেশকে কতোটুকু চেনা যায়? চিনতে হলে শুধু ভূগোল নয় জানা দরকার তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই চার দিক থেকে আলোচনা করা হবে—আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব আমরা।

কোচবিহার—(৩)

প্রত্নসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি

কোচবিহার যে একদা বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য ছিল তা প্রমাণের জন্য কোন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বা আলেকজান্ডার কানিংহামের প্রয়োজন হয় না। তার অতীত ইতিহাস, লোকধর্ম ও সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও জনপদে।

উত্তরবঙ্গের এই ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডটিতে রাজ্য ভাঙা গড়ার জীর্ণ নিদর্শন সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বে দিনহাটা মহকুমার খালিসা গোসানিমারি, কামতাপুর, জামবাড়ি, টাকিমারি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে গেলে। একদা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত এই জনপদগুলির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নানা প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানে খেনবংশীয় রাজাদের আধিপত্য কায়েম হয়। রাজ্যের নাম ছিল কামতারাজ্য এবং নীলধ্বজ ছিলেন সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রাজ্যের উপাস্য দেবী ছিলেন কামদা বা কামতা, তাই থেকেই রাজ্যের নামের উদ্ভব। আবার সাধারণ লোকের কাছে কামদা দেবী পরিচিত ছিলেন গোস্বামিনী সর্বেশ্বরী নামে, এবং সেই থেকে গোসানী শব্দের উদ্ভব আর কামতাপুর পরিচিত হয় গোসানিমারি নামে। কামতাপুরের তৃতীয় রাজা নীলাম্বর (শাসনকাল ১৪৬০-৯৮) পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি কামরূপ রাজ্যের অনেকাংশ জয় করেন এবং রাজ্য সুরক্ষার জন্য রাজধানীতে নির্মাণ করেন বিশাল দুর্গ।

ধরলা নদীর ভাঙনে দুর্গটি আজ প্রায় অবলুপ্ত, কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে খালিসা গোসানিমারির রাজপাটে কামতেশ্বর দুর্গই কোচবিহারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বিবেচিত হবে। পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ডিম্বাকৃতি ঐ বিশাল দুর্গটির বাইরের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় বিশ মাইল। ঐ প্রাচীরের পরে ছিল একটি পরিখা, তারপর আবার প্রাচীর ও পরিখা। দ্বিতীয় পরিখার অভ্যন্তরে একটি চতুষ্কোণ জমিতে রাজা নীলাম্বরের দুর্গটি গড়ে ওঠে। ভগ্নস্তূপ দেখেই দুর্গটির বিশালতা সম্বন্ধে ধারণা করতে হয়, নইলে তার নক্সাটাই এখন ঠিকমত বোঝা যায় না। ঐ দুর্গপ্রাসাদ থেকে পাথরে খোদাই কতকগুলি সুন্দর চিত্রপট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটির উচ্চতা তিন ফুটের কিছু বেশি এবং প্রস্থে দু ফুট থেকে তিন ফুট। পটগুলিতে রাজারাণী, দেবদেবী, সাধারণ নরনারী সকলেই চিত্রিত আছে এবং প্রতিটিরই খোদাইয়ের কাজ প্রশংসনীয়।

খেন রাজাদের টাঁকশাল ছিল যেখানে সে স্থানটি টাঁকশাল নামেই পরিচিত। টাঁকশালের অস্তিত্ব অবশ্য ভাঙা ও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কতকগুলি পাথরের টুকরো ও ছাঁচ থেকেই উপলব্ধি করতে হয়। আটকোণা কয়েকটি পাথরের স্তম্ভ থেকে টাঁকশাল ভবনের আকার ও গঠন সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

তোর্ষা নদীর বাম পারে, কুমারীর কোট নামক প্রাচীন দুর্গটিও একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্মারক। তুফানগঞ্জে মহারাজা

মদনমোহন মন্দির
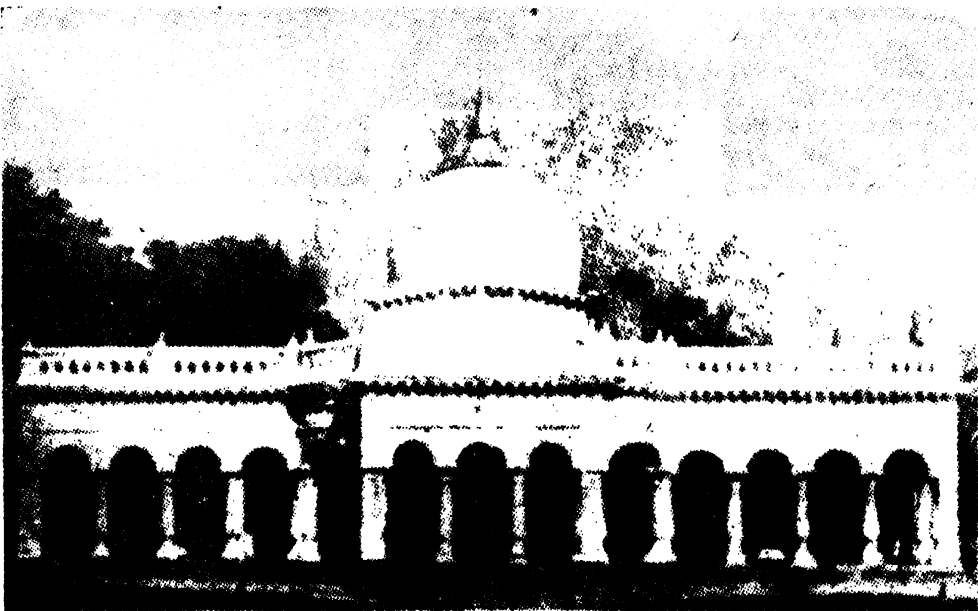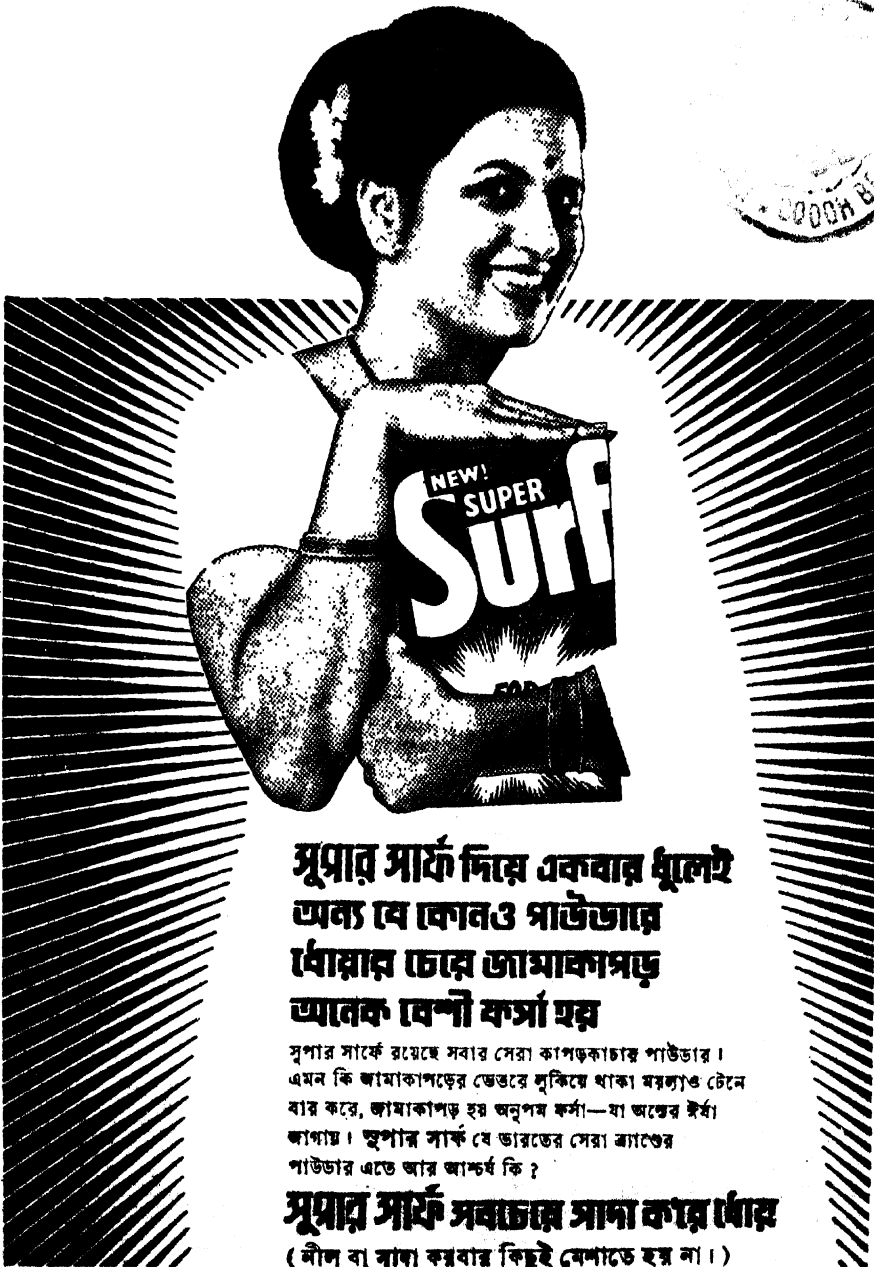
নরনারায়ণের অনুজ চিলারায় যে প্রাসাদ নির্মাণ করেন বা দীঘি খনন করেন, রাই-ডাক নদীর সর্বনাশা আক্রমণে তার প্রায় সবই বিলুপ্ত হয়েছে। তবু ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধানীরা এখনও সেখানে একদা গড়ে ওঠা একটি স্বাধীন রাজ্যের বহু কীর্তিচিহ্ন খুঁজে পাবেন।

মন্দির মঠ দরগা ও মসজিদ

কোচবিহারের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য বাণেশ্বরের মন্দির। মহারাজা প্রাণনারায়ণের শাসনকালে সম্ভবত ১৬৬৫ খৃঃ মন্দিরটি নির্মিত হয়। আলিপুর-দুয়ার-দিনহাটা রেলপথে যে বাণেশ্বর নামে স্টেশন ও গ্রাম আছে বাণেশ্বরের মন্দির সেখানে অবস্থিত। দেবতার নামেই গ্রামের নাম। সুবৃহৎ এই গর্ভ মন্দিরটির চূড়া অনেক দূর থেকে দেখা যায়। খাড়া উঠে যাওয়া মন্দিরের আটকোণা গম্বুজটির কার্নিসগুলি নির্মিত হয়েছে নোয়ানো বাঁশের ধাঁচে। মন্দিরের চূড়ায় উপর্যুপরি কয়েকটি কলসির উপর একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রাচীর সংলগ্ন পুষ্করিণীটি মোহনদীঘি নামে পরিচিত। বর্ষায় ঐ বৃহৎ পুষ্করিণীর জল উচ্ছলিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। মোহনদীঘিতে অনেকগুলি বড় বড় কচ্ছপ আছে। জনশ্রুতি, মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই সেগুলি ঐ পুকুরে অবস্থান করছে। মোহনদীঘির কচ্ছপগুলিও মোহন বা মোহনের বংশধর নামে পরিচিত। ভক্তরা

কচ্ছপগুলিকে দেবজ্ঞানে পুজো করে ও খাদ্য দেয়। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরের পূর্ব দিকটি বসে যাওয়ায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। তারপর মন্দিরটির বহুবার সংস্কার হলেও শিবলিঙ্গটিকে সেভাবেই রাখা হয়েছে। বিগ্রহটি মন্দিরের অভ্যন্তরে কয়েক ধাপ নীচে, যাতে প্রমাণ হয় যে বিগ্রহটিকে ঘিরে মন্দির গড়ে তোলা হয় এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার অনেক আগে বিগ্রহটি সেখানে ছিল।

কোচবিহার শহর থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরটিরও প্রতিষ্ঠাতা প্রাণনারায়ণ এবং বাণেশ্বরের মন্দিরের সমকালেই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুটি মন্দিরের স্থাপত্যরীতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। চূড়ার গঠনে দুটি মন্দিরে সাদৃশ্য থাকলেও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের আটকোণা থামগুলিতে গ্রীক স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব দেখা যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলী যে সপ্তদশ শতাব্দীতেই ভারতীয় স্থপতিদের প্রভাবিত করে, তিন শ বছরের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির দেখলে তা বুঝতে পারা যায়। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে গৌরীপট্ট এবং এখানে ভগবতীর পুজো হয়। সম্মুখের বারান্দা থেকে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ দেবীস্থানটি বাণেশ্বরের মতোই, এবং সম্ভবত একই কারণে বেশ খানিকটা নীচু। মন্দিরের অন্ধকার অভ্যন্তরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত। দেবীর নিত্য পুজো হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরকে একটি পীঠস্থান মনে করে, এবং মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব কোণে যে একটি কামরাঙা গাছ আছে সেটিকে দেবী কামাক্ষ্যার প্রতীকজ্ঞানে পুজো করা হয়।

কোচবিহার-মাথাভাঙা রাস্তায়, কোচবিহার থেকে প্রায় সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে আছে হরিপুর গ্রাম। সেখানে হরিহর শিবের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে। পশ্চিমমুখি চতুষ্কোণ মন্দিরটির চূড়া পিরামিডের মতো এবং চূড়ার নীচের কার্নিসগুলি বাঁকানো বাঁশের ধাঁচ নির্মিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত শিবলিঙ্গটি একটু সামনের দিকে প্রোথিত।

ধলিয়াবাড়ির মন্দিরটিও প্রতিষ্ঠিত হয় মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের শাসনকালে (১৭১৪-৬৩)। এই মন্দিরে একটি উচ্চ গৌরীপট্টের উপর শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখি, তবে পশ্চিম পাশেও একটি দরজা আছে। চতুষ্কোণ মন্দিরটির প্রতিদিক কিঞ্চিদধিক বারো ফুট দীর্ঘ এবং দেওয়ালগুলি প্রস্থে প্রায় পাঁচ ফুট। মন্দিরের প্রতিদিকে একটি করে খিলান এবং দুটি খিলানের মিলনস্থলে আছে লম্বমান ফুলের কুঁড়ির মতো একটি করে সুদৃশ্য শিল্পকার্য। বাইরে থেকে মন্দিরটি বাঁশের কুঁড়ে ঘরের মতো দেখতে।

মন্দিরটির উত্তরদিকের দেওয়ালে মসজিদের স্থাপত্যশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। এতে অনুমান করা হয় যে, মুশ্লিম শাসনকালে মন্দিরটি হয়ত সাময়িকভাবে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং এখন যে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত সেটি হয়ত অপেক্ষাকৃত নতুন। মন্দিরে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির চারিদিক ঘিরে একদা ১৪টি পুষ্করিণী ছিল, তার মধ্যে শুধু পশ্চিমে ফুলবাড়ি দীঘি ও উত্তরে সাগরদীঘি এখনও নির্দিষ্ট করা যায়। তার মধ্যে সাগরদীঘি সম্পূর্ণ শুষ্ক। মন্দিরটির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছিল মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের প্রাসাদ, যার শুধু জীর্ণাবশিষ্ট আজ অতীতের সাক্ষ্য বহন করে।

গোসানিমারির কামতেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় সম্ভবত ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা প্রাণনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায়। দেবী ভবানীর মন্দির এটি। মন্দিরের খিলানটি বাঙলার কুঁড়ে ঘরের ছাঁদে নির্মিত এবং তার মধ্যস্থল দিয়ে মন্দিরের চূড়াটি উত্থিত হয়েছে। মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বঙ্গীয় স্থাপত্যশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আদলটিতে যেমন বাঙলার গ্রামীণ নমনীয়তার ছোঁয়া আছে, তেমনই তার গঠনসৌকর্যে আছে মোগল স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব।

মন্দিরের দেওয়াল চার ফুটেরও বেশি চওড়া এবং তার কুলুঙ্গিতে অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি সংরক্ষিত আছে। তার মধ্যে একটি মূর্তি হল সপ্ত অশ্ববাহিত রথে দণ্ডায়মান সূর্যদেব। সূর্যদেবের কানে আছে কিরীটকুণ্ডল ও মকরকুণ্ডল, কণ্ঠে দুটি হার ও স্কন্ধে দীর্ঘ যজ্ঞোপবীত। দুটি হাতে আছে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম। কটিদেশের নিম্নভাগে আছে কোষবদ্ধ তরবারি। সূর্যদেবের দুপাশে আছে দণ্ড ও পিঙ্গল, তাদের নীচে ঊষা ও প্রত্যূষা, অন্ধকারের দানবকে লক্ষ্য করে যাদের তীর উদ্যত। অরুণচালিত রথের সাতটি অশ্বেরই মুখ পাশে ঘোরানো, মধ্যের অশ্বটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সপ্ত অশ্ববাহিত রথের মধ্যের অশ্বটির দৃষ্টি সাধারণত সম্মুখ দিকে নিবদ্ধ থাকে। তির্যক দৃষ্টিতে ধাবমান অশ্ব অঙ্কনরীতি পালযুগের ভাস্কর্যশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মন্দিরে সূর্যদেবের একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিও সংরক্ষিত আছে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরটি উত্তরদিকে একটু ঝুঁকে পড়ে কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি কষ্টিপাথরের সাইত্রিশ ইঞ্চি উঁচু বিষ্ণুমূর্তি আছে। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান শঙ্খ-পদ্ম-গদাধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর বামপাশে বীণাপাণি সরস্বতীর মূর্তি। এই মূর্তিটিও পালযুগের শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন।

কোচবিহার-শিলিগুড়ি পথে তিন মাইল অভ্যন্তরে আছে মধুপুর গ্রাম। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন ধর্মগুরু শঙ্করদেব কোচবিহারে অবস্থানকালে মধুপুরে তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন এবং পরিণত বয়সে সেইখানেই দেহরক্ষা করেন। মধুপুরের মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই, তার বদলে সিংহাসনের উপর স্থাপিত আছে শঙ্করদেবের পাদুকা। আর আছে একটি অনির্বাণ প্রদীপ। আনুমানিক ১৫৮৬ খৃঃ শঙ্করদেব মধুপুরে অবস্থানকালে ভাগবতের অনুবাদ করেন। মধুপুরের মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবদের প্রচারকেন্দ্ররূপে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবদের আশ্রমটিও উল্লেখযোগ্য। শঙ্করদেবের পাদুকা বন্দনা করে রোজ মন্দিরে কীর্তন হয়। আর রাসযাত্রার মেলা হয় কার্তিক মাসে। মেলাটি শতাধিক বছরের পুরনো।

মরা তোর্ষা নদীর দক্ষিণ পাড়ে আছে বৈষ্ণবদের আর একটি পুণ্যক্ষেত্র দামোদরপুর। শঙ্করদেবের মতো দামোদরও আসাম থেকে কোচবিহারে এসে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খৃঃ দামোদর প্রভুকে ঐ স্থানে আশ্রম স্থাপনের জন্য জমি দান করেন। সেখানে কোন মন্দির নেই, কোন স্মারকও কোনদিন স্থাপিত হয়নি, যা ছিল, চারশ বছরের ব্যবধানে ও তোর্ষার আক্রমণে সবই প্রায় লুপ্ত হয়েছে। তবুও দামোদরপুর ধামের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গুদাম মহারাণীগঞ্জ গ্রামে পীরগোপীদের যে দরগা আছে তার জন্য কোচবিহার রাজ সরকার থেকে চাকরান জমির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় হিন্দু মুশ্লিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সে দরগায় কাঁচা দুধ, চিনি, বাতাসা প্রভৃতি দিয়ে মানত দেয়। দরগার প্রাঙ্গণে বহুকাল ধরে মহরমের মেলা চালু আছে।

মেলা পার্বণ ও লোকউৎসব

বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত কোচবিহারে রাস উৎসব ও সেই উপলক্ষে মেলায় সর্বাধিক আড়ম্বর ও উৎসাহ দেখা যায়। মদনমোহন কোচবিহারের রাজপরিবারের গৃহদেবতা। ঐ মদনমোহনের সঙ্গে কিন্তু রাধার মূর্তি নেই। ১৮৮৯-৯০ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার শহরে বৈরাগীদীঘির উত্তর পাড়ে মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করেন এবং রাজপ্রাসাদ থেকে মদনমোহনের বিগ্রহ এনে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরটির শিল্পসৌকর্য উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিন্তু সুন্দর। মন্দিরের অভ্যন্তরে রূপোর মঞ্চে অষ্টধাতুনির্মিত মদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত।

কার্তিক মাসে রাসযাত্রায় ঐ মদনমোহনের মন্দিরকে ঘিরে যে উৎসব ও মেলা হয় সেটিকে কোচবিহার জেলার শ্রেষ্ঠ স্থানীয় উৎসব বলা যেতে পারে। প্রায় পক্ষকাল ধরে মেলা চলে এবং বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসাম এমনকি ভুটান থেকেও দলে দলে লোক আসে দর্শ

এখন 'হরলিক্স' খেতে
ভুলবেন না।
বিশেষতঃ এখন আপনার
খাওয়া দরকার
দু'জনার জন্যে।

দিনের ঐ উৎসব ও মেলা দেখতে। দর্শনের সুবিধার জন্য উৎসবের সময় মন্দিরের বিগ্রহটিকে বাইরে সুসজ্জিত মঞ্চে স্থাপন করা হয়। উৎসব মেলায় স্থানীয় কুটির-শিল্পজাত পণ্য ও মনিহারী দ্রব্যের জোর বেচাকেনা চলে। মেলায় রোজ আট থেকে দশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়।

রাসের মেলা জেলার প্রায় সর্বত্রই হয়। কোচবিহার শহরের মেলার পরেই উল্লেখ্য হল মাথাভাঙা মহকুমায় নিশিগঞ্জের রাসের মেলা। সে মেলাও সাতদিন ধরে চলে এবং প্রতিদিনই মেলায় ছয় সাত হাজার লোকের সমাবেশ হয়। তুফানগঞ্জের ভুরকুশ গ্রামে ফাল্গুন মাসে 'দোল সোয়ারী' উৎসবের মেলা বসে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত রাধাকৃষ্ণের মন্দিরকে ঘিরে। মেলাটি প্রায় শতাব্দীকালের। মেলায় দোকানপাট বসে, তাছাড়া কবিগান, জলসা, যাত্রা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হয়। দোলযাত্রা উপলক্ষে তুফানগঞ্জ শহরে যে বড় মেলা বসে তা পক্ষকাল ধরে চলে এবং মেলায় প্রতিদিন সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হয়। তুফানগঞ্জের বলরামহাটে, দিনহাটা শহরে ও দিনহাটা মহকুমার পুঁটিমারির, গোবিন্দের, পানাগুড়ি, গোসানিমারি ও মেখলিগঞ্জের ধুলিয়াহাটে দোলযাত্রার মেলাগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

শিবরাত্রির বড় মেলা হয় বাণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে। মেলাটি প্রাচীন, প্রায় শতাব্দীকালের। ফাল্গুন মাসের শিব-চতুর্দশীতে মেলা বসে, চলে তিনদিন ধরে। প্রতিদিন পাঁচ ছ হাজার লোক মেলা দেখতে আসে। দিনহাটা ও মাথাভাঙা শহরেও শিবরাত্রির মেলা হয়। এই দুটি মেলা সাতদিন ধরে চলে। মাথাভাঙার শিবরাত্রির মেলা একটি বড় উৎসব, প্রতিদিন হাজার দশেক লোক সে মেলায় জড়ো হয়। মাথাভাঙার শোকসারডাঙা গ্রামের শিব-চতুর্দশীর মেলাও সাতদিন ধরে চলে এবং প্রতিদিন বিপুল লোকসমাবেশে মেলা প্রাঙ্গণ পূর্ণ থাকে।

সদর মহকুমার আমবাড়িতে বৈশাখে অষ্টমীর স্নান উপলক্ষে একটি বড় মেলা হয়। দুদিনের ঐ মেলায় প্রতিদিন চার পাঁচ হাজার লোক আসে।

তুফানগঞ্জ মহকুমায় বলাকুটি গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজার যে মেলা বসে তা চলে পনের দিন। এই মেলাটি সম্প্রতিকালের। গোপালপুর গ্রামের গোপালপাটের মেলাটি সুপ্রাচীন, প্রায় দুই শতাব্দীর। মাথাভাঙা মহকুমার একটি বড় লোকউৎসব হল ভেরভেরির গোলকনাথের মেলা। বৈশাখ মাসের ঐ মেলা সাতদিন ধরে চলে এবং প্রতিদিন সে মেলায় দশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ি শহরে পৌষ মাসে একমাস ধরে একটি মেলা চলে। মেলায় প্রতিদিন তিন হাজার লোকের সমাবেশ হয়। জন-সমাবেশের হিসাবে এই বৎসরান্তিক মেলাকে কোচবিহারের বৃহত্তম মেলা বলা যায়।

বারুণী উপলক্ষে কোচবিহারের বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় মেলা বসে। মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধার বারুণীর মেলাও উল্লেখ-যোগ্য। চাংড়াবান্ধায় মেলা চলে এক মাস। দিনহাটা মহকুমায় বারুণীর মেলা বসে ভাউলি, জামালদহে ও গোসানিমারিতে। মাথাভাঙার শালটুগাড়ির বারুণীর মেলা চলে সাত দিন, প্রতিদিনই মেলায় বেশ ভিড় হয় ও কেনাবেচা চলে।

মাথাভাঙার নিশিগঞ্জে কার্তিক পূর্ণিমার মেলাও বেশ বড় মেলা। সাত দিন ধরে মেলা চলে এবং প্রতিদিনই সাত আট হাজার লোক মেলায় জমা হয়। ঐ মহকুমার ঘোকসাডাঙার পৌষ মেলাও বড় মেলা। ঐ মেলা সাতদিন ধরে চলে এবং প্রতিদিনই লোকসমাবেশে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। লোকসমাবেশে ও বেচাকেনায় জম-জমাট পৌষ সংক্রান্তি মেলা মাথাভাঙা মহকুমার অন্য মেলার চেয়ে বেশি।

শারদোৎসব, দুর্গাপূজা, কালীপূজা আগে খুব বেশি প্রচলিত ছিল না, কিন্তু এখন সারা কোচবিহারেই শারদীয়া পূজা-পার্বণের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু মৃৎশিল্পীদের জন্য প্রতিমা সহজলভ্য হওয়াই এর প্রধান কারণ। পূজা উপলক্ষে মেলাও বাড়ছে জেলার বিভিন্ন স্থানে দুর্গাপূজা ও দশহারা উৎসবে বড় মেলা বসে সদর মহকুমার দেবীবাড়িতে। সাতদিন ধরে মেলা চলে এবং প্রতিদিনই মেলায় তিন চার হাজার লোকের সমাবেশ হয়। দিনহাটা মহকুমায় মহামায়া পাট, গোসানিমারি, রাণীর হাট, গোবরাছড়া, আলোকঝাড়ি, ভাওগুড়ি, বলাডাঙা, টিয়াদহ, খরির হাট প্রভৃতি স্থানেও দুর্গাপূজার সময় মেলা বসে। মেখলিগঞ্জ মহকুমা শহরে দুর্গাপূজার সময় বেশ বড় মেলা হয়। চারদিন ধরে মেলা চলে এবং প্রতিদিনই তিন চার হাজার লোক মেলা দেখতে আসে। মেখলিগঞ্জের নিজতরফ, কুচলিবাড়ি প্রভৃতি স্থানেও দুর্গাপূজার মেলা বসে।

মুসলমানদের মহরম উপলক্ষে দিন-হাটার কারবালা মাঠে বড় মেলা হয়। দুদিন মেলা বসে এবং দুদিনই বেশ ভিড় হয়। এছাড়া মহরমের মেলা হয় দিনহাটার গোসানিমারি, ওকরাবাড়ি, বড় আটিয়া-বাড়ি, কুরসামারী, নাককাটাবাড়ি ও বলা-ডাঙায়। মেখলিগঞ্জ মহকুমার খোসবাস নগরে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে স্থানীয় এক মুসলিম ফকিরের স্মরণে যে দুদিনের মেলা হয় তাতে কয়েক হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে।

লোকদেবতা

উল্লিখিত পূজা-পার্বণ ও মেলাগুলি ছাড়াও কোচবিহারের গ্রামে গ্রামে আছে লোকদেবতার পূজা ও উৎসব। শীতলা, মনসা (পদ্মকুমারী), চণ্ডী প্রমুখ সুপরি-চিত দেবদেবী ছাড়াও অগণিত দেবদেবী স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস ও সংস্কার অনু-সারে আবির্ভূত হয়েছে কোচবিহারের সকল পল্লীর পথে প্রান্তরে। সেসব দেব-দেবীর নাম বলে শেষ করা যায় না। তাদের পূজোর মন্ত্র ও পদ্ধতিও সর্বত্র এক নয়।

লোকদেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক জন-প্রিয় সন্ন্যাসী, যা শিবেরই এক অপভ্রংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। খড়ের তৈরি মূর্তি, দাড়ি, গোঁফ ও জটায় মুখ আচ্ছন্ন এবং বিশাল ভুঁড়ি, গাঁজা সর্বাধিক প্রিয় সেব্য। জ্বরজ্বালা ও রোগশোক থেকে রক্ষা করাই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাজ। সন্ন্যাসী ঠাকুর কোচ ও রাজবংশীদের গৃহ-দেবতা বিশেষ এবং সব ঋতুতেই তাঁর পূজো হয়। কোচদের মধ্যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্মুখে শুয়োর বলি দেওয়ার প্রচলিত প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরেই বুড়ী পূজোর জনপ্রিয়তা। বুড়ী দেবী চণ্ডীর অপভ্রংশ রূপ। শিশুদের মঙ্গল ও রোগমুক্তির কামনায় ঘরে ঘরে বুড়ীর পূজো হয়। উত্তর কোচবিহারে বুড়ীচণ্ডী নামে অভি-হিত। গৃহস্থের ঘরে গরুর বাছুর হলেও বুড়ীমার পূজো হয়।

বুড়োবুড়ীর পূজো হয় বাড়ি অথবা গ্রামের অমঙ্গল দূর করতে। বুড়োবুড়ী শিব ও চণ্ডীর মিলিত রূপের এক গ্রাম্য কল্পনা।

পদ্মকুমারী, মনসাদেবীর পূজো হয় বাড়িতে কোন পুরুষের বিবাহের আগে জকাজাকনীর পূজো করে মোরাশিয়ালো যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য জখা-জখনীকে পূজো দেওয়া হয়। ঐ পূজোয় বলির ব্যবস্থা থাকে।

মশান দেবতার অবস্থান পথের ধারে এবং পথ দুর্ঘটনা থেকে ভক্তদের রক্ষা করাই মশান দেবতার কাজ। শুয়োরের পিঠে চতুর্ভুজ শিব—এই মশান মূর্তি। চিঁড়ে দই দিয়ে মশান দেবতার পূজো হয়।

ঢোল দেবেরও অবস্থান গাছের নীচে এবং তাঁর পূজোর কোন নির্দিষ্ট রীতি নেই। ডাং-ধরা হলেন ব্যাঘ্রদেবতা, বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর পূজো। এসব পূজোর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে সপ্তাহের শনি মঙ্গলবারে জাগ্রত দেবতাদের পূজায় বেশি ঘটা হয়। প্রায় গ্রামেই মনসা, শীতলা ও মশানের পাট আছে। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তাদের কাছে মানত করা হয় এবং পরে পাঁঠা, পায়রা, কুমড়ো প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

ভক্তের মনোভূমিই ভগবানের জন্মস্থান, তাই অগণিত ভক্তের বিচিত্র কল্পনা অনু-সারে তাঁর এত রূপবৈচিত্র্য। কিন্তু তিনি এক, একথাও ভক্তের অজানা নয়, সে-কারণে সব দেবতার কাছেই সে অসংকোচে মাথা নোয়ায়।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

(৮)

শুক্রবারে হাটে গেছিলাম।

এসব হাটে বাণিজ্য হয়, বিকি-কিনি হয়, কিন্তু ব্যবসাদারী গন্ধটা শহরের বাজারের মত তীব্র নয়। হাটের দিনে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দেখে মনে হয় এরা যেন, সবাই একটা খেলায় মেতেছে।

বড় রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরে পড়ে। তাই বাড়ির পেছনের তিতিরকান্নার হলুদ মাঠ পেরিয়ে, মহুয়া গাছগুলোর তলায় তলায় ঝাঁটি জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে পায়ে চলা পথ চলে গেছে টিলা-নালা পেরিয়ে সে পথ দিয়ে চললাম। শর্টকাটে এলে গির্জার সামনে উঠতে হয়। তারপর ছোট্ট একটা বস্তি। বস্তি পেরোলেই লেভেল-ক্রসিং। লেভেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে চোখে পড়ে লাইনটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ডাইনে সোজা চলে গেছে খিলাড়ি পলাতু হয়ে বাড়কানার দিকে—আর বাঁদিকে গেছে হেহেগাড়া, রিচুঘুটা কুমান্ডি চীপাদোহর হয়ে ডালটনগঞ্জে।

লেভেল-ক্রসিং পেরুলেই মিস বনারের বিরাট পাকা বাড়ি। এই অবিবাহিতা একটি বৃদ্ধা সারাদিন হাঁস-মুরগীর দেখা শোনা করেন, শীতের দুপুরে দাঁড়িয়ে নিজের মনে রাজহাঁসীদের সংগে কথা বলেন।

তাঁর বাড়ি পেরুনোর পর বাঁয়ে আরো অনেক বাড়ি—হেসালঙের পথের পাশে।

পথটা সোজা চলে গেছে। মাঝপথে একটা মোড়। সেই মোড়ে ডাইনে ঘুরলে হেসালঙের হাটের রাস্তা। মোড় ছেড়ে সোজা একটু গেলেই শুঁড়িখানা। ইতস্ততঃ শালপাতার দানা ছড়ানো ছিটানো, মত্ত অবস্থায় যুবক-যুবতীরা, আর মুখে-খেউড়, চোখে-কতুর ভস্মপ্রায় বৃদ্ধেরা।

হাট-পেরিয়ে পথটা সোজা চলে গেছে খলাড়ির দিকে এ সি সি কোম্পানীর সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে।

মালু আগে আগে চলেছিল, মাথায় পাগড়ি-বেঁধে লাঠির ডগায় থলিয়া ঝুলিয়ে গায়ে নতুন খাকি রঙা কোট পরে।

মোড়ের মাথায় এসে মালুকে মনে করিয়ে দিলাম যে হাটে গিয়ে ও যেন ইচ্ছে করে হারিয়ে না যায়। ও গতবার ইচ্ছে করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে সোজা শুঁড়ি-খানায় চলে গেছিল। তারপর মত্ত অবস্থায় রাতে ফিরে এসে বলেছিল, 'যাও তুমকো হাম বরখাস্তু কর দিয়া, তুমহারা মাফিক নোকরু হামকো নেহি চাইয়ে।'

মালু কথা দিল যে সে এবার আর হারাবে না।

হাট বেশ জমে গেছে।

দেহাতীরা এসেছে টাটকা শাক-সবজি নিয়ে। একপাশে মোরগ-মুরগীর ভীড়। তারই পাশে বাঁশের গায়ে ঠ্যাং উপরে মাথা নীচে করে ঝোলানো আছে চামড়া-ছাড়ানো নগ্ন খাসী। খাসীগুলোর মৃত্যুর পরও নিস্তার নেই, সমস্ত অপমান থেকে ছুটি পাবার পরও এক মস্ত নির্লজ্জতায় ওদের মুক্তি।

এদিকে রাবারের চটি, ওদিকে কাঁচের চুড়ি, প্লাস্টিকের খেলনা, রুপোর গয়না, পাকৌড়ার দোকান, চায়ের দোকান। আর মধ্যে দূরে দূরে গ্রাম থেকে আসা চুলে কাঠের কাঁকই-গোঁজা তেলমাখা, টানটান করে চুল-বাঁধা আঁট-সাঁট বনজ মেয়েরা।

রুপোর গয়নার দোকানে ভীড় করে ছিল একদল শহুরে সুন্দরী মেয়ে—এখানের কোনো বাসিন্দার বাড়ির ক্ষণকালের অতিথিরা। তাদের রঙীন বেল-বটম্ ও বহুমূল্য শাড়ি, অদের চুল-বাঁধার কায়দা ও রকমারী সান-গ্লাস ম্লান করে তাদেরই পাশে আছে এখানের মেয়েরা। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বসে এ ওর মাথার উকুন বাছছে। কেউ বা হেসে হেসে ঝরনার মত এ ওর গায়ে ঝরে পড়ছে। তাদের উত্তোলিত হাতের ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ঝলক চোখে পড়ছে তাদের নিবিড় স্তন, তাদের মেদহীন পরিশ্রমী শরীর দেহ, তাদের সরল নিরাভরণ নিরাবরণ তারুণ্যময় সৌন্দর্য। আর ওদেরই পাশে আসলের অভাব মেকীতে-ভরানো বিত্তবতী সদ্য যুবতীরা তাদের সমস্ত প্রাপ্তি সত্ত্বেও ওদের আড়চোখে দেখে শারীরিক হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে।

আমার বন্ধু পানওয়ালার দোকান থেকে দুটো পান খেলাম জর্দা দিয়ে। চায়ের দোকানে সকলের সঙ্গে বসে চা খেলাম। ধীরে সুস্থে হাট শেষ হল।

হু হু করে উত্তুরে হাওয়া বইছিল। হৈ হৈ করে উড়ে যাচ্ছিল শালপাতার সঙ্গে খড়-কুটো; গরু, ঘোড়া, ছাগল মুরগী আর তেলেভাজা পাকৌড়ির গন্ধ মাখা ধুলো। সমস্ত হাট থেকে একটা গুঞ্জরণ বাজছিল উচ্চ গ্রামে।

হেসালঙের হাটে এলে আমার মন প্রতিবারেই ভীষণ চমৎকৃত হয়। এখানে কোনো দৌড়াদৌড়ি নেই, লোকাল ট্রেন বা লাস্ট বাস মিস্ করার চিন্তা নেই, সময়মত উপস্থিত না-হবার জন্যে অফিসের বড় সাহেব বা কোর্টের জজসাহেবের ভ্রূকুটির ভয় নেই। ঘড়ি আবিষ্কার হবার পর যদিও বহু সহস্র বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু মানুষ এখানে আজও ঘড়ির উপর কর্তৃত্ব করছে, ঘড়ি মানুষের উপর নয়।

এই হাট-করা ছেলেমেয়েদের কাউকে যদি শুধোনো যায় তোমার কত বছর বয়স, সে প্রথমে জবাব দেবে না। হেসে বলবে, জানি না। তারপর পীড়াপীড়ি করলে ভুরু কুঁচকে অনেক ভেবে বলবে, যে-বছর পাহাড়তলির আমলকী বনে একটিও আমলকী ধরেনি, যে-বছর আমলকী তলায় চিতল হরিণের ঝাঁক খেলা করেনি ও সে-বছর জন্মেছিল।

ওরা ওদের জন্ম, ওদের মৃত্যু ওদের জীবন কোনো কিছু নিয়েই কখনো মাথা ঘামায়নি—অথচ ওদের স্বল্পবিত্ততা ছাড়া ওদের আর কোনো অভাব নেই। কারণ ওরা আমাদের মতো প্রতিমুহূর্তের তীব্র ও বহুবিধ অভাববোধে নিজেদের কণ্টকিত জর্জরিত করেনি। ওদের মত হতে পারলে কি ভালোই না হত। কিন্তু ওদের জগৎ আর আমাদের জগৎ যে এক নয়। আমরা যে সেই অভাববোধহীন দিনগুলিকে বহুদিন আগে পিছনে ফেলে রেখে এই সাইকোলজিক্যাল বুভুক্ষু মানসিক জগতে প্রবেশ করে

ফেলেছি। এ জগৎ এ মানসিকতা থেকে বেরোবার পথ ত আমাদের হাতে নেই।

মুরগী কিনতে গিয়ে হঠাৎ দত্তবাবুর সংগে দেখা। ছোটখাট ভাল স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক। বয়স ষাটে পৌঁছেছে—কিন্তু শক্ত আটসাট শরীর। এখনো অবলীলাক্রমে পাঁচ-দশ মাইল হেঁটে বেড়ান। বেড়ানোর জন্যে নয়, এখানে প্রয়োজনেই প্রত্যেককে দিনে দু-তিন মাইল কমপক্ষে হাঁটতে হয়। দত্তবাবুর ছেলেরা সকলেই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। তবুও উনি এখন একটা চাকরি নিয়েছেন। সময় কাটাবার জন্যে ডালটনগঞ্জের কাঠ ও বাঁশের নামকরা এক ঠিকাদার কোম্পানীতে। উইক-এণ্ডে এখানে আসেন যান।

দত্তবাবুর পরেই দেখা হল রায়বাবুর সংগে। উনি এখানের অন্যতম পুরোনো বাসিন্দা। বয়স পঁচাত্তর হয়েছে—কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। হেসালঙ ও খিলাড়ির হাটে এখনো নিজে যান, এখনো রোজগার করেন নানা কিছু করে। মাইলের পর মাইল হেঁটে এর বাড়ি তার বাড়ি গিয়ে খাল-খরিয়াত্ শুধোন।

আজ থেকে অনেক বছর আগে যখন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা এখানের দশ হাজার একর পাহাড় ও জঙ্গল সরকারের থেকে নিয়ে 'কলোনাইজেশান সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার' পত্তন করে এখানে কলোনী করেন তখন থেকে উনি এখানে আছেন। তখন এ জায়গাটার চেহারা নাকি অন্যরকম ছিল। রাস্তাঘাট সব চমৎকার ছিল। অনেকের বাড়িতেই নাকি গাড়ি ছিল। প্রত্যেক বাড়িতে যাবার মত মোটরের রাস্তা ছিল। সকাল-বিকেলে ফুটফুটে মেয়েদের দেখা যেত গান গাইতে গাইতে গরুর-গাড়ি চালিয়ে ক্ষেত-খামার থেকে আসতে যেতে। তখনই বসু সাহেবের ফার্মেরও পত্তন হয়। বিরাট জায়গা নিয়ে ফল ও ফসলের চাষ। এখনও সে ফার্ম আছে, তবে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এখন কিনে নিয়েছেন সে ফার্ম।

রায় বাবুর মদের দোকান ছিল এখানে সেই সময়। 'ফরেন-লিকার শপ'। বলছিলেন, পুরো বিহারে তখন তাঁর দোকানের বিক্রী ছিল সবচেয়ে বেশী। এ জায়গাটার চেহারা কি ছিল এখন দেখে বোঝার উপায় নেই।

তারপর দেশ স্বাধীন হবার পরই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা একে একে এখান থেকে সরে পড়তে লাগলেন, কেউ ইংল্যাণ্ড, কেউ কানাডা, বেশীর ভাগই অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিলেন। বাড়িগুলো সব একে একে বিক্রী হয়ে গেল। তাদের বদলে জঙ্গল-পাহাড় ভালোবাসেন এমন ভিনদেশী লোক এসে এখানে জমতে লাগলেন। এখন জায়গাটা দেশী, বিদেশী ও স্বল্পসংখ্যক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আন্তর্জাতিক জায়গা হয়ে গেছে।

প্রসাদ সাহেবদেরও দেখলাম। আলাপ নেই ওদের সংগে। মিলিটারীতে ছিলেন প্রসাদ সাহেব। এখন রিটায়ার করে, এখানে আছেন। জোত-জমি করেন।

ওঁর মেয়েটিকে দেখলেই আমার মন বড় খারাপ লাগে। ভারী সুন্দরী, বিয়ের অল্প কিছুদিন পরই স্বামী প্লেন ক্র্যাশে মারা যান। তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে সে মা-বাবার সংগে এখানেই থাকে। ম্যাকলাস্কি-গঞ্জের এই বন-পাহাড়ে ও নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে যা দিয়ে ওর একাকীত্বও ভরিয়ে রাখে।

শাদা পোষাক পরা এই সুন্দরী মেয়েটিকে যখনি দেখি, তখনই মন এক পবিত্রতায় ভরে যায়। বিষাদেরও বোধহয় কোনো নিজস্ব পবিত্রতা আছে। তাই ওর প্রতি এক নীরব সমবেদনায় মন হু হু করে ওঠে।

হাট শেষ করে বাড়ি ফিরব, এমন সময় মিসেস কার্ণির সংগে দেখা, মিসেস মেরেডিথের ভাগ্নীর সংগে ইয়াং-লেডি হাটে এসেছেন। আমাকে বললেন, পালাবে না, আজ আমার সংগে বাড়ি চল, আমার ওখানে খেয়ে যাবে।

বললাম, বেশ। তাই-ই হবে।

মালুকে বললাম, বাড়ি ফিরে যেতে। তারপর বাড়ির পথেই যায় না শুঁড়িখানার মোড়ে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে যায় তা লক্ষ্য করার পর নিশ্চিন্ত হলাম যে ও বাড়ির দিকেই যাচ্ছে।

বেলা পড়ে এসেছিল। হাট শেষ করে সবাই একে একে বাড়ির দিকে ফিরছিল। যাদের সওদা কেনা হয়ে গেছে, যাদের বেচাও শেষ, তারা সবাই-ই।

এক সময় মিসেস কার্ণির সংগে হাট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ছোট মেয়ের মত ফুটফুটে বুড়ো হাই-হিল জুতোর খুট-খাট আওয়াজ করে পাশে পাশে হাঁটছিলেন।

বয়স হয়ে গেলে সব মানুষই বেশী কথা বলেন, তাদের বোধহয় মনে হয় তাঁদের এত কথা বলার ছিল, অথচ বলা হল না; বোধহয় মনে হয়, এখন না বলে ফেললে পরে আর বলা যাবে না। কিংবা হয়ত তাঁদের কথা শোনার মত লোক জোটে না, যুবক-যুবতীরা তাঁদের এড়িয়ে চলে। তাই যদি কেউ মনোযোগ সহকারে তাঁদের কথা শোনেন, তাদের কিছু-বাকী না রেখেই তাঁরা সব কথা শোনাতে চান।

মিসেস কার্ণির বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন আলো চলে গেছে। কিন্তু পশ্চিমের আকাশে তখনো লালচে আভা। এক ঝাঁক মেঠো বক তাদের লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যার আকাশে দুলতে দুলতে টাঁড় পেরিয়ে নাকুটা পাহাড়ের নীচে ফিরে চলেছে।

চওড়া বারান্দা এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। রেলিং দেওয়া। পর পর অনেকগুলো ঘর। প্রত্যেক ঘরের সংগে এ্যাটাচড্ বাথরুম। উপরে টালির ছাদ।

এক পাশের দুটি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে বসু ফার্মের একজন কর্মচারীকে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। সপরিবারে তিনি থাকেন সেখানে।

বাকি তিনটি ঘর মিসেস কার্ণি আগন্তুকদের ভাড়া দেন। বাইরে বড় করে হলুদের উপর সাদায় লেখা আছে 'রেস্ট হাউস'। আট টাকায় থাকা-খাওয়া।

বেড়াতে এসে এখানে একাধিক বার ছিলাম। থাকা তেমন আরামপ্রদ না হলেও খাওয়া এবং মিসেস কার্ণির যত্ন-আত্তির তুলনা নেই।

বারন্দার অন্য প্রান্তে—একটু আড়াল করে মিসেস কার্ণির ড্রইংরুম। তারই পাশে ছোট্ট লেখা-কাম-খাওয়ার টেবল। বারান্দার সামনে থেকে লতানো গোলাপ লতিয়ে উঠেছে। উঠেছে টবের মানি-প্ল্যান্টস।

মিসেস কার্ণি বললেন, বোসো, বোসো, আমি একটু কাজ সেরে আসছি। চা খাবে ত?

বললাম, খাব।

একটু পর ওঁর আয়া এসে চা দিয়ে গেল।

মিসেস কার্ণি গায়ে গরম কোট চাপিয়ে এসে সামনে বসলেন।

টেবলের উপর ওঁর যৌবনের একটা ফোটো ছিল। রাইডিং-ব্রিচেস পরা ফুটফুটে একটি দপদপানো দামাল মেয়ে। সেই ফোটোর দিকে চেয়ে আজকের সাতষট্টি বয়েস বুড়ীকে চিনতেও কষ্ট হয়।

একদৃষ্টে ঐ ফোটোটার দিকে চেয়েছিলাম।

তিনি বললেন, কি দেখছ?

আমি জবাব দিলাম না, হাসলাম।

মিসেস কার্ণিও হাসলেন, বললেন, আমার ছবি নয়, বলো আমার অতীতকে দেখছ। আমার পুরোনো আমিকে দেখছ।

তাকিয়েই ছিলাম—সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী একটি হাসিখুশী মেয়ে—কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোঁকড়া চুল—হাসিমুখে চেয়ে আছে সে সামনের দিকে।

বললাম, আপনার কষ্ট হয় বুঝি এই ছবি দেখলে?

তিনি বললেন, নট এ্যাট অল। আমি এখনও খুশী। এজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট—আই হ্যাভ ভেরী মাচ এনজয়েড দিস লাইফ-এন্ড আই এনজয় ইট ইভিন টু-ডে'।

তারপর বললেন, শুধু বড় একা একা লাগে মাঝে মাঝে। এছাড়া—আমি খুব খুশি। লাইফ ইজ আ ওয়াণ্ডারফুল থিং বুঝলে। আমি আবার প্রথম থেকে সুরু করতাম, আমার পাঁচ-বছর বয়স থেকে, যদি আমাকে ভগবান সে সুযোগ দিতেন।

এ অবধি বলেই উনি চুপ করে গেলেন, তারপর বললেন, দাঁড়াও তোমাকে আমার ও মিস্টার কার্ণির সব ছোটবেলার ছবি দেখাচ্ছি—হোয়াট আ ওয়াণ্ডারফুল টাইম উই হ্যাভ। আই রিয়্যালি ডু মিস মাই ম্যান।

শোবার ঘর থেকে মিসেস কার্ণি অনেকগুলো ছবি নিয়ে এলেন, দু-তিনটি এ্যালবাম ভর্তি ছবি। ও'র বাবা-মার ছবি—ও'র শ্বশুরবাড়ির অনেকের ছবি। ও'দের হানিমুনের ছবি।

মিসেস কার্ণি বলছিলেন, জানো, শেষ বয়সে মিস্টার কার্ণি অন্ধ হয়ে গেছিলেন।

যে-লোকটা ভীষণ চটপটে ছিল, কাজের লোক ছিল, যে আমাকে সারা জীবন সব রকম আরামে, আনন্দে রেখেছিল সে লোকটার শেষ বয়সে যে কী দুর্দশা হয়েছিল তা কি বলব।

এই আমি, এই অবলা নারী, এই মিসেস উইনিফ্রেড কার্ণিই তখন তার সব-কিছু ছিল।

আমার হাত ধরে তাকে চলতে হত আমার রোজগারে তার খেতে হত—তার পক্ষে সেই শেষের দিনগুলো বড় লজ্জার ছিল।

কোন আত্মসম্মানজ্ঞানী পুরুষমানুষ স্ত্রীর উপরে নির্ভর করে, তার দয়ায় বেঁচে থাকতে চায়, বলো? অবশ্য পুরুষদের এটা অন্যায়। তারা যদি আমাদের ভালোবাসে, তবে তাদের মনে কোনো দৈন্য থাকা উচিত নয় এ বাবদ। একে দৈন্য বলা যায় কি না জানি না, তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমরা মেয়েরা পুরুষদের এই সম্মানজ্ঞান বা দম্ভ যাই-ই বল, কিন্তু পছন্দ করি। কি জানি, মনে হয়, যে-পুরুষের এই সম্মানজ্ঞান নেই, যে এমন অবস্থায় নিজেকে অসহায় ও কর্তব্যচ্যুত বলে মনে করে না, তাকে কোনো মেয়ের পক্ষেই ভালোবাসা সম্ভব নয়।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা দুজনে চুপ-চাপ বসেছিলাম। ও'র কথার উত্তরে আমার কিছু বলার ছিলো না।

অনেকক্ষণ পর মিসেস কার্ণি বললেন, জানো মিস্টার বোস, উনি মারা যাবার আগে আগে অন্ধ হাতে হাতড়ে হাতড়ে আমার হাত খুঁজে নিয়ে নিজের হাতে নিতেন, আর ধীরে ধীরে বলতেন, আমার হাতে হাত রাখো, আমার বড্ড শীত করে। বলতেন, ও মাই গার্ল, তুমি তোমার এই ছোট ছোট গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত হাত দুটি দিয়ে কী কষ্টই না করছ, কত কষ্ট দিলাম তোমাকে আমি—। তোমার এই সুন্দর হাত দুটি দিয়ে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর বিরুদ্ধে তুমি একা-একা লড়াই করে গেলে, তোমার জন্যে আমার সারা জীবনে আমি যা, না করলাম, তুমি আমার জন্যে এই শেষ জীবনে তার অনেক গুণ বেশী করলে। বলতেন, সুইটি গার্লি, আবার যদি তোমার সঙ্গে কখনো দেখা হয়, অন্য কোনো জন্মে, কখনো যদি আবার যৌবনাবস্থায় দু'চোখ খুলে তোমাকে দেখতে পাই, ত দেখবে, আমি কি করে তোমার ঋণ শোধ করি।

বলতে বলতে মিসেস কার্ণির দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

বাইরে ঝিঁ-ঝিঁর শব্দ জোর হল।

ভারী একটানা ভোঁতা আওয়াজ তুলে ডিজেল-টানা মেরুনরঙা মালগাড়ি চলে গেল অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাড়কাকানার দিকে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। এখন কিছু বলা উচিত নয়, বলার নেই।

একটু পরে খাবার এল। খাবার বলতে কিছুই নয় তেমন। আণ্ডা কারী, ও পাঁউরুটি, সঙ্গে পেয়ারার জ্যাম।

মিসেস কার্ণি তাঁর গেস্টহাউসের অতিথিদের যেমন ষোড়শোপচারে খাওয়ান, নিজে তেমন খান না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে রাত আটটা বাজল। রাত আটটা এখানে শীতের রাতে অনেক রাত।

যাবার সময় উনি একটা টর্চলাইট ধার দিলেন আমাকে। বললেন, কাল মালুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

উনি রেলিং ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন—আমি পেছনে শর্টকাট দিয়ে বেরিয়ে এসে দীখাচাঁদের দোকানের সামনের মাঠে পড়লাম। অন্ধকার হলেও আকাশে এক ফালি চাঁদ ছিল, আর ছিল নক্ষত্র মণ্ডলী। কোমরে তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কালপুরুষ এক প্রাগৈতিহাসিক স্থবিরের মত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পাহারা দিচ্ছিলেন। অগণিত তারারা এই হিমের রাতে তাদের নীলাভ সবুজ চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

প্রথমে বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। তারপর একটু হাঁটতেই গা গরম হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে মাঠ পেরিয়ে এলাম।

ঝর্ণা পেরিয়ে, সেই ভূতের বাড়ির পাশ দিয়ে একা একা সান্ধকার শিশির-ভেজা পথে যেতে যেতে মিসেস কার্ণির কথাগুলো কানে বাজছিল, 'লাইফ ইজ আ ওয়াণ্ডারফুল থিং'।

কিন্তু আমার কেন এ কথা একবারও মনে হয় না।

আমার এই ভরা-যৌবনে — আমার এই সমস্ত বকম আপাত-প্রাপ্তির মধ্যেও কেন মন আমার সব সময় এমন অশান্ত থাকে? কেন এমন পাগলের মত ছটফট করে? না কি, আমি একাই নই, সবাইই এরকম, প্রত্যেক মানুষ ও মানুষীর মনের ভিতরেই বুঝি এমনি একটা মন থাকে, যে মনটা প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্রোহীর মত মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, যা পেল, তাকে ধুলোয় ফেলে, অন্য কিছুর দিকে হাত বাড়ায়।

মাঝে মাঝে আমার নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছা করে। কেন সুখী হতে পারলাম না সহজ পথে—সকলে যেমন করে সুখী হয়? কেন সর্বক্ষণ একটা কাঁকড়া-বিছে আমাকে এমন করে কামড়ায়? কেন?

(৯)

কালকের ডাকে ছুটির একটা চিঠি এসেছিল।

ছুটি লিখেছিল, আপনি লিখেছেন যে আমার তৈরী সোয়েটার গায়ে দিলেই আপনার মনে হয় যে আমি আপনাকে দুহাতে জড়িয়ে আছি। এ কথা ভাবতেই ভাল লাগছে। আমি এবার থেকে প্রতি বছর আপনাকে একটা করে সোয়েটার বুনে দেব, আমি যেখানেই থাকি না কেন। আপনি কেমন আছেন, আগের থেকে ভাল কিনা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

কাল আমাদের কলেজ বন্ধ ছিল, কলেজের সেক্রেটারী মারা যাওয়ার জন্যে। এরকম হঠাৎ-ছুটিগুলো বেশ লাগে। কলিগরা অনেকেই দল বেঁধে সিনেমা দেখতে গেল। এখানে রাজেশ খান্না শর্মিলা ঠাকুরের একটা জমজমাট ছবি হচ্ছে। আমি যাইনি। আমারও একজন রাজেশ খান্না আছে, যে ম্যাটিনী আইডলের চেয়ে অনেক সত্যি, অনেক কাছের। কি? নেই?

হঠাৎ ছুটি পেয়ে খুব ভাল করে চান করলাম, তারপর ঘর গুছোতে বসলাম।

বইগুলোতে এমন ধুলো পড়ে যে, বলার নয়।

বই ঝাড়তে ঝাড়তে বইয়ের তাক থেকে আপনার লেখা তিন-চারটে বই বেরিয়ে পড়লো। আপনি নিজে হাতে লিখে দিয়েছেন আমার নাম। এসব বই আমি মনে ধরে কাউকে পড়তে দিতে পারি না। বইয়ের পাতায় পাতায় কত চেনা ঘটনা, কত হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি ঝিলিক মারে, আর আমি অমনি ভাবতে বসে যাই, কত কী ভাবি, কত কি।

বারে বারেই মনে হয়, আপনি আমাকে কত কি দিয়েছেন কিন্তু বদলে আমার আপনাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই, যা আছে তার দাম অতি সামান্য। আমি আপনাকে যা দিতে পারি তা যে-কোনো মেয়েই হয়ত দিতে পারে। অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়। অথচ আপনি আমাকে যা দিয়েছেন, প্রতিনিয়ত যা দেন, তা আমি পৃথিবীর অন্য কোনো পুরুষের কাছ থেকে পেতাম না। মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই, জানাই এ জন্যে যে, এ জন্মে কোনো এক আশীর্বাদ-স্বরূপ আপনাকে পেয়েছিলাম, সেই প্রাপ্তির জন্যে স্বাভাবিক কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি একজন সামান্য মেয়ে। আমি ভগবান মানি, এই চাঁদে-পাড়ি দেওয়া যুগেও। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার যা আছে আপনাকে আমি সবই সহজ সমর্পণে দিতে পারি। আমি চিরদিনই আপনার। আমি নিশিদিনই আপনাকে ভালোবাসি, আপনার কখন সময় হবে সেই অপেক্ষায় আমি ক্ষণ গুনি।

আমার সম্বন্ধে আপনার এখনও কি দ্বিধা আছে কোনো? এখনও কি আপনি বোঝেন নি, আপনি জানেননি, পুরোপুরি আমাকে?

আপনার আত্মবিশ্বাস এত কম কেন? আপনার চিঠি পড়ে আমার ভাল লাগেনি। আপনি আমার চোখে কি, তা আপনি কখনও জানেননি, তাই নিজের সম্বন্ধে অহেতুক দ্বিধা প্রকাশ করে নিজেকে আমার কাছে ছোট করেন। অমন আর কখনও করবেন না।

আপনি কি মনে করবেন জানি না, মাঝে মাঝে রমাদির জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে যে, যা তাঁর একান্ত ছিল, তাঁর সর্বস্ব ছিল, তা ধীরে ধীরে আমার হস্তগত হচ্ছে। এতে হয়ত আমার জয়ের আনন্দ বোধ করা উচিত ছিল স্বাভাবিক কারণে, কিন্তু সত্যি বলছি, এতে আনন্দের বদলে এক গভীর দুঃখ বোধ করি আমি।

আমি জীবনে কাউকে ঠকাতে চাইনি, নিজের সুখের জন্যে ত নয়ই। হয়ত এই বাবদেই আপনার চরিত্রের সংগে আমার সবচেয়ে বড় মিল। আপনিও ত দেখলেন যে আপনি কাউকে ঠকান আর নাই-ই ঠকান আপনার দুঃখ আপনাকে পেতেই হয়।

আপনি লিখেছিলেন যে রমাদির ব্যবহার আপনার আত্মবিশ্বাসের মূলে এক দারুণ আঘাত হেনেছে। আপনার মনে হয়, আপনি যেন কখনও কোনো মেয়ের ভালোবাসা পাবেন না, যেমন করে আপনি চান, যা আপনি চান, তা।

এ কথা আপনার ভুল, রাঙা দিদি! ভাবিনি না এই নির্গুণ, নিরূপ মেয়েটির চেয়ে আরো ভাল কেউ, যোগ্য কেউ এসে আপনাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে ততদিন আপনি আমার। রমাদি যদি তাঁর প্রাপ্তির অমর্যাদা করে থাকেন ত তিনি নিজেকেই ঠকিয়েছেন, এতে আপনার মনোবেদনার কারণ কি তা ত আমি বুঝতে পারি না।

আমার দুঃখ এই যে, আমার ম্যাটেরিয়াল যোগ্যতা যদি আরো বেশী থাকত, অন্ততঃ হাজারখানেক টাকা মাইনে পেতাম কোথাও যদি, তাহলে আপনাকে কোর্ট-কাচারী ছাড়িয়ে শুধুমাত্র লেখকে পর্যবসিত করতাম। আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চেতাম না—শুধু আপনার চাওয়ার দিকে মুখ করে দিন গুনতাম। আমার বেশ একটা ছোট ছিমছাম কোয়ার্টার থাকত—একফালি বারান্দা থাকত—কাছোপিঠে বড় বড় মেহগিনী গাছ থাকত—শীতের রোদে মেহগিনীর পাতা কাঁপত—আপনি শাল গায়ে দিয়ে বসে চশমা-নাকে একমনে লিখছেন আর আমি আপনাকে আড়াল থেকে দেখতাম—দেখতাম, আর গর্বে মরে যেতাম। আমার এ জন্ম সার্থক হত।

একজন লেখকের অনুপ্রেরণা হবার চেয়ে মহত্তর আর কিছু হবার কথা আমার মত সামান্য একজন মেয়ের ভাবনার বাইরে। এর চেয়ে বড় সার্থকতা একজন নারীর জীবনে আর কি হতে পারত?

আসলে রমাদির মত অত লেখাপড়া জানা অত die-hard মেয়েকে বিয়ে করা আপনার উচিত হয়নি।

কিছু মনে করবেন না, রমাদিকে হাসপাতালের ডাকসাইটে মেট্রন বা কোনো কলেজের প্রলয়ংকরী প্রিন্সিপাল হলে মানাত, রমাদিরা কোনো দিন কোনো পুরুষকে নির্ভর করে, তার জন্য বাঁচতে শেখেন নি। তাঁরা যেহেতু শিক্ষিতা, যেহেতু তাঁরাও মাস পোয়ালে মোটা অংকের চেক নিয়ে বাড়ি ফেরেন তাঁরা ভাবেন তাঁরা, বুঝি পুরুষের সমকক্ষ। আমার কিন্তু চিরদিন মনে হয় এ ভাবনাটা ভুল। ঘরের বাইরে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির যতই বড়াই থাক না কেন, ঘরের মধ্যে পুরুষের সংগে প্রতিযোগিতায় নামাটা মূর্খামির কাজ। প্রাকৃতিক নিয়মেই আমরা জীবনের সব নরম ক্ষেত্রে পুরুষের পরিপ্রেক্ষিতে প্যাসিভ রোলেই অভিনয় করি। আপনারা ভালবাসতে জানেন, আমরা ভালোবাসা গ্রহণ করতে জানি। এমনকি আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব, মাতৃত্বের সমস্ত গর্বও আপনাদেরই দান-নির্ভর। ঘরের মধ্যে অথবা শয্যালীন হয়ে যে-মেয়ে পুরুষের সংগে প্রতিযোগিতা করতে চায় তার কপালে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। আমি এ যুগের মেয়ে হয়েও এ কথা জোর গলায় বলতে ভয় পাই না। আমি গোঁড়া নই, আমি প্রাচীন-পন্থী নই, (নই যে তার প্রমাণ হয়ত আপনি পেয়েছেন) তবু আমি বলব যে, আমি একজন মেয়ে এবং সেই সুবাদেই আমার স্থান কোথায় তা আমি জানি। ভাগ্যক্রমে আমাদের স্থান এত সুবিন্যস্ত যে, যে-সব মেয়ে সেই উচ্চাসন থেকে নেমে এসে পুরুষের সংগে প্রতিযোগিতায় নেমে গার্হস্থ্য পরিবেশ অসহনীয় করে, তাদের বোকা না বলে পারি না।

আর কিছু লিখব না, অনেক এক্তিয়ার বহির্ভূত কথা বলে ফেললাম। হয়ত এত কথা কলমের ডগায় আসত না, যদি না রমাদিকে আমি ভালবাসতাম। আমি জানি, আমি আপনাকে ভালোবাসি বলে রমাদির অনেক অত্যাচার আপনার সহ্য করতে হয়। কিন্তু তাতে আমার জেদই যে বাড়ে, আপনাকে পুরোপুরি করে পাওয়ার ইচ্ছেই যে আরো তীব্র হয়, একথা রমাদি বুঝলে আরো ভাল করতেন। আপনাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপনি ডাইভোর্স পান কি না পান অথবা পেতে চান কি না চান, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি শুধু জানি যে, আপনি আমার, আমার একান্ত। আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমি যতদিন বাঁচব আপনার পাশে থাকব। আপনার মনের পাশে; আপনার শরীরের পাশে। বদলে আমি কিছু চাই না। আমি স্বাবলম্বী। আমাকে আপনার খাওয়াতে-পরাতে হবে না, আমার কোনো জাগতিক দায়িত্ব নিতে হবে না; আমার সন্তানের বাবা বলে পরিচয়ও দিতে হবে না। বাৎসল্য রস আমার নেই। আমি বড় স্বার্থপর। আমার শরীর, আমার জীবন, আমার সুখ, মনের সুখ, আমার শরীরের সুখকে আমি বড় ভালবাসি। আমি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভালোবাসি, আমি অনেক অনেকদিন বাঁচতে চাই। শুধু আমার এই আপনাকে ঘিরে যা ইচ্ছা তা আমাকে এ জন্মে সফল করতে দিন। আপনার কাছে আমার শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।

সমাজকে আমি ভয় করি না। আমি কাউকে ভয় করি না। আপনাকে আমার করে পাবার জন্যে আমার সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক আমি ছিন্ন করতে রাজী। ভাবাবেগের বশে এ সব কথা বলছি না। এ আমার বহু বছরের ভাবনালব্ধ কথা। এ কথা লেখার আগে আমি অনেক অনেক দিন ভেবেছি। আমার কাছে জীবন এক দারুণ আনন্দময় অনুভূতি—এই আনন্দে আমার নরম ভাবুক মন, আমার অনেক বিপদ-আপদ ও দুর্নামের হাত থেকে বাঁচিয়ে-রাখা অনাঘ্রাত অনভিজ্ঞ নারীশরীর সবাই সোৎসাহে ভাগ নেবে। আপনার জীবনের আমাকে শুধু অংশীদার করুন।

আগে থাকতে দেবার মত মূলধন আমার কিছু নেই; আমাকে আপনার জীবনের ওয়ার্কিং-পার্টনার করে নিন—শেষবেলায় দেখবেন, জীবনের ব্যালান্স-শীটের পাতাগুলি ভারী হয়ে উঠেছে পাওয়ার পুঁজিতে। আমার জীবন, আমার জীবন সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস, আমার বাঁচার তাগিদই আমার একমাত্র মূলধন। এই মূলধন আমি আপনাতে লগ্নী করতে চাই—সুদ ছাড়াই, কোনোরকম শর্ত ছাড়াই। কি? নেবেন না? আমাকে নেবেন না আপনি?
—ইতি, আপনার পাগলী ছুটি।

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম।

এবারে ছুটি যখন এসেছিল তখন ওর মুখ ও হাবভাব দেখে ওকে খুবই ডেসপারেট বলে মনে হয়েছিল—আজ ওর চিঠির মধ্যে ওকে সম্পূর্ণভাবে দেখা গেল।

কি করব আমি জানি না। আমি জানিনা আমার কি করা উচিত। রমার প্রতি আমার অভিযোগের অন্ত নেই, হয়ত রমারও আমার প্রতি অনেক অভিযোগ আছে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই আছে। হয়ত আমার দোষ ওর চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু আমি এখনও ওকে ভালোবাসি। একে ঠিক ভালোবাসা বলা উচিত কিনা জানি না, হয়ত এটা কর্তব্যবোধ, হয়ত এটা অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে যে যুক্তিহীন মমতা জন্মায় অন্যের প্রতি, তাই। হয়ত এ আমাদের একমাত্র ছেলের প্রতি, তার ভবিষ্যতের প্রতি মমত্ববোধ।

হয়ত আমাদের মতই আরো লক্ষ লক্ষ বিবাহিত দম্পতি এমনি করে দাম্পত্যের অভিনয় করে চলেছেন, ক্লাবে, পার্টিতে, সামাজিক উৎসবে। সকলের সামনে ভাব দেখাচ্ছেন কত প্রেম। হাসছেন, এসে অন্যকে ডার্লিং বলছেন, তারপর বাড়ি ফিরে এয়ার-কন্ডিশনড বেডরুমে মোটা ডানলোপিলোর গদীর উপর দুটি প্রাণহীন মোমের মূর্তির মতো দুজন দুদিকে শুয়ে থাকছেন। গায়ে গায়ে লেগে থেকেও হাজার মাইল ব্যবধানে আছেন।

কিন্তু কেন? কেন আমার সাহস হয় না, আমার জোর আসে না হৃদয়ে এই মিথ্যে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার? জীবন কি সত্যিই এত অবহেলার জিনিস? জীবন ত একটাই—একবারই আসে। তবে সে জীবনও আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও নিজেদের সাধ অনুযায়ী ভোগ করতে পারি না কেন?

এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে সে সব দিনের কথা। আমি তখন লিঙ্কনস্ ইনে। আমার এক ইংলিশ বন্ধু স্টিভের বাবার কান্ট্রী-হাউসে ডে-স্পেণ্ড করার নেমন্তন্ন ছিল এক রবিবার। সেখানে সুইমিং পুলের পাশে উইলো গাছের নোয়ানো ডালের নীচে প্রথম দেখেছিলাম কলকাতার নরম মেয়ে রমাকে। প্রথম দেখাতেই দারুণ ভাল লেগেছিল। সবচেয়ে প্রথমে যা চোখে পড়েছিল তা রমার মিষ্টি ব্যবহার ও ওর ফিগার।

ছোটবেলা থেকেই মোটা মহিলাদের সম্বন্ধে আমার ভীষণ একটা ভীতি ছিল। হয়ত অতিমাত্রায় রোম্যাণ্টিক ছিলাম বলে। একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত মোটা মহিলাদের মহিলা বলে স্বীকার করতেই চাইতাম না। আমার মাইডিয়ার জ্যাঠামশায় (যাঁর কাছে আমি ছোটবেলা থেকে মানুষ আমার মা-বাবার একসঙ্গে প্লেন-ক্র্যাশে মৃত্যুর পর থেকে)—বলতেন, সুকু, তোর এত ফিগার-ফিগার বাতিক কেন? কেন তা ছিল, তখন নিজেও তা বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। আজও পারি না। হয়ত মেয়েদের আমি ফুল, প্রজাপতি, হলুদবসন্ত পাখিদের মত ভালবাসতাম বলে, হয়ত মেয়েদের সঙ্গে প্রকৃতির, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের এবং সঙ্গীতের সঙ্গে সৌন্দর্যের একটা ওতপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ খুঁজতে চাইতাম বলে।

জানি না, কেন? কিন্তু নিজেদেরই অযত্নে ও অবহেলায় যারা অসুন্দরী সে-সব মেয়েদের উপর খুব রাগ হত তখন। ভগবান মুখ, চোখ, গায়ের রঙ এসব সকলকেই সমান দেন না। কিন্তু যাকেই যা দেন না কেন, যা দিয়েছেন তাকে সুন্দর করে সযত্নে রাখতে, নিজেদের অন্যের চোখে সুন্দরভাবে প্রতিভাত করতে যে মেয়েরা পারত না জানত না, তাদের উপর আমার একটা অহেতুক বোকা-বোকা নিষ্ফল ছেলেমানুষী রাগ ছিল।

রমার ফিগার দেখে আমার ওকে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বলে মনে হয়েছিল—সে সংজ্ঞার পরিপূরক হয়েছিল ওর লাজনম্র শান্ত ব্যবহার।

কোন অজ্ঞাত কারণে জানি না, রমারও আমাকে দারুণ ভাল লেগেছিল।

কিছুদিন মেলামেশার পর দেশে আমার কোনো রকম সম্পত্তি নেই, হাইকোর্টের ব্যারিস্টার পাড়ায় মামা-মেসো কেউ নেই সমস্ত জানার পরও বিত্তশালিনী, রূপবতী উচ্চ-শিক্ষিতা রমা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই একথা আমার বলা অন্যায় হবে যে ও আমাকে ভালো না বেসে আমার পটভূমিকে ভালবেসেছিল: কারণ কোনো আর্থিক পটভূমি আমার ছিলো না। সেদিন ও হয়ত সুকুমার বোস মানুষটাকেই ভালবেসেছিল।

রমার কোর্স শেষ হল, আমিও ব্যারিস্টার হলাম। তারপর দুজনে একসঙ্গে দেশে ফিরলাম বিয়ের এক বছর পরে।

এখানে এসে প্রথম চার পাঁচ বছর রমা চাকরি করেছিল। ভাল চাকরি। আমার জন্মদিনে, আমাদের ছেলে রুণের জন্মদিনে রমা নিজের রোজগারে ঘটা করে পার্টি দিত। যা ছুটি জানে না, তা হচ্ছে, রমা গত দুবছর হল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

ও চাকরি করুক তা আমার কোনো দিনও ইচ্ছা ছিল না। ওকে বলেছিলাম নিজে একটা পলি-ক্লিনিক করতে—তাতে নিজেও ব্যস্ত থাকবে এবং দশজনের উপকারও হবে। কিন্তু ও শোনে নি।

এখন পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় যা ঘটেছে তার দোষটা সম্পূর্ণই আমার। অথচ তবুও পুরোপুরি নিজেকে দোষী করতে পারি না।

আমার অপরাধ এই যে, জীবনে আমি বড় হতে চেয়েছিলাম, আমার বাবা ছোটবেলায় বলতেন, দশজনের মধ্যে একজন হতে হবে তোমায়। দশজনের মধ্যে একজনই হতে চেয়েছিলাম আমি, চেয়েছিলাম যেখানে যাব সেখানে আমার সম্মান করবে, সবাই আমাকে চিনবে, জানবে। হাই-কোর্টে আমি নাম করতে চেয়েছিলাম।

বিয়ের পর পর দেশে ফিরে এসে আমার ছিপছিপে সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী, পায়ে পায়জোর পরে, নাকে শখ করে নথ পরে, দারুণ সাজে সেজে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলত, তোমাকে কিন্তু বড় হতে হবে বুঝলে, তুমি দেখো, তোমার সব হবে, বড় কিন্তু হতেই হবে। ও বলত, তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না, তুমি শুধু বড় হও।

বড় হতে চেষ্টা করতে লাগলাম। সকালে লাইব্রেরীতে বসে ঠিক দশটায় কোর্টে বেরিয়ে বিকেলে ফিরে কোনো রকমে একটু চা খেয়ে আবার লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতাম। দুটো তিনটে হয়ে যেত রাত। দাঁতে দাঁত চেপে বলতাম, আমাকে বড় হতে হবে। আমার সিনিয়র পাইপ-মুখে বলতেন, ইউ মাস্ট বার্ণ অল দা ব্রিজেস বিহাইণ্ড। বুঝলে সুকুমার, প্রফেশান ইজ আ জেলাস মিসট্রেস। তোমার স্ত্রীও নয়, মিসট্রেস। একটু হেলা করেছ কি অন্যের ঘরে গিয়ে পৌঁছবে।

আমি যখন শুতে যেতাম তখন আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের মত ঘুমিয়ে থাকত। আমারও শরীর বলে একটা জৈবিক ব্যাপার ছিল। মাঝে মাঝে সেটা স্বাভাবিক কারণে ক্ষুধার্ত বোধ করত। কিন্তু তখন রমাকে ঐ অবস্থায় দেখে সেই জৈবিক ব্যাপারটাকে চাবুক মেরে স্লিপিং-স্যুট পরে শুয়ে পড়তাম।

আমার খুব খারাপ লাগত। রমাকে সঙ্গ দিতে পারতাম না, ওকে নিয়ে একদিনও সিনেমায় যেতে পারতাম না, কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও না। রমা তখন যে কি করে দিন কাটাতো আমি এখনও ভেবে পাই না। ওর কথা ভাবলে এখনও খুব কষ্ট হয়।

কিন্তু দোষ কি আমারই একার? রমা যদি বলত, তোমাকে বেশী বড় হতে হবে না, তুমি নাম নাই বা করলে, তুমি সাধারণ হও, মোটামুটি রোজগার কোরো, কোর্ট থেকে ফিরে সামান্য কাজ করে তারপর আমায় নিয়ে বেড়াতে যেও—কোনোদিন ক্লাবে, কখনও বাপের বাড়িতে, কখনও কোথাওই না, শুধু গাড়ি করে একটু ঘুরে আসবার জন্যে। তাহলে, আমিও হয়ত সে সময়ে একবার ভাবতাম। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। শুধু প্রফেশানাল কাজ করলেও না হয় হত, আমি তার উপরে লেখক হতে চাইলাম।

টাকা আমি কোনোদিনও চাই নি। চেয়েছিলাম যশ, চেয়েছিলাম নাম। আর প্রফেশানের এমনই মজা যে, নাম যদি কারো হয়ই তখন টাকা এমনিতেই আসে—টাকাটা তখন ইনসিডেন্টাল হয়ে যায়।

আমি বড় হলাম, আমার নাম হল, আমার টাকা হল অথচ জীবনে আমি যা সবচেয়ে চেয়েছিলাম সেই সবকিছুই আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। আজ আমার মত নিঃস্ব, রিক্ত কেউই নেই।

আমারও দোষ নেই; রমারও দোষ নেই। কিন্তু হারিয়ে গেল।

এই অল্পবয়সে অনেক নাম হল, অনেক টাকা হল, কিন্তু আমার অনেকানেক বন্ধু যারা বোকার মত নাম করতে চায় নি, তারা আমার চোখের সামনেই আমার চেয়ে অনেক সুখী হল। তারা কোম্পানীর গাড়িতে পাঁচটায় বাড়ি ফিরে, বগলে সুগন্ধি সাবান ঘষে চান করে, তাদের হাত-কাটা ব্লাউজ-পরা সুখের বুদবুদ-তোলা স্ত্রীদের নিয়ে ছুটার শোয়ে ফুলফুল হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে সিনেমা অথবা ক্লাবে যেতে পারল প্রায় রোজই।

রমা বোধহয় আমাকে বড়ও হতে বলেছিল সেই সঙ্গে আবার আমার বন্ধুদের মতই হতে বলেছিল। ঐ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড রাখা আমার মত সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব হল না। কর্মজীবনের, লেখক জীবনের প্রথম কয়েক বছর আমার নিজের কোনো অধিকার ছিলো না আমার উপর। আমি তখন মক্কেলদের, প্রকাশকদের। আমার নিজের উপর কোনো দাবী ছিলো না আমার।

হঠাৎ একেবারে হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলাম যে আমার সুন্দরী ছিপছিপে স্ত্রী, একেবারে কর্পূরের মত উবে গেছে। সে যেন কী রকম হয়ে গেছে, রোগা হয়ে গেছে, অথচ তার কোনো রকম অসুখ ধরা পড়ল না।

নার্সিংহোমে একমাস থাকল, তবুও কিছু ধরা পড়ল না।

ও যখন নার্সিংহোমে চেক-আপের জন্যে থাকত তখন ওকে রোজই একবার কোর্ট ফেরতা দেখে আসতাম। তখন মাঝে মাঝেই সীতেশের সঙ্গে দেখা হত। সীতেশ ইংলণ্ডে গেছিল চার্টার্ড এ্যাকাউন্টান্সী পড়তে। পরীক্ষায় পাশ না করতে পেরে, ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে একটা কোর্স করে ফিরে এসেছিল। বড় লোকের ছেলে, বাপ-ঠাকুর্দার অনেক পয়সা ছিল, ওল্ড আলিপুরে বাড়ি ছিল, তাছাড়া ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই নাকি ছবিটবি ভালই আঁকত। ওর কালারকম্বিনেশনও খুব ভাল ছিল। সীতেশ বেশ ভাল ব্যবসা করছিল।

নার্সিংহোমে ওর স্ত্রী ছিলেন, ডেলিভারীর জন্যে। সেই সুবাদে বহুদিন পর ওর সঙ্গে দেখা হতে হতে আলাপটা আবার ঘন হল।

একসময় সীতেশের স্ত্রী বাড়ি চলে গেলেন কিন্তু সীতেশের নার্সিং-হোমে আসা বন্ধ হলো না।

একদিন কোর্টে ল্যাঞ্চের আগে আমার কোনো মামলা ছিলো না। মেনশান করার কাজ ছিল কয়েকটি—সে ভার জুনিয়রদের উপর দিয়ে আমি রমার নার্সিং হোমে গেলাম, সাড়ে দশটা নাগাদ। হঠাৎ গিয়ে পড়তে দেখি, সীতেশ বসে আছে রমার হাতে হাত রেখে। সীতেশ খুব স্মার্ট—হেসে বলল, রুগীর হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাত গরম করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, খুব ভাল, বেচারী ত সব সময়ই একা থাকে, ওকে ত আমি কখনোই কম্পানী দিতে পারি না, তুই যে দিচ্ছিস সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার চোখের দিব্যি আমার সেদিনের সে কথায় কোনো শ্লেষ, কোনো ভণ্ডামি বা মিথ্যা ছিলো না। আমি সত্যি সত্যিই যা বলেছিলাম তাইই বুঝিয়েছিলাম।

মনে মনে হয়ত সেদিন থেকে আমি সাবধান হতে আরম্ভ করেছিলাম। সেই দিনই প্রথম আমি কোলকাতার সবচেয়ে বড় সলিসিটরকে ফোন করে বলেছিলাম, আমাকে কম করে ব্রিফ পাঠাতে, সেদিন থেকে আমি পাঁচ মোহর ফী বাড়িয়ে দিয়েছিলাম যাতে আমার জীবনের সমস্ত সুখের বিনিময়ে যেন মক্কেলদের না পেতে হয়।

কিন্তু মানুষের মন এক দুর্জ্ঞেয় জিনিস। ব্রিফ সহজে বোঝা যায়, কোর্টে জজসাহেবদের মেজাজ বোঝা যায়, বিরোধী পক্ষের উকীলের প্রতিটি মস্ত, এন্টিসিপেট করা যায়, মন বোঝা যায় না, অন্ততঃ আমি যা বুঝতে পারলাম না, তা রমার মন।

আমার যতটুকু অপারগতা, ঘাটতি সমস্তটুকু সম্বন্ধেই আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম সবসময়ে, মনে এবং মুখে সবসময়েই তা স্বীকার করতাম। তবু রমা আমাকে ক্ষমা করল না। যে-দোষ ক্ষমা করা যেত সহজেই, সে দোষের জন্যে আমাকে চরম শাস্তি দিল।

ইতিমধ্যে আমি কিন্তু বদলে ফেলেছিলাম নিজেকে। ভীষণভাবে চেষ্টা করছিলাম বদলে ফেলার। কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরেই কাজে বসতাম না। যাতে রমার সঙ্গে বসে চা খেতে পারি, আমার সুস্নাতা সুগন্ধি স্ত্রীর মুখোমুখি বসে একটু গল্প-গুজব করতে পারি সেই চেষ্টা করতাম। রাতেও ডিনারের সময় ও তার পরে রাত নটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি কাজ করতাম না। যাতে ধীরে সুস্থে ডিনার খেতে পারি, ডিনারের পর ইচ্ছে করলে এবং রমার ইচ্ছে হলে রমাকে আদর করতে পারি।

কিন্তু তখন আমার এই পুনর্মূষিক হবার ইচ্ছা, নিজের কাছে নিজে ফিরে আসার সব ইচ্ছাই বিফল হল। বোধহয় খুব দেরী হয়ে গেছিল। বোধহয় দেরী হয়ে গেলে আর নিজের কাছে, নিজের স্ত্রীর কাছে, নিজের ঘরে আর কখনোই ফেরা যায় না।

মক্কেলদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে রমার সঙ্গে চা খাব গল্প করব বলে উপরে/উঠে এসে দেখতাম রমা ওর আকাশী-নীল হেরাল্ড চালিয়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, কেউ তা জানে না। ছেলের আয়া জানে না, বাবুর্চি জানে না, বেয়ারারা জানে না। যদি কখনও বলতাম, কোথায় যাও না যাও একটু বলে যেও— কখন কি দরকার হয় কে বলতে পারে? রমা উত্তরে ঝাঁঝালো গলায় বলতো, বলব না কোথায় যাই, কেন? তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?

সন্দেহ করিনি কখনো—কারণ যদি আমার স্ত্রীর আজ আমাকে পছন্দ না হয় সেই জানাটাই আমার কাছে যথেষ্ট অপমানের। তাই সন্দেহ করে নিজেকে আরো ছোট করতে চাইনি। সন্দেহ হত না; যা হত তা দুঃখ। নিদারুণ দুঃখ। একজনকে সুখী না করতে পারার দুঃখ। অথচ জীবনে নিজের জন্যে আমি কিছুই করিনি— যা করেছি, যতটুকু করেছি, জেঠিমা-জ্যাঠামশায়, রমা, আমার ছেলে, তাদেরই সুখের জন্যে। আমার সময়, আমার বিশ্রাম, আমার সব আনন্দর বিনিময়ে যাতে এদের সকলের ভাল হয়, সকলের সুখ হয়, সেই ভাবনায় সমস্ত সময় ব্যয় করেছিলাম।

মনে পড়ছে, একদিন খাওয়ার জন্যে রাতে উপরে এসেছি। সেদিন ভীষণ গরম গেছিল। চানটান করে বসবার ঘরের ডিভানে হেলান দিয়ে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছি। রমা আসবে, এলে এক সঙ্গে খাব, এই জন্যে অপেক্ষা করতে করতে।

অনেক রাতে বেয়ারা এসে আমাকে ডেকে তুলল, বলল, সাহেব, লাইব্রেরী কি বন্ধ করে দেব?

আমি বলাম, কটা বাজে?

—এগারোটা।

—বৌদি আসেন নি এখনও?

—হ্যাঁ! বৌদি এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছেন।

আমার সেদিন এমন এক দুঃখ-মিশ্রিত রাগ হয়েছিল যে সে বলার নয়। ইংরাজিতে বলে না 'এনাফ ইজ এনাফ,' আমার তাই মনে হয়েছিল। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি রমা বেড-লাইট জ্বালিয়ে শুয়ে শুয়ে স্টিরিও রেকর্ড শুনছে। আমি বললাম, তুমি আমার সামনে বাইরে থেকে এলে, দেখলে আমি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছি, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, তবু একবার জিগ্‌গেস করতে পারলে না আমি খেয়েছি কি না খেয়েছি, আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি না? বললাম, বাড়ির কুকুর বেড়ালের প্রতিও ত মানুষের এর চেয়ে বেশী সহানুভূতি থাকে।

রমা বলল, কেন করব? তোমার জন্যে আমার কোনো ফিলিং নেই। তোমার সম্বন্ধে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। কিছুই আর নেই।

সেদিনের পর থেকে আর কখনও রমাকে সঙ্গে খাওয়ার কথা বলিনি আমি। আমি এখন লাইব্রেরীতে খাই, বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। বিকেলের চাও তাই খাই। রমার প্রতি সমস্ত রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য করা ছাড়া আমার আর কিছু আজ করণীয় নেই—। করতে আমি চাই সব কিছুই— ভালবাসতে চাই, ভালবাসা পেতে চাই।

এত কাজ, এত টাকা, এত খ্যাতির মাঝেও বড় শীতার্ত লাগে—স্ত্রীর কাছে, একটু বসে, তার চোখের দিকে চেয়ে, তার সুগন্ধি গ্রীবায় আলতো করে একটু চুমু খেয়ে, তার কবোষ্ণ বুকের রেশমী বলে একটু মুখ ঘষতে ভারী ইচ্ছা করে।

কিন্তু আজ বহুদিন, বহু বছর রমা আমার কাছে পর্যন্ত আসে না, আমাকে শেষ আমার স্ত্রী কবে চুমু খেয়েছে ভালোবেসে, তা ভাবতে গেলে স্পষ্ট মনে পড়ে না, আমার শরীরের সব আর্তি, আমার মনের উষ্ণতা আমায় দিনের পর দিন একা একা বয়ে বেড়াতে হয়।

এভাবে, ঠিক এভাবে একজন বাঙালি গোবেচারা ভদ্রলোকই বেঁচে থাকতে পারে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, গুরুজন, লঘুজন, সকলের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করে প্রতি মুহূর্তে নিজের একটা মাত্র একবারের-মাত্র জীবনকে মর্মান্তিকভাবে নষ্ট করে— তারাই প্রশ্বাস নিতে পারে, নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। এর নাম কি বাঁচা? সব দিক দিয়ে নিজেকে এর চেয়ে বেশী করে কি ভাবে ঠকানো যেতে পারে?

অথচ টাকা আমার রোজগার করতেই হবে। পান থেকে চুন খসলে চলবে না। স—ব কিছুই চাই।— স—ব জাগতিক কিছু। অথচ তার বদলে কারো কাছে আমার পাওনা ছিলো না কোনো কিছু।

প্রায় বছর তিনেক হল রমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলেই রমা বলত তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই, আমি তোমাকে ডিভোর্স করব, যে ভাল, যে আমাকে ভালোবাসে, আমি তার সঙ্গে থাকব। এসব বলত, চাকর-বাকরদের সামনে। আমি বলতাম, আমি ত তোমাকে দয়া করে এখানে থাকতে বলিনি। তুমি মুক্ত, তুমি এই মুহূর্তে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যেতে পারো। যা করো, যা করবে, তা শুধু ডিসেন্‌টলি কোরো। কত লোকেরই ত ডিভোর্স হয়— ডিভোর্স ত গ্রেসফুলিও হতে পারে।

কিন্তু রমা ডিভোর্স আমাকে করবে না। অথচ আমার সঙ্গে যে-অমানুষিক দুর্বোধ্য অত্যাচার করার, তা করেই যাবে। আশ্চর্য! ওকে কিছুতেই বুঝতে পারি না। এখনও আমি ওকে খারাপ ভাবতে পারি না, এখনও মনে হয় ও কোনো ভুল করছে, কোনো সর্বনাশে ভর করে ও এমন বিনা-দোষে বিনা-কারণে আমার সঙ্গে এরকম করছে। তাই এখনও ওকে ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারি না। আমার এখনও ভাবতে কষ্ট হয় যে ওর প্রতি আমার কোনো ফিলিং নেই— কারণ আমি এখনও ওকে ভালোবাসি।

আমার জীবনের এমন একটা অন্ধ আঁধার সময়ে ছুটি আমার জীবনে খস আতরের গন্ধ মেখে এসেছিল, তাকে ঠেকানো যায়নি।

রমা কোনোদিন বুঝতে চায়নি, বোঝেনি সে। আমি উকীল হলেও আমি একজন লেখকও। একজন লেখকের জীবন কখনোই একজন সাধারণ লোকের মত হতে পারে না। তারা সাধারণের মতো হয় না। তারা অসম্ভব অনুভূতিপ্রবণ হয়, তাদের কল্পরাজ্যে অনেক ভাবনা ছেঁড়া-মেঘের মত আসে যায়। তাদের কোনো না-কোনো অনুপ্রেরণার দরকার হয়ই লিখতে গেলে।

অথচ আমি কিন্তু আমার কোনো সত্তা ও লেখক সত্তাকে আশ্চর্যরকমভাবে দুটো পাশাপাশি ঘরে বন্দী করে রেখেছিলাম— ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্টে—। উকীল মানুষটার এবং গৃহী মানুষটার সঙ্গে লেখক মানুষটার কোনো সংঘাত ছিল না।

রমার জীবনে আমি গৃহী ও সাধারণ মানুষ, সাধারণ একজন কৃতী স্বামী হিসেবেই পরিচিত ছিলাম। পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। রমা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আমার কল্পলোকের নায়িকাদের নিয়ে পড়ল। গল্পে যাই লিখি না কেন, আমার নায়িকারা যেরকমই হোক না কেন প্রত্যেককে ও চিনে ফেলতে লাগল। মানে ও মনে করতে লাগল ও চিনে ফেলেছে। ও কখনও বুঝতে চাইল না, নায়িকারা লেখকের মনের মধ্যেই থাকে—কোনো রক্ত-মাংসর মেয়ে হয়ত সেই মেয়ের ছায়ায় প্রতিফলিত হয় অথবা তার মুখ চিবুক তার চরিত্র হয়ত সেই কল্পনার নায়িকার মধ্যে সংক্রমিত হয় মাত্র।

এমন একটা অবস্থা হল যে, আমি যা করি তাই ওর কাছে খারাপ লাগতে লাগল। কোনো পার্টিতে গিয়ে কম কথা বললে, বাড়ি ফিরে ও বলত, তুমি এত দাম্ভিক কেন? গোমড়ামুখে রামগড়ুরের ছানা হয়ে থাকলে কি তুমি মনে করো তোমাকে ভাল দেখায় ?

যদি বা কখনো কথা বলতাম, হাসতাম, সহজ হতাম, লোককে মজার কথা বলে হাসতাম, ও বাড়ি ফিরে বলত, তুমি এত ক্যাবলা কেন? সব জায়গায় গিয়েই কি তোমার ভাঁড়ামো করতে হবে?

অফিসে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই একটা অস্বস্তিত্বে পৌঁছে দিয়েছিল রমা। এমন কি কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়াল করার সময়েও আজকাল আমার মনে সংশয় জাগত, বোধহয় জজসাহেবদের ইমপ্রেস করতে পারছি না। লিখতে বসলে, কেবলি মনে হত বোধহয় লেখাটা ভাল হচ্ছে না—যাঁরা পড়বেন, তাঁরা বোধহয় আমাকে বুঝবেন না—তাঁরাও বোধহয় রমার মত আমাকে নস্যাৎ করে দেবেন। কোথাও কোনো সুন্দরী মেয়ে হঠাৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকালে আমার ভয় হত, লজ্জা হত, আমি মুখ নামিয়ে নিতাম। আমার দু কান লাল হয়ে গরম হয়ে যেত। আমার মন বলত ও চাউনি ফেরত দিও না—তোমার মধ্যে ভালো লাগার মত কিছুই নেই। তোমাকে কারোই ভাল লাগবে না। তুমি জীবনের রেসে খোঁড়া ঘোড়ার মত বাতিল হয়ে গেছ চিরদিনের মত।

আমার জীবনের সেই দুর্দিনে ছুটি কালবৈশাখীর ঝড়ে ওড়া সুগন্ধি আম্রমুকুলের মত রাশ রাশ নরম আশায় আমার জীবন ভরে দিল। মিথ্যে করে বললেও, বলল যে আমাকে ওর ভালো লাগে, ডাকসাইটে উকীল হিসেবে নয়, বাড়ি-গাড়ির মালিক হিসেবে নয়, একজন নিছক পুরুষমানুষ হিসাবে একজন স্বল্পপরিচিত নতুন লেখক হিসেবে।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমার লেখা যদি আর কেউ নাও পড়েন, যদি কখনও ও লেখা কারো ভালো লাগার মত নাও হয়, তবুও মাত্র একজনের ভালোলাগার জন্যেও আমার কষ্ট করেও লেখা উচিত। শুধু ছুটির জন্যেই লেখা উচিত।

লেখা মাত্রই কষ্ট করে লিখতে হয়—। এমন কোনো লেখা, সত্যিকারের ভাল লেখা নেই, যা কষ্ট না পেয়ে এবং কষ্ট না করে লেখা যায়। কিন্তু আমার কষ্টটা অন্য কষ্ট। ওকালতী করতে করতে লেখাটা আরো বেশী কষ্টের। নিজের নিজস্ব অবকাশের বিনিময়ে লেখা। তাই ও লেখা খারাপ হলে খারাপ লাগলে, সে বড় মর্মান্তিক যাদের জন্যে লেখা তাঁদের দুঃখের।

যখন কোথাও কোনো আশা ছিলো না, হৃদয়ে, আমার নরম লজ্জানত লতার মত কোমল হৃদয়ে, যখন কাঁটার বন গজিয়ে উঠেছিল, যখন মানুষ কেন বাঁচে, বাঁচার মানে কি, জীবন বলতে কি বোঝায় এ সব কথার একটাই নীরেট অন্ধকার উত্তর আমার সামনে ছিল—সে উত্তর ছিল আত্মহত্যা—ঠিক সেই সময় ছুটি, আমার চেয়ে অনেক ছোট ছুটি একটা হলুদ তাঁতের শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে বেণী-ঝুলিয়ে এক রবিবার আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল—তার ভালোলাগার লেখককে দেখতে।

তারপর কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছিল আমার মধ্যে—হয়ত ছুটির স্বপ্নময় মুঠি-ভরা বুকের মধ্যেও—যার ব্যাখ্যা আমি জানি না। একটা আচ্ছন্ন আকৃতি বোধ করেছিলাম সেদিন, অন্ধকার নিশ্চিদ্র কারাগারের মধ্যে বসে, আলোয় ভরা আকাশের দিকে বুঝি হঠাৎ চোখ পড়েছিল।

ছুটি তার ছোট্ট মুখে ধীরে ধীরে আমাকে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়েছিল। ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় হয়েও সেসব কথা আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। সেসব কথা আগে হয়ত অনেকের কাছে শুনেছিলাম, অনেক বইয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু অন্তরের মধ্যে তা গ্রহণ করিনি। যে কিছু বলে এবং যাকে বলা হয় তারা দুজন যদি একই ওয়েভ-লেংথে ভাবের আদান-প্রদান না করে তাহলে সে কথা বিফল হয়।

হয়ত কারো অভিশাপে আমার ও রমার এই ওয়েভ-লেংথের গণ্ডগোল হয়ে গেছিল। ও যখন মিডিয়াম-ওয়েভে ওর যা বলার বলেছিল আমি তখন শর্ট-ওয়েভে কান পেতে ছিলাম। আমি আবার যখন কিছু বলব বলে মিডিয়াম ওয়েভের মাউথপীসের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন রমা সেই রিসিভারের কাছ থেকে হয়ত সরে গেছিল।

রমার সঙ্গে যদি বা কখনও মিটমাটের সম্ভাবনা ছিল, ছুটি আমার জীবনে আসার পর সে সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হয়ে গেল।

আমার কোনো উপায় ছিলো না। রমার জন্যে আমি দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করেছিলাম, ও আবার ওর পুরোনো মনের ঘরে ফিরে আসবে বলে।

অনেক বিবাগী হিয়াই বাহির পথে অনেক কিছুর খোঁজে যায়; কিন্তু খোঁজা শেষ হলে আবার সেই সুখের পুরোনো ঘরেই ফিরে এসে ছেঁড়া-আসন পেতে দুয়ার দিয়ে বসে।

আমি ভেবেছিলাম রমাও তাই ফিরবে।

কিন্তু রমাও বুঝি আমারি মত ভীষণ দেরী করে ফেলল—যে খোলা দরজাটি দিয়ে সে বেরিয়ে গেছিল সেই দরজা দিয়েই ছুটি স্বচ্ছলীলায়, সম্মানের সঙ্গে তার সরল ঋজুতায় ও ছেলেমানুষী সততায় ভর করে আমার মনে প্রবেশ করল। আমার শীতের রাতগুলি আমার দিনগুলি হঠাৎ এক বাসন্তী উষ্ণতায় ভরে গেল। আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা করল নতুন করে। পৃথিবীর অন্য কোনো লোকের অন্যায় মর্জি ও খেয়াল-খুশীর উপর যে আমার বেঁচে-থাকা-না-থাকা নির্ভরশীল নয়, ছুটিই তা আমাকে শেখাল। আমাকে বোঝাল, যে এ জগতে কেউই কাউকে কিছু নিজে থেকে দেয় না—যা পাবার তা নিজের অধিকারে শক্ত হাতে সুপুরুষের মত কেড়ে নিতে হয়। শেখাল সে আমাকে আমার নিজের জন্যে, আমার একার জন্যেই বাঁচতে হবে। আমার জীবন আমার নিজের কাছে সবচেয়ে দামী।

অগ্নিসাক্ষী করে কাউকে কোনোদিন বিয়ে করেছিলাম বলে, কাউকে সমস্ত উষ্ণতারভরা হৃদয় দিয়ে একদিন ভালোবেসেছিলাম বলেই সে আমার সেই নিবে-যাওয়া যজ্ঞের আগুনে, সেই ডিপ-ফ্রিজে-রাখা কোঁকড়ানো ঠাণ্ডা হৃদয়ের কবরে বাকি জীবন হাহাকারে কাটাতে হবে একথা ঠিক নয়।

ছুটিই বলেছিল, এখনো কাউকে নতুন করে ভালোবাসা যায়, এখনো হিম হয়ে যাওয়া হৃদয়ে তাপ সঞ্চারিত হতে পারে, এখনও আকাশ-ভরা আলো, পাখির ডাক, প্রজাপতির নাচ, কারো উষ্ণ নরম নগ্ন নির্জন হাতে হাত রাখার যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে।

আমি বাঁচব, আমি আবার নতুন করে বাঁচব ছুটি, তোমার হাত ধরে আমি আবার বাঁচব।

আমার বড় শীত করে ছুটি, আমার ভীষণ শীত করে, তুমি আমাকে একা ফেলে কোথাও যেও না, তুমিও আমাকে ধুলোয় ফেলো না, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই ছুটি, তুমি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।

যে লোকটা একা একা বাঁচতে চাইছে প্রশ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ফেলাকেই বাঁচা বলে জানত সে লোকটা মরে গেছে।

এখন সে তার জীবনে আবারও একান্ত পরনির্ভর। সেই দয়ার, ভালোবাসার; ভালো ব্যবহারের কাঙাল মানুষটাকে তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তোমাকে ছাড়া আমি কারুকে জানি না, কারুকে মানি না; কারুকে জানতে চাই না। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ছুটি, ও ছুটি, তুমি আমার এই অন্তরের একান্ত কথা কি শুনতে পাচ্ছ? সব কথাই কি মুখে অথবা লিখেই জানাতে হয়, এক হৃদয়ের কথা শব্দ তরঙ্গে ভেসে কি অন্য হৃদয়ে পৌঁছয় না? যদি নাই-ই পৌঁছয় ত কিসের ভালোবাসায় বিশ্বাস করি আমরা, কিসের আন্তরিকতা আমাদের? তুমি আমার এই এলোমেলো একলা নীরব স্বগতোক্তি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছ। পাচ্ছ না ছুটি?

(ক্রমশঃ)

পরিবৃত্ত
চন্দ্র
পৃথিবী
ডেফারেন্ট

চন্দ্রের গতি : টলেমির ব্যাখ্যা
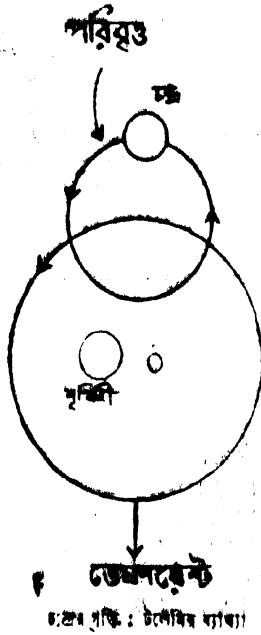
৫০০তম জন্মবার্ষিকী : নিকোলাস কোপার্নিকাস

কোপার্নিকাসের জন্ম আজ থেকে ৫০০ বছর আগে, ১৪৭৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। বিশ্বজগতের গঠনগত ধারণায় তিনি একটি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, সেজন্যে তিনি স্মরণীয়। বিপ্লব বলতে সাধারণত আমরা বুঝি—যা প্রতিষ্ঠিত তার ধ্বংসসাধন এবং নতুন কিছুর নির্মাণ। এই অর্থে কোপার্নিকাসের বিপ্লব সম্পূর্ণ ছিল না। কোপার্নিকাসের একমাত্র গ্রন্থ ‘স্বর্গীয় গোলকদের আবর্তন সম্পর্কে’—প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৪৩ সালে, তার আগে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে বিশ্বজগতের গঠনগত ধারণায় প্রশ্নাতীত নিশ্চয়তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল টলেমির তত্ত্ব। কোপার্নিকাসের গ্রন্থ কিন্তু টলেমির তত্ত্বকে টলাতে পারে নি, তার পরেও প্রায় দেড়শো বছর টিকে ছিল। এক-দুই করে শুধু বছরের হিসেব করলেও দেখা যায়, গ্রহদের গতি সম্পর্কিত কেপলারের ক্রান্তিকারী তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল কোপার্নিকাসের মৃত্যুর (কোপার্নিকাসের গ্রন্থের প্রকাশ ও তাঁর মৃত্যু একই সময়ে) [illegible] বছর পরে, গ্যালিলিওর বিচার কোপার্নিকাসের মৃত্যুর ৯০ বছর পরে। গ্যালিলিওকে [illegible] কার্ডিনালদের রায়টি এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে:

‘সূর্য বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং সূর্য স্থিতিশীল—এই বক্তব্য উদ্ভট, দার্শনিক বিচারে মিথ্যা, এবং যেহেতু এই বক্তব্য ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্যের সরাসরি বিরোধী অতএব স্পষ্টতই ঈশ্বরবিরোধিতা। পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয় এবং স্থিতিশীল নয় এবং বার্ষিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আহ্নিক গতিও আছে—এই বক্তব্যও সমান উদ্ভট ও মিথ্যা।’ শোনা যায় এই রায় শোনার পরেও গ্যালিলিও আপন মনে বলে উঠেছিলেন, ‘তবুও ও ঘুরছে।’ ‘ও’ মানে পৃথিবী। পৃথিবী তারপরে সত্যিই ঘুরেছে, অর্থাৎ টলেমির তত্ত্ব পুরোপুরি বাতিল হয়েছে। এ কৃতিত্ব বিশেষ করে কেপলার ও গ্যালিলিওর। তবে কেপলার ও গ্যালিলিওর সঙ্গে সমসাময়িক আরো একজন বিজ্ঞানীর নাম অবশ্যই করা দরকার, তিনি টাইকো ব্রাহে। ডেনমার্কের এই বিজ্ঞানী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই জ্যোতিষ্কলোকের অতি নির্ভুল সব পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন যেগুলো কেপলারের হাতে এসেছিল। আর গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণযন্ত্র নিয়ে জ্যোতিষ্কলোকের পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলেন ১৬০৯ সালে, তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘টলেমীয় ও কোপার্নিকীয়—দুই মুখ্য বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে কথোপকথন’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৩২ সালে, ইনকুইজিশনের (রোমান ক্যাথলিক গীর্জার বিচারকমণ্ডলী—অপরাধী ও পাপীদের যারা শাস্তি দিতেন) সামনে তাঁর বিচার ১৬৩৩ সালে, তাঁর মৃত্যু ১৬৪২ সালে এবং এই ১৬৪২ সালেই নিউটনের জন্ম যে-নিউটন থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু। নিউটনের ‘প্রিন্সিপিয়া’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৬৮৭ সালে, কোপার্নিকাসের গ্রন্থের ১৪৪ বছর পরে। অর্থাৎ কোপার্নিকীয় বিপ্লবের সূচনা মাত্র কোপার্নিকাসে, পূর্ণতায় কেপলার (তাঁর সঙ্গে টাইকো ব্রাহে), ও গ্যালিলিওয় সম্পূর্ণ নিউটনে। বিপ্লবের যে দিকটি ধ্বংসের তার প্রধান পুরুষ ছিলেন গ্যালিলিও ও অবশ্যই কেপলার। টাইকো ব্রাহে যদিও ছিলেন কোপার্নিকীয় তত্ত্বে অবিশ্বাসী এবং বিশ্বের গঠনগত ধারণায় নিজস্ব তত্ত্বের প্রবর্তক, তবুও বিপ্লবের ধ্বংসক্রিয়ায় সহায়ক হয়েছিলেন তাঁর আশ্চর্য রকমের নির্ভুল পর্যবেক্ষণ নিয়ে। আর বিপ্লবের যেটি নির্মাণের দিক সেখানেও কোপার্নিকাস মৌলিক নন। তাঁর জন্মের সতেরো-শ বছর আগে গ্রীক বিজ্ঞানী অ্যারিস্টার্কাস (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০—২৩০) তাঁর ‘সূর্য ও চন্দ্রের আকার ও দূরত্ব বিষয়ক’ গ্রন্থে ও অন্য একটি গ্রন্থে (যার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি, বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের লেখায় উল্লিখিত) যে তত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন তারই পুনরুজ্জীবন কোপার্নিকাসে। অ্যারিস্টার্কাসকে তাই বলা হয় গ্রীক যুগের কোপার্নিকাস। কোপার্নিকাস নিজে বড়ো পর্যবেক্ষক ছিলেন না। তাঁর গ্রন্থে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের উল্লেখ আছে মাত্র সাতাশটি [illegible]। তিনি নির্ভর করেছিলেন প্রাচীন গ্রীক ও আরবদের পর্যবেক্ষণের উপরে (যে-সব পর্যবেক্ষণে অনেক ভুল ও ভ্রান্তি ছিল),

কিন্তু সমস্ত কিছু সত্ত্বেও তাঁর কৃতিত্ব ও স্বকীয়তা এই যে, তিনিই প্রথম কোপারনিকীয় তত্ত্বকে একটি গাণিতিক ব্যাখ্যার ওপরে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। কোপারনিকীয় তত্ত্বের মূল কথাকে একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করতে হলে এইভাবে বলা চলে—সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আজকের দিনে কথাটা সামান্য কিন্তু টলেমির জ্যোতির্বীয় গ্রন্থ 'অ্যালমাজেস্ট'-এর পনেরো শ' বছরের অপ্রতিহত আধিপত্যের পরে এই কথাটিকে গণিতের ব্যাখ্যায় ওপরে দাঁড় করানোটাই ছিল বিরাট এক বিপ্লবকর্মের তুল্য, যার ফলে মানুষের সমগ্র চিন্তাধারায় এক মহাবিপ্লব সূচিত হয়েছিল।

কোপারনিকাস তাই স্মরণীয়। ৫০০তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি তাঁর এই বিপ্লবী ভূমিকা। তা অনুধাবন করবার জন্যে আমরা প্রথমে উপস্থিত করব তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তারপরে বিশ্বজগতের গঠনগত ধারণায় টলেমীয় তত্ত্ব ও কোপারনিকীয় তত্ত্ব।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কোপারনিকাসের জন্ম ১৪৭৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। জন্মস্থান ভিশ্চুলা নদীর তীরে তোরুন। পোল্যাণ্ডের রাজার রাজত্ব যে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই প্রুশিয়ার অন্তর্গত এই স্থানটি।

বংশগত পরিচয়ে তাঁর নাম ছিল নিকোলাউস কোপারনিক্ক পরে বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচয় দেবার সময়ে ল্যাটিনীকৃত রূপ নিকোলাস কোপারনিকাস। তাঁর বাবা নিকোলাস কোপারনিক্ক ১৪৫০-এর দশকের শেষদিকে রাজধানী ক্রাকাও থেকে তোরুনে এসেছিলেন, কপার বা তামার পাইকিরি ব্যবসা করতেন। সম্ভবত এই কপার থেকেই পারিবারিক পদবী কোপারণিক্ক। যে-সময়ে কোপারনিকাসের জন্ম, ব্যবসায় কেন্দ্র হিসেবে তোরুনে তখন পড়তির দিকে, বেড়ে উঠেছে ভিশ্চুলা যেখানে বাল্টিক সাগরে পড়েছে সেই মোহনার কাছের ডানজিগ। ফলে অজস্র পণ্যবাহী ভিশ্চুলার জলপথে যাতায়াত করত।

কোপারনিকাসের জন্ম এমন এক সময়ে যাঁর কিছুকাল আগে পৃথক পৃথক ধাতুর হরফ সাজিয়ে ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল (১৪৪৭) ও কিছুকাল পরে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন (১৪৯২)। অর্থাৎ সময়টি ছিল পুরনো জগৎ রূপান্তরিত হওয়া ও নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হওয়ার মাঝামাঝি। রিফর্মেশনের স্রষ্টা মার্টিন লুথার, এবং মিকেল্যাঞ্জেলো ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন কোপারনিকাসের সমসাময়িক। এমনি আরো দুটি নাম: ইরাসমাস ও ডুরার। রেনেশাঁসের অনুকূল হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে কোপারনিকাস বড় হয়েছিলেন। এই সময়ের বিশেষ একটি লক্ষণ ছিল নিরপেক্ষ মতের প্রতি সহিষ্ণুতা, উদারতা ইত্যাদি, পরবর্তী কালে গ্যালিলিওর সময়ে রিফর্মেশনের বিরোধী হওয়ার প্রাবল্যে যার অভাব ছিল।

ধনী পরিবারে কোপারনিকাসের জন্ম—তাঁর বাবা ছিলেন বড়ো ব্যবসায়ী ও স্থানীয় শাসনকর্তাও। কোপারনিকাসের মা সম্পর্কে শুধু এইটুকুই জানা যায় যে, বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল বারবারা ভাৎসেলরোডে। কবে তাঁর বিয়ে হয় বা কবে তাঁর মৃত্যু বা স্বামীর মৃত্যুর সময়ে তিনি বেঁচে ছিলেন কিনা—এসব খবর জানা যেতে পারে এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় নি।

কোপারনিকাসের বাবা মারা যান ১৪৮৩ সালে, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে। তখন কোপারনিকাসের মামা লুকাস ভাৎসেলরোডে এই চারটি ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নেন। এই দায়িত্ব তিনি ভালোভাবেই পালন করেছিলেন। তাঁর সাহায্য ও প্রতিপালনে লালিত দুই ভাই—আনড্রিয়াস ও নিকোলাস—পরবর্তী জীবনে ক্যানন হতে পেরেছিলেন, দুই বোনের একজন হয়েছিলেন একটি কনভেন্টের সিনিয়র মাদার, অপরজনের ভালো বিয়ে হয়েছিল।

নিকোলাসের জীবনে তাঁর চেয়ে ছাব্বিশ বছরের বড়ো মামার প্রভাব ছিল খুবই বেশি। এই মামার জীবন ছিল দাপটের, কারও তোয়াক্কা করতেন না, দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। সে-জায়গায় নিকোলাস ছিলেন খানিকটা ভীরু প্রকৃতির, খানিকটা আত্মরহ, কখনো নিজেকে জাহির করতেন না। মামা-ভাগনেকে দেখে মনে হত, একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র আর অপরজন নিষ্প্রভ উপগ্রহ।

১৪৯১-৯২ সালের শীতকালে নিকোলাস কোপারনিক্ক ক্রাকাওর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। সে-সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইউরোপের বহু দেশের ছাত্রদের মিলন-স্থান — জার্মানীর, হাঙ্গেরীর, ইতালীর, সুইজারল্যান্ডের, সুইডেনের। সাধারণ ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত ল্যাটিন। সে-সময়ে পণ্ডিতরা বই লিখতেন ল্যাটিন ভাষায় এবং প্রত্যেক উচ্চশিক্ষার্থীকে এই ভাষাটি ভালোভাবে শিখতে হত। ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিকোলাসের পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও ভূগোল। নিকোলাসের দাদা আনড্রিয়াসও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যায় পাঠ নেওয়াটা সে-সময়ে খুবই জরুরি ছিল। সমুদ্রপথে বাণিজ্য বাড়ছিল, জাহাজগুলো আরো বড়ো হচ্ছিল ও আরো লম্বা লম্বা পাড়ি দিচ্ছিল। নিকোলাস যখন ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তাঁর বয়স উনিশ—সেই সময়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। সমুদ্রযাত্রার জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল সঠিক জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা। ধর্মীয় দিনগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্যেও তার প্রয়োজন ছিল।

বাইশ বছর বয়সে নিকোলাস ফিরে গিয়েছিলেন তোরুনে-এ, বিশপ লুকাসের (তাঁর মামা) ডাক পেয়ে। সে-সময়ে বিশপ চেষ্টা করেছিলেন নিকোলাসকে ফ্রাউয়েনবুর্কের ক্যাননের পদে নিযুক্ত করাতে। কিন্তু কোনো কারণে তা হয়ে ওঠেনি। তবে দু-বছর পরেই নিকোলাস এই পদে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পদেই ছিলেন। এ কারণে আর্থিক অস্বাচ্ছল্য তাঁকে কোনো সময়েই ভোগ করতে হয়নি। ফ্রাউয়েনবুর্গের ক্যাননের পদে নিযুক্ত হবার পরে গোড়ার দিকে বহু বছর তিনি ছুটিতে ছিলেন ও ইতালিতে পড়াশুনা করছিলেন, তারপরে ১৫০৬ সালে তেত্রিশ বছর বয়সে ইতালি থেকে ফিরে আসার পরেও আরো ছ-বছর কাটিয়েছিলেন মামা লুকাসের সঙ্গে, এর্মলান্ডের বিশপের আবাস হাইলসবের্ক দুর্গে। ১৫১২ সালে বিশপ লুকাস মারা যান।

বাইশ বছর থেকে বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ ক্যানন ইতালির বোলোঞা ও পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছিলেন। তাঁর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল দর্শন ও আইন, গণিত ও ভেষজ, জ্যোতির্বিদ্যা ও গ্রীক।

প্রথম ছিলেন বোলোঞা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৪৯৬ সালে। এখানেই তিনি জ্যোতির্বিদ্যার তৎকালীন বিখ্যাত অধ্যাপক মারিয়া দা নোভারার সংস্পর্শে আসেন। অধ্যাপক নোভারা ছাত্রদের কাছে টলেমির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন, সঙ্গে সঙ্গে অ্যারিস্টার্কাসের কথাও বলতেন। এই অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেই নিকোলাসের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা গভীরভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল এবং বিষয়টি নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন ও কিছু কিছু পর্যবেক্ষণও করেছিলেন।

১৫০৩ সালে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজবিদ্যা পাঠ করেন। সে-সময়ে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে ভেষজবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমন একটা ধারণা ছিল যে মানুষের ভালোমন্দ নির্ভর করছে রাশিচক্রে সূর্য ও গ্রহের চলাফেরার ওপরে। এই ধারণা অবশ্য এখনো দূর হয়নি—এখনো গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে জ্যোতিষীরা মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন।

তবে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর যতোই নিজস্ব ভাবনাচিন্তা থাকুক, ভেষজবিদ্যায় কিন্তু যেমনটি শেখানো হত তাই শিখলেন, এবং চিকিৎসা করতে গিয়ে হুবহু তাই প্রয়োগ করতেন। 'অলিভ তৈলে টিকটিকি' বা 'সুরায় কেঁচো' ইত্যাদি ধরনের ব্যবস্থাপত্র সে-সময়ে অপ্রচলিত ছিল না।

১৫০৬ সালে তেত্রিশ বছর বয়সে যাজকীয় আইনের ডকটর ক্যানন কোপারনিক্ক ইতালির পাঠ শেষ করে প্রাশিয়ায় ফিরে এলেন। তারপরে ছ-বছর কাটালেন হাইলসবের্ক দুর্গে এর্মলান্ডের বিশপের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে। তের বছর আগে ফ্রাউয়েনবুর্ক গির্জার ক্যানন হয়েছিলেন, ইতিমধ্যে বারদুয়েক ক্ষণিকের দর্শন দিয়ে আসা ছাড়া কোনো সময়েই সেখানে স্থায়ীভাবে থাকেন নি। বিশপের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করা হল।

হাইলসবের্ক দুর্গের ছটি বছর তাঁকে কাটাতে হয়েছিল প্রবলপ্রতাপশালী মামার ছায়ায় ছায়ায়, আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি পুরোপুরি মেনে নিয়ে। যেমন, দুপুরে বেলা খাবার ঘণ্টা বাজলে দুর্গের প্রত্যেকটি মানুষকে এসে দাঁড়াতে হত নিজের নিজের কামরার দরজার সামনে, শ্রদ্ধাবনত হয়ে বিশপের জন্যে অপেক্ষা করতে হত। বিশপ যে আসছেন তা টের পাওয়া যেত কুকুরের চিৎকার শুনে, কুকুরদের খাওয়ানো শেষ করে বিশপ এসে দাঁড়াতেন উঠোনে, আপাদমস্তক নিখুঁত সাজসজ্জায় মণ্ডিত হয়ে, হাতে থাকত শাসনদণ্ড। আগে আগে যেতেন বিশপ, পিছনে অন্য সবাই। ভোজনকক্ষে প্রধান টেবিলে আসন নিতেন বিশপ স্বয়ং, দ্বিতীয়টিতে তাঁর ভাগনে ও চিকিৎসক কোপারনিক্ক, এমনিভাবে নামতে নামতে নবমটিতে বিদূষক ও মনোরঞ্জকরা।

হাইলসবের্কের ছ-বছরের জীবনে ক্যানন কোপারনিকের যথেষ্ট অবসর ছিল এবং এই অবসর তিনি কাজে লাগিয়ে-

ছিলেন দুটি পান্ডুলিপি তৈরি করার কাজে। একটি পান্ডুলিপি জ্যোতির্বিদ্যার, তাতে তিনি কোপারনিকীয় বিশ্বতত্ত্বের একটি কাঠামো দাঁড় করেছিলেন। এই পান্ডুলিপিটি ছাপতে দেননি। দ্বিতীয়টি ছেপেছিলেন, এটি হচ্ছে সপ্তম শতকের বাইজানটাইন ইতিহাসবিদ থিওফাইল্যাক-টাসের একটি গ্রীক রচনার ল্যাটিন অনুবাদ, পূজোপাদ বিশপ লুকাসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পান্ডুলিপিটিকে বলা হয় 'কমেনটারিওলাস', এটি পান্ডু-লিপির আকারেই প্রচারিত হয়েছিল। শিরোনামায় ঘোষণা ছিল যে এটি হচ্ছে স্বর্গীয় গতি সম্পর্কে নিকোলাই কোপার-নিকাসের তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পান্ডুলিপির শুরুতে কোপারনিকাস বলছেন, বিশ্বজগতের ব্যাখ্যায় টলেমীয় তত্ত্ব যথেষ্ট উপযোগী নয়। গ্রহদের গতি সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই একটা মূল দাবি এই যে গ্রহদের গতি হবে সমান বেগসম্পন্ন ও নিখুঁত বৃত্তাকার। টলেমির তত্ত্বে গ্রহগুলো অবশ্য বৃত্তেই ঘুরছে কিন্তু সমান বেগে নয়। তাই কোপারনিকাস উপস্থিত করছেন বৃত্তগুলোর অধিকতর যুক্তিসংগত একটি বিন্যাস। তবে তার আগে সাতটি সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। তা হচ্ছে এই :

১। জ্যোতিষ্কগুলো একই কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে না,

২। পৃথিবী শুধু চন্দ্রের কক্ষের কেন্দ্র, বিশ্বের কেন্দ্র নয়,

৩। সূর্য গ্রহমন্ডলের কেন্দ্র, অতএব বিশ্বের কেন্দ্র,

৪। স্থির নক্ষত্রগুলি থেকে দূরত্বের তুলনায় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর,

৫। খগোলের যে দৈনিক আবর্তন প্রতীয়মান হয় তা পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের দরুন,

৬। অন্যান্য গ্রহের মতো পৃথিবীও সূর্যের চারদিকে ঘোরে আর তারই দরুন প্রতীয়মান হয় সূর্যের বার্ষিক গতি,

৭। একই কারণে প্রতীয়মান হয় গ্রহ-গুলির স্থির থাকা ও পিছু যাওয়ার অবস্থা।

তারপর সাতটি পরিচ্ছেদে তিনি বর্ণনা করছেন সূর্য চন্দ্র ও পাঁচটি গ্রহের বৃত্ত ও পরিবৃত্ত। শুধুই বর্ণনা, তার সপক্ষে কোনো গাণিতিক প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। পরিশেষে শেষ অনুচ্ছেদে বলছেন যে 'তাহলে বুধের গতি মোট সাতটি বৃত্তে, শুক্রের পাঁচটিতে, পৃথিবীর তিনটিতে এবং পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের চারটিতে, এবং মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি প্রত্যেকের পাঁচটিতে। অতএব বিশ্বের গোটা কাঠামোটিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে সর্ব-সমেত চৌত্রিশটি বৃত্তই যথেষ্ট।'

১৫১২ সালে বিশপ লুকাস আকস্মিকভাবে মারা যান। কোপারনিকাসের বয়স তখন চল্লিশ। ফ্রাইয়েনবুর্কে গির্জার ক্যানন নিযুক্ত হবার পনেরো বছর পরে তখন তিনি সশরীরে কর্মস্থলে উপস্থিত হন। তারপরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিষ্ঠার সংগে ক্যাননের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পান্ডুলিপিতেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে বিষয়টি নিয়ে গাণিতিক প্রমাণ সহ তিনি একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করবেন। ফ্রাইয়েন-বুর্কে আসার পরে প্রচুর অবসর পেলেন এবং ১৫৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে 'আবর্তন' গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করলেন। কিন্তু গ্রন্থের পান্ডুলিপি তুলে রেখে দিলেন একটি গোপন স্থানে, সংগে সংগে প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না।

ফ্রাইয়েনবুর্কে কোপারনিকাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পেরেছিলেন মাত্র একজন, তিনিও একজন ক্যানন ও পরবর্তীকালে বিশপ। নাম, টীডেমান গীজে। ক্যানন গীজে ছিলেন কোপারনিকাসের চেয়ে সাত বছরের ছোট, নম্র স্বভাবের বিদ্বান মানুষ। কোপারনিকাসকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন ও নানা অপ্রিয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। যে দুজন মানুষের পীড়াপীড়িতে কোপারনিকাস শেষ পর্যন্ত তাঁর 'আবর্তন' গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সম্মত হন, তিনি সেই দুজনের একজন।

অপরজন হচ্ছেন গেওর্গ ইওযাখিম ফন লাউখেন বা ল্যাটিন নামে রেটিকাস। ১৫১৪ সালে জন্ম, শৈশবে ধনী পিতা-মাতার সংগে ইতালিতে ঘুরেছিলেন, তরুণ বয়সে পড়েছিলেন জুরিখ ভিটেনবের্ক নুরেমবের্ক ও গোয়েটিংগেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। বাইশ বছর বয়সে হয়েছিলেন ভিটেনবের্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সে-সময়ে ভিটেনবের্ক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রোটেস্টান্ট জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ও গৌরব-স্থল। এহেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন রেটিকাস ও তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড়ো এরাসমুস রাইনহোল্ট। এই দুজন অধ্যাপকই সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন যদিও স্বয়ং মার্টিন লুথার ছিলেন তার ঘোরতর বিরোধী। তবুও, যে ক্যানন কোপারনিকাসকে মার্টিন লুথার বলেছিলেন 'ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধ-চারী এক নির্বোধ' তাঁর সংগে দেখা করার জন্যেই ১৫৩৯ সালের বসন্তকালে অধ্যাপক রেটিকাসকে ছুটি দেওয়া হল।

রেটিকাস ছিলেন রেনেশাঁসের বার্তা-বাহী এমন এক দূত যার উদ্দীপনায় স্ফুলিঙ্গ হত শিখা, যিনি আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে যেতেন এক দেশ থেকে অপর দেশে, আর জ্ঞানের রাজ্যে আগুন ছড়াতেন। ফ্রাইয়েনবুর্কে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। কোপারনিকাসের লেখা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পান্ডুলিপির খ্যাতি শুনে এই সংকল্প নিয়ে ছুটে এসে-ছিলেন যে কোপারনিকীয় বিপ্লবকে সচল রাখবেন। অথচ কোপারনিকাস নিজে এই বিপ্লবকে দমন করতেই চাইছিলেন।

রেটিকাসের সংগে ক্যানন কোপার-নিকের সাক্ষাৎকারের কোনো বিবরণ অত্যুৎসাহী রেটিকাসের লেখায় পাওয়া যায় না, যদিও এই সাক্ষাৎকার ছিল ঐতিহাসিক—কেপ্লারের সংগে টাইকো ব্রাহের সাক্ষাৎকারের মতো বা মার্কসের সংগে এংগেলসের সাক্ষাৎকারের মতো। তবে কোপারনিকাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে কত-খানি ছিল তা বোঝা যায় তাঁর কোপার-নিকাসকে সবসময়ে 'আমার গুরু' বলে উল্লেখ করা থেকে। কোপারনিকাসের বয়স তখন ছেষট্টি এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর জীবন শেষ হয়ে আসছে।

তা সত্ত্বেও রেটিকাস ও ক্যানন গীজের পীড়াপীড়িতে গোড়ার দিকে তিনি সম্মত হননি। সম্ভবত অন্য ধরনের একটা রফা হয়েছিল। তা এই যে রেটিকাস নিজের নামে কোপারনিকাসের অপ্রকাশিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিবরণ দেবেন, তাতে কোথাও কোপারনিকাসের নাম উল্লিখিত হবে না, শুধু বলা হবে 'আমার গুরু' এবং একে-বারে শুরুতে—যেখানে কোনো একটা নাম উল্লেখ না করলেই নয়—বলা হবে 'তোরুন-এর ডঃ নিকোলাস'।

সম্ভবত এমনি একটি রফা অনুসারেই প্রকাশিত হল রেটিকাসের 'নেরোশিও প্রাইমা—প্রথম বিবরণ' পঁচাত্তর পৃষ্ঠার একটি রচনা, চিঠির আকারে লেখা। কোপারনিকীয় বিশ্বতত্ত্বের বিবরণসম্বলিত এই প্রথম মুদ্রিত রচনা প্রকাশিত হল ১৫৪০ সালে ফেব্রুয়ারীতে।

তারপর রেটিকাসকে ভিটেনবের্কে ফিরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু গ্রীষ্মকালীন ক্লাস শেষ হতেই আবার তিনি হাজির হলেন ফ্রাইয়েনবুর্কে। এবারের পীড়া-পীড়িতে কাজ হল। কোপারনিকাস তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশ করতে সম্মত হলেন।

রেটিকাস দ্বিতীয়বার ফ্রাইয়েনবুর্কে এসেছিলেন ১৫৪০ সালের গ্রীষ্মকালে, থেকেছিলেন ১৫৪১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কোপার-নিকাসের পুরো গ্রন্থটি কপি করেছিলেন। তারপরে আবার ফিরে গিয়েছিলেন ভিটেন-বের্কে, শীতকালীন ক্লাশ নেবার জন্যে। বসন্তকালে আবার ছুটি হতেই ১৫৪২ সালের ২রা মে তারিখে চলে এলেন নুরেমবের্কে। এই নুরেনবের্কেই 'আবর্তন' গ্রন্থের ছাপার কাজ শুরু হল।

কিন্তু গ্রন্থটি ছাপার কাজ রেটিকাস শেষ পর্যন্ত দেখতে পারেননি, মাঝপথে তাঁকে নুরেমবের্ক ছেড়ে লাইপৎসিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার জন্যে চলে যেতে হয়েছিল। ছাপার কাজের তদারকীর ভার তিনি দিয়ে গেলেন আনড্রিয়াস ওসিয়ান্ডার নামে লুথারপন্থী কিন্তু কোপারনিকাসের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন একজন ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ওপরে।

এই ওসিয়ান্ডার করলেন কি, কোপার-নিকাসের গ্রন্থের সংগে একটি অস্বাক্ষরিত ভূমিকা জুড়ে দিলেন। ভূমিকায় বলা হল যে

গ্রন্থের মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রন্থের তত্ত্বগুলোর না আছে সত্যতা, না এমনকি সম্ভাব্যতা ইত্যাদি।

গ্রন্থটি ছাপা হয়ে কোপারনিকাসের হাতে পৌঁছল ১৫৪৩ সালের ২৪শে মে তারিখে। এমন এক সময়ে যখন তিনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছেন, গ্রন্থটি নেড়েচেড়ে দেখবেন সে-ক্ষমতাও আর নেই। গ্রন্থের ভূমিকা তিনি পড়তে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় না, যদি পেরে থাকেন তবে তাও একটি কারণ যে গ্রন্থটি হাতে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মারা যান।

রেটিকাস কিন্তু তারপরে আর কোপারনিকাসের গ্রন্থ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। তা সম্ভবত এই কারণে যে গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে কোপারনিকাস তাঁর গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় আগ্রহী অন্যদের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রেটিকাসের নয়। কোপারনিকাস বরাবরই ছিলেন ভীরু প্রকৃতির এবং হিসেবী ও বিশ্বাসী। পোপের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থে একজন লুথারপন্থীর নাম উল্লেখ করার সাহস হয়তো তাঁর ছিল না।

যাই হোক, 'আবর্তন' গ্রন্থ থেকেই কোপারনিকীয় বিপ্লবের সূচনা। বিপ্লব কেন বলা হচ্ছে তা বুঝতে হলে জানা দরকার আগে কী ছিল ও তার জায়গায় নতুন কী হচ্ছে।

আগে কী ছিল

প্লেটো (খৃষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৮) বলতেন এই বিশ্ব হবে গোলকের মতো, গতি হবে সমান বেগসম্পন্ন, গতিপথ হবে বৃত্তাকার। গোলক হচ্ছে নিখুঁত হওয়ার নিদর্শন। পরম নিখুঁত সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে অবশ্যই এই লক্ষণটি থাকা চাই।

প্লেটোর এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করলেন অ্যারিস্টটল (খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪—৩২২)। প্রচলিত একটি বাংলা বইয়ের উদ্ধৃতিতে ব্যাখ্যাটি এই: 'বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে অনড় পৃথিবী। আর এই পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে নয়টি এককেন্দ্রীয় স্বচ্ছ গোলক, একটির ওপরে আরেকটি, অনেকটা পেঁয়াজের খোসার মতো। সবচেয়ে ভেতরের দিকের গোলকে রয়েছে চন্দ্র, তারপরে যথাক্রমে সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, সবচেয়ে বাইরের দিকের দুটি গোলকে স্থির নক্ষত্র।'

কিন্তু দেখা গেল বিশ্বজগতের এই আঁটোসাঁটো চেহারার মধ্যেও গ্রহগুলোর চলন যেন বেখাপ্পা ধরনের—সমান বেগ-সম্পন্ন হওয়া দূরের কথা, গ্রহগুলো কখনো-বা স্থির, কখনো-বা পশ্চাদগামী। তখন মূল সিদ্ধান্তকে অপরিবর্তিত রেখে ব্যাপারটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হল। কাজটি করলেন প্লেটোর শিষ্য গণিতজ্ঞ ইউডকসাস (খৃষ্টপূর্ব ৪০৮—৩৫৫)। প্রত্যেকটি গ্রহের জন্যে বরাদ্দ হল কয়েকটি করে গোলক—একটির ভিতরে আরেকটি তার ভিতরে আরো একটি, এমনি পর পর, সবকটিই ঘুরছে—সমান বেগে ও নিখুঁত বৃত্তে। গ্রহের গতি হচ্ছে এই সবকটি ঘূর্ণনের মোট ফল। ইউডকসাস গোড়ায় মোট সাতাশটি গোলকের কল্পনা করেছিলেন, পরে বাড়াতে বাড়াতে চুয়ান্নটি করতে হয়েছিল।

তারপরে এলেন টলেমি (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক)। তাঁর বিখ্যাত জ্যোতিষীয় গ্রন্থ 'আলমাজেস্ট'-এ তিনি বিশ্বজগতের যে কাঠামোটি দাঁড় করালেন তা ইউডকসাসেরই অনুসারী, তবে গোলকের মধ্যে গোলকের বদলে কল্পনা করা হল বৃত্ত ও পরিবৃত্তের। ব্যাপারটা এই রকম—একটি ছোট চাকা ঘুরছে যার কেন্দ্র রয়েছে একটি বড়ো ঘূর্ণমান চাকার পরিধির ওপরে। ছোট চাকাটিকে বলা হয় পরিবৃত্ত বা এপিসেন্টার, বড়ো চাকাটিকে ডেফারেন্ট। তাহলে টলেমির ছবিতেও পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রে, স্থির ও অনড়। আর গ্রহগুলো পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে পরিবৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে। গ্রহের গতি ব্যাখ্যা করবার জন্যে টলেমিকে আশিটি পরিবৃত্তের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তবে বিখ্যাত 'স্লীপ-ওয়াকার্স' গ্রন্থের লেখক আর্থার কোয়েসলার বলছেন—তিনি নিজে গুণে দেখেছেন, টলেমির 'আলমাজেস্ট'-এ পরিবৃত্তের সংখ্যা আশি নয়, চল্লিশ। কোপারনিকাস তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, টলেমির পরিবৃত্তের সংখ্যা আশি—সম্ভবত এই কারণেই আশি সংখ্যাটি এমন কি চেম্বার্স অভিধানেও গৃহীত হয়েছে।

টলেমির 'আলমাজেস্ট' প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ছিল প্রশ্নাতীত, অভ্রান্ত। অ্যারিস্টার্কাস কল্পিত সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের কথা জানা ছিল বটে কিন্তু গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হত না।

কোপারনিকাসই প্রথম 'আলমাজেস্ট'-এর অচলায়তনকে প্রচণ্ড একটি নাড়া দিলেন ও সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের পক্ষে গাণিতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন।

'কোপারনিকাসের গ্রন্থে বিশ্বের যে কাঠামোটি পাওয়া গেল তা সংক্ষেপে এই: এই বিশ্বের পরিসর সীমিত, তার সীমানা হচ্ছে স্থির নক্ষত্রদের গোলক। বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। স্থির নক্ষত্রদের গোলক ও সূর্য অনড়। গ্রহগুলো ঘুরছে সূর্যের চারদিকে—সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছে বুধ, তারপরে শুক্র, তারপরে পৃথিবী, তারপরে মঙ্গল, তারপরে বৃহস্পতি, তারপরে শনি। চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের অক্ষের চারদিকেও পাক খাচ্ছে। পৃথিবীর এই আহ্নিক আবর্তনের দরুনই মনে হয় যেন গোটা আকাশটাই আবর্তিত হচ্ছে। আর পৃথিবীর বার্ষিক আবর্তনের দরুনই মনে হয় যেন সূর্য রাশিচক্রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই একই কারণে গ্রহগুলোকে দেখে মনে হয়, কখনো কখনো তারা যেন গতিহীন, কখনো কখনো তাদের গতি যেন পেছনের দিকে। আরো কিছু কিছু সামান্য ধরনের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে পৃথিবীর অক্ষের দোলনের জন্যে।'

তবে এই কাঠামোর মধ্যে কোপারনিকাস প্লেটোর সেই উক্তিকেও মেনে নিয়েছিলেন যে গতি হবে বৃত্তাকার ও সমবেগসম্পন্ন। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তত্ত্বের মিল ঘটাবার জন্যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত সূর্যকে সরিয়ে আনতে হয়েছিল বিশ্বের কেন্দ্র থেকে খানিকটা দূরে আর গ্রহগুলোর গতি ব্যাখ্যা করার জন্যে চৌত্রিশটি পরিবৃত্তের সাহায্য নিতে হয়েছিল (কোয়েসলার বলছেন, তিনি নিজে গুনে দেখেছেন চৌত্রিশ নয়, আটচল্লিশ)।

পৃথিবী যদি অক্ষের চারদিকে ঘুরতেই থাকে তাহলে পৃথিবীর ওপরকার বস্তু কেন ছুটকে যাচ্ছে না? পড়ন্ত বস্তু কেন বেঁকে যাচ্ছে না? এসব প্রশ্নের জবাবও কোপারনিকাস তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জবাবে অ্যারিস্টটলের বাইরে নতুন কোনো কথা নেই। পৃথিবীর আবর্তনটা স্বাভাবিক, চাপানো নয়, তাই এসব কাণ্ড ঘটছে না।

কেপলার মন্তব্য করেছেন, কোপারনিকাস যেন টলেমিকেই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন। টলেমির মতোই কোপারনিকাসের আশ্রয়ও সেই পরিবৃত্ত।

তাহলে বিপ্লবটা ঘটল কোথায়?

এইখানে যে পৃথিবীও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, অন্য আর চারটি গ্রহের মতোই। বিশ্বের কেন্দ্রে স্থির মহিমান্বিত অবস্থান নয় এই পৃথিবীর। টলেমির জগতে মানুষ নিজের সম্পর্কে ধারণা করতে পারত যে ঈশ্বরের এই বিশ্বজগতে তার বিশেষ স্থান, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র তাকেই বন্দনা করছে ইত্যাদি। কোপারনিকাসের জগতে মানুষ এই মহিমান্বিত অবস্থান থেকে চ্যুত হল। এদিক থেকে কোপারনিকাসের 'আবর্তন' ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পীসিস'-এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

তবে, যে-কথা আগে বলেছি, কোপারনিকাসে শুধুই সূচনা, বিপ্লবের রূপকার ছিলেন কেপলার ও গ্যালিলিও, উত্তরণ ছিলেন নিউটন।

—অমলকান্ত

পুনশ্চ

পথ-ঘাট থেকে আরম্ভ করে নানা জায়গায়, নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় যুগ-সূর্য নেতাজীর ৭৭তম জন্মজয়ন্তী উৎসব এবার যেন অপেক্ষাকৃত অনেক বেশীই অনুষ্ঠিত হল বলে মনে হয়। এ কেবলমাত্র আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও নেতাজীর নামে পথ-ঘাটের নামকরণ, মূর্তি স্থাপন ও সভা-সমিতির অনুষ্ঠান যে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

কলকাতায় শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে, ময়দানে রাজভবনের দক্ষিণে, নেতাজীর দুটি বিরাট মূর্তি ব্যতীত, কলকাতার মধ্যে ও শহরতলির বাইরে বিভিন্ন স্থানে সুভাষচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি আছে প্রচুর। এরপর গঙ্গাবক্ষে কলকাতায় যে দ্বিতীয় বিরাট সেতু নির্মিত হচ্ছে, তার নামও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে নামাঙ্কিত হওয়ায়, বঙ্গবাসী তথা ভারতীয় জনসাধারণ মাত্রেই সম্ভবত অত্যন্ত আনন্দবোধ করেছেন।

কিন্তু একটি বিষয়ের নিরসন নিয়ে এখনও ভারতের বহুজন সংশয়াতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি যে, নেতাজী আজও নরদেহে বর্তমান আছেন, না সত্যই তাঁর দেহত্যাগ ঘটেছে! এই বিষয় সম্পর্কে সরকারীভাবে কয়েকটি বিচার-বিভাগীয় তদন্তও হয়েছে, কিন্তু এখনও সর্বশ্রেণীর মানুষের মনের দ্বিধা সর্বতোভাবে দূরীভূত হয়নি, সংশয় প্রশমিত হয় নি। বিশেষ করে এই সেদিনও ভারত সরকারের 'শিক্ষা ও যুব-কল্যাণ' দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'হুজ হু অফ ইন্ডিয়া ম্যাটারস' নামক ইংরেজী গ্রন্থে নেতাজীর নাম উল্লিখিত হওয়ায়, কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত 'দি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' দলের সেন্ট্রাল অফিস থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, 'যেহেতু ভারত ও বহির্ভারতের অগণিত মানুষ নেতাজীর মৃত্যু বিশ্বাস করেন না, সেই হেতু জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে 'নেতাজী দিবসের' পূর্বেই নেতাজীর নাম শহীদ তালিকা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে ভারত সরকার সদিচ্ছার পরিচয় দেবেন এটাই আমরা আশা করি।'

প্রসঙ্গত ১৩৫৯ সালের ৯ই মাঘ 'যুগান্তর' পত্রিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দ্বিপঞ্চাশত্তম জন্মদিবসে কর্ণেল পি কে সেগল লিখিত একটি রচনার কথা আমাদের মনে পড়ায়, এখানে সেই রচনাটির অংশবিশেষ আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম। কর্ণেল সেগলের এই রচনাটি নেতাজী এখনও জীবিত আছেন বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁর সেই বিশ্বাসের উপর কিছুটা আলোকপাত করবে বলেই আমাদের ধারণা।

'১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরের বেসামরিক ঘাঁটিতে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর এবং ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কয়েকজন কর্মকর্তা সুভাষ বসুর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। আমিও ছিলাম এদের দলে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য নেতাজীর বিমান পৌঁছাতে কয়েক ঘন্টা দেরী করল। এই অবসরে আমি কত কথাই ভাবলাম। এক বছর হল সুদূর প্রাচ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু হয়েছে। এ আন্দোলন নতুন। আন্দোলনের উদ্যোক্তারা পরীক্ষিত নন। এর নেতা রাসবিহারী বসু মহান দেশপ্রেমিক; পুরানো বিপ্লবী। ভারতের জন্য তাঁর অবদান বিপুল। তাঁর মন ছিল প্রেমে পূর্ণ, দয়ায় আর্দ্র। ক্ষমতালিপ্সু তিনি ছিলেন না, দেশের কল্যাণে তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সর্বদাই তৈরি ছিলেন। কিন্তু এসব গুণ সত্ত্বেও আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সবাই আমরা জানতাম ভারতে সুভাষচন্দ্র কি করেছেন। আমাদের সামনে সেদিন যে সমস্যা ছিল, তা একেবারেই পৃথক। আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প করেছিলাম। তার হাতে কত শক্তি, আর আমাদের হাতে সামান্য সম্পদই ছিল। তারপর ছিল আমাদের মিত্র জাপানীদের সম্পর্কে সমস্যা। আমরা তাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ করতাম। তারাও একই প্রকারে আমাদের সন্দেহ করত। ইতিমধ্যেই খোলাখুলিভাবে জাপানী এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর মধ্যে কলহ হয়ে গেছে; জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ক্রীড়ণক হতে রাজী ছিল না। আমাদের আন্দোলনের তরী তখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মাঝিহীন হয়ে চলেছিল। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যে, সুভাষচন্দ্র কি এর হাল ধরতে পারবেন? তাঁকে পারতেই হবে, ৪০ কোটি নরনারীর ভাগ্য তাঁরই উপর নির্ভর করছিল।

বিমানের শব্দে আমার অন্যমনস্কতা কেটে গেল; মাথার উপর ইঞ্জিন ঘুরছে। সবাই চীৎকার করছিল যে বিমান এখুনি নামবে। সমস্ত অফিসার সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অনতিবিলম্বে তিনি, রাসবিহারী বসু ও কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) ভোঁসলের সঙ্গে বিশ্রামকক্ষে এসে দাঁড়ালেন। আমরা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম; তিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন; সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। আমি যখন তাঁর সামনাসামনি দাঁড়ালাম, তিনি আমার হাত প্রীতিভরে গ্রহণ করলেন; আমি তাঁর গম্ভীর চোখের পানে তাকালাম। সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল।

আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। এরপর থেকেই মিলিটারী সেক্রেটারী হিসাবে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করি। প্রায় সময়েই তাঁর কাছে থাকতাম। সম্যক অবস্থা পর্যালোচনা করতে তাঁর বেশী সময় লাগত না; কালক্ষেপ না করে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বুঝলেন যে, আমরা আমাদের শত্রুর সমকক্ষ কিছুতেই হতে পারব না; কারণ তাদের সমগ্র পৃথিবীময় সম্পদ রয়েছে। তবে আমাদের একটি শক্তি ছিল, সে শক্তি

খেলার রণ—শুরু থেকে শেষ।

ফটো : হীরালাল বসু

নৈতিক শক্তি। আমরা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছি।...

তাঁর আহ্বানে পূর্ব্ব এশিয়ার ২০ লক্ষ ভারতীয় সর্ব্বান্তকরণে সাড়া দিল, নিশ্চয়ই তা খুব আশ্চর্যজনক। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল এই যে, তিনি জনসাধারণের প্রাণে এক নতুন প্রেরণা এনে দিলেন—বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে জয়ের বাসনা, পরাজয় কখনই বরণ করব না।... আমার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি সে দৃশ্য ভুলব না, যেদিন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রথম দলকে তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তিনি সৈনিকদের এই বলে সম্ভাষণ করলেন, 'তোমরা দিল্লীর পথে এগিয়ে যেতে সুরু করেছ, দিল্লীর পথ বিজয়ের পথ। কিন্তু মনে রেখ, এ পথে তোমাদের চলা সুখের নয়। আমাদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য আমাদের শত্রুরা পথে বিপুল আয়োজন করেছে। বহু ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, লরী, বৃহৎ কামান, সহস্র সহস্র বিমানে তারা সুসজ্জিত। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করছে; কিন্তু সেখানে বহু খাদ্য আছে, শত্রুর সৈন্যের জন্য খাদ্য আছে। তাদের বিরুদ্ধে তোমরা মুষ্টিমেয়; তোমাদের রণসম্ভার অল্প; তোমাদের রণসম্ভার প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।...এ পথে আমি তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন সহচরের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। এ সব কিছুর জন্য যদি তোমরা প্রস্তুত থাক, তবেই শুধু আমার সঙ্গে চলতে পার। একসঙ্গে আমরা বিজয়ের পথে এগিয়ে যাব। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মনে করে থাক যে, তোমার এ সমস্ত সহ্য করার মত ক্ষমতা নেই, তাহলে এই দল থেকে তুমি সরে দাঁড়াও। এতে তার পক্ষে কোন লজ্জা নেই; কারণ আমরা সবাই সমান শক্তিশালী নই। এর ফলে সে বরং আমাদের জয়যাত্রার পথে সাহায্য করতে পারবে।'

তাঁর সম্মুখে যে সমস্ত সৈনিক দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৃদ্ধ ও ভগ্নস্বাস্থ্য। কিন্তু কেউ দল ছাড়ল না। সারিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই এই প্রতিশ্রুতি দিল, জাতীয় বাহিনীতে সর্ব-প্রকার কষ্ট তারা স্বীকার করবে। পূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম করবে, এর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে।

•

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে নেতাজীর অসামান্য দখল ছিল। সে সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তা খুবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে তিনি বলেছিলেন যে, রাশিয়া ও ইঙ্গ-আমেরিকার মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে; ফলে মিত্রপক্ষ যদি জয়ী হয়, তাহলে ইউরোপ পূর্ব ও পশ্চিম গোষ্ঠী গঠিত হবে। ১৯৪৪ সালে তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার একমাত্র উপায় সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বৃটীশের সঙ্গে কোন রকমের আপোষ করলে তার ফলে দেশ বিভক্ত হবে। দেশ বিভাগের ফলে সমস্যার সমাধান হবে না বরং সেগুলি আরও বাড়বে। জনসাধারণের অপরিসীম দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা হবে। তাঁর প্রত্যেকটি কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

আমি এতদিন অবধি যত ব্যক্তিকে জেনেছি, তাঁদের মধ্যে নেতাজী হলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেয় ও প্রিয়। তিনি ভালবাসতেন অসাধারণ, প্রতিদানে কিছুই চাইতেন না। তাঁর ভালবাসা জনসাধারণকে তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখবোধ জয় করাতে পেরেছিল। সাধারণ মানুষকে তিনি সব সময়েই দেবতা, বীর রূপে পরিণত করতে পারতেন। তাদের মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে যাঁদের কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদের জীবনে আজ বিরাট শূন্যতা। কারণ তিনি ত' আজ আর তাঁদের পাশে নেই। বহু বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি বেঁচে আছেন, থাকলে কোথায় আছেন? কি উত্তর আমি তাঁদের দিতে পারি? আছে একমাত্র জবাব যে তিনি আমার অন্তরে চিরজীবী; যাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন, যাঁদের তিনি ভালবাসতেন, তাঁদের অন্তরেই তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন। নেতাজী কী জয়! জয়হিন্দ!'

—[illegible]

অনিমেষের মা আর বিভার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে বেরিয়ে আসছিলাম। বিভা আমার পেছন পেছন এল। গেটের মুখে এসে বিভা হঠাৎ কথাটা বলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। রাস্তার আলো এসে জায়গাটায় পড়েছিল। সেই আলোতে বিভার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, বিভা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী স্থির। ও এত স্থির, যে মনে হল, বিভা যেন পাথরে গড়া মূর্তি, মানুষ না।

বিভার মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বিভা অনেকক্ষণ পরে আমাকে দেখল। এক সময় হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি বিয়ে করবেন!'

হেসে উঠলাম, 'করবো না কেন। সময় হলে নিশ্চয়ই করবো।'

বিভা আমার খুব কাছে সরে এল। এত কাছে যে একটু হলে ওর মাথা আমার বুক স্পর্শ করে ফেলতো। কীরকম অস্বস্তি হতে লাগল। হাল্কাভাবে বললাম, 'এই মুহূর্তে বিয়ের কথা চিন্তা না করলেও চলবে।' বলে যেই পিছন ফিরতে যাব, বিভা খপ করে আমার একটা হাত ধরে ফেলল। ও যে এরকম বিশ্রী একটা কান্ড করে বসবে ভাবতে পারি নি! হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'ছিঃ বিভা, কী করছো।'

দেখতে দেখতে বিভা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। এতক্ষণ বিভাকে অস্বাভাবিক রকমের শান্ত দেখাচ্ছিল হঠাৎ যেন ওর মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল, বিভার চোখ ঠিকরে সেই আগুন এসে আমার গায়ে লাগল। 'ছিঃ বিভা, কী করছো! লজ্জা করে না বলতে! আর আপনারা? আপনারা কী! লুকিয়ে লুকিয়ে দাদা যে ঐ নচ্ছার মেয়েটার সঙ্গে ঢলাঢলি করে, দেখেন না, বলুন, বিয়ে করবেন কিনা। এক্ষুনি বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করে ঐ ডাইনীকে নিয়ে সরে পড়ুন। কোনদিন আর এদিকে পা বাড়াবেন না, বাড়ালে মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।' বলতে বলতে বিভার গলা ক্রমশই উঁচুতে উঠতে লাগল। ওর চেহারাও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। চোখ বড় বড়, চোখের তারা দুটো অতি দ্রুতগতিতে এপাশ ওপাশ ছুটোছুটি করছে। বিভার শাড়ির আঁচল খসে মাটিতে পড়ে গেল। হঠাৎ আমি গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে উঠলাম, 'মাসীমা, শিগগির আসুন।'

বিভা অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল, 'ভীতু কোথাকার! বিয়ের কথাতেই ভয় পেয়ে গেল, দুয়ো!' বিভার সে কী হাসি মানুষকে এভাবে হাসতে জীবনে দেখি নি। কী অমানুষিক যন্ত্রণাদায়ক হাসি!

মাসীমা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দুই হাত দিয়ে বিভাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বিভা ওর মাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। মাসীমা ব্যাকুলভাবে বললেন, 'এ সময় সঙ্কোচ করো না বাবা, তুমি এসে ওকে ধরো। বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলো। একা আমার পক্ষে ওকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না।'

বহু কষ্টে দুজনে ধরে বিভাকে ঘরে নিয়ে এলাম। কী প্রচন্ড শক্তি বিভার! কে বলবে, এই বিভা স্বাভাবিক অবস্থায় কী শান্ত, কত মিষ্টি ওর গলার আওয়াজ। হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিভা গালাগাল দিতে লাগল। যদিও কোন সময়েই বিভা কারও নাম বলছিল না, কিন্তু বোঝা গেল, ও দুজনকে উদ্দেশ করেই গালাগাল দিচ্ছে। অনিমেষ আর লীলাবতীকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনিমেষ এল। সব শুনে অনিমেষ বলল, 'কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম, একটা ঝড় ঘনিয়ে আসছে। ঝড় আসার আগে পৃথিবী খুব শান্ত হয়।' অনিমেষের মুখে বিষণ্ণ ক্লান্ত হাসি।

বললাম, 'কাজ থেকে ফিরলে, তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো। আমি বসছি।'

অনিমেষ গেল না। বসে রইল। কিছুক্ষণ আগে বিভাকে একটা ওষুধ খাওয়ান হয়েছে। বিভা এখন ঘুমোচ্ছে। কেদারবাবুও ফিরে এসেছেন। ঘরের কোণের দিকটায় একটা চেয়ার পাতা আছে। মাথার দুপাশ দিয়ে দুটো হাত তুলে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন কেদারবাবু। দেখে মনে হয় উনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, আজ সমস্ত রাত কেদারবাবু ঘুমোবেন না। শুধু আজকের রাত না, যতদিন না বিভা সুস্থ হয়, এই-ভাবে ডেক চেয়ারে শুয়ে মাথার দুপাশ দিয়ে হাত তুলে দেবেন কেদারবাবু। দরজার বাইরে গিয়ে অনিমেষ ঘন ঘন সিগারেট টানছিল। মাসীমা চুপ করে বিভার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মানুষের এমন অসহায় রূপ এর আগে আমার চোখে পড়ে নি। যে কোন মুহূর্তে বিভা জেগে উঠতে পারে, এবং জেগে ওঠা যে কী ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক এই বাড়ির প্রতিটি মানুষের পক্ষে, সে কথা আমি বুঝতে পারছিলাম। অথচ একজন অসহায় দর্শক ছাড়া কী-ইবা আমার করার আছে।

অনেকক্ষণ পর অনিমেষ বলল, 'একার তুমি বাড়ি যাও। যতদূর মনে হচ্ছে ও এখন ঘুমোবে। তুমি বসে থেকেই বা কী করবে।'

মাসীমাও অনিমেষের পক্ষ নিলেন, 'আমরা তো জেগেই রয়েছি। তোমার কাল অফিস আছে, শরীর খারাপ করবে। তুমি যাও বাবা।'

অনিমেষের বাবা একটাও কথা বললেন না। যেমন চোখ বুজে পড়ে ছিলেন, সে ভাবেই পড়ে রইলেন।

অনিমেষ আমাকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। যাবার সময় বললাম, 'চলি'। অনিমেষ বলল, 'পরশু লীলা এসেছিল। আমি বাড়ি ছিলাম না। বিভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওকে এত করে বাড়িতে আসতে বারণ করেছিলাম।' অনিমেশ যেন লীলা-বতীকে ভৎসনা করল।

'তুমি কি বিভাকে নিয়ে কোলকাতায় যাচ্ছ?'

'দেখি, যদি যাওয়ার মত অবস্থা থাকে।'

যেতে যেতে একবার ফিরে তাকালাম। অনিমেষ তখনও সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অনিমেষের জন্য আমার দারুণ মায়া হতে লাগল। সবদিক দিয়েই অনিমেষ কষ্ট পাচ্ছে। এই যে বিভা পাগল হয়ে গেল, কেদারবাবু ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না, যতদূর দেখেছি মাকে খুব ভালবাসে অনিমেষ, সেই মাকে কোন সাহায্যই করতে পারছে না, লীলা-বতীর সম্বন্ধে নিজেই তো বলেছে, যাকে কাছে পেলে আনন্দ হয়, তাকেই দূরে ঠেলে দিতে হচ্ছে, এ কী কম কষ্টের কথা। অথচ সব কষ্টই তো অনিমেষ মুখ বুজে সহ্য করছে। একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত ওর মুখে শোনা যায় না।

বেশ রাত হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। দু একটি পান সিগারেটের দোকান তখন পর্যন্ত খোলা রয়েছে। বাকী সব অন্ধকার। দূরে দূরে কয়েকটা লাইট পোস্টে আলো জ্বলছে। ওদেরও যেন ঝিমুনী ধরেছে। যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়বে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় অদ্ভুত সব কথা মনে হতে লাগল। আমি যে এই পৃথিবীতে এলাম, এতে আমার কোন হাত ছিল না। ইচ্ছে করলে যে না আসতে পারতাম তা না। এই আকস্মিক ঘটনাটা যে ঘটে গেল, তার জন্যে নিজে বিন্দুমাত্র দায়ী না হয়েও সমস্ত দায়দায়িত্বই আমার ওপর ন্যস্ত হল। আমার এই জীবন কোন পথে চালিত হবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। নাকি আমার না! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূরে কোন একটা গ্রহ কিংবা উপগ্রহ যাকে আমি হয়ত দেখতে পাই, কিন্তু চিনি না, সে-ই হয়ত আমার গতিপথ নির্ণয় করে দিচ্ছে। কিংবা বিধাতাপুরুষ, যাঁর সম্বন্ধে আমার কোন দৃঢ় ধারণা নেই, শুধুমাত্র একটা অনুভূতি, ঘোলাটে জলের মত অস্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালেও অস্বচ্ছতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, হয়ত সেই অদৃশ্য পুরুষ, যাঁর হাতে পায়ে অসংখ্য সুতো বাঁধা, সামান্য একটু সুতোর টানে আমার জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দিচ্ছেন। নিজেকে নিয়ে এইভাবে চিন্তা করার অবসর বা ইচ্ছা বড়

একটা হয় না, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল, আমি আবার হারানো জগতের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। সেই ভাঙা ভাঙা মতন বাড়িটা, সামনে কিছুটা জমি, একটা পেয়ারা গাছ, বড় টিনের ফটক, অফিসে যাবার সময় বারান্দায় মার দাঁড়িয়ে থাকা—সব কিছু আমি ফিরে পেতে চাই। অফিস ছুটির পর হেঁটে হেঁটে বাস স্টপ পর্যন্ত আসা, রাজভবনের নীচু পাঁচিল, সারিবন্ধ গাছেরা, সরল সোজা রেড রোড, মাথার ওপর বিরাট আকাশটা—সব কিছু। আরও কিছু। সুপ্রিয়া দ্রুত পদক্ষেপে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে, কোন কোনদিন চিনেবাদাম খাচ্ছি দুজনে, আঙুলের চাপে বাদামের খোসা মচমচ করে ভেঙে যাচ্ছে, সুপ্রিয়া মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলছে, কখনও তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপ করছে, সেই স-ব আমি আবার ফিরে পেতে চাই।

হোটেলের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। পাশ কাটিয়ে চলে আসছিলাম। মেয়েলী গলার ডাক কানে এল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি।' গলা শুনেই চিনতে পারলাম, লীলাবতী। গাড়ি দেখেই চেনা উচিত ছিল। কিন্তু নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে গাড়িটা ভাল করে লক্ষ্য করিনি।

বললাম, 'এত রাত্রে, এখানে?'

'অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি, উঠে আসুন।'

'এত রাত্তিরে?'

লীলাবতীর হাসি কানে এল 'এগারোটা এমন কিছু রাত নয়। ভয় নেই, আপনাকে নিয়ে পালাবো না।' লীলাবতী গাড়ির দরজা খুলে দিল। ওর পাশে গিয়ে বসতেই মদের তীব্র গন্ধ নাকে এল।

'আপনি ড্রিংক করে ড্রাইভ করবেন?'

'ড্রিংক করলে আমি খুব স্টেডি হই অশোকবাবু। অথবা এও বলতে পারেন, স্টেডি হবার জন্যই আমি ড্রিংক করি।' লীলাবতী গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। লীলাবতী কথা বলছে না। ও যেন চিন্তার অতলে ডুবে গিয়েছে। এক সময় বললাম, 'চলুন ফেরা যাক।' লীলাবতী উত্তর দিল না। গাড়িও ঘোরাল না। বাধ্য হয়েই আবার বলতে হল, 'আমি খুব ক্লান্ত মিস দেশপাণ্ডে, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন।'

লীলাবতী একবার আমার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল। শান্তভাবে বলল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

'অনিমেষের ওখানে।'

লীলাবতী দপ করে জ্বলে উঠল, 'আপনার বন্ধু একজন হৃদয়হীন মানুষ।'

উত্তর দিলাম না।

লীলাবতী আবার বলল, 'অনিমেষ আজ আমাকে দারুন অপমান করেছে। এত অপমান জীবনে সে আমাকে আর করে নি। কী বলেছে জানেন?' লীলাবতী চুপ করল। ও যেন নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলল, 'বলেছে আমার মত মেয়েকে ও নাকি ঘৃণা করে। ভাবতে পারেন, অনিমেষ আমার মুখের ওপর এই কথা বলেছে!' বলতে বলতে লীলাবতী ভেঙে পড়ল। ধীরে ধীরে গাড়ি থেমে গেল। স্টিয়ারিং-এর ওপর মাথা রেখে পড়ে রইল লীলাবতী।

বললাম, 'অনিমেষের অবস্থায় পড়লে অনেকের পক্ষেই মাথা ঠিক রাখা সম্ভবপর হতো না। ওর বোন বিভা আবার পাগল হয়ে গেছে।'

সোজা হয়ে গেল লীলাবতী। সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, 'ভালই হয়েছে।'

'একী বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলছি, বিভা পাগল না হলে আমাকেই পাগল হতে হতো। জানেন অনিমেষ বিয়ে করতে চায় না কেন? শুধুমাত্র বিভার জন্য। এ বিয়েতে বিভার মত নেই। আমাকে দেখলে বিভা ক্ষেপে যায়। পরশু আমাকে ও মারতে এসেছিল।'

আরও কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইল লীলাবতী, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

শুতে যাবার আগে ছোট একটা প্রার্থনা জানিয়ে শোয়ার অভ্যেস আমার। আমার জীবন সুখের হোক, মা-র জীবন সুখের হোক। আজ বললাম, লীলাবতী সুখী হোক, বিভা সুস্থ হোক, অনিমেষ শান্তি পাক, কেদারবাবুর জীবন আনন্দময় হোক, অনিমেষের মার দুঃখ ঘুচে যাক। বলার পরে নিজের মনেই বললাম, আমেন। তথাস্তু।

অফিসে যেতেই দেশপাণ্ডে ডেকে পাঠালেন, উনি যেন এতক্ষণ আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। ঘরে ঢুকতেই উনি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে থাকার পর দেশপাণ্ডে বললেন, 'জানেন, আপনাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি?' ঘাড় নাড়তে উনি বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল। আমাদের সম্মুখে আজ বিরাট এক সমস্যা দেখা দিয়েছে, যে সমস্যার কথা অপর কাউকে বলা যায় না। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনাকে আমি নিজের মানুষ বলে মনে করি মিস্টার চ্যাটার্জি।' যদিও কথাগুলো নাটকীয়, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে অন্তরঙ্গ সুর ছিল, অস্বাভাবিক বলে মনে হল না।

বললাম, 'আমার সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।'

'গুড। সে বিশ্বাস আমার আছে বলেই প্রথম আপনার কথাই মনে পড়লো। আপনার সাহায্য আমার খুব দরকার মিস্টার চ্যাটার্জি। বলতে গেলে আপনি আমার ছেলের বয়সী, সে বেঁচে থাকলে আপনার মতই হতো।'

'আপনার ছেলে ছিল?'

'হ্যাঁ, জলে ডুবে মারা গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল।' দেশপাণ্ডের সদা-উজ্জ্বল মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।

একটুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, 'আমাদের সার্ভিস ইনচার্জ ভাট আপনার বন্ধু।'

প্রথমে বুঝতে পারিনি, 'কোন দত্ত?'

'অনিমেষ ভাট। আমি যতদূর জানি আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ মধুর। কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তার কাজকর্ম দিনকে দিন খুব খারাপ হচ্ছে। আপনি যে সেলস্-এ ভাল ফল দেখাতে পারছেন না, জানেন তার কারণ কি?'

'জেনারেল ডিপ্রেশন ইন দ্য মার্কেট, বা আমার ইন-এফিসিয়েন্সী।'

দেশপাণ্ডে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সার্টেনলী নট। মার্কেট ইদানীং প্রতি বছরই ডিপ্রেসড্ থাকে, কিন্তু সেলস এরকম পুয়োর হয় না। এর একমাত্র কারণ আমরা গুড-উইল নষ্ট করে ফেলছি। এই গুড-উইল নষ্ট করার মূলে কী রয়েছে জানেন। ইনএফিসিয়েণ্ট সার্ভিস, নট ইউ। আমরা মাল বেচে পারচেজারদের খুশী করতে পারছি না। ব্রেক ডাউন কল ঠিকমত অ্যাটেণ্ড করা হচ্ছে না, ঠিকমত মেরামত হচ্ছে না, ফলে একটা বদনামের সৃষ্টি হচ্ছে। এই রিপোর্ট আমি তৈরি করেছি আপনার তরফ থেকে, দয়া করে এখানে একটা সই করে দিন।' দেশপাণ্ডে একতাড়া কাগজ আমার দিকে ঠেলে দিলেন।

কাগজগুলো হাতে নিতে নিতে বললাম, 'আমাকে সময় দিন, পড়ে দেখবো।'

দেশপাণ্ডে অধৈর্যস্বরে বলে উঠলেন, 'এতে পড়ে দেখার মত কিছু নেই মিস্টার চ্যাটার্জি। দিজ আর বেয়ার ফ্যাক্টস্। অসত্য ঘটনা একটাও স্থান পায়নি এই রিপোর্টে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সই করার আগে সবকিছুই পড়ে দেখা আমার একটা বদ-অভ্যেস মিস্টার দেশপাণ্ডে।'

দেশপাণ্ডেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, 'অর্থাৎ আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?'

'আপনি যে পরিশ্রম করে আমার জন্যে এই বিরাট রিপোর্ট তৈরী করেছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' আর একমুহূর্তও দাঁড়ালাম না। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। পিঠের ওপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টি উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

ঘরে এসে নিবিষ্ট মনে রিপোর্ট পড়ছিলাম, অনিমেষ এসে ঢুকল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ও বলল, 'খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?'

মুখ না তুলেই বললাম, 'হ্যাঁ, কিছু দরকার?'

অনিমেষ বলল, 'বিশেষ না, একটা কথা জানাতে এসেছিলাম। সামনের সপ্তাহে দিন-চারেকের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় যাব। বিদেশী ডাক্তারটি কিছুদিনের মধ্যেই কোলকাতায় আসছেন। কেস হিস্ট্রি তৈরি

করে ডেট পাবার চেষ্টা করা হবে, আমার ডাক্তার-বন্ধু সেরকম লিখেছে, তারপর বিভাকে নিয়ে যাব।'

অনিমেষ চলে যাচ্ছিল। ডাকলাম, 'তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ আছে অনিমেষ।'

অনিমেষ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বলতে লাগলাম, 'গত তিন মাসে তোমার ডিপার্টমেণ্ট দুশো বারোটা ব্রেক-ডাউন কল অ্যাটেন্ড করেছে, তার মধ্যে একশো তেরোটার রিপিট কল এসেছে। এই মেসিনগুলো সবই ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে। অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশটির বেশী কলই তোমাদের দোষে।' অনিমেষ একটাও কথা বলল না, যেমন দাঁড়িয়েছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। আবার বললাম, 'এ-বিষয়ে তোমার বলার কিছু আছে?

নিমেষের জন্য অনিমেষের চোখ কৌতুকে নেচে উঠল। 'দেশপাণ্ডেদের ইংরেজী ভাল। রিপোর্টটা ভাল করে পড়, ভাষা শেখার ব্যাপারে কাজে লাগবে।'

"তুমি জানলে কি করে যে, এই রিপোর্ট ওর লেখা?'

'ওর বলতে তুমি কাকে মিন করছো?'

'মিস্টার দেশপাণ্ডে।'

'না, মিস্ দেশপাণ্ডে।'

'লীলাবতী এই রিপোর্ট তৈরি করেছে? কিন্তু এই অফিসের সে তো কেউ না।'

'ওর বাবা একজন কেউকেটা। একটা কথা হয়ত তুমি জানো না, লীলাবতী ইংরেজীর ছাত্রী এবং সে যার ওপর রাগে তাকে ছাড়ে না।'

'লীলাবতী তোমার ওপর রেগেছে? কিন্তু কেন?' সঙ্গে সঙ্গে মনে হল প্রশ্নটা অবান্তর। এর উত্তর আমার অ-জানা না। অনিমেষ উত্তর দিল না। হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কাগজের তাড়াটা এক টানে ছিঁড়ে ফেললাম।

অনিমেষ বলল, 'এ কী করলে!'

রাগটা গিয়ে পড়ল অনিমেষের ওপর। বললাম 'তুমি একজন অক্ষম পুরুষ।'

অনিমেষ রাগল না। নরম চোখ দিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'কাজটা হয়ত ভাল করলে না।'

'কাজের কৈফিয়ৎ দেওয়ার অভ্যেস আমার নেই অনিমেষ।' গলার স্বর উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। অনিমেষ উত্তেজিত হল না। একভাবেই নরম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

যাবার সময় অনিমেষ বলে গেল, 'যুদ্ধের জন্য তৈরি থেকো।'

অনিমেষ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য একটা জ্বালা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অথচ রাগটা যে কার ওপর, অনিমেষ, লীলাবতী, দেশপাণ্ডে না আমার নিজেরই ওপর বুঝতে পারলাম না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। রাগটা ক্রমশ বাড়তেই লাগল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্থিরতা। বসে থাকা রীতিমত কষ্টকর মনে হতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করলাম কিছুক্ষণ। জানালা দিয়ে নীচের রাস্তা দেখতে লাগলাম। অগণিত মানুষ, অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া, মন ঘুরেফিরে আবার একই জায়গায় এসে পাক খাচ্ছে। কী অসহ্য আস্পর্ধা লোকটার। নিজের তৈরি করা রিপোর্ট কিনা অম্লানবদনে আমার হাতে দিয়ে সই করতে বলল। আর মেয়েটিও হয়েছে তেমন! উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত মেয়েই বটে। কোন স্ত্রীলোক যে এত কদর্য হতে পারে, কিম্বা এত নিষ্ঠুর, জানা ছিল না। সত্যিই কি জানা ছিল না? অতর্কিতে সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। এর চেয়ে শত-সহস্র গুণ নিষ্ঠুর এক মহিলাকে আমি জানি। একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওপরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, অথচ আমি ওর কোন ক্ষতি করিনি। বরঞ্চ ওর মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করিনি কোনদিন। সুপ্রিয়াকে মনে মনে আদিম বর্বর বলে গালাগাল দিলাম। আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে এর বেশী কিছু চিন্তা করার মত ভাষা আমার মনে আসছিল না।

হঠাৎ টেলিফোনের দিকে দৃষ্টি গেল। রিসিভার তুলে নিয়েই কলকাতার অফিস চাইলাম। লাইন ক্লিয়ার ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই কানেকশন পেয়ে গেলাম।

'আমি সেক্রেটারি মিস মিত্রর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়াকে পাওয়া গেল।

'আমি পাটনা থেকে বলছি।'

'বলো।'

'আমার পক্ষে এখানে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।'

'কী ছেলেমানুষী করছো। এখানে আবার গণ্ডগোল শুরু হয়েছে, দু-এক-দিনের মধ্যেই ফ্যাক্টরী লক-আউট হয়ে যাবে। কাল মিস্টার কাপুরকে ঘেরাও করেছিল, আজ নাকি আবার করবে।'

'কিন্তু আমি এখানে থাকতে পারছি না, থাকা সম্ভবপর হচ্ছে না।'

'তোমার চাকরি ছাড়াও আমার মাথায় অনেক প্রবলেম রয়েছে। আর প্রবলেমগুলো প্রত্যেকটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।'

হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেললাম। মনে হল আমার জিভ অসাড় হয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করেও একটা শব্দ উচ্চারণ করা গেল না। সুপ্রিয়া চেঁচিয়ে বলল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? উত্তর দিচ্ছো না কেন? হ্যালো, হ্যালো—'

কানে রিসিভার চেপে রেখেও আমি আর সুপ্রিয়ার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। একটা বিকট ঝড়ের শব্দ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় করে ফেলেছিল।

দারুণ উত্তেজনায় পদত্যাগপত্র ডাক-বাক্সে ছেড়ে এলাম। ডাকবাক্স বেশী দূরে না। সামান্য এইটুকু পথ, যাতায়াত করতে প্রচণ্ড হাঁপ ধরে গেল। পরিশ্রান্ত কুকুরের মত অনেকক্ষণ ধরে হাঁপালাম।

অনিমেষকে ডেকে পাঠালাম। অনিমেষ আসতেই ওর হাতে গোটা কয়েক নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, 'তুমি যেদিন যাবে, আমারও টিকিট কেটো।' একটু থেমে আবার বললাম, 'যাওয়াটা হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল।'

অনিমেষ 'ঠিক আছে' বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বললাম, 'বিভা কেমন আছে?'

'অফিসে বেরোবার সময় পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিল। দুপুরে খবর নিয়েছি, ঘুম ভেঙে চুপ করে শুয়ে আছে, চেঁচামেচি করছে না। বিভা চেঁচাচ্ছে না, কিন্তু বাবা নাকি খুব দাপাদাপি করছেন।'

'কেন?'

'সেই এক অনুযোগ। আমি-ই নাকি সংসারটা নষ্ট করে দিলাম।' অনিমেষ বিষণ্ণভাবে হাসল।

উঠে গিয়ে অনিমেষের একটা হাত চেপে ধরে বললাম, 'তুমি সংসার নষ্ট করো নি অনিমেষ। একথা কেউ বিশ্বাস না করলেও আমি করি। তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে না।'

অনিমেষ উত্তর দিল না। আমার হাতে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

লাঞ্চের পরে ঘরে এসে ঢুকলেন দেশপাণ্ডে। 'রিপোর্ট কি সই করেছেন?'

ওয়েস্ট পেপার বাসকেট ওপরে তুলে ধরে কাগজগুলো দেখাতেই ভদ্রলোকের মুখ লাল হয়ে উঠল। দেখে মনে হচ্ছিল উনি কষ্ট করে নিজেকে সংযত করছেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে চিবিয়ে খাবার মত করে বলতে লাগলেন, 'অবাধ্য এবং অসংযত স্টাফকে কী করতে হয় আমার জানা আছে।'

'কিন্তু যে আপনার স্টাফ না, তাকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আপনার নেই মিস্টার দেশপাণ্ডে। কিছুক্ষণ আগেই আমি কোলকাতার অফিসে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছি।'

দেশপাণ্ডে সামনের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লেন। 'আপনি রেজিগনেশন দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ ধরে মাথা নীচু করে বসে রইলেন দেশপাণ্ডে। দেখে মনে হচ্ছিল উনি আর কোনদিনই মাথা উঁচু করবেন না। এক সময় ও'র কথা কানে এল, 'কাজটা ভাল করলেন না মিস্টার চ্যাটার্জি। চাকরির বাজার খুব খারাপ। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ ছিল না। আপনাকে আমি কাজের লোক বলে ভাবতাম।'

'কিন্তু আমি আর নিজেকে কাজের

লোক বলে ভাবতে পারছিলাম না। অনেক-দিন ধরে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছিলাম। আপনাকে একটা অনুরোধ করবো, এই বেলাটা আমাকে ছুটি দিন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' বলে দেশপাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন। কাগজপত্র চাপা দিয়ে আমিও উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দাঁড়ালাম। গভীর ভাবে বার কয়েক নিঃশ্বাস নিলাম। মনে হল বুকের মধ্যটা বিষাক্ত হাওয়ায় ভরে গিয়েছিল, হঠাৎ বুকটা খুব হালকা হয়ে গেল। এত হালকা যে কী বলবো! ইচ্ছে করল গলা ছেড়ে ছোটবেলার শোনা গানটা গেয়ে উঠি, মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে। হেমন্তের মাঝামাঝি। আকাশের রং গাঢ় নীল। মাঝে মাঝে শাদা মেঘের স্তূপ। রোদের তেজ আছে, কিন্তু উত্তাপ নেই। বাতাসে কেমন নেশা জাগানো ভাব। সোজা হাঁটতে লাগলাম। খুব ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি একজন সদ্যমুক্ত ক্রীতদাস। কিছুক্ষণ আগেও আমার হাতে পায়ে লোহার শিকল ছিল। হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে লোহায় লোহায় ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ উঠছিল, ঝনাৎ ঝনাৎ। সেই শব্দটা আর নেই, হাত পা অনেক বেশী হালকা মনে হচ্ছে। অনেক হালকা, অনেক স্বাধীন। খুব ছেলেবেলার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। তখন বাবা বেঁচে ছিলেন, এবং সুস্থ ছিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)
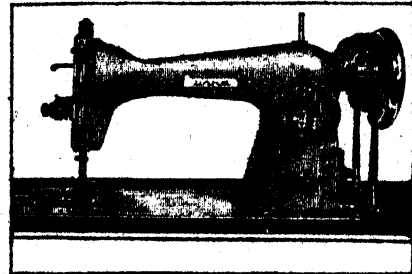
অঙ্গনা

শরীরের নাম মহাশয়

আমাদের শরীর অতি রহস্যময়। প্রতি মুহূর্তে যা ঘটছে তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় শরীরে। খুব বেশী শীত পড়লে কাঁপুনি ধরে। দাঁত ঠকঠক করে। আমরা উষ্ণতার আশ্রয় খুঁজি। শীতের প্রকোপ বাঁচিয়ে গরম থাকার চেষ্টা করি। আবার যদি কোন অসুখ-বিসুখ করে তবে শরীরে অন্যরকম প্রভাব পড়ে। মুখচোখ ঔজ্জ্বল্য হারায়। একটা পাশুটে ভাব আমাদের শরীরকে আশ্রয় করে। তেমনি গভীর দুঃখ অথবা সুখের অনুভূতিতে চোখে নেমে আসে শ্রাবণের ধারা। দুঃখে কেঁদে শরীর হালকা করি। আর আনন্দে অশ্রুজলে ভেসে নবজীবন লাভ করি। যদি কখনো খুব ভয় পাই তখন সারা শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সেই সময়টিতে রক্তপ্রবাহ যেন স্বাভাবিকতা হারায়। সব যেন হিম হয়ে আসে। নিথর নিষ্পন্দ।

বিভিন্ন সময়ে শরীরের এই পরিবর্তন আমরা সকলেই অনুভব করি। আর এও জানি যে, বিভিন্ন মুহূর্তে শরীরের অভিব্যক্তি একইরকম হয় না। আমাদের অনেকেই স্বতঃসিদ্ধের মতো এই শারীরিক পরিবর্তন গ্রাহ্য করেন না। কোন ঘটনায় কি হচ্ছে অতটা খোঁজখবর করেন না। হঠাৎ হয়তো শরীরের দুর্বলতা অনুভূত হলো. স্বরূপ গ্রীষ্মেও দরদর করে ঘাম দিতে শুরু করলো আমরা তখন নেহাতই দুর্বলতার দোহাই দিয়ে সমস্ত ঘটনাটি ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। এরকম আকস্মিক পরিবর্তনের আর কোন অনুসন্ধান করলাম না। এবং তার যে কোন প্রয়োজন আছে সেকথাও হুঁশ হলো না। অন্ততঃ শরীরের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বাচ্চারা ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়মিড় করে। আমরা পাশ ফিরে শুই। কিন্তু শরীরে একটা স্বাভাবিক তাপ থাকা প্রয়োজন। এই তাপের অভাব ঘটলে শরীর হয় দুর্বল। তখনই দাঁত ঠকঠক করে বা কিড়মিড় করে। মাংসপেশীর ক্রমাগত সংকোচন আর প্রসারণ থেকেই শরীরে তাপ উৎপন্ন হয়। আর এর ফলেই আমাদের শক্তি। কিন্তু মাংসপেশীর ক্রিয়ায় কোন ত্রুটি হলে সঙ্গে সঙ্গে তার খবর চলে যায় মস্তিষ্কে। সেখান থেকে নির্দেশ আসে তাপ উৎপাদনের। দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যায়। এই দ্রুততার জন্য শরীর কেঁপে ওঠে। অর্থাৎ এসময় কোন মাংসপেশী আর নিষ্ক্রিয় থাকে না। সবাই কাজ করে। দাঁতের মাংসপেশীও এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে না। স্বাভাবিক কারণেই দাঁত ঠকঠক বা কিড়মিড় করে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি হলো শরীরে তাপ উৎপাদনের সহায়ক। এজন্য ভীতি বা দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

আমরা কখনো কখনো খুব ভয় পাই। তখন এত বেশি ভীত হয়ে পড়ি যে, শরীর কাঁপতে শুরু করে। এতে আমরা আরো ঘাবড়ে যাই। যদি সঠিক কারণ জানা থাকে তবে ভয়ের মুহূর্তে এই বাড়তি ঘাবড়ানোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব নয়। নানাপ্রকার দুর্দৈব থেকে আমাদের শরীরকে রক্ষার জন্য কয়েকটি শক্তি দেহযন্ত্রে সবসময় কাজ করে যাচ্ছে। কোনকিছুতে ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিগুলির সক্রিয়তা একজোট হয়ে সেই ভয়ের মোকাবিলা করে। বিপদের সঙ্গে আমরা সংঘর্ষ হয় শরীরের। এখান থেকেই আমরা নির্দেশ পাই মুখোমুখি রুখে দাঁড়ানোর অথবা পলায়নের। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য এসময় মাংসপেশীতে স্বাভাবিকের তুলনায় রক্তপ্রবাহ কমে যায়। তাই মুখচোখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। হজমে বিঘ্ন ঘটে। আবার বিপদ সেই মুহূর্তে কেটে না গিয়ে যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে তার প্রভাবও হয় সুদূরপ্রসারী। দুশ্চিন্তা মনে এসে বাসা বাঁধে। শরীর শ্লথ হয়ে পড়ে। সবকিছুই তখন অন্যরকম হয়ে যায়। তারপর একসময় মাংসপেশী রীতিমত কাজ শুরু করবে। কিন্তু তখনো ভয়ের ভাব সহজে কাটে না। শরীর থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। তবে মনে রাখা দরকার যে, ভয় থেকে জাত এই কম্পন শীতের কাঁপুনি থেকে স্বতন্ত্র।

ভয়ে শরীর কাঁপে আবার শীতেও শরীর কাঁপে। খুব শীতের মধ্যে একটা জন্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার শরীরটা কেমন ফুলিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ শরীরের লোমগুলি ফুলে উঠে তাকে শীতের আক্রমণ থেকে বাঁচাচ্ছে। গরমের সময় সেই জন্তুর শরীর কিন্তু আর তেমন ফোলা দেখা যায় না। বরং শীতের তুলনায় কেমন রোগা রোগা ভাব। শরীরের লোমরাজি শীতের হাত থেকে আমাদের অনেকখানি বাঁচায়। শীতের সঙ্গে আমাদের শরীর যন্ত্রের সংঘর্ষ একটু জটিল। কেউ কেউ বেশি শীত অনুভব করেন আবার কারো বা কম। এজন্য মূলতঃ আমাদের শরীরই দায়ী। তবে দেহযন্ত্র যদি শীতের প্রকোপ থেকে শরীরকে যথাযথ বাঁচাতে না পারে তবে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ত্বকের উপর নানারকম ফুস্কুড়ির আক্রমণে। অতীতে অর্থাৎ মানবসভ্যতার প্রারম্ভে মানুষের শরীরে অত্যধিক লোম ছিল। তখন এই লোম শরীরের সমস্ত গরমকে বেঁধে রাখতো। এখন যা হয় জন্তু-জানোয়ারের বেলায়। প্রচণ্ড শীতে আমরা এখন গরম জামা-কাপড়ের আশ্রয় নিই।

মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। আমাদের অনেকের ধারণা পেটের গোলযোগের জন্যই এমনটা হয়। সবসময় যে এই ধারণা সঠিক তা নয়। আমরা পেঁয়াজ-রসুন এবং উগ্র ঝাঁজযুক্ত কোনকিছু খেলে মুখে গন্ধ হয় এবং নিঃশ্বাসেও তার প্রকাশ ঘটে। আসল ব্যাপার হলো যে, পদার্থের গন্ধ রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে সঞ্চারিত হয়। এর ফলেই নিঃশ্বাসেও তার গন্ধ পাওয়া যায়।

মাথা ঘোরার ব্যারামে মেয়েরা প্রায়ই ভোগে। এর সূচনা সাধারণতঃ হয় কান থেকে। ধরা যাক এই ব্যামোতে ভোগেন না এমন কেউ গাড়ি বা ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছেন। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি হাই-স্পীড তুলেছে অথবা ট্রেন ছুটেছে দারুণ জোরে। হঠাৎ তার মাথায় কি খেয়াল হলো তিনি ঝাঁপ দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাঁকে ধরে ফেললেন। যদি ঝাঁপ দিতে গিয়ে সফলকাম হতেন তাহলে তো অন্যকথা। কিন্তু এবার তিনি বেঁচে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথাঘোরার ব্যারামে আক্রান্ত হলেন। ঝাঁপ খাওয়ার মুহূর্তে কানের মধ্য দিয়ে হাওয়ার সঞ্চালন ঘটে তীব্র বেগে যাতে কিনা মাথায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মাথাঘোরা রোগ এভাবেও হয়। আবার এরকম দুর্ঘটনাজনিত কারণ ছাড়াও মাথাঘোরার ব্যামোতে ভুগতে হয়।

কঠিন অসুখবিসুখ হলে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর সুস্থ হয়ে উঠলে স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগে। এ সময় একটা উটকো ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। চোখের সামনে একটা বেগুনি রঙের পর্দা যেন খাটানো রয়েছে। দেহত্বকেও একই রঙ দেখা যায়। এজন্য আমরা মনে করি যে চোখ বুঝি খারাপ হলো। কিন্তু এরকম অনুভূতি হলেই একটু ভাল করে চোখ মেলে তাকাতে হবে। এবং মনকে সংশয়মুক্ত করতে হবে। আস্তে আস্তে দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে। বেগুনি রঙের ছায়া আর দেখা যাবে না। এজন্য এমনি কোন বাহ্যিক চিকিৎসা নেই। এর মনোবৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করাই ভাল। দুর্বলতা থেকেই এরকম হয়। তারপর স্বাস্থ্য ভাল হয়ে এলেই সবদিক থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা যায়।

অসুখে ভুগে উঠলে জিভে ময়লা দেখা যায়। নিয়মিত মুখ না ধোয়ার জন্য এরকম যে হয় তা নয়। অসুখের প্রভাবেই এরকম হয়। শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। মুখকে যা কীটানুমুক্ত রাখে তার উপরও অসুখের প্রভাব পড়ে। এজন্যই জিভের উপর ময়লা জমে।

আসল কথা হলো শরীর। শরীর সুস্থ তো সব ঠিক। না হলেই কোথায় কি বিগড়ে বসবে তার ঠিক নেই। শরীর হবে শ্রীহীন। সৌন্দর্যের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আমাদের যদি সুনিদ্রা হয় তবে রোগ আক্রমণের ভয় কমবে আর সেই সঙ্গে সৌন্দর্যও বাড়বে। ঘুম ঠিক মতো না হলে শরীর খারাপ লাগে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। চেহারার উপরও তার প্রভাব পড়ে। চোখের কোলে কালি পড়ে। মুখশ্রী পাল্টে হয়ে যায়। ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে। অনিদ্রা মহিলাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। হরমোন সক্রিয়তার প্রভাব ঘুমের উপর পড়ে। এতে ঘুমের অভাবে মহিলাদের সৌন্দর্যহানি খুবই স্বাভাবিক।

ঘুম দুরকম : পরম্পরাযুক্ত এবং পরম্পরাবিহীন। রাত্রির প্রথম দিকের ঘুম হলো পরম্পরাযুক্ত। এসময় শরীরের তাপ কমে যায়, নাড়ী চলাচল ঠিক স্বাভাবিক থাকে না। এবং শ্বাসক্রিয়া পুরো স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি। আর স্বপ্নের জগৎই তখন আমাদের নিজের জগৎ। ক্রমাগত স্বপ্ন দেখতে দেখতে শ্বাসক্রিয়া অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং রক্ত-চাপে পরিবর্তন দেখা দেয়। তারপর ক্ষণিকের জন্য পরম্পরাবিহীন নিদ্রা আমাদের ঘিরে ধরে। এই ঘুম এই জাগরণ। পরক্ষণেই স্বপ্নরাজ্য।

সুনিদ্রার জন্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা উচিত। কারণ, আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। অনিদ্রার প্রকোপ কাটানোর জন্য তাই কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। শুতে যাবার পূর্বমুহূর্তে অথবা সামান্য আগে চা-কফি [illegible] ঠিক নয়। রাত্রির খাওয়া যাতে [illegible] না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। [illegible] খালি পেটে শোওয়াও উচিত হবে না। দুইই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এবং সৌন্দর্যহানিকর।

সুস্থ শরীর ও স্বাভাবিক ঘুম শরীর এবং সৌন্দর্যের পরম সহায়ক। এ দুয়ে মিলে গুণগত দিক থেকে সৌন্দর্য আমাদের অপরূপ করে। রঙ থাকলেই রঙ চড়ানো যায় একথা মনে রেখে আমাদের জীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখতে হবে। রঙ বলতে অবশ্য এখানে সৌন্দর্যের রঙ—যা না থাকলে ঘষামাজায় চমক ওঠে না।

—প্রমীলা

লেডিস কামরা

লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরাটি নিয়ে বিভ্রাট প্রতিদিনই লেগে আছে। আর এখন যেন ছকে বেঁধে গেছে ঘটনাগুলো। অনেকে না পেরে ছেড়ে দিয়েছেন। কত আর পারা যায়। কিন্তু তাতে সমস্যার কিছু সমাধান হয়নি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

ব্যাপারটা গভীরতার দিক থেকে মোটেই তেমন কিছু নয়। কিন্তু তা হলে কি হবে? এক দল যতই শিক্ষিত হোন, তবু কেন যেন অবুঝ হয়ে পড়েন মাঝে মাঝে, আর এক দল তো সুযোগের সন্ধানে দুচোখ মেলেই আছেন সব সময়ই।

—আরে দীপা অত ছুটছিল কেন?

—দেরী হয়ে গেছে। আর লেডিস-টাতো একদম সামনে।

এমনিই অবস্থা হয় মেয়েদের। মেয়েরা মরীয়া হয়েই ছোটে মহিলা কামরাটিতে ওঠার জন্য। এতে যে অনেক সুবিধা তাদের একথা নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রতিদিন শহরতলি থেকে আসে অসংখ্য মেয়ে। নানা উদ্দেশ্যে এদের যাতায়াত। আজকের দিনে মেয়েদের নানা কারণেই বাইরে বেরোতে হয়।

তাই অফিসের সময় তো ভিড় আছেই, অন্য সময়েও কিছু কমতি যায় না। মেয়ের সংখ্যা এত বেড়ে চলেছে যে ট্রেনের একটি মহিলা কামরা আর কোন মতেই যথেষ্ট নয়। তবু আজকাল কোন কোন গাড়ীতে ছোট কামরার বদলে একটি বড় কামরা দেওয়া হয়ে থাকে।

—কি হচ্ছে কি? উঠতে দিন না? আপনারা অন্য কামরাতে যেতে পারেন না? মেয়েদের কামরাতে একে দেখছেন মেয়েরা উঠতে পারছে না। তবু আপনাদের ভিড় করা চাই। আশ্চর্য।

—কেন আপনারা যখন জেন্টস-এ ওঠেন?

—ওটা জেনারেল কম্পার্টমেন্ট। ওখানে সবাই উঠতে পারে। ওটা শুধু মাত্র ছেলেদের কামরা নয়।

এতো নিত্য দিনের ঘটনা। আর এ ভুলটা যেন একটা অলিখিত ভুল। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডারও অন্ত নেই।

শুধু অবাক লাগে গোটা ট্রেনে যেখানে একটিই লেডিস কম্পার্টমেন্ট সেখানে কেন তার প্রতি ছেলেদের এত ঝোঁক! এ ব্যাপারটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এক একদিন তো আরো অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। মেয়েদের কামরাটি পুরোপুরি ছেলেদের দখলে। কোন কোন মহিলা তা সত্ত্বেও উঠলেন কামরায়। কিন্তু জায়গা ছাড়ার নামগন্ধটি পর্যন্ত নেই। ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে হয় তখন মেয়েদের। কেউ কেউ হয়তো সোজাসুজিই ছেলেদের উঠে যেতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়ে উঠল ছেলেরা। ভাবখানা যেন মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কামরা থেকে ছেলেদের চলে যেতে বলায় মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছেন মহিলারা।

অথচ এযে মেয়েদের পক্ষে কি এক অস্বস্তিকর অবস্থা তা ধারণাতীত। রোজ রোজ আর কত ভাল লাগে এই নিয়ে ঝামেলা করতে। আর না করলে পরিণতি হোল ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

—দেখুন মেয়েটাকে। গরম জামা পরেনি। আবার হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি এখনকার মেয়েরা যে কি?

—মজাটা দেখুন, এত করে ছেলেগুলোকে নামালুম। তবু ওদের লজ্জা নেই। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কম্পার্টমেন্টে উঠতে পারে তো।

—আরে ওরা কি যাবে। ট্রেনটা চলতে শুরু করলেই সব উঠবে এই কামরাটায়।

—দ্যাখো আবার কেমন দাঁত বের করে হাসছে।

—বেশি বলতে গেলেও তো বিপদ। কোথায় আবার রাস্তাঘাটে কি করে বসে।

—তোরা এটায় উঠলি কেন? জানিস না লেডিস।

—কি হয়েছে? এই শ্যামল আয়।

—জানিস তোদের ধরলে একশ টাকা ফাইন।

—ছোঃ! ধরবে, কে ধরবে?

—ওঃ এই ছেলেরা এত চীৎকার করবে না।

—কেন; আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—ওরে বাবা চল্ চল্ অন্য কামরায়। দেখছিস না সাপের মত ফোঁস ফোঁস করছে।

দেখেছেন এরা সব এখনকার কলেজে পড়া ছেলে। মেয়েগুলোও কি। কোন কেয়ার করে না। বাবা মাকেই মানে না।

এটা হওয়াই হয়তো স্বাভাবিক। বয়স্কদের চোখে উচ্ছলতা বিরক্তিকর। তাই এরা রেগে উঠেন অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের চালচলনে।

কথার তো কোন ট্যাকস নেই। ওদের উচ্ছলতা বড় বেশি হয়ে যায়। কিন্তু এক শ্রেণী মহিলা আছেন যাঁরা অল্পেতেই দক্ষযজ্ঞ বাধাতে ঝগড়া করতে কসুর করেন না।

রাত্রির দিকে দূরের মেয়েদের লেডিস কামরায় যাতায়াত করায় অসুবিধে হয় ভীষণ।

কারণ বিশেষ কোন ভয় না থাকায় অনেক সুযোগসন্ধানী লোকের কামরায় ওঠা সহজ হয়ে ওঠে। তাই মেয়েরা বাধ্য হয়েই তখন অন্য কামরায় চলে যায়। এ ছাড়া উপায়ও থাকে না।

এই তো সেদিন হাওড়া সেকশনে একদল ছেলে সাড়ে সাতটার ট্রেনে এক কামরায় ঢুকে পড়ে। যে কয়েকজন ভদ্রমহিলা ছিলেন সেখানে তাঁদের ছোরা দেখিয়ে সব নিয়ে চলে যায়।

এর ফলে মেয়েদের কামরায় অনেক দূরের মেয়েরা যেতে তেমন সাহস পান না রাতের বেলায়। অথচ অনেক রাত্রি না হোক আটটা সাড়ে আটটায় ফেরার দরকার অনেক মেয়েরই হয়।

তাই বলছিলাম ট্রেনের এই লেডিস কামরাটির প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। পুরুষ যাত্রীদের তুলনায় মহিলা যাত্রীর সংখ্যা কম। তাই তাঁদের যাতায়াতের যদি কোন বিশেষ ব্যবস্থা না হয় তবে এই লঘু সম্প্রদায়ের প্রতিদিন যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাই কামরাটি অফিসের সময় আরো বাড়ানো দরকার।

—অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

জীবিকা হিসেবে মডেল

জীবনধারণের তাগিদে কাজের সন্ধানে আজকের দিনে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমান অগ্রণী। এমন একদিন ছিল (বেশীদিন পূর্বের কথা নয়) যখন পুরুষেরাই একমাত্র সংসার খরচের হাল ধরে থাকতেন, সেক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের কোন ভূমিকা ছিল না। তাঁরা রক্ষণশীল পরিবারের পর্দানসীন স্ত্রী বা মেয়ে হিসেবে আভ্যন্তরীণ সংসারের একঘেয়ে কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। সেখানে তাঁদের বাইরের কোন আকর্ষণ থাকাও নিষিদ্ধ ছিল। সে দিন, সে চিন্তা এখন আর নেই। সেই গোলাভরা ধানও নেই, পুকুরভরা মাছও নেই। সুতরাং সংসারের স্বচ্ছলতার ও সংসার চালাবার চিন্তায় অধিকাংশই বিব্রত, উৎকণ্ঠিত। একজনের উপার্জনে সংসার চলে না এমনি বহু পরিবারই আছে। সেক্ষেত্রে বাড়ীর কর্ত্রী বা মেয়েকে অর্থনৈতিক ভাঙা হাল শক্ত মুঠিতে ধরতে হয়। এখন আর এই ধরার কোন সংকোচ নেই, নেই কোন জড়তা। অথচ জড়তা আছে জীবিকা নির্বাচনে।

জীবিকার ওপরে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক মান নির্ভর করে তেমনি এর ওপরেই তাঁর ব্যক্তিগত মান, সম্মানও বহুলাংশে নির্ভর করে। যথেষ্ট শিক্ষিত শুধু নয়, উচ্চশিক্ষিত হলেও বাস কণ্ডাকটরকে অনেক সময়েই বহু জ্ঞানীগুণী লোক 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে সংকুচিত হন। তেমনি সংকুচিত হন কোন মহিলাকে তাঁর জীবিকা অনুযায়ী যথার্থ সম্মান দিতে।

মেয়েদের জীবনের এক নিষ্ঠুর জীবিকা মডেল। সাধারণেরা মনে করেন এরা অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করে। তাই তাঁরা অতি সাবধানে নিজেদের আত্মগোপন করে রাখে তথাকথিত সভ্যসমাজের কাছে।

এক সময় তিল তিল মাধুর্য, সৌন্দর্য দিয়ে লিওনার্দোর শিল্পমানস 'মোনালিসা'-কে রং-তুলিতে রূপ দিয়েছিলেন। জানা যায় মোনালিসা বা ম্যাডনালিসা নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা দিনের পর দিন এ ছবির মডেল হিসেবে লিওনার্দোর স্টুডিওতে এসে হাজিরা দিতেন। তাঁর নাকি সখ হয়েছিল লিওনার্দোকে দিয়ে নিজের একটি প্রতিকৃতি আঁকাবার।

লিওনার্দোর জগৎবিখ্যাত অমর ছবির মডেল হয়েছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা। মোনালিসা নিশ্চয়ই প্রোফেশন্যাল কোন মডেল ছিলেন না। কিন্তু প্রোফেশন্যাল মডেলের কেউ কেউ হয়তো শিল্পীর তুলিতে, নয়তো ভাস্করের পাথরের মূর্তিতে অমর হয়ে থাকবেন। হয়তো কারও ভাগ্যে সে সুযোগ হবে না। কিন্তু প্রোফেশন্যাল মডেলদের তাই নিয়ে কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। তাদের সম্পূর্ণ জীবিকা হিসেবেই এটা বেছে নিতে হয়েছে। তারা শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিয়ে নিজের ও পরিবারের অনেকের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করছে। আমাদের সমাজে এই মডেলদের স্থান কোথায়? জীবিকা হিসেবেই বা মডেলরা জীবনে কতটুকু মানসম্মান আর শ্রদ্ধার পাত্রী হচ্ছে?

এমনি একজন মডেল মহিলা মিসেস বিনতার সঙ্গে দেখা করে তাঁর সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলাম।

বলেছিলাম, 'আপনার এ কাজ কেমন লাগছে?'

মহিলাটি সংকোচে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, কাজ কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করার চেয়ে জিজ্ঞেস করুন কেন এ লাইনে এলাম।

আমার সরাসরি উত্তর, লাইন-এর চিন্তাটা কেন করছেন। চুরি-ডাকাতি বা অসৎ কোন কাজ না করে জীবিকা উপার্জন করছেন এতে এতো লজ্জা কিসের?

মিসেস বিনতা বললেন, লজ্জা কি শুধু আমাদের। লজ্জা তো সকলের—যারা আমাদের আশেপাশে বাস করছেন। আমরা মডেল, আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে অসম্মানিত যেন তারাই। সমাজে আমাদের স্থান অত্যন্ত নীচে।

ও'র চোখেমুখে অত্যন্ত অসন্তোষ ফুটে উঠলো। টেনে টেনে বললেন—'প্রতিবেশীরাই অসম্মানিত একথাই বা বলি কেন সত্যিই তো আমাদের সম্মান কোথায়? সকলেই তো একটা ঘৃণিত দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকায় মনে হয় পৃথিবীতে আমরা অপাংক্তেয়।

মিসেস বিনতা তাঁর জীবনের কতগুলো কথা একাই বলে চললেন। 'আমরা মডেল হই বলে অনেকেই আমাদের অন্ধকারের জীব মনে করেন। অথচ এই মডেল হবার আগে আমার জীবন ছিল অন্যরকম। বাবা পোর্টকমিশনের চলনসই এক পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই কল্যাণে বিয়ের বছর দু'-এর মধ্যে আমি এক কন্যারত্ন লাভ করেছিলাম। মোটামুটি চলে যেত সংসার। কিন্তু সংসারের এই সুখ আমার কোনদিন টিকলো না। আমার স্বামী অন্য এক মহিলায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিলেন। বহুদিন অপেক্ষা করেছি, সে ফিরে আসবে বলে কিন্তু আমার অপেক্ষায়ই শুধু কালক্ষেপ হয়েছে।

এরপর চাকরীর চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলাম। কোনদিকেই কোন সুবিধা করতে পারি নি। শেষে একদিন খবর পেলাম আর্ট কলেজ বা শিল্পীদের কোন স্টুডিওতে সন্ধান নিলে হয়তো বা একটা মডেলের কাজ জুটতে পারে। আমি মরিয়া হয়ে তারই সন্ধানে চললাম। জুটে গেল কাজ।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আর্ট কলেজ জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র হল। জীবনে এই অভিজ্ঞতার কথা কোনদিন ভুলবো না। সে কি চূড়ান্ত লজ্জা। মনে হচ্ছিল লজ্জা-সরমে ধরণী দ্বিধা হলে আমি ঢুকে গিয়ে বেঁচে যেতাম। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে আমাকে সেদিন মডেল হতে হল। দিনের পর দিন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, বসে আমি আমার আপন সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হত নিষ্প্রাণ পাথরের মত আমি কঠিন কোন ধাতুতে গড়া। ছাত্রছাত্রীরা হয়তো বা কেউ সহৃদয়সম্পন্ন ছিল আবার কেউ কেউ নানারকম নিষ্ঠুর উক্তিতে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করতো। সবই সয়ে গিয়েছিল আমার সেই ছোট্ট মেয়েটির মুখ চেয়ে।

সবচেয়ে দুঃখের জিনিস হচ্ছে এ কাজে কারুর চোখে কোন সম্মান বা শ্রদ্ধা নেই। অনেকেই মনে করেন রাতের আঁধারেই আমরা পুরুষদের শিকার করে পয়সা উপার্জন করি আর দিনের বেলায় 'মডেল'। একটানা অনেকগুলো কথা বলে মিসেস বিনতা হাঁপিয়ে উঠলেন।

আমি বললাম, নিজের ভরণপোষণের চিন্তা যখন আপনাকেই করতে হবে তখন অন্যেদের কথা কানে তুলে লাভ কি?

'সব বুঝলাম। একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আমরা সামাজিক জীব। সমাজকে বাদ দিয়ে একা চলার মত অর্থ তো আমরা উপার্জন করতে পারি না। মেয়েটিকে সারাদিন রাখার জন্য প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হতেই হবে। ওদের কাছে মিথ্যে বলে আর লাভ কি? অবশ্য মিথ্যে দিয়েই প্রথম কাজের সূচনা করেছিলাম কিন্তু বেশীদিন তা টেঁকে নি। এখন সত্য বলতে সংকোচ কেটে গেছে।'

মিসেস বিনতা একান্ত নিরুপায় হয়ে যে জীবিকাকে বেছে নিয়েছেন তার প্রয়োজন আমাদের সমাজে নিশ্চয়ই আছে। আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একই অভিযোগ শুনি, ভাল মডেল পাই না, লাইফ স্টাডি করতে আর ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে মডেলের একান্ত অভাব। যারা এই মডেলের কাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তাঁদের দিনমজুরী অতি সামান্য বা দিয়ে তাঁদের দিনগুজরান করা যথেষ্ট কষ্টসাপেক্ষ। বিদেশের দেশগুলোতে মডেলদের কদর ও সম্মান আছে, ঐসব দেশে মডেলের কাজ আমাদের দেশের মত নিন্দনীয় নয়। আসলে সভ্যতার বড়াই করা আমাদের একটা অহংকার। অথচ সেই অহংকার করার যথার্থ যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

—[illegible] চৌধুরী

স্টুডেণ্টস্ হেল্থ হোম মহান প্রয়াস

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া!' শেয়ালদা রেল-স্টেশনের কর্মপ্রবাহের অদূরে মৌলালির মোড়ে 'স্টুডেণ্টস্ হেল্থ হোমে'র বিরাট তিনতলা বাড়ীটার মধ্যে যে এখন একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতাল গড়ে উঠেছে নিঃশব্দে, স্বচক্ষে ঘুরে না দেখলে তা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারতাম না। সম্পূর্ণভাবে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থা যৌবনশক্তিতে জীবন্ত। নিয়মানুবর্তিতায়, দায়িত্বসচেতনতায়, পরিচ্ছন্নতায়, সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রমে নিঃস্বার্থভাবে এমন একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানকে বৃহত্তর করবার যে প্রয়াস ও উদ্যম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম, তাতে শুধু একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছে—ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় শুধু ভাঙতেই জানে না, গড়তেও জানে। গড়ার কাজে পরিচালিত করলে তাঁরাও অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। বেসরকারী অ-রাজনৈতিক এই সংস্থাটি ভারতের গৌরব, দৃষ্টান্তস্থল।

মাত্র দু দশক আগে ১৯৫২ সালে ডাঃ অজিত বসুর ধর্মতলা ডিসপেনসারির [illegible] কর্মকেন্দ্র স্বরূপ পরিমিত স্থানে ছাত্ররা নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্র প্রথম স্থাপন করেছিলেন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। ক্ষয়রোগ-গ্রস্তা জনৈকা ছাত্রীকে বাঁচাতে গিয়েই তাঁরা প্রেরণা পেয়েছিলেন এই জাতীয় সংস্থা গড়ে তোলবার। স্থান সংকুলান না হবার ফলে সেখান থেকে প্রথমে ক্রীক্ রো, পরে ১৯৬৪ সালে মৌলালির মোড়ে হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয়।

কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব হাসপাতাল গড়ার স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীরা প্রায় বিনামূল্যে ওষুধ পাচ্ছেন, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসিত হচ্ছেন, ব্যাধি দুরারোগ্য হলে বিদেশে পাঠিয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হেল্থ্ হোমে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়বে মোজাইক করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহতল। ডানপাশে অভ্যর্থনা-কেন্দ্র—ক্লান্তিহীন কয়েকজন ছাত্র কর্ম-ব্যস্ত। সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তাঁরাই পালা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাচ্ছেন। অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ চন্দন মুখার্জি হাসপাতালটি ঘুরিয়ে দেখালেন। কলকাতা কর্পোরেশনের দেওয়া আট কাঠা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতাল ভবনটি জনৈক ইঞ্জিনিয়ার-ছাত্রের পরিকল্পনা। একতলায় অভ্যর্থনাকেন্দ্র, ফিজিওথেরাপি, সেণ্ট্রাল [illegible], জেনারেল ক্লিনিক, এক্সরে বিভাগ। দোতলায় দন্ত, চক্ষু-চর্ম-ই এন টি—স্ত্রীরোগ—মনস্তত্ত্ব—এক্সরে বিভাগ। এ ছাড়া আছে অপারেশন থিয়েটার, মজুত ওষুধ এবং দশটি পুরুষ ও দুটি স্ত্রী শয্যা বিশিষ্ট [illegible] কক্ষ। তিন তলায় ২০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হবে; আর হবে প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটোরী ও লাইব্রেরী। নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে; শুরু হয়েছে চারতলা তোলার আয়োজন।

সভ্য এখানে দুভাবে হওয়া যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাৎসরিক মাত্র ১৲ টাকার বিনিময়ে ব্যক্তিগত সভ্য হতে পারেন। সার্বজনীন সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাদবপুর ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সমেত এ পর্যন্ত [illegible] ৪৫টি কলেজ। এর মধ্যে কলকাতা বাদ দিলে শাখা চিকিৎসাকেন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৪ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া ও বাঁকুড়ার মোট ১৩টি কেন্দ্রে। ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র আছে মোট ৭টি। হোমের সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৬৫ হাজার।

এখানে জেনারেল ক্লিনিকে প্রথমে রোগীদের সাধারণভাবে চিকিৎসা করা হয়। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়। কোন মেজর অপারেশন করতে খরচ পড়ে নামমাত্র। যেমন ভর্তির জন্য ৫্ টাকা এবং খাওয়া ইত্যাদি বাবদ দিনে ২্ টাকা এবং ওষুধের জন্যে প্রতি তিনদিনে ৫০ পয়সা। দুপুর বারটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নামমাত্র বেতন নিয়ে দুজন ডাক্তার এবং বিনা পারিশ্রমিকে বহু বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে থাকেন, অপারেশন করেন। এখানকার পরিবেশ বাড়ীর মত। বাজার-হাট, দেখাশোনা সবই ছাত্ররা করে থাকেন, নিখুঁত ও নিপুণভাবে। তাঁদের ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার ও আন্তরিকতা মুগ্ধ করে।

হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শুরু থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত। এত বিরাট খরচ কিভাবে নির্বাহ করা হয় সে প্রশ্নের জবাবে চন্দনবাবু ও বিশ্বনাথবাবু জানালেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রচুর অর্থসাহায্য দিয়েছেন এবং দিচ্ছেনও। তাছাড়া চ্যারিটি খেলা, নাচগান, নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি থেকেও তাঁরা বছরে প্রায় ৬০ হাজার টাকার মত সংগ্রহ করেন। কিন্তু সূচনা পর্বে ছাত্ররা শরীরের রক্ত-দানের টাকায় এখানকার এক একটি ইঁট কিনেছিলেন। রক্তদান করে এ পর্যন্ত তাঁরা প্রায় ৬০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন।

শুধুমাত্র ভারত সরকারের সহযোগিতাই নয় তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এগিয়ে এসেছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সহৃদয় ছাত্র বন্ধুরা। তাঁরা দিয়েছিলেন অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী, বিশাল এক্সরে প্ল্যান্ট, ডেন্টাল ইউনিট প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ টাকার অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি।

আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্যে জাতীয় স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র রাষ্ট্রে ছাত্রদের একমাত্র স্থায়ী চিকিৎসা-কেন্দ্র হচ্ছে কলকাতার এই স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম। অবশ্য এই সংস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হায়দ্রাবাদে সম্প্রতি ছাত্রদের স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমেদাবাদেও গড়ে তোলবার পরিকল্পনা চলছে।

হেলথ হোমের সহ-সভাপতি শ্রীঅশোক ঘোষ জানালেন এটা সম্পূর্ণভাবে অ-রাজনৈতিক সংস্থা। এখানে সর্বদলমতনির্বিশেষে ছাত্রছাত্রীরা একযোগে কাজ করছেন, এখানে কোন বিরোধ নেই।

বাস্তবিকই স্বচক্ষে দেখলাম, বিনা প্রচারে নীরবে নিঃশব্দে স্বেচ্ছায় এঁরা এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কিন্তু স্থানের সঙ্কুলান হচ্ছে না বলে ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যাচ্ছে না। করা সম্ভবও নয়। তাই এবার এঁরা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনতলা থেকে আটতলা তোলার পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীনন্দন ভট্টাচার্য জানালেন, এ মাসের ২৫ তারিখে তিন লক্ষ টাকা তোলবার এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রেস কনফারেন্স করে নাগরিক কমিটির সভাপতি শ্রীশান্তনু রায় সে কথা সংবাদপত্রে ঘোষণাও করেছেন। ঐদিন সকাল ৮টায় দমদম থেকে পদযাত্রা শুরু করে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল রেল-পথের পথ ধরে ১৬ কিলোমিটার পথ তাঁরা পরিক্রমা করবেন। সঙ্গে থাকবেন মন্ত্রী ডাক্তার উপাচার্য সাহিত্যিক শিল্পী অধ্যাপক সাংবাদিক—বিভিন্ন স্তরের সহস্র জন বিশিষ্ট নাগরিক। মাদার টেরেসাও পদযাত্রার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১৬ কিলোমিটার পথে থাকবে ১৭টি স্টেশন; সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থা 'বুথ' নির্মাণ করতে পারবে কিছু অর্থের বিনিময়ে। তাছাড়া যে সমস্ত বিশিষ্ট কোম্পানী বিজ্ঞাপন দেবেন তাঁদের নামলেখা ছাপানো পোস্টার পদযাত্রার সঙ্গে বহন করা হবে।

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন দশজন ছাত্রের মধ্যে পাঁচ জন অপুষ্টিতে ভুগছে, শতকরা চারজন যক্ষ্মারোগী বিনা চিকিৎসায় এবং শতকরা একজন তীব্র মানসিক গোলযোগে দিন কাটাচ্ছে। ছাত্রসমাজকে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম তাঁদের ১২-শয্যার বর্তমান হাসপাতালকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করার ঐকান্তিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য, জাতির প্রতি এক মহান সেবার ব্রত। বর্তমান রাজনীতিসর্বস্ব অস্থিরতার যুগে ভাঙার নেশায় মোহগ্রস্ত দিশাহারা বাংলা দেশের ছাত্রসমাজকে যদি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে চাই তবে হেলথ হোমকে চিনতে হবে, এর ইতিহাস জানতে হবে। মহান ও আন্তরিক প্রয়াস কখনো বিফল হয় না। জনগণ ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাই স্টুডেন্টস হেলথ হোম আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব হাসপাতাল গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করুন এবং পদযাত্রায় যোগদান করে মহান প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

—পূর্ণমা মি[illegible]

(১) বনপলাশির পদাবলী

শিল্পী সংসদ নিবেদিত ও শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স পরিবেশিত 'বনপলাশির পদাবলী' একটি বহুপ্রতীক্ষিত ছবি। রমাপদ চৌধুরী লিখিত এই নামের কাহিনীটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তা পাঠকমহলে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। এরপর যখন সংবাদপত্র মারফত ঘোষিত হয় যে, উত্তমকুমার শিল্পীসংসদের পক্ষে এই জনপ্রিয় রচনাটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবার জন্যে নির্বাচিত করেছেন এবং নিজেই এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন, তখন থেকে বাংলা ছবির দর্শকরা অধীর আগ্রহে ছবিটির জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বেশ কিছুকাল ধরে রাজনৈতিক হানাহানি যখন কলকাতা শহর ও শহরতলীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তখন টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলিতেও ছবি তোলার কাজ বিঘ্নিত হত প্রায়ই এবং 'বনপলাশির পদাবলী' ছবিও তারই মধ্যে তোলা হতে থাকে। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে ছবিটি যখন সমাপ্ত হল, তখন শোনা গেল মূল কাহিনীর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবার ফলে ছবিটি এমনই দীর্ঘ হয়েছে যে, দুভাগে ছবিটি দেখাবার জন্যে জল্পনা-কল্পনা চলছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু উত্তমকুমার নিজে ছবির অংশবিশেষ কাটছাঁট করে এটিকে ২২ রীলে এনেছেন এবং সেন্সার সার্টিফিকেটে ৬,৯৬২'৯৪ মিটার দৈর্ঘ্য লেখা থাকলেও সাধারণ্যে দেখানো হচ্ছে মোটামুটি ৫,৮০০ মিটার।

ছবিটি দেখবার পরে মনে হয়েছে, বনপলাশির জীবনযাত্রার বিরাট পটভূমিকাটিকে চিত্রায়িত করবার চেষ্টা না করে পরিচালক-চিত্রনাট্যকার উত্তমকুমার যদি তাঁর নিজের গৃহীত ভূমিকা 'উদাস'কে কেন্দ্র চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তার জীবনের ট্রাজিডির পরিপ্রেক্ষিতে অপর প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলিকে তাঁর কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতেন, তা হলে আমরা একটি রসসমৃদ্ধ অখণ্ড কাহিনীচিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করবার দুর্লভ সুযোগ পেতুম। অবশ্য তখন ছবিটি 'বনপলাশির পদাবলী' নামে চিহ্নিত না হয়ে অন্য কোনও নামে অভিহিত হত।

তখন প্রয়োজন হত না দেওঘর স্কুলের শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করে গিরিজাপ্রসাদ রায়ের বনপলাশিতে ফিরে আসার ঘটনাটিকে দেখাবার জন্যে অতখানি ফিল্ম-ফুটেজ নষ্ট করা কিংবা গিরিজার গ্রামে ফেরার পরে তাকে ঘিরে স্কুল তৈরী, রাস্তাঘাট নির্মাণ বা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবার অলীক জল্পনা-কল্পনার; প্রয়োজন হত না অন্তী-মা বা আন্না-মার অতীত ইতিহাস রোমন্থনের অথবা ব্লক-ডেভেলপমেন্ট অফিসার শ্রীমান প্রভাকরের সঙ্গে গিরিজাপ্রসাদ ও তার ভাই বিপিনের মেয়েদের প্রেম ও বিবাহঘটিত বৃত্তান্তের। শ্রেফ বংশীর ছেলে উদাসের ক্ষেত-খামারী থেকে বাস-ড্রাইভারীর প্রতি আকর্ষণ, তারই ফলে লক্ষ্মী বাস-সার্ভিসের দশরথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, বংশীর অনুরোধ উপেক্ষা করে দশরথের কন্যা লক্ষ্মীরাণীকে বিবাহ, লক্ষ্মীর দুর্ব্যবহারে সংসারে বৈরাগ্য, বাস ড্রাইভারীর কাজেও ঢিলা, যাত্রাপালাগানে অবসরবিনোদন, বাউণ্ডুলে উদাসের প্রতি পদ্মর আকর্ষণবোধ, পরস্পরের সান্নিধ্য, লক্ষ্মীর ঈর্ষা, পদ্মর পিতাকে গুরুতর আঘাত করবার পরে লক্ষ্মীর আত্মহত্যা উদাসকে বিবাহ করতে পদ্মর অস্বীকার, উদাসের মত্ততা ও শেষ পর্যন্ত পদ্মের চরিত্রের প্রতি সন্দেহে উদাসের পদ্মকে হত্যা এবং অনুশোচনা—এই ঘটনাগুলিকে তাৎপর্য সহকারে গ্রথিত করলে একটি মর্মস্পর্শী কাহিনীচিত্র গড়ে উঠতে পারত, যার প্রতিটি ফ্রেম হত দর্শকের কাছে মূল্যবান। —সম্পূর্ণ রামায়ণ বা মহাভারত নিয়ে ছবি তৈরী করবেন হিন্দী ছবির প্রযোজক-পরিচালকেরা; বাঙালী প্রযোজক-পরিচালক ঐ দুই বিরাট মহাকাব্য থেকে বেছে নেবেন খণ্ড খণ্ড নানা অধ্যায়ের নাটকীয় ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনা। বনপলাশির পদাবলীও একটি মহাভারত বিশেষ। তার বহু চরিত্রের ভীড় থেকে একটি চিত্রোপযোগী ঋজু কাহিনী নির্বাচন করে নেওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

কিন্তু চিত্রনাট্যকার-পরিচালক উত্তমকুমার দর্শকবৃন্দকে উপহার দিয়েছেন একটি খণ্ডিত মহাভারত, যাতে আছে বহু চরিত্র ও ঘটনার ভীড় এবং মাত্র একই 'বনপলাশি' গ্রামের চরিত্র ও ঘটনা হওয়া ছাড়া যাদের অধিকাংশের মধ্যেই কাহিনীগত সূত্রটিকে খুঁজে পাওয়া দায়। তাই ছবির প্রথমাংশে কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়েছে গিরিজাপ্রসাদ, মধ্যে এসেছে ব্রজমোহন এবং তারপরে যখন থেকে উদাস এসেছে, তখন থেকে আর সবাই মাঝে মাঝে দেখা দিয়েও পথ ছেড়ে দিয়েছে ঐ উদাসকেই এগিয়ে যাবার জন্যে। ফলে ছবির মাধ্যমে যেমন একটি অখণ্ড মূর্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, তেমনই হয়নি অবিমিশ্র রসপরিবেশন করা।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ছবির অগণন চরিত্রের প্রায় প্রতিটিই সু-অভিনীত। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই উদাসের চরিত্রে উত্তমকুমারের অনবদ্য অভিনয় সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়ে। এবং এর পরেই পদ্মর ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবীর সহজ সাবলীল অভিনয়। তাঁর চলনে বলনে তিনি প্রচণ্ড মাদকতার সৃষ্টি করেছেন। এঁদের পরেই যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁরা হচ্ছেন মলিনাদেবী (অন্না-মা), শমিতা বিশ্বাস (বিবাহোত্তর যুগের অন্না-মা), নির্মলকুমার (বিপিন), মাধবী চক্রবর্তী (বিপিনের স্ত্রী), অনিল চট্টোপাধ্যায় (অবিনাশ ডাক্তার), স্বপনকুমার (ব্রজমোহন ভট্টাচার্য—অন্না-মার স্বামী), বিকাশ রায় (গিরিজাপ্রসাদ) এবং তরুণ রায় (হেড-মাস্টার)। এঁদের পরে আসেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় (কালীনাথ), অমর মুখোপাধ্যায় (দামু), জহর রায় (দশরথ), কালী চক্রবর্তী (বংশী), সুব্রত সেন (প্রভাকর), প্রভাত ঘোষ (পদ্মর বাবা), বিদ্যা রাও (বিমলা), অজিত মিত্র (অবনী চট্টোপাধ্যায়), সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায় (টিয়া), কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় (নেতা), গৌর শী (হরি দত্ত) ও দেবানন্দ সেনগুপ্ত (ছোট গিরিজা)। উদাসের স্ত্রী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বাসবী নন্দী। বদমেজাজী, মুখরা, ঈর্ষাপরায়ণ এই চরিত্রটির বাহিকরূপ তিনি ঠিকই দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, কিন্তু যে-দ্রুততার সঙ্গে তিনি তাঁর সংলাপ বলেছেন, তাতে অধিকাংশ স্থলেই তাঁর সংলাপ হয়ে উঠেছে একান্ত দুর্বোধ্য। খুব রাগ বা অসূয়ার উদ্বেগে কথা বলতে গেলেও ছবিতে স্পষ্ট বাচনের প্রয়োজন আছে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। ছবির গানগুলির অধিকাংশই সুগীত, বিশেষ করে উত্তমকুমারের মুখের গানগুলি।

শিল্পী সংসদ নিবেদিত 'বনপলাশির পদাবলী'র আয়ের অংকটি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের সাহায্যভাণ্ডারে যাবে, এই শর্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ছবিটিকে প্রমোদ-কর মুক্ত করেছেন। আমরাও ছবির আর্থিক সাফল্য কামনা করি ঐ একই কারণে।

(২) একরার মুস্কুরা দো

মুখার্জি ব্রাদার্স-এর নিবেদন 'একবার মুস্কুরা দো'র কাহিনী ভারতীয় চলচ্চিত্রের পর্দায় দৃশ্যত নতুন নয়। নায়িকার ধনী পিতা শিল্পী নায়ককে তাঁর কন্যার যোগ্যপাত্র মনে করলেন না এবং তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে জীবনে সাফল্যমণ্ডিত এক বিত্তশালী সার্জেনকে জামাতা হিসেবে বরণ করলেন, এমন ঘটনা ছবির কাহিনীতে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করা গেছে। এবং প্রত্যাখ্যাত নায়ক ও মনোনীত জামাতার মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আছে, এমন পরিস্থিতিও বিরল নয়। আলোচ্য কাহিনীতে যে-জিনিসটা নতুন সেটি হচ্ছে—নায়ক যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পরে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের জন্যে আবেদন জানালে তা অবশ্যই মঞ্জুর হবে, এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা কন্যার পিতা অনুভব করেননি। এবং প্রচুর ভালোবাসাবাসির পরেও নায়িকা নায়কের ভালোবাসা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল, যখন সে দেখল নায়ক তার পিতার টাকাভর্তি ব্যাগটি (অবশ্য ব্যাগটি খালিই ছিল) হাতে করে তাদের গৃহত্যাগ করছে, তার সঙ্গে দেখা না করেই। এবং সমস্ত তথ্য জানবার পরেও নায়িকা প্রেমিককে

ননীগোপালের বিয়ে
চিন্ময় রায় এবং জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়

হারায়ে খুঁজি : দীপঙ্কর দে, সোমা দে
পরিচালনা : স্বদেশ সরকার

ফটো : অমৃত

গ্রহণচিত্রের মহরতে পরিচালক বলাই সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী এবং বি এন সরকার

অশোককুমার দাশ পরিচালিত শবরী
সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

ডানদিকের ছবি

ওপরে

বনপলাশির পদাবলী
উত্তমকুমার এবং সুপ্রিয়াদেবী

মধ্যে

অচেনা অতিথি রবি ঘোষ

নীচে

ছবি

দেবরাজ রায় এবং অমরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুমাত্র আমল না দিয়ে স্বামীরই অনুবর্তী হয়ে থাকতে চাইল, যার ফলে নায়কের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর রইল না। —কিন্তু যে-দিলীপ (নায়ক) ছিল অঙ্কনশিল্পী, সে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় রাতারাতি সঙ্গীতশিল্পী 'কুমার সাহেব' হয়ে পড়ল কেমন করে এবং অতি শিগগিরই ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীরূপে পরিগণিত হল কোন্ বিশেষ গুণে, সে-সম্বন্ধে কাহিনীকার একেবারেই নীরব। একজন জাতশিল্পী যে এইভাবে নিজের শিল্প-মাধ্যম পরিবর্তন করে, এ-সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত ছিল। কাহিনীকার তো দিলীপকে প্রথম থেকেই সঙ্গীতসাধক করতে পারতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসর বিনোদনের জন্যে সে অঙ্কন করে, এ-ও দেখাতে পারতেন। ক্ল্যাসিক্যাল গাইয়ে দরদী মিষ্ট কণ্ঠের গুণে জনপ্রিয় 'পপ' গাইয়ে হয়ে উঠল, এমন একটা পরিস্থিতি রচনা কি খুব কঠিন ছিল? মালা যে দিলীপের প্রেমাস্পদা, এ-খবর দিলীপের সার্জেনবন্ধু অশোকের অজ্ঞাত থাকে কি করে? কাহিনী বিস্তারে এমন আরও ত্রুটি নির্দেশ করা যেতে পারে।

ছবির অভিনয় প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, নায়ক দিলীপ ও নায়িকা মালার ভূমিকায় যথাক্রমে দেব মুখোপাধ্যায় ও তনুজা চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। দেব মুখোপাধ্যায় যদি বাচনের সঙ্গে সঙ্গে মুখচোখের সাহায্যে উপযোগী ভাবাভিব্যক্তির দিকে মনঃসংযোগ করেন, তাহলে, তাঁর অভিনয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে। সঙ্গীতশিল্পী কুমার সাহেবের ইম্প্রেসারিও রূপে রাজেন্দ্রনাথ হাসির খোরাক যুগিয়েছেন। সাফল্যমণ্ডিত সার্জেন, নায়িকা মালার স্বামী অশোকের ভূমিকায় জয় মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অযথা আড়ষ্টতা-পূর্ণ। অপরাপর ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত (মালার বাবা), শোভনা সমর্থ (অশোকের মা), ফরিয়াল (ক্যাবারে নৃত্যশিল্পী), ইফ্তেকার (পুলিশ অফিসার) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন, 'গেভাকলার' ছবিটিকে প্রায় চক্ষুপীড়াদায়ক করে তুলেছে; জানি না, দোষটা আসলে কাঁচা ফিল্মের, না ক্যামেরাম্যানের, কিংবা ল্যাবরেটারীর? কলকাতার লাইটহাউসের দর্শক হিসেবে আমরা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভাবতে বাধ্য হয়েছি, ছবিটি যদি ইস্টম্যানকালারে তোলা হত, তাহলে আমাদের চোখকে অযথা দুর্ভোগ সহ্য করতে হত না।

ছবিতে গান আছে আটখানি। ও পি নায়ার দ্বারা সুরারোপিত এবং কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে, মুকেশ ও মোহাম্মদ রফি কর্তৃক গীত হয়ে প্রায় সব কটিই হয়েছে শ্রুতিসুখকর। 'সবেরে কা সুরজ তুমহারে লিয়ে হ্যায়', 'তুমকো আজ বতানা হোগা ক্যা থী এ মজবুরী', 'নজরবালে জিনহে তুম দেখতে রহো' প্রভৃতি গান বারংবার শোনবার মতো। সত্যি কথা বলতে কি, এই গানগুলিই হচ্ছে 'একবার মুসকুরা দো' ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

মুখার্জি ব্রাদার্স নিবেদিত, শশধর মুখোপাধ্যায় লিখিত ও প্রযোজিত এবং রাম মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'একবার মুসকুরা দো' ছবিটি নায়ক-নায়িকার দীপ্ত অভিনয় ও মাধুর্যমণ্ডিত সঙ্গীতের গুণে হিন্দী ছবির দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে।

(৩) গাঁও হামারা শহর তুমহারা

ডিম্পল ফিল্মস-এর 'গাঁও হামারা শহর তুমহারা' ছবির কাহিনীটি শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্র বিরচিত 'কাঞ্চন রঙ্গ' নাটকের হিন্দী চিত্ররূপ। হিন্দী ছবিসুলভ আতিশয্য সত্ত্বেও এটি যে 'কাঞ্চন রঙ্গ'-এর হিন্দী সংস্করণ, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবার অবকাশ নেই। অথচ আশ্চর্য! ক্রেডিট টাইটেলে, ছবির পুস্তিকাতে বা বিজ্ঞাপনে 'কাঞ্চন রঙ্গ' সম্বন্ধে কোনও রকম উল্লেখ নেই। উল্টে বলা হয়েছে, চিত্রকাহিনীটি ডিম্পল ফিল্মস স্টোরি ডিপার্টমেন্ট রচিত। এও কি সম্ভব, কাঞ্চন রঙ্গ এবং গাঁও হামারা শহর তুমহারা-র কাহিনী একই কোনও বিদেশী উৎস থেকে গৃহীত? —সেই গ্রামের সাদাসিধে যুবকটি শহরে আত্মীয়ের বাড়ীতে এল ভাগ্যান্বেষণে এবং আত্মীয় মামা, মামী, মামাতো ভাইবোনদের শতেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে সেখানে থেকে গেল বিনামাইনের চাকর হিসেবে। তার প্রতি সহানুভূতির একমাত্র লোক সেখানে বাড়ীর যুবতী দাসী। দাসীর সহানুভূতি ক্রমে অব্যক্ত প্রেমে পরিণত হয়। যুবকটির প্রতি লাঞ্ছনা যখন চরমে উঠেছে, তখন শোনা গেল, তার নামে এক লটারীর টিকিট উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে উঠল ওদের প্রত্যেকের মাথার মণি। আবার যখন খবর পৌঁছল, লটারীর প্রাইজটা ফস্কে গেল তার বরাতে, অমনই শুরু হল নিষ্ঠুরভাবে কিল-চড়-লাথি। দাসীর সঙ্গে বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হতে যাচ্ছে, এমন সময়ে আবার ভাগ্যের পরিবর্তন। সে লটারীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে!

নায়ক বিরজুর বেশে রাজেন্দ্রকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। সারল্যে-ভরা বিরজুর প্রতি অকথ্য অত্যাচার দর্শকচিত্তে সহানুভূতি আকর্ষণ করে। দাসীর ভূমিকায় রেখার দরদী অভিনয় উপভোগ্য। মামী, মামা, মামাতো ভাই রাম আর শ্যাম এবং মামাতো বোন বিন্দুর ভূমিকায় যথাক্রমে ললিতা পাওয়ার, কানাইয়ালাল, সুজিৎকুমার, সত্যদীপ এবং আরতি চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করলেও বিরজুর প্রতি তাঁদের অত্যাচারটি সহজ-সীমা অতিক্রম করেছে, সম্ভবত পরিচালকেরই নির্দেশে। অপরাপর ভূমিকায় সুন্দর, ভগবান ও পদ্মা খান্না উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। রাজেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত চারখানি গানে সুরযোজনা করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। এদের মধ্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে 'কৈসে কহুঁ, কিসসে কহুঁ, শরমকী হৈ বাত; বড়ী মুশকিলসে কটতী হৈ রাত' গানখানি।

ডিম্পল ফিল্মস-এর 'গাঁও হামারা শহর তুমহারা' একটি উপভোগ্য রঙীন ছবি।

মঞ্চাভিনয়

সমবায়ীর 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—কল্লোল-মুখর শহর জীবনের প্রচণ্ড প্রলোভনের বৃত্ত থেকে পালিয়ে এক শিল্পী আশ্রয় নিলো একটি নির্জন পার্কের কোণে। উদ্দেশ্য—রং আর তুলির সমন্বয়ে আঁকবে সে অমৃতের সন্তান মানুষের পূর্ণাঙ্গ রূপ। ক্যানভাসের ওপর চলতে লাগলো রঙের ব্যঞ্জনা। সকাল, সন্ধ্যা, রাতের প্রহরে কতো বিচিত্র চরিত্রের লোক এসে দাঁড়ালো শিল্পীর কাছে। সবারই এক জিজ্ঞাসা কি সে আঁকছে, কেনই-বা আঁকছে। উত্তর শুনে বেশীর ভাগই তাকে পাগল বললো, কেউ হয়তো বললো সে গভীর ধ্যানে মগ্ন। সব শেষে এলো তার স্ত্রী, বন্ধন ছিন্ন করতে এসে ভালোবাসার এক মরমী যন্ত্রণা বুক ভরে নিয়ে সে চলে গেলো। ...আর একটু রং, আর একটি রেখা শুধু বাকী, তাহলেই পূর্ণ হবে ছবিটি।...কিন্তু হলো না...আলো নিভে গেল প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায়...পৃথিবীর ভীষণতম উল্লাস স্তব্ধ করলো শিল্পীর জীবনকে। ছুটে এলো অধ্যাপক, সে বললো না, শিল্পীর অমৃতস্য পুত্রা সমাপ্ত করবে আগামীকাল।

এই সুগভীর বক্তব্যটি অসাধারণ ব্যঞ্জনায় যে নাটকটির সংলাপে আর সংঘাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে তার নাম 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। নাটকটি কয়েক দিন বিশ্বরূপার মঞ্চে পরিবেশন করলেন 'সমবায়ী'র শিল্পীরা। প্রথমেই বলি এই ধরনের নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে একটি বিশেষ ধরনের স্বতন্ত্র প্রত্যাশা সবার মনে থাকা খুবই স্বাভাবিক। মনে হয় সমগ্র প্রযোজনায় সে প্রত্যাশা বোধ হয় বেশী পরিপূর্ণতা পায় নি। মঞ্চপরিকল্পনায় শৈল্পিক ব্যঞ্জনা ছিল, কিন্তু সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে কোন সুষম ছন্দ ছিল না যা এই নাটকের বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের জন্য একান্ত আবশ্যক বলেই মনে হয়। যাই হোক নির্দেশক ভোলা দত্তের নিষ্ঠার খুব একটা শৈথিল্য প্রকাশ পায় নি।

নাটকের মুখ্য চরিত্র শিল্পী সনাতনের ভূমিকায় শ্যামল বসুমল্লিক যে অভিনয়ের ধারাটিকে নিয়েছেন, তা অন্তত আমাদের আবেগকে উদ্দীপ্ত করতে পারে নি। পার্কের অন্য পাঁচটা মানুষের থেকে সে যে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির, চরিত্রচিত্রণে সে ছোঁয়া মেলে নি। কণ্ঠের মধ্যে প্রত্যাশিত গভীরতার তীব্রতাও ছিল না। তবে হাল্কা চালে কয়েকটি কথা সাবলীলভাবে তিনি বলতে পেরেছেন। ঊষা ভৌমিকের 'সজনু'ও আমাদের অভিভূত করতে পারে নি, যে কান্নার ইতিহাস লুকিয়ে আছে তার মনে সেটা ব্যক্ত করতে গিয়ে যন্ত্রণার যে তীব্রতম সকরুণ হাহাকার তা তাঁর অভিনয়ে হয়তো সবটা আসে নি। নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন 'রমণীমোহনে'র ভূমিকায় মহাদেবপ্রসাদ গুহখাসনবীশ। সত্যিই তাঁর প্রতিটি স্বচ্ছন্দ সংলাপ, আর অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে একটি কপট চরিত্রের শৈল্পিক আত্মবিকাশ ঘটেছে। জগন্নাথ রায়চৌধুরীর 'অধ্যাপক'ও হয়েছে একটি মরমী চরিত্রচিত্রণ। উজ্জ্বল সাবলীল অভিনয় করেছেন গীতা কর্মকার (কবিতা), সেই তুলনায় 'তরুণে'র ভূমিকায় অলোক ঘোষের অভিনয় যথেষ্ট নিষ্প্রভ। 'শিবানী'র আশ্চর্য সুন্দর চরিত্রটি প্রাণ পেয়েছে মমতা চ্যাটার্জির অভিনয়ে।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (বানোয়ারীলাল), জয়দেব অধিকারী (মিস্তিরমশায়), প্রদীপ সেনশর্মা (বিদ্যুৎ), বিভূতি দাস (অজিত), মুরলী মিশির (কনস্টেবল), মুরলীধর ভট্টাচার্য (কুলপুরোহিত), নিতাই দে (চানাচুরওয়ালা), সুনীল বসু (পুঃ অফিসার), অন্নপূর্ণা মুখার্জি (জনৈকা মহিলা)।

বহুরূপীর 'গণ্ডার'

নবনাট্য আন্দোলনের ই তি হা সে 'বহুরূপী' নাট্য-সংস্থার স্মরণীয় স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত অবদান বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যামোদীদের কাছে বাস্তবিকই গর্বের বিষয়। নাটক ও নাট্য বিষয় নির্বাচন, মঞ্চ ও অঙ্গসজ্জা, অভিনয়, আলোকসম্পাত এবং সর্বোপরি নাট্য প্রযোজনায় বহুরূপীর কৃতিত্ব আমাদের গভীর আনন্দে উৎসাহিত করে। ছেঁড়া তার, উলুখাগড়া, পথিক, ডাকঘর, রক্তকরবী, চার অধ্যায় থেকে হালের রাজা অয়দিপাউস, 'চোপ, আদালত চলছে', অপরাজিতা ইত্যাদির প্রযোজনায় এই সংস্থা অভিনয় ও টীম ওয়ার্কে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার ঐতিহ্য নতুন করে মনে পড়ে সম্প্রতি প্রযোজিত 'গণ্ডার' নাটক দেখে।

'গণ্ডার' নাট্যকার ইয়োনেস্কোর বহুবিখ্যাত নাটক 'দি রাইনোসেরাসের' বঙ্গানুবাদ। বহুরূপীর সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হল— অনূদিত নাটককে অভিনয়ে ও সামগ্রিক প্রযোজনায় বাঙালী স্বভাবী দর্শকের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা। 'গণ্ডার' অ্যাবসার্ড ড্রামা। বক্তব্য প্রতীকী, পাত্র-পাত্রীর সংলাপে ও সক্রিয়তায় স্পষ্ট হয়। এ নাটকের দর্শক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীস্বভাবা মানুষ।

'গণ্ডার' নাটকের বিষয়ে ইয়োনেস্কোর লক্ষ্যও তা-ই। একই সঙ্গে হাসি আর ব্যঙ্গ দিয়ে নাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে দর্শকদের কাছে উপস্থিত করেন। কিন্তু ক্রমশ সেই হাসি ও ব্যঙ্গ জীবনের কঠিনতম সত্যকে স্পর্শ করে। মানবতা হল মানুষের জীবনের একমাত্র সত্য ও শাশ্বত। বস্তুত মানবতাই হল জীবনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাটকের শেষে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ কাব্য বিষয়কে সত্য করে যে দৃশ্য-কাব্যময় সমাপ্তি টেনেছেন, নাটকের চরম 'অ্যাকশান' সেখানেই। এর বিপরীতে যা কিছু তা 'গণ্ডারে'র মত—পাশব, সীমিত-দৃষ্টিসম্পন্ন স্থূল-বুদ্ধিযুক্ত, একগুঁয়ে, গোষ্ঠীসর্বস্ব, সেই মহান চিরকালের কাব্যবিষয়ের মহতী বিনষ্টি।

উইলিয়াম সারোয়ান তাঁর 'ট্রেসিস টাইগার' উপন্যাসে 'বাঘ'কে প্রতীক ধরেছেন, বড় সাপের গল্প 'মেটামরফোসিসে' কাফ্‌কা পোকাকে করেছেন প্রতীকপ্রতিম। 'গণ্ডার' প্রতীকটি কিন্তু 'বাঘ' বা 'পোকার' মত অতি-প্রচলিত-পরিচিত-অভ্যস্ত প্রতীক নয়, কিন্তু এই উপমা গ্রহণে নাট্যকার যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, বহুরূপীর প্রযোজনা সেই প্রতীককে সার্থকতম অভিনয়-টীকায় অসাধারণ বিশ্বাস্যতা দিয়েছেন।

বস্তুত, বহুরূপীর নতুন এই নাট্য-প্রযোজনায় আমরা মুগ্ধ। মনেই হয় না আমরা কোন বিদেশী নাটক দেখছি, বা কোন নাটক দেখছি। এই উপলব্ধির কৃতিত্ব যেমন প্রযোজনার, তেমনি দলবদ্ধ অভিনয়েরও। কৃতিত্ব পাওয়ার প্রথম শর্ত— নাটকটি সময়োচিত এবং আমাদের দেশ-কালের সমাজ-জীবন-ভাবনা-অনুগ বলে। শ্রীশাঁওলী মিত্র-কৃত অনুবাদ অভিনয়কে জীবন্ত করার সহায়ক হয়েছে। নাটকের প্রথমে এক রবিবারের সকালে রেস্তোরায় সভ্যসমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের হাল্কা হাসি-ঠাট্টা কথাবার্তা, পরে গণ্ডারের আবির্ভাব এবং ঠিক পরবর্তী দৃশ্যে গত দিনে গণ্ডার দেখার আলোচনা পর্বটি অত্যন্ত ক্ষিপ্র রূপ পেয়েছে প্রধানত সমবেত অভিনয়ের কেন্দ্রীয় ঐক্যবিন্দুটি স্থির-নির্দিষ্ট থাকায়। ইয়োনেস্কোর নাটকে একটি তত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে এবং বেরঁজে ও জঁ-র কথাবার্তায় ও অন্যান্যদের সমবেত আলাপে তা কিন্তু এতটুকু নাট্যক্রিয়াকে স্থির করে নি। প্রযোজনায় শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের এ অংশের অসাধারণ কৃতিত্ব স্মরণীয়।

তৃতীয় দৃশ্যে জঁ-র ধীরে ধীরে গণ্ডারে রূপান্তর ও বেরঁজে-র মানস-প্রতিক্রিয়া এবং শেষ দৃশ্যে সর্বকালের মানবতার প্রতীকরূপে বেরঁজে'র আত্মচেতনা ও আত্মোপলব্ধির উজ্জ্বল উদ্বোধনের দৃশ্য-গুলিতে আমরা বহুরূপীর প্রাচীন গভীর প্রোথিত ঐতিহ্যের আর এক অভিনব পদক্ষেপ লক্ষ্য করি। বেরঁজে'র উপলব্ধিকে এমন অবলীলায় সর্বকালের দর্শকদের উপলব্ধি হিসেবে উত্তরণ ঘটানোর মত আশ্চর্য শক্তির পরিচয় রেখেছেন নাটকের রুদ্ধশ্বাস ভয় ও ভয়হীনতা, আশঙ্কা ও আশার দৃশ্যে শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। সংক্ষিপ্ত অথচ ক্ষিপ্র সংলাপ, গতিপ্রাণ অভিনয়, বক্তব্যানুগ আলোকসম্পাত ও পরিবেশ রচনায় এই অংশে শ্রীমতীর নির্দেশনা বহুদিন মনে থাকবে।

অভিনয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ও চরিত্রানুগ দক্ষতা দেখিয়েছেন সর্বশ্রী কালীপ্রসাদ ঘোষ (বেরঁজে), দেবতোষ ঘোষ (বোতার), শাঁওলী মিত্র (দেইজি), নমিতা মজুমদার (জনৈকা গৃহিণী), উৎপল ভট্টাচার্য (মঁসিয়ে সিয়ান) ও সুনীল সরকার (বৃদ্ধ ভদ্রলোক)। জঁ'র ভূমিকায় শ্রীঅরিজিৎ গুহ প্রথম দৃশ্যের সংলাপ প্রয়োগে ও চালচলনে কিছুটা কৃত্রিম, কিন্তু পরবর্তী অংশে সহজ, সাবলীল হতে পেরেছেন। অবশিষ্ট

অন্যান্য চরিত্রগুলির সব সব ভূমিকায় বহুরূপীর টীম ওয়ার্কের সুনাম যথাযথ রাখতে পেরেছেন। শ্রীশান্তি দাসের (দুলার) অভিনয়ের কেন্দ্র সীমিত, কিন্তু অভিনয়ে মুখের ভাব আরও সহজ ও প্রকাশ্য হওয়া উচিত ছিল।

তাপস সেনের আলো এ নাটকের আর এক মূল্যবান সম্পদ। প্রথম দৃশ্যে একটি ছুটির দিনের সকালের রেস্তোরাঁ, রাস্তা ও বাড়ির দেওয়াল দেখাতে বা জর্জ গণ্ডার হয়ে যাওয়ার কাছে সবুজ আলোর প্রয়োগে অথবা শেষ দৃশ্যে আলো-ছায়ার ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রয়োগে শ্রীযুক্ত সেন টীম ওয়ার্কের অন্যতম অবধারিত শরিক হয়ে গেছেন।

'বহুরূপী'র প্রযোজনা, অভিনেতাদের অভিনয় ইত্যাদি সব কিছুর প্রশংসা করার পরেও কিছু ত্রুটির কথা থেকে যায়। যেমন প্রথম দৃশ্যে জর্জের সংলাপে 'সাথে' শব্দের ব্যবহার কি শ্রুতিসুখকর? বেরেঞ্জে' বা অন্যান্যরা যেখানে সঙ্গে বলেন, সেখানে 'সাথে' প্রয়োগ—যা এমনিতেই গদ্যে অশুদ্ধ—তা থাকবে কেন? বেরেঞ্জে'র দেইজিকে 'তুমি জান' বা 'তুমি জান দেইজি'—এই কথা বলার সময় শব্দগুলি অত্যধিক 'ন্যাজাল' হওয়ায় দর্শকদের কানে শ্রুতি-কটু লাগে। বেরেঞ্জে'র জর্জকে ডাকার সময় বার বার 'য' হয়ে আসে কানের কাছে।

বেরেঞ্জে'র ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন, তিনি আবেগের মুহূর্তে 'পৃথিবী-জোড়া ওই সব অসুরদের মধ্যে...' সংলাপে 'অসুরদের' জায়গায় 'ওসুরদের' উচ্চারণ করেছেন। 'বহুরূপী' সংস্থার অভিনেতাদের উচ্চারণ চিরকালই বিশুদ্ধ, সাবলীল ও স্পষ্ট বলে খ্যাতি আছে। এসব ক্ষেত্রে সে সুনাম থাকে কি? অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে আমাদের একটি বক্তব্য—দুলারের মাথার চুলের একদিকে একটি ক্লিপ আঁটা চোখে পড়ে। ফরাসী পুরুষেরা কি চুলে ক্লিপ পরেন? সবশেষে আর একটি বিনীত নিবেদন মঞ্চে প্রতীক প্রয়োগ সম্পর্কে। শোনা গেছে, নাটকের শেষে ফরাসী প্রযোজনায় নাকি পাদপ্রদীপে ধীরে ধীরে বহু গণ্ডার-মুণ্ডের বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীমতী মিত্র তাঁর প্রযোজনায় নাটকের শেষে আলো-ছায়ায় সেই রকম করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তা নিশ্চয়ই শিল্পসার্থক। কিন্তু প্রকাশ্য আলোয় বাড়ীর দোতলা থেকে স্পষ্টত গণ্ডার-মুণ্ড দেখানো কি শিল্পের বিচারে স্থূলত্ব পায় না? ছায়ায় বা আলোর মধ্যে অন্ধকারের ব্যঞ্জনায় কি বুদ্ধিজীবী স্বভাবী দর্শকদের তৃপ্ত করা যায় না? 'গণ্ডার' নাটকে এ জাতীয় বাস্তবতা মনে হয় শিল্পের স্থূলতাকেই স্পর্শ করে।

তবে 'এহ বাহ্য'। বহুরূপীর 'গণ্ডার' প্রযোজনা সামগ্রিকভাবে আমাদের এমনভাবে দীর্ঘ সময় মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে রাখে—এবং যা শুধু মঞ্চের কলাকৌশলের কারণে নয়, মূল বক্তব্যকে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের রক্তের আত্মীয়তায়—তাতে এসব ত্রুটি বা আড়ষ্টতা মুহূর্তে স্পষ্ট করে তুলতে পারাতেই—ঢাকা পড়ে যায়। 'গণ্ডার' নাটক অভিনয়ের সর্বজনীন আবেদন বস্তুত 'বহুরূপী'র প্রযোজনার ইতিহাসে এক নতুন পদক্ষেপ।

বিবিধ সংবাদ

গীতালি সারস্বত সম্মেলন : বিগত শ্রীপঞ্চমীতে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন গীতালি উদ্‌যাপন করেন সারস্বত সম্মেলন, সংস্থার অধ্যক্ষ পঙ্কজ সাহার পরিচালনায়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছাত্রছাত্রীরা হলেন—পলি ভট্টাচার্য, দেবশ্রী মুখার্জি, বীথিকা কুণ্ডু, শান্তা মুখার্জি, গৌরী সরকার, সুদীপ্ত শীল ও অমর চ্যাটার্জি। শিবনাথ সাহার গীটার অনুষ্ঠান সুন্দর। মাধুরী মিত্রের ইমন রাগে খেয়াল উপভোগ্য হয়। আসরের শেষ দুটি অনুষ্ঠান ছিল শান্তা সাহার খেয়াল ও রণজিৎ রায়ের বেহালা। শান্তা সাহা পরিবেশিত শুদ্ধ কল্যাণ মার্জিত। সঙ্গে হারমোনিয়াম সহযোগিতায় ছিলেন পঙ্কজ সাহা। রণজিৎ রায়ের বেহালায় রাগেশ্রী উপভোগ্য হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগিতা করেন শম্ভুনাথ নস্কর, গোরাচাঁদ অধিকারী, কালীপদ দে ও পঙ্কজ সাহা।

আর্ট সেণ্টার-এর বার্ষিক উৎসব : ১৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রঞ্জিত গুহ-ঠাকুরতার প্রযোজনায় আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েন্টের ৩৪তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবটি এবার শিবপুর নবীনভূষণ মেমোরিয়াল, হাওড়া রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ও আশুতোষ (কলেজ) মেমোরিয়াল হলে পৃথকভাবে শিবপুর, হাওড়া ও কালীঘাট কেন্দ্রের ৩০০ ছাত্রছাত্রী দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। এতে রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' অবলম্বনে উর্বশীকন্যা, প্রাচীন কাহিনী, মহিষমর্দিনী নৃত্যনাট্য, ফাইং বার্ড ও বিউটি অফ প্যারাডাইস নামে দুটি ব্যালেসহ গীটার সিম্ফনী ও নানা প্রকার ক্লাসিক ও আধুনিক নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান নৃত্য পরিচালক হিসাবে শিশির শোভন, গীটারে শশী ভট্টাচার্য, কণ্ঠসঙ্গীতে স্বপন মুখার্জি প্রভৃতি দায়িত্ব নিয়েছেন। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হবে বলেই আশা করা যায়।

আলো হাসি গান : চিত্র নির্মাণের সব-স্তরে নতুন নতুন প্রতিভাবানদের নিয়ে সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কারজয়ী নাট্যকার, পরিচালক অমর ঘোষ সম্প্রতি তাঁর স্বরচিত ও পরিচালিত 'আলো হাসি গান' ছবিটির কাজ শেষ করেছেন। ভেঞ্চার মুভীজের পক্ষে অনিমা ঘোষ প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রে অংশ নিয়েছেন নির্মল চক্রবর্তী, সুলেখা ঘোষ, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি, অজিত ব্যানার্জি, ইরা সিনহা প্রভৃতি উদীয়মানদের সঙ্গে প্রবীণ চিত্রনট সন্তোষ সিংহ এবং যাত্রাজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী শান্তিগোপাল। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে অমর বোস ও অমর চ্যাটার্জি। কাহিনীকার রচিত গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন কমল গুপ্ত, কণ্ঠ দিয়েছেন শ্রাবণী দত্তচৌধুরী, রীণা মুখার্জি এবং সুরকার স্বয়ং। সব মিলিয়ে চিত্রটিকে একটি বিস্ময়কর অভিযান আখ্যা দেওয়া যায়, যা দর্শকদের সমালোচনার মোকাবিলায় অচিরেই মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

মিত্র সাহিত্য গোষ্ঠী আয়োজিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র জন্ম-উৎসব : মানিকতলাস্থ মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে মিত্র সাহিত্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে ভারতমাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাতাত্তরতম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ সান্যাল মহাশয়। বন্দে মাতরম সঙ্গীত, প্রদীপ প্রজ্বলন, শঙ্খধ্বনি ও সভাপতি মহাশয় কর্তৃক প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এর পর রেকর্ডে নেতাজীর প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ শোনান হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁর দীর্ঘ ভাষণে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বা দেশপ্রেমিক সত্তার আলোচনায় না গিয়ে মানুষ সুভাষচন্দ্র নিয়েই আলোচনা করেন। তাঁর ভাষণের মধ্যে রসিক সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রোতাদের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সঙ্গীতের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তরুণ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রশংসা কুড়ান। মিত্রের সদস্যারা নেতাজী প্রসঙ্গে মোহিতলালের রচনা ও সুভাষচন্দ্রের লিখিত বিভিন্ন পত্র পাঠ করেন।

রবীন্দ্র সদনে জলসাঘরের আসরে আলি আকবর খাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সভার উদ্বোধন করেন কানন দেবী।

গুরু আলাউদ্দিনের উত্তর সাধক

গত দুই মাসে কোলকাতার সংগীত-রসিকদের জীবনে এমন কয়েকটি আনন্দ-উদ্বেল মুহূর্ত এসেছে, যা বিরল বলেই স্মরণীয়। সমুদ্রের ঢেউ-এর মতই অগণিত নৃত্যগীতের আসরের মধ্যে উত্তাল হয়ে ওঠে তিনটি অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার বাদন। রবীন্দ্রসদনে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর এবং পাম এ্যাভিনুতে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সরোদ বাদন। এঁরা তিনজনেই গুরু আলাউদ্দিনের শিষ্য।

যন্ত্রসংগীতে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী প্রথম দুজন শুধু সারা ভারতের নয়, সারা জগতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারের সন্ধ্যা যেন পুজারীতির একটি চিত্তহারী ছবি। বিবেকানন্দ হলে মঞ্চের ওপর নীলাভ আলো। পশ্চাৎপটে স্বামী বিবেকানন্দর উন্নতশির পূর্ণ প্রতিকৃতি। এরই পাশে পণ্ডিত রবিশঙ্কর সেতার হাতে, যেন ধ্যানস্থ। মনে হোলো স্বামীজী গুরুর সাধনার বাণী প্রচার করবার যে দুর্বার প্রেরণায় ছুটে বেরিয়েছেন সেই প্রেরণাই কি সংগীতলোকে আলি আকবর রবিশঙ্করকে 'বাহির বিন্দু ঘর' হতে উদ্দীপ্ত করেছে?

এক উদাস বৈরাগ্যের অকুলীববাগী সুর মনের তারে রণিয়ে উঠেছিলো যখন পণ্ডিতজী ধরলেন পটদীপের আলাপ। ভীমপলাশী আর পটদীপ পরস্পরের দোসর, যাকে বলে 'এক জাতি এক প্রাণ'—তবু উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য নিষাদের বলিষ্ঠ প্রয়োগে পণ্ডিতজী মূর্ত করে তুললেন। দিনশেষের গৈরিক আলোর সম্ভাবনায় যেন সকল অনুভূতি অনুরঞ্জিত হয়ে উঠল। কখনও গান্ধার থেকে পঞ্চমের ঝটকার মধ্যে মপধার পেলব ছোঁয়া, কখনও ছুট্‌-তানের বিদ্যুৎবাঞ্জনায় যেন মানসসরোবরের পথের ইসারা। জোড়ের অঙ্গে নানান ধাঁচের স্বরসমন্বয়, ছন্দের নকশায় মন্থর গতিতে এল লয়ের জোয়ার। রূপক তালের ছোট্ট গতটি যেন গীতিকবিতার রসে ভরপুর। বিষাদ এখানে রূপান্তরিত, মুক্তির উল্লাসে।

পরের রাগ ছিল ইমন, একটি সন্ধ্যা প্রার্থনা যেন ধ্রুপদী আধারে বিধৃত। বীণকার ঘরানার শিল্পী রবিশঙ্কর। সেই পরিচয়ই ধ্বনিত হোলো সুবিস্তৃত মীড়ে, বাজের গাম্ভীর্যে, শিল্পীমনের অতল-স্পর্শী ভাবগাঢ়তায়।

এই গাম্ভীর্যের বনিয়াদ ধরেই শিল্পী পৌঁছলেন খেয়ালের বর্ণবৈভবের রাজ্যে—যখন বিলম্বিতের পটপরিবর্তন ঘটল দ্রুতের আলিঙ্গনের নৃত্যমুখরতায়।

এবারে ব্যঞ্জনাধর্মী অলংকরণের চেয়ে রবিশঙ্কর তৈরী অংগের ওপরই জোর দিয়েছেন বেশী। খ্যাতির চরমে পৌঁছেও সাধনায় ইনি আজও শিথিল নন, সেই কথাটিই যেন স্মরণ করিয়ে দিল আগুনের মত জ্বলে-ওঠা অবরোহী সাপাটের দাপট, বোলের রকমারী ছন্দ, ঝালার লয়কেরতায়। ভারতীয় যন্ত্রসংগীতের সবরকম ঘরানার বাদনশৈলীকে আত্মস্থ করে যে অভিনব আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন গুরু আলাউদ্দিন, আপন শিল্পীহৃদয়ের ধ্যান দিয়ে সেই সমৃদ্ধ আঙ্গিককে পূর্ণতম পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরই প্রিয় শিষ্য রবিশঙ্কর। সেতারে ইনি যুগস্রষ্টা।

মাঝখাম্বাজে সাদা-মাটা গানের সুরের স্ব-রূপ অক্ষুণ্ণ রেখেও ক্লাসিক্যালের পর্যায়ে উত্তরণে পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের অপরূপ মিলন অবিস্মরণীয়।

আল্লারাখার তবলা সংগতের মাত্রা, ছন্দ, আড়ি, কো-আড়ি সেতারের সুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছিলো দুই উভয় শিল্পীর বোঝাপড়ার অদৃশ্য বন্ধনে।

আলি আকবরের সরোদ রবীন্দ্র সদনে

উচ্চাশী জলসাঘরের উদ্যোগে রবীন্দ্র-সদনে শোনা গেল ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর একক সরোদ বাদন।

এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করলেন শ্রীমতী কানন দেবী। শিল্পীকে সস্নেহ অভিনন্দন জানিয়ে কানন দেবী বলেন, 'ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের সম্বন্ধে নতুন করে কিছুই বলার নেই। আর সে যোগ্যতাও আমার আছে বলে মনে করি না। তিনি নিজের জীবনকালেই সংগীতজগতের উপকথা, সুরের সমুদ্র। তবু আজকের এই সংগীতসন্ধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করছি।

গুরু 'আলাউদ্দিন ঋষির মত তপস্যা করে ভারতের সঙ্গীতজগতে যে বিপুল ঐশ্বর্যলোক সৃষ্টি করেছেন তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁরই পুত্র ও শিষ্য আলি আকবর সারা জগতে ভারতীয় সঙ্গীতের বিজয়পতাকা উড়িয়ে স্বদেশের মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই করেননি, ভারতবর্ষ সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে সকল দেশের সেরা এই সত্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। একজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমাদের জীবনকালেই এতবড় সাধক-শিল্পীর দেখা পেলাম। তাঁর বাজনা শোনার সুযোগ ঘটল ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা সৌভাগ্য বলেই মনে করি। আর গর্ব অনুভব করি এই ভেবে যে এই মহাশিল্পী ভারতীয়, বাঙালী এবং আমাদের কাছের মানুষ। ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করি।'

গুরু ও পিতা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের উল্লেখে আলি আকবর অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রকাশকুণ্ঠ, স্বল্পভাষী শিল্পীকে এই প্রথম মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে শোনা গেল : 'আজ আমি ও পণ্ডিত কিষণ মহারাজ যা বাজাচ্ছি সবই বাবা 'আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ও পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের তালিমী জিনিস। আজকাল অনেক রকম নূতন বাজনা চলছে, এসব পুরনো বন্দেজ শ্রোতাদের অজ্ঞাতেই থেকে যাচ্ছে।'

শিল্পী আলাপ শুরু করলেন 'শ্রী' রাগ দিয়ে। সম্পূর্ণ একটি ঠাট, ধ্রুপদী ঢঙের মর্যাদাগম্ভীর চলনে যেন পুণ্যপূত দেবদেউলের আরতি প্রদীপ জ্বলে ওঠে। যে কোনো শিল্পীর পক্ষে এ আলাপ অনুধাবনীয় বস্তু। সঙ্গীতরসিকের কাছে অভিজ্ঞতা। এতবড় রাগকে দীর্ঘবিলম্বিত করে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভ সংবরণ করা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই কঠিন। কিন্তু সঙ্গীতের বিশাল জগত করতলগত বলেই. হয়ত আলি আকবর খাঁ সাহেব জানেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উচ্ছ্বাসকে দুলিয়ে দিতে, সীমার মাঝে অসীমের বিপুল বিস্তারকে প্রত্যক্ষ করাতে।

সহজ হওয়াই কঠিন। কিন্তু কঠিন কাজকে নিপুণ যাদুকরের মতই স্বচ্ছ করে তুললেন ডাগরবাণীবাজের সরল টোকায়। একটি বাজে মধ্যম থেকে নিষাদ স্পর্শ করে টুক করে সুরে পৌঁছনর মীড়ে কি মধুর ভঙ্গীতেই না তিনি শ্রী রাগের শান্ত মধুর রূপটি মেলে ধরলেন। জোড়ের অঙ্গে খাণ্ডারবাণীর সঙ্গে নাহারবাণী বাজের আলতো ছোঁয়ায় ছন্দের কি অফুরন্ত বাহার। ঠোক ঝালার হাজারো ঝং-এর দীপাবলী চিকারীতে রেখাব পঞ্চমের অনুরণন যে কি অবর্ণনীয় ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে! লাবণ্য ও দৃঢ়তার সে অপূর্ব সমন্বয় ভোলার নয়। একটি ধানের শীষের ওপর একটি শিশিরবিন্দুর মতই অনপণেয় স্মৃতি হয়ে ওঠে ত্রি-সপ্তক সাপটের মধ্যে গান্ধার ধৈবতের মৃদু-ছোঁওয়া। যে স্বর যে রাগে প্রবল নয় তাদেরও একটা বক্তব্য থাকে। মরমী শিল্পী বলেই আলি আকবর এদের উপেক্ষা করেননি। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এদেরও তিনি আদর করেন, যেমন স্নেহময় পিতা অপারগ সন্তানের প্রতিও সযত্ন দৃষ্টি রাখেন।

'শ্রী' রাগের সঙ্গে ভাবসঙ্গতি রেখেই শিল্পী গত্ ধরলেন 'পুরিয়া ধ্যানেশ্রী'-তে। সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠল কিষণ মহারাজের ত্রিতালের ঠেকা। ছুট্ তানের কারুকার্যের সঙ্গে বোল্‌পরনের সুগম্ভীর বাজ, যেন মহাকালের প্রবীণ সংহতির বুকে চির-যৌবনের উচ্ছ্বাস জোয়ার। স্থিতধী প্রজ্ঞার সঙ্গে সৃষ্টিশীল রঙিন মনের হৃদয় বিনিময়। এ বস্তু একান্তই অনুভবনের। আড়ি, কোয়ারীর ছন্দে ডিরি ডিরি বোলের সমুদ্র গর্জনের পরই নরগমাপাধপ ম গা র অস্ফুট কিন্তু সুস্পষ্ট রেশের পরই যখন ম র গা তে ফিরে এসেছেন, প্রাণ 'হায় হায়' করে উঠেছে।

দ্বিতীয়ার্ধে ধরলেন স্ব-সৃষ্ট রাগ চন্দ্রনন্দন। চিরন্তন বিরহের আর্তি, ও উর্ধ্বমুখী আকুতির কি নিবিড় ব্যাকুল দ্যোতনা, মাত্র দুটি পর্দার নানান বর্ণ-বিন্যাসে। কিষণ মহারাজের ধামার তালের পাখোয়াজী বোলের সঙ্গতে ধরলেন বোলতান—সে কতরকমের। কখনও আড়ি কখনও দেড়ী কখনও আদ্যা ছন্দে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বোলের বাহার—সিকিমাত্রা থেমে তা আবার দুই স্বরের মাঝে আড়াই মাত্রা কখনও তারও কম যতির পর ডিরিডিরি-র কত রকমফের। এসব রবাবী বাজ আলাউদ্দিন খাঁর বহু ধ্যানের ধন, বহু বিনিদ্ররজনীর সৃষ্টি আর কিষণ মহারাজের বোল কণ্ঠে মহারাজের। **অতীতের এই মহামহিম ঐশ্বর্যকে মেলে ধরার জন্য অভিনন্দনীয় জলসাঘরের লভ্যবৃন্দ।**

আলাউদ্দিনানুসারী বাহাদুর খাঁ

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি একক সরোদবাদনের আসরের আয়োজন করেছিলেন তাঁর শিষ্যবৃন্দ।

সমবেত গুণীবৃন্দ শিল্পীর দীর্ঘ-জীবন কামনা করেন আর তাঁদের অভিনন্দনকে শিল্পী অভিবাদন জানান দেড়ঘণ্টাব্যাপী একটি একক সরোদানুষ্ঠান দিয়ে। সঙ্গতে ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য।

আলি আকবর খাঁ সাহেবকে বাদ দিলে বাহাদুর খাঁর মত সরোদী সারা ভারতে কমই আছেন, এ সত্য জানা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঁর ধ্যান আরো গভীর, নিবিড় গুরুমুখী হয়েছে এ খবর অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি না সেদিনের বাজনা শুনতাম।

খাঁ সাহেব বাজালেন 'মালবী গুর্জর'। এ রাগও আলাউদ্দিন খাঁর রচনা, এবং এই রাগটিই গুরুর কাছে তাঁর শেষ তালিম বলে শিল্পী জানালেন।

এর আগের বাজনায় আলাউদ্দিন খাঁ ঘরানার সুবিশাল পটভূমিকার ইঙ্গিত থাকলেও শিল্পীর নিজস্ব কারিগরীর প্রাধান্য ছিল প্রবল।

সেদিন বাহাদুর খাঁ সাহেব যেন আলাউদ্দিনগত প্রাণ হয়ে বাজিয়েছিলেন, তাঁর ভাবসাগরে ডুবে গিয়েছিলেন। আলাপের বিস্তারপদ্ধতিতে, তানে এমন কি ঝালাতেও ইনি পুরোপুরি ধ্রুপদী অঙ্গের রবাবী বাজে রাগরূপ উন্মোচন করলেন, এমনভাবে যা গুরুর খাসতালিম ছাড়া সম্ভব নয়।

শুনে শুনে শেখা তালিমবিহীন তৈরী বাজনা, আর তালিমী বাজনার তফাতটা সেদিন বোঝা গেল। বোলের প্রাধান্য বজায় রেখেও গায়কী অঙ্গের রূপ উন্মীলন—অন্যভাবে বলা যায়—এমন সব বোলের কাজ যার মধ্যে গায়কী অঙ্গকে আরো সুষ্ঠু, সুন্দর, মর্যাদাভূষিত রূপে পাওয়া যায় সেই বাজনাই শুনলাম বাহাদুরের কাছে। গায়কী অঙ্গ বলে আজকাল অনেকেই মিঠে করে এমন বাজান যে সেতার, সরোদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে তফাত করাটা কঠিন হয়ে ওঠে।

কিন্তু ডানহাতের কারুকার্য, বাদন-শৈলী ও শিল্পচাতুর্য ছন্দকারী ও বিন্যাসের মাধুর্য, যা যন্ত্রসঙ্গীতে একান্তভাবেই গুরু আলাউদ্দিনের অবদান—তারই এক স্মরণীয় নিদর্শন বাহাদুর খাঁর সেদিনের বাজানো মালবীগুর্জর। পূর্বী ঠাটের সকল ঔদাস্য রগমধার পকড়ে কি ভাবগভীর রূপ পেয়েছে। সে রূপকে অনুরঞ্জিত করেছে অনিল ভট্টাচার্যর রঙিন মেজাজের বোলচাতুর্য।

বিবিধ সংবাদ

মহাজাতি সদনে অলংকার মিউজিক সার্কেলের ৪দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে (২১—২৪ ফেব্রুয়ারী) অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ আমরী খাঁ, মুনাব্বর খাঁ, দুর্গাশংকর, এস এম ইউসুফ, সুনন্দা পট্টনায়ক, মনোরমা আহুজা, গোলাম মুস্তাফা খান, এ কানন, উমা দে পুরবী মুখোপাধ্যায় (কণ্ঠসংগীত), ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, আমজাদ আলি খাঁ, বিমল মুখার্জি, ইমরাৎ খাঁ, শিশিরকণা ধর-চৌধুরী, নিশাদ হোসেন খাঁ (যন্ত্রসংগীত), সংগতে ওস্তাদ কেরামৎ খাঁ, মহম্মদ সগীরুদ্দিন, মহাপুরুষ মিশ্র, শ্যামল বসু এবং আরো অনেকে। নৃত্যে শ্রীমতী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী ও শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা পাল।

—[illegible]

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

পঞ্চম টেস্ট খেলা

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের শেষ ৫ম টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার ফলে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ভারত ২—১ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে ভারত উপর্যুপরি ৩টি টেস্ট সিরিজে রাবার জয়ী হল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১টি এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২টি টেস্ট সিরিজ।

বর্তমানে ভারত-ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ১২টি টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৭টি, ভারতের 'রাবার' জয় ৩টি এবং সিরিজ ড্র ২টি। অপরদিকে ১২টি টেস্ট সিরিজের ৪৫টি টেস্ট খেলার ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের জয় ১৯টি, ভারতের জয় ৬টি এবং খেলা ড্র ২০টি।

ভারত টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নেয়। প্রথম দিনের খেলায় ভারতের ১ম ইনিংসের ৪টে উইকেট পড়ে ২৫০ রান উঠেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন বিশ্বনাথ (১০ রান) এবং দুরানী (২০ রান)। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিল

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

টনি গ্রেগ

৭৭ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ১৮৫ (১ উইকেটে)—ইঞ্জিনীয়ার ১০০ এবং ওয়াদেকার ৭৪ রান করে খেলায় অপরাজিত ছিলেন। ইঞ্জিনীয়ার ২৩৫ মিনিট খেলে তাঁর ১২১ রানে ১১টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এটি দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী ১০৯ রান—বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, মাদ্রাজ, ১৯৬৬-৬৭। এখানে উল্লেখ্য, ইঞ্জিনীয়ারের এই ১২১ রানই ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতের পক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। অপরদিকে ওয়াদেকারের দুর্ভাগ্য, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর আর সেঞ্চুরী করা হল না—তিনি তাঁর ৮৭ রানের মাথায় আউট হন। ২য় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং ইঞ্জিনীয়ার ১৯২ রান তুলে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২য় উইকেট জুটির নতুন ভারতীয় রেকর্ড রান করেন। এ-বিষয়ে পূর্বের রেকর্ড ছিল এঁদেরই—১৬৮ রান, লিডস, ১৯৬৭। ওয়াদেকার তাঁর ১ম ইনিংসের ৮৭ রানের মধ্যে ৬৫ রান তুলে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন। ওয়াদেকারকে নিয়ে ১১ জন ভারতীয় খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে করেছেন এই তিনজন—দিল্লীর ১ম টেস্টে সারদেশাই, কানপুরের ৪র্থ টেস্টে ইঞ্জিনীয়ার এবং বোম্বাইয়ের ৫ম টেস্টে ওয়াদেকার।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের ১৬ মিনিট পর ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৪৪৮ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তারা ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করে-

জি আর বিশ্বনাথ

কিথ ফ্লেচার

বিষেণ সিং বেদী
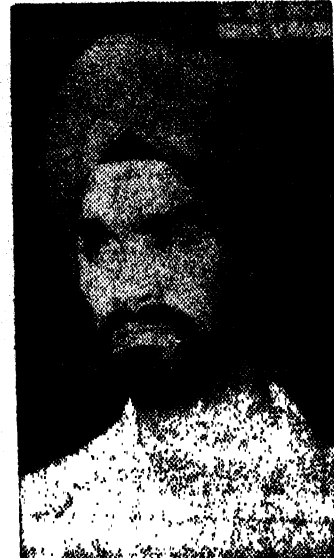
ছিল। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৩৩৮ (৪ উইকেট)—দুরানী ৬১ রান এবং বিশ্বনাথ ৫১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চা-পানের সময় ভারতের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪৩৯ (৯ উইকেটে)। দলের ৩৭১ রানের মাথায়, দুরানী ৭৩ রান (বাউণ্ডারী ১০ ও ওভার-বাউণ্ডারী ২) করে আউট হন। ৫ম উইকেটের জুটিতে দুরানী এবং বিশ্বনাথ ১৮৫ মিনিট খেলে দলের ১৫০ রান তুলে দিয়েছিলেন। বিশ্বনাথ ১১৩ রান করে আউট হন। তাঁর ২৬৭ মিনিটের খেলা দর্শকদের খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তাঁর ১১৩ রানে ছিল ১৮টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার বাউণ্ডারী।

এখানে উল্লেখ্য, বিশ্বনাথ তাঁর এই দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী করার সূত্রে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সামনে সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে যে বিভীষিকার বেড়া গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে দিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে এপর্যন্ত সেঞ্চুরী করেছেন এই ৬ জন খেলোয়াড়—লালা অমরনাথ (১৯৩৩-৩৪ সালে), দীপক সোধন (১৯৫২-৫৩ সালে), কৃপাল সিং (১৯৫৫-৫৬ সালে), আব্বাস আলি বেগ (১৯৫৯ সালে), হনুমন্ত সিং (১৯৬৩-৬৪ সালে) এবং বিশ্বনাথ (১৯৬৯-৭০ সালে)। এই ৬ জনের মধ্যে একমাত্র বিশ্বনাথই খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করার পর দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী করলেন। এর জন্যে বিশ্বনাথকে ১৪টি টেস্ট ম্যাচ অপেক্ষা করতে হল।

দ্বিতীয় দিনের বাকি একঘণ্টার খেলায় ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ৪১ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৩৩ (৫ উইকেটে)। এই দিন তারা আরও ৩টে উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ৪১ রানের (২ উইকেট) সঙ্গে ২৯২ রান যোগ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের

বি এস চন্দ্রশেখর
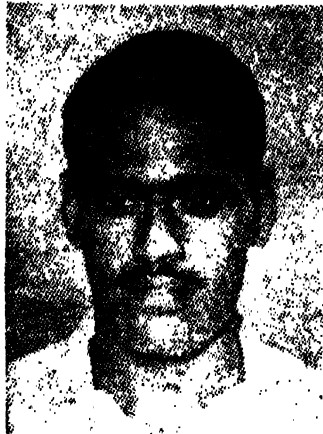
পক্ষেও দুজন সেঞ্চুরী করেন—ফ্লেচার (১১৩ রান) এবং গ্রেগ (নট আউট ১২৬ রান)—টেস্ট খেলায় তাঁদের এই প্রথম সেঞ্চুরী। ৫ম উইকেটের জুটিতে ফ্লেচার এবং গ্রেগ যে ২৫৪ রান সংগ্রহ করেন তা যে-কোন দেশের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের ৫ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। তাছাড়া ভারতের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ছাড়া অপর কোন দেশ ৫ম উইকেটের জুটিতে ২৫৪ রান তুলতে পারেনি।

চতুর্থ দিনে চা-পানের ২৫ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৪৮০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ভারতের ১ম ইনিংসের ৪৪৮ রানের থেকে ৩২ রানে এগিয়ে যায়। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ৪০১ (৭ উইকেটে)। টনি গ্রেগ ৩৬০ মিনিট খেলে তাঁর দর্শনীয় ১৪৮ রানে ২৪টা বাউণ্ডারী উপহার দিয়ে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেন। গ্রেগের এই ১৪৮ রান তাঁর টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান এবং সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে উভয় দলের খেলোয়াড়দের পক্ষেও সর্বোচ্চ রান।

চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারত কোন উইকেট না-খুইয়ে ২য় ইনিংসে ১০২ রান সংগ্রহ করেছিল। খেলায় অপরাজিত ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার (৪৭ রান) এবং গাভাস্কার (৫৩ রান)।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারত তার দ্বিতীয় ইনিংসের ২৪৪ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ১ম উইকেটের জুটিতে ইঞ্জিনীয়ার এবং গাভাস্কার যে ১৩৫ রান তুলেছিলেন তা ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে ১ম উইকেট জুটির সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

চা-পানের পর ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংস খেলতে নেমে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুটো উইকেট খুইয়ে ৬৭ রান তুলেছিল। বাকি ৯০ মিনিটের খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৩ রান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতবর্ষ : ৪৪৮ (ইঞ্জিনীয়ার ১২১, ওয়াদেকার ৮৭, দুরানী ৭৩ এবং বিশ্বনাথ ১১৩ রান। আরনল্ড ৬৪ রানে ২, ওল্ড ৭৮ রানে ৩ এবং পার্কিনশ ৬০ রানে ২ উইকেট)

ও ২৪৪ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ইঞ্জিনীয়ার ৬৬, গাভাসকার ৬৭ এবং বিশ্বনাথ ৭৮ রান। আণ্ডারউড ৭০ রানে ২ এবং পোকক ৭৫ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ৪৮০ (নট ৫৬, ফ্লেচার ১১৩ এবং গ্রেগ ১৪৮ রান। চন্দ্রশেখর ১৩১ রানে ৫ এবং বেদী ১২৮ রানে ৩ উইকেট।

ও ৬৭ রান (২ উইকেটে। চন্দ্রশেখর ২৬ রানে ১ এবং বেদী ২৫ রানে ১)

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

সদ্য সমাপ্ত ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় টনি গ্রেগ উভয় দেশের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন—তাঁর মোট রান ৩৮২ এবং গড় ৬৩·৬৬। তাছাড়া তিনি উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানও (১৪৮) করেছেন।

ভারতের ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন ফারুক ইঞ্জিনীয়ার তাঁর মোট রান ৪১৫ এবং গড়ে ৪১·৫০। তিনি ভারতের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (১২১) এবং উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রানও (৪১৫) করেছেন।

উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন বি এস চন্দ্রশেখর—৬৬২ রানে ৩৫টি উইকেট (গড় ১৮·৯১)। এখানে উল্লেখ্য, চন্দ্রশেখরের এই ৩৫টি উইকেট যে কোন দেশের বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে ভারতের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আরেকটি উৎকৃষ্ট ডেট উৎপাদন : নতুন তিন ভাবে কার্যকর **ডেট** পাউডার—

সাদা কিম্বা নীল : কাপড় ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে। রঙীন কাপড় সবচেয়ে উজ্জ্বল ক'রে। কাপড় আর হাতের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।

Shilpi HPMA-38a/72 Ben

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০২
ষাণ্মাষিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্য্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪২ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 23rd. February, 1973. শুক্রবার, ১১ ফাল্গুন, ১৩৭৯ **.52 Paise**

প্রচ্ছদ : শ্রীঅশোক চৌধুরী

চিঠিপত্র

শহীদ স্মৃতিবাসর উপেক্ষিত 'প্রফুল্লচন্দ্র' প্রসঙ্গে

আমার লেখা 'শহীদ স্মৃতি বাসরে উপেক্ষিত প্রফুল্লচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে কিছু 'ত্রুটি-বিচ্যুতি' দেখাবার জন্য যে প্রতিবাদ-পত্র স্বপনকুমার ঘোষ লিখেছেন এবং আমাকে 'একটু সতর্ক' এবং যত্নবান' হতে যে উপদেশ দিয়েছেন, সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি লেখাটিতে যে 'মারাত্মক ত্রুটি' লক্ষ্য করেছেন তাও তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

স্বপনবাবুকে একটি খবর নিবেদন করি। তিনি যে অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে এই লাইনের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই অমৃতবাজার পত্রিকাই আপাততঃ আমার সকল তথ্যের সূত্র, কোথাও কোথাও আক্ষরিক অনুবাদও, আমি এখনও সরকারী দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটার সময় ও সুযোগ পাইনি। এমনকি অমৃতবাজারে উদ্ধৃত স্টেটসম্যান', 'এম্পায়ারের' উদ্ধৃতি ছাড়া অন্য কোন সাময়িকপত্রও নয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় যখন মজঃফরপুরে বিস্ফোরণের প্রথম সংবাদ বেরোয় তখন পত্রিকাও এটি একটি দুর্ঘটনা বা ঘটনার অতিরিক্ত তাৎপর্য ধরতে পারেনি। সংবাদটা 'টপ' হেডিংয়ে অবশ্য ছিল। তারপর প্রচুর, কোন কোন সময় পরস্পরবিরোধী সংবাদও আসত।

স্বপনবাবুর মন্তব্যের জবাবে আমার প্রথম কথা ঃ প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের তুলনায় দলের প্রবীণতর সদস্য কিনা। প্রফুল্লচন্দ্রই কিংসফোর্ডকে মারবার প্রস্তাব করেন এবং বারীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রনাথ তাতে সায় দেন একথা স্বপনবাবু মানেন কিনা। সেই অত্যন্ত গোপন সভায় ক্ষুদিরাম ছিলেন কিনা। বারীন্দ্রকুমার প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়েই হেমচন্দ্র দাসের ওখানে যান কিনা এবং সেখানেই প্রথম ক্ষুদিরামকে দেখেন কিনা। অমৃতবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত স্বীকারোক্তিতে বারীন্দ্রকুমার ও'দের এই কারণে দুটি রিভলবার (কোথাও কোথাও পিস্তলও বলা হয়েছে), তিনটি নয়, দিয়েছেন যে, ধরা পড়ার উপক্রম হলে তাঁরা তা ব্যবহার করবেন। বরং আমি এ প্রশ্ন তুলেছি যে, দুটি হলে, প্রফুল্ল চাকী যেটি ব্যবহার করলেন সেটি কোত্থেকে এল? স্বপনবাবুর উদ্ধৃতিতে তিনটি আছে, বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তিতে দুটি। কিন্তু তিনটিই সত্য। স্বপনবাবুর বক্তব্য, বোমা একটাই ফেটেছিল এবং সেটি ক্ষুদিরামই ছুঁড়েছিলেন। এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? স্বপনবাবু যদি বাংলায় বিপ্লববাদের সব নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তথ্য জেনে থাকেন আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে রাজী আছি। অসুবিধে এই, প্রফুল্লচন্দ্র একটা কথাও বলে যাননি। বোমা বিস্ফোরণকালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ছাড়া তৃতীয় কেউ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে একজন মৃত, একজন ধৃত। দুটি রিভলবার কিছু টাকা ইত্যাদিসহ ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং কিছু বিবৃতি দেন। যে বিবৃতি দেন তার সঙ্গে পরবর্তীকালের ঘটনার কতটা সামঞ্জস্য ছিল এবং কতটা অনুদ্ঘাটিত ছিল স্বপনবাবু কি তা খতিয়ে দেখেছেন? ক্ষুদিরাম প্রফুল্লচন্দ্রের নাম জানতেন? তিনি বলেছেন, সঙ্গীর নাম দীনেশচন্দ্র রায়। যদি জানতেন তবে নিশ্চয়ই গুপ্ত বিপ্লবী দলের রীতি অনুযায়ী ভুয়া নাম বলেছেন। এমনিতে বিপ্লবীরা সত্যাশ্রয়ী কিন্তু ধরা পড়লে এই সত্যাশ্রয়ী বিপ্লবীরা হয় মরণপণ বোবা সেজে যান নয়তো বিভ্রান্তিকর মিথ্যার আশ্রয় নেন। যদি ক্ষুদিরাম বলে থাকেন 'বোমাটা আমিই মেরেছি (যদিও আমি এ পর্যন্ত এ বিবৃতি পাইনি) তবে কি স্বপনবাবু হলফ করে বলতে পারবেন যে, আর কাউকে না জড়াবার জন্যই ক্ষুদিরাম এ বিবৃতি দেননি?

ক্ষুদিরামের সঙ্গে মানিকতলা বাগানবাড়ীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না, স্বপনবাবু একথাও কি অস্বীকার করবেন? ক্ষুদিরামের বিবৃতিসূত্রে কিন্তু মানিকতলা বাগানবাড়ীর আবিষ্কার ঘটেনি। দুজনের মধ্যে এক প্রফুল্লচন্দ্রই ছিলেন বাগানের বাসিন্দা এবং এ পরিকল্পনাও তাঁর। বারীন্দ্রকুমার যেখানে বলছেন দুটি রিভলভার সেখানে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ২+১ তিনটি রিভলভার। একটা হাতলওলা বোমার কথা পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু বিস্ফোরণের রিপোর্ট ও লোকের প্রতিক্রিয়া খবর যা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে একাধিক বোমা বিস্ফোরণের অনুমান অযৌক্তিক নয়, সমগ্র মজঃফরপুর শহর নাকি কেঁপে উঠেছিল এবং কেউ কেউ বলেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ দুটি প্রচন্ড শব্দ শোনা গেছে। গাড়ী ও গাড়ীর যাত্রী যেভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ বেরিয়েছে তার প্রচন্ডতাও বিচার্য। স্বপনবাবু অমৃতবাজারের একটি উদ্ধৃতি ও ক্ষুদিরামের বিবৃতির ওপর নির্ভর করে বলেছেন, 'একটি বোমাই ফেটেছিল।'

স্বপনবাবু আমাকে 'একটু সতর্ক ও যত্নবান' হতে উপদেশ দিয়েছেন, আমি তাঁকে অনুরোধ করব পত্রিকার অন্যান্য অংশ পড়তে, তাতে প্রফুল্লচন্দ্রের নির্বিঘ্ন গঙ্গাস্নানের কথা জানতে পারবেন, ওটা আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। সঞ্জীবনী আমি পড়িনি, সুতরাং, স্বপনবাবুর কথাটা আমি মনে তুলে নিলাম, কিন্তু আমি তো কোথাও বলিনি প্রফুল্লচন্দ্র অপরিচিত ছিলেন, বরং বলেছি, প্রফুল্লচন্দ্রই গুপ্ত দলের 'ইনার ক্যাবিনেটের' অন্যতম ছিলেন। পুলিশ তাঁর নাম জানত না, ক্ষুদিরাম জানতেন না, পত্রিকা জানতেন না এবং এমন অজানা বলেই পুলিশ ধড় থেকে মুন্ড ছিন্ন করে সনাক্তকরণের জন্য লালবাজারে এনেছিল, পত্রিকায়ই এ খবর আছে। বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তিতেই প্রফুল্লচন্দ্রের নাম প্রকাশ পায়।

স্বপনবাবু অকারণ রাগ করেছেন, রাগ করলে ইতিহাস লেখাও যায় না, পড়াও যায় না, ইতিহাসের কাজই হল সত্যাবিষ্কার। স্বপনবাবু কোথায় পেলেন আমি ক্ষুদিরামকে 'কাজের পুতুল' করেছি? আমি শুধু প্রফুল্লচন্দ্র ও ক্ষুদিরামের যথাযথ ভূমিকা তুলে ধরতে চেয়েছি এই মনোবেদনায় যে যাঁর ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, যিনি প্রবীণতর, যিনি নিজেই জীবনের নির্বাক উপসংহার করলেন এবং গুপ্তদলে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করলেন, তিনি উপেক্ষিত কেন হবেন? 'কাজের পুতুল' কথাটা স্বপনবাবুর মন-গড়া, আমার নয়। এই বলে স্বপনবাবু আমার উদ্দেশ্যকে হেয় করতে চেয়েছেন। আমাকে হেয় করলে স্বপনবাবুর আত্মতৃপ্তি হতে পারে তা ইতিহাস হয়ে উঠবে কিসের জোরে? এমনি আরও উপেক্ষিত হয়েছেন, কানাইলালের পাশে যেমন সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

শেষ কথা। স্বপনবাবু অমৃতবাজারের উদ্ধৃতি মেনে নিয়ে বলছেন রিভলবার, আবার উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, 'বেশ বড় একটি পিস্তল'। স্বপনবাবু দুটিই একসঙ্গে বিশ্বাস বা গ্রহণ করলেন কি করে? দ্বিতীয়ত, এই উদ্ধৃতি থেকে স্বপনবাবু বলছেন, ক্ষুদিরাম 'পিস্তল চালাতে জানত না'। পক্ষান্তরে, প্রফুল্লচন্দ্র এন্ডরু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় যে বোমা বসিয়েছিলেন তা পাওয়া যাচ্ছে, এবং আরও অন্ততঃ দুটি ঘটনায় জানা গেছে, তিনি বোমা ব্যবহারের কলা-কৌশল জানতেন। ক্ষুদিরাম মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের আগে বোমা নিয়ে কোন কারবার করেছেন এমন পরিচয় কোথাও নেই। তবু এ সূত্রেই সম্ভব প্রবীণ অভিজ্ঞ প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গী ক্ষুদিরামই বোমা ছুঁড়েছিলেন! কিন্তু সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে (কিংসফোর্ডকে মারবার পরিকল্পনা, বোমা ব্যবহারের পূর্বঅভিজ্ঞতা, অন্যান্য আত্মহনন ইত্যাদি বিচারে) স্বপনবাবু কোন তথ্যের জোরে বলছেন ক্ষুদিরামই বোমাটা ছুঁড়েছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্র ছোঁড়েননি অথবা বোমা ছিল একটাই, একাধিক নয়? আর, প্রথম শহীদ? প্রফুল্লচন্দ্র ও ক্ষুদিরামের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রই যে প্রথম শহীদ এও কি স্বপনবাবু অস্বীকার করবেন? প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে প্রথম শহীদ করতে চান আপত্তি করব না, কেননা, সেটা আমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে (এবং অধিকাংশ তথ্যেই আমার জ্ঞানের ও নাগালের বাইরে। এই স্বীকৃতিতেও আমার লজ্জা নেই। কেননা, আমার কাজ ইতিহাসের উপকরণ কুড়োনো এবং তার সবে আরম্ভ), কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র ও ক্ষুদিরাম প্রসঙ্গে কে প্রথম? যাঁরা প্রফুল্লচন্দ্রকে অজ্ঞতাবশত অভিন্ন বলে গান গায় স্বপনবাবু নিশ্চয়ই তাঁদের দলে নন। বাদানুবাদ নয়, আসুন, সহযোগিতা করে, বাংলা তথা ভারতে বিপ্লববাদের নৈর্ব্যক্তিক রূঢ় ঐতিহাসিক তথ্যগুলো কুড়াই, হতভাগ্য বাংলায় যদি কোনদিন সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসবিদের আবির্ভাব হয় তিনি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখবেন।

পুলকেশ দে সরকার
কলকাতা-৩।

ডলার বাজারের সংকট

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বশক্তিমান মার্কিন মুদ্রা ডলারের দাম কমানোর প্রভাব না বুঝতে পারলেও, দুনিয়ার পণ্য আমদানী-রপ্তানীর বাজারে তা বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। মার্কিন দেশ হল পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশ। তার খাদ্যসম্ভার উদ্বৃত্ত, উৎপন্ন পণ্য অঢেল। প্রয়োগবিজ্ঞানে তার কাছ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো সব সময় সাহায্য নেয়। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট নিকসন যখন শতকরা দশভাগ ডলারের আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য কমিয়ে দিলেন তখন তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকল দেশেই অনুভূত হবে।

মাত্র চৌদ্দ মাসের মধ্যে দুবার প্রেসিডেন্ট নিকসনকে ডলারের বিনিময় হার কমাতে হল। মার্কিন অর্থনীতির ভিতরকার সংকটই এর জন্য দায়ী। এ সংকটের অন্যতম কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার প্রভূত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিম জার্মানী এবং জাপান শক্তিশালীই শুধু নয়, তাদের মুদ্রা মার্ক এবং ইয়েন দস্তুরমত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে মার্কিন ডলারের। গোড়ার দিকে আমেরিকা চেষ্টা করেছিল পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের ওপর চাপ দিয়ে ডলারের ভিত্তিতে তাদের মুদ্রার নবমূল্যায়নের। তাহলে ডলারের মান বাঁচত, কিন্তু রপ্তানী বাজারে তারা মার খেত এবং তার প্রতিক্রিয়ায় তাদের দেশে বেকার সৃষ্টি হবার আশঙ্কা ছিল। ইয়োরোপীয় খোলা বাজারের সদস্যরাও এ ব্যাপারে ছিল বিরোধী। অবাঞ্ছিত ডলার সে সমস্ত দেশে মুদ্রা বিনিময়ের হারই শুধু ওলট-পালট করে দিত না, দেশে মুদ্রাস্ফীতিতেও তা ইন্ধন জোগাত। এখন পশ্চিম জার্মান মার্ক এবং জাপানী ইয়েন আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় নিজস্ব মূল্য খুঁজে পাবে। ডলারের সোনার ফাঁসে তা আর আটকে থাকবে না।

এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন ইয়োরোপীয় খোলা বাজার এবং জাপানের কাছে বাণিজ্যিক সুবিধা দাবি করেছেন। তা নিয়ে চলবে এখন দর কষাকষি। মোট কথা এখন মার্কিন ডলার আর শক্তির ঘাঁটি থেকে নিজস্ব দর হাঁকতে পারবে না। তাকে বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিতে হবে।

ভারতের দিক থেকে ডলারের এই অবমূল্যায়নে ক্ষতির কোনো কারণ নেই। ভারতীয় টাকার দাম মার্কিন চাপে আগেই কমাতে হয়েছিল। এখন ডলারের দাম কমায় সে অনুপাতে আমাদের টাকার দাম কিছুটা চড়বে। মার্কিন দেশ থেকে আমাদের অনেক জিনিসপত্র আমদানী করতে হয়। এখন আগের চেয়ে কম দামে সে জিনিস আমরা আনতে পারব। তবে যা কিছু রপ্তানী আমরা করি তার ডলার মূল্যও আনুপাতিক হারে বেড়ে যাওয়ায় হয়তো আমাদের রপ্তানীর কিছুটা ঘাটতি দেখা দেবে মার্কিন দেশে। তবে আমাদের বিদেশী মুদ্রা আমানতের মাত্র ৪·৮০ শতাংশ রয়েছে ডলারে। তাই খুব একটা মুস্কিল আমাদের হবে না। পাউন্ডের সঙ্গে আমাদের টাকার বিনিময় হার অনির্ধারিত থাকায় রপ্তানী বাজারে ক্ষতি হবার আশংকা কম। আমেরিকায় আমাদের রপ্তানী পণ্যের অন্যতম হল পাট ও পাটজাত দ্রব্য। তার দামের ওপর যাতে কোনো প্রতিক্রিয়া না হয় তার জন্য সরকারকে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে ডলারের মূল্য কমালেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হল আমেরিকার রপ্তানী বাড়ানো এবং নিজের দেশের অর্থনৈতিক বাজারে সমতা সাধন। তিনি এখন চাইবেন বৃহৎ বাণিজ্যিক দেশগুলোতে মার্কিন পণ্য রপ্তানীর অধিকতর সুযোগ। যদি তা না করা হয় তাহলে তিনিও বিদেশী পণ্যের, বিশেষ করে জাপানী ও পশ্চিম ইয়োরোপের, আমেরিকা প্রবেশ সংকুচিত করবেন। মূলত তাদের উদ্দেশ্যে হলেও ভারতকেও এ থেকে সতর্ক হবার সংকেত নিতে হবে। টাকার দাম আগেই কমানোর ফলে আমাদের রপ্তানী পণ্যের আয় বাড়ে নি। বরং আমদানীর জন্য চড়া দাম দিতে হচ্ছে আমাদের। জাপান ও পশ্চিম জার্মানী দুটোই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছিল। গত পঁচিশ বছরে এই দুটি দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন বিস্ময়কর এই দুটি দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক শিক্ষণীয় আছে। স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতিক বুনিয়াদ গঠন করাই আমাদের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। গত কয়েক বৎসরে দেশের ভিতরে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে। তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকার হিমসিম খাচ্ছেন। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্রব্যমূল্যের দাম জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এনে, রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপাদনে সাফল্য দেখাতে পারলেই টাকার বাজার শক্তিশালী হবে। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ এবং অপচয় নিবারণ। জাতীয় স্বার্থে সার্বিক কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ন্যূনতম জীবনধারণের মানের নীচে যাদের বাস তাদের কাছে তো কৃচ্ছ্রতা দাবি করা যায় না। সুতরাং স্বচ্ছলতর অংশকেই সমাজের কল্যাণে অপচয় নিবারণ করে ভারতীয় অর্থনীতিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করতে হবে। নয়তো আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়ব।

হ্যানয়ের জিয়ালাম বিমানবন্দরে মার্কিন যুদ্ধবন্দীরা মুক্তির পর স্বদেশ গমনের প্রতীক্ষায়।

দেশে বিদেশে

পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামি পার্টির নেতা ওয়ালি খাঁ ঠিকই বলেছেন, 'ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব পাকিস্তানে যা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এখন বালুচিস্তানে তাই করছেন।'

পাকিস্তানের যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেখানকার আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে দুবছরের আগেকার পরিস্থিতির বাস্তবিকই অনেকগুলি সাদৃশ্য রয়েছে। সেবার যেমন ইয়াহিয়া খাঁ (জুলফিকার আলি ভুট্টোর সহায়তায়) সৈন্য পাঠিয়ে আওয়ামী লীগের আন্দোলন দমন করার ও বাঙালীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন এবারও তেমনি প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সামরিক বলের সাহায্যে বালুচিস্তানে জাতীয় আওয়ামি পার্টির আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করছেন ও বালুচদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছেন।

দুই পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর সাদৃশ্য হল, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আঘাত হানার আগে সেবার যেমন শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রের' মামলা সাজান হয়েছিল, এবারও তেমনি প্রেসিডেন্ট ভুট্টো জাতীয় আওয়ামী পার্টির বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র ষড়যন্ত্রের অভিযোগ খাড়া করেছেন। তফাত এই যে, সেবার ঐ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ভারতের নাম জড়ান হয়েছিল, এবার জড়ান হয়েছে ইরাক ও সোভিয়েট রাশিয়ার নাম।

পাকিস্তানী সূত্রের সংবাদে বলা হয়েছে যে, গত ১০ ফেব্রুয়ারী জনচল্লিশেক সশস্ত্র পাকিস্তানী পুলিশ রাওয়ালপিণ্ডির ইরাকী দূতস্থানে হানা দিয়ে ৬০ বাক্স অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। বলা হয়েছে যে, এই বাক্সগুলিতে কমপক্ষে ৩০০ সাবমেশিন গান, ৩০ হাজার রাউন্ড গুলি-বারুদ, ৪০টি আগুনে বোমা, গেরিলা লড়াইয়ের উপযোগী হাতিয়ার এবং বেতার প্রাপক ও গ্রাহক যন্ত্র পাওয়া গেছে। আরও বলা হয় যে, এইসব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সোভিয়েট রাশিয়ার অথবা সোভিয়েট নক্সা অনুযায়ী তৈরি।

ইরাকী দূতাবাসের এই ঘটনার সঙ্গে বালুচিস্তানের পরিস্থিতিকে জড়িয়ে দিতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। বালুচিস্তানের লাসবেলা অঞ্চলে এর কয়েকদিন আগেই উপজাতীয় সংঘর্ষ হয়েছিল এবং ঐ সংঘর্ষের অজুহাতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বালুচিস্তানে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন। ইরাকী দূতস্থানে পাকিস্তান হানাদারির সঙ্গে সঙ্গে রটনা করে দেওয়া হল যে, বালুচ উপজাতীয়দের মধ্যে সংঘর্ষের উস্কানি দেওয়ার জন্য ইরাক অস্ত্রশস্ত্র যোগাচ্ছিল!

একথা ঠিক যে, ইরাণের সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ভাল নয় এবং ইরাক অতীতে ইরাণে উপজাতীয় বিদ্রোহের উস্কানি দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে। এই সন্দেহও হয়ত অমূলক নয় যে, ইরাণ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বালুচ উপজাতীয়রা নিজেদের পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের যে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তার পিছনে ইরাকের প্রশ্রয় রয়েছে—প্রধানত ইরাক-ইরাণ শত্রুতার কারণে। এই আন্দোলনের সদর দপ্তর বাগদাদে অবস্থিত বলে প্রকাশ। কিন্তু সে যাই হোক, ইরাক যদি বালুচ স্বাতন্ত্র্যবাদীদের অস্ত্র জোগাতে চায় তাহলে সে সেটা তার দেশের সংলগ্ন সীমান্তের ভিতর দিয়ে না পাঠিয়ে দূরবর্তী পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে পাঠাবার চেষ্টা করবে কেন তার কোন কৈফিয়ত পাকিস্তান দেয় নি।

কৈফিয়ত যাই হোক না কেন, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ঘটনার যতখানি প্রতি-

ক্রিয়া না হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে তার ঘরের ভিতরে। নাটকীয় দ্রুততার সঙ্গে পাকিস্তানে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে এবং এই ঘটনাগুলি পাকিস্তানকে গভীর থেকে গভীরতর সঙ্কটের আবর্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বালুচিস্তানের গবর্ণর ঘউশ বক্স বিজেঞ্জো ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর আরবাব সিকান্দর খাঁ খলিলকে বরখাস্ত করে নতুন গবর্ণর নিয়োগ করেছেন। ওঁরা দুজনেই ছিলেন জাতীয় আওয়ামী পার্টির সমর্থক এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের অভিযোগ তারা তাঁর নির্দেশ মেনে চলছিলেন না। সিন্ধুর গবর্ণর তালপুর যদিও ভুট্টোর পিপলস্ পার্টির সমর্থক তাহলেও তিনিও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে পদত্যাগ করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাঁর জায়গায় সিন্ধুর গবর্ণর করে পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর বিধবা পত্নী বেগম লিয়াকৎ আলি খাঁকে।

ভুট্টো শুধু বালুচিস্তানের গবর্ণরকেই বরখাস্ত করে ক্ষান্ত হননি, আতাউল্লা খাঁ মেংগলের নেতৃত্বে গঠিত সেখানকার মন্ত্রিসভাকেও তিনি অপসারণ করে বালুচিস্তানকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে এনেছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মৌলানা মুফতি মামুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আওয়ামী পার্টি ও জমিয়ৎ-উল-উলেমা-ই ইসলাম দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাও ইস্তফা দিয়েছেন।

ওদিকে বি-বি-সি-র সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্তানের সর্বত্র ডাকঘর, রেডিওস্টেশন, স্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কড়া সামরিক পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে

সাত দিনের শুভাশুভ

বিশেষ বিচার

সপ্তাহের সাতটা দিন সমান যায় না। কিন্তু কোন সপ্তাহ কেমন যাবে, কোন সপ্তাহ শুভ আর কোন সপ্তাহ অশুভ, তা যদি আগে থেকে জানা যায়, এবং বিশেষ করে যদি জানা যায় অশুভ সময়টি কবে কাটবে, কবে আসবে শুভ সময়, কতোই না ভালো হয়।

আগামী সপ্তাহ থেকে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে 'সাতদিনের শুভাশুভ' বিভাগে। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত রাশিফলের সঙ্গে থাকবে একটি কুপন, যা কেটে নিয়ে পাঠকেরা প্রশ্ন করে পাঠালে তার জবাব পাবেন পরের সপ্তাহের অমৃতে।

বিচার করবেন শুভাচার্য

এবং বালুচিস্তানে প্রচুর সৈন্য পাঠান হয়েছে।

পাকিস্তানে এইসব ঘটনা ঘটছে এমন এক সময়ে যখন তার সংবিধানের চূড়ান্ত আকার দেওয়ার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা। কিন্তু জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা ওয়ালি খাঁ যখন সরকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধকে পাকিস্তানের রাজপথে টেনে নামাবার ভয় দেখাচ্ছেন তখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তাঁর সংবিধান অনুমোদন করিয়ে নিতে পারবেন কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সংশয় দেখা দিচ্ছে।

●

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা কিছুদিন আগে পর্যন্তও 'ডলার বাঁচাও' বলে আওয়াজ তুলতেন। এক আউন্স পাকা সোনার দাম ৩৫ ডলারে বেঁধে না রেখে যার এক সেন্ট চড়াতে হবে, এমন কোন প্রস্তাব এলেও যেন ওয়াশিংটনের মাথায় বাজ পড়ত। তাঁরা এমন একখানা ভাব দেখাতেন সোনার দাম আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার না হয়ে ৩৫-০১ ডলার বলে যদি মেনে নিতে হয় তাহলে সেটা ডলারের পতন ও সেই অর্থে মহাশক্তিধর আমেরিকারই পতনের সামিল।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বিনিময় মুদ্রার বাজারে ক্রমাগত সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আমেরিকার শাসক মহল তাঁদের সেই আগেকার মনোভাব কতকটা কাটিয়ে উঠেছেন। যদি তা না হত তাহলে তাঁরা ১৪ মাসের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার ডলারের আন্তর্জাতিক বিনিময় হার হ্রাস করতে রাজি হতেন না। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়া থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রার কারবারিরা প্রায় সাত শ' কোটি ডলার বিক্রি করে দিয়ে অন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করার পর গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন সরকার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা ডলারের আন্তর্জাতিক

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে শুক্রবার বেঙ্গল চেম্বার অভ কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য বক্তৃতা মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন চেম্বারের প্রেসিডেন্ট শ্রীএ এন-হাকসার। ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ এ ডব্লিউ হেউডকে পিছনে দেখা যাচ্ছে।

উত্তর ভিয়েতনাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মার্কিন বৈমানিক এডওয়ার্ড ডেভিস বিমান চলেছে ফিলিপিন্সের ক্লার্ক বিমানঘাঁটিতে

বিনিময়ের হার দশ শতাংশ কমিয়ে দিলেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জাপান থেকে ঘোষণা করা হল যে, জাপানী ইয়েনের কোন নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য বেঁধে না দিয়ে বাজার অনুসারে এই মূল্য ওঠাপড়া করতে দেওয়া হবে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, সাময়িকভাবে কিছুকাল ওঠাপড়া করার পর শুধু জাপানী ইয়েন নয়, ব্রিটিশ স্টার্লিং, জার্মান মার্ক, ফরাসী ফ্রাঙ্ক ইত্যাদিরও বিনিময় মূল্য বাড়বে। তা যদি হয় তাহলে ডলারের অবমূল্যায়নের হার প্রকৃতপক্ষে দশ শতাংশের চেয়ে বেশি হবে। আমেরিকার আশা এই যে, আমেরিকার বহির্বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে ক্রমাগত যে সংকট চলেছে এই অবমূল্যায়নের ফলে সেই সংকটের মোচন হবে। তা হবে কিনা সেটা ভবিষ্যতের প্রশ্ন। কারণ, বছরখানেক আগে যখন স্মিথসোমিয়ান চুক্তি নামে পরিচিত নতুন বিনিময়মূল্য ঘোষণা করা হয় তখন প্রেসিডেন্ট নিকসন এ চুক্তিকে 'পৃথিবীর আর্থিক ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্বের ঘটনা' বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু সেই তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্বও এখন দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে ডলারের এই অবমূল্যায়নের কি প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত হবে তা দেখার জন্য কিছুকাল অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান প্রধান বৈদেশিক মুদ্রাগুলির বিনিময় মূল্য কোথায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তা ঠিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লী থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, স্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টাকার বিনিময় মূল্য নির্দিষ্ট করার যে সিদ্ধান্ত ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থির করা হয়েছে সেই সিদ্ধান্তই বজায় থাকবে এবং পাউন্ড স্টার্লিংয়ের বিনিময়মূল্য শেষ অবধি কি দাঁড়ায় তা দেখে দরকারমত টাকার নতুন বিনিময়মূল্য ঘোষণা করা হবে।

নয়াদিল্লিতে সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে এখন যে ৭১২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার সঞ্চয় আছে তার মধ্যে ৫১-৫৩ শতাংশই আছে স্টার্লিংয়ে এবং মাত্র ৪-৮ শতাংশ আছে মার্কিন ডলারে।

১৩-২-৭৩ —পুণ্ডরীক

একুশের সংকল্প ও উত্তরাধিকার

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে, ভারতীয় মুসলমানেরা আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী তুলেছিলেন ধর্মীয় বিধানকে মান্য করে। হিন্দুরা হিন্দুস্থানের দাবী তোলেননি। তার কারণ, তাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা ছিল না। মুসলমানদের ছিল। তাঁরা ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রকে পেতে চেয়েছিলেন, নিরাপত্তার স্বপ্নময় কেন্দ্রীয়ভূমি হিসেবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবেরও, প্রায় অনুরূপ আকাঙ্ক্ষায়, ময়নাদ্বীপের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবে কতদূর বিস্তৃত হতে পারে, বা হওয়া সম্ভব, ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা পূর্ব-পরীক্ষিত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের মতে, হিন্দু-মুসলমানের যে-বিরোধ, তা এক অনাধুনিকের সঙ্গে আরেক অনাধুনিকের সংঘর্ষ। এক চিরপ্রথার সঙ্গে আরেক চিরপ্রথার সংঘাত।

সেই মুহূর্তে, বাঙালী মুসলমানেরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটা চিঠিকে স্মরণ করেছিলেন, অনাগত জন্মের স্বপ্ন নিয়ে। অনেকটা দৈগন্তিক হাতছানির মতো। মহাকাব্যের বিষয়-নির্বাচনে দ্বিধাগ্রস্ত মাইকেল তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, কারবালার যুদ্ধে নিহত হোসেন ও তাঁর ভাইদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উত্তরাধিকার থাকলে, ঐ বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তা থেকে তিনি বঞ্চিত।

তৎকালীন বাঙালী মুসলমানেরা মাইকেলের ভ্রান্তিটাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। নাইলে, ঐ চিঠিটাকে তাঁরা আরো খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতেন। যে-কারণে মাইকেল খৃস্টান হয়েও খৃস্টানী আদর্শে মহাকাব্য রচনা করেন নি, সেই কারণেই মুসলমান হলেও, তাঁর পক্ষে হাসান-হোসেনের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লেখা সম্ভব হত না।

দেশ ভাগের পর, পূর্ববঙ্গের কবিরা, পাকিস্তানের বাঙালী হিসেবে, কিছুকাল ইরাণী গুলাবের গন্ধে কাব্য-রচনায় উদ্যম নিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া নামে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহকে 'কায়েদে আজম' বলে ডেকেছিলেন। কিন্তু প্রাক-সাতচল্লিশের কল্পিত-ভূমিতে বিচরণের সুযোগ ছিল না। ছিল বাংলাদেশের মাটির ওপর, পাকিস্তানী মানচিত্রের একটা সুনির্দিষ্ট এলাকা।

এই এলাকায়, পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল, সেই মৌসুমী হাওয়া, বাউল গান,

ভাটিয়ালীর সুর, পদ্মার স্রোতোধারা বন্যার প্রকোপ, কিছুই পাল্টায়নি। সাতচল্লিশের পরেও, পূর্ববঙ্গ, পাকিস্তান নামে আরব্য-রজনীর দেশ হয়ে ওঠেনি। গ্রীক মাইথোলজির আইকেরাসের মতো, স্বপ্নে-পাওয়া বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় পাখা দুটি, সেই মুহূর্তেই মহাজাগতিক রশ্মিপাতের মতো বাস্তবের তাপে পুড়ে গিয়েছিল।

এই স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডিতেই, বাঙালী মুসলমানের জন্মান্তর লাভ। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। তার আগে, তাঁরা ছিলেন, দিগন্তের বাসিন্দা। দিগন্ত মানে, দূরের দিকে দৃষ্টি। এইবার মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মা।

মা, মানে বাঙলাদেশ, দেশের মাটি।

এই ডাক পাকিস্তানী সেপাই শাসকদের ভালো লাগেনি। পাকিস্তানী অনুচরদেরও না। তাঁরা ততোধিক জোরের সঙ্গে এই সম্বোধনকে ভোলাতে চেয়েছিলেন। দেশ মানে, মা নয়। দেশ মানে, পিতৃভূমি। আরবের লোকেরা তাই বলে।

অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে ধর্মের, বহিরাগত সংস্কারের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে বাঙালী মুসলমানেরা একটি জাদু আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সেই সময়। সেই আয়নাটিকে তাঁরা হাতছাড়া করতে নারাজ। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান— সমস্ত ধর্মের দেশজ ভিত্তিকে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। সেই মুহূর্তে, কেউ বা প্রশ্ন করেছিলেন, সব দেশের মুসলমানেরা কি একই রকম? এক ভাষায় কথা বলে? উর্দু কি কোরাণের ভাষা? কেউবা নিরুত্তরে, লোক-সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

এই আত্মজিজ্ঞাসার সূত্র ধরেই, বাঙালী মুসলমানেরা আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম সিংহলে ও চীনে প্রচারিত হলেও ভারতীয় সমাজের আদর্শ কোনো দেশ গ্রহণ করেনি। জাপানে নাকি এমন পরিবার আছে যে-পরিবারের চার ভাই চার ধর্মাবলম্বী? ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানেরা স্থানীয় রীতি-নীতিকেই অধিকতর মান্য করে চলে। তাহলে পাকিস্তানের সেপাই শাসকেরা বাঙালী মুসলমানদের কোন ধর্মনীতি শেখাচ্ছেন?

একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২-র বিস্ফোরণ, এই আত্মজিজ্ঞাসার প্রথম সর্বনাশা উত্তর।

॥ ২ ॥

কিন্তু সর্বনাশটা কার? কোনদিক থেকে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে গোটা মুসলিম দুনিয়ার শেকড় ধরে টান দিতে হয়। পার্থিব অনুসন্ধানে মুসলিম লীগ, আইয়ুব খান আর ইয়াহিয়া খানের পরাজয় চূড়ান্ত অনুসন্ধানে, মুসলিম মানসিকতার অনড় বিশ্বাসে দেখা যায়, ফাটলের চিহ্ন। অথচ, ধর্মীয় গোড়ামি আর রক্ষণশীলতাই ছিল, মুসলিম দুনিয়াকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রধান হাতিয়ার।

তাহলে, সেই হাতিয়ারটাই কি ক্রমশ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে? আত্মঘাতকের কারণ হয়ে উঠছে? একুশের জাগ্রত বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে কথা বললে, এই আশঙ্কাটাই স্থায়ী হয়। আইয়ুব খান এবং ইয়াহিয়া একটু বুদ্ধিমান হলে, এই জাগরণের সময়কে কিছুটা পিছিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁরাও ছিলেন নিজস্ব সংস্কারের হাতে বন্দী।

কেন জানি না, ব্রেশটের নাটকে অঙ্কিত গ্যালিলিওর বিচার দৃশ্যটির কথাই এখন বিশেষভাবে মনে পড়ে। যেন ইয়াহিয়াই বিচারক। বাঙালীর নবজাগ্রত চেতনাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করছেন, কে ঘোরে, সূর্য, না, পৃথিবী?

সেদিনের বাঙালী বিবেক ও প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। ইয়াহিয়ার বেয়নেটের মুখে উত্তর বেরিয়েছিল, পৃথিবী ঘোরে না। সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। ইয়াহিয়ার সর্বনাশের সূত্রপাত যে এই উত্তরের উৎসেই নিহিত, তা ইয়াহিয়ার পূর্বসূরীরা কেউ টের পাননি।

ইয়াহিয়া নিমিত্ত মাত্র।

ষোড়শ শতকের ইতালীয় রেনেশাঁসের কালে বাইবেলের আবিষ্কার, য়ুরোপীয় চিত্তের জাগরণ ঘটিয়েছিল। তার প্রমাণ পাই, শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে ও দর্শনে। তার ফলে বৈজ্ঞানিক চেতনারও জন্ম সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু য়ুরোপের সঙ্গে দু'শ বছর ধর্ম যুদ্ধ করে, মুসলিম দুনিয়ার জাগরণ ত্বরান্বিত হল না। বরং খৃস্টধর্মের সঙ্গে লড়াই করে, তাঁদের ধর্মীয় সংকীর্ণতায় আস্থাশীল হয়ে উঠতে হয়েছে। ফরাসী বিপ্লব কি রুশ বিপ্লবের ফলেও, সেই ধর্মীয় অচলায়তনে এতটুকু ফাটল ধরেনি। [illegible] বাঙালী মুসলমানেরা মুসলমানের চিরশত্রু ইংরেজ-খৃস্টানদের অধীনে দু'শ বছর বাস করে ভিন্ন স্বাদ পেয়েছিলেন।

এটাই ঘটনা।

বাঙালীর বাক আর্ম-বুকের অনটন বরাবরই ছিল। সেটা কি হিন্দু, কি মুসলমান— সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে নবাবী [illegible] শেষভাগে, বাঙালী মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রথম দিকে অনাগ্রহী ছিলেন। হিন্দুরা ঐ সংযোগটিকে [illegible] করেন নি। ফলে উনিশ শতকের [illegible] ও আধুনিক [illegible] মুসলমানের ভূমিকা [illegible] থেকে গেছে। এবং বিশ শতকেও হিন্দু-আধি-

দেশভাগের মূলে, এই অসাম্যই নানা জটিলতার আকারে, প্রেরণা জুগিয়েছিল। ধর্মই ছিল, সেই সময়ে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের সাম্প্রদায়িক মাধ্যম। মুসলমানেরা ভেবেছিলেন, একটা ধর্মীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে, সুবিধাভোগী হিন্দুদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু সুবিধাভোগীদের যে জাত নেই, সেটা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

ফলে, বাঙালী মুসলমানের পক্ষে পাকিস্তানের সমর্থক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বলেছিলেন, কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব।

সেটা ১৯৬৪ সালের কথা হবে বোধহয়। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি বলেছিলেন, বাঙালী মুসলমানেরা আত্মবিকাশের উপায় খুঁজেছিল, কিন্তু পথটা নিয়েছিল ভ্রান্ত। তখন তাদের আবিলতা ছিল। এখন ভাষাকে আশ্রয় করে, বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছে। দেখবেন, নবজাগ্রত বাঙালীর স্বরূপ। তারা পাকিস্তানের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এবং সেদিনের বাঙালী ধর্মে মুসলমান হলেও, চিন্তার দিক থেকে হবে মুক্ত, নিরপেক্ষ।

তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী, অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে ভাবতেও পারিনি।

সেই মুহূর্তে ওদুদ সাহেব আরো কয়েকটি চমকপ্রদ কথা বলেছিলেন, বেশ মনে আছে। তাঁর মতে, আচার-বিচারে হিন্দুরা বেশী সংকীর্ণতাগ্রস্ত। অথচ, ধর্মের ব্যাপারে উদার। অন্যদিকে মুসলমানেরা ধর্মের ব্যাপারে দারুন গোঁড়া। কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার মানে না। যদি হিন্দুরা ধর্মের উদারতাকে বাছবিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন এবং মুসলমানেরা ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি ত্যাগ করতেন, তাহলে হয়তো বাংলাদেশ ভাগ হত না।

একটু থেমে বলেছিলেন, মুসলমানদের উচিত বাংলা নামে চিহ্নিত হওয়া। কথা বলছে বাংলায়, অথচ নিজের নামটা আরবী-ফারসীতে না হলে চলছে না। কি দরকার, নামের ব্যাপারেও বিদেশীয়ানায়? ওতে কি ধর্মের মাহাত্ম্য বাড়ে? স্বপন, তপন, রতন তো বেশ ভালো নাম। তবে হিন্দুরাও এ ব্যাপারে কম কনজারভেটিভ নয়। তাঁরাও দেব-দেবীর নামেই ছেলেমেয়েদের নাম রাখেন বেশী।

সত্যি কথা বলতে কি, ওদুদ সাহেবের মতো, এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন চেতনার মানুষ আমি কমই দেখেছি। তাঁর কাছে তখন বাংলাদেশের অনেক পত্রপত্রিকা আসত। তিনি ভাষা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে, প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা নিশ্চয়ই.

করতেন? তিনি তো পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন না।

কিন্তু পাকিস্তানের বাঙালীরা, সেই সময়ে, গণতন্ত্রের যে-স্বপ্ন দেখতেন, তাও ছিল ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতিকূল। অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর অধিনায়কেরা গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে বসে ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে। বাংলাদেশটা হয়ে পড়েছিল উপনিবেশের মতো, মুনাফা-শিকারের জায়গা। এর ফলে, পূর্ববাংলার মুসলমানরা প্রতারিত হয়েছিলেন দুটো দিক থেকে। প্রথমত, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উৎসগুলিও চলে যাচ্ছিল অবলুপ্তির মুখে। রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ। নজরুল পুনর্লিখিত। এই রকম পরিস্থিতিতে রফিক-বরকত-সালামের মতো দু'চারজন শহীদের রক্ত তো বেশী নয়!

আরো রক্ত দেওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এবং রক্তের মধ্যেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন নিজেদের আইডেন্টিটি। তেইশ বছরের ভাষা-আন্দোলনে, গ্রীক-পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো, বাঙালী তরুণেরা বারবার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুরনো শরীর বিসর্জন দিয়েছে এবং নতুন শরীর ফিরে পেয়েছে। ১৯৬৯ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে আমরা এই সংকল্পের আগ্নেয় চেহারা দেখেছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে না দেখলে, একুশের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা কঠিন। কেননা, একুশের উত্তরাধিকার, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাঙালী মুসলমানের, আত্মজাগরণের স্মৃতিকে বহন করে দীর্ঘায়িত হয়েছে। প্রথম স্তরে, তাঁরা লড়েছিলেন হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় স্তরে লড়েছেন, মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে।

এর ফলে, যে-রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, সেই রাষ্ট্র, ধর্মের নয়, সম্প্রদায়ের নয়, ভাষার নামে, জাতি-সত্তার নামে চিহ্নিত হয়েছে। মুসলিম দুনিয়ার সামনে, এ এক বিপজ্জনক উদাহরণ। সর্বনাশা দৃষ্টান্ত। মুসলিম দুনিয়ার, এর আগে, সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার আহবান শোনা যায়নি। বাংলাদেশের মুসলমানেরা, এই আদর্শ স্থাপন করে মুসলিম দুনিয়াকে বিপন্ন করেছেন, বিস্মিত করেছেন। যার ধাক্কা সামলাতে, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে বেশ হিমসিম খেতে হবে।

।। ৩ ।।

ঐতিহাসিক টয়েনবির মতটা প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে। ইতিহাসের গতি-নির্দেশ করতে গিয়ে, তিনি লক্ষ্য করেছেন, গোঁড়া ক্যাথলিক রাশিয়া ধর্মীয় মালিন্যের ফলে, তার বিশ্বাসের আশ্রয় বদল করেছে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে। মুসলিম দুনিয়াও তেমনি একটি উর্বর ক্ষেত্র। গুরুবাদী ভারতবর্ষও তাই। তবে, কোথাও পরিবর্তন আসবে আগে, কোথাও পরে।

বাংলাদেশের মুসলমানেরা ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্যে, তাঁর ঐ মতামতকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু একুশের সাফল্যকে, স্বপ্নের খোলস-মুক্ত করে, বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ এখনো পাননি। এতদিন একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল, সংকল্প গ্রহণের দিন। বিপ্লবের আগে যেমন, ছোটখাট অনেক বিপ্লব ঘটে যায় মানসিক স্তরে, তেমনি একুশের উত্থান ছিল প্রাক-বিপ্লবের জাগরণ।

এই মুহূর্তে, বাংলাদেশের মুসলমান নয়, বাঙালীদের স্মরণ রাখতে হবে, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এমন বহু মানুষ, যাঁরা একুশের উত্থানকে সমর্থন করেছিলেন, বাংলার বদলে কেবল উর্দু শিখতে হবে বলে। মা, মেয়ে, বউকে শাড়ীর বদলে শালোয়ার-কামিজ পরাতে হবে বলে। এখানে যুক্তির চেয়ে, সংস্কারের মূল্য বেশী। মোল্লা-মৌলভীরাও বঙ্গজ-সংস্কারের মধ্যেই ইসলামের পুনরভ্যুত্থান চেয়েছিলেন। একুশের সঙ্কল্প বাস্তবভিত্তি না পেলে, আমার আশঙ্কা, ধর্মীয় বিকারে পুনরায় বাঙালীর চিত্তবিকার ঘটতে পারে।

অবশ্য, এই সংগ্রামের প্রথম সারির সৈনিকেরা, কেউই দেশভাগের তিক্ত স্মৃতিকে মনের মধ্যে লালন করেননি কখনো। অনেকেই জন্মেছেন দেশভাগের পরে। কিংবা, দেশভাগের পরিণতিতে বাংলাদেশের বাসিন্দা হতে বাধ্য হয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও লালন করে চলেছেন অখণ্ড বাংলার আকাশ ও ফেলে-যাওয়া বন্ধু-বান্ধবদের অবিস্মরণীয় স্মৃতিগুলি। যেমন করে, পশ্চিমবঙ্গে আগত বাংলাদেশের মানুষেরা লালন করে চলেছেন পদ্মাতীরের অম্লান সময়ের কথা।

এই স্মৃতি-বিনিময়ের নেপথ্যে কাজ করে যাচ্ছে, এক ভাষা, এক আকাশ, একই ঐতিহ্যের চিরকালীন পরিপ্রেক্ষিত। বাংলাদেশের তিন-সীমান্তের ভারতীয় বাঙালীরা একুশের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করছে, এই সত্যকে স্মরণে রেখে। তাঁরাও জানেন, ভাষার প্রতিরোধ-ক্ষমতা কত ব্যাপক। কত সুদূরপ্রসারী। যে-আঞ্চলিক ভাষায় ভারতবর্ষের মানুষেরা কথা বলেন, সেই ভাষার একেকটি দুর্গে বসে, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ জাতীয়তা এবং আন্ত-র্জাতিকতার পাঠ নিচ্ছেন। তাঁদের সামনেও বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন, কমবেশী নৈতিক শক্তির জোগান দিচ্ছে।

আইরিশ বিপ্লবীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঘোষণা করেছিলেন: রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসার আগেই চাই ভাষার স্বাধীনতা। কেননা, মাতৃভাষার অধিকার অর্জিত হলে, পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যে, আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারে। ইয়েটসও সেই সময়ে জন সিঞ্জ আর গ্রেগরীকে নিয়ে এমন লেখাই লিখতে চেয়েছিলেন, যা হবে মাটির স্পর্শবাহী।

একুশের উত্তরাধিকারী, বাঙালী কবি-সাহিত্যিকরা কি এ সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করতে পারেন? বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় কার লেখায় যেন, ইয়েটসের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করেছি।

গত কয়েকদিন ধরে, বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলিতে একটা খবর দেখেছি: একুশের প্রস্তুতি চলছে নানা-মহলে। কবিরা বিস্তর কবিতা লিখছেন। গল্পকাররা গল্প লেখায় ব্যস্ত। প্রবন্ধকাররা প্রবন্ধ লিখছেন। প্রেসে ব্যস্ততার অভাব নেই। সংকলন বেরুচ্ছে অজস্র। আর্ট কলেজের হোস্টেলে আর্টিস্টরা পোস্টার, ফেস্টুন, এবং সংকলনের প্রচ্ছদ এঁকে চলেছেন। শহীদ মিনার তৈরীর কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত। ২০ তারিখ রাত্রিতে আলপনা আঁকা হবে, শহীদ চক থেকে আজিমপুর গোরস্থান পর্যন্ত।

গত বছর শহীদ মিনারহীন বাংলাদেশে পালিত হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারী। হামিদুর রহমানের নকসা অনুযায়ী, সেটি তৈরী হয়েছিল ১৯৬২ সালে। প্রায় এক দশক, বাংলাদেশের শোষিত, নিপীড়িত মানুষ এই মিনারকে সাক্ষী রেখেই সঙ্কল্পে অটল ছিলেন। তার শরীরে ছিল লক্ষ লক্ষ স্ফটিকের চোখ। এবং সারি সারি বাংলা বর্ণমালা।

পুনর্নির্মিত শহীদ মিনারের দিকে তাকিয়ে, একুশের উৎসবরত বাঙালী কি স্মরণ করতে পারছেন যে, পাঁচ কিংবা পঁচিশ নয়, লক্ষ লক্ষ বাঙালীর আত্মদানের স্মৃতি যুক্ত হয়েছে শহীদ মিনারের গায়ে; এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে, বাংলাদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিলিয়েছিল একটি পোস্টার। যার মধ্যে লেখা ছিল: 'এক একটি বাংলা অক্ষর...এক একটি বাঙালীর জীবন।' ঐ পোস্টারের মাঝখানে ছিল, স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণটি, 'অ।'

কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে, কিম্বা ঘটার কথা ছিল অথচ ঘটেনি, অথবা অনেক দিন আগে ঘটেছিল যা কাল মনে পড়েছে, হয়তো কাউকে দেখে অথবা কোনো পুরোনো কোনো চিঠি বা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে—তারই উপর এক পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম এই ফিচার বুদ্ধির দীপ্তিতে আর হৃদয়বৃত্তির গভীরতায় লক্ষ্যভেদ ...করবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঠকরাও যোগ দিতে পারেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

যেদিন লিখতে ভালো লাগে না, কিম্বা লেখা আসেই না, সেদিনটা আমার মুক্তির। একটা নিষিদ্ধ চাপা আনন্দে মনের কোন আড়াল ভরে থাকে। মিথ্যে অজুহাতে ছুটি নিয়ে স্কুল-পালানো ছেলের মতো। কাল আমার এরকম একটা দিন ছিল।

কিন্তু কাল একটা গুরুতর ভুলই করে বসলাম। কিশোর বয়সে গদ্যে-পদ্যে যা খুশি লিখে পরাক্রান্ত রাজার মতো পা ফেলতাম, পরে কোন সময়ে সেই লেখাগুলো পিতৃদেব জড়ো করে ফাইলবন্দী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতদিন খুলিই নি। হঠাৎ কাল করলাম কী, খুলে বসলাম পুরনো নীল সেই ঝুললাগা ধুলোয় ধূসর ফাইল। ভিতরে ছেঁড়াখোঁড়া রঙ চটে-যাওয়া একগাদা কাগজ। আঁকাবাঁকা বড়ো বড়ো হরফের সার, কালির রং কোথাও নীল, কোথাও কালো।

চমকে উঠলাম। এ কার হস্তাক্ষর? দিশেহারা কিংবা অনাচারী শব্দবন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত বাক্যে কে কী বলতে চেয়েছিল?

কবরখানার শিমুল গাছটা থেকে
দলে দলে বেরিয়ে এসেছে পতঙ্গেরা
লাল শিরস্ত্রাণপরা অস্থির সৈনিক.’

একটা মুখের ছবি অস্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চিনতে পারলাম না। আমার লেখার টেবিলের ওপর ওই বয়সের একটা ফটো আছে। মিলিয়ে দেখলাম। না—এ সে নয়। অন্য কেউ।

পদ্যের নিচে তারিখ লেখা আছে ২২ মাঘ, ১৩৫৪ সাল। এই মাসে শিমুল ফুল ফোটে। আমাদের গ্রামের কবরখানায় একটা শিমুল গাছও ছিল। স্মৃতির অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কেন হঠাৎ ওই গাছটা নিয়ে পদ্য লিখতে গেলাম? কেনই বা ফুলগুলোকে বললাম ‘লাল শিরস্ত্রাণপরা অস্থির সৈনিক’? অন্ধকারে সেই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার ফুলগুলো এখন ধূসর, খড়ি খড়ি, মমির মতো। আঙুলে ছুঁলেই ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ে। আর এসব আঙুল এখন বয়স্ক, শিরাবহুল, আগ্রাসী। এখন আমার আঙুলগুলো মূলন্দুধ রক্ত-মাংস একাকার করে দিতে উন্মুখ নিরন্তর। এ বর্তমান আঙুল সতত ভ্রূণহন্তা। প্রকৃতির জরায়ুবিদারক।

স্মৃতির অন্ধকারে আমি সাবধানী দূরত্বে গাছটাকে দেখতে থাকলাম। আস্তে আস্তে আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হল। নির্জন কবরখানা। পাশে পদ্ম শালুকভরা পুকুর। চারদিকে রাঢ়বাংলার অসমতল ঢেউ-খেলানো ধূ-ধূ বৃক্ষবিরল শস্যশূন্য মাঠ। সেই শূন্যতার মধ্যে একটা উঁচু শিমুল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তার নিচে এসে দাঁড়াল একটি কিশোর। তার প্রথম পাপের প্রতীক্ষায়, কম্পিত সতর্ক। তারপর এল একটি কিশোরী। দুটি আবছায়া একাকার হল। নিষিদ্ধ বৃক্ষের মতো আরেক আদি-পাপের সাক্ষী হয়ে রইল নিঃসঙ্গ শিমুল।

লজ্জায় সরে এলাম তক্ষুনি। সেই আমার প্রথম প্রেম, প্রথম পাপ। ‘তোমার সাথে পাপ করেছি, সেই তো আমার পুণ্য’—একথা ঘোষণার সাহস আমার নেই। তাই তাকে নিছক পাপ জেনেই লুকিয়ে রেখেছিলাম মগ্নচৈতন্যের গভীরে। হঠাৎ কাল একটা অপরিণত পদের সূত্রে সেই পাপ গুরুতর ধাক্কা দিল দ্বিতীয়বার। প্রথমবার আঘাত শিল্পিত স্বভাবে কামময় করে ফেলতে পেরেছিলাম। এখন পারলাম না। এখন রূপহীন বস্তুসত্যে পৌঁছনোর বয়স। এখন সুষমাকে অস্বীকার করে বাঁচা—কারণ জেনে গেছি—‘সত্য শুধু বাঁচা, পশুর মতন বাঁচা।’

কাল তাই একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। আমি কি তবে আজ প্রান্তরবিলাসী বহির্জগতের অস্তিত্বেই নিজেকে আবিষ্কার করতে চাই অধুনা? পৃথিবী জুড়ে আজ সবাই বহুবাচনিক স্রোতে মনাভিমুখী, সাবজেকটিভ অন্তর্মুখীন। আমি কি তবে বলতে চাই—ঘরে নয়, প্রান্তরেই আছে জীবনের সারতত্ত্ব?

ভারতীয় ঋষি বলেছেন, ‘অমৃতের তত্ত্ব গুহায় নিহিত।’ কোথায় সে গুহা? মনে, না বস্তুবিশ্বে? ‘যা অমৃত নয়, তা দিয়ে আমি কী করব?’ গার্গী বলেছিলেন। কিন্তু অমৃত কি চেতনায়, নাকি বস্তুর বাস্তবতায়? আমার চেতনায় মৃত বস্তু-বিশ্ব। তার নিজস্ব বাস্তবতায়, ‘থিং-ইন-ইটসেলফে’ পৌঁছনো দুঃসম্ভব। তা দুর্জ্ঞেয়। একথা দার্শনিক কান্টের।

অথচ আমি অমৃতাভিলাষী সারাক্ষণ।

এবং সেই অমৃতেই কি পেতে চেয়ে প্রথম পাপ করে বসেছিলাম? তারপর থেকে কতবার কত পাপ করে আসছি। অমৃত কি নিছক সুখে—নিছক দুঃখে, না কি দুঃখ-সুখময় অবোধ মানসিক এক স্থিরতায়—বা জাড্যের নামান্তর?

আমার এই গোরাচাঁদ রোডের ঘরের জানলা থেকে চল্লিশ ফুট দূরে একটা শিমুল গাছ আছে। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল সে ফুলবতী। অবাক হলাম—এত দিন লক্ষ্য করি নি সজ্ঞানে। ক্যালেণ্ডারে তারিখ দেখি—২২ মাঘ, ১৩৭৯ সাল।

পঁচিশ বছর আগে ঠিক এই দিনটি। আশ্চর্য এক যোগাযোগ তাহলে। এবং আজও আমার পাপচেতনা বদলায় নি। শুধু তফাৎ এই যে, তখন আমি শূককীটের বর্ণাঢ্য প্রজাপতিতে রূপান্তরের মতো শিল্পে আত্মগোপন করতে পারতাম, এখন পারি না। পাপকে এখন পাপ বলেই বর্ণনা করি। প্রেমকে জানি শুদ্ধ যৌনতা। প্রকৃতি আমার ইন্দ্রিয় থেকে রঙীন পোষাকগুলো একটার পর একটা খুলে নিয়েছে কবে, আবিষ্কার করতে দেরী হয় না। প্রকৃতির প্রয়োজন সিদ্ধ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—এই ধারণা আমাকে পৌঁছে দিয়েছে ‘নিখিল নাস্তির মোমে।’

কালকের দিনটা আমার জীবনের এযাবৎ সবচেয়ে কষ্টকর দিন গেছে। ক্রমাগত রাঢ়-বাংলার সেই দিগন্তবিস্তৃত অসমতল ধূ-ধূ শূন্যতা এসে গ্রাস করেছে—যার প্রান্তে একটি নিঃসঙ্গ শিমুল লাল ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিষিদ্ধ স্বর্গীয় বৃক্ষের মতো—আদিপাপের এক নিঃশব্দ সাক্ষী। নিঃশব্দ, কিন্তু ভয়ঙ্কর। নরকপাত্ত স্বয়ং।

গোরাচাঁদ রোডের এই শিমুল গাছটা আমার বাড়িওলা বলেছেন, শিগগির কেটে সেখানে একটা বাড়ি বানাবেন। তার ওপরতলার ফ্ল্যাটটা চাইলে আমাকেই তিনি দেবেন। তাঁর মতে, আমি তখন ‘প্রিন্সের মতো’ বাস করব।

তমালের বাবা মারা গেছে।

খবরটা যেন একমুঠো গরম সীসের মত ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলো কেউ। ওরা প্রত্যেকেই আহত হোল, সঙ্কুচিত হোল, ভেতরে ভেতরে প্রত্যেকেই ভীষণ অসহায় আর ফাঁকা অনুভব করলো। অথচ সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই, প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠা আবার সন্ধ্যেবেলা অস্ত যাওয়া বা নদীর জলের [illegible] জায়গায় বসে না থাকা কিংবা অন্যান্য সব ব্যাপারের মতই মৃত্যুও খুব স্বাভাবিক সহজ ব্যাপার, বরং কোন মানুষের দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক। তবু খবরটা ওদের মনে ভীষণভাবে নাড়া দিলো। অনুপ ঘাড় নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এত খারাপ লাগছে। ওরা কোন উত্তর দিলো না। বেলাশেষের চাঁপা রঙের নরম রোদ কিছুক্ষণ ওদের চোখে মুখে খেলে বেড়ালো, ওরা চুপচাপ সেই লোকটির কথা চিন্তা করতে লাগলো, একজন অকাল-বৃদ্ধ, সংসারের ভারে নুয়ে পড়া মানুষ, তমালের বাবা, যাঁকে দেখলে তারা প্রত্যেকেই '...কেমন আছেন মেসোমশাই' বলে খবর নিতো, মুখে সিগারেট থাকলে আঙুলের কোণে লুকিয়ে ফেলতো এবং সম্প্রতি তাঁর যে মাথার গোলমাল দেখা গেছিল, যখন তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, ও তাদের দেখলে নীচু গলায় বলতেন, তমালের খবর পেয়েছি বুঝলে, ও এখন অনেক টাকা [illegible], একটু থেমে ফিসফিসিয়ে বলতেন, [illegible] বলেছে শিগ্গির ও এলে আমি জানো একটু বড় খাট কিনবো, মশারীও, একটু ঘুমোতে পারি না ভাল করে। এত অসহায় আর করুণ তাঁর সংলাপ, অনেকদিন নিরুদ্দেশ হওয়া তমালের জন্যে অধীর অপেক্ষা তাদের বুকে যেন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতো, ওদের এত কষ্ট হোত, ওরা তাঁকে সযত্নে সহানুভূতিভরে বাড়ী পৌঁছে দিতো।

এখন অবশ্য ওদের এটা উপলব্ধি হয়েছে যে সংসারে তমালের বাবার প্রয়োজন অনেক-দিন ফুরিয়েছে। বিশেষত অসুস্থ অপ্রকৃতস্থ লোকটাকে দিনের পর দিন চোখের সামনে চিকিৎসাহীন অবস্থায় দেখে যাওয়া যে কত বড় দুঃসহ জ্বালা তা তমালদের বাড়ীর লোকও যেমন জানে, ওরা মানে তমালের বন্ধুরাও জানে।

তবু এটা এক আশ্চর্য দুঃখ বয়ে এনেছে তাদের কাছে, সেই সুন্দর সবুজ ছেলেবেলার পবিত্র দিনগুলোয় তমালের বাবা কতদিন যে তাদের আদর করেছেন, তার হিসাব তারা রাখেনি। কিন্তু শত অভাব

অনটনেও তার মুখের তৃপ্তির হাসিটি যা শুকনো পাতার বুকে একরাশ ঝলমলে রোদ্দুরের মত খেলে বেড়াতো, ক'দিনেই তা হারিয়ে গেল চাকরি যাবার পর। তখন ওরা একটু বড় হয়েছে।

একদিন তমাল এসে বিরক্তমুখে বললো, বাড়ীতে থাকতে আজকাল এত বিশ্রী লাগে, বাবা সবসময় এমন খিটখিট করে। অবশ্য...ওদের বিস্মিত সরল মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে শীর্ণ হেসেছিল তমাল, বাবার দোষ দিই না রে, কোথাও একটা মাসমাইনের ধরাবাঁধা চাকরি পেলেই আমরা নিশ্চিন্ত, এইভাবে রোজ জমি-বাড়ীর দালালী আর...

ওরা কেমন চমকে উঠেছিল। ওরা তখন ছাত্র। ওপর থেকে দেখা না গেলেও মনে ওরা সবাই এক একটা রঙীন কাচওয়ালা চশমা পরে বসে আছে। তখনও ওরা অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর একটুকরো শিশুর হাসির মত সোনালী রোদ দেখলে উচ্ছ্বসিত হয়, হঠাৎ ঘুম ভেঙে বৃষ্টি শব্দ শুনলে মনে হয় অনেকদূরে ওদের জন্য কেউ বোধহয় অপেক্ষা করে আছে...আকাশে নীল মেঘ দেখে কিংবা বুনোফুলের গন্ধ নাকে এলে তখনও ওদের মনে বেলাশেষের উদাসী হাওয়া বইতে থাকে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটা কথা তখনও ওদের মনে আঘাত করে...তাই মেসোমশাই-এর মত একজন ভাল লোক দালাল এটা ভাবতে ওদের নিজেদেরই খুব কষ্ট লেগেছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে তমাল তখন অনেক সচেতন, তাই ও খুব সহজ স্বাভাবিক সুরে বলেছিল, আসল কথাটা হচ্ছে বাঁচা, বাঁচতে গেলে যে কোন কাজ করা আমাদের কর্তব্য...অন্তত আমি তো করবো...

ওরা কোন কথা বলেনি। ওদের ফুলের মত মনে সে কথাগুলো হাল্কা আঁচড় কেটেছিল, কীট হয়ে প্রবেশ করেনি। সেই তমাল জীবনে পরাজয় স্বীকার করবে না বলে কোথায় যে চলে গেল!

এখন সময় গড়িয়ে অনেক লম্বা হয়ে গেছে, এখন ওরাও জীবনের মর্ম উপলব্ধি করতে শিখেছে। সমর মৃদুস্বরে বললো, এখন তমাল যদি অন্তত থাকতো...!

থাকলেই বা কি, এতদিনে ও কি চাকরি পেতো, অনুপ ঝাঁঝালো বিষাদে কথাগুলো বললো।

তমালের বাবার এই মৃত্যুসংবাদটা ওদের সবাইকেই যেন এক একটা ফাঁকা মস্ত মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলো, যে মাঠটা কেবল ধূ-ধূ করা হতাশার বালির মরুভূমি, যার হাওয়া যেন গরম হাপরের মত বইছে। যেখানে কোনদিন মাটি ফুঁড়ে বেরোবে না ভালবাসার মিষ্টি জল, ফুটবে না আশার কোমল ফুল, ঝরবে না আনন্দের ঝিরঝিরে বৃষ্টি। একটা অদ্ভুত বেদনাময় অনুভূতি ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে তিলক বললো, আমি আজ চলি রে। তখন সূর্য ডুবে গেছে। সারা আকাশটায় যেন লাল-কমলা-হলদে-গোলাপী আলোর ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে। পড়ন্ত সেই আলোয় ওদের এত বিষণ্ণ আর করুণ লাগছে।

উৎপল ম্লান হেসে বললো, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নাকি! তিলক মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হঠাৎ ছুটে আসা এই সংবাদটা তাকে যেন তীরের মত বিঁধেছে, সবার মধ্যে এই খবরটা তাকেই যেন আহত করেছে সবচেয়ে বেশী।

তিলক এখনও রাত জেগে বৃষ্টির শব্দ শোনে, আকাশের তারা গুনতে ভালবাসে, শেওলা রঙের অন্ধকারে সে এখনও দেশলাই-এর আলো জেলে শর্মির মুখ দেখে আনন্দ পায়। তার এই অদ্ভুত খেয়ালে শর্মি আগে মজা পেতো, ঝর্ণার মত উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ে বলতো, পাগল ছেলে।

কিন্তু তাতে তিলকের পাগলামিতে একটুও ভাঁটা পড়তো না বরং সিগারেট কম কিনে সে মোমের কাঠির দেশলাই কিনতো--যাতে অনেকক্ষণ কাঠি জেলে সে শর্মির মুখ দেখতে পায়। আলোটা একটা ছোট্ট ভীরু পাখীর মত শর্মির মুখ-ঘাড়-গলার আনাচে-কানাচে নেচে বেড়ায়, তিলকের তখন এত ভাল লাগে! ইদানীং অবশ্য শর্মির ঠোঁটের ফাঁকে আর কাঠগোলাপের কুঁড়ির মালা ঝিলমিলিয়ে ওঠে না, বরং ম্লানভাবে বলে, এমন করে কি সারাজীবন কেটে যাবে তিলক।

তিলক তখন এত দুঃখ পায়, কাঁপা হাতে দেশলাই-এর কাঠি নিভে যায়, ব্যথিত সুরে বলে সে, আমি তো প্রাণপণে চেষ্টা করছি।

নিরুত্তর শর্মির সামনে তিলক আর দেশলাই জ্বালে না, অন্ধকারে তার সিগারেট ছোট্ট চুনীর মত জ্বলে, শর্মির ভারী দীর্ঘশ্বাসের পাশে সে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না, উঠে পড়ে। এমন কতবার।

আর আজ এই এখন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে, এখনও সে উঠে দাঁড়ালো। দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সোজা হয়ে আড়মোড়া ভাঙলো সে। আজ তার এক জায়গায় যেতে হবে। তবে ওরা অনুমান করছে শর্মির সঙ্গে তার দেখা করার কথা তা নয়। শর্মির সঙ্গে আজকাল সে বেশী দেখা করে না, দুজনের দীর্ঘশ্বাসে বাতাসটা এত শিগ্গির ভারী হয়ে যায়, তিলক খুব অস্বস্তি বোধ করে। হাত দিয়ে কপালের ওপরের চুলগুলো সরালো তিলক, পাতলা অন্ধকারে পর পর বসে থাকা অনুপ, সমর, উৎপল, সন্দীপদের কেমন জলছবির মত লাগছে, কেমন পাণ্ডুর আর নিষ্প্রভ। খুব দুঃখ লাগলো তার। ওদের একেই মন খারাপ তার ওপর আবার এই হঠাৎ ছুটে আসা মৃত্যুসংবাদটা যেন ওদের পাথর করে দিয়েছে। যেন কোন জীয়ন কাঠির স্পর্শেই ওরা জাগবে না। দাঁত দিয়ে একবার ঠোঁট চাপলো তিলক, তারপর অল্প একটু হাত নেড়ে এগিয়ে গেল।

বাবার মুখটা দিন দিন এত শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, বাড়ীর সবাই যেন কেমন লুকিয়ে পড়ছে শুধু নিজের কাছে, তাছাড়া শর্মির কথাটা ভাবাও...গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেললো তিলক। আজ আবার বাবার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। চলতে চলতে ভাবলো তিলক, আজকাল সে আগের চেয়ে অনেক প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছে। এই যে এখন ও ওদের কাছে বললো না কোথায় যাচ্ছে, এটাও তো এক ধরনের স্বার্থপরতা ছাড়া কিছু নয়। যদি সে বলতো, যাচ্ছিরে এক জায়গায় চাকরির জন্য তেল লাগাতে, ওরা জিজ্ঞেস কোরতো কে, কোথায়, তখন অবশ্য তিলক কিছু বলতে পারতো না। কারণ কার কাছে সে যাচ্ছে তা সেও এখন জানে না। কিন্তু জানি না বললে ওরা মুখে অবশ্য কিছু বলবে না, মনে মনে ভাববে যে সে জানলেও বলছে না। কষ্ট পাবে ওরা, সেটা তিলকের কাছে আরও বেশী দুঃখের।

ভাবতে ভাবতেই তিলক তাদের বাড়ীর আলো দেখতে পেলো, একটু এগোতেই তার বোন টিনা অধীরভাবে এগিয়ে এসে বোললো, এই দাদা শিগ্গির চল, বাবা কখন থেকে তোর জন্য বসে আছে।

বাড়ী ঢুকতে বাবা বললেন, হাতমুখ ধুয়ে একটু জলটল খেয়ে বিশ্রাম করে নে... তারপর বেরোনো যাবে।

ইস, সারাদিন অফিসে কাজ করে বাবাকে কি শ্রান্ত আর বিষণ্ণ লাগছে, চিন্তাগুলো যেন কালো পাউডারের মত আটকে রয়েছে বাবার সারা মুখে। দীর্ঘশ্বাস ফেললো তিলক, শুধু তাদের কথা চিন্তা করেই বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কতদিন লুকিয়ে দেখেছে তিলক সবচেয়ে ছোট্ট মাছটা যেটা তেলসর্বস্ব বা একটুখানি তরকারী দিয়ে বাবা ভাত খাচ্ছেন। আর মায়ের তো কতদিন ভাল করে খাওয়াই হয় না...অথচ ভাল যেটুকু থাকে তার, শান্তনু আর টিনার জন্য। তার এত কষ্ট হয় সবার জন্য, সে মনে মনে ভাবে যদি কোনদিন সে চাকরি পায়, সংসার হয়, বাড়ীর সবাইকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

এই যে এখন বাবার সঙ্গে দীনহীনের মত গিয়ে হাজির হতে হবে কারও দরবারে, অথচ কাজ যে কিছুই হবে না তিলক ভাল করেই জানে। যত সব মামুলী প্রশ্নের তীর ছুঁড়বে তার দিকে, অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট না অনার্স ছিল--টাইপ জানো--সর্ট হ্যান্ড--তার পর সেই পুরনো লেকচার এক একসময় মনে হয় যেন গায়ে ছুঁচ ফুটছে। তবু বাবার দিকে একবার তাকালো তিলক, দেখাই যাক একবার। বাবার মুখের ওপর কথা বলতে ভাল লাগে না তিলকের, আর হবেই বা কী, এখন তো তারা মনে মনে নির্বিকার গাছ হয়ে গেছে। বেরোবার মুখে মাকে হঠাৎ খুপ

হয়ে একটা প্রণাম কোরলো তিলক। মা শীর্ণ হাসলেন, তিলক মনে মনে বললো, আশীর্বাদ করো মা যেন হাসিমুখে ফিরতে পারি।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর তিলকের মনে হতে লাগলো বুকের মধ্যে যেন একরাশ দমকা বাতাস ছুটোছুটি করছে। গলার কাছটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার পাশের বাল্বগুলো থেকে করমচা রঙের আলো ছিটকে এসে কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে চারদিক। আবছা অন্ধকারে বাবাকে কেমন বাঁকা লাঠির মত লাগছে। অথচ আগে কি চটপটে ছিলেন বাবা, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর আবার ওভারটাইম করতে যেতেই...ঢোক গিলে বললো সে, বাবা আমরা কি জ্যোতির্ময়বাবুর বাড়ী যাচ্ছি!

হ্যাঁ তার বাবা একবার পিছন ফিরে বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকালেন। তিলক আর কিছু বললো না। জ্যোতির্ময়বাবু একজন শাঁসালো লোক, লোক ঠকিয়ে, চুরি করে, বেনামীতে কত টাকা যে তিনি করেছেন সরকারী খাতায় তার হিসাব নেই।

খুব সম্প্রতি একটা কিসের যেন কারখানা তিনি কিনেছেন। কারখানাটা আগের মালিক অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জ্যোতির্ময়বাবু সেটা কিনে নিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে সেই পুরনো কারখানায় কিছু নতুন লোক নেওয়া হবে। লোকটার মিটমিটে হাসি আর কুতকুতে চোখ দেখলে কেমন যেন মনে হয়, তিলকের পা আটকে আসছিলো, কিন্তু তবু বাবাকে সে এতদূর এসে মুখ ফুটে বলতে পারলো না, আমি যাবো না।

মুখ নীচু করে সে বাবার সঙ্গে ঝকঝকে গর্বিতভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা স্ফটিকের মত বাড়ীটায় ঢুকলো।

জ্যোতির্ময়বাবুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো তিলক, টাকা হয়ে লোকটার গা যেন মাছের আঁশের মত চকচক করছে।

তারা তখন ঘরটায় ঢুকলো মনে হোল যেন হাজার পাওয়ারওয়ালা ঝলমলে আলোর সামনে একটা চিমনীতে কালি মাখা লণ্ঠন কেউ বসিয়ে দিলো। এত বিশ্রী লাগছিলো তার, তবু মুখটা যথাসম্ভব গদগদ করে রাখতে হোল তাকে। ঘরে একাই বসে ছিলেন তিনি, খুব সুন্দর একটা ধূপের গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে, খুব দামী ধূপ নিশ্চয়ই, তিলক ভাবলো, ঝকঝকে দেওয়ালে শাদা মসৃণ আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে, একটা খুব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি টাঙানো রয়েছে। বাবা এগিয়ে গিয়ে কি যেন বলতে জ্যোতির্ময়বাবু ইসারা করে ডাকলেন তিলককে।

তিলকের মনে হোল যেন বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কেউ, এই লোকটার কাছে যে চাকরির জন্য খোসামোদ করতে আসতে হবে সে কোনদিন ভাবেনি...তাও আবার একটা বন্ধ কারখানার চাকরি। এ যেন বন্যার জলে ভেসে যাওয়া কোন বাড়ীর চালা, যেটা আশ্রয় করেই বাঁচতে চাইছে আবার কয়েকজন ডুবন্ত মানুষ। মনে মনে ভীষণ অসহায় বোধ করছিল সে। দুঃখ, রাগ, বিরক্তি সব মিশিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিলো তার মনে।

তিলক তাকিয়ে দেখলো মস্ত ঘরটার অতগুলো ফাঁকা সোফা চেয়ার রয়েছে, অথচ উনি একবারও বাবাকে বসতে বললেন না। চারদিকে আধুনিক ফ্লুরোসেন্ট টিউবের আলো ঝলমল পার্কে যেন একটা পুরোন আমলের জীর্ণ গ্যাসবাতির মত তার বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন। আর কেমন মিনতি করার মত সুরে তাকে বললেন, খোকা যাও!

জ্যোতির্ময়বাবুর চোখ দুটো যেন সার্চলাইটের মত তিলককে দেখছিলো। তার মনে হচ্ছিল ঐ চোখ দুটো যেন তাকে শুধু ওপর থেকে জরিপ করছে না, একেবারে কবরের মত খুঁজে দেখছে তার অন্তস্তল, মনের সব কিছু।

দাঁতে দাঁত চেপে সে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু প্রশ্নের জবাবগুলো দিয়ে গেল কলের দম দেওয়া পুতুলের মত।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ সারা ঘরটা নীরব রইলো। যেন হাতের নাড়ী চলার শব্দও শোনা যায়। তিলকের বাবার মুখটা ডাঙায় তোলা মরা মাছের মত লাগছিলো। তিলক বারবার ঢোক গিলছিলো। দেওয়াল ঘড়িতে ঢং করে আটটা বাজলো।

সারা ঘরে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া নিঃশ্বাসের নীরবতা ভেঙে চমক লাগলো তিলকের, সবিস্ময়ে সে দেখলো জ্যোতির্ময়বাবু তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলছেন, হবে তোমার চাকরি।

পরদিন খবরটা শুনে সমর, উৎপল, অনুপ, সন্দীপ ওরা কেমন ভয়ানক অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তিলকের দিকে। যেন আচমকা অন্য গ্রহের অজানা অচেনা কেউ ছিটকে এসেছে তাদের সামনে। তিলক খুব অস্বস্তি বোধ করছিলো। ওর মনে হোল যেন ওদের সঙ্গে এই চারপাশের মিথ্যেলো বেলাশেষের ম্লান আলো, নিমগাছের কচি পাতা, এমন কি যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেই মুক জায়গাটাও সরব চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ উৎপল বললো, রাজকন্যা তো আগেই পেয়েছিস, এবার রাজ্য জয় করলি—হাসকামরে বলার চেষ্টা করলেও কথাগুলোর সঙ্গে একটা গাঢ় বুকছেঁড়া দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

রাজকন্যা নয়, ঘুঁটেকুড়ুনী বল, তিলক হেসে বলতে গেল, কিন্তু তার সব হাসি আনন্দ উচ্ছলতা যেন জমাট বাঁধা কফের মত আটকে গেল গলায়।

ওরা চুপ করে বসে রইলো কেমন সার-বাঁধা মৃত গাছের কংকালের মত পত্রপল্লব-হীন। আর একমাত্র তিলকই যেন পাতায় ভরা জ্যান্ত গাছ, যাতে হাওয়ার ঝাপ্টা এসে আলোড়ন তুলছে।

সমর বললো, তোকে আমরা কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি। সমরের গলাটা কি একটু কেঁপে গেল?

তিলকের খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তার মনে হোল, এ যেন তার চাকরি পাওয়া নয়, অকথ্য বুকভাঙা কোনো দুঃসংবাদ। যেন কারো [illegible] লোকের অনুকম্পা [illegible] অত্যাচার করার মত [illegible] কিন্তু মুক্তির কারণটা কিছুতেই বলা যায় না।

হতাশভাবে চারদিকে তাকিয়ে তিলকের মনে হোল সে যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, [illegible] বন্ধুদের থেকে। হঠাৎ কেমন [illegible] দুর্বিষহ [illegible] তিলক আর [illegible] হঠাৎ বলে উঠলো, আমাকে একটা সিগারেট খাওয়াবি!

গুডি সাহেব তাঁর 'মিউনিসিপ্যাল কলকাটা' গ্রন্থে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে লেখেন—

> .."the financial position of the corporation is therefore particularly strong .. ..'

এই প্রসঙ্গে জানা যায় যে, ১৯১৩-১৪ খৃঃ কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব খাতে মোট আয় ছিল ১,০৪,৪৯,২৭৫ টাকা আর মোট ব্যয় ছিল ১,০৩,৩১,২৯৮ টাকা। সেই বছরের শেষে প্রারম্ভিক তহবিল সমেত পৌরসংস্থার রাজস্ব খাতে ২০,২৮,৭৪২ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। বৎসরের শেষে ২০ লক্ষ টাকার তহবিল তখনকার দিনে সত্যই জোরালো আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিতবহ।

কলকাতা পৌরসংস্থার আজকের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে উপরি উক্ত বিবরণী দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। গত কয়েক বৎসর ধরে পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা এই পর্যায়ে এসেছে যে, ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, কলকাতা পৌরসংস্থা কি করে চলছে। ১৭২৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা দিনের পর দিন আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ল কেন? সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই।

কলকাতা পৌরসংস্থার আয় ও ব্যয়ের গতি :

রাজস্ব খাতে

খৃষ্টাব্দ	আয় টাকা	ব্যয় টাকা
১৯০৯-১০	৮৩,৬৬,০০০	৭৫,৭০,০০০
১৯১৯-২০	১,৪০,৯০,৯৫০	১,৫১,৬২,৫৪৬
১৯২৯-৩০	২,৩৭,০৭,৬০৭	২,০১,২৩,২৪৮
১৯৩৯-৪০	২,৫২,৭৬,৫৩৩	২,৪৭,৯৬,৯৩৭
১৯৪৯-৫০	৪,৮১,৫৫,৬০৬	৪,৬৮,৮৩,৮৪৭
১৯৫৯-৬০	৭,৪০,৪৬,৯২৫	৭,৭০,৯৪,৭০০
১৯৬৯-৭০	১১,৯৪,৮৩,৫৮০	১০,৫৫,৮৯,০৩৫

তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থার আয় ও ব্যয় ঊর্ধ্বগতিতেই চলেছে। তারা গতিশূন্য নয়। কিন্তু এই গতি আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা রক্ষা করতে পারছে না। দেখা যাচ্ছে, ১৯১৯-২০ খৃঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর কলকাতা পৌরসংস্থার আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হয়েছিল। ১৯২১-২২ খৃঃ পর্যন্ত আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়েছিল। কারণ সম্ভবত প্রথম মহাযুদ্ধ। সাধারণতঃ যুদ্ধোত্তর কালে খানিকটা রাজস্ব আদায়ে অসুবিধা ঘটে এবং বিবিধ আশ্রয়স্থল নির্মাণকার্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকে। ১৯২২-২৩ খৃঃ থেকে আবার পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা ছিল উন্নতির পথে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার দাবী তোলেন। কিন্তু পৌরসংস্থার মহার্ঘ ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় বহন করবার ক্ষমতা ছিল না। পৌরসংস্থা সেজন্য বারবার সরকারের কাছে এই ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত অর্থের জন্য দাবী পেশ করেন। অবশেষে সরকার কলকাতা নগর উন্নয়ন সংস্থার (সি আই টি) তদানীন্তন সভাপতি সি ডবলু গার্ণারকে কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে পাঠান। গার্ণার পরীক্ষার পর সরকারকে রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, মহার্ঘ ভাতার মোট ব্যয়ের ৮০ অংশ সরকারকে সাহায্য হিসাবে পৌরসংস্থাকে দিতে হবে এবং পৌরসংস্থা তার নিজ তহবিল থেকে শতকরা ২০ ভাগ বহন করবে। এই প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বহাল আছে।

তারপর তদানীন্তন মেয়রের ৬ অকটোবর ১৯৪৭ খৃঃ রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার ১৯৪৮ খৃঃ মার্চ মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসনভার গ্রহণ করেন। এরপর ১৫ এপ্রিল ১৯৪৮ খৃঃ কলকাতা পৌরসংস্থা অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই অনুসন্ধান কমিশনকে কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা ও পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তার উন্নতির জন্য সুপারিশ রাখতে অনুরোধ জানান হয়েছিল। এই অনুসন্ধান কমিশনের সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস। এই কমিশন ৩১ জানুয়ারী ১৯৫০ খৃঃ কলকাতা পৌরসংস্থা পরিচালন ব্যাপারে মূল্যবান সুপারিশ করেন। কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক অসঙ্গতি দূর করবার জন্যও ছিল বিভিন্ন সুপারিশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তৃত্বে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিচালনভার ছিল ৩০ এপ্রিল ১৯৫২ খৃঃ পর্যন্ত। বিশ্বাস কমিশনের রিপোর্ট ও সরকারী প্রশাসকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯২৩ খৃঃ কলকাতা পৌর আইন নতুনভাবে সংস্কার করে ১ মে ১৯৫২ খৃঃ কলকাতা পৌর আইন ১৯৫১ খৃঃ প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই নতুন পৌর আইন পৌরসংস্থা পরিচালন ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী

হয়নি। এই আইনের কিছু কিছু নতুন ধারা পৌরসংস্থা পরিচালন ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি করে। পরিচালনাতে স্বচ্ছন্দ গতি আনতে পারেনি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯৫১ খৃঃ পৌর আইনের বেশ কিছু ধারা কলকাতা পৌরসংস্থার স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায়। সেইজন্য বেশ-কিছুদিন যাবৎ নতুন পৌর আইন প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে।

১ মে ১৯৫২ খৃঃ থেকে ১৯৫১ খৃঃ-র পৌর আইন অনুযায়ী, কলকাতা পৌরসংস্থার পরিচালনভার আবার জনপ্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হয়। নতুন আইনেও কলকাতা পৌরসংস্থার আয়ের ব্যবস্থা সুগম হয়নি। ফলে জনপ্রতিনিধিরা অল্প কিছুকালের মধ্যেই উপলব্ধি করেন যে, আয়ের ব্যবস্থার উন্নতি না করলে ঊর্ধ্বমুখী ব্যয়ভার নিয়ে পৌরসংস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। আনুমানিক ১৯৫৯-৬০ খৃঃ থেকেই পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতির পথে যেতে থাকে।

১৯৭০-৭১ খৃঃ কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব খাতে প্রধান প্রধান আয় ও ব্যয় নিম্নরূপে ঃ

রাজস্ব খাতে
১৯৭০-৭১

	আয় টাকা	মোট আয়ের শতাংশ
বাড়ীর ট্যাক্স	৬৮৪·৭১ লাখ	৪৪%
লাইসেন্স বিভাগের আয়	৭৫·৮২ "	৫%
ভারত সরকার থেকে ঋণ	২৯২·০০ "	১৯%
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য (প্রধানতঃ মহার্ঘ ভাতার জন্য)	২২১·০৭ "	১৪%
রাস্তা এবং বস্তীর কাজের জন্য সি এম ডি এ থেকে সাহায্য	১০০·০০ "	৬%
অন্যান্য খাতে	১৬৯·৭৬ "	১২%
মোট আয়	১৫৪৩·৩৬ "	১০০%

	ব্যয় টাকা	মোট ব্যয়ের শতাংশ
জঞ্জাল সাফাই	৩৫৩·৪৫ লাখ	২৪%
জল সরবরাহ	২৫৭·৬০ "	১৭%
পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন	৮২·৯৭ "	৬%
রাস্তা মেরামতি	৬৯·৭২ "	৪%
আলো	৭৪·৫০ "	৫%
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী	১১০·৩১ "	৭%
প্রাথমিক শিক্ষা	৭৫·৮০ "	৫%
ঋণ পরিশোধ বাবদ	৭৫·৭৩ "	৫%
সাধারণ প্রশাসন খাতে	২২০·৯২ "	১৫%
বিবিধ	১৬৫·৪৬ "	১২%
মোট ব্যয় ...	১৪৭৮·৪৬ "	১০০%

আপাতঃদৃষ্টিতে ১৯৭০-৭১ খৃঃ রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত দেখলেও বাস্তবিক কিন্তু তা হয়নি। কারণ ঐ বছরের মোট আয় থেকে ভারত সরকার থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকা, সি এম ডি এ থেকে প্রাপ্ত টাকা (এই দুটি আরও স্বাভাবিক আয় না), আনুষঙ্গিক ঘাটতি তহবিল এবং কলকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে দেয় ৬০ লক্ষ টাকা (যা অর্থের অভাব দরুন দেওয়া সম্ভব হয়নি) বাদ দিলে দেখা যাবে ১৯৭০-৭১ খৃঃ শেষে কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব খাতে প্রায় ৭৫৯ ৭৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হয়েছিল।

কলকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে শুধু ১৯৭০-৭১ খৃঃ নয়, কয়েক বৎসর যাবৎ কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে কিছুই সাহায্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যদিও কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার আইনে আছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থা প্রতি বৎসর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থাকে কলকাতার করযোগ্য সম্পত্তির মূল্যায়নের ২ শতাংশ সাহায্য হিসাবে দেবে। আইনের এই ধারাটি দ্বারা কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতি সম্পূর্ণ অবিচার করা হয়েছে এবং কলকাতা পৌরসংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট বৎসরের পর বৎসর সুবিচার প্রার্থনা করে আজ পর্যন্ত সুবিচার পায়নি। অবিচারের কারণ, কলকাতা শহরের ক্রমোন্নতি হেতু কলকাতা শহরের বাৎসরিক মূল্যায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বর্ধিত মূল্যায়নের উপর কলকাতা পৌরসংস্থাকে ২ শতাংশ সাহায্য দিতে হবে। ফলে সাহায্যের পরিমাণ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শহরের দ্রুত উন্নতির জন্য কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে কম কাজ করে বেশী সাহায্য দানের প্রশ্ন এসে পড়ছে। সেইজন্য বিশ্বাস কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে, এই বাবদ বৎসরে ২০ লক্ষ টাকার বেশী দেওয়া সমীচিন নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেননি।

উপরি উপরি কয়েক বৎসর রাজস্ব খাতে ঘাটতির দরুন কলকাতা পৌরসংস্থা যেখানে যা সঞ্চিত ছিল, তা ব্যয় করে সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য। নীতিগতভাবে আজকের আর্থিক পরিস্থিতিতে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে কোনওরূপ উন্নতিমূলক, এমনকি ব্যয় সাপেক্ষ সাধারণ কাজ করাও সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনবোধে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের জন্য ঋণ তহবিলও আজ নিঃশেষিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব জানা সত্ত্বেও কলকাতা পৌরসংস্থার আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেননি। বহু শলা-পরামর্শের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরের দিকে বাড়ীর কর বৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। যার ফলে বাড়ীর কর উপরের দিকে শতকরা ২৩ থেকে শতকরা ২৭ ও ৩০ ভাগ করা হয় এবং পরের বছর করা হয় ২৭ ও ৩৩ ভাগ। বস্তী বাড়ীগুলির কর কমিয়ে শতকরা ১৫ ও ১৮ ভাগ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, পৌর আইনে শতকরা ৩৩ ভাগ বাড়ীর করই ঊর্ধ্বতন সীমা। এই কর বৃদ্ধির ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার বাৎসরিক আয় প্রায় ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং মহার্ঘ ভাতার পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধির ফলে ১৯৬৭-৬৮ খৃঃ থেকে সবরকম চেষ্টা করেও কলকাতা পৌরসংস্থার হিসাবের ঘাটতি রক্ষা করা গেল না। কলকাতা পৌর আইনের ১২৭(৪)(খ) ধারায় আছে যে, খরচ-খরচা বাদে প্রতি বৎসরের শেষে কলকাতা পৌরসংস্থাকে ১২ লক্ষ টাকা রাখতে হবে রাজস্ব খাতের তহবিলে। ১৯৬৭-৬৮ খৃঃ থেকে বছরের পর বছর রাজস্ব খাতে ঘাটতি বৃদ্ধির দরুন পৌর আইনের এই ধারা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অজানা ছিল না। কারণ আইন অনুযায়ী পৌরসংস্থার বাজেটের এবং হিসাবপত্রের সকল কাগজপত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রেরণ করতে হয়।

সহজেই বোঝা যায় যে, এই পরিস্থিতি একদিনে হয় নি। বিবিধ কারণে কলকাতা পৌরসংস্থাকে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যুদ্ধভীতিহেতু নগরবাসীর নগর ত্যাগ, সেইহেতু রাজস্ব খাতে আদায়ের ঘাটতি এবং জনস্বার্থ রক্ষার্থে অনপেক্ষিত ব্যয়। যুদ্ধোত্তর দিনে ক্রমশ মূল্যবৃদ্ধি, দেশ বিভাগের জন্য সহস্র সহস্র গৃহহারা মানুষের কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—যা মাঝে মাঝে শহর জীবন স্তব্ধ করে দিয়েছিল। শেষে ১৯৫৩ খৃঃ টালিগঞ্জ পৌর সমিতির

কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত। এই সবেরই নীট ফলাফল হল নতুন আয়ের ব্যবস্থা না হয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

এইভাবে ব্যয়ের বোঝা যখন দিনের-পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে আয় বৃদ্ধির বিবিধ প্রস্তাব সরকারের কাছে বৎসরের পর বৎসর পেশ করা হতে থাকে। জন-প্রতিনিধিরা আশা করেছিলেন সেই সব প্রস্তাবে আমাদের নিজেদের সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন লাভ সম্ভব হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি বলে কলকাতা পৌরসংস্থা দ্রুতগতিতে আর্থিক অভাবের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে কলকাতা পৌরসংস্থা আয় বৃদ্ধির যে সব প্রস্তাব পেশ করেছিলেন সেগুলি উদ্ভট নয়। সেই প্রস্তাবগুলি রচিত হয়েছিল ভারতের অন্যান্য পৌর-সংস্থার চালু কর ব্যবস্থা অনুযায়ী। কলকাতা পৌরসংস্থার জনপ্রতিনিধিরা বার বার সরকারকে কেবল এই কথাই বলেছিলেন যে, ভারতের অন্যান্য পৌরসংস্থার ন্যায় কলকাতা পৌরসংস্থাকে আয় বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কোন কারণেই হোক এই সব অনুরোধ রাখতে পারেন নি।

বোম্বাই পৌরসংস্থা (৭০-৭১ খৃঃ)

১৯৭০-৭১ রাজস্ব খাতে

প্রারম্ভিক তহবিল		
	(+) টাকা	৩,৯৫,৩৬,৬৮৯
মোট আয়		৫২,০৪,৫১,৫২৪
		৫৫,৯৯,৮৬,২১৩
মোট ব্যয়		৫২,৫৭,৭৬,২৫০
তহবিল	(+)	৩,৪২,০৯,৯৬৩

দিল্লী পৌরসংস্থা (৭০-৭১ খৃঃ)

১৯৭০-৭১ রাজস্ব খাতে

প্রারম্ভিক তহবিল		
	(−) টাকা	১৮,৮০,৩৯৩
মোট আয়		২৯,৩১,৬৪,৪০০
		২৯,১২,৮৪,০০৭
মোট ব্যয়		২৯,০০,৫৬,২০০
তহবিল	(+)	১২,২৭,৮০৭

ভারতের বিভিন্ন পৌরসংস্থার কয়েকটি আয়ের অংক নীচে দেওয়া হল।

বোম্বাই (১৯৭০-৭১)

চুঙ্গীকর	টাকা ১৫,৩১,০৬,৪৯১
জল সরবরাহ কর	৯,৬৮,১৪,৯০৯
জঞ্জাল সাফাই	২,৪৫,৫৭,৭০০
চাকীকর	১,১৮,০৮,১২৩
অগ্নি নির্বাপণের জন্য কর	৫৩,০৯,৬০৮
প্রাথমিক শিক্ষা কর	১,৪৩,০৬,১৬৮
ঐ বাবদ সরকারী দান	৭২,০০,০০০

দিল্লী পৌরসভা (১৯৭০-৭১)

প্রান্তিককর	টাকা ৭,৭৭,৫৫,০০০
প্রমোদ কর	২,২২,০০,০০০
মোটর গাড়ীর উপর কর	১,৫৫,০০,০০০
বিজলী আলো ইত্যাদি ব্যবহারের কর	২,০৭,৮০,০০০
সম্পত্তি হস্তান্তরণ কর	৭৫,০০,০০০
প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী দান (বকেয়া সমেত)	৪,৬৫,০০,০০০

তা ছাড়া সম্পত্তি করের সঙ্গে অগ্নি নির্বাপণের জন্য কর আদায় করা হয়।

মাদ্রাজ পৌরসভা (১৯৬৯-৭০)

প্রমোদ কর	টাকা ২,২৫,০০,০০০
পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন কর	২,০০,০০,০০০
সম্পত্তি হস্তান্তরণ কর	৪৭,০০,০০০
কোম্পানীদের উপর কর	৮,০০,০০০
আলোর কর	৬০,০০,০০০
জল সরবরাহ কর	৯০,০০,০০০
বৃক্ষকাণ্ড কর	৪,০০,০০০

পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, এক চুঙ্গীকর থেকে বোম্বাই পৌরসভার রাজস্ব খাতে আয় কলকাতা পৌরসংস্থার প্রায় মোট আয়ের সমান। আর মোটর গাড়ী বাবদ দিল্লী পৌরসভার আয় প্রায় ১,৫০,০০,০০০। কলকাতা পৌরসভাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোটর গাড়ী কর বাবদ ক্ষতিপূরণ ৪,৫০,০০০, ও রাস্তা মেরামতের জন্য ৫,৫০,০০০, মোটর গাড়ী কর বাবদ সংগৃহীত অর্থ থেকে দিয়ে থাকেন। পৌর আইনের ১২৪ ধারায় লিখিত আছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বাৎসরিক অন্তত ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু সরকার এই দায়িত্ব পালনের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থাকে কোনও রকম অর্থ সাহায্য করেন না। এই ব্যাপারে বোম্বাই ও দিল্লী পৌরসংস্থার সাহায্য লক্ষ্য করবার বিষয়।

১৯৬৯-৭০ খৃঃ থেকে কলকাতা পৌর-সংস্থার আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। কলকাতা পৌরসংস্থার তদানীন্তন পৌরপ্রতিনিধিরা দিল্লীতে ছোটেন 'কলকাতা বাঁচাও'—এই আবেদন নিয়ে। অবশেষে ভারত সরকারের টনক নড়ল। ভারত সরকার কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক অচল অবস্থা দূর করবার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করতে সম্মত হন। এই নীতি স্থির করবার আগে ভারত সরকারের এক বিশেষজ্ঞ দল কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে খুঁটিয়ে দেখেন। এই বিশেষজ্ঞ দলের সকলেই একমত ছিলেন যে, ঋণের অর্থে কলকাতা পৌরসংস্থার সাময়িক অসুবিধা দূর হবে কিন্তু কলকাতা পৌর-সভাকে নিম্নতম মান অনুযায়ী কাজ চালাতে হলে নতুন আয়ের পথ করে দেওয়া দরকার। আয় বৃদ্ধি না করতে পারলে কলকাতা পৌর সংস্থাকে বাঁচান অসম্ভব। সরকারী এবং বেসরকারী মহলে একটি ধারণা আছে যে, কলকাতা পৌরসংস্থা তার কর্মচারীদের মাহিনা বাবদ অত্যধিক অর্থ ব্যয় করায় অন্যান্য খাতে ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত অর্থ রাখতে পারে না। এই বিশেষজ্ঞ দলের কিন্তু সেরূপ মত ছিল না।

যাই হোক কলকাতা পৌরসংস্থাকে নতুন আয়ের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার ঐ বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশক্রমে বৃহত্তর কলকাতায় পণ্য প্রবেশ কর (এনট্রি ট্যাক্স—চুঙ্গীকরের আর এক নাম) প্রবর্তন করা স্থির করেন। এই কর বৃহত্তর কলকাতায় আনুমানিক ১৯৭০ খৃঃ নভেম্বর মাস থেকে প্রচলিত হয়। কিন্তু ট্যাক্সেস অন এনট্রি অফ গুডস ইনটু ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন এরিয়া ১৯৭০ খৃঃ আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী কলকাতা পৌরসভাকে ঐ নতুন করের অংশ দেওয়া স্থির হয়।

কলকাতা পৌরসংস্থা সম্পর্কে জন-সাধারণের একটি বিরূপ ভাব আছে। কারণ সকলেরই ধারণা যে, এই সংস্থা ঠিক-মত সম্পত্তি কর, যা এই পৌরসভার একমাত্র বৃহৎ আয়ের পথ, আদায় করে না। সেইজন্যই কলকাতা পৌরসংস্থার এত অর্থাভাব। কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক কর অনাদায় নীতিকে সমর্থন করতে পারেন না।

ভারতের বৃহত্তম পৌর প্রতিষ্ঠান বোম্বাই পৌরসংস্থার অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে।

সম্পত্তি কর

১৯৭০-৭১

বোম্বাই পৌরসংস্থা—

		বর্তমান বৎসরের হিসাবে আদায়	বকেয়া আদায়
শহর অঞ্চল	শতকরা	৯০·৫০	১৯·৫৩
শহরতলী	"	৬২·৭৫	৪৬·১৮
বিস্তৃত শহরতলী	"	৫৬·২৫	৫১·৮২

কলকাতা পৌরসংস্থা—

শহর অঞ্চল	শতকরা	৮০·৪৮	২৩·০৬
টালিগঞ্জ	"	৫৮·২০	১৮·১৪

১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দের শেষে অনাদায়ী সম্পত্তি করের পরিমাণ নীচে দেওয়া হল :—

বোম্বাই পৌরসংস্থা

শহর	টাকা	৪,০৮,৮৮,৩৪১
শহরতলী	"	৫,৪৯,৫৫,৯৬১
বিস্তৃত শহরতলী	"	২,৬১,৫২,২৩৫
মোট অনাদায়ী	"	১২,১৯,৯৬,৫৩৭

কলকাতা পৌরসংস্থা

এসেসরের হাতে	টাকা	২,১৪,০০,০০০
কালেক্টরের হাতে	"	৩,৭৯,৯৩,০০০
টালিগঞ্জ বিভাগে	"	৯০,৪৮,০০০
আইন বিভাগে	"	১,৮০,৮০,০০০
সার্টিফিকেট সেকশনে	"	১০,০০,০০০
মোট অনাদায়ী	"	৮,৭৫,২১,০০০

সম্পত্তি কর আদায়ের ব্যাপারে বোম্বাই পৌরসভার পৌর আইন কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর আইনের তুলনায় খুবই সুবিধাজনক। তাছাড়া কলকাতা পৌরসংস্থার আদায়ের হারের নিম্নগতির কারণ হচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলা তথা কলকাতায় কয়েক বছর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক দুর্দশা। কয়েক বছর আগেও আদায়ের হার আরও ঊর্ধে ছিল।

যাই হোক যে উদ্দেশ্য নিয়ে পণ্য প্রবেশ কর প্রবর্তিত হয় (কলকাতা পৌরসংস্থাকে একটি নতুন আয়ের পথ দেওয়া) তা কিন্তু সফল হয়নি। বহুদিনের অবহেলিত কল্লোলিনী কলকাতার অবয়বে কালিমা দেখা গেল এবং চারদিক থেকে কলকাতাকে বাঁচাবার জন্য রব উঠল। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু বলেছিলেন ". If the whol. city went to pieces it would be a tremendous tragedy".

সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা থেকে কলকাতাকে রক্ষা করবার জন্য ভারতের বর্তমান জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ও নেহরু দুহিতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। নতুন নতুন সংস্থা তৈরি হল কলকাতার সামগ্রিক উন্নতির জন্য। কলকাতার সর্বাত্মক উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে স্থাপিত হল সি এম ডি এ। স্থির হয় আদায়ীকৃত নীট পণ্যপ্রবেশ করের অর্ধেক অংশ এই সংস্থা পাবে এবং বাকি অংশ বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন পৌরসংস্থাকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাপ্য অংশ থেকে তার রাজস্ব খাতে ঘাটতি মেটানো সম্ভব নয়। ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক বিপর্যয়ের সুরাহা সম্ভব হল না। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হোল অন্যান্য প্রদেশে চুঙ্গীকর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা পৌর সংস্থাদেরই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সরকার নিজেই সেই ভার গ্রহণ করেছেন।

এইখানে একটি কথা ভেবে দেখতে হবে। যখন অর্থাভাবে কলকাতা পৌর সংস্থার নাভিঃশ্বাস উঠেছে তখন সরকার সেই সংস্থাকে রক্ষা করবার চেষ্টা না করে কলকাতাকে বাঁচাতে একটার পর একটা নতুন সংস্থা স্থাপন করছেন। এইসব নতুন সংস্থা পরিচালনা করতে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার কিছুটা অংশে কলকাতা পৌরসংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হত। মূলতঃ কলকাতাকে মনোহারিণী শহররূপে রক্ষা করা কলকাতা পৌরসংস্থার প্রধান দায়িত্ব। প্রধানতঃ আর্থিক বিপর্যয় হেতু কলকাতা পৌরসংস্থা সেই দায়িত্ব পালনে আজ অপারগ। যে পৌরসংস্থা থেকে দেশবন্ধু, নেতাজী প্রভৃতি জনবরেণ্য নেতৃবৃন্দ বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা সরকারের নেই কেন? কিছুদিন পূর্বে ১৯৭১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে, তদানীন্তন মেয়র দিল্লীতে অর্থমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেছিলেন

"You take charge of your Baby who is gasping for want of proper nourishment'.

তা শুনে অর্থমন্ত্রী হেসে উঠে ২৫০ বৎসরের শিশুটিকে পুনরুজ্জীবিত করবার অঙ্গীকারও করেছিলেন।

তারপর শ্রীমতী গান্ধীর জনপ্রিয়তায় পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭২ খৃঃ মার্চ মাসের শেষের দিকে সরকার কলকাতা পৌরসংস্থার পরিচালনের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেছেন। সম্ভবতঃ সরকার এবার কলকাতা পৌরসংস্থার অর্থাভাব দূর করে কলকাতা পৌরসংস্থাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

বাইরের লোকেরা কলকাতাকে "সিটি অব নাইট মেয়ার" বলতে পারে। আমরা জানি ওটা নিন্দুকেদের কথা। কলকাতার জীবনের বন্যা কোনওদিন ব্যাহত হয় নি। কলকাতাকে আমরা ভালবাসি এবং আশা রাখি সরকারী প্রশাসনে কলকাতা পৌরসংস্থা আবার নব সজ্জায় সজ্জিত করতে পারবে শহরকে। কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা আবার পুনরুজ্জীবিত হবে এবং কবির কথায় আবার আমরা বলব :—

"কল্লির শহর কলকাতাটির পায়ে নমস্কার যার জাঁক জমকে ভাগীরথীর দুর্বার গুলজার।"

আমি তাকে ফেরাতে পারিনা ॥

শান্তনু দাস

পৃথিবীর শেষ গান শেষ হয়ে এলে
ভামিনী রাত্রির কোলে
মাথা রাখে
জীবন।

আমি তাকে ফেরাতে পারি না।
আমি কখনোই ফেরাতে পারি না আজ
তাকে,
বয়ে যায় জল,
দাঁড় বেয়ে সারারাত খেয়া পারাপার করে স্মৃতি।
স্মৃতি আজ হন্তারক,
নরম মাংসল-বুকে হাঁটু গেড়ে বসে
চিবুকে আঁকড়ে থাকে
থাবা।

আমি তাকে ফেরাতে পারি না ঃ
দিবস গড়িয়ে হয় রাত, দিন যায়,
ভামিনী রাত্রির কোলে মাথা রেখে
ঘুমোয়
জীবন।

বোধি নয় স্বতঃসিদ্ধ ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সূর্যকুঁড়ি অসম্পৃক্ত গাঢ় শ্যাম অরণ্যচূড়ায়
পীতাভ রক্তিম মনোবাসনা পল্লবে মৃদুস্বর
রাগলিপি অবচিত্র উচ্চাশার ঊষায় নিথর
অনুক্ত আশ্বাসবাণী সপ্রতিভ নেপথ্য ক্রীড়ায়।
অভীপ্সার অস্বস্তিতে কৃতবিদা জীবন কি চায়
নিরাসক্ত উচ্চারণ সুশোভন প্রজ্ঞায় প্রখর?
কিম্বা তৃপ্ত আত্মসুখ স্পর্শঘন অধরে অধর
নিপীড়ন? মন নয় সূর্যপ্রভ স্বনিষ্ঠ প্রজ্ঞায়।

লিপিসিদ্ধ গণেশের লেখনী নিশ্চল ব্যাসকাব্যে
ক্ষোভাতুর আপামর অরাজক দ্বান্দ্বিক বাসনা
সারস্বত সরোবরে মগ্নমন সৃজন সম্পুটে
অনাহূত উপাদান রীতি রস প্রযুক্তি ব্যঞ্জনা।
সূর্যকুঁড়ি পাপড়ি খোলে নৈসর্গিক নিশ্চেষ্ট উন্মেষে
বোধি নয় স্বতঃসিদ্ধ পথ খোঁজে সৃষ্টির নির্দেশে।

এখন ॥

বিশ্বনাথ ঘোষ

এখন মিত্ররা সবাই চলে যাচ্ছে দূরে—
মণিবন্ধের ঘড়ির ডায়ালে ঘুরে ঘুরে সখ্যতা ও ভালোবাসা
তোমার মুখের প্রতিটি ভাঁজ, জলরঙে আঁকা ডাকটিকিটের ছবি
হলুদ খামের মধ্যে চলে যাচ্ছে দ্যাখো, ডেড্-লেটার অফিসে;

এখন বড়োই দুঃসময়, ঈর্ষা জ্বলে যাচ্ছে রোদ্দুরে—
নদীগুলো আরো উদাসীনা এমনকি ওই দুঃখময় পাখিটি
যে রোজ গাছের ডালে বসে হাজার গান গাইতো
যে রোজ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে উড়ে বেড়াতো
যে রোজ মানুষের ঘরের মতো একটা ঘর ভাবতো

দুর্দিন এখন শ্মশানবন্ধুর মতো পড়ে আছো তুমি একলা
মিত্ররা চলে যাচ্ছে যে যার প্রত্যন্ত প্রদেশে, এবং
মণিবন্ধের ঘড়ির ডায়ালে ঘুরে ঘুরে সখ্যতা ও ভালোবাসা
তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছে দ্যাখো, বিশ্বাসহীন একটা বাড়িতে, নির্বাসনে

(ছয়)

বাড়ি ছাড়ার নোটিশ বসাক দেবার আগে বাবাই দিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী দেড় মাসের সময় নিয়ে। আমরা যখন বাড়ি ছাড়ছি, দিদি তখনো দেয়াল ধরে হাঁটে।

মাত্র চৌদ্দ দিন জ্বর ভোগ করেছে দিদি, তারপর একমাস কেটে গেছে, তবু এই অবস্থা।

যে শুনলো, বললো, 'এই অবস্থায় কী করে নিয়ে যাবে? মেয়ে তো হাঁটতে পারে না—'

বাবা বললেন, 'কোলের শিশুকে যে ভাবে নিয়ে যাওয়া হয়। সে-ও তো হাঁটতে পারে না।'

মা তো দিদির অসুখে খেটে খেটে আর কেঁদে কেঁদে এমন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে কিছুই পেরে উঠছিলেন না।

দিদির অসুখে মাকে কাঁদতে দেখে সত্যি বলতে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমনিতে যাকে যা দেখি আমরা সেই দেখাটা যে ঠিক দেখা নয়, সেই প্রথম অনুভব করেছিলাম।

জিনিসপত্র যখন ঠেলাতে তোলা হচ্ছে, মদন বসাক গুটি গুটি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে হাত কচলে বললো, 'আপনি মশাই এতো রাগী তা জানতাম না। সামান্য একটু কথান্তরের জন্যে—ইয়ে দুটো ঘটি-বাটি একত্র থাকলেও তো ঠোকাঠুকি হয়—'

বাবা যেন শুনতে পেলেন না। বললেন, 'একবার দোতলায় উঠে গিয়ে চোখ বুলিয়ে আসবেন, বাড়ির কোনো ক্ষতি-টতি হয়েছে কিনা—।

বসাক জিভ কাটলো।

'রাম বলো, একী বলছেন। আপনাদের মতন ভাড়াটে পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু আপনি যে চলে যাবেন, তা ভাবি নি।'

বাবা বললেন, 'চাবিটা রাখুন। ওর মধ্যে একটা তালা আমার ছিল, সে চাবিটা খুলে নিয়েছি।'

'দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান কুপিত হয়ে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন, এতে আমার অকল্যাণ হবে না? ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি।'

বাবা বললেন, 'কুপিত হবো কেন? আপনার বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হচ্ছিল, সেটা যাতে আর নাহয় সেইটুকুই দেখেছি।'

বেহায়া বুড়ো তবু বলে, 'দেখুন একটা কথার কথায় আপনি এতো চটে গেলেন। ওই অনড়রোগী কন্যাকে নিয়ে—'

বাবা বললেন, 'এখন খুব ব্যস্ত রয়েছি বসাকমশাই, গাল-গল্প করবার সময় নেই।'

'গাল-গল্প! ওঃ আচ্ছা।' বলে মুখটা পেঁচা করে চলে গেল বুড়ো।

চলে যাওয়ার পর মা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'অতো নরম হয়ে খোসামোদ করে বলছিল যখন, তখন এবারের মতন মিটিয়ে নিলেই ভালো হতো না?'

বাবা শুধু একবার মার মুখের দিকে তাকালেন।

ওইটুকুতেই সবই বোঝা গেল।

অর্থাৎ বাবার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

আবার সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া।

দিদির আর এবার ক্ষমতা নেই, আমি একাই ঘুরে ঘুরে সব বাড়িটা দেখলাম, আর তারপর একটা লাল নীল পেন্সিল নিয়ে আমাদের শোবার ঘরের একটা জানলার পিঠে একে একে বাড়ির সকলের নাম লিখে রাখলাম।

তারপর আর একটু ভেবে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লিখে ফেললাম, বাড়িওলা খুব বিচ্ছিরী লোক।

পরে অবিশ্যি মনে হয়েছিল কাজটা বিশেষ ভালো হয়নি। কাজটা অভিসন্ধিমূলক মনে হতে পারে। তখন এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি অতো ছোট্ট ছোট্ট অক্ষর বুড়ো পড়তে পারবে না।

দিদির অসুখের জন্যে বাবা সময় নিয়ে বাড়ি খুঁজতে পারেন নি, তাছাড়া শোনা যাচ্ছিল বাড়ির ভাড়া ক্রমশঃ বাড়ছে, বাড়ি পাওয়াও শক্ত হয়ে উঠছে।

এবারের বাড়িটা আগের মতো ভাল নয়, তবে একটা পুরো দোতলা বাড়ি। আর বাড়িওয়ালার সঙ্গে থাকতে রাজী নয় বাবা। কিন্তু বাড়িতো মনের মতো নয় তাই মাল-পত্তর অর্দ্ধেকের উপর খোলাই হলো না। নেহাৎ দরকার সেই গুলোই মাত্র খুলে বার করে কাজ চালানো হতে থাকলো।

এর আরো একটা কারণ দিদির শরীরটা তেমন সেরে উঠছিল না, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'হাওয়া বদল করলে ভালো হয়।'

চিন্তা চলছিল হাওয়া বদলের।

আজকের দিনে, যখন 'বিদেশ' মানেই সাগর পার, বেড়াতে যাওয়া-র আভিজাত্য থাকে না কাশ্মীর কি কুলুভ্যালি, গোয়া দিউ-দমন কি ত্রিবান্দ্রম ত্রিচিনাপল্লী-টল্লীতে না গেলে, নিতান্ত গেরস্থ ঘরের ছেলেও বিয়ের অষ্ট-মঙ্গলার মধ্যেই বৌ নিয়ে হনিমুনে ছোটে, তখন আর কে কল্পনা করতে পারবে সাধারণ গেরস্থ ঘরে 'হাওয়া বদলে' যাওয়া ব্যাপারটা কি।

তখন তো বাংলাদেশের বর্ডারের বাইরে পা দিলেই পশ্চিম যাওয়া, হাওড়া স্টেশন ছাড়লেই বিদেশ যাওয়া। সারা জীবনে একবার পুরী কিম্বা কাশীতে যেতে পারলেই জীবন ধন্য।

অবশ্য যে বুড়ি-সুড়িরা তীর্থ করতেন তাঁদের কথা আলাদা। আর বড়লোকের কথাও আলাদা। ছা-পোষা গেরস্তর জীবনযাত্রায় রেলগাড়ী চড়া একটা দেবদুর্লভ ঘটনা।

অতএব ডাক্তার বলেছে বলেই যে তৎক্ষণাৎ হাওয়া বদলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এমন আশা করা যায় না। বিশেষ করে—যখন দরকারটা একটা মেয়ের জন্যে। সংসারের সবচেয়ে স্বল্প মূল্যের সদস্য।

অবশ্য আমাদের বাবার মনোভাব এমন ছিল না, তিনি সব সন্তানকেই সমচক্ষে দেখতেন, কিন্তু উপদেষ্টামন্ডলীরা তো আছেন? তাঁরা আসছেন যাচ্ছেন, বিদেশ যাওয়ার এক দশমাংশ খরচেই যে

আস্তুর বেদানা এবং মাগুর মাছ খাওয়ালে কাজ সমানই হবে এ নির্দেশ দিচ্ছেন। ছোট-মেসো একদিন বলে গেলেন, 'তোমাদের যে আবার জাত-পাতের ভয়, নইলে প্রতিদিন দুটো করে মুরগীর ডিম সেদ্ধ খাওয়াতে পারলে দেখবে দুর্বলতা 'বাপ বাপ' করে পালাবে।'

কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়?

কোন রান্নাঘরে কোন উনুনে কার দ্বারা ওই অপবিত্র বস্তুটি সিদ্ধ হবে?

দাদা একবার বলেছিল, 'আমি ছাতে স্পিরিট স্টোভ জেলে করে দিতে পারি—' শুনে দিদি লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

আর বোধ করি ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বুদ্ধির ভয়েই বললো, 'না বাবা আমি ওসব খেতে-টেতে পারবো না। ভেবেই গা কেমন করছে।'

অথচ হাঁসের ডিমটা রান্নাঘরের প্রায় নিত্য খাদ্যের তালিকায় ছিল আমাদের।

এই রকম সব অদ্ভুত অর্থহীন সংস্কারের মধ্যে বড়ো হয়েছি আমরা—আমাদের মতো গেরস্থ ঘরের মেয়েরা।

সে যাক দিদির দুর্বলতাকে 'বাপ বাপ' করে পালাবার পথটা যখন সহজ মনে হল না, তখন হাওয়া বদলই স্থির হলো।

যাবার কথা শুনে মামারা বললেন, 'যাবে তো চুণারে যাও, রোগ আরোগ্যের পক্ষে আদর্শ জায়গা—'

মেসোরা কেউ বললেন দেওঘর, কেউ বললেন মধুপুর অথবা গিরিডি। অথবা ওই সাঁওতাল পরগণারই কোথাও মিহিজাম কি জামতাড়া, গালুডি কি ঝাঁঝাঁ। ছোটকাকা একদিন এসেছেন, আলোচনা শুনে বললেন, ছোটনাগপুরের জল-হাওয়ায় মরামানুষ বেঁচে ওঠে। যাবে তো রাঁচি কি হাজারি-বাগ যাবার ব্যবস্থা করো। পয়সা খরচ সার্থক হবে।'

কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই সব পরামর্শ দাতাদের এসব জায়গা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। রেলওয়ে টাইম-টেবলে দেখা নাম, অথবা লোকমুখে শোনা ধাম। অতএব ওইরকম অজানা অচেনা জায়গায় শুধু স্ত্রী আর দুটো 'বয়স্থা' মেয়েকে নিয়ে গিয়ে পড়লে বাবার মতো একজন সৎ শান্ত ভদ্রলোকের কী হাল হতে পারে জানা যাচ্ছে না। দাদারা যদি সঙ্গে যেতে পারতো তো আলাদা, কিন্তু ওরা নতুন কলেজে উঠেছে, পড়ার চাপ, ওদের তো কামাই করানো যায় না।

ওরা দুই ভাই নিজেরা রেঁধে খেয়ে মাসখানেক চালাবে এটাই স্থির। কিন্তু তার জন্যেও তো অনেক ভাবনা-চিন্তা।

পরামর্শ যখন এইভাবে ন যযৌ, ন তস্থৌ, অবস্থায় তখন একদিন জ্যাঠামশাই এলেন। এবং সব শুনে টুনে গম্ভীরভাবে বললেন, পাঁচজনের কথায় কান দিয়ে একটা পাগলে কাণ্ড করিসনে ন্যাড়া, (বলা বাহুল্য ওইটিই বাবার ডাক-নাম) একটা মেয়ের জন্যে সর্বস্বান্ত হবি না-কি? তোর যা পাওনা ছুটি আছে নিয়ে বৌমাকে আর মেয়েদুটোকে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে আয়। বাসা তুলে দিয়ে যা অন্ততঃ দু-দুটো মাসই যা বৃথা ভাড়া গুনবি কেন? ওই টাকাতে তোর খরচ-খরচা হয়ে যাবে। ছেলেদুটোকে আমার ওখানে রেখে যা, জেঠির কাছে খাবে দাবে কলেজ যাবে, পড়া-শুনো করবে। ওরা নিজেরা রেঁধে খাবে? এমন আজগুবি চিন্তা তোদের মাথায় এলোও তো। কেন, আমরা কি মরে গেছি '

শুনে বাবা লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন। এবং তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললেন।

কিন্তু বাসা তুলে দেওয়া?

এতো সব জিনিসপত্র কোথায় যাবে? এইসব খাট-বিছানা বাসন-পত্র, শিলনোড়া, বঁটি কাটারী, যা যাকে 'সংসার' বলেন!

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কেন, ওবাড়িতেই রেখে যাবি। ফিরে এসে আবার পছন্দমতো বাড়ি দেখে-শুনে নিয়ে এসে স্থিত-ভিত করবি।'

এর আগে জ্যাঠামশাই বা কাকাদের আমরা তেমন করে কোনোদিন দেখিনি সেদিন হঠাৎ যেন ওই ভদ্রলোককে নতুন করে দেখলাম। আর মনে হলো, 'ভদ্রলোক' সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খাটো ধুতির উপর গলাবন্ধ কোট আঁটা—কাঁধে চাদর ফেলা এই ভদ্রলোককে আমরা যে এতোদিন অবিচার করেছি, এতে মনে মনে লজ্জা পেলাম।

তবু বাবা বললেন, 'এতো সব কোথায় ধরবে? কতগুলো জঞ্জাল তো জমিয়ে বসে আছি। ও-বাড়িতে জায়গা কোথায়? সকলের অসুবিধে হবে—'

জ্যাঠামশাই গম্ভীর ভাবে একটু হেসে বললেন, 'জায়গাটা গেছে কোথায় তাই বল? তুই যদি ওখানে থাকতিস? তোর জায়গা হতো না?' 'অসুবিধে হবে।' মানে হয় না এ কথার। যা বলছি তাই কর। এই শীতের মুখে গাঁয়ের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়ার তুল্য।'

এরপর আর কারো কোনো কথা দাঁড়ালো না।

মার ওজর-আপত্তিও নস্যাৎ হয়ে গেল, বাসা ছেড়ে দিয়ে দাদাদের সঙ্গে জিনিসপত্র-টত্র ওবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে, আমরা চারজন গিয়ে রেলগাড়ীতে চড়ে বসলাম।'

মা বাবা, আমি দিদি।

আমাদের জীবনে এই প্রথম রেলগাড়ী চড়া।

উত্তেজনা, উন্মাদনা ইত্যাদি বলে বোঝাবার নয়।

আর একবার মাত্র রেলগাড়ী চড়ার সুযোগ হয়েছিল। তারকেশ্বরে কী যেন পুজো দিতে যাওয়া হয়েছিল। তা আমি তো তখন নেহাৎই ছোট।

দিদির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

দিদির কারণেই তো এমন সুযোগ লাভ। দিদি যদি তাড়াতাড়ি 'সবল' হয়ে উঠতো এ-হেন দুর্লভ ঘটনা ঘটতো না নিশ্চয়।

দিদিতে আমাতে সেই কথাই হচ্ছে হঠাৎ একসময় বাবার একটা কথা কানে গেল। মাকেই বলছেন অবশ্য।

'তখন যদি আমার হিস্যা মিটিয়ে দাও' বলে বাড়ির ভাগের দাম চাইতে বসতাম, এ-বস্তু থাকতো? ভাগটাই বড় কথা নয় বুঝলে? বড়ো কথা হচ্ছে আশ্রয়। মনের আশ্রয়, নিশ্চিন্ততার আশ্রয়। ত্রিভুবনে আর কোনোখানে তোমার ছেলেদের রেখে এমন নিশ্চিন্ত হতে পারতে?'

মা বললেন, 'বাড়ি থেকে তুমিই চলে এসেছিলে—।

'এসেছিলাম। আর এসেছিলাম বলেই তার কী দাম সেটা বুঝতে শিখেছি।'

এরপরই একটা স্টেশন এসে গেল।

ঘটাং করে গাড়িটা থেমে গেল। উল্টোডাঙ্গা।

আমাদের দেশ মুর্শিদাবাদ জেলায় অতএব হাওড়া স্টেশন দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেনি. কিন্তু তাতে কী?

স্টেশনে স্টেশনে গাড়ী তো থামছে?

ক্যানভাসাররাও উঠছে।

চাবির রিং, ছুরি, কাঁচি নিয়ে, হাত-কাটার মলম আর দাঁতের মাজন নিয়ে, যে মাজনে নড়া দাঁত আবার টাইট হয়ে যায়।

শ্যামনগর, পায়রাডাঙ্গা, কাঁচরাপাড়া, বাদকুল্লা এ সবই কি কম শ্রুতিমধুর নাম?

অতঃপর গোয়াড়ী কেষ্টনগর।

যেখানে অনেকক্ষণ গাড়ী থামলো এবং প্রাণভরে সরপুরিয়া সরভাজা, ছানার জিলিপি কেনা হলো।'

বাবা বললেন, 'বলছে বটে মুড়োগাছার ছানার জিলিপি, বাজে কথা। এখানেই তৈরী। তা' হোক এই তো মিষ্টির কারি-গরের জায়গা।'

আবার গাড়ী ছেড়ে যাবার পর বাবা বললেন, 'স্টেশন থেকে একটু গেলেই ডি এল রায়ের বাড়ি। 'ধনেধান্যে পুষ্পে ভরা'র সৃষ্টিকর্তা।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'তাছাড়া গোপাল ভাঁড়েরও দেশ।'

জ্যেঠামশাই মহানুভবতা দেখালেও, 'ও-বাড়ি' যাবার সময় দাদা-ছোড়দা খুবই নিরুৎসাহ বোধ করেছিল।

অনেককাল আগে ছেড়ে চলে আসা জায়গায় আবার গিয়ে থাকার মধ্যে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনাই বেশী হয়। মানিয়ে নেওয়া যাবে কিনা—কে জানে?

তবু দাদারা আমাদেরই উপদেশ দিল।

পাড়া-গাঁ যে কলকাতা শহর নয়, সেখানের লোকেরা যে নিতান্ত সরল নয় একথা দাদারা শহরে বসে বসেই কেমন করে যেন শিখে ফেলেছিল। আমাদের মতো বড়ো বড়ো মেয়েদের এখনো বিয়ে হয়নি, এ সেখানের কেউ সুচক্ষে দেখবে না, এবিষয়ে ছোড়দা অন্ততঃ স্থির।

'বাবাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে ওখানেই না তোদের পাকস্থ করে বসে বাবার হিতৈষী জ্ঞাতিরা।'

বললো ছোড়দা।

শুনে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

দাদা, বললো, 'আঃ ওদের ঘাবড়ে দিচ্ছিস কেন?'

তারপর আরো কিছু হিতোপদেশ দিয়ে দুই দাদা আমাদের দু-জনকে একটা করে 'উপহার' দিল। বললো শেয়ার করে নিস দুজনে। গাঁয়ে গিয়ে পাড়া বেড়িয়ে আর টোপাকুল খেয়ে না কাটিয়ে এই নিয়ে থাকবি।'

দাদা দিলো একটা চরকা, আর অনেকটা হালকা তুলো, আর ছোড়দা দিলো একটা 'চয়নিকা'।

ছোড়দা বললো, অনেকগুলো কবিতায় লাল পেন্সিলের ফুটকি দেওয়া আছে, দু-মাস পরে যেন দেখি সেগুলো মুখস্থ হয়েছে। যার না হবে সে ফেল, আর কিছু পাবে না। যার হবে, সে আবার বই পাবে।'

আর দাদা বললো, 'আমি ওসব লোভ দেখানো টেখানোর মধ্যে নেই, আমি চাই তোমরা নিজেদের গরজে সুতো কাটবে। আর সেই সুতোয় মার জন্য একখানা কাপড় করানো হবে।'

আমি হেসে বললাম, 'মা ওই মোটা কাপড় পরলে তো?'

শুনে দাদা খুব আহত হলো।

বললো, 'তোদের হাতে-কাটা সুতোয় বোনা কাপড় মা পরবেন না? বলিস কী রাঁচি? মাকে তোরা কী ভাবিস?'

কী ভাবি আমরা নিজেরাই জানি না, কাজেই চুপ করে গেলাম।

তখন আবার মা-বাবা উপদেশ দিচ্ছেন ওদের।

বিষণ্ণ মুখে বিদায় নিলো দাদারা স্টেশন থেকে মা বাবাকে প্রণাম করে।

এর আগে আমরা চার-ভাইবোন কখনো কেউ কারো কাছছাড়া হইনি, তাই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

তাছাড়া—আমার যেন কেমন মনে হতে লাগলো যে, দাদা ছোড়দাকে আমরা রেখে যাচ্ছি দু-আড়াই মাস পরে এসে ঠিক তাদের বোধহয় আর ফিরে পাবো না।

ওরা বদলে যাবে।

ওরা নিজ নিজ পথে এগিয়ে যাবে যেখানের নাগাল আমরা পাবো না। মা-বাবাও নয়। কিছুদিন থেকেই মনে হতো এটা, ওরা যেন সরে যাচ্ছে দূরে চলে যাচ্ছে। ক্রমশঃই যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। যে জীবন ওদের টানছে, তার শতবাহু, তার আকর্ষণ তীব্র। ওরা ভেসে যাবে ওরা আর আমাদের থাকবে না।

তখন ঠিক এমন স্পষ্ট ভাবে ভাবতে না জানলেও, এমনি একটা ধারণা অস্পষ্ট ভাবে ছিল। আর সেইজন্যেই খুব কান্না পাচ্ছিল।

সেই কান্না পাওয়াটা গেল রেলগাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে।

গতির একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, সে সমস্ত ভয়কে ঝেড়ে ফেলে দিতে পাবে। গতি যেন কোথা থেকে ডেকে আনে আহ্লাদের বাতাস।

স্টেশনে স্টেশনে গাড়ি আমার সঙ্গে সঙ্গে নামগুলো মুখস্থ করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলাম আমি। দিদি গলা পর্যন্ত একটা মোটা চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে রইলো।

থার্ড ক্লাশের যাত্রী বলে যে শুতে পাবে না এমন কথা তখন কেউ ভাবতো না। একখানা কামরায় আমরা চারজন ছাড়া আর দু-তিনজন বসেছিল, তারাও কেষ্টনগরে নেমে গেল।

আমাদের দেশের বাড়ি, বা বাবার পিতৃ-ভিটে কাঞ্চনতলা গ্রামে।

বহরমপুর স্টেশনে নেমে খানিকটা ঘোড়ার গাড়ী চেপে তারপর উঠতে হলো গোরুর গাড়ীতে। জীবনে কখনো এমন অ্যাডভেনচারের সুযোগ ঘটেনি, তাই প্রথমটায় খুব উৎসাহ বোধ করছিলাম, তারপর গাড়ী একটু চলতেই বুঝলাম ব্যাপারটা বেশ মনোরম নয়। কিন্তু উপায় কী?

এ ছাড়াতো কোন যানবাহন নেই।

কলকাতায় থার্ডক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীকে বাবা ছ্যাকড়াগাড়ী বলে নীচু চোখে দেখেন, এখন কী? বলতে ইচ্ছে হলো বাবাকে, কিন্তু চেয়ে দেখছি বাবার অবস্থা অনেক বেশী শোচনীয়। দিদিকে সাবধানে শুইয়ে মা আর আমি পাশে বসেছি, আমাদের তবু মাথাটা ছইয়ের নীচে আছে, কিন্তু বাবার? বাবার মাথাটা গুঁজে বসে থাকা উপায় হচ্ছে না।

অনেক যুদ্ধের শেষে, শরীরের প্রতিটি হাড়ের জোড় খুলে খুলে, অবশেষে যখন কাঞ্চনতলায় এসে পৌঁছনো হলো, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

খবর অবশ্য দেওয়া ছিল।

একটা মস্তবড় পুরনো কালের দোতলা বাড়ির উঠোনের সামনে গোরুর গাড়খানা এসে থামলো, গাড়োয়ানরা গরুদের বাঁধন খুলতে খুলতে বললো, 'যাই বাবু ফিনিক-ফোটা রাত ছেলো তাই বেটক্কর হলোনি, আঁদার হলে মুস্কিল হতো।'

ফিনিকফোটা রাত শুনে প্রথমটা বুঝতে পারিনি, তারপর বুঝে ফেলে হেসে মরি। গাড়োয়ানবাবু কবি আছেন।

উঁচু পাঁচিলে ঘেরা উঠোনের মাঝখানে একটা বেড়ার দরজা। দেখে এমন হাসি পেলো। দরজাই যদি বেড়ার তো, এমন উঁচু পাঁচিল কেন। পরে জেনেছিলাম ওখানে নাকি একটা লোহার গুল বসানো প্রকাণ্ড দরজা ছিল, কালের প্রকোপে তার কব্জা খসে পড়ায় খুলে উঠোনের ধারে কাৎ করে রেখে দেওয়া হয়েছে, এবং এই বাঁশের বেড়ার দরজাতেই কাজ চালানো হচ্ছে।

হয়তো বাকি বংশধরেদের ওতেই চলে যাবে।

বোধহয় গরুরগাড়ী থামার অথবা গাড়োয়ানদের গলার শব্দে তৎপর হয়ে ওই বেড়ার দরজা খুলে একজন বেরিয়ে এলেন। না, হাতে তাঁর টর্চ ফর্চ নয়, একটি কেরোসিনের কুপী।

সেই কুপীটাকে মুখের পাশে উঁচু করে তুলে ধরে একজন রোগা কালো ঢ্যাঙ্গা বুড়ি চোস্ত পরিষ্কার গলায় বলে উঠলেন, 'কে ন্যাড়া এলি?'

বাবা বললেন, 'এলাম পিসিমা।'

কেরোসিনের কুপীর আলোয় দেখলাম চুলগুলো কুচি কুচি করে ছাঁটা, একদম শাদা ধবধবে।

যেন ধবধবে নতুন আলপিনের গোছা পিন-কুশানে গেঁথে রাখা হয়েছে মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে।

অনেক সমুদ্র পার হয়ে, অনেক লোনা-জল খেয়ে আর অনেক বালির চড়ার আস্বাদ পেয়ে তবে, আমরা আমাদের জন্যে উৎসর্গীকৃত ঘরটিতে শুতে এলাম, তখন রাত কতো কে জানে।

খুব বড় বড় দুখানা চৌকি পাতা রয়েছে ঘর দুটোয়, দিব্যি জবরদস্ত।।

আমাদের বিছানার বাণ্ডিল খুলে যখন নিজস্ব পরিচিত বালিশ চাদর দিয়ে বিছানা দিয়ে বিছানা পাতা হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

অন্তত রাতটার মতো নিশ্চিন্দি, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হতে হবে না।

এসেছি পর্যন্ত কম জেরা সুরু হয়েছে।

বাবার পিসিমার তো সব প্রথম কথা, হ্যাঁরে ন্যাড়া, তোর এই দুটো মেয়েই কি আইবুড়ো না কি? একটারও বে দিসনি? নাকে সর্ষের তেল দে ঘুমোচ্ছিলি নাকি? ও-মা এ যে এক রাত্তিরেই দুটোকে পার করলে ভাল হয়।'

তারপর একে একে অনেকেই এলেন, তখন শুরু হলো আমাদের নিখুঁৎ পরিচয়-লিপি সংগ্রহ।

ক'টি ভাই-বোন, ছেলেরা কেন এলো না, জন্মে কখনো তো বাপের ভিটে চোখে দেখেনি। মেয়েদের বয়েস কতো, এখনো বিয়ে না হওয়ার হেতু কি? বাবার চাকরীর আর কতদিন আছে, রিটায়ার করে দেশে এসে বসবাস করার ইচ্ছে আছে কিনা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এক প্রশ্ন হচ্ছে, রাত্রে আমরা ভাত খাই, না রুটি পরোটা খাই, গাঁড়াগাঁয়ের পাঁচ-ধরণ আমাদের পছন্দ হবে কিনা, কলকাতায় মশা আছে কিনা, কলকাতায় বাজারের দর এখন কেমন। গলাকাটা না একটু সহনীয়? চরকা কাটার হুজুগ কলকাতায় চলছে কিনা এখনো।

কাঞ্চনতলাতেও ওইসব হুজুগের ঢেউ এসেছে।

হাত-মুখ ধোওয়ার জন্যে জল তোলা আছে, তবে যদি টাটকা জলে মুখ-হাত ধুতে ইচ্ছে হয়, কুয়ো থেকে জল তুলে দিতে পারা যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতো কথা যিনি বলছিলেন, তিনি হচ্ছেন বাবার ওই পিসিমার মেয়ে। তিনিও বিধবা, মাঝারি বয়েস, এবং দোহারা চেহারা, রং ফর্সা কিন্তু মায়ের মতই ছাঁটা চুল, পরনে থান। তবে এঁর চুলগুলো আলপিনের ডগার মতো নয়, বলতে পারা যায় বুরুশের রোঁয়ার মতো। কালো ঘন আর একটু বোধহয় খড়ো।

বাবা বললেন, 'নীরোদি না?'

মহিলাটি খলখলিয়ে হেসে উঠে বললেন, 'তবু ভালো যে নামটা মনে রেখেছিস। আমি তো কোন ছার, বলে পিসিকেই বড়ো সমীহ। সাতজন্মে তো একখানা পোসটোকার্ট ফেলে বিজয়ার একটা নমস্কার জানাসনা।'

হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলাম ওই নীরোদির মুখের দিকে। দেয়ালের পেরেকে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, তার খানিকটা আলো তেরছা হয়ে এসে পড়েছে সেই মুখে, দেখছি কতো অবলীলায় অনর্গল কথা বেরিয়ে আসছে সেই মুখ থেকে।

বাবার মুখে বাবার পিসিমার কথা শুনেছি। কিন্তু এই নীরোদির কথা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।

অথচ ইনি অনায়াসে এইভাবে কথা বলছেন। আড়ষ্টতা নেই, সমীহ নেই। কুণ্ঠা নেই।

'খুব আশ্চর্য লাগছিল আমার।'

ওনার কথার মাঝখানে মাঝখানে যিনি সেবাপর্ব চালাচ্ছিলেন তিনি বোধহয় বাবার কোনো জ্ঞাতি খুড়ি বা বৌদি।

তিনি আমাদের হাত-মুখ ধোবার জল দিলেন, জলখাবার দিলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাতের খাবার ব্যবস্থা-স্বরূপ দালানের একধারে ভারী ভারী পিঁড়ি পাতলেন দুখানা। মার জন্যে বোধহয় রান্নাঘরের মধ্যে পিঁড়ি পড়েছে। দিদি কিছু খাবে না, শুধু একটু গরম দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লো।

খেতে বসে হাসবো না কাঁদবো।

এতো ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে, যা অন্ততঃ আমার সাতবেলার খাদ্য। বাবারও প্রায় তাই।

বাবা হেসে উঠে বললেন, 'ও পিসিমা, এ ক'জনের ভাত?'

পিসিমার বদলে নীরোদি বলে উঠলেন, 'ক'জনের আবার? সারাদিন রেলের ধকল, ও-কটি খাবি না?'

বাবা হেসে বললেন, 'বুঝতে পারছি দেশে কেন ঘন ঘন আকাল পড়ে। তোলাও তোলাও।'

বলতে বলতে যদি বা তোলানো হলো কিছু, তার সিকিও খেতে পারা গেল না। শক্ত শক্ত ভাত, অনেকরকম জানা অজানা থপথপে তরকারি, আর একটা বড় কাঁসার বাটি ভর্তি একবাটি কাটায় ভর্তি ঝাল মাছ দিয়ে সেই হিমেল হাওয়ার মুখে বসে আধা-অন্ধকারে বসে খাওয়া, একটা যেন আতঙ্কের স্মৃতি হয়ে মনে বসে আছে।

এইখানে থেকে দিদির শরীর সারবে?

কক্ষনো নয়।

দিদি নির্ঘাৎ কাঁদতে বসেছে।

দুটো চৌকিকে পাশাপাশি বসিয়ে প্রকাণ্ড বিছানা পাতা হয়েছে, আমি দিদি মা-বাবা।

দিদি জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে না। আমি অন্ততঃ ঘুমের ভাণ করে পড়ে আছি। আর ভাবছি, এখানে কি আমরা থাকতে পারবো?

একটু পরে বোধহয় আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে মা আস্তে বললেন, 'সুনীকে খুব সাবধানে রেখো ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা না লাগে। এতো খোলামেলায় তো থাকা অভ্যেস নেই। তায় নতুন শীতের মুখ।'

মা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বললে তুমি রাগ করবে কিন্তু আমার যেন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'কেন ভয়টা কিসের?'

বাবার গলা একটু চড়া।

'কিসের তা আর তুমি কি বুঝবে!' মার নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। কোথায় বিদেশে গিয়ে একটু হাঁফ ফেলে বাঁচবো, তা নয়, পিসশাশুড়ী খুড়-শাশুড়ী ননদ ভাগ্নী ভাসুরপো ভাসুরপো-বৌ, মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল।'

বাবা বললেন 'নিজে ঠিক থাকলে কে কি করবে?'

'করবে আবার কী! বৌ-গিরি অভ্যেস তো চলে গেছে। তাছাড়া এই বুড়ো-বুড়ো আইবুড়ো মেয়েদের নিয়ে দেশের বাড়িতে আসা—।'

'যতো ভাববে ততোই ভাবনা বাড়বে। ভাবনার মূল কেটে ফেললে আর ডালপালা গজায় না।'

মা চুপ করে গেলেন।

তারপর একটু পরে আবার বলে উঠলেন, 'এই যে আমরা থাকবো, খরচ-পত্রের কিভাবে হবে?'

বাবা বললেন 'ও চিন্তাটা আমার হাতে ছেড়ে দাওনা।'

'তোমার ওই সেজখুড়ি না কে, তার কথাগুলো যেন কেমন বাঁকা-বাঁকা। বলছিলেন 'এতোদিন পরে অমুক বুঝি জমি-জমার ভাগ-টাগ দেখতে এলেন!'

'তা তুমি আসল কারণটা বললে না?'

'বললে বিশ্বাস করবেন?'

'ঠিক আছে। যখন দেখবেন সেসব করছি না তখন সন্দেহমুক্ত হবেন।'

'এখানে এতো বিধবা! বাবাঃ! দশজন মেয়েমানুষ তার সাতজন বিধবা।'

এটা আমারও লক্ষ্যগোচরে এসেছিল। আমিও ভেবেছিলাম, কী-রে বাবা, সবাই বিধবা কেন?

কেনর উত্তরটা পেলাম বাবার কথায়।

বাবা বললেন, 'খুবই স্বাভাবিক। যারা উপার্জনশীল যারা কৃতী তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাসা বেঁধেছে, যারা বে-ওয়ারিশ তারাই পড়ে আছে। ওদের জন্যে মমতা আসা উচিত বুঝলে?'

বাবার উচিত বোধ-এর সঙ্গে মার উচিত বোধ মিললো কিনা জানি না।

কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

অচিন রাগিণী

সতীনাথ ভাদুড়ীর একটি অলপখ্যাত গ্রন্থের নাম 'অচিন রাগিণী'। আশ্চর্যের বিষয় বাংলা-সাহিত্যে তিনি স্বয়ং সত্যই এক 'অচিন-রাগিণী'। এক অশ্রুতপূর্ব নতুন রাগিণীর সন্ধান তিনি এনেছেন বাংলা-সাহিত্যে। বাংলা-সাহিত্যের হাটে যখন দিক্‌পালদের কোনো অপ্রাচুর্য ছিল না তখনই সতীনাথ তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবে চমক সৃষ্টি করেছেন। থাকতেন নাগরিক দলাদলির গন্ডী ছাড়িয়ে এমন এক অঞ্চলে যাকে নীরব সাধনার ক্ষেত্র বলা যায়।

সতীনাথ কলেজ-জীবনে ছিলেন রায়-পন্থী র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট, ১৯৩৯-এ কংগ্রেসে যোগ দিলেও মনে-প্রাণে সোস্যালিস্ট, কম্যুনিস্টদের সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসা করলেও পরদেশ অভিমুখী রাজনৈতিক নীতির তিনি সমর্থক ছিলেন না। ১৯৪২-এ আগস্ট বিপ্লবের কালে সমগ্র পূর্ণিয়া জেলার সংগ্রাম পরিচালনার ভার ছিল তাঁর হাতে। বিহারের জনতার কাছে তিনি ভাদুড়ীজী, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর সহজ আনাগোনা। ১৯৪৭-এ তিনি কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্সের সেক্রেটারি। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলি, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার লোভ প্রভৃতি তাঁর পরিচ্ছন্ন মনকে আকুল করে তোলে। তাই ঠিক স্বাধীনতার ঊষা লগ্নে আরও অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধার মত তিনিও অবসর গ্রহণ করলেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে।

একবার জেল থেকে ফেরার পর তিনি তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্যকে বললেন এক প্রশ্নের জবাবে—'উর্দু শিখেছি, ফ্রেঞ্চ ভাষাও আয়ত্ত করেছি, আর একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছি।' এইভাবেই কারাজীবনের অন্তরালে দিনগুলি কাটিয়েছেন সতীনাথ।

অনেক অনুনয়ের পর পাণ্ডুলিপি দেখালেন প্রিয় সহকর্মীকে। বই কে ছাপবে সেই প্রশ্ন আজ প্রবল হল। স্বর্গত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই) স্বয়ং উদ্যোগী হলেন। বীরেনবাবু একজন খ্যাতনামা লোককে ধরলেন—নতুন লেখকের উপন্যাস কে ছাপবে? তিনি পরিচিত প্রকাশককে অনুরোধ জানালেন, সেই অনুরোধও বিফল হল। পাঁচ-ছ মাস এভাবেই কাটল। শেষ পর্যন্ত 'সমবায় প্রকাশন' সংস্থা থেকে প্রকাশিত হল সৌষ্ঠবহীন 'জাগরী', সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের হাতে পৌঁছালো। অতুলচন্দ্র কত দুস্থ সাহিত্যিককে যে সাহায্য করেছেন কতভাবে এমনকি প্রচুর অর্থও দান করেছেন সেকথা ক'জন স্মরণে রাখে? অতুলচন্দ্র সুরসিক, তিনি স্বয়ং সাহিত্যকার ও সাহিত্য সমালোচক। তিনি এই নতুন লেখকের উপন্যাস 'জাগরী' পাঠ করে চমৎকৃত। লিখলেন—

'লেখকের কোন লেখা আগে পড়িনি। তাঁর নামও শুনিনি। বই একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা। কাঁচতার চিহ্ন কোথাও নেই। শক্তির ছাপ সর্বত্র।'

'জাগরী' বাংলা-সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টির স্বীকৃতি পেল। বাংলা-সাহিত্যের কৃতিত্বের অধিকারী হিসাবে প্রথম 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পেলেন এমন একজন লেখক যাঁর নাম কেউ শোনেনি। আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত এই একটি মাত্র সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে কোনো মতপার্থক্য নেই।

এই সতীনাথ কেমন মানুষ? লেখক সম্পর্কে পাঠকের চিরদিনই কৌতূহল থাকে। বিমল কর সামান্য কয়েকটি কথায় একটি আশ্চর্য রেখাচিত্র এঁকেছেন।

সতীনাথকে যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন প্রবাসী বাঙালী, তাঁদের মুখে শুনেছি, এমন সুন্দর স্বভাব কদাচিৎ দেখা যায়। বিনয়ী, নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত, স্বার্থত্যাগী, কর্মী, নিরহংকার এরকম মানুষ লাখে এক। কেউ বলেছেন, 'শরীর নিয়ে বড় খুঁত-খুঁতে ছিলেন,' কেউ আমায় বলেছেন—'অসাধারণ ব্যাডমিন্টন খেলতে পারতেন'; কেউ বলেছেন—'ওঁর যা বাগানের শখ ছিল... হ্যাঁ...এই সমস্ত নিয়েই মানুষ সতীনাথ, লেখক সতীনাথ। তাঁর সাহিত্য তাঁর বাগানের শখের মতন। নিরিবিলি বসে, দিনে দিনে, কত অসংখ্য সুন্দর ফুল লতা এনে তিনি সেই বাগান রচনা করেছেন। এবং তিনি তাঁর বাগানের ফুল কলকাতার সাহিত্য-পাড়ায় এনে দিয়ে বলেননি—এর একটা একজিবিশন করুন। আমার প্রাইজ চাই।'

এমন মানুষ সতীনাথ। অকালে পরলোকগমন করেছেন। বাংলার সাহিত্য-জগৎ অকৃতজ্ঞ। কাল যাঁর অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ হয়েছে আজ দিনের আলোয় তাঁকে ভুলতে সময় লাগে না। তাই স্মরণ-সভা ইত্যাদির আয়োজন করতে হয় আত্মীয়-স্বজনদের।

সতীনাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। কে মনে রাখে? গবেষক সমালোচক পিঁচুটি চোখের দৃষ্টি নিয়ে বলবে? কতটুকু জেমস জয়েস আর কতটুকু কাফকা, কিংবা আরো অগ্রসর হয়ে ভার্জিনিয়া উল্ফ। কিন্তু পাঠক সম্প্রদায়ের কোনো দায় নেই। তারা ততদিনে অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে নতুন বিলায়েৎ লোভে ভীড় জমিয়েছে। সুবল গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ, তিনি সতীনাথের আত্মীয় নন, সমকালীনও নন, অথচ যে অসাধারণ নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় 'সতীনাথ-স্মরণে' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তা দ্বিতীয় রহিত। দীর্ঘকাল ধরে

তিনি রচনা সংগ্রহ করেছেন। অজ্ঞাত, অখ্যাত পত্র-পত্রিকাও তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি। কতজনকে অনুরোধ জানিয়েছেন রচনার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন এবং অপরিসীম ধৈর্যের ফসল হিসাবে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা 'সতীনাথ-স্মরণে' নামক স্মারক-গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। শুনেছি সম্প্রতি সতীনাথের গ্রন্থাবলীও কোনো উদ্যোগী প্রকাশ করেছেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিহারের রাজ্যপাল বিখ্যাত অসমীয়া কবি শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া লিখেছেন ঃ

'বিহারে এসে আমি পূর্ণিয়া যাই। সেখানে তাঁর বাড়ী দেখতে যাই। সেখানকার অনেকের সঙ্গে সতীনাথ সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিহারের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ভোলা শাস্ত্রী আমাকে বলেন যে, তিনি সতীনাথবাবুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বহুদিন গ্রামে গ্রামে দেশের কাজ করেন। শাস্ত্রী আরও বলেন যে, এমন অসাধারণ লোক আর হয় না। তিনি ছিলেন পণ্ডিত লোক অথচ গরীব চাষী এবং কৃষক-মজুরদের সঙ্গে মিশতেন নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গে।'

সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে, কবি-রাজ্যপাল দেবকান্ত বড়ুয়া সাহায্য দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে ও মূল্যবান ভূমিকা লিখে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন। কথাটি অনুধাবনযোগ্য। দেবকান্ত বড়ুয়ার আদর্শ অন্যসব রাজ্যপালবৃন্দ যদি অনুসরণ করেন, তাহলে সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি সম্ভব।

এই স্মারক—গ্রন্থে স্মরণাঞ্জলি অর্পণ করেছেন অনেকেই। প্রথম পর্বে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অন্নদাশংকর রায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাণী রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, কৈলাসবিহারী সহায়, গৌরী রায় ও নারায়ণ প্রসাদ ভর্মা স্মৃতি-তর্পণ করেছেন স্বর্গত সাহিত্যিকের। কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যমণি হল ফনীশ্বরনাথ 'রেণু'র 'ভাদুড়ীজী'।

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' হিন্দি আঞ্চলিক সাহিত্যের পথিকৃৎ। 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত। তাঁর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস সর্বভারতীয় মর্যাদায় সম্মানিত এবং কয়েকটি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'তিসরি কসম' নামক একটি কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়ে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছায়াছবি হিসাবে স্বর্ণপদক পেয়েছে। 'পরতি পরিকথা' তাঁর আর একটি সার্থক উপন্যাস।

এই পরিচয়টুকু দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কারণ ফণীশ্বর নাথ বাংলা ভাষায় সতীনাথ প্রসঙ্গে যে স্মৃতি-চারণ করেছেন তা বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ। আশা করব অতঃপর তিনি এই ভাষাতেও কিছু সাহিত্য-চর্চা করবেন।

একটা মজার কথা এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। বাংলা থেকে হিন্দি ভাষান্তর প্রসঙ্গে এই অংশটুকু চমকপ্রদ—

'একদিন মুজফ্ফরপুরের সাহিত্যিক রামধারীবাবু (দিনকরজী নয়), বাংলা থেকে হিন্দি অনুবাদের কথায় বললেন—'ও তো খুব সহজ।'

ভাদুড়ীজী সেদিন জেল লাইব্রেরী থেকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কয়েকটি হিন্দি অনুবাদ বই নিয়ে এসে রামধারীবাবুকে মাত্র কয়েক পাতা খুলে বলেছিলেন... 'অনুবাদ সহজ বলেই বোধহয় এরকম হয়।...'ডাকসাইটে মেয়ে'র অনুবাদ করা হয়েছে—'ডক-ইয়ার্ড'সাইড মে' রহনেওয়ালী লড়কী...' গোঁয়ার গোবিন্দর মানে দিয়েছে 'গোবিন্দ গোয়ালা', টুইম্বুর 'কটহল', —মাছরাঙা মানে 'রংগীন মছলী'...কচুরিপানা—' পানিভরা কচৌড়ি...। আরও আছে...। রামধারীবাবু এই অনুবাদক মহোদয়ের সম্বন্ধে বলেছিলেন উনি ভালো অনুবাদ করেছেন।

যাঁরা ভিন্ন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাদি বিষয়ে আনন্দে আছেন ভাগ্যে তাঁদের অন্য ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই, নতুবা হারিকিরি ছাড়া আর পথ থাকত না।

ফনীশ্বরবাবুর রচনায় জেলের ভিতরকার এবং জেলের বাইরের সতীনাথ প্রসঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ চিত্র আছে যা অতি সহজেই পাঠক-চিত্তকে আকুল করে তোলে।

আমরা ফণীশ্বরবাবুর অকুণ্ঠিত প্রশংসা করি। এই স্মারকগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, বিমল কর, নারায়ণ চৌধুরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ভগবানপ্রসাদ মজুমদার, সুবল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা সংযোজিত হয়েছে।

সম্পাদক সুবল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'ইতিকথা'র মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে যুক্তি ও তথ্য-নির্ভর আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটির মধ্যে অনেকগুলি আলোকচিত্র এবং পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। বাংলার বাইরে মুদ্রিত হলেও গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

—অভয়ঙ্কর

সতীনাথ-স্মরণে (স্মারক-গ্রন্থ)— সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক— ভারতী-ভবন—পাটনা-১। মূল্য আট টাকা।

পুরস্কার নিলেন বিষ্ণু দে

খবরটি বেরিয়েছিল কয়েক মাস আগেই। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার প্রদানকারীগণ ঘোষণা করেছিলেন কবি বিষ্ণু দে-কে এবার তাঁরা সম্মানিত করছেন 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যগ্রন্থের জন্যে।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা সেই লক্ষ টাকা দামের পুরস্কারটি হাতে তুলে দেন সম্মানিত কবিকে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম অগ্রনায়ক শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে।

কলকাতায় বুলগারিয়ার লেখক

প্রখ্যাত বুলগারিয়ান লেখক মিঃ এমিল মানভ ও তাঁর লেখিকা পত্নী মিসেস মানভ সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন ১০ হিন্দুস্থান রোডে আয়োজন করেছিলেন এক সভার, সেখানে এই দুইজন বিদেশী অতিথি উপস্থিত থেকে কলকাতার বাঙালী ও অবাঙালী কবি লেখকদের বিভিন্ন সাহিত্যবিষয়ক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ।

বুলগারিয়ায় সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যের খুব একটা প্রচার নেই। অথচ শ্রীএমিল মানভ বলেন—'ভারতে বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে আমার মনে হয়েছে, বাংলাতেই সবচেয়ে ভাল লেখা হচ্ছে।' কি করে বুলগারিয়ায় বাংলার অনুবাদও প্রচার করা যায়, তা নিয়ে সভায় বিস্তৃত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সতীকান্ত গুহ, হিন্দী কবি মনমোহন ঠাকুর, শ্রীমতী লীলা রায়, শান্তিকুমার ঘোষ ও আশিস সান্যাল। মোটামুটিভাবে স্থির হয় যে, আপাততঃ বাংলার ইংরেজি অনুবাদ থেকে বুলগারিয়ান ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও সোফিয়ার ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে যাতে বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য এমিল মানভ চেষ্টা করবেন বলে জানান।

বিদ্যুৎগতি অভিযান (ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ—১৯৭১—মেজর জেনারেল ধরিত্রীকুমার পালিত প্রণীত ও টমসেন প্রেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, নতুনদিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবেশক, প্রকাশ পাবলিকেশনস, কলকাতা—১০। মূল্য দশ টাকা।

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর অপূর্ব সংগ্রাম, ভারতীয় বাহিনীর চিরস্মরণীয় অভিযান সম্পর্কে যেসব পুস্তক এপর্যন্ত হাতে পড়েছে তারমধ্যে মেজর পালিতের এই বইটি একটি উল্লেখযোগ্য অবশ্যপাঠ্য বলে আদৃত। লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কী দ্রুততা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সুন্দর উন্নত কৌশলের মধ্য দিয়ে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন তাঁর কথা। সামরিক বাস্তবজ্ঞানের সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন অভিজ্ঞ বিশ্লেষণী, তথ্য এবং তীব্র অনুভূতি। রণক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা তাঁর লেখায় যেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি ভারত-পাক যুদ্ধের পটভূমি ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং পাক সৈন্যের অস্ত্র ত্যাগ—এক নতুন জাতির অভ্যুদয়ের ইতিবৃত্ত দক্ষতার সঙ্গে লেখায় সংযুক্ত করেছেন। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বাঙালী এই বইটি পাঠ করে ভারত-পাক যুদ্ধের সুস্পষ্ট ছবিটি বুঝতে পারবেন।

Bengali Poems on Calcutta—Selected and transcreated by Subhoranjan Das Gupta and Sudeshna Chakravarti Writers workshop. 162/92 Lake Gardens Calcutta 700045 Special Edition Rs. 60 and popular edition Rs. 10.

বিচিত্র শহর কলকাতা। উদ্ভব কাল থেকে বিচিত্র মানুষ আর সমস্যা নিয়ে অবহেলিত কলকাতা আজও বেঁচে আছে। অসংখ্য মানুষের জীবনঘেরা এই শহর প্রাচীনকাল থেকে আকৃষ্ট করে আসছে কবি এবং শিল্পীদের। সৃষ্টিধর্মী রচনায় রয়েছে তার স্বচ্ছ প্রতিফলন। বাঙালী সংস্কৃতির ও সভ্যতার ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরের ইতিকথা যুগে যুগে প্রভাবিত করেছে শিল্পীর জীবন ও রচনাকে। কলকাতা নির্ভর রচনার সংকলন বাংলাভাষায় বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং সুদেষ্ণা চক্রবর্তী একটি সুদৃশ্য মনোরম কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছেন। সংকলনটি মূলে বাংলা থেকে অনূদিত ইংরেজি কবিতার। গ্রন্থটির অঙ্গসৌষ্ঠব এবং মুদ্রণ-পারিপাট্য বিস্ময়কর। পরিতোষ সেন এবং ডেসমন্ড জয়েগের অলংকরণ গ্রন্থটির স্বতন্ত্র আকর্ষণ।

অনুবাদ দুরূহ শিল্পকর্ম। তার মধ্যে কবিতার অনুবাদ সম্ভবত সব থেকে দুঃসাধ্য। শুধু ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, শব্দরূপ ও চিত্রকল্পের রূপান্তরকরণ গভীর রসবোধ ও সহমর্মিতার পরিচায়ক। তাছাড়া প্রয়োজন ব্যাপক ভাষাজ্ঞান।

বর্তমান গ্রন্থটি সম্পাদনায়, বিশেষ করে কবি ও কবিতা নির্বাচনে সম্পাদকদ্বয় যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। কিছু কবিতাকে সহজেই বাদ দেওয়া যেত। এমনকি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা সংগৃহীত হয়নি। এটাকে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসাবে মেনে নেওয়া দুষ্কর।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে তরুণতর কবিদের কবিতা আছে সংকলনে। কিন্তু অনুবাদের কোথাও কোথাও দুর্বলতা চোখে পড়ে। সহজেই বোঝা যায় এমন কিছু পংক্তির যথার্থ রূপান্তর হয়নি। সেকারণে অনুবাদে মূল অর্থ প্রতিরূপ পায়নি।

বাংলা ভাষার রচনা অনুবাদ প্রধানত অ-বাঙালী বা অভারতীয়দের জন্য। সুতরাং অনূদিত বক্তব্য তাদের উপলব্ধিগম্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সম্পাদকদ্বয় আরো যত্নবান হলে, সংকলনটি প্রতিনিধি স্থানীয় হতে পারত।

কিন্তু যা পারেননি তা থাক এঁরা যা করতে পেরেছেন তাও বড় কম নয়। কিছু বাংলা কবিতা (যার অনুবাদ উৎরে গেছে) যদি কয়েকজন অবাঙালী পাঠকেরও ভালো লাগে, ভবিষ্যতে আরো অনেক অনুবাদক একাজে উৎসাহিত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর সেইভাবেই বাংলা কবিতা নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হবে।

ছিন্ন তার : বীণা দেবী (কুণ্ডু) : পরিবেশক দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

অর্ঘ্য : বীণা দেবী (কুণ্ডু) প্রকাশক : নিত্যানন্দ ঘোষ, ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা, ২-৫০।

শ্রীযুক্তা বীণা কুণ্ডু অনেকদিন আগে 'পুরুষের মন' নামে এক গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 'ছিন্ন তার' তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত আটটি গল্পের সংগ্রহ। বিষাদ ও কারুণ্যের স্বাদ এই গল্পগুলির বিশেষত্ব, সেই সঙ্গে গল্প বলার ভঙ্গির সাবলীলতা আছে। 'স্মৃতির ঝর্ণা', 'অপমৃত্যু'র বিজলী, 'আলতা' গল্পের শিশুকন্যা আলতা—তার মা ও পিসি 'উপেক্ষিতা'র ইন্দ্রাণী, 'বাঘা' গল্পের ছোটো ছেলেটি টুটু আর তার প্রিয় কুকুর বাঘা—এইসব চরিত্র ও এদের বিচিত্র পরিস্থিতি লেখিকা মসৃণভাবে রূপায়িত করেছেন।

'অর্ঘ্য' বইখানিতে তাঁর মোট সতেরোটি গান ও কবিতা এবং ষোলোটি গদ্যনিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গানে ও কবিতায় আধ্যাত্মিক আকুতির লক্ষণ আছে, সেই সঙ্গে 'চাষীর গান', 'পাটচাষীর গান' প্রভৃতি রচনায় অন্য সুরও বিদ্যমান। তাঁর গদ্য-নিবন্ধগুলিতে ধর্মবিচার, সংযমের আদর্শ,—রবীন্দ্র-কাব্য, শরৎ-সাহিত্য, দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি সাহিত্য-প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে।

গদ্যে ও কবিতায় লেখিকার স্বাচ্ছন্দ্য প্রশংসনীয়। বই-দুখানির মুদ্রণ-প্রমাদই প্রধান ত্রুটি।

কালবৈশাখী অস্ফুট চেতনা (কাব্য সংকলন)। ঋদ্ধি ভট্টাচার্য। শোভনা প্রকাশনী, ১৯, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। তিন টাকা।

শ্রীঋদ্ধি ভট্টাচার্যের বর্তমান গ্রন্থের কবিতাগুলি অপরিণত কবিমানসের ফসল। অধিকাংশই গদ্য কবিতা। কয়েকটি কবিতায় অন্ত্যমিল থাকলেও, চরণবিন্যাস ও স্তবক-বন্ধ রচনায় গদ্যকবিতার রীতি অনুসৃত হয়েছে। কবিতাগুলিতে কোন নতুন বক্তব্য নেই। শুধু ব্যক্তিগত কিছু আবেগ উচ্ছ্বাস দিয়ে যে কবিতা লেখা যায় না, কবির তা বোঝা উচিত ছিল।

সময় নিহত ঘুমে (কাব্যগ্রন্থ)—প্রেমময় দাশগুপ্ত। বিনোদবিহারী, কটক-২। পাঁচ টাকা।

এই সময় এবং সমকালীন জীবনের দুঃখ, শোক, বেদনা ও ব্যর্থতা প্রেমময় দাশগুপ্তের কবিতার উপাদান। এবং কবিতাগুলি নিহত নয়, আহত অবস্থায় লেখা। এই চাঁদ, এই আকাশ, এই পৃথিবীর প্রতি গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও প্রেমময় দাশগুপ্ত লক্ষ্য করেন : 'দুরন্ত হারিয়ে চাঁদ আর পৃথিবী এখন ভয়ঙ্কর মুখোমুখি/ মুখোমুখি স্বপ্ন ও বাস্তব।' কেননা, অসীম শূন্যতা নিয়ে এখন তিনি ক্লান্ত এবং বিপন্ন।

সংকলনটি দ্বিভাষিক নয়। তবে প্রতিটি কবিতার ওড়িয়া ট্রানস্লিটারেশন ছাপা হয়েছে পাশাপাশি। বইটি অনেকের কাছেই ভালো লাগবে।

১৯৭৩ কেমন যাবে? ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা (জ্যোতিষগ্রন্থ)— ভৃগুজাতক। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২। দাম—২ টাকা।

ভাগ্য গণনার ক্ষেত্রে এবং জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে শ্রীভৃগুজাতক সুপরিচিত লেখক। গত বছর তাঁর '১৯৭২ কেমন যাবে' বইটি যথেষ্ট জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ বছর বেরিয়েছে '১৯৭৩ কেমন যাবে?' বইটি তার পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। যাঁরা এ বিষয়ে উৎসাহী বইটি তাঁদের কাজে লাগবে।

জান-মান-মাটি (উপন্যাস)—বিকাশ। আলফা-বিটা পাবলিকেশনস, ৫৫।১ কলেজ স্ট্রীট (তেতলা), কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

বিকাশ রচিত 'জান-মান-মাটি' উপ-ন্যাসের নায়ক জগবন্ধু ও নায়িকা কুমুদিনী। এক সময়ে বিপাকে পড়ে কুমুদিনীদের সংসার ভেঙে যায়। কুমুদিনী ভাগ্যের তাড়নায় ঘুরতে ঘুরতে মাকে ফেলে রেখে ভাইকে নিয়ে পতিতালয়ে আসে। কিন্তু অন্যান্য মেয়েদের মত দেহজীবী হওয়ার পথে তার মন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই যন্ত্রণাময় অস্তিত্ব থেকে অব-শেষে মুক্তি দেয় ওর মাস্টারমশাই এবং প্রেমিক জগবন্ধু। এদের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিউটি ও রণেনের পার্শ্ব-কাহিনী। লেখকের কাহিনীগ্রন্থন মেলো-ড্রামাটিক হলেও যাঁরা গল্প পড়ে আনন্দ পেতে চান, এতে তার খোরাক আছে। পতিতাদের সম্পর্কে পুরনো কথার ক্লান্তি-কর পরিবেশন গল্পরসপিপাসুদের রস-গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করবে না।

এটা ঠিক সময় নয় (কাব্যগ্রন্থ) : সত্যদাস মণ্ডল। ২৫৩ মহারাজ নন্দকুমার রোড (নর্থ), কলকাতা-৩৫। দাম : তিন টাকা

আক্ষরিক অর্থেই বইটির নাম সার্থক। সময়ের সংশয়, পীড়ন ও যন্ত্রণার মধ্যে অধিকাংশ কবিতা লেখা। তবে, যে-রকম নৈপুণ্য ও শিল্পদৃষ্টি থাকলে, সময়ের অন্তঃরহস্যকে উদ্ঘাটন করা যায়, সেই অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কোনো কবিতাই লেখা হয়নি। মনে হয়, নিয়ত আত্মসচেতন থাকলে, তিনি ভালো কবিতা লিখতে পারবেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সম্বন্ধনা : (ধর্মীয় পত্রিকার জয়দেব সংখ্যা)—সম্পাদক : বীরেন মল্লিক ও গৌরী-পদ গাঙ্গুলী। মনোহর সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে ২৩।এ, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হতে প্রকাশিত। মূল্য ১-২৫ পয়সা।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতী (ক্ষেপা মনোহর ঠাকুর) প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মীয় পত্রিকাখানির বর্তমান সংখ্যাটি যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ সে দলে আছেন—সর্বাগ্রে ক্ষেপা মনোহর ঠাকুর, যাঁর 'গুরু শিষ্য উবাচ' লেখাটি বিরাট ধর্মীয় দার্শনিক তথ্যের নিদর্শনস্বরূপ। এরপরই হরিপদ বসুর 'দেশবন্ধুর ধর্মজীবন' ও ব্যোমকেশ মজুমদারের কবিতা ও বনমালী ভট্টাচার্যের 'মাতৃ আরাধনা' মনোজ্ঞ হয়েছে। শ্রীব্রজেন্দ্র-চন্দ্র সর্ববিদ্যা ও বিমলজ্যোতি দাসের লেখা দুটিও মনে রেখাপাত করে।

সত্তরের কবিতা (সপ্তম সংকলন) : সম্পাদক কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। ৩৮এ প্যারী-মোহন রায় রোড, কলকাতা-২৭। দাম —এক টাকা।

খুব হাল্কা মেজাজের প্রবন্ধ, কবিতা বিষয়ক রম্যরচনা, সত্তরের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পূর্বতন কবিদের অসারতাবিষয়ে নানারকম মন্তব্যে পত্রিকাটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাই উত্তেজক। সিরিয়াস আলোচনাও আছে দু-একটি। লিখেছেন নগেন্দ্র দাশ, সমীর দাশগুপ্ত, কমল চক্রবর্তী, মনোজ নন্দী, সুকোমল রায়চৌধুরী এবং কয়েক-জন।

শিশুতীর্থ। সম্পাদক : বীরেন গুপ্ত। ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম এক টাকা।

শিশুদের জন্য কোন সচিত্র মাসিক পত্রিকা আজকাল প্রায় দুর্লভ। আমাদের শিশু সাহিত্যে এমন সময় বোধহয় আর কখনও আসেনি। আর এ-সময়ে যখন শিশু-দের জন্য কোন সচিত্র মাসিক আমাদের হাতে চলে আসে তখন আর আনন্দের সীমা থাকে না। শিশুতীর্থের আত্মপ্রকাশ এদিক থেকে এক সত্যিকারের দুঃসাহসিক প্রয়াস।

কাগজটি প্রায় নিঃশব্দে বছর ঘুরে এল। এর লেখক এবং পাঠকরা বার বার নিজেরা নিজেদের চিনে নিতে এতটুকু সময় নষ্ট করেনি। শিশুদের জন্য যে এক আলাদা জগত আছে, যেখানে কাঠবিড়ালী, প্রজাপতি, নানাবর্ণের পাখি এবং সকালে জানালায় রোদ এলে পৃথিবীকে অন্যভাবে চেনা যায়—এ পত্রিকা পাঠে জানা যায় তা গভীর ভাবে।

লিখেছেন অর্পণা রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, বেগম সুফিয়া কামাল, লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কবিতা সিংহ, কামাক্ষীপ্রসাদ, প্রভাতরঞ্জন গোস্বামী, উষা ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কৃতী সোম, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

(১০)

একদিন সকালে লাবু এসেছিল।

লাবু বলল, আমাদের বাড়ির দিকে যাবেন? আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।

আমি বললাম আগে রসগোল্লা খাও, তারপর যাব।

লাবু অত্যন্ত আপাত-আপত্তিসহকারে গোটা আষ্টেক রসগোল্লা খেল। তারপর বলল, দাদাকে বলবেন না যেন আমি রসগোল্লা খেতে চেয়েছিলাম।

আমি বললাম, তুমি ত খেতে চাও নি। আমিই তোমাকে সেদিন জিগগোস করে-ছিলাম তুমি কি খেতে ভালবাস। তোমার এতে দোষ কি? আর তুমি না আমাকে দাদা বলো। দাদার কাছে যদি আবদারও করতে তাতেও বা দোষের কি ছিল।

লাবু বলল, নাঃ, এমনিই, তবুও বলবেন না কিন্তু।

লাবুর সঙ্গে লাবুদের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

অনেকটা পথ।

শালের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পথ। এককালে হয়ত পথটা চওড়া ছিল, তখন হয়ত গাড়িও যেতে পারত এ পথে, কিন্তু এখন দুধারে ঝাঁটি জঙ্গলে ছেয়ে গেছে—পথ বলতে এখন একটা পায়ে-চলা পথই আছে। এঁকে-বেঁকে গেছে সুঁড়ি পথ—দুধারে গাছ-গাছালি ঝুঁকে পড়ে চাঁদোয়ার মত একটা আচ্ছাদনের সৃষ্টি করেছে।

ডানদিকে একটা পাহাড়—পেয়ারার বনে ভরা—এককালে হয়ত কারো পেয়ারা-বাগান ছিল।

লাবু বলল, জানেন সুকুদা, এই পাহাড়ে আমার বাবা ভালুক শিকার করেছিলেন।

বললাম, তোমার বাবাকে তোমার মনে আছে?

মনে নেই। আমার মনে নেই। আমি ত তখন দু বছরের ছিলাম, যখন বাবা মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। আমি মার কাছে গল্প শুনেছি।

শাল সেগুনের জঙ্গলে বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর কতগুলো আম ও পেয়ারা গাছের ঝুপাড়ির আড়ালে একটা জরাজীর্ণ দু-কামরা বাড়ি চোখে পড়ল।

বাড়িটা প্রায় ভেঙে পড়েছে। দরজা-জানালা যে-কোন সময়ে খুলে পড়ে যেতে পারে। বাইরের বারান্দায় একটা পাল চট দিয়ে ঘেরা। মহুয়া—গত বছরের তোলা মহুয়া—ডাঁই-করা আছে এক কোণায়, তার পাশে খোঁটায় বাঁধা একটা লাল-রঙা বাছুর বড় বড় চোখ মেলে পায়ের উপর মুখ রেখে শুয়ে আছে।

লাবু সেই বারান্দায় একটা হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারে আমাকে বসতে বলে বলল, বসুন সুকুদা, আমি মাকে ডেকে আনছি।

আমি বললাম, তুমি আমাকে কি যেন দেখাবে বলেছিলে?

লাবু ওর ভাঙা দাঁত বের করে সরস লাজুক হাসি হাসল, হেসে বলল, দেখাব, দেখাব, আপনি ত এক্ষুনি পালাচ্ছেন না।

আমাকে বসিয়ে রেখে লাবু চলে গেল।

চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। দারিদ্র্য চতুর্দিকে বাঙময় হয়ে রয়েছে। দারিদ্র্য মানে, চরম দারিদ্র্য। জানি না কি করে ওদের দিন চলে। হয়ত এই রকম জায়গা বলেই এখনো চলে, কোনরকমে চলে—কোলকাতার মত কোন নিষ্ঠুর নির্দয় জায়গা হলে হয়ত এতদিনে এদের চলা থেমে যেত।

চারিদিক থেকে ঘুঘু ডাকছে। বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে গরু ডেকে উঠল। কোথায় কে যেন কাঠ কাটছে—তার শব্দ পাহাড়ের তলা অবধি গাছে গাছে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক দল ছাতারে বাড়ির হাতার পিটীস ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এসে শীতের রোদে সভা বসিয়েছে।

চারিদিকে নিবিড় শান্তি, স্তব্ধ সৌন্দর্য, তার মাঝে এই জরাজীর্ণ বাড়ি। বাড়ির মধ্যে লাবু থাকে তার মা ও দাদাকে নিয়ে। এ বাড়িতে বর্ষায় ওরা কি করে থাকে ভাবছিলাম। ভাবতেও অবাক লাগছিল।

দরজার দুপাশে অযত্নবর্ধিত দুটি লতানে গোলাপের গাছ। ছোট ছোট সাদা ফুল ধরেছে তাতে। এক জোড়া বুলবুলি ফিসফিস করে কি যেন বলতে বলতে তাতে দোল খাচ্ছে।

ওখানে বসে নিজের ভাবনার মধ্যে নিজে কখন বেহুঁশ হয়ে গেছিলাম, হঠাৎ লাবুর গলা শুনলাম, সুকুদা, এই যে আমার মা।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম।

ভদ্রমহিলা তাঁর তোরঙ্গের কোণা থেকে বের করা ভাঁজ-ভাঙা ন্যাপথালিনের গন্ধ-ভরা সবচেয়ে ভাল কাপড়খানি পরে এসে-ছিলেন।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—লম্বা আগুনের মত গায়ের রঙ—এক সময় ছিল—এখন রোদে-জলে-ঝড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তবু, চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। আভিজাত্য কখনো সহজে মোছে যায় না—তার রঙ বড় পাকা—রোদ জল, দুঃখ-দারিদ্র কিছুই পারে না সেই রঙকে ম্লান করতে—যদি অন্তরে দারিদ্র না থাকে।

উনি বললেন বসো বাবা বসো। লাবুর কাছে তোমার অনেক গল্প শুনেছি। সেদিন তুমি মান্দার থেকে লাবুর জন্যে মিষ্টি পাঠিয়েছিলে না পেয়েছিলাম। লাবু তোমার খুব ভক্ত হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ডাবু কোথায়?

সে ত স্কুলে গেছে। সেই ভোরে বেরিয়ে যায়—পাঁচ মাইল পথ—আবার স্কুল সেরে ফিরতে সন্ধ্যে। ফিরে এসেও বাড়ির কাজ করতে হয়। আমার অসুখ হলে রান্না-বান্না সব ওই করে।

তারপর বললেন, আমার লাবুও কিন্তু অনেক কাজ করে। না করলে চলবে কি করে বল? ওদের কপালে ছিল কষ্ট করা, কষ্ট করতেই হবে, যতদিন না ওরা বড় হয়, নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়ায়। আমি নিজের সুখের আশা আর রাখি না, ওরা যদি বড় হয়ে একটু সুখের মুখ দেখে—এই ভেবেও আমার ভাল লাগে।

বললাম, লাবুর বাবা এখানে কি করতেন?

উনি খিলাড়ির সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন। সে সময়ে

এই বাড়ি বানিয়েছিলেন উইক-এন্ডেও এসে পিকনিক করার জন্যে, ছুটি কাটাবার জন্যে। তখন ত ভাবি নি যে উইক-এন্ডে ছুটি কাটানোর আস্তানায় সারাজীবন কাটাতে হবে।

এই অবধি বলেই উনি বললেন, তুমি বসো বাবা, তোমার জন্য একটু চা করে আনি।

আমি বললাম, আমি তো চা এক্ষুনি খেয়ে এলাম।

—তা না হয় খেয়েই এলে, জীবনে এই প্রথমবার আমার বাড়িতে এলে, একটু কিছু না খেলে হয়।

তারপর যাবার সময় বললেন, লাবু ততক্ষণে তোমার দাদাকে তোমার বাবার ছবিগুলো দেখাও।

লাবু একটু পরে একটা রুপোর পানের ডিবে নিয়ে এল। বেশ বড় সাইজের ডিবে—ধুলো পড়ে রুপোর রূপ আর কিছু অবশিষ্ট নেই তার। ডিবে খুলে আমার হাতে দিয়ে, লাবু বলল, এই যে ছবি দেখুন সুকুদা। তারপরই অনেকগুলো ছবি ঘেঁটে লাবু একটা ছবি বের করে বলল, এটা আমার অন্নপ্রাশনের ছবি, দেখুন ঃ, আমি কেমন গোল ছিলাম।

দেখলাম একটি বাচ্চা ছেলে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে তার সুন্দরী যুবতী মায়ের কোলে বসে আছে। চতুর্দিকে সুবেশা আত্মীয়দের ভিড়। বিরাট প্যাণ্ডেলের পট-ভূমিতে লাবুবাবু মায়ের কোলে চড়ে তার অন্নপ্রাশনের দিনে ভীষণ কাঁদছেন।

আমি বললাম, আরে, তোমাকে ত চেনাই যায় না, তুমি ত দারুণ ফর্সা আর গোল-গাল ছিলে।

লাবু সগর্বে ও সলজ্জে বলল হ্যাঁ।

লাবুর বাবার ছবি দেখলাম।

লম্বাচওড়া সুপুরুষ ভদ্রলোক। সেডান-বডি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। স্যুট পরে অফিসে বসে কাজ করছেন। কোনটা বা শিকারের পোষাকে বন্দুক হাতে ছবি।

উনিশশ সাতচল্লিশের পর পরই পূর্ব বাঙলার রিফিউজীরা—তাদের কখনও পূর্ব বাংলায় কিছু ছিল একথা বললেই, পশ্চিমবঙ্গীয় স্থায়ী বাসিন্দারা যেমন অনেকেই তা শ্লেষের সঙ্গে অকারণে অস্বীকার করতেন, এই ছবিগুলো প্রমাণ-স্বরূপ না থাকলে লাবুদের অতীতকেও বোধহয় সকলে তেমনি অক্লেশে অবিশ্বাস করত। অন্তত বেশীর ভাগ লোকই করত।

তাই-ই বোধহয় এত যত্ন করে ছবি-গুলোকে রাখা—কেউ এলেই প্রথমেই তাকে ছবিগুলো দেখালে—তাকে মিনতি করে চোখের ভাষায় বলা যে, আজ যা দেখছ এইটেই সত্যি নয়—আমরা আগে অন্যরকম ছিলাম।

টাকা-পয়সা স্বচ্ছলতা এ সব কিছুই নয়। আজ আছে কাল নেই। অথচ স্বচ্ছলতা থাকা আর না থাকায় কতবড় তফাং। স্বচ্ছলতা থাকার সময় অস্বচ্ছলতার গ্লানি ও ক্লেশের কথা ভাবাও মুশকিল। সে কথা মনেও পড়ে না।

বসে বসে ফোটোগুলো নাড়তে-চাড়তে ভাবছিলাম, রমা এ দিকটাও কখনো ভাবে না। ভাবার প্রয়োজন মনে করে না—কারণ লাবুর মার কাছে যেমন, রমার কাছেও তেমন স্বচ্ছলতাই বড় কথা। লাবুর মা স্বচ্ছলতার জন্যে লাবুর বাবার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। রমা আমার উপর তা নয়। সে নিজের রোজগারে নিজে খেতে পারে, সে কোনো ব্যাপারেই আমার উপর নির্ভরশীল নয়। আমি তার জন্যে কিছুমাত্র করি নি, আর কিছু যে করব সে ভরসাতেও ও বসে নেই। ইদানীং এ কথাটা সে কারণে-অকারণে আমাকে বহুবার শোনায়, যে, ইচ্ছা করলেই আমি যা রোজগার করি তার-চেয়ে অনেক বেশী গুণ সে রোজগার করতে পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, রোজগার করাটাই কি দাম্পত্য জীবনের সিমেন্টিং ফ্যাকটার? লাবুর মার রোজগার করার ক্ষমতা নেই বলেই কি আজও লাবুর বাবার অভাব উনি এমনভাবে বোধ করেন? তাঁর মৃত্যুর পর ওঁদের অবস্থা এতটা অস্বচ্ছল না হলে কি সহজেই উনি তাঁর স্বামীকে ভুলে যেতেন? জানি না। হয়ত যেতেন। তাই-ই যদি হয়, তাহলে ভালোবাসা কি? ভালো-বাসা বলে কি কিছুই নেই?

আজকাল মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সব বদলে গেছে। অথবা আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে যে আমার একারই বুঝি এই সম্পর্কটা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আরসব বিবাহিত লোকই বোধ-হয় দারুণ খুশী। অথবা তাঁরা বোধহয় স্বচ্ছলতা পেলেই, শনিবারে সিনেমা দেখলেই রবিবার দুপুরে ভরপেট খেয়ে পানমুখে দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে শুতে পেলেই নিজে-দের পরম সার্থক স্বামী বলে মনে করেন? তাও বোধহয় নয়।

যথার্থ সুখী দম্পতি হয়ত নিশ্চয়ই আছেন—অন্তত অনেককে ত দেখি। তাঁরা কি অন্য কারো সুখ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা সুখী হয়েছেন? জানি না।

একটু পরই লাবুর মা এলেন, একটা কাঠের ট্রেতে বসিয়ে—ট্রের উপর হাতে-বোনা লেসের বহু-পুরোনো ম্যাটস্ পেতে পুরোনো দিনের জাপানী রেকাবে করে চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে দুটি বিস্কুট। বললেন, খাও বাবা। খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তারপর বললেন, বৌমাকে নিয়ে এক-বার এসো আমাদের বাড়ি। তুমি ত এখানে অনেকদিন আছ, থাকবেও ত শুনি বেশ কিছুদিন, কই? বৌমা ত এলেন না?

আমি বললাম, তিনি কোলকাতাতেই আছেন, নানারকম ঝামেলা, তার উপর ছেলের স্কুলের পড়াশুনা দেখতে হয়—তিনি আসতে পারেন না। যদি আসেন এখানে থাকেনও, ত নিয়ে আসব।

চা খেতে খেতে ভাবছিলাম যে, যদি রমা কখনও আসেও এখানে, তাহলেও কোনদিনও এ বাড়িতে আসবে না। না—আসার অন্য কোনো কারণ নেই। যেহেতু আমি অনুরোধ করব সেজন্যেই আসবে না। আমি জানি, ও বলবে পাবলিক রিলেশনস করতে ত এখানে আসি নি—আমার যার-তার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। আমি একজন যথেষ্ট ইম্পর্ট্যাণ্ট লোক।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে লাবু বলল, কি? চা-টা খান। তারপরে আপনাকে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, কি দেখাবে কি?

লাবু বলল, চলুনই না।

চায়ের কাপটা শেষ করে উঠে লাবুর মাকে বললাম, চলি মাসীমা।

উনি হেসে বললেন, যাওয়া নেই, এসো বাবা। আবার এসো।

লাবুর সঙ্গে জঙ্গলের ভিতরে যেতে যেতে ভাবছিলাম, আমাদের এই মাসীমা-পিসীমারা একেবারেই বদলান নি। স্ত্রীরা বদলে গেছে, ভাই-বোনেরা বদলে গেছে বড় তাড়াতাড়ি। গত প্রজন্ম থেকে এ প্রজন্মের অনেক তফাং অনেক ব্যাপারে। কিন্তু এই জরাজীর্ণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা জঙ্গলের মধ্যের পর্ণকুটিরের মাসীমা—গত প্রজন্মে যেমন ছিলেন এ প্রজন্মেও তেমনই আছেন। তাঁদের উপরে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের হৃদয়হীনতার, যান্ত্রিকতার কোনো প্রভাব পড়ে নি।

লাবু আমাকে ওদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে হাঁটিয়ে নিয়ে এল।

জায়গাটায় ভীষণ জঙ্গল। একটা নুড়ি-ভরা টিলা মত আছে সামনেই। তার পিছনেই একটা ঝরণা। টিলার গায়ে একটা গুহা। ছোট্ট গুহা।

লাবু সাবধানে গিয়ে গুহার মুখ থেকে পাথরটা সরালো। তারপর বলল, ভিতরে যেতে হবে।

আমি বললাম, ঢুকব কি করে?

ও বলল, আমি যা-করে ঢুকছি। বলেই, লাবু অবলীলায় ভিতরে ঢুকে গেল। ওর দেখাদেখি আমিও মাথা নীচু করে ভিতরে ঢুকলাম।

ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম।

গুহাটা বেশ বড়। চার-পাঁচজন লোক পাশাপাশি আরামে শুয়ে থাকতে পারে।

গুহার একদিকে একটা পুরোনো চট পাতা। সেই চটের উপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা জরাজীর্ণ একটি 'চাঁদের পাহাড়' বই। একটা লালরঙা ছেঁড়া তাঁতের শাড়ি, একটা ছেঁড়া প্রমাণসাইজের জুতো এবং যাত্রাদলে ব্যবহার করা রাংতা-মোড়া একটা তরোয়াল।

লাবু ফিসফিস করে বলল, এটা রাজার গুহা। রাজার সব আছে, শুধু টুপী নেই। একটা টুপী হলেই রাজা ঠিকমত রাজত্ব চালাতে পারে।

আমি অবাক হয়ে ওখানে বসে পড়লাম।

গুহাটার গড়ন আশ্চর্য। মাথাটা পুরো ঢাকা অথচ চার পাশে এমন ফাঁক-ফোকর যে প্রচুর আলো আসে ভিতরে—এত আলো যে, স্বচ্ছন্দে বই পড়া যায়।

লাবু বলল, বর্ষাকালে, আমি এখানে বসে বৃষ্টি দেখি, অথচ আমার গায়ে

একটুও ছাট লাগে না। এমনকি মাথাতেও জল পড়ে না।

আমি বললাম, সত্যি! তোমার সিংহাসনটা দারুণ।

লাবু আবার হাসল, নির্মল খুশীতে ওর লালচে রুক্ষ মুখটা আর কটা চোখটা ভরে গেল।

লাবু বলল, শুধু টুপী নেই; আর রাণী নেই।

আমি বললাম, তোমাকে একটা টুপী আমি আনিয়ে দেব রাঁচী থেকে।

লাবু সোজাসুজি ওর খসখসে গলায় আমার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, কবে?

আমি বললাম, যত তাড়াতাড়ি পারি।

পরক্ষণেই লাবু বলল, আর রাণী?
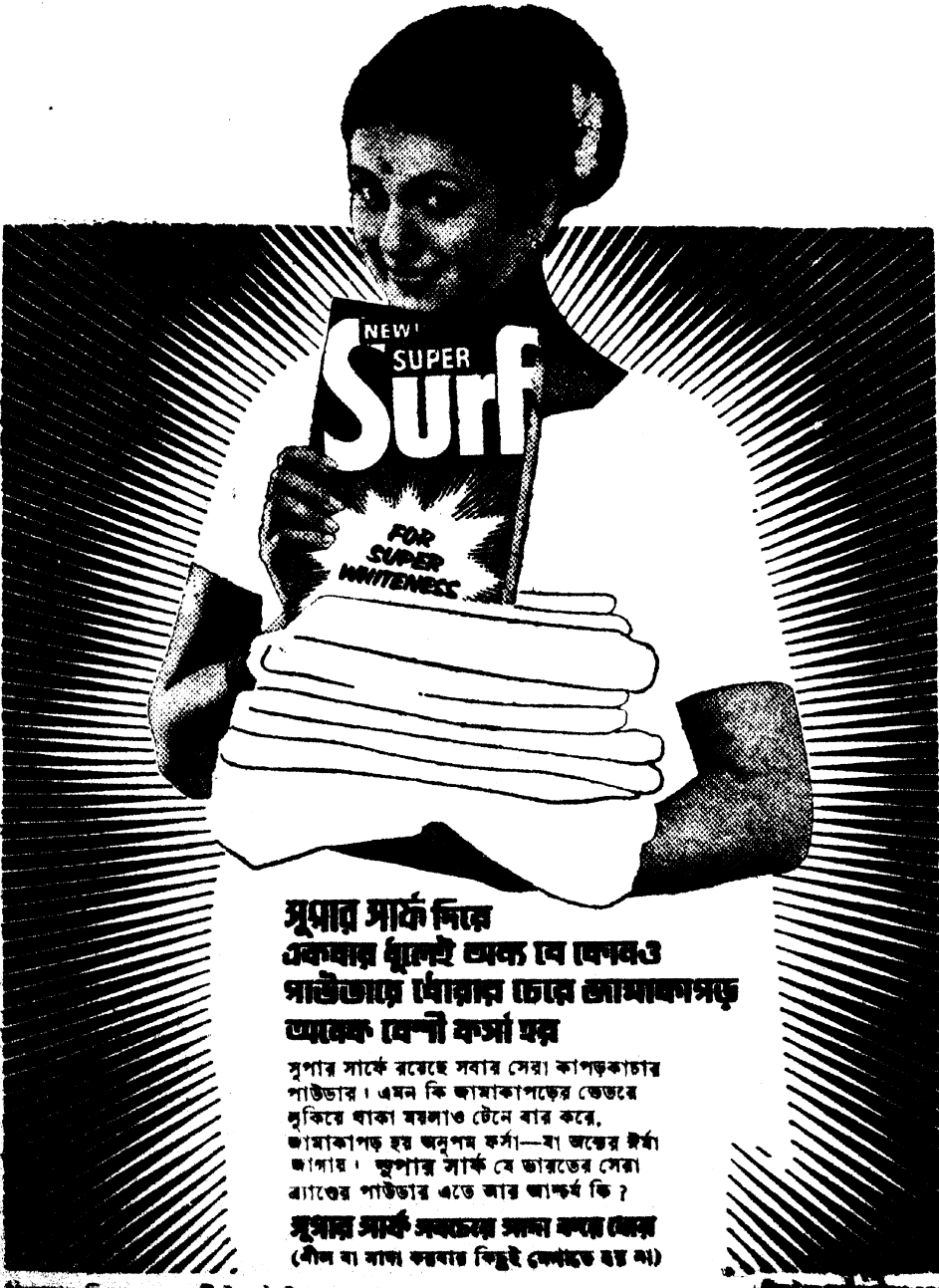
আমি হেসে ফেললাম। বললাম, কোনো রাজাকে কি কেউ রাণী দিতে পারে। রাজার নিজে যেতে হয় ঘোড়ায় চেপে—রাণীর স্বয়ংবর সভায় পৌঁছতে হয়—রাণীর পছন্দ হলে তবে রাণী তোমার গলায় মালা পরিয়ে দেবে। তখন ঘোড়ায় চড়িয়ে রাণীকে নিয়ে আসতে হবে।

লাবু দু হাত দুদিকে তুলে প্র্যাকটি-কাল গলায় বলল : আমার তবে রাণী হবে না। হবে না।

আমার খুব মজা লাগছিল ওর হাবভাব দেখে। আমি বললাম, কেন? রাণী হবে না কেন?

লাবু দার্শনিকের মত বলল, সে অনেক

ঝামেলা। নিনটন সাহেবের একটা টাট্টু-ঘোড়া ছিল। একদিন গরু চরিয়ে ফিরছি দেখি সেটা একা একা পানয়ানা টাঁড়ে চরে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবলাম, এই বেলা একটু ঘোড়া চড়েনি। ছাগলে চড়েছি, গরুতে চড়েছি, শুধু ঘোড়া চড়িনি। তারপর না সুকুদা—যেই-না তড়াক করে ওর পিঠে চড়ে ওর কান ধরেছি, পেছনের দুপা তুলে এমন এক লাফ লাগালো যে আমি শূন্যে তিন ডিগবাজী খেয়ে একেবারে ধাঁই করে গিয়ে পড়লাম একটা পাথরে। হাঁটুতে যা লেগেছিল না। সেই থেকে আমি ঐ হাঁটুটা মুড়ে বসতে পারি না। থাক সুকুদা, রাণী টানির দরকার নেই। নিজেই চড়তে পারি না, তার আবার রাণীসুদ্ধ ঘোড়া চড়া।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, রাজপাট ত দেখা গেল, কিন্তু প্রজারা কোথায়?

লাবু দুষ্টুমীর হাসি হাসল। বলল, আছে: দেখবে।

বলেই গুহার মধ্যে থেকে একটা শিল-পাটার সাইজের চ্যাটানো পাথর সরিয়ে ফেলল দু হাত দিয়ে। পাথরটি সরাতেই একটা ফোকর হয়ে গেল—আর সে ফোকর দিয়ে যা দেখলাম, তাতে দু চোখ জুড়িয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, টিলাটা একটা চড়াই-এর শেষে—গুহাটার অন্য পাশে সোজা খাদ নেমে গেছে প্রায় পঞ্চাশ ফিট। নীচ দিয়ে একটা পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে। গুহাটার ঠিক সামনে একটা বাঁক নিয়েছে নদীটা। নদীর ওপাশে গভীর জঙ্গল। এখন দুপুরের রোদে শান্ত সবুজ জেল্লা দিচ্ছে গাছ-পাতা থেকে।

লাবু বলল, সন্ধ্যের আগে আগে এখানে এলে, এসে বসলে, দেখতে পাবে, কত প্রজা আমার। কত পাখি—কব-কব—ঘুঘু, টিয়া, ডাহুকে, বুলবুলি, বনমুরগী, তিতির, বাটর, চাবপাখি টি-টি পাখি, আরো কত কি! হরিয়াল পাখিরাও ঐ দিকের অশথের ডাল থেকে নদীতে জল খেতে নামে। যখন নামে, তখন ঠোঁটে করে পাতা ভেঙে নিয়ে এসে বালির উপর রেখে তার উপর পা দিয়ে দাঁড়ায়। হরিয়ালেরা কখনো পা মাটিতে ফেলে না, জানেন না তা?

আমি বললাম, না ত।

লাবুকে তখন কথা বলার নেশায় পেয়ে-ছিল। বলল, আরো কত প্রজা আমার। কাঠবিড়ালি, খরগোশ, সজারু, বুনোশুয়োর, হায়না, ভোমরী, লেকড়ে, সবাইকেই দেখতে পাবে। একসঙ্গে নয়, মাঝে মাঝে।

এই অবধি বলে, লাবু হঠাৎ চুপ করে গেল।

তারপরই বলল, আচ্ছা, রাজা মরে যাবার পর রাজত্ব কে পায়?

বললাম, কেন? রাজার ছেলে পায়।

লাবু বলল, ধ্যাৎ। দেখছ, রাণীই নেই আমার, হবেও না। ছেলে পাব কোত্থেকে?

আমি বললাম, এতটুকু রাজার মরার কথা উঠছে কি করে?

লাবু চোখ বড় বড় করে বিজ্ঞের মত বলল, মরার কথা কেউই বলতে পারে? তার-পর মাথা নাড়িয়ে বলল, মরার কথা কেউই বলতে পারে না। বলো না সুকুদা, রাজার ছেলে না থাকলে রাজত্ব কে পায়?

আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, রাজা যাকে দিয়ে যান, সেই পায়।

তাইই! সত্যি? তাইই? লাবু আমাকে শুধোল।

তারপর বলল, তাহলে ভালই হল। তোমাকেই আমি দিয়ে যাব। আমি মরলে।

আমি বললাম, এবার অন্য কথা বল।

লাবু নাছোড়বান্দা। বলল, আচ্ছা রাণী আনতে ত ঘোড়া করে যায়, স্বর্গে যেতে কিসে করে যায়?

বললাম, কি করে জানব? আমি কি গেছি?

তুমি যাওনি ত কি? বাবা ত গেছে। মা বলেছিলেন আমাকে চাব পাখির পিঠে করে যায়।

বললাম, চাব পাখি মানে ঐ বড় বাদামী লেজ-ঝোলা পাখিগুলো? ওগুলোকে আমি কুম্ভাটুয়া বলি।

তুমি যা-খুশী বল, ওগুলো চাবপাখি। গভীর রাতে কেমন ডাকে দ্যাখোনা? চাব-চাব-চাব-চাব-চাব। স্বর্গে যেতে হলে চাব-পাখির পিঠে চড়ে যেতে হয়। আমার রাজত্বে ত ওরা অনেক আছে। স্বর্গে যেতে তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নেই? কি বল?

তারপরেই বলল, ধ্যাৎ তেরী, যা বল-ছিলাম, আমার তোমাকে খুব ভাল লাগে। আমার রাজত্ব আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

আমি হাসলাম, শুধোলাম, আমাকে কেন ভাল লাগে লাবু? কি কারণে?

লাবু আর আমি গুহা থেকে বাইরে আসছিলাম, গুহার পাথরটা ঠিক করে বসিয়ে রাখতে রাখতে লাবু লাজুক মুখে বলল, এমনিই।

এমনিই আবার কারো কাউকে ভালো লাগে না কি? আমি বললাম।

মানে, এই গুহার মধ্যে আমার এই ছোট্ট ঘরে এলে যেমন লাগে, তোমার কাছে গেলে আমার তেমন লাগে সুকুদা। তোমার কাছে গেলে আমার ভাল লাগে।

লাবু পাথরটা বসিয়ে রেখে আগে আগে নামছিল।

আমি ওর পিছনে পিছনে নামছিলাম।

আমি কি করে এই সরল অপাপবিদ্ধ শিশুকে বলব জানি না, ওকে বলা যায় না, যে নিজের উষ্ণতার জন্যে অন্য কারো উপরে নির্ভরশীল হতে নেই, হলেই তার কপালে আমারই মত দুঃখ।

এসব কথা ও এখন বুঝবে না। ও একটানা অনবধানে ওর শিশুসুলভ ভাষায় যে দামী কথাটা বলে ফেলল, ওর বয়ঃসন্ধির যৌবনে, ওর প্রসন্ন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে ঐ কথাটাই ও নতুন করে শিখবে, জানবে, ভাববে।

সেদিন ও বুঝতে শিখবে, পরনির্ভর-তার মত অর্বাচীনতা আর বুঝি কিছু নেই। ও সেদিন জানবে, নিজের হৃদয়ের উষ্ণতায়, নিজের মনের জেনারেটরে তাপ সঞ্চারণ করে এই ঠাণ্ডা নির্দয় পৃথিবীতে বাঁচতে যে না পারে, তার বাঁচা হয় না। তার জন্য এই পৃথিবী একটি চলমান প্রাগৈতিহাসিক হিমবাহ।

টিলা থেকে নেমে লাবুকে বললাম, লাবু তোমাকেও আমার খুব ভাল লাগে। তোমার যখনই ইচ্ছা করবে, চলে আসবে। কোনো লজ্জা করবে না। আমার বাড়িতে যদি অতিথি থাকে তখনও লজ্জা করবে না; বুঝেছো। তারপর একটু থেমে বললাম, তোমাকে আমারও খুব পছন্দ। তুমি এলে আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।

লাবু বলল, বেশ। তারপর বলল, আমার গুহাটা, মানে আমার রাজত্ব তোমার ভাল লাগেনি?

আমি বললাম, ভাল মানে? দারুণ লেগেছে। আজ থেকে তোমার নাম দিলাম, রাজা লাবু।

লাবু হেসে ফেলল। বাঁহাত দিয়ে কপালে-পড়া চুল সরিয়ে বলল, তুমি ভীষণ মজার। তুমি খুব ভাল, জানো সুকুদা, বলেই এগিয়ে এসে লাবু আমার হাত ধরে ঝুলে পড়ল।

(এগারো)

বলা নেই কওয়া নেই, সেদিন সাত-সকালে শৈলেন এসে উপস্থিত। শৈলেন ঘোষ।

গেট খুলে ঢুকতে ঢুকতেই চেঁচিয়ে বলল, দাদা, খাওয়ার কি আছে? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

যখন কাছে এসে পেয়ারাতলায় চেয়ার টেনে বসলো তখন বললাম, কি খাবে বল?

ও বলল, কি খাব না তাই বলুন? কি আছে?

বললাম, কি চাই।

ইতিমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে লালি এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

শৈলেন নিজেই শুধোলো কি আছে ঘরে?

লালি বলল আণ্ডা হ্যায়।

শৈলেন বলল, কেঠো আণ্ডা হ্যায়?

লালি বলল, এক ডজন।

তব ছেঠো আণ্ডাকা ওমলেট বানাকে লাও, জলদি, ঔর চায়ে।

লালি ওকে বোধহয় বিশ্বাস করল না। শুধোলো, ছে আণ্ডাকা ওমলেট?

শৈলেন বলল, হাঁ হাঁ। জলদি।

আমি ওর রকম দেখে হাসছিলাম। ও শান্ত হয়ে বসার পর বললাম, অত ডিম খাওয়া কিন্তু শরীরের পক্ষে খারাপ। ডিমে কোলেস্টেরল বাড়ায় জানো ত?

শৈলেন বলল, কোলেস্টেরল কি দাদা?

আমি বললাম, রক্তের ঘনতা; কোলো-স্টেরল বাড়লে স্ট্রোক হয়।

শৈলেন জোরে হেসে উঠল, বলল ও সব বড়লোকদের অসুখ, যারা রোজ ভাল ভাল জিনিস খায় তাদের জন্যে। আমি কি রোজ সকালে নিয়ম করে ডিম খাই? মাসে একদিন খাইকি সন্দেহ, খেলেও ডিমের কারী নয়ত ডিমসেদ্ধ, মাঝে মধ্যে। তাই

একসঙ্গে ছটা আটটা ডিম খেলে আমাদের মত লোকের কিছু হবে না।

আমি শুধোলাম, তোমাদের থিয়েটারের রিহার্সাল কতদূর এগোল? কালিপুজো ত এসে গেল।

ও বলল, আর বলবেন না, সব ঝুলে। কি বলব দাদা যেখানে তিনজন বাঙালি, সেখানেই পলিটিকস, দলাদলি, কি হবে বলুন, কোনো ভাল কাজই কি করা যাবে?

কথা ঘুরিয়ে আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে অভিনয় কে ভাল করে?

শৈলেন হাসল। বলল, অভিনয় আমাদের মধ্যে কে বেশী ভাল করে তা বলা মুশকিল। সকলেই ভাল করি। প্লাটফর্মে দেহাতী মুর্গী পাকড়ে পয়সা আদায় করার সময় নজর করে আমাদের অভিনয় দেখবেন, দারুণ। কেবল উত্তমকুমারের মত চেহারাটাই নেই দাদা, নইলে কি আর অভিনয় খারাপ করি।

আমি ওর কথার ধরনে হেসে উঠলাম।

শৈলেন বলল, হাসি নয় দাদা, দারুণ সীরিয়াস ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। নইলে এই সাত-সকালে চুপি চুপি এতখানি হেঁটে আসি? দেখবেন স্টেশনের কেউ যেন না জানে যে, আমি একা একা আপনার কাছে এসেছি।

বললাম, ব্যাপারটা কি? খুলেই বল না?

শৈলেন বলল, দাঁড়ান, বুকে বল পাচ্ছি না, আমার এই টিকিট-চেকারের বুক এখন বিনা-টিকিটে পাড়ি-দেওয়া মেল ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের মত কাঁপছে—একটু দম নিয়ে নিই। সময় লাগবে। খেয়েদেয়ে গায়ে জোর করে নিই। একটু সময় দিন আমাকে। আমার জীবনের পয়েন্টসম্যান এই গাড়িটাকে ভুল লাইনে ফেলে দিয়েছে; মুখোমুখী কলিশান অনিবার্য—এখন আপনি না বাঁচালে কেউ বাঁচতে পারবে না।

আমি জবাব দিলাম না। বুঝলাম শ্রীমান শৈলেনের কোনো একটা গোলমেলে ব্যাপারে পড়ে আমার কাছে আসতে হয়েছে, সময় হল নিজেই বলবে।

কুঁয়োর দিকে বুধাই আর তার বোন মুংগলি জল তুলে কি সব কাচাকাচি করছিল। ওদের হলুদে আর লাল শাড়ির রঙ সবুজ জঙ্গলের পটভূমিতে সকালের রোদে ভারী ভাল লাগছিল। নানারকম ছোট ছোট মৌ-টুশকি পাখি এসে চেরীগাছে, ফলসা গাছে, কারিপাতার গাছে নাচানাচি করছিল। কোথা থেকে একদল হলুদে ফিনফিনে প্রজাপতি এসে অনেকক্ষণ থেকে পেছনের জঙ্গলের সামনের ঘাসভরা মাঠে ওড়াউড়ি করছিল। হঠাৎ একটা প্রজাপতি এসে শৈলেনের গায়ে বসল। কিছুক্ষণ বসে থেকেই উড়ে গেল।

শৈলেনকে যেন পাগলা কুকুর কামড়েছে এমন করে লাফিয়ে উঠে শৈলেন বলল, শালা মরেছি। সরি দাদা, শালা বলে ফেললাম; কিন্তু মরেছি। আর বাঁচা হলো না।

আমি আবার হেসে ফেললাম ওর রকম দেখে, বললাম, হয়েছেটা কি? গায়ে প্রজাপতি বসা ত ভাল লক্ষণ।

শৈলেন বলল, ভাল লক্ষণ আপনাদের, আমার মত একজন একশ পঁয়ত্রিশ টাকা টেক-হোম মানির লোকের জন্যে বিয়ে নয়; অথচ দারুন বিয়ে করতে ইচ্ছা করে। মানে ঠিক বিয়ে করতে নয়, মানে কাউকে কাছে পেতে। মানে মাঝে মাঝে ভাবি। এমন যদি কেউ থাকত কাছে-পিঠে, যার কাছে রড্‌কা-কানার বড়সাহেবের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে এসে সাহেবের শ্রাদ্ধ করা যায় মন খুলে, যার কাছে নিজের ইচ্ছা, নিজের কল্পনা সব বুঁদ হয়ে বলা যায়, যাকে জড়িয়ে ধরে এই লাপরার শীতের রাতে সিঙ্কের ওয়ার-দেওয়া লেপের আরাম পাওয়া যায়। মানে এমন কেউ যদি থাকত, যাকে সম্পূর্ণভাবে আমার বলা যেত, যে সেজেগুজে থাকলেও আমার, কিছু না পরে থাকলেও আমার, যে দিনে, রাতে, মাসে, বছরে, সারা জীবনে শুধু আমারই।

আমি হালকা গলায় বললাম, 'এত ভাল কথা, এমন কোনো লোক ত সহজেই পেতে পার—তোমার মত ইয়াং এলিজিবল ব্যাচিলর।

তা পারি। শৈলেন বলল। তারপরেই বলল, সাহস হয় না। ভীষণ ভয় করে।

লালি ছটি ডিমের মধ্যে পেঁয়াজ, টোম্যাটো, কাঁচালংকা, মেটের টুকরো সব দিয়ে একটা অতিকায় ওমলেট নিয়ে এল। শৈলেন দেখে একটুও ঘাবড়াল না, বলল, বাঃ লালি, তোকে আর তোর ফ্যামিলিকে সারাজীবনের মতো রেলের টিকিট কাটতে হবে না—সে জিম্মা আমার। আজ যা খাওয়ালি, সে বলার নয়। আজকে এরকম কিছু একটা খাওয়ার দরকার ছিল।

আমি চা বানাতে বানাতে বললাম, এবার কাজের কথা বলো দেখি।

শৈলেন গব্‌গব্‌ করে ওমলেট চিবোতে চিবোতে বলল, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার যা কাজ তা আপনার। বলেই বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে বলল, এ চিঠির একটা জবাব লিখে দিন।

বললাম, এটা কি?

শৈলেন বলল, লাভ-লেটার। ব্যাপার বুঝুন, আমারও লাভ-লেটার আসে। নয়নতারা লিখেছে আমায় প্রেম নিবেদন করে।

আমি কি বাংলা লিখতে জানি? ডাবলু-টি প্যাসেঞ্জারের চালান লিখতে পারি আমি; তাও ইংরিজীতে। বাংলা যে একেবারে লিখি না তা নয়, মাকে সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখি, শতকোটী প্রণামান্তে নিবেদন এই যে, মা, আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ? তার সঙ্গে আরও দুটো লাইন থাকে—।

আমি বললাম, দুটো লাইন কেন?

শৈলেন বলল, এক লাইন ওয়েদার রিপোর্ট, অন্য লাইনে মার্কেট রিপোর্ট।

অবাক হয়ে বললাম, মানে?

হতাশ হয়ে শৈলেন বলল, মানে বুঝলেন না? প্রথম লাইনে লিখি এখানে এখন শীত (কি প্রকার শীত তাও লিখি, বেশী, না কম, না মাঝামাঝি) অথবা গরম অথবা বৃষ্টি। দ্বিতীয় লাইনে লিখি, এখন কদু সস্তা, কি আলু সস্তা, কি বেগুন সস্তা। বুঝলেন?

—বুঝলাম।

বুঝলেনই যদি, তাহলে আমার এই লাভ-লেটারের একটা যুৎসই উত্তর লিখে দিন দাদা যাতে আমার সাঁটুলি এক চিঠিতে কাৎ হয়ে পড়ে।

শুধোলাম, সাঁটুলি মানে? সাঁটুলি কি?

সাঁটুলি জানেন না? সাঁটুলি মানে লাভার। এখানের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা বলে বার্ড। বার্ড মানে পাখি; নরম গরম পাখি।

আমি হেসে উঠলাম। শৈলেন আসা অবধি এত হাসাচ্ছে যে, সে বলার নয়।

ও বলল, কি দাদা? চিঠিটা খুলুন। এক্ষুনি জবাব লিখে দিতে হবে, যাতে আমি এগারোটার ডাকে পোস্ট করতে পারি।

অগত্যা চিঠিটা খুললামই।

প্রিয়তমেষু,

অই সুন্দর জাগা হইতে আসা অব্দি এবং অই মুখখানি দেখা অব্দি আমার চক্ষে ঘুম নাই। প্রতি অংগ কাঁইদতাছে তোমার প্রতি অংগ লইগ্যা। ঘুম নাই, খাওন নাই, কিছুই নাই। তুমি কবে আইস্যা আমারে নিয়ে যাবে। কবে তোমার কোর্টারে যাইয়া তোমারে ভাত রেঁধে দিমু। আমার হৃকল্‌ডা তোমারে দিমু দেব।

আমি তোমারে ভাল বাসি। তুমি কি মোরে খারাপ বাসো?

ইতি তোমারই নয়নতারা

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম।

ততক্ষণে শৈলেন ওমলেট খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দ করে চা খেতে আরম্ভ করেছে।

ও আমার মুখের অবস্থা দেখে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, বরিশাল্যা। জানেন ত? আইতে শাল, যাইতে শাল, তার নাম বরিশাল? পরক্ষণেই বলল, নয়নতারা কিন্তু বাংলা ভালই লেখে, অন্ততঃ আমার চেয়ে ভাল লেখে, কিন্তু ও জানে আমরা তিন-পুরুষ জয়নগর-মজিলপুরের বাসিন্দা—শেষ পুরুষ বিহারের ভাগলপুরে। বাঙাল-কথা আমরা মোটে জানি না; বুঝি না। বুঝলেন দাদা, ও সেই কমপ্লেক্সে ভুগে এমন বাঙালভাষা ঘটি ভাষায় মিশিয়ে একটি জগা-খিচুড়ি পাঠিয়েছে। চিঠিটা খারাপ হতে পারে, কিন্তু দাদা, আমার স্টেশনমাস্টারমশায়ের দিব্যি, মেয়ে ভাল। ভাল মানে, আমার পক্ষে ভাল। শক্ত, সোমত্ত, গড়ন-পেটন ভালো, কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে জব্বর মুসুরীর ডাল রাঁধে, ধনেপাতা দিয়ে চালতে যা মাখে না, কি বলব, তেল-কই, শর্ষে-ইলিশ, উঃ কি বলব দাদা জুতো, জুতো।

আমি বললাম, জুতো কি শৈলেন?

ওমা জুতো জানেন না? জুতো মানে, কি বলব? জুতো মানে হচ্ছে গিয়ে লাজোয়াব।

নয়নতারার সবচে যা ভাল জানেন দাদা, তা হচ্ছে মনটা। একেবারে টাঁড়ের মতো

খোলা। ও এখানে এসেছিল বেড়াতে ওর কাকা-কাকিমার সঙ্গে এক মাসের জন্যে। বড় দুঃখী মেয়ে—পাকিস্তান হয়ে যাবার সময় ওর তিন মাস বয়স—সেই সময় থেকে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। ওর কাছে আমার এই পেঁপেগাছ লাগানো কোয়ার্টারই স্বর্গ—আর খুব হাসিখুসী মেয়েটা—খুব গান ভালবাসে—বুঝলেন দাদা, আমার আর ডানাকাটা পরী বিদ্যাধরী দিয়ে কি হবে? যে আমার সামান্য সামর্থ্যে খুশী থাকবে, আমাকে ভালবাসবে, আমার জন্যে ভাববে, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি আর হুহু-হাওয়ার মধ্যে আমাকে দু হাতে জড়িয়ে থাকবে বুকের মধ্যে—সেই আমার কাছে অনেক দামী।

আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল দাদা। আমি কি, আমি কতখানি, এ পৃথিবীতে আমার চাহিদা, আমার যোগ্যতা কতটুকু, তা আমি বুঝে নিয়েছি। আমার এইই ভাল। নয়নতারা রাঁধবে বাড়বে, আমি গলা ছেড়ে গান গাইব, দুজনে হি হি করে হাসব, হাটের মধ্যে হট্টামি করব, খাটের উপর হুল্লোড় করব—এই আমার ভাল লাগে। সকলে আমাদের দেখে বলবে, ঢঙ দ্যাখো। সকলে যেই বলবে, আমরা আরো ঢঙ করব। ঢঙ আমার দারুন লাগে। মেয়েরা যদি ঢঙি না হয় তাহলে কি আপনার ভাল লাগে দাদা?

আমি বললাম, আমার ভাল লাগার কথা এর মধ্যে আসছে কোথায়? তোমার ভাল লাগলেই ভাল। তাহলে বিয়েটা করছ কবে?

শৈলেন বলল, আমার ত এক্ষুনি করতে ইচ্ছে করছে দাদা। এমন বরফ-পড়া রাতগুলো চলে যাচ্ছে। আমার একটা দিনও আর নষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না। যখনি দেখি পাতা ঝরে যাচ্ছে, শীতের হাওয়ায় চারিদিক রুক্ষ, খড়ি-ওঠা, তখনি আমার বার্ধক্যের কথা মনে পড়ে যায়। যে কদিন যৌবন থাকে, বাঁচার জেদ থাকে ততদিন, ততদিনের প্রত্যেকটি দিন আমার প্রতিমুহূর্তেও বাঁচতে ইচ্ছে হয় দাদা।

তারপরই একটু থেমে, একটু লজ্জা পেয়ে শৈলেন বলল, আমি জানি, আমি একজন সামান্য লোক, সামান্য আমার রোজগার, সামান্য আমার যোগ্যতা, কিন্তু তবু দাদা আমি ত একজন সুস্থ শরীর সুস্থ মনের মানুষ। এ বাবদে ত আমি কারো চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, গরীব নয়—তবে আমার যদি দারুন শখ থাকে, ভীষণ উৎসাহ থাকে, মানে আপনারা 'উচ্ছ্বাস না, কি বলেন তাই; তাহলে আমি তেমন হৈ হৈ করে বাঁচব না কেন?

আমি এই জীবনকে ভীষণ ভালবাসি দাদা। আমার মত এত বোধহয় খুব কম লোকই ভালবাসতে জানে। আমার মনে সবসময় ফুর্তি, আমি সবসময় হাসি, সবসময় গান গাই—তাই আমার এই ফুর্তি নয়নতারাকে পাশে নিয়ে আমি আরো বাড়াতে চাই। আমরা দুজনে দেখবেন একে অন্যকে কী দারুন ভালবাসি, কি মজাই না করি। কি যে বলব আপনাকে, আমার ভাবতেই ভাল লাগছে। আমি আর একা থাকব না, আমার সুখ এবং দুঃখের, আমার মন এবং শরীরের ভাগীদার আর একজন শীগগীরি আসবে।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। ভাবছিলাম, প্রত্যেক লোককেই কখনো কখনো কথায় পায়—আমাকেও পায়—যখন যাকে পায় তখন তাকে বাধা দিতে নেই। এই ভণ্ডামি ও অভিনয়ের জীবনে সত্যি কথা স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় বলার সময় বড়একটা আসে না।

বাগানে এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল। কিছুক্ষণ কাঁচা পেয়ারা কামড়ে, ফেলে, নষ্ট করে আবার উড়ে গেল অন্য কোনো বাগানের দিকে।

একটু পর শৈলেন নিজের থেকেই বলল নয়ন যখন ওর বরিশালিয়া ভাষায় কথা বলে না, ওকে দারুন মিষ্টি লাগে—আমি ওকে চিরদিন ওর নিজের ভাষায়ই কথা বলতে বলব, আর আমি বলব আমার দোখনো ভাষা। যেখানে মনের মিল, শরীরের মিল, সেখানে ভাষা কি কোনো বাধা? কি দাদা?

তারপর আবারও শৈলেন কথা বলতে শুরু করল। ওর কথায় এখন কোনো যতি নেই। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন কিছুই নেই। ও যে এক দারুন আনন্দের ঘোরে বলে চলেছে।

শৈলেন বলল, লাপরা হেসানং, কঙ্কাতে এত লোক ছিল আমার জানা-শোনা, আমি এখানে চার বছর আছি, আমার জানা-শোনা কম নয়—তবু আমি আপনার কাছে ছুটে এলাম কেন জানেন?

বললাম, কেন? আমি চিঠির উত্তর দিতে পারব বলে?

ও বলল, না, না। ওটা একটা ছুতো। ওকে বিয়ে করব এবং ও আমাকে বিয়ে করতে চায় একথা আমরা দুজনে যখন একে অন্যে চোখের ভাষাতেই জেনে গেছি তখন আর চিঠির দাম কি? দরকারই বা কি? তার জন্যে নয়। আজকে আমার মন বলছিল, আপনাকে এত সব কথা বলে হাল্কা হব, যাই হোক আপনি একজন লেখক। মানুষের মনের কারবারী আপনি। কারো মনে যদি তেমন দুঃখ হয়, বা আনন্দ হয় তখন আপনার মত কেউ হাতের কাছে থাকলে তার কাছেই ত ছুটে আসা উচিত। তাই না? শুনেছি, আপনি কোলকাতায় বড় বড় মামলা-টামলা করেন, আপনার নাকি হাঁক-ডাক আছে—কিন্তু আমি সেজন্যে আসি নি। আপনার চেয়ে বড় বড় উকীল-ব্যারিস্টার অনেক এখানে এসেছে গেছে, তাদের দেখেছি; ভুলে গেছি। কিন্তু যে লেখে, যে আমার কথা নয়নতারার কথা, আমাদের মত লক্ষ লক্ষ অজানা অচেনা লোকের কথা যারা লেখে, সেই সব অসংখ্য হতভাগ্য লোক যা বলতে পারে না কিন্তু বুঝতে পারে, তারা যা বুঝতে পারে কিন্তু বলতে পারে না সে সব কথা যারা অক্লেশে বলে ফেলে তাদের কথাই আলাদা। তারা সেই অসংখ্য লোকের মত আপনার লোক, সবচেয়ে কাছের লোক।

আজকের দিনটা আমার জীবনের এক দারুণ দিন দাদা। আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। কি? আমি সুখী হবো না? আজ থেকে বহুদিন, বহু বছর, বহু যুগ আমি আর নয়নতারা খুশী থাকব না? দুজনে দুজনকে পেয়ে ভীষণ মজা করব না? কি দাদা? আপনি চুপ করে আছেন যে?

আমি কোনো কথা বললাম না। একটু পরে বললাম আর এক কাপ চা খাবে?

শৈলেন উত্তরে কিছু না বলে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল, বলল, বেলা হয়ে গেল। কটা বাজে?

হাতঘড়ি দেখে বললাম, দশটা বেজে গেছে।

তাহলে এবার পালাই। কি বলেন? চিঠিটা লিখেই পোস্ট করে দেব।

বললাম এ ডাক ধরতে পারার সময় পাবে?

শৈলেন যেন কী এক দারুণ নেশা করেছিল। তার দুটি কালো চোখ সকালের রোদে ঝিকমিক করছিল — সমস্ত মুখ উৎসাহে আনন্দে ঝলমল করছিল।

ও বলল, সময় পাবো না? কি বলেন দাদা? সময়কে এবার থেকে পকেটে পুরে রাখব, সময়ই আর পাবে না আমাকে; কোন দিন পাবে না। দেখবেন। বলেই বলল, চললাম। বিয়ের তারিখ ঠিক হলে নেমন্তন্ন করে যাব।

শেষ কথাকটি বলেই শৈলেন জঙ্গলের পাকদণ্ডী দিয়ে বাড়ির পিছনের গেট খুলে উধাও হয়ে গেল।

আমি চেয়ারে বসে বসে বেশ অন্যমন করতে পারছিলাম।

শৈলেন মিলনোন্মত্ত কোনো শিঙাল হরিণের মত দৌড়চ্ছে মাঠ পেরিয়ে—মহুয়াতলা দিয়ে—জাটি-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। হু-হু করে সকালের ঠাণ্ডা রোদ-লাগা হাওয়া লাগছে ওর মুখে-নাকে-বুকে—ও এক দারুণ জীবনীশক্তিতে নতুন করে সঞ্জীবিত হচ্ছে, পবিত্র হচ্ছে, সে-শক্তি আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে রাখে, সকলকে মহৎ করে, উদার করে ঃ সে শক্তির জন্যে শৈলেনের, নয়নতারার, আমাদের সকলের প্রত্যেকে বেঁচে থাকাই সার্থক—তার আরেক নাম, গোপন নাম, স্বচ্ছ নাম; প্রেম।

(ক্রমশঃ)

লোকে বলে—অবক্ষয়ের যুগ, ভেঙে পড়ার দিন,
কিন্তু সত্যিই কি তাই?
আমরা কি গড়েও তুলছি না?
অন্তত ক্লাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে
যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অন্য চেহারাই
দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো
ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা
করছি, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।
আমাদের নবযুগের যুবসমাজের সেই
অক্লান্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে তুলে
ধরা হবে এই বিভাগে।

চৈতন্য লাইব্রেরী

উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীট (দানী ঘোষ সরণি) রাজপথের কর্মচঞ্চল প্রাণ প্রবাহের মাঝপথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীটা। দেখে বোঝবার উপায় নেই গ্রন্থাগার, না ফ্ল্যাট বাড়ী। বর্তমানে আর দু-দশটা সাধারণ লাইব্রেরীর মত হলেও উনিশ শতকের নবজাগরণের এক সুমহান ঐতিহ্যের শরিক এই 'চৈতন্য লাইব্রেরী'। কালের নিষ্ঠুর বিধানে আজ দীনহীন বঞ্চিত, পথের এক প্রান্তে অবহেলিত। আজ সে রামও নেই, নেই সে অযোধ্যা। আছে শুধু ঐতিহ্যের স্মৃতি।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ আত্মগোপন করে থাকে, এই চৈতন্য লাইব্রেরীর অন্দর মহলে তেমনি লুকিয়ে আছে এক ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ঘুমন্ত স্মৃতি, নীরব মহাশঙ্খ। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেববাহাদুর যে ব্যাপকতর শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বপ্রথম উত্তর কলকাতায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। চৈতন্য লাইব্রেরী উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার, প্রাচীনতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। তখন কলকাতায় একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী ছিল—'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী', পরে লর্ড কার্জন সেটিকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সংগে যুক্ত করে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথম থেকেই এই লাইব্রেরীর সংগে জড়িত ছিলেন, আর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। ফলে শুরু থেকেই এই গ্রন্থাগার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরা এর সংগে যুক্ত হওয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল চৈতন্য লাইব্রেরী।

চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেনের লেখা থেকে জানা যায়—'কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর অনুকরণে, 'গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে, পাদরি টমরি সাহেবের নেতৃত্বে বিডন স্ট্রীটের ৮৩নং বাটীতে, ১৮৮৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়।' মাত্র কুড়িটি বই, তিনটি পত্রিকা আর পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রন্থাগারের সূচনাপর্ব। ১৮৯৩ সালের শেষভাগে বছরে দুশো টাকা ভাড়ায় ৪।১ বিডন স্ট্রীটের বর্তমান ভবনে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৬ সালে বাড়ীটি কিনে নেওয়ায় এটি লাইব্রেরীর নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে ওঠে।

গৌরহরি সেন প্রথমে এ লাইব্রেরীর নাম দিয়েছিলেন 'বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব'। কিন্তু গঙ্গানারায়ণ দত্তমশাই তাতে আপত্তি করায় এবং ঠাকুর দেবতার নামানুসারে নাম রাখতে চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় চৈতন্য লাইব্রেরী এন্ড বিডন স্কোয়ার লিটারারী ক্লাব'। কিন্তু কালের প্রবাহে ঝরে গেছে নামের শেষাংশটুকু।

চৈতন্য লাইবেরীর প্রাচীনত্বের সংগে জড়িয়ে আছে কলকাতার সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। গ্রন্থাগারের অনতিদূরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী, রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রিয়নাথ সেন, বিহারীলাল প্রমুখের বাসস্থান। লিটারারী ক্লাবের কাজ ছিল ভালো লেখক ও পন্ডিত ব্যক্তিদের দিয়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করানো। এই জাতীয় সাহিত্যসভায় যাঁরা সভাপতিত্ব করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—অধ্যাপক টমরি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্যার হেনরি কটন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, লর্ড কারমাইকেল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা হত প্রধানত ইংরেজীতে, কখনো কখনো বাংলায়। তার বিষয়বস্তু থাকত দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজনীতি-ইতিহাস ভ্রমণ আইন শিক্ষা অর্থনীতি সাহিত্য রাষ্ট্রনীতি ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে। লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে এগুলি পড়া হত। অধিবেশন বসতো বিভিন্ন স্থানে। বক্তা ও রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার লরেন্স জেনকিনস্, সিস্টার নিবেদিতা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সি ভি রমণ প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ পঠিত আটটি অনন্য সাধারণ রচনার মধ্যে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি', 'স্বদেশী সমাজ' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারের রেজিস্ট্রেশন দলিলেরও তিনি অন্যতম স্বাক্ষরদানকারী।

চৈতন্য লাইব্রেরীর অবস্থান মিনার্ভা থিয়েটারের পাশেই। একতলায় অবৈতনিক পাঠকেন্দ্র। প্রতিদিন দুবেলা প্রায় শখানেক লোক এখানে খবরের কাগজ পড়তে আসেন। দোতলায় বাংলা বিভাগ—প্রধানত গল্প

উপন্যাসেই সমৃদ্ধ। দোতলার বারান্দায় বসে সর্বসাধারণ বই ও পত্র-পত্রিকা পড়তে পারেন সম্পূর্ণ নিখরচায়। তিনতলায় বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী বই-এর অপূর্ব সমাবেশ। তবে বর্তমানে গ্রন্থাগারটি ভবনের সামনের অংশে, পেছনের অংশটি এখনো ভাড়াটেরা ছেড়ে যাননি।

এখানে শিশু এবং রবীন্দ্র সংক্রান্ত রচনা মিলিয়ে বাংলা বই-এর সংখ্যা ৬০ হাজারের কাছাকাছি। দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী বই-এর সংখ্যা ৩০ হাজারের মত। বাংলা ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকার মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বর্তমানে ২৫ হাজার। এখানে এমন অনেক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র আছে যা জাতীয় গ্রন্থাগারেও নেই। ক্যাটালগিং প্রণালী বই-এর নামানুসারে। গ্রন্থাগার প্রতিদিন খোলা থাকে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটা দুবেলাই। রবিবার রাত্রে শুধু বন্ধ। গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় গভর্ণিং বডির দ্বারা।

এখানকার সদস্য সংখ্যা আটশ। গ্রন্থাগারের মোট কর্মচারীর সংখ্যা যোলজন। তার মধ্যে চারজন কেরানী ও দুজন বেয়ারাই নামমাত্র মাইনে পান। বাকি সকলে অবৈতনিক। আর্থিক অবস্থা এখানে শোচনীয়, বিশেষত বাড়ী কেনার পর থেকে। কারণ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় না। কলকাতা কর্পোরেশন গ্রান্ট বন্ধ করেছে বিগত পাঁচ বছর। এখন সদস্যদের মাসিক ৭০ পয়সা চাঁদায় এবং ব্যাংকে জমানো টাকার সুদেই অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের সভাপতি নাট্যতত্ত্ববিদ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডীন ডঃ অজিত ঘোষ দুঃখ করে বললেন, শুধু লাইব্রেরী নয়, সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র ছিল এখানে, ছিল গৌরবময় ভূমিকা। কিন্তু বর্তমান যুগে সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ায় সাহিত্য সভায় জনসমাগম ঘটে না, শিশু বিভাগ চলে না; শিক্ষা অর্থকরী হওয়ায় জ্ঞানলাভের স্পৃহাও কমে গেছে পাঠকদের। এর পেছনে আছে সামাজিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা কারণ। কিন্তু চৈতন্য লাইব্রেরীর নিজস্ব সমস্যা প্রধানত দুটি। প্রথমটি অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়টি স্থানাভাব। স্থানাভাব মেটানো সম্পর্কে ডঃ ঘোষের পরিকল্পনা, ভাড়াটেরা উঠে গেলে নতুন পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ করা হবে এবং স্থায়ীভাবে আলোর সুবন্দোবস্ত করবার জন্যে একটি হল তৈরি

চৈতন্য লাইব্রেরী
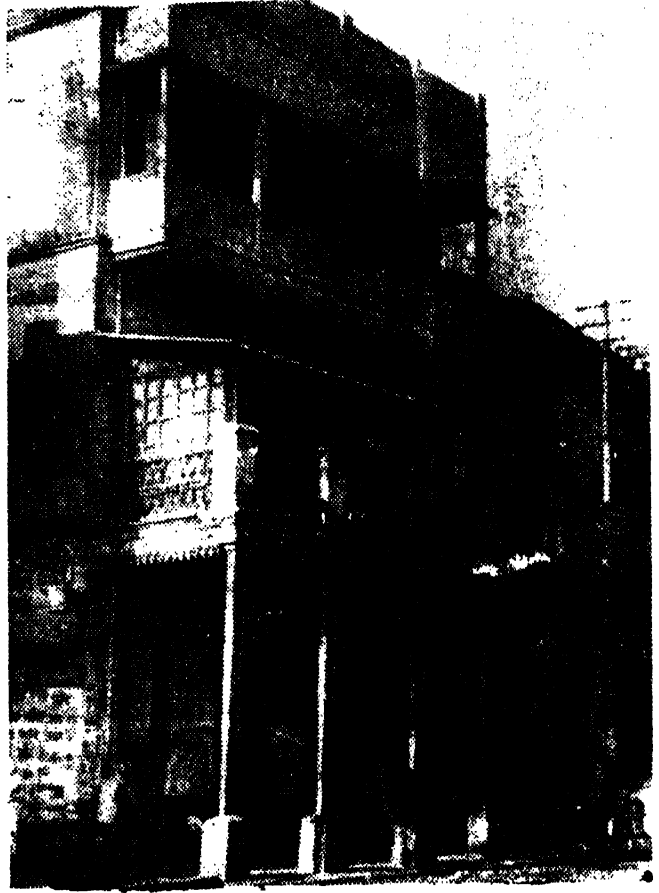
করাও একান্ত আবশ্যক। কিন্তু খরচ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বাড়ী কিনতে ভান্ডার প্রায় খালি হয়ে এসেছে, জমানো মাত্র ৪০ হাজার টাকায় এ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য। তিনি মনে করেন, গ্রন্থাগারকে সাহায্যের ব্যাপারে ইউ-জি-সির এগিয়ে আসা উচিত।

লাইব্রেরী নিছক বই-এর সমষ্টিমাত্র নয়, জ্যোতির্ময় আত্মার সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধা: সংগীত, হৃদয়ের আশা, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনি আর আকাশের দৈববাণীকে কাগজে মুড়ে রাখা। উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার দিক থেকে গ্রন্থাগারের ভূমিকা গণতান্ত্রিক—অধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু চৈতন্য লাইব্রেরীর একদিকে গৌরবময় অতীত, অপরদিকে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ হয়তো বা সম্ভাবনাপূর্ণ, যদি ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে আগামীদিনগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়। কিন্তু আপাতত-তা দেখতে পাচ্ছি না।

পল্লীর চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে গবেষণা গ্রন্থাগার আজ গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও হালকারসের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ তথা রূপান্তরিত। ইংরেজী গ্রন্থের বিরাট ও মূল্যবান সংগ্রহ পাঠকের উপেক্ষায় আজ তিনতলায় নির্বাসিত, চর্চা ও চর্যার পরপারে তার বাস।

স্বীকার করি, জীবিকা ছাড়া জীবন বাঁচে না, বিজ্ঞাপন ছাড়া ভালো কিছুও সামনে আসে না, পাঠক ছাড়া গ্রন্থাগার অচল। পাঠকের রুচি বিবর্তন আজ বহু গ্রন্থাগারের সামনে এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু পাঠকের রুচি সংগঠনের দিকে দৃষ্টিপাত না করে পাঠকের চাহিদাটুকু মেটালেই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব শেষ হয় না। এই উদাসীনতার চরম বিপর্যয়ের ফলশ্রুতি বর্তমানের লঘু চটক সাহিত্যের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ। চৈতন্য লাইব্রেরী সে চটক কমিয়ে যদি তার পাঠকদের সুস্থ স্বাভাবিক আনন্দ ও জ্ঞানস্পৃহার দিকে চালিত করতে পারে, নিশ্চয়ই তাহলে পুরনো গৌরবময় দিনের ঐতিহ্যকে সার্থক করে তোলা অসম্ভব হবে না।

—সুশান্তকুমার মিত্র

আপনি কেমন আছেন?
—উত্তর খুবই প্রাঞ্জল—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।'...কিন্তু প্রাণ রাখার চেষ্টায় যে ওষুধপত্র ডাক্তার না দেখিয়ে নিজেরাই কিনে ব্যবহার করি, আর খাদ্যের নামে যেসব অখাদ্য আমরা খাই, তাতেও কম প্রাণান্ত ঘটে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই অসুখবিসুখ, পুষ্টি ও পরিবেশের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবেন এই বিভাগে।

ডায়াবিটিস কি ও কেন?

ডায়াবিটিস বা তথাকথিত বহুমূত্র রোগের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। মিশরীয় ও গ্রীক পণ্ডিতদের লেখায় যেমন এর উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি এর বিশদ বিবরণ আছে স্বনামধন্য ভারতীয় ভিষক্ সুশ্রুতের চিকিৎসা গ্রন্থে। সুশ্রুত এই রোগের নাম দিয়েছিলেন মধুমেহ।

সুশ্রুতের সময়-কাল সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দী। এর প্রায় বারশ' বছর পরে টোমাস উইলিস বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ ও প্রমাণ করলেন সুশ্রুতের ধারণাকে। প্রমাণ করলেন যে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত রোগীদের প্রস্রাবে চিনি থাকে—সাধারণ সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে যা থাকে না। তার পর থেকে অজস্র গবেষণা হয়েছে এই রোগের উৎপত্তি, কার্যকারণ ও প্রতিবিধান নিয়ে। আজও ঠিক এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অগ্রসর দেশের হাজার হাজার বিজ্ঞানী এমনি গবেষণা চালাচ্ছেন। তিন তিনবার নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে ডায়াবিটিসের গবেষণার উপর। প্রথমে পেয়েছেন কানাডার ডাঃ বেনটিং ও বেসট্, ইনসুলিনের অস্তিত্ব ও প্রভাব আবিষ্কার করে। দ্বিতীয়বার দেওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ডাঃ হুসেকে, এই রোগে পিটিউ-টারী গ্রন্থির প্রভাব কী এবং কতটা তার উপর আলোকপাত করার জন্যে। আর তৃতীয়বার পেয়েছেন কেমব্রিজের ডাঃ সোঙ্গার কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরীতে ইনসুলিন তৈরি করে।

বহুমূত্র নামের উৎপত্তি ডায়াবিটিক রোগীরা ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ অনুভব করেন বলে। কিন্তু সব সময়ে তা নাও হতে পারে। বহুমূত্রের অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে, বিশেষ করে, স্থূলকায়া মহিলাকে রাতে বারবার উঠতে হলে ডায়াবিটিস সন্দেহ করা এবং রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করান উচিত। বহু-মূত্র ছাড়া ডায়াবিটিসের অন্যান্য লক্ষণ হল বার বারে তৃষ্ণার্ত হওয়া, ঘন ঘন খিদে পাওয়া, অন্য কোন কারণ না-থাকা সত্ত্বেও রোগা হয়ে যাওয়া বা ওজন কমে যাওয়া, গা চুলকান, চোখে কম দেখা, ফোঁড়া, একজিমা, কাটাঘা সহজে না-সারা ইত্যাদি। স্থূলকায়রা অবশ্য রোগা না হয়েও ডায়া-বিটিসে ভুগতে পারেন।

সাধারণত এই রোগের শিকার হন মধ্যবয়সীরা। পুরুষের থেকে মেয়েরাই বেশি। অল্পবয়সীদেরও এই রোগ হতে পারে। হলে সেটা দুরারোগ্য। স্থূলকায়দের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়—যদিও ক্ষীণকায়রাও বাদ যায় না।

অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, ডায়াবিটিস বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রামিত হতে পারে। বাপ-মার মধ্যে একজনের ডায়াবিটিস

থাকলে ছেলেমেয়েরা এই রোগ পেতে পারে। আর বাপ-মা দুজনেই যদি ডায়াবিটিক হন, সন্তানদের মধ্যে কেউ না কেউ রোগের উত্তরাধিকারী হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। এরকম ক্ষেত্রে কৈশোর থেকেই সাবধান হওয়া দরকার।

সাবধান হতে হলে রোগটা কী এবং কিভাবে হয়, সে সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা উচিত।

প্রথমেই জানা দরকার যে সব সুস্থ মানুষের রক্তেই চিনি থাকে। থাকে গ্লুকোজ রূপে। খালি পেটে এই গ্লুকোজের পরিমাণ হল প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ৮০—১১০ মিলিগ্রাম। ডায়াবিটিক রোগীদের ক্ষেত্রে সেটা ১১০ মিলিগ্রামের উপরে চলে যায়। তেমনি ভরপেট খাওয়ার দেড় থেকে দু-ঘন্টা পরে সুস্থ মানুষের রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে গেলেও শতকরা ১৫০ মিলিগ্রামের বেশি হয় না। ডায়াবিটিক রোগীদের ক্ষেত্রে সেটা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে এমনকি শতকরা ৪০০—৫০০ পর্যন্ত হতে পারে।

সাধারণতঃ রক্তে শতকরা ১৫০—১৮০ মিলিগ্রাম চিনি হলে প্রস্রাবেও চিনি পাওয়া যায়। কিন্তু একথাও মনে রাখা ভাল যে এমন কিছু কিছু অবস্থা আছে যখন রক্তে চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক থাকলেও প্রস্রাবে চিনি আসতে পারে। তাকে বলা হয় গ্লাইকোসুরিয়া। তাছাড়া পুরোন ডায়াবিটিক রোগীদের ব্লাড-সুগার শতকরা ১৫০ মিলিগ্রামের নিচে থাকলেও যেমন প্রস্রাবে সামান্য চিনি পাওয়া যেতে পারে, তেমনি ব্লাড-সুগার ১৫০-এর উপরে থাকলেও প্রস্রাবে চিনি নাও দেখা দিতে পারে। এরকমটা ঘটে কিডনীর সক্ষমতার জন্যে। মোট কথা, প্রস্রাবের চেয়েও খাওয়ার আগে এবং পরে রক্তে চিনির পরিমাণ থেকেই ডায়াবিটিসের সঠিক হদিস পাওয়া সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হল, রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায় কেন? এ সম্পর্কে অজস্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়েও সংক্ষেপে বলা যায় যে রক্তে চিনি আসে প্রধানত শর্করা জাতীয় এবং কিছুটা স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে। এবং থাকে গ্লুকোজ রূপে। আমাদের দেহ এবং দেহ-যন্ত্রগুলি যে অসংখ্য কোষ বা সেল দিয়ে তৈরি, তারা এই গ্লুকোজকে ব্যবহার করে শক্তি ও তাপ উৎপাদনে। আর কিছু গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন রূপে নিয়ে সঞ্চিত থাকে লিভারে ও পেশীতে। কোষগুলির তথা জীবনধারণের পক্ষে গ্লুকোজ একটি অপরিহার্য বস্তু।

বিশেষ কোন অবস্থায় দেহকোষগুলি যখন গ্লুকোজকে নিজেদের জৈবক্রিয়া সম্পাদনের কাজে পূর্ণ ব্যবহার করতে অপারগ হয়, তখন রক্তে সঞ্চারিত গ্লুকোজের পরিমাণ যায় বেড়ে, এবং একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে তা বেরিয়ে যায় প্রস্রাবের সঙ্গে। কখনো কখনো লিভারে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনরূপী গ্লুকোজ হু হু করে বেরিয়ে আসে রক্তে, যার ফলে কোষ-গুলির পক্ষে সেই বাড়তি গ্লুকোজ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা দেয় ডায়াবিটিসের লক্ষণ।

কী সেই বিশেষ অবস্থা যাতে রক্তে গ্লুকোজের বাড়তি সরবরাহ হয়? এই-খানেই প্যাংক্রিয়াসের বা ইনসুলিনের ভূমিকা।

আমাদের পেটের মধ্যে প্যাংক্রিয়াস নামে একটি গ্রন্থি আছে যা থেকে ক্ষরিত হয় এক ধরনের হরমোন—যার নাম ইনসুলিন। এই হরমোনটি রক্তে প্রবাহিত হয় এবং এই ইনসুলিনের সাহায্যেই দেহকোষরা গ্লুকোজকে নিজেদের জৈবিক কাজে ব্যবহার করে থাকে। প্যাংক্রিয়াসের অসুস্থতার জন্যে ইনসুলিনে যদি ঘাটতি পড়ে, তবে কোষেরা গ্লুকোজের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে রক্তে গ্লুকোজের আধিক্য ঘটে। আবার এমনও হতে পারে যে প্যাংক্রিয়াসেরই অন্য আর এক ধরনের অসুস্থতার কারণে লিভারে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন গ্লুকোজরূপে প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে এল রক্তে।

এমনও দেখা যায়, ইনসুলিন ক্ষরিত হচ্ছে ঠিক, কিন্তু তার চরিত্র এমনি অস্বাভাবিক যে কোষদের গ্লুকোজ ব্যব-হারের কাজে তা লাগছে না। অনেকটা নিউমোনিয়ায় পেনিসিলিন বা যক্ষ্মায় স্ট্রেপটোমাইসিন কাজ না-করার মতন। ইনসুলিনের এই নিষ্ক্রিয়তা নানা কারণে ঘটতে পারে। যেমন হতে পারে পিটুইটারি গ্রন্থির অত্যধিক ক্ষরণের জন্যে কিংবা অ্যাড্রিনাল কর্টেকস গ্রন্থির অসুস্থতার জন্যেও। আবার রক্তে কিছু ইনসুলিন-বিরোধী শক্তি থাকে যা বৃদ্ধি পেলেও গ্লুকোজের ব্যবহার ব্যাহত হতে পারে।

মোটকথা, ইনসুলিন ব্যবহারে দেহ-কোষের সক্ষমতা ঘটতে পারে নানা কারণে —যদিও তার লক্ষণ শেষ পর্যন্ত একই— অর্থাৎ রক্তে চিনি বা গ্লুকোজের আধিক্য।

ডায়াবিটিসের গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ার গ্যারান্টি সৃষ্টি করা যায়নি। তাই বলে হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কঠোর নিয়মা-নুবর্তিতা পালন করলে এবং নিয়মিত চিকিৎসা করালে এই রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবদমিত রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব। বিশেষ করে আজকাল ডায়াবিটিস বিরোধী যেসব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে চিকিৎসা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে।

ডায়াবিটিস চিকিৎসায় সবচেয়ে বড় কথা হল, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও নির্দেশ পাওয়ার পর রোগকে বশীভূত রাখতে পারা না-পারা নির্ভর করে রোগীর নিজের উপর। দীর্ঘকাল ধরে, এমনকি অনেক সময় সারা জীবন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয় বলে রোগীর ধৈর্য ও সংযমের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই চিকিৎসার মূল কথা হল, একদিকে কঠোর খাদ্যনিয়ন্ত্রণের দ্বারা রক্তে চিনির পরিমাণকে সীমিত রাখার সঙ্গে সঙ্গে দেহের শক্তি, তাপ ও কর্মক্ষমতাকে বজায় রাখা, অন্যদিকে নিয়মিত ডায়াবিটিস বিরোধী ওষুধ ব্যবহার করে দেহকোষ-গুলিকে গ্লুকোজ ব্যবহারে সাহায্য করা। ধৈর্যহারা এবং বেপরোয়া হয়ে এই দুটি কাজের কোন একটিতে গাফিলতি করার অর্থ রোগকে বশীভূত না রেখে রোগের বশীভূত হওয়া—যার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে। অনেক সময় ডায়াবিটিস ধরা পড়ে আকস্মিকভাবে—হয়ত অন্য কোন রোগের অনুষঙ্গ হিসাবে অথবা ডায়া-বিটিসেরই গুরুতর উপসর্গের লক্ষণ নিয়ে। কাজেই পিতৃ-মাতৃকুলে কারও ডায়াবিটিসের ইতিহাস কিংবা ইঙ্গিত থাকলেও সেই পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের নিয়মিত চেক-আপ, খাদ্য সংযম ও কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। মনে রাখা দরকার যে ভোজন-বিলাসিতা, শ্রমবিমুখতা ও মেদ-বৃদ্ধি ডায়াবিটিসের পথকে সুগম করে।

—অশ্বিনী সামন্ত

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই,
কিন্তু মন?
মনের অসুখও তো সমানই অক্ষম করে
দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীব্র
তীক্ষ্ণ জটিলতার যুগে. অভিজ্ঞ
চিকিৎসক 'মনের খবরে' সেই সব মনোব্যাধি
ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা
করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

আক্রম (অ্যাগ্রেশান)

পূর্ব প্রবন্ধে কামশক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। তা থেকে এমন ধারণা হতে পারে যে ফ্রয়েড বুঝি মনে কেবল কামশক্তির অস্তিত্বই মানেন, আর কোনো শক্তি যে মনের আছে তা তিনি স্বীকার করেন না। এই ভুল ধারণার বশে অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে নানা ভ্রান্ত মন্তব্য প্রচার করেছেন, আজও অনেকে করছেন। আসল কথাটা এই যে, আমাদের মনের অনেক ইচ্ছা আমাদের বহু আচরণের ক্রিয়ার আড়ালে যে কামশক্তি কাজ করে তা আমাদের জানা ছিল না। যখন সেই সত্য জানা গেল তা প্রকাশ করে ফ্রয়েড নিন্দার ঝড় নিজে বরণ করে নিলেন, তবু যা সত্য বলে তিনি জেনেছেন তা থেকে তিনি এতটুকু বিচ্যুত হলেন না। সমাজে আমরা কাম সম্বন্ধে অনেক রকমের রাখ-ঢাক মেনে চলি। যুগ যুগ ধরে এই আবরুর ফলে আমরা অনেক পরিমাণে সে সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে চলি। মনে করি আমাদের অনেক কাজেই কামের চিহ্ন নেই। এমনকি অনেক কাজকে শুদ্ধ, পবিত্র বলেও মনে করতে শিখেছি। যখন সেই সব যুগ যুগ সঞ্চিত বিশ্বাসে নতুন মতবাদ আঘাত হানলো, তখন তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক, আর হয়েছিলোও তাই। সেকথা বলেছি।

মনঃসমীক্ষণের আরেকটি তত্ত্বও আমাদের বিশ্বাসের গোড়ায় বেশ কিছুটা আঘাত দিয়েছে। সেটি হলো মনের আক্রম বৃত্তি। আমাদের ভেতরে যে আজও এক আদিম হিংস্র আক্রম বৃত্তি মনের বেশ খানিকটা জুড়ে বসে আছে একথা মানতে আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার গর্বে আঘাত লাগে। তাই যদি হঠাৎ কেউ বলে, 'আপনার মনে নিজের সন্তানকে হত্যা করবার, তাকে আঘাত করবার ইচ্ছা আছে', তা হলে যে কোনো মা তাতে তীব্র আপত্তি করবেন; হয়ত বা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। মনে রাখবেন তাঁর আপত্তি জানানোর তীব্রতার অন্তরালেও মনের আক্রম বৃত্তিই কাজ করে চলেছে। তাছাড়া আপত্তি প্রকাশ যত উগ্র হয়, ততই মনের গোপন তথ্য প্রকাশ হতে থাকে। যে বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করা হয়, সেই বিষয়ের অস্তিত্ব (নিজের মনে) তত সেই আপত্তিকারী প্রমাণ করে দেয়। বেশী আপত্তি বা অস্বীকার, অপরের মনে সন্দেহ জাগায়। আমাদের মনে যে আক্রম বৃত্তি কত তীব্র তার প্রমাণ আমরা এই শহরের পথেঘাটেই নানা রকমের খুন-জখম ঘটতে দেখে কিছু বুঝতে পেরেছি। দেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে হোক, রাজনৈতিক বিশেষ মতবাদের জন্য হোক, বা আর যে কোনও কারণ বা উপলক্ষেই হোক আমরা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে খুন করি, মারধর করি, ট্রাম-বাস বাড়িঘর পোড়াই, জবরদস্তি করে দোকানপাট লুঠ করি তখন আমাদের ঐ আক্রম বৃত্তির প্রভাবেই তা সম্ভব হয়। আজ সারা দুনিয়ায় এই আক্রম যজ্ঞ চলছে। যে আক্রম বৃত্তিকে চেপে রাখবার চেষ্টা মানুষ যুগ যুগ ধরে করে চলেছে তার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হঠাৎ দপ করে এখানে ওখানে হিংস্র আক্রম বৃত্তি জ্বলে ওঠে।—সেদিন বয়স্ক এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কি দিনকাল পড়েছে ডাক্তারবাবু! আমরা যে সভ্য মানুষ সেকথা আর বলবার মুখ রইল না। অন্যেরা আমাদের যদি অসভ্য বলে ঘৃণা করে তাতে ওদের দোষ দেওয়া যায় না। আজ বাসে আসছিলাম, এই আপনার কাছেই আসছিলাম, আমার এই ছেলেকে দেখাবো বলে। কিন্তু যা কান্ড ঘটল না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। কন্ডাকটার টিকিট চাইতেই এক ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠে তাকে গালাগাল দিয়ে বলে উঠলেন, 'চোখের মাথা কি খেয়েছো। দেখছো না ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াতে পারছি না, কখন পড়ে যাই তার ঠিক নেই—আর তুমি টিকিট চাইছ এখন। বড্ড বাড় বেড়েছে! ছোটলোকদের সব মাথায় তোলা হচ্ছে। যতসব...!' কন্ডাকটার ঐ ভিড়ে দিনের পর দিন নানা কথা শুনে, চাপ সয়ে সয়ে হয়ত ধৈর্যের সীমা আর রাখতে পারেনি। দু'চার কথা সেও বলেছে। ব্যাস আর যাবে কোথায়—, চিৎকার গালাগাল তারপর বাসের ভিড়ের মধ্যেই মারামারি। বাস থামাবার জন্যে বারে বারে ঘন্টা। চালককে গালাগাল এক থেকে সাধারণে সংক্রামিত হল। ভিড়ের মধ্যেই দুই দল হয়ে যাত্রীরা মারামারি শুরু করে দিয়েছে। ওদিকে বাস ছুটে চলেছে। যত বলি থামুন থামুন তত আমাকে তেড়ে মারতে আসে। এই দেখুন আমার জামাটার দশা। ছেলেটা এক সময় কোথায় নেমে গেছে দেখতেই পাইনি। মাঝপথে কোনো মতে নেমে অতি কষ্টে এক ট্যাক্সি পেয়ে আপনার এখান এলাম। ছেলেকে দেখতে পেলাম না। কি জানি কখন সে আসবে।' ভদ্রলোকের জামা ছিঁড়ে গেছে, নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এরকম ঘটনা কমবেশী প্রায় প্রতি বাসেই রোজ ঘটছে। কিছুদিন হল মাত্রাটা একটু কমেছে মনে হয়।

ছোট্ট শিশুকে প্রথম থেকেই শেখানো হয়, মেরো না, ভেঙো না, নষ্ট করো না, ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় উপদেশের কথা। একবার নয়, বার বার শত শত বার একই কথা শেখানোর পরেও দেখি সামান্য আঘাতেই তা ভেঙে পড়ে। আর না তখন রুখে উঠে বকে লাগাও মার। শিক্ষা সংস্কার বাধা দিতে চায়, কিন্তু বৃত্তির তাড়না প্রবল হয়ে গিয়ে সব শিক্ষার আবরণ ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিন এক মানসিক রোগীর স্ত্রী এসে অতি বিপন্ন অবস্থায় বলেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনার রোগী আগের চেয়ে অনেক ভাল, প্রায় সেরেই গেছেন, কিন্তু রাগটা বড্ড বেড়ে গেছে। ছয়-নয় কথাতেই একেবারে নয়-ছয় করছেন, যা হাতের কাছে পান ছুঁড়ে মারেন, বকাবকি করেন, মারবেন বলে হাত তোলেন। ডাক্তারবাবু, কখন আবার মেরে বসবেন না তো! বড্ড ভয় করে; বেশ ত শান্ত স্বভাব ছিল, এমন কেন হল, ডাক্তারবাবুর ওষুধে ভুল হয়ে যায়নি তো?' ইত্যাদি। রোগী বিষণ্ণতা (ডিপ্রেশন) রোগে ভুগছিলেন। চুপচাপ বসে থাকতেন, কাজ-কর্ম কিছু করতে চাইতেন না। এমন কি খেতেও রুচি ছিল না। ডাক্তারের নির্দেশে ওষুধ চলছিল। যে রোগী অমন বিষণ্ণতায় ভুগছিল, আগেও কখন বদমেজাজী বলে পরিচিত ছিল না, হঠাৎ কোথা থেকে সে এমন আক্রম প্রবল হয়ে উঠলো—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। মনোবিদ্যার মতে আমার মধ্যে যে বৃত্তি আদৌ নেই কোনো প্রকারেই কোনো অবস্থাতেই আমার মধ্যে সে বৃত্তির প্রকাশ দেখা যেতে পারবে না। আমার মধ্যে যে বৃত্তি সুপ্ত থাকে কেবল সেই বৃত্তিকেই অবস্থাবিশেষে বা কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবরণ মুক্ত করে বাইরে বের করে আনা সম্ভব হতে পারে। যে রোগী দীর্ঘদিন বিষণ্ণতা রোগে ভুগছিল, তার মধ্যেও আক্রম বৃত্তি চাপা ছিল। হতে পারে উত্তেজক ওষুধের ফলে, তার সে বৃত্তি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এমনও দেখা যায়, রোগীর স্বভাবে যে আক্রম বৃত্তি থাকে তাকে চাপতে গিয়ে, অবদমনের ফলে, রোগীর স্বাভাবিক কামশক্তিও চাপা পড়ে যায়। আর তখনই নিষ্ক্রিয়

বা অবসন্নতার রোগলক্ষণ দেখা দেয়। বলা যায়, আক্রম বৃত্তিকে চাপবার জন্য বা অবদমন করার জন্য যেন আক্রম বৃত্তিকেই কাজে লাগানো হয়। যে রোগীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার, ওষুধ বা মনঃসমীক্ষার ফলে, অবদমনকারী আক্রমশক্তি হ্রাস পাওয়ায়, স্বভাবের উগ্র আক্রম বৃত্তি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। একদিক থেকে বলতে গেলে রোগীর এই হিংস্রতার প্রকাশ তার রোগোন্নতির লক্ষণ বলা চলে। যদিও তার সেই উগ্র ব্যবহার মাত্রাধিক্যের পরিচায়ক, এবং এও তার মানসিক সাম্য বজায় রাখবার ক্ষমতার অভাবকেই প্রমাণিত করে। এটাও তার অসুস্থতার আরেক লক্ষণ বলা চলে। বরং এই কথা বলাই আরও ঠিক যে, রোগীর যে-আক্রম বৃত্তি শিশুকালে অতিমাত্রায় অবদমিত হয়ে ক্রমে তার সক্রিয়তাকে অবদমিত করেছিল, চিকিৎসার ফলে, অবদমন ক্রিয়া শিথিল হওয়ায়, আক্রম বৃত্তি বেরিয়ে এসে তার দৈনন্দিন জীবনের শান্তি নষ্ট করছে। এই আক্রম বৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার দিকে এখন নজর দেবার সময় এসেছে। মনঃসমীক্ষার চিকিৎসায় এমন নানা বৃত্তির কিছু কিছু এলোমেলো অর্থাৎ শিশুসুলভ প্রকাশ দেখা যায়। এই অবস্থাকেও চিকিৎসার এক স্তর বলে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে জবরদস্তি করে এই বৃত্তিকে আবার দাবিয়ে দিলে রোগের স্থায়ী উন্নতি না হওয়াই সম্ভব।

জন্ম থেকেই মানুষ তার সব বৃত্তিগুলি নিয়ে জন্মায়। শরীর ও সামর্থ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাশ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। যেমন সদ্যজাত শিশুর কোনো অসুবিধা, বিরক্তি বা কষ্ট যন্ত্রণা বোধ হলেই সে কাঁদে, বড় জোর সামান্য হাতপাও সেই সঙ্গে নাড়ে। তার বেশী কিছু করা সেই অবস্থায় তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বড় হলে সেই রকম বিরক্তিকর কিছু ঘটলে সে তার বিরুদ্ধে কথায় আপত্তি জানায়, এমন কি গালাগাল দেওয়া মারধর করা পর্যন্তও তখন তার পক্ষে সম্ভব হয়। আরও অনেক উপায়ে বড় হলে মানুষ তার বিরক্তি বা মনের আক্রোশ ফলাতে পারে। শিশুর সব মানসিক প্রতিক্রিয়াই তখন তখন ঘটে। তার সহজাত বৃত্তির ক্রিয়া ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাধাহীনভাবে তখনই প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু বয়স্করা মনের প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশ না করে পরে সময় সুযোগ বুঝে, অনেক বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলিয়ে প্রয়োজন মত প্রকাশ করেন। বৃত্তির ক্রিয়া প্রবল হলে অবশ্য বয়স্কদের তীব্র প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ ঘটতে দেখা যায়। তার ফলে, যেমন রাগের মাথায়, এমন নানা অঘটনও ঘটে যায়, যার জন্যে পরে অনুতাপ হয়। হঠাৎ রাগের বশে খুন করতেও দেখা যায়। সুপ্ত আক্রম বৃত্তি তখন প্রকাশিত হয়। এক নামী ভদ্রলোকের কথা জানি যিনি নানা দেশবিদেশে ঘুরে অনেক খরচ করে, বহু সৌখীন এবং প্রয়োজনের জিনিস এনে বাড়ি সাজিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের মেজাজ একটু অনিশ্চিত ছিল। সামান্য কারণে খুব রেগে যেতেন। এক এক সময় ক্রোধের মাত্রা এমন বেড়ে যেতো যে, হাতের কাছে যা তখন পেতেন তা ছুঁড়ে ভেঙে একাকার করতেন। একদিন ঐ অবস্থায় তাঁর বিদেশ থেকে আনা বড় একটা সৌখীন দেয়ালঘড়ি পেড়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে তা ভেঙে টুকরো টুকরো করলেন। রাগ পড়লে তখন আপসোস করলেন। লজ্জা হল, কিন্তু তার দু-চারদিন পরেই একদিন রেগে গিয়ে আলমারির কাচ ভেঙে ভেতরে থেকে বহুমূল্য পুরোনো চীনেমাটির বেকারি, ফুলদানি ইত্যাদি সব দোতলা থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে চেয়ে থেকে নাকি রাগ আস্তে আস্তে কমে আসে। শান্ত হবার পরে তাড়াতাড়ি ভাঙা টুকরো সব সরিয়ে ফেলতে বলেন। তখন ঐগুলো দেখলে তাঁর কষ্ট হয় কান্না পায়। এ এক রকমের মানসিক রোগ। সামান্য কারণে হঠাৎ রেগে গিয়ে মা সন্তানকে বেদম মার লাগান—এমন হামেসাই দেখা যায়। এসবই রোগের পর্যায়ে পড়ে। আর এই আচরণের মধ্যে যে রোগীর আক্রম বৃত্তি প্রকাশ পায়, সেকথা বিশেষ করে বলবার দরকার হয় না।

গীতায় আছে '...কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।' (গীতা ২।৬২) অর্থাৎ কাম বাধা পেলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এখানে কাম শব্দে কেবল যৌনক কাম বোঝায় না। আমাদের কামনা বাসনাও বোঝায়। বহু কারণে আমাদের ক্রোধ হতে পারে। সবগুলির বিস্তৃত তালিকা দেবার দরকার নেই। এই বললেই চলবে যে নিজের অহংকারে ঘা লাগলে, নিজের ক্ষতি অপরে করতে চাইছে দেখলে, নিজের সুখে বাধা পড়লে, নিজের একান্ত ইচ্ছায় বাধা দিলে, নিজের সম্মানের হানি ঘটলে, নিজেকে ভোগের সুযোগ না দিয়ে, বা সে ভোগের উপকরণ কেড়ে নিয়ে, অপরকে তা ভোগ করতে দেখলে, নিজের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেখলে ইত্যাদি আরও নানা কারণে রাগ হতে পারে। সকলেরই যে তা হবে সেকথা নয়, তবে সাধারণ মানুষের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সব অবস্থায় রাগ হয়। নিজের কিছু ক্ষতি হচ্ছে না, অপরের ক্ষতি হচ্ছে দেখলেও রাগ হতে পারে। যেমন একজনকে ধরে খুব মার দেওয়া হচ্ছে দেখলে দুঃখ বোধ হয়, আবার রাগও হয় অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে।

গ্রামে ছেলেরা মাঠে গরু চরাতে যায়। কোথাও গরু ছেড়ে দিয়ে নিজে গাছতলায় বসে থাকে বা দুচারজন মিলে খেলা করে। একবার এই রকম একটি ছেলে কয়েকটা গরু চরাতে ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বসে ছিল। গরু দু-তিনটে এক ধানক্ষেতের পাশে থেকে খুব আরামে কচি ধান খেয়ে চলেছে—সেদিকে ছেলেটির হয়তবা খেয়াল ছিল। মাঠের হাঁটাপথে এক বয়স্ক কৃষক যাচ্ছিল। সে তা দেখতে পেয়ে রেগে গিয়ে ছেলেটিকে খুব মার লাগায়। যে ক্ষেতের ধান গরুতে খাচ্ছিল সে ক্ষেতটি ঐ কৃষকের ছিল না। অপরের ধান লোকসান হচ্ছে দেখে সে রেগে গেল। মনের একাত্মতা বোধের জন্য, অপরের ক্ষতি, নিজের ক্ষতি মনে হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মনের সব অনুভূতির ক্ষেত্রেই এই একাত্মতা (আইডেন্টিফিকেশন) ঘটতে পারে। নিজের কাজের জন্য নিজের উপর নিজেরই রাগ হতে পারে। যে কাজ করতে পারি মনে করি, বারবার চেষ্টা করেও তা করতে না পারলে রেগে গিয়ে নিজের গালে চড় মারা বা নিজের কান নিজেই মলে দেবার দৃষ্টান্তও আছে। আরও অনেক রকমের উদাহরণ দেওয়া যায়। এগুলির তো যা হোক একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন মানুষ আছেন যাঁকে 'ভালো' বললে বা তাঁর কাছে ১৩ সংখ্যা বা অন্য বিশেষ কোনও সংখ্যা উল্লেখ করলেই তিনি চটে যান। সাধারণ দৃষ্টিতে এরকম রাগের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কারণ সে কারণ ব্যক্তির আসংজ্ঞান বা নির্জ্ঞান মনে লুকোনো থাকে। মনঃসমীক্ষণ রীতিতে এই রাগের মূল কারণ জানতে পারা যায়।

যতগুলি উদাহরণ দেওয়া হল বা ক্রোধের কারণ বলা হল, সবগুলিই যে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্রোধ দেখা দেয় এই কথাই মনে হয়। কোথাও কোনো কারণ, সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে, নেই তবু রাগ হচ্ছে এমন দেখা যায় না। অবশ্য, যা আগে বলেছি, রাগের কারণ জানতে না পারলেও একটা কিছু কারণ আমাদের মনের গভীরে লুকোনো থেকে প্রতিক্রিয়াটাকেই কেবল প্রকাশ করে, এমন হতে পারে। 'কেন জানিনা কিন্তু খুব বিরক্তি হচ্ছে, রাগ হচ্ছে, কিছু ভাল লাগছে না' এমন কথা অনেককেই বলতে শোনা যায়।

আক্রম বৃত্তির প্রকাশ, পরীক্ষায় অপরকে হারিয়ে বেশী নম্বর পাওয়া, প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ঘরে বসে দাবা খেলায় বিপক্ষের বল ধ্বংস করবার সময় জোরে ঠোকা মারার মধ্যে কিংবা দেনার মধ্যে, তাস খেলায় বড় তাস মেরে বিপক্ষের পিঠ তুলতে বা তুরুপ মারতে, ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি নানা খেলার

মধ্যে আক্রম বৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। চিবিয়ে খাওয়ার মধ্যে বিশেষ করে শক্ত খাদ্য দাঁত দিয়ে ভাঙবার মধ্যে বা দাঁত কাটবার মধ্যে, চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারের মধ্যে ঐ বৃত্তি কাজ করে। শুনলে অবাক লাগে যে আমাদের ভালবেসে আদর করার মধ্যে, শিশুকে আদর করার মধ্যে, এমনকি যৌন সম্ভোগের মধ্যেও আক্রম বৃত্তি কাজ করে চলে। তা সে তার আপন কাজ করে চলুক, যতক্ষণ সহজ সাধারণ জীবন যাপনের পক্ষে সে বাধা সৃষ্টি না করে ততক্ষণ আমাদের আক্রম বৃত্তি সম্বন্ধে আপত্তি করবার বা তাকে ভয় করবার কারণ নেই। কিন্তু সাধারণ, স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তখন নানা অসুবিধে, অসন্তোষ দেখা দেয়, এমনকি তা মানসিক রোগ-লক্ষণও হয়ে দাঁড়ায়। মনঃসমীক্ষণবাদের প্রথমাবস্থায় কামশক্তির বিকৃতি, প্রতিরোধ, অবদমন ইত্যাদি কারণে বেশীর ভাগ মানসিক রোগ হয় মনে করা হতো। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল এই আক্রম বৃত্তির প্রভাবই যৌন অবদমন ইত্যাদি ও অন্যান্য নানা মানসিক রোগের কারণ জোগায়। এই বৃত্তি আমাদের জীবনে, সমাজে, সভ্যতায় যে কী বিপর্যয় ডেকে আনে তা আমরা, বর্তমান যুগের মানুষ, ভাল করেই জানি। গত মহাযুদ্ধের রেশ, ভিয়েৎনামের অবাধ ধ্বংসলীলা, আমাদের ঘরের পাশে অধুনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের নৃশংস বর্বরোচিত আক্রম বৃত্তির আদিম পাশবিক রূপ আমরা দেখেছি। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ এই আমরাই এই সব এবং আরও অনেক ধ্বংসলীলায় আমাদের আক্রম বৃত্তির অশোধিত ব্যবহার করেছি। সর্বনাশ ঘটিয়ে আবার তার ঘর বাঁধবার জন্যে দরাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় না। স্বার্থ এমনই শক্ত! জিনিস ভেঙে ফেলে তার জন্য পরে মায়া করা দরদ দেখানো যেমন মানসিক রোগলক্ষণ বলেছি, ধ্বংস করে, সর্বনাশ ঘটিয়ে দরদ দেখানোও তেমনই এক প্রকারের মানসিক রোগলক্ষণ। বিংশ শতাব্দী কার পরানো, রক্তটিকা পরে দেখা দিয়েছিল কে জানে! আমরা এই শতাব্দীতে জন্মে আক্রম বৃত্তির যে বিস্তৃত ও বহুল পরিচয় পেয়ে গেলাম সে পরিচয় আর যেন ভবিষ্যত শতাব্দীবাসীর ভাগ্যকে বিড়ম্বিত না করে। মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে এই দাবী আমরা রাখবো।

মানুষের যে বৃত্তি এমন প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করতে পারে, মানুষের মনের এই ভীষণ পরমাণু বোমাকে কি করে শান্ত রাখা যায়, কি করে বৃত্তিকে অতি প্রবল হতে না দিয়ে তাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয় সামান্য মাত্র উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করবো। শান্তি ও কল্যাণের জন্যে পরমাণুর ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা অনেক চেষ্টা করছি। কিছু সফলতাও লাভ হয়েছে। তবু আরও অনেক বাকি। কিন্তু মনের এই আগ্নেয়গিরিকে কি করে শান্ত করা যাবে? আক্রম বৃত্তিকে মানুষ চেনে, আর তাকে নিজমূর্তিতে প্রকাশ হতে না দিয়ে, সমাজকল্যাণের দিকে চালনা করতেই, নানা রকমের প্রতিযোগিতা খেলাধুলো রোগের বীজাণপ্র নাশ, প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে আনা, মানুষের ক্ষতিকর নানা বিরুদ্ধ শক্তি ও শত্রুকে আয়ত্তে আনা ও বিনাশ করার দিকে আমরা সেই আক্রম বৃত্তিকেই প্রয়োগ করেছি। কোনো বৃত্তিকেই আমূল ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে করে তারা মানুষের অকল্যাণ না করে, কল্যাণ করতে পারে। বৃত্তির প্রকাশ দরকার। তার সবটুকু চেপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ, আমাদের বৃত্তিগুলি মরে যায় না। জীবন্ত বৃত্তিগুলি সর্বদা নিজেদের পূরণের জন্য তৎপর থাকে। কখন যে কোন পথে বেরিয়ে এসে সমস্যা বাধাবে তা বলা যায় না। এই সত্য চিন্তাশীল মানুষ আদিকাল থেকে জানতে বুঝতে পেরেছিলেন বলে নানা সামাজিক ব্যবহার আচরণের মধ্যে দিয়ে বৃত্তিগুলির বিশেষ প্রকাশকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য এর ফলে সুস্থ থাকতে পারে। বৃত্তিকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। বৃত্তির সুষ্ঠু সমাজগ্রাহ্য নিয়ন্ত্রণই একমাত্র পন্থা যা আমাদের সমাজের ও ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ও সবল রাখতে পারে।

আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বা মহেশ্বরের কল্পনা করা হয়েছে। রুদ্রের সংহার না থাকলে সৃষ্টি অচল হয়ে যায়। সংহার বলতেই পূর্বপাকিস্থানের বা ভিয়েৎনামের সংহার বোঝায় না। রুদ্রের সংহার নিয়ন্ত্রিত সংহার। নতুন সৃষ্টির স্থান করবার জন্যেই পুরোনো জরাজীর্ণের বিনাশ প্রয়োজন। সৃষ্টি এই লীলা চালু রাখতে হলে সৃজন, পালন যেমন দরকার সংহারও তেমনি দরকার। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও এই সংহারের প্রয়োজন আছে। ম্যালেরিয়ার মশা, রোগের বীজাণু, ফসলের কীট প্রভৃতি যা আমাদের ক্ষতিকারক তাকে নিধন করতে হবে। তা না পারলে কালক্রমে আমাদেরই মরতে হবে—ওদের আক্রমের ফলে।

মানুষের স্বভাবের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, আক্রম বৃত্তিকে চেপে রাখবার জন্যে যতরকম উপায় অবলম্বন করা হয় তার ফলে ঐ বৃত্তির প্রকাশ অনেক পরিমাণে শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু মনের এই বৃত্তিগুলির চাপ সহ্য করার, অবদমিত হওয়ারও, যেন একটা সীমা আছে। সে সীমা কোনো নির্দিষ্ট সকলের পক্ষে সার্থক সীমা নয়। একে একেবারে ব্যক্তিগত সীমা বলা চলে। রাম যত পরিমাণ বিশেষ কোনো বৃত্তি দমনের চাপ সহ্য করে জীবনযাপন করতে পারে, শ্যাম হয়ত ততখানি চাপ সহ্য করতে পারবে না। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলেই আমাদের বিরুদ্ধ বৃত্তি যেন বিদ্রোহ করে বসে। মনের যে শক্তি এই দমনের কাজ করে থাকে সেই শক্তিকে অগ্রাহ্য করে বৃত্তি, তার আপন শক্তিতে, অল্পসময়ের জন্য হলেও, বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের সাজানো সুনিয়ন্ত্রিত জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এই যদি আমাদের মনের অবস্থা হয়, তবে আক্রম বৃত্তির বিধ্বংসী ক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবার পথ কি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। প্রশ্নটি জটিল, উত্তর খুব সহজে দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। ছোট থেকে কিভাবে শিক্ষা দিলে আমাদের আক্রম বৃত্তি উগ্র হয়ে উঠবে না অর্থাৎ যে চাপ সহ্য করবার সীমার কথা বলেছি, মনের সেই সীমাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করা দরকার হবে। সুদীর্ঘ অতীতকালের শিক্ষার সামগ্রিক কিছু সুফল আমাদের জীবনে দেখা যায় বলে মনে হয়। কিন্তু আবার এমন ধাক্কা আসে যা সব বাঁধ ভেঙে চুরমার করে দেয়। তবু হাজার হাজার বছরের শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের কিছুটা প্রভাব বৃত্তিগুলির উপরেও পড়ে, সে প্রভাব যত সামান্যই হোক, এর ফলে বৃত্তিগুলির হিংস্রতা, প্রাবল্য ইত্যাদি হয়ত আদিম যুগের মত সব প্রসারী ও সর্বক্ষণের জন্য স্থায়ী হতে আর পারে না। যত কমই হোক এটাও কম লাভ নয়। বৃত্তির ভোগ মন যেমন চায়, আবার সুনিয়ন্ত্রিত সুসম জীবনযাপনও মন চায়। এই দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যা আমরা ভাল বলি, সেই সু একসময় যা খারাপ বলি সেই কুয়ের কাছে হার মানলেও আবার সু কুয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে বলেই, পৃথিবীতে মানুষ আজও সগর্বে বাস করছে, সভ্যতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। এক সভ্যতা নষ্ট হলেও আর এক সভ্যতা গড়ে ওঠে। পূর্বের বর্বর যুগে আমরা ফিরে যাই না। উত্থান পতন আছে সত্য, কিন্তু তবু গতি থেমে যায়নি। সভ্যতার গতিকে আমাদের মনই থামতে দেয় না। মনের এই সব ক্রিয়া সম্বন্ধে পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

এখন পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানের মধ্যে, মন সম্বন্ধে যেসব তথ্য ও তত্ত্ব ধরতে পারা গেছে, তাতে এখনও এমন কোনো শিক্ষা বা প্রক্রিয়ার পদ্ধতি বলে দেওয়া সম্ভব নয় যার অনুশীলন করলে আমাদের বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যাবে। সেজন্য নিরাশ হবার কারণ নেই। চেষ্টা করে যেতে হবে, যেমন আমাদের পূর্বপুরুষেরা করে এসেছেন। নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। এই আমাদের করণীয় কর্ম। নিষ্ঠার সঙ্গে সততার সঙ্গে জ্ঞানের ও পন্থার সন্ধান করে যেতে হবে। জ্ঞানীগুণীরা নানা দেশে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা যা বলে গেছেন, সেগুলিকেও জানতে হবে, বুঝতে হবে, যাচাই করতে হবে, তার থেকে নতুন পথ বের করতে হবে। চলতে হবে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

আজকের এই সুগম যাতায়াতের যুগে দেশভ্রমণ দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই না একটা দেশকে কতোটুকু চেনা যায়? চিনতে হলে শুধু ভূগোল নয় জানা দরকার তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই চার দিক থেকে আলোচনা করা হবে—আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব আমরা।

কোচবিহার—(৪)

অগ্রগতি ও সম্ভাবনা

শিক্ষার উন্নয়নে কোচবিহারের মহারাজাদের বরাবরই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত কোচবিহার জেন্‌কিন্স ইনষ্টিটিউশন দীর্ঘকাল ধরে উত্তর বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুল বলে স্বীকৃত ছিল। ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্টোরিয়া কলেজ, যে কলেজে একদা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসাম থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। কারিগরি শিক্ষার দিকেও কোচবিহার রাজসরকারের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ১৮৬৯ সালে কোচবিহার শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারিগরি শিক্ষার স্কুল, সেখানে কামার, কুমোর, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, তাঁতি প্রভৃতি সকলেরই হাতে-কলমে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হয় ও ছাত্র আকর্ষণের জন্য ঢালাও ভাবে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। শরীর-চর্চা ও খেলাধুলোর উন্নতির দিকেও কোচবিহারের রাজাদের প্রশংসনীয় উৎসাহ ছিল। কুস্তি, ক্রিকেট ফুটবল, হকি, টেনিস প্রভৃতি সবেরই মানোন্নয়নের জন্য কোচবিহারের রাজারা দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় কুস্তিগির ও খেলোয়াড়দের আনান এবং এ-ব্যাপারে কোচবিহারের রাজাদের তৎপরতা শুধু কোচবিহার রাজ্যের মধ্যেই সীমিত ছিল না।

১৯০০ সালে কোচবিহারে প্রথম শ্রেণীর কলেজ ছিল একটি, উচ্চ-ইংরেজি স্কুল ছিল চারটি, ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমিক স্কুল ছিল ৩৯টি, সংস্কৃত টোল ছয়টি, মাদ্রাসা পাঁচটি, নাগরি স্কুল একটি, পাঠশালা ২৪৫টি, নৈশ বিদ্যালয় ৪৪টি ও বালিকা বিদ্যালয় ১৫টি। একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এতগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকা কম কথা নয়।

শিক্ষার ব্যাপারে এই এগিয়ে থাকার সুফল কোচবিহার আজও ভোগ করছে। ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা যায় শহর এলাকায় শিক্ষিতের হারে কোচবিহার এই রাজ্যে প্রথম স্থানাধিকারী, এমন কি কলকাতার স্থানও তার পরে। ১৯৬১ সালে কোচবিহারের শহরগুলিতে শতকরা ৬৪-৫৪জন শিক্ষিত ছিল, যখন কলকাতায় শিক্ষিতের হার ছিল ৬৪-৯৮ শতাংশ। সারা পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র কলকাতা ও কোচবিহারের শহরাঞ্চলে নারীর শিক্ষার হার ছিল ৫০ শতাংশের উপরে। কোচবিহারের একমাত্র মেকলিগঞ্জ বাদে প্রতিটি থানার শহরাঞ্চলে শিক্ষিতের হার ৬০ শতাংশের বেশি ছিল, মেকলিগঞ্জেরও হার ছিল ৫৮ শতাংশ। শহরে শিক্ষিতের হারে কোচবিহারের কলকাতাকেও অতিক্রম ক'রে প্রথম হওয়া কোচবিহারবাসীদের পক্ষে অবশ্যই শ্লাঘার বিষয়, কোচবিহারের শহরগুলির নারী সমাজও শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী।

কিন্তু কোচবিহারবাসীদের সতর্ক হওয়ার জন্য জানা দরকার যে, '৭১ সালের জন-গণনার ভিত্তিতে যেটুকু হিসাব নিকাশ এখনও পর্যন্ত হয়েছে তাতে কোচবিহারের শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারে কোন সুসংবাদ নেই। '৬১ সালের তুলনায় '৭১ সালে সমগ্র জেলায় পুরুষের শিক্ষাহার ৬-৮৯ শতাংশ ও স্ত্রী-শিক্ষার হার ৩০-১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পুরুষের শিক্ষালাভের সংগতি রক্ষা ক'রে অগ্রসর হতে পারেনি। '৬১ সালে সমগ্র জেলায় পুরুষের শিক্ষা-হার ছিল ৩১-৪৪ শতংশ। কিন্তু '৭১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩১-৪৩ শতাংশ। এ রাজ্যের আর কোন জেলায় এমন হয়নি।

পরের সপ্তাহে
বাঁকুড়া

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার ব্যাপারেও কোচবিহার অনেক পেছিয়ে আছে। শহরে শিক্ষার হারে যে জেলা প্রথম স্থানাধিকারী, গ্রামে শিক্ষার হারে তার স্থান দশম। গ্রামাঞ্চলে নারী-শিক্ষার হারেও কোচবিহার খুব বেশি পিছিয়ে। শহরের তুলনায় গ্রামে শিক্ষা-ব্যবস্থা বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে বলেই কোচবিহার জেলার সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অবস্থা এত অসন্তোষজনক। ১৯৭১ সালের হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৪-৪৬ হলেও কোচবিহার জেলায় শিক্ষিতের হার ২৫-৩৯ শতাংশ; আর জেলার ৩৭-৪৩ শতাংশ পুরুষ শিক্ষিত হলেও নারীর শিক্ষাহার মাত্র ১১-৪০ শতাংশ।

বর্তমানে কোচবিহারে কলেজ আছে ছয়টি, টিচার্স ট্রেণিং কলেজ তিনটি, সংস্কৃত শিক্ষার কলেজ একটি, টেকনিকাল স্কুল দুটি, সেকেণ্ডারি স্কুল ১৭২টি ও প্রাইমারী স্কুল ১,১১৪টি। চৌদ্দ লক্ষ লোকের একটি জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত কম বলেই সে জেলার তিন-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ দশ লক্ষ লোক আজও নিরক্ষর। এদের স্বাক্ষর করার দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের, এই শিক্ষাপ্রসারের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের যে বড় সুযোগ রয়েছে তাও উপেক্ষণীয় নয়। শিল্পে অনগ্রসর এবং সীমাবদ্ধ সম্ভাবনাসম্পন্ন কোচবিহার জেলায় এই কারণে শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। একটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া ইঞ্জিনীয়ার আছেন মাত্র ১৪জন ডাক্তার মাত্র ৩৩জন, কৃষি-স্নাতক মাত্র একজন এবং এঁরা সকলেই পুরুষ—এ প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও কোচবিহার এ রাজ্যের অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশ এগিয়ে ছিল। কোচবিহার শহরে মিউনিসিপ্যালিটি হয় ১৮৮৫ সালে এবং শহরটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাজ্য সরকারের সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। পরিচ্ছন্ন, সুরক্ষিত ও সুরম্য শহর হিসাবে কোচবিহার বরাবরই ছিল অগ্রগণ্য। কোচবিহার ছাড়াও একদা দিনহাটা ও তুফানগঞ্জ শহরের রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কোচবিহার শহরের সাগরদীঘি, লালদীঘি, বৈরাগীদীঘি প্রভৃতি জলাশয়গুলি একদা পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পরে কলের জলের ব্যবস্থা হয়। মহকুমা শহরগুলিতেও পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত পুষ্করিণী ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগেই কোচবিহার শহরের টাউন হাসপাতাল উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল রূপে স্বীকৃত ছিল। এখন তার আরও সম্প্রসারণ ঘটেছে

কিন্তু পরিচ্ছন্নতা বা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা আর আগের মত নেই বলে অভিযোগ শোনা যায়। সব মহকুমা শহরে একটি ক'রে হাসপাতাল আছে, মেকলিগঞ্জে আছে দুটি। মেকলিগঞ্জে ও হলদিবাড়ীতে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও গড়ে উঠেছে ব্লকে ব্লকে। কিন্তু বিদ্যুৎ, লেবরেটরি, যোগ্য চিকিৎসক ওষুধপত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজই সন্তোষজনক নয়। সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সমগ্র জেলায় মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার আছেন মাত্র ৩৩জন এবং মহিলা ডাক্তার একজনও নেই।

ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কলেরা জেলার প্রধান সংক্রামক ব্যাধি। তার মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসেছে, বসন্তের প্রতিষেধক টীকাও ব্যাপকভাবে দেওয়া হয়। কিন্তু কলেরা প্রতিরোধের ব্যাপারে সতর্ক তার অভাব আছে। জনসাধারণের অশিক্ষা ও কুসংস্কার সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যাপারে একটি বড় বাধা।

বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ কোচবিহার জেলার একমাত্র শক্তির উৎস। কিন্তু এ শক্তিতে কোচবিহারের দীনতা প্রায় অবিশ্বাস্য। কোচবিহার, দিনহাটা, ভেতাগুড়ি, দেওয়ান হাট, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা মেকলিগঞ্জ ও চাংড়াবাধা—এই কটি শহর ও আধাশহর বাদে জেলার ১১৩৮টি লোক-অধ্যুষিত গ্রামের মধ্যে মাত্র তেরটিতে বৈদ্যুতিক শক্তি পৌঁছেছে।

কোচবিহারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় জলঢাকা জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এবং তা পুনঃসঞ্চারিত করা হয় কোচবিহার পাওয়ার হাউস ও চাংড়াবাধা পাওয়ার হাউস থেকে। কোচবিহার থেকে সরবরাহ করা হয় ২-৮ মেগাওয়াট ও চাংড়াবাধা থেকে মাত্র ৫৭৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। এই সরবরাহেরও একটা বড় অংশ আবার জলপাইগুড়িতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। চাংড়াবাধা পাওয়ার হাউস থেকে যায় ২৪০ কিলোওয়াট ময়নাগুড়ি বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্রে, আর কোচবিহার পাওয়ার হাউস থেকে যায় ৬০০ কিলোওয়াট আলিপুরদুয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে। ফলে সারা কোচবিহার জেলাতেই আজ বিদ্যুতের জন্য হাহাকার। যা সরবরাহ করা হয় তারও ভোল্টেজ এত কম যে তা দিয়ে ছোটখাটো শিল্পের কাজ চালানোও কঠিন ব্যাপার। জেলায় এখন নতুন ক'রে কাউকে বিদ্যুতের কানেকশন দেওয়া হয় না। কোচবিহারের শিল্পোন্নতির পথে নিঃসন্দেহে এইটিই সবচেয়ে বড় বাধা। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কোচবিহারে বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর থেকে যদি সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়, তাহলে এখনই সে জেলায় বিদ্যুৎ চাহিদা ২-৫ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে এবং অনতিবিলম্বে ঐ চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ৪-৫ মেগাওয়াট। বলা বাহুল্য, এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য জলঢাকার ক্ষণভঙ্গুর সরবরাহের উপর নির্ভর করা যায় না এবং তাপ-বিদ্যুতের সাহায্যেই এই অভাব পূরণ করতে হবে। জেলায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে, তা যেমন শিল্প সম্ভাবনা বাড়িয়ে স্থানীয় লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে, তেমনই ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতেও বহু শিক্ষিত যুবক ও দক্ষ শ্রমিকের কাজের সংস্থান হবে।

সেচ ব্যবস্থাতেও কোচবিহার খুব বেশি পিছিয়ে আছে। জেলায় মে থেকে সেপ্টেম্বর ভাল বৃষ্টি হলেও অন্য সাত মাস বিভিন্ন স্থানে চাষের জন্য জলের অভাব হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই জেলায় কোন বড় বা মাঝারি ধরনের সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি। যে দুটি ছোট সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, সেই জোড়াই ও বড় সালবাড়ি সেচ প্রকল্পে যথাক্রমে ১৬০০ ও ৬৫০ একর জমিতে জল সেচ সম্ভব। এখন নদী থেকে খাল কেটে জল তুলে, গভীর নলকূপ বসিয়ে, পুকুর কেটে, কুয়ো খুঁড়ে ও অগভীর নলকূপ বসিয়ে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও সঞ্চারণের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু জেলার মধ্য দিয়ে যে চার-পাঁচটি অত্যন্ত বেগবতী ও দুর্নিবার নদী বয়ে চলেছে সেই তোর্ষা, তিস্তা, রাইডাক, কালজানি ও জলঢাকাকে (স্থানীয় নাম সিঙ্গিমারি ও মানসাই) নিয়ন্ত্রণে না আনা পর্যন্ত জেলার সেচ ব্যবস্থা সন্তোষজনক কিছুতেই হতে পারবে না। বর্ষায় প্রমত্ত নদীগুলি দুই কূল ভাঙে, তারপর মাঝে মাঝেই গতি পরিবর্তন করে দুই কূলের মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। নদীর খেয়ালিপনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সদর ও তুফানগঞ্জ মহকুমা। সরকার জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বারোটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। বড় বড় বাঁধ বেঁধে নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনা ও এক-একটি এলাকাকে রক্ষা করা ঐ পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য। যেমন কোচবিহার শহর রক্ষার্থে যে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য প্রায় চৌত্রিশ হাজার ফুট এবং

ঐ বাঁধে রক্ষা পাবে ২২৪০ একর জমি। গদাধর নদীর বাঁ পারে যে ৬০ হাজার ফুট দীর্ঘ বাঁধ বাঁধা হবে তাতে রক্ষা পাবে আট হাজার একর জমি। এইভাবে বারোটি বাঁধের সাহায্যে কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ প্রভৃতি শহরগুলি ও মোট তেত্রিশ হাজারের কিছু বেশি একর জমি রক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জেলার মোট ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার একর চাষের জমির মধ্যে এখন সরকারি উদ্যোগে ২৪,৫৮৫ একর ও বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে মোট ৩৪,৮০৩ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। এই থেকেই জেলার সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। জেলার সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য টিউবওয়েলের ওপরেই সব-চেয়ে বেশি নির্ভর করতে হবে। একমাত্র মেকলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ থানার কিছু পাথুরে এলাকা ছাড়া সর্বত্রই টিউবওয়েল বসতে পারে।

সরকারি হিসাব অনুসারে কোচবিহারের দুই লক্ষ ৬২ হাজার ৮০০ হেক্টেয়ার (এক হেক্টেয়ার সমান প্রায় আড়াই বিঘা) চাষের জমির মধ্যে প্রায় ৯১ হাজার হেক্টেয়ার জমি এখন দো-ফসলি। ঐ জমিকে তিন-ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করতে প্রায় বাইশ হাজার অগভীর নলকূপের দরকার হবে। একটি অগভীর নলকূপের জলে তিন হেক্টেয়ার জমি সিঞ্চিত করা যায়, এবং বিদ্যুৎ-চালিত একটি অগভীর নলকূপ বসাতে খরচ পড়ে চার হাজার টাকা। বাইশ হাজার নলকূপ বসলে যেমন কয়েক হাজার মানুষের কাজ জুটবে, তেমনই খাদ্য ঘাটতি কোচবিহার জেলা উদ্বৃত্ত জেলায় পরিণত হবে।

জেলায় কৃষি

কোচবিহারের প্রধান ফসল ধান, পাট ও তামাক। এ ছাড়া সর্ষে, আখ, গম, যব, ডাল প্রভৃতির ফলনও ভাল। ধান হয় দু-রকম আউস ও হৈমন্তী। আউসের চাষ হয় দু-লক্ষ একর জমিতে, আর হৈমন্তীর চাষ হয়—প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল আউস চাষ হয় ২,১১০ একর জমিতে ও উচ্চ ফলনশীল আমন ৬০ হাজার একর জমিতে। সারা জেলায় আউসের ফলন হয় কিঞ্চিদধিক ১৬ লক্ষ মণ, অর্থাৎ একরপিছু আট মণ। সে জায়গায় ২,১১০ একর উচ্চ-ফলনশীল আউস চাষ করে পাওয়া যায় ৪২ হাজার ২০০ মণ ধান, অর্থাৎ একরপ্রতি বিশ মণ। সারা জেলায় আমনের ফলন হয় ৯৬ লক্ষ ৬ হাজার মণ, অর্থাৎ একরপ্রতি ১২ মণ; অপরদিকে ষাট হাজার একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল আমন ফলে ১৮ লক্ষ মণ, অর্থাৎ একরপ্রতি ত্রিশ মণ।

উল্লিখিত উচ্চ ফলনশীল দু-জাতের ধানের ফলন থেকেই বোঝা যাবে, কোচ-বিহারে ধানের ফলন বৃদ্ধির কতখানি সম্ভাবনা আছে। অথচ এই জেলাকে এখন বাইরে থেকে ধান গম, সবজি ইত্যাদি আমদানি ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। এই জেলা বাইরে থেকে প্রতি বছর চাল, ডাল, সবজি, মসলা, তেল, গম, চিনি, লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী, সিমেন্ট, কয়লা প্রভৃতি যা আমদানি করে তার মোট মূল্য দশ কোটি টাকা।

কিন্তু তাহলেও আমদানি রপ্তানির বিয়োগফল এখনও কোচবিহারের অনুকূলে। কোচবিহার রপ্তানি করে ৯৪ হাজার টন পাট, যার দাম ১১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, আর প্রায় ৬ হাজার টন তামাক, যার দাম দুই কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ শুধু পাট ও তামাক বেচে কোচবিহার পায় প্রায় তের কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং কোচ-বিহার সারা বছরে যে মূল্যের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানি করে, শুধু তামাক আর পাটের দামে তা শোধ হয়ে গিয়েও ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বাড়িয়ে চললে এবং সেই সঙ্গে তামাক ও পাট চাষেরও উন্নতি হলে কোচবিহার কি রকম সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমেয়। কোচ-বিহারের শিল্প সম্ভাবনা সীমিত, সে-কারণে তার সামগ্রিক উন্নতির জন্য কৃষির উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর এ-ব্যাপারে কোচবিহারের উন্নতির সম্ভাবনা যে অন্ত-হীন তা উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে।

কিন্তু কোন মন্ত্রে বা শুভেচ্ছায় এ কাজ সম্ভব নয়। এর জন্য চাই বিদ্যুতের ব্যাপক সম্প্রসারণ, প্রতি একর জমিতে সেচের সুব্যবস্থা, পথ ও পরিবহনের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন, কৃষকদের সহজে ঋণ লাভের সুযোগ ও কৃষিজ পণ্য বিপণনের উন্নততর পরি-কল্পনা। আর এইসব পরিকল্পনাগুলি ঠিক-মত রূপায়িত হলে তার মধ্য দিয়ে অগণিত মানুষের কাজের সুযোগ ঘটবে।

অর্থকরী শস্যগুলির মধ্যে তামাকেই চাষীদের আয় সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। একমাত্র সদর ও তুফানগঞ্জ মহকুমার উত্তর-অঞ্চল বাদ দিলে সারা জেলায় তামাকের চাষ হয়। তার মধ্যে লালবাজার অঞ্চলের তামাকের খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। তামাক চাষের বড় সুবিধা যে তার জন্য ভাল জমির দরকার হয় না। খারাপ জমিও সার পেলে ভাল তামাকের জমিতে পরিণত হয়। সারা কোচবিহারে এখন প্রায় পঁচিশ হাজার একর জমিতে তামাক চাষ হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে পনর একর জমিতে র‍্যাপার ও সাড়ে বারো একর জমিতে ফিল্লার চাষ করে খুব ভাল ফসল পাওয়া গেছে। ভাল চুরুটের উপযোগী এই র‍্যাপার ও ফিল্লার তামাক।

জেলায় পাটের জমি প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার একর। কোচবিহারের পাটের আঁশ সূক্ষ্ম, সেকারণে তার চাহিদা বেশি, দামও বেশি। চট, দড়ি-দড়া ছাড়াও মেকলি-গঞ্জে মেকলি বা মেখলি নামে এক ধরনের সুদৃশ্য কাপড়ও পাট থেকে তৈরি হত। মেকলি থেকেই মেকলিগঞ্জ। কিন্তু অমন মনোরম একটি বস্ত্রশিল্প আজ অস্তিত্বহীন, ডোডো পাখির মতো ইতিহাসের বস্তু।

জেলায় গম চাষও বেড়ে চলেছে; এখন এগারো হাজার একর জমিতে উচ্চ-ফলনশীল গমের চাষ হয় এবং মোট ফসল পাওয়া যায় ২ লক্ষ ৬৪ হাজার মণ। অর্থাৎ একরে চব্বিশ মণ। গমের চাষের জমি বাড়িয়ে ৭৫ হাজার একর পর্যন্ত করার [illegible] আছে। এ ছাড়া আলু চাষ হয় প্রায় [illegible] হাজার একর জমিতে, আখ চাষ হয় [illegible] হাজার একর জমিতে, তৈলবীজ ২৬,[illegible] একর জমিতে ও ছোলার চাষ হয় ২৫০ একর জমিতে। বোরো ধানের চাষও বাড়ছে; ৮০৫ একর জমিতে সাধারণ বীজের [illegible] ফসল পাওয়া যায় প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার মণ, অর্থাৎ একরপ্রতি ১৮ মণ। আর [illegible] একর জমিতে উচ্চ-ফলনশীল বোরো ধানের চাষ করে পাওয়া যায় প্রায় এগার হাজার মণ, অর্থাৎ একরপ্রতি সাতাশ মণ।

কোচবিহারের জমির ফলন বৃদ্ধির [illegible] যেমন সেচ সম্প্রসারণ ও সার সরবরাহের দিকে নজর দিতে হবে এবং উচ্চ-ফলনশীল বীজের চাষ বাড়িয়ে চলতে হবে, তেমনি প্রতিটি জমিকে দো-ফসলি ও তিন-ফসলি করার জন্যও পরিকল্পনা নিতে হবে। পাট—আমন ডাল; আউস—উচ্চ ফলনশীল আমন—উচ্চ ফলনশীল গম; পাট—উচ্চ-ফলনশীল ধান—উচ্চ-ফলনশীল গম—তৈলবীজ [illegible] অথবা আউস—তামাক; পাট—সবজি [illegible] তৈলবীজ; আউস—উচ্চ ফলনশীল [illegible] তামাক—এইরকম চক্রাকারে জেলার [illegible] জমিতে ফসল ফলাতে হবে কৃষি বিশেষজ্ঞ-দের পরামর্শ নিয়ে। এখনই আউসের পর আমন, আউসের পর ডাল ও তৈলবীজ—[illegible] ভাবে চাষ কোচবিহারের প্রায় সব জমিতেই হয়। এক জমিতে পর-পর পাট ও [illegible] চাষও চলে। শুধু ভাল তামাকের জমি ছাড়া কোচবিহারের সব জমিই দো-ফসলি।

কোচবিহারে একদা নীল চাষ প্রচলিত ছিল। সদর মহকুমায় রংপুর জেলার সমীপবর্তী দিনহাটা মহকুমার দক্ষিণাঞ্চলে নীলের চাষ হত। গোসানিমারির [illegible] ধোয়া বিলের পাশে রাজপাটের [illegible] কুঠিবাড়ি এখনও একদা নীল চাষের সাক্ষ্য বহন করে। কোচবিহার শহরের এক সময়ের সাহেব পাড়া আজও নীলকুঠি নামেই পরিচিত। একসময় পপি চাষও প্রচলিত ছিল কোচবিহারে। ১৮৬৭ সালে রাজ-নির্দেশে পপি চাষ ও আফিং উৎপাদন বন্ধ হয়।

জেলায় শিল্প সম্ভাবনা

কোচবিহার জেলা প্রায় সম্পূর্ণই শিল্প-বর্জিত। বৃহৎ শিল্পের ত কথাই নেই

মাঝারি ধরনের শিল্প, এমন কি কুটিরশিল্পও এ জেলায় দুর্লভ। কামারকুমোর, ধোপা, নাপিত, বা জেলে মাঝিদের বাদ দিলে জেলার সব লোকই কৃষিজীবী বা কৃষি নির্ভর। ১৯৭১ সালের লোক গণনা অনুসারে, কোচবিহারের ১৪ লক্ষ ১২ হাজার লোকের মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা চার লক্ষ এক হাজার। কিন্তু তার মধ্যে কৃষকের সংখ্যাই দুই লক্ষ ৭১ হাজার ও ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ৬০ হাজার। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমজীবীর সংখ্যাই মোট শ্রমজীবী মানুষের ৮২ শতাংশ। অবশিষ্ট মাত্র ৭০ হাজার শ্রমজীবী কৃষি-বহির্ভূত কাজে নিযুক্ত। সারা জেলার ধোপা নাপিত, কামার-কুমোর, রাজমিস্ত্রি, জোগাড়ে, জেলে-মাঝি, বাজনাদার, মুচি মেথর—সবই এই কৃষি বহির্ভূত শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। এই থেকেই শিল্পক্ষেত্রে কোচবিহারের অনগ্রসরতার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

আরও উদ্বেগের কথা, যতদিন যাচ্ছে কোচবিহারের মোট জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমজীবীর শতকরা হার হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৬১ সালে কোচবিহারের মোট জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমজীবীর সংখ্যা ছিল ৩৯-৮ শতাংশ; ১৯৭১ সালে ঐ আনুপাতিক হার কমে দাঁড়িয়েছে ২৮-৪১ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জেলার শিল্প উদ্যোগ সঙ্গতি রেখে চলতে পারেনি বলেই এইভাবে শ্রমজীবী মানুষের আনুপাতিক হার কমে যাচ্ছে। আবার ক্ষেত মজুরের সংখ্যা '৬১ সালে যেখানে ছিল মোট জনসংখ্যার ৭-১ শতাংশ, '৭১ সালে তা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫-০২ শতাংশ। অর্থাৎ দশ বছরের ব্যবধানে বর্ধিত মানুষ আর কোথাও কাজ না পেয়ে চাষের জমিতে গিয়ে ভিড় বাড়িয়েছে। কিন্তু দশ বছরের ব্যবধানে কোচবিহারের জমি ত বাড়েনি। তাই ঐ বর্ধিত মনুষ্যকুল প্রকৃতপক্ষে ক্ষেতমজুরের দুর্ভাগ্যকেই ভাগ করে নিয়েছে।

কাঁচা মালের অভাব কোচবিহারের শিল্পোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তার সঙ্গে আছে বিদ্যুতের অভাব, পথঘাট ও পরিবহণের অভাব, সুসংগঠিত বাজারের অভাব এবং শিল্পোদ্যোগীরও অভাব। সারা জেলায় একটিও বৃহৎ বা মাঝারি ধরনের শিল্প নেই। শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫১—এই বিধি অনুসারে জেলায় একটি শিল্পও গড়ে ওঠেনি। চিফ ইনস্পেকটর অফ ফ্যাকটরিজ-এর অফিস থেকে লাইসেন্স নিয়ে জেলায় মোট কারখানা গড়ে উঠেছে মাত্র ১৫টি। বিড়ি তৈরি, তাঁতবোনা, বাঁশের সামগ্রী তৈরি করা, বেতের আসবাব তৈরি করা, গম ঝাড়াই, ধান ঝাড়াই, রুটি তৈরি, ছাপাখানা—এই সবই হল কোচবিহারের ক্ষুদ্র শিল্প। ঐ শিল্পগুলিতে ১৯৭০ সালে প্রতিদিন কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৬৯ জন।

কোচবিহারের চা-বাগান আছে মাত্র একটি।

১৯৭২ সালে কোচবিহারে রেজিস্টার্ড কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ছিল ৫৬০টি। রেজিস্ট্রি না করা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ছিল আনুমানিক তের হাজার। ৫৬০টি রেজিস্ট্রি করা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হল বস্ত্র শিল্পের সংখ্যা, মোট ২২৫টি। তারপর খাদ্য উৎপাদনের কারখানা ৮৪টি, কাঠের আসবাব তৈরির কারখানা ৫৩টি, তামাকজাত দ্রব্য পণ্য উৎপাদনের কারখানা ২৪টি, ধাতু-শিল্পের কারখানা ১৮টি, মৃৎশিল্পের কারখানা ১৭টি, ছাপাখানা দশটি, ইত্যাদি। ১৯৬১ সালে জেলায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১২,৮৭৪। বর্তমানে এই সংখ্যা বিশ হাজারের বেশি হবে না।

জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি নামেই শিল্প, আসলে সেগুলি ব্যক্তি বিশেষের দোকান ছাড়া কিছুই নয়, যার বেশিভাগেরই মূলধন পাঁচ হাজার টাকার কম ও কর্মচারীর সংখ্যা পাঁচের বেশি নয়। ১৪৬টি প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংখ্যা এক থেকে দুই, ১১৯টির কর্মী সংখ্যা তিন, ৮৯টির চার এবং ৪৯টির পাঁচ। মাত্র ৫১টি প্রতিষ্ঠানের কর্মীসংখ্যা ১৫ বা তার বেশি। ৫৬০টি রেজিস্ট্রি করা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট মূলধনের পরিমাণ ৭২ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৫০ টাকা এবং মোট কর্মীর সংখ্যা ৫,০৩০ জন।

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ হলে কোচবিহার জেলায় যে দুটি বৃহৎ শিল্প স্থানীয় কাঁচা মালের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে তা হল চুরুট ও সিগারেটের কারখানা এবং শোটি ফুডের কারখানা। জেলায় যে বিপুল পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয় তা থেকে কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা গড়ে ওঠারও সুযোগ আছে। পাট থেকে হতে পারে চটকল এবং দড়িদড়া তৈরির কারখানা ও কাগজের মণ্ড তৈরির কারখানা। কোচবিহারে যে এণ্ডির চাষ ও এণ্ডির কাপড় তৈরি হয় তারও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ আছে। তাছাড়া হতে পারে দেশলাই, মাদুর, ইট টালি ও সুরকি তৈরির কারখানা। আরও হতে পারে হাড় গুঁড়ানোর ও চামড়া তৈরির কারখানা, কাঠ চেরাইকল, তেলের ঘানি ও ধানকল।

জেলার লোকেদের চাহিদা পূরণের জন্য বাইরে থেকে আধা তৈরি ও কাঁচামাল এনেও কয়েকটি শিল্প গড়ে তোলা যায়। যেমন হতে পারে বাতি, তার ও পেরেকের কারখানা, কৃষির বিভিন্ন সরঞ্জামের কারখানা, ছাতা ও সাবানের কারখানা, রুটির বেকারি, খেলার সরঞ্জাম তৈরির কারখানা, ছাপাখানা, হোটেল রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

আর ছোটখাটো কারখানা তৈরির জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন তা জোগাড় করাও বর্তমানে খুব কঠিন কাজ নয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এবং বেঙ্গল স্টেট এড টু ইণ্ডাস্ট্রিজ এক্ট অনুসারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে শতকরা দু টাকা সুদে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। তাছাড়া কাঁচামাল জোগাড়েও সরকারি সাহায্য মেলে।

কোচবিহারের নদীপথগুলি উন্মুক্ত হলে এই জেলার বাণিজ্য সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। কোচবিহারের সব কটি বড় নদী গিয়ে পড়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। দেশ-বিভাগের পর পাকিস্থানের বৈরিতার জন্য তার নদীপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। বহির্দুনিয়ার সঙ্গে এখন কোচবিহারের আকাশ-পথেই সংযোগ বেশি। ফলে অতি সাধারণ পণ্যেরও এ জেলায় আকাশ ছোঁয়া দর। তার পণ্য বিপণনের সুযোগও সীমিত। বাংলা-দেশের সঙ্গে ভারতের স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠলে কোচবিহার আবার তার বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। নদীপথগুলি উন্মুক্ত হলে নতুন সৌভাগ্যের সূচনা হবে কোচবিহারের জীবনে।

কোচবিহারের স্থল পরিবহণ সম্প্রসারণেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। সারা জেলায় রেলপথ আছে মাত্র ১২২ কিলো-মিটার, যার মধ্যে ব্রডগেজ মাত্র ৫৩ কিলো-মিটার। অত্যন্ত মন্থর গতির কয়েকটি মাত্র ট্রেন চলাচল করে ঐ পথ দিয়ে। সেপথে যাত্রী চলাচল সামান্যই হয়, শুধু পাট তামাক চামড়া কাঠ প্রভৃতি পণ্য চলাচলে ঐ রেলপথ ব্যবহৃত হয়। রেলপথ অবিলম্বে দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সে কারণে সড়ক পথের উন্নতির উপরেই কোচবিহারের পথ ও পরিবহণ সমস্যার সমাধান নির্ভর করবে। কিন্তু নদী বহুল কোচবিহার জেলায় সে সমাধান খুব সহজ নয়। বিভিন্ন নদী-নালার উপর দিয়ে অগণিত সেতু-সাঁকো বেঁধে কোচবিহারের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে সংযুক্ত করা একটি ব্যয়সাধ্য বিরাট পরিকল্পনার কাজ। কোচবিহারের নদীগুলি আভ্যন্তরীণ মাল পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এমন সেতু বাঁধতে হবে যাতে মাল পরিবহণের কাজে বিঘ্ন না হয়।

কোচবিহারের যা সম্পদ ও সম্ভাবনা তাতে এই জেলার কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কথা নয়। শুধু দরকার বাস্তবানুগ পরিকল্পনার। তাহলে এই জেলা নিজের প্রয়োজন পূরণ করেও প্রতিবেশীর কাজে লাগতে পারবে।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনকাল কেমন চলছে,
তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি।
কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব
আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আঁতের
খবর মেলে ধরা হবে এই
বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু
সচেতন হতে পারি।

কালো হীরের কথা—(২)

অনেকে অনেক কিছু নিয়ে মুশকিলে পড়ে, আমি মুশকিলে পড়েছি সমাজতন্ত্র শব্দটি নিয়ে। অনেক বই ঘেঁটেও শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জোডের সিদ্ধান্তই মেনে নিলাম : সমাজতন্ত্র হল এমন একটা টুপি যা সবাই পরে বলে টুপিটি তার আকৃতি হারিয়ে ফেলেছে। (মডার্ন পোলিটিক্যাল থিওরি)। গুনার সিরডালও দেখলাম সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজতন্ত্র একটা আকৃতিহীন এবং পরিবর্তনশীল ধারণা, যে যখন খুশি তার প্রয়োজনে শব্দটিকে ব্যবহার করে। (এশিয়ান ড্রামা)।

অবশ্য শুধু সমাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রবাদ নয়, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও এমন অনেক শব্দ আছে যাদের সত্যিই কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই—যেমন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ইত্যাদি। এই শব্দগুলোর একটা উদ্দীপনা বা মোহিনী শক্তি আছে। ইংরেজীতে এদের বলে উদ্দীপক বা আনন্দবোধক শব্দ—হুরে ওয়র্ডস। অপরদিকে ধনতন্ত্র, নায়কতন্ত্র (ডিকটেটরশিপ), আমলাতন্ত্র ইত্যাদি হল দুঃখবোধক শব্দ—অ্যালাস ওয়র্ডস।

সমাজতন্ত্র :

আমার পক্ষে সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছিল কাঁচা কয়লার খনিগুলোকে সরকারী পরিচালনায় আনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিবৃতি নিয়ে। অনেকে দেখলাম এই কাজকে সমাজতন্ত্রের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই বর্ণনা করেছেন। মনে প্রশ্ন উঠল : সমাজতন্ত্রের পথ যদি এতই সোজা হয়, তবে দেশের সব ক্ষেতখামার কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিলে ত একদিনেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যায়। দেখলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জি ডি এইচ কোলও মোটামুটি এই ধারণাই পোষণ করতেন—তখন তাঁর মত ছিল যে, উৎপাদনের সকল গুরুত্বপূর্ণ উপকরণে সাধারণের মালিকানাই হল সমাজতন্ত্রের মূলকথা। (দি সিম্পল কেস ফর সোস্যালিজম, ১৯৩৫)।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে তাঁর ধারণা বেশ কিছুটা পাল্টে গিয়েছিল। এই সময় তিনি সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার মানের ওপর। অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানে যদি নিয়ত উন্নতি না ঘটে তবে যৌথ মালিকানাভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা—যাকে সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়—সম্পূর্ণ নিরর্থক, এই ছিল তাঁর অভিমত। (অ্যান ইনটেলিজেন্ট ম্যানস গাইড টু দি লাস্ট ওয়র ওয়রল্ড, ১৯৪৭)।

অতএব, উৎপাদন-ব্যবস্থার কোন ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই উল্লসিত হবার কারণ নেই; দেখতে হবে কোন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে এবং ঐ উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু। এবং শিল্প-ব্যবস্থার জাতীয়করণের—তথা সমাজতন্ত্রের সকল প্রকারভেদের মৌল উদ্দেশ্য হল অভাবমুক্তি—মানুষকে তার অভাব থেকে, আগামী দিনের ভাবনা থেকে মুক্ত করা। এই উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয় সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে, কারণ টসে যেমন কখনো দু পক্ষই জিততে পারে না, তেমনি বৈষম্য বর্তমান থাকলে সকলের পক্ষে অভাবমুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। অভাবের ধারণাই যে মূলত আপেক্ষিক। কিন্তু অন্তত অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সবাইকে ফেল করানোর মত সবাইকে নামিয়ে আনারও বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। তাই বলছিলাম, জাতীয়করণের যে-কোন ব্যবস্থাকেই সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা ভুল, কারণ ঐ ব্যবস্থা হয়ত শেষ পর্যন্ত পথের গল্প বলেই ফুরিয়ে যাবে—পথের সন্ধান দিতে পারবে না।

কাঁচা কয়লায় সরকারী পরিচালনা :

অবশ্য কাঁচা কয়লার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পর্কে সরকারী বিবৃতিতে মৌল উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : কাঁচা কয়লার খনিগুলোকে সরকারী পরিচালনায় আনা হল রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তুতিপর্ব, এবং রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্দেশ্য হল পঞ্চম পরিকল্পনায় কলকার-

খানা রেল-স্টীমার সেচ-বিদ্যুৎ প্রকল্প আর ভোক্তার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে (কাঁচা) কয়লা সরবরাহ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে আধুনিক পদ্ধতিতে অপচয় পরিহারমূলক পরিকল্পিত উৎপাদনও সম্ভব হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা। যে অর্ডিন্যান্সের দ্বারা কাঁচা কয়লার খনিগুলোকে সরকারী পরিচালনায় আনা হয়েছে, তার থেকে উদ্ধৃত করে বলা যায় : 'অর্থ-ব্যবস্থার উত্তরোত্তর বর্ধমান প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে আমাদের কয়লা-সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার এবং কয়লা উৎপাদনে যুক্তিসিদ্ধ এবং সুসম্বন্ধ উন্নয়নই হল কাঁচা কয়লার খনিগুলোকে বর্তমানে সরকারী পরিচালনায় এবং অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়নের উদ্দেশ্য।' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উদ্দেশ্যটি মোটামুটি দ্বিবিধ : (ক) বর্ধমান প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে উৎপাদনবৃদ্ধি, (খ) যুক্তিসিদ্ধ ও পরিকল্পিত উৎপাদন। উৎপাদন বৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেরই দ্যোতক, এবং যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পিত উৎপাদন হল সংরক্ষণ (কনজারভেশন), অর্থনীতিতে যাকে বলে ইকনমাইজিং—ব্যয় সংক্ষেপের ব্যবস্থা। এই দিক দিয়ে দেখলে তবেই কাঁচা কয়লার জাতীয়করণকে অন্যতম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা যায়, কয়লাখনি শিল্প শুধু ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধন করা হচ্ছে বলে নয়।

এখন এই মৌল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা কতদূর তার পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

পশ্চাৎপট :

কয়লা উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান সপ্তম কি অষ্টম, এবং উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৭ কোটি মেট্রিক টনের মত। এর মধ্যে ৫ কোটি মেট্রিক টনের কিছুটা হল কাঁচা কয়লা এবং বাকিটা ধাতুনিষ্কাশক বা জ্বালানী কয়লা। জ্বালানী কয়লার খনির সংখ্যা ছিল ২৫০-এর মত, যার মধ্যে ২১৪টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। বাকি খনিগুলো সম্পর্কে ঐ জাতীয়করণ আইনেই ব্যবস্থা আছে যে, কোন বিশেষ খনি জ্বালানী কয়লার বলে ঘোষিত হলেই ঐ খনি সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে চলে আসবে। জাতবিচার করে এইভাবেই বাকি জ্বালানী কয়লার খনিগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার কাজ এগোচ্ছিল, এমন সময় ঘোষণা শোনা গেল, সরকার জাতীয়করণের প্রস্তুতি-পর্ব হিসেবে কাঁচা কয়লার খনিগুলোরও পরিচালনাভার গ্রহণ করেছে। ব্যস, জাত-বিচারের আর কোন সমস্যাই রইল না, সব ধরনের কয়লা মিলে হয়ে গেল অন্যতম অনন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন শিল্প।

'অনন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন শিল্প' বাক্যাংশটির বোধহয় একটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উনিশ শতক এমনকি বর্তমান শতকের প্রথম দিকেও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বলে বিশেষ কিছু ছিল না—মাত্র রেলপথ এবং গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের মত অপরিহার্য একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিছুটা নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করত। এর পর কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তিন-দশকের মহামন্দা বিভিন্ন দেশের সরকারকে বাধ্য করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় হস্তক্ষেপ করতে। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণারও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে—সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের পরিবর্তে সমাজের সামাজিক ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের আদর্শ, এবং এই ধরনের রাষ্ট্রকে অভিহিত করা হতে থাকে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সব কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সরকারী ভূমিকার দাবি জোরদার হতে থাকে। ফলে সরকারকেও অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুসম্পাদন ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের কাজে অগ্রসর হতে হয়।

কিন্তু অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুসম্পাদন ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের জন্যে সুনির্দিষ্ট সরকারী আর্থিক নীতি অপরিহার্য এবং আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান আঙ্গিক উপাদান হল শিল্পনীতি।

স্বাধীন ভারতে এই শিল্পনীতি প্রথম ঘোষিত হয় ১৯৪৮ সালে। তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চিন্তা করা হলেও কাজ শুরু হয়নি, বর্তমান সংবিধানও প্রবর্তিত হয়নি, আর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্যে কোন প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি। সুতরাং মাত্র সমাজকল্যাণের আদর্শের রূপায়ণই ছিল এই শিল্পনীতির উদ্দেশ্য। বলা হয়েছিল মাত্র তিনটি শিল্প অনন্য সরকারী অধিকারে থাকবে : অস্ত্র-শস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি এবং রেলপথ। রাষ্ট্রের, তবে বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে এই রকম কয়েকটি শিল্পের একটি তালিকাও প্রণয়ন করা হয়েছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল, এই তালিকাভুক্ত শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে পুরোনো প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১০ বছরের জন্যে বেসরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে থাকতে দেয়া হবে কিন্তু সকল নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনের দায়িত্ব থাকবে সম্পূর্ণ সরকারের। কয়লাখনি শিল্প ছিল এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, ১৯৪৮ সালের মূল শিল্পনীতি অনুসারে ১৯৫৮ সালের মধ্যেই কয়লাখনি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হবার কথা, কিন্তু তা হয়নি। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার আগেই—১৯৫৬ সালে শিল্পনীতির পরিমার্জনা করে ঘোষণা করা হয় যে, ১৭টি শিল্পের উন্নয়নের অনন্য দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের। তবে বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোকে প্রসারের সুযোগ দেওয়া হবে। কয়লা এই ১৭টি শিল্পেরই তালিকাভুক্ত। সুতরাং একরকম সরকারী ও বে-সরকারী যৌথ উদ্যোগের অধীন।

১৯৫৬ সালের এই পরিমার্জিত শিল্পনীতিই এখনও কার্যকর। এই মাসের গোড়ার দিকে নীতিটির আরও কিছুটা পরিমার্জনা করা হলেও তা কয়লার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং ফলে এই সমীক্ষার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি জাতীয়করণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলেনি। তবে জাতীয়করণের চেয়ে উন্নয়নের উপরই সরকার যে সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে চান তা শিল্পনীতি ঘোষণা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই নীতির স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হল যে, বে-সরকারী উদ্যোগের অস্তিত্বের দরুন উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, সেখানে জাতীয়করণে সরকার মোটেই পিছপাও হবে না।

অতএব, সরকারী শিল্পনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমগ্র কয়লাখনি শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণে অবাক হবার কিছু নেই, অভিযোগ করবারও কিছু নেই। তবে এই রাষ্ট্রায়ত্তকরণ কতটা প্রয়োজনীয় ছিল এবং কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, তা অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে। নচেৎ মতাদর্শই

হয়ে দাঁড়াবে, অর্থনীতির নিয়ামক, যে-ব্যবস্থার সপক্ষে এ-দেশের লোক এখনও সায় দেয়নি।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও বে-সরকারী উদ্যোগ :

অবশ্য সমগ্র প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রবর্তিত হক—মোটামুটি সব কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রেই এই দাবি বিশেষ জোরালো হয়ে উঠেছে। ফলে এই সব দেশে খনিজ সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার সংক্রান্ত সব দায়িত্বই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে সরকারে। বৃটেনে (কোন সংজ্ঞা অনুসারেই সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়) সমগ্র কয়লাখনি শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরই—১৯৪৭ সালে। ঐ দেশে বর্তমানে কয়লাখনি শিল্প পরিচালনাকারী সংস্থা জাতীয় কোল বোর্ড ক্রমশ খুচরো কয়লা বিক্রির ভারও নিজের হাতে নিচ্ছে। আর খনিজ তেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিশ্বজনীন গতি হল, সরকারী নিয়ন্ত্রণ নয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানার দিকে। মোট কথা, খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বে-সরকারী উদ্যোগ সমাজ-কল্যাণের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই মনে করা হয়। এই দিক দিয়ে দেখলেও কয়লাখনি শিল্পে বে-সরকারী উদ্যোগের বিলোপসাধনের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত কাজই হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রাষ্ট্রনেতারা বিষয়টিকে এই দিক দিয়ে দেখেননি—দেখেছেন অর্থ-নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, উন্নয়ন পরি-কল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং কিছুটা ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস বা বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে।

এখন দেখা যাক, রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে একমত হতে পারা যায় কিনা।

সরকারী পরিচালনার প্রথম প্রতিক্রিয়া :

অবশ্য সকলের পক্ষে একমত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কারণ, কোন প্রতিকার, কোন ব্যবস্থা, কোন পরিবর্তনই সকলের কাছে কাম্য বলে গণ্য হতে পারে না। কয়লাখনি শিল্পের জাতীয়করণ ব্যবস্থা অন্তত ভূতপূর্ব মালিকদের কাছে কাম্য বলে গণ্য হয়নি। তবে জ্বালানী কয়লার রাষ্ট্রীয়করণের পর এবার তাঁরা তৈরি হয়েই বসেছিলেন। সুতরাং তাঁদের দুঃখ ঠিক রাষ্ট্রীয়করণ নিয়ে নয়, রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কাঁচা কয়লার খনি-গুলোকে আচমকা সরকারী পরিচালনায় আনা হয়েছে বলে—অর্থাৎ এবার আর বিশেষ কোন খবর ছিদ্রপথে এসে পৌঁছয়নি বলে ধূমপায়ীর মত সুখটানটা আর দেওয়া হয়নি।

তবুও কিন্তু অনেকে যে শেষ চেষ্টা করতে ছাড়েননি তা ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের অতিরিক্ত কাস্টোডিয়ান-জেনারেল শ্রী সি এস ঝার বিবৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। শ্রীঝা বলেছিলেন : অর্ডিন্যান্সের খবর আসার পর আমরা যখন খনিগুলোর দখল নিতে যাই, তখন দেখা গেল যে, খাতাপত্রের কোন পাত্তাই নেই, আর অন্য কয়েকটিতে নগদ টাকা সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটি খনির অফিসে মালিক কিছুতেই সিন্দুক খুলতে দেবেন না, বললেন : ঐ সিন্দুকের টাকা খনির অ্যাকাউন্টের নয়, অন্য অ্যাকাউন্টের টাকা। আর একটি খনিতে গিয়ে দেখা গেল, খনির কাজ ঠিকই চলছে কিন্তু অফিসঘরের দরজায় তালা দেওয়া—ভেতরে কেউ নেই বলেই মনে হয়।

এধারে অর্ডিন্যান্স জারির সঙ্গে সঙ্গে কয়লাখনি শিল্পের প্রাণকেন্দ্র সমগ্র ধানবাদ অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করে ১৪টি জায়গায় চেক-পোস্ট বসানো হয়েছিল। খনির যন্ত্রপাতি বোঝাই কয়েকখানি লরী টহলদারী পুলিশের হাতে এবং চেকপোস্টে ধরা পড়ে। এইভাবে যথাসম্ভব সতর্কতা অব-লম্বন করেও দখল নেবার সময় স্টোরে বিশেষ কিছু মালপত্র ছিল না বললেই হয়।

এবারও বোধহয় শেষপর্যন্ত খবর লিক করেছিল, কারণ ব্যাঙ্কের সূত্রে থেকে জানা যায় যে, অর্ডিন্যান্স জারির দিন সকাল থেকেই কয়লাখনিগুলো টাকা তোলবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে—যাকে বলে 'রানের' অবস্থা। একসঙ্গে অত টাকা ধানবাদ শাখাতে থাকে না। চেক জমা নিয়ে অনেককে পরের দিন আসতে বলা হয়। কলকাতা থেকে টাকা নিয়ে আসা হবে। পরের দিন অনেকেই এসেছিলেন কিন্তু তাঁদের রিক্তহস্তে ফিরে যেতে হয়েছিল, কারণ ইতিমধ্যেই নবগঠিত সরকারী সংস্থা 'কোলমাইনস্ অথরিটি'র নির্দেশক্রমে এই সব আমানত থেকে টাকা তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

খনির মালিকরা বা তাঁদের কোন প্রতি-নিধি সংস্থা এই সব বিবৃতির বিশেষ প্রতিবাদ করেননি। তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিযোগে। অভিযোগটি হল এই রকম : জ্বালানী কয়লার জাতীয়করণের পর বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের সঙ্গে পরা-মর্শ করে আমরা কাঁচা কয়লার খনির মালিকরা পঞ্চম পরিকল্পনায় ৮০ কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে ঐ কয়লার উৎপাদনকে প্রয়োজনীয় ৭ কোটি মেট্রিক টনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা প্রায় শেষ করে ফেলেছিলাম। উপরন্তু, কেন্দ্রীয় খনি ও ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়সহ সরকারী মুখপাত্ররা আমাদের বারবার আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কাঁচা কয়লাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে না। এই অবস্থায় হঠাৎ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা বে-সরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত সংকটের সৃষ্টি করেছে। কয়লাখনি না হয় গেল, কিন্তু বে-সরকারী উদ্যোগ কি এই রকম মার খাবার পর আর ঝুঁকি নিতে চাইবে?

শেষের কথাটি সত্যিই ভেবে দেখবার মত।

কয়লাখনি শিল্পে মজুরি বোর্ডের সুপারিশকে উপেক্ষা করার অভিযোগের উল্লেখ করে মালিকরা বলেন, দু-একটা ছোটখাট ও মুমূর্ষু খনি হয়ত সুপারিশ মানেনি কিন্তু সব বড় বড় প্রতিষ্ঠানই সুপারিশকে সম্পূর্ণ কার্যকর করেছে। সুতরাং অভিযোগটি একরকম ভিত্তিহীন।

অবশ্য অভিযোগটি বিশেষ ভিত্তিহীন নয়। মাত্র কয়েকটি নয়, অনেক কয়লাখনিই মজুরি বোর্ডের সুপারিশ এড়িয়ে গেছে, অনেকে আবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও ঠিকমত জমা দেয়নি। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমাদের মত বাইরের লোকের বক্তব্য হল, এ-ব্যাপারে এতদিন কোন কিছু করা হয়নি কেন—সরকার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল কেন?

কাঁচা কয়লা সরকারী পরিচালনায় আসার পর একদিকে বিশেষ করে শ্রমিক মহলে যেমন আনন্দের বন্যা বইতে থাকে অপরদিকে তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই কয়লার দাম বাড়তে সুরু করে। আমাদের মত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রাথ-মিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ ব্যবসায়ীরা এই রকম মওকার জন্যেই বসে থাকে। বিচার্য বিষয় হল, জল থিতিয়ে এলে কয়লার দাম কি হবে—কলকারখানায় ব্যবহৃত শক্ত কয়লা আর গৃহস্থের পাকশালায় ব্যবহৃত নরম কয়লার দাম ভবিষ্যতে কি হবে! কলকারখানার ব্যবহৃত কয়লা হল ইনপুট যার দাম বাড়লে পণ্যের দাম বাড়তে বাধ্য, আর গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত কয়লার দাম

বাড়লে জীবনযাত্রার ব্যয় সরাসরি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কয়লার দাম স্থিতিকরণের গুরুত্বকে লঘু করে দেখা চলবে না—শুধু ভবিষ্যতের স্বার্থে যুক্তিসিদ্ধ উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহারের কথা বললেই লোকে শুনবে না। এ ধরনের কথা তারা আগে অনেক শুনেছে।

এখন দেখা যাক, বিভিন্ন দিকের সম্ভাবনা কি রকম।

দাম ও সরবরাহ

ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশানের সভাপতি শ্রীপি এ চণ্ডালিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এক বছরের মধ্যেই কাঁচা কয়লার দাম গড়ে অন্ততঃ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। সমগ্র পঞ্চম পরিকল্পনার সম্ভাবনা বিচার করে তিনি বলেছেন, দাম মেট্রিক টন প্রতি ১০ টাকা করে বা ২৫ শতাংশের মত বাড়বেই। এবং বর্ধিত দামকে এই স্তরে রাখা সম্ভব হবে যদি পরিকল্পনাধীন সময়ে কয়লাখনি শিল্পে অন্ততঃ ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। (সরকারী হিসেব অনুসারে অবশ্য কাঁচা কয়লা শিল্পের জন্যে প্রয়োজন হবে এর এক-দশমাংশ বিনিয়োগ—অর্থাৎ মাত্র ১০০ কোটি টাকা)। কোল মাইন্স অথরিটির কাস্টোডিয়ান-জেনারেল শ্রীজে কুমারমঙ্গলম দাম বৃদ্ধির আশংকা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, মজুরি বোর্ডের সকল সুপারিশ মেনে নিতে হবে এবং সংরক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার র‍্যাশানালাইজেসনের জন্যে সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হবে। এতে হয়ত দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কয়লার সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

অতএব, সরকারী বক্তব্য হল যে, শ্রমিকের প্রতি ন্যায় বিচার, উৎপাদন ব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধকরণ এবং যোগানের নিশ্চয়তার জন্যে দাম কিছু বাড়বেই। প্রথম দুটি বিষয় ছেড়ে দিলেও শেষেরটি অর্থাৎ যোগানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ আছে। কারণ আর কিছুই নয়, আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা। দেখা যায়, কোন গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের বন্টন ব্যবস্থা সরকারের হাতে গেলেই বন্টনের অব্যবস্থা সুরু হয়। বর্তমান বছর খরার বছর। খাদ্যশস্য অবশ্য যথেষ্টই মজুত আছে, কিন্তু বলা হয় ত্রুটিপূর্ণ বন্টন-ব্যবস্থার দরুন অনেক জায়গাতেই খাদ্যাভাব ঘটছে।

কাঁচা কয়লার বেলাতেও যদি ঐ একই ব্যাপার ঘটে তবে ভাবীকালের স্বার্থ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক যুক্তিও দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বন্টন-ব্যবস্থাকেও জোরদার করতে হবে।

যুক্তিসিদ্ধ উন্নয়ন

উৎপাদনবৃদ্ধি যুক্তিসিদ্ধ উন্নয়নেরই অঙ্গ, মূলত যে উদ্দেশ্যে সমগ্র কয়লাখনি শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। এই উন্নয়ন সম্ভব করবার জন্যে উৎপাদন-ব্যবস্থার আধুনিকিকরণ ছাড়াও সারফেস মাইনিং বা খনিগুলোর পৃষ্ঠদেশ খননের, সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ছোট ছোট খনিগুলোর একত্রীকরণের, বন্ধ খনিগুলো খোলার এবং শ্রম সীমান্তে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির প্রয়োজন। কোল মাইন্স অথরিটির ধারণায় এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মোট ১০০ কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে; অপর দিকে ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশনের মতে ১ হাজার কোটি টাকাতেও কুলোবে না। মোট কথা, বিরাট পরিমাণ বিনিয়োগের যে প্রয়োজন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিনিয়োগ আশু ফলপ্রদায়ী নয় বলে এর ফলে মূল্য স্তর বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। তা ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্নও আছে। সব দিক দিয়ে বিচার করে প্রশ্ন করা যেতে পারে : জ্বালানী কয়লা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর ঐ ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ উন্নয়নের কাজ শেষ না করা পর্যন্ত কাঁচা কয়লার এ্যাডভেঞ্চারে নামা কি ঠিক হয়েছে? উপরন্তু, বৃহদায়তনে উৎপাদন একটা সীমা দাঁড়িয়ে গেলে নানা রকম ব্যয় বাহুল্য দেখা দেয়, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে যার ফলভোগ করে করদাতারা। এ ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা করা উচিত ছিল।

শ্রম-সীমান্তে শান্তি :

শ্রম-সীমান্তে শান্তি গুণবাচক শব্দ ন্যায়বিচারের ওপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে রাজনৈতিক আবহাওয়ার ওপর। সুতরাং রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় কয়লাখনি শিল্পের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় শ্রমিক সংস্থাগুলো যে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে তার বিশেষ মূল্য নেই। বরং ধর্মঘট বা ঐ রকম কিছু ঘটলে তা সমগ্র শিল্পেই পরিব্যাপ্ত হবার সম্ভাবনা। কারণ এখন থেকে কয়লাখনি শিল্প তো আর খণ্ডীকৃত থাকবে না।

নিয়োগবৃদ্ধির সম্ভাবনা

ধরে নেওয়া হয়, কোন শিল্প বা বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত হলে আর কিছু না হোক নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। জ্বালানী কয়লা সরকারী পরিচালনায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নিয়োগের পরিমাণ বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। পরে স্বীকার করা হয় যে, এই সব নবনিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মীদের অধিকাংশই অতিরিক্ত।

কাঁচা কয়লা সরকারী পরিচালনায় আসার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, জ্বালানী কয়লাখনির ক্ষেত্রে নিযুক্ত অতিরিক্ত কর্মীদের স্থানান্তরিকরণের ব্যবস্থা না করে আর কোন নতুন লোক নিয়োগ করা হবে না। সুতরাং এখনই নিয়োগ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিশেষ নেই। ভবিষ্যতে বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের কাজ পরিকল্পনা মত চললে তবেই আছে।

উপসংহার

তা হলে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আশাবাদের চেয়ে সমস্যাই গুরুত্ব লাভ করে। এই সব সমস্যার সমাধান করেই আশাবাদের ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং উল্লাসকে দূরে সরিয়ে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হবার দাবি না করে সমস্যাগুলোর মোকাবিলার পথেই অগ্রসর হতে হবে। এর জন্যে অন্যান্যের সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে কাঁচা কয়লার জন্যে এন সি ডি সি এবং কোল মাইন্স অথরিটিকে সংযুক্ত করা হবে, এবং জ্বালানী কয়লার পরিচালনাভার থাকবে ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের ওপর। কয়লা যখন দুরকমের তখন এই দ্বৈত ব্যবস্থাই হয়ত ভাল। কিন্তু এই দুই সংস্থা যাতে অদক্ষতার ক্ষেত্রে নয়, দক্ষতার ক্ষেত্রেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। অপর দিকে শিল্প যখন এক—কয়লাখনি শিল্প, তখন উভয় সংস্থার মধ্যে সংহতি সাধনও অপরিহার্য। এই সংহতিসাধনের প্রয়োজনীয়তাই আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়লাখনি শিল্পের ক্ষেত্রেও সমস্যাকে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতেই হবে।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

শিল্পী ঃ রেবা হোড়

রেবা হোড়ের প্রদর্শনী

দেশের চারুকলা শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষার্থীদের অর্ধেকই মহিলা। প্রতি বছর যত শিক্ষার্থী এসব বিদ্যায়তন থেকে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসেন তার শতকরা চল্লিশজনই মহিলা। কিন্তু সারা দেশে মহিলা শিল্পীর সংখ্যা অংগুলীমেয়। আমাদের বাংলাদেশে সব মিলিয়ে মাত্র জন দশেক মহিলা আছেন যাঁরা নিয়মিত শিল্পচর্চা করেন। শিক্ষান্তে দু একজন প্রতি বছরই প্রতিশ্রুতির সাক্ষর রেখে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যান।

পশ্চিমবঙ্গে যে স্বল্পসংখ্যক মহিলা বহুকাল যাবৎ নিয়মিত শিল্পচর্চা করে যাচ্ছেন শ্রীমতী রেবা হোড় (দাশগুপ্ত) তাঁদের অগ্রণী। রেবা হোড়ের মহিলা শিল্পী হিসাবে পরিচিত হতে আদৌ কোন বাসনা নেই এবং মহিলা শিল্পী হিসাবে তিনি কোন কনশেসন দাবী করেন না। চিত্রকর হিসাবে তিনি যে অভিনিবেশ এবং সম্মান দাবী করে তা নির্বিশেষ। পেলবতা, নমনীয়তা, লালিত্য, বিধুরতা ইত্যাদিকে যদি আমরা নারীসুলভ গুণ বলে মনে করি, তা হলে দেখব এসব গুণগুলি রেবা হোড়ের চিত্রে একান্তই দুর্লক্ষ্য। রুক্ষ বলিষ্ঠতা, সংঘাতময় ছন্দ, সীমার শাসন না-মানা গতি ইত্যাদি রেবা হোড়ের ছবির চারিত্রসুলভ গুণ। অবশ্য এই রুক্ষ বলিষ্ঠতা, সংঘাতময় ছন্দ ইত্যাদি বর্ণের বৈচিত্র্যে এবং মধ্যমশক্তিসম্পন্ন বর্ণের প্রয়োগে কথঞ্চিৎ শান্ত।

অনেকদিন পরে কোলকাতায় শ্রীমতী রেবা হোড়ের একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন পার্ক স্ট্রীটের গ্যালারী কেমল্ড-এর কর্তৃপক্ষ। প্রদর্শনীতে শ্রীমতী হোড়ের গত দু বছরে রচিত তেরোটি তেল রঙের ছবি ও কিছু জলরঙের ও প্যাস্টেলের স্কেচ প্রদর্শিত হয়।

শ্রীমতী হোড়ের ছবিতে মনুষ্যাবয়বের আভাস থাকলেও আদতে এগুলি সবই বিমূর্ত রচনা। প্রতিটি ছবির শুরুতেই এক বা একাধিক মনুষ্যমূর্তির আভাস আছে। সে আভাস কখন এক নারীর, কখনও একাধিক নারীর; কখনও বা শিশু-সহ নারী, কখন নারী এবং পুরুষ, কখনও বা নারী-পুরুষ ও শিশুর। অবয়বের ভঙ্গি থেকে এ-সব নারী, পুরুষ এবং শিশুদের দেখে দুঃস্থ, অসহায়, ক্ষিপ্ত ক্ষুধার্ত এবং ক্লিষ্ট মানসিকতার প্রতীক বলে মনে হয়। কিন্তু ঘনত্ব এবং আবয়বিক বিশদবিবরণ

[illegible]

চিহ্নে পরিণত হয়েছে, সে চিহ্ন কিছু প্রাতিস্বিক আকারে এবং আকারসৃষ্টিতে ব্যবহৃত সমভারসম্পন্ন বর্ণক্ষেত্রের সমাহারে গঠিত। অর্থাৎ চিত্রক্ষেত্রে এসব মনুষ্যাবয়বের স্থিতি প্রধানতঃ আকার হিসাবে, রূপকল্প হিসাবে নয়।

শ্রীমতী হোড়ের ছবির মুখ্য আবেদন তাঁর বর্ণ ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভরশীল। উনি সাধারণতঃ কোন মিশ্র রঙ ব্যবহার করেন না বা বর্ণস্তরের উপর বর্ণস্তর চাপিয়ে চিত্রক্ষেত্রে ভারসম্পন্ন ক্ষেত্র নির্মাণ করেন না। অমিশ্র বর্ণ নিয়ে সরাসরি তা ক্যানভাসে ফেলে তুলি অথবা ছুরি দিয়ে টেনে বর্ণক্ষেত্র তৈরী করেন এবং সে ক্ষেত্রের উপর আর কাজ করেন না। ফলে তাঁর রচিত বর্ণক্ষেত্রে খানিকটা রেখার ধর্ম পায়; সে-ক্ষেত্রে তুলির বা ছুরির টানের গতিবেগ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আবার বিপরীতমুখী টানে তৈরী ক্ষেত্রের গতির বৈপরীত্যে ছবিতে একটি স্পন্দনমূলক সংঘাত দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এভাবে ছবি নানান বিপরীতমুখী, বিপরীত গতিসম্পন্ন রেখাধর্মী বর্ণক্ষেত্রের সমাহারে ভরে ওঠে। যেখানে তুলির বা ছুরির কাজের ভায়লেন্স এবং দ্বিমাত্রিক চিত্রক্ষেত্রের বিভাজনজাত স্পন্দনই মুখ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য শক্তি হিসাবে প্রতীত হয়।

শ্রীমতী হোড় মিশ্র রঙ ব্যবহার করেন না। ফলে তাঁর রঙ স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। গাঢ় শ্যাওলা সবুজ অথবা নীল, কিংবা সিঁদুর লাল বা লেবু হলুদকে তিনি মুখ্য রঙ হিসাবে ব্যবহার করেন। তারপর, সাধারণতঃ তিন অথবা চার রঙের কোন বর্ণান্তর ব্যবহার না করেই তাঁর বর্ণিকা ভঙ্গ তৈরী করেন। সবুজ এবং লাল অথবা নীল এবং হলুদ বা ঐ

[illegible]

পর তিনি একটি মধ্যমশক্তিসম্পন্ন রঙ ব্যবহার করে স্পন্দনকে কথঞ্চিৎ শান্ত করেন। যেমন সবুজ ও লালের সঙ্গে মধ্যশক্তিসম্পন্ন হলুদ। ফলে তাঁর ছবির আকার এবং রৈখিক-ক্ষেত্রমাত্রিক স্পন্দন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়।

শ্রীমতী হোড়ের ছবির সম্পর্কে আমাদের দু একটি নিবেদন আছে। প্রথমতঃ মনে হয় চিত্রক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া বা কাঙ্ক্ষিত[illegible] করা আয়তক্ষেত্রের অভাবে এবং একচারিত্র্যের রেখ-ক্ষেত্রের বাহুল্যে অনেক সময়ে ছবির অভিব্যক্তি স্ফূর্তি পায়নি ও ছবিগুলি একটু একসুরে বাঁধা বলে মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ছবির শুরুতে যে মনুষ্যাবয়ব এসেছে তা সম্পূর্ণভাবে বিমূর্ত চিহ্নে পরিণত হয়নি বলে, তাদের আবয়বিক ভঙ্গি এবং একাধিক মনুষ্যাবয়বের পারস্পরিক অবস্থান যে দুঃখ দুর্দশার কথা বলে উঠতে চায় সে কথা উপরোক্ত শিক্ষাশৈলীর থেকে কোন সাহায্য পায় না। ফলে ছবিতে খানিকটা সাযুজ্যের অভাব দেখা যায়।

আমাদের দ্বিতীয় কথাটি থেকেই তৃতীয় এবং শেষ নিবেদন আসছে। তা হল শ্রীমতী হোড় শুরু করেন তাঁর অভিজ্ঞতায় পাওয়া দৃশ্য থেকে। সে দৃশ্যাবলী, সে অভিজ্ঞতা একান্তভাবে ভারতীয় জীবন সম্পৃক্ত। সেই অভিজ্ঞতায় যদি বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন তবে সেই ক্রোধ বা বিচলিত হবার দৃশ্য-ভাষাকেও খানিকটা দেশজ হতে হয়। তা না হলে, অন্য ভাষা অন্য অনুসঙ্গ বহন করে এনে ক্রোধের বা অন্য যে কোন অভিব্যক্তির বিশুদ্ধতার ব্যত্যয় ঘটায়।

—প্রণবরঞ্জন রায়

চৈতন্য চরিতামৃত বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অমূল্য সম্পদ। এই কথায় এই বাংলা গ্রন্থের তুলনা হয় না এবং চৈতন্যদেবের জীবনদর্শন সম্বন্ধে এই গ্রন্থকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বললেও অত্যুক্তি হয় না। মহাপ্রভু ভগবান শ্রীচৈতন্যের নামাঙ্কিত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এমন কি 'চৈতন্য চরিতামৃতের' পূর্বে অনুমান ১৫৪২ খৃঃ ঐ একই নামধেয় কবি কর্ণপুরের রচিত সংস্কৃতে চৈতন্যদেবের প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থও আছে একখানি। এতদ্ব্যতীত প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত 'চৈতন্য চন্দ্রামৃত', বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিখ্যাত 'চৈতন্য ভাগবত,' লোচনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্যমঙ্গল', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারও চৈতন্যদেবের জীবনের উপর ইংরেজীতে একখানি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচনাকাল ও রচনাকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মকাল সম্বন্ধে নানা মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে এই গ্রন্থ ১৫৭২—৮২ খৃঃ রচিত হয় এবং অনেকে বলেন, ১৬১৫ খৃঃ এই মহামূল্য গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করেন। কৃষ্ণদাসের জন্ম সাল সম্বন্ধে বহু তারতম্য দৃষ্ট হয়। অনেকে বলেছেন, কৃষ্ণদাসের জন্ম ১৪৯৬, আবার অনেকে বলেছেন ১৫২৭ সালে। বিশেষ করে উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিতাভিধান' গ্রন্থে শেষোক্ত সালটি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে রচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, সেটিতে লেখক যা অনুমান করেছেন, তাতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বয়সের তারতম্য ঘটে প্রায় ১৩ বছর। কিন্তু তাহলেও নানা দিক থেকে 'চৈতন্য চরিতামৃতের' লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই জীবন-কথাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও প্রাচীন বলে আমরা এখানে উল্লেখ করলাম। রচনাটি শিবরতন মিত্র রচিত এবং 'মানসী'তে ১৩১৬ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

'কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া সাবডিভিসন মধ্যে অজয় নদের উত্তরে এবং ভাগীরথীর তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ঝামটপুর নামক গ্রামে অনুমান ১৫৩০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণদাস যখন মাত্র ছয় বৎসরের ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাস চারি বৎসরের শিশু, তখন পিতা ভগীরথ কালগ্রাসে পতিত হন। ভগীরথ কবিরাজী ব্যবসায় দ্বারা অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন — কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত মাতা সুনন্দা দেবী, শিশু পুত্র দুইটি লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পর তিনিও পরলোক গমন করিয়া সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অনাথ শিশু দুইটি অগত্যা তাহাদের অপুত্রা পিতৃস্বসার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই স্থানে রহিয়া কৃষ্ণদাস, প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিলেন। অনন্তর সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া অচিরে তাহাও আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এতদ্ব্যতীত তৎকালীন প্রথানুযায়ী কৃষ্ণদাস যৎকিঞ্চিৎ পারশী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রথমাবস্থায় কৃষ্ণদাসের, সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া জাতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ রহিলেও কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাল্যকালাবধি কৃষ্ণদাস সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনায় কালযাপন করিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। কৃষ্ণদাসের ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃস্বসা ঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। ধর্মপরায়ণ কৃষ্ণদাস, বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের ভার কনিষ্ঠ শ্যামদাসের উপর অর্পণ করিয়া একাগ্রমনে সাধন-ভজন ও ধর্মচিন্তায় আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণান্তর তৎপরিবর্তিত ধর্ম্মপথই শ্রেয় জ্ঞান করিয়া তিনি অতিমাত্রায় চৈতন্যগতপ্রাণ হইয়া পড়িলেন এবং সংসারের প্রতি একেবারে বীতস্পৃহ হইলেন—তিনি আদৌ দারপরিগ্রহ করিলেন না। এইরূপে তিনি প্রায় বিংশতি বর্ষ ধরিয়া নানাবিধ শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণদাসের বাটীতে গুণার্ণব মিশ্র নামক তাঁহাদের কুলদেবতার একজন পূজারী ছিলেন। কৃষ্ণদাস স্বয়ং চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু উক্ত পূজারী ঠাকুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামদাস, চৈতন্য মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব কোনমতেই অস্বীকার করিতেন না। এইরূপ মতামত লইয়া কখনও কখনও তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা চলিত। একদিন ঘটনাক্রমে নিত্যানন্দ প্রভুর মীনকেতন রামদাস নামক একজন শিষ্য ও অনুচর ইঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলে এই বিষয় লইয়া গুণার্ণব ও শ্যামদাসের সহিত তর্ক উপস্থিত হয়। তর্ক ক্রমে বিবাদে পরিণত হইলে রামদাস ক্রোধবশতঃ অভিসম্পাত প্রদান করেন। তদনন্তর কৃষ্ণদাস, তাহাদের নিকট বহু যত্নে নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস সেই রজনীতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশপ্রাপ্ত হন এবং পরদিন প্রত্যুষেই চিরজীবনের মত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে নানা দেশ পর্যটন ও তীর্থদর্শন করিতে করিতে বৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। তথায় রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, জীব গোস্বামী, কবি কর্ণপুর, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণব গোস্বামী মণ্ডলীর পুণ্যাশ্রয়ে রহিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী মহোদয়গণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তত্তৎশাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রচিত গ্রন্থাদি

পূর্ব্বোল্লিখিত গোস্বামী মহোদয়গণের আদেশ এবং উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া কবিরাজ মহাশয়, রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন সেবা বিষয়ক সংস্কৃত ভাষায় 'গোবিন্দ লীলামৃত' নামক পাণ্ডিত্য ও কবিত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ[১], 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা এবং 'ভাগবত শাস্ত্রগূঢ় রহস্য' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'অদ্বৈত সূত্রের কড়চা', 'স্বরূপবর্ণন', 'বৃন্দাবন ধ্যান', 'ছয় গোস্বামীর সূচক', 'চৌষট্টি দণ্ড নির্ণয়', 'প্রেম রত্নাবলী', 'বৈষ্ণবাষ্টক', 'রাগমালা', 'শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার', 'রাগময় কারণ', 'পাষণ্ড দলন', 'বৃন্দাবন পরিক্রমা', 'রাগ রত্নাবলী', 'শ্যামানন্দ প্রকাশ', 'সার-সংগ্রহ', 'শ্রীললিতমাধব গ্রন্থ' প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুসংখ্যক গভীর জ্ঞান, ভক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়, এই সকল গ্রন্থ অপেক্ষা চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ক 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' নামক সুবৃহৎ তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াই সাহিত্য ও ধর্ম্ম জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী চৈতন্য ভক্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী, চৈতন্য প্রভুর অন্ত্যলীলা সম্যকরূপে বর্ণিত না থাকায়, বৃন্দাবনদাস বিরচিত 'চৈতন্য-মঙ্গল' (চৈতন্য-ভাগবত) নামক গ্রন্থ পাঠে তাদৃশ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই[২] বয়োবৃদ্ধ পরম জ্ঞানী, সুপণ্ডিত ও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়কে চৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ জীবনের নানা কথা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া একখানি চরিত গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের এই সময় শরীর ও মনের অবস্থা—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির।।
নানা রোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগ পীড়ায় ব্যাকুল, রাত্রি দিনে মরি।

তথাচ তিনি তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। আদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক নবোৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়া এই গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। এদিকে তিনি তাঁহার কুলাধিদেবতা মদনগোপাল (বা মদনমোহন) শ্রীবিগ্রহের প্রত্যাদেশ সূত্রে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আরব্ধ কার্য্যে অগ্রসর হইবার অমিত বল সঞ্চয়

১। মালিহাটী নিবাসী বৈদ্যবংশীয় সুবিখ্যাত কবি যদুনন্দন দাস এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

২। আদিলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

করিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু, রঘুনাথ গোস্বামী, নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থানকালে স্বরূপ দামোদরের সহিত একত্র মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। স্বরূপ, মহাপ্রভুর মনোগত ভাব সমস্তই অবগত ছিলেন — তিনি রঘুনাথ গোস্বামীকে তৎসমুদয় বর্ণনা করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী, স্বীয় দীক্ষাগুরু রঘুনাথের নিকট এই সকল বিস্তারিতভাবে অবগত হইয়াছিলেন। 'চরিতামৃত' গ্রন্থ রচনাকালে কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ের ইহাই যে প্রধান অবলম্বন তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত তিনি বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্য ভাগবত', মুরারী গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের 'কড়চা', শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর রচিত 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালীয় অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের নিকট মৌখিক বিবরণ হইতে ঘটনাবলীর সূত্রানুসরণে প্রভূত সহায়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩ সর্ব্বোপরি, কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভক্তিময় কবিত্ব একত্র সমাবেশ করিয়া এই গ্রন্থখানিকে এই অপূর্ব্ব অমৃতাধাররূপে সৃজন করিয়া গিয়াছেন।

'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবন কথা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১) আদিলীলা — জন্মাবধি গার্গস্থ্য গ্রামে অবস্থিতি কাল চব্বিশ বৎসর — সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। ১—১২ পরিচ্ছেদে মুখবন্ধস্বরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব, চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক কারণ, মহাপ্রভু ভক্তগণের নাম ও শ্রেণী বিভাগ বর্ণিত আছে। ১৩—১৭ পরিচ্ছেদে জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত জীবনের স্থূল ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। (২) মধ্যলীলা—সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে দেশপর্যটন করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্যন্ত—ছয় বৎসর—পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। লীলা বর্ণনার এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে নানাবিধ ঘটনার সমাবেশ এবং গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্যের পূর্ণ বিকাশ ও জ্ঞানের গভীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৩) অন্ত্যলীলা —নীলাচলে অবস্থিতি — শেষ আঠার বৎসর—বিংশ পরিচ্ছেদ। সমগ্র গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১।

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় নয় বৎসরকাল অমিত পরিশ্রমের পর ১৫৫৭ শক (১৬১৫ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন। ৪ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া তিনি তৎকালীয় বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব সমাজের নেতা জীব গোস্বামীর নিকট সাধারণ্যে তাঁহার গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। জীব গোস্বামী, গ্রন্থের পাণ্ডিত্য ও সহজ ভাষায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য নিয়ে বিবৃত দেখিয়া, এইরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইলে কি জানি, রূপ সনাতন প্রভৃতি বিরচিত সংস্কৃতগ্রন্থাবলীর আদর খর্ব হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থখানি নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সের এত পরিশ্রমের ফল ব্যর্থ দেখিয়া একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য মুকুন্দ দত্ত, কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ এক এক পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে তাহার এক এক প্রস্থ অনুলিপি রক্ষা করায় সে আশঙ্কা দূর হইল—তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই সময়, শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বঙ্গদেশ হইতে বৃন্দাবনে উপনীত হন। এবং কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি উল্লিখিত অবিচার ও অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট তাহার প্রতিকার করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই সঙ্গে তিনি এই গ্রন্থের একটি টীকা প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অগত্যাই জীব গোস্বামী অনুমোদন স্বাক্ষর করিয়া প্রতি পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে 'চৈতন্য চরিতামৃত' শব্দের পর স্বহস্তে 'কহে কৃষ্ণদাস' এই বাক্যটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু গ্রন্থখানি এখনও বিপন্মুক্ত হইতে পারিল না। 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ গৌড়ে প্রেরিত হইবার সময় পথিমধ্যে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কথিত আছে, কৃষ্ণদাস এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া একান্ত শোকাকুলিত হৃদয়ে রাধাকুণ্ডে পতিত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হন। ৫ ভবিষ্যতে এই গ্রন্থখানি যে বৈষ্ণব মাত্রেরই সম্মান ও ভক্তির বস্তু হইবে, কৃষ্ণদাস বিন্দুমাত্রও তাহার আভাষ জানিতে পারিলে তাঁহাকে শেষাবস্থায় কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ করিয়া বিমল আনন্দের সহিত প্রাণত্যাগের পরিবর্তে এরূপভাবে জীবনের অবসান করিতে হইত না।

কবিরাজ গোস্বামীর 'চরিতামৃত' গ্রন্থখানি বৈষ্ণবগণের নিত্যসহচর 'আধ্যাত্মিক-রূপে চৈতন্যের ধর্ম্মমত সমর্থন, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য ও ঘটনার বিচিত্রতা প্রদর্শন ও রচনার ওজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি ধরিলে, ইহা বৈষ্ণবের সর্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্য-সংসারে একটি অমূল্য রত্ন ও প্রেম-ভক্তির অমৃত প্রস্রবণ!' (জগদীশ গুপ্ত)। 'চৈতন্য প্রভুর জীবন সম্বন্ধে গোবিন্দ দাসের কড়চার পর চৈতন্য চরিতামৃত' শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ; কিন্তু গভীর ও প্রবীণতা জন্য এই পুস্তক পূর্ব্ববর্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। 'চৈতন্য ভাগবতের' ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই, বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে অবকাশ আছে, কিন্তু সেই অবকাশ, ছবির অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোড়ন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য, এই বহুগুণে সমন্বিত হইয়া 'চৈতন্য চরিতামৃত' এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে ক্ষুদ্র লতাগুল্ম পুষ্প হইতে বৃহৎ বনস্পতির বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় স্বীয় গ্রন্থে কিরূপ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন দেখুন—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ।।
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা মুঞি করিয়া পানে।
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে,
সফল হৈল শ্রম।।

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের ভাষা সর্বত্র বিশুদ্ধ বাংলা নহে—বৃন্দাবনী, সংস্কৃত ও বাংলা এই তিন ভাষার শব্দেরই মধ্যে সমাবেশ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও, 'ভাষা'র অংশ, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তত দুর্ব্বোধ্য নহে।

সর্ববিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন —এই টীকা এখনও বৈষ্ণব সমাজে আদৃত রহিয়াছে।

এই সকল গ্রন্থাদি ব্যতীত কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় বহুতর সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

ইনি ১৬১৫ খৃঃ চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বৃন্দাবনধামে দেহত্যাগ করেন।

কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুর গ্রামে, মহাপ্রভুর মূর্ত্তি-সেবা, কবিরাজ গোস্বামীর কাষ্ঠপাদুকা, এবং ভজনস্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকলের নিত্য পূজাদির বন্দোবস্ত আছে। ঝামটপুর বৈষ্ণব-সাহিত্যসেবীগণের দর্শনীয় স্থান। এখানে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের হস্তলিখিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ রক্ষিত আছে। কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্তলিখিত মূল গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে এখনও বর্তমান রহিয়াছে।'

—ক্ষপণক

৩। 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে ৬০টি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণস্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। 'শাকে সিন্ধাগ্নি বাণেন্দৌ' (১৫৩৭ শক)-এর পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'শাকে হগ্নিবিন্দু বাণেন্দৌ', (১৫০৩ শক) পাঠ ধরিয়া, ১৭৮১ খৃঃ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা শেষের তারিখ বলিয়া উল্লেখ করেন। কৃষ্ণদাস যখন অশীতিপর বৃদ্ধ তখন এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয় ও এই হিসাবে তিনি অনুমান ১৫০০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মানিতে হয়—এদিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর ১৫৩৩ খৃঃ লীলাবসান হয়। তবে কি কৃষ্ণদাস, চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাকালে অনুমান ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া বর্তমান ছিলেন? —অসম্ভব!

৫। 'নরোত্তম চরিত' পৃঃ ৫২—৬০।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৌবাজার স্ট্রীটের একটা বাড়ির দো-তলায় ভাড়াটে থাকতাম আমরা। আমার স্কুল ছুটি ছিল তখন। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে মা ঘুমোচ্ছিল, আমি মেঝেয় বসে একটা ছবিঅলা বই দেখছিলাম। জানালাগুলো সব বন্ধ থাকলেও একটা জানালা একটু ফাঁক করা ছিল। হঠাৎ সেই জানালা দিয়ে ফরফর করে উড়ে এসে একটা চড়ুই পাখি ঘরে ঢুকে পড়ল। আমার কী খেয়াল হল, উঠে গিয়ে জানালাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলাম। তারপর চড়ুই পাখির সঙ্গে চলল চোর চোর খেলা। ও যেন ছোট্ট একটা চোর এদিক ওদিক থেকে পালাতে চায়, আর আমি পাহারাওয়ালা ওকে ধরবোই ধরবো। শেষ পর্যন্ত ও ধরা পড়ল। ভাত ঢাকা-দেওয়ার টোপ দিয়ে ওকে ঢেকে রেখে আমি একটা পাখির খাঁচা কিনে নিয়ে এলাম। এটা যে আমার পক্ষে দারুণ অন্যায় —এই যে মাকে না বলে নিচে নেমে যাওয়া, একটা খাঁচা কিনে আনা, উত্তেজনায় সব কিছুই ভুলে গিয়েছিলাম।

বাবা অফিস থেকে এসে পাখিটাকে দেখলেন। আমাকে ডেকে বললেন, 'ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো তো, কী রকম ভয় পেয়েছে। আর ও যে রকম ডানা ঝাপটে ওড়ার চেষ্টা করছে, এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে ও নির্ঘাৎ মারা যাবে।' বাবা আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই খাঁচার দরজাটা খুলে দিলেন। পাখিটা উড়ে গিয়ে প্রথমে বারান্দার রেলিংয়ের ওপর বসল। ও যেন বুক ভরে বিশুদ্ধ বাতাস নিল বার কয়েক, তারপর উড়ে কোথায় চলে গেল।

কতদিন আগেকার ঘটনা। কিন্তু কী স্পষ্ট মনে আছে। এমনকি খাঁচায় বন্দী থাকার সময় ওর চোখে যে আতঙ্ক ছিল, সে আতঙ্ক-ভরা চোখ দুটোও যেন আমি দেখতে পেলাম।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে অযথা মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাঁটতে লাগলাম। সব কিছুই ভাল লাগছিল। একটা ছেলে ওর বাবার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে বার বার পেছিয়ে পড়ছিল, থেকে থেকে ছেলেটা দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ধরছিল, আবার পেছিয়ে পড়ছিল। এ যেন এক দারুণ মজার খেলা। যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের দেখা গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেই ষণ্ডামার্কা বাপ আর রোগা রোগা মতন ছেলেটা, যে কিনা এক হাত দিয়ে খুলে-যাওয়া প্যাণ্টটাও তুলে ধরে রেখেছিল। যদিও লোকটা ছেলেটার বাপ কিনা জানি না, কিন্তু এই মুহূর্তে সেই রকম কল্পনা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

সন্ধে পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। যতক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো ছিল ভেতরে ভেতরে একটা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছিলাম। কিন্তু সন্ধে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে একটা ছায়া এসে পড়ল। অকারণে ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হতে লাগল, পৃথিবীটা বিরাট আর আমি খুব ক্ষুদ্র একজন মানুষ। চতুর্দিকে শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে, সুযোগ পেলে ওরা আমাকে খাবলে খাবলে মেরে ফেলবে। ঠিক এ ধরনের কথা যে কেন মনে হতে গেল, আর কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গা শির শির করতে লাগল, তা বলতে পারবো না। নিজেকে ধমক দিলাম। চাকরি ছাড়ার জন্য কি আমি অনুতপ্ত? স্পষ্ট উত্তর নেই। একবার মনে হল ঝোঁকের মাথায় চিঠিটা পাঠিয়ে দেওয়া দারুণ অন্যায় হয়ে গেছে। সংসারে আমি একা না। মা রয়েছে। মার আশা-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সুষমাকে আর আমাকে নিয়ে মার স্বপ্ন রয়েছে। শুধু আমরা দুজনে না, আমাদের সন্তান-সন্ততি—সবাইকে নিয়েই মার স্বপ্ন; এসব কিছুই সফল হবে না, বরঞ্চ একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন—হতাশা, ক্ষোভ, ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, শেষ পর্যন্ত অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলাম, নেভার, নেভার। আমি পুরুষ মানুষ। আমি শক্তিমান। এই দেখ আমার বলিষ্ঠ শরীর, এই দেখ আমার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা; আমি কর্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী যুবক, আমি কোনদিনই অনাহারে মরতে পারি না।

কিন্তু বাজারের অবস্থা ভাল না। রোজই বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। ইঞ্জিনীয়ার দর্জির দোকান খুলছে, এম, এ পাশ ছেলে অফিসের পিওন হতে চাইছে; কে তোমাকে চাকরি দেবে অংশুমান।

...ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। হঠাৎ অনিমেষের কথা মনে পড়ে গেল। দেশপাণ্ডের এই মারাত্মক রিপোর্টের কথা জেনেও অনিমেষ কী করে এত নিশ্চিন্ত ছিল। ওর মাথার ওপর তো অনেক বেশী দায়িত্ব চাপানো রয়েছে। ওর তুলনায় বলতে গেলে আমি তো অনেক হালকা আছি, একটা পাখির পালকের চেয়েও হালকা।

সবচেয়ে হাসি পেল, যখন মনে পড়ল, অনিমেষকে একগোছা নোট দিয়ে বললাম, তুমি যেদিন কলকাতায় যাবে, আমার জন্যেও একটা টিকিট কেটো। যেন আমি একা একা কলকাতায় যেতে পারি না। আসলে আমি ভয় পেয়েছিলাম বলেই অনিমেষের সঙ্গ কামনা করছিলাম। অনিমেষ সাহসী, অনিমেষ বুদ্ধিমান, অনিমেষ নিজের ওপর আস্থা রাখে। এই মুহূর্তে আমি অনিমেষের মত একজন লোক খুঁজছিলাম, যার ওপর আমি ভরসা করতে পারি। আর একজন এই ধরনের লোক আমার খুব কাছাকাছি ছিল। দ্যোতন। দ্যোতনের কথা মনে পড়তেই অনেকখানি ভরসা পেলাম। দ্যোতন আমার জন্যে চাকরি ঠিক করে রেখেছে। ওখানে তো আর শ' শ' এর ব্যাপার না, হাজার হাজার টাকার ব্যাপার। সুতরাং মাকে নিয়ে চলে যাব। তারপর সুযোগ সুবিধামত একদিন সুষমাও যাবে। মা, আমি আর সুষমা, তারপর—

আবার সেই প্রশনটা এসে মাথায় ঢুকছে, মানুষ বাঁচে কেন। দাঁত খিঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, মরতে পারে না বলে। কিন্তু কে যেন খুব শান্তভাবে আমার কানে কানে বলল, মোটেই না। মানুষ বাঁচে, যেহেতু এই বাঁচার মধ্য দিয়ে সে আরও অনেককে বাঁচিয়ে তোলে। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রঙে সে নিজেকে রাঙিয়ে নেয়, আশেপাশের সবাইকেও রাঙিন করে তোলে। কথাটা মনে হতেই ভাল লাগল। মনের মেঘটা কেটে যেতে লাগল। তারপর এক সময় হালকা মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। জানালার বাইরে রোদ ঝলমল করছে। উঠতে যাচ্ছিলাম, মনে পড়ল আজ আমার ছুটি। শুধু আজ না, আ-জীবন। আ-জীবন না হোক অন্তত অনেক—অনেক দিন। অনেক দিন পর্যন্ত কাজ করবো না। শুধু খাবো, ঘুমবো আর ঘুরে বেড়াবো।

হাতের কাছে টি-পয়। টি-পয়ে একটা মুখ-খোলা খাম পড়ে রয়েছে। খামটা নিয়ে আবার চিঠি পড়তে বসলাম। মার চিঠি। মা যথারীতি অনুযোগ করে লিখেছে, বাড়ি ঠিক করে মাকে এখানে নিয়ে আসতে। তারপর মা বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী হয়ে হরিদ্বার যাবে। মা আরও লিখেছে, তুই কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলি, কত ভাল লাগলো। ইচ্ছে করলে তুই তো এরকম ছুটি নিয়ে প্রায়ই আসতে পারিস। মা যেন ইঙ্গিতে জানালো, এ ধরনের ছুটি নিয়ে এলে অফিসের তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই। মাকে এই আশ্বাস সুপ্রিয়া ছাড়া আর কেউ দেয় নি। এক এক সময় সন্দেহ জাগে, সমস্ত অফিসের মালিক কি সুপ্রিয়া! সে যাকে যখন খুশী ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে। অথচ এতদিন পর্যন্ত মুখের মত জবাব পায় নি। এবার পাবে।

চিঠিটা যখন সুপ্রিয়ার হাতে গিয়ে পড়বে, তখন ওর মুখের অবস্থা কল্পনা করে হঠাৎ বিষম মজা লেগে গেল। সুপ্রিয়া যে একজন বিমূঢ় মানুষের মত মুখ করে এদিক ওদিক তাকাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর নিশ্চয় মনে মনে ভাববে, অংশুকে এতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিত্বহীন মানুষ হিসেবে ভেবে এসেছিলাম, কিন্তু কী ভয়ানক ভুল সেই ভাবাটা!

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে সুপ্রিয়ার কথা ভাবলাম। বিভার কথাও বার কয়েক মনে হল। উচিত হিসেবে আজ একবার ওদের বাড়িতে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওদের কথা মনে হতেই খুব খারাপ লাগল। এত সুন্দর একটা পরিবার কী ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই নষ্ট হওয়ার জন্যে ওরা কেউই দায়ী নয়। ব্রহ্মচারীর কথাও মনে পড়ল। কে জানে ব্রহ্মচারী পুষ্পকে খুঁজে পেয়েছেন কিনা। মানুষ কী অদ্ভুত! কোথায় যে কার দুর্বলতা লুকিয়ে [illegible] ব্রহ্মচারীকে দেখে কি একবারও মনে হয়েছিল সামান্য এক পুষ্পর জন্য নিজের সমস্ত বর্তমান, ভবিষ্যত ধুলোয় লুটিয়ে দেবেন ভদ্রলোক। অথচ কত অনায়াসে তা-ই করে বসলেন তিনি। লীলাবতীও কম বিস্ময়কর না। এত সব থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা ডুবল গিয়ে একটা পানাপুকুরে। পানাপুকুর ছাড়া আর কি। লীলাবতীর মত মেয়ের পক্ষে অনিমেষ শুধু যে পানাপুকুর তা না, একটা মজে যাওয়া ডোবা। অথচ সেই বিস্ময়কর ব্যাপারটা চোখের সামনেই ঘটে গেল। ঘোতনকেও মনে পড়ল। কোথা থেকে উড়ে এসে দু' চারদিন ভেল্কী বাজী দেখিয়ে আবার সরে পড়ল। যাবার সময় সঙ্গে করে নোলক-পরা বউ নিয়ে গেল, যে কিনা আমেরিকায় গিয়ে ভাত রাঁধবে আর চুটিয়ে ঘরকন্না করবে. সুযোগ সুবিধামত—চাকরিও। মানুষ যে কী আজব বস্তু! সবচেয়ে বিচিত্র মানুষ বলে যাকে মনে হল, তিনি হলেন দেশপাণ্ডে। ধীর, স্থির, বিচক্ষণ। সহজে টলেন না। টললেও বোঝা যায় না। আচ্ছা, এই যে পুষ্প সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল, দেশপাণ্ডের মনে কী প্রতিক্রিয়া হল? কষ্ট পেয়েছেন দেশপাণ্ডে, নাকি পুষ্প চলে গিয়েছে বলে মুক্তি পেয়েছেন? দেশপাণ্ডেকে ভাল করে বোঝা হল না। বোঝার আগেই সরে পড়তে হল।

দরজায় কে টোকা দিচ্ছে। বেয়ারা নিশ্চয় চা নিয়ে এসেছে। উঠে দরজা খুলে দিলাম, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল লীলাবতী। লীলাবতীর এই মূর্তি কোনদিন দেখিনি। বেশবাস আলুথালু, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো অসম্ভব লাল। ঘরে ঢুকে হাঁপাতে লাগল লীলাবতী। একটা চেয়ার এগিয়ে দিতেই লীলাবতী ধপ করে বসে পড়ল।

দু' হাত দিয়ে কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে বসে রইল লীলাবতী। একসময় মুখ তুলে গাঢ় স্বরে বলল, 'এ ধরনের যে কিছু ঘটবে আমি বুঝতে পারিনি।'

'কিন্তু এর জন্যে আপনি দায়ী নন মিস দেশপাণ্ডে।'

হঠাৎ লীলাবতী একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আকুলভাবে বলে উঠল, 'আমাকে এ ভাবে দোষী করতে আপনি কিছুতেই পারেন না। রেজিগনেশন লেটার আপনাকে উইথড্র করতে হবে।'

'চিঠি কাল দুপুরেই পোস্ট করা হয়ে গেছে।'

লীলাবতী উঠে দাঁড়াল, 'তাতে কিছু যায় আসে না। আমি মিস্টার কাপুরকে ফোন করে দিচ্ছি।'

'তা হয় না মিস দেশপাণ্ডে।'

'কেন হয় না!' লীলাবতী যেন আমাকে ধমকে উঠল। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, 'বলুন কেন হয় না?'

'সব কেনর উত্তর হয় না।'

'কথা এড়িয়ে যাবেন না। আপনাকে রেজিগনেশন উইথড্র করতেই হবে।'

'অনেক ভেবেচিন্তেই আমি এ কাজ করেছি।'

'আপনি একটুও ভাবেন নি। আপনার বন্ধুর ব্যাপারে খুব আপসেট হয়ে আপনি এ কাজ করেছেন। আমার সমস্ত দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি আর কোনদিন এ ধরনের রিপোর্ট লিখবো না।'

হেসে বললাম, 'কিন্তু আমার জানার কথা নয়, যে রিপোর্টটা আপনার লেখা।'

লীলাবতী যেন জ্বলে উঠল, 'আপনি না জানলেও অনিমেষ জানে। আমি ওকে রিপোর্ট পড়ে শুনিয়েছিলাম।'

'ওর মাত্রা-ঘন্টা [illegible] [illegible] ছিলেন?'

'হ্যাঁ।' লীলাবতী ক্রমশই [illegible] হয়ে পড়ছিল। 'আমি অনিমেষকে আঘাত করতে চেয়েছিলাম, ওর অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন [illegible] আঘাত করার ইচ্ছা আমার ছিল না।'

'সে কথা আমি বিশ্বাস করি [illegible] দেবী। কিন্তু আঘাত বলে ভাবছেন কেন। হয়ত, হয়ত কেন, এটা খুবই [illegible] আমি নিজেকে একটা খাঁচা-[illegible] বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম। আপনি খাঁচার দরজাটা খুলে দিলেন।'

লীলাবতী কিছুক্ষণ অর্থহীন [illegible] আমাকে দেখল। তারপর বলল, [illegible] এখানে তো কেউ বন্দী করে [illegible]।'

'কেউ রাখেনি, আমি নিজে [illegible] একটা খাঁচায় ঢুকে গিয়ে দরজাটা [illegible] দিয়েছিলাম। ঢোকার পথ জানা [illegible] কিন্তু বেরোবার পথ আমি হারিয়ে [illegible] ছিলাম।' আবহাওয়া হালকা [illegible] জন্যে শব্দ করে হেসে উঠলাম।

লীলাবতী হাসল না। কী [illegible] বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে [illegible] কিছুক্ষণ পর বলল, 'আপনি [illegible] আপনার মত পরিবর্তন করবেন না?'

'তা আর সম্ভব না লীলা দেবী।'

লীলাবতী আর কথা বলল না। [illegible] [illegible] ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। [illegible] বিশ্বাস করুন, আপনার [illegible] আমার কোন রাগ নেই। ঈশ্বর [illegible] মঙ্গল করুন।' লীলাবতী [illegible] পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

—বারো—

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল [illegible] মেসের পাত্তা নেই। অথচ অনিমেষ [illegible] সময়ের কিছু আগেই সে আসবে [illegible] যে একটা কুপে যোগাড় করবে [illegible] আগেই সে খবরটা পেয়েছিলাম। [illegible] অফিসে আর মাত্র একদিন [illegible] বুঝিয়ে দিয়ে আসতে। আমার সেই [illegible] পত্রের জবাব আজ পর্যন্ত পেলাম না। [illegible] চারেক আগে চিঠি পোস্ট করা [illegible] হিসেব মত আজ সকালে উত্তর আসা উচিত ছিল। নিয়ম অনুযায়ী কলকাতা অফিসে

চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে পাটনা ছেড়ে যাওয়া উচিত না। কিন্তু কোন উচিতটা হয় জীবনে। বলা নেই কওয়া নেই অতগুলো সিনিয়র লোককে ডিঙিয়ে যে আমাকে প্রমোশন দেওয়া হল, সেটা কি উচিত হয়েছিল? আর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এই যে আমাকে নতুন একটা পোস্টে এনে বসানো হলো, এটা কী দারুণ অনুচিত হয়নি? বলতে গেলে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়নি। দেশপান্ডের পা-চাটা কুকুর হয়ে আর যেই থাকতে পারুক, অংশু চট্টোপাধ্যায় সে জাতের লোক না। মনে মনে বেশ গর্বিত বোধ করছিলাম। মানুষের সহজাত একটা বৃত্তি হচ্ছে মাঝে মাঝে শৃংখলা ভঙ্গ করা। এই যে বেআইনীভাবে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছি ভাবতেও এক ধরনের উল্লাস বোধ করছিলাম। নিজেকে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারার উল্লাস।

হঠাৎ অনিমেষের দীর্ঘদেহ নজরে পড়ল। অনিমেষ হন হন করে এগিয়ে আসছে। কিন্তু অনিমেষ তো একা না। দূরে থেকে মানুষের ভীড়ে মুখটা ভাল করে বোঝা গেল না। কিন্তু হাঁটাটা খুব পরিচিত। এত পরিচিত যে কী বলবো। নিমেষের মধ্যে রাজভবনের নীচু পাঁচিল, ঝাপড়া গাছের সারি, অল ইন্ডিয়া রেডিওর বাড়িটা, সরল সোজা বেড রোড, সব একসংগে মনে পড়ে গেল। অনিমেষরা আরও এগিয়ে এসেছে। ওদের মুখ খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এত পরিষ্কার যে সুপ্রিয়ার কপালে জমে-ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামও আমার নজরে পড়ল না।

আমাকে দেখে অনিমেষ হাত নাড়ল। আমিও হাত নাড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার হাত দুটো অসম্ভব ভারী ঠেকল, তোলা গেল না।

অনিমেষ এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন বলল, 'পথ ছাড়ো, উঠতে দাও' তখন যেন আমার জ্ঞান ফিরে এল। তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে দাঁড়াতেই কুলী মালপত্র নিয়ে ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন অনিমেষ আর সুপ্রিয়া উঠে এল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে অনিমেষ বলল, 'কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল। আর একটু হলে ট্রেনই মিস করতাম।'

সুপ্রিয়া যেন নিজের মনে মনেই বলে উঠল, 'শুধু ট্রেন না, অনেক কিছুই। আপনার তো ডাক্তারের সংগে কাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

অনিমেষ কী একটা বলল বোঝা গেল না।

এই ক্ষেত্রে আমার অন্তত কিছু বলা উচিত। যেমন, সুপ্রিয়াকে বলা উচিত, হঠাৎ তুমি? অনিমেষকে বিভার কথা জিজ্ঞাসা করা একান্ত উচিত, অথচ কোন কথাই বলতে পারলাম না। শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সুপ্রিয়া বলল, 'করিডরে দাঁড়িয়ে কী হবে। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।'

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলো হে।' মনে হল অনিমেষের চোখে যেন একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। এ আলো আমার চেনা। অনিমেষ যখন হাসে, তখন ওর চোখে এই ধরনের আলো জ্বলে ওঠে।

কামরায় এসে তিনজনে বসলাম। অনিমেষ সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমার সামনে খুলে ধরল। একটা সিগারেট বার করে নিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বার করে আগুন ধরাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সুপ্রিয়ার কথা মনে এল, 'এখানে এসে অনেক উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে। পকেটে দেশলাই সিগারেট সবই মজুত থাকে দেখছি।' ঠিক এ ধরনের কথা সুপ্রিয়া ইদানীং বলতো না। ওর পদমর্যাদা ও বুঝতে শিখেছিল। সেই অনুযায়ী কথাবার্তা বলতো। বিশেষ করে অনিমেষের সামনে যে ও সিগারেট খাওয়া নিয়ে এ ধরনের একটা অশোভন মন্তব্য করে বসবে বুঝতে পারি নি।

উত্তর না দিয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। অনিমেষ একটা হোল্ড অল খুলে বেঞ্চিতে বিছোতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়া বাধা দিল, 'সরুন, আমি পেতে দিচ্ছি।' অনিমেষ সরলো না। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি একটু উঠে দাঁড়াও তো।' আমি উঠে দাঁড়াবার সংগে সংগে অনিমেষ চটপট ওর কাজ শেষ করে ফেলল।

সুপ্রিয়া বিরক্তভাবে বলল, 'আপনি যে কী করেন। মেয়েরা থাকতে কি পুরুষদের এইসব কাজ মানায়।'

অনিমেষ উত্তর দিল না। এতক্ষণ যে সিগারেট ঠোঁটে চেপে রেখেছিল, সেটা হাতে নিয়ে খুব জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। জ্বলন্ত টুকরোটা একটা অঙ্গারের মত ছিটকে বেরিয়ে গেল। পাশাপাশি তিনজনে বসলাম। আমি, মাঝখানে সুপ্রিয়া, ওপাশে অনিমেষ। সুপ্রিয়া অনিমেষের দিকে একটু কাত হয়ে বসেছিল। ওর মুখের যে অংশটা আমার এদিক থেকে দেখা যাচ্ছিল, তাতে ওকে সুপ্রিয়া বলেই মনে হচ্ছিল। অথচ একদিন ওর মুখের একটা অংশ দেখে ওকে অন্য একজন বলে মনে হয়েছিল। মনে করতে চেষ্টা করছিলাম সেদিন সুপ্রিয়ার মুখের যে অংশটা আমার নজরে পড়েছিল, সেটা কোন অংশ। ডান না বাঁ? এখন সুপ্রিয়ার মুখের অংশ নিয়ে মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করছিলাম, সুপ্রিয়ার গলা কানে এল, 'আপনি তো কাল রাত্রের ট্রেনেই ফিরে আসছেন? ইচ্ছে তো আছে?'

সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষের মত ওদের কথা শুনে যাচ্ছিলাম। বাস্তবিক ওদের সংগে আমার যে কোন সম্পর্ক আছে এই মুহূর্তে আমি যেন সেই কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার এখন মা-র কথা মনে পড়ছিল। প্রত্যেকবারের মত এবারেও হয়ত মা-র সংগে প্রথমে দেখা হবে। মা এবারে খুব অবাক হবে। এত তাড়াতাড়ি যে আমি আসব মা নিশ্চয়ই ভাবতে পারবে না। কিন্তু মা যখন চাকরি ছাড়ার কথা শুনবে, কী অবস্থা হবে, কে জানে। মা যে দারুণ আঘাত পাবে, সে কথা নিশ্চিত। মা-র সব আশা স্বপ্ন এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে অথচ আমার কীই বা করার ছিল। মা আমেরিকায় যেতে চাইবে কিনা জানি না কিন্তু না যাওয়ার কোন কারণ নেই। মা যেতে রাজী হয় কোন গোলমালই থাকবে না, যেতে না চাইলেই যত সমস্যা। তখন যে কী করবো! এখানে কে আর আমাকে চাকরী দিতে যাচ্ছে। অথচ মাকে ফেলে চলে যাওয়াটাও তো ভাবা যায় না।

হঠাৎ অনিমেষ বলে উঠল, 'তুমি এত কী ভাবছো বলো তো!'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা মানুষ বাঁচে কেন?'

সুপ্রিয়া খিল খিল করে হেসে উঠল। এভাবে শব্দ করে ওকে বহুদিন হাসতে শুনি নি। অনিমেষও হেসে ফেলল। 'প্রশ্নটা খুব জটিল, আবার বিষম সহজ। আমার মনে হয় মানুষ বাঁচে শুধু ভার বইতে।'
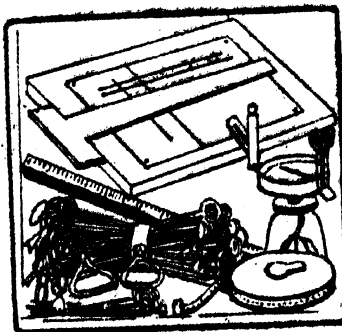
অনিমেষের বলার ধরণ দেখে সুপ্রিয়া হাততালি দিয়ে আরও জোরে হেসে উঠল, 'ওয়েল সেড অনিমেষদা।'

অনিমেষদা, কথাটা যেন কানে বাজল, সুপ্রিয়ার দিকে তাকালাম। সুপ্রিয়া যেন অপ্রস্তুত হয়ে চোখ সরিয়ে নিল। হয়ত আমার ভুল। কিন্তু সুপ্রিয়ার চোখ সরিয়ে নেওয়ার কী কারণ থাকতে পারে। অনিমেষ যে ওর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, সে কথা সুপ্রিয়াই একদিন বলেছিল। তাছাড়া দাদা ডাকটার মধ্যে আর যাই থাক, অপ্রস্তুত বোধ করার কিছু থাকতে পারে না। তবু যে হঠাৎ কেন কথাটা কানে বাজল কে জানে।

গাড়ি খুব জোরে ছুটছে। ঠান্ডা হাওয়া এসে কামরায় ঢুকছে। শরীরে শিহরণ জাগছে। সঙ্গে সঙ্গে মনেও ছড়িয়ে পড়ছে। এরকম ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়ায় ট্রেনে চড়তে বেশ লাগে। মনে হয় আমি একটা ভাল-লাগা জগতের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। আমার চারদিকে সব কিছুই ভাল। ট্রেনের কামরাটা ভাল, পাশের লোক দুজন ভাল, বাইরে থেকে শিরশিরে হাওয়া এসে নাকেমুখে লাগছে, সেটা ভাল, একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বালিশ বুকের কাছে চেপে ধরে বসেছিলাম, যে বালিশটা এই কিছুক্ষণ আগে হোল্ড-অল খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই বালিশ থেকে মৃদু সৌরভ নাকে লাগছিল—সেই গন্ধটাও দারুণ ভাল।

হারানো কথার রেশ ধরে অনিমেষ বলে উঠল, 'আসল কথাটা কি জানো, বাঁচা-মরার প্রশ্ন নিয়ে যত কম ভাবা যায় ততই ভাল। এ প্রশ্নের তো কোন কূল কিনারা নেই।'

সুপ্রিয়া পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'আমার কী মনে হয় জানেন। মনে হয় বাঁচাটা কী দারুণ থ্রিলিং। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, আমি যদি না থাকতাম, কত কিছু আমাকে বাদ দিয়েই ঘটে যেত। এই যেমন ধরুন, আপনারা দুজনে কত আরাম করে ট্রাভেল করতেন, অথচ আমার তো এখন বিছানায় শুয়ে থাকার কথা। এই যে মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন নতুন স্বাদ, নতুন অনুভূতি—এসবের কী ভয়ানক মূল্য, তাই না।' সুপ্রিয়া নিমেষের জন্য আমাকে দেখে নিয়ে অনিমেষের ওপর দৃষ্টি স্থির করে রাখল।

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই কি?'

'কি জানি।' আমি বাইরের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিলাম।

'অথচ প্রশ্নটা তুমিই তুলেছিলে।' বলে সুপ্রিয়া আমার দিকে তির্যক দৃষ্টি হানল। সুপ্রিয়া যে এভাবে অনিমেষের সামনে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলবে বুঝতে পারি নি। সুপ্রিয়ার অনেক কিছুই, সত্যি কথা বলতে কি, আমি বুঝতে পারি না। ও যেন ক্ষণে ক্ষণে ওর রং পাল্টাচ্ছে। কখন কী রং ধরে সামনে এসে দাঁড়াবে সে জানে সুপ্রিয়া নিজে, আর ওর অন্তর্যামী।

গাড়ির গতি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসছে। তীক্ষ্ণ স্বরে বাঁশী বেজে উঠল। অনিমেষ বলল, 'মনে হচ্ছে স্টেশন, এবার আমি উঠবো, হাওড়ায় গিয়ে দেখা হবে।'

আমি বলে উঠলাম, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো অনিমেষ?'

অনিমেষ হেসে বলল, 'কুপ-এ দুজনে যাওয়ার কথা। আমরা তিনজন। একজনকে অন্য কামরায় যেতে হবে। এবং সেই একজন আমি।'

'আমিও সেই একজন হতে পারি।'

'তুমি পারো না, যেহেতু বার্থ দুটো তোমার আর আমার নামে রিজার্ভ করা ছিল, আর উনি আমার গেস্ট, তোমার নন। সুতরাং—' বলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

সুপ্রিয়া বলল, 'সাবধানে যাবেন। গাড়ি ছাড়বার আগেই উঠে পড়বেন। জায়গা না পেলে এখানেই চলে আসবেন, তারপর যা হয় দেখা যাবে।'

অনিমেষ নেমে গেল।

গাড়ি ছাড়তেই সুপ্রিয়া বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'জায়গা পেয়ে গেছে।'

'মনে হল তোমার একটা বড় রকমের দুশ্চিন্তা গেল।'

চোখ বড় করে সুপ্রিয়া বলল, 'দুশ্চিন্তা নয়, বলো কী! পরের ছেলেকে নিজের জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিলাম, জায়গা পেলো কী না তাও ভাববো না!'

'তোমার ভাবনাটা তা না। তুমি ভাবছিলে অনিমেষ যেন ফিরে না আসে।'

'তোমার বুদ্ধি আশ্চর্যরকমের বেড়ে গেছে।' বলে সুপ্রিয়া মুচকি হাসল। 'এরপর যার দেখবো বুদ্ধি কম, তাকেই পাটনায় পাঠাবো।'

'পাটনায় না এসেও অনেকের বুদ্ধি খুব সার্প হয়।'

সুপ্রিয়া একটা আঙুল নিজের বুকে ঠেকিয়ে বলল, 'যেমন আমার, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বুদ্ধি খুব সার্প বলেই বুঝতে পারি, দিনকে দিন তুমি ভয়ানক রকমের নির্বোধ হয়ে যাচ্ছো।'

'আমাকে গালাগাল দেবার জন্যেই কি তুমি অনিমেষকে তাড়ালে?'

'অনিমেষকে আমি তাড়াই নি। রেলওয়ের আইন অনুসারে আমাদের মধ্যে একজনকে নেমে যেতেই হতো।'

'সেই একজন আমি হতে পারতাম।'

'না, পারতে না। কারণ তোমাকে আমার দরকার। একটা বোঝাপড়া করতে চাই।'

'কীসের বোঝাপড়া?'

'তুমি তোমার খামখেয়ালীমত কাজ করতে পার না।'

'পারি, যেহেতু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা অধিকার জন্মেছিল। সেই অধিকারের জোরে আমি আমার পথ ধরে চলতে পারি। এ আমার আইনত, নীতিগত অধিকার।' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে একটা আবেগ অনুভব করছিলাম।

সুপ্রিয়া চুপ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ও যেন মনে মনে কথা খুঁজছিল। হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'এখানে এসে তুমি বেশ মোটা হয়েছো।' একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলল, 'হঠাৎ চলে আসতে হল। বিভার খবরটা পেয়েই মন খুব খারাপ হয়ে গেল।' বুঝলাম সুপ্রিয়া পালাবার পথ খুঁজছে।

'তুমি বিভার খবর পেয়ে এখানে আসো নি।'

সুপ্রিয়া যেন ভয়ানক বিরক্ত বোধ করল, 'তবে কেন এলাম?'

'তুমি এসেছো, আমার চিঠি পেয়ে।'

সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ও যেন তলে তলে নিজেকে সামলাতে লাগল। 'তা-ই যদি আসি ক্ষতি কি।'

'অনেক ক্ষতি, তোমার ক্ষতি, আমার ক্ষতি, আরও অনেকের ক্ষতি।' আমি ক্রমশই নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিলাম।

'কোন ক্ষতি নেই, কারও ক্ষতি নেই।' সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল। 'ক্ষতি করবো বলে আসি নি, ক্ষতি হতে দেব না বলেই এসেছি।'

'আমার লাভক্ষতি নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না, সে দায়িত্ব থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম।'

ভেবেছিলাম সুপ্রিয়া খুব রেগে উঠবে। ও রাগল না, বরং একটু হাসল। হেসে বলল, 'দিতে চাইলেই কি মানুষ নিতে পারে সবসময়? এই যে অনিমেষকে জায়গাটা ছেড়ে দিতে চাইলে, অনিমেষ কি নিতে পারল?'

'কথার মারপ্যাঁচে চিরদিনই তুমি জেতো, আজ তোমাকে জিততে দেব না।'

সুপ্রিয়া খুব মিষ্টি করে হাসল। আমার ওপর চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, 'বেশ, আমি হারতে প্রস্তুত আজ।'

'এত সহজেই হার স্বীকার করবে! এতো তোমার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার।' সুপ্রিয়াকে আঘাত করবার বাসনা ক্রমশই আমাকে পেয়ে বসতে লাগল।

'স্থিরতা বলে মানুষের কিছু নেই, থাকতে পারে না। মানুষ চিরদিনই অস্থির ছিল, আজও আছে। আমরা আজ যা ভাবি, কাল তা ভুলে যাই। যে কাজের জন্যে একদিন গর্ব বোধ করি পরক্ষণেই হয়ত তার জন্যে অনুশোচনা আসে।' বলতে বলতে সুপ্রিয়ার গলার স্বর গম্ভীর হয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু আমার মধ্যের নিষ্ঠুর মানুষটা আজ দয়াহীন, ক্ষমাহীন। বিষাক্ত হাসি ছড়িয়ে বললাম, 'একটা কথা জানাতে ইচ্ছে হয়।'

'বলো সাধ্যমত জবাব দেবার চেষ্টা করবো।'

'আশা করবো, জবাবটা সত্যি হবে।'

'মিথ্যে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।'

'কিন্তু বহু মিথ্যে কথা তুমি বলেছো।'

সুপ্রিয়া শান্ত মেয়ের মত ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'দরকারের সময়, ভাল না লাগলেও আমি মিথ্যে কথা বলি।'

'আমাকে পাটনায় পাঠিয়েছিলে তোমার নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায়, আমার উন্নতির জন্যে নয়।'

মনে হল সুপ্রিয়ার মুখ নিমেষের জন্য লাল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই স্বাভাবিক সরল মুখ করে ও বলল, 'কি করে বুঝলে?'

'আমি তোমার পরিহাসের পাত্র না। পদমর্যাদায় তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। ইচ্ছে হলে আমাকে করুণা করতে পার, কিন্তু উপহাস নয়।'

'কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছো, মর্যাদার কথা এখন অবান্তর, যেহেতু তুমি এখন কোম্পানীর কর্মচারী না। সুতরাং মানুষ হিসেবে আমরা একজন আর একজনের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিহাস করতে পারি। তাছাড়া—' সুপ্রিয়া একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি আমার বন্ধু।'

ক্রমশই যেন একটা কোণের দিকে আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে সুপ্রিয়া। কিন্তু আজ এভাবে ওর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে আমার পৌরুষে বাধল। উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ সুপ্রিয়া বলে উঠল, 'লীলাবতী কেমন আছে?'

'শারীরিক না মানসিক?'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে সুপ্রিয়া বলল, 'দুই-ই।'

'শারীরিক বিষয় জানি না। মনে হয় ভালই আছে। মানসিক ব্যাপারে ও খুব মুষড়ে পড়েছে।'

মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ভেতরে এনেই আবার বাইরে প্রসারিত করল সুপ্রিয়া। বলল, 'তুমি চলে যাচ্ছো বলে?'

'যদি বলি হ্যাঁ, কষ্ট পাবে?'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। নিঃশব্দে হাসল।

ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসিলের শব্দে কিছুক্ষণ কথা বলা গেল না। মনে হল লাইন ক্লিয়ার নেই। ধীরে ধীরে ওর গতি কমে আসতে লাগল। ঝুঁকে পড়ে বাইরের দিকে তাকালাম। অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে কতগুলো গাছ ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের আলাদা করে চিনতে না পারলেও, ওরা যে আছে সে কথা বোঝা যাচ্ছিল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও চলেছে। পৃথিবীর যে প্রান্তে যাই না কেন, ওরা থাকবেই। হঠাৎ ওদের আমার খুব আপন বলে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, আমার জন্মাবার মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ওরা আমার নিত্য সহচর। মেঘে যদি একদিন সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায়, গাঢ় তমসায় যদি চোখের আড়ালে চলে যায় ওরা, তবু বুঝবো, ওরা আছে, ওরা চিরদিন থাকবে। ভাবতে ভাবতে কী রকম একটা মমতাবোধ আমার মধ্যে জন্মাতে শুরু করল। শুধু যে আকাশের তারা, তাই না। এই যে গাছপালা, নদীনালা পৃথিবীর এত মানুষজন, বনের পশুপাখি, কীটপতঙ্গ কেউ আমার অপরিচিত না, আমার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নয় ওরা। কোথায় যেন এক অদৃশ্য সুতোয় আমরা সবাই গ্রন্থিত হয়ে রয়েছি। এই মুহূর্তে যদি এক মহাপ্লাবন শুরু হয়ে যায়, কিম্বা প্রলয়ংকর একটা ঝড়, কিম্বা নিদারুণ ভূমিকম্প, এই যে কোটি কোটি প্রাণী সবাই আমরা একই লক্ষ্য স্থির রেখে সেই দিকে ধেয়ে যাব—নিজ নিজ নিরাপত্তা খুঁজবো। কিম্বা যদি হঠাৎ ট্রেনটা লাইন থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে, এর ভেতরে যত মানুষ আছে, সেই মুহূর্তে সবাই সবার কী কাছাকাছিই না চলে আসবো। হঠাৎ দৃষ্টি ফেরাতেই সুপ্রিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সুপ্রিয়া আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলতেই ও হেসে ফেলল, 'আমি জানি তুমি কার কথা ভাবছো।'

বললাম, 'তুমি জানো না, এখন আমি কোন মানুষের কথাই ভাবছি না। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।'

'কি কথা?'

হঠাৎ কী রকম লজ্জা করতে লাগল। ওকে আমার চিন্তার বিষয় বলতে কোথায় যেন আটকাল। অথচ একদিন আকাশ, সবুজ মাঠ, আর পাখিটার কথা সহজেই সুপ্রিয়াকে বলতে পেরেছিলাম। বললাম, 'কী হবে শুনে। তার চেয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'বাতিটা নিভিয়ে দিতে পারো, কিন্তু শোব না। ট্রেনে চড়তে আমার মজা লাগে শুধু এই কারণে যে, বসে বসে, একটুও পরিশ্রম না করে, কত কী দেখা যায়।'

'কিন্তু এখন অন্ধকার, কিছুই দেখা যাবে না।'

'ভেতরের আলো থাকলে বাইরের আলো বোঝা যায় না। বাইরে এখন জ্যোৎস্না উঠেছে।'

সত্যি সত্যি বাতি নিভিয়ে দিতেই বাইরের গাছপালা নদীনালা মাঠঘাট অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। এতক্ষণ কে যেন পর্দা দিয়ে সবকিছু ঢেকে রেখেছিল। জ্যোৎস্নার খানিকটা আলো জানালা গলিয়ে ভেতরে এসে পড়ল। সুপ্রিয়ার চুলে কপালে আলো এসে পড়েছে। ওকে অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে খুব নরম একজন মানুষ, যে

কিনা সামান্য আঘাতেই ভেঙে পড়বে, কিম্বা একটু উত্তাপেই গলে যাবে।

সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বললাম, 'তোমার ঘুম পেলে বলো, ওপরের বার্থে চলে যাব।'

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না। একটা সিগারেট ধরালাম। যতটা না সিগারেট খাওয়ার নেশায়, তার চেয়ে অনেক বড় নেশা হঠাৎ আমাকে পেয়ে বসল। মনে হতে লাগল, এই সেই বিরল মুহূর্ত যখন নিজের কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের রূপটা মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে যায়। সুপ্রিয়াকে দেখার ইচ্ছাটা এই মুহূর্তে আমার মধ্যে তীব্র এক অস্থিরতা নিয়ে এল।

দেশলাইয়ের আগুনের প্রয়োজন কিছু-ক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু দু' হাতের আড়ালে ওকে সযত্নে রক্ষা করতে লাগলাম। ও যেন বহু পরিচিত হারিয়ে-যাওয়া একজন মানুষকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। সুপ্রিয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর এই বসার ভঙ্গী, ট্রেনের দুরন্ত গতি, একটানা শব্দ, বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা গাছপালা, আঁকাবাঁকা নদী, বড় বড় ফাঁকা মাঠ, শির-শিরে রোঁয়া-কাঁপানো বাতাস—সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হতে লাগল, নির্জন কোন এক প্রান্তরে আমি যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। দাঁড়িয়ে রয়েছি কারও প্রতীক্ষায়। সে আসবে, সে আসবে।

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল, চারিদিকে ভয়াবহ অন্ধকার। অন্ধকারের বিরাট স্তূপগুলো যেন তীব্র গতিতে আমাকে পিষে ফেলতে ছুটে আসছে। দুই হাতে মুখ ঢাকলাম।

'কী হল?'

হাত সরিয়ে দেখলাম—দেখলাম, জ্যোৎস্নার আলো এখন আর সুপ্রিয়ার চুলে কিম্বা কপালেই সীমিত নেই, ওর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে, সুপ্রিয়া আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বললাম, 'জ্বলন্ত কাঠিটা হাতে লাগল।'

'দরকার হলে বাতি জ্বালতে পারো। সবাই অন্ধকার সহ্য করতে পারে না।' যদিও সুপ্রিয়া হাসেনি, মনে হল ভেতরে ভেতরে ও হাসল। ওর গোপন হাসি আমি চিনি। সুপ্রিয়া আমার দিকে সরে এসে বলল, 'দেখি কতটা পুড়ল।' বলে ও হাত বাড়াল।

হাত নাড়তে অস্বস্তি হচ্ছিল, কিন্তু না বাড়ানো আরও অস্বস্তিকর। ক্ষীণ আলোয় কিছুক্ষণ ধরে ও আমার হাত দেখার চেষ্টা করল। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আগুন যারা ঠিকমত সামলাতে পারে না, তাদের হাত পোড়ে।'

ওর কথার আগুন আমার মনে একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল। বললাম, 'হেঁয়ালী কথা আর যাকেই মানায়, তোমাকে মানায় না।'

ভালমানুষের মত মুখ করে সুপ্রিয়া বলল, 'কেন? আমি কি মানুষ না?'

'মানুষ শুধু না, অতি-মানুষ।'

'যাঃ, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছো।' সুপ্রিয়া শব্দ করে হেসে উঠল। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আবার বলল, 'বলো না, আমি কেন অতি-মানুষ?'

উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হল না। ইচ্ছে হল ওপরের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ ধরে আমাকে দেখল। ও যে আমাকে দেখছে ওর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম। ওর এই দৃষ্টিকে আমি ভয় করি। অথচ কেন যে এই ভয়, বুঝি না। এক সময় সুপ্রিয়া বলল, 'সব মেয়ে আগুন-জাতীয় নয়, কিন্তু কিছু কিছু মেয়ে রয়েছে, যাদের খুব সাবধানে—'

ওর কথা শেষ হবার আগেই চীৎকার করে উঠলাম, 'তোমার নোংরা কথাগুলো বন্ধ করলে আমি খুশী হবো।'

সুপ্রিয়া যেন দপ করে জ্বলে উঠল, 'সত্য কথা শুনতে হয়, অপ্রিয় হলেও শুনতে হয়।'

'আর যাই করি তোমার উপদেশ শুনতে আমি প্রস্তুত না। একটা বদ্ধ মাতালের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটিয়ে আর যাই করো, মানুষকে নীতিজ্ঞান দিতে এসো না।' একটা বিরাটাকার জহ্লাদ যেন আমার মধ্যে মাতামাতি শুরু করে দিল. উদ্যত খড়্গ নিয়ে ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠল।

'মাতাল নিয়ে দিন কাটাই আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। বারবার অন্যায় পথ ধরে তুমি জিতেছো। আজ তোমাকে সেই সুযোগ আমি দেব না। কিছুতেই না।' বলতে বলতে আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল, দারুণ উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপতে লাগল।

'এ কী হয়ে যাচ্ছো তুমি? আগে তো এ ধরনের কথা বলতে না।'

'বলতাম না, যেহেতু মূর্খ ছিলাম।'

'না, আগে তুমি সরল ছিলে, সুন্দর স্বাভাবিক ছিলে।'

মনের মত কথা না শুনলেই মানুষ বিরক্ত হয়। নিজের দোষ না দেখে অপরকে আঘাত করতে চায়।'

'তুমি কি অস্বীকার করতে পার, তুমি কী ভীষণ রকমের রূঢ় হয়ে গেছ। শুধু রূঢ়ই না, কী অসম্ভব রকমের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে তোমার মধ্যে।'

'মানুষ মাত্রেই পরিবর্তনশীল। শুধু মানুষ কেন, প্রত্যেকটি জীবজন্তু, এমনকি প্রকৃতিও পালটায়। শিশুগাছ একদিন বনস্পতি হয়।'

সুপ্রিয়া হেসে উঠল, 'তুমি খুব সুন্দর সুন্দর কথা শিখেছো।'

'বিদ্রূপ করার চেষ্টা করো না।' আমি ধমকে উঠলাম।

সুপ্রিয়া আরও জোরে হেসে উঠল, 'সত্যি সত্যি তোমাকে আসল পুরুষ মানুষ বলে মনে হচ্ছে।' ও আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে ভাল করে আমাকে দেখার চেষ্টা করল।

মুখ ঘুরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'অসহ্য!'

'কী অসহ্য; এই ট্রেনটা, ছোট্ট কামরাটা, না না-ঘুমিয়ে রাত কাটানোটা?'

'তুমি। শুধু তুমি, তুমি, তুমি।' বলতে বলতে আমার গলায় যেন কী একটা উঠে এল। মনে হল আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

'আমি অসহ্য? বেশ এই আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম। এবার সহ্য সহ্য মনে হচ্ছে তো।' সুপ্রিয়ার স্পর্ধা ক্রমশই বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। মানুষ যে এত নির্লজ্জ হতে পারে, ধারণার বাইরে ছিল। অথচ কত অন্যরকম ছিল ও। যখন প্রথমে অফিসে এল, একটা গাঢ় সবুজ রংয়ের শাড়ি পরতো। তখন ওর রং ফর্সা ছিল না। সবুজ রংয়ের শাড়িটায় ওকে একটুও মানাতো না। কিন্তু কত ভাল ছিল ও।

একটা স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। গভীর রাত। নির্জন স্টেশন। দু' একজন লোক ওঠানামা করল। হুইসিল বাজিয়ে আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। সুপ্রিয়া সেই যে মুখ ঘুরিয়ে বসেছে, আর এদিকে ফেরেনি।

বাইরে হালকা কুয়াশা ঝরছে। চাঁদের আলোর সঙ্গে কুয়াশার মাখামাখি দেখতে দেখতে এক সময় মনে হল, রাত প্রায় শেষ

হতে চলল, একটুও ঘুম হল না। শুধু আমার না, দু হাত দূরে যে বসে আছে, সেও একটু ঘুমোয় নি। বেশ শীত শীত করছে। আমার পরনে স্যুট রয়েছে। একটা সিল্কের শাড়ি পরে নিশ্চয়ই সুপ্রিয়ার শীত করছে। শীত করলে মানুষ যেভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে ও সেভাবে বসে রয়েছে। হাতড়ে হাতড়ে স্যুটকেশ থেকে একটা কম্বল বার করে ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিলাম। সুপ্রিয়া একটুও নড়ল না। যেমন বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। ওর এই বসে থাকাটা ক্রমশই অস্বস্তিকর বলে মনে হতে লাগল। চোখের সামনে কাউকে কষ্ট পেতে দেখলে খারাপ লাগে। সে যে-ই হোক না কেন। অথচ কম্বলটা যে খুলে গায়ে জড়িয়ে দেব সে প্রবৃত্তি আমার নেই। আজ সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! যত রাজ্যের ঝুটঝামেলা! রাগটা গিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ল অনিমেষের ওপর। ইচ্ছে করলে অনিমেষ একবার না একবার এসে খোঁজখবর নিতে পারতো। তা হলেই আবহাওয়া অনেক হালকা হয়ে যেত।

হঠাৎ বলে ফেললাম, 'অনিমেষটা অসম্ভব স্বার্থপর।' ভেবেছিলাম সুপ্রিয়া প্রতিবাদ করবে, কিন্তু উত্তর দিল না। অনিমেষের ওপর রাগটা ক্রমশই বাড়তে লাগল, 'শুধু স্বার্থপরই না, হৃদয়হীন আর অসম্ভব জেদী।'

'আদর্শবাদী মানুষ নিষ্ঠুর আর জেদী হতে পারে, কিন্তু নোংরা রাস্তায় পা বাড়ায় না।'

আপোষের যে ভাবটা মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল, চলে গেল। 'যে মানুষ ক্রূর হয়, তারাই আদর্শ আদর্শ করে চেঁচায়। ও একজন সরল নিষ্পাপ মেয়েকে ঘরে বন্দী করে রেখেছে, ওকে সংসারে সাধ আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করেছে। বিভাকে বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যেত। কেদারবাবু এর জন্যে কত কষ্ট পান, বিভা আর ওর মারও কষ্ট খুব কম না।'

'ওরা বুঝি তোমাকে বলেছে একথা?'

'না বললেও বুঝতে পারি।'

'অনেক কিছুই তুমি বোঝ যেটা সত্যি নয়।' সুপ্রিয়া আমার দিকে ঘুরে বসল।

'যা সত্যি, মানুষ ঠিকই বুঝতে পারে। সত্য কখনও চাপা থাকে না। শুধু যে বিভার কথা তা-ই না। লীলাবতীকে কি ও কম কষ্ট দিচ্ছে? মেয়েটা সত্যি সত্যি অনিমেষকে ভালবেসেছিল।'

'শুধু অনিমেষকে?'

'মানে?'

'তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে শিখেছো, এটুকু বোঝ না?'

'না বুঝি না, স্পষ্ট করে বল।'

'লীলাবতীর সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে তুমি মদ খেয়েছো, দিনের আলোয় বাইরে এসে এক সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছো। ছিঃ!' সুপ্রিয়া যেন থুথু ফেলল।

'বেশ করেছি। কিন্তু একটা কথা তোমার জানা নেই, সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল।'

'অন্যায় চিরদিনই অন্যায়। তিনজনে মিলে করলেও সেটা ন্যায় হয় না। শুধু তা-ই না, দিনের পর দিন লীলাবতীর সঙ্গে ওদের বাড়িতে বসে আড্ডা মেরেছো, ভগবান জানেন, কত বোতল মদ শেষ করেছো। আরও শুনবে? অফিসের গাড়িতে করে অফিসের পেট্রোলে তোমরা মাইলের পর মাইল ফূর্তি করে বেড়াও নি? অনিমেষের সঙ্গে লীলাবতীর সম্পর্ক জেনেও তুমি ভদ্রলোকের মত দূরে সরে যাওনি, বরং প্রচণ্ড লোভে ওর দিকে ছুটে গেছ। আর বলবো!' বলতে বলতে সুপ্রিয়া চুপ করে গেল।

কামরার ভেতরে এখন আর জ্যোৎস্নার আলো আসছে না। অন্ধকারে সুপ্রিয়ার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শুধু ছায়া ছায়া একটা মূর্তি আমার খুব কাছে বসে আছে। ওর বসার ভঙ্গীটা ভয়ানক অসহায় বলে মনে হতে লাগল। মনে হল হাত বাড়িয়ে ওকে স্পর্শ করি, ওর মনে সাহস ফিরিয়ে আনি। কিন্তু সে রকম কিছুই করলাম না। শুধু বললাম, 'এত সব খবর জোগাড় করেছো?'

সুপ্রিয়া যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু বলল, 'কিন্তু কেন এ রকম করবে? লীলাবতী ভাল মেয়ে না, একথা তুমি জানো না?'

বলতে বলতে অতর্কিতে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল সুপ্রিয়া, দুই হাতে আমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। সেই আকর্ষণ প্রতিহত করার শক্তি আমার মধ্যে ছিল না। সুপ্রিয়া আবার বলে উঠল, 'তুমি এত অবুঝ কেন, এত নিষ্ঠুর কেন। কিছুই কী বুঝতে পার না, বুঝতে চাও না। আমি তোমাকে দূরে সরে যেতে দেবো না, কিছুতেই না।' গভীর আবেগে সুপ্রিয়া ওর মুখ আমার মুখের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

দুরন্ত বেগে ট্রেন ছুটে চলেছে। একটানা সেই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর একটা শব্দও আমার কানে বাজছে। ক্রমাগত বাজছে। না, না না।

যদিও এই মুহূর্তে সুপ্রিয়ার ভেজা চোখের কালো তারা আমার চোখে পড়া সম্ভব ছিল না। আমি অনুভব করলাম, ওর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে একটা যন্ত্রণা বাইরে প্রকাশ পেতে চাইছে। ইচ্ছে হল বাতি জেলে ওকে দেখি, ওর এতদিনের পরিচিত রূপ পালটে গিয়ে নতুন যে রূপ নিয়েছে, তাকে দেখি। কিন্তু এই মুহূর্তে সে রকম কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। দুরন্ত এক বাধা এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। আমি বিষম অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

এক এক দুর্লভ মুহূর্তে মানুষের জীবনে কী বিস্ময়কর পরিবর্তনই না নিয়ে আসে! আমার সমস্ত চিন্তাধারা বিচিত্র এক পথ ধরে বইতে শুরু করল। এমন করে কোনদিন ভাবিনি, ভাবতে চাই নি।

মনে হতে লাগল সুপ্রিয়ার চোখের তারায় তারায় একটা রুদ্ধ কান্না আটকে আছে, যা এতদিন আমি দেখতে পাই নি। চাই নি। রূঢ় কথা আর অসঙ্গত আচরণের মধ্য দিয়ে এই অতিপরিচিত নারীটি আমাকে যে আঘাত করতে চেয়েছিল, সে আঘাত আমাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। বরং, কী বলবো, ভাবার মত ভাষা যেন ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি, বরং আমাকে নতুন এক জগতের দিকে ঠেলে দিয়েছে; যে জগৎ আলোয় ভরা, আনন্দে ভরপুর, যা কিনা এতদিন আমার দৃষ্টির বাইরে ছিল। আরও মনে হতে লাগল এই অপরিচিতা গলার কাছে রুদ্ধ একটা কান্না নিয়ে বরাবর হেসেছে, আনন্দে উল্লাসে চিৎকার করেছে নিজের ব্যথার ভাগ কাউকে দেয় নি, সঞ্চয়ী মানুষের মত গোপনে নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছে।

জানি না, হঠাৎ সুপ্রিয়া সম্বন্ধে এই ধরনের স্নেহ এবং ব্যথা আমার অন্তরে উদ্বেল হয়ে উঠল কেন। কিন্তু আর বার শুধু এক কথাই মনে হতে লাগল, এই সেই বহুপরিচিত মানুষটি, যে ক্ষণে ক্ষণে অপরিচয়ের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতেও আবার ভেসে উঠেছে।

একে আমি চিনতে পারি নি। চাই নি। সে আমারই অক্ষমতা।

— শেষ —

চালকসহ গরুরগাড়ী

প্রাচ্যের প্রাচীনতম শহর মহেঞ্জোদাড়ো / সুধাংশুকুমার গুপ্ত

মহেঞ্জোদাড়োর নাম আজ কারো কাছেই অপরিচিত নয়। অনেকেই জানেন, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে এখানে এক সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল যা সত্যই বিস্ময়কর। ১৯২২ সালে সিন্ধু মরুভূমিতে একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে পান জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ। তাতে উৎকীর্ণ ছিল এক অজানা লিপি। পাথরখানি পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারেন, ঐ প্রস্তরখণ্ড অতি প্রাচীন যুগের। তাঁরই নির্দেশে ওখানে কিছুকাল খননকার্য চলার পর আবিষ্কৃত হয় এক প্রাচীন শহর। তবে এই আবিষ্কারের পূর্ণ রূপ উদ্ঘাটিত করেন প্রখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যর মর্টিমার হুইলার ১৯৫০ সালে। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের ধারণা ছিল ভারতের আদিম অধিবাসীরা ছিল অর্ধসভ্য যাযাবর। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে সে ধারণার বিলুপ্তি ঘটল। মহেঞ্জোদাড়ো শহরটি যারা গড়েছিল তারা যে সভ্যতায় যথেষ্ট উন্নত ছিল এবিষয়ে কারো সংশয় রইল না।

শহরটির দুটি অংশ। একটা অংশ উঁচু, আরেকটা নীচু। উঁচু অংশটা আয়তক্ষেত্র এবং সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এটা হল দুর্গ। মাটি দিয়ে তৈরী ইঁটের তিরিশ ফুট উঁচু একটা কৃত্রিম মঞ্চের উপর নির্মিত। বন্যার হাত থেকে দুর্গটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই

লিপি ও প্রাণীর চিত্রসহ সীল
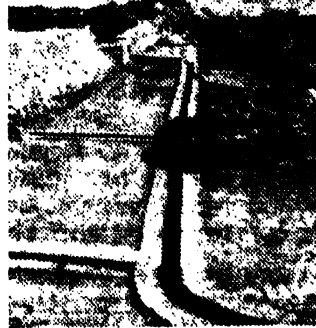
একটি বৃহৎ রাস্তায় পয়ঃপ্রণালী

যে এ ব্যবস্থা তা সহজেই অনুমান করা যায়, কারণ সে যুগে বন্যা হত প্রায়ই।

দুর্গের অভ্যন্তরে একটি বৃহৎ স্নানাগার আছে। স্নানাগারের জলাধার দৈর্ঘ্যে উনচল্লিশ ফুট আর প্রস্থে তেইশ ফুট। জলাধারের চারপাশে ইঁটের দেয়াল। ইঁটের গায়ে বিটুমেন-এর প্রলেপ। জলে নামার জন্য জলাধারের উভয় পাশেই সিঁড়ি। স্নানার্থীদের জন্য বেড়াবার জায়গা এবং ছোট ছোট কামরার ব্যবস্থা আছে স্নানাগারটিতে। জলাধারটিতে জল ভর্তি করা এবং জল বার করে দেওয়ার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা বিশিষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

দুর্গ এলাকার মধ্যে রয়েছে স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি বৃহদাকার হল, একটি মঠ বা শিক্ষালয় এবং সম্ভবত একটি মন্দির। মন্দিরটি একটি বৌদ্ধস্তূপের নীচে আজও সমাহিত। স্তূপটি পরবর্তীকালের, সম্ভবত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল একটি বিরাট শস্যভাণ্ডারের ধ্বংসাবশেষ যা ঐ দুর্গের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। একসময়ে শাসকদের সম্পদ সংরক্ষিত হত এখানে।

দুর্গ থেকে নীচের দিকে তাকালে আসল শহরটি (town proper) দেখা যায়। তেত্রিশ ফুট চওড়া একটা রাস্তা সোজা চলে

উদ্ধারকৃত অঞ্চলের দৃশ্য
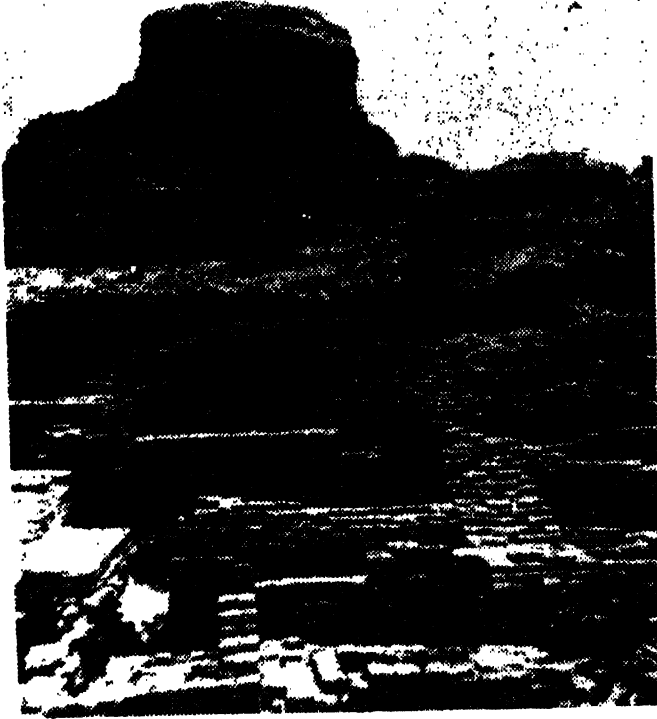
গিয়েছে এক মাইল পর্যন্ত। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান। এই রাস্তাকে সমকোণে খণ্ডিত করে আরো কয়েকটি রাস্তা শহরের একদিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে শহরটি কয়েকটি বড় বড় আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত।

শহরে যে বাড়িগুলি দেখা যায় তাদের নক্সা একই রকমের। মাঝখানে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তার চারপাশে বড় বড় ঘর। বাড়িগুলি তৈরী পোড়া ইট দিয়ে। কাদার প্রলেপের সাহায্যে ইঁটগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ। ইঁটগুলি বেশ বড় আকারের। বাড়িগুলি দ্বিতল ও প্রশস্ত।

গৃহনির্মাণে কোথাও পাথর ব্যবহার করা হয়নি। অলঙ্করণের কোনো প্রয়াসও কোথাও নেই। প্রতিটি বাড়িতেই কূপ ও স্নানাগার দেখা যায়। স্নানাগারে ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থাও আছে। পাকা ড্রেনের ভিতর দিয়ে ময়লা জল একটা সোক-পিট-এ (soak-pit) গিয়ে পড়ে। রাস্তায় যেসব ড্রেন রয়েছে সেগুলো নজরে পড়ে না—মাটির নীচে চাপা।

মহেঞ্জোদাড়োতে চাকাওয়ালা কয়েকটি শকটও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শকট টানতো সম্ভবতঃ গাধা। শকটগুলি শস্যের বোঝা বয়ে নিয়ে যেত শহরের বিরাট শস্যভাণ্ডারে।

কূপ ও স্নানাগারসমন্বিত ঐ দ্বিতল বাড়িগুলি ছাড়াও দুর্গের এলাকার বাইরে শ্রমিকদের আস্তানাও দেখা যায়। ছোট ছোট বাড়ি, ঘনসংবদ্ধ। এখানে সম্ভবত মজুরে ও মিস্ত্রিরা বাস করত। এই জায়গায় প্রচুর তামার যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্থানীয় লোকেদের প্রধান খাদ্য ছিল গম আর যব। বেশ কিছু গম ও যব পাওয়া গেছে খননকার্যের ফলে। এখানে তুলার চাষ ছিল, পশুর মাংস পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে, মাছ সংগৃহীত হত নিকটবর্তী নদী আর সমুদ্র থেকে। অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ছিল কচ্ছপ, পশম আর রকমারি মূল্যবান পাথর।

ওখানকার লোকেরা নিজেদের কাজকর্মের সুবিধার জন্য পশুর সাহায্য নিত। পশুদের মধ্যে তারা পুষত হাতি, বলদ আর সম্ভবত গাধা। ঘোড়া বা উটের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না।

তাদের অস্ত্র ছিল কুঠার, ছোরা, তীর-ধনুক আর ব্রোঞ্জ ও তামার বর্শা। লোহার বর্শার ব্যবহার তারা জানত না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেই সুপ্রাচীন যুগে শুধু ব্রোঞ্জ ও তামার অস্ত্র এবং পাথরে তৈরী কিছু অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হত।

যাজকেরা এবং পদস্থ রাজকর্মচারীরা সূক্ষ্ম কারুকার্য-করা লম্বা আঙরাখা পরতেন আর সাধারণ দরিদ্র লোকেরা পরত কৌপীন। মেয়েরা পরত ছোট ঘাগরা আর সেই ঘাগরাটি আটকে রাখত পাথর-বসানো সুদৃশ্য কটিবন্ধের সঙ্গে। কোমরের উপর থেকে দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত, গলায় ঝুলত হরেক রকমের রঙীন পাথরের মালা। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা পরত পাখার মত দেখতে এক রমণীয় শিরোভূষণ।

মহেঞ্জোদাড়োর বাসিন্দাদের শিল্প-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন আকারের পাথরের সীলগুলি থেকে। এই সীলগুলিতে জন্তুজানোয়ার এবং পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্র খোদাই করা। এগুলি কীভাবে ওরা ব্যবহার করত তা ঠিক জানা যায় না, তবে এগুলির পিছনদিকে ছিদ্র থাকায় অনুমান করা যেতে পারে, এগুলি শক্ত সুতো দিয়ে ওরা বাঁধত গলায় বা হাতে। এগুলির উপর যে লিপি খোদাই করা রয়েছে তার যদি পাঠোদ্ধার করা যেত, তবে এদের ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হত। সীলে চিত্রিত প্রতীকগুলি কল্পিত হয়েছে স্থানীয় জন্তুজানোয়ার ও গাছপালা আর কতকগুলি জ্যামিতিক চিত্রকে অবলম্বন করে।

কতকগুলি সীল যে ধর্মসংক্রান্ত সেটা সহজেই বোঝা যায়। একটি সীলে দেখা যায় একটি পিপ্পল বৃক্ষের সামনে একজন পূজার্থী নতজানু হয়ে রয়েছে। তার পাশে অদ্ভুত আকৃতির এক জন্তু এবং তার পিছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনকতক লোক।

সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব সিন্ধু উপত্যকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আমেদাবাদের নিকটবর্তী লোথালে কিছুকাল আগে যে খননকার্য শুরু করা হয় তার ফলে ওখানে মাঝারি আকারের একটি বন্দর শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর সঙ্গে সমুদ্রপথে এই শহরের যে বাণিজ্যিক যোগ ছিল সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

সংগৃহীত প্রমাণাদি থেকে অনুমান করা হয়, সিন্ধু উপত্যকার এই উন্নত সভ্যতার আকস্মিক বিলোপ ঘটে খৃস্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে। ঠিক এই সময়েই ভারতের পশ্চিমভাগে আর্যরা দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে। আর্যদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে দস্যু ও তাদের সুরক্ষিত নগরগুলির ধ্বংসের উল্লেখ দেখা যায়। মহেঞ্জোদাড়ো এবং সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত ঐ ধরনের অন্যান্য নগর যে আর্যদের আক্রমণে বিনষ্ট হয়েছিল এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ঋগ্বেদে যাদের দস্যু বলা হয়েছে তারা সম্ভবত এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। যখন ঐ প্রতীকী চিত্র সমন্বিত রহস্যময় লিপির পাঠোদ্ধার করা হবে তখন মহেঞ্জোদাড়ো ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে।

ছলনাময়ী

সাধনকুমার সেন

বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে একবার মুসৌরী বেড়াতে যাই। সেখানে একজন অল্পবয়সী অকৃতদার মহারাষ্ট্রীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ হয় তাসখেলার মাধ্যমে। ছোকরা ভাল ব্রিজ খেলে, ফলে আমার সঙ্গে বেশ জমে ওঠে, বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও। ওর বাবা কলকাতায় জীবন কাটান এবং ও কলকাতার কলেজে পড়াশুনো করে—শুধু ভালো বাংলা বলতে পারে তা নয়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বই ওর কণ্ঠস্থ। কলকাতার কফি হাউস সম্বন্ধে ও একেবারে উচ্ছ্বসিত—ওর ধারণা এরকম আড্ডার জায়গা আর হয় না—সেখানে সেক্স থেকে ফিলসফি, ইকনমিক্স, মার্কস, থিয়োসফিকাল ম্যাটার সব আলোচনা চলে এবং ছাত্ররা নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে যোগ দেয়,—কফি হাউসে না গেলে আড্ডা কাকে বলে বোঝা যায় না। গ্রীষ্মে মুসৌরীতে বিকেল ৮টা পর্যন্ত অন্ধকার হয় না—একদিন দুজনে বিকেলে বেড়াচ্ছি সন্ধ্যা এখনও হয়নি অর্থাৎ ৮টা বাজে। দূরে পাহাড়ের গায়ে ধোঁয়ার টান। ছোকরা বললে, 'দাদা, ডি এল রায় নিশ্চয়ই মুসৌরী এসেছিলেন।' জিজ্ঞাসা করলাম 'কি করে বুঝলে?' বললে, 'দেখছেন না দূরে কি রকম ধুঁয়ো—সেইজন্যই উনি লিখেছেন 'কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।' রসিক ছোকরা তার ওপর ওর আবার একটা বাতিক ছিল—মাঝে মাঝে গোরস্থানে গিয়ে কবরের ওপরে লেখা 'এপিট্যাপ' খুঁজে দেখা এবং তার ওপর গবেষণা করা। মুসৌরীর ক্যাসেল ব্যাক-এ গোরস্থান আছে—আমাকে নিয়ে যাবেই। আমার আবার ভূতের ভয় আছে— রাজি হইনি। ওকে কিন্তু সেখানে মাঝে মাঝে দেখা যায়। গোরস্থান রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচে এবং জায়গাটা ভয়ানক নির্জন, গা ছমছম করে। এ হেন গুণী লোকের কি নাজেহালই হল! আগেই বলেছি ছোকরা ভাল তাস খেলে কিন্তু অনেকদিনই চারজন আমাদের হয়ে ওঠে না—প্রায়ই আমাকে বলে, 'দাদা, চলুন কোন ক্লাবে মেম্বার হই—কিছুক্ষণ তাস না খেললে ছুটি কাটাব কি করে?' বললাম, 'তুমি খুঁজে বের করো কোন ক্লাবে ব্রিজ খেলা হয় এবং সেখানে আমরা ঢুকে পড়ব।' 'বহুত আচ্ছা' বলে

সেদিনকার মত ও চলে গেল। তারপর বেশ কয়েকদিন ওর পাত্তা নেই—ওর হোটেলে গিয়ে ওকে পাই না—হোটেলের বাসিন্দারা বলে যে কখনও কখনও আসে কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না। ওর হোটেল আমার বাসস্থান থেকে অনেকদূরে, সুতরাং দুবেলা যাওয়া সম্ভবপর নয়—চিঠি রেখে এলাম দেখা করবার জন্য তবুও সাড়া নেই। ভাবলাম, কোথায় কোন কবরের ওপর রচনা লিখছে কে জানে। বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলাম—হঠাৎ একদিন এসে হাজির—চেহারা বেশ খারাপ। বললাম, 'কি ব্যাপার, ডুব মেরেছ কেন? তোমার অভাবে যে রিক্ত বসে না, বেড়াতে পারি না। তোমার হয়েছে কি?' বললে, 'সে অনেক ব্যাপার, সব বলছি। আজ এখানেই খাব, বাড়ীর ভেতরে বলে দিন।' ওর মুখে যা শুনলাম তাই লিখছিঃ

একজন আবাসিককে ভজিয়ে নিয়ে ক্যাসেল ব্যাংক-এর গোরস্থানে যাই। ওকে এপিট্যাপ-এর মাহাত্ম্য বোঝাতে চেষ্টা করি কিন্তু ওর বোধহয় আপনার মত ভূতের ভয় আছে—দেখলাম ফিরে যাবার জন্য ছটফট করছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন আপনি এখানে এত আসেন?' উত্তরে বললাম, 'তাস খেলার লোক পেলে আসি না, কিন্তু সবদিন তো চারজন জোটে না, কাজেই বাধ্য হয়ে আসতে হয় সময় কাটাতে। ভালো ক্লাব বলতে পারেন যেখানে ব্রিজ খেলা হয়?' ভদ্রলোক একটি ক্লাবের নাম করে বললেন যে, ওখানে নাকি খুব তাসের আড্ডা বসে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়লেন। আমি একা একা গোরস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার খুশিমাফিক। ফিরে আসবার সময়ে অল্প দূরে একটি ছোকরাকে দেখলাম। চোঙ্গা প্যান্ট পরা। আগে নজরে পড়েনি। ছোকরাটি আমাকে বললে, 'আপনি কি ঐ ক্লাবে যাচ্ছেন নাকি?' বললাম, 'হ্যাঁ যাব কিন্তু আপনি ক্লাবের কথা শুনলেন কখন?' বললে, 'আমি ত ঐ যে কবর দেখছেন তার পাশেই বসেছিলাম। আপনার বন্ধু তো আপনাকে ক্লাবের নাম বললেন। ক্লাবে নীনা সারিনের সঙ্গে যদি দেখা হয় তো বলবেন রণধীরের সঙ্গে যেন এখানে এসে একদিন দেখা করে।' উত্তরে বললাম, 'দেখুন, প্রথমতঃ আমি তাকে চিনি না, দ্বিতীয়ত, কবে এবং কখন তাকে আসতে বলব?' 'কোন বার ও কি সময়ে আসতে হবে নীনা জানে—তাকে বললেই হবে', এই বলে ভদ্রলোক অন্য একটি কবরের দিকে চলে গেলেন। আমিও ওপরে উঠে এলাম—ভাবলাম ভদ্রলোকের বোধহয় মাথার বিকৃতি আছে নইলে নিজেই তো যেতে পারে। যাই হোক, কথাটা যেতে যেতে একদম ভুলে গেলাম।

ক্লাবে গিয়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কিন্তু সেখানে খুব কমই খেলা হয়—শুধু তিন তাস, ফিস ও রামি। মেয়ে পুরুষ প্রত্যেকের হাতে রঙ্গীন গ্লাস। আমরা নিজেরা একটু আধটু ড্রিংক না করি এমন এমন নয় কিন্তু আমাদের মেয়েদের এরকম নির্লজ্জভাবে গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলতে আমি কখনও দেখিনি। যেমনি মদের গ্লাস উঠছে তেমনি জুয়ো চলছে। বড় বড় ঘরের মেয়ে-বৌ-ঝিরা এসব ক্লাবের মেম্বার। স্বল্প তাদের বসন, সঙ্গে তাদের মিনি ব্লাউজ হাতে তাদের সফেন গ্লাস—তাসের মাঝে মাঝে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে। আমরা কোথায় যে তলিয়ে যাচ্ছি কেউ ভেবে দেখছেন না—পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা খারাপটাই নিচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আমাদের বাচ্চারা যখন দেখবে যে তাদের মায়েরা বোনেরা এরকম করে চলে তখন কি তাদের প্রতি থাকবে বাচ্চাদের কোন শ্রদ্ধা? তারাও বড় হলে তলিয়ে যাবে না? শুনতে পাই একজন বিদেশী নাকি আমাদের এরকম এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ভারতীয় নাচ কোনটি সব চাইতে ভাল। জবাবে মহিলা বলেছিলেন, 'টুইস্ট'—হা মোর দুর্ভাগা দেশ। দাদা, আপনি না দেখলে বুঝবেন না যে কত অধঃপতনে আমাদের উঁচুস্তরের লোকেরা চলে যাচ্ছে। সে যাই হোক, গিয়ে যখন পড়েছি তখন কিছুক্ষণ একজনের পাশে বসে খেলা ও ইতরামি দেখছিলাম ও উঠে আসবার সুযোগ খুঁজছিলাম। পাশে নজরে পড়ল একটা টেবিলে কিছু মাসিক পত্রিকা আছে। উঠে সেই টেবিলে গিয়ে বই দেখছি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা ভাল প্রবন্ধে মন বসে গেল। হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠে চমকে উঠলাম— দেখি একটি তন্বী সুন্দরী— বয়স বলা চলে আঠারো থেকে আঠাশের মধ্যে—সাজের বহরে ঠিক বয়স অনুমান করা কঠিন।

মিষ্টি করে আমাকে শুধালেন, 'আপনি একা বসে এখানে? তাসে বসবেন না?'

জবাবে বললাম, 'তিন তাস বা রামি-পোকার আমার চলে না, তাই বই পড়ছি।'

শ্রীমতী বললেন, 'আমারও ওসব বেশীক্ষণ ভাল লাগে না উঠে পড়ি।' বলেই বললেন, 'আপনার হাতে গ্লাস নেই কেন?'

'চলে না।'

'সে কি? টি টি নাকি?'

'না, টি টি বলতে যা বোঝায় তা নয় তবে কখনও-সখনও এক-আধটুকু খাই—বেশী খাই না।'

শুনেই মহিলা উঠে গিয়ে দু-গ্লাস হুইস্কি নিয়ে এসে আমাকে এক গ্লাস দিলেন। আমি তো মহা অপ্রস্তুত। আপত্তি করতে বললেন, 'হয়েছে কি? পরের বার আপনি দেবেন।' সর্বনাশ। যাই হোক, গ্লাস নিতেই হল, একেবারে গোঁড়া যখন নই। ড্রিংকের ফাঁকে ফাঁকে নানারকম গল্প হল—বেশীর ভাগই মুসৌরীর কথা এবং অন্যান্য বিষয়ে। মেয়েটি মিশনারী স্কুলে শিক্ষিতা অতএব বলতে কইতে বেশ পারে; তার ওপর কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর, 'গোল্ডেন ভয়েস' যাকে বলে আর কি। খুব খারাপ লাগছিল না। গ্লাস শেষ হওয়াতে সজ্জার খাতিরে দ্বিতীয়বার আমাকেই গ্লাস নিয়ে আসতে হল। মেয়েটি নিজের নিঃসঙ্গতা এমনভাবে বলতে শুরু করল যে মনে হল মেয়েটির যেন কি একটা অভাব আছে। আমাদের দুজনের আলাপের মধ্যে লক্ষ্য করলাম কয়েকজন মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওকে হাত নাড়ল। দ্বিতীয় গ্লাস শেষ হতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি বলল, 'সে কি? এখনই চললেন? সবে তো সন্ধে।' রাত তখন দশটা। জবাবে বললাম, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে আর থাকতে পারছি না।' মেয়েটি অত্যন্ত করুণভাবে চাইল; বলল, 'আর একটু বসুন।' কিন্তু আমি জোর করে নিজেকে নিয়ে এলাম— দু গ্লাসের পর যদি আবার খেতে হয় তবে মাতলামি শুরু করতে হবে। আসবার সময় অত্যন্ত কাতরভাবে বললে, 'কাল অতি অবশ্য আসবেন কথা দিন।' কথা দিতে হল নইলে রেহাই পেতাম না।

পরের দিন নিজেকে খুব সাবধান করলাম। মনকে বললাম যে ওসব কুহকিনী মেয়েদের পাল্লায় পড়া ঠিক নয়, তাছাড়া ক্লাবে ত যত বেলেল্লাপানা—সেখানে যাওয়ারও কোন মানে হয় না। তবুও সন্ধের দিকে মনটা আনচান করে উঠল। ভাবলাম দেখি না ঐ মেয়েগুলো কতদূর গড়াতে পারে, তাছাড়া কথা দিয়েছি যখন, তখন একবার যেতে দোষ কি? আমি কি এতই দুর্বল যে একদিন গেলেই আমি অধঃপাতে চলে যাব—ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কি মনের ভিতরে লড়াই চলছে—শেষে অসতেরই জয় হ'ল। যেতে একটু দেরী হ'ল। যেতেই মেয়েটি অভিমান করে বলে উঠলো, 'এত দেরী? আমি কখন থেকে আপনার পথের দিকে চেয়ে আছি।' আবার সেই গতকালের পুরোনো ব্যাপার—সেই দু গ্লাস মদপান, মেয়েটির নানারকম করুণ কাহিনী ও ঘটনা শোনা ইত্যাদি। পরের দিন যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ী আসতে পারলাম। কিরকম যেন নেশা হয়ে গেল। পরের দিন আবার গেলাম—এবার দুজনে বেড়াতে বের হলাম। মেয়েটি তার নাম বললে 'সুমতি'। আমার হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল—আমিও ওর বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইলাম। সুমতি বললে যে ও ক্লাবে ফিরে যাবে, ক্লাবে ওর দাদা আছে তার সঙ্গে বাড়ী যাবে। ফিরবার মুখে একটি ছেলে ওকে টোন করে চুপসে বললে, 'গুড লাক নেকস্ট টাইম।' এরপর আরো দুদিন ক্লাবে যাই—সবাই দেখি মুচকি হাসে ওকে আমাকে একসঙ্গে দেখে। কেমন বিরক্ত লাগল। ওকে বললাম যে আমি আর আসব না। সুমতি বললে, 'এই ক্লাবের মেম্বাররা সবাই এরকম। কাল বিকেল ৫টায় আমি তোমার হোটেলে যাব, তোমায় আসতে হবে না।'

পরদিন পাঁচটায় সুমতি এসে হাজির। চা খেয়ে বললাম, 'চল, বেড়িয়ে আসি।' ও সানন্দে রাজি। আমি ক্যামেল ব্যাক-এর রাস্তা ধরলাম। ওর একটু আপত্তি দেখলাম, বললে 'বড্ড নির্জন এই রাস্তাটা।' জবাবে বললাম, 'ভালই তো। এদিক দিয়ে তোমাদের ক্লাবের মেম্বাররা আসবে না—আমরাও গল্প চালাতে পারব।' ও যেন একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও এলো। হাঁটতে হাঁটতে কবরস্থানের ওপরের রাস্তায় এলাম—তখন হঠাৎ মনে হল যে এই গোরস্থানটা তো এক ছোকরা আমাকে ক্লাবের নীনা সারিনকে রণধীরের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। কথাটা যে বেমালুম ভুলেই গেছিলাম। সুমতিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, তোমাদের ক্লাবের নীনা সারিণকে চেনো?'

মুচকি হেসে বললে, 'কেন বলো তো?'

বললাম, 'কবরের এপিটাপ দেখা আমার বাতিক আছে। একদিন ঐ কবরখানায় ঢুকে এপিটাপ দেখছিলাম। ঐ যে কবরটা দেখছ, সেখানে আর এক ছোকরা ভদ্রলোক বোধহয় আমারই মত ছিটগ্রস্ত তিনিও দেখছিলেন। আমি তোমাদের ক্লাবে যাচ্ছি জেনে আমাকে বললেন যে, নীনা সারিণকে বলবেন যেন রণধীরের সঙ্গে এসে দেখা করে। আরো বললেন যে নীনা জানে কোন বার ও কোন সময়ে এখানে আসতে হবে। বোধহয় সেদিন সেই সময়ে উনি নীনার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

আমার কথা শোনামাত্র সুমতি থরথর করে কেঁপে উঠলো আর ওর মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখলাম। ও মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল—আমি তো থ—কিছুই বুঝতে পারছি না। 'কি হয়েছে সুমতি?' কোন জবাব নেই। ব্যাপার কি? আমার কিছু ভাববার কোন শক্তিই রইল না—কথার মাঝে হঠাৎ একি পরিবর্তন? কি করব ভাবছি হঠাৎ পিছন ফিরে সুমতি এক দৌড়। আমি হকচকিয়ে কিছু ঠিক করবার আগেই আমিও 'এই সুমতি,' সুমতি' বলে দৌড়ে ওকে ধরব বলে ছুটলাম। ও খানিকটা এগিয়ে গেছে আগে থেকেই—তাছাড়া বেশ দৌড়তে পারে। পাহাড়ে রাস্তা—একটা বাঁকের মুখে হঠাৎ আমাকে এক ছোকরা গোছের লোক ধরে ফেলল—বললাম, 'আমাকে ছাড়ুন। ঐ মেয়েটিকে ধরুন—ওর কি রকম অসুখ করেছে ও ছুটে পালাচ্ছে।' ছেলেটি মুচকি হেসে বলল, আপনার ছুটবার দরকার নেই, ও ঠিকই যাবে। এ জায়গাটা ওর পক্ষে ভাল নয়।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ওকে চেনেন নাকি?'

ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভালই চিনি। আপনিও আমাকে চেনেন—আমিই তো সেদিন সুমতিকে 'গুড লাক নেকস্ট টাইম' বলে শুভেচ্ছা জানালাম। ছেলেধরা ওর ব্যবসা। আজ আপনাকে কিরকমভাবে ফাঁদে ফেলেছে তাই দেখতে আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম।'

কথা বলতে বলতে সুমতি বহুদূরে চলে গেছে। সুতরাং তাকে ধরতে যাওয়া নিষ্ফল। ছোকরাটিকে অত্যন্ত ইতর মনে হল। আমাদের পিছু নিয়েছে ঈর্ষায়—মাঝ থেকে আমাকে আটকে দিল। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম।

ক্লাবে এসে সুমতির খোঁজ করলাম দরওয়ানের কাছে। সে বললে যে সুমতি ও তার দাদা বাড়ী চলে গেছে। যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কিন্তু মনটা কেমন বিষিয়ে গেল। কি হল সুমতির? হঠাৎ ভাবান্তর হল কেন? অমন করে দৌড়ে পালিয়ে গেল কেন? ইতর ছোকরাটি আমি ফাঁদে পড়ি কি না দেখতে পিছু নিল, অথচ সুমতি আমার সঙ্গ এড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল—সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেল।

পরের দিন আবার ক্লাবে গিয়ে সুমতির খোঁজ নিলাম। শুনলাম আসেনি; বাড়ীরও ঠিকানা জানি না যে খোঁজ নেব। তাছাড়া ঐ ঘটনা কাউকে বলতেও ইচ্ছা করছে না—কি যে ভিতরে আছে কে জানে? জানবার কৌতুহল অদম্য; পরের দিন আবার ক্লাবে গিয়ে দরওয়ানের কাছে সুমতির খবর নিতেই ভিতর থেকে ম্যানেজার বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুমতি তো পরশু আপনার সঙ্গে বেরিয়েছিল, তাই না?' উত্তরে 'হ্যাঁ' বললাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম সুমতি কোথায়। ম্যানেজার বললে, 'আপনি জানেন না সুমতি আত্মহত্যা করেছে?'

আঁতকে উঠে বললাম, 'সে কি? কবে?'

'কাল রাত্রে।'

'কারণ কি?'

'কেউ জানে না। কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।'

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে পরশু কতক্ষণ ছিল? আপনার কাছ থেকে এসেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে ও ওর দাদাকে নিয়ে বাড়ী চলে যায়। পরের দিন রাত্রে ঐ ঘটনা—আপনাকে কিছু বলেছে কি?'

'না তো, আমার সঙ্গে বেশ গল্প করতে করতেই যাচ্ছিল। ক্যামেল ব্যাক-এর দিকে কবরখানার কাছাকাছি এসে ওকে বললাম যে রণধীর নামে এক ভদ্রলোক এই ক্লাবের নীনা সারিনের খোঁজ করছিল। কথাটা শুনেই সুমতি ছুটে চলে গেল। আমি ওকে ধরতে চেষ্টা করি কিন্তু এক ভদ্রলোক আমাকে আটকে দিল।

ম্যানেজারের মুখ দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রণধীরকে আপনি কোথায় দেখলেন এবং কবে?' জবাবে ঘটনার উল্লেখ করলাম—দেখলাম ভদ্রলোক যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'নীনা কে? কোথায় থাকে?'

উনি বললেন, 'সুমতির ডাক নাম নীনা।'

এবার আমার চমকাবার পালা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'রণধীর ওর কে হয়?'

বললেন, 'রণধীর ওর লাভার। আজ এক বছর হল মারা গেছে আত্মহত্যা করে এবং ক্যামেল ব্যাক-এ ওকে কবর দেওয়া হয়। সুমতি বা নীনা ওকে অনেক নাচিয়েছে। ছেলেটা বড় ভালো ছিল কিন্তু নীনা তখন আরেকটিকে নিয়ে পড়েছে—এই ওর স্বভাব, শিখেছে ওর ভাবীজির কাছ থেকে। ছেলেটি আত্মহত্যা করে।'

আমি 'ত তাজ্জব! একি করে সম্ভব হয়? আমি তো নিজে দেখেছি চোঙ্গা প্যান্ট পরা ছেলেটি কবরখানায় আমাকে বলল নীনাকে খবর দিতে। সবই আশ্চর্য! এও কি সম্ভবপর। হোটেলে চলে এলাম ভারাক্রান্ত মনে—এক কুহকিনীর হাত থেকে রক্ষা পেলাম বলে ভগবানের চরণে প্রণাম জানালাম। আজ আপনার কাছে সব খুলে বলতে পেরে অনেক হাল্কা বোধ করছি। কেন যে জুটে গিয়েছিলাম জানি না। ও দুঃখের কথা বলাতে আমি গলে গিয়েছিলাম—আমি যে বড় দুঃখী দাদা!'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কিসের দুঃখ হে? লেখাপড়া জান, শিক্ষিত, সংসার করনি এখনও, বড় চাকুরী কর—তোমার কিসের দুঃখ?'

'শুনবেন দাদা? সে বড় করুণ', বলে আরম্ভ করতে যাচ্ছিল এমন সময়ে গিন্নী এসে হাজির, 'তোমরা খাবে না? সব তো জুড়িয়ে গেল। নিজের তো কোন খেয়ালই নেই—ছেলেটা যে অভুক্ত সেদিকেও হুঁশ আছে কি? ছোকরা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঠিক ঠিক বৌদি, চলুন বড্ড দেরী করে দিলাম আপনাদের।' খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওর হোটেল থেকে একজন লোক এসে জানাল পুলিশ এসেছে হোটেলে, ওকে দরকার—ওর একটা এজাহার নিতে হবে। বাধ্য হয়ে খাওয়া শেষ করেই ওকে যেতে হল।

পরের দিন হোটেলে গেলাম। গিয়ে শুনি ও চলে গেছে। সে কি? কোথায়? হোটেলওয়ালা সে হদিশ জানে না। জানবার দরকার নেই তাদের—টাকা তারা ঠিকই পেয়েছে—কিন্তু আমি যে তার ঠিকানা রাখিনি, এখন কি করি? খোঁজ নিয়ে দেখলাম সীজন-এর সময় হোটেলওয়ালারা ঠিকানা দিল কি না দিল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না—এক্ষেত্রেও দেখা গেল হোটেলে ঠিকানা লেখা নেই।

বাস সব শেষ। আর দেখাই হল না সেই ছেলেটির সঙ্গে। তার করুণ কাহিনী আর শোনা হ'ল না গিন্নীর তাগাদার ঠেলায়।

সরোজিনী নাইডু, চিত্তরঞ্জন দাস এবং বাসন্তী দেবী। পিছনে দাঁড়ানো কল্যাণী মুখার্জি

দেশপ্রেমিকার পদ্মবিভূষণ

'আমাকে কেন এই পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হল?' তিরানব্বই বছরের বৃদ্ধা দেশপ্রেমিকা বাসন্তীদেবী এ সম্মানের সংবাদ শুনে বলেছিলেন।

খবরটা শুনে দেশবাসী সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। যিনি এই সম্মানের অধিকারিণী তাঁকে একবার দেখে আসার ইচ্ছা জাগল মনে। জানতে ইচ্ছে হল সম্মানের অধিকারিণী কতটা খুশী হয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যেই চিত্তরঞ্জন দাশের নফরকুণ্ডু লেনের বাড়ীতে এক রবিবারের সকালে হাজির হয়েছিলাম।

ডাক্তারের কড়া নির্দেশে তিনি এখন বন্দিনী। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অত্যন্ত প্রয়োজন ভিন্ন তিনি হাঁটাচলা করেন না। বর্তমানে রেডিও তাঁর প্রধান সঙ্গী। শ্রীমতী স্বরূপা দাশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সামান্য কিছু জানতে পারলাম।

১৮৯৩ খৃঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে প্রত্যেকেই প্রায় আইনজীবী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ভুবনমোহন ও জ্যেঠতাত দুর্গামোহন দুজনেই খ্যাতনামা আইনজীবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। পিতা ভুবনমোহন প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু মোটেই তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। ঋণ করেও আশ্রিতকে পালন করতেন এবং শেষজীবনে এক বন্ধুকে ঋণভার মুক্ত করতে গিয়ে জামিনস্বরূপ নিজের ঘাড়ে দশ হাজার টাকার বোঝা নিয়েছিলেন। শেষে তাঁর আর্থিক অবস্থায় এত অবনতি ঘটেছিল যে তারই ফলস্বরূপ চিত্তরঞ্জন দাশকে আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তার এক বছর পরেই ১৮৯৭ খৃঃ ৩ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত নওগাঁও গ্রামের বিজনীর ম্যানেজার বরদা হালদার মহাশয়ের বড় মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। কলকাতাতেই তাঁদের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। যে প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্যের মধ্যে চিত্তরঞ্জন মানুষ হয়েছিলেন, এসময়ে সে-সবের অনেক কিছুই ছিল না। এই কষ্টকেও বাসন্তীদেবী সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অবশ্য এই কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ব্যারিস্টার হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশের খ্যাতি অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্তরের মধ্যে তাঁর যে শক্তি ও তেজ আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় সুপ্ত ছিল তা আদালতের মধ্যে প্রকাশিত হল।

বিবাহের পরে চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্য পেয়ে বাসন্তী দেবী স্বদেশপ্রেমে বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ হলেন এবং দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিপ্লবীদের বিরাট ভরসা আর সহায় ছিলেন তিনি। ১৮৯৮ খৃঃ তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবীর জন্ম হয়। পরবৎসরই একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। তারই বছর দু-এর মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দেবীর জন্ম। অল্পকালের মধ্যে তিনি সংসারের নানা দায়িত্বে জড়িয়ে পড়লেও দেশের পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে স্বামীর মতই সর্বক্ষণ দগ্ধ করতো।

বাসন্তী দেবী শুধু যে বিপ্লবীদের ভরসাস্থল ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজে ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯২১ খৃঃ বাংলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ তার নেতৃত্ব করেন। আই সি এস সুভাষচন্দ্র সরকারী কাজে যোগদান না করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গুরুর আদর্শে জীবনকে উৎসর্গ করেন। শুধু দেশবন্ধুই তাঁর গুরু ছিলেন না, দেশবন্ধুজায়াকে তিনি মাতৃজ্ঞানে পুজো করতেন। সে বছরই ৮ ডিসেম্বর আইন অমান্যের অভিযোগে এক-

মাত্র পত্র চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। পুত্রের এই গ্রেপ্তারে মাতা বাসন্তী দেবী বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। পরদিন ৭ ডিসেম্বর বড়বাজারে খদ্দর বিক্রী করতে গিয়ে নিজে গ্রেপ্তার হন। বাসন্তী দেবীর সেই গ্রেপ্তারে চতুর্দিকে এত আলোড়ন ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল যে অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আসলে বাসন্তী দেবী দেশবাসীর এত আপনার-জন ছিলেন যে তাঁর কোন রকম অবমাননা সহ্য করা কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এর দিন কয়েক বাদে ১০ ডিসেম্বর শনিবার বিকাল সাড়ে চারটায় দেশবন্ধু প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করেন। একই পরিবারের তিনজন প্রায় পর পর গ্রেপ্তার বরণ করলেও বাসন্তী দেবী নিজ কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছিলেন।

তাঁর এই কাজে সরোজিনী নাইডু ছিলেন আন্তরিক বন্ধু, কর্মী। দুজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের কথা সর্বজনবিদিত। এছাড়া তিনি লাবণ্যপ্রভা দত্ত, সুপ্রভা মুখার্জি, নেলী সেনগুপ্তা প্রমুখ দেশপ্রেমিকার সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বপনে, তাঁদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ও পরাধীনতার গ্লানি সম্বন্ধে সচেতন করতে তাঁর দান অনস্বীকার্য।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীমতী স্বরূপা দাশ বলছিলেন 'ঠাকুরদা যখন মারা গেলেন তখন আমার সবে দু মাস বয়েস। জ্ঞান হতেই দেখেছি সুভাষ কাকার নিত্য যাতায়াত ঠাকুরমার কাছে। বিধান কাকাও প্রায়ই আসতেন। আরও অনেকেই আসতেন। বড় হয়ে শুনেছি ঠাকুরদা মারা যাবার সময় ঠাকুরমাকে তাঁর আরাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে বলেছিলেন।'

বাসন্তী দেবী সুভাষ বোসকে বহুসময়ই পরিচালনা করেছিলেন। স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়ও নানারকম পরামর্শ নিতে আসতেন বাসন্তী দেবীর কাছে। সুভাষ বোস জেলে যাবার আগে অন্ততঃ নফরকুণ্ডু লেনের এ-বাড়ীতে দিনে অন্ততঃ একবার প্রবেশ করতেন। জেল থেকে বেরিয়েও এর কোন নড়চড় হয়নি। বাসন্তী দেবীকে একবার প্রণাম করে তবে তাঁর দৈনন্দিন কার্য শুরু হতো। শুধু স্বদেশ সেবার কাজের জন্য বাসন্তী দেবী সুভাষ বোসের আরাধ্যা ছিলেন না, বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সন্তান আর জননীর। সুভাষের দৈনন্দিন আহার্যের অনেকটাই জুটে যেত বাসন্তী দেবীর কাছে। সুভাষ মায়ের 'ভাতে ভাত' রান্নার প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে। বাসন্তী দেবীও পুত্রসম সুভাষকে পেয়ে বলতেন—সুভাষের মা বড় ভাল। ও যে আমার কাছে থাকে, তারজন্য ও'র একটুও রাগ নেই। আসলে মাতৃস্নেহে ভরপুর তিনি সুভাষকে পেয়ে নিজেও পরম তৃপ্তি পেতেন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বিপ্লবীরা অনেক সময়ই তাঁর পরিচালনাধীনে কার্য করতেন।

শ্রীমতী দাশকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম 'ভারত তো বহুদিন স্বাধীনতা পেয়েছে। বর্তমানের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কি বলেন?'

শ্রীমতী দাশ বললেন, 'এত বয়সে এসব প্রশ্ন বিশেষ আর কিছু করি না। তবু প্রায় বছর ছয়েক হবে পর দেশের ওপর খাদ্যদ্রব্যের জন্য ভারতকে এত নির্ভর করতে হতো বলে তিনি খাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। তার বদলে দুপুরে তিনি শশা, গাজর, বীট, সাগু প্রভৃতি খেয়েই থাকেন।'

স্বাধীনতার পরেও তিনি বারবার স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথাই বলেছেন। স্বাধীনতার চেয়ে বড় জিনিষ আত্মনির্ভরতা। শুধু নামে স্বাধীন হয়ে কোন লাভ নেই, স্বাধীন হতে হবে জীবনের প্রতি পদে পদে।

দেশবন্ধুর বিলাসিতা আর ত্যাগ মানুষের গল্পে গল্পে ফেরে। তিনি যেমন চূড়ান্ত ভোগী ছিলেন তেমনি ছিলেন ত্যাগী। তাঁর এই দান আর ত্যাগ নিঃসন্দেহে বাসন্তী দেবীর মত সহধর্মিণীর আন্তরিক সহযোগিতায় আরও সম্ভব হয়েছিল।

বৃদ্ধা দেশপ্রেমিকাকে দেখে মনে হচ্ছিল এ সম্মান আরও কিছুদিন আগে দিলে বোধহয় ভাল হতো। যদিও তিনি কাজ করেছিলেন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় নয়, তবু তাঁকে এ সম্মান দেওয়াতে দেশবাসী গৌরবান্বিত।

—অঞ্জলি চৌধুরী

যাত্রাগান ও মঞ্চনাট্য সহোদর নয়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যাত্রাগান বহু প্রাচীন—বাংলাদেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার মানুষের নাট্যরস পিপাসা নিবৃত্তির একমাত্র না হলেও প্রধান উপায় ছিল যাত্রাগান। বাংলার যাত্রাগান কত প্রাচীন তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে কোন না কোন আকারে যাত্রাগান বাংলাদেশে জনপ্রিয় ছিল। মহাকবি জয়দেব বিরচিত গীতগোবিন্দ এবং বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে পরবর্তী কালিয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রার প্রাচীন রূপ বলেই মনে করি। কালিয়দমন যাত্রার মতই উপরোক্ত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতিনাট্য দুটি রাধাকৃষ্ণ ও দূতীর সঙ্গীতাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। কালিয়দমন যাত্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোবিন্দ অধিকারী ও তাঁর শিষ্য (অথবা ভাবশিষ্য) নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করে বঙ্গদেশের হৃদয় জয় করেছিলেন। যাত্রাগানের অবস্থা পরবর্তী শতাব্দীতে কেমন ছিল তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য থেকে জানা যায় যে মহাপ্রভু দুবার কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন,—একবার চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে আর একবার শ্রীবাসের অঙ্গনে। এই অভিনয় কৃষ্ণযাত্রারই একটি রূপ বলে অনুমান হয়। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যাত্রাগান বহুল ব্যাপকতা এবং বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রাকার হিসাবে শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ দাস, প্রেমচাঁদ, বদন অধিকারী প্রভৃতি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-শাসন কায়েম হওয়ার পরে নাগরিক সভ্যতার বিলাস এবং ইংরাজ প্রভুদের কৃপা-লালিত হঠাৎ নবাবদের নিম্নগামী রুচির চাহিদা মেটাতে কবিগানের মত হয়ত বা কবিগানের প্রভাবে যাত্রায় প্রবেশ করলো অশ্লীলতা, ভাঁড়ামি, গ্রাম্যতা। কালিয়দমন যাত্রার অনুকরণে চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, নন্দ-বিদায় যাত্রা, নলদময়ন্তী যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতি কত রকমের যাত্রারই না আবির্ভাব হোল! এদের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত উন্নতরুচির মানুষ রুচিহীনতা দোষে দুষ্ট যাত্রাগানকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। অথচ বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা তৃপ্ত হবে কিসে? তখন কলকাতায় ইংরাজদের নাট্য-শালায় ইংরাজী নাটকের অভিনয় পুরোদমে চলেছে। প্লে হাউস, ক্যালকাটা থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার, সাঁ সুসি প্রভৃতি বিভিন্ন ইংরাজী নাট্যশালায় ইংরাজী নাটকের অভিনয় হতে থাকে। রুশ পর্যটক হেরাসিম লেবেডেফ দুখানি ইংরাজী নাটকের অনুবাদ করিয়ে অভিনয় করিয়ে বাংলা নাট্যাভিনয়ের শুভ সূত্রপাত করেছিলেন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাড়ীতে ১৮৩১ (মতান্তরে ১৮৩৫) খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় দিয়ে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়ের সূত্রপাত হোল। অতঃপর সখের নাট্যাভিনয় কলকাতায় জনপ্রিয় হতে থাকে; রাজা, জমিদার, ধনিকশ্রেণীর বাড়ীতে নাট্যশালা নির্মাণের ও নাটক অভিনয়ের ধুম পড়ে যায়। বেলগাছিয়া থিয়েটার, পাথুরেঘাটার থিয়েটার, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর নাট্য-শালা, শোভাবাজার নাট্যশালা প্রভৃতির অবদান বাংলা নাট্য আন্দোলনে নিতান্ত স্বল্প নয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যাভিনয়ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। নাটক রচনার বহুবিধ প্রয়াস অনেক পূর্ব থেকেই সূচিত হয়েছিল। এখন দিকে চললো বাংলা নাট্যপ্রয়াসের নব নব দিগন্তের দ্বারোদ্ঘাটন। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাবান নাট্যকারের অভ্যুদয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্য হোল সুসমৃদ্ধ।

বাংলা নাটকের আদিপর্বে সংস্কৃত ও ইংরেজী নাট্যরীতি অনুসরণ করার সচেতন প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রথম মৌলিক নাট্যপ্রয়াস জি. সি. গুপ্তের কীর্তিবিলাসেই সংস্কৃত ও ইংরাজী নাট্য-রীতির মিশ্রণ চোখে পড়ে। তারাচরণ শিকদার ভদ্রার্জুন নাটকে (১৮৫২) সংস্কৃত নাট্যরীতি পরিহারের সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও সংস্কৃত প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। মিশ্র নাট্যরীতি মধুসূদন পর্যন্ত চলেছিল। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকেই পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিলেন, সংস্কৃত রীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হোল। পাশ্চাত্য রীতির প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক কৃষ্ণকুমারী। মধুসূদনোত্তর বাংলা নাটক সংস্কৃত রীতিকে বর্জন করে পাশ্চাত্য নাট্য-কৌশলকেই স্বীকার করে নিয়েছে। সংস্কৃত নাট্যরীতির কৃত্রিম অনুসরণ বিলুপ্ত হোল বটে, কিন্তু এলো একটি নূতন প্রভাব—যাত্রাগানের প্রভাব। বাংলার প্রাণের যোগ যে যাত্রাগানে সেই যাত্রাগানের প্রভাব বাংলা নাটকে বিশেষত পৌরাণিক নাটকে স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় হোল। যাত্রা ও নাটক ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে বিচিত্র পথে; কিন্তু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারলো না। পুরাতন ধারার সঙ্গীতপ্রধান বা সঙ্গীতাত্মক যাত্রা ইংরাজী প্রভাবিত নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকার ঐকান্তিক প্রয়াসে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হোল। যাত্রাগান মঞ্চনাট্যের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে যুগোপযোগী পরিবর্তন লাভ করে পরিণত হোল গীতাভিনয় যাত্রায়।

এক সময়ে সখের যাত্রার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সখের যাত্রার মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু অশ্লীলতা-দোষাধিক্যহেতু বিদ্যাসুন্দর যাত্রা শিক্ষিত রুচির কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল। অথচ নাট্যাভিনয় ব্যয়বহুল। তাই যাত্রাগানের নবতর সংস্করণ 'গীতাভিনয়' নামে জনপ্রিয় হতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম মঞ্চাভি-নয়ের জন্য লিখিত নাটকগুলিতে অতিরিক্ত গান সংযুক্ত করে খোলা আসরে গীতাভি-নয়ের অনুষ্ঠান হতে থাকে। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম মৌলিক গীতাভিনয় 'শকুন্তলা' রচনা করেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর কালিদাস সান্যাল লেখেন 'নল দময়ন্তী' গীতাভিনয় এবং হরিমোহন কর্মকার লেখেন 'রত্নাবলী' গীতাভিনয় (১৮৬৫ খৃঃ)। ক্রমশ গীতাভিনয় যাত্রা জনপ্রিয় হতে থাকে এবং নানাস্থানে সখের যাত্রাদলে গীতাভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সখের দলের গণ্ডী ছাড়িয়ে গীতাভিনয় যাত্রা পেশাদার যাত্রাদলেও স্বীকৃতি লাভ করে। চন্দননগরের মদন-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের (মদন মাস্টারের) দল এবং বর্ধমান জেলার রায় দোগাছিয়ার হরিনারায়ণ রায়চৌধুরীর দল পেশাদার গীতাভিনয় যাত্রাদল হিসাবে বাংলাদেশের নানাস্থানে খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়।

গীতাভিনয় সঙ্গীতাত্মক যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যবর্তী একপ্রকার অনুষ্ঠান। এতে যেমন যাত্রাগানের মত প্রচুর সঙ্গীত ছিল, তেমনি ছিল থিয়েটারের মত গদ্য-সংলাপ ও অল্পবিস্তর নাট্যগুণান্বিত কাহিনী। এই সময়ে গীতাভিনয় যাত্রাজগতে আবির্ভূত হলেন স্বনামধন্য মতিলাল রায় (১৮৪৩—১৯০৯ খৃঃ)। মতিলাল রায় গীতাভিনয় যাত্রাকে এক মহত্তর মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি

গীতাভিনয় যাত্রা করে ভারতব্যাপী খ্যাতি ও বিপুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন। মতিলালের গীতাভিনয়ে যাত্রাগান, থিয়েটার, কথকতা এবং পাঁচালী একত্র সমন্বিত হয়ে লোকশিক্ষামূলক এক অভিনব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। মতি রায়ের যাত্রায় প্রচুর সংগীত ছিল;—কখনও জুড়ির কণ্ঠে বিচিত্র রাগরাগিণীসমন্বিত সংগীত,—কখনও 'ছোকরা' বা বালক দলের কণ্ঠে, কখনও বা একক গায়কের কণ্ঠে,—কখনও বা নৃত্যের সহযোগে সখীদলের কণ্ঠে। তাঁর যাত্রায় ছিল কথকতার ভঙ্গীতে দীর্ঘ পুরাণাশ্রিত শিক্ষামূলক বক্তৃতা, ছিল অপূর্ব নৃত্য ও বাদ্যকৌশল প্রদর্শন, আর ছিল থিয়েটারের অনুসরণে নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ। মতি রায়ের অনুসরণে যেমন বহু যাত্রাদলের আবির্ভাব হয়েছিল, তেমনি বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিও গীতাভিনয় রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অহিভূষণ ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন প্রমুখ খ্যাতিমান হয়েছিলেন গীতাভিনয় রচনা করে। কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে হারাধন রায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতিও যাত্রানাট্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যাত্রাগানকে ক্রমশ থিয়েটারের নাট্যগুণের দিকে অগ্রসর হতে হয়। ধনকৃষ্ণ সেন, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল, হারাধন রায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, নিতাই-চাঁদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির গীতাভিনয়ে যাত্রার বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা নাটকের গুণাবলী অধিকতর প্রকট হয়ে উঠেছে। এমন কি মতিলাল রায়ের দুই পুত্র ধর্মদাস রায় ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গীতাভিনয়েও মতি রায়ের গীতাভিনয় অপেক্ষা নাট্যগুণ অধিক। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভূপেন্দ্র-নারায়ণকে থিয়েটারের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হয়েছে মতি রায়ের যাত্রাকে।

থিয়েটারের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রেখে যাত্রার প্রাচীন রীতি বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তাই যাত্রা থিয়েটারের কাছে এগিয়ে এসেছে। প্রসিদ্ধ আছে, মথুরানাথ সাহা (মথুর সাহা নামে প্রসিদ্ধ) প্রথমে তাঁর যাত্রাদলকে থিয়েটারের অনুকরণে থিয়েট্রিক্যাল অপেরা পার্টিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর দলে থিয়েটার ঘেঁষা পালা লিখতেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। মথুর সাহাই তাঁর যাত্রাদল থেকে জুড়ি ও ছোকরার গান তুলে দিয়ে-ছিলেন। গানের সংখ্যা ক্রমশ যাত্রাগান থেকে কমে এলো। বিবেকের গান ও সখী দলের গান যাত্রাগানের সঙ্গে যাত্রানাট্যের ক্ষীণ সম্পর্কটুকু বজায় রেখেছিল। ইদানীংকালে গীতাভিনয় থেকে সেটুকুও নির্বাসিত হতে চলেছে। মতি রায়ের যাত্রা দশ বারো চোদ্দ ঘণ্টার অনুষ্ঠান ছিল। ক্রমে সময়ের পরিমাপ সংকুচিত হতে হতে আড়াই তিন ঘণ্টায় এসে ঠেকেছে। পৌরাণিক কাহিনীই যাত্রাগানের [illegible]

গানের আসরে। মথুর সাহার দলে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ঐতিহাসিক পালা অভিনীত হতে থাকে। ধীরে ধীরে পৌরাণিক কাহিনী নির্বাসিত হোল যাত্রা-জগৎ থেকে—স্থান করে নিল ঐতিহাসিক কাহিনী—ঐতিহাসিক কাহিনীর দিন অবসিত হওয়ায় সামাজিক কাহিনী নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে আধুনিক কালে। আধুনিক যাত্রা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে শিক্ষামূলক দীর্ঘ বক্তৃতা,—প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে পুরুষদের স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করার রীতির। সেকালের যাত্রা-গানের সঙ্গে একালের যাত্রার আত্মিক সংযোগ,—যাত্রার জগতে এসেছে নতুন হাওয়া। যাত্রায় আলোর কৌশল প্রদর্শন, টেপ্ রেকর্ডের ব্যবহার, ফ্ল্যাশ ব্যাক প্রভৃতি বৈচিত্র্য আনছে। আধুনিক যাত্রা খোলা আসরে থিয়েটার ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাত্রা যেমন থিয়েটারের প্রভাব অতিক্রম করতে না পেরে থিয়েটারের বিকল্প অনুষ্ঠানে পরিণত হোল, থিয়েটারও তেমনি যাত্রার প্রভাবকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা নিয়ে বিরাজ করতে পারলো না। বাংলা নাটকের প্রথম যুগেই নাট্যকারগণ যাত্রার প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। সংগীতের প্রাচুর্য, পৌরাণিক শিক্ষামূলক কাহিনী, ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সংলাপ, নাট্য-গুণের প্রতি ঔদাসীন্য, অতি নাটকীয় বা মেলোড্রামাটিক পরিণতি ছিল প্রাচীন গীতাভিনয় যাত্রার বৈশিষ্ট্য। যাত্রাগানের এই বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক নাট্যকারের নাটকেই কমবেশী পাওয়া যাবে। তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব কিছুটা কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয়। পদ্য-সংলাপের বাহুল্য, প্রচুর অনুপ্রাসের ব্যবহার, ছড়ায় উক্তি প্রত্যুক্তি যাত্রাগানের প্রভাবের কথাই স্মরণ করায়।

যাত্রাগানের গভীর প্রভাব মঞ্চনাট্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রথম লক্ষিত হয় মনো-মোহন বসুর নাট্যরচনায়। যাত্রাগানের সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের সংযোগ সহস্র বৎসরের। মধুসূদন ও দীনবন্ধু পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বিষয় যাত্রাগানকে অপাংক্তেয় করে রেখে যে নাট্যাভিনয় তা বাঙালীর অন্তর স্পর্শ করতে পারে না। তাই নাটকের ক্ষেত্রে মনো-মোহন যাত্রাকে দূরে সরিয়ে না রেখে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে যাত্রাগানকে সংমিশ্রিত করলেন। বাংলার লোকনাট্যের ঐতিহ্য-ধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তিনি মতিলাল রায়ের আদর্শে কথকতা, পাঁচালী ও যাত্রাগানের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলা নাটকে পৌরাণিক পরিবেশ এবং ভক্তিরস মনোমোহনই সর্বপ্রথম দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। মনোমোহন প্রথম নাটক রামাভিষেক (১৮৬৭)-এ সংস্কৃত নাটকের রীতি কিছুটা অনুসৃত হয়েছে আবার যাত্রা-গানের প্রভাবে সংগীতের বাহুল্যকেও তিনি

স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছে। মনো-মোহনের শেষ পৌরাণিক নাটক পার্থ পরাজয় (১৮৮১ খৃঃ) নাটক প্রকৃতপক্ষে গীতাভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। মনোমোহন যখন পার্থ পরাজয় নাটক রচনা করছিলেন, তখন যাত্রা জগতের সম্রাট মতিলাল রায়ের প্রভাব খ্যাতি চতুর্দিক ব্যাপ্ত করেছে। মনোমোহন সম্ভবতঃ মতি রায়ের যাত্রা দ্বারা অনু-প্রাণিত হয়ে পার্থ পরাজয় নাটকে গীতা-ভিনয়ের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। নাটকটিতে নেপথ্য সংগীত সহ মোট উন-ত্রিশটি সংগীত আছে। যাত্রাগানের সুলভ উচ্ছ্বাস, সংগীতের বাহুল্য, স্থূল হাস্যরস, করুণাশ্রিত ভক্তিরস পার্থপরাজয় নাটকটিকে যাত্রাগানের সমধর্মী করে তুলেছে।

রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব আরও গভীর। তাঁর নাটকগুলি মঞ্চনাট্য অপেক্ষা গীতাভিনয়েরই নিকটতর আত্মীয়। সংগীতের আধিক্য, কাব্যময়তা, দীর্ঘ সংলাপ, সংগীতে উক্তি প্রত্যুক্তি, ছড়া-কাটাকাটি, যাত্রানাট্যোচিত উচ্ছ্বাস-প্রবণতা, করুণাশ্রিত ভক্তিরসের একাধিপত্য, পৌরাণিক বিষয়ের অবতারণা প্রভৃতি গীতাভিনয় যাত্রার ধর্মগুলি সবই রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে সুলভ।

দময়ন্তীর মৃগয়া, হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বনগমন, ভরণীসেন বধ, দুর্বাশার পারণ, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি নাটকগুলিতে মতিলাল রায়ের গীতাভিনয়ের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যজগতে আবির্ভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাগবাজারের এমেচার থিয়েটারে মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের গীতাভিনয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শতাধিক নাটক রচনা করেছেন বিচিত্র ধরনের। তাঁর নাট্যসৃষ্টির মধ্যে গীতিনাট্য ও পৌরাণিক নাটকগুলিতে যাত্রাগানের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত। গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মতিলাল রায়। সে যুগের অনেক নাট্যকার এবং গীতাভিনয় রচয়িতাই মতিলালের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ হন নি। গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য ও পৌরাণিক নাটকে যাত্রাগানের স্পন্দন শোনা যায়। তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন মনোমোহন বসুর নাটক; রাজকৃষ্ণ রায়ও তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছেন, আবার মতিলাল রায়ের প্রভাবও তিনি বরণ করে নিয়েছেন। সহজ ভাবালুতা, ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস, পৌরাণিক কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুসৃতি, দ্বন্দ্বহীন চরিত্র, অলৌকিক ঘটনাবলীর অবতারণা, পাগল আধপাগল সাধক মহাপুরুষ চরিত্রের অবতারণা, কাহিনী বন্ধনের শিথিলতা প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সাধারণ ধর্ম। এগুলি গীতাভিনয় যাত্রারও বৈশিষ্ট্য। গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্যগুলিতে যাত্রাগানের গীতিধর্মিতা ও সঙ্গীতবাহুল্য আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর নিমাই সন্ন্যাস ও চৈতন্যলীলা গীতিনাট্যে মতিলাল রায়ের 'নিমাই সন্ন্যাস' গীতাভিনয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। গিরিশচন্দ্রের রাবণবধ নাটকের সঙ্গে মতিলাল রায়ের রাবণবধ গীতাভিনয়ের সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক জনাতেও প্রচুর গানের সমাবেশ, যাত্রাগানের জুড়ি ও বালকদলের গানের অনুরূপ সখীও বালকগণের গান, দেবদেবীর ভক্তিমূলক স্তোত্র, অনুপ্রাসাশ্রিত সমিল পদ্য সংলাপ, ছড়ায় উক্তি প্রত্যুক্তি, বিদূষকের ভক্তিরসাশ্রিত গূঢ়ার্থব্যঞ্জক সংলাপ, কৃষ্ণভক্তি প্রচারের অত্যধিক আগ্রহ, রাধাকৃষ্ণ ও হরপার্বতীর যুগলমূর্তি প্রদর্শন প্রভৃতি যাত্রাগানের গভীরতর প্রভাবের কথাই স্মরণ করায়। জনা নাটকে সম্মিলিত হয়েছে পাশ্চাত্য নাট্যকলা এবং বাংলা যাত্রাগান।

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের (১৮৫৭—১৯১২) পৌরাণিক ও গীতিনাট্যে যাত্রাগানের প্রভাব সুমুদ্রিত। গোপীগোষ্ঠ, নিত্যলীলা, প্রণয় কানন বা প্রভাস, নন্দোৎসব, নন্দবিদায়, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি গীতিপ্রধান পৌরাণিক নাটকগুলির প্রকৃতি গীতাভিনয় যাত্রার সমধর্মী।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান এবং সার্থক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পৌরাণিক নাটক এবং গীতিনাট্য রচনায় যাত্রাগানের প্রভাব অস্বীকার করতে সমর্থ হননি। তাঁর নাটকের প্রকৃতি যাত্রাগান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও আকৃতিগত দিক থেকে তিনি গীতাভিনয়ের বৈশিষ্ট্যকে কতকাংশে গ্রহণ করেছেন। যুগধর্ম অনুসারে বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াসহেতু পৌরাণিক নাটকের অন্যতম প্রধান ধর্ম অনাবিল ভক্তিরস দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে নি। পাষাণী, সীতা এবং ভীষ্ম—এই তিনখানি পৌরাণিক নাটকে এবং পারশ্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত সোরাব রুস্তম নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনেও যাত্রার আঙ্গিকগত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। উল্লিখিত নাটকত্রয়ে কাব্যগুণ অধিকতররূপে প্রকাশিত। পাষাণী নাটককে লেখক 'গীতি নাটিকা' আখ্যা দিয়েছেন। কাব্যসংলাপ, ছড়ায় সংলাপ, দীর্ঘ সংলাপ, ভীষ্ম নাটকে হরপার্বতীর অকারণে বারে বারে আবির্ভাব ভীষ্মের মৃত্যুকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি, পাষাণী নাটকের পরিণামে রামসীতার যুগলমূর্তির উপস্থাপনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি গীতাভিনয় যাত্রার প্রভাবরূপে গণ্য করা যায়। প্রহসনে সঙ্গীতগুলি হাস্যরসাত্মক হলেও সঙ্গীতগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের প্রাণ। সঙ্গীতাধিক্য এবং সঙ্গীতপ্রাণতা যাত্রাগানের সঙ্গে প্রহসনের নৈকট্য স্থাপিত করেছে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে যে অহৈতুকী ভক্তিবাদের প্রাবল্য আত্মপ্রকাশ করেছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাকে অনেকটা সংযত করেছেন। তিনি উনিশ শতকীয় বুদ্ধিবাদের দ্বারা চালিত হয়ে পৌরাণিক নাটকের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন। তথাপি তাঁর পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরস অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত। পাতিব্রত্য ধর্ম, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ, ক্ষাত্রিয়ের কর্তব্যকর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষামূলক আদর্শ প্রচারণা, কবিত্বময় দীর্ঘ-সংলাপ,—পৌরাণিক আদর্শবাদ প্রচার, সর্বোপরি কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারে সর্বশক্তি বিনিয়োগ ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে যাত্রাগানের প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। ভীষ্ম নাটকের ভীষ্ম ও নারায়ণ নাটকের কর্ণ চরিত্রের পরিণাম দুই মহাভক্তের কৃষ্ণকৃপা লাভের ইতিবৃত্তরূপে চিহ্নিত হওয়ায় মতিলাল রায়ের ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণবধ রাবণবধ প্রভৃতি গীতাভিনয়ের ভীষ্ম, কর্ণ, রাবণ প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা। মতি রায়ের ভীষ্মের মৃত্যু অভিশপ্ত দ্যুবসুর অভিশাপ মুক্তির সাধনার ফলশ্রুতি; ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটকেও অভিশাপ মুক্তির কাহিনীই প্রধান হয়েছে। মতিরায়ের কর্ণবধ গীতাভিনয়ে কর্ণের মহামুক্তি বর্ণিত হয়েছে—ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ নাটকে কর্ণের কৃষ্ণস্বরূপোপলব্ধি লাভের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। মতি রায়ের রাবণ ও রামারাধনায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সিদ্ধিলাভ করে কৃতার্থ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধে' রাবণের রামহস্তে নিহত হয়ে রাক্ষসজীবন থেকে মহামুক্তিলাভের বিবরণটিও তুলনীয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকের বাহ্যিক গঠন অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি গীতাভিনয় যাত্রার সন্নিকটবর্তী।

হরিনাথ মজুমদারের সাবিত্রী নাটক (১২৮১), মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়ের গঙ্গা-বিজয় (১৩০১) প্রভৃতি অপ্রধান নাট্যকারের নাটকে, আধুনিককালে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রাবণ ও সীতা নাটকে যাত্রার প্রভাব স্বাভাবিকভাবে আপতিত হয়েছে।

যাত্রার মূল বাঙালীর মনের এত গভীরে সঞ্চারিত যে বাংলার প্রায় সকল নাট্যকারই এর কমবেশী প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেন নি। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনায় নানাবিধ পরীক্ষা, নিরীক্ষা চালিয়েছেন, বহুবিধ বৈচিত্র্যও এনেছেন কিন্তু যাত্রাকে একেবারে অস্বীকার করেও চলতে পারেন নি। যাত্রাগানের আত্মাটিকে আমরা তাঁর নাটকে খুঁজে পাব না। কিন্তু নাটকের বাহ্যিক অবয়বে মাঝে মাঝে যাত্রার রীতি আমাদের স্মরণে আসবে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্যগুলিতে, ঋতুবিষয়ক নাটকে, ফাল্গুনী, অরূপরতন প্রভৃতি সাংকেতিক রূপক নাট্যে, এমন কি চিরকুমার সভার মত প্রহসনেও গীতিধর্মিতা এবং সঙ্গীতাধিক্য যাত্রাগানের চিরাচরিত রীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যাত্রাভিনয়ের মত খোলা জায়গায় মঞ্চসজ্জা ব্যতিরেকেই নাট্যাভিনয় রবীন্দ্রনাথের মন জয় করেছে। সেইজন্য তাঁর নাটকে মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার বিরলতা দৃষ্ট হয়। তিনি নিজেই বলেছেন তপতী নাটকের ভূমিকায়, 'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা...আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।'—আবার রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের দেশের যাত্রা এ জন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয় দর্শন ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই।' যাত্রাগান রবীন্দ্রনাথের নিকট এত প্রিয় ছিল বলেই তিনি নাট্য রচনায় ভিন্নমার্গের পথিক হয়েও যাত্রার ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

যাত্রা ও নাটক পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে শতবর্ষের অধিক কাল,—উভয়ে একাত্ম না হয়েও উভয়ে উভয়ের আত্মীয় হয়ে উঠেছে।

রূপায়ণে/পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী ও অপর্ণা সেন।

ফটো : অমৃত

নাট্যকার আসিফ করিমভয়

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সু-উন্নত নাসা, স্বাস্থ্যবান, একহারা গড়ন, উচ্চতায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি—খোজা সম্প্রদায়ভুক্ত আসিফ করিমভয়কে দেখলেই আলাপ করতে ইচ্ছে করে। ভদ্রলোকের জন্ম ১৯২৮এর ... আগস্ট। বোম্বাই সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়া শেষ করে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ... হন। নাটকের প্রতি আসক্তি ... থেকেই জন্মায় এবং প্রথম নাটক "... মজা" লেখেন ১৯৫৮ সালে। ... যে শুরু, এর পরে আজ পর্যন্ত আসিফ করিমভয় লিখেছেন ২৪খানি নাটক এবং প্রতিটিই ইংরেজীতে। না, নাটক ... অন্য কিছু তিনি লেখেননি, লেখার ... ভাবতেই পারেন না। যেমন ভাবতে পারেন না, নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনা বা পরিচালনা করার কথা। ... অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করবার কথাও ... চিন্তার বাইরে। উনি স্পষ্টই ... ন, নাটক লেখা যদি ক্রিয়েটিভ আর্ট ... সৃষ্টিধর্মী শিল্প হয়, তাহলে নাট্য-প্রযোজনাও আর এক ধরনের ক্রিয়েটিভ আর্ট ... দুটোই এক জিনিস নয়। "আমি ... টা নিয়েই ব্যস্ত থাকি, ওরই মধ্যে ... আছি। ইট ইজ এ প্যাশন উইথ মি— ... লেখার তাগিদ আমার অন্তর থেকে।"

নিউইয়র্কে মিঃ করিমভয়ের চারখানি ... অভিনীত হয়েছে। "..." নাটকটি ... একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত ১৯৬৫ সালে। পরে নাটকটি ... তে ১৯৬৮ সালে মঞ্চস্থ হয়ে প্রায় সপ্তাহ ধরে চলে। ১৯৬৯ সালে ... র ভারতভুক্তির ... ও হিংস্রতাপূর্ণ এই নাটকটি সম্পর্কে ইংরাজ ঔপন্যাসিক গ্রেহাম গ্রীণ বলেন, 'একটি অত্যন্ত বিশেষত্বপূর্ণ রচনা।......গোয়াতে থাকবার সময়ে আমার মনে যে মিশ্র অনুভূতির উদয় হয়েছিল, নাটকটি পাঠ করবার সময়ে সে সমস্তই মনে আবার নতুন করে জেগে উঠেছিল।' দিল্লীর জাতীয় অভিনয়বিদ্যাকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

১৯৬৫তেই অভিনীত এঁর দ্বিতীয় নাটক হচ্ছে "মনসুন" (মৌশুমী বাতাস)। একটি মৌশুমী বাতাসপূর্ণ দ্বীপে একটি ছেলে কেমন করে বড়ো হয়ে উঠল, এই কাহিনীর মাধ্যমে একটি খৃষ্টীয় ধর্মযাজকের জীবনী বর্ণিত হয়েছে এই নাটকটিতে। তৃতীয় নাটক 'ডাম্ব ড্যান্সার' অভিনীত হয় অফ-ব্রডওয়ের বিখ্যাত "কাফেলা মামা"তে। নাটকখানি প্রতিষ্ঠানের প্রথম খ্যাতি এনে দেয়। নিউইয়র্কে অভিনীত চতুর্থ নাটকের নাম হচ্ছে 'হাংরী ওয়ান্স'; বাংলা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকটি রচিত হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে রচিত "ডোলড্রামাস" নাটকটির অভিনয় বোম্বাই শহরে নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রচুর হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। আজকের কোলাহলপূর্ণ বিশৃংখল জগতে যুবকরা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন বোধ করছে, এই হচ্ছে নাটকটির বক্তব্য। ইলাস্ট্রেটেড উইকলির খুসবন্ত সিং এই নাটকটি সম্বন্ধে রায় দিয়ে বলেছেন, "কল্পনার রাসকে প্রচুর আলগা দিয়েও করিমভয়ের বক্তব্যের মধ্যে দুর্নীতির নামগন্ধ খুঁজে পেলুম না।" পরে দিল্লী ও কলকাতাতে নাটকখানি অভিনীত হয়।

আসিফ করিমভয় চা-বাগানে ইংরেজ মালিকানা থেকে 'বাদামী সাহেব' মালিকানাতে পরিবর্তনের প্রসঙ্গে যে "দার্জিলিং টী" নামে কমেডি লিখেছেন, তা হাল্কা হাসির আবরণে জীবনের তিক্ত-মাধুর্য ও প্রাসঙ্গিক করুণ রসকে পরিবেশন করেছে। পাকিস্তানী হানাদারদের নির্যাতনের হাত এড়িয়ে যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় খুঁজেছিল এই সেদিন, তাদের সংঘাতময় জীবনকে ঘিরে তিনি "রেফিউজী" নামে একটি প্রাণবন্ত অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ একাঙ্কিকা রচনা করেছেন।

পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশের জন্মলাভের ঘটনাকে অবলম্বন করে মিঃ করিমভয় রচনা করেছেন "সোনার বাংলা"। এতে তিনি কোনও নীতি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা না করে সমস্ত ব্যাপারটার মানবিক দিকটাই উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস পেয়েছেন, যার ফলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি নাড়া পায়।

১৯৭০-এ কলকাতায় নকসালপন্থীদের আন্দোলনের ফলে যে-বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেছেন "ইনকিলাব"। বইখানি তথ্যপূর্ণ, আবেগময় ও নাটকীয়। আধা-বাস্তব কিছুটা ডকুমেন্টারী ধরনের এই রচনার মাধ্যমে নাট্যকার করিমভয় নির্লিপ্তভাবে, সততার সঙ্গে এই আন্দোলনের কারণ নির্ণয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন, যার দ্বারা আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারি। এই 'ইনকিলাব' নাটকটিই ধনঞ্জয় বৈরাগী দ্বারা বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে গেল ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে কলা-মন্দিরে অভিনীত হয়ে গেল থিয়েটার সেন্টার দ্বারা।

আন্তর্জাতিকে খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার আসিফ করিমভয় ব্যক্তিগত জীবনে একটি সদাগরী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল

নাট্যকার আসিফ করিমভয়

ভারতনাট্যমের এক বিশেষ ভংগীমায় মার্কিন নর্তকী জর্জিয়া কুশমান

অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৫১ সালে বিবাহিত তিন সন্তানের জনক মিঃ করিমভয় কিন্তু সমসাময়িক জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ঘটনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাঁর নাটকের উপাদান সংগ্রহের জন্যে। নাট্যরসজারিত তাঁর শিল্পী মন অত্যন্ত জীবনন্ত।

চিত্র-সমালোচনা

শবরী

ইউনাইটেড আর্টিস্ট **অ্যান্ড টেকনিসিয়ান্স** নিবেদিত ও **রঙলোক** পিকচার্স **পরিবেশিত "শবরী"** ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার, সংলাপ-রচয়িতা, চিত্রশিল্পী ও পরিচালক হচ্ছেন একাধারে অশোককুমার দাস। শুনেছি, শ্রীদাস কিছুদিন পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা সম্পর্কে তিনি কোথা থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে-সংবাদ আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। তবে তাঁর রচিত 'শবরী' কাহিনীটি কাহিনী রচনা বিষয়ে তাঁর একান্ত অনভিজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। 'পলাতক' ও 'কবি'—এই দুটি গল্পকে মিশ্রিত করে শবরী কাহিনীটিকে গড়ে তোলবার চেষ্টায় শ্রীদাস মূল কাহিনী দুটির আকর্ষণীয় ভাগ ত্যাগ করে শুধু খোলসই ব্যবহার করেছেন। কিভাবে পরিস্থিতি রচনা করতে হয়, চরিত্র-চিত্রণ কাকে বলে, সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতার প্রতি কিরকম দৃষ্টি রাখতে হয়, এসম্পর্কে শ্রীদাসের জ্ঞান সামান্যই।

'শবরী'র নায়ক গোবিন্দকে প্রথমে দেখা যায় এক যাত্রাদলের গায়কশিল্পী রূপে। সহসা সে তার এক সহশিল্পী গোপালের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে যাত্রার অধিকারীর কাছ থেকে আদায় করা সব টাকাটাই তাকে দিয়ে দেয়। এরপরেই সে তার গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বিধবার একমাত্র কন্যা

অচেনা অতিথি/স্বরূপ দত্ত, সমরেন দাস, রবি ঘোষ এবং মেনকা

চতুরঙ্গ ছবির মহরতে প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী। এবং সুচিত্রা সেন

কল্যাণী যখন বরপক্ষের চাহিদা মেটাতে না পারার দরুন লগ্নভ্রষ্ট হতে চলেছে, তখন ঘটনাচক্রে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। ব্যস, কোথায় গেল তার যাত্রাদলের চাকরী, কোথায় তার কর্মপ্রচেষ্টা! সঙ্গে সঙ্গে এল জমিদারবাড়ীতে এক ঝুমুরের দল এবং গান শুনতে গিয়ে গোবিন্দকেই নিতে হল গায়কের ভূমিকা; কারণ, দলের গায়ক অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত। গোবিন্দর গান শুনে দলের প্রধানা নর্তকী শবরী শুধু মোহিতই নয়, গোবিন্দের প্রতি প্রেম-গদগদ। এরপরে দেখা যায়, ঝুমুর দল অসুস্থা শবরীকে জমিদার বাড়ীতে ফেলে রেখেই অন্য গ্রামে রওনা দিল। কাহিনীকার একবারও ভেবে দেখলেন না, দলের নায়িকাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভবপর কিনা। তাছাড়া ঝুমুর দল যে সাধারণত কর্ত্রীপ্রধান, একথাটাও তিনি উপেক্ষা করেছেন। স্বভাবতই গোবিন্দ শবরীকে দেখতে আসে। কিন্তু শবরীর কথাবার্তা শুনে বা তার চেহারা দেখে কে বলবে যে, সে অসুস্থ। বরং কারুর যদি মনে হয়, সে ছিনালী করছে, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। গোবিন্দকে একটি ফুটো কড়িও উপার্জন করতে দেখা যায় না। সে কাহিনীর প্রথমদিকে এক জায়গায় বলে দিয়েছে, তার যা ধনসম্পত্তি আছে, দুপুরুষ বসে খেলেও চলে যাবে। অতএব দেখা যায়, সে গ্রাম্য দুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যে অনাথ-আশ্রম খোলবার বন্দোবস্ত করছে এবং শবরীকে সে সেই অনাথআশ্রমের ভার দিতে চায়। এদিকে শবরীর সঙ্গে গোবিন্দর মেলামেশাকে উপলক্ষ্য করে কল্যাণীর কানে এমন সব কথা আসতে থাকে, যা শোনবার পরে কল্যাণী আত্মহত্যায় উদ্যত হয়। অবশ্য কাহিনীকার যথাসময়েই গোবিন্দকে এনে ফেলে শেষরক্ষা করেছেন এবং অকস্মাৎ শুভবুদ্ধির উদয় ঘটিয়ে শবরীকে স্থানান্তরে রওনা করে দিয়েছেন। গোবিন্দ ও কল্যাণীর আহ্বানকে উপেক্ষা করেই সে তাদের চোখের সামনে চলে গেছে গোযানের আরোহী হয়ে। এইখানেই ছবির সমাপ্তি।

না, কাহিনী রচনা—বিশেষ করে চলচ্চিত্রের উপযোগী কাহিনী রচনা আদৌ সহজ কাজ নয়। তাই যদি হোতো, তাহলে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, মৃণাল সেন প্রভৃতি খ্যাতিমান পরিচালক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেরাই ওই সহজ কাজটুকু সারতে পারতেন। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনাতেও শ্রীদাস বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। অনেক সময়ে দুর্বল কাহিনী সত্ত্বেও চিত্রনাট্যরচনার মুন্সিয়ানা চলচ্চিত্রকে সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। মাত্র গেল সপ্তাহে মিত্রা সিনেমায় যাঁদের নিউ থিয়েটার্সের পুরাতন ছবি 'জীবনমরণ' (১৯৩৯ সালের ছবি) দেখবার সুযোগ হয়েছে, তাঁরাই আমাদের কথার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন।

ছবিতে অনুপকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় শ্যাম লাহা প্রভৃতি শক্তিশালী শিল্পী নিজেদের গুণপনার বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন নি সুযোগ সুবিধার অভাবের দরুন। নায়িকা শবরীর ভূমিকায় বিদ্যা রাও একেবারেই ব্যর্থ। অপরাপর ভূমিকা অনুল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সম্পর্কেও প্রশংসা করা যায় না। একাধারে পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব বহন করতে গিয়ে শ্রীদাস কোনোটিই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন নি। চিত্রগ্রহণে এমন দৈন্য বাংলা ছবিতে বহুদিন দেখিনি। "এর থেকে দূরে থাকা ছিল ভালো..."এ কি হোল এ কি হোল" গানখানি যখন গোবিন্দ গাইছে, তখন যে-ভাবে বিভিন্ন শট গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে সময়টা দিন না রাত্রি, এ-প্রশ্নের সমাধান আমরা করতে পারি নি। শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনাও কিছুমাত্র কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। ছবিতে কম করে সাতখানি গান আছে—দুখানি লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একখানি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। বর্তমানের হিন্দী ছবির গানের মতো গানগুলি দীর্ঘায়ত, অর্থহীন, ভাবলেশশূন্য এবং ভাষার দিক দিয়ে দুর্বল। নচিকেতা ঘোষের সুর ভাষা ও ভাবের দৌর্বল্যকে ঢাকতে পারে নি। যাত্রার একটি বিশেষ ঢং আছে, যেমন আছে ঝুমুর গানের—নচিকেতা ঘোষ কিন্তু সুরযোজনায় এ দুটিকেই উপেক্ষা করেছেন।

'শবরী'র মতো দুর্বল ছবি যাতে নির্মিত হতে না পায়, এবিষয়ে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের এবং মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাবধান দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নইলে এই ধরনের ছবির প্রযোজক ও পরিচালকরাই পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পজগতের দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দেবেন এবং তখন আর কোনোও আলিবাবার 'চিচিং ফাঁক" মন্ত্র সেই বন্ধ দরজা খুলতে কার্যকরী হবে না।

—নান্দীকর

স্টুডিও সংবাদ

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ"

বাংলা চিত্রামোদীদের কাছে প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলীর নাম সুবিদিত। রূপশ্রী পিকচার্স নাম দিয়ে তিনি সম্প্রতি একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন, যার প্রথম চিত্রার্ঘ্য হবে রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ"। গেল ৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার দিন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে চলচ্চিত্র-জগতের বহুজনের উপস্থিতিতে ছবিটির শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হল। ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রীর নির্দেশমতো মহরৎ শটে ক্যামেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুইচ টিপে ক্যামেরাকে চালু করেন জগন্বরেণ্য শ্রীশ্রীনিরঞ্জানন্দ ভারতী ও ক্ল্যাপস্টিক দেন পরিচালক তপন সিংহ। শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমরা বলি: অস্ম্যারম্ভ শুভায় ভবতু।

পরীক্ষামূলক ছবি "জনালা"

আজকের তরুণ-তরুণীরা আগেকার যুগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে—প্রচলিত শিক্ষাধারাকে তারা অশিক্ষা মনে করে; প্রাচীন বা বৃদ্ধেরা আজ আর তাঁদের প্রণম্য নয় বিপরীতভাবে তাঁদের উপহাসের পাত্র ও শত্রু; নীতির কথা তাদের কাছে মূল্যহীন, রীতি ও রুচি তাঁদের স্বতন্ত্র। বর্তমান এই যুগযন্ত্রণাকে বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 'জনালা' ছবির প্রযোজক-পরিচালক দিলীপ চৌধুরী সম্পূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষামূলক এই ছবিতে প্রতিটি শিল্পীই নতুন। অলইন্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা শাখার ঘোষক তরুণ চক্রবর্তী হচ্ছেন নায়ক এবং তাঁর বিপরীতে আছেন রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকের চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন লেখক-প্রযোজক-পরিচালক দিলীপ চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় দেখা দেবেন পান্না হোসেন, ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী, দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রগ্রহণে আছেন ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিমান সিংহ। সুরযোজনা করছেন অজয় দাশ।

"নদীর ওপার"-এর শুভ মহরৎ

২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "নদীর ওপার" অবলম্বনে গড়ে ওঠা ছবির শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হয়। ছবির পরিচালনা ও সুরযোজনায় আছেন যথাক্রমে বিমল ভৌমিক ও সলিল চৌধুরী। প্রযোজনায় অনিতা ফিল্মস এবং পরিবেশনায় স্বপ্ন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

বিবিধ সংবাদ

"কন্যাদান"-এর শুভমুক্তি

ফণী মজুমদার পরিচালিত মৈথিলী ছবি "কন্যাদান"-এর শুভমুক্তি আগতপ্রায়। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় আছেন লতা সিংহ ও গোপাল এবং অন্যান্য ভূমিকায় চাঁদ উসমানী, পদ্মা দেবী, তরুণ বসু, চুনটুন ও দুলারী। মান্না দের গাওয়া ভোজপুরী গানগুলি ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

রবীন্দ্রসদনে উদয়শংকর সম্বর্ধনা

'আগে জানতাম নৃত্য একটা আমোদের বস্তু। কিন্তু শঙ্করকে দেখে আমার মনে হয়েছে নৃত্যও আমাদের ধর্মও হয়ে উঠতে পারে'—গত ১৮ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত উদয়শঙ্কর সম্বর্ধনা সভায় ভাষণে বললেন উৎসবের সভানেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী। 'মাতৃভূমির জন্য বিশ্বের বরমাল্য নিয়ে আসার জন্য শঙ্করকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন স্বয়ং কবিগুরু।

আজ মনে পড়ে শঙ্করের যৌবনকালে তাঁর শঙ্কর-পার্বতীর নৃত্য দেখে মনে হয়েছিলো স্বর্গ থেকে স্বয়ং মহাদেব ও

র্বতী যদি মর্ত্যে এসে নাচতেন, সে-নাচ য় এমনই হোতো। নৃত্যের এর চেয়ে রূপ ভাবা যায় না। তারপর দেখে-লাম তাঁর 'কল্পনা'—সে এক ভিন্ন তের, ভিন্ন সুরের ছবি। আর সেদিন খলাম তাঁর পরিণত শিল্পচিন্তার ফসল ক্যালেস্কোপ'। এখানে 'কল্পনা'র ক্ল্যাসি-ল নৃত্যকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে টুইস্ট ও এনেছেন। কল্পনার কি বিপুল চ্যার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনকেও নি অস্বীকার করেননি। এত বড় জীবন-রসিক বলেই শঙ্কর কালজয়ী মহা-শিল্পী।

সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও শঙ্করের দীর্ঘজীবন ও অটুট কর্ম-তু প্রার্থনা করি।'

শ্রীমতী তপতী রায় মানপত্র পাঠ ন। আর সে-মানপত্র শিল্পীর হাতে ন দেন শ্রীমতী কানন দেবী।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর ভাষণে বলেন অতীতের এক গৌরবের অধ্যায় যুগে বাংলা-সাহিত্যের আকাশ সূর্যের উদ্ভাসিত করে বিরাজিত ছিলেন ন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নাট্যজগৎ সম্বন্ধ ছিলেন নটগুরু শিশির ভাদুড়ী। এই ই দেখেছিলাম তরুণ উদয়শঙ্কর, রবরণ, বিষ্ণুদাস সিরালী ও কিশোর শঙ্করকে। সেই উদয়শঙ্করই বিশ্বের প্রে ভারতীয় নৃত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ন। আজ তাঁর সম্বর্ধনা-সভা তাঁর য়ু প্রার্থনার দিন।'

শ্রীমতী তপতী রায় জানান, রবীন্দ্র-নের অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাজের মধ্যে প্রধান অঙ্গ গুণী সম্বর্ধনা। এর নাট্যজগতের কৃতী শিল্পীদের আমরা ত করেছি। আজ উদয়শঙ্করকে জানিয়ে আমরা ধন্য হলাম। ভবিষ্যতে না শিল্পীদেরও সমাদর করবার পরি-না আছে।'

বিচিত্রানুষ্ঠানে উদ্বোধন সংগীত গেয়ে ন রবিতীর্থের শিল্পিবৃন্দ।

কলের অনুরোধে উদয়শঙ্কর বলেন, করতে আমি জানি না। আজ আমার ইচ্ছে করছে। ডাক্তারের অনুমতি নাচই দেখাতাম। তা ত হোলো না। আজ এই উৎসবের উদ্যোক্তা, রা এবং যাঁরা এসেছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানাই। নৃত্যে আজ র অভাব নেই কিন্তু এঁরা এক য় এসে থেমে না গিয়ে এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যান—এই আমার ।'

বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আজ'—কথাকলি ও ভারতনাট্যম প্রদর্শিত নৃত্যে শান্তি বসু ও া দাস। মণিপুরী, ভারতনাট্যম, ও নৃত্যে ছিলেন যথাক্রমে দেবযানী অলকানন্দা রায় ও মায়া চট্টো-পাধ্যায়। উদয়শঙ্কর ব্যালে সেন্টার থেকে তবলাতরঙ্গ বাজিয়ে শোনান শ্রীকমলেশ মিত্র।

পরিশেষে উদয়শঙ্করের নৃত্যপরিচালনা এবং রবিশঙ্করের সংগীত-পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি'। রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্করের ভাবকল্পনার অভিনব সম্মেলন এই নৃত্যনাট্য শিল্প-জগতের বিশেষ সম্পদ।

গীত-ভারতী : সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ ও হৃদ্য পরিবেশে গীত-ভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সারস্বত সম্মেলন সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। প্রারম্ভে শরৎচন্দ্র বড়াল (সভাপতি), সুভাষচন্দ্র বসু (প্রধান-অতিথি), গৌরীশঙ্কর রায় (উদ্বোধক) ও হরিদাস ঘোষ, জে, পি (বিশিষ্ট অতিথি) সম্মেলনের তাৎপর্য ও সার্থকতা কামনা করে তাদের বক্তব্য রাখেন গুণীজন সমুপস্থিতিতে। পরে বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ-গ্রহণ করেন—তরুণিমা ঘোষ, ভাস্বতী বসু, রমা ভট্টাচার্য, শুভ্রা চন্দ্র, শিবানী ভট্টাচার্য, রুমা চক্রবর্তী, নমিতা বড়াল, খোকন মজুমদার, সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক সরকার, ননীভূষণ চক্রবর্তী, নিরঞ্জন দত্ত, সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিলাল সরকার (অধ্যক্ষ)।

উত্তর ভারত সফরে সি এল টি-র পাপেট : আগামী ২ মার্চ থেকে দিল্লী ফাইন আর্ট হলে সুরেশ দত্ত পরিচালিত সি এল টির পাপেট দলটি পরপর আটটি অনুষ্ঠান করবেন। ২০ জনের এই দলটি দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ শহরে প্রায় তিন সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠান করবেন। শ্রীদত্তের পুতুল নাচের সঙ্গে আলোকসম্পাতে থাক-বেন তাপস সেন। সি এল টির এই দলটি এবার উপহার দেবেন আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ। শ্রীদত্ত রুশ দেশের পাপেট 'সার গাই আব্রাৎসভের' যোগ্য ছাত্র।

বালিতে অনুষ্ঠান বিচিত্রা : বিখ্যাত শিল্পীদের অনুপস্থিতেও যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আকর্ষণীয় সংগীতানুষ্ঠান হতে পারে, তা গত ৮ ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যায় বালি ডিংসাই পাড়ার অনুষ্ঠান বিচিত্রায় উপস্থিত না থাকলে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। মূলে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন রথীন বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান পরি-চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রীতিশ ধর।

এই দিনের এই অনুষ্ঠান সুরু হয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর মাধ্যমে। প্রখ্যাত যাদু-কর এ সি সরকার তাঁর কয়েকটি আকর্ষ-ণীয় খেলার মাধ্যমে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর

মন জয় করে নেন। এরপর সংগীতানুষ্ঠানে একক শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রত্না ঘোষের। তাঁর মিষ্টি গলায় রবীন্দ্রসংগীত এবং পল্লীগীতি যেন এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। দেবযানী চক্রবর্তীর রবীন্দ্রসংগীত ও অতুল প্রসাদের গান সুন্দর। মানস কুমারের কণ্ঠে আধুনিক গানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। মাণিক ব্যানার্জির আধুনিক গানে সপ্রশংস ধন্যবাদ। শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। টুটুন চৌধুরীর কণ্ঠে আধুনিক গান শুনে শ্রোতৃমান আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গৌতম সেনগুপ্তের আধুনিক গান প্রশংসার দাবি রাখে। নিমাই দাস ও সম্প্রদায়ের অর্কেস্ট্রা একটি বিশেষ আকর্ষণীয় এবং শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে। সবশেষে পিণ্টু দত্তের কৌতুক-গীতি সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে আনন্দ রসে ভরিয়ে তোলে এবং শ্রোতৃমণ্ডলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগিতা করেন দীপেশ দত্ত, নিমু মুখার্জি, লাল বাগ, শ্যামসুন্দর নট্ট ও গৌর সাহা।

তরুণ সংসদের অনুষ্ঠান : কুমারটুলীতে তরুণ সংসদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সারস্বত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুনীলচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর ভাষণে তরুণ সংসদের বিভিন্ন লোকহিতকর এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতির ভাষণে হরিদাস ঘোষ (জে পি) কুমারটুলী তথা উত্তর কলকাতার তরুণ এবং যুবকদের দেশের শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেদন জানান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনিবাস বসু, সোমনাথ মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, আভা দেবী। হরিদাস ঘোষ রচিত এবং নির্দেশিত ভাঙছি নিয়ম ভাঙছি নাটিকাটি তরুণ সংসদের সদস্যগণ অভিনয় করেন। আবৃত্তি করেন শ্যামল রায়চৌধুরী। যাদুকর মদন কুণ্ডু যাদু প্রদর্শন করেন। সংগীত পরিবেশন করেন সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণিমা ঘোষ, শিখা মণ্ডল।

আর বি আর স্পোর্টিং ক্লাবের সারস্বত উৎসব : কাশীপুরে আর বি আর স্পোর্টিং ক্লাবের দুই সপ্তাহব্যাপী সারস্বত উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা প্রযোজিত 'মহুয়া' নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে সুরু হয়। অনুষ্ঠানের কুশীলবদের সুচারু প্রস্থাপন কাশীপুরবাসীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে অনুষ্ঠানসূচীর দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হয় প্রখ্যাত তরুণ যাদুকর মদন কুণ্ডুর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী। শ্রীকুণ্ডুর মুন্সীয়ানা উপস্থিত সহস্রাধিক দর্শকবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ : অত্যন্ত সুসংবাদ যে, নমাস ধরে প্রতীক্ষা করবার পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন বাইশজন সভ্য নিয়ে। পর্ষদের সভাপতি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

পরিবর্তন / রঞ্জিত এবং হেনা

নিশিকন্যা / সৌমিত্র ও মি

যৌবনভরা বসন্ত / উত্তমকুমার ও কালীপদ চক্রবর্তী

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং সঙ্ঘের মধ্যে আছেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, অশোককুমার সরকার, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ-এর উদ্যোগে তথ্যচিত্র প্রদর্শনী

২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে ফেডারেশান অব ফিল্ম সোসাইটিজ-এর উদ্যোগে 'ড্রিফটার্স', সঙ অব সিলোন, লণ্ডন ক্যান টেক ইট, ওয়ার্ল্ড অব প্লেন্টিং, ডায়েরী ফর টিমোথি ও ড্রিমল্যাণ্ড, মোমা ডোণ্ট অ্যালাউ ও টার্মিনাস-তথ্যচিত্রগুলি প্রদর্শিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র প্রযোজনাশিল্পের নিম্ন আয়বিশিষ্ট কলাকুশলী ও কর্মীদের উদ্যোগ

প্রচুর অশ্রুপাত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনাশিল্পের সঙ্গে জড়িত নিম্ন আয়বিশিষ্ট কলাকুশলী ও কর্মীদের জন্যে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি আজ পর্যন্ত। তাই এ'রা নিজেরাই মিলিত হয়ে নিজেদের মাথা গোঁজবার জন্যে একটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি গঠনের জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। ফিল্ম প্রোডাকসান অ্যাসিস্ট্যাণ্টস্ গিল্ড-এর পরমর্শদাতা সমিতি কানন দেবীর নেতৃত্বে এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন এবং কয়েকটি সাহায্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে এই কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন। প্রথম সাহায্য প্রদর্শনী হিসেবে এ'রা একটি আকর্ষণীয় গানের আসর বসাচ্ছেন ১১ মার্চ তারিখে সাড়ে আটটায় মহাজাতি সদনে। সর্বশ্রী মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পী এই আসরে অংশগ্রহণ করবেন বিনা পারিশ্রমিকে। আমরা এই শুভকর উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

মহিলা শিল্পীমহলের সাহায্যার্থ "পরিবর্তন" ছবির প্রাক্‌মুক্তি সাহায্য রজনী

পশ্চিমবঙ্গের রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহিলা শিল্পীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান মহিলা শিল্পীমহল দুস্থ শিল্পীদের আশ্রয় দেবার জন্যে গরচা রোডে একটি আশ্রয়নিবাস প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। ১৯৬২ থেকে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ অনুভব করেছেন, পীড়িত শিল্পীদের যথারীতি চিকিৎসার জন্যে কোনো ভালো হাসপাতালে অন্তত দুটি শয্যা, একটি যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি শয্যা এবং ক্যান্সার হাসপাতালে একটি শয্যা মহিলা শিল্পীদের জন্যে সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। এ'দের এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন প্রযোজক-পরিচালক দয়াশঙ্কর সুলতানিয়া। তিনি তাঁর রঙীন হিন্দী ছবি "পরিবর্তন"-এর একটি প্রাক্‌মুক্তি সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করেছেন ২২ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় সোসাইটি সিনেমায়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই কল্যাণকর বিশেষ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করছেন।

শৌভিক-এর চিত্রাঙ্গদা : সুখ্যাত নাট্য সাংস্কৃতিক সংস্থা শৌভিক নিবেদিত গুরুজনের কবিগুরুর 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যানুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় হাজরা পার্কে। প্রায় সাত হাজার দর্শকের সামনে ও বিশিষ্ট অতিথির আগমনে আট দিনব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন দক্ষিণ কলিকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি।

সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন বেতার-শিল্পী মঞ্জুরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ দাস। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বেতার-শিল্পী রবি বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য ও গ্রন্থনায় ছিলেন বাসন্তী বিশ্বাস, সুকুমার মুখোপাধ্যায় ও নৃত্যশিল্পী শঙ্কর ভট্টাচার্য।

মঞ্চাভিনয়

'আনর্তম' প্রযোজিত 'ধলেশ্বরী' : ধলেশ্বরী নদী ঋতুতে ঋতুতে রং বদলায়, কখনো সে জলতরঙ্গে উদ্দাম, উদ্বেলিত; যেন সে চলচঞ্চল তারুণ্যের প্রাণবন্ত প্রতীক। কখনো সে শান্ত-ধীর সমাহিত। এই ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে যে জনপদ, তার মানুষের মধ্যে যে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, বিরহ বিচ্ছেদের কলতান আর নিঃসীম যন্ত্রণা, তার পটভূমিকায় প্রবোধচন্দ্র অধিকারীর 'ধলেশ্বরী' উপন্যাস প্রাণ পেয়েছে। এই নতুন স্বাদের প্রাণবন্ত উপন্যাসটিকে নাট্যরূপে আরো সাবলীল করে তুললেন সেদিন 'আনর্তমে'র শিল্পীরা। উপন্যাসটিকে নাটকের সংলাপে সাজিয়েছেন শ্রীনিমাই শূর। মূল উপন্যাসের গতি ও ছন্দ অটুট থেকেছে নাট্যরূপে। বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে শ্রীশূরের সচেতন শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রযোজনাটি মোটামুটিভাবে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রয়োগ-পরিকল্পনারও দায়িত্ব নেন শ্রীনিমাই শূর। নাটকটির গতি দুর্বার রাখার জন্য তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। তবুও মনে হয় প্রথম পর্বের গতি হয়তো কিছুটা শ্লথ ও মন্থর হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে গতিছন্দ সম্পূর্ণভাবে উত্তাল হয়ে উঠতে এতটুকু বাধা পায়নি। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটিতে যখন 'নয়ন'রূপী ছন্দা চ্যাটার্জি ধলেশ্বরীর কল্লোলমুখর তরঙ্গে আত্মবিসর্জন দিল—বিশেষতঃ সেই মুহূর্তটির অভিনয়ে সংগীতে, আবহসংগীতে, ধ্বনিপ্রক্ষেপণে, আলোকসম্পাতের অপরূপ বিস্তারে এক অসাধারণ মুহূর্তের ব্যঞ্জনা এসেছিল।

অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গেলে সর্বাগ্রে নাম উল্লেখ করতে হয় 'নয়ন'রূপী ছন্দা চ্যাটার্জির। কুমারী গ্রামবালার সজীব লাজ-লাজুক অভিব্যক্তিকে তিনি আপন দক্ষতায় মঞ্চের আলোয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। বুলা সেনগুপ্তার 'মানদা' একটি শয়তান বৃদ্ধার ছবিকে সবার চোখের সামনে মূর্ত করে তুলতে পেরেছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন মনু মুখার্জি (শিবচরণ), সন্তোন মতিলাল (পেত্র), অভয় সিনহা (বিপিন), আরতি দাস (সরমা), রঞ্জন ব্যানার্জি (রাসু), বেচু ঘোষ (বৈকুণ্ঠ), শীলক চাকলানবিশ (কোকিলা), গীতিকা মিত্র (বাতাসী), তপন চক্রবর্তী (অনন্ত), প্রবাল দাস (পরাণ), ফণী সরকার (কালাচাঁদ), মধু শী (ঢোলকদার), তুহিন ঘোষাল, বুলু দাস, বিভূতি জানা, হারাধন ঘোষাল, রবিউল হক, নিমাই শূর, মধুমিতা দাস, মায়া দে, কৃষ্ণা দাস, মন্দিরা ভাদুড়ী।

আলোকসম্পাত, মঞ্চ, সঙ্গীত ও আবহ-সঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে তাপস সেন, সুরেশ দত্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, শৈলেশ রায়। সংগীত উপদেষ্টা ছিলেন হেমাংগ বিশ্বাস।

জি-আই-সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'নিকটেই ফাঁদ' : অগ্নিমিত্রের 'নিকটেই ফাঁদ' নাটকটির সংঘাত গড়ে উঠেছে অলোক নামে একটি ছাঁটাই যুবকের মর্মান্তিক জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে। নাটকটির

মধ্যে যে প্রচণ্ড গতিবেগ আছে, তা সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে জি-আই-সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের নিটোল প্রযোজনার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। নাট্যনির্দেশনার আন্তরিক শিল্পচেতনার পরিচয় রাখতে পেরেছেন অর্ধেন্দু রায়। অভিনয়ে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। অলোকের ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেন হরিপদ মন্ডল। দিলীপ রায়ের 'রসিক' ও শর্মিষ্ঠা ঘোষের 'সোমা' হয়েছে দুটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রন। অন্যান্য ভূমিকায় যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেন অর্ধেন্দু রায়, তপন মিত্র, মনিকা ঘোষ, গোপাল দাস, অসীম রায়, রামজিৎ মিশ্র, রবীন্দ্র রায়, মনোরঞ্জন মন্ডল, প্রণব মতিলাল, সুকুমার ঘটক, কেশব সামন্ত, অজিত নিয়োগী। নেপথ্য সঙ্গীতে শ্রীপ্রভাতভূষণ ও আলোকসম্পাতে বিমল দাস মুন্সিয়ানার পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

শৈল্পিকের চারটি নাটক : বাংলার সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি কলামন্দিরে চারটি সুন্দর নাটক পরিবেশন করেন কয়েকদিন আগে 'শৈল্পিকে'র শিল্পীরা। নাটকের বক্তব্য ও প্রয়োগ পরিকল্পনা দুইই দর্শককে করেছে অভিভূত। প্রথম দিনে অভিনীত দুটি নাটক হল সুধাংশু দাশগুপ্তের 'আমি এ চাইনি' ও বিমল করের 'ঘাতক'। নাটক দুটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন মধুমিতা সেন ও শান্তা রায়। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করা ছাড়াও দুজনেই নাটকে চরিত্রচিত্রনে মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন তাপস গুপ্ত, প্রদীপ দাশগুপ্ত, অভিজিৎ বসু।

দ্বিতীয় দিনে পরিবেশিত হয় বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র সওয়ার' ('রাইডার্স টু দি সি' নাটকের ভাবানুবাদ) ও মনোজ মিত্রের 'টাপুর টাপুর'। সমুদ্র সওয়ারের পরিচালিকা ছিলেন শ্রীমতী শান্তা রায়। অভিনয় তিনি করেছেন খুবই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায়। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন শিবশংকর বসু, প্রদীপ দাশগুপ্ত, দিলীপ সেনগুপ্ত, পারমিতা সেন।

প্রদীপ দাশগুপ্ত নির্দেশিত 'টাপুর টাপুর' দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

সপ্তারণী নাট্যদলের 'অদল বদল' : বীরু মুখার্জির হাসির নাটক কয়েকদিন আগে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন সপ্তারণী নাট্যদলের শিল্পীরা। নাটকটির নির্দেশনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন মধু দত্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন ভবেন চক্রবর্তী, স্বপন রায়, মৃণাল দাস, মধু দত্ত, সমর ভট্টাচার্য, দেবাশীষ সান্যাল, সবিতা মিত্র, লক্ষ্মী হালদার, সাধন চৌধুরী, নিতাই দে।

ইউরেকার নাট্যোৎসব : ইউরেকার শিল্পীরা বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন। আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারী বরানগর রবীন্দ্রভবনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। মোট' বে আটটি নাটক এই উৎসবে পরিবেশিত হবে, তার নির্দেশনায় আছেন শিবশাক ঘোষাল, বিমল রায়, শিশির রায়, কমল গাঙ্গুলী, অভিজিৎ চক্রবর্তী, তরুণ ঘোষ।

বহ্নিশিখা : নীহাররঞ্জন গুপ্তের মঞ্চসফল নাটক 'বহ্নিশিখা' কয়েকদিন আগে 'রঙ্গনা'য় পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন এফ সি আই রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। বহু ঘটনা-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই গতিমুখর নাটকটি সার্থকতার সঙ্গে পরিচালনা করেন শ্রীপীযূষ দত্ত। নিজ নিজ চরিত্রগুলোকে যাঁরা আপন অভিনয়গুণে প্রোজ্জ্বল করে তুলতে পেরেছেন, তাঁরা হলেন পার্থ চ্যাটার্জি, তুষারকান্তি গুপ্ত, ভবদেব মুখার্জি, রবীন্দ্রনাথ সেন, সুখেন্দুবিকাশ চৌধুরী, রথীন্দ্রমোহন মুন্সী, আদ্যনাথ মুখার্জি, গোকুলচন্দ্র দাস, রণজিৎকুমার দত্ত, দীপালি ঘোষ, মালা দাস, ইরা মিত্র, সঞ্চিতা মুখার্জি ও নমিতা গাঙ্গুলী।

ভিলাইয়ে নাট্য প্রতিযোগিতা : ভিলাই-এর বঙ্গীয় কৃষ্টি পরিষদ আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক অভিনয় প্রতিযোগিতা এবারও অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। আবেদনের শেষ তারিখ : ১৩ মার্চ। যোগাযোগের ঠিকানা : ১৩।২৪ সেক্টর-৪, ভিলাই-১, দুর্গ, মধ্যপ্রদেশ।

'ডাউন ট্রেন' নাট্যাভিনয় : সলিল সেন রচিত ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত নাটক 'ডাউন ট্রেন' মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিল্পীরা। নাটকের প্রযোজনাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে নাট্যনির্দেশক ও শিল্পীদের নিবিড় সহযোগিতা প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকটির দু-একটি জায়গায় জোনাল অ্যাকটিং এফেক্ট কিন্তু স্পষ্ট হোয়ে উঠতে পারেনি। কতকগুলি ঘটনাগত দৃশ্য নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত করলে নাটকটি আরও সফল হয়ে উঠতো —এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভীতসন্ত্রস্ত অথচ স্বীকারোক্তি বাসনায় উল্লসিত সত্যভূষণের ভূমিকায় জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্তের চলাফেরা ও আচরণে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তার পার্শ্ববর্তী শিল্পীদের অসামঞ্জস্যের জন্যে। তবুও সত্যভূষণের ভূমিকায় জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁর নাটকীয়তার সফল রূপ দিতে। নরেন পাল অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ভূমিকায় চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চে দু-একটি দৃশ্যে উপস্থিত দেখে মনে হল তাঁর রিহার্সালের অভাব। তবুও তাঁর ভূমিকা অনেকাংশে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁদের কৃতিত্বের কথা প্রথমেই মনে আসে, তাঁরা হলেন জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ ভদ্র। মঞ্চে তাঁদের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা সত্যি অপূর্ব। সুষ্ঠু চরিত্র চিত্রণের জন্যে যাঁদের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য, তাঁরা হলেন শিশিরকুমার ঘোষ, নিত্যগোপাল ঘোষ, স্বপন মুখোপাধ্যায়, প্রণব রুদ্র, সমরেশ মুখোপাধ্যায় ও ভোলানাথ অধিকারী।

কলকাতায় ...বোম্বের বাংলা নাটক : বোম্বাইর প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা ইন্ডিয়া কালচার লীগ বাংলা সধারণ নাট্যশালা শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব উপলক্ষে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সোমেন্দ্র নন্দীর 'পিরানদেল্লোর মতো' একাঙ্কটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এটি পরিচালনা করেন সুকৃতি রায়চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রাখেন জ্যোতির্ময় মুখার্জি (চাকর), সামু চাটার্জি (নাট্যকার) ও রমা ভাদুড়ি (নায়িকা)।

কুমারটুলি তরুণ সংসদ আয়োজিত সারস্বত সম্মেলনে প্রধান অতিথি কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুনীলচন্দ্র চৌধুরী ভাষণ দিচ্ছেন। পাশে হরিদাস ঘোষ (জেপি)। ফটো : সন্তোষ ডালিয়া

১৯৭২ সালের রোভার্স কাপ যুগ্ম বিজয়ী মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের দুই অধিনায়ক (সুকল্যাণ ঘোষ ও সুধীর কর্মকার) প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা দিলীপ কুমারের হাত থেকে রোভার্স কাপ উপহার নিচ্ছেন।

দর্শক

রোভার্স কাপ

১৯৭২ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। দুদিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ফলে মোহনবাগান উপর্যুপরি তিন বছর রোভার্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল একই বছরে ভারতের তিনটি প্রধান ফুটবল ট্রফি—আই এফ এ শীল্ড, ডুরান্ড কাপ এবং রোভার্স কাপ জয়ী হয়। এখানে লেখা, একটি দলের পক্ষে একই বছরে আই এফ এ শীল্ড, ডুরান্ড এবং রোভার্স কাপ জয়ের নজির এই প্রথম।

মোহনবাগান ক্লাব এই নিয়ে উপর্যুপরি ৯ বার রোভার্স কাপের ফাইনালে খেলে ৬ বার রোভার্স কাপ জয়ী হল—১৯৫৫, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ (যুগ্ম বিজয়ী)। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল মোট ৮ বার ফাইনালে খেলে ৫ বার রোভার্স কাপ পেয়েছে—১৯৪৯, ১৯৬২ (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭২ (যুগ্ম বিজয়ী)।

রোভার্স কাপের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে একই বছরের ফাইনাল খেলায় কলকাতারই দুটি দল খেলেছে এপর্যন্ত ৫ বার, এর মধ্যে ৩ বারের ফাইনালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল পরস্পর খেলেছে। এই তিনবারের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ২ বার জয়ী হয়েছে এবং একবার (১৯৭২) উভয় দলই যুগ্ম বিজয়ী।

বিশেষ সাফল্য

ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সদ্য সমাপ্ত ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজটি একাধিক ভারতীয় খেলোয়াড়ের অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্যের দরুণ অমরত্ব লাভ করেছে। এই টেস্ট সিরিজ খেলার সূত্রে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০০ রান পূর্ণ করেছেন সেলিম দুরানী এবং সুনীল গাভাস্কার। এবং ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন এই তিনজন—দিলীপ সরদেশাই, ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং ভারতের টেস্ট অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার। ১০০ টেস্ট উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন ন্যাটা স্পিনার বিষেণসিং বেদী এবং লেগ স্পিনার ভাগবত চন্দ্রশেখর।

দিলীপ সরদেশাই নিউদিল্লীর ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসে তাঁর ১০ রান করার সূত্রে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেন। ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে তিনি মাত্র একটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। তাঁর বর্তমানের টেস্ট পরিসংখ্যান : ৩০টি খেলায় মোট ২০০০ রান।

সেলিম দুরানী কলকাতায় ২য় টেস্টের ২য় ইনিংসে তাঁর ৩৬ রানের মাথায় পোককের বল বাউন্ডারীতে পাঠালে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০০ রান পূর্ণ হয়ে ১০০৩ রান দাঁড়ায়। তাঁর বর্তমানের টেস্ট পরিসংখ্যান : ২৯টি খেলায় মোট ১২০২ রান।

সুনীল গাভাস্কার কানপুরের ৪র্থ টেস্টের ১ম ইনিংসে নিজস্ব ২১ রানের মাথায় ক্রিস ওল্ডের বলে এক রান নিয়ে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০০ রান পূর্ণ করেন। তিনি তাঁর একাদশ টেস্ট খেলার ১ম ইনিংসে এই হাজার রান পূর্ণ করার সূত্রে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবথেকে কম টেস্ট ম্যাচ খেলে হাজার রান পূর্ণ করার রেকর্ড করেন। তাঁর বর্তমানের টেস্ট পরিসংখ্যান : ১২টি খেলায় মোট ১১৪২ রান।

ভারতের উইকেটকীপার - ব্যাটসম্যান

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার কানপুরের ৪র্থ টেস্টের ১ম ইনিংসে নিজস্ব ১০ রানের মাথায় ডেরেক আন্ডারউডের বলে এক রান নিয়ে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেন। তাঁর বর্তমানের টেস্ট পরিসংখ্যান : ৩৮টি খেলায় মোট ২১৯৪ রান।

অজিত ওয়াদেকার বোম্বাইয়ের ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে তাঁর ব্যক্তিগত ৮৭ রানের মধ্যে ৬৫ রান তুলে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেন। তাঁর বর্তমানের টেস্ট পরিসংখ্যান : ৩৪টি খেলায় মোট ২০০১ রান।

বিষেণ সিং বেদী নিউদিল্লীর ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসে কিথ ফ্লেচারের উইকেট নেওয়ার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। তাঁর বর্তমানের টেস্ট পরিসংখ্যান : ৩২টি খেলায় ১২১টি উইকেট।

ভাগবত চন্দ্রশেখর মাদ্রাজের ৩য় টেস্টের ২য় ইনিংসে অ্যামিসের উইকেট নেওয়ার সূত্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে চন্দ্রশেখর ৩৫টি উইকেট পাওয়ার সূত্রে একটি সরকারী টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার যে-রেকর্ড করেন, তা ভারত বনাম যে-কোন দেশের সরকারী টেস্ট সিরিজে যে-কোন দেশের পক্ষে প্রযোজ্য।

বেদী : ৩২ টেস্টের ৩৪১১ রানে ১২১টি উইকেট

চন্দ্রশেখর : ২৪টি টেস্টের ২৯৮৩ রানে ১১০টি উইকেট

	খেলা	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়
ইঞ্জিনীয়ার	৩৮	৭২	২	২১৯৪	১২১	২	৩১·৩৪
সরদেশাই	৩০	৫৫	৪	২০০০	২১২	৫	৩৯·২১
ওয়াদেকার	৩৪	৬৫	৩	২০০১	১৪৩	১	৩২·৭৫
গাভাস্কার	১২	২৪	৪	১১৪২	২২০	৪	৫৭·১০
দুরানী	২৯	৫০	২	১২০২	১০৪	১	২৫·০৩

পূর্বাঞ্চল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক পূর্বাঞ্চল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়াও সিঙ্গাপুরের ১নং খেলোয়াড় ইয়ো আহ সাং এবং ২নং খেলোয়াড় আহমেদ বিন আবু বাকর পুরুষ বিভাগে অংশ গ্রহণ করে খেলার আকর্ষণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিলেন। সিঙ্গাপুরের ১নং খেলোয়াড় ইয়ো আহ সাং সেমি-ফাইনালে সুরেশ গোয়েলের কাছে এবং ২নং খেলোয়াড় আবু বাকর কোয়ার্টার ফাইনালে দাবীন্দর আহুজার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

প্রতিযোগিতায় দীপু ঘোষ পুরুষদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : দু'বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রকাশ পাড়ুকোন ১২—১৫, ১৫—৮ ও ১৫—২ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েলকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপু এবং রমেন ঘোষ ১৫—৬ ও ১৫—৬ পয়েন্টে সিঙ্গাপুরের ইয়ো আহ সাং এবং আহমেদ বিন আবু বাকরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : রফিয়া লতিফ ১১—৩ ও ১২—৯ পয়েন্টে মরিন ম্যাথিয়াসকে পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : মরিন ম্যাথিয়াস এবং রমেন ঘোষ ৮—১৫, ১৫—১১ ও ১৫—৩ পয়েন্টে দীপু ঘোষ এবং রফিয়া লতিফকে পরাজিত করেন।

পাকিস্থান বনাম নিউজিল্যান্ড

অকল্যাণ্ডের ইডেন পার্কে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যাণ্ডের শেষ টেস্ট খেলায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে পাকিস্তান ১—০ খেলায় (ড্র ২) ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করে।

প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ৩০০ রান সংগ্রহ করেছিল। মজিদ খাঁ সেঞ্চুরী (১১০ রান) করেন। নিউজিল্যাণ্ডের রস টেলর তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১০০ উইকেট পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৪০২ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সময়ে নিউজিল্যাণ্ড ১ম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১৮০ রান সংগ্রহ করেছিল। নিউজিল্যাণ্ডের রডনে এডমণ্ড তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী (১০৭ রান) করেন। মজিদ খাঁর এক ওভারের বোলিংয়ে এডমণ্ড উপর্যুপরি ৫টা বাউন্ডারী করেন।

তৃতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস পাকিস্তানের ১ম ইনিংসের মতই ৪০২ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়। নিউজিল্যাণ্ডের রায়ান হেস্টিংস ১১০ রান করে এবং পেস বোলার রিচার্ড কলিঞ্জ ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১০ম উইকেটের জুটিতে হেস্টিংস এবং কলিঞ্জ ১৫৫ রান সংগ্রহ করার সূত্রে ১৯০৩-৪ সালে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের উইলফ্রেড রোডস এবং আর ই ফস্টার ১৩০ রান তুলে ১০ম উইকেট জুটির যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা ভেঙে দেন।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান ২য় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৭৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষদিনে পাকিস্থানের ২য় ইনিংস ২৭১ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি ১১০ মিনিট সময়ে নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৭২ রান সংগ্রহ একেবারেই অসম্ভব ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের অসমাপ্ত ইনিংসের ৯২ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারিত্ব
এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি
বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪

(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম—সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৬। যে সব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সর্বশ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার (মৃত) ১৭১এ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২৬ ; প্রাণতোষ ঘটক (মৃত) ১১৯, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯ : মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী (মৃত) ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা ; মনোজ বসু, পি-৫৬০, লেক রোড, কলিকাতা-২৯ : গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ; সুমথনাথ ঘোষ কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ : বিশু মুখোপাধ্যায়, ১২ডি, রাজা কালীকিষণ লেন, কলিকাতা—৫ ; ভবানী মুখোপাধ্যায়, ৩।১।৪-এ ব্যাচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা—৩৪ ; তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ : অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩; তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ ; শচীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫ বনমালী নস্কর রোড, বেহালা এবং প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ/সুপ্রিয় সরকার

তাং—২৫-২-৭৩

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 2nd March, 1973 শুক্রবার, ১৮ ফাল্গুন, ১৩৭৯ .52 Paise

'পুনশ্চঃ' প্রসঙ্গে

গত ৫ই মাঘের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুনশ্চ' পড়লাম। 'পুনশ্চে' মহাত্মা শিশিরকুমার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। বলা হয়েছে বলতে বহুদিন আগেকার দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্বন্ধে পত্রিকা দুটির অভিমত পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। 'সাহিত্য-সংবাদ' পত্রিকায় স্মৃতি-সভার মধ্যে পরিবেশিত তথ্যটি মহাত্মা শিশিরকুমারকে রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু হিসাবে সঠিক ও পুরোপুরি মর্যাদা দিতে পারে নি। 'তাঁহাকে এ-দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন গুরু বলিলেও বলা যাইতে পারে।'—এই উক্তির মধ্যে একটা 'হাঁ-না'র প্রশ্ন থেকে গেছে। অথচ কংগ্রেস-পরবর্তী যুগের প্রথম চরমপন্থী নেতা 'বাল গঙ্গাধর তিলক' তাঁকেই রাজনৈতিক গুরু হিসাবে বরণ করে নেন।

'It is significant that Bal Gangadhar Tilak the first extremist leader of the post-Congress era, saluted Sisir Kumar as his political Guru' (Sisir Kumar Ghosh by Anathnath Bose)

কংগ্রেসের জন্মকাল ১৮৭০ থেকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাত্মা শিশিরকুমার ছিলেন তখনকার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একজন অতি কঠিন ও কঠোর সমালোচক। শুধু এই কারণেই যে তিনি তখনকার ভারতীয় রাজনীতিবিদদের দ্বারা চালিত চরমপন্থী দলের প্রথম পুরোধা হয়েছিলেন তা নয়: তিনিই এদেশে জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনের শক্ত কাঠামো তৈরী করেন নির্ভীকভাবে।

'Sisirkumar is the first exponent of the Extremist School of Indian politicians not only because of his attitude towards Government but also because of his bold scheme of popular political organisation in this country'. (Bimanbehari Mazumder, History of Polical Thought, Vol. 1)

দ্বিতীয়ত, যে-গণতন্ত্র আজ আমাদের দেশে চলছে, সেই গণতান্ত্রিক শাসনের তিনিই হলেন প্রথম পুজারী। গণতন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার আইনসভার তিনিই হলেন একরকম প্রবর্তক। যদিও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই এই প্রতিনিধিমূলক আইনসভার জন্য সর্বপ্রথম আবেদন-নিবেদন করেন এবং পরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এর জন্যে বিশেষ চাপ দেন, কিন্তু এ'রা কেউই এর প্রবর্তনের জন্য তেমন কিছু জোরালো যুক্তি দেখান নি এবং এর জন্যে তেমন কোন সক্রিয় ভূমিকাও গ্রহণ করেন নি। মহাত্মা শিশিরকুমারই এর জন্যে নীতিগত ও দর্শনগত কারণ দেখান এবং কোন্ পথে ও কিভাবে অগ্রসর হলে এটা বাস্তবে রূপায়িত হবে, তার সঠিক নির্দেশ দেন। এ-বিষয়ে তাঁর উক্তিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

'If Canada & Australia were securing autonomy, why should India lag behind? "We as human beings have all the aspiration and privileges of human beings and we donot know how England can reasonably refuse our demand' (A. B. Patrika, 1st Sept, 1870)

"As a nation we live, and unlike the Jews, in our own country, with a language, literature, genius, philosophy and a religion of our own'. (Ibid)

"Nothing short of a representative form government in some shape ought to be demanded for those who are taxed should at least be permitted to choose the mode in which the assessment ought to be made' (Ibid)

"If we demand a Parliament of our own from the English people, it is to lighten their trouble'. (Ibid 1st Sept, 1870)

"India has a civilisation of its own. It is a distinct country from England and its people have distinctive features, acquired by an exclusive civilisation of thousands of year. It is not for a foreigner to come and at once unravel the Gordian Knot. It is not for a foreigner to come and analyse the manners, customs, civilisation and genius of such an intelligent and exclusive race which India is peopled with' (Ibid, 6th July 1876)

বাদিবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া, হুগলী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২৬শে মাঘ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে 'অমৃত' পত্রিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আর্থিক দুরবস্থার কথা পড়লাম। একজন পুরানো সভ্য হিসাবে সভ্যদের কয়টি পুরানো অসুবিধার কথা উল্লেখ করছি। পরিষদে পাঠাগার আছে, পাঠকক্ষ নেই। বর্তমানে একতলার যে ঘরটি পাঠকার্যে ব্যবহৃত হয় সেটি অন্ধকার, আলোবাতাসহীন। দ্বিতলে যে ঘরে অধিবেশন হয়, সেটি কি পাঠকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না? যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগ্রহ থেকে গ্রন্থ চাওয়া যায় (যেমন বিদ্যাসাগর সংগ্রহ, রমেশচন্দ্র দত্ত সংগ্রহ ইত্যাদি) তাড়াতাড়ি পওয়া যায় না: চাবি খুলে বই বার করা কর্মিগণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর বলে মনে হয়। কোন সন্ধান পুস্তক (রেফারেন্স বুক) চট করে পাওয়া যায় না। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দীর্ঘকাল পরিষদে কোন গ্রন্থাগারিক নাই। নিচের কাউন্টারে যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হিসাবে উপন্যাস বাছাই-বাচাই করার জন্য থাকে, সেখানে অভিধানাদিও রাখা দরকার। সভ্য হিসাবে পরিষদের যে ত্রুটিগুলির কথা লিখলাম, তার নিরসনে কোন অনুদানের প্রয়োজন নাই।, দরকার সুবিবেচনার।

(অধ্যাপক) কমল সেন,
গড়িয়া।

নতুন লেখক ও প্রকাশক

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী অমৃতে প্রকাশিত শুভঙ্কর পাঠকের 'বইপাড়ার সংকট ও সংকল্প' শীর্ষক মূল্যবান লেখাটি পড়লাম। শুভঙ্করবাবুর কাছে বেঙ্গল পাবলিশার্সের শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু—পশ্চিমবঙ্গে 'বাংলা একাডেমী' নামে একটি সংস্থা গঠনের যে সুচিন্তিত ও সময়োচিত প্রস্তাব করেছেন, সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রই তাকে স্বাগত জানাবেন। একমাত্র এই ধরনের সংস্থাই তরুণ লেখকদের ক্ষমতার অপব্যয় রোধ করতে সক্ষম। কারণ নতুন লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে বর্তমানে কোন প্রকাশকই এগিয়ে আসেন না। কোন কোন প্রকাশনী সংস্থা থেকে বর্তমানে নতুন লেখকদের যে বই বের হচ্ছে, তার ব্যয়ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকই বহন করেছেন, প্রকাশক নন। এভাবে কজন লেখকের পক্ষে বই বের করা সম্ভব? সুতরাং প্রস্তাবিত 'বাংলা একাডেমী" গঠিত হলে নিঃসন্দেহে নতুন লেখকগণ অনেক উপকৃত হবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুরূপ একাডেমী গঠনের ব্যাপারে অদূর ভবিষ্যতে এগিয়ে আসবেন কি?

মনোজবাবু বর্তমান পাবলিশারদের ভূমিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন—তার সত্যতা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি সম্প্রতি আমার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে। কাব্যগ্রন্থটি নিজের খরচে প্রকাশ করে আমি কেবল এর বিক্রয়ের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি,—সে বিষয়ে দু' একটি কথা লেখার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কোন প্রকাশক আমাকে লিখেছেন,

"We undertake distribution and sales promotion of books on a monthly fixed service charges of Rs. 20 for the first six month and @ Rs 10 only on subsequent months, This fee is required for handling your book with all serious attention and personal care'.

কী অপার সহযোগিতার নমুনা দেখুন। বই বিক্রি হোক বা না হোক মাসিক কুড়ি টাকা হ্যান্ডলিং খরচ লেখককে বহন করতে হবে। এছাড়া বিক্রীত বইয়ের উপর অতিরিক্ত শতকরা ৪০।৫০ টাকা কমিশন তো আছেই।

অজিতকুমার দাস,
হাওড়া-৬।

প্রাদেশিকতার চক্রান্ত

আসামে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন আমাদের সকলেরই দুঃখের কারণ হয়েছে। তার ক্ষত এখনো শুকোয়নি। এমনি দুর্ভাগ্য আমাদের যে জাতীয় সংহতির মহান আদর্শের প্রতি আনুগত্য সামান্য প্ররোচনায় বা ভুল বোঝাবুঝিতে মুহূর্তে বিনষ্ট হয়ে যায়। আমরা সকলেই এক ভারতের সন্তান, প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীই আমাদের আপনজন ও দেশবাসী, এই সত্য আমরা ভুলে গিয়ে পরস্পরকে আঘাত করি। ওড়িশা ও পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিক কতকগুলো ঘটনা এই দুঃখদায়ক দিকটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতীয়তাবোধের চেয়ে প্রাদেশিকতাবোধ যদি বড় হয়ে দেখা দেয় তাহলে ও ধরনের ঘটনা আমাদের কল্যাণবুদ্ধি বারবার নষ্ট করবে। আমরা সংকীর্ণতার চোরাবালিতে আটকে পড়ব। জাতীয় সংহতি এবং ভাবগত ঐক্যের স্বপ্ন মরীচিকার মতো যাবে মিলিয়ে।

অন্ধ্রের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি এই একই বিভেদবুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবোধ অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানাবাসীদের অশেষ দুঃখ ও ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়েছে। ওড়িশা ও পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ওড়িশার চেয়ে বাংলা ও বাঙালীর নিকটতর কে আছে? এই সম্প্রীতি ও সান্নিধ্যের জন্য আমরা গর্বিত। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও পূর্বাঞ্চলের এই দুটি রাজ্য, তৎসহ বিহার ও আসাম পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরস্পরের সহযোগিতা ও সদ্ভাব ছাড়া এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি অসম্ভব। আজকের যুগে গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগোষ্ঠি ও পরস্পর মতাদর্শ-বিরোধী সমাজের সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সহাবস্থানের নীতি অনুসৃত হচ্ছে তখন একই ভারতবর্ষের মানুষ আমরা কি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে ও সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারব না?

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা এর স্বপক্ষেই উত্তর পাই। ভারতবর্ষ যখন পরশাসনে আবদ্ধ ছিল তখন জাতীয়তাবোধ ও ভারতীয়বোধই ছিল আমাদের শক্তি। মহাত্মা গান্ধী এই ঐক্যবোধ জাগ্রত করেছিলেন; পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে কেনই বা সেই জাতীয় ঐক্যবোধ বিস্মৃত হয়ে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার ভেদবুদ্ধি, পারস্পরিক বিরোধ ও সন্দেহ এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল? এর দ্বারা কার লাভ হচ্ছে? আসামের সঙ্গে বাংলা, ওড়িশাবাসীর সঙ্গে বাঙালীর বিরোধে লাভ হচ্ছে কার? আজ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালী, ওড়িয়া, অসমীয়া তথা, ভারতবাসীকে। গুণ্ডা ও সমাজ-বিরোধীরা এর সুযোগ গ্রহণ করে, গুজব ছড়ায় এবং সমাজের শান্তি নষ্ট করে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী তৎপরতার সঙ্গে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। উভয় রাজ্যের বিধানসভায় দলমতনির্বিশেষে সকল সদস্য এই অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর নিন্দা করেছেন। উভয় রাজ্যে দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে সফর করে গেছেন। সকলেই একবাক্যে বলেছেন, সংখ্যালঘুরা নিরাপদে আছেন, সরকার তাঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছেন। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব। তিনি বলেছেন, আসাম, পশ্চিমবাংলা, ওড়িশা ও অন্ধ্র প্রদেশের ঘটনার পেছনে বিদেশী শক্তির হাত আছে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এর তদন্ত দাবিও করেছেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হতাশার কারণ। তারা চাইছে আভ্যন্তর গোলযোগ ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করে সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে। শ্রীযাদব পরিষ্কার ভাষায় এই অভিযোগ করেছেন যে, কয়েকটি সন্দেহজনক সংগঠন এই হাঙ্গামাসৃষ্টিকারীদের অর্থসাহায্য করছে ও হাঙ্গামাকারীদের কাছে চোরাপথে অর্থ আসছে অশান্তি জীইয়ে রাখার জন্য। সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়। জীবিকার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে যান। চিরকালই তা হয়ে আসছে। ভারতবর্ষের যে কোনো অঞ্চলে যে কোনো ভারতীয় নাগরিকের বসবাস করার এবং জীবিকা উপার্জনের অধিকার আছে। প্রত্যেক রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হল তাঁদের সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধা দান এবং নিরাপত্তা বিধান। মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতকারী আঞ্চলিকতার নামে আমাদের জাতীয়তাবোধ বিনষ্ট করার জন্য যে চক্রান্ত করছে তার বিরুদ্ধে সকলকে আজ সজাগ হতে হবে। এর সঙ্গে কোনরকমেই আপস করা চলবে না। ভারতবর্ষকে বাঁচতে হলে তার গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ অবারিত রাখতে হলে সকল ভাষাভাষীর মধ্যে চাই ঐক্য ও সংহতি। এর বিরুদ্ধে যারা কাজ করছে তারা সংখ্যায় কম হলেও তাদের অনিষ্ট করার ক্ষমতা কম নয়। সরকার ও জনসাধারণের অতন্দ্র সতর্কতা এবং সক্রিয় ব্যবস্থাই এদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে পারে। আমাদের যেন এই সতর্কতায় কোনোরকম শিথিলতা না দেখা দেয়। আমরা সকলেই ভারতীয়, সকলের মিলিত শক্তিই ভারতের শক্তি, এই সত্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

দ্বিতীয় হুগলী সেতুর ভিত্তি সংক্রান্ত নির্মাণকার্য যথারীতি চলছে। খুঁটি পোতা হচ্ছে।

তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩। স্থান লণ্ডন শহরের ব্যস্তসমস্ত অফিসপাড়া অল্ডুইচ। লণ্ডনের সময় তখন সকাল সাড়ে ন'টা, ভারতীয় সময় বিকাল তিনটা। এই অল্ডুইচ পাড়াতেই রয়েছে রয়্যাল শেকস্‌-পীয়ার কোম্পানীর লণ্ডন থিয়েটার। এই থিয়েটার বাড়ির উল্টোদিকে যে বিরাট প্রাসাদটি রয়েছে সেটিই হল লণ্ডনস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনারের দপ্তর।

অল্ডুইচের সেই গৃহে সেদিন পনের মিনিটের নাটক হয়ে গেল, যে নাটকের শেষে পড়ে রইল দুটি গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ, দুজন আহত এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ল দুজন।

গুলীবিদ্ধ হয়ে যে দুজন মারা গেল এবং তরবারি হাতে যে তরুণ গ্রেপ্তার হল, তাদের পরিচয় জানতে দেরি হল না। তিন-জনেরই বাস লণ্ডন থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে ওয়াটবোর্ড শহরে। তারা তিনজনই এক বাড়িতে বাস করত, তারা তিনজনই পাকিস্তানের মানুষ এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। বসিরৎ হানিফ এবং মহম্মদ হানিফ সবে ২০ বছর বয়স পার হয়েছিল। আর দিলওয়ার খাঁ নামে তৃতীয় যে তরুণটি জীবিত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তার বয়স মাত্র ১৫ বছর। প্রথম দুজন কারখানার শ্রমিক আর তৃতীয় জন স্কুলের ছাত্র।

এই তিনটি তরুণ কি উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় হাই-কমিশনার অফিসে হানা দিয়েছিল? তারা কি নিজেদের বুদ্ধিতেই এসেছিল? অথবা অন্য কেউ তাদের পাঠিয়ে-ছিল? এটা কি একটা বিচ্ছিন্ন হানাদারির ঘটনা বা এর পিছনে একটা সংগঠিত আয়োজন রয়েছে?

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং আশ্বাস দিয়েছেন যে, সিমলা চুক্তির উপর এই ঘটনার কোন প্রভাব পড়বে না। আপাতত যেসব প্রশ্ন উঠেছে ভবিষ্যতের তাহলেও যেসব প্রশ্ন উঠেছে, ভবিষ্যতের জন্য সেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার।

এখন পর্যন্ত যেটুকু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির দাবী তোলার উদ্দেশ্যেই এই হানাদাররা ভারতীয় হাই-কমিশনারের অফিসে চড়াও হয়ে সেখানে যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই পাকড়াও করার চেষ্টা করেছে। স্পষ্টতই, পাকিস্তানী হানাদাররা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আরব গেরিলাদের কৌশল অবলম্বন করেছিল।
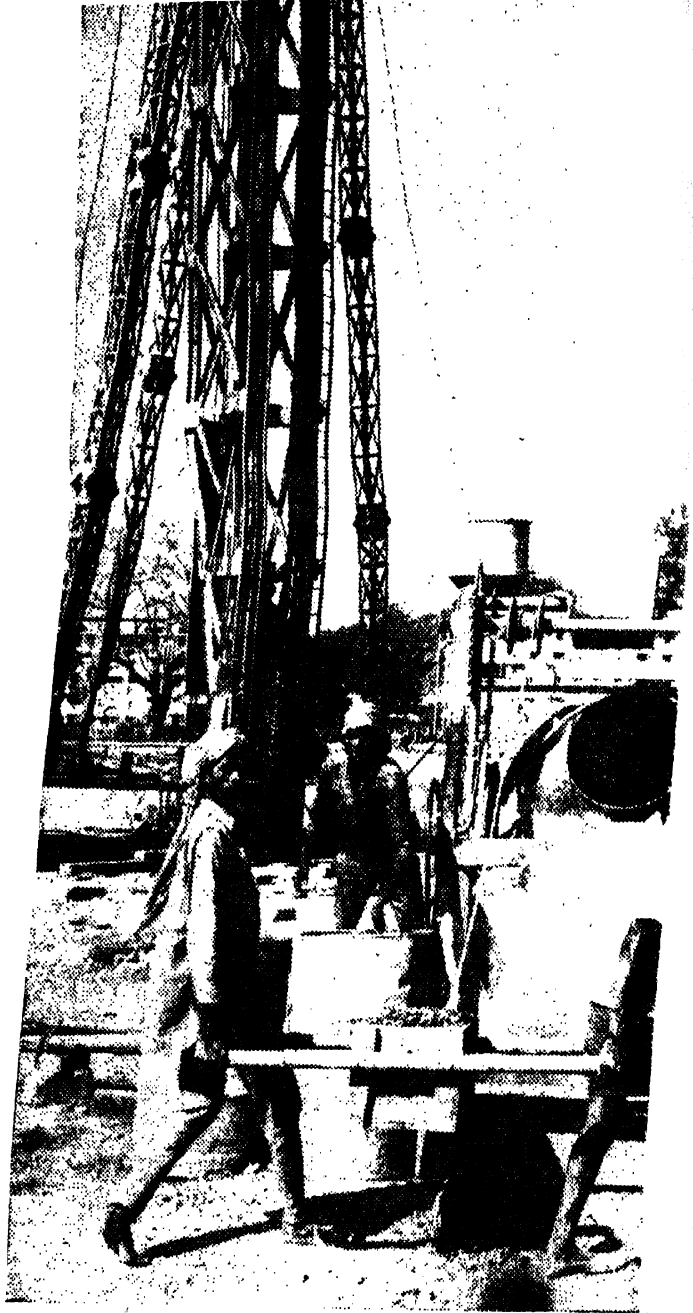
এই ঘটনার পর নিজেকে মহম্মদ বিন কাসিম নামে পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় টেলিফোন করে জানায় যে, 'ব্ল্যাক ডিসেম্বর' নামে একটি সংস্থা এই হানাদারদের পাঠিয়েছিল। কাসিম নাকি জানায় যে, হানাদাররা কাউকে মারতে যায়নি অথবা কাউকে জামিন হিসাবে আটকাতেও চায়নি। সঙ্গে সঙ্গে সে এই বলে শাসিয়েছে যে, 'এটা আমাদের প্রথম আঘাত। তবে এটাই শেষ হবে না। ভারতীয় ও রুশ কূটনীতিবিদদের ও তাঁদের সম্পত্তিকে আমরা আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য করতে চাই। আমরা শুধু চাই যে, আমাদের

দেশ যে মর্যাদা হারিয়েছে সেটা সে ফিরে পাক।'

'ব্ল্যাক ডিসেম্বর' নামে একটি পাকিস্তানী গোষ্ঠীর কথা এই প্রথম শোনা এই ধরনের কোন সংস্থা যদি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে সেটা যে আরব গেরিলাদের 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' সংস্থার অনুকরণে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ওয়াটফোর্ড মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ ইসরায়েল একটি বিবৃতি দিয়ে ব্ল্যাক ডিসেম্বর নামে কোন চরমপন্থী সংস্থার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছেন।

কয়েকজন মাথাগরম পাকিস্তানীর কল্পনার বাইরে 'ব্ল্যাক ডিসেম্বর'-এর অস্তিত্ব থাকুক না থাকুক, একটা কথা ঠিক। সেটা হল এই যে, এই হানাদাররা ছিল নেহাৎই আনাড়ী। এই ধরনের গেরিলা তৎপরতার জন্য যে দক্ষতা ও প্রস্তুতির দরকার হয় তার কোন পরিচয়ই এই হানাদারির ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায়নি।

কিন্তু, তাই বলে এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, ভারতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নটির প্রতি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণের মরিয়া চেষ্টায় কিছু লোককে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। বিশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা অন্তত এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ৯০ হাজারের বেশি পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ভারতের হাতে এখনও আটক হয়ে থাকার যন্ত্রণা কিছু পাকিস্তানী কোনক্রমেই ভুলতে পারছে না। যেভাবে হোক, এর একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য এই পাকিস্তানীরা মরিয়া হয়ে উঠছে। প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো জানেন যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য তাঁর দেশের লোক তাঁর উপর ক্রমেই আরও বেশি করে চাপ দেবে। দেশের মানুষের ক্ষোভ ও রোষ তাঁর নিজের উপর থেকে সরিয়ে এনে ভারতের বিরুদ্ধে চালিত করার চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

দেশের ভিতরকার সংকটের সম্মুখীন হয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের উস্কানি দিয়েছে, এর অতীত নজির রয়েছে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে যখন পূর্ব পাকিস্তানের সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছিল ঠিক তখনই জম্মুর আকাশ থেকে ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে-সময়ে বিমান ছিনতাইকারীকে পাকিস্তানে বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা ঐ বিমানদস্যুকে নিয়ে নাচানাচি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সকলের আগে ছিলেন যিনি, তাঁর নাম জুলফিকার আলি ভুট্টো।

হানাদারদের কেন গুলি করে মারা হল এই নিয়ে এখন লণ্ডনের পাকিস্তানীরা বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। হানাদারদের হাতে যে বন্দুক ছিল সেটা ছিল নকল রিভলবার একথা জানার পর পাকিস্তানী 'শহীদ'দের নিয়ে আরও বেশি করে সোরগোল তোলা হচ্ছে। পাকিস্তানীরা যেসব প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে লণ্ডনের রাস্তায় মিছিল বার করেছে সেগুলির মধ্যে একটিতে লেখা ছিল, 'দুটি খেলনা রিভলবারের জন্য এগারটি গুলি!'

বাজেটের প্রাক্কালে অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত রাও চাভন দেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষার যে বিবরণ পেশ করেছেন সেটি একটি হতাশার দলিল। এই অর্থনৈতিক সমীক্ষার পাতার পর পাতা ভর্তি শুধু ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের স্বীকৃতিতে। পর পর দু-বছর ধরে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের হার দেড় শতাংশ দুই শতাংশের মধ্যে আটকে

আছে। অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যা যে-হারে বাড়ছে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার তার চেয়েও কম।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে ২৫২ কোটি টাকা ঘাটতি হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঘাটতি তার চেয়ে অনেক বেশি হবে। অথচ, আর্থিক বছরের প্রথম নয় মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছে অনুমানের চেয়ে ৪২৬ কোটি টাকা বেশি। তাছাড়া সরকার বাজার থেকে ৪৭৮ কোটি টাকা ঋণও সংগ্রহ করেছেন। ১৯৭২-৭৩ সালের প্রথম নয় মাসে বাজারে চালু টাকার পরিমাণ বেড়েছে ৯২৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৭-৮ শতাংশ। আগের বছর টাকার যোগান বৃদ্ধির হার ছিল ১৩-৯ শতাংশ।

একদিকে সরকারি খরচের বড় একটা অংশ (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) জুড়ে রয়েছে উন্নয়ন-বহির্ভূত ব্যয় অর্থাৎ যা থেকে ভবিষ্যতে আয়ের সম্ভাবনা নেই এমন ব্যয়, অন্যদিকে টাকার যোগান বাড়ছে। এভাবে দেশের অর্থনীতির উপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ পড়ছে প্রচণ্ড রকমের। ১৯৭২-৭৩ সালে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৭-৮ শতাংশ। ১৯৭১ সালে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪ শতাংশ। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হচ্ছে।...১৯৭১ সালের তুলনায় ১৯৭২ সালে মূল্যবৃদ্ধির একটি বিশেষত্ব এই যে এবার খাদ্যবস্তুর দাম বেড়েছে। যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে চাল, চিনি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি।'

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সমীক্ষায় দুটি আশা বা ভরসার কথা শোনান হয়েছে। প্রথমটি হল, আগামী রবি ফসল ভাল হলে বাজার দরের উপর চাপ কমবে। দ্বিতীয়টি হল, বর্তমান বছরে যদি ভাল বৃষ্টি হয় ও খরিফ ফসল ভাল হয় তাহলে মূল্য-স্থিতি আনা যাবে। তবে, এই দুটি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট 'কিন্তু' রয়েছে। এবারকার রবি ফসল ভাল হলেও ১৯৭২-৭৩ সালের অজন্মার আঘাতটা ১৯৭৩ সালে টের পাওয়া যাবে। আরও অনেক মাস ধরে পরিস্থিতিটা লক্ষ্য করে যেতে হবে। বিশেষ করে, মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাজার দর বাড়ার যে স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে সেকথা মনে রেখে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে হবে। আগামী খরিফ ফসল ভাল হলেও তার পুরোপুরি সুফল পাওয়া যাবে না যদি না খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান যায়, বন্টন ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় এবং সংগ্রহ ও বন্টনের খরচ কমান যায়।

●

জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক কি মৃত্যুপথযাত্রী? 'হংকং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে, ৮৬ বছর বয়সের এই নেতা এখন মৃত্যুর দিন গুনছেন এবং তিনি আর বেশি দিন নেই, এটা ধরে নিয়ে তাইওয়ানে তাঁর স্থলাভিষিক্তের পথ সুগম করার জন্য ইতিমধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

হংকং স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর খবর হল, জেনা-রেলিসিমো চিয়াং কাই-শেককে গত জুলাই মাসের পর আর কখনও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি এবং গত আগস্ট মাস থেকে তিনি হাসপাতালে আছেন। তাঁর নাকি হৃদযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের অসুখ হয়েছে এবং বহুমূত্র ও গেঁটে বাতেও তিনি ভুগছেন। তাঁর এই অসুস্থতার কথা দেশের মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। এমন কি খবরটা ছড়িয়ে পড়বে, এই ভয়ে আমেরিকান ডাক্তারও ডাকা হয়নি।

এটা ঠিকই হয়ে আছে, চিয়াং কাই-শেক চোখ বুজলে তাঁর স্থান গ্রহণ করবেন তাঁর বড় ছেলে ও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী চিয়াং চিং-কুও। 'হংকং স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর খবর হল, চিয়াং চুং কুওর অনুগত সরকারী কর্মীদের ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বসান হচ্ছে এবং যাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

চিয়াং কাই-শেকের অবর্তমানে তাই-ওয়ানের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কি বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেল সম্প্রতি প্রকাশিত আর একটি খবর থেকে। খবর হল এই যে, তাইওয়ান নাকি সোভিয়েট রাশিয়াকে তাদের দেশে নৌঘাটি বসাবার সুযোগ দিতে চাইছে। এই খবর যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে চীন আমেরিকা সমঝোতার রাস্তা যখন পরিষ্কার হচ্ছে, তখন তাই-ওয়ান নিজের জন্য একটি নতুন ভূমিকা খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করছে। তাইওয়ান রুশ ঘাঁটি করতে গিয়ে একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করবে তেমনি আবার চীনের একেবারে দোর-গোড়ায় নিজের সামরিক শক্তিকে উপস্থিত রাখার সুযোগ পেয়ে সোভিয়েট রাশিয়া খুশি হবে।

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী চিয়াং-কুও প্রথম জীবনে সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী একজন রাশিয়ান।

২২।২।৭৩ —পুন্ডরীক

ডলার, ভিয়েতনাম—কমন মার্কেট

— দিলীপ মালাকার

মার্কিন ডলার জখম হয়েছে অনেককাল আগে। ১৯৭৩-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয়-ধারের মতন জখম হল। প্রথমবার ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে। টাকার বাজারে ডলারের প্রভুত্ব কমে এসেছে। এরই অপেক্ষায় ছিল পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান ১৯৬৬ সাল থেকে। আগে ডলার পেলে অন্য টাকা কেউ ছুঁত না। এমনই ছিল তার দাপট। সে দাপট এখন কমেছে। ডলারের অধঃপতনের সঙ্গে দুটো প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে, (১) ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, (২) পশ্চিম ইউ-রোপের জার্মান মার্ক ও জাপানের ইয়েন মুদ্রা। ডলারের আভিজাত্য হারাতে শুরু করে ১৯৬৬ সালে। ওই বছরে ভিয়েৎনামে মার্কিনদের অবনতি শুরু হয়। যুদ্ধখাতে অত্যধিক ব্যয়ের ফলে ডলারের ওপর চাপ তখন থেকে শুরু। অনেক মার্কিন ধনপতি প্রকাশ্যে ও গোপনে সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে সেই থেকে ডলার পাচার শুরু করে। তারা ডলার ভাঙিয়ে সোনা কিনে জমাতে শুরু করে বিদেশী ব্যাঙ্কে। সে সময়ে জনসন সরকার অনেক চেষ্টা করেও ডলার ও সোনা পাচার বন্ধ করতে পারেন নি। হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। ১৯৬৬-৬৭ সালে যখন ডলার বেকায়দায় পড়ে তখন ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্যগল চেয়েছিলেন ফ্রাঁর ঊর্ধ্বমূল্যায়ন করে ডলারকে প্যাঁচ মারার। কিন্তু দ্যগলের সে স্বপ্ন সার্থক হতে পারে নি। ১৯৬৮ সালে এলো ফ্রান্সে ছাত্র বিপ্লব। ফরাসী মুদ্রার দাম পড়ে গেল। সবার অলক্ষ্যে পশ্চিম জার্মান মুদ্রা মার্ক শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের অন্য দেশের আর্থিক অবস্থা তখন খুব ভাল নয়। ডলারের পরেই জার্মান মার্কের স্থান। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্মান মার্ক এক ঢিলে দুই পাখি মারে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মার্কের ঊর্ধ্বমূল্যায়ন করে ফ্রাঁ ও ডলারকে প্যাঁচ মারা। সে যাত্রায় ডলার ও ফ্রাঁ কোনোরকমে প্রাণ বাঁচায়। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে জার্মান মার্কের রিভ্যালুয়েশন অর্থাৎ ঊর্ধ্বমূল্যায়ন হল। জার্মান মার্কের কাছে ডলারের দাম পড়ে গেল, বিনিময় দাম হল ডলার প্রতি চার মার্ক থেকে ৩-৬৬ মার্কে। ১৯৭১ সালের ৫ মে আবার হল মার্কের ঊর্ধ্বমূল্যায়ন. ফলে ডলারের দাম পড়ে গেল পাঁচ থেকে দশ শতাংশে। তার জের হিসেবে ওই বছরের জুলাই মাসে কয়েকদিনের জন্য জার্মান ব্যাঙ্কে ডলারের কেনা-বেচা বন্ধ ছিল।

ইতিমধ্যে দুর্বল ফ্রাঁ শক্তি সঞ্চয় করে ১৯৭১ সালের জুন মাসে ঊর্ধ্বমূল্যায়ন করে।

ডলারকে বাঁচাবার জন্যে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে দশ ধনী দেশগুলো এক বৈঠক ডাকে। সে সময়ে প্রখ্যাত মার্কিন ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক জন গলব্রেথ বলেছিলেন যে, ডলারের অবমূল্যায়ন অবশ্যম্ভাবী। হলও তাই। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ডলারের অবমূল্যায়ন হল। ডলার মুদ্রার অবমূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী মুদ্রার ঊর্ধ্বমূল্যায়ন হয় ১৫ শতাংশ, জার্মান মার্কের ১৩ শতাংশ. বেলজিয়াম ও ডাচ মুদ্রার হয় দশ শতাংশ. বৃটিশ, ফরাসী ও ইতালিয়ান মুদ্রার হয় সাত শতাংশ থেকে দশ শতাংশ, কানাডার হয় ৮ শতাংশ।

ডলারের ওপর চাপ আসছিল পশ্চিম ইউরোপের ধনী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে। সেই সঙ্গে জাপান ও কানাডাও ছি[illegible]।

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডলারের অবমূল্যায়নের জন্যে মার্কিনরা দায়ী করছে জাপানী মুদ্রা ইয়েনকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত দুই রাষ্ট্র জার্মানী ও জাপানের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিই কাল হয়েছে মার্কিনদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য মার্কিন সরকার জলের মতন টাকা খরচ

করে চলেছে। জার্মানী ও জাপান সামরিক খাতে ব্যয় না করে একের পর এক কলকারখানা ও শিল্পোন্নয়ন করে চলছিল গত পঁচিশ বছর ধরে। একজন ধনী ব্যক্তি জলের মতন টাকা খরচ করে গেছে আর দুজন নিম্ন মধ্যবিত্ত অগাধ পরিশ্রম করে মাথা খাটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা জমিয়ে গেছে। এই হল জার্মানী, জাপান ও আমেরিকার বর্তমানের রূপ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পশ্চিম জার্মানী কেবল রপ্তানী বাড়িয়ে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা ও স্বর্ণ মজুদ করেছে। যার জোরে সে ডলারকে প্যাঁচ কষলে ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে। ঠিক অনুরূপভাবে জাপান রপ্তানী বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করে গত পনর বছর ধরে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে যেমন মার্কিনদের আর্থিক ক্ষতি হয় তেমনি জাপানের হয় লাভ। তারা আমেরিকার বাজার দখল করে বসে। জাপানী জিনিস ভাল এবং দামে সস্তা। তাই মার্কিন বাজার ছেয়ে গেছে। বর্তমান নিকসন সরকারের সবচেয়ে বড় ভয় জাপান। অন্য দেশ নয়। বিদেশের বাজারে জাপানী জিনিসের চেয়ে মার্কিন জিনিসের দাম বেশী। কিন্তু জাপানী জিনিস নিকৃষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জাপানের কাছে মার্কিনরা মার খাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারত উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথাও ধরা যেতে পারে।

মিঃ নিকসন তাঁর নব অর্থনীতিতে বলতে চান যে, ডলারের অবমূল্যায়ন করে জাপানী ইয়েনের উর্ধমূল্যায়ন করলে আমেরিকায় আবার তাদের জিনিস বিক্রি হবে এবং জাপানী জিনিসের দাম বাড়লে, জাপানী জিনিস কম বিক্রি হবে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে আবার ডলার সামলে উঠে তার পুরোনো শক্তি ফিরে পাবে। এই কারণে নিকসন সরকার জাপানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। জাপানীরা ততখানি উর্ধমূল্যায়ন চায়নি তাদের ইয়েনের। কারণ ইয়েনের দাম খুব বেশী বাড়লে বিশ্বের বাজারে জাপানী জিনিস কম বিক্রি হবে। ডলার চাইছে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে। তাই আমেরিকা চাপ সৃষ্টি করেছে জার্মান মার্ক ও জাপানী ইয়েনের ওপর। তাদের মুদ্রার মূল্য বেশী বাড়ালে তাদের জিনিসের দাম বাড়তে বাধ্য। জিনিসের দাম বাড়লে, বিক্রি কম হবে। তাহলে আমেরিকানদের মাল বেশী বিক্রি হবে। এটি গেল একটি দিক।

ডলার অবমূল্যায়নের সবচেয়ে বড় দিকটি হল ভিয়েৎনামের যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে ১৯৭১ সালে মার্কিন সরকারের বাজেটে ঘাটতি হয় আড়াই হাজার কোটি ডলার। ১৯৭২ সালেও ঘাটতির পরিমাণ ছিল দু হাজার কোটি ডলারের মত। বাজেটে ঘাটতির দরুন প্রতি বছরে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এটিও ডলার অবমূল্যায়নের আরেকটি অন্যতম কারণ।

মার্কিনদের হিসেবে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ভিয়েৎনামে মার্কিনরা যতবার বিমান আক্রমণ করেছে তার দরুন খরচ হয়েছে ১·৭ বিলিয়ন ডলার (এক হাজার তিনশ ষাট কোটি টাকা)। এ শুধু বোমাবর্ষণের খরচ। গত ছ বছরে সে খরচ হয়েছে মার্কিনদের দশ হাজার কোটি টাকা। সামরিক বাহিনী, ইত্যাদির খরচ তার তিনগুণ। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে মার্কিন সরকার যখন হদিস পাচ্ছিল না তখন তারা ভিয়েৎনামে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হয়। এই কারণে ১৯৬৭ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ ম্যাকনামারা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ব্যয় কমাতে পরামর্শ দেন। পরে আরও অনেক মার্কিন নেতা সেকথা বলে এসেছেন কিন্তু মিঃ নিকসন সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। এতদিনে তাঁদের সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে।

হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ করে ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভাঙতে পারল না মার্কিন সরকার। তাই তারা ভিয়েৎনাম থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। তারই ফলস্বরূপ এখন তাদের মান-সম্মান-গর্ব সেই ডলারের অবমূল্যায়ন করতে বাধ্য হলেন।

এখনও ডলারের দুর্যোগ কাটেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলার ছিল বিনিময় মুদ্রার পাটরানী। সোনার বদলে এতদিন ডলার সে আসন গ্রহণ করেছিল। এতদিন ৩৪ ডলারে এক আউন্স সোনা কিনতে পাওয়া যেত। সে দাম ছিল অটুট গত চল্লিশ বছর ধরে। এতদিন পর সোনার পরিবর্তে ডলারের দাম কমল অর্থাৎ এক আউন্স সোনার দাম ৩৪ ডলার থেকে ৩৮ ডলার হল। কালোবাজারে ৪০ ডলারের মতন দাম এক আউন্স সোনার।

মার্কিনদের স্বর্ণ মজুদ ছিল ২২,০০০ টন। যার মূল্য ২৪ বিলিয়ন ডলার। এখন সে মজুদ কমে হয়েছে ১৮,০০০ টন সোনা। ১৯৬৫ সাল থেকে তাদের স্বর্ণ মজুদ কমতে থাকে।

সোনার মজুদ কমতে থাকে বলে একদল ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ বলেছেন আবার গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চালু করা হোক। অনেকে বলেন, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে না গিয়ে পেপার গোল্ড চালু করা হোক। আর ডলার নয়। ডলারের প্রভুত্ব যাতে কমে সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছে পশ্চিম ইউরোপের ধনী রাষ্ট্রগুলো। তাদের পরোক্ষে মদত দিয়ে আসছে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো। এদের অনেকে পেপার গোল্ড-এর পক্ষে। অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক থেকে যদি পেপার গোল্ডকে মেনে নেওয়া হয় তাহলে ডলারের একচেটিয়া প্রভুত্ব কমবে। তা সত্ত্বেও কিন্তু ডলারকে নড়ান যাচ্ছে না। কারণ বিশ্বের সিন্ধুকে যার যত মজুত সোনা আছে তার দুই তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। যদি ভবিষ্যতে মার্কিনদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয় তাহলে হয়ত ডলার পাটরানীর স্থান ছেড়ে দেবে। কিন্তু তার আগে অন্য কোনো মুদ্রা তার স্থান অধিকার করবে বলে এখনই কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি কমন মার্কেটের সম্প্রসারণ হয়েছে। ছয় রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেন ইত্যাদি আরও পাঁচটি রাষ্ট্র যোগ দিয়েছে। এরা মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ডলার তাদের ওপর আর খবরদারী না করতে পারে। তারা চাইছেন যাতে তাদের মিলিত মুদ্রা ও স্বর্ণ মজুতে নতুন টাকার আবির্ভাব এবং সেই টাকায় ডলারকে স্থানচ্যুত করে নতুন আসন লাভ করা।

এখন প্রশ্ন উঠেছে ডলার অবমূল্যায়নের ফলে টাকার অবস্থা খারাপ হবে কিনা। গত কয়েক বছর ধরে টাকার অবস্থা খুব ভাল নয়। সুতরাং ডলার অবমূল্যায়নে টাকার দাম বাড়ছে না। ১৯৭১ সালে যখন ডলার অবমূল্যায়ন হয় তখন টাকার দাম বাড়েনি। বরং বিনিময়হার যা ছিল প্রায় তাই ছিল। খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। এবারও ডলার অবমূল্যায়নে বিনিময় হারের খুব বিরাট পরিবর্তন হয়নি। তবে ভবিষ্যতে হতে পারে।

কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে, কিম্বা যাঁর কথা ছিল অথচ ঘটেনি, অথবা অনেক দিন আগে ঘটেছিল যা কাল মনে পড়েছে, হয়তো কাউকে দেখে অথবা কারো পুরোনো কোনো চিঠি বা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে— তারই উপর এক পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম এই রচনার বুদ্ধির দীপ্তিতে আর হৃদয়বৃত্তির গভীরতায় লক্ষ্যভেদ ...করবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঠকরাও যোগ দিতে পারেন।

পরিমল গোস্বামী

এতকাল ধরে সবার মুখে শুনে আসছি আগামী কালের কথা ভাব। সমস্ত জীবনবীমার বিজ্ঞাপনে, ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে, ঐ একই কথা। তা ছাড়া যত সুহৃৎ আছেন, তাঁরাও ঐ কথাই বলে আসছেন— কাল কি হবে ভেবে কাজ কর। গণৎকারের সামনেও হাত বাড়িয়ে বলি—কাল কি হবে বলুন। এই কাল অবশ্য আগামী ২৪ ঘণ্টার কাল নয়—সমস্ত ভবিষ্যৎ কাল। কবি যখন গেয়েছেন, 'এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তরে/ তোমার অলস দ্বিপ্রহরে।' তখনো তিনি ভবিষ্যতের অনেক কালের কথাই মনে রেখে ঐ কথা বলেছেন। এবং সবাই প্রায় আগামী কালের কথাই ভাবতে বলেন। কিন্তু সম্ভবত এই প্রথম অমৃতের কাছ থেকে গত পয়লা ফেবরুয়ারি হঠাৎ ফোনে অনুরোধ এলো—গত কালের কথা ভাবুন। ভাবুন এবং লিখুন।

কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখি কালকের দিনটা বিগত বহু বৎসর ব্যাপী 'কালকের দিন'-এর সঙ্গে একের পর এক গাঁথা হয়ে আছে, এবং সমগ্র অতীতটার সঙ্গে এবং সে অতীত শুধু আমার নয়, সমস্ত পৃথিবীর। অতএব গত ২৪ ঘণ্টার কালকের দিনটার কথা বলবার আগে এই সম্পর্কের কথাটাও একটু স্মরণ করা যাক।

৪৫০ কোটি বৎসর এই পৃথিবীর বয়স অনুমান করেন বিজ্ঞানীরা। তা মেনে নেওয়া গেল। এই ৪৫০ কোটি বছর ধরে পালাক্রমে আজকের দিন কালকের দিনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ কি তা নিয়ে খুব চিন্তা করেছেন? কারণ আদি-যুগে তো চিন্তা করার মতো জীবই ছিল না। তার পর হোমো সাপিয়েনসের আবির্ভাব। হয়তো ১০ লাখ, হয়তো ৫ লাখ বছর আগে। তারাই হয়তো আজ কাল পরশুর কথা ভেবেছে। আমার চিন্তা তাদের চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবছি। কিন্তু পরবর্তী প্রায়-আধুনিক জ্ঞানীরা শুধু গত দিনের দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি ভুলতেই বলেন। বলেন, গতস্য শোচনা নাস্তি, বলেন, লেট বাই-গনস বি বাই-গনস, বলেন, ফুরায় যা দেরে ফুরাতে, ইত্যাদি। কিন্তু অমৃত সম্পাদক এঁদের সুরে সুর মেলালে আজ আর আমাকে এ রচনা লিখতে হত না। তিনি শুধু গত দিনের কথাই ভাবতে বলেছেন। এবং শেকসপীয়র যে অন্যায় করে বলেছেন আমাদের জীবনে যতগুলি গতকাল এসেছে তারা সবাই দিনের পর দিন মূর্খদের শুধু মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে গেছে, সে কথা কোনো বিশেষ মেজাজের কথা হতে পারে, কিন্তু পুরো সত্য কথা নয়।

কত সুন্দর সুন্দর প্রতিদিনের আজ গত কাল বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আজ যাকে কাল ভাবছি, সেই গত কাল কত আনন্দ কত দুঃখ-বেদনা কত হাসিকান্না সমেত চলে গেল। কোথায় গেল? আর আসবে না ফিরে। এ কথা প্রকৃতই আমি চিন্তা করি। শুধু গত কালের কথা নয়, আজও যে মিনিটটি লিখতে লিখতে চলে যাচ্ছে তাকে আর ফেরানো যাবে না। এই মুহূর্তে যা ঘটল তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, ঘটানো যাবে না। কত বড় মর্মান্তিক ঘটনা। চলে যাওয়া কালকে ফেরাতে পারতেন একজন, তাঁর নাম বিরিঞ্চিবাবা, পরশুরামের আবিষ্কার। কিন্তু কোথায় তিনি?

রবীন্দ্রনাথ তার উপন্যাসে নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'আমার মনে হয় বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে, সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে। আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।'

এমন সুন্দরভাবে, চলে যাওয়া আনন্দের প্রহরটি, আর কারো কল্পনায় এমন সত্য হয়ে উঠেছে কি না আমার জানা নেই। আমাদের প্রতিটি দিন এই-ভাবেই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এক-একটি আংটির আকারে, কিন্তু তা কোনো বোয়াল মাছের পেট কেটেই আর পুনরা-বিষ্কৃত হবে না কোনো দিন।

কিন্তু বোধহয় এবারে আমার গত ২৪ ঘণ্টা আগের এবং সেই ২৪ ঘণ্টাব্যাপী জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির কথা বলবার সময় এসে গেল। আমি গত কাল অপে-ক্ষিত কয়েকখানি চিঠি না পেয়ে বেদনা-বোধ করেছি। আরো বেশি বেদনা বোধ করেছি পিঠের বাঁধারের পেশীতে এবং দাঁতে। সে যে কি, তা বুঝিয়ে বলার ভাষা নেই। আর সেই জনাই তার তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। ভাষাহারা বেদনার তবু একটা অব্যক্ত মাধুর্য আছে। অতএব আমি তাতে খুশি আছি। কিন্তু তৃতীয় আর একটি ঘটনা হয়তো কোনো দিন ভুলতে পারব না। ক্ষুরের ব্লেডে নিতান্তই পৃষ্ঠ-দন্তবেদনাকম্পনজাত হাতের রক্তপাত ঘটেছে মুখমণ্ডলের একটি ধারে। দুঃখ পেয়েছি বেশি এর জন্য, কারণ রক্তদান করলাম অথচ তা দেশের কাজে লাগল না। রক্তদান করলাম, অথচ ব্লাড ব্যাংকে জমা পড়ল না। রক্তের এমন অপব্যয় আমার পক্ষে বেদনাদায়ক, যদিও চামড়া কিছু কেটে যাওয়াতেও কোনো বেদনা পাইনি। কিন্তু এও ভুলেছি গত কাল পনেরোটি চাঁদা আদায়ের দলের দিনরাতব্যাপী হামলা-ঘাতে। সে যে কি মনোহর এক নতুন বাঙালী কালচারের চেহারা, তা দেখলে যত আনন্দ হয় তত করুণা জাগে মনে। বাঙালী শিক্ষা ভুলল, ভাষা ভুলল, জাতীয় অপমান ভুলল, কিন্তু চাঁদা আদায় করে স্ফূর্তি করা ভুলল না। এসব কথা মনে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত আনন্দের বদলে বেদনাটাই বেশি হয়েছিল। এরকম হওয়া অবশ্যই দুঃখের।

কিন্তু তবু কালকের দিনটা এইসব সুখ-দুঃখ ভাবনা-চিন্তা সমেত হারিয়ে গেল জীবন থেকে। আর এরা কি ফিরে আসবে? আর কি পিঠের ব্যথা দাঁতের ব্যথা এমন করে ফিরে আসবে? অপেক্ষায় শুধু থাকব, হয়তো আর ফিরে পাব না। সে জন্য অনুতাপ জাগে মনে। শুধু একটি জিনিস ফিরে আসবে। বাঙালী-হিন্দু জাতি- হিসাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে শেষবারের মতো চাঁদা আদায় করে বিস্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। শুধু এই আশায় গত ২৪ ঘণ্টার পরেও বেঁচে আছি।

লোহার বড় দরোজাকে দৃষ্টির আড়াল করে বাঁদিকের গলিতে ঢুকে পড়লো। জাহেদ আলী; তবে স্বস্তি পেলো। নয়তো বাড়ী থেকে হঠাৎ কেউ দেখে ছুটে আসতে কতক্ষণ! এখন সে ভয় নেই। নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত বোধ করলো জাহেদ আলী। শরতের নীল আকাশে ধবল মেঘের খণ্ড দেখলো। সূর্য অসম্ভব তেতে উঠেছে, চারিদিকে ঝিম ধরা নীরবতা। দূরে কাদেব বাসা থেকে কাপড় কাচার শব্দ ভেসে আসছে। নিঃসঙ্গ ঘেয়ো কুকুরের মত গলিটা ধুঁকছে।

পেছন থেকে কারা ডাকলো। চমকে উঠলো জাহেদ আলী। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইলো। ঋণের দরোজায় কাবুলিওয়ালা এসে দাঁড়ালে যেমন মিথ্যে ভাষণে লুকিয়ে পড়েন গৃহকর্তা, তেমনি জাহেদ আলী দু হাতে মুখ ঢেকে বলতে চাইলো, আমি নেই।

ওরা আরও কাছে এসে চেঁচিয়ে ডাকলো, মামা, ও মামা...।

যেন আর কোনো গত্যন্তর নেই, এমনি অসহায় ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো মিথ্যের দরোজা খুলে। ওদের দিকে মুখ নামিয়ে চাপা স্বরে বললো, আস্তে বল, কেউ শুনতে পাবে।

ওদের মাঝে যাকে দলনেতা মনে হয়, বয়সে বড়, চালাক চতুর এবং সাহসী, নিচু স্বরে বললো, মামা, মনে আছে তো?

কি রে?

ঐ যে, আমাদের কাছ থেকে তুমি লজেন্স ধার করেছিলে।

না, মিথ্যে বলছিস।

বাঃ, মিথ্যে হবে কেন, তোমার মনে নেই?

কি?

অনেক আগে আমাদের কাছ থেকে লজেন্স ধার করেছিলে। দলনেতা সমর্থনের আশায় সঙ্গীদের দিকে তাকালো, তোদের মনে আছে না?

সবাই চেঁচিয়ে বললো, হ্যাঁ মামা, তুমি ধার করেছিলে।

জাহেদ আলী কেমন বিব্রত বোধ করে। বললো, সত্যি বলছিস তো?

তোমার খাতায় লেখা রয়েছে, দ্যাখো না।

জাহেদ আলী এতক্ষণে স্বস্তি পেলো। পকেট থেকে সযত্নে খাতা বের করে বললো, আমি সবার নাম লিখে রাখি। কেউ ফাঁকি দিতে পারে না, বুঝলি। বল, তোদের সবার নাম বল।

সবার মুখ দিয়ে এক ডজন নাম গড়-গড়িয়ে বেরিয়ে গেলো।

জাহেদ আলী খাতায় ঝুঁকে পড়ে মিলিয়ে দেখতে দেখতে সারা মুখ উজ্জ্বল করে বললো, পেয়েছি।...ইস, কি ভুলটা হয়েছিলো!

গলির শেষে বড় রাস্তার মাথায় রহমতের মনোহারি দোকান। একবার জাহেদ আলী ক্রোধে রহমতের দোকানের জিনিস-পত্র ভেঙেছিলো। কারণ, রহমত জাহেদ আলীকে ধারে জিনিস দেয়নি। জাহেদ আলী তার ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। রহমত অবশ্য ক্ষতিপূরণের বেশী টাকাই পেয়েছিলো। এবং সেই সঙ্গে নির্দেশ পেয়েছিলো—জাহেদ আলী কখনো যদি কোনো জিনিস চায়, দাম লিখে রেখে তা যেন দিয়ে দেয়া হয়।

জাহেদ বললো, রহমতের দোকানে চল, তোদের সবার ঋণ শোধ করে দেবো।

একজন ভয় পেয়ে বললো, না মামা, রহমত আমাদের দেখলে তেড়ে আসবে। তুমি গিয়ে লজেন্স নিয়ে এসো, আমরা এখানে আছি।

জাহেদ হেসে বললো, দূরে বোকা, তোদের মারতে আসবে কেন! তোরা কি ধার করেছিস? ধার করেছি তো আমি। তোদের ভয় কিসের?

তবুও ভয় পায় না। ওরা সবাই রহমতের দোকানের অদূরে দাঁড়িয়ে রইলো। জাহেদ রহমতের দোকানে গিয়ে, যেন খুব বিপদে পড়েছে এমন অসহায় স্বরে বললো, দ্যাখো তো রহমত, কি মুস্কিলে পড়েছি। অদূরে দাঁড়ানো ছেলে-দের দিকে আঙুল দেখিয়ে লজ্জায় হাসলো, ওদের কাছ থেকে লজেন্স ধার করেছিলাম, এখন শোধ দিতে হবে।

রহমতের কিছু যায় আসে না, দাম সে ঠিকই পাবে, তবু ওর কি যে স্বভাব, যেন ওকে কেউ প্রবল ভাবে ঠকিয়ে নিচ্ছে। ক্রোধে সে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললো, লজেন্স কেউ ধার করে নাকি! ওরা মিথ্যে বলেছে...।

আরে না না। জাহেদ আপত্তি জানিয়ে পকেট থেকে খাতাটা বের করে বললো, দ্যাখো না, সবার নাম আমি লিখে রেখেছি। কেউ আমাকে ঠকাতে পারবে না...।

দু হাতের মুঠিতে যতগুলি লজেন্সের প্যাকেট নেয়া যায়, জাহেদ নিজ হাতে তুলে নিলো। রহমতকে হেসে বললো, তোমার নাম আমি লিখে রেখেছি, রহমত। তোমাদের সবার ঋণ আমি শোধ করে দেবো। আমি কাউকে ঠকাই না...।

।।থ।।

মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দু চোখ গর্তের ভেতর পিট পিট করছে। দুপুরের প্রবল উজ্জ্বল আলো যেন সহ্য হচ্ছে না, অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত জ্বলে উঠবে। মুখমণ্ডলের কাঠামো ভেঙে গেছে, গালের মাংস নেই, চোয়ালের হাড় সামনের দিকে বেরিয়ে এসেছে। এবং বিশাল বক্ষ শুধু ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ। দেহের বলশালী কাঠামো এখনো রয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্য হারিয়েছে।

জাহেদকে দেখে বর্ণিত লোকটির দু চোখ আশার আলোতে ভরে উঠলো। দ্রুত এগিয়ে এসে সালাম দিলো।

জাহেদ দূরে থেকে দেখছিলো, লোকটি উজ্জ্বল চোখে তাকে দেখছে। জাহেদ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছে। পার্কের যে নিরিবিলি বেঞ্চটায় বসেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতমুখী হয়ে আকাশ দেখায় মনো-যোগী হয়েছে।

লোকটি ভীরু কাঁপা গলায় ডাকলো, স্যার...।

জাহেদ আলী যেন বধির। কোনো শব্দ তার শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। আকাশের সৌন্দর্যে কিংবা আপন ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে ছিলো।

লোকটি আবারও বললো, হুজুর, আমাকে চিনতে পারলেন না।

জাহেদ এবার লোকটির মুখোমুখি হয়ে বসলো, তুমি কে?

হুজুর, আমি রহিম শেখ।

রহিম শেখ কে?

রহিম শেখ হঠাৎ খুব বিব্রত বোধ করলো। আত্মপরিচয় কি ভাবে দেয়া যায় বুঝতে না পেরে আবারও বললো, হুজুর, আমাকে ভুলে গেছেন। আমি রহিম শেখ।

রহিম শেখের কণ্ঠস্বর করুণ শোনালো। নিজের নাম ছাড়া লোকটির অন্য আর কোনো আত্মপরিচয় নেই। জাহেদ আলী এবং আলী জুট মিলের সবাই তার নাম শুনে একডাকে চিনতে পারবে, এমন বিশ্বাস রহিম শেখের ছিলো।

হুজুর, আমি আপনাদের মিলের ফোরম্যান ছিলাম। ফোরম্যান রহিম শেখ।

জাহেদ আলী একদৃষ্টিতে রহিম শেখের অবয়ব দেখছিলো, ঝাউ শাখার মত দু-পাশে মাথা দুলিয়ে বললো, আমি চিনি না...।

রহিম শেখ মরিয়া হয়ে উঠেছে। না, সে হারিয়ে যেতে পারে না। মিলে তার দীর্ঘদিনের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, মালিক মহলের বিশেষ স্নেহদৃষ্টি সব আজ মিথ্যে হয়ে গেছে? গলা নামিয়ে রহিম শেখ চাপা স্বরে বললো, হুজুর, আপনার আব্বা বড় সাহেবের পেয়ারের লোক আমি সেই রহিম শেখ। বড় হুজুরের সামান্য ইংগিতে আমি কতবার জীবন বিপন্ন করে হুজুরদের আদেশ পালন করতে ছুটে গেছি। শ্রমিকদের বস্তিতে আগুন লাগিয়েছি, হরতাল ভেঙে দিয়েছি...শ্রমিক ইউনিয়নের গণ্ডগোল লাগিয়ে দল ভাঙিয়েছি...।

জাহেদ আলী রহিম শেখের চোখের ভেতর জ্বলে উঠতে দেখলো আগুনের শিখা। শ্রমিকদের বস্তি জ্বলে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অসহায় মানুষের বীভৎস করুণ চিৎকার। অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের একতায় ভাঙন ধরেছে, দাবী জোড়ে কঁচোর মত পূর্ব-সীমানায় উঠে আসছে হায়-সম্বলহীন মানুষগুলি। শুধু হাস্তে জয়ী হয়ে ফোরম্যান রহিম শেখ হাতে মালিকপক্ষের আশীর্বাদ, টাকা ও নিয়ে বিশাল ভয়াবহ দেহ কাঁপিয়ে হাসে হাসছে। এবং মিল মালিক রাহামত আলীর অবয়বে বিজয়ের নিষ্ঠুর আনন্দ।

ধীরে ধীরে জাহেদের স্মরণে ভেসে আসছে, মালিক পক্ষের পোষাপন্ন শ্রমিকদের স ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আলী জুট মিলের ফোরম্যান রহিম শেখের ছবি...।

তুমি রহিম শেখ?

জী, হুজুর। রহিম শেখের দু' চোখ অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত সহসা

জ্বলে ওঠে। আমাকে চিনতে পেরেছেন, হুজুর।

জাহেদ মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ। তুমি রহিম শেখ। বাবা তোমাকে খুব ভালো-বাসতেন।

বড় সাহেব ছিলেন ফেরেসতা। তাঁর মতো মানুষ হয় না। উনি যতদিন ছিলেন, আমার কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না। উনি জান্নাতবাসী হলেন, আর আমার কপাল পুড়লো। মেজো সাহেব আমাকে মিল থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

তোমাকে তাড়িয়ে দিলো কেন?

হুজুর, সব দোষ ঐ ইউনিয়ন সেক্রেটারীর। আজ যদি বড় সাহেব বেঁচে থাকতেন, তাহলে ব্যাটাকে গুম করে ফেলতাম।

রহিম শেখের কোটরগত চোখের তারায় ফুটে ওঠে অতীত দিনের নৃশংস উল্লাস। হাতের কাছে পেলে যেন এখনই প্রতিপক্ষকে খুন করে ফেলতে পারে। জাহেদ আলী ভয়ে শিউরে ওঠে, দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। ভেবে পেলো না, লোকটা কেন এসেছে, তার কাছে কি চায়?

হুজুর, আপনি আমাকে বাঁচান। লোকটির কণ্ঠস্বর নিচু তে নেমে এসে কাঁপতে থাকে যেন অতীতের ভয়াবহ সেই লোকটি আর কেঁদে ফেলবে। এত অসহায় করুণ বর্তমান রহিম শেখ। ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে মরে যাবো। এই বুড়ো বয়সে কেউ আমাকে চাকরি দিতে চায় না। আমার কি হবে হুজুর?

জাহেদ কিছু বুঝতে না পেয়ে বার বার নিজের বিরত মুখমণ্ডল দেখতে থাকে।

হুজুর, আপনি মেজো সাহেবকে একটু বলে দিলেই আমার চাকরি হয়ে যায়। আপনি বড় ভাই, আপনার কথা মেজো সাহেব ফেলতে পারবেন না।

না, না। জাহেদের চোখের মণি ভয়ে শিউরে ওঠে। ত্রস্ত উঠে দাঁড়িয়েছে, পালাতে চাইছে রহিম শেখের দৃষ্টির জাল ছেড়ে।

হুজুর! আপনাদের এত কাজ করেছি, আমাকে শুধু এইটুকু শোধ দিন, হুজুর...। না হলে আমি মরে যাবো...।

পালাতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে জাহেদ। শোধ? কিসের শোধ? ঋণের? জাহেদ বললো, আমি তোমার ঋণ শোধ দেবো।

দেবেন হুজুর!

হ্যাঁ। আমি কাউকে ঠকাই না। সবার নাম আমি খাতায় লিখে রেখেছি।

রহিম শেখ কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

তোমার নাম বলো?

রহিম শেখ, ফোরম্যান রহিম শেখ...।

ময়লা জীর্ণ খাতাটা পকেট থেকে সযত্নে বের করে জাহেদ আলী গভীর মনোযোগ দিয়ে দীর্ঘ নামের তালিকা লক্ষ্য করছিলো। এক সময়ে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠলো, চোখের তারায় উত্তেজনা তির তির করে কাঁপছে।

পেয়েছি! রহিম শেখ, তোমাকে পেয়েছি...।

রহিম শেখ এখন জাহেদ আলীর কাণ্ড কারখানা দেখে ওর প্রয়োজনের কথা ভুলে গেছে। কৌতূহল অনুভব করছে বেশী—পেয়েছেন, হুজুর?

এইতো, দ্যাখো না, রহিম শেখ পাঁচ হাজার টাকা...।

রহিম শেখ বাংলা পড়তে জানে, খাতায় ঝুঁকে পড়ে সে নিজের নাম দেখতে পেলো না। পেন্সিলের অস্পষ্ট আঁচড়ে জাহেদ আলী নিজের নামই বেশী অংশ জুড়ে লিখেছে, আরো আছে আলী জুট মিলের মালিকদের নাম, তাদের ছেলে-মেয়েদের নাম, আরো কিছু অচেনা নাম। নামের পাশে বড় বড় টাকার অংক লিখে রেখেছে।

জাহেদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, দেখলে তো, আমি ঠিক লিখে রেখেছি। তুমি পাঁচ হাজার টাকা পাও...।

পাঁচ হাজার টাকা। রহিম শেখ প্রথমে চমকে উঠলো। পরে ভয় পেলো। দু চোখের লোভ শবের গন্ধ পেয়ে শিয়ালের মত জ্বলে উঠছে। চকিতে চারপাশ চেয়ে নিলো রহিম শেখ। না, কেউ তাদের লক্ষ্য করছে না, তাদের কথা শুনছে না।

জাহেদ মৃদু হাসলো, হ্যাঁ, এইতো স্পষ্ট লেখা আছে। আমার ভুল হয় না।

রহিম শেখ চাপা উত্তেজিত স্বরে বললো, হুজুর, আমার টাকা কবে দেবেন? আমার টাকার খুব দরকার। কাল দেবেন?

বেশ, কাল দেবো।

এখানে, এই সময়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। মেজো সাহেবের কাছে টাকা চাবেন না। উনার আলমারি থেকে চুপি চুপি নিয়ে আসবেন। খবরদার, কাউকে বলবেন না।

জাহেদ হেসে বললো, আরে না, আমি অত বোকা না। কালকে তোমাকে ঠিক শোধ করে দেবো।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যায়ও জাহেদ ফিরে এলো না।

সারা বাড়ী বিষণ্ণ হৃদয় নিয়ে বসে ছিলো। সবাই উদ্বিগ্ন, গম্ভীর, চকিত নিচু স্বরে কথা বলছে, যেন কেউ শুনে না ফেলে, এ বাড়ীর বিষণ্ণতা ভেঙে না যায়।

দু' গাড়ীতে লোক গিয়েছে জাহেদ আলীকে খুঁজতে। থানায় খবর গিয়েছে—জাহেদ আলী পালিয়েছে, ধরে আনো।

মিল থেকে ফেরার পর শাহেদ আলীর কানে খবরটা দিতে কেউ সাহস করে নি।

শাহেদ প্রতিদিন বিকেলে একবার বড় ভায়ের ঘরে এসে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করেন। বাড়ীর সবাই ভেবে রেখেছে তার আগেই জাহেদ আলীকে ফিরিয়ে আনা যাবে।

বৈকালিক চায়ের টেবিলে শাহেদের স্ত্রী নীলাই জানালো, শুনেছো, বড় ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে! কোথায় গিয়েছে?

দুপুর বেলা চুপি চুপি কোথায় যেন চলে গেছে।

শাহেদ রেগে গেলো, বাড়ীর এতগুলি লোক কি করছিলো? তারা দেখলো না?

নীলা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো, ড্রাইভারদের খুঁজতে পাঠিয়েছি, থানায়ও খবর দেয়া হয়েছে।

শাহেদ আলী চায়ের টেবিল থেকে উঠে এসে বারান্দায় নির্জন কোনায় গুম মেরে বসে থাকলো। ভেতরের ক্রোধ ক্রমশঃ বাড়ছে। দিন দিন কি যে হচ্ছে, মান-সম্মান রেখে আর চলা যাবে না। পানওলা-মুদি-ওলা এসে নালিশ করে যাবে, রাস্তায় যার-তার কাছে ধার করবে, ছিঃ ছিঃ...। আপন বড় ভাই, বেঁধে রাখারও উপায় নেই। সামান্য ভুলভ্রান্তি হলে বিবেক চোখ রাঙায়।

ওয়াহেদ আলী বাইরে বেরুবার পোষাকে শাহেদের কাছে এসে বললো, মেজ ভাই, মন খারাপ করে কি হবে। বড় ভাই তো অমনি। চলো ক্লাব থেকে বরং ঘুরে আসি...।

শাহেদ গম্ভীর গলায় বললো, তুমি যাও।

যেতে বলছো, ওদিকে ড্রাইভার দুজন বেরিয়েছে বড় ভাইকে খুঁজতে। যাই কি করে? না, বড় ভাইটা জ্বালিয়ে মারলো।

ওয়াহেদ বিরক্ত হয়ে চলে গেলো।

গেটে কোলাহল শুনে শাহেদ নিচে নেমে এলো। জাহেদ আলীকে ড্রাইভার ধরে এনেছে। জাহেদের নোংরা জামা কাপড় দেখে শাহেদের ক্রোধ আবার জেগে উঠলো। এগিয়ে এসে রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় গিয়েছিলে?

জাহেদ ভয়ে অসহায় শিশুর মত কেঁদে ফেললো, আমি কোথাও যাইনি। ওরা মিথ্যে কথা বলছে...।

রাগ করবে কি, শাহেদের চোখে কান্নার কুয়াশা ঘনিয়ে এলো। কণ্ঠস্বরে রাগ ছড়িয়ে নিজেকে লুকিয়ে বললো, ঘরে চলো।

না না, আমি যাবো না। তুমি আমাকে ঘরে আটকিয়ে রাখবে।

চারপাশ থেকে চাকর ড্রাইভার চলে গিয়েছে। শাহেদ সেই কৈশোরে যেমন আদুরে গলায় ডাকতো, তেমনি গলা নিচুতে নামিয়ে ডাকলো, ভাইয়া, ঘরে চলো।

তবুও জাহেদের ভয় যায় না। দু'চোখে সন্দেহ ঝুলে থাকে। মাথা দুলিয়ে বলে, না, ঘরে যাবো না।

শাহেদ আর রূঢ় হতে পারে না। রক্তের ভেতর কষ্টের স্রোত অনুভব করে। জাহেদকে আর কিছু বললো না। শোভনকে ডেকে বললো, তোমার চাচাকে ঘরে নিয়ে এসো।

শোভন জাহেদের হাত ধরে ডাকলো, চাচা এসো।

শোভনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জাহেদ মাথা দুলিয়ে বললো, যাবো না। ওরা আমাকে আটকে রাখবে। বাইরে যেতে দেবে না।

শোভনের কচি বুকে কষ্ট দুলে ওঠে, চাচা, তোমাকে বাইরে যেতে দেয় না কেন?

চারিদিকে তাকিয়ে শোভনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে জাহেদ কান্নার স্বরে বলে, ওরা বলে আমি পাগল। শোভন, আমি পাগল?

ওরা কিচ্ছু জানে না। কে বলেছে তুমি পাগল?

ওরা যে বলে। আমাকে বাইরে যেতে দেয় না।

মার শিখিয়ে দেয়া কথাগুলি শোভনের মনে পড়ে। চাচাকে পাগল বলতে নেই, গুনাহ্ হয়। তোমার চাচার অসুখ হয়েছে, আবার ভালো হয়ে যাবেন।

শোভন বলে, ওরা মিথ্যে কথা বলে। তুমি খুব ভালো। জানো চাচা, মা রোজ তোমার জন্য দোয়া করেন। তুমি আবার ভালো হয়ে যাবে।

তোর মা ঠিক আমার মার মত। মা নামাজ পড়ে আমার জন্য দোয়া করতেন। তোর মাকে আমার মা ডাকতে ইচ্ছে করে।

যাঃ!

জাহেদের হাত ধরে শোভন ঘরে নিয়ে এলো। শোভন বললো, আজ কোথায় গিয়েছিলে চাচা?

জাহেদ নিচু গলায় বললো, কাউকে বলবি না তো?

শোভন দু'পাশে মাথা নেড়ে জানালো, সে কাউকে বলবে না।

আজ অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম। ইস্, কত কি যে দেখেছি! জাহেদ হঠাৎ সুর হারিয়ে ফেলে। কোথায় যেন গিয়েছিলাম? জাহেদ মনে করতে পারছে না, সে আজ পার্কে শুয়েছিলো, ছেলেদের লজেন্স কিনে দিয়েছে, রাস্তার কল থেকে পানি টেনে খেয়েছে, একটা ষাঁড়কে তাড়িয়ে দিয়েছে, আকাশ দেখেছে, বাতাসের সুবাস নিয়েছে.....।

কাউকে বলিস না, তোকে একদিন নিয়ে যাবো। বাইরে কত কি যে দেখার আছে!

শোভন সুবোধ বালকের মত ঘাড় হেলে সায় জানালো, আচ্ছা।

কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে জাহেদ কি যেন ভাবলো। পরে কাতর ভঙ্গিতে বললো, শোভন, আমাকে দু'টা টাকা দিবি?

শোভনের হঠাৎ মনে পড়েছে, আনন্দে বললো, চাচা, তোমার জন্য আমি টাকা জমিয়েছি। দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

জাহেদ পেছন থেকে চুপিচুপি সাবধান করে দিলো, তোর বাবাকে বলিস নে, খবরদার, কেউ যেন দেখতে না পায়।

শোভন একদৌড়ে ওর বইয়ের সুটকেস নিয়ে ফিরে এলো। জাহেদ উঠে দরোজা বন্ধ করে দিলো। শোভন সুটকেস থেকে পয়সা বের করে বললো, চাচা, আমি তোমার জন্য পয়সা জমাই। এই দ্যাখো এক টাকা সত্তুর পয়সা জমিয়েছি।

জাহেদ পয়সাগুলি গুনে নিয়ে চাপা স্বরে বললো, কেউ দ্যাখেনি তো?

কেউ দ্যাখেনি।

পকেট থেকে খাতাটা বের করে জাহেদ বললো, শোভন, তোর নামও লিখে রেখেছি। তোর সব টাকা আমি শোধ করে দেবো।

চাচা, আমাকে শোধ দিতে হবে না। আমি তোমাকে এমনি দেই।

যা, এমনি কেউ দেয় নাকি! সবার কাছে সবার কিছু না কিছু পাওনা থাকে, সে ঋণ শোধ দিতে হয়। একদিন তোকে দিতে হবে।

আমি তো কারোর কাছে ধার করি না।

বেঁচে থাকতে হলে ধার করতে হয়, একদিন তোকেও করতে হবে।

শোভন কিছু বুঝতে পারে না। অবাক চোখে জাহেদ আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। জাহেদ হেসে বলে, এই দ্যাখ তোর নামও লিখে রেখেছি। সব শোধ করে দেবো।

।। ঘ ।।

সাতদিন জাহেদ আলী বেরুতে পারে না। যখনই বেরুতে যাবে, জলের ওপর ধ্যানমগ্ন মাছরাঙার মত কেউ না কেউ তেড়ে আসে। জাহেদ আলী নিজের ঘরে ফিরে আসে। খাতা খুলে সারাক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকে। তার ঋণ হয়তো শোধ করা হবে না। করিম শেখকে ভুলতে পারেনি।

ওয়াহেদকে দেখে জাহেদের ভয় হয়। ও কখনো জাহেদকে ঘরে আটকে রাখে না। ওয়াহেদকে একাকী বেরুতে দেখে জাহেদ ছোটবেলার সেই আদুরে নামে ডাকে, হেদু, শোন্...।

ওয়াহেদ এগিয়ে এসে বিরক্ত স্বরে বললো, কি?

আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দে না, দরকার। তোকে আমি শোধ করে দেবো।

অত টাকা দিয়ে কি করবে? যা দরকার সেজ ভাইকে বলো, কিনে দেবে।

জাহেদ ভয় পেয়ে বলে, না না, ওকে বলিস না। তুই দে, আমি শোধ দেবো। ...

নাম আমি লিখে রেখেছি, এই দ্যাখ। আমি কাউকে ফাঁকি দেই না...।

ওয়াহেদ রেগে বললো, তোমার সঙ্গে পাগলামি করার সময় আমার নেই। যা চাওয়ার মেজ ভায়ের কাছ থেকে নিও।

জাহেদ বিষণ্ণ মন নিয়ে বসে রইলো। সময় হয় না, সুযোগ মেলে না। জাহেদ শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে থাকে।

একদিন সুযোগ বন্ধুর মত জাহেদের সীমানায় এসে দাঁড়ালো।

দুপুরে লাঞ্চের সময়ে শাহেদ বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ীর সবাই সে সময় একটু অতিরিক্ত ব্যস্ত, জাহেদের প্রতি দৃষ্টি কিছুটা শিথিল। জাহেদ সাধারণতঃ সারাক্ষণ নিজের ঘরে থাকে, কখনো ইচ্ছে হলে উপরে উঠে এসে শোভনের খোঁজ করে। সেদিন জাহেদ জানতো না, শাহেদ অসময় দুপুরে বাড়ী ফিরেছে। দোতলায় উঠে শাহেদকে দেখে চমকে উঠলো। শাহেদ আয়রণ সেফে টাকা তুলে রাখছে, জাহেদকে দ্যাখেনি। জাহেদ ভয় পেয়ে পালিয়ে এলো। নিজেকে লুকিয়ে রাখলো। না, তাকে কেউ দ্যাখেনি। আবার পা টিপে টিপে শাহেদের ঘরে উঁকি দিলো, ঘরে কেউ নেই। স্বর্গের গন্ধর্ব ফলের মত গোলাব ঘরে চাবি ঝুলছে। ঘরে ঢুকে সেলফের দরোজায় টান দিতে খুলে গেলো। জাহেদের ইচ্ছে হলো, সে এখন পাখি হয়ে যায়, এ বাড়ীর দেয়ালের সীমানা ছাড়িয়ে উড়ে পালায়।

জাহেদকে বেশীদূর এগুতে হলো না। রহিম শেখ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। প্রতিদিন রহিম শেখ পার্কের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতীক্ষা করেছে, এ-বাড়ীর প্রতি নজর রেখেছে। যেন নিশ্চিত জানতো, জাহেদ আলীকে একদিন বেরিয়ে আসতে হবে এবং সেই হবে তার বেঁচে থাকার একমাত্র শেষ সুযোগ।

এ কদিনে রহিম শেখের দাড়ি আরো বড় হয়েছে, চোখের তীক্ষ্ণতা বেড়েছে। হিংস্রতায় এবং উল্লাসে দু'চোখ যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠবে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে রহিম শেখ চাপা উত্তেজনায় জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর, এনেছেন?

এনেছি।

জাহেদ পকেট থেকে টাকা বের করতে যাবে, রহিম শেখ বাধা দিলো, হুজুর, এখানে না, আমার সঙ্গে চলুন। জাহেদের হাত ধরে রহিম শেখ রিক্সায় চড়ে বসলো।

জাহেদ যতবার রহিম শেখকে কিছু বলতে চেয়েছে রহিম শেখ বাধা দিয়ে বলেছে হুজুর, এখানে না। এখানে অনেক লোক।

শহরের উপকন্ঠে এসে রিক্সা থামলো। রিক্সা থেকে নেমেও জাহেদ কিছু বলতে পারেনি। রহিম শেখ হাত ধরে নিয়ে গেছে আরো নির্জনে—যেখানে কোনো লোকালয় নেই, কোনো তীক্ষ্ণ চিৎকারও লোকালয়ে পৌঁছবে না।

রহিম শেখ কপালের ঘাম মুছে হাসলো। যেমন আলী জুট মিলের স্বর্গতঃ মালিক রাহাত আলীর নির্জন ঘরে কোনো গোপন নির্দেশ শুনে মৃদু, নিঃশব্দ আনন্দে হাসতো। বললো, এবার বলুন হুজুর, এখানে কোনো লোক নেই।

জাহেদ কত টাকা এনেছিলো জানতো না। পকেট থেকে এক-একটা টাকার তোড়া বের করে রহিম শেখের হাতে দিয়ে বললো, তোমার ঋণ শোধ করে দিলাম।

রহিম শেখ মনে মনে বললো, এবার আমরা শোধ দেবার পালা। রহিম শেখের কোমরের গোপন থেকে বেরিয়ে এলো চকচকে ধারালো ছোরা......।

।। ৬ ।।

মাঝ রাতে থানা থেকে খবর পেয়ে শাহেদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। বিমূঢ়ের মত অনেকক্ষণ টেলিফোন হাতে নিয়ে বসে ছিলো। নামিয়ে রাখার কথা মনে ছিলো না। তারপর একে একে সবাই জানলো। সেই অত রাতে বাড়ীর সবাই একটা শোকের জন্য প্রস্তুত হলো।

তখনো জাহেদের জ্ঞান ফেরেনি। শহরের সব নামী-দামী ডাক্তার ঘড়ির কাঁটা ধরে বসে আছেন। সব ডাক্তারদের প্রবীণ ভ্রূ কুটিল এবং ভয়ংকর। দর্শনপ্রার্থী সবাই চোখে জল নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। শাহেদ শুধু মৃত্যুকে দেখার জন্য হসপিটালে থেকে গেলো।

জাহেদের কাছে ধীরে ধীরে সব খোলসা হয়ে যাচ্ছে। একেবারে শরতের নির্মেঘ আকাশের মত ঝরঝরে হাল্কা। চেতন-অচেতনের মাঝে স্বপ্নে-জাগরণে কৈশোর থেকে যৌবন এবং চল্লিশোত্তর এই বার্ধক্য—চলচ্চিত্রের মত সব ভেসে যাচ্ছে। মা নামাজ পড়ে জাহেদের সারা দেহে আশীর্বাদের শীতল পরশ বিছিয়ে দিচ্ছেন। মাঝ রাতে জাহেদের ঘুম ভেঙে যেতো, সিঁড়িতে বাবার বেসামাল ভারী পদশব্দে, অশ্লীল চিৎকারে। বাবার মিল বড় হচ্ছে, টাকা বাড়ছে, শ্রমিক-দের বিক্ষোভ বাড়ছে। মিল বন্ধ, শ্রমিকদের ঘরবাড়ী জ্বলছে, বাবা হাসছেন। মা কেঁদে বলছেন, একদিন সব শোধ দিতে হবে......। জাহেদ ও শাহেদ মামার বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখলো মার কবর। তাদের আকৈশোর বুড়ো চাকর রহমত দাদু নেই। জাহেদের মনের ভেতর বোধ চিৎকার করে বললো, মাকে বাবা খুন করেছে......। সিঁড়ির দরোজায় সন্তানসম্ভবা রাত্রি স্বাধিকারের ভয়ংকর ক্রোধ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাহেদ বেসামাল ভারী পা ফেলে এগিয়ে এসে লাথি দিয়েছিলো। বাবা টাকা দিয়ে আইনের পথ বন্ধ করেছিলেন। ডাক্তারের রিপোর্ট এসে-ছিলো, পা ফসকে পড়ে গিয়ে অতিরিক্ত রক্ত-ক্ষরণের ফলে মৃত্যু। জাহেদ পালিয়ে গেলো। একমাস পর যে জাহেদ ফিরে এলো, সে অন্য মানুষ—কারোর সঙ্গে কথা বলে না, কখনো আনমনে হাসে, কাঁদে এবং ঋণের হিসেব রাখে......।

শেষ রাতে অবয়বহীন একজন লোক জাহেদের ঘরে প্রবেশ করে ডাকলো, এবার ওঠ।

জাহেদ চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে?

ঐশ্বরিক আলোতে লোকটির দু'চোখ জ্বলে ওঠে তুই ঋণ শোধ করেছিস?

বলুন, আপনার কাছ থেকে আমি কি ঋণ করেছিলাম?

তুই জীবন ধার নিয়েছিলি। এখন শোধ দে।

খাতায় আমি সবার নাম লিখে রাখি। আপনার নাম বলুন।

আমি মৃত্যু।

জাহেদ খাতার মাঝে মৃত্যুকে কোথাও খুঁজে পেলো না। একপাশে দেখলো রাত্রি এবং তার ভ্রূণের জীবন সে হরণ করেছিলো। মৃত্যু তার কালো হাত বাড়িয়ে ডাকলো, উঠে আয়, তোকে শোধ দিতে হবে।

জাহেদের কোনো দুঃখ ছিলো না; একটুও ভয় পায়নি। ঋণ পরিশোধের প্রশান্তির হাসি ছিলো তার মুখে।

গৃহসজ্জায় ফুল

ঘর সাজাতে আমরা ফুলের ব্যবহার যে খুব করি তা নয়। বিশেষ দিনে বা বিশেষ পূজো পার্বণে ফুল দিয়ে আমরা কিছু সাজাই ঠিকই, কিন্তু ফুল যে ঘরের শোভা বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে এ বিষয়ে আমরা মোটেই সচেতন নই। তবে আনন্দের কথা, এ বিষয়ে আমাদের সচেতনতা যে আসছে তার লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। যদিও তা আসছে খুব ধীর গতিতে। আমাদের সমতল বাংলায় বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফুলের সমাবেশ। প্রচুর ফলের সঙ্গে রয়েছে ফুলের বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য। গৃহসজ্জায় সচেতন যে-কোন দেশের পক্ষে এ অবস্থা একান্ত কাম্য।

গৃহসজ্জার প্রতি সচেতনতা খুব অল্প দিনের এবং তাও খুব স্বল্প সংখ্যকের ভেতরে সীমিত, তাই গৃহসজ্জা তথা পুষ্পসজ্জার কোন নিজস্ব রচনাশৈলী এদেশে এখনও গড়ে ওঠেনি। এ বিষয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং সবচেয়ে বেশি চলছে অন্যান্য দেশের বিভিন্ন পুষ্পসজ্জার রচনাশৈলীর অনুকরণ। গৃহসজ্জার আমাদের একটি আলাদা রীতি গড়ে উঠবে কারণ এখানে যেসব পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুল পাওয়া যায় তার বেশ কিছু ফুল পাশ্চাত্যে বা জাপানে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই শুধু অনুকরণ করে চলা স্বাভাবিক নয় এবং তা উচিতও হবে না। একটি দেশের পুষ্পসজ্জার রচনাশৈলী গড়ে ওঠে অনেক কিছু জিনিসকে কেন্দ্র করে। উপযুক্ত ফুল ছাড়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, ঘরবাড়ীর গড়ন, ব্যক্তির রুচিবোধ প্রভৃতি এর ভিতরে প্রধান। এবং এগুলির ভিতরেও প্রধানতম স্থান রুচিবোধের। রুচির বেলায় বৈচিত্র্য থাকবেই এটা সর্বজন স্বীকৃত। শিল্পীর স্বকীয়তার স্বাক্ষর সৌন্দর্যময় হয়ে ফুটে উঠলে তবেই সে পুষ্পসজ্জা সবার মনে দাগ কাটে। এ দেশের নিজস্ব কোন রচনাশৈলী না থাকায় সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলারও নেই। তাই এ নিবন্ধে গৃহসজ্জার বিভিন্ন দিক তুলে ধরবো এবং মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করব কিভাবে অনেকে সাজাতে পছন্দ করেন তার প্রতি।

যে ফুলগুলি কাটা অবস্থায় ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে কয়েক দিন ধরে শুধু তাদেরই সংগ্রহ করা চলে বাজার বা দূরে জায়গা থেকে। যেগুলি ভাল থাকে একদিন বা শুধু একবেলা তাদের যোগাড় করতে হবে নিজেদের বাগান থেকেই। ফুল সুপ্রভ রাখতে ফুল কেটেই ডাঁটির কাটা দিকটি ডুবিয়ে দিতে হবে জলের ভিতরে। দূরে থেকে ফুল সুপ্রভ অবস্থায় সহজে আনতে খুব ভাল কাজ দেবে একটু মোটা পলিথিনের ছোট ব্যাগগুলি। ঐ ব্যাগে জল ভরে তার ভিতরে ডাঁটিগুলি ঢুকিয়ে তা ভাল করে বেঁধে দিতে হবে, এভাবে ফুল সব সময়েই তার প্রয়োজনীয় জল পেতে পারবে। ফুল ঘসে গেলে খারাপ দেখাবে তাই সদাই সতর্ক থাকা দরকার যাতে এগুলি ঘসে না যায়। ফুল কাটা উচিত সকালে বা বিকালে এবং ফুলের ডাঁটি কাটতে হবে তেরছাভাবে।

ভিক্ষু বুদ্ধদেব

ফুল ফোটা টবের গাছ দিয়ে সাজানো

কাটা ফুল ছাড়াও ফুল ফুটেছে এরকম টবের গাছ দিয়ে ঘর চমৎকার সাজানো চলে। একাজে এদের সঙ্গে পাতাবাহার ও অন্য বাহারি পাতার গাছেরও ব্যবহার রয়েছে। টবে করা স্বল্প আয়তনের সব কন্দজ গাছ ফুলফোটা অবস্থায় ঘর সাজাবার কাজের বেশ উপযুক্ত। বড় ফুলের হেমেন্থাস ও ছোট আকৃতির কিন্তু নধর দর্শন টবের কচিয়া পাশাপাশি সাজালে চমৎকার মানায়। এদের সাজানো চলে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং এগুলি এমন জায়গায় সাজাতে হবে যাতে তা ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। পাঁচ ইঞ্চি টবে চাষ করে ফুলফোটা অবস্থায় এগুলি দিয়ে ঘরের জানালার পাশে প্রভৃতি জায়গা ঝলমলে করে তোলা সম্ভব। এ টবের জন্য মোটামুটি বড় ও উজ্জ্বল রঙের ফুলের গাছগুলি বেছে নেওয়া ভাল। চন্দ্রমল্লিকার বিভিন্ন প্রজাতি, গ্লোব আমারান্থ, গাঁদার স্বল্প আয়তনের প্রজাতিগুলি, জিনিয়ার স্বল্প আকৃতির ডাবল ফুলের প্রজাতিগুলি, সিলোসিয়া প্লুমোসা লিলিপুট প্রভৃতির এ কাজে লাগার দাবি সর্বাগ্রগণ্য। চন্দ্রমল্লিকা ছাড়া আর সব গাছেই একই সঙ্গে অনেক ফুল হতে দেখবেন। ছোট টবের চন্দ্রমল্লিকা ফুলদানির পুষ্পসজ্জার পরিবর্তেও ব্যবহার করা চলবে। খাপে খাপে লেগে যায় এবং কোন ফুটো নেই এরকম সুদৃশ্য টবের ভিতরে ছোট টবের গাছগুলি বসিয়ে দিলে টব থেকে জল চুঁইয়ে পড়ার ভয় থাকে না। ফুটো নেই এরকম টব তৈরী করিয়ে নেওয়া যেতে পারে প্লাস্টিক, মাটি বা চীনামাটি দিয়ে। বাইরের এ টবগুলি বেশ ভাল দেখাবে যদি তা অল্প করে অলংকৃত হয়। ফুলফোটা টবের গাছগুলিকে রাতে বাইরে রাখা ও সকালের রোদ অবশ্যই খাওয়ানো দরকার।

সাজানোর কাজে মরসুমী ফুল

সমতল বাংলার শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি মরসুমে মিলেই পাবো বছরের নির্দিষ্ট মরসুমের ফুল। বছরের যে কোন সময়ে হয় এরকম ভুঁই ফুলগাছের ফুল পাওয়া যাবে বছরের যে কোন সময়ে। শীতের মরসুমী ফুলের ভিতরে এস্টার, কারনেশান, ক্যালেনডুলা, ন্যাস্টারশিয়াম, লাভ-লাইজ-ব্লিডিং, লার্কস্পার, সুইট পি, সুইট সুলতান, আর্কটোটিস, এন্টিরাইনাম, কর্নফ্লাওয়ার, জিপসোফিলা, পিমপেনেল, লুপিন প্রভৃতি গৃহসজ্জার প্রথম সারির ফুল। এদের ভিতরেও প্রথম আটটি পুষ্পসজ্জায় আরও বেশি সমাদৃত এবং এগুলি ফুলদানিতে সুপ্রভও থাকে দুদিনের বেশি ধরে। এস্টার বোকে পাউডার-পাফ, কাট ডিউয়েট হায়োসিন্থ ফ্লাওয়ারড ও গাঁদার ছোট আয়তনের প্রজাতিগুলির ফুলসহ গাছ কেটে শুধু সেটিই ফুলদানিতে বসিয়ে দিলে তার রূপান্তর ঘটবে সুন্দর পুষ্পসজ্জা হিসাবে। এদের জন্য ছোট ও স্বল্প উচ্চতার ফুলদানি ব্যবহার করা ভাল। আর্কটোটিস বিকালের দিকে গুটিয়ে গিয়ে আবার খুলবে পরের দিন কিছু রোদ পাবার পরে। রাতের বৈদ্যুতিক আলোয় ক্যালেনডুলা, ন্যাশটারশিয়াম, বড় গাঁদা ইত্যাদি চমৎকার মানায়। মরসুমী ফুলের এক্রোক্লিনিয়াম, গ্লোব আমারান্থ, স্ট্যাটিস, সিলোসিয়া প্লুমোসা ও হেলিক্রিসাম ফুল কেটেই ফুলদানিতে ব্যবহার করা চলে। আবার এদের ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে যখন দরকার ব্যবহার করাও সম্ভব।

সুমী বাহারি-পাতার গাছ এমারান্থাসের বড় ডাল কেটে তা ফুলদানির একমাত্র 'ফুল' হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি সুপ্রভ থাকবে দুদিনের বেশি সময় ধরে এবং এটিকে রাখা উচিত একটু দূরের জায়গায়।

কন্দজ ফুল

রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, ডালিয়া, গ্লোরিওসা, এমারিলিস লিলি, হেলিকোনিয়া ও দোলন চাঁপা ফুলদানির পক্ষে খুবই ভাল ফুল। এদের ভেতরে দোলন চাঁপা ছাড়া অন্য সব কয়টিই কয়েক দিন ধরে সুপ্রভ থাকে। দোলন চাঁপার খুব সমাদর এর সুগন্ধের জন্য, এবং এটিকে ব্যবহার করা চলবে শুধুমাত্র বিকালের পুষ্পসজ্জায়। রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস ও এমারিলিস লিলির ডাঁটির গোড়ার শেষ আধ ইঞ্চি অংশ প্রতিদিন কেটে ফেলে ফুল আবার ফুলদানিতে ব্যবহার করা উচিত, এতে ফুল বেশি ভাল থাকবে। গ্লাডিওলাসের ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি ফুলদানিতে থাকা অবস্থায়ও ফুলতে থাকবে সহজ সুন্দরভাবে। গ্লোরিওসা, হেলিকোনিয়া ও দোলন চাঁপা বর্ষার, এমারিলিস গ্রীষ্মের প্রথমের ফুল; রজনীগন্ধা প্রধানত এই দুই মরসুমের ফুল হলেও একে পাওয়া যেতে পারে সারা বছর ধরে, এবং ডালিয়া ও গ্লাডিওলাস ফুটবে শীতকালে।

গুল্মের ফুল।।

গৃহসজ্জায় বহুবর্ষজীবী বিভিন্ন গুল্মের ফুলের অবদান অনস্বীকার্য। শীতের মরসুমে গুল্মের ফুল বেশি রকমের পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু গোলাপের বিপুল সম্ভার একথা একবারও মনে আসতে দেয় না। গোলাপ ছাড়া রয়েছে পয়েনসেটিয়া, এর ব্যবহার বেশি বড়দিনের সময়ে। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফোটে যে ফুলগুলি তাদের ভিতরে গন্ধরাজ ফরচুনিয়ানা, ফরুষের সাদা ফুলের প্রজাতি এলবা ও অন্যান্য প্রজাতি, ক্লিরোডেনড্রন কেম্পফিব, জবার সিঙ্গল প্রজাতিগুলি, কাঞ্চন গল্পিনি, মুসায়েনডা এরিথ্রোফাইলা প্রভৃতি সাজাবার পক্ষে মোটামুটি ভাল। সারা বছর ধরে ফুল ফোটে এরকম গুল্মের ভিতরে রুসেনড্রা, করবী, প্লাম্বাগোর হালকা নীল রঙের ফুলগুলি, জ্যাট্রোফা, পেন্টাস, রঙ্গন, রনডেলেশিয়া, ছোট কৃষ্ণচূড়া, ফ্রানসিশিয়া, গলফিমিয়া প্রভৃতি পুষ্পসজ্জায় সমাদর লাভের উপযুক্ত। জবা সিঙ্গল ও কাঞ্চন গল্পিনিকে পুষ্পসজ্জার কাজে লাগানো যাবে শুধু সকাল বেলায়। বিভিন্ন রঙের শুধুমাত্র কয়েকটি সিঙ্গল জবা দিয়ে ছোট ও স্বল্প উচ্চতার ফুলদানি সাজালে তা সৌন্দর্যময় হয়ে উঠবে খুব সহজেই। ক্লিরোডেনড্রন কেম্পফেরি বা পয়েনসেটিয়ার ফুলসহ বড় ডাল দিয়ে জালার আকৃতির বড় ফুলদানি সাজালে তা বেশ ভাল মানায়। পয়েনসেটিয়ার ভিতরে এর ডাবল ফুলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর; এর সব প্রজাতির ফুল কেটেই তার ডাঁটির কাটা দিকটি কিছু সময়ের জন্য

ফুটন্ত গরম জলে ডুবিয়ে রাখা দরকার ফুলকে সুপ্রভ থাকতে সাহায্য করার জন্য। রঙ্গন ফুল দেয় বেশি গ্রীষ্ম ও বর্ষায়, এর বিভিন্ন রঙের ফুল রয়েছে এবং এগুলি ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে বেশ কয়েক দিন ধরে।

লতানো গাছের ফুল।।

লতানো গাছের ফুলের ভিতরে ক্লায়ান্থাস, বুগেনভিলিয়া মাহারা, এনটিগোনান, ক্লিমেটিস, হোমস্কিয়োলডিয়া, পাইরোস্টেজিয়া, মধুমালতী প্রভৃতিকে পুষ্পসজ্জায় ভাল লাগানো যায়। বুগেনভিলিয়া মাহারার ডাবল ফুলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর এবং এটি ফুলদানিতে থাকেও ভাল বেশ কয়েক দিন ধরে। ত্রিনিদাদ ছাড়া অন্য সিঙ্গেল বুগেনভিলিয়া খুব সাজাবার উপযুক্ত নয়। ফুলদানিতে ব্যবহার করার আগে বুগেনভিলিয়ার সব পাতা ঝরিয়ে দেওয়া দরকার। এনটিগোনানের ফুলের ঝাড় কাটতে হবে ফুলের ফুটনোন্মুখ অবস্থায়, এর পরে কাটলে ফুল তত ভাল থাকে না। পাইরোস্টেজিয়ার ডালের মাথায় ফুল ফোটে অনেক এবং তা ঝুলে পড়ে ফুলের ভারে। পুষ্পসজ্জায় এদের ডালকে স্বাভাবিক অবস্থার মত পেলব ভাবে লতিয়ে আনা উচিত এবং এর জন্য লম্বা গলা কুঁজোর আকৃতির ফুলদানি মানায় ভাল। ব্যবহারের আগে পাইরোস্টেজিয়ার বড় পাতাগুলি ঝরিয়ে দেওয়া ভাল। হোমস্কিয়োলডিয়া ফুলদানিতে ভাল থাকে বেশ কয়েক দিন ধরে। এর ফুলভর্তি খুব লম্বা ডাল একটু বড় ধরনের ফুলদানির পক্ষে বেশ মানানসই। বাহারি পাতার লতানো গাছ পোথোস অর্থাৎ মানি প্ল্যান্ট ঘরের ভিতরে মাসের পর মাস ভাল থাকে; অনেকে এদের জলপূর্ণ বোতলে চাষ করেন এবং তা ঘরের ভিতরে লতিয়ে বেয়ে উঠতে সাহায্য করেন।

বড় গাছের ও অন্যান্য গাছের ফুল।।

ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরা, গুলঞ্চ, সোনালী শিমুল, নাগলিঙ্গম, ক্যালিস্টিমন প্রভৃতি পুষ্পসজ্জার পক্ষে বেশ ভাল। গুলঞ্চের পুরো থোকা ও সোনালী শিমুলের ফুলভর্তি ডাল দিয়ে সাজানো উচিত এবং শেষেরটির জন্য জলের কুঁজোর আকৃতির বড় ফুলদানি বেশ মানানসই। নাগলিঙ্গম দিয়ে শুধু সকালে সাজানো চলে এবং এর জন্য খুব স্বল্প উচ্চতার ফুলদানি বেছে নেওয়া দরকার। ক্যালিস্টিমন ও গুলঞ্চ ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে কয়েক দিন ধরে। ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্লোরাকে সাজাবার কাজে ব্যবহার করতে হবে ফুলসহ ডাল কেটে।

অন্যান্য গাছের ফুলের ভিতরে চন্দ্রমল্লিকা, জারবেরা, এনজেলোনিয়া পুষ্পসজ্জার কাজে খুবই উপযোগী। চন্দ্রমল্লিকা পাওয়া যাবে শুধু শীতকালে এবং অন্য দুটি সারা বছর ধরে। জারবেরা সন্ধ্যার দিকে গুটিয়ে যেতে পারে, কিন্তু একই ফুল আবার পরের দিন সকালে খুলবে। জলজ ফুল পদ্ম ও শালুকও বড় মুখের ফুলদানির পক্ষে খুব মানানসই।

যে ফুলগুলি পুষ্পসজ্জায় লাগানো যায় না।

কিছু ফুল রয়েছে যা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু তাদের কিছুতেই পুষ্পসজ্জায় ব্যবহার করা চলে না। কারণ এ ফুলগুলি গাছ থেকে কেটে ঘরে আনতেই তা ঝিমিয়ে পড়বে যদিও সেই ফুলই না কাটলে গাছে সুপ্রভ থাকে কয়েক দিন ধরে। এগুলির ভেতরে এলাম্যানডা, এমহার্স্টিয়া, কমরেটাম, কেশিয়া ও পোর্টিয়া উল্লেখযোগ্য।

মালা গাঁথার ফুল।।

গৃহসজ্জায় ফুলের মালারও ব্যবহার রয়েছে। মালা দিয়ে বিশেষ কোন জায়গা সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা যায় খুব সহজেই। মালা তৈরীর কাজে রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই, শিউলি, বকুল, এনটিরাইনাম পাইরোস্টেজিয়া, গাঁদা, সন্ধ্যামণি, লঙ্কাজবা প্রভৃতির খুবই সমাদর। এদের ভেতরেও এই তালিকার প্রথম পাঁচটি তাদের সুগন্ধের জন্য আরও বেশি সমাদৃত। মালা গাঁথার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং নিপুণ শিল্পীর হাতের

মালা সত্যিই চেয়ে চেয়ে দেখার মত। সন্ধ্যামণি ও পাইরোস্টেজিয়া দিয়ে বিনা সুতোয় (অর্থাৎ সুতো বা এ ধরনের কোন কিছু ছাড়াই) মালা গাঁথা সম্ভব। লঙ্কাজবা, পাইরোস্টেজিয়া ও এনটিরাইনামের মালা রজনীগন্ধার মোটা মান্ধার মত পাশাপাশি ভাবে গাঁথা দরকার। হালকা হলদে রংয়ে এনটিরাইনামের মালা বৈদ্যুতিক আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।

পুষ্পসজ্জার বিশিষ্ট ফুলগুলি।।

পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুলগুলির ভিতরে কয়েকটি ফুল এ কাজে বিপুল সমাদৃত। এদের সৌন্দর্যের উচ্চ মান সম্পর্কে কোন ভিন্নমতের অবকাশ নেই এবং এরা প্রত্যেকেই ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে অনেক সময় ধরে। এ বিপুল সমাদৃত ফুলগুলির নাম গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, গ্লোরিওসা, জারবেরা ও ক্রায়ান্থাস। এ তালিকায় গোলাপ ও রজনীগন্ধার সঙ্গে পুষ্পসজ্জার ফুল হিসাবে আমাদের মোটামুটি পরিচয় রয়েছে, এবং খুব অল্প পরিচয় রয়েছে গ্লাডিওলাসের সঙ্গে। তবে এ তিনটির ভেতরে উঁচুদরের ফুল পাওয়া যায় একমাত্র রজনীগন্ধার, অন্য দুটির যে ফুল সমতল বাংলার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তাদের মান কিছু ভাল নয়। গোলাপের ভিতরে আরও বেশি সমাদর এর সুগন্ধি ফুলগুলির। গোলাপ দিয়ে সাজাবার বেলায় একটু বড় ডাঁটির বা ডালের ফুল দিয়ে পুষ্পসজ্জা তৈরী করলে তা আরও ভাল দেখাবে। গ্লাডিওলাস বা রজনীগন্ধার শুধু কয়েকটি স্টিক দিয়ে তৈরী পুষ্পসজ্জা আরও বেশি মানায়। গ্লাডিওলাসের বেলায় এ কাজ সংমিলিয়ে করা যেতে পারে খুব সহজেই।

হালকা রংয়ের জারবেরা দিয়ে সাজানো পুষ্পসজ্জা দেখতে খুবই সুন্দর। ক্রায়ান্থাস ও গ্লোরিওসার ফুল এদের গড়নের অভিনবত্বের কারণে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পুষ্পসজ্জার কাজে সমাদর চন্দ্রমল্লিকার ছোট ফুলগুলির কিন্তু এদেশে এরা এখনও অনুপস্থিতের তালিকায়। একই কথা প্রযোজ্য ডালিয়ার স্মল, ক্যাকটাস, স্মল ডেকরেটিভ ও পম্পন প্রজাতিগুলি সম্পর্কে—পুষ্পসজ্জার কাজে যাদের বিভিন্ন দেশে সমাদর গোলাপের মতই। ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকার পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুলগুলি পাওয়া গেলে এ কাজে এদের সমাদর বেড়ে যাবে অনেক গুণে।

গৃহসজ্জার ফুল যোগানোর ব্যবসা গড়ে উঠলে তা গড়ে উঠতে হবে প্রধানত উপরের আটটি ফুলকে কেন্দ্র করে। 'নৈবেদ্যের কলা' পর্যায়ের ফুল দিয়ে পুজো করতে বা পুজোর বেদি সাজানোতে আমরা অভ্যস্ত হলেও ভাল পুষ্পসজ্জায় এই নিম্নমানের ফুল একেবারেই অপাংক্তেয়। তাই ভাল করে ঘর সাজাতে সত্যিকারের ভাল ফুল পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পুষ্পসজ্জা প্রসঙ্গে আরও দুয়েকটি কথা।।

মুখোমুখি বসে কথা বলার টেবিলের ফুলদানি ও পুষ্পসজ্জা সব সময়ে ছোট ও স্বল্প উচ্চতার হওয়া দরকার। হালকা সবুজ রংয়ের ফুলদানিতে সাদা রংয়ের ফুল মানায় খুব ভাল। এবং ফুলভরা ডাল দিয়ে পুষ্পসজ্জার কাজে হালকা রংয়ের সাধারণ ফুলদানিই বেশি মানানসই। অনেক ফুল দিয়ে পুষ্পসজ্জার প্রান্তসীমায় হালকা রংয়ের ফুলের বেশি ব্যবহার হওয়া উচিত এবং মাঝখানে ঘন রংয়ের ফুলের। বড় ফুলদানির বেলায় বেশি ফুল বা বড় ফুল দিয়ে এবং ছোট ফুলদানির বেলায় অল্প ফুল দিয়ে পুষ্পসজ্জা করা ভাল। পুষ্পসজ্জার উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশ এর গভীরতা হওয়া দরকার, নইলে অনেক ক্ষেত্রে এটি নেড়া নেড়া দেখাতে পারে। ফুল ভাল খুলেছে কিন্তু খুলে যাওয়া শেষ হয়নি এরকম ফুল পুষ্পসজ্জার কাজে বেছে নেবেন। ফুল গাছ থেকে কাটার সময়ে যতটা সম্ভব ডাঁটি লম্বা রেখে কাটতে হবে এবং পুষ্পসজ্জার কাজে কতটা ডাঁটি রাখা দরকার দেখে তা আবার সঠিক মাপে কাটতে হবে। এই কাটার কাজ করতে হবে পাত্রে জলের ভিতরে যাতে এয়ার লক হবার আশঙ্কা না থাকে। ফুল সাজাবার পরে ফুলদানিতে জল ভরে দিতে ভুলবেন না। তামার পাত্রের ঠান্ডা জলে ফুল সবচেয়ে ভাল থাকে বলে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই ফুলদানিতে কিছু তামার পয়সা ফেলে রাখা যেতে পারে। পুষ্পসজ্জার ফুলকে ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে স্প্রোয়াল পিন হোল্ডার ও টুকরো তারের জাল ব্যবহার করার দরকার পড়বে অনেক সময়েই। পুষ্পসজ্জা নিতে এগুলির পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যাওয়া দরকার যাতে এগুলি দেখা না যায়। পুষ্পসজ্জায় পাতা ইত্যাদির ব্যবহারেও প্রচুর। অরোকেরিয়া কুকী, ঝাউ, এসপারাগাস দেবদারু, ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা, কনক চাঁপা ফার্ণ, গ্লাডিওলাস, [illegible] স্কারলেট কুইন, ভেরীগেটা, [illegible] পোথোস, হেমারোকেলিস ইত্যাদি পাতা [illegible] ছোট ডাল এবং কাশফুল, ঘাসফুল ও [illegible] ধরেছে এরকম ঘাসফুলের পুষ্পসজ্জায় বিশেষ সমাদর।

বাইরে সূর্যস্নাত অবস্থায় খুব সুন্দর হলেও কিছু রংয়ের ফুল ঘরের ভিতরে একেবারে নিষ্প্রভ। এদের ভেতরে ঘন পারপেল, কালচে লাল ও অন্যান্য ঘন লাল প্রধান। বৈদ্যুতিক আলোতে সবচেয়ে ভাল দেখায় বিভিন্ন পর্দার হলদে ও কমলা-হলদে রংয়ের ফুলগুলি। এবং এ আলোতে ভাল দেখায় না একেবারে দলে রয়েছে সেই ফুলগুলি যাদের রং মোভ, লাইল্যাক বা নীল। সবুজ রংয়ের ফুল গাঢ় সবুজ পাতার ভিতরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বেমানান, কিন্তু পুষ্পসজ্জায় এগুলিই অদ্ভুত মানানসই। সবুজ রংয়ের ফুল পাওয়া যাবে জিনিয়া এনভি, ডোডোনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা গ্রীণ গডেস প্রভৃতি ফুলের মাধ্যমে। ঘরের ভিতরে সূর্যের আলোকচ্ছটায় নীল বা ভাওলেট রংয়ের ফুল দেখায় বেশ ভাল। এ রংয়ের পুষ্পসজ্জার উপযুক্ত ফুল পাওয়া যাবে এনক্লেলোনিয়া, ডুরান্টা, [illegible] সিশিয়া, কর্ণফ্লাওয়ার, লার্কস্পার নীল শালুক ইত্যাদি ফুলে। পুষ্পসজ্জার বিশেষ উপযুক্ত রংয়ের ফুলগুলি পাওয়া যাবে সব ফুলের ভিতরে, এদের ভিতরেও উজ্জ্বল হালকা পিঙ্ক রংয়ের ফুলগুলি ও সুপার স্টার গোলাপের মত ভার্মিলিয়ান-অরেঞ্জ রংয়ের ফুলগুলি দিনেও এবং রাতেও মানায় চমৎকার।

— সাত —

রাত্রে দিদি ন্যাকড়ার পুতুলের মতো নেতিয়ে ঘুমোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সকালে বুঝি আর উঠতেই পারবে না। ওমা ভোর-বেলায় দিদিই আমায় ঠেলে তুললো।

বললো, 'এই ওঠ ওঠ, কী অদ্ভুত চমৎকার দেখ।'

আমরা শুয়েছিলাম জানলার ধারে, দিদি ঘুম ভেঙে উঠেই জানলাটা একটু খুলেছে, আর তার সেই 'অদ্ভুত চমৎকারের' ভাগ দেবার জন্যে আমাকে ঠেলে না তুলে পারেনি।

আমি কিন্তু চট করে 'অদ্ভুত' কিছু খুঁজে পেলাম না, অবাক হয়ে বললাম, 'কী?'

দিদি বিহ্বলভাবে আস্তে আস্তে বললো, 'দেখতে পাচ্ছিস না? ঠিক যেন আঁকা ছবি। একেবারে সদ্য। মাঠ, পুকুর, নারকেল গাছের সারি, রাখাল বেরিয়েছে গরুর পাল নিয়ে, একটি বৌ ঘাটে জল নিতে এসেছে, আর দূরে আকাশে সূর্যি উঠছে—'

ততক্ষণে অবশ্য আমিও আমাদের কাছে অভূতপূর্ব এই দৃশ্যটির রস গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি, দিদির মুখটা ঠেলে সরিয়ে নিজের মুখটা জানলার মধ্যে যতোটা সম্ভব এগিয়ে দিয়ে মুগ্ধ গলায় বলে উঠি 'সত্যি রে! উঃ কী ভালো! কাল কিছু বুঝতে পারছিলাম না।'

'আমিও। আমারও কাল ভাল লাগছিল না। কান্না পাচ্ছিল।'

'ভাগ্যিস বলে ফেলিনি। বাবা আমাদের এখানে নিয়ে এসে ভালই করেছেন নারে দিদি?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা কটা গরু যাচ্ছে বলতো! এখান থেকে গুনতে পারিস?'

দিদি একটু কড়া গলায় বলে ওঠে, 'আঃ! দেখছিস পল্লীসৌন্দর্য, তার মাঝ-খানে গরু গুনতে বসলো!'

ছি ছি! সত্যিই তো! লজ্জায় মরমে মরে গেলাম, তবু মুখে হারবার পাত্র নই, তাই বলে উঠি, 'আহা গরুও তো পল্লী-সৌন্দর্যের একটা অংশ! বেশ না হয় নারকোল গাছগুলো গোন।'

'সন্ধ্যেবেলা তোকে গোনায় পেলো কেন বলতো?' বলে দিদি জানলাটা আর একটু খুলে দিলো, আর সেই সময় আমরা সেই লোকটিকে দেখতে পেলাম।

দিদি তার সরু সরু আঙুলে আমার কাঁধটা সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরে বলে উঠলো, 'রুচি, দেখতে পাচ্ছিস?'

দেখতে পেয়েছিলাম।

বিহ্বল গলায় বললাম, 'ঠিক বাল্মীকি মুনির মতোন না রে?'

সদ্য ভোরের আলোয় আর দিদির ওই 'পল্লীসৌন্দর্যের পটভূমিকায় সত্যিই ওই শাদা ধবধবে বাকে বলে আবক্ষলম্বিত দাড়ি, থাক কাটা বাবরি চুল, আর মোটা-সোটা গোঁফে ঘেরা মুখ মানুষটিকে মুনি-ঋষির মতই দেখতে লাগলো। আর মনে হলো—ও'র আবির্ভাবেই বুঝি ভোরের এই ছবিটি সম্পূর্ণতা লাভ করলো।

'এখানে তাহলে তপোবনও আছে!'

দিদির এই স্বগতোক্তির পর আমিও একটি উক্তি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, হঠাৎ ও মশারির থেকে বাবার গলা শুনতে পাওয়া গেল, 'এই দুমী, জানলা খুলে ভোরের ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিস কেন? বন্ধ কর।'

ব্যস সঙ্গে সঙ্গেই জানলার কপাট টেনে দিতে হলো। কারণ বাবার হুকুমের

পর সে কাজটা না করা সম্ভব, এতো আমাদের স্বপ্নের বাইরের জিনিস ছিল।

অথচ আজকাল? ...যাক সে কথা।

দিদি তো অভিমানী, চুপ করে গেল, আমি বলে উঠলাম, 'আমরা ঠিক বাল্মীকি মুনির মতন একজনকে দেখছিলাম বাবা—'

'বাল্মীকি মুনির মত?'

বাবার হাসি শোনা গেল, 'দেখেছিস বুঝি তাঁকে?'

'বাঃ ছবি দেখিনি বুঝি?'

'ছবি? ফটোগ্রাফ?'

'অতো জানি না—' বলে আমি বিছানা থেকে নেমে পড়ে মশারি খুলতে লাগলাম।

বাবার মৃদু গলা শুনতে পেলাম তখন, 'ন বৌ, এইবেলা উঠে পড়ো, এখানে বৌ টৌরা বেলা অবধি ঘুমোয় না।'

মা একটু কাতরোক্তি করে উঠে পড়লেন। কক্ষনো মা বেশী ভোরে উঠতে পারেন না, ঝিকে দরজা খুলে দিতে হলে দাদারা দেয়। বাবা উঠে পড়লে বাবা।

মা ঘরের খিল খুলতে খুলতে বললেন, 'আমি যেন নতুন বৌ।'

'এখানে তো নতুন।'

'জানি না বাবা! হাওয়াবদলের আর জায়গা পেলে না,' বলে মা ঘরের দরজা খুলে ফেললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দালান থেকে শোনা গেল, 'এই যে ন বৌমা, উঠেছো? এখেনে আর একটু ভোর-ভোর উঠবে বাছা, 'সর্বেশ্বরের' ঘরে মঙ্গল আরতি হয়।'

কণ্ঠস্বরটা মনে হলো বাবার সেই পিসিমার।

কিন্তু আরতিকে উনি আরতি বলছেন কেন?

মার কথার সাড়া পেলাম না। ওনার গলাই আবার বেজে উঠলো, 'ন্যাও চটপট হাতমুখ ধুয়ে একখান পাটের কাপড় জড়িয়ে ঠাকুরবাড়িতে চলে এসো। আরতির সময় হয়ে গেছে। ন্যাড়া ওঠেনি? অ ন্যাড়া আরতি দেখবি না কি? দেখিসতো আয়। তোকে আর কাচা ধুতি পরতে হবে না, শহুরে অব্যেস, কষ্ট হবে, বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে দেখিস।'

ঝটপট চলে গেলেন উনি, দরজার বাইরে ওনার পরনের কাপড়ের একটা কোণ দেখা গেল। চটের থলির মতো কী যেন একটা পরেছেন। পরে জেনেছিলাম ওকে বলে 'কেটে'র কাপড়। নানাবিধ সিল্ক গরদের দেশ মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ হয়েও শুদ্ধাচার বজায় রাখতে এঁরা এই কাপড়ই পরেন। না, 'পিওর' বলে নয় সস্তা বলে। বারোমাস পরতে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা দিয়ে মটকার থান কিনে পরবেন, বিধবারা এমন দামী-মাল না কি! তাঁদের এই একটাকা-পাঁচসিকের কাপড়ই যথেষ্ট।

বাবার পিসিমার গলা আবার সিঁড়ির ওধার থেকে পাওয়া গেল, 'রাজবালার বুঝি ওঠেন নি? অবোস বড় খারাপ করে ফেলেছিস ন্যাড়া। মেয়েছেলেকে এতো আয়েস শেখাতে নেই। ওদেরও কাচা কাপড় পরে ঠাকুরবাড়িতে আসতে বল, নইলে লোকে নিন্দে করবে।'

বুঝলাম যা কিছু নীতি নিয়ম মেয়েমানুষের জন্যে বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য ইচ্ছাসাপেক্ষ।

অথচ বাড়িটা পুরুষদেরই।

তাঁদেরই গৃহদেবতা কুলদেবতা পারিবারিক রীতি-নীতি।

কিন্তু বাবার বেলায় 'তোকে আর কাচা কাপড় পরতে হবে না।' বেশ মজা!

তবে বাবাকে তাড়াতাড়ি [illegible] একটা র‍্যাপার কোমরে জড়িয়ে চলে যেতে দেখলাম। আমাদেরও ডাক দিয়ে গেলেন, 'সুনী, দুটি, তোরাও চলে আয়! [illegible] ঠাকুমার কথা? তাছাড়া—নিজেদের বাড়ির ঠাকুর, যাকে বলে কুলদেবতা। দেখিসনিতো কখনো। দালানের ধারে বালতিতে জল আছে! মুখ ধুয়ে নে।'

আমরা দুইবোনে অকূলে পড়লাম।

জলের কল নেই।

কলের ঘর?

এই একটা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পল্লীসৌন্দর্যের রেশ উপে গেল।

ওদিকে কোন দিক থেকে যেন ঘণ্টা কাঁসর বাজতে শুরু করেছে, ধারে কাছে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখলাম দিদির মুখ লালচে, বিপন্ন। অগত্যা আমিই মনের জোর করে বলে উঠলাম, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, একটা কিছু তো করতেই হবে।'

ঘণ্টাকাঁসরের শব্দ লক্ষ্য করে আমরা যখন সেই ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আরতির শেষ ক্ষণ!

দেখলাম ঠিক মন্দির নয়, ঘরই, ঠাকুরঘর, তবে তার সামনে বেশ প্রশস্ত দালান, লাল সিমেন্টের মেজে, তার উপর কালো সিমেন্টের পদ্মলতা আঁকা। যদিও তার

মাঝখানে বড় বড় ফাটল। একদা বস্ত ছিল, এখন সেটার ভগ্নদশা বলে মনে হচ্ছে। এই কথা নিয়ে বাবা একদিন হেসে বলেছিলেন, 'অগ্রে আগ্রহ তা থেকে 'বিগ্রহ', তারপর নিগ্রহ শেষতক গলগ্রহ। এখন নিগ্রহের কাল চলছে।'

বলেছিলেন ওই কথা, কিন্তু আমরা সেটা তখন ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি। আমরাতো দেখতে পাচ্ছি নিত্যপুজোর একটি বিশেষ সমারোহ।

আমাদের জ্ঞানগোচরে বাড়িতে পুজো বলতে সত্যনারায়ণের পুজো দেখেছি। দাদারা পাশ করলে, কি বাবার মাইনে বাড়লে, এটা হতো। ওবাড়ি থেকে জেঠিমারা আসতেন, পিসিমা আসতেন, তাঁরাই জোগাড় যন্তর করতেন, মা উপোস করে কুটমুখে ব'সে থাকতেন। ও'রা হেসে হেসে বলতেন, ন বৌ আমাদের একবেলার উপোসেই যেন সাতদিনের উপসী।'

তা সত্যিই তাই, উপোসে মার কষ্ট হয় বেশী।

ওই পর্বটা মিটে গেলে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। তাও মার দিন দুই জের যেতো, সেই ঘর পরিষ্কার করতে আর ঝিয়ের খোসামোদ করে পুজোর বাসন মাজিয়ে তুলতে।

আর এখানে রোজ এই বিরাট পর্ব!

পুজোর বাসন মাজার জন্যে আলাদা একটা কুয়ো, তার পাশে বাসন নামানোর জন্য ঘেরা চাতাল। আলাদা একজন ঝি শুধু পুজোর বাসনই মাজে। সকালে ঘণ্টা-কাঁসর কোশাকুশী পঞ্চপ্রদীপ নৈবেদ্যের থালাথালা, আর বিকেলে ভোগের বাসন।

ভোগ রান্নার ঘরও আলাদা, সেদিকে গিন্নীরা ছাড়া অন্য আর সকলের প্রবেশ নিষেধ। 'সর্বেশ্বরের' জন্যে না কি প্রতিদিন শাক শুক্তো থেকে শুরু করে দই পায়েস পর্যন্ত একটি নির্ধারিত তালিকার ভোগ বাধ্যতামূলক আছে।

তার থেকে প্রায় রোজই কিছু কিছু ছিটেফোঁটা আমাদের মত হরিজনদের পাতেও পড়তো। মূলটা অবশ্য বরাদ্দ ছিল নিরামিষাহারিণী বিধবাদের জন্যে।

ব্যবস্থাটা ন্যায়সংগতই বলতে হবে।

বিধবারা মুখে যতই দাপট করুন, আর অধস্তনদের মাথাগুলি হাতে কাটুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারের যে তাঁরা ফালতু মাল এ বিষয়ে তো সন্দেহ নাস্তি? অতএব তাঁরা শুধু তাঁদের নিরামিষ ঘরে নিজেদের জন্যে রাঁধতে বসলে নিত্য অমন নারায়ণসেবাটি ভাগ্যে জুটতো?

অবিশ্যি সকালের বাল্যভোগ, বিকেলের বৈকালী, সন্ধ্যার জলপান, এগুলি পর্যায়-ক্রমে শিশু বালক ও পুরুষদের জন্যে বিতরিত হতো, আর সেগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়।

নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, মাখা মিশ্রী ছানাচিনি, এবং নানাবিধ কাটা ফলের একত্র সমাবেশ, এটা আমাদের পরিচিত জীবনে প্রায় দুর্লভ ছিল। আমাদের বাল্যভোগ মানে বিস্কুট পাউরুটি চা দুধ, বৈকালী প্রায়শঃই ময়রার দোকানের অবদান, এবং সান্ধ্য আহারে অন্নের অধিকারই প্রধান।

এতে নতুনত্ব আছে, বৈচিত্র্য আছে।

নীরোপিসি যে বলতেন, 'যাই বলো ন বৌ তোমাদের শহরের জীবনে সুবিধে আছে সোয়াদ নেই, সে কথা খুব ভুল নয়। সত্যি, গ্রামজীবনের বিশেষ একটি স্বাদ আছে।

সে স্বাদ বুঝিবা মুক্তির।

অনেকটা অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র।

বৌ চৌদের একগলা ঘোমটা দিতে হতো, অনেক বিধিনিষেধের মধ্যে চলতে হতো, তবু তাদের জন্যে মাঠ ছিল, ঘাট ছিল, ঝোপ জঙ্গলের গাছপালার হাতছানি ছিল।

আর ছেলেমেয়েদের তো ছিলই স্বাধীনতার সুখ। বাবাদের এক জ্ঞাতি খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ে রোজ বকুনি খেতো, তবু রোজ গাছে চড়তো। মেয়েটা সাঁতরে কড়দীঘি এপার ওপার হতো।

তাছাড়া সে নাকি কুমোরপাড়ায় গিয়ে মাটির পুতুল গড়তেও শিখেছিল।

ঝর্নি নামের ওই মেয়েটার আরো অনেক গুণ ছিল, যার বিকাশ শহরের জীবনে সম্ভব নয়।

নীরোপিসি ওই মেয়েটাকে সমর্থন করুন না করুন, এমনি বলতেন, 'বালক বয়সে গাঁয়ের সোয়াদটি না পেলে মানুষের মনটা ফোটে না, বুঝলে ন বৌ। আকাশ বাতাস মাঠ ঘাট নদীনালা পাখিপক্ষী গাছ-পালা ফুল ফল এ সব না দেখলে ভেতরটা ভরাট হবে কী দিয়ে? বালক বয়েসের এই সোয়াদটুকু তোমার গে ওই ব্যাঙ্কের টাকার মতন ভেতরে জমা থাকে বুঝলে? তারপর তুমি যতই শহুরে হও, ওই জমা টাকাটি রইলো। তোমার ছেলেদের জন্যে একবার ভিটে দেখাতে নিয়ে এলে না, গাঁ দেশ কেমন তা চক্ষে দেখলো না, এটা কী ভালো?'

মা উত্তর দিতেন, 'তা আমায় বলছো কেন ঠাকুরঝি? যার ছেলে তাকে বল না।'

'তাকেও বলেছি—' নীরোপিসি বলেন, 'বলতে আমি ছাড়ি না কাউকে। সুবিধে পেলেই বলি। ভগবান মুখপোড়াকেই কি কম বলা বলি না কি?'

ভগবানকে 'মুখপোড়া' আকাশকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বাতাসকে 'চোখখেগো' এসব নীরোপিসি অবলীলায় বলতে পারতেন।

এবং আশ্চর্য ওনাদের মুখে এগুলো খুব কটু শোনাতো না। কথা যেন ওঁর শুধু মুখ দিয়েই নয় প্রতিটি লোমকূপ দিয়েই ঝরতো। সেই ঝরাটা যেন শুকনো পাতার মতো পাখির পালকের মতো, গায়ে এসে লাগে না, উড়ে যায়।

যাক সেই মঙ্গল আরতির কথাই বলি। আমরা আরতির শেষ ক্ষণে এসেও দেখতে পেলাম লোকে ভর্তি দালান। বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই এসে জড়ো হয়েছে।

কর্তাদের গায়ে শাল র‍্যাপার জড়ানো কিন্তু মহিলাদের আঁচলমাত্র সার, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কারো গায়ে ওই ... অঞ্চলের কোণটুকু, কারো গায়ে একটুকরো বিবর্ণ ছিটের টুকরো। দেখে খুব আশ্চর্য লাগলো। চিরকাল জেনে আসছি ছোটদেরই ঠাণ্ডা লাগে। এ দেখি উল্টো।

এ বাড়িতে যে এতো লোক আছে, তা গতকাল রাত্রে বুঝতে পারিনি।

মনটায় বেশ ভাবনা ধরে গেল। বেশী লোকে আমার বড় ভয়। তবু এই আরতিটি বড় ভাল লাগলো।

আলো হয়েছে, কিন্তু রোদ ওঠেনি, এই স্নিগ্ধ পটভূমিকায় এই পুরনো পুরনো মন্দির, ধূপ ধুনোর গন্ধ, ঘণ্টাকাঁসরের শব্দ, পুরুতমশাইয়ের মন্ত্রোচ্চারণ, সব মিলিয়ে যেন একটা আচ্ছন্ন ভাবের সৃষ্টি করে ফেললো।

আস্তে আস্তে অদ্ভুত একটা ভাল লাগায় মনটা ভরে গেল।

আরতি জানতাম, মঙ্গল আরতি জানতাম না, জানতাম। ব্যাপারটা হচ্ছে নিদ্রিত ঠাকুরের ঘুম ভাঙানো।

একটা মেয়ে আমার থেকে বেশ খানিকটা ছোট, সে বলে উঠলো, 'এমা! মঙ্গল আরতি দেখনি কখনো! কী আশ্চর্য্যি! একেই বলে শহুরে মেয়ে! কেন কলকেতায় ঠাকুর নেই? সেখেনে মঙ্গল আরতি হয় না?' এ আবার আরতিকে 'আরতি' বললো।

কলকাতায় সবই আছে, সবই হয় একথাটিও যেমন সত্য, তেমনি সত্য, আমাদের সঙ্গে সেই 'হওয়া' গুলির কোনো পরিচয় ঘটেনি।

আমার জ্ঞানগোচরে একবার কালীঘাটে যাওয়া হয়েছিল, আর একবার তারকেশ্বরে। তা সে তো রোদে চড়চড়ে সময়ে।

কালীঘাটে যাওয়া হয়েছিল, বোধহয় আমাদের কোনো বহিরাগত আত্মীয়ের প্রেরণায়, তবে গিয়েছিলাম আমরা সকলেই। বাবা মা দাদা মেজদা, দিদি আমি, এবং সেই আত্মীয়া মহিলারা।

একখানা ঘোড়ার গাড়ি ঠেশে রওনা দিয়েছিলাম আমরা, একেবারে যাতায়াতের ভাড়া করে। নিয়ে যাবে, সারাদিন থাকবে, বিকেলে ফিরিয়ে আনবে।

ওই কালীঘাটে যাওয়াটাই আমাদের কাছে একটা পরম উৎসবের ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

দেবীকে কি দর্শন করেছিলাম?

মনে পড়ে না।

শুধু একটি চকচকে নথ আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাছাড়া ভিড়ের চাপে তো দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

কালীঘাটে যাওয়ার মনোরম অংশটি ছিল জলযোগের অংশটি। তেতে পুড়ে ঘেমে মন্দির থেকে ছুটকে এসে যখন কোনো এক পাণ্ডার বাড়ির দাওয়ায় বসে ওই পর্বটি সারা হলো, তখন মনে হল কালীঘাটে আসাটা নেহাৎই লোকসানের ব্যাপার নয়।

ওখানে একটা অদ্ভুত জিনিস সেই প্রথম দেখি, আস্ত নারকেল, কিন্তু ছাড়ানো। জানি না কোন কৌশলে নারকেল না ভেঙে ছাড়ানো যায়।

আরও একটা আশ্চর্যের দৃশ্য ছিল, বাড়িতে এসে পড়া ওই বিধবা মহিলা তিনটি, যাঁরা স্বপাকে হবিষ্য ছাড়া আর কিছু খান না, দোকানের চিনি গরুর হাড় দিয়ে সাফ করে শাদা করে বলে, দোকানের সন্দেশ রসগোল্লা পর্যন্ত খান না, তাঁরা অম্লানবদনে বড় বড় শালপাতার ঠোঙায় ভর্তি রাশিকৃত দোকানের তেলভাজা খাবার পার করলেন। বেগুনী ফুলুরি, আলুর চপ ইত্যাদি।

খাওয়ার সময় সেই তিন প্রৌঢ়ার মুখে যে পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল, তা আমার শিশুর দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছিল।

ওঁদের গালগল্পেও সেই পরিতৃপ্তির সুর।

'মায়ের মন্দিরে এলেই এইটুকু জোটে। আর তো কোথাও খাবার উপায় নেই। যাই বল বাবা, বাড়িতে যতই পোরের ভাজা করে খাও, এমন সোয়াদটি হয় না।'

অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, 'আচ্ছা এত্তোই যদি ভাল লাগে, খান না কেন দোকানের জিনিস? কে ওঁদের বারণ করেছে?'

তারকেশ্বরের স্মৃতিটা আরো অস্পষ্ট, শুধু রেলগাড়ি চড়াটা মনে আছে ... আছে একটা মাটির দাওয়ায় কলাপাতা পেতে খিচুড়ি খাওয়া হচ্ছে, যে খিচুড়ি আমাদের জ্যাঠাইমা কাঠের আগুন জ্বেলে ওইখানেই বসে রান্না করেছিলেন।

মনে আছে ক'জন লোক, একবার করে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়েছিল, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল। এইভাবে শুয়ে শুয়েই ওরা মন্দিরে যাবে। পাগল নাকি? বাবা বলেছিলেন, 'ছিঃ ওকথা বলতে নেই। পাগল কেন হবে? ওকে দণ্ডীখাটা বলে। মানত করে রেখেছে ঠাকুরের কাছে।'

মানত কথাটা জানা ছিল। ঠাকুর মন্দিরে পুজো দেওয়া কিন্তু এটা কী? বুক ছিঁড়ে হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে এ আবার কেমন মানত বাবা!

সাধের অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন, অ... অমানুষিক শরীর পীড়নের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে যে ভগবানকে দ্রুত কাছে টেনে আনা যায় এ জ্ঞানটি জন্মাতে তখনো বাকি ছিল, ... অবাক হয়েছিলাম।

বইপত্তর পড়ে ফেলেছিলাম ... অনেক, এলোমেলোভাবে ... কিন্তু বাড়িতে জ্ঞানদাতার অভাব ছিল, কাজেই সেই সুদূর অতীতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি আমার বয়সের অন্য মেয়ের যে সব জ্ঞান ছিল, আমার ... ছিল না।

অতএব বাবার এই কাঞ্চনতলা ... এসে 'ন্যাকা' শব্দটি বহুবার ... হয়েছে।

কিন্তু তখন তো সদ্য এসেছি, ... ওই মেয়েটার তাচ্ছিল্য বাণীতে ... আহত হয়ে বললাম, 'থাকবে না কেন ... মন্দির আছে কলকাতায়, আরতিও ... সে তো সন্ধ্যেবেলায়।'

'আহারে, শুধু সন্ধ্যেবেলা? ভোর বেলায় আরতি করে ঠাকুরের ঘুম ভাঙানো হয় না বুঝি?'

এটা যে হয়, এবং সব ঠাকুরবাড়িতে হয়, তা জানা ছিল না। কে কবে আমাকে ভোররাতে উঠিয়ে ওই ঘুম ভাঙানো ... দেখাবার জন্যে নিয়ে গেছে?

তাই অর্বাচীনের মতন বলে ফেললাম 'ঠাকুরের ঘুম ভাঙাতে? মানুষে ভাঙায় ঠাকুরের ঘুম? ঠাকুরই তো মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে চৈতন্য করিয়ে দেন।'

বলাটা যে বেশ মধুর হয়নি তা বোঝা গেল, কারণ কোথা থেকে যেন একটি ... গম্ভীর গলা বলে উঠলো, 'কথাটা কে বললো রে?'

আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন কাঠ হয়ে গেলাম।

আস্তে দিদির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বুঝলাম সেখানেও একই অবস্থা।

কে জানতো সেই বাল্মীকি মুনিটিই এতোক্ষণ ঠাকুরঘরের মধ্যে আরতি করছিলেন। দরজায় অনেক লোকের ভিড় থাকায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, এখন আরতি অন্তে তিনি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার তৈরী পাণিশঙ্খ হাতে নিয়ে।

বোধহয় সকলের মাথায় ওর জল ছিটোতে।

উনিই তবে এ বাড়ির পুরুতমশাই?

ছবির মতন পথটা দিয়ে এখানেই আসছিলেন?

আমি তো চিত্রাপির্তিবৎ, কিন্তু সেই কটকটে মেয়েটা, বাবার জ্ঞাতিকাকার মেয়ে না নাতনী, সে হি হি করে হেসে আমার পায়ে একটা ঠ্যালা দিয়ে বলে দিলো, 'এই যে এ! কলকেতা থেকে এসেছে কালকে।'

এবার এগিয়ে এলেন বাবার পিসিমা।

খরখরিয়ে বলে উঠলেন, 'সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন লো? পেন্নাম কর! ঠাকুরের দেখে বাবার পায়ে ...এলি।... আমাদের সেজদার ন ছেলে ন্যাড়ার মেয়ে গো চক্কোত্তি খুড়ো। মেয়ে দুটোকে আর পরিবারকে নিয়ে কাল রাত্তিরে যে ন্যাড়া এসেছে কলকেতা থেকে। সাতজন্মে তো ভিটেয় পা দিতে আসা নেই, তাও ছেলেদের দেখে এসেছে। ছেলেরা ইস্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ছে, এখনো বাপের দেশ কেমন তা জানলো না।'

হঠাৎ মনে হলো, এতো বেশী কথা বললেন কেন উনি।

ইতিমধ্যে বাবা এগিয়ে এসে প্রণাম করেছেন, মাও খানিকটা দূর থেকে প্রণাম সেরে নিলেন। শুধু আমি দিদির দিকে আর দিদি আমার দিকে চাওয়াচাওয়ি করছি। এগিয়ে যেতে সাহস নেই।

বাবা প্রণাম করে উঠতেই বাল্মীকি মুনি বলে উঠলেন, 'দীর্ঘায়ু ভব! ...তো দেশের বাড়িতে আসা হয় না কেন? ভবেশ দেবেশ সুরেশ, এরাতো তবু মাঝে মধ্যে কখনো আসে!'

আবার বাবার পিসিমার কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো, 'ও আর আসবে কী? ভাইদের সঙ্গে ভেন্ন যে! বৌ ছেলে গলায় গেঁথে জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। কলকেতাটি তো মোর ছাড়িয়েছে বাসা, বাড়ি বন্ধ করে তো আমার জো নেই। তা এবার ভিটের ভাগ্য ফিরেছে—'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, কতো অবলীলায় কতো সব কড়া কড়া কথা বলতে পারেন ইনি! অথচ বাবার মুখে রাগ দুঃখের কোনো ছাপ নেই, যেন কটু তেতো ঝাল টক কিছুই শুনছেন না।

বাবা আমাদের ইসারা করলেন, অতএব গুটি গুটি গিয়ে সেই মুনির চরণে প্রণাম করতে হলো। আমি আগে, দিদি পিছনে।

বাবা সচেতন করতে বললেন, 'খুড়োমশাই, আমার মেয়েরা—'

খুড়ো বললেন 'থাক থাক—সাবিত্রী সমান হও। তা মেয়েদের বিবাহ দিয়েছো কোথায়?'

আবার বাবার পিসিমা, জিভে একটা টকাস করে শব্দ করে বলেন, 'হায় কপাল, মলে মা রাঁধে না তা তপ্ত আর পান্তো! একটারও তো বে দেয়নি।'

'আঁ তাই নাকি? রমেশচন্দ্র তো শুনি ভালো রোজগারপাতি কর—'।

বাবা অপ্রতিভভাবে বলেন, 'সেজন্যে নয়, মনের মতন পাত্রটার—'

হঠাৎ সেই দাড়ি-গোঁফের অরণ্যের ফাঁক থেকে অনেকখানি হাসি ঝরে পড়লো।

কৌতুকের হাসি।

এমন হাসি বোধহয় ওইরকম বুড়োরাই হাসতে পারে। কিম্বা জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এলো বলেই ভাল লাগলো।

বাল্মীকি মুনি তাঁর মুনিত্ব বিসর্জন দিয়ে খোলা গলায় বলে উঠলেন, 'আরে তা এতোক্ষণ বলতে হয়! দুটিকেই একসঙ্গে পাত্রস্থ করে ফেলো হে বাবাজী, পাত্র সামনেই মজুত। আমিও আমার গৃহিণী-শূন্য গৃহে একেবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী একত্রে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করিগে। কী গো রাজকন্যেরা, বর পছন্দ হচ্ছে?'

এরকম বিচ্ছিরী ঠাট্টায় রাগে গা জ্বলে গেলেও, জানি ঠাকুর্দা সম্পর্কীয়রা এমন করে থাকে। জেঠিমা তাঁর নাতিকে বলেন 'বর'। অনায়াসে বলেন, 'বুড়োকে দিয়ে আর চলছে না, এইবেলা একটি নতুন বর মুঠোয় রেখে দেওয়া ভাল।'

জ্যেঠিমার মেয়ে লতিকাদি বলে, 'ইস আমার ছেলের এইরকম বুড়ি কনে হবে নাকি?'

জেঠিমা আরো কত কী বলেন হেসে হেসে। 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে'। পাকা সোনার দর নামে না,' এমনি সব কত কী।'

অতএব ওই বিচ্ছিরী ঠাট্টাও সহ্য করতে হয়। বাবা কিন্তু দিব্যি হেসে হেসে বলেন, 'আমার ভাগ্যে এমন জামাই হলে তো?'

'যাক তোমার তাহলে জামাই পছন্দ হয়েছে? চটপট একটা লগ্ন দেখে ফেলি।'

আবার সেই হা-হা হাসি।

হাসিটা ভালো।

পুরুত-বামুনরা সচরাচর এমন হয় না।

হাসি থামিয়ে উনি আবার বললেন, 'তা তত্ত্বকথাটি বললেন কে? ইনি, না উনি?'

বাবা বললেন, 'এই আমার ছোট কন্যেটি। ভারী শর্ত্তবে।'

মুনি ঠাকুর বললেন, 'আরে এইটিই ছোট নাকি? আমি ভাবছিলাম এটিই বড়।'

মা। এ ব্যাপারই দিদির মাথাছাড়ানো। তাছাড়া আমার এই বড় মেয়েটি সম্প্রতি টাইফয়েডে ভুগে—'

ভিড় সরে গেছে, আস্তে আস্তে রোদ ফুটে উঠেছে, দালানের একটা থিলেনের পাশ দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে ঠাকুর-ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে সর্বেশ্বরের মুখের ওপর গিয়ে পড়েছে।

একক নারায়ণ মূর্তি।

না লক্ষ্মী না রাধিকা।

মাথার চুড়ো গলার হার হাতের বালা সব সোনায় গড়া, রোদ পড়ে ঝকমক করছে।

অপূর্ব সুন্দর মুখ।

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে দেখি।

আস্তে বললাম, 'বাবা, এ তোমাদের নিজেদের ঠাকুর?'

বাবা হেসে বলেন, 'তোমাদেরও।'

'ওটা ছেলেভুলোনো কথা—'

দিদি বলে, 'মেয়েরা কি বংশের কেউ নাকি? মেয়েদের তো ধরে বেঁধে বংশছাড়া গোত্রছাড়া করে দেওয়া হয়। এই যে আছি, যেন অনধিকারীর মতন। যেন কবেই বিদেয় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সবাইয়ের চোখে একরকম দৃষ্টি।'

কথাটা সত্যি।

বাড়িতে মা দিদির 'বিয়ে বিয়ে' করতেন বটে, কিন্তু এমন অবাক চোখে তাকাতো না কেউ। আসল কথা আমাদের প্রকৃত বয়েস কেউ বিশ্বাস করছে না, সবাই ধরে নিয়েছে, আইবুড়ো মেয়ের বয়েস, ও কি আর অন্ততঃ দু-তিন বছর না কমিয়ে বলেছে? দশের পর থেকেই মেয়েদের বয়েস এক-এক জায়গায় চব্বিশ মাস করে দাঁড়িয়ে থাকে এ আর কে না জানে?

আড়ালে আমাদের (মা সমেত) নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছে, তা বেশ টের পাচ্ছি।

আমরা যে 'পুণ্যিপুকুর' 'বীরব্রত' 'সেঁজুতি'—এসব কোনো ব্রতই করিনি এ শুনে গালে হাত দিয়েছে সবাই।

মা অবশ্য অপ্রতিভভাবে বলেছেন, 'এই এক মানুষের বাতিকে চোদ্দবার ঠাঁই নাড়ানাড়ি, সব জায়গায় সুবিধে নেই—জনে জনে শিবপুজো করিয়েছি চার বছর করে —সেটা কেউ ধর্তব্যই করেনি।

'জনে জনে আবার কী?'

কেন মহাদেব গড়িয়ে পুজো করানো যায় না? কলকাতায় কি গঙ্গামৃত্তিকার অভাব আছে? মেয়েদের কিছু শেখায়নি মা! এমন মেমসাহেব!

আর বাবার কাকার ওই নাতনি ফুলি, সে যে আমার বয়সী হয়েও (অবশ্য পিছু-হটা নিয়মেই সে এখন দশ চলছে) এখনো একখানা মলাট-ছেঁড়া কথামালা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছু পড়তে পারে না, তার বেলায় কিছু দোষ হয় না?

অনেক কিছুই তো জানে না ও।

এই ন্যায্য কথাগুলি কিন্তু বাবার ওই নীরোদি বলতেন হঠাৎ হঠাৎ।

ওর নাকি 'নেয্য' কথা বলাই রোগ।

সেই প্রথম দিনই ও'র এ-রোগের পরিচয় পেয়েছিলাম।

মঙ্গল আরতি দেখে এসে ভিতর উঠোনে পা দিয়েই দেখি ইঁদারার ধারে ও-পাশে কতকগুলো বাঁশ আর দর্মা ফেলে একটা লোক উঠোনে গর্ত খুঁড়ছে।

বাবা নাকি মার আর আমাদের নাইবার জন্যে একটা আব্রুর ব্যবস্থা করছেন। ওই দর্মার ঘরটা বানানো হলে তবে মা নাইবেন।

তা হলেও গেল ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে। দিব্যি একখানা ঘর, বাইরে থেকে বাঁশের চোঙ দিয়ে তার মধ্যে জল সরবরাহেরও ব্যবস্থা হলো। ইঁদারা থেকে জল তুলে সেই চোঙে ঢালা হবে, সেটা ঘরের ভিতরে বালতিতে গিয়ে পড়বে।

উঃ এই নিয়ে যা হাসাহাসি হলো তা আর বলবার নয়। আমাদের দিকে সবাই এমন করে তাকাচ্ছে আমরা যেন কী এক আজব জীব।

টুকটাক কথা শোনা যাচ্ছে, 'গোসলখানা বানানো হলে, তবে মেমসাহেবরা চান করবেন।'

'...এইজন্যেই সাহেব বাড়িতে বনেনি, ভিন্ন হয়েছেন।...এতো সায়েবীআনা বলেই সাতজন্মে দেশে আসেন না নবাবু।'

মা একবার কাঁদো কাঁদো হয়ে জানলার ওধারে গিয়ে বাবাকে বললেন, 'এসব না করলেই হতো বাপু! মা যেমন করে চলে যেতো।'

বাবা বললেন, 'লোকে সবতাতেই কথা বলে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। কাজটা ভাল করছি কি খারাপ করছি সেটাই দেখতে হয়। আমি তো ঠিক করছি উঠোনের ওধারে একটা পাকা নাইবার ঘর করে দিয়ে যাবো বাড়ির বৌ-ঝিদের জন্যে।'

কিন্তু তৎক্ষণে বাবার সেই খুড়তুতো ভাই ফুলির বাবা আর কি, আমাদের নাকি তিনি নকুলকাকা, এসে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে উঠেছেন, 'দাদা যে একেবারে কীর্তি রাখা কাজ করছো দেখছি।'

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাবার নীরোদি, আমাদের যিনি পিসি হন, তিনি কোথা থেকে যেন তেড়ে বেরিয়ে এসে বলে ওঠেন, 'তা করছে কিছু মন্দ করছে? কুকীর্তি তো করছে না? আমার বাবা নেয্য কথা বলাই রোগ। বৌ-ঝির আব্রু রক্ষের চিন্তে কিছু নিন্দের কাজ নয়। চির-কাল শহুরে মানুষ, ঢাকা জায়গায় চানের অব্যেস, তা স্বামী হয়ে সেটা দেখবে না? তোর মতন লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর পরিবার তো নয় যে, পরিবারের পরণে লজ্জা নিবা-রণের বস্তরটুকু আছে কিনা দেখবে না?'

বাবা বলে ওঠেন, 'আহা থাক থাক নীরোদি, ও তো ঠাট্টা করে বলেছে—'

'ঠাট্টা! হুঃ! দ্যাখনা দু-দিন, বুঝবি ওই নির্ধাটির ঠাট্টা হচ্ছে ভিমরুলের হুল।'

তখন না বুঝলেও পরে নীরোপিসির সম্যক অবস্থা অনুধাবন করেছিলাম। নীরোপিসি বাবার পিসিমার মেয়ে। ওই একটা মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে যাওয়া মহিলাটিই তো চিরদিন পিত্রালয়বাসিনী, নীরোপিসি আবার সেই মায়েরই চির-গলগ্রহ কন্যে। অথচ দাপট দেখে কে!

সেকালে বিধবা মহিলারা যে কীভাবেই এই পোজিশানটি বজায় রাখতে সক্ষম হতেন!

নীরোপিসিকে অবশ্য ঠিক বিধবা বলা চলে কিনা জানি না। যদিও ছাঁটা চুলে আর কেটে থানে তিনি স্রেফ তাঁর মায়ের একটি 'কার্বন কপি', তবু ঠিক বিধবা কিনা কে জানে।

নীরোপিসির জীবনের একটি ইতিহাস আছে।

ওনার যখন এগারো বছর বয়েস, তখন বিয়ে হয়। এই গাঙ্গুলীবাড়ি থেকেই হয়। তখন বাবার পিসিমা সুরবালা দেবীর বাবা যোগেশচন্দ্র বেঁচে। তিনি নাকি আমার বাবার ঠাকুর্দা ছিলেন।

তিনি নাকি এই কাঞ্চনতলা গ্রামের বেশীর ভাগ অংশের জমিদার ছিলেন, তাঁর দাপটে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক কাঁপতো। কারণ, শুধু জমিদারই নয়, তিনি আবার গভর্মেন্টের বিশেষ খয়ের খাঁ ছিলেন।

ওঁর বাড়িতে বড় বড় সাহেবসুবোরা আসতো।

কাঞ্চনতলা গ্রামের বিখ্যাত মেলা মাঘী পূর্ণিমার মেলায় একবার নাকি কোন সাহেবের মেমও এসেছিল।

তবু যোগেশচন্দ্রকে গ্রামের সমাজ-পতিরা 'পতিত' করতে সাহস করেনি।

সে যা হোক সেই যোগেশচন্দ্রের এক মাত্তর বিধবা মেয়ের একমাত্তর কন্যের বিয়ে।

ঘটার মতন ঘটা করেছিলেন যোগেশ-চন্দ্র।

কেষ্টনগর থেকে ময়রারা এসে ভিয়েন করেছিল, লালবাগ থেকে ছানাবড়া কাটিয়ে আনা হয়েছিল এক-একটা গামলায় একটা। তত্ত্বয় যা থাজা গিয়েছিল, বড় বারকোশে এক একখানা।

সাতদিন ধরে বাড়িতে ন্যাড়া যজ্ঞি চলেছিল, বিয়ের রাতে তিন গাঁয়ের লোক ভোজ খেয়েছিল। মটুকসুটের গয়না পরিয়ে 'কন্যেদান' করেছিলেন যোগেশচন্দ্র, আর একশোজন বরযাত্রীর প্রত্যেককে ধুতি-চাদরের জোড়া দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

বর জিয়াগঞ্জের ছেলে, বরযাত্রীরা দু-দিন দু-রাত্রি কাঞ্চনতলায় কাটিয়ে গিয়ে-ছিল চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র সমুদ্রে ভেসে।

মোটের মাথায় যোগেশচন্দ্রের দৌহিত্রী নীরবালার বিয়ে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

জামাইও করেছিলেন নাকি দেখবার মতো।

(ক্রমশঃ)
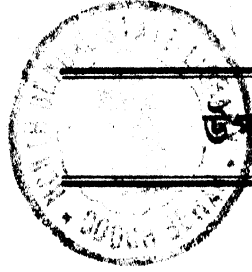
গীতা ও উপনিষদ হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুধর্মের ভিত্তি বেদ থেকে। কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থের নাম বেদ নয়। বেদ বিভিন্ন, সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ এই তিন ভাগে বেদ বিভক্ত। সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আছে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও প্রণালী, উপনিষৎ কিন্তু স্বতন্ত্র। অধ্যাত্মদর্শনের এক আশ্চর্য তত্ত্বজ্ঞানের আকর। ভারতে বিভিন্ন সময়ে যে সব ধর্মমত প্রচলিত হয়েছে তা বহুল অংশে উপনিষৎ প্রভাবিত।

উপনিষদের এই ভূমিকা উপলব্ধি করে এবং উপনিষদের বাণীর মধ্যে যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে তা বিবেচনা করে দারা শিকোহ পঞ্চাশখানি উপনিষদের মূল সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করে 'সিরুল আকবর' (রহস্য বিদ্যা সংবাদ) নামে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর পর উইলিয়াম জোনস উপনিষদ গ্রন্থের সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। তারপর লাতিন, ইতালীয়, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় দার্শনিক পণ্ডিতগণ উপনিষদের অনুবাদ করেছেন অজস্র, এবং বিশ্বের সর্বত্র উপনিষদের ভাবধারার ব্যাখ্যা এবং মর্মবাণী প্রচারিত হয়েছে। খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পূর্বে উপনিষদ রচিত হয় পণ্ডিতগণ এই অনুমান করেন।

এই কারণে সম্প্রতি তুর্কীতে উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হওয়ায় সেই দেশের সরকারের সাংস্কৃতিক অন্ধত্বের পরিচয় পেয়ে বিস্ময় ও বিরক্তিতে অন্তর ভরে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খৃঃ) উপনিষদের মহিমা উপলব্ধি করে তা বাংলা ভাষায় প্রচারে উদ্যোগী হন। উপনিষদ যে শুধু মাত্র সন্ন্যাসীদের নিজস্ব শাস্ত্র এই ধারণা তিনি দূর করে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া গৃহস্থেরও এক লক্ষণ এই শিক্ষা প্রচারে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। রাজা রামমোহন বিভিন্ন ধর্মমতের মূল সূত্র অধ্যয়ন করে এক সমন্বয় মার্গে উপনীত হন। এবং একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। যুক্তিনিষ্ঠ রামমোহন শঙ্করের মতাদর্শ অনুসরণ করে উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তিনি শঙ্করের মায়াবাদ পরিহার করেন।

পরে রামমোহনের অনুগামী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্র ও যুক্তি-প্রধান বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম স্থাপনা করেন। তিনি বলেছেন—

যখন উপনিষদে দেখিলাম, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'সোহহং', 'তত্ত্বমসি', 'এই আত্মা ব্রহ্ম' 'তিনি আমিই', 'তিনি তুমি'—তখনই বুঝিলাম যে ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই।' দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে উপনিষদের বাণী সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের দৃষ্টিকোণে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মানসিকতাকে উপনিষদ প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। বালক নচিকেতাকে যম আত্মতত্ত্ব ও আত্মলাভের উপায় নির্দেশ করে বলেছিলেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সূত্রটিকে তার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। মোহনিদ্রা ত্যাগ করে তিনি বলেছেন, ওঠো, জাগো, মোহনিদ্রা ত্যাগ কর। স্বামিজীর 'উদ্বোধন' পত্রিকার মূল নীতিবাক্যও এই 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—'। উপনিষদ আমাদের বীর্যবান করে এই বিশ্বাস স্বামিজীর ছিল।

একালে উপনিষদকে যিনি পরিপূর্ণভাবে জীবনে ও মনে গ্রহণ করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। উপনিষদ ছাড়া তিনি প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন ধর্মমত বৌদ্ধ মৈত্রী সাধনা, বাউল, সুফীদের মরমীয়াবাদ এবং বৈষ্ণবদের প্রেমধর্মাশ্রিত রস সাধনাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই মানসিকতার প্রকাশ অজস্র গান ও কবিতায় জড়ানো আছে। 'গীতাঞ্জলি', 'নৈবেদ্য', 'শান্তিনিকেতন' 'ধর্ম', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভারতাত্মার বাণী প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অতি সহজে উপনিষদের এক নিগূঢ় তত্ত্বের নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।—

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যে দিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্মবন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম ও দক্ষিণ বাহু।

এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।'

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালীন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ঐতরেয় ও তৈত্তেরীয় উপনিষদ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। শ্রীঅরবিন্দের সুগভীর দার্শনিক চিন্তার ফলশ্রুতি উপনিষদ বিচারে প্রযুক্ত হওয়ায় প্রাচীন ভাষ্যকারদের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন। শংকরের মায়াবাদকে তিনি গ্রহণ করেন নি, জীবনকে গ্রহণ করেই দিব্যজীবন, জীবন বিমুখতা সাধনার পথ নয়।

বাংলার বিভিন্ন মনীষীবৃন্দ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে উপনিষদ বিচার করেছেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ, চিত্রিতা দেবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। চিত্রিতা দেবী উপনিষদের পদ্যানুবাদ করেছেন এবং সম্প্রতি একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। উপনিষদ সম্পাদনা করেছেন আচার্য সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রমুখ পণ্ডিতগণ। সেই নামগুলির সঙ্গে যুক্ত হল সাধনপ্রবর অতুলচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম।

অতুলচন্দ্র সেন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কঠোপনিষদের সরল বাংলা অনুবাদ করেন এবং ১৯৪২-৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কঠোপনিষদসহ মোট নয়খানি উপনিষদ বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। এইগুলির ভিতর শুধু কঠ ও কেন উপনিষদের অনুবাদ তিনি স্বয়ং প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। বাকী সাতখানি উপনিষদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে রেখেছেন তবে ঈশ, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর, এই তিনখানির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। সবকটি উপনিষদ একত্রিত করে 'অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি' সম্প্রতি 'উপনিষৎ-নবক' এই নামে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

অতুলচন্দ্র সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবদগীতার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং এই স্তম্ভে তার বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করা হয়েছে। অতুলচন্দ্র ছিলেন (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে) রিপণ কলেজের অধ্যাপক এবং আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের কালে মতভেদ হওয়ায় তিনি অধ্যাপনার কাজ ত্যাগ করেন। তথ্যনিষ্ঠ, তেজস্বী ও কর্মযোগী এই মানুষটি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। ১৯৪৮ খৃঃ অতুলচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে। অতুলচন্দ্র ছিলেন উদার এবং বাস্তবধর্মী। তাঁর অজস্র রচনাবলী এখনও ছড়ানো আছে। তাঁর রচনার একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া গেল—

'মানুষের হৃদয় যখন নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন জ্ঞানের গভীর বৈরাগ্য কি কর্মের কঠোর সাধনা এসব কিছুই সে গ্রহণ করিতে চায় না। কোথায় ভাবের একটু উন্মাদনা আছে, তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে।'

ভাবের উন্মাদনা তিনি লাভ করেছিলেন প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে, ভারতীয় দর্শনের মধ্যে তিনি ভারত-আত্মার বাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন তাই 'গীতা' ও 'উপনিষদে'র এই জাতীয় সর্বজনবোধ্য মহাগ্রন্থ তিনি বিশেষ শ্রম সহকারে রচনা করেছেন। এক সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অতুলচন্দ্র একরকম নীরবেই সাধনা করে গেছেন। আজ অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতির উদ্যোগে দেশবাসী সেই সাধনার সুফল ভোগ করার সুযোগ লাভ করল।

এই গ্রন্থের ভূমিকাংশে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—

'সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে সর্বোচ্চ জ্ঞানের এই ঐশ্বর্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া অতুলচন্দ্র সেন তাঁহার কর্মময় জীবনে একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তাহাতে নিজের জীবনেও যে তিনি গীতা উপনিষদের আদর্শ অনুসরণ করিতেন তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।'

অতুলচন্দ্রের সুযোগ্য সন্তানগণ ও আত্মীয়স্বজন এই মহাগ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে মহৎ পুণ্যকর্ম করেছেন একথা বলা যায়।

এই গ্রন্থের সংকলনায় নির্মলকুমার বসুর 'ভারতীয় সমাজ ও শাস্ত্র', হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব', অন্নদা চৌধুরীর 'উপন্যাসে আনন্দ-সাধনা', দেবব্রত সিংহের 'সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে উপনিষদ', প্রফুল্লকান্তি বসুর 'উপনিষদ ভাব-পরিচিতি', ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রীর 'উপনিষদ ও ভারতীয় মনীষা' ও গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের 'প্রতীচ্যে উপনিষদ চর্চা' প্রভৃতি আলোচনাগুলি মূল্যবান। বিশেষ করে নির্মলকুমার বসু, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী ও গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত প্রভৃতি অধিকারীবৃন্দের রচনা পাঠে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুগ্ধ হবেন।

গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'উপনিষদ ও বর্তমান জগৎ'। এছাড়া অনুক্রমণিকা, গ্রন্থপঞ্জী, নির্দেশপঞ্জী প্রভৃতি সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।

সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ধর্মপরায়ণ বাঙালী পাঠকের কাছে সম্প্রতি অতুলচন্দ্রের এই জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হল। তাই স্বদেশবাসীগণ এই অসীম ধনের উত্তরাধিকারী হয়ে নিঃসন্দেহে গর্ব বোধ করবেন।

উপনিষৎ-নবক—(ধর্মগ্রন্থ) ঃ অতুলচন্দ্র সেন অনূদিত ও সম্পাদিত। প্রকাশ ঃ অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি। ১৩।৫, ডোভার লেন। কলিকাতা-২৯। মূল্য ষোল টাকা মাত্র।

—অভয়ংকর

সাহিত্যের খবর

ব্রেশটের ৭৫তম জন্মদিবস

শুধু নাট্যানুরাগীদের কাছেই নয়, বাঙালী সাহিত্যিকদের কাছেও বেরটোল্ট ব্রেশট একটি প্রিয় নাম। গত এক দশকে এঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে অসীম। ভাষান্তরিত হয়ে বা ব্রেশট নাটকের ভাব-অবলম্বনে একাধিক নাটকের যেমন অভিনয় হয়েছে বা হচ্ছে, তেমনি এই মহান নাট্যকারের অসংখ্য কবিতাও হয়েছে অনূদিত। বেরিয়েছে একাধিক সংকলনগ্রন্থ।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রেশটের নাট্য প্রযোজনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা। সেটা ১৯৬৮ সাল। প্রযোজনা করেছিলেন 'ককেশিয়ান চক সার্কল'।

ব্রেশট জন্মেছিলেন ১৮৯৮-র ১০ ফেব্রুয়ারি। ১৯১৮-র নভেম্বরেই হয়েছিলেন আউগসবুর্গের বিপ্লবী সৈনিক পরিষদের সদস্য। ঐ বছরেই শুরু করেন তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত কাজ। লেখেন 'বাল'। অভিনীত হয় সেটি প্রথম ১৯২৩-এ। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন মেডিসিন ও ন্যাচারল সায়েন্স। ১৯২২-এ বেরোয় 'ট্রোমেলন ইন ডেয়া নাখটে'। ঐ বছরেই পান 'ক্লাইস্ট' পুরস্কার। এরপর লেখেন এডুয়ার্ড দাস হ্বোইটেন ফন ইংল্যান্ড, মান ইশট মান, ডি ড্রাইগ্রোশেন ওপার, ডি মাসনামে, ডি মুটার, ডাস ওয়ার্ট, মুটার উন্ড ইরে কিন্ডার লেবেন দেস গালিলি এবং আরো অনেক নাটক।

শিল্পীজীবনের শুরুতেই বেরটোল্ট ব্রেশট যেসব কবিতা লেখেন সেগুলো ছিলো

গাওয়া গানের মতো। সুর করে গাওয়া হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লিখেছিলেন সমরবিরোধী কবিতা ও গান। যেমন 'মৃত সৈনিকের গান'। ১৯২৮-এর গ্রীষ্মে বার্লিন শিফবাউয়ারডাম থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয় থ্রি পেনি অপেরা। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেশট্ বিশ্বখ্যাত হয়ে পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই এই নাটকের গানগুলো লোকের মুখে ঘুরতে থাকে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাউসপোস-টিলে' বেরোয় ১৯২৭ সালে।

১৯৫১-তে ব্রেশট পান গণতান্ত্রিক জার্মানির প্রথম শ্রেণীর জাতীয় পুরস্কার, ১৯৫৬-য় পান আন্তর্জাতিক লেনিন শান্তি পুরস্কার। মারা যান বার্লিনে, ১৪ আগস্ট, ১৯৫৬-তে।

সম্প্রতি তাঁর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন কলকাতাস্থ জি ডি আর দূতাবাস ও ইন্দো-জি ডি আর মৈত্রী সমিতি যৌথভাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ। এবং উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়। উদ্বোধনকালে মন্মথবাবু বলেন : ব্রেশট আমাদের দিয়েছেন একটি নান্দনিক নাট্যরীতি। তাঁকে আমরা মনে করি বন্ধু, দার্শনিক ও গাইড হিসেবেই।'

নিঃশব্দ বিদায়

অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন তিনি অসুখে। হালে চলছিল বাড়াবাড়ি। অবশেষে মারা গেলেন সম্প্রতি। ঔপন্যাসিক এর্নস্ট ক্রয়ডারের জীবনাবসান ঘটল তাঁর ডার্ম-স্টাটের বাড়িতে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

শুয়ে শুয়েই ক্রয়ডার লিখছিলেন তাঁর নতুন উপন্যাস। যতদূর জানা যায় শেষ করেও এনেছিলেন তিনি। বহু প্রকাশকই বইটি বের করার ব্যাপারে দেখান উৎসাহ।

এর্নস্ট ক্রয়ডার ছিলেন রোমান্টিক লেখক। কাহিনী আর চরিত্রচিত্রণের দিকেই শুধু নয়, ভাষা সম্পর্কেও ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। শব্দের পর শব্দ গেঁথে এমন এক আশ্চর্য জগত তৈরি করতেন তিনি উপন্যাসে, যার ফলে তাঁর পাঠকেরা অনায়াসে পৌঁছে যান এক সৌন্দর্যের জগতে, বিমুগ্ধতার দ্বীপে। এবং এদিক থেকে পশ্চিম জার্মানির সমকালীন সাহিত্যে ক্রয়ডারের জুড়ি মেলা ভার। এলিজাবেথ লাংগাশার তাঁকে বলতেন 'অনন্ত সৌন্দর্যের যাদুকর'।

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন ক্রয়ডার। ১৯১৯-এই একটি ব্যাঙ্কে তিনি ছিলেন শিক্ষার্থী। কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই এ চাকরির প্রতি জন্মাল বিতৃষ্ণা। ছেড়েও দিলেন। জমা-খরচ, সুদ-আসলের হিসাব কষাকষির চাইতে তাঁর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল দাই

হামসন, ডস্টয়ভস্কির জগত। পড়াশোনা করতে শুরু করলেন। দর্শন, সাহিত্য, অপরাধ বিজ্ঞান—সব বিষয় নিয়েই চলল পড়াশোনা। না, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনও তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে নি। এরপর এক সময় বেরিয়ে পড়লেন ভ্রমণকারীর মতো। ঘুরলেন যুগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া, গ্রীস।

১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছিলেন ফ্রী-লান্স লেখক। এই সময়েই শুরু করেন তাঁর উপন্যাস ডি উনার্ডিফিনডবারেন-এর খসড়া। তাঁর প্রথম গ্রন্থ হল গোসেলশাফট ফম ডাখবোডেন। এরপর বেরোয় একাধিক উপন্যাস। ১৯৫৩-য় পান সাহিত্যের জন্য গেওর্গ ব্যুখনার পুরস্কার।

শিরোনাম : পাবলো নেরুদা

'ক্ষুধা বা অনশন—তা সে ভারতবর্ষে বা পশ্চিমের নানান রাজধানী-শহর যেখানেই থাকুক না কেন আমার কাছে সমান পীড়াদায়ক।......চলতে হবে আমাদের পথের মাঝখান দিয়ে, চলতে হবে জীবনের দিকে।' কথাগুলি বলেছিলেন একসময় নোবেল পুরস্কৃত কবি পাবলো নেরুদা। যাঁর আসল নাম নেফতালি রিকার্ডো রেইস বাসয়াল্তো।

শান্তির সৈনিক, মানবতার দক্ষ রূপকার এই কবি কিছুদিন আগেও ছিলেন ফ্রান্সে চিলির রাষ্ট্রদূত। সম্প্রতি তিনি সেই কাজে ইস্তফা দেন। এবং এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে ৬৮ বছর বয়স্ক কবি নেরুদা জানান 'আমি আরো বেশি কবিতা লিখতে চাই। কাব্যের জন্যেই নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দিতে চাই। সেজন্যে দরকার আমার কবিতা লেখার জন্য অধিকতর সময়। আমি চাই চিলির অধিবাসীদের গৌরবান্বিত করে ফুটিয়ে তুলতে। মাতৃভূমির শ্রমিকদের গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশে চাই আত্মনিয়োগ করতে। হ্যাঁ, কবিতাই আমার প্রাণ।'

আল-বিরূণির জীবনী

সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত ছিলেন আল-বিরুণি। সম্প্রতি তাঁর স্মরণে তাসখন্দ থেকে বেরিয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী। উপলক্ষ্য আল-বিরুণির সহস্রতম জন্ম-বার্ষিকী। উজবেক ফিল্ম স্টুডিও থেকেও তোলা হচ্ছে তাঁর জীবন নিয়ে একটি চলচ্চিত্র। পরিচালনা করছেন উজবেক প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্ট শিল্পী শুখরাত আব্বাসোভ। জানা যায় উজবেকিস্থান ছাড়াও ভারত, আফগানিস্থান ও ইরানে এই ছবি তোলার কাজ চলবে।

ভয় ভাবনা ভালবাসা এবং অন্যান্য (গল্প-সংকলন)। সমর দত্ত। বি এম ট্রেডার্স, ১৯, তেলিপাড়া লেন, কলকাতা-৪। তিন টাকা।

শ্রীসমর দত্ত তরুণ লেখক এবং 'ভয় ভাবনা ভালবাসা এবং অন্যান্য' গল্প-সংকলনটি এঁর সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই নবীন এবং তরুণ লেখক প্রথম গ্রন্থে কিছু পরিণত সাহিত্য-চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। মোট সাতটি ছোট গল্প নিয়ে বর্তমান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের নাম গল্পটি গ্রন্থের শেষ গল্প এবং অন্যান্যের মধ্যে আছে অতিথি, ধোঁয়াটে, কোনও একদিন ছায়ার মধ্যে ছায়া ছেঁড়া চিঠি যে ডাকে আমারে, বাকি ছয়টি গল্প। গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি ইতিপূর্বে ছোট বড় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় সমস্ত গল্পেরই মূল উপজীব্য প্রেম। 'অতিথি' গল্পের নায়ক রবি, নায়িকা বন্দনা। বন্দনার প্রতি রবির প্রেম অনেকটা খেলার বিষয়, কিন্তু বন্দনার ভালোবাসাবোধ দায়িত্বশীল। এই বিপরীতধর্মী নায়ক-নায়িকা-ভাবনায় লেখক সার্থক। 'ধোঁয়াটে' গল্পের মিহির-তাপসী, 'ছেঁড়া চিঠি'র নমিতা-পলের কোনও একদিনের অপূর্ব-অনুরাধার রোমান্টিক সম্পর্ক, 'ছায়ার মধ্যে ছায়া'র সুনীল-সুলেখা সংবাদ—সমস্তই লেখকের তরুণ শিল্প-মানসিকতার স্বাক্ষর হয়ে আছে। আলোচ্য তরুণ লেখকের গল্প বলার ক্ষমতা অনস্বীকার্য। 'ভয় ভাবনা ভালবাসা' নামের শেষ গল্পটির মূল রসকেন্দ্র বাৎসল্য। লেখকের ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল। তবে তাঁর শিল্পসম্মত জীবনদৃষ্টির গভীরতা এখনো পরোক্ষ আসেনি।

দ্বিতীয় শৈশবে। বিশ্বরূপ মণ্ডল। বলাকা প্রকাশনী, ৮৮।৩এ, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, কলকাতা-১৩। দু'টাকা।

মোট চারটি ছোট-বড় কবিতার সংকলন গ্রন্থ শ্রীবিশ্বরূপ মণ্ডলের 'দ্বিতীয় শৈশবে'। মাত্রাবৃত্তে রচিত। বাকি তিনটি কবিতাই গদ্যছন্দে নির্মিত। গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দ্বিতীয় শৈশবে' দীর্ঘ কবিতা। কবিতাগুলির সবই দেশাত্মবোধক এবং সম্প্রতি সৃষ্ট শিশুরাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'-এর মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দিক নিয়েই এদের বিষয়বস্তু। এ ধরনের বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে বহু লেখা হয়েছে। বিশ্বরূপবাবুর লেখা সেখানে নতুন কোন বক্তব্য ও কবি-প্রাণতার স্বাক্ষর রাখেনি। কয়েকটি শব্দচিত্র ভাল, কবিত্বময়।

বইপড়া : কায়সুল হক সম্পাদিত। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। ৬-৭-ক পুরানা পল্টন। ঢাকা-২। বাংলাদেশ। দাম—পঁচিশ পয়সা।

পাঠকের উচ্চারণ : কায়সুল হক সম্পাদিত। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। ৬-৭-ক পুরানা পল্টন। ঢাকা-২।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-উৎসব পালিত হয়েছে গত বছর। নয়াদিল্লীতে আয়োজিত গ্রন্থ-উৎসব এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও সাড়া জাগায়। শিক্ষার ক্রমবিকাশ এবং জনগণের পাঠ-অভ্যাস বাড়াবার পক্ষে এই ধরনের উৎসবের ভূমিকা অসামান্য। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অনুষ্ঠান উদযাপন করলে আমাদের মত অল্পশিক্ষিত মানুষের দেশ উপকৃত হবে।

গত বছর ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থ উৎসব পালিত হয় জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের উদ্যোগে। 'বইকে জনতার হাতের সামগ্রী করে তুলে দাও'—এই ছিল উৎসবের শ্লোগান। ভাষণ, সংগীত, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আবৃত্তি—বৈচিত্র্যময় কর্মসূচী ছিল উৎসবের অনুষঙ্গ। বিভিন্ন দিনে লেখকের স্বাধীনতা, গ্রন্থপ্রকাশন, পাঠাগার উন্নয়ন, পাঠাভ্যাস, ছড়া প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা সভায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা অংশ গ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

উৎসব উপলক্ষে কয়েকটি সুদৃশ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। প্রকাশিত এইসব পুস্তিকার মধ্যে কায়সুল হক সম্পাদিত 'বই পড়া' সবথেকে আকর্ষণীয়। লাইব্রেরী এবং বই পড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, জসীমউদ্দিন, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরদার জয়েনউদ্দীন জহুরুল হকের কয়েকটি লেখা মুদ্রিত হয়েছে। কায়সুল হক সম্পাদিত আর একটি পুস্তিকা হল 'পাঠকের উচ্চারণ'। বিভিন্ন দেশের 'বাংলা দেশ' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত সমন্বিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বই সম্পর্কে এবং পাঠাভ্যাস বিষয়ক মন্তব্য সংকলিত হয়েছে। আকারে ছোট হলেও যে কোন শ্রেণীর পাঠককে পুস্তিকাগুলি আকৃষ্ট করবে। 'কর্মসূচী' সম্পাদনায়ও স্বতন্ত্র রুচির সম্পন্ন পরিচয় রয়েছে। এজন্য জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের কর্মপ্রধান সরদার জয়েনউদ্দিন সুধীজনের সাধুবাদ পাবেন।

চব্বিশ পরগণা (রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ) —সম্পাদক তারাপদ পাল। ১২৭এ, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৭। দাম : দু' টাকা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে এই সংকলনটি বেরিয়েছে। উৎসর্গীকৃত হয়েছে 'জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টিতে ২৪ পরগণা জেলার যে সকল মনীষী ও কৃতী সন্তান সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, এবং উত্তরকাল ও উত্তরসূরীদের জন্য আদর্শ অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের স্মরণে।' লিখেছেন তারাপদ পাল, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরা, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দাস, সিদ্দিক দেওয়ান, তাপেশ দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন দে, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর মৌর, কালিদাস দত্ত, জগদীশ সরকার, আনন্দ রায়, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ও অনিল দাস। চব্বিশ পরগণার ইতিহাস, সংস্কৃতি, মন্দির মসজিদ পত্র-পত্রিকা, লোকউৎসব মেলা প্রভৃতির আলোচনায় সংকলনটিকে গবেষণা-গ্রন্থের মতো মনে হয়। আমাদের ধারণা, সকলের কাছেই সংকলনটি সংগ্রহযোগ্য মনে হবে। উদ্যোক্তারাও ধন্যবাদ পাবেন।

বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। কলিকাতা পুস্তকালয়। ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম—আট টাকা।

মুনি-ঋষিদের দেশ ভারত। আজও ধর্মীয় চিন্তাধারায় আকর্ষণ কোন অংশে কম নেই মানুষের। প্রতি বছর বই বেরোয় অসংখ্য। পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর আশ্চর্য দেব-মাহাত্ম্যময় জীবনকথা রচনা করেছেন অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই মহামানবকে শ্রেষ্ঠ যোগী পুরুষের সম্মান জানিয়েছিলেন। লেখকের রচনা-নৈপুণ্যে মহাত্মার জীবনকথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির অন্যতম সম্পদ তৈলঙ্গ-স্বামীর উপদেশাবলী।

বেথলেহেমের পথে : দীপালি রায়। প্রকাশক : সাহিত্য সদন, কলকাতা-৯। দাম : ২-৫০।

খৃষ্টের জন্মকালীন একটি কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি রচিত। মহৎ জীবনের কথা সবসময়ই আদরণীয়। বিশেষতঃ এই ছন্নছাড়া যুগে ও হলো আলোকবর্তিকার মতো। মানবজীবনের সার কথা গ্রন্থটিতে বিধৃত। লেখিকা সুন্দর ভাষায় আগাগোড়া কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। গ্রন্থটি অনেককে আকর্ষণ করবে।

লোকে বলে—অবক্ষয়ের যুগ, ভেঙে পড়ার দিন, কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরা কি গড়েও তুলছি না? অন্তত ক্লাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অন্য চেহারাই দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি। আমাদের নবযুগের যুবসমাজের সেই অক্লান্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে তুলে ধরা হবে এই বিভাগে।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট

একাশি বছরের যে যৌবনদীপ্ত প্রতিষ্ঠান আজও তার বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে চলেছে সতেজে, 'সোসাইটি ফর দি হাইয়ার ট্রেণিং অব ইয়ংমেন' বললে এই শতকের মানুষ হয়তো তাকে চিনতেই পারবেন না। কারণ বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট'। উনিশ শতকের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার, স্বদেশী আন্দোলন, আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ প্রভৃতি নবজাগরণের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জোয়ার বাংলায় নবোন্মাদনা এনেছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মিলন ঘটিয়ে জন্মলাভ করেছিল এই মহান প্রতিষ্ঠান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৩১ আগষ্ট। বিগত শতকে বিদেশী শাসক জীবনবিমুখ—নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে উপেক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে এদেশে। ১৮৫৭ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পর বাইরে থেকে দলে দলে ছাত্ররা এসে হারিয়ে গেল কলকাতায়। তলিয়ে গেল অসংখ্য প্রলোভনের পাপ-পঙ্কে, দেশের চিন্তাবিদরা তাই নৈতিক শিক্ষা দিতে ও সামাজিক সুস্থ পরিবেশ রচনা করতে গড়ে তোলেন এই প্রতিষ্ঠান। নৈতিক বিভাগের দায়িত্ব নিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আর ব্যায়াম ও সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয় যথাক্রমে মিঃ এইচ লি ও বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর। প্রতিষ্ঠানের প্রেরণার মর্মমূলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার গুরুদাস, আনন্দমোহন, মহেন্দ্রলাল, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রেভারেন্ড কালীচরণ, রিজলে, টমারী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ। টাউন হলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পাঁচ বছর পর সংস্থার নাম বদল করা হয়। রচিত হয় সংবিধান, স্থির হয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। শুরু হয় সাহিত্য-নাটক-আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সার্থক হয় কবিগুরুর প্রত্যাশা—'কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদে প্রাঙ্গণ রচনা করিয়াছে। বিদ্যাতয়নের ভিতরের সহিত বাহিরের মিলন... এইখানেই। শাস্ত্রিক বিদ্যার সহিত কলাবিদ্যারও মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, নূতন ছাত্রের সহিত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র। এই মিলনে চিত্ত সরস ও বিদ্যাপ্রাণবান হইয়া উঠিবে—এই প্রত্যাশা আমার মনে রহিল।'

গোলদীঘির পূর্ব দিকে উত্তর দিক ঘেঁসে এক বিঘা জমির ওপর বিরাট দেহ নিয়ে তিনতলা সমান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ভবন। এক তলায় থিয়েটার হল (ঘূর্ণায়মান মঞ্চে) এবং জিমনাসিয়াম কেন্দ্র, দোতলায় ব্যালকনি বা বারান্দা এবং কমিটি রুম, আর তিনতলায় গ্রন্থাগার ও রিডিং রুম, অফিস ঘর, বিলিয়ার্ড টেবল টেনিস ইত্যাদি খেলার ঘর।

বর্তমান শতকের পাঁচটি দশক ছিল ইনষ্টিটিউটের স্বর্ণযুগ। দেশের জ্ঞানীগুণী মনীষীরা নিয়মিতভাবে এখানে এসেছেন, সভা ও আলোচনাচক্রে সানন্দে যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' 'পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি এখানে পাঠ করেছেন। শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্রের মত কুশলী নট এখান থেকেই নাট্যস্বীকৃতি লাভ করেছেন। অবশ্য এব্যাপারে নাট্যশিক্ষক অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর কৃতিত্বই সর্বাধিক। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে পরিপূর্ণভাবে মানুষ গড়ে তুলতে যা প্রয়োজন, এখানে তারই সর্ববিধ ও সর্বাঙ্গীণ আয়োজন।

এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইনষ্টিটিউটের কার্যকলাপ হয়েছে বহুমুখী, গড়ে উঠেছে বয়স্কশিক্ষা ও সমাজসেবা বিভাগ, নাট্য বিভাগ, সংগীত বিভাগ, নৃত্য বিভাগ, (কত্থক-কথাকলি-ভারতনাট্যম্--মণিপুরী), সন্তরণ বিভাগ, জিমনাসিয়াম বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগে আছেন একজন বিভাগীয় সভাপতি। আন্তঃকালেজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে প্রতি বছর বিভিন্ন বিভাগে। গত বছর থেকে শুরু হয়েছে আন্তঃবিদ্যালয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করার কথা বর্তমানে চিন্তা করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য জাতীয়

স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষাকে বাদ দিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। শিক্ষাপ্রসারের জন্যে এখানে গড়ে উঠেছে একটি গ্রন্থাগার এবং নিখরচায় বসে পড়বার রিডিং রুম। যে কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগারে এসে খবরের কাগজ ও পত্রপত্রিকা পড়তে পারেন। ইংরেজী ও বাংলা মিলিয়ে এখানে রাখা হয় ৬টি দৈনিক, ৫টি সাপ্তাহিক, ২টি মাসিক, বার্ষিক সংখ্যাগুলি ও কিছু বিদেশী পত্র-পত্রিকা। প্রতিদিন খোলা থাকে দুপুর দুটো থেকে রাত নটা পর্যন্ত। রবিবার থাকে বন্ধ।

গ্রন্থাগারে দু'রকম সদস্য আছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাৎসরিক তিন টাকার বিনিময়ে জুনিয়র সদস্য হতে পারেন। আর যাঁরা স্নাতক ও উপার্জনশীল তাঁরা বাৎসরিক আট টাকার বিনিময়ে সিনিয়র সদস্য হতে পারেন। বই-এর সংখ্যা ইংরেজী ও বাংলা মিলিয়ে মোট ১০ হাজার। পুরোনো পত্রপত্রিকার জন্যে গবেষকরা কদাচিত আসেন।

এই গ্রন্থাগারের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল টেক্সবুক লাইব্রেরী। সেখানে পাওয়া যায় বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, দর্শন, বাণিজ্য, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত ও জীববিদ্যার বই।

অস্নাতক দরিদ্র ছাত্রদের এ'রা অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন।

লাইব্রেরী, হল ইত্যাদি দেখাশোনা করার জন্যে ১৭ জন কর্মচারী আছেন।

ইনস্টিটিউটের বর্তমান সভাপতি হলেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র এবং সম্পাদক হচ্ছেন ডাক্তার অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

এখানকার দুটি নিয়ম ভারী অদ্ভুত। কোন মহিলা এই লাইব্রেরীর সদস্য হতে
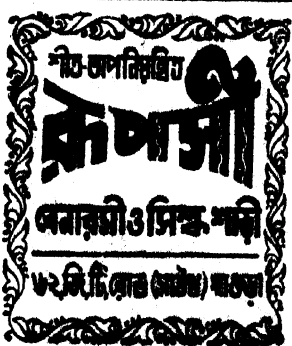
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট

পারেন না এবং সিনিয়র মেম্বার হতে গেলে উপার্জনশীল ব্যক্তিকে অন্তত স্নাতক হতে হবে। মুখে আমরা শিক্ষাপ্রসারের কথা বলছি, আর কার্যক্ষেত্রে আবহমানকালে রচিত সংস্থার সংবিধানের দাসত্ব করছি—এটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ, এদিকটা যেন তাঁরা একবার ভেবে দেখেন!

গ্রন্থাগারের প্রধান সমস্যা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি তার উত্তরে ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক ডাক্তার সুকান্তি হাজরা জানালেন—টেক্সবুক লাইব্রেরীকে তাঁরা বাড়াতে চান। দরিদ্র ছাত্ররা যাতে এখানে বসে পাঠ্যবই পড়তে পারেন এবং সামান্য কিছু অর্থ জমা রেখে যাতে বাড়ীতে বই নিয়ে গিয়ে পড়তে পারেন, তার ব্যবস্থার কথা এ'রা চিন্তা করছেন। কিন্তু বই কেনার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। রাজ্য সরকার গত পাঁচ বছর এবং কলকাতা কর্পোরেশন গত দশ বছর অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় অথবা বেসরকারী কোন সাহায্যও পাওয়া যায় না। সদস্যদের চাঁদা আর হলভাড়া থেকে এত বিরাট ব্যয় নির্বাহ করে বই কেনা দুষ্কর। অবিলম্বে সরকারের উচিত টেক্সবই কেনার জন্যে কিছু অর্থসাহায্য করা।

ইনস্টিটিউট শুধু একটা হলদে বাড়ী নয়, একটি সাংস্কৃতিক সত্তা—জাতির মর্মবাণী, যুবসম্প্রদায়ের জীবনসাধনার পীঠস্থান, আগামী দিনের ভবিষ্যত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর নেই কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। সমগ্র পশ্চিম বাংলার ছাত্রসমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন এর ব্রত এবং ইনস্টিটিউটকে তার সাধনক্ষেত্রে পরিণত করাই এই সংস্থার আদর্শ ও লক্ষ্য। এই মহান উদ্দেশ্যকে আরো সার্থকতর ও ব্যাপকতর করে তুলতে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায় আগামী দিনের প্রত্যাশাগুলিকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না জওহরলাল নেহরুর উক্তি—"সমগ্র এশিয়ার এই একমাত্র প্রাচীনতম গৌরবময় ছাত্র-প্রতিষ্ঠান," আর কবিগুরুর সশ্রদ্ধ মন্তব্য—"পর্বতপ্রমাণ আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতনকালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে।"

—সুশান্তকুমার মিত্র

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু মন? মনের অসুখও তো সমানই অক্ষম করে দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীব্র তীক্ষ্ণ জটিলতার যুগে, অভিজ্ঞ চিকিৎসক 'মনের খবরে' সেই সব মনোব্যাধি ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

সামনে চলতে গেলেও মাঝেমধ্যে পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখতে হয়। আগের পরিচয় ঠিক না হলে বর্তমানের বা ভবিষ্যতের পরিচয়ে গোলমাল ঘটতে পারে। অমৃতে পত্রিকার কয়েকজন পাঠক-পাঠিকার চিঠিতে কয়েকটি অনুরোধ এসেছে। তাদের প্রশ্নকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁরা জানতে চেয়েছেন—(১) নির্জ্ঞান মনের বা অদস অংশের স্বরূপ কি? (২) মনঃসমীক্ষণের অহং এবং হিন্দুশাস্ত্রের অহং কি এক? (৩) অধিশাস্তা বলতে ঠিক কি বোঝায়, আর তার কাজ কি? (৪) শিশু ও মায়ের সম্বন্ধের মধ্যে কামবৃত্তির অস্তিত্বের প্রমাণ কি? (৫) সমকামিতা কোন্ স্তর থেকে দেখা দেয়?

যে-প্রশ্ন পাঠক-পাঠিকাদের মনে জেগেছে তার উত্তর দিতে আমাদের আরেকবার পেছন ফিরে তাকাতে হবে। তাতে বাধা কিছু নেই বরং বোঝবার সুবিধে যদি হয় তবে তাতে লাভই হবে। খুব সংক্ষেপে বলতে গিয়ে অনেক কথা বাদ দিতে হয়েছে আর তার ফলেই বোঝবার কিছু অসুবিধে হয়েছে। প্রশ্নগুলির ক্রমানুসারে একে একে উত্তর দিলে সুবিধে হবে।

(১) প্রথম অবস্থায় মনকে দৈশিক বা সাংস্থানিক (টোপোগ্রাফিক্যাল) হিসেবে ভাগ করে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল নির্জ্ঞান (আনকনশাস্) আসংজ্ঞান (প্রি-কনশাস্) ও সংজ্ঞান (কনশাস)। বাস্তবে মনকে এমন কোনো সীমারেখা টেনে ভৌগোলিক নিয়মে ভাগ করা যায় না। কারণ, মন বস্তু বা পদার্থ নয়। সে কোনও বিশেষ স্থান জুড়ে থাকে না। তাই তাকে বাস্তব নিয়মে ভাগ করা সম্ভব নয়। আমরা সাধারণত বস্তুর সঙ্গেই বেশী পরিচিত আর কিছু বুঝতে হলে সেই অনুসারে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে বা বুঝতে সহজ হয় বলেই মনকে ঐ তিন ভাগে ভাগ করে কল্পনা করে নিয়ে মনের ক্রিয়া বোঝবার সুবিধে করা হয়েছে মাত্র। এই মতবাদানুসারে চলে দেখা গেল মনের ক্রিয়াগুলি সব ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ফ্রয়েড তখন মনের এক অবয়ববাদ বা সংঘাতবাদ (স্ট্রাকচারাল) সিদ্ধান্ত (থিওরী) গ্রহণ করলেন। এই পরিবর্তিত বাদে মনকে অদস (ইদ), অহং (ইগো) ও অধিশাস্তা (সুপার-ইগো) এই তিন ভাগে ভাগ করে কল্পনা করা হল। নির্জ্ঞান অর্থে মনের যে অংশের বিষয় আমরা কিছু জানতে বুঝতে পারি না। কেবল বিশেষ কোনও পদ্ধতিতে এই নির্জ্ঞানের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে ও অনুমান করতে পারা যায়। যখন নির্জ্ঞানের কোনো তথ্য জানা হল তখন আর তা নির্জ্ঞান রইল না, সংজ্ঞানের স্তরে উঠে আসে। আদি অবস্থায় মনের সবটাই নির্জ্ঞান থাকে, পরে ক্রমে বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শে আসাতে নির্জ্ঞান স্তরের উপরের অংশ ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে সংজ্ঞানের স্তর সৃষ্ট হয়। এই সংজ্ঞান মনের সাহায্যেই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জানা, বোঝা, অনুভব করা, বিচার করা ইত্যাদি কাজ চলে। যখন মনের অবয়ববাদ স্থাপন করলেন তখন ফ্রয়েড বললেন, আমাদের যত সহজাত বৃত্তি নিয়ে আমরা জন্মাই, তার আধার হল অদস্। এই অদস্ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান সোজাসুজি আমাদের হয় না। কারণ অদস্ নির্জ্ঞান অর্থাৎ তা আমাদের সংজ্ঞান মনের অধিকারের বাইরে। কারণ, সে-অবস্থায় সংজ্ঞান মন গঠিত হয়নি। যে বৃত্তি সেখানে আছে তাদের কিছু কিছু প্রকাশ যখন সংজ্ঞান মন গঠনের পরে দেখতে পাই বা অনুভব করতে পারি তখনই কেবল বুঝতে পারি, ঐরকম বৃত্তি আমাদের মনে আছে। বিশেষ কোনো বৃত্তিজনিত যে ইচ্ছাগুলিকে আমরা চেপে দিই অর্থাৎ অবদমিত (রিপ্রেস) করি, সে ইচ্ছাগুলি আবার নির্জ্ঞান বা আসংজ্ঞানে চলে যায়। তখন আমরা তার অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং তার ফলে তা জানতে বুঝতে পারি না। কোনো বৃত্তি বা অবদমিত ইচ্ছা অদসে মরে যায় না। তারা সর্বদাই বাস্তবে তাদের পূরণের চেষ্টা করতে থাকে। যে-কোনো ভোগস্পৃহা নির্জ্ঞানে বেঁচে থেকে, ভোগ মেটানোর জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যায়। নির্জ্ঞানের একটা অংশ অদস্, যার মধ্যে জন্ম থেকে ঐ সহজাত বৃত্তিগুলি বাস করে। নির্জ্ঞানের বাকি অংশে বহু অবদমিত ইচ্ছা প্রভৃতি ভিড় করে আছে। তারাও নিজেদের প্রকাশের জন্য সদাসচেষ্ট। বাস্তব জগতে যেমন স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির বিচার বিবেচনা আছে, 'হাঁ' এবং 'না' আছে, বড়-ছোটর ভেদ আছে, ভাল-মন্দর বিচার আছে, নির্জ্ঞানে বা অদসে সেসব কিছুই নেই। সে এক একাকারের রাজ্য। সেখানে 'সবাই রাজা'। যে যখন পারে সুযোগ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কে আগের ইচ্ছা, কে পরের ইচ্ছা সেখানে তার কোনো হিসেব নেই। তারা যে আছে এই তাদের পরিচয়, কবে থেকে, কখন থেকে আছে, সে-প্রশ্ন সেখানে নেই। যা আছে সেখানে তা 'অস্তি', আছে। এটা নয় ওটা নয়, এমন কথাই সেখানে ওঠে না। ইচ্ছেগুলিকে অবদমিত করে অহং, আবার তাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধাও দেয় অহং। এই অহং-ই পূর্বকল্পিত প্রহরী (সেন্সর)। যাতে আমাদের সহজভাবে দিনের কাজ চালিয়ে যেতে অসুবিধে না হয় সেইজন্যেই অহং ঐ প্রহরীর কাজ চালিয়ে অবাঞ্ছিত ইচ্ছাগুলিকে বাইরে আসতে বাধা দেয়। যদি তা না হতো তবে আমাদের নানা বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সংজ্ঞান মন সর্বদা আন্দোলিত হতো, কোনো দিকে কিছু করে উঠতে পারতো না। সুখে বাঁচবার পক্ষে এই ব্যবস্থা যে কত দরকার তা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। এক শ্রেণীর মানসিক রোগী আছে যাদের কোনো কিছু ভাবতে বা করতে গেলেই মনে করুন, মনে হয়, 'গলায় দড়ি' বা অন্য কিছু কথা। সব সময় যদি এই কথা মনে হতে থাকে, তাদের পক্ষে কিছু ভাবা বা করা কি সম্ভব হবে! মহা অশান্তিতে তাদের দিন কাটে। অহমের আরও অনেক রকমের কাজ আছে। সেসব নিয়ে আলোচনা করার এখন দরকার নেই। অদস্ ও নির্জ্ঞান মিলে আমাদের মনের মূল ভাঁড়ার-ঘর বলা চলে। সেখানেই আছে মনের শক্তির প্রধান কেন্দ্র। তাদের বাদ দিলে মন অচল।

(২) মনঃসমীক্ষণ মতে অহং আর হিন্দু-দর্শনের মন এক নয়। তবে দুয়ের কার্যতার কিছু কিছু মিল আছে। মনঃসমীক্ষণের অহং মনেরই এক অংশ কিন্তু হিন্দুদর্শনে মন ও অহং (অহংকার) পৃথক। সেই দর্শন মতে মনকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। মন সেখানে অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ, প্রকৃতির বিকৃতির ফল বলা হয়েছে।

মনঃসমীক্ষণবাদে মনকে জড় পদার্থ বা বস্তু বলা হয় না। তা পদার্থ নয়—(নন ম্যাটার)। এই দুই মতবাদের মধ্যে অহমের কাজেরও অনেক প্রভেদ আছে। বাস্তব দুনিয়া থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করতে হলে জানতে হলে তা মনের মাধ্যমে ছাড়া জানা যায় না। অধুনা মনঃসমীক্ষণবাদেও, ফ্রয়েডোত্তর যুগ, অহং

(ইগো)-বাদেও (সেলফ) নামে মনের আরও একটি পৃথক সংস্থার প্রয়োজন কোনো কোনো সমীক্ষক অনুভব করেছেন। এই সেলফ দর্শনের আত্মা নয়। এই মনঃসমীক্ষণের সেলফ-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা কঠিন, কারণ এই তত্ত্ব এখনও খুব স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। দর্শনের মহৎ তত্ত্বের কাছঘেঁষা অহং ও মহত্তের মাঝখানে এই সেলফ-এর স্থান হয়ত নিরূপিত করতে হবে। গবেষণা চলছে। সময়ে ফলাফল জানা যাবে।

(৩) মনের বর্তমান পূর্বমতের কিছু সংস্কার করে অবয়ববাদ বা সংঘাতবাদ (স্ট্রাকচারাল কনসেপ্ট অব মাইন্ড) অনুসারে—অদস্ ও অহং প্রথম থেকেই সহাবস্থান করে বলা হয়। ক্রমে বয়ঃবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভের ফলে অহং সুগঠিত হতে থাকে। তার শক্তি ও প্রসারও বেড়ে যায়। সেই অভিজ্ঞতার ফলে অহং অদসের বৃত্তির সহজ প্রকাশে বাধা দেয়—ব্যক্তির জীবন সুখময় করবার প্রয়োজনে। বৃত্তির পূরণে সুখ হয়, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি যেখানে প্রতিকূল হয় সেখানে বৃত্তির পূরণে সুখের চেয়ে দুঃখ-দুর্দশাই বাড়ে। আক্রম বৃত্তির প্রভাবে যখন রাম শ্যামকে খুন করবে তখন বৃত্তি পূরণের সুখ তার হয় তা মনে করা যায়। কিন্তু শ্যামের প্রতি রামের কেবল যদি আক্রম বৃত্তিরই প্রভাব থাকে তবেই সে সুখ হবে। কিন্তু যদি সেই সঙ্গে শ্যামের প্রতি রামের ভাললাগা বা ভালবাসার কোনো টানও কিছু থাকে তবে সে হত্যায় রামের সুখ বা তৃপ্তি না-ও হতে পারে। তা ছাড়া, বাস্তবে হত্যার পরিণাম কি তা যদি জানা থাকে তবে হঠাৎ হত্যা করলেও সুখের চেয়ে উৎকণ্ঠা ও ভয়ই তখন প্রবল হবে। সুখ তখন ভোগ করা যায় না। এ-বিচার বাদ দিলেও আরেক রকমের বিচারের তাগিদ আমাদের নিজেদের মনের মধ্যেই থাকে। সে হলো আমাদের ভাল-মন্দের বিচার উচিত অনুচিতের বিচার। ন্যায় অন্যায়ের বিচার। এসব বিচার নিজের মনেরই বিচার' তৎকালীন বাইরের বিচার নাও হতে পারে। অদস্ থেকে আক্রম বৃত্তি অহংকে দাবিয়ে দিয়ে যদি বাস্তব জগতে বেরিয়ে আসে, অহং তখন কারে পড়ে যদি বৃত্তির টানে চলতে চায়, তখন তার অধিশাস্তা যদি প্রবল হয়, তবে তার রাজকীয় নিষেধ নির্ঘোষিত হয়ে অহংকে শক্তি জুগিয়ে সাহায্য করে অদসের বৃত্তিকে আবার অবদমিত করতে চেষ্টা করে। অহং ও অধিশাস্তার যুগ্ম শক্তি যদি অদসের আক্রম শক্তির কাছে হার মানে তখন আর কিছু করবার থাকে না। ব্যক্তি তখন আক্রম শক্তির দুর্দম প্রকাশে মত্ত হয়। সে শক্তি যতই প্রবল হোক না কেন, তথাকথিত সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে, ঐ যুগ্মশক্তি একসময় আবার প্রবলতর হয়ে আক্রম বৃত্তিকে অবদমিত বা অন্ততঃ নিরুদ্ধ (সাপ্রেসড) করে রাখতে পারে। এটা করা মনের পক্ষে সম্ভব না হলে সমাজ সভ্যতা কিছুই রক্ষা পেতে পারতো না। মনে রাখতে হবে, উল্লিখিত অবয়ববাদে মনের তিনটি প্রত্যয়ের (কনসেপ্টের) শক্তি সকলের সমান নয়। কেবল তাই নয়। এমনকি একই মানুষের সেই শক্তিগুলির বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কম-বেশী হয়। সেইজন্যেই ভিন্ন লোকের একই পরিস্থিতিতে অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই মানুষের আচরণের প্রভেদ দেখা যায়। পূর্ব প্রবন্ধে বলেছি, অহং থেকেই অধিশাস্তা গঠিত হয়। বলা হয় শিশু পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের বাধা নিষেধ নির্দেশ ইত্যাদি বহু পরিমাণে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ক্রমে সেই নিষেধ, নির্দেশ ইত্যাদির অনেকখানিই শিশু তার বোধ অনুসারে নিজ মনে গ্রহণ করে নেয়। এই প্রক্রিয়াকে অন্তঃক্ষেপ (ইন্ট্রোজেকশান) নাম দেওয়া হয়েছে। যা ছিল মা বাবা বা অন্য গুরুজনের নিষেধ নির্দেশ, এখন তা শিশুর নিজেরই মনের নিষেধ নির্দেশ হয়ে তার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত অনুচিত, বোধের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। এই অন্তঃক্ষেপের ফলে অধিশাস্তার গঠন সম্ভব হয়। একসময় শিশু বাইরের ঐ সব নিষেধ নির্দেশগুলিকে গুরুজনের বাধা-নিষেধ বলে আর মনে করে না। সেগুলিকে তখন সে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে করে। এই অধিশাস্তা একদিকে যেমন আমাদের নীতিবোধ সৃষ্টি করে অপরদিকে সে স্বাদর্শ (ইগো-আইডিয়া) সৃজন করে। জীবনে সে কি হতে চায় কি তার আদর্শ তা ঠিক করেই স্বাদর্শ রচিত হয়। সুস্থ সবল জীবনের পক্ষে অধিশাস্তার প্রয়োজন কতখানি তা বোঝা কঠিন হবে না। কিন্তু যদি অধিশাস্তা অতি প্রখর বা অতি নম্র হয় তবে পরিণাম ফল শুভ হয় না। নানারকমের মানসিক রোগ তার ফলে দেখা দেয়। মানসিক রোগ সম্বন্ধে বলবার সময়ে এই বিষয় আরও বলা হবে।

(৪) অতীতে মনঃসমীক্ষাবাদের প্রচারের প্রথমাবস্থায় ফ্রয়েডের কামতত্ত্ব নিয়ে বিরোধের ঝড় উঠেছিল। তিনি কামকে লৈঙ্গিক-স্তর থেকে যেভাবে শিশুর কামবৃত্তির প্রকাশের নানা স্তরে ছড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন নি। আজও যে তা মেনে নিতে কষ্ট হয়, হয়ত বা আমাদের নীতিবোধেই বাধে। শিশুকে আমরা নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, দেব-স্বভাবী বলে মনে করে এসেছি। আর কামকে এক সময় থেকে দেখে এসেছি পশুবৃত্তির মত, নীচ, কলুষময় ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যা দিয়ে। সুতরাং শিশুরও যদি কাম আছে বলা হয় তবে তা' শিউরে ওঠবার কারণ হতেই পারে। দেবতাকে টেনে নরকে পশুর পর্যায়ে নামাতে কে চায় আর কেউ তা রাখতে চাইছে তাকে সহ্যই বা করবে কে? দেবতাকে দেবতা করে রাখতে না পারলে আমাদের মত দুর্বল মানুষের পক্ষে ধরে দাঁড়ানোর মত শক্ত খুঁটি আর থাকে কোথায়? আপত্তি তাই সজোর ও সোচ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে কিন্তু আপত্তি করবার কিছু থাকে না।

আগেও বলেছি কামশক্তি বা লিবিডো বলতে ফ্রয়েড কেবল লৈঙ্গিক কামকেই বোঝেন নি। বলেছি আমাদের যত রকমের কামনা, বাসনা, ভোগলিপ্সা আছে সবকেই কামের গণ্ডির মধ্যে আনা হয়েছে। কাম না থাকলে কামনা হয় না, কামনা না থাকলে ভোগও হয় না। এই কথাগুলি নিজের মনে তলিয়ে দেখে অনুভব করে নিলে আমাদের কাম বলতে আঁৎকে ওঠবার বা পতনের ভয়ে আতঙ্কিত হবার কারণ আর থাকবে না। শিশু যখন মায়ের বুকের দুধ খায় তখন সে কি তার ক্ষিদেটুকুই মেটায়, আর কিছু পায় না। যাঁরা মা হয়েছেন এবং যাঁরা শিশুদের আচরণ লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন যে দুধ না পেলেও শিশু মায়ের স্তন চুষতে থাকে। এমনকি একটু ঘুম আসতেই যদি সন্তানের মুখ থেকে মা স্তন সরিয়ে নেন তবে শিশু সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠে আপত্তি জানায়, শিশু তখন স্তন্যপান করে না তবু মুখের শোষণটুকুতে তার একান্ত প্রয়োজন থাকে। দুধ খেয়ে পেটভরা ছাড়াও মুখের যে স্বাদ ও স্পর্শসুখ আছে তা মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। সে সুখ থেকে বঞ্চিত হলে শিশু অসহায় বোধ করে; উৎকণ্ঠা, বিরক্তি ইত্যাদি বোধ করে। আহার্য ছাড়াও মুখের এই সুখের জন্যই শিশু আঙুল চুষে, চিচি মুখে রাখতে চায়। তাতে করে শিশুর পেট ভরে না সত্যি কিন্তু অন্য ভোগ মেটে। মাতৃস্তনের সঙ্গেও এই ভোগ জড়িত হয়ে যায়। আমাদের সবগুলি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই কোনো না কোনো ভোগ জড়িত থাকে। সেই ভোগপূরণের মাধ্যমে যে সুখ পাই তার ফলে আমরা ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হই। আমাদের বাসনা আছে বলেই ভোগ খুঁজি। শিশু মায়ের দেহ থেকে স্পর্শ, উত্তাপ ইত্যাদি নানা ভোগলিপ্সা মেটাতে পারে বলেই শিশুর সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধের মধ্যেও কামবৃত্তির প্রকাশ আছে বলা হয়েছে। মায়ের দিক থেকেও তিনি কেবল সন্তানের খাদ্যের প্রয়োজনেই যে তাকে বুকের দুধ দিয়ে দিনের পর দিন পালন করেন তা নয়। এই ক্রিয়ার মধ্যে মায়েরও স্পর্শসুখ কম থাকে না। সন্তানকে বুকে চেপে আদর করা, তাকে চুম্বন করা ইত্যাদির মধ্যে মায়ের বহু দেহগত সুখ থাকে। সেই সুখভোগের মধ্যেই কামের প্রকাশ দেখা যায়। আরও বহু তথ্য থেকে মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধের মধ্যেও যে কাম জড়িত আছে তা জানতে পারা যায়। এমন অনেক শিশু আছে স্তন্যপানের সময়, এমনকি তীব্রভাবে আঙুল বা চুষিকাঠি চুষতে গিয়ে যাদের উপস্থ উত্তেজিত হতে

দেখা গেছে। সন্তানের জননীকেও স্তন্যপান করানোর সময় নিজে যৌন উত্তেজনা বোধ করেন জানা যায়। বেশ কিছুসংখ্যক তথ্য-কথিত সুস্থ নারী আছেন যাঁদের স্তন্যপান না করালে তাঁরা যৌন উত্তেজনা বোধ করেন না এমনকি কোনো যৌন ইচ্ছাই তাঁদের মনে জাগে না। আরও বহু তথ্য থেকে শিশু ও মায়ের সম্বন্ধের মধ্যে কামের অস্তিত্ব জানতে পারা যায়। যাঁরা প্রথমাবস্থায় এই ভোগলিপ্সা অস্বীকার করেন, কিছুদিন মনঃসমীক্ষার ফলে মনের অবদমন দূর হলে এবং মনের বাধা বা প্রতিবন্ধ (রেজিস্টান্স) দূর হলে নিজের মনের এই ভোগের সঙ্গে যোনকামের সম্পর্ক অনুভব করতে পারেন।

(৫) পূর্ব প্রবন্ধে কামবৃত্তির ক্রম-প্রকাশের যে স্তর বর্ণনা করা হয়েছে তা একটা অতি সাদামাটা কাঠামো মাত্র। আরও বহু বিস্তৃত বিষয় তাতে বাদ দেওয়া হয়েছে। যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তার উত্তর দিতে হলে মনের স্বকাম স্তরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা দরকার। এ স্তরে শিশু নিজেকে ভালবাসে, নিজের দেহকে ভালবাসে। দেহের যে অংগ থেকে সে সুখ পায় সেই অংগ তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। সুখপ্রদ দেহের কেন্দ্র-গুলিকে সে সাধ্যমত বারে বারে উত্তেজিত করে তা থেকে সুখ পেতে চেষ্টা করে। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখের সুখের কথা বা মুখ-কাম (ওরাল সেক্সুয়ালিটি) সম্বন্ধে বলা হয়েছে। শিশু যেমন মুখের সুখ চায় তেমনই, দেখা যায়, সে তার পায়ুতেও স্পর্শসুখ পায়। নানারকম পায়ু-প্রদেশের ঘর্ষণে, মলত্যাগের সময়ও, সে সুখ পায়। এই সুখভোগের জন্য শিশু অনেক সময় একবারে সম্পূর্ণ মলত্যাগ না করে বারে বারে কিছু কিছু করে মলত্যাগ করে সেই সুখ সে পেয়ে থাকে। এর ফলে মায়ের যে অসুবিধা ও বিরক্তির উদ্রেক করে তাও জানা। এই সুখভোগ সজ্ঞানে বেশীদিন করা চলে না। বয়স বাড়ার সংগে শিক্ষার ফলে শিশু ধীরে যখন তখন যেখানে সেখানে মলত্যাগ করার অভ্যাস ত্যাগ করে। শিশু তার সুখের ইচ্ছা সুপ্তভাবে থেকেই যায়। অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরাও নিজের ইচ্ছামত পেট পরিষ্কার না হলে অসন্তোষ বোধ করেন। পেট ভার হয়ে থাকার কথাটাই একমাত্র বড় কথা এখানে নয়; তার পায়ু সুখ ইচ্ছাও এর সংগে জড়িত থাকে। মনঃসমীক্ষার ফলে তা স্পষ্টরূপে জানতে পারা যায়। একটু বয়স বাড়বার পর খাবার পরে পেট ভরলে, পেট বড় হলে, পেটে ছেলে আছে এমন কথাও লোকের কাছে শুনে শিখে নেয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে সন্তান ধারণের ইচ্ছা গুপ্ত থাকে অপরের কথায় সেই ইচ্ছাই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। মা যখন পেট ভরে বড় হলে ভার বোধ করাকে, পেটে ছেলে আছে এমন কথা কল্পনা করে। এক সময় মলত্যাগের সংগে তার সন্তান প্রসবের ইচ্ছা যুক্ত হয়ে যায়। সন্তান প্রজননের প্রকৃত তথ্য শিশুর জানা থাকে না। তার অভিজ্ঞতালব্ধ মলত্যাগের সময় পায়ু সুখের সংগে, সন্তান প্রসবের ইচ্ছা যোগ হয়ে যায়। স্ত্রীলোকের পৃথক জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তার ধারণা থাকে না। পায়ুপথই প্রসব পথ হয়ে দেখা দেয়। মূলতঃ এই পায়ুকাম থেকেই সমকামিতার (হোমোসেক্সুয়ালিটি) উৎপত্তি হয়। নিজের কামবৃত্তির বিভিন্ন অবস্থার সুখলিপ্সার আকর্ষণ থেকে ব্যক্তির স্বভাবে সক্রিয় (অ্যাকটিভ) বা নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ) স্বকাম ভোগের ইচ্ছা জাগে।

সমকামিতা মাত্রেই তা মানসিক বিকারের লক্ষণ একথা মনে করা ভুল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই সমকামিতা কমবেশী আছে। অন্য বৃত্তির মতই এই বৃত্তিরও জীবনে প্রয়োগ বা প্রকাশ থেকে তার সুস্থতা বা বিকৃতির বিচার করতে হয়। সমকামিতা আমাদের মধ্যে আদৌ না থাকলে একজন পুরুষ অপর একজন পুরুষের বন্ধু হতে পারতো না। একজন অপর একজনকে সহ্য করতে পারতো না। এ সম্বন্ধে পুরুষের বেলাতে যা সত্য স্ত্রীলোকের বেলাতেও তা সত্য। প্রভেদ কিছু নেই। অনেকের ধারণা আছে সমকামিতা কেবল পুরুষের মধ্যেই দেখা যায়, স্ত্রীলোকের মধ্যে তা নেই। এ ধারণা ভুল। সমকামিতা স্ত্রী বা পুরুষ নির্বিশেষে তার অস্তিত্ব নানা ভাবে প্রকাশ করে। মনঃসমীক্ষণ করলে এই ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রত্যেকের মধ্যেই সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সমকামিতা কেবল যে পায়ুকামেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। একজন সমলৈঙ্গিক ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরা তার সান্নিধ্য চাওয়া, তাকে ভালবাসা ইত্যাদির মধ্যেও এই সমকামিতারই বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। বৃত্তির সামাজিক ও কল্যাণকর প্রকাশে তা হয় কাম্য। কিন্তু বিকার ঘটলে তা ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। বৃত্তি হিসেবে কোনো বৃত্তিই বিকার নয়, অসুস্থতা প্রকাশক লক্ষণ নয়, অশ্রদ্ধেয় নয়। বিকার বিকারই, তা প্রকৃত রূপ নয়। বৃত্তির, স্থানকালপাত্র বিবেচনা করে সুষ্ঠু প্রকাশই মূল কথা। বৃত্তির নানারকম রূপবদল, সংশোধ, উদ্‌গতি (সাবলিমেশন) ইত্যাদি ক্রিয়াও আমাদের মনই করে, আর বৃত্তিকে মন নিজের, সমাজের নানা কল্যাণে লাগায়। সম-কামী বৃত্তিও এর ব্যতিক্রম নয়।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

আজকের এই সুগম যাতায়াতের যুগে দেশভ্রমণ দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই কি একটা দেশকে ততোটুকু চেনা যায়? চিনতে হলে শুধু ভূগোল নয় জানা দরকার তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই চার দিক থেকে আলোচনা করা হবে—আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব আমরা।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া আজ রুক্ষ শুষ্ক দীন। তার নদী জলহীন, বৃক্ষ পত্রহীন, যোজন-বিস্তৃত মাটি তৃণহীন। তার দলমাদল কামান আজ স্তব্ধ, তার ভগ্ন শূন্য মন্দির-গুলি অনাদৃত অবহেলিত অবস্থায় পরিত্যক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে পথভ্রান্ত পথিকের মত। দারুণ খরতাপে ও তপ্ত বায়ুর তৃষার্ত রসনার লেহনে বাঁকুড়ার প্রাণরস আজ নিঃশেষিত।

কিন্তু এই নিঃস্ব রিক্ত রূপই যে বাঁকুড়ার অনাদ্যন্ত কালের রূপ নয়, সে যে অভাগিনী অহল্যার মত অভিশাপে প্রস্তরী-ভূত, তার সাক্ষী এই স্তব্ধ দলমাদল ও ভগ্ন শূন্য মন্দির, তার সাক্ষী শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রস্তরলিপি ও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। আর বাঁকুড়া যে আবার সরস, সঞ্জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে তাও বোঝা যাবে দামোদর ও কংসাবতীর করুণাধারায় সিক্ত শ্যামল প্রান্তরগুলির দিকে তাকালে।

যে জেলায় আছে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সভ্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ অনুপমের শিলালিপি, পুণ্যময়ী জননী সারদা দেবী মরজগতে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম যে জেলার মাটি স্পর্শ করেছিলেন, ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণের পাদস্পর্শে যে জেলার প্রতিটি ধূলি-কণা পবিত্র, যে মাটিতে বসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী যামিনী রায়, সাহিত্যসাধক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ মনীষীগণ যে জেলার মানুষ, প্রকৃতির রুদ্ররোষে আজ সে হতশ্রী হলেও অন্তরের সম্পদে সে কার চেয়ে দীন?

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের সূচনায় যে এলাকা জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল, অগণিত রাজ্য ভাঙাগড়ার ইতিহাস আজও যার পাহাড় প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা ভগ্নস্তূপে লিখিত হয়ে আছে, সেই এলাকার বিদ্রোহী মানুষদের বাঁধে আনতে ১৮০৫ সালে বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল নামাঙ্কিত স্থানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে 'জঙ্গলমহল' নামেই একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করা হয়। ঐ অঞ্চলের মুখ্য প্রশাসককে তখন বলা হত 'ম্যাজিস্ট্রেট অফ দি জঙ্গল মহালস'।

জঙ্গলমহলে মোট তেইশটি পরগণা ও মহল ছিল, যার পনেরোটি নেওয়া হয়েছিল বীরভূম থেকে, তিনটি বর্ধমান থেকে ও পাঁচটি মেদিনীপুর জেলা থেকে। জঙ্গল-মহলের সদর দপ্তর হয় বাঁকুড়া। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন বজায় থাকে না। ১৮৩২ সালে জঙ্গলমহলের পশ্চিমাঞ্চলে চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটায় জঙ্গলমহলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। সেকারণে ১৮৩৩ সালে জঙ্গলমহলকে ভেঙে তার বিভিন্ন মহল ও পরগণাগুলিকে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দেওয়া হয়। যেমন বর্ধমানকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার কাছ থেকে নেওয়া সেন-পাহাড়ি, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর পরগণা, আর মেদিনীপুর থেকে অঞ্চলগুলি চলে যায় মানভূম জেলায়। অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি নিয়ে ১৮৩৫-৩৬ সালে যে প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করা হয় তার নাম দেওয়া হয় পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়াই থাকে তার সদর শহর। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও বাঁকুড়া জেলার আয়তন ছিল বর্তমান আয়তনের অর্ধেক। নানা ভাঙাগড়ার পর ১৮৮১ সালে বাঁকুড়া জেলা বর্তমান আকার ধারণ করে এবং ঐ বছরেই তার 'পশ্চিম বর্ধমান' নাম বাতিল করে বাঁকুড়া নাম দেওয়া হয়।

'বাঁকুড়া' নামকরণ সম্বন্ধে নানা
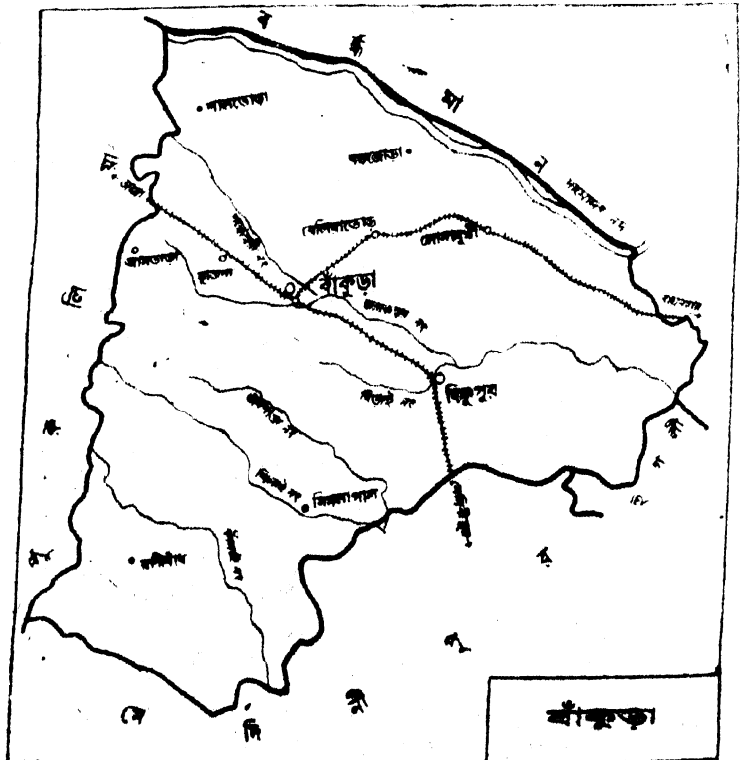
কাহিনী প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোককাহিনী অনুসারে 'বাঁকুড়া' কথাটির উদ্ভব হয়েছে বাঁকুরাই নামক এক শক্তিশালী আঞ্চলিক প্রধানের নাম থেকে, বাঁকুড়ার রাড়া পল্লীর রাইরা এখনও যাঁর বংশধর বলে নিজেদের দাবি করে থাকে। আর এক প্রচলিত কাহিনী হল যে, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের বাইশটি পুত্রের অন্যতম বীর বাঁকুড়া একদা বর্তমান বাঁকুড়া শহরাঞ্চলের শাসক ছিলেন বলে তাঁর নাম থেকে প্রথমে বাঁকুড়া শহরের, পরে ঐ এলাকার নাম বাঁকুড়া হয়। তবে বাঁকুড়া কথাটি বানকুণ্ড থেকে উদ্ভূত, এইটাই সবচেয়ে যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। বিভিন্ন সংস্কৃত রচনায় বানকুণ্ড শব্দের উল্লেখ আছে, যার অর্থ হল পঞ্চ পুষ্করিণী। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কুলাচার্য এড়ু মিশ্রের রচনায় বানকুণ্ড নামক স্থানের উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় কবি ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীহর্ষ বর্ধমানের পশ্চিমে বানকুণ্ড নামক স্থানের কাছাকাছি বাস করতেন। পুরানো নথিপত্রে বাঁকুড়ার বাকুণ্ডা নামেও উল্লেখ মেলে।

বৃটিশ শাসনের আগে বাঁকুড়ার যে ইতিহাস তা প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপুর রাজ্যের ভাগ্যবিবর্তনের ইতিহাস। বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রাচীনত্ব বর্ণনাকালে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, যখন দিল্লীতে হিন্দু শাসন কায়েম ছিল এবং মুসলমান শব্দটিই প্রায় অজ্ঞাত ছিল ভারতে। বিষ্ণুপুর তখন হিন্দু রাজাদের শাসিত একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের অন্তত পাঁচ শতাব্দী আগে বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের শাসনাধীন ছিল। এমনকি বখতিয়ার খিলজির হাতে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় হলেও খরস্রোতা দামোদরের পশ্চিম পারে, শাল জঙ্গলে ঘেরা বিষ্ণুপুর রাজ্যের শাসনব্যবস্থা তাতে প্রভাবিত হয় নি। পরবর্তীকালে মোগল শাসকরা বিষ্ণুপুরের রাজাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে কর আদায় করতেন কিন্তু তখনও বিষ্ণুপুর রাজাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। ইংরেজ শাসনের আগে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে ধেয়ে আসা মারাঠা বর্গীদের বারম্বার কঠিন আঘাত হেনেছে বিষ্ণুপুরের রাজশক্তি। শত্রুদলমর্দনকারী দলমাদল কামান বারবার গর্জন করে বিষ্ণুপুরের বিক্রম প্রকাশ করেছে। ইংরেজ শাসনকালেই বিষ্ণুপুরের ভাগ্যসূর্য অস্তমিত হয় আর তার সেই দুর্দিনে তাকে সর্বাধিক বিপর্যস্ত করে প্রতিবেশী বর্ধমান রাজ্য।

বিষ্ণুপুরের রাজারা সাধারণভাবে বাগদি রাজা নামে অভিহিত হলেও তাঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলে দাবি করতেন। প্রজাপুঞ্জের বেশির ভাগই ছিল বাগদি, বাউরি, সাঁওতাল প্রমুখ আদিবাসী এবং বিষ্ণুপুরের রাজবংশের সঙ্গে প্রজাপুঞ্জের কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না এমন কথাও সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে কেউ বলতে

জোড়বাংলা মন্দির/বিষ্ণুপুর　　—ফটো : রণেন চট্টোপাধ্যায়
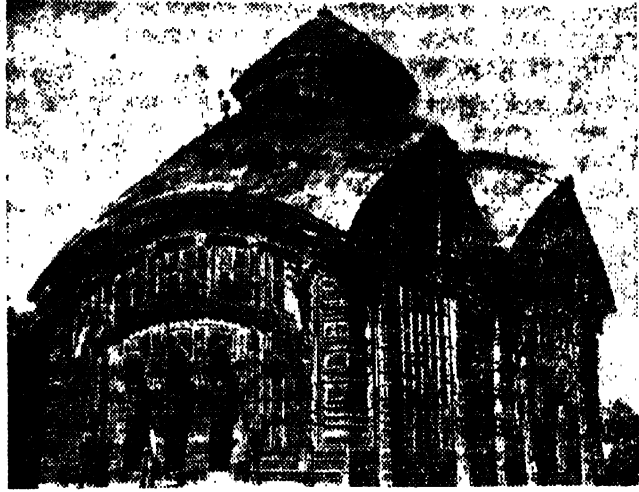
পারেন না। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজবংশের দাবি অনুসারে, প্রথম মল্ল রাজা আদি মল্ল ছিলেন উত্তর ভারতের জয়নগর রাজ্যের রাজার পুত্র। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, ঐ রাজা পুরীর জগন্নাথদেব দর্শনের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক যখন কতুলপুরের নিকটবর্তী লাউগ্রামে পৌঁছান সেই সময় ঐ রাজার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী যে সন্তানের জন্ম দেন সেই সন্তানই পরবর্তীকালে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মল্লভূমির রাজপদে অভিষিক্ত হন ও মল্ল রাজা নামে পরিচিত লাভ করেন। প্রথম মল্ল রাজা আদি মল্লের জন্মসন ১০২ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ বলে ধরা হয় এবং সেই অনুসারে বিষ্ণুপুরে মল্লাব্দ প্রচলিত হয়।

তেত্রিশ বছর রাজত্বের পর আদিমল্লের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র জয়মল্ল রাজা হন। তিনি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং রাজ্যবিস্তারের পর জয়মল্ল বিষ্ণুপুরকে তাঁর রাজ্যের রাজধানী করেন। পরবর্তী মল্ল রাজাদের শাসনকালে বর্তমান বাঁকুড়ার প্রায় সবটুকুই মল্ল রাজাদের শাসনাধীন হয়। মল্ল রাজবংশের ৪৯তম রাজা ধর হাম্বীর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মোগল সম্রাটদের কর দেন। তখন বিষ্ণুপুর রাজ্যের বাৎসরিক কর নির্ধারিত হয় এক লক্ষ সাত হাজার টাকা।

ধর হাম্বীরের পুত্র বীর হাম্বীর (রাজত্বকাল ১৫৯১—১৬১৬) শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিলে সমগ্র বিষ্ণুপুর রাজ্যে প্রেমধর্মের জোয়ার আসে। মদনমোহন হয় সারা বিষ্ণুপুরের উপাস্য দেবতা। মন্দিরে মন্দিরে ভরে যায় বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া, আর প্রায় সব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, মদনমোহন, নয়ত মদনগোপাল। বিষ্ণুপুর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র বাঁকুড়া হয়ে ওঠে গৌড়ীয় মন্দির, স্থাপত্যের কীর্তিনগরী।

বীর হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সর্বপ্রথম ক্ষত্রিয় পদবী সিংহ ব্যবহার করেন। তিনি পরিচিত হন রঘুনাথ সিং নামে। ঐ পদবী সম্ভবত মুর্শিদাবাদের নবাবদের দেওয়া। রঘুনাথ সিং-এর শাসনকালে সম্ভবত ১৬৪৩-৫৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে শ্যামরায়, জোড়বাংলা ও কালাচাঁদের মন্দির নির্মিত হয়।

রঘুনাথ সিং-এর পুত্র বীর সিং বিষ্ণুপুরের দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পানীয় জল ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নির্মাণ করেন সাতটি বৃহৎ জলাশয়, যেগুলি বাঁধ নামে পরিচিত। বাঁধগুলির নাম লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাতাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও পোকাবাঁধ। তাঁরই শাসনকালে ১৬৫৮ সালে নির্মিত হয় লালজির মন্দির এবং তাঁর রাণী শিরোমণি অথবা চূড়ামণি দেবীর আনুকূল্যে ১৬৬৫ সালে মদনগোপাল ও মুরলীমোহনের মন্দির। একটি ব্রাহ্মণ বালককে হত্যার অনুশোচনায় রাজা বীর সিং নাকি আত্মহত্যা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রতিবেশী রাজ্য বর্ধমানের বৈরিতায় ও মারাঠা বর্গীদের বারম্বার হামলায় বিষ্ণুপুর রাজ্যের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। তারপর ১৭৬০ সালে বাঁকুড়া অঞ্চল ইংরেজ অধিকারে আসার আগে পর্যন্ত ঐ এলাকার ইতিহাসে উল্লেখ্য ঘটনা সামান্যই আছে।

ইংরেজ শাসনের সূচনায় বাঁকুড়ার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা চুয়াড় বিদ্রোহ। স্থানীয় আদিবাসীদের একাংশ প্রভাবশালী জমিদারদের লাঠিয়াল ও পাইক বরকন্দাজ হিসাবে কাজ করত এবং তার বিনিময়ে তারা নিষ্কর জমি ভোগ করত। ঐসব আদিবাসীরা চুয়াড় নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ শাসনে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় চুয়াড়রা বৃত্তিচ্যুত হয় এবং সহজভাবে বাঁচার কোন সুযোগ না

থাকায় বেপরোয়া হয়ে লুঠতরাজ শুরু করে। সেসময় তাদের আচরণ এমনই নিষ্ঠুর হয় যে, বর্বর নিষ্ঠুর অর্থেই চুয়াড় কথাটি ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৭৯৮-৯৯ সালে বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে রায়পুর, অম্বিকানগর, সুপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্জন সিং নামক এক প্রাক্তন জমিদারের নেতৃত্বে চুয়াড় বিদ্রোহ এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করে যে সে বিদ্রোহ আয়ত্তে আনতে ইংরেজ সরকারকে সৈন্য তলব করতে হয়। বাঁকুড়া জেলার সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৮১৬ সালে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের চুয়াড় বিদ্রোহ সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। এরপর বাঁকুড়া জেলায় আর কোন বড় অশান্তি ঘটে নি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঁকুড়া ছিল সম্পূর্ণ শান্ত।

ভৌগোলিক পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলার আয়তন, সার্ভেয়র জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার হিসাবমতে ২,৬৫৭·৭ বর্গমাইল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভেজ-এর হিসাবমতে ২,৬৪৬·৯ বর্গমাইল (৬,৮৫৫ বর্গ কিলোমিটার)।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক ঘিরে আছে বর্ধমান জেলা, দুই জেলার মধ্যে আছে দামোদর নদী। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হুগলী জেলা ও দক্ষিণে মেদিনীপুর। পশ্চিম দিকে আছে মানভূম, যা খণ্ডিত হয়ে ধানবাদ ও পুরুলিয়া জেলার সৃষ্টি হয়েছে। মানচিত্রে বাঁকুড়া জেলাকে মানভূম ও বর্ধমানের মধ্যে অবস্থিত এক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত দেখতে লাগে।

বাঁকুড়া জেলা পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সমতল ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের অধিত্যকা অঞ্চলের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী বলে উভয় এলাকারই প্রভাব আছে তার উপরে। জেলার পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল একেবারে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মত সমতল ও শ্যামল। সবুজ ধানক্ষেত, বাঁশ-ঝাড়, আমবাগান আর তালগাছে ভরা ইন্দাস, কতুলপুর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানগুলির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী হুগলী মেদিনীপুর অঞ্চলের কোন বৈসাদৃশ্য নেই। অপরদিকে অসমতল, রুক্ষ ও অরণ্যময় বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলে পূর্বের শ্যামলিমা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাঁকুড়া শহর থেকে উত্তর-পশ্চিমে চোদ্দ মাইল দূরে আছে শুশুনিয়া পাহাড়। পূবে-পশ্চিমে প্রায় দুমাইল দীর্ঘ ঐ পাহাড়টির সর্বাধিক উচ্চতা ১,৪৪২ ফুট। আর বাঁকুড়া জেলার উত্তরপূর্ব কোণে আছে বিহারীনাথ পাহাড়, যার সর্বাধিক উচ্চতা ১৪০০ ফুট। জেলার উত্তর-পশ্চিমে সালতোড়া অঞ্চলও অসমতল, তবে সেখানে উল্লেখযোগ্য উচ্চতা কিছু নেই। দামোদর নদীর দক্ষিণ পারে আছে প্রায় দশ ফুট উঁচু মেজিয়া পাহাড় আর বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ পথে বাঁকুড়া ও মেজিয়ার মাঝামাঝি স্থানে আছে প্রায় চারশ ফুট উঁচু কোরা পাহাড়। জেলার দক্ষিণ দিকে খাতড়া ও রায়পুর অঞ্চলেও কয়েকটি অনুচ্চ ও সুদৃশ্য পাহাড় আছে যার মধ্যে মসকের পাহাড়কে ঘিরে নানা কাহিনী গড়ে উঠেছে।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর দিকে দামোদর নদী। ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত হয়ে দামোদর বাঁকুড়ার সীমান্তে বরাকর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপর বাঁকুড়া বর্ধমান জেলার মধ্যে ৫৬ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত রচনা করে দামোদর বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী হল দারকেশ্বর, কংসাবতী, গন্ধেশ্বরী, শিলাবতী, সালি, জয়পণ্ডা ও বোদাই। প্রায় সব নদীই জেলার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বেরিয়ে সমান্তরাল ব্যবধানে এগিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে গেছে। সব কটি নদীই বৃষ্টির জলে পুষ্ট এবং তাদের গর্ভগুলি বালুকাময়। সেকারণে বর্ষার কটি মাস বাদে কোন নদীতেই জল থাকে না। গ্রীষ্মে শূন্য শুষ্ক বালুকাময় নদীগর্ভগুলি দেখলে বোঝাই যায় না যে কয়েক মাস আগে সেগুলি বেগবতী খরস্রোতা জলরাশিতে পূর্ণ ছিল।

বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দামোদর নদী সালতোড়া, মেজিয়া, বড়জোড়া, সোনামুখি, পাত্রসায়ের ও ইন্দাস থানা ছুঁয়ে গেছে। নদীটির গড় প্রস্থ ১৬২৩ গজ। গ্রীষ্মে নদীটি প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়লেও বর্ষায় এটি প্রচণ্ড রূপ নেয় এবং নিম্নাঞ্চলে নদীটি বারবার সর্বনাশা বিপর্যয়ের কারণ হয়। তবে দামোদরের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং বর্ষায় দামোদর যে পলিমাটি বহন করে আনে তা খুবই জমির উপকারে আসে। সে কারণে বর্ষায় দামোদরের স্ফীতিকে একেবারে অবিমিশ্র অভিশাপ বলা যায় না। দামোদরকে বেঁধেই তার দুই তীরবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও চাষের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে। বাঁকুড়ার রুক্ষ ও রুক্ষবর্ণ প্রান্তর যে আবার সরস ও শ্যামল হয়ে উঠছে তাতে দামোদরের অবদান সামান্য নয়। জেলার চারটি ব্লকে সেচের জল সরবরাহ করে ডি-ভি-সি।

কোরা পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত সালি নদী গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া, সোনামুখি ও ইন্দাস থানার মধ্য দিয়ে ৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করে দামোদরে এসে মিশেছে। সেচের কাজে সালি নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর থেকে যে সেচের খাল টেনে আনা হয়েছে সেটি সোনামুখি শহরের কাছে সালি নদী অতিক্রম করেছে।

কংসাবতী নদীর উদ্ভব হয়েছে পুরুলিয়া জেলার পার্বত্য অঞ্চলে। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে নদীটি খাতড়া ও রাণীবাঁধ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রায়পুর থানাকে ভেদ করে মেদিনীপুরে প্রবেশ করেছে। বাঁকুড়া জেলায় কংসাবতী (কাঁসাই) নদীর দৈর্ঘ্য ৩৫ মাইল। অম্বিকানগরের কাছে কুমারী নদীর জল কংসাবতীতে মিশেছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী এই তিনটি জেলায় সেচের কাজে কংসাবতীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁকুড়ার অপর গুরুত্বপূর্ণ নদী হল দ্বারকেশ্বর। মানভূমের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত এই নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বাঁকুড়ার ছাতনা থানার দুমদুমা নামক স্থান দিয়ে জেলায় প্রবেশ করেছে এবং বাঁকুড়া, ওন্দা ও বিষ্ণুপুর থানার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কতুলপুর থানার মধ্য দিয়ে জেলার বাইরে চলে গেছে। নিম্নাঞ্চলে মেদিনীপুর সীমান্তে যেখানে শিলাই অথবা শিলাবতী নদী দ্বারকেশ্বরে মিলেছে সেখান থেকে ঐ নদীর নাম রূপনারায়ণ। দ্বারকেশ্বরের প্রধান উপনদী

মন্দিরগাত্রের শিল্পনিদর্শন
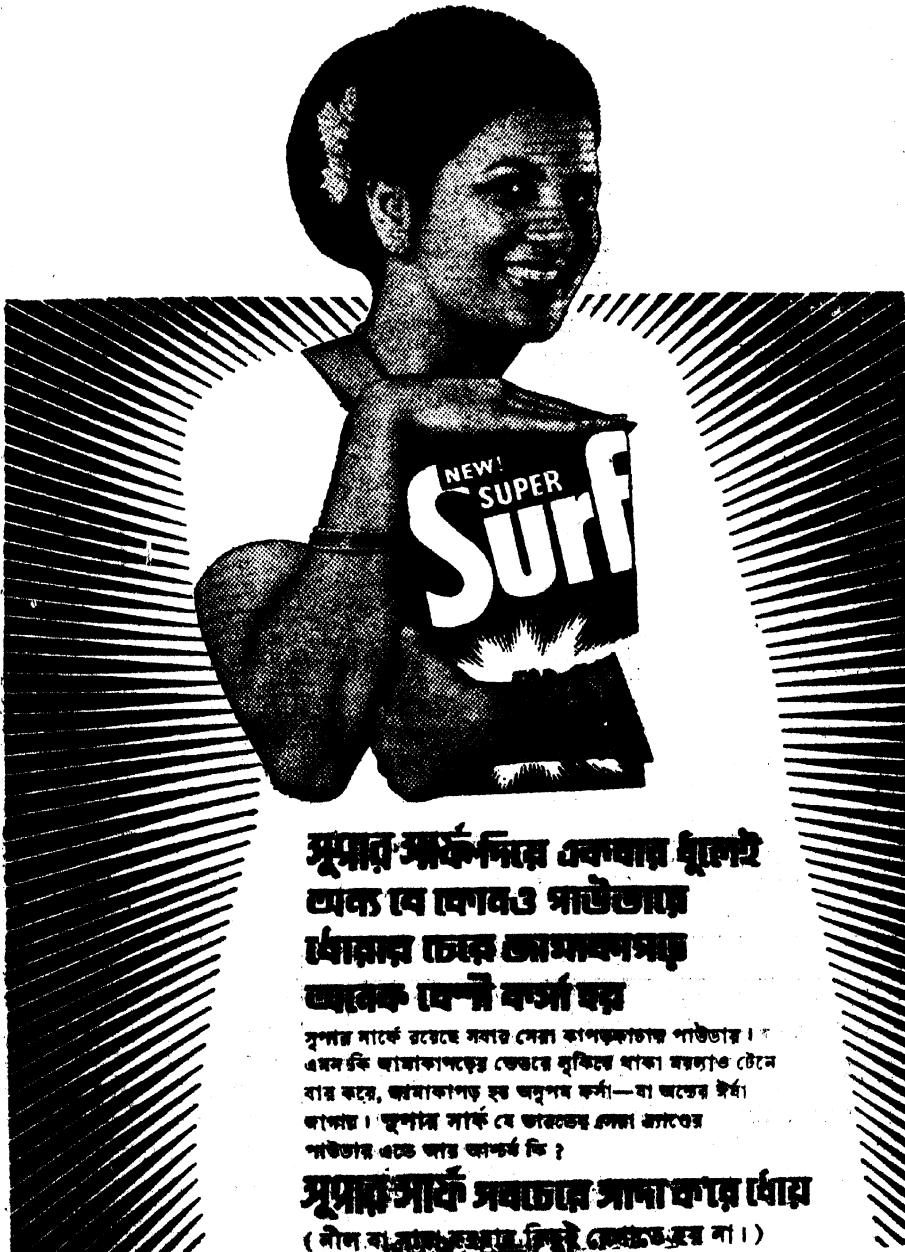
গন্ধেশ্বরীর উদ্ভব শুশুনিয়া পাহাড়ে। সেখান থেকে এসে গন্ধেশ্বরী দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে বাঁকুড়া শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে। বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল এই নদীটিও গ্রীষ্মকালে শূন্যে শুষ্ক বালুচরের রূপ নেয়।

শিলাই অথবা শিলাবতী নদীর জন্ম পুরুলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। বাঁকুড়ার ইন্দপুর, তালডাংরা ও সিমলাপাল থানার মধ্য দিয়ে প্রায় ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করে শিলাই দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বর্ষায় শিলাই নদী স্ফীত হয়ে প্রায়ই প্লাবনের সৃষ্টি করে। খাতড়া থানায় বাগার কাছে সুন্ট ছোট নদী জয়পন্ডা অথবা জয়খাল শিলাই নদীতে এসে মিশেছে। হাড়মাসড়ার কাছে শিলাই নদী থেকে কয়েকটি সুদৃশ্য ঝরণার সৃষ্টি হয়েছে। জেলার ছোট নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রায়পুর থানার ভৈরববাঁকি নদী। শ্যামসুন্দর পাহাড় থেকে উদ্ভূত নদীটি জেলার মধ্য দিয়ে কয়েক মাইল বয়ে গেছে।

জেলায় কোন হ্রদ বা বড় খাল নেই। একমাত্র বড়জোড়া থানায় শুভঙ্কর দাঁড়া নামে যে একটি খাল আছে সেটি মল্লরাজ গোপাল সিংহের শাসনকালে (১৭২০-৫৮) কাটা হয়। রাজার সভাসদ সুপরিচিত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর রায়ের পরিকল্পনায় ঐ খাল কাটা হয় বলে কাহিনী প্রচলিত আছে। ১৮৯৬-৯৭ সালে দুর্ভিক্ষের সময়

খালটি আবার মজে গেছে।

খালটির একবার সংস্কার হয়, কিন্তু অযত্নে

জেলার আবহাওয়া অত্যন্ত তপ্ত ও শুষ্ক এবং সারা বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৫১ ইঞ্চি। ঐ বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭৮ ভাগ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে হয়। যার ফলে বছরে প্রায় আটমাস জলের অভাবে কোন চাষই হয় না। আবার ঢালু এলাকায় যে বৃষ্টিপাত হয় তা শক্ত কাঁকুরে জমিতে সামান্যই প্রবেশ করে এবং সবটাই ছুটে এসে নদীর জলে মিশে যায়। ঐ জল ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা না থাকায় চাষের কোন কাজে লাগে না, আর জমির উপরের সরস অংশটুকু জলের সঙ্গে ধুয়ে চলে যায় বলে অসমতল ও ঢালু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। সারা জেলায় চাষের জন্য যত জমি পাওয়া সম্ভব তার প্রায় ১৩ শতাংশ এখন ওপরের মাটি হারিয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে গেছে।

বর্তমানে জেলার প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার একর জমি, অর্থাৎ মোট জমির প্রায় বিশ শতাংশ বনভূমি। ইন্দাস, কতুলপুর ও মেজিয়া এই তিন থানা বাদে বাঁকুড়ার সর্বত্র বনভূমি আছে। বন এলাকার অভ্যন্তরে নতুন গাছ লাগিয়ে ও বন এলাকা সম্প্রসারিত করে জেলার বনসম্পদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ১৯৫৬-৫৯ সালে যে ব্যাপকভাবে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হয় তার সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে।

ছোটনাগপুরের সংলগ্ন বাঁকুড়ার পাহাড়ী এলাকায় ও শাল জঙ্গলে একদা বাঘ, নেকড়ে, বুনো শুয়োর, হায়না, হরিণ ইত্যাদি প্রাণীর বাস ছিল। কিন্তু আমিষ বুভুক্ষু আদিবাসীদের ক্ষুধা মেটাতে আজ জেলার অরণ্য প্রাণিকুল প্রায় নিশ্চিহ্ন। একদা বুনো হাতির দলও আসত বাঁকুড়ার অভ্যন্তরে। তাদের শেষ দেখা যায় ১৮৯৮-১৯০০ সালে। ঐ সময় একদিন তিনটি বুনো হাতি চারদিক ভেঙে তছনছ করতে করতে বাঁকুড়া শহরের বারো মাইলের মধ্যে এসে গিয়েছিল। তারপর শিকারীদের হাতে তারা প্রাণ হারায়। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমান্তের অরণ্যাঞ্চলে এখনও কিছু হরিণ মেলে।

(২)

বাঁকুড়া জেলা বাঁকুড়া (সদর) ও বিষ্ণুপুর—এই দুই মহকুমায় বিভক্ত। জেলার পশ্চিম দিকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থান নিয়ে সদর মহকুমা, যার আয়তন ১৯৩৩ বর্গমাইল। সদর মহকুমায় আছে বাঁকুড়া, ওন্দা, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া, মেজিয়া, সালতোড়া, খাতড়া, ইঁদপুর, রাণীবাঁধ, রায়পুর, সিমলাপাল ও তালডাংরা—এই তেরোটি থানা।

বিষ্ণুপুর মহকুমার আয়তন ৭১৩ বর্গমাইল, এবং এই মহকুমায় থানা আছে ৬টি—বিষ্ণুপুর, জয়পুর, কতুলপুর, সোনামুখি, পাত্রসায়ের ও ইন্দাস।

জেলায় শহর আছে পাঁচটি—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখি, পাত্রসায়ের ও খাতড়া। তার মধ্যে শেষে উল্লেখিত দুটি শহরে মিউনিসিপ্যালিটি নেই।

জেলার সদর শহর বাঁকুড়ার লোকসংখ্যা '৭১ সালের হিসাব অনুসারে ৭৯,২৪৩। শহরের পৌর এলাকা ৭ বর্গমাইল হলেও আসলে শহরটি অতবড় নয়। পার্শ্ববর্তী রামপুর, নতুনচটি, কেন্দুডি, লোকপুর, রাজগ্রাম, কানকাটা, পাটপুর, গোপীনাথপুর প্রমুখ দশ-বারোটি গ্রাম বাঁকুড়ার পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত। আসল শহর এলাকা পূবে-পশ্চিমে বড়জোর এক মাইল লম্বা উত্তর-দক্ষিণে আধ মাইল চওড়া। শহরে রামপুর পাড়ায় রঘুনাথজিউর যে দালান মন্দির আছে সেটি ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে তৈরি বলে দাবি করা হলেও মন্দিরটি দেখে অত পুরানো বলে মনে হয় না। এছাড়া শহরে খুব প্রাচীন আর কোন প্রাসাদ বা স্তম্ভ কিছু নেই। জনপদ হিসাবে বাঁকুড়া প্রাচীন হলেও শহর হিসাবে তাকে আধুনিকই বলা যায়। বাঁকুড়া শহরের আবহাওয়া শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। বাঁকুড়া শহরের উত্তরে আছে গন্ধেশ্বরী নদী ও দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর। দুটি নদী শহর থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভুতেশ্বর নামক পল্লীর কাছে মিলিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুর হল বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রশাসনিক কেন্দ্র। একদা বিষ্ণুপুর রাজ্যের রাজধানী, সুপ্রাচীন এই শহরটির মত পুরাকীর্তিময় [illegible] আর নেই। বিষ্ণুপুর শহরের পৌর এলাকা ৮ বর্গমাইল এবং পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি গ্রাম তার অন্তর্ভুক্ত। '৭১ সালের হিসাব অনুসারে বিষ্ণুপুর পৌর এলাকার লোকসংখ্যা ৩৮,১৫২।

অপর মিউনিসিপ্যাল শহর সোনামুখি বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত। ১৯৬৯ সালে সোনামুখির লোকসংখ্যা ছিল ১৫,০২৭, ঐ সময় খাতড়ার লোকসংখ্যা ছিল ৬৭৫৫ এবং পাত্রসায়ের শহরের ৬৫৮২।

বাঁকুড়া শহরে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৮৯৭৬, বিষ্ণুপুরে ৩৮৭০ এবং সোনামুখিতে ৩৩৩৯। সারা জেলায় যত লোক শহরবাসী তার অর্ধেকের বেশির বাস বাঁকুড়া শহরে। অবশ্য জেলায় শহরবাসীর সংখ্যা প্রতি হাজারে মাত্র ৮১ জন।

পরের সংখ্যায় জেলার মানুষ

জেলায় উন্নয়ন ব্লক আছে বাইশটি, পঞ্চায়েৎ ১৮১টি, গ্রাম পঞ্চায়েৎ ১৯৯, আর গ্রামের সংখ্যা ৩৮৪৭। তার মধ্যে লোক-বসতি আছে ৩,৫৭৪টি গ্রামে।

বাঁকুড়ার গ্রামগুলি খুব পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। জেলার প্রতি ১০০ বর্গমাইল স্থানে গড়ে ১৩৬টি গ্রাম আছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে আছে প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ১১৫টি গ্রাম। এর মধ্যে আবার বাঁকুড়া থানায় আছে প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ১৮০টি গ্রাম, ইঁদপুরে ১৭০টি ও কতুলপুরে ১৬৯টি গ্রাম।

বাঁকুড়ার গ্রামগুলি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় জনবিরল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি গ্রামে গড়ে ৬৮৬ জনের বাস, আর বাঁকুড়ার গ্রামে ৪৩৪ জনের। বাঁকুড়া জেলার শতকরা ৭২টি গ্রামের লোকসংখ্যা পাঁচশ'র কম, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫৮টি গ্রামের লোকসংখ্যা পাঁচশ'র কম। সারা বাঁকুড়ায় এমন একটিও গ্রাম নেই যার লোক-সংখ্যা দশ হাজার। জেলার বৃহত্তম গ্রাম হল বড়জোড়া থানার অন্তর্গত মালিয়াড়া, '৬১ সালে যার লোকসংখ্যা ছিল ৫৮৬৪। সারা বাঁকুড়ার ৩৫৭৪টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৯২টিতে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছেছে।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনকাল কেমন চলছে,
তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি।
কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব
আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আঁতের
খবর মেলে ধরা হবে এই
বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু
সচেতন হতে পারি।

বাজেটের আগে

আপনারা যখন দিনকালের এই হিসেবের ওপর চোখ বোলাবেন তখন হয়ত রেল বাজেট, কেন্দ্রীয় বাজেট এবং আমাদের রাজ্য সরকারের বাজেট সবই বেরিয়ে যাবে। আমাকে কিন্তু যে কোন সংখ্যার জন্যে লেখা জমা দিতে হয় ঐ সংখ্যা প্রকাশের অন্তত ১০ দিন আগে, আর লিখতে লাগে বেশ কয়েক দিন সময়। তাই উপক্রমণিকা হিসেবে বাজেটের আগের কথাই লিখলাম। লেখার হয়ত অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু বাজেটের বাজারে আর কোন প্রসঙ্গ একটু খাপছাড়া ঠেকত না কি? তাছাড়া বাজেটে কি না থাকে। বাজেট আলোচনার অর্থই হল সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থার পর্যালোচনা—জাতির সালতামামি। শুধু তাই নয়, আজকের দিনে বাজেট অজানা অর্থনৈতিক সমুদ্রে দিকনির্ণয়ের কাজেও লাগান হয়। তবে অনেকের কাছেই এই দিকনির্ণয় যন্ত্র ইনজেকশান সিরিঞ্জের মত প্রাথমিক আতঙ্কেরই সৃষ্টি করে। আর সিরিঞ্জের উত্তরোত্তর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আতঙ্কের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আতঙ্কের প্রসঙ্গেই মনে পড়ল গ্রীক উপকথায় বর্ণিত মানুষের অকল্যাণের জন্মকথা আর বাজেট শব্দার্থের রূপান্তরের কথা। আমার এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

ব্রিটেনের সাংবিধানিক ইতিহাস থেকে :

চ্যান্সেলার অব দি একসচেকার (ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী) তাঁর বাজেট খুললেন। সদস্যরা হাঁ করে তাকিয়ে আছেন—কি বেরোয় কি কে জানে। যেন প্যাণ্ডোরার বাকস খোলার মত। তবে প্যাণ্ডোরা (এবং বোধহয় এপিমিথিউসেরও) শুধু ছিল কৌতূহল ও প্রত্যাশা, আর আশঙ্কা যাঁর ছিল সেই প্রমিথিউস তখন ছিলেন বাইরে। কিন্তু চ্যান্সেলারের বাজেট খোলা অধিকাংশ সদস্যেরই আতঙ্কের কারণ। কেননা তাঁরা দেখে এসেছেন বাজেট থেকে যা বেরোয় তাতে ভালমন্দ মেশানো থাকলেও মন্দের সংখ্যাই বেশী—ভাল যদি তেতাল্লিশ, মন্দের সংখ্যা তিপ্পান্ন। সুতরাং তাঁরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেনই।

'তাকিয়ে থাকবেন' কথাটা বোধহয় ভুল, কারণ দৃষ্টি নয় তাঁদের শ্রবণই নিয়োজিত চ্যান্সেলারের বিবরণী শুনতে। বাজেট থেকে যা বেরিয়েছে তা হল কয়েক তাড়া কাগজ মাত্র যা পাঠ করেই চ্যান্সেলার তাঁর বিবরণী দেবেন। মুদ্রণ-ব্যবস্থা চালু হলেও প্রথম থেকেই এই সব কাগজপত্র ছাপা হয়ে আগে-ভাগেই সদস্যদের হাতে দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয় নি। সুতরাং তখন চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জনের কোন প্রশ্নই ছিল না — সদস্যদের পক্ষে কর্ণেন্দ্রিয়ই ব্যবহার করতে হত চ্যান্সেলারের বিবরণী অনুধাবন করতে। তবুও কিন্তু ঐ বিবরণী যে-কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ তা বেরিয়েছে বাজেট থেকে। আবার যা ছিল সবই বেরিয়েছে, প্যাণ্ডোরার বাকসের মত ঢাকনা বন্ধ করে কোন কিছুকে বন্দী করে রাখা যায় নি।

বাজেট শব্দার্থের রূপান্তর :

হ্যাঁ, 'বাজেট' শব্দের মূলে অর্থ হল কাগজপত্র বা জিনিসপত্র বহনের জন্যে চামড়ার ব্যাগ—আমরা ছেলেবেলায় যা গ্ল্যাড-স্টোন ব্যাগ বলে জানতাম, তাকেই বলা হত বাজেট। সুতরাং চ্যান্সেলার অব দি একসচেকার তাঁর বাজেট খুললেন—এর অর্থ ছিল, তিনি তাঁর চামড়ার ব্যাগটা খুললেন, যে-ব্যাগে আছে আগামী বছরের জন্যে সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবিত হিসেব। পরে এই প্রস্তাবিত হিসেবই বাজেট নামে অভিহিত হতে লাগল—আধারের স্থানাধিকার করল আধেয়। এখন অবশ্য এই দ্বিতীয় অর্থই প্রচলিত হয়ে গেছে—বাজেট বলতে বোঝায় সরকারী বার্ষিক অর্থবিবরণী বা প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের হিসেব।

এবার বলুন, বাজেট খোলা অনেকেরই আতঙ্কের কারণ নয় কি? অবিশ্যি অনেকের, সকলের নয়। পৌষ মাস মানেই ত সকলের সর্বনাশ নয়। এই বাজেট খোলার দিনে বেশ কিছু লোক বেশ কিছু দিন ধরে তাকিয়ে থাকে প্রত্যাশা নিয়ে, যে প্রত্যাশার মূল্য দিতে হয় আপনাকে-আমাকে।

জিউসের এই রকম প্রত্যাশাই ছিল—কবে প্যাণ্ডোরার বাকস খোলা হবে আর প্রমিথিউসের আগুন চুরির শাস্তি ভোগ করবে তার স্বজাতি—মানুষ। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে চুরির জন্যে ছিল শাস্তির প্রশ্ন, কিন্তু আপনি আমি ত কোন কিছু চুরি করি নি। তবে আমাদের এই শাস্তি কেন?

প্যাণ্ডোরার বাকস :

আচ্ছা প্যাণ্ডোরার বাকসের গল্পটাই আগে বলা যাক। এ গল্প আপনারও জানা। 'দিন কালের হিসেব' লেখার জন্যে আমাকে আবার ঝালিয়ে নিতে হয়েছে।
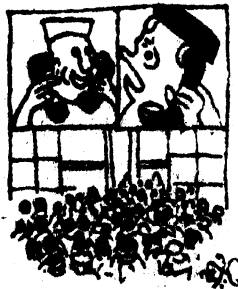
টাইটান-দেবতা প্রোমিথিউস (নামের অর্থ দূরদৃষ্টি) মানুষের কল্যাণের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে আনেন। এতে স্বর্গ-রাজ্যের অধিপতি জিউস ভীষণ চটে গিয়ে প্রতিহিংসা নেবার পরিকল্পনা করতে থাকেন। তাঁর আদেশে গ্রীক বিশ্বকর্মা এক নারী সৃষ্টি করেন। সব দেবতার গুণাবলীর অধিকারিণী হয়ে এই নারী হন এক তিলোত্তমা এবং প্যান্ডোরা নাম দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় প্রোমিথিউসের ভাই এপিমিথিউসের (নামের অর্থ পশ্চাদ্‌দৃষ্টি) কাছে। প্রোমিথিউসের নিষেধ সত্ত্বেও এপিমিথিউস প্যান্ডোরাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করে। প্যান্ডোরার সঙ্গে ছিল জিউসের উপহার দেওয়া একটি বাকস। ঠিক বাকস অবিশ্যি নয়, একটি কুঁজো—তবে বলা হয় বাকস। প্রোমিথিউস বারবার সতর্ক করে দিয়েছিল বাকসটি যেন না খোলা হয়। কিন্তু প্যান্ডোরার আবদার এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এপিমিথিউস বাকসটি খুলে ফেলে। (কোন কোন বর্ণনায় প্যান্ডোরা নিজেই বাকসটি খুলে ছিল)। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে থাকে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি সব-কিছু অকল্যাণ। ভয় পেয়ে এপিমিথিউস (বা প্যান্ডোরা) বাকসের ঢাকনাটি বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে জিউসের প্রতিহিংসার উপাদান সব অকল্যাণই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, শুধু আশা বেরোবার সুযোগ পায় নি। শুধু মাত্র আশাই বাকসবন্দী হয়ে রইল হয়ে রইল মানুষের শেষ ভরসা।

কিন্তু কিছুটা দেখবার পর বাজেট যখন আর বন্ধ করবার উপায় নেই তখন আমাদের আর ভরসা কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে কোন ভরসাই নেই, কিন্তু তলিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই আছে। তবে ঐ আলোচনা পরে করব। এখন বাজেটের আগের ভাবনার কথাই ভাবা যাক।

রেল-বাজেট :

ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষণা করা রেল-বাজেট। যাঁরা প্রাত্যহিক যাত্রী নন, যাঁরা ন-মাসে ছ-মাসে একবার রেলগাড়ী চাপেন তাঁদের কাছে রেল-বাজেট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপারটা তাই? স্মরণ রাখতে হবে, রেলপথ শুধু যাত্রীই বহন করে না, মালপত্রও বহন করে। মালপত্রের মাশুল বাড়লে আপনি রেলযাত্রী না হয়েও কি রেহাই পাবেন? অন্য জিনিসের কথা ছেড়েই দিন, যদি মাশুল বৃদ্ধির জন্যে কয়লার দামই বাড়ে তা কি আপনাকে স্পর্শ করবে না? সুতরাং রেল-বাজেটও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৪ সালের আগে রেল-বাজেট ছিল কেন্দ্রীয় বাজেটেরই অংশ। ঐ সালে অ্যাক-ওয়র্থ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ঐ দুই বাজেটকে পৃথক করা হয়। পৃথক করা হলে উভয় বাজেটের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হতে থাকে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত প্রথা বা কনভেনশান দ্বারা। বর্তমানে যে প্রথাটি চালু আছে তাকে বলা হয় ১৯৬৫ সালের প্রথা। এই প্রথা অনুসারে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রেলপথের জন্যে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে তার জন্যে রেল-বাজেট থেকে কেন্দ্রীয় বাজেটকে ৫·৫ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড দিতে হবে এবং পরবর্তী সময় থেকে ডিভিডেন্ডের হার হবে ৬ শতাংশ। এছাড়া রেলপথগুলোকে বছরে ১০০ কোটি টাকার মত অবপূর্তি তহবিলে জমা রাখতে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রেল-বাজেটের ওপর দু রকমের ধার্য ব্যয় আছে : (ক) কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় ডিভিডেন্ড, (খ) নিজস্ব অবপূর্তি তহবিলে অর্থ জমা রাখা। বর্তমান বছর বা ১৯৭২-৭৩ সালে এই দুই খাতে মোট ২৭০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। এ ছাড়া আছে রেলপথ পরিচালনার ব্যয়। এই সব ব্যয় মিটিয়ে এ বছর ৩·২ কোটি টাকার মত মোট উদ্বৃত্ত হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

অনুমানের চেয়ে আয় অনেক কম হয়েছে বলে নাকি আশা পূর্ণ হয় নি। এর মূলে আছে দুটি কারণ : বর্তমান বছরের খরা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের গোলমাল। তিন দক্ষিণ ভারতে ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত। আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে নানা রকম সমস্যা উদ্ভব হয় এবং অনুমানভিত্তিক আয়-ব্যয়ের হিসেব হয়ে যায় সম্পূর্ণ বানচাল। এর জন্যেই ব্রিটিশ আমলের একজন অর্থসচিব উক্তি করেছিলেন : ভারতে বাজেট কেবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নিয়ে জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে এ বছর আয়ের অঙ্কে গোলমাল—রেলপথের আয় হ্রাস। অপর দিকে ব্যয় নাকি অনুমানকে ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং উদ্বৃত্তের আশা রূপান্তরিত হয়েছে ঘাটতির আশংকায়।

এই আশংকার স্বাভাবিক পরিণতি সিদ্ধান্ত : যাত্রীভাড়া ও মালপত্রের মাশুল বৃদ্ধি। বিভিন্ন মহল থেকে এই পূর্বানুমানই করা হয়েছে।

রেলপথ সরকারের একচেটিয়া কারবার। ভাড়া ও মাশুল বাড়ালে আমাদের কিছু করবার নেই। সংসদে হয়ত এর কিছুটা বিক্ষুব্ধ সমালোচনা হবে যার দরুন প্রস্তাবিত বৃদ্ধির কিছুটা প্রান্তিক রদবদল করা হতে পারে। কিন্তু তারপর আগামী ১লা এপ্রিল থেকে চালু হবে নতুন হার-পুরোনো টিকিটগুলোর ওপর মুদ্রিত দাম কেটে দিয়ে কালি দিয়ে দাম লিখে সেই টিকিট তুলে দেওয়া হবে যাত্রীদের হাতে। ফলে অনেকেরই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। মালপত্রের মাশুল বাড়লে মূল্যস্তর আরও ঊর্ধ্বগামী হবে। এর দরুন মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী আরও জোরালো হয়ে উঠবে।

এইটা—এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ফল ফলাতে সময় লাগে। আর কিভাবে যে সাধারণ লোকে তা সম্যক বুঝতেও পারে না। মৌখিক বিক্ষোভ দেখা যায় মাত্র। কিন্তু সত্যিই কি মাথা ঘামাবার মত নয়?

কেন্দ্রীয় বাজেট :

অবিশ্যি রেল বাজেটের চেয়ে কেন্দ্রীয় বাজেট অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বের দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় বাজেটের স্থান শুধু রেল বাজেট নয়, রাজ্য সরকারের বাজেটেরও ওপর। এর কারণ, আমাদের আয়-ব্যয় ব্যবস্থা তত্ত্বের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হলেও মূলত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেরই দ্যোতক। প্রথমত দেখা যায়, আয়কর মূলধনলাভ-কর, সম্পত্তিকর, সম্পদকর, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যের ওপর অন্তঃশুল্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কর ধার্য করবার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে। এইসব আমাদের যতটা পরিমাণে স্পর্শ করে রাজ্য সরকারের কোন কর তত্তটা করে না। যেমন, আয়করের হার বৃদ্ধি পেলেই মাসিক বেতন থেকে আরও বেশী পরিমাণে কর্তন শুরু হয়ে যাবে, কোন ভোগ্যপণ্যের ওপর অন্তঃশুল্কের হার বাড়ানো বা হের-ফের করা হলেই

সঙ্গে সঙ্গে বা তার আগে থেকেই ঐ সব পণ্যের দাম ঊর্ধ্বগামী হতে শুরু করবে, সম্পদকরের ক্ষেত্রে অব্যাহতির সীমা কমান হলে এই কর আপনার-আমার ঘাড়ে এসে পড়তে পারে ইত্যাদি। অপরদিকে রাজ্য সরকারের কর—যেমন বিক্রয়কর প্রমোদকর বিদ্যুৎকর প্রভৃতির হার যদি বাড়ে তখন তা অনেক সময় বোঝাই যায় না। আর আগে যা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেই ভূমি রাজস্ব নিয়ে আজ আর কেউ খুব একটা মাথা ঘামায় না। কারণ, ভূমিরাজস্ব বাড়বার আশংকা নেই বললেই হয়, বরং রাজনৈতিক কারণে কমবার সম্ভাবনাই আছে—

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্যে অর্থসংস্থানের দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রের। তাই রাজ্য সরকারের বাজেটের চেয়ে লোকে কেন্দ্রীয় বাজেটের দিকেই বেশী চেয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, আয়করের অন্তঃশুল্ক ইত্যাদির মত কয়েকটি কররাজস্ব সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলোর মধ্যে অংশত বণ্টিত হয় বলে এবং কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সূত্রে রাজ্যগুলো গ্রান্টস-ইন-এইড বা সাহায্যরূপে অনুদান পায় বলে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রত্যেক রাজ্য সরকারের বাজেটে কিছু-না-কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয়। পরিশেষে ঘাটতি ব্যয় বা নোট ছাপিয়ে ব্যয় নির্বাহের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই প্রকল্পগুলোর

গতির দিক দিয়েও কেন্দ্রীয় বাজেট বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলেই বেশী ভয়-ভাবনার কারণ। তাই কেন্দ্রীয় বাজেট বেরোবার অনেকদিন আগে থেকেই অনেকে হয়ে থাকে সন্ত্রস্ত। অনেক সময় আবার যেমন অনুষ্ঠানের চেয়ে অধিগমই বেশী কার্যকর, তেমনি বাজেটের আগের অবস্থাটাই হয় বেশী ভয়াবহ। এবং এ অবস্থার সংগে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। যেমন ধরুন, আপনি যদি ধূমপায়ী—আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে সিগারেট সেবী—হন তবে বাজেটে অনেক আগে থেকেই অনেক ব্রান্ডের সিগারেট উধাও হওয়ার বা দাম বাড়ার অভিজ্ঞতা আপনার নিশ্চয়ই আছে। কয়েক বছর আগে দেশলাই এর দামও বাড়ত এবং দোকানদার সোজা বলত: বাজেট আসছে, জানেন না? যেন বাজেটের আগে দেশলাই-এর মত পণ্যের দাম বাড়াই স্বাভাবিক, আর না বাড়াটাই আশ্চর্যের বিষয়। কয়েক বছর দেশলাই-এর ওপর অন্তঃশুল্ক না বাড়ায় বাজেটের আগে দাম স্থিতিশীলই থাকছে।

শুধু সিগারেট-দেশলাই-এর কথা নয়, আরও অনেক জিনিস আছে—চা কফি চিনি পেট্রল তামাক সুতো সুতোর কাপড় সাবান টায়ার টিউব ইস্পাতদ্রব্য বৈদ্যুতিক দ্রব্য মোটর পাম্প ট্রানজিস্টার রেডিও সেট গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতি সব কিছুরই ওপর বসেছে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক। বাজেট ঘাটতি পড়লেই অন্তঃশুল্কের সংখ্যা বৃদ্ধি, শুল্কের হারবৃদ্ধি এবং অনেক সময় শুল্কের ওপর সারচার্জ ধার্য করা হয়। পাইকারী ব্যবসায়ী খুচরো ব্যবসায়ী এবং অনেক সময় উৎপাদকও এই মওকার আশায় বসে থাকে—অর্থনীতিতে যাকে বলে সংরক্ষণ-দাম তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলে বাজেটের ঠিক আগে মজুত মাল ছাড়তে চায় না। ফলে ঘটে কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা এবং তার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে মূল্যবৃদ্ধি।

এই পণ্যমূল্যবৃদ্ধিই বাজেটের আগে ভাববার প্রধান ভাবনা। আরও ভাবনার কারণ আছে। যেমন, শ্রীমোরারজী দেশাই অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ছল করে কম্পালসারি ডিপোজিট বা আবশ্যিক জমা প্রবর্তন করেছিলেন, যা অনেকের কাছেই নতুন উৎপীড়ন বলে মনে হয়েছিল। মনে আছে, পরের বার যখন এই আবশ্যিক জমার বিলোপসাধন করা হয় তখন চারদিকে কি উল্লাস। ভাবনা হল, এবারের বাজেট এই রকম কোন নতুন উৎপীড়নের সংবাদ বহন করে আনবে না ত।

আর আছে আয়করের হারে রদবদল সম্পর্কে আশংকা। শোনা যাচ্ছে, এবারে স্বামী-স্ত্রীর আয় একসংগে ধরা হবে। এর
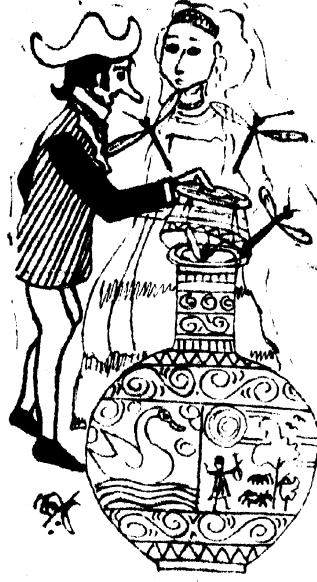
ফলে অনেকেরই ওপর যে ঘা পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত উদ্বাহবন্ধনের মূল্যবৃদ্ধি পাবে কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর এর কোন ফল ফলবে কি?

পরিশেষের ভাবনা, আরও কি নতুন কোন কর বসবে—প্যাণ্ডোরার বাকসে আর কি কোন অজানা অভিশাপ আছে?

রাজ্য সরকারের বাজেট :

রাজ্য সরকারের বাজেটের সংগে তেমন দুশ্চিন্তা জড়িত নেই। বিক্রয়কর ও প্রমোদ-কর হয়ত সামান্য বাড়তে পারে। বাড়তে পারে বিদ্যুৎকর এবং স্ট্যাম্পকর ও রেজিস্ট্রেশনের ফি। বিক্রয়কর ও প্রমোদকর বাড়লে প্রথমটা একটা ধাক্কা লাগে, মনে হয় পকেট একটু বেশী ছেঁদা হয়ে গেছে, তবে তা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি সয়ে যায়। এর কারণ দুটো: বিক্রয়কর বৃদ্ধির আগেই সাধারণত জিনিস-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সুতরাং খাঁড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত আর এক দফা মূল্যবৃদ্ধির অনুভূতি—একটু কমই হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় বিক্রেতা দামের মধ্যে বিক্রয়-কর ধরে নেয়। ফলে বুঝতেও পারা যায় না। প্রমোদকরের বেলায় নিছক অঙ্ক হিসেব করে চলে না, কারণ আমোদপ্রমোদের পশ্চাতে যে আকাংক্ষার তীব্রতা কাজ করে তা ব্যয়জনিত অনুপযোগের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়। বিদ্যুৎকর বাড়লে আবার সব সময় বোঝাও যায় না—ধরে নেওয়া হয় বিদ্যুৎ একটু বেশী খরচ হয়েছে বা মিটারে গোলমাল আছে, ইত্যাদি। আর স্ট্যাম্প ডিউটি বা রেজিস্ট্রেশনের ফি একজনকে জীবনে কতবার দিতে হয়?

প্যাণ্ডোরার আসল বাকস

তা বলে প্যাণ্ডোরার আসল বাকস—আমাদের দিক দিয়ে আসল বাজেট হল কেন্দ্রীয় বাজেট। রেল বাজেট ও রাজ্য সরকারের বাজেট কম গুরুত্বপূর্ণ—সব অভিশাপ ধরে নি বলে প্যাণ্ডোরার আসল বাকসের সংগে জিউস যেন আরও বাকস উপহার দিয়েছিলেন।

এসব কথা, প্যাণ্ডোরার এই আসল এবং ফাউ বাকস দুটো থেকে কিছু যে বেরোবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু কি বেরোবে তাই নিয়েই ভাবনা। তার পরের কথা—যে প্রশ্নের বিবেচনা এতক্ষণ মুলতুবী রেখেছি আশা দেবীর খবর কি? তিনি ত প্যাণ্ডোরার বাকসের মত বন্দী হয়ে থাকবেন না। না, বন্দী হয়ে থাকবেন না। প্রত্যেক বাজেট থেকে বেরিয়ে পাখা মেলে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন, আর তাঁর সেই পক্ষসঞ্চালন থেকে আমরা শুনব বিভিন্ন বাণী: প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর হবে, অর্থনৈতিক পরি-কল্পনার কাজ ঠিকমত চলবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতার দিকে যাবে, দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ অনেকটা এগোবে, সমাজতন্ত্রের পথে গতিও দ্রুততর হবে, বিরাট কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, রেল-পথের পরিচালনা উন্নত হবে, নতুন রেললাইন পাতা হবে, ভূতপূর্ব মার্টিন রেল আবার চালু হবে, শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রকল্পের রূপায়ণের মাধ্যমে জনকল্যাণ সম্প্রসারিত হবে, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটবে, জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্যাণ্ডোরার উপকথায় মানুষ আশাকেই বাকসবন্দী করে বেঁচে ছিল। আমাদের ক্ষেত্রে আশা কিন্তু উড্ডীয়মান। সিনিক না হয়ে বলব, এই আশার বাণীর বেশ কিছুটাও যদি রূপায়িত হয় তবে সমাজ-সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি রোগে চিকিৎসার মত আপাতদৃষ্টিতে করবৃদ্ধির অকল্যাণকে চূড়ান্ত কল্যাণের সূচক বলেই গ্রহণ করব।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

(বারো)

সেদিন মান্দারে গেছিলাম। ডাক্তার-সাহেব পিঠে চড় মেরে বলেছিলেন, 'ওয়েল মিস্টার বাসু, ইউ নাউ ক্যান টু মি এনি মোর। ইউ আর এ ফ্রি ম্যান নাউ। ইউ মে লিড ইউর নর্মাল লাইফ। উইশ য়ু অল দা বেস্ট।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যখন দাঁড়ালাম তখন বেলা দশটা বেজেছে। শীতের রোদ পীচের রাস্তায় পিছলে যাচ্ছে। পাশেই একটা গীর্জা। দোকান, বাজার।

ঘন ঘন বাস আসছে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে মালবোঝাই ট্রাক পিচের উপরে প্যাচ প্যাচ আওয়াজ তুলে। শুকনো পাতা উড়ছে হাওয়ায়, ঘূর্ণী উঠছে চায়ের দোকানের সামনে শালপাতার ফেলে-দেওয় দোনা-গুলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

হাওয়ায় আমার চুল এলোমেলো হচ্ছিল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে গায়ে শাল-জড়ানো আমি, এই সুকুমার বোস, স্থাণুর মত দাঁড়িয়েছিলাম মিশন-হসপিটালের গেটের বাইরে।

ভাবতেও দারুণ লাগছিল যে আমি আজ স্বাধীন। মনে হচ্ছিল যে আমি যেন কোনো জেলখানার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। পিছনে ফেলে-আসা টি-বি হস-পিটালের দুঃখময় স্মৃতি, এবং পরবর্তী সময়ের পদে পদের বাধার-বাধা প্রতিদিনের অসুস্থতার বাসি স্মৃতি-ভরা জীবন, সবই যেন অনেক দূরে ফেলে এসেছি। আজ যেন হঠাৎ-ছুটি-হওয়া কোনো যাবজ্জীবন কারা-দণ্ডের আসামী ছাড়া পেয়ে গরাদের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার এই হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতা নিয়ে আমি কি করব বুঝে উঠতে পারলাম না। স্বাধীনতা ও মুক্তির দায় বড় বিষম বলে মনে হল। এ নিয়ে আমি এক্ষুনি কি করব, বা কি আমার করা উচিত, তাও আমি ভেবে পেলাম না।

আস্তে আস্তে অন্যমনস্কভাবে সামনের চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়ালাম।

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পাকোড়া ও চা খেলাম। তারপরে বেশ করে খুশবু-ভরা জর্দা দিয়ে দুটো মঘাই-পান খেলাম। তারপর অনেকদিন পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম এক্ষুনি আমার কি করা উচিত।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জে যেতে হলে এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যেতে পারি, কিন্তু আমার পা দুটো কিছুতেই সেদিকে যেতে চাইল না। আমার পার্সের ভিতরে একটা ঠিকানা লেখা ছোট্ট কাগজ ছিল, সেই কাগজটা বের করে ছুটির রাঁচীর ঠিকানাটা একবার দেখ-লাম। তারপর রতনলালের ডালটনগঞ্জীয়া বাস এসে দাঁড়াতেই কি এক অদৃশ্য ও অনামা টানে সেই বাসে উঠে পড়লাম।

রাতুর রাজার লাল-রঙা প্রাসাদের ধার-ঘেঁষা আমবাগানের পাশ দিয়ে বাস চলছিল। ডানদিকে সেই বড় জলাটা। একদল হাঁস দূরে ওড়াউড়ি করছে। সকালের রোদ ওদের সাদা ডানায় পিছলে পড়ে চমকে উঠছে।

বাস চলেছে। একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ করে প্রকাণ্ড বাসটা চলেছে রাঁচীর দিকে, ছুটির দিকে।

রাঁচীর রাতু বাস স্ট্যাণ্ডে পোঁছে একটা সাইকেল রিকসা নিলাম।

রিকসাওয়ালা অনেকগুলো মোড় নিয়ে কোঁচোর-কোঁচোর করতে করতে এসে অনেকক্ষণ পর যেখানে থামল, সে জায়গাটা বেশ নির্জন। একটা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা পুরোনো দিনের বিরাট বাড়ি। এক-তলা এবং দোতলার কিছুটা জুড়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনো অফিস আছে। রিকসাওয়ালা দারোয়ানকে জিগ্গেস করে, আমাকে বাড়িটার পিছনের দিকে নিয়ে গেল।

ভাড়া মিটিয়ে চওড়া ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে, দারোয়ানের সঙ্গে দোতলার বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দারোয়ান বলল, এহি হ্যায় দিদিমণিকা ঘর, বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

বারান্দায় একটা শাড়ি মেলা ছিল। শাড়িটা আমার চেনা।

ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই একটি স্থানীয় বুড়ো এসে দরজা খুলল। হিন্দীতে বলল, দিদিমণি বাড়ি নেই। দুপুরে আসবে।

আমি বললাম, আমি দিদিমণির আত্মীয়। আমি দিদিমণির জন্যে অপেক্ষা করব। আমাকে বসতে দাও।

বুড়ির চোখেমুখে কোনো নরম ভাব দেখা গেল না। বেশ শক্ত গলায় বলল, হুকুম নেই হ্যায়। বলল, আপনি যেই হোন না কেন, নীচে গিয়ে অপেক্ষা করুন। ভাবটা এমন যে, দিদিমণি এসে সরেজমীনে তদন্ত করে আপনাকে বেকসুর বলে সার্টিফিকেট দিলে তখন দিদিমণি নিজেই উপরে নিয়ে আসবেন আপনাকে। এখন তার পক্ষে আর কিছু করণীয় নেই।

আমি বললাম, একটু জল খেতে পারি?

ও বলল, একটু কেন, একঘড়া জল খাওয়াব, কিন্তু এখন নয়, দিদিমণি এলে। তারপরেই বলল, এখন মানে মানে নীচে যান, নইলে লছমন সিংকে ডাকব।

আমার চেহারা কখনও সুন্দর যাকে বলে তা ছিল না। তবে নিজের চেহারা সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা হয়ত প্রত্যেকেরই থাকে। আমারও ছিল। আমার ধারণা ছিল, আমার চেহারাটা আর যাই হোক অভদ্র বা চোর-ডাকাতের মত নয়। কিন্তু এই অচেনা বুড়ি আমার সঙ্গে যে ব্যবহারটা করল তাতে মনে মনে বিলক্ষণ দুঃখিত হলাম। বুড়ি না হয়ে ছুঁড়ি হলেও না হয় তার অপমান হজম করা যেত—কিন্তু এ অপমান বড় লাগল। তবু ভেবে দেখলাম সীন ক্রিয়েট করে জোর করে ঘরে ঢোকার চেয়ে নীচে গিয়ে লছমন সিং-এর ছারপোকাওয়ালা খাটিয়াতে অবস্থান করাও অপেক্ষাকৃত সম্মানের।

সিঁড়ি দিয়ে যখন নেমে আসছি, মাঝ-সিঁড়িতে এসে জানালার কাচে হঠাৎ আমার মুখটা দেখতে পেলাম। আমি নিজেই চমকে উঠলাম দেখে। রুক্ষ, উস্কুখুস্কো চুল, বড় বড় দাড়ি (সেই কাল ভোরে দাড়ি কামিয়ে-ছিলাম) পান-খাওয়া লাল ফাটা ফাটা ঠোঁট এবং ঘোলাটে চোখ।

নীচে নামতে নামতে ভাবলাম ভাগ্যিস জোর করে ভিতরে ঢুকিনি বা আমি যে ছুটির আত্মীয় সে সম্বন্ধে ঐ বুড়িকে বোঝাতে চাইনি। ঘরে ঢুকলে বা তা বোঝাতে গেলে হয়ত নিজেকে ও ছুটিকে অসম্মানই করা হত। যদি [illegible] জানতে চাইত আমি ছুটির কে হই [illegible] উত্তর দেবার মত কিছুই আমার [illegible] না।

আসলে আমি ত কেউই হই না ওর। ওর মনের উদারতায়, সংস্কারহীনতায়, এই সমাজের বিরুদ্ধে ওর বিদ্রূপময় বিদ্রোহে ভর করে ও আমাকে যে আত্মীয়তা দিয়েছে তার ত এদের চোখে কোনো স্বীকৃতি নেই। এ সম্পর্ক ত শুধু ওর এবং আমার। এ সম্পর্কের যতটুকু দাম যতটুকু নৈকট্য সে ত শুধু আমার এবং ছুটির কাছেই। বাইরের কেউই ত এ সম্পর্ক বুঝতে পারবে না। আমরা দুজনেই শুধু এ সম্পর্ককে স্বীকার করেছি, শ্রদ্ধা করেছি, সমস্ত সামাজিক ঝড়, ঝাপটা, ন্যাপাম-বোমা থেকে আড়াল করে রেখেছি। এ সম্পর্কের ত নাম নেই, একে ত ছাঁচে ফেলে কোনো বিশেষ আভিধানিক নামে ডাকা যায় না। এ যে এক দারুণ সম্পর্ক। শুধু ছুটি জানে, আর আমি জানি। ছুটি আমার কে হয়? এই সাধারণ স্থূলে জবাবের উত্তরে ত আমি কিছু বলতে পারব না। বললে বলতে পারতাম এক কথায়, ও আমার কে হয় না?

বুড়ো দারোয়ান, যে আমাকে উপরে পেঁাছে দিয়ে এল, সে শুধোল, কি হল?

আমি বললাম, দিদিমণি নেই।

ও চটে উঠে বলল, নেই ত কি? ঐ বদমায়েস বুড়িটা আপনাকে বসতে পর্যন্ত বলল না।

আমি অবাক হয়ে দারোয়ানের মুখের দিকে তাকালাম।

কিছু বলার আগেই দারোয়ান একটা গালাগালি দিয়ে বলল, ও ওরকমই—সাধে কি আর ওকে আমি দেখতে পারি না। বলেই, বলল, আপনি ঐখানেই বসুন। ঐ গাছতলায় চোপাই পাতা আছে, ওতে গিয়ে বসুন। দিদিমণি দেড়টা-দুটোর সময় এসে যাবেন।

আমি বললাম, একটু জল খাওয়াতে পারবে দারোয়ানজী?

সে বলল, নিশ্চয়ই খাওয়াব। পিয়াসীকে জল খাওয়ানো, এত পুণ্যের কাজ। বলেই তার ঘর থেকে হাতে করে একটু আখি গুড় আর ঝকঝকে লোটায় করে একলোটা জল নিয়ে এল। আদর করে বলল, পীজীয়ে

আশ মিটিয়ে জল খেলাম।

দারোয়ানের ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে। বেচারার একা বসে বসে আর খৈনী টিপে টিপে আর বুঝি সময় কাটে না।

কিন্তু আমার তখন গল্প করার ইচ্ছা ছিলো না। শুধু ওর সঙ্গে নয়, কারো সঙ্গেই না। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি গিয়ে চোপাইতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম হাতের উপর মাথা দিয়ে।

যে-গাছের নীচে চোপাইটা পাতা ছিল সেটা একটা খুব প্রাচীন নিমগাছ। রোদে ফিনফিনে পাতাগুলো ঝিলমিল করছে। একটু একটু হাওয়া আছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো শুকনো পাতা হাওয়াতে ঘুরে ঘুরে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে আসছে।

অনেক পাখি এসে বসেছে গাছটাতে, অনেকে বাসা করে আছে, এরকম গাছতলা বড় শান্তির জায়গা।

ঐ গাছটার নীচে এই রৌদ্রালোকিত সচকিত কাকলিমুখর সকালে শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল আমি যেন ছুটিরই কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। যত ঝড়, যত ঝাপটা যতকিছু অন্যায্য অত্যাচার যাকিছু ব্যক্ত বা ব্যক্ত ব্যথা সব পেরিয়ে এসে আমি এই দারুণ স্নিগ্ধ শান্তির ঘরে পেঁৗছেছি। ভগবান সাক্ষী করে বলতে পারি ওর কাছে কখনও আমি কোনো কিছু প্রত্যাশা করে আসিনি। ভিখিরীর মত কোনো কিছু চাইনি ওর কাছে। ও-ও আমার কাছে কিছু-মাত্র চায় নি। কিন্তু সব কিছু দিতে চেয়েছে; যা ওর আছে, যা ও দিতে পারে। হয়ত আমরা দুজনে কেউই কারো কাছে কিছু-মাত্র প্রত্যাশা করিনি বলেই সম্পর্কটা এমন সহজ হয়েছে। ছুটিকে দেখতে পাই আর না পাই, সবসময় ছুটি আমার সমস্ত মন জুড়ে থাকে। যখন ওকে এক বছর দেখিনি তখনও ও আমার সমস্ত মন জুড়ে ছিল।

প্রথম প্রথম মনে হত আমি বোধহয় রমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। ছুটিও বলত, 'আমার মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে, মনে হয় আমার জন্যেই আপনার বিবাহিত জীবন এমন অশান্তির হয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু আমি জানি, হয়ত ছুটিও জানে, আমরা দুজনেই সৎ ও হৃদয়বান বোকা বলেই এ কথা আমার মনে হয়েছে।

রমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাক এ আমি কখনও চাইনি। কিন্তু এ বাবদে আমার কিছু করার আছে বলে আমার আর মনে হয় না। মনে হয়, যা কিছু করার ছিল, শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু রমা আজ বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার আত্মীয়স্বজন, আমার চেনা-পরিচিত সকলের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে এবং করে আসছে তাতে মনে মনে তার থেকে সরে না এসে আমার কোনো উপায় ছিলো না।

কতদিন, কতদিন যে পিস্তলের নল মাথার কাছে ঠেকিয়ে নিজেকে শেষ করে দিতে গেছি, কত যে দিন, সে আমিই জানি। পারিনি, কারণ আমি নিজেকে ভালোবাসি বলে নয়, পারিনি রুণের কথা ভেবে। আমার ছেলে, নিরপরাধ, সরল অপাপবিদ্ধ ছেলে ত কোনো অপরাধ করেনি। আমি না-থাকলে ওকে ওর স্বাভাবিক ও সুস্থ অধিকার থেকে ঘৃণিতভাবে বঞ্চিত করব। আমিই ওর প্রতি যা আমার করণীয় (শুধু টাকা পয়সায় নয়) সবই আমার করা উচিত। এই কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যত যন্ত্রণাই পেয়ে থাকি, যত কষ্টই পেয়ে থাকি, ভেবে দেখেছি যতদিন না রুণের প্রতি আমার সব কর্তব্য শেষ হচ্ছে ততদিন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার অনুচিত।

আমার জীবনটা যে আমারই, শুধু আমারই একার, রমার নয়, রুণের নয় এমনকি ছুটিরও নয়—একমাত্র আমার—এই ভাবনাটা ছুটিই আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছে।

ছুটিই আমাকে শিখিয়েছে জীবনের মানে কি? ছুটিই বলেছে, বার বার, কেউই অন্য কারো জন্যে, অন্য কারো কারণে বাঁচে না; অন্তত কারোই সে রকমভাবে বাঁচা উচিত নয়। এও বলেছে সে, কেউই অন্য কারো দয়ায় নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। বেঁচে থাকার এবং সুস্থ স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের সকলের জন্মগত নয়; সে অধিকার আমাদের প্রত্যেককে তৈরী করে নিয়ে বাঁচতে হবে।

ও সবসময় বলে, যে জীবন একটা চলমান চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা, এতে স্থাবর বা স্থবিরের কোনো স্থান নেই। বলে, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সত্যি। এই মুহূর্তটিই—যে মুহূর্তে আমি বা ছুটি বা অন্য কেউই বেঁচে আছি। আর সব মিথ্যা। বর্তমানের জন্যে অতীত অথবা ভবিষ্যৎ দুইকেই হাসিমুখে বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে।

ভাবলে অবাক লাগে যে, ছুটি এই অল্পবয়সে এত সব অরিজিনাল ও মুক্ত ভাবনা পেল কোত্থেকে? কি করে ও ওর সমসাময়িক অনেকের থেকে এমন দারুণ ভাবে আলাদা হল অন্য একটা আনন্দময়

জগত আবিষ্কার করে ফেলল—ও আর ফেলল না। যদি, তা আমার কোনো সৌভাগ্যে ও আমার কাছে এল, এসে, আমি যখন কাঁটার মধ্যে, পাঁকের মধ্যে বসে, সামাজিক গলার শীল-মোহরটা চিরদিনের মত গলায় ঝুলিয়ে সামাজিক সম্পর্কের ভীষণ ভারী পাথরটার চাপে অসহায়ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে ও কি করে এসে আমাকে মুক্ত করল। —ও কিসের টানে, আমার মধ্যে কি আবিষ্কার করে, কেন আমাকে হাতছানি দিয়ে আমার মৃত্যু এবং স্বেচ্ছারোপিত অবশ মনের ভার থেকে স্বাধীন করল? ও কিসের জন্যে আমাকে পুলকভরে এই নতুন রোমাঞ্চময় সবুজ জীবনের উষ্ণতা-কয় ডাক দিয়ে বলল, 'আপনাকে বাঁচতে হবে।' বলল, 'আর কারুর জন্যে নয় নিতান্ত স্বার্থপরের মতই, আপনাকে আপনার নিজের জন্যেই বাঁচতে হবে।'

একদিন ছুটি একটা দারুণ কথা বলেছিল। ওকে নিয়ে এক রবিবার একটা বড় হোটেলে খেতে গেছিলাম। ডাইনীং রুমের শাদা ফিনফিনে পর্দা ভেদ করে বাইরের আলো ঘরময় ছড়িয়ে গেছিল। অন্তবড় এয়ার-কন্ডিশানড় ডাইনীং রুমটাকে একটা বসবার ঘর বলে মনে হচ্ছিল।

ছুটি আমার সামনে মুখ নীচু করে বসেছিল।

আমি বলেছিলাম, ওয়েল, আই থিংক ইউ হ্যাভ চোজেন আ রং পার্সন।

ছুটি মুখ তুলে বলেছিল, হ্যাভ আই? তারপর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হেসে বলেছিল আই ডোন্ট থিংক সো।

আমি শুধিয়েছিলাম, তুমি কি বলতে চাও?

ছুটি কাঁটাচামচ নাড়তে নাড়তে বলেছিল, বলতে চাই না কোনোকিছুই, কিন্তু আমি আপনার ব্যাপারে কোনো ভুল করিনি। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, ভালোমন্দ বিচার করে, নিন্দা-অপবাদ সবকিছুর কথা ভেবেই আপনাকে ভালোবেসেছি। যে-সব মেয়ে সুখের ভালোবাসা বাসে আমি তাদের দলে নই। আমার ভালোবাসা উপায়হীন, কম্পালসিভ।

তারপর হঠাৎ মুখ নামিয়ে বলেছিল, একজন নাম-করা ব্যারিস্টারের সঙ্গে তর্কে জিতব কিনা জানি না, তবে আমার মনে হয় আপনি আমাদের দুজনকেই ঠকাচ্ছেন। আপনি অতীতে বাস করছেন। একদিন যে ভালোবেসেছিলেন, একদিন যে বিয়ে করেছিলেন সেই অতীতের স্মৃতিটা আমাদের বর্তমানের সমস্ত আনন্দটুকুকে, জীবনের সমস্ত স্বাদটুকুকে ঘোলা করে দিচ্ছে। এটা কি ঠিক?

একটু পরে ছুটি বলেছিল, একটা কথা বলব সুকুদা?

মুখ তুলে বলেছিলাম, কি? বল?

কথাটা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ লোকই অতীতের স্মৃতি অথবা ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনা নিয়ে বাঁচি, বাঁচতে চাই। আর এই বাসি ঠান্ডা অতীত ও জরামুর মধ্যের ঈর্ষোদ্দীপক ভবিষ্যতের মধ্যে পড়ে তাদের প্রত্যেকের বর্তমানটাই মারা যায়। কথাটা হালকা শোনাচ্ছে বুঝি কিন্তু কথাটা হালকা নয়।

বর্তমান মানে, জাস্ট একটা মুহূর্ত নয়, এই মুহূর্তই নয়, বর্তমানের বিস্তৃতি অনেক। বর্তমান মানে সমস্ত জীবন, আপনার আমার, সকলের প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্ব। আমরা যদি প্রতিটি মুহূর্তে নিজেদের ফাঁকি দিই, একে অন্যকে ফাঁকিতে ফেলি, তাহলে সে জীবনের কি বাকি থাকে বলুন?

জানি না, কতক্ষণ এমন এলোমেলো ভাবনা ভেবে চলেছিলাম, হঠাৎ হুঁশ হল লছমন সিং-এর গলার স্বরে। হয়ত রোদে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ বুজে এসেছিল।

যখন চোখ খুললাম, দেখি ছুটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা হালকা ছাই-রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে গায়ে শাদা কার্ডিগান। ডান হাতের হাতাটা একটু গুটিয়ে তোলা—কালো অ্যালিগেটরের একটা ঘড়ি। বাঁ হাতে একটি কাঁকন।

ছুটি ফুলে ফুলে হাসছিল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই হাসি থামিয়ে বলল, কি হেনস্থা—সরি, সরি, ভেরী সরি।

আমি বললাম, এর চেয়ে তরোয়াল হাতে একজন খোজা প্রহরী রাখলেই ত পার, এইই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় যে, কোনো পুরুষ তোমার অন্দরমহলে পা দিতে পারবে না, তবে সেটা আরো ভাল হত।

ছুটি আমাকে হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, চলুন চলুন উপরে চলুন। জানেন, আজ সকালে কলেজে যাওয়ার সময় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিরুনিটা হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে গেল মাটিতে। তখনই জানি আপনি আসবেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললাম, আমিই আসব কি করে জানলে। তোমার কাছে অন্য পুরুষও ত আসতে পারত।

উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে ছুটি চাইল আমার দিকে, বলল, আমার জীবনে এখন শুধু একজনই আছে, সে আমার পরম পুরুষ। ভবিষ্যতের কথা জানি না। আপনি ত জানেন, বর্তমান ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

সেই বন্ধ দরজা খুলে ছুটি আমাকে এরকম সসম্মানে নিয়ে আসছে দেখে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হলো না। বুঝলাম, তার কাজ বাড়ী রক্ষা করা—সে করেছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই বলল, পানি পিজিয়েগা?

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, নেহি।

ছুটি বলল হাসছেন কেন?

—বললাম, তোমার প্রহরীকে জিগ্গেস কর।

ওর কাছ থেকে জল চাওয়া এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কথা শুনে ছুটি আরেক চোট হাসলো। বলল, জানেন ত এ বাড়ির প্রায় সবটাই অফিস— কাজকর্ম, বাইরের লোক আসে যায়—তাই ও এরকম করে—ভালই করে। আমি একা থাকি, আর আমার পাশে একটি বিহারী পরিবার থাকে, ভদ্রলোকের একটা ছোটোখাটো ব্যবসা আছে দুমকাতে।

বাইরের ঘরটাতে বই ঠাসা। দুটি চেয়ার, একটি ছোট টেবিল, টেবল ক্লথ পাতা হালকা সবুজ রঙের। দেওয়ালে ছুটির মায়ের এবং জীবনানন্দ দাশের ফটো।

বললাম, এ ফটো তুমি কোথায় পেলে?

ও চোখ নাচিয়ে বলল, পেয়েছি।

জীবনানন্দ দাশের ভক্ত অনেকই দেখেছি, প্রায় সকলেই ওঁর ভক্ত, কিন্তু তোমার কাছেই ছবি দেখলাম।

—ছুটি বলল, কেন রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাড়া অন্য কারো ছবি কি টাঙানো যায় না?

—রবীন্দ্রনাথের উপর এত রাগ কেন?

—রাগ নয় শ্রদ্ধা করি। আমার ঠাকুমাকে যেমন করতাম। তাঁর সঙ্গে

সম্পর্কটা ভালোবাসার নয়। দুঃখের কথা এই যে, বাঙ্গালীদের কালচারটা রবীন্দ্রনাথে এসেই থেমে গেছে। তারপর যা তারা করেছে, বলেছে, লিখেছে সমস্তটুকু সম্বন্ধেই কিছুই নয় কিছুই নয় ভাব। আমি বলছি না এখন বাংলায় দারুণ কিছু লেখা হচ্ছে, কিন্তু এট লিস্‌ট, যা লেখা হচ্ছে তার সঙ্গে আজকের জীবনের যোগ আছে। আমি আজকের কথা জানি। আজকের ভালোবাসাকে দাম দিই। আপনি হয়ত এ কথা বললে দুঃখ পাবেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ফটো দেখি প্রতি বাড়িতে সানমাইকা-বসানো খাওয়ার টেবিলের মত একটা ফ্যাশানেবল্ আসবাব হয়ে গেছে। আপনি কি মনে করেন যাঁরাই গুরুদেবের ছবি টাঙিয়ে রাখেন, যাঁরাই দরজায় শান্তিনিকেতনী পর্দা ঝোলান তাঁরাই সংস্কৃত? তাঁরাই একমাত্র লোক যাঁরা কালচার গুলে খেয়েছেন?

—তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে পারব না।

—ছুটি হাসল, বলল, চেষ্টাও করবেন না। তারপরেই বলল, চা খাবেন?

—আমি বললাম, না। এত বেলায় চা খাব না।

ছুটি তার প্রহরীকে ছুটি দিয়ে দিল। বলল, বিকেলে এসো।

বৃন্ধা চলে গেলে ছুটি বলল, আমি এখন রক্ষীহীন। আমি এখন আপনার। এখন আপনাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

আমি হাসলাম। বললাম, চান করোনি?

—না। আমি ত জানি না আপনি আসবেন? হাত থেকে চিরুনি পড়ল বলেই ত আর আমি গণক নই যে ঐ সাতসকালে ঠাণ্ডায় চান করে ফেলব। এক্ষুনি চান করে নেব। পাঁচ মিনিট লাগবে। আপনি চান করবেন না?

—আমার এত বেলায় ঠাণ্ডা জলে চান করা ঠিক হবে না।

—ঠাণ্ডা জল কেন, এক্ষুনি গরম জল করে দিচ্ছি।

—না। কিছু করতে হবে না। তুমি আমার সামনে একটু চুপ করে বসোতো।

এই বসলাম। বলে ছুটি এসে আমার সামনের চেয়ারে বসলো।

ওর কপালে ছোট ছোট চুল লেপ্টে ছিল—দু'কানে দুটো কাল পাথরের দুল পরেছিল। ভারী সুন্দর দুল দুটি। চোখে হালকা করে কাজল লাগিয়েছিল। বড় করে লাল মাদ্রাসী সিঁদুরের টিপ পরেছিল। আমি অপলকে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

কী যে ভাল লাগে, কী যে ভাল লাগে কি বলব। ওর কাছে এলে, ওর সঙ্গে দেখা হলে, ওর মুখোমুখী বসলে ভালো লাগায় যেন আমি মরে যাই।

ছুটিও অনেকক্ষণ আমার মুখে তাকিয়ে থাকল। বলল, ভাবতেই পারছি না যে আপনি সত্যি সত্যি এসেছেন, আমার ঘরে বসে আছেন। কিন্তু একটু জানিয়ে আসবেন ত? কিছুই রান্না করিনি আজ, কি খাওয়াই বলুন ত আপনাকে?

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

ছুটি বলল, চুপ করে আছেন যে?

ভাবছি, জীবনানন্দ দাশের পরে কোন্ ছবি টাঙাবে দেওয়ালে তুমি।

বাবাঃ আপনি এখনও ভাবছেন এ নিয়ে? রবীন্দ্রনাথের ছবি না টাঙিয়ে কি এমনই অন্যায় করেছি?

—আমি হাসলাম, বললাম, না, তা নয়, তাই ভাবছি।

—ছুটি বলল, এক্ষুনি যদি জানতে চান ত বলতে পারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি, তার পরে তুষার রায়ের ছবি। আমি সমালোচক নই, পণ্ডিত নই, আমার পছন্দ অপছন্দ নেহাৎ একজন সিনসীয়র পাঠিকা হিসাবে।

আপনি হয়ত বলতে পারেন কাব্য-বিচারে এঁদের চেয়ে বড় কবি অনেকে আছেন, কিন্তু আমি ওঁদের লেখা ভালো-বাসি কেন জানেন? ভালোবাসি এই জন্যে যে ওঁরা ভণ্ড নন। দে আর অলওয়েজ ট্রু দেয়ার ফীলিংস। আমাদের পিতা-পিতামহদের জেনারেশানের পিচ্ছল ব্যাঙের গায়ের মত ঠাণ্ডা ভণ্ডামির পর এঁরা একটা উষ্ণ জৈবিক প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা। ওঁদের কাউকেই আমি চিনি না, ভবিষ্যতেও ওঁরা আমার এক্সপেকটেশান ফুলফিল করবেন কি না তাও জানি না, কিন্তু বর্তমানে করেছেন। ওঁদের লেখা পড়লে মনে হয় আমাদের জেনারেশানের কেউ লিখছেন। যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন, তাই নিখাদ অনুভূতিতে ব্যক্ত করেছেন। আমার নিজের মতে, দিস ইজ আ গ্রেট থিং।

তারপর একটু থেমে বলল, আপনার হিংসে হচ্ছে?

আমি হেসে বললাম, হিংসে হবে কেন? কোথায় সুকুমার বোস আর কোথায় ওঁরা। তবে তোমার কথা শুনে আশ্চর্য লাগছে আমার, কারণ আমারও তাই মত। আমারও ওঁদের দুজনের লেখা খুব ভাল লাগে এবং তুমি যে কারণ বলছ, সে কারণেই।

ছুটি বলল, আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় লেখা-টেখা সম্বন্ধে অস্কার ওয়াইল্ডের পিকচার অফ ডরিয়ান গ্রে'র ভূমিকায় উনি যা বলেছিলেন, তা আজও সত্য। আপনি বলবেন হয়ত, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কিন্তু আপনি জিগগেস করলেন, তাই আমার অল্প বিদ্যায় যা বুঝি, যা ভালো লাগে, তাই-ই বললাম। আমার মতামত ত ছাপা হয়ে কোথাও বেরুচ্ছে না।

তারপর ছুটি বলল, চলুন ভিতরের ঘরে যাই। আপনি হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমি চট করে চান করে নিচ্ছি।

ভিতরের ঘরটা ছুটির শোবার ঘর। একটা ছোট সেট। পরিষ্কার বেডকভার পাতা আছে টান টান করে। এ ঘরেও অনেক বই। এক কোনায় একটা আলনা।

ছুটি বলল, স্নান। তোয়ালে আছে, সাবান আছে, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। বেচারী! আমার জন্যে কত কষ্ট— দারোয়ানের চৌপাইতে ছারপোকা ছিলো না?

—আমি হাসলাম, বললাম, থাকলেও কামড়ায় নি।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখি ছুটি বাইরের শাড়ি ছেড়ে ফেলে একটা হলুদ আর লাল শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি পরে ফেলেছে। জেঠিমা-পিসীমারা যেমন করে শাড়ি পরতেন, তেমন করে। কি মিষ্টি যে দেখাচ্ছে ছুটিকে, কি বলব।

আমি অমন করে তাকিয়ে আছি দেখে ছুটি বলল, কি হল? চান করবে বলে শাড়ি ছাড়লাম।

আমি বললাম, এদিকে এসো ত।

ছুটির দু'চোখ ভাললাগায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, না। আসব না।

ওর গলায় খুশী ঝরে পড়ল।

আমি এগিয়ে গিয়ে ছুটিকে বুকের মধ্যে নিলাম, ছুটির নরম ভিজে মিষ্টি ঠোঁটের সমস্ত স্বাদ, স্বাদ ও উষ্ণতা আমার ঠোঁট দিয়ে শুষে নিলাম। ভালোলাগায় ছুটি আমার বুকের মধ্যে শিউরে উঠতে লাগল।

আমি বললাম, দেখি আমার দারুণ পায়রাগুলো দেখি।

ছুটি বলল, অসভ্য।

অসভ্য, বলেই ওর কাজলমাখা চোখ অনামা, অসভ্য আশ্লেষের নিমন্ত্রণ জানাল।

ওর জামার মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর রেশমী কোমল শাড়ির উলজড়ানো সুডৌল বুক আমার হাতের সমস্ত পাতা দিয়ে ধরলাম। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল ভাল-লাগায়।

ছুটি মুখ নামিয়ে ফেলল লজ্জায়।

আমি ছুটির কবুতরের লালচে ঠোঁটে আমার কালো ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

ছুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল, ভালোলাগায়, ভীষণ ভালোলাগায়, এই শীতের নিস্তব্ধ ছায়া-পড়া মধ্যাহ্নে ছুটির সমস্ত একাকীত্ব, সমস্ত শৈত্য আগুনের ফুলকির উষ্ণতার ফোয়ারার মত মনের মধ্যে উৎসারিত হল।

ছুটি অস্ফুটে বলতে লাগল, অসভ্য। অসভ্য! অসভ্য।

তারপর ছুটি হঠাৎ বলল, আর না। এখন আর না।

আমি দেখলাম উত্তেজনায় ছুটির হাঁটু কাঁপছে থর থর করে।

ছুটিকে নিয়ে এসে আমি ওর খাটে বসিয়ে দিয়ে ওর চোখের পাতায় চুমু খেলাম। পরক্ষণেই বললাম, যাও চান করে এসো তাড়াতাড়ি—আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।

ছুটি উঠল না।

অনেকক্ষণ আমার দিকে মাথা এলিয়ে ও বসে রইল।

ছুটি যখন চান করছিল, আমি ছুটির ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলাম। বই দেখ-ছিলাম নাড়ছিলাম, চাড়ছিলাম।

ছুটির ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের উপর একটা বই ছিল, কবিতার বই। কবিতা ঠিক নয়, ছড়ার বই। তুষার রায়ের লেখা—নাম, গাঁটছড়া।

বইটা হাতে তুলতেই, পেজ-মার্ক হিসেবে একটা ছোট চিঠি চোখে পড়ল।

যে লিখেছে, তার হাতের লেখাটা অশিক্ষিতের মত অনেক ইংরেজী শব্দ-ব্যবহার করা হয়েছে।

হিনু, রাঁচী

ছুটি,

দিদা তোমাকে এই ইনভিটেশন পাঠাতে বলল।

কামিং রবিবারে আমরা সকলে গৌতম-ধারায় পিকনিকে যাচ্ছি। পিংকু ও মিলিও যাচ্ছে।

আমাদের সকলেরই সিনসিয়ার ইচ্ছা যে তুমিও চল। আমাদের কোম্পানী যদি বোরিং না লাগে, তাহলে অবশ্যই এসো।

শনিবার বিকেলে তোমার ওখানে যাব। তখন ডিটেলস এ কথা হবে।

তোমাকে সেদিন বিকেলে দেখলাম, রিকসা করে আমাদের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলে। একটা পিংক শাড়ি পরে-ছিলে। তোমাকে খুব চার্মিং দেখাচ্ছিল। তুমি জানো না, তুমি কত গুড্‌লুকিং। কত লোককে মাডার কর!

বাই— সি ইউ সুন ইয়োরস রুদ্র

কেন আমার ও রকম মনে হল জানি না, আমার মনে ভীষণ ভয় হল। ঘরের কোণায় সাপ দেখলে লোকে যেমনি আতঙ্কে ওঠে, আমি তেমনি আতঙ্কে উঠলাম। সে সাপ দাঁড়াশ কি গোখরো তা আমার জানা নেই, কিন্তু এই চিঠির মধ্যে সাপের গায়ের গন্ধ পেলুম আমি। মনে হলো,

সাপটা আমার সব-হারানোর দিনে হঠাৎ-পাওয়া সুখের, বুকভরা উষ্ণতার একমাত্র পাখিটিকে গ্রাস করার জন্যে এই শীতের দিনে বিশ্রাম নিচ্ছে, যাতে শীত কাটলে, ফাগুন হাওয়া বইতে শুরু করলেই সে এই পাখির দিকে হাঁ বাড়াতে পারে।

বাথরুমের ছিটকিনি খোলার আওয়াজ হতেই আমি চোরের মত বইটি নামিয়ে রাখলাম। কেন আমার নিজেকে চোর-চোর লাগল জানি না। কিন্তু লাগল।

আমি ছুটিকে সহজে জিগগেস করতে পারতাম, ছেলেটি কে? কি কুধে? পিঙ্কু ও মিলি কারা?

কিন্তু আমার মনে হল সে সব নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে যাবে। আমার কোনো অধিকার নেই ছুটিকে তার বন্ধু-বান্ধবীদের প্রসঙ্গে কিছু শুধোবার।

ছুটি সহজ চোখ তুলে আমার দিকে চাইল।

ওর সমস্ত শরীর থেকে সাবানের গন্ধ বেরোচ্ছে। চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল লাগছে। সমস্ত মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

তাড়াতাড়ি চুল ঠিক করে ঠোঁটে গালে একটু ভেসলিন বুলিয়ে নিয়ে, আইব্রো-পেনসিল দিয়ে ভুরুটা ঠিক করে নিয়ে বলল, চলুন, খাবেন চলুন।

খাবার ও রান্নাঘরের বন্দোবস্ত করে নেওয়া হয়েছে পাশের বারান্দায়।

খুব আলো আছে বারান্দাতে।

তাড়াতাড়ি খাবার গরম করে নিয়ে টেবিলে রাখল। বলল, ছুটির হাতের রান্না ত আর কখনও খান নি। খেয়ে দেখুন। দেখছেন ত কত গুণ আমার।

ধনেপাতা-শর্ষে দিয়ে কই মাছের ঝোল রেঁধেছিল ছুটি, পালং শাকের তরকারী, হিং দিয়ে ছোলার ডাল এবং স্যালাড।

আচারের টিনটা বের করল। বলল, আপনার ওখান থেকে ফিরে এসেই শহর খুঁজে ঐ আচার কিনেছি।

আমি বললাম, ওকি? সবই ত আমাকে দিয়ে দিলে। তুমি কি খাবে?

ও—ও-ও। বলে চোখ বড় বড় করে ছুটি বকল আমাকে। বলল, যা বলছি লক্ষ্মী ছেলের মত শুনুন। শান ত আপনি। রোজ যেন আসছেন। আমার কত সৌভাগ্য আজকে।

—আমি হেসে ফেললাম, বললাম, থাক আর ঢং করতে হবে না।

ও অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, বলল কেন? একথা বলছেন কেন? আমার সৌভাগ্য নয় কি?

আমি বললাম, আমি হয়ত আসি না, আসি নি কখনোও — তোমার কত বন্ধু-বান্ধব, দাদারা আছেন তাঁরা ত রোজই আসেন। আমার অভাব বলে ত কিছু কখনও বোধ করো নি তুমি। কখনও কি করেছ? কিন্তু আমি করি, সব সময়ই করি, বিশ্বাস করো, সত্যিই করি।

নুনের পাত্রে ছোট চামচ দিয়ে হিজি-বিজি কাটতে কাটতে ছুটি আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনি ভীষণ বোকা। কিন্ডার-গার্টেনের ক্লাসের ছাত্রের চেয়েও বোকা।

বলল, আমার আছে অনেকে আসে, এখানে এসে অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, ছেলে-মেয়ে সকলের সঙ্গে। আপনাকে ত বলেছি, আমি বর্তমানে বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতে কখনো আপনাকে পাব কি পাব না এই ভেবে গোমড়া মুখে আমার বর্তমানটাকে আমি মাটি করতে চাই নি। আমি হেসেছি, আড্ডা মেরেছি, পিকনিক করেছি, তা বলে কি আপনি মনে করেন আপনি মুছে গেছেন আমার জীবন থেকে?

তারপর একটু থেমে বলল, সুকুদা, আপনি বড় ব্যারিষ্টার হতে পারেন, লেখক হতে পারেন, কিন্তু মেয়েদের মন এখনও আপনার বোঝা হয় নি।

আমি বললাম, এ জন্মে হবে বলেও আশা নেই।

একটু পরে ছুটি বলল, আমার কাছে অনেকে আসে, আমি অনেককে চিনি, তবে আপনার এটুকু জানা উচিত সুকুদা, যে তারা আপনার মত কেউই নয়। তারা আসে, বসবার ঘরে বসে, চা-সিগারেট খায়, চলে যায়। আপনিই একমাত্র লোক যে আমার শোবার ঘরে এলেন, আমার খাটে বসলেন।

তারপর একটু থেমে বলল, ঘরে ও খাটে বসা ছাড়াও আপনার অধিকার আরো অনেক বেশী তা আপনি জানেন। আপনি আর অন্যরা যে সমান নয় একথা আমার বলতে হচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে আমার। আপনি যেন কি রকম, অদ্ভুত।

আমি খেতে খেতে ছুটির টেবিলে-রাখা বাঁ হাতের উপর হাত রাখলাম। বললাম, খাও। তুমি খাচ্ছ না কেন?

হঠাৎ ছুটি খাওয়া থামিয়ে বলল, আচ্ছা সুকুদা, কোনদিন আমি যদি আপনার মত করেই অন্য কাউকে চাই, তাহলে আপনি কি রাগ করবেন?

আমি জবাব দিলাম না। বললাম—তোমার সব প্রশ্নের জবাব ত তুমিই দাও। এ প্রশ্নের জবাবটাও দাও।

ছুটি বলল, প্রশ্নটা বোধ হয় ঠিক হলো না। একথা বলা ঠিক নয় যে, আপনার মত করে কাউকে ভালোবাসতে পারব আমি। আসলে প্রত্যেকটা সম্পর্কই বিভিন্ন, তাদের প্রকৃতি, তাদের ডাইমেনশান সব বিভিন্ন। তাই এক সম্পর্কের সঙ্গে অন্য সম্পর্কের তুলনা বোধ হয় কখনো করা উচিত নয়। তাই না?

ঠিক তাই। আমি বললাম।

ছুটি বলল, থাক এসব কথা। আপনি আজ থাকছেন ত?

আমি বললাম, না পাগলি, আমায় খেয়ে উঠেই বাস ধরতে ছুটতে হবে। যদি থাকতাম, তবে তোমার কাছে আজ নিজে কিছু চাইতাম। কিন্তু বিশ্বাস করো এই চার দেওয়ালের মধ্যের আনন্দ আমার ভাল লাগে না।

ছুটি মুখ তুলে চাইল। বলল, ঠিক বলেছেন। আমার কিন্তু তাই মত ছিল ছোটবেলা থেকে। প্রত্যেক মেয়েরাই জীবনে মিলিত হয় কোনো না কোনো পুরুষের সঙ্গে—সারাজীবনে কত শত বার মিলিত হয়। —কিন্তু প্রথমবারের মিলনই একমাত্র মিলন যা চিরদিন মনে থাকে। জানেন, সুকুদা, আমার ভাবলে হাসি পায়। প্রত্যেক বিবাহিত মেয়েই ফুলশয্যার দিনে, অনেক রজনীগন্ধার গন্ধের মধ্যে নতুন বিছানার নতুন চাদরের ইরিটেটিং গন্ধের মধ্যে ডাঁই-করা উপহারের মধ্যে জীবনে প্রথমবার মিলিত হয়। যেমন, বয়স হলে বিয়ে করতে হয়, যেমন বিয়ে করলে লালচেলি পরতে হয়, অভ্যাগতদের রাধাবল্লভী, ফ্রায়েড রাইস ও ফিস ফ্রাই খাওয়াতে হয়, তেমন ঐ নতুন বিছানায় শুয়ে, আনকোরা কোনো বরের কাছে কুমারীত্বও খোয়াতে হয়।

শীতকাল হলে শার্টিনের ওয়াড়-দেওয়া লেপ গায়ে দিয়ে শুতে হয়, দরজা জানালা খোঁচ-খাঁচ সব সন্তর্পণে বন্ধ করে। গরম-কাল হলে, বাঁই-বাঁই করে পাখা ঘোরাতে হয়। বুঝলেন, আমার ভাবলেই খারাপ লাগে। বিচ্ছিরী ব্যাপার। তারপরই বলল, আপনি যা বললেন, সত্যি? তা সত্যি ত?

—বললাম, সত্যি। তুমি দেখো, সত্যি কিনা। কোনো ঘরের মধ্যে নয়, সূর্যকে সাক্ষী রেখে, আকাশ, বাতাস, ফুল পাখি সবাইকে সাক্ষী রেখে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। যেদিন হব তুমি যতদিন বাঁচবে যতদিন ভাবতে পারবে, ততদিন সেই মুহূর্তে, সেই দিনটির স্মৃতি, তোমার মনে তোমার শরীরে লেখা থাকবে। তুমি দেখো, লেখা থাকবেই।

ছুটি শিউরে উঠল উত্তেজনায়। হেসে ফেলল, বলল, খেতে পারছি না আমি, এমন একসাইটেড হয়ে গেছি। আপনি এমন করে বলেন না, যেন নর্ম্যান্ডী অভিযানে যাচ্ছেন। তারপর একটু থেমেই বলল, বোকা। এসব কথা মুখে বলতে নেই। যা করবেন, তা করে দেখাবেন। মুখে এসব একেবারেই বলতে নেই। বলা মানা। বলে ওর বাঁ হাতের পাতা আমার ঠোঁটের সামনে ধরল। একটা নরম গোলাপি 'ব্লণ্ড' আমার চোখ ধেঁধে গেল। (ক্রমশঃ)

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সামাজিক প্রক্রিয়া * বিখ্যাত মানুষের জয়গান এখন থেকে বন্ধ হোক * নির্যাতন-বিজ্ঞান * বিজ্ঞান মেলা

বিজ্ঞানীমণ্ডলকেও কতকগুলো সামাজিক প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়—প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা, বৈষম্য ও অন্তর্ভুক্তি। প্রত্যেক পৃথক বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীর গোষ্ঠীর পারস্পরিক ক্রিয়াকে এমনি এক একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করা চলে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলেন, যা থেকে বোঝা যায় কোন প্রক্রিয়াটি তাঁরা অনুসরণ করছেন। এমনও হয়ে থাকে একটি গোষ্ঠীতে বা দেশে যে প্রক্রিয়াটি প্রধান, অন্যত্র তা হয়তো চোখে না পড়ার মতো।

বৈষম্যের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভূরি ভূরি। বৈষম্যের ভিত্তি বদলায় কিন্তু তার ফল সবরই সমান। বৈষম্যের কবলে পড়লে অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকেই বঞ্চিত হতে হয়। নাৎসী জার্মানীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কুৎসিত রকমের বৈষম্য ছিল। হালে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশেও অভিযোগ উঠছে যে বিজ্ঞানী হিসেবে শিক্ষা পাবার ক্ষেত্রে মেয়েদের বৈষম্য ভোগ করতে হয়। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানী হবার পরে কর্মক্ষেত্রেও মেয়েদের সামনে সেই একই বৈষম্য। অবশ্য প্রতিযোগিতা যদি হয় সাধারণ একজন পুরুষ ও অসাধারণ একজন মহিলার মধ্যে তাহলে সাধারণত মহিলাই জয়ী হন। কিন্তু প্রতিযোগিতা সমানে সমানে হলে ক্বচিৎ মহিলার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। কারণ মহিলাদের নিয়ে নাকি নানান ঝামেলা—তাঁরা বিয়ে করে বসেন, তাঁরা অন্তঃসত্ত্বা হন, ইত্যাদি।

নৈতিক বা দার্শনিক বিবেচনা এখানে গুরুত্বহীন। দেখতে হবে বিজ্ঞানের পক্ষে কোনটি সবচেয়ে শ্রেয়। পুরুষই হোন মহিলাই হোন, বড়ো একটি প্রতিভাকে যদি গবেষণা থেকে দূরে রাখা হয় তাহলে সেটা বিজ্ঞানেরই ক্ষতি। দক্ষ ও সমর্থ মহিলারা যদি গবেষণায় নিযুক্ত হতে না পারেন তাহলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধা পায়।

বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি কদাচিৎ আলোচিত, অথচ বিষয়টির গুরুত্ব কম নয়। যখনই কোনো অধ্যাপক টের পেয়ে যান যে তাঁর এক তরুণ ছাত্র কিছু একটা আবিষ্কার করতে চলেছে, অমনি তিনি তরুণ ছাত্রটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। অর্থাৎ তরুণ ছাত্রটি হয়ে ওঠে তাঁর সহকারী।

কোনো কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ করলে দেখা যাবে, এই অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি গোটা প্রতিষ্ঠানকে প্রায় গ্রাস করে বসে আছে। প্রতিষ্ঠানের যাঁরা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী তাঁরা তরুণ বিজ্ঞানীদের সহকারী করে নেন বা অন্তর্ভুক্ত করেন। এ-কারণে নয় যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসে তরুণ বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন। এ-কারণে যে গবেষণার নিবন্ধ প্রকাশ বজায় রাখার জন্যেই তরুণ বিজ্ঞানীরা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। (প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী তরুণ বিজ্ঞানীর গবেষণা আত্মসাৎ করে নিজের নামে প্রকাশ করার পরে তরুণ বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করেছেন, এমন ঘটনা এই কলকাতাতেই ঘটেছে, আর মোহভঙ্গ তরুণ বিজ্ঞানীর হতাশ হয়ে দেশত্যাগের ঘটনা তো প্রচুর।) সাধারণত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের হাতে থাকে গবেষণা ও শিক্ষণের কলকাঠি অর্থ-ভাণ্ডারের চাবিকাঠিও। ফলে অনন্যোপায় তরুণ বিজ্ঞানীকে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীর কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হয়।

তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে যদি নজর রাখতে হয় তাহলে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার স্থান আরো বড়ো। প্রতিযোগিতা বলতে কখনো কখনো এমনি একটি ছবি ভেসে ওঠে ঃ বিজ্ঞানী যেন ভাঁওতা দিয়ে কিছু একটা অর্জন করছেন, নিজের গবেষণার খবর যাতে কাকপক্ষীও টের না পায় সেজন্যে অনবরত মিথ্যে বলে চলেছেন, অপরের গবেষণার খবর জানবার জন্যে গোয়েন্দাগিরি করছেন, ইত্যাদি। আসলে প্রতিযোগিতাকে দেখতে হবে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যার ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শ্রেষ্ঠ প্রয়াস মুক্তি পায়। অবশ্য প্রতিযোগিতার নানা দিক আছে, খারাপ দিকও,

কোনো পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তারপরেও সেই প্রচণ্ড প্রক্রিয়াগুলোকে বশে আনা যাবে না, ফলে মানুষের কল্যাণে প্রযুক্ত হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

ব্রিটেনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এমন একজন বিজ্ঞানী ব্রিটেন ছেড়ে চলে গিয়েছেন—এতে বিচলিত হবার কোনো কারণ ঘটেনি। কয়েক দশক আগে থেকেই বহু গবেষক কর্মী ব্যক্তিপূজা বর্জন করেছেন, এখন তাঁদের সাধারণ পরিচয় [illegible]। ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল রাদারফোর্ড থেকে। কিন্তু ব্যক্তিপূজার অভ্যাসটি সমানে বজায় রেখেছে সংবাদপত্র, জনসাধারণ ও এস্টাব্লিশমেন্ট। বাছাই বাছাই মানুষের মূর্তি উঁচু বেদীর ওপরে খাড়া করে মহা সমারোহে ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল বিজ্ঞানীরা ক্রমেই এসে দাঁড়াচ্ছেন সমতার ভিত্তিভূমিতে।

এক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থীর বিষয়, [illegible] ও [illegible] ব্যক্তিদের [illegible] প্রবীণ [illegible] প্রতি [illegible] মনোযোগ [illegible] আলোচনা [illegible] তাদের পৌরুষের অন্য কোনো [illegible] অভিব্যক্তি খুঁজে না পেয়ে [illegible] আশ্রয় করে থাকেন। [illegible] ভুলে যান যে তাঁদের বিরাট পৌরুষের এমন একটা সবল দিক আছে যে বহু দক্ষ ও [illegible] ব্যক্তিকে তাঁরা পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেন। এই লক্ষণ [illegible] অপরিপক্বতার—কেউ চান আধিপত্য করতে, কেউ চান অধীন হতে। তবে এটা যে [illegible] আধুনিক লক্ষণ নয়, বহুকাল ধরেই চলছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এই [illegible] ও [illegible] সম্পর্কটা [illegible] সৃষ্টি করে। এখন আর এটাকে চলতে দেওয়া কেন? কেননা

যার দরুন অনেক সময়ে প্রতিযোগিতার আগে 'গলাকাটা' বিশেষণটি বসানো হয়। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে গলাকাটা প্রতিযোগিতার নজির কম, এমন যদি হয় যে কুবেরের ধনদৌলত বিজয়ীর হাতে এসে যাচ্ছে তাহলে তার সম্ভাবনা থাকতে পারে। নইলে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষ বিরল একটি পুরস্কারের জন্যে প্রয়াসী।

আর এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে সহযোগিতাও সম্পর্কিত। একজন একক বিজ্ঞানী বা একটি গোষ্ঠী একই সঙ্গে হতে পারেন যেমন প্রতিযোগী তেমনি সহযোগী। দলবদ্ধভাবে কাজ করতে হলে সহযোগিতা অবশ্যই চাই। একালের জাতীয় গবেষণাগারগুলি সহযোগিতারই নিদর্শন। বৈজ্ঞানিক সেমিনার এখন আর বিরল ঘটনা নয়। এখানে বিজ্ঞানীরা আসেন তাঁদের সর্বশেষ ধ্যানধারণা ব্যক্ত করতে এবং অন্যদের ধ্যানধারণা গড়ে তোলায় সাহায্য করতে। যৌথ গবেষণা-নিবন্ধ রচনার দৃষ্টান্তও ক্রমেই বাড়ছে। এই হচ্ছে সহযোগিতার বড়ো দৃষ্টান্ত। সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে প্রকাশ করার মনোভাবও থাকে, তারই দরুন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত উদ্যম। সহযোগিতামূলক প্রতিযোগিতার পথেই একালের বিজ্ঞানগবেষণা অগ্রসর হচ্ছে। (এই লেখার বক্তব্য নেওয়া হয়েছে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখের নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ জেরি গাস্টন-এর 'সোশ্যাল প্রসেসেস ইন সায়েন্স' প্রবন্ধ থেকে, ছবি সহ)

বিখ্যাত মানুষের গুণগান এখন থেকে বন্ধ হোক

একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকা এই শিরোনামায় কিছু মন্তব্য করেছেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে, তাই মন্তব্যটি পাঠকদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

ঘটনাটি এই : স্বনামখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার ফ্রেড হয়েল কেমব্রিজের তাঁর নিজস্ব 'ইনস্টিটিউট অফ থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি' ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

মন্তব্যে বলা হয়েছে, কেমব্রিজের আভ্যন্তরিক রাজনীতির কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তার মধ্যে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা সেটা খুব জরুরি ব্যাপার নয়। সত্যি কথা বলতে কি, খোদ জ্যোতির্বিজ্ঞানই বা কি এমন জরুরি ব্যাপার—যদিও অনেকের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক। আজকাল আর সমুদ্রে পাড়ি দিতে হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয় না। এই বিশ্বের অধিকতর বিদঘুটে যে-সব বস্তু আছে সেগুলো ব্যাখ্যার জন্যে সম্ভবত নতুন

নির্মম ঘটনা হচ্ছে এই যে প্রভু যদি চলে যান তাহলে তাঁর 'প্রতিষ্ঠানের' আশ্রিতরা বিপদে পড়েন। গবেষণার জগতটি এখন যেভাবে গঠিত সেখানে কোনো সচেতন নেতারই চাওয়া উচিত নয় যে তিনি হবেন 'স্ব-সম্পূর্ণ গোটা একটি বিশ্ব'। তোমাদের জন্যেই হোক বা জ্ঞানের জগতে অনুসন্ধিৎসা থেকেই হোক বা প্রকৃত শ্রদ্ধা থেকেই হোক—এই নেতার কিছু অনুগত থাকেই, যাঁরা তাঁর ওপরে নির্ভরশীল। তিনি যদি চলে যান তাহলে এই অনুগতদের সবকিছুই বিপন্ন হয়ে পড়ে—কি জীবিকা, কি বৈজ্ঞানিক আগ্রহ, কি গবেষণার অর্থ, কি পারিবারিক ব্যবস্থা।

কাজেই অ্যাকাডেমিক জগতের ডাইনোসররা যখন হানাহানিতে প্রবৃত্ত হন—তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় দুঃখের। তা শুধু এই কারণে নয় যে এই ধী-সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজেদের বিরোধ আপোসে মিটিয়ে নিতে অসমর্থ, এই কারণেও যে তাঁদের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা একদল সৎ ও পরিশ্রমী কর্মীর জীবনে কী অভিশাপ আনছে তা ধারণা করতে তাঁরা অক্ষম।

আর গোটা ব্যাপারটার উদ্ভব যেখানে, এই অত্যুচ্চ মর্যাদা, তা গড়ে তুলেছি আমরাই। সংবাদপত্র চায় বিজ্ঞানের কোনো সংবাদ বিক্রি করতে, এই ব্যবসায়ে তার চাই উঁচুদরের একটা নাম। গবেষক ছাত্র হয়তো নক্ষত্রের দীপ্তিতেই মুগ্ধ কিংবা সেও হয়তো দ্রুততম একটি যানে অর্থ ও যশের দিকে ধাবমান। যাঁদের হাতে টাকার থলে তাঁদের বিগলিত করার জন্যে চাই বড়ো বড়ো নাম। আর এই বাজারে পরস্পরের পিঠ চুলকিয়ে পরস্পরের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাটিও খুবই পাকা। এ-অবস্থায় শুধু বলা যেতে পারে, এমন কিছু হোক যাতে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে আসে।

নির্যাতন বিজ্ঞান

আন্তর্জাতিক অ্যামনেস্টি বা রাজনৈতিক ক্ষমাপ্রদর্শন নামে লণ্ডনের একটি সংস্থা গত এক বছর ধরে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচাররত রয়েছেন। তাঁরা বলছেন, স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য বা বিরোধী মতকে নির্মূল করার জন্য বা প্রতিবাদী ব্যক্তিকে অকর্মণ্য করার জন্য ক্ষমতাসীনরা বন্দীদের ওপরে নির্যাতন চালিয়ে থাকে। সেটা চালানো হয় এমন সব পরিশীলিত সাজ-সরঞ্জাম ও পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ও এমন মারাত্মক নৈপুণ্যের সঙ্গে যে, মধ্যযুগীয় দৈহিক নিপীড়ন তার কাছে ছেলেখেলার সামিল। বস্তুত বন্দীদের ওপরে নির্যাতন চালানোর ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে রীতিমতো একটা বিজ্ঞান, যাকে বলা চলে নির্যাতন-বিজ্ঞান। তার জন্যে স্কুল আছে, গবেষণা-কেন্দ্র আছে, আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা আছে। এই বিজ্ঞানটি এখন দুনিয়ার প্রায় সকল গভর্নমেন্টের হাতেই মস্ত হাতিয়ার—বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে বিচার বিবেচনা বা বিশ্লেষণের বদলে এই হাতিয়ারটির চালাও ব্যবহার চলছে। এটি এমনই এক হাতিয়ার যা ব্যবহারে ভোঁতা হয় না, বরং তার ধার বাড়ে, একখানা থেকে দশখানা হয়। শুধু হিটলারের জার্মানিতে নয়, শুধু মার্কিনী দখলের ভিয়েতনামে নয়, একালে যেসব দেশ গণতান্ত্রিক বলে পরিচিত সেখানেও ক্ষমতাবানদের ক্ষমতায় টিঁকে থাকার জন্যে বড়ো রকমের নির্ভর এই হাতিয়ারটি।

১৯৭২ সালে সংস্থার হাতে এসেছে ১৮টি বিভিন্ন দেশে বন্দী-নির্যাতনের বিবরণ। এটা যে কতখানি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, দুটি দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যায়। এক, পাকিস্থানের ইয়াহিয়া গভর্নমেন্ট। নির্যাতন চালাবার জন্যে সম্পূর্ণ একসেট সাজসরঞ্জামের অর্ডার তারা দিতে পেরেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। দুই, বেলজিয়ামের ছটি কম্যাণ্ডো। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের 'ন্যাটো' মহড়ার সময়ে সৈনাদের ওপরে প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হয়েছিল। এই সৈনারা ছিল সকলেই ভলান্টিয়ার এবং নির্যাতন চালানো হয়েছিল ট্রেনিং-এর জন্য।

ব্রেজিলে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপরে নির্যাতন চালানো হয় ব্যাপক ও সংগঠিতভাবে। ওদেশে বিক্ষোভকে দমন করার এটাই পদ্ধতি। রাজনৈতিক বন্দীদের আদালতে উপস্থিত করাতে হলে স্বীকারোক্তি চাই, ফলে স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক বন্দীরই নির্যাতন থেকে রেহাই নেই। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ব্রেজিলের কয়েদখানায় ১০৮১জন নির্যাতিত বন্দীর এক তালিকা প্রকাশ করেছেন, সেইসঙ্গে কিভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে তারও বিস্তৃত বিবরণ: পড়লে শিউরে উঠতে হয়। যেমন, একটি নির্যাতনের নাম টিয়ার দাঁড়। বন্দীর গোড়ালি ও কব্জি একসঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়, তারপরে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় হাঁটুর নিচে দিয়ে লোহার রড চালিয়ে, শরীর উলঙ্গ, এই অবস্থায় চলতে থাকে ইলেকট্রিক শক ও অন্যান্য নির্যাতন। ডাক্তারও উপস্থিত থাকে, বন্দীর পরিচর্যার জন্য নয়, বন্দীকে প্রাণে না মেরে আরো নির্যাতন চালানো যায় কিনা তা স্থির করার জন্যে কিংবা বন্দী অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে। নির্যাতন চলবার সময়ে বন্দী যাতে অজ্ঞান না হয়ে পড়ে সেজন্যে ওষুধ দেবার ব্যবস্থাও আছে।

এবং নির্যাতনের পদ্ধতি ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠছে। ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে 'মৃত্যু না ঘটিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্বোচ্চ কি-পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে পারে' তা নির্ধারণ করার জন্যে। তাছাড়া, শারীরিক নির্যাতনের একটা সীমা আছে, তাই মানসিক নির্যাতন চালাবার ব্যবস্থাও পাকা। ব্যবস্থাপত্রটি এই রকম: জেট ইঞ্জিনের শব্দের মতো অসহ্য গোলমাল, আর্ত চিৎকার, কানে-তালা-লাগানো স্নায়ু-চমকানো সঙ্গীত, চোখ-ঝলসানো আলো—তারই সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা, শীত ও ক্ষুধা। বন্দীকে প্রলাপ বকাবার জন্যে এমনি আরো ব্যবস্থাপত্র বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে তৈরি হচ্ছে।

নির্যাতনের কথা শুনলে অনেকেই বলে থাকেন যে ব্যাপারটা দুঃখের কিন্তু

রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ব্রিটিশ শাখার কর্তা ভিক্টর জোকেল বলছেন, 'নির্যাতনের পক্ষে সাফাই পাওয়া খুবই সহজ, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে একবার যদি আমরা সম্মতি দিই যে দুর্বৃত্তকে নির্যাতন করা হোক, তাহলে এই সম্মতিও দিয়ে বসতে পারি যে কোনো একজন লোক দুর্বৃত্ত কিনা বা কোনো দুর্বৃত্ত সম্পর্কে সে কিছু জানে কিনা তা জানবার জন্যেও তার ওপরে নির্যাতন চলুক। একটি থেকে অপরটি খুব দূরে নয়।'

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাই আবেদন জানিয়েছেন, প্রত্যেক গভর্নমেন্টকে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক মানুষকে শত্রু হয়ে দাঁড়াতে হবে সকল প্রকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে নির্যাতন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। বন্দীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার বন্ধ হোক।

ভিয়েতনামে মার্কিনীরা যে বর্বরতম নির্যাতন চালিয়েছিল (অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে, কখনো কখনো নিছক জল্লাদী উল্লাসে) তা নিপুণভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অত্যাধুনিকতম আবিষ্কারের ভিত্তিতে। নির্যাতনের জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির এমন ব্যাপক ব্যবহার আগে কখনো শোনা যায়নি। ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে মার্কিনী সমরকর্তাদের হাতে এসে গিয়েছে অতিমাত্রায় সফিস্টিকেটেড বিপুল নির্যাতন-যন্ত্র। এবং দেখা যাচ্ছে সেগুলো কেনার জন্যে আহ্বান দেওয়াও চলেছে। নির্যাতন-বিজ্ঞান একটা দানবের মতো দুনিয়াকে গ্রাস করতে চাইছে, বিজ্ঞানের কল্যাণকর ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই এই দানবকে অবিলম্বে হত্যা করা দরকার।

ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান মেলা, ১৯৭৩

গড়ুসদহ রোডে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান মেলা। মেলায় ছিল প্রায় আড়াইশো দ্রষ্টব্য বিষয়। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা—অধিকাংশই দশ থেকে ষোল বছরের—বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা ও নির্মাণ-কৃতির যেসব নিদর্শন এই মেলায় উপস্থিত করেছে তা দু-চোখ ভরে দেখতে হয়, দেখে বাংলার এই ছেলেমেয়েদের জন্যে গর্ববোধ করতে হয়। বড়ো হবার পরে এদের মধ্যে কতজন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারবে বা তার সুযোগ পাবে বলা শক্ত, কিন্তু আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যে অভাব নেই—এই মেলায় একবারটি ঘুরে এলেই তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বলেছেন, 'ভারতে বিজ্ঞানের শিক্ষা যাতে হ্রাস না পায় তা আমাদের দেখা উচিত।' অবশ্যই উচিত, কিন্তু এই মেলা যাঁরা দেখবেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও আশা করবেন যে বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ যারা পাচ্ছে তারা যেন বড়ো হয়েও বিজ্ঞান-চর্চার সুযোগ পায়। বিজ্ঞান মেলায় যেসব ছেলেমেয়ে হাতের তৈরী জিনিস নিয়ে এসেছে, সুযোগ পেলে তারা অনেকেই বড়ো বিজ্ঞানী হবে একথা জোরগলায় বলা চলে।

মেলায় ঢুকতেই বাঁকুড়ার একটি ছাত্রের তৈরী ওজন-যন্ত্র রীতিমতো অবাক করে। একটি টিপয়ের ওপরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সরু একটি কাঁচের নলে জলের স্তর উঠতে থাকে, যতো বেশি ওজন ততো উঁচুতে। হাইড্রোস্ট্যাটিকস-এর নীতির ভিত্তিতে তৈরী ওজনযন্ত্রটিতে প্রায় ৯০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত নির্ভুলভাবে ওজন করা চলে।

অল্প আয়োজনে ভারী জিনিসের ওজন নেবার খুব সহজ একটি ব্যবস্থা দেখান কলকাতার একজন ছাত্র। একটি ফুটস্কেলের একপ্রান্ত থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০০ গ্রাম ওজন, অপরপ্রান্তে সেই বস্তুটি যার ওজন নেওয়া হবে আর আছে স্কেলটিকে ভূমির সমান্তরাল করার জন্যে দাগে দাগে নড়াবার ব্যবস্থা আর কোন দাগে কত ওজন তার একটি ছক। ব্যবস্থাটি অভিনব বা মৌলিকও নয়, কিন্তু পরিষ্কারভাবে হাতে কলমে করে দেখানোর মধ্যে যে কারিগরি কৃতিত্ব আছে তার প্রশংসা করতেই হয়।

পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ পার্বতীসুন্দরী হাই স্কুল থেকে এসেছে সম্পূর্ণভাবে বাঁশ ও নারকেল-দড়ির তৈরী একটি সাইকেল, অভিনবত্বের জন্যে যেটা সহজেই চোখে পড়ে। প্রমাণ সাইজের পুরোদস্তুর সাইকেল এটি, যেটি চালালে চলে।

বর্ধমান থেকে এসেছে ইন্টারকম সেট, ফ্লাড্ অ্যালার্ম ইত্যাদি। মেদিনীপুর থেকে চিকেন ইনকিউবেটর। কন্টাই থেকে জল-ঘড়ি, সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরির কারখানার মডেল ইত্যাদি। পুরুলিয়া থেকে অটোমেটিক স্ক্রীন। এমনি নানা জিনিস হাওড়া ও হুগলি থেকে, ২৪-পরগণা থেকে।

কলকাতার ছেলেমেয়েরা দেখিয়েছে ম্যাজিক পেন, মনো-রেল, মাইক্রো প্রোজেক্টর, ইলেকট্রনিক ট্র্যাপ, ইলেকট্রনিক ডিটেক্টর, ভয়েস-অপারেটেড ট্রেন ও এমনি অনেক কিছু। কৃষি ও জীববিদ্যার বিষয়েরও অভাব নেই।

সবচেয়ে ভালো লাগে—অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা যখন বয়স্ক বিজ্ঞানীর মতোই আস্থার সঙ্গে নিজেদের তৈরী যন্ত্রপাতি ও মডেল ব্যাখ্যা করতে শুরু করে তখনকার সেই উদ্দীপ্ত উদ্ভাসিত মুখগুলো।

বিজ্ঞান মেলায় চারদিন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থাও ছিল। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রীরতনলাল ব্রহ্মচারীর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আফ্রিকায় বনজীবন'। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এই বক্তৃতাটি অবশ্য শুনবেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিপুল অনুসন্ধান না থাকলে বক্তৃতা এমন সাবলীল ও মনোগ্রাহী হতে পারে না।

—অয়স্কান্ত

সম্প্রতি সুরাপানের মাত্রা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতার শহরে যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা পার্ক স্ট্রীটের বারগুলি রাত্রের দিকে একটু ভাল-ভাবে নজর দিলেই বোঝা যায়। শনি-রবি বা বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে এই ধরনের রেস্তোরা বা হোটেলে নাকি তিল ধারনের ঠাঁই থাকে না। অনেক সময় আগে থেকে সিট রিজার্ভ করে না রাখলে কয়েক গ্লাস এই মাদক পানীয় গলাধঃকরণ করার কোন উপায় নেই। এ শুধু ছাড়পত্র পাওয়া বারগুলি বা হোটেলেই নয়, শুনেছি অনেক সাধারণ রেস্তোরাতেও মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে। লোকেরা ইচ্ছে করলে ওয়াইন শপ থেকে বোতল সমেত মদ্য কিনে নিয়ে গিয়ে খাবার সঙ্গে সেখানে বসে অনায়াসে খেতে পারে। এছাড়া শহরের মধ্যে এখানে-ওখানে পান-সিগারেটের দোকানেও নাকি কালী মার্কা দেশজ খাঁটি সুরা সোডা-লেমনেডের সঙ্গে দোকানদাররা বিশেষ গ্লাসে জানাশোনা লোকদের নির্বিবাদেই সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া এও শুনেছি এইসব জায়গায় পাড়ার ছেলে-ছোকরারাও নাকি নিয়মিত দু-এক গ্লাস পানীয়ের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ ছাড়েন না।

সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও, আজকাল বালীগঞ্জ, নিউ আলিপুর প্রভৃতি অভিজাত অঞ্চলের বহু উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী পরিবারের মধ্যেও এই ড্রিঙ্ক করা একটা বিলেতী ফ্যাশনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়িতেই তাঁদের নানা জাতীয় মদ্য রাখার ব্যবস্থা থাকে এবং বন্ধুবান্ধব গেলে চা-কফির পরিবর্তে কারণ পান করিয়ে তাঁদের আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা হয়। পূর্বে যেটা সমাজের ভয়ে গর্হিত বলে প্রকাশ্যে ব্যবহৃত হত না, কিছুটা লুকোচুরির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এখন তা খোলাখুলিভাবেই প্রচলিত হয়েছে। এমন কি আজ অনেক উচ্চপদস্থ বাঙালী স্ত্রী-কন্যা সমভি-ব্যাহারে এবং অনেক গোঁড়া ভিন্ন প্রদেশ-বাসী ব্যবসায়ীও হোটেলে গিয়ে এই 'অমৃতে মদিরা' (অমৃতলাল বসুর গ্রন্থের নামানু-সারে) পান করে নিজেরা গর্ব বোধ করে থাকেন, আভিজাত্য প্রকাশ করেন।

ইংরেজ আমলের সময় থেকেই এদেশে হুইস্কি, ব্রান্ডী, বীয়ার, শ্যাম্পেন প্রভৃতির প্রচলন এদেশের বড়মানুষদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। অনেকে এই মদ্যপানকে বড়-মানুষীর একটা বিশেষ অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করতেন এবং অতি-গোঁড়াদের কথা কানে নিতেন না, সমাজের নীতি বা আদর্শকেও অগ্রাহ্য করতেন। তবে কেউ কেউ আবার যথাসম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকতেন, উচ্চনিনাদে মদ্যপানের কথা প্রকাশ হতে দিতেন না সাধারণ্যে। তাহলেও তৎকালীন কবিদের অনেকের রচনা থেকেই মদ্যপানের বিষয় অনেক জানা যায়। রঙ্গ-মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার প্রভৃতিদের মধ্যেও মদ্যপানে বিশেষ আসক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রচুর দেখা যেত। 'অমৃতে মদিরা' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই বিনির বাড়িতে (অর্থাৎ নটী বিনোদিনী) অমৃত-লাল বসু কবিতার মাধ্যমে বিয়ার খেতে যাবার যে কথা বিবৃত করেছেন তা নিশ্চয় অবগত আছেন।

এ সম্বন্ধে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বেশ কয়েকটি কবিতা আছে। তিনি নিজে এই মদিরার দারুণ অনুরাগী ছিলেন বলেই সম্ভবত ব্যাপারটিকে দারুণভাবে সমর্থন করে গিয়েছেন তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের 'মদাম' নামক কবিতায়। ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'হাসির গান' গ্রন্থের পাঁচটি এয়ার নামক কবিতাটিতেও এই রসের প্রাচুর্য অনুভূত হয়। মদাম কবিতায় একস্থানে তিনি লেখেন—

'বলবে তুমি মদ্য খেলে লোকে বড় নিন্দা করে।
সে তো মানুষ চিরকালটা করেই আসছে পরস্পরে'—

তিনি বিশ্বাস করতেন মদ খাওয়া খারাপ নয়, তবে মাতাল হওয়াই খারাপ। তাই তিনি লিখেছেন —

'তবে যদি মাত্রা চড়ে? সেটা বটে গুরুতর
তবে কিনা চড়ে না সে—ইচ্ছা যদি নাহি করো।

সুরা যদি চালায় তোমায়—তা'লে সুরা মহা অরি,
সুরায় যদি চালাও তুমি—তা'লে সুরা শুভঙ্করী।'

এই মদাম কবিতার মধ্যে তিনি আরও বলেছেন—

'হৃদিরূপ এই বাকস খুলতে সুরাই একটি চাবি
বোতল খুললে খুলবে হৃদয় তা অবশ্য-ম্ভাবী রে।'

'পাঁচটি এয়ার' কবিতার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

'আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার

কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস—
আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্রান্ডী মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন
মোদের রাণী,
আমরা করি না কাহারে ডর, আমরা করি
না কাহারো হানি,

●

মোদের দিওনাকো কেউ গালি,
মোদের করোনাকো কেউ মানা,
আমরা খাব না ক কারো চুরি করে দুগ্ধ,
ননী, ছানা,
শুধু লুটিব একটু মজা, শুধু করিব
একটু পেয়ার,
শুধু নাচিব একটু, গাহিব একটু—
আমরা পাঁচটি এয়ার।'

শরৎচন্দ্র বলতেন, 'আফিং খেলে তাঁর নেশা খুলত।' একথা দিলীপকুমার রায় তাঁর পিতার জীবন-চরিত 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। এবং প্রসঙ্গত একথাও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন পালিতের তর্ক খুলত নেশা করলে।

এই সুরাপান সম্পর্কে আরও বহু খ্যাতনামা কবির উপভোগ্য কবিতা আছে এবং মানুষের জীবনে কেবলমাত্র আজকের দিনেই নয়, অতীতেও বহু সাহিত্যিক, শিল্পী সুরাপানকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন প্রেরণার উৎস বা আনন্দ উপভোগের মাধ্যম হিসাবে। কিন্তু তা হলেও সমাজ ও শাস্ত্র সুরাপানকে মোটেই আমল দেয়নি এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছেন। তারই নিদর্শনস্বরূপ 'সনাতনী' পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ, ১৯১৭) থেকে একটি তথ্যসমৃদ্ধ রচনার অংশ বিশেষ এখানে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করলাম।

সুরাপান

'হিন্দুর পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ। পান করা দূরে থাকুক, মদ্য স্পর্শ করাও তাঁহার পক্ষে পাপ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মদ্যমপেয় মস্পশ্য মদেয় মগ্রাহ্যম।
(উপনিষদ)

অর্থাৎ মদ্য পান করিবে না, স্পর্শ করিবে না, কাহাকেও দিবে না, এবং কেহ দিলেও তাহা গ্রহণ করিবে না।

পঞ্চমহাপাতকের মধ্যে সুরা পান পরিগণিত। যথা—ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বাঙ্গনাগমঃ অসাধুজনসংসর্গশ্চেতি পঞ্চ-মহাপাতকানি।

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা, সুরা পান, চৌর্য, গুর্বাঙ্গনাগমন ও অসাধু লোকের সহিত সংসর্গ—এই পাঁচটি মহাপাতক।

মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

ব্রহ্মহত্যা সুরা পানং স্তেয়ং গুর্বাঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ
সহ।।
(১১শ অঃ ৫৫)

সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মনু এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং
সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বি-
ষাত্ততঃ।।

দ্বিজাতিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মোহবশতঃ সুরাপান করিলে, অগ্নি-বর্ণ (জ্বলন্ত) সুরা পান করিবে। তাহাতে স্বীয় শরীর বিদগ্ধ হইলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

অগ্নিবর্ণ বা জ্বলন্ত সুরাপান করিলে পাকস্থলী তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য মৃত্যুও ঘটে। সুতরাং মনুর উক্তির তাৎপর্য এই যে, যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য মোহবশতঃ কখনও সুরাপান করে, তাহা হইলে, সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাকে জ্বলন্ত সুরাপান করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

বৃহস্পতিও তাহাই বলিয়াছেন। যথা—

সুরা পানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং
বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া স নির্দগ্ধো মৃতঃ শুদ্ধি
মবাপ্নুয়াৎ।।

ইচ্ছাপূর্বক সুরাপান করিলে, জ্বলন্ত সুরা মুখমধ্যে ঢালিবে অর্থাৎ পান করিবে। সেই জ্বলন্ত সুরাপানে দগ্ধ হইয়া মৃত হইলে, সুরাপানরূপ মহাপাতক হইতে শুদ্ধিলাভ করিবে।

মনু আরও বলিয়াছেন যে, যদি এই-রূপ না করে, তাহা হইলে তদন্যথায় সে মরণ পর্যন্ত অগ্নিবর্ণ (জ্বলন্ত) গোমূত্র, বা জল বা দুগ্ধ, বা ঘৃত বা গোময়রস পান করিবে। কিম্বা, সুরাপানদোষ অপনোদনার্থ, লোমজবস্ত্র পরিধান, জটা-ধারণ ও সুরাপাত্র-রূপ চিহ্ন গ্রহণপূর্বক এক বৎসর পর্যন্ত রাত্রিতে একবার মাত্র কণা (খুদ) ও পিন্যাক (তিলের খইল) ভক্ষণ করিবে।

মনু সর্বশেষ (১১শ অঃ ৯৪-৯৮) বলিয়াছেন—

সুরা অন্নসকলের মল; মল পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিবে না।

গৌড়ী (গুড় হইতে উৎপন্ন), পৈষ্টী (পিষ্টক হইতে উৎপন্ন) ও মাধ্বী (মধু ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন)—এই তিন প্রকার সুরা। ইহার একটিও যেরূপ, সকলগুলিও সেইরূপ। অতএব দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণ কর্তৃক ইহা পানীয় নহে। যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ-দিগের খাদ্য মদ্য, মাংস, সুরা ও আসব (সদ্যোজাত মদ্য), এই সকল দেবহবির্ভোজী ব্রাহ্মণের খাদ্য নহে। ব্রাহ্মণ মদমোহিত ও মত্ত হইলে, অপবিত্র স্থানে পড়িতে পারে, বেদমন্ত্র পাঠ করিতে পারে, কিম্বা অন্য অকার্যও করিতে পারে। যাহার শরীর-গত ব্রহ্ম একবার মদ্যে আপ্লুত (সিক্ত) হয় তাহার ব্রাহ্মণত্ব বিনাশ পায় এবং শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

●

তামসিক পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সুরাই প্রধান। ইহা অতিশয় উত্তেজক। প্রথমতঃ উত্তেজনার জন্য দেহে স্ফূর্তির সঞ্চার হয়। সুরাপায়ী সেই স্ফূর্তি বাড়াইবার জন্য আরও অধিক মাত্রায় সুরাপান করিতে থাকে। তাহার ফলে উত্তেজনা এত বর্ধিত হয় যে, ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞান লুপ্ত হইলে সে জ্ঞানহীন পশুর দশায় উপনীত হয়। তখন আর তাহার হিতাহিত ও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। এই অবস্থায়, এমন পাপ নাই যাহা তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সুরাপানকে মহর্ষিগণ যে মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত করবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া সুরাপান করে, তাহারা ইহজন্মেই পশুত্বে উপনীত হয়। নরের আকারে পশুত্ব বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক, এই জন্যই যেন তাহার দেহ ক্ষীণ, দুর্বল ও নানা রোগের আধার হইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে ব্যক্তি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করে। মোক্ষলাভের জন্যই আমরা এই মানব-দেহ লাভ করিয়াছি, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, সুরাপান দ্বারা আমরা মানবের পদবী হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার পশুত্বে প্রত্যাবৃত্ত হই এবং মোক্ষ হইতে শত শত জন্ম দূরে গিয়া পড়ি। সুরাপানের এইরূপ ভয়ানক অপকারিতা। ইহার এই অপকারিতা দেখিয়াই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহর্ষিগণ ইহাকে মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন—

মদ্যমপেয় মস্পৃশ্যং মদেয় মগ্রাহ্যম্।

মহর্ষিগণের এই বাক্য গৃহে গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

●

দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমানে অনেক ভদ্র-সন্তান সুরাপানাসক্ত হইয়া হিন্দুর উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পশুত্ব লাভ করিয়াছেন। সুরাপান-দোষে কত লোক যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কত পরিবারের যে সর্বনাশ হইয়াছে, কত পিতা-মাতা ও বিধবা রমণী যে নিয়ত চক্ষুর জলে ভাসিতেছেন, কত সুকুমার বালক-বালিকা যে অনাথ হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে, এবং কত মানবাত্মা যে মোক্ষপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুরাপান এদেশের দারিদ্র্য-কষ্ট বাড়াইয়াছে এবং এদেশকে পিশাচের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত ও হাহাকারে পূর্ণ করিয়াছে। নরহত্যা, পরদারগমন, গুরুদার-গমন, চৌর্য, অসৎসংসর্গ প্রভৃতি মহাপাতকগুলি সুরা পানের নিত্য সহচর। সুরাপানের এই বিষময় ফলসমূহ অবগত হইয়াই আর্য মহর্ষিগণ তাহা একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়াই আমরা অধঃপতিত হইয়াছি।

সুরাপান দোষেই যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। সুরাপানের অপকারিতা লোক-জগতে প্রচারিত করিবার জন্যই বুঝি লীলা-ময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরাপান দ্বারা যদু-বংশের ধ্বংস দেখাইয়া গিয়াছেন। সুরা-পানের ন্যায় মহাপাতক আর নাই। তাহার কারণ এই যে, এই মহাপাতক হইতেই অপর মহাপাতকসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে।'

—কল্পতরু

ফেরা

মনোতোষ সরকার

অপিসে ঢুকেই রীতিমত হকচকিয়ে গেল নমিতা। চারদিকে বিশ্রী রকমের বোবা নিস্তব্ধতা। অপিসে সবাই রয়েছে কিন্তু এতটুকু হৈচৈ নেই কোথাও। একটা বিষাদের সুর শুধু এখানে ওখানে ছড়ানো। ইতিমধ্যে রঙিন ফোল্ডিং ছাতাটা ভাঁজ করে ভ্যানেটি ব্যাগে পুরে ফেলেছে। তারপর নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে গিয়েই এটা টের পেল নমিতা। যদিও কেউ কেউ রয়েছে টেবিলে অথচ মুখ বন্ধ। এমন কি হাত চলছে না তাদের কারোর। মানে তাই কলমও বন্ধ। কিন্তু কেন? চেষ্টা করেও এ মুহূর্তে তা বুঝতে পারল না নমিতা। অপিসের সবাই কি পেন স্ট্রাইক করেছে? কই তেমন ত কিছু শোনেনি নমিতা। এত বড় একটা ব্যাপার ঘটলে নমিতা নিশ্চয় তা জানতে পারত। নমিতা ওদের দিকে ইচ্ছে না থাকলেও তাকিয়েছে। বলতে গেলে বেশ কয়েকবার। নমিতা তাকালে কি হবে, কি বুঝবে, বরং নমিতা দেখতে পেয়েছে সবার দৃষ্টি এখন যেন তাকে ঘিরেই। যদিও এর মানে এখনও অস্পষ্ট নমিতার কাছে। আবার সেই একই প্রশ্ন, কিন্তু কেন? নমিতা এর পরে আর বুঝতে চেষ্টা করেনি, নিজের কাজের দিকে মন দিতে চেয়েছে। তাই নিয়মমত টাইপ-রাইটার মেসিনটার ঢাকা তুলেছে। ড্রয়ার খুলে ঝারণ দিয়ে মেসিনটার উপর পড়ে-থাকা আলগা ধুলো ঝেড়েছে। ইরেজার থেকে শুরু করে কাগজ কাটা ছুরিটা পর্যন্ত মানে যত কিছু টুকিটাকি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যা কাজে লাগবে কিম্বা লাগবে না এমন সব কিছুই টেবিলটার ওপর সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। তারপর অভ্যাস মত ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্লভকে ডাকতে চেয়েছে এক গ্লাস জলের জন্য। এর ভেতরেই গলাটা বেশ শুকিয়ে উঠেছে। অবশ্য এই ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকাটা এটাও একটা রোজকার ডিউটি নমিতার। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হাতের তালু ব্যথা হয়ে গেলে তবেই দুর্লভ আসে। দুর্লভ সে সময়ের জন্য সত্যি দুর্লভ বস্তু। নামের সঙ্গে কাজের অদ্ভুত মিল যেন। কিন্তু সেই দুর্লভকে আজ অনায়াসেই হাতের কাছে পেয়েছে। জল না চাইতেই জল ভর্তি গ্লাস নিয়ে বলেছে, 'দিদিমণি আপনার জল।' তারপর নমিতার দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

দুর্লভের এমন অদ্ভুত আচরণ কেন? এমন ত ও কোনদিন করে না বরং অহেতুক

দেরী করার জন্য ; মুখটাই তুলতে চায় না কোনদিন। কোন রকমে জলের গ্লাসটা দিয়ে সরে পড়তে পারলেই তখন বাঁচে। কিন্তু আজকের ব্যাপারে বেশ কিছুটা অবাক হয়ে যখন কিছু জিগ্যেস করবে বলে নমিতা ভেবেছে এবং তাই মুখও তুলেছে তখন দুর্লভ সরে গেছে অনেকটা। বলতে গেলে নমিতার নাগালের বাইরে। তাই কিছুই জিগ্যেস করা আর হল না। অথচ জিগ্যেস করতে পারলে যেন ভাল হত। অফিসের ভেতর এই যে আবহাওয়া তার কিছুটার হয়ত হদিস করতে পারত।

জল খেয়ে রুমালে মুখটা মুছে সিধে হয়ে বসল নমিতা। আর রুমালে আজকের সকালের কিছু সঞ্চিত নরম ধাঁচের প্রসাধনের খানিকটা গন্ধ সারা মুখে যেন লেগে রইল। যদিও ম্লান এবং অস্পষ্ট। পেণ্ডিং ড্রাফট ফাইলটা নমিতার হাতের কাছেই রয়েছে। ইচ্ছে করলে এখুনি কাজ শুরু করে দিতে পারে ঠিকই কিন্তু সারা অফিস জুড়ে এই যে অবস্থা তা যেন কেমন কেমন লাগছে নমিতার। প্রতিদিনের সঙ্গে কোন মিল নেই এতটুকুও। বলতে গেলে সত্যি কেমন খাপছাড়া। আর একটা ভাবনা নমিতাকে কেন যেন ভাবাল। ওকি আজ লেট করে অফিসে এসেছে? মানে অনেক লেট? একঘণ্টা, দুঘণ্টা না আরও বেশী? বড়সাহেব এর জন্য খোঁজাখুঁজি করেছেন? কিন্তু এটাও যদি সত্যি হয় তা হলে অফিসসুদ্ধ সবাই এমন বোবা হয়ে থাকবে কেন? তবুও মনে এবার কিছুটা জোর এনে অফিসের ঘড়ির দিকে তাকাল নমিতা। তারপর নিজের ঘড়ির দিকেও। না তেমন ত সময়ের কোন ফারাক দেখতে পাচ্ছে না ঘড়ি দুটোর মধ্যে। বরং বলতে গেলে আজ বেশ কিছু সময় আগেই এসেছে অফিসে। তা হলে—তা হলে কি এমন ঘটল?

কেউ কেউ এখনও ঠিক তেমনি করেই বসে আছে। কেউ আবার এদিক ওদিক ঘুরছে। কারোর কিছুই করার নেই। সবাই কিসের একটা প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিসের সেই প্রতীক্ষা? নমিতা কিন্তু এখনও কিছু জানতে পারল না। ওকে এই ব্যাপার নিয়ে কেউ কিছু জিগ্যেস করলে কিছুই বলতে পারবে না। বোবার মত অবাক চোখে তার

দিকেই তাকিয়ে থাকবে। উলটে হয়ত তার কাছেই জানতে চাইবে, 'কি ব্যাপার বলুন ত আপনি?'

মাঝে আর একবার দুর্লভ ঘুরে গেছে। 'জল লাগবে দিদিমণি?'

অবাক চোখে নমিতা তাকিয়েছিল দুর্লভের দিকে। কিন্তু দুর্লভের এ ভাবে কথা বলাতে নমিতার চোখে অবাক হওয়ার বদলে কিছুটা শাসনের ভঙ্গিটাকে খুঁজে পেয়েছিল দুর্লভ। তাই আর কোন কথা না বাড়িয়ে যেমন এসেছিল তেমন আবার ফিরে চলে গেছে।

এবার যেন প্রিয়ব্রতকে মনে মনে পেতে চাইল নমিতা। তার জন্য কোন সংকোচ নেই। লজ্জাও করবে না এতটুকু। কিন্তু প্রিয়ব্রত কোথায়? সত্যি, অফিসে আসার পর থেকে তাকেই শুধু দেখতে পায়নি একটিবারের জন্যও। আর সবাই হয়ত রয়েছে। এতক্ষণ অবশ্য অতশত ভাবেনি নমিতা, নাম ধরে ধরে খোঁজেওনি। তবে এটা একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে এ সময়ে এক প্রিয়ব্রত ছাড়া অফিসের সবাই হাজির রয়েছে। এমন একটা ধারণা কেন যে পেয়ে বসল নমিতাকে তা ও বলতে পারবে না। প্রিয়ব্রত মাঝে মাঝে কি এমন কামাই টামাই করে? ঠিক মনে করতে পারছে না—তবে বিশেষ করে ঠিক আজকের দিনে প্রিয়ব্রতর কামাই করাটা একরকম অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হতে লাগল নমিতার। প্রিয়ব্রতর চেয়ারটার দিকে কতকটা খেয়ালবশে কতকটা হয়ত ইচ্ছে করেই তাকাল নমিতা। যা ভেবেছে ঠিক তাই। প্রিয়ব্রতর চেয়ার খালি। তবে কি প্রিয়ব্রত বড়সাহেবের ঘরে গেছে? তাই বা কি করে সম্ভব—প্রিয়ব্রত অফিসে এলে নিশ্চয় ওর টেবিলে কিছু না কিছু একটা নিদর্শন থাকতই। যেমন ওর চশমার খাপ অথবা সিগারেট লাইটার। কিন্তু কোথায় সে সব? বিকেলে চলে যাবার সময় যেমন টেবিলটাকে পরিষ্কার করে রেখে গেছে এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে আছে টেবিলটা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঝকঝকে তকতকে। কারুর তোয়াক্কা না করেও নিজেই নিজের টেবিল পরিষ্কার রাখে। এই রকমই অভ্যাস প্রিয়ব্রতর। এখন ওর টেবিলে যদি একটা মাছিও বসে তা হলে সেটাও বুঝি গড়িয়ে পড়ে যাবে নীচে। তা হলে কি প্রিয়ব্রত অফিসেই আসেনি? কিন্তু কেন? হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন একটা ঠুকপুকোনি শুরু হল।

অথচ অফিসে ঢুকেই এই প্রিয়ব্রত নমিতার খোঁজ করবে। নমিতার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াবে বারকয়েক। কিছু বলতে চাইবে হেসে হেসে। প্রথম প্রথম নমিতার এসব কিছুই ভাল লাগত না যখন প্রথম এসেছিল এই অফিসে। কেমন গায়ে পড়া গায়ে পড়া মনে হত প্রিয়ব্রতকে। এর জন্য মাঝে মাঝে রেগেও উঠত নমিতা। চোখ মুখ লাল করে কখনো সখনো তাকাত প্রিয়ব্রতর দিকে। এদিকে প্রিয়ব্রতর বুদ্ধিও প্রখর ছিল। তাই নমিতার এইভাবে তাকানো দেখে সহজেই বুঝতে পারত নমিতা রেগে গেছে। এর পরে আর যদি তেমন কোন ঘটনা ঘটে যায় তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে পায়ে পায়ে সরে আসত প্রিয়ব্রত নিজের জায়গায়। তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত নমিতাকে। নমিতার মুখটা আবার যেন সহজ হয়ে আসছে। সারা মুখে হঠাৎ জমে থাকা রক্তগুলো যেন আবার চলাচল শুরু করে দিয়েছে। যাক, কেমন যেন একটু নিশ্চিন্ত হল প্রিয়ব্রত।

প্রিয়ব্রত একদিন বলেছিল, 'আচ্ছা মিস সেন আমাকে দেখলে এত চটে যান কেন বলুন ত?'

টাইপ করতে করতে হাত দুটো থামিয়েছিল নমিতা। প্রিয়ব্রতর দিকে একবার তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে নিয়েছিল। আর ভেবেছিল কি জবাব দেবে। কিন্তু সেদিন সত্যি তেমন কোন জবাব দিতে পারেনি প্রিয়ব্রতকে। এবার আর রাগ নয় লজ্জাই কেমন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর আস্তে আস্তে প্রিয়ব্রত সম্বন্ধে কেমন কৌতূহল জমা হতে থাকে নমিতার মনে। অফিসে আরও অনেকে আছে, কই তারা ত এমন ভাবে নমিতার কাছে এসে হাজির হয় না। তা হলে প্রিয়ব্রত এমন করে কেন? কত পুরুষ আছে যারা মেয়ে দেখলেই কেমন ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, প্রিয়ব্রত কি তাই? তাই বা বলা যায় কি করে। অফিসে আরও ত মেয়ে রয়েছে, কই তাদের কাছে ত প্রিয়ব্রত যায় না। তবে? প্রিয়ব্রতর মনে ওর সম্বন্ধে কি কোন দুর্বলতার জন্ম হয়েছে? তাই কি ওর সঙ্গ বারে বারে খুঁজে বেড়ায় প্রিয়ব্রত? এমন অনেক প্রশ্ন নমিতার মনকে এই মুহূর্তে প্রিয়ব্রতর আজকের অনুপস্থিতির সুযোগেই বেশী করে ভাবাচ্ছিল।

প্রিয়ব্রতর কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ীর কিছু কথা এ সময়ে মনে পড়ল নমিতার। বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা করে এল যার জন্য এখন নমিতা নিজেই কেমন অস্থিরতা অনুভব করছে। গলাটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। জল ত এক গ্লাস সেই কখন খেয়েছে। এখন আবার জলের জন্য সেই থেকে মনটা আঁকু পাঁকু করছে। দুর্লভকে কি ডাকবে? সেই ত আবার বেল বাজাতে হবে। তবেই যদি দুর্লভ আসে। কারণ একটু আগে দুর্লভকে যেভাবে বিদায় নিতে হয়েছে তাই তার পক্ষে আবার নমিতার কাছে আসা সত্যি অসুবিধাজনক। আর অফিসের বর্তমান পরিবেশের মধ্যে বার বার বেল বাজিয়ে দুর্লভকে ডাকাটাও কেমন বিরক্তিকর বলে মনে হতে লাগল নমিতার কিন্তু জল ত এই মুহূর্তে খুবই দরকার। চোখে মুখেও কিছুটা জল ছিটোতে পারলে ভাল হত। অন্য সকলের মতই সেও কাজ শুরু করেনি। তার জন্য

তেমন কোন তাগাদাও নেই কারুর কাছ থেকে। সকলেই যেন কোন খবরের আশায় ... যে অপেক্ষা করছে এমন একটা ভাব নিয়ে ছাত্রের কাজ হাতের নাগালের মধ্যে নিয়ে চুপচাপ ঠায় বসে আছে।

নমিতা কি করছে দেখার জন্য ... কেউ তখন থেকে শুধু লক্ষ্য করছে। ...দের কাছে ও এমন কি দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল ... কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না নমিতা। ...রা কি জানতে আজকের ব্যাপারটা? প্রিয়ব্রত কি বলেছিল কিছু ওদের কাছে? দিলীপের সঙ্গে যা ভাব প্রিয়ব্রতর আবার। নিজেকে ... সবার চোখ থেকে আড়াল করার জন্য এবং এমন কি নিজেকে নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার জন্য পেন্ডিং ড্রাফট ফাইলটার মধ্যে ডুব দিতে চেষ্টা করল নমিতা।

ভাগ্য ভালই বলতে হবে নমিতার। দুপুর ... টিফিনের জন্যে যেম আর্দালি এসেছিল। তাই তাড়াতাড়ি করে এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়েছিল। কিছুটা জল খেয়ে বাকীটা চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিল। পাখার হাওয়াটা এ সময়ে চোখে মুখে আরাম ছড়াচ্ছিল। বেশ ভাল লাগছিল নমিতার। আবার বাড়ীর ব্যাপারটা মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। বাবাকে অত বড় কথাটা না বললে কি চলত না? কত যে কষ্ট পেলেন এখন যেন এটাই নমিতার মনকে বেশী করে ভাবাচ্ছিল।

সকালে বড় সুখের একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমটা ভেঙে গেল নমিতার। নমিতা দেখছিল বধূবেশে ও যেন প্রিয়ব্রতর পেছন পেছন কোথায় চলেছে। কিন্তু কোথায় সেটা ভাল করে বোঝার আগেই ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রিয়ব্রত নেই, নমিতা শুয়ে আছে তারই বিছানায়। আচ্ছা ভোরের স্বপ্ন কি সফল হয়? নমিতা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল এসব কথা। আর ওর শরীরে তখনও রয়েছে কিছুটা রোমাঞ্চ, কিছুটা শিহরণ। এইসব নিয়ে আরও কিছুক্ষণ পড়ে রইল বিছানায়। এপাশ ওপাশ করল সুখানুভূতিকে সম্বল করে।

মা এসে বলল, 'কিরে চা খাবি না? খুকী, যা হাতমুখ ধুয়ে আয়।'

'আমার উঠতে ইচ্ছে নেই মা, আমি বরং শুয়েই থাকি।'

'চা খাবি না?'

'না মা আজ আর মুখ ধোবো না, বরং চাটা এখন এখানেই পাঠিয়ে দাও।'

মা চলে গেল আর কথা না বাড়িয়ে।

চা খেতে খেতে নমিতা বলল, 'আবার এবার ভাবছি বিয়ে করব, তুমি কি বল মা?'

'বেশ করবি।' মা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে চাইল না। এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে নমিতার অফিসের ভাতের কথা চিন্তা করে।

কদিন হল বাবার শ্বাসকষ্টটা বেড়েছে। রাতে ঘুমোতে পারছেন না। রাত যত বাড়ে কষ্টও তত বাড়তে থাকে। মা তো সারারাত বাবার শিয়রে বসে থাকে। নমিতাও শুয়ে
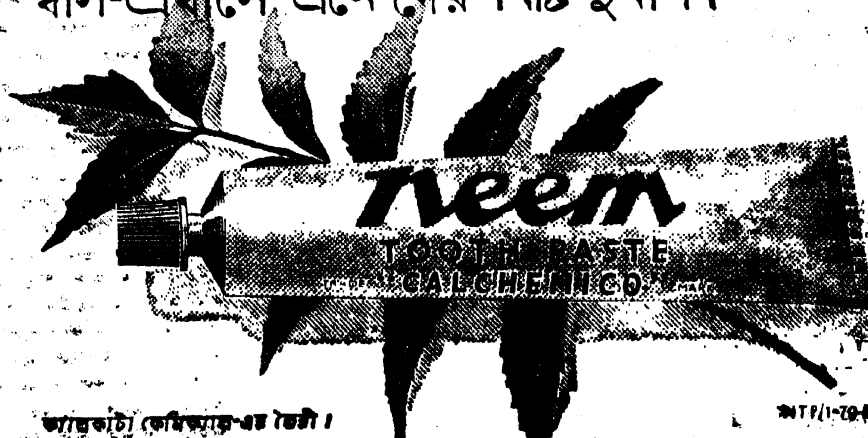
থাকতে পারে না এর জন্য। ওকেও জেগে বসে থাকতে হয়। টান বাড়লেই গরম তেল মালিশ করতে হয় বাবার বুকে। কষ্ট কিছুটা কমলে, টানটা ছোট হয়ে এলে বাবা নিজে থেকেই এক সময়ে বলেন, 'যা খুকী শুতে যা। আর কত কষ্ট করবি। আমার এরকম রোজই হবে।'

মার চোখে যদিও ঘুম নেই, সারাদিনের ধকল বুকে পেতে সহ্য করতে করতে আরও বেশী সহনশীলা হয়ে উঠেছে ঠিকই তবু মাকেও বলতে শোনা গেল, 'তুই ঘুমোগে যা খুকী, তোর আবার অফিস আছে।'

অগত্যা আর কি করবে নমিতা, উঠে এসেছে বাবার ঘর থেকে। কিন্তু তবুও মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে পারল না, তুমি যাও না একটু, ঘুমিয়ে নাও। আমি ত রয়েছি, ভয় নেই কিছু। অফিস ত আছে ঠিকই, ও আমি ম্যানেজ করে নিতে পারব। আর তোমাকে ভাবতে হবে না তার জন্য।

এমনি করেই রাত কাটছে নমিতার। কোন কোন দিন ওঘর থেকে ফিরে এসে চোখে মুখে জল দিয়েছে। তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোথায় ঘুম? ছটফট করেছে সারারাত। ওঘর থেকে বাবার হাঁপানার শব্দকে এ সময়ে ভৌতিক বলে মনে হয়েছে। ঐ শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে যেন ভেঙেচুরে অনবরত একসা করছে। কেমন যেন অসহ্য লাগে নমিতার।

সকালে নমিতার অফিস আছে ঠিক কথা। এখন কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর দরকার। কিন্তু কোথায় সেই ঘুম? মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠেছে। মাথার তালুতে হাত ঠেকিয়ে এটা বুঝতে পারল নমিতা। আর সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এখনি মাথায় জল ঢালতে পারলে বেশ ভালই হত। কিন্তু এত রাতে ঠাণ্ডা লাগবে এই ভয় করে শুধু পাখাটাকে আরও জোর করে দিল। এবার মাথাটা যদি ঠাণ্ডা হয় তা হলে একটু ঘুমোতে পারবে।

প্রিয়ব্রতকে এ সময়ে একবার মনে পড়ল নমিতার। সত্যি ত, প্রিয়ব্রত এখন কি করছে? ঘুমোচ্ছে না ওর মত জেগে জেগে রাত কাটাচ্ছে?

অফিসে বসে সেদিন কাজ করতে পারেনি নমিতা। মাঝে মাঝে ঘুমের একটা ঝোঁক কর্মরত হাতকে বারবার থামিয়ে দিচ্ছিল। চোখও কেমন ঝাপসা হয়ে আসছিল নমিতার। এটাও প্রিয়ব্রতর নজরে পড়ল এক সময়। তাই নমিতার টেবিলের কাছে এসে চুপি চুপি বলল, 'রাত্তিরে ঘুমোতে পারেননি বলে মনে হচ্ছে।'

প্রিয়ব্রতর কথা কানে যেতে চমকে ওঠে। সামনেই প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে। লজ্জা পেল নমিতা। বলল, 'বাবার হাঁপানির টান উঠেছে তাই সারারাত জাগতে হয়েছে।'

এবার প্রিয়ব্রতও কম লজ্জা পেল না। বলল, 'আগে যা বলেছি তার জন্য মনে কিছু করবেন না কিন্তু।'

'আচ্ছা।' মাথা নেড়েছে নমিতা।

'আপনার বাবা এখন কেমন আছেন?' আগের বলে ফেলা কথাটা এখনও ঘোরাতে চাইছে প্রিয়ব্রত।

'হাঁপানি রুগীদের আবার থাকাথাকি কি। যখন তখন টান উঠতে পারে। টান উঠলে বড় কষ্ট, দেখছি ত আমি।'

'আমিও জানি ভয়ানক কষ্ট। তা হলে আজকে না এলেই পারতেন। একদিন দুদিন কামাই করলে কি এমন আর হত, আমরা ত ছিলাম চালিয়ে নিতে পারতাম।'

'আসতে পারলে কে আর শুধু শুধু কামাই করে বলুন?'

'তা ঠিক। এখানেই আমাদের সঙ্গে আপনাদের তফাত। আমরা কিন্তু কামাই করতে পারলে কিছুতেই ছাড়তে চাই না।'

'তাই নাকি?'

'ঠিক তাই। যাক, অফিসের পর তাড়াতাড়ি পালাবেন না যেন, অনেক কথা আছে।'

'আচ্ছা' কথাটা উচ্চারণ না করে ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক শুধু মাথা নেড়েছিল নমিতা। তাতেই মনে হল প্রিয়ব্রত যেন ক্রমেই নমিতার নাগালের মধ্যে চলে আসছে।

সেদিন সকাল সকাল কেন যেন ছুটি হয়ে গেল অফিস। একে একে সবাই বেরিয়ে গেলেও নমিতা বসে রইল। এত রোদ বাইরে কোথায় যাবে এখন। রোদটা একটু কমলে বেরুবে এটাই ভাবছিল বসে বসে। এদিকে প্রিয়ব্রত ধারে কাছে কোথাও বুঝি ছিল এতক্ষণ। এসে বলল, 'বসে কেন, চলুন।'

নমিতা বলল, 'বাইরে কড়া রোদ কিন্তু।'

'তাতে কি, আপনার একটা ছাতা ত রয়েছে।'

'তা রয়েছে।' হঠাৎ থামল নমিতা। এখনই প্রিয়ব্রতর সঙ্গে হুট করে বেরিয়ে যায় এটা মনেপ্রাণে কিছুতেই চাইছিল না। কার চোখে পড়বে, কে কি ভাববে, এটাও একটা ভাবনা তখন।

'আর দেরী করবেন না প্লিজ, সবাই সেই কখন চলে গেছে।'

অগত্যা আর কি করবে নমিতা, প্রিয়ব্রতর সঙ্গেই অফিসের সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

গেটের মুখে এসে প্রিয়ব্রত আবার বলল, 'চলুন কোথাও গিয়ে বসা যাক। বিকেল হতে এখনও অনেক দেরী আছে।'

প্রিয়ব্রতর সঙ্গে সম্পর্কটা অফিসের গণ্ডির মধ্যে থাকলে কেমন হয়? লোক-লজ্জা, ভয়, এসব আর থাকে না তা হলে। এই ভেবেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নমিতা।

'ভয় পেলেন নাকি? ভয়ের কিছু নেই। আমাকে আপনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারেন।'

নমিতার মনের কথাটা প্রিয়ব্রতর মুখের ডগায় আসতে দেখে নিজেই লজ্জা পেল নমিতা। এটা যে এত সহজে প্রিয়ব্রত ধরে ফেলবে তা ছিল নমিতার ধারণার বাইরে। এটাই তখনকার মত প্রিয়ব্রতকে বুঝতে না দিয়েই শুধু বলেছিল, 'কোথায় যাবেন বলছেন চলুন।' তারপরেই ছাতাটা খুলতে গিয়ে আবার গুটিয়ে নিল নমিতা। এসময়ে ছাতাটা খুললে মহাবিপদ, ঐ ছাতার তলায় দুজনের একসঙ্গে যাওয়া, চলতে চলতে গায়ে গা লাগা—ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারল না নমিতা।

'কি হল, ছাতা খুললেন না? এত রোদ সহ্য করতে পারবেন? কাল রাতে ঘুমোতে পারেননি বলছিলেন না?'

'না থাক।' নমিতা বুঝতে পারছে না বারবার প্রিয়ব্রত তাকে এমন একটা অস্বস্তিকর জায়গায় এনে দাঁড় করাচ্ছে কেন?

কখনো পাশাপাশি, কখনো আগে পেছনে এইভাবে নমিতা প্রিয়ব্রতর সঙ্গে চলতে লাগল ডালহৌসি থেকে এসপ্লানেডের দিকে। কখনো পুরোপুরি রোদ্দুর, কখনো এক চিলতে ছায়া। চোখ মুখ রোদে তাতিয়ে নমিতা যখন সত্যি সত্যি এসপ্লানেডে এল, তখন চোখে কেমন ঝাপসা দেখছে। সবই অস্পষ্ট। পা টলছে, কেমন পড়ে যাচ্ছিল নমিতা, প্রিয়ব্রতই ধরে ফেলল। নমিতার শরীরের ভার তখন প্রিয়ব্রতর শরীরে। প্রিয়ব্রত জিগ্যেস করল, 'কি হয়েছিল আপনার?'

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। নমিতা নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে বলল, 'মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।' এত রোদ সহ্য করতে পারে না নমিতা। তাই এই বিপদ। কিন্তু যেটাকে এড়িয়ে চলতে গেল নমিতা তা আর শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না। প্রিয়ব্রত তাকে সেই স্পর্শ করল। শুধু স্পর্শ নয় জড়িয়েই ধরেছিল বলতে হবে।

'তাই ত তখন বলছিলাম ছাতাটা খুলে ফেলুন, এত রোদ আপনি সহ্য করতে পারবেন না। হল ত তাই?'

লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়েছিল নমিতার। মুখ তুলতে পারল না কিছুতেই। প্রিয়ব্রতর বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ এখনও নমিতার সারা শরীরে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। জীবনে প্রথম পুরুষের স্পর্শ। শিহরণ, রোমাঞ্চ। অফিস থেকে বেরুবার সময় যত ভয়, যত লজ্জা ছিল তার আর কিছু অবশিষ্টই নেই। এসময়ে প্রিয়ব্রত না থাকলে

কি হত তাহলে? লোকচক্ষুর সামনে কতটা হেয় হতে হত!

'শরীরটা কি এখনও সুস্থ হয়নি?'

'না না, কোথায় যাবেন চলুন।' অনেক সহজ হয়ে এসেছে নমিতা।

চায়ের দোকানের এক কোণার কেবিনে বসে প্রিয়ব্রত জিগ্যেস করল, 'কি খাবেন বলুন? আপনি বরং ঠাণ্ডা কিছু খান।'

'আমাকে নিয়ে অত ভাবছেন কেন আপনি? আমি ভালই আছি। এবং আপনি যা খাবেন আমিও তাই খাব।'

আমি ত চা খাব ভাবছি।'

বয় অর্ডার নিয়ে কেবিনের পর্দাটা টেনে দিয়ে চলে গেল। অন্য সময় হলে এই পর্দা টানা নিয়ে নমিতা আপত্তি করত। কিন্তু পথে যে ঘটনা ঘটে গেল, তারপরে এই পর্দা টানা নিয়ে কোন কিছু বলার কোন মানেই হয় না আর। যে জন্য কিম্বা যার জন্য সংকোচ, প্রিয়ব্রতর স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার অভিপ্রায় কি টিকিয়ে রাখতে পারল নমিতা? বরং ও সময়ে প্রিয়ব্রত না থাকলে, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে হয়ত হাসপাতালে ছুটতে হত নমিতাকে। সে এক লজ্জাকর কাহিনী।

বয়টা এবার দু-পিস করে কেক ও দু' কাপ চা দিয়ে গেল। প্রিয়ব্রত বলল, শুরু করুন।'

এতক্ষণ বসে মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া শেষ করল নমিতা। তারপর তাকাল প্রিয়ব্রতর দিকে। প্রিয়ব্রতর মুখে তখন এক চিলতে হাসি দেখে নমিতা বুঝতে পারল ও বুঝি অনেক কিছু বলতে চায়। কি বলবে প্রিয়ব্রত? কেকের একটা টুকরো ভেঙে মুখে দিল নমিতা।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না প্রিয়ব্রত। নমিতাও নিঃশব্দে ভেঙে ভেঙে কেক খেতে লাগল। তারপরে এক সময়ে জলের গ্লাসটা নামিয়ে চায়ে চুমুক দিল নমিতা। সত্যি শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বলল পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে, 'কি বলবেন বলছিলেন না?'

'না আজ থাক।' প্রিয়ব্রত এতক্ষণ বাদে কথা বলল।

রোদটা ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে। নমিতা বলল, 'তাহলে ওঠা যাক।'

'কেন আমরা কি জলে পড়েছি, না আমাদের কেউ তাড়িয়ে দিচ্ছে।'

'না তা নয়, তবে কতক্ষণ আর এই-ভাবে বসে থাকা যায়।'

'বসলে ক্ষতি কি? কতজনাই ত এমন বসে আছে।'

নমিতা পর্দা সরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। সত্যি তাই। প্রিয়ব্রত ঠিক কথাই বলেছে।

আর একদিন প্রিয়ব্রত বলল, 'তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই নমিতা। তোমার আপত্তি নেই ত?'

'থাকলে কি আর তুমি শুনবে?'

'তা ত ঠিক কথাই। তোমার আপত্তি আমি কেন শুনতে যাব।' নমিতার হাতখানা নিয়ে সেদিন অনেক খেলাই খেলল প্রিয়ব্রত। আর নমিতা তখন নতুন করে আবার স্পর্শ-সুখ কুড়োতে লাগল।

তারপরেই সেদিন মাকে বলেছিল নমিতা, 'মা আমি এবার বিয়ে করব।'

মা আর কি বলে, বলেছিল, 'বেশ ত করবি।'

এ-কথাটাই কি করে বাবার কানে চলে গেল। তাতেই বাবা রেগে আগুন। একেই রাতে ঘুমোতে পারেন না বাবা হাঁপ টেনে টেনে। এ ত নমিতা জানেই। তবুও কেন যে এমন হল। বাবা বললেন, 'তুই নাকি বিয়ে করতে চাস খুকী?'

চুপ করে থাকল নমিতা।

'কি কথা বলছিস না কেন? বল বল কি বলতে চাস তুই?'

'হ্যাঁ বাবা।'

আর যায় কোথায়, বাবা এবার দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, 'আমাদের কি না খাইয়ে মেরে ফেলতে চাস? আমার এখন এই অবস্থা আর তোর বিয়ে করাটা বড় হল?'

নমিতাও তেমনি রেগে উঠল ও সময়, বলল, 'তাহলে আমার কি সাধ-আহ্লাদ বলে থাকবে না কিছু?'

এক কথায় দু-কথায় অনেক হল। বাবা গুম মেরে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর আদেশের সুরে বললেন, 'আমি মরে গেলে ওকে তুই বিয়ে করতে পারবি।' বাবা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হাঁপানির টানটা আবার চাগিয়ে উঠল। বাবা এবার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।

ওখান থেকে সরে আসার সময় নমিতা দেখল মা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু নমিতার আর ফেরার উপায় নেই। এক মাস আগে নোটিশ দিয়ে এসেছে রেজেস্ট্রি অফিসে। আজকেই সেই শুভদিন।

এতক্ষণে অভিশপ্ত প্রতীক্ষার যেন অবসান হল। দিলীপ এই মাত্র খবর আনল গতকাল রাতে প্রিয়ব্রতর স্ট্রোক হয়েছিল। আজ সকালে হাসপাতালে মারা গেছে।

কে মারা গেছে? প্রিয়ব্রত? তবু নমিতা যেন আর কিছুই শুনতে চাইল না। কেমন বোবা হয়ে গেছে। কান দুটোও বন্ধ।

অফিস ছুটি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। একে একে সবাই বেরিয়ে গেল। কিন্তু নমিতা তার জায়গায় চুপচাপ বসে থাকল। দিলীপ এগিয়ে এল নমিতার কাছে, বলল, 'খুব দুঃখিত মিস সেন। এমন যে হবে ভাবা যায় না। আপনি কি একা যেতে পারবেন না বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে?'

'ধন্যবাদ। আর কিছুক্ষণ বাদে আমি একাই চলে যেতে পারব।'

প্রচ্ছায়া

মেয়েদের জীবনে প্রতিভা বিকাশের পথে সব চাইতে বড় অন্তরায়, পুরুষের প্রতি তাদের একান্ত নির্ভরশীলতা। অথচ একথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই, পুরুষের সাহচর্য, সান্নিধ্য ও বিশ্বস্ত সহৃদয়তা ভিন্ন তাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়াও দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ যেসব মেয়েরা নৃত্য-গীত ও রঙ্গমঞ্চের অনুরাগী তাদের পক্ষে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অথচ এই সব স্বাধীন জীবিকাশ্রয়ী নারীর পুরুষের সঙ্গে অবাধ সাহচর্যের ক্ষেত্র বহুবিধ প্রলোভনে কণ্টকিত এবং এই সান্নিধ্য আশ্রয় করে সহজেই নানাবিধ কলঙ্কজাল জন্মলাভ করে শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায় এই সকল কলঙ্ক কাহিনী বহুলাংশেই সত্য। এই ভ্রষ্ট-পথের বিষময় ফল হিসাবে এই সব স্বাধীন জীবিকাবলম্বী নারী সহজেই সম্ভ্রান্ত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে হয়তো অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

সম্ভবত সকল দেশেই চারুশিল্পের উপাসিকা এই সব মঞ্চশিল্পী নারীর জীবন-সমস্যার চেহারাটা একই রকম। আমাদের দেশের একদা বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রীদের জীবনকাহিনী স্মরণ করলেই এই উক্তির যাথার্থ্য সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব। একটা খুব সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। এক সময়ে আমাদের দেশে পূজা-পার্বণে এবং উৎসবের জলসাঘরে ও সঙ্গীতের আসরে বাঈজীদের কণ্ঠসংগীত ও নৃত্যকলা বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হতো। অথচ এই সকল সঙ্গীতসাধিকা নারীদের আমাদের গৃহের অন্দর মহলে কদাচ প্রবেশাধিকার ছিল না। সেখানে তারা ছিল অপাংক্তেয়। এইভাবে তারা ক্রমশঃ এক বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের অন্ত-র্ভুক্ত হয়ে সমাজের সুস্থ ও সম্ভ্রমপূর্ণ জীবনধারা থেকে নির্বাসিত হয়ে অবলুপ্তির গর্ভে বিলীন হয়ে যেতো।

এই প্রসঙ্গে একজন বিশ্ববিখ্যাত মঞ্চা-ভিনেত্রীর বিচিত্র জীবনকাহিনী মনে পড়ছে। তাঁর নাম এলিনরা ডুসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইটালির এক ক্ষুদ্র শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর সমসাময়িক কালে তিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। নাট্য-ইতিহাসে এরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভা-শালিনী নারী সুদুর্লভ। ডুসের পিতা-মাতা ছিলেন ইটালির এক ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায়ের সভ্য। এক শহর থেকে অন্য শহরে অভিনয় করে বেড়ানোই ছিল তাঁদের পেশা। এই ভ্রমণরত অবস্থাতেই ১৮৫৮ সালে ডুসে ভূমিষ্ঠ হন। কাজেই অভিনয় ডুসের সহজাত বৃত্তি।

কথিত আছে, জন্মের অব্যবহিত পরেই লোম্বার্ডির স্থানীয় রীতি অনুযায়ী ডুসেকে স্ফটিক-পেটিকার আবরণে গীর্জায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য। সেই সময়ে সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল রাস্তা ধরে আসছিল। স্ফটিকপেটিকা দেখতে পেয়ে তারা সেটিকে ভগবান যীশুর কোন অভিজ্ঞান মনে করে, তৎক্ষণাৎ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে সামরিক ভঙ্গিতে সদ্যজাত শিশুকে অভিনন্দন জানালো। এই ঘটনায় উল্লসিত হয়ে ডুসের পিতা বলেছিলেন— আমার মেয়ে বিশ্ববিজয়ী হবে।

সত্যই ডুসে অভিনয় জগতে বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি যে চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন সেই চরিত্রের সঙ্গে দেহে ও মনে একাত্ম হয়ে যেতেন এবং নিজের স্বাভাবিক ও সহজ বেশভূষাই তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। প্রসাধন, পরচুলা, রং ইত্যাদির দ্বারা কৃত্রিম রূপ ফুটিয়ে তোলবার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি বলতেন রং দিয়ে আঁকা আগুনের শিখা কখনও সত্য-কারের আগুন নয়।

অতুল চক্রবর্তী

অভিনয়ের শেষে সাধারণতঃ তিনি নিজেকে হোটেলের কামরায় কিংবা সাজঘরে বন্দী করে রাখতেন অথবা নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে রাজপথে একাকিনী বিচরণ করতেন। মধ্যরাত্রির উল্লাস অথবা পানোন্মত্ততা তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। পালা শেষ হয়ে গেলে অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং কীভাবে আরও উন্নত স্তরের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব সেই কথা নিয়েই ভাবতেন। মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্তও আপন ভূমিকার ধ্যান-ধারণা নিয়ে মগ্ন থাকতেন।

ক্ষুদ্র একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ডুসে যখন একবার ট্রিয়েস্ট শহরে অভিনয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই সময়ে একদিন বিখ্যাত নাট্যকার মার্কো প্রাগা বিনা খবরে হোটেলে দেখা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে ডুসের কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি দেখতে পান, ডুসে একাকিনী আসনে উপবিষ্ট এবং নিঃশব্দ অশ্রুপ্রবাহে তার বক্ষ প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। প্রাগা বিমূঢ় ও কুণ্ঠিত চিত্তে ফিরে আসবেন কিনা সেই কথা ভাবছিলেন। সেই সময়ে ডুসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসিতে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লেন—কুণ্ঠিত হবেন না। ও কিছু নয়। আজ রাত্রিতে 'অডেটের' ভূমিকায় নামতে হবে তাই মনে মনে একটু তৈরী হয়ে নিচ্ছিলাম।

অপরদিকে ডুসে অত্যন্ত আত্মসম্মানী ও তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। জার্মানীর ওয়ারটেমবার্গ রাজ্যের স্টাটগার্ট শহরে তিনি একবার অভিনয় করতে উপস্থিত হয়ে-ছিলেন। সেই সময়ে ওয়ারটেমবার্গের রাজা সংবাদ পাঠান, অভিনয়ের মধ্যকালীন বিরতির সময়ে তিনি ডুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক। উত্তরে ডুসে জানান—এই প্রস্তাবে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন তবে অভি-নয়ের বিরতির মধ্যে তিনি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। কারণ, তাতে মনের একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং অভিনয়ের ক্ষতি হওয়া সম্ভব। অতএব তিনি রাজামশাইকে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা থেকে নিরস্ত হবার জন্য মিনতি জানান।

রাজা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি চির-দিন নিজের ইচ্ছা বজায় রাখতেই অভ্যস্ত, সামান্য একটি অভিনেত্রীর ইচ্ছার নিকট নত হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। কাজেই তিনি অভিনয়ের বিরতির মধ্যেই উপস্থিত হয়ে ডুসের সাজঘরের দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করতে লাগলেন। ডুসে কঠোর এবং ধীর কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন—আগেই বলেছি, আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আপনি আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন।

এই আচরণের জন্য পরদিনই ডুসেকে তাঁর সম্প্রদায়সহ রাজরোষের পরিণামস্বরূপ ওয়ারটেম্বার্গ রাজ্য থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

শুধু রাজরোষ নয়, রাজ অভ্যর্থনাও তিনি প্রচুর লাভ করেছেন। ১৮৯৪ সালে ইংরেজ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিকটোরিয়ার আমন্ত্রণে তিনি উইন্ডসর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন এবং অভিনয় কুশলতায় প্রাসাদের সকলকে মুগ্ধ করে রাজ পরিবারের অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য লাভ করেন। এলিনরা ডুসের নাম সেযুগে দর্শকদের মনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে আসতো প্রেক্ষাগৃহে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লেভল্যান্ড যখন প্রেসিডেন্ট তখন ডুসে তিনবার মার্কিন মুল্লুকে উপস্থিত হন এবং প্রতিবারই প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সপরিবারে ডুসের মঞ্চাভিনয় দর্শন করবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হন এবং প্রতিবারই তিনি বিশ্ববন্দিতা অভি-নেত্রীকে প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন শ্বেত প্রাসাদে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের

আয়োজন করেন। এই সকল দুর্লভ সম্মান সকল মানুষের ভাগ্যেই জোটে না।

শেকসপিয়ার বিরচিত ক্লিওপাট্রা নাট্যে নাম-ভূমিকায় ডুসের অভিনয় দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে রাশিয়ার সুবিখ্যাত নাট্যকার অ্যান্টন চেকভ এক পত্রে তাঁর ভগ্নীকে জানান—আমি এই মাত্র শেকসপিয়রের ক্লিপাট্রার ভূমিকায় ডুসের অভিনয় দেখে এলাম। আমি ইটালির ভাষা জানি না কিন্তু তবু আমার মনে হলো, আমি যেন তার প্রত্যেকটি কথা বুঝেছি। কী অপূর্ব অতুলনীয় অভিনেত্রী।

সম্মান ও জনপ্রিয়তার উত্তুংগ শিখরে তিনি আরোহণ করেছিলেন কিন্তু একদিন উল্কার মত আবার স্খলিত হয়ে পড়লেন গৌরবের মহাকাশ থেকে। তখনকার দিনে ইটালির তরুণ কবি গ্যাব্রিয়েল ডি অ্যানানজিও ছিলেন এক উদীয়মান জ্যোতিষ্ক। ধনীর রূপবান সন্তান, দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক এবং কাব্যজগতের এক উজ্জ্বল তারকা। ডুসে অদৃষ্টচক্রে অ্যানানজিওর প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এই আকর্ষণ প্রগাঢ় হবার অবকাশ পায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন উভয়েই মিলিত হন ঐতিহাসিক নগরী ভেনিসে। চিত্রপটে আঁকা মায়াপুরীর মত রূপসী ভেনিস, রাজপথের পরিবর্তে জলভরা পরিখার ছকবন্দী শহর। এইখানে দুইজনে গণ্ডোলায় আরোহণ করে হর্মশোভিত ও আলোক সজ্জিত জনপদে বহু বিনিদ্র রজনী একত্র যাপন করেছেন। উদ্বেল যৌবনের বিপুল তরংগাঘাতে আত্মহারা হয়ে ওঁরা দুজন সেন্ট মার্কস স্কোয়ারের বাগিচায় নিশিথ রাত্রির নিভৃত অবকাশে বহু মধুর প্রহর অতিবাহিত করেছেন।

এই ভেনিসেই দুজনে পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুতি দান করেন—অ্যানানজিও যে নাটক রচনা করবেন তার মঞ্চরূপ দান করবেন ডুসে। এই অঙ্গীকার অনুযায়ী ডুসে অ্যানানজিওর অনেক নাটকই সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করেছেন। এর প্রায় দু বছর পরে জীবননাট্যের যবনিকা উদ্ঘাটিত হলো ফ্লোরেন্স শহরে যখন ডুসে এসে অধিষ্ঠিত হলেন নগরের উপকণ্ঠে অ্যানানজিওর পল্লীভবন সন্নিহিত এক বাসগৃহে। প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্যানশোভিত ও মর্মর মূর্তিখচিত কবি ভবন ছিল ডুসের নৈশ-অভিসারের গোপন কুঞ্জ। কিন্তু কলংক কখনও গোপন থাকে না। কানাকানিতে বিষাক্ত অপবাদ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তে লাগল অদৃশ্য দাবানলের মত।

কিন্তু অবস্থাটা চরমে গিয়ে দাঁড়ালো ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন অ্যানানজিও তাঁর বহু সমালোচিত গ্রন্থ দি ফ্লেম (শিখা) প্রকাশ করেন। অনেকেই মনে করেন গ্রন্থখানি ডুসের প্রতি কবির অবৈধ প্রণয়ের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি। এই পুস্তক প্রকাশিত হবার পর সারা ইউরোপ ডুসের কলংকগুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে। ডুসে অনুভব করলেন, বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, পূর্বে যেখানে একদিন তাঁর বিচরণ অবাধ ও গৌরবময় ছিল তা যেন সহসা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। আগে তিনি ছিলেন উন্নতশির এখন যেন মাথা নীচু হয়ে গেছে। আবাহনের পরেই যেন বিসর্জন।

ডুসে বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি সহজেই উপলব্ধি করতে পারলেন ইউরোপের বায়ুমণ্ডলে তাঁর বিরুদ্ধে একটি তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ বিষাক্ত নিশ্বাসের মত প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে তাঁকে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হলো। প্রায় কুড়ি বছর তিনি আর কোন অভিনয়ে অবতীর্ণ হননি।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ এসে উপস্থিত হলো এবং তার ফলে জগতের ওলট-পালট হয়ে গেল অনেক। ডুসে আপন উপার্জন থেকে যা অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তা বজায় থাকলে হয়তো পুনর্বার কর্মোদ্যোগে লিপ্ত না হয়েই অক্লেশে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সঞ্চয়ের অধিকাংশই গচ্ছিত ছিল জার্মানীর এক ব্যাংকে। যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর ব্যাংকের টাকাগুলো ডুবে গেল। এর ফলে ডুসে রীতিমত অর্থকষ্টের সম্মুখীন হলেন। ইতিমধ্যে যক্ষ্মারোগেও আক্রান্ত হয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে তিনি ধনীর ঘরে জন্মলাভ করেননি। এমন কি তাঁর শৈশবকাল অযত্ন ও অবহেলার মধ্যেই কেটেছে। জীবনীশক্তি দুর্বল এবং পুষ্টির অভাবে ছিলেন কৃশাঙ্গী। একমাত্র প্রতিভার বলেই তিনি একদিন সমাজের শীর্ষ স্থানে আসন লাভ করেছিলেন।

একদিকে অভাব অন্যদিকে ব্যাধির তাড়নায় দিন যখন প্রায় অচল অবস্থায় এসে উপস্থিত সেই সময়ে তিনি পুনর্বার রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। প্রথম রাত্রিতে অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়ে তিনি দর্শকজনের নিকট যে আবেদন করেছিলেন তা বড়ই করুণ—আমি আবার আপনাদের নিকট ফিরে এসেছি। আজকে আমার রূপের উজ্জ্বলতা নেই, মুখমণ্ডল লোলচর্মাবৃত ও ক্লান্তিতে অবসন্ন, পক্ককেশ মস্তক আজ শুভ্র, আমি এখন জীবন সন্ধ্যায়। আপনারা যদি পুনর্বার আমাকে গ্রহণ করেন তবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করবো নতুবা চিরদিনের মত ফিরে যাবো নেপথ্যের অন্ধকারে।

প্রেক্ষকবর্গ তাঁকে গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু পূর্বের এলিনরা ডুসের সঙ্গে পরবর্তীকালের ডুসের ব্যবধান ছিল দুস্তর। তাছাড়া তাঁর জীবনদীপও ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। ১৯২৪ সালে মার্কিন মুল্লুকে পিটসবার্গ শহরেই তাঁর শেষ অভিনয়। ভুল ক্রমে গাড়ির চালক তাঁকে শিল্পীদের প্রবেশদ্বারের পরিবর্তে নাট্যশালার প্রধান তোরণের সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়। দরজা ছিল তখন বন্ধ, এদিকে প্রচণ্ড বেগে বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আশে-পাশে মাথা গোঁজবার কোন স্থান ছিল না। তাই দরজা না খোলা পর্যন্ত তাঁকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভিজতে হলো।

হায়! বিশ্ববিমোহিনী ডুসের আজ এই অবস্থা! কোথায় গেল সেই সব দিন যখন রাজপথে উদ্বেল জনতা ক্ষণিকদর্শন লাভের জন্য অধীর আগ্রহে সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করে থাকতো। অজ্ঞাত পরিচয় ডুসে অপরিচিতার মতই, পথের পাশে একাকিনী দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলেন। যখন প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে তাঁকে ভেতরে নেওয়া হলো তখন তাঁর সর্বাঙ্গের প্রতি রোমকূপ জল-সিক্ত। দেহে প্রবল জ্বর দেখা দিয়েছে। সেই অবস্থাতেই কোন ক্রমে অভিনয় সমাপ্ত করলেন।

পরদিন থেকে মুহুর্মুহুঃ রক্তবমন শুরু হলো। ডুসে নিজেও বুঝতে পারলেন তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তিনি তাঁর শেষ আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করলেন—মৃত্যুকে আমার আর ভয় নেই কিন্তু চোখ বোঁজবার আগে একবার জন্মভূমি দেখতে চাই।

তাঁর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাতে তাঁকে নড়ানো সম্ভব ছিল না। পিটসবার্গেই ১৯২৪ সালের ২১শে এপ্রিল তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইটালির মাটিতে অন্তিমশয্যা রচনার জন্য আনীত হলো তাঁর মরদেহ। ইটালির জল স্থল ও বায়ু-সেনার বহর সামরিক অভিবাদন সহকারে মহান অভিনেত্রীকে অভ্যর্থনা জানালো। ডুসে তাঁর জন্মলগ্নে সামরিক অভিবাদন লাভ করেছিলেন কিন্তু সে ভ্রমক্রমে, এবার আর ভুলের অবকাশ ছিল না।

কী বিপুল প্রতিভা, কী সকরুণ সমাপ্তি!

সাতদিনের

সপ্তাহের সাতটা দিন সমান
যায় না। কিন্তু কোন সপ্তাহ কেমন যাবে,
কোন সপ্তাহ শুভ আর কোন সপ্তাহ
অশুভ, তা যদি আগে থেকে জানা
যায়, এবং বিশেষ করে যদি জানা যায়
অশুভ সময়টি কবে কাটবে, কবে
আসবে শুভ সময়, কতোই না
ভালো হয়।

তারই ব্যবস্থা সাতদিনের শুভাশুভ বিভাগে

জন্মরাশি অনুযায়ী সাপ্তাহিক শুভাশুভ লক্ষণগুলো সাধারণভাবে এখানে বলা হচ্ছে।

মেষ : শনি দ্বিতীয়ে, কেতু তৃতীয়ে, রাহু ও মঙ্গল নবমে, বৃহস্পতি দশমে, রবি ও শুক্র একাদশে এবং বুধ দ্বাদশে অবস্থান করছেন।

শরীর চলনসই, কিন্তু ক্লান্তি যোগ আছে। পুরান রুগীরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি আশা করতে পারেন। আয় বাড়লেও খরচের মাত্রাধিক্য আপনাকে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে। অবশ্য বকেয়া ও ধার দেওয়া কিছু অর্থ আপনি লাভ করতে পারেন। ব্যবসায় মন্দ নয়। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ, বেকারদের কাজ জুটতে পারে। সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষেত্র অনুকূল। মেয়েদের পক্ষে আশাপ্রদ সময়। আপনার পক্ষে শুভ তারিখগুলো হোল এই : ১, ২, ৩, ৪, ৮ মার্চ।

বৃষ : শনি প্রথম, কেতু দ্বিতীয়ে, রাহু ও মঙ্গল অষ্টমে, বৃহস্পতি নবমে, শুক্র এবং রবি দশমে, বুধ একাদশে অবস্থান করছেন।

শরীরটা সুবিধার নয়। জ্বর, পেটের পীড়া, আঘাতপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার ফলে পারিবারিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। আর্থিক অবস্থা মোটের ওপর ভাল। ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। সম্পদ-সম্পত্তির ব্যাপারে সাফল্যের যোগ আছে। কিন্তু শিল্পে, অফিসে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে। কাজকর্ম শুভ। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হোতে পারে। অবশ্য প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখগুলো : ১, ৩, ৪, ৬ এবং ৮ মার্চ।

মিথুন : কেতু প্রথমে, রাহু ও মঙ্গল সপ্তমে, বৃহস্পতি অষ্টমে, শুক্র ও

> **ভাগ্য গণনার কুপন**
>
> নাম............................
>
> জন্ম সময় ও তারিখ
> কিম্বা রাশি ও লগ্ন........................
>
> আপনার প্রশ্ন.........................
>
> [কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায়।]

রবি নবমে এবং শনি দ্বাদশে অবস্থান করছেন।

জ্বর, চোখ ও পেটের পীড়ায় সামান্য কষ্ট পেলেও অস্বস্তিত সপ্তাহ শেষে কেটে যাবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয় বিরোধের সম্ভাবনা আছে। ব্যয়াধিক্যের চাপ বাড়বে, ফলে আর্থিক দুশ্চিন্তা দেখা দিতে পারে। কাজকর্ম ও ব্যবসায়ে বিবিধ ঝামেলা হলেও তা ক্ষণস্থায়ী হবে। মেয়েদের মানসিক উত্তেজনা পরিহার অত্যাবশ্যক, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখগুলো : ৪, ৬, ৭, ৮ মার্চ।

কর্কট : রাহু ও মঙ্গল ষষ্ঠে, বৃহস্পতি সপ্তমে, শুক্র ও রবি অষ্টমে, বুধ নবমে, শনি একাদশে এবং কেতু দ্বাদশে অবস্থান করছেন।

শরীর ও মন সুবিধার নয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে অস্বস্তির ভাব থাকবে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভাল। আয়ও মন্দ নয়। কিছু সঞ্চয় যোগ আছে। নতুন সম্পদ-সম্পত্তি লাভ, কেনার সুযোগ আসতে পারে। কাজকর্মে পরিবেশ অনুকূল হবে, চাকরীতে পদোন্নতির যোগ আছে। মহিলাদের পক্ষে শুভ সময়। আপনার শুভ তারিখগুলো : ১, ৩, ৬, ৮ মার্চ।

সিংহ : রাহু ও মঙ্গল পঞ্চমে, বৃহস্পতি ষষ্ঠে, রবি ও শুক্র সপ্তমে, বুধ অষ্টমে, শনি দশমে এবং কেতু একাদশে রয়েছেন।

শারীরিক অস্বস্তি মাঝে মাঝে হলেও বিশেষ কোন উদ্বেগের কারণ নেই। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। ছেলেমেয়েদের শরীরের প্রতি সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। আয় মন্দ নয়। কিন্তু বন্ধুজনের প্ররোচনায়

অর্থক্ষতি ঘটতে পারে। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। মহিলাদের পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হোতে পারে। শুভ তারিখগুলো: ১, ৩, ৪, ৮ মার্চ।

কন্যা: রাহু ও মঙ্গল চতুর্থে, বৃহস্পতি পঞ্চমে, শুক্র ও রবি ষষ্ঠে, বুধ সপ্তমে, শনি নবমে এবং কেতু দশমে অবস্থান করছেন।

শারীরিক অসুস্থতা বা অসুবিধা থাকবে। পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হোতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্র চলনসই। ব্যবসায় মন্দ নয়। সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিতে পারে। কাজকর্ম চলনসই। মেয়েদের পক্ষে আচরণে, কাজকর্মে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখগুলো: ১, ৩, ৪, ৬ মার্চ।

তুলা: রাহু ও মঙ্গল তৃতীয়ে, বৃহস্পতি চতুর্থে, শুক্র ও রবি পঞ্চমে, বুধ ষষ্ঠে, শনি অষ্টমে এবং কেতু নবমে রয়েছেন।

শরীর একপ্রকার। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ে উন্নতির লক্ষণ আছে। কাজকর্ম শুভ। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। শুভ তারিখগুলো: ১, ৩, ৪, ৬, ৮ মার্চ।

বৃশ্চিক: রাহু ও মঙ্গল দ্বিতীয়ে, বৃহস্পতি তৃতীয়ে, শুক্র ও রবি চতুর্থে, বুধ পঞ্চমে, শনি সপ্তমে এবং কেতু অষ্টমে রয়েছেন।

শরীরটা সুবিধার নয়। নিদ্রাহীনতা বায়ুরোগে কষ্ট পেতে পারেন। মাঝে মাঝে পারিবারিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। চুরি, অর্থক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সম্পদ-সম্পত্তির ব্যাপারে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে মানসিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে।
শুভ তারিখগুলো: ২, ৫, ৭ মার্চ।

ধনু: রাহু ও মঙ্গল প্রথমে, বৃহস্পতি দ্বিতীয়ে, শুক্র ও রবি তৃতীয়ে, বুধ চতুর্থে, শনি, ষষ্ঠ এবং কেতু সপ্তম রয়েছেন।

মাঝে মাঝে শরীর সামান্য খারাপ হতে পারে। পারিবারিক অস্বস্তির সম্ভাবনা আছে। আয়বৃদ্ধি ও বকেয়া অর্থ লাভের লক্ষণ আছে। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কাজকর্ম শুভ। মেয়েদের পক্ষে মানসিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখগুলো: ১, ৩, ৪, ৬, ৮ মার্চ।

মকর: বৃহস্পতি প্রথমে, শুক্র ও রবি দ্বিতীয়ে, বুধ তৃতীয়ে, শনি পঞ্চমে, কেতু ষষ্ঠে, রাহু ও মঙ্গল দ্বাদশে অবস্থান করছেন।

চোখের রোগে, বায়ুর চাপে কষ্ট পেতে পারেন। পারিবারিক ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকা দরকার। আয় বাড়বে, ব্যয়ের চাপও বাড়বে। ব্যবসায় শুভ নয়। কর্মক্ষেত্রে অস্বস্তির ও অসন্তোষের লক্ষণ আছে। মেয়েদের সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখগুলো: ১, ৩, ৪, ৬, ৮ মার্চ।

কুম্ভ: শুক্র ও রবি প্রথমে, বুধ দ্বিতীয়ে, শনি চতুর্থে, কেতু পঞ্চমে, রাহু ও মঙ্গল একাদশে, বৃহস্পতি দ্বাদশে রয়েছেন।

শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনুকূল। আয় ভাল। ব্যবসায় আশাপ্রদ। কাজকর্মে খ্যাতি ও উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। মেয়েদের পক্ষে সময় অনুকূল। শুভ তারিখগুলো: ১, ২, ৩, ৪, ৬ ৮ মার্চ।

মীন: বুধ প্রথমে, শনি তৃতীয়ে, কেতু চতুর্থে, রাহু ও মঙ্গল দশমে, বৃহস্পতি একাদশে এবং শুক্র ও রবি দ্বাদশে রয়েছেন।

শরীর ভাল, রোগমুক্তির লক্ষণ আছে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে উন্নতির লক্ষণ আছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখগুলো: ১, ৩, ৪, ৬, ৮ মার্চ।

—শুভাচার্য
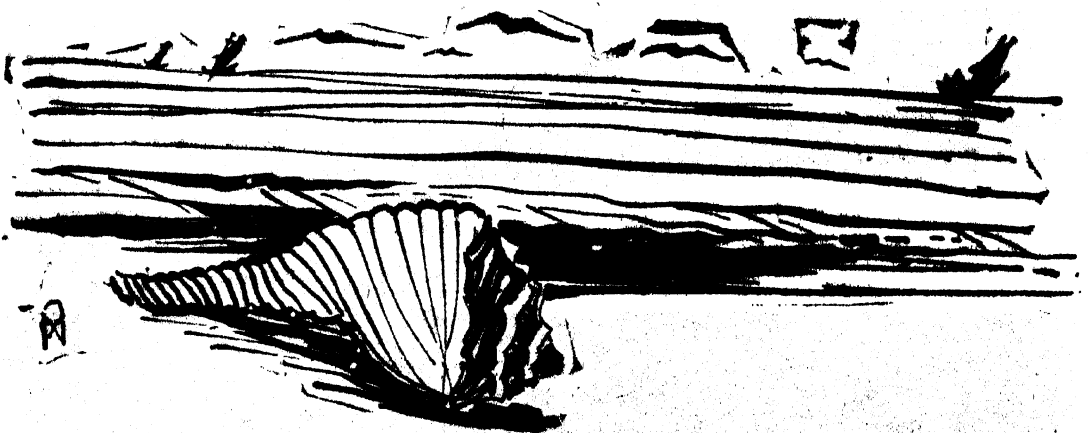
অঙ্গনা

হরেক রকমের পুতুল

কিছুদিন আগে ফ্রান্স প্রত্যাগত এক বাঙালী ভদ্রলোক গল্প করছিলেন ফ্রান্সের সকলেই শিল্পী। ছুটির দিনে ছেলে, বুড়ো ইজেল-ক্যানভাস কাঁধে নিয়ে সমুদ্রের ধারে নয়তো খোলা নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকে।' কিন্তু সকলে মিলে আঁকলেই যে কতগুলো মহৎ সৃষ্টি হ'ল—সেকথা কখনই বলা চলে না। তবুও একথা নিশ্চয়ই বলবো যে তাঁদের সকলের মধ্যে রয়েছে এক বিরাট শিল্পচেতনা, অন্তর দিয়ে তাঁরা শিল্পকে ভালবাসেন।

ঠিক ফ্রান্সের লোকেদের প্রতিচ্ছবি দেখলাম মিসেস সবিতা বসুর বাড়ীতে। পরিবারে স্বামী, আর এক পুত্র। তিনটি মানুষের সংসারে সময় হয়তো প্রচুর কিন্তু সংসারের খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজ নিজেরাই করেন। অল্পলোকের সংসার হলেও পরিবারের সকলেই যে শিল্পরসিক হবেন এটা একেবারেই দুর্লভ। সেদিক দিয়ে সবিতা বসু সৌভাগ্যশালিনী। স্বামী, পুত্রের আন্তরিক সহযোগিতাও তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যকে অনেকখানি বাড়িয়েছে।

মিসেস বোসের হাতে তৈরী নানারকম জিনিসের খবর পেয়ে একদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। দক্ষিণ কলকাতার এক দোতলা ছিমছাম বাড়ীতে সবিতা বোস বাস করেন। আমার যাওয়ার আগের দিন সবিতা বসু মাঘোৎসবে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, পরদিনও তার জের চলছিল। অতিথি-অভ্যাগতে ঘরদোর ভরা। তারি ফাঁকে তিনি আমাকে বসতে দিয়ে জনা-কয়েকের সঙ্গে কথা সেরে তাঁদের বিদায় দিলেন। একলা থাকার এই অবসরটুকুতে আমি একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। দুটো ঘরের মাঝে সবুজ পাড়ের আধাসিল্ক শাড়ীর এক পর্দা ঝুলছে। শাড়ীর পর্দায় আজকাল যদিও কোন নতুনত্ব নেই সত্যি কিন্তু মিসেস বোসের ঘরের পর্দার নীচে শাড়ীর ঝালরের সঙ্গে খান-কতক ঘন্টার মিষ্টি আওয়াজ নিঃসন্দেহে অভিনব। পর্দা নাড়ার সঙ্গে ঘন্টার মিষ্টি ধ্বনি একটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করছিল। জানলার পর্দারও অতি-সাধারণ খদ্দরের কাপড় দেওয়া পাড়ে। সেই একই বসার ঘরে রয়েছে ফ্রিজ থেকে ডাইনিং টেবিল, কোনটাতেই দামী জিনিসের বাহুল্য নেই অথচ সবগুলো সুন্দর, ছিমছাম, কাঠের সোফাগুলো অত্যন্ত সাধারণ অথচ তা অসাধারণ হয়ে উঠেছে পরিবারের প্রত্যেকের রুচিবোধে।

মিস্টার বোস হরেক রকমের পাখি পুষে বাড়ীতে একটা প্রায় মিনি-মিউজিয়াম তৈরী করেছেন। সেই মিউজিয়ামে যাবার পথে বাঁশের এক সুন্দর সিঁড়ি তৈরী করেছেন। মিস্টার বোস অবশ্য বললেন 'পয়সার অভাবে একসময় বাঁশের এই সিঁড়ি তৈরী করেছিলাম। কিন্তু এখন এটা ভেঙে ফেলব বলতেই অনেকে এটা রেখে দেবার জন্য অনুরোধ করছেন।'

দেওয়ালের একদিকে ছোট ছোট কত-গুলো তাক। তাতে রয়েছে নানান ঢং-এর কতগুলো পুতুল, তালপাতার খেলনা, ধানের ছড়া। আমার দেখা শেষ হবার আগেই মিসেস বোস একটা চেয়ার টেনে আমার সামনে এসে বসলেন। ঘরে খোলানো দু-একটি পুতুল দেখাবার পর উঠে গিয়ে নিজের হাতে তৈরী রকমারী পুতুল এনে একে একে জড়ো করলেন টেবিলের ওপর।

অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সাগ্রহ সংগ্রহে তৈরী পুতুল দেখতে গিয়ে তারই ফাঁকে তাঁর ঘর সাজাবার সুন্দর উপকরণগুলোও দেখেছিলাম।

পুতুল যেন বিভিন্ন যুগ, কাল আর দেশের মিলনের গ্রন্থি। যে কোন দেশের পুতুল তার নিজের দেশ, নিজের সমাজ, নিজের কাল—সেই দেশের জলমাটি হাওয়ার সঙ্গে একাত্ম—এক কথায় সে দেশের প্রতিভূ। আমার সামনে যখন সাঁওতাল মেয়েদের নাচের পুতুলগুলো এনে হাজির করলেন তখন মনে হল আমি রয়েছি সাঁওতাল পল্লীতে। মাদলের তালে তালে ওদের গ্রাম্য নাচের এক অদ্ভুত উন্মাদনায় আমিও অভিভূত। ওদের পরিবেশে আমি যেন একটুও বেমানান নই। মিসেস বোসের পুতুলগুলোর অধিকাংশই
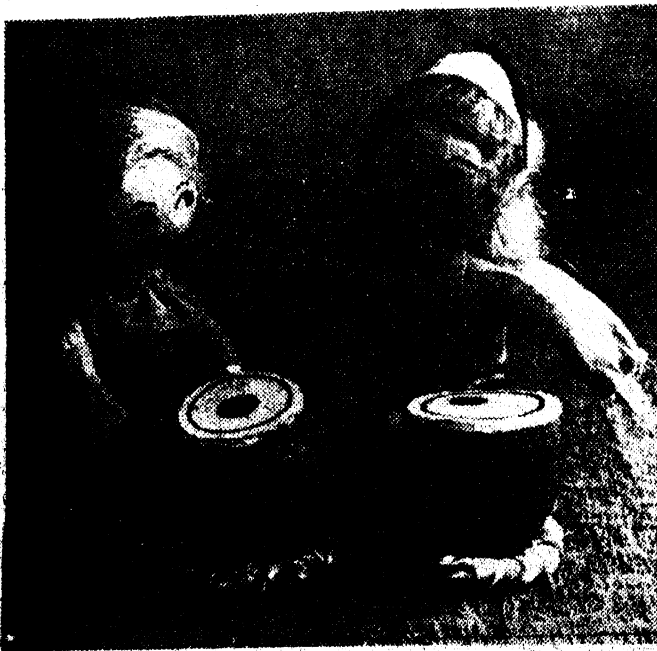
পাটে তৈরী। নতুন কেনা পাট থেকে শুরু করে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া পাটকে এইসব পুতুল তৈরীর কাজে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া রয়েছে হরেক রকমের জিনিস: দর্জির দোকানের টুকরো ছিটকাপড়, সমুদ্রের ঝিনুক, ট্যাসেল, জরি, ফুল ঝাড়ুর কাঠি, ব্যাটারী, মুরগীর ডিম, ঔষধের বাক্সের করুগেটেড কাগজ, পেস্টের ঢাকা, সিকোশ্লাস, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি।

ছোট ছোট জাপানী মেয়েদের পুতুলগুলো বার করে মিসেস বোস বললেন, 'এগুলো তৈরী করতে আমার মানসিক প্রস্তুতির সঙ্গে সময় ও পরিশ্রম অনেক লেগেছিল।' পুতুলগুলো ইঞ্চি দুই কি আড়াই হবে অথচ কত নিখুঁতভাবে তৈরী। দাঁড়িয়ে থাকা বা ছাতা মাথায় পুতুলগুলোর পোশাক আশাকের জাঁকজমক জাপান দেশের মেয়েদের যেন জীবন্ত রূপ। পুতুলগুলো তৈরী করতে ফুলঝাড়ুর কাঠি আর টুকরো কাপড়ই লেগেছে বেশী; জাপানী মেয়েদের চুল বাঁধার ঢং আনতে পুরনো ট্যাসেলকে ব্যবহার করা হয়েছে। মিসেস বোস কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন 'আমার বাড়ীর কোন জিনিসই ফেলনা যায় না। আত্মীয়-প্রতিবেশী অনেকেরই ফেলনা জিনিস এসে জড়ো হয় আমার ভাঁড়ারে। জড়ো করা জিনিসের সংগ্রহ দেখাতে বিরাট একটা ট্রাঙ্ক দেখালেন। জাপানী ডিনার সেটের মাটির পাত্র নিজের হাতেই তৈরী।

গড়গড়ার নলমুখে আয়েসীবাবুদের সংখ্যা বোধহয় আগের চেয়ে এখন অনেক কমেছে। ইজিচেয়ারে বসে প্রফুল্লবদনে বাবু য়ানীর চূড়ান্ত নিদর্শন মিললো পাটের তৈরী একটি পুতুলে। সামনের ল্যাম্পের স্ট্যান্ড তৈরী হয়েছে পেস্টের ঢাকা আর পিসবোর্ডের ওপর চকমকে কাপড় আটকে। বাঁশের কাঠির ইজিচেয়ার, নতুন সাদা আদ্দির পাতলুন, পাঞ্জাবী রাংতা জড়ানো মাটির গড়গড়া সবটাই মিসেস বোসের কীর্তি।

এছাড়া বিহারী ঝাড়ুদারনী, বঙ্গললনা কুলবধূ, মেছুনী, বাউল সবগুলো দেখে মনে হয় শিল্পী যেন দীর্ঘদিন ধরে সজাগ দৃষ্টি মেলে বাস্তবজগতের সবকটি জিনিস পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে তাদের সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। বাঁয়া-তবলা ছবিটিতে ব্যবহার করা ব্যাটারী দিয়ে তার ওপর কাপড় জড়িয়ে পুতুল করা হয়েছে। চুলগুলো পাটের। মুরগীর ডিমের ওপর রং করে বাঁয়া তবলা তৈরী করেছেন। ঝিনুকের তৈরী গরু গোপের পালিয়ে যাবার ভঙ্গি অতি সুন্দর।

এত বিচিত্র ধরনের পুতুল তৈরী করেছেন মিসেস বোস অথচ প্রতিটি প্রোপোরশন এত নিখুঁত যে দেখলে মনে হয় দীর্ঘদিনের স্কুল-কলেজের শিক্ষার ফল। অথচ কোনো বিদ্যায়তনের ছাপ নেই তার। মিসেস বোস নিজে শুধু শিল্পী নন

তিনি জন্ম দিয়েছেন এক শিল্পী-পরিবারের।

কথায় কথায় তিনি বললেন, শিল্পীদের হলে আমরা পারিবারিক ঐতিহ্যের উপহার দিতে ভালবাসি, এখানে এসে আমা অনেকের সঙ্গে আমরা আমাদের এক পরিবারের আত্মীয়বন্ধুদের জড়িয়ে রাখতে পারবো।

আমি বললাম, 'এগুলো বাইরে বিক্রীর জন্য রাখছেন না কেন?'

মিসেস বোস সরাসরি বললেন, 'আমি তো এটাকে ঠিক প্রোফেশন হিসেবে নিইনি। করতে ভাল লাগে তাই করছি। অবশ্য আমাদের ক্রাফটসম্যানদের একজিবিশন-এ কিছু বিক্রী হয়েছে। লাভের দিকে আমার কিন্তু কোনো ঝোঁক নেই।'

বললাম, 'ভাল করে একটা প্রদর্শনী করুন। অনেকে দেখে তৃপ্তি পাবে। তাছাড়া দামটা আকাশছোঁয়া না করলে নিশ্চয়ই এমন বিক্রী হবে না। বিশেষ করে বিদেশী টুরিস্ট বা সৌখীন বাঙালী এখনও এর মূল্য দিতে জানে।'

মনে মনে ভাবলাম প্রদর্শনী করুন আর নাই করুন একটা কুটীরশিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলে আরও অনেকের শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকারও একটা সম্ভাব্য উপায় হত।

—অঞ্জলি চৌধুরী

কলকাতায় মেয়ে সাংবাদিক নেই কেন?

অনেক দিন পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে এলাম। ঢুকেই অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। পরিবর্তন মানে পুরনো দেওয়ালে রং-এর প্রলেপ পড়েছে। অনেক ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে গেটের দিকে এগোচ্ছিল। দেখে বোঝা যায় ওদের বাইরেটা এখনও নতুন রং করা বাড়ীর মত চকচকে ঝকঝকে। মনের পলেস্তারা এখনো খসে পড়েনি।

যাই হোক বেশ খুশি খুশি লাগছিল। কেমন সব চেনা অথচ যেন অচেনা রহস্যময়ী। ঠিক অনেক অনেক দিন পর বিবাহিত মেয়েদের বাপের বাড়ী আসার মত। এমনি অনেক এলোমেলো কথা ভাবছিলাম।

একটি মেয়ের গলায় আমার নামটি শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। ও একটু অবাক হোল। প্রশ্ন করল—তুমি এখানে?

—এই এসেছিলাম।

ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী। কথা বলতে বলতে আশুতোষ বিল্ডিং ধরে ওপরে উঠলাম। আশুতোষ বিল্ডিং থেকে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংটির দিকে মিলন সেতুটি ধরে হেঁটে চললে চোখে পড়বে সাংবাদিকতা বিভাগটি। ১৯৫০ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগটি শুরু। যে কোর্স চালু হয় তা ডিপ্লোমা কোর্স নামে পরিচিত। অবশ্য ১৯৬৮ সাল থেকে এটিকে ডিগ্রিতে পরিণত করা হয়েছে। ওর সঙ্গে ওদের ডিপার্টমেন্টে গেলাম। অন্য সব বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ের তুলনায় এখানে ভিড় অনেক কম। আরো কম ছাত্রীদের ভিড়। তবে এপর্যন্ত অনেক মেয়েই এই বিশেষ বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। স্বভাবতই কৌতূহল হোল যারা ইতিমধ্যে এ বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন সেসব মেয়েরা কোথায় কি ধরনের কাজে নিযুক্ত আছেন? এরই মধ্যে আজ একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। ওর কাছে উত্তরটা তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলাম। জানলাম তাঁরা কেউ পাবলিক রিলেশনস পদে, কেউ রেডিও অফিসে, কেউ বা সরকারী কিংবা বেসরকারী অফিসে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত আছেন। এছাড়া বিজ্ঞাপন বিভাগে অনেকে কাজ পেয়ে থাকেন। এভাবে ভাগ্য অনুযায়ী কাজের সুযোগ ঘটে।

কিন্তু সে তো গেল। বর্তমানে ডিগ্রিতে উন্নীত হওয়ায় নিশ্চয়ই কিছুটা সুযোগ সুবিধা বেড়েছে।

মাষ্টার ডিগ্রির সমতুল্য হওয়ায় পাশ করার পর রিসার্চ-এর সুযোগ আছে। কিংবা লেকচারার পদেও নিযুক্ত হতে পারেন। যে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তার কাছে জানতে ইচ্ছে করল সাংবাদিকতা পড়তে আসার তা উদ্দেশ্য কি?

পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে এম-এ পড়তে না গিয়ে সাংবাদিকতা পড়তে আসার কি কারণ? বলল প্রথমতঃ স্নাতকোত্তর বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের যত ভিড় এখানে ততটা ভিড় নেই।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগতভাবে তার লক্ষ্য রিসার্চ করা যে সুযোগ অন্ততঃ আগের ছাত্রছাত্রীরা পান নি। অবশ্য ক্রমশঃ এ ডিপার্টমেন্টে নানা প্রকারের চেষ্টা চলছে। এর ফলে ভবিষ্যতে আরো সুযোগ লাভ করা সম্ভব।

এভাবে কাজ করার নানা সুযোগ হয়তো আছে কিন্তু তাদের সকলেরই এক প্রশ্ন কলকাতায় সংবাদপত্রগুলিতে মেয়েদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই কেন?

সত্যি অবাক হতে হয়। সংবাদপত্রগুলিতে রিপোর্টার কিংবা সাংবাদিকতার কাজ করতে উৎসাহী মেয়ে কি নেই?

অথচ ভারতবর্ষের অন্য শহরগুলিতে এ ব্যবস্থা আছে। সেখানে পত্রিকা অফিসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে মেয়েরা কাজ করে থাকেন। কিন্তু কলকাতায় নেই কেন? এ প্রশ্ন আজ অনেক মেয়ের মনেই।

কলকাতায় মেয়েরা উচ্চশিক্ষার জগৎ-এ, কর্মজগৎ-এ কোথাও পিছিয়ে নেই। এগিয়ে চলেছে পূর্ণ উদ্যমে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে। অনেক মেয়েরাই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, দেখিয়েছেন নানা বিভাগে বহুমুখী দক্ষতা।

তাই তো দেখি স্বাধীনতা উত্তর যুগে উচ্চশিক্ষার জন্য চাহিদা কলকাতার মেয়েদের মধ্যে যত বেশি অন্য শহরে তত নয়। উপার্জনের অনেক পথই এ শহরে খোলা। হাসপাতাল বিদ্যালয় থেকে শুরু করে ওকালতি, অফিসের ষ্টেনোগ্রাফার, ফার্মের রিসেপসনিষ্ট, কোম্পানির সেলস গার্ল—সব ক্ষেত্রেই শিক্ষিত মেয়েরা আছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে মেয়েরা বড় তুলেছেন মেয়েরা ব্যাঙ্ক, পোষ্টঅফিস, অফিস কাছারীতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। খেলার জগৎ-এও মেয়েরা আছেন। এমনকি পুলিশ বিভাগেও। তখন সাংবাদিকতার দ্বার রুদ্ধ কেন? বিশেষ করে ভারতের অন্য শহরে যখন মেয়েরা এ সুযোগ পেয়ে থাকেন।

সৃজনশীল কর্মেও কলকাতার মেয়েরা পিছিয়ে নেই, তাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এককথায় এ শহরে মেয়েরা সব ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় দর্শক নয় সক্রিয় অংশীদার। শুধু সাংবাদিকতার কাজেই এ শহরে তাদের কোন স্থান নেই। অবশ্য ফ্রি-ল্যান্সারদের কথা আলাদা।

তাই যখন আমরা অনেক কথা ভাবছি তখন একথা ভেবে দেখা দরকার কলকাতায় পত্রিকা অফিসগুলিতে মেয়েরা থাকবে না কেন?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের নানা সম্প্রসারণ-সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের এই বিশেষ সুযোগটির কথা নিশ্চয়ই ভাবতে হবে, অন্যথায় এ পাঠক্রম তাদের কাছে অর্থশূন্য ঠেকবে না কি?

একটি জাতিকে গড়ে তুলতে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাংবাদিকের দায়িত্বও সীমাহীন। এ দায়িত্ব মেয়েদেরও। উৎসাহী মেয়েদের দিতে হবে এ কাজে পূর্ণ সুযোগ।

—অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

রাজা-রাণী

ফিল্ম কুঞ্জ-এর পতাকাতলে যে ওম-প্রকাশ নিবেদিত, জগদীশকুমার প্রযোজিত এবং শচীন ভৌমিক লিখিত ও পরিচালিত 'রাজারাণী'র কাহিনীর মধ্যে যে মানবিক অবেদন আছে, তা বাস্তব অবাস্তবের বিচার-বুদ্ধিকে স্তব্ধ করে দিয়ে রসিক দর্শককে মুগ্ধ না করে পারে না। এই ছবির নায়ক রাজার মতো দুর্ভাগা আমরা সংসারে অনেক দেখেছি, যারা স্রেফ অদৃষ্টের কারসাজিতে ভালো হতে চেয়েও ভালো হতে পারেনি, যারা মানুষের ভালো করতে গিয়েও অদৃষ্ট-দোষে মন্দ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, সংসারে যারা শুধু হেরে যাবার জন্যেই জন্মেছে। তেমনই নায়িকা রাণীর মতো রূপ-যৌবন-সম্পন্না মেয়েও আমাদের চোখে পড়েছে, শৈশবে মা-বাপ হারানোর দুর্ভাগ্য নিয়ে যাদের সংসারের কুটিল পথ চলা শুরু হয়েছে, প্রাণপণে লড়াই করে চলেও যারা কুলটার বদনামকে অঙ্গের ভূষণ করতে বাধ্য হয়েছে, জীবনের পরম সম্পদ ইজ্জত রক্ষার জন্যে নরহত্যার দায়ে যারা আদালতে অভি-যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন কারাবাস ভোগ করেছে—নায়ক রাজা ও নায়িকা রাণীর জীবনের অন্ধকারের দিকটা জীবনের বাস্তবকে প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু যেভাবে শেষ পর্যন্ত দুঃখনিশার অবসান ঘটিয়ে তাদের সামাজিক সুখের স্বর্গে পৌঁছে দেওয়া হল, সেটাকে প্রায় আকাশকুসুমই বা উইসফুল থিঙ্কিংই বলা চলে। তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, এই আকাশকুসুম রচনাই সকল দর্শকের সঙ্গে আমাদেরও খুশী করেছে। কাহিনীকে যে চিত্তগ্রাহীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাতে আমাদের মন নিয়তই চেয়েছে ওদের শুভ দেখতে। ওরা যে সত্যিই ভালো।

না, রাজারাণী'র কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার আমরা এখানে দেব না। কাহিনীর ভিতর অসম্ভব পরিস্থিতি আছে বৈকি, ফুলের ঝালর ঝুরি দিয়ে ঢাকা মুখ নিয়ে বরের পোশাক-পরা রাজার একজন আদালতের বিচারপতির ছেলে হিসেবে বিয়ে হবে যাওয়ার মধ্যে যতই কৌতুক থাকুক না কেন, বাস্তবতার নামগন্ধ নেই। কিন্তু তবু বলব, সচরাচর হিন্দী ছবিতে যে পাহাড়প্রমাণ অবাস্তবতা, প্রেমের নামে দেহ নিয়ে নাচা-নাচি, প্রতিহিংসা, লড়াই প্রভৃতি বস্তাপচা দৃশ্য দেখা যায়, 'রাজারাণী'তে তা প্রায় [illegible]

মর্জিনা আবদাল্লা/ মিঠু এবং দেবরাজ

মতো, ভালোবাসবার মতো চরিত্র, পরিস্থিতি সংলাপ ও গান আছে বহুল পরিমাণে, যা দেখে ও শুনে রসিক দর্শকের মন-প্রাণ খুশীতে ভরে উঠবে।

সুন্দর, সংযত, অথচ হৃদয়সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন রাজেশ খান্না নায়ক রাজার ভূমিকায়। চরিত্রটিকে যে তিনি ভালোবাসেন, তা বোঝা যায়, যখন অনেক কথা তিনি এমন আস্তে বলেছেন যে, প্রায় শুনতে না পাওয়ার মতো। তাঁর চলচ্চিত্রজীবনে এই ভূমিকাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবন্ত অভিনয় করেছেন নায়িকা রাণীর চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর। ভূমিকাটিতে আমরা যেন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছি। এই ছবিতে শ্রীমতী নাচে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা প্রায় অতুলনীয়।

রাণীর পরামর্শে যে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নতুন চোখে দেখলেন, সেই ভূমিকায় রাজ মেহেরার অভিনয় হয়েছে চিত্তাকর্ষক। রাজার বন্ধু টনি বেশে সুরেশ দরণী, সাবলীল অভিনয়ের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। কাহিনী নির্মাতার ভূমিকায় ডেভিড একটি সুন্দর চরিত্র অংকনের সুযোগ পেয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কমল কাপুর, রঞ্জ ভরদ্বাজ, পরভীন পাল, নাজ, অসিত সেন, কানু রায়, ইফতিকার, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

কলাকুশলীদের বিভিন্ন বিভাগে ছবির কাজ আশানুরূপ ভাবে উচ্চ শ্রেণীর। রাত্রি কালের বহির্দৃশ্যগুলি ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকে অপরূপ সাহায্য করেছে রমেশ পন্থ রচিত সংলাপ। কাহিনীর গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পাদনা করেছেন প্রতাপ দাবে। সুরচিত গানগুলিতে আবেদন সৃষ্টিকারী সুরযোজনা করেছেন রাহুল দেববর্মণ। বেশ কয়েকখানি গান জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

ফিল্ম কুঞ্জ-এর পতাকাতলে নির্মিত শচীন ভৌমিক লিখিত ও পরিচালিত 'রাজারাণী' একটি বক্তব্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ছবি হিসেবে দর্শক অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

পরিবর্তন

জি এন শিবদাসানি নিবেদিত এবং দয়াশঙ্কর নন্দকান্তিয়া প্রযোজিত ও পরিচালিত ইস্টম্যান কালার রঞ্জিত হিন্দী ছবি 'পরিবর্তন' সম্বন্ধে যেটি সবচেয়ে বড়ো কথা

ডি এম এল বিভাগের কর্মীরা বিশ্বরূপা মঞ্চে 'কেদার রায়' নাটকটি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেন। এই সাফল্যের পিছনে শিল্পীদের সার্থক দলগত অভিনয় ও পরিচালক সুশীল চ্যাটার্জির দক্ষতা অনস্বীকার্য। ষোড়শ শতকের পটভূমিকায় রচিত এই ঐতিহাসিক নাটকটির কয়েকটি দৃশ্য শিল্পীদের নিপুণ অভিনয়ের গুণে দর্শকদের সামনে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অমৃতে বহুবার 'কেদার রায়' নাটকটির সারাংশ প্রকাশিত হওয়ায় নতুন করে এর কাহিনী-বিন্যাসে না গিয়ে অভিনয়াংশে প্রথমেই যাঁদের নাম করতে হয়, তাঁরা হলেন চাঁদ রায়রূপী দেবব্রত চক্রবর্তী, কেদার রায়রূপী কানুপ্রিয় রায়চৌধুরী ও ঈশা খাঁরূপী গোপাল মুখার্জি। এছাড়া শ্রীমন্তের চরিত্রে পরেশ আচার্য, কালু সর্দারের ভূমিকায় শিশির মৌলিক ও কিলমক খাঁরূপী রেণুপদ সিংহরায়কে দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। কার্ভালো চরিত্রে গোবিন্দ গাংগুলীর অভিনয় সুন্দর। রামপদ চট্টোপাধ্যায়ের মানসিংহ বেশ মানানসই। বিকাশ হাইতের চরিত্র সৃষ্টিও উপেক্ষণীয় নয়। স্ত্রী-চরিত্রে অনুরাধা দাশগুপ্ত, পাপিয়া চট্টোপাধ্যায় ও বুলবুল চট্টোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন বরেন সরকার, পিযূষ ভট্টাচার্য, সুশীল বসু, মলিন বসু, নির্মল আচার্য, শ্যামাপ্রসাদ দে, রাখাল দত্ত, সুকুমার হালদার, বিজন ভট্টাচার্য, হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব ঘোষ, গৌর ঘোষ, অনিল ঘোষ, দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাদাস দত্ত ও মধুসূদন দাস।

নাট্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভে অনুষ্ঠান-সভাপতি শ্রী স দত্ত (ডি ভি এম এল) ক্লাবের সর্বাংগীণ উন্নতি কামনা করে এরূপ নাট্যানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ক্লাবের সম্পাদক ইন্দুভূষণ মুখার্জি সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তরুণ অপেরার 'ওথেলো' যাত্রাভিনয়

পশ্চিমবংগের যাত্রাভিনয়ে শেক্সপীয়ারের ওথেলো! নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বলতে পারেন, যে-তরুণ অপেরা একদা হিটলার এবং লেনিন পালা দ্বারা যাত্রামোদের শ্রোতাদের অভিভূত করেছে, সেই তরুণ অপেরা 'ওথেলো' করবে, এ আর এমন বিচিত্র কি! কিন্তু দুই-ই কি এক জাতীয়? বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানী শৃংখল থেকে মুক্ত হতে আমরণ সংগ্রাম পণ করেছেন, পশ্চিমবংগের রাজনৈতিক আবহাওয়া যখন দলগত হানাহানি দ্বারা কলুষিত, তখন দেশের জনসাধারণের কাছে স্বাদেশিকতার বাণী বহন করে আনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। তারই ফলে জন্ম নিয়েছিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, শহীদ সূর্যসেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, দিল্লী চলো প্রভৃতি যাত্রাপালা। তরুণ অপেরা এই আবহাওয়াতেই দেশের উপকরণ ভাল না বসিয়ে বিদেশ থেকে সংগৃহীত উপকরণে যাত্রালক্ষ্মীর সেবা করেছিলেন 'হিটলার' ও 'লেনিন' পালার নৈবেদ্য সাজিয়ে। তরুণ অপেরার কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেছিলেন, বিষয়বস্তু যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে ঘটনা এদেশের, কি ও-দেশের, তা নিয়ে দর্শক মাথা ঘামায় না, চরিত্রের বিজাতীয় নামেও কিছু যায় আসে না। অতীতের এই অভিজ্ঞতাই, বোধ করি, তরুণ অপেরার কর্তৃপক্ষকে সাহস যুগিয়েছে শেকসপীয়ারের বিখ্যাত নাটক 'ওথেলো'র বাংলা যাত্রাভিনয় যাত্রামোদী দর্শকবৃন্দকে উপহার দিতে। অশিক্ষিত মনে সন্দেহের বীজ বপন করা সহজ এবং সন্দেহবিষে জর্জর মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনে—এই মানবিক বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে ওথেলো নাটকের মাধ্যমে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুবাদকে সামনে রেখে মাত্র দশটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একটি আড়াই ঘন্টার উপাদেয় যাত্রানাটক রচনা করেছেন নাট্য-পরিচালক অমর ঘোষ। বলা-বাহুল্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা শান্তিগোপাল নাম-ভূমিকায় চরিত্রটির মর্মকথাকে উদ্ঘাটিত করেছেন ভাবোন্মাদনাপূর্ণ অভিনয়ের মাধ্যমে। শঠ, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ইয়াগো চরিত্রটিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে রূপায়িত করেছেন হিমাংশু দাস। অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত ক্যাশিওর ভূমিকায় সুদেশকুমার প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। হাস্যরসাত্মক চরিত্র 'ভুড়ুভুড়ু'কে সজীব করে তুলেছেন শিব ভট্টাচার্য। নিষ্পাপ, সরলপ্রাণা দেসডিমোনার ভূমিকায় মিতা তালুকদার সহজ, স্বাভাবিক, দরদী অভিনয় করেছেন। বিয়াঙ্কা, এমিলিয়া ও মারিয়ানা বেশে যথাক্রমে শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, গায়ত্রী দাস ও সোনালী গোস্বামী চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। বিয়াঙ্কার গানগুলি আরও সংগীত হওয়া উচিত ছিল।

বাঙলাভাষায় ইংরেজী নাটক 'ইনকিলাব'

আসিফ করিমভয়ের নতুন নাটক 'ইনকিলাব' (ইংরেজী) দিল্লীতে 'যান্ত্রিক' নাট্যসম্প্রদায়ের জন্য মাইকেলের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। এরই অব্যবহিত পরে মাত্র গেল হপ্তায় ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে মূলে নাটকটি ধনঞ্জয় বৈরাগী দ্বারা বাঙলায় অনূদিত হয়ে থিয়েটার সেন্টার দ্বারা অভিনীত হয়ে গেল কলকাতার কলামন্দিরে।

হেমেন গাংগুলীর নতুন চিত্রগৃহ রাঁচীর 'প্লাজা'

চলচ্চিত্র প্রযোজক হেমেন গাংগুলীর নব নির্মিত রাঁচীর 'প্লাজা' নামের চিত্রগৃহটির শুভ দ্বার উদ্ঘাটন পর্ব বিশেষ আড়ম্বরের সংগে সমাপ্ত হয় ৯ ফেব্রুয়ারী। এই মাংগলিক অনুষ্ঠান করেন সাধক শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী বিরজানন্দ ভারতী (শ্রীশ্রী ক্ষ্যাপা মনোহর ঠাকুর)। জলযোগের দ্বারা উপস্থিত সকলকে আপ্যায়ন করেন ভাস্কর গাংগুলী। উপস্থিত গুণীজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন গিরিডির এম-পি চপলা ভট্টাচার্য, রাঁচীর জেলার মিঃ এস কে ব্যানার্জি, পাটনার আই-জি নারায়ণ গুপ্ত, নাট্যকার হরিপদ বসু, নেফার সুবেদার মিঃ এন কে আচার্য ও আরো অনেকে। মনোহর দেবাশ্রম সংঘের প্রাণকেন্দ্র শ্রীশ্রীমা তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছিলেন শ্রীগাংগুলীর এ প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ জানাতে।

পুরুলিয়া রাধাকুঞ্জে সংগীতানুষ্ঠান

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী বিরজানন্দ ভারতী (শ্রীশ্রী ক্ষ্যাপামনোহর ঠাকুর) প্রতিষ্ঠিত পুরুলিয়া রাধাকুঞ্জে এক বিরাট সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। তবে এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন ঘরোয়ানার বাউল গান—যা সত্য সত্যই খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এছাড়া রবীন্দ্রসংগীত বাগদেবী বন্দনা গীতিও ঠাঁই পেয়েছিল এই আসরে। রবীন্দ্র সংগীতের পর বাগদেবী বন্দনাগীতি গেয়ে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন রাধাকুঞ্জের অন্যতম কর্ণধার শ্রীরাধানাথ ঠাকুরের কন্যা কুমারী জাহ্নবী ঠাকুর। সবশেষে আকর্ষণীয় অংশে রূপদান করে শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা মনোহর ঠাকুর মুখে মুখে রচিত তাঁর বাউল সংগীত পরিবেশন করে। উপস্থিত অতিথিমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন নলিনীবিহারী সরকার (প্রখ্যাত আইনজীবী) নেফা বর্ডারের সুবেদার মিঃ এন আচার্য্য ফরেস্ট অফিসার পুরুলিয়া জেলা—মিঃ খেসা, পুরুলিয়ার প্রাক্তন পুলিশ সুপার খগেন চ্যাটার্জি, নাট্যকার হরিপদ বসু ও চিত্র প্রযোজক হেমেন গাংগুলীর সহধর্মিণী শ্রীমতী রমা দেবী।

'সূর্যগ্রাস' অভিনয় : সম্প্রতি পঞ্চমুখ নাট্য সংস্থার শিল্পীরা রঙ্গনা মঞ্চে কমল লাহিড়ী বিরচিত 'সূর্যগ্রাস' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন। নাট্যকার কমল লাহিড়ী সূর্যগ্রাস নাটকের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে বর্তমানের একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কিভাবে অন্যায়-অত্যাচার চলে এবং সেখানকার মহিলা কর্মীরা কি ধরনের মানসিক অবমাননার মধ্যে চাকরি করে ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হন। নিষ্ঠাবান সৎ কর্মী কিভাবে চক্রান্তের শিকার হয়ে চাকুরিচ্যুত হবার পর অভাবের জ্বালায় একমাত্র পুত্রসন্তানকে হত্যা করে জেলে যান, এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। পরিচালক শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই নিষ্ঠার সংগে নাটকটি পরিচালনা করেছেন। তাঁর সুপরিচালনায় গুণে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বোম্বাই থেকে

চন্দ্রমোহন নিম্বলকর মারা গেলেন কিছুদিন আগে। তিরিশের দশকের প্রিয়দর্শন জনপ্রিয় অভিনেতা নিম্বলকর। সেকালের চলচ্চিত্র মহল মানেই কলকাতা। রাধা ফিল্মসের আমন্ত্রণে অভিনয়ে অংশ নিতে সেই কলকাতায় পাড়ি জমান নিম্বলকর। সম্প্রতিকালে অবশ্য তিনি সক্রিয়ভাবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং মহামূল্যবান উপদেশ একালের বহু অভিনেতাকে নিঃসন্দেহে পাথেয় যুগিয়েছে। রাজেন্দ্রকুমার তাঁর শিষ্যবর্গের অন্যতম।

রাজকাপুরের 'মেরা নাম জোকার'-এ নিম্বলকরের পুনরাবির্ভাব সম্ভব হত, যদি না বিধি বাম হয়ে দাঁড়াত। 'মেরা নাম জোকার'-এর স্যুটিং চলাকালে এক দুর্ঘটনায় আহত হলেন নিম্বলকর, শয্যা আশ্রয় করতে হল বাধ্য হয়েই। রাজ তখনই আর কে ফিল্মস থেকে তাঁর জন্যে মাসিক ৫০০ টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেন। নিম্বলকর মানা করেছিলেন, রাজকে জানিয়েছিলেন—প্রয়োজন নেই। রাজের বক্তব্য অন্য—দুর্ঘটনা ঘটেছে স্যুটিং চলাকালে, অতএব এই মাসোহারা দিতে তাঁর কোম্পানী বাধ্য। সেই থেকে প্রতি মাসে আর কে স্টুডিয়ার পক্ষ থেকে মাসোহারা পেয়ে আসছিলেন নিম্বলকর তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটানা সাড়ে তিন বছর।

সব থেকে দুঃখের বিষয় সম্প্রীতি-বোধের এই ভাবটি চিত্রজগতের সর্বত্র সমান জাগ্রত নেই। অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রতারকারা প্রযোজকের প্রতি ক্ষুব্ধ, প্রযোজকও ততোধিক। স্যুটিং শুরু হবে। সেট রেডি। ব্যস্ত-ব্যস্ত পরিচালক, কলাকুশলী। অথচ নায়িকার দেখা নেই। ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়, প্রযোজকের সঙ্গে দেনাপাওনা সংক্রান্ত ব্যাপারে মতান্তর। সংশ্লিষ্ট মহল জানান মাদ্রাজের প্রযোজকদের কাছে তারকাদের রাগ কাড়ার যো থাকে না। কারণ তারকাদেরই সুবিধে অনুযায়ী ডেট, এবং রেট অনুযায়ী হাতে হাতে টাকা। অতঃপর প্লেনের টিকিট, হোটেল ইত্যাদি যাবতীয় বন্দোবস্ত যান্ত্রিক নিয়মে সুসম্পন্ন। বিনিময়ে প্রাপ্য কাজ পুরো মাত্রায় উসুল।

বোম্বাইতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। কিছুদিন আগে প্রযোজক শাওন-কুমার নবাগতা নীতু সিংকে চুক্তিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর আগামী তিনটি ছবির জন্য। প্রথমটি পাঁচ হাজার, দ্বিতীয়টি দশ হাজার এবং তৃতীয়টি পনেরো হাজার—অনেকটা এই রকম ছিল বন্দোবস্ত। ইতিমধ্যে নীতু সিং জেমিনী'র আমন্ত্রণ পান। নবাগতার পক্ষে এই আমন্ত্রণ স্বভাবতঃই লাভজনক, লোভ-জনকও বটে। নীতু শাওনের অনুমতি চান। শাওনের ছবির দিন এগিয়ে আসছিল তা সত্ত্বেও তিনি অনুমতি দেন। এর অন্য কারণও অবশ্যই ছিল। জেমিনী'র দৌলতে নীতুর পাবলিসিটি, ফলতঃ শাওনের আগামী তিনটি ছবিরও পাবলিসিটি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতু মাদ্রাজে গিয়েছিলেন, তার পর থেকে বোম্বাইতে তাঁর পাত্তাই পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে দুবার স্যুটিং-এর ডেট ক্যান্সেল করতে হয়েছে শাওনকে।

বাস্তবিক, বোম্বাই-এর প্রযোজক সম্প্রদায় এখন তেমন নিশ্চিন্ত নন। প্রধানতঃ কাহিনী বিন্যাস, খা রাজেশ খান্না, শর্মিলা ঠাকুরের মত বড় নামও তেমন ব্যবসায়িক সাফল্য দিতে পারছে না। অথচ 'কোসিস'-এর মত চটকহীন ছবির বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্যে তাঁদের ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। দর্শকজনের মেরুদণ্ডের সুতোর নাগাল আর তেমন করে পাওয়া যাচ্ছে না। 'আনন্দ'-খ্যাত অমিতাভ বচ্চন সম্বন্ধেও প্রযোজক মহল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। অমিতাভ অভিনীত বেশ কয়েকটি ছবির খবর আশাজনক নয়। অথচ অমিতাভ অভিনীত আরও বেশ কয়েকটি ছবিও অচিরেই মুক্তি পাবে। প্রযোজকেরা তাই তাঁর সাফল্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছেন।

শুধু যে চিত্র তারকারাই মাঝে মাঝে বেঁকে দাঁড়াচ্ছেন তাই নয়, তাঁদের ছোট সংস্করণ, অর্থাৎ জুনিয়র আর্টিস্ট অর্থাৎ একস্ট্রা সম্প্রদায় রীতিমত তিক্ত মনোভাবাপন্ন। এরই ফলশ্রুতি, চিত্রশিল্প এক ধর্মঘট সংঘটিত হতে চলেছিল। প্রস্তুতকারক সকলেই তাড়াহুড়োয় নিজেদের কাজ শেষ করে ফেলেছিলেন। অবশ্য শেষ মুহূর্তে প্রযোজকরা সমঝোতায় আসতে পারেন, ও ধর্মঘট এড়াতে সফল হন। কি কি শর্তে প্রযোজকরা সমঝোতায় আসেন তা এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়নি।

কলোটি/অমিতাভ বচ্চন। পরিচালনা : অরবিন্দ সেন

ছায়াছবির জগতে যেসব কায়াহীনের বিভীষিকা—অর্থাৎ ভূতের দৌরাত্ম্য মাঝে মাঝে দেখা দেয়, তেমনি এক অপদেবতার কোপ সামলাতে স্থানীয় চলচ্চিত্র কর্মী সংঘের ফেডারেশনকে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হয়। কয়েকটা স্যুটিংও বানচাল হয়েছে। গত মাসে এখানের টেলিভিশনে 'ইয়ে অনজানে' (এই অজানা) শীর্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'এক্সট্রা' বলে পরিচিতদের (ছোট ভূমিকায় যাঁরা কাজ করেন) কাজের অবস্থা আলোচনা করেন। প্রযোজক বি আর চোপরা, অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন তাঁদের মতামত জানানোর পর ওই 'এক্সট্রা'দের কয়েকজন নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় খোলাখুলি কিছু কথা বলেন। এক স্পষ্টবাদিনী মহিলা তো ওদের অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু প্রযোজকের লালসা চরিতার্থ করার অপচেষ্টার কথা জানান। তাছাড়া, কালো টাকা সাদা করার জন্যে ও'দের ফাঁপানো রসিদ ব্যবহার করার কথাও উল্লেখ করেন। এসব কথা কিছু নতুন নয়, সরকারি কমিটি কমিশনেও আগে এসবের উল্লেখ হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানকার অল ইণ্ডিয়া প্রোডিউসারস কাউন্সিল ক্ষেপে উঠে ফেডারেশনের কাছে দাবী জানালেন 'এক্সট্রা'দের জুনিয়ার আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে যেন 'ব্যান' করে দেওয়া হয়। ফেডারেশনের সভাপতি অভিনেতা মনমোহন কৃষ্ণ এই দাবী অগণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক বলে বাতিল করে 'ইয়ে অনজানে' এক সেরা অনুষ্ঠান স্বীকার করেন। তিনি টেলিভিশনকে অভিনন্দন জানান।

আপনারা শুনে সুখী হবেন যে নূতন আবার হিন্দি ছবির অভিনেত্রীর দুর্ভিক্ষ দূর করতে সগৌরবে এসে হাজির হয়েছেন। 'বন্দিনীর' নূতনকে আর দেখা যাবে না—এ ভাবনাটা কষ্টকর ছিল। শক্তি সামন্তের ছবি 'অনুরাগে' আছেন নূতন। বিমল কর়ের কাহিনী 'গ্রহণ' অবলম্বনে ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশনের ছবি, সুনীল ঘোষের পরিচলনায় নূতন প্রধানা চরিত্রে আছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বসন্ত চৌধুরী আর ভুবন সোম খ্যাতা সুহাসিনী! সুনীল ঘোষের কাছে শুনলাম নূতন এখনো তেমনি নূতনই আছেন। কাজের সময়ে নূতন সর্বদাই একেবারে ইউনিটের একজন হয়ে যান। কোনো নায়িকাসুলভ এয়ারকণ্ডিশণ্ড আবরণী থাকে না তাঁর চার পাশে। নূতন তাঁর পরিচালক স্বামীর ছবির কাজেও শট্-কনটিনিউটি থেকে এডিটিং পর্যন্ত সবকিছুতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করতেন। এখনো তেমনি করে থাকেন। সম্প্রতি রাজশ্রী প্রোডাকশানসের ছবি 'সওদাগর'-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে কলকাতার কাছে গেছেন। 'সওদাগর' হল প্রখ্যাত বাংলা গল্প 'রস'-এর হিন্দি চিত্ররূপ। পরিচালনা করছেন সুধেন্দু রায় যিনি রাজশ্রীর আগের ছবি 'উপহার' পরিচালনা করেছিলেন। এই ছবিতে গান লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন কলকাতার অন্ধ সুরকার শ্রীরবীন্দ্র জৈন। রবীন্দ্রজী অনেক ছবিতেই এখন সুর দিচ্ছেন। সওদাগরের গান বাজারে এলেই নিঃসন্দেহে উনি প্রথম শ্রেণীর সুরকার হিসেবে গণ্য হবেন। সওদাগরের নায়ক অমিতাভ বচ্চন। অন্য নায়িকা পদ্মা খান্না। পদ্মার পক্ষেও এই ছবি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ক্যাবারে নাচের, আর প্রায় বিবস্ত্র দৃশ্যের প্রতি বীতরাগ হয়ে উনি অনেকগুলো ছবির প্রস্তাব নাকচ করেছেন। আমায় বললেন, দেখুন তো, যদি রাহুগীর চলতে, বা রাহুগীরের কথা লোকে মনে রাখত তাহলে কি আমাকে এমন বেলাল্লাপনা করেই কাটাতে হতো। এখানে অনেকেই মনে করেন খুব শিগগিরই পদ্মাও মমতাজের মত নাচতে নাচতে শেষে নায়িকা হয়ে যাবেন। কেননা, পদ্মা সত্যিই ভাল অভিনয় করেন। তার প্রমাণ উনি বহুবার দিয়েছেন। মুকুল দত্তের ছবি 'আজ কি রাধা'র সেটে ও'র সঙ্গে সেদিন দেখা হল। সেখানে ভগ্নহৃদয় এক নর্তকীর ভূমিকায় ও'কে দেখলাম। নর্তকীর ভূমিকা হলেও ছবিতে নাচ একটিই, সেই প্রসঙ্গে কথাটা উঠলো। আসলে অভিনয় করার অনেক সুযোগ আছে বলেই ওই ভূমিকাটি পদ্মার খুব পছন্দ দেখলাম। এই ছবিতে ও'র সঙ্গে দুই উর্বশী পুরস্কারপ্রাপ্তা নায়িকা রেহানা সুলতান ও ওয়াহিদা রহমানও আছেন।

জ্যোতির্ময় রায়ের 'কাঁচামিঠে' অবলম্বনে একটি হাস্যরসের ছবি শেষ করেছেন দেবু সেন। তাঁর আগের ছবি ছিল বিমল রায় প্রোডাকশানের 'দো দুনী চার'। শোনা যাচ্ছে, এতদিন বাদে ব্যবসায়িক জটিলতা কাটিয়ে কিশোর-তনুজা অভিনীত 'দো দুনী চার' রাজশ্রী কর্তৃক পরিবেশিত হয়ে কলকাতা ও অন্যত্র পর্দায় দেখা দেবে। 'অনুভবে'র সাফল্যের পর বাসু ভট্টাচার্য রাজেশ শর্মিলা তারকামণ্ডিত যে নতুন ছবি করছেন, জানা গেল, তাতে অভিনবত্বের একটা নজীর পাওয়া যাবে। কানু রায় সুরারোপিত একটি গানে মান্না দে কোনো যন্ত্রসংগীতের সঙ্গ ছাড়াই কণ্ঠদান করেছেন।

—পুরন্দর
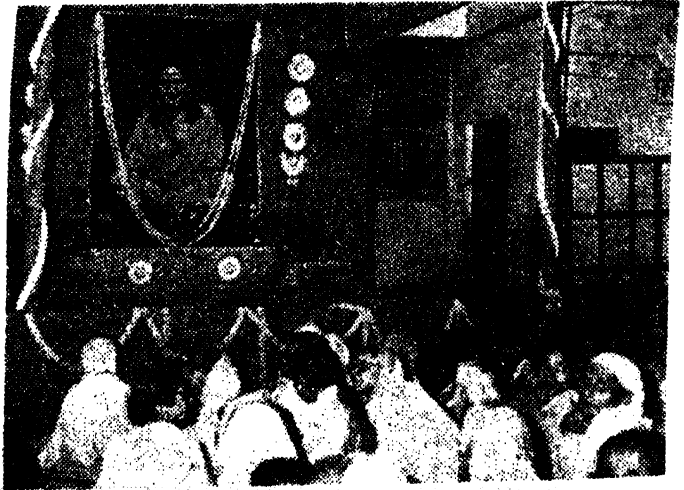
গত ৩রা ফাল্গুন তারিখে ২৬ নং গৌরীমাতা সরণীস্থিত (কলিকাতা-৪) শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রমে শ্রীশ্রী গৌরীমাতার জন্মবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়ে গেল। তাহাতে বহু ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট খেলা

কিংস্টনের সাবিনা পার্কে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি ড্র গেছে। এই দুই দেশের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা ড্র হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এই নিয়ে যে ৩১টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৭, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৬, খেলা ড্র ৭ এবং টাই ১। ইতিপূর্বে এই দুই দেশের মধ্যে যে ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৫ বার এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ১ বার—১৯৬৫ সালে গ্যারী সোবার্সের নেতৃত্বে ২—১ খেলায় (ড্র ২)। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৭৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে দুই দেশের তৃতীয় টেস্ট সিরিজের আসর।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৯০ রান সংগ্রহ করেছিল। উপযুক্ত আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৬২ মিনিট আগে খেলাটি বন্ধ করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসের ৪২৮ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন তারা আরও তিনটে উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৯০ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ২৩৮ রান যোগ করেছিল। উইকেটকিপার রডনি মার্শ মাত্র সাত রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। এইদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রবীণ টেস্ট খেলোয়াড় ল্যান্স গিবস চারটি উইকেট পাওয়ার সূত্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে মোট ২১৬টি উইকেট পেয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেন। পূর্ব রেকর্ড ছিল ২১৫টি—বিশ্বখ্যাত অলরাউণ্ডার গ্যারী সোবার্সের।

দ্বিতীয় দিনের বাকি ৬৫ মিনিটের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩০০ (৪ উইকেটে)। এইদিনের খেলায় তারা তিনটে উইকেট
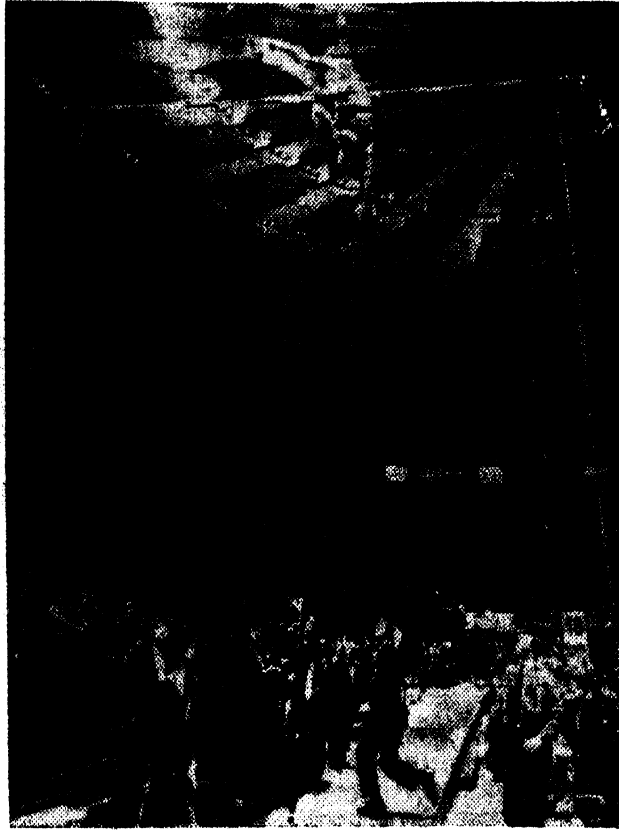
কালিফোর্নিয়ার লং বীচের ২১ বছরের ছাত্র স্টেভ স্মিথ ইনডোর পোলভল্টে ১৮ ফিট [illegible] ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ইনডোর পোলভল্টে ১৮ ফিট উচ্চতা অতিক্রমের নজির এই প্রথম।

খুইয়ে ২৬১ রান তুলেছিল। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে কালীচরণ (৫০ রান) এবং লরেন্স রো (৭৬ রান) ১১৬ রান তুলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ডকে স্পর্শ করেন (পূর্ব রেকর্ড : ১১৬ রান—হান্ট এবং বুচার, সাবিনা পার্ক, ১৯৬৫)। অপরদিকে মরিস ফস্টারের সহযোগিতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নতুন অধিনায়ক রোহন কানহাই অসমাপ্ত ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৩৫ রান তুলেছিলেন। কানহাই ৬০ রান এবং ফস্টার ৬৯ রান সংগ্রহ করে নটআউট থাকেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪২৮ রানের মাথায় শেষ হয়। ৫ম উইকেটের জুটিতে মরিস ফস্টার (১২৫ রান) এবং রোহন কানহাই (৮৪ রান) ২১০ রান সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড স্থান করেন। চতুর্থ দিনের খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না খুইয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৬০ রানের মাথায় (২ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি ১২৫ মিনিট সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৬১ রান সংগ্রহ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় দেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলায় জয়লাভের কোন চেষ্টাই করে নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৭ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) প্রথম টেস্ট খেলাটি শেষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে উইকেট-কিপার রডনি মার্শ মাত্র তিন রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার সহ-অধিনায়ক কিথ স্ট্যাকপোল ১৪২ রান করেন—ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী—অপরদিকে ৩৫টি টেস্ট খেলায় তাঁর এটি ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৪২৮ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রস এডওয়ার্ডস ৬৩, ডগ ওয়াল্টার্স ৭২ এবং রডনি মার্শ ৯৭ রান। গিবস ৮৫ রানে ৪ উইকেট)
ও ২৬০ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কিথ স্ট্যাকপোল ১৪২ এবং রেডপাথ ৬০ রান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪২৮ রান (মরিস ফস্টার ১২৫, কানহাই ৮৪, রো ৭৬ এবং কালীচরণ ৫০ রান, ম্যাকস ওয়াকার ১১৪ রানে ৬ এবং জেফ হ্যামণ্ড ৭৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ৬৭ রান (৩ উইকেটে। চ্যাপেল ১৮ রানে ২ উইকেট)

ভিজি ট্রফি

পুণার জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ১৯৭২-৭৩ সালের আঞ্চলিক আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল এক ইনিংস ও ২৯৯ রানে পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে মোট ৪ বার ভিজি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ৩৩৬ রান তুলেছিল। পশ্চিমাঞ্চলের এই ৩৩৬ রানে ছিল দুটো সেঞ্চুরী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ কে শাহের ১০৩ রান এবং মহারাষ্ট্রের রঞ্জি ট্রফি দলের খেলোয়াড় যাজুবেন্দ্র সিংয়ের ১৭৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসের জুটিতে এই দুজনে দলের ২১৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের কিছু পরেই পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ৬৮৪ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের আরও দুজন সেঞ্চুরী করেন—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিশীত নায়েক (১৩৪ রান) এবং অধিনায়ক রাজু ভালেকর (১১১ রান)। এঁদের পঞ্চম উইকেটের জুটিতে দলের ১১১ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট পড়ে ৩৭ রান উঠেছিল।

জিমন্যাস্টিক্সের এক মনোরম ভঙ্গিতে রাশিয়ার বিখ্যাত জিনাইদা ভোরোনিনা

তৃতীয় দিনে পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২২৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৪৫৫ রানের পেছনে পড়ে ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে এইদিনে মাত্র ৬৬ রান সংগ্রহ করেছিল। পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসে ওপনিং ব্যাটসম্যান প্রদীপ পাণ্ডে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ৯১ রান করে আউট হন।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষদিনে লাঞ্চের ১৫ মিনিট আগে পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৬ রানের মাথায় শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল এক ইনিংস ও ২৯৯ রানে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল : ৬৮৪ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। যাজুবেন্দ্র সিং ১৭৭, এইচ কে শাহ ১০৩, কে নায়েক ১৩৪ এবং আর ভালেকর ১১১ রান। যোধ সিং ১৩৪ রানে ৩ এবং স্বপন রায় ৬৮ রানে ২টি উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ২২৯ রান (প্রদীপ পাণ্ডে ৯১, যোধ সিং ৪৩ এবং চন্দ্রভারকার ৩৩ রান। রমেশ বোরদে ৫৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ১৫৬ রান (অধিকারী ২৪ রান। বোরদে ৩৩ রানে ৩ উইকেট।)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আবদুল জব্বার-এর

মাতালের হাট ৭৲

দুঃখ দুর্দশাভরা, রক্তঘাম ভরা
প্রেম ভালবাসার
দুর্দান্ত ছবি।
রোমহর্ষক এর পরিণতি।
সাঁওতাল জীবনের অসাধারণ জীবন্ত কাহিনী।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নতুন উপন্যাস

পূর্ব পুরুষ (১ম পর্ব) ৮৲

আকাশের আয়না ১০৲ ॥ আসা যাওয়ার পথের ধারে ৫৲ ॥ রাণী কাহিনী ৭৲

সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক মণীন্দ্রকুমার রায়ের

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ৬৲

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের স্মরণীয় সৃষ্টি

আবার যদি ইচ্ছা কর ১২৲

অন্তর্লীনা ৮৲ ॥ তাজের স্বপ্ন ৮৲

পাষণ্ড পণ্ডিত ৬৲

নিশাচরের রহস্য কাহিনী

একটি খুনের কাহিনী ৫৲

রাত্রি গভীরে ৫৲ ॥ জিঘাংসা ৫৲

তিন তাসের খেলা ৫৲

অমরেন্দ্র দাশের নতুন উপন্যাস

এই সেতু সেই সেতু ৬৲

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন বই

সমুদ্রের সামনে

সুবোধ ঘোষের নতুন বই

দুই গন্ধর্ব

বন্ধু গোলাপ

গল্প মণিঘর

চিরঞ্জীব সেনের নতুন বই

প্রেমিক দস্যু

চোকি বেঁচে আছে

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যোপন্যাস

রাই শোনো আজ

অনেক রক্ত মাড়িয়ে

লাশ কাটা টেবিল

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

মুক্তিস্নান

রূপবতী অরণ্য

নয়া বসত

রূপ বদল

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নীলাঙ্গুরীয়

কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

সুভদ্রা হরণ

ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীবের খেলার বই

স্পোর্টস ডায়েরী

বেদুইনের নতুন বই

যুদ্ধের পর যুদ্ধ

অনিল রায়ের

হট লাইন হটকারী

অবধূতের নতুন উপন্যাস

সুমেরু কুমেরু

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৪ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
শুল্ক—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday 9th March, 1973 শুক্রবার, ২৫ ফাল্গুন, ১৩৭৯ .52 Paise

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্টার থিয়েটারের বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীরণজিৎ মল কাংকারিয়া বাংলার সুধী নাট্যামোদীদের একটি মনোজ্ঞ উপহার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেটি হচ্ছে একটি বিরাট সংকলন গ্রন্থ—'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস', যার মধ্যে থাকবে বাংলা নাট্যশালা আদি যুগ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সমস্ত ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বিবরণসহ পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত। মোট তিন খন্ডে এই ইতিহাস রচিত হবে। এই মহৎ প্রচেষ্টার সংবাদ পাঠ করে প্রতিটি বাঙালী নাট্যরসিক মাত্রই যে খুশী হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই! বাংলা ভাষায় ঐ জাতীয় কোন গ্রন্থপঞ্জী আগে ছিল না। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি 'রেফারেন্স' বইয়ের নাম জানাই—'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (অহীন্দ্র চৌধুরী), 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য), 'বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' (সাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য), 'কলকাতার থিয়েটার' (শঙ্কর ভট্টাচার্য), 'বাংলা থিয়েটারে অভিনয়' (ঐ), 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার (ঐ), 'নবান্ন প্রসঙ্গে' (বিজন ভট্টাচার্য), 'সাজঘর' (ইন্দ্রমিত্র) ইত্যাদি। আমরা সাগ্রহে প্রথম খন্ডটি প্রকাশের প্রত্যাশায় রইলাম।

—ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য
বোকারো, হাজারীবাগ।

। ২ ।

২৬শে মাঘ প্রকাশিত বই পড়ার সংকটের কথা পড়ে কেবল একটি কথাই মনে হয় যে এই সংকটের জন্য দায়ী প্রকাশকরা। সীমাবদ্ধ পাঠকের গন্ডী ছাড়িয়ে নতুন পাঠক সৃষ্টির কথা উপলব্ধি করেন, কিন্তু পড়েচড়ে তাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন না। নতুন প্রকাশিত বইয়ের খবর কয়জন জানে? অথচ প্রতি মাসেই অনেক বই প্রকাশিত হয়। মফস্বলের লোক যখন কোলকাতায় যায়, তখন আগ্রহী পাঠক বই-এর দোকানে দোকানে গিয়ে নতুন বা পুরনো প্রকাশিত বই কেনেন। অনেক বই-এর দোকানেই শো-কেসগুলি মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

যদি প্রকাশকরা সকলে মিলে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল অবধি সব সদর ও মহকুমা শহরে আকর্ষণীয়ভাবে ছবি ও বইয়ের ভ্রাম্যমান মেলা করতে পারেন, তবে তাঁরা দেখে আশ্চর্য হবেন যে কত আগ্রহী ক্রেতা এতদিন তাঁরা হেলায় হারিয়েছেন। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বেশীর ভাগ পাঠককেই সেই পুরনো বইগুলিই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। এই মেলার সুযোগে তাঁরা একটু সুষ্ঠু পরিবেশনারও ব্যবস্থা করতে পারবেন।

শেখর গোস্বামী
আসানসোল।

লেখকদের কথা ভাববে কে

বাংলা সাহিত্যের জনৈক তরুণ অধ্যাপক সেদিন আক্ষেপ করে শোনালেন এক প্রতিষ্ঠিত লেখকের কথা। জানালেন, ইদানিং নাকি কষ্টে-সৃষ্টে চালাচ্ছেন সেই ঔপন্যাসিক তাঁর সংসার। এমনকি, পড়ুয়া ছেলেটির পড়াশোনা চালানোর জন্যে কলেজ থেকে হাফ-ফ্রিয় সাহায্য নিতেও কুন্ঠিত হননি সেই সাহিত্যিক। অথচ একদা তিনিও চাকরি করতেন জবরদস্ত আপিসে। পরে লেখার জন্যেই চাইলেন পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে। ছাড়েন চাকরি। তাঁর একটি উপন্যাসও একসময় তুলেছিল দারুণ আলোড়ন। এখনো নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই!

অধ্যাপক-বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে সেদিন অনেকগুলো মুখ ভিড় করেছিল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কয়েকটি যন্ত্রণাদীর্ণ অথচ তীক্ষ্ণ, দীপ্ত, শাণিত লেখকের অস্তিত্ব। মনে পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সত্যিই অবাক লাগে। দুঃখে বুক ভরে যায়, যখন দেখি আমাদের দেশের লেখকরা প্রবীণ ও অশক্ত হয়ে পড়লে তাঁদের অবস্থা হয় শোচনীয়। বড়জোর দু-চারজন ছিটেফোঁটা সরকারী অনুদান পান, কিন্তু অধিকাংশই অবর্ণনীয় দুঃখে-দারিদ্র্যে শেষ দিনগুলি কাটান। সরকার যদি একটু ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে ওঁদের সম্পর্কে খোঁজখবর করেন ও এঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করেন, তাহলে বৃদ্ধবয়সে তাঁদের অন্যের দাক্ষিণ্য, অবহেলা ও হাত-তোলা ভাতের ওপর পড়ে থাকতে হয় না।

জীবিকার তাগিদে আমাদের লেখকদের প্রায় সব সময়টুকুই ছোটাছুটি করতে হয়। লিখবেন তিনি কখন? ভালো লেখার জন্য সময় দেওয়া বা চিন্তা করার কথা তো দূরস্থান। তাঁরা যাতে সর্বক্ষণের জন্যে লেখার কাজ নিয়ে থাকতে পারেন, সে সম্পর্কে সরকার কোনো অর্থনীতিক পরিকল্পনা না হয় কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই নিলেন।

বিদেশে প্রায় সব জায়গাতেই রুগ্ন লেখকদের চিকিৎসার জন্যে সরকারী ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থাটুকু কি আমাদের এখানে গ্রহণ করা যায় না?

ঠিক এভাবেই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে তোলা যায় লেখকদের জন্য সংরক্ষিত বিশ্রামাগার বা অ্যাসাইলাম—যেখানে তাঁরা বসে নিরুদ্বিগ্নভাবে ভাবতে ও লিখতে পারেন।

সরকার যেভাবে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট গড়ে তুলেছেন সেভাবেই যদি একটি জাতীয় লেখক সংস্থা গড়ে ওপরের বিষয়গুলি নিয়ে ভাবেন, তাহলে বস্তুত জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিতই বেশ খানিকটা শক্ত হবে।

গৌতম চৌধুরী,
বেহালা
কলকাতা-৩৪

প্রতিমা নির্মাণে এ কোন্ ছেলেখেলা?

গত ৪০ সংখ্যা 'অমৃত'-এ শ্রীশুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রতিমা নির্মাণে এ কোন ছেলেখেলা' বিষয়ে যা লিখেছেন আমি তার সঙ্গে একমত নই।

মানুষের মনের নবীকরণ প্রবণতা নিত্যই তাকে চঞ্চল ও অস্থির করে রেখেছে। তাই স্টাইলের আমূল পরিবর্তন সর্বদা সম্ভব না হলেও সুযোগ পেলেই সে খুঁজে নিয়েছে নতুন নতুন ফর্ম। আধুনিক প্রতিমা নির্মাণে এই বৈচিত্র্য সেই মানস-সত্তারই ফলশ্রুতি। দুঃখের বিষয়, সেটা শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ছেলেখেলা এবং সে কাজ মানুষকে জানানো তাঁর চোখে সার্কাস দলের বিজ্ঞাপন বিশেষ।

পত্র-লেখিকা আমাদের সংস্কারবাদিতায় সন্দিগ্ধ। শাস্ত্রীয় মতবাদও এক সময় গৌণ হিসেবে ধরে তিনি শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যভাবনার প্রশ্ন তুলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মত, শিল্পের স্বরূপ কোনো শৃঙ্খলিত সংজ্ঞায় আবদ্ধ নয়। পৃথিবীতে গতানুগতিকতার বাইরে যখনই কিছু করা হয়েছে তখনই একদল শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকেদের 'গেল' 'গেল' অর্থহীন রব শোনা গেছে। শৈল্পিক প্রকাশ কিন্তু বরাবরই নির্বিকার। লেখিকার অবগতির জন্য বলছি উনি কি আধুনিক 'ছেলেখেলা' প্রতিমা একটাও দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন সেখানে শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যভাবনা বা শিল্পসুষমার স্বাক্ষর কি কোথাও পাননি? এ বছর বাঁশ-নির্মিত এক সরস্বতী প্রতিমায় (গত বছর ঝিনুক-নির্মিত ভবানীপুরের দুর্গা প্রতিমাও) যে অপূর্ব সূক্ষ্ম শৈল্পিক কারুকার্য আমার নজরে পড়েছে, তা তো তুলনারহিত। এই সুগভীর ভাব ও ভাবনার ছন্দোবদ্ধ নৈষ্ঠিক সমন্বয় সাধনেই নিহিত আমাদের জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির এক নতুন ডাইমেনশন। এই সৃষ্টি যদি নিছক অবক্ষয়ী ভাবনার দোষেই দুষ্ট হত, তাহলে পুজোর শেষে তাদের মিউজিয়মে স্থান দেবারই বা কি যুক্তি থাকতে পারে?

প্রতিমা দত্ত
শিবপুর, হাওড়া-২

রাজ্য রাজনীতির পটপরিবর্তন

অন্ধ্রে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর এবার ওড়িশায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর মন্ত্রিসভাকে নিতান্ত আকস্মিকভাবে বিদায় নিতে হল। উল্লেখযোগ্য যে, অন্ধ্র এবং ওড়িশা এই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত। শ্রীমতী শতপথী মাত্র কিছুদিন আগে কটক উপনির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্রকে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব সেদিনও বললেন যে, শতপথী মন্ত্রিসভার বিপদের কোনো আশংকা নেই। তবে তিনি এই অভিযোগ করেছিলেন যে, ওড়িশায় রাজনৈতিক স্থায়িত্ব নষ্ট করার জন্য সি, আই, এ প্রভৃতি সংস্থা খুবই সক্রিয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অতি সামান্য কারণে ওড়িশা ও বাংলার মধ্যে মধুর ও প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য কোনো কোনো শক্তি উস্কানি দিচ্ছিল। লক্ষণ খুব ভাল ছিল না। তারই পরিণতিতে ন' মাসের নন্দিনী মন্ত্রিসভাকে বাজেট অধিবেশনের মুখে সরে দাঁড়াতে হল। দিল্লির পক্ষে এটা দুশ্চিন্তার।

ন' মাস আগে বিশ্বনাথ দাসের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূলে ছিল উৎকল কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের কংগ্রেসে যোগদান। শ্রীনীলমণি রাউত রায় ছিলেন এই অন্তর্ভুক্তির প্রধান নিয়ামক। তাঁরা আশা করেছিলেন কংগ্রেসে যোগ দিলে ক্ষমতা তাঁদের হাতেই ফিরে আসবে। কংগ্রেসও মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আগ্রহী ছিল। তাই দলত্যাগীদের তাঁরা নিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য। এখানেই ছিল আসল দুর্বলতা। ওড়িশার দুই প্রধান নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়েক এবং ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব কেউই তাঁদের ঈপ্সিত ক্ষমতা পেলেন না। বিজুকে কংগ্রেসে নেওয়াই হল না। মহতাবজীকে নেওয়া হলেও তিনি ক্ষমতা পেলেন না। শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছেড়ে এলেন ওড়িশার রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীরূপে। বিধানসভায় তৎকালীন কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীবিনায়ক আচার্যের দাবি উপেক্ষিত হল। শ্রীমতী শতপথী আশা করেছিলেন প্রগতিশীল কার্যসূচী রূপায়ণের দ্বারা তিনি ওড়িশার গণতান্ত্রিক সমাজবাদী শক্তি সংহত করতে পারবেন। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। প্রাক্তন উৎকল কংগ্রেসীরা ছিলেন ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ ছিল, কংগ্রেসে তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কটক উপনির্বাচনের মুখে একবার বিজু পট্টনায়েক ও তাঁর সঙ্গীদের কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার কথাও উঠেছিল। শ্রীমতী শতপথীর বিরোধিতাতেই তা সম্ভব হয়নি। তিনি পরিচ্ছন্ন কংগ্রেস চেয়েছিলেন। কিন্তু ওড়িশা রাজনীতির জটিলতার জাল তিনি ছিন্ন করতে পারেননি। শ্রীরাউত রায় এবং প্রাক্তন স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীগঙ্গাধর প্রধানই মন্ত্রিসভাকে দুর্বল করে দিলেন। তাঁরা দাবি করছেন, ২৫ জন সদস্য নিয়ে তাঁরা ওড়িশা প্রগতি দলে যোগ দিয়েছেন। শ্রীপট্টনায়েক বলছেন, তাঁর দল ৭২ জন সদস্য নিয়ে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং তাঁকেই বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেওয়া হক।

ওড়িশায় এ ধরনের মন্ত্রিসভার অদলবদল বহুবার ঘটেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, স্বাধীনতার পর কোনো নির্বাচনেই কংগ্রেস কিংবা অন্য কোনো দল ওড়িশায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। প্রতিবারই একাধিক দলের কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হয়েছে। গত কয়েক বৎসর ওড়িশায় দলত্যাগ প্রায় একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো দেখা দিয়েছে। তা থেকে এখন পর্যন্ত ওড়িশার রাজনীতি মুক্ত হতে পারেনি। তার ফলে যখনই কোনো দল সরকার গঠন করে তখনি শুরু হয়ে যায় দল ভাঙিয়ে সে মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর চেষ্টা। এ থেকে কংগ্রেস দলও মুক্ত নয়। এখন বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নটাই রাজনৈতিক মহলে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তার বিচার হওয়া উচিত বিধানসভাতে। শ্রীমতী শতপথী যখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দল সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে তখনই তিনি পদত্যাগ করে একটি সুস্থ রাজনৈতিক নজীর স্থাপন করলেন। এখন দেখতে হবে ওড়িশায় এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান কীভাবে ঘটানো যায়। রাজনৈতিক দলত্যাগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করলে রাজ্য রাজনীতিতে এই অস্থির অনিশ্চয়তার অবসান হবে না। সুবিধাবাদী রাজনীতিই আমাদের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বিপদ ডেকে আনছে। আজ ওড়িশায় যা ঘটল পরে অন্যত্রও তা ঘটতে পারে। সুতরাং এ সম্পর্কে এখনই সিদ্ধান্ত নেবার সময়। জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলীকে না জানিয়ে বিধানসভায় রাজনৈতিক নেতাদের দল পরিবর্তন নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ। মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে আবার নির্বাচকদের কাছে গিয়ে তাঁদের রায় নতুন করে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। তা না হলে যে মন্ত্রিসভাই গঠন করা হোক না কেন, নেপথ্য চক্রান্তে তার পতন ঘটানোর জন্য লোকের অভাব হবে না। এ সমস্ত বিবেচনা করেই শ্রীমতী শতপথী বিধানসভা ভেঙে দিতে বলেছেন। তাঁর যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ওড়িশায় নতুন নির্বাচন ছাড়া অন্য যে কোনো পথে এই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাতে গেলে তার প্রতিক্রিয়া হবে অশুভ। কারণ, বিরোধীপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও দলত্যাগেরই ফল।

ওড়িশায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন ও বিধানসভা বাতিলের সিদ্ধান্ত তাই যুক্তিযুক্তই হয়েছে। এখন জনসাধারণের কাছেই যেতে হবে রাজনীতিকদের। এই অনিশ্চয়তার অবসানের দায়িত্ব নিতে হবে ওড়িশার জনগণকেই।

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খান দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলম। তাঁর ডাইনে যথাক্রমে ইঞ্জিনীয়ারিং এসোঃ-র সভাপতি শ্রীপি কে নন্দা এবং সহ-সভাপতি মিঃ কে হার্টলি।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তাঁদের রিপোর্ট দিয়েছিলেন ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁদের সুপারিশ মানলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হত ১৬। কিন্তু ভারত সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি পৃথক বিদর্ভ রাজ্য ও পৃথক হায়দরাবাদ রাজ্য গঠন করেন নি। অর্থাৎ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টের পর ভারতে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ছিল ১৪। আর এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১-এ। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির সীমানা বিন্যাসের কাজ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় নি। বরং বলা যায়, সেই কাজ চলছেই।

অতএব, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার আবার বড় হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যসভায় তাঁর সর্বশেষ বিবৃতিতে বলেছেন, যাঁরা অন্ধ্রের অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ় সমর্থক তাঁদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, আবার যাঁরা অন্ধ্রের ভাগ চান তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে কোন কিছুই মেনে নেওয়া হয় নি আবার কোন কিছুই বাতিল করা হয় নি।'

অন্ধ্র পরিস্থিতি এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এটা অবধারিত যে, রাজ্যটি ভাগ হতে চলেছে। অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা, এই দুই অংশের কংগ্রেস নেতারাই এখন বিভাগ চাইছেন এবং তাঁদের নিজেদের স্বার্থের বিরোধ চাপা দিয়ে তাঁরা স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের মঞ্চে এক হয়ে এসে দাঁড়াচ্ছেন। এই কংগ্রেসনেতারা ক্রমাগত দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের অমান্য করে চলেছেন। তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর উপর মীমাংসার ভার দিয়েও তাঁর প্রস্তাবিত মীমাংসাসূত্র চালু করার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেন নি, দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, লোকসভায় বিরোধী পক্ষে গিয়ে বসবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এমন কি দিল্লীতে এসে আলোচনা করার আমন্ত্রণও গ্রহণ করেননি। কিন্তু, তবু, অন্ধ্রের ও তেলেঙ্গানার এই নেতাদের প্রতি

দিল্লীর নেতাদের বাধিত থাকার কারণ হয়েছে। কারণটি হল এই যে, স্বাতন্ত্র্যবাদীর নেতারা এই আন্দোলনে নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন। পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্র, গুজরাটে স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব অতীতে যেমন কংগ্রেস দলের হাত থেকে বিরোধী দলের হাতে চলে গিয়েছিল এবার তেমন কিছু ঘটে নি। দিল্লীর নেতারা নিশ্চয়ই একথা বিবেচনা করছেন যে, কংগ্রেস নেতারা যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই আন্দোলনের দাবী মেনে না নিলে ঐ রাজ্যে পরিণামে কংগ্রেসের অবস্থাটাই অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে। অন্ধ্রের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে সুর নরম করে কংগ্রেস নেতারা হয়ত সেই বুদ্ধি-বিবেচনারই পরিচয় দিচ্ছেন।

কিন্তু অন্ধ্রের পর কি? তেলেংগানায় যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বাবিংশতিতম অঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে ত্রয়োবিংশতিতম রাজ্যটি আর কত দূরে? এবং কোথায়? এভাবে আজ এখানে কাল ওখানে অঙ্গরাজ্যগুলির পৃথগন্ন সংসার না পেতে বরং আর একটি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বসিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের রেখাগুলি চূড়ান্তভাবে এঁকে ফেলাই ভাল নয় কি?

দাবীটা সবচেয়ে জোরালোভাবে এসেছে ভারতীয় জনসঙ্ঘের তরফ থেকে। প্রথমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশঙ্কর দীক্ষিত পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজে এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগের কথা তুললে দেশের ভিত্তিভূমিই কেঁপে যাবে। তিনি বলেছেন, যাঁরা দ্বিতীয় আর একটি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগের কথা বলছেন তাঁদের আচরণ অতিশয় দায়িত্বজ্ঞানহীন।

প্রথম রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট পেতে তিন বছর সময় লেগেছিল এবং এই কমিশনের জন্য ব্যয় হয়েছিল, প্রায় সওয়া দশ লক্ষ টাকা। এখন দ্বিতীয় আর একটি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগ করলে সময় ও অর্থের ব্যয় তার চেয়ে কম হবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে আর একটি কমিশন গঠন করতে ইচ্ছুক নন তার একমাত্র কারণ এটাই নয়। এই অনিচ্ছার সবচেয়ে বড় কারণ হল, রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন রয়েছে এবং রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বসান মানে এই আন্দোলনগুলিকে উস্কে দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকার সেই উস্কানী দিতে চাইবেন না, এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বসান বন্ধ রাখলেই কি রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী ঠেকিয়ে রাখা যাবে? খুব সম্ভবত তা করা যাবে না। বরং অন্ধ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী মেনে নেওয়ার পর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্ত থেকেও এই ধরনের দাবী ওঠার পথ খোলা হয়ে যাবে। মহারাষ্ট্র থেকে বিদর্ভকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তরখণ্ডকে, আসাম থেকে মিকির পাহাড় ও উত্তর কাছাড় পাহাড় জেলাকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে ঝাড়খণ্ডকে আলাদা করার দাবী রয়েছে ভারত সরকার অন্ধ্রে নীতিস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই এই সব দাবীর সমর্থনে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। নতুন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিযুক্ত না হলেও এটা হবে। এবং অতীতের অভিজ্ঞতা যদি কোন সাক্ষ্য দেয় তাহলে সেটা হল এই যে এই সব আন্দোলনের কোন কোনটির সামনে কেন্দ্রীয় সরকার নীতিস্বীকার করবেন।

ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এই অন্ধ্রেই একদিন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। আর আজ মনে হচ্ছে, অন্ধ্র থেকেই ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলির ভাঙ্গন আরম্ভ হল।

ভারতবর্ষ যখন বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশগুলি পুনর্গঠন করার উপর জোর দিয়ে এসেছে। ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল :—

'কোন প্রদেশকে যদি তার নিজের ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হয় এবং ঐ ভাষায় যদি তার প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম করতে হয় তাহলে ঐ প্রদেশকে অবশ্যই একটি ভাষাভিত্তিক অঞ্চল হতে হবে।... সাধারণ নিয়ম হল এই যে, এক একটি ভাষা এক একটি বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাহিত্যের আধার। একটি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদেশের সাধারণ প্রগতিকে সাহায্য করবে।'

পরবর্তী কালে ১৯৩৭ সালে কলকাতায় ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় ও ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতির পুনরুল্লেখ করেছে।

কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতারা এই বিষয়ে তাঁদের মত কিছুটা বদল করেন। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখার জন্য গণপরিষদ ১৯৪৮ সালে এস কে দারের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় :—

'যা কিছু জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সাহায্য করে তাকেই এগিয়ে যেতে দিতে হবে, আর যা কিছু জাতীয়তাবাদের পথে প্রতিবন্ধক তার সবটাই নাকচ করে দিতে হবে।... ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতিকে আমরা এই নিরিখে বিচার করে দেখেছি এবং আমাদের মতে এই বিচারে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ অচল ও আমরা সেটা সমর্থন করতে পারি না।'

দর কমিশনের পর কংগ্রেসের আর একটি কমিটিও এই বিষয়টি বিবেচনা করলেন। জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল ও পট্টভি সীতারামাইয়াকে নিয়ে গঠিত ও 'জে-ভি-পি কমিটি' নামে পরিচিত এই কমিটি তাঁদের রিপোর্টে প্রসঙ্গক্রমে বলেন ঃ—

'ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের যে নীতি কংগ্রেসের পুরান নীতি সেটা তখনই প্রয়োগ করা যাবে যখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে এই নীতির প্রয়োগের সমীচীনতা বিবেচনা করে দেখা হবে। ঐ নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে এমন গুরুতর ধরনের প্রশাসনিক বিশৃংখলা অথবা পারস্পরিক সংঘাত ডেকে আনা চলবে না যাতে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়। আমরা বরং চাই যে, এই প্রশ্নে আমাদের নজর অন্য দিকে চলে যেতে না দিয়ে আমরা যাতে মধ্যবর্তী সময়টায় অন্যান্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারি সেজন্য নতুন প্রদেশ গঠন কয়েক বছর স্থগিত রাখা হোক।' কমিটি তাঁদের রিপোর্টে একথাও পরিষ্কার করে দেন যে, দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে যদিও তাঁরা ব্যতিক্রম করতে পারেন তাহলেও উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব তাঁরা আদৌ সমর্থন করেন না।

একথা মনে করার কারণ আছে যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবীকে পিছনে ঠেলে দিয়ে জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীর স্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আমাদের জাতীয় নেতাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে দর কমিশনের রিপোর্টের যে অংশটি উল্লেখ করা যেতে পারে সেটি হল ঃ—

'ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের ফলে জনসাধারণের যে একমাত্র হিত হতে পারে বলে অনুমান করা যায় সেটা হল, আঞ্চলিক ভাষায় বিধানসভার সব কাজকর্ম করার সুবিধা হতে পারে। হিন্দীর প্রতি আমাদের অনুরাগের ঘোষণায় আদৌ যদি কোন আন্তরিকতা থাকে তাহলে সমস্ত বিধানসভায় জাতীয় ভাষাকে গ্রহণ করে অনায়াসেই এই অসুবিধা মেটান যেতে পারে।'

বহুভাষিক রাজ্যে হিন্দীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে চেষ্টা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বোম্বাই রাজ্যে। বোম্বাই তখনও মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় নি। দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যের সরকার হিন্দীকে ঐ রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করার জন্য বিল এনেছিলেন এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের কলেজগুলিতে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বিভাগীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। জনমতের বিরোধিতায় বিল ও সরকারী নির্দেশ, দুই-ই অবশ্য প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের নীতিকে শিকেয় তুলে রাখার এই চেষ্টার কারণ যাই হোক না কেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি। পৃথক অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবীতে ৫৬ দিন অনশন করার পর ১৯৫২ সালের ১৫ ডিসেম্বর পট্টি শ্রীরামুলু প্রাণত্যাগ করলেন। অন্ধ্র এলাকায় জনতা মারমুখী হয়ে উঠল। ১৯৫২ সালের ১৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্র রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ১৯৫৩ সালে ১ অকটোবর নতুন অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হল আর তার তিন মাসের মধ্যেই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিযুক্ত হল।

যে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে এই কমিশন বসান হয়েছিল সেগুলি পর্যালোচনা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন, '(রাজ্য পুনর্গঠনের) প্রক্রিয়া হয়ত কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু অন্ধ্র রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত ও যে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাতে পরিণতিটা দ্রুত এগিয়ে এসেছে।'

বিচারপতি ফজল আলির সভাপতিত্বে গঠিত তিনজন সদস্যের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তাঁদের রিপোর্ট দিয়ে এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, রাজ্যগুলির পুনর্গঠন হয়ে গেলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র পাকাপাকিভাবে আঁকা যাবে এবং একটা রাজনৈতিক স্থায়িত্বের আবহাওয়ার মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অখণ্ড মনোনিবেশ করা সম্ভব হবে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, কমিশনের এই আশা পূরণ হয় নি। কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর এমন একটা বছরও কাটে নি যখন ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রান্তে রাজ্যগুলির ভাঙ্গা-গড়ার কথা চলতে থাকে নি।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভারত সরকার নতুন রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন ঘটনার চাপে এবং প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে। কমিশন বোম্বাইকে দ্বিভাষিক রাজ্য হিসাবে বজায় রাখার সুপারিশ করেছিলেন। ভারত সরকার বোম্বাইকে ভেঙ্গে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য তৈরী করলেন। সেটা করতে গিয়ে সরকার কমিশনের আরও একটি সুপারিশ অগ্রাহ্য করলেন। কমিশন একটি পৃথক বিদর্ভ রাজ্য সৃষ্টির প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সরকার বিদর্ভকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করলেন। অন্যদিকে, বোম্বাই শহরকে ভারত সরকার দ্বিভাষিক শহর হিসাবে গণ্য করার চেষ্টা করলেন। বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রে অনেক প্রচণ্ড হাঙ্গামার পর সরকার সেই চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বোম্বাইকে অবশেষে মহারাষ্ট্রের সঙ্গেই যুক্ত করলেন।

কমিশন হায়দরাবাদকে একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে টিঁকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার হায়দরাবাদকে টুকরো টুকরো করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। হায়দরাবাদের তেলুগুভাষী অঞ্চলগুলি যুক্ত হল অন্ধ্রের সঙ্গে (যা থেকে আজকের মুল্কি সমস্যার উদ্ভব)।

এইভাবে পাঞ্জাবও দ্বিখণ্ডিত হল এবং নতুন হরিয়ানা রাজ্য তৈরী হল।

রাজ্য পুনর্গঠনের এই অসমাপ্ত প্রক্রিয়ায় আধুনিকতম সংযোজন হতে চলেছে অন্ধ্রে। তবু, অন্যত্র যা হয়েছে ও অন্ধ্রে যা হতে চলেছে তার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। এতদিন পর্যন্ত যে সব রাজ্য গঠিত হয়েছে সেগুলি গঠিত হয়েছে মোটামুটিভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের নীতি মেনে নিয়ে। এতাবৎকাল যেভাবে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে তাতে একভাষিক রাজ্য গঠনের প্রবণতাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু অন্ধ্রে এই প্রথম যা ঘটতে চলেছে সেটা হল ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলির নিজ নিজ আঙিনার মধ্যে আঞ্চলিকতার দেওয়াল তুলে দেওয়া। মূলত এই দেওয়াল হচ্ছে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার। যেহেতু এই আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সমস্যা অন্যত্রও আছে সেহেতু ভাষাভিত্তিক রাজ্যে ভাঙ্গনের এই প্রবণতা অন্ধ্রেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে, এমন মনে করা যায় না। একদিন যেমন অন্ধ্রেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সূচনা হয়েছিল আজ তেমনি আবার সেখানেই আঞ্চলিকতাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সূচনা হবে কিনা কে জানে?

২১-৩-৭৩ পুণ্ডরীক
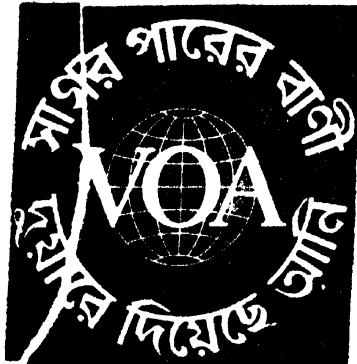
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে, মাত্র চার দিনের জন্য রাঁচী সফরে গিয়েছিলেন অমৃত ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। ঐ চার দিনই তাঁর কেটেছে চরম ব্যস্ততা আর কর্ম-তৎপরতার মধ্যে। কখনো সাহিত্যের আসরে কাটিয়েছেন। কখনো ভাষণ দিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় রাঁচীর বেঙ্গলী এসোসিয়েশন এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঐ সভায় শ্রীযুক্ত ঘোষ বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, মাতৃভাষার অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত বিষয়। এই অধিকারকে কেউ খাটো করে দেখতে পারেন না। দেখাতেও পারেন না। কেননা, মাতৃভাষার অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে, বেঁচে-থাকার স্বতঃস্ফূর্ততায় বাধা পড়ে। সেটা কেবল বাংলা ভাষাভাষী নয়, যে-কোনো ভাষাভাষীর ক্ষেত্রেই সত্য।

সভায় উপস্থিত প্রবাসী বাঙালীরা, সময় ও সমাজ-সচেতন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে প্রত্যক্ষ করেন, গত ও অনাগত-কালের মধ্যবর্তী সংযোগের সেতুর মতো। যিনি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সম্পাদনা-সূত্রে অস্থির বর্তমানকে দেখেছেন, তাঁর উপলব্ধিতে সময়ের শাশ্বত সত্যটিও সমানভাবে প্রতিফলিত। আঞ্চলিকতার চৌহদ্দীর মধ্যেই শ্রীযুক্ত ঘোষ দেখেছেন, সর্বভারতীয় সাধনার স্বরূপ। ভারতীয়ত্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক চেতনার স্ফুরণ।

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সরোজ বসু বলেন, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সেই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ আজ আমাদের মধ্যে অনন্য ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত লেফটানেন্ট জেনারেল ডাঃ বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য, অবসর-প্রাপ্ত আই সি এস শ্রী এন বকসী, শ্রীক্ষিতি গুপ্ত ও রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠেও ছিল শ্রীযুক্ত ঘোষের ভূয়সী প্রশংসা। ঐতিহ্যরক্ষায় ঘোষ-পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও যে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে চলেছেন, সেকথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন প্রায় সকলেই।

রাঁচী অবস্থানকালে, শ্রীযুক্ত ঘোষ উপশহর ধারোয়ার নামকরা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'মিলনী' ক্লাব ও পাঠাগার পরিদর্শন করেন। ওখানেও তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মিলনীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুপ্রিয় মজুমদার তাঁকে স্বাগত জানান। এবং শ্রীযুক্ত ঘোষ এই সাংস্কৃতিক সংস্থার বিভিন্ন কর্মোদ্যমে খুশি হয়ে তার আজীবন সদস্য হতে সম্মত হন।

প্রকৃতপক্ষে, তুষারবাবু প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় এবং আত্মবিকাশের প্রয়োজনে, যে-কোনো ভাষাভাষীর ন্যায্য দাবীকেই সমর্থন করেন। বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের সভায় ও বিশিষ্ট বাঙালীদের আয়োজিত কয়েকটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর এই মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

তিনি বলেন, প্রবাসী বাঙালীরা যদি কোনো সঙ্কটে পড়েন, তাহলে আমরাও এগিয়ে আসব তাঁদের সাহায্য করার জন্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে, বিহার পাঠ্য-পুস্তক কমিটির নির্বাচিত বাংলা বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকরা এগিয়ে আসতে পারেন। বইয়ের জন্য শিক্ষাকে ব্যাহত হতে দেওয়া যায় না। সেটা উচিতও নয়।

শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশ্বাস করেন, মাতৃভাষার প্রসারে ও মর্যাদা রক্ষায় প্রবাসী বাঙালী-দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা ভাষার দিগন্ত বিস্তারে তাঁরাই অন্যতম সহায়ক। আঞ্চলিক চৌহদ্দীর বাইরে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ, তা তাঁরাই করে থাকেন।

বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের কাছে তিনি প্রস্তাব করেন, নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে প্রবাসী বাঙালীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে ও সংরক্ষণেও তৎপর হতে হবে। কেননা, ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত না হলে কোনো সাহিত্যই প্রাণের আবেগ পায় না।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, বিহারের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি শ্রী এন বকসীর বাসভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তুষারবাবু লক্ষ করেন, কেবল বাঙালীরা নয়, অবাঙালীরাও তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিহারের বিভাগীয় কমিশনার শ্রী কে এ রাম সুব্রহ্মণ্যম, বিহার বিভাগীয় কমিশনার শ্রীমেদিনীপ্রসাদ সিং, ছোটনাগপুরের মহারাজকুমার, রাজেন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ টি বি প্রসাদ, শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ এম-পি, রাজবাহাদুর হরেকচাঁদ জৈন ও ডাঃ ডি এন বসু।

ঘরোয়া বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঘোষের মেজাজও ছিল ঘরোয়া। পঞ্চাশ বৎসরাধিককালের সাংবাদিক জীবনের বহু ঘটনায় চমকপ্রদ তাঁর জীবন। কলকাতার কোনো এক সভায় জনৈক নাট্যকার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কেন আত্মজীবনী লিখছেন না?

তুষারবাবু নাকি মৃদু হেসে সেদিন উত্তর দিয়েছিলেন, লিখব কি ? সব কথা লিখতে গেলে, ভারতবর্ষে সিভিলওয়ার লেগে যাবে।

ঐ অনুষ্ঠানে তুষারবাবু কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করে দেননি। তবে, সাংবাদিক-জীবনের বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলে অনেককে চমকে দেন। রামকৃষ্ণ মিশনের দিব্যায়ন ইনস্টিটিউটের সভায় অবশ্য বলেছেন অনেক সিরিয়াস কথা। ওখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন স্বামী মুক্তানন্দ। নামকুমের ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা ভবনেও তাঁর সম্বর্ধনা সভার আয়োজন হয়। ই এল বি বি হাই স্কুলের ছাত্রদের কাছে তিনি দাবী করেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা যেন তারা পায়।

ঠিক অনুরূপভাবে, দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিস্ট-এর বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময়, সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছিলেন ২৩ ফেব্রুয়ারী। ঐ সম্মেলনে তিনি বলেন, যখনই কোনো বিষয় সংবাদপত্রের জন্য লিখবেন, তখন নিজের বিবেককে সতর্ক রাখবেন। কেননা, যা সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত, কেবল সে সংবাদই কল্যাণকর এবং প্রকাশযোগ্য। জাতীয় স্বার্থকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার জন্য তিনি সাংবাদিকদের পরামর্শ দেন।

চার দিনের সফরে প্রমাণিত হয়, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে, তাঁর গুরুত্ব কত বেশী। শিক্ষক, ছাত্র, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, প্রবাসী বাঙালী, জাতীয় উদ্যোগের কর্মী মানুষেরা, তাঁর প্রজ্ঞায় ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের আলোকিত করতে চান। এবং সকলের জন্যই রাখেন তাঁর সমান সহযোগিতা ও সক্রিয় সমর্থনের মনোভাব।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

কালকের দিনটা

কাল, অর্থাৎ গতকাল যা ঘটেছে, কিম্বা ঘটার কথা ছিল অথচ ঘটেনি, অথবা অনেক দিন আগে ঘটেছিল যা কাল মনে পড়েছে, হয়তো কাউকে দেখে অথবা কারো পুরোনো কোনো চিঠি বা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে—তারই উপর এক পৃষ্ঠার লেখা। আকারে ছিমছাম এই ফিচার বুদ্ধির দীপ্তিতে আর হৃদয়বৃত্তির গভীরতায় অক্ষচ্ছেদ ...করবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঠকরাও যোগ দিতে পারেন। লেখা অমৃতের এক পৃষ্ঠার মতো অর্থাৎ ৯০০ শব্দের কাছাকাছি হওয়া দরকার।

গতকাল আমাদের বাড়িতে যা ঘটে গেলো তা রীতিমতো একটা নাটক!

তখন বেলা আন্দাজ দশটা হবে। আমাদের সদর দরজায় মূর্তিমান পিয়ন সশব্দে সাইকেল থেকে নেমেই লম্বা হাঁক পাড়লো—টে-লি-গ্রা-ম। আপনাদের আর-জেন্ট টেলিগ্রাম আছে। পরক্ষণেই কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

আওয়াজ শুনেই মেজদি দোতলার বারান্দা থেকে প্রথমে লোকটাকে দেখে নিলো। তারপর তড়াক করে আমার ঘরে ঢুকে কাছে এসে ফিসফিসে গলায় বললো—এই শিগগির ওঠ, নীচে পিয়ন দাঁড়িয়ে। বললো আমাদের নাকি আরজেন্ট টেলিগ্রাম আছে। টেলিগ্রাম শুনে আমিও লেখা থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে আসি। পরিচিত পিয়ন নমস্কার জানিয়ে টেলিগ্রামখানা সযত্নে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। ওরই কলম দিয়ে এক টুকরো কাগজে একটা সই করে দিতেই পরক্ষণে ফের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলো সে। আমি দরজা বন্ধ করলাম।

একেই টেলিগ্রাম, তার ওপরে আবার আর্জেন্ট। ফলে সবাই কি রকম হকচকিয়ে গিয়েছিলাম প্রথমটায়। কে পাঠালো এই টেলিগ্রাম? বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। অথচ সাহস করে কেউ ছিঁড়তেও পারছি না। মেজদি এমনিতেই খুব নার্ভাস। টেলিগ্রামের চেহারাটা বাইর থেকে দেখেই তার মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসী হয়ে গিয়েছে। ও পিয়ন চলে যাওয়ার পর থেকেই বার বার আমার মুখের দিকে অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। আমি টেলি-গ্রামখানা হাতে নিয়ে তখনও খুলবো কি খুলবো না ভাবছিলাম।

হঠাৎ কি ভেবে মেজদি আমাকে সাবধান করে দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে উঠলো : খবরদার বুলা, এ নিয়ে এখনই কোনও হৈ-চৈ করতে যাস্ না। আমার যত-দূর মনে হচ্ছে দিদিমার কোনও খবর নিয়ে

অশোককুমার চক্রবর্তী

টেলিগ্রামখানা এসেছে। পরশু ছোটমামার চিঠি এসেছে। দিদিমার নাকি খুব বাড়া-বাড়ি। মাকে যেতে লিখেছে একবার। আজ শিখার পাকা দেখা না হলে আজই তো মায়ের দুর্গাপুর যাওয়ার কথা। তাই বল-ছিলাম, এখন একেবারে চেপে যা ব্যাপারটা। ভালয় ভালয় শিখার আশীর্বাদের কাজটা চুকে যাক—তারপর লোকজন সব চলে গেলে সন্ধ্যের মুখে দেখলেই চলবে।

আমি মেজদির যুক্তি মেনে নিয়ে বললাম—বেশ তোর কথাই থাক। এখন এটাকে বরং তুলে রেখে দিই আলমারিতে। এই বলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম আমি। মেজদি রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো। তখন কেউ জানলো না ব্যাপারটা।

এদিকে বাড়িতে দলে দলে আত্মীয়-পরিজনরা সব আসতে শুরু করেছে। কথাবার্তা, হৈ-চৈ সব মিলিয়ে গোটা বাড়িটা যেন উৎসবের রূপ নিয়েছে। পাত্রপক্ষের লোকেদের দুপুরে এখানে এসে খাওয়ার কথা। সকাল থেকেই এক রকম সাজ সাজ রব।

বাড়ির সকলেই এখন দারুণ ব্যস্ত ভাব দেখাচ্ছে। বড়দি আর বৌদি সকাল থেকেই রান্নাঘরে ভীষণরকম এন্‌গেজড। ওদের দুজনের ওপর মেনু তৈরীর ভার পড়েছে। কিংবা নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে। মেজদি কোনও দায়িত্বে নেই। এমনিই ঘোরাঘুরি করছে। জামাইবাবুরা শিখাকে নিয়ে ঠাট্টা-ফাজলামিতে ভীষণ ব্যস্ত। মাঝে মাঝে বড় জামাইবাবুর অট্টহাসি গোটা বাড়িটাতে এসে আছড়ে পড়ে। দাদা গলদা চিংড়ির খোঁজে নতুনবাজারে সেই ভোর থেকে কি করছে কে জানে! মা দক্ষিণেশ্বরে শিখার নামে পুজো দিতে গিয়েছে বলে কানে এলো। বাবা এখন বাতিলের দলে। বারান্দায় কাগজ পড়তে পড়তে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে এলাম। আমার ওপর ভার পড়েছে রিসেপশনের। পাত্র-পক্ষের এখনও দেখা নেই রিসেপশন জানাবো কাকে? কাজেই এখন স্রেফ বেকার। সেই ফাঁকে একটা রিপোর্ট শেষ করছিলাম। এমন সময় আর্জেন্ট টেলিগ্রামখানা এসে সব মাটি করে দিলো।

আমি ঘুরছি-ফিরছি, মনের সুখ নেই। টেলিগ্রামের প্রশ্নটা এসে বার বার মনে আলপিন ফোটাচ্ছে। একবার ভাবলাম মেজদিকে না বলে একবার ছিঁড়েই ফেলি ওটা। দেখি কি খবর। আবার ভাবি যদি খারাপ খবর হয়। যদি তাল সামলাতে না পেরে বাড়িতে ফাঁস করে ফেলি। তাহলে সব কিছুই নিমেষে বিষাদে পরিণত হবে। তারচেয়ে বরং মেজদির কথাই থাক। কাজটা আগে মিটেই যাক নির্বিঘ্নে।

আমার এই মনমরা ভাব দেখে মেজদির বর পিঠে হাত রেখে রসিকতা করে বললে : কি ভায়া আলো বিনে যে সব একেবারে অন্ধকার মনে হচ্ছে? তা খবর-টবর পেলে

কিছু? আমি কি আর জবাব দেবো! মেজদিই আমার হয়ে বললো : ব্যস্ত হয়ো না, খবর আসতে বিশেষ দেরী নেই। এই মাসেই তো ডিউ টাইম তাই না রে? মেজদি আমার দিকে তাকায়। আমি 'কি জানি' বলে কাজের অছিলায় সেখান থেকে কেটে পড়ি।

আমি ভাবছিলাম সত্যি সত্যিই ঐ টেলিগ্রামটায় দিদিমার ব্যাপারে যদি কোনও অশুভ খবর এসে থাকে তাহলে কি হবে? কাল সকালের ট্রেনেই মা দুর্গাপুর যেতে চাইবে। মাকে নিয়ে যাবে কে? দাদার পক্ষে সম্ভব নয়। অফিস আছে। নিয়ে যাওয়ার ভার শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়েই এসে পৌছবে। কারণ, আমার অফিস দাদার মতো সাহেব কোম্পানীর নয়। অফিস না গেলেই আমার অফিসে ছুটি ধরে নেয়। অথচ আমার হাতে পর পর কতগুলো লেখার কাজ! না করতে পারলে রেকর্ড খারাপ।

সে যাই হোক। এদিকে বিকেলের মধ্যেই ভালয় ভালয় শিখার পাকা দেখা সেই সঙ্গে মেয়ে আশীর্বাদের কাজটা মিটে গেলো। বিয়ের দিন স্থিরের কাজটা মোটা-মুটি বাবার ওপরই ছেড়ে দিয়ে গেলো ওরা। কারণ বাবা আগেই বলে রেখেছিলেন ছোট বৌমা বাপের বাড়ি থেকে না ফিরলে দিন-স্থির করা সম্ভব নয়। শিখার ভাবী শ্বশুরও সায় দিয়েছিলেন বাবার কথায়। ওদের কথা সেরে রওনা হতে সন্ধ্যে হলো।

রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মেজদি অতর্কিতে আমার ঘরে এসে হাজির। ঘরের দরজাটা ভালো করে টেনে দিয়ে নীচু গলায় বললো—কই এবার ওটা বের কর দেখি। বাব্বা! সারাটা দিন যা উৎকণ্ঠা গেলো—না জানি এখন আবার কি ভীষণ খবর শুনতে হবে। তারপর একটু থেমে মেজদি ফের বললো—তুই দেখে নিস। নিশ্চয়ই স্যাড নিউজ। আর সেটা দিদিমার নামেই। মাকে নিয়ে বাধবে গন্ডগোল।

আমি শেলফ থেকে মোটা বইটা পেড়ে নিয়ে তার ভেতর থেকে টেলিগ্রামের মোড়কটা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেজদির হাতে তুলে দিলাম। মেজদি দু-একবার ওটা নিজের হাতে নাড়াচাড়া করে 'দেখি তোর জামাইবাবুর কাছে নিয়ে যাই' বলে দুম করে বেরিয়ে গেলো।

পরক্ষণেই আনন্দের রোল উঠলো বাড়িতে। ছেলে-বুড়োর মিলিত হৈ-চৈ। দেখি দেখি করে টেলিগ্রামের কাগজখানা নিয়ে সবার সে কি কাড়াকাড়ি! আমি তখনও বিছানায় শুয়ে খবরের উৎস আন্দাজ করি। তার অল্পক্ষণের মধ্যেই বৌদি হুড়মুড়িয়ে আমার ঘরে ঢুকে এলো, জামাইবাবু-দিদিরাও পিছু পিছু। এলো আরও অনেকেই।

টেলিগ্রামের গোলাপী রঙের কাগজ-খানা আমার হাতে এক রকম জোর করেই ধরিয়ে দিয়ে বৌদি বলে উঠলো : ওঠো ওঠো বীরপুরুষ—শিগগির মিষ্টি আনতে দাও, একটা জবর খবর আছে।

'মেল বেবি, মাদার ও-কে'। ঘর ভর্তি লোকের সামনে টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে নিজেকে একটা আস্ত বোকা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। কে যেন আমার বাক-শক্তিটাও কিছুক্ষণের জন্য কাল চুরি করে নিয়েছিল।
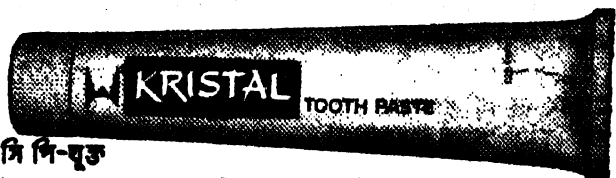
জোড়াসাঁকো ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

গ'ড়ে উঠতে না উঠতেই ভেঙে পড়ছে
দীর্ঘশ্বাসের ওই সাঁকো;
মেঘ তাকে মুছে দেয়, মেলে ধরে চন্দ্রালোক
কেবল নিঃসঙ্গ মূর্তি
চেয়ে থাকে দূরে;
বন্য সভ্যতা ও বর্বরতা দুই ঢেউ নীচে।

নগরী নিঝুম ক্রমে, বুড়ো হয় চীনা বট
সভা উঠে গেলে ফাটে চৈত্রের চাতাল;
অট্টালিকা বেড়ে ছোঁয় গ্রামের কুটির
ঢেঁকি-ঘরে শব্দ ঝরে স্বর্ণশস্য ভানছে সময়।

ঝাঁপ দিয়েছিল কবে উচ্চতার থেকে নারী :
দহে নাকো যেই রূপ জ্বলে যায় শুধু
তাড়িয়ে ফিরেছে কাকে জাগর-নিদ্রায়;
অঙ্গার গিয়েছে ঝ'রে—থেমেছে সন্ত্রাস
তারায় তারায় গাঁথা বিরাট খিলানে বাঁধে
রাত্রির আকাশ।।

গোলাপবন ॥

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ওই জানলার নিচে যে গোলাপবন,
কত রাত্রির পরেছে নীলাঞ্জন।।
দৃষ্টিরে কেড়ে করেছিল নির্বাক,
ওই জানলার নিচে যে গোলাপবন :
বিঘ্নিত বুঝি আজকের মৌচাক?

সহস্র দাঁত মেলেছে মক্ষী মিলে,
দূর শিবিরে কী নেকড়ের গর্জন!

আসে সর্পিল দিন কী ভয়ঙ্কর,
আকাশ ভরবে রক্তপিপাসু চিলে?

আহা লালে লাল ওই যে গোলাপবন
আজ নিষ্ঠুর শাসনে নিরুত্তর!

সহসা কী হবে বজ্র-বিস্ফোরণ?

আলো দাও, রাজেন্দ্রাণী ॥

অনন্ত দাশ

এখন নির্ভরযোগ্য কোন প্রেম নেই, প্রতিশ্রুতি নেই
যেন বহুদিন ধরে আকাল চলেছে এই দেশে
সঞ্চিত শস্যের কণা ইঁদুরেরা খায়
বিনিদ্র রাতের কান্না
ছায়াচ্ছন্ন বুকে সংশয়, সন্দেহ নিয়ে সমাকীর্ণ আজ।

অথচ ছিলাম আমি কোনদিন স্বপ্নের ভিতরে
নির্বিকার। আকুল, উদ্দাম প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত রাত চলে গেলে
পৃথিবী পায়ের নীচে
আরেকটা উজ্জ্বল দিন ঠেলে দিত বিনা প্রতীক্ষায়।

অন্ধকারে, অভিশাপে সমস্ত বন্ধন গেল ছিঁড়ে
এখন প্রতিটা দিন বিষাক্ত বাতাস বয়ে আনে
আমার ফুসফুসে ঘা,, মেরুদণ্ডে জীর্ণ সরীসৃপ
সারারাত রক্ত খায়; ক্ষয়িষ্ণু বুকের হাড়ে
আমি দীর্ঘকাল যেন জীবনের ঝড় আটকে আছি।

আমার শঙ্কিত মুখে আলো দাও, রাজেন্দ্রাণী
ফুসফুসে বিশুদ্ধ বাতাস
সমস্ত ক্লান্তির শেষে জীবনের পুষ্পসমারোহে
নতুন সূর্যকে দেখি মৃত্যুঞ্জয় চোখে।

বাস্তবিক এ যেন অবিশ্বাস্য কাহিনী! দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যেমন বিশ্বাস করতে পারা যায় না, যা প্রত্যক্ষ করলুম তা সত্যি না মিথ্যে—ঠিক তেমনি অবস্থা সকলের।

সত্যি কথা বলতে কি, ওই নরপিশাচ ইয়াহিয়া খাঁ ও তার জল্লাদবাহিনী, যাদের অমানুষিক, নৃশংস হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বে কেবল রেকর্ড স্থাপন করেনি, নরহত্যার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ, এমনকি হিটলার নাদির শাকেও হার মানিয়েছে। তারাও বিস্মিত, হতচকিত! তারাও যেন কল্পনা করতে পারে না, ভারতের ওই জওয়ান আর মুক্তিসেনাদের কাছে তাদের পরাজয় ঘটেছে। ওদের হাতে মার খেতে খেতে পিছু হটতে হটতে লাঞ্ছিত, বিপর্যস্ত হয়ে শেষকালে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। সত্যি সত্যি পূর্ব পাকিস্তানের কবরের ওপর যে স্বাধীন সোনার বাংলার নবজন্ম হয়েছে, এ যেন তাদের স্বপ্নের অতীত!

একদিন খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে যে দৈত্যকুলপতি ভেবেছিল, সামান্য একটা মহিলা, তায় গান্ধীবাদী, নিরামিষভোজী সে তার ওই বীভৎস মূর্তি ও রক্তচক্ষু দেখে ব্যাঘ্রভয়ে ভীত শেয়ালের মত কাঁপতে কাঁপতে ছুটে গিয়ে গর্তের মধ্যে মুখ লুকবে কিন্তু সে যে চোখের নিমেষে ভেল্কীর খেল দেখিয়ে দেবে এইভাবে তার সব অহংকার চূর্ণ করে দেবে, তা ভাবতেও পারেনি।

শুধু ইয়াহিয়া খাঁ কেন, তার ওই খুনী চক্রান্তের পিছনে বন্ধুত্বের মুখোশ এঁটে মদত জোগাচ্ছিল বিশ্বের যে দুই বৃহৎ শক্তি, তাদেরও মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে ভারতেশ্বরী। ভারতের এই সামান্য নারী। ওরা ভেবেছিল, কেউ জানতে পারবে না, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবে! সামনে শিখণ্ডী খাড়া করে, রক্তলোলুপ ওই ইয়াহিয়াকে ডালকুত্তার মত মাংসের লোভ দেখিয়ে লেলিয়ে দেবে। তাই কোটি কোটি ডলার ও আধুনিক সব সাংঘাতিক মারণাস্ত্রের বন্যা বইয়ে দিয়ে তারা যখন স্বপ্নে বিভোর, এখনি বুঝি সেই নিরপেক্ষবাদিনী, প্রিয়দর্শিনীর উন্নতশির মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের জয়রথের চাকা কেবল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেয়নি সেই ভারত-নেত্রী, তাঁর সেই রণচণ্ডীর মূর্তি দেখে সবাই আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত! সকলের সব ধ্যানধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে সেই [illegible] অনন্যশক্তিময়ী ভারতমহিলা।

কিন্তু বাইরের আকাশ বাতাস যখন জয়ধ্বনিতে মুখরিত—'জয় ইন্দিরা গান্ধী' 'জয় সোনার বাংলা' 'জয় জোওয়ান' লোকের

মুখে মুখে তখনো সেই হতভাগিনীদের বন্দীশিবিরে বুঝি সে-ধ্বনি গিয়ে পৌঁছোয়নি। তারা জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি যে তাদের দুঃখনিশার চিরঅবসান ঘটেছে!

তাই মুক্তিসেনারা যখন তাদের উদ্ধার করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এখানে ওখানে, বনেজঙ্গলে, ভাঙা বাড়ীর গোপন কক্ষে, তখন তাদের পদধ্বনি কানে যেতেই আর্তনাদ করে উঠেছিল হতভাগিনীরা।

এ কান্না তাদের নতুন নয়, নিত্য-সাথী। গত আট মাস ধরে এমনি কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে তাদের গলা বুজে গেছে, তবু সেই কামার্ত কুকুর, খানসেনাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। দিন নেই, রাত নেই, দুপুর নেই, সকাল নেই যার যখন খুশি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের দেহটাকে লুটে-পুটে খেয়ে যায়। মুখে প্রতিবাদ উঠলে, পশুর মত ঠ্যাঙানি দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। হতভাগিনীদের সারা দেহে শুকিয়ে আছে সেই লাঞ্ছনার চিহ্ন।

মরিয়া হয়ে যারা ওদের কবল থেকে পালাতে গেছে গভীর রাত্রে পাঁচীল ডিঙিয়ে কিংবা জঙ্গলের সুড়ঙ্গপথে, তাদের কুকুর বেড়ালের মত গুলি করে মেরেছে, তাদের মৃতদেহটাকে এনে সবার সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যাতে আর কেউ ওপথ অনুসরণ না করে।

সশস্ত্র প্রহরী হতভাগিনীদের সব সময় পাহারা দেয়। ভয়ে তাই কেউ মুখে টুঁ শব্দ করে না। শুধু গুমরে গুমরে কাঁদে। কেঁদে কেঁদে চোখের জল বুঝি ওদের শেষ হয়ে গেছে, কিংবা জমাট বেঁধে গেছে, কে জানে!

তাই মুক্তিসেনারা যে ওদের সেই কলঙ্কিত নরকযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে এসেছে, ওরা বুঝতে পারেনি ভেবেছিল, আবার সেই কামার্ত পশুগুলো বুঝি আসছে!

বন্ধ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে হতবাক হয়ে যায়, মুক্তিসেনারা! তাদেরি কেউ না কেউ মা, বোন, মাসী পিসী, কুমারী বিবাহিতা কিন্তু তাদের দেখে চিনতে পারে না!

এরা কারা! ডাইনীর মত চেহারা। রোগা কাঠির মত শুকনো সব দেহ, সর্বাঙ্গে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড়, চোখ কোঠরাগত, রুক্ষ চুলের বোঝা মাথায়, শুধু পেটগুলো উঁচু হয়ে ঠেলে আছে সামনের দিকে। প্রায় সবাই গর্ভবতী! ওরি মধ্যে দুজনের কোলের কাছে দুটো সদ্যজাত শিশু!

মুক্তিযোদ্ধারা চোখের জল সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে তাদের কাছে এগিয়ে যায়। ভাল করে তাদের দিকে তাকাতে পারে না, তবু চিনতে চেষ্টা করে যে যার নিজের আত্মীয়স্বজনকে!

মোকবুলের অবস্থা উন্মাদের মত! আজ চারদিন ধরে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে আয়েসাকে।

প্রথমে ভেবেছিল গ্রামের বাড়ীতে সে পালিয়ে গিয়েছিল জান মান বাঁচাবার জন্যে। তাই সর্বপ্রথম ও তাদের গ্রামের বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে ও যখন দেখলে খান-সেনাদের অত্যাচারের শত চিহ্ন—বাড়ীঘর সব ভেঙে জ্বালিয়ে দিয়ে লুঠতরাজ করেছে, নরহত্যা, নারীধর্ষণ, নারীহরণ কিছুই বাদ দেয়নি, তখন একেবারে ভেঙে পড়লো মোকবুল।

কলেজের শেষ মিলনের দিনটির কথা মনে পড়তে তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। বড় রেস্তোরার ছোট্ট একটা কেবিনে, পর্দার আড়ালে বসে চায়ের সঙ্গে মুর্গীমসল্লা খেতে খেতে আয়েসাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করে বলেছিল, চলো কোথাও পালিয়ে যাই, দুজনে।

ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। বাপজান তো আমাদের বিয়েতে কোন আপত্তি করেনি। শুধু বলেছে, আর এই ক'টা মাস পরে আই-এ পরীক্ষাটায় পাশ করলেই বিয়ে দেবে তোমার সঙ্গে, খুব ধুমধাম করে। ইতিমধ্যে তুমিও বি-এ-টা পাশ করে নাও। তোমারও তো এটা ফাইনাল ইয়ার!

বেশ তাই হবে। বলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপতে গিয়েও পারেনি মোকবুল!

কেন এমন করে নিঃশ্বাস ফেললে! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা। আল্লার কিরে! তুমি ছাড়া, আর কাউকে আমি স্বামী বলে ভাবতে পারবো না কোনোদিন, বিশ্বাস করো! বলে দু'হাত দিয়ে মোকবুলের গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল।

মোকবুলকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিল, কথা কইছো না কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, আমার কথা?

ছিঃ আয়েসা, তুমি আমার সম্বন্ধে এমন কথা মনে আনলে কি করে?

অভিমানে সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফুলে উঠেছিল আয়েসার। ওর হাতটা টেনে নিয়ে বুকের ওপর রেখে বলেছিল, আমায় ছুঁয়ে শপথ করো আগে!

এবার হেসে ফেলেছিল মোকবুল। খপ্ করে আয়েসাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আল্লার কিরে! আল্লার কিরে আল্লার কিরে! হয়েছে?

তিনদিন ধরে অনেকগুলো গুপ্তস্থানে হানা দিয়ে অনেক হতভাগিনীকে উদ্ধার করেছে মুক্তিসেনারা!

মোকবুল অনেক মেয়ের মুখের ওপর চোখ বুলতে বুলতে খুঁজে বেড়ায় আয়েসাকে।

শেষের দিন একটা ঘরের কোণে গিয়ে একটি মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সে চমকে ওঠে! এই ত আয়েসা!

একটি সদ্যজাত, কাঁচ বাচ্চা তার কোলের কাছে পড়ে ঘুমোচ্ছে, আর তার সেই ঘুমন্ত মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলে, কিসের গভীর চিন্তায় যেন সে মগ্ন!

আয়েসা! বলে ডাকতেই তার সারাদেহ যেন শিউরে উঠলো! মুখটা তুলে একবার মোকবুলের দিকে তাকিয়েই সে তার পায়ের ওপর কেঁদে লুটিয়ে পড়লো!

তুমি কেন এখানে এলে? কি দেখতে এলে? বলে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি, আয়েসা! বিশ্বাস করো! আল্লার কিরে!

নিঃশব্দে মুখটা তুলে মোকবুলের চোখের ওপর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সে বললে, তুমি আমায় নিতে এসেছো, সত্যি বলছো?

হাঁ, আয়েসা! তুমি অবিশ্বাস করছো কেন? চলো, ওঠো! বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে মোকবুল ওর চোখের জল যত মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করে তত যেন দু'চোখ ভেসে যায় জলে!

লক্ষ্মীটি, চুপ করো! ওঠো আয়েসা! চলো! বলে মোকবুল ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরতেই আয়েসা উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু আয়েসা দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। খপ্ করে মোকবুলের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বসে পড়লো আয়েসা। তারপর বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে মোকবুলের দিকে পিছন ফিরে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল!

হঠাৎ যেন ছন্দপতন ঘটে!

মোকবুলের মুখের রেখাগুলো সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে ওঠে। তার সমস্ত মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে আয়েসার প্রতি! চাপা কণ্ঠে আক্রোশ ফেটে পড়ে। ফেলে, আরে, ফেলে দাও ওটাকে। চলো! ওই শয়তানের বাচ্চাকে আবার বুকের দুধ খাওয়াচ্ছো! লজ্জা করে না তোমার! ছিঃ ফেলে দাও ওকে।

এই বলে যেমন আবার আয়েসার হাতটা ধরতে গেল সে বললে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে! অনেকক্ষণ খায়নি। পেটটা যতক্ষণ না ভরছে, ওই রকম চিলচীৎকার করবে।

করুক! এইখানে পড়ে পড়ে যত পারে কাঁদুক, শয়তানের বাচ্চাটা!! বলেই রসনা সংযত করে নেয় মোকবুল। মনে পড়ে যায়, সরকারী নিষেধাজ্ঞার কথা! এইসব অবাঞ্ছিত শিশুদের মানুষ করার দায়িত্ব সরকার নিজস্কন্ধে তুলে নিয়েছেন! তবু আয়েসা কাঁদে। কেন কাঁদে বুঝতে পারে না মোকবুল!

ছিঃ কেঁদো না। চুপ করো আয়েসা! তোমার চোখে জল দেখলে, আমার বুক ফেটে যায়।

আমার এই কলঙ্কিত দেহটাকে কি তুমি আবার ভালবাসতে পারবে? তারচেয়ে তুমি ফিরে যাও। অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হও। বলতে বলতে মাথাটা নীচু করে কাঁদতে লাগল।

মোকবুল তার চোখের জল মুছিয়ে বলে, তোমার দেহের কলঙ্কের জন্যে তুমি ত দায়ী নও আয়েসা! এর জন্যে তোমার চেয়ে বেশী লজ্জা যে আমাদের!

আমরা পুরুষ হয়ে মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারিনি!

একটু থেমে মোকবুল গলাটাকে খাটো করে বলে, আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এ স্বাধীনতার যে গৌরব আমরা লাভ করেছি তার ভেতরে রয়েছে তোমার মত শত শত নারীর ইজ্জত আর আত্মবলি, একথাটা কেমন করে ভুলবো!

বাচ্চাটাকে বুকে করে এবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে আয়েসা মোকবুলের সংগে, ঘর থেকে বাইরে।

পল্লীর পথঘাট তখনো তেমনি জনশূন্য। খানসেনাদের অত্যাচারের ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, এখনো কেউ ফেরেনি। চারিদিকে যেন শ্মশানের দৃশ্য!

মেঠো পথে, বনজঙ্গল, বাগান বাগিচার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায় মোকবুল।

আয়েসা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, এখানে দাঁড়ালে কেন? চারিদিকে গভীর জংগল।

ফিস্‌ফিস করে মোকবুল বলে, দাও ওই শয়তানের বাচ্চাটাকে ওই জংগলের মধ্যে শেষ করে দিয়ে আসি। কেউ জানতেও পারবে না।

অজ্ঞাতে আয়েসার সারাদেহে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। বলে, ছি ছি, এ পাপ কাজ তোমায় করতে দেবো না। ওকে সরকারের ঘরে জমা দিলেই ত চুকে যাবে!

তার তো অনেক দেরী! আর একটা মুহূর্তে যে আমি ওকে সহ্য করতে পারছি না। তোমার আমার মাঝে যেন একটা প্রকাণ্ড পাঁচিল তুলে দিয়েছে ও, বুঝতে পারো না তুমি?

পারি। তবু তোমাকে এ অন্যায় আমি করতে দেবো না। এ পাপ—

হোক আমার পাপ! তোমার তাতে কি! প্রতিহিংসার আগুন যেন ছিটকে বেরোয় মোকবুলের গলা ভেদ করে। ছেলেটাকে এবার আয়েসার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলে, চীৎকার করে সে কেঁদে ওঠে।

আয়েসা তাড়াতাড়ি স্তনটা তার মুখের মধ্যে ভরে দেয়। ছেলেটা চুপ করে খেতে থাকে। মোকবুল বলে, আচ্ছা তুমি ততক্ষণ খাওয়াও, আমি জঙ্গলের মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়ে আসি, তারপর ওকে নিয়ে গিয়ে সেখানে জ্যান্ত কবর দেবো! কেউ কিছু দেখবে না, জানতেও পারবে না! শুধু মাটির মধ্যে ওর দেহটা গলে পচে যাবে যেমন করে ওর বাপ আর তার দলের শয়তানরা আমাদের হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলেছে, ঠিক তেমনি প্রতিশোধ নেবো, এই শয়তানের বীজকে টিপে মারবো, যাতে আর না বাড়তে পারে।

এ কথার জবাবে কি বলবে আয়েসা বুঝতে পারে না। শুধু তার বুকের ভেতরটায় কি যেন টিপ্‌টিপ্‌ করতে থাকে। বারে বারে চোখে জল এসে পড়ে!

কিছুক্ষণ পরে মোকবুল ফিরে এসে দেখে, আয়েসা মাটির ওপর আঁচল বিছিয়ে অচৈতন্যের মত পড়ে আছে, আর সেই
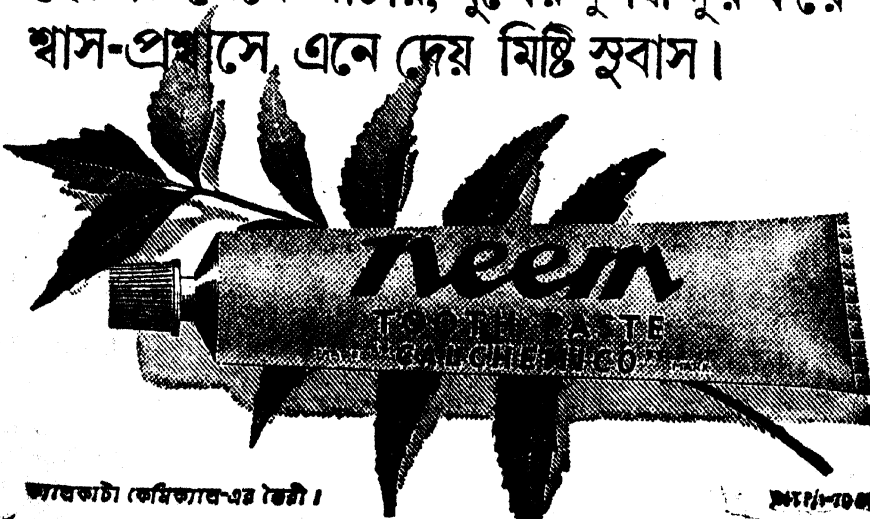
ছেলেটা একহাতে তার বুকের ওপর জড়িয়ে ধরা।

মাটির ওপর এই ঠান্ডা ছেলেটাকে কোথায় শোয়াবে ভেবে না পেয়ে বুঝি আয়েসা বুকের ওপর তাকে রেখেছিল! এ দৃশ্য অসহ্য লাগে মোকবুলের!

আয়েসার বুকের ওপর থেকে ছেলেটাকে যেমন সে টেনে নিতে গেল অমনি চোখদুটো ধীরে ধীরে খুললো। আয়েসা বললে, পানি। একটু জল দাও! বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে, তিনদিন পেটে অন্ন নেই। শরীরটা কেমন আনচান করছে, আমি উঠতে পারছি না! পানি! পানি! শিগগির একটু জল দাও...

আয়েসা! তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি এখনি জল আনছি। বলেই মোকবুল ছুটে গেল গ্রামের দিকে। নিকটেই গ্রাম, কিন্তু ঘর বাড়ী সব জনশূন্য। কে জল দেবে! কোথায় পাবে জল? খোদা মেহেরবান!

তাই অসহায়ের মত এদিক ওদিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ মোকবুলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অদূরে একটি বাগানে নারিকেল গাছের ওপর। দেখে কয়েকটা ডাব ঝুলছে। ছুটে গিয়ে, জামাটা খুলে গাছের তলায় রেখেই নারিকেল গাছে ওঠে পড়ে মোকবুল। তারপর দুটো ডাব ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে।

কিন্তু ফিরে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। কোথায় গেল আয়েসা!

আয়েসা! আয়েসা! বলে চীৎকার করে বারকতক ডাকলে। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। কি হলো আয়েসার। যে এখান থেকে উঠতে পারছিল না তেষ্টার জ্বালায়, সে গেল কোথায়? তবে কি তার বিলম্ব দেখে নদীর দিকে চলে গেছে পিপাসা মেটাতে।

এই মনে করে আয়েসার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সে নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

অল্পদূর যেতেই সে নদীর ঘাটটা পেলে বটে কিন্তু সেখানেও কোন লোকজন নেই। জনশূন্য নদীর তীর। কোথায় গেল তবে আয়েসা! ভাবতে ভাবতে মোকবুলের চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার মনে হয়! ওই ক্লান্ত শরীর নিয়ে তাহলে গেল কোথায় আয়েসা! বারবার মাথার মধ্যে সেই চিন্তা যেন পাক খেতে থাকে!

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ওর নজর পড়লো অল্প দূরে গাছপালার আড়ালে টিমটিম করছে একটা চালাঘর। ঘাটমাঝির চালার মত।

সে দ্রুত পা চালালো সেইদিকে। ক্লান্ত দেহটাকে নিয়ে হয়ত বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আয়েসা! তাই তার ডাক শুনতে পাচ্ছে না!

কিন্তু সেখানে পা দিয়েই মোকবুল চমকে ওঠে। দেখে আয়েসা নেই, তবে সেই শয়তানের বাচ্চাটা সেখানে আরামে ঘুমুচ্ছে। আয়েসা তার পরনের শাড়ীটা সর্বাঙ্গে বেশ ঢেকেঢুকে জড়িয়ে দিয়েছে। ঠান্ডার দিন, নদীর ওই কনকনে হাওয়া লেগে যাতে না বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায়।

আয়েসার শাড়ীটা দেখেই মোকবুলের হঠাৎ যেন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে থাকে। শাড়ী ফেলে, উলঙ্গ হয়ে গেল কোথায় আয়েসা!

এর বেশী আর যেন কিছু চিন্তা করতে সাহস হয় না মোকবুলের। ওখান থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে নদীর ধারে পাগলের মত চীৎকার করতে থাকে, আয়েসা, আয়েসা বলে।

একটা ছোট্ট মেয়েকে জঙ্গলের ভেতর থেকে একবোঝা কাঠ মাথায় করে বেরিয়ে আসতে দেখে তার কাছে ছুটে গেল মোকবুল। জিজ্ঞেস করলে, এদিকে কোন মেয়েছেলেকে দেখেছিস।

আট-ন বছরের কাঠকুড়ুনির মেয়ে। হি-হি করে হেসে উঠলো। বললে একটা পাগলীনীকে ন্যাংটো হয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে দেখেছিল। তারপর কি হয়েছে, আর কিছু জানে না। সে তার ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল।

কোথায়? কোনখানে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বল শিগগির। কন্ঠের আবেগ চেপে রাখতে পারে না মোকবুল!

মেয়েটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, ওই গাছটার নীচে।

মোকবুল ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁ মেয়েটা ঠিকই বলেছে। গাছের নীচ থেকে বরাবর মানুষের পায়ের ছাপ নদীর তীর পর্যন্ত সুস্পষ্ট আঁকা রয়েছে ভিজে মাটির ওপর।

এবার নদীর দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো মোকবুল। যেমন প্রচন্ড স্রোত, তেমনি ঘূর্ণিজলের তান্ডব, যেন ঠিক সেই জায়গাটায়!

হতভম্বের মত শুধু তাকিয়ে থাকে মোকবুল সেই রুদ্রমূর্তি নদীর দিকে।

এমন সময় হঠাৎ তীরের মত মোকবুলের কানে এসে বেঁধে সেই বাচ্চাটার কান্না। নদীর কনকনে ঠান্ডা হাওয়া লেগে বোধ হয় ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

মোকবুল এক মুহূর্ত দেরী না করে ছুটলো। ভালই হয়েছে। এই উপযুক্ত অবসর। যেখানে ওর মা গেছে, ওকেও সেইখানে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। গলাটা টিপে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, রাক্ষসী নদীর গর্ভে। ওই শয়তানের বাচ্চাটাকে কিছুতেই বড় হতে দেবে না।

কিন্তু এ কি! যেমন তার গলায় হাত দিতে যাবে মোকবুল হঠাৎ তার মুখের ওপর দৃষ্টি পড়তেই হাতটা ওর থেমে যায়। স্থির অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে সে! হ্যাঁ, ঠিক আয়েসার ঠোঁটের নীচে যেখানে একটা কালো তিল ছিল, ওই ছেলেটারও তেমনি রয়েছে! কাঁদছে কিন্তু ওর ঠোঁটের ভঙ্গীটার মধ্যেও যেন মোকবুল আয়েসার সাদৃশ্য দেখে চমকে ওঠে। তখন সব ভুলে গিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে মোকবুল।

আরো জোরে বাচ্চাটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতেই মোকবুলের যেন চমক ভাঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আয়েসার সেই কথাটা। যতক্ষণ না পেটটা ভরছে শয়তানটার কান্না কিছুতেই থামবে না। কি খেতে দেবে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ ডাবের কথা মনে পড়ে।

চট করে ছুরি দিয়ে ডাব কাটে মোকবুল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে ডাবের জলে ভিজিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে বাচ্চাটার মুখের মধ্যে দিতে থাকে। মিষ্টি ডাবের জল কিছুটা পেটে পড়তেই চুপ করে যায় শিশু। যে মুখের দিকে ঘৃণায় আগে তাকায় নি মোকবুল এখন যেন তার মনে হয় সেই মুখে আয়েসার মুখের সম্পূর্ণ ছাপ রয়েছে।

একদৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে এক সময় আয়েসার সেই পরণের শাড়ী জড়ানো বাচ্চাটাকে সস্নেহে বুকের মধ্যে তুলে নেয় মোকবুল। তারপর সেই শিশুর দেহে আয়েসার বুকের স্পর্শ অনুভব করতে করতে বাড়ী ফিরে যায় তাকে নিয়ে।

করবেট পার্কে দু'দিন

৫২৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে করবেট পার্ক স্থাপিত ১৯৩৫ সালে। কুমায়ুন পাহাড়ের পাদদেশে সেই করবেট ন্যাশনাল পার্কে বেড়িয়ে এলাম। বিখ্যাত শিকারী জিম করবেটের নামে এই পার্ক। না, বাঘ দেখিনি, হাতিও না। দেখেছি একটি বুনো শুয়োর। একপাল হরিণ। দু-চারটে সম্বর। চারটি কুমির। আর গভীর পরিব্যাপ্ত অরণ্য। আরণ্যক রাত্রি। নক্ষত্র-ভরা মধ্যরাত্রি যেন নেমে এসেছিল চোখের সামনে। জ্বলজ্বল করছিল বাঘের মত তার সহস্র চোখ। নিজেকে হারাব বলেই তো দেখা।

মস্ত দল। চল্লিশজন। তরুণ থেকে ৬১ বছরের বুড়ো। ওয়াইল্ড লাইফ ক্লাব থেকে এই সফরের আয়োজন করা হয়েছিল। দিল্লী কালীবাড়ীর যে-কজন উৎসাহী বাঙালী বাস চালাচ্ছেন, তারাই সব বন্দোবস্ত করলেন।

গজরৌলায় আটকে দিল বাস। এ পথে ডাকাতের ভয়। চার-পাঁচ মাস আগেও একজন ইন্সপেকটর নিহত হয়, একজন পুলিশ ও একজন ড্রাইভার। তারপর থেকে কনভয় সমেত যাওয়ার রেওয়াজ। দেখতে দেখতে পর পর বাস-ট্রাক দাঁড়িয়ে গেল, তিরিশটা। রাত তখন একটা। বাসে বারোটা পর্যন্ত তরুণেরা গান গেয়েছে, হাসি-গল্প-মস্করা। একজনকে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনলাম। ডি-সি-এম গ্রুপের দুজন এখন ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। তাদেরই দলে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; এতক্ষণ তরুণদের সঙ্গে গানের সুরে ভাঁজছিলেন, তালি দিচ্ছিলেন, সে-কি উৎসাহ। আর মাঝে মাঝে চুরুট টানছেন, উর্দু শের আওড়ে যাচ্ছিলেন। গভীর রাতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি পুলিশরা আগুন

আদিত্য সেন

পোহাচ্ছে। গোল হয়ে বসেছে। আগুনের শিখায় তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে; কখনও বা চোখ। কতক্ষণে উঠবে কে জানে! এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। একজন পুলিশ একটা লরিতে উঠে বলল, এবার চল! লরিটা এঁকেবেঁকে রাস্তার ধার দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপরেই দেখলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের বাস চলছে। পাশের তরুণ মাস্টার আমার ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়ছেন। এভাবে কি রাতের ঘুম পোষায়?

সকাল সাড়ে আটটায় এলাম রামনগর। সরগরম বসন্ত সকাল। চা পান করে এসে বসলাম বৃদ্ধ মানুষটির পাশে। আলাপ জমার এই শুরু। চিরকাল ডি-সি-এম চাকরী করেছেন: ইঞ্জিনীয়ার। এখন রিটায়ার করে সুযোগ পেলেই নানা দলে ভিড়ে যান। সময় কাটান আর কি? জীবনের মানে কি জানেন তো? উত্তর দিলাম না। কারণ জীবনের সত্যি যদি কোন মানে থাকে তবে ইনিই বলতে পারবেন। মাথা নেড়ে বললেন, কোন মানে নেই। জীবন মানে দেখা, চোখ ভরে দেখা।

আমরা ভুল পথে চলে এসেছি। দুপাশে ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে মেঠো পথ। এবড়ো-খেবড়ো। জীপ নিশ্চয় চলতে পারে, কিন্তু এতবড় একটা বাস চলা উচিত নয়। কিন্তু চলারও একটা প্রচণ্ড নেশা আছে। তাই মদ্যপের মত টলে সামলে চলছে বাসটা। বারবার মনে হচ্ছে এবার ওতগুলো লোক নিয়ে বাসটা উল্টে পড়বে। শত হলেও বাঙালীর বাস। মাঠের মধ্যে ক্রুদ্ধ অবস্থায় সব বাঙালী একত্র হব, মারপিট হয়ে যাবে নাকি? যাদের বাস, সেই তিনজন তরুণ ডিরেকটর বুকে হাত দিয়ে কি বুক-ধড়ফড়ানি সামলাচ্ছেন!

পাগল ড্রাইভার, একবার যখন ভুল পথে চলে এসেছে তখন অর্ধপথে থেমে থাকার ভুল সে করলে না। সূর্যটা দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ছোট্ট শিশুর মত যেখানে-সেখানে রঙের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, দেখ, দেখ, কি সুন্দর আমার আর্ট।

দেড় ঘন্টা প্রাণপাখিটাকে সামলে দশটার সময় উঠে এলাম পাকা রাস্তায়। রামনগর। করবেটের কাছারীতে হাজিরা দিতে হল। সামনে কি চমৎকার দৃশ্য। দূরে কুমায়ুন পাহাড়। সূর্যের আলোতে ধূসর চাদর জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। কত বিশাল গাছ। দু'চারটে ঘর। কৌতূহলী হয়ে সবাই দেখছে। এবার আঁকাবাঁকা রাস্তা। মাঝে মাঝে কোশী নদীর ছিমছাম শরীরটা লাফ দিয়ে দিয়ে চোখের সামনে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'পাশে ঘন বন। এগারটার রোদ্দুরে দূরের পাহাড়ে নীল ধূসর আভা। গভীর অরণ্যের মাথায় আলো। ধানের ক্ষেত মাঝে মধ্যে। দু-একটা কুঁড়ে ঘর। পাকা দালান। তার মানে করবেট এখনও দূরে। একটা পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে বাঁদরের মত টপকে যাচ্ছি। আঁকাবাঁকা পথটা লোভী হয়ে আকর্ষণ করছে।

করবেটের গেট পেরুলাম। আমরা গেইরালে যাব। এখান থেকে ১৫ কিলোমিটার। সাইনবোর্ডে লেখা আছে : 'অরণ্যের গভীরে এখন প্রবেশ করবেন, অনুভব করবেন নগ্ন প্রকৃতির নিঃশব্দ আকর্ষণ।'

পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছি; দু'পাশে শালবন। বাসটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে বেরিয়ে যাচ্ছে; পাশে পঞ্চাশ ফুট গভীর খাদ। পড়ে গেলে রক্ষে নেই। দেবনাথবাবু দলের নেতা; ওঁর কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা। দাড়িগোঁফ নিয়ে বন্য মানুষ সেজে থাকেন। অরণ্য নাকি ওঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওঁর নির্দেশ, দু'পাশে লক্ষ্য রাখুন, যে কোন সময় হিংস্র পশুর আবির্ভাব ঘটতে পারে। কেউ যেন কথা না বলে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকুন। টুঁ-শব্দটি করবেন না। নড়াচড়াও চলবে না। ভগবানের জন্য মানুষ যেমন প্রতীক্ষা করে তেমনি চলবে নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। অনেক প্রতীক্ষা করে একটা বন্য শুয়োর দেখলুম। আর হুড়মুড় করে ৪০জন লোক উঠে দাঁড়াল। বন্য শুয়োর বাসের আওয়াজ পেয়ে কৌতূহলবশত এদিকে আসছিল কিন্তু তখন চল্লিশজন মানুষের কথাবার্তা ও নড়াচড়া দেখে সে ছোট্ট লেজ তুলে উধাও।

গেইরালে এসে পৌঁছলাম দুপুর বারোটায়। চমৎকার গেস্ট হাউস। সামনে দিয়ে রামগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে 'সোঁ' 'সোঁ' আওয়াজ করে। চারিদিকে গভীর অরণ্য। সূর্যের আলোয় ঢেউগুলি ইলিশ মাছের মত চিকচিক করছে। এখানে নাকি কুমির থাকে। সুতরাং নির্দেশ এল একা বিচরণ করা চলবে না। দলবদ্ধ হয়ে চলতে হবে। কিন্তু অত নির্দেশ কি মানা যায়। জলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছন পেছন এল বন্ধুরা। অজস্র পাথর ছড়ান। বর্ষাকালে পাথরগুলো সব ডুবে থাকে। এখন যেন প্রকৃতি অনাবৃতা। বর্ষার সময় লজ্জাবতী নারীর মত গা ঢাকা দিয়ে পরিপূর্ণ যৌবন সামলায়। পাথর কুড়োচ্ছি, কারণ এ হরিদ্বারের মত পাথর নয়। এর নানা বাহারী রঙ। হরেক পাথর হাতে তুলে নিলাম। সবুজ একটা পাথর তার চারপাশে ডোরাকাটা। দেখতে দেখতে দু'হাত ভরে গেল। একটি পাথরে সাদা ছোপ ছোপ। দূরের থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটি নগ্ন মানুষ। কিংবা নারী। যা-খুশী ভেবে নাও। বন্ধুরা ধমক দিলেন, 'কি করছেন? ছোট ছোট পাথর কুড়োন। অত বড় পাথর দিল্লীতে কি বয়ে নেওয়া যাবে?'

বিকেল চারটের সময় পাহাড়ী একটি লোককে ধরে কুমির দেখতে গেলাম জনা দশ-বারো আমরা। জঙ্গলের পথে দুই কিলোমিটার পথ। নাথুরাম একটা হাওয়াই চপ্পল পরে তীরবেগে হাঁটছে। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছি না। চলতে চলতে বাঘের থাবার ছাপ দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভয় করে না?' হাসল। যেন অবান্তর একটা প্রশ্ন। বলল, 'ছোটবেলার থেকে এই জঙ্গলে। অভ্যাস হয়ে গেছে। বহুবার বাঘের সামনে পড়েছি। আমিও সেদিকে চোখ তুলে দেখিনি, তারাও হয়ত দেখে ধীরে ধীরে অন্য পথ নিয়েছে। একবার হাঁটছি, দেখি কি একটা বাঘও হাঁটছে। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে হাঁটলাম। হঠাৎ ও দেখি চলে গেছে।'

পাহাড় বেয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে লতা-পাতা ধরে ধরে নামলাম রামগঙ্গার পাশে। 'ঐ দেখুন, চার চারটে কুমির। রোদ্দুর পোহাচ্ছে।' সঙ্গে বাইনাকুলার ছিল। সাতা পরম নিশ্চিন্তে ওপারের পাথরের ওপর
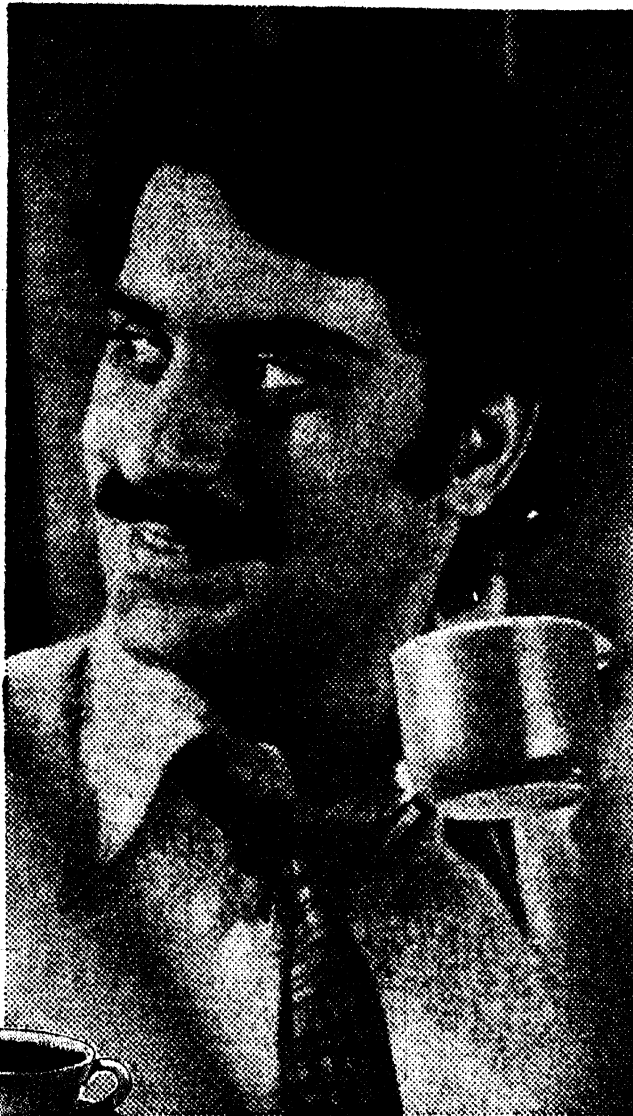
মুখোমুখি শুয়ে 'বাবুরা' ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু দেখতে গেলেই মুশকিল; সঙ্গে আবার পর্বতারোহণে পারদর্শিনী এক মহিলা। অতএব কতটা কলকল ছলছল শুরু হল, তা আর না বললেও চলবে। অতঃপর কুমির গেল একে একে জলে নেমে। রামগঙ্গার তীরে নেমে এলাম। কিন্তু চার-চারটে কুমির হাওয়া। চৌকিদার নাথুরাম বলল, 'ওরা দূর থেকে মানুষের আসবার সংবাদ পায়। কথা শুনতে পায়। কথা শুনলে পালিয়ে যায়। পরের দিন এখানে আসবে না। অন্য জায়গায় রোদ পোহাবে।'

রামগঙ্গার তীরে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ।—'এই দেখুন বাঘের ছাপ। মনে হচ্ছে আজই তারা এ-পথ দিয়ে গেছে। হাতিও। এ-পথে আকছার বাঘ দেখা যায়।'

পরের দিন সকাল আটটা নাগাদ বাসে চড়ে বসলাম। ধিকালায় যাব। সেখানে হাতির পিঠে চড়ে বনে যাওয়া চলে। মোষ মারা পড়লে মাচায় উঠে বাঘ দেখার দুর্লভ সুযোগ ঘটে। মেঘলা দিন। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। বিশাল শাল বন। মাঝে মাঝে একটি গাছ অন্য গাছকে জাপটে ধরেছে। কখনও বা লম্বা হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এক-একটার উচ্চতা ৪০ থেকে ৬০ ফুট, মাঝে মাঝে একশো ফুট। এখান থেকে ধিকালা ১৬ কিলোমিটার। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মেঘ উড়ছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। চলতে চলতে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের প্রান্তদেশে সূর্যকে উঁকি দিতে দেখছি। রামগঙ্গা বয়ে চলেছে। সরু ছয় ফুটের পাহাড়ী পথ; বাঁকের মাথায় কাদা। বাসের চাকা আটকে যাবার ভয়। দু-একবার আটকে গেলাম। একবার তো তীর্যক রাস্তা পেরোতে ড্রাইভার হিমসিম খেয়ে গেল। কিছু লোক নেমে পড়ল। গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে বাসটা ফাঁড়া কাটিয়ে উঠল। আমরা অরণ্যের গভীর প্রান্তদেশে চড়াই-উৎরাই পেরোচ্ছি। কখনও বা রামগঙ্গা কলকল রবে বয়ে চলেছে। কখনও মাঝ-ভূমিতে এসে দূরের পাহাড় দেখছি। এদিকে-সেদিকে ছোট ছোট ঝুপড়ি। অনেকে এর মধ্যে থেকে অরণ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতায়। অরণ্যের সঙ্গে মিশে থাকলে বন্য পশুদের খুব সহজে দেখা যায়। এই মাত্র পাহাড়ের দিকে অদ্ভুত সুন্দর একটা শাদা পাখি উড়ে গেল। চলেছি তিন হাজার ফুট উঁচুতে। ঘুরতে ঘুরতে পাহাড় টপকাচ্ছি। স্নেহমতী মানুষগুলো নির্বিবাদে অরণ্যের পাশে দাঁড়িয়ে, এরা রাস্তা মেরামত করছে। কুচি পাথর বিছিয়ে দিচ্ছে। আমাদের তাকিয়ে দেখছে। মাথায় দেশী টুপি, হাতে কোদাল, শাবল। ছেঁড়া কাপড়-জামা। এদের কি ঠান্ডা লাগে না। আমরা এত ভারি ওভারকোট পরেও শীতে জমে যাচ্ছি যেন। দেবনাথ বললেন, 'রাস্তা দিয়ে চলেছি তো, তাই বুঝতে পারছি না কত গভীর এ অরণ্য। আমি এ অরণ্যের মধ্যে দু-একবার ঢুকে পড়েছিলাম। ওরে বাবাঃ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। দম বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় কখন বেরিয়ে আসব। অথচ কি প্রচণ্ড এর আকর্ষণ। শহরে ফিরে গেলে এই অরণ্য হাতছানি দিয়ে ডাকে।'

দু'একটা হরিণ ছাড়া এতটা পথে কিছুই দেখলাম না। গাছের আড়াল দিয়ে কত অসহায়ভাবে হরিণ মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখে। এত মায়া হয়। হয়ত ভাবে দেখলেই মারব। তাই মুখ বাড়িয়ে দেখে, কথাবার্তা শুনলেই ছুটে পালায়। ওরা জানে না, ওদের মারা নিষেধ। মেরে মেরে আমরা ওদের বিশ্বাস ভেঙেছি। এখন কিছুতেই সামনে আসে না। এলেও এক মুহূর্ত। কালো হরিণ চোখ দেখিয়েই ছুট। একটা নয়, বেশ কয়েকটা। এরা অরণ্যে দলে দলে চলে। আধুনিক মানুষ ছাড়া সবারই গোষ্ঠীবদ্ধ স্বভাব।

ধিকালায় গিয়ে দেখি আকাশটা হাসছে। দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে মনে হল উনুনের ধোঁয়া। কিন্তু না ধোঁয়া নয়, ওগুলো মেঘ। পাহাড়গুলো যেন মেঘগুলোকে বগলদাবা করে যখন-খুশী আকাশে ছুঁড়ে দেবে আর ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামবে। শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। তাঁবুতে শিলাগুলো কেমন সুন্দর সেঁটে গেছে। একজন শিলাগুলো গোল পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল আমাদের গায়ে। এখানে বহু ট্যুরিস্ট দেখছি। তিন-চারটে মেয়ে গগলস্ লাগিয়ে স্ল্যাকস পরে সিগারেট ফুঁকছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে। তাদেরই গাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে। অরণ্যে, হে ঈশ্বর, হিন্দি গান কি না-বাজালেই নয়। আধুনিকারা কি এখানেও পিকনিক করতে আসে নাকি? অন্য দু-একটি পরিবার এসেছে; তারা দেখলাম হাতির পিঠে চড়ে বসল। দেড় ঘণ্টা ধরে অরণ্যের পথে সফর করবে। আগে থেকে বুকিং করতে হয়।

চা খেতে গেলাম ছোট্ট একটা দোকানে। এখানেও পাহাড়ী শ্রমিকরা গোল হয়ে বসেছে আগুনের সামনে। কি নিরীহ সরল এদের মুখ, চাহনি। একজন তর্ক করছে দলের নেতার সঙ্গে। রাস্তা তৈরী করবে না। মাঝ-পথে কাজ বন্ধ করে দেবে। হাজার দুই টাকা কম দিচ্ছে তাদের। দুই কিলোমিটার রাস্তা তৈরী। এদের জল্পনা-কল্পনা দেখে বুঝলাম এরাও প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম বক্সার দিকে। এখান থেকে দশ কিলোমিটার। দুপাশে এলিফ্যান্ট গ্রাস। এই ঘাসেই বাঘ দেখা যায়। এখানে ওরা নির্ভয়ে চলে-ফিরে বেড়ায়। ১২ থেকে ৯৫ বর্গমাইল এলাকা সমতল জমি। দুপাশে বড় বড় ঘাস। যেতে যেতে দেখলাম দূরে গাছের নিচে হরিণদের মহড়া চলেছে। একজন পুরুষকে ঘিরে হরিণীদের আসর। অন্য কোন পুরুষ ঢুকতে চাইলেই লাঠালাঠি লেগে যায়। সেই ভাগ্যবান হরিণকে এরা সামলে রাখে। এখানে নাকি দলে দলে হাতি আসে। বন্য প্রাণীদের লোভনীয় স্থান এটা। কিন্তু এখানেও হরিণ ছাড়া আমরা কিছুই দেখলাম না।

দেবনাথ বললেন, 'জায়গাটা ভাল করে দেখে নিন। এখানে একটা হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট হচ্ছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। জলে এ জায়গাটা জলে ভরে যাবে। বন্য জন্তুদের এত অপূর্ব জায়গাটা ধ্বংস করে বিদ্যুৎ সরবরাহের কি প্রয়োজন তা তো বুঝি না। কত আমরা প্রতিবাদ করেছি; সরকারের কাছে 'পিটিশন' দিয়েছি। কিন্তু কিছু হয়নি।'

এগিয়ে গিয়ে প্রকল্পটা দেখে এলাম। কিছু কিছু জায়গা নষ্ট করে প্রকল্প রচিত হয় বলেই তো আমরা সভ্য হয়ে উঠি। তবে আমার মনে হয়, সেক্রেটারি বা অন্য আমলারা এখানে এসে কিছুদিন থাকলে হয়ত এই সমস্যা নিয়ে একটু ভাবতেন। আমাদের সঙ্গে যে বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি হেসে বললেন, 'কন্ট্রাক্টাররা সবাইকে খাইয়ে রেখেছে, বুঝলেন?' না, এসব ঠিক বুঝি না। কে কাকে ধরে খাওয়াচ্ছে আর কে কাকে গিলে ফেলছে, মানুষের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত ক্ষয়ে নিঃশেষ—এ ভাবতে যেন একটু কষ্ট হয়।

বৃষ্টি পড়ছিল। বকসার থেকে ধিকালায় ফিরে এসে গরম গরম রুটি খেলাম। ঠিক ছিল খেয়েদেয়ে মাচায় উঠব। কিন্তু গরম গরম রুটি খাবার সময় বুঝলাম, ভাগ্য খারাপ। আকাশটায় ঘন মেঘ জমেছে। বৃষ্টি নামল বলে। এই হিমশীতল সন্ধ্যায় বৃষ্টি মাথায় করে অরণ্যের বন্য পশু দেখা সম্ভব নয়। ফিরে এলাম।

বিকেল ছটায় ফিরে এলাম গেইরাল গেস্ট হাউসে। পরের দিন আবার যাব ধিকালায়, অবশ্য যদি বৃষ্টি না হয়। সেদিন অনেক রাতে বাইরে বেরিয়ে দেখি, অরণ্য যেন আদিম প্রকৃতি; গভীর রাতের আকাশ দেখলাম যেন হাত প্রসারিত করে নেমে এসেছে অরণ্যের প্রান্তদেশে। নগ্ন নিরাভরণ, সর্বহারার ঐশ্বর্যে ভরা সে আকাশ আর তমসাচ্ছন্ন অরণ্য। আমি রামগঙ্গার তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারে, শুধু শুনছি তার 'সোঁ' 'সোঁ' শব্দতরঙ্গ। এখন রাত কটা হবে? রাত দুটো। নিজেকে ভুলে অনন্ত প্রদীপের আলোতে নিজেকে খুঁজে পাবার দুর্লভ অভিজ্ঞতা হল আমার। এরকম একটা মুহূর্তে আমি বুঝি আমরা মানুষ, আমরা বেঁচে আছি।

(৮)
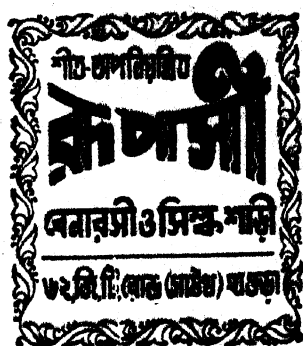
যোগেশচন্দ্র বলেছিলেন, 'সুরোর আমার জীবনের কাজ এই প্রথম এই শেষ। ওর যেন মনের কোনোখানে এতোটুকু আক্ষেপ না থাকে মেয়ের বাপ ঠাকুদ্দা নেই বলে এইটির ত্রুটি হলো।'

না সে আক্ষেপ হয়নি, হবার কথাও নয়। মেয়েই বরং বারবার বলেছে, 'বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? নাতনীর বিয়ে দিতে বসে সর্বস্বান্ত হবে না কি?'

যোগেশচন্দ্র হেসে বলেছিলেন, 'সর্বেশ্বর যাঁর ঘরে বিরাজমান সে কখনো সর্বস্বান্ত হতে পারে পাগলী?'

সর্বেশ্বর না কি ও'দের সাত পুরুষের ঠাকুর।

তা যোগেশচন্দ্র অবিশ্যি সর্বস্বান্ত হলেন না, হলেন সুরবালাই। যার কিছুই ছিল না থাকার মধ্যে শুধু ওই মেয়েটুকু।

এতো ঘটার বিয়ের পরিণাম হলো এই, বিয়ের পর জানা গেল জামাইয়ের মাথার গোলমাল। মাঝে মাঝে ভাল থাকে, মাঝে মাঝে গোলমাল দেখা দেয়। বিয়েটা যখন হয়েছিল তখন ভাল থাকার পিরিয়ড চলছিল। কাজেই কেউ কোনো সন্দেহ করেনি।

সন্দেহ দেখা দিল জামাই ষষ্ঠীতে জামাই এলে। জামাই এমন সব আচরণ শুরু করলো যেটাকে ঠাট্টা-তামাসা করছে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নীরবালা অবশ্য অতো বোঝেনি, সে তার মায়ের কাছে চুপি চুপি হিহি করে বলেছিল, 'তোমার যে সেই রকম জামাই হয়েছে মা। সেই যে ছড়া আছে—কচুপাতাটি মাথায় দিয়ে নাইতে নেমেছে। তেল মাখতে তেল দিয়েছি ফেলে দিয়েছে, পা ধুতে জল দিয়েছি খেয়ে ফেলেছে, বসতে পিঁড়ি দিয়েছি শুয়ে পড়েছে।...ওই দ্যাখো সে দুধের গেলাসটি মাথায় উপুড় করে হি হি—'

মা তীব্র গলায় বললেন, 'চুপ কর লক্ষ্মীছাড়ি পোড়াকপালী। কে বলেছে তোকে এসব কথা?'

'বাঃ ওরা তো সবাই বলছে। ন্যাপলা সত্য, বিন্দাবন।'

'বলুক! তুমি চুপ করে থাকো। আর দুবার যেন না শুনি তোমার মুখে।'

তা মেয়ের মুখে আর না শুনলেও জনে জনে সকলের মুখেই শুনতে পেলেন সুরবালা জামাইয়ের মাথা খারাপ।

নাতজামাইয়ের চিকিৎসার জন্যে অনেক ব্যয় করলেন যোগেশচন্দ্র, অনেক ডাক্তার বদ্যি, অনেক মাদুলি কবচ, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সাহেব ডাক্তার পর্যন্ত দেখালেন, কিছুতেই কিছু হল না। জগদীশ কখনো একদম ভাল থাকে—সুন্দর সভ্য আচরণ করে, কখনো যা তা করে।

বিয়ের ঘটাপটা দেখে যাদের বুক ফেটেছিল তারা বলতে লাগলো, 'হবে না? হবেই তো। এতো বাড়াবাড়ি কি বিধবার কপালে সইবার? ...নাতনীর বিয়েতে ইংরিজি বাজনা! তখনই বুঝেছিলাম একটা কিছু ঘটবে।'

আবার জিয়াগঞ্জে যাদের যাতায়াত আছে, এমন আত্মীয়রা বলতে লাগলো, ওখানে নাকি বার্তা রটেছে জামাইকে বশ করতে বিয়ের রাত্তিরে কিছু না কি 'খাইয়ে' দেওয়া হয়েছে। সেই গুণতুক এখন মাথায় উঠেছে।

আবার এমন কথাও কেউ কেউ বলতে লাগলো এদিক ওদিক থেকে—ওই পাগলামীটা নাকি জগদীশের ছিল না, ওর নাকি বৌ পছন্দ হয়নি তাই পাগল-ছাগল সেজে এদের হাত এড়াতে চায়।

যোগেশচন্দ্র নাকি নাতজামাইয়ের বাবার কাছে উপস্থিত হয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন, ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে এতোবড় অন্যায় করলেন কী বলে? একটা বিধবার সন্তানের সর্বনাশ করতে বাধলো না আপনার? জানেন আপনার নামে কেস করতে পারি।

তিনি আবার উল্টে মারমূর্তি হয়ে বললেন, 'বটে? পয়সার গরমে ধরাকে সরা দেখছেন? কেস করতে পারেন? কে কার নামে কেস করতে পারে দেখতে চান? কিছু বলছি না তাই। আমি যদি বলি আমার ছেলেকে আপনারাই ওষুধ-বিসুদ করে পাগল করে দিয়েছেন।'

'চমৎকার। তা'তে আমার স্বার্থ?'

'কার যে কিসে স্বার্থ তা কি চট করে বলা যায়? আমার ছেলের পূর্ব অসুস্থতার কোনো প্রমাণ নেই। এ যাবৎকাল সে স্কুলে পড়েছে, আগামী বছর এনট্রান্স দেবার কথা—'

কথাটা সত্যি।

অতএব যোগেশচন্দ্র মুখ বোপ খেলেন। ফিরে আসার সময় শুধু বলে এলেন, 'একটা বিধবার মেয়ের এই সর্বনাশ করার শাস্তি ভগবান আপনাকে দেবেন।'

কিন্তু ভগবানের দায় পড়েছে।

কলি যুগ তাঁর ছুটির কাল, একালে অফিসের ফাইল নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন কেন তিনি?

অতএব শাস্তিটা আর চোখে দেখা গেল না। অথবা গেলই। পাগল ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটাকে যদি শাস্তির কোঠায় ফেলা যায়। তবু তো ছেলে কখনো হাসছিল কাঁদছিল, কখনো সহজ হচ্ছিল, এ যে একেবারে হাওয়া।

তা' সেও তো যোগেশচন্দ্রেরই শাস্তিই অধিকতর।

এই দু বছর যাবৎ তো তবু চিকিৎসার সমারোহে মেয়েকে কিছুটা বুক দিয়ে রাখছিলেন, নিজেও আশায় দুলছিলেন।

এ যে মূলে হাভাত।

সুরবালা কপাল ঠুকে কপাল ফাটালেন, বুক চাপড়ে বুক ছিঁড়লেন, ভগবান থেকে পাড়া-পড়শী পর্যন্ত সকলকে শাপ-শাপান্ত গালমন্দ করলেন, তারপর বিছানা নিলেন।

আর তাই দেখে নীরবালা মাকে বললো, 'গলায় দড়ি। একটা নিষ্পরের ছেলের জন্যে করছে দেখো! বলি তোমার নিজের পেটের মেয়ের কোনোখানটা টসকেছে? যদি বুকভাঙা তোমার নিজের মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তা হলে কিছু বলার ছিল না।'

মা বললো, 'তোর যে সম্বন্ধ গেল মুখপুড়ি।'

মুখপুড়ি বললো, 'গেল বললেই গেল? আমি রইলাম এখেনে, দিব্যি ডাঁটের ওপর, আর আমার সম্বন্ধ হাওয়ায় উড়ে গেল?'

'কিসের তোর এতো ডাঁট রে হতচ্ছাড়ি? ভবিষ্যৎটা ভেবে দেখেছিস?'

'কী যে আনতাবাড়ি কথা বল মা। ভবিষ্যৎটা কেউ ভেবে দেখে বুঝতে পারে? এই যে দাদামশাই এতো বিজ্ঞ পণ্ডিত, সায়েব-জানিত লোক সে পেরেছিল বুঝতে? নাতনীর অদৃষ্ট যখন অলক্ষ্যে বসে হাসছে, দাদামশাই তখন নাতনীর মটুকসুটের গয়না গড়াচ্ছে, ইংরিজি বাজনার বায়না দিচ্ছে। তবে? কান্নাকাটি আমার দু চক্ষের বালাই বাবা! তোমার নিজের পেটের মেয়ে যখন মরবে কি ঘর ছাড়বে, তখন গলা ছেড়ে কেঁদো, বারণ করতে আসবো না।'

এসব কথা গল্প করেছেন বড়জ্যেঠি। বাবার জ্যেঠতুতো দাদার স্ত্রী।

কিছু কিছু আবার বাবার পিসিমা নিজেও। বলছেন এমন ভাবে, যেন এই সেদিন ঘটে গেছে ঘটনাগুলো।

আসল কথা— যে কাহিনী সবাইয়ের জানা, যে কথা বারবার বলা হয়ে গেছে, এখন বললে আর কেউ কান দেয় না, সেই কথা সেই কাহিনীই আবার নতুন করে বলতে ইচ্ছে করে, যদি কান দেবার মত নতুন শ্রোতা জোটে।

আমাদের দাদামশাইকে দেখেছি, তখন বোধহয় সত্তর বছর বয়েস পার হয়ে গেছে তাঁর, অতএব হিসেব মতো রিটায়ার করেছেন বছর চোদ্দ পনেরো আগে, কিন্তু বাড়িতে যেই কেউ নতুন লোক এলো, দাদামশাই তার কাছে অফিসের গল্প ফেঁদে বসলেন।

বসবেনই, জানা কথা।

আড়ালে হাসাহাসি চলতো আমাদের। মামাতো ভাই-বোনেরা বলতো, 'ওই—হলো আরম্ভ ঠাকুর্দার 'বড়সাহেবের' গপ্পো।

দাদামশাই কিন্তু এই সব হাসাহাসি টের পেতেন না তিনি ওই নতুন শ্রোতা পেয়ে মহোৎসাহে সেই মুখস্থ হয়ে যাওয়া সব কাহিনী সদ্য টাটকার মতো বলতে থাকতেন।

বলতে বলতে উদ্বেলিত হতেন, উদ্দীপিত হতেন, উঠে দাঁড়াতেন, হাত-পা নাড়তেন এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বুঝিয়ে ছাড়তেন সেই নতুন শ্রোতাকে, অফিসে ওঁর কী একখানা পোজিশান ছিল, বড় সাহেব ওঁকে কী পরিমাণ সমীহ করতেন আর উনি কী ভাবে ছোটসাহেবকে নস্যাৎ করে চলতেন।

একদা যে দাদামশাই কোনো এক সায়েব কোম্পানীতে বড়বাবু ছিলেন, এবং সমগ্র কেরানী কুলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, সেই ভয়ানক দরকারি কথাটা কারো অজানা থেকে যাবে, এটা যেন বরদাস্তের বাইরের।

এক্ষেত্রেও অনেকটা তাই।

নীরোপিসির অতীত ইতিহাস এ দিকের সকলেরই জানা, নতুন করে সে কথায় কান দেবার লোক নেই। মা এসেছেন এক নতুন মানুষ, আগ্রহী শ্রোতা, অতএব পুরনো কথা নতুন হয়ে উঠছে।

বাবার পিসিমা একান্ত উৎসাহে জানাতে চাইছেন এই যে তাঁরা দুই মাতা-কন্যা এ সংসারে পড়ে আছেন শুধু দিনযাপনের ভূমিকায়, তাঁরা ফেলনা নয়, তাঁদেরও একদা কতো মূল্য ছিল।

আক্ষেপের সূত্র ধরেই সেই গৌরবের দিনের ছবি মেলে ধরছেন তিনি এই নতুন লোকেদের সামনে। 'এখন দেখলে কে বিশ্বাস করবে একদা নীরির রং ছিল কাঁচা সোনার মতন! চুল ছিল মেঘের ঢাল নলুপা নলুপা গড়ন, চোখের কী বাহার! মটুকসুটের গয়না আর লাল বেনারসী পরে কনে যখন বাসরে বসলো, মনে হলো যেন সরস্বতী প্রতিমা-খানি। কে জেনেছে অমন চাঁদপারা কপালের মধ্যে অমন ছাই পোরা ছিল।'

আর বড় জ্যেঠাইমা?

তাঁর দিকটা আলাদা। গল্প করতেই আহ্লাদ তাঁর।

বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক জীবনের মধ্যে আমাদের এই এসে পড়াটা একটা সাড়া জাগানো ব্যাপার। আমাদের শহুরেপনা নিয়ে আমার মার অজ্ঞতা নিয়ে, আমার বাবার 'লম্বা হাত' নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করাতেও যেমন একটা রস আছে, তেমনি এ পরিবারের সব কিছু সম্বন্ধেই অজ্ঞ এই মহিলাটির কাছে পারিবারিক ইতিহাস, পরিবারের সকলের রীত চরিত্র সম্পর্কে সমালোচনা, পরিবারের নীতি নিয়ম প্রথা কুলাচার ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রসংগ বিবৃত করার মধ্যেও একটি বিশেষ রস আছে।

এই গল্পগুলি সাধারণতঃই হাতে একটা কাজ নিয়ে চলতো।

মেয়েমানুষ শুধু হাত-পা কোলে করে বসে গালগল্প করবে, এমন অনাচার এই গাংগুলীবাড়িতে নেই।

ওঁদের গল্প চলতো কুটনো কুটতে কুটতে, সুপুরি কাটতে কাটতে, ঠাকুরের নৈবিদ্যির চাল বাছতে বাছতে, নিত্যদিন আরতির সলতে পাকাতে পাকাতে।

নীরোপিসির গল্পের উপসংহার বড়জ্যেঠিমার কাছেই শোনা—

'মেয়ে তো ওই রকম কাটোয়া সেপাই, কাঁদে না গুমরোয় না, খাওয়া-দাওয়ায় বৈলক্ষণ নেই, কিন্তু পিসিমা একেবারে শয্যেধরা হয়ে গেলেন। আর তাই দেখে মেয়ের দাদামশাই যেন ছেলেমানুষের মতন হয়ে উঠলেন। অমন যে ডাকাবুকো আর বিচার বিচক্ষণওলা লোকটা, বোকাহাবার মতো যে যা বলো তাতেই নেচে উঠে ভাবেন এই বুঝি নিরুদ্দিশের উদ্দিশ হলো।...কে বললো, কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে তাকে দেখেছে, নবীন সাধুর বেশ মাথা মুড়নো, তবু চিনতে কি আর ভুল হয়? ...অমনি ছোটালেন লোক তাকে ধরে আনতে।... লবডংকা! যাকে দেখেছে সে একটা হিন্দুস্থানী ছেলে। ...আবার কে বললো, কলকাতায় একটা ময়রার দোকানে বসে গরম গরম রসগোল্লা খেতে দেখেছে তাকে।...আর যায় কোথা? এতো সে না হয়েই যায় না, গরম রসগোল্লায় তার নাকি বরাবরের ঝোঁক।...দাদাশ্বশুর অমনি ছুটলেন কলকাতায়। কোথায় কী? রসগোল্লা খাওয়া লোকটাকে পাওয়া গেল, রোজই না কি গরম রসগোল্লা খায় সে, কিন্তু লোকটা তো আর সে নয়? ...কতোজনই যে ওনাকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে ট্যাঁক ভারী করলো। জেনে বুঝেও ঠগের হাতে পড়েন, আর বলেন, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পেলেও পেতেও পারো অমূল্য রতন।'...সেই সায়েব-ঘেঁষা মানুষ হয়ে গেলেন আলাভোলা। সকাল-সন্ধ্যে সর্বেশ্বরের মন্দিরে পড়ে থাকেন, আর কোথায় গণৎকার, কোথায় জানের বাড়ি, কোথায় মাদুলী কবচ এই করে বেড়ান। কেষ্টনগরে পাঁচুঠাকুরের থানে, ঘোষপাড়ায় সতীমার থানে, নবদ্বীপে পোড়া

মা তলায়, ছোটেন, কোথায় কার 'ভর' হয়, ভরের মুখে জিগ্যেসার উত্তর মেলে। এই করতে করতে হঠাৎ একদিন মিলে গেল ওই পরম রতন। একজন শুধু বলে দেওয়া নয়, চোখে দেখিয়ে দিলেন জামাই ঠিক সেই সময় কোথায় আছে, কী করছে। দাদাশ্বশুর দেখতে পেলেন না কি একটা ইস্টিশানের ধারে কোথায় যেন বসে শালপাতার ঠোঙায় করে জিলিপি খাচ্ছে নাতজামাই। দাদাশ্বশুর বললেন, 'এ ইস্টিশান রাণাঘাট ইস্টিশান। আমার চেনা। বাস ছুটলেন রাণাঘাটে। তারপর কদিন পরে ফিরলেন খুব উত্তেজিত ভাবে।

সন্ধান পাওয়া গেছে।

হাতেনাতে ধরে এসেছেন।. পাগলছাগল কিছুই না। আর সংসারজীবনে তার মন নেই এ কথাটাও মোটেই খাঁটি নয়। দেশ থেকে নাকি একটা তাঁতিদের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে ওখানে একটা পান বিড়ি চায়ের দোকান দিয়েছে আর তার সংগেই স্বামী-স্ত্রীর মতন বসবাস করছে। কানাঘুষোয় জেনে এসেছেন সেটি। কী কেলেঙ্কার, কী কেলেঙ্কার।...তখন মেয়ের সংগে পরামর্শ চললো চুপিচাপি, ঠিক হলো কলকাতায় কালীঘাটে পুজো মানতে যাচ্ছি ছুতো করে মেয়েকে আর নাতনীকে নিয়ে গিয়ে একেবারে সেই ছুঁড়ির সামনে গিয়ে পড়বেন, আর শেষ পর্যন্ত তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে বিদেয় করে দিয়ে জামাইকে গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে আসবেন।...নীরো ঠাকুরঝির কাছেও তখন ফাঁস করলেন না একথা, সে জানালো কালীঘাট যাচ্ছে।

কিন্তু কালীঘাটে যেতে অষ্টাঙ্গে গহনা কেন? পরনে জরি বেনারসী কেন?

মেয়েটা বারবার প্রশ্ন করে।

বলে 'সং সেজে মায়ের মন্দিরে যাবো কেন?'

ওকে বোঝানো হয় পুরুত ঠাকুরের এই আদেশ। মায়ের কাছে সালঙ্করা দিব্যবস্ত্র পরিহিতা নববধূর মূর্তিতে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর উদ্দিশের জন্যে ধর্ণা দিতে হবে।

মেয়ে বললো, উদ্দিশ তো কতই হবে। যাক আমার কলকাতায় বেড়ানো হয়ে যাবে ফাঁকতালে।'

রাণাঘাটে নেমে মেয়ের কাছে আসল কথা ব্যক্ত করা হলো। মেয়ে তো কাঠ। একী ষড়যন্ত্র!

'তা' তোর ভালর জন্যেই তো ষড়যন্ত্র।'
তা বটে! তবে করো ভালো।

মেয়ের ভালো করতে ওনারা তাকে নিয়ে ঘোড়ারগাড়ীতে চেপে গিয়ে পৌঁছলেন সেই পান বিড়ির দোকানে। সামনেটা দোকান ঘর, পিছনটা থাকার ঘর, করোগেট টিনের চাল, ন্যাড়া ইঁটের দেয়াল, হতবিচ্ছিরী একটা জায়গা।

সেইখানে মেয়েকে বিয়ের চেলি পরিয়ে অটকলদেটের গহনা গা মুড়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন মহারাণীর মতন। মুখপোড়া ছোঁড়া দেখুক কী জিনিসের মালিক সে।... আর সেই ছুঁড়িও দেখুক কিসে আর কিসে।

গিয়ে দেখেন ঘরের সামনে খোলা দাওয়ায় খাজাঞ্চির উনোনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে ছুঁড়ি, আর মহাপ্রভু কাছে বসে তার উনোনে বাতাস পাড়ছে। দুজনেরই হাসি মস্করার মুখ।

এই কুদিশা দেখে কর্তা পা থেকে চটি খুলেছিলেন, তবু মেজাজ সামলে নিয়ে বললেন, 'জগদীশ! দেখতে পাচ্ছো কে এসেছে?'

মেয়েটা তো ওঁদের দেখেই বোঁ করে ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে গেছে, জগদীশ ভ্যাবাচ্যাকা মেরে হাতের পাখা ফেলে পেন্নাম করতে এলো। কর্তার চেহারাখানাও তো তেমনি ছিল! এই দশাসই গড়ন, টকটকে রং, পরনে চুনোটকরা ধুতি, গায়ে সৌখিন মেরজাই, পকেটে ঘড়ি ঘড়ির চেন, হাতে রূপো বাঁধানো ছড়ি! দেখে ভয় পাবারই মতোন।

কর্তা বললেন, 'থাক থাক আর পেন্নামে কাজ নেই! বাঁদরের পেন্নাম অমুক গাঙগুলী নেয় না। এসো, সোজা চলে এসো, বাইরে গাড়ি মজুত আছে, গিয়ে উঠে বোসো গে!'

ও বললো, 'আ-আমি গিয়ে গাড়িতে বসবো?

কর্তা বাঘের মতন হাঁক ছেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ বসবে। আমার হুকুম। যাও! আর একদণ্ড দেরী নয়।'

কর্তার পেছনে বিধবা শাশুড়ী কাঁদছেন ফাঁস ফাঁস করে আর তার পাশে সেই আগুনের খাপরার মতন বৌ।

বিয়ে করা পরিবার!

ছোঁড়ার মুখ দিয়ে আর বাক সরে না। তবু তোৎলামো করে বললো, 'এ-এক্ষুণি কী করে যাওয়া যাবে?'

'যাবে। এক্ষুনিই যাবেই।'

'মা-মানে জিনিস পত্তর—'

কর্তা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'জিনিস-পত্তর তোমার এই পান বিড়ির দোকানের মাল? ঘরের মালিক রাস্তায় টান মেরে ফেলে দেবে বেচে খাবে যা খুশী করবে, তুমি উঠে এসো।'

তাঁতিদের সেই মেয়েটার কথা তুলছেন না, জামাইও বলতে সাহস করছিল না ভয়ে ডরে বোধহয় চলেই আসতো, কিন্তু—'

কিন্তু কী হলো সেটা সুরবালা দেবীর জবানীতে শোনা। কপালে করাঘাত করে বলেছিলেন তিনি, পোড়াকপালী সর্বনাশী সর্বনেশে জেদ আর অহঙ্কারের বশে সব খোওয়ালো। পুরুষ ছেলের কতো মতিছন্ন হয়, কতো স্বভাবদোষ ঘটে, আবার কালেখ্যে শুধরে গিয়ে ঘর সংসার করে।... নীরুর কপালে ছাইপোরা, তাই বুদ্ধিতেও আগুন লাগলো।...ওই কুজায়গায় সোয়ামীকে দেখে একেবারে বিগড়ে কাঠ হয়ে বললো কিনা, কাকে কী বলছো দাদামশাই? কোন চুলো থেকে যে কে কী খবর দিচ্ছে তোমায়, তুমিও নাচছো। ওই লোকটা তোমার নাতজামাই না কি? কস্মিন কালেও নয়। জন্মে ওকে চোখেই দেখিনি আমি! চলো চলো এই নরককুণ্ড থেকে পালিয়ে চলো।'

লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াও তখন জো পেলো, বললো, 'তাই তো! আমিও তাই ভাবছি—আমি অধরদাস, আমাকে হঠাৎ জগদীশ বলেই বা ডাকছেন কেন, আর গাড়ীতে গিয়ে উঠতেই বা বলছেন কেন?'...বাবা রাক্ষসের মতন ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'চোপ রাস্কেল! তোকে পুলিশ দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবো আমি—'

কিন্তু তৎক্ষণে ওই হারামজাদী কিনা হেসে গড়িয়ে পড়ে, 'দাদামশাই তোমার এবার চশমার দরকার—।' বলে তড়বড়িয়ে

গাড়িতে গিয়ে উঠে বসেছে।...বোঝো আক্কেল! বিদেশ বিভুঁই, অচেনা একটা গাড়োয়ান আর তুই কিনা এক গা গয়না পরে সোমত্ত মেয়ে একলা গিয়ে উঠলি।... আমার তো তখন জামাইখরা মাথায় উঠলো, মেয়ের পাছু পাছু ছুটে গিয়ে নিজেও গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। তারপর বাবা ফিরে এলেন। গাড়ীকে হুকুম দিলেন, 'চলো ইস্টিশান।'

অনেক পরে বাড়িতে ফিরে আমার শ্বশুর একদিন সর্বেশ্বরের দালানে বসিয়ে লক্ষ্মী-ছাড়িকে জিগ্যেস করলেন, 'সেদিন এরকমটা করলি কেন?'

মেয়ে বললো, 'এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দাদামশাই, ওই নোংরা হতভাগা লোকটাকে তোমার নাতজামাই বলে ভাবতেই পারিনি। মনে হলো জন্মজীবনেও ওকে আমি দেখিনি, চিনি না।'

'তার মানে তুই ওর সঙ্গে ঘর করবি না?'

নাতনী বললো, 'গলায় দেবার দড়ি না জুটলে করতাম, সেটা তো রয়েছে হাতে।'

আমরা হাঁ করে শুনছিলাম।

আমার মা বললেন, 'কিন্তু ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ির ওদের খবর দেওয়া হল না?'

'ওদের কথা বাদ দাও বৌমা, ওরা মহা ধোড়েল। ওরা সব খবরই রাখতো। ওই তাঁতিদের মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে বলে সাধু হয়ে নিরুদ্দিশ হয়ে গেছে বলে রটিয়েছিলো।'

তা শেষ অবধি সত্যি নিরুদ্দিশই হয়ে গেলো। পুলিশের ভয়েই হোক আর যাই হোক, পাততাড়ি গুটিয়ে কোথায় যে চলে গেল আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কিন্তু পাত্তাই যদি পাওয়া গেল না তো নীরবালার বৈধব্যের খবরটা এলো কোথা থেকে?

কোথাও থেকেই নয়।

ওতো অংক কষা ব্যাপার।

কে না জানে বারো বছর কাল কোনো খোঁজ-খবর না পেলে, ধরে নিতে হয় সে লোক মৃত।

একদিন, সেদিন সর্বেশ্বরের মন্দিরে চাঁচর উৎসব, নীরবালা তার দাদামশাইয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো, 'দাদামশাই বারো বছর পূর্ণ হয়ে আরো তিনদিন কেটে গেল না?

দাদামশাই তখনো বেঁচে তবে মরে বেঁচে।

নাতনীর দুর্ভাগ্য তাঁকে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করে ফেলেছিল। ছেলের ঘরেও তো নাতি-নাতনী কম নয়, কিন্তু ওই নীরবালাই যে মাথার মণি, বুকের পুতুল।

যোগেশচন্দ্র চমকে বললেন, 'কী বলছিস?'

'বলছি—তোমার সেই সাতজন্মের শত্রুটা জন্মের শোধ বিদেয় হওয়ার পর বারো বছর কেটে গেছে কিনা?'

যোগেশচন্দ্র বললেন, 'আমার অতো হিসেব নেই।'

'তোমার নেই, আমার তো আছে।'

'সেই তিথি নক্ষত্র ভেবে ভেবে জপ করছিস বুঝি?'

নীরবালা অনায়াসে ঘাড় কাৎ করে বলল, 'তা আর বলতে। শাঁখা নোয়া যে অঙ্গে ফুটছে, সিঁদুর সিঁতেয় জ্বালা ধরাচ্ছে। এবার অনুমতি হোক ওগুলো মড়িপোড়ার ঘাটে ভাসিয়ে দিয়ে এসে জঞ্জালমুক্ত হই।'

যোগেশচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন, বললেন, 'তুই ভেবেছিস কী? মড়া মাটির ওপর খাঁড়ার ঘা দিবি?'

নীরবালা বলল, 'মা কালীর খাঁড়ার কোপ যার ওপর পড়েই আছে, তাকে আর নতুন কী কোপ দেব দাদামশাই? ও সয়ে যাবে। তুমি অনুমতি দাও—'

যোগেশচন্দ্র বললেন, 'আর যদি অনুমতি না দিই?

'তাহলে কালকে দোলের দিনে আমায় শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকতে হবে। দেশ শুদ্ধু লোক আসবে কালকে। তাদের বুঝি হিসেব নেই নীরবালা দেবী কতোকাল যাবৎ ফোকটে মাছ-ভাত খেয়ে নিচ্ছে।'

যোগেশচন্দ্র আগুন হয়ে বললেন, 'দেখি তো কার ঘাড়ে কটা মাথা যে একথা বলে?'

নীরবালা বললো, 'বলতে হয়তো পারবে না তোমার ভয়ে, কিন্তু ভাবতে তো ভয় নেই? ভাবটা কে আটকাতে পারে?'

'বয়ে গেল! যার যা ইচ্ছে ভাবুক, তোর ওসব বদ মতলব ছাড়।'

নীরবালা আবদারের গলায় বললো, 'কিন্তু দাদামশাই, আমার নিজেরই যে রাত-দিন মহা উপসর্গো হচ্ছে। মাছের ন্যাজা পাতে নিয়ে বসতে নিজের মুড়োটা কাটা যাচ্ছে—'

'লোকটা নেই, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কিছু?' যোগেশচন্দ্র বললেন, 'হয়তো জল-জ্যান্ত বেঁচে আছে কোথাও।'

'তা' শাস্তর বিধিও তো, জলজ্যান্ত বেঁচে আছে দাদামশাই! বারো বছর খোঁজ না পেলে 'মৃত' বলে ধরে নিতে হয় না? ওই শাস্তরটির জ্বালাতেই তো এতোদিন ধরে সং সাজলাম দাদামশাই, নইলে সেই রাণাঘাট থেকে ফেরার পথেই শাঁখা নোয়া ভেঙে সিঁদুর মুছে বাড়ি ঢুকতাম।'

ব্যস তারপর আর কী?

সেই চাঁচরের দিনই ভরদুপুরবেলা নীরবালা বাড়ির বাগদী ঝিটাকে সঙ্গে নিয়ে শ্মশানঘাটে গিয়ে শাঁখা নোয়া খুলে ফেলে দিয়ে মায়ের দরুন একখানা থান ধুতি পরে বাড়ি ফিরে এলো।

এই আকস্মিক ঘটনাটায় বাড়িতে একটা তুমুল আলোড়ন উঠলো ঠিকই, মা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো, মামা-মামীরা রাগারাগি করলো, বাগদী বৌকে মারতে ছুটলো। মেয়েকে গালমন্দ করলো, যোগেশচন্দ্র চেঁচিয়ে বললেন, 'খবরদার তুই আমার সামনে আসবি না রাক্ষুসী!'

কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য সেই আলোড়ন থিতিয়ে যেতেও দেরী হল না।

যেন এইরকম একটা ঘটনার প্রত্যাশাই করছিল সবাই। পাড়াপড়শীরাও যতোই এসে হা-হুতোশ করুক আর বলুক 'মায়ের চোখের সামনে হাত-দুখানা একেবারে ন্যাড়া না করে দু'গাছ সরু চুড়ি রাখলেই পারতিস। আর একেবারে থান ধুতিটা না পরে, একটু নরুণ পাড়-ফাড় পরলেও চলতো—' তবু সবাই যেন স্বস্তি পেলো। যেন একটা অন্যায্য ঘটনা চলছিল, এতোদিনে ন্যায্যটা হলো।...

ক্রমশঃ দেখা গেল নীরবালা যখন পুজোর গোছ করে, যোগেশচন্দ্র ভাবেন 'পবিত্রতার প্রতিমূর্তি!'

সুরবালা যখন মেয়েকে নিয়ে 'মুখোমুখি ভাত খেতে বসেন, অনুভব করেন মুখ বুঁজে একা বসে খাওয়া খুব কষ্টকর ছিল। এখন একটা সঙ্গী পেয়ে দুটো কথা কয়ে বেঁচেছেন।

তখন সংসারে সুরবালা ছাড়া আর কোনো বিধবা ছিল না।

দাদামশাই বেঁচে থাকতে নীরবালা হাত-ন্যাড়া করেছিল, মাথাটা ন্যাড়া করেনি। সেটা করেছিল পরে পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে প্রয়াগে গিয়ে। কিন্তু একাদশীতে?

কাঠকবুল নির্জ্জলা।

যোগেশচন্দ্র বলেছেন, 'সর্বেশ্বরের পেসাদের ফল দুধ একটু খা, দোষ নেই।'

নীরবালা হেসে ফেলে বলেছে, 'দোষ আবার কী দাদামশাই? মাকড় মারলে ধোকড় হয়, চালতা খেলে বাকড় হয়। দোষ বললেই দোষ, না বললেই নেই। উপোসে আমি থাকি ভালো।'

ব্যস তদবধি চলছে এই ভালো থাকা। পঁচিশ বছর বয়েস থেকে এই পঞ্চান্ন পর্যন্ত।

মার সঙ্গে বসে আমরাও হাঁ করে শুনেছি এই কাহিনী।

আশ্চর্য বটে।

ইচ্ছে করে কেউ বিধবা হয়?

তাছাড়া এই বা কী শাস্ত্র বাবা, যে একটা মানুষকে বারো বছর খুঁজে না পেলেই ধরে নিতে হবে সে মরে গেছে?

প্রথম এসে নীরোপিসিকে মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু এই কাহিনী শোনার পর ওঁর প্রতি বেশ একটু শ্রদ্ধা এলো।

ত্যাগটাই জগতের সেরা জিনিস।

কেউ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছে দেখলেই আপনা থেকে শ্রদ্ধা আসে। যখনই দেখি তখনই ওই কদমছাঁট চুল তামাটে রং আর খাটো ধুতিপরা মানুষটার মধ্যে থেকে সেই কিশোরীটিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি।

যার কাঁচা সোনার মতন রং, মেঘের মতন চুল, নল্‌পো নল্‌পো গড়ন, চোখের কী বাহার!

সর্বাঙ্গে গহনা আর লাল বেনারসী শাড়ীতে যাকে সরস্বতী প্রতিমাটির মতন দেখতে লাগতো।

নাঃ ভাবতে গেলে গুলিয়ে যায়।

সত্যি মানুষ কী অদ্ভুতভাবেই বদলায়!

সেই মেয়েটা কি এই ইনি?

মোটেই না।

তবু একই নামের পরিচয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বয়ে বেড়ায় লোকে।

দিদি তো এ কাহিনী শুনে ফাঁস ফাঁস করে কেঁদেই মরেছিল।

দেখে ফুলি তো হেসেই অস্থির।

'পিসির দুঃখে তুই কাঁদছিস? বাড়ি কী কম দুঁদে নাকি? বাড়ি সুদ্দু মেয়ে পুরুষকে জিভের ধারে টিট করে রেখেছে! বুড়ো দাদামশাই ওকে অনেক সম্পত্তি দিয়ে গেছে কিনা তাই অতো অহঙ্কার!'

আমি রেগে বললাম, 'ছি ছিঃ তুমি গুরুজনের বিষয় এভাবে কথা বলছো?'

ফুলি হি-হি করে বললো, 'তোরা বেম্ম না কি রে? তোদের কথা শুনলে মনে হয় বেম্ম খিশ্চান কথা কইছে!'

ফুলির ওপর এইজন্যেই রাগ ধরতো আমার, প্রত্যেক কথায় কথায় দোষ ধরতো ও।

আমি একদিন বলেছি, 'মা আমাদের লেপগুলো আসেনি?'

শুনে ফুলির কী হাসি!

'লেপ! লেপ! মেয়েমানুষে আবার লেপ বলে নাকি? কেন 'নেপ' বলতে পারিস না? লেপ, লেবু, লঙ্কা, লুচি! হি হি হি! মেয়েমানুষের যে 'ল' বলতে নেই তাও জানিস না? নেপ নঙ্কা নেবু নুচি এইসব বলতে হয়।'

'মেয়েমানুষকে ল বলতে নেই? আহা-হা কী কথাই বললে। তাহলে তুমি 'লাল' বল কেন?'

'কই বলি?'

ফুলি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'নাল' বলি তো!'

'নাল!'

'হ্যাঁ তো। নাল পদ্ম, নাল সুয্যি, এইসব বলি না?'

আমি বলি, 'এতোগুলো অক্ষর থাকতে লটাই বা কী দোষ করলো?'

ফুলি মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'তা জানিনে বাবা। গিন্নীরা যা বলে তাই বলি।'

'বেশ আমিও তাহলে তোমায় ফুলি না বলে ফুলি বলবো।'

বলে হাসতে থাকি।

ফুলি রাগ করে চলে যায়।

দিদি চুপিচুপি বলে, 'ফুলি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেই রাগ করে চলে যায় কেন জানিস? মা বলেছেন আসলে ও আমাদের হিংসে করে।'

'ধেৎ! আমাদের কী এতো রাজত্ব আছে যে হিংসে করবে?'

'কি জানি মা তো তাই বলেন।'

মা যে এইটি খুব ভাল করেছেন তা বলা যায় না।

আসলে বড়রাও বোঝে না ছোটদের মনের মধ্যে কখন কোন বিষের চারা পুঁতে বসলেন তিনি। অথচ ছোটদেরকে 'ভালো' করবার জন্যে উপদেশ বর্ষণের শেষ নেই।

ফুলি যে আমাদের মাথায় বাঁধবার রিবন, আমাদের বিলিতি মুক্তোর মালা চুরি করে নিয়েছে একথা আমরা টেরই পেতাম না যদি মা না বলতেন সেকথা।

মা নিজেই আমাদের ডেকে বললেন, 'তোমাদের জিনিসপত্তর সাবধানে রেখো, ঠাকুরপোর মেয়ে ফুলিটার বুদ্ধি ভালো নয়। ওই তো তোদের রিবন মালা সব নিয়ে নিয়েছে।'

'বাঃ ওতো তুমি দিয়েছো ওকে।'

মা যদি বলতেন, 'হ্যাঁ ওগুলো আমি দিয়েছি—' তাহলে ফুলির থেকে অনেক বেশী লাভ আমাদের হতো।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকদিন কাঞ্চনতলায় থাকা হয়ে গেল আমাদের। কখনো খুব ভাল লাগে, কখনো খুব খারাপ লাগে। কখনো মনে হয় এখানেই থেকে যাই, কখনো মনে হয় আজই পালাই।

এইসময় মেজদার একটা চিঠি এলো।

আমাদের দুই বোনকে লিখেছে।

এপর্যন্ত যা চিঠিপত্তর দিয়েছে মাকে কিম্বা বাবাকে, আমাদের এই প্রথম। আহ্লাদের সাগরে ভাসতে লাগলাম। সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের জন্যে একটা চিঠি আসা! এই প্রথম!

মেজদা লিখেছে, 'এই সুনী আর বুচি! ওখানে গিয়ে দেদার ঘুরে বেড়াচ্ছিস তো! আর কুল পেয়ারা আর তেঁতুল খেয়ে খেয়ে দিন কাটাচ্ছিস, কেমন? দাদার দেওয়া চরকাটা আছে না জ্বালানী কাঠের মধ্যে চলে গেছে। আর আমার দেওয়া চয়নিকাটা? কিছু পদ্য মুখস্থ হয়েছে? না মলাটও খোলা হয়নি এখনো? বাবার চিঠিতে জানলাম, এই কদিনেই সুনীর নাকি চেহারা বেশ উন্নতি হয়েছে, অতএব বাবা ছুটি ফুরিয়ে গেলে চলে আসবেন, তোরা থেকে যাবি। আশা করছি পুরোপুরি গাইয়া হয়ে তবে আসবি। যাই করিস তার মধ্যে ওই কবিতাগুলো পড়ে পড়ে কিছু মুখস্থ করিস। আর যদি দেশোদ্ধার করতে চাস তো বসে চরকা কাট।'

'চরকা দিয়ে দেশোদ্ধার' নিয়ে মেজদা দাদাকে খুব ক্ষ্যাপায়। সেটাই বলে নিলো।

(ক্রমশঃ)

ইয়েভতুসেংকোর আত্মকাহিনী

ইয়েভতুসেংকোর বর্তমান বয়স চল্লিশের কোঠায়। যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ তখন তিনি লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী যার ইংরাজী অনুবাদের নাম 'এ প্রিকোসাস অটোবায়োগ্রাফী'। এ গ্রন্থটি কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

ইয়েভতুসেংকোর পরিবারবর্গ জার আমলে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন, আর সেখানেই তাঁর জন্ম। মাত্র এগার বছর বয়সেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু—এইসব কবিতা একটি কিশোর ডাকাত প্রসঙ্গে রচিত শ্লেষ-কাব্য। ১৯৫৩ খৃঃ যখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ তখন স্তালিনের মৃত্যু হয়। সেই সময় ইয়েভতুসেংকোর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সে সময় লিটারারি ইনস্টিটিউটের ছাত্র। স্তালিনের অপরাধাদি প্রকাশিত হওয়ার পর যে নৈতিক সংকট উপস্থিত হয় সে কালে, গোড়ার যুগের বিপ্লবে অবিচল আস্থাবান ইয়েভতুসেংকো তরুণ সমাজের নিজস্ব কবি হিসাবে তাঁর ভূমিকাটি অনুভব করে 'পবিত্রতার পূর্ণপ্রতিষ্ঠার' উদ্দেশ্যে আত্ম-নিয়োগ করলেন। এই নতুন কর্মভার গ্রহণ করায় সাধারণের কাছ থেকে প্রচণ্ড সমর্থন পাওয়া গেল। ১০০,০০০ সংখ্যক সংস্করণের ইয়েভতুসেংকোর গ্রন্থ তৎক্ষণাৎ বিক্রি হয়ে গেল। মস্কো স্টেডিয়ামে ইয়েভতুসেংকোর ভাষণ শোনার জন্য ১৪,০০০ শ্রোতার জমায়েত হল। কিন্তু 'থ' বা সাময়িক তুষ্ণী অবস্থার কালে লেখকের অবস্থার উত্থান-পতন ঘটতে লাগল। লিটারারি ইনস্টিট্যুট থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হল। কমসোমল থেকেও তাড়ানো হল, কিন্তু এই দু' জায়গাতেই আবার তাঁকে নেওয়া হয়েছে।

ইয়েভতুসেংকো ত্রিশের কোঠায় পৌঁছানোর কালে যখন বিদেশে ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন তখন লিখেছেন এই 'এ প্রিকোসাস অটোবায়োগ্রাফী' বা 'অকাল পক্কের আত্মকাহিনী' রচনা করেন।

কোনো সোবিয়েত লেখক রচিত আর কোনো গ্রন্থে আধুনিক রুশ তরুণ সমাজের মনোভংগী এভাবে প্রকাশিত হয়নি। কবি হিসাবে ইয়েভতুসেংকোর প্রতিষ্ঠার কারণ তাঁর কবিতার উৎকর্ষ, প্রাণোচ্ছলতা আর আত্ম-নিবেদিত ভঙ্গী। এইসব কারণে বর্তমান কালের কবি সমাজে তিনি এক অসীম মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ। ইয়েভতুসেংকো সম্পর্কে অভিযোগ যে তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেনি। তিনি 'পলিটিকাল ইমমেচুরিটি'র নমুনা। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠকগণ নিজস্ব বিচার অনুসারে রায় দিতে পারবেন। এই গ্রন্থ সোভিয়েত রাশিয়ায় নিষিদ্ধ নয়।

ইয়েভতুসেংকো বলেছেন, 'একজন কবির আত্মজীবনী হল তাঁর স্বরচিত কবিতা। বাকী সব কিছু পাদটীকা মাত্র। কবি তখনই শুধু কবি যখন পাঠক তাঁকে 'করতল আমলকিবৎ' সমগ্র আকৃতিটি দেখতে পান। কবির মনোভংগী অনুভব করতে পারেন, সকল চিন্তা, সকল কর্মের যুক্তিযুক্ততা বিচার করতে পারেন।

কবি যদি আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রয়াস পান আধা-কবি আর আধা-মানুষরূপে, তাহলে নিঃসংশয়ে আর্টিস্ট হিসাবে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

দাস-ব্যবসায়ে ব্রতী হওয়ার ফলে, জীবন ও কাব্যাদর্শের মধ্যে যখন সংঘাত বাধল তখনই র‍্যাবো কবিতা লেখা ছাড়েন। বেরিয়ে আসার এ এক সাধু প্রয়াস।

দুঃখের বিষয় অনেক কবি আছেন যাঁদের জীবন আর তাঁদের কবিতার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না, তাঁরাও লিখে যেতে ছাড়েন না। তাঁরা এই বলে চালাতে চান যে তাঁদের অতীতের সঙ্গে এখন তাঁদের পার্থক্য ঘটেছে।

তাহলে তখন শুধু তাঁরা নিজের জন্যই কবিতা রচনা করেন।

কবিতা দিয়ে ঠকানো যায় না।

কাব্য-লক্ষ্মী তখন তাঁদের পরিত্যাগ করেন।

কবিতা-বনিতার মত ঈর্ষায় পরিপূর্ণ, অসত্যকে সে ক্ষমা করে না।

সত্যের চেয়ে কিঞ্চিৎ কম কিছুকেও কবিতা ক্ষমা করে না। অনেকে আছেন জীবনে মিথ্যা বলেন নি বলে গর্ববোধ করেন। কিন্তু তাঁদের আত্ম-প্রশ্ন করতে দেওয়া হোক, তাঁরা কতবার সত্য বলতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছেন। সুবিধাজনক নীরবতার ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছেন সত্যকে এড়িয়ে।

এইসব মানুষ তাঁদের সমগোত্রীয়দের আবিষ্কৃত এক প্রাচীন নীতিবাক্যের আড়ালে আশ্রয় নেন—'স্তব্ধতাই স্বর্ণ'।

কিন্তু নীরবতাই যদি স্বর্ণ হয় তাহলে সে সোনা নিঃসন্দেহে শূন্যোগর্ভ। জীবনের ক্ষেত্রে একথা সাধারণত সত্য, এবং বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে—কারণ সংহত আকারে কবিতাই জীবন।

নিজের সম্পর্কে অস্পষ্টতা অপরের দুঃখদুর্দশা বিষয়ে অস্পষ্টতা ও উদাসীনতায় পরিণত হয় অপরিহার্যভাবে।'

এই উক্তির পর ইয়েভতুসেংকো সোবিয়েত কবিদের প্রতি দোষারোপ করেছেন। বলেছেন দীর্ঘকাল তাঁরা মনের কথা, নিজেদের জীবনের দ্বন্দ্ব—আর জটিলতার কথা এড়িয়ে গেছেন। সেই কারণে তাঁরা অপরের জীবনের জটিলতা ও দুর্দশার কথাও এড়িয়ে গেছেন।

এর পর ইয়েভতুসেংকো 'প্রলেটিকুলট্' বা প্রলেটারিয়ান কালচার আন্দোলন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। প্রলেটিকুলট্ নামক প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধিজীবীরা তখন একটি নব্য প্রলেটরীয় সর্বহারা কালচারের প্রতি অভিমুখী হন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বুর্জোয়া কালচারের বিপরীত। লেনিন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করেন, ফলে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব হ্রাস পায়, বিশের দশকের মাঝামাঝি এ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। তথাপি ১৯৩২ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। এবং সেই সময় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়।

ইয়েভতুসেংকো বলছেন—'আমি যা বলতে চাই তা শুধু 'আমরা কথাটির পরিবর্তে 'আমি' বসানো নয়, যেমনটি 'প্রলেটিকুলট্' মুদ্রিত পৃষ্ঠায় বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে মধুর গম্ভীর সকল সুরকে চাপা দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের বিলুপ্তির অনেককাল পরে অনেক কবিতা উত্তম পুরুষে চালু হলেও সেই কিম্ভূত-কিমাকার মগুভোলানো 'আমরা' আত্মপ্রকাশ করেছে।

কবির মুখে আমি কথাটি নিছক কথার কথা, অনেক সময় 'আমি ভালোবাসি' এই সাধারণ কথাটি এমনই মৈবর্ত্তিক অর্থ গ্রহণ করতে পারে - যার ফলে সেই কথাটি ওজস্বিনী বক্তৃতার 'আমরা ভালোবাসি'র মত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে পরিণত হতে পারে।

এই সময় সাহিত্য সমালোকদের কণ্ঠে 'লিরিক্যাল হিরো' কথাটি ধ্বনিত হত। এইটাই ফ্যাসনে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের পাক-প্রণালী মতে কবি তাঁর কাব্যে আত্মপ্রকাশ করবেন না, তাঁর উপস্থিতি হবে প্রতীকী!

এই সময়কার অধিকাংশ কবিতাই বহিরঙ্গভাবে আত্মজীবনীমূলক। তার মধ্যে স্থানের নাম উল্লিখিত হত,—কবির নিজের পল্লীর নাম, যে সব স্থান তিনি ভ্রমণ করেছিলেন সেইসব স্থানের নাম, এবং [illegible]

তথাপি এ সব কবিতা ছিল নিরামিষ জাতীয়। এইসব কবিতার অধিকতর শক্তিমান লেখকগণকে তাঁদের রচনাপদ্ধতির মধ্যেই ধরা যেত। কিন্তু চিন্তাধারার বিচারে তাঁদের পৃথকীকরণ সম্ভব ছিল না। বোঝা যেত না যে তাঁরা সজীব, বাস্তবজগতের অস্তিত্ববিশিষ্ট মানুষ—কারণ প্রতিটি অস্তিত্ববিশিষ্ট মানুষের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও বক্তব্য ছিল একরকমের। সহজ অনুকরণ সম্ভব। কোনো মানুষের বহিরঙ্গ জীবনের কোনো হিসাবনিকাশ অর্থবহ হয় না যদি না তার মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের কোনো চিন্তা, কোনো অনুভূতি প্রকাশিত না হয়ে ওঠে।'

কবিদের 'আমি' কথাটির বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে ইয়েভতুসেংকো এসব কথা বললেও তিনি বলেছেন—

'বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে আমি যেসব কথা বলেছি তা সমগ্র সোবিয়েত কবি ও কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'

মায়কোভস্কী যখন বলেন 'আমরা' তখনও তিনি সেই মায়াকোভস্কী-ই।

পাস্তেরনাকের 'আমি' পাস্তেরনাকের নিজস্ব 'আমি'। এই সূত্রে তিনি বলেছেন, 'আমি সোবিয়েত কবিদের সুদীর্ঘ তালিকা দান করতে পারি। তবে পাশ্চাত্য দেশের পাঠকদের কাছে সেইসব নাম হবে নিরর্থক।'

সাচ্চা কবির কবিতা যদি হৃদয়গ্রাহী হয়, যদি তাঁর কালের ধ্বনি-পূর্ণ চিত্র হয় তাহলে সে কবিতা আবার তাঁরই সেলফ্ পোর্ট্রেট। আত্মচিত্রের মতই প্রাণবন্ত এবং সর্বসমেত পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ।

তাহলে এত কাণ্ডের পর আমি এ আত্মজীবনীমূলক রেখাচিত্র রচনা করছি কেন? কারণ পাশ্চাত্য জগতে আমার কবিতা যেখানে অপরিচিত, সেখানে আমার পাঠক-দের হাতে যে সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পড়ে তাতে আমাকে এক অবিশ্বাস্য কিম্ভূত প্রাণী হিসাবে আঁকা হয়। বলা হয় সোবিয়েত ধূসরতার মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য।

কিন্তু আমি তা নই।

সোবিয়েত সমাজে যে নতুন চিন্তাধারা উদয় হয়েছে, যে মনোভঙ্গী প্রকাশিত হচ্ছে আমার লেখক হওয়ার আগে থেকে তা আমার কবিতায় আমি প্রকাশ করেছি। আমি না করলে আর কেউ তার কাব্যরূপ দিত।

তাহলে আমার 'আত্মসত্তা' কি?"

এই প্রশ্ন দিয়ে ইয়েভতুসেংকোর আত্ম-কাহিনী শুরু হয়েছে। আগামীবারে তার যথাসম্ভব পরিচয় প্রকাশিত হবে।

—অভয়ঙ্কর

A PRECOCIOUS AUTO-BIOGRAPHY By: YEVGENY YEVTUSHENKO: Translated by Andrew R. MacAndrew: Publisher: E. P. DUTTON & Co. NEW YORK

নেহরু পুরস্কার নিলেন জর্জিয়ার কবি

ইরাকলি আবাসিদজে তাঁর 'গঙ্গার তীরে' এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবনা-সমৃদ্ধ কাব্য সংকলনের জন্য গ্রহণ করলেন সম্প্রতি নেহরু পুরস্কার।

ইরাকলি আবাসিদজে হলেন জর্জিয়ার অন্যতম বর্ষীয়ান এবং জনপ্রিয় কবি। রুশ ভাষাতে অনূদিত হয়েছে তাঁর সংখ্যাহীন কবিতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরেও কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসামান্য।

জর্জিয় বিজ্ঞান আকাদামির যেমন তিনি সভাপতি তেমনি জর্জিয়ান এনসাইক্লো-পেডিয়ার হলেন প্রধান সম্পাদক।

নতুন দিল্লীর অনুষ্ঠান

গত ২২ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লীতে একটি কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। ব্যবস্থা করেন হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা অসমীয়া কবি, পেট্রোলিয়ম দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবকান্ত বড়ুয়া।

বিঠলভাই প্যাটেল হাউসের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন আজমল আজমানি, আনোয়ার করেশি, সফি প্রেমি, সন্তোষকুমার জৈন, কুসুমলতা, রাণা যশোবন্ত সিং প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা কবি।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ভিয়েৎ-নামী রাষ্ট্রদূত চু জ্যান বিয়েন ভারতের জনগণ এবং সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের জন্য ভিয়েতনামী জনগণের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছে। তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন, ভিয়েতনামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি ভারতের মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের সংহতি প্রকাশের গৌরবময় ভূমিকার কথা।

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলন

দিনটি রবিবার। ১৮ ফেব্রুয়ারি। কৃষ্ণ-নগরের রবীন্দ্রভবন। সারাদিন ধরে চলল সেখানে সাহিত্য সম্মেলন। অংশ নিলেন স্থানীয় কবি সাহিত্যিকেরা। এলেন নদীয়া জেলার অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যসেবী। কলকাতা থেকেও আমন্ত্রিত হয়ে আসেন বহু খ্যাতনামা কবি ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তরুণতর লেখকেরা।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন নদীয়ার [illegible]

চৌধুরী। বিকেলের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সন্তোষকুমার ঘোষ।

সকালের কবিতা-পাঠের অধিবেশন পরিচালনা করলেন মণীন্দ্র রায়। মূলত স্থানীয় কবিরাই পড়লেন তাঁদের কবিতা এই অনুষ্ঠানে। অংশ নিলেন মজনু মোস্তাফা, নিরুপ দে চৌধুরী, দেবদাস আচার্য, নীহার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর বসু, স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় সফিউদ্দিন, শিখা বিশ্বাস, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাস আচার্য, সুবীর সিংহ প্রমুখ প্রায় ৬০ জন কবি।

বিকেলে হল দ্বিতীয় অধিবেশন। উদ্বোধন করেন কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এই সময় দুই প্রবীণ কবি হেমচন্দ্র বাগচি এবং বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে জানানো হয় সম্বর্ধনা। মানপত্র পাঠ করেন যথাক্রমে মোহিত রায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সমীরেন্দ্র সিংহরায়। তারপর বিশিষ্ট কবিরা পড়ে শোনালেন তাঁদের কবিতা। একে একে কবিতা পাঠ করেন মণীন্দ্র রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল সিংহ, আশিস সান্যাল, শুভ মুখোপাধ্যায়, রাণা বসু, গোবিন্দ চক্রবর্তী, কুমারেশ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

এরপর আলোচনা। লোক সংস্কৃতি বিষয়ে বললেন তুষার চট্টোপাধ্যায়, ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা করলেন শচীন বিশ্বাস এবং সাংবাদিকতা বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন কালীপ্রসাদ বসু।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের পরিচালক দিলীপকুমার সেনগুপ্ত আধুনিক জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন। সাহিত্যের সঙ্কট কালে প্রবীণ লেখকদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতি সন্তোষকুমার ঘোষ সম্মেলনের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পারস্পরিক মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের গুরুত্ব বিষয়ে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণ করেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সলিল ঘোষ ও দীপঙ্কর দাস। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্তভঙ্গীতে কয়েকটি আবৃত্তি করে শোনান।

ষাট বছরে পা দিলেন তিনি

আসলে ছিলেন তিনি বিল্ডিং ইঞ্জিনীয়ার। কারিগর আর গৃহ-নির্মাণের মাল মশলা নিয়েই ছিলো তাঁর কারবার। হঠাৎ মাথায় চাপল তাঁর খেয়াল। যেসব মানুষজন ঘিরে তাঁর কাজের জগত তাকে হবহু তুলে ধরবার প্রবল বাসনা জাগল। অমনি লিখতে শুরু করলেন গল্প। একেবারে টাটকা ব্যাপার, ভরতাজা বিষয় নিয়ে চলল তাঁর স্বপ্নের সাধনা। কয়েক বছরের মধ্যেই নাম-ডাক করে ফেললেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর চেক সাহিত্যে তিনি এখন প্রথম সারির লেখক চেকোশ্লোভাকিয়ার সেই লেখক ঝলেনেক লেহার এবছর পা দিলেন ষাটে। তাঁর উপন্যাসগুলিকে এক কথায় বলা যায় বাস্তববাদী। আশ-পাশের মানুষজনের বিভিন্ন পেশা, জটিলতর ভাবনা-চিন্তা ও অভিজ্ঞতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন নানা রূপে নানা বর্ণে তাঁর উপন্যাসে। 'নীল উপত্যকা' বেরোয় ১৯৫৮-তে। এই গ্রন্থে নানান বয়সের গৃহ-নির্মাণ শ্রমিকদের জীবনকে ছবি তুলে ধরে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হন লেহার। ইফ ইউ ডেজার্ট মি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-য়। এই উপন্যাসটির জন্য পান তিনি ক্লিমেন্ট গটওয়াল্ড পুরস্কার। 'লেট ইম কাস্ট এ স্টোন' (১৯৬২) গ্রন্থে তিনি এঁকেছেন যুবকদের জীবন সংগ্রাম। কেন তারা মাঝে মাঝে নোংরা পথে যেতে চায়, বড়োদের কাছে নিজেদের বহু স্বপ্ন-ইচ্ছা লুকিয়ে রাখে তার কথা সহমর্মিতার সঙ্গে চিত্রিত করেন এখানে। সাম্প্রতিক উপন্যাস দ্য টার্মিনাসে (১৯৭১) তিনি শুনিয়েছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের 'হোম'-এর বিচিত্র কাহিনী।

বর্ধমানে সাহিত্য সভা

সম্প্রতি বর্ধমানের কাছে রসুলপুর গ্রামে সানাই সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা। সভাপতিত্ব করেন মজনু মোস্তাফা। গ্রাম বাংলার জীবন ও সমাজের কথা সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরার কথা বলেন প্রধান অতিথি শচীন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে গল্প, কবিতা পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন পরিমল সরকার, নবকুমার মণ্ডল, বিশ্বনাথ রায়, সনৎকুমার পাল, সুভাষ দেবরায় গোপাল দাস, বিশ্বনাথ ঘোষ, সুধীন পান প্রমুখ স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকগণ।

নতুন বই

বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)

ধনঞ্জয় দাসমজুমদার। ৮২।১৬ নরসিংহ দত্ত রোড। হাওড়া-১। দাম ১০ টাকা।

বাঙালী জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখা হয়েছে মাত্র কয়েকখানি বই। উনিশ ও বিশ শতকের কয়েকজন মনীষী দেশ ও জাতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে নীরবতার মধ্যে। বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের বইখানিও বেরোয় বেশ কিছুকাল আগে। সেখানিও ছাপা ছিল না অনেকদিন। এক খানি বই লেখেন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু মূল্যবান এবং তথ্যনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বইখানি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি।

বেশ কিছুকাল যাবৎ ধনঞ্জয় দাসমজুমদার বাংলাদেশ বাঙালী জাতির ইতিহাস নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করছেন। 'বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এই লেখকের প্রতি। দুটি খণ্ডই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে। সম্প্রতি বেরিয়েছে 'বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। গ্রন্থকারের মনীষাদীপ্ত চিন্তাধারার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত ও বাঙালীর বিভিন্ন রাজপরিবারের ইতিহাস নিয়ে যে বিকৃত তথ্য এযাবৎ প্রচার করা হয়েছে শ্রীমজুমদার তথ্য ও প্রমাণসহ তা খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। সর্বভারতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা ভারতের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। নন্দবংশ, অন্ধ্র রাজবংশ, গুপ্তবংশ, পালবংশ, সেনবংশের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রীমজুমদার ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে নতুন চিন্তার যুক্তিনির্ভর বিবরণ রেখেছেন। পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশের সুদীর্ঘ বিবরণটি প্রত্যেক ঐতিহ্য সচেতন বাঙালীকে বিস্মিত করবে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আছে। যেকোন বয়সের পাঠকের উপযোগী বই-এর অভাব নেই। কিন্তু বাঙালী জাতির সুলিখিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। শ্রীমজুমদারের প্রচেষ্টার মধ্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর লিখনভঙ্গী স্বচ্ছ এবং সাবলীল নয়। তাছাড়া বিষয় সংস্থাপনেও কিছুটা শৈথিল্যের আভাস রয়েছে। এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় কেবলমাত্র তথ্য পরিবেশন করে অর্জিত জ্ঞান উপস্থাপন করলেই চলে না, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের দিকেও নজর রাখার দরকার পড়ে।

দুটি নয়ন মেলে (কবিতা)—অজিতকুমার দাস।। দাস ভবন ঃ ৮।২।১৭ লালবিহারী বসু লেন, হাওড়া-৬। দাম ঃ এক টাকা।

নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার প্রথম সংকলন এটি তরুণ কবির। প্রায় তেরো চোদ্দ বছর ধরে নাকি লেখা হয়েছে কবিতাগুলি। কিন্তু লেখার মধ্যে তেমন কোন পরিণতির স্বাক্ষর মিলল না। অবশ্য তাঁর সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তিনি কল্যাণুরাগীদের প্রশংসা পাবেন। পুস্তি-কাটির ছাপা-বাঁধাই সাধারণ স্তরের।

রক্তে জ্বলে চোখ (কাব্যগ্রন্থ)—সুদীপ্ত চক্রবর্তী। সুবর্ণরেখা ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দু'টাকা।

শেষতম রহস্যের উন্মোচনে সুদীপ্ত চক্রবর্তী প্রেম, ভালোবাসা, নির্জনতা, জ্যোৎস্না ঈশ্বর এবং নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নিয়েই এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লিখেছেন। সময় এবং বয়সের বিষাদময়তার সঙ্গে তারুণ্যের অহঙ্কার, যন্ত্রণা ও পীড়নের আভাস প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই সঞ্চারিত। ইমেজ ও শব্দের ব্যবহারে আরেকটু পরিণত হলে, তিনি তার নিজস্ব পথ খুঁজে পাবেন।

কাব্যবিচিত্র (প্রথমার্ধ) ঃ গৌরগোবিন্দ ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান ঃ আলফা পাব-লিশিং কনসার্ন, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম ঃ তিন টাকা।

ক্রিয়াপদের নির্বাচনে গৌরগোবিন্দবাবু অনাধুনিক। রবীন্দ্রানুসারী বলাই বোধহয় ভালো। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ, দুঃখ, প্রেম, ভালোবাসার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই তাঁর কবিতার বিষয়। কবিতাগুলিও স্বচ্ছন্দ। তবু যে সারল্য ও আন্তরিকতা নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, তা একালের জটিল, বিক্ষুব্ধ মানসিকতার মধ্যে এক প্রকার বিশ্বাসের আশ্রয় বলেই উল্লেখযোগ্য।

এই নক্ষত্রখচিত আকাশ ও মানবসংসার যেন, তাঁর উপলব্ধির অন্তর্গত রহস্যের মায়াবী হয়ে দেখা দিয়েছে। লেখক শিশুর বিস্ময় ও দার্শনিকের আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়েছেন বিষয় ও বিষয়ীর দিকে। হয়তো এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি, একালের তরুণ কবি ও কবিতাপাঠকের কাছে, তেমন মর্মস্পর্শী হবে না। কিন্তু সত্যানিষ্ঠ সমা-লোচকেরা এই কবিতাগুলির মধ্যে চির-কালীনতার আভাস নিশ্চিতভাবেই খুঁজে পাবেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সন্ধানী ঃ গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী, সুভাষ জোয়ারদার, নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যানার্জীপাড়া, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা। একটাকা।

পত্রিকাটিকে পাঠকদের নিজস্ব মুখপত্র বলে সম্পাদক জানিয়েছেন। এর সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষকও অনেক। এ সংখ্যায় লিখেছেন কান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শান্তিময় দাস, রতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্রাট সেন, নির্মল মণ্ডল, পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত এবং অনেকে।

রুদ্রবীণা ঃ সম্পাদক অমরেশরঞ্জন দাস। টি১৪২(সি), আপার বাবুপট্টি, লামডিং, আসাম। পঞ্চাশ পয়সা।

চেহারায় খর্বাকার হলেও পত্রিকাটিকে তুচ্ছ ভাবা যায় না। বেরিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আসাম থেকে। লেখাগুলি চমৎকার। লিখেছেন, কৃষ্ণা রায়, ভূপেন্দ্র-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস দাস, বিপুল মুখোপাধ্যায়, ভবানী সরকার, ব্রহ্মময় ভট্টাচার্য, সদানন্দ ভট্টাচার্য, জীবন সরকার, মনোমোহন পাল ও অর্ধেন্দু পুরকায়স্থ।

মানবমন ঃ [জানুয়ারী-মার্চ] — সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ, বিধান সরণী, কলকাতা ৪। দেড়টাকা।

মনস্তত্ত্বের কাগজ হিসেবে মানবমনের গুরুত্ব পাঠকমহলে স্বীকৃত। এ সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে লিখেছেন স্বয়ং সম্পাদক। বেশ ভাবিয়ে তোলার মত লেখা। সন্তোষকুমার দে লিখেছেন, দুশ্চিন্তা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে। সিরিয়াস পাঠকের কাছে পত্রিকাটির প্রতিটি লেখাই আদৃত হবে।

অগ্রণী ঃ সম্পাদিকা সান্ত্বনা প্রামানিক। মাটিয়ারী-বাণপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

স্কুলের ম্যাগাজিন হলেও, লেখাগুলি পড়তে মন্দ লাগে না। প্রবন্ধগুলির মধ্যে দীপককুমার দত্তের 'দুখু মিঞা থেকে বিদ্রোহী কবি নজরুল' শীর্ষক রচনাটি বেশ ভালো। গল্প-কবিতাগুলির মধ্যে বিস্ময়ের আভাস আছে। লিখেছেন শান্তি প্রামানিক, যোগমায়া রায়চৌধুরী, কানাই-লাল রায়, মনোতোষ বিশ্বাস, অমর হালদার, পরিমল মিত্র, অপর্ণা দত্ত, বিজয়া দত্ত, রণজিৎ দাস, শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এবং অনেকে।

অন্যাক্ষম ঃ সম্পাদক শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেন্স, কলকাতা-৪৫। এক টাকা।

কবিতার কাগজে কবিতাই বেশী থাকবে, এটা স্বাভাবিক। বিজ্ঞাপন, সূচীপত্র, ইত্যাদি জন্য পূর্বনির্দিষ্ট ১৩ পৃষ্ঠা বাদ দিলে, বাকি ৮৯ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে ভিয়েতনাম, ব্রাজিল, মালয়ালাম, কোঙ্কনী কবিতার অনুবাদসহ দুটি প্রবন্ধ, দুটি আলোচনা এবং ৭৫টি আধুনিক বাংলা কবিতা। মোটামুটি একটি সংকলনের মতো মনে হয়। কবিরাও অনেকে তরুণ। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আছেন মনীন্দ্র রায়, দিনেশ দাস, সৈয়দ আলি আহসান, তরুণ সান্যাল, হরপ্রসাদ মিত্র, গৌরাঙ্গ ভৌমিক সমীর দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, শান্তনু দাস, জীবন সরকার তুলসী মুখোপাধ্যায়, কায়সুল হক, রুদ্রেন্দু সরকার, শান্ত বসু, সুশীল রায় শুভ মুখোপাধ্যায় শিশির ভট্টাচার্য এবং কয়েকজন। চমৎকার হয়েছে, 'মোহিতলালের কাব্য ভাবনায় রসবাদ' শীর্ষক আলোচনাটি। মনীন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনাটি দীর্ঘ এবং বিতর্কিত। সব মিলিয়ে পত্রিকাটি সকলের কাছেই ভালো লাগবে।

কিছু ধ্বনি [পৌষ ১৩৭৯]—বেবী আন-ওয়ার সম্পাদিত। বি-৯১।এফ৭, মতি-ঝিল কলোনী, ঢাকা-২। পঞ্চাশ পয়সা।

নির্ভেজাল কবিতার কাগজ। লিখেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার, শহীদ সাবের দিলওয়ার, মহাদেব সাহা, সালাহউদ্দিন চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, শামসুল হুদা, মাকিদ হায়দার এবং অনেকে। এ পার বাংলার কবিরাও লিখেছেন। বাংলাদেশের কবিরা, এই মুহূর্তে, কে কিভাবে ভাবছেন, তারও আভাস পাওয়া যায় কবিতাগুলি পড়তে পড়তে। সম্পাদকের দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন।

রূপম [ঈদ সংখ্যা]—আনওয়ার আহমদ সম্পাদিত। বি ৯১।এফ-৭, মতিঝিল কলোনী, ঢাকা-২। দাম ঃ পঁচাত্তর পয়সা।

সিনেমায় চুম্বন চলবে কিনা, তাই নিয়ে খান্দকার ফারুক লিখেছেন একটি নিবন্ধ। গল্প কবিতাও ছাপা হয়েছে অনেকগুলি। পড়তে ভালো লাগে। তার চেয়েও ভালো লাগে, এই কথা ভেবে যে, বাংলাদেশের সম্পাদকেরা কবিদের বাদ দিয়ে সিনেমার কাগজও বের করেন না।

কালি ও কলম (মাঘ ১৩৭৯)—সম্পাদক ঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম একটাকা।

কালি ও কলমের বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন তারাপদ লাহিড়ী, অশোক ভাদুড়ী, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সাহা, নির্মলেন্দু গৌতম, সুভাষ ঘোষাল, দীপঙ্কর গুহ, কবিরুল ইসলাম, প্রতিমা সেনগুপ্ত, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ধারা-বাহিক উপন্যাস লিখছেন চাণক্য সেন এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। পত্রিকার এ সংখ্যাটি তার আগের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে।

বের্টোল্ড ব্রেশ্‌ট

বের্টোল্ড ব্রেশট বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নাট্য জগতের ইঙ্গিতময় সম্ভাবনাপূর্ণ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। নাট্যের কলাকৌশলে কুশলী হয়ে ব্রেশট নাট্যরসের স্বরূপটুকু বোঝার চেষ্টা করেছেন একান্তভাবে। সামাজিক জীবনকে তার নগ্ন প্রতিরূপে রূপায়িত করার এক ধরনের নাট্য-সাধনা নাট্যকার ব্রেশট লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি এই ধরনের স্থূল স্বাভাবিকতা-বাদের বিরোধী ছিলেন। আবার বৈজ্ঞানিক-যুগের রঙ্গমঞ্চে তিনি আর এক ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন; সে প্রবণতা হলো শিল্পানন্দের উৎসকে বিদ্যালয়ের হরিণ বাড়ীর চার দেওয়ালের মধ্যে বেঁধে দেবার চেষ্টা; যা ছিল আনন্দ বিতরণ কেন্দ্র তাকে এক শ্রেণীর শিল্প বিজ্ঞানীরা করতে চাইলেন গণসংযোগের মাধ্যম বা উপায়। অবশ্য ব্রেশট লক্ষ্য করেছিলেন যে, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে যে বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যবোধটুকু রয়েছে সে তত্ত্বকে। পরমাণু পদার্থবিদ ওপেন হাইমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন। বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে তার চার পাশের জগতের যে সঙ্গতি ঘটিয়েছে তার মধ্যেই ওপেন হাইমার বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যদর্শনের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। ব্রেশট কিন্তু জাগতিক বা বৈজ্ঞানিক জগতের সঙ্গে মানুষের সঙ্গতি বা সমন্বয়সাধনের মধ্যে সৌন্দর্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পান নি। তিনি বললেন রসের ক্ষেত্রটুকুই হলো সুন্দরের লীলাক্ষেত্র। যেখানে আনন্দ নেই, সে জগত থেকে সুন্দর নির্বাসিত; নিরা-নন্দ জগতে সুন্দর অন্তেবাসী।

ব্রেশটের মতে নাট্যশালা বা রঙ্গমঞ্চই হলো সুন্দরের পীঠভূমি। রঙ্গমঞ্চ শ্রোতাকে ও দর্শককে আনন্দ দেবে। নাট্যকার নাটকে উপস্থাপিত ঘটনাগুলি হয় জীবন থেকে নেবেন না হলে সেগুলি তিনি কল্পনা করবেন। অবশ্য ব্রেশট বলে-ছেন যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-টুকু ছাড়াও মানুষের সঙ্গে দেবতার যে সম্পর্কটুকু সম্ভাব্য তাও নাটকে উপজীব্য হতে পারে। রঙ্গমঞ্চের উপর নাট্যকার যাই উপস্থিত করুন না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আনন্দ দান করা। এই আনন্দ পরিবেশনার মধ্যে নাটক ও নাট্য-কারের মর্যাদাটুকু পরিচ্ছিন্ন থাকে। ব্রেশট বললেন, নাট্যকার যেন এই আনন্দটুকু

সুধীরকুমার নন্দী

দেবার ভান করে নীতিকথা না বলেন। নীতিকথা পরিবেশন করে আনন্দ দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ব্যবহারিক প্রয়োজন-টাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে প্লেটো এবং আরিস্টটল এঁরা দুজনে তাঁদের নন্দনতত্ত্বের কাঠামোটাকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। ব্রেশট তা থেকে শিক্ষা নিলেন। তিনি বললেন, নাটকের জগতে নীতিকথার প্রয়োজনটা এহ বাহ্য। সেখানে আমাদের মূল লক্ষণীয় বিষয়ই হলো নাটক আমাদের আনন্দ দিতে পেরেছে কিনা? নাট্যবস্তু অনুধাবনের মূল সূত্র হলো আনন্দ, তা সে নাটকের উপজীব্য জাগতিক অথবা জড়জাগতিক যাই হোক না কেন। যদি তা দর্শককে আনন্দ দিল তবে বুঝতে হবে সে নাটক রসোত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্য ব্রেশট আরিস্টটলীয় নন্দনতত্ত্ব ব্যাখ্যাত 'ক্যাথারসিস' তত্ত্বকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন আমরা হয়তো তাকে ঠিক সেই-ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। ক্যাথারসিস তত্ত্ব ঠিক আনন্দতত্ত্বের অনুসঙ্গী নয়। ব্রেশট বলেছেন, তারা হলো অনুসঙ্গী। আমরা বলবো, ক্যাথারসিস তত্ত্ব ও প্রয়োজনবাদ পরস্পরের সহযোগী। নাটকে সে রস পরিবেশিত হয় তা থেকে আমরা যে আনন্দ পাই সে আনন্দের মধ্যে উচ্চ-নীচের স্তরভেদ নেই। অবশ্য ব্রেশট স্বীকার করেছেন যে নাট্যরসের মধ্যে বা নাট্যানন্দের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদ না থাকলেও আমরা জটিল নাটক থেকে বেশী আনন্দ পাই। যে নাটকে নাট্য বস্তু সহজ এবং সরল তার উপস্থাপনায় আমরা যে আনন্দ পাই, তা স্বাদে বর্ণে গন্ধে জটিল নাট্যবস্তুর দেওয়া আনন্দের চেয়ে অনেক তরল এবং ফিকে। এই জটিল নাট্যবস্তু থেকে পাওয়া যে আনন্দ তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রেশট উপমার আশ্রয় নিয়ে-ছেন। প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন প্রেমলীলার চরম পরিণতি এবং পরম সার্থকতা পেয়ে থাকেন যৌন আনন্দে, ঠিক তেমনিধারা মহৎ নাটকের অর্থাৎ জটিল নাটকের পরিণতি হলো এই নাট্যানন্দে। তাহলে, ব্রেশট ইঙ্গিত করলেন যে, জটিল নাটকই হলো মহৎ নাটক; কেননা এই জটিল নাটকের আবেদন দর্শকের কাছে অনেক বেশী সরস ও ঐশ্বর্যবান; এই নাটকের আবেদনে অন্তর্বিরোধ থাকলেও এতে বেশী ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ বেশী মাত্রার

আনন্দ হলো এই ধরনের নাটকের ফলশ্রুতি।

নাটকের উপজীব্য হলো জীবন ও জগত। জীবনধারা সহস্র খাতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। সে ধারা শুধু পরস্পরের থেকে বহিরঙ্গে ব্যাপ্তিতে বা গতিশীলতায় পৃথক নয়; তাদের মধ্যে স্বরূপগত প্রকৃতিগত প্রভেদও রয়েছে। সেই স্বারূপ্যের বিভিন্নতাটুকু নাট্যবস্তুর উপজীব্য হবে একথা ব্রেশট বললেন। দর্শককে আনন্দ দেবার প্রয়োজনে নাট্যবস্তুর রকমফের করতে হবে। ব্রেশট ঐতিহাসিকতার নজীর তুললেন। গ্রীস দেশে শ্রোতা আনন্দ পেয়েছেন অমোঘ দৈববিধির ক্ষমাহীন প্রয়োজনটুকু দেখে। ফরাসী দর্শক সংহত প্রত্যাশায় নাটকে দেখতে চেয়েছেন যে সবাই নিজ নিজ কর্তব্য করছেন। এইটুকু পেলেই ফরাসী দর্শক খুশী। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ দর্শক সে যুগের নাগরিকের সদাজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটুকুকে নাটকীয় চরিত্রে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। যুগে যুগে দেশে দেশে শ্রোতা বা দর্শক নাটক দেখতে গিয়েছেন বিভিন্ন প্রত্যাশা নিয়ে এ তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েও ব্রেশট বললেন, রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাট্যবস্তুকে জীবনের প্রতিচ্ছবি না হলেও চলবে।

নাটকের উপজীব্য যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি না হয় তবে তার স্বরূপটা কি হবে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠবে। ব্রেশট বললেন, জীবনে যেমনটি ঘটেছে তাকে ঠিক সেইভাবে নাটকে রূপায়িত করার প্রয়োজন নেই। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে গরমিলটুকু নাট্যবস্তুর গুণে অবক্ষয় ঘটায় না। যা অসম্ভব তাও নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে। এই জীবনের সঙ্গে অসংগতি ও অসম্ভাব্যতা এরা যখন নাটকের উপজীব্য হবে তখন তাদের মধ্যে একটা ছেদহীন ছন্দ অনুস্যূত করে দিতে হবে। এটি নাট্যকারের গুরুদায়িত্ব। নাট্যকারকে কাব্য প্রকরণ ও নাট্য প্রকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ করে নাটকের গল্পটিকে গতিশীল করে তুলতে হবে। নাটকের মুখ্য চরিত্রের হৃদয়াবেগ প্রবাহ দর্শককে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তা যখন যায় তখন নাটকের আখ্যানভাগের অসংগতি আমাদের চোখে পড়ে না। সোফোক্লিস, রাচিন অথবা সেক্সপীয়র কারোর নাটকই এই নাট্যতত্ত্বের ব্যতিক্রম নয়। ব্রেশট সেই সত্যটুকু জোর দিয়ে বললেন। তিনি ইতিহাস থেকে নজীরের পর নজীর উদ্ধৃত করে বললেন, নাট্যের বিষয়বস্তুর 'অসম্ভাব্যতা ও অবাস্তবতা' সত্ত্বেও এই সব নাটক আমাদের আনন্দ দিয়েছে; আজও গোঁড়জন সেইসব নাটক থেকে আনন্দের সুধাপান করছেন। তবে ব্রেশটের মতে পুরাতন নাটক থেকে আমরা নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ আখ্যানভাগ থেকে যথার্থ নাট্যরসটুকু উপলব্ধি করতে পারি না। 'ভাষার সৌন্দর্য', 'নাটকের বিষয়বস্তুর নির্মিতি সৌকর্য' অথবা 'কুশীলবের বাচন-কৌশল' — এরা আমাদের মোহিত করে। ব্রেশট এদের নাম দিয়েছেন 'ইনসিডেন্টালস অফ দি ওল্ড ওয়ার্কস'। তাঁর মতে এই সব কৌশল অবলম্বন করে নাটকের আখ্যানভাগের দুর্বলতাটুকু ঢেকে রাখেন। আরিস্টটলীয় সূত্র— আখ্যানভাগই হল নাটকের প্রাণ— আধুনিক দর্শক এ সম্বন্ধে বোধ হয় একটু উদাসীন। ব্রেশট বললেন পুরানো নাটককে তার সেই পুরানো পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। 'সহৃমর্মিতাবোধ' তত্ত্ব দিয়ে ও যুগের নাটককে বোঝা যাবে না। কেননা তাঁর মতে এই তত্ত্ব হল বয়সে নবীন। এ দিয়ে প্রাচীন নাট্যাবলীর রসগ্রহণে বাধা আছে। ব্রেশটের এই মতটি বোধহয় প্রাচীন নাট্যতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বে আলোচিত তত্ত্বাবলীর দ্বারা বাধিত। অভিনব গুপ্ত বিরচিত 'অভিনব ভারতী' শীর্ষক ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের টীকা থেকে' প্রতিভান শব্দটির ব্যাখ্যা অনুধাবন করলেই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। সাধারণভাবে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে জ্ঞাতার চিত্তবৃত্তি যে 'ঘটাকার' বা 'অটাকার' প্রাপ্ত হয়, একথা সহজ স্বীকৃতির মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং সহমর্মিতাবোধ আমাদের দেশের জ্ঞানতত্ত্বে একটি সুপরিচিত ধারণা। শিল্পতত্ত্বে এর স্বীকৃতি পেয়েছি নাট্যশাস্ত্রের টীকা গ্রন্থ অভিনব ভারতীতে। এই গ্রন্থে 'প্রতিভান' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রতিভা হল কবির শক্তি, প্রতিভান সহৃদয়ের। রাজশেখর প্রতিভার দুটি ভাগ করেছেন। প্রথম, কারয়িত্রী—যে শক্তি কবির কাব্য রচনায় সহায়ক ('কবেরুপ কুর্বাণা কারয়িত্রী')। দ্বিতীয়, ভাবয়িত্রী—যে শক্তি ভাবকের ভাবনায় সহায়ক, যা কবির চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্মতা ঘটায় (ভাবকস্যোপকুর্বাণা ভাবয়িত্রী। সা হি কবেঃ শ্রমমভিপ্রায়ং চ ভাবয়তি')। প্রতিভান বলতে 'ভাবকত্বশক্তি' বা 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'কেই বোঝায়। অতএব একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সহমর্মিতাবোধের ধারণা মোটেই আধুনিক কালের নয়। অভিনব গুপ্ত যখন ভরতমুনি বিরচিত নাট্যশাস্ত্রোক্ত নাট্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, নাট্যে প্রযুক্ত গীত-বাদ্য-মঞ্চ-নটী প্রভৃতির জন্যই দর্শকের মনের পরিমিতত্ব বা সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং তার মন একাগ্রভাবে নাট্যের বিষয়মুখী হয় তখন কি প্রকারান্তরে এই সহমর্মিতার কথাই বলা হয় না?

এতদ্ব্যতীত রসের আলোচনা প্রসঙ্গে মম্মট, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ বলেছেন যে ভক্তের প্রেম যখন তার ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রধাবিত হয় তখন তাকে 'ভাব' আখ্যা দেওয়া হয় এবং এই 'ভাব' (ভক্তি) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে প্রকট হয়। অবশ্য এঁরা একে 'রস' আখ্যা দেননি। কিন্তু বৈষ্ণব রসবাদীরা এই ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ রস বলেছেন। সে যাই হোক, এ তত্ত্বটি সুপ্রকট হয়ে উঠছে যে সহমর্মিতা তত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্বে এবং কাব্যতত্ত্বে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই ব্রেশটের উপরোক্ত মন্তব্যটি খুব সমীচীন হয়নি বলেই মনে হয়।

(দুই)

নাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আনন্দদান। আনন্দ দেওয়া ছাড়া, নাটকের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন ব্রেশট। দর্শক কখন আনন্দ পান নাটক দেখে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে। ব্রেশট বললেন, জীবনের হুবহু নকল করতে পারলেই মঞ্চে উপস্থাপিত নাট্যবস্তু দর্শককে যে আনন্দ দিতে পারবে, এ কথাটা কিন্তু সত্য নয়। জীবনে যেমনটি ঘটেছিল, তা থেকে বহু বিচ্যুতি, বহু ব্যতিক্রমও কিন্তু নাটকে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে। এর ফলে কিন্তু রসাভাব ঘটবে না কোথাও। প্রাকৃতিক ঘটনাপরম্পরায় যাকে আমরা 'সম্ভাব্যতা' বলি, তাও কিন্তু নাট্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুপস্থিত থাকতে পারে। আর এই 'অনুপস্থিতি'-টুকুও কোথাও কিন্তু নাটকে রসের হানি ঘটায় না। ব্রেশটের মতে, নাটকের আখ্যানভাগে 'দুর্নিবার গতিবেগের মাত্রা' এসে লাগলে তবেই নাটক সহৃদয় সামাজিকের চোখে সার্থক হয়ে উঠবে। আর এটি সংঘটন করতে কাব্য এবং নাট্যের সর্ববিধ প্রাসঙ্গিক প্রকরণকে কাজে লাগাতে হবে। ব্রেশট আরিস্টটলকে অনুসরণ করে বললেন, নাট্যের উপজীব্য হলো নাটকের কাহিনী। রঙ্গমঞ্চে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু যদি সঠিকভাবে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে আমাদের রসোপলব্ধির পথে বাধা ঘটে। বিজ্ঞান যেমন আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে, শিল্পকলা-নাট্যকলা তেমনি আমাদের চিত্তবিনোদন করে, আনন্দের বিবর্ধন ঘটায়। ব্রেশট বলছেন, সমকালীন সামাজিক জীবনকে রঙ্গমঞ্চে আমরা যদি উপস্থাপিত না করতে পারি তাহলে তা তৎকালীন দর্শকদের কাছে গ্রাহ্য হবে না। তবে সমকালীন সমাজের প্রতিফলন নাটকে ঘটাতে পারলে, তবেই নাটক গণসংযোগ ও জনশিক্ষার

বাহন হয়ে উঠবে। সমকালীন সমস্যার সমাধান থাকবে মঞ্চে উপস্থাপিত নাটকে। সমকালীন যুগের জ্ঞানীজনের প্রজ্ঞা, যৌবনের অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ, হতভাগ্যদের জন্য গভীর মমত্ববোধ, এক কথায় এক ধরনের সর্বজনগ্রাহ্য মানবিকতা নাটকে প্রতিফলিত হবে। যুগের কল্যাণবোধ, তার শুভবুদ্ধির ছায়া, নীতিজ্ঞানের প্রভাব এ সবই এসে পড়বে নাটকে। যা কিছু আসুক না কেন, নাটকের উপজীব্য যাই হোক না কেন নাট্যকারের দায়িত্ব হলো তাকে যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা: এই যথাযোগ্যতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রেশ্‌ট 'ফোর্সফুল' এবং 'গ্র্যান্ড স্কেল' এই দুটি কথার ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ নাটকের উপজীব্য কাহিনীকে এক ধরনের প্রাণ-মণ্ডিত করতে হবে। যার ফলে ঘটনা তার সাময়িক তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে বৃহৎ-এর সঙ্গে মহত্তের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। আমরা বলতে পারি সাময়িককে সার্বিক আবেদনে মণ্ডিত করাই নাট্যকারের কাজ। এটুকু ঘটাতে পারলেই অতিপরিচিত ঘটনাও অজানার রহস্যে মণ্ডিত হয়ে উঠবে। পরিচিত ঘটনাকে দেখেও তার বিস্ময়ের ঘোর কাটবে না। আমাদের চারপাশের পরিচিত জগৎটা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে দর্শকের চোখে। নাট্যকার এটি ঘটাবেন নাটকের আঙ্গিক বা প্রকরণের যথাযোগ্য ব্যবহার করে। ব্রেশ্‌ট এই নব্য-সামাজিক-বৈজ্ঞানিক প্রকরণকে নাম দিলেন 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ'। সমাজ যে বিধি মেনে এগিয়ে চলে সেই বিধিগুলিকে যথাযোগ্য-রূপে ধরতে পারলে আমরা সমাজ বিবর্তনের ছন্দটুকুকে ঠিক মতো ধরতে পারবো এবং সমাজের অগ্রগতির পথে যেসব অসংলগ্নতা রয়েছে তাদের আমরা বুঝতে পারবো। 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ' বললো যার পরিবর্তন আছে তাই-ই 'অস্তিত্ববান'। পরিবর্তনই অস্তিত্বের সূচনা করে। অর্থাৎ 'ক' যখন 'খ' এ পরিবর্তিত হয় তখনই কেবল আমরা 'ক' এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। এই সামাজিক পরি-বর্তনকে আবার আমরা বুঝতে পারি নাটকের পাত্রপাত্রীদের অনুভূতি, মনোবৃত্তি এবং মতপ্রকাশের ব্যারোমিটারে। মানুষের সমাজজীবনকে বুঝতে হলে মানুষের এই বোধের এবং বুদ্ধির জগতটাকে বুঝতে হবে। সে বোঝার পথে কিন্তু সহমর্মিতা বোধ নয়। ব্রেশ্‌টের মূল বক্তব্য আমাদের মনে হয় 'এম্প্যাথি' তত্ত্বের বিরোধী। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই—

"There is a great deal to man, we say, so a great deal can be made out of him. He does not have to stay the way he is now, nor does he have to be seen only as his now, but also as he might become. We must not start with him, we must start on him. This means, however, that I must not simply set my self in his place, but must set myself facing him, to represent us all. That is why the theater must make what it shows seems strange'.

ব্রেশ্‌টএর উপরিউদ্ধৃত বক্তব্য থেকে এক ধরনের বিরোধের ধারণা উপ্ত হচ্ছে। নাটক এবং দর্শকের মধ্যে এমন এক ধরনের 'বিরোধ', এক ধরনের 'অপরিচয়' গড়ে তুলতে হবে যার ফলে অতিপরিচিত ঘটনাও, অতিপরিচিত চরিত্রও অপরিচয়ের বিস্ময়ে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এটি হল নন্দতাত্ত্বিক দর্শন ভঙ্গীর ফলশ্রুতি। ব্রেশ্‌ট পরিষ্কার-ভাবে বললেন, অভিনেতা যেমন অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবেন না, তেমনি দর্শকও এই অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবেন না। একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা, সহানুভূতি থাকাও শিল্পবোধের পরি-পন্থী। বের্গসঁ হাস্যরসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, সহানুভূতি হাস্যরস-এর পরিপন্থী। বের্গসঁকে অনুকরণ করে ব্রেশ্‌ট বললেন যে শিল্পানন্দের মধ্যে যে অপরিচয় ও বিস্ময়ের ঘোরটুকু লেগে থাকে তার অকালমৃত্যু ঘটবে যদি আমরা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠি অথবা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ব্রেশ্‌টে হলেন এক অর্থে সহমর্মিতা তত্ত্বের বিরোধী।

প্রকৃতি যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, আমাদের চারপাশের জগৎটার যেমন নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে তেমনি সমাজও নিত্য পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের মধ্যেই আনন্দের উৎসটুকু নিহিত আছে। নতুনের, অভিনবের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মনে বিস্ময় জাগে আর এই বিস্ময় হলো শিল্পানন্দের সূতিকাগৃহ। অতএব মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে না 'বদলায়' তাহলে নাটকের এক-ঘেয়েমির মধ্যে শিল্পানন্দটুকু হারিয়ে যাবে, তাই ব্রেশ্‌টে বললেন, মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি একে অপরের উপর নির্ভর করে, পরস্পরের কাছ থেকে 'শিক্ষা' নিয়ে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপন আপন চরিত্রের ক্রমবর্ধমানতাকে অব্যাহত রাখবে। নাটকে প্রায়শই একটি চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য চরিত্র অপ্রধান ভূমিকায় সেই প্রধান চরিত্রটি মুখ্য ভূমিকায় সহায়তা করে মাত্র। ব্রেশ্‌ট এর বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্কের জগৎ তাকে ব্রেশ্‌ট 'গেসটুস' এই আখ্যায় অভিহিত করলেন। অভিনেতাকে এই 'গেসটুস'কে বুঝতে হলে প্রথমেই নাটকের আখ্যানভাগের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে। গল্পটিকে পরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে অপরিচয়ের সীমানায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে বিচিত্র মঞ্চ-আঙ্গিকের মাধ্যমে। এই মঞ্চ-আঙ্গিকের মাধ্যমেই অভিনেতার এবং দর্শকের মনের মধ্যে যথাযোগ্য নন্দতাত্ত্বিক বৈরাগ্য বা 'astuetic' detachment এর আবির্ভাব ঘটবে। এই পথেই আমাদের শিল্পানন্দের উপভোগ সম্পূর্ণ হবে।

লোকে বলে—অবক্ষয়ের যুগ, ভেঙে পড়ার দিন,
কিন্তু সত্যিই কি তাই?
আমরা কি গড়েও তুলছি না?
অন্তত ক্লাব আর লাইব্রেরীগুলোর দিকে
যদি তাকাই তাহলে কিন্তু অন্য চেহারাই
দেখি। হাজার অসুবিধের মধ্যেও পুরনো
ঐতিহ্যকে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা
করছি, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।
আমাদের নবযুগের যুবসমাজের সেই
অক্লান্ত সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে তুলে
ধরা হবে এই বিভাগে।

কালীঘাটের তরুণ সঙ্ঘ

তারুণ্য-দৃপ্ত যৌবন উন্মাদনায় একদিন যে তরুণেরা দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে গোপনে হয়েছিলেন সংঘবদ্ধ, আজ সেই তরুণ সঙ্ঘই দেশ ও জাতি গড়ার কাজে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তুলেছে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার। 'কালীঘাট তরুণ সঙ্ঘে'র অতীতের এক মহান বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে। মহান দেশনেতাদের মত দেশের বহু কীর্তিহীন নামহীন প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরম আত্মাহুতি দিয়েছে। তরুণদের নীরব আত্মদান ছাড়া দেশের জাতীয় আন্দোলন কখনো সফল হতে পারে না। কালীঘাট তরুণ সঙ্ঘ দেশের মুক্তি সংগ্রামে চরম আত্মদানের ইতিহাস রেখে গেছে। এখানকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাঘা যতীন, বিনয় রায়, রবি রায় প্রমুখ বিপ্লবীরা। কিছু তরুণের সহায়তায়, কিছু উৎসাহী নাগরিকের সমর্থনে বর্তমানের ১ নম্বর কৃত্তিবাস লেনে ১৯২৬ সালে কালীঘাট তরুণ সঙ্ঘের জন্ম।

তখন দেশব্যাপী চলছে সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচার, শুরু হয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন। সারা দেশে তরুণদের সংগঠিত করতে প্রতিষ্ঠিত হল নানা সঙ্ঘ-সমিতি, শুরু হল মানুষ গড়ার কাজ। এই মানুষ গড়ার আদর্শকে রূপায়িত করতে মাত্র ২১ খানা বই নিয়ে তরুণ সঙ্ঘের যাত্রা শুরু। সঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছিল অনাথ ভাণ্ডার, সেবা, নৈশ বিদ্যালয়, স্বেচ্ছাসেবক, ব্যায়াম ও খেলাধুলা। বস্তুত সামাজিক ও সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে বিপ্লবী সংগঠনই ছিল সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য এ উদ্দেশ্যকে বেশিদিন গোপন রাখা যায়নি। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অল্প-দিনের মধ্যেই সঙ্ঘ ও সঙ্ঘকর্মীদের ওপর পুলিশী জুলুম শুরু হয়। বাংলার বিপ্লবী সংগঠন ও ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে
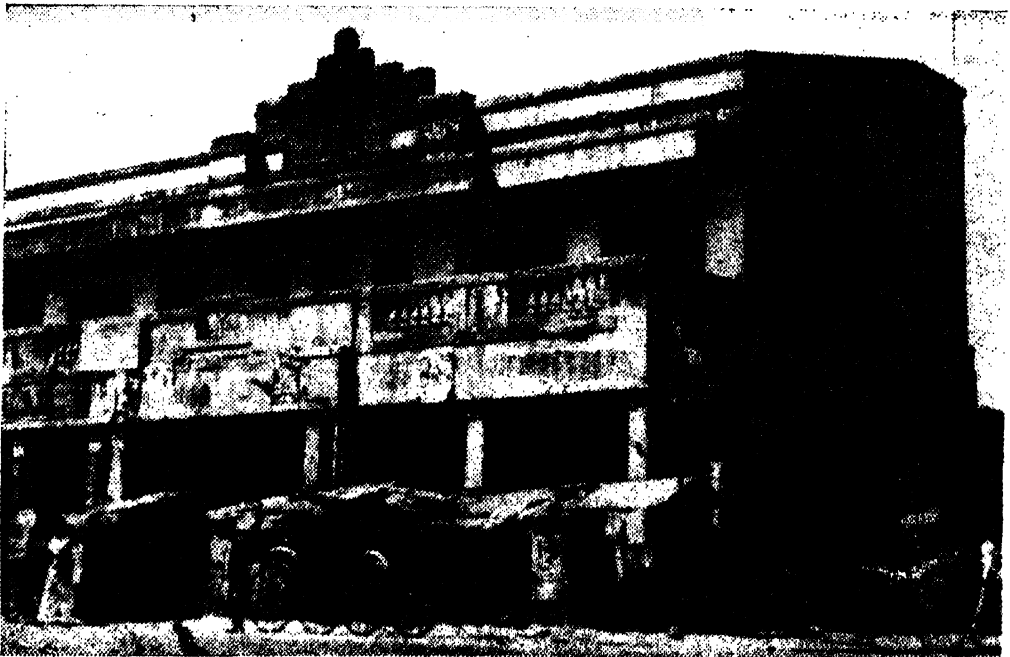
যে বৃহত্তর ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, তরুণ সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কর্মীদের প্রচেষ্টায় তা বাস্তব রূপে লাভ করেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনার পর তরুণ সঙ্ঘের ৩০।৪০ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলা তথা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে কালীঘাট তরুণ সঙ্ঘের নেপথ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দেশ জুড়ে চলেছে আজ দেশ গঠনের কাজ। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতিই জাতিকে বড় করে তোলে না, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মিলনেই জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। এই দিক থেকে তরুণ সঙ্ঘের একনিষ্ঠ উদ্যম মনে রাখবার মতো।

দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী ও সাদার্ন এ্যাভিনিউকে বাঁ পাশে ফেলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ধরে কিছুটা এগোলেই দেখা যাবে ডান পাশে বিরাট বাজার—সাদার্ন মার্কেট। এই মার্কেটের দোতলায় তরুণ সঙ্ঘ গ্রন্থাগার। বাইরে থেকে পরিবেশটা যতটা ঘিঞ্জি দেখায়, গ্রন্থাগারে ঢুকলে একেবারেই সেরকম মনে হয় না। বরং দোতলার আলোবাতাসের খোলা পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠু ব্যবস্থা তৃপ্তি দেয়।

গ্রন্থাগারটি উপন্যাস প্রধান নয়—সর্বশাখায় সুসম মাত্রায় সমৃদ্ধ। বিশেষত মানুষের চিন্তাজগতের কথা স্মরণে রেখে এখানে গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়। ভাল বই, আধুনিকতম বই এবং বেশি দামের বই কেনার ব্যাপারে পরিচালকেরা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ইংরেজী ও বাংলা মিলিয়ে মোট গ্রন্থ সংখ্যা ১১ হাজার। গ্রন্থসূচী বিষয় ও লেখকের নামানুযায়ী। পুরনো পত্র-পত্রিকাও এখানে রাখা হয়।

পাঠাগার খোলা থাকে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। ঐ সময় পাঠকক্ষও সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত থাকে। এখানে ছোট ও বড়দের ইংরেজী-বাংলা মিলিয়ে মোট ৪টি দৈনিক, ২০টি সাপ্তাহিক, ১৫টি মাসিক-ত্রৈমাসিক, বার্ষিক সংখ্যাগুলি এবং ৮টি বিদেশী পত্রপত্রিকা রাখা হয়। অবৈতনিক পাঠককে বসে যে কোন লোক উপন্যাস ছাড়া যে কোন বই পড়তে পারেন। গ্রন্থাগারকর্মীর সংখ্যা পাঁচজন। সকলেই অবৈতনিক।

এই গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ছাড়া তরুণ সঙ্ঘ ফুটবল, ক্যারাম, দাবা ইত্যাদি খেলা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচী, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করে থাকেন।

গ্রন্থাগারের প্রধান সমস্যা প্রসঙ্গে সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রীদিলীপ সেন জানালেন, এখানে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত তিন বছর এবং কলকাতা কর্পোরেশন গত পাঁচ বছর অনুদান দেওয়া বন্ধ করেছেন। কেন্দ্রের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় মাত্র সাড়ে তিনশ সদস্যদের চাঁদা আর প্রতি বছর চারিটি সিনেমা শো আয়ের একমাত্র উৎস। বড়দের চাঁদা একটাকা হলেও ছোটদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলবার জন্যে চাঁদা ধার্য হয়েছে মাত্র পঁচিশ পয়সা। উপন্যাস ও লঘু সাহিত্যবিষয়ক বই-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাঠক সংখ্যা বাড়ানো যায় বটে তবে এঁরা তার পক্ষপাতী নন। আর্থিক সমস্যা ছাড়াও স্থানাভাব এখানে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার ভবনটি ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত।

স্থানাভাব ও অর্থাভাব এমন দুটি সমস্যা যা গ্রাস করলে অন্তত গ্রন্থাগারের মত সংস্থা বড় হয়ে উঠতে পারে না। কালীঘাট তরুণ সঙ্ঘের উৎসাহী যুবক ও কর্মীদের সব বৃহৎ প্রচেষ্টাকেই তা অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অপরদিকে সুরুচিপূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করায় বর্তমানকালের রুচি ও চাহিদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দেশে, যে কোন কারণেই হোক, গ্রন্থাগারের জন্যে আর্থিক অনুদান পাওয়া যায় না অথবা গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন স্থায়ী আয়ের সুবন্দোবস্ত নেই, সেখানে সাধারণ জনরুচি ও উন্নতরুচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও স্বাস্থ্য বজায় রাখা ছাড়া গত্যন্তর কী, সেটাও ভাববার কথা!

—সুশান্তকুমার মিত্র

আপনি কেমন আছেন?
—উত্তর খুবই প্রাঞ্জল—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত!'...কিন্তু প্রাণ রাখার চেষ্টায় যে ওষুধপত্র ডাক্তার না দেখিয়ে নিজেরাই কিনে ব্যবহার করি, আর খাদ্যের নামে যেসব অখাদ্য আমরা খাই, তাতেও কম প্রাণান্ত ঘটে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাই অসুখবিসুখ, পুষ্টি ও পরিবেশের বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবেন এই বিভাগে।

ক্যানসারও নিরাময় হয়

ক্যানসারে মৃত্যুহার আমাদের দেশেও বাড়ছে। তবু একথাও সত্যি যে, ক্যানসারে মৃত্যুহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল আমাদের ভয় ও অজ্ঞতা। এই অহেতুক ভয় ও অজ্ঞতার জন্যেই ক্যানসারাক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই এমন সময় চিকিৎসা করাতে আসেন যখন উপসর্গ ও যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা ছাড়া বিশেষ কিছুই আর করার থাকে না।

অথচ শুরুতে ধরা পড়লে এবং সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা করালে ক্যানসারকে আয়ত্তে আনা সম্ভব। ক্যানসার হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসা করাতে আসেন, অনেকেরই রোগ উপশম হয়েছে। সেরেও গিয়েছেন অনেকে।

আমাদের দেশে ক্যানসার বেশী দেখা যাচ্ছে পুরুষদের প্রধানত মুখবিবরে ও স্বরযন্ত্রে এবং কিছু কিছু ফুসফুসে, পাকস্থলীতে ও প্রস্টেট গ্রন্থিতে, আর মেয়েদের জরায়ুমুখে (সারভিকস-এ) ও স্তনে। হাসপাতালের তথ্য অনুসার পুরুষ ও মহিলা ক্যানসার রোগীর অনুপাত ৫৫ : ৪৫। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, ইংলন্ড ও আমেরিকার পুরুষরা বেশী ভোগেন ফুসফুস ও পাকস্থলীর ক্যানসারে, আমাদের দেশে মুখবিবর ও স্বরযন্ত্রে। পাশ্চাত্যের মেয়েরা অধিকাংশ আক্রান্ত হচ্ছেন স্তনের ক্যানসারে, ভারতবর্ষে জরায়ুমুখে।

সাত ভাই-চম্পার মত ক্যানসার সন্দেহ করার প্রাথমিক লক্ষণ সাতটি। (১) যদি জিবে বা অন্য কোথাও ঘা না সারতে চায়, (২) যদি গলার স্বর ভেঙে গিয়ে আর স্বাভাবিক না হয়, (৩) যদি যখন-তখন রক্তস্রাব হতে থাকে, (৪) যদি ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, (৫) যদি হজমের গোলমাল চলতেই থাকে, (৬) যদি স্তনে বা অন্য কোথাও অস্বাভাবিক স্ফীতি বা শক্ত গুটি দেখা দেয়, (৭) যদি কোন বয়স্ক ব্যক্তির অকারণে ওজন কমে যায়, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। এই সাতটির যে-কোন একটি লক্ষণ যদি সন্দেহও হয়, অবিলম্বে ক্যানসার হাসপাতালে এসে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হওয়াই ভাল। লক্ষণ কোন কিছু যদি নাও থাকে তবু চল্লিশে পৌঁছেছেন এমন বয়সের মহিলারা বছরে অন্তত একবার ক্যানসার ডিটেকসন সেন্টারে এসে জরায়ুমুখের ক্ষমীয়ার পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারেন যে, প্রাক-ক্যানসার স্তরের অতি প্রাথমিক বা সন্দেহজনক কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। মেয়েরা যদি দলে দলে এই সহজসাধ্য ক্যানসার-তাড়ান অভিযান শুরু করেন, ক্যানসার নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।

কিন্তু ক্যানসার ব্যাপারটা কি?

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আধুনিক কালের চিকিৎসা ও জৈবরসায়ন বিদ্যার সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা এইটাই—ক্যানসার হয় কি করে, কেন হয়, প্রতিকারের পথ কি! রোগটা শুধু প্রাচীন নয়, অত্যন্ত জটিল—যার প্রমাণ, ক্যানসারের উৎপত্তি ও গতিস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। যদিও জানা গিয়েছে অনেক কিছুই। কলমের ডগায় মহাকাশের সীমানা আঁকার প্রয়াসের মত অতি সংক্ষেপে বলা যায়, ক্যানসার হল জীবদেহের কোন অংশের কোষগুলির নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, যা দেহের পক্ষে বিষক্রিয়। পরিণাম স্ফীত বা টিউমারে। রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় বলে সেখানে ঘাও দেখা দিতে পারে।

ক্যান্সার হয় কিভাবে?

এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট—এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে হয়ে কোষগুলি তৈরী করে জীবদেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ। প্রতিটি উপাঙ্গের (যেমন মস্তিষ্ক, যকৃত, হৃদপিন্ড, অস্থি, কেশ ইত্যাদির) কোষগুলির আপন আপন আকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটি কোষের জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, আছে ক্ষয় ও লয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঘর্ষণে বা আঘাতে চর্মকোষের ক্ষয় হলে তলার অপরিণত কোষ তার স্থান পূরণ করছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারা আর বাড়বে না, তখন চালিয়ে যাবে অংশ নেবে নিজেদের ও সমগ্র দেহের বিপাক ক্রিয়ার অসামান্য জটিল কিন্তু সুসংবদ্ধ কাজে। এই হল স্বাভাবিক কোষ। ক্যানসারগ্রস্ত কোষের আকৃতি যেমন অস্বাভাবিক, তাদের বৃদ্ধির গতিও তেমনি বল্গাহীন। সেই বৃদ্ধি হয় অপরিণত অবস্থাতেই। নিজ উপাঙ্গের কোষ থেকে আকৃতি তাদের ভিন্ন। সংখ্যাতেও তারা বাড়তে পারে হুড়মুড় করে।

সাধারণ দেহকোষগুলি তাদের বিপাক ক্রিয়া মারফৎ চালায় আমাদের জৈবক্রিয়া, রক্ত থেকে গ্রহণ করে পুষ্টি ও অক্সিজেন, তাদের পরিত্যক্ত বস্তুগুলি বেরিয়ে যায় মল-মূত্র-ঘাম-শ্বাসের সঙ্গে। ক্যানসার
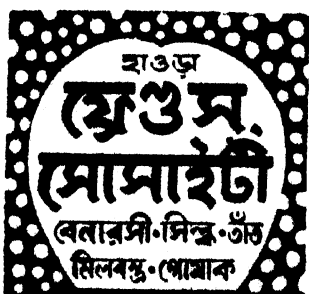
করেই না, বরং তাদের ত্যাজ্য বস্তু থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় এমন বিষাক্ত উপাদান যা দেহের পক্ষে হানিকর।

প্রতিটি উপাদানের কোষগুলি তাদের স্বস্থানেই স্থিতিশীল। ক্যানসার-কোষ কিন্তু রক্ত ও লসিকাস্রোত বেয়ে অন্যত্র চলে গিয়ে সেখানে বাসা বাঁধতে পারে। জরায়ুর ক্যানসার যেতে পারে লিভারে, স্তনের ক্যানসার পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। তবে ক্যানসার একের দেহ থেকে অন্য দেহে কিংবা বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রামিত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এই যা রক্ষে।

ক্যানসার বাড়ছে কেন?

এই স্বাভাবিক কিন্তু আজও অমীমাংসিত প্রশ্নের হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি। বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের ব্যাপক অনুশীলনের যোগফল প্রমাণ করছে, ক্যানসারের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আমাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, অভ্যাস, পেশা ও পরিবেশের। আবহাওয়ায় যেখানে ধোঁয়া, ধোঁয়াশা ও গ্যাসের আধিক্য, পশ্চিমের সেই সব শহরে ক্যানসার বাসা বাঁধছে প্রধানত ফুসফুসে। খনির মধ্যে নানারকম খনিজ-চূর্ণ নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছে যেখানে, তেমনি পরিবেশে যাঁরা কাজ করেন, সেইসব খনিশ্রমিকরাও আক্রান্ত হচ্ছেন ফুসফুসের ক্যানসারে। পাকস্থলীর ও লিভারের ক্যানসার বেশি দেখা যাচ্ছে অতিমাত্রায় অ্যালকোহলসেবীদের মধ্যে। আলকাতরা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, অ্যানিলিন, অ্যাসবেসটস, রবার, কিছু কিছু প্লাস্টিক ও পলিমার, রঞ্জক এবং আরও নানারকম হাইড্রোকার্বন নিয়ে কাজ করা যাদের পেশা, তাদের মধ্যে ক্যানসার বাড়ছে। যে রঞ্জনরশ্মি আধুনিক চিকিৎসায় অপরিহার্য, মাত্রাধিক্যে তা থেকেও ক্যানসার হতে দেখা গিয়েছে। ক্যানসার হতে পারে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও আইসোটোপ থেকে। আফ্রিকার প্রখর সূর্য-কিরণ থেকে ত্বকের ক্যানসার লক্ষ্য করা গিয়েছে। ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যানসারের যেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তেমনি যাঁরা বেশি পান-দোক্তা-সুপারি খান এবং মুখের মধ্যে রেখে দেন, তাঁদের দেখা যায় মুখবিবরের ক্যানসার। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভারতের বহু-প্রসবিনীরা উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন না করার জন্যে যেমন জরায়ুমুখের ক্যানসারের শিকার হন, তেমনি পাশ্চাত্যের যেসব মহিলা সন্তানহীনা অথবা শিশুকে স্তন্যদানে অভ্যস্ত নন, তাঁরা ভোগেন স্তনের ক্যানসারে। গবেষণায় এও প্রমাণ হয়েছে করতে সক্ষম এবং এই ভাইরাস এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রামিত হতে পারে। কারও মতে রক্তের ক্যানসার হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং ভাইরাস থেকে।

ক্যানসার কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে এমন বহু উত্তেজক পদার্থ ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ছে যার সংকলিত তালিকা দেখলে হয়ত সভ্যজগত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জাগতে পারে। কিন্তু তা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সমাজজীবনে উৎপাদনের আদিম স্তরকে ফিরিয়ে আনা। ভরসার কথা এই যে উত্তেজক পদার্থগুলির সংস্পর্শে বা ক্যানসারের অনুকূল পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান না করলে ক্যানসার সাধারণত হয় না। সুতরাং কিসের প্রভাবে ক্যানসার হতে পারে সে সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকলে সাবধান হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ বেশি সিগারেট ও পান-দোক্তা খাওয়ার ও সুরাসক্তির অভ্যাস পরিত্যাগ করা, জননেন্দ্রিয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা ও বহুপ্রসবিনী না হওয়ার চেষ্টা করা, শিশুকে স্তন্যদানে পরাঙ্মুখ না হওয়া, পরিবেশে গ্যাস ও ধোঁয়ার মাত্রা কমানর চেষ্টা, শিল্প ও খনি শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি যেসব সুপারিশ বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই করেছেন, এবং যেগুলি আমাদের পক্ষে অসাধ্য নয়, রাষ্ট্রপরিচালক ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিক সে-ব্যাপারে যদি সতর্ক হন, ক্যানসার নিয়ন্ত্রণের বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতিমধ্যে যে-কাজটি অবশ্যপালনীয় সেটি হল, ক্যানসার সম্পর্কে অহেতুক ভীতি দূর করা এবং রোগের প্রথম অবস্থায় হাতুড়ে চিকিৎসা থেকে বিরত থাকা। ক্যানসারের সাতটি প্রাথমিক লক্ষণের কোন একটি সন্দেহ করলে ক্যানসার হাসপাতালে বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। অস্ত্রচিকিৎসা, রেডিয়েসন ও কেমোথেরাপীর সাহায্যে আজকাল বহু ক্যানসার রোগী নিরাময় হচ্ছেন। শুরুতে ধরা পড়লে ক্যানসারেরও চিকিৎসা আছে। বৈজ্ঞানিক সমাজকে ধন্যবাদ, ক্যানসার হলেই মৃত্যু আজ আর অবধারিত নয়।

—অশ্বিনী সামন্ত

না কখনো ছিল, না পাবেন—এমন
সাদা
সাবানের তুলনায়
১½ গুণ
বেশী কাপড় ধোয়
সাবানের তুলনায় অর্ধেক
মেহনত—দু'গুণ পরিষ্কার—
তা সে জল যে ধরণেরই হোক।
NEW!
det
detergent washing cake
ডেট কেক

শরীরের অসুখে আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু মন? মনের অসুখও তো সমানই অক্ষম করে দিতে পারে, বিশেষ করে আজকের এই তীব্র তীক্ষ্ণ জটিলতার যুগে, অভিজ্ঞ চিকিৎসক 'মনের খবরে' সেই সব মনোব্যাধি ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা করবেন ধারাবাহিক নিবন্ধে।

আমাদের সহজ বৃত্তির সম্বন্ধে বলেছিলাম। মনের কামশক্তির ক্রমবিকাশের ধারা ও আক্রমবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। মনের এই দুই বৃত্তিকেই প্রধান বলে মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এছাড়াও মনের আরও বৃত্তি আছে কিন্তু সেগুলি জীবনকে ঐ দুই বৃত্তির মত এত বেশী তোলপাড় করতে পারে না। একটু ভাবলে অবাক লাগে, মানুষ কত সহজে রেগে যায়! কিন্তু রাগে কেন? প্রশ্নটা করা যত সহজ, তার উত্তর দেওয়াটা কিন্তু মোটেই তত সহজ নয়। বরং খুবই কঠিন। এটা ওটা যাই উত্তরে বলতে যাই না কেন, শেষ পর্যন্ত মনে হয় উত্তরটা যেন পাওয়া হল না বা দেওয়া হল না। রামবাবু আর শ্যামবাবু অনেক দিনের বন্ধু, প্রায় ইস্কুল-জীবনের মধ্যভাগ থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব চলে আসছে। একদিন রামবাবু শ্যামবাবুর কাছে সামান্য একটা কলম একদিনের জন্য চাইলেন। শ্যামবাবু নিজের ব্যবহারের প্রিয় কলমটি রামবাবুকে দিলেন না। কারণ ওটা নষ্ট হয়ে যাবে। রামবাবু চটে গেলেন। লেখবার জন্যেই কলম। তিনি লিখলে কলম নষ্ট হয়ে যাবে আর শ্যামবাবু বরাবর লিখছেন তাতে কলম নষ্ট হল না। কেন তিনি কি লিখতে জানেন না! কলম দিয়ে কি তিনি গাঁইতির কাজ করবেন যে কলম নষ্ট হয়ে যাবে? ইত্যাদি বেশ কিছু কথা তিনি শ্যামবাবুকে শুনিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে পরে উঠে বেরিয়ে গেলেন। কলমের দরকার ছিল তাই কলম চাইলেন কিন্তু পেলেন না। রাগ করার ফলে কি কলম পাওয়া গেল? যে কাজের জন্যে কলম চেয়েছিলেন রামবাবুর, সে-কাজ হয় অন্য উপায়ে তিনি করেছেন, না-হয় কাজ পণ্ড হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু রাগ হল কেন? যা চাইলাম তা পাবার জন্যে যা করা দরকার তাই ত করা সঙ্গত। রাগ করে যদি কলম না পেলাম তবে কলম না-পাওয়ার অসুবিধার সঙ্গে আবার রাগ করার ফলে মনের অশান্তি যোগ দিল। তাতে লাভ তো কিছু এলো না, তবে! যুক্তি কিছু না থাকলেও রাগ হল— এটা সত্যি। রামবাবুর মনে যা লেগেছে, শ্যামবাবু এতদিনের বন্ধু হয়েও তাঁকে সামান্য কলমটা দিলেন না। শ্যামবাবু তাঁকে বিশ্বাস করেন না? তাঁকে কি এতই দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করেন? তাঁর চাওয়াটার কোনো মূল্য না দিয়ে তাঁকে এমন করে অবহেলা করে অমর্যাদা করলেন? এই রকম নানা কথা রামবাবুর মনে খোঁচা দিয়ে তাঁকে রাগিয়ে তুলেছে। আঘাতটা লেগেছে রামবাবুর অহংকারে। তাঁকে ছোট করা হয়েছে। সেটা তিনি সইতে পারেননি। শ্যামবাবুর কথাটা রামবাবুকে আঘাত করেছে, মানে, শ্যামবাবু যেন রামবাবুকে আঘাত করেছেন এই বোধ হওয়াতে রামবাবু রেগে গিয়ে তাঁকে প্রত্যাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অর্থাৎ আহত বোধ হওয়ায় তাঁর আক্রমবৃত্তি জেগে উঠে ফিরে আঘাত করতে চেয়েছে। কথায় যতটা সম্ভব ততটাই এ ক্ষেত্রে রামবাবু আঘাত করেছেন। কথা কাটাকাটি সময়-বিশেষে হাতাহাতিতে এসে থামে। আক্রমবৃত্তির প্রয়োগে সময় সময় যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত আছে। যেমন জোর করে মারধর করে টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া যায়। ছোটছেলেদের মধ্যে মারামারি করে অন্যের কাছ থেকে বল ইত্যাদি ছিনিয়ে নেওয়া যায়। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু রাগ করে বল প্রয়োগ করে অপরের কাছে থেকে শ্রদ্ধা সম্মান বা আত্মমূল্য পাওয়া যায় কি? নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই জানেন জোর-জবরদস্তি করে তা পাওয়া যায় না। ভয়ে হয়ত শক্তিমানের কথা কিছুটা মেনে চলতে হয়—কিন্তু সুযোগ পেলেই তাকে অমান্য করতে মনে বাধে না। এসব জেনেও আমরা তবু রাগ করি কেন? রাগ প্রকাশ করে, নিজেকে বড় ভাববার সুযোগ নেয় মন। রাগ প্রকাশ না করেও মনে মনে গজরাতে থাকে, সেখানে সে বশ্যতা মানে না। আসল কথাটা তবে দাঁড়ায় চেয়ে না পাওয়াটা কেবল যা চাইলাম তা না-পাওয়াতে আবদ্ধ থাকে না—নিজের হেরে যাওয়া, ছোট হয়ে যাবার কথাটা বড় হয়ে দেখা দেয়। হার মানতে আমরা চাই না, ছোট হয়ে যাওয়া অপমানকর, ইত্যাদি নানা মনোভাব তখন একসঙ্গে ভেতর থেকে তাড়া দিয়ে আমাদের রাগিয়ে তোলে, অর্থাৎ প্রবল করে তোলে। কিন্তু যে দুর্বলতার বা নীচু হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে জোর করে দাঁড়িয়ে (রেগে গিয়ে) আমাদের মানের দণ্ড উঁচু করতে চাই, ভুলে যাই যে সেই রাগের জন্যেই সমাজে আমরা আরও ছোট হয়ে যাই। অশান্তিকেও বাড়িয়ে তুলি। কিন্তু সেকথা শোনে কে, আর শুনলেই বা তা জীবনে পালন করছে কজন? সমগ্র অবস্থাটার গভীর অনুভূতি না হলে, আর তার ফলে নিজের ভুল ধারণার পরিবর্তন না হলে রাগ বারে বারে দেখা দিতে থাকে। যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে তার থেকে দেখা যায়, চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্র থেকে চেয়ে না পাওয়ার ফলে অসুবিধে বা ক্ষতির পরিণাম থেকে মন কেমন সহজে অহংকারের আত্মমূল্য বা মর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে চলে যায় আর তার জন্যেই আর সব ভুলে রেগে টং হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এই অহংকারবোধ সম্বন্ধে নানা সূত্রে আরও আলোচনা করতে হবে। এখন এই সূত্র ধরে দেখা যাক এই অহংকারই আমাদের কেমন করে আক্রমবৃত্তিকে দমন করে, অন্যদিকে তার মোড় ফেরাতে চেষ্টা কোরে আমাদের সভ্যনামে পরিচয় দেবার গৌরব দান করে।

যে মানুষ কিছু না কিছু ঘটতেই চিৎকার রাগারাগি মারামারি করে, তাকে আমরা অসভ্য বর্বর বলি। অর্থাৎ এই সহজ আক্রমবৃত্তিকে সে দমন করতে পারে না, নিজের আয়ত্তে রাখতে পারে না। এই বৃত্তির প্রয়োগের সময় আর দশজনের মতামতের কথা তার মনে থাকে না। নিজেকে সে তখন বৃত্তির দাস করে দেয়। আমরা যারা নিজেদের সভ্য বলে মনে করি তাদের কাছে এতে আমাদের পরাজয়বোধ জাগে। আমরা লজ্জিত হই।

যেকথা অদস্ ও অহং সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি এখানে সেকথা মনে করতে হবে। অদস্ থেকে বৃত্তি বাইরে প্রকাশ করতে এলে তাকে অহং রোধ করতে না পারলে অহং অধিশাস্তার সহায়তা খোঁজে। তাতেও যদি বৃত্তিকে দমিত করতে না পারে তবে বাস্তব অবস্থা, অর্থাৎ সভ্যতার পরিবেশের কথা মনে হতেই তার পরাজয়ের জন্য অহং যেন কুণ্ঠাবোধ করে, নিজের সম্বন্ধে অহমের যে গৌরববোধ তা ক্ষুণ্ণ হয়। তখন যথাসম্ভব আবার সেই বৃত্তির অবাঞ্ছিত প্রকাশকে রোধ করতে অহং অধিশাস্তার সাহায্যে চেষ্টা করে, এবং সাধারণ অবস্থায় এই রোধ করা অহমের পক্ষে সম্ভব হয়। বিশেষ রকমের মানসিক রোগী অহমের পরাজয়ের গ্লানি রোধ করতে পারে না। অহং সেখানে প্রবল বৃত্তির দাস হয়ে যায়। তখন তার বিচারের মানও বদলে যায়। উচিত অনুচিতের সামাজিক বিচার তার তখন অনেকাংশে লোপ পায়। কিন্তু সে তো রুগ্ণ অবস্থা। মানসিক রোগ ছাড়াও সমাজে আরও অবস্থা আসে যখন মানুষ সভ্যতার গৌরবের নিদর্শন, যুগ যুগ ধরে মানুষ যাকে মূল্য দিয়ে এসেছে, সম্মান করে এসেছে, মনে শ্রদ্ধার আসন দিয়ে এসেছে, সেই সব অমূল্য সম্পদ সে, বিশেষ মতবাদের ক্ষিপ্ততায়, ধ্বংস করেই গৌরব বোধ করে। মানব সভ্যতার কত সম্পদ এভাবে ছারখার করা হয়েছে ইতিহাসে তার কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক মতবাদের দোহাই দিয়ে, এই সেদিনও এই কলকাতা শহরেও মানুষের আক্রমবৃত্তিকে উদ্দীপিত করে যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল তা ভোলবার সময় আজও হয়নি। সাময়িক উত্তেজনার বশে যখন ভাঙ্গনটাকে মানুষ বড় বলে মূল্য দেয় তখন ভাঙ্গতে পারাটাতেই গৌরব বোধ হয়। মানুষের অহং যখন বৃত্তির চাহিদার সঙ্গে যোগ দিয়ে বৃত্তির অদম্য প্রকাশের মধ্যেই নিজের সার্থকতা বোধ করে তখন ব্যক্তির জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। ব্যক্তির এই গতি যদি অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তবে তা সমাজ ও দেশের অকল্যাণ ডেকে আনে। দুষ্ট ব্রণ কেটে বাদ দেওয়াতে স্বাস্থ্য বজায় থাকে সত্যি, কিন্তু তার সঙ্গে যদি কাম্য ও পূজিতকেও বাদ দেবার নেশা জাগে তবে তাকে শ্রেয় বলা যায় না। একথা সত্যি নতুন করে গড়তে হলে পুরোনো কিছু কিছু ভেঙ্গে বাদ দিতে হয়। কিন্তু সেখানেও সুস্থ অহং যদি কাজ করতে না পারে তবে আপন মনের ঐশ্বর্যকেই বিনাশ করা হয়। কোনো রাজনীতির মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধেই আলোচনা করা হচ্ছে মাত্র।

অহং ও আক্রমবৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে আরেক রকমের ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অহং নিজেই তখন সক্রিয় হয়ে আক্রমবৃত্তিকে বা প্রবল কামকে নিধন করতে লেগে যায়। অহং নিজেই তখন আক্রমবৃত্তির প্রয়োগ করে আক্রম ও অন্যান্য বৃত্তির বিরুদ্ধে। কথাটা প্রথম শুনতে ধাঁধার মত শোনায়, তবু তা সত্যি। এক ভদ্রলোকের কথা বলি। তার নামটা বদলে তাকে নবীন নাম দেওয়া যাক। নবীন বয়সেও নবীন, বছর ২০।২২ বয়স হবে। প্রথম যৌবন থেকেই সে নিজেকে ন্যায়, নীতি ও নিষ্ঠানুসারে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে আসছে। নবীনের মনে যখন রাগ দেখা দিতে চায়, তখন সে রাগ অত্যন্ত গর্হিত মনে করে তা চেপে দেবার জন্যে নানা রকমে চেষ্টা করতে থাকে। অন্য কৌশলে না পারলে সে রাগ করছে বলে নিজের গালেই চড় মারতে থাকে, নিজের কান ধরে টেনে টেনে মনে মনে বারে বারে বলে 'আর রাগ করবি? বল, আর রাগ করবি?' এর ফলে তার বাইরে রাগের প্রকাশ বন্ধ হয়। ক্রমে সে শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু আবার একসময় তার রাগ হয়। তবু এই কৌশলে সে তার রাগ অনেকখানি দমন করতে সক্ষম হয়েছে। কাম সম্বন্ধেও তার ধারণা—কাম জয় না করতে পারলে বড় হওয়া যায় না। কাম ক্রোধ এসব সাংঘাতিক রিপু। এদের দমন করে জয় করতেই হবে। কামবোধ জাগলেও সে নিজেকে শাস্তি দেয়। কখনোবা কিছু শারীরিক ব্যায়াম করে নিজের মনের কাম নিরোধ করে। আহার সম্বন্ধেও নবীনের একই রকম মনোভাব। কিছু খেতে লোভ হলে সে নিজেকে শাস্তি দেয়—এমনকি একদিন দুদিন উপোস করেও কাটায়। একে একরকমের আত্মনিগ্রহ বলা চলে। অবশ্য মানতে হবে যে শিক্ষা মানেই আমাদের সহজ বৃত্তিগুলিকে সামাজিক সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করা। সুতরাং কিছু শিখতে গেলেই আমাদের কোনো না কোনো সহজ বৃত্তির স্ফুরণে কিছু বাধা দিতে হয়। সে বাধাকে প্রয়োজনমত শক্তিশালী করতে হয়। নইলে শিক্ষা সফল হয় না। সেসব ক্ষেত্রেই অহং নিজে বা অধিশাস্তার হুকুম মেনে, বৃত্তির উপর আক্রমণ চালায়, তাদের দমন করতে সচেষ্ট হয়। নবীনের বেলায় এই দমনের চেষ্টা বারে বারে ভেঙ্গে পড়তে চায়, আর সেই জন্যই তার সতর্ক হয়ে বৃত্তিগুলির সহজ প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করে নিজেকে, অর্থাৎ অহংকে, তাদের উপরে স্থাপন করতে ব্যস্ত থাকতে হয়। নবীনের জীবনে আজও এই বিরোধের কোনো মীমাংসা সে খুঁজে পায়নি। বৃত্তির বিরুদ্ধে অমন মারমুখো হয়ে ওঠাও যে আক্রমবৃত্তিরই ব্যবহার, আর সেটা সে নিজে নিজের আক্রমবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে, নবীন তা বুঝতে পারে না। তার ধারণা সে বড় হবার সাধনায় ক্রমে উন্নতি লাভ করছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তার মনের অন্যান্য নানা ক্রিয়া, যেমন চিন্তা করার ক্ষমতা, কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার মীমাংসা করা, কোনো বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া, সহজ আনন্দ করা, স্বাভাবিক উৎসাহে নিজের কাজ করা ইত্যাদি নবীনের পক্ষে সহজ নয়। আক্রমবৃত্তির যা যে কোনো সহজ বৃত্তির প্রকাশ যেমন জীবনকে অশান্তি ও ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বেঁধে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে, তেমনি বৃত্তিগুলিকে নিষ্ঠুর পীড়নের ফলেও জীবনে অন্য নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলেও জীবনের গণ্ডি ক্ষুদ্র হয়ে যায়, মনের শান্তি ও কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। বৃত্তিকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া বা একেবারে বেঁধে ফেলা কোনোটাই মনের পক্ষে শুভ নয়। বৃত্তি ও অহমের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারার উপরেই সুস্থ সবল মানসিকতা নির্ভর করে। কোনোটারই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মন তাতে ভেঙ্গে পড়ে বা মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে থাকে, তখন অনেক রকমের রোগও দেখা দিতে পারে।

মন সম্বন্ধে আলোচনার এক পর্যায়ে উল্লেখ করেছিলাম—বৃত্তির প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক কাঠামো কিছু গড়ে তুলতে না পারলে, বৃত্তিকে ব্যক্তির ও সমাজের কল্যাণে লাগাতে না পারলে সমস্যা জটিল হয়ে পড়ে। মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজেদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাকে সমাজ-গ্রাহ্য রূপ দেবার চেষ্টা করে চলেছে। নাচের মধ্যে যেমন নানা দেহভঙ্গীর মাধ্যমে তার নানা অতৃপ্ত বাসনার আংশিক পরিতৃপ্তি খোঁজে, তেমনই গান-বাজনার সুরের মধ্যেও নিজের বাসনার আবেগের প্রকাশ কিছু মেটে। ছবি আঁকা, কাব্য, গল্প, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমেও মনের নানা বৃত্তি প্রকাশের পথ করে নিচ্ছে। মানুষের সব সৃষ্টির মূলেই কোনো না কোনো বৃত্তিপ্রসূত বাসনা-কামনার পরিতৃপ্তির তাগিদ ও তারই প্রকাশ কাজ করে। বৃত্তির স্বাভাবিক শুভ প্রকাশপথ রুদ্ধ হয়ে গেলে তীব্র মানসিক বিকার দেখা দেয়। মনের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই বৃত্তির নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ দরকার। অহং যদি বৃত্তির পথে কেবল বাধা সৃষ্টিই করতে থাকে, যদি বৃত্তির প্রকাশ-পথের নির্দেশ দিতে না পারে তবে একসময় বৃত্তির প্রবল চাপে, অহং আপন সংহতি হারিয়ে ফেলে পর্যুদস্ত হয়ে যেতে পারে। মনের সে-অবস্থা অতি সংকটজনক এবং সুস্থ মানসিকতার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

যেসব পথে বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে তার সামাজিক কয়েকটি পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বহু উপায়ে বৃত্তির আংশিক ক্ষোভ স্বীকার করে নিয়ে অহং সুস্থতা ও শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। তার মধ্যে আর একটি প্রধান উপায় হল, স্বপ্ন। স্বপ্নের মাধ্যমে মনের বহু রকমের অবদমিত ইচ্ছা সুযোগ বুঝে স্পষ্ট রূপে অথবা নানা জটিল উপায়ে পূরণ হবার সুযোগ পায়। তার ফলে অদসের চাপ এবং নির্জ্ঞানের ইচ্ছাগুলির সঙ্গে অহমের বিরোধ খানিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। এই জন্যেই স্বপ্ন আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়।

পরের পর্যায়ে স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু বলবো।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

আজকের এই সুগম যাতায়াতের যুগে দেশভ্রমণ দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু ঘুরে বেড়ালেই না একটা দেশকে কতোটুকু চেনা যায়? চিনতে হলে শুধু ভূগোল নয় জানা দরকার তার ইতিহাস, এবং তার বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডের দিক, আর ভবিষ্যতের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কথা তাই চার দিক থেকে আলোচনা করা হবে—আমাদের এই দেশটিকে হয়তো তাহলে আরেকটু ভালো করে চিনতে পারব আমরা।

বাঁকুড়া—(২)

জেলার মানুষ

বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের জনবিরল জেলাগুলির একটি। ১৯৭১ সালের গণনা অনুসারে বাঁকুড়ার লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৭৩। আয়তনে বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ জেলা হলেও লোকসংখ্যার তালিকায় তার স্থান নবম।

জেলার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বরাবরই কিছু কম এবং লক্ষণীয় যে সে ব্যবধান ক্রমবর্ধিষ্ণু। ১৯৬১ সালে বাঁকুড়ায় প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ৯৮৯, আর ১৯৭১ সালে সে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৬১। এখন জেলার পুরুষের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং নারীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯৭ হাজার।

১৮৭২ থেকে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়ার লোক বৃদ্ধির গতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সম্প্রতিকালে ছাড়া এ জেলার লোকসংখ্যা কোন সময়েই দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়নি। এমনকি মাঝের এক দশকে (১৯১১-২১) বাঁকুড়া জেলার লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার থেকে কমে ১০ লক্ষ ১৯ হাজার হতে দেখা যায়। আরও এক দশক পরে, ১৯৩১ সালে বাঁকুড়ার যে লোকসংখ্যা হয় (১১ লক্ষ ১২ হাজার) সেও ছিল ১৯১১ সালের চেয়ে কম। ১৯৫১ সালে বাঁকুড়ার লোকসংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার। সত্তর বছরের ব্যবধানে (১৮৭২-১৯৫১) বাঁকুড়া জেলায় লোকবৃদ্ধি ঘটে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। অথচ ১৯৬১ থেকে '৭১ সালের মধ্যে বাঁকুড়ার লোক বেড়েছে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার। হঠাৎ এত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থনে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও মৃত্যুহার হ্রাস ছাড়া কোন কারণ দেখানো যায় না। দেশবিভাগের পর বাঁকুড়া জেলায় উদ্বাস্তুর আগমন খুবই কম হয়েছিল। '৬১ সালের হিসাবে এই জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের সংখ্যা দেখা যায় মাত্র ১৫ হাজার। তারচেয়ে অনেক বেশি লোক বাঁকুড়া ছেড়ে অন্যত্র রুজিরোজগারের সন্ধানে চলে গেছে। তবু বাঁকুড়ার পক্ষে আশার কথা যে, বিগত দুই দশকে লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় বাঁকুড়া এখনও জনবিরল।

দুর্ভিক্ষ খরা খাদ্যসংকট এমনকি ঝড় প্লাবন বাঁকুড়ার নিত্যসঙ্গী। দুর্ভিক্ষ ও প্লাবন একই সঙ্গে বাঁকুড়াকে আক্রমণ করেছে কোন কোন বছরে। এক বছর বর্ধমান জ্বর নামে এক মারাত্মক রোগ গলসি ও খণ্ডঘোষ দিয়ে বাঁকুড়ায় ঢুকে বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রায় অর্ধেক লোক শেষ করে দিয়ে যায়। বাঁকুড়ার লোকেদের বাইরে যাওয়ার প্রবণতাও জেলার লোকসংখ্যা সীমিত রাখতে সাহায্য করে। বাঁকুড়ার গরিব লোকেরা কাজের জন্য দলে দলে কলকাতায় আসে, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে চাষের কাজে যায়। সুদূর চা বাগানে যেতেও তাদের কোন পরোয়া নেই।

বাঁকুড়ার লোকসংখ্যার ৯১·১৬ শতাংশ হিন্দু, ৪·৪০ শতাংশ মুসলমান এবং হিন্দুধর্মের প্রভাবমুক্ত উপজাতীয় ৪·২০ শতাংশ। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতির সংখ্যা নগণ্য।

মুসলমানদের বেশি বাস বিষ্ণুপুর মহকুমায়, বর্ধমান জেলার সমীপবর্তী কতুলপুর ও ইন্দাস থানায়। প্রায় সব মুসলমানই হানিফি সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নি। মুসলমানদের কয়েকটি বিখ্যাত পিরের দরগা আছে, যেখানে হিন্দুরা পুজো দেয় বা মানত করে। দরগার সংখ্যা ইন্দাস থানাতেই সবচেয়ে বেশি। তাদের মধ্যে রোল-এর শাহমাদার, চাঁচংগার বন্দেগি শাহ মুস্তফা, হায়াৎনগরের সত্য পির, লখিপুরের শাহ ইসমাইল গজলস্কর প্রভৃতি দরগাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাহ ইসমাইল গজলস্কর পিরের দরগা কতুলপুর থানার পাথরচাটিতে ও গঙ্গাজলঘাটির পির পুষ্করিণী ফকিরবেড়াতেও আছে। বিষ্ণুপুর শহরে আছে শাহকুবান আলি পিরের দর্গা। রায়পুর থানার মিরন শাহর সমাধি মুশলমদের আর একটি পবিত্র স্থান।

জেলার খৃষ্টান মিশনারিরা একদা ধর্মপ্রচারে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। শিক্ষাবিস্তার, কুষ্ঠরোগীর সেবা প্রভৃতি জনসেবামূলক কাজেও তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র বাঁকুড়ায় খৃষ্টধর্মীর সংখ্যা নগণ্য, প্রতি হাজারে মাত্র একজন।

জৈনধর্মাবলম্বীর সংখ্যা আরও কম। কিন্তু সংখ্যায় সামান্য হলেও তারা উপেক্ষণীয় নয়। জেলার পাইকারি ব্যবসাগুলি প্রায় তাদের হাতের মুঠোয়। একদা সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল, এখানে ওখানে গ্রামে গঞ্জে অরণ্যের আড়ালে পরেশনাথের ভগ্ন মূর্তি আজও তার সাক্ষ্য বহন করে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর জেলার জনজীবনে জৈন ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় এবং আরও পরে গ্রামবধূরা পুজো করে সিঁদুর চন্দন লেপে পরিত্যক্ত পরেশনাথের মূর্তিগুলিকে বিষ্ণু অথবা শিবে রূপান্তরিত করে।

১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুসারে জেলার ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮২৫ জন, অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার ২৮·৪ শতাংশ তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আরও ২ লক্ষ

কালাচাঁদ মন্দির (বিষ্ণুপুর)

১২ হাজার ৮৮৯ জন, অর্থাৎ ১০·৪৫ শতাংশ তফশিলি উপজাতীয়। অর্থাৎ, জেলার মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা তফশিলি উপজাতীয়।

তফশিলি উপজাতীয়দের মধ্যে আবার সাঁওতালদের সংখ্যা মোট সংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ। সংখ্যানুপাতে তারপরে স্থান খেরা ও ভূমিজ। একদা যাযাবর খরিয়ারা সংখ্যায় বেশি নয় কিন্তু তাদের আছে নানা সমস্যা। উপজাতীয়দের মধ্যে সাঁওতালরাই সবচেয়ে সুসংহত, সমাজবদ্ধ এবং চাষবাস তাদের অনেকেরই জীবিকা।

তফশিলি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বাউরিরা সংখ্যায় সর্বাধিক, জেলার তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে তারাই ৩৯ শতাংশ। অন্যান্য তফশিলি সম্প্রদায় হল—বাগদি, ভুঁইয়া, ধোবা, ডোম, হাড়ি, জেলে, কৈবর্ত, লোহার, মুচি, নমশূদ্র, শুঁড়ি প্রভৃতি।

বাঁকুড়ার পশ্চিম দিক, অর্থাৎ সদর মহকুমা ছোটনাগপুরের সংলগ্ন অঞ্চ সাঁওতাল, বাগদি, বাউরি প্রভৃতি উপজাতীয় ও আধা উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির সেখানেই বেশি বসবাস। অপরদিকে 'বিষ্ণুপুর হল ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বাসভূমি

সাঁওতালদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি বাস বাঁকুড়া মহকুমায়। বিষ্ণুপুর মহকুমা যারা বাস করে তারাও বাস করে বাঁকুড়া কোল ঘেঁষে। বিষ্ণুপুর মহকুমার চারিত্র আলাদা। মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমানে সমীপবর্তী ঐ অঞ্চলের সঙ্গে পাথু কাঁকরে বাঁকুড়ার চেয়ে সন্নিকটবর্তী সমতল ও শ্যামল জেলাগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি। সেখানে চাষ প্রতি ইঞ্চি জমিতে, সুতরাং ভূমিহী আদিবাসীদের পুনর্বাসনের সুযোগ সেখানে নেই। আর অরণ্যবাসী সাঁওতালরা ব কেটে বসত গড়ে তুলতেই বেশি ভালবাসে সে কারণে 'গো ওয়েস্ট' ধ্বনিই বাঁকুড়াবাস সাঁওতালদের অধিক প্রিয়। জমির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ঘরে মন বসে, যাযাবরবৃত্তি লোপ পায়।

সাঁওতালদের ধর্মচিন্তায় হিন্দু দেব দেবীর প্রভাব সীমিত। তাদের নিজস্ব দেবদেবী আছে এবং পূজাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে তাদের ভিন্ন কল্পনা। দামোদর ন বাঁকুড়ার সাঁওতালদের কাছে বিশেষ পবি এই কখনো ভয়ংকর, কখনো শুষ্ক নদী মধ্যে তারা তাদের দেবতার বিভিন্ন দেখতে পায়। দামোদরে মৃতের অ বিসর্জন দিলে তবেই তাদের সংক সম্পূর্ণ হয়।

সাঁওতালদের মধ্যে দ্রুতগতিতে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে। চাষ আব ছাড়াও গরু পালন, হাঁস মুরগি পো প্রভৃতি কাজেও তারা আগ্রহী।

বাউরিদের বেশিভাগই কৃষক অথবা ক্ষে মজুর। বাউরিরা মল্লভূমিরা, শিখরিরা, প

যুগল শিব মন্দির

াটি, ধুলিয়া, মালুয়া প্রভৃতি নয়টি উপ-
াতিতে বিভক্ত। এই উপজাতিগুলি প্রায়
ত্যেই এক-একটি এলাকাকে কেন্দ্র করে ও
এলাকার নাম ধরে উদ্ভূত হয়েছে। বাউ-
রা বাঁকুড়ার প্রাচীনতম আদিবাসী বলে মনে
রা হয়। বক পাখিকে বাউরিরা তাদের সম্প্র-
য়ের প্রতীক জ্ঞান করে। কুকুর তাদের অতি
য় ও পবিত্র প্রাণী। একজন বাউরি কোন
বস্থায় কুকুরকে হত্যা করবে না বা মৃত
কুর স্পর্শ করবে না। অন্য যে কোন
সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে বাউরি সমাজে স্থান
পাওয়া খুবই সহজ কাজ। তার জন্য গোষ্ঠী
পঞ্চায়েৎকে ভোজের জন্য কিছু টাকা দিলেই
যথেষ্ট। বাউরি মেয়ের অন্য সম্প্র-
দায়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশায়
বাউরি সমাজের কোন আপত্তি নেই,
আর সেই প্রণয়িনীর আকর্ষণে অন্য
সম্প্রদায়ের যুবকটি যদি বাউরি সমাজে মিশে
যায় তাহলে ত কথাই নেই। বাউরি সমাজে
বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে কোন
জটিলতা নেই। সেটা সম্পূর্ণরূপে মনের মিল
অথবা মন ভাঙ্গাভাঙ্গির উপর নির্ভরশীল।

মদ্যপানে বাউরিদের অতি বেশি আসক্তি,
এবং যে খাওয়াখাওয়ি, ছোঁয়াছুঁই নিয়ে হিন্দু
সমাজের সব জটিলতা বাউরিরা তা থেকে
সম্পূর্ণ মুক্ত। সাপ, টিকটিকি, গোসাপ প্রভৃতি
সরীসৃপ বাউরিরা খায় না এবং এ-ব্যাপারে
তারা খুবই সচেতন। কিন্তু গরু, শূকর,
মুরগি বা অন্যান্য পশুমাংস ভক্ষণের ব্যাপারে
তাদের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। পশ্চিমবঙ্গের

রাধাগোবিন্দ মন্দির (বিষ্ণুপুর)

অন্যান্য জেলার বাউরিরা মৃতদেহ দাহ করলেও বাঁকুড়ার বাউরিদের মধ্যে এখনও মৃতদেহ সমাহিত করার রীতিই বেশি প্রচলিত।
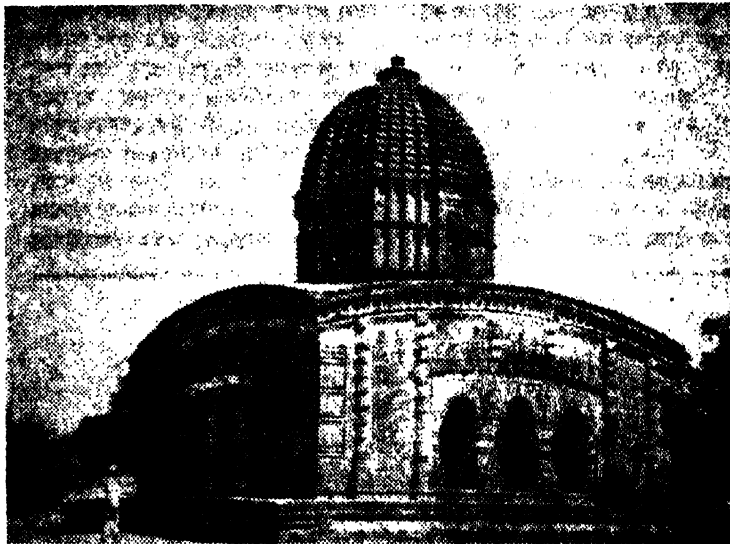
মনসা বাউরিদের সর্বাধিক প্রিয় দেবী। আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত বর্ষার চার মাসে মাসের পাঁচ ও বিশ তারিখে বাউরিদের ঘটা করে মনসা পূজা হয় এবং পূজোয় পাঁঠা ভেড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। ফুল ফল মিষ্টি চাল প্রভৃতিও উৎসর্গ করা হয়। ভাদু, মানসিং, বড়পাহাড়ি, ধর্মরাজ, কুদ্রাসিনি প্রভৃতিও বাউরিদের উপাস্য দেবদেবী। বাউরিদের কাছে যা বড়পাহাড়ি, সাঁওতালদের কাছে তাই মরাং বুরু। মানসিং-এর পূজোয় পাঁঠা ও বড়পাহাড়ির পূজোয় মুরগি উৎসর্গ করা হয়। বাউরিদের পূজোয় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নেই। তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেঘরিয়া বলে এক শ্রেণীর লোকেদের উপর পূজোর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। পূজোর আগের দিন থেকে পুরোহিতদের মাছ মাংস না খেয়ে সংযম পালন করতে হয়। কিন্তু পূজোয় যেসব মুরগি উৎসর্গ করা হয়, সেগুলি এবং যে শূকর বলি দেওয়া হয় তার ঠ্যাং কটি দক্ষিণা হিসাবে পুরোহিতের প্রাপ্য।

বাগদি বাঁকুড়ার অপর বৃহৎ কৃষিজীবি সম্প্রদায়। সাঁওতাল ও বাউরিদের তুলনায় বাগদিরা অনেক বেশি হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত। শিব, বিষ্ণু, ধর্মরাজ, দুর্গা, শক্তি প্রভৃতি সব হিন্দু দেবদেবীই বাগদিদের উপাস্য এবং তাদের পূজোর কার্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমাধা হয়। তবে সে ব্রাহ্মণ পতিত ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত হয়ে থাকেন। আর বাউরিদের মত বাগদিদেরও সর্বাধিক প্রিয় দেবী মনসা।

বাগদি জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনী হল যে তারা শিব ও পার্বতীর সন্তান এবং তাদের পূর্বপুরুষ আসে কোচবিহার থেকে। শিব ও পার্বতীর দুই পুত্রকন্যার [illegible] বিবাহের ফলে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের জন্ম হয় এবং বীর হাম্বিরের চার কন্যা—সান্তু, নেতু, মান্তু ও ক্ষেতু থেকে তেঁতুলিয়া, দুলিয়া, কুসমাতিয়া ও মাতিয়া—এই চার বাগদি উপজাতির উদ্ভব। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা বীর হাম্বিরকে কেন্দ্র করে বাগদিদের জন্মবৃত্তান্তের কাহিনী প্রচলিত হওয়ার কারণ বীর হাম্বির বাগদি রাজা নামেই জনপ্রিয় ছিলেন।

বাগদিদের কাজ হল পালকি বওয়া, মাছ ধরা, জাল বোনা, হোলি খেলার আবীর তৈরি করা, ইত্যাদি। ভাল রাজমিস্ত্রিও বাগদিদের মধ্যে পাওয়া যায়। বাগদিদের মধ্যে কিছু কিছু গোত্র বিচার আছে। যেমন তেঁতুলিয়ার সঙ্গে তেঁতুলিয়ার বিয়ে হয় না। বাগদিদের সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। তবে বেশি বয়সেও অনেক মেয়ের বিয়ে হয়। বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিবাহসম্পর্কিত যাবতীয় যোগ-বিয়োগের ব্যাপার বাগদি সমাজে অতি সাধারণ ঘটনা।

বাগদিদের বিবাহ অনুষ্ঠানে একটি আচার এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। বর নিয়ে বরযাত্রীরা এমন সময় বেরোয় যাতে সন্ধ্যার মধ্যে কনের বাড়িতে পৌঁছতে পারে। মাঝপথে বরের সঙ্গে এক মহুয়া গাছের বিয়ে হয়। বর মহুয়া গাছকে আলিঙ্গন করে তার গায়ে সিঁদুর লেপে দেয়, তারপর তার ডান হাতটি কিছুক্ষণের জন্য ঐ মহুয়া গাছের সঙ্গে একটি সরু সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। হাতটি খোলার পর ঐ সুতোতেই মহুয়া গাছের কটি পাতাসহ বরের হাতে রাখীবন্ধন করা হয়। তারপর বীরের বেশে বর সন্ধ্যাকালে সঙ্গীদের নিয়ে কনের বাড়ি পৌঁছয়। সেখানে কিছুক্ষণ নকল যুদ্ধের মহড়া চলার পর বরই বিজয়ী সাব্যস্ত হয় ও কিছু অনুষ্ঠানের পর তার হাতে কন্যা সমর্পণ করা হয়।

বাগদি সমাজ অতি দরিদ্র এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা আজ পর্যন্ত সামান্যই স্বীকৃতি লাভ করেছে। খুব কম বাগদিরই নিজস্ব জোত জমি আছে এবং অন্যের জমিতে সামান্য বিনিময়ের প্রত্যাশায় জন-খেটে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। পশু-মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে তারা সামান্যই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে। সীমাহীন দারিদ্র্য, কুসংস্কার আর এসবের সঙ্গে অত্যধিক মদ্য-পান বাগদি সমাজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। বাগদিদের মধ্যে তেঁতুলিয়াদের উপর হিন্দু সমাজ জীবনের প্রভাব কিছুটা বেশী এবং তাদের একটি বড় অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত।

(২)

বাঁকুড়ার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক পুরুষ বোধহয় রাজা চন্দ্রবর্মা। খৃষ্টীয় চতুর্থ

শতাব্দীর এই রাজার যে শিলালিপি শুশুনিয়া পাহাড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে জানা যায় যে, চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক এই রাজা পুষ্করণার অধীশ্বর ছিলেন। বর্তমানে শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে পঁচিশ মাইল দূরে পোখরনো নামে যে গ্রাম আছে, সম্ভবত সেই স্থানটিই চন্দ্রবর্মার কালে পুষ্করণা নামে পরিচিত ছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র শুশুনিয়া পাহাড়ে ছাড়া আর কোথাও প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান মেলে নি।

বাঁকুড়ার আর এক গৌরবময় অবদান বড়ু চন্ডীদস। বাঁকুড়া বা বীরভূমের কট্টর-পন্থীরা যাই বলুন, আজ মোটামুটিভাবে গোড় সুধীজন এটা মেনে নিয়েছেন যে, চন্ডীদাস নামে অন্তত তিনজন কবি মধ্য-যুগে বঙ্গ কাব্যসরস্বতীর সেবা করেছেন। তার মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস প্রাচীনতম এবং তিনি সম্ভবত ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। তাঁর সমকালে বাঁকুড়ার ছাতনা ছিল সামন্তভূম নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী, আর সেই রাজ্যের উপাস্য দেবী ছিলেন বাশুলি। ছাতনায় বাশুলি দেবীর মন্দিরের ধ্বংসা-বশেষ আজও ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের কাছে একটি বড় আকর্ষণ।

নিত্যনিরঞ্জনের দুই পুত্র দেবীদাস ও (বড়ু) চন্ডীদাস অন্য কোন স্থান থেকে ছাতনায় আসেন এবং দেবীদাস বাশুলি দেবীর পূজারী নিযুক্ত হন। বড়ু চন্ডীদাসও সর্বদা দেবী সান্নিধ্যে থাকতেন এবং দেবীর অনুপ্রেরণায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচনা করেন। সম্ভবত তিনি তাঁর কাব্যের নাম রাখেন 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' এবং পাণ্ডুলিপিটি বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে সংরক্ষিত থাকে। পরে সেটি হারিয়ে যায় এবং ১৯১৬ সালে বাঁকুড়ার বিশিষ্ট সাহিত্যসাধক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এক গোয়ালঘর থেকে কীট-দষ্ট অবস্থায় ঐ পাণ্ডুলিপিটি পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয় "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন"। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির পথে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কাব্যরসসুধা পান করে পরিতৃপ্ত হতেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বাঁকুড়া জেলার তৃতীয় ইতিহাস-পুরুষ হলেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বির। মল্লরাজ তাঁর পিতৃপুরুষদের মতো প্রথম জীবনে শিবের উপাসক ছিলেন, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিলে বিষ্ণুপুরের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে যায়। সমগ্র মল্লভূমি হয়ে ওঠে মন্দিরের দেশ, গৌড় স্থাপত্যের নন্দনভূমি।

বীর হাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। এক গাড়ি বোঝাই বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বৃন্দাবন থেকে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বঙ্গভূমিতে আসার পথে যখন বীর হাম্বিরের অরণ্যময় রাজ্য মল্লভূমিতে প্রবেশ করেন সেই সময় এক দল দস্যু ঐ গাড়ি বোঝাই বই লুঠ করে নিয়ে যায়। ঐ লুণ্ঠিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নাকি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের সদ্য শেষ করা পাণ্ডু-লিপিটিও ছিল। ঐ পাণ্ডুলিপি লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পরেই নাকি কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ দারুণ শোকে প্রাণত্যাগ করেন। লুণ্ঠিত গ্রন্থগুলির সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে শ্রীনিবাস আচার্য শেষ পর্যন্ত বীর হাম্বিরের রাজ্যসভায় উপস্থিত হন। তখনই শ্রীনিবাসের প্রভাবে শৈব রাজা হাম্বিরের ভাবান্তর ঘটে এবং তিনি ও তার পরে তাঁর প্রজাপুঞ্জ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ দাস (বলরাম দাস) রচিত 'প্রেমবিলাস' এবং নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখিত কাহিনী বর্ণিত আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে বীর হাম্বিরের রচনা দুটি বৈষ্ণব সঙ্গীতও লিপিবদ্ধ আছে। বীর হাম্বিরের প্রবর্তনায় মদনমোহন হন বিষ্ণুপুর রাজ্যের আরাধ্য দেবতা।

কথিত আছে যে, সিরাজুদ্দৌলা অপসৃত হওয়ার পর মিরজাফর যখন মুর্শিদাবাদের নবাব সেই সময় মিরজাফরের সহায়তায় দামোদর সিং নামে মল্লরাজ বংশের এক উচ্চাভিলাষী তৎকালীন রাজা চৈতন্য সিং-এর বিরুদ্ধে অতর্কিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে চৈতন্য সিং মদনমোহনের বিগ্রহটি সঙ্গে নিয়ে অন্তর্ধান করেন ও নানা পথ ঘুরে কলকাতায় পৌঁছান। বিষ্ণুপুর থেকে মদন-মোহনের ঐ অন্তর্ধান কাহিনীর ইঙ্গিত 'কারুর কিছু হারিয়েছে, মদনমোহন পালিয়েছে' ছড়ার মধ্যে মেলে। বাগবাজারের গোকুল মিত্র নাকি তিন লক্ষ টাকা দিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজার কাছ থেকে ঐ মদন-মোহনের বিগ্রহটি কিনে নেন। মদনমোহন বিষ্ণুপুর ত্যাগ করার পর থেকেই বিষ্ণু-পুরের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হয়।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশের পর উল্লেখ্য হল বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যরা, যাঁদের খ্যাতি একদা বিষ্ণুপুরের সীমান্ত পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যদুনাথ ভট্টাচার্য—যদু-ভট্টর নাম, সঙ্গীতের দুনিয়ায় যে নাম অবিস্মরণীয়। দীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজ-দরবারের সভাগায়ক ছিলেন যদু-ভট্ট। সঙ্গীতাচার্য [illegible]নারায়ণ গোস্বামী ছিলেন [illegible] রাজদরবারের সভাগায়ক। [illegible] রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সংগীত শিক্ষক [illegible] করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। [illegible]মোহন গোস্বামী ছিলেন পাথুরেঘাটার ঠাকুর বাড়ির সংগীত শিক্ষক। সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গায়কী প্রতিভা আধুনিক কালের সঙ্গীত রসিকদেরও অজানা নয়।

গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাংবাদিক ও লেখক রামা-নন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলার লোক। ১৯০১ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল একদা রবীন্দ্র কাব্যলহরীর ধারক। তাঁর নির্ভীক নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় আজও সংবাদপত্রের দুনিয়ায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

পরের সপ্তাহে
প্রত্নসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি

বিশিষ্ট সাহিত্যসাধক ও গবেষক আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির জন্ম হুগলী জেলাতে হলেও বাঁকুড়াই তাঁর শৈশবের লীলাক্ষেত্র ও বার্ধক্যের বারাণসী। বাঁকুড়ার স্কুলে তাঁর শিক্ষা এবং ১৯১৯ সালে কটকের র‍্যাভন শ কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (১৯৫৬) তিনি বাঁকুড়াতেই অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, কিন্তু বাংলা ভাষা সাহিত্য ও ব্যাকরণ নিয়েই তিনি জীবনভোর চর্চা ও অনু-শীলন করেন। যোগেশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে বাঁকুড়ার ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা অসম্ভব।

পরিশেষে, সমগ্র রচনাটি পুণ্যধারায় সিঞ্চিত করতে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করি পুণ্যময়ী জননী সারদা দেবীকে, এই জেলার মাটি স্পর্শ করে তিনি প্রথম জগতের আলো দেখেছিলেন। তাঁকে বধু-রূপে বরণ করে নিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণও এসেছিলেন এখানে, তাঁর পায়ের ছোঁয়া পেয়েছে বাঁকুড়ার লাল মাটি, এমন পুণ্য সঞ্চয়ের সৌভাগ্য আর কোন জেলার হয়েছে?

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনকাল কেমন চলছে,
তার হিসেব আমরা সকলেই রাখি।
কিন্তু হিসেবের আড়ালেও অন্য হিসেব
আছে। আর্থিক দুনিয়ার সেই আঁতের
খবর মেলে ধরা হবে এই
বিভাগে, যাতে আমরা আরো একটু
সচেতন হতে পারি।

রেল বাজেট

—দেখি দেখি, বলে ভদ্রলোক ফর্মগুলো একরকম ছিনিয়েই নিলেন। তারপর আমাদের সকলের বিস্ফারিত চক্ষুর সম্মুখেই একে একে ১৯৫০ কেটে লিখতে লাগলেন ১৯৫১। আমার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হওয়ার সংগে সংগে বোধহয় ওষ্ঠাধরও কম্পিত হতে শুরু করেছিল, হয়ত দু-একটা অব্যক্ত ধ্বনিও উচ্চারিত হয়েছিল কিন্তু যাকে বলে বাক্যস্ফূর্তি তা ঠিক ঘটেনি।

তারপরের ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, তবে আগের ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

এক সময় আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। স্পোর্টস বোর্ড অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করতে পারবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। অন্যতম নিয়মের দরুন ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করার আট বছর পরে সে আর কোন প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকারী থাকত না। যেমন, কেউ যদি ১৯৫০ সালে পাশ করত তা হলে সে (পাশের বছর ধরে) ১৯৫৭ সালে প্রতিযোগিতায় নামতে পারত। এই এবং অনুরূপ নিয়মের উদ্দেশ্য ছিল যাতে আসল ছাত্রদের বদলে নাম লেখানো ছাত্রেরা অর্থাৎ পেশাদারী খেলোয়াড়েরা কলেজীয় খেলাধুলোর ভিড় না জমায় তা দেখা। তবুও পেশাদারী খেলোয়াড়ই সংখ্যায় ছিল বেশী; বর্তমানে নিয়ম আরও কড়া হওয়া সত্ত্বেও এদের সংখ্যা বিশেষ কমেনি। এখনকার মত তখনও প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর এই নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপককে অধ্যক্ষের প্রতিস্বাক্ষরসহ সার্টিফিকেট দিতে হত যে ছাত্র বা ছাত্রীটি স্পোর্টস বোর্ড গৃহীত নিয়মাবলী অনুসারে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকারী। আর সার্টিফিকেটই চূড়ান্ত বলে গণ্য হত।

একবার কলকাতার এক বড় কলেজ থেকে পাওয়া সার্টিফিকেটগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেল যে অনেক ছাত্রেরই যোগ্যতা নেই, এদের সবাই-এর ক্ষেত্রে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর আট বছর পেরিয়ে গেছে। সেদিনই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ঐ কলেজ দলের খেলা। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাঠে আসতেই তাঁকে সার্টিফিকেটগুলো দেখানো হল। প্রথমে তিনি বুঝতেই চান না: কেন, '৫০ সালে পাশ করলে ত '৫৮ সাল অবধি এলিজিবিলিটি থাকবে, প্রতিবাদ করলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। . বুঝিয়ে দেওয়া হল: '৫০ সালে পাশ করলে '৫০ সালেই কলেজে ভর্তি হবার কথা। সুতরাং পাশের বছর ধরে '৫৭ সাল অবধি সে খেলতে পারবে। তর্কটি অনুধাবন করা মাত্র পূর্ব বর্ণিত 'দেখি, দেখি' বলে ফর্মগুলো একরকম ছিনিয়ে নিয়ে সংশোধনের কাজে লেগে গেলেন—অর্থাৎ পাশের বছর '৫০ সাল কেটে '৫১ করতে লাগলেন।

ঘটনাটা মনে পড়ল রেল বাজেটের আলোচনা প্রসংগে লোকাল বৈদ্যুতিক ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর কামরার ব্যবস্থা নিয়ে। সবাই জানেন যে এই রকম ট্রেনে দু' শ্রেণীর কামরার ব্যবস্থা আছে: প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী। উভয় শ্রেণীর মধ্যে তফাৎ শুধু নামের বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, দাঁড়ির—তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নির্দেশ করছে তিনটি দাঁড়ি এবং কোনটি প্রথম শ্রেণীর কামরা তা বুঝিয়ে দেয় একটি মাত্র দাঁড়ি। তবে অবশ্য রং আলাদা। প্রথম শ্রেণীর দাঁড়ির রং লাল, আর তৃতীয় শ্রেণীর হরিৎ। বোঝবার আর কোন উপায় নেই—উপবেশনের অনুপযোগী সেই কাষ্ঠাসন, অতীত গৌরবের সাক্ষ্য হিসেবে অপসারিত বৈদ্যুতিক পাখার ধ্বংসাবশেষ, অপসারিত মালপত্র রাখবার র‍্যাক। দণ্ডায়মান অবস্থার জন্য অপসারিত অবলম্বনের চিহ্ন এবং এক সময় যে কামরাটি রাত্রে আলোকিত হত তারও নিদর্শন। তার ওপর আছে ক্যাসলেশ ট্রাভেল—দণ্ড ভয়ে ভীত বা কিছুটা নৈতিক চেতনাসম্পন্ন যাত্রী ছাড়া সবাই উঠে পড়ে ঐ লাল রংয়ের এক দাঁড়ির কামরায়। খালি থাকবে বলে বেশী লোক ওঠার দরুন অনেক সময় দেখা যায় যে ঐ কামরাতেই ভিড় বেশী।

অবশ্য গোড়া থেকেই এরকম ছিল না। বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হবার সময় প্রথম শ্রেণী সত্যি প্রথম শ্রেণী ছিল—ছিল গদি মোড়া আসন, বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর ব্যবস্থা, মালপত্র রাখবার র‍্যাক, দাঁড়িয়ে থাকতে হলে টাল সামলাবার জন্যে অবলম্বন এবং কিছুটা চেকিং-এর ব্যবস্থা। একে একে চোর ও ভ্যান্ডালদের হাতে সবই গেল এবং চেকিং-এর ব্যবস্থাও হয়ে দাঁড়াল ছ-মাসে ন-মাসে। যখন শ্রেণীর কামরার আর কোন গুণগত পার্থক্য রইল না তখন রেল কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকটি কামরাকে জাতে তোলার ব্যবস্থা করলেন দুটো করে দাঁড়ি মুছে দিয়ে। এখনও অনেক ক্ষেত্রে সেই দাঁড়ি স্পষ্ট পড়া যায়।

সরকারী সংস্থা রেল-কর্তৃপক্ষ যদি এ কাজ করতে পারে তবে আমাদের সেই ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ১৯৫০ কেটে ১৯৫১ লিখে কি কিছু অন্যায় করেছিলেন? পাবলিক ফিনান্স বা সরকারী আয়ব্যয় শাস্ত্র সংক্রান্ত আর একটা প্রশ্নও মনে উঠল। যাত্রী ভাড়া হল 'প্রাইস' বা সেবার দাম। এখন সেবার যদি গুণগত অবনতি ঘটে তবে সরকারের পক্ষে কি দাম ঠিক রাখা বিধেয়? আর গুণগত অবনতির সংগে দাম যদি বাড়ানো হয় তবে কি বলা যায়?

বোঝার ওপর শাকের আঁটি :

হ্যাঁ, আগামী বছরের (১৯৭৩-৭৪) রেল বাজেটে আশংকামত যাত্রী ভাড়া ও মালপত্রের মাশুল দুই-ই বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবে রেলমন্ত্রীর ভাষায়ঃ নামমাত্র মারজিনাল। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার এত সামান্য যে কথামালার সেই পিঠে মাছি বসা ষাঁড়ের মত লোকে বুঝতেও পারবে না। রেলমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত করে বলা যায়ঃ 'বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মাশুল ও ভাড়ায় অতি পরিমিত পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই রদ-বদল জীবনযাত্রার ব্যয়কে বিশেষ প্রভাবান্বিত করবে না।' এই বিবৃতির আগের অংশ হল: 'বর্তমানে দেশ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের পক্ষে সাধারণ মানুষের ভার লাঘব করবার জন্যে সব কিছুই করা উচিত।'

কিন্তু রেল বাজেটে ভার লাঘবের প্রচেষ্টা না করে আরও কিছুটা ভার চাপাবারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য বলা হয়েছে, এই অতিরিক্ত ভার বোঝার ওপর শাকের আঁটি মাত্র। যে বোঝা ইতিমধ্যেই অসহনীয় হয়ে উঠেছে তার ওপর যদি একটা করে শাকের আঁটি চাপানো হতে থাকে তবে বহু পরিমাণ বহনক্ষমতা সম্পন্ন উষ্ট্রপৃষ্ঠ হলেও এক সময় না এক সময় তা ভেঙে পড়বেই। মালপত্রের মাশুলের ক্ষেত্রে উপমাটির একটু প্রকার ভেদ করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মাশুল বৃদ্ধি উটের পিঠে একজন করে নতুন যাত্রী চাপানোর মত, আর প্রত্যেক যাত্রী সঙ্গে করে একটা শাকের আঁটিও নিয়ে উঠছে। অর্থাৎ, মাল-মাশুল বৃদ্ধি শুধু সংশ্লিষ্ট পণ্যেরই দাম বাড়ায় না, ঐ পণ্য যে জিনিসের ইনপুট তারও দাম বাড়ায়; যেমন, কাগজের ওপর মাশুল বৃদ্ধির প্রাথমিক ফল হল কাগজের দাম বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ী ফল হল বই-এর দামবৃদ্ধি। সুতরাং রেলপথের মাশুল বৃদ্ধি যে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের ওপর গতিবর্ধক ভাগ কাজ করে তা স্মরণ রাখতে হবে।

রেল বাজেট ১৯৭৩-৭৪

১৯৭৩-৭৪ বা আগামী বছরের রেল বাজেট থেকে দেখা যায় যে সংশোধিত হিসেব অনুসারে বর্তমান বছরে (১৯৭২-৭৩) অনুমিত উদ্বৃত্ত ৩২ কোটি টাকার জায়গায় কমে দাঁড়াবে ১২ কোটি টাকায়। অতএব, উদ্বৃত্তের পরিবর্তে যে ঘাটতির আশংকা করা হয়েছিল তা অমূলক। তবে সংশোধিত হিসেব কতদূর নির্ভুল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মনে হয় এই সংশোধিত হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশে গোলযোগের দরুণ রেলপথের আয়-ব্যয়ের তারতম্য ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং ভাড়া ও মাশুল থেকে যে পরিমাণ আদায়ের আশা করা হয়েছে তা পূরিত না হওয়ারই সম্ভাবনা। অপরদিকে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সংশোধিত বাজেটে প্রদত্ত অঙ্কের চেয়ে বেশীই হতে পারে। অতএব, ঠিক ঘাটতি না হলেও শেষ পর্যন্ত হয়ত উদ্বৃত্তের পরিমাণ নামমাত্র দাঁড়াবে।

আগামী বছরের জন্যে অনুমান করা হয়েছে যে বর্তমান হারে ভাড়া ও মাশুল থেকে মোট প্রায় ৪৬ কোটি টাকা বেশী আয় হবে, অপরদিকে কিন্তু পরিচালনার ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে ৬১ কোটি টাকার মত। এবং মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১১ কোটি টাকার ওপর। সুতরাং রেলমন্ত্রীর মতে, ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তিনি যে বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন তার থেকে সর্বসাকুল্যে ৪৪ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত আয় হবে আশা করেছেন। ফলে ১৯ কোটি টাকার ঘাটতি মিটিয়ে থাকবে ২৫ কোটি টাকায় যা থেকে অন্য দেনা মেটানো হবে এবং আগামী বছরে উন্নয়নকার্যের জন্যে কিছু অর্থ সংস্থান করাও সম্ভব হবে।

প্রাথমিক বিচারে রেলমন্ত্রীর প্রত্যেক যুক্তিই অকাট্য মনে হবে। রেলপথ অন্যতম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত যথাসম্ভব বেশী মুনাফার প্রচেষ্টা করা। সুতরাং রেলপথও নিশ্চয় তাই করবে। এর স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হল পরিচালনার ব্যয় যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন ভাড়া ও মাশুল বাড়বেই, কারণ ক্ষতি স্বীকার করে ত আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হবে না। আরও বলা যায়, ১৯৪৯ সাল থেকেই কুঞ্জরু কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রেলপথের ওপর নিজস্ব উন্নয়ন-দায়িত্বও অনেকাংশে ন্যস্ত। এর দরুনও অর্থ প্রয়োজন। প্রয়োজনমত ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করা না হলে এই অর্থের সংস্থান করা হবে কোথা থেকে? অতএব, ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি অকাম্য হলেও অপরিহার্য।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক যুক্তিগুলো সত্যিই কতদূর গ্রাহ্য।

রেল বাজেট বিশ্লেষণ :

১৯২৪ সালের সেপারেশান কনভেনসান বা পৃথকীকরণ প্রথার প্রবর্তন থেকে রেল বাজেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে সন্দেহ নেই। আবার বিনিয়োজিত মূলধনের দরুন কেন্দ্রীয় বাজেটকে যে ডিভিডেন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাও অনেকাংশে বাণিজ্যিক নীতি দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু বক্তব্য হল যে রেলপথ অন্যতম পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস বা জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন কারণে এই ধরনের জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমেই করা হয়, এবং একচেটিয়া কারবারের এই রূপকে অভিহিত করা হয় সামাজিক একচেটিয়া কারবার — সোস্যাল মোনোপলি বলে। সামাজিক একচেটিয়া কারবারের মূল লক্ষ্য সমাজসেবা— সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা নয়। এই লক্ষ্য ব্যাহত হলেই সামাজিক একচেটিয়া কারবারকে বেসরকারী-উদ্যোগের ক্ষেত্র থেকে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আনা হয়। কিন্তু সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও যদি ঐ মূল লক্ষ্য ব্যাহত হতে থাকে তবে সামাজিক একচেটিয়া কারবারের চরিত্র বজায় থাকে কি? গত কয়েক বছরের মত এবারের রেল বাজেটের বিরুদ্ধেও এই আমাদের প্রধান বক্তব্য। দেখা যায়, ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ভাড়া ও মাশুল এবং রেলপথের আয় নিয়মিত বেড়ে চলছে, কিন্তু সেই তুলনায় এই সেবার গুণগত উন্নতি ঘটছে কি? এই গুণগত অবনতির আশঙ্কাই একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, কিন্তু সরকারী উদ্যোগাধীন সংস্থা যখন এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তখন তাকে কি বলা যায়।...

দ্বিতীয়ত, রেলমন্ত্রী সামাজিক ন্যায়-বিচারের কথা তুলেছেন। তাঁর প্রতিবেদন অনুসারে দূরগামী ট্রেনে উচ্চ শ্রেণীতে

এখন 'হরলিক্স' খেতে
ভুলবেন না।
বিশেষতঃ এখন আপনার
খাওয়া দরকার
দু'জনার জন্যে।
রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বাড়ে তোলে
স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।
গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের জন্যে দরকার বিশেষ ধরণের পুষ্টি। 'হরলিক্স' তাঁদের এই প্রয়োজনীয় পুষ্টি যুগিয়ে গর্ভকালকে ক'রে তোলে যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সুখকর। এটি মা ও গর্ভস্থ শিশুকে দেয় বাড়তি শক্তি ও শরীর গঠনকারী প্রোটীন। মনে রাখবেন, এটি খেতে বেশ হালকা আর হজমও হয় সহজে।
তাই তো সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা গর্ভাবস্থায় আর প্রসবের পর 'হরলিক্স' খেতে বলেন আর আজ প্রায় ১০০ বছর ধরে তাঁরা এই পরামর্শই দিয়ে আসছেন।
Horlicks
'হরলিক্স'—
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়
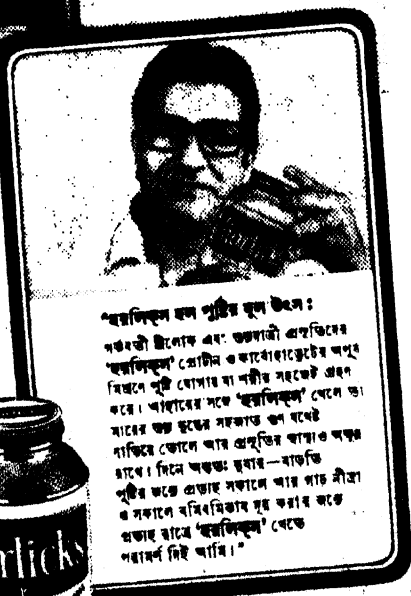
ভ্রমণকারী যাত্রীরা মোট যাত্রী সংখ্যার ১-৩ শতাংশ হলেও তাদের কাছ থেকেই আদায় হয় মোট ভাড়ার ১৩ শতাংশ। সমাজের এই 'বিত্তশালী শ্রেণীর' কাছ থেকে আরও বেশী ভাড়া আদায় করা 'ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত'। যুক্তিটি একচেটিয়া কারবারীর' ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণে'র যুক্তিও বটে। কিন্তু এর সঙ্গে সামান্য হলেও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির সামঞ্জস্য কোথায়? বিত্তশালী শ্রেণীর ওপর আরও ভার চাপানো হোক, কিন্তু বিত্তহীনদের ওপর আরও বোঝা কেন?

অবশ্য ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতে কোন ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়নি, কিন্তু এর কারণ ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ নয়, পথ পরিবহনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। গত চার শতকের গোড়ার দিক থেকে রেলপথ ও রাজপথ পরিবহনের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিশেষ তীব্র হয়ে ওঠে। কিভাবে এই অকাম্য প্রতিযোগিতার অবসান ঘটান যায় তাই নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা চলে। মিচেল-কার্কনেস কমিটি প্রভৃতি অভিমত প্রকাশ করে যে স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে পথ পরিবহনই সুবিধাজনক। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় রেলপথের পক্ষে পথ পরিবহনের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। এই অভিমতের অর্থ হল, স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে রেলপথের পথে যদি মোটরযানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয় তবে ভাড়া ও মাশুলের হার প্রতিযোগিতামূলক— কম্পিটিটিভ করতে হবে। এ পর্যন্ত কিন্তু তা করা হয়নি। ফলে রেলপথ পথ পরিবহনের সঙ্গে কিছুতেই পারছিল না। যেমন, হিন্দ মোটর ও উত্তরপাড়ার মধ্যে দূরত্ব এক কিলোমিটারেরও কম। রেলে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া হল ২০ পয়সা কিন্তু বাসে এর অর্ধেক। আবার ট্রেনের চেয়ে বাসের সংখ্যাও অনেক বেশী। এ অবস্থায় যে লোকে বাসে যাওয়া-আসাই বেশী পছন্দ করবে তার আর আশ্চর্য কি। মনে হয়, রাজপথ পরিবহনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রেলপথের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে অনুমান করেই ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ানো হয়নি। কারণ ১৫ কিলোমিটার দূরত্বের বাইরে যারা বাস করে তারা অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী, এরকম উদ্ভট যুক্তির কল্পনা করাও যায় না।

ঐ দূরত্বের বাইরে মাসিক টিকিটের ভাড়া বৃদ্ধি শহরাঞ্চল থেকে বিকর্ষণ করার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সমর্থনীয়। এটা সকলেরই জানা যে শহরাঞ্চলে অকাম্য ভিড় করবার ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে বা বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে—যেমন, শহরগুলিকে আকর্ষণীয় করা, উপনগরী গড়ে তোলা, ইত্যাদি। এখন এই উপনগরী প্রভৃতিতে যাতায়াতের ব্যয় যদি বেশী হয় তবে অন্যান্য বিকর্ষণ ব্যবস্থা সত্ত্বেও শহরাঞ্চলের ভিড় কমবে না। তাই মনে হয় ১৫ কিলোমিটারের জন্যও মাসিক [illegible] এমন কি কমাবার কথাও চিন্তা করা যেত।

মালপত্রের মাশুল:

মালপত্রের মাশুলের ক্ষেত্রেও হার মাত্র সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। কাগজে-কলমে হয়ত দাবি ঠিকই, কিন্তু বৃদ্ধি করা হয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে: জ্বালানী কাঠ, আখ, রাসায়নিক সার, সিমেন্ট, কাগজ, খইল, কয়লা ইত্যাদি। এইসব পণ্যের হার বৃদ্ধির যুক্তি দেখানো হয়েছে সেবার উৎপাদন ব্যয় বা কস্ট অফ সার্ভিস তত্ত্বের দিক থেকে। যুক্তিটি হয়ত ঠিকই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে সরকারী আয়ব্যয় নীতির সেই সুপ্রচলিত উক্তিটিও মনে না পড়ে পারে না: অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি স্বীকার করেও কোন কোন সেবা সরবরাহ করলে আখেরে সরকারের লাভই হয়। কয়লা, রাসায়নিক সার, খইল এবং কাগজের কথাই ধরা যাক। কয়লার ক্ষেত্রে মাশুল বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশের বেশী হবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কয়লাখনি শিল্পকে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেই কয়লার প্রতি এই পক্ষপাত বলে রেলমন্ত্রী জানান। সাধারণ অবস্থায় কয়লার ওপর আরও মাশুল চাপানো হত। কারণ কয়লা বহনে বছরে রেলপথের বার কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়। হয়ত কয়লার ক্ষেত্রে মাশুল বৃদ্ধির যুক্তি আছে কিন্তু এ বছরের ডামাডোলের বাজারে বৃদ্ধি স্থগিত রাখলেই বোধহয় ভাল হত। একে জাতীয়করণ, তার ওপর আবার মাশুল বৃদ্ধি কয়লার দামের ক্ষেত্রে যাকে বলা যায় একসিলারেশান প্রিন্সিপলের প্রবর্তন করবে বলেই আশঙ্কা করা যায়। এর ফলে গৃহস্থালির ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও কস্ট-পুস বা উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি যে আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাসায়নিক সার কৃষির অন্যতম আনুষঙ্গিক উপাদান, এর মাশুল বৃদ্ধির ফলে সবুজ-বিপ্লবের প্রসার ব্যাহত হবে। খইলের মাশুল বৃদ্ধি দুধের দাম বাড়াবে। এবং কাগজের মাশুল বৃদ্ধি বইপত্রের দাম বাড়িয়ে শেষপর্যন্ত জ্ঞানকর— এ ট্যাকস অন নলেজ হয়ে দাঁড়াবে। মনু বলেছেন, করবৃদ্ধির পরিমাণ অতি সামান্য হলে জোঁকের রক্তপানের মত, বাছুরের দুগ্ধপানের মত লোকে বুঝতে পারে না। কিন্তু আজকের অর্থনীতি চর্চার দিনেও কি মনুর উক্তি গ্রহণযোগ্য? রেলমন্ত্রী অন্তত তাই মনে করেছেন। তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি হল: মাশুলবৃদ্ধি দ্রব্যমূল্যে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাবে না বলে লোকে বুঝতেও পারবে না!

বাণিজ্যিক নীতির সাফল্যের সম্ভাবনা:

মোট কথা, আগামী বছরের রেল-বাজেট বিশ্লেষণ করলে সামাজিক নীতি ও বাণিজ্যিক নীতির মধ্যে বিশেষ সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায় এবং এই সংঘর্ষে বাণিজ্যিক নীতিই জয়ী হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু অনুসৃত বাণিজ্যিক নীতি কতটা কার্যকর হবে তা সন্দেহের বিষয়, কারণ ভাড়া ও মাশুলের হারকে বাড়ানোই হয়েছে—যুক্তিসিদ্ধ করা হয়নি। আর পরিচালনার দিক দিয়েও ব্যয়সংক্ষেপের ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

যে কোন একচেটিয়া কারবারের দাম-নির্ধারণের ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভর করে

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপর, এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার অন্যতম নির্ধারক পরিবর্ত-দ্রব্যের অস্তিত্ব। রেলপথের চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক নয়। কারণ শুধু যাত্রীবহন নয়, মালপত্র বহনের ক্ষেত্রেও মোটরযান অনেকাংশে রেলপথের পরিবর্ত। রেলপথ দ্বারা 'ডোর ডেলিভারি' বা দ্বারে দ্বারে মাল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা সত্ত্বেও পথ-পরিবহনের প্রতি লোকের আকর্ষণ বাড়ছে দেখা যায়। এ-অবস্থায় মাশুলবৃদ্ধি কতটা আয়বৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হবে, অনুমান করা কঠিন।

পরিচালনার দিক দিয়ে ব্যয়সংক্ষেপের ক্ষেত্রে অন্তত কয়েকটা অপচয়মূলক ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে পূর্ব রেলপথের সব স্টেশন-প্লাটফর্মে কাষ্ঠনির্মিত এবং হস্তচালিত ট্রেনের সময়-নির্দেশক বসানো হয়েছিল। কত খরচ পড়েছিল জানি না। কিন্তু ব্যবস্থাটি কোন কাজেই লাগেনি। কারণ যাঁদের হাত দিয়ে কাঁটা সরিয়ে সময় নির্দেশ করবার কথা, তাঁরা ঐ কর্তব্য পালনই করেননি। ফলে বৃষ্টি আর রোদে ঐ সময়-নির্দেশকগুলো অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। তখন তাদের ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিনা, তাও জানি না। তবে উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত এইরকম নয়া ব্যবস্থার প্রবর্তনে অপচয় না করাই উচিত বলে মনে করি। অনুরূপভাবে স্টেশনগুলোর নাম লেখার ব্যাপারে প্রথমে হিন্দিকে প্রাধান্য এবং পরে আন্দোলনের ফলে অনেক স্থানে স্থানীয় ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যে যে অপচয় তাও পরিহার করা যেত।

অধিকাংশ সময় যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নামেই এইরকম অপচয়মূলক ব্যয় করা হয়, কিন্তু যাত্রীকল্যাণের জন্যে সহজ ব্যবস্থা-গুলো অবলম্বিত হয় না। স্টেশনগুলোর সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধির সম্পর্ক বিশেষ নেই। অনেক স্টেশনের প্লাটফর্মই আচ্ছাদনহীন বলে রোদবৃষ্টির সমান প্রকোপ। অনেক সময় আবার প্ল্যাটফর্মগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক শ্রেণীর লোকের স্থায়ী আস্তানা, পানীয় জলের জন্যে নলকূপ অনেক স্থানেই অচল, কামরার অবস্থা আগেই বর্ণনা করেছি, লম্বা লাইনের জন্যে অনেক সময় টিকিট কাটাও বিড়ম্বনা, ট্রেনের সংখ্যাও বিশেষ বাড়েনি, কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানির হিড়িক—যার দরুন শতবার দুর্গানাম স্মরণ করে ট্রেনে চাপতে হয়। সাধারণে ওয়েলফেয়ার বা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলতে এগুলোকেই বোঝে—প্লাটফর্মে দু-একটা ফুলের কেয়ারি বা অনুরূপ দৃষ্টি আকর্ষক কিছু নয়।

আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা :

অপচয় পরিহার করা ছাড়া আয়বৃদ্ধিরও সুযোগ আছে। বিনা টিকিটে ভ্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করলেই আয় অনেক বেড়ে যাবে। এ ব্যাপারেও কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ অবলম্বিত ব্যবস্থাকে মোটেই ঐকান্তিক বলে বর্ণনা করা চলে না। দেখা যায়, বেশ কদিন স্পেশাল চেকিং ইত্যাদির পর সেই ঢিলেমি। ফলে আবার বিনা টিকিটে ভ্রমণের প্রবণতাবৃদ্ধি। আর নিয়মিত যে চেকিং ব্যবস্থা আছে তার দুর্নীতি সর্বজনবিদিত। মালবহনের ক্ষেত্রে রেলপথকে হারান মালের দরুন বছরে বিরাট খেসারত দিতে হয়। প্রায় এক দশক আগে আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটির সুপারিশে কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও দুর্নীতির পরিমাণ হ্রাস পায় নি। অবশ্য বলা যায়, দেশের সর্বত্র যখন দুর্নীতিতে ভরা তখন মাত্র রেলপথের ক্ষেত্রেই দুর্নীতিদমন ব্যবস্থা সার্থক হবে কি করে?

আরও একটা কথা। স্বল্প দূরত্বের জন্যে ট্রেনভাড়া এত বেশী যে দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে বিনা টিকিটে ভ্রমণের ঝোঁক আপনা থেকেই জন্মায়। সুতরাং মনে হয় স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে ভাড়া একটু কমালে আয় বেশীই হত। এই ধারণাও চাহিদার স্থিতি-স্থাপকতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

ভোক্তার উদ্বৃত্ত :

এই প্রসঙ্গে কনজিউমার্স সারপ্লাস বা ভোক্তার উদ্বৃত্তের ধারণাও মানা চলে। বর্তমানে গুরুত্ব অনেক কমে গেলেও অর্থনৈতিক তত্ত্বে ধারণাটি বোধহয় একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। বলা হয়, একচেটিয়া কারবারী যদি মোটেই ভোক্তার উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট না রাখে তখন ঐ কারবারীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে পারে। রেলপথ ভোক্তার উদ্বৃত্ত বোধহয় একেবারে শেষ করে ফেলেছে, কারণ যাত্রীরা যে ভাড়া দিতে পারে তাদের যে ভাড়া দিতে হয় তার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। অবশ্য রেলপথ পরিবহনকে অন্যতম নেসেসারী বা প্রয়োজনীয় সেবা ধরে বলা যায়, এক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ করা অসম্ভব। এইদিক দিয়ে কয়েকটি দ্রুতগামী দূরপাল্লার ট্রেনে প্রস্তাবিত বিশেষ কর বসালে ভোক্তার উদ্বৃত্ত একেবারে শেষ হয়ে যাবে কিনা, তার তত্ত্বগত বিচারও করা যায় না।

প্রতিশ্রুতি :

১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য রেল বাজেটে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করা হলেও বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ভাড়ার ওপর যে কর বসানো হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে, আর দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি—যথা, হাওড়া আমতা, হাওড়া-শিয়াখালা প্রভৃতি লাইট রেল আবার চালু করার ব্যবস্থার 'নীতিগত' স্বীকার, যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের 'নতুন' ব্যবস্থা, রেলকোচে আসনবৃদ্ধি, জয়ন্তী-জনতা এক্সপ্রেসের প্রবর্তন, ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আছে সতর্কবাণী : বেতন-কমিশনের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে রেলমন্ত্রী আবার সংসদের দ্বারস্থ হবেন বাজেট-বহির্ভূত অধিবেশনে নতুন প্রস্তাব—অর্থাৎ ভাড়া ও মাশুল-বৃদ্ধির আর এক দফা প্রস্তাব নিয়ে। সুতরাং বাজেট অধিবেশনের বাজেটই শেষ নয়—এর পরও আছে। বস্তুত, কয়েক বছর ধরে বাজেট অধিবেশনের গুরুত্ব আর বিশেষ নেই, সংসদের যে কোন অধিবেশনে কর শুল্ক ভাড়া মাশুল বাড়ানো হয়ে থাকে।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

।। তের ।।

কাল মাঝরাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। এই শীতের মধ্যে যে শিলাবৃষ্টি হতে পারে এবং হলে যে কতখানি ঠাণ্ডা পড়তে পারে তা ধারণায় বাইরে ছিল।

সকালে সূর্যের মুখ দেখা গেল না। ঘরের বাইরেও যাওয়ার উপায় ছিলো না। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসেই প্রায় এক কেটলি চা খেলাম। তাতেও গা-গরম হল বলে মনে হল না। বাড়িতে বসে থাকলে শীত আরো বেশী লাগে। তাই ভাল করে গরম জামাকাপড় জুতো-মোজা এবং টুপী চাপিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে একটা কনকনে হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে কান কেটে নিয়ে যাবে। নাক-মুখের যেটুকু অংশ আ-ঢাকা আছে সেটুকু অংশ মনে হচ্ছে অসাড়। এখন সাড়টা বেজেছে কিন্তু এখনও মুখ থেকে সমানে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কথা বললেই।

বাইরে বেরিয়েই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঝরা-পাতা ঝরা-ফুলে সমস্ত পথ প্রান্তর পাহাড়তলি ছেয়ে গেছে। ছেয়ে গেছে পাখির কোমল পালকে। গোলাপ-ফুলের সমস্ত সৌন্দর্য মাটিতে ঝরে গেছে —যা রয়েছে, তা কঙ্কালসার কাঁটা। সমস্ত প্রকৃতি এক বিষাদ-বিধুর বিধবার সাজে সেজেছে।

এই স্তব্ধ ঝড়ের পরের শীতার্ত শান্তির মধ্যেও তিতিরগুলোর গলা শোনা যাচ্ছে চতুর্দিক থেকে। তিতিরদের ভাষা জানা নেই আমার, জানলে, বলতে পারতাম, ওরা সুখের না দুঃখের কথা বলছে।

প্যাটের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন হঠাৎ প্যাটের গলা শুনলাম--ভীষণ উৎসাহী খুশীর গলা। প্যাট ক্র্যাচে ভর দিয়ে ওর সিঁড়ির উপর একটা উইণ্ড-চিটার গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বলল, গুড মর্নিং মিস্টার বোস। আমি মুখ তুলে বললাম, ভেরী গুড মর্নিং ইনডিড।

প্যাট সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে এল, বলল, কোথায় চললে?

এই একটু হাঁটতে বেরিয়েছি।

কোনো বিশেষ কোথাও?

আমি হেসে বললাম, না। ঘরে বসে থাকতে পারছিলাম না ঠাণ্ডায়। দিনের বেলায় ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালাতেও ইচ্ছা করে না।

প্যাট বলল, তোমার যদি বিশেষ কোথাও যাবার না থাকে তাহলে চল আমার সংগে মিস্টার বয়েলস্‌কে দেখে আসি।

মিস্টার বয়েলস্‌ কে? আমি বললাম।

মিঃ বয়েলস্‌ এক বৃদ্ধ। বড় একা ভদ্রলোক এবং বড় ভীষণ বৃদ্ধ। ভদ্রলোকের দুই মেয়ে। মেয়েদের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। তারপর জামাইরা সে সম্পত্তি বেচে দিয়ে একজন ক্যানাডায় এবং অন্যজন অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে। শুনেছিলাম মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী অ্যাফেকসনেট হয়—কিন্তু এই বিপত্নীক অসহায় বৃদ্ধকে দেখে সে কথা আমার মনে হয় না। টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা দূরের কথা, সবসময় মনে করে ক্রিসমাসে একটা কার্ডও পাঠায় না তারা বাবাকে। অথচ এই বাবাই তাদের কোলকাতার লা-মার্টিনিয়ারে, লরেটোয় পড়িয়েছিলেন, ভাল বিয়ে দিয়েছিলেন, সমস্ত সম্পত্তি মেয়েদের তাঁর জীবদ্দশাতেই সমানভাবে বন্দোবস্ত করে দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সৎকর্মের এই পরিণতি।

কি করে চলে মিস্টার বয়েলস্‌-এর?

চলেই না বলতে পারো—হাওয়া খেয়ে থাকেন।

ভাবলেও খারাপ লাগে।

এ জায়গাটা সেদিক দিয়ে অভিশপ্ত। এখানে অনেক অসহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দেখতে পাবে তাদের দেখে আমি যে বিয়ে-থা করিনি, তোমরা যাকে সংসার বলো, তা করিনি বলে, নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়।

সংসারের জন্যে অনেক কিছু করলে মানুষ স্বাভাবিক কারণে সংসারের কাছে কিছু আশাও করে। এবং মনে হয়, সে আশা করাটা অন্যায়ও নয়। শেষের দিনে যদি এই-ই ঘটে, যখন মানুষ একটু সঙ্গ চায়, একটু সহানুভূতি চায়, তখন যদি তার অশক্ত হাতে তাকে এমন করে বাঁচার জন্যে, নিছক বাঁচার জন্যেই লড়াই করতে হয় তাহলে এই সংসার-সংসার মিথ্যে পুতুল-খেলা খেলে লাভ কি বল?

কাল রাতে ঝড় উঠতেই আমার মিস্টার বয়েলস্‌-এর কথা মনে হল, মনে হল, হয়ত গিয়ে দেখব এই দারুণ ঠাণ্ডায় মরে কুঁকড়ে আছেন মিস্টার বয়েলস্‌। মিস্টার বয়েলসের তুলনায় আমি সুস্থ, যদিও আমার চলা-ফেরার জন্যে এই ক্র্যাচের উপর নির্ভর করতে হয়। আমার তবু একজোড়া ক্র্যাচ আছে, যাদের আমি এমনি ঠাণ্ডা দিনে বুকের কাছে চেপে ধরে আমার চতুর্দিকের স্বার্থ-পর পৃথিবীর মুখে লাথি মেরে মেরে ঘৃণার সঙ্গে আমার একটা পা মাটিতে ফেলে ফেলে আমি হাঁটতে পারি—কিন্তু এই বয়েলসদের তাও নেই। আঁকড়ে ধরার মত কিছুমাত্র আর এঁদের অবশিষ্ট নেই এ-পৃথিবীতে। অথচ এদের সব কিছুই থাকার কথা ছিল।

তোমার কি মনে হয় মিস্টার বোস, এ-সংসারে আমাদের আপনার বলতে কেউই নেই? কেউই থাকে না?

আমি জবাব দিলাম না। কোটের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি নিঃশব্দে ওর পাশে পাশে হাঁটছিলাম।

প্যাট ওর সাঁতরাগাছির ওলের মত মুখটি ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার শুধোল, কি? উত্তর দিচ্ছো না যে?

আমি বললাম, উত্তর একটা জিভের ডগায় আসছে, কিন্তু সেটা ঠিক উত্তর কিনা জানি না। কারণ আমার আমাদের জীবন সম্বন্ধে এখনও অনেক দেখার বাকি, জানার বাকি, নিজেকে জানারও অনেক বাকি। আমার কি মনে হয় জানো প্যাট, আমার, তোমার আমাদের সকলের জীবনই একটা চলমান অভিজ্ঞতা —এতে কোনো জানাই, কোনো মতই স্থিতিশীল নয়। আজ যা নির্ভুল বলে জানছি, কাল সেটাকেই চরম ভুল বলে মনে হয়। আজ যেটাকে চমকপ্রদ বুদ্ধিমত্তা বলে ভাবছি, কালই জানব যে সেটা একটা পরম নির্বুদ্ধিতা। তাই কোনো ব্যাপারে কিছু বলার আগে, বলতে ভয় হয় আজকাল।

প্যাট দাঁড়িয়ে পড়ে উইণ্ড-চিটারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালো, বলল, তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে।

আমি হাসলাম, বললাম উত্তর—মানে আমার উত্তর যদি শুনতেই চাও ত বলছি। আমার কি মনে হয় জানো প্যাট, আমাদের জীবনে, এই সংসারে আপনার বলতে, নিজের বলতে শুধু একটিই জিনিস আছে। একটি মাত্র জড়পদার্থ।

—তার মানে? প্যাট বলল।

বললাম, সে জিনিসটি হচ্ছে বাথরুমের আয়না এবং সে আয়নায় প্রতিফলিত তোমার সত্যিকারের ব্যথাতুর মুখ। এ সংসারে আপনার বলতে কেউই নেই প্যাট। কেউ কেউ আপনার হয়, আপনার হতে চায়, ক্ষণ-কালের জন্যে, কিছুদিনের জন্যে। তুমি যদি সমস্ত জীবনটাকে ছোট করে হাতের মধ্যে তুলে ধরে একটা বলের মত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখো ত' দেখবে যে, তুমি ছাড়া, তোমার আয়নার মুখ ছাড়া তোমার আপনার বলতে আর কেউই নেই; সত্যিই কেউ নেই।

—প্যাট বলল, বাথরুমের আয়না কেন? ঘরের আয়না না কেন?

—আমি হেসে বললাম, ঘরের আয়নার সামনে তোমার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ ও গোপনীয়তা ত নেই। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠবে, তোমার স্ত্রী (যদি থাকতেন) তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার মা-বাবা হঠাৎ পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকবেন। আর যেই তারা ঢুকবে, অমনি তোমার অভিনয় শুরু করতে হবে। তুমি আর তোমার নিজের মধ্যে থাকবে না।

—প্যাট বলল, এ আবার কি কথা? তুমি কি বলতে চাও, আমাদের জীবনের সমস্ত সম্পর্কই অভিনয়ের? সত্যি বলতে সেসব সম্পর্কে কি কিছুই নেই?

সত্যি সম্পর্ক আছে। আমি বললাম, যেমন আমার এবং তোমার সম্পর্ক। এ-সম্পর্কে কোনো প্রত্যাশা নেই কারো। আমি তোমার পাশের বাড়িতে অল্প ক'দিনের জন্যে এসেছি। আমাকে তোমার এবং তোমাকে আমার ভালোও লাগতে পারে, খারাপও লাগতে পারে, কিন্তু যেমনই লাগুক সেই সত্যি অনুভূতিটুকুকে গোপন করার কিছু নেই। তোমার যদি আমাকে খারাপ লাগে, আমার সঙ্গে তুমি কথা না বলতে চাও, সকালে বিকালে 'উইশ' না করতে চাও দেখা হলে, নাও করতে পারো। এবং তা না করলে আমারও কিছু লাভ বা ক্ষতি নেই। কিন্তু সাংসারিক সব সম্পর্ক অন্য রকম।

মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয়, জানো প্যাট,—এই সংসার একটা দারুণ অর্কেস্ট্রা। কোনো বুড়ো, মান্ধাতার আমলের প্রস্তরী-ভূত সামাজিক প্রতিভূ একজন কন্ডাক্টরের মতো তার হাতের ছড়ি ওঠায় নামায় এবং তুমি যে বাজনাই বাজাও না কেন, তোমাকে সকলের সঙ্গে একই সুরে, একই লয়ে একই মাত্রায় বাজাতে হবে। তোমার ভাল লাগুক, কি নাই-ই লাগুক। তোমার তার ছিঁড়ে গেলে তাড়াতাড়ি তার বেঁধে নিতে হবে, তার শ্লথ হয়ে এলে তবুও অন্যদের সঙ্গে একই সঙ্গে বাজাতে হবে, যদি তুমি থেমে যাও, না বাজাও, সমস্ত অর্কেস্ট্রা তখনই থেমে যাবে।

যদি থেমে যাও, সেই পলিতকেশ কন্ডাকটর এবং তোমার এতদিনের সঙ্গীরা, তোমার সঙ্গে এক সুরে এক লয়ে-বাজানো বহু-বছরের সঙ্গীরা সবাই বাজনা থামিয়ে তোমার দিকে তাকাবে। সবাই বলবে, ছিঃ ছিঃ। সবাই বলবে, কি খারাপ! সবাই বলবে, কি দুশ্চরিত্রতা; কি বিদ্রোহ।

তুমি অমনি আবার বাজনা তুলে নেবে, আবার বাজাবে সেই একই সুরে, একই লয়ে—তুমি আবার সেই মেষপালের একজন হয়ে যাবে—তোমার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, তোমার সুখ-দুঃখ, স্বকীয়তা, তোমার নিজের শরীর নিজের মন আবার নতুন করে বাঁধা দেবে সেই সামাজিক জনগণের স্টিম-রোলার রাজের কাছে। একজন সস্তা বেশ্যার মত তুমি নিজেকে বিক্রী করবে। তুমি নিরুপায়।

প্যাট বোধ হয় আমার কাছ থেকে ওর সহজ ও ক্যাজুয়াল প্রশ্নের এমন একটা ডিসটার্বিং উত্তর আশা করেনি। তাই ও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সো হোয়াট? তোমার গাটস থাকলে তুমি বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করতে ভয় কিসের?

আমি বললাম, ভয় তোমাদেরই। ভয় সকলকে। ভয় কাকে নয়? তোমরা, মানে সংসারের তোমরা। নিজেরা যা— চিরদিন করতে চেয়েছ, চিরদিন বাঁধন-ছিঁড়ে পালিয়ে এসে নিজের শরীর ও মনের নৌকোয় নিজের খুশীর পালে ইচ্ছার হাওয়া লাগিয়ে নিজের জীবনের দরিয়ায় ভেসে পড়তে চেয়েছ, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি যে-চড়ুই পাখি তোমাদের সেই তোমরাই একজন পুরুষ কি একজন নারী সেই সাহস দেখালেই ছিঃ ছিঃ করে উঠবে, তোমরাই তার ঘাড়ে পড়ে জংলী কুকুরের পালের মত তাকে ছিন্নভিন্ন পদদলিত রক্তাক্ত করবে। কি? করবে না? তুমি করো নি? আমি করিনি? এ পর্যন্ত কখনও কি করিনি আমরা? ভেবে দেখো ত?

তাই-ই বলছিলাম প্যাট, পারা যাবে না কেন? কিন্তু এমন যে করতে চায় সেই বিদ্রোহীর মেরুদণ্ডে যথেষ্ট জোর থাকা দরকার। তোমার আমার মত শ্যাওলা-ধরা মরচে-ধরা সামাজিক জয়গান-গাওয়া মেরুদণ্ডে সে জোর নেই।

প্যাট কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তার-পর বলল, ওয়েল, আই থিংক উ্য আর রাইট।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ভাংগা পলে-স্তারা-খসা ক্ষয়েরী হয়ে যাওয়া গায়ে ঘাস ও অশথের চারা-গজানো পুরোনো বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা একটু পায়ে চলা পথে ঢুকে পড়লাম।

পথটা উঁচু নীচু—বেশ যেন ঘন জংগলের মধ্যে দিয়ে। দুধারে ঘন শালের জংগল—সে জংগলে যেন গতরাতে হাতীর দল মত্ততা করে গেছে। কোথাও মাটি দেখা যায় না—ঝরা-পাতা, ফুল, আর কুটোয় ভরে আছে সমস্ত জমি। এক দারুণ গালিচা যেন কেউ অদৃশ্য হাতে পেতে দিয়েছে। সে গালিচার রঙের বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার নেই। সবুজ, লাল এবং হলুদের যে কত বিচিত্র নরম ও তীব্র রেশ হতে পারে তা এই গালিচা না দেখলে বোঝা যাবে না। পা ফেললে এখানে কোনো শব্দ হয় না। পাতার নরম আর্দ্র গালচেয় পা পড়ে। ভুর ভুর করে আতরের মত বনজগন্ধ ওঠে।

এখনও হু হু করে হাওয়া বইছে জো জংগল পাহাড়ের ছাড়াছাড়ি গন্ধ বয়ে—সে পরিষ্কার, নির্মল শীতল হাওয়া ফু ফুসের, হয়ত হৃদয়েরও যা কিছু কালি সব সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিচ্ছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই একটা বাঁকে মুখে দেখা হল লাবুর সঙ্গে।

এই শীতেও লাবুর খালি পা, গা একটা প্রাপ্ত-বয়স্কদের ছেঁড়া-কোট, পর সেই গুটিয়ে-পরা প্রাপ্তবয়স্ক লোকে ফুলপ্যান্ট। বুকের কাছে কি একটা জিনি দু'হাতে সযত্নে ধরে লাবু এদিকে আ ছিল, আমাদের ও দেখতে পায় নি।

কাছাকাছি আসতেই মুখ তুলে আ দের দেখেই লাবু যেন খুব ভয় পেল, ছেড়ে জংগলে দৌড়ে যেতে চাইল যেন পা।

আমি ডাকলাম, লাবু।

লাবু থমকে দাঁড়াল।

আমরা এগিয়ে যেতেই লাবু দু হা তুলে দেখাল ওর হাতের জিনিস।

একটি নেতিয়ে-পড়া হলদে-কালো মেশা হলুদ বসন্ত পাখি।

পাখিটাকে দেখে মনে হচ্ছে না পাখিটা বেঁচে আছে। ঘাড়টা একপা হেলানো—অমন সুন্দর রেশমী নরম চকচকে উজ্জ্বল পালকগুলো যা স্বভাবি অবস্থায় গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে গুলো ভিজে গিয়ে চতুর্দিকে এলোমে হয়ে গেছে। পালকের ফাঁকে ফাঁকে ওর ন কোমল বুক দেখা যাচ্ছে।

লাবু বলল, বেঁচে আছে। দেখ বুকটা এখনও গরম। ধরে দেখুন।

আমি বললাম, তুমি কি করবে এটা নিয়ে?

লাবুর কটা চোখ দুটো বড় বড় হ উঠল। ও বলল, বাঁচাবো—কাল ঝড়ে ঠাণ্ডায় ও মাটিতে পড়ে ছিল, ও ম যাচ্ছিল, আমি দেখতে পেয়ে কুড়ি আনলাম। আমি ওকে ঠিক বাঁচাব, দেখবে

বাঁচিয়ে কি করবে? পুষবে?

লাবু হাসল, ওর দাঁত-ভাঙ্গা র আন্তরিক হাসি, বলল, ধ্যাৎ। ওকে তাম বাঁচিয়ে লাভ কি? ওকে বাঁচিয়ে ওকে উড়িয়ে দেব। খাঁচার মধ্যে বাঁচা বাঁচা নাকি।

প্যাট আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ততক্ষণে। প্যাট কৌতূহলী চোখে দিকে তাকিয়ে বলল, বাঁচিয়ে তোমার লাভ

লাভ? বলে লাবু অনেকক্ষণ বোক মত তাকিয়ে থাকল প্যাটের মুখের দিকে ওর চোখ দেখে মনে হল ওর জীবনে লা ক্ষতির হিসেবটা এখনও ওর সমস্ত ক ও অকাজকে আমাদের যে-ভাবে করে সে-ভাবে আচ্ছন্ন করেনি।

একটু ভেবে বলল, কিসের লা এমনিই বাঁচাব। ভাল লাগে; তাই। বাঁচা কাউকে বাঁচাতে আমার দারুণ লাগে।

লাবু আর কথা না বলে আমাদের পাশ কাটিয়ে যেমন আপন-ভোলা হয়ে হাঁটছিল তেমন আপন-ভোলা হয়ে চলে গেল।

আরো কিছুদূরে যাবার পর একটা টিলার একেবারে নীচে একটা ছোট্ট কটেজ চোখে পড়ল। এককালে কটেজটার গায়ের রং বোধ হয় লাল ছিল এখন জলে, রোদে, ঝড়ে পাংশুবর্ণ প্যাতার মত হয়ে গেছে। ছাদটা টালির: এখানের সব বাড়িই যেমন। বাইরে একটা ছোট্ট বারান্দা, কাঠের রেলিং দেওয়া।

বাড়িটার সমস্ত পরিবেশে, বাড়িটার এ হিমেল রোদ-না-ওঠা সকালে অসহায় অসংলগ্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীর মধ্যে কেমন একটা গা-ছমছম অজ্ঞাত অস্বাভাবিক ভাব ছিল।

ঝরা-পাতা, ঝরা-ফুল মাড়িয়ে আমরা বারান্দায় উঠে দরজার কাছে দাঁড়ালাম।

বারান্দার এক কোণায় একটা ভাঙ্গা কাঠের ইজি-চেয়ার। বসতে বসতে যেন কাঠের চেহারটা ক্ষয়ে গেছে। এককালে সবুজ রং ছিল চেয়ারটার এখন শুধু একটু সবুজের অস্পষ্ট আভা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। এ বাড়ির কোথাও কোনো রং নেই—সমস্ত বাড়িটাই কেমন ম্যাটমেটে পাংশুটে।

প্যাট ওর তীক্ষ্ণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ডাকল, মিস্টার বয়েলস, মিস্টার বয়েলস, আর উ্য ইন?

ভিতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

প্যাট আবার ডাকল গলা চড়িয়ে, মিস্টার বয়েলস, আর উ্য ইন?

তবুও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মাথাহীন ঝোড়ো হাওয়াটা শালের বনে পাইনের ডালের খাঁজেখাঁজে হুইসেল বাজিয়ে পরের বাঁশীর মত বেজে যেতে লাগল।

প্যাট এবার দরজায় ধাক্কা দিল। পরক্ষণেই ধাক্কা দেওয়া বন্ধ করল, পাছে দরজাটা ভেঙ্গে যায়। পাতলা কাঠের টুকরো জোড়া দিয়ে দিয়ে দরজাটা বানানো—বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকছে সাঁ সাঁ করে। কাঠের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখার চেষ্টা করলাম, কিছুই দেখা গেল না।

প্যাট এবার প্রায় চীৎকার করে ডাকল, মিস্টার বয়েলস, মিস্টার বয়েলস, ফর গডস্ সেক, প্লিজ ওপেন।

এমন সময় পাহাড়ের গা বেয়ে একজন দেহাতী লোককে নেমে আসতে দেখা গেল। প্যাট ওকে দেখে হিন্দীতে জিগেস করল, সাব কা কা হো গ্যায়া?

লোকটি নিরুত্তাপ গলায় বলল, বুখার হ্যায়।

—কব্ সে?

—তিন চার রোজ সে।

লোকটা আর বাক্যালাপে উৎসাহ না দেখিয়ে বাড়ির পেছনে গিয়ে কি প্রক্রিয়ায় কোন দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জানি না। কিন্তু দেখলাম, ঢুকল। তারপর সেইই এসে ছিটকিনি খুলে সামনের দরজা খুলে ফেলল।

প্যাট আমাকে বলল, প্লিজ কাম ইন।

প্যাটের সঙ্গে সেই সায়ান্ধকার বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

বাইরে একটা বসবার ঘর। ভাঙা-চোরা কতগুলো ফার্নিচার—একটা রোঁয়া-ওঠা অপরিষ্কার পাটের কার্পেট। সেই ঘর পেরিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই আঁৎকে উঠলাম।

মানুষের মুখ যে এমন হয় আমার তা জানা ছিলো না; দেখা ছিলো না। ইংরিজী অভিধানে 'অ্যাগোসিয়েটেড' বলে একটা কথা পড়েছিলাম। অ্যাগোসিয়েটেডের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কি হওয়া উচিত তাও আমি জানি না। তবে, সেই প্রথম, কথাটার মানে বুঝতে পারলাম।

দেখলাম, একজন কংকালসার বৃদ্ধ। তাঁর অস্থিচর্মসার মুখ দেখা যাচ্ছে কম্বলের আড়ালে, এবং তিনি যে বালিশ মাথায় শুয়ে আছেন সেই বালিশেই আর একজন কোঁকড়া চুলের মাথাওয়ালা ছোটখাট মানুষ শুয়ে আছেন। প্রথমে পাশের মানুষটি কে বুঝতে পারিনি—কারণ প্যাট বলেছিল মিসেস বয়েলস অনেকদিন আগেই মারা গেছেন।

প্যাট কাছে গিয়ে ওর ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়ে ডাকল, মিস্টার বয়েলস, মিস্টার বয়েলস।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কোনো সাড়া দিলেন না। প্যাট কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখল, জ্বর আছে কি নেই।

তারপর এ ঘরের লাগোয়া খাবার ঘর ও রান্নাঘরে এসে প্যাট সেই লোকটিকে, যে আমাদের দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে, শুধোল, জ্বর ত এখন নেই? সাহেব শেষ কখন খেয়েছিলেন? কবে খেয়েছিলেন?

লোকটি বলল, পরশু দিন।

তার পরে? বলে প্যাট চোখ বড় বড় করে তাকাল ওর দিকে।

ও বলল, তার পরে আমি আসার সময় পাই নি। আমাকেও ত কাজ করে খেতে হয়। সেদিন রোজ আমি যেমন বাইরে থেকে পিছনের দরজা বন্ধ করে চলে যাই, তেমনই চলে গেছিলাম। কাল রাতের ঝড়-বৃষ্টির পর এই আবার আসছি খোঁজ নিতে।

প্যাট একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর খাওয়ার ঘর ও রান্নাঘর হাতড়ে হাতড়ে সমস্ত আনাচকানাচ খুঁজেও কিছু খওয়ার জিনিস খুঁজে পেল না। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, হ্যাভ উ্য ইউর পার্স অন উ্য?

আমি বললাম, আছে, পার্স সঙ্গে আছে। কেন, কি চাও?

প্যাট বলল, তোমার কাছ থেকে দশ টাকা ধার চাই। পরের মাসে মাইনে পেয়ে শোধ করে দেব।

আমি কথা না বলে দশ টাকার একটা নোট বের করে দিলাম। প্যাট টাকাটা নিয়ে, পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে একটা ফর্দ লিখতে বসালো। ফর্দ লেখা শেষ করে সেই লোকটিকে দিয়ে বলল শীগ্গির মুদির দোকান থেকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে। প্যাট আরও একটা ছোট চিঠি লিখে দিল ওর বাড়ির মালির কাছে—ওর ঘরে এক বোতল ব্র্যান্ডি আছে সেই ব্র্যান্ডিটা দিয়ে দিতে বলে।

লোকটি চলে গেল, প্যাট রান্নাঘরের কোণা থেকে একটু কুড়ুল তুলে নিয়ে আমাকে বলল, তুমি ওদের দেখো। যদি উঠে পড়ে এর মধ্যে তাহলে আমার নাম কোরো। আমি এক্ষুনি একটু কাঠ কেটে নিয়ে আসছি, যা হোক কিছু রান্না করে খাওয়াতে হবে এখুনি মিস্টার বয়েলসকে ও কুকুরটাকে। এই ঠাণ্ডায় না খেয়ে থাকায় ওদের দুজনেরই কোমার মত হয়েছে। খিদে এবং শীতে দুজনেই এমন কুঁকড়ে গেছে।

আমি বললাম, কুকুর মানে? কুকুর কোথায়?

প্যাট বলল মিস্টার বয়েলসের পাশে ওঁর কুকুর লুসি শুয়ে আছে। ককারস-স্প্যানিয়েল। অন্ধকারে তুমি কি মানুষ বলে ভুল করলে নাকি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি ত তখন থেকে তাই-ই ভাবছি — যে মিস্টার বয়েলসের পাশে শুয়ে থাকা সাদা চুলের বৃদ্ধাটি কে?

প্যাট একটু হাসল—শব্দ না করে, তারপর বলল, এক্ষুনি আসছি।

ঐ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে আমার অস্বস্তি লাগছিল। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্যাট কাছেই জঙ্গলের মধ্যে শুকনো ঝরে-পড়া কাঠ কাটছিল। ওর কুড়ুল চালানোর শব্দ হতেই আমার হুঁস হল যে আমার ওকে পাঠানো উচিত হয় নি। ও ওর এক-পা নিয়ে কাঠ কাটবে কি করে? কিন্তু আমি শব্দ পেলাম যে ও কাঠ কাটছে।

দৌড়ে গিয়ে ওর হাত থেকে কুড়ুলটা কেড়ে নিতেই ও হাসল, বলল, অল রাইট লেটস ডু ইট টুগেদার, বলে ও এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঠগুলোকে পা দিয়ে চেপে ধরতে লাগল, আমি কুড়ুল চালাতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বেশ অনেকক্ষণ জ্বালানোর মত কাঠ জড়ো হয়ে গেল।

সূর্য তখনো ওঠে নি। আকাশ ও চতুর্দিকের ভেজা সুগন্ধি শীতার্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে মনে হল সূর্য আর কোনদিনও উঠবে না। চারিদিকে শুকনো বলে কোন কিছু ছিলো না যে তাড়াতাড়ি আগুন করবার জন্যে আনা যায়।

আমি যখন প্রথম কিস্তির কাঠগুলো বয়ে আনছি, এবং প্যাট আমার পাশে পাশে হাঁটছে তখন হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একটা সাদা কিন্তু কালচে হয়ে-যাওয়া ককারস স্প্যানিয়েলকে আসতে দেখা গেল আমাদের দিকে।

কুকুরটা দৌড়ে আসছিল না, কেমন নেশাগ্রস্তের মত হেলতে দুলতে আসছিল।

কুকুরটা এগিয়ে কাছে এসেই প্যাটকে দেখে অনেক কষ্টে একবার লেজ নাড়াল, তারপর একবার ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু ডাকের বদলে যে শব্দটা তার মুখ থেকে বেরোল সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ডাকটা বড় করুণ। এক অবলা জীবের অশেষ সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে জান্তব যন্ত্রণায় সে এক করুণ অভিব্যক্তি।

প্যাট কুকুরটাকে অনেকক্ষণ আদর করল।

আমি, প্যাট ও কুকুরটা একসঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলাম। আমি যখন কাঠগুলো ঢেলে রাখছি, তখন মিস্টার বয়েলস যেন জীবনের অন্য পার থেকে ক্ষীণ দুর্বল, অথচ তীক্ষ্ণ গলায় শুধোলেন, হুজ দ্যাট।

প্যাট জোরে উত্তর দিল, ইটস মী, মিস্টার বয়েলস, ইটস মী, প্যাট প্লাসকিন।

পরক্ষণেই প্যাট বলল, আমরা একটু কাজ করছি, এক্ষুনি যাচ্ছি ও ঘরে। সঙ্গে আমার এক বন্ধু আছে, নিয়ে যাচ্ছি।

তারপর উনুনে কাঠ সাজাতে-সাজাতে প্যাট বলল, এখন ও ঘরে গেলেই কথা বলতে চাইবে বুড়ো। আগে আগুন করি, ঘরেও ফায়ার প্লেসে আগুন করব, কিছু খাবার বানাই, তারপর বুড়োকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর কথা বলব। এখন ওঁর কথা বলার মত অবস্থা নেই।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা কাজ করতে লাগলাম। কখন যে সেই লোকটি প্যাটের লিস্ট অনুযায়ী সব রসদ এনে হাজির করল, কখন যে প্যাট উনুন ধরিয়ে, লোকটিকে দিয়ে শোবার ঘরের ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে ডালের স্যুপ, টোস্ট ও আলু ও ডিম দিয়ে একটা কারি-মত বানিয়ে ফেলল বুঝতেই পারলাম না।

দ্রুতগতিতে কাজ করতে করতে প্যাট ফিসফিস করে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। বলছিল, দ্যাখো, এরকম করেও মানুষ বেঁচে থাকে, মানুষের প্রাণ বড় শক্ত। শুয়োরের প্রাণের চেয়েও শক্ত। মানুষের বাঁচার সাধ বড় লজ্জাকর।

আমি বললাম, তুমি কি এই অবস্থায় থাকলে বাঁচতে চাইতে না প্যাট।

প্যাট দেওয়ালে হেলান দিয়ে ওর ক্রাচ দুটো রেখে একটা টুলের ওপর বসে টেবিলের উপর ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটছিল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, খুব ভাল লোককেই প্রশ্নটা করেছ বোস— কারণ আমারও একদিন এ অবস্থা হতে বাধ্য। মিস্টার বয়েলসের তাও মেয়েরা ছিল, এক সময় স্ত্রীও ছিল, তবুও আজকে তার এই অবস্থা। কিন্তু আমার ত আজও কেউ নেই, সেদিন কেউ থাকবে না। তবে একটা কথা তোমাকে বলছি বোস, তুমি জেনে রেখো যে, আমি নিজেকে এই অবস্থায় পৌঁছতে দেব না। দেখবে, তার আগেই কোন-না-কোন উপায়ে আমি পালাব এই নিষ্ঠুর শীতার্ত জগৎ থেকে। তোমাকে বলেছি আমি আমার জীবনকে ভালোবাসি। ডেসপাইট অফ এভরী-থিং আমি আমার জীবনকে ভালবাসি। কিন্তু এরকম জীবনকে নয়। যতদিন এই গায়ের উইন্ড-চিটারের মত, আমার বুকের ভিতরের মনের উইন্ড-চিটারটা অক্ষত থাকবে, ততদিনই আমি বাঁচব। আমি কাউকে আমাকে করুণা করতে দেব না, কোন কিছুর জন্যেই নয়। আই উইল কিক, মাই ওওন বাকেট উইদাউট দা হেল্প অব আদারস। তুমি দেখো। যদি তখনও তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকে তবে তখন দেখো। জানো, আমি এরকম কুঁই কুঁই করে কখনো বাঁচবো না। মরবও না। আই ওয়ান্ট টু ডাই উইথ আ ব্যাং, নট উইথ আ হুইসপার। আমি সশব্দে সমস্ত অনুভূতির তীব্রতার মধ্যে বাঁচতে চাই, মরার সময়েও সচকিত শব্দতার মধ্যে মরতে চাই। বিলিভ মি, আমাকে বিশ্বাস করো বোস।

প্যাটের মুখে একটা আশ্চর্য হাসি দেখলাম। সে রকম হাসি টলস্টয়ের গল্পের নায়করাই হাসতে পারে বলেই জানতাম— আমার সামনে এক-পা ঝুলিয়ে বসে-থাকা এই সাদার মধ্যে কালো ছিট-ছিট মুখের প্যাটও যে অমন দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসতে পারে তা আমার জানা ছিলো না।

প্যাটকে এই গত এক ঘণ্টা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। ও ওর শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও কত কর্মক্ষম— কত চটপটে—কথায়-বার্তায় ওর নিজের প্রতি সম্মানজ্ঞান ওর জীবনের প্রতি ভালোবাসা দেখে মনে হচ্ছিল যে আমাদের ধরে-কাছের, চেনা-পরিচিত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই কত কি শেখার আছে। প্রত্যেককে খুঁতিয়ে দেখলে, খুঁটিয়ে দেখলে তাদের সম্মান-অসম্মানজ্ঞান, স্বার্থপরতা —স্বার্থহীনতা, সততা-অসততা কত প্রাঞ্জলভাবে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে করে আমার চোখের-দেখা, কাছের মানুষেদের সবাইকে ভালোবাসতে, বা শ্রদ্ধা করতে —কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগ মানুষই মনুষ্যত্বহীন মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শোভিত জীব বিশেষ। দুঃখ সেখানেই।

কলাই-করা চলটা-ওঠা ডিশে স্যুপ ঢেলে নিয়ে, অন্য ডিশে টোস্ট ও কারি সাজিয়ে, প্যাট যখন ক্যানেস্তারা টিন-কাটা-ট্রেতে করে সব ও ঘরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তখন মিস্টার বয়েলস আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

প্যাট ওঁকে জাগিয়ে, খাটের পাশে বসে সব আস্তে আস্তে খাওয়াল।

কুকুরটা খাটেই মিস্টার বয়েলসের পাশে গুটিসুটি হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। প্যাট ডাকল লুসি, লুসি। লুসি চোখ খুলে খাটের উপরই দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যাট লুসিকে নিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে ওকেও গরম ডালের সঙ্গে মিশিয়ে খাবার দিল। লুসি লম্বা জিভ বের করে চাক চাক শব্দ করে খেতে লাগল।

মিস্টার বয়েলসের খাওয়া শেষ হতে সময় লাগল। খাওয়া শেষ হলে প্যাট গরম জলের সঙ্গে অনেকখানি ব্র্যান্ডি মিশিয়ে ওঁকে খেতে দিল।

মিস্টার বয়েলস ব্র্যান্ডির গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললেন—এত বড় ভোজ আজ কিসের জন্যে? তারপরই দেওয়ালে টাঙানো রাঁচীর একটা জুতোর কোম্পানীর ক্যালেন্ডারের দিকে চেয়ে খুব উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন। বললেন, বাই জোভ, টুডে ইজ মাই বার্থডে!

আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম। প্যাট বলল, মেনি মেনি হ্যাপী রিটার্নস অব দি ডে।

কথাটা শুনেই বৃদ্ধ কেমন মুষড়ে গেলেন—বললেন, ফর গডস সেক, ডোণ্ট সে দ্যাট টু মী। ঐ সব আমার চেয়ে ভাগ্যবান লোকদের জন্যে। তার চেয়ে তোমরা উইশ কোরো আমাকে যেন পরের জন্মদিন আর দেখতে না হয়।

প্যাট একটা সিগারেট ধরিয়ে মিস্টার বয়েলসের দিকে এগিয়ে দিল। খেয়ে-দেয়ে সিগারেট মুখে দিয়ে মিস্টার বয়েলস বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। দাঁড়িয়ে উঠে দেওয়াল থেকে গ্রেট-কোটটা পেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেন। তারপরই বললেন, ওয়েল, হাউ অ্যাবাউট ইউ জেন্টেলমেন, ওন্ট ইউ হ্যাভ এনিথিং টু ড্রিঙ্ক?

প্যাট বলল, আমরা চা ভিজিয়েছি। চা খাব পুরো এক কেটলি। বলেন ত চায়ের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়েও নিতে পারি। আজকের মত ঠান্ডা দিন বোধহয় এ বছর আর পড়বে না।

মিস্টার বয়েলস, প্যাটের কথা শেষ হবার আগেই বললেন, আর সেই জন্যেই বোধহয় আমার জন্মদিন আজই পড়েছে।

মিস্টার বয়েলস যেন বরফে-ঢাকা পাহাড়-তলীর ওপার থেকে কথা বলছিলেন, তাঁর গলার ও গালের চামড়া শকুনির গলার মত ঝুলে ছিল। গালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে ছিল। কোটরগত দুটি এককালীন-তীক্ষ্ণ চোখ ঘোলা বক্তব্যহীন হয়ে উঠেছিল। উনি বলছিলেন, ওয়েল মিস্টার বোস, আপনার কথা আমি শুনেছি প্যাটের কাছে। আশা করি এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। জানেন, আমি এখনও প্যাটের জন্যে বেঁচে আছি। প্যাট যে আমার জন্যে কি করে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমার ছেলে নেই, কেউ নেই, আমার টাকা-পয়সাও নেই। প্যাটের আমার প্রতি ব্যবহারের বদলে আমি যে কিছু করব সে সামর্থ্য আমার নেই। তবে মানুষের হৃদয়ের দানের যদি কোন দাম থাকে, মানুষ যদি সে দামের বিন্দুমাত্র মর্যাদাও দেয়, তাহলে আমি বলব প্যাটকে আমি অনেক কিছু দিয়েছি। সব সময় দিই। বলেই বৃদ্ধ গলার ক্রশ মুঠো করে ধরে বললেন, মানুষের প্রার্থনার যদি কোন দাম থাকে তাহলে প্যাট একদিন খুব সুখী হবে, আপনি দেখবেন, মিস্টার বোস।

প্যাট হেসে বলল, আমি কি এখনও অসুখী? আমার সবসময়ই সুখ—আপনি আমার জন্যে প্রার্থনা করুন আর নাই করুন।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল, দেখি দশটা বেজে গেছে। আমার চোখের দিকে চেয়ে প্যাট বলল, ইয়েস, উই থিঙ্ক, উই শ্যাল মেক আ মুভ নাউ।

বৃদ্ধকে প্যাট কথাটা জোরে বলল, বৃদ্ধ বুঝতে পেরে বললেন, হ্যাঁ যেতে ত হবেই—তোমরা ত সারাদিন এই বুড়ো মানুষ এবং একটা বুড়ি কুকুরের কাছে বসে থাকবে না। বুঝলে তোমরা আমার ছেলের মত। আমার ছেলে থাকলেও ত তারা আমার জন্যে এত করত না।

আমি ওঠার সময় বললাম, আমি কি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি মিস্টার বয়েলস?

বৃদ্ধ চমকে উঠলেন, বললেন, ও থ্যাঙ্ক উ। থ্যাঙ্ক উ ভেরী মাচ। কিন্তু আমার জন্যে আর কি করবে বল? আমার জন্যে কিছু করার দিন শেষ হয়ে গেছে।' বাট, ওয়েল, ইয়েস, উ ক্যান ডু মী আ ফেভার?

আমি ও'র মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললাম, কি? সেটা কি?

বৃদ্ধের বিষাদময় লোলচর্ম মুখে এক দারুণ কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল, বৃদ্ধ বললেন, প্যাট যখন আমার কবর খুঁড়বে, তখন প্যাটকে একটু সাহায্য করো। মাই সোল উইল ফিল অনার্ড। আমার আত্মা আনন্দিত হবে।

আমি উত্তর দিলাম না কোনো। কিন্তু বৃদ্ধের মুখে সেই আশ্চর্য বরফ-গলা হাসিটি অনেকক্ষণ ঝুলে রইল, ও'র মুখের ঝুলে-থাকা চামড়ার মত।

আমরা বেরিয়ে এলাম।

আমাদের পিছনে পিছনে লুসী এল অনেকখানি ভেজা পথ মাড়িয়ে। খেয়ে-দেয়ে লুসীর গায়ে জোর হয়েছিল।

কিছুটা গিয়ে প্যাট ঘুরে দাঁড়ালো, বললো, গো ব্যাক ইউ বিচ।

প্যাটের মুখে কি কেন এক ঘৃণা ফুটে উঠল, অবাক ঘৃণা।

প্যাট বলল, গো ব্যাক লুসি, নাউ অফ ইউ গো।

লুসি কথা বলতে পারে না আমাদের ভাষায়, কিন্তু ওর এলোমেলো শনের নুড়ির মত চুলে-ভরা মুখের মধ্যে থেকে দুটি চোখ তুলে সে প্যাটের দিকে এক দারুণ কৃতজ্ঞতার চোখে চেয়ে রইল।

প্যাট বলল, আই উইল কিক ইউ গার্ল। ইউ বেটার গো নাউ।

প্যাটের চোখ মুখ এক হিংস্র ঘৃণায় ভরে গেল, কেন বুঝলাম না।

লুসি মুখ নামিয়ে পাতা-ঝরানো পথ বেয়ে ফিরে গেল।

প্যাট আমার পাশে পাশে হাঁটছিল।

আমি বললাম, তুমি মাঝে মাঝে বড় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠ। কেন? তোমাকে যত দেখছি, তত তোমাকে বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছে। তুমি এরকম কেন?

প্যাট হাসল, হেসে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমাকে বোঝার চেষ্টা কোরো না।

আমি বললাম, তুমি লুসির উপর এমন হঠাৎ চটে উঠলে কেন?

প্যাট ক্যাজুয়ালি বলল, আই কান্ট স্ট্যান্ড দা স্মেল অফ আ বিচ। বিশ্বাস করো, মেয়েদের আমি সহ্য করতে পারি না, সে মানুষই হোক, কি কুকুরই হোক।

আমি হাসলাম, বললাম, তোমার ঘর তাহলে পিন-আপ ছবিতে মুড়ে রেখেছ কেন?

প্যাট বলল, ওদের দূর থেকে ভালো লাগে, কোনো মেয়ে কাছে এলে আমার গা-বমি-বমি করে। আই হেট দেম ফ্রম দা কোর অফ মাই হার্ট।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী আজ ঢাকা। ত্রিশ লক্ষ বাঙালীর রক্তের বিনিময়ে এই দেশ তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সেখানে শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হল। এই দিনটি আরও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ১৯৫২ সালে প্রাক্-স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এই জাতীয় ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার মহাবিদ্রোহের বীজ সেই দিনই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল জাতির অন্তরে।

ঢাকার যুবজন ও সংগ্রামী ছাত্রছাত্রী সমাজ প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, অতঃপর সেই আন্দোলন আবার রুদ্ররূপে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়েছিল বীরদর্পে এবং তৎকালীন পাক সরকার প্রবর্তিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী। গুলী, লাঠিচার্জ ও ধরপাকড়ের নৃশংসতায় সারা ঢাকা শহর উদ্বেল হয়ে উঠেছিল—একজনের পর একজন রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়েছিল মাটির উপর। ঢাকা থেকেই সারা পূর্ব-বাংলার মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছিল দেশাত্মবোধের নতুন প্রেরণা।

অবশেষে এই ঢাকাতেই সমগ্র জাতির উপর পাকিস্তানের অমানুষিক অত্যাচারের শেষ ফল ফলেছে : নতজানু হয়ে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে তাদের। বন্দী হতে হয়েছে ন্যূনাধিক এক লক্ষ সৈন্যকে। অত্যাচারের পরিবর্তে অপমানের অপরিসীম দাহ চিরকাল সহ্য করতে হবে তাদের।

বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি-বিজড়িত ঢাকা এক অবিস্মরণীয় শহর। এককালে যখন দুই বাংলা এক ছিল, তখন 'ঢাকার ইতিহাস' লিখেছিলেন যতীন্দ্রমোহন রায়। 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' মত এই ঢাকার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও গ্রন্থকার ঐতিহাসিক বিবিধ তথ্য সংগ্রহে যেরূপ পরিশ্রম ও গবেষণা করে গেছেন তার তুলনা হয় না। দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে নানা উপকরণ ও প্রবাদ-কিংবদন্তী সংগ্রহের এই বিরাট গ্রন্থ আজ দুর্লভ হলেও, এর মূল্য উভয় বঙ্গের বিদ্বজ্জনের কাছে শাশ্বতকাল স্বীকৃত হবে।

এই ইতিহাসের কিয়দংশ বা সমালোচনা হিসাবে ১৩২১ সালের 'সাহিত্য সংহিত' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে 'নৌশিল্প' ও 'ধামরাইর মদনোৎসব' নামক পরিচ্ছেদ দুটি এ-স্থলে পুনশ্চ প্রকাশিত হল।

নৌ-শিল্প

ঢাকা জেলা নদীজালে সমাচ্ছন্ন ; এজন্যই এতদঞ্চলে নৌকার প্রয়োজন বেশী। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এতদ্দেশবাসিগণ নৌশিল্পে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বস্ত্রশিল্পের ন্যায় বঙ্গীয় নৌশিল্পও প্রতীচ্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

দীর্ঘ নৌকাও দশবিধ, :—দীর্ঘিকা, তরণি, লোলা, গত্বরা, গামিনী, তরি, জঙ্ঘালা, প্লাবিনী, ধারিণী ও বেগিনী। ইহার মধ্যে লোলা, প্লাবিনী ও গামিনী দুঃখপ্রদা। ১

মহাভারতে যন্ত্রচালনীয় নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ

ততঃ স প্রেষিত বিদ্বান বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়া মাস মনো মারুত গামিনীম্।।
সর্ববাত সহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিশ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্।।

আ ১।১৫০।৪৫

এই যন্ত্রচালনীয় নৌকা শব্দে কলের জাহাজই বোধ হয়। বর্তমান সময়ে জাহাজের যেসকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা পূর্বোক্ত যন্ত্রচালনীয় নৌকার সহিত তুল্য। এই নৌকা মনোমারুতগামিনী, যন্ত্রে চালিত ও ইহাতে নানা প্রকার পতাকা শোভিত হয়।

নৌকা প্রস্তুতের জন্য কিরূপ কাষ্ঠের প্রয়োজন তাহাও হিন্দুদিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত ছিল না। বৃক্ষায়ুর্বেদে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ কি প্রকার গুণবিশিষ্ট তাহার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা নৌকা প্রস্তুত করিলে উহা সুখপ্রদ হয় না বলিয়া কীর্তিত আছে।

লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্ম জাতি তৎ।।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্র জাতি তৎ।।
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্র জাতি তদুচ্যতে।।

*   *   *   *   *   *

ক্ষত্রিয় কাষ্ঠে-ঘটিতা ভোজে মতে সুখসম্পদং নৌকা।
অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈ র্বিদধতি জল দুষ্পদে নৌকাং।।
বিভিন্ন জাতিদ্বয় কাষ্ঠ জাতা ন শ্রেয়সে নাপি সুখায় নৌকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে চ বিভিদ্যতে বারিনী মজ্জতেচ।।
ন সিন্ধু গাদ্যার্হতি লৌহ বন্ধং তল্লোহ কান্তৈহ্রীয়তে হি লৌহম্।
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌকা গুণেন বন্ধং নিজগাদ ভোজঃ।।

'যুক্তি কল্পতরু' নামক একখানা প্রাচীন গ্রন্থে জলযান নির্মাণ কৌশলের বিস্তারিত আলোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্বকালে যানের কক্ষগুলি কনক, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয়ের ও উহাদের মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। চতুঃশৃঙ্গ যান সিতবর্ণে, ত্রিশৃঙ্গ যান রক্তবর্ণে, দ্বিশৃঙ্গ যান পীতবর্ণে এবং একশৃঙ্গ যান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার রীতি ছিল। যানের মুখগুলি কেশরী, মহিষ, নাগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক বা মনুষ্যের অনুকরণে নির্মিত হইত। নির্গৃহ ও সগৃহ ভেদে নৌকা দ্বিবিধ। সগৃহ নৌকা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। যে জলযানে খুব বৃহৎ মন্দির থাকিত তাহাকে 'সর্ব্বমন্দিরা' বলা হইত। ইহা রাজধন, অশ্ব ও রমণী বহনে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর যানের নাম ছিল 'মধ্যমন্দিরা'। ইহার মন্দির মধ্যভাগে থাকিত বলিয়া ইহা মধ্যমন্দিরা নামে খ্যাত ছিল। ইহা বর্ষাকালে রাজাদিগের বিলাস যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। যে যানের মন্দির অগ্রভাগের দিকে থাকিত তাহা 'অগ্রমন্দিরা' নামে প্রচলিত ছিল। ইহা চিরপ্রবাস যাত্রার এবং রণে ব্যবহৃত হইত। মন্দিরগুলি কাষ্ঠ অথবা ধাতুর দ্বারা নির্মিত হইত।

নৌকা দ্বিবিধ। সামান্য এবং দীর্ঘ।

সামান্য নৌকা দশবিধ :—ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা। সার্দ্ধ এক হস্ত বৃদ্ধি হইলে ভীমা প্রভৃতি নৌকা হইবে। ইহার মধ্যে ভীমা, অভয়া ও গর্ভরা নৌকা শুভজনক নহে।

কথিত আছে মহারাজ মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পূর্বাঞ্চলের নিমিত্ত নৌসেনা বিভাগের সৃষ্টি হয়। নদীবহুল দেশ বলিয়া এতদ্দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই নৌবিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। পালরাজগণও নৌবিভাগের বিশেষ আদর করিতেন। পালরাজগণের তাম্রশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নৌবিভাগের অধ্যক্ষ 'তারিক' নামে অভিহিত হইতেন।

প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্রপথে বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকঙ্কন, কেতক দাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ বাঙ্গাল মাঝিদিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন।

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাণিজ্য ব্যপদেশে দক্ষিণ পাটনে গমনোদ্যত চাঁদসদাগর বন্ধকী আনিয়া

১। শিল্পকোষ নৌকাশব্দ।

বিবিধ ডিঙ্গা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ ডিঙ্গাগুলি বিবিধ পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তিনি দক্ষিণ পাটনা যাত্রা করিয়াছিলেন। কোন কোন নৌকা বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ, কোনটিতে বা হাটবাজার বসিত। তৎকালে 'চন্দনকাষ্ঠে গুড়া আর ডালি' প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

বঙ্গে বার ভুঞার আধিপত্যকালে খিজিরপুর, বন্দর, শ্রীপুর ও ধাপা প্রধান নাবিস্থান ছিল। কার্ভেলোর রণতরী সমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া গেলে, তিনি আপনার নৌশ্রেণী গঠনের জন্য শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত নিবারণের জন্য মোগল সুবাদারগণ নৌবলের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। নবাব মীর জুমলার আসাম অভিযান সময়ে এবং সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম অধিকারকালে ঢাকার নৌবলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

টেভারনিয়ার যে সময়ে ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে এখানে বহুসংখ্যক সূত্রধর নবাব সায়েস্তা খাঁর আদেশ মত নৌকা প্রস্তুত হইবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি এখানে সূত্রধরের সংখ্যাধিক্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ২

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্তও যে এই শিল্প ঢাকা হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছিল না, তাহা আমরা বিশপ হিবারের গ্রন্থ হইতেও অবগত হইতে পারি। ৩

ঐতিহাসিক সাহাবুদ্দিন, তালিশ মীরজুমলা ও সায়েস্তা খাঁর সময়ের নৌবলের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তৎপাঠে কোষা, জলবা, খাব, পারেন্দা, বজরা, পাতেলা, সলব, পালেল, বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহালকড়ি, পালওয়ার, ডুঙ্গা, খালু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের নৌকার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়েও (অর্থাৎ ১৩২১ সালেও) ঢাকা জেলায় কোষা, বজরা, ভাওয়ালী, ছান্দী, ছিপ, ডিঙ্গি, পলয়ার, পান্সী, কুমারিকা নৌকা, খাসী নৌকা, জেলেডিঙ্গি গহেনার নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মীরের বাগের মাঝিগণ পলওয়ার ও লালডিঙ্গির পরিচালনার জন্য বিখ্যাত। নৌকা পরিচালনায় জেলে মাঝিগণ সিদ্ধহস্ত। ভীষণ তরঙ্গসংকুল পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যেও ইহারা সুকৌশলে অবলীলাক্রমে নৌকা চালাইয়া থাকে।

শিকারিগণ পূর্ব্বে ছিপ নৌকায় মাঝিগিরি করিত।

ধামরাইয়ের মদনোৎসব

ধামরাই গ্রামে তেরাস্তার মধ্যে 'কামদেবস্থলীতে কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া কামদেবে অর্চনা করিবার প্রথা প্রবর্তিত আছে। কামদেবের স্থলী কোথায়ও পাকা বাঁধান আছে, কোথায়ও বা মাটি দিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী ও চতুর্দশীতে কামদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই চতুর্দশী 'মদন চতুর্দশী' নামে খ্যাত।৪ কামদেবের পূজার ধ্যান :—

'চাপেষুধৃক কামদেবোরূপবান্ বিশ্বমোহনঃ।'

কামদেব পূজার সময় ঢাক বাজাইয়া বহু লোকে সমস্বরে তান লয় সহযোগে যে ছড়ায় আবৃত্তি করে, তাহা অবিকল এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

এই থলীতে আয় রে কামা এই থলিতে আয়।
ধবল পাঠা দিমু তোরে এই থলীতে আয়।।
লোচা বাচা দিমু তোরে এই থলীতে আয়।
ভাঙ্গা ভুজমা দিমু তোরে এই থলীতে আয়।।
পূবে বন্দিয়া গামু উদয় হয় ভানু।
যাহার ঘরেরে জন্মেছে রাম কানু।।
পশ্চিমে বন্দিয়া গামু ক্ষীর নদী সাগর।
যার জাল ভাইসা ফিরে সাহেব সদাগর।।
উত্তরে বন্দিয়া গামু কৈলাস পর্ব্বত।
শিব আর পার্ব্বতী যথা থাকেন সতত।।
আরে হাত মেলারে শিবা যোগী, হাত যায় আকাশ।
পা মেলারে শিবা যোগী, পা যায় পাতাল।।
সোনার খাটে বৈসেন শিব রূপার খাটে পাও।
চতুর্দ্দিকে পরে শিবের শ্বেত চোয়ারের বাও।।
দক্ষিণে বন্দিয়া গামু ঠাকুর জগন্নাথ।
যাঁহার প্রতাপেরে বাজারে বিকায় ভাত।।
শূদ্রে রান্ধিয়া ভাত থোয় নিয়া বামন বাড়ী।
লুইটা পুইটা খায় প্রসাদ বলে হরি হরি।।
হুগলী বন্দিয়া গামু গলি গলি কোঠা।
বৈষ্ণবী বৈরাগী যথা পরে তিলক ফোঁটা।।
ঢাকার সহর বন্দিয়া গামু পাচপীরের মোকাম।
সাহেব সুবায় যথা খেলায় চোকাম।।
বংশাই বন্দিয়া গামু যার খাইরে জল।
কায়েত কুঠী বন্দিয়া গামু খার কলমের তল।।
ধামরাই বন্দিয়া গামু মাধবের চরণ।
যথায় হইয়াছে রে ভাই পর্ব্বের জনম।।
আগন মাসে ভাঙ্গের জন্ম সকসার ক্ষেতে।
হাতে বিষতে ভাংগ ফুল ধইয়াছে মাথে।।
ভাংগ বানাইয়ারে ভাই ভাংগে দিল চিনি।
ভাংগ আনিয়া দিল রসের বিনোদিনী।।
ভাঙ্গ বানাইয়া ভাঙ্গে দিল দই।
ভাঙ্গ আনিয়া দে লো গোয়ালিনী সই।।
হাইলা ভাইরে খাইয়া ভাংগ পাকে পাকে মই।
জাইলা ভাইরে খাইয়া ভাংগ ডুবাইয়া ধরে কই।।
কুমার ভাইরে খাইয়া ভাংগ করে ভুর ভুর।
কামার ভাইরে খাইয়া ভাংগ গোঁসাইয়া মারে বারি।।
কায়েত ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ আখর কৈল চুরি।
হিসাবের কালে খায় লাথি আর গুড়ি।।
তাঁতি ভাইরে খাইয়া ভাংগ মাকু মারে ঝোকে।
মর্কা আন মর্কা আন বলে নিকারিরে ডাকে।।
পোলাপানে খাইয়া ভাঙ্গ চোক মিটকাইয়া চায়।
মায় বলে অবাগীর পোরে যমে নিয়ে যায়।।
আগে যদি জানিতাম রে ভাংগের এমন গুণ।
ডোল ডালি ভরিয়া থুইতাম ঘরের চারি কোণ।।
সুধা ভাইজা খোলারে সুধা ভাইজা খোলা।
নাচিয়ে তোলায়ে ভাঙ্গ বেজাব তোলা তোলা।।
ইতি কামদেব প্রীতে হরি হরি বল।'*

* উদ্ধৃত অংশটির শব্দবিন্যাস ও বানান সর্বত্র অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

2. There is but one coutinued row of house speroted one from the other inhabited for the most part by carpenters,
That build galleys and other small boats Travernier's Travels. Book 1, Page 103 (Bangabashi edition)

3. Boating is popular, and they make boats very well here. Bishop Heber's Narrative of a Journey Vol. 1, Page 186.

৪। চৈত্রে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং মদনস্য মহোৎসবঃ। জগদ্বিস্তোত্তিভিস্তত্র গীতবাদ্যাদিভির্ন্নাম। ভগবাংস্তুষ্যতে কামঃ পুত্র পৌত্র সমৃদ্ধি দঃ।। ইতি তিথিতত্ত্বম্।
চৈত্র শুক্লত্রয়োদশ্যাং মদনং মদনাত্মকম্। কৃত্বা সংপূজ্য বিধিবদ্বীজয়েদ্ব্যজনেন তু।। ইতি ভবিষ্য।

হেব্বারের একক প্রদর্শনী

কাট্টিনগেরী কৃষ্ণ হেববার বা সংক্ষেপে কে কে হেব্বার ভারতবর্ষের চিত্রকলাশিল্প জগতের একটি বহুখ্যাত নাম। ১৯১২ সালে মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৩৮ সালে বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অফ আর্ট থেকে চিত্রকলায় স্নাতক হন। পঞ্চম বা চল্লিশের দশকের আরম্ভেই চিত্রকর হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। দেশে-বিদেশে তিনি বহু প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বহুতর একক প্রদর্শনী করেছেন।

এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক বা বিশের দশকেই গগনেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে আধুনিক শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিশিল্পীকে যদি তার নিজস্বতা প্রকাশ করতে হয় তবে ভারতের কোন ঐতিহাসিক যুগে অনুসৃত কোন নাগর শিল্পীশৈলী অথবা লৌকিক গ্রামীণ শিল্পরীতির ভাষা, শৈলী, রীতিই যথেষ্ট নয়। কারণ ভারতবর্ষের শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিক পরিমণ্ডলে তখন বিশ্বভাবনা স্থান পেয়ে গেছে, যদিও সামাজিক পরিমন্ডল পৃথক। চতুর্থ দশকে অর্থাৎ তিরিশের যুগে গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ শিল্পভাবনার শরিক হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বৈজ। এঁরা যেহেতু সবাই তাঁদের সামাজিক পরিমন্ডল সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সেহেতু মানসপরিমন্ডলের বিশ্বভাবনা তাঁদের শিল্পকে উৎকেন্দ্রিকতার হাত থেকে রক্ষা করল। তাঁরা ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পশৈলীর সেতুবন্ধের চেষ্টা করলেন। তাঁরা আধুনিক ইউরোপীয় পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে ততটুকুই গ্রহণ করলেন যতটুকু দিয়ে আধুনিক ভারতীয় জীবন ও মানসিকতাকে বস্তুময় করা যায়, যা কোন প্রাচীন ভারতীয় নাগর রীতি অথবা লৌকিক রীতি দিয়ে করা যায় না। ইউরোপীয় ঐতিহ্যে লালিত অমৃতা শের গীলও তাঁর সীমাবদ্ধতা নিয়েই ভারতীয় জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গিয়ে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এর পরেই এলেন পঞ্চম অর্থাৎ চল্লিশের দশকের বিদ্রোহীরা। চল্লিশের এই শহুরে বিদ্রোহীরা ঘোষণা করলেন ঐতিহাসিক যুগের কোন প্রকার শিল্পভাষা বা রীতির কাছ থেকে আধুনিক ভারতীয়ের পাবার কিছুই নেই। শিল্পের ভাষা সর্বজনীন, এবং আধুনিক মানস সর্বজনীন। সেই সর্বজনীন আধুনিক মানসিকতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে হলে আমাদের পশ্চিম ইউরোপে আবিষ্কৃত আধুনিকতার শরণাপন্ন হতে হবে। এঁদের শিল্পভাবনায় 'প্রগতি' সম্বন্ধে একটা ধ্যান অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। শিল্প ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ে প্রগতির পথ বেয়ে একটা উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছয়, এমন একটি ধারণা থেকে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে আমাদের ললিতকলাকে সে পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে পশ্চিম ইউরোপীয় আধুনিকতাকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে শিল্পের ভাষার আবেদন সর্বজনীন হলেও, তার উৎস সর্বজনীন নয়। কোন শিল্পরীতি বা ভাষার জন্ম হয় সময় ও জীবনের প্রয়োজনে, শিল্প ঐতিহ্যের বিবর্ধন সাধন করে। অর্থাৎ যে কোন শিল্পরীতি বা শৈলী দেশ-কাল নির্ভর।

চল্লিশের দশকের এ বিদ্রোহ শুরু হয় হায়দরাবাদে পি টি রেড্ডি, মজিদ প্রমুখ চিত্রকরদের প্রচেষ্টায়। তারপর বোম্বাই এবং কলকাতার শিল্পী মহলে এই বিদ্রোহের ঢেউ পৌঁছয়। বোম্বাইতে এন এস বেন্দ্রে, শিবাক্স চাবড়া, কে কে হেব্বার, আরা, দিল্লীতে শৈলজ মুখোপাধ্যায়, এন এস কুলকার্নি, ভবেশ সান্যাল এবং কলকাতায় প্রদোষ দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র প্রমুখরা এই বিদ্রোহের শরিক হলেন। আজ পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় এঁদের পুঁজি ছিল সামান্যই। ঐতিহ্যবাদকে অস্বীকার করতে এবং তথাকথিত প্রগতির স্বার্থে ইউরোপীয় আধুনিকতার দৃশ্যত প্রকট কলাকৌশলকে অনুসরণ করতে এঁরা যত তৎপর ছিলেন আত্ম-আবিষ্কারে এঁরা ততটা যত্নবান ছিলেন না। ফলে অল্পকালের মধ্যেই এঁদের সৃজনীশক্তি ফুরিয়ে এলো।

নীরদ মজুমদার, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, মকবুল ফিদা হুসেন এবং গাইতোণ্ডে প্রমুখ চল্লিশের কয়েকজন শিল্পী মাত্রই আছেন যাঁরা পরবর্তীকালে নিজেদের চল্লিশের মানসিকতামুক্ত করতে পেরেছেন। আজকে চল্লিশের শিল্পীদের কাজ দেখলে ভীষণ মেকি মনে হয়। আধা-মধ্যযুগীয় উপনিবেশের মানুষ হিসাবে তাঁরা কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি, সমাজ এবং পরিপার্শ্ব থেকে ইউরোপীয় শিল্পীদের মতন বিচ্ছিন্ন হতে পারেন নি। অথচ বিচ্ছিন্নতার ফলশ্রুতিরূপে প্রাপ্ত ইউরোপীয় আধুনিকতার রীতি-কৌশল অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁদের হাতে এক কিম্ভুত-কিমাকার আধুনিক চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছে। হেব্বারের ছবি সেই আধুনিকতার অন্যতম নিদর্শন।

কিছুদিন আগে কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টস গৃহে, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে রচিত হেব্বারের ২৩টি তেল-রঙের ছবি ও কয়েকটি ড্রইংয়ের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। শাদা জমির উপর কালো কালির রেখায় আঁকা ড্রইংগুলি অনবদ্য। হেব্বারের রেখা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং প্রবাহিনী, কিন্তু রেখার প্রবাহে কোন বানানো ভাবালুতা নেই। ড্রইংগুলির বিষয় নৃত্যরত নারী ও পুরুষ এবং রেখার গতিতে ঘূর্ণমান শরীরের নৃত্যছন্দ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ছবি সম্পর্কে ওঁর ধারণা—মানুষ, বাড়ী, ঘর, জল, গাছ-পালা, প্রান্তর, আকাশ-সহ নিসর্গকে সরলীকৃত আকারে এনে রঙের সাহায্যে চিত্রতলে স্থান দিলেই ছবি ছবি হয়ে উঠলো। ফলে ছবি হয় একাধারে সমবিমূর্ত রচনা, অন্যধারে গল্পবলা দৃশ্য। দুয়ের মাঝে কোন যোগসূত্র গড়ে ওঠে না।

তবু স্বীকার্য, হেব্বারদের বিদ্রোহের একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। ওঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভুল-ভ্রান্তি থেকেই পরবর্তীকালীন চিত্রকররা শিক্ষা নেবার চেষ্টা করছেন।

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপের-ছবি

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের ছবি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং কলকাতার সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারী আর্টিস্টস্-এর সদস্য দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের অন্যতম খ্যাতনামা ছাপের ছবি নির্মাতা। দীপক ললিতকলা আকাদেমি কর্তৃক আয়োজিত বাৎসরিক জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং বার দুয়েক ঐ প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি পৃথিবীর তাবৎ প্রতিযোগিতামূলক ছাপের ছবি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এ বছরে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন যুগোশ্লাভিয়ার ল্যুবলিয়ানা শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ছাপের ছবির দ্বি-বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ছবি দেবার জন্য। কলকাতার অপর ছাপের ছবি নির্মাতা যিনি ল্যুবলিয়ানাতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি হলেন লালুপ্রসাদ সাউ। দীপক ছাপের ছবি নির্মাণ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন পারীর বিখ্যাত আতেলিয়ে ১৭-তে, স্টানলী উইলিয়ম হেটার এবং কৃষ্ণ রেড্ডির কাছে।

গত সপ্তাহে পার্ক স্ট্রীটের গ্যালারী কেমুল্ড-এ দীপকের সম্প্রতিকালে রচিত নয়টি রঙিন এচিং-এর ইনতালিও প্রিন্ট ও পাঁচটি ধাতুপত্র খোদাইয়ের ছাপের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল।

দীপক অত্যন্ত দক্ষ ছাপের ছবি নির্মাতা। নরম-জমির (সফট-গ্রাউণ্ড টেকনিক) উপর কাপড়, জাল, সুতো চুল ইত্যাদির বুনোট এবং প্রতিভাস ও একোয়াটিণ্ট করে নরম দানাদার বুনোট আনতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর স্টেনসিলের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণক্ষেত্র বিভাজন পদ্ধতিও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সবচেয়ে বিস্ময় উদ্রেককারক প্লেটের বা ছাঁচের একমাত্রিক তলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণক্ষেত্র তৈরীতে তাঁর দক্ষতা। এখানে বলে নেওয়া দরকার দীপক একটিমাত্র প্লেট বা ছাঁচের জমিকে এসিডে খাইয়ে বা স্টেনসিলের সাহায্যে বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন তল সৃষ্টি করেন। তারপর ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের রঙকে ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় লেপন করেন ভিন্ন ভিন্ন কাঠিন্যের রোলারের সাহায্যে, তারপর ভিজে কাগজের উপরে এচিং-প্রেসের চাপে ছাপ নেন। ছাপ নেবার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গভীরতা থেকে ভিন্ন রঙ বেরিয়ে আসে। ফলে এক প্লেটের সাহায্যেই বহুবর্ণ ছাপের ছবি তৈরী হয়।

দীপক একান্তই বিমূর্ত শিল্পী। তাঁর ছবি দ্বি-তলমাত্রিক জমিতে তৈরী নকশা। তাঁর গোড়ার দিককার ছবিতে নকশাগুলি বেশ আলঙ্কারিক। ছবি একান্তই দ্বি-তলমাত্রিক, বহুবর্ণে বিভাজিত দ্বিতলমাত্রিক ক্ষেত্রের সমাহার। এই রূপ বিভাজিত ক্ষেত্রের উপর প্রবাহিনী রেখা এবং সরলরৈখিক টানের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে তিনি আলঙ্কারিক নকশা গড়ে তুলতেন। ১৯৬৬, ৬৭, ৬৮ সালের রচনাগুলি ফলত একটু শুষ্ক এবং আলঙ্কারিক। ক্রমে তাঁর ছবিতে সারল্য এসেছে। ছবিতে অনলঙ্কৃত বর্ণক্ষেত্র সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বর্ণক্ষেত্র আভূমিক ও উল্লম্ব প্রবণতা পেয়েছে। বর্ণক্ষেত্রগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যাতে দ্বি-মাত্রিক ক্ষেত্র খানিকটা উচ্চাবচ প্রবণতা পেয়েছে; চিত্রক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, গভীরতা এবং উচ্চতা পেয়েছে ফলে দেশে পরিণত হয়েছে। তবু দীপকের রঙিন এচিংগুলিতে একটা দমবন্ধ হওয়া শুষ্ক ফর্মালিজম থেকে যাচ্ছে।

দীপকের এচিংগুলির তুলনায় শাদা-কালোয় রচিত ধাতুপত্র খোদাইয়ের (মেটাল এনগ্রেভিং) কাজগুলি অনেক উপভোগ্য। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি বুরিণ দিয়ে খোদাই করেছেন। সরলরৈখিক টান এবং খোঁচাগুলি, যার সমাহারে তিনি ক্ষেত্র এবং টোন রচনা করেন, হাল্কা এবং অগভীর; প্রবাহিনী রেখা সব, যার সাহায্যে তিনি রূপবন্ধের আভাস দেন, গভীর এবং ভারসম্পন্ন। এই এনগ্রেভিংগুলি একান্তই রৈখিক এবং কোন রেখা কখনও কোন আবদ্ধ ক্ষেত্র রচনা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রেখার পারম্পর্যে রূপবন্ধের আভাস আসে, ক্ষেত্র বিভাজিত হয়, কোন কোন ছেড়ে দেওয়া শাদা ক্ষেত্র ঘন শরীর পায়, কালোর জালের পাশের ছেড়ে দেওয়া শাদা জায়গা উচ্চতা বা গভীরতা পায়, চিত্রক্ষেত্র সম্প্রসারিত উচ্চাবচ দেশে পরিণত হয়। সরলরৈখিক জ্যামিতিক টান এবং খোঁচার পাশে প্রবাহিনী রেখা ছুটে চলে, নতোন্নত হয়। এক কথায়, এই আপাত-বিমূর্ত এনগ্রেভিংগুলি অত্যন্ত অভিব্যক্তিমূলক।

এচিং ব্যাপারটিই মূলতঃ রেখাধর্মী, যেমন লিথোগ্রাফ মূলতঃ পুঞ্জক্ষেত্রধর্মী। এটা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে এনগ্রেভিং এবং লিথোগ্রাফ মারফৎ সোমনাথ হোড় এবং দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন সচেতন ছাপের ছবি নির্মাতারা তাঁদের মাধ্যমের মূল উৎস সন্ধানে ফিরে যাচ্ছেন।

বিড়লা একাডেমি অফ আর্টের বাৎসরিক ও অন্যান্য প্রদর্শনী

ভারতবর্ষের তাবৎ বৃহৎ শিল্পোন্নয়নমূলক সংস্থাগুলির সাংবাৎসরিক প্রদর্শনীগুলির মান সম্প্রতি যা দাঁড়িয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার বিড়লা একাডেমি অফ আর্টের ১৯৭৩ সালের বাৎসরিক প্রদর্শনীটিকে স্বাগত না জানিয়ে কোন উপায় নেই। প্রদর্শনীটিতে নীচু মানের এবং শিক্ষানবিশী ছবি, ছাপের ছবি এবং ভাস্কর্য একেবারে ছিল না তা নয়। তা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকদের একজনকে সাধুবাদ দিতে হয় যে প্রদর্শনীতে বেশ কিছু উন্নতমানের ছবি এবং ছাপের ছবি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নামী তরুণ-শিল্পীদের অংশগ্রহণে প্রদর্শনীর সাধারণ মান যথেষ্ট ভাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নীচু মানের ও শিক্ষানবিশী ধরনের কাজ বাদ গেলে হয়তো প্রদর্শনীর মান আরও উন্নত হত। প্রদর্শিত বস্তু চয়ন ও পুরস্কার বিতরণ নিয়ে সাধারণ্যে কথঞ্চিত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। শিল্পবস্তুর গুণাগুণ বিচার অন্যতম দুরূহতম কর্ম। আজ পর্যন্ত এমন কোন বিচার-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিল্পবিচার বিশ্লেষণ করে বিচারকরা একটি সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। পৃথিবীতে এতাবৎকাল পর্যন্ত এমন কোন বিচারকমণ্ডলী তৈরী হয়নি যা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারে। সুতরাং বিচার নিয়ে গুঞ্জন হলেই বিচারকদের এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকদের বিচলিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমান সমালোচকই পুরস্কার সম্বন্ধে এবং প্রদর্শিত বস্তু চয়ন সম্পর্কে বিচারকদের রায়ের সঙ্গে একমত নন; তবু তিনি মনে করেন বিচারকরা তাঁদের নিজ নিজ বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রবণতা অনুযায়ী সততাসহ তাঁদের রায় দিয়েছেন।

প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গণেশ পাইনের টেম্পেরায় আঁকা 'বন্দর'। গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের এই উত্তরসূরী, তাঁদেরই শিল্পভাষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একান্তভাবে বাঙলাদেশীয় দৃশ্যে এমন এক অশুভবোধ আরোপ করেন যা এতাবৎকাল পর্যন্ত কোন ভারতীয় শিল্পী পাশ্চাত্য-শিল্পভাষার শরণাপন্ন না হয়ে করতে পারেন নি। বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয়, এই তরুণ আজ ভারতবর্ষের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রকর। এরপরই নাম করতে

হয় সুহাস রায়ের তেলরঙের কাজ 'অবতরণ'-এর। এটিকে তেলরঙ মাধ্যমে আঁকা একটি বৃহদায়তন ড্রইং বলাই ভাল। ছবিটি একান্তভাবে রৈখিক, যদিও বুনটের কাজের জন্য স্প্রের সাহায্যে কালি ছিটানো হয়েছে এবং ছবিটি শাদার-কালোয় রচিত। বর্ণান্তরের সাহায্য না নিয়েই ছিটোনো দানার এবং রেখার ঘন এবং পাতলা বুনটের সাহায্যে বর্ণান্তরের কাজ করা হয়েছে; ফলে কোথাও কালো রঙ ঘন হয়ে কোথাও পাতলা হয়ে এবং কোথাও বা শাদা উজ্জ্বল হয়ে উঠে গভীরতা এবং উচ্চতা জ্ঞাপন করছে। রূপকল্পটির উদ্ভাবন এবং বিন্যাস অত্যন্ত অভিব্যক্তিমূলক। একটি ক্ষীণকায় কবন্ধ তলিয়ে যাচ্ছে, শরীরের নিম্নাংশ স্বচ্ছ শাদার গভীরে, ঊর্ধ্বাংশ কালোর অন্ধকারে, কাঁধ থেকে একটি কচি গুল্ম জন্মগ্রহণ করেছে। গণেশ হালুই গত দু-এক বছর যাবৎ গভীর রঙের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যাভাসে উপস্থাপিত উজ্জ্বল রঙের রেখাশ্রয়িক লতা-পাতার সাহায্যে যে গীতিছন্দময় রচনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত আছেন প্রদর্শিত ছবি দুটির মধ্যে একটিতে তার সার্থকতায় উপনীত হয়েছেন। হালুই নিঃসন্দেহে একজন শক্তিধর চিত্রকর। এছাড়াও যাঁদের ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা হলেন সলিল ভট্টাচার্য, মাধবী পারেখ, মনু রাঠোড, মনু পারেখ, রবীন মণ্ডল বীণা ভার্গব এবং লালুপ্রসাদ সাউ ও অলোক ভট্টাচার্য। এঁদের সবার ছবি সম্পর্কেই এই কলমে কখনও না কখনও কিছু আলোচনা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, কারণ এঁরা নিয়মিত প্রদর্শনী করে থাকেন।

ছাপের ছবি বিভাগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল সনৎ করের। ইনতাগ্লিও এচিং-এর ছাঁচ তৈরী এবং ডিফারেন্সিয়াল ভিসকসিটি প্রথায় ছাপ তোলায় ইনি অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন তাঁর দুটি ছাপের ছবিতে। রূপকল্প ধ্যানে, বিন্যাসে, আলঙ্কারিক নকশা রচনায় এবং বর্ণকাভঙ্গে লুপ্ত প্রাকৃত জীবন সম্পর্কে মানবিক আর্তি মূর্ত হয়ে একটি বিষাদ-মধুর গীতিময় মেজাজ তৈরী করে সনতের ছবি দুটি। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় শ্যামল দত্তরায়ের ছবি দুটির। শ্যামলও অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ইনতাগ্লিও এচিং-এর ছাঁচ তৈরী করেন কিন্তু ছাপ তোলায় কথঞ্চিৎ অযত্ন পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া আলোছায়ার সাহায্যে তিনি যেভাবে জ্যামিতিক ক্ষেত্র-বিভাজন করেন তার জন্য তাঁর ছবির উজ্জ্বল রঙের বা আলোকিত অংশ যে ঔজ্জ্বল্য দাবী করে তিনি ছাঁচ ঘষার (scraping) জন্য বোধহয় তত সময় দেন না। শ্যামল আজও স্থির করে উঠতে পারলেন না তিনি ছবিতে বহির্জাগতিক দৃশ্যাবস্তুর কতোটা পরিবর্তন ঘটাবেন; অথচ রঙে এবং বিন্যাসে তিনি যে মেজাজ সৃষ্টি করেন তাতে বহির্জাগতিক দৃশ্যাবস্তু রেখাবন্ধনহীন রূপান্তর দাবী করে। লিথোগ্রাফ মাধ্যমে অসাধারণ দক্ষতার

শিল্পীঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

ছাপ রেখেছেন হরেকৃষ্ণ বাগ। এরপর ওঁর কাছ থেকে আমরা বিষয়মনস্কতা আশা করব। বিষয় মানে অবশ্য বহির্জাগতিক বস্তুর প্রাতিস্বিক প্রতিরূপ দর্শন নয়। বিষয় মানে বক্তব্য, দৃশ্যগত রূপে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা রাখে। ইরা বাষের এচিং-এ ড্রইং এবং বক্তব্য বেশ মিলে গেছে। উনি আরও একটু সারল্য আনয়ন করলে ভাল করবেন। এই বিভাগে আর যাঁদের কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁরা হলেন শান্তনু বসু, নির্মলেন্দু দাস, তপন মিত্র এবং মৈনাকশংকর রায়।

ভাস্কর্য বিভাগটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বস্তুর গঠন বিষয়ে ভাস্করের উল্লেখযোগ্য কাজ একটিও ছিল না। তারই মধ্যে চন্দ্রবিনোদ পাণ্ডের শ্বেতমর্মরে ক্ষোদিত রচনা দুটি গঠনসারল্যে, ঘনত্বব্যঞ্জনায় এবং বক্রগতিসম্পন্ন ছন্দোগুণে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটির একটি স্থাণু অথচ জৈব শক্তির দ্যোতনা বহন করে কথঞ্চিৎ বিষয়-মনস্কতার পরিচয় দেয়। নিরঞ্জন প্রধানের কাষ্ঠ-খোদিত ভাস্কর্য দুটিই যথেষ্ট আকর্ষণী ক্ষমতার অধিকারী। মনুষ্যাবয়ব নিরঞ্জনের প্রাথমিক অবলম্ব। ওঁর কাজ আলঙ্কারিক ছন্দোগুণে সমৃদ্ধ। পরিষ্কার হাতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে খোদাই করেছেন। এই বিভাগে অন্যান্য যাঁদের কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন মানিক তালুকদার এবং ফুলচাঁদ পাইন। মানিক তালুকদারের পোড়ামাটির কাজটি, পোড়ামাটির দ্রব্যনির্মাণের একটি বিস্মৃতপ্রায় রীতি (যা নাকি চাপাটি-রীতি নামে খ্যাত) অনুযায়ী গঠিত এবং সমস্ত রূপটি গঠনে ট্রাইব্যাল শিল্পের সরল ঋজুতা এবং জীবায়বভিত্তি অনসৃত হয়েছে। পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। অনেকেই শাদা-কালোয় রচিত ড্রইং দিয়েছেন তার মধ্যে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এবং কল্পনা সেনের কাজ খানিকটা মনে রাখার মতন। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন মকবুল ফিদা হুসেন ৬ই ফেব্রুয়ারীতে এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এটি খোলা থাকে।

অনিমেষ সেনগুপ্তের একক প্রদর্শনী

ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে ৯ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইউ এস আই এস প্রেক্ষাগৃহে অনিমেষ সেনগুপ্তের সাম্প্রতিক ছবির একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। অনিমেষ সেনগুপ্ত তরুণ শিল্পী হিসাবে কলকাতার শিল্পরসিক মহলে বেশ পরিচিত। অনিমেষ নিয়মিতভাবে কলকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা এগারোটি ছবি দেখান হয়। কম্পোজিশন নং ৫ ও ৯-এ শিল্পীর নকশা তৈরীর দক্ষতা দেখা যায়। তাছাড়া ছবিতে খুব বেশী একটা কিছু পাওয়া যায় না।

মারি ডায়াস অরোরার ছাপের-ছবি

মারি ডায়াস অরোরা পাঞ্জাপোল ডায়াসের কন্যা এবং সে পরিচয় বহন করার জন্যই বিবাহোত্তর জীবনেও তিনি পৈতৃক পদবী বজায় রেখেছেন। ৫ থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এ এই তরুণী শিল্পীর ছাপাইশাটি ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। উনি বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল এবং দিল্লী আর্ট কলেজে শিল্পশিক্ষা সমাপনান্তে ফরাসী সরকারের একটি বৃত্তি নিয়ে প্যারীর বিখ্যাত আতেলিয়ে ১৭-এ গিয়ে স্ট্যানলী উইলিয়ম হেটার এবং কৃষ্ণ রেড্ডির কাছে ছাপের-ছবি নির্মাণের পাঠ নেন। দেশে ফিরে এই তাঁর প্রথম প্রদর্শনী।

কাজে মাধ্যমনস্কতা লক্ষণীয়। নরুন, খোদন যন্ত্র এবং এসিডের সাহায্যে ছাঁচ রচনা, বিভিন্ন কাঠিন্যের রোলারের সাহায্যে বিভিন্ন ঘনত্বের রঙ ছাঁচের বিভিন্ন গভীরতা বিশিষ্ট তলে লেপন এবং কাগজে ছাপ তোলার কায়দা তিনি বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছেন। ফলে তাঁর ছবিতে বেশ তরতাজা ভাব চোখে পড়ে।

ছাপগুলি সবই আতেলিয়ে ১৭-তে কাজ করার সময়ে নেওয়া। প্রত্যেকটি কাজে উইলিয়ম স্ট্যানলী হেটার-এর প্রভাব সোচ্চার। কৃষ্ণ রেড্ডির কাজের প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না। সবই একান্ত বিমূর্ত রচনা। দেশে থেকে তাঁর কাজ কোন দিকে মোড় নেয় সেটা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করব।

—প্রণবরঞ্জন রায়

'স্যার, এর একটা বিহিত করা দরকার! এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।' প্রায় ছুটে সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করলেন বার্তা-সম্পাদক। মাথার অবিন্যস্ত চুল দেখে বোঝা গেল প্রচণ্ড ধকল গেছে ওঁর ওপর দিয়ে, চোখ মুখ দেখে মনে হল তিনি ভীষণ উত্তেজিত।

বার্তা-সম্পাদকরা সহজে উত্তেজিত হন না, উত্তেজিত হলেও চট করে আপন কেশাকর্ষণ করেন না। সম্পাদকমশাই পাইপে তামাক সাজবার পর সবেমাত্র মুখাগ্নি করবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। বার্তা-সম্পাদকের ঝটিকা-প্রবেশে সচকিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে ফেললেন।

'আবার ছেপেছে?' চেহারার নাড়ি টিপে রোগ ধরায় সম্পাদকমশাই সুদক্ষ, বিশেষ করে বার্তা-সম্পাদকের চেহারার।

'হ্যাঁ স্যার, একেবারে হুবহু। এই দেখুন।' 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদ-এর এক কপি সম্পাদকের টেবিলের ওপর রাখলেন বার্তা-সম্পাদক—'দাঁড়ি কমা সেমিকোলন অবধি বাদ যায় নি।'

এটি একটি গুরুতর সমস্যাই বটে। শহরে দুটিমাত্র দৈনিক খবরের কাগজ বেরোয়, একটি সকালে এবং অন্যটি সন্ধ্যায়। সকালে বেরোয় 'দৈনিক খবর'। এই পত্রিকাটিই সবচেয়ে পুরনো, এবং বাজারে কাটেও সবচেয়ে বেশী। সন্ধ্যাবেলা প্রকাশিত হয় 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদ'। এর পাঠক তারাই, যাদের সকালবেলায় কাগজ পড়বার ফুরসৎ একদম নেই অথবা ফুরসৎ এত বেশী যে সকাল এগারোটার আগে শয্যাত্যাগ করার অভ্যাস নেই আদৌ। এই পত্রিকার অফিসের আয়তন খুবই ছোট, কর্মিসংখ্যা রহস্যময় এবং, বলা বাহুল্য, পাঠকসংখ্যাও নগণ্য। তবু বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার [illegible] তাগিদে তাদের 'দৈনিক খবর'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা চাই-ই। ওদের কাগজের পৃষ্ঠাসংখ্যা আট, এদেরও তাই। ওদের কাগজে যেসব ফীচার বেরোয়, এদেরও বেরোয় সেসব। 'দৈনিক খবর' শহরে মশার প্রাদুর্ভাবের ওপর সম্পাদকীয় লিখলে 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদ' নির্ঘাৎ সেই একই বিষয়ের ওপর সম্পাদকীয় লিখবে।

তা না হয় লিখুক। সংবাদ তো আর কোন খবরের কাগজের কপি-রাইট নয় যে অন্যের তা প্রকাশ করা আদালতে শাস্তি পাবার যোগ্য অপরাধ। কিন্তু ইদানীং ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, সাংবাদিকতার সততা সবকিছুর মাথা খেয়ে 'দৈনিক খবর'-এর সংবাদ, ফীচার মায় সম্পাদকীয় [illegible]

একটু অদলবদল করে অথবা হুবহু ছেপে দিচ্ছে ওরা।

'আচ্ছা, ওদের পাঠকদের ওপর এর কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে কিছু?' সম্পাদকমশাই পাইপ ধরালেন এবার।

'কি করে হবে স্যার? আমাদের পাঠকরা কেউ 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদে'র মত ওছা কাগজ ছুঁয়েও দেখে না—' বার্তা-সম্পাদক গর্বটা একটু বুক ফুলিয়ে প্রকাশ করলেন—'আর ওদের পাঠকরাতো সব কুঁড়ের বাদশা একেকজন। সকালে ওদের ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই আমাদের কাগজ বিক্রী হয়ে যায় সব।'

'হুম, বুঝলাম। এখন আমাদের করণীয় কি?'

'আপনি কথা বলুন স্যার 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদে'র সম্পাদকের সঙ্গে। আচ্ছা করে ধমকে দিন।' বার্তা-সম্পাদক প্রস্তাব দিলেন।

সেদিনই ঘন্টাখানেক বাদে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হল দুই সম্পাদকের।

'দেখুন মিস্টার বোস,' বললেন 'দৈনিক খবর'-এর সম্পাদক, গলার স্বরে যথাসাধ্য উষ্মা প্রকাশ করে, 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? আমাদের সব খবর, ফীচার, সম্পাদকীয় একেবারে হুবহু কপি করে আপনার কাগজটাকে জাতে তুলতে চাইছেন?'

'কপি করি? হুবহু? আমরা? মোস্ট অবজেকশনেবল্ কথা!' তেড়ে উঠলেন ওপাশ থেকে মিস্টার বোস, 'সব সংবাদই কি আপনাদেরই ওরিজিন্যাল ব্রেন থেকে বেরোয় ভাবছেন? কেন, আমাদের সাব-এডিটর স্টাফ রিপোর্টাররা কি ঘাস কাটবার জন্য মাইনে নিচ্ছে?'

এরপর আর কথা বলবার কোন মানে হয় না। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন 'দৈনিক খবরে'র সম্পাদকমশাই।

অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং রইল। পৃথিবীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়—মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজল না। তবে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। হুবহু কপি না করে 'দৈনিক খবরে'র সব সংবাদই একটা দুটো শব্দ পাল্টে দিয়ে ছাপা হতে লাগল 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদে'। মাঝে মাঝে সাধু কথ্য মেশানো বাংলা ভাষায় রকফেলারী কায়দায় বিষোদ্গার হতে লাগল 'দৈনিক খবরে'র বিরুদ্ধে।

'স্যার', দেখেশুনে প্রায় ক্ষেপে উঠলেন 'দৈনিক খবর'-এর বার্তা-সম্পাদক, 'আর সহ্য করা যায় না। বাজারে বদনাম হয়ে যাবে আমাদের। আপনি ওদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করুন।'

সম্পাদক ঠান্ডা মাথার মানুষ, দিনরাত ফ্যানের তলায় বাস করেন, আইসক্রীম খান সুযোগ পেলেই। তিনি চটলেন না, অন্ততঃ বার্তা-সম্পাদকের মত অত চটলেন না। চটলেও, প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'ধৈর্য ধরো। আরেকটু ভেবে দেখি কি করা যায় এ ব্যাপারে।'

পরের দিন 'দৈনিক খবরে' একটি বিশেষ সংবাদ ছাপা হল ঃ

'মন্ত্রী মহাশয়ের ডিগবাজি

বসখোদে, ৭ই এপ্রিল। শদেয়াভূর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার রবথ কনিদৈ রিচুকেথে নামক শহর থেকে রাজধানীতে ফিরবার পথে জীপ দুর্ঘটনায় পতিত হন। বার দশেক নিপুণ সার্কাস খেলোয়াড়ের মত ডিগবাজি খেয়ে তিনি অক্ষত অবস্থায় নিজের প্রাণরক্ষা করেন।'

সারাদিনটা প্রচন্ড স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে লড়াই করতে করতে কাটালেন বার্তা-সম্পাদক, সম্পাদক এবং ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যরা। বিকেল ছ'টার সময় 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদ' বেরোয়। পাঁচটা বাজতেই সম্পাদক এক কপি কাগজ কিনে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। বার্তা-সম্পাদক নিজেই বেরিয়ে গেলেন কাগজটি সংগ্রহ করবার জন্য।

'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদে'র এক কপি হাতে নিয়ে হাসিমুখে সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করলেন বার্তা-সম্পাদক। নাচতে নাচতে ঢুকলেনও বলা চলে, কারণ বার্তা-সম্পাদকের বয়সী মানুষদের এবং ওই চেহারার সঞ্চালকদের নাচ এবং হাঁটার মধ্যে পার্থক্য মাইক্রোস্কোপে ছাড়া ধরা পড়ে না।

সম্পাদক নিজেও তখন কাগজখানা পড়ছিলেন। তাঁরও মুখ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত।

'দেখেছেন তো স্যার।'

'দেখলাম। দেখি এবার ওরা কি বলে।' টেলিফোন করলেন সম্পাদক।

'মিস্টার বোস?'

'বলছি।' ওপাশ থেকে জবাব এল 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদে'র সম্পাদকের কন্ঠস্বরে।

'এখনো কি কারুর মনে সন্দেহ থাকা উচিত?'

'তার মানে? আপনি মিস্টার মুখার্জি বলছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু কি বলছেন বুঝতে পারছি না।'

ন্যাকা! মনে মনে হাসলেন সম্পাদক। বললেন, 'আপনার কাগজের আজকের সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের খবরটা একবার পড়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

ফড় ফড় করে কাগজ ওলটানোর শব্দ কানে এল। মুখ টিপে হাসলেন, চোখ টিপলেন 'দৈনিক খবরে'র সম্পাদক, বার্তা-সম্পাদকের মুখের দিকে তাকিয়ে।

'দেখলাম।' জবাব এল ওপ্রান্ত থেকে, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'ওই যে খবরটা—মন্ত্রী না সার্কাসের খেলোয়াড়?—ওর মধ্যে কয়েকটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন ঃ বসখোদে, শদেয়াভূ, রবথ কনিদৈ এবং রিচুকেথে। কি, লক্ষ্য করেছেন? আচ্ছা, এবার শব্দগুলো পেছন থেকে পড়ে দেখুন। কি দেখছেন? দেখোসব, ভুয়োদেশ, দৈনিক খবর, থেকে চুরি।'

ঈশ্বরের প্রতি বেদনার্ত আবেদন 'ও গড!' এবং খটাশ করে হাত থেকে রিসিভার পড়ে যাবার শব্দ শোনা গেল ওপ্রান্ত থেকে। সম্পাদক নিজের রিসিভারটাকে যথাস্থানে রেখে তারপর বললেন বার্তা-সম্পাদককে, 'যান আপনার সমস্যা মিটল বোধহয়। এবার সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একটা বেশ রসালো রম্যরচনা তৈরী করে ফেলুন কালকের সংখ্যার জন্য।'

সেই রসালো রম্যরচনার জন্যই কিনা বলা দুষ্কর, তবে পরদিন দেখা গেল 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদের অফিসে তালা ঝুলছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আর কাগজ বেরুল না। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী পাঠক অফিসে চলে গেল খোঁজ নিতে। দেখল বন্ধ দরজার ওপরে সাঁটা কাগজে কে যেন লিখে রেখেছে, 'অনিবার্য কারণবশতঃ 'দৈনিক সান্ধ্য সংবাদে'র প্রকাশ বন্ধ রহিল।'

ঘরে বসেই রিপোর্টটি পেলেন 'দৈনিক খবর'এর সম্পাদকমশাই। হেসে মন্তব্য করলেন তিনি, 'অনিবার্য কারণই বটে। একজন সম্পাদক আর তিনজন রিপোর্টার নিয়ে তো আর একটা দৈনিক কাগজ প্রকাশ করা যায় না।'

বার্তা-সম্পাদক কোনরকম মন্তব্য করলেন না। তার বুকটা কিঞ্চিৎ ফুলে উঠল শুধু। তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল সেই স্ফীত বক্ষ থেকে।

রান্নাঘরে চলুন

জীবনধারণই মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য। তারপর অন্য অনেক কিছুর চিন্তা আসে। বিলাসিতা এর অনেক পরের সোপান। সুষ্ঠু আর সুন্দরভাবে পেট ভরাতে পারলে তবে ভাবনা আসবে কত আরাম আর আয়াসে দিন কাটানো যায়। জীবনধারণ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই খাবার। খিদের সময় যে কোন খাবার দিয়ে পেটপূর্তি করা চলে কিন্তু সেটা মোটেই সুখাদ্য বলে বিবেচিত হবে না। খাবারকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেটা দেখলেই মানুষের খাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে ও সেটা খেয়ে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়।

আগেকার দিনে অতিথি-অভ্যাগতে ঘরদোর বেশ জমজমাট থাকতো। আজকালের মত তাঁদের শুধু চা-পানে তুষ্ট করা হত না। সেদিন আর এখন নেই, নেই সেই মনও। তখনকার দিনে কোন অতিথি সকালে এলে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা না করে তাঁর কোনমতেই নিস্তার ছিল না। অতিথিকে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়ন না করতে পারলে গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর মান-সম্মান রক্ষা হতো না। অতিথিরাও প্রায় সেইমত প্রস্তুত হয়ে আসতেন।

সেদিনের মহিলাদের বাইরের জগতে এত স্বাধীনতা ছিল না তাই তাঁরা ঘরের কাজ করেই আনন্দ পেতেন। বিভিন্ন রকম খাবার তৈরি ও পরিবেশন করে তাঁরা আন্তরিক সন্তুষ্ট হতেন। কথায় বলে নিজে খাওয়ার চেয়ে অপরকে খাইয়ে অনেক বেশী সুখ, অনেক আনন্দ।

রান্না একটা বিরাট শিল্প, এটা কম-বেশী সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। একই উপকরণ, একই পদ্ধতি অথচ ব্যক্তিবিশেষের তফাতে তার স্বাদ ভিন্ন। রান্নার প্রথমে হলুদ, অথবা চিনি, শেষে নুন এটা দেবার দায়িত্ব বা বোধ সম্পূর্ণ নির্ভর করে খাবার প্রস্তুতকারিণীর ওপর। তাতেই কারো রান্না বেশ তেলতেলে, কারোটা বা পোড়া পোড়া। আমাদের দেশে পিঠে-পায়েস থেকে শুরু করে চপ-কাটলেট অবধি এত বিভিন্ন রকমের রান্না হয় যেটা অনেক দেশেই বিরল। আমাদের এই শিল্পের সমাদর করতে সকলেই জানেন। ভালো রান্নার তারিফ আর মন্দের গালভরা গালি এটা দৈনন্দিন ব্যাপার।

ঘুরেফিরে এক রান্না খেলে তা কখনই একঘেয়ে মনে হয় না অথচ রোজ রোজ পোলাও, মাংস খেলেও তাতে রুচি থাকে না। রোজের খাবার জন্য বায়বহুল খাদ্য প্রস্তুত করা আমাদের মত গরীব দেশের কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। অল্পসময়ে অতিথি এলে বা মাঝে মধ্যে নিজেরাও কয়েকটি খাবার তৈরী করে খেতে পারি তারই কয়েকটি প্রস্তুতিপর্ব দেখা যাক।

ইলিশ মাছের পাতুরী

ইলিশ মাছের আন্দাজে সরষে-বাটা, হলুদ-বাটা, লঙ্কা বাটা, নুন, কাঁচা লঙ্কা ও সরষের তেল হাতের কাছে গুছিয়ে রাখতে হবে।

ইলিশ মাছের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। মাছ টুকরো করে কাটার পরেও ধোওয়া যায় তাতে স্বাদ অনেকটা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। মাছ পছন্দমতো গাদা ও পেটি করে নুন, হলুদ মাখিয়ে রাখতে হবে। কড়াতে তেল দিয়ে বাটা হলুদ অল্প জলে গুলে কড়ার তেলে ঢালতে হবে। এই মসলা ভাজা হলে সরষে-বাটা, আস্ত কাঁচা লঙ্কা ও অল্প জলে নুন গুলে এবার ছাড়তে হবে। সরষে বাটা জল টেনে গেলে যখন মসলা তেলের ওপর ভাসবে তখন মাছ আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে দু'চারবার আন্দাজ মতো জল দিয়ে অল্প আঁচে বসিয়ে রাখতে হবে। উনুনের আঁচ গনগনে হলে পাতলা একটা টিনের পাত আঁচের উপর দিয়ে আঁচটা একটু কমিয়ে নিলে ভাল হয়। মাছ সুসিদ্ধ হলে কড়া নামাতে হবে।

ইচ্ছে করলে ইলিশ মাছের পেটি, গাদাকে আর একটু অন্যভাবে রান্না করা যায়। এবারও ইলিশ মাছ নুন, হলুদ-বাটা, সরষের তেল, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালঙ্কা, সরষে বাটা লাউ বা কুমড়োর পাতা হাতের নাগালে রাখতে হবে।

ইলিশ মাছের পেটি ও গাদা পরিমাণ মত নুন, হলুদ-বাটা ও অল্প সরষের তেল, পেঁয়াজ কুচি, মিহি কাঁচালঙ্কা ও সরষে বাটা দিয়ে মাখতে হবে। কচি দেখে লাউ বা কুমড়োর পাতার মধ্যে মসলা মাখা মাছ রেখে ওপরে আর একখানা পাতা দিয়ে ভাল করে ঢেকে সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এবার ফ্রাই-প্যানে সামান্য সরষের তেল দিয়ে এই পাতায় মোড়া মাছ ভাজতে হবে। দু'দিকের পাতা উল্টে উল্টে লালচে হওয়া পর্যন্ত মাছ ভাজতে হবে। পরিবেশনের সময় অল্প উত্তাপে মাছ গরম করে পাতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পমফ্রেট মাছের পাতুরী

উপকরণ—পমফ্রেট মাছের আন্দাজে নারকেল কোরা, ধনে-পাতা, কাঁচালঙ্কা,

রসুন, জিরে, পাতিলেবু, সামান্য চিনি, ঘি ও ভিনিগার।

পমফ্রেট মাছ পছন্দ মতো টুকরো করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নুন মেখে ঘণ্টা-খানেক ভিজিয়ে রাখতে হবে। পমফ্রেট মাছ গরম জলে ধুলেই ভালো না হলে অনেকে হয়তো খাবার সময় সমুদ্রের মাছের একটা কটু আঁশটে গন্ধ পেতে পারেন। গোটা সাতেক পমফ্রেট মাছ হলে মোটামুটি একখানা নারকোল কোরার সংগে পরিমাণ মত কাঁচালঙ্কা, চার কোয়া রসুন, সামান্য জিরে, কিছু ধনেপাতা দিতে হবে। অপছন্দ হলে ধনেপাতা না দিলেও ক্ষতি নেই। তারপর ঐ বাটা নারকোল এবং মসলার সংগে সামান্য চিনি, পরিমাণ মত নুন এবং একটি লেবুর রস মিশিয়ে এবার ঐ মসলা প্রত্যেকটি টুকরোর গায়ে ভাল করে মেখে টুকরোগুলোকে কলাপাতায় জড়িয়ে ভাল করে বেঁধে নিতে হবে।

এরপর সামান্য ভিনিগার ও ঘি কড়াতে দিয়ে কলাপাতা শুদ্ধ মাছ ভাল করে চাপা দিয়ে বন্ধ করে অল্প আঁচে বসাতে হবে—অনেকটা ভাপে রান্নার মত। পমফ্রেট মাছের পাতুরী গরম গরম পরিবেশন করলে যথাযথ রান্নার স্বাদ পাওয়া যাবে।

মাছের মুড়ো দিয়ে খিচুড়ি

উপকরণ—আতপ চাল, ভাজা মুগ, মাছের মুড়ো, বাটা আদা, বাটা লংকা, পেঁয়াজ কুচি, তেজপাতা টমাটো, গরম মসলা, নুন, চিনি সরষের তেল ও ঘি।

সমান পরিমাণ চাল, ডাল ভাল করে ঝেড়ে-বেছে ধুয়ে আলাদা শুকিয়ে নিতে হবে। ডাল একটু পরিমাণে বেশী হলে ক্ষতি নেই। কানকো ও কানকো বাদ দিয়ে রুই মাছের মুড়ো ভাল করে ধুয়ে নুন ও হলুদ মাখিয়ে তেলে লাল রং করে ভেজে আলাদা তুলে রাখতে হবে। ঘি বা তেলে পেঁয়াজ কুচি বাদামী রং করে ভেজে রাখতে হবে। ঐ ঘিয়ে আস্ত গরম মসলা ফোড়ন দিয়ে আদা-বাটা, লংকা-বাটা, হলুদ বাটা, নুন, চিনি ও টমাটো দু' টুকরো করে কেটে ছেড়ে দিয়ে নাড়তে হবে। মসলা ভাজা হলে চাল ছেড়ে দিয়ে নেড়েচেড়ে ডাল ছেড়ে নাড়তে হবে। চাল ও ডাল অল্প ভেজে জল ঢেলে নাড়াচাড়া করে সমস্তটা বেশ ভাল করে মিশিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দিতে হবে। খিচুড়ি ফুটে উঠলে ভাজা মুড়ো ও তেজপাতা ছেড়ে দিয়ে হাতা দিয়ে ভাল করে নেড়ে আবার পাত্রের মুখ ঢাকতে হবে। চাল, ডাল সেদ্ধ হলে মুড়ো ভেঙে খিচুড়ির সংগে মিশিয়ে ভাজা পেঁয়াজ খিচুড়ির ওপর ছড়িয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখতে হবে। খিচুড়ি গরম গরম না খেলে ঠিক স্বাদ পাওয়া যায় না। সংগে একটু পাঁপড় ভাজা হলেই পরম উপাদেয়। বর্ষাকালে খাদ্য হিসেবে খিচুড়ির জুড়ি নেই।

ছোলার ডালের চপ

ছোলার ডাল, আলু, তেল, কাঁচালংকা কুচি, আদা-কুচি, ধনেপাতা, চিনি, নুন, গুঁড়ো লঙ্কা ও গুঁড়ো গরম মসলা।

আধসেদ্ধ ছোলার ডাল জল ঝরিয়ে আধভাঙা করে রাখতে হবে। এবার আদা-কুচি, লঙ্কা-কুচি, নুন ও চিনি দিয়ে ডাল বেশ করে মেখে নিতে হবে। এই মাখা ডাল তেলে ছেড়ে ভাজতে হবে। ডাল ভাজা হলে লংকা ও গরম মসলার সংগে নেড়ে-চেড়ে রাখতে হবে। সেদ্ধ আলুর খোসা ছাড়িয়ে অন্য একটি পাত্রে চটকে রাখতে হবে। নুন ও চিনি দিয়ে চটকানো আলু ভাল করে মেখে নিতে হবে। এবার আলুর দলা তৈরী করে তাতে ডালের পুর ভরে চপ গড়তে হবে। একটা পাত্রে একটু ঘন করে নুন দিয়ে বেসন গুলে ফেটিয়ে এক একটা চপ বেসনের গোলায় ডুবিয়ে তেলে বাদামী রং করে ভেজে রাখতে হবে।

ছোলার ডালের চপ—আগে তৈরী করে রেখে বিকেলে জলখাবারের সময় তেলে ভেজে চা-এর সংগে খেলে বা অপরকে খাওয়াতে কোন ঝামেলা নেই। —অঞ্জলি চৌধুরী

চাই—প্রসারিত কর্মক্ষেত্র

কাগজে কাগজে ঢক্কানিনাদ; মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ পাতায় অনেক তেজস্বিনীর উক্তি, প্রত্যুক্তি, দর্পিত প্রত্যুত্তর বহুবর্ণ ছবি ও ছকে রঞ্জিত হয়ে সোচ্চার: ফ্রান্সে অন্তর্বাসের বিরুদ্ধে উত্তাল হল বিদ্রোহ: সোসাইটি, কমিটি, সঙ্ঘ ও সংস্থা গড়ে উঠলো অনেকরকম: এক-তুড়ি-মেরে উড়িয়ে দেওয়া ভাবোচ্ছ্বাসে ফেনিল যেন প্রত্যেকে। ব্যাপারটা কি?—'উইমেনস লিব!' হ্যাঁ, লিব! লিবিডো নয়, লিবারেশন। পরিপূর্ণ মুক্তি চাই এবার। পুরোনো প্রশ্ন! তারই ফয়সালা করার জন্যে নতুন করে বিদ্রোহ।

এ-বিদ্রোহের পুরোধা মেয়েদের সংগে আলাপ করে অনেকেই কিন্তু মর্মাহত হবেন। নমনীয়তার নামগন্ধ নেই, পুরুষ-কিশোরের মতো জেদী আর একগুঁয়ে, কথাবার্তা সহৃদয় হবার পরিবর্তে চমকে দেবার মনোভাবটা প্রবল। রসনা ও আচরণ ক্ষুরধার—অনর্গলধারে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আর অপ্রভাবী মন্তব্যের ফুলঝুরি বেরিয়ে আসছে সুচিন্তিতভাবে—অপ্রসারিত পাংশু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। বলার কথা কিন্তু ঘুরে ফিরে একই: 'মানি না।'

এই যে উন্মত্তের ঘোর এখনও কাটে নি, এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে আন্দোলন এখনও সাফল্যের ধারে কাছে আসে নি। পুরুষের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্তর্নিহিত হীনম্মন্যতার বহিঃপ্রকাশ এই নিয়ম-না-মানা বেপরোয়া মনোভাব। অথচ স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সমমর্মিতার মনোভাব নিয়ে মেয়েরাই এগিয়ে আসতে পারেন পুরুষের সহকর্মীরূপে। আর তার জন্য চাই, ব্যাপক কর্মক্ষেত্রের অবকাশ সসম্ভ্রমস্বরূপে, সাবলীল গতিতে ও সহজভাবে।

■

এখনও পর্যন্ত, নিঃসন্দেহে, অফিস জগতে পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার—সরকারী উদ্যোগ, বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সংস্থায় একই অপরিবর্তনশীল চিত্রধারা। এয়ারকুলার, লিনোলিয়ম শোভিত কামরায় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে থাকা 'বিগ বস' থেকে শুরু করে খাকী-পরিহিত পিয়ন বা বেয়ারার—সর্বত্রই পুংশাসিত সংসার। হ্যাঁ, স্টেনোগ্রাফার, পি-এ এবং কনফিডেনসিয়াল সেক্রেটারীরা সংখ্যায় অপ্রতুল না হলেও অপরিহার্য কি? তারা যান্ত্রিক টাইপরাইটারের মানবিক বিকল্প মাত্র। তাদের মস্তিষ্কোদ্ভূত চিন্তা কোনোও দুরূহ সমস্যার জট খোলে না। জরুরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। স্থান ও কাল—এই নিয়মুখী প্রতিযোগিতার মাঝখানে তাদের ভূমিকা নির্ভরশীল, অনুগত, পরগাছার মতন। তারা নোট নেন পটাপট, বক্তব্য প্রয়োজনমত জুড়ে-ছেঁটে বাছাই করে, যোগ-বিয়োগের হিসেব নিয়ে মাথা ঘামায়, আর, অবশ্যই, মাঝে মাঝে ক্লান্তি অপনোদনের সহজলভ্য দাওয়াই 'এনার্জী ট্যাবস'-এর মত মিষ্টি মুচকি হাসি দিয়ে 'বস'-এর প্রীতি উৎপাদন করে। তাদের কোনোও লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অতিকায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঘূর্ণায়মান চাকার একটি-দুটি বল্টু ছাড়া অন্যতর জরুরী অংগ বলে ভাবা যায় কি?

একমাত্র শিক্ষকতার ক্ষেত্রে মেয়েরা আপন পদাধিকারবলে সসম্মানে অধিষ্ঠিত। এই পরিমণ্ডলে তারা অতি সহজেই নিজেকে মেলে ধরে—দরদী মন ও স্বভাবপটুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবার অবসর পায়। প্রতিদিন ডালহৌসীগামী ট্রামে, বাসে, অগণিত সুবেশা, আত্মসচেতন মহিলার ভীড় দেখা যায়। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মণিকের কাজ নিপুণভাবে চালিয়ে নেন এ'রাই। চাকুরীক্ষেত্রে মধ্যপদে অধিষ্ঠিত এই মহিলারা এক বিশেষ মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলেছেন। কিন্তু আরও ওপরে বা আরও নীচে তাকালে কি পরিসংখ্যান পাই? অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন, বিদেশী পোষাকে সজ্জিত, পাইশোভিত নৈর্ব্যক্তিক মুখ পুরুষের দাপটে অধীনস্থ মহিলা কর্মণিক তটস্থ। বেয়ারা, পিয়ন, ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হয়ে কোনোও মহিলা চিঠি বা ফাইল নিয়ে ছুটোছুটি করছেন এ-দৃশ্য কল্পনা করতে কষ্ট হয় বৈকি। সেদিন, মহিলা-প্রগতিবিষয়ক নানা কথার উপসংহারে মহিলাদের চাকুরিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতির

প্রসঙ্গে একমত হতে পারলাম না এক বিখ্যাত কোম্পানীর ডিরেক্টরের সঙ্গে। আমার সোচ্চার প্রতিবাদের কারণ সবশেষে তাঁর একটি মন্তব্য : 'আশার কথা, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের আগ্রহ এখন প্রবল। গতানুগতিক পেশা ছাড়াও বিশেষ দায়িত্বভার ন্যস্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে মহিলাদের ওপর। বাবা পেলে আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে হয়তো বা কোথাও। কিন্তু না, মাপ করবেন, ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানীর ম্যানেজারের ঘরে বসে, দু হাতে টেলিফোন রিসিভ করে, সেক্রেটারীকে প্রয়োজনীয় নোট দিয়ে, অনবরত সই করার ফাঁকে ফাঁকে জরুরী ফাইল উল্টেপাল্টে দেখছেন একজন মহিলা, এ আমি একদম ভাবতে পারি না। হ্যাঁ, সেক্রেটারী হিসেবে বহাল হলে ভালই কাজ করে, আইমিন ছেলেদের চাইতেও। বেশী ওপরে? নৈব নৈব চ। আর নীচু পোস্টে দেব কি—ধমক খেলেই ছিচকাঁদুনী শুরু হবে।'

আমি হাঁ হাঁ করে উঠতেই উনি আর একদফা কৈফিয়তের ফিরিস্তির মাধ্যমে যা বলতে চাইলেন, তার মোদ্দা কথাটা হল 'মেয়েরা খুব নির্ভরতার সঙ্গে রাশ টেনে ধরতে পারে না।' মনে হল, ভদ্রলোক অটল বিশ্বাসী। রণে ক্ষান্ত না দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে বোঝাতে লাগলাম—'আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বুদ্ধির প্যাঁচ, দুর্জয় সাহস ও দার্ঢ্য মনোভাবের এক অ-সাধারণ উদাহরণ। ইস্রায়েলের শ্রীমতী গোল্ডা মায়ার, সিংহলের শ্রীমতী বন্দরনায়ক অনুরূপ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক আসরে সসম্মানে স্থিত।' উত্তর সঙ্গে সঙ্গে তৈরী, 'এঁরা নমস্য নিঃসন্দেহে। এঁদের সমকালীন আন্তর্জাতিক পটভূমিকা প্রশংসিত পথে পৌঁছে দিতে এঁদের সাহায্য করেছে। তবে এঁদের পেছনে মাথা ত' সব পুরুষের—উপদেষ্টা ও সহকারীরূপে এঁরা অন্তরালবর্তী। আর, ব্যবসাক্ষেত্রে অনমনীয় মনোভাব সহজাত প্রতিভার প্রকাশ এবং সে শক্তি একমাত্র পুরুষেরই করায়ত্ত।'

বেসরকারী কর্মোদ্যোগের প্রতিভূ হিসেবে একমাত্র ইনিই এই সনাতনী চিন্তার ধারক নন; খোদ সরকারও সমদোষে দুষ্ট। বিভিন্ন রাজ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চাকরির বিজ্ঞাপনে চোখ বোলালে এ তথ্য প্রতীয়মান : নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া মহিলা পদপ্রার্থী অযোগ্য। পাহারাদার, দফাদার, ক্লীনার-কম-কন্ডাক্টার, দারোয়ান, পিয়ন, মিস্ত্রী এসব কাজে মেয়েদের একেবারে প্রবেশ নিষেধ।

বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত—অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আর্কিটেক্ট প্রভৃতি পাত্রীরা সমতুল পাত্রের পাণিগ্রহণ করলে ৫০ থেকে ৯৫ শতাংশ আয়কর দিতে বাধ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে মহিলা ছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য নয়। বাস্তবে, চাকুরিক্ষেত্রে মহিলা সাব-এডিটর রিপোর্টার হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে উঠছে।

ব্যাঙ্কে মহিলা অফিসার নিয়োগ অনেকটা স্বাভাবিক একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক ছাড়া। তবে, এখনও মহিলা বৈমানিক, পর্বতঅভিযাত্রিনী রীতিমত খবর। তেল-আবিব-এ সমগ্র পুলিশ দপ্তর—উচ্চপদস্থ অফিসার, করণিক, কনস্টেবল আর ট্রাক ড্রাইভার পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলা নিযুক্তির বিবরণ পাঠ করে আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত। প্রসারিত কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যাপক নিয়োগ এই অসুস্থ মনোভাব থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র। সনাতন বিধি-নিষেধ এখন অবলুপ্ত; সমাজ দ্রুতগতিতে বদলাচ্ছে। আশা করি, অভিপ্রেত উন্নতির চরম শিখরে মেয়েরা পৌঁছবে নিশ্চয়ই—এবং অচিরেই।

এষা ভট্টাচার্য

৯ই মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ—এ সপ্তাহের ব্যক্তিগত সাপ্তাহিক রাশিফল সাধারণভাবে নীচে বলা হোল। প্রশ্নোত্তর আগামী সপ্তাহে দেওয়া হবে।

গ্রহ সন্নিবেশ : বৃষে শনি, মিথুনে কেতু, ধনুতে মঙ্গল ও রাহু। ১৫ই মার্চ মঙ্গল মকরে প্রবেশ করছে। মকরে বৃহস্পতি। কুম্ভে রবি ও শুক্র। মীনে বুধ, আবার ১৫ই মার্চ কুম্ভে আসছে।

মেষ : আপনার সময়টা ক্রমশ ভাল হবে। অশুভ গ্রহের প্রভাব কমবে। শারীরিক দৌর্বল্য ও ভ্রমণজনিত ক্লান্তি হতে পারে। নতুন পথে আয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। বকেয়া টাকাও আদায় হতে পারে। ব্যবসায় ভাল। বেকার ব্যক্তির কাজের সংস্থান হোতে পারে। চাকুরীজীবীর বা সম্পত্তিভোগীর পক্ষে সময়টা আশাপ্রদ। মেয়েদের পক্ষে সাংসারিক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা প্রবল। বিয়ের প্রস্তাব পাকা হোতে পারে।

শুভ তারিখগুলো : ৯, ১০, ১১, ১৫ মার্চ।

বৃষ : শারীরিক উদ্বেগ, মানসিক দুশ্চিন্তা থাকবে। দৈহিক কষ্টভোগের লক্ষণ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। সম্পদ-সম্পত্তি, ঘরবাড়ীর ব্যাপারে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু আর্থিক ক্ষতি বা ব্যবসায়ে মনোমালিন্যের লক্ষণ আছে। কিন্তু এই সাময়িক অসুবিধা সপ্তাহ শেষে কমে যাবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে। মেয়েদের পক্ষে সপ্তাহটা অনুকূল।

শুভ তারিখগুলো : ৯, ১১, ১৪, ১৫ মার্চ।

মিথুন : মাঝে মাঝে শারীরিক উৎপাত, পারিবারিক অশান্তির লক্ষণ থাকলেও সময়টা কাটবে ভাল। ব্যবসায় বিরোধ দেখা দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ নেই। ব্যয়ের মাত্রা বাড়বে। কাজকর্মে বাধা ও বিরোধ আসতে পারে। সপ্তাহ শেষে সামান্য উন্নতির সম্ভাবনা। মহিলাদের সব বিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

শুভ তারিখগুলো : ৯, ১০, ১৪ ও ১৫ মার্চ।

কর্কট : সময়টা অনুকূল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ও উন্নতি সূচিত হবে। অবশ্য শরীরটা আশানুরূপ নয়। সাংসারিক বিষয়ে আর্থিক ক্ষেত্র সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তনের আভাষ আছে। নতুন সম্পদ-সম্পত্তি সংগৃহীত হোতে পারে। মহিলাদের সাংসারিক উদ্বেগ থাকলেও মোটের ওপর সময়টা ভাল। শুভ তারিখগুলো : ৯, ১০, ১১, ১৪ ও ১৫ মার্চ।

সিংহ : শারীরিক দুশ্চিন্তা, বায়ু ও রক্তচাপ বৃদ্ধি, মাথা ও দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়ার লক্ষণ আছে। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যত্ন নেওয়া দরকার। ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য ভীষণ চাপ আসতে পারে। ব্যবসায়ে অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। কিন্তু সাময়িক অসুবিধা সপ্তাহ শেষে কেটে যাবে। মহিলাদের কর্মক্লান্তির ভাব থাকবে।

শুভ তারিখগুলো : ৯, ১০, ১১, ১৪ ও ১৫ মার্চ।

কন্যা : শরীরটা এখন সুবিধার নয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে ঝামেলা, দুশ্চিন্তা থাকবে। বাইরের আত্মীয়-বন্ধুজনের জন্য মানসিক কষ্ট ভোগ হতে পারে। আর্থিক উন্নতির লক্ষণ আছে। ব্যবসায় বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে ঝামেলা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতায় আপনার সাফল্য আসবে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা প্রতিকূল। শুভ তারিখগুলো : ১১, ১৪ ১৫ মার্চ।

তুলা : গ্রহ সন্নিবেশ ক্রমশ আপনাকে অস্বস্তির মধ্যে টেনে নেবে। শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। ব্যয়াধিক্যের চাপ বাড়বে। ব্যবসায় আশানুরূপ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির বা স্থানান্তরে গমনের লক্ষণ আছে। মেয়েদের দুশ্চিন্তা কাটবে। শুভ তারিখগুলো : ৯, ১৪ ও ১৫ মার্চ।

বৃশ্চিক : শারীরিক অস্থিরতা ও মানসিক কষ্টভোগের সম্ভাবনা আছে। অবশ্য সপ্তাহ শেষে অবস্থার উন্নতির লক্ষণ আছে। পারিবারিক ব্যাপারে ক্রমশ স্বস্তি আসবে। সপ্তাহের শেষের দিকে আর্থিক উন্নতি ও ব্যয়াধিক্যের চাপ হ্রাসের লক্ষণ প্রবল। কর্মক্ষেত্র অনুকূল। মেয়েদের পক্ষে ক্রমোন্নতির আভাস আছে।

শুভ তারিখগুলো ৯, ১০, ১১, ১৪ ১৫ মার্চ।

ধনু : শরীর মোটের উপর ভাল। পারিবারিক দুশ্চিন্তা কমবে। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে। সপ্তাহ শেষে অবশ্য আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না। তাই আর্থিক চিন্তার কারণ ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অস্বস্তি ও অশান্তির আভাষ আছে। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখগুলো : ৯, ১০, ১১ মার্চ।

মকর : শরীর সুবিধার নয়। মানসিক অস্বস্তি, সন্তানদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থাকবে। আয় চলনসই। ব্যবসায় মন্দ নয়। বন্ধুজনের দ্বারা আর্থিক প্রশ্নে উপকৃত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও সুনামের লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে মানসিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে।

শুভ তারিখগুলো : ৯, ১০, ১১, ১৫, মার্চ।

কুম্ভ : শারীরিক ও মানসিক উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। কিন্তু সপ্তাহ শেষে আর্থিক দুশ্চিন্তা দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে শুভ যোগ আছে। বিভিন্ন কাজে যশ লাভের লক্ষণ আছে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হোতে পারে।

শুভ তারিখগুলো : ৯, ১১, ১৪, ১৫ মার্চ।

মীন : বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুকূল ফল পাবেন। শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বস্তির সম্ভাবনা। আয় ভাল। ব্যবসায়ে শত্রুতা সম্পর্কে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাবেন। নতুন বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। মেয়েদের পক্ষে সাংসারিক সুখ-শান্তি লাভের সম্ভাবনা আছে। শুভ তারিখগুলো : ৯, ১১, ১৪, ১৫ মার্চ।

—শুক্রাচার্য

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম.........................

জন্ম সময় ও তারিখ
কিম্বা রাশি ও লগ্ন.........................

আপনার প্রশ্ন.........................

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে আমাদের ঠিকানায়।]

জলসা

তবলায় এবং সেতারে যথাক্রমে হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এবং গোকুলচন্দ্র নাগ

মনোজ্ঞ সংগীত আসর: বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দ গত ১৪ ফেব্রুয়ারী লাইব্রেরী হলে (২৯ নং কে সি বোস রোড) সরস্বতী পূজা উপলক্ষে মার্গ-সংগীতের এক মনোজ্ঞ ও ভাবগ্রাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় আরতি বাগচীর 'পূরিয়া কল্যাণ' রাগের খেয়াল দিয়ে। শ্রীমতী বাগচীর রাগ পরিবেশনে ভঙ্গিমাটি সমগ্র শ্রোতৃবৃন্দের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। খেয়াল গানের পর একটি ঠুংরি ও ভজন গান পরিবেশনের মাধ্যমে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ হয়। শেষ দুটি গানেও ক্ল্যাসিক ও মাধুর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীশংখ চ্যাটার্জি।

এরপরে বিষ্ণুপুর ঘরানার ধারক ও অগ্রদূত গোকুলচন্দ্র নাগ মহাশয়ের সেতার বাদন ঐ ঘরানার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে সুললিতভাবে শ্রোতাদের কাছে প্রকাশ করে। তিনি সেতারে 'ইমন' রাগ বাজিয়ে শোনান।

আলাপ অংশে তিনি যে জোড় এবং ঝালার সূক্ষ্ম কাজ দেখিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। তাঁর বাজনার বৈশিষ্ট্য এই যে, রাগীর সংগীতে ধ্রুপদীয়া রীতিতে অতি ধীরে ধীরে প্রতিটি স্বরের বিস্তার, আধুনিক কালে প্রায় শোনা যায় না। বর্তমান যুগে স্বর্গতঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মহাশয়ের পরে একমাত্র গোকুলবাবুর নামই উল্লেখযোগ্য।

প্রায় ৬৮ বছরের প্রবীণ এই মহান শিল্পী তাঁর সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন সারাক্ষণ। রাগ-রূপকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য সুরবিস্তারের ভঙ্গিমা সংগীতকে অনবদ্য করে তোলে। রাগের স্বকীয় ভাব ও সূক্ষ্ম শ্রুতির প্রয়োগ অতি সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে এই সুদক্ষ শিল্পীর পরিবেশনায়। মুদারায় গাম্ভীর্য আনয়নকারী খরজ তারের সুসংযত অনুরণন সমগ্র পরিবেশকে এক গভীর আবেগে বাজনায় বাঙ্ময় করে তোলে। তিনতালের গৎ সুসংহত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পরিবেশিত রাগটির বাদনভঙ্গী, সুর সংযোজন, গতিশক্তি ও সুদক্ষ পরিচালনা বিভিন্ন লয়কারীতে মীড়, গমক ও অলংকারের বৈচিত্র্য এক ভাবময় স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করেছিল।

হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর তবলা সংগতে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখান। তাঁর বোল, টুকরো সাতসংগত-এর মাধ্যমে গোকুলবাবুর ছন্দের এক নতুন জগতের সন্ধানে মগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর অনুষ্ঠান খাম্বাজ ঠুংরি ও দেশ রাগের সুললিত পরিবেশনে শেষ হয়।

পরিশেষে অমর সাহা 'বাগেশ্রী' রাগে বেহালা বাজিয়ে শোনান। তাঁর রাগ পরিবেশন অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়। মিঠে তবলায় এই অনুষ্ঠানকে মধুর করে তোলেন ভুপাল ভট্টাচার্য।

নূপুরগোষ্ঠী নিবেদিত "হোরী খেলা"

কোলকাতার সংস্কৃতিলোকে এখন নৃত্যনাট্যের প্রেরণা এসেছে বোধহয় কবিগুরুর আশ্চর্য নৃত্যনাট্যগুলি থেকেই। 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' 'শাপমোচনে'র গন্ডীতেই শিল্পীরা এখন সীমিত থাকতে চান না। কবিগুরুর অফুরন্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কাব্য, গান সৃষ্টিশীল শিল্পীদের সৃজনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করছে। তরুণ হৃদয়ের প্রেরণামথিত এমনই এক সৃষ্টি— নরেশকুমার ও কমলেশকুমারের নৃত্য ও সংগীতের মিলিত ফলশ্রুতি 'হোরী খেলা'। এই নৃত্যনাট্য রবীন্দ্র সদনে নিবেদন করলেন 'নূপুর' শিল্পীগোষ্ঠি।

কেশর খাঁর ভূমিকায় ছিলেন নৃত্যপরিচালক নরেশকুমার। কেশর খাঁর মদিরতা, আকস্মিক মুহূর্তের হতবাক বিহ্বলতা নরেশকুমারের নৃত্য ও অভিনয়ে যথাযথ রসরূপ লাভ করে। হয়ত পরিচালকোচিত সংযমে নিজেকে তিনি স্বল্প অভিনয়েই সংহত রেখেছিলেন। তবে দর্শকের দৃষ্টি তাঁর নাচের জন্যই তৃষিত ছিল বলেই বোধহয় একটু নিরাশ হয়েছে।

টিমওয়ার্কের প্রশংসা না করে উপায় নেই। নরেশকুমার পরিকল্পিত 'তরবারী নৃত্য', 'রাজস্থানী লোকনৃত্য' এবং কথাকলি আঙ্গিকের অন্যান্য নৃত্যজাত নাট্যরস —শিল্পসৃষ্টির দাবি পূর্ণ করেছে।

টিম ওয়ার্ককে সমৃদ্ধ করেছিলেন সর্বশ্রী ভানু দে, বটু পাল, কালুশংকর, ধূর্জটি সেন, সুতপা দাসগুপ্ত, পলি গুপ্ত, আরতি মজুমদার, সুতপা ব্যানার্জি, সুমিত্রা মিত্র এবং কানাইলাল মজুমদার, সোমেন্দ্র ঘোষ, শ্যামল বসু, পান্নালাল, স্মৃতিকুমার, স্মৃতি ঘোষ, চুণীলাল, দেবতোষ চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী বটব্যাল, শ্যামলী চৌধুরী, রীণা ঘোষাল, মল্লিকা বসাক।

বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে রাণীর ভূমিকায় সুমিত্রা মিত্রের, রাজপুত রমণীর লালিত্য ও কঠোরতা, তেজ, অভিমান ও শৌর্য শ্রীমতী মিত্রের নৃত্যে চিত্তহারী রূপ পরিগ্রহ করে।

কমলেশ মিত্রের সঙ্গীত কখনও আনন্দ লহরার কৌতুকে, কখনও রাগসঙ্গীতে নৃত্যনাট্যের একটি বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে। অন্যান্য কৃতিত্বের অংশীদার হলেন প্রদীপ ঘোষ, শ্যামলেশ ঘোষ, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়।

তবে রূপসজ্জায় কল্পনার দৈন্য আমাদের আশাকে কিছু ক্ষুণ্ণ করেছে।

ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত বিদ্যালয় : বাংলার সংগীত, শিল্প ও সংস্কৃতিজগতে এক সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নৃত্যভারতী (কড়েয়া রোডে) একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দ। এই উপলক্ষেই ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীত বিদ্যালয় (এটি ৭।৮ বছর আগে নৃত্যভারতীর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ শাখারূপে গঠিত হয়) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যাভিনয়ের একটি দৃশ্য

উদ্বোধন দিবসে সভাপতি সুপরিচিত সাহিত্যিক ও সংগীতবিদ দিলীপ মুখার্জি তাঁর ভাষণে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্বদেশ ও শিল্পসেবার উল্লেখ করে বলেন—তাঁর মত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ করা হবে যদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বছরই 'ব্রজেন্দ্রকিশোর জন্মশতবার্ষিকী ব্যাপকভাবে পালন করা হয়।

সভার উদ্বোধক সংগীত-সাগর বীরেন্দ্র-কিশোর বলেন সেনী ঘরানার ধ্রুপদী কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত ছাড়াও তাঁর সারা জীবনের খেয়াল, ঠুংরী এবং সুবিস্তৃত তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ও বিদ্যা তিনি অকৃপণভাবে সংগীতনিষ্ঠ শিষ্য-শিষ্যাদের শিক্ষা দিয়ে পিতার আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন এই আশাতেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল।

এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী কল্পনা ব্যানার্জী (বিলম্বিত আলাপ ও ধ্রুপদ), ওমর খাঁ সাহেবের পুত্র ইমরান আলি খাঁর সরোদ (বিশেষ উপ-ভোগ্য ঠোকঝালা ও লড়ীর বিস্তার) ও তীর্থংকর মুখার্জী। ইনি সেনিপদ্ধতির গিমা ও দুনী গৎ ও ঝালায় শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা আদায় করেন।

'চণ্ডালিকা' : সম্প্রতিকালে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ চলেছে তার মধ্যে চণ্ডালিকা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য মানবিক আবেদন ও মানুষের ক্ষুদ্র সত্তার বন্ধনমুক্তির বার্তা এসেছে নৃত্য ও সঙ্গীতের চিরন্তন আবেদনের পথ ধরে।

কমলা গার্লস স্কুলের উদ্যোগে রবীন্দ্র-সদনে মঞ্চস্থ 'চণ্ডালিকা' এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এই হিসাবে এখানে কোন নামকরা নৃত্যশিল্পী ছিলেন না, ছিল না 'গ্ল্যামরাস' ব্যক্তিত্ব—তবুও যে প্রযোজনাটি 'গ্ল্যামরাস' [illegible]

ও ভাবের গভীরে প্রবেশ করতে পারার মননশীলতার কারণে। এর জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব নিশ্চয়ই নৃত্যপরিচালক অনাদি-প্রসাদের। কিন্তু রূপকারী শিল্পীরাও যদি নৃত্যদক্ষা ও গ্রহণশীলা না হতেন তা হলে পরিচালকের পরিকল্পনা এমন সার্থক রূপে পৌঁছতে পারত না।

নিরর্থক প্রথা ও সামাজিক সংস্কার-লাঞ্ছিতা প্রকৃতির হৃদয়বেদনা, আনন্দের মুক্ত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে হৃদয়ে নব-জাগরণের বিস্ময় আনন্দ উল্লাস বা যে আকুলতার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস—বিভ্রান্তি অনুতাপ সবশেষে মহৎ উত্তরণ—প্রতিটি পর্বই প্রকৃতির ভূমিকায় অবতীর্ণা সুতপা চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যে, অভিনয়ে যথাযথ অভিব্যক্তি পেয়েছে।

জননীর অন্তরের স্নেহ, শঙ্কা, যথাসাধ্য শক্তিপ্রয়োগে কন্যার আনন্দসাধনের প্রয়াসের ভূমিকায় আন্তরিক ছিলেন দেবযানী ভট্টশালী।

এ ছাড়াও সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক হয়েছেন সোমা দত্ত, চয়নিকা সেনগুপ্ত, সাথী ঘোষ, মঞ্জীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সবাই।

সংগীত পরিচালনা ও মায়ার গানে সুপ্রীতি ঘোষ তাঁর সুনামে সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে প্রকৃতির গানে বনানী ঘোষ। কণ্ঠসৌকর্য আবেগ দুটোর ভারসাম্য ছিল বলেই গানগুলি শুনতে এত ভাল লেগেছে।

শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও রবীন মুখোপাধ্যায়ের গানও সুগীত। সমবেত সংগীতের এমন উন্নত মান সচরাচর দেখা যায় না।

মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে পট-ভূমিকা পরিস্ফুটনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়, [illegible] ও [illegible] সেন।

সঞ্চারিণী নিবেদিত : নজরুল সন্ধ্যা : প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীতে এক নবীন শিল্পীগোষ্ঠীও গড়ে উঠছে। ঐতিহ্যকে তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন এ আশ্বাস অনেকবারই পেয়েছি। সেদিন তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া গেল আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে 'সঞ্চারিণী' পরি-বেশিত নজরুল সঙ্গীতের আসরে। শিল্পী কালিদাস নাগ। একটি নতুন কণ্ঠ। ইনি সুখেন্দু গোস্বামীর সুরে শংকরা বেহাগ রাগভিত্তিতে রচিত 'সরস্বতী স্তোত্র' দিয়ে সুরু করে পর পর এগারটি বিভিন্ন আঙ্গিকের নজরুল গীতি গেয়ে শোনান। রাগসংগীত, কাব্যগীতি, ইরাণী, আরবী সুর, গজল ভাটিয়ালী ঝুলন, সাঁওতালী—নজরুলসৃষ্ট সবরকম সুরের গানই ছিল তার মধ্যে। শিল্পীর কণ্ঠ সুমিষ্ট, সুপরি-শীলিত এবং শিক্ষামার্জিত। প্রতিটি গানের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অত্যন্ত দরদভরে গানগুলি গেয়েছিলেন শিল্পী। এই দরদের ছোঁয়াই মনকে স্পর্শ করে। শিল্পী তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রমে অবিচলিত থেকে উজ্জ্বল পরিণতিতে পৌঁছবেন এই আশাই আমরা রাখব।

দ্বিতীয় শিল্পী ধীরেন বসু। ইনি সংগীতজগতে প্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত। —বিশেষ করে নজরুল গীতিতে ইনি উল্লেখযোগ্য অধ্যবসায়ের পরিচয় বহুবারই দিয়েছেন। এবারের গাওয়া 'রাগসঙ্গীত'-গুলি তাঁর পূর্বখ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। গজল অঙ্গে গাওয়া 'বাগিচায় বুলবুলি' গানটি খুবই সুখশ্রাব্য হয়েছিলো। এঁদের সঙ্গে সুযোগ্য সঙ্গতে ছিলেন কানাইলাল মিশ্র ও ঝুন্দু চ্যাটার্জি। প্রদীপ ঘোষের আবৃত্তিও আনন্দদায়ক।

চিত্রেশ দাসের চিত্তগ্রাহী কত্থক : সম্প্রতি আমেরিকান য়ুনিভার্সিটি সেন্টারে একটি নাচের আসরে দেখলাম—চিত্রেশ দাসের কত্থক নৃত্য। ইনি সুবিখ্যাত নৃত্যগুরু প্রহ্লাদ দাসের পুত্র এবং তরুণ যশস্বী কত্থক নৃত্যশিল্পীদের অন্যতম।

চিত্রেশের খ্যাতি এখন শুধু ভারতেই সীমিত নয়—আমেরিকায় বহু শহরে কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে ইনি প্রচুর যশ অর্জন করেছেন এবং ক্যালিফোর্ণিয়ায় আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের নৃত্যশিক্ষক।

কিছুদিনের জন্য ইনি দেশে এসে-ছিলেন এবং গত সপ্তাহে ফিরে গেছেন। তারই মাঝে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

চিত্রেশের নাচ আগেও দেখেছি। এবারের অনুষ্ঠান আরো পরিমার্জিত। ধামার তালের ওপর ইনি প্রথমে কত্থকের বিভিন্ন অঙ্গ প্রদর্শন করেন। যেমন তেহাই-এর ওপর চক্রধারের তীব্র ব্যঞ্জনা ও ক্ষিপ্রগতিতে চিত্রেশ সকলকে চমকে দেন।

চতুরংগ অংশে একাধারে পাখোয়াজ, গানের বোল, তবলার বোল ও নাচের বোলে নৃত্যদক্ষতা ও রসবোধের সমন্বয়ে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। খণ্ডজাতি মিশ্রিত বোলে ধীরদৃপ্ত ভঙ্গি রাজপুত বীরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ত্রিতাল মধ্যলয়ে গতের সংগে 'গিরি-গোবর্ধন' নৃত্যে অভিনয়াংশও তারিফ করবার মতই।

এর সঙ্গে তবলাসংগতে মুগ্ধ করেন নারায়ণ মিশ্র।

উপরিপাওনা হিসাবে পাওয়া গেল চিত্রেশ দাসের মার্কিণী সহধর্মিণী জুলিয়া দাসের নৃত্য। বেশ কয়েক বছর আগে প্রহ্লাদ দাসের শিক্ষাধীনে দেখেছিলাম এর ভারতনাট্যম। এবার দেখলাম চিত্রেশের শিক্ষাজাত কথক। জুলিয়া শুধু সুন্দরীই নন, প্রতিভার অধিকারিণী। বিলম্বিত লয়ে হলেও এঁর 'রংগপ্রণাম' 'পরণ' 'ভ্রাং' পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহ্য ইনি হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন এইটিই হল বড় কথা।

আসর সুরু হয় আলি আকবর কলেজের ১৫ বছরের মার্কিণী ছাত্র পিটারের ত্রিতালে পরিবেশিত তবলালহরা দিয়ে। এদের আগ্রহ, পরিশ্রম সত্যিই আশ্চর্য করে দেয়।

কালিদাস সংগীত সমাজ : বি কে পাল এভিনিউস্থ আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় ভবনে সমাজের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে স্নিগ্ধা বিশ্বাস উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দকে অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ জানান। পরে জয়কৃষ্ণ সান্যাল সমাজের আদর্শের জন্য একনিষ্ঠ চেষ্টার বিষয় বর্ণনা করেন। পরে উত্তর কলিকাতা-নিবাসী বিনয় দাসকে দীর্ঘ (৬০ বৎসর) যাবৎ উচ্চাঙ্গ সংগীতের একনিষ্ঠ শ্রোতা হিসাবে সমাজের পক্ষ থেকে প্রধান সংগীতজ্ঞ বংগগৌরব অনাথ বসু মহাশয় মাল্যদান করে সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানের প্রথমে শিল্পী হিসাবে কুমারী শর্মিলা মজুমদার রাগ বেহাগে সেতার বাজান, পরে কুমারী স্নিগ্ধা কু-ভুর গানের পর ভারত-বিখ্যাত শিল্পী বংগগৌরব হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (হীরুবাবু) মহাশয় তবলায় পঞ্চম সোয়ারী ও পরে ত্রিতাল লহরা বাজিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের যুগপৎ চমৎকৃত করেন। সহযোগিতায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন সমর সাহা। বহু বিশিষ্ট শ্রোতার উপস্থিতিতে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

রাগরঙ্গের সংগীতানুষ্ঠান : রাগ-রঙ্গের নবম সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বারাসতের সুন্দরতম প্রেক্ষাগৃহ 'বিজয়া'য় ১৭ ফেব্রুয়ারী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মহকুমা শাসক শ্রীকালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুন্দর ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক উদ্বোধন করেন।

শহরতলীর সাড়াজাগানো সারা রাতব্যাপী এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক। 'রামকেলী' রাগে খেয়াল ও তারানায় শিল্পীর নিজস্ব ভঙ্গীটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। 'মাত যা যোগী' ভজনে শ্রোতাদের মন কেড়ে নেন। শ্রীমনিলাল নাগ সেতারে বাজান রাগ 'রাগেশ্রী পঞ্চম'। শ্রোতাদের ধৈর্যের পরীক্ষা না নিয়ে আর একটু সময় সংক্ষেপ করলে এক কথায় অনুষ্ঠানটি হোত অপূর্ব। সঙ্গে সঙ্গতে ছিলেন ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ। সঙ্গত ছাড়াও তাঁর তবলা লহরায় অনুষ্ঠানটি হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর। সারেঙ্গীতে ছিলেন শ্রীবাচ্চালাল মিশ্র।

আসরের আর একটি আকর্ষণ প্রফেসর শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়ের রাগ যোগিয়া কালেংড়ায় সরোদ বাদন। সঙ্গে সু-সঙ্গত করেন প্রফেসর বিশ্বনাথ বোস; দুই পরিণত শিল্পীর বাদন ও সঙ্গতের অপূর্ব সমন্বয়। ওস্তাদ মুনাব্বর আলীর 'ললিত' রাগে খেয়াল ও 'ক্যা করু সজনী' ঠুংরিটি অত্যন্ত সু-পরিবেশিত। হারমনিয়ম-এ সহযোগিতা করেন শ্রীআমীর আলি। শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক ও ওস্তাদ মুনাব্বর আলী উভয়ের সঙ্গে সু-সঙ্গত করেন প্রফেসর শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়।

স্থানীয় শিল্পী শিবদাস ঘোষের 'শুদ্ধ কল্যাণ' রাগে খেয়াল ও ঠুংরির অনুষ্ঠানটি সুন্দর হয়েছে। সঙ্গে তবলা সঙ্গতে শ্রীরাম চক্রবর্তী ও হারমনিয়ামে শ্রীজীতেন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়েছিল রাগরঙ্গের [illegible] শ্রীতুষার ব্যানার্জি ও শ্যামল [illegible]র সুষ্ঠু পরিচালনায়।

একটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের উৎসব : টেকনিক স্কুল অফ মিউজিক, মহাজাতি সদনে প্রযোজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান জন-প্রিয় শিল্পীসমন্বয়ে খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সংগীত চিত্রগীতি ও আধুনিক ছিট সং দিয়ে আসর জমিয়ে তোলেন। মানব মুখো-পাধ্যায়ের রাগাশ্রিত নজরুলগীতি শিল্পীর উন্নত মান সম্বন্ধে শ্রোতাদের সচেতন করে। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদ মামা শোনো' গানটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিবেশিত। তা ছাড়াও রাগসংগীত, গজল ও আধুনিক গানগুলিতে শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভা স্বাক্ষরিত।

প্রতিষ্ঠানের যেসব ছাত্রছাত্রীরা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তাঁরা হলেন প্রতিমা দাস, মঞ্জু রায়, মায়া সাহা, কাজল হালদার, দীপক মিত্র, রণজিত ঘোষাল, সব্যসাচী বসু, সুধীর ঘোষ, জয়ন্ত মজুমদার, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপর্ণা দত্ত, দীপা চৌধুরী, অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ রোজারিও, সুরজিৎ দাস। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন গীটারবাদক বেচু মুখোপাধ্যায় ও সুনীল দত্ত।

—চিত্রাঙ্গদা

রোদন ভরা বসন্ত

উত্তমকুমার বাসবী নন্দী

পরিচালনা : সুশীল মুখোপাধ্যা...

ধ্বংস

চিত্র-সমালোচনা

(১) মর্জিনা আবদাল্লা (বাঙলা)

গেল শুক্রবার, ২ মার্চ তারিখে শ্রী. প্রাচী, ইন্দিরা এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবি "মর্জিনা আবদাল্লা" কাহিনীর অন্তর্গত যে-দুটি চরিত্রের নাম বহন করছে, ক্ষীরোদপ্রসাদের চিরউজ্জ্বল গীতিনাট্য আলিবাবার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে তাদের সম্বন্ধে নতুন করে বলে দিতে হবে না। "আয় বাঁদী, তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি, আমি বাদসা বনেছি; আমি বেগম বনেছি, বাদসা বেগম, ঝম্ ঝমাঝম বাজিয়ে চলেছি"—এই মধুর দ্বৈত-সঙ্গীত যাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হত, সেই বান্দা ও বাঁদী—আবদাল্লা ও মর্জিনা ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্যের অনেকখানি অংশই জুড়ে রয়েছে। কিন্তু দীনেন গুপ্ত পরিচালিত ও পিয়ালী পিকচার্স পরিবেশিত 'মর্জিনা আবদাল্লা' ছবিতে মর্জিনার চরিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও আবদাল্লাকে অনেকখানি পিছনে পড়ে থাকতে হয়েছে। তাছাড়া আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনী নির্মাণে ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার ছায়াপাত হলেও এই সুপরিচিত কাহিনীটিকে আরব্য উপন্যাসের পাতা থেকে সরাসরি নেওয়া হয়েছে বললেও আপত্তি করবার কিছু নেই। তবে আলিবাবা নিজে একটি বৃহৎ অরণ্যের মালিক ছিল এবং নিজের ভাই কাশিমের কাছে তা বন্ধক রেখেছিল বলেই সহসা একদিন কাশিম লোকজন পাঠিয়ে সেই বন অধিকার করে নিয়ে আলিবাবার সেই বনে কাঠ কাটা বন্ধ করে দিল—এমন সৃষ্টিছাড়া, যুক্তিহীন ঘটনা দিয়ে ছবিটি আরম্ভ করা হল কেন, তা ভেবে পাই না। যে লোক নিজে একটি বৃহৎ অরণ্যের অধিকারী, সে নিজে কবে কোন্ কালে কাঠ কাটতে যায়?

আসাম ও ব্রহ্মদেশে মাত্র অরণ্যের মালিকানা মানুষকে কোটিপতি করেছে।

যাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদের চিরনূতন গীতি-নাট্য 'আলিবাবা'র সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের কাছে 'মর্জিনা আবদাল্লা' একটি হাল্কা গীতিবহুল কাহিনীর চিত্ররূপে হিসেবে সমাদৃত হবে। বোম্বাই-মার্কা মারপিটের দুটি দৃশ্য—এক, ডাকাত-সর্দার দ্বারা কাশিমের হত্যা দৃশ্য এবং দুই, ফুটন্ত তেল দ্বারা উৎপীড়িত ডাকাতদের সঙ্গে মর্জিনা-আবদাল্লা প্রমুখের খণ্ড-যুদ্ধের দৃশ্য—যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ছবিটির উপভোগ্যতা বর্ধিত করবার জন্যে ছবির শেষভাগে মর্জিনার নৃত্য ও ডাকাত সর্দারকে হত্যার অংশটি ইস্টম্যান-কলারে গৃহীত হয়েছে। এই রঙীন অংশটিতে ক্যাবারে ঢংয়ে মর্জিনা যে-নাচ নেচেছেন, তা আজকের দিনে মধ্যপ্রাচ্যের হোটেলগুলিতে খুব চালু থাকলেও যে-যুগের কাহিনী, সেই যুগের উপযোগী কিনা, এ প্রশ্ন কেউ কেউ তুলতে পারেন। কিন্তু আজকের দিনের দর্শকদের চিত্ত-বিমোহনের জন্যে ছবিখানি তৈরী হয়েছে, এ-কথা ভুললে চলবে না।

অভিনয়ে প্রধানা চরিত্র মর্জিনার ভূমিকায় মিঠু মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অধিকাংশ স্থলেই তাঁর অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত সাবলীল। নৃত্যেও তিনি প্রশংসনীয় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আবদাল্লার ভূমিকায় রবি ঘোষ তাঁর স্বাভাবিক হাবভংগীর সুব্যবহার করেছেন। আলিবাবার চরিত্রে সন্তোষ দত্ত চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। কাশিমের ভূমিকায় শেখর চট্টোপাধ্যায় একটু অতি-অভিনয়ের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন এবং স্বরগ্রামকেও অযথা উচ্চে তুলেছেন। বরং ডাকাত সর্দারের বেশে উৎপল দত্ত ঢের বেশী স্বাভাবিক। বাবা মুস্তাফার ভূমিকায় জহর রায়ের রূপসজ্জা অত্যন্ত প্রশংসনীয়; তবে বাচনে তিনি জনৈক বিখ্যাত অভি-নেতার অনুকরণ করবার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। দেবরাজ রায়ের হাসান (ক্ষীরোদপ্রসাদের হুসেন) শিল্পী ও প্রেমিক রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আলিবাবা ও কাশিমের স্ত্রীর চরিত্রে যথাক্রমে গীতা দে ও কাজল গুপ্তের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছে শিল্প-নির্দেশনা। তবে ডাকাতের গুহার মধ্যে 'শো-কেসে' সাজানোর মতো অলঙ্কারাদি না রেখে বড়ো বড়ো সিন্ধুকে ওগুলি রাখা ঢের স্বাভাবিক হত। সুরকার সলিল চৌধুরী নতুন গানে নতুন সুর দিয়ে যতখানি না মাতাতে পেরেছেন, তাঁর নৃত্য এবং আবহসংগীত তার থেকে ঢের বেশী উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে।

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত, পিয়ালী পিকচার্সের "মর্জিনা আবদাল্লা"কে আজকের দিনের সাধারণ দর্শকরা যথেষ্টই উপভোগ করবেন।

(২) দি রাইট অ্যান্ড দি রঙ (ইংরেজী)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর ত্রিনিদাদ থেকে যে-প্রথম রঙীন কাহিনীচিত্র কলকাতা তথা ভারতে এসে পৌঁছেছে, তার নাম হচ্ছে "দি রাইট অ্যান্ড দি রঙ"। ছবির কাহিনীতে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিরক্ষর আদিবাসী ও সেখানকার কিছু ভারতীয় প্রবাসীদের ওপর শ্বেতচর্মধারীদের অকথ্য অত্যাচারের বিবরণ। ম্যালকম (মাশা) হচ্ছে একজন প্ল্যান্টার। তার অধীনে যারা কাজ করে, তারা নির্বিচারে তার আদেশ শুনতে বাধ্য। কোনোরকমে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলেই সে অপরাধীকে ফাঁসিতে লটকে দেয়। এমনকি তার ভোগলালসার হাত থেকে কোনো রমণীকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেও মাশা ঐ একই শাস্তির ব্যবস্থা করে। ভারতীয় প্রেমিক-প্রেমিকা, শ্যাম ও চন্দা লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে নদীর অপর কূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মাশার নারী-লালসা তার স্ত্রী ক্রিস্টিনাকে পীড়িত করে। শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে দাস-দলপতি জোজোকে বাধ্য করে তার সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করতে। মাশা চোখের সামনে নিজের স্ত্রীকে এক দাসের সঙ্গ-সুখরতা দেখে ক্ষেপে ওঠে এবং দুজনকেই প্রচুর প্রহার করবার পরে জোজোর প্রণয়িনী ভি-ডিকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। দাস-কর্মীরা মাশার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘ-বদ্ধ হয়;....কিন্তু জোজো অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনোরকম প্রতিশোধ না নিয়ে সকলকে অহিংস থাকতে পরামর্শ দেয় এবং আত্মনির্ভরশীল হতে বলে। ওরা মাশার আশ্রয় ত্যাগ করে নিজেদের একটি বাগান তৈরী করতে উদ্যোগী হয়। দুজন দলত্যাগী, বিভীষণের চক্রান্তে ওরা মাশার বন্দুকের সামনে কয়েকজন প্রাণ দেয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অহিংস রীতিতেই ওরা জয়ী হয়। মহাত্মা গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিংয়ের মতবাদ ওদের চিত্তকে অধিকার করে।

ছবির প্রযোজক-পরিচালক হরবংশ-কুমার প্রথমে বছর আষ্টেক বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রজগতে এক্সট্রা, সহকারী ব্যবস্থাপক, সহকারী পরিচালক প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ করবার পরে ত্রিনিদাদে যান ভারতীয় ছবির পরিবেশক-রূপে কাজ করবার জন্যে। সেখানে বছর ছ-আট বাদে বেশ কিছু অর্থ-সঞ্চয় করে তিনি চিত্রপ্রযোজকের ভূমিকা

অভিনয়/শমিত ভঞ্জ ও রাধা সালুজা। ফটো : অমৃত

গ্রহণ করবার সংকল্প করেন এবং লণ্ডন থেকে চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, চিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী প্রভৃতি আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এঁরা এত বেশী টাকা দাবি করেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি সহকারী পর্যায়ের চিত্রশিল্পী শব্দযন্ত্রী ও সম্পাদক আনিয়ে নিজেই একটি অ্যারিফ্লেক্সজাতীয় ক্যামেরা এবং নাগ্রা শব্দযন্ত্র কিনে তাঁদের সাহায্যে মাত্র পঁচিশ দিনের শুটিংয়ে তাঁর নিজেরই লিখিত গল্পের চিত্ররূপ গ্রহণ করেন। ছবির সংগীতাংশ—ইংরাজী ও হিন্দী গান সমেত তিনি গ্রহণ করেন বোম্বাইয়ে। এবং মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছবিখানিকে প্রদর্শনের উপযোগী করে তোলেন।

—এই পর্যন্ত হরবংশকুমারের কাজ নিশ্চয়ই উৎসাহ পাবার যোগ্য। তবে তাঁর ছবিটি শেষ পর্যন্ত যে-রূপ গ্রহণ করেছে, তা বেশ কিছুটা বোম্বাইমার্কা হিন্দী ছবির অনুকরণ এবং যতই তিনি বক্তব্য হিসেবে হিংসার ওপর অহিংসার প্রতিষ্ঠা করতে চান না কেন, তাঁর ছবি কিন্তু দেখিয়েছে, বন্দুকের নলই হচ্ছেই পার্থিব শক্তির উৎস; তা নইলে মাশাকেও শেষপর্যন্ত বন্দুকের গুলীতে প্রাণ দিতে হয় কেন? অবশ্য ছবির একেবারে শেষাংশে মহাত্মা গান্ধী ও মার্টিন লুথার কিংয়ের বিভিন্ন সময়ের ছবিগুলি অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করে অহিংসা নীতির ওপর যে জোর দেওয়া হচ্ছে, তা অনস্বীকার্য।

অভিনয় সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এই ছবিতে অভিনয় করেন নি। সেই হিসাবে বলতে হয়, জোজো ও ভি-ভির ভূমিকায় জাসে ম্যাকডোনাল্ড ও গ্লোরিয়া ডেভিডের অভিনয় আন্তরিকতাপূর্ণ। শ্যাম ও চন্দারূপে রালফ্ মহারাজ এবং অ্যাঞ্জেলা শিউকরণকে সর্বাংশে ভারতীয় বলেই মনে হয়। মাশার ভূমিকায় ফ্রাঙ্ক রাইটার বেশ কিছুটা একঘেয়ে। বরং ক্রিস্টিনরূপে এলান লা গাউ একটি শান্ত অথচ নিপীড়িত ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুসান রূপিনী সুসান হীকস নাচের দৃশ্যে মনোরম।

ছবিতে ফোটোগ্রাফীর কাজ মোটের উপর যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বেদপাল বর্মার সুরারোপ বোম্বাইয়ের ধারা অনুসরণ করেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম রঙীন ছবি হিসেবে "দি রাইট অ্যান্ড দি রঙ" বক্তব্য এবং প্রয়াসের দিক দিয়ে প্রশংসনীয়।

মঞ্চাভিনয়

'অন্বেষা'র অপমানিত

গত ২৮ জানুয়ারী রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল 'অন্বেষা' প্রযোজিত, নরেশ বসু পরিচালিত নাট্যকার গঙ্গাপদ বসুর 'অপমানিত'।

সাম্প্রতিককালের অতিনাটকসর্বস্ব আড়ম্বরধর্মী নাটকের অভিনয়জগতে অন্বেষার বর্তমান প্রযোজনা একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিভিন্ন দিক থেকে নাটকটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবেন নাট্যরসিক দর্শক।

কাহিনীর বাস্তবতা নাটকের প্রধান সম্পদ, জীবনধর্মী বাস্তব কাহিনী [illegible] মঞ্চসাফল্যেরও সহায়ক। অপমানিত নাটকে লক্ষ্য করা গেল জীবনধর্মী বলিষ্ঠ একটি কাহিনী। সমাজের বিশেষ একটি সমস্যা রূপ লাভ করেছে এই নাটকে। প্রতিক্রিয়াশীল একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর মূলে নির্মম আঘাত এই নাটকের প্রতিপাদ্য। অবশ্য জীবনই নাট্যকারের উপজীব্য; চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ—জীবনের ট্র্যাজিক আলেখ্যই অপমানিত নাটক। সার্থক নাটকের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য কাহিনীর গতি শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকা। পরিচালক বর্তমান নাটকটির অভিনয়ের মধ্যে গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি সৎ নাটকের সার্থক প্রযোজনার জন্যে যে দলগত সু-অভিনয় অপরিহার্য—অন্বেষার শিল্পীরা সেই দুর্লভ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রুমকি চরিত্রে শ্রীমতী আরতি মৈত্রের অভিনয় দীর্ঘদিন দর্শকদের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে থাকবে। তাঁর মুখে বাউড়ীদের ভাষা যেমন স্বাভাবিক, তাঁর বাচনভঙ্গী তেমনি সাবলীল। স্ত্রী এবং জননী রুমকির

ফ্রাংকো পলেসলো/এল এস ডি চিত্রে

অন্তর্দ্বন্দ্বকে, ক্ষত-বিক্ষত নারীহৃদয়ের বেদনাময় রূপটিকে অনুভূতি এবং মননের সংযোগে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী মৈত্র। তাঁর কয়েকটি অভিব্যক্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে, বুঝি বা বিস্মিত করে। নির্মল সেন-এর অভিনয়ে 'রাজা রায়'-এর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি শ্রীসেন দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্গা সার্থক চরিত্রাভিনয়। ব্যাঙ্গার অন্তরবেদনা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক অভিনয়গুণে দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত হয়েছে। বুধন একটি টাইপ চরিত্র, কিন্তু এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটুকু নিমাই দের কুশলী অভিনয়গুণে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বুড়ো'র চরিত্রে স্বরাজ বসু তাঁর অভিনয়ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গী, আবেগ, অভিব্যক্তি দর্শকদের অনুভূতিকে আলোড়িত করে। স্বরাজ বসুর অভিনীত আর একটি চরিত্র চুণীলাল। চরিত্রটির ব্যঙ্গ লক্ষ্যণীয়, শ্রীবসুর অভিনয়ও প্রাণবন্ত, চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তিনি প্রতিমুহূর্তে সচেষ্ট, তবু শেষপর্যন্ত চরিত্রটির ভারসাম্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

চন্দনরূপী স্বদেশ বসু আগাগোড়া দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। কিন্তু হীরালাল চরিত্রে স্বদেশ বসুর অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে। এই জটিল চরিত্রের অন্তর রূপটি সূক্ষ্ম মনন ও ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তির স্মরণীয় নানান মুহূর্ত রচনার মধ্যে দিয়ে শ্রীবসু দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই চরিত্রে তাঁর অভিনয় যথার্থই উচ্চমানের।

প্রশান্ত সেন ভীমানন্দরূপে সজীব। অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের পল্লব, হীত তালুকদারের চুমকি যথাযথ চরিত্রাভিনয়।

নাটকটির বড় সম্পদ এর সংলাপ। সাধারণের মুখের ভাষায় এমন সুনিপুণ প্রয়োগ সম্প্রতিকালের নাটকে প্রায় দুর্লভ। দুর্লভ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন দীপালী বসুরায় প্রারম্ভিক লোকগীতিটির সুন্দর সুরের সুমার্জিত ব্যবহারে। শ্রীমতী আরতি মৈত্রের গাওয়া সাঁওতালী গানটির সুরও সুন্দর—মূলে নাট্যরসের বাইরে এটি উপরি পাওনা। নিমাই দের মঞ্চ-সজ্জা বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। ভাব ও আঙ্গিক রচনার ক্ষেত্রে অবশ্য আরো চিন্তার অবকাশ আছে। এবং প্রয়োজন আছে দু একটি চরিত্রে সংলাপ সংযত-করণের। সামগ্রিক বিচারে 'অপমানিত' 'অন্বেষা'র একটি সফল প্রযোজনা।

কোন্নগর উদয়াচল সংঘ : বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি কোন্নগর উদয়াচল সংঘ নিবেদন করেন 'নীলদর্পণ' ও 'তাইতো' নাটকদ্বয়। হুগলী জেলায় কোন্নগর উদয়াচল সংঘ খ্যাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই খ্যাতি এ'রা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখেছেন উপরোক্ত নাটকদ্বয় মঞ্চস্থ করে, বিশেষ করে 'নীলদর্পণ' নাটকখানি। দীনবন্ধুর মূল নাটক অবলম্বনে 'নীলদর্পণ' নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন তরুণ নাট্যকার বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নীলদর্পণ' নাটকটি পরিচালনা করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন মণীন্দ্র মিত্র।

'বেগম আসমানতারা' যাত্রাভিনয় : ডায়-মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত আশুরালী বান্ধব নাট্যসমাজ-এর শিল্পীরা স্থানীয় লোকোৎসবে গত ২২ জানুয়ারী ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বেগম আসমানতারা' যাত্রানাটক অভিনয় করেন। অনুষ্ঠানে সভা-পতিত্ব করেন অমিয়রঞ্জন দাশ ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অধ্যাপক পান্নালাল হালদার। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়াংশে ছিলেন সত্য সরকার (গণেশ-নারায়ণ), রুহিত দলুই, টগর মল্লিক, অশ্বিনী দাশ, শর্বরী হালদার, অমূল্য মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, সন্তোষ হালদার, চন্দ্রশেখর সামন্ত, সন্তোষ মণ্ডল, তারক

পাড়ুই, পঞ্চানন মণ্ডল, গান্ধী মণ্ডল, গোবিন্দ ঘোষ, মনোরঞ্জন হালদার, বিক্রুপদ মণ্ডল ও কুনারায়ণের ভূমিকায় অমৃতলাল পাড়ুই। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব নেন অমৃতলাল পাড়ুই ও সংগীত-পরিচালক ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ হালদার। গায়ক ছিলেন বলরাম গায়েন ও মাঃ রবীন।

রাণাঘাট অ্যাথলেটিক ক্লাব : সম্প্রতি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে রাণাঘাট অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভ্যগণ রবীন্দ্রভবন মঞ্চে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'উত্তাল তরঙ্গ' নাটকটি প্রদ্যোত বসাকের নির্দেশনায় সুঅভিনয় করেন। নাটকে অংশ গ্রহণ করেন সুজন ঘোষ, নারায়ণ প্রামাণিক, রবীন্দ্র প্রামাণিক, প্রীতিময় দে চৌধুরী, তড়িৎ প্রমাণিক, অচিন্ত্য হালদার, সুনীত মল্লিক, স্বপন পাল, তপন চক্রবর্তী, জ্যোতি কুণ্ডু, নৃসিংহ দে চৌধুরী, রাজর্ষি দে চৌধুরী, নির্মল দেবনাথ ও গোপা কুণ্ডু।

কালিন্দী অভিনয়ঃ সম্প্রতি সেন্ট্রাল একসাইজ (নবম ডিভিসন) ক্লাবের সভ্যগণ স্টার রঙ্গমঞ্চে তারাশঙ্করের কালিন্দী নাটকটি বীরু মুখার্জির নির্দেশনায় সু-অভিনয় করেন। অংশগ্রহণে ছিলেন সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, নিখিল চৌধুরী, কমল প্রধান, রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, রণধীর দাশগুপ্ত, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম হালদার, হরিপদ দাস, ননীগোপাল বড়ুয়া, সবিতা মুখার্জি।

কলামন্দিরে 'ইনক্লাব'—থিয়েটার সেন্টার আসিফ করিমভয়ের বিতর্কমূলক নাটক 'ইনক্লাব' মঞ্চস্থ করছে ১৯, ২০ এবং ২১ ফেব্রুয়ারী কলা-মন্দিরে।

যে নক্সাল আন্দোলন গেল কয়েক বছরে চরমে উঠেছিল, সেই বিষয় নিয়ে লেখা এই নাটক 'ইনক্লাব'। নাট্যকার কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে যা ঘটেছিল, তারই নিরপেক্ষ রূপ দিয়েছেন। নাটকটি পরিচালনা করছেন তরুণ রায়। অভিনয় করছেন চল্লিশজন শক্তিশালী শিল্পী। আলো ও মঞ্চের দায়িত্ব যথাক্রমে আশুতোষ বড়ুয়া ও সুবিমল রায়ের।

তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটকটি ১৯৭০-৭১ এর নকশাল আন্দোলনের পটভূপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। চাষী রুখে দাঁড়িয়েছে জমিদার, জোতদারের বিরুদ্ধে—সে শিখেছে 'লাঙল যার, জমি তার'। ছাত্র সম্প্রদায় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও তাকে যাঁরা পোষণ করছেন, সেই অধ্যাপকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে : 'সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা নিপাত যাক'। কলের শ্রমিকেরা মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে : 'পুঁজিপতিদের ধ্বংস করো—দুনিয়ার মজদুর এক হও।' ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে—আবহমানকালের প্রচলিত পন্থাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে, ভেঙেচুরে দিয়ে নতুন শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে হবে, যেখানে বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। ইংরেজ নিজের স্বার্থে আমাদের দেশে গড়ে তুলেছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে, ব্যবহারে, আইনে, কানুনে আমরা এতকাল সেই সমাজেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছি। আজকের যুবসমাজ সেই সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে চায়। এবং তারই ফলে নকশাল আন্দোলন। এই শক্তিশালী আন্দোলনের বিরুদ্ধে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় জন্যে এগিয়ে গেছে পুলিশ ও সৈন্য। দুই দলে হয়েছে প্রচণ্ড সংঘর্ষ; সেই সংঘর্ষের ফলে দুইপক্ষেই কত যে হতাহত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ তালিকা বোধকরি আজও প্রস্তুত হয়নি।

আসিফ করিমভয় নির্লিপ্তভাবে এই আন্দোলনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর নাটকে। তিনি আহমেদ নামধারী যে-যুবককে আন্দোলনের নেতা করেছেন, দর্শকের শেষ পর্যন্ত বুঝতে ভুল হয় না সেই হচ্ছে প্রোফেসার দত্তের নিখোঁজ বড়ো ছেলে। নিজের ভাইয়ের কাছেও সে নিজেকে রাখে অজ্ঞাত। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সে উল্কার মতো ছুটে বেড়ায় ছাত্র-চাষী-মজদুরদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহকে সফল করে তুলতে। যে-সমাজকে সে জাতির পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করে, তাকে সে ভাঙবেই, এই তার পণ। তার পণের প্রথম বলি হল জমিদার জীবন মল্লিক, যে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ভালো লোক হয়েও জমিদারীর মোহ থেকে মুক্তি পায়নি। তার দ্বিতীয় বলি হল তার নিজের বাবা—প্রোফেসার দত্ত; এঁকে সে অত্যন্ত শান্তভাবে নিজের হাতে হত্যা করল; কারণ প্রোফেসার দত্ত হচ্ছেন সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতীক। ভাই অমর নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে এই আন্দোলনের সঙ্গে: জমিদারকন্যা সুপ্রিয়ার ভালোবাসা তাকে বর্মের মতো আগলে থেকেও এই আন্দোলন থেকে তফাত করতে পারে না। কৃষক দলের নেতৃত্ব নিয়েছে শমীক; লেখাপড়ার ঘাটতি সে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে পূরণ করে। সে জানে, ন্যায়ের কাছে দয়াধর্মের স্থান নেই। যারা এতদিন ধরে বঞ্চনা করে এসেছে, শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে গেলে তাদের শাস্তি দিতেই হবে নির্বিচারে। এরই মাঝে আছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দালালের চক্রান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ইনকিলাব'কে মঞ্চস্থ করতে গিয়ে নির্দেশক তরুণ রায় মঞ্চের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন স্তরে তাঁর দৃশ্যগুলিকে সংস্থাপিত করেছেন এবং আঞ্চলিক আলোকিত-করণ (জোনাল লাইটিং) পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন। কলামন্দিরে ঘূর্ণমঞ্চের সুবিধা আছে কিনা জানি না। তবে নাটকাভিনয়ের জন্যে ঘূর্ণন-মঞ্চ ঢের বেশী উপযোগী ও কার্যকর। কারণ, চাষীদের জমায়েত এবং কলেজে ছাত্রসমাবেশের দৃশ্যগুলি বাস্তবভাবে ফুটে ওঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

অভিনয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেন জমিদার জীবন মল্লিকের ভূমিকায় সুধীর রায়চৌধুরী; এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবন্ত অভিনয় কচিৎ দেখা যায়। শমীকের ভূমিকাভিনয়কারী অর্জুন মুখোপাধ্যায় তেজস্বী চাষী যুবককে বিশ্বস্ততার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। প্রোফেসর-পুত্র অমরের বিক্ষুব্ধ অন্তরকে ভাষা দিয়েছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। প্রোফেসরের নিখোঁজ বড়ো ছেলে, আমেদের ছদ্মবেশধারীরূপে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ইস্পাত-কঠিন নেতৃত্বকে চমৎকারভাবে রূপায়িত করেছেন। প্রোফেসর দত্তবেশে তরুণ রায় যদি তাঁর বাচনে সুরকে সর্বাংশে বর্জন করতে পারতেন, তাহলে ভূমিকাটি ঢের বেশী প্রত্যয়নিষ্ঠ হত। শ্রীমতী দত্ত রূপে দীপান্বিতা রায় সম্বন্ধেও সমান কথাই প্রযোজ্য। জমিদারকন্যা অমরের প্রেমিকা সুপ্রিয়ার ভূমিকায় সুনন্দা মিশ্রের অভিনয় আন্তরিকতাপূর্ণ। অন্যান্য ভূমিকায় রমেন চৌধুরী, সমতা দে গীতশ্রী রাহা, অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ বসু প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

নৈহাটিতে সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা—যান্ত্রিক পরিচালিত সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা ও নাট্যোৎসব গেল ৩১ জানুয়ারী শেষ হয়েছে। ২০ জানুয়ারী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন নাট্যসমালোচক ও প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। ঐদিন সাহিত্যিক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি পশুপতি চট্টোপাধ্যায় আজকের নাটকের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মোট আটচল্লিশটি সংস্থা যোগদান করে। নাট্যোৎসবে যান্ত্রিক সম্প্রদায় নিখিল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের পঃ বঙ্গ সংগীত নাটক একাডেমীর প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত একাংক নাটক 'সন্ধবামী' ও 'হংসবদলের মেলা' মঞ্চস্থ করে। অনুষ্ঠানের শেষদিনে রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'আমার জননী' মঞ্চস্থ করে যান্ত্রিক নাট্যগোষ্ঠী। ঐদিন ভাটপাড়ার শিল্পীলোক গোষ্ঠী সৌমেন ঘোষের পরিচালনায় রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'শ্মশানে রক্তের স্বাদ' নাটকটির সুপ্রযোজনা করে দর্শকগণের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছে। দীর্ঘ বারদিনের এই নাট্যানুষ্ঠানে নাট্যপ্রদর্শনী ও নাট্যালোচনা নৈহাটির নাট্যপিপাসু দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

আগ্রহী গোষ্ঠীর অভিনয় : গত ১লা জানুয়ারী হাওড়া নাট্য সম্মেলনে আগ্রহী গোষ্ঠী 'ঝি ঝি পোকার কান্না' নাটকটি সার্থক ভাবে অভিনয় করে। সু-অভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন—সুজিত ভকত, স্বপন কুণ্ডু, কাবুল লাহিড়ী, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, শিবাজী বোস, গোপাল সাহা, কৃষ্ণাশিস ধর, গৌর দত্ত, সমীর লাহিড়ী। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন তপন ধর।

বিবিধ সংবাদ

১৯৭২-এর চলচ্চিত্র বিষয়ে

বেংগল ফিল্ম জার্ণালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর বিচার

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ (বেংগল ফিল্ম জার্ণালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন)-এর ১৯৭২ সালে কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র বিষয়ক বিচারের ফলাফল গেল বুধবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী রাত্রে ঘোষণা করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ভোটগ্রহণের ফলে ১৯৭২-এর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র বিবেচিত হয়েছে বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত হিন্দী ছবি "অনুভব"। বাঙলা ও হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক বিবেচিত হয়েছেন যথাক্রমে মৃণাল সেন (কলকাতা-৭১) ও শিবেন্দ্র সিংহ (ফির ভী)।

বছরের শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় চিত্র : ১। অনুভব, ২। ফিরভী, ৩। কলকাতা-৭১ ৪। পাকীজা, ৫। দস্তাক, ৬। বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা, ৭। উপহার, ৮। হরে কৃষ্ণ রাম, ৯। মেমসাহেব, ১০। বাবরুচি।

বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিতদের তালিকা নিম্নরূপঃ অভিনয় (বাঙলা—উত্তমকুমার (স্ত্রী); সুচিত্রা সেন (আলো আমার আলো); (হিন্দী)—রাজেশ খান্না (বাবরুচি); জিনাত আমন (হরে কৃষ্ণ হরে রাম)। সহ-অভিনয় (বাঙলা) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (স্ত্রী), সুপ্রিয়া দেবী (ছিন্নপত্র), বিনতা রায় (কলকাতা-৭১); (হিন্দী)—শত্রুঘ্ন সিংহ (তনুহাই), উর্মিলা ভাট (ফির-ভী)। পরিচালনা (বাঙলা)—মৃণাল সেন (কলকাতা-৭১), (হিন্দী)—শিবেন্দ্র সিংহ (ফির-ভী)। চিত্রনাট্য (বাঙলা)—মৃণাল সেন (কলকাতা-৭১), হিন্দী)—শিবেন্দ্র সিংহ (ফির-ভী)। সংলাপ (বাঙলা)—সলিল দত্ত (স্ত্রী), হিন্দী—শিবেন্দ্র সিংহ (ফির-ভী)। সঙ্গীত-পরিচালনা (বাঙলা)—নচিকেতা ঘোষ (স্ত্রী), (হিন্দী)—রাহুল দেববর্মণ (হরে কৃষ্ণ হরে রাম)। গীত-রচনা (বাঙলা)—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (স্ত্রী), (হিন্দী)—নীরজ (শর্মিলা)। নেপথ্য কণ্ঠসংগীত (বাঙলা)—মান্না দে (স্ত্রী), কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (বিগলিত করুণা); (হিন্দী)—কিশোরকুমার (হরে কৃষ্ণ হরে রাম), লতা মঙ্গেশকার (পাকীজা)। সাদাকালোয় আলোকচিত্রগ্রহণ (বাঙলা)—কে, কে, মহাজন (কলকাতা-৭১), (হিন্দী)—নন্দু ভট্টাচার্য (অনুভব); রঙীন চিত্রগ্রহণ (হিন্দী)—জোসেফ বীরশিংং (পাকীজা)। সম্পাদনা (বাঙলা)—গঙ্গাধর নস্কর (কলকাতা-৭১), (হিন্দী)—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (দস্তাক)। শিল্পনির্দেশনা (বাঙলা)—বংশী চন্দ্রগুপ্ত (কলকাতা-৭১), (হিন্দী)—এন, বি, কুলকার্ণি ও ডি এস মালবাঙ্কার (পাকীজা)। শব্দানুলেখন (বাঙলা)—নৃপেন পাল, অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চট্টোপাধ্যায় (আলো আমার আলো), (হিন্দী)—আর জি পুশলকার (পাকীজা)।

সাগিনা/সায়রাবানু ও দিলীপকুমার।
পরিচালনা তপন সিংহ

বছরের বিশিষ্টতম গুণপনার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন মীনাকুমারী (পাকীজা)।

শ্রাবণ সন্ধ্যা—বাংলা চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন অভিনীত কালীমাতা প্রোডাকসন্সের 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' ছবিটি রাধা, পূর্ণ প্রাচী ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে শিগ্গীরই মুক্তিলাভ করবে। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন—বীরেশ্বর বসু। 'প্রান্তিক' ছবিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। সংগীতবহুল এই ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন—নচিকেতা ঘোষ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে কন্ঠদান করেছেন—মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন। অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছবিটির প্রধান সম্পাদক। দীনেন গুপ্ত হলেন—চিত্রগ্রহণ উপদেষ্টা। চরিত্র-চিত্রণে আছেন—শমিত ভঞ্জ সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, জহর রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বঙ্কিম ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, অপর্ণা দেবী, শ্যাম বড়ুয়া, তৃপ্তি দাস, তপতী বর্মণ, আইভিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দিরা দে ও নবাগত সুনীলকুমার। কালীমাতা ফিল্ম ছবিটির পরিবেশক।

সিনে সেন্ট্রাল-এর উদ্যোগে জাপানী চিত্রের প্রদর্শনী

ক্যালকাটা সিনে সেন্ট্রাল জাপানী কনসুলেটের সহযোগিতায় ৪ ও ১১ মার্চ ম্যাজেস্টিক চিত্রগৃহে দুখানি জাপানী ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। ছবি দুটির নাম ঃ 'অ্যাক্টার্স রিভেঞ্জ" এবং 'বিয়ন্ড দি গ্রীণ হিলস্'। জাপানী ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কাছে অভিনব ও চিত্তাকর্ষক হয়। আশা করা যায়, এ-দুখানি ছবিও তার ব্যতিক্রম হবে না।

কলকাতার ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারত বনাম জাপানের ৪র্থ টেবল টেনিস টেস্টে ক্রীড়ারত ১৯৬৯ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান সিগেও ইতো।

দর্শক

টেবল টেনিস টেস্ট

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত প্রথম টেবল টেনিস টেস্টে জাপান ৫—০ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে বিশ্ব খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারতের অধিনায়ক মীরকাশিম আলি বাদে কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ই জাপানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি। বিশ্বের ২নং খেলোয়াড় জাপানের সিগেও ইতো এবং মীরকাশিমের খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইতো ১৯—২১, ২১—১০ ও ২১—১০ পয়েন্টে মীরকাশিম আলিকে পরাজিত করেন।

মাদ্রাজের দ্বিতীয় টেবল টেনিস টেস্ট খেলাতেও জাপান ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। এই দ্বিতীয় টেস্টে ভারতবর্ষকে ৫—০ খেলায় হারাতে জাপানের মাত্র ৭০ মিনিট সময় খেলতে হয়েছিল এবং জাপান একটা সেটেও হারেনি।

কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে জাপান ৫-২ খেলায় জয়ী হয়। ভারতের পক্ষে জয়ী হন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান নীরজ বাজাজ এবং মীরকাশিম আলি (মতোকুনি আরামাকির বিপক্ষে)।

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত চতুর্থ টেস্টে জাপান ৫-১ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে। ভারতের পক্ষে মীরকাশিম আলি একটি খেলায় জয়ী হন (তোমামি মেইজির বিপক্ষে)। ১৯৬৯ সালের বিশ্ব সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং বর্তমান বিশ্বের দুই নং খেলোয়াড় সিগেও ইতো।

গোহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে জাপান শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলায় ৫—০ খেলায় ভারতকে পরাজিত করার সূত্রে টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

টেবল টেনিসে জাপানের সাফল্য

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের প্রথম যোগদান ১৯৫২ সালে, বোম্বাইয়ের ১৯তম আসরে। জাপান তার এই প্রথম যোগদানের বছরেই মেয়েদের দলগতবিভাগের কোর্বিলোন কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগের তিনটি খেতাব পায়—পুরুষদের সিঙ্গলসে হিরোজি সাটো, পুরুষদের ডাবলসে ফুজী এবং হায়াসী এবং মেয়েদের ডাবলসে নিশিমুরা এবং নারাহারা। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের এই পুরস্কার লাভ এশিয়া মহাদেশের পক্ষে প্রথম। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর প্রতি বছরের পরিবর্তে ১৯৫৭ সালের পর থেকে এক বছর অন্তর বসছে। জাপান এপর্যন্ত ১২টি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করে মোট ৮৪টি খেতাবের মধ্যে ৪৪টি খেতাব নিয়ে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। জাপান ১৯৫২ সাল থেকে এপর্যন্ত ১৯৫৩ সাল বাদে প্রত্যেকটি আসরে যোগদান করেছে।

১৯৫২ : ৪টি খেতাব জয় : মেয়েদের দলগত বিভাগের কোর্বিলোন কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মেয়েদের ডাবলস।

১৯৫৩ : প্রতিযোগিতায় জাপান অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৫৪ : ৩টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে সোয়েথলিং এবং কোর্বিলোন কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৫ : ২টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ এবং ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস।

১৯৫৬ : ৪টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস।

১৯৫৭ : ৫টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস।

১৯৫৯ : ৬টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ (উপর্যুপরি ৫ বার) এবং কোর্বিলোন কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস।

১৯৬১ : ৩টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস।

১৯৬৩ : ৪টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ (উপর্যুপরি ৪ বার—প্রতিযোগিতায় রেকর্ড), ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস।

১৯৬৫ : ২টি খেতাব জয় : ব্যক্তিগত বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস।

১৯৬৭ : ৬টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস।

১৯৬৯ : ৪টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ; ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস।

১৯৭১ : ১টি খেতাব জয় : দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ।

এক নজরে হিসাব

জাপান বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ১২টি আসরে কিভাবে ৪৪টি খেতাব পেয়েছে তার এক নজরে হিসাব:

সোয়েথলিং কাপ	৭
কোর্বিলোন কাপ	৮
পুরুষদের সিঙ্গলস	৭
পুরুষদের ডাবলস	৫
মেয়েদের সিঙ্গলস	৬
মেয়েদের ডাবলস	৪
মিকস্‌ড ডাবলস	৭
মোট :	৪৪

একই বছরে দুটি কাপ জয়

জাপান একই বছরে দলগত বিভাগের দুটি কাপই (সোয়েথলিং ও কোর্বিলোন কাপ) জয়ী হয়েছে মোট ৪ বার (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭)। এখানে উল্লেখ্য, জাপান ছাড়া একই বছরে দলগত বিভাগের দুটি কাপ জয়ী হয়েছে আমেরিকা ১ বার (১৯৩৭) এবং প্রজাতন্ত্রী চীন ১ বার (১৯৬৫)।

এক আসরে সর্বাধিক খেতাব

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যেখানে মোট খেতাব অর্থাৎ পুরস্কারের সংখ্যা ৭টি, সেখানে জাপান এক বছরের প্রতিযোগিতায় ৬টি করে খেতাব অর্থাৎ পুরস্কার জয়ী হয়েছে দুবার (১৯৫৯ ও ১৯৬৭ সালে)। জাপান ছাড়া অপর কোন দেশের পক্ষে এক বছরের প্রতিযোগিতায় ৬টি খেতাব জয় করা আজও সম্ভব হয়নি।

কলকাতার ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক টেবল টেনিস সিঙ্গলস খেলায় জাপানের তোং সুও ইনো। ইনি এই খেলায় সিগেও ইতোকে পরাজিত করেন।

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থান

টনি লুইসের নেতৃত্বে এম সি সি ভারত এবং সিংহল সফরের শেষে পাকিস্তান সফরে গেছে। এম সি সি ১৯৭৩ সালের এই পাকিস্তান সফরে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে—প্রথম টেস্ট লাহোরে, দ্বিতীয় টেস্ট সিন্ধুর হায়দরাবাদে এবং তৃতীয় টেস্ট করাচীতে। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাকিস্তান প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে লর্ডস মাঠে, ১৯৫৪ সালে। সেই সময় থেকে এপর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যে ২১টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের জয় ৯, পাকিস্তানের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১১। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের একমাত্র জয়—১৯৫৪ সালে ওভাল মাঠের ৪র্থ টেস্ট খেলায় ২৪ রানে। এই জয়লাভের ফলে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের ১৯৫৪ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজটি ১—১ খেলায় (ড্র ২) অমীমাংসিত থেকে যায়। পাকিস্তানের এই ২৪ রানে জয়লাভ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলায় যেখানে জয়লাভের জন্যে মাত্র ১৬৮ রানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে ১৪৩ রানের মাথায় তাদের ২য় ইনিংস শেষ হলে পাকিস্তান ২৪ রানে জিতে যায়। এই খেলায় ফজল মামুদের মারাত্মক বোলিংই (৯৯ রানে ১২ উইকেট)। পাকিস্তানের জয়লাভের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, ফজল মামুদের এই ৯৯ রানে ১২টি উইকেট আজও উভয় দেশের পক্ষে একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড হয়ে আছে।

১৯৬৭ সালে লর্ডস মাঠে হানিফ মহম্মদ ৫৪২ মিনিটে ১৮৭ রান তুলে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। তাঁর এই নট আউট ১৮৭ রানই সেই সময়ে পাকিস্তান-ইংল্যাণ্ডের টেস্টে পাকিস্তানের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডে পরিণত হয়। তাছাড়া এই লর্ডস মাঠের খেলাতেই হানিফ মহম্মদ এবং আসিফ ইকবাল ৮ম উইকেটের জুটিতে যে ১৩০ রান তুলেছিলেন তা উভয় দেশের পক্ষে ৮ম জুটির রেকর্ড রান। ১৯৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের ওভাল মাঠে ৯ম উইকেটের জুটিতে আসিফ ইকবাল এবং ইন্তিখাব আলম যে ১৯০ রান তুলেছিলেন, তা ৯ম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড রানে পরিণত হয়।

বিবিধ রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

পাকিস্তান : ৬০৮ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), এজবাস্টন, ১৯৭১

ইংল্যাণ্ড : ৫৫৮ রান (৬ উইঃ ডিক্লে), নটিংহাম, ১৯৫৪

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

পাকিস্তান : ৮৭ রান, লর্ডস, ১৯৫৪

ইংল্যাণ্ড : ১৩০ রান, ওভাল, ১৯৫৪

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড : ২৭৮ রান—ডেনিস কম্পটন, নটিংহাম, ১৯৫৪

পাকিস্তান : ২৭৪ রান—জাহির আব্বাস, এজবাস্টন, ১৯৭১

সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ড ২৫ : পাকিস্তান ১৩

একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

পাকিস্তান : ১১১ ও ১০৪ হানিফ মহম্মদ, ঢাকা, ১৯৬১-৬২

ইংল্যান্ড : শূন্য

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান (ব্যক্তিগত)

ইংল্যান্ড : ৪৫৩ রান (গড় ৯০·৬০) —ডেনিস কম্পটন, ১৯৫৪

পাকিস্তান : ৪০৭ রান (গড় ৬৭·৮৩) হানিফ মহম্মদ, ১৯৬১-৬২

একটি খেলায় সর্বাধিক মোট রান

১১৯০ রান (২২ উইকেটে), এজবাস্টন, ১৯৭১

পাকিস্তান : ৬০৮ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)

ইংল্যান্ড : ৩৫৩ ও ২২৯ (৫ উইঃ)

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

পাকিস্তান : ৬টি (৪৬ রানে)—ফজল মামুদ, ওভাল, ১৯৫৪

ইংল্যান্ড : ৭টি (৫৬ রানে)—জে এইচ ওয়ার্ডল, ওভাল, ১৯৫৪

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট উইকেট

পাকিস্তান : ২০টি (গড় ২০·৪০)—ফজল মামুদ, ১৯৫৪

ইংল্যান্ড : ২২টি (গড় ১৯·৯৫)—ফ্রেডী ট্রুম্যান, ১৯৬২

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

পাকিস্তান : ১২টি (৯৯ রানে)—ফজল মামুদ ওভাল, ১৯৫৪

ইংল্যান্ড : ৯টি (১১০ রানে)—এল জে কোল্ডওয়েল, লর্ডস, ১৯৬২, ৯টি (১১৬ রানে)—ফ্রেডী ট্রুম্যান, লর্ডস, ১৯৬২, ৯টি (১৪৫ রানে)—জে ডি এ লার্টার ওভাল ১৯৬২

[illegible]

কুইলনে ১০ম জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ৪-০ গোলে কেরলকে পরাজিত করে বি সি রায় ট্রফি জয়ী হয়েছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ান বাংলা ৩-০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান লাভ করে। সেমি-ফাইনালে বাংলা ০-২ গোলে কেরলের কাছে হেরে যায়। সেমি-ফাইনালের প্রথম পর্যায়ে কেরল ২-০ গোলে জয়ী হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত থাকে। প্রথম সেমি-ফাইনালে মহীশূর ২-১ ও ২-০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে ২৩তম জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক ফ্রি-স্টাইল, গ্রিকো-রোমান স্টাইল এবং ওরিয়েন্টাল স্টাইল—এই তিনটি স্টাইলেই সার্ভিসেস দল চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

অলিম্পিক ফ্রি-স্টাইল :

১ম সার্ভিসেস, ২য় হরিয়ানা এবং ৩য় মহারাষ্ট্র

গ্রিকো-রোমান স্টাইল :

১ম সার্ভিসেস (৪৯·৫ পয়েন্ট, ২য় মহারাষ্ট্র (২৩·২৫ পয়েন্ট) এবং ৩য় পোস্ট এ্যান্ড টেলিগ্রাফ (২১·২৫ প॰)

ওরিয়েন্টাল স্টাইল :

১ম সার্ভিসেস (৫২ পয়েন্ট), ২য় রেলওয়ে (১৯·৮৩ পয়েন্ট) এবং ৩য় মহারাষ্ট্র (১৯·৫০ পয়েন্ট)।

ভারতের 'রাবার' জয়

১৯৩২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারত পাঁচটি দেশের বিপক্ষে (ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড) যে ৩১টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলেছে বর্তমানে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতের 'রাবার' জয় ৮, পরাজয় ১৭ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ৬ বার।

ভারত এইভাবে ৮ বার 'রাবার' জয়ী হয়েছে : লালা অমরনাথের নেতৃত্বে ১ বার, পলি উমরীগড়ের নেতৃত্বে ১ বার, নরী কন্ট্রাক্টরের নেতৃত্বে ১ বার, মনসুর আলীর নেতৃত্বে ২ বার এবং অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে উপর্যুপরি ৩ বার।

১৯৫২ : লালা অমরনাথের নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ খেলায় (ড্র ২) প্রথম 'রাবার' জয়।

১৯৫৫-৫৬ : পলি উমরীগড়ের নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ খেলায় (ড্র ৩) দ্বিতীয় 'রাবার' জয়।

১৯৬১-৬২ : নরী কন্ট্রাক্টরের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ খেলায় (ড্র ৩) তৃতীয় 'রাবার' জয়।

১৯৬৪-৬৫ : মনসুর আলীর নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১-০ খেলায় (ড্র ৩) চতুর্থ 'রাবার' জয়।

১৯৬৮ : মনসুর আলীর নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-১ খেলায় পঞ্চম তথা বিদেশের মাটিতে প্রথম 'রাবার' জয়।

১৯৭১ : অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১-০ খেলায় (ড্র ৪) ৬ষ্ঠ তথা বিদেশের মাটিতে দ্বিতীয় 'রাবার' জয়।

১৯৭১ : অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১-০ খেলায় (ড্র ২) ৭ম তথা বিদেশের মাটিতে তৃতীয় জয়।

১৯৭২-৭৩ : অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২-১ খেলায় (ড্র ২) ৮ম তথা স্বদেশের মাটিতে ৫ম 'রাবার' জয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স

আমেদাবাদের গুজরাট কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ৩৩তম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী নানী রাধা স্বল্প পাল্লার দৌড়ের তিনটি অনুষ্ঠানে (১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার) প্রথম স্থান পাওয়ার সূত্রে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন এবং মেয়েদের বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি নতুন রেকর্ড হয়েছে—মেয়েদের ৬টি এবং ছাত্রদের ২টি।

চূড়ান্ত ফলাফল

দলগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র বিভাগ : ১ম গুরু নানক বিশ্ববিদ্যালয় (৩৭ পয়েন্ট) এবং ২য় পাঞ্জাবী (৩৩ পয়েন্ট)

ছাত্রী বিভাগ : ১ম বাঙ্গালোর (৪৩ পয়েন্ট) এবং ২য় মাদ্রাজ (২৩ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র বিভাগ : মালকিয়াত সিং (পাঞ্জাবী)

ছাত্রী বিভাগ : নানী রাধা (কেরালা)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৫ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
অতিরিক্ত—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday 16th March, 1973 শুক্রবার, ২ চৈত্র, ১৩৭৯ .52 Paise

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪৬৩	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৬৮	সমুদ্রের অস্থিতে ঝড়	(কবিতা)	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
৪৬৮	দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান	(কবিতা)	—শ্রীফিরোজ চৌধুরী
৪৬৮	অব্যক্ত	(কবিতা)	—শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়
৪৬৯	অন্যান্য		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৭১	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশম্ভাচার্য
৪৭৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৪৭৯	খেলাধূলা		—শ্রীদর্শক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রসঙ্গে

'আমরা গড়ে তুলি' বিভাগে শ্রীসুশান্ত কুমার মিত্রের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্বন্ধে যে লেখাটি গত ৪০শ সংখ্যায় (২৬শে মাঘ, ১৩৭৯) প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি অনেক অনুরাগী পাঠকের মত আমিও আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। পড়ে মনে হোল, অনেকদিনের ধূমায়িত অভিযোগে কিছু যা আগুনের ছোঁয়া লাগল। কেননা, ঐ লেখাটি প্রকাশের কয়েকদিন পরে কিছু বই আনার জন্যে পরিষদে গিয়েছিলাম। তখনই বুঝলাম, 'অমৃতে'র লেখার ফলে ওখানে বেশ একটু নড়াচড়া শুরু হয়েছে।

কিন্তু মনে হয়, সামান্য এইটুকু ধাক্কা না দিয়ে শ্রীমিত্র আরও একটু জোরে ধাক্কা দিলেই বুঝি ভাল করতেন, কেননা, পরিষদ সম্বন্ধে তো অভিযোগের অন্ত নেই। এবং যে কোন পাঠক-পাঠিকা এর সত্যতা স্বীকার করবেন। এমনি করে সত্যিই যদি আঘাত হানতে হানতে পুরোনো পলেস্তারা খসিয়ে নতুন পলেস্তারা লাগানো যায়, সত্যিই তখন হয়ত রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরের স্বপ্ন আবার শীতের জড়তা কাটিয়ে বাসন্তী সৌন্দর্যে সুন্দরতর হয়ে উঠবে। শেষে বলা যায়, কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতার অভিযোগ তুললেই সবার আদরের পরিষদের উন্নয়ন হবে না, কেননা, যেখানে এত বিশ্বজ্জন, এত বড় বড় সরকারী কলেজের গণ্যমান্য অধ্যাপক (যাঁরা হয়ত পরবর্তীকালে শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা হতে পারেন, বা হন) পরিষদের কমকর্তা ছিলেন, আছেন বা হবেন, তাঁদের সবার চেষ্টা যদি থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই একদিন পরিষদ তার আপন গৌরবে দাঁড়াবেই।

রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-৯

শিল্পী নির্বাচনের গোলক ধাঁধা

আকাশবাণীর অডিসন বোর্ডের বিচিত্র ব্যবস্থাপনায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উদীয়মান শিল্পীরা কিভাবে মার খাচ্ছেন তার কিছু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। নিয়মমত অডিসন ফি জমা দিয়ে আবেদনপত্র পাঠানোর পর লোকাল অডিসনের ডাক আসতে বেশ কিছু সময় লেগে যায়। লোকাল অডিসনে পাশ করার আরও এক বছর পর শিল্পীর গান পুনরায় টেপরেকর্ড করে দিল্লীর

এর ফলাফল জানতেও শিল্পীকে প্রায় বছরখানেক অপেক্ষা করতে হয়। স্থানীয় বিচারকদের দ্বারা নির্বাচিত শিল্পীদের পাইকারী হারে ফেল করিয়ে দিল্লী কর্তৃপক্ষ তাঁদের পদাধিকার প্রয়োগ করেন। এইভাবে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের ব্যাপার। ফেল করা শিল্পীকে আরও ছ'মাস অপেক্ষা করার পর পুনরায় ফি জমা দিয়ে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। এইভাবে শিল্পীরা জীবনের অমূল্য সময়গুলি নষ্ট করে হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন।

কলকাতার অডিসন বোর্ডে আছেন ভারত-বিখ্যাত গুণী ও শিল্পীরা। এঁদের সিদ্ধান্তের পরও দিল্লীতে বিচারের ব্যবস্থা স্থানীয় বিচারকদের উপর কর্তৃপক্ষের আস্থাহীনতাই প্রমাণ করে না কি? স্থানীয় বিচারকদের হাতে পাশ করা শিল্পীদের দিল্লীওয়ালারা ব্যাপকভাবে নাকচ করে দিয়ে পরোক্ষভাবে এঁদের অপমানই করেন। আমার প্রশ্ন কলকাতার বিচারকমন্ডলী কিসের মোহে এই অপমান নীরবে হজম করেন!

দেবু লাহিড়ী
বহুবাজার
কলকাতা-১২

একটি লেখা নিয়ে

১৯ মাঘ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ 'অমৃতে' প্রকাশিত একটি লেখায় কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় তার সংশোধনের চেষ্টায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রচনার নাম— 'সুস্বাগতম—মহাকাশচারিণী' এবং লেখিকা সিপ্রা আদিত্য।

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা এবার কেবলমাত্র ভারত সরকারের আমন্ত্রণেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এই সংবাদটি ঠিক নয়।

এবারে ভারতবর্ষে আসবার জন্য তাঁকে প্রথম আমন্ত্রণ জানান ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন। পরে নানা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেই আমন্ত্রণ ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন ও ভারত সরকারের যৌথ আমন্ত্রণে পরিণত হয় (প্রসঙ্গত সোভিয়েত মহিলা সমিতি এবং ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন উভয়ই 'মহিলা আন্তর্জাতিক ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের' অন্তর্ভুক্ত সমিতি)। মহাকাশচারিণী ভারতে আগমনের সময় এই তথ্য বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের সভানেত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী তাঁকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান, তার ছবিও কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

উপরন্তু মহাকাশচারিণী কলকাতা আগমনের যে ছবিটি আপনার সাপ্তাহিকে

সমিতির অন্য সকলের নাম প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভানেত্রী শ্রীমতী অরুণা মুন্সীর নামটি অনুল্লেখিত।

—অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলিকাতা-২৯

শীতের চিড়িয়াখানা

গত ৫ই মাঘ, ১৩৭৯ (ইং, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৩) তারিখে প্রকাশিত 'অমৃতে' শ্রীশুভঙ্কর পাঠকের লেখা 'শীতের চিড়িয়াখানায়' নিবন্ধটি পড়লাম। আমি পক্ষিবিশারদ নই, তবে কৌতূহলবশত মাঝে মাঝে পাখি সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধ পড়ে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করি। তাই নিবন্ধটির বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করছি। অধ্যাপক হ্যালডেনের অনেক লেখা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তবে পাখির পরিব্রাজন (মাইগ্রেসন) সম্বন্ধে ওঁর কোন লেখা আমার চোখে পড়েনি। লেখক যদি অধ্যাপক জে, বি, এস, হ্যালডেনের কথা বলে থাকেন, তবে তাঁর কোন বই বা প্রবন্ধে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা আছে তা' জানালে বাধিত হব।

শ্রীপাঠক 'পিনটেল'কে 'দিকহংসজাতীয় মরাল' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি পিনটেলকে 'দিকহংস' বলে এবং 'লেসার হুইসলিং টিল'কে বলে মরাল। মরাল বা লেসার হুইসলিং টিল ভারতবর্ষীয় পাখি। এমনকি কলকাতার আশেপাশে অঞ্চলেও বাসা বেঁধে, ডিম পাড়ে। চিড়িয়াখানায় যত হাঁসজাতীয় পাখি আসে তাদের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশি। গ্রেটার হুইসলিং টিল সম্বন্ধে বিশিষ্ট পক্ষিবিদরা বলেন, গত প্রায় পনের বছর আগেও কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলেও এদের মাঝে মাঝে দেখা গেছে; এখন সারা ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা এত কমে গেছে, যে আজকাল ওদের দেখতে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। লেখক যদি সত্যিই নিজের চোখে দেখে ঠিক সনাক্ত করে থাকেন তবে উনি ভাগ্যবান।

৯১৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে লেখক লিখেছেন, 'আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যে পাখিরা আসে, তারা মূলত লাদাক, তিব্বত ও সাইবেরিয়ার বাসিন্দা। এ খবর অনেকের জানা নেই।' প্রকৃতপক্ষে শীতকালের চিড়িয়াখানায় যেসব পাখি আসে তাদের মধ্যে পূর্ব তিব্বত, কিছু সাইবেরিয়ার বাসিন্দা দেখা যায়। এবং লাদাকের পাখির সংখ্যা নগণ্য। লেসার হুইসলিং টিলের সংখ্যা সব থেকে বেশি। উত্তর আফরিকার কোন পাখি কলকাতায় আসে বলে আমার জানা নেই। লেখকের যদি এসব পাখির নাম জানা থাকে তবে কোন তথ্য ভিত্তি করে এই কথা লিখেছেন তা জানালে বাধিত হব। লেখকের তালিকাভুক্ত স্পটবিল ডাক ও ম্যালার্ড পুরোপুরি ভারতবর্ষের বাসিন্দা।

[illegible] মিত্র,
[illegible] পার্ক, কলকাতা-৫৫

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর

মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি ও শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা ভক্তজনের কাছে পবিত্র আনন্দের বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। ধর্মের গ্লানি দূর করবার জন্য যুগে যুগে যিনি আবির্ভূত হবার আশ্বাস দেন, নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই দিব্য আশ্বাসবাণী নিয়েই কলিযুগে তাপিত, তৃষিতদের কাছে সশরীরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণহৃদয় শ্রীচৈতন্য সর্বজীবে প্রেম বিতরণ করে বাংলাদেশে ভক্তির বন্যা বহন করে এনেছিলেন। ধর্মের সংস্কার ভেঙে তিনি ধর্মকে বিশ্বজনীন আবেদনে করে তুলেছিলেন সার্থক ও সুন্দর। জাতিভেদ দূর করে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের সারবস্তু হল সর্বজীবে প্রেম। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এই মানবিকতার বাণী প্রচার করে বাংলাদেশের ভাবজগতে এক বিপ্লব আনয়ন করেছিলেন। বংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জীবন ও বাণীর প্রভাব অসাধারণ। বাঙালীর চিন্তাধারায় তিনি এনেছিলেন আমূল পরিবর্তন।

গত পাঁচশত বৎসরে মহাপ্রভুর মহিমা দেশে দেশে ভক্তজনের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আজ দিয়েছে বিশ্বজনীন মর্যাদা। দেশ দেশান্তরে মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বাণী সমাদৃত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি যুগের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। আজ তিনি সর্বযুগের প্রেম, ভক্তি, ভালবাসার অনির্বাণ বিগ্রহরূপে সর্বত্র পূজিত। ধরাতলে অমর্ত্যের পুণ্য প্রস্রবণ বহন করে এনেছিলেন তিনি। পতিত উদ্ধারই ছিল তাঁর ব্রত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে তিনি প্রেম ও করুণার আধার। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত তনু তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে জগতের পরিত্রাণের জন্য দোল পূর্ণিমায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাব তিথিতে জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও বিনম্র প্রণাম। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে এই পৃথিবী থেকে সমস্ত কলুষ অপসারণ করে ভক্তজনের হৃদয়ে চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকুন। জয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

ওপার বাংলার জয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নির্বাচনের মাধ্যমে আবার প্রমাণ করল যে, শেখ মুজিবুর রহমানই তার এক ও অনন্য নেতা। সমস্ত বিরোধীদল ছত্রখান হয়ে গেছে। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৭টি আসন জুটেছে বিরোধী দলগুলোর। প্রধানমন্ত্রী চারটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। আওয়ামী লীগের জয় জয়কার। বিশ্বের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই নির্বাচনী সাফল্য একটা রেকর্ড।

বিরোধীদলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর)। সবচেয়ে মুখর ছিল মৌলানা ভাসানীর ন্যাপ। নতুন আবির্ভূত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মেজর জলিলের নেতৃত্বে নির্বাচনের আগে খুবই হৈচৈ করেছিল। এই তিনটি দলই শোচনীয়ভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। শেখ মুজিবুর বলেছেন, আমি বিরোধীদের সুযোগ দিয়েছিলাম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের ক্ষমতা দেখাবার জন্য। জনগণ তাদের প্রত্যাখান করেছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ নিয়ে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রশাসনে নিশ্চয়ই অনেক ত্রুটি আছে। জিনিসপত্রের দাম চড়া। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টও হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচন প্রমাণ করল, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আস্থা অটুট। শেখ সাহেব শুধু বাংলার প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি নতুন বাঙালী জাতির পিতা, তিনি বঙ্গবন্ধু। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর দলকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের পথ খুলে দিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে তাঁর দলকেই নিরঙ্কুশ, নিঃসংশয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাংলার জাতীয় সংসদে পাঠিয়ে সোনার বাংলা গড়ার পথ করে দিল সুগম।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হল সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চার স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক কাঠামো। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে এখন জাতিকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই জয়কে তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জয় বলে চিহ্নিত করেছেন। এই জয় বাঙালীর আত্মচেতনার জয়। দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ নিজস্ব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে সার্বভৌম সংবিধান [illegible] করে জাতির কাছে রায় গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের জনগণের এই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সত্যই প্রশংসনীয়। [illegible] ও তাঁর [illegible] জানাই অভিনন্দন। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবী [illegible]

দেশে বিদেশে

জনতার মুজিব

বাঙলাদেশের প্রথম নির্বাচন

বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফল অনেকের ভুল ধারণা ভেঙে দেবে এবং এই ভুলগুলি তাঁরা যদি অকপটে স্বীকার করে নেন তাহলে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অধিকতর বাস্তব ও স্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগের জয় হবে সেবিষয়ে পর্যবেক্ষকদের কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু এই জয় যে এত বিরাট ও এত তর্কাতীত হবে সেটা পর্যবেক্ষকরা অনুমান করতে পারেন নি। ১৯৭০ সালে যেখানে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন পেয়েছিল এবার সেখানে তারা পেয়েছে ২৯১টি আসন। ১৯৭০ সালের জয়ের তুলনায় এই জয় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নেমেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র হিসেবে এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছিলেন সকল অর্থেই সমগ্র জাতির নেতা। স্বাধীনতার পর আজ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে অন্যতম একটি রাজনৈতিক দল এবং যদিও ব্যাপক অর্থে মুজিব এখনও বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা তাহলেও সঙ্কীর্ণ অর্থে তিনি একটি দলের নেতা। ১৯৭০ সালে নিজের দেশের জনগণের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার যে সুবিধা মুজিব ও তাঁর দলের ছিল ১৯৭৩ সালে তাদের সেই সুবিধা ছিল না। মুজিব ইচ্ছা করলে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে নির্বাচনের আহ্বান দিতে পারতেন। বাংলাদেশের কোন কোন রাজনৈতিক দল সেরকম পরামর্শও দিয়েছিল। আজকের নির্বাচনের ফলাফল দেখে স্বচ্ছন্দেই অনুমান করা যায় যে, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার লোভে তিনি সেদিন সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন নি। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাহ্যত ১৯৭১-৭২ সালের তুলনায় আওয়ামী লীগের পক্ষে অনেকখানি প্রতিকূল। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ ভেঙে গেছে। ঢাকায় মার্কিণ দূতাবাসের সামনে গুলিবর্ষণের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। মুজিবের ছবি পদদলিত করা হয়েছে এবং তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যপদ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এইসব বাহ্যিক লক্ষণ দেখে কোন কোন পর্যবেক্ষকের পক্ষে এটা অনুমান করা স্বাভাবিক ছিল যে, স্বাধীনতার প্রথম উচ্ছ্বাস যখন স্তিমিত, স্বাধীনতার সংগ্রামের সহযোদ্ধাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যখন আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে অথচ ক্ষমতাসীন সরকার নিজেদের কাজের ব্যস্ততায় মানুষের জরুরি সমস্যাগুলি সমাধানের সময় পেয়ে ওঠেন নি তখন নির্বাচনে নেমে আওয়ামী লীগ কতকটা বেকায়দায় পড়বে। কিন্তু এই পর্যবেক্ষকরা একটা দিকই দেখেছেন, অন্য আর একটি দিক উপেক্ষা করেছেন। ভারতবর্ষের সংবিধান তৈরির কাজ স্বাধীনতার আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল আর সেই সংবিধান চালু হয়েছিল স্বাধীনতার আড়াই বছর পরে। ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন

হয়েছিল স্বাধীনতার চার বছরেরও বেশি সময় পরে। পাকিস্তান আজ পর্যন্ত তার সংবিধান তৈরি করতে পারে নি, সেখানে একটিও প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয় নি। অথচ, বাংলাদেশ স্বাধীনতার লাভের ১৫ মাসের মধ্যে তার সংবিধান চালু করে প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। অনেকেই এটা সম্ভব বলে মনে করেন নি। শেখ সাহেব ও তাঁর দল অসাধ্য সাধন করেছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের ভোটদাতারা আওয়ামী লীগের বিরোধীদের আওয়াজে বিচলিত হন নি, তাঁরা আওয়ামী লীগের সাফল্যের দিকটাও বিবেচনা করেছেন। সেই সাফল্য তারা অর্জন করেছে শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের সংগ্রাম ক্ষেত্রে নয়, স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও।

বাংলাদেশের নির্বাচনের এই ফলাফল সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোকে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কৈফিয়ৎ হিসাবে তিনি এই নির্বাচনের দোহাই পেড়েছেন। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যদি পরাজিত হত, নিদেনপক্ষে জাতীয় সংসদে যদি একটি শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী উপস্থিত থাকত তাহলে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো গলা বাজিয়ে বলতে পারতেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের নীতিতে "মুসলিম বাংলার" জনগণের সায় নেই। পাকিস্তানের যেসব মিতা আয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁ অথবা ভুট্টোর শাসনক্ষমতার অধিকার সম্পর্কে কখনও প্রশ্ন তোলে নি তারাও বাংলাদেশের নির্বাচনের দোহাই পেড়ে এই নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছিল। এখন হয় তাদের নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিতে হবে অথবা নিজেদের ভুল নীতি অনুসরণ করার জন্য নতুন কোন ছুতো খুঁজে নিতে হবে। যাই তারা করুক, তার দায়িত্ব তাদের নিজেদের। মুজিব তাঁর চাল দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু এই নির্বাচনকে তাঁর নীতির উপর গণভোট বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই গণভোটের রায় বিপুলভাবে মুজিব-বাদের সপক্ষে গেছে। "মুজিববাদের" প্রধান চারটি স্তম্ভ হল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। সরকারি কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এই নীতি-গুলি প্রয়োগ করার অবাধ অধিকার এখন বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রধানমন্ত্রী মুজিবকে দিলেন। যেসব বিরোধী নেতা তাঁকে "ভারতের দালাল" বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন অথবা যাঁরা ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি থেকে সরে আসার জন্য তাঁর উপর চাপ দিতে চাইছেন তাঁদের সঙ্গে মোকাবেলা করা এখন শেখ সাহেবের পক্ষে অনেক সহজ হবে। যাঁরা এই ধরনের প্রচার করছিলেন তাঁরা যদি এখন তাঁদের মুখ বন্ধ করেন তাহলে সেটা ভারতীয় উপমহাদেশে উত্তেজনা হ্রাসের সহায়ক হবে।

ফ্রান্সে নির্বাচন

বাংলাদেশের নির্বাচন ছাড়া আর যে নির্বাচনটি গত সপ্তাহে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি হচ্ছে ফ্রান্সের নির্বাচন।

ফ্রান্সের নির্বাচন সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, একাদিক্রমে ১৫ বছর কাল ক্ষমতা ভোগ করার পর এই নির্বাচনে দাগলপন্থী কোয়ালিশন সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অথবা দাগলপন্থীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী - কম্যুনিস্ট জোটের সংঘাতের ফলে সাংবিধানিক সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ফরাসী নির্বাচনের নিয়ম অনুসারে দুই চক্করে ভোট গ্রহণ করা হয়। যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তাঁদের পিছনে যাতে অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন থাকে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। যে প্রার্থী শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ভোটদাতার ভোট পাবেন তিনি প্রথম চক্করেই নির্বাচিত ঘোষিত হবেন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

ক্যাপ্টেন মনসুর আলি, শেখ আবদুল আজিজ এবং আবদুস সামাদ

জহুর আমেদ চৌধুরী, ফণী মজুমদার, কামরুজ্জামান, খোন্দকার মোস্তাক আমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমেদ

যাঁরা পাবেন না তাঁদের মধ্যে যাঁরা দশ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পাবেন তাঁদের দ্বিতীয় চক্করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। প্রথম চক্করের নির্বাচনে যদি কেউ দশ শতাংশ ভোট না পান তাহলে যে দুজন প্রার্থী ভোটসংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে থাকবেন তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

এই নিয়ম অনুযায়ী ফ্রান্সের নির্বাচনের প্রথম চক্করের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ঐ চক্করে যে ৫০ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অবশ্য ৩৮ জনই দক্ষিণপন্থী। নেতাদের মধ্যে যাঁরা প্রথম ভোট গ্রহণে জয়ী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রধানমন্ত্রী পিয়ের মেসমার ও অর্থমন্ত্রী ভ্যালেরি গিসকার্ড দেস্তাং। কিন্তু প্রথম চেষ্টায় যাঁরা সফল হন নি তাঁদের মধ্যে আছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস শুম্যান, বিচারমন্ত্রী রিয়া প্লেভা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জ্যাক শাপাঁডেলমাস।

কিন্তু প্রথম চক্করে ৫০-এর মধ্যে ৩৮টি আসন লাভ করে অবশ্য দক্ষিণপন্থীরা সান্ত্বনা পাচ্ছেন না। কারণ, এই প্রথম চক্করের ভোট গণনায় দেখা যাচ্ছে, সোস্যালিস্ট-কম্যুনিস্ট জোটের প্রার্থীরা মোট ভোটের ৪৬ শতাংশ পেয়ে এগিয়ে আছেন আর ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থীরা শতকরা মাত্র ৩৮টি ভোট পেয়ে পেছনে পড়ে আছেন। চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করছে দ্বিতীয় চক্করের ভোট গ্রহণের উপর।

কোন কোন পর্যবেক্ষক ফ্রান্সের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রথমত, ভারতে সেসময়ে যেমন নানা চরিত্রের রাজনৈতিক দল শুধু কংগ্রেস বিরোধিতার জন্যই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তেমনি ফ্রান্সেও শুধু দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। এমনিতে ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর সমাজতন্ত্রী দল ও মঃ জর্জ মাসেই-এর নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। কিন্তু দুই দলই জানে যে, নিজেরা হাত না মেলালে পৃথকভাবে তাঁরা কেউ ক্ষমতায় আসতে পারবে না। এই জোট সম্ভব করার জন্য কম্যুনিস্টরা নিজেদের ভাবমূর্তি বদলাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বারবার ভোটদাতাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁরা মস্কো বা অন্য কোনও বিদেশী শক্তির দালাল নয়। শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে এই জোটের নীতি ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেসব শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করবেন সেগুলিতে সোভিয়েট ধাঁচের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে না বরং যুগোশ্লাভ ধাঁচে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। যদিও ভারতবর্ষের যুক্তফ্রন্টগুলির মতই ফরাসী সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের এই জোট একটি ন্যূনতম কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তাহলেও এই জোট কতদিন স্থায়ী হবে সেবিষয়ে সন্দেহ আছে।

১৯৬৭ সালের ভারতবর্ষের সঙ্গে আজকের নির্বাচনকালীন ফ্রান্সের দ্বিতীয় যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা হয়েছে সেটা হল, ভারতবর্ষের মতই এই নির্বাচনের ফলে একটি সাংবিধানিক সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সাংবিধানিক সঙ্কটের সম্ভাবনা ছিল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে। রাজ্যে রাজ্যে অকংগ্রেসী ও কংগ্রেসবিরোধী সরকার গঠিত হলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সংগে তাঁদের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে এবং কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রশাসন করা সম্ভব হবে কিনা, ১৯৬৭ সালের ভারতে এইটাই ছিল প্রশ্ন। ফ্রান্সে আজকের প্রশ্ন হচ্ছে, জাতীয় পরিষদে দক্ষিণপন্থীরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান তাহলে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিদুর সঙ্গে জাতীয় পরিষদের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে। ফ্রান্সের সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে সরকারও গঠন করা চলে। সরকারকে যে জাতীয় পরিষদের

অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু এই ধরনের সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হলে তাঁদের জাতীয় পরিষদে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এই অবস্থায় একটা শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

১০-৩-৭৩ —পত্রবাহক

বাংলাদেশ : নির্বাচন

বাঙলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ শতকরা ৭৩ ভাগ জন-সমর্থন লাভ করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ইতি-হাসে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৩টি দল উপদল সবাই মিলে পেয়েছেন মাত্র ২টি আসন, আর নির্দল প্রার্থীরা পেয়েছেন মাত্র ৫টি আসন। বিরোধী পক্ষের মোট আসন সংখ্যা ৮টি। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল :

মোট আসন	...	৩০০
ঘোষিত আসন	...	২৯৯
আওয়ামী লীগ	...	২৯২
বাঙলা জাতীয় লীগ	...	১
নির্দলীয়	...	৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	...	১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	...	০
বাঙলাদেশ কমিউঃ পার্টি	...	০
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী	...	০
কংগ্রেস	...	০
বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী)	...	০
বাংলা শ্রমিক ফেডাঃ	...	০
বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	...	০

গত মাসে একজন আওয়ামী লীগ প্রার্থী জীপ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ায় আসনটির নির্বাচন স্থগিত আছে।

বাঙলাদেশে তালিকাভুক্ত ভোটদাতার সংখ্যা ৩৩৭৮৭৭২৫। ২৮৮টি নির্বাচনী এলাকায় ভোট দেন শতকরা ৫৫জন অর্থাৎ ১৮৪৬৫০০০ ভোটার। প্রদত্ত ভোটের ১৩৫০৩৪৮৩ ভোট পেয়েছে আওয়ামী লীগ। তার পরেই অন্যান্য দলের প্রাপ্ত ভোট হল : ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ১৫৮৬৪৪১ ভোট, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১২২৯৫৫৭২ ভোট, ন্যাশ-নাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) ১০০১৩১২ ভোট, নির্দল প্রার্থী (১২০জন) ৯১৪৯৯৩ ভোট, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ৬১৫৪১ ভোট, বাংলা জাতীয় লীগ ৫২৯০৩ ভোট, বাঙলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি ৪৭২২১ ভোট, শ্রমিক কৃষক সমাজ-বাদী দল ৩৮৪০৪ ভোট, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী) ১৮৫৩১ ভোট, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন ১৭২৬৪ ভোট, বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি ১১৮৯২ ভোট, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ৭৫৬৪ ভোট, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস ৪৩৩৪ ভোট এবং জাতীয় গণতন্ত্রী দল ১৮২৮ ভোট।

সর্বভারতীয় শিক্ষিতের হার

১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার ৩৩-২ শতাংশের কিছু বেশি। সর্বভারতীয় গড় হিসাবে এই সময়ে শিক্ষিতের হার ২৯-৫ শতাংশ। পশ্চিমবাংলায় শিক্ষিতের হার ১৯৫১ খৃঃ ২৪ শতাংশ এবং ১৯৬১ খৃঃ ২৯-৩ শতাংশ ছিল। শিক্ষিত জনসংখ্যায় ১৯৫১ খৃঃ পশ্চিমবাংলার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ১৯৭১ খৃঃ কুড়ি বছরে তার অবস্থান হল ষষ্ঠ স্থানে। গত ২০ বছরে শিক্ষিত মানুষের হারে কেরালা ভারতীয় রাজ্য-গুলির মধ্যে প্রথমেই আছে। এই রাজ্যে শিক্ষিতের হার ১৯৫১ খৃঃ ৪৬-৮ এবং ১৯৬১ খৃঃ ৬০-৪। ১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থান হল তামিল-নাড়ুর। ১৯৫১ খৃঃ ২০-৮ শিক্ষিতের হার ১৯৬১ খৃঃ বেড়ে হয় ৩১-৪ এবং ১৯৭১ খৃঃ এই হার হয়েছে ৩৯-৫। তৃতীয় স্থানাধিকারী মহারাষ্ট্রের অবস্থা ১৯৫১ খৃঃ ২০-৯ শতাংশ, ১৯৬১ খৃঃ ২৯-৮ শতাংশ এবং ১৯৭১ খৃঃ ৩৯-২ শতাংশ। গুজরাটেও শিক্ষিতের হার ক্রমবর্ধমান। এই রাজ্যে ১৯৫১ খৃঃ ২৩-১, ১৯৬১ খৃঃ ৩০-৫ এবং ১৯৭১ খৃঃ ৩৫-৮। পাঞ্জাবে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক প্রয়াস চলেছে। এই রাজ্যে শিক্ষিতের হার ১৯৫১ খৃঃ ১৫-২ শতাংশ, ১৯৬১ খৃঃ ২৪-২ শতাংশ এবং ১৯৭১ খৃঃ ৩৩-৭ শতাংশ।

ভারতীয় পুরুষ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ১৯৫১ খৃঃ ২৪-৯ শতাংশ, ১৯৬১ খৃঃ ৩৪-৪ শতাংশ এবং ১৯৭১ খৃঃ ৩৯-৫ শতাংশ। নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হল ১৯৫১ খৃঃ ৭-৯ শতাংশ, ১৯৬১ খৃঃ ১২-৯ শতাংশ এবং ১৯৭১ খৃঃ ১৮-৭ শতাংশ।

ভারতে বেকার সংখ্যা

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি সম্প্রতি লোকসভায় জানিয়েছেন যে, ১৯৭২ খৃঃ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে তালিকাভুক্ত বেকার সংখ্যা মোট ৬৮,৯৫,-০৮৯ জন। ১৯৭২ খৃঃ জুনে এই সংখ্যা ছিল ৫৬,৭৮,৯৭৮ জন। এদের মধ্যে ২১,৪৮,৩০৮ জন স্কুল পর্যায়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ৪,২০,৬০৪ জন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর হল ৪২,৯১৫ জন।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনে ভারতীয় সিল্ক

১৯৭২ খৃঃ ভারতীয় সিল্ক ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে। ১৯৭১ খৃঃ এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টাকারও কম। বিদেশের বাজারে ভারতীয় সিল্ক টাই-এর চাহিদা অনেক কমে গেছে, প্রায় ১৮ ভাগ। ১৯৭২ খৃঃ অবশ্য এ থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ২২ লক্ষ টাকা। এই সময়ে স্কার্ফ, শাড়ি, রেডিমেড জামা-কাপড়ও বিদেশী অর্থ উপার্জন করেছে।

ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : আসাম প্রথম

সরকারী তথ্য থেকে জানা গেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমানে আসাম সর্বাগ্রে। ১৯৬১ খৃঃ থেকে ১৯৬৭ খৃঃ মধ্যে আসামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৪-৩৭। এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বভারতীয় হার ছিল ২৪-৫৭।

কলকাতায় দুর্ঘটনা

পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী সম্প্রতি কলকাতা শহরের পথ দুর্ঘটনায় এই পরিসংখ্যান জানিয়েছেন :

	দুর্ঘটনা	মৃত্যু
১৯৬৮ খৃঃ	২৫৩	২৬৯
১৯৬৯ খৃঃ	৩৫৯	৩৬৬
১৯৭০ খৃঃ	৩৬০	৩৬৭
১৯৭১ খৃঃ	৪০৭	৪১৮
১৯৭২ খৃঃ	৪৬৭	৪৭৫

ভারতীয় বাঁদরের বিদেশ যাত্রা

বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীএ সি জর্জ রাজ্যসভায় জানান ভারতীয় বাঁদর এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন এবং ইতালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

১৯৬৯-৭০ খৃঃ এবং ১৯৭১-৭২ খৃঃ মধ্যে বিদেশে গেছে ১৩৭১৬৫টি বাঁদর। এজন্য ভারত অর্জন করেছে ৯৭ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা।

সব থেকে বেশী বাঁদর রপ্তানী হয়েছে আমেরিকায়। সেখানে ৯১ হাজার বাঁদর পাঠিয়ে উপার্জিত হয়েছে ৬৬ লক্ষেরও বেশী টাকা।

কালকের দিনটা

এবার শীতের একটু লাজুক ভাব। দ্বিধাগ্রস্ত মাধবীর মতন আসি আসি করেও আসছে না। এমন অবস্থায় বেতারে যখন কাল প্রচারিত হল, সিমলায় কলের জল পর্যন্ত জমে গেছে, দার্জিলিংয়ে তিন ইঞ্চি তুষারপাত, তখন গায়ের কাপড় ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে মনকে বোঝালাম শীত আগত ওই।

কড়া এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে গিয়েই থেমে গেলাম।

ভৃত্যপ্রবর সংবাদ নিয়ে এসেছে।

একটি মেয়ে আর একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কোন সভা-সমিতির ব্যাপার, কিংবা আকস্মিক গজিয়ে ওঠা পত্রিকাকে পুষ্ট করতে হবে অ-মূল্য রচনা দিয়ে।

নিরুপায়। নীচে নামতে হল।

ভদ্রলোক রীতিমত সুপুরুষ। রং, মুখ-চোখের গড়ন নায়কোচিত। সেই অনুপাতে মহিলাটির গায়ের রংই শুধু কিঞ্চিৎ আঁধার ঘেষা নয়, নাক মুখও বেশ চাপা।

আমাকে দেখেই মহিলা সোল্লাসে উঠে দাঁড়ালেন।

কি চিনতে পারছ? এত বছরে তুমি কিন্তু বিশেষ বদলাও নি। বদলাবেই বা কেন, অর্থ, খ্যাতি সব করায়ত্ত। সুখের পায়রা হয়ে আছ।

এমন অন্তরঙ্গ সম্বোধনে বেশ একটু বিব্রত হলাম। মহিলাকে কোথায় দেখেছি স্মৃতির সমুদ্রে ডুবুরি নামিয়েও তার সন্ধান পেলাম না।

কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

মহিলা এবার কৃত্রিম হতাশায় মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করলেন।

আমার মতন মেয়েকে কি আর চিনতে পারবে তুমি। পরিচয় দেবার মতন আমার আছেই বা কি। টুনিকে মনে আছে, যাকে তুমি রাগাবার জন্য টুনটুনি বলতে।

বেশ গরম বোধ করতে লাগলাম। যে শৈত্য প্রবাহ এ শহরে আসছিল, মহিলা যেন তার গতিরোধ করলেন।

মনে নেই রেঙ্গুনে পাশাপাশি কত বছর ছিলাম? তুমি কলেজে পড়তে, আমি আর্ট ক্লাশে। আর্ট ক্লাশেই আমি অবশ্য বেশ পাকা ছিলাম। তোমার কাছে পড়বার ছুতোয় রোজ সন্ধ্যায় বই নিয়ে গিয়ে বসতাম। অবশ্য পড়াশোনা বাদ দিয়ে সবই হ'ত। মনে আছে?

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কিছু মনে নেই। আমি আড়চোখে ভদ্রলোকটিকে দেখতে লাগলাম।

সম্ভবত ইনি ভদ্রমহিলার স্বামী। এই সব শ্রুতিমধুর কথাগুলো নিশ্চয় তাঁর কানে অমৃত সিঞ্চন করছে না।

রেঙ্গুনে বহুদিন ছিলাম সত্যি কথা। সেখান থেকে কলেজেও পড়েছি। আশ-পাশে কিছু কুমারীও ছিল, তাদের সঙ্গে সাধারণ আলাপ-পরিচয় ছিল, কিন্তু কারো সঙ্গে সে আলাপ অন্তরঙ্গতার স্তরে পৌঁছেছিল, এমন মনে পড়ল না।

কি পড়ছে মনে?

মহিলার দুটি ভ্রূ বঙ্কিম, অধর ঈষৎ স্ফুরিত।

এবার আমি মহিলাকে নিরাশ করলাম না। অবশ্য এমন কথাও ভাবলাম, আমারই কি ভুল হয়েছে? বিচিত্র নয়। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের কথা ঠিক মত স্মরণ রাখা প্রায় অসম্ভব। হয়তো আমার উত্তীর্ণ-কৈশোরে কোন বয়ঃসন্ধির মেয়ে পাঠ্যপুস্তক খুলে রেখে আমার সান্নিধ্যে বসে যত অপাঠ্য বিষয় চিন্তা করত। হঠাৎ পড়া ধরার ছলে হাতে হাত ছুঁয়ে যাওয়ার শিহরণ বেশ কিছুদিন আমার তখনকার জীবনকে রোমাঞ্চিত করে রাখত। ছোট বুদ্বুদ বড় তরঙ্গের রূপ নিতে পারেনি, সত্যি কথা, কিন্তু ক্ষণেকের আলোড়ন তুলেছিল হৃদয়ে এ কথা অস্বীকার করি কি করে।

কণ্ঠে দরদের স্পর্শ আনলাম।

আরে সেই টুনটুনি, এতদিন পরে—

মহিলা আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন।

দাঁড়কাকে রূপান্তরিত হয়েছি।

তাই তো?

জিভ কেটে বললাম, ছি, ছি, ও কি কথা!

মহিলা বললেন যাক, চিনতে পেরেছ এই আমার কত ভাগ্যি। এস তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এতক্ষণে বুঝি তাঁর পাশের ভদ্রলোকটির কথা মনে পড়ল।

ইনি আমার স্বামীদেবতা। ভারত সরকারের অরণ্য বিভাগের জাঁদরেল অফিসার। গাছপালা সম্বন্ধে আগ্রহ যেমন বেশী, মানুষ সম্বন্ধে কৌতুহল তত কম। কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

ভদ্রলোক দুটো হাত কপালে ঠেকালেন।

আমার নাম সুবীর সেনগুপ্ত। আপনি স্বনামধন্য লোক। আপনার মতন লোকের দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

উত্তরে হাসলাম। বিগলিত হবার ভান করে।

তুমি এখনও কবিতা লেখ? আগে যেমন লাল মলাটের খাতায় লিখতে?
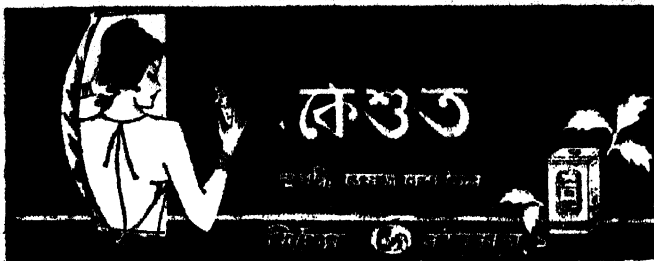
বাঙালী সন্তান জীবনে ব্যায়াম করিনি মন কথা হলফ করে বলতে পারি, কিন্তু খনও কবিতা লিখিনি এ-কথা বললে তোর অপলাপ করা হবে। তবে ল্যাব-ল্যাটের কথা স্মরণ করতে পারলাম না।

সব দিক বাঁচিয়ে বললাম, সব াহিত্যিকই কবিতা দিয়ে শুরু করে। ামিও করেছিলাম। তারপর ব্যাঙাচির ্যাজ খসে যাওয়ার মতন কবিতার বাতিক সে গেছে।

এখন তাহলে তুমি পুরোপুরি ব্যাঙ? মহিলার রসজ্ঞান প্রশংসনীয়।

তারপরের প্রশ্নটি মারাত্মক।

মনে আছে, দশটি কবিতার মধ্যে নটাই ামাকে নিয়ে লেখা। তখন আমার কি-ই া বয়স। তোমার কাব্যচর্চার কিছুই ুঝতে পারতাম না, তবু ভাল লাগত। খনই ভাবতাম তোমার এই ছন্দ পরিক্রমা ামাকে কেন্দ্র করে, তখনই মনে একটা হংকার জাগত। মনে হত, আমি সাধা-ণের মধ্যে থেকেও অসাধারণ।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টায় বললাম। তুমি এখানে আছ কোথায়?

নেপিয়ার রোডে। আছি আর কোথায়। াজ রাত্রেই চলে যাব সেরাইকেলা। একে-ারে অরণ্যের কোলে। চল না একবার তোমার লেখার অনেক খোরাক পাবে। আদি-বাসিনীদের পাথর-কোঁদা চেহারা, অফুরন্ত যৌবন, তোমাদের সাহিত্যের এই সবই তো আজকাল উপজীব্য।

সুবীরবাবু বললেন, অফিসের কাজে এক সপ্তাহের জন্য এসেছিলাম। আজ ফিরে যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়ালাম, একটু চায়ের কথা বলে আসি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চিৎকার করে উঠলেন, এই মাত্র এক জায়গায় খেয়ে আসছি। হেভি টি-র ব্যাপার। আর কিছু চলবে না।

কতদিন ভেবেছি তোমাকে একটা চিঠি লিখি, কিন্তু সাহস হয়নি। কি জানি, এখন তুমি খ্যাতির তুঙ্গে, চিনতে পারলেও হয়তো স্বীকার করতে চাইবে না। বিস্মৃতি সহ্য হত কিন্তু অবহেলা নয়। সে সব কথা মনে আছে?

একটু ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করলাম, কি কথা?

বলেছিলে বড় হলে বিয়ে করবে আমাকে। এখন অবশ্য ব্রাহ্মণ বদ্যির বিয়ে কোন সমস্যাই নয় তখন এসব কথা ভাবাই যেত না। যাক অনেক জ্বালাতন করলাম গেলাম, কিছু মনে কর না। কয়েকটা কেনা কাটা আছে, সেরে ফেলতে হবে।

আমাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই দুজনে বেরিয়ে গেলেন।

দাঁড়িয়ে রইলাম। সব ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল, এত নাটকীয়ভাবে যে মনে হল আমার উপন্যাসের কোন ঘটনাই বুঝি চোখের সামনে রূপ নিল।

এমন তো নয়, শোকের তাপে মহিলাটি ভারসাম্য হারিয়েছেন। তাই তাঁর স্বামীও কোনরকম বাধা দিলেন না।

কালই বিকালে চিঠিটা এল। ভৃত্য বলল, একটি ছেলে চিঠিটা দিয়েই চলে গেছে।

চিঠিটা এই রকম।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার সকালের ব্যবহারে নিশ্চয় আপনি খুব বিস্মিত হয়েছেন। আমরা বর্মায় ছিলাম সত্যি কথা, কিন্তু কোনদিনই আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না। পাশাপাশি থাকা তো দূরের কথা। আমার এ অভিনয়টুকুর প্রয়োজন ছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য দাম্পত্য প্রেমকে বাঁচাবার জন্য। লক্ষ্য করে থাকবেন, স্বামীর তুলনায় আমি রূপহীনা। সেইজন্যই কিনা জানি না দিনের পর দিন স্বামীদেবতার ঔদাসীন্য আর অবহেলাই পেয়ে এসেছি। আমাদের পঙ্গু প্রেমকে বাঁচাবার যখন কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তখন আপনার লেখা এক উপন্যাস থেকেই সমাধানের ইঙ্গিত পেলাম। স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগানো। সন্দেহের বিষে তাকে সতর্ক করে তোলা। উপেক্ষা-জর্জর জীবন সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস।

মার্জনা করবেন, আপনার কিছু সময় নষ্ট করার বিনিময়ে আমার অনাগত জীবনের সম্পদ ফিরে পেয়েছি।

টুনটুনি

নিমাই-নিতাই ॥

বনফুল

অনিত্যের মায়া-লীলা মূর্ত্ত অহরহ
তারই মাঝে থাকে নিত্য, থাকে চিরন্তন
দুঃখের দারুণ স্রোত বহিছে দুঃসহ
আনন্দ তাহারই মাঝে আছে অনুক্ষণ।

।

উত্তরের সমন্বয় নিত্যানন্দ তুমি
কোটি কোটি ভক্ত যাঁর পদরজঃ চুমি
ধন্য হল, তৃপ্ত হল, হ'ল সিদ্ধ-কাম
তাঁহার চরণে আজ সহস্র প্রণাম।

একচক্রাপুরে আর পুণ্য নবদ্বীপে
জ্বালালো যাহারা আলো প্রাণের প্রদীপে
এলো তারা পার হ'য়ে অশ্রু-পারাবার
পার হ'য়ে বিচ্ছেদের গাঢ় অন্ধকার।

ইতিহাসে পুত্রহারা দুইটি জননী
চির-অশ্রুমুখী—অশ্রুর বিরাম নাই—
সে অশ্রু মুক্তা হ'ল, অমিয় লাবণি
সমুদিল জ্যোতির্ম্ময় নিমাই নিতাই।
বিস্মিত করিল সবে, আজিও তা' করে
অনবদ্য দুটি পদ্ম অশ্রুর সাগরে।
নিষ্কলুষ দুদল কমল অভিরাম
পুনরায় জানালাম সহস্র প্রণাম।*

---

* নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ৫০০তম আবির্ভাব দিবসে রচিত।

অবিস্মরণীয় ফাল্গুনী পূর্ণিমা

বাঙলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম দিনরূপে চিহ্নিত ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮।৯ মার্চ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার পূর্ণোদয়ে রাহুকবলিত চন্দ্রমার ক্ষীয়মাণ কিরণমালায় অন্ধকারের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলেও সেই তীব্রতার প্রয়োজন ছিল সেদিন। কেননা, ঘোর অন্ধকারে পথ হারানো পথিকের দিশারীর কথাই বেশি করে মনে হয়। বাঙালীজীবনে ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুনে সন্ধ্যা প্রাকৃতিক নিয়মে আলোকময়ীরূপে পরিগণিত হলেও দৈবের এক অমোঘ নিয়মে দেখা গিয়েছিল তমোময়ীরূপে। এই তমোময়ী সন্ধ্যা প্রকাশ করেছিল বিগত তিন শতকেরও কিছু বেশি কালের সুদীর্ঘ তমিস্রার ভয়ঙ্কর রূপকে—চন্দ্রমার সাধ্য ছিল না সে তমিস্রা দূর করার। তাই চরায়ত সেই দুর্ভেদ্য তমিস্রার মাঝ থেকে আবির্ভূত হলেন সেদিন এক আলোকমান যুগমানব, যাঁর নিষ্কাম অকলঙ্ক প্রেমালোকে বাঙালীজীবনের সুদীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ঈর্ষা-বিদ্বেষ জর্জরিত হতাশাচ্ছন্নতার অবসান হল—বাঙালী ফিরে পেল তার চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত অধ্যাত্মালোকে উদ্ভাসিত আনন্দময় জীবনকে, যার ফলে মনের সব কিছু গ্লানি ধুয়ে মুছে গিয়ে এক পবিত্র প্রেমের দীক্ষায় নবজীবন লাভ হল তার। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—প্রাচীন ঋষির এই বাক্যকে সার্থক করে তুলতেই যেন নদীয়াপুরীতে আবির্ভূত, তখন চোখে বিস্ময়, অশ্রু ও বিস্ময় নিয়ে বাংলা তথা ভারতের অনন্ত প্রেমিক ভক্তের শ্রীপাদারাগ। বৈষ্ণবকবি পরমানন্দ সেনিকের সেই শুভক্ষণটিকে অপূর্ব ললিত পদবন্ধে উল্লেখ করে রেখেছেন :

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ করিলে হয় সোনা

আমার গৌরাঙ্গের গুণ গাইয়া গুনিঞা রে
রতন হৈল কতজনা

গৌরাঙ্গচান্দের ছান্দে ও চাঁদ কলঙ্কী রে
এমন করিতে নারে আলো

অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে
মনের আন্ধার দূরে গেলো।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফাল্গুনী পূর্ণিমার শুভলগ্নে এই

প্রণব রায়

যুগমানবের জন্ম বিরাট তাৎপর্যবহ। চিরাচরিত দোল উৎসব পালনের মধ্যে এই দিনটি বাংলা তথা সমগ্র ভারতে একটি আরও পবিত্র দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়। রং আবীরের লালিমার এই বিশেষ দিনে মানুষ ভুলে যায় জাতিধর্ম সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ। মহাপ্রভু যুগসঞ্চিত সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করার জন্যেই জন্মগ্রহণ করলেন বাংলার বুকে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত লীলাকে দোললীলায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। মধুবনে রাধাকৃষ্ণের দোলনের সঙ্গে গোপীগণের পীতবর্ণ কুঙ্কুমবারি ও ফাগপ্রদানের মধ্যে উভয়ের প্রেমবৈচিত্র্য ও অনুরাগাভিব্যক্তির মধুর ছবি এঁকেছেন বৈষ্ণব কবিরা। রেচকযন্ত্র বা পিচকারি যেন অনুরাগাঞ্জনে রঞ্জিত নয়ন এবং তন্মধ্যস্থ লোহিত-পীত কুঙ্কুম বা ফল্গুচূর্ণ যেন অনুরাগ। কবি উদ্ধবদাসের ভাষায় :

'নিরখত বয়ন নয়ন পিচকারিত
প্রেমগুলাব মন হি মনলাগ।

দুহুঁ অঙ্গ পরিমল চুয়াচন্দন ফাগু
রঙ্গ তঁহি নব অনুরাগ।।'

(পদকল্পতরু, ১৪০৭ পদ)

অর্থাৎ নয়নরূপ পিচকারি থেকে প্রেমরূপ গোলাপ মনে মনে লগ্ন হল। তার ফলে পরস্পরের অঙ্গসৌরভ চুয়াচন্দন ও নব অনুরাগ ফাগুর রং হল। ভক্তশ্রেষ্ঠ সনাতন গোস্বামী রচিত কয়েকটি পদবন্ধে ফল্গুচূর্ণে অলঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণরাধার অপরূপ শোভাতিশয় বর্ণিত হয়েছে। বাসন্তী-দোলের হোরিবিলাসে পীতবর্ণ কুঙ্কুমবারি ও কৃষ্ণবর্ণ কস্তুরীবারির যে বর্ষণ হয় তার প্রথমটিতে রাধার বর্ণসাম্য ও দ্বিতীয়টিতে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাম্য এবং পরস্পরের অঙ্গে মিশ্রিত এই বর্ণদ্বয়ের দ্বারা অপূর্ব প্রিয়ানুকূলতা ও বৈদগ্ধ ব্যঞ্জিত হয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের দোল ও হোরিলীলা অবলম্বন করে অসংখ্য পদ রচিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ভূরি ভূরি বর্ণনা থাকলেও দোল বা হোরিলীলার উল্লেখ কোন বর্ণনা নেই বললেই চলে। দশম স্কন্ধের ৯০তম অধ্যায়ে হোলিকা সম্পর্কে একবার মাত্র বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকানগরীতে বাস করাকালীন

অন্তঃপুরে নারীগণ ও তিনি রেচকযন্ত্র নিয়ে ক্রীড়ায় মত্ত হতেন। কিন্তু তার মধ্যে ফাগ বা অন্য কোন রঙের উল্লেখ নেই। দোল উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোরিবিলাস বা হোলি খেলা প্রাচীন ভারতে বসন্তোৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়, সংস্কৃত সাহিত্যে যার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এই হোলি-খেলা সেযুগে ছিল এক সামাজিক উৎসব, কামদেবের অর্চনা যার এক আবশ্যিক অঙ্গ-রূপে পরিগণিত হতো। নাট্যকার শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটিকার প্রথম অঙ্কে মদনমহোৎসবের এক চমৎকার বর্ণনা আছে। বৎসদেশের রাজা উদয়নের রাজধানী কৌশাম্বী সেই মহোৎসবে পুরবাসী কর্তৃক কুঙ্কুম ও আবীর-চূর্ণ উৎক্ষেপনে যেন গলিত সুবর্ণ খচিত বলে মনে হয়েছিল। সে সময় সর্পফণাকৃতি বহু পিচকারি ব্যবহৃত হয়েছিল। মহিষী বাসবদত্তা মদনমহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে মকরন্দ উদ্যানে কামদেবের বিপুল পূজার আয়োজন করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতে বহুল প্রচলিত এই বসন্তোৎসব সম্ভবত কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার এক আবশ্যিক অঙ্গরূপে স্বীকৃতিলাভ করতে থাকে। চৈতন্যোত্তরকালের বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের বসন্তলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে দোললীলা ও হোরিলীলারও বর্ণনা করেছেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' ব্রজসুন্দরীদের সঙ্গে শ্রীহরির বাসন্তী রাসলীলার যে বর্ণনা আছে সেখানেও 'অনঙ্গোৎসবে'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাক চৈতন্যযুগে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্বাদনের যে দুটি ধারা দেখা যায় তার মধ্যে একটি হল বৃন্দাবনলীলার অন্তর্গত শৃঙ্গাররসের বর্ণনা, যার মধ্যে রাধা ও গোপীগণের প্রেম-লীলা প্রধান। জয়দেব, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার-লীলা বর্ণনার মধ্যে রাসলীলা ও কোন কোন স্থানে দোললীলার বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শৃঙ্গারলীলার বর্ণনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবত্তার প্রতি এযুগের কবিরা যেন বেশি জোর দিয়েছেন দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি মালাধর বসুর (যিনি গুণরাজ খাঁন নামে

পরিচিত ছিলেন) 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কৃষ্ণ লীলার এই দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এরও অনেক আগে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের গোড়ার দিকে অল বেরুণীর রচনায় যে বাসুদেবচরিত আছে তাতে গোপীলীলার কোনই উল্লেখ নেই। এমন কি হিন্দোলী চৈত্র উৎসব প্রসঙ্গে অল বেরুণী বাসুদেবের যে চরিত্র বর্ণনা করেছেন তাতেও গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহারের কোন কথা নেই। তবে দোলায় শায়িত শিশু কৃষ্ণের লীলার কথা তিনি এই উৎসব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতে রাধার উল্লেখ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবত্তাই বেশি করে ফুটে উঠেছে। এছাড়া আরও অনেক লেখকের রচনায় লীলাবিলাস বর্ণনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাপ্রতিপাদনের দিকেই ঝোঁক বেশি দেখা যায়। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে গৌরাঙ্গের জন্মপ্রসঙ্গে সমগ্র নবদ্বীপে 'ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যা'য় 'শ্রীহরিকীর্তনে'র উল্লেখ থাকলেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মাধুর্য অবলম্বনে লীলারস প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সেদিন দোল বা শ্রীকৃষ্ণের হোরিবিলাসের কোন প্রসঙ্গ বৃন্দা-বন দাস বা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেননি। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগে বৃন্দাবনীয় রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা অপেক্ষা এদেশে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী শক্তির মাহাত্ম্য-বর্ণনই বেশি প্রচলিত ছিল। তাই প্রেম ও মধুরলীলাবৈচিত্র্যের রসাস্বাদন করা সাধারণ মানুষের কাছে একপ্রকার অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তারা আসক্ত হয়ে পড়েছিল আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীর তামসিক পূজার্চনায়। বৃন্দাবন দাস সেযুগের তামসিক আচারানুষ্ঠানের উল্লেখ করে বলেছেন:

> কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
> প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার।।
> ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
> (চৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড ২য় অধ্যায়)

ঠিক এই সময়ে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন। মহাপ্রভুর হৃদয়ের আকুলতা ধ্বনিত হল মালাধর বসুর সুপরিচিত একটি পংক্তির মধ্যে—

'বসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'। কুলীন গ্রামের কবি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র এই পংক্তি মহাপ্রভু বার বার আবৃত্তি করতেন। কৃষ্ণের প্রতি কান্তাভাবের এক মধুর স্ফূর্তি মহাপ্রভু উচ্চারিত এই পংক্তিটির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলার সূত্রে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যের রূপতত্ত্বের বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিগ্রহে পূর্বলীলায় রাধা ও কৃষ্ণের দুটি পৃথক সত্তার একীকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
> অন্যোহন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি।।
>
> সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
> রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি।।
>
> ...সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
> যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার।।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
> রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।।

শ্রীচৈতন্যের অবতারতত্ত্বে একথাও বলা হয়েছে, পূর্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিন তৃষ্ণা (অর্থাৎ রাধিকার প্রণয়মহিমা, তৎকর্তৃক আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য এবং মাধুর্যানুভববশত শ্রীরাধার সুখোদয়) যুগপৎ একই বিগ্রহে পূরণ না হওয়ায় শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে শচীগর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমার শুভক্ষণে

হয়েয়ে কান্তাভাব গ্রহণ করে প্রেমরূপী গোরাঙ্গের আবির্ভাব হল। নীলাচলে গমন করে মহাপ্রভু প্রথমে জগন্নাথের মধ্যে ঐশ্বর্য-মূর্তি কুরুক্ষেত্রনায়ক কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন। কেননা সেই বিগ্রহের মধ্যে "উজ্জ্বলরসমূর্তি" গোপীচিত্ত-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পাননি। তাই বার-বার 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ' ইত্যাদি শৃংগাররসাত্মক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে গভীর আকূতি নিবেদন করেছিলেন জগন্নাথের চরণে। মহাপ্রভুর স্বরচিত বলে পরিচিত নীচের এই শ্লোকে তাঁর গোবিন্দ-বিরহ ব্যথার সকরুণ স্ফূর্তি লক্ষ্য করা যায়ঃ

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।

অর্থাৎ আমার নিমেষ যুগের মতো দীর্ঘ, চোখ বর্ষণমুখর আকাশের আচরণ-কারী, গোবিন্দবিরহে আমার কাছে সমস্ত জগৎ শূন্য। নীলাচললীলায় মহাপ্রভুর এই বিরহোন্মাদ অবস্থার চিত্রটি নিরন্তর লীলা-সুহৃৎ স্বরূপ দামোদরের কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোকে প্রকাশ পেয়েছে। মহাপ্রভুর এই করুণাঘন ভাবরসমূর্তির মধ্যে যে মধুর ভগবৎপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছিল, সমাজের উচ্চ-নীচ সকলের মধ্যে তা স্বতই সঞ্চারী হয়েছিল। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' এই প্রেম-বন্যা সমাজের সর্বসাধারণকে আর কোন যুগে এতখানি প্লাবিত করেছে কিনা জানা যায় না।
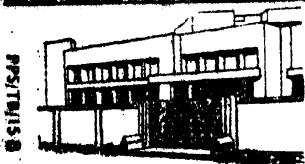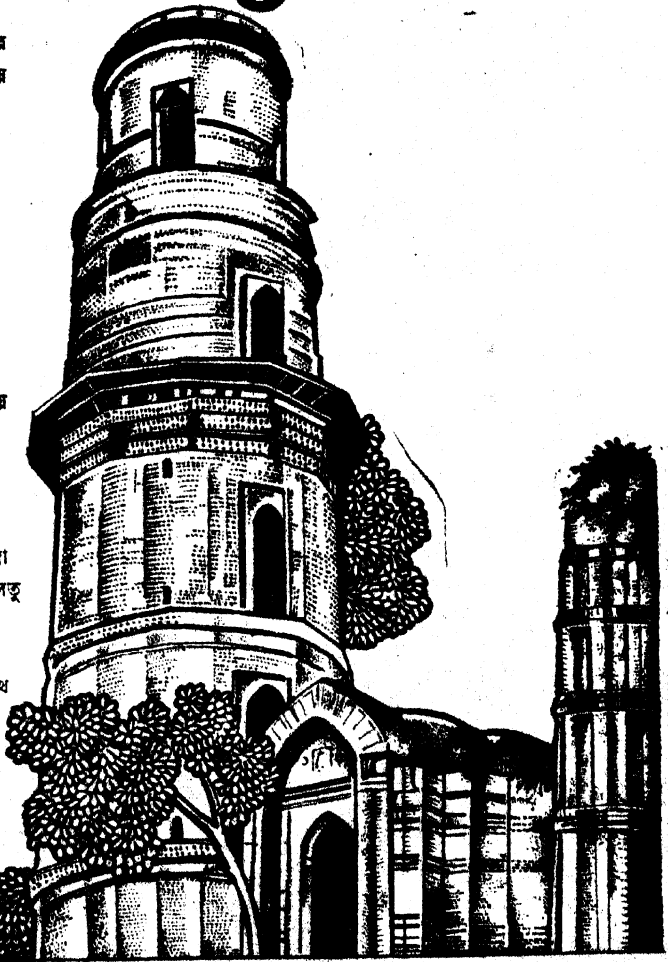
বাসের ভেতর দেখা হয়ে গেল। বাস মোটামুটি ফাঁকা, বাইরে শীতের সকালের শরীরে নরম কুয়াশা, ফাঁকা রাস্তায় বাসের চাকার মসৃণ শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে, ডান পাশ, বাঁ পাশ হেলছে, উল্টোদিকের গাড়ি কাটাবার সময় সীটে ঝাঁকুনি, সব মিলিয়ে শহরতলির শীতের কুয়াশা-জড়ানো দিনের শুরু তখন। দু একটা জানলা তখনও খোলা হয়নি, চাপ দিয়ে খুললাম। একদম ভিজে আছে জানলার ফ্রেম, কাঠ, আঙুলের মাথার ঠাণ্ডাটুকু সমস্ত রোমকূপে একবার দ্রুত ছুটে গেল। হাফপ্যাণ্ট পরা কনডাকটর রাত জাগা ছাত্রের মত এখন সিরিয়স হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, তার সঙ্গী বছর ষোলর ছেলেটি হাতল ধরে একদম বাইরের দিকে আশ্চর্যভাবে ঝুলে আছে, তার গলায় ইঁদুরের রঙের মাফলার, একটা হিন্দী ফিল্মের হিট গানের লাইন গাইতে গাইতে প্যাসেঞ্জার ডাকছে ছেলেটি। কুয়াশা ভেঙে ডিমের কুসুমের মত রোদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, জানলায়, বাসের ভেতর সেই রোদ হালকাভাবে শুয়ে আছে এখন। বাইরে শীতের সকাল সদ্য ঘুম ভেঙে রোদ মাখছে গায়ে, এক চিলতে নরম উজ্জ্বল আকাশ বাসের জানলায় ছুটে চলেছে, এ রকম আকাশ দেখলে হঠাৎ ছেলেবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। পেছন থেকে শরীরের একটা আউটলাইন দেখা যাচ্ছে, রোদ, পিঠ, ঘাড় মাথায় মায়াময় অহঙ্কে, অপরূপ মেজাজে বসিয়া।

দু তিনবার হর্ন দিয়ে বাসটা দাঁড়াল। মোটামুটি একটা বড় স্টপ, কিন্তু সকালের দিকে তেমন লোকজন নেই, ব্যস্ততা নেই। দু তিনজন ওঠানামা করল। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, একজন দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে হেসে কথা বলছে, কনডাকটর 'টাইম' নিতে গেল। রাস্তা ডিঙিয়ে ছোট চায়ের দোকান, রোদের ভেতর পাশাপাশি দু তিনখানা বেঞ্চ, খদ্দের তেমন জমেনি, শুধু একজন খবরের কাগজ চোখের ওপর বিছিয়ে নিয়েছে, চোখে পড়ল একটা ছবি, জনসভায় প্রধানমন্ত্রী...মাইক, মানুষ...অসংখ্য কালো কালো বিন্দু, এ রকম সকালে ছবিটা যেন ছুটির মেজাজের সঙ্গে মিশে যায়। লোকটি কী মিটিং-এর খবর পড়ছে? বাঁ দিকের নিচু রাস্তায় গরুর গাড়ির চাকার ভিজে দাগ, ছোট পুকুরের ঠাণ্ডা, স্থির জলের ওপর এখনো কুয়াশা ঘন। একটি পুরনো ল্যাণ্ডস্কেপ মনে হয়। টেলিগ্রাফের সরল-রেখা তারের ওপর দু তিনটি চঞ্চল পাখি, পৃথিবীকে কী সুন্দর ও বাসযোগ্য মনে হয় ওই পাখিদের বসে থাকা দেখলে। পেট্রোল পাম্প থেকে একটু এগিয়ে বেশ হাল-ফ্যাশানের ঘি-রঙের একটি বাড়ি, সামনের বাগানে গাঁদাফুলের অজস্র হলুদের ভেতরে নীল কার্ডিগান গায়ে একটি কিশোরীর মুখ। বাসের দিকে তাকিয়ে নিরপেক্ষভাবে সে হাসল, অথবা হাসেনি, সকালের আকাশ এখন তার চোখে লেগে আছে। মেয়েটি কী ওই চমৎকার গাঁদাফুল তুলে বাসের জানলায় এগিয়ে আসবে? কনডাকটর ফিরে এসে ঘণ্টা বাজাতেই আবার হর্ন দিল ড্রাইভার।

—টিকিট আপনার?

কনডাকটরের দিকে মুখ ফেরাতেই চোখে চোখ পড়ল আমার।

—আরে তুমি?

—তুমি? দ্বিগুণ জোরে সুলেখা কথাটা ফিরিয়ে দিল। ওর মুখ এবং হাতের ওপর এখন রোদ গোল হয়ে পড়ে আছে, ও রোদে তাপ নেই, অথচ সুলেখার মুখের ডৌলটুকু কেমন প্রতিমার মত জ্বলে উঠছে তখন। একটা বাদামি শাল ওর পিঠ বুকের ওপর ব্রিজের মত আড়াআড়ি।

—ওখানে কেন, চলে এস এখানে, জায়গা তো আছে; সুলেখা ওর সীট দেখাল। আপত্তির কোনো মানে হয় না। উঠে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। অবশ্য এমনি লেডিস সীটে বসতে আমার খুব নার্ভাস লাগে, খালি মনে হয় এখুনি জাঁদরেল গলায় ধমক শুনতে পাব—সীটটা ছাড়তে পারছেন না? ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে আছেন!

এখন বসলাম। সুলেখা একটুও শরীর টানল না। ওর হাঁটুর ওপর অংশের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে রইল আমার শরীর। এক ধরনের আলগা স্পর্শ বাসের ঝাঁকুনিতে ফিরে ফিরে আসতে লাগল। তবে এসব ব্যাপার নিয়ে কোনো চিমটি-কাটা আবেগ কাউকেই ছুঁলো না। বয়স। এখন ফেরার দিকে নৌকোর মুখ ঘোরানো, জলের রহস্যে আর নেচে ওঠা নেই।

—কোথায় যাবে? কনডাকটরকে পয়সা দিতে দিতে আমি প্রশ্ন করলাম; আমার হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর রোদ্দুরের হাত;

—এই, এই, আমার ভাড়াটা তুমি দেবে না, খবর্দার! হঠাৎ ওর গলার স্বর যেন আমাকে ধাক্কা মারল।

—কেন, দিলে ক্ষতি কী?

—বা রে! আমার আজ এই বাসে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, [illegible] দেখে ঠিক করে আমি বেরিয়েছিলাম?

—না তা কেন, এমনিই, [illegible]...

সুলেখার সকালের নরম নিষ্পাপ মুখ সোজা আমার চোখের দিকে যেন টেবল-ফ্যানের মত মুহূর্তে ঘুরে গেল, এই রকম চেয়ে থাকার সঙ্গে কী বাসের ছুটে যাওয়ার শব্দ মিশে যাচ্ছে?

—বরং আমিই দুটো কাটছি; বলো তুমি কদ্দুর যাবে?

বাসের পেছনের দু' একজন যাত্রী বেশ শীতের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে শুরু করেছে। একজন তো আমাকে বাদ দিয়ে সুলেখাকে প্রশ্ন করল—কটা বেজেছে এখন?

বাস ডানদিকে ঘুরে একটা প্রাইভেট গাড়িকে পথ দিল। গাড়ির মাথায় কিছু জিনিসপত্র। কোনো একটি দল কোথাও পিকনিকে যাচ্ছে, গাড়ির ভেতর থেকে একটি বাচ্ছা হাত বাসের দিকে একটা লাল গ্যাস-বেলুন ভাসিয়ে দিল। দৃশ্যটা সুলেখার চোখে পড়লেও আর একবার মুখ ফেরায় আমার দিকে, ওর জানলায় রাখা হাত সরে এল, ব্যাগের খোঁচা লাগছে আমার গায়ে। চুড়ির সামান্য শব্দ আমার শরীরে ছড়িয়ে যায়। দুজনের নিঃশ্বাসই কী দুজনের গায়ে লাগে?

জানলার ওপিঠে দূরে একটা লম্বা গাঢ় হলুদ স্কুল বিলডিং; মাঠে বাঁশের গোলপোস্ট এখন কাৎ হয়ে আছে, টিউব-ওয়েলের সামনে দাঁড়ান দুটি বাচ্চা বাসের দিকে তাকিয়ে হাসে, গরুর পিঠে কারা রাজ্য শাসন করার ভঙ্গিতে বসে, নীল আকাশে, [illegible] রোদ্দুর ঢেউ সাঁতরে চলে যাচ্ছে একটি চিল, আমার মনে হয়, ওই দু'জনের জানলার কাছে থাকলে [illegible] কী বাসের ভেতরের সুলেখাকে দেখতে পেতাম?

—তারপর এদিকে যাচ্ছ কোথায়?

—এই যাচ্ছি একটু—

—কোথায়? [illegible] ঠোঁট [illegible] না হাসি কিসে [illegible] এখন?

—এদিকে এক বন্ধু বিয়ে করে উঠে এসেছে বাড়াবাড়ি করে; যাওয়া হয় না, এ নিয়ে কথা, সেণ্টিমেণ্টাল ব্যাপার আর কি! দুম করে একটা চান্স পেয়ে গেলাম আজ;

—সেণ্টিমেণ্ট কার? বন্ধুর না তার...

আমি হাসলাম, সুলেখাও শব্দ করে হাসল।

আর আমার অনেকগুলো বছর আগের দুপুরের কলেজ স্ট্রীট যেন রীল উল্টে যাওয়া ছবির গতি মনে পড়ে গেল। ভয়ানক পেছনে লাগা, ঠোঁট আলগা স্বভাব ছিল ওর। যেন বনের দুর্দান্তপনা মিশে আছে ওর সমস্ত শরীরে, মনে। তাপসের কী দুর্বুদ্ধি হয়েছিল কে জানে, হঠাৎ সুলেখার অসম্ভব ফ্ল্যাটারি শুরু করে দিয়েছিল; টুকটাক দু'তিনটে কবিতাও তখন বিভিন্ন পত্রিকায় তাপস লিখে ফেলল; আর এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুলেখাই বেশি হাসত, ফোড়ন কাটত, ক্লাশে হঠাৎ উঠে তাপসের পাশে বসে পড়ে বলতো—কী এবার শুনতে পাচ্ছ লেকচার?

মতন আছে। সন্ধ্যার দিকে ফাঁকা সিঁড়ি দিয়ে ওপরের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে নামছিল সুলেখা। বাইরে বিশ্রী থমথমে ঝড়ের আবহাওয়া, বৃষ্টির সন্ধ্যার অন্ধকার যেন বুকের ভেতর জমা হয়। পাঁচটার পর মাখালদার ক্যানটিনে চা খেয়ে বাড়ি যাবো বলে নেমে এসেছি, সুলেখা উঠল না। শেখর বলল—কী রে হঠাৎ আজকেই লাইব্রেরী [illegible] নাকি ও?

[illegible] নামতে নামতে আমি [illegible] শেখরকে আমি এড়িয়ে গেলাম। আমি জানতাম আজ ওর মন [illegible] বৃষ্টির মতই ভিজে আছে, ওর খুব [illegible] এক বন্ধু ক্যানসারে মারা গেছে আজ; লাইব্রেরিতে এসে সকালের আড়ালে, শব্দ, মানুষ চিৎকার, পরিচিত মুখ, পরীক্ষার নোটস তৈরির ভাবনা, সব কিছু ডিঙিয়ে একা বসে আছে ও। না শ্মশানে যায়নি সুলেখা, বাড়িতেও থাকতে পারেনি; কিন্তু সেদিনই তাপসটা একটা কেলেংকারি করেছিল, দোতলায় ম্যানাস্‌ক্রিপট ঘরের পাশ থেকে ছায়ার মত বেরিয়ে এসে......

একটা থাপপড় মেরেছিল সুলেখা। আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায়নি সেখানে।

তাপসটার কী মাথাফাথা খারাপ হয়ে গেল? এ রকম ছাগলের মত—

কিন্তু কিছুই হল না শেষ পর্যন্ত, সুলেখাই সব ব্যাপারটা যেন বাতাসে ভাসিয়ে দিল। আবার সিনেমা দেখতে গিয়ে তাপসের পাশে বসে সেই মজার ভঙ্গি; আমি ওর পাশে না বসলে সোফিয়া লোরেনকে দেখতেই পারে না। সেজন্য আবার কলেজ স্কোয়ারের দুপুরগুলোর অম্লান ছবি, পয়সা না থাকলে ওর কাছে ধার চাওয়া, টিউটোরিয়ালের খাতা দেখার জন্য শীতের কুয়াশা ভেঙে সকালে শেখরের বাড়ি যাওয়া সুলেখার।

বাসটা একটা বড় ঝাঁকুনিতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। আমার শরীর রবারের বলের মত খানিকটা নাড়িয়ে গেল ওর দিকে, সুলেখার হাত কী এখন নরম রোদ তুলে নিচ্ছে? ভেতরে চোখ পড়ে আমার: এখন বাসের যাত্রী জন বারো-তের। সামনের দিকে সীটের মাথায় ডানদিকে লেখা টু সীট থারটি সিক্স প্লাস ওয়ান, বানান ভুল করে লেখা 'তিন বছরের উর্দ্ধে পুরো ভাড়া লাগিবে'। একদিকে নেতাজীর ছবি, মাঝখানে গুরু নানক, ডানদিকে দিলীপকুমার। কালো চাদরে ভালুকের মত আকৃতিতে বাঁ দিকের সীটে বসে আছে একজন। বাইরে রোদ্দুর যেন শুকোতে দেওয়া হয়েছে মাঠ জুড়ে; একটি বেড়াল দুঃখীর মত মাঠ ডিঙিয়ে কোথায় যাচ্ছে এখন? তরকারির ঝুড়ি পেছনে নিয়ে দু'তিনখানা সাইকেল আড়াআড়ি খুব সরু একটা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা কালো জলের মজা পুকুর, কিন্তু আশ্চর্য, চমৎকার কয়েকটি জলপদ্ম ফুটে আছে। একটা কারখানার টানা পাঁচিল, আলকাতরার লেখা : ছাঁটাই করা চলবে না। দিগন্তে

কালো বিন্দুর মত কয়েকটি পাখি উড়ে যায়, যেন কোনো বিগত স্বপ্নের শেষটুকু লেগে আছে ওখানে আকাশের গায়ে। শীতের এইসব স্বাভাবিক জীবন মাখান ছোট ছোট ছবি; সবটা মিলিয়ে তাহিতি দ্বীপের মত আর একটা ছবি করা যায় না? সুলেখা কী এ সব দেখছে? ওর শাড়ির ভাঁজে এখন উলের বলের মত রোদ্দুর, ওর চোখেও বাইরের মাঠ, মানুষের ছবি, একটি শিশুর দাঁড়িয়ে থাকা, অথবা জলে ঢিল পড়ার মত এখন ওর ভেতরটাও তিরতির করে কেঁপে উঠল?

—তুমি নামবে কোথায়?

—দেরি আছে;

আসলে আমি সত্যি কথা বলিনি। বন্ধুর বাড়িফাড়ি সব বানানো. যাচ্ছিলাম একটা ইন্টারভিউ দিতে। সুলেখার নিঃশ্বাস একবার আমার কাঁধ ছুঁয়ে গেল। কোথাও কী কাছে কোনো মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে এল? হাওয়ায় উজ্জ্বল শীত মিশে যায়, ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছে, উল্টোদিকের বাস বিকট শব্দে আমাদের ডিঙিয়ে গেল, অশথগাছের পাতায় হালকা শব্দ।

সুলেখা হঠাৎ ওর ব্যাগটা চাপ দিয়ে খুলল। তারপর হাত চালিয়ে খুঁজে খুঁজে বড় এলাচ বের করে আনল। এলাচের সুগন্ধে যেন ভরে গেল ওর আঙুলের কাজ।

—খাবে?

আমি হাত পেতে নিলাম। বহু দিনের পুরনো অভ্যাস ওর। হাতের ওপর ছোট ছোট কয়েকটি কালো দানা, অথচ কেন আমার এখন না খেয়ে মূল্যবান সঞ্চয়ের মত জমিয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে?

—বন্ধুর বাড়ি থেকে আজ ফিরছ তো?

হঠাৎ এরকম আচমকা একটা কথায় যেন শক খেলাম আমি। সুলেখা কী সন্দেহ করছে কিছু? জেরা করছে আমাকে? আমি ওকে সত্যি কথা বলিনি এটা...

—এই জার্নির জন্যই একদম আসতে ইচ্ছে করে না।

সুলেখা ছোট করে হাসল, চোখের ভেতর কী নীল আকাশ কৌতুক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এখন? বাইরে জানলায় কী মাঠের শূন্যতায় কিছু খুঁজল ও? আমার বুকের শব্দ যেন চাকার ভারী শব্দ হয়ে ফিরে আসছে।

নেমে যাব? পরের বাস ধরবো?

এই ছ'-সাত বছরে আমার জীবনটা সুতো ছেঁড়া বেলুনের মতো খালি শূন্যে ডিগবাজি খেয়েছে, খাচ্ছে, বেশ কয়েকশ অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া, কয়েক ডজন ইন্টারভিউ, জুটেও ছিল নর্থবেঙ্গলের দিকে, কিন্তু পার্টি ফার্টির ঝামেলা, থাকা গেল না। তারপর মাঝে মাঝে খুচরো চাকরি, রদ্দি সিনেমা কাগজে ফিচার লেখা, একটা স্কুলে লীভ-ভ্যাকান্সির চাকরি কিছু দিন, না হলে বাজপড়া তালগাছের মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। খাওয়া-ঘুম-আড্ডা-খাওয়া-ঘুম... তারপর...। মাঝে মাঝে মধ্যরাতে বিহ্বল নীল জ্যোৎস্নায় ভেসে গেলে আঙুলের মাথায় একটা হিংস্র প্রতিজ্ঞা জেগে ওঠে। দেয়ালগুলো লাথিতে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে, গোটা শহরের তলপেট ফাঁসিয়ে দিয়ে হাইড্রান্টের জলের মত কোথাও পৌঁছে যেতে ইচ্ছে করে। বৃষ্টির জল জমা ভাঙা কুঁজোর মত ঘাড় ভেঙে পড়ে থাকা, খবরের কাগজে দেশের উন্নতির খবরটবর রাখা। একদিন স্বাতী তারা থেকে কেউ নেমে এসে বলবে, এই নীলরঙের সাম্রাজ্য তোমার, এই নীল আকাশ ও জল, সব তোমার, সিনেমার অন্ধকারে হেমা মালিনী আমার দিকে তাকালে আমারও গাইতে ইচ্ছে করে—জীবন এত ছোট কেনে...

—তুমি এদিকে কোথায়? এতক্ষণ পরে আমি একটা সুযোগ বানিয়ে নিই।

—আর বলো কেন! সুলেখার হাসি রোদ্দুরের গুঁড়ো হয়ে উড়ে যায়।

'মীরার বাড়ি।'

আমি হোঁচট খাওয়ার মত চোখেমুখে তার দিকে তাকাই. আঙুল তুলে দেখাল সুলেখা, তিন বছর বিয়ে হয়ে গেছে মীরার। আজ ওর ছেলের মুখে ভাত। কে আর আসবে বলো আমি ছাড়া। মা অবশ্য জিনিসটিনিস নিয়ে কালই গেছে, আমি তো কিছু কিনলাম না ছাই, আচ্ছা, কী দেওয়া যায় বলো তো? সুলেখা কী খুব দ্রুত হাতে রেডিওর নব ঘুরিয়ে যাচ্ছে? অসংখ্য কথা বালিশ ফেটে তুলোর মত বেরিয়ে পড়ছে? ইচ্ছে হল এই সুযোগে ওকে একটু খোঁচা মারি, মীরা ওর ছোট বোন। বললাম, তা মীরার দিদির এরকম সুখবর একটা পাওয়া গেলে—আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে ও আমাকে একটা খোঁচা মারল, তারপর নিচুগলায়—

বলল,—এই তো বেশ আছি, ঝামেলায় জড়ালেই তো—। দুপুরের মন্থর জলে কী হঠাৎ কাতনা কেঁপে উঠলো? আমি বাইরে তাকালাম। আকাশ অসহ্য নীল। একটুও মেঘ নেই। থাকলে ভাল হত। একটা শূন্যতার নিচে কে দাঁড়িয়ে? একবার তাকালাম সুলেখার দিকে, আমের মুকুলের রঙের শাড়ি পরে আছে ও, আচ্ছা এখন কী ওকে জিজ্ঞেস করা যায়—তোমার সেই চিতাবাঘের চামড়ার মত শাড়িটা আছে না ছিঁড়ে গেছে?

সুলেখাও কী একটা পাতাহীন বেলগাছ দেখছে বাইরে?

প্রসঙ্গটা ওলটাবার চেষ্টা করলাম—তোমার অন্য সব খবর কী? চাকরি করছো?

সুলেখার কপাল ছুঁয়ে রোদ, যেন আকাশের নীল রঙের ভেতর ওর চোখ ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে হাওয়ার নরম শীতে বুক কী কেঁপে উঠছে এখন?

—পাঁচ বছর প্রায়, মুখ তুলল সুলেখা। এবার তো বি-এড পড়তে চলে এলাম, মিছিমিছি ইনক্রিমেন্টগুলো নষ্ট করা—

সকালেই বোধ হয় ও স্নান করেছে, চুলের ঈষৎ ভেজা গন্ধ, চিবুকের সেই ভঙ্গি মাঝে মাঝে ওর শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার শরীর, ওর বুক ও গলায় সতেজ মসৃণতা, কী দেখছে এখন বাইরে? কী করে বাসের পেছনে ধুলো উড়ে যায় না গাছের ভেতর থেকে দু-একটি চঞ্চল পাখির উঁচু আকাশের শূন্যে মিশে যাওয়া? কন্ডাকটরের সাগরেদ ছেলেটি চেঁচাচ্ছে কামার মাঠ

...কামার মাঠ...। বাতাসে শুকনো শীত, সুলেখা স্থির হয়ে বসে, নাকি জলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে আছে ও? গরমে সবুজ লজেন্স নিয়ে দু' আনায় পাঁচটি বলে বাসের জানলায় দাঁড়িয়েছে একজন। কিন্তু কিছুই যেন আমাকে টানছে না, সুলেখার নিঃশ্বাস হাটি ছাড়িয়ে শরীরে হারিয়ে যাচ্ছে আমার, কিন্তু আমার কোন অস্থিরতা নেই, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য খোঁচা পিনের মত ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে আমার। ঈর্ষা? সুলেখাকে আমি ঈর্ষা করছি? অ্যাবসার্ড! তবে? সমস্ত রাত জল পড়ে যাওয়ার মন্থর শব্দের মত কী আমাকে ভাবছে এখন? আমি কেমন হেরে যাচ্ছি, কাটা ঘুড়ির মত উদ্দেশ্যহীন, আমের মঞ্জরীর রঙের ওপর ওর স্বাভাবিক হাত, আঙুলগুলো জড়িয়ে আছে রোদ্দুরে, আমি আর একবার সম্পূর্ণ সুলেখাকে দেখি, ওর সামান্য চাপা কপাল এখন শান্ত ও উজ্জ্বল। সুলেখা কী মেয়ে বলেই জীবন চমৎকার পোষা বেড়াল হয়ে আছে ওর কাছে? চাকরি, সুখ, পায়ের নিচে অফুরান স্বাধীনতা, বৃষ্টির সন্ধ্যায় রেকর্ড-প্লেয়ারে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনতে শুনতে হয়তো ও টের পায় পাকা ধানের গন্ধের মত এই জীবন। কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা, সুলেখার দৃষ্টিতে একটুও ধুলো লেগে নেই। মেয়ে, তাই পাল্লাটা ওর দিকেই ঝুঁকে আছে।

—তোমার সব খবর কী? সুলেখার নখ রোদে আঁচড় কাটছে এখন। একটা নিমগাছের নিচে টিউবওয়েল পাম্প করছেন একজন মহিলা।

—ভাল, খুব ভাল। আমি হঠাৎ সংলাপ মুখস্থ বলার চেষ্টা করি। খেজুর রসের ফেনার মত আমার ভেতরটা তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়। সুলেখা ওর ঠান্ডা চোখ তুলে আমাকে দেখে। বাসের পেছনের দিকে কে একজন 'সুরেশ, সুরেশ' বলে চেঁচায় একজন মহিলার কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু, বাসের চাকার শব্দ গড়িয়ে যেতে থাকে আমাদের ওপর দিয়ে, লম্বা মাঠে অলস উদাসীন সকাল।

—তুমি কী লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছ? তেমন চোখে পড়ে না কোথাও—

—ও আমার হবার নয়, শুধু শুধু সময় নষ্ট। আমার ঠোঁট বাসি বাতাসে কী শুকিয়ে যায়?

—কে বুঝিয়েছে? সম্পাদকেরা না নিজেই? সুলেখা সুন্দর করে হাসে। হাসির নিজস্ব শব্দে বাস ভরে যায়। আমি তখন ওর গলার কাছাকাছি নীল শিরায় আবেগ টের পাই। সুলেখা ঠাট্টা করছে? না অবিশ্বাস? ওর গলায় দু বছর আগের ছোট ছোট দুঃখের।

একটা পুকুর, শহরতলীর জীবন। দুটো সাইকেল পাশাপাশি চলে গেল। একটা পোস্টার চোখে পড়ে: বিরাট জনসভা, স্থান: চণ্ডীতলার মাঠ, দু-একজন শিল্পীর এম-পির নাম। সেই পোস্টারের অর্ধেক ঢেকে আছে চলিতেছে 'বিরাজ বৌ'। উত্তম-কুমারের বেদনার্ত মুখ। একটা পেট্রল পাম্প স্টেশানে দুতিনখানা গাড়ি। বাসের ভেতর সুলেখার মুখে এলাচির গন্ধ। সুলেখার হাত কী আমাকে ছুঁয়ে গেল?

—জানো, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কফি-হাউসে গিয়ে পড়েছিলাম। সেই ভিড়, কথা, শব্দের ওঠানামা, বেয়ারারা ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে, সিগারেটের পাতলা ধোঁয়া ফ্যানের শব্দে মিশে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে রইলাম, বসার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ, অথচ একটাও চেনামুখ খুঁজে বার করতে পারলাম না। নতুন ছেলেমেয়েরা ভিড় করে আছে, শব্দ করে হাসছে, আঙুল তুলে অন্য টেবিলের পরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা, সামনে বইখাতা, সেই রবীন্দ্রনাথের ফোটোর নিচে যেখানটায় আমরা দলবেঁধে বসতাম, সেখানে অবিকল সেরকম একটা ছবি, কিন্তু আমরা নই, এত কষ্ট হল না! আমরা বাতিল হয়ে গেছি, সিনেমা দেখা হয়ে যাওয়ার পর টিকিটের মত।

—তাই তো নিয়ম, ওল্ড অর্ডার চেঞ্জেস...

বাসটা কী হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠল?

কারো সঙ্গে দেখাটেখা হয়? আমি উলটো সাঁতার কাটার মত হাত-পা ছোঁড়ার চেষ্টা করি।

—দিন কয়েক আগে শেখরের সঙ্গে দেখা হল, 'কলকাতা৭১' দেখতে গিয়ে। ও বৌ নিয়ে এসেছিল। ওর বৌ নাকি ভাল সেতার বাজায়। ও নিজেই অনেকের কথা জিজ্ঞেস করল। ওর শোনপাপড়ির মত ছিমছাম বৌ বাড়িতে ইনভাইট করল। শেখর জানতে চাইল চন্দনার খবর কী? আমি দারুণ হেসে বললাম, কেন সে খবর তো তুমিই দেবে। কেন, আর সরস্বতী পুজোর দিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করছে না?

তারপর অনেকের খবর দেওয়া-নেওয়া চলল। তাপস নাকি মাঝে খুব রাজনীতিতে জড়িয়ে জেলটেল খেটেছে। শেখর বলল, মিহির ডক্টরেট করেছে। অসীম নাকি এখন কোথাকার এস-ডি-ও, ও জানতো না হেনা মারা গেছে। সুলেখা এখন একটানা কথা বলে যাচ্ছে। কথার ভেতর ডুব দিয়ে কথা তুলে আনছে। যেন বহুদিনের ফেলে-যাওয়া ঘরে আবার একা এসে দাঁড়িয়েছে এই বাসের স্পীডের মত একটা দুর্দান্ত উত্তেজনায় সুলেখা টগবগ করছে এখন। ও যাদের কথা বলছে, যাদের কথা শুনতে চাইছে, কয়েক বছর আগের আমাদের সেই দিনগুলোকে এখন কাঁচের তেকোণা নল দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে চাইছে; আমিও কী উজানে ভাসছি না? মনে পড়ল আমাদের দলবেঁধে চন্দননগর বেড়াতে যাওয়ার কথা। একটা দুর্দান্ত দুপুর টলমাটাল করে আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসা। রক্তের ভেতর সেই অসংখ্য ছেলেমানুষীর খেলা। তাপসটা কোত্থেকে গাঁজা জুটিয়েছিল তাই দেখে সুলেখা বাজি রেখে ভকভক করে টানল, ব্যস তার চোখের সামনে সব ধোঁয়া। চন্দনাকে পাগল করে তুলল শেখরের ব্যাপার নিয়ে, গান জানে না, তবু অদ্ভুত গলায় খানিক চেঁচাল—আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে...। তারপর জলের ভেতর হাওয়ার ভেতর জ্বলে ওঠা শরীর, মাথার বিশাল শূন্যতা...কী গভীর সুখ, দুঃখ হয়ে বুকের শব্দে মিশে যায়, ওর চামড়ায় লেগে থাকে জুঁই ফুলের মত জল। যা দেখতে দেখতে আমার মাথায় নীল-কুয়াশা ভরে যায়। আমি রোদ্দুরের মত ভয়ংকর হয়ে উঠতে গিয়ে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি। দুপুরের জলে হৃদয় শব্দ হয়ে ঘোরে...একখণ্ড মেঘ সাদা থেকে বাদামি হয়ে আমাদের চোখের ওপর দিয়ে স্বপ্নের মত উড়ে যায়। শেখর অনেকগুলো ছবি তোলে। অসীম ফরাসীদের সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে শুরু করে। আর সুলেখার গোড়ালিতে ঘাস লেগে আছে দেখে আমি কেঁপে উঠি। কিন্তু আশ্চর্য! মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয় নীলামে তুলে দিয়ে দারুণ জোরে হাসতে হাসতে সুলেখা নৌকোয় ঘুরে বেড়াবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ফেরবার সময়েই সব গোলমাল হয়ে গেল। সুলেখা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুখটা অদ্ভুত। হৈ চৈ করছিল, এক-সময় মনে হচ্ছিল ও পাগলামিতে বোধহয় নৌকোটা ডুবিয়ে ছাড়বে, জলের ভেতর জল হওয়ার খেলা। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত শরীর ঢিলে করে ও

শুয়ে পড়ল। আমরা অন্যমনস্ক ছিলাম। নদীর ওপর কেমন দিনশেষের রঙ, সেই অলৌকিক রঙ গায়ে মেখে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে কয়েকটি পাখি। হরতকির মত রঙ দিগন্তের কাছে, জলের শব্দ। সুলেখা হয়তো আর সহ্য করতে পারছিল না, ওর চোখ হলুদ হয়ে আসছে, তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। হাত তিলে করে প্রাণপণে পৃথিবীর ঘ্রাণ নিতে চাইছে তখন। আমরা কেউ ওর অসুখ দেখিনি কোনো দিন, জানতাম না। শেখর বলল—কী রে, হসপিটালে নিতে হবে নাকি? কেমন যন্ত্রণায় কোঁচকান চাদরের মত হয়ে যাচ্ছে ওর মুখ। নষ্ট পেঁয়াজের রঙ ওর ঠোঁটে। কয়েকবার ওকে ডাকল চন্দনা, চোখে-মুখে জল দিল। অস্ভুত এক অস্বস্তির মধ্যে ফিরে এলাম কলকাতায়। অসীম বলল, তুই বাড়িতে তো গেছিস অনেকবার, তুইই পৌঁছে দিয়ে আয়। ট্যাকসির পেছনের সীটে প্রায় আচ্ছন্ন সুলেখা। বাইরে সন্ধ্যার কলকাতার শব্দ আলো আমাদের ছুঁয়ে যায়? সুলেখার ঠোঁটের ওপর ঘাম, চোখ ভেজা, আমীর আলি এভিনিউ দিয়ে বেকবাগানের দিকে ট্যাকসি যাচ্ছে। আমি রুমাল বার করে ওর চোখ মুছিয়ে দেই। অস্ভুত! শহরের অসংখ্য সুখ দুঃখ, হাওড়া স্টেশনের মাইকের ঘোষণা, হ্যারিসন রোডে আউট লাইন ট্রাম, কোনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলে, অন্ধের কষ্ট করে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা...। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটি সুন্দর মেয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে আমার হাত। আমি কী ফিরে গেছি মহাভারতের যুগে? এক বলবান ও সুখী নায়কের মত আমি ছায়ার মত ঢেকে আছি সুলেখাকে? ও কি কিছু টের পাচ্ছে? বুঝতে পারছে?

দিন চারেক বাদে আবার যখন ওর বাড়ি যাই ওর গলার স্বর তখনও নিচু। চোখের দৃষ্টি সাদা। বার্লির মত ফ্যাকাসে হাসিতে ও আমাকে বসতে বলে।

—তোমাদের সেদিন সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছি না?

—তোমার এ রকম একটা ভয়ানক অসুখ আছে, অথচ...

—আমিও ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়, ছ'-সাত বছর আগে স্কুলে যখন পড়ি তখন শেষবার হয়েছিল, আগে ছেলেবেলায় খুব হত। জানো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যেতাম। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখা হত আমাকে।

—তোমার রুমালটা রয়ে গেছে, নিয়ে যেও।

আমার মাথার ভেতর যেন ক্রেন আটকে যায়। সুলেখা কী সব সময় নিজেকে ভুলে থাকতে চায়? নাকি বাইরের সুলেখা ছোটদের হাতের কাগজের প্লেনের মত উড়তে গিয়েই পড়ে যায়? কিন্তু কে ওকে দেখে সে কথা কখনও বিশ্বাস করবে? আমি প্রায়ই বলতাম—তোমার এই সব সময় পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা, এটা ভাল, আসলে, রিয়েলিটিকে তুমি ভয় পাও। হাসত সুলেখা। কিছু বলত না। অথচ জানতাম মিহি চালের মত ওর জীবন নয়। রিসক নিয়ে ব্যবসা করতে নেমে ওর বাবা প্রায় পথে বসেছেন। এখন একটা স্ট্রোক হয়ে যাবার পর পাকাপাকি বিছানায়। ওর মা সংসার টানতে তাই একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করেন। তিনটে ছোট ছোট ভাইবোন। কিন্তু যখন সুলেখা তাপসকে জব্দ করায় মজা পায়, বা চন্দনাকে ক্ষেপায়, আমার খাতা নিয়ে ফেরত দিতে অসম্ভব দেরি করে, অথবা লাইব্রেরিতে নোটস করতে বসে ফার্স্ট পেপারেই নির্ঘাত ডুববো বলে— ছটফট করে তখন কে বলবে সুলেখা কোনো গল্পের চরিত্র নয়? ওর স্পষ্ট গভীর চোখ কখনো কখনো জলে ভিজে যায়?

এই, তুমি কোথায় নামবে?

সুলেখার কথা মিহি বৃষ্টির মত উড়ে আসে আমার দিকে। আমি তাকাই। বাসের শব্দে আমার মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়। বাইরে দিনের বয়স বাড়ছে, বটগাছের গায়ে ধুলো, আমের মঞ্জরীর মত শাড়িতে রোদের বিশ্রাম, আমি কী এতক্ষণ জলের নিচে ডুবে যাচ্ছিলাম?

—এবার নামব, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—আমিও, ব্যাগ তুলে, শাড়ি গুছিয়ে সুলেখাও উঠে দাঁড়াল।

—মীরার বাড়ি এখানে?
কথা না বলে ছোট করে হাসল সুলেখা।
দুজনেই নেমে এলাম শেষ পর্যন্ত।

আমার অস্বস্তি বাড়ছিল। যদি সুলেখা আমার চালাকিটা বুঝতে পেরে থাকে! ওকে অ্যাভয়েড করার দারুণ ইচ্ছে হল এখন। বললাম, বন্ধুর বাড়িতে বড় আরলি এসে গেছি। একটু ঘুরে-টুরে কোথাও চা-ফা খেয়ে যাই। আসলে ইন্টারভিউর তখনো ঘন্টাখানেক দেরি। বললাম, তুমি চা খেতে যাবে, না দেরি হয়ে যাবে?

—না কাজের বাড়ি, চলেই যাই, সাইকেল রিকসায় উঠে ও হাত নাড়ল।

একটা টানা লম্বা বারান্দায় আট-ন'খানা চেয়ার দখল করে বসে আছে রোগা-মোটা কয়েকজন। দু-চারজন দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। পুরনো বইয়ের মলাটের মত মুখ অনেকের। গুনলাম, একুশ-বাইশজন, অথচ পোস্ট একটা। আমার মত নির্দোষ বেকার বোধহয় আর একজনও নয়। যারা গম্ভীর-মুখে মোটা ব্যাগ নিয়ে বসে আছে, তারা বোধহয় দূরের কলেজ-টলেজে আছে, কলকাতার কাছাকাছি আসার চেষ্টা। অনেকে হয়তো স্কুলে আছে, এখানে চাকরি হলে মাইনে কমবে, স্ট্যাটাস বাড়বে। তাই আলটপকা অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে কেউ কেউ, যদি লেগে যায়। আমার হাসি পেয়ে গেল রবিদার একটা কথা মনে পড়ে। হাত দেখে বলেছিলেন, তোর এখন ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে। চাকরি-বাকরির কোনো চান্স নেই, শুধু শুধু পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে বড়-লোক করছিস। আমি বারান্দার চারপাশে আর একবার তাকালাম, একটু দূরে একটা ছন্নছাড়া বাগান, কয়েকটা পেঁপে ও কলা-গাছ, অদ্ভুত একটা ঠান্ডা গন্ধ উঠে আসে। রোদের ভেতর হলুদ প্রজাপতিরা সূর্যের দিকে উড়ে যাচ্ছে? আশ্চর্য! এর মধ্যে বিষণ্ন, উদ্বিগ্ন মধ্যযৌবন কিছু মানুষ; প্রত্যেকেই বোধহয় প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ করছে, এই বোধহয় ভেতরের লোক। হঠাৎ মনে পড়ল সুলেখা কী এখন মীরার বাচ্চাটাকে আদর করতে করতে শীতের শান্ত মাঠের ছবি দেখছে না? আচ্ছা, কোন বাসে ফিরবে ও?

কিন্তু আরও কিছু বাকি ছিল আমার জন্য। সবুজ পর্দা টাঙানো মাথায় স্টাফ-রুম লেখা ঘরের ভেতরে কয়েকটি মেয়ের জটলা। তারাও যুদ্ধে অবতীর্ণ। হঠাৎ নিজের নামটা শুনে চমকে গেলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার চমকাবার কিছু ছিল না। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে সুলেখা।

—তুমি? আমি হসালাম।

সুলেখার হাসির দাগ সমস্ত মুখে ছড়িয়ে গেল।

—হ্যাঁ, দুজনেই কেমন ধরা পড়ে গেলাম।
আমার উদ্বেগ কেটে যাচ্ছিল। যেন অপরিচিত কোনো দূরের স্টেশনে হঠাৎ কাছের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
হঠাৎ সুলেখা বলল—চলো।

—কোথায়?

—আর বসে থেকে কিছু লাভ নেই। ভেতরে গিয়ে বুঝলাম, একটি মেয়ের হবে, সেক্রেটারির শ্যালিকা, অতএব বুঝতেই পারছো—

সমস্ত শরীর ভরে যাচ্ছে হাসিতে। ওর চোখে কী এই শীতের দুপুর?

শহরতলীর মন্থর দুপুর। নির্মেঘ আকাশে হাওয়ার শরীরে লেগে আছে অগণন হাওয়া। একটা গাছের ভেতর থেকে অদ্ভুত বিষণ্নতায় কোনো পাখি ডেকে উড়ে গেল। এদিকে এর মধ্যেই আমগাছ মুকুলে ভরে গেছে।

সুলেখা চুপ করে হাঁটছে। আমিও। দুরন্ত কোনো কথা কী আমরা দুজনেই খুঁজে যাচ্ছি এখন। নিমগাছের ছায়ার কারুকার্য সুলেখার শরীরে। রাস্তার পাশে দু-তিনজন একটা গাছের গুঁড়ি করাত চালিয়ে কেটে যাচ্ছে। তার হিস হিস শব্দ আমাদের শরীরে মিশে যায়। পাশে মরা ধান ক্ষেত পড়ে আছে। নরম রোদ যেন মাদুরের মত মেলে দেওয়া সেই মাঠে। কোথাও কী চিল ডেকে উঠল? একটা কালো পুকুরের ও-পাড়ে আশ্চর্য টাটকা কয়েকটা জবা চোখে পড়ল। সুলেখা কী ওই রঙ দেখছে এখন?

—সুলেখা,

—বলো,

—আমাদের দুজনের কারোই চাকরিটা হল না।

—কী আর করা যাবে তা বলে?

আবার সাইকেল রিকসার শব্দ আমাদের ডিঙিয়ে যায়। পেয়ারা গাছের নিচে গুলি খেলতে খেলতে কয়েকটি ছেলে আমাদের দেখে।

—অনেকদিন আগে আমার একটা গল্প নিয়ে তুমি আমাকে যাচ্ছেতাই বলেছিলে, মনে আছে তোমার?

সুলেখা কী এই প্রথম ঘাসের সবুজে চোখ নামিয়ে নিল?

কিন্তু আমার মনে পড়ছিল ওর পুরনো কণ্ঠস্বর। যেন এক অদৃশ্য টেপ রেকর্ডার ঘুরে চলেছে আমার ভেতরে।

চালাকি পেয়েছ? ইতি ও রকম একটা কনরুদ্ধশ্বাস জীবনে কেন মেনে নেবে? বসন্তের বিশাল হাওয়ায় ইতি একা পথ হাঁটছিল, ইউক্যালিপটাসের ছায়া ওর শরীরে। আর তখন কলকাতার গাছের মাথায় আলো জ্বালিয়ে মালাবদল হচ্ছিল সঞ্জয়ের। ওই ছায়ার দিকে তাকিয়ে কিছু কী ভাবছিল ইতি? ভারী ট্রাক চলে যাবার শব্দে মাটি কাঁপছিল, ইউক্যালিপটাসের ছায়ার ঠান্ডা হাত কোনদিকে টেনে নেবে তাকে? এরকম একটা শেষ দেখে দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিল ও। ঠোঁঁটে শব্দ করে বলে উঠেছিল, কেন ইতি সঞ্জয়ের ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট বাবার কাছে গিয়ে বলতে পারল না জীবন নিয়ে এরকম পুতুল খেলা চলে না মিঃ সেন?

আমি চুপ করে ছিলাম।

—আসলে, পুরনো সেন্টিমেন্টই মাথা খাচ্ছে তোমাদের? ওর গলায় তখনো কঠিন আক্রমণ। মেয়েরা সবসময় ধূপকাঠি হয়ে গন্ধ ছড়িয়ে যাবে। আহারে, কী আবদার!

এতে রাগ হচ্ছিল না আমার?
আমি যদি হতাম না...
—কী করতে তাহলে?

—নিশ্চয়ই ইউক্যালিপটাসের শরীরে ছায়া হয়ে হারিয়ে যেতাম না।

খুব হেসে ছিলাম ওর কথায়।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কাছেই কী কোনো ছোটদের স্কুল আছে? অনেক ছেলে-মেয়ে মাঠ ভেঙে কোথায় চলে যাচ্ছে। আকাশের বিপুল বৈরাগ্য এখন সুলেখার শরীরে। একটা বাড়ি কিছুটা উঠে এখন অবহেলায় পড়ে আছে। সেদিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সুলেখা। আমার ইচ্ছা হল এখন ওকে জিজ্ঞেস করি—ছায়া হয়ে হারিয়ে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে আছে তোমার?

—তবু তো একটা অছিলায় আবার কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—হ্যাঁ।

—আমরা কিন্তু অনেকটা পথ হাঁটলাম।

—ভাল লাগল না?

সুলেখা রোদের ভেতর রোদের রঙ দেখছে এখন?

—রিকসা নেব?

—কিছু দরকার নেই। সুলেখার ঠোঁট ও আঙুলে লোভী হাওয়ারা উঠে আসে।

—এখনো অনেকটা পথ কিন্তু।

—মন্দকী...

বাস স্টপ চোখে পড়ল আমাদের। দু-চারজন যাত্রী এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে; বাস আসতে বোধহয় দেরি আছে কিছুটা। আকাশে দিনশেষের রঙ ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। একটা করবীগাছের নিচে সমস্ত আকাশ গায়ে মেখে সুলেখা ছবির মত। আমি তাকালাম। করবীর হালকা গন্ধ। বিকেলের লম্বা ছায়া যেন ক্রমশঃ টেনে নিচ্ছে সুলেখাকে। হঠাৎ আমায় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল—সরে এসো সুলেখা। বোধহয় বাস আসছে। দূরে ধুলোর মেঘ। ডাল-পালা ভেঙে অদ্ভুত এক ছায়ার ভেতর এখন সুলেখা। ওই ছায়ার ভেতর কী দেখছে এখন?

ইয়েভতুশেংকো

আত্মকাহিনী—(২)

১৯৬৩-এর জুলাই মাসে বৈকাল হ্রদের কাছাকাছি একটি ছোট রেলওয়ে স্টেশন জিমা-র ইয়েভতুশেংকোর জন্ম। তাঁদের পরিবারবর্গ কিষাণ বংশোদ্ভূত। প্রপিতামহকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়, তিনি তাঁর জমিদারের ঘরে আগুন লাগানোর প্রয়াস করেছিলেন সেই অপরাধে। ইয়েভতুসেংকো বলেছেন—আমাদের পরিবারে "বিপ্লব" কথাটি অতি শান্ত ধীর ও গম্ভীর ভঙ্গীতে উচ্চারিত হত। আমাদের পরিবারে "বিপ্লব" ছিল একটি ধর্মের মত পবিত্র।

পিতামহের এক সুন্দর রেখাচিত্র এঁকেছেন ইয়েভতুসেংকো। ১৯৩৮-এ শেষ দেখা, তখন ইয়েভতুসেংকোর বয়স মাত্র পাঁচ বছর তবু সেই রাতের কথাবার্তা সব স্মরণে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ইয়েভতুসেংকো তারপর আর পিতামহকে দেখেন নি, তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে সেই রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়।

ছুটির দিনে প্যারেড দেখতে যেতেন জনক-জননীর সঙ্গে। পিতাকে বলতেন, আমাকে একটু উঁচু করে তুলে ধরো, স্তালিনকে ভালোভাবে দেখতে চাই।

পিতা জনতার ভিতর উঁচু করে তুলে ধরতেন। মনে হত যেন স্তালিন ওর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। অন্য যেসব ভাগ্যবান ছেলের দল স্তালিনের হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিত তাদের ওপর ঈর্ষা হত। স্তালিন পুজোর ব্যাপারটি জোর করে চাপানো হয়েছে একথা মিথ্যা। স্তালিনের এক সম্মোহক আকর্ষণ ছিল। যেসব বলশেভিক গ্রেপ্তার হতেন তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে তাঁদের এই দুর্দশার কথা স্তালিন অবগত আছেন। তাঁরা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়েও নিজেদের দেহের শোণিতে কারাগারের দেওয়ালে লিখতেন—"স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন।"

রাশিয়ার জনগণ ঠিক বুঝতে পারেন নি আসলে কি হয়েছে—ভেবেছেন কিছু একটা ঘটেছে, তবে সেটি যে কি তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি। রাশিয়ার জনগণ অলস চিন্তায় সময় না কাটিয়ে কাজ করে গেছেন। কাজ করতে তাঁরা ভালোবাসতেন। বীরত্বপূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁরা যেভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ও কারখানার পর কারখানা গড়েছেন ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত নেই।

আমাদের জনক-জননী আমাদের কাছ থেকে সমগ্র ব্যাপারটি চেপে যাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ফলে ব্যাপারটির গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়েছিল।

আমার জনক-জননী মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ছিলেন একেবারে পরস্পরবিরোধী, ফলে তাঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে। বিশের দশকে ছাত্র অবস্থায় জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই তখনকার দিনে কিষাণ ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘরের।

আমার পিতৃদেবকে একবার কমসোমলের সভায় বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন বলে আক্রমণ করা হয়। কারণ তাঁর গলায় একটা 'টাই' বাঁধা ছিল। আমার পিতা সম্প্রতি এই ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন। মস্কো-র এক রেস্তোরাঁয় আমরা সেদিন প্রবেশাধিকার পাই নি, উভয়েই 'টাইহীন' এই অপরাধে।

ইয়েভতুসেংকো লিখেছেন — যুদ্ধ কাছে ঋণী। তিনি আমার মনে পড়াশোনার আগ্রহ জাগিয়েছেন। আমার বয়স অতি অল্প হলেও তিনি আমাকে ব্যাবিলনের পতন, স্প্যানিস ইনকুইজিশন, ওয়ার অব রোজেস ইত্যাদি প্রসঙ্গে ও অরেঞ্জ উইলিয়ামের গল্প বলতেন। উইলিয়ামের কাহিনী তাঁর প্রিয় ছিল।

পিতার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর প্রিয় কবি লারমনতভ, গ্যয়টে, পো এবং কিপলিঙ-এর অনেক কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি আবৃত্তি করতেন। পিতার প্রভাবে আট বছর বয়স হতে না হতেই ইয়েভতুসেংকো ডুমা, ফ্লবেয়ার, সীলার, বালজাক, দান্তে, মোপাসাঁ, সার্ভেন্টিস, শেকসপীয়র, ওয়েলস, জ্যাক লণ্ডন প্রভৃতি পড়ে ফেলেছেন। মাথার ভিতর এইসব এক পাঁচমিশেলী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করতেন ইয়েভতুসেংকো—আশপাশের কোনো কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

এমন কি পিতা-মাতা দুজনের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এসেছে এবং শুধু-মাত্র ইয়েভতুসেংকোর খাতিরেই তাঁরা একত্রে আছেন এই চিন্তাও তাঁর মনে জাগে নি।

১৯৪১ পর্যন্ত এই রোমান্টিক আবেগ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর ধারণা ছিল মানুষ যে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে সে শুধু পুঁথির পাতায়।

ইয়েভতুসেংকো লিখেছেন যুদ্ধ সম্পর্কিত আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া অনেক আলংকারিক। মস্কো-র আকাশে সার্চ-লাইটের আলো ভালো লেগেছিল, বিমান আক্রমণের কালে সতর্কতামূলক সাইরেনের আওয়াজ অন্তরে আতঙ্ক উদ্রেক না করে

[illegible] জাগিয়েছিল। বয়স্করা সুন্দর [illegible] আর রাইফেল পেয়েছিল বলে ও [illegible] "ফ্রণ্ট" নামক এক আশ্চর্য দেশে [illegible] যেতে পারে এই ভেবে মনে মনে তাদের ঈর্ষা করতাম।

এরপর ইয়েভতুসেংকো বলছেন, আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর দৃশ্য হল জিমা জংশনে এসে বিবাহের দৃশ্য দর্শন। অল্পবয়সী যেসব তরুণ যুদ্ধের প্রয়োজনে আহূত হয়েছিল, তাদের হাতে মাত্র দুই কিম্বা তিন দিন সময় থাকত। তারা তার মধ্যেই বিবাহটা সেরে নিত, কেউ কেউ মাত্র একটি রাতের বিবাহিত জীবনযাপন করত তারপরই বৈধব্য বরণ করতে হয়েছে অনেককে। লোকনৃত্যে পারদর্শী হওয়ায় ইয়েভতুসেংকো এই জাতীয় অনেক বিবাহে নৃত্য করার জন্য আহূত হতেন এবং বিনিময়ে পেতেন এক খণ্ড রুটি আর একটি আলু। ইয়েভতুসেংকোর ভাষায় এর নাম "ভয়ংকর বিবাহ"। এই সব তিনি তাঁর "ওয়েডিং" নামক বিখ্যাত কবিতায় ধরে রেখেছেন। ইয়েভতুসেংকো বলেছেন—'শান্তি' কথাটির অর্থ তারাই বুঝবেন যাঁরা জানেন যুদ্ধ কি বস্তু। যুদ্ধকে আমি ধন্যবাদ দিই এই কারণে যে যুদ্ধের জন্য আমি বুঝেছি "শান্তি" কাকে বলে, 'শান্তি' কথাটির অর্থ কি। যুদ্ধকে আরো ধন্যবাদ যে যুদ্ধ আমাকে সহায়তা করেছে "আমার দেশ" এই কথাটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে।

ইয়েভতুসেংকো আরও বলেছেন—"মানুষকে ভালোবাসা সম্ভব হয় তখনই যখন মানুষ তার স্বদেশকে ভালোবাসতে পারে।"

এরপর ইয়েভতুসেংকো প্রশ্ন করেছেন তাহলে কি বুঝতে হবে রাশিয়া শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেমের জন্য যুদ্ধ জয় করেছে?

না, তা নয়।

যুদ্ধের পূর্বে রুশ জনগণ এক খণ্ডিত জীবনযাপন করছিল—স্তালিনের বন্দী শিবিরের আতংক সত্ত্বেও—রুশ জনগণের অন্তরের গভীরে বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আস্থা কোনোদিনই লুপ্ত হয় নি। যুদ্ধের আবির্ভাব সম্ভাবনায় কবি মিখাইল কুলচিৎসকী লিখেছিলেন—

> And once again,
> through dove-grey mists,
> The secret units move.
> And once again we are as near
> To Communism as in 'nineteen'.

আমাদের যুদ্ধজয়ের প্রধান কারণ যুদ্ধের সময় আত্মিক দিক থেকে রুশ জনগণের জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল—আর অবিশ্বাসের অস্বস্তি নেই—আর যুদ্ধজয়ের এই হল প্রধানতম হেতু।

আমরা সবাই, বালক-বৃদ্ধ, শ্রমিক, কিষাণ, বুদ্ধিজীবী সবাই তাদের সব অকাতরে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় দান করেছি। আমি নিজেও কাজ করেছি, ফসল তোলার কাজে সাহায্য করেছি, কারখানার কাজে কাজ করেছি, ওষুধ সংগ্রহের কাজও করেছি।

আর এই সময়েই সর্বপ্রথম পদ্য রচনা সুরু করলাম। তখন কাগজ পাওয়া যেত না। একটা খাতা কিনতে গেলে দু পাউণ্ড মাখন লাগত। বিদ্যালয়ে আমরা বিজ্ঞাপনের কাগজের ফাঁকে ফাঁকে লিখতাম। একটা উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলাম তাই আমার পিতামহীর মার্কস ও এঙ্গেলসের দুটি খণ্ড নিয়ে তার শাদা অংশগুলি এক বছরের মধ্যে লিখে ভরিয়ে দিলাম। আমার পিতামহী আমাকে ক্ষমা করেছিলেন। আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—এর ফলে কালে তুমি একজন উত্তম মার্কসিস্ট হবে।

মনে হয় আমার পিতামহীর ধারণা ভ্রান্ত হয় নি।"

ইয়েভতুসেংকো তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশের কথা বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন:

"সাতটার সময় কাগজওলার কাছ থেকে এক খণ্ড 'সোবিয়েত স্পোর্ট' নাম পত্রিকা টেনে নিলাম। তখনও কালির গন্ধ যায় নি। দেখলাম কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, কবিতার নীচে আমার নাম।

কাগজওলার কাছে যা ছিল সেই পঞ্চাশ কপি পত্রিকা কিনে নিলাম। আমার পায়ের তলার মাটি ঘুরছে।

আমি এক প্রতিভাধর ব্যক্তি।

বাড়ি গিয়ে মার সামনে যখন কাগজটা খুলে ধরলাম তখন তাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনো উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না।

তিনি হতাশাব্যঞ্জক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—তাহলে এখন তোমার আর কোনো আশা রইল না।"

মা হয়ত ঠিকই অনুমান করেছিলেন সেই সময়।

পরে সেদিনই তারাসোভ (সতীর্থ) যাতে আমি দক্ষিণা পাই তার ব্যবস্থা করল, আমি ৩৫০ রুবল পেলাম। আমার কোনো আইডেন্টিটি কার্ড না থাকায়, বার্থ সার্টিফিকেট দেখাতে হল। একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি আমার টি সার্ট আর ছেঁড়া জুতো এবং বিশ্রী নাক দেখে কোনোমতে হাসি চাপলেন।

আমি পিছন ফিরতে ওরা খিল খিল করে হেসে বলে উঠল "কি বেয়াড়া হাঁসের ছানার মত আকৃতি!" আমি কিন্তু ধন্যবাদ দিয়ে রাজহংসের ভঙ্গীতে চলে এলাম।

আমার মা সব সময় বলতেন, তা ছাড়া বই-এ পড়েছি সব কবিই মাতাল। এখন আমি কবি হয়েছি, রোজগারের সব টাকাটাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেওয়া স্থির করলাম।"

এরপর সেই টাকাটা কিভাবে ব্যয় করা হল তার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। মাতাল পুরুষকে সবাই যখন ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল তখন আর সব জননীর মতই ইয়েভতুসেংকোর জননী বিলাপ করে কেঁদে উঠেছিলেন। ফুটবলের গোলকীপারের পদে নির্বাচনের কথা ছিল—বেলা দশটার সময় যখন কোচের কাছে গেলেন, তখন তিনি শেকসপীরীয় ভঙ্গীতে স্বগতোক্তি করলেন—"সকাল দশটায় পনের বছরের বাচ্চা মদে চুরচুরে হয়ে এসে হাজির। এই অধঃপতনের যুগে বেঁচে থাকতে আমার লজ্জা হচ্ছে।"

ইয়েভতুসেংকো লিখেছেন — আমার ফুটবল খেলার জীবনের এখানেই ইতি।

এই গ্রন্থের শেষাংশে আছে "লিটারারি গেজেটে" ইয়েভতুসেংকো কীয়েভের বাইরে দেশে বেবী ইয়ার নামক যে জায়গায় নাৎসীরা ইহুদীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে সেই 'বেবী-ইয়ার' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে "ইহুদী-বিদ্বেষী" মনোভাবের নিন্দা ছিল, সেই কারণে কবিতাটির নিন্দা করেন।

'লিটারারি গেজেটে'র প্রধান সম্পাদক অনেক বিবেচনার পর কবিতাটি প্রকাশ করেন। লিটারারি গেজেট কয়েক মিনিটের মধ্যে সব বিক্রী হয়ে গেল। অজস্র অভিনন্দন আসতে লাগল। কিন্তু "লিটেরেচার ও লাইফ" পত্রিকায় জবাব দিলেন অলেকসী মারকভ। তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন।

ইয়েভতুসেংকো লিখেছেন "বিশ হাজার চিঠি আমাকে অভিনন্দিত করেছে আর মাত্র ত্রিশ-চল্লিশটি আমাকে আক্রমণ করেছিল তীব্র ভাষায়। কিন্তু আমার ভয় ছিল না। ভয় হল মারকোভের। সে আর প্রকাশ্যে মুখ দেখাতে পারে নি।

মায়াকোভস্‌কী স্কোয়ারে যখন আমি কিউবা যাত্রার প্রাক্কালে এই কবিতা পাঠ করলাম, তখন দুশ হাজার শ্রোতা আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানালো। আমার জীবনে জনগণের এই সমর্থন চিরস্মরণীয়।

ইয়েভতুসেংকো তাঁর আত্মজীবনী শেষ করেছেন এই উক্তি দিয়ে—

"আমি গর্ববোধ করি যে আমি শুধু দর্শকমাত্র নই, আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ জীবনের বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রামে আমি অংশ নিয়েছি।"

"আমি বিশ্বাস করি আমাদের জনগণ ও আমার সামনে সব কিছুই পড়ে আছে।"

ইয়েভতুসেংকোর এই জীবনেতিহাস সর্বদেশের তরুণ সমাজে এক অভিনব উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করবে।

—অভয়ংকর

A PRECOCIOUS AUTOBIOGRAPHY : By : YEVGENY YEVTUSHENKO (Tr : from Russian by Andrew R. MacAndrew : E. P. DUTTON & CO : INC : N. YORK.

পার্ল বাক

এমন একটা সময় ছিল, যখন 'গুড আর্থ'-এর নামে সারা পৃথিবীর সাহিত্য-মহলে চাঞ্চল্য জাগত। এখনো হয়তো জাগে। কেননা, 'গুড আর্থ' তো কেবল জনপ্রিয় উপন্যাস ছিল না। ছিল তারও অতিরিক্ত। আমরা এই উপন্যাসটির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম, প্রাচ্যের অন্যতম একটি বৃহৎ দেশ, চীনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আভ্যন্তরীণ জীবন চেতনার নিগূঢ় পরিচয়।

সেকালে বইটি বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। যেমনভাবে, পৃথিবীর অনেকগুলি সমৃদ্ধ ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে, এবং লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে, অনেকটা তেমনিভাবেই বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও ছিল তার বিপুল সমাদর। আমার বিশ্বাস পুরোনোদিনের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইটি এখনো সমানভাবে আকর্ষণীয় রয়ে গেছে।

এই আকর্ষণের উৎস কোথায়?

সম্ভবত অপরিচয়ের ব্যবধান সত্ত্বেও, চৈনিক জনগণের সঙ্গে আমাদের সংস্কার ও দুঃখ-দুর্দশাগত জীবনের একটা অদৃশ্য অন্তঃসংযোগ ছিল। দ্বিতীয়ত, বিদেশী উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল ইংরেজীর মাধ্যমে। ফলে, সেইসব উপন্যাসে যে-সমাজ ও জীবনাচরণকে প্রত্যক্ষ করেছিলুম, তা ছিল মূলত য়ুরোপীয়। এবং আধুনিক নগরজীবনের হাহাকার, নিঃসঙ্গতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাই ছিল তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'গুড আর্থে'র মধ্যে আমরা পাশ্চাত্যের মানুষকে পাইনি। পেয়েছিলুম আমাদেরই মতো লাঞ্ছিত, হতভাগ্য, কিছু মানুষকে। সম্ভবত সেজন্যেই উপন্যাসটির আকর্ষণ ছিল আমাদের কাছে প্রবল।

তার লেখিকা পার্ল বাক সেদিনই আমাদের কাছে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে গৃহীতা হয়েছিলেন। চীনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত গভীর। দীর্ঘকাল তিনি চীনে কাটিয়েছেন। চৈনিক মাটির স্বাদ, গন্ধ বর্ণময়তা ও প্রাকৃতিক আবহের জাদুকারী সম্মোহকে সেজন্যেই তিনি ব্যবহার করতে পেরেছিলেন উপন্যাসের উপাদান হিসেবে। এ সবই ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বিষয়।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, আরেকজন মার্কিনী সাংবাদিক এডগার স্নো যখন চীনে গিয়ে মাও সে তুংয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে চীনা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস লিখছিলেন, 'রেড স্টার ওভার চায়না' নাম দিয়ে, প্রায় সেই সময়েই পার্ল বাক নোবেল পুরস্কারে সম্মানিতা হন, ১৯৩৮ সালে। তাও ছিল চৈনিক কৃষক-জীবনেরই আরেক দলিল।

পার্ল বাক এ ছাড়াও আরো কয়েকটি পুরস্কারে সম্মানিতা হয়েছেন। তাদের মধ্যে মার্কিন সরকারের দেওয়া পুলিৎজার পুরস্কারের অর্থ মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশী।

মৃত্যুর আগে অবশ্য তাঁর জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল। চীনের রাজনৈতিক জীবন ও পরবর্তী কালের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সংযোগও তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে, তাঁর সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিরই পটভূমি হয়ে পড়েছিল, বিগতকালের এক বিস্মৃতপ্রায় সমাজ-জীবন। সেজন্যেই, তাঁর রচনাকাল ও সময়ের কথা মনে না রাখলে, তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়।

সেই সময়ে চীন ছিল, দুর্ভিক্ষে ও দারিদ্র্যে পীড়িত। শোষণ ও স্বৈরাচারের বিলাসভূমি। সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার কাকে বলে তা ভুলতেই বসেছিল। সেই সময়ে মানুষ কিভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে, ওপরতলার সঙ্গে নীচুতলার ব্যবধান ঘোচাবার জন্য জেগেছে, তারই বিবরণ পার্ল বাক দিয়েছিলেন 'হাউস অব আর্থ'—ট্রিলজির প্রথম খণ্ডে।

পরবর্তী দু খণ্ডে দিয়েছেন, বিত্তহীন চাষী থেকে বিত্তসম্পন্ন জমিদার হলে, মানুষ কিভাবে পালটে যায়, ভূমি-আশ্রিত মানসিকতারও রূপান্তর ঘটে—তারই বিবরণ। লেখিকা দেখিয়েছেন, চাষী যদি জোতদার হয়ে যায়, তাহলে সেও সমান দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে।

তাঁর এই বিশ্লেষণ অনেকের ভালো লাগেনি। কেউ কেউ এজন্যে তাকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছিলেন।

আরেকটি উপন্যাস লিখেছিলেন পার্ল বাক। সে উপন্যাসটির নাম 'ড্রাগন সীড'। বিষয়, চীন-জাপান যুদ্ধের সময়ে, চৈনিক প্রতিরোধের কাহিনী। এই উপন্যাসে, জাপানের আগ্রাসী ভূমিকাকে সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এবং কৃষিনির্ভর জীবনযাপনে অভ্যস্ত চীনের মানুষ যে, বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত জাপানের হাতে বার বার পরাজিত হয়েও ভেঙে পড়েনি, বরং প্রাণশক্তিতে অজেয় হয়ে উঠছে—তার আশ্চর্য কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয়েছে, 'ড্রাগন সীড' উপন্যাসে।

অনেকে এই উপন্যাসটির সঙ্গে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিসের' সাদৃশ্য কল্পনা করেন। শলোখভের সঙ্গেও নাকি তাঁর তুলনা চলে?

হয়তো পটভূমির সামান্য সাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই, এরকম তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। তাছাড়া উপায় কি? এরকম বই তো আর দুটি লেখা হয় না বা হওয়া উচিতও নয়। তলস্তয়ের উপন্যাসের যেমন যুদ্ধের পরিবেশে মানুষের অদম্য প্রাণশক্তির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, অনেকটা তেমনিভাবেই, ভিন্নতর পরিবেশে হলেও, পার্ল বাক দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের ভূমি-আশ্রয়ী মানুষও নিঃশব্দে প্রস্তুত হচ্ছে।

তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন অনেক। গল্প লিখেছেন অজস্র। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে ফাইটিং এঞ্জেল অল মেন আর ব্রাদার্স প্রভৃতির নামও উচ্চারিত হবার যোগ্য। শোষণ-জর্জর এশিয়া, আফ্রিকার মানুষের সামনে তাঁর ঐ লেখাগুলি ছিল মানুষী ভালোবাসায় আস্থাশীল হওয়ার প্রেরণাস্বরূপ।

ভারতের মানুষের কাছে পার্ল বাক জনপ্রিয় ছিলেন, চল্লিশের দশকের শেষের দিকে। এবং পঞ্চাশের দশকে। জওহরলাল নেহরুর অনুপ্রেরণায় ডক্টর কোটনিস যখন মেডিক্যাল মিশন নিয়ে চীনে যান এবং সেখানেই আত্মদান করেন, তখন থেকেই চীন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। তারই কিছুকাল পরে, তাঁর লেখাগুলি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

—[illegible]

সাহিত্যের খবর

বাংলা একাডেমীর পুরস্কার ও পুরস্কৃত লেখকেরা

ঢাকার বাংলা একাডেমী, এবার ছয়জন কবি-সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে। তাঁরা হলেন, যথাক্রমে—মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, আবদুল গণি হাজারী, রসিদ করীম, কল্যাণ মিত্র, বদরুদ্দীন উমর ও শহীদ সাবের। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ ও শিশু-সাহিত্যের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে আসছে কবীর চৌধুরীর আমল থেকে। অবশ্য অনুবাদ ও শিশু-সাহিত্যের জন্য এবার কেউ পুরস্কার পাননি। সম্ভবত স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে, অনুবাদ ও শিশু-সাহিত্যের ওপর তেমন কোনো ভালো বই বেরোয়নি।

চমক সৃষ্টি হয়েছে শহীদ সাবেরকে নিয়ে। প্রথমত, শহীদ সাবের ছিলেন, স্বাতন্ত্র-প্রয়াসী নিঃসঙ্গ মানুষ। বামপন্থী লেখক হিসেবে চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত, এই পুরস্কার যখন ঘোষিত হয়েছে, তখন ইহলোকে তিনি অনুপস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায়, হাজার হাজার শহীদের সঙ্গে, তাঁর নামও যুক্ত হয়েছে, মহাশোকের স্মৃতিকে বহন করে।

অবশ্য, মৃত্যুর আগে, তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। কথা বলতেন কম। দেশ, রাজনীতি, সমাজ, ভাষা-আন্দোলন প্রভৃতি সব ব্যাপারেই উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাংবাদিক জীবনের দীর্ঘকালীন অভ্যাসকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি। মাঝে মাঝে দু-একটি পরিচিত জায়গায় যেতেন। নীরবে বসে থাকতেন। ১৯৭১ সালের কালরাত্রিতে পাকিস্থানী সেপাইরা যখন খবরের কাগজের অফিসগুলি তছনছ করছিল, তখন শহীদ সাবের ছিলেন 'দৈনিক সংবাদ'-এর কার্যালয়ে।

সে এক আশ্চর্য সময়।

সবাই যখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, তখন শহীদ সাবের ছিলেন নিরুদ্বিগ্ন ও উদাসীন। যেন অভূতপূর্ব ঐ অত্যাচারের মুখে তিনি বোবা বনে গিয়েছিলেন। নাকি নীরবতাকেই প্রতিবাদের ভাষা বলে মনে করেছিলেন শহীদ সাবের? সে রহস্য কেউ জানেন না। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, দৈনিক সংবাদের অফিস যখন পুড়ে যাচ্ছিল সেপাইদের লাগানো আগুনে, তখনো তিনিই বসেছিলেন একা একা। এবং অন্য অনেক-কিছুর সঙ্গে, তিনিও পুড়ে মরেছেন একান্ত অবলীলাক্রমে। অসহায়ভাবে।

শহীদ সাবের গল্প লিখতেন। কবিতা লিখতেন। তবুও গল্পকার হিসেবেই তাঁর সুনাম ছড়িয়েছিল বেশী। অনেকের মতে, তাঁর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। ১৯৪৯ সালে লেখা, কারাজীবনের কাহিনী 'আরেক দুনিয়া থেকে' লিখেছিলেন তিনি জেলখানায় বসে বসে। তারপর এক দশক তিনি সুস্থ ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৯ সালের পর, আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারেননি। বাংলা একাডেমী তাঁকে ছোট গল্পের জন্য পুরস্কৃত করেছেন, তাঁর প্রতিভা ও বিষাদময় মৃত্যুর স্মৃতিকে স্মরণ করে।

সম্প্রতি মিসেস সেলিনা হোসেন তাঁর সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। অবশ্য সেটি এখনো ছাপা হয়নি। পাণ্ডুলিপির আকারেই আছে। খবরে প্রকাশ, বাংলা একাডেমী তা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং আশা করা যায়, এই মার্চেই, শহীদ সাবেরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে বইটি প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশের লেখক শিবির, সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাঁর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু বাংলা একাডেমী কি করবেন, তা এখনো জানা যায়নি। তবে জনশ্রুতি ছড়িয়েছে যে, বাংলা একাডেমী নাকি পুরস্কারের অর্থ তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে না দিয়ে, সেই টাকায় তাঁর নামে একটি পুরস্কার ঘোষণার কথা ভাবছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, বাংলা একাডেমীর প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। পাকিস্তানী আমলে যখন বিভিন্ন সংস্থা সাহিত্যিকদের পুরস্কার দিতেন, তখন বিতর্কের ঝড় উঠত। কিন্তু বাংলা একাডেমীর পুরস্কার দেওয়ার নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে কখনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। বরং, ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্থাটিই ছিল, গবেষক ও সৃজনশীল কবি-সাহিত্যিকদের প্রধানতম আশ্রয় ও প্রেরণা।

এখন অন্যান্য সংস্থাগুলি লুপ্ত। সেজন্যেই বাংলা একাডেমীর কাজের গুরুত্বও বহুগুণ বেড়ে গেছে। এমনো হতে পারে, তার কার্যকলাপের পরিধি আরো বিস্তৃত না হলে, নানারকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। তার আভাসও ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

২

এবার কবিতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন দুজন। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আবদুল গনি হাজারী। দুই বাংলার মানুষের কাছেই তাঁরা পরিচিত। এবং যে-কোনো উল্লেখযোগ্য কাব্য সঙ্কলনেই তাঁদের নাম অনিবার্য কারণেই যুক্ত হয়ে থাকে। কবিতা লেখার ব্যাপারে, তাঁরা বরাবরই আলস্যহীন। পত্রপত্রিকায় তাঁদের কবিতা প্রায়শ নজরে পড়ে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। যথাক্রমে—(১) দুর্লভ দিন, (২) শঙ্কিত আলোকে, (৩) বিপন্ন বিষাদ, (৪) অনির্বাণ ও (৫) কর্ণফুলী। এমিলি ডিকিনসনের অনেকগুলি কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। শোনা যায়, এই কবিতাগুলি শীঘ্রই গ্রন্থাকারে বেরুবে মুক্তধারা প্রকাশ থেকে।

আবদুল গণি হাজারী কবিতা লিখেছেন আরো কম। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিন। যথাক্রমে—(১) সামান্য ধন, (২) সূর্যের সিঁড়ি ও (৩) জাগ্রত প্রদীপে।

লক্ষণীয়, বাংলা একাডেমীর ছয়জন পুরস্কৃত কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে দুইজনই কবি। অর্থাৎ পুরস্কারের এক-তৃতীয়াংশ অর্থ পেয়েছেন কবিরা। এবং তাঁরা কেউই গ্রাম-জীবন নির্ভরশীল নন। রীতিমতো নাগরিক ও সফিস্টিকেটেড। আধুনিক জীবন চেতনায় আস্থাশীল। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতায় প্লাবিত বাংলাদেশে, কবিদের এই মর্যাদায় যে-কোনো বাঙালীই খুশি হবে বলে মনে হয়।

৩

তবু, পুরস্কার দেওয়ার নীতি হিসেবে বাংলা একাডেমী, কোনো সুনির্দিষ্ট মান এবার রক্ষা করেননি, বলে অনেকের ধারণা। তার কারণ সম্ভবত স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে এখনো উপযুক্ত সৃজনশীল আবহ তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই নিহত। বিশেষ করে, মুক্তি সংগ্রামের কালে যেসব তরুণ সাহিত্যিক ও নাট্যকার নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন, তাঁদের কথাও বাংলা একাডেমীকে মনে রাখতে হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করাও একটি বড় কথা।

যেমন কল্যাণ মিত্র।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময়, স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'জল্লাদের দরবার' লিখে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নাটক থেকে প্রেরণা পেয়েছে। পাকি-

শয়তানী সেপাই শাসক ও তার অনুচরদের স্বরূপ উপলব্ধি করেছে।

অবশ্য, কল্যাণ মিত্র বাংলাদেশে জনপ্রিয় নাট্যকার। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই তাঁর নাটক অভিনীত হয়েছে। অনেকের মতে, তাঁকে পুরস্কৃত করে, তাঁর যুদ্ধকালীন ভূমিকাকেই পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'পাকা রাস্তা', 'দায়ী কে', 'পোড়োবাড়ী', 'শুভবিবাহ' প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয়।

৪

উপন্যাসের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন রশীদ করীম। খুব অল্প কথার মানুষ। সাহিত্যের হট্টগোলে বিশেষ উৎসাহ দেখান না। লেখেনও খুব কম। সেজন্যেই, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নাম উভয় বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বহুশ্রুত নয়।

অনেকদিন আগে, তাঁর দুটো উপন্যাস বেরিয়েছিল—'উত্তমপুরুষ' ও 'প্রসন্ন পাষাণ'। তারপর আর বিশেষ কোনো লেখা লেখেননি। কিন্তু এই দুটো উপন্যাসের খ্যাতি ও স্বাতন্ত্র তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি তিনি একটি উপন্যাস লিখে শেষ করেছেন। মাঝখানে সাপ্তাহিক বিচিত্রা কাগজে লিখছিলেন ব্যক্তিগত নিবন্ধ। 'মানুষ আর নাই মানুষ' নাম দিয়ে।

ভাবতেও ভালো লাগছে যে, জনপ্রিয়তা এক্ষেত্রে পুরস্কার দেওয়ার মানদণ্ড হয়নি। এমন কি, দু-এক বছরের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস না লেখার অজুহাতে তাঁকে বঞ্চিত করাও হয়নি। বাংলা একাডেমীর সাহিত্যপ্রাণতার এও বুঝি আরেক নিদর্শন!

৫

সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো, বদরুদ্দীন উমরকে এবার বাংলা একাডেমী পুরস্কৃত করেছেন প্রবন্ধ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য। এবং বদরুদ্দীন উমর সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন, সে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে। একুশের আশ্চর্য মুহূর্তে, সকলেই যখন ভাষা-আন্দোলনের তাৎপর্যে প্রাণিত, তখন বদরুদ্দীন উমর এক ঘোষণায় জানিয়েছেন, এই ধরনের বৈষয়িক অনুপ্রেরণা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, লেখকের সৃজনশীলতাকে পঙ্গু বা বিনষ্ট করে। কেননা, পুরস্কারদাতার প্রতি পুরস্কৃতের মনোভাব কিছুটা কোমল না হয়ে পারে না।

সেজন্যেই, বদরুদ্দীন উমর বাংলা একাডেমীর পুরস্কার গ্রহণে নিজের অসামর্থ জানিয়েছেন।

বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষও সম্ভবত এরকম একটি ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যদিও অতীতে, পৃথিবীর বহুদেশে, অনুরূপ ঘটনা বহুবার ঘটে গেছে। ভারতেও প্রত্যাখ্যানের ঘটনা বিরল নয়। রবার্ট গ্রেভস নোবেল পুরস্কারকে বার্ধক্য ভাতার সমতুল বলে উপহাস করেছেন। অবশ্য, তাঁর ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তির বেদনা ছিল। কেননা, তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এদিক থেকে বদরুদ্দীন উমরের ঘোষণায় কিছুটা অভিনবত্ব আছে, মানতেই হবে।

তিনি বামপন্থী প্রবন্ধকার ও মুক্ত চেতনার মানুষ। ১৯৬৭ সালে বেরোয় তাঁর একটি ছোট প্রবন্ধের বই 'সাম্প্রদায়িকতা' নাম দিয়ে। তখন আইয়ুবশাহী আমল। শোনা যায়, ঐ সময়েই তিনি আইয়ুবী শাসনের দুর্নীতি এবং দালালীর হাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধানের চাকরী থেকে ইস্তফা দেন।

প্রকৃতপক্ষে, বদরুদ্দীন উমর ছিলেন সেইকালে প্রগতিশীল বাঙালী বিবেকের জাগ্রত প্রতীক।

'সাম্প্রদায়িকতার' পর বেরোয় তাঁর 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' নামে আরো দুটো প্রবন্ধের বই। তারপর বেরোয়, ভাষা-আন্দোলনের ওপর একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থঃ 'পূর্ববাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'র প্রথম খণ্ড। সম্প্রতি বেরিয়েছে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সাম্প্রদায়িকতা' পাকিস্তান আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। শীঘ্রই নাকি তাঁর প্রবন্ধের একটি সংকলন বেরুবে, 'মাওলা ব্রাদার্স' থেকে।

প্রত্যাখ্যাত হলেও, বাংলা একাডেমীর সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল, এ বিষয়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা সকলেই ঐকামত পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা, বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যে বদরুদ্দীন উমর একটি নির্ভর ও সাহসী কণ্ঠস্বর। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণের আবির্ভাব এখনো হয়নি।

অরণ্য গভীরে (উপন্যাস)। বিশ্বনাথ বসু। ডি জি পাবলিসার্স, ১৭বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। সাত টাকা।

শিকার কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনার শিল্পসফল প্রয়াস বিদেশী সাহিত্যে প্রচুর দেখা গেছে। বিখ্যাত জিম করবেটের কাহিনী সব শ্রেণীর পাঠককেই মুগ্ধ করে। বাংলায় এই শিকার কাহিনী লিখে যিনি সবচেয়ে বেশী খ্যাতকীর্তি হয়েছেন, তিনি হলেন শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর রচনা পরবর্তী বহু লেখককে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে শ্রীবুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ তরুণ কথাকার শিকার কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যের এই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রীবিশ্বনাথ বসু রচিত অরণ্য গভীরে উপন্যাস সেই ধারায় এক উল্লেখ্য সংযোজন।

'অরণ্য গভীরে'র প্রথম কয়েক পাতার কাহিনীগত পটভূমি কলকাতা। কিন্তু পরবর্তী অংশ বিস্তৃত হয়েছে শিলিগুড়ির ভয়ঙ্কর জঙ্গলে, কাহিনীর নায়ক মিঃ রায়। তাঁর পুত্র রাজীব মাতৃহারা। কারণ খুব অল্প বয়সে রাজীবের মা অর্থাৎ মিসেস রায় জঙ্গলে বন্য প্রাণীর আক্রমণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মারা যান। মিসেস রায় রাইফেল চালাতে জানলেও প্রাণী হত্যার ব্যাপারে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রাণা ছিলেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে স্বামীকে শিকার থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার অনুরোধ রেখে যান। মিঃ রায় স্ত্রীর মৃত্যুর পর শিকার ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁর পুত্র রাজীব ছোটবেলা থেকে জীবজন্তু সম্বন্ধে যেন বা উত্তরাধিকারসূত্রেই এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করে। সে আকর্ষণ প্রীতি, ভাললাগা, বিস্ময় ইত্যাদির। পিতা তা চান না। রাজীব বন্ধু বিমলের কাকার বাড়ী পিতার অমতেই চলে আসে। এখানে জঙ্গলে নতুন জীবন। আসে মিঃ চৌধুরী, তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারী জন্তুর 'ভিলেন', মেয়ে রুমা এবং রুমার সঙ্গে রাজীবের প্রেম প্রসঙ্গ। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে রুমার প্রতি বিকৃত প্রতিশোধ স্পৃহায় জয়ন্ত বীভৎস হয়ে ওঠে, ধরা পড়ে যায়। রুমা-রাজীব মিলিত হয় ভালবাসায়, জীবন গঠনে।

সমস্ত কাহিনী মূর্ত হয়েছে জঙ্গলের ভয়ঙ্কর পরিবেশে। শিকারীবন্ধু মিঃ রায়, রাজীব, মেজর ব্রাউন, মিসেস ব্রাউন, জয়ন্ত, মুন্না ইত্যাদি ছোট-বড় চরিত্র সু-অঙ্কিত। শিকার কাহিনীমূলক উপন্যাসের সবচেয়ে বেটা বড় দিক—অ্যাডভেঞ্চার ও সবল রোমান্টিকতা এবং বন্য প্রাণীদের সহজ, সরল, আদিম ও হিংস্র ব্যবহার—সে সব বিশ্বনাথ বসু সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। কাহিনীটি রুদ্ধশ্বাস পড়ার মত। লেখকের বর্ণনাশক্তি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ তাকে শিল্পিত করার ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য। তবে গদ্যভঙ্গীর সাহিত্যিক সুষমা সম্পর্কে লেখকের সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

চড়াই উৎরাই (উপন্যাস)। অপূর্ব মুখোপাধ্যায়। মণি প্রকাশনী, ৩৯বি ভেন্ট মিশন রোড, কলকাতা—২৩। তিন টাকা।

শ্রীঅপূর্ব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'চড়াই উৎরাই'। এটি একটি মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস। নায়ক দুষ্মন্ত ও নায়িকা মণিকা। দুষ্মন্তর বন্ধু শ্যামল। শ্যামলের প্রেমিকার নাম বাসন্তী। শ্যামল দুষ্মন্ত পরীক্ষার পর দার্জিলিং বেড়াতে আসে। সেখানেই মণিকার সঙ্গে দুষ্মন্তের দেখা এবং প্রেমোদয়। মণিকাও পরীক্ষান্তে ওখানে বেড়াতে আসে। কাহিনীর শেষে দুষ্মন্ত তার পৈতৃক সম্পত্তির কিছু হারিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারীর কাজে নেমে দুর্বৃত্ত যাত্রীদের হাতে দুর্ঘটনায় পড়ে। হাসপাতালে নায়কের সঙ্গে মণিকার মিলন হয়। কবিত্বময় ভাষা, বর্ণনা, মিষ্টি সংলাপ, দুষ্মন্তর মা, বাবা, অশোকদা, বৌদি, মণিকা, শ্যামল, বাসন্তী ইত্যাদি ছোট-বড় সু-অংকিত চরিত্রের জন্য গ্রন্থটি পাঠকদের আদ্যান্ত ধরে রাখে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

নৈর্ঋতী (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)—সম্পাদক : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯এ শ্যামপুকুর লেন, কলকাতা-৪। দাম দু'টাকা।

নৈর্ঋতীর প্রথম আত্মপ্রকাশ একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা 'কবিতা ও আমার জীবন' সংখ্যাটির সব থেকে বড় আকর্ষণ। অন্যান্য আলোচনাগুলির বেশীরভাগই হল শিল্প, চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ সম্পর্কে। প্রখ্যাত শিল্পী হুসেন এবং রামকিঙ্কর বেইজ সম্পর্কে দু'টি আলোচনা আছে। মঞ্চ সম্পর্কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গঙ্গাপদ বসুর দু'টি আলোচনাই মূল্যবান। পত্রিকাটি সুমুদ্রিত ও সুসম্পাদিত।

স্মরণিকা—পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ সমিতি। দাসপুর। মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর জেলা পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ সমিতির প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী উপলক্ষে বর্তমান পুস্তিকাটি বেরিয়েছে। মেদিনীপুরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি সচিত্র আলোচনা আছে।

শাশ্বতী : সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র। ৫, কৈলাস পণ্ডিত লেন, কলকাতা ৫৩। পঞ্চাশ পয়সা।

সম্পাদকের লেখা 'জীবনানন্দ ও আধুনিক কবিতা-বিষয়ক রচনাটি ভালো। কবিতা লিখেছেন বিমল ঘোষ, ফণিভূষণ আচার্য, রাম বসু, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এবং কয়েকজন। গল্পগুলি মন্দ নয়। রিলকের একটি কবিতার অনুবাদ করেছেন অমিতাভ বন।

ছন্দিতা : সম্পাদক অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও গৌরগোপাল দাশ। বি-৫৯ রবীন্দ্রনগর, কলকাতা ১৮। পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন মুক্ত জয়শ্রী। মণিলাল খানের লেখা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে নিবন্ধটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। পত্রিকাটি তরুণদের তৃপ্তি দেবে।

সমকাল (ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩) সম্পাদক: অরুণপ্রকাশ ঘোষ। ৭।১ বেণী মাস্টার লেন। বীরেন রায় রোড (ওয়েস্ট)। সরশুনা। কলকাতা—৬১।

প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে সমকালের আত্মপ্রকাশ এই প্রথম। কয়েকটি প্রবন্ধ গল্প এবং কবিতা সংকলনে পত্রিকাটি কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রাখতে পারেনি।

সীমান্ত (পৌষ-মাঘ)—সম্পাদক : গণেশ বসু ও দীপেন রায়। ৩১।২ হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬। এক টাকা।

কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে সীমান্তের প্রতিটি সংখ্যাই মূল্যবান। এ সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ প্রবন্ধগুলি। লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি সিদ্ধান্ত, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর দত্ত ও ওসমান আলি। জর্জ টমসনের লেখা একটি প্রবন্ধের অনুবাদ এই সংখ্যার মর্যাদা বাড়িয়েছে। কবিতা লিখেছেন, রাম বসু, তরুণ সান্যাল, বীরেন্দ্র রক্ষিত, চিত্তরঞ্জন পাল, সাধনা মুখোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, সত্য গুহ, শিশির সামন্ত, তুলসী মুখোপাধ্যায়, দুলাল ঘোষ, জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর দত্ত, রথীন্দ্রনাথ রায়, অনীশ কল্যাণ, গণেশ বসু, রামচন্দ্র প্রামাণিক ও দীপেন রায়। কবিতা পাঠকের কাছে সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য বলে মনে হবে।

কবিপত্র (ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩)—সম্পাদক : তুষার চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত ও পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ২২বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬। এক টাকা।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা (গতি তবে স্তব্ধতার মতো) প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। বেশ ভালো। কবিতা লিখেছেন তরুণ সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, গৌতম গুহ, মনোজ নন্দী, অনন্য রায়, অজয় সেন, কালীকৃষ্ণ গুহ, প্রণয় শূর, সুকোমল রায়চৌধুরী এবং অনেকে।

নান্দীমুখ : স্বপন সেনগুপ্ত। ধলেশ্বর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

ভারতের পূর্ব-সীমান্তের রাজ্য ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত নান্দীমুখের এই সংখ্যাটি চমকপ্রদ এবং মূল্যবান। কেন না, এ সংখ্যাটি বিষ্ণু দে-র রচনায় সমৃদ্ধ। এবং বিষ্ণু দে-র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত কবির নন্দনচিন্তা ও কবিতা-বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি মূল্যবান। লিখেছেন শান্তনু ঘোষ, বিষ্ণু দে, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ বসু, কার্তিক লাহিড়ী ও সরোজ চৌধুরী।

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ ও সাধুর দেহাবশেষ উদ্ধার

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানার অন্তর্গত সোনাথলী গ্রামে শ্রীশ্রীযুগলদাস ঠাকুরের প্রায় চারশত বছর আগেকার প্রাচীন সমাধি মন্দির খুঁড়ে ৭।৮ ফুট মাটির নীচে থেকে শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী বিরজানন্দ ভারতী (শ্রীশ্রীক্ষ্যাপামোহন ঠাকুর) তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীবড়া বাবা (সদানন্দ দাসীস্বামী) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক পরম বৈষ্ণব শ্রীশ্রীযুগলদাস ঠাকুরের দেহাবশেষ উদ্ধার করেছেন। সমাধি খনন করে কতগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থের তালপাতার ও তুলোট কাগজে লেখা দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। ঐ সঙ্গে জয়দেবের গীতা গোবিন্দের পাণ্ডুলিপিও আছে, আর আছে শালি এবং

সংস্কৃত ভাষায় লেখা কতগুলি মহামূল্য প্রাচীন গ্রন্থ। পাণ্ডুলিপি দেখলে মনে হয় যেন আজকালকার লেখা নিখুঁত এক জীবন ইতিহাস।

।।৯।।

মেজদার চিঠিটা পড়ে মনের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন উঠলো।

সত্যিই তো মেজদার আদর করে দেওয়া বইটাতো খুলেই দেখা হয়নি এতোদিন। দাদার চরকাই বা কে দেখেছে?

কলকাতাকেই বা এমন করে ভুলে বসে আছি কী করে? হঠাৎ দারুণ মন কেমন করে উঠলো কলকাতার জন্যে। আর মনের কোণে একটা দুঃখের কাঁটা ফুটতে লাগলো, আমরা স্রেফ 'গাঁইয়া' হয়ে যাচ্ছি।

আমাদের ভাই-বোনেদের অভিধানে 'গাঁইয়া' শব্দটা ছিল পরম ধিক্কারের। কেউ কিছু ভুল করলে, বোকামি করলে, কোনো ব্যাপারে বুঝতে দেরী করলে, তাকে ওই পরম ধিক্কার বাণীটিতে জর্জরিত করা হতো। তাই ওটাই উচ্চারণ করলাম নিজেদের জন্যে।

গাঁইয়া ছাড়া আর কী এখন আমরা?

প্রথমটায় এসে 'ভালোলাগা আর মন্দ-লাগা'র একটা তীব্র দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে দুলতে কখন যে এই মুক্ত প্রকৃতির স্বাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে মন বসিয়ে ফেলেছি টের পাইনি। টের পেলাম ওই চিঠিটা পড়ে।

কী লজ্জা কী লজ্জা!

মাসখানেক হতে চললো আমরা এসেছি, এর মধ্যে একটা ছাপার অক্ষরের মুখ দেখিনি, এবং তার জন্যে শূন্যতাও অনুভব করিনি।

অথচ কলকাতায়?

যেদিন গল্পের বই না থাকতো ছটফট করে বেড়াতাম। যতই খেলা করি, কি সাধ্যমত সংসারের কাজ-টাজ করি, দিন আর কাটতে চাইতো না। আর এখানে কোথা দিয়ে যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে টেরই পাচ্ছি না।

বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার যে সময়ের একটি অংশ ছাড়াবার জায়গা আর সন্দেহ কী? তুমি কিছু কাজ করো আর না করো, অতোগুলো লোকের সঙ্গে সৌজন্য বজায় রাখতেই সব সময় কেটে যাবে। তার ওপর আছে অনেকগুলি হিতৈষীর হিতকথার ভার।

আমাদেরকে স্রেফ শহুরে করে মানুষ করে মা যে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে রেখেছেন, গ্রামে গঞ্জে বিয়ে হলে যে মানিয়ে নিতে হাড়ে হলুদ হয়ে যাবে আমাদের এই তীব্র অভিযোগের মুখে পড়ে মা আমাদের উঠতে বসতে 'সভ্যতা' শেখাচ্ছেন, কাজেই প্রত্যেকটি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহার রাখা আমাদের দুই বোনের একটা মস্ত কর্তব্য হয়ে উঠেছে। ঠাকুরবাড়িতে তো দুটি বেলা উপস্থিতি দিতেই হয়, তাছাড়া বাবার পিসিমার কাছে একটু বসতেই হয়, বাবার বড়দার মহলে গিয়ে একবার দর্শন দিতে হয়, বাবার ওই খুড়তুতো ভাইয়ের দিকে গিয়ে 'নতুন খুড়িমা কী করছেন?' বলে দৈনিক একবারও দাঁড়াতে হয়, প্রতিটি বিকেলে চুলের ফিতে কাঁটা নিয়ে নীরো-পিসির এজলাসে গিয়ে হাজির হতে হয়।

বিয়ে না-হওয়া মেয়েরা অথবা নতুন বৌয়েরা নিজে নিজে চুল বাঁধলে নাকি গুরুজনদের অপমান করা হয়।

ভগবান জানেন এর অর্থ কী?

অনেক অর্থহীন ব্যাপারের সঙ্গেই অবশ্য পরিচিত থেকেছি ছেলেবেলা থেকে কিন্তু এটা জানা ছিল না। নিজেরা বাঁধলে চুলের যত্ন হয় না এই অজুহাতে মা মাঝে মাঝে টেনে ধরে চুল বেঁধে দিতেন। তবে মার অপারগতাই আমাদের পরাধীনতা পাশ থেকে মুক্ত করতো। বেশীর ভাগ দিনই মার দিবানিদ্রার পরিধিটা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতো যে ততোক্ষণে আমাদের ওপাট চুকিয়ে ফেলা ছাড়া উপায় থাকতো না।

কিন্তু এখানে আলাদা পরিস্থিতি।

এখানের অভিধানে 'দিবানিদ্রা' শব্দটার কোনো স্থান নেই। ... মধ্যাহ্ন আহারের পর্ব চুকতেই ... বিকেল, তার উপর ছিল মহিলা ... মজলিশ। পাড়ার সমস্ত মহিলাকুলের অবসর যাপনের জমায়েৎটা ছিল ওই গাঙ্গুলী বাড়ী।

এখানে বিরাট দালান, এখানে অনেক কথার চাষ।

মা বেচারীর লুকিয়ে চুরিয়েও একটু শোবার উপায় ছিল না, কারণ দুপুরবেলা শুতে যাওয়াটা এঁদের দৃষ্টিতে না কি শোভন ছিল না।

মাকে দেখতাম ঢুলে ঢুলে চোখ টেনে টেনে আর হাই তুলে তুলে এই মজলিসে যোগ দিয়ে শোভনতা বজায় রাখতে।

ঝাল ঝাড়বার লোকটিকেও তো হাতের কাছে পাচ্ছেন না? বাবা যে ভেসে গিয়ে কোথায় কোন বৈঠকখানার কূলে গিয়ে ঠেকতেন কে জানে। বাল্য কৈশোরের স্মৃতিমণ্ডিত জায়গা, ছুটির মৌজ, আর জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সঙ্গ, এই তিনটির পরম সুখ বাবাকে যেন অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিল।

বাবার মুখের চেহারায় সেই সুখের আলো।

রাত্রে অবশ্য মা মাঝে মাঝে সেই সুখের ওপর হাতুড়ী কসাতেন। বলতেন 'তোমার আর কী। দায় নেই দায়িত্ব নেই, দিব্যি আছো। মাছ ধরছো, দাবা খেলছো, আড্ডা দিচ্ছো, আমারই কষ্টের একশেষ।'

বাবা বলতেন, 'কেন তোমারই বা কষ্টের একশেষ কিসের? এরা তোমায় দিয়ে ধান সিদ্ধ করাচ্ছে? ঢেঁকিতে পাড় দেওয়াচ্ছে? ক্ষার কাচাচ্ছে? পঞ্চাশজনের হাঁড়ি ঠেলাচ্ছে? তুমিও তো দিব্যি আছো?'

'তা তো বলবেই। তুমি আর কী বুঝবে? তোমাদের এই সংসারে তো সেই ব্রতকথার মত, ঢেঁকি পড়ন্ত পাট বিরন্ত উনুন জ্বলন্ত। অকম্ম নেই, বিশ্রাম নেই—'

বাবা হেসে ফেলে বলতেন, 'তোমার ... কিন্তু সেটি বোঝবার উপায় নেই। এই ক'দিনেই তো প্রায় বড়বৌয়ের কাছাকাছি ওজন করে তুলেছো—'

মা রাগ করে ... পড়তেন।

সত্যি এই এক জ্বালা।

ভালই লাগুক আর মন্দই লাগুক, ওজনে আমরা সবাই বেশ বেড়ে যাচ্ছি। চেঞ্জটা বেশ ভালই লেগে যাচ্ছে শরীরে। শীতের হাওয়া, খাওয়া দাওয়ার প্রাচুর্য, এগুলো কাজ না করে ছাড়ছে না। পরিমাণে কম খাওয়াও তো শহুরেপনা। অতএব পিটিয়ে পিটিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে আমাদের। বাবা পর্যন্ত অসময়ে মুড়ি-নারকোল ছোলা-সেদ্ধ নতুন গুড়ের পাটালী নিয়ে বসে যাচ্ছেন, বসে যাচ্ছেন জীবন ময়রার দোকানের তেলে ভাজা জিলিপি আর ফুলুরি নিয়ে তো আমরা কোন ছার।

এছাড়া আর এক উপসর্গ পাড়ায় বাড়ি-বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া!

এটি নাকি এখানের ধর্ম।

কারো বাড়িতে কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব এলেই বাড়ি বাড়ি থেকে তাকে নেমন্তন্ন না করলেই নয়, ধর্মে পতিত হবার ভয়।

অতএব এসে পর্যন্ত নেমন্তন্ন খেতে যাওয়াও একটা কাজ চলছে আমাদের। আমাদের 'অনারে' ফুলি ঝুনি নতুন খুড়ি-মাবও নেমন্তন্ন চলছে।

নীরোপিসি গাইড হয়ে এই বাহিনী-টিকে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসেন, এবং যাঁরা নেমন্তন্ন করেন, তাঁদের বাড়ির কোনো গিন্নী অথবা পুরনো ঝি ফেরত দিয়ে যায়। বৌ মেয়েদের রাস্তায় হাটে যাওয়ার বিধি আছে এখানে, কিন্তু এই গাঙ্গুলীবাড়ির মেয়েদের একা-একা বেরোনোর অনুমতি নেই। এদের মান-সম্ভ্রম উঁচু পর্যায়ের।

ক্রমশঃ নেমন্তন্নর নামে ভয় জন্মে যাচ্ছিল। জবরদস্তি করে একটা পেটে তিনটে মানুষের খাদ্যবস্তু চালান করিয়ে দেওয়াটাই নাকি এখানের আদর করা। আদরের ঠ্যালায় কান্না পেয়ে যেতো। আর সব বাড়িতেই তো রান্নার মেনু এক। সেই শাক শুকতো থেকে পায়েস পর্যন্ত। এতো এতো তরকারির অরণ্যের আড়ালে মাছের সম্ভার।

গাঙ্গুলীবাড়ির ন' ছেলে এসেছে সাত-জন্মে যে আসে না, তায় আবার শহুরে বড়লোক (এই বড়লোক আখ্যাটি যে আমরা কেন পেয়েছিলাম তা জানি না) অতএব তাদের আদর-আপ্যায়ন করতে হবে না?

কিন্তু আদরের ভার বড় ভার।

নীরোপিসির ওই চুল বেঁধে দেওয়াও তো সেই ভার।

দুপুরের খাওয়া মেটার সঙ্গে সঙ্গেই ওই নিরলস মহিলাটি বসতেন চিরুনি, তেলের বাটি, সিঁদুর কৌটো আর এক-খানি হাত আয়না নিয়ে। ফিতে কাঁটা যার যার নিজের। তা উনি দালান আলো করে বসবার আগেই তো অনুগ্রহপ্রার্থিনীদের ভীড় জমে গেছে। বাড়ির এবং পাড়ার সমস্ত মেয়ে ঝেঁটিয়ে এবাড়িতে এসে হাজির হয় ডাকসাইটে চুলবাঁধিয়ে নীরো-পিসির কাছে। উনি একে একে তাদের মাথা নিয়ে কারুকার্য করেন। কারো প্রজা-পতি খোঁপা, কারো মেম খোঁপা, কারো জাপানী খোঁপা, কারো দু বিনুনী চার বিনুনীর খোঁপা। বেশীর ভাগই মাথার মাঝখানে সোনার চিরুনি গুঁজে। চিরুনি দিয়ে খোঁপা বাঁধা, পেটি পেড়ে চুল আঁচ-ড়ানো, তিনপেড়ে শাড়ী পরা এগুলোকে আমরা রীতিমত সেকেলে বলে গণ্য করতাম, নথপরা গিন্নীদের তো প্রায় নীচু চক্ষেই দেখতাম। কিন্তু কাঞ্চনতলায় তখনো এগুলি ছিল।

কালের কী কুটিল গতি!

সেই পরিত্যক্ত ফ্যাসান এখন একেবারে হাই সোসাইটিতে উঠে এলো।

সে যাক, নীরোপিসির কাছে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হতো আমাদের। পিঠ একটু নীচু করলেই উনি অক্লেশে পিঠে গুম করে একটি কিল বসিয়ে দিয়ে বলতেন, 'ঘাড় খাড়া কর।'

আমার চুল দিদির থেকে বরাবরই একটু কম, তাই আমার মাথায় তেলের বাটির বেশীর ভাগ তেলটুকুই ঢালতেন নীরোপিসি এবং চুলের যত্ন সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দিতেন।

চুল যে একটা প্রাণী, এটা নীরোপিসির মুখেই শুনেছি। বলতেন, 'চুল বড়ো সুখী প্রাণী। ওকে যত্ন না করলেই উড়ে পালায়। চুলের তরিবৎ করতে হয়।'

আমি একদিন বলে বসেছিলাম, 'আর এই যে আপনি এক চিরুনি দিয়ে সকলের চুল বাঁধছেন, এতে বুঝি দোষ হয় না?'

নীরোপিসি অবাক নেত্রে তাকিয়ে বললেন, 'এতে কী দোষ হলো?'

'বাঃ যদি কারো মাথায় উকুন থাকে?'

নীরোপিসি বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির চক্ষে চেয়ে থেকে মাকে বললেন, 'তোমার এই মেয়ের কপালে অনন্ত দুর্গতি আছে নবো, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখলাম।'

সন্ধের পর দোতলার ঘরের সামনের ছাতে এসে দিদি আমায় চুপি চুপি বললো, 'এই, তুই তখন নীরোপিসিকে ওকথা বললি কেন? তোর খুব নিন্দে হলো।'

আমি সতেজে বললাম, 'বারে, ওঁকে আমি কিছু বলেছি? বলেছি যদি কারুর

মাথার উকুন থাকে। ও'র মাথা তো ন্যাড়া, ওর গায়ে লাগবার কী আছে?'

দিদি বললো, 'কী আছে না আছে জানি না বাবা, এই জানি বড়দের সামনে কথা-টথা না বলাই ভালো।'

'মানুষ বুঝি বোবা হয়ে বসে থাকবে?'

'বড়দের সামনে সেটাই ঠিক। তাতে অনেক বকুনি ঝামেলার হাত এড়ানো যায়।'

যুক্তিটা অকাট্য!

আমি দেখেছি বরাবরই আমি ওই দুম-দাম কথার জন্যেই বকুনি খেয়েছি, দিদি কদাচ নয়।

বললাম, 'দ্যাখ্ এখানটার ভালোও লাগে বিচ্ছিরীও লাগে।'

দিদি আকাশের দিকে তাকিয়ে, কেমন আচ্ছন্নের মতো বললো, 'তা সত্যি।'

আমি ওর ভাব দেখে একটু অবাক হলাম।

দিদি আবার বললো, 'তোর মনে হয় না বুচি, এখানে এসে আমরা যেন হারিয়ে গেছি!'

দিদির কথা শুনে মনে হলো, ঠিক ঠিক! এতোক্ষণে আমার মনের অবস্থাটার নাম খুঁজে পেয়েছি। এখানে এসে আমরা যেন হারিয়েই গেছি। শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা, নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে থাকা, কিছু না পেয়েও পাওয়ার সুখ পাওয়া, সেই আমার চিরকেলে মনটার আর সন্ধানই পাচ্ছি না।

বললাম, 'মেজদার চিঠি পড়লি?'

'পড়লাম।'

'কাল থেকে আর এরকম ভেসে যাওয়া নয়।'

আমিও তাই ভাবছি। চরকা কেটে অনেক সুতো করে দাদাকে দেখাতে হবে।'

'ঠিক আছে। দুটো জিনিস দুজনে ভাগ করে নিই, তুই চরকাটা আমি বইটা।'

এখন শীত আরো চেপে পড়েছে। পাড়াগাঁয়ের শীতও পাহাড়ে শীত।

মঙ্গল আরতির শেষে কেটের কাপড়ের আঁচলটুকুই গায়ে টেনে টেনে নীরোপিসি বলেন, 'শীতের দাত এবার জেয়াদা।'

বড় জেঠামশাইয়ের গায়ে ফ্যানেলের ফতুয়া তার ওপর চওড়া পাড়ের শাল জড়ানো। সাবেকি জিনিস, জায়গায় জায়গায় পোকায় কেটেছে, পাড়ের কাজ কিছু কিছু ক্ষয়ে গেছে, তবু দামী জিনিস, এখনো গরম, নরম।

বড় জেঠামশাই সেই শালের কোণ তুলে কান ঢেকে বলেন, 'শীতটা যতো জেয়াদা হবে খেজুর রসটা ততো সরেশ হবে।'

'গরীবের কষ্ট। মালোপাড়ায় দেখে এলাম কাল, হাত-পা সেঁকতে আগুন জুটছে না।'

'কেন? বনের কাঠকুটোও কি শীতে হরে নিলো?' জেঠামশাই একটু বিরক্ত গলায় বললেন, 'মালোপাড়াতেই বা গিয়েছিলি কেন? ইহ পরকাল একরোগ! বিশ্ব-সুদ্ধ লোকের দুঃখ ঘোচাতে পারবি তুই?'

'কে কার দুঃখু ঘোচায় বড়দা। সর্বে-শ্বরের মূর্তি বানিয়ে বড়াই করে বসে থাকার একটা দায়িত্ব কোর্তব্য আছে, না কি নেই?'

'যতো কর্তব্যের দায় সর্বেশ্বর তোর ঘাড়েই চাপিয়েছে। তা নিজে শীতে কাঁপলে ওদের দুঃখু ঘুচবে? একখানা চাদর র‍্যাপার কিছু গায়ে দিসনি কেন?'

'চাদর র‍্যাপার? তুমি আর হাসিও না বড়দা। ভূতের আবার জন্মদিন! এক্ষুনি পাড়া টহল দিতে বেরোবো, হাত-পা আপনিই গরম হয়ে উঠবে। হাঁটলে শীত পালায়।'

কথাটা মনে লাগলো।

হাঁটলে শীত পালায়।

মনে মনে ঠিক করলাম, কাল থেকে ওই মঙ্গল আরতির পর্ব চুকলেই নিঃশব্দে সকলের চোখ এড়িয়ে আমবাগানে চলে যাবো। হেঁটে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কবিতা মুখস্থ করবো। দিদিকে বলে লাভ নেই। দিদির সাহস নেই।.........

এই সময়টা কেউ কারুর দিকে বড় দৃষ্টি দেয় না, যে যার নিজের তালে থাকে।

অতএব আমার অভিযান সার্থক হবে।

হলও তাই। নিঃশব্দে কেটে পড়ি।

নির্জন ভূমি, শীতকালে আমবাগানে আসায় দরকার কারো নেই। আমি গলা খুলে পড়ে চলি—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,

জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!'

সাহস বেড়ে যায়, বুঝতে পারি এ স্বর কারো কানে পৌঁছচ্ছে না। আরো উদাত্ত স্বরে পড়ি—

'আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে—
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতো দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।'

উঃ এ কী জিনিস! এ কোন অজ্ঞাত-লোকের স্বাদ বয়ে আনা কথা। এ কেবল-মাত্র যে আমারই জন্যে লেখা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাস্তি। পাগলের মতো পাতা উল্টে চলি—কোনটা রেখে কোনটা মুখস্থ করবো? মনে মনে ঠিক করে ফেললাম পুরো বইটাই মুখস্থ করে ফেলবো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে পেলে মুখস্থ করতে কতোক্ষণ?

এই তো দুবার পড়েই হয়ে গেল ক' লাইন—

'আর কতোদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?'

প্রায় আপনি আপনিই মুখস্থ হয়ে গেল—'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে—'

মুখস্থ হয়ে গেল—

'বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে
এখনো সময় নয়,
নিশি অবসান যমুনার তীর
ছোট গিরিমালা বন সুগভীর
গুরু গোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া—
অনুচর গুটি ছয়।'

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' তো বার দুই পড়েই মুখস্থ হয়ে গেল।

ধনভান্ডারের দরজা খুলে ফেলে আলিবাবার যে অবস্থা ঘটেছিল, আমার অবস্থাও প্রায় তাই।

কতকগুলো ভয়ানক ভালো লেগে যাওয়া কবিতা যেন সত্যিই আস্তে আস্তে অনুভূতির কোন এক রত্ন ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিচ্ছে। যেন—আমার বাল্য-কৈশোরকে গলিয়ে ফেলে উর্ধতন আর এক মানসিকতার ভাবে ঢেলে দিচ্ছে।

বুঝতে পারছি এগুলি মুখস্থ করে ফেলে মেজদাকে শুনিয়ে বাহাদুরী নেওয়া চলবে না, এ হচ্ছে প্রেমের কবিতা। সেই বয়সে কি প্রেমের কবিতায় উদ্বেলিত হবার কথা? না উচিত?

নিজেরই মনে হচ্ছে, উচিত নয়, তবু উদ্বেলিত না হয়ে পারছি না।

বুকের মধ্যে একটা ভয় ভয় ভাব ঠেলে উঠছে, মনে হচ্ছে আমি একটা অনুচিত কাজের নেশায় পড়ে যাচ্ছি, তবু বারবার পড়ছি।

অবশ্য গলা নামিয়ে।

আমবাগানের নির্জনতা হলেও।

প্রায় লুকিয়ে প্রেম করারই অনুভূতি প্রেমের কবিতা পড়ায়। ও জিনিস দিদির সামনেই কি গলা খুলে পড়া যাবে—

'কাল মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে,
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।'

অথবা—

'—আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে—
ছিলাম সবার মাঝে
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতাম যখন,
সেই পথ ছায়াভরা,
সেই বেড়া লতাঘেরা
সেই সরসীর তীরে করবীর বন।

সেই কুহরিত পিক শিরিষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা,
কতো হাসি কতো খেলা,
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে।'

নাঃ। দিদির সামনেও না।

দিদি হয়ত সন্দেহ করে বসবে।

বলতে কি নিজেকেই নিজে সন্দেহ হচ্ছিল যেন। মনে হচ্ছিল, প্রেমেই পড়ে বসে আছে বুঝি, তাই রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ সব কিছুর স্বাদ এমন তীব্রভাবে এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

বয়েসের পক্ষে যথেষ্ট পাকা ছিলাম বৈকি।

ফুলি আমায় যখন-তখন 'ন্যাকা' বলে ধিক্কার দিলে কী হবে।

ফুলির পাকামী বাস্তব জগতের উপকরণ নিয়ে, আমার পক্কতা কল্পনার জগতের কিছু বোঝা আর কিছু না বোঝার অনুভূতি নিয়ে। যে অনুভূতিতে মন অবশ হয়ে আসে, কেমন যেন বিষণ্ণও হয়ে যায়।

দিদি যে একদিন 'বিরহবেদনা' না কি বলেছিল, সেটা কী এই? কি জানি। তবে এই সব পড়ে পড়ে মনে ধারণা জন্মাতে লাগলো পাড়াগাঁটাই প্রেমে পড়বার পক্ষে উৎকৃষ্ট জায়গা। শহুরে টহরে ওই সব 'সরসীর তীরে করবীর বন' কোথায়? কোথায় ছায়াভরা পথ, লতাঘেরা বেড়া?

কিন্তু দিদি বেচারী কি শুধুই চরকা কাটবে?

এক-একটা বিশেষ বিশেষ কবিতার মধ্যে একটুকরো শুকনো আমপাতা দিয়ে চিহ্ন করে রাখি। দিদিকে দেখাতে হবে।

তবে দিদিকে একটু ভয়ও আছে, এই সব প্রেমট্রেম বিরহ টিরহর কবিতা পড়লেই হয়তো দিদি আবার সেই আগের মতো বিষণ্ণ বিষণ্ণ হয়ে যাবে।

তাছাড়া সময়ই বা কোথায়? জায়গাই বা কোথায়?

সত্যি বলতে—দিদিকে এই আমবাগানের সন্ধানটি দিতে ইচ্ছে করছে না। এ যেন আমার নিজের আবিষ্কার, আমার নিজস্ব নির্জন তপস্যাভূমি।

ক'দিন পরে দিদি একদিন বললো, 'তুই রোজ রোজ কোথায় হারিয়ে যাস রে?'

আমি অম্লান মুখে বলি, "ওমা হারিয়ে আবার যাবো কোথায়? ওই তো ওখানে ছিলাম।' (মিথ্যে কথা বলা হল না নিশ্চয়?)

'আমি তোকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। ছাতে গেলাম, গোয়ালে গেলাম, ঢেঁকিশালে গেলাম, রান্নাবাড়িটাড়ি সর্বত্র খুঁজে এলাম।'

দিদির মুখটা দেখে মায়া হলো, মনে হলো বলে ফেলি, কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে।

একটু ঢোক গিলে বললাম, 'তুই বড় জ্যেঠিমার ওধারে গিছলি?'

দিদি মাথা নাড়লো।

বললো, 'কেমন করে জানবো তুই ওখানে গিয়ে বসে আছিস!'

যাক দিদির কথা বলার ভঙ্গীতেই আমাকে আর প্রত্যক্ষ মিথ্যে কথা বলার পাপ বইতে হলো না, 'অববাজা' হত'র ওপর দিয়েই গেল।

তবু একটু পাপবোধ পীড়া দিল বৈকি।

তাড়াতাড়ি ও প্রসঙ্গ চাপা দিতে বললাম, 'খুঁজছিলি কেন?'

দিদি বললো, 'কোথায় যেন খেজুর-রস জ্বাল দিয়ে গুড় হবে, তাই হৈ-চৈ করে দেখতে যাচ্ছিল ওরা সবাই ফুলি ফুন্টি সুবোধ কেষ্ট মিতু মিহুকা। আমাদেরও সঙ্গে যেতে ডাকছিল, বললো, 'তোরা তো দেখিসনি কখনো—ওরা সবাই দু'তিনটে করে রাঙা আলু নিয়ে গেল। রস জ্বালের সময় সেগুলোকে নাকি কাঠি বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ওই রসের মধ্যে ফেলে দেবে, গুড় জ্বালের সঙ্গে জ্বাল হয়ে হয়ে পিঠে-পুলির মতো হয়ে যাবে।...যারা গুড় জ্বাল দেয় তারা চিমটে দিয়ে কাঠি ধরে ধরে তুলে দেয়, ভীষণ নাকি মজা—'

মনটা অবশ্যই হায় হায় করে উঠলো।

অমন একটা না-দেখা মজা হারালাম।

কিন্তু দিদি তো দেখে নিতে পারতো।

অবাক হয়ে বলি, 'তা তুই গেলি না কেন?'

দিদিও অবাক হলো, 'বাঃ, তোকে খুঁজে পেলাম না, আর আমি একলা একটা মজার জিনিস দেখতে যাবো?'

মরমে মরে গেলাম।

চোখে জল এলো।

এই দিদির কাছে আমি কথা চাপছি?

বললাম, 'আমার জন্যেই তোর দেখা হল না।'

দিদি একটু হাসলো।

আমি একটু চুপ করে থেকে আস্তে বললাম, 'আমি বড় জ্যাঠার বাড়ি যাইনিরে দিদি।'

দিদি যেন একটু কেঁপে উঠলো, শুকনো মুখে বললো, 'তবে?'

আমবাগানে।

'আমবাগানে?'

'হ্যাঁরে গলা ছেড়ে 'চয়নিকা'র কবিতাগুলো পড়ে মুখস্থ করবো বলে। কী অপূর্ব সুন্দর সব কবিতা রে দিদি। পড়তে পড়তে মনে হয় অন্য কোনো জগতে চলে গেছি যেন। ভাল ভালগুলো বেছে চিহ্ন করে রেখেছি তোর জন্যে, পড়ে দেখিস।'

কিন্তু দেখবে কখন?

চিহ্ন তো বইয়ের পাতার মধ্যেই পড়ে থাকবে।

নির্জনতা বলে কিছু আছে আমাদের?

দিদিতে আমাতে চুপি চুপি একটু ছাতের সিঁড়িতে যাবার ঠিক করলাম।

ছাতে যাবার তো উপায় নেই, ছাতের দরজায় তালা লাগানো। কারণ ছাতে গিন্নীদের বড়ি শুকোয়, আচার শুকোয়, বিশুদ্ধ বস্ত্র শুকোয়। পাছে বাড়ির ছোটছেলেরা কেউ আচার চুরি করে খায় অথবা পবিত্র বস্তুগুলিতে অপবিত্র স্পর্শ লাগায়। ছোটদের তো ওনারা শ্লেচ্ছটেচ্ছদের দলে রেখে দিয়েছেন।

তা ছাতের সিঁড়িটাও খারাপ নয়। এখন শীত, হাওয়াটা কনকনে, সিঁড়িটা বেশ গরমগরম।

আমার হাতে 'চয়নিকা', দিদির হাতে একটা মোটা খদ্দর, সিঁড়ির চাতালে

...বো। নিষিদ্ধ বস্তু আস্বাদনের রোমাঞ্চ ...র উত্তেজনা নিয়ে পা টিপে টিপে উঠে ...চ্ছি। হঠাৎ সামনে বাবার পিসিমা।

বলে উঠলেন, 'এই যে তোদেরই ...জছি! দুটি বোনে সন্ধ্যা কোথায় থা...কিস। বড়ো হয়েছিস, মায়ের কাছে কাছে ...কাই ভালো।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'মেয়ে-...য়ের কাছে 'বের্তনিয়ম' কিছুই তো ...রিসনি। শুনে হাঁ হয়ে গেছি, কুমারী-...লে 'পুণ্যিপুকুর' 'হরির চরণ',. 'যম-...পুকুল' কিছু করাসনি মা। তা এখন তো ...আর ওসব হবে না, মা বড্ডোই বয়েস ...কুক চোদ্দপুরুষ নরকস্থ করে রেখেছো ...তোমরা, এ আর আমার বুঝতে বাকি নেই, ...বে সূর্য্যি অর্ঘ্য দিয়ে দেহ শুদ্ধ করে ...একটা বের্ত ধরিয়ে দেব আমি। বাপের ...বংশের মেয়ে তো? আমার একটা কোর্তব্য ...আছে।'

এই এক রাশ কথার মধ্যে একটা ...কথারও তো মানে বুঝতে পারি না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকি।

'ওমা অমন গরুচোরের মতন ড্যাব-ডেবিয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চল নীচে। চুপি চুপি বড়দাকে দিয়ে একটা সূর্য্যিঅর্ঘ্য দিয়ে দুই বোনকেই একটু পঞ্চগব্যি খাইয়ে নিই। কাল সংক্রান্তি, কালকে 'তুষতুষলী' ধরাবো তোদের। হিন্দুর মেয়ে, এসব জানা দরকার। এইতো ...লির এবার উদ্‌যাপন, ঝুনি গেল বছর ধরেছে।'...তোদের মা ইতু পুজো পর্য্যন্ত করায় না, ছিঃ ছিঃ।'

চেয়ে দেখলাম দিদির মুখ লাল লাল।

এখানে এসে সত্যিই চেহারা ফিরে গেছে দিদির। এমনিতেই লালচে হয়ে গেছে মুখ।

হয়তো অসুখ থেকে উঠে এই সারবার সময় বলে, হয়তো এর আগে কখনো হাওয়া বদল হয়নি বলে, হয়তো বা এইটাই চোখে মুখে দেহে মনে লাবণ্য সঞ্চারের সময় বলে।

মোট কথা এখন দিদি লাবণ্যে ঢলঢল করছে। আর দিদিকে আমার থেকে ছোট দেখায় না।

এখন দিদিকে আরো বড় দেখতে লাগলো।

বাবার পিসিমা ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেলেন, আমরা পিছু পিছু। ঠাকুরবাড়ি যাওয়া মানেই তো ওপর নীচের বিরাট বিরাট দু-তিনটে দালান আর প্যাসেজ পার হওয়া।

দিদি একটু পিছিয়ে পড়ে চাপা গলায় বলে, 'শুনলি কথা? আমাদের আর 'কুমারী' বলা যাবে না। উঃ বড়োদের মুখের ওপর কথা কইতে নেই, তাই চুপ করে থাকতে হলো, নইলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'তোমাদের এই ধর্মের বলে, স্বর্গে যাওয়া চোদ্দপুরুষকে নরকে পাঠাতে পারি এমন ক্ষমতা তাহলে আছে আমাদের? অতো অতো ধর্ম কোনো কাজে লাগলো না?'

এখন আমি দিদির কথাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না, বাড়ির ছোট মেয়েরা ব্রতটত না করলে ঊর্দ্ধতন চোদ্দ পুরুষ নরকে পড়ে যান, এটাই হবে বোধ হয়। কিন্তু ব্যাখ্যাটা ঠিক মনে লাগলো না। বাবার পিসিমার কথার মধ্যে যেন একটা চাপা ধিক্কার, দিদির কথার মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ।

অন্য কোনো রহস্য আছে বাবা।

'তবু ভাগ্যি যে একটাও হাতে রয়েছে—' বাবার পিসিমা বলেন, 'মেয়েদের কাল সক্কালবেলাই কিছু খাইয়ে বোসো না ন বৌমা।......ইতুপুজোও তো ধরাওনি। নিজে করো বললে তো চলবে না, মেয়েদেরও সব শেখাতে হয়। পরের ঘরে যেতে হবে না? উনো ঝুমনোর মতন দুই মেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছো। কাল ওরাও সব মেয়ের সঙ্গে ইতুর পালুনী করবে। আর তুষতুষলোর বের্ত ধরবে। তবু একটাও হাতে পাওয়া গেল।'

তাকিয়ে দেখি মার মুখ শুকনো, চোখে ভয় ভয় ভাব।

মাকে চিরদিনই অপ্রতিহত প্রতাপের মূর্ত্তিতে দেখেছি, এ রকম দেখে কষ্ট হলো।

মনে হলো—সেই চুণার না কোথায় যাবার কথা হয়েছিল, তাই গেলেই হতো।

তবু মনটা ঠিক আরাম ছিল না।

সত্যি আমাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছু নেই, আমাদের অনেক কিছু জানার বাকি আছে।

মা আস্তে বলেন, 'তুষতুষলি? ওর কী নিয়ম টিয়ম পিসিমা?'

পিসিমা ঝংকার দিয়ে বলেন, 'হাতীও নয় ঘোড়াও নয় মা' বৌমা, বিনি খরচের বের্ত। শুধু উদ্‌যাপনের সময় বামুনকে সোনার নাড়ু দিতে হয়। তো—সে তো চার বছর পরের কথা। তখন মেয়েরা শউরের পয়সায় বের্ত সারবে। এখন এই অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে পোষ মাস ভোর রোজ তুষ আর গোবর দিয়ে চারটে করে নাড়ু পাকিয়ে, মুলোর ফুল আর সরষের ফুল দিয়ে ধরে ধরে মন্তর পড়বে—

'তুষতুষুলি কাঁধে ছাতি,
বাপ-মার ধন যাচা যাচি,
স্বামীর ধন, নিজ পতি।
বাস করবো নগরে—
মরবো গিয়ে সাগরে—
জন্মাবো উত্তম কুলিনের ঘরে।
তুষলি গো মাই
তুষলি গো রাই।
তোমারে পুজিয়া আমি কি বর পাই?
যে বর চাই, সে বর পাই।
অমর পুরু বাপ চাই—
ধন সাগরে মা চাই।
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই—

সভা-আলো জামাই চাই—
সভা পন্ডিত ভাই চাই—
দরবার শোভা বেটা চাই
রূপ কোটো ঝি চাই।

সিঁতের সিঁদুর দপ দপ করে,
হাতের নোয়া ঝকমক করে,
আলনায় কাপড় ঝলমল করে,
ঘরে ঘটিঝাটি চকচক করে।

গোলায় ধান, মরাইয়ে ধান,
যুবতী এই বর চান।
ছ বুড়ি ছটা ক্ষীরের নাড়ু,
শাঁখার অগ্রে সুবর্ণের খাড়ু।'

মাস ভোর ওই তুষের নাড়ুগুলো একটা মালসায় রেখে রেখে, মকর সংক্রান্তির দিন ছ বুড়ি ছ গন্ডা ক্ষীরের নাড়ু দিয়ে পায়েস রেঁধে খেতে হবে। খাওয়ার সময় ওই মালসার তুষের নাড়ুতে আগুন ধরিয়ে পিঠের কাছে রাখার নিয়ম। খাওয়া হলে মালসাটা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলবে, 'তুষলি গেল ভেসে,

আমার বাপ ভাই এলো হেসে।
তুষলি গেল ভেসে—

আমার স্বামী-পুত্তুর শ্বশুরশাশুড়ী
ধন দৌলত টাকাকড়ি
সব এলো হেসে।'

এই ব্রেতো। হাঙ্গামাও নেই খরচও নেই।'

যে আমি আজ সকালেও আবার সঙ্কল্প করেছি পুরো 'চয়নিকা'খানাই মুখস্থ করে ফেলবো, সেই আমিই বাবার পিসিমার ওই অনর্গল মন্ত্র পড়ায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। এতোও মুখস্থ থাকে?

মা কিন্তু এতো আশ্বাসেও স্বস্তি পেলেন বলে মনে হলো না। শুকনো মুখে কাষ্ঠ হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'এ বছর তো না হয় আপনি যত্ন করে নাতনীদের ব্রত ধরালেন, কিন্তু এর পরে? 'জোগাড়' কোথায় জোগাড় করবো?'

বাবার পিসিমা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'তুমি যে অবাক করলে না' বৌমা। তোমার কলকেতা এমন সোনার দেশ যে, একটু দুধ গোবর জুটবে না?'

মা বললেন, 'তা নয় মানে—'

'মানের কিছু নেই না বৌমা। তোমার প্রিকিতি আমি দেখছি, কোনো হ্যাঁপাই নিতে চাও না। তা উদ্‌যাপনের সময় তো মেয়েদের শউরবাই খরচ জোগাবে। আরো চার বছর তো থুবড়ি হয়ে থাকবে না মেয়েরা? ভয় খাচ্ছো কেন?'

আমার রোগ যায় না।
যাবেই বা কেন?
কথাতেই তো আছে স্বভাব যায় না মলে—'

আমি দুম করে বলে বসি, ' তা ছাই গোবরের ব্রত করারই বা দরকার কী ঠাকুমা? জগতে এতো ভাল জিনিস থাকতে?'

ঠাকুমা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলেন, 'নীরি সেদিন মিছে কথা বলেনি না বৌমা, তোমার এই মেয়ের কপালে ভবিষ্যতে অশেষ দুঃখু আছে। তা হ্যাঁ গা, পোষ মাসে কি আমি বোশেখ মাসের বেত্ত করাবো? যে সময়ের যা।'

তবু নাছোড়বান্দা আমি বলি, 'ব্রত তো ভারী। খালি দাও আর চাই।'

'ওঃ! মেয়েকে তো দেখছি মহা পন্ডিত করেছে ন্যাড়া। বড়োটা তবু নরম আছে, ছোটটি কী? বলি ও ছুঁড়ি, এতো যদি তত্ত্বকথা জানিস তো বলি, 'চন্ডী' শুনিস নি কখনো?...তাতে 'দেহি দেহি' নেই? দাও দাও চাই চাই করবো না তো কি জন্যে বেত্ত করবো?'

বাবার পিসিমার কথা শেষ না হতেই মা আমার ঝুলন্ত বেণীটা (যেটা খোঁপার গঠন মুক্ত হয়ে পিঠের উপর লম্বিত) ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে ওঠেন, 'তোকে নিয়ে আমি কী করবো মুচি? তুই কি চাস যে আমি এখান থেকে বিদেয় হই?'

মা হঠাৎ গলা খাটো আর ঘোমটা বড় করে ফেললেন।

বুঝলাম কোনো পুরুষ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে।

বাবা, বড় জেঠামশাই অথবা নতুন কাকা।

বাবা বা জেঠামশাইয়ের কথা বুঝি কিন্তু নতুন কাকাকে দেখেও যে কেন ঘোমটা টানেন মা তা জানি না। ওখানে তো ছোটকাকার সঙ্গে বেশ গল্প করেন।

এখানে উনি জ্ঞাতি দ্যাওর বলে?
না পাড়াগাঁ বলে?

না, নতুন কাকা নয়, বড়জ্যাঠা।

খড়ম খট খটাতে খটাতে এসে বললেন, 'কাল গঙ্গাস্নানে যাবে না কি পিসিমা?'

বাবার পিসিমা বলে উঠলেন, 'সে তুই বলবি, তবে যাবো?'

'আহা তা নয়, গেলে গাড়ীখানাকে বলে রাখবো।'

'শোনো কথা'—ঠাকুমা অবাক গলায় বলেন, গঙ্গাচ্ছ্যান করতে যাবো সাধনের গাড়ীতে? কেন পায়ে কী ঘুণ করেছে?'

'আহা তা নয়, মানে ন বৌমা রয়েছেন উনি কি আর অতোটা—'

'ন বৌমার কথা বাদ দে গুপে। বলে বারো মাস গঙ্গার দেশে বাস তাই বড় গঙ্গাচ্ছ্যান করে।'

'আহা-হা, শহরে টহরে আলাদা কথা, সেখানে সঙ্গীই বা কোথা? এখানে পাঁচ-জনের সঙ্গে—তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির দেশের গঙ্গা। কাল একটা যোগ রয়েছে—আমি সাধনকে বলে রাখছি।

'বলগে বা। আমি তো আর গাড়ী চড়ে গঙ্গাচ্ছ্যানে যাবো না। নিজের পায়ের ক্ষ্যামতা যেদিন ফুরোবে, তোদের কাঁধে চড়ে চলে যাবো।'

স্নানকে এঁরা 'ছ্যান' বলেন।

ও'রা আমাদের কথা শুনে বিদ্রূপ করেন, আমরা ও'দের কথা শুনে হাসি।

এখন বড়জ্যাঠা তাঁর পিসিমার কথার ভাবার্থে হাসলেন। বললেন, 'তুমি আর নীরি যে গাড়ী চড়বে না, তা জানি। যেমনি মা, তেমনি ছা তো। একেবারে কাটোয়া সেপাই।'

'কাটোয়া সেপাই' কথাটার অর্থ কী, ওটা কোন শব্দের রূপান্তর, এ সব জানতাম না। কিন্তু এখানে এসে পর্যন্ত কথাটা বারবার শুনছি। বোধ হয় এঁদের পরিবারের একটি প্রচলিত ব্যবহারিক বিশেষণ।

তবে শুনে শুনে মানে একটা ধরে নিয়েছি, মানেটা বোধ হয় 'অনমনীয়।'

সত্যিই এঁরা দুই মাতা-কন্যা তাই। একেবারে অনমনীয়।

'কষ্ট' হওয়াটাকে এঁরা একেবারে নীচু চোখে দেখেন, দুর্বলতা বলে কস্মিন্ এঁদের ধারে-কাছে আসতে পায় না। আর নিজের প্রতি মমতার লেশমাত্র নেই বলেই বোধহয় অপরের প্রতিও এমন নির্মম!

নির্মম ছাড়া আর কী?

কতো অনায়াস অবলীলায় এঁরা অন্যকে কতো কঠিন কথা বলতে পারেন।

তবে মায়ের মধ্যে যেন একটা রুক্ষ শুষ্কতা, একটা মমতাহীন কাঠিন্য। মেয়ের মধ্যে ঠিক ওই বস্তু নেই। সেখানে সব কিছু ছাপিয়ে একটু হৃদয় দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন সেদিন দেখলাম।

বদনের মা নাম্নী একটি দুঃখী মানুষ এসে উঠোনের এক ধারে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায়, এদের নীচু জাত বলে ঠেলে রাখা হয়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মেয়ে-মানুষটি উঠোনের ওপরই বসে পড়লো, আর ঠিক সেই সময় নীরোপিসি কোথা থেকে এসে ঢুকলেন।

(ক্রমশ)
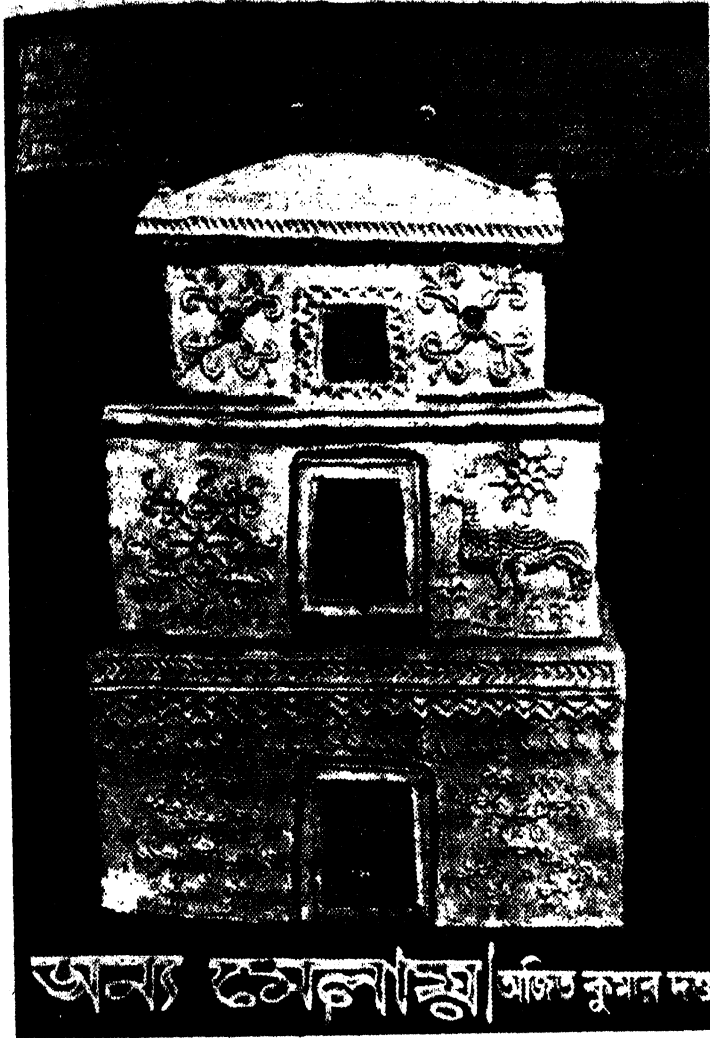
সবুজের বেশ খানিকটা ছোঁয়া রয়েছে জায়গাটাতে। এখানে-ওখান বা ঢিপিটার গায়ে দূর্বাঘাস ছাড়াও, ওদিকটায় যেখানে জড়জাড়ি করে রয়েছে কিছু বাবলার মাথা, সেখানটায় ছোপটা একটু গাঢ়। গা-ঘেঁষেই একটা উঁচু ইউকিলিপটাস। মাঝখানটায়ও একটা বড় গাছ। গাছের মাথা ছাড়িয়ে কোণাকুণি দৃষ্টি দিলে পৌঁছোয় পুরানো কেল্লার সুউচ্চ প্রাচীর-গাত্রে খুঁটিয়ে দেখলে নজরে আসে চবুতরাটাও। সব মিলিয়ে একটা আলাদা পরিবেশ। কিন্তু সম্বিত ভাঙতে সময় লাগে না। থেকে থেকে কানে ভেসে আসে গাড়ীর হর্ণ, লাউড স্পীকারের গুঞ্জন আর জনতার কোলাহল। ঘুরে তাকাতেই দৃষ্টিপথে আসে ইট-কাঠ, কংক্রীট-কাচ এবং আরও কতকিছুর তৈরী রকমারি বাড়ীঘর—মেলার প্যাভেলিয়ন সব। অগনিত প্যাভেলিয়ন, লোকজন আর কল-কোলাহল মিলিয়ে ত দিল্লীর এই শিল্প-মেলা—তৃতীয় এশিয়ান ফেয়ার, নামান্তরে ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিজ ফেয়ার।

বছরখানেক আগে যখন প্রথম কোদালের ঘা পড়ল মাটিতে, তখনই পত্তন হয়ে গেল পুরানা কিল্লা আর আগ্রার রেল-লাইনের পার্শ্ববর্তী নতুন এক মেলা-নগরীর। কোদাল-গাঁইতি-শাবলের সঙ্গে এসেছে বুল-ডোজার। কাজে লেগেছে চল্লিশ হাজারের ওপর লোক—নানা ধরনের সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে। দীর্ঘ ও সমবেত প্রয়াসে মেলা-প্রান্তর, নতুন নামের এই প্রগতি ময়দান যে রূপ-পরিগ্রহ করেছে, সেখানে প্রতিফলনটা মুখ্যত শিল্পোন্নয়ন ও বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার। সঙ্গে স্বাধীনোত্তর ভারতের নানাবিধ বিকাশ-প্রকল্প-কাহিনীও স্থান পেয়েছে। প্রদর্শন বা বিন্যাস ব্যাপারে স্বভাবতই প্রাধান্য লাভ করেছে আন্ত-র্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সরকারী ও বে-সরকারী নানাবিধ শিল্পোদ্যোগ আর কল-কারখান-জাত বিবিধ সম্ভার। কিন্তু নিছক বড় বড় কারখানা বা উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিয়েই শিল্পোদ্যোগের সমগ্র কাহিনী বিধৃত নয়। অন্য ধরনের উদ্যোগও রয়েছে। পরম্পরাগত, হাতে-তৈরী নানা জিনিসের উৎপাদন বা চাহিদাও সমভাবেই এই শিল্প-কাহিনীর অঙ্গীভূত। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এই পরিপূরক কাহিনী বাণিজ্য-মেলা কর্তৃ-পক্ষের নজর এড়ায়নি। তাই মেলায় বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের, আধুনিকের সঙ্গে পরম্পরারও স্থান হয়েছে। মেলার সবুজ-ঘেঁষা কোণে সেজন্য প্রদর্শিত হচ্ছে—রুর‍্যাল কমপ্লেক্স বা গ্রাম্য-ঝাঁকি।

এই ঝাঁকির উদ্যোক্তা অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফট্স বোর্ড অর্থাৎ অখিল ভারতীয় হস্তকলা বোর্ড (কারুকলা সংস্থা নয় কেন কে জানে)। জল্পনা-কল্পনা নানা-রকম হয়েছে গোড়ায়। একটা বাজার বসালে কেমন হয়? মাস্টার-ক্র্যাফটসম্যান বা কুশলী শিল্পী কারিগরদের কাজে বসিয়ে দেওয়া-টাই বা কেমন হবে? কিংবা নিতান্তই বাতায়নসজ্জা ও বিক্রীর স্টল? তারপর নানা বোর্ড-কমিটির বেড়া ডিঙিয়ে যা সম্ভব হল, সেটা নিঃসন্দেহে নতুন ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

সম্ভবত সবচেয়ে বড় কথা এই যে, কমপ্লেকসে একটা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। মাঝখানে একটা উঁচু ঢিপিকে ঘিরে চারপাশে তৈরী হয়েছে

নানা ধরনের নানা কুটির তথা অঙ্গন ও প্রাঙ্গন। ঢিপিটার ওপরেও রয়েছে একটি। বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে কুটিরগুলো সমৃদ্ধ। এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে, গড়নে, চেহারায় এবং সাজানো-গোছানোয়। নতুন করে ব্যবস্থা করা হয়েছে জলাশয় ও গাছপালার. অবশ্য তার কিছুটা গোড়া থেকেই ছিল। সামগ্রিকভাবে সহজেই একটা গ্রামীণ পরিবেশ গড়ে উঠেছে এলাকাটা জুড়ে।

ঢিপির ওপরকার বাড়ীটি অচিরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওখানটায় তৈরী করা হয়েছে হিমাচলের পাহাড়ী ধরনের একটি বাড়ী। পাথরে গাঁথা ভিতের ওপর কাঠের তৈরী এটি। চারপাশে ঘুরে গেছে রেলিং-ঘেরা বারান্দা। নকসা ও জালির কাজ স্থানে স্থানে। ওপরে বসানো তাঁতও নজরে আসে ভাল করে তাকালে। ওদিকটার বিস্তৃত প্রাঙ্গনের একপাশে টালি-ছাওয়া ক'টি বাড়ী. উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গ্রাম্য-কুটিরের অনুকরণে তৈরী। একধারে হয়ত পড়ে রয়েছে কাগজ-রাংতায় তৈরী একটি তাজিয়া। দাওয়া পেরিয়ে ভেতরে দেখা যাচ্ছে ঘানি ধরনের যন্ত্র. সাঁড়াশি ইত্যাদি। দেশী করণ-কৌশলে এর সাহায্যে রূপোর সরু তার নিষ্কর্ষণ করা হয়। মাটির তাল থেকে তৈরী হচ্ছে মূর্তি—মহাদেবের। গোরখপুর অঞ্চলের এ-দলের থেকে কিছুটা দূরে আরেক দল ব্যস্ত সিকীর ঘাস দিয়ে জিনিস বানানোতে। এরা বিহারের আর এদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশী।

পূর্বাঞ্চলীয় বাড়ী-ঘর বেশ কয়েকটা একসঙ্গে দণ্ডায়মান। নাগা ও পার্বত্য উপজাতির বসবাসের কুটির আকৃতি ও গঠনে বিশিষ্ট। বাঁশের সুদৃশ্য ব্যবহার এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়। এই সারিতেই মাটি-লেপা দেওয়াল আর কুলুঙ্গীতে-রাখা লক্ষ্মীঘট. মনসার ঝারি ইত্যাদি দেখে সহজেই চেনা যায় বাংলার কুটিরকে। মিথিলার তথা অধুনা জনপ্রিয় মধুবনীর দেওয়াল-চিত্র শোভিত কুটির রয়েছে এই দিকটাতেই।

দেওয়াল-সজ্জার বিশিষ্টতা দেখা যায় পশ্চিম প্রান্তের কুটির সারিতে। মাটির রিলিফে কাজ. কাচ-সজ্জিত অলঙ্করণ এদিকটাতেই নজরে পড়ে। রাজস্থানী দেওয়ালগায়ও বর্ণচ্ছটায় সুরঞ্জিত। পরম্পরানুসারী এসব নকসায় জালপনা-জাতীয় ডিজাইনের সঙ্গে সঙ্গে স্টাইলাইজড্ জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা ও আরও অনেক কিছুই দৃশ্যমান।

দক্ষিণের বিশিষ্টতা যত না বাইরেকার চেহারায়, তার চেয়ে বেশী বোধহয় ঘরের এ-পাশে ও-পাশে সাজানো নানা কারুকৃতির মধ্যে। এ-প্রসঙ্গে মহীশূর অঞ্চলের কাঠের একশংশ উল্লেখের দাবী রাখে।

ভিড়ের মধ্যে ঠিক হারিয়ে না গেলেও কিংবা হঠাৎ-করে ততখানি দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ না হলেও. নিকোবরের কুটিরখানি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। অরণ্য-সঙ্কুল জীবনে যেটা স্বাভাবিক. নিকোবরের কুটির সেই মাচার ধরনে উঁচু থামের ওপর অবস্থিত। মই থাকে প্রবেশ-নির্গমের মুখে। প্রয়োজনে উঠিয়ে ফেলা হয়। ভেতরে চাটাই. মাদুর ইত্যাকার দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ঘরের মেঝে। এমন আড়াআড়িভাবে সেটা বাঁশ-বেতে বোনা যে বুননের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর স্থান রাখা হয়েছে। দেখা-শোনার চেয়ে বাতাস-চলাচলের ব্যবস্থা রাখাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কুটিরের অনতিদূরে গাছের মাথায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাঠের নৌকা। সমুদ্রগামীদের শুভ কামনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নিকোবরের সাগর-সৈকতে এ-ধরনের নৌকা সাজিয়ে রাখার রেওয়াজ রয়েছে।

ঘর-বাড়ী. সাজ-সরঞ্জাম, কর্মরত নানা শিল্পী-কারিগরের দল—সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র এলাকাটা জুড়ে। একটা সংগ্রহশালাও রয়েছে। ছোট ছোট বহু জিনিস যথাযোগ্যভাবে দেখা বা দেখানোর অসুবিধাহেতু, এখানে স্থান পেয়েছে। পরিবেশটা আরও আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যেই হয়ত বা আছে মুক্তাঙ্গন. মুখ্যত লোকগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশনের জন্য। শিল্প আর জীবন এখানে একাত্মভূত।

সহাবস্থানের প্রতিভূ এই ঝাঁকি নিশ্চিতভাবেই বিশেষ অর্থবহ। প্রথমত, কোনও কিছুর যথার্থ বিচার যে তার স্বীয় পরিপ্রেক্ষিতে, সেটা স্মরণ করানোর আজ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটা জিনিসের যে প্রয়োজন ও দাম, অন্য পরিবেশে তা নয়। লোকাচার সমৃদ্ধ পোড়ামাটির ঘোড়া তাই নিছকই বাণিজ্যিক সামগ্রী নয়। যেমন এক নয় মন্দির-চত্বরের কথাকলি আর শহুরে স্টেজের নাচ। পরিবেশ সৃষ্টি বিনা এ-সত্যটি স্মরণ করানো নিশ্চয়ই কঠিন হত। দ্বিতীয়ত, এমন একটা বাণিজ্য মেলায় কারুকলাকে এভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হওয়ায়, আশা করা যায় সমগ্র আন্দোলনে একটা নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হবে। তৃতীয়ত. স্থায়ী আকারের এ-ধরনের কিছুর আশাটা এখন বোধহয় আর দুরাশা নয়।

বহুজনের চিন্তা ও কর্মোদ্যমের ফলশ্রুতি এই কমপ্লেক্স। তবুও এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে কারুর নাম করতে গেলে নিশ্চয়ই করতে হবে প্রখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী মহাশয়ের। ইতিপূর্বে এই বোর্ডেরই একটি এবং ললিতকলা আকাদামি আয়োজিত লোকায়ত ও আদিম শিল্পের আরেকটি প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে, অভিজ্ঞতা-লব্ধ তাঁর চিন্তা এবারে তিনি বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন। পরামর্শদান ছাড়াও, এ-ব্যাপারে তিনি দৌড়াদৌড়িও করেছেন খুব—কখনও কাশ্মীর. কখনও পূর্বোত্তর সীমান্ত আর হয়ত কখনও বা আন্দামান-নিকোবর অবধি। সবার ওপরে তাঁর স্বকীয় শিল্প দৃষ্টি। এসব কিছুরই সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে ঝাঁকির বিন্যাস-ব্যবস্থায়। আরেকটা কথা এই সব পরিকল্পনা সত্ত্বেও যথাযোগ্য ফল লাভ সম্ভব হত না, যদি বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান. বিশেষত উপরের মহলের সারটা না থাকত।

আরও কিছু গ্রহণ বা বর্জনে হয়ত আরও ফলপ্রসূ হত কার্যক্রম. তবু যতটা পাওয়া গেছে, তা-ও নিশ্চিতরূপেই অনেকখানি। এক কথায় এই জাতীয় প্রচেষ্টার জন্য উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য। দেশজ কারুকলার ধারাকে ভিন্নভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনের এই প্রয়াস যদি নবদিক-দর্শনে সহায়ক হয় তবেই, বলা চলে, সার্থক হবে এই প্রচেষ্টা।
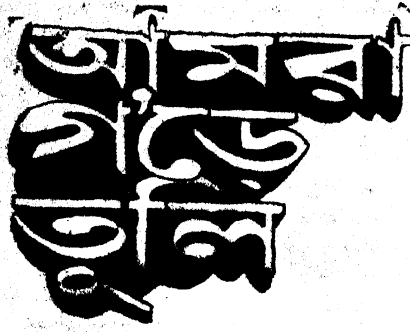
বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট

কোনো প্রচেষ্টা আন্তরিক হলে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে নিষ্ঠা থাকলে সীমিত শক্তিও অপরিসীম হয়ে ওঠে, লাভ করে দুর্দমনীয় গতি। বিশেষত যদি সে-শক্তি যৌবনদীপ্তিতে দুর্বার হয়। এই বিশিষ্ট গুণগুলির অধিকারী হয়ে দক্ষিণ কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউ-এর ওপর গড়িয়াহাট মার্কেটের উল্টোদিকে প্রাণ-প্রবাহের কেন্দ্রস্থলে শক্ত ভিতের ওপর চারকাটা পরিব্যাপ্ত হয়ে তিনতলা সমান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে 'বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট'। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর আগে ১৫।১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে যার জন্ম, ১৬ নম্বর ফার্ণ রোড, ২২ নম্বর ফার্ণ রোড, ১৭১।২সি, রাসবিহারী এভিনিউ হয়ে আজ তা ১৭১।২ডি, রাসবিহারী এভিনিউ-এর নিজস্ব বাড়ীতে স্থিতি লাভ করেছে। প্রবীণদের প্রচেষ্টায় আর নবীনের কার্যোদ্যমে বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট আজ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

গ্রন্থাগার ভবনটি আধুনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত—মোজেক-করা, কাঁচের জানলা-দরজা, আলো-বাতাসের সুপ্রচুর ব্যবস্থাযুক্ত। প্রতিটি তলার উচ্চতা খুব বেশি নয়। একতলায় শিশু বিভাগ, ছোট ও বড়দের অবৈতনিক পাঠকক্ষ, অফিসঘর এবং জিমনাসিয়াম। দোতলা ও তিনতলায় বড়দের গ্রন্থাগার। চারতলায় ছেলে-মেয়েদের ইনডোর গেমের ব্যবস্থা এবং গবেষণা বিভাগ (নির্মাণকাজ চলছে)। পাঁচতলা তৈরী সম্পূর্ণ হলে হবে মহিলা বিভাগ। এবং সেই সঙ্গে লিফটেরও ব্যবস্থা।

এস আর রঙ্গনাথন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যাঁর দান অপরিসীম, তিনি গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে তিনটি বা তিনটি বিষয়ের পারস্পরিক ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বাধিক—গ্রন্থ, পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মচারী। বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট এই তিনের পারস্পরিক ঐক্য ও সমন্বয়বিধান করে আদর্শ গ্রন্থাগারের এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা গড়ে তুলেছে। এখানে শিশু বিভাগের সদস্য সংখ্যা ৫০০, গ্রন্থসংখ্যা ইংরেজী-বাংলা মিলিয়ে ৫,০০০, মাসিক চাঁদা ৫০ পয়সা। শিশুদের জন্যে স্বতন্ত্র পাঠকক্ষে বসে তাদের উপযোগী পড়বার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকাও তাদের জন্যে রাখা হয়। খোলা থাকে সকাল সাতটা থেকে নটা এবং বিকেলে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা। এই বিভাগের গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক বিশেষ হৃদ্যতাপূর্ণ।

শুধু শিশুদের নয়, বড়দের মানসিক উৎকর্ষের দিকেও তাঁদের সমান দৃষ্টি। বড়দের গ্রন্থাগারের সভ্য-সংখ্যা ১৯৫০ জন এবং তার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই অর্ধাংশ। ক্যাটালগিং করা বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা ২৯,৮২৩ এবং ইংরেজী গ্রন্থ-সংখ্যা ৭,৮৭৩খানি। বাংলায় সব জাতীয় বই আছে, ইংরেজীতে উপন্যাসের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইংরেজী বই-এর শ্রেণীবিভাগ এবং আদানপ্রদান ব্যবস্থায় ডিউই ও কাটার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, কিন্তু বাংলা বই-এর ক্ষেত্রে লাইব্রেরীর নিজস্ব পদ্ধতি চালু আছে। পাঠক 'ওপন একসেস' ব্যবস্থা অনুযায়ী বই নিতে পারেন অর্থাৎ র‍্যাক থেকে ইচ্ছেমত যে-কোন বই বেছে ইস্যু করতে পারেন। এ-ব্যবস্থায় ছোটরাও বঞ্চিত নয়। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পাঠকেরাও ধন্যবাদার্হ এই কারণে, যে, তাঁরা বই-এর পাতায় মন্তব্য লিখে বা অন্য কোন উপায়ে বই-এর ক্ষতিসাধন করেন না। বহু গ্রন্থের পাতা উল্টে এ-জিনিসটা পরখ করেছি। অন্যান্য বড় গ্রন্থাগারের মত এখানেও গ্রন্থাগারের অন্যতম অঙ্গ বই রিজার্ভেশন ব্যবস্থা চালু আছে।

এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদের জন্যে চাঁদা এক টাকা, কিন্তু গ্রন্থাগার বা অন্য কোন বিভাগের সদস্য হতে গেলে অতিরিক্ত মাসিক এক টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। প্রতি মাসে চাঁদা দিলে বই নেবার জন্যে লাইব্রেরীর নতুন কার্ড ইস্যু করা হয়। ফলে কারুরই চাঁদা বাকি পড়ে চাপ সৃষ্টি হয় না।

গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠকক্ষ খোলা থাকে সকাল সাতটা থেকে নটা এবং বিকেল

সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। রিডিং রুমে. ইংরেজী-বাংলা দেশী-বিদেশী মিলিয়ে চারটি দৈনিক, ত্রিশটি সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক এবং অন্যান্য বার্ষিক সংখ্যাগুলি রাখা হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য ছাড়াও যে-কোন পাঠক অনুমতি নিয়ে বই পড়তে পারেন।

গবেষণা বিভাগের নির্মাণ কাজ চলেছে। এখানে ধর্ম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাল সংগ্রহ আছে। বাংলা সাহিত্যের ওপরেও বহু পুরনো বই আছে। গবেষণাগার নির্মাণকাজ শেষ হলে তা উন্মুক্ত করা হবে। পুরনো পত্র-পত্রিকা স্থানাভাবের জন্যে রাখা হয় না।

এখানকার গ্রন্থাগার কর্মচারীর সংখ্যা কুড়িজন, তাঁদের অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকও আছেন। কেউ কেউ অবৈতনিক, কেউ বা কাজ করেন সামান্য অর্থের বিনিময়ে। কাজকর্মের ব্যাপারে এঁরা অতি তৎপর। বই নেবার জন্যে কোন পাঠক-পাঠিকাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, এমন সুষ্ঠু এঁদের ব্যবস্থা। সবচেয়ে মুগ্ধ করে এঁদের নিরলস আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার

এঁরা শুধু ভবনটিই সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলেননি, প্রবেশপথের গলিতে ফুলগাছ লাগিয়ে গেট বসিয়ে পরিবেশকে মনোরম করে তোলবার আয়োজন করেছেন। প্রবেশপথের বাঁদিকের দেওয়ালের গায়ে ইঁটের পাকা গাঁথুনিতে ছোট ছোট খোপ করা আছে। সেখানে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শহরের গদ্যময় পরিবেশের মধ্যেও এঁরা সুন্দর ও প্রসারিত দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন।

শুধু গ্রন্থাগারই নয়, দেহ ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশের অন্যান্য আয়োজনেরও অভাব নেই এখানে। শিমুলতলায় বর্তমানে সভ্যদের জন্যে একটি 'হলিডে হোম' আছে। সামান্য খরচায় যে-কোন সভ্য বা তাঁদের পরিবারবর্গ বিশ্রাম ও ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আদর্শে এখানে গড়ে উঠেছে অন্যান্য বিভাগ। যেমন,

খেলাধুলোর মধ্যে এখানকার জিমনাসিয়াম বিভাগের বক্সিং-এ শক্তি মজুমদার খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই সংস্থার বহু ফুটবল ও হকি খেলোয়াড় পরবর্তীকালে স্বনামধন্য হয়েছেন। যেমন, চুণী গোস্বামী, চঞ্চল সরকার, ডি চন্দ্র প্রভৃতি। অনেকে বাংলার প্রতিনিধিত্বও করেছেন। ইনডোর গেমের মধ্যে টেবিল টেনিস, ক্যারাম, তাস ও দাবা খেলায় নারী ও শিশুদেরও অবাধ প্রবেশাধিকার।

সাংস্কৃতিক বিভাগ গান, সাহিত্যসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

সমাজসেবা বিভাগ থেকে টীকা দান করা হয়। দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি সঙ্কট-কালে সাহায্যও করা হয়।

সভ্যদের দ্বারা প্রতি বছর নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি সর্বকিছু পরিচালনা করে থাকেন। প্রত্যেক বিভাগেরই আলাদা আলাদা সম্পাদক আছেন।

গ্রন্থাগারের প্রধান সমস্যা প্রসঙ্গে সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুনীল বসু জানালেন, জায়গার অভাবই এখানকার প্রধান সমস্যা। গ্রন্থাগারের নতুন সদস্য নেওয়া বন্ধ করে এ-সমস্যা সমাধানের কথা এঁরা চিন্তা করছেন। বর্তমানে সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে এখানকার মোট সদস্য-সংখ্যা তিন হাজার। অর্থনৈতিক সমস্যা এখানে গৌণ। তবে আর একতলা বাড়াতে এবং বিভিন্ন বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা করতে অন্তত আরো ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশন গত পাঁচ বছর কোন অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন না। বাড়ী তৈরী করতে শুধু কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিশ হাজার টাকা এবং কলকাতা করপোরেশন বিশ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন সাহায্য দেননি। জমি বাদে বাড়ী তৈরী করতে খরচ হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এখানকার আয়ের একমাত্র পথ সভ্যদের চাঁদা—বছরে ৩৫ হাজার টাকা এবং তা ক্রমবর্ধমান।

প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রীসৌরীন রায় বললেন, মহিলাদের জন্যে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বিভাগ খোলবার ইচ্ছে আছে। সেখানে সেলাই, গান, রান্না, দেহ-সজ্জা, পুষ্প-সজ্জা ইত্যাদি শেখানো হবে। মেয়েদের জন্যে বিশেষ খেলাধুলোরও ব্যবস্থা করা হবে। গবেষকদের জন্যে নির্মাণ করা হবে স্বতন্ত্র কক্ষ। শিশুদের জন্যে খেলাধুলোর আয়োজন বাড়ানো প্রয়োজন। শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও নাট্য বিভাগ খোলবারও পরিকল্পনা আছে।

বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট-এর মহান প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। এঁরা যে অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন তা দৃষ্টান্ত-স্থল এবং অনুকরণযোগ্য। বর্তমানে একতলার ঘরে জিমনাসিয়াম হয়ে থাকে এবং বা উন্মুক্ত স্থানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছোটদের জন্যে সি-আই-টি যদি রবীন্দ্রসরোবরে কিছুটা জায়গা বন্দোবস্ত করে দেন তো উপকার হয়। ছোট-বড় যুবক-বৃদ্ধ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যে এঁরা যে সর্বাঙ্গ সুন্দর স্বাস্থ্যকর আয়োজন ও পরিবেশমণ্ডল রচনা করছেন, তা নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি সুমহান বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

—সুশান্তকুমার মিত্র

মনের খবর

স্বপ্ন (১)

বর্ষা কাল। শ্রাবণের এক দিনের শেষের জমাট কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ আলোর নানা রংয়ের ছটা যেন বর্ষণক্লান্ত গোধূলিকে আরও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কমলাকান্ত বাড়ী ফিরে জানালার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাল্যবন্ধু সতীশ পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল—'এক মনে কার স্বপ্ন দেখছ?' কমলাকান্ত একটু যেন চমকে উঠেই বলল, 'বস, কারো স্বপ্ন দেখার দিন কি আর আছে। সে-দিন অনেক কাল পার হয়ে গেছে। এখন কেবল অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলির মধুর স্বপ্ন, এই আছে। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবারও আর কিছু নেই।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। গান্ধীজী দেখেছিলেন সবরমতি আশ্রমের স্বপ্ন, অরবিন্দ দেখেছিলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের স্বপ্ন, কত দেশপ্রেমিক যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছেন দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন, নিজ দেশের গৌরবময় দিনের স্বপ্ন। বর্তমানে মানুষ দেখছে মহাশূন্য আর নানা গ্রহ-উপগ্রহ জয়ের স্বপ্ন ইত্যাদি। মানুষের সেই কবেকার আদি কাল থেকে স্বপ্ন দেখার যেন আর শেষ নেই। কবি বলেন 'কেবলই স্বপন করিনু বপন' দেখা যাচ্ছে কোন বিষয়ের বা ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন রকম ইচ্ছা জড়িত কল্পনাকেই স্বপ্ন বলা হয়। ইস্কুলের পাঠ্য বইতে পড়েছিলাম এক ফেরিওয়ালার কথা। কাঁচের জিনিস নিয়ে ফেরি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় ছায়াতে জিরোতে বসে ভাবছিল—জিনিস ফেরি করে বিক্রি করে এসে তার টাকা হচ্ছে, সে দোকান দিল, বড় ব্যবসায়ী হল এবং কোটিপতি হয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠল। নবাবজাদীর সঙ্গে তার বিয়ে হল। একদিন রুষ্ট হয়ে নবাবজাদীকে লাথি মারল আর বাস্তবে সে লাথি গিয়ে লাগলো তার নিজের ফেরির ডালায়। ডালা উল্টে কাঁচের সব বাসন-কোসন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল, সেই সঙ্গে চূর্ণ হল তার কোটিপতি হবার স্বপ্নও। উদাহরণ বহু দেওয়া যায়। কিন্তু আর তার দরকার হবে না। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় আমরা সাধারণত যে-কোন কিছুটা অবাস্তব কল্পনাকেই স্বপ্ন বলি।

মানতে হবে এও এক ধরনের স্বপ্ন। মনোবিদ্যার ভাষায় এগুলিকে জাগর স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্ন, (ডে-ড্রিম) বলা হয়। নিছক কল্পনাবিলাসের সঙ্গে এই ধরনের দিবা স্বপ্নের কিছু কিছু তফাৎ আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় দিবা স্বপ্নের মধ্যে যেন বাস্তবের সম্ভাব্যতার কিছু রেশ থাকে। অনেক কিছু তথ্যকে আগে থেকে মেনে নিয়ে তারপর নিজের ইচ্ছার পূরণের জন্যে যে কল্পনা করা হয় তাকেই দিবাস্বপ্ন বলা হয়। নিছক কল্পনায় যেন অবস্থাটা আরও বেশী লাগামছাড়া যথেচ্ছ রচনা করা হয়। মূলত কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন এই দুই-ই কল্পনা। ইচ্ছা পূরণের জন্যে মনের রচনার ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্নের বেলায় কিছুটা বাস্তবের ছোঁয়া রেখে মন চলে, কেবল কল্পনা করবার সময় মনের যেন সব বাঁধ আরও আলগা হয়ে যায়। মনের রচনার বিস্তার তখন আরও অনেক বেড়ে যায়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে কেবল এই দিবাস্বপ্ন নিয়ে থাকলেই চলবে না—যাকে প্রকৃত স্বপ্ন দেখা বলা হয়, তার কথাও বলতে হবে। ঘুমের মধ্যে আমরা যা দেখি, শুনি, অনুভব করি, ইচ্ছা করি, প্রভৃতি মানস ক্রিয়াকেই স্বপ্ন বলা হয়। একে নিদ্রাবস্থার স্বপ্ন বা ঘুমে দেখা স্বপ্ন বলা যেতে পারে। সাধারণত আমরা স্বপ্ন কথাটার সঙ্গে দেখা কথাটা যুক্ত করি। আমরা 'স্বপ্ন দেখেছি' বলি। তার কারণ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন অধিকাংশ সময়ই ছবির মত রূপ নিয়ে দেখা দেয়। প্রায় সিনেমা দেখার মত অনেক দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু দেখা ছাড়াও নানা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিও স্বপ্নে অনুভব করা যায়। যেমন কথা শোনা যায়, গন্ধ পাওয়া যায়, স্বাদ পাওয়া যায়। স্পর্শ পাওয়া যায় ইত্যাদি আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারই প্রকাশ স্বপ্নে পাওয়া যায়। তবু মানতে হবে যে, স্বপ্নের মধ্যে দেখার অংশই বেশী থাকে। তা বলে করার অংশ কম থাকে এমন কথা বলা যায় না। যেমন এমন স্বপ্ন হয় যাতে কেবল কথা শোনা গেল, কিন্তু দেখা গেল না। অথবা কেবল ফুলের বা আতরের গন্ধ পাওয়া গেল কিছু দেখা গেল না—ইত্যাদি।

কতক স্বপ্ন দেখার পরে তার অর্থ বেশ যেন সহজেই বোঝা যায়। আবার এমন স্বপ্ন দেখা যায় যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারা যায় না। আমাদের খুব বেশী সংখ্যক স্বপ্নই এই না বুঝতে পারার শ্রেণীতে পড়ে। ফলে স্বপ্ন সম্বন্ধে একটা হেঁয়ালির বোধ মনে থেকে যায়। তাই বলে স্বপ্ন বোঝবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা আমাদের কম নয়। কোন যুগ থেকে যে মানুষ এই স্বপ্নের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করে আসছে তার ঠিকানা জানা নেই। যুগে যুগে মানুষ সাধ্যমত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে এসেছে। প্রধানত স্বপ্নকে সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন এই দু ভাগে ভাগ করে নিতে দেখা যায়। আবার অনেক স্বপ্ন আছে যেগুলিকে ভালও নয়, মন্দও নয় অর্থাৎ তাদের তেমন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হয় না। এইভাবেই আমাদের স্বপ্ন সম্বন্ধে বিচার চলে আসছে।

প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে ভোরের দেখা স্বপ্ন সত্য হয়। অর্থাৎ বাস্তবেও তাই ঘটে। কেউ কেউ নাকি স্বপ্নে মাদুলী পেয়েছেন। ওষুধ পেয়েছেন এমন কথাও শোনা যায়। দুঃস্বপ্ন দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন এমন লোকের অভাব নেই। স্বপ্নকে নিছক ঘুমে দেখা অর্থহীন ব্যাপার বলে বোধ হয় কোন কালেই সকলে মনে নি। স্বপ্নের কোন না কোন অর্থ আছে এমন একটা সংস্কার আমাদের মনে বহু যুগ ধরে চলে আসছে। বর্তমান কালেও যাদের আমরা আদিবাসী, নগ্ন বা প্রায় নগ্ন অসভ্য উপজাতি বলে থাকি তাদের মধ্যেও

স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক সংস্কার আছে। পূর্বেঙ্গ আসামের যে অংশ এখন মেঘালয় নামে পরিচিত, সেই মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের গারো জাতির মনের গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদি, সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টি কোণ থেকে জানবার জন্য যখন চেষ্টা করছিলাম তখন বারো তেরো বছর ধরে নানা সময়ে বহুদিন পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে দেখেছি, যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যেও স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা রকম বিশ্বাস, সংস্কার গড়ে উঠেছে। মনে পড়ে গেল একবার ঘুরতে ঘুরতে প্রায় দুপুর বেলা পাহাড়ের একখানে একটা গ্রামে মাদলের ও শিঙ্গার শব্দ হচ্ছে দূরে থেকে শুনতে পেয়ে সে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেলাম। এক পাহাড়ের উপর থেকে দেখলাম যে-পাহাড়ের দিক থেকে মাদলের শব্দ আসছে তার নীচে গা-বেয়ে একটা ছরা (ঝর্ণার জলের ধারা) বয়ে যাচ্ছে—তার এক পাশে বালুচর দেখা যায়। সে গ্রামে কিছু একটা উৎসব বা পুজো হচ্ছে, আর সেখানে গেলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে মনে করে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম। যখন ছরার জলের কাছে এলাম দেখি একটা শাদা সুতো দিয়ে ছরার অংশসহ গ্রামের দু দিকে যেন সীমা বন্ধনী টানা হয়েছে। সঙ্গে যে গারো লোকজন মালপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে চলেছিল তাদের সর্দার আমাকে সেই সুতোর সীমানার মধ্যে যেতে বারণ করল। কারণ জানতে চাইলে সে বলেছিল—সুতোর সীমানার মধ্যে ঢুকলে আর বেরুতে পারা যাবে না। ওদের কুসংস্কার মনে করে আমি ওদের সঙ্গে নিয়ে অল্পপাতোয়া ছরা পেরিয়ে গ্রামে পৌছলাম। একটু যেতেই চোখে পড়ল ওদের 'কামাল' (পুরোহিত) বন্য পাতা আর বাঁশের এক 'মোও' (দেবতা) বানিয়ে তাকে পুজো করছে। মূর্তি কিছু ছিল না—খাড়াভাবে বিশেষ গাছের ডাল (আখারুর ডাল) বালিতে পুঁতে দেবতার প্রতীক বানিয়ে তাতে পুজো দিচ্ছে। পুজোয় ফুল-বেলপাতা লাগে না। পচাই মদ, মুরগীর ডিম, মুরগীর সদ্য কাটা রক্ত, শুয়োরের রক্ত এই দিয়ে পুজো হচ্ছে। গ্রামের কিছু লোক সেখানে জড় হয়েছে। আমরা সেখানে যেতেই গ্রামের 'নকমা' (মোড়ল) এসে সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের পরিচয় এবং সেখানে আসার কারণ জানতে চাইল। তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম, তাদের সব নিয়ম-কানুন, পুজো পদ্ধতি জানতে এসেছি। পুজোটা দেখেই চলে যাবো। শুনে সে বলল, গ্রামের একজন একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। তাতে যে মারাং (পাপ) হয়েছে সেই জন্যেই মারাং মেত্তির পুজো দেওয়া হচ্ছে—শান্তির জন্য। তিন দিন তিন রাত্রি আমাদের সেই গ্রামেই ঐ সুতোর ঘেরা দেওয়া সীমানার মধ্যেই থাকতে হবে। বাইরে যাওয়া চলবে না। অন্যের গারোরা নিজেরাই আর যেতে রাজি হল না। আমাকেও বাধ্য হয়ে আটকা পড়তে হয়েছিল। সেই সূত্রে ওদের স্বপ্ন-বিশ্বাস, পুজো পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশ কিছু দেখা ও খবর পাওয়ার সুযোগও আমার হয়েছিল। এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বলবার কেবল এই আছে যে ওদের মধ্যে খারাপ স্বপ্ন দেখে যে বায়বহুল উপকরণে পুজো দিয়ে স্বপ্ন দেখার দোষ মোচন করা হয়, আমাদের সমাজে তেমন কিছু বর্তমানে আর দেখা যায় না। স্বপ্ন সম্বন্ধে ওরা কত বেশী বিশ্বাসী সেই টুকুর পরিচয় দিতেই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম।

নিজেদের আমরা সভ্য মনে করি, কিন্তু আমাদেরই মনের আনাচে-কানাচে কত সংস্কার, কত বিশ্বাস পড়ে আছে তার খবর আমরা নিজেরাই রাখি না। কিন্তু কাজের বেলায় নানা রকম রীতি পালন করে চলি। এই স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের নানা রকমের বিশ্বাস আছে। যেমন আগেই বলেছি ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। সেই সঙ্গে এও বিশ্বাস আছে যে স্বপ্ন যদি দশ কান হয় তবে আর তা ফলে না। তাই ভাল স্বপ্ন বলতে নেই, বলে ফেললেই তা বিফল হবে। আর একই কারণে দুঃস্বপ্ন দেখে সকালে মুখ না ধুয়েই, বেশ কয়েক জনের কাছে সে স্বপ্ন বলে দিলে আর সে স্বপ্ন বাস্তবে ফলবে না এই বিশ্বাসও আছে। যাঁরা ধর্মভীরু তাঁরা ইষ্টমন্ত্র হাজার দু হাজার বার জপ করে স্বপ্নের কুফল রোধ

... করেন। তাছাড়া যাঁরা ... তাঁরা মানত করেন, পূজো দেন, এমন কি তেমন তেমন ক্ষেত্রে শান্তি স্বস্ত্যয়নও করেন। ভাল স্বপ্ন দেখে কোন ভাল কাজে গেলে (যেমন মামলায় সুফলের আশায় কিছু করতে, পরীক্ষা দিতে গেলে, চাকুরীর চেষ্টা করতে গেলে) ভাল ফলের আশা নিশ্চয় হবে বলে মনে আশা হয়। তেমনি আবার খারাপ স্বপ্ন দেখে কাজে বেরুলে সে কাজ পণ্ড হবে এই শংকা মনে জাগে।

উপরোক্ত মনোভাব কেবল যে বর্তমান কালেই দেখা যায় তা নয়। সেকথা আগেও বলেছি। বিদেশের পুরোনো কাহিনীতে, আমাদের দেশের পুরাণ কাহিনী, ইতিহাসের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে পুরোনো কালের রাজাদের যুদ্ধযাত্রা, মৃগয়া প্রভৃতি শুভকাজের পূর্বে রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা রাজদরবারে পণ্ডিতরা ঠিক করে, তার শুভাশুভ বিচার করে, পরে শুভকাজে যাত্রা সম্বন্ধে ঠিক করা হতো। অশুভ স্বপ্নের ফল খণ্ডনের জন্যে যাগযজ্ঞ হোম ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা হতো। বিদেশেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই কারণের জন্য প্রচলিত ছিল। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। কিন্তু মানুষের মনের সংস্কার আজও লোপ হয়ে যায় নি। অবস্থা বিপাকে যাগযজ্ঞ না করতে পারলেও, সামান্য একটু পূজো দিয়ে বিপদমুক্ত হবার চেষ্টার অভাব একালেও নেই।

যে প্রশ্নটা মনে আসে সেটা হল—আদিবাসী অশিক্ষিত পার্বত্য বা তথাকথিত বনবাসীদের থেকে আরম্ভ করে আর অতি-আধুনিক উচ্চশিক্ষিত পর্যন্ত সব স্তরের মানুষই, অতীতের অজানা যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত স্বপ্ন নিয়ে এত মাথা ঘামাতে গেল কেন? কেনই বা স্বপ্নের ফলাফল সম্বন্ধে এতবেশী বিশ্বাসী? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। মানুষ বাইরের দিকে, দূরের দিকেই বোধ হয় প্রথম নজর বেশী দিয়েছিল। অতি আদিম অবস্থার কথা কল্পনা করা যায়, কিন্তু তার সত্য প্রমাণ পাবার উপায় নেই। তখনকার মানুষ কি ভাবতো, কি করে নিজের ভাবনা সম্বন্ধে কর্মে প্রবৃত্ত হত, তার কিছুই জানা নেই। মানব জাতির আদিম অবস্থার সঙ্গে যদি শিশুজীবনের কিছু মিল থাকা সম্ভব মনে করা হয়, অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক স্তরে, মানুষ শিশুর মতই অসহায় ছিল মনে করা যায় তবে বোধহয় খুব বেশী ভুল করা হবে না। আত্মরক্ষার জন্য একদিকে তার বাইরের শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা, পরে নিজের সন্তানকেও রক্ষা করার তাগিদে এবং বেঁচে থাকার জন্য, খাবার ও নিরাপদ থাকার জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টাতেই তার বস্তু-জগতের সঙ্গে ক্রমে পরিচয় বাড়তে থাকে, বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে। ক্রমে কার্য কারণ সম্পর্ক বুঝতে পারে এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও বের করবার চেষ্টা করে এসেছে এমন কথা কল্পনা করা যেতে পারে। ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তার পরিচয় বেশী নিবিড় হতে পেরেছে। এমন কি আকাশের মেঘ, তারা ইত্যাদির সঙ্গে প্রাকৃতিক ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বজ্রপাত, শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। কিন্তু নিজের মনের দিকে নজর দেবার মত মনের গঠন গড়ে উঠতে কত লক্ষ বছর কেটে গেছে তা বলা যায় না। ভয়, রাগ, ভালবাসা, মন্দলাগা এই নিয়েই তাদের বেশী সময় কেটেছে। ভালবাসাকে আমরা যে চোখে দেখি তাদের মধ্যে ঠিক তেমন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলে মনে করা যায় না। তার মানে এ নয় যে, তাদের মধ্যে ভালবাসা বলে কিছু ছিল না। প্রবল এক জৈবিক আকর্ষণ তাদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু মনের বিভিন্ন সূক্ষ্ম অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে তাদের চেতনা ছিল না—তা মেনে নিতে বাধে না। এদিক থেকে দেখতে গেলে মানুষের দৃষ্টি দূর থেকে ক্রমে নিজের মনের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে, বলা যায়, কিন্তু নিজের মনের মধ্যেই প্রথমাবস্থায় আবদ্ধ থাকে। একথা বলার মানে এ নয় যে, শিশু তার মনের গতি-প্রকৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকেই নজর দিতে ব্যস্ত থাকে। বরং শিশুর যখন যেদিকে ইচ্ছে যায় সেই দিকেই তা পাবার তাগিদ আসে। না পেলে তার কান্না, অসন্তোষ প্রকাশ পায়। কিন্তু শিশু সেই অবস্থায় নিজের ইচ্ছাকে দেখে বুঝে চলে তা বলা চলে না। বলা যায় শিশু তখন ইচ্ছার দাস। বাস্তবকে সে মানতে শেখে অনেক পরে, ঠেকে শেখে। কল্পনা করা যায় সেই অবস্থায় শিশুর স্বপ্নের মত আদি মানুষের স্বপ্ন তাদের খুশী বা তখনকার মত বিরক্তি জাগিয়েছে, কিন্তু তার বেশী আর কিছু বোঝবার সম্ভাবনা তাদের ছিল না। সেই অবস্থায় কিছু বিচার করে দেখবার মানসিক ক্ষমতাও তাদের ছিল না। আজকে যাদের আমরা আদিবাসী ইত্যাদি বলি, প্রকৃতপক্ষে তারাও সেই যে আদিম যুগের অবস্থা থেকে অনেক সভ্য, অনেক নিয়ম-কানুনের দ্বারা চালিত। তাদেরও নিজেদের ধর্ম আছে, রীতি আছে, নীতি আছে, নানা বিষয়ে নিজ নিজ বিশ্বাস আছে। আপনার আমার সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের বা রীতি-নীতির মিল হয়ত তেমন হবে না—তবু তাদের যে স্তরের 'অসভ্য' বলে আমরা, তথাকথিত সভ্যরা, তাদের মনে করি, তারা আদৌ তা নয়। তাদের মনের খবর নিয়ে আর আমাদের মনের খবর নিয়ে যদি তুলনা করে দেখা যায় তবে দেখা যাবে উল্লিখিত দুই স্তরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে অনেক বিষয় আমরাও ওদের সমগোত্রীয়। গারো ও অন্যান্য পার্বত্য এবং আদিবাসীদের স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে ধারণা তুলনা করে দেখে অনেক মিল পেয়েছি। পূর্বোল্লিখিত রাজ-দরবারের পণ্ডিতদের স্বপ্ন বিচারের ফলে যে অর্থ স্বপ্নের জানা গেছে, তার অনেকগুলি স্বপ্নাবস্থার অর্থ ঐ পার্বত্য আদিবাসীদের লব্ধ অর্থের এবং অধুনা মনঃসমীক্ষণের দ্বারা স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে যে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে, এদের মধ্যে বহু মিল দেখতে পাওয়া যায়। কেমন করে মানুষ সেই অশিক্ষিত অনুন্নত মনের অবস্থা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত স্বপ্নের অর্থ বোঝবার বিষয়ে এত কাছাকাছি ফলাফলের সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের স্বপ্ন বোঝবার পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। গারো ও অন্যান্য জাতিদের কাছে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারি নি। তাদের স্বপ্নব্যাখ্যাকারীদের কাছেও জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি 'আগে থেকে এই রকমই চলে আসছে'। অর্থাৎ সে তার পূর্ববর্তীদের কাছে থেকে জেনেছে, তার বেশী কিছু নয়। আমার ব্যক্তিগত একটা সন্দেহ রয়ে গেছে। স্বপ্নে যত রকম দৃশ্য বা ঘটনা ঘটতে দেখা যায়—সেই সব রকম ঘটনার অর্থ পূর্বসূরীর কাছে থেকে পাওয়া বা তা মনে রাখা সম্ভব নয়। সব 'কামালের' মেধাও সমান নয়, আর সকলে সমান শিক্ষাও পেতে পারে না, কারণ এই সব কৃত্য শেখবার কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত শিক্ষণের ব্যবস্থাও তাদের মধ্যে নেই। কিছুটা দেখে কিছুটা শুনে আর বাকীটা নিজের মনগড়া কিছু যোগ দিয়ে ওদের কাজ চলে। সুতরাং এই ব্যক্তিগত সীমা ও জাতিগত মানসিকতার প্রভাবে স্বপ্নের অর্থ ঠিক করার মধ্যে যদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাওয়া বিভিন্ন সমাজের স্তরের বিভিন্ন যুগের স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে কোনও মিল দেখতে পাওয়া যায় তবে বিস্মিত বোধ করতেই হয়। ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে স্বপ্ন বিশ্লেষণ না করেও একই সিদ্ধান্তে, অনেক ক্ষেত্রে, আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হল কি করে? মন কি কোন উপায়ে নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে সত্য জানতে পারে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা নেই, কতকগুলি সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে তার বেশী নয়।

—[illegible]চন্দ্র সিংহ
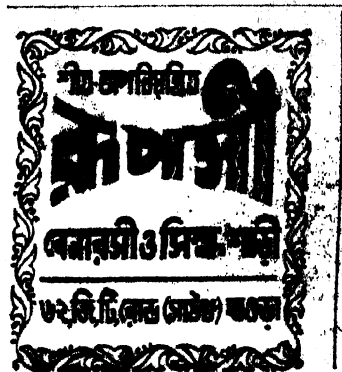
এই আমাদের দেশ

বাঁকুড়া—(৩)

প্রত্নসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি

সারা জেলার অবারিত প্রান্তরে, অরণ্যের আড়ালে, পাথরের গায়, অবজ্ঞায় উপেক্ষায় ভরা কয়েকটি শতাব্দী অতিক্রম করে আজও যেসব পুরাকীর্তি ভগ্ন জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে বাঁকুড়ায় সেগুলি নিঃসন্দেহে বঙ্গীয় স্থাপত্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ওড়িশি, দক্ষিণী, মোগল—সব স্থাপত্য-রীতিই সেদিন বাঙালী স্থপতি ও ভাস্কর-দের প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপন মনের মাধুরী ও ভাবভাবনা দিয়ে বাঙালি শিল্পীরা সেদিন যা গড়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে অনন্য, একান্তরূপে গৌড়ীয় স্থাপত্যশৈলী। ভেবে অবাক হতে হয় যে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী বাংলার এমন সব শিল্পীরা কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে কোন শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

একান্তভাবে ঐতিহাসিক এমন নিদর্শনের উল্লেখ করতে হলে প্রথমেই শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপির কথা বলতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও গুহালিপির সন্ধান মেলেনি। শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহা-লিপি পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজা সিংহবর্মনের পুত্র মহারাজা চন্দ্রবর্মন পুষ্করণার রাজা ছিলেন। বর্তমান বড়জোড়া থানায় যে পাখন্না গ্রাম, সম্ভবত সেই স্থানেই ছিল মহারাজা চন্দ্র-বর্মনের রাজ্য পুষ্করণা। পাখন্নায় উৎখননের ফলে যেসব পুরাকীর্তির জীর্ণোদ্ধার হয়েছে সেগুলি সম্ভবত পুষ্করণার বর্মন রাজাদের শাসনকালের। প্রত্নতাত্ত্বিক কারণে পাখন্না-জয়ন্তপুর, পাখন্না-প্রতাপপুর প্রভৃতি স্থানগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রানিবাঁধ থানার অন্তর্গত অম্বিকানগর গ্রামে প্রত্ন-তত্ত্ববিদরা খননকার্য চালিয়ে প্রায় প্রাগৈতি-হাসিক কালের বহু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছেন। পরবর্তীকালে ঐ গ্রামে অম্বিকা ও শিবের দুটি পাথরের মন্দির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবী অম্বিকা থেকেই অম্বিকানগর নাম, কিন্তু অম্বিকার আদি মন্দিরটির এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। তালডাংরা থানার হাড়মাসরা গ্রামেও বহু প্রাচীন সভ্যতার জীর্ণাবশেষের সন্ধান মিলেছে।

বিষ্ণুপুর রাজাদের দুর্গ আর একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি। দুর্গের চারদিকে আছে উঁচু মাটির প্রাচীর এবং প্রাচীরকে ঘিরে পরিখা। পাথর দরজা নামে খ্যাত দুর্গের লাল পাথরের দরজায় আছে তীরন্দাজ ও গোলন্দাজদের ব্যবহারের জন্য দুটি ফোকর। দরজার গায়ের পাথরের খিলানগুলি ভেঙ্গে পড়েছে। দুর্গটি অন্তত সাড়ে তিনশ বছরের পুরানো। দুর্গের পশ্চিমদিকে একটি চতুষ্কোণ ইটে গাঁথা ঘর দেখা যায় যার কোন দরজা জানালা নেই, কিন্তু সমগ্র উপরিভাগ উন্মুক্ত। জনশ্রুতি যে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের ওপর থেকে ঐ ঘরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত এবং অভুক্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বন্দীরা সেখানে মৃত্যু বরণ করত। ঘরটি গুমঘর নামে অভিহিত।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আছে বিখ্যাত দলমর্দন অথবা দলমাদল কামান। একদা শত্রুসন্ত্রাস দলমাদল কয়েক শতাব্দী আগে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। তবু ঢালাই লোহার ঐ বিশাল কামানটির গায় আজ পর্যন্ত মরচে ধরেনি। তেষট্টিটি লোহার আংটা জুড়ে দলমাদল কামান নির্মিত হয়। কামানটির দৈর্ঘ্য বারো ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এবং চোঙের ব্যাস সওয়া এগারো ইঞ্চি, শুধু মুখের ব্যাস সাড়ে এগারো ইঞ্চি। দলমাদলকে নিয়ে বিষ্ণুপুরে যে কত লোককাহিনী গড়ে উঠেছে তা বলে শেষ করা যায় না। মল্লরাজ গোপাল সিং-এর রাজত্বকালে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গিদের যখন হামলা শুরু হয় তখন বিষ্ণুপুর রাজ্যের ভগবান মদনমোহন স্বয়ং নাকি শত্রুদলমর্দন দলমাদল কামান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, ঠিক দলমাদলের অনুরূপ আর একটি কামান বিষ্ণুপুরের কোন হ্রদের নীচে লুকানো আছে।

দুর্গের চাতালে আরও চারটি ছোট কামান আছে। সেগুলিও ঢালাই লোহার এবং দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ফুট। কামানগুলির চোং ছয় ইঞ্চি থেকে প্রায় এক [illegible] কামানগুলির গায়ের সূক্ষ্ম কাজ [illegible] সব কাঁটার পদ্ম অলঙ্কৃত [illegible] কামানের মুখ বাঘের [illegible] কামানের দুটি [illegible] এখনও সোনা যায় [illegible] পরিখার কাছে যা [illegible] সন্ধান চাতালে [illegible] অনেক কামানের সন্ধান [illegible]

শহরের [illegible] রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় [illegible] রাজা দ্বিতীয় বীর সিংহের [illegible] ১৬৫৭-৭৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে [illegible]

মদনমোহন বিগ্রহ

দলমাদল
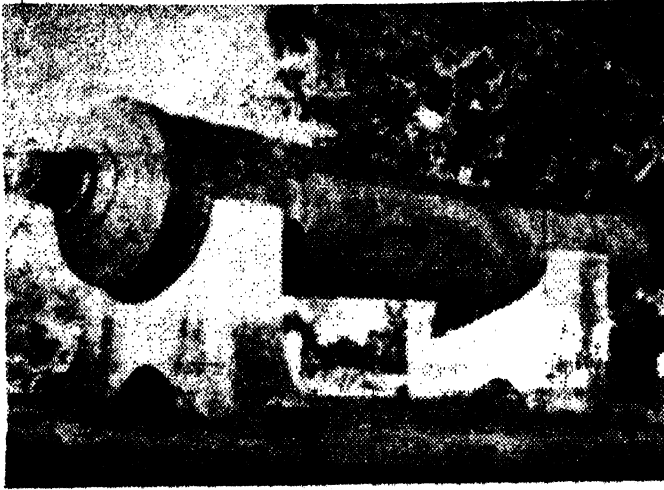
আশেপাশে ও অভ্যন্তরে বাঁধ নামে পরিচিত যে জলাশয়গুলি নির্মিত হয় সেগুলি নিঃসন্দেহে তিন শতাব্দীকাল পূর্বের নগর স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। লালবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, পোকাবাঁধ ও চৌখানবাঁধ নামে যে আটটি বাঁধ নির্মিত হয় তার মধ্যে চৌখান বাঁধ ভরাট হয়ে গেছে। বাঁধগুলি নির্মিত হয় ঢালু জায়গায় বাঁধ বেঁধে, বৃষ্টির জল আটকিয়ে। বাঁধগুলির সঙ্গে দুর্গের চারিদিকের পরিখার সংযোগ ছিল এবং দরকার হলেই বাঁধের জলে দুর্গের পরিখা পূর্ণ করে ফেলা হত। আজ অবশ্য এসবই কাহিনী এবং কল্পনার বিষয়। এই প্রসঙ্গে বড়জোড়া থানার শুভঙ্কর দাঁড়া ও খালের উল্লেখ করা যেতে পারে। মল্লরাজা গোপাল সিংহের শাসনকালে (১৭২০-৫৭) ঐ এলাকার মানুষদের জলকষ্ট দূর করতে, রাজার সভাসদ সুপরিচিত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাসের পরিকল্পনায় ঐ খাল কাটা হয়। ১৮৯৭ সালে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের সময় খালটির একবার সংস্কার হয়েছিল।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ডিহর গ্রামের ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরি ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবের মন্দির দুটি। মন্দির দুটির চূড়া ভেঙে পড়ায় সঠিক উচ্চতা জানা যায় না, তবে হয়ত তাদের উচ্চতা বিশ ফুট মতো ছিল। দুটি মন্দিরই পশ্চিমমুখী, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মন্দির দুটির নির্মাণকাল একাদশ শতাব্দী। অন্য মতে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। মন্দির দুটির প্রাঙ্গনে এখনও চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা বসে।

মল্লরাজাদের শাসনকালে বিষ্ণুপুরে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল মল্লেশ্বর মন্দির। মল্লরাজ বীর সিংহ ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের গায় ভুলক্রমে নির্মাণকাল ৯২৮ শকাব্দ লেখা হয়েছে যা আসলে হবে ৯২৮ মল্লাব্দ। শকাব্দ ও মল্লাব্দর মধ্যে ৬৯২ বছরের ব্যবধান এবং সেই হিসাবে মন্দিরটির নির্মাণ কাল ১৫৪০ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৬২২ খৃষ্টাব্দ, যা মল্লরাজ বীর সিংহের শাসনকালের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। ল্যাটেরাইট পাথরের এই শিব মন্দিরটির বয়স সাড়ে তিনশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। শহর অঞ্চলের মন্দির হল—মল্লেশ্বর, মদনমোহন, মুরলীমোহন ও মদন গোপালের মন্দির; দুর্গ এলাকার মন্দির হল—শ্যামরায়, জোড়বাংলা, লালজি ও রাধাশ্যামের মন্দির; লালবাঁধ জোটের অন্তর্ভুক্ত হল—কালাচাঁদ গোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব ও নন্দলালের মন্দির। বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদের কাছে জোড়বাংলার অনুরূপ আর একটি মন্দির এবং ছোটখাটো অনুল্লেখ্য আরও কয়েকটি মন্দির আছে। শহর অঞ্চলের মদনমোহনের মন্দিরের কাছে আছে একটি নামবিহীন, তারিখবিহীন জরাজীর্ণ মন্দির।

লালবাঁধ অঞ্চলের প্রাচীনতম মন্দির হল কালাচাঁদ গোবিন্দের মন্দির। মল্লরাজ বীর হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ। ঐ এলাকার সবচেয়ে অর্বাচীন মন্দির হল রাধাশ্যামের মন্দির, মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দিরই এক রত্ন অর্থাৎ একচূড়ার মন্দির। বাঁকানো কার্নিসযুক্ত দেওয়ালের উপর ঈষৎ ঢালু ছাদ এবং তার মধ্যে থেকে উদ্গত একটি চূড়া। এই রীতির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল মদনগোপালের পঞ্চরত্ন পাথরের মন্দির, পঞ্চরত্ন অর্থাৎ পাঁচটি চূড়ার মন্দির। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন মল্লরাজ দ্বিতীয় বীরসিংহের মহিষী শিরোমণি অথবা চূড়ামণি দেবী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ; ঐ বছরই তিনি মুরলীমোহনের মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরের গায়ে মহিষীর নাম চূড়ামণি দেবী লিখিত আছে। একরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে কালাচাঁদের মন্দির প্রাচীনতম। মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কালাচাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি এখন বিগ্রহহীন।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে মোটামুটি চারটি ধাঁচে ভাগ করা হয়। প্রথমভাগে পড়ে চতুষ্কোণ একচূড়ার মন্দির, মল্লেশ্বর শিবের মন্দির যার উদাহরণ। দ্বিতীয়ভাগে পড়ে একরত্ন শৈলীর চালা মন্দির, যার চতুষ্কোণ গঠন ও বাঁকানো কার্নিস আর ঈষৎ ঢালু ছাদ গ্রাম বাংলার কুটিরের অনুরূপ; চালা মন্দিরের মধ্যস্থল থেকে উদ্গত হয়েছে একটি চূড়া। এই ধাঁচের ইটের মন্দিরের

কুতুবশাহী মসজিদ (পাণ্ডুয়া)

শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মদনমোহনের মন্দির, পাথরের মন্দিরের উদাহরণ জোড়বাংলা ও রাধাশ্যামের মন্দির। পঞ্চরত্ন অর্থাৎ পাঁচ চূড়ার শ্রেষ্ঠ পাথরের মন্দির মদনগোপালের মন্দির, ইটের শ্রেষ্ঠ পঞ্চরত্ন মন্দির হল শ্যামরায়ের মন্দির। চতুর্থ ধাঁচের মন্দির হল জোড়বাংলা মন্দির, যাতে পাশাপাশি দুটি চালা মন্দিরের মাঝখান থেকে উদগত হয়েছে একটি চূড়া। চালা মন্দির ও জোড়বাংলা সম্পূর্ণরূপে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যশৈলী। মন্দির নির্মিত হওয়ার আগে ঐসব দেবদেবীর হয়ত অনুরূপ কুটিরেই অবস্থান ছিল। আর বাঙালি তার দেবদেবীকে একান্তরূপে আপনার, ঘরের মানুষরূপে ভাবতে অভ্যস্ত। সে কারণেও বাংলার মন্দির বাংলার কুটির থেকে ভিন্নতর হতে পারেনি।

বিষ্ণুপুরের আর এক দ্রষ্টব্য বিষয় হল রাসমঞ্চ। চতুষ্কোণ এই ভবনটি আনুমানিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ বীর হাম্বীর কর্তৃক নির্মিত হয়। রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুরের সব রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এখানে প্রদর্শিত হত। ভবনটির ছাদ পিরামিড আকৃতির। সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি ভবনটি নির্মিত হয় যে কারণে গাঁথুনি মজবুত হতে পারেনি। রাসমঞ্চের একাংশ ভেঙে পড়েছে এবং সমগ্র ভবনটির এমন অবস্থা যে সম্পূর্ণ পুনর্গঠন ছাড়া তার সংস্কার সম্ভব নয়।

বিষ্ণুপুরে যিনি আসবেন, বিষ্ণুপুরের গৌরবময় অতীত জানার জন্য তাঁকে অবশ্যই বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ ভবন পরিদর্শনে যেতে হবে। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র থেকে মল্লরাজাদের শাসনকালের পাথর ও পোড়ামাটির কাজ সেখানে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া আছে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও প্রাচীন বাংলার পুঁথিপত্র আর নানা কুটিরশিল্পের নিদর্শন।

তালডাংরা থানার অন্তর্গত দেউলভিড়্যা গ্রামে যে কালো ল্যাটেরাইট পাথরের একটি পূর্বমুখি মন্দির আছে সেটি বাঁকুড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভবত প্রাচীনতম স্থাপত্যকীর্তি। মন্দিরটি সম্ভবত জৈনদের উপাসনাস্থল ছিল। বাঁকুড়ার জনজীবনে জৈন ধর্মের প্রভাব সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীতে শেষ হয়। সেই হিসাবে দেউলভিড়্যার মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীর হওয়া অসম্ভব নয়। ধর্ম অপেক্ষা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের কারণে মন্দিরটি গুরুত্বপূর্ণ। রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত পরেশনাথেও একদা সমৃদ্ধ জৈন বিহার ছিল। সেখানে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু জৈন ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। পরেশনাথ থেকে দু মাইল পূর্বে অবস্থিত অম্বিকানগর গ্রামের অম্বিকা ও শিবের দুটি পাথরের মন্দিরের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। সম্ভবত ঐ মন্দির দুটি প্রথমে জৈনদেরই উপাসনা গৃহ ছিল এবং পরবর্তীকালে সেখানে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা হয়।

বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন যদিও বাঁকুড়া শহরে কিন্তু ঐ অমূল্য উত্তরাধিকার থেকে প্রায় বঞ্চিত। রামপুর পাড়ায় অবস্থিত রঘুনাথ জিউর দালান মন্দির ছাড়া সেখানে পুরাকীর্তি নেই বললেই হয়। মন্দিরটি ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বলে দাবি করা হলেও সেটি অত প্রাচীন নাও হতে পারে। এছাড়া পাঠকপাড়ায় আছে মাধবলালের মন্দির। ইটের তৈরি ঐ পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পঁচিশ ফুট উঁচু। মন্দিরে স্থাপিত অষ্ট ধাতুর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহটি বেশ বড় ও সুন্দর। মন্দিরের সামনের দেওয়ালের পোড়ামাটির অলংকরণটিও মনোরম। রাধাকৃষ্ণের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি দুই শতাব্দীকালের প্রাচীন হতে পারে। শহরে একটি বড় ও পুরানো মসজিদ আছে তবে সন তারিখ উল্লিখিত না থাকায় তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

কিন্তু বাঁকুড়া শহরের দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীরে যে এক্তেশ্বর শিবের মন্দির আছে সেটি অবশ্যই বাঁকুড়ার বিশেষ সম্পদ। পশ্চিমমুখি, পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু এই পাথরের মন্দিরটি জেলার সুপ্রাচীন ও বৃহৎ মন্দিরগুলির অন্যতম। এক্তেশ্বর শিব অথবা মণিমহাদেবের এই মন্দিরটি ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত হলেও পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় ইট ও বালি পাথর কাজে লাগানো হয়। মন্দিরের চূড়াটি কোন সময়ে ভেঙে পড়ায় সেটিকে নতুন করে তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে চুন-বালি দিয়ে মন্দিরের যেসব সংস্কার হয় তারও চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে। আরও পরে মন্দিরের সম্মুখভাগে কয়েকটি ইটের গাঁথুনির তোরণ নির্মিত হয়। মন্দিরের উপাস্য শিবলিঙ্গটি স্বয়ম্ভু বলে দাবি করা হয়। অনেকে বলেন, কোন সুদূর অতীতকালে আদিনাথ পৃথিবী বিদীর্ণ করে এখানে আবির্ভূত হন; পরবর্তীকালে মল্লরাজাদের কেউ ঐ মন্দিরটি নির্মাণ করে সেবাবিধেয়ের নিয়মিত ব্যবস্থা করেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি বেদগ্রন্থে বর্ণিত একপাদেশ্বর, এবং একপাদেশ্বর থেকেই এক্তেশ্বর শব্দের উদ্ভব। এই মন্দিরকে ঘিরে নানা লোককাহিনী প্রচলিত হয়েছে। এখনও এখানে চৈত্র সংক্রান্তির সময় বড় গাজনের মেলা বসে।

বাঁকুড়া মহকুমার তথা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর মন্দির হল ওন্দা থানার অন্তর্গত বহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির। এটি দ্বারকেশ্বর নদীর ডান পারে অবস্থিত একটি ইটের মন্দির। বেগলার সাহেব এই মন্দিরটির বর্ণনাকালে বলেছেন, এটি বাংলার বৃহত্তম না হলেও সুন্দরতম ইটের মন্দির। ইটের উপর পলেস্তারার কাজ এবং ইট ও পলেস্তারা উভয়ের উপরেই সুন্দর টেরাকোটার অলংকরণ। মন্দিরে সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহের

অন্দরে একটি নগ্ন জৈন মূর্তি স্থাপিত আছে। তাতে অনেকে মনে করেন, সুচনায় মন্দিরটি হয়ত জৈনদের উপাসনাস্থল ছিল। কিন্তু বেগলার সাহেব বলেছেন এটি প্রথম থেকেই শৈবমন্দির। ত্রিশ ফুট উঁচু এই রেখ দেউলটির উপর ওড়িশার শিল্প রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরটির নির্মাণ কাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এটি দশম একাদশ শতাব্দীর হওয়াও অসম্ভব নয়।

দ্বারকেশ্বর নদীর দুই তীরই যেন একদা শৈবদের দখলে ছিল। সেখানে পর পর গড়ে উঠেছে ডিহর, ধারাপাট, বহুলাড়া, সোনাতাপন ও এক্তেশ্বরের মন্দির। নদীর বাম পারে ডিহর, ধারাপাট ও এক্তেশ্বর আর অপর পারে সোনাতাপন ও বহুলাড়া।

ছাতনা আর একটি পুরাকীর্তির জন্য খ্যাত পল্লী। একদা ছাতিম গাছের প্রাচুর্য ছিল সেখানে, তাই থেকে ছাতনা নামের উদ্ভব। ছাতনায় আছে বড়ু চণ্ডীদাস কবির স্মৃতি বিজড়িত বাসুলির মন্দির যা অবশ্য এখন ভগ্নস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঁকুড়া-খাতরা সড়কে আটবাইচন্ডী নামে যে ছোট গ্রামটি আছে সেখানেই এক পাথরের মন্দিরে দেবী বাসুলির বিগ্রহ স্থাপিত ছিল, পরে তা ছাতনার মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়।

ছাতনার বোলপুখুরিয়া নামক পুষ্করিণীটির উল্লেখ না করলে ছাতনাবাসীরা অবশ্যই ক্ষুণ্ন হবেন। গভীর এই পুষ্করিণীর জল কখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় না। সুপ্রাচীন এই পুষ্করিণীটি সম্ভবত ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাড়ে পাঁচশ বছরেরও অধিক প্রাচীন এই পুষ্করিণীকে নিয়ে বহু কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। ছাতনার প্রধান মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা হাম্মির উত্তর রাজা এবং প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবত ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ।

রায়পুর থানার শিখরগড়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত ঐ স্থানটিতে পৌঁছাতে হলে বাঁকুড়ায় দ্বারকেশ্বর, তালডাংরায় জয়খাল, সিমলাপালে সিলাই ও রায়পুরে কাঁসাই নদী অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু এখানকার ভগ্ন দুর্গ শিখরগড় ও তার দক্ষিণদিকে অবস্থিত শিখরসায়র না দেখলে কোন ইতিহাস প্রেমীর বাঁকুড়া দর্শন সম্পূর্ণ হবে না। এক চৌহান বংশীয় রাজদূত এই অঞ্চল দখল করে শিখর রাজা নাম নিয়ে রাজ্য শাসন শুরু করেন। শিখরগড় দুর্গ ও তার অভ্যন্তরে মন্দির, বাসগৃহ সবই শিখর রাজাদের সৃষ্টি। শিখরসায়রের পশ্চিম পারে আছে শিখর রাজাদের সেনাপতি মিরন শাহর কবর, যিনি বর্গিহানা রুখতে গিয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। শিখর রাজাও নাকি বর্গিদের কাছে পরাস্ত হয়ে সপরিবারে শখর সায়রে ডুবে আত্মহত্যা করেন।
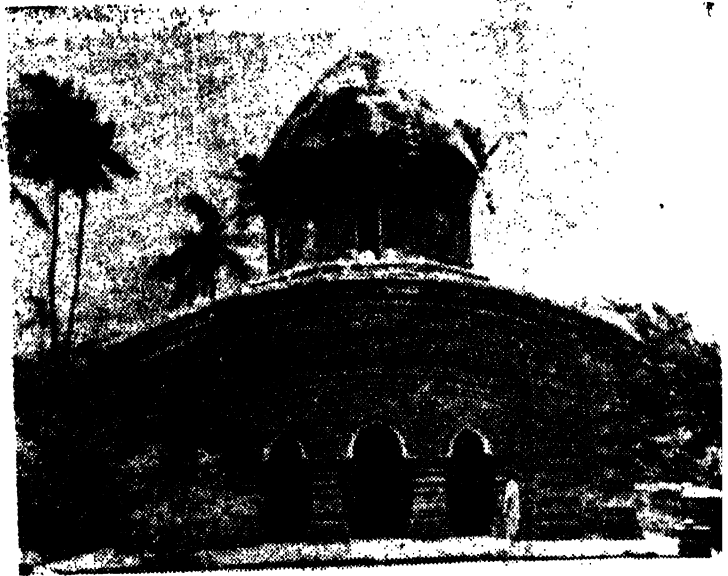
রামচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)

রায়পুরে শাঁখারিয়া নামে আর এক পুষ্করিণীর পারে আছে মহামায়ার মন্দির।

লোকদেবতা

বাঁকুড়ার লোকদেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় বাঁকুড়া রায়। ইন্দাসে আছে ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের মন্দির। দক্ষিণমুখী এই দালান মন্দিরটির স্থাপত্য সৌকর্য অনুল্লেখ্য, তবে যে বড় কালো পাথরের উপর ধর্মরাজের কূর্মমূর্তিটি স্থাপিত সেটি লক্ষণীয়। বাঁকুড়া রায়ের মন্দিরের পুরোহিত ছুতোর সম্প্রদায়ের লোক, তবে পণ্ডিত উপাধি।

কোতুলপুর থানার দেশড়া গ্রামে আছে মনসা দেবীর মন্দির। জাগ্রত দেবী বলে তার বিশেষ খ্যাতি। পাত্রসায়ের থানার দেউলপাড়া গ্রামে যে দেউলেশ্বর শিব আছেন তাঁর খ্যাতি হাঁপানি, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিরাময়কারী দেবতারূপে। দেউলেশ্বর শিবের মন্দিরে পুজো দিলে বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভ হয় বলেও জনশ্রুতি আছে।

বাগদি ও বাউরি সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা মনসা দেবীর। মনসা দেবী সন্তুষ্ট থাকলে তারা সর্প দংশন থেকে রক্ষা পাবে, এই বিশ্বাসেই তারা মনসা পুজা করে থাকে। পুজার পুরোহিত অব্রাহ্মণ এবং ছাগল, ভেড়া, শুয়োর প্রভৃতি পশু পুজায় উৎসর্গ করা হয়। চতুর্ভুজা মনসা দেবীর পুজার ঘটা সবচেয়ে বেশি হয় শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে।

ভাদু সংক্রান্তিতে ভাদু পুজা বাউরি, বাগদিদের আর এক জনপ্রিয় ধর্মোৎসব। ভাদু পুজার সুচনার ইতিহাস সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। একটি

পাথর দরজা

মতে ভাদু ছিলেন পঁচেত রাজার কুমারী কন্যা, প্রজাদের কল্যাণে যিনি আত্মোৎসর্গ করেন। অপর মতে ভাদু ছিলেন কাশী-পুরের (পুরুলিয়া) রাজকন্যা এবং তাঁর স্মৃতি অম্লান রাখতে কাশীপুরের রাজা স্বয়ং শতাব্দীকাল পূর্বে এক বাৎসরিক মেলা প্রবর্তন করেন। প্রথম মেলায় মৃত রাজকন্যার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয় এবং সেই সুন্দরী রাজকন্যাকে ধর্মভীরু প্রজারা দেবী-রূপে গ্রহণ করে। বর্তমানে ভাদুপুজো এক লোক উৎসব। ভাদ্র মাসের শেষ রাত্রে ভাদু পূজার সূচনা হয় এবং তিন দিন তিন রাত্রি অবিশ্রান্ত পান ও ভোজোৎসবের পর ভাদুর মূর্তি মিছিল করে নিয়ে গিয়ে পুকুরে বিসর্জন দিয়ে উৎসবের শেষ হয়। সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তর মতে ভাদু পুজো মানভূম থেকে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে সম্প্রতিকালে প্রবর্তিত হলেও আদিবাসীদের মধ্যে এই পুজো বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে মনসা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের শ্রদ্ধা-ভক্তি আদায়ে সমর্থ হলেও ভাদু এখনও বোধহয় তাঁর স্বভাব-নম্রতার জন্য বাগদি বাউরিদের দেবী হয়েই সন্তুষ্ট আছেন।

ধর্মরাজের পুজোরও ব্যাপক প্রচলন আছে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে। ধর্মরাজ জেলার বিভিন্ন স্থানে নানা নামে পরিচিত, তার মধ্যে বিষ্ণুপুরের শাঁখারিপাড়ার বুদ্ধক অথবা বুড়ো ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সর্বাধিক। বুদ্ধক দেবের মন্দিরের পুরোহিত কর্মকার সম্প্রদায়ের লোক, তিনি ধর্মপণ্ডিত নামে পরিচিত। ইন্দাসের ধর্মরাজ বাঁকুড়া রায়ের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। কতুলপুর থানার বৈতালেও বাঁকুড়া রায়ের পুজো প্রচলিত আছে। ইন্দাস থানার মঙ্গল-পুরের রূপনারায়ণ, বালসির নবজীবন, কতুলপুরের কালাচাঁদ বা বংশীধর ও পারসার পঞ্চানন, জয়পুর থানার আধাকুলির আধারকুলি বা গোপালপুরের কাঁকড়া-বিছা সবই ধর্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই সব ঠাকুরেরই পুরোহিত অব্রাহ্মণ কামার, ছুতোর নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু উচ্চ বর্ণের লোকেরাও এই সব দেবতার কাছে পুজো দেয়। ধর্মপুজোর ইতিহাস সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না, যদিও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বহু যুক্তির অবতারণা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এটি বৌদ্ধধর্মের পুজো অর্চনারই একটি বিকৃত রূপ। কিন্তু আদি-বাসীদের মধ্যে এই পুজো এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং এর পুজো পদ্ধতি, উৎসব রীতি এমনই ভিন্নতর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে যারা এই পুজো করে তারা অন্য কারও কাছ থেকে এটি গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় না। এটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবমুক্ত বলে এ পুজোর ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকার নেই। কিন্তু যেখানে ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের আসনটি দখল করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানেই ধর্ম-রাজ শিব অথবা বিষ্ণুর অবতার রূপান্তরিত হয়েছেন।

রামচন্দ্রের মন্দিরের গায়ে কারুকাজ (গুপ্তিপাড়া)
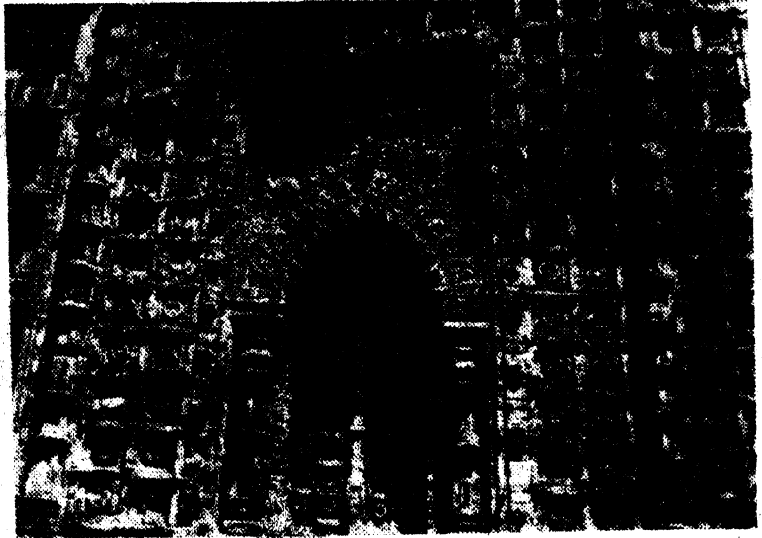
চড়ক পুজোও একদা ব্যাপকভাবে জন-প্রিয় ছিল বাগদি, বাউরি, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে 'ইণ্ডিয়ান মেথডিস্ট টাইমস' পত্রিকায় 'ফ্রম দি হার্ট অফ বেঙ্গল—হুক সুইঙ্গিং এণ্ড আদার ডাইভারসানস' শীর্ষক নিবন্ধে তৎকালে বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত পিঠে আংটা বিঁধিয়ে চড়ক গাছে পাক খাওয়ার ভয়ংকর নিষ্ঠুর রীতির বর্ণনা আছে। বলা হয়েছে যে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই রীতি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসীরা এখনও শরীরের বিভিন্ন স্থান ক্ষত-বিক্ষত করে চড়কগাছে পাক খায়। ইংরেজ বর্ণনা-কারী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, পিঠে আংটা বেঁধানোর সময় ভক্তরা সামান্যই আর্তনাদ করে বা রক্তপাতও খুব বেশি হয় না। আর চড়কগাছে উঠে যখন তারা প্রচণ্ড গতিতে পাক খেতে শুরু করে তখনও তাদের কোন রকম ক্লিষ্ট বা ভয়ার্ত দেখায় না। পাক খেতে খেতে তারা এক হাতে কোঁচড় থেকে ফুল ছড়ায়, আর এক হাত মুখে লাগিয়ে তালি বাজানোর মত করে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকে।

পিঠে আংটা বেঁধানো, [illegible] প্রভৃতি ব্যাপারগুলো ১৮৬৫ সাল থেকে আইনত নিষিদ্ধ হলেও [illegible] বাসীদের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে [illegible] সাঁওতালি [illegible] উৎসব। সাঁওতালদের মধ্যে [illegible] ধর্মীয় উৎসব প্রচলিত তার সঙ্গে কৃষির নিকট সম্পর্ক। জোহরাই, বাহা, হেরো-সিম, হোরো প্রভৃতি উৎসবগুলি হলকর্ষণ ও ফসল ফলার বিভিন্ন সময়ে পালিত হয়। শুধু সকৃৎ হল ক্রীড়া উৎসব যখন তাদের মধ্যে তীর ছোড়া বর্শা ছোড়ার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা হয়, আর যাত্রা হল গ্রামের বৃদ্ধ মুরুব্বিদের সম্মান জানানোর উৎসব। সে উৎসবে বৃদ্ধদের চেয়ারে বসে চরকি পাক খাওয়ানো হয়। তারপর পান ভোজনে তৃপ্ত করা হয় তাদের।

শিক্ষার অগ্রগতি ও সমাজজীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-গুলির বৈচিত্র্য লোপ পাচ্ছে। আর কয়েক দশক পর হয়তো সাঁওতাল বা বাউরির ঘরের শিক্ষিত ছেলেরাই ঐতিহাসিক কৌতূহল নিয়ে মা-ঠাকুরমার কাছে শুনতে চাইবে তাদের পিতৃপুরুষদের আমলে প্রচলিত উৎসবগুলির কথা। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই, বাবধানের প্রাচীর ভাঙাই বড় কথা। তাতে যদি সব ধর্ম ও সমাজ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় ত যাক। আজকের ব্যবধান ও বৈচিত্র্য অতীতের ইতিহাসে পরিণত হলে কারও কোন ক্ষতি নেই।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

পরের সপ্তাহে

বাঁকুড়া : অগ্রগতি ও সম্ভাবনা

দিন কালের হিসেব

বাজেট বিচার—(১)

আমরা যখন আইন পড়তাম তখন হাটকোর্টের ক্লাস নিতেন একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী। তিনি আজ আর বেঁচে নেই, সুতরাং নাম না হয় নাই করলাম। ক্লাসে তিনি বার বার বলতেনঃ তোমার যদি কিছু বলবার না থাকে তবে অপর পক্ষকে শুধু গালাগালি দাও—জাস্ট অ্যাবিউজ দি আদার পার্টি। চুপ করে থেক না। উকিলের কাজই মক্কেলের হয়ে ওকালতি করা—মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করা। বলবার কিছু নাই বা থাকল!

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শোনা একটা ঘটনাও মনে পড়ল। ১৯২২ সাল বা (দক্ষিণ) আয়ারল্যান্ডের সাধারণতন্ত্র (আইরিশ রিপাবলিক) গঠনের আগের কথা। উত্তর আয়ারল্যান্ডের কোন কাউন্টির এক জনসভায় ইউনাইটেড কিংডম বা যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তৃতা করছেন। দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড থেকে এক দল যুবক এসেছে বক্তৃতায় পদে পদে বাধাদান করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতা বেশ খানিকক্ষণ চললেও ঐ যুবক দল বাধাদান বা প্রতিবাদের কোনো কারণই খুঁজে পেল না। কারণ মন্ত্রীমহাশয় দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোন পরোক্ষ ইঙ্গিতও করেন নি। শেষপর্যন্ত অধৈর্য হয়ে যুবক দলের নেতা লাফিয়ে উঠল : মন্ত্রীমহাশয়, আমার দেশকে অপমান করার সাহস আপনার হল কি করে?

—আপনার দেশকে আমি কখন অপমান করলাম? মন্ত্রীমশায় বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করেন, আপনার দেশের নামোচ্চারণও ত আমি করি নি।

—সেইটেই কি অপমান নয়— ইস্‌নট দ্যাট নট অ্যান ইনসাল্ট?—প্রতিপ্রশ্ন করে দলের নেতাটি।

আরও মনে পড়ল বিরোধী দল সম্পর্কে লর্ড র‍্যানডল্‌ফ চার্চিলের সুবিখ্যাত উক্তি যার অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ বিরোধী দলের কাজ [illegible] বিরোধিতা করা, কোন কিছু প্রস্তাব করা নয়। এবং এর উদ্দেশ্য হল সরকারী দলকে গদীচ্যুত করে ঐ গদী অধিকার করা। বিরোধী দলের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারকে সমর্থন করা গীর্জার বেদী থেকে নাস্তিকতা প্রচারের মতই।

এসব মনে পড়ল কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট বিচার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে। এঁরা সবাই মোটামুটি পাঁয়তারা কষছিলেন বাজেট প্রস্তাবকে আক্রমণের জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রস্তাবের সরাসরি বিরুদ্ধতা করবার বিশেষ কিছু নেই। প্রথমে কেন্দ্রীয় বাজেটের কথা ধরলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত আয়করে হাত দেওয়া হয় নি কিন্তু প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি (ওয়ান চু কমিটি) এবং রাজ কমিটির সুপারিশ কিছুটা কার্যকর করা হয়েছে, বাজেট ঘাটতি মেটাবার জন্যে অন্তঃশুল্ক ও আমদানী শুল্কের ওপর প্রধানত নির্ভর করা হলেও সর্বসাধারণের ভোগ্যপণ্যকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, শরণার্থী ত্রাণের জন্যে সব 'লেভী' উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, করের দিকে কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে, আর চীনের দুর্বোধ্য মতিগতি এবং থেকে থেকে পাকিস্তানী হুমকীর জন্যে প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকেও শিথিল করা হয় নি। এ অবস্থায় সমালোচনার ক্ষেত্র আর রইল কোথায়? অবশ্য কোন অবস্থা-ব্যবস্থাই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, কারণ সবই নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। তবে যে-রন্ধ্রপথে আক্রমণ করা হবে ঠিক করা হয়েছিল তা যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে অসুবিধে হয় না কি? দেখা যায়, কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনায় উদ্যত বিভিন্ন বিরোধী দলের এই রকম অসুবিধেই হয়েছে—তাঁদের নতুন করে খুঁজতে হয়েছে সমালোচনার সূত্র। অবশ্য এই [illegible] [illegible] এবং [illegible]—যথাক্রমে এই দুই ধারণা ও বিকল্পপ্রসূত সূত্র সব সময়েই হাতের কাছে রয়েছে, এবং মোটামুটি এদের অবলম্বন করেই সমালোচকগণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বাজেটে কোন করবৃদ্ধিরই প্রস্তাব করা হয়নি, তবে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্যে যে লেভী এবং আন্তঃরাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে যে কর বসানো হয়েছিল তাদের স্থায়ী (!) রূপ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রেল বাজেটে কিন্তু এই লেভী উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সমালোচনার একটি সূত্র হল এই রূপান্তকরণ-ব্যবস্থা। এ ছাড়াও অন্যান্য সূত্রও অবশ্য আছে এবং থাকবেই। তবে এ প্রসঙ্গে আসছি পরে। এখন কেন্দ্রীয় বাজেটের পরিচয় থেকেই শুরু করা যাক।

কেন্দ্রীয় বাজেট

এবারের বা ১৯৭৩-৭৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্বন্ধে সাধারণ পথচারী, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সকলেরই মোটামুটি আতঙ্ক ছিল। কোন কোন সংবাদপত্রও অনুমানভিত্তিক বা 'বিশেষ সূত্রে সংগৃহীত' বিভিন্ন প্রকার গুজব ছড়াতে কসুর করে নি—যেমন প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান বা ওয়ান চু কমিটির এবং রাজ কমিটির সুপারিশ পুরোপুরি কার্যকর করা হবে, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা, অন্তঃশুল্কের জাল আরও ব্যাপকভাবে ফেলা হবে যার ফলে সুই কাতলা থেকে চুনোপুঁটি পর্যন্ত সকলেই আটকা পড়বে, আমদানী শুল্কের কবল থেকে বইপত্রও বাদ যাবে না, বাংলাদেশ আগত শরণার্থীদের জন্যে প্রবর্তিত লেভী বজায়ই থাকবে তবে হয়ত নতুন নামে ডাকা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের ভার লোকের বহনক্ষমতা, সামর্থ্যকে অতিক্রম

করবে—এই ছিল সংবাদপত্র মহলের মোটা-মুটি ঐক্যমত। এর ফলে বিভিন্ন ভোগ্য-পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছিল, আর 'বাজেটের আগেই কিনে ফেলুন' ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচারও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য কোন কোন সংবাদপত্র কিছুটা উপকারও করেছিল। যেমন, প্রতি বছরের মত কলকাতায় ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়া থেকেই কয়েক বিশেষ ব্রাণ্ডের সিগারেট উধাও হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু হঠাৎ এক সংবাদপত্রে 'এবার আর সিগারেট ও তামাকের ওপর অন্তঃশুল্ক বাড়বে না বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে'—এই খবর বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সব সিগারেট অজানা আস্তানা থেকে যথাস্থানে এসে হাজির হয়, এবং বাজেটের দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট দামে বিক্রি হতে থাকে। তারপর অবশ্য বাজেট ঘোষণার পর আবার শুরু হয় লুকোচুরির খেলা। নিশ্চয়ই সিগারেটের অনেক পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ী ঐ সংবাদপত্রে বা সংবাদ-দাতাকে খুব আপ্যায়নের নজরে দেখে নি।

১৯৭৩-৭৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে অনেক আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। অপরপক্ষে অনেক আশাও পূরিত হয় নি। মোট কথা বাজেট সম্বন্ধে যাকে বলা হয় ইন্টেলিজেন্স গেস তা করা মোটেই সম্ভব হয় নি। বাজেট যে বৃহত্তর আকারের হবে, ঘাটতির পরিমাণও যে বাড়বে আর দরুন কর বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না—তা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু যা বোঝা যায় নি তা হল কার ঘাড়ে কত ভার চাপবে। তবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কেউই বিশেষ রেহাই পাবে না। ফলে আয়বণ্টন আরও বৈষম্যমূলক হবে এবং গরীবী হটাও-এর কার্যক্রমের পশ্চাৎগতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে।

তা ঠিক ঘটে নি। বাজেটে যে কর-প্রস্তাব করা হয়েছে তা থেকে গরীবী হটাও কার্যক্রমের সম্মুখগতি বা পশ্চাৎ-গতি কোনটাই বিশেষ অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং কংগ্রেস দলেরই অন্যতম তরুণতুর্কী শ্রীকৃষ্ণকান্তের প্রতিধ্বনি করে বলা যায় : এ হল অবস্থা বজায় রাখার বাজেট—এ স্ট্যাটাস কুয়ো বাজেট, যা অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি কোন কিছুই নির্দেশ করে না।

বাজেটের আকার

কেন্দ্রীয় বাজেটের আকার যে বৃহত্তর হবে তা বোঝা গিয়েছিল তিনটি কারণে। প্রথমত, ১৯৫০-৫১ সালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু থেকে বাজেটের আকার স্বভাবতই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ-স্বরূপ, বিগত দশকের গোড়ার দিকে—রাজস্ব খাতে আয় ছিল ১২০০-১৩০০ কোটি টাকা। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৫০০০ কোটি টাকার ওপরে। অর্থাৎ করের মাধ্যমেই ঐ পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া আছে ঋণ, ঘাটতি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ। দ্বিতীয়ত, পর পর দু বছর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খরার জন্যে ব্যাপক ত্রাণ কার্যেরও ব্যবস্থা করতে হয়েছে এবং ১৯৭১-৭২ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ছায়া ১৯৭২-৭৩ পেরিয়ে ১৯৭৩-৭৪-এ পড়তে বাধ্য। তৃতীয়ত, ১৯৭৩-৭৪ সাল চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছর বলে এই বছরে পরিকল্পনার সব অসমাপ্ত কাজ যথাসম্ভব সমাপ্ত করবার প্রচেষ্টা করতেই হবে। এর ওপরও আছে ক্রমবর্ধমান নিয়োগহীনতার জন্যে ব্যাপক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা।

এ সব দিকে দৃষ্টি রেখেই আগামী বছরের বাজেটে রাজস্ব খাতে—অর্থাৎ কর-রাজস্ব থেকে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৭,৭৫২ কোটি টাকা আর মূলধনী খাতে—অর্থাৎ ঋণ ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে—২৮৭৪ কোটি টাকা। তুলনামূলক-ভাবে বর্তমান (১৯৭২-৭৩) সালের বাজেটে এই দুই খাতে থেকে ব্যয়ের পরিমাণ [illegible] ২২৪ কোটি টাকা এবং ২[illegible] পরে সংশোধিত হিসেবে এই দুই অঙ্কই বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৯৯ কোটি এবং ৩২৮৯ কোটি টাকা। বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল বাংলা-দেশের মুক্তিসংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে এবং খরাত্রাণে রাজ্যগুলোকে ৯১০ কোটি টাকা অর্থসাহায্যসহ বিপুল ব্যয়। এই রকম কোন আকস্মিক ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না অনুমান করে ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্যে মূলধনী খাতে ব্যয় সংশোধিত হিসেবের কিছু কমই ধরা হয়েছে।

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ও সরকারী আয়-ব্যয় :

এখানে হয়ত উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় বাজেটের আকার আয়ের দিক থেকে না দেখে ব্যয়ের দিক থেকেই প্রথমে দেখা হচ্ছে কেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এর কারণ সরকারী আয়-ব্যয়ের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য। প্রাইভেট ফিনান্স বা ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে আয় বুঝে ব্যয়-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে পরে ঐ পরিমাণ অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, যতটা কাটা কাপড় পাওয়া গেছে সেই অনুসারে কোর্তা-কামিজের সাইজ ঠিক করা হয় না, আগে কোর্তা-কামিজের সাইজ ঠিক করে পরে প্রয়োজনীয় কাপড় সংগ্রহের প্রচেষ্টায় বেরোন হয়।

মোট ঘাটতির পরিমাণ :

আগামী বছরের বাজেটে বর্তমান কর-হারে রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ ধরা

হয়েছে ৪৮৩১ কোটি টাকায় এবং ব্যয় ৪৭৫২ কোটি টাকায়। সুতরাং কর বৃদ্ধি না করলেও উদ্বৃত্ত থাকত ৭৯ কোটি টাকার মত। অপর দিকে কিন্তু প্রাপ্তির চেয়ে অনুমিত ব্যয় অনেক বেশী হওয়ার জন্যে মূলধনী খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াত ৪১৪ কোটি টাকা। এই ঘাটতি থেকে রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত বাদ দিলে মোট ঘাটতি হত (৪১৪—৭৯=) ৩৩৫ কোটি টাকা। এর ওপরে আছে বর্তমান বছরের বিপুল ঘাটতি—৫৫০ কোটি টাকা। সুতরাং করবৃদ্ধি ছাড়া উপায় ছিল না।

মোট করবৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা থেকে ২৯৩ কোটি টাকার মত পাওয়া যাবে। আয়কর, অন্তঃশুল্ক ইত্যাদি বণ্টনযোগ্য কররাজস্ব বলে এই টাকার ভাগ রাজ্যগুলোকেও দিতে হবে। ধরা হয়েছে, রাজ্যগুলোর ভাগে পড়বে ৪৩ কোটি টাকা। সুতরাং কেন্দ্রের হাতে থাকবে (২৯৩—৪৩=) ২৫০ কোটি টাকা। মোট ঘাটতি ৩৩৫ থেকে ২৫০ কোটি টাকা বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘাটতি ৮৫ কোটি টাকায় রাখা যাবে বলে আশা করা হয়েছে। যদি যায় তবে রাজনীতি মতাদর্শ ইত্যাদির কথা ছেড়ে দিলে এর চেয়ে ভাল বাজেট আর হয় না—এত সামান্য কর বৃদ্ধি করে এত কম ঘাটতির ব্যবস্থা অনেক দিনই করা যায় নি। কিন্তু যাবে কিনা সন্দেহ। অন্তত বেতন কমিশনের রিপোর্ট বেরুলেই যে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য অর্থমন্ত্রী স্বয়ং এ-বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

বাজেটে উপরি-বর্ণিত আয়-ব্যয় এবং ঘাটতির অবস্থা চট করে বোঝবার জন্যে নীচের ছকটি দেওয়া হল।

১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেট
(হিসেব কোটি টাকায়)

ক। রাজস্ব খাত	
১। আয়	৪৮৩১
২। ব্যয়	৪৭৫২
উদ্বৃত্ত(+)	৭৯
খ। মূলধনী খাত	
১। প্রাপ্তি	২৪৬০
২। ব্যয়	২৮৭৪
ঘাটতি (—)	৪১৪
গ। মোট ঘাটতি	(—) ৩৩৫
ঘ। করবৃদ্ধির ফল	(+) ২৫০...
শেষ মোট ঘাটতি	(—) ৮৫

কেন্দ্রীয় বাজেটের বিচার করতে এই সংখ্যায় এইখানেই ইতি দিলাম। বিচার অবশ্য ঠিক করি নি, বর্ণনাই করেছি। বিচার করব পরের সংখ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করব যাঁরা প্রথম ধাক্কায় ঠিক হালে পানি না পেয়ে অন্যভাবে বাইবার যে প্রচেষ্টা করেছেন, তা কতদূর সমর্থনীয়।

এখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বাজেটের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করা যাক।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

একই দিনে—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে— দুই রাজ্য সরকারের বাজেট বেরিয়েছিল—পশ্চিমবঙ্গের ও তামিলনাড়ুর। তামিলনাড়ুর বাজেটে মোট ৪৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে দুটি অস্থায়ী করকে নতুন জীবনদান সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে অনুমান করা হয়েছে। উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি কেন্দ্র যে অর্থসাহায্য ও অর্থবণ্টন ব্যাপারে তামিলনাড়ুর প্রতি অবিচার করে চলেছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করা হয়েছে তা ঠিক না বলে অর্থবণ্টন ব্যাপারে নতুন নীতি প্রবর্তনের দাবী করেছেন। দুজনেরই প্রাথমিক দৃষ্টি বর্তমানে যষ্ঠ ফিনান্স কমিশন যে রাজস্ব বণ্টন, অর্থসাহায্যের নীতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের কাজ করছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অবশ্য চূড়ান্ত লক্ষ্য বোধহয় আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়-ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবী করা। শ্রীকরুণানিধি সুস্পষ্ট ভাষায় এই দাবী রাখলেও শ্রীশঙ্কর ঘোষের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। যে কোন রাজ্য সরকারের বাজেটের বিচার করতে হলে পশ্চাৎপট হিসেবে আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার কিছুটা বিশ্লেষণ অপরিহার্য। সে কাজ অবশ্য পরের সংখ্যার জন্যে মুলতুবী রেখে শুধু আগামী বছরের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণই দেব। তবে একথা বলা দরকার যে, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়-ব্যবস্থা নামেই যুক্তরাষ্ট্রীয়। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক। এই ব্যবস্থা ঠিক গৃহীত নীতি 'প্ল্যানিং ফ্রম বটম' বা নীচের থেকে পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আয়-ব্যয় :

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে মোট প্রায় ১৫-৫ কোটি টাকা ঘাটতি হবে বলে ধরা হয়েছে। অপর দিকে রাজস্ববহির্ভূত ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হবে ৭ লক্ষ টাকার কম। সুতরাং সব পাওনা আদায় হলে শেষ অপূরিত ফাঁক ঐ ৭ লক্ষ টাকাই থেকে যাবে। এর মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ব্যয়ের দরুন এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে সুদ হিসেবে পাওনা।

১৯৭৩-৭৪ সালে মূলধনী খাতে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা, কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে ঋণ সংগ্রহের আশা করা হয়েছে ১৮৮ কোটি টাকা। এটা ঠিক সুস্থ সরকারী আয়-ব্যয় নীতির পরিচায়ক বলে মনে হয় না।

শ্রীশঙ্কর ঘোষ আগামী বছরের বাজেটকে 'অশ্রুবিহীন' বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ দুটি অস্থায়ী লেভীকে স্থায়ী করা ছাড়া কোন নতুন কর ধার্যেরই প্রস্তাব করা হয় নি, আর পুরোনো ক্ষতের মত পুরোনো করও অধিকাংশ সময় বিশেষ পীড়াদায়ক মনে হয় না। তবে অশ্রুবিহীনতাই কি সুস্থতার একমাত্র লক্ষণ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আগামী বছরের বাজেটের বিচার করতে হবে, এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের মত তা করব পরবর্তী সংখ্যায়।

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

(১৪)

প্রথম বিকেলে স্টেশানে গেছিলাম।

বহুদিন মাস্টারমশাই, গাঙ্গুলিবাবু, সাহাবাবুদের সঙ্গে দেখা হয় না। একটু গল্প গুজব করা গেল।

বিকেলের স্টেশান একটা বেড়াবার জায়গা। শেষ-বিকেলের প্যাসেঞ্জার এসে প্লাটফর্মে দাঁড়ায় — লোক ওঠে-নামে, ফেরিওয়ালার গলার স্বরে সরব হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্যে নির্জন প্লাটফর্ম। ফুল-ফুল স্কার্ট পরে, ফুল-ফুল কাপড়ের টুপী পরে মিসেস কার্ণি তাঁর স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ফুটফুটে পুতুলের মত হাত নেড়ে নেড়ে অনর্গল কথা বল্লেন।

আলুর চপ ও শিঙাড়া ভাজার গন্ধ আসে, ভাঁড়ের চায়ের সোঁদা সোঁদা গন্ধ তার সঙ্গে মিশে যায়।

শৈলেনের সঙ্গে দেখা হল। ওর আজ ডিউটি নেই। প্যান্টের উপর একটা পাঞ্জাব পরেছে, তার উপর একটা খয়েরী র‍্যাপার চাপিয়েছে।

স্টেশন ঘরের সামনের বেঞ্চে বসে সিগারেট খাচ্ছিল শৈলেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন আসুন দাদা। আপনাকে অনেকদিন দেখি না।

আমি হেসে বললাম, দেখতে চাও না, তাই দেখো না।

ও বলল, দেখতে চাই বলেই দেখতে পাই না।

শৈলেন আমাকে একটু একা পেয়েই বলল, আমার এই সাদামাটা লাইফের এক দারুণ চ্যাপটারের মধ্যে দিয়ে পাস করছি দাদা। এখন রাজধানী এক্সপ্রেসের মত এই সময়টাকে সাঁ সাঁ করে নির্বিঘ্নে পাস করিয়ে দিতে পারলেই হয়। আপনার কি মনে হয়? কোনো খারাপ লোক কি লাইফ থেকে আমার সুখের ফিস-প্লেট সরিয়ে নেবে?

আমি ওর কথার ধরন দেখে হেসে ফেললাম।

ও বোকা বোকা মুখ করে আমার দিকে তাকাল।

প্রেমে পড়লে সব লোকই বোকা হয়ে যায়, এবং সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সে-যে বোকা-বোকা ভাব করে তা সে নিজেও তখন বুঝতে পারে এবং বুঝতে পেরে যতই নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করতে চায়, ততই সেই চেষ্টার বোকামিটা বেশী করে চোখে পড়ে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, ও আমাকে জোর করে প্লাটফর্মের এক কোণায় টেনে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ র‍্যাপারের মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে একটা মেটে-রঙা খাম বের করেই ছবিটা আমাকে দেখাল।

বিকেলের সোনার আলোয় নয়নতারাকে দেখলাম।

কালোর মধ্যে খুব মিষ্টি বুদ্ধিমতী মুখ, রীতিমত ভাল ফিগার। নয়নতারার ছবির মুখ দেখে কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না যে সেই চিঠি ওর নিজের লেখা। কেন জানি না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না।

আমি শুধোলাম, এ ছবি তোমাকে কি নয়নতারাই পাঠিয়েছে?

শৈলেন বলল, না। তাহলে ত হতই। যখন এখানে ছিল তখনই ওর সম্বন্ধর জন্যে ওর গুরুজনেরা ডজনখানেক এমন পাসপোর্ট সাইজের ছবি করে পাঠিয়েছিল। তখন ত আর তারা জানতো না যে, এ-জন্মের মত নয়নতারার সম্বন্ধ আমার সঙ্গেই হয়ে আছে। একেই বলে নির্বন্ধ।

জানেন দাদা, জীবনে এই একটি পরের দ্রব্য না বলে নিয়েছি। ছবিটা ওর কাকীমার বাড়ি থেকে হাতিয়ে এনেছি। লোকে ত বলেই, নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার, কি বলেন?

আমি বললাম, তাই ত।

শৈলেন বলল, কি বলব দাদা, এই ছবিটা বুকের কাছে থাকলে আমার শীত লাগে না। আমি শীতের রাত্রে খালি গায়ে এই ছবি বুকে করে তামাম লাপরা-হেসালও কংকায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারি।

পরক্ষণেই শৈলেন বলল, আপনি আমার পাগলামি দেখে হাসছেন, না? আমি খুব এমোশানাল, না?

একটু চুপ করে থেকে বললাম, শুধু তুমি কেন? সমস্ত মানুষই কম-বেশী এমোশানাল। তবে তোমার মত সরল মানুষদের এমোশন বেশী। যারা ঘা-খাওয়া লোক, বা যারা জীবনের আঁকা-বাঁকা পথে চলতে চলতে তাদের মনটাকে অন্য রকম করে ফেলেছে তাদের এমোশন কম। আমরা সকলেই বোধ হয় অনেক পরত ভাবাবেগ নিয়ে জন্মাই, বড় হই, হয়ত সেটাই স্বাভাবিক। তারপর এই জীবনের ছায়াময় রুক্ষ পথে চলতে চলতে বাড়তি পোশাকের মত এক এক করে এমোশানের এক এক পরতকে পথে ফেলে যেতে থাকি। আমার তোমাকে দেখে মনে হয় শৈলেন যে, তুমি নিজে এখনও কাউকে কোনো দুঃখ দাও নি, এবং অন্য কেউও তোমার সুন্দর সরল মনটাকে বিদ্ধ করে নি। এরকম মন নিয়ে যদি চিরদিন বাঁচতে পারো, তবে বুঝবে, কিছু একটা করলে।

এটা কি একটা কিছু-করা হল দাদা? মানুষের মন, আমার মন, আপনার মন ত নৌকোর পালের মতই—হাওয়া লাগলেই ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে, হাওয়া না লাগলেই চুপসে যায়, কুঁকড়ে ওঠে। এতে আমার বিশেষত্ব কি?

—আছে বিশেষত্ব। তোমার আমার চারপাশের লোকদের যদি তেমন করে লক্ষ্য কর, ত দেখবে যে, তাদের বেশীর ভাগের মনই স্যানফোরাইজড। তাদের মনে কোনো সংকোচন প্রসারণ নেই। তাদের মনের পাল যেমন ছিল তেমনিই থাকে, হাওয়া লাগলেও ফোলে না, দোলে না, হাওয়া না লাগলেও চুপসে যায় না, কুঁকড়ে ওঠে না। তারা তাদের মনকে জীবনের সঙ্গে কন্ডিশানড করে নিয়েছে। এয়ার-কন্ডিশনড ঘরের মত। সেখানে শীতে-গ্রীষ্মে একই তাপ।

তারা কি সুখী হয় দাদা? শৈলেন বলল। তারা কি অমন করে সুখী হতে পারে?

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, সুখের ত কোনো বিশেষ চেহারা নেই শৈলেন। প্রত্যেকের সুখ আলাদা আলাদা—আলাদা রকম। আসলে আমাকে যদি পুরোও ত আমি বলব, সুখের নিজস্ব কোনো চেহারাই নেই, সুখ যে-কোনো তরল পদার্থের মত—যে মানুষের মনের যেমন আয়তন, যেমন পরিধি, যেমন ঘনতা, সুখ ঠিক সেই আকার ধারণ করে। কাজেই যারা এমো-শনকে জীবন থেকে বাড়তি পোশাকের মত ফেলে দিয়েছে তারা তাদের মত সুখী, আবার তুমিও তোমার মত সুখী। মনে হয়, জীবনে সুখ বলতে কে কি মনে করে তার উপরই সব কিছু নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা সকলেই সুখী এবং সকলেই দুঃখী।

আমরা দুজনেই ট্রেনটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

[illegible] সামনের শালের জঙ্গল আমাদের [illegible] পাখিদের কলকাকলীতে ভরে গেছিল। [illegible] মানুষের গলার নানারকম স্বর ছাপিয়ে সেই একটানা কলরোল, দূরের নদীর স্রোতের মত আমাদের কানে এসে লাগছিল। আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলাম। আমি এবং শৈলেন। চুপ করে নিজেদের, প্রত্যেকের বুকের ভিতরে যে-পাখিরা এই শীতের সন্ধ্যেবেলায় ডাকে, তাদের ক্ষীণ শীতার্ত স্বর শুনছিলাম।

শেষ-বিকেলের প্যাসেঞ্জার প্লাটফর্ম ছেড়ে ধীরে ধীরে একসময় চলে গেল।

শৈলেন কখন যে চলে গেছিল, যাবার সময় নিশ্চয়ই বলে গেছিল, হয়ত নমস্কার জানিয়েও গেছিল, আমার মনে নেই।

পিছনের পথ দিয়ে যখন বাড়িতে এসে উঠলাম ছোট গেট খুলে, তখন সবে অন্ধকার হয়েছে। মুর্গীর-ঘর কাঠ-রাখার ঘরের পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ রমার গলা শুনলাম বাড়ির ভিতর থেকে।

প্রথমে বিশ্বাস হল না।

তারপর বাড়ির পাশে আসতেই দেখি বাড়ির সামনে একটা ঘন বেগুনী রঙা মার্সিডিস গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটায় সাদা কাপড়ের সীট কভার লাগানো।

বসবার ঘরের আলো জ্বলছিল। ওরা গোল হয়ে বসেছিল। রমা, সীতেশ, সীতেশের স্ত্রী ডলি এবং আর একজন মহিলা।

আমি ঘরে ঢুকতেই সীতেশ আমাকে আপ্যায়ন জানিয়ে বলল, এই যে! অতিথিরা কখন এসে বসে আছে আর গৃহস্বামীর পাত্তা নেই। আমরা তোমার বিনা অনুমতিতেই কফি-টফি খাচ্ছি। আশা করি তাড়িয়ে দেবে না। আমরা কালই লাঞ্চের পর চলে যাব।

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রমা বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই যে আমার বান্ধবী মাধুরী সেন। মিস্টার সেন, মানে ওঁর স্বামী গাণ্ডার এণ্ড [illegible] কোম্পানীতে আছেন—হি ইজ ভেরী হাই-আপ দেয়ার।

সীতেশের স্ত্রী ডলিই প্রথমে আমার স্বাস্থ্য [illegible]-সুখোল, বলল, তারপর? শরীর এখন কেমন? শুনলাম এখন একেবারে সুস্থ—নর্মাল লাইফ লিড করছেন—তাই নর্মাল লাইফ যাতে পুরোপুরি নর্মাল হয় তাই জন্যেই রমাকে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। কি? খুশী ত? বলে রমার দিকে চকিতে তাকাল।

এরকম পরিবেশে আমি চিরদিনই বোকা হয়ে যাই, মুখে কথা জোগায় না। আমি তাই জবাব দিলাম না কোনো।

বললাম, আপনারা বসুন, আমি বাবুর্চিকে খবর পাঠাই, দোকানেও পাঠাতে হবে একবার মালীকে। পাঁচ মিনিট। আমি এক্ষুনি আসছি।

সীতেশ বলল, বাব্বাঃ দায়ে পড়ে বেশ সংসারী হয়েছিস ত।

ওদের উচ্চগ্রামের কথা বাজছিল কানে। ভাঁড়ারঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম।

মিসেস সেন, যাঁর নাম মাধুরী, তিনি বললেন, তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম তা কিন্তু ভেঙে গেল ভাই।

সীতেশ চিরদিনই সপ্রতিভ, সীতেশ কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ভেঙে গেল মানে কি, কল্পনার তুলনায় ভাল লাগল, না খারাপ লাগল?

মাধুরী বলেন, তা বলব কেন? মানুষটিকে যেমন ভেবেছিলাম তেমন তিনি নন।

আমি ফিরে এসে ওদের সঙ্গে বসলাম।

রমা খুব সেজে-গুজে আছে। দেখে ভালই লাগছে। মেয়েরা সেজে না-থাকলেই আমার খারাপ লাগে, তবে আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা নিয়ে মাথা ঘামানো রমা বহুদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। তবু, যেন ও আমার স্ত্রী নয়, ও যেন কোনো স্বল্প-পরিচিত দূরের কোনো মহিলা তেমনি ভাবেই ও আমার সামনে বসেছিল।

রমা নিরুত্তাপ গলায় কিছু বলতে হয় তাই বলল, তুমি বেশ মোটা হয়ে গেছ। আর মোটা হলে আনকুথ দেখাবে।

আমি জবাব দিলাম না।

সীতেশ আমার দিকে তাকিয়েছিল। আলোর মধ্যে বসে সীতেশের দিকে চেয়ে আমার মনে হল স্যাংচুয়ারীর মধ্যে, যেখানে কোনোরকম শিকার করাই বারণ, সেখানে আমার সঙ্গে হঠাৎ কোনো দাঁতাল শুয়োরের দেখা হয়ে গেছে। আমাকে বিনা প্রতিবাদে নিরস্ত্র অবস্থায় শুয়োরের [illegible] সব সহ্য করতে হচ্ছে: অথচ কিছুই করার নেই।

সীতেশ বলল, তারপর? তুই এখানে কি মধু পেয়েছিস রে? প্রফেশান কি ছেড়ে দিবি? ভাল হয়ে গিয়েও তোর কোলকাতা যাবার নামটি নেই?

রমা হঠাৎ বলল, ও-ও তোমাকে বলা হয় নি, মিস্টার ঘোষ হাইকোর্টে এলি-ভেটেড হয়েছেন—হাইকোর্টের জাজ হয়ে [illegible]।

[illegible] বলল, যেন [illegible] হচ্ছে সব খবর

ওর নখদর্পণে, যেন ওই-ই গত কয়েক বছর ধরে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার।

তারপর বলল, এখন তুমি ফিরলে তোমার প্র্যাকটিস আরো ভাল হবে। কারণ হাবুল রায় ছাড়া তোমার লেভেলে আর কোনো কমপিটিটর রইল না তোমার। তুমি ফী বাড়াবে না?

আমি জবাব দিলাম না। এসব কথার জবাব হয় না।

সীতেশের স্ত্রী বলল, রমা বলেছে, আপনি ফিরে গেলেই ক্যালকাটা ক্লাবে একটা দারুণ পার্টি দেবে। ফীসটা না হয় সেই দিন থেকেই বাড়াবেন। কত মোহর করবেন?

আমার ঠাস করে একটা চড় লাগাতে ইচ্ছা করল মহিলার ফোলা ফোলা ফর্সা গালে। কিন্তু তবুও চুপ করেই রইলাম।

সীতেশ কথা ঘুরিয়ে বলল, বাইরেটা এখন কি যে প্লেজেন্ট তা কি বলব। মনে আছে ডলি, গতবার যখন কন্টিনেন্ট থেকে ফিরছিলাম, আমি আর তুমি, তখন আজকের দিনে, গত বছরের ঠিক এই দিনে, এই সময় প্যান-এ্যামের ফ্লাইট ধরছি। ওঃ হোয়াট আ ওয়াণ্ডার-ফুল টাইম উই হ্যাড—না, ডার্লিং?

পরক্ষণেই সীতেশ তার ডার্লিং-এর অপেক্ষা না করেই আমাকে বলল, এখানে সোডা পাওয়া যাবে? বোতলটা বের করি?

আমি বললাম, না। সোডা পাওয়া যায় না।
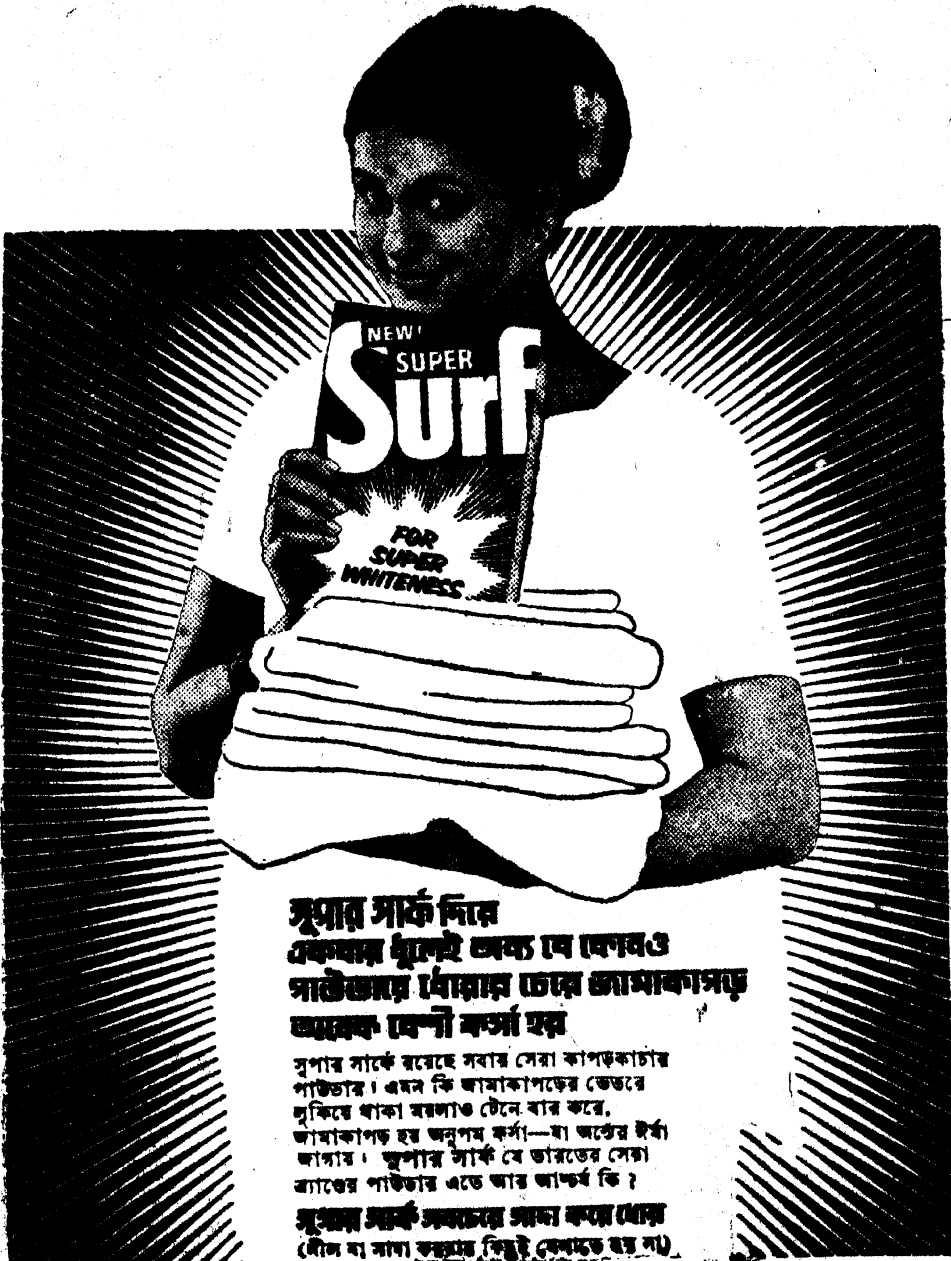
কি হরিবল জায়গা। তুই কি করে এখানে আছিস বল ত একা একা? তোর ঐ কি চামা না কামা, তার মোড় থেকে এই খাড়ি অবধি এটা কি একটা রাস্তা? মাই ফুট।

আমি বললাম, হুইস্কী জল দিয়েই খেতে হবে। জল ত রয়েছে টেবলে। তেষ্টা কি জোর পেয়েছে?

সীতেশ বাহাদুরীর হাসি হেসে বলল, তা সানডাউন যখন হয়ে গেছে, একটা সানডাউনারের সময় ত হয়েই গেছে। বলেই উঠে গিয়ে হুইস্কীর বোতল এনে জলের সঙ্গে মিশিয়ে পর পর দুটো বড় হুইস্কী খেল। কুইক ওয়ান্স্‌ন। তারপর বলল, একটু বেড়িয়ে আসি। আই উইল গো ফর আ স্ট্রল। কে যাবে আমার সঙ্গে?

রমা বলল, পাঁচ বছরের আদুরে মেয়ের মত, আমি যাব।

রমার দিকে তাকিয়ে মিসেস সেন বললেন, আমার খুব টায়ার্ড লাগছে, আমি যাব না।

ডলি বলল, আমিও যাব না।

সীতেশের মুখ দেখে মনে হল ও এই-ই চাইছিল।

সীতেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তবে আর দেরী কেন? চল রমা, একটু হেঁটেই আসি। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে পা ধরে গেছে। দা ড্রাইভ ওয়াজ ভেরী টায়ারিং। বলেই সীতেশ উঠে পড়ল, টেবলের উপর— রাখা টর্চটা তুলে নিয়ে দরজা খুলল।

রমা হ্যাঙ্গার থেকে ওর ওভারকোটটা তুলে নিয়ে হ্যান্ডব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে বলল, চল।

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল।

আমার জন্যে রেখে গেল একটি গোল-গাল ব্যক্তিত্বহীন সুগন্ধি জড়পদার্থ এবং আর একজন আকাট বড়লোকের আড়ষ্ট-কাঠ স্ত্রী।

ডলি আলোর নীচে বসে মুখ নীচু করে নেইল-পালিশের রঙ তুলছিল লোশান দিয়ে। ডলির চেহারাতে কোনো খুঁত ছিল না। ধবধবে গায়ের রঙ, নাক, চোখ, মুখ এবং যেখানে যা যতটুকু থাকার তা। এবং সেই খুঁত-হীনতাই ওর চেহারার একমাত্র খুঁত ছিল বলে আমার মনে হত। স্বামী-সোহাগিনী, দোকানে চুল-বাঁধা, ভোজরাজে শাড়ি-কেনা এবং শ্যামরাম-দাসে গয়না কেনাই, যাদের হোলটাইম অকুপেশান, তেমন অনেক ইনসিপিড মেয়ে-বউ আমার দেখা ছিল। এদের উপর আমার কোনো রাগ ছিল না। কিন্তু করুণা ছিল চিরদিনের। এদের আশ্চর্য সুযোগ ও অফুরন্ত সময়-ভরা জীবনকে এরা কি অবহেলায় নষ্ট করতে পারে তা দেখে এদের উপর একটা ঘৃণামিশ্রিত করুণা জাগত।

কোনো কথাই বলার নেই, বলা চলে না; এরকম মেয়েদের সঙ্গে।

হঠাৎ মিসেস সেন বললেন, আপনার লেখার আমি একজন দারুণ ভক্ত।

আমি মুখ তুলে বললাম, আপনি আমার কি কি বই পড়েছেন?

বই? বলে মিসেস সেন থেমে গেলেন। তারপর থেমে থেমে, ভেবে তিন-চারটে বইয়ের নাম বললেন।

আমি একটি বইয়ের নাম করে বললাম, এ বইয়ের কোন্ চরিত্র আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?

ভদ্রমহিলা চুপ করে থেকে বললেন, সত্যি কথা বলছি, আপনার সম্বন্ধে, মানে সুকুমার বোস লেখক সম্বন্ধে আমার ইন্টারেস্ট হয়েছে হালে এবং আপনার নাম শুনেই এবং আপনি যে আমাদের রমার হাজবেন্ড তা জেনেই আপনার সব বই কিনে ফেলেছি। —কিন্তু জানেন, এত ঝামেলা যাচ্ছে যে, একটাও এখনও পড়া হয়নি। ফিরে গিয়েই সব পড়ে ফেলব।

আমি নির্লজ্জের মত বললাম, মিস্টার সেন পড়েছেন?

ও? বলে, মিসেস সেন চোখ নাচালেন, বলতে চাইলেন আমার কি আস্পর্ধা! সাহেবী মার্কেনটাইল ফার্মের এতবড় এক-জন অফিসারের কি বাংলা বই পড়ার সময় আছে? —তাও সুকুমার বোসের মত এত স্বল্পপরিচিত ও নতুন লেখকের লেখা?

মিসেস সেন মুখে বললেন, ও পড়ে। পড়ে না, বললে মিথ্যে কথা বলতে হয়। তবে, বাংলা বই নয়।

—ইংরিজী বই পড়েন বুঝি? বাঃ খুব ভাল ত।

—হ্যাঁ।—হ্যারল্ড রবিনস্ ওঁর খুব ফেভারিট।—উনি কি বলেন জানেন? কিছু মনে করবেন না ত, শুনে?

বললাম, না। বললেই না।

—উনি বলেন, বাংলা-সাহিত্যে আজকাল কিছুই লেখা হচ্ছে না— যা হচ্ছে সব ট্র্যাশ, —ম্যাদামারা। ওসব পড়ে সময় নষ্ট করার সময় নেই ওঁর। বোঝেনই ত। অত বড় কোম্পানীর এরিয়া ম্যানেজারের কত রকম ঝামেলা। ট্যুরোরী। সবসময়ই ত কনফারেন্স করছে। যেদিন করেও একটু কথা বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ, বাংলা বই বলতে কি পড়েন উনি জানেন?

—কি?

—পঞ্জিকা। গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা। খুব রেলিশ করে পড়েন বিজ্ঞাপনগুলো।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

এই জেনারেশনের ম্যাদামারা বাংলা সাহিত্যের একজন ম্যাদামারা লেখক হবার যে কি যন্ত্রণা, তার যে কি নাক্কারজনক অস্বস্তিত তা এই স্বল্পখ্যাত সাহিত্যিক সুকুমার বোস হাড়ে হাড়ে জানতে পেল।

আমার স্ত্রীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী যদি মিসেস সেন হন এবং সীতেশ হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

কিন্তু রমা কখনও এমন ছিলো না আগে। অলস অবকাশ, ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা লোকের হাতে, বিশেষ করে মেয়েদের হাতে পড়ল তাদের মাথার ঠিক থাকে না।

ডলি বলল, এখানে গীজার আছে বাথরুমে?

আমি বললাম, গীজার নেই। ক্যানেস্তারা করে জল গরম করে দেবে। কেন? চান করবেন?

হ্যাঁ। একটু চান করে ফ্রেশ হওয়া যেত।

লালি বাইরে কাঠের আগুন করে ক্যানেস্তারায় জল বসিয়েছে দেখেছিলাম। ওকে দুই বাথরুমেই জল দিতে বললাম। ওঁরা উঠে ফ্রেশ হতে গেলেন।

মহিলারা চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে দেরী হয়েছিল।

রমা আর সীতেশ বেরিয়ে ফিরেছিল প্রায় দেড়ঘন্টা বাদে।

এখানে রাতে বাঘ না বেরোলেও হায়না, শিয়াল, নেকড়ে, শুয়োর ইত্যাদি মাঝে মাঝে বেরোয়—বিশেষ করে কঙ্কার এদিকে যেদিকে এখনও জঙ্গল আছে।

ওদের জন্যে বেশ চিন্তা হচ্ছিল। দুজনেই নতুন এ জায়গাতে। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার। শেষে পথ হারিয়ে না ফেলে।

কিন্তু সীতেশ পথ হারায়নি। রমাও নয়।

ওরা যখন ফিরল, দেখলাম রমার চুল এলোমেলো, কপালের টিপ সরে গেছে। ওরা এসেই সমস্বরে বলল, বাবাঃ, যা বিপদে পড়েছিলাম, পথ ভুলে সেই কোথায় গিয়ে পড়েছিলাম।

আমি বললাম, স্বাভাবিক। এখানে পথ ভোলা খুবই স্বাভাবিক।

রমা আমার চোখের দিকে একবার চাইল, বোঝবার চেষ্টা করল আমি ওকে সন্দেহ করছি কিনা। কিন্তু আমার চোখে ছিলো অথবা রাগ অথবা সন্দেহ কিছুই ছিল না। আমার চোখ এবং মন এখন রমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাস। রমা সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, ও যেন আর একটু [illegible] পরিচয় দেয়। নিজেকে এত সস্তায় [illegible] ছোট না করে।

ছাড়া ওর কাছে আমার আজ আর চাইবার কিছুই নেই।

ডলির মুখ দেখে মনে হল না, ও কিছু বোঝে বলে। বুঝলেও বোধহয় ডলির কিছু মনে করা সম্ভব ছিল না। কারণ পৃথিবীতে স্বামী ছাড়া নিজের বলতে দের আর কিছুই থাকে না, ডলি সেই জনের মেয়ে। স্বামী যাইই করুক তার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস বা শিক্ষা তার ল না।

খাওয়া-দাওয়া পর ডলি বলল, আমরা মেয়েরা সবাই একঘরে শোব।

মিসেস সেন বললেন, আমার কিন্তু ভয় করবে মেয়েরা একা একা শুলে। কি রকম জায়গা বাবা, মনে হচ্ছে কোন্ অন্ধকূপে এসে পেঁৗছেচি।

আমি বললাম, তাহলে সীতেশও ঐ ঘরে থাকুক, মেয়েদের পাহারা দিক।

সীতেশ বলল, আই এ্যাম এ গেম—খুব রাজী।

হঠাৎ ডলি বলল, তোমরা অত্যন্ত ইনকনসিডারেট। রমা কতদিন পরে এল, কতদিন পরে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হল আর ওরা বুঝি আলাদা আলাদা শোবে।

ব্যাপারটায় আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল।

সীতেশ দারুণ উৎসাহ দেখিয়ে বলল, আরে তাইই ত! আমরা ত সকলেই ভুলে মেরে দিয়েছি। আজ যে এমন হ্যাপী-রি-ইউনিয়নের দিন তা আমার একেবারে খেয়াল ছিল না।

শেষকালে রমা আমার ঘরেই এল। মানে আমার পাশের ঘরে।

ওদিকের ঘরে ডলি আর মিসেস সেন শুলে। মধ্যের দরজা খুলে রেখে শুল সীতেশ।

সমস্ত বাড়ির বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু মধ্যের ছোট বসবার ঘরে শেডের মধ্যে টেবল-ল্যাম্পটা জ্বলছিল। যাতে আমার অতিথিরা ভয় না পায়।

আমি আমার ঘরে শোওয়ার বন্দোবস্ত করছিলাম আমার, এমন সময় রমা চাপা গলায় বলল, ঢং করো না। ওরা জানলে কি ভাববে? এ ঘরে এসে আমার পাশের খাটে শোও।

আমার কথাটা শুনে হাসি পেল, কিন্তু হাসলাম না।

আসলে আজ সন্ধ্যেবেলা থেকেই আমার মনে হচ্ছিল আমরা সকলে, মানে রমা, সীতেশ এবং আমি আমরা একটা দারুণ নাটক মঞ্চস্থ করব বলে ঠিক করে রিহার্শাল একেবারে না দিয়ে, আজই সন্ধ্যেয় নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছি।

ফলে, অভিনয় কারোই ভাল হচ্ছে না। প্রম্পটারও নেই কেউ যে, পিছন থেকে প্রমট্ করবে। তাই আমরা সবাই ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ বলছি। সবচে মজার কথা এই যে, আমরা তিনজনই অভিনেতা অভিনেত্রী এবং এই তিনজনই দর্শক। কার অভিনয় কেমন হচ্ছে সেটুকুও বুঝতে পাচ্ছি না আমরা। সকলেই একটা অসহায় অবস্থায় অবস্থান করছি। কখন কার মুখে আলো পড়ছে অজানা জায়গা থেকে তা বুঝতে পারছি না, কখন বেরিয়ে যাওয়া উচিত উইংস থেকে, কখন ঢোকা উচিত উইংস-এ কিছুই আগে থাকতে ঠিক করা নেই।

মনে হচ্ছে, এমন আধুনিক নাটক কোলকাতার মুক্তাঙ্গনেও কোনো নাট্যগোষ্ঠী এর আগে মঞ্চস্থ করেননি।

বাইরে ফিস ফিস করে শিশির পড়ছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা।

ওঘরে ডলি আর মাধুরী পুটুর পুটুর করে কি সব মেয়েলী গল্প করছে।

সীতেশের গলা শোনা যাচ্ছে না। ও বোধহয় এখন গ্রীনরুমে মেক-আপ ধুতে গেছে।

হঠাৎ পিছনের নালা থেকে শিয়াল ডেকে উঠলো—একসঙ্গে অনেকগুলো—হুয়া হুয়া—হুক্কা হুয়া—কেঁসে হুয়া?

ওঘর থেকে মাধুরী চেঁচিয়ে বলল, রমা ঘুমিয়ে পড়েছিস?

রমা আয়নার সামনে বসে ক্রীম লাগাচ্ছিল মুখে। বলল, কেন? ভয় করছে?

মাধুরী বলল, না। কি রোম্যান্টিক জায়গা রে! সুইট ড্রিমস্।

সীতেশও পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, সুইট ড্রিমস্।

রমা চাপা গলায় আমাকে বলল, সত্যি! অবাক লাগে। তুমি কি আর চেঞ্জে আসার জায়গা পেলে না? কোনো ভদ্রলোকে এরকম জায়গায় থাকে?

—আমি খাটের ফ্রেমে বসেছিলাম। বললাম, আমি ত ভদ্রলোক নই।

—সত্যি। রেসপেকটেবল লোকদের নিয়ে এরকম শ্যাবী জায়গায় আসতে লজ্জা করে।

—তুমি এলে কেন? আমি ত আসতে বলিনি।

—তুমি বলোনি জানি, কিন্তু লোকে কি বলে?

—কি বলে?

বলে, আমি রমার দিকে চেয়ে রইলাম—ভাবলাম ছুটির কথা উঠবে এখুনি। এবং উঠলে প্রসঙ্গটা অত্যন্ত অপ্রিয় হবে। কিন্তু রমা ওদিকে গেল না। মনে হল, রমা ইদানীং আমাকে কিছু স্বাধীনতা মঞ্জুর করে নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। রমা হয়ত জানে না, যে সুকুমার বোসকে ও আগে জানত সে সুকুমার বোস মরে গেছে। ও নিজে হাতে তাকে একদিন মেরে ফেলেছে। সে আর কখনও বেঁচে উঠবে না।

রমা বলল, লোকে কি বলে? স্বামী এই জঙ্গলে একা পড়ে আছে আর স্ত্রী আরামে দিন কাটাচ্ছে শহরে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কোনো কর্তব্য নেই?

—লোকে এসব বলে না কি? আমি বললাম। লোকের কথা শোনো কেন? তুমি ত লোকের কথা নিয়ে কখনও মাথা

থামারগুলি। থামানো উচিতও নয়। আমিও ত থামাই না।

রমা ক্ষীণ মাথা থামিয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

বলল, এখন শরীর একেবারে ভাল? পুরোপুরি সুস্থ?

—হ্যাঁ। বললাম, আমি।

—তুমি কি কাজকর্ম একেবারে ছেড়ে দেবে?

—মাঝে মাঝে সেরকম ইচ্ছা হয়; কিন্তু উপায় নেই।

—উপায় নেই কেন? আমার জন্যে? আমি তোমার কিসের তোয়াক্কা করি? তুমি কি মনে কর আমি তোমার মুখাপেক্ষী? ইচ্ছা করলে তোমার দুগুণ রোজগার করতে পারি আমি—আমার সে কোয়ালিফিকেশান আছে। করি না; তাই। সেটা অন্য কথা।

আমি জবাব দিলাম না।

রমা বলল, কি? জবাব দিচ্ছ না যে?

আমি বললাম, তোমার জন্যে বা অন্য কারো জন্যে নয়, আমি আমার কাজকে ভালোবাসি তাই। ফিরে একসময় যাবই। তবে, ছেদ যখন পড়েছে তখন আরো এক-দেড়মাস কাটিয়ে তারপরই যাব। গিয়ে শুধু কাজ করব-মাথা তুলে আর কোনো-দিকে চাইবও না।

রমা বলল, তাইই ত উচিত। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে লেট-ডাউন করবে না।

—কিসের লেট-ডাউনের কথা বলছ তুমি?

—মানে একজন সাকসেসফুল ব্যারিস্টারের স্ত্রী হিসেবে আমাকে সকলে জানে—তোমার পরিচয়েই আমার পরিচয়—যদিও আমার নিজেরও একটা পরিচয় আছে—তবুও—আশা করি তুমি হাইকোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে আমার মাথা হেঁট করাবে না সকলের কাছে।

আমি কাজ ছাড়লে তোমার মাথা হেঁট হবে কেন?

—কারণ সমাজে মিসেস বোস বলে আমার একটা পরিচয় আছে। এই ত সেদিন মিঃ গুহর পার্টিতে মিসেস গুহ আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—হিয়ার ইজ মিসেস সুকুমার বোস। তোমাদের হাইকোর্ট পাড়ার যত বাঘা লোক সব ডাব ডাব করে চেয়ে রইল।

—সে তুমি সুন্দরী বলে।

—না। সেটাই সব নয়। আমি তোমার স্ত্রী বলেও।

—তাই বুঝি? হবেও হয়ত বা, আমি বললাম।

তারপর বললাম, দ্যাখো রমা, আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। আমার প্রতি তোমার কোনো ফীলিংস নেই তা যেমন তুমিও জানো আমিও জানি, তবু তুমি আমার স্ত্রী বলে সর্বসমক্ষে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হও কেন? আমরা কি দুজনে এই সম্পর্কের প্রতি কখনোই সীনসিয়র হতে পারি না। আর তা না যদি পারি.....।

রমা কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, তুমি কি কোনো নতুন পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে নাকি। আজকাল অনেক কথা বলতে শিখেছ দেখছি?

জিগগেস করছ তাইই বলছি, তোমার স্ত্রী বলে পরিচিত হয়ে যে আনন্দিত হই সেটা সামাজিক কারণে। তোমার সঙ্গে আমার ঘরের মধ্যে যে রিলেশানই থাকুক না কেন—সমাজের লোক তা জানবে কেন? তাদের তা জানতে দেবই বা কেন? এ সব কথা তুমি বুঝবে না। পরক্ষণেই রমা বলল, আমার কিছু টাকা লাগবে।

—টাকা ত আমার এখানে নেই। জানো ত পোস্টাফিস থেকে প্রতি মাসে টাকা তুলি এখান থেকে।

—তা আমি জানি। চেক দাও।

—চেক সই করা আছে আমার লাই-ব্রেরীর টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ারে। কত লাগবে—ফিগার বসিয়ে নিও। টাকা দিয়ে কি করবে? তোমার সংসারের টাকা মনোজ প্রতি মাসে পৌঁছে দেয় না?

—তা দেয়। এটা সংসারের জন্যে নয়। এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। একজনকে আমি একটা জিনিস দেব।

—ঠিক আছে। আমি বললাম। কি জন্যে দরকার, আমাকে বলার দরকার নেই। চেক বের করে নিয়ে নিও।

—থ্যাংক উ! বলে খুব খুশী খুশী মুখে রমা তাকাল আমার দিকে। তারপরই এসে, আমি যে খাটের ফ্রেমে বসেছিলাম তার পাশের খাটে শুয়ে পড়ল। বলল, লাইট-টাইট তুমি নিবিয়ে দিও।

আমি কিছু বলার আগেই রমা ফিস-ফিস করে বলল, তোমার কাছে ত ওসব কিছু নেই। আমি আমার সময় নিয়ে এসেছি। আমার হ্যান্ডব্যাগে আছে। তার-পরই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় বলল, তাড়াতাড়ি কর; আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।

আমি যেমন বসেছিলাম, বসেই রইলাম। কথা বললাম না।

রমা ভুরু কুঁচকে বলল, কি? ইচ্ছা কি? আমার এসব ভালো লাগে না। আমার বলা কর্তব্য তাইই বললাম, আমি কিন্তু এক্ষুনি ঘুমোব।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, না। থ্যাংক উ।

বলতে ইচ্ছে হল, ইটস ভেরী কাইন্ড অফ উ। কিন্তু বললাম না।

ওঘর থেকে আসবার আগে, আলো নিবিয়ে রমার গায়ে কম্বলটা ভাল করে টেনে, গলার কাছে গুঁজে দিয়ে আমার ঘরে এলাম।

শোবার আগে বললাম, কাল সকালে কি খাবে বল? ব্রেকফাস্টে। হাসান খুব ভাল লিভারকারী বানায় ব্রেকফাস্টের জন্যে। আমরা যা ভালো লাগে তাত তোমার ভাল লাগে না, তাই তোমার পছন্দমত মেনু বলে দিও—যা তোমার ভাল লাগে। এখানে সবই পাওয়া যায়।

—ঠিক আছে। কালকে ওসব কথা হবে। আমার ঠান্ডা লেগে গেছে। বাইরে বেশ ঠান্ডা ছিল। ঘুমোলাম, বুঝলে।

আমি বললাম, রুণু কেমন আছে? ওকে নিয়ে এলে না কেন?

—আহা। কি যে বল? স্কুল নেই? তাছাড়া ছোটরা এরকম বড়দের সঙ্গে ট্যাং ট্যাং করে সবজায়গায় যায় নাকি? ছোটরা সঙ্গে থাকলে এ্যাডালটরাও এনজয় করতে পারে না, ছোটদেরও খারাপ লাগে।

—তা বলে, বাচ্চারা মা কি বাবার সঙ্গে কোথাও যাবে না?

—যাবে না কেন? এরকম ট্রিপে নিয়ে আসা যায় না।

আমি বললাম, রুণুকে অনেকদিন দেখি না।

—আমিও দেখি না।

—কেন? তুমিও দেখো না কেন? শুধোলাম, আমি।

—সময় কোথায়? একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। আজ পার্টি কাল সেমিনার, তারপর দিন ফ্লাওয়ার-শো ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি একটা ইকেবানার স্কুল খুলব ভাবছি কিংবা মেয়েদের চুল-বাঁধার দোকান। আমার টাকার দরকার।

—বিলেত থেকে ডাক্তারী পড়ে এসে চুল-বাঁধার দোকান? আস্তে বললাম আমি।

—তাতে কি? অনেক টাকা আছে এই ব্যবসায়। সেদিন আমার এক সিন্ধী বান্ধবী বলছিল কি জানো? বলছিল, লেক, মানি ইজ মাই ফারস্ট হাজব্যান্ড। টাকাই হচ্ছে সব। স্বামী বল পুত্র বল, টাকার কাছে কেউ কিছু না—।

আমি চুপ করে রইলাম।

রমা বলল, কথা বলছ না কেন? কথাটা কি মনঃপূত হলো না?

আমি বললাম, ঘুম পেয়েছে। তুমিও ঘুমোও।

রমা বলল, বুঝেছি। ঘুমোলাম। কাল ভোরে নটার আগে আমাকে তুলো না কিন্তু।

বললাম, আচ্ছা।

(ক্রমশঃ)

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি, ভারতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজ আমলের প্রায় প্রথম দিকে এক বিস্ময়কর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে বহুজন-শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দিতে হয়। স্বীয় মুসলমান রাজের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি তৎকালীন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কোপানলে পড়েন, এবং শেষপর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টে বিচারের প্রহসনের মধ্যে তাঁর জীবনান্ত হয় প্রাণদণ্ডাজ্ঞায়।

সে সময় এই দুষ্কর্মের প্রধান হোতা ছিলেন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস। তিনিও পরিশেষে তাঁর কৃতকর্মের জন্য রেহাই পাননি। কেবলমাত্র নন্দকুমারের ফাঁসিই নয়, চৈৎসিংহের উচ্ছেদ, অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার প্রভৃতির জন্য ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করলে তাঁকে এই সকল গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় এবং ওয়েস্টমিনিস্টার হলে এডমণ্ড বার্ক তাঁর অনন্যসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দেন ভারতে হেস্টিংস-এর কুকীর্তি প্রকাশের ব্যাপারে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার ইম্পেও হেস্টিংস-এর সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে, অন্যায়ভাবে মহারাজকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত হন এবং সরকার পক্ষের কৌঁসিলী স্যার গিলবার্ট ইলিয়ট তাঁকে সাধারণের সমক্ষে নানাভাবে অপমানিত করেন।

এই সকল ঘটনার ইতিবৃত্ত এবং মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর সত্যকাহিনীসমূহ বাংলায় যে গ্রন্থে বিশদভাবে প্রকাশিত হয়, সেই বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'মহারাজ নন্দকুমার-চরিত'। এই গ্রন্থ রচনা করেন সুপণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী। তিনি 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাকার। ১৯০৫ সালে ২০নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত এবং ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গলি, বাগবাজার কলিকাতা পত্রিকা প্রেস হইতে কেশবলাল রায়ের দ্বারা মুদ্রিত হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মহামূল্য সচিত্র গ্রন্থ অধুনা অত্যন্ত দুর্লভ। ঈদৃশ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বর্তমানের কোন সুরুচিসম্পন্ন প্রকাশক এই কার্যে ব্রতী হলে বাংলা সাহিত্যের অশেষ কল্যাণসাধন করবেন। অতীতে বদান্যশীল ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরা অনুরূপ গ্রন্থাদি প্রণয়নের ব্যাপারে যে যথেষ্ট সাহায্য করতেন, তা মহারাজ নন্দকুমার-চরিত' গ্রন্থের রচনাকার শাস্ত্রী মহাশয় অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর গ্রন্থের 'ভূমিকা'র মধ্যে উল্লেখ করে গিয়েছেন। উক্ত ভূমিকার এক-স্থানে তিনি বলেছেন, 'ইহা প্রণয়নকালে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ (মহাত্মা) মহাশয় আমাকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা আমি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।'

এই গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ, যার মধ্যে নন্দকুমারের বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছে, তা থেকে আমরা আমাদের 'অমৃতে'র পাঠকবর্গের অবগতির জন্য অংশবিশেষ এখানে মুদ্রিত করছি এবং আশা করছি এর ফলে তাঁরা গ্রন্থখানি সংগ্রহ করে সমগ্র পাঠের জন্য আগ্রহান্বিত হবেন।

কথারম্ভ

"১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৬ই মে শনিবার রাত্রি দশটার সময় জজেদের আদেশানুসারে মহারাজ নন্দকুমার কারাগারে প্রেরিত হইলেন। সকলেই বুঝিল যে হেস্টিংসই মহারাজার তীব্র জ্বালাময় অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া সমপাঠী ইম্পের সহায়তায় মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য এই গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।"

* * *

অতঃপর সুপ্রিম কোর্টে "মহারাজ নন্দকুমারকে বিচার করিবার জন্য বারজন জুরী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে রবটসন ও ওয়েসটন ব্যতীত সকলেই অজ্ঞাতনামা। রবটসন সাহেব হেস্টিংস সাহেবের একজন সুহৃৎ ছিলেন। ইনি জুরিগণের মুখপাত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ওয়েসটন হলওয়েল সাহেবের একজন ভৃত্য ছিলেন পরে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল জুরিদিগের মধ্যে অনেক সংকরবর্ণ ও এতদ্দেশজাত ছিলেন। একজন ন্যায়দর্শী লেখক ইহা-দিগকে 'কসাইখেলার জুরী' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি অনভিজ্ঞ জজ ও জুরিগণ মহারাজ নন্দকুমারের বিচার করিতে আরম্ভ করেন।"

* * *

সমস্ত সাক্ষীসাবুদ গ্রহণের পর বিচারের শেষে, "প্রধান বিচারপতি ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য বেশ বিশদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহার বলিবার ভাব-ভঙ্গিতে জুরীরা ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্যে বিশ্বাস এবং আসামীর পক্ষের সাক্ষ্যে অবিশ্বাসের কথা সহজেই বুঝিয়া লইলেন, জুরীরা এক ঘন্টা পরামর্শ করিয়া মহারাজ নন্দকুমারকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন।"

নন্দকুমারের ফাঁসি

"১৬ই জুন মহারাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তিনি অবিকম্পিতভাবে মৃত্যু আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। মহারাজার এই বিপদাগমে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যেমন ঘোরতর দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন, তেমনি হেস্টিংসের দল আহ্লাদে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ প্রমুখে ব্যক্তি-

গণ (মহারাজ নবকৃষ্ণ, রাজা হুজুরীমল, রাজা রামলোচন প্রভৃতি) আহ্লাদের বেগ উপশম হইতে না হইতে মহারাজার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইম্পেকে বাহবা দিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লিখিত হইল—হে প্রভু! আপনাদের আগমনেই আমরা উল্লসিত ও আপনাদের বিচারশক্তি দেখিয়া পরম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে ভগবান আপনাদিগকে জীবিত রাখিয়া দেশের কল্যাণ বিধান করুন। কিছুদিবস পূর্ব্বে নূতন উপাধিপ্রাপ্ত নবকৃষ্ণ, হুজুরীমল প্রভৃতি জাল অপরাধে প্রাণদণ্ড হওয়া দেশের আচার ও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া রাধাচরণ মিত্রের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা স্থগিত করিবার জন্য ইংলণ্ডাধিপের কাছে আবেদন করিয়া পাঠান। মুন্সী নবকৃষ্ণ এক্ষণে স্বতন্ত্র ব্যক্তি সুতরাং সেই দেশেই জাল অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে একথা লিখিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন কেন?

ইংলণ্ডাধিপের আদেশ না আসা পর্য্যন্ত মহারাজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার জন্য নবাব মোবরকদ্দৌলা একখানি পত্র কাউন্সীলে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহার কোন ফল ফলিল না। মহারাজার ভাই শম্ভুনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সকল আশাই বিফল হইল।

মহারাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, তিনি পুনরায় কারাগারে নীত হইলেন। এ স্থানে একটি দ্বিতল গৃহ তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় তিনি অধিকাংশ সময় পূজাপাঠ বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথন ও শাস্ত্রালাপে সময় যাপন করিতেন। দণ্ডাজ্ঞার পর হইতে তাঁহাকে দ্বাবিংশ দিবস ইহলোকে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই কয়েক দিবসের পর তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ইহা জানিয়াও মৃত্যুভয়-জনিত উদ্বেগ তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় সর্ব্বদাই নির্ভীক চিত্তে সেই অন্তিমকালের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজের কারাবাসের সময় তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা দিবসের অধিকাংশ সময় নিকটে থাকিতেন। বৃদ্ধ মহারাজকে শেষ দর্শন করিবার জন্য সকল সময়েই তাঁহার কারাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। কলিকাতা কাউন্সীলের সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সাহেবেরাও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া এ সময় কলিকাতায় এরূপ জনরব উঠে যে, জেনারেল সাহেব বধ্যভূমিতে সদলবলে গমন করিয়া মহারাজার উদ্ধারসাধন করিবেন। দেখিতে দেখিতে অন্তিম দিবস নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমরা কলিকাতার এই সময়কার সেরিফ ম্যাক্রেবী সাহেবের লিখিত বিবরণ হইতে সেই সময়ের হৃদয়বিদারক দৃশ্য পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

'৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি। তিনি আমাকে যথানিয়ম সম্বর্দ্ধনা করিয়া অতি প্রশান্তভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মহারাজার এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল যে, মহারাজাকে যে চিরদিনের জন্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেকথা বোধহয় ইনি অবগত নহেন। আমি দ্বিভাষীর দ্বারা বলাইলাম যে, অদ্য আমি তাঁহাকে আমার শেষ অভিবাদন করিতে আসিয়াছি। বিশেষতঃ কল্য শোচনীয় সময় আমার কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্তই সম্পন্ন করিতে হইবে, আপনার যে সকল অন্তিমবাসনা আছে, সে সকল পূরণ করিতে আমি সম্পূর্ণ চেষ্টা করিব। বাহক ও শিবিকা যথাসময়ে আপনার গৃহদ্বারে অবস্থান করিবেক। আপনার যে সকল আত্মীয় বন্ধু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তাহাদিগকেও আমি রক্ষা করিব।'

'মহারাজ বলিলেন, আপনার ভদ্রতায় আমি বড় বাধিত হইয়াছি, এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তারপর কপালে অঙ্গুলী দিয়া বলিলেন, বিধাতার ইচ্ছা কখন খণ্ডিত হয় না।—জেনারেল সাহেব, মনসন সাহেব ও ফ্রান্সিস সাহেবকে তাঁহার সম্মান করিতে কহিয়া রাজা গুরুদাসকে রক্ষা এবং ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এ সময় মহারাজের নিরুদ্বেগ ভাব দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়, একটীও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতিত হয় নাই অথবা তাঁহার মুখশ্রী ও স্বরের বৈলক্ষণ্য হয় নাই।...

'পরদিবস প্রাতঃকালে ৭৷৷টার সময় আমি জেলে গমন করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা যায় না, দরিদ্র লোকেরা মহারাজার কাছে চিরবিদায় লইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া দিক্‌সকল আকুলিত করিতেছে, এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের তিন ঘণ্টা পরে যখন আমি ইহা লিখিতে আরম্ভ করি, তখনও আমি ভাল করিয়া স্থিরতা লাভ করিতে পারি নাই। মহারাজা প্রশান্তমনে উপবেশন করিলে আমিও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। এই সময় একজন যথাক্রমে ঘড়ি দেখেন, মহারাজ ইহা দেখিয়া বলিলেন, 'আমি প্রস্তুত আছি', ইহা বলিয়াই তিনি তাঁহার তিনজন ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মৃতদেহ রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু মহারাজ নির্ব্বিকার ও চিন্তাশূন্য। আমরা প্রায় ১ ঘণ্টা বসিয়াছিলাম, এ সময়ের মধ্যে তিনি অনেক সময় রাজা গুরুদাস, জেনারেল, কর্ণেল মনসন ও ফ্রান্সিস সাহেবের কথা কহিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট সময় হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আমার দিকে চাহিয়া জেলের একজন চাকরকে ডাকিয়া এ স্থানে তাঁহার যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা রাজা গুরুদাসকে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তারপর মহারাজ প্রশান্তচিত্তে পাল্কীতে গিয়া বসিলেন।

'আমরা বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ময়দান লোক পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগের ভিতর কাহারও হাঙ্গামা করিবার ভাব দেখিলাম না। মহারাজ পাল্কীতে বসিয়াই একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। ফাঁসী কাট দেখিয়া মহারাজের মুখে কোন উদ্বেগের ভাব দেখিতে পাইলাম না। মহারাজের ব্রাহ্মণত্রয় এখনও উপস্থিত না হওয়াতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, এর মধ্যে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। কাহারও সহিত মহারাজের দেখা করিবার ইচ্ছা আছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন অনেকের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু ইহা দেখা করিবার সময় ও স্থান নহে। এই বলিয়াই তিনি পাল্কীতে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

'কিয়ৎক্ষণ পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহারাজ! সময় প্রায় নিকট হইয়া আসিল, এ সময় একটি কথা বলিব, বধ্যমঞ্চে যখন আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া সঙ্কেত করিবেন, সেই সময় রজ্জু সংলগ্ন হইবে। তিনি কহিলেন, হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করিব। আমি বলিলাম হাত বাঁধা থাকিবে, সুতরাং পা নাড়িলেই হইবে। তিনি তাহাই করিবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। সময় উপস্থিত দেখিয়া আমি বধ্যমঞ্চের নিকট পাল্কী আনিতে আদেশ করিলাম। তিনি পাল্কী হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে মঞ্চ সোপানের কাছে উপস্থিত হইলেন।

'তাঁহার হস্তদ্বয় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বদ্ধ করা হইল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একবার চতুর্দ্দিক দেখিলেন কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চোপরি উপস্থিত হইলেন। এই সময় বস্ত্র দ্বারা তাঁহার বদন আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক হইলে আমি আমাদের একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিলাম। রাজা তাহাতে আপত্তি করিয়া তাঁহার যে সেবক পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল তাহাকে নির্দ্দেশ করিলেন। মহারাজার মুখ আচ্ছাদিত হইলে তিনি সরলভাবে দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে দেখিলাম, তিনি নির্ভয়চিত্তে স্থিরতর নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নিজের পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ইহার পরই মঞ্চাপসরণের শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ সংযত চিত্ত

হইয়া দেখিলাম, মহারাজার হস্তদ্বয় প্রথম যেরূপ বাঁধা হইয়াছিল সেইরূপ রহিয়াছে, মুখমণ্ডলে কোন বিকৃত চিহ্ন নাই। এই শোচনীয় ব্যাপারে মহারাজা যেরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার উদাহরণ কোন গ্রন্থ বা কাহারও কাছে এরূপ কথা শ্রবণও করি নাই।

মহারাজ নন্দকুমার যখন বধ্যমঞ্চে আরোহণ করেন, তখনও ভারতীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করে নাই যে, হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রত্যেক হিন্দুর মাননীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চিরদিনের জন্য ইহসংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখন তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল মহারাজকে ভয় দেখাইবার জন্য এই সকল আড়ম্বর করা হইয়াছে, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল তাহাদের ধারণা সর্ব্বৈব মিথ্যা এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই মহারাজার প্রাণ বহির্গত হইয়া গেল—তাঁহার মৃতদেহ লম্বাভাবে ঝুলিতেছে, তখন সেই লোক সমষ্টি গভীর আর্তনাদ করিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে কেহ বা গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া পাপ ক্ষালন করিতে লাগিল, যে যেদিক পাইল সেইদিকে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কয়েক মুহূর্ত পূর্ব্বে অসংখ্য লোকের আর্তনাদে যে স্থান আকুলিত হইতেছিল, এক্ষণে তথায় মহারাজার তিনজন ব্রাহ্মণ আর কতিপয় ইউরোপীয় ব্যতীত আর কেহই নাই।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে মহারাজার মৃত্যুদিবসে কলিকাতার ব্রাহ্মণেরা অনাহারে দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই অবধি অনেক দিবস পর্যন্ত মফঃস্বলের ব্রাহ্মণেরা কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে পিপাসায় কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইয়া গেলেও কলিকাতায় জলগ্রহণ করিতেন না, সেই সময় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে গিয়া বাস করেন। মহারাজার মৃত্যুসংবাদে সমগ্র বঙ্গদেশে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।*

মহারাজা সাধারণ অধ্যবসায় বুদ্ধিবলে উন্নতি লাভ করিয়া নবাব মীরজাফরের সময় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেন। নবাব আলিবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সারফরাজকে যেরূপ নিহত করেন, সাদাভাবে দেখিতে গেলে মীরজাফর মুষ্টিমেয় ইংরাজ সাহায্যে সিরাজকে পরাস্ত করিয়া সেইরূপে সিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু উপযুক্ত মন্ত্রী অভাবে মুষ্টিমেয় ইংরাজের মুষ্টির মধ্যেই পতিত হইলেন। এইরূপে তাঁহার প্রথম নবাবী অতীত হইলে তিনি দ্বিতীয়বার নন্দকুমারের বুদ্ধিবলের উপর নির্ভর করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হন।

মহারাজ নন্দকুমার প্রভুর স্বাধীনতা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসীম সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। মহারাজ স্বীয় প্রভুর মঙ্গলের জন্য স্বীয় সমূহ অমঙ্গল সম্ভাবনা সত্ত্বেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার প্রভু তাঁহার এই গুণের কথা সবিশেষ অবগত ছিলেন। এই জন্য তিনি মৃত্যুকালে মহারাজার হস্তে পুত্রাদি ন্যস্ত করিয়া শান্ত মনে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লন।

মহারাজার শত্রুপক্ষীয়রা তাঁহাকে স্বার্থপর প্রভৃতি বলিয়া যত কেন নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সংসারচক্রে নানা অবস্থায় নানা প্রকার লোকের সহিত মিলিত হইতে হইয়াছিল, সকল সময়েই সকল প্রকার লোকের প্রতি প্রিয়ভাষী হওয়া নিতান্ত সামান্য কথা নহে। ফল কথা, তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন, জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। জনসাধারণের সুখের জন্য কোম্পানীর লোকের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ হইত এবং ইহাদিগের জন্য তাঁহাকে হেস্টিংসের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইতে হয়।'

—রূপদর্শী

---

*মহারাজের মৃত্যুতে দেশের ভিতর যেরূপ শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল, নিম্নের গানটিতে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

মহারাজ নন্দকুমার রে,
তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলি রে?
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেস্টিংস সাহেব এলো জান করিবার হারি।।
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙ্গের
পানে চেয়ে।
আর না আসিরে বাছা ঘোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।।
খোপেতে [illegible] কাঁদে জোহারাতে হাঁস।
খোড় বাঙ্গলায় কাঁদে সোনার
গুলতি বাঁস।।
ছোটরাণী উঠে বলে বড়রাণী গো দিদি।
[illegible] সিন্দুর
বঞ্চিত করলেন বিধি।।

প্রায় দুই দশক আগে নতুন একটি বিজ্ঞানের নাম শোনা গিয়েছিল : সাইবারনেটিক্‌স। অনুশীলনের বিষয় ছিল —নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ। তারপরে গত দুই দশকের মধ্যে এই বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে বিশেষ করে কম্পিউটিং মেশিন বা গণকযন্ত্রের প্রসার ও উন্নতির ক্ষেত্রে—যদিও এই বিশেষ বিষয়টি সাইবারনেটিক্‌স-এর একটি অংশ মাত্র।

নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ নিয়ে অনুশীলন করতে হলে অনেকগুলো বিষয় এসে পড়ে। গোড়ার বিষয় অবশ্যই বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ। কিন্তু তা ছাড়াও অনেক কিছু। তার মধ্যে আছে ভাষার অনুশীলন, যন্ত্রপাতি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে বার্তার অনুশীলন, কম্পিউটিং যন্ত্র ও এমনি ধরনের অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উদ্ভাবন, মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে কিছু ভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এক নতুন তত্ত্ব। সব মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ সম্পর্কিত বৃহত্তর একটি তত্ত্ব।

ধারণাটি নিঃসন্দেহে জটিল, একটিমাত্র শব্দের সাহায্যে তাকে প্রকাশ করা শক্ত। এই বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ ডঃ নরবার্ট উইনার একটি গ্রীক শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে একটি নাম তৈরি করলেন—সাইবারনেটিক্‌স। গ্রীক শব্দটি হচ্ছে 'কুবারনীটিস', যার অর্থ কর্ণধার। ইংরেজি 'গভর্নর' শব্দটিও এই গ্রীক শব্দ থেকেই। নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ সম্পর্কিত বৃহত্তর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে ১৯৪৮ সালে একটি বই লিখলেন তিনি আর তার নাম দিলেন—সাইবারনেটিক্‌স। নতুন বিজ্ঞানের নাম হিসেবে এই নামটি চলে গেল।

সাইবারনেটিকস-এর সংজ্ঞা কী? নরবার্ট উইনার দুটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন—নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ। পৃথক পৃথক ভাবে নয়, একযোগে। কেন? প্রায় তাঁরই ভাষায় তাঁর ব্যাখ্যাটি উপস্থিত করছি।

আমি যখন অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করি, আমি তাকে একটি বার্তা দিই। সে যখন আমার সঙ্গে পাল্টা যোগাযোগ করে, আমাকে ফিরিয়ে দেয় তৎসম্পর্কিত একটি বার্তা। এই বার্তার মধ্যে খবরটি থাকে তার ওপরে দখল প্রধানত তার, আমার নয়। আমি যখন অন্য এক ব্যক্তির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, আমি তাকে একটি বার্তা দিই। যদিও এই বার্তাটি আজ্ঞাসূচক, কিন্তু বিবরণসূচক হলেও যোগাযোগের প্রকরণের দিক থেকে ভিন্নতর হয় না। উপরন্তু, আমার নিয়ন্ত্রণ যদি ফলপ্রসূ হতে হয় তাহলে তার কাছ থেকে পাওয়া বার্তা সম্পর্কেও আমার উপলব্ধি থাকা চাই, যা থেকে বোঝা যাবে যে আমার বার্তাটি সে ঠিকমতো বুঝেছে ও মেনেছে।

নরবার্ট উইনার বলেছেন, সমাজকে বোঝা যেতে পারে বার্তার অনুশীলন ও যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে। বার্তার উন্নতি—যেমন বার্তা মানুষে ও যন্ত্রের মধ্যে, যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে, যন্ত্র ও যন্ত্রের মধ্যে এবং যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধার উন্নতি ভবিষ্যতে অবশ্যই বড়ো রকমের ভূমিকা নেবে।

আমি যখন কোনো যন্ত্রকে হুকুম দিই তখনকার পরিস্থিতি আর আমি যখন কোনো ব্যক্তিকে হুকুম দিই তখনকার পরিস্থিতির মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। অন্য ভাষায়, আমি যতোদূর বুঝতে পারি, আমার হুকুম সম্পর্কে এবং আমার হুকুম যে পালিত হচ্ছে সেই নির্দেশসূচক সংকেত সম্পর্কে আমি সজাগ। এই সংকেত তার মধ্যবর্তী পর্যায়ে কোনো যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, না, কোনো ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে—ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে তা অবান্তর। সংকেতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তাতে বড়ো একটা বদলায় না। অতএব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব—তা সে মানুষে হোক বা পশুতে হোক বা যন্ত্রে হোক—বার্তার তত্ত্বে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়।

বলা বাহুল্য, ব্যাপক পার্থক্য এসে যায় যেমন বার্তায় তেমনি নিয়ন্ত্রণের সমস্যায়—শুধু জীবন্ত প্রাণী ও যন্ত্রের মধ্যেই নয়, প্রত্যেকটি সংকীর্ণতর ক্ষেত্রেও। সাইবারনেটিক্‌স-এর উদ্দেশ্য—এমন একটি ভাষা ও প্রকরণ গড়ে তোলা যা নিয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগের সমস্যাটিকে সাধারণভাবে আয়ত্ত করতে পারি এবং কোনো কোনো ধারণার বেলায় তাদের বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে শ্রেণীবদ্ধ করার সঠিক প্রকরণটি খুঁজে পাই।

আমাদের পরিবেশের ওপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য আমরা যে

অনুভব দিই তা হচ্ছে একধরনের খবর দেওয়া। যে-কোনো খবরের মতো এই অনুভবও অতিক্রমণের সময়ে খানিকটা অসংগঠিত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে এসে যায় কম-বেশি অসমন্বয়। নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগের ব্যাপারে এই একটি সমস্যা। প্রকৃতিতে সবসময়েই একটা ঝোঁক থেকে যায় সংগঠিতকে অবনত করার, অর্থপূর্ণকে ধ্বংস করার। অর্থাৎ, হাতের জিনিসকে ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায় খুইয়ে বসা।

মানুষ এমন এক জগতে নিমজ্জিত যে-জগতকে সে অবলোকন করে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। লব্ধ খবর সুসমন্বিত হয় তার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে, তারপরে তার প্রকাশ ঘটে সংরক্ষণ সংমিশ্রণ ও নির্বাচন ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলো পার হয়ে। তখন বাইরে জগতের সঙ্গে আবার একটি ক্রিয়া ঘটতে পারে, ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে আবার তার প্রতিক্রিয়া। বিভিন্ন প্রক্রিয়া পার হয়ে তা যুক্ত হয় খবরের সঞ্চিত মজুদের সঙ্গে। তার দ্বারা আবার প্রভাবিত হয় ভবিষ্যতের ক্রিয়া।

বাইরের জগতের সঙ্গে বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তারই নাম খবর। খবর পাওয়া ও খবর ব্যবহার করার প্রক্রিয়া হচ্ছে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে আমাদের মানিয়ে চলার প্রক্রিয়া এবং সেই পরিবেশের মধ্যে সার্থকভাবে আমাদের বেঁচে থাকা। আধুনিক জীবনের প্রয়োজন ও জটিলতার ফলে খবরের এই প্রক্রিয়ার ওপরে চাহিদাও ক্রমেই বাড়ছে। এই চাহিদা মেনে চলতেই হয়। সার্থকভাবে বাঁচার অর্থই হচ্ছে যথেষ্ট খবর সহ বাঁচা। অতএব নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ হচ্ছে যেমন মানুষের অন্তর্নিহিত জীবনের তেমনি সামাজিক জীবনের মূল বিষয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে যোগাযোগ নিয়ে অনুশীলন তুচ্ছ নয়, আকস্মিক নয়, নতুনও নয়। এমনকি নিউটনের আগের কালেও পদার্থবিদ্যায় এই সমস্যাটির অস্তিত্ব ছিল। একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে—লাইবনিৎস। সাইবারনেটিক্স-এর চিন্তার প্রথম উদ্গাতা বলা যায় তাঁকে। যন্ত্রের সাহায্যে গণনা ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সম্পর্কে তিনি আগ্রহী ছিলেন। এবং গণনার জন্য তিনি চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ কৃত্রিম একটি ভাষা গড়ে তুলতে। অর্থাৎ, গণকযন্ত্রের বেলাতেও তাঁর চিন্তা গিয়েছিল ভাষা ও যোগাযোগের দিকে।

বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডের গবেষণার ফলে অপ্টিকস বা আলো-বিজ্ঞানের দিকে পদার্থবিজ্ঞানীদের মনোযোগ গিয়েছিল। আলোকে মনে করা হয়েছিল এক ধরনের বিদ্যুৎ এবং ঈথর নামে এক সর্বতোব্যাপ্ত অদৃশ্য মাধ্যমের সাহায্যে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর মনে করা হত। ঈথরকে অনুশীলন করতে গিয়ে কতকগুলো সমস্যাতেও পড়তে হল। একটি হচ্ছে ঈথরের মধ্যে দিয়ে বস্তুর গতি সম্পর্কিত। নব্বইয়ের দশকে মিচেলসন ও মর্লির বিখ্যাত পরীক্ষাকার্য এই সমস্যার সমাধানের প্রয়াসেই। কিন্তু যে জবাবটি পাওয়া গেল তা সে-সময়ে আশা করা যায়নি। ঈথরের মধ্যে দিয়ে বস্তুর গতি নির্ধারণের কোনো উপায়ই নেই। বিজ্ঞানী লোরেনৎস বললেন, বস্তুর গতিও বৈদ্যুতিক বা অপটিক্যাল এমনটি ধরে নিলে তবেই এই পরীক্ষাকার্য টেকে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন উপস্থিত হলেন তাঁর তত্ত্ব নিয়ে, আলো ও বস্তুকে দাঁড় করালেন একই ভিত্তির ওপরে। আইনস্টাইনের ব্যাখ্যায় দর্শকের অবস্থান হতে পারে স্থির বা গতিশীল। তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি এমনই যে দর্শককে উপস্থিত করতে হলে বার্তা সম্পর্কিত ধারণা উপস্থিত করতেই হয়।

বার্তা হচ্ছে বিন্যাস ও সংগঠনের একটা রূপ। এই বার্তা যে অতিক্রমণের সময়ে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, সেকথা আগে বলেছি। কথাটা প্রথম পাওয়া যায় জার্মানির বোলৎসমান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গিবস-এর গবেষণায়, উনিশ শতকের শেষদিকে। তার আগে, সতেরো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত জগৎ সম্পর্কে ধারণা ছিল প্রায় পুরোপুরিভাবেই নিউটনের তত্ত্ব অনুসারী। সেখানে সমস্ত ঘটনাই ছিল কড়াকড়ি রকমের নিয়মবদ্ধ, জগৎ ছিল আঁটোসাঁটো ও সুসংগঠিত, গোটা ভবিষ্যৎ নির্ভর করত গোটা অতীতের ওপরে। এ এমনই এক ছবি যার সমর্থনে সামগ্রিক কোনো পরীক্ষাকার্য দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না, সম্ভব নয়, কেননা এখনো পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষাকার্য এমন নিখুঁত নয় যে কোনো একপ্রস্থ জাগতিক নিয়মকে শেষতম দশমিক পর্যন্ত যাচাই করা চলে। নিউটনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বাধ্য হয়েই জগতের এমন একটি ছবি ধরে নিতে হয়েছিল যা কতকগুলো নিয়মের অধীন। সে এক আঁটোসাঁটো সুসংগঠিত জগৎ। তারপরে গিবস ও বোলৎসমান প্রবর্তন করলেন চাঞ্চল্যকর নতুন ধারণা—পদার্থবিদ্যায় পরিসংখ্যানের ব্যবহার। পরিসংখ্যান হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন বা বিভাজনের বিজ্ঞান এবং এই দুজন আধুনিক বিজ্ঞানী জাগতিক ব্যবস্থাকে বিচার করলেন তার বিভাজনের মধ্যে, অবস্থান ও বেগের বিভিন্নতার মধ্যে। নিউটনীয় ছবিতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে অবস্থান ও বেগের বিভিন্নতা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ব্যবস্থা একই নিয়মের অধীন। নতুন পরিসংখ্যান বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে দেখলেন অন্যভাবে। তাঁরা অবশ্য এই নীতিকে অস্বীকার করলেন না যে মোট তেজের বিচারে কতকগুলো ব্যবস্থা অন্য কতকগুলো ব্যবস্থা থেকে পৃথক, কিন্তু স্বীকার করলেন না যে মোট তেজ অভিন্ন হলেই ব্যবস্থা থেকে ব্যবস্থার পার্থক্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বজায় থাকে ও সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হয়ে পড়ে। গিবস ও বোলৎসমান এমনিভাবে পদার্থবিজ্ঞানে অনির্দিষ্টতার একটা ধারণা নিয়ে এলেন, পরবর্তীকালে হাইজেনবার্গ বা প্লাঙ্ক যা নিয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন।
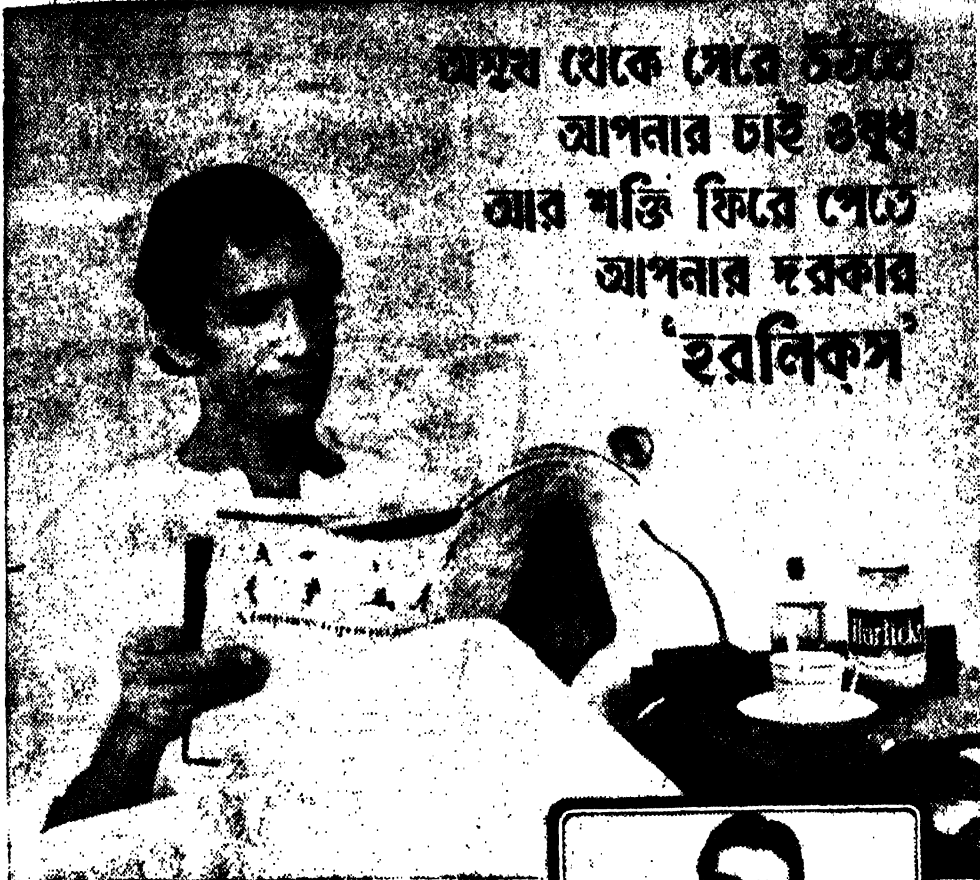
অসুখবিসুখ আপনার শরীরের সব প্রোটীন আর পুষ্টিশক্তি নাশ করে আর তাই আপনি দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন এই ক্ষতি পূরণের জন্যে আর স্বাস্থ্য ফিরে পেতে আপনার দরকার বাড়তি পুষ্টি। 'হরলিক্স' আপনাকে এই বাড়তি পুষ্টি যোগায় এমনভাবে যাতে আপনার দুর্বল পেটেও তা দিব্যি হজম হয়। তাছাড়া 'হরলিক্স' তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে, রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলে আর অঘোরে ঘুমোতেও সহায়তা করে।

তাইতো সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা রোগভোগের পর 'হরলিক্স' খেতে বলেন। আজ প্রায় ১০০ বছর ধ'রে তাঁরা এই পরামর্শই দিয়ে আসছেন।
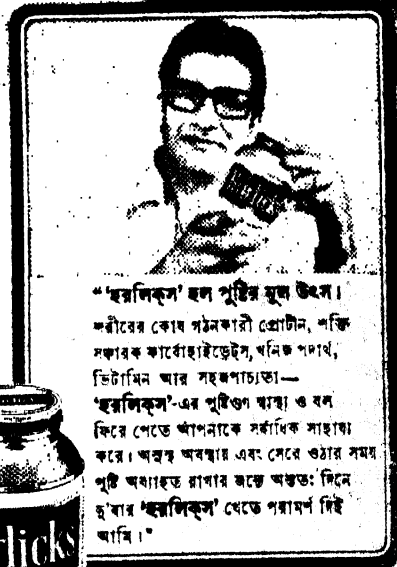
"'হরলিক্স' হল পুষ্টির মূল উৎস। শরীরের কোষ গঠনকারী প্রোটীন, শক্তি সঞ্চারক কার্বোহাইড্রেটস, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন আর সহজপাচ্যতা— 'হরলিক্স'-এর পুষ্টিগুণ স্বাস্থ্য ও বল ফিরে পেতে আপনাকে সর্বাধিক সাহায্য করে। অসুস্থ অবস্থায় এবং সেরে ওঠার সময় পুষ্টি অব্যাহত রাখার জন্যে অন্ততঃ দিনে দু'বার 'হরলিক্স' খেতে পরামর্শ দিই আমি।"

'হরলিক্স'-
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্স'—রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 5601 A
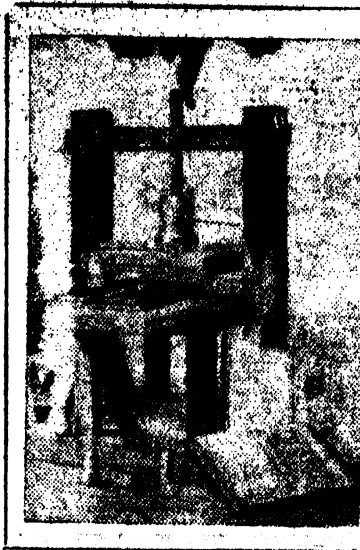
গ্যুটেনবের্গ-এর মুদ্রণযন্ত্র। যন্ত্রের ওপরে সাল লেখা রয়েছে ১৪৪১। আলগা হরফ দিয়ে ছাপার আবিষ্কার যোগাযোগের ইতিহাসে এক বিরাট ঘটনা।

এখানে এই ধারণা নিয়ে বস্তুগত পরিমাপকে ধরা যাক। আমরা এখন আর বলতে পারি না যে এই পরিমাণটি বাইরের বিশ্বের। বরং বলতে হয়, বাইরের গোটা-কতক সম্ভাব্য বিশ্বের। বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে আমরা গোটাকতক নির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলতে পারি, তারই জবাব এই পরিমাণটি। অতএব পদার্থবিদ্যা এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাইরের এমন এক বিশ্বের আলোচনা নয় যেটিকে মনে করা যেতে পারে তৎসম্পর্কিত সকল প্রশ্নের মোট জবাব, বরং তার চেয়ে অনেক সীমাবদ্ধ সব প্রশ্নের জবাবের বিবরণ। কাজেই এখন আমাদের ভাবনার বিষয়—যতো বার্তা আমরা পাঠাতে পারি এবং যতো বার্তা আমরা পেতে পারি, সব-গুলোর অনুশীলন নয়; ভাবনার বিষয় আরো অনেক নির্দিষ্ট বার্তার তত্ত্ব।

বার্তার মাধ্যমে বাইরের জগতে ক্রিয়াশীল হয় এমন যে যন্ত্র তার সংগে আমরা পরিচিত। যেমন, ফটো-ইলেকট্রিক দ্বার খোলার ব্যবস্থা। ইউরোপের বহু শহরে বড়ো বড়ো হোটেলের দরজা আগন্তুকের সামনে আপনা থেকেই খুলে যায়। আগন্তুক যখন দরজার দিকে এগিয়ে আসছে তখন আলোর কিরণ বাধাপ্রাপ্ত হয় আর তার ফলেই দরজা খোলে। ফটো-ইলেকট্রিক সেল আলো ও অন্ধকারের তফাৎ করতে পারে ও তদনুযায়ী ক্রিয়াশীল হয়।

তবে যন্ত্রটি হতে পারত আয়ত্ত ইঞ্জি-নিয়ারিং বিদ্যার সম্ভবপরতার মধ্যে আরো অনেক বেশি জটিল। একটি ক্রিয়া তখনই জটিল যখন বাইরের জগৎ সম্পর্কিত একটা ফল পাবার জন্য—যাকে আমরা বলি 'আউটপুট'—যে তথ্য বা ড্যাটা প্রবিষ্ট হচ্ছে—যাকে আমরা বলি 'ইনপুট'—তার মধ্যে থেকে যায় প্রচুরসংখ্যক সংযোগ। এই সংযোগ যেমন এই মুহূর্তে প্রবিষ্ট ড্যাটার, তেমনি অতীতে মজুদ করা ড্যাটা থেকে নেওয়া লিপির—যাকে আমরা বলি 'মেমোরি'। যন্ত্রের মধ্যেই এই লিপি থেকে যায়। এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে জটিল যে যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার সাহায্যে ইনপুট ড্যাটা আউটপুট ড্যাটায় রূপান্তরিত হয়, তা হচ্ছে উচ্চবেগসম্পন্ন ইলেকট্রনিক কমপিউটর।

সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি

নরবার্ট ভীনার-এর বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৮ সালে, তারপরে পঁচিশ বছরেও বিজ্ঞানীরা এই নতুন বিজ্ঞানের কোনো সংজ্ঞায় একমত হতে পারেন নি। বলা হয়েছে, সাইবারনেটিকস-এর অনু-শীলনের বিষয়—নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ (কনট্রোল অ্যান্ড কম্যুনিকেশন)। অর্থাৎ সাইবারনেটিক্স হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও যোগা-যোগের বিজ্ঞান।

নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগের আওতায় তো অনেক কিছুই এসে পড়ে। সাইবার-নেটিক্স-এর বিস্তার তাই নানা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। মোটামুটি বলা হয়ে থাকে যে পাঁচটি বিজ্ঞানের সঙ্গম ঘটেছে এই সাইবারনেটিক্স-এ—যথা, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, জীববিদ্যা ও যোগাযোগ তত্ত্ব। পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও অতি ব্যাপক; তার মধ্যে পড়ে যন্ত্রব্যবস্থা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, ফিনান্স বীমা বাণিজ্য পরিবহণ ইত্যাদি সংগঠিত মানবিক তৎপরতার নিয়ন্ত্রণ, জীবদেহের প্রক্রিয়াসমূহের নিয়ন্ত্রণ। এমনি-ভাবে [illegible] সাইবারনেটিক্স-এর [illegible] মধ্যে বিজ্ঞানের বহু শাখা এসে পড়ছে।

সাইবারনেটিক্স-এর বিকাশ ঘটেছে যন্ত্র ও জীবন্ত প্রাণীর তুলনামূলক অনু-শীলন থেকে। ফলে জীববিজ্ঞান ও যন্ত্র-[illegible] উঠেছে এই নতুন বিজ্ঞানের [illegible] ক্ষেত্র। একালে জীবদেহের [illegible] খবর সংগ্রহ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য আধুনিক যন্ত্র তৈরি হয়েছে, তার ফলে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসারিত। ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞ ও গণিতবিদ ও জীববিজ্ঞানীর মধ্যে। তত্ত্বগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার সুফল প্রচুর। রোগনির্ণয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। তৈরি হয়েছে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড, কৃত্রিম ফুসফুস, কৃত্রিম কিডনি।

এমনি সব ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করতে গিয়ে মানুষ পাঠ নিয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে। ব্যাপারটা নতুন নয়। মানুষের সরলতম যন্ত্রও ছিল প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নেওয়ার ফল, এবং সেগুলো ছিল মূলত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 'সম্প্রসারণ'। তবে, হাতের জোর ও পাল্লা বাড়ানোর জন্য যন্ত্র বানানো যেতে পারে হাতের যান্ত্রিক অনুকরণে। ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সরল। কিন্তু মস্তিষ্কের অনুকরণে যন্ত্র-মস্তিষ্ক তৈরি করা? সেটা অতি জটিল। মস্তিষ্কের ক্ষমতা অসাধারণ, সে নিজের ভুল নিজে শোধরাতে পারে, নিজের প্রোগ্রাম নিজে রচনা করতে পারে, অর্থাৎ সে শিখতে পারে'। কিন্তু মস্তিষ্কের কাজ চলে ধীরে এবং মস্তিষ্কের 'মেমোরি' দুর্বল। মানুষ এই মস্তিষ্কের অনুকরণেও যন্ত্র তৈরি করেছে—ইলেকট্রনিক কমপিউটর—মস্তিষ্কের কিছু সরল ধরনের ক্ষমতা এই যন্ত্রের আয়ত্ত, এমনকি ছবি আঁকা ও কবিতা লেখার মতো কাজও। উপরন্তু এই যন্ত্রের কাজ চলে বিপুল বেগে, তার মেমোরি অসাধারণ। প্রশ্ন উঠেছে, পুরোপুরি মস্তিষ্কের মতো একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব কি? অসম্ভব—এমন কথা বলা চলে না। বিজ্ঞানের সামনে বিরাট এক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে সাইবারনেটিক্স।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে
বি-ই-এস-এম কমপিউটর

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সম্প্রতি একটি বি-ই-এস-এম ৬ কমপিউটর বোম্বাইয়ের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে। নিউক্লিয়র গবেষণার জন্য কমপিউটর অবশ্যই প্রয়োজন এবং এই গবেষণায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃতিত্বের সঙ্গে যে কমপিউটরটি সম্পর্কিত তা হচ্ছে বি-ই-এস-এম ৬। সোভিয়েত ও ভারতীয়
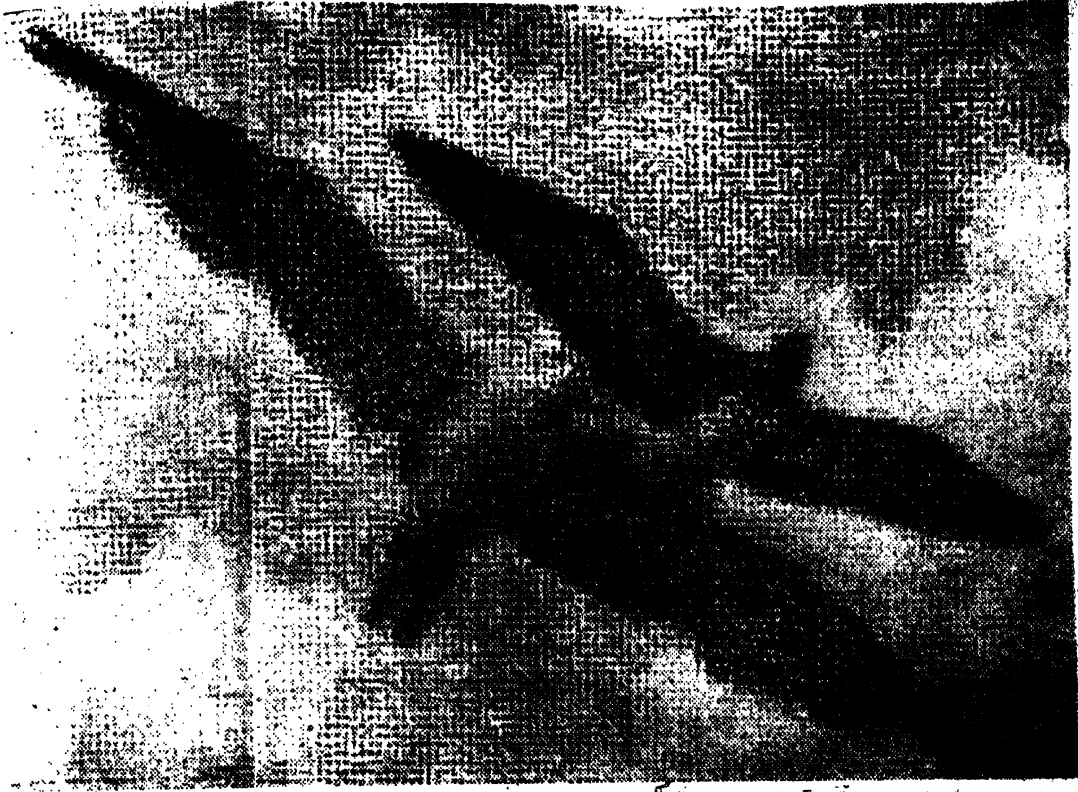
গবেষকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে এই খ্যাতকীর্তি কম্পিউটর ভারতে পৌঁছল। ইতিপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে আরো কম্পিউটর এসেছে—কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সিট-টিউটে, বোম্বাইয়ের টেকনোলজিক্যাল ইনস্টি-টিউটে, থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে। তবে যতো কম্পিউটর আজ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে, বি-ই-এস-এম ৬ সবার সেরা, সবচেয়ে শক্তিশালী ও উন্নত। গত বছরের শেষদিকে প্রথম বি-ই-এস-এম ৬ কম্পিউটরটি সরবরাহ করা হয়েছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একদল ইঞ্জি-নিয়ার ও প্রোগ্রাম-সেটার গিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য।

বি-ই-এস-এম ৬ কম্পিউটরে প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ অপারেশন হতে পারে, তার 'মেমোরি' অতি বিপুল। ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় এই কম্পিউটর যে অতি সহায়ক হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একটি কবিতার লাইন

গাছের পাতায় আমি পুলিসের গন্ধ পাই। এমনি একটি কবিতার লাইন কিছুকাল আগে বিদেশের ইলেকট্রনিক কম্পিউটর থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বহু কবিও এই লাইনটি পড়ে চমৎকৃত হয়েছেন, আমাদের দেশের এক কবি তো এই লাইনটি অবলম্বনে কবিতা পর্যন্ত লিখেছেন। আর কম্পিউটরে আঁকা ছবিও মুগ্ধ করে, বিশেষ করে রঙের বিন্যাসে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার অনুবাদ কম্পিউটরের সাহায্যে হতে আর বিশেষ দেরি নেই। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিসের বদলে রোবোট এসে পড়ল বলে। তাহলে মানুষে ও ইলেকট্রনিক কম্পিউটরে তফাৎ কী? তফাৎ, একজন ফরাসী বিজ্ঞানীর মতে, ইলেকট্রনিক কম্পিউটর মানুষের মতো হাসতে পারে না।

—অয়স্কান্ত

সমুদ্রের অস্থিতে ঝড় ॥

[illegible] বসু

জন্ম অজাতশত্রু স্থিরদৃষ্টি চোখ :
প্রচণ্ড শক্তির বেগ সমুদ্র অস্থিতে,
সম্ভবত যেনো অভিযান
যন্ত্রণা শোষণ থেকে বাঁচার দাবীতে;
অধিকার রক্ষার সংগ্রামে
ক্রোধের আগুনে দগ্ধ
সমুদ্রের শরীরের শিরাগুলি
প্রতিবাদে বার বার ফুঁসে ফুঁসে ওঠে।

দৃষ্টিতে বিস্ময় চোখে শঙ্খচিল দেখে :
সমুদ্রের হাড়ে হাড়ে কী ভীষণ ক্ষোভ!
তীরে তীরে পাহাড়ে প্রান্তরে
কেবলি মৃতের স্তূপ অশরীরী ছায়া;
তবুও আশ্চর্য লাগে কোথাও কখনো
মৃত্যুরে পরোয়া নেই।
অনুক্ষণ অন্ধকারে তরঙ্গ মিছিল।
কারণ অজ্ঞাত নয়;
তাদের মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
সমুদ্রের হৃৎপিণ্ডে মুক্তির নিশান,
স্বাধীন সত্তার চিহ্ন স্থির প্রতিশ্রুতি।
আত্মার বিজয় গান পাখা মেলে যায়,
আর তার দেহ দোলে গর্বের হাওয়ায়।

অব্যক্ত ॥

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

দূর তাকে ডেকে এনো
শুধু একটি কথা :
সকালে প্রার্থনা করেছি
আপনার জন্য,
কিন্তু আমি কে? কেন?
আমার জন্য প্রার্থনা।

কত পথ হেঁটে
কত দেশ ঘুরে
কত প্রান্তর নদী উপনদী
পাহাড় সমুদ্র পেরিয়ে
মরু প্রান্তর আর অন্ধকার কান্তার ছাড়িয়ে
কত দিন মাস বছর পরে
কোথায় আমি এলাম,
এ কোথায়?

স্বর্ণ-শিখর প্রান্তের উপমা জানি না
শুধু চিনি শহরের মাটি, পল্লীর ছায়া
শান্ত নির্জন স্বচ্ছ উজ্জ্বল :
কত যুগ ধরে
যে পথপ্রান্তের জন্যে
যে মাটির উদ্দেশে
আশ্রয়ের নিশ্চিত ইংগিতে
কাকে যেন খুঁজছি,
খুঁজছে আমার খেয়ালী মন,
বিবাগী আশা।

তাই আজ আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি
এ কি সেই আমার ভবিষ্যৎ
কত জন্ম জন্মান্তর ধরে
যে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে আজনে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় অমলিন ॥

ফিরোজ চৌধুরী

ফুলের নামে তোমার নাম বলে প্রিয়তর দ্বিতীয় ফুল ছুঁতে পারি না
ফুলের নামে তোমার নাম বলে তোমার পায়ে সমস্ত আকাশ
ভেঙে পড়ে
তোমার মুখে ডিমের কুসুমের মত রৌদ্রালো ছড়িয়ে থাকে
তোমাকে দেখতে দেখতে তাৎক্ষণিক সুখে আমি শুচিস্নাত হই
তুমি কি জানতে পারো
সেখানে অপসৃয়মান মরচে-পড়া সব স্মৃতি কেমন গলে যায়!

জন্মান্ধ আমি, অবরুদ্ধ এতকাল কণ্টকিত কৃপণ উদ্যানে
মুহূর্তে বিশ্বাসী হয়েও আকৈশোর হিম পিপাসার্ত
তুমি আমায় চক্ষুষ্মান করে দাও
আলোর সন্ধানী সুদক্ষ ডুবুরী আমি
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তোমার দিকে অমলিন হাত বাড়িয়ে...
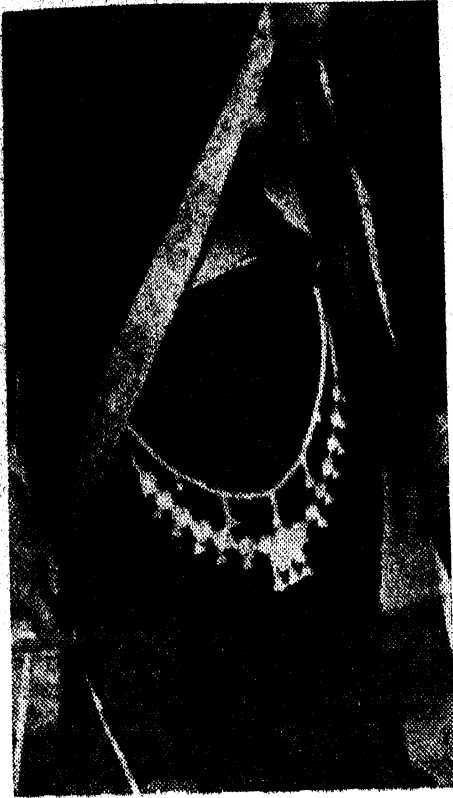
অঙ্গশোভা

অলংকার নারীর যেমন সৌন্দর্য তেমনি সম্পদ। এমন এক দিন ছিল যখন মানুষ ছিল গুহাবাসী, পশুপক্ষী, ফলমূলেই ছিল তখন তার প্রধান আহার্য। বনের জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বাঁচতে হতো। তখন হয়তো কোথাও কোথাও মূল্যবান সোনা, রূপা বা মণি-মুক্তা থাকলেও তার ব্যবহার তারা জানতো না।

তারপর এক সময় মানুষ লোহা ও আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। আরও শিখেছিল অস্থি ও ধাতুর ব্যবহারের মধ্যে সর্বপ্রথম লোহা দিয়ে নিজেদের সাজাতে। বহুবর্ণের ও বিচিত্র ধরনের পালক দিয়েও তারা মাথায় অলংকার শোভিত করেছে। যার ব্যবহার আজকের দিনেও কোনো কোনো পার্বত্যজাতির মধ্যে দেখা যায়।

অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য বা সহজলভ্য নানাবিধ জিনিস দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিজেদের সাজিয়েছে। সহজলভ্য দ্রব্যের মধ্যে শাঁখের চলন আমাদের দেশে বহু পুরানোদিনের। শাঁখ আর লোহা যত পুরানোদিনের হোক আজকের সুসভ্য যান্ত্রিক যুগের মেয়েদের হাতে লোহা আর শাঁখা এক অপরিহার্য অলংকার।

কতদিন আগে মানুষ এই অলংকার ব্যবহার করতে শিখেছিল তার সঠিক সময় হয়তো নির্দেশ করা যায় না। খৃঃ পূঃ আড়াই কি তিন হাজার অথবা আরও পুরানো খৃঃ পূঃ চার হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতায় যে ধাতু-নির্মিত নৃত্যরত নারীমূর্তি দেখতে পাই তার বাঁ হাত কনুই থেকে সম্পূর্ণ অলংকারে আবৃত। এছাড়া খননকার্যের দ্বারা অনেক অলংকার আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ ছাড়া, সে যুগের মেয়েদের মাথায় ত্রি-পত্রাকৃতির এক ধরনের অলংকারের চলন ছিল। আসলে যুগে যুগে মেয়েরা সাজতো, সাজতে ভালবাসতো।

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে মেয়েদের অলংকার ব্যবহারের দিকে যে ঝোঁক ছিল আজ বিংশ শতকেও তার কমতি নেই। নানারকম সামাজিক বিশৃংখলায় এখন মেয়েরা আর পূর্বের মত গয়না পরতে ঠিক সাহসী নয়। এমন এক দিন ছিল যখন মেয়েদের দেহে ভারী ভারী গয়না শোভা পেত। আর এই বহুমূল্য গয়নাই ছিল সামাজিক মানমর্যাদার অনেকখানি মাপকাঠি। বেশী গয়না পরলে এখনও ঝোঁক আছে 'জমিদার গিন্নী' বলে রসিকতা করার। রাজা-রাজড়া বা জমিদাররা এখন আর নেই, নেই তাঁদের সেই সম্পদ। সেই সংবাদে গয়নার চলন থাকলেও ওজনে আজ আর তা সেই পুরানো দিনের মত নেই।

রুচিরও এখন অনেক বদল হয়েছে। হালকা অথবা সরল অলংকরণের অলংকারের দিকেই সকলের নজর। অলংকারের চলনে ঘুরেফিরে সেই প্রাচীনাদের জিনিসই নতুন আকারে আসছে। নাকের অলংকারের দিকে আধুনিকা তন্বীদের নজর অত্যধিক। এটা সাজসজ্জার এক বিশেষ অঙ্গ।

প্রাচীনকালে খুব সম্ভবত নাকের কোনরকম অলংকারের চলন ভারতবর্ষে ছিল না। আবার কোন সময় থেকে যে এর প্রচলন হল তা সঠিক বলা যায় না। নাকের অলংকার সম্বন্ধে নানারকম সংস্কার আমাদের দেশে রয়েছে। প্রবীণারা বিবাহিতাদের নাকে সোনা থাকা শুভ মনে করেন। প্রবাদ আছে কোন মহিলার সন্তান জন্মানোর পর পর যদি তাদের মৃত্যু হয় তবে সেই মহিলারা নবজাতককে সূতিকা-ঘরেই ডান দিকের নাক বিঁধিয়ে সোনা, রুপো বা লোহার মাকড়ি—পরিয়ে শিশুর জীবন রক্ষা করতেন। কান বিঁধবারও এরকম একটি চলতি প্রবাদ আছে। নাকের অলংকারের মধ্যে নথ, মাকড়ী, বেসর, নোলক, বোন্দা প্রভৃতির ব্যবহারই সবচেয়ে বেশী।

আধুনিক দক্ষিণ ভারতীয় ও বাঙালী মহিলারা সাধারণত হালকা ধরনের নাকের গয়না পরে থাকেন। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে কেউ কেউ জবরজং নাকের গয়নাও ব্যবহার করেন। তিলফুলের মত নাকে একখানা পোখরাজের ঔজ্জ্বল্য চেহারার জৌলুষ কতখানি বাড়ায় সৌন্দর্যরসিকমাত্রই অবগত আছেন। হিন্দুস্থানী মহিলারা একাধিক ভারী ভারী নাকের গয়না পরতেই ভাল-বাসেন। মাঝখানে কিছুদিন বাঙালী মেয়েরা নাকের এই গয়নাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিলেন। হালে আবার এর কদর বেড়েছে। ফলে ফুটোবিহীন নাকের অধিকারিণীরা নকল পরেই আসলের সখ পূরণ করছেন।

কানের অলংকারের মধ্যে ঢেঁড়ী, মাকড়ী, পাশা, ঝুমকা, কান, কানবালা, চৌদানী, কর্ণফুল, বীরবোলী, পিপুল-পাতা দুল, চাঁপা ,কানপাশারই আদর ছিল একসময়ে সবচেয়ে বেশী। এখনকার মেয়েরা কানে মাকড়ী ব্যবহার করতে বেশী ভালবাসে। চাঁপা দুলের চলনও দিনকে দিন বেড়ে চলেছে।

বঙ্গললনার পাঁচনলী, সাতনলী আর হাঁসুলী হারের গল্প লোকের মুখে মুখে ফেরে। মটরমালা, চিক্, বাইচুড়ী, পদক প্রভৃতি গলার গয়না। বাইচুড়ী, সীসেতে তৈরী। এটা আকারে গোল ও ছোট। প্রবাদ আছে শিশুদের গলায় বাইচুড়ী থাকলে আর শিশুরা তা চুষলে কোনরকম রোগ তাদের আক্রমণ করতে পারে না। বাইচুড়ীর চলন আজকাল প্রায় একরকম উঠে গিয়েছে।

গলায় ভারী ভারী গয়না পরার সখ অবাঙালীদের মধ্যে এখনও খুব দেখা যায়। খড়ের তৈরী জমকালো হার ভীল মেয়েদের অতি প্রিয়। এ ছাড়া ভীল মেয়েরা বালা, ব্রোঞ্জের পাইজর, হার, তামা, সীসা বা ব্রোঞ্জের মাথার অলংকার ছাড়াও সুপারী ও বাদাম, খড়, ঘাস এবং রুপোর তৈরী নানাবিধ অলংকারে নিজেদের সব সময় ঝলমলে করে সাজিয়ে রাখে। অন্যান্য-পার্বত্য জাতির মধ্যে ভীলদের রুচিবোধ বেশ লক্ষ্য করা যায়। সাধু, সন্ন্যাসীর রুদ্রাক্ষের মালা বাঙালী আধুনিকাদের এখন কণ্ঠহার।

মণিপুর ও ত্রিপুরার উপজাতিরা তাদের মূল্যবান অলংকার তৈরী করে ময়ূর ও অন্যান্য পাখির পালক দিয়ে। শিঙের তৈরী মস্তকের অলংকার একটি সুন্দর শিল্পের নিদর্শন। উপজাতিদের চিরুনির সঙ্গে শাঁখ ঝুলে থাকার বাহার সুসভ্য মানুষের গয়নার চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়।

বাংলাদেশে নানারকম শিরোভূষণের চলন রয়েছে। এমন দিনও ছিল যখন ছোট ছোট মেয়েরা, কৌয়েরা খোঁপা বেঁধে তাতে বড় বড় পুঁটে লাগাতো। পুঁটে দেখতে ও আকারে অনেক সময়েই মল্লিকা ফুলের কুঁড়ির মত। আর্থিক সঙ্গতি হিসেবে পুঁটে সোনা, রুপো প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী হতো। অনেকে আবার বিনুনি বেঁধে তার নীচে একটা সুদৃশ্য পুঁটে লাগাতো। অল্পবয়স্ক মেয়ে ও যুবতী মেয়েরা বিয়ে বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে সিঁথি-মউড় পরতো। কপাল ওপর ঘেরে, সিঁথি ঢেকে সিঁথি-মউড়ের চলন আজকেও আছে। তবে তা সামান্যই। এই সিঁথি-মউড়ের মাঝে মাঝে লাল, সবুজ পাথর বসানো হতো, কখনো সখনো ধারে ধারে নীচের দিকে মুক্তোর ঝালর ঝুলতো। ঠিক কপালের মাঝখানে থাকতো ধুকধুকী। বিনুনিতে জড়াবার জন্য সোনা বা রুপোর জিঞ্জির ও খোঁপায় লাগাবার গুঞ্জীকাটি, নানাপ্রকার ফুল ও প্রজাপতি এবং চিরুনিতে সোনার পাতের কাজ সমধিক প্রচলিত ছিল। এখন খোঁপায় সোনার গয়নার পরিবর্তে কাপড় বা প্লাস্টিকের অথবা তাজা ফুল দেবার চলন হয়েছে। কবরীতে ফুল দেবার প্রচলন সেই সুপ্রাচীন কাল হতে চলে আসছে।

পায়ের অলংকারে নূপুর আর মলের প্রচলন প্রাচীন দিনের। বাঁকমল, গোলমল, পাইজোর, চরণপদ্ম বেঁকী, ঘুঙুর সাধারণত ছোটদের পায়েরই অলংকার। বাঙালীরা পায়ে রুপোর গয়না পরে থাকে। কিন্তু রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে পায়ে সোনার গয়না পরার চলন আছে। বর্ধমান, বীরভূম, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা এখনও পায়ে বাঁকমল পরে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

সাতদিনের শুভাশুভ

১৭ই মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত যে সপ্তাহ, সেই সময়ে প্রতিটি জন্ম-রাশির শুভাশুভ লক্ষণগুলো সাধারণভাবে নীচে দেওয়া হলো :

গ্রহ সন্নিবেশ—মঙ্গল মকরে প্রবেশ করছে। রবি ও শুক্র কুম্ভ থেকে মীনে প্রবেশ করছে। বুধ কুম্ভে আসছে। বৃষে শনি। মকরে বৃহস্পতি। ধনুতে রাহু, মিথুনে কেতু। চন্দ্র বৃহস্পতিবার সকালে কর্কটে এবং শুক্রবার বিকেলে সিংহে যাচ্ছে। গ্রহাদির স্থান পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকার ফলপ্রাপ্তিতে কিছুটা হেরফের হচ্ছে।

মেষ : মানসিক চাঞ্চল্য, শারীরিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। অবশ্য কাজকর্মে সাফল্য ও সুনামের সম্ভাবনা প্রবল। আর্থিক দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসায়ে শত্রুরা ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখগুলো : ১৯, ২০, ২১ মার্চ।

বৃষ : পারিবারিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। শরীর ভাল। ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বেগ থাকবে। আয় ভাল। কিন্তু ব্যয়াধিক্যের চাপ প্রবল। ব্যবসা শুভ। কর্মক্ষেত্রে নতুন শুভ যোগাযোগ আশাপ্রদ ফল দেবে। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখগুলো : ১৯, ২০, ২১, ২২ মার্চ।

মিথুন : বিভিন্ন কাজকর্মে আলস্য ও হতাশার ভাব ক্রমশ কাটবে। পারিবারিক ও শারীরিক ক্ষেত্র অনুকূল। আর্থিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। ব্যবসায়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। কাজকর্মে মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেয়েদের শরীরটা একপ্রকার। শুভ তারিখগুলো : ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৩ মার্চ।

কর্কট : কাজকর্মে নতুন যোগাযোগের অনুকূল ফল পেতে পারেন। শারীরিক উৎপাত, মানসিক ভীতি, শত্রুতাজনিত চাঞ্চল্য ঘটতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। আয় মন্দ নয়। ব্যবসায়ে শত্রুতার সম্ভাবনা। সামান্য অর্থকষ্টের আভাস আছে। কাজকর্ম শুভ। মেয়েদের পারিবারিক উন্নতির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখগুলো : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ মার্চ।

সিংহ : আর্থিক উন্নতির লক্ষণ থাকলেও ব্যয়াধিক্যের চাপ প্রবল হতে পারে। ব্যবসায় চলনসই। শরীর ভাল। পারিবারিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। কাজকর্ম অনুকূল। মেয়েদের পক্ষে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। শুভ তারিখগুলো : ১৭, ১৯, ২০ ২১, ২৩, ২৪ মার্চ।

কন্যা : কাজকর্মে যতই বাধা আসুক না কেন আপনার পক্ষে আশাপ্রদ ফল আসবে। ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। শারীরিক ক্ষেত্র চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্র সুবিধার নয়। মেয়েদের শরীরের ব্যাপারে যত্ন নেওয়া কর্তব্য। শুভ তারিখগুলো : ১৮, ১৯, ২০, ২২ মার্চ।

তুলা : শরীর মন্দ নয়। পারিবারিক বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। আয় মন্দ নয়। ব্যবসায় শুভ। কিন্তু শত্রুতা, কলহের ফলে কাজকর্মে, ব্যবসায়ে আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা বিঘ্নিত হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রেম-প্রীতির ব্যাপারে অস্বস্তির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখগুলো : ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ২১ ২২ মার্চ।

বৃশ্চিক : বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্বস্তির ফলে মানসিক কষ্ট ভোগের লক্ষণ আছে। আর্থিক দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসায় চলনসই। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। শরীর একপ্রকার। কর্মক্ষেত্র গতানুগতিক। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখগুলো : ১৭, ২০, ২২ মার্চ।

ধনু : বিভিন্ন কাজে ব্যর্থতা ও বাধা আপনাকে বিব্রত করতে পারে। কিন্তু অসুবিধাগুলো ক্রমশ কেটে যাবে। শরীর একপ্রকার। পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে ঝামেলা ক্রমশ কমবে। আয় মন্দ নয়, ঋণশোধের চাপ পড়বে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখগুলো : ১৭, ১৯, ২০, ২৩ মার্চ।

মকর : শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি থাকবে। যানবাহনে চলাচলকালে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। ব্যবসায় শুভ। আর্থিক ক্ষেত্রে ঋণ-শোধ বা ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধির যোগ আছে। মেয়েদের আচরণে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখগুলো : ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ মার্চ।

কুম্ভ : কাজকর্মে চাকরীতে শুভ ফল পাবেন। আর্থিক দুশ্চিন্তা চলবে। ব্যবসায় অনুকূল। শরীর ক্রমশ ভাল। মেয়েদের পক্ষে শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। শুভ তারিখগুলো : ১৭, ১৮, ২২, ২৩ মার্চ।

মীন : কাজকর্মে সুখ্যাতি ও সাফল্যের যোগ প্রবল। আয় ভাল। কিন্তু ব্যবসায় সুবিধার নয়। শরীর চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। শুভ তারিখগুলো: ১৮, ১৯, ২০ মার্চ।

প্রশ্নের উত্তর

এ সপ্তাহে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু হোল। পত্রলেখক-লেখিকাদের একটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। চিঠিতে জবাব পাঠানো হবে না। অমৃতের স্বপনের

অনেকে যেসব প্রশ্ন আসছে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর অমৃতেই প্রকাশ করা হবে। প্রশ্নের জবাব ক্রমান্বয়ে দেওয়া হচ্ছে :

আনন্দ কুণ্ডু: ব্যবসাতে আপনি ভাল ফল পাইবেন। ১৭ই মার্চ পর্যন্ত সময় খারাপ।

মনোজ সেনগুপ্ত (নৈহাটি) : আগামী পরীক্ষায় পাশ করিবেন। ১৯৭৩ সালে চাকুরী পাবেন।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় : ২৭ অথবা ২৯ বৎসর বয়সে বিবাহযোগ। বিবাহিত জীবন মধ্যমপ্রকার।

দীপ চ্যাটার্জি (চম্পাহাটি, ২৪ পরগণা) : স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। বিবাহ ২৪ বর্ষ বয়সে।

সুজয় বিশ্বাস : ১৯৭৪ সালে পদোন্নতি ও বাতরোগের উপশম হবে।

মিস্ বি. ব্যানার্জি (কলকাতা) : ১৩৮০ সালে বিবাহ হবে। বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব।

শ্রীমতী রমা পাঠক : আপনার জন্ম-সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

দেবকুমার মুখার্জি : ১৯৭৩ সালে স্বাস্থ্য ক্লেশ ও লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটাবে।

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান) : ১৯৪৭ সাল ১১ই এপ্রিল। ১৯ নক্ষত্র।

কল্পনা ভক্ত চৌধুরী : ভাগ্য মোটের উপর ভাল। ৬৮ বৎসর।

পূরবী দাস (বরানগর) : বিবাহে প্রবল বাধা। ৩৭ বর্ষ বয়সে বিবাহ হতে পারে।

সুগত মুখোপাধ্যায় : ১ম বিভাগে পাশ করার যোগ আছে।

প্রণব সেনগুপ্ত : ৪৮ বর্ষ বয়সে উন্নতি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে।

নির্মলেন্দু সেনগুপ্ত (কলি-৪৯) : জন্ম-সাল পাঠাবেন। একাধিক ব্যক্তির প্রশ্ন পাঠাবেন না।

অনুপ গুহ : জন্ম-সাল তারিখ ও সময় পাঠাবেন।

নরেন গিরি ও অমিতা গিরি : আগামী সন্তান পুত্র হবে।

নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য (কাছাড়) : ১৯৭৩ সালে চাকুরী পাবেন। কিন্তু স্বাধীন বৃত্তিতে উন্নতির যোগ বেশী।

দেবীপ্রসাদ দে : ১৯৭৫ সালে কর্ম-প্রাপ্তি ও স্থানান্তর গমন।

নীলা সেন : ২২ বর্ষ বয়সে বিবাহ সম্ভাবনা প্রবল।

অতুল পাল (নদীয়া) : সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন না। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি।

শ্রীমতী বসুরায় (হাওড়া) : আগামী বৈশাখ হইতে শ্রাবণের মধ্যে বিবাহ সম্ভাবনা।

বিবেক মৈত্র (বাঁকুড়া) : ৬৯ বৎসর।

কাজল গঙ্গোপাধ্যায় (যাদবপুর) : ২৮ বৎসর পর্যন্ত খারাপ। নীলা এবং প্রবাল রত্ন ধারণ করা উচিত।

নিশীথ মজুমদার (হুগলী) : ২৫ বৎসর বয়সে চাকুরী লাভ হবে।

প্রফুল্লকুমার দাস (হাওড়া): বৃষ রাশি।

দিলীপ কুণ্ডু (আসানসোল) : ২৭ বর্ষ বয়সে বিবাহ। কিন্তু হবে কিনা সন্দেহ।

অসীম ব্যানার্জি (ঢাকুরিয়া) : ১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে চাকরী পাবার সম্ভাবনা।

শ্রীমতী চন্দ্রা চ্যাটার্জি (শংকচর) : জন্ম সাল জানাবেন।

সোমনাথ গোল (কলি-৫৩) : জুন মাসের ভিতর বদলীর সম্ভাবনা আছে।

নরেশচন্দ্র দেব (আসাম) : ৫৪ বর্ষ বয়স পর্যন্ত অশুভ সময়। আগামী এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের ভিতর প্রাপ্য কিছু টাকা পেতে পারেন।

শ্রীমতী জয়শ্রী বসু : আগামী বৎসর বিবাহ সম্ভাবনা প্রবল।

শ্রীমতী দুর্গা দাস : আগামী বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের মধ্যে বিবাহ।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী (বিলাসপুর) : আগামী এপ্রিল থেকে জুনের ভিতর দাম্পত্য শান্তি ফিরে পাবেন। বোধ পরিবারে থাকা হবে কিনা সন্দেহ।

দিলীপ দত্ত : ৮ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত রাহু-মঙ্গল-শনির অশুভ থাকায় মানসিক দুশ্চিন্তা ও বিপদাশঙ্কা আছে। শিক্ষাজীবনে বহু বাধা আসবে।

ইরা মিত্র : সিংহ লগ্ন। এবছর পাশের যোগ প্রবল।

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : দ্বিতীয় সন্তান পুত্র হবার সম্ভাবনা। জুন মাসে শিক্ষা বিষয়ে আশানুরূপ ফল হবে না।

ছন্দা নাগ (হুগলী): ১৮ই মার্চ থেকে মে মাসের ভিতর পাবেন।

উৎপল রায় (হুগলী) : ১৯৭৩ সালের মে থেকে ১৯৭৪ সালের মে মাসের মধ্যে হবার সম্ভাবনা।

অমল দত্ত : শনির দশায় শনির অন্তরে বাধাপূর্বক বিবাহ। আগামী জুনের মধ্যে যোগ।

গৌতম রায় (মেদিনীপুর) : কুপন পাঠাবেন।

তরুণকুমার দাস : যে বিষয়ে পড়াশোনা চলছে তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা।

সুকুমার সরকার : ব্যবসায় উন্নতি। এপ্রিল-মে মাসে চাকরী পাবার সম্ভাবনা।

সৌরেন্দ্রনাথ দাস : আগামী বৎসর আপনার শুভ। মানসিক অশান্তি অনেকাংশে কম।

—শুভাচার্য

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ... ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ... ...

আপনার প্রশ্ন ... ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায়]

যদুবংশ।
অপর্ণা সেন এবং উত্তমকুমার।
পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

কোশিশ (হিন্দী)

উত্তম চিত্র-এর পতাকাতলে এন. সি. সিপ্পী নিবেদিত এবং গুলজার লিখিত ও পরিচালিত 'কোশিশ' নিঃসন্দেহে হিন্দী ছবির সাধারণ ধারার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বোবা ও কালা মেয়েকে কেন্দ্র করে যে-কয়েকটি ছবি আমরা দেখেছি, তাদের মধ্যে আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'জনি বেলিণ্ডা' (নায়িকা জেন ওয়াইম্যান ১৯৪৮এ অস্কার পেয়েছিলেন), 'তথাপি' (১৯৫০-এ মুক্তিপ্রাপ্ত) ও 'শ্যামলী' (১৯৫৬-তে মুক্তিপ্রাপ্ত)। কিন্তু বোবা ও কালা তরুণ-তরুণীকে রোমান্টিক নায়ক-নায়িকারূপে আমরা ইতিপূর্বে একখানি মাত্র ছবিতেই দেখেছি; সেটি হচ্ছে ১৯৬৫ সালে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত জাপানী ছবি 'হ্যাপিনেস অফ আস্ অ্যালোন।'

জানিনা, শ্রীগুলজার এই জাপানী ছবিটি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই 'কোশিশ'-এর কাহিনীটি রচনা করেছেন কিনা। তবে কালা ও বোবা তরুণ-তরুণীকে নায়ক-নায়িকারূপে কল্পনা করে হিন্দী তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে কাহিনী রচনা এই প্রথম। এবং মাত্র এরই জন্যে শ্রীগুলজার আমাদের অভিনন্দন লাভের যোগ্য। নায়ক ও নায়িকার—হরি ও আরতির দেখা হয় দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে। এর পরে আর একদিন কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অসভ্য ব্যবহারের হাত থেকে হরি আরতিকে রক্ষা করে ওর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসে। আরতি হরির প্রতি কৃতজ্ঞ। সাইকেল চেপে খবরের কাগজ ফিরি করাই হরির কাজ। লেখাপড়ার প্রতি হরির প্রচুর আগ্রহ। মূক-বধির বিদ্যালয়ে গিয়ে ও কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে। ও আরতিকেও ঐ বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করে। ওর সঙ্গে আরতির ঘনিষ্ঠতা দুর্বৃত্তদের সহ্য হয় না। তারা ওর সাইকেলটি চুরি করে। ফলে খবরের কাগজ ফিরি করবার কাজটি ওর যায়। কিন্তু হরি দমবার পাত্র নয়। ও জুতো বুরুশের কাজ শুরু করে। ক্রমে ও একটি ছাপাখানায় কাজ পায়। নিজের চেষ্টায় ও ক্রমেই উন্নতি করতে থাকে। ইতিমধ্যে আরতির সঙ্গে ওর বিবাহ হয়েছে। আরতির কোলে এসেছে একটি ফুটফুটে ছেলে। এবং ওদের আশংকাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সে দিব্য শুনতে পায়। কাজেই তার বোবা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আরতির দুর্বৃত্ত ভাই কানুর অপরাধপ্রবণতা ওদের শিশুসন্তানটির মৃত্যুর কারণ হয়। স্বাভাবিকভাবেই ওরা শোকাচ্ছন্ন হয়। তবে দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ওরা সুখের মুখ দেখতে শুরু করে। ওদের ছেলেটি স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে হোস্টেলে থেকে ভালোভাবে পড়াশুনা করতে থাকে। হরির উপরওয়ালার ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে; কিন্তু সে মূক-বধির। তিনি হরির ছেলের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করেন। এতেই ওঠে তুমুল ঝড়। ছেলে একদিকে, বাবা অপরদিকে। এই ঝড়ের সুষ্ঠু সমাপ্তিতেই ছবির সমাপ্তি।

কোনো কথা নয়; শুধু চোখে চোখে, আকারে ইঙ্গিতে, মুখের মৃদু হাসিতে প্রেম—যে-কোনও দর্শকের কাছে অভিনব ও হৃদয়স্পর্শী। আরতির ভাইয়ের কি দুর্বৃত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল? ওরা মূক ও বধির। ওদের প্রথম শিশু সন্তানের মৃত্যুকে ঢের স্বাভাবিকভাবেই—মাত্র ওদের মূক-বধিরত্বের কারণে—ঘটানো যেতে পারত এবং তা হত আরও ট্র্যাজিক।

আরতিকে শিশুপুত্রের বিয়োগ-ব্যথা ভোলাবার জন্যে হরির নানারকম চেষ্টাকে অবলম্বন করে ছবির মাধুর্য অনেক বেশী বর্ধিত করবার সুযোগ ছিল। দেখানো যেতে পারত, দ্বিতীয় পুত্রকে মানুষ করতে আরতি ও হরির একযোগে কষ্টস্বীকার, বাপ-মা মূক-বধির বলে সহপাঠীদের কাছে ওদের সন্তানের লাঞ্ছনা, তার তীব্র প্রতিবাদ, মাঝে স্কুল ছেড়ে দেবার ইচ্ছা, কিন্তু মায়ের বা বাবার আগ্রহে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বহু কিছু আরতি ও হরির জীবনকে জড়িয়ে দেখানো যেত। তবে শ্রীগুলজার যে গতানুগতিকতাকে ত্যাগ করে ছবি তৈরী করছেন একের পরে এক, হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে তা যেন পথপ্রদর্শনকারী দীপশিখার মতো কাজ করে।

অভিনয়াংশেও নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া গেছে আরতি ও হরির মূক-বধির চরিত্রে যথাক্রমে জয়া ভাদুড়ী ও সঞ্জীবকুমারের মনোভাবপ্রকাশক অঙ্গ ও মুখচোখের ভঙ্গীর মাধ্যমে। নায়িকার মায়ের ভূমিকায় ঊর্মিলা ভাট চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, হরির উপরওয়ালার সুশ্রী মূক-বধির কন্যা, উপরওয়ালা, হরির দ্বিতীয় ছেলে প্রভৃতি ভূমিকার শিল্পীরা আকর্ষণীয় অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের মধ্যে ফুজিরংয়ে চিত্রগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কে. বৈকুণ্ঠ ফুজি রংয়ের কাঁচা ফিল্মে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ছবির পরিচয়লিপি বা ক্রেডিট টাইটেলের পশ্চাদপটে মূক-বধিরের ইঙ্গিতময় অঙ্গুলিসংকেত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ছবির আবহ-সংগীত রচনায় মদনমোহনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

উত্তম চিত্রকৃত, এন-সি সিপ্পী প্রযোজিত এবং গুলজার লিখিত ও পরিচালিত 'কোশিশ' মূক-বধিরের প্রেম-ভালোবাসা, দুঃখবেদনার প্রতিচ্ছবি হিসেবে একটি অভিনব চিত্রকথা।

ধুন্দ (হিন্দী)

বি. আর. ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত, বি. আর. চোপরা প্রযোজিত ও পরিচালিত ইস্টম্যানকলারে নির্মিত 'ধুন্দ' হচ্ছে একটি রহস্য-চিত্র। পাহাড়তলীর এক জনবিরল স্থানে কুয়াশাভরা রাতে এক দ্রুতগামী মোটর এক গাছে ধাক্কা খায়। আরোহী অচল মোটরটিকে চালাতে অক্ষম হয়ে আশ্রয়ের এবং টেলিফোনের সাহায্যেরও সন্ধানে এক অট্টালিকার সম্মুখীন হয়। খোলা প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে টর্চের আলোক সাহায্যে সে যে-ঘরে এসে উপস্থিত হয়, সে-ঘরে দেখা যায়, এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ক্ষণপূর্বেই। আরও দেখা যায়, একটি রিভলবার হাতে এক তরুণী দাঁড়িয়ে। তরুণীটি বলে—সেই হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তি তার স্বামী। ইচ্ছা করে হত্যা করেনি, ধস্তাধস্তিতে হঠাৎ গুলি ছুটে গেছে। মোটরের আরোহী রাণী সিংকে পরামর্শ দেয়—কি কৌশলে হত্যার অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তারই। কিন্তু তার কথামতো কাজ করবার পরে যখন পুলিশ তল্লাসী শুরু করল, তখন 'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুলো'; শোনা গেল, সুরেশ নামক এক আইনজীবীর সঙ্গে রাণীর ছিল অবৈধ প্রণয় এবং মৃত রঞ্জিৎ সিংহ পঙ্গু অবস্থায় হুইল-চেয়ারে বসে তাদের এই প্রণয়লীলা দেখে অতিষ্ঠ হয়ে ওদের দুজনকেই হত্যা করতে চেয়েছিলেন। শিকারী রঞ্জিৎ সিংহের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ, উড়ন্ত পাখীকে তিনি অনায়াসেই ধরাশায়ী করতে পারতেন। সাক্ষ্যপ্রমাণে পুলিশ সুরেশকেই রঞ্জিতের হত্যাকারী সন্দেহে আদালতে চালান করে দিল। পাবলিক প্রসিকিউটার প্রমাণ করতে চাইল, প্রণয়ীকে হত্যার অপরাধ থেকে বাঁচাবার জন্যেই রাণী নিজের ওপর ঐ অপরাধের বোঝা নিয়েছেন। কিন্তু আইনজীবী সুরেশ জোর গলায় বলছে—সে এই হত্যা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহলে অপরাধী কি রাণী?—কিংবা আর কেউ? —এর চমকপ্রদ উত্তর পাওয়া যাবে ছবিটি শেষ পর্যন্ত দেখবার পরে, তার আগে নয়।

এই রহস্য চিত্রটিতে রহস্য উপস্থাপিত হয়েছে একটি নবতম আঙ্গিকে। আগন্তুক চন্দ্রশেখর রিভলভারধারী রাণীকে হত্যাপরাধ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে একজন অজ্ঞাতনামার ওপর হত্যাপরাধ চাপাবার জন্যে যে-উপায় বলে দিল, সেই পথ ধরে চলতে গিয়ে যে সব তথ্য প্রকাশ পেল, তাতে আদালত শেষ পর্যন্ত কাকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করে, সেইটিই হচ্ছে রহস্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রযোজক-পরিচালক যে-ভাবে কাহিনীর মোড় ঘুরিয়েছেন, তা দর্শককে চমকিত করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ঐ চমকপ্রদ সমাপ্তিকে [illegible] করে নিয়েছে।

চমকপ্রদ চরিত্রাভিনয় করেছেন ড্যানী রঞ্জিৎ সিংহের চরিত্রে। হুইল-চেয়ারে-বসা, একদা শিকারী, বর্তমানে পঙ্গু রঞ্জিতের ভূমিকায় তাঁর দৃপ্ত, বলিষ্ঠ চরিত্রাভিনয় ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ। ধনীর খাস খানসামা বাঁকেলালের ভূমিকায় দেবেন বর্মা একটি উপভোগ্য চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাট্যনৈপুণ্যের গুণে। আইনজীবী সুরেশের চরিত্রটি যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন, সঞ্জয়-কুমার। আগন্তুক মোটরচালক, চন্দ্রশেখর বেশে নবীন নিশ্চল নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের তেমন কোনও সুযোগ পাননি। নায়িকা রাণীর ভূমিকায় জীনত আমনের কাছে দর্শকদের যে প্রত্যাশা ছিল, তা যদি সর্বাংশে পূর্ণ না হয়ে থাকে, তার জন্যে কাকে দায়ী করব? জীনত আমনকে, না, তাঁর পরিচালক বি, আর, চোপরাকে? বিচারকবেশে নানা পালশিকার তাঁর কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় অশোককুমার (পাবলিক প্রসিকিউটার), মদন পুরী (পুলিশ ইন্সপেক্টর), পদ্মা খান্না ও জয়শ্রী টি (দুই নর্তকী) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের মধ্যে রাত্রিকালে বহির্দৃশ্য গ্রহণে উচ্চাঙ্গের চিত্রগ্রহণপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তর্দৃশ্য গ্রহণেও ক্যামেরা অবস্থান ও চলাচলে যথেষ্ট কৃতিত্ব লক্ষণীয়। শিল্পনির্দেশনায় সন্ত সিং ও সম্পাদনায় প্রাণ মেহেরার কার্যও প্রশংসনীয়। সহীর রচিত গানে রবির সুরযোজনায় কোনো নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বি-আর ফিল্মস নিবেদিত এবং বি-আর চোপরা প্রযোজিত ও পরিচালিত 'ধুন্দ' একটি রহস্যচিত্র হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছে।

—নান্দীকার

মঞ্চাভিনয়

'নক্ষত্রের লম্বকর্ণপালা' : ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে বৃত্তাকারে আলো-ছায়ায় দুলছে অনেক অনুভব...বিচিত্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে অনেক চরিত্রের রূপকার...সামনের দিকে নীচের থেকে উঠে আসছে বিচিত্র পোশাক-পরা দুজন, আবার ওপর থেকে নীচে, হাতে তাদের একটি নিশানা...।

...সে এক অদ্ভুত উন্মাদনাকর দৃশ্য সে এক স্বপ্নময়ের পরিবেশ। স্বভাবতই মনটা এক অজানা, অচেনা, অনাস্বাদিত ভুবনে ডুব দিয়ে এমন কিছু তুলে আনতে চাইছিল, যার ছোঁয়ায় প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি কিছুটা অপসারিত হতে পারে।

...বলছিলাম 'নক্ষত্র' প্রযোজিত 'লম্বকর্ণপালার' কথা। সেদিন রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের অকৃত্রিম আবেগদীপ্ত উচ্ছ্বাসের অংশীদার হয়ে ভাবছিলাম এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা যেখানে সম্ভব সেখানে কেন শুধু [illegible] মূলক নাট্য

চর্চার জন্য বিদেশী নাটকের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়া। প্রশ্ন জাগছিল স্বাভাবিকভাবেই আজকের যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাট্য-প্রযোজনা, তা কি শুধু সাগর পারের নাট্যাঙ্গিকেরই অনুকরণ বা অনুসরণ হবে? রবীন্দ্রনাথের 'ফর্ম' ও 'কন্টেন্ট' তো বিশ্বনাট্য-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ হতে পেরেছে। তবে একথা ঠিক রবীন্দ্র নাটকের প্রযোজনা সবার সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ? যিনি সহজ কথার মালা, প্রাণের ছন্দে গেঁথেছেন, তাঁর নাটক বা পালা? যে 'বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প' তাঁর মন থেকে টলমল করে বেরিয়ে এসেছে, তার প্রাণময়তায় বিভোর হয়েই তো মঞ্চের আলোক অনেক উদ্বেল অনুভূতির আলপনা আঁকা যায়। বলতে কোন দ্বিধা নেই 'নক্ষত্রে'র শিল্পীরা সেদিন 'লম্বকর্ণপালা' পরিবেশন করে এই সত্যটিকেই প্রোজ্জ্বল করে তুলতে পেরেছেন।

পরশুরামের 'লম্বকর্ণপালা' সত্যি 'বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প' করে গড়ে তুলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। যে নিটোল মস্তোকে অবনীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল করেছেন এই পালাতে, তাকেই সবটুকু আবেগে চিরন্তন করে তুলতে পেরেছেন 'নক্ষত্রে'র শিল্পীরা। যে সম্পদ সবার অগোচরে প্রায় অবহেলিতই হয়ে ছিল, তাকে সবার সামনে উপস্থিত করে দেশের সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের সুগভীর নিষ্ঠাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য নিশ্চয়ই তাঁরা প্রশংসার দাবী রাখেন।

প্রযোজনাটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য নির্দেশক শ্যামল ঘোষ যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁকে বার বার সাধুবাদ দিতে হয়। অপেরা ঢংটি তিনি অব্যাহত রেখেছেন, মাঝে মাঝে পুরনো ঢংও, সঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত নাট্য-প্রযোজনার আঙ্গিকের সংমিশ্রণ করে এক আশ্চর্য দীপ্তি এনেছেন সামগ্রিক প্রযোজনায়। প্রয়োগ-পরিকল্পনার এই শৈল্পিক ভঙ্গীটি খুব বেশী চোখে পড়ে না আজকের নাট্যাভিনয়ে।

সমকালীন কোন সমস্যার ওপর ছায়াপাত না করে শুধু ছাগলরূপে লম্বকর্ণকে কেন্দ্র করে যে অনাবিল হাস্যরস ফুটিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, 'নক্ষত্রে'র পরিবেশনায় তা আরো টলমল করে উঠেছে। বেলেঘাটা যাত্রাসমাজের বংশীবদন অধিকারী মশায়ের দলের প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে ব্যানার্জি বাহাদুরের বৈঠকখানা পর্যন্ত সর্বত্রই হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে হাসির কল্লোল। কয়েকটি কম্পোজিসন অসাধারণ হয়েছে। লম্বকর্ণ লাঞ্ছিত নটবর ব্যাণ্ডমাস্টারের ভিক্ষার ঝুলি হাতে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ পরিভ্রমণ সত্যি উপভোগ্য হয়েছে।

এই প্রযোজনার আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণীয় দিক হল গান। অবনীন্দ্রনাথের গানগুলোতে সুর-সংলাপের ব্যাপারেও [illegible] [illegible] [illegible] রুচির পরিচয়

অগ্নিভ্রমর

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক বসু এবং সন্ধ্যা রায়।
পরিচালনা : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

সেদিন দুজনে

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং দেবরাজ রায়
পরিচালনা : অগ্রদূত। ফটো : অমৃত

মেলে। অপেরার ঢংটি অটুট রেখে কয়েকটি গানে কিছু রাগের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। অজিত মুখার্জি, তিনু ব্যানার্জি ও শ্যামল ঘোষের কণ্ঠে 'নটবর', 'নরহরি' ও মিঞাসাহেবের গানগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি শিল্পীই অসাধারণ অভিনয় করেছেন। এবং তাতেই টিমওয়ার্ক অক্ষুণ্ণ থেকেছে। ব্যাণ্ডমাস্টার 'নটবর' ও তার সহযোগী 'নরহরি'র ভূমিকায় অজিত মুখার্জি ও তিনু ব্যানার্জির সরস প্রাণঢালা অভিনয় সত্যি ভোলা যায় না। এমন স্বচ্ছন্দ, সরস ভঙ্গিমার চরিত্রচিত্রণ বহু দিন পরে চোখে পড়লো। রায়বাহাদুর গৃহিণী 'মালিনী দেবী'র ভূমিকায় দাপটে অভিনয় করেছেন স্বাগতা ব্যানার্জি। অমল চক্রবর্তী'র রায়বাহাদুরও একটি বিশিষ্ট চরিত্রচিত্রণ হতে পেয়েছে। 'মিঞাসাহেব' চরিত্রে শ্যামল ঘোষ এক অর্থবান রসিক গ্রাম্য মানুষকে সজীব করে তুলেছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সুরঙ্গমা ঘোষ, মাস্টার টোটন, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রশান্ত রায়চোধুরী, শ্যামল চক্রবর্তী, রজত সেনগুপ্ত, মানস মুখোপাধ্যায়, দেবু বসু, নিতাই দে, অলকেন্দু দে, দেবাশিষ দাশগুপ্ত, নারায়ণ মোল্লা, নারায়ণ দে,

সে যেখানে দাঁড়িয়ে
দীপংকর দে এবং কাবেরী বসু

উমাপ্রসাদ পাকড়াশী, সত্যব্রত গাঙ্গুলী, কালীপদ রায়।

সবশেষে প্রচণ্ড আবেগে বলতে হয় 'মঙ্কদের 'অশ্বকর্ণ পাকা' বহু বার দেখার মত নাটক।

কীর্তিনাশী : ব্যাংক অফ বরোদা (শ্যামবাজার শাখা) রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা কয়েক দিন আগে স্টার রঙ্গমঞ্চে 'কীর্তিনাশী' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। অমরেন্দ্র দাসের কাহিনী অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করেছেন মণি দত্ত। প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে নির্দেশক সন্তোষ মজুমদারের আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। উপভোগ্য এই নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন প্রশান্ত চ্যাটার্জি, কাশীনাথ মুখার্জী, বিজন ব্যানার্জী, সন্তোষ মজুমদার, দেবব্রত সরকার, সিদ্ধার্থ মুখার্জী, উৎপল দাস, রণজিৎ বসু, প্রদীপ্ত ঘোষ, অমল ঘোষ, সুখেন্দু ব্যানার্জী, রণধীর রায়, কানাই চন্দ্র, অনন্ত সন্ন্যাসী, অমিত বসু, বাসন্তী চ্যাটার্জী, হিমানী গাঙ্গুলী ও শিবানী ভট্টাচার্য।

'চিতাভস্ম' : ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড অ্যামুজমেণ্ট ক্লাবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রতি 'রঙ্গনায়' পরিবেশিত হোল জোছু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিতাভস্ম' নাটকটি। রঘুনাথ চক্রবর্তীর সুষ্ঠু নির্দেশনায় নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনাটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁদের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে তাঁরা হোলেন সুনীল ভট্টাচার্য (হাজারী), হরিপদ চক্রবর্তী (কেনারাম), প্রফুল্ল বিশ্বাস (পাগলা), পশুপতি পাহাড়ী (সাধু), কেয়া রায় (সাবিত্রী)। এছাড়া জীবনকৃষ্ণ দত্ত, অভিমন্যু ভৌমিক, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব কুণ্ডু, শৈলেন ঘোষ, বীণা দাস, সবিতা রায়।

'নাটকের সন্ধানে নাটক' : ছদ্মবেশী থিয়েটার ইউনিটের সভ্যরা কয়েকদিন আগে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন মঞ্চে অভিনয় করলেন সুকুমার সেনের 'নাটকের সন্ধানে নাটক' নাটকটি। সুঅভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন তপন চৌধুরী (সামন্ত), সুকুমার সেন (সত্যব্রত), ভূপতি পাইক (বিকাশ), খোকন দেবরায় (ভৈরব), স্বপন চন্দ (সন্তোষ), তপন চক্রবর্তী (বাড়ীওয়ালা), অলক মিত্র (গোয়ালা), রবীন্দ্রনাথ বসু (মিঃ বসু), সরোজ ভট্টাচার্য (শিবতোষ), সবিতা রায় (নন্দিতা)। আলোকসম্পাত নাটকটির গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে কৃতিত্বের দাবী রাখতে পারেন সুশীল দাস।

কলকাতার বাইরে

* কৃষ্ণনগরের 'সংলাপগোষ্ঠী' সম্প্রতি স্থানীয় রবীন্দ্রসদনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীভৎস' নাটকটি পরিবেশন করেন। তুহিন দত্ত নির্দেশিত এই নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন আরাধনা মিত্র, বীণা ভৌমিক, রত্না ভৌমিক, রতন পাল, তুহিন দত্ত, অজয় বিশ্বাস, অলীপ কুণ্ডু, সুশীল দাস, গণেশ সাহা।

মিত্র সম্মিলনী (শিলিগুড়ি) আয়োজিত সারা ভারত একাঙ্ক প্রতিযোগিতা। মিত্র সম্মিলনী আয়োজিত এই একাঙ্ক প্রতিযোগিতা সুরু হবে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে সম্মিলনীর নিজস্ব মঞ্চে। নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হোলো—

(১) বাংলা ভাষায় (মৌলিক রূপান্তর বা অনুবাদ) যে কোনো একাঙ্ক। (২) সময়সীমা একঘণ্টা বা তার কম। (৩) পনেরজনের বেশি প্রতিযোগী কোনো সংগঠনে থাকলে অবশিষ্টের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব সম্মিলনীর নয়। (৪) প্রবেশ মূল্য : (৫) একটি ড্রইংরুম সেট, ফ্লাড লাইট ও মঞ্চ ছাড়া আর যা প্রয়োজন তা প্রতিযোগী সংগঠনকে আনতে হবে। (৬) বিচারকদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ; বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন সম্পাদক—মিত্র সম্মিলনী হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

রঙমহলে "মারীচ সংবাদ" : চেতনা নাট্যসম্প্রদায় প্রযোজিত এবং অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত "মারীচ সংবাদ" নাটকের অভিনয় আগামী ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে।

সত্য মারা গেছে : গত ২ ফেব্রুয়ারী কোর্টস ক্যালকাটা রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে গঙ্গাপদ বসু রচিত 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি কলকাতার স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ক্লাবের সদস্যবৃন্দের সামগ্রিক অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা পায়। বিশেষতঃ শান্তিপদ সোম, দিলীপ সেনগুপ্ত, গণেশ ঘোষ, বোস ও রঞ্জন সুরের অভিনয় বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শিবদাস মুখার্জী।

অন্ধকারে একা : নাট্যকার শক্তিপদর দাসের তৃতীয় নাটক 'অন্ধকারে একা' উপহার দিলেন ২১ ফেব্রুয়ারী মুক্ত অঙ্গন রঙ্গমঞ্চে। নির্দেশনায় ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। পরিবেশন করেন রক্তকরবীর সদস্যরা। শ্রীদাসের অভিনীত চরিত্র সমীর, রবেন্দু ভট্টাচার্যের লোকটা, পাঁচুগোপাল দের বিজয় এবং সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রমোদ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ করে সমীর ও লোকটার অভিনয় সকলের অভিনন্দন কুড়িয়েছে। জ্যোতি কুণ্ডুর আবহ ও মন্টু শীলের আলোক সম্পাত নাটকের ব্যঞ্জনাকে গভীরতর করেছে।

এম-ই-এম-ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'বন্দর' : অফিস ক্লাবের নাট্যপ্রযোজনাও মাঝে মাঝে অভিনয় ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার একটি প্রমাণের পরিচয় সেদিন 'রঙ্গনা'য় চিহ্নিত হোল নাটকের নাম 'বন্দর'। বীরু মুখোপাধ্যায়ের এই জীবনরস সমৃদ্ধ নাটকটি সেদিন মঞ্চের আলোয় নতুন উদ্দীপনা পরিবেশন করলেন এম-ই-এম-ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। বহু প্রশংসিত নাটকটির সামগ্রিক অভিনয়ে যে চূড়ান্ত সাফল্যের সীমায় পৌঁছতে পেরেছিল তা নেপথ্যে শিল্পীদের আন্তরিক ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেছিল নাট

নির্দেশকের শৈল্পিক নিষ্ঠা। প্রয়োগ পরিকল্পনার বহু মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর শ্রীমৌলিক নাটকটির অনেক মুহূর্তেই রাখতে পেরেছেন।

প্রতিটি চরিত্রই শিল্পীদের প্রাণঢালা অভিনয়ে সজীব ও সপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল এবং এতেই নাটকের গতিবেগে এতটুকু শৈথিল্য কোথাও আসে নি। অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই নাম করতে হয় 'অঘোর চৌধুরী'রূপী শ্রীকান্ত দত্ত। চরিত্রটির অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও স্নেহসিক্ত কোমলতা শ্রীদত্তের অভিব্যক্তিতে সম্পূর্ণরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রঘুনাথ মুখার্জির 'সুবিনয় রায়' ও শ্যামল নাগের 'প্রসাদ পালিত' দুটি বৈশিষ্ট্যদীপ্ত চরিত্রচিত্রণ হোতে পেরেছে। 'পিথু' চরিত্রে পরিমল সরকারের উজ্জ্বল ভঙ্গিমা সত্যি মনে রাখার মতো। 'ঝুন্টা' ও 'নান্টু'র ভূমিকায়ও দাপটে অভিনয় করেছেন শঙ্করলাল সাহা ও চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। আর দুটি সরস চরিত্রচিত্রণ হোল হরেকৃষ্ণ কর্মকারের 'অনন্ত মল্লিক' ও দিলীপ সাহার 'সুধাময় সেন'। তরুণ বৈদ্য 'প্রলয়ে'র চরিত্রটিও মোটামুটিভাবে মঞ্চে মূর্ত করতে পেরেছেন। অঞ্জলি ভট্টাচার্যের 'যোগমায়া' ও গীতা কর্মকারের 'জননী' দুটি অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত সৃষ্টি হোতে পেরেছে। 'অপর্ণা'র প্রাণ-মর্মকে অর্পিতা ঘোষ আন্তরিকতার সঙ্গেই মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তুলেছেন। রাণী দেবীর তারাকালীও একটি জীবন্ত চরিত্র হোতে পেরেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন জগদীশনাথ রায় (অনঙ্গ), রঞ্জন গোস্বামী (গোবর্ধন), শঙ্কর মুখার্জি (কেদার ঘোষাল), বিলাস চৌধুরী (পরেশ), বিপিন নাগ (দারোয়ান), ননী-গোপাল দে (ডাক্তার)। মঞ্চসজ্জায় দক্ষতার পরিচয় দেন শ্রীশান্তিপদ ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সার্থক পরিচালনার জন্য শ্রীরমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীতারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখেন।

কালিন্দী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটক সম্প্রতি 'রঙমহল' থিয়েটারে পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন এস-আই-সি-এ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। সুঅভিনীত এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নিতাই মল্লিক, পরেশ-নাথ দে, বিনয় দে, অজিত মালাকার, গোপাল দত্ত, সুকুমার বসু, অজিত নন্দী, হীরালাল ব্যানার্জী, আর. রাধাকৃষ্ণন, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, জনমালি সরকার, সজিত মুখার্জি, ললিতমোহন দত্ত, পার্থ সারথি দাস, শিবু দাস, দীপ্তি ভট্টাচার্য, শিপ্রা দে, নীলিমা চক্রবর্তী, পূর্ণিমা ঘোষ, লক্ষ্মী হালদার।

রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে নাট্যাভিনয় : যাদবপুর মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি উচ্চতর বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতে বিভিন্ন দিনে পরিবেশিত নাট্যাভিনয় একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল। প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান ছাত্রদের পক্ষ থেকে যেসব নাটক এই উৎসবে মঞ্চস্থ হয় তা হোল বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দর', শৈলেশ গুহ-নিয়োগীর 'স্কুল', বনফুলের 'নব সংস্করণ' ও সলিল সেনের 'মৌচোর'।

প্রতিটি নাটকই শিল্পীদের অভিনয়-গুণে মঞ্চে বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 'বন্দর' নাটকে যাঁদের অভিনয় নৈপুণ্য দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তাঁরা হলেন দিলীপ মৌলিক, শ্যামল বিশ্বাস, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়, কাজল চ্যাটার্জী, মালা দাস, দীপালি ঘোষ। 'নবসংস্করণ' নাটকটির প্রযোজনাও দর্শকদের প্রতি মুহূর্তে হিল্লোলিত করেছে। 'মৌ-চোর' নাটকের প্রযোজনায় একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হোল সনাতন মণ্ডলের ভূমিকায় শ্রীসৌমেন চ্যাটার্জীর অসামান্য অভিনয়। তিনি যে একজন প্রথম সারির অভিনেতা অনেক-দিন পরে তা আবার সবার সামনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি সত্যি ভোলা যায় না। নাট্যানুষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে অংশ নেন কালিদাস ঘোষ, বিপুল মজুমদার, চঞ্চল বিশ্বাস, বিশ্বনাথ বোস, অনুপ গুপ্ত, পরিমল সিংহরায়, প্রীতিগোপাল দত্তরায়, নরেশ ঘোষাল, বেলা রায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন ডক্টর রমা চৌধুরী। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রীএস এন চ্যাটার্জী। প্রধান অতিথির আসনে একদিন ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ। উদ্বোধন দিবসে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিনয়ভূষণ গাঙ্গুলী বিদ্যালয়ের ইতিহাস তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেন। উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীরণজিৎ দাশগুপ্ত সংগঠনের ব্যাপারে বক্তৃতা করেন।

রজতজয়ন্তী উৎসবের আর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হোল ছাত্রদের দ্বারা আয়ো-জিত বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনী। এ ব্যাপারে যাঁরা ছাত্রদের জন্যে প্রতিটি মুহূর্তে জ্ঞানময়তা সঞ্চার করেছেন তাঁরা হোলেন শ্রীশংকর দত্ত ও শ্রীসিতাংশু নিয়োগী।

মন্ত্রশক্তি অভিনয় : বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় রংমহল থিয়েটারে আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' অভিনয় করে নতুন করে কালোত্তীর্ণ নাটকের রসস্বাদন করান, অপূর্ব টিমওয়ার্ক, দক্ষ পরিচালনাই ছিল নাটকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নাটক প্রতিযোগিতা : 'হিল্লোল' পরি-চালিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা যোগ-দানের শেষ তারিখ—৩১ মার্চ ১৯৭৩ ঠিকানা—বরুণ দত্ত 'টি হাউস', ২৪০এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪ (৫৫-৫৫৫৮) গৌরমোহন হাজরা, ১৩ রাণী রাসমণি রোড, কলিকাতা-১৩।

বিবিধ সংবাদ

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সাহিত্য সম্মেলন : দেশাত্মবোধক সংগীত পরিষদের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট হলে ২০, ২১ এবং ২২ মার্চ দেশাত্মবোধক সংগীত সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সংগীত, আবৃত্তি, আলোচনা, কবিতা পাঠ, বিভিন্ন দিনের বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত। অনুষ্ঠানে সহযোগিতাকামীরা আহ্বায়ক শ্রীসুদীপ্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে ৭২।১বি, ইব্রাহিম রোড (সঙ্গীতায়ন) কলকাতা-৩২। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনী : ভারতীয় শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগে নিয়মিত শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করেছেন। মাসের দ্বিতীয় শনিবার বাদে অন্যান্য প্রতি শনিবার বিকাল তিনটায় জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগের প্রেক্ষা-গৃহে শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। অবাধ প্রবেশাধিকার।

প্রতিভা সাহিত্য মন্দির : সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল '৭৩। নাম দেবার শেষ তারিখ ৩১ মার্চ '৭৩। প্রতিযোগিতার বিষয় : কণ্ঠ সংগীত—উচ্চাঙ্গ, রবীন্দ্র, লোক ও বাংলা গান (নজরুল অতুলপ্রসাদ, রজনী-কান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) এবং যন্ত্র-সংগীত—গীটার, (লঘু সংগীতের সুর)। যোগাযোগের ঠিকানা : প্রতিভা সাহিত্য মন্দির, 'নীলাদ্রি', আতাবাগান, গড়িয়া, ২৪ পরগণা এবং 'সংগীত প্রতিভা', ৭৬ রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

কেদার রায় অভিনয় : গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ কোলড়া বীণাপাণি ক্লাবের (হাওড়া) সঙ্ঘের ৮৫তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান ও রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সভ্যবৃন্দ কর্তৃক রমেশ গোস্বামীর "কেদার রায়" নাটকটি সঙ্ঘের নিজস্ব মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
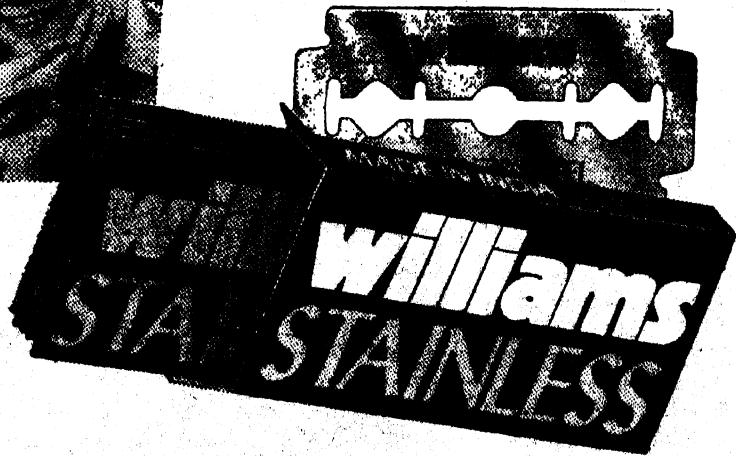
দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

লাহোরে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলাটি নিস্তেজ অবস্থায় অমীমাংসিত থেকে গেছে।

প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের চারটে উইকেট পড়ে ২৭২ রান উঠেছিল। ডেনিস অ্যামিস ১১২ রান করে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ডেনিস বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি—তিনটি টেস্টের ৬টা ইনিংসে খেলে তিনি মাত্র মোট ৯০ রান (গড় ১৫-০০) সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৫৫ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ড এইদিন বাকি ৬টা উইকেটে পূর্বদিনের ২৭২ রানের (৪ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৮৩ রান যোগ করেছিল। শেষ ৫টা উইকেটে উঠেছিল মাত্র ২২ রান।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৪৭ (৫ উইকেটে)। খেলার এই অবস্থায় তারা হাতে ৫টা উইকেট জমা রেখে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৫৫ রানের থেকে মাত্র ৮ রানের পেছনে ছিল। সাদিক মহম্মদ ১১৯ রান করে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সাদিকের এটি ৩য় সেঞ্চুরী। তাঁর আগের দুটি টেস্ট সেঞ্চুরী—১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৩৭ রান (মেলবোর্ণ) এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬৬ রান।

পাকিস্তানের এই ৩৪৭ রানের (৫ উইকেটে) মধ্যে মুস্তাক মহম্মদের ৬৬ এবং আসিফ ইকবালের নটআউট ৭৭ রানও উল্লেখযোগ্য ছিল।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ৪২২ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৫৫ রানের থেকে ৬৭ রানে এগিয়ে যায়। পাকিস্তান তাদের শেষ ৫ উইকেটে মাত্র ৭৫ রান সংগ্রহ করেছিল। পাকিস্তানের আসিফ ইকবাল সেঞ্চুরী (১০২ রান) করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় আসিফের এটি চতুর্থ সেঞ্চুরী। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায়

টনি লুইস
২য় ইনিংসে ৭৪ রান

টনি গ্রেগ
২য় ইনিংসে ৭২ রান

তাঁর সর্বোচ্চ রান ১৭৫ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ১৯৭৩)।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হওয়ার পর বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩০৬ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের জন্যে পাকিস্তানের যেখানে বাকি ১৪৫ মিনিটে ২৪০ রান করার দরকার ছিল, সেখানে তারা জয়লাভের কোনরকম চেষ্টা না করে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১২৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ৩৫৫ রান (এম ডেনেস ৫০, ডেনিস অ্যামিস ১১২ এবং ফ্লেচার ৫৫ রান। পারভেজ ৫৮ রানে ৩ এবং মুস্তাক মহম্মদ ২১ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩০৬ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লুইস ৭৪ এবং গ্রেগ ৭২ রান।

পাকিস্তান : ৪২২ রান (সাদিক মহম্মদ ১১৯, মুস্তাক মহম্মদ ৬৬ এবং আসিফ ইকবাল ১০২ রান।

ও ১২৪ রান (৩ উইকেটে)

করমুক্ত অর্থদান

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন ঘোষণা করেছেন, সরকারী অনুমোদিত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করলে তা দাতার দিক থেকে আয়করমুক্ত হবে। এই সরকারী ঘোষণায় দেশের বিভিন্ন ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। ক্রীড়া-কর্মকর্তাদের দৃঢ় ধারণা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ক্রীড়ানুরাগীরা আগের তুলনায় মুক্তহস্তে খেলাধূলার প্রসারকল্পে দানধ্যান করবেন। এই সরকারী ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীরামপ্রকাশ মেহেরা, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সম্পাদক ডাঃ অমরিক সিং এবং ভারতীয় অপেশাদার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী এল আর খান্না এইরকম আশা প্রকাশ করেছেন যে, বে-সরকারী দানে ভারতীয় খেলাধূলার যথেষ্ট প্রসার এবং উন্নতি হবে।

খেলাধূলার প্রসার এবং উন্নতির জন্য নিশ্চয়ই অর্থের প্রয়োজন। তবে ভারতের ক্ষেত্রে এই অর্থ প্রধান সমস্যা নয়। ভারতীয় খেলাধূলার বিভিন্ন আসরে এক স্বার্থপর গোষ্ঠী নানাভাবে দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন আছে। এদের কায়েমী স্বার্থই ভারতীয় খেলাধূলার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। এই গোষ্ঠীর কার্যকলাপে আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসরে ভারত বারংবার অপদস্থ হয়েছে। সুতরাং এদের অস্তিত্ব থাকতে টাকা ব্যয় করে সমস্যা দূর করা যাবে না।

অল্-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

আগামী ২১শে মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক ৬৩তম অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আসর বসছে। এবারের প্রতিযোগিতায় ১৮টি দেশের প্রায় ২০০ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করবেন। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলোয়াড়দের যোগ্যতার ক্রম-পর্যায় তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন জাকার্তার ২৩ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রুডি হার্টোনো এবং ডেনিস খেলোয়াড় স্বেভেন প্রি। হার্টোনো যদি এবছরও সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হন তাহলে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার (৬বার) সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড করবেন। এখানে উল্লেখ্য,

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলার এক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে আম্পায়ার শ্রী এস কে সিংহ দুই দলের খেলোয়াড়দের শান্ত করছেন।

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে রুডি হার্টোনো ছাড়া উপর্যুপরি ৫বার সিংগলস চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন মাত্র একজন—আয়ারল্যান্ডের ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন (১৯২৫—১৯২৯)। ১৯৭৩ সালের প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী মালয়েশিয়া যোগদান না করায় রুডি হার্টোনোর পক্ষে সিংগলস খেতাব জয়ের পথ অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলার আসরে মালয়েশিয়া দীর্ঘকালের এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় তারা ৯বার সিংগলস খেতাব পেয়ে এশিয়া মহাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছে। মালয়েশিয়ার অনুপস্থিতিতে রুডি হার্টোনোর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন ডেনমার্কের স্বেন প্রী। অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় হার্টোনো এবং প্রী যে তিনবার পরস্পর খেলেছেন তার ফলাফল হার্টোনোর অনুকূলেই গেছে—হার্টোনো ১৯৭১ সালের কোয়ার্টার ফাইনালে এবং ১৯৭০ ও ১৯৭২ সালের ফাইনালে প্রীকে পরাজিত করে সিংগলস খেতাব পেয়েছিলেন।

গোল্ড কাপ

বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ২—১ গোলে গত বছরের গোল্ড কাপ বিজয়ী ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স দলকে পরাজিত করেছে। ফাইনালের প্রথম পর্যায়ের খেলা, ১—১ গোলে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ১-০ গোলে জিতে যায়। এখানে উল্লেখ্য বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এই নিয়ে চারবার গোল্ড কাপ জয়ী হল—সরাসরি জয় ৩বার (১৯৬৮, ১৯৭০ ও ১৯৭৩) এবং যুগ্মবিজয়ী ১বার (বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে ১৯৬৯ সালে)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০৪
ষাণ্মাসিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩৪ (৬৪ লাইন)

৪৬ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
প্লেন—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

ly, 23rd March, 1973 শুক্রবার, ৯ চৈত্র, ১৩৭৯ .52 Paise

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅশোক চৌধুরী

এই আমাদের দেশ : বাঁকুড়ার প্রত্নসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে

'অমৃতে'র গত ৪৫ সংখ্যায় (১৬ই মার্চ, ১৯৭৩) শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'এই আমাদের দেশ' পর্যায়ের বাঁকুড়ার 'প্রত্নসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক রচনায় কয়েকটি বিষয়ের অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই রচনার ৪৪৬ পৃষ্ঠার একস্থানে বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বরমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে লেখক বলেছেন : 'মন্দিরের গায়ে ভুলক্রমে নির্মাণকাল ৯২৮ শকাব্দ লেখা হয়েছে যা আসলে হবে ৯২৮ মল্লাব্দ। শকাব্দ ও মল্লাব্দের মধ্যে ৬১২ বছরের ব্যবধান এবং সেই হিসাবে মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৫৪০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬২২ খৃষ্টাব্দ।'

কিন্তু বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারিপাড়ায় অবস্থিত বিখ্যাত মল্লেশ্বরমন্দিরটির গায়ে যে লিপিটি আছে তাতে 'মল্লশক' বলে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। সংস্কৃতে রচিত লিপিটি হোল :

'বসুকরনবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং
শিবপাদপদ্মেষু'।।

বসু=৮, কর=২, নব=৯ 'অঙ্কের বামদিকে গতি' এই নিয়ম অনুসারে ৯২৮ মল্লশক হয়। শ্লোকটির অর্থ হোল, ৯২৮ মল্লশকে শিবপাদপদ্মে শ্রীবীর সিংহ এই সুরম্য দেবালয় বা দেউল স্থাপন করলেন। ৬৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে মল্লাব্দ গণনা করা হয়। তাই ৯২৮ মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৪ যোগ করলে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়। আর শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কারণ শকাব্দের আরম্ভ ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। অতএব শকাব্দ ও মল্লাব্দের ব্যবধান ৬১৬ বছর। মল্লেশ্বরমন্দিরটি বীরসিংহ কর্তৃক নির্মিত বলে উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বীরসিংহের রাজত্বকাল ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়। শ্রীযুক্ত অমিয়-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এটি বীরহাম্বির কর্তৃক অর্ধ অসমাপ্ত মন্দির বলে অনুমান করেছেন এবং রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক সমাপ্ত বলে মনে করেন। (বাঁকুড়ার মন্দির, পৃঃ ১৮৩-১৮৪, ১৩৭১ সং)।

দ্বিতীয়ত শ্রীমুখোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে যেসব শ্রেণীতে ভাগ করেছেন সেগুলিও প্রচলিত ও স্বীকৃত মতের পরিপন্থী। তিনি বলেছেন, 'বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে মোটামুটি চারটি ধাঁচে ভাগ করা হয়। প্রথমভাগে পড়ে চতুষ্কোণ একচূড়ার মন্দির, মল্লেশ্বর শিবের মন্দির যার উদাহরণ· দ্বিতীয়ভাগে পড়ে একরত্ন শৈলীর চালা-মন্দির, যার চতুষ্কোণ গঠন ও বাঁকানো কার্ণিশ আর ঈষৎ ঢালু ছাদ গ্রামবাংলার কুটিরের অনুরূপ......চতুর্থ ধাঁচের মন্দির হল জোড়বাংলা মন্দির, যাতে পাশে পাশে দুটি চালা মন্দিরের মাঝখান থেকে উদগত হয়েছে একটি চূড়া।'

প্রচলিত ও স্বীকৃত মতে চতুষ্কোণ এক-চূড়ার মন্দির বলে কিছু নেই। মল্লেশ্বর-মন্দিরটি যে মূলত এরূপ ছিল না ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ডি বি স্পুনারের ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে তার উল্লেখ আছে। মিঃ স্পুনার সেই বিবরণীতে বলেছেন, বর্তমান অষ্টকোণাকৃতি চূড়াটি সে সময়ে নির্মিত হচ্ছিল। এটি মূলত দেউলমন্দিরই ছিল। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 'একরত্নশৈলীর চালামন্দির' কথাটিও ঠিক নয়। চালার চালগুলি বেশ প্রশস্ত ও ঢালু হয় এবং গ্রামবাংলার খোড়ো চালাঘরের সঙ্গে এর বেশ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। আবার চালার শ্রেণীবিভাগে দোচালা, (অর্থাৎ সামনে-পেছনে ঐ ধরণের দুটি চাল) চার-চালা, আটচালা, বারোচালা ইত্যাদি। আট-চালা শৈলীর মধ্যে আবার বিষ্ণুপুরী আটচালা একটি স্বতন্ত্র শৈলীর সৃষ্টি করেছে। রত্নমন্দিরগুলির মূল গৃহটির ছাদ ও বাঁকানো কার্নিশ ছাড়া ঢালু প্রশস্ত চাল থাকে না। শ্রীমুখোপাধ্যায় সম্ভবত ছাদ ও চালের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। তাই একরত্ন মন্দিরকে চালা মন্দির বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত রত্নমন্দিরগুলির গৃহ প্রচলিত ও স্বীকৃত মতানুযায়ী চাঁদনী বা দালান যাদের কোন চাল থাকে না। বিষ্ণুপুরের একরত্ন মন্দিরগুলিকে গ্রাম-বাংলার চলতি পরিভাষায় 'আলগোছটুঙী' অর্থাৎ আলগোছে একটি টুঙী বা শিখরকে যেন ছাদের মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে। রত্ন বা শিখর মন্দিরগুলির শ্রেণীবিভাগের মধ্যে একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশ-রত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন ও পঞ্চ-বিংশতিরত্ন পর্যন্ত মন্দির বাংলায় দেখা যায়। তাই পঞ্চরত্নকে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে একরত্ন 'রীতির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম' (পৃঃ ৪৪৬) বলা যায় না।

জোড়বাংলা মন্দির সম্পর্কেও শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের ধারণা স্পষ্ট নয়। আসলে জোড়-বাংলা হোল দুটি একবাংলা বা দোচালার যুক্তরূপ। বাংলার বহু স্থানেই এই শৈলীটি এককালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সামনে পেছনে পর পর দুটি দোচালা বা একবাংলা যুক্ত করে দিয়ে এ শৈলীর মন্দির নির্মিত হতো। পেছনের দোচালাটিতে দেব-মূর্তি স্থাপিত থাকে। এটি চালাশ্রেণীর একটি বিশিষ্ট রূপ। জোড়বাংলার মাঝখানে যে চূড়া থাকতেই হবে তার কোন নিয়ম নেই। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলাটির (১৬৫৫ খৃঃ) পেছনের একবাংলার ওপরে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি চারচালা শিখর যা বাংলার জোড়-বাংলা মন্দিরগুলিতে সচরাচর দেখা যায় না। বিষ্ণুপুর গড়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ জোড়বাংলা মন্দিরটি পেরিয়েই আর একটি ভগ্ন জোড়-বাংলা মন্দির দেখা যায়। এটির শিখর আটচালা রীতির ছিল বলে মনে হয়। এরই কাছাকাছি রাস্তার পাশেই দুটি উৎকলীয় রেখদেউল আছে। (যার উল্লেখ শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের রচনায় নেই) বিষ্ণুপুরগড়ের মধ্যে বিখ্যাত জোড়বাংলারই কাছে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ চৈতন্যসিংহ প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যামের একরত্ন মন্দিরটি প্রস্তর-ভাস্কর্যের দিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে 'অমৃতে'র (৪৫ সংখ্যায়) প্রকাশিত 'অবিস্মরণীয় ফাল্গুনী পূর্ণিমা' শীর্ষক আমার একটি রচনায় নিম্নলিখিত কয়েকটি গ্রন্থের সাহায্যের কথা অনুল্লিখিত থাকায় দুঃখপ্রকাশ করছি। এই গ্রন্থগুলি হোল, (১) ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ১৯৭০ সং), (২) খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত), (৩) ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের 'বৈষ্ণবরসপ্রকাশ' (১৩৭৯ সং)।

প্রণব রায়
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

'প্রতিমা নির্মাণে এ কোন ছেলেখেলা' প্রসঙ্গে

গত ৪৪ সংখ্যা অমৃতে শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিমা নির্মাণে এ কোন ছেলেখেলা'র প্রতিবাদে প্রতিমা দত্ত-র বক্তব্য পড়লাম। আমার এ বিষয়ে সামান্য নিবেদন আছে।

বৎসরান্তে আমরা যে দেবদেবীর পূজা করি—তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধাকে দেবতার পায়ে সমর্পণ করা। তার জন্যই তো আমরা উপবাসী থেকে দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই। দেবতার আশীর্বাদ কামনা করি। কিন্তু যতই শিল্প-চেতনার স্বাক্ষর বহন করুক না কেন 'ঝিনুক' দিয়ে তৈরী প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে বা তাঁর আশীর্বাদ কামনা করতে মনে সর্বদাই কুণ্ঠা জাগবে। শৈল্পিক চেতনা বা শৈল্পিক সুষমা প্রকাশ করবার তো বহু সুযোগ রয়েছে। আর্ট প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েও তার প্রকাশ ঘটতে পারে। দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ নাইবা ঘটল।

শ্রীশংকরকুমার চট্টোপাধ্যায়
চুঁচুড়া, হুগলী

ভারতকে বিপন্ন করার চক্রান্ত

পাকিস্তানকে আবার অস্ত্র সাহায্য দিয়ে মার্কিন সরকার এই উপমহাদেশে শান্তির প্রকাশ্য বিরোধিতার পথেই পা বাড়িয়েছে। এই উপমহাদেশের দিকে পাশ্চিমীদের দৃষ্টি চিরকালই ছিল লোভাতুর ও স্বার্থপূর্ণ। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা বিদায় নেবার পর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীরা এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব স্থায়ী করার জন্য নানা কূটকৌশল অবলম্বন করে। পাকিস্তান তাদের ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করতে থাকে। তারা প্রকাশ্যেই আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট সামরিক জোটে যোগ দেয়। সিয়াটো ও সেণ্টো সামরিকচক্র গড়ে তুলে আমেরিকা এই অঞ্চলে কমিউনিজম প্রসারের বিরুদ্ধে ঘাঁটি তৈরি করে। পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে একজোট হয়ে সেই সামরিক চক্রান্তের প্রধান শরিকের ভূমিকা পালন করে। আমেরিকার হিসাবে গোলমাল হয়ে যায় বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে। পাকিস্তানকে গত দুই দশক ধরে দেদার ডলার সাহায্য দিয়ে, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বিমান পাঠিয়ে এত মজবুত করলো তারা। পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা পৃথিবীর 'সেরা যোদ্ধৃবাহিনী' তৈরি করেছেন বলে সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বাঙালীর অভ্যুত্থানের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারল না। এমনকি সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েও পাকিস্তানের ডানা-ভাঙা রোধ করা গেল না।

তখন থেকেই আমেরিকার মনে গোসা। মুজিবের বাংলাদেশ এবং আমাদের ভারতবর্ষের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন নিকসন সাহেব। পাকিস্তান আক্রমণ করল ভারত। সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হল তারা। আমেরিকা বলল, উপমহাদেশে শান্তি চাই। সুতরাং আমরা এখন পাকিস্তান বা ভারত কারো কাছেই অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী করব না। এদিকে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত এবং পাকিস্তান ঘোষণা করেছে যে, পরস্পরের বিরোধ তারা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করবে। তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থ হবে না। বিদেশী শক্তির কাছে এই আবেদনও করা হয় যে, তারা যেন এই উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা না করেন। পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠিয়ে আমেরিকা সে-আবেদন ব্যর্থ করেছে। বাংলাদেশ এবং ভারত এতে উদ্বেগ বোধ না করে পারে না।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় উপমহাদেশে অস্ত্র সরবরাহ বিষয়ে আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছিল। ১৯৭০ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করে আমেরিকা। অবশ্য ইরান ও জর্ডান মারফৎ পাকিস্তান নিয়মিত মার্কিন অস্ত্র পেত। এখন সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে কোটি কোটি ডলার মূল্যের সামরিক উপকরণ পাকিস্তানে পাঠাবার যুক্তি কি? মার্কিন মহল থেকে বলা হয়েছে যে, আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসেবেই নাকি এগুলো পাকিস্তানের দরকার। কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ? কোথা থেকে আক্রমণ? চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব। রাশিয়াও পাকিস্তানের বৈরী নয়। তবে আক্রমণটা কি ভারতের দিক থেকে? আমেরিকা কি বিশ্বাস করে যে, ভারত কোনো অজুহাতে পাকিস্তানকে আক্রমণ করবে? এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। তারা যুক্তি দেখাচ্ছে, এগুলো পুরনো চুক্তি অনুযায়ীই এতদিন পর পাঠানো হচ্ছে। আসলে পাকিস্তানের বিধ্বস্ত যুদ্ধের যন্ত্র চাঙ্গা করে তোলার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো দুনিয়াময় কেঁদে বেড়াচ্ছেন যে, ভারত তার ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিচ্ছে না। আমেরিকাব অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে কি ভুট্টো এখন এই যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য জেহাদে প্রবৃত্ত হবেন?

সিমলা চুক্তির উদ্দেশ্যই ছিল উপমহাদেশে উত্তেজনা হ্রাস এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধান। বাংলাদেশে নির্বাচনের পর শেখ মুজিবুর রহমান দেশের উন্নয়নকর্মে আত্মনিয়োগের জন্য নতুনভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন। ভারত তার সহযোগী। ঠিক এই সময়ে ভুট্টোকে অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে আমেরিকা নতুন করে এই উপমহাদেশে বিরোধ ও অশান্তির আগুন জ্বালাতে চাইছে। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়। বালুচ, পাখতুন ও সিন্ধীরা ক্ষুব্ধ। ভুট্টোকে অস্ত্র দিয়ে আমেরিকা ভারতকেই শুধু বিপন্ন করছে না, পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে ভুট্টোকে আরও শক্তিশালী করছে। এ এক জটিল রাজনৈতিক চক্রান্ত। আমেরিকার কথায় ও কাজের পার্থক্য কারো দৃষ্টি এড়াবে না। প্রেসিডেণ্ট নিকসন কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আমরা খুশি। উপমহাদেশে শান্তি আনতে তা সহায়তা করবে।

তলে তলে চক্রান্ত করে এই কি খুশি হবার নমুনা? তবে আমেরিকার মনে রাখা উচিত যে, স্বৈরাচারী দেশগুলোকে অস্ত্রশস্ত্র ও ডলার দিয়ে যতই সাহায্য করা যাক না কেন—গণতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ কখনোই সফলতালাভ করতে পারে না। পাকিস্তান বারবার মার খেয়েও শিক্ষালাভ করেনি। ভিয়েতনামের পর এ-শিক্ষা কি আমেরিকারও হয়নি? তবে ভারতকে [illegible] প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোনো বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে।

দিল্লীতে একদল ফরাসী সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের কাছে ভাষণ দিচ্ছেন।

ভারতবর্ষস্থিত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোলজ তাঁর 'প্রমিসেস টু কিপ' বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ—

'(আমেরিকার) পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরে পাকিস্তান বহু বছর ধরে যে বিপুল প্রভাবপ্রতিপত্তি গড়ে তুলেছে সেটা আমি জানতাম। পাকিস্তানের সংগে আমাদের সম্পর্কের মূল অনুসন্ধান করলে বুঝতে সুবিধা হবে, এই বছরগুলিতে প্রায়ই কিভাবে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি তৈরী করা হয়েছে। এই সম্পর্ক আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

পাকিস্তানের সামরিক শক্তি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের মূল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে 'ওয়েলস অব পাওয়ার' নামক বইয়ে। স্যার ওলাফ ক্যারো নামে একজন বৃটিশ সিভিল সার্ভেণ্ট এই বই লিখেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে বইটি মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের নজরে আসে। ক্যারো দেখিয়েছিলেন, বৃটিশ উপনিবেশের কালে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থায়িত্ব নির্ভর করছিল তিনটি বিষয়ের উপর ঃ—বৃটিশ কূটনীতি, বৃটিশ নৌবহর ও ভারতীয় স্থলসৈন্য বাহিনী। ভারত থেকে বৃটিশরা সরে আসার পর এবং নেহরু নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ব্যাপারে ভারতীয় সৈন্য-দলের আর কোন ভূমিকা থাকছে না। এই থেকে ক্যারোর যুক্তি হচ্ছে, একটি বিকল্প খুঁজে বের করতেই হবে আর সেদিক থেকে পাকিস্তানের সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

'১৯৫২ সালের শীতকালে যখন আমি প্রথমবার ভারতে নিযুক্ত হয়ে আসি তখন এই কষ্টকল্পিত ভৌগোলিক ব্যাখ্যা আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। সে সময়ে আমি এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলাম।'

বোলজ সাহেবের এই লেখার পর অনেক কিছুই ঘটে গেছে। পাকিস্তান তার সামরিক বলপ্রয়োগ করেও বাংলাদেশকে তার সংগে রাখতে পারে নি, ভারতের বিরুদ্ধে তার সেই সামরিক বল ব্যবহার করতে গিয়ে [illegible]

সিমলা চুক্তির মধ্য দিয়ে দুই দেশ শান্তি-পূর্ণ পথে পারস্পরিক সমস্যাগুলি মিটিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার যে ঘোষণা করেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, তাদের নীতি এখনও সেই ওলাফ ক্যারোর কালেই আবদ্ধ হয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তিত অবস্থার কোন প্রতিফলনই তার মধ্যে হয় নি।

কথাটা প্রথম শোনা গিয়েছিল মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রসচিব জোসেফ [illegible] সিসকোর কাছ থেকে। হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভসের বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত সাবকমিটিতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বললেন, আমেরিকা পাকিস্তানকে আবার অস্ত্র সরবরাহ আরম্ভ করার কথা 'সক্রিয়ভাবে বিবেচনা' করছে। দুয়েকদিনের মধ্যেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র চার্লস ব্রে সাংবাদিক সম্মেলনে আমেরিকার সরকারি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। তারপর স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট নিকসন এই সংবাদ সমর্থন করলেন।

ওয়াশিংটনের সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল সেটা তুলে নেওয়ার ফলে পাকিস্তান এখন আমেরিকা থেকে তিন ধরনের সামরিক সরবরাহ পাবে ঃ—(১) পাকিস্তানকে যেসব অস্ত্র 'বিক্রি করার জন্য আগে থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু [illegible]

রা যায় নি। এই দফায় পাকিস্তান পাবে ৩০০টি সৈন্যবাহী সাঁজোয়া গাড়ি। গুলির দাম ১ কোটি দশ লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা। ২) এর আগে পাকিস্তানকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল তার যন্ত্রাংশ এবং (৩) মারাত্মক নয় এমন সাজ-সরঞ্জাম। শেষের এই দুই দফায় মিলিয়ে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে সংগ্রহ করবে মোট ১১ লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২ লাখ টাকা দামের যন্ত্রাংশ, প্যারাসুট বিমানের রিকনডিশান করা ইঞ্জিন।

সেই সঙ্গে আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারতের সীমান্তে রাডার যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত যেসব যন্ত্রপাতি ভারতকে বিক্রি করার কথা ছিল সেগুলি এখন ভারত পেতে পারে।

পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করার পুরান মার্কিনী যুক্তিটা এবার অবশ্য তেমন উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করা হয় নি। সেই যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, উপমহাদেশে শান্তি রাখতে হলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক শক্তির সমতা বজায় রাখতে হবে। ভারতের নেতারা বারবার আমেরিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানকে এক পাল্লায় ওজন করার কোন অর্থই হয় না, কারণ আয়তন বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্ব ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা করা যায় না। চেষ্টার বোলজের মত মার্কিন নীতির সমালোচকরাও এই কথা বলেছেন। মেকসিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের কথা বললে সেটা কি বাস্তবতাসম্মত হবে? আমেরিকা যখন ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে তখন ত সে ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে শক্তিসাম্যের কথা বলে না।

অন্য যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেটা হল, এইসব অস্ত্র অথবা সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য আগে থেকেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এখন শুধু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়েছে মাত্র। বারবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই ধরনের অজুহাত দেওয়া হয়েছে। কোন সময়ে বলা হয়েছে, 'এই একবারের মত ব্যতিক্রম' করা হচ্ছে, কোন সময়ে বলা হচ্ছে, 'মারাত্মক নয় এমন অস্ত্রশস্ত্রই শুধু দেওয়া হচ্ছে'

কিন্তু এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথায় ও কাজে প্রায় কখনই মিল হয় নি। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং লোক-সভায় বলেছেন, অতীতের অভিজ্ঞতাতেই ভারত দেখেছে আমেরিকা অসত্য বলেছে। আমেরিকা আশ্বাস দিয়েছিল যে, পাকি-স্তানকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না। সেই আশ্বাস কার্যকর করা হয় নি। তৃতীয় দেশের মধ্য আমেরিকার কাছ থেকে সমরোপকরণ পেয়েছে তারা সেগুলি পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবে না, এই আশ্বাসও মিথ্যা হয়ে গেছে। জর্ডান, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ পাকিস্তানে আমেরিকান বিমান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি চালান দিয়েছে বা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

এখন আবার বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, পাকিস্তানকে যেসব আমেরিকান অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে সেগুলি মারাত্মক ধরনের নয়। কিন্তু এই বিষয়ে মার্কিন সাংবাদিক-রাও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। চার্লস ব্রে-র সাংবাদিক সম্মেলনে এই সাংবাদিকরা জেরা করে তাঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন যে, পাকিস্তানকে সৈন্যবাহী যেসব সাঁজোয়া গাড়ি দেওয়া হবে সেগুলি 'মারাত্মক' ধরনের মধ্যেই পড়ে। এই গাড়িগুলিতে কামান লাগান আছে কিনা, সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করেও সাংবাদিকরা সরকারি মুখপাত্রের কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পান নি।

চার্লস ব্রে আর একটি আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানকে এই অস্ত্র বিক্রির ফলে দুই দেশের মধ্যে সামরিক শক্তির বর্তমান অনুপাত বিপর্যস্ত হবে না। কিন্তু এটা নিতান্তই কথার কথা। আমেরিকা যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখার নীতি

ঢাকায় সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভাষণ দিচ্ছেন। সঙ্গে আছেন তাজ-উদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলি।

অনুসরণ করেই চলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মিঃ সিমকো হাউস অব রিপ্রে-জেণ্টেটিভসের সাবকমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভারতের সামরিক শক্তির যে উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যেই সেই ইঙ্গিত ছিল।

উপমহাদেশে এই পরোক্ষ মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ এমন এক সময়ে ঘটল যে সময়টা ভারতে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহানের পক্ষে আদৌ স্বস্তিকর নয়। রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নতুন মার্কিন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভারতের কঠোর অভিমতের কথা জেনে এসেছেন। যখন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রদূত ময়নিহান যখন ঐ উদ্দেশ্যে তাঁর কাজ আরম্ভ করেছেন তখন ওয়াশিংটনের এই ঘোষণা তাঁর কাজ কঠিন করে তুলবে।

বোমা বিস্ফোরণের ফলে লন্ডনের কেন্দ্রীয় ফৌজদারী আদালত ভবন ওল্ড বেইলির একটি জানালা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আইরিশ উগ্রপন্থীরা বোমাটি পুঁতে রেখেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

লকআউট ধর্মঘটে ক্ষতি ৭০ কোটি টাকা

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭২ খৃঃ ধর্মঘট ও লকআউটে দেশের শিল্পোৎ-পাদনে ৬০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী। ১৯৭১ খৃঃ শিল্প উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। গত বছর ২৬১৪টি ধর্মঘট ও লকআউট ঘটে।

গত বছর বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক মালিক বিরোধে ধর্মঘট ও লকআউটের সংখ্যা : মহারাষ্ট্র ৬৬২, পশ্চিমবঙ্গ ৩৩৯, তামিল-নাড়ু ৩৩৪, বিহার ২৩৬, উত্তরপ্রদেশ ১৯২, কেরল ১৮৩, গুজরাট ১২০, মধ্যপ্রদেশ ১০২, মহীশূর ৯৯, অন্ধ্র ৮৯, রাজস্থান ৯৬, হরিয়ানা ৩৬, গোয়া দমন দিউ এবং উড়িষ্যা ৩১ করে, দিল্লি ২৮, আসাম ২০, পাঞ্জাব ১৫, ত্রিপুরা ১২, পণ্ডিচেরী ১২, জম্মু ও কাশ্মীর ৬, হিমাচল প্রদেশ ১, আন্দামান ১ এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১।

১৫-৩-৭৩ —পুণ্ডরীক
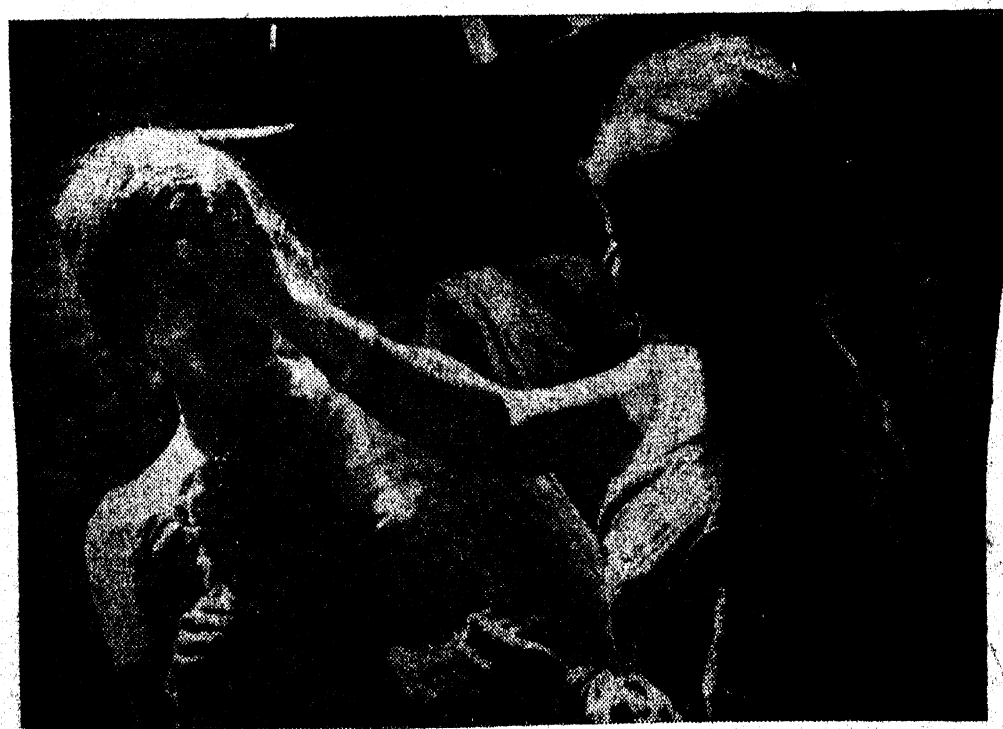
কতো কাল পুকুরে নামি না ॥

কবিরুল ইসলাম

কতো কাল পুকুরে নামি না
সেই বালক বয়স আর নেই।

এখন বাথরুম আছে, ঝরে পড়ে জল
ট্যাপে ও শাওয়ারে
সাবানের ফেনা আছে, শ্যাম্পু আছে
আছে গন্ধতেল
কিন্তু সেই অতল জলের আহ্বান
আর নেই
নেই চোখে-জল-বেরুনো ঝাঁঝ সরষের তেল
মায়ের চুলের গন্ধে আতুর গামছাও নেই!

বাথরুমের জলে ঝলে না সে সুনীল দুপুর
দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যায় না ঢেউ-এ ঢেউ-এ পুনর্নির্মাণে
ঊর্ধ্বে কুলকুচো মেলে ধরে না তো আর
সাতরঙা বাহার।

কতো কাল পুকুরে নামি না
আজ, নামতে বড়ো ভয়
অনভ্যাস 'না না' করে তেড়ে আসে
তুমি, সুবোধ বালক!

হায়, আমার মায়াবী আঙটি প্রাচীন পুকুরে ভেসে গেছে।।

বেলা অবেলায় ॥ রত্নেশ্বর হাজরা

বিদায় শব্দে দু'পাশ দিয়ে শিমুলে তুলো উড়ে যাচ্ছে
উড়ন্ত আলোর কিছু শরীর
ঘুরে যাচ্ছে
গ্রাম পেরিয়ে গ্রামান্তরে হাওয়ায়
পালক-পালক কী যেন কী
বিদায়—আমার মানুষ
তোমার দিনের—। রাত্রি বিদায়……

বিদায় শব্দ বলামাত্র মিলিয়ে যায়
চেনা প্রহর—। জন্ম থেকে
দেখা স্বপ্নে নাভির গন্ধ, হিংসা ও সুখ
সময় থেকে বুকের অসুখ। সমস্ত বুক
মাঠের মধ্যে শিমুলে তুলো—তখন আকাশ
যেন উঠোন ঋষিগাছের—সমাপ্ত হয়ে
আবহাওয়া তখনো প্রায় কুসুম-কুসুম। বিদায় শব্দে
মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সামান্য ওম্
চেনাশোনা কিছু পালক—পালকে তার
মহারাজের আঁকা বাড়ি—বাড়ির মধ্যে
কী যেন কী—কার যেন কী
তাই উড়ে যায়………

দিবসশেষের পাখি ॥

শরৎসুনীল নন্দী

যার মুখে কথা নেই তার কাছে এভাবেই ফিরে আস তুমি:
আর আমি
ভাষাহীন তোমার মুখের দিকে পলকবিহীন চেয়ে থাকি—
এভাবে গাছের ফুল ফোটে
ডেকে যায় দিবসশেষের এক পাখি।

তুমি ত জীবনভর বিগত সময় থেকে স্মৃতি তুলে এনে
পুরাণকৃত অন্য এক সময়ের কাছে
বারবার মেলে দিচ্ছ হাত,
এভাবেই দিন বাড়ছে
বাড়ছে রাত,
নদীতে বৃষ্টির জল বাড়ছে অবিরত—
ইচ্ছা ও অনিচ্ছার সমস্ত আবর্ত ঠেলে ঠেলে
তোমার জন্মের শর্তগুলি জেনে দিচ্ছ তুমি:
আর আমি
ভাষাহীন তোমার মুখের দিকে পলকবিহীন চেয়ে আছি—
আবার কখন ফুল ফোটে
আবার কখন ডাকে দিবসশেষের সেই পাখি।।

আমি কখনো আত্মীয় দেখিনি। রতনকাকাও না। রতনকাকা বলেন, আত্মীয়কে দেখা যায় না। দেখা গেলেও চেনা কঠিন।

রতনকাকা আমাদের কেউ নন। অনেকদিন আগে মাদ্রাজে মীনাক্ষী মন্দির দেখতে গিয়ে আমার বাবা ভারী ফ্যাসাদে পড়েন। শহরের এক ভোজনশালায় খেতে বসে, লবণ চাইতে, পরিবেশক এক তাল তেঁতুল এনে থপ করে ফেলে দিল পাতে। বাবা না না করে মাথা নাড়তে, লোকটি সোৎসাহে ছুটে গিয়ে আরও এক তাল তেঁতুল নিয়ে এল। বাবা তখন নির্ভেজাল [illegible] ভাষার সঙ্গে হিন্দী মিশিয়ে লবণের রূপ-গুণের বর্ণনায় দু হাত তুলে, সমস্বরে চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন। ব্যাপার বেগতিক বুঝে পাচক ঠাকুরটি রান্নাঘরের দিকে দৌড়ল। সেখান থেকে এক হাতা লঙ্কার গুঁড়ো এনে হুস্ করে ঢেলে দিল পাতে। আর যায় কোথা।

সেই তুমুল লবণ আন্দোলনের মাঝ-মধ্যিখানে হঠাৎ রতনকাকা গিয়ে হাজির। তিনি অফিস যাবার আগে, তাঁর নিত্য-নিয়মের খাওয়া খেতে ঢুকেছেন হোটেলে। রতনকাকার মধ্যস্থতায় এক লহমায় ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

এঁটো হাতটা ধুয়ে ফেলেই বাবা রতনকাকার হাতদুটো জড়িয়ে বললেন, আপনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি। আমার এই দু-কুড়ি সাড়ে তিন বছর বয়সে সর্বত্র দেখেছি, বাঙালী বাঙালীর শত্রু। কিন্তু আজ আপনি আমায় বাঁচালেন। এই দেশে আসা অবধি ক'দিন প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে আমার।

মাদ্রাজী যে বেহারী নয় এ-কথাটা রতনকাকার মুখ থেকে বেরোবার আগেই বাবা উত্তেজিত গলায় বাধা দিলেন, ঐ একই কথা। ততক্ষণে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন তিনি। বললেন, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত। কেন এই পোড়া দেশে পড়ে আছো? কলকাতায় চল। আমার ভায়রাভাইয়ের কাকা মস্ত বড় এ্যাটর্ণী। যা হোক একটা হিল্লে হয়ে যাবেই।

বিপত্নীক রতনকাকার ত্রিসংসারে কেউ ছিল না বলেই বোধহয় দু-চারবার বলতেই, বাবার কথায় রাজী হয়ে গেলেন। হপ্তাখানেক পরে ওখানকার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বাবার সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়। গর্চা লেনের একতেরে ছোট্ট একটা বাড়িতে, এখন আমরা তিনজন থাকি। বাবা, আমি আর তাঁর ভাবাতুত ভাই, রতনলাল মুখুজ্যে।

আমি কখনো আত্মীয় দেখিনি। রতনকাকাও না। শিশুবয়সে বাবার কিছু আত্মীয়স্বজন ছিল। বাবার মতে, আত্মীয় অনেকটা [illegible]

মত। তাদের কথা শোনা যায়, চোখের দেখা বড় একটা মেলে না।

।। ২ ।।

একদিন বেলা ন'টায়, বাবা স্নান করতে গেছেন। রতনকাকা সামনের রকে উবু হয়ে বসে খবরকাগজ দেখছেন, এমন সময় আমাদের সদরদোরের সামনে বিশাল-শরীর একজন লোক বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, যতীশবাবু.... যতীশবাবু হ্যায় ইহাঁমে? লোকটির পাশে একটি রিকশা দাঁড়িয়ে। রিকশার মধ্যে পাঁচ-সাতটা পুঁটুলীর পেছনে জড়সড় অথর্ব এক বৃদ্ধ।

লোকটির হাঁকডাকে, একটু ক্ষণের মধ্যে আমাদের বাসার সামনে ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গেল। আধভেজা কাপড়ে বাবা ছুটে এলেন বাইরে। রতনকাকার হাঁপানির টান উঠে পড়ল। সকালের লেক-ফেরৎ দু-চারজন পেনসনার দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা হৈ-চৈ সোরগোলের পর সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হল।

রিকশায় আসীন ওই বৃদ্ধটি বাবার পিসতুত কাকা। নাম সরলচন্দ্র রায়। বাবার এই সরল কাকা বছর-কুড়ি আগে সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যান। এতদিন বিশাল-শরীর ওই পাণ্ডার বাড়িতে একটি ঘর নিয়ে পুজো অর্চনায় কাল কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু খরচপত্র পাণ্ডার হাতে দিতেন।

মাস দু-তিন হল বৃদ্ধের মাথায় কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। রাতদুপুরে 'যাই একটু ঘুরে আসি' বলে লাঠি হাতে সদর খুলে বেরিয়ে যান রাস্তায়। কোনো-দিন হয়তো বা খেতে বসে গ্লাসের জলটা মাথায় ঢেলে, আমার গামছা কই রে, বলে চেঁচাতে থাকেন। একদিন রাত বারোটায় দরজায় ধাক্কা দিয়ে পাণ্ডাকে ঠেলে তুলেছেন। কি ব্যাপার! না, মহাষ্টমীর ভোগের বাসনপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এইসব নানা ঝঞ্ঝাটে নাজেহাল হয়ে, ব্রজবাসী পাণ্ডাটি, পুরোনো চিঠিপত্রের মধ্যে থেকে বাবার ঠিকানা খুঁজে বার করে শেষ পর্যন্ত এখানেই নিয়ে এসেছে বৃদ্ধকে। হিসেব কষে দেখা গেল, সরল-দাদুর বয়স একানব্বই বছর। টিনের স্যুটকেশের মধ্যে তাঁর এনট্রান্স পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট আর সেই সঙ্গে খান চব্বিশ ব্যাঙ্কের পাশবই পাওয়া গেল।

ব্রজবাসী লোকটি নির্ভেজাল সৎ লোক। সবশেষের পাশবইয়ে সর্বসাকুল্যে এক হাজার একশ' এগার টাকা জমা আছে। পুরোনো পাশবই মিলিয়ে পরে রতনকাকা দেখেছেন, আগাগোড়া নির্ভুল হিসেব। কোথাও কারচুপি নেই।

ছোটবড় পাঁচ-সাতটা পুঁটুলি টিনের স্যুটকেশ ও একানব্বই বছরের বৃদ্ধকে বাবার জিম্মায় রেখে লোকটি বিদায় নিল। যাবার সময় সজল চোখে সরলদাদুর দিকে তাকিয়ে ব্রজবুলিতে যা বলল, তার অর্থ— এরা তোমার আত্মীয়, আপনার লোক। এতদিনে তুমি ঠিক জায়গায় এসেছ। গঙ্গাজীও খুব নিকটে রাধাগোবিন্দজী তোমায় কৃপা করুন।

এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা রিকশাটায় চেপে চলে গেল সে। রতনকাকা চুপ, আমি চুপ। পাঁচিলের ওপরে যে কাকটা এতো ডাকছিল, সেটাও চুপ হয়ে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাদের দেখতে লাগল। ঠিক এমন সময়ে, বাবার সরলকাকা হাতের লাঠিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে, বাবার সম্মুখে গড় হয়ে প্রণাম করে বললেন, বড়দাদা না? এতক্ষণ চিনতে পারিনি। বাবা ম্লান হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একেবারে স্মৃতি নষ্ট হয়নি। কুড়ি বছর আগে তোর ঠাকুরদাদার চেহারা অবিকল, এখন আমার যেমন, এমনই ছিল।

।। ৩ ।।

এরপর থেকেই আমাদের বাসায় আত্মীয়দের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। প্রথম কিছুদিন ছাগলতাড়ানো বৃষ্টির ফোঁটার মত জনকয়েক লোক এসে চড়বড় চড়বড় করে সরলদাদুর সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার ফিরিস্তি আউড়ে চলে গেল। তারপর হ্যামলেন টাউনের ইঁদুরের মত অনর্গল আত্মীয়রা আসতেই থাকল। সে এক ধুন্ধুমার ব্যাপার। আসছে তো আসছেই। অনবরত এত লোকের হাতের নাড়া খেয়ে আমাদের সদর দুয়ারের একটা কড়া খুলে পড়ে গেল।

ঠিকে ঝি কাজে জবাব দিল। জামাই-এর বাপের শ্রাদ্ধের কথা বলে রাঁধুনী মেয়েটি ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল। আর এইসব অভ্যাগতদের হাজারো জেরায় জেরবার হয়ে বাবার হেঁচকি উঠতে লাগল। ব্যাঙ্কের পাশবইটার ওপরেই দেখলাম সকলের ঝোঁক। জমার ঘরে এক হাজার একশ' এগার টাকার হিসেব দেখে নানাজনে নানাকথা বলতে লাগল। সরল-দাদুর বাবা, মানে বাবার পিসেমশাই নাকি রাজাগজা লোক ছিলেন। তাঁর পিলখানায় আড়াইটে হাতী (বাবা, মা ও বাচ্চাসমেত) ছিল। বিশ বছর আগে সরলদাদু যখন সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে যান, তখন কম করেও এক-দেড় লাখ টাকা যে টাঁকে গুঁজে নিয়ে যাননি, একথা হলফ করে বলা যায় না।

সে যাই হোক, শেষপর্যন্ত নারকেল-ডাঙা থেকে সরলদাদুর এক বিধবা ভাইবৌ এসে বিস্তর কান্নাকাটি করে সব-শেষের পাশবই টিনের স্যুটকেশ আর বৃদ্ধটিকে নিয়ে চলে গেলেন। তখন ঘোর ঘোর সন্ধ্যা।

সেই অবেলায় এক গ্লাস ঠাণ্ডাজল খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বাবা শুয়ে পড়লেন। রতনকাকা, 'তারা তারা মা ব্রহ্মময়ী', বলে লাঠিহাতে বেরিয়ে যেতেই দেখি, আমাদের পাঁচিলঘেঁসা নারকেলগাছটায় আগের মতন আবারও সেই সতেরটা কাকের জটলা বসেছে। আত্মীয়দের ছিঁড়িকে এতদিন ওদের দেখিনি।

।। ৪ ।।

এবার পুজোর আগেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্রঙ্কাইটিস। হপ্তা-তিনেক ভুগে ভাল হয়ে উঠলেও, আগের সামর্থ্য ফিরে পেতে দেরি হবে, বলল ডাক্তার। রতনকাকা আর আমি, দুজনে মিলে বাবার দেখাশোনা করি। খাঁটি দুধ আর মিষ্টি কমলালেবুর রস খাওয়াতে পারলে, বাবা যে দুদিনেই হেঁটে চলে বেড়াতে পারবেন, এ বিষয়ে রতনকাকার কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে, শ্রীহট্টের কমলালেবু যে রসালো এবং অতি উপাদেয়, সেই বর্ণনায় যখন আমি মুগ্ধ, অভিভূত, সেই সময়ে সদরদুয়ারে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনে রতনকাকা উঠে গেলেন।

কার্তিক মাসের দুপুরে, নারকেল গাছের পাতায় রোদের রুপো জ্বলছে। আকাশ ঝকঝকে নীল। অনেক উঁচুতে গা ভাসিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাঁচ সাতটা চিল। অন্যমনস্ক সেদিকে তাকিয়ে প্রায় ঘুম এসে যাচ্ছিল চোখে, হঠাৎ রতনকাকা ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, পু-পুলিশ—পুলিশের সাবইন্সপেক্টার এসেছে রে। শীগগির যতীদাকে ডাক।

অসুস্থ দুর্বল শরীরে কোনমতে লাঠিতে ভর দিয়ে বাবা বেরিয়ে এলেন। গেঞ্জির ওপরে সোয়েটার চাপিয়ে রতন কাকাও বসবার ঘরে এসে বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে কুঁজো বুক নুইয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

বাবা সর্বদা বলেন, দুই সর্বনাশ থেকে দূরে থাকবি। পুলিশ আর বাঘ। একবার ছুঁলে আর রক্ষা নেই। এখন সেই পুলিশের দুহাত তফাতে আমরা বসে। আমাদের সুমুখে আয়েস করে সিগারেট টানতে শুরু করে অল্পবয়সী পুলিশ অফিসারটি বললেন, কে বা কারা বাবার নামে থানায় ডায়েরী লিখিয়ে এসেছে। আজ তিনদিন বাবার সরলকাকা নিখোঁজ হয়ে গেছেন। ঠিকানা, এই বাসার। তার মানে, এই বাসা থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

তাকিয়ে দেখি, বাবার চোখ মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট দুটি কাঁপছে। রতনকাকা তাড়াতাড়ি বাবাকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে জলের সঙ্গে ব্রাণ্ডি মিশিয়ে খাইয়ে দিলেন। আমাদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে সব কথা শুনে, নোটবইতে লিখে নিলেন পুলিশ অফিসার। ভদ্রলোক সহৃদয়। যাবার আগে বললেন, এ কিছু নূতন নয়। এরকম আকছারই ঘটছে। নব্বইয়ের ওপর বয়স, তার মাথার ঠিক নেই। পাওয়া যাবেই, যদি না গাড়ি টাড়ি চাপা—।

বাবা শিউরে উঠলেন, রতনকাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। জুতোয় জোর আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন পুলিশ অফিসারটি।

।। ৫ ।।

রেডিও, অয়্যারলেস, সংবাদপত্র, সব কিছুর মাধ্যমে, সরলদাদুর খোঁজ করা হল। না, কোথাও কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। রতনকাকা সেইদিনই দৌড়েছিলেন নারকেলডাঙ্গায়, সরলদাদুর বিধবা ভাই-বৌয়ের বাসায়। অনেক রাতে অমাবস্যার আঁধার মুখে ফিরে এলেন। মহিলা সাফ জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, এখান থেকে নিয়ে যাবার এক মাস পরেই নাকি অতিষ্ঠ হয়ে সরলদাদুকে আমাদের বাসায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সে কি? কবে—কার সঙ্গে পাঠালেন?
আমার এক বোনপোর সঙ্গে।

বোনপো কোথায়?

পুজোর ছুটিতে দিল্লী, আগ্রা বেড়াতে গেছে। ফেরেনি এখনো।

সর্বনাশ! দরজাটা মুখের ওপরেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। রতনকাকা কোনমতে হাত দিয়ে ঠেকিয়ে শুধোলেন, ওঁর সেই পাশবইটা?
সে তো ভাসুরঠাকুরের বুকপকেটেই থাকতো সারাক্ষণ!

।। ৬ ।।

আগেও আমাদের আত্মীয় ছিল না। এখনও নেই। ঘন ঘন পুলিশ অফিসারের যাতায়াতে পাড়ার লোকরাও আমাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে আজকাল। কিন্তু সরলদাদুর নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর থেকে এ বাসায় এক উৎকট রোগ দেখা দিয়েছে। হঠাৎ চমকে ওঠার রোগ।

কোথাও কিছু নেই, আচমকা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন বাবা। বলেন, কে ডাকল রে? সরলকাকার গলার আওয়াজ পেলাম যেন।

কোন কোনদিন ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠেন রতনকাক। পুলিশ এসেছে যতীদা, পুলিশ।

আমারই হয়েছে সব থেকে মুশকিল। রাত্রে আলো নিভিয়ে যেই শুয়ে পড়ি, মনে হয় অন্ধকার মেঝেয় লাঠি ঠুকঠুক করে বুড়োমত্তন কে যেন এগিয়ে আসছে। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। কানের কাছে ফিসফিস কথা শুনি, আমি তোদের পর নইরে, আপনার জন......আত—।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসি। তাকিয়ে দেখি, নারকেলগাছের আগায় চড়ে বসে ফিকফিক করে হাসছে চাঁদটা।

শালভঞ্জিকা মূর্তি

বিদেশে
ভারতীয় শিল্প-ভাস্কর্য

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী। সেই কবে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার যুগে যে বিরাট সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল যুগ যুগ ধরে তা রূপে-রসে সঞ্জীবিত হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই প্রাচীন সভ্যতাই শাখা-প্রশাখায়, পল্লবে-কুসুমে পূর্ণাঙ্গ হয়ে রূপায়িত হয়েছে বর্তমান শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যে।

ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির খ্যাতি কোনও ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। কত দেশ যে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে প্রেরণা পেয়েছে ও এখনও পাচ্ছে তার হিসাব নিলে গৌরবে বুক ভরে যায়। ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির কদর সর্বত্র। বস্তুত, ভারতীয় সভ্যতা যে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম তা কারও অবিদিত নেই।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজের দেশের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বিদেশী শিল্প-সংস্কৃতির কর্ণধারেরা বেশ আগ্রহশীল। ভারতীয়দের পক্ষে এটা অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের কথা। এইভাবে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী অন্য দেশের মানুষের কাছে প্রকাশ পাচ্ছে। সে দেশের মানুষ এইভাবে ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসের মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। এর ফলে দু-দেশের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের সূত্র গড়ে উঠছে।

শিল্প-যাদুঘরের মাধ্যমেই এ কাজ সম্ভব। বস্তুত যাদুঘরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হল স্থায়ী ও সাময়িক উভয় প্রকার প্রদর্শনীর মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। কথাগুলি বলেছেন একজন শিল্প-বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ। এমনি একটি যাদুঘর বা সংগ্রহশালা হল ওহায়োর ক্লীভল্যান্ড মিউজিয়াম অব আর্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভার্জিনিয়ার একটি যাদুঘরের যেমন ভারতীয় শিল্পসংগ্রহের জন্য খ্যাতি আছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি অনুরূপ সংগ্রহশালা হল ওহায়োর এই ক্লীভল্যান্ড মিউজিয়াম অব আর্ট। সম্পূর্ণ নতুন ও সুন্দর পরিবেশে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-নিদর্শন দেখতে পাওয়া এই যাদুঘরের প্রাচ্যশিল্প গ্যালারীর দর্শকদের পক্ষে এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

এই যাদুঘরের প্রাচ্যশিল্প গ্যালারীর বয়স খুবই অল্প। মাত্র ১৯৭০ সালে জুন মাসে এর উদ্বোধন হয়েছিল। চীন, জাপান ও অন্যান্য দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহের শিল্প-নিদর্শন স্থান পেয়েছে এই গ্যালারীতে। তবে এই যাদুঘরের প্রাচ্য সংগ্রহের প্রায় এক তৃতীয়াংশই ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন। প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে গান্ধার যুগ থেকে শুরু করে ভারতীয় শিল্প বিবর্তনের একটি

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী

ইতিহাস পাওয়া যাবে বিদেশী যাদুঘরের এই সংগ্রহশালায়।

প্রাচ্যশিল্প গ্যালারীর শিল্পনিদর্শনগুলি সাজানো রয়েছে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে। ভারতীয় চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, ব্রোঞ্জ-মূর্তি, ধাতুর কাজ প্রভৃতি রয়েছে এই শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে। নির্মাণকাল, স্থান ও ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে এগুলিকে সাজানো হয়েছে। গুপ্তযুগের শিল্পনিদর্শনের মধ্যে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্য। এই দুই রীতির শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বিভিন্ন। একটি প্রেরণা পেয়েছে বৌদ্ধধর্ম থেকে, অপরটি হিন্দুধর্ম থেকে। কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টির মৌলিক প্রেরণার দিক থেকে দুটিকেই সমজাতীয় বলা যেতে পারে।

প্রদর্শনী কক্ষগুলি খুবই প্রশস্ত এবং এখানে শিল্পবস্তুগুলি এমন কৌশলে রাখা হয়েছে যে, যে কোনও কোণ থেকেই তা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বুদ্ধ-মূর্তিগুলি বেশ উঁচু বেদীর উপর স্থাপন করা হয়েছে।

শিল্পবস্তুগুলির নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি তো আছেই। ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকেই হোক, আর ভাস্কর্যের দিক থেকেই হোক এগুলির মূল্য প্রশ্নাতীত। এগুলি ঐতিহাসিক ও শিল্পসমালোচকদের বিচার্য বিষয়। কিন্তু প্রদর্শনীকক্ষে এই শিল্পবস্তুগুলির অন্য আর একটি মূল্যও আছে। সে মূল্য নিহিত রয়েছে প্রদর্শনীকক্ষে অন্য বহুতর শিল্প-বস্তুর সঙ্গে এগুলিকে সাজানোর মধ্যে। বস্তুত শিল্পনিদর্শনগুলিকে প্রদর্শনীকক্ষে সুরুচি ও অর্থসংগতির সঙ্গে সজ্জিত করাও একটা শিল্পবিশেষ।

সার্থক কক্ষসজ্জা শিল্পবস্তুগুলিকে অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে, অর্থ-বহ করে। প্রদর্শনীকক্ষে বিশেষ ধরনের আলোর ব্যবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-বস্তুর জন্য রুচিসম্মত আধারের ব্যবস্থাও কক্ষসজ্জার অঙ্গবিশেষ। এই দিক থেকে ক্লীভল্যাণ্ড মিউজিয়মের প্রাচ্য গ্যালারীটি সত্যিই বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।

এখানকার কয়েকটি শিল্পনিদর্শন বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নৃত্যরত শিব' মূর্তিটি একাদশ শতকের। এই দক্ষিণ ভারতীয় ব্রোঞ্জ-মূর্তিটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দশম শতকের 'শিব নটরাজ' মূর্তিটিও দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এটিও ব্রোঞ্জনির্মিত। এই ধরনের মূর্তিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন বলে বিবেচিত। পঞ্চম শতাব্দীর একটি বেলে-পাথরের বুদ্ধমূর্তি আর অষ্টম শতাব্দীর একটি পিতলের বুদ্ধমূর্তিও ক্লীভল্যাণ্ড মিউজিয়মের প্রাচ্য গ্যালারীর শোভাবর্ধন করছে।

সিংহাসনসিংহ একটি শালভঞ্জিকা মূর্তি উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় শিল্পসংগ্রহগুলির অন্যতম। রাজস্থান থেকে পাওয়া দশম শতাব্দীর এই কাষ্ঠনির্মিত মূর্তিটি কাঠ-খোদাইয়ের একটি সুন্দর নিদর্শন। বহু অলংকারশোভিতা এই মূর্তি যক্ষদেবীর। মূর্তিটি নিপুণ শিল্পকৃতির স্বাক্ষর বহন করছে।

বেলেপাথরে তৈরি অগ্নিদেবতার মূর্তিটি পাওয়া গেছে রাজপুতানা থেকে। মূর্তিটির নির্মাণকাল ১০০০ খৃস্টাব্দ।

বহু অলঙ্করণমণ্ডিত সিংহাসনে আসীন বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তিটি বাংলাদেশে পাওয়া। পালবংশের রাজাদের আমলে নির্মিত এই মূর্তিটি সূক্ষ্ম কারুকার্যের অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন। এর মূল মূর্তিটি গিলটিকরা তামার, আর বিগ্রহের দেবীটি পিতলের। মূর্তিটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

শিল্পসংগ্রহকালে ক্লীভল্যান্ড আর্ট মিউজিয়ম একটি নীতি মেনে চলে। তা হল এই যে, শিল্পবস্তুটি প্রথম শ্রেণীর হওয়া চাই। অবশ্য মোটামুটিভাবে এটাই যেকোন শিল্প-যাদুঘরেরই নীতি। কিন্তু ক্লীভল্যান্ড আর্ট মিউজিয়ম এই নীতিটি যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনও যাদুঘর তা করে কিনা সন্দেহ।

আর যে সকল প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-বস্তু ক্লীভল্যান্ড যাদুঘরে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকের বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের একটি ধূসরবর্ণের রিলিফ ভাস্কর্য, ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর একটি জৈন মন্দির থেকে সংগ্রহ করা ন' ফুট উঁচু একটি কাষ্ঠ-নির্মিত স্তম্ভ, অষ্টাদশ শতাব্দীর হাতির দাঁতের বাক্স আর লকেট। এছাড়া আছে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের একটি অতি মনোরম কার্পেট। কার্পেটটির আয়তন দশ বর্গ-ফুট।

চিত্রশিল্পের দিক থেকেও এই যাদুঘর কম সমৃদ্ধ নয়। অতি উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় মিনিয়েচার পেন্টিং এই সংগ্রহশালার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে। ভারতীয় শিল্পের এই অদ্ভুত-

অগ্নিদেবতা

পূর্ব সংগ্রহ দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই যে কত-শত শিল্পবোদ্ধা, বিদগ্ধজন, ছাত্র, যাদুঘরের কিউরেটার আর শখের শিল্পসংগ্রাহক নিত্য ক্লীভল্যান্ডের এই সংগ্রহশালায় ভীড় জমাচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই।

মহীশূরের ধারওয়ারে কর্ণাটক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিউজিয়ম অব আর্ট এন্ড আর্কিওলজির কিউরেটার ডঃ নাগরাজ রাও একবার ক্লীভল্যান্ড মিউজিয়ম অব আর্ট পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি এখানকার ভারতীয় শিল্প-ভাস্কর্যের সংগ্রহগুলি খুঁটিয়ে দেখে মন্তব্য করেছিলেন, সংগ্রহগুলি প্রকৃতই প্রতিনিধিত্ব-মূলক।

ক্লীভল্যান্ড মিউজিয়ম অব আর্ট ভারতের বড় বড় যাদুঘর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পত্রিকাদি বিনিময়ও করে থাকে। এই ভাবে ভারতের সঙ্গে তারা একটা যোগসূত্র বজায় রাখে। মিউজিয়মটির উদ্বোধন হয় ছিল ১৯১৬ সালে। সেই থেকেই যাদুঘরটি শিল্পসংগ্রহ করা ছাড়াও অন্য নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণের মনে শিল্পবোধ জাগ্রত করছে, শিল্পজ্ঞান প্রসারিত করছে। এই ভারতীয় শিল্প সংগ্রহের মধ্য দিয়ে আমেরিকার অধিবাসীরা শুধু ভারতের ভৌগোলিক পরিচয়ই পাচ্ছেন না, তাঁরা জানতে পাচ্ছেন কেমন করে একটি সুপ্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ সভ্যতা নাটকীয়ভাবে ইতিহাসের সোপান অতিক্রম করে আজকের এই যুগে উপনীত হয়েছে।

কখনো দিন কখনো রাত

উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

।। ১৩ ।।

ওকে দেখেই নীরোপিসি কড়া গলায় বলে উঠলেন. 'কীরে হাড়হাবাতি লক্ষ্মী-ছাড়ি, কী মতলবে?'

বদনের মা এই আদরের সম্ভাষণে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

দাওয়ার এদিকে 'চোরের মার' খাবার জন্যে যে বৃহৎ তক্তাপোষটি পিঠ পেতে পড়ে আছে, আমি তার ওপর বসে নতুন খুড়িমার একটা জ্যাকেটে বোতাম বসিয়ে দিচ্ছিলাম। এসবদিকে তখনো 'ব্লাউস' কথাটা চালু হয়নি, 'জ্যাকেট, বডি' অথবা 'সেমিজ' এটাই প্রচলিত। নতুন খুড়িমার এই জ্যাকেট নাকি গোয়াড়ি কেষ্টনগরের দর্জির কাছ থেকে করানো, সেখানে নাকি নতুন খুড়িমার কোন মাসি থাকেন, তিনিই করিয়ে দেন। দাম অবিশ্যি বেশী পড়ে, এক একটা জ্যাকেটের সেলাই ছ' আনা, কিন্তু ছাঁটকাট ভালো। তবে বোতামের সেলাই? পরম দুঃখে বলেছেন নতুনখুড়ি. 'সে সেই এক পয়সার পচা গুলির একহারা সুতোর ফোঁড়। দে তো একটু শক্ত করে।'

শক্ত করছিলাম, হঠাৎ এরকম একটা শক্ত কথায় চমকে উঠলাম। ছি ছি অকারণ এমন গালমন্দ কেন? কিন্তু বদনের মা কৃতার্থমন্যের মতো বললো· এই আপনার অপিক্ষেতেই বসে আছি দিদিঠাকরুণ।'

দিদিঠাকরোণ বলে ওঠেন, 'কেতাথ করেছো। তা ওই চুলোয় বসেছো কেন? দাওয়ার পৈঠেটায় বসলে কি তোমায় কেউ শূলে দিতো?'

বদনের মা এবার গুন গুন করে যা বলে সেটা শুনতে না পেলেও নীরোপিসির চাঁচাছোলা মারকাটারী গলার উত্তরটা শুনে বুঝতে পারি আর কিছু নয়, সাহায্য প্রার্থী।

নীরোপিসি বলে উঠলেন. 'ওলো সেই যে একটা কথা আছে না, 'নিত্যি নেই দেয় কে, আর নিত্যি রুগী দেখে কে,' তা তোদের দুটোই খাটে। যেমন সোয়ামীর ছিরি, তেমনি, পুত্তুরের ছিরি, একটা মাতাল, একটা পাগল।'

বদনের মা অনায়াসে সায় দেয়, 'যা বলেছো দিদিঠাকরোণ। ইহ পিথিমিতে এই বদনের মার মতন দুঃখী আর কোথাও নেই। জন্ম গেল হাঁড়ির হালে।'

'বদনা মুখপোড়া কিচ্ছু করছে না তো?

'করবেনি কেন?' বদনের মা অতি সহজ গলায় বলে, 'যা উপায় কচ্ছে নেশায় আর বদচরিত্তিরের পেছনে যাচ্ছে।'

নীরোপিসি কড়া গলায় বলেন, 'তবু তো তোর 'বদনের বাপ' বলতে সাতখানা প্রাণ। ছি ছি। ছেলেও তেমনি গুণের গুণ-মণি! বুড়ো হাতী ছেলে, কেবল খেলে বেড়াচ্ছে। তোদের ঘরে ওর বয়সী ছেলে কতো কাজ করে।...কী বলবো· তোর থেকে বাঁজা বিধবারাও ঢের সুখী।'

বদনের মা অস্ফুটে কী যেন বলে।

বদনের মা ময়লা কাপড়ের আঁচলটা দিয়ে চোখ মোছে।

কিন্তু নীরোপিসি সেই অশ্রুধারার ধার ধারেন না, অম্লান বদনে বলেন, ওই চিমটি-কাটলে ময়লা ওঠা আঁচল দিয়ে আর চোখ ঘগড়াসনে বদনের মা, চোখে ব্যামো ধরবে। থাকার মধ্যে তো 'চক্ষু দরদ' টুকু, তা-ও কি খোয়াবি? কাপড়টা কাচতেও পারিস না?' বদনের মা অপ্রতিভ গলায় বলে, 'সোটা কিনতে পয়সা কোথা দিদিঠাকরুণ?'

'তা' থাকবে কোথা থেকে?'

নীরোপিসি বলেন, লক্ষ্মীছাড়াটা তো যা উপায় করে নেশার পেছনে ঢালে। অমন সোয়ামীর সুমুখে আবার তুই ভাতের কাঁসি ধরে দিস। গলায় দড়ি।'

বদনের মা আর একবার সেই চোখে ব্যামো ধরানোর মতো কাজটা করে ফেলে বলে, 'আজ তিনদিন তিন সন্ধ্যে ঘরে ভাতের হাঁড়ি চড়েনি দিদি ঠাকরোণ।'

'আহা হা কী বার্তাই শোনালি বদনের মা! বলি লক্ষ্মীছাড়াটাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারলিনে? দুখানা বাঁশ বাঁখারি চেঁছে, উঠোনের ঘাস ছুলে,' কি চারটি কাঠ কেটে গেরস্থর উপ্‌গার করে দে যেতো। একটা রোজ', এক পালি চাল দুটো ছোলাকড়াই জুটতো।'

বদনের মা কাতর গলায় বলে, 'বলতে কি কসুর করেছি দিদিঠাকরুণ, বলে বলে মুখ বেথা। আসবেনি। বলে, গা গতরে টাটানি, কোমরে বেথা।'

হুঁ তা বলবে বৈকি। জলবিছুটি লাগালে তবে ওই টাটানি ব্যামো ছাড়ে। তা কপালে যার ছাইপোরা, তার আর আমি কি করবো? মরগে যা চুলোয় যা।'

শুনে এতো কষ্ট হয়! মনে হয়—

বড় নিষ্ঠুর বাবা এ'রা। নিজেদের কতো রয়েছে, অথচ! পাথরের দেবতাকে এতো খরচা করে ভোগ দিচ্ছো, আর মানুষকে 'দূরছাই?' বিবেকানন্দর বাণী কি এ'দের কানে কোনোদিনই পৌঁছয়নি? শোনেন নি এ প্রশ্ন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'

কিন্তু ওই মেয়েমানুষটাকেও বলি বাবা, এতো অপমানেও উঠে চলে যায় না? দাঁড়িয়েই থাকে।

ওমা হঠাৎ দেখি নীরোপিসি কোথা থেকে একখানা নারকেলের আধমালা ভর্তি করে তেল নিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'মাথাতো দেখছি তাড়কা রাক্ষসীর মতন, কতোকাল একটু তেল জোটেনি?'

বদনের মা দুঃখের হাসি হেসে বলে, 'পেটে ভাত জোটেনি তো· মাতায় ত্যাল।'

হুঁ খুব তত্ত্বকথা শিখেছিস! নীরো-পিসি আরো কড়া গলায় বলেন, 'যা তেল-টুকু নিয়ে আড়ালে গে ভালো করে গায়ে মাথায় ডলে পুকুরে একটা ডুব দে' আয়। আলক্ষ্মীর মূত্তি কোথাকার।'

তেল দেখে বদনের মার চোখ দুটো কেমন তেল চকচকে হয়ে উঠলো, মৃদুমন্দ গলায় বলে ফেললো, 'এ্যাট্টা খুরিমুরি' যদি পেতুম দিদি ঠাকরোন।'

'খুরি'? খুরি কী করবি এখন?'

বেহায়া বদনের মা বলে ওঠে, 'এই এট্টসখানি ত্যাল বদনের আর বদনের বাপের

লেগে নে যেতুম। তাদের মাতাও তো ফাটতেছে।'

বলার সংগে সংগে নীরোপিসি প্রায় কুকুর তাড়ানোর মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, 'মর মর এক্ষুনি মর। গলায় পাথর বেঁধে পুকুরে ডুব দিগে যা বেহায়া ছুঁড়ি! এখনো ওদের জন্যে প্রাণ কাঁদছে তোর?'

বদনের মা মলিন গলায় বলে, 'বদনের আর দোষ কী দিদিঠাকরোণ? ওর মাতার ব্যায়রাম!'

নীরোপিসি বলেন, 'হুঁঃ! মাথার ব্যায়রাম! রাখ কথা! আমি ওর মা হলে ব্যায়রাম তো ব্যায়রাম ছেলের মাথার ভূত ছাড়িয়ে দিতাম। রেখেছি তেল, তোমার বদন আর বদনের বাপের জন্যে। ওই ওখেনে শিশিতে আছে নে যেও। জানি তো, তোর দশা! কী পতিব্রতা সতীরে আমার! যা ডুবটা দে আয়, একখান ছেঁড়া পুরনো কাপড় রাখছি, এসে জড়াবি।'

বদনের মা চোখ তুলে তাকায়। তারপর কী যে বিড়বিড় করে বলে কে জানে। বাগদীর মেয়ে কি বামুনের মেয়েকে আশীর্বাদ করে? করতে সাহস পায়?

কী করে কী হয় ভগবান জানে, অতঃপর ডুব দিতে চলে যায় সে তেমনি বিড়বিড় করতে করতে।

নতুন খুড়ি তখন মোছা দালানে বসে পেতলের থালায় ঢেলে ভোগের চাল বাছছিলেন, নীরোপিসি এগিয়ে এসে বলেন, 'নতুনবৌ, দ্যাও দিকিন একখান পুরনো মুরোনো কাপড়, আমার কাপড়ে তো চলবে না। অমন সোয়ামির অকল্যেণে অবিশ্যি পাপ নেই, তবু—এয়োস্ত্রীমানুষ, হাতে করে তো থানের ন্যাকড়াখানা ধরে দিতে পারিনে।'

পাছে নতুন খুড়িমা ইতস্তত করেন, তাই হয়তো এই দীর্ঘ বক্তৃতা।

নতুন খুড়িমা অনিচ্ছামন্থর গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'কাচা কাপড়ে চাল বাছছি, এখন তো বাকসো ছোঁওয়াও—'

'মুস্কিল' এই তো?'

নীরোপিসি ব্যঙ্গাতিক্ত গলায় বলে ওঠেন, 'তোমার আর তোমার বরের গরীবকে একটু দুব্বো ঘাস দিতে হলেও মুস্কিল। তা মুস্কিল বলে বসে থাকলে তো চলবে না! ঘরের মধ্যে ঢুকে একখানা গামছা টামছা জড়িয়ে বার করে আনো। নচেৎ ছুঁড়িকে বলতে হবে, ওলো, তুই ভিজে কাপড় গায়ে শুকো, এ বাড়ি থেকে একখানা পুরনো কাপড় বেরোলো না।'

'পিসিমা!'

গলা বাড়িয়ে দেখি দিদি।

নতুন খুড়ির কাছে বসেছিল বোধহয়।

দিদি নীরোপিসির কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বলে, 'পিসিমা, ও কী তুরে কাপড় পরবে?'

'তুরে কাপড়? পরবে? হুঁঃ পেলে তো বর্তে যাবে। কেন তুই দিবি নাকি?'

দিদি সাবধানে মাথা হেলায়।

নীরোপিসি সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'তোর মা আবার কিছু বলবে না তো?'

'বাঃ মা কী বলবেন? আমার কাপড়তো!'

'তা তোরা তো সবাই নতুন নতুন চকচকে ঝকঝকে এনেছিস—'

'না না সে কিছু না!'

দিদি ছুটে চলে যায়।

এবং খুব তাড়াতাড়ি দিদির লাল সবুজ মিশেল ডোরা শাড়ীটা নিয়ে এসে হাজির করে।

নীরোপিসি ভুরু কুঁচকে বলেন, 'আলো ধরতো দেখি।'

দিদি নির্দেশমতো কাজ করে, এবং দেখা যায় শাড়ীটা নিতান্তই অটুট।

'ওমা! এ যে টনকায়নি মাত্তর জুনী!' নীরোপিসি বলেন, 'দিয়ে দিবি?'

দিদি ব্যস্ত হয়ে বোঝায় না টনকালে কি হবে, কাপড়টা অনেকদিনের। তাছাড়া রং ঝলসে গেছে। যদিও নীরোপিসির অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তবে তিনি শান্ত গম্ভীর গলায় বলেন, 'তা' ইচ্ছে হচ্ছে দে। মনের গুণেই ধন! গরীবকে দিলে, ভগবান শতগুণ দেন। আহা ও ছুঁড়ি কি জন্মে এমন কাপড় চোখে দেখেছে? পেয়ে বর্তে যাবে।'

তারপর দেখলাম একটা বড় চেঙারীতে চাল ডাল আলু নুন আরো সব কি যেন দিয়ে সিধে সাজানো করে নিয়ে এলেন নীরোপিসি, তার সংগে পয়সা।

হঠাৎ উঠোনের ওধার থেকে নতুন কাকার আবির্ভাব। এঁরা যে কতোবার বেরোন কতোবার ঢোকেন।

এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'এটি আবার কোন ব্রাহ্মণের সিধে সাজানো হয়েছে?'

নীরোপিসি সংক্ষেপে বলেন, 'ব্রাহ্মণের নয়, নারায়ণের।'

তার মানে বিবেকানন্দর বাণী জানেন।

কিন্তু নতুন কাকা বোধহয় জানেন না।

তাই থমকে বলেন, 'নারায়ণের? মানে?'

'মানে পরে বুঝিস এখন এখেন থেকে সর। মদনের বৌটা ছ্যান করে ঘাট থেকে আসছে না, তোকে দেখে আসতে পাচ্ছে না।'

'ওঃ মদনের বৌ!'

নতুন কাকা একটু হেসে বলেন, 'তোমার পুষ্যিকন্যে। তাই বল। তা রোজ রোজ এসব ঝামেলা না করে ওদের তিনটের নিত্য বরাদ্দ করে দিলেই পারো।'

নিত্য বরাদ্দ!

নীরোপিসি গম্ভীরভাবে বলেন, 'পারবো না কেন, পারি। দাদামশাই আমায় যা বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তার উপসত্ত্বে ওটা কিছু কঠিন নয়, তবে সেটা আমি করতে চাইনে। ভাতের বরাদ্দ করে দিলে ওদের ক্যাঙালী বানিয়ে দেওয়া হবে। ওরা যে একটা গেরস্ত, একদিন গেরস্তর করণ কারণ সব করেছে ভুলে যাবে।'

'আর এতে তা' হবে না?'

'না!' নীরোপিসি স্থির গলায় বলেন, 'এ আমি মদনার মজুরি বলে দিই। যা তোর সংগে আর বকতে পারিনে। ছুঁড়ি ওদিকে ভিজে কাপড়ে হি হি করে মলো।'

দিদিতে আমাতে তাকাতাকি করি, যার অর্থ—ওঃ আসলে ওই নিষ্ঠুরতা ওর ছদ্মবেশ। আসলে মায়াদয়া আছে।

ছদ্মবেশটা অবশ্য শেষ পর্যন্তই বজায় রাখেন পিসি, ওই বৌটা আসতেই বলেন, 'এই নে পর। সাতজন্মে চোখেও দেখিসনি এমন কাপড়। ন' বাবুর মেয়ে দিয়েছে। আর এই সিদেটা নে যা রেঁধে বেড়ে তিনমানুষে খেগে যা। আর এই পয়সা চারটে ধর, তোর বদন রসগোল্লা বলে মরে, ভুতোর দোকান থেকে কিনে নিয়ে যা। খবরদার হাতে হাতে ছুঁয়ে নিবিনে, ভুতোর দোকানের সন্দেশ সর্বেশ্বর খান। ...আর শোন্‌ গেলোন কোটোন হলে মদনাকে অবিশ্যি করে পাঠিয়ে দিবি, চারটি কাঠ কেটে দিয়ে যাবে। বলবি 'ভাত অমনি আসে না। মনে থাকবে?'

বদনের মা ভিজে কাপড়ের আঁচল আরো ভিজে করে, তারপর রান্নাঘরের দেয়ালের আড়ালে গিয়ে শাড়ীটা বদলে এসে ছুঁৎমার্গ বাঁচিয়ে বড় করে একটা প্রণাম করে বলে, 'তুমি আছো দিদি ঠাকরোন, তাই এখনো পেরাণে বেঁচে আছি।'

অবাক কাণ্ড নীরোপিসি অম্লানবদনে বলেন, 'বেঁচে থেকে তো পৃথিবীর মস্ত উপগার করছিস। এতো নোকের মরণ হয় আর তোর কেন মরণ হয় না তাই ভাবি।'

এতোখানি কটূক্তিতেও কিন্তু বদনের মার মুখের রেখার কোনো পরিবর্তন হয় না, সে দিদিকে আমাকে পর্যন্ত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানিয়ে বিদায় নেয়।

দিদিতে আমাতে ফিসফিস করে একটা আলোচনা করি, এবং আমি হঠাৎ সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে বলি, 'আচ্ছা পিসিমা আপনার তো গরীবের ওপর বেশ দয়ামায়া আছে, আর করবেনও দয়া, তবে অতো বকেটকে কেন?'

নীরোপিসির সুডৌল মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে, বলেন, 'দয়ামায়া আছে সেটা আবার তোকে কে বললো?'

'আমি বুঝতে পেরেছি।'

উনি এবার হেসে ফেলে বলেন, 'সেটা বুঝতে পারলি, আর এটা বুঝতে পারলিনে?'

আমি মাথা নাড়ি।

নীরোপিসি আবার হাসেন, 'মানুষের প্রিকিতি কী জানিস, যতো পায়, ততো চায়। বকাঝকা না করে যদি মুখে মধু ঢেলে 'আহা উহু' করে দয়ামায়াটি করতাম, আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠতো। ভাবতো— "না চাইতেই ঘোড়াটা দিলো, চাইলে তবে— হাতীটা দিতো।' ...আর পাওয়াটা অমনি হলে, তার আর দামও থাকে না। পাওয়ার দাম দিতে হয়। ...এই যে তোরা ইস্কুলে পড়িস, যদি লেখাপড়া কিছু করলি না, তবু কেলাশে উঠিয়ে দিলো, মনে সুখ পাবি? ...ওই গালমন্দটা হচ্ছে দাম

বুঝলি? তবু মদনা মুখপোড়াকে দিয়েও আমি কিছু না করিয়ে ছাড়িনে। ভয়ে সাতাই না জেনে বলে আমি দিদি ঠাকুরাণের পুষ্যি পুত্তুর।'

আর একদিন দেখেছিলাম, হারাণ দুলে নামের একটা বছরেকের উড়েকের একধারে বসিয়ে ঠাকুরের সেবাশী কলা মিষ্টি সব খাইয়ে আর হাতের এই রকম চাল ডাল দিয়ে বললেন, 'তুই আর বলতে বলতে আসিসনে হারাণ, নাতিটাকে পাঠিয়ে দিস।'।

সেদিন বাবার পিসিমার চোখে পড়েছিলো।

বুড়ো চলে যেতে উনি কড়া গলায় বললেন, এবার থেকে দোকানপাড়ায় বায়না দিয়ে দু' কুড়ি পাঁচ কুড়ি চেঙারী বানিয়ে রাখিস নীরি, নইলে তো কুলোবে না।'

নীরি বললেন, সর্বেশ্বরের ভাঁড়ারে চেঙারীর অকুলোন হবে না, রাতদিন পুজো আসছে।'

কথাটা সত্যি।

জনসাধারণের মন্দির না হলেও গাঙ্গুলীদের ঠাকুরবাড়ি একটা পীঠস্থান-তুল্য, বহুলোক মানত করে, পুজো দিয়ে যায় দেখছি।

ঠাকুমা বলেন, 'তা চেঙারী না হয় সর্বেশ্বরের, বাকি মাল তো গেরস্তর?'

নীরোপিসি হেসে উঠে বলেন, 'তোমার যে বেশ আইন জ্ঞান হয়েছে মা দেখছি। ভাগভেন্নর মামলায় উকিল ডাকতে হবে না। ভাঁড়ারটা গেরস্থর? সর্বেশ্বরের নয়?'

ঠাকুমা তবু জেদ ছাড়েন না, মেয়েরই মা তো।

বলেন. 'তা না হয় তাঁরই হলো। তা বলে রাতদিন বিলোবি? অপচেয়ে কুবেরের ভাঁড়ার শূন্যি হয়ে যায়।'

বুঝতে পারছিলাম, মায়ের থেকে মেয়ে অনেক উঁচু দরের মানুষ। মায়ের মধ্যে কৃপণতা আছে।

নীরোপিসি অবিশ্যি মা বলে রেয়াৎ করেন না। চটপট উত্তর দেন' চারটি মোটা ধানের আকাঁড়া চাল, চারটি খেশারির ডাল, আর দুমুঠো নুন লঙ্কা এই তো? গরীবকে দিলে যদি কুবেরের ভাঁড়ার শূন্যি হয়ে যায়, তবে কুবেরের গলায় দড়ি মা।'

'বলি সংসারটা কাদের তা জানিস?'

নীরোপিসি এই গুরুতর যুক্তিতেও নরম হন না, বলে ওঠেন, 'না জানি না। জানতে চাইও না। চিরকাল জেনে এসেছি সর্বেশ্বরের সংসার, তাই জানতে জানতে, আর মানতে মানতে যাবো। ব্যস।'

এমনি অনেক ছোটখাটো ব্যাপারে বুঝতে পারতাম নীরোপিসি এঁদের থেকে একটু পৃথক। মনটা উঁচু, মেজাজটা গরম, বুদ্ধিটা স্বচ্ছ।

বড়জ্যাঠাও লোক ভালো।

অবিশ্যি গরীবের প্রতি দয়ামায়ার বালাই দেখিনি, তবে এমনিতে সোজা সরল উদার।

বড় জেঠিমাটি অন্যরকম।

যাকগে গুরুজনের বেশী সমালোচনায় কাজ নেই।

নতুন কাকা নতুন খুড়ি হচ্ছেন আদর্শ দম্পতি। ওঁরা দুজনেই বেশ কৃপণ, দুজনেই নীরোপিসির প্রতি বিরূপ, দুজনেই নিজের মেয়ে ছেলের দোষ দেখতে পান না, অন্যেরটা দেখতে পান।

ফুলিটা তো দুষ্টুর রাজা, অথচ মা-বাপ দুজনেই বলেন, 'আগে তো ফুলি এমন ছিল না, এই কিছুদিন থেকে দেখছি মেয়ে বিগড়ে যাচ্ছে।'

অর্থাৎ ধরে নিতে হয় কলকাতার মেয়ে দুটোর সঙ্গে মিশেই ওঁদের ফুলি উচ্ছন্ন গেছে। বড়জ্যাঠার ছেলেদের বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে, বৌরা আছে, তাদের সঙ্গে নতুন খুড়ির ব্যবহার ভালো নয়।

অথচ বাইরের লোকেরা সর্বদা বলে যায়. 'এই কলিকালে গাঙ্গুলীবাড়ির মতন এমন পুণ্যের সংসার আর দেখবে না কেউ। কী একতা, কী সভ্যতা।'

এসব যে কতো ভুয়ো, তা আমরা ছোট হলেও বুঝতে পারি।

আর ফুলি তো বিচ্ছিরী মেয়ে। বলতে গেলে খারাপ মেয়ে। একদিন যা করেছিল।

আমাকে এসে বললো, 'এই খুচি, কী বোকার মতন সর্বদা বড়দের মুখের কাছে বসে থাকিস। চলে আয় না আমার সঙ্গে।'

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করি, কোথায়?'

'আয় না পরে বলবো।'

'অন্যদের বাগানের ফুল চুরি করে খেতে যাবি বুঝি? আমি বাবা ওর মধ্যে নেই।'

'দূর হাঁদাগাধা। ফুল চুরি। আমি কি বানর?'

বলেই ফুলি একটা পাকা হাসি হেসে বলে, 'তা তাও বলতে পারিস।'

'কী বল না ভাই।'

'আহা হা সে বলে বোঝানো যাবে না।' ফুলি কেমন একরকম চোখমুখ করে বলে, 'গেলেই বুঝতে পারবি।'

'বলছিস না কেন, আমার যেতে ভয় করছে।'

ফুলি আমায় ঠেলে দিয়ে হি হি করে হেসে বলে, 'সাধে বলি ন্যাকা। কলকেতায় বুঝি তোর একটাও সমবইসী বন্ধু ছিল না?'

'থাকবে না কেন! ইস্কুলে ছিল।'

'তারা তোকে একটুও পাকায়নি। ধন্যি বটে। নে বাবা চল দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

আমার অবশ্য ওই রহস্যময় ভাবটায় একটু অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু পরের বাগানে চুরি করা ছাড়া, আর কোনো অপরাধ মাথায় এলো না। কিন্তু লোভও হচ্ছে এই ভরদুপুরে শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার।

বলি, দাঁড়া দিদিকে ডেকে আনি।'

'দিদিকে ডেকে আনবি?' ফলি হেসে গড়িয়ে পড়ে, 'তা নে তোর মাকেও ডেকে নিয়ে চল। কী ন্যাকা, কী ন্যাকা! বলছি একটা মজা দেখাবো—'

আমাকে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ফুলি।

খানিকটা দূরে গিয়ে কোথা দিয়ে যেন ঘুরে [illegible] শিব মন্দিরের [illegible] দিয়ে, 'দাঁড়া আসছি' বলে একেবারে হাওয়া।

ওঃ এই তাহলে ওর 'মজা' দেখানো।

আমরা যেমন 'এপ্রিল ফুল' করি।

এমন রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে এনেছে যে সহজে বেরিয়ে পড়তে পারবো না। রাগও হলো, কৃপাও হলো। এর বেশী বুদ্ধি নেই ছোড়ারীর, যতই হোক গাইয়া তো। ভেবেছে আমি রাস্তা চিনতে পারবো না।

উঠে দাঁড়িয়েছি, ওমা হঠাৎ ফুলি একটা গাছের আড়াল থেকে কাদের একটা ধাড়ি ছেলের হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে হিহি করে তাকে ঠেলে আমার গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে বলে উঠেছিল, 'এই নিয়ে এলাম মজা। আসল মজাটি দেখতে চাস তো—।'

আমি ওদের দুজনকে ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে কোথা দিয়ে যে পালিয়ে এসেছিলাম।

পিছনে ওদের গড়িয়ে পড়া হাসিটা যেন আমার তাড়া করতে আসছিল।

শেষ অবধি বাড়ি এসে পেঁছিলাম।

তখন ভরাদুপুর, নিরিমিষ ঘরে নিরিমিষ গিন্নীরা খেতে বসেছেন, ঘরের দরজার বাইরে রোয়াকে আমিষ আহারের পাতকে পতিত সধবা গিন্নীরা বসেছেন তাঁদের খাওয়া তদারক করতে! প্রবল কলকল্লোল শোনা যাচ্ছে।

বুক দুড়দুড় করছিল, শীতের দুপুরেও ঘাম ছুটে গিয়েছিল, এবং এসেই কোথাও আছড়ে পড়ে কেঁদে ফেলবার ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু পা টিপে টিপে ওধার দিয়ে ঘুরে দোতলায় উঠে গেলাম।

এখানে এই এক মস্ত সুবিধে।

কতো যে ঘর দালান, কতো যে গলি গলি পথ, কতোদিকে যে কতো দরজা। হারিয়ে যাবার পক্ষে আদর্শ!

এতোবড়ো বাড়ি যে সহজে কেউ কাউকে ডেকে পায় না, একটা ছেলেকে ডাকতে হলে, আর দু' একটা ছেলেকে লাগাতে হয়, সে হয়তো ডাক বসিয়ে বসিয়ে ডেকে নিয়ে যায়।

কাঞ্চনতলার বিরাট চকমিলোনো বাড়িটায় এ দৃশ্য অহরহই দেখতে পাওয়া যেতো, ধূলি ধূসরিত রক্তমাংস একটা ছেলে কি মেয়ে দোতলা একতলা দালান সিঁড়ি, অথবা বারবাড়ি ঠাকুরবাড়ি চষে বেড়াচ্ছে, 'এই অমুককে কোথায় জানিস?' নতুন কাকা ডাকছে।...নতুন কাকা না হলে জেঠামশাই কি পিসিমা। এঁদের ডাক অমোঘ, এঁদের নির্দেশ অলঙ্ঘ্য।

মা খুঁজছে?

তাঁদের কথা শুনতে বয়ে গিয়েছে ওদের।

আমি ওই হারিয়ে যাবার সুবিধেওলা বাড়িটায় এপথ ওপথ করে, দোতলায় উঠে গেলাম।

হে ভগবান, ঠিক এই মুহূর্তে যেন দিদির সামনেও না পড়ি। আমাকে একটু অন্তত হাঁফ জিরোতেও দাও।

কাঁদবার জন্যে আমার চোখের ভিতরে একঝলক গরম জল টগবগ করছিল।

কিন্তু ভগবান কথা শুনলেন না।

ঘরে ঢুকেই আমি দিদিকে দেখতে পেলাম। দিদি কী একটা সেলাই করছিল, আমাকে দেখে বলে উঠলো, 'কী হয়েছে রে?'

আমি কেঁদে ফেললাম।

দিদিকে না বলে পারা যায়?

দিদি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলেছিল, 'খবরদার মাকে বলিস না। আর ওই পাজীটার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলবি না।'

'ওটাই তো সেধে সেধে আসে। কেবল ডাকে, চলনা পেয়ারা পাড়িগে, চলনা কুল পাড়িগে—'

এবার বলতে এলে বলবি, 'বড়দের কাছে তোর সব কথা বলে দেবো। দেখিস ভয় খেয়ে যাবে।'

পরে বুঝেছিলাম, দিদি সেই বয়সেই যথেষ্ট সংসার-অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

সেই থেকে ফুলির আমায় দেখে হি হি করা বেরিয়ে গেল। একা দেখা হলেই বলবে, 'এই বুচি, তোর পায়ে পড়ি ভাই, কাউকে বলে দিস না!'

আমার মনে হয়েছিল, আর বেশীদিন এখানে থাকা আমাদের পক্ষে বোধহয় নিরাপদ নয়। ঠিক করলাম বাবাকে বলবো।

দিদি বললো, 'লাভ কিছু হবে না। কি কথা আছে জানিস তো? ছুটি ফুরলে বাবা একা ফিরে গিয়ে, 'ও-বাড়িতে' থেকে অফিস করবেন, আর বাড়ি খুঁজবেন। পেলে ঠিকঠাক করে তবে আমাদের নিয়ে যাবেন। আজকাল তো আবার সহজে বাড়ি পাওয়া যায় না।'

কান্না এসে যাচ্ছিল।

কী চমৎকার বাড়িটাই ছিল আমাদের, সেই অবিনাশ ডাক্তার লেনের।

লেন হলে কি হবে, ছাতে উঠলেই তো বড় রাস্তা দেখা যেতো।

'দিদি তোর মনে আছে এক-একদিন রাস্তা দিয়ে কীরকম ঘটা করে বর যেতো।'

'থাকবে না কী রে! ব্যাগপাইপের বাজনা, আলোর গেট, বাজি পোড়ানো, কতো কীই হতো।'

'এখানে কেউ ভাবতেই পারে না।'

আমি নিঃশ্বাস ফেলি, 'একদিন বিহঙ্গ আর বিন্দাবনকে বলছিলাম, একবার একটা বিয়েতে ষোলো ঘোড়ার গাড়ীতে বর যেতে দেখেছিলাম, পেছনে চতুর্দোলায় কনে। বরের মুখ টোপরের ঝালরে ঢাকা—তা ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে ইস, ষোলো ঘোড়ার আবার গাড়ী হয়। সে তো গল্পের রাজা-রানীর হয়।' আর একটা বিয়েতে—প্রসেশনে বিরাট বিরাট সত্যি হাতীর মতন কাগজের হাতী, কাগজের ঘোড়া, কাগজের তাড়কা রাক্ষসী দেখেছিলাম শুনে হেসেই মলো। সব নাকি আমি মিছে কথা বলেছি। ...তাড়কা রাক্ষসী একেবারে সত্যি তাড়কার মতন প্রকাণ্ড ছিল, না দিদি?'

দিদি উচ্ছ্বসিত হলো, 'তা আবার বলতে। ওরা অনেক কিছুই বিশ্বাস করে না, আমি তাই বলি না আর।'

'আর দিদি, সেই মহরমের তাজিয়া? 'হাসান-হোসেন' করতে করতে দলে দলে রাস্তা দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে যাওয়া?'

হঠাৎ কলকাতার জন্যে এতো মন কেমন করে ওঠে যে, দুজনের জানা কথাই আবার দুজনে বলাবলি করি।

সেই ছাত, সেই বড় রাস্তা, সেই রাস্তার বহুবিচিত্র দৃশ্য, যেন তীব্র আকর্ষণে টানতে থাকে।

মন কেমন করে উঠলে এই রকমই হয় বোধ হয়।

দিদি আস্তে বলে, 'পুরো ভালো তুই কোথাও পাবি না বুচি। ওখানে অন্য সব ভালো, কিন্তু বাড়িতে এমন খোলামেলা অগাধ জায়গা অগুনতি ঘর পাবি না। আবার এখানে বাড়ি ঠাকুরবাড়ি সবটাই কী ভালো, কিন্তু সবই যেন অন্যরকম। ভেবে দেখ—কতো বইতে পড়েছি, 'সরলা গ্রামবালিকা!' এই তার নমুনা!'

ছেলেবেলায় মন কেমন করলে মনটা কি রকম যে মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না।

আমি সাহসে ভর করে গিয়ে বাবাকে ধরলাম।

এমনিতে তো বাবাকে চোখেই দেখতে পাওয়া যায় না। বাবা তাঁর সেই কোন ছেলেবেলার পাঠশালার এক বন্ধুকে পেয়ে এমন ভিড়ে গেছেন।

তাঁর সঙ্গেই দীঘিতে চান করতে যান, তাঁর ক্ষেতখামার দেখে বেড়ান, তাঁর সঙ্গে পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকেন, আর কিছু না হলে তাঁর বাড়ি গিয়ে বসে বসে দাবা খেলেন।

একমাত্র রাতে আমাদের একঘরে শোওয়া তাই বাবাকে দেখতে পাওয়া। কিন্তু তখন তো মা সামনে। আমরা কিছু বলতে গেলে মা তার ওপর কথা বলে সব গুবলেট করে দেবেন না?...আর খাওয়ার সময়? সেখানে তো বাবার পিসির রাজত্ব।

জেঠামশাইয়ের ছোট্ট নাতি বিহঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাবার সেই বন্ধুর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির। আমরা বড়ো হয়ে গেছি, আমাদের পর্দানসীন হওয়া দরকার, তবু সাহসে ভর করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম।

বাবা দাবা খেলছিলেন, হঠাৎ আমার সবলে প্রবেশ দেখে বললেন, কী রে? বলবি কিছু?

আমি এক কোপে গাছ কাটি।

বলে ফেলি, 'আমরা কবে কোলকাতায় যাবো তাই জিগ্যেস করছি—'

বাবা একটা বোড়ের চাল দিয়ে নিয়ে হা-হা করে হেসে উঠে বলেন, 'সেই কথা জিগ্যেস করতে হঠাৎ ছুটে এখানে এলি? ...দ্যাখ সুবোধ দ্যাখ। এই মেয়েকে পিসিমা উঠতে বসতে বড়ো হয়েছে, বড়ো হয়েছে করেন।...দেখতেই বড়ো, ছেলেমানুষের অধম।'

হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন ঘটে। দুঃখের, অপরাধবোধের, লজ্জার।

বাবা আমাকে এতো ছেলেমানুষ ভেবে নিশ্চিন্ত আছেন? অথচ আমি প্রেমের কবিতা পড়ে তার রসে নিমজ্জিত হই, আমি 'ভালবাসা' শব্দটার নতুন ব্যাখ্যা বুঝি, আমি আন্দাজে জেনে ফেলেছি, ফাল্গু ওই ভাঙা শিবমন্দিরে কেন যায়। কেন আমাকেও দলে টানতে নিয়ে গিয়েছিল।

বাবা একটু তাকিয়ে বলেন, 'কী হলো? কান্না পেয়ে গেল কেন? মা বকেছে বুঝি?'

আমি মাথা নাড়ি।

'তাহলে?'

'বাঃ কাঁদিইনি তো।'

'তবু ভালো। কি বলছিলি? কবে কলকাতায় যাওয়া হবে? সেসব কথা বাড়ি গিয়ে হবে রে। দাদাদের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?'

আমি ঘাড় হেলাই।
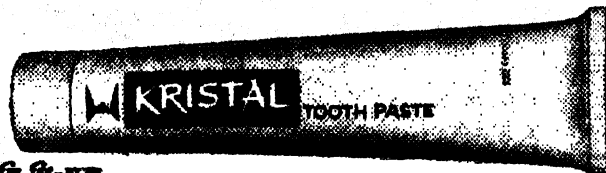
একটা কারণ পেয়ে বেঁচে যাই।
বাবা বললেন, 'বাড়ি যা, রোদে বেড়াস নে।'
চলে আসতে হলো।
মাকে গিয়ে ধরলাম, 'মা আমরা কি এখানেই থেকে যাবো নাকি?'
মা চাপা আক্রোশের গলায় বললেন, 'তা আমায় বলছিস কেন? যাকে বলবার তাকে বলগে না।'
'বলেছি। বাবা বললেন, বাড়ি গিয়ে কথা হবে।'
'তবে আবার আমায় জিগ্যেস করতে আসা কি জন্যে? ছেলে দুটো রইলো, এখানে-সেখানে পড়ে—আর উনি দিব্যি—'
মা চুপ করে গেলেন।

অথচ মা যখন মহিলা মজলিশে বসেন তখন তো আহ্লাদের সাগরে ভাসছেন মনে হয়। এই তো সেদিন ওঁদের দুপুরের তাসের আড্ডায় দিব্যি বিগলিত গলায় বলতে শুনলাম, 'তাস খেলতে এতো ভালবাসি, সঙ্গী অভাবে খেলতে পাই না। কতো কাল পরে যে প্রাণ খুলে খেললাম এখানে, সাবেকী বাড়িতে বসতো একটা তাসের পাট, তা তখন তো কোলে কাচিকাচা, সময়ই ছিল না।'

রাতে কথা হলো বাবার সঙ্গে।
বাবা প্রায় অবাক গলায় বললেন, 'আসার সময় কথা হয়েছিল মাস-দুই-আড়াই থাকবে তোমরা, দেড় মাস না হতেই এমন অধীর হচ্ছো কেন বলতো? এখানে তোমাদের অসুবিধেটা কোথায় হচ্ছে বুঝছি না তো।'

মা মা হয়েও দিব্যি আমাকে সওয়ালের মুখে ঠেলে দিলেন। বললেন, 'আমি বলছি না, তোমার মেয়েই বলছে।'

'ওঃ. তাই বল। রুচি তো হঠাৎ সুবোধের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। সুনীর এখানে স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে আর কিছুদিন থাকাই তো ভালো। নীরোদির সঙ্গে সঙ্গে তোমরা একটু বেড়াতে বেরিও তো, এখানে যখন সুবিধে রয়েছে। বেরোলে ভাল লাগবে।'
দিদি হাসলো।
বললো, 'নেমন্তন্ন খেতে খেতেই তো সারা গ্রামটা বেড়ানো হয়ে গেল আমাদের বাবা।'
'তা বটে।'
বাবাও হাসলেন।

তারপর বললেন, 'আসল কথা কী জানো নবো, কেউ যদি সর্বদাই নিজের অবস্থাটাকে ভয়ানক অসুবিধের অবস্থা ভাবে, তাহলে তার সুবিধে ভগবানেও করে দিতে পারে না। কলকাতাতেই কি তুমি কোনোদিন ভেবেছো, বেশ ভালো আছি, সুবিধেয় আছি? আমার তো বিশ্বাস কলকাতায় ফিরে গেলে তুমি রাতদিন ভাববে কাওমতলায় কতো সুখে ছিলাম, এখানে এসে এতো অসুবিধে।'
বাবা হাসতে থাকেন।

হঠাৎ এক সময় মা বলে ওঠেন, 'এখানের বিষয়-সম্পত্তিতে বুঝি তোমাদের কোনো ভাগ নেই?'
বাবা শান্ত গলায় বলেন, 'কেন থাকবে না? না থাকলে এখানে এসে এমন আরামসে আছি কি করে?'
'আহা। সারাজীবনে দু মাস।'
বাবা আস্তে বলেন, 'এই দু মাসটাই কি কম দামী নবো?'
'নতুন ঠাকুরপো তো তলে তলে আলাদা বিষয়-সম্পত্তি করছে।'
বাবা হেসে ফেলে বলেন, 'তলে তলে করছে তো তুমি জানলে কী করে?'
'নতুন বৌ-ই বলেছে।'

বাবা পাশ ফিরে পাশবালিশটা জড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'গুজবে কান দিও না নবো!'
বুঝলাম বাবাকে নড়ানো যাবে না।
অথচ বাবাকে কতো কোমল আর নমনীয় মনে হয়।
দাদাও অনেকটা বাবার মতো।

এখানে এসে দিদির সঙ্গে ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম।
দিদি বেশীর ভাগ সময়ই বড় জেঠামশাইয়ের ছেলের বৌ বীণা, অরুণা আর কল্যাণীর কাছে কাছে ঘোরে। ওদের দুজনের একটা করে ছেলে হয়েছে, একজনের হয়নি। তার সঙ্গেই দিদির অধিক ভাব। তার কাছে দিদি চটের আসন বোনা শিখে ফেলেছে, তুলোর হাঁস, তুলোর কুকুর করতে শিখেছে এবং কুরুশ-কাঠির বোনা রপ্ত করছে।
আমার ওগুলোর সবই দু' চক্ষের বিষ। কী করে যে মানুষ অতোক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে ওইসব করতে পারে।

দিদিকে বলেছিলাম, 'অথচ চরকাটা পড়ে রইলো দিদি।'
দিদি অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে এলোমেলো-ভাবে যা বললো, তার অর্থ হচ্ছে, ঠাকুমার চরকা কাটায় হাত আছে, বলেছেন শিখিয়ে দেবেন।

ঠাকুমার বাবা অর্থাৎ সেই মহাপ্রতাপ ব্রাহ্মণ যোগেন্দ্রচন্দ্র নাকি বাড়িতে হাতে-কাটা সুতোয় ছাড়া পৈতে পরতেন না। অতএব তাঁর মেয়েকেই করে দিতে হতো সেটা।
যোগেন্দ্রচন্দ্রের আরো হুকুম ছিল, বাড়িতে যখন যে বালকের উপনয়ন হবে, তার ঝুলির গামছা ও গেরুয়া বস্ত্রের বস্ত্র-খণ্ড চরকার সুতোয় বুনিয়ে নিতে হবে।
তা বুড়ো সংসারে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওই অন্নপ্রাশন উপনয়ন অনুষ্ঠানও আবর্তিত হতো।
অতএব সারা বছরই কিছু কিছু করে সুতো কেটে জমাতেন যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিধবা মেয়ে।
প্রয়োজনের সময় সেই সুতোর গোছা নিয়ে ছুটতেন তাঁতিবাড়ি।
তাঁতিবাড়ি, কুমোরবাড়ি, কামারবাড়ি, এসব ওনাদের ভাতের হাঁড়ি।

যাকগে, দিদি ওই বৌদিদের গোকুলে বাড়ুকগে, চটের আসনে ফুল তুলুকগে। আমার ভিতরে সমুদ্রের আলোড়ন।

পুরো চয়নিকাটাকে মুখস্থ করে ফেলবার সাধনায় তৎপর তখন আমি।
দুপুরবেলা ছাতের সিঁড়িতে, সকালে আমবাগানে।
একদিন হঠাৎ ফুলি ধরলো, 'কী বাবা, আমায় তো এতো ঘেন্না, এদিকে নিজে বেশ ডুবে ডুবে জল খাওয়া চালিয়ে যাচ্ছো।'
ওই আপ্তবাক্যটির মানে জানতাম না তখন, অই অবাক হয়ে বলি, 'জল খাওয়া মানে?'
'আহা! ফের সেই ন্যাকামি? রোজ আমবাগানে গিয়ে কী করিস শুনি?'
আমার হঠাৎ বড় করুণা হলো।
আহা কতো নীচু স্তরে পড়ে আছে মেয়েটা।
আমারই বয়সী, আমার থেকে সুন্দরী।
বলে ফেললাম, 'শুনবি? দেখবি কী করি। তবে চল।'
ওর মতই প্রায় টেনে নিয়ে গেলাম ওকে।
তারপর বইটা খুলে একটু দেখে নিয়ে ওর বোধগম্যের পরিধি আন্দাজ করে উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলাম—
'নদীতীরে বৃন্দাবনে, সনাতন একমনে
জপিছেন নাম—
হেনকালে দীনবেশে, ব্রাহ্মণ চরণে এসে—'
ফুলি আমার বইয়ের ওপর হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলো, 'লুকিয়ে লুকিয়ে আম-বাগানে এসে তুই পদ্য পড়িস? পাগল, না ছন্ন?'

(ক্রমশঃ)

প্রতিভার অপমৃত্যু

আমাদের বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' থেকে আচার্য হরিনাথ দে প্রসঙ্গে লিখিত কবিতাটি ছিল। তার কয়েকটি লাইন আজো স্মরণে আছে—

"যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব
শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা
যাচ্ছে পুড়ে নতুন ক'রে
সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।"

এই কবিতার মাধ্যমে জীবন প্রভাতে ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে-র সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। কবিতাটির মধ্যে একটা সুগভীর শোকের মর্মবেদনা ছিল। অবশ্য এখন দেখছি ইঙ্গবিদ্ পণ্ডিত নীরদ সি. চৌধুরীর মতে—'ইট ইজ টিপিক্যাল বেঙ্গলী গস্'। এমন কি তাঁর মতে এ কবিতা 'ফুলিস'। নিজস্ব মত পোষণে অবশ্য সকলের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু আজো মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই সর্বপ্রথম 'হরিনাথ দে'-র পরিচয় মাত্র কয়েকটি লাইনে আচার্য হরিনাথের মৃত্যুর মুহূর্তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১৯১১ থেকে ১৯৭২ সুদীর্ঘকাল। এই কালের মধ্যে আচার্য হরিনাথ প্রসঙ্গে অনেকরকম ছোট-খাটো আলোচনা নজরে পড়েছে কিন্তু সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'ভাষা পথিক হরিনাথ দে' নামক গ্রন্থে যেভাবে আচার্য হরিনাথের জীবন ও মনীষা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বাংলাভাষার জীবনী সাহিত্যে তা এক স্মরণীয় অবদান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। এই গ্রন্থ রচনায় লেখক যে অসাধারণ শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা সচরাচর নজরে পড়ে না। জীবনেতিহাস আর ইতিহাস সমধর্মী, তাই ইতিহাস-কারের তথ্যনিষ্ঠা জীবনীকারেরও স্বধর্ম। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। আচার্য হরিনাথের জীবন যেন গ্রীক ট্রাজেডি। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে এই আশ্চর্য প্রতিভাধর পণ্ডিতের মৃত্যু জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্য। যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর মৃত্যু ঘটে সেই বছরের মার্চ মাসেই তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার নেমে আসে। ভগ্ন হৃদয় হরিনাথের মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা তাই কঠিন। টাইফয়েড রোগ যেন জীবনের সব জ্বালা সব গ্লানিকে মুছিয়ে দিয়ে গেল।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ও শেষের দিকে আবেগমুক্ত থাকতে পারেন নি, তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—

'সময় তাঁকে ক্ষমা করেনি, দেশ তাঁকে মর্যাদাবান করে তোলেনি; ইতিহাস তাঁকে দেয়নি বরমাল্য। তবু কেন একালের একজন দ্বন্দ্বক্ষত মানুষের মানসিকতায় তিনি মূল্যবান বিবেচিত হবেন? কেন তাঁর সকল অস্তিত্ব বিলুপ্তির সমস্ত ইতিহাস পেরিয়ে আরও একবার এসে দাঁড়াবে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাচর্চার খেলা প্রাঙ্গণে জিজ্ঞাসায় মুখর স্ফিংসের দম্ভে? ...মৃত্যু তাঁকে করে তোলেনি বরণীয়। কারণ জীবনকে ধূপের মতো পোড়াতে তিনি জানতেন না।'

হরিনাথ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই. ই. এস. ইংলণ্ড থেকেই তিনি সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহে মাতুলালয়ে হরিনাথের জন্ম। পিতা ভূতনাথ ছিলেন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের একজন সফল আইনজীবী। কিন্তু সেইখানে মিউনিসিপ্যালিটি, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষকালে জনসেবা ইত্যাদি কর্ম করে সরকারি মহলে এবং জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি দানবীর ছিলেন। হরিনাথের বাল্যকাল কাটে এই রায়পুরে। হরিনাথ জননী এলোকেশী স্বয়ং পুত্রের প্রাথমিক বিদ্যারম্ভে সহায়তা করেন। রায়পুর মিশন স্কুলে তাঁর পড়াশোনার সূচনা এবং সেই অল্প বয়সেই তিনি ইংরাজী বাইবেলের এক হিন্দি অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বারো তের বছর বয়সে মিডল স্কুল পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম বিভাগে এবং পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। বাল্যো রেভারেণ্ড পসের কাছে লাতিন শিক্ষায় হাতেখড়ি হয়। এর পর থেকে আগাগোড়া এক অভূতপূর্ব সাফল্যের ইতিহাস। যে বিষয় খুশী সেই বিষয়ে তিনি পরীক্ষা দিয়েছেন এবং অবলীলাক্রমে উচ্চশ্রেণীর মর্যাদা নিয়ে পাশ করেছেন।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র তথ্যাদি বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করেছেন, স্কুল ও কলেজের পুরাতন রেকর্ড থেকে শুরু করে সমকালীন অভিমত এবং পরিচিতদের বক্তব্য পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। কোনো তথ্য লোকমুখে শুনে তা যেখানে সেখানে বসিয়ে কাহিনী বানানোর চেষ্টা করেন নি এবং সেইখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

প্রথম দিককার পরিচ্ছেদগুলি যেন এক অবিশ্বাস্য জগতের উপকথার মতো। এই গ্রন্থের ত্রিশ পৃষ্ঠায় প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিস্টার (কলিকাতা ১৯২৭) থেকে হরিনাথ দে বিষয়ক যে পাদটীকা সংকলিত হয়েছে সেই কয়েকটি লাইনের মধ্যেই বিগত যুগের এই অবিস্মরণীয় পুরুষের জীবনালেখ্য।

হরিনাথের এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য স্বভাবতই তাঁকে ঘিরে অনেক কাল্পনিক গালগল্পও রচিত হয়েছে, যা মুখে মুখে ছড়িয়েছে। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় যতগুলি এই জাতীয় গুজব কানে এসেছে বা চোখে পড়েছে তার যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। এমন একটি তথ্য হল হরিনাথ দে আই. সি. এস পাশ করে সিংহলে যৌথ শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করেছিলেন। বহু প্রচলিত দুটি অভিধানে এই তথ্য আজো পরিবেশিত হয়ে থাকে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ ও বিদেশের বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে পত্র লিখে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সংগৃহীত বহু তথ্য মিলিয়ে নিয়েছেন। যেমন হরিনাথ দে 'স্মিথ' পুরস্কার পেয়েছিলেন এই ধারণা প্রচলিত আছে, কিন্তু 'স্মিথ' ও 'স্কিট' এই দুটি নামে গোল পাকিয়ে গেছে। কেম্ব্রিজের 'স্মিথ' প্রাইজটি অঙ্কের জন্য দেওয়া হয়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এ ধারণাও নিরসন করেছেন।

হরিনাথ পাঁচশত টাকায় ঢাকা কলেজে যোগ দিলেন এবং লেখক বলেছেন—

'ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় হরিনাথ ইংরাজী সাহিত্যের কতিপয়

সুকঠিন পুস্তকের অভিনব সংস্করণ প্রকাশনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মেকলে'স এসে অন মিলটন' এর সম্পাদনা করলেন। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতাতেই সম্পাদকের পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই ধরনের সুনিপুণ সম্পাদনা দেশী বিদেশী খুব কম পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য, টীকা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি হরিনাথ সম্পাদিত 'মেকলে'স এসে অন মিলটন'-এ সংযোজিত হয়েছে।'

এই গ্রন্থে প্রকাশিতব্য কয়েকটি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল। আর 'মেকলেস এসে অন মিলটন' নামক গ্রন্থ প্রকাশের পরের বছর তিনি 'প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারী, বুক ফোর'-এর একটি মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করেন। লেখক বলেছেন—

'গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, আরবী, পারসিক, গের্মনীয়, ইতালীয়, হিস্পানী প্রভৃতি সাহিত্যের স্রষ্টাদের রচনা থেকে অজস্র উপমা এবং টীকা-টিপ্পনী—এই পাঁচশ পাতার গ্রন্থটিকে এক অনন্যসাধারণ আকার দিয়েছে।, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থগারিক পদের জন্যে লিখিত হরিনাথের আবেদনপত্রটি থেকে জানা যায় :

I have written commentaries on books of English literature which have elicited praise from men like Mr. C. H. Tawney (senior classic in 1860)-and Professor E. Dowden, the celebrated Shakespērian critic, printed copies of whose letters are attached with my testimonials.'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা কর্তব্য যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থগারিক পদের জন্য লিখিত আবেদনপত্রটি (যা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে পূর্ণাঙ্গ সংযোজিত) এক হিসাবে হরিনাথ দের আত্মজীবনী।

হরিনাথ দের রচনাপঞ্জীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা গ্রন্থ শেষে সংযোজিত হয়েছে। শুধু সেই তালিকা পাঠ করলেও এই বিচিত্র মানুষটির বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে লেখক কয়েকখানি পত্র সংযোজিত করেছেন। এই পত্রগুলি ডি ডি কোশাম্বী, নীরদ সি চৌধুরী, পি এন ব্যানার্জি ও ডাঃ তারকনাথ সেন প্রভৃতির লেখা। ডাঃ তারকনাথ সেন লিখিত পত্রটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু নীরদ সি চৌধুরী ও পি এন ব্যানার্জির পত্র দুটি অনাবশ্যক ভারবৃদ্ধি করেছে মনে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক হরিনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—

'প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তাঁর মহানুভবতার কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর এদেশে এমন হৃদয়বান মানুষ কমই জন্মেছেন।' এই দিকটি অনুসন্ধান করে তিনি শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং হরিনাথের ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষের কলিকাতা 'ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনের ১৯১১-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় সদ্য পরলোকগত আচার্য হরিনাথ প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধ রচনা করেন সেই প্রবন্ধ থেকে অনেকখানি উদ্ধৃতিদান করেছেন। অঘোরনাথের এই মন্তব্যটি হরিনাথ-চরিত্র বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

অঘোরনাথ লিখেছিলেন—

Many wild stories are in circulation about him, but those who actually came in contact with him will say in one voice that he spent a large portion of his income in the cause of charity though sometimes undiscovered. ....He never desisted from helping the needy and the distressd even at the risk of personal inconvenience and discomfort, sometimes dishonour and insult.'

অঘোরনাথ বলেছেন এমন অনেক ঘটনার তিনি নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী।

এই কথাগুলি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে এই কারণে যে অতঃপর হরিনাথের জীবনের বিয়োগান্ত দিকটির আলোচনা হবে। হরিনাথের এই অসম্মানজনক অপসারণের সঙ্গে বিখ্যাত লেখক অসকার ওয়াইলডের বিয়োগান্ত জীবন-নাটকের কথা স্বভাবতই স্মরণে আসে। সেখানেও একটা শক্তিশালী চক্র অসকারের বিরোধী ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করেছিল। এই গ্রন্থের লেখকও এই তুলনা উল্লেখ করেছেন।

হরিনাথ সাধারণ মাপকাঠিতে যাকে বলে 'রেকলেশ', তিনি মদ্যপান করতেন (বর্তমানকালে স্কুল কলেজের কোনো কোনো বালকেও এমন কার্য করে থাকে)। তিনি থিয়েটারে যেতেন সুতরাং চরিত্রহীন ইত্যাদি নানারকম অপবাদ মুখে মুখে ছড়ালো। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক সদ্‌গুণ থাকলেও তিনি যে স্তাবকতা পছন্দ করতেন এবং স্তাবকের কথা শুনতেন এমন প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আশুতোষ হরিনাথ চরিত্রের কলঙ্ক কথা বিশ্বাস করেছিলেন এবং তিনি হরিনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। লেখক বলেছেন—

"কিন্তু নির্বিচারে আশুতোষ হরিনাথের প্রতি এতদূর বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন যে একদিন সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ উত্তেজিত হয়ে হরিনাথকে বলে উঠলেন, 'তোমার কীর্তিকলাপ সব আমি জানি।'"

দীনেশচন্দ্র সেন কৃত আশুতোষ স্মৃতিকথায় হরিনাথ প্রসঙ্গে যে কথাকটি বলা আছে তার মধ্যেও আশুতোষ-হরিনাথ বিরোধের ভিতরের দিকটি প্রচ্ছন্ন নেই। গ্রন্থকার সেই প্রাসঙ্গিক অংশটি উধৃত করেছেন।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্যার আশুতোষের তদন্তের যে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লেখক সংযোজিত করেছেন তা থেকে বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে সেই সময়টিতে আশুতোষের মনোভঙ্গী হরিনাথের প্রতি কতখানি অনুদার ছিল তা বোঝা কঠিন হবে না। স্যার আশুতোষ একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবী এবং হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন, তথাপি মাঝে মাঝে হরিনাথ সম্পর্কে নিজের অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন, অনেক স্থানে অনুমানের ওপর নির্ভর করেছেন। 'এ্যাপারেন্টলি', 'মাইট হ্যাভ বিন' দে-র বক্তব্য 'ভ্যালুলেস' কিন্তু দু এক জায়গায় 'ইনটারেস্টিং'—এর পিছনে আবার কেরানী সরোজেন্দ্রকে স্যার আশুতোষ নিজেই যে 'উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট' দিয়েছিলেন তার উল্লেখ থাকায় তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

গ্রন্থকার কোনো মন্তব্য না করে সকল প্রকার তথ্যাবলী এই গ্রন্থে পরিবেশন করায় পাঠকদের পক্ষে সমগ্র ব্যাপারটি বিচার করা সহজ হবে মনে করি। মনে হবে হরিনাথ শুধু 'রেকলেস' নন 'ট্যাকটলেস' পণ্ডিত মানুষ বলেই এত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন।

হরিনাথের কর্মজীবনের উত্তরাধিকারী জন আলেকজান্দার চাপম্যান সাহেব হরিনাথ প্রসঙ্গে যে বিস্তারিত উক্তি করেছেন তার মধ্যেও হরিনাথের আকৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়—

'আমার পরবর্তী বৃত্তান্ত এমন একজন মানুষ সম্পর্কিত যিনি অন্য যে কোনও জনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। তিনি হলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আমার পূর্বগামী হরিনাথ দে। তিনি ছিলেন একজন বিস্ময়কর ভাষাবিদ।...... তিনি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ ভাষাবিদ, কিন্তু ততোধিক তিনি কিছুই ছিলেন না। শুরুতেই বলা যায়, তিনি একান্তভাবে বিবেকহীন ছিলেন।'

চ্যাপমান লিখিত 'দি ক্যারাকটার অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটি পাঠ করেই সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় হরিনাথ দে বিষয়ে গবেষণা কর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, চ্যাপমানের গ্রন্থটির কাছে বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য।

গ্রন্থকার সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কোনো পরিচিতি প্রকাশক গ্রন্থের মলাটে দেন নি। কিন্তু এই ত্রুটিটুকু অমার্জনীয়। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যেই তাঁর আত্মপরিচয় ছড়ানো আছে। বাঙালী গবেষকদের তালিকা সুদীর্ঘ নয়, সেই তালিকায় গ্রন্থকারের নাম সগৌরবে সংযোজিত হল।

গ্রন্থটিতে অনেকগুলি সুমুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংযোগ করা হয়েছে।

—অভয়ঙ্কর

ভাষাপথিক হরিনাথ দে (জীবন ও কর্ম)—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : অভী প্রকাশন। ১০, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা—১। দাম পনের টাকা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষকে নবগঠিত বাংলা সাহিত্য একাডেমি ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করা হয়।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্বর্ধনা

নবগঠিত বাংলা একাডেমি ও লেখক-শিল্পী শিক্ষাব্রতী-সমাজকর্মী সংঘের উদ্যোগে সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ারস্থ ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের সেমিনার কক্ষে স্বনামখ্যাত সাংবাদিক ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা জানিয়ে প্রায় প্রত্যেক বক্তাই বলেন যে, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের দুর্দিনে সাহিত্যদরদী শ্রীঘোষের মত উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বই একান্তভাবে কাম্য। তাঁরা বলেন, 'শ্রীঘোষের অভিভাবকত্বে আমরা বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে প্রয়াসী হব।'

ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমনোজ বসু।

শ্রীঘোষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীপ্রবোধ সান্যাল বলেন, তাঁর মত একজন পরম বৈষ্ণব যে আমাদের মাঝে এখনও আছেন তা ভাবতে বিস্ময় হয়। অতি পরিচ্ছন্ন, বলয়ী ও স্বাধীনতার বাহক শ্রীঘোষ আমাদের গৌরবের বিষয়। তিনি শুধু সাংবাদিকই নন, একজন সমাজপতিও বটে। তিনি ভারতের মধ্যে একটি বড় মনের প্রতীক। তিনি প্রস্তাব রাখেন, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্যের সভাপতি হিসাবে শ্রীঘোষ যেন সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন, বাংলা সাহিত্য বর্তমানে অভিভাবকহীন। শ্রীঘোষ সেই দায়িত্ব গ্রহণ করলে বাঙালী লেখকরা একটু মনোবল ফিরে পাবে। তিনি বলেন, জাতীয় পাঠাগারটি 'অটোনমাস' হতে চলেছে। এ ব্যাপারে বাংলার সাহিত্য জড়িত। এই সময়ে আমরা শ্রীঘোষের নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী।

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বলেন, শ্রীঘোষ একজন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। রাজনীতি অপেক্ষা তাই তাঁর মধ্যে বেশী করে আমরা সাহিত্য প্রীতি দেখতে পাই।

ঔপন্যাসিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র বলেন, শ্রীঘোষ জীবনে যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, একজন রসজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে সেগুলিকে সাহিত্যাকারে লিপিবদ্ধ করা তাঁর উচিত।

প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ও বলেন, তিনি একজন বিচিত্র পুরুষ। তিনি যদি আত্মজীবনী লেখেন তাহলে তা হবে আমাদের পরম প্রাপ্তি।

শ্রীসমথনাথ ঘোষ বলেন, বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীঘোষের ন্যায় ব্যক্তির অভিভাবকত্ব একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু শ্রীঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা সাহিত্য একাডেমির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে শ্রীঘোষের নাম প্রস্তাব করে বলেন বাংলা সাহিত্যের [illegible] সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শ্রীঘোষের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্য একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করে।

কবি শ্রীগোপাল ভৌমিক শ্রীঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষ।

অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রীমনোজ বসু বলেন, কেন্দ্রীয় সাহিত্য একাডেমির ন্যায় একটি আঞ্চলিক সাহিত্য একাডেমিও হওয়া প্রয়োজন। তাতে প্রকৃত সাহিত্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব। ভারতে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ একাডেমিও আছে। বাংলা সাহিত্য একাডেমিও তেমনি হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমরা তুষারবাবুর নেতৃত্ব কামনা করি।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, 'বাংলা সাহিত্যের উন্নতির ব্যাপারে আমার ইচ্ছা আপনাদের সকলের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করি।' বাংলা সাহিত্য একাডেমি বিষয়ে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'একাডেমি যাতে ঠিকভাবে চলে তেমন সকল কাজেই আমি থাকবো এবং তাতে আমি আগ্রহশীল।'

অনুষ্ঠান শুরুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রীঘোষকে মাল্যদান করা হয়। শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় শ্রীঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

টনি মরিসন

সাহিত্যের খবর

রিচার্ড রাইট

নতুন আমেরিকার কণ্ঠস্বর

কবিতা এবং নাটক, উভয়ক্ষেত্রেই আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ লেখকেরা এনেছিলেন এক সময় বিপ্লব। উন্মোচিত করেন নতুন দিগন্ত। আনেন নতুন স্বাদ। নিগ্রোদের জীবনের নানান সমস্যা আর টানাপোড়েনের কথা এই সব কবি ও নাট্যকার নিপুণভাবে

জেমস বল্ডুইন

তুলে ধরে বানিয়ে ফেলেছিলেন একেবারে আলাদা জগতই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ লেখকদের উপন্যাসের খোঁজ তেমন-ভাবে আমরা অনেকেই হয়তো রাখতাম না। আর তারই কিছু খবর পাওয়া গেল সম্প্রতি। একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। নাম, আমেরিকাস ব্ল্যাক নভেলিস্টস। লিখেছেন কৃষ্ণাঙ্গ গল্পলেখক মেল ওয়াটকিনস।

বেশ কিছুকাল ধরে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণাঙ্গ লেখকেরা এনেছেন বিপ্লব। ভাবনার ক্ষেত্রে এনেছেন জোয়ার। নিত্য নতুন কণ্ঠস্বরে মার্কিনী সাহিত্যকেই করছেন সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ। বলাবাহুল্য, নিজেদের কথা বলছেন তাঁরা নিজস্ব ভঙ্গিতে, নানান দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করছেন মার্কিনী সমাজের মূলে সমস্যাকে।

যতদূর জানা যায়, আমেরিকার প্রথম নিগ্রো ঔপন্যাসিক হলেন উইলিয়ম ওয়েলস ব্রাউন। তাঁর প্রথম বই বেরোয় ১৮৫৩-য় লণ্ডন থেকে। তারপর স্মরণীয় কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান লেখক হলেন সাটন গ্রীগ। তাঁর ইম্পেরিয়াম ইন ইম্পেরিও' বেরোয় ১৮৯৯-এ।

তবে কৃষ্ণাঙ্গ কথাসাহিত্যে নতুন চেতনা বলতে যা বোঝায় তার শুরু একরকম ১৯২০-এ। এসম্পর্কেই এ'রা একেবারে নতুন রীতিতে নিজেদের কথা বললেন। জীন টুমারের 'কেন', ক্লাউড ম্যাকে-র 'হোম টু হার্লেম', 'ব্যানানা বটম'; ল্যাংস্টন হিউজের 'নট উইদাউট লাফটার' আলোড়ন তুলল। কিছুকাল পরে এ'দের সঙ্গে যুক্ত হলেন রিচার্ড রাইট, র‍্যালফ এলিসন, জেমস বল্ডুইন প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকেরা। প্রকৃত প্রস্তাবে আজকের কৃষ্ণাঙ্গ কথা-সাহিত্যের মজবুত ভিত তৈরি করেন এ'রাই একদা।

রিচার্ড রাইটের 'নেটিভ সন' হলো সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস। অবশ্য অনেকেই তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ব্লাক বয়'কে মনে করেন মহত্তর সৃষ্টি। কৃষ্ণাঙ্গদের লোককথা, জাজ-এর স্পন্দন, স্যুররিয়া-লিজম এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনাতে ঠাসা র‍্যালফ এলিসনের 'ইনভিসিবল ম্যান' আমেরিকার কৃতী লেখকদের ভোটে গত বিশ বছরের সেরা উপন্যাস বলে নির্বাচিত হয়। বল্ডুইনের 'গো টেল ইন অন দা মাউন্টেন' সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এতে তিনি আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ সমস্যাকে দারুণ-ভাবে চাবুক মেরেছেন, শোনাতে চেয়েছেন স্বাধীন সত্তার কণ্ঠস্বর।

কোন কোন লেখক বেশ কড়া মেজাজের। ফলে পছন্দ করেন না তাঁরা কোন শ্বেতাঙ্গ পাঠক। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার চান শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের হাতেই আসুক পৃথিবীটা, ভরে যাক নিগারে। এ প্রসঙ্গে জন আলিভার কিলেন, স্যাম আন্ডারসনের নাম মনে পড়ে।

কৃষ্ণাঙ্গ লেখকদের রচনার যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা তা হচ্ছে, এ'রা অনেক বেশি রিয়ালিস্টিক। এবং সমসাময়িক বহু উপন্যাসে যেমন আঙ্গিক নিয়ে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমনি বিষয়ের দিক থেকে আমদানি করছেন আফ্রো-আমেরিকান অভিজ্ঞতা।

১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আর্নেস্ট গেইন-এর বেরিয়েছে মাত্র তিনটি উপন্যাস ও একটি গল্পসংকলন। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস

'দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব মিস জেন পিটম্যান' নানা কারণেই উল্লেখ্য। আমেরিকার সমাজ-জীবনে গত একশো বছর ধরে বর্ণ-বিদ্বেষের যে বিষ-বৃক্ষ ডালপালা ছড়িয়ে গোটা সমাজটাতেই ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিল তার কথা বলেছেন সহজ ভঙ্গিতে এক কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ের অশ্রুসিক্ত জীবনালেখ্যের মধ্য দিয়ে। নাথান হার্ড-এর প্রথম উপন্যাস 'হাওয়ার্ড স্ট্রীট'; উইলিয়ম মেলভিন কেলি-র 'ডানফোর্ড'স ট্রাভেলস এভরিহোয়্যারস'; ইসমায়েল রীড-এর 'দ্য ফ্রি-লান্স পলবেয়ারার্স', চার্লস রাইটের 'দ্য ম্যাসেঞ্জার', 'দ্য উইগ'; সেসিল ব্রাউনের 'দ্য লাইফ অ্যান্ড লাভস অব মিঃ জিভ্যাস নিগার'; কার্লেন হ্যাচার পোলাইটের 'দ্য ফ্ল্যাগেল্যান্টস'; রবার্ট ডিন ফায়-এর প্রথম উপন্যাস 'দ্য বুক অব নাম্বারস' সাম্প্রতিক কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনী উপন্যাসে উল্লেখ্য সংযোজন।

তরুণতম ঔপন্যাসিক হলেন টনি মরিসন। মাত্র দু'বছর আগে বেরোয় এই লেখিকার প্রথম উপন্যাস। 'দ্য ব্লুয়েস্ট আই'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পান।

মোদ্দা কথা, সকলেই নতুন করে বলছেন, নিজেদের কথা, স্বদেশ ঘিরে স্বপ্নের কথা। সকলেই চাইছেন একরকম নতুন আশ্রয়, ছটফট করছেন নতুন আমেরিকার কণ্ঠস্বর শোনাতে।

ত্রিবৃত্ত পুরস্কার

উত্তর বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য পত্র হলো 'ত্রিবৃত্ত'। সম্প্রতি ত্রিবৃত্ত সংস্থা দুটি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড'-এর জন্য ১৯৭১ সালের আর কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো' সংকলনের জন্য ১৯৭২ সালে ত্রিবৃত্ত পুরস্কারে সম্মানিত হন।

ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান ।। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, কলিকাতা। মূল্য আট টাকা।

'আলোচ্য গ্রন্থের গানগুলি ধলভূম-মানভূম ও মল্লভূমের অর্থাৎ বাঙলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমান্তভূমির। উপরোক্ত ভূমিত্রয়ের প্রথমটি ছাড়া শেষ দুটি অধুনা-লুপ্ত নাম। মানভূমের অস্তিত্ব এখন পুরুলিয়া ও ধানবাদ জেলা দুটিতে এবং মল্লভূম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমায়। এই তিনটি ভূমিখণ্ডের সম্মিলিত প্রাচীন অভিধা ঝাড়খণ্ড।'

পাহাড় ও অরণ্যময় তরঙ্গভঙ্গিম এই ভূমির আরণ্যক জীবনের সংস্কৃতির একটা বড় অংশ এখানকার লোকসমাজের গান। 'একদিকে সাঁওতাল-ভূমিজ-মুণ্ডা-খাড়িয়া অন্যদিকে মাল-মাঝি-মাহাত-মাহলী-কামহার-কুমহার, এখানকার এই বিচিত্র সঙ্গীত, সংস্কৃতিনির্ভর লোকবৃত্তের ধারক।'

এই বিশিষ্ট অঞ্চলের মরমী মানুষজন তাদের হৃদয়ের নিভৃত ভাবভাবনা, অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে অকৃত্রিম ছন্দে। তাদের সেই গান শ্রেষ্ঠ মরমী কবির অনুভবের পাশে এসে দাঁড়ায় সলজ্জ পায়ে।

একটি সাঁওতালী পাতাগীতের অংশ—

'আখড়া মা দুলদুল
আখড়া তলে বিটি দাঁড়ালি কেনে;
নাচ গ নাচ বিটি খেল গ খেল
ই জীবন গ বিটি আধাদিন লাগি।
—নাচের শব্দে আখড়া উত্তরোল। কি ভেবে? কিছুক্ষণ নেচে-খেলে নাও এই জীবন বড় কম দিনের।'

একটি দাঁড় ঝুমুর : করম গীত—

'ঘর করি আঙিনা
আঙিনা করি ঘর
যত করি শ্যাম বঁধু
তবু বাস পর।'

আর একটি দাঁড় ঝুমুর ও করম গীত—

'জুসনা রাতিয়া, হুদকে উঠে ছাতিয়া
মনে পড়ে
আমার পুরনো পিরিতিয়া।'

—জ্যোৎস্না রাত, বুক হঠাৎ আকুলতায় ভরে ওঠে। পুরাতন ভালোবাসা স্মৃতিতে জাগে।' —এই অঞ্চলের প্রকৃতির চিত্র এবং এখানকার মানুষের জীবনাচরণের বহু তথ্য নিহিত আছে এদের গানে।

এইসব গান নিভৃতে ফোটে, নিঃশব্দে ঝরে যায় সবার অলক্ষ্যে। —এই অমূল্য মণিমুক্তার ভাণ্ডার বাঙালী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা। তাঁর সযত্ন প্রয়াস, প্রভূত পরিশ্রম এবং মহান গবেষণা সম্পূর্ণ সার্থক। এই শ্রেণীর একটি মূল্যবান সংকলনের জন্য বাঙালী পাঠক, গবেষক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই কীর্তি যোগ্য স্বীকৃতি পাবে।

বহ্নি-পতঙ্গ (উপন্যাস)—মদন চৌধুরী। দীপায়ন বুক ডিপো, ১৮এ টামার লেন, কলকাতা-৯। সাড়ে তিন টাকা।

বাংলা আঞ্চলিক ভাষা হলেও, আঞ্চলিকতার চৌহদ্দী ছাড়িয়েছে অনেক-'বহ্নি-পতঙ্গ' পতিতা-জীবনের কাহিনী নিয়ে লেখা। অর্থাৎ সমাজ-বহির্ভূতা নারীদের অন্তঃসংকটকে ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখক। প্রাথমিকভাবে সার্থকও হয়েছেন। প্রীতি, মৌসুমী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে দেখেছেন রোম্যান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে, যে-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে তারা সমাজ-নিন্দিতা হয়েছে, তার হদিশ দিতে পারেন নি। বরং যৌবনের উত্তাপ ও অসুস্থতার কথাই, নানারকম ঘটনাকে আশ্রয় করে, বর্ণিত হয়েছে। আরেকটু সতর্ক হলে হয়তো লেখক চরিত্রগুলিকে পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু ভবাবেগের প্রাবল্যে তিনি লক্ষ্যস্থির রাখতে পারেন নি। এবং এই ভাবাবেগের জন্যই, এই উপন্যাসটি তরুণ-তরুণীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা।

খেয়াল খাতা (দ্বিতীয় খণ্ড)—রাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর কে পাবলিশিং কোং। ১১এ গোকুল মিত্র লেন, কলকাতা ৫। আট টাকা।

খেয়াল খাতা প্রবন্ধের বই। কিন্তু প্রবন্ধগুলি গতানুগতিক বা অ্যাকাডেমিক নয়। রীতিমতো বিচিত্র। 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পুলিশ', 'বিশ্ব সাহিত্যে কুমারী', 'ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রেম কাহিনী' নিয়ে যেমন তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়েও সিরিয়াস আলোচনা করেছেন লেখক।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বইটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ বিষয়ক হেলাফেলা নিয়ে। আরেকটু সতর্ক হলে বইটিকে আরো ভালোভাবে বের করা যেত কিন্তু সে যাই হোক, সহজ সরল ভঙ্গিতে লেখা এমন উদ্ধৃতিবহুল প্রবন্ধের সংকলন বাংলা সাহিত্যে কমই বেরিয়েছে।

এই গ্রন্থের সবচেয়ে আকর্ষণীয় রচনা 'দুই কবি'। এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, প্রমথের চিঠি ফিরো পাণ্ডুলিপির প্রতি-

সাহিত্য অনুবাদের সমস্যা

অরুণ মিত্র

অনুবাদ অর্থাৎ এক ভাষাকে আর এক ভাষায় নিয়ে আসা এমন এক কাজ যার প্রতি পদেই সমস্যা। একদিকে যেমন যান্ত্রিক হবার তাগিদ অন্যদিকে তেমনি মৌলিক হবার আহ্বান-- এই দুই পরস্পর-বিরোধিতার মাঝখানে তার পথ চলতে হয়। এ কাজের প্রকৃতি প্রথম থেকেই দ্বৈত। নিজের ভাষায় মগ্ন হয়ে নিজের খুশীতে লিখে যাওয়া নয়, একই সঙ্গে দুই ভাষার স্তরে মনকে নিযুক্ত রাখা। দুই ভাষা নিয়ে মাথা ঘামানো এবং দুই ভাষার চলচলন পদ্ধতিপ্রকরণের উপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা। সুতরাং সফল অনুবাদকর্মের প্রথম শর্তই হল দুটি ভাষা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান। সমান জ্ঞান বলব না। কারণ এ কাজের একদিকে পাল্লা ভারী হবেই, যে-দিকটায় জ্ঞানের সঙ্গে অনুভবও যুক্ত হয়। যে-ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় সেই ভাষা পড়ে তার সঠিক অর্থ বোঝাই আসল, যেহেতু সেই ভাষায় অনুবাদক লিখছেন না, তিনি পড়ছেন। কিন্তু যে-ভাষায় অনুবাদ করা হয় সেই ভাষায় অনুবাদকের নিগূঢ় জ্ঞান থাকা দরকার, যেহেতু সেই ভাষায় তিনি লিখছেন। শব্দার্থ ও বাক্যার্থের সূক্ষ্ম তারতম্য বা 'নুআন্স' নিয়ে অনুবাদকের কারবার উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তাঁকে শুধু প'ড়ে উপলব্ধি করতে হয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁকে লিখে প্রকাশ করতে হয়। এ দু'য়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। প্রকাশ-ক্ষমতার দিক থেকে দুই ভাষায় সমান স্বভাবজ অধিকার যদি কারো থাকে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু তেমন সব্যসাচী অনুবাদকের জন্মের জন্যে যতদিন অপেক্ষা করা দরকার ততদিন অনুবাদকর্ম থেমে থাকতে পারে না। দুই ভাষায় উপর অধিকারে অসমতা থাকবেই। এই কারণে আমার বদ্ধমূল ধারণা, যথার্থ অনুবাদ, বিশেষত সাহিত্যের অনুবাদ একমাত্র সম্ভব অনুবাদকের মাতৃভাষায় বা যা তাঁর মাতৃভাষায় পরিণত হয়েছে সেই ভাষায়।

কিন্তু যে-ভাষা অনুবাদের দায়িত্ব নেওয়া সেই ভাষা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য। নইলে হৃদয়বিদারক ঘটনার সম্ভাবনা মোড়ে মোড়ে। বিদেশী ভাষার শব্দসমষ্টির বিশেষ বিশেষ প্রয়োগার্থে যথেষ্ট অনুপ্রবেশ না থাকলে অনুবাদ নানান মিথ্যার জন্ম দেয়। যাকে বলা হয় 'ক্রিয়েটিভ লিটারেচার', সৃজন-সাহিত্য, তার অনুবাদে এই জ্ঞানাভাব রচনাকে স্থূলতম অর্থে নিষ্ফল করে দেয়। আমাদের বিনীত বাংলা ভাষার কথা ছেড়েই দিলাম, জ্ঞানে গরিমায় সেরা ইংরিজী ভাষাতেই এ দুর্ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে দেখা যায়। কয়েক বছর আগে আমেরিকার এক বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থার উদ্যোগে ফরাসী কবি পল এলুয়ার-এর কবিতাবলীর একটি অনুবাদ-গ্রন্থ বেরোয়। সেখানে দেখা গেল ইংরিজী ভাষান্তরে কোনো কোনো জায়গায় মূল ছত্রের যে মানে করা হয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়। অনুবাদক যে ফরাসী বাক্‌রীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন তা স্পষ্ট। বোদল্যার কাব্যের ইংরিজী অনুবাদেও ঐ ধরনের ভুল লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য যে-ভাষা অনুবাদকের নিজের ভাষা নয় তার বিষয়ে ভ্রান্তি ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সেইজন্যেই কিন্তু আক্ষরিক অর্থারোপে অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন, যাতে লেখক যা বলেননি তাঁকে দিয়ে তা বলানো না হয়, অথবা তিনি যা বলেছেন তা অকথিত রাখা না হয়। ভ্রান্তি ঘটা খুবই স্বাভাবিক। এমনকি টি এস এলিয়ট-এর মতো ফরাসীজানা অসাধারণ অনুবাদকও তা এড়াতে পারেন নি। ফরাসী কবি স্যাঁ-জন্ পের্স-এর 'আনাবেস' কাব্যের প্রথম অনুবাদে তিনি যে বেশ কয়েকটা ভুল করেছিলেন, একথা তিনি নিজেই ঐ গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। এ-ও তাঁর এক মহত্ত্ব। এই স্বীকৃতি ও সংশোধন অনুবাদক হিসেবে তাঁর অসাধারণ দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক।

এলিয়ট তাঁর ভূমিকায় একথাও বলেছেন যে, তিনি প্রথম অনুবাদে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছিলেন যা তিনি অতঃপর বর্জন করলেন। তাঁর এই ঘোষণায় অনুবাদবিষয়ক এক বিশেষ প্রশ্ন প্রতিফলিত হয়েছে, যা অনুবাদ-সমস্যার এক অন্তর্নিহিত মূল প্রশ্ন : সৃজন-সাহিত্যের ভাষান্তরের কাজে অনুবাদক কতখানি স্বাধীনতা নিতে পারেন ?

সাহিত্যের অনুবাদ এবং সু-সাহিত্যের অনুবাদ জাত হিসেবে আলাদা। যে রচনা সৃজনধর্মী নয় তার অনুবাদ আক্ষরিকতায় বিশ্বস্ত হলেই সফল হয়। তার ক্ষেত্রে মোটামুটি বাক্যের স্থূল বা সাধারণ বা বাস্তব বা বৈষয়িক অর্থ প্রকাশ ছাড়া অন্য সমস্যা নেই। কিন্তু সৃজনধর্মী সাহিত্যের অনুবাদও এক সৃজনধর্মী কর্ম। অথচ, কি বিড়ম্বনা, তা পূর্ণ সৃজন নয়। এই দুই অর্থ-চারিত্র্যের সংযোগ থেকেই অধিকাংশ সমস্যার উদ্ভব। মূলে রচনার বক্তব্য, শৈলী, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি তার ভাবমণ্ডল অনুবাদে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা অবশ্য কর্তব্য। ভাষাজ্ঞানের প্রশ্নটা এক্ষেত্রে

আরো বিশদ ও সূক্ষ্ম। শুধু মূল ভাষাটা জানলেই চলে না; যে-লেখকের অনুবাদ করতে যাওয়া, তাঁর বিশিষ্ট ভাষাও জানা দরকার, এমন কি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর সেই গ্রন্থটির বিশিষ্ট ভাষাও। এবং এ কাজের পক্ষে শুধু ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, কারণ নিছক আক্ষরিকতা মূল রচনাকে অন্য ভাষায় বহন করতে পারে না। ভাষাজ্ঞানকে অতিক্রম করে প্রয়োজন হয় লেখন-কুশলতার। অর্থাৎ সাহিত্যের অনুবাদ যদি কেউ গ্রহণযোগ্য-ভাবে করতে পারেন, তো সাহিত্যিকই পারেন। অন্যে নয়। কেননা, সাহিত্য রচনায় তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তাঁকে বিবিধ অন্তর্লীন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে, যা অন্যের অধিগত নয়।

কিন্তু অনুবাদে যতই সাহিত্যিক ক্ষমতার প্রয়োজন হোক না কেন, সাহিত্য সৃজনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌল। অনুবাদ নিজস্ব কোনো সৃষ্টি নয়, ধার-করা সৃষ্টি। মূলত তা সৃজন-সাহিত্য নয়, যেহেতু তার প্রেরণা, আবেগ, বিষয়-বস্তু, বক্তব্য এবং আঙ্গিক—কিছুই অনুবাদকের নয়, সবই লেখকের। এক ফরাসী সমালোচকের উক্তি অনুসারে বলা যায়, অনুবাদ কখনো কখনো শিল্পকর্মের মর্যাদা লাভ করতে পারে; কিন্তু অনুবাদ নিজ অধিকারে শিল্পসৃষ্টি নয়। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল অন্য এক জগতে অন্য এক যুগে পাঠককে নিয়ে যাওয়া অথবা অন্য এক জগৎকে অন্য এক যুগকে পাঠকের কাছে নিয়ে আসা; অন্য এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটানো যে-ব্যক্তিত্ব অনুবাদকের নয়, লেখকের।

লেখক সম্পূর্ণ স্বাধীন, অনুবাদক আদৌ স্বাধীন নন। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আছে; কিন্তু তার প্রকৃতি একেবারে আলাদা। লেখকের নিয়ন্ত্রণ স্বতোদ্ভূত, তাঁর প্রতিভার স্বভাবে তা নিহিত, পক্ষান্তরে অনুবাদকের নিয়ন্ত্রণ যান্ত্রিক, তার নির্দেশ বাইরে থেকে আসে। অনুবাদক নিজের সামনে নিজে নয়, অন্যের সামনে নিজে। এক আত্ম-অবলোপের দায় যেন তাঁকে টেনে নিয়ে চলে। অনুবাদককে নিজের ব্যক্তিত্ব লেখকের ব্যক্তিত্বের আধারে রাখতে হয়, তা ছাপিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। আর মজার কথা এই যে অনুবাদকের এ আত্মসমর্পণ যত নিঃশর্ত হয় ততই তিনি জয়লাভ করেন। কারণ তাঁর অনুবাদ মূল রচনাকে ততই বেশী প্রতিফলিত করতে পারে। এজন্যে অনুবাদককে বাস করতে হয়, লেখকের সৃষ্টির মধ্যে, তার আবহাওয়ায় তাঁকে নিশ্বাস নিতে হয়। তবেই তাঁর কলমে লেখকের ভাব-ভাষার কিছু গুণ ভর করতে পারে। এই কারণেই সাহিত্য-অনুবাদকের পক্ষে সাহিত্যিক সত্তার এমন প্রয়োজন। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে এই জাতবিচার হয়তো খানিকটা পরিহার করা চলে; কিন্তু কবিতা অনুবাদের যোগ্যতা কবি ছাড়া, অন্তত যাঁর কাব্য-প্রবণতা আছে এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো আছে ব'লে মনে হয় না।

সৃজনধর্মী সাহিত্যের সব শাখার অনুবাদ-সমস্যা স্বভাবতই একরকম নয়। কাহিনী-ভিত্তিক উপন্যাস বা গল্পের অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদে রচনার রূপ মোটামুটি বজায় রাখা যায়, অবশ্য মূল ভাষার শব্দসমষ্টির প্রয়োগার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই আপেক্ষিক সহজসাধ্যতার কারণ এইসব রচনার বাক্যবিন্যাস সাধারণত প্রধানুগ এবং বিষয়বস্তু সর্বজনবোধের সীমানার মধ্যে। কিন্তু এমন সব রচনাও আছে, যাদের ক্ষেত্রে সমাধান অমন সহজ নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, জেমস্ জয়েস-এর 'ইউলিসিস'। হলের বহু উপন্যাস ও নাটকে এই দুরূহতা। তবে নাটকের সমস্যা একটু আলাদা ব'লেই মনে হয়। নাটক তো কথোপকথন। সেখানে বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের কথাবার্তার সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাদের সংযোগ প্রত্যক্ষ। এই ঘনিষ্ঠতা অটুট রাখবার জন্যে বিদেশীয়ানা এড়ানোর ঝোঁক দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এই কারণেই বোধহয় নাটকের ক্ষেত্রে অনুবাদের চেয়ে অনুসরণের রেওয়াজ বেশী। অনুবাদের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে সাধারণ সামাজিক নাটকের ভাষান্তর অনেকটা সহজ-সাধ্য। কিন্তু প্রতীকী বা গূঢ়ার্থ নাটক? সেখানে যে শব্দ ও অর্থের বিচিত্র লীলা! অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন, ইওনেস্কো যাঁর নামে আজকাল অনেকে বিহ্বল হন। তাঁর কোনো কোনো নাটক কি ভাষা এবং বিষয়-উপস্থাপন উভয়তই অত্যন্ত দুরূহ নয় বাংলায় অনুবাদের পক্ষে? এইসব রচনার অনুবাদ-কর্মে কাব্য অনুবাদের সমস্যাই অনেকটা এসে পড়ে। শব্দ তার অন্তরঙ্গ প্রতিধ্বনি, তার প্রয়োগের অভিনবত্ব এবং তাদের সমন্বিত বাক্যের তাৎপর্য অনুবাদে প্রকাশ করতে গেলে দরকার হয় নানান ওলটপালটের, নানারকম ছাঁটাই বাছাইয়ের, এমনকি কখনো কখনো নতুন নতুন শব্দনির্মাণের। যেমন, কবিতায়, বিশেষত আধুনিক কবিতার বেলায় হয়।

আক্ষরিক ভাষান্তর কখনোই সাহিত্য-অনুবাদের এক সাধারণ বিধানরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প যাই হোক না কেন, সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ কদাচ সম্ভব নয়, এমনকি যেখানে প্রয়োগ-সিদ্ধতার সূত্রে শব্দবদলের প্রয়োজন নেই সেখানেও নয়। প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, এক ভাষার সমস্ত শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ আর এক ভাষায় নেই। দ্বিতীয়ত, একটি শব্দের প্রতিশব্দ সব সময় মূল ভাষার শব্দের মতো জীবন্ত হয় না, যেহেতু দুই জাতির সাধারণ অভিজ্ঞতা, যা থেকে সেই শব্দের উৎপত্তি, একরকম নয়। তৃতীয়ত, এক ভাষার শব্দাবলীর কোনো গ্রন্থন যে-আন্দোলন সৃষ্টি করে তা অন্য ভাষায় তাদের প্রতিশব্দের গ্রন্থনে হারিয়ে যায়; যেহেতু পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ধ্বনি ও অর্থের প্রতিক্রিয়া এক রকম হয় না। তৃতীয় ব্যাপারটা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটে থাকে।

তাৎপর্য প্রকাশই প্রধান কথা। মূল রচনার বিকিরণ-কেন্দ্রগুলো যদি কোনো অনুবাদে চাপা পড়ে যায় তাহলে সে-অনুবাদ মূল্যহীন। অনুবাদে যে-তাৎপর্য প্রকাশিত হবে তা অবশ্যই অনুবাদকের বোধ ও উপলব্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ তিনি রচনার কি ভাষ্য করলেন তার উপর। অনুবাদকের উপলব্ধিই সমগ্র-ভাবে রচনার অনুবাদকে নিয়ন্ত্রিত করে। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দের ভাষ্যও রচনার উপস্থাপনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তার ফলেই মূলের যে রূপ অনুবাদক দেখেছেন অনুবাদে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এইখানেই অনুবাদকের স্বাধীনতার প্রশ্ন, কেননা এই-খানেই তাঁর কল্পনার উদ্ধার ক্ষেত্র। প্রখ্যাত ফরাসী কবি পল ক্লোদেল একদা ইংরিজী থেকে কভেন্ট্রি প্যাটমোর-এর একটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। কবিতাটির এক জায়গায় ছিল 'প্যাথেটিক ল্যাশ' তার অনুবাদ ক্লোদেল করেছিলেন 'পাতেতিক পোপিয়েব' কিন্তু 'পোপিয়েব' তো ল্যাশ নয়, 'আইলিড'। ফরাসীতে 'ল্যাশ' হ'ল 'সিল'। ভালেরি লারবোর মুখে ফরাসী অনুবাদটা শুনে অ্যালিস মেনেল ঐ পরিবর্তনে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন ক্লোদেল এক পত্রে জবাব দিয়েছিলেন এই: 'দুর্ভাগ্যের বিষয় ল্যাশকে 'সিল' দিয়ে অনুবাদ করা অসম্ভব। একটা হল যে 'সিল' বিদ্যুৎস্ফুরণ ক'রে উপরে ওঠে, আর একটা হল সেই ঝালর যা নিচে নামে, সে এক ছায়ার শব্দ, প্রায় নিরর্থক। গম্ভীর 'পোপিয়েব' শব্দটি বেশী উপযোগী, বিশেষত 'পাতেতিক'-এর সঙ্গে অনুপ্রাসে।'

[illegible]

মনে এসেছিল এবং ধ্বনির যে-আবেদন তিনি শুনেছিলেন, তার ফলে তিনি মূল শব্দকে অনুবাদে বদলে দেন। প্রতিভাবান লেখকের এই উপলব্ধি এবং তার ফলে তার স্বাধীনতাগ্রহণ আপত্তিকর না হতে পারত। কিন্তু স্বাধীনতার সুযোগ থাকলে তার অপ-ব্যবহারেরও সুযোগ থাকে। সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রচনার তাৎপর্য যেখানে বহুমুখী, যেমন কবিতার অনেক সময়, সেখানে স্বাধীনতার ক্ষেত্র খুব প্রশস্ত। অনুবাদকের নিজস্ব ভাবনার ছাপ তাতে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা কখনোই এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে লেখকের স্বতন্ত্র মানসচরিত্র এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। অনুবাদে এমন শব্দ ব্যবহারও উচিত মনে হয় না যার দ্বারা মূল ভাষার বহির্ভূত কোনো অনুষঙ্গ এসে উপস্থিত হয়। কেউ কেউ কবিতা বা কাব্যধর্মী রচনার অনুবাদে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তাঁরা প্রধানত নিজেরাই লেখক। তাঁরা মূল লেখক সম্বন্ধে তাঁদের বিশিষ্ট উপলব্ধি প্রকাশে এত ব্যগ্র হ'য়ে পড়েন যে, লেখকের ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য, এমনকি রচনাংশ ছাঁটাই ক'রে সে জায়গায় নিজের নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুযায়ী শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। জোসেল বিবেক তাড়িত হয়ে যে-পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, এ তা নয়। এ হ'ল লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর অনুবাদকের ব্যক্তিত্বকে চাপিয়ে দেওয়া। এই অনুবাদকেরা মনে রাখেন না যে, অনুবাদ এক শিল্পকর্মের পরিচয় মাত্র, তা স্বাধীন শিল্পকর্ম নয়। এর ফলে যে-অনুবাদ আমরা পাই তা অনুবাদকের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত, লেখকের গুণাগুণ তাতে দুর্নিরীক্ষ্য। রচনা হিসেবে তা প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু অনুবাদ হিসেবে নয়। কোনো অসুবিধার কারণেই, কোনো অপূর্ণতার ভয়েই অনু-বাদে রচনার পুনর্লেখন চলে না। যতই ক্ষীণভাবে হোক, অনুবাদ যদি লেখকের স্বতন্ত্র মৌলিকতার পরিচয় উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে তাকে অনুবাদ নাম দেওয়া যায় না।

অনুবাদকর্মের পরিকল্পনায় দুই রকম পদ্ধতির কথা উঠে থাকে। এক পদ্ধতি হল ভিনদেশী লেখককে পাঠকের ভাষার জগতে নিয়ে আসা। অন্যটি হল পাঠককে ভিনদেশী লেখকের ভাষার জগতে নিয়ে যাওয়া। প্রথম পদ্ধতি একান্তভাবে গ্রহণ করলে স্বাধীনতার সীমা থাকে না। নাম-ধাম পালটে দেওয়া যায়, অনুষঙ্গ বদলে দেওয়া যায়, সবরকম বিদেশীয়ানা দূর করা যায়। এর ফলে, সন্দেহ নেই, অনুবাদ সাবলীল ও সুপাঠ্য হওয়ার সুযোগ পায় এবং তার চেহারাটা দেশীয় হয়। একেই বুদ্ধি বলে সুন্দরী বিচারিণী। অন্য পদ্ধতিতে অনুবাদকে অনুবাদই মনে হয়। কারণ তাতে পাঠককে এক বিদেশী লেখক-সকাশে সরাসরি উপস্থিত করা হয়, তাকে অন্য এক সংস্কৃতির আবহাওয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এক ভিনদেশী সৌরভ পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা হয়। এ পদ্ধতিরও একটা ঝুঁকি আছে : অনুবাদ-বহিরঙ্গসর্বস্ব হ'য়ে পড়তে পারে। আমার ধারণা, সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নির্বাচন ক'রে অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার বিশেষ দরকার হয় না। দুই পদ্ধতির মধ্যে পাঁচিল তোলার কোনো মানে নেই। অনুবাদ যদি মূলকে বিকৃত না ক'রে স্বাভাবিকভাবে দেশীয় হ'য়ে ওঠে তাতে আপত্তির কি আছে? কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার বিদেশী চেহারা থাকলেই বা ক্ষতি কি? পাঠক তো জেনেশুনেই অনুবাদ পড়ছেন, মৌলিক স্বদেশী রচনা পড়ছেন না। জায়গা বিশেষে প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যাত্মক শব্দও জোড়া যেতে পারে যদি তাতে লেখকের প্রকাশভঙ্গী না বদলে যায়। অবশ্য এ সবই ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা পরিবর্জন অনেক সময় রচনার বিশেষ প্রকৃতি অথবা বিষয়বস্তুর জন্যে অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে। সে এক ভিন্ন প্রশ্ন। যেমন ধরুন মলিয়ের-এর ল্য বুরজোয়া জাঁতিয়ম'। যে সব দৃশ্যে মঃ জুরদ্যাঁ সঙ্গীত, নৃত্য, অসিবিদ্যা, উচ্চারণ ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা বা আলোচনা করছেন, বাংলা তথা কোনো ভারতীয় ভাষায় তা অনুবাদ করা যাবে কি ক'রে? কি করেই বা অনুবাদ করা যাবে শেষ ব্যালে দৃশ্যটির? এমন ক্ষেত্রে মনে হয়, ভাষান্তরের পরিবর্তে রূপান্তরই একমাত্র পথ। উপভাষা (ডায়লেক্‌ট্‌) এবং অপভাষা স্ল্যাঙ আর এক সমস্যার উৎস। কিভাবে তাদের অনুবাদ করা যাবে? উপভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সরল। কোনো বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি কাহিনীর পাত্রপাত্রী হয় তাহলে লেখক অনেক সময় তাদের ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকেন। অনুবাদে তা বজায় রাখা তো সম্ভব নয়। তবে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম্যতা প্রকাশের জন্যে অনুবাদের ভাষায় একটা গ্রাম্যতা আনা যায়। অপভাষার ব্যবহার দুই কারণে হতে পারে। হয়, সেই স্তরের মানুষদের কথাবার্তার জন্যে তার প্রয়োগ : নয়, অপভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা অনেক ব্যাপারে শিক্ষিত ভাষার চেয়ে বেশী ব'লে তার প্রয়োগ। এই দুই ক্ষেত্রেই সমস্যার মুকাবিলা করা খুব কঠিন মনে হয় না। অপভাষা মানব-সমাজের সর্বত্রই আছে, যা এক বিশেষ স্তরের ভাষা। এবং সর্বত্রই তাতে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির তীব্র তির্যক প্রকাশ। সুতরাং এক দেশের অপভাষার যাত্ত মনোভাব ও বক্তব্যকে অন্য দেশের অপভাষার শব্দ ও বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যথেষ্ট সম্ভব মনে হয়।

কাব্যে আর এক সমস্যা আছে। ছন্দ ও মিল অনেক কবিতার অমোঘ প্রকরণ। অনু-বাদে তাদের যথাযথ রক্ষা করার প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে না। তবে অনুবাদে তাদের একটা সাদৃশ্য উদ্ভাবন করা নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় কিন্তু ছন্দ ও মিল আনতে গেলেই নতুন শব্দ যোজনা এবং মূলের শব্দ কিছু পরি-মাণে বর্জন না ক'রে পারা যায় না। তাহলে অনুবাদ কিভাবে করা হবে? গদ্যে? কোনো কোনো অনুবাদক শব্দাশ্রয়ী মূল বক্তব্যকে অবিকৃতভাবে পাঠকের কাছে উপস্থিত করার জন্যে গদ্য ব্যবহার সমীচীন মনে করেন। কিন্তু ছন্দ ও মিল যেখানে কবিতার এক প্রধান অংগ সেখানে নিছক গদ্য কি বিকৃতি নয়? আমার বিশ্বাস, কাব্যের অন্তরে যদি প্রবেশ করা যায় এবং শ্রদ্ধার সংগে সমস্ত শব্দ ও বাক্যকে যদি অনুধাবন করা হয়, তাহলে লেখকের ব্যবহৃত শব্দ থেকে কিছু কিছু স'রে এসেও, অল্পস্বল্প হেরফের ক'রেও তাঁর রচনার আবেদন অনেকখানি বজায় রাখা যায়। অবশ্য সেজন্যে হয়তো একাধিক দিনরাত্রির আচ্ছন্নতা প্রয়োজন হয়, ব্যর্থতার বিপদ সামনে দেখেও নিষ্ঠায় অবিচল থাকতে হয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এ উদ্যমের পাথেয়।

লেখকের রচনার প্রতি বিশ্বস্ততা অনুবাদকর্মের মূল দায়িত্ব। যদি লেখকের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকে তাহলে অনুবাদক স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব মেনে নেন। এক বিশেষজ্ঞের অভিমতের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি : প্রকৃত অনুবাদ তাঁদেরই কাজ যাঁরা একাগ্র শ্রদ্ধায় মূল রচনার প্রতি মনোযোগী হ'য়ে জানেন কিভাবে তাঁদের ভাষায় সমার্থক শব্দ ও বাক্যকে খুঁজে বের করতে হয়।

'বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী'র যখন জন্ম হয়, তখন লর্ড রিপণ ভারতের বড়লাট। সেই বছরেই ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ইলবার্ট বিল উত্থাপিত হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় বিচারকেরা ইংরেজদের ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারবেন। কালা আদমীরা ইংরেজদের বিচার করবে এ খবর শুনে বেসরকারী ইংরেজ-মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, কলকাতার পথেঘাটে উত্তেজনা, সংবাদপত্রে তীব্র বাদানুবাদ। ঠিক এই সময় কোন এক সন্ধ্যায় কয়েকজন শিক্ষিত বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসু যুবক উত্তর কলকাতার রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের বাড়ীর বারান্দায় (বর্তমানে সেখানে শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) বসে স্থির করলেন, দরিদ্র নাগরিকেরা যাতে বিনা পয়সায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে খবরাখবর পেতে পারেন, রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেন, তার জন্যে একটি পাঠাগার গড়ে তোলা দরকার। তাই ১৮৮৩ সালের ৩ জুন ১৮ নম্বর আপার চিৎপুর রোডের 'হিন্দু বয়েজ স্কুলে'র বাড়ীতে তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং প্রস্তাব অনুযায়ী ৬৫ নম্বর রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের (বর্তমানে ৩ নম্বর রাধামাধব গোঁসাই লেন) দোতলাটি ভাড়া করে ১৬ জুন স্থাপিত হল পাঠাগার—'বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী'।

সংবাদপত্র মনের দাবী মিটিয়েছিল, কিন্তু প্রাণের দাবী ছিল অপূর্ণ। উত্তর কলকাতায় শিক্ষাবিস্তারের চেতনা জেগে উঠলেও পথ ছিল অবরুদ্ধ। রাধাকান্ত দেব-বাহাদুর প্রমুখের দু'একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকলেও ছিল না কোন পাবলিক লাইব্রেরী। অথচ উনিশ শতকের নব-জাগরণের ঢেউ তখন বাংলা সাহিত্য শিল্প সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। বাগবাজার লাইব্রেরী আত্মার অন্ন পরিবেশন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রথম মাস-তিনেক ৩৩খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে সংগৃহীত হলেও কোন বই জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (গ্রন্থাগারের সভ্য ছিলেন) প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত লেখকেরা তাঁদের লেখা বই বিনা-মূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে উপহার দেন। জ্ঞানস্পৃহা তখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল বলে এক বছরের মধ্যে গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে যায় এবং গ্রন্থসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮৫খানি। ফলে ছোট ঘরে স্থানের অসংকুলানের জন্যে ১৮৮৪ সালের ১৫ মে ৩ নম্বর রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটে গ্রন্থাগার সরিয়ে আনা হয়। কিন্তু তাতেও স্থায়ী-ভাবে সমস্যার সমাধান হল না। দশ বছরের মধ্যে গ্রন্থ আর সভ্যসংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থাগারের একটি নিজস্ব বাড়ী কেনার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠলো। ১৮৯৬ সালে সাধারণ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী ৬ নভেম্বর পাশেই একটি

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

জমি কেনা হয় এবং গ্রন্থাগারের সম্পত্তি রেজেস্ট্রি করা হয়। কিন্তু এই জমির সীমানা নিয়ে মামলা বাধায় বাড়ী তৈরীর কাজ চার বছর পেছিয়ে যায়, শুরু হয় ১৯০০ সালে। বাড়ী তৈরীর ব্যাপারে সর্ববিধ সাহায্য করেছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বিশ্বম্ভর মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা স্থানীয় ব্যক্তিরা। এই বছরে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রন্থাগারের বহু মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। সেই দুর্দিনে রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু তাঁর বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় গ্রন্থাগারকে স্থান দিয়েছিলেন। ১৯০১ সালের ১ ডিসেম্বর শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগার ২৫।১ রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে কুমারটুলিয়াটোলা বয়েজ রীডিং ক্লাব ও জোড়াসাঁকো লাইব্রেরী এই গ্রন্থাগারের সংগে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারের আকার ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী এক গাড়ী পুস্তক দান করেন। ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ীটি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট দখল করেন এবং কিছুকাল পরে বর্তমান জায়গাটি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করেন। সেই সময় ২২ নম্বর লক্ষ্মী দত্ত লেনের ভাড়া বাড়ীতে শত অসুবিধা আর কষ্টের মধ্যে লাইব্রেরী তুলে আনতে হয়। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ২ নম্বর কে সি বোস রোডে (শ্যামপুকুর থানার কাছে) গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ীতে স্থিতি লাভ করে। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগারকে 'পাবলিক লাইব্রেরী' বলে গেজেটে ঘোষণা করেন।

'বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী' ভবনটি চার কাঠা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দোতলা বাড়ী। একতলায় আছে গ্রন্থাগার, রীডিং রুম এবং খবরের কাগজ পড়বার আলাদা জায়গা। আর সমস্ত দোতলা জুড়ে (ছোট মঞ্চ সমেত) একটি হল—স্থানীয় সংস্থাগুলিকে উৎসব ও অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়।

রীডিং রুমে জনসাধারণ খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা ও উপন্যাস ছাড়া যে কোন বই পড়তে পারেন। লাইব্রেরী ও রীডিং রুম প্রতিদিন খোলা থাকে সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা, রবিবার সাড়ে নটা পর্যন্ত এবং রাতে সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার ও রবিবার রাত্রে শুধু বন্ধ থাকে। এখানে রাখা হয় ইংরেজী-বাংলা মিলিয়ে ৫টি দৈনিক, ২৩টি সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক এবং অন্যান্য বার্ষিক সংখ্যাগুলি। তাছাড়া যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, কোরিয়া ও রাশিয়ার পত্র-পত্রিকা এখানে রাখা হয়।

গ্রন্থাগারের শিশু সদস্য সংখ্যা ৭০ জন, মাসিক চাঁদা ২৫ পয়সা। বড়দের সদস্য চার ধরণের হতে পারে। ২৫০্ টাকার বিনিময়ে আজীবন সদস্য এবং ক খ ও গ শ্রেণীর সদস্য। গ-শ্রেণীর সদস্যেরা মাসিক ৭৫ পয়সা চাঁদা দিয়ে একটি করে বই পেতে পারেন। খ—শ্রেণী দিনে দুটি করে এবং ক—শ্রেণী দিনে চারটি করে বই পাবার অধিকারী। ক ও খ শ্রেণীর চাঁদা গ—শ্রেণীর হার অনুযায়ী ধার্য হয়। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৭৩০ জন, ইংরেজী-বাংলা গ্রন্থ সংখ্যা ২৫,০০০, সাময়িক পত্র-পত্রিকা আছে ১৫০০। ক্যাটালগিং ব্যবস্থা বাংলায় লেখক অনুযায়ী, ইংরেজীতে ডিউই প্রথায়। বই নেবার পদ্ধতি 'ক্লোজ একসেস' অর্থাৎ শ্লিপ দিয়ে বই নিতে হয়।

গবেষকদের জন্যে বাংলা সাহিত্যের ভাল সংগ্রহ এখানে আছে, আর আছে পুরনো পত্র-পত্রিকা।

গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা পাঁচজন। এঁরা নামমাত্র বেতন পান।

এখানকার পাঠক প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারিক শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস জানালেন, বর্তমানে উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাস, ভ্রমণ ইত্যাদি গ্রন্থের চাহিদাও বেড়ে চলেছে।

প্রতি বছর সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত ২৬ জনের কমিটি কার্যভার পরিচালনা করে থাকেন।

গ্রন্থাগারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল নিয়মিত সাংস্কৃতিক বৈঠক, পাঠচক্র, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ডিবেট, কবি-সম্মেলন, একজিবিশন ইত্যাদি। এই সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও সুধীবৃন্দ।

গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায় এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীদাস জানালেন, আর্থিক সমস্যার জন্যে বই, ম্যাগাজিন, র‍্যাক ইত্যাদি কেনা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে গত তিন বছর এবং কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে গত পাঁচ বছর এঁরা অনুদান পাচ্ছেন না।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। ভারতবর্ষের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনে এবং জাতীয়তাবোধ জাগরণে বাংলাদেশের দান অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে বাংলাদেশের নানাস্থানে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী রাজধানী কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম জনসাধারণের গ্রন্থাগার। চৈতন্য লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পূর্ববর্তীকালে এর জন্ম। এই গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"বর্ষে বর্ষে পাঠ্য ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি পূর্ণতর হইয়া পাঠকদের আদরণীয় হোক এই আমার আশীর্বাদ।" কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থা আর তীব্র স্থানাভাবে এই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রন্থাগার আজ নানা সমস্যা কণ্টকিত। গ্রন্থাগারটি শুধু একতলায় কেন্দ্রীভূত। দোতলার সম্পূর্ণটাই হল। এই হল রামমোহন লাইব্রেরী হল অথবা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলের মত ভাড়া দিয়ে এর স্থায়ী আয়ের সুবন্দোবস্ত করতে পারেন। এ ব্যাপারে যদি কলকাতা কর্পোরেশন কর ইত্যাদি বাবদ ভবিষ্যতে কিছু শর্তে কিছু সুযোগ সুবিধা দেন, তবে এই গ্রন্থাগারটি স্বাধীনভাবে চলতে পারে এবং ভবিষ্যতে তিনতলা তুলে স্থানাভাব পূর্ণ করতে পারে। কারণ এই লাইব্রেরীর সঙ্গে জড়িত আছেন উত্তর কলকাতার এক বৃহৎ সংখ্যক পাঠকগোষ্ঠী। আশাকরি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রন্থাগারটির ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন এবং নব্বই বছরের ঘুমন্ত ঐতিহ্যকে আবার শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে নতুন আলোকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

—সুশান্তকুমার মিত্র

ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায় কেন?

একটুতেই নার্ভাস হয়ে পড়া, খিটখিটে মেজাজ, অকারণে ক্লান্তি ও অবসাদ, মাথার পিছনটা মাঝে মাঝে জ্যাম হয়ে থাকে, হয়ত ঘোরেও। ডাক্তারের কাছে চেক-আপ করাতে ধরা পড়ে, ব্লাড-প্রেসার বেড়েছে কিংবা বাড়ার মুখে।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ব্লাড-প্রেসারে ভুগছেন এরকম কেউ না কেউ আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। ওষুধ খেলে কমে যাচ্ছে; সেরে গেছে মনে করে ওষুধ খাওয়া ও চেক-আপ করান ছেড়ে দেওয়ার কিছুদিন পরে হয়ত দেখা দিল আবার সেই সব পুরান লক্ষণ। মানে আবার বেড়েছে। বিরক্তিকর ব্যাপার সন্দেহ নেই।

ব্লাড-প্রেসার অবশ্য সকলেরই আছে। ব্লাড-প্রেসার মানে ধমনীর গায়ে রক্তের চাপ। স্বাভাবিক চাপের চেয়ে বেড়ে গেলে সেটা অসুস্থতার পর্যায়ে পেঁছাল। ডাক্তারি ভাষায় তার নাম হাইপারটেনসন।

সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন, ব্লাড-প্রেসার মাপার সময় ডাক্তাররা দুটো ফিগার লিখে থাকেন—একটা বেশি, একটা কম। বেশিটাকে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার, আর কমটার নাম ডায়াস্টোলিক। স্বাভাবিক ও সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে প্রথমটা ওঠে পারদদণ্ডের ১০০-১২০ মিলিমিটার, আর দ্বিতীয়টি তার ৩০-৩৫ কম—অর্থাৎ ৭০-৮০ মিলিমিটার।

বিভিন্ন বয়সে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ব্লাড-প্রেসার অর্থাৎ সিসটোলিক ও ডায়াসটোলিক প্রেসারের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, একই ব্যক্তির প্রেসার এক এক সময় এবং শরীর ও মনের এক এক অবস্থায় তারতম্য ঘটতে পারে। কঠোর শ্রমের পর কিংবা মানসিক আবেগে —যেমন রাগ হলে বা খুব ভয় পেলে, ধূমপানের কিংবা ভরপেট খাওয়ার পর প্রেসার কমে যেতে পারে।

সিসটোলিক ও ডায়াসটোলিক প্রেসারের পার্থক্য বুঝতে হলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে রক্তচাপের মূল উৎসে, অর্থাৎ হৃদপিণ্ডে।

দিন নেই রাত নেই, ছুটি নেই অবসর নেই, ক্লান্তি নেই অভিযোগও নেই, আমাদের হৃদপিণ্ড নিজ কক্ষ থেকে মিনিটে ৬০-৮০ বার রক্ত পাম্প করে দিচ্ছে প্রধান দুটি ধমনীর মধ্যে। দিচ্ছে নিজ দেহকে সংকুচিত করে—প্রতিটি সংকোচনে ৬০-৮০ সিসি রক্ত। সেই এক মিনিটের কাজ ৬-৮ কিলোমিটারের সমতুল। একটা ক্রেন ২ টন ভার ৫ মিটার উঁচুতে তুলতে যে পরিমাণ কাজ করে থাকে, দিনে প্রায় ততটা কাজ সম্পন্ন করে হৃদপিণ্ড।

মাত্র ৩০০ গ্রাম ওজনের এই উপাঙ্গটা একজন মানুষের জীবদ্দশায় এই বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ করে কোন যাদুমন্ত্রে, সে-প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। আসলে এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্যের পিছনে আছে হৃদপিণ্ডের ছন্দোবদ্ধ গতি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে একবার সঙ্কোচন, একবার শিথিল অবস্থা। গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ০-৩—০·৮ সেকেণ্ডব্যাপী সঙ্কোচনের পরই আসে ০-৪ সেকেণ্ডের শ্লথতা বা বিরতি। এই ছন্দোবদ্ধ পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও বিরতির জন্যেই হৃদপিণ্ড আমাদের সারা জীবনভোর শোণিতধারাকে সদা প্রবাহমান রাখতে পারে।

হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত যে ধমনীগুলির মধ্যে এসে পড়ছে তাদের চরিত্র অনেকটা রবারের নলের মত—দেহের গঠন যাদের স্থিতিস্থাপক। পাম্প করা রক্ত সজোরে এসে পড়লে ধমনীর ভিতরের দেয়ালে বা গায়ে তা বাধা পায়, এবং তাতেই সৃষ্টি হয় যে চাপ, তাকে বলে সিসটোলিক প্রেসার।

সঙ্কোচনের পর হৃদপিণ্ডের শিথিল অবস্থা বা বিরতির সময়েও ধমনীর গায়ে রক্তের চাপ থাকে—যদিও তখন তা কমে আসে। ধমনীর গায়ে রক্তস্রোতের সবচেয়ে কম চাপকে বলা হয় ডায়াসটোলিক প্রেসার।

সিসটোলিকের চেয়েও ডায়াসটোলিক প্রেসার তুলনায় বেড়ে যাওয়াটা বেশি দুশ্চিন্তার কথা।

রক্তচাপ বৃদ্ধি সাধারণত দেখা যায় ৪০-৬০ বছর বয়সে—যদিও অল্পবয়সীরা বাদ যান না। ডায়াবিটিসের মত ব্লাড-প্রেসার বৃদ্ধিরও বংশানুক্রমিক ইতিহাস পাওয়া যায় কিছু ক্ষেত্রে।

রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হাইপারটেনশন হয় দু-ধরনের। এক—এসেনসিয়াল হাইপারটেনসন—যার কারণ আজও অজ্ঞাত। দ্বিতীয় ধরনের রক্তচাপ-বৃদ্ধি ঘটে কিডনীর অসুখ, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির এক রকম টিউমার, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির অসুস্থতা, গর্ভাবস্থার বিষক্রিয়া ইত্যাদি থেকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধিটা আনুষ্ঠানিক বা সেকেন্ডারী।

এসেনসিয়াল হাইপারটেনসন আবার দুরকম। এক—বিনাইন অর্থাৎ যা বিষম নয়; এবং দুই—ম্যালিগন্যাণ্ট বা মারাত্মক। ম্যালিগন্যাণ্ট বলা হয় যখন রক্তচাপ উঠে যায় হয়ত ২১০।১৫০ বা তারও উপরে। অনেক সময় রোগী তখন চোখে দেখতে পায় না বা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। বিনাইন হাইপারটেনসনও কখনো কখনো ম্যালিগন্যাণ্ট রূপ নিতে পারে।

এসেনসিয়াল হাইপারটেনসনের কারণ অজ্ঞাত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে বা উপাঙ্গে (যেমন কিডনীতে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী বা ধমনিকার মধ্যে রক্তচাপের প্রতি অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি হওয়ায়। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে, হৃদপিণ্ডের পাম্প করা রক্ত প্রধান দুটি ধমনীর মধ্যে এসে পড়লে ধমনীর গায়ে রক্তস্রোতের চাপ সৃষ্টি হয়, যার নাম ব্লাড-প্রেসার। এই চাপ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ধমনীদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায়, যারা গাছের শাখা-প্রশাখার মতই মোটা থেকে ক্রমশ সরু, আরও সরু, শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ নিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে ও উপাঙ্গে। সরবরাহ করছে দেহের পুষ্টি ও অক্সিজেন। টিউবওয়েল থেকে জল পাম্প করে দিলে পাম্প-এর মুখে লাগান মোটা রবারের পাইপে জলের যে তোড় বা চাপ দেখা যায়, সেই পাইপের সঙ্গে জোড়া লাগান অনেকগুলো পাইপ দিয়ে জলটা যদি দূরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে দূরের পাইপগুলোর মধ্যে জলস্রোতের চাপ স্বভাবতই কমে যাবে। ধমনীর মধ্যে রক্তচাপের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে থাকে। ছোট ছোট ধমনীর মধ্যে রক্তের চাপ এবং রক্তস্রোতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও কম। কিন্তু কোন কারণে সেই প্রতিরোধ যদি বেড়ে যায়, তবে রক্তের চাপ বা ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হল, ধমনীর মধ্যে রক্তস্রোতে প্রতিবন্ধকতা বাড়ে কেন? এ সম্পর্কে মত আছে নানারকম। কেউ বলেন, ছোট ছোট ধমনীগুলোর সঙ্কোচনের জন্যেই রক্তস্রোতে বাধা পড়ে, এবং এই সঙ্কোচনের কারণ হয় স্নায়বিক (যার উদ্ভব মস্তিষ্কে), কিংবা একরকম রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টির জন্যে। আবার কারও কারও মতে ধমনীর মধ্যে কোলেস্টেরলের পলি পড়ে ধমনীর গা পুরু ও শক্ত হয়ে যায়, তাদের ফুটো ক্রমে অপরিসর হয়ে আসে, তাতেই বাধা পায় রক্তধারা। এক্ষেত্রে বিতর্কটা হচ্ছে এই যে বয়স্ক ব্যক্তিদের ধমনী পুরু ও শক্ত হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু অল্পবয়সী ব্লাড-প্রেসার রোগীদের তো সেরকম নিদর্শন পাওয়া যায় না। তা থেকে এই ধারণাই ক্রমশ দানা বাঁধছে যে আসল কারণ রাসায়নিক—অর্থাৎ ধমনী সঙ্কোচন।

হাইপারটেনসনের উপসর্গ হতে পারে নানারকম। ধমনীতে রক্তস্রোতে বাধা পড়লে সারাক্ষণ একটা চাপের বিরুদ্ধে কাজ করতে করতে হৃদপিণ্ড নিজেই আকারে ক্রমশ বড় হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। ডাক্তারি ভাষায় তাকে বলা হয় কার্ডিয়াক ফেলিওর। অশক্ত হয়ে পড়ছে হৃদপিণ্ড; হার্ট ফেল করছে।

ধমনীগুলোর ফুটো অপরিসর হতে হতে হয়ত একটা ধমনীর ফুটো একেবারে বন্ধ হয়ে গেল—যাকে বলা হয় থ্রম্বোসিস। কিংবা হয়ত ফেটেই গেল ধমনীটা এবং শুরু হল রক্তক্ষরণ। মস্তিষ্কে এবং হৃদপিণ্ডের গায়ে এরকম দুর্ঘটনা ঘটলে তা মারাত্মক হয়ে পড়ে।

কিডনী বা মূত্রাশয়ের অসুখ থেকে যেমন হাইপারটেনসন হতে পারে, তেমনি হাইপারটেনসনের উপসর্গ হিসাবে কিডনীও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। বংশানুক্রমিক ইতিহাস না থাকলে অল্পবয়সীদের হাইপারটেনসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষঙ্গিক—অর্থাৎ ভাল করে খুঁজে দেখলে কিডনীর অসুখ বা অন্য কোন কারণ ধরা পড়তে পারে।

রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায় ঘী, মাখন, চর্বি, মাংস ইত্যাদি বেশি খেলে। সেই কোলেস্টেরল ধমনীর গায়ে জমা হয়ে তার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করে। তখন রক্তস্রোতের চাপে প্রসারিত হতে না পেরে রক্তস্রোতে বাধা সৃষ্টি করে ধমনী। বিশেষ করে যাদের পরিবারে হাইপারটেনসনের ইতিহাস আছে তাদের ছেলেমেয়েদের তাই শৈশব থেকেই খাদ্য সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত।

কায়িক শ্রমবিমুখতা একদিকে যেমন রক্তের স্রোতধারাকে ক্ষীণ করে, হৃদপিণ্ডের পেশীকে দুর্বল করে, তেমনি কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সহায়ক।

মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতেও রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অনেকের মতে আজকাল হাইপারটেন বা ব্লাড-প্রেসার রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ আধুনিক জীবনযাত্রার নিরন্তর মানসিক চাপ ও উত্তেজনা। অর্থাৎ নিয়মিত কায়িক শ্রম ও ব্যায়াম করলে এবং অতিভোজন ও অনাবশ্যক উদ্বেগ এড়িয়ে চলতে পারলে হাইপারটেনসনকেও পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব।
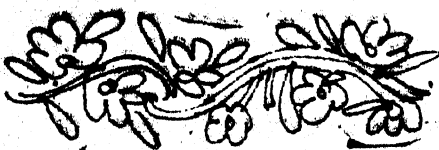
—অশ্বিনী সামন্ত

স্বপ্ন (২)

প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিনই স্বপ্ন দেখে, এই হল আধুনিক মনোবিদদের মত। রোজ যে একটামাত্র স্বপ্ন দেখে তাও নয়, অনেকে একাধিক স্বপ্ন দেখে। তবু কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন নি বলে থাকেন, এমন কথাও বলতে শুনেছি যে তিনি কখনই স্বপ্ন দেখেন না। আসল কথা হল অনেক সময়ই স্বপ্ন মনে থাকে না। ঘুম ভাঙার সংগে সংগে স্বপ্নের কথা একেবারে ভুলে যাওয়ার কথা বহু শোনা যায়। এই জন্যেই কেউ কেউ মনে করেন তিনি স্বপ্নই দেখেন না। আবার অনেকে স্বপ্ন দেখেছেন বলেন কিন্তু কি স্বপ্ন দেখেছেন তার কথা কিছুই মনে করতে পারেন না। এর ঠিক বিপরীত স্বভাবের মানুষও আছেন যে রোজ এসে স্বপ্নের কথা বলতে থাকে। মানসিক রোগীদের মধ্যেও এই সবরকমের রোগী পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে এক একজন রোজ এসে পনর-কুড়ি মিনিট ধরে বেতাল স্বপ্নই বলতে থাকে। যারা প্রথম প্রথম এসে স্বপ্ন বলতে পারে না, তারাও কিছুদিন অভ্যাস করার ফলে স্বপ্ন মনে রাখতে পারে। আমরা স্বপ্ন অনেক সময়ই মনে রাখতে চাই না বা স্বপ্নের দিকে তেমন মন দেই না বলেই স্বপ্ন আমাদের মনে থাকে না। সাধারণভাবে একথা সত্য হলেও কিন্তু এক একটা স্বপ্ন এমন স্পষ্ট ও জোরালো হয়ে প্রকাশ পায় যে ঘুম ভাঙার পরেও মনে পড়তে থাকে যেন স্বপ্নের অবস্থাতেই আছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা-টাকেই যেন তখন অবাস্তর মনে হতে থাকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে কিছুক্ষণ বুঝতে পারে না বিকেল হয়েছে। ভুল করে মনে হয় সকাল হয় গেছে। ঘুম ভাঙতে অনেক দেরী হওয়ায় বেলা অনেক হয়ে গেছে আপিস যাবার বা ঘরের কাজকর্মের অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। তখন ধড়মড় করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখা যায় বেলা তিনটে বেজে গেছে তখন একটু ধাঁধা লাগে, পরে সত্যিকার অবস্থাটা বুঝতে পেরে নিজেরই হাসি পায়, স্বস্তি বোধও করে।

স্বপ্নে উঁচু পাহাড় থেকে বা বাড়ীর ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে, চমকে উঠে ঘুম ভেঙে যায়। সাপ বা অন্য কোনো জন্তু তাড়া করছে দেখে ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়। তেমনই, জলে ডোবা, আগুনে লাগা, চোর-ডাকাত বা গুণ্ডার হাতে পড়ায় ভয়েও, অনেক সময় চিৎকার করে, ঘুম ভেঙে যায়। এইরকম আরোও অনেক উৎকণ্ঠার স্বপ্নের কথা শোনা যায়। নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে যায় এমন অনেক স্বপ্নের কথা শোনা যায়। জেগে উঠেও এক এক সময় কান্না থামতে চায় না। খুশির স্বপ্নে তেমনই আবার হাসিতে ঘুম ভাঙে। ভাল-মন্দ দুরকমের স্বপ্নই দেখা যায়।

কোন আদ্যিকাল থেকে যে মানুষ স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা জল্পনাকল্পনা করে আসছে তা জানা যায় না। যে প্রাচীন যুগের কথা লেখায় পাওয়া যায় বা যে আদিম মানুষের কথা লোকের মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, দেখা যায় সে সব যুগেও মানুষ স্বপ্ন নিয়ে নানা আলোচনা করেছে। নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছে, আর তৎকালীন বিশ্বাস ও আচার অনুসারে স্বপ্নের ফলাফল বিচার করে প্রয়োজনীয় পূজাদি দ্বারা স্বপ্নের দোষ স্খালন করতে চেষ্টা করে এসেছে। আজও তা অনেক ক্ষেত্রে করা হয়। স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা বিশ্বাস কেবল আমাদের দেশেই আছে এমন নয়। পৃথিবীর সব দেশেই, সব জাতির মধ্যে, স্বপ্ন সম্বন্ধে কোনো না কোনো বিশ্বাস চলে আসছে। এবিষয় সভ্য বা অসভ্য জাতির মধ্যে প্রভেদ দেখা যায় না। অবশ্য বিশেষ বিশ্বাস সম্বন্ধে পার্থক্য কিছু দেখা যায়। পৃথিবীর সব মানুষই যে স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় তা নয়। অনেকে স্বপ্নের কোনো অর্থ আছে তা মনেই করেন না। ঘাড়ে চেপে না-বসলে কোনো বিষয় সম্বন্ধেই বোধহয় আমরা কিছু ভাবতে চাই না। 'মিথ্যে কেন ভাবনা করতে যাওয়া' এমন মনোভাব অনেকের আছে। তবু যাঁরা স্বপ্ন সম্বন্ধে ভেবে এসেছেন তেমন কিছু কিছু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মত সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে তাকাতে গেলে আমাদের প্রাচীন গ্রীসের কথাই ভাবতে হয়। আজও আমরা বহুক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতার চিন্তাধারার আওতায় রয়ে গেছি। বিশেষ করে দর্শনের ক্ষেত্রে ত বটেই। তার মানে এ নয় যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক যুগের সভ্যতার স্তরেই আজও রয়ে গেছে। কাল ছুটে চলেছে, আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক বদলে গেছে সত্যি কিন্তু আজও তার মূলধনের খোরাক অনেক সময়ই গ্রীক, রোমান, সভ্যতা থেকে যেন খুঁজে দেখতে বা যাচাই করে নিতে হয়। যেমন আমাদের দেখতে হয় বেদ পুরাণ, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহা-ভারত থেকে উপাদান সংগ্রহের জন্যে, নিজেদের চিন্তাধারার সংগে সেই সব চিন্তাশীলদের চিন্তাধারার সংগে মিলিয়ে দেখতে, তার পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে। অতীতকে বাদ দিয়ে তো বর্তমানকে সব-টুকু বুঝতে পারা যায় না। তাই অতীতের দিকে ফিরে তাকাতেই হয়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিন্তাশীলদের মধ্যে কয়েক রকমের মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে এক শ্রেণীর চিন্তাশীলদের মতে স্বপ্ন হচ্ছে দেহের একরকমের বিকারের ফল। শরীরে যখন কোনও অসুস্থতা দেখা দেয় তখন রোগী স্বপ্ন দেখে। অন্য মতবাদানুসারে দেহের ঠাণ্ডা গরম বোধ, ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি দৈহিক প্রয়োজন থেকেই স্বপ্ন সৃষ্টি হয় এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। কেউ মনে করেছেন ঘুমের সময় মন আত্মার সান্নিধ্যে এসে যে সব বিষয় জানতে পারে বুঝতে পারে সেই-গুলিই স্বপ্নের রূপে দেখা দেয়। যে স্বপ্ন বুঝতে পারা যায় না সেগুলির নিগূঢ় অর্থ মন ধরতে পারে না তাই আমাদের কাছে সে-সব স্বপ্ন অর্থহীন বা কিম্ভূত বলে মনে হয়। অন্যমতে স্বপ্ন ব্যক্তির জীবনের অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা দেখিয়ে দেয়। তার মানে যা আমাদের ঘটেছে তা যেমন দেখা যায় তেমনই যা আমাদের ঘটবে তাও দেখা যায়। তাই অশুভ স্বপ্ন দেখলে মন চঞ্চল হয় আর তার প্রতিকার কিছু করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করতে ব্যস্ত হয়। আরও অন্য অনেক মত আছে যেমন—মনের অতৃপ্ত কামনা বাসনা নানা কৌশলে স্বপ্নের মধ্যে তা মিটিয়ে নিতে চায়, যদিও তখন প্রকৃত দৈহিক ভোগ তার হয় না। অর্থাৎ স্বপ্নে যদি কোথাও যাবার ছবি দেখা যায় তখন স্বপ্নদ্রষ্টা বাস্তবে সেখানে যায় না—হাতে কিছু পেয়েছে দেখলে বাস্তবে সে হাতে কিছু পায় না স্বপ্ন দেখার সময় বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের বস্তুগত

সংবেদন কিছু হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি তখন কাজ করে না। কিন্তু তাদের যে স্মৃতি মনে থেকে যায় তাই থেকে স্বপ্নের সংবেদন অনুভূত হয়। বাস্তব অবস্থায় যা বাইরের বস্তুজগৎ থেকে পাওয়া যায় স্বপ্নের মধ্যে তা মনের ভেতর থেকেই তৈরী হতে থাকে। মনের নিজের এই সংবেদন যে কত প্রবল হতে পারে আর কত বাস্তব বলে মনে হতে পারে তার উদাহরণ আগেই কিছু উল্লেখ করেছি। আরও অনেক মতবাদের কথা বলা যেতে পারে। আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকে স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা মতবাদ চলে আসছে। বেদ উপনিষদ পুরাণে এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন গ্রন্থে ভারতের অন্যান্য নানা ধর্মে বিশ্বাসানুসারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হয়ে আসছে। জীবাত্মার মায়াবন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় তার নানা ক্লেশ ইত্যাদির প্রকাশ স্বপ্নে প্রকাশ পায় যেমন বলা হয়েছে তেমনই বলা হয়েছে মায়াবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিকাতর আত্মার প্রয়াস এই স্বপ্নে দেখা দেয়। আবার সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের প্রভাবে বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন সৃষ্ট হয় বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিধাতুর ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখা যায় বলা হয়েছে। যথা বায়ু প্রকোপিত হলে স্বপ্নে উড়ে বেড়ানো, ছুটে বেড়ানো ইত্যাদি দেখা যায়। পিত্তের প্রকোপে জ্বালা, পোড়া, আগুন ইত্যাদি ঘটিত স্বপ্ন দেখা যায়। আর কফ প্রকোপিত হলে জলে ডোবা, বরফ ইত্যাদি ঠান্ডা জিনিসের বা ঠান্ডা অবস্থায় স্বপ্ন দেখা যায় বলা হয়েছে। এমনকি রোগীর স্বপ্ন থেকে রোগীর দেহের কোন ধাতু প্রকোপিত হয়েছে তা ধরে নিয়ে সেই অনুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয় বলা হয়েছে।

মনের নানা কামনা বাসনা যেগুলি বাস্তব জীবনে অপূর্ণ থেকে যায়, তাদের মধ্যে যেসব কামনা বাসনা বেশী প্রবল থাকে, স্বপ্নে তাদের পূরণের ছবি দেখা যায়—এই মতবাদও প্রচারিত ছিল। মনের মধ্যে অবরুদ্ধ ইচ্ছা তার পূরণের পথ স্বপ্নের মাধ্যমে, অন্ততঃ আংশিক পরিমাণে পায়, আমাদের দেশের প্রাচীন চিন্তাবিদের মতে একথাও বলা হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন চিন্তাশীলদের স্বপ্ন সম্বন্ধে চিন্তাধারার অনেক মিল আছে। কেবল তাই নয় সেই সব মতবাদের সঙ্গে আধুনিক ফ্রয়েডীয় মতবাদেরও বেশ কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কি তাই। আমরা যাদের আদিম জাতি বলে অনুন্নত বলে থাকি তাদের মধ্যেও কিছু-টুকু প্রায় একই রকমের বিশ্বাস এই স্বপ্ন সম্বন্ধে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আসামের ত্রিপুরা পার্বত্য জাতিদের কোনো কোনো জাতের মধ্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা গভীর বিশ্বাস ও তার ফলাফল সম্বন্ধেও বিধিবদ্ধ সংস্কার দেখা যায়। অধুনা মেঘালয়ের গারো জাতিদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে ঘুমের সময় মানুষের আত্মা (জাংগী) শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়, তার যেমন ইচ্ছা তেমন আচরণ করে বেড়ায়। আর তার এইসব খোরাকেরা নানা কিছু করা স্বপ্নে দেখা যায়। প্রত্যেক স্বপ্নের বিশেষ অর্থ আছে। সে অর্থ সকলে জানে না। তাদের মোড়ল (নকমা) কিছু জানে আর সবচেয়ে ভাল জানে তাদের পুজারী (কামাল বা খামাল)। তাই স্বপ্ন দেখে মনে কিছু সন্দেহ জাগলেই তারা স্বপ্ন খামালকে গিয়ে বলে। খামালের বিচারে যদি সেটা বিশেষ কোনও খারাপ স্বপ্ন বলে মনে হয় তবে দোষ অপনোদনের জন্যে কোন দেবতার (মেত্তির) পুজা কি উপকরণে করতে হবে তা সে বলে দেয়। স্বপ্নদ্রষ্টা সেই বিচার বিধি অনুসারে পুজাদির ব্যবস্থা করে নিজের অনিষ্ট সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হতে চায়। এজন্যে তাদের প্রচুর খরচ করে নানা উপচারে পুজো দিয়ে বিধি পালন করতে দেখা যায়। একটি তেমন ঘটনার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আরও অনেক রকমের পুজো, এই স্বপ্ন দেখার ফলে, দিতে দেখেছি। পুজো সফল না হলে স্বপ্নদ্রষ্টাকে অত্যন্ত ভীত অবস্থায় দিন কাটাতেও দেখেছি। স্বপ্নের ফলাফল বিষয়ে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। বিশেষ কোন দেবতা রোষবশতঃ যাকে কোনও ক্ষতি করতে চান তাকে স্বপ্ন দেখান এই বিশ্বাসও আছে। তাই তাঁকে পুজো দিয়ে তুষ্ট করলে স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষতিটা আর হবে না এই তাদের বিশ্বাস। এমন কথাও শুনেছি যে দেবতারা মানুষের কাছে পুজো পাবার জন্য মাঝে মাঝে মানুষকে স্বপ্ন দেখান আর পুজো পেয়ে তুষ্ট হন। তবে সব স্বপ্নই যে খারাপ স্বপ্ন তা নয়। অনেক স্বপ্ন আছে ভাল স্বপ্ন যার জন্যে পুজো দেবার দরকার হয় না। স্বপ্নদ্রষ্টার কিছু ভাল হবে এই খবরটুকুই যেন ইঙ্গিতে স্বপ্নে জানিয়ে দেওয়া হয়। দেবতারাই এ স্বপ্ন দেখান বা তার জাংগী এই বিষয়েও সেই ভাল বা মন্দের পূর্বাভাস দিয়ে দেয়। গারোদের বিশ্বাসানুসারে কোন স্বপ্নের কি অর্থ এবিষয় একটা বড় রকমের ফর্দ সংগ্রহ করেছিলাম। তেমনি ঐ অঞ্চলের রাভা, মান, ডালু, হদি, হাজং বানাই প্রভৃতিদের স্বপ্নবিশ্বাসের তালিকা সংগ্রহ করেছিলাম। কতকগুলি স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই একই বিশ্বাস আছে দেখতে পাওয়া যায়!

ভোরবেলায় দেখা স্বপ্ন সত্য হয় এ বিশ্বাস অনেকের মধ্যেই প্রবল। স্বপ্নের বিচার অনেকের কাছে বলে দিলে সে স্বপ্ন ফলে না এ বিশ্বাসও আছে। সেই জন্যে ভাল স্বপ্ন দেখলে আর তা ভোরবেলায় দেখলে অন্যের কাছে বলতে বারণ করা হয়। কিন্তু খারাপ স্বপ্ন দেখলে তা অনেকের কাছে বলে দিলে আর বিপদ ঘটবে না বলা হয়। তবু কিন্তু দেখেছি যাদের উৎকণ্ঠা বেশী, তাদের এই বলে ফেলেও মনে

স্বাচ্ছন্দ্যবোধ জাগে না। দেবতার কাছে নানা মানত করে, পুজো দিয়ে, দোষ কাটানোর চেষ্টা আমাদের সভ্যসমাজেও দেখতে পাওয়া যায়। অতি আধুনিক মার্কিন দেশেও এই মনোভাবাপন্ন মানুষ [illegible] দেখেছি। ইউরোপেও দেখেছি। বৈজ্ঞানিক [illegible] দিয়ে স্বপ্ন বোঝবার চেষ্টা আছে; অনেকে তাতে তুষ্টও হন, কিন্তু অনেকে তাতেও তুষ্ট না হয়ে মনে মনে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান বা ভবিষ্যতের জন্যে শঙ্কিত হয়ে থাকেন। মানুষের মনের ভয়, তার বহু-যুগের সংস্কার সহজে দূর হয় না।

ভাল স্বপ্ন, খারাপ স্বপ্ন যেমন আছে তেমনই আছে দুর্বোধ্য হিজি-বিজি স্বপ্ন। যার কোনও মাথামুণ্ডু বুঝতে পারা যায় না। এ রকম স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পরেও ভারি একটা অস্বস্তি [illegible] থেকে যায়। অনেক সময় মেজাজ [illegible] বিগড়ে যেতেও দেখেছি। ঐ রকম স্বপ্ন দেখে সারাদিন ধরে কেবল বিরক্তি বিরক্তি ভাব লেগেই থাকে। স্বপ্নের প্রভাব আমাদের জীবনে যে কতখানি তার উদাহরণ একটা দিচ্ছি। এক বয়স্ক মহিলা বহু সন্তানের জননী, এক রাত্রিশেষের স্বপ্নে দেখলেন তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, আকাশপথে কালী নেমে এসে তাঁর ঠান্ডা হাতখানি মহিলার কপালে ছোঁয়ালেন। এর পরেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। জেগে উঠেই তাঁর মনে হতে লাগল মা কালী তাঁর দেহে ভর করেছেন; তিনি নিজেই মা কালী হয়ে গেছেন। তারপর থেকেই তিনি সেইরকম অর্থাৎ মা কালী হয়ে বিবস্ত্র হয়ে জিভ বার করে দিয়ে এর ওর দিকে তাড়া করে যান আবার কখনও বা মা কালীর মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন, জিভ বের করা থাকে হাত উপর দিকে তোলা, হাতে কিছু পেলে তাই দিয়ে খাঁড়ার মত ধরে হাত তুলে রাখেন। এই উন্মাদ অবস্থা বেশ কিছুদিন চলার পর চিকিৎসার ফলে তিনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। রোগের প্রথমাবস্থায় ওঝা ডাকা হয়েছিল। সে ঝাড়-ফুঁক করা সুরু করতেই কালীরূপী রোগী তাকে তাড়া করে বাড়ীর বার করে দেন। মহিলার মানসিক রোগাভাস পূর্ব থেকেই ছিল। সাধারণ অবস্থায় তা ধরা পড়ে নি। স্বপ্ন দেখার ফলে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ রকম স্বপ্ন দেখলে সকলেই যে উন্মাদ হয়ে যাবেন এমন কথা মনে করা ভুল হবে। রোগ প্রবণতা না থাকলে কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখার ফলেই মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে না একথা যেমন সত্য তেমনই বহু মানসিক অবস্থার বিশেষ [illegible] স্বপ্ন দেখার ফলে মানসিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে এ কথাও তেমনই সত্য। স্বপ্ন মনকে কতখানি বিচলিত করতে পারে এটা তারই একটা প্রমাণ।

স্বপ্ন সম্বন্ধে বলতে গেলে আরও অনেক কথা বলতে হয়। যেমন যদিও স্বপ্ন স্বপ্নই, বাস্তব নয়, তবু স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরেই কথা বলতে শোনা যায়, নানা রকম অঙ্গ চালনা, মুখভঙ্গী ইত্যাদিও দেখতে পাওয়া যায়। ছোট শিশু স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, হাসে হাত-পা নাড়ে। স্বপ্ন দেখে কিছু কিছু বয়স্ক ব্যক্তিও বিছানায় বা ঘরের যেখানে সেখানে পেচ্ছাপ করে দেন এমন কি কোনও কামোদ্দীপক স্বপ্ন দেখে বাস্তবে বীর্যপাতও ঘটে থাকে। স্বপ্নচারিতা নামে যে মানসিক অবস্থা, রোগাবস্থা বলাই ভাল, আছে তাতে স্বপ্নের ঘোরে ঘুমের মধ্যেই স্বপ্নদ্রষ্টা চলে বেড়াতে পারে। অনেক সময় তেমন রোগী রাত্রিতে স্বপ্নে কারও ডাক শুনে ঘরের দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে অনেক দূরে হেঁটে চলে যায়। সাধারণ কথা একে নিশির ডাক বলা হয়। এই নিশির ডাক শুনে একজন রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দু মাইল দূরে গ্রামের পথের পাশের মাঠে এক বড় গাছে উঠতে গিয়ে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কেন গাছে উঠছে তখন তা বুঝতে না পেরে একখানে বসে পড়ে। তখন তার ভয় এত বেশী হয়েছিল যে সেই ভয়েই প্রায় অচৈতন্য হয়ে গাছের তলায় পড়ে থাকে। বেলা হলে অন্য লোকে তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ীতে দিয়ে যায়। নিশির ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে ইন্দারার পাড়ে বা দীঘির পারে চলে যাওয়া, জলে নামতে গিয়ে ঘুম ভেঙ্গে চমকে জাগার ঘটনাও শুনতে পাওয়া যায়। আজকাল এই ধরনের ঘটনা খুব কম শুনতে পাই। আমাদের ছোটবেলায় ওরকম ঘটনার কথা অনেক শুনতে পেতাম। তাদের চিকিৎসার জন্যে আনা হতো। আমাদের সুসঙ্গের বাড়ী থেকে একটা বিশেষ তেল বিতরণ করা হতো। কাঁচা আম, সরষের তেল আরও অনেক রকমের উপাদান দিয়ে সেই তেল তৈরী করা হতো, নাম শুনতাম 'আমতেল'। ঐ তেল নিতে বহু দূর দেশ থেকেও লোক আসত। ঐ আমতেলে বহু মানসিকরোগী (তখন যাদের পাগল বলে বলতাম) সুস্থ হয়ে গেছে। রোজ পাঁচ-সাতজন থেকে, দশ পনরজন পর্যন্ত রোগী তেল নিতে আসতো। তাদের সাথীর লোকদের কাছে রোগের নানা লক্ষণের কথা শুনেছি। আজও তার কিছু কিছু মনে আছে। তখন ঐ স্বপ্নচারিতার কথাও অনেক শুনেছি। এখন আর ঐ শ্রেণীর রোগীর কথা তেমন শুনতে পাই না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগের লক্ষণও কিছু কিছু বদলায়। হয়ত তার ফলেই স্বপ্নচারিতার রোগও কমে এসেছে তার বদলে যা এসেছে সে সম্বন্ধে মানসিক রোগ বিষয় আলোচনার সময় বলব।

চেষ্টা করে স্বপ্ন মনে রাখা যায় [illegible] চেষ্টা [illegible] করে একই স্বপ্ন [illegible] দেখাও সম্ভব হয়। চেষ্টা ছাড়াও বিশেষ মানসিক অবস্থার দরুণ একই স্বপ্ন বারে বারে, আপনা থেকেই, দেখা যায়। স্বপ্ন দেখে অনেক সময়ই ঘুম ভেঙে যায়। সুখকর স্বপ্ন যদি কিছুটা দেখার পরে ঘুম ভেঙে যায় তবে, বিশেষ চেষ্টা করে, আবার ঘুমিয়ে, সেই স্বপ্নের রেশ ধরে, আরও স্বপ্নের কাহিনী বাড়িয়ে নেওয়া যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথাও বলতে পারি। কিন্তু সকল সময়ই তা সম্ভব হয় না।

স্বপ্ন সম্বন্ধে গবেষণা বহু দেশেই নানা পদ্ধতিতে হচ্ছে। আমাদের দেশে আজও তেমন কোনও নূতন স্বপ্ন গবেষণার কথা শুনি নি। অন্যান্য দেশে চেষ্টা করে দেখা হচ্ছে কোনও বিশেষ উপায়ে প্রত্যেককেই একই রকমের স্বপ্ন দেখানো যায় কিনা। অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার বিষয় বাইরের কোনও উদ্দীপক সকলের বেলায় একই রকম প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে কিনা, বাইরের চেষ্টায় স্বপ্ন দেখার সময় তার গতি-প্রকৃতি ইচ্ছামত পরিচালন করা যায় কিনা, স্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোনও বিষয় জানতে পারা যায় কিনা বা তা কি করে জানা যায়, দূরের কোনও ঘটনা স্বপ্নে আগে থেকেই জানতে পারা যায় কিনা ইত্যাদি বহু বিষয় স্বপ্ন সম্বন্ধে জানবার আছে। আমার এক রোগিণীর ধারণা ছিল তিনি স্বপ্নে কারও কোনও অনিষ্ট ঘটতে দেখলে, বিশেষ করে মৃত্যু দেখলে যার মৃত্যু দেখেন তিনি বা তাঁর নিকট আত্মীয় কেউ অবশ্য মারা যান। আরেক রোগী বলত বিদেশে বা দূরে তার আপনজন বা পরিচিত কেউ বিশেষ অসুস্থ হলে বা মারা গেলে তখনই সে স্বপ্নে তা জানতে পারে। খবর নিয়ে সে বরাবর দেখেছে ঠিক যেমন সে স্বপ্নে দেখেছে তেমনটিই ঘটেছে। চিকিৎসা চলবার সময় সে দুবার এই রকম স্বপ্নের কথা আমাকে বলেছে। খবর নিয়ে কিন্তু তার সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। অনেক রোগীই এই ধরনের কথা বলেন। অনেক স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ একটা স্বপ্ন বাস্তবে ফলেছে, দেখেছি। কিন্তু সেরকম ঘটনার সম্ভাবনা আগে থেকেই রোগীর মনে ছিল; তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় অনেক স্বপ্নের মধ্যে যদি একটা স্বপ্নও সঠিকভাবে মিলে যায় তবে তা কি করে রোগীর মন জানতে পেরে স্বপ্নে তা দেখিয়ে দেয়? এ প্রশ্নের সদুত্তর আজও আমাদের জানা নেই। ফ্রয়েড প্রবর্তিত স্বপ্ন বিশ্লেষণ সম্বন্ধে এরপরে বলব। সামান্য যা জানা গেছে তার চেয়ে অনেক বেশী এখনও অজানা রয়ে গেছে। জানবার চেষ্টা চলছে ভবিষ্যতে আরও জানা যাবে। (ক্রমশঃ)

তরুণচন্দ্র সিংহ

এই আমাদের দেশ

বাঁকুড়া—(৪)

অগ্রগতি ও সম্ভাবনা

শিক্ষাক্ষেত্রে বাঁকুড়া ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ১৯৫১ সালে জেলায় শিক্ষিতের হার ছিল প্রতি শতে ১৭-২৯ জন; দশ বছর বাদে, ১৯৬১ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৩-০৮। আরও দশ বছর বাদে, ১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুসারে বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষিতের হার দাঁড়িয়েছে ২৬-২১ শতাংশ। অর্থাৎ জেলার বিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের মধ্যে এখন পাঁচ লক্ষ তেত্রিশ হাজার লোক লিখন পঠনক্ষম।

ভৌগোলিক আয়তনে বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ জেলা হলেও লোকসংখ্যার তালিকায় তার স্থান নবম; আর শিক্ষার হারে বাঁকুড়া আরও এক ধাপ নিচে নেমে দশম স্থান লাভ করেছে।

বাঁকুড়া জেলায় এখন একটি মেডিক্যাল কলেজ, দুটি টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সহ মোট দশটি কলেজ আছে। বাঁকুড়া শহরের মেডিক্যাল কলেজটি সুপ্রাচীন এবং স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে এটি গড়ে ওঠে। প্রথমে স্কুল ছিল, পরে মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থায় দু'ধরনের শিক্ষারীতি তুলে দেওয়া হলে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল কলেজের মর্যাদা লাভ করে। এখন কলেজে প্রতি বছর ৫০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। কলেজের প্রয়োজনে জেলা হাসপাতালটি কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে হাসপাতালটির মোট শয্যাসংখ্যা হয়েছে ৩৪৪। টেকনিক্যাল স্কুল দুটি আছে বিষ্ণুপুর ও তালডাংরায়। এর মধ্যে বিষ্ণুপুরের কেজি ইঞ্জিনীয়ারিং ইনষ্টিটিউট সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান, ১৯২২ সালে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে ছয়টি কলেজ আছে তার দুটি আছে বাঁকুড়া শহরে, আর তালডাংরা, বিষ্ণুপুর, সোনামুখি ও ইদপুরে আছে একটি করে। সারা জেলায় একটিও মেয়েদের কলেজ নেই।

জেলায় হাই ও হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল আছে ২১০টি, জুনিয়ার হাইস্কুল ১৫০ আর জুনিয়ার বেসিক স্কুল (পঞ্চম শ্রেণী) ১৪০। এই সব স্কুলগুলিতে ১৯৭২ সালে ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় একাত্তর হাজার। এই ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে দেড় লক্ষ করতে হলে জেলায় আরও ২০০ নতুন উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের প্রয়োজন হবে এবং তাতে প্রায় ৬০০০ শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

জেলায় প্রাথমিক স্কুল আছে ২,৬৩৫টি; তাতে মোট ছাত্রদের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার এবং শিক্ষকশিক্ষিকার সংখ্যা ৬ হাজার ১০০। জেলার সব ৫—১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বাক্ষর করে তুলতে যদি প্রতি দেড় কিলোমিটার অন্তর একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা হয় তবে জেলায় আরও অন্তত পাঁচশ নতুন প্রাথমিক স্কুলের প্রয়োজন হবে। এখন অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলেরই শোচনীয় অবস্থা। স্কুলগৃহগুলি ভেঙে পড়ছে, আসবাবপত্র বা শিক্ষার সরঞ্জাম নেই বললেই হয়, প্রায় স্কুলেই শিক্ষকের সংখ্যা দুই কি একজন। তাঁরাও নিয়মিত বেতন পান না। প্রতি স্কুলে অন্তত চারজন শিক্ষক থাকা উচিত এবং অবশ্যই তাঁদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আর সব শিক্ষক যাতে শিক্ষণপ্রাপ্ত হন তারও ব্যবস্থা করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে সারা জেলায় আরও দশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে।

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া জেলায় যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ আছে। এতে যেমন জেলার মানুষের রোগমুক্তির ও স্বাস্থ্যোন্নতির সুযোগ হবে, তেমনই কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে।

রাধেশ্যামের মন্দির (বিষ্ণুপুর)

মদনমোহন মন্দির (বিষ্ণুপুর)
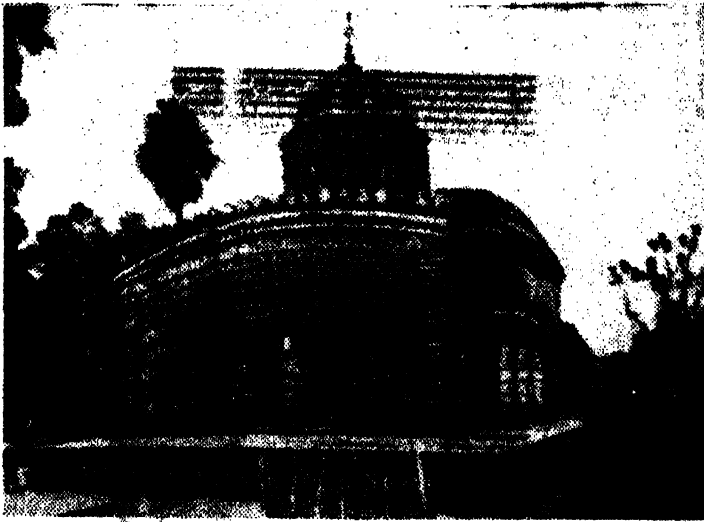
জেলার ২২টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে ১৯টিতে। সুতরাং ব্লক পিছু একটি হেলথ সেন্টার নীতি অনুসারে জেলায় অবিলম্বে আরও তিনটি হেলথ সেন্টার স্থাপন করা দরকার। তারপর ওন্দা, ছাতনা, বড়জোড়া ও গংগাজলঘাটি ব্লকের লোকসংখ্যা লক্ষাধিক হওয়ায় এই ব্লক কটিতে, একাধিক হেলথ সেন্টার থাকা উচিত। তারপর সোনামুখি, পাত্রসায়ের, ইন্দাস এবং রায়পুর থানার দুটি ব্লকের সঙ্গে মহকুমা শহর বিষ্ণুপুর কিংবা জেলাসদর বাঁকুড়ার সংযোগ ব্যবস্থার এতই অভাব যে, ঐসব স্থানের লোকেদের পক্ষে প্রয়োজনে বড় হাসপাতালের সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। সেকারণে ঐ ব্লকগুলির প্রাথমিক হেলথ সেন্টারগুলির যথেষ্ট উন্নতি ও সম্প্রসারণ দরকার।

জেলার ১৮৩টি অঞ্চলের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৪৫টিতে সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার আছে। যে অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক হেলথ সেন্টার আছে সেগুলি বাদে সব অঞ্চলে একটি সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার গড়ে তুলতে হলে জেলায় আরও ১০৯টি সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টারের প্রয়োজন হবে।

প্রতিটি হেলথ সেন্টারে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা দরকার, আর সেই সঙ্গে অন্তত একজন ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী। জেলা সদরের সঙ্গে হেলথ সেন্টারগুলির টেলিফোন সংযোগ না থাকলেও প্রতি পদে কাজের অসুবিধা হয়। হেলথ সেন্টারগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে আরও চাই একটি লেবরেটরি, একটি গাড়ি ও একটি এম্বুলেন্স। এইভাবে সমস্ত হেলথ সেন্টারগুলিকে যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে সেখানে আসার জন্য ডাক্তারদের সাধ্যসাধনা করতে হবে না। তাঁরা আগ্রহের সঙ্গেই সেখানে যাবেন এবং দারোয়ান, জমাদার, মালি, অফিস কর্মী, নার্স ইত্যাদি মিলিয়ে বহুজনের যে কাজ হবে ঐসব হেলথ সেন্টারে তা বলে শেষ করা যায় না। সুপরিকল্পিতভাবে একটা কাজ শুরু হলে আপনা থেকেই তা সম্প্রসারিত হয় এবং তা আরও নতুন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাঁকুড়ার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ সমস্যা হল কুষ্ঠরোগ। এই রোগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে জেলায় অন্তত আটটি লেপ্রসি কন্ট্রোল ইউনিট থাকা দরকার, যে জায়গায় আছে চারটি।

সড়ক সংযোগ ও পরিবহন

বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে কোন জাতীয় সড়ক যায় নি, তবে রাজ্য সড়ক আছে চারটি। বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর যে রাজ্য সড়কটি গেছে সেটি বাঁকুড়া ও বড়জোড়া থানার মধ্য দিয়ে গেছে; বাঁকুড়া-গোয়ালডাঙা রাজ্য সড়কটি গেছে বাঁকুড়া ও ইন্দপুর থানার মধ্য দিয়ে; আর একটি রাজ্য সড়ক গোয়ালডাঙায় শুরু হয়ে ভাংরায় শেষ হয়েছে; চতুর্থ রাজ্য সড়কটি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর শহরকে সংযুক্ত করার পথে বাঁকুড়া ও বড়জোড়া থানা অতিক্রম করেছে। জেলার মধ্যে আরও নয়টি বড় রাস্তা আছে, যার মধ্যে একটি জেলার বাইরেও প্রসারিত হয়েছে। বর্ধমানের রাণীগঞ্জ থেকে মেদিনীপুর শহর পর্যন্ত, ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ পথটি বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। জেলার অভ্যন্তরে দুটি দীর্ঘ পথ হল, বাঁকুড়া সোনামুখি ও বাঁকুড়া-খাতড়া পথ, দুটিই ৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর সড়কের দৈর্ঘ্য ৩২ কিলোমিটার।

সারা বাঁকুড়া জেলায় পথ আছে ২২৭৫ কিলোমিটার, যার মানে হল প্রতি হাজার বর্গ কিলোমিটারে পথ আছে মাত্র ৩৩৩ কিলোমিটার, যে জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সামগ্রিক হিসাব হল, প্রতি হাজার বর্গ কিলোমিটারে ৬০২ কিলোমিটার পথ। ১৯৬১ সালের হিসাবে জেলায় গ্রামপথের সংখ্যা ছিল ৯৮৩, যার বেশিভাগই তৈরি হয়েছিল টেস্ট রিলিফ কর্মসূচী অনুসারে। বছর তিনেক আগে যেসব গ্রামপথ তৈরি হয়েছিল, সংস্কারের অভাবে তার অনেকগুলিরই এখন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। জেলায় যে পথ আছে তারই যদি এখন সম্পূর্ণ সংস্কার করা হয় এবং জেলার [illegible] রাজ্যের [illegible] করা হয় [illegible] কয়েক হাজার মানুষের কাজ জুটবে।

গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সড়ক সংযোগের নিবিড় সম্পর্ক। পরিবহন ব্যবস্থা ভাল না হলে পণ্য বিপণনের আদর্শ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না এবং চাষীর পক্ষেও তার ফসল বা দ্রুত পচনশীল সাক-সব্জির ন্যায্য দাম পাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং শুধু কয়েক হাজার মানুষের কাজের জন্যই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্যও সারা জেলার গ্রামপথের সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

জেলার পরিবহন ব্যবস্থার অবশ্য উল্লেখযোগ্য উন্নতিই ইতিমধ্যে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে জেলায় বাসরুট ছিল একুশটি এবং সেগুলি মোট ৭,১৮৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করত; ১৯৭০ সালে জেলায় বাসরুট হয়েছে ১৫০টি যা জেলার প্রতিটি থানাকে সংযুক্ত করেছে এং জেলার বাইরেও বর্ধমান, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলী বীরভূম ও কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু জেলার গ্রামজীবনের সঙ্গে এই পরিবহন ব্যবস্থার সম্পর্ক অতি সামান্য। প্রধান পথগুলির সঙ্গে জেলার গ্রামগুলির সড়ক সংযোগ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হবে না।

জেলার উনিশটি থানার মধ্যে আটটির সঙ্গে রেলপথের সংযোগ আছে। সারা জেলায় রেল স্টেশন আছে বিশটি। দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ ছাড়াও বাঁকুড়ার নিজস্ব রেলপথ বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে জেলার পরিবহন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যাত্রী চলাচল ছাড়াও শালপাতা, বাঁশ, জ্বালানি, কাঠ, সর্ষের তেল, শুকনো লঙ্কা, ধান চাল, ডাল, অয়দা, কয়লা, লোহা, ইস্পাত স্টোনচিপস প্রভৃতি পণ্য পরিবহনের কাজেও রেলপথ ব্যবহৃত হয়। রেল স্টেশনগুলির সঙ্গে সড়ক সংযোগ বৃদ্ধি পেলে জেলার রেলপথকে আরও বেশি বাণিজ্যিক প্রয়োজনে লাগানো সম্ভব হবে।

জেলায় পোস্ট অফিসের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৬২ সালে জেলায় পোস্ট অফিসের সংখ্যা ছিল ১০৫, এখন হয়েছে ২৫২। টেলিগ্রাফ অফিস আছে বিশটি এবং টেলিফোন একসচেঞ্জ আছে তিনটি— বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও ঝাঁটিপাহাড়িতে। প্রতি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস, প্রতি ব্লক হেলথ সেন্টার ও থানার সঙ্গে জেলা-সদর ও মহকুমা শহরের টেলিফোন সংযোগ থাকা উচিত। শুধু নতুন কাজ সৃষ্টির জন্যই নয়, জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্যও এটা দরকার।

বিদ্যুৎ জল ও সেচব্যবস্থা

সারা জেলায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নেই, তাই জেলার বিদ্যুৎ

বাড়ন্ত বয়েসের
ছেলেমেয়েদের প্রিয়...
PARLE

চাহিদা পূরণের জন্য সম্পূর্ণরূপে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উপর নির্ভর করতে হয়। জেলার বিদ্যুৎ চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়ছে, এবং যা বাড়ছে তা গার্হস্থ্য প্রয়োজনেই। শিল্পের বিদ্যুৎ চাহিদা সামান্য, কারণ কোন বৃহৎ শিল্পই জেলায় গড়ে ওঠে নি। শুধু ধানকল বা তেলকলগুলি যা বিদ্যুৎ কাজে লাগায় তার বাইরে সবটাই লাগে শিল্প-বহির্ভূত প্রয়োজনে। ১৯৬৪-৬৫ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, সারা জেলায় যে মোট ১১,৪৮৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যয় হয়েছে তার মধ্যে শিল্পের প্রয়োজনে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩,৪৭৪ কিলোওয়াট, বাকি সবটাই গার্হস্থ্য প্রয়োজনে লেগেছে। জেলার পল্লী বৈদ্যুতিকরণের কাজের অগ্রগতিও সামান্য। সারা জেলায় বিদ্যুৎ আছে পাঁচটি শহরে এবং ৩,৫৫৩টি মৌজার মধ্যে এপর্যন্ত মাত্র ১৯২টিতে বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনার শেষে ৬৩৩টি মৌজায় বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছানোর কথা। সেটা সম্ভব হলে জেলার এক-পঞ্চমাংশ পল্লীতে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। ক্ষুদ্র কুটির-শিল্পীদেরও আজ উৎপাদন ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়; বিদ্যুৎ ছাড়া হ্যান্ডলুম, হেল্থ সেন্টার প্রায় অচল; আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুর্গি পালন, দুগ্ধ উৎপাদন প্রভৃতির জন্যও বিদ্যুৎ অপরিহার্য। সুতরাং পল্লী বৈদ্যুতিকরণের কাজে কোনরকম ঢিলা দেওয়া চলে না।

জেলার বনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলেছে, কিন্তু জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি ও শিল্পসমৃদ্ধি এবং কয়েক হাজার মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এদিকে আরও বেশি নজর দেওয়া দরকার। বর্তমানে জেলার প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার হেক্টেয়ার অর্থাৎ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জমিতে বনভূমি গড়ে উঠেছে। একমাত্র ইন্দাস, কোতুলপুর ও মেজিয়া বাদে সবক'টি উন্নয়ন ব্লকে বনভূমি আছে। বনভূমির অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গায় নতুন গাছ লাগিয়ে ও শিল্প ও বাণিজ্যের কাজে লাগতে পারে এমন গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে জেলার বনভূমিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু জেলায় জ্বালানির এমনই অভাব যে বনভূমি রক্ষা করা খুবই কঠিন। ১৯৫২—৭২ সালে যে ৮,০৭৩ হেক্টেয়ার নতুন বনভূমির সৃষ্টি করা হয়, সরকারি হিসাব অনুসারেই তার মাত্র ২,৫০০ হেক্টেয়ারে এখনও বনভূমি আছে। বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার হেক্টেয়ার জমির বন বে-আইনীভাবে লোকে কেটে নিয়ে গেছে। সুতরাং বনভূমি সংরক্ষণের জন্য প্রহরীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা দরকার।

বনভূমির উন্নয়ন, প্রসার ও সংরক্ষণ জেলার বেকার সমস্যা সমাধানে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। বনভূমির জন্য যা ব্যয় হয় তার শতকরা ৮০ ভাগই লেগে যায় শ্রমিকদের মজুরি দিতে, এবং এই ব্যয় একেবারেই অনুৎপাদক নয়। দশ বছরের হিসাব ধরলে দেখা যায় যে, বনভূমি সৃষ্টিতে যা ব্যয় হয়, বনসম্পদ বেচে তার তিনগুণ ফেরত পাওয়া যায়। এক হেক্টেয়ার জমিতে বন সৃষ্টির জন্য মজুরি বাবদ বছরে এক হাজার টাকা ব্যয় আর এক হেক্টেয়ার জমির কাঠ বেচে বছরে তিন হাজার টাকা পাওয়া যায়। তাছাড়া বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে যেসব শিল্প গড়ে ওঠে তাও নিশ্চয়ই বনভূমির পরোক্ষ অবদান।

শাল, নিম ও মহুয়ার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের কারখানা বনভূমির অদূরেই গড়ে উঠতে পারে। ঐ তেল সাবান তৈরির কাজে লাগে। আবার তৈল নিষ্কাশনের পর ঐসব বীজের ভূষি জমির উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাসে এক মেট্রিক টন অভোজ্য তৈল উৎপাদনের একটি কারখানায় প্রায় ২০০ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

১৯৫৬—৬৯ সালে বাঁকুড়ার বনভূমিতে যে ব্যাপকভাবে ইউক্যালিপটাস ও আকাশ-মণি গাছ লাগানো হয়, তার ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য প্রয়োজন ঐ দুই শ্রেণীর গাছ বেচে জেলার যথেষ্ট আয় হয় এখন। কিন্তু জেলার সম্পদের ভিত্তিতে জেলাতেই যাতে একটা কাগজের মণ্ড তৈরির কল গড়ে উঠতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যদি ৪০ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে বিশ বছর গাছ লাগানো যায় তবে দৈনিক ৩০০ টন কাগজের মণ্ড উৎপাদনের একটি কারখানা গড়ে উঠতে পারে। এক টন কাগজের মণ্ড উৎপাদনের ব্যয় ৫০ টাকা, আর এক টন কাগজের মণ্ডের মূল্য ৯০ টাকা।

বাঁকুড়া জেলায় জলসেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। প্রধানত ডি-ভি-সি ও কংসাবতী জলসংরক্ষণ প্রকল্প থেকে এই জেলা যে জল পায় তার উপরে নির্ভর করেই জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের চাষবাস চলে। এছাড়া ছোট সেচ প্রকল্প এবং গভীর ও অগভীর নলকূপের সাহায্যেও কিছু কিছু চাষ হয়।

কংসাবতীর জল জেলার দক্ষিণাংশে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার বিস্তৃত হয়ে জল সিঞ্চিত করছে। তালডাংরা, সিমলাপাল, সারেঙ্গা, বিষ্ণুপুর ও জয়পুর ব্লক কংসাবতীর জলে উপকৃত। ডি-ভি-সি-র জল পায় বড়জোড়া, সোনামুখি, পাত্রসায়ের ও ইন্দাস। কিন্তু জেলার উত্তরাংশের শালতোড়া, মেজিয়া, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি ও বাঁকুড়া থানা সেচ-ব্যবস্থার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সারা জেলার প্রায় সাতশ' বর্গমাইল স্থান, যেখানকার জমি সবচেয়ে অনুর্বর এবং বৃষ্টিপাত সবচেয়ে অনিশ্চিত সেখানেই সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে খরা ও তার ফলে ফসলের ব্যর্থতা জেলার উত্তরাংশের প্রায় প্রতি বছরের ঘটনা, আর বাঁকুড়াবাসীদের দারিদ্র্যের কারণও সেইটাই। উত্তর কংসাবতী ও উত্তর দ্বারকেশ্বর বাঁধ প্রকল্পের কাজ ঠিকমত শেষ হলে তবেই বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিমাংশ বাঁচতে পারে।

নদীর জল তুলে সেচ-ব্যবস্থার যে ৪৪টি পরিকল্পনার কাজ চলছে তাতে জেলার প্রায় ষোল হাজার একর জমি জল পাবে। জেলায় গভীর নলকূপ আছে ৫৮টি তবে তার সবগুলিই আছে সোনামুখি, ইন্দাস, পাত্রসায়ের ও বিষ্ণুপুর ব্লকে। অগভীর নলকূপ ও কুয়োর জলের সাহায্যেও চাষবাসের কাজ এগিয়ে চলেছে।

কৃষি, পশুপালন ও কুটির শিল্প

কৃষির উপর বাঁকুড়া জেলার নির্ভরতা এই থেকেই বোঝা যাবে যে, জেলার শতকরা ৮২ জন লোক কৃষিনির্ভর। ১৯৭১ সালের গণনা অনুসারে জেলার শ্রমজীবীদের মধ্যে শতকরা ৭৯ জন কৃষক অথবা ক্ষেতমজুর, যেখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কৃষিজীবী শতকরা ৫৭-৫ জন।

বর্তমানে সারা জেলার শতকরা ৫৩ ভাগ জমিতে চাষ হয়। শিল্পোন্নতি না ঘটায় চাষের জমির উপর সমানে চাপ বাড়ছে, অথচ চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো খুবই কঠিন কাজ। জেলার প্রায় ১৩ শতাংশ জমির মাটি ধুয়ে যাওয়ায় চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্ষায় এই অবক্ষয় আরও বৃদ্ধি পায়। চাষের জমি বাড়াতে হলে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই সব ক্ষয়ে যাওয়া জমিকে আবার চাষের যোগ্য করে তুলতে হবে। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, জেলার প্রায় ৯৫ হাজার একর ক্ষয়ে-যাওয়া জমির পুনরুদ্ধার সম্ভব। তাতে খরচ হবে আড়াই কোটি টাকার কিছু বেশি কিন্তু ঐ জমিতে ফসল পাওয়া যাবে প্রায় ষোল কোটি টাকার। আর পাঁচ হাজারেরও বেশি কৃষকের পুনর্বাসন সম্ভব হবে ঐসব উদ্ধার করা জমিতে।

কিন্তু ঐ ক্ষয়ে-যাওয়া জমি উদ্ধার হলেই বাঁকুড়ার প্রয়োজন মিটবে না। তাকে ফসল বাড়াতে হবে এক জমিতে বহুবার চাষ করে এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে। স্বভাবতই এর সঙ্গে সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও সার সরবরাহের উন্নতির কথা এসে যায়।

ধান এবং তার মধ্যে আমন জেলার প্রধান ফসল। জেলার চাষের জমির ৯০ শতাংশতেই ধানের চাষ হয়, তার মধ্যে আবার আমনের চাষ হয় ৭৭ শতাংশ জমিতে। বর্তমানে জেলার প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে, আর উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ হচ্ছে চল্লিশ হাজার একর জমিতে। জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশে চাষের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা করাই এখন জেলার কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। উত্তর দ্বারকেশ্বর প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটি বাঁকুড়া ও বড়জোড়া থানায় প্রায় ৬৫ হাজার একর খরিফ ফসলের জমিতে, ৩০ হাজার একর রবিশস্যের জমিতে ও পাঁচ হাজার একর বোরো ধানের জমিতে জল সেচ করা

সম্ভব হবে। উত্তর কংসাবতী প্রকল্পের জল বাঁকুড়ার পাহাড়ে পাথুরে এলাকার প্রায় ৭৯ হাজার একর রুক্ষ শুষ্ক জমিকে সরস ও সুফলা করে তুলবে। সুতরাং বাঁকুড়ার সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন এই দুটি প্রকল্পের পূর্ণ রূপায়ণ।

দুগ্ধ উৎপাদন, পশু পালন, হাঁস-মুরগির চাষ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বাঁকুড়া অনেক পেছিয়ে আছে। গরুর খাদ্য উৎপাদনের কোন ব্যবস্থাই নেই, সেকারণে মাঠে চরেই গরুর পালকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু গোচারণক্ষেত্র ক্রমেই কমে আসছে, ফলে সব তৃণজীবী পশুকেই এখন আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। তাছাড়া ভাল গরু জেলায় নেই বললেই হয়, ভাল ষাঁড়েরও অভাব আছে, আর কৃত্রিম প্রজননের যে ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। সুতরাং জেলার গোধন দিনে দিনে গৃহস্থের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাইশটি ব্লকের মধ্যে মাত্র বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সোনামুখী ও পাত্রসায়েরে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র আছে, কিন্তু শুধু প্রতি ব্লকেই নয়, প্রতি অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে কোন চাষীকে তার গরু নিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে যেতে না হয় প্রতিটি প্রজনন কেন্দ্রে দশজন লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। আর দুধের সরবরাহ বাড়াতে ও গো-প্রজাতির উন্নয়নার্থে প্রতি ব্লকে অন্তত একশটি করে ভাল জাতের গরু সরবরাহ করা উচিত। এই সঙ্গে গরুর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রতি ব্লকে পশু চিকিৎসক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এসবেরই মানে হল জেলার উন্নতি ও কর্মসংস্থানের নব নব সুযোগ।

হাঁস-মুর্গি পালনেরও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে জেলায়। এতে জেলার আয় বাড়বে, বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা আমিষের অভাব ঘুচবে। জেলার চারিদিকে রয়েছে রানিগঞ্জ, আসানসোল, খড়্গপুর, বার্ণপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি শিল্প এলাকা যাদের ডিম ও মাংসের চাহিদা অন্তহীন। প্রতি ব্লকে যদি একটি করে পোলট্রি খোলা হয়, তাহলে তা গ্রামবাসীদের আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালন শেখাতে পারবে, ডিম ও মাংস বেচে লাভও করতে পারবে। আর প্রতিটি পোলট্রি ফার্মে অন্তত পাঁচজনের কাজের ব্যবস্থা হবে।

জেলার সালতোড়া, ছাতনা, খাতড়া, ইন্দপুর ও গঙ্গাজলঘাটি থানার বিভিন্ন এলাকায় ভেড়ার চাষেরও বিশেষ সুযোগ রয়েছে। ঐসব এলাকার লোকেরা ভেড়া পালনে অভ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুপালন দপ্তর থেকে বছর-দশেক আগে বাঁকুড়া ব্লকের জোকপুরে ও সালতোড়া ব্লকের রাজীবপুরে পরীক্ষামূলকভাবে

নন্দদুলালের মন্দির, বিষ্ণুপুর
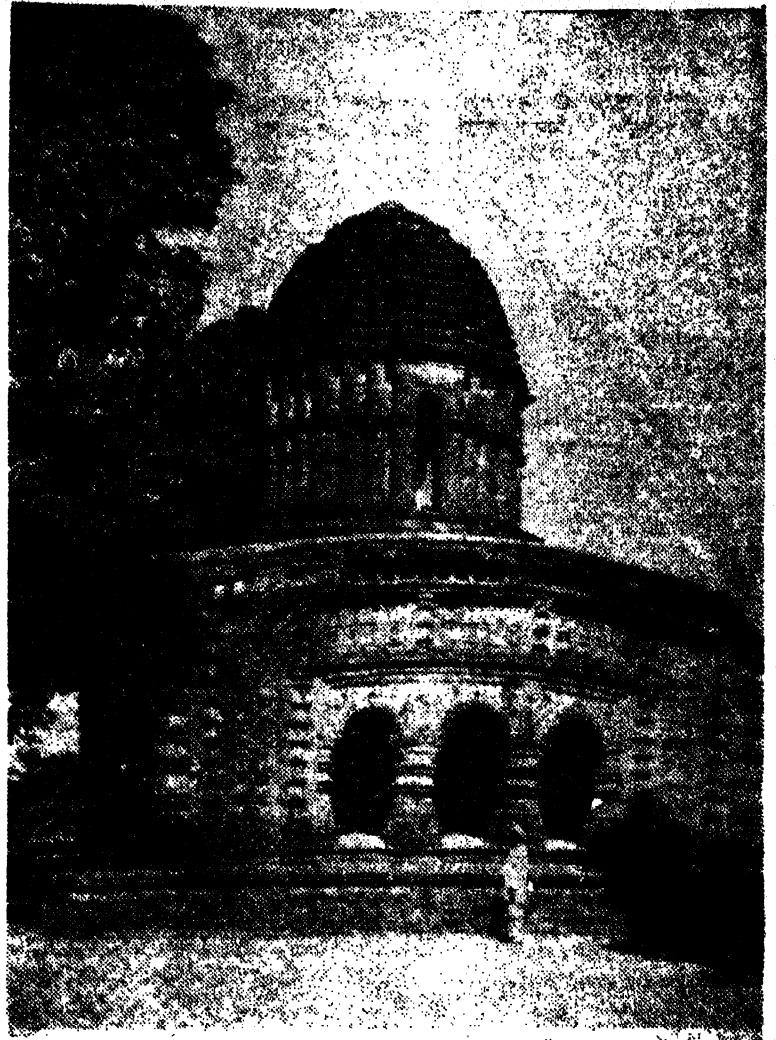
দুটি ভেড়া প্রতিপালন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ঐ দুটি কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর ৫০টি করে সাহাবাদি ভেড়া গ্রামবাসীদের সরবরাহ করা হত। তার ফলে ঐ দুটি ব্লক ছাড়াও ছাতনা ব্লকের কিছু কিছু এলাকায় ভেড়ার চাষে অভাবিত উন্নতি ঘটে। আগে যেখানে দেশি জাতের ভেড়ার গা থেকে গড়ে ১০০ গ্রাম পশম পাওয়া যেত এখন সেখানে সঙ্কর জাতের ভেড়াগুলির গা থেকে ২৫০ গ্রাম পশম পাওয়া যায়। আর পশমের মানও খুব উন্নত। ভেড়াগুলির ওজনও পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে খাতড়ার দুটি ব্লকে এবং ইন্দপুর ও গঙ্গাজলঘাটি ব্লকে নতুন চারটি ভেড়া প্রতিপালন কেন্দ্র খুলে ভেড়ার চাষের আরও উন্নতি করা যেতে পারে।

কুটিরশিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই তালডাংরা ব্লকের, বিশেষ করে পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির পুতুলের কথা বলতে হয়। বাঁকুড়ার ঘোড়া প্রায় বিশ্ব-বিজয়ী। কিন্তু মাটির অভাবে, জ্বালানির অভাবে এবং পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থার অভাবে এমন শিল্পও আজ মুমূর্ষু। যথেষ্ট মূলধন ও পণ্যবিপণনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে দিলে এ শিল্পকে বাঁচানো যাবে না।

বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ার শাঁখা শিল্পেরও আজ টিঁকে থাকাই প্রধান সমস্যা। কারণ কাঁচামাল ও মূলধনের অভাব এবং বিপণনের অভাব। এই শিল্পকে বাঁচাতে হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাকে কাঁচামাল ও মূলধন সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সারা জেলায় প্রায় আড়াইশ শাঁখা তৈরির কারখানা আছে এবং তাদের মোট কর্মীর সংখ্যা বারোশ। এই শিল্প ঠিকমত চলার জন্য প্রতি ইউনিটকে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা মূলধন সরবরাহ করা প্রয়োজন।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির (গুপ্তিপাড়া)

বাঁকুড়ার বিখ্যাত কাঁসা শিল্পেরও এখন চরম দুরবস্থা। মিশ্রধাতু কাঁসার জন্য যে তামা, রাং ও দস্তা দরকার তা একসঙ্গে কাঁসা শিল্পীদের পাওয়া প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যায্য দামে কাঁচামাল পাওয়াই এখন এ শিল্পের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তাছাড়া সহজ শর্তে হাজার বারোশ টাকা ঋণেরও দরকার হয়ে পড়েছে সব কাঁসাশিল্পীর। বাঁকুড়া, ছাতনা, বিষ্ণুপুর, বড়জোড়া ও খাতরা ব্লকে ছোট বড় প্রায় আটশ কাঁসার কারখানা আছে এবং তাতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা প্রায় বত্রিশ শ।

বাঁকুড়ার তাঁতশিল্প ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে বৃহত্তম। সারা জেলায় তাঁত আছে ১২,৮০০ এবং তাতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ হাজার। মোটা ধুতি, শাড়ি, বিছানার চাদর, লুঙি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ঐসব তাঁতে। এছাড়া সিল্ক বোনার তাঁত আছে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, রাজগ্রাম, বীরসিংহপুর, জয়পুর, গোপীনাথপুর ও সোনামুখিতে। ভেড়ার পশমের কম্বলও তৈরি হচ্ছে লোকপুর ও কেঁদুয়াডিতে। তাঁতিদের যে ৬৬টি সমবায় আছে তার অর্ধেক ভাল চলছে, অর্ধেকের মুমূর্ষু অবস্থা। বাঁকুড়ার তাঁতশিল্পকে নিজ শক্তিতে চলক্ষম করতে হলে ব্যাঙ্ক ও সরকার থেকে সমবায়গুলিকে যথেষ্ট

পরবর্তী সংখ্যায় নদীয়া

পরিমাণ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। উপযুক্ত মূলধন ও বিপণনের ব্যবস্থা হলে বাঁকুড়ার তাঁতশিল্প অনেক সম্প্রসারিত হতে পারে কারণ বাঁকুড়ার তন্তুজ সামগ্রীর চাহিদা সারা দেশে আছে।

বাঁকুড়ার কাপড়ের চাহিদা বাড়াতে জেলায় একটি কাপড় ছাপানোর কারখানা গড়ে তোলা যায়। ছাপার আকর্ষণে যেমন কাপড়ের চাহিদা বাড়বে তেমনই ঐ কারখানায় দেড়শ লোকের কাজ হতে পারে।

তারপর সুতোর অভাবে যে বাঁকুড়ার তাঁতিদের প্রায়ই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয় তার প্রতিকার করতে জেলায় একটি [illegible] করা যায়। তা যেমন [illegible]বিত করবে, তেমনই বহু লোকের কাজের সুযোগ হবে ঐ সুতাকলে।

খনিজ ও শিল্প সম্ভাবনা

জেলায় আজ পর্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসারে খনিজ পদার্থের সন্ধান করা হয়নি। মেজিয়া গঙ্গাজলঘাটি অঞ্চলে নিম্নমানের কয়লা পাওয়া গেছে, কিন্তু ভালভাবে সন্ধান করলে ঐ এলাকায় উন্নত মানের ও যথেষ্ট পরিমাণের কয়লার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ রাণিগঞ্জের কয়লা এলাকা ও ঐ এলাকার মধ্যে শুধু দামোদর নদী ছাড়া আর কোন ব্যবধান নেই। এ ছাড়া চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে তালডাংরা, ওন্দা, সালতোড়া, সাতড়া, বড়জোড়া ও রায়পুর থানায়। ঐসব এলাকায় প্রায় বাইশ লক্ষ মেট্রিক টন চীনামাটি আছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। ঐ চীনামাটি দিয়ে কাপ প্লেট ডিশ প্রভৃতি বাসনপত্র ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি হতে পারে। সুতরাং এই কাঁচামালের ভিত্তিতে বাঁকুড়ায় একটি চীনামাটি বিশুদ্ধ করার কারখানা ও একটি ক্রকারি ও ইনসুলেটর তৈরির কারখানা গড়ে উঠতে পারে।

সালতোড়া-মেজিয়া অঞ্চলে ও খাতড়ায় যে কালো পাথরের অফুরন্ত ভান্ডার আছে তার চাহিদা আছে সারা দেশ জুড়ে। সুতরাং অগুনতি পাথর ভাঙার কল গড়ে উঠতে পারে বাঁকুড়ার ঐসব এলাকায়। এসব কাজে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। একটি পাথর ভাঙার কল গড়তে মূলধন লাগে তিন লক্ষ টাকার, কিন্তু তাতে প্রায় পাঁচশ লোকের কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। চারিদিকে যেসব গঠনমূলক কাজ চলেছে তাতে স্টোনচিপসের চাহিদার কোন শেষ নেই।

কতুলপুর ও রানিবাঁধ অঞ্চলে যে সাবুই ঘাস হয় তা দিয়ে খুব শক্ত মজবুত দড়া তৈরি হয়। ভাল দড়াদড়ির বিপুল চাহিদা আছে বাজারে। একটি আধুনিক দড়ির কারখানায় বিশ হাজার টাকার মূলধন লাগে, কিন্তু অনেক লোকের কাজ জোটে তাতে।

মোটকথা, বাঁকুড়ার যা প্রাকৃতিক সম্পদ তা সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো হলে এই জেলার চতুঃসীমার ভেতরেই তার দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

বাজেট বিচার—২

খুড়োমশায়রা অনেক ক্ষেত্রেই একটু অদ্ভুত বা অসাধারণ লোক হন, এ-ধারণা আমার ঠিক কোথা থেকে হয়েছিল জানি না। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ থেকে। তবে ধারণা যে বদ্ধমূল হয় আমার খুড়োমশায় অবসর গ্রহণ করে আমাদের সঙ্গেই বাস করতে শুরু করার পর, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে এসে অবিবাহিত খুড়োমশায় একখানা ঘরই দখল করলেন, বেছে নিলেন আমার পড়াশুনোর ঘরের পাশের ঘরটি। বলেছিলেন : তুইও পড়াশুনো ভালবাসিস, দুজনে পাশাপাশি থাকব ভাল। হয়ত তাঁর সিদ্ধান্তকে মনে মনে পছন্দই করেছিলাম, কিন্তু মনে আছে মুখে শুধু বলেছিলাম : বেশ ত'। এখন ভাবি বোধহয় আমতা আমতা করলেই ভাল হত, কারণ তাহলে আমার আপত্তি আছে মনে করে খুড়োমশায় নিশ্চয়ই তেতালার চিলেকোঠা বেছে নিতেন—কাউকে কোনরকম অসুবিধের ফেলা যে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

খুড়োমশায় দিনরাত পড়াশুনো নিয়েই থাকেন আমাকে মোটেই বিরক্ত করেন না। তবে তাঁর স্বভাব পড়তে বসে কোন কিছু ভাল লাগলে সেই অংশটুকু চেঁচিয়ে পড়া। কাল তিনি পড়ছিলেন (কোন্ বই থেকে জানি না) : মনে পড়ে পুণ্যতীর্থ ভারতের পুণ্য রণক্ষেত্রে তুবনবিজয়ী বীরের আপন সারথির বিশ্বরূপ দর্শন করে সেই প্রশ্ন—প্রভু কোন্ দিক দিয়ে তোমার বন্দনা শুরু করব?

আমি তখন ভাবছিলাম, কোন্ দিক দিয়ে বাজেট বিচার আরম্ভ করব। ভেবে প্রায় ঠিকও করে ফেলেছিলাম কিন্তু চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল খুড়োমশায়ের আবৃত্তিতে।

শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি খুড়োমশায়ের আবৃত্তির মধ্যেই পেয়ে গেলাম ইঙ্গিত—সম্পূর্ণতার উপলব্ধি করলাম বিশ্বরূপের বন্দনার মত বাজেট বিচার শুরু করার ... আয়বণ্টন, ঋণনীতি, রপ্তানি প্রসারের সম্ভাবনা—যে-কোন দিক থেকেই শুরু করা যেতে পারে। তবে পাবলিক ফিনান্স বা সরকারী আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে অর্থ সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া রীতি বলে বোধহয় ব্যয় থেকেই আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রথমে কেন্দ্রীয় বাজেটের কথাই ধরা যাক।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয়ের খাত :

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত সরকারী ব্যয়বৃদ্ধিও সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন প্রকৃতির—প্রত্যেক দেশেই সরকারী ব্যয় অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। আমাদের দেশে সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৫৬) রাজস্ব ও মূলধন উভয়কেই ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৬৮০ কোটি টাকা, আর মাত্র আগামী বছর বা ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৬২৬ কোটি টাকা। বেতন কমিশনের প্রতিবেদন বের হলে এর সঙ্গে বেশ একটা মোটা অঙ্ক যোগ হবে। তুলনামূলকভাবে বর্তমান বছরে (১৯৭২-৭৩) মোট ব্যয় ৬৮১৩ কোটি হবে বলে সংশোধিত বাজেটে ধরা হয়েছে। আগামী বছরের পরের বছরে—অর্থাৎ পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় যে আরও বৃদ্ধি পাবে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও যে এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবে না, তাও সহজে অনুমেয়। গ্ল্যাডস্টোন বেঁচে থাকলে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির এই হার দেখে নিশ্চয়ই আতঙ্কে উঠতেন। তাঁর এবং সমসাময়িক অধিকাংশ রাজনীতিবিদের ধারণা ছিল যে, লোকের পয়সা যতই নিজের পকেটে থাকবে ততই ফলবতী হয়ে উঠবে। এই ফলবতী বা ফ্রাকটিফাই হওয়ার ধারণার মধ্যেই বোধহয় সমাজ-কল্যাণের নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। তবে বর্তমান দিনের বিশ্বাস হল যে লোকের পকেট খালি করে ঐ পয়সা সরকার ব্যয় করলে তবেই সমাজ-কল্যাণ সম্প্রসারিত হতে পারে, লোককে পকেট ভর্তি রাখতে দিলে নয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, এর মূলে আছে বিবিধ কারণ : (ক) আদর্শ হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিদায় গ্রহণ, (খ) সরকারী উদ্যোগের ওপর লোকের আস্থা বৃদ্ধি, (গ) সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার, (ঘ) কেইনসীয় অর্থনীতির প্রভাবে ফিস্ক্যাল বা আয়ব্যয় নীতির আমূল পরিবর্তন, (ঙ) প্রতিরক্ষার ব্যয়-বৃদ্ধি, (চ) অভাব-মুক্তি বা উচ্চতর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে বিশ্বজনীন আকর্ষণ। আমাদের দেশে অবশ্য এই পাঁচটি মোল কারণের মধ্যে চারটির অস্তিত্ব পুরোপুরি লক্ষ্য করা যায়, এবং বাকী কারণটি—সরকারী উদ্যোগের ওপর লোকের আস্থা বৃদ্ধি—বিশেষ বিতর্কমূলক। সত্যকে স্বীকার করতে গেলে বলতে হয়, এদেশে সরকারী উদ্যোগের ওপর লোকের আস্থা মোটেই বাড়েনি, বরং কোন কোন মহল থেকে সরকারী উদ্যোগাধীন সংস্থাগুলোকে অদক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলেই ধরা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রতিটি প্রকল্প থেকেই যখন লোকসান হচ্ছে আর তার চাপ পড়ছে করদাতাদের ওপর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগাধীন অধিকাংশ সংস্থার যখন ঐ একই অবস্থা, তখন এদেশে সরকারী উদ্যোগের প্রতি লোকের আস্থার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে—এরকম উক্তি করা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে দুধ বলে পিটুলির জল খাওয়ানোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবুও কিন্তু এদেশে সরকারী উদ্যোগের প্রতি আকর্ষণ কমেনি, এবং এর কারণ সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার—এই রকম উদ্যোগের প্রতি লোকের আস্থা বৃদ্ধি নয়।

কেইনসীয় অর্থনীতির প্রভাবে ফিস্ক্যাল বা সরকারী আয়ব্যয় নীতি পরিবর্তিত হয়ে যে রূপ গ্রহণ করেছে, তাকে বলা হয় ফাংকশানাল ফিনান্স বা উদ্দেশ্য-মাফিক আয়-ব্যয় ব্যবস্থা। এবং উদ্দেশ্য হল বাজারের তেজীমন্দার তীব্রতা হ্রাস। নিয়োগ হ্রাসের সময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, সাধারণ সময়ে পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌঁছোন ইত্যাদি। আমাদের দেশে বর্তমান নিয়োগ-সংকটের দিনে এই উদ্দেশ্যসাধক আয়ব্যয় ব্যবস্থা যে গুরুত্ব লাভ করবে তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। স্মরণ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় বাজেটে আগামী বছরের জন্যে ১০০ কোটি

টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ লক্ষ তথাকথিত শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের স্কিমের ব্যবস্থা করার আশা নিয়ে। এই দিক দিয়েই আবার পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ দাবি করেছেন যে, তাঁর বাজেটে গ্রোথ বা সম্প্রসারণের চেয়ে কর্ম-সংস্থানের সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, আগামী কয়েক বছরের জন্যে এইভাবেই বাজেট তৈরী করে যেতে হবে। শ্রীঘোষের দাবির বিচার আপাতত স্থগিত রেখে শুধু তাঁর অভিমত সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে : সম্প্রসারণকে উপেক্ষা করলে কর্মসংস্থানের কোন ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং তাকে রূপায়িত করা সম্ভব হবে কি? বিসমার্ক একবার প্রাসিয়ার এক যুব-সম্মেলনের উদ্বোধন করতে এসে বলেছিলেন : তোমাদের আমি মাত্র তিনটি উপদেশ দেব—কাজ কর, কাজ কর এবং কাজ কর। পরবর্তী যুগে শ্রীনেহরুও বিসমার্কের এই উক্তির প্রতি-ধ্বনি করেছিলেন। অবশ্য এ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অফ নেশানস'-ই ধারণার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে যে জাতীয় সম্পদ বা আয়ের বৃদ্ধি সাধন সম্ভব নয়, এ্যাডাম স্মিথ তা সুক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের এই পরিমাণ বৃদ্ধিকেই বর্তমান দিনে গ্রোথ বা সম্প্রসারণ বলে অভিহিত করা হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রকার-ভেদ থাকে বলে পরিকল্পনা যে সকল সময় সম্প্রসারণ-অভিমুখী হবে, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা আবশ্যিকভাবেই সম্প্রসারণ-অভিমুখী—এইরকম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্ভব করা। নাম তাই হল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং বা উন্নয়ন-পরিকল্পনা। সুতরাং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকে প্রাধান্য না দেওয়ার চিন্তা করাও ভুল।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অবশ্য বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন। তাই তিনি বাজেটে শিক্ষিত বেকারদের কর্ম-সংস্থানের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াও পঞ্চম পরিকল্পনার আগাম কার্যক্রমের ('এ্যাডভান্স এ্যাকসান') জন্যে সংসদের কাছ থেকে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের দাবী জানিয়েছেন এবং পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছেন।

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় :

১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের আগে প্রতিরক্ষার ব্যয় নিয়ে বিশেষ সমালোচনা করা হত। বিভিন্ন কারণে ভারতের ন্যায় দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে ব্যয় রাজস্বখাতে মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশের মত হওয়া কোনমতেই উচিত নয়—এই ছিল বিভিন্ন মহলের ঐকামত। চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে জন-মতের মোড় ঘুরতে থাকে। তখন থেকেই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বাজেটের আকার সমানুপাতিকের বেশী হারে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন বর্তমানে প্রতিরক্ষার জন্যে ব্যয় মোট রাজস্বখাতে ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশের মত। ১৯৭১-৭২ সালে বরাদ্দ ছিল ১২০০ কোটি টাকা কিন্তু ঐ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪০০ কোটি টাকায়। বর্তমান বছরের জন্যে প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছিল ঐ ১৪০০ কোটি টাকাই কিন্তু সংশোধিত বাজেট থেকে দেখা যায় যে অন্তত ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। আগামী বছরের জন্যে ঐ ১৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দই দাবী করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০০ কোটি টাকার মত হল মূলধনী খাত থেকে। বিভিন্ন কারণে বর্তমানে প্রতিরক্ষার ব্যয় হ্রাস না করাই যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

অন্যান্য ব্যয় :

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের অন্যান্য খাতের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঋণ-জনিত-ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন বিশেষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণও অবশ্য সুস্পষ্ট—ঋণের পরিমাণও দিন দিন বিরাট আকার ধারণ করছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকারের মোট দেনার পরিমাণ ছিল ২৬৮৫ কোটি টাকা। এই বছরের মার্চ মাসের শেষে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২১,০০০ কোটি টাকায় এবং আগামী বছরের শেষে প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকায়। স্বভাবতই ঋণজনিত ব্যয়—অর্থাৎ সুদ মেটানো ও মূলধন ফেরত দেবার জন্যে ব্যয় বেশী হবে।

আগামী বছরে খাদ্যের জন্যে ভরতুকির ব্যয় সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে—১১৭ কোটি টাকা থেকে ১৩০ কোটি টাকা। এই ব্যয় প্রয়োজনীয় হলেও কোন সংজ্ঞা অনুসারেই উৎপাদনশীল নয়। তাই খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় বাজেট রাজস্ব ও প্রাপ্তি :

বাজেট বিচারে আগের সংখ্যায় আলো-চনা করেছি যে বর্তমানে আমরাও আধুনিক সরকারী আয়ব্যয়ের নীতি অনুসরণে আগে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে পরে কিভাবে ঐ অর্থ সংগ্রহ করা হবে তা স্থির করি। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়-পদ্ধতি'। এর দরুন ঘাটতি দেখা দিলেই তা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয় নতুন কর ধার্য করে, প্রচলিত করের হার বৃদ্ধি করে, ঋণ সংগ্রহ করে এবং তাতেও না কুলোলে, ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করে—অর্থাৎ নোট ছাপিয়ে।

আগামী বছরের বাজেটে রাজস্ব ও মূল-ধনী খাত একসঙ্গে ধরে মোট ঘাটতির পরি-মাণ ৩৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে অনু-মান করা হয়েছে। সুতরাং করবৃদ্ধি ছিল অপরিহার্য। অবশ্য আমাদের বাজেট বিচার তা নিয়ে নয়, বিচার্য বিষয় হল করবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাছাই করার কাজ ঠিকমত করা হয়েছে কিনা এবং বৃদ্ধির ফল কি দাঁড়াবার সম্ভাবনা।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করবৃদ্ধি ও পরিবর্তন :

আগামী বছরের জন্যে বাজেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দুইই বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আশা করা হয়েছে এর ফলে ২৯৩ কোটি টাকা আগম হবে। অবশ্য এর থেকে রাজ্যগুলোকে ভাগ দিতে হবে ৪৩ কোটি টাকা। ফলে কেন্দ্রের হাতে থাকবে ২৫০ কোটি টাকার মত।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে মাত্র আয়করকে স্পর্শ করা হয়েছে এবং তাও মাত্র দুটি ক্ষেত্রে : রাজ কমিটির অন্যতম সুপারিশ অনুসারে কৃষি থেকে আয়কে অংশত মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ কর-অনুসন্ধান কমিটি বা ওয়ানচু কমিটির মাত্র একটি সুপারিশ মেনে নিয়ে হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে অব্যাহতির সীমা কমিয়ে ব্যক্তির অব্যাহতির সীমার মত ৫ হাজার টাকাতেই আনা হয়েছে।

মূলধন-লাভ কর আয়করের অংশ। এত-দিন পর্যন্ত এই করের ক্ষেত্রে কোন মূলধন সম্পদ কেনার ২ বছর পরে বিক্রি করলেই সুবিধা পাওয়া যেত, এবার থেকে ২ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর হাতে রাখলে তবেই ঐ সুবিধা পাওয়া যাবে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জাল ফেলা হয়েছে অন্তঃশুল্ক ও বাণিজ্য-শুল্ক উভয়েরই ওপর। অন্তঃশুল্কের মধ্যে আছে 'দামী' সিগারেট, পাইপের তামাক, মোটরযানের তৈল, গৃহস্থের ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক দ্রব্য, দাড়ি কামাবার ক্রীম, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, রেফ্রিজারে-টর ইত্যাদি।

বাণিজ্য-শুল্ক বা আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির আওতায় এসেছে কাঁচা তুলো, স্টেনলেস স্টীলের সীট, টেরিলিন বয়নের উপাদান প্রভৃতি।

এখন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আয়কর ধার্যের ক্ষেত্রে হিন্দু যৌথ পরিবার এবং ব্যক্তির মধ্যে যে অযৌক্তিক পার্থক্য ছিল তা অপসারিত করা হয়েছে এবং মূলধন-লাভকে আন্তর্জাতিক করবিধির সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে প্রত্যক্ষ কর থেকে পাওয়া অতিরিক্ত ৯৮ কোটি টাকা, অন্তঃশুল্ক থেকে ১১৮ কোটি টাকা এবং

...জ্য-শুল্ক, বা সংক্ষেপভাবে বলতে গেলে, ...দানী-শুল্ক থেকে ১৫৬ কোটি টাকা।

...চীর পর্যায়ী ফলাফল :

কর বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের প্রাথমিক ফল ... রাজস্ব আগম। এখানেই কিন্তু ...পারটির পরিসমাপ্তি নয়, এর দ্বিতীয় ...য়ী ফলাফল বিচার করতে হবে। এবং ... ফলাফল অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অর্থমন্ত্রীর মতে, আমাদের সম্মুখে ...ন্যা হল বিবিধ : মূল্যস্ফীতির মোকা-...া করা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, ...দেন-উদ্বৃত্তকে সংগঠিত করা, কর্ম-...থানের উত্তরোত্তর বর্ধমান ব্যবস্থা করা ... সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত ...। মূল্যস্ফীতির প্রতিবিধান হিসেবে ...নি মোট ঘাটতি ৮৫ কোটি টাকাতে রাখতে ...টা করেছেন সত্যি, কিন্তু এতটা করবৃদ্ধি ... হয়েছে যে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ...রও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য। এই কস্ট ...শ এফেক্ট বা উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধির ফলই ... আগামী বছরের কেন্দ্রীয় প্রধান সমা-...চনা। আরও বলা যায়, এই মূল্যস্ফীতির ...বহাওয়ায় ৩০০ কোটি টাকার মত অতি-...ক্ত কর যারা আরও মূল্যবৃদ্ধির আশা করছে ...দের মনোভাবের সহায়কই হয়। অবশ্য ...ঘাট ঘাটতি ব্যয়ের চেয়ে অতিরিক্ত করই ...ণীয়। কারণ ঘাটতি ব্যয় যেরকম সরাসরি ...মূল্যস্ফীতিতে সহায়তা করে করবৃদ্ধি ততটা ...নই করে না।

...য় ও বিনিয়োগ :

বাজেট বক্তৃতায় বিশেষ দাবী করলেও ...খা যায় যে সঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যাপারে আগামী ...রের বাজেটে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ...বস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জীবনবীমা ও ...ভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে যে সুবিধা দেওয়া ...য়েছে তা শর্তব্যের মধ্যে নয় বললেও ...লে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্য চিত্রটি বেশ ...ছুটা উজ্জ্বল। বর্তমান বছরে পরিকল্পনায় ...না অর্থব্যয় কোন অংশে কম হবে না এবং ...ঞ্চম পরিকল্পনার 'আগাম কার্যক্রমের' ...না বরাদ্দ নিশ্চয়ই বিনিয়োগকে উৎসাহিত ...রবে। আর প্রত্যক্ষ করের ওপর বিশেষ ...ঘাত থেকে বিরত থাকাও এর সহায়ক ...বে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে বর্তমান ...ছরেই মূল্যসূচক ৯ শতাংশের মত বৃদ্ধি ...পেয়েছে, এর ফলে বিনিয়োগের আসল মূল্য ...নেক কমে গেছে।

...লেনদেন-উদ্বৃত্ত :

লেনদেন-উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ...রবৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানী হ্রাসের ব্যবস্থা ...রা হলেও রপ্তানী প্রসারের জন্যে কিছুই ...রা হয়নি। অবশ্য কয়েকটি কারেন্সীর ...ক্ষে আন্তর্জাতিক বাজার-দাম নির্ধারিত ...ওয়ার দরুন ভারতীয় টাকার কার্যক্ষেত্রে ...অনেকটা মান হ্রাস বা এফেক্টিভ ডিভ্যালুয়ে-...শন ঘটেছে, কিন্তু এতে কত সুরাহা হবে ...তা সন্দেহের বিষয়।

উপসংহার :

সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবীর আলোচনা করলে দেখা যায় যে তথাকথিত শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। এই জন্যে স্বভাবতই সংসদ ও অন্যান্য মহলে প্রশ্ন উঠেছে যে, সরকার কি 'গরীবী হটাও'-এর আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছে?

সরাসরি এ প্রশ্ন না করেও কংগ্রেসের অন্যতম তরুণ তুর্কী শ্রীচন্দ্রশেখর অর্থমন্ত্রীকে একজন স্নায়ুদুর্বল শল্যচিকিৎসকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, জটিল অস্ত্রোপচারের সময় শল্যচিকিৎসকের স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিলে যেমন হয়, বাজেট যেন হুবহু তারই প্রতিবিম্বন। অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত কি করবেন ঠিক করতে না পেরে কোনরকমে কাজ সেরেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, এতে রোগী সারবে কি মরবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে আত্মীয়স্বজন মোটামুটি খুশী। আবার তরুণ তুর্কী কৃষ্ণকান্তের উক্তির পুনরুল্লেখ করে বলা যায়, ১৯৭৩-৭৪ সালের সম্পূর্ণ রক্ষণশীল বাজেট—স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই এর উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট :

আগামী বছরের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বাজেট নিতান্তই মামুলি বাজেট। তবে শরণার্থী রিলিফের জন্যে যে 'বলি' বসানো এবং আন্তঃরাজ্য নদী-উপত্যকা বিদ্যুৎ যোগানোর ব্যাপারে যে লেভি ধার্য করা হয়েছিল তাদের বজায় রাখা হয়েছে, তবে অন্য নামে। মনু যাজ্ঞবল্ক্য থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংহিতায় 'কর' এবং 'বলি' শব্দ সমার্থক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বলির অর্থ বিসর্জন—কোন কিছু উদ্দেশ্যে বিসর্জন। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্যে আমরা বিসর্জন দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ কেন দেব? —এইটেই হ'ল প্রশ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় বাজেট, রেল বাজেট প্রভৃতিতে এই বলি তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের বাজেটে নাম পরিবর্তন করে বজায় রাখা হয়েছে। বিহারও দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। বিহারের বাজেট বেরিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পর।

আর কোন নতুন কর ধার্য বা করবৃদ্ধির ব্যবস্থা না করে অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের জন্যে জোর দেওয়া হয়েছে স্বল্প সঞ্চয়ের ওপর। ব্যবস্থাটি অবশ্য মূল্যস্ফীতির অন্যতম প্রতিবিধান হিসেবে গণ্য। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল : যে রাজ্যে মাথাপিছু আয় হ্রাস পাচ্ছে, দিন-দিন আরও লোক দারিদ্র্যরেখার নীচে নেমে যাচ্ছে, যেখানে মূল্যান্তর অপেক্ষাকৃত বেশী, সেখানে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের সম্ভাবনা কতদূর?

১৯৭৩-৭৪ সালের জন্যে বাজেটে পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ৭৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুখবর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এক বছরের মধ্যেই মূল্যান্তর যে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে তাও মনে রাখতে হবে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ আগামী বছরের বাজেটকে জনগণের বাজেট আখ্যা দিয়েছেন, কারণ 'মোট অর্থের একটা মোটা অংশ আসবে ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনা থেকে'। এইরকম যুক্তি মেনে নিতে বেশ একটু অসুবিধে হয়। 'জনগণের বাজেট' বলতে বোঝায় জনগণের জন্য—ফর দি পিপল—বাজেট, জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে ব্যয়নির্বাহ ভিত্তিক বাজেট নয়। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে সমগ্র ব্যয়ই নির্বাহ করা হয় জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে কিন্তু সব বাজেটই জনগণের বাজেট। সুতরাং স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে বেশী অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেই জনগণের বাজেট—এইরকম উক্তি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।

বাজেটে উন্নয়ন খাতে ব্যয়ে আশু উপশম-কারী ব্যবস্থাগুলোর ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হয়ত এর প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু নিরাময়ের পথ এ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০০ শিক্ষক নিয়োগের ফলে কতটা সুরাহা ঘটবে?

কেন্দ্রীয় বাজেট যদি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বাজেট হয় এতে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটও যে বিশেষ আশাবাদের সৃষ্টি করতে পারেনি—সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। রাজ্যে হয় একটু বেশ ঝুঁকি নিয়ে অ-মামুলি বাজেট প্রণয়ন করলেই ভাল হত। অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার এই সন্ধিক্ষণে আমরা তাই আশা করছিলাম।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

প্রদর্শনী

সুকুমার দত্তর একক প্রদর্শনী

চাকুরীসূত্রে বোম্বাইয়ের বাসিন্দা হবার আগে সুকুমার দত্ত ছিলেন কলকাতার শিল্পী। অধুনালুপ্ত আর্টিসটস্ সার্কেল ও সোসাইটি অফ কনটেমপোরারী আর্টিসটস্-এর প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বহির্জাগতিক দৃশ্যবস্তুর রূপায়ণ, পারস্পরিক সংস্থাপন, বর্ণপ্রয়োগ পদ্ধতি এবং বিন্যাস পদ্ধতি দিয়ে তিনি এক অদ্ভুত অপাপবিদ্ধ মায়াবী জগৎ তৈরী করতেন তাঁর ছবিতে।

বহুকাল পরে সুকুমার দত্তর ছবি দেখা গেল কলকাতায়। পার্ক স্ট্রিটের গ্যালারী কেমূল্ড-এ তার আঠারোটি সাম্প্রতিক ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। ছবিগুলি ছোট আকারের। কাগজের উপর জলরং, জলভিত্তিক গোয়াশ, রঙিন কালি এবং কালি-কলমের সাহায্যে এ ছবিগুলি রচিত।

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফটস বোর্ডে কর্মসূত্রে সুকুমারবাবু গত এক দশক ধরে পুতুল নিয়ে নানা রকম গবেষণায় লিপ্ত আছেন। বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে পুতুল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাব তাঁর চিত্ররচনা কর্মে বর্তমান।

মকবুল ফিদা হুসেনসহ ভারতবর্ষের অনেক চিত্রশিল্পীই যখন কিউবিজমের ভারতীয়করণ করতে চেয়েছেন—তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক কাঠের পুতুলের গঠনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। ব্যতিক্রম বোধহয় গগনেন্দ্রনাথ এবং রামকিঙ্কর। কিউবিজমের জ্যামিতিকতার মধ্যে এ'রা এমন এক রীতির সন্ধান পেয়েছেন যা দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে স্থাপিত রূপবন্ধকে একটি ঘনশরীর-বিশিষ্ট বাস্তবতা দেয়। কিন্তু কিউবিজমের আঙ্গিকসর্বস্বতা, বহির্জাগতিক দৃশ্য-বস্তুকে অগ্রাহ্য করে নতুন চিত্রবাস্তবতা সৃষ্টি করার প্রয়াস এবং ভাব বিষয়ে নির্লিপ্ততা এ'দের তৃপ্তি দিতে পারে নি। কারণ অনগ্রসর প্রকৃতিশাসিত সমাজবদ্ধ দেশের মানুষ হিসাবে এ'রা কখন প্রকৃতি সমাজ-দেশ-বহির্জগত সম্পর্কে সামগ্রিক-ভাবে আস্থাশূন্য হতে পারেন নি। ফলে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁরা এমন এক রীতির সন্ধান করেছেন যা তাঁদের কিউবিজমের শিল্পজাগতিক বিশুদ্ধতার স্বাদ দেবে অথচ বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করবে না। ভারতীয় গ্রামীণ পুতুল (কাঠের) নির্মাণ শিল্পের মধ্যে এ'রা তেমনই এক ঐতিহ্যের সন্ধান পান। কাঠের পুতুলে বহির্জাগতিক রূপের রূপায়ণ করা হয় দ্বি-মাত্রিক জ্যামিতির নিয়ম মেনে। প্রথমে বহির্জাগতিক রূপকে সরলীকরণ করে কতকগুলি জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বিভাজিত বলে কল্পনা করে নেওয়া হয়; পরে এই সরলীকৃত জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বিভাজিত বলে কল্পনা ক'রে নেওয়া হয়: পরে এই অংশের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন রঙের অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। এটা গেল গঠনের দিক। অভিব্যক্তির দিকটিও কিন্তু পুতুলে অগ্রাহ্য করা হয় না। মুখের ডৌল, ঠোঁটের, চোখের, নাকের রূপায়ণ, আয়তন আকৃতি এবং পারস্পরিক অবস্থান [illegible] সমাহারে এবং বর্ণিকাভঙ্গ দিয়ে অভিব্যক্তির ভিন্নতা সৃষ্টি করা হয়।

সুকুমার বাবুর ছবিতে যখনই মানুষ এসেছে তখনই সে মানুষ এসেছে কাঠের পুতুলের রূপধরে। কাঠের পুতুলকে দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে রূপায়ণ করে তিনি রূপকল্প তৈরী করেছেন। সুকুমারবাবুর ছবিতে যখন মানুষেরা অঙ্গসঞ্চালন করে তখনই আমাদের রাজস্থানের পুতুলনাচের কথা মনে পড়ে। আর তাঁর মানুষেরা তো বেশীরভাগ সময়েই মাথা উঁচুতে স্থাপিত; এই মাথা অবশ্য বহির্জাগতিক মাথার সমানুপাতিক নয় বিভাজিত চিত্রক্ষেত্র মুণ্ডের দ্যোতনা-বাহী।

সুকুমারবাবুর বর্ণচয়ন, বর্ণবিন্যাস এবং বর্ণপ্রয়োগ পদ্ধতি অবশ্য সম্পূর্ণ নিজস্ব। এ ক্ষেত্রে সুকুমারবাবু কিউবিজম বা লৌকিক পুতুল নির্মাতাদের একেবারেই অনুসরণ করেননি। তাঁর বর্ণক্ষেত্র রূপ-বন্ধের বা জ্যামিতিক ক্ষেত্রের রৈখিক সীমা মানে না। বর্ণপ্রয়োগ এবং বুনটের কাজে চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা দেখা যায়; বর্ণান্তরও প্রয়োগ করেন। বলা যায় মূলত রঙ দিয়েই তিনি তাঁর ছবির অভিব্যক্তি সৃষ্টি করেন। তাঁর ছবির ঘোর রঙের পশ্চাদপট থেকে রেখার সীমায় আবদ্ধ মানুষেরা অথবা মানুষের দেহাংশ ভেসে বেরিয়ে আসে; উজ্জ্বল রঙের মুখ অথবা চোখ কিংবা উজ্জ্বল একটি ক্ষেত্র করুণ ভাবে আঁধারের বেড়াজাল থেকে ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করতে থাকে। একটি উজ্জ্বল উদ্ভাসের প্রতীক হিসাবে বিরাজ করে।

সুকুমারবাবুর ছবি যে প্রতিশ্রুতি রাখে শেষ পর্যন্ত তার শর্ত পূরণ করে না। তাঁর অন্যতম কারণ বোধহয় শেষ পর্যন্ত শিল্পী বিশুদ্ধ আঙ্গিক-সর্বস্ব শিল্পের দাবী এবং অভিব্যক্তির মুক্ত প্রকাশের দাবীর মধ্যে সাযুজ্য বিধান করতে পারেন নি।

বিভাজিত ক্ষেত্রের অতিজ্যামিতিকতা প্রায় শুষ্ক অলঙ্কার সর্বস্বতায় পর্যবসিত। আবার এই জ্যামিতিকতাকে কথঞ্চিত কমনীয় করে তুলতে তিনি সজ্ঞানে যে আলঙ্কারিক নকশার প্রবর্তন করেছেন তা চিত্রক্ষেত্রের সারল্যকে আহত করে। রূপ-বন্ধভেদে রেখার চারিত্রের যে ভিন্নতা আনয়ন প্রয়োজনীয় ছিল সে ভিন্নতা আসেনি। রেখায় স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। রঙের ব্যবহারে যে অভিব্যক্তি সচেতনতা দেখা যায়, বর্ণসঞ্চয়নে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেগুনী এবং সোনালী রঙের সমাহার আলঙ্কারিক, অভিব্যক্তিমূলক নয়। বর্ণপ্রয়োগ রীতি এবং ড্রইং পরস্পর-বিরোধী। রেখা প্রায় সব-সময়েই বেধ রেখা বা বদ্ধ-অন্ত রেখা হওয়াতে রঙের মুক্ত প্রয়োগজনিত অভিব্যক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গভীর আঁধার রঙ, বর্ণান্তরমূলক রং ও মুক্ত তুলিতে লেপা রঙের উপর মুক্ত-অন্ত সূক্ষ্ম জৈব-চারিত্র্যের রেখা কতটা অভি-ব্যক্তিমূলক হতে পারে পাউল ক্লে'র ছবি তার প্রমাণ।

—প্রণবরঞ্জন রয়

বুদ্ধদেব গুহ

একটু উষ্ণতার জন্যে

উপন্যাস

।। ১৫ ।।

শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরেই রমার নাক
কার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।
ন্দরী মেয়েরও যে কি বিশ্রী আওয়াজ
রে নাক ডাকে তা যাঁরা স্বকর্ণে শোনেন নি
াঁরা বোধহয় জানেন না।

আমার ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে
নাকথা ভাবছিলাম। অনেক মাস পরে
মা আমাকে ওর শরীরে আসার জন্যে
নমন্তন্ন করেছিল আজ রাতে। যদি একে
নমন্তন্ন বলা চলে।

কিন্তু আমার ঘেন্না হয়েছিল।

ঘেন্নাটা রমার উপরে ত বটেই, ঘেন্নাটা
ুরো ব্যাপারটার অশ্লীল প্রস্তাবনার
উপরও হয়ত বা।

আমি জানি না অন্য পুরুষরা এ বাবদে
কি ভাবেন, জানি না এজন্যে যে, ব্যাপারটা
এত ডেলিকেট ও ব্যক্তিগত যে তা নিয়ে
কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেও আলোচনা
করার ইচ্ছা হয় নি কখনও।

মনে হয় যে, প্রত্যেকটি নারীই এক
একটি তারের বাজনার মত—তাদের সুরে
বাজালে তারা ভরপুর সুরে বাজে—তারা
রবিশঙ্করের সরোদের মত গমগমে সুরে
বাজে—কিন্তু তা না হলে আলাপ, বিস্তার,
ঝালা সবই তখন বেসুরে বাজে। যাদের
রসজ্ঞান আছে, সুরুচি আছে, তাদের কাছে
সুরের আর অসুরের মধ্যে তারতম্যটা
অনেকখানি।

যাঁরা বাজাতে হবে বলেই বাজাতে
ভালবাসেন এককথায়, যাঁরা কমপালসিভ
বাজিয়ে আমি তাঁদের দলে নই। যে-বাজনা
আলাপের গভীর গম্ভীর অস্ফুট খাদ
থেকে ঝালার চঞ্চল দ্রুতধাবমানা অনুরণিত
পর্যায়ে না পৌঁছয়, সে-বাজনা বাজাতে বা
সেই বাজনার সঙ্গত করতে আমি রাজী
নই।

গানের সঙ্গে যেমন গায়কীর, সারেঙ্গীর
সঙ্গে যেমন গায়কের, তেমন শরীরের সঙ্গে
মনের পূর্ণ সমর্থন ও বোঝাবুঝি না
থাকলে কারো শরীরে যাওয়ারই মানে নেই।

এত সব তত্ত্বকথা নিয়ে মাথা ঘামাতাম
না আমি, এই সুকুমার বোস এ নিয়ে
সোচ্চার চিন্তাও করতাম না যদি না আমি
ভুক্তভোগী হতাম; যদি না রমার এব্যাপারের
অদ্ভুত শীতল ব্যাখ্যাহীন অশালীনতা
আমাকে চিরদিন পীড়িত না করত।

শারীরিক সম্পর্ক ব্যাপারটাতে চির-
দিনই গলদঘর্ম কর্তব্যকর্ম যা ছিল, তা
আমারই ছিল; রমা চিরদিনই একজন
মহান, প্রাচীনা, মহিলার মত তার গর্বিতা,
দয়াবতী, কড়িকাঠ-গোনা প্যাসিভ ভূমিকায়
কয়েক মিনিটের আড়ষ্ট অভিনয় শেষ করে
এয়ার-কণ্ডিশানার এবং দেওয়ালের নীরব
টিকটিকিদের (যারা তার কৃতিত্বর একমাত্র
সাক্ষী থাকত) কাছ থেকে প্রচণ্ড হাততালি
আশা করত।

জানি না, হয়ত আমি এই সুকুমার
বোস, অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক, অতিমাত্রায়
পারফেকশনিস্ট বলে 'এই ব্যাপারটাকে'
নিয়ে এমন মর্মান্তিক শীতল হেলাফেলা
আমার কাছে ভণ্ডামিরই নামান্তর বলে
মনে হত, যে ভণ্ডামি আমাদের দুজনকেই
সুস্থ, স্বাভাবিক, খুশী জীবন থেকে পদে
পদে বঞ্চিত করছে।

আমি চিরদিনই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে
সম্মান করে এসেছি। কাউকে ইচ্ছার
বিরুদ্ধে বাঁধতে চাই নি; আমার কাছে,
কারো উপর নিজের ইচ্ছা জোর করে চাপাই
নি, বদলে এইটুকুই শুধু আশা করেছি যে
অন্য পক্ষও আমাকে এই স্বাধীনতা থেকে
বঞ্চিত করবে না।

রমার চরিত্রটা এখন এমন হয়ে
দাঁড়িয়েছে যে, ওকে বুঝতে পারি না।

ও এখন সীতেশের সঙ্গ চায়, অথচ
সীতেশকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে
চায় না। আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না,
অথচ আমাকে স্বামী হিসেবে সমাজে
প্রেজেন্ট করতে চায়। কোনো ইম্প্রেসারিও
যেমন করে ঘোষল পাশা যাদুকর বা স্বামী
শ্রীমৎ হঠযোগীনন্দকে উপস্থিত করে।

এই অবস্থাটা আমার পক্ষে নিতান্ত
অস্বস্তিকর। একে মানিয়ে নেওয়া মুশকিল।
আমার অসুখের আগে অবধি ছুটিই ছিল
আমার সঙ্গে রমার মনোমালিন্যের একমাত্র
কারণ। কিন্তু এবারে ছুটি সম্বন্ধে ওর এই
ঔদাসীন্য আমাকে আশ্চর্য করেছে। কারণ
এতে কোনো ভুল নেই যে ছুটির সব খবরা-
খবর ওর নখদর্পণে। ওর মাইনে-করা
অপেশাদার গুপ্তচর আছে এখন। এ আমি
জানি এবং তারা তাদের কাজে এমন দক্ষ যে,

সি-আই-এর বড়সাহেব জানতে পেলে অবিলম্বে তাদের মোটা মাইনের বহাল করবেন।

অথচ তবু, সব জেনেশুনেও ওর এই ঔদাসীন্য আমাকে অবাক ও ব্যথিত করেছে।

এই সব নানাকথা ভাবতে ভাবতে খাটে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

হঠাৎ সীতেশের সঙ্গে দেখা। ঘুমের মধ্যে।

আশ্চর্য!

দেখলাম সীতেশ কেতুর-চোখেই সিগারেট ধরিয়ে রোদে এসে দাঁড়াল।

লালি এসে আমাদের দুজনের চা দিয়ে গেল।

সীতেশকে চা ঢালতে ঢালতে বললাম, তোরা হঠাৎ চলে এলি এখানে? খবর না দিয়ে?

সীতেশ হাসল। বলল, রমা বলল, চলো সরেজমীনে তদন্ত করে আসি।

তোর আর তোর গার্লফ্রেন্ড সম্বন্ধে গুজবে কোলকাতার বাজার গরম।

তাই বুঝি? আমি বললাম। তারপর বললাম, তোর ব্যবসা কি বন্ধ করে দিয়েছিস না কি? কাজকর্ম নেই?

ও চমকে উঠল, বলল, ব্যবসা বন্ধ করব কেন?

ব্যবসা চলছে।

আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ সীতেশ বলল, রমা আসতে আসতে তোর কথা বলছিল। জানিস, ও শী ইজ ভেরী প্রাউড অফ ইউ।

আমি জবাব দিলাম না। তারপর বললাম, আর ডলি? তোর সম্বন্ধে ডলি প্রাউড না?

ফুঃ। ও বলল, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে। তারপর বলল, কি জানিস ত, ডলিকে ও যা চায় সবই আমি দিয়েছি—ওর বাইরে ওর কিছু চাইবার বা বোঝবার নেই। ওকে নিয়ে আমার মস্ত সুবিধা এই যে, ও মনে করে ওর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে পৃথিবীতে হয় না। এবং সেখানেই আমার সুবিধা। বুঝলি সুকুমার মেয়েদের বাড়তে দিতে হয় ফুলিয়ে দিতে হয়, সব সময় জানবি, মেয়েরা গ্যাস-বেলুনের মত। ওদের মধ্যে গ্যাস পুরোপুরি দিয়ে দেবার পর তুই বারান্দার রেলিং-এ শক্ত সুতোটা বেঁধে রাখ। দেখবি উপরে যে চড়েছে সে আর নামতে পাচ্ছে না। তুই নিজে সুতো টেনে না নামালে আর নামতে পাচ্ছে না—তখন তুই ইচ্ছেমত তুলায় চরে-বরে খা।

আমি বললাম, তুই যেমন খাচ্ছিস?

ও আমার দিকে ঘুরে বলল, হাউ ডু য়ু মীন?

আমি ওর বাঁ কানে হাত বুলিয়ে বললাম, তোর বাঁ কানটা ডান কানের চেয়ে বড় ছিল না? মনে আছে? এ নিয়ে কলেজের ছেলেরা ঠাট্টা করত। তোর এই বাঁ কানে পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে দিয়ে ট্রিগারটা টেনে দেব—ডান কানের ফুটো দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে যাবে। বুঝলি?

সীতেশ অবিশ্বাসী গলায় বলল, হোয়াট?

আমি বললাম, চা খা। ঠান্ডা হয়ে গেল।

সীতেশ অন্যমনস্ক গলায় চায়ে চুমুক দিল, বলল, কেন? তুই আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর—অন্যভাবে পরাস্ত কর, আমায়।

আমি বললাম তোর সঙ্গে লড়বার মত সম্মান তোকে আমি দিতে রাজী নই। বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে কেউ কখনও লড়ে শুনেছিস? বিশ্বাসঘাতকদের জাস্ট সাবড়ে দেওয়া হয়।

তোকে আমি ঘেন্না করি। রমার সঙ্গে তুই অন্তরঙ্গতা করেছিস বলে করি না. করি এই জন্যে যে, তোকে আমি একদিন বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছিলাম, তুই সেই সম্পর্কের অমর্যাদা করেছিস। তোর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। বন্ধুত্ব যে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি যা তুই কখনও বুঝিস নি। তা তুই শেষের দিনে জানতে পাবি।

ঘুম ভাঙল চোখে আলো পড়তে।

তাড়াতাড়ি উঠলাম। বাড়িতে অনেক অতিথি।

বাবুর্চিখানার দিকে গিয়ে ব্রেকফাস্টের আয়োজন ঠিকমত করছে কিনা হাসান এবং লালি তা দেখে এলাম।

মুখ-টুখ ধুয়ে বাইরের রোদে পাইচারী করছি, দেখি, সীতেশ একটা চক্রা-বক্রা ড্রেসিং-গাউন গায়ে দিয়ে সিগারেটের টিন হাতে বেরিয়ে এল। দূর থেকে বলল, গুড মর্ণিং।

আমি হাসলাম। বললাম, রাতে ঘুম হয়েছিল?

ও বলল, দারুণ। তারপর বলল, জায়গাটা ভাল। তবে একা একা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোর মত পাগলরাই পারে।

শুধোলাম, তোরা আজই ফিরে যাবি?

ও বলল, ও ইয়েস, ক্যাটেগরিকাল। লাঞ্চের ইমিডিয়েটলি পরেই।

ইতিমধ্যে ডলি ও রমা দুজনেই গরম ড্রেসিং-গাউন পরে বেরিয়ে এল। ডলি বলল, এই সুকুমার—শাগগীরী চা—ভীষণ ঠান্ডা।

লালি চা নিয়ে এসেছিল টী-কোজীতে কেটলি ঢেকে। চায়ের ট্রেটা বেতের টেবিলের উপর বসিয়ে রেখে গেল। আমরা এক কাপ করে চা খেয়েছি এমন সময় রমা ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, বেয়ারা চায়ে লাও। এখানে বেয়ারা কেউ নেই। যারা আছে তাদের প্রত্যেকের বাবা-মার দেওয়া একটা করে ভাল হোক খারাপ হোক নাম আছে। সেই নামেই আমি তাদের ডেকে থাকি। বেয়ারা বা বাবুর্চি কি আয়া বলে তাদের ডাকি না। কেউ ডাকলে কানে লাগে।

লালি যখন বেয়ারা বলে ডাকাতে বুঝতে পারল না তখন আমিই এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে ওকে দিলাম। আর যাই হোক, রমা এইখানে আমার অতিথি। ওর জন্যে হাতে করে চা-টা নিয়ে যেতে খারাপ লাগল না। বরঞ্চ ভালোই লাগল। মনে হল, আমি মার্টিন লুথার কিং-এর মত ক্ষমাময় কেউ হয়ে গেছি।

ও বলল, বাবাঃ কত ঢঙ্। কি? লোকের সামনে ভালোবাসা দেখাচ্ছ?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম যে, চা-টা নিয়ে বাইরে এসো বাইরে রোদ।

সীতেশ ওদের বলছিল, এইখানে একটা ওপেন-এয়ার বার থাকবে, আর ঐখানে বার-বি-কিউ হবে—ক্রিসমাস ইভে দুশো লোকের পার্টি দিতে বলব এখানে রমাকে। যদি তোমরা চাও ত এখানে একটা নাচের বন্দোবস্তও করা যেতে পারে এবারিজিনালস-দের দিয়ে।

আমি আসতেও সীতেশ বিন্দুমাত্র দমিত হল না। বলল, এসব জায়গা দল-বেঁধে এসে হৈ-হুল্লোড় করার জন্যে—আদারওয়াইস নো-গুড।

তিতিরগুলো ডাকছিল চতুর্দিক থেকে। টুনটুনী পাখি এসে বেগুনের ডালে দুলে দুলে অস্ফুটে কি কথা বলে চলে গেল বোঝা গেল না। বুলবুলিরা জোড়ায় জোড়ায় এদিকে ওদিকে ভর্-র্-র্-র্ করে উড়তে লাগল। টীয়ার ঝাঁক রোজ সকালের রুটিন মত পেয়ারার বনে এসে বসে ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল।

কিন্তু সীতেশের একতরফা বক্তৃতার জন্যে কোনো পাখির ডাকই আজ শোনা হল না।

মালু এসে সীতেশের গাড়িটা ঝাড়তে আরম্ভ করেছিল।

সীতেশ খেঁকিয়ে উঠল নেড়ি-কুত্তার মত। আমার দিকে ফিরে বলল, তোর লোকগুলো কি রে? মার্সিডিস গাড়িতে এরা জমে হাত দিয়েছে? —এক্ষুণি রঙটার বারোটা বাজাত—আর গায়ে স্ক্র্যাচ পড়ে যেত। তারপরই বলল, যদি এখানে থাকিস আরো কিছুদিন ত, এইসব লোকে ট্রেন-আপ কর্—এরকম সব জংলী লোক নিয়ে কাজ চলে?

আমি হাসলাম, বললাম, জায়গাটাও ত জংলী—এখানের মত জায়গায় আমাদের মত লোকের এ দিয়েই কাজ চলে যায়। তোদের মত লোকের জন্যে ত এ জায়গা নয়।

কিছুক্ষণ বিরতির পর সীতেশ বলল, হ্যাঁরে সুকুমার সেদিন তোর একটা গল্প পড়লাম, কোথায় যেন? কিছু মনে করিস না, তোর নায়কগুলো কেমন যেন মিনমিনে?

ডলি বলল, তার মানে?

সীতেশ বলল, মানে নায়ক নায়িকার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল, নায়িকার স্বামী বাড়িতে নেই—ট্যুরে গেছে। নায়িকা তাকে থেকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু নায়ক নায়িকার হাতে একবার হাত রেখে চলে এল।

তারপরই বলল, কিছু মনে করিস না, এর চেয়ে কোনো সীলি ব্যাপার ভাবা যায় না।

মাধুরী বলল সীতেশকে, ধরুন আপনিই যদি নায়ক হতেন ত কি করতেন?
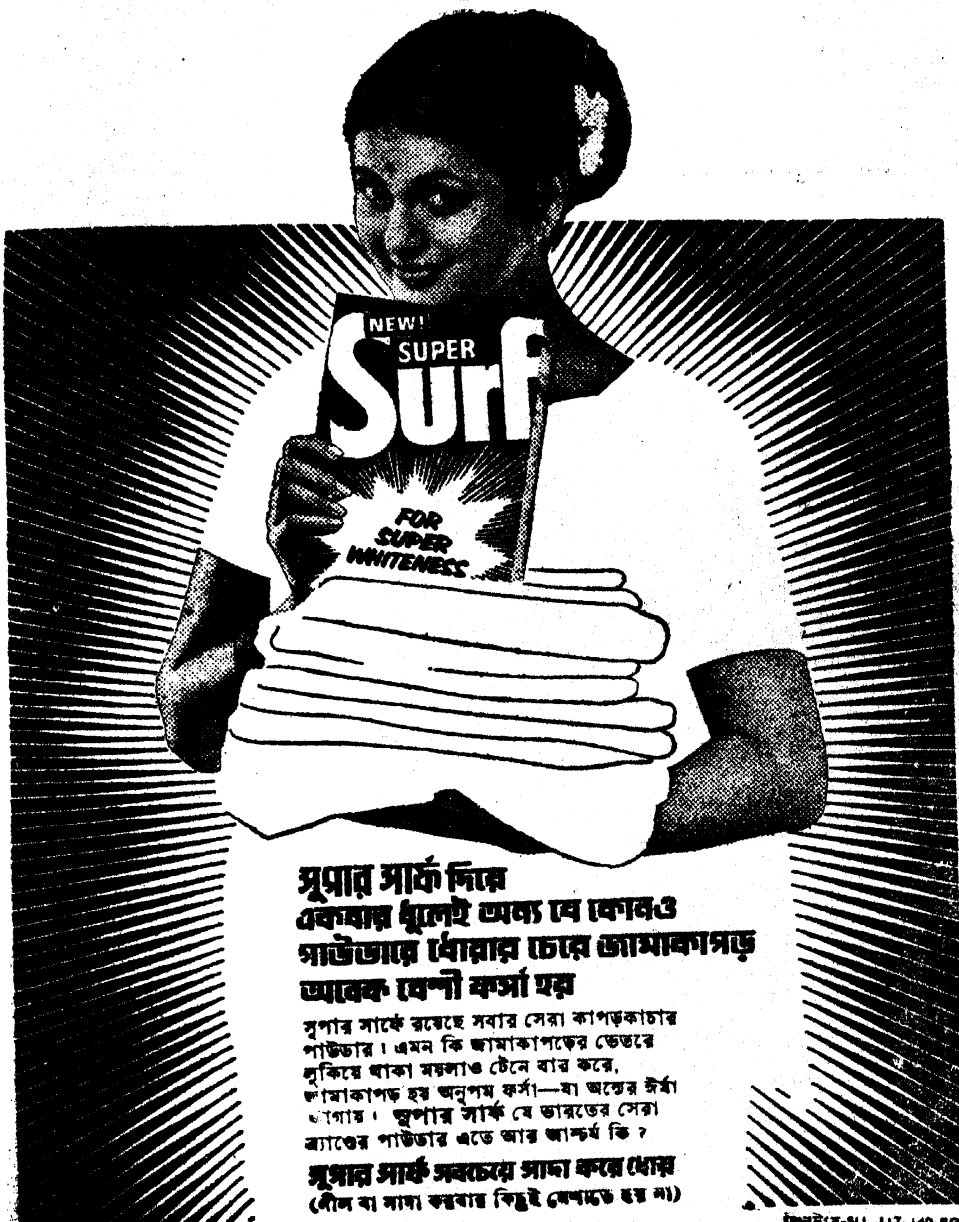
সীতেশ হাঃ হাঃ করে হাসল অনেকক্ষণ, তারপর বলল; যা করতাম, তা নায়িকাই জানত, নায়িকা রেলিশ করত—তা কি অন্য লোককে বলে বেড়াবার?

ডলি খুব অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, সুকুমারবাবুর নায়কদের কিন্তু আমি বুঝতে পারি।

সীতেশ বলল, কি রকম? তাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

ডলি হেসে উঠল, বলল, তারা শুধু মনের কারবারী—তাদের শরীর নেই।

ওরা তিনজনেই সমস্বরে হো হো করে হেসে উঠল।

আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগতে লাগল। রমার উপর প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল। রমা কোলকাতায় যা-ইচ্ছে-তাই করুক—তার যা প্রাণ চায়—আমি কখনও বাধা দিতে যাই নি কিন্তু কতগুলো [illegible] সঙ্গে করে আ[illegible] পাখি-ডাকা [illegible] তার কোনোই অধিকার নেই। আজকে আর আমার উপর তার কোনোই অধিকারই অবশিষ্ট নেই।

আমি বললাম, তোমরা চান-টান করে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও—আমি বাবুর্চিখানায় তাড়া দিয়ে আসি।

বাবুর্চিখানায় ওদের তাড়া দিয়ে আমি কারিপাতা গাছগুলোর তলায় দাঁড়িয়েছিলাম।

ওদিকে ফিরে যেতে আমার ইচ্ছা করছিল না। স্থূলতার প্রতিবাদ স্থূলতা দিয়ে হয় না, সে প্রতিবাদে আমি বিশ্বাসও করি না।

আমার হঠাৎ মনে হল, ডলি এবং মাধুরীও রমার সঙ্গে সীতেশের যে একটা সম্পর্ক আছে তা জানে এবং জেনেও সেটাকে রেলিশ করে। এমনকি ডলিও করে।

ওরা হয়ত সকলে যুক্তি করেই আমাকে অপমান করার জন্যে এখানে এসেছে। আমি চীৎকার করতে পারি কিনা, অপমানে কাঁদি কিনা, রেগে নীল হয়ে যাই কিনা, তা ওরা বোধহয় দেখতে এসেছে। কিন্তু ওরা জানে না, রমাও জানে না যে, জীবনে আমি এক নিজের—পেটের কারণে ছাড়া অন্য কোনো রক্তক্ষরী প্রতিযোগিতায় নামতে চাই নি। এক প্রতিযোগিতাতেই আমি ফুরিয়ে গেছি। আমি লড়ব না, প্রতিবাদ করব না জেনেও ওরা কেন আমার মুখে মদ ছোঁড়ে?

ওদের সঙ্গে আমি ডুয়েল লড়ব না—কখনও লড়ব না। না-লড়ার কারণটা ওরা কখনও বুঝবে না। আমি ওদের বুঝিয়ে বলতে, নিজের এই নিদারুণ অপমান সহ্য কেন করি তা ওদের বুঝিয়ে বলতেও, রাজী নই।

পিছনের নালাটায় রোদ এসে পড়েছিল। কতগুলো হলুদ প্রজাপতি ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছিল ওদিকে। মালুর কালো-রঙা মেয়ে-কুকুরটা রোদে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। এমন সময় আশেপাশের বাড়ির কোনো একটা খয়েরী-রঙা মদ্দা কুকুর এসে তার পিছনে লাগল। কুকুরীটা প্রথমে বিরক্তি দেখাল, ঘ্যাক ঘ্যাক করল, তারপর কামড়া কামড়ি করল, সবশেষে পরাভূত অবস্থায় মদ্দা কুকুরটার প্রবৃত্তিতে আত্মস্থ হয়ে পিছনের নালার অন্ধকারে নেমে গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল, ডলি সীতেশ এবং আরো অনেকে বোধহয় খুশী হত যদি সুকুমার বোসের নায়করা এই মদ্দা কুকুরটার মত হত। ওরা বোধহয় একবারও বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না যে সুকুমার বোস, এই একজন সামান্য অখ্যাত লেখক মানুষদের নিয়েই লেখার চেষ্টা করে, কুকুরদের নিয়ে নয়। মানুষদের জীবনেও [illegible] প্রবৃত্তি আছে যা পশুদেরও [illegible] আবার এমন কিছু মানুষদের আছে যা পশুদের নেই; তা হচ্ছে মানুষের গর্ব। বহু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিশীলিত হয়ে সে বস্তুটি আজ মানুষের জীবনের সবচেয়ে গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি জানি, ঠিক বুঝতে পারি না, যে-যুগে মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সে যুগেই কি মানুষ মানুষের মনের এক বিশেষ অংশে মানবিক সত্তা বিসর্জন দিয়ে পাশবিক সত্তা আমন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে? তাই যদি না হয় তবে এ বাড়ির সামনে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথচ কুকুরের মস্তিষ্ক নিয়ে বসে আছে এরা কারা? এরা কি মানুষী-কুকুর না কুকুরী-মানুষ?

হঠাৎ রমা বলল, এখানে কি করছ?

রমা বাবুর্চিখানার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

আমি বললাম, কিছু না।

রমা চান করে নিয়েছিল একেবারে। প্রসাধন করেছিল, দামী একটা বালুচরী শাড়ি পরেছিল, কানে মুক্তোর ইয়ার-টপ্, গলায় মুক্তোর মালা। রমার চুলে রোদ এসে পড়েছিল। পেঁপে গাছের পাতায় বসে শালিক ডাকছিল। রমাকে খুব সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

রমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ খুব ইচ্ছা করছিল দৌড়ে গিয়ে ওকে বুকের মধ্যে ধরি, ওকে বলি: রমা, আমার প্রথম যৌবনের রমা, আমার জীবনের প্রথম নারী, প্রথম প্রেম রমা, তুমি ফিরে এসো, আমার কাছে ফিরে এসো—তুমি দেখো, আমরা দুজনে—আমি আর তুমি দুজনে মিলে আবার নতুন করে সব আরম্ভ করব—ঘর বাঁধব সুখের ঘর, ফিরে এসো রমা—।

ভাবলাম বলি, আমি ছুটিকে ভুলে যাব, তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করব শুধু তুমি আমার কাছে তোমার সম্পূর্ণতায়, তোমার উচ্ছলতায়, তোমার সাবলীল বাধাবন্ধহীন শরীরে এবং নিষ্কলুষ মনে ফিরে এসো আমার কাছে।

ইচ্ছে হল, ওকে চুমু খেতে খেতে বলি, এসো, ক্ষমা করে দিই আমরা দুজন দুজনকে—পুরোনো জীবন খারিজ করে এসো একটা নতুন জীবন শুরু করি। এখনও বেলা আছে, এখনও সকালের আশাবাদী রোদ আছে, এখনও পথ আছে ফেরার।

রমা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, বলল, তোমার রাতে ঘুম হয়নি?

হুঁ। বললাম, আমি।

রমা বলল, আমি জানি, তোমার কষ্ট আছে। কষ্ট হয় অনেক। কিন্তু তোমাকে কষ্ট পেতে হবে আরও। কারণ তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। কী কষ্ট দিয়েছ তুমি জানো না।

একটু থেমে ও বলল, আমি জানি আমি যা করেছি তা ভাল করিনি, কিন্তু তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে হাতের কাছে ওর চেয়ে ভাল হাতিয়ার কাউকে পাওয়া গেল না।

আমি বললাম, আমার অপরাধ আমি জানি, কিন্তু তুমি একথা বলতে পারবে না যে তোমাকে ঠকিয়ে আমি নিজেকে আনন্দিত করেছি। সেইসব পায়ে-দাঁড়ানোর দিনে তোমাকে যদি ঠকিয়ে থাকি ত সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ঠকিয়েছি। যা করেছি সে ত তোমার জন্যেও করেছি। আমার একার জন্যে ত করিনি?

করেছ, করেছ। তুমি যশ চেয়েছিলে, তুমি বড় স্বার্থপর। তুমি নিজেকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভালোবাসোনি। তুমি কোর্ট করেছ, মক্কেল সামলেছ, তোমার সিনিয়রের প্রতি সিনসীয়র হয়েছ, তারপরও তুমি লেখক হয়ে নাম করতে চেয়েছ। কিন্তু কেন? এত স্বার্থপর তুমি কেন?

—আমি ছোটবেলা থেকে লেখক হতে চেয়েছিলাম। এ দেশে কারো ইচ্ছাই ইচ্ছা নয়, ছিলো না। গুরুজনরা যা হতে বলেছিলেন, তাই-ই হতে হয়েছিল। নিজের মনের ইচ্ছাটা গুরুজনদের ইচ্ছা পূরণের পর বিকাশ করতে চেয়েছিলাম।

—আর আমার ইচ্ছাটা? ইচ্ছা বলব না, বলব দাবী। আমার দাবী কি কিছুই ছিল না তোমার উপর? আমাকে কি তোমার লাইব্রেরীর তাকের রেফারেন্স বই ভেবেছিলে তুমি? ভেবেছিলে কোনোদিন কোনো মামলায় যদি প্রয়োজন হয় তবেই আমার পাতা খুলবে?

আমি চুপ করে রইলাম।

রমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, এসে বলল, ঐদিকে চল, কুয়োতলার দিকে।

তারপর বলল, তোমার সঙ্গে এ কমাস ছাড়াছাড়ি থেকে বোধহয় ভালই হল। তুমিও নিজেকে বুঝবার সুযোগ পাবে, আমিও পারি নিজেকে বুঝবার। তোমাকে একটা কথা বলব? তোমার জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়। একটা ঘিনঘিনে করুণা হয়, কারণ, তুমি অনেক টাকা রোজগার কর অথচ নিজের হাতে তোমার পাঁচ পয়সা খরচ করার অবকাশ নেই। তুমি যশ পেয়েছ অথচ সেই যশের কোনো মূল্য নেই তোমার নিজের কাছে। নিজের জীবনের মূল্যে কাউকে যদি যশ পেতে হয় ত যশের দাম কি? যারা সেই যশ চায় চাক, তুমি চেওনা।

হাজার হাজার লোক বলল, তুমি দারুণ সওয়াল কর, বলল, তুমি দারুণ লেখো, তোমাকে চিঠি লিখল, তোমার ছবি চাইল, তাতে তোমার কি? যখন তুমি ভীষণভাবে একা থাকো— যখন তুমি ভীষণভাবে

াউকে চাও তখন তোমার কোনো পাঠিকা ক তোমাকে আমি যা দিই, দিতে পারি; তা দেবে? দেবে না। কেউ দেবে না। তারা বড়-জার তোমার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খাবে, বন্ধুদের চোখ বড়-বড় করে বলবে, 'এাই জানিস, ...কুমার বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।' ঠান্ডা করে বলবে, 'জানিস, আমার প্রেমে পড়েছে, হেড ওভার হীলস্।' অথবা ... বড়জোর টেলিফোন করে তোমাকে ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলবে, তারা তোমার সত্যিকারের অভাব, কখনও মেটাবে না, তোমাকে ভালোবাসবে না। পাঠিকাদের ভালোবাসা পোশাকী ভালবাসা, দামী শাড়ির মতন, পার্টি শেষ হলে সযত্নে ন্যাপথলিন দিয়ে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে আলমারীতে তুলে রাখবে।'

আমি চুপ করে ছিলাম। হঠাৎ রমাই বলল, আমি জানি, তুমি ছুটির কথা ভাবছ। মেয়েটা ভাল, হয়ত তোমাকে সত্যিই সে ভালবাসে, কিন্তু আজকালকার অল্পবয়সী মেয়েরা ভালোবাসার কিছু বোঝে বলে আমার মনে হয় না। ওরা এই গলায় ঝোলে, ঐ ঝুপ্ করে নেমে পড়ে দৌড় দেয়। এদের কোনো গভীরতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়—ভয় হয়, ছুটি যদি তোমাকে দুঃখ দেয়, সে দুঃখ তুমি সামলে উঠতে পারবে না। কারণ তুমি আমার মত শক্ত নও।

আমি আগাগোড়া চুপ করেই ছিলাম। বললাম, আর সীতেশ? সীতেশ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

রমা হাসল। বলল, আমি জানতাম তোমার আত্মবিশ্বাস আছে—সীতেশ যে তোমাকে এমন পীড়া দেবে তা কখনও ভাবতে পারিনি আমি। তোমাদের এই পুরুষমানুষদের আমরা মেয়েরা মিথ্যাই ভয়-ভক্তি করি। তোমরা আসলে কাঁচের চেয়েও ঠুনকো। মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার আত্মবিশ্বাস যদি এতই কম, তাহলে জীবনে সাকসেসফুল হলে কি করে? কিসে ভর করে?

আমি বললাম, তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে।

ও বলল, বলছি, তোমার বন্ধু সীতেশ একটি আস্ত সিলী-গোট। একটি বাবার পয়সায় বসে-খাওয়া আকাট বুড়ো-খোকা। তুমি জাস্ট দেখে নিও, ওর কি অবস্থা করি আমি। ও কেঁদে কূল পাবে না। ছুটি যেমন তোমাকে ভালোবাসে, আমিও ওকে তেমনি করে ভালোবাসি। আজকালকার অল্পবয়সী মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে—গিল্‌টি-করা গয়নাকে কিভাবে সোনা বলে চালানো হয়, তাই শিখছি। তোমার কথা বলতে পারি না, আমি কিন্তু আমার পার্ট দারুণ এনজয় করছি। ইটস্ গ্রেট ফান্। আই উইশ, তুমিও তোমার এই মিথ্যা এমব্যারাসমেন্টটা পুরোপুরি এনজয় করো।
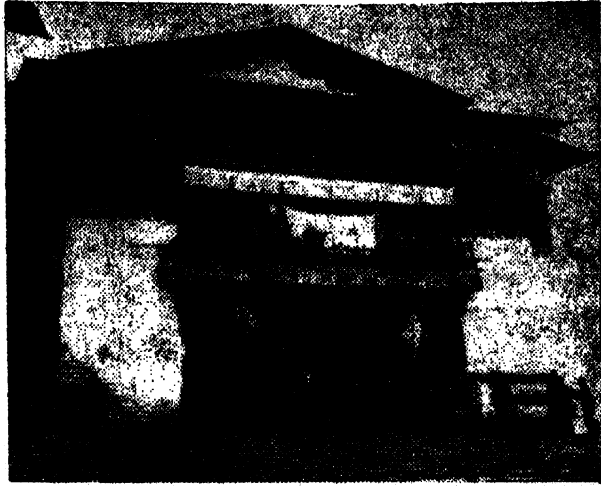
রমার কথা ভাল করে আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রমা স্বগতোক্তি করল, বলল, টাইম ইজ আ গ্রেট হীলার। ছ' মাস ছাড়াছাড়ি না-থাকলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়াত আমি জানি না। আজ দারুণ লাগছে। মনে হচ্ছে আমাদের হানিমুনের কোনো সকাল। জানো সুকু, আমি জানি, আমি কনফিডেন্টলি জানি যে, তুমি আমার এবং চিরকাল আমারই থাকবে। আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নেয় এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই। ছুটিকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার আত্মবিশ্বাস আছে। তোমারও যদি আমার সম্বন্ধে এই আত্মবিশ্বাসটুকু থাকত ত, আমি খুশী হতাম। এ সম্বন্ধে তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকাটা আমার পক্ষে অপমানকর।

ওরা বাইরের পেয়ারাতলায় ব্রেকফাস্ট ঠিকঠাক করে লাগাচ্ছিল, হঠাৎ রমা বলল, তুমি কাল রাতে রাগ করেছিলে? না?

আমি মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। বললাম, না। রাগ করব কেন?

ও বলল, এখন যাবে? ওর চোখ আনন্দে নেচে উঠল। এই রমাকে আমি চিনতাম না। হয়ত কখনও চিনতাম, কিন্তু ভুলে গেছিলাম।

ও বলল, বাথরুমের দরজা দিয়ে বেডরুমে চলে যাই। ওরা কেউ জানতে পারবে না—বলেই রমা আমাকে টেনে নিয়ে বেডরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমার মন চাইছিল না. কিন্তু রমার এমন একটা খুশীর মুহূর্তকে আমি ফুঁ দিয়ে নিবাতে চাইনি।

তারপর আমার মনে নেই। যা মনে আছে তা এই যে, অনেকদিন ভুলে যাওয়া, ফেলে-আসা কোনো নির্জন সুগন্ধী পাহাড়তলীতে আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী রমার হাত ধরে আমি গিয়ে পৌঁছেছিলাম।

অনেকগুলি বিস্মৃতপ্রায় বোধ, অনুভূতি, অনেক আশ্চর্য অবাক আরাম আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। যে কোষাগারের চাবি বহু বছর খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেই কোষাগার হঠাৎ এই আলো-ঝলমল সকালে খুলে গেছিল। মণি-মাণিক্যে, হীরে-জহরতে চোখ ঝলসে উঠেছিল। শরীর; দুটি সুন্দর শরীর, তাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ বিন্যাসে স্বর্গরাজ্যের বীণার মত বাজছিল। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, আরতির শঙ্খ সব সেই পারিজাত-পাহাড়তলীর প্রথম সকাল এক বিস্মৃত ভরন্ত ভালোলাগায় ভরে দিয়েছিল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা যখন গাড়িতে উঠছিল, রমা হঠাৎ আমাকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, কাল রাতে সীতেশের সঙ্গে যখন বাইরে গেছিলাম তখন সত্যিই বোকাটা পথ হারিয়ে ফেলেছিল। মাথার চুল আমি নিজেই এলো-মেলো করে দিয়েছিলাম, হাত দিয়ে টিপ লেপ্টে দিয়েছিলাম। সীতেশ বলেছিল, ওরকম করছ কেন? আমি বলেছিলাম চুলের মধ্যে পোকা ঢুকে গেছে।

তারপর বলল, যাইই করে থাকি—তোমার মুখ দেখে বুঝেছিলাম তুমি যা মনে করবে ভেবেছিলাম; তাই ভেবেছ। তোমার মনটা বেশ ছোট, যাইই বল।

সীতেশের বেগুনীরঙা মার্সিডিস, ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

আমি অনেক, অনেকক্ষণ বাগানের চেয়ারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম।

মনে হলো, এই একদিনে আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেলো। ঝড়টা বসন্ত-বাতাসের না শিলা-বৃষ্টির একদিন তা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। (ক্রমশঃ)

প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে চললো, ১৩৩৫ সালে এক বসন্তকালের রাত্রে ২৩শে ফাল্গুন 'ভারতী' গোষ্ঠীর সর্বেসর্বা ও উক্ত পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন।

তৎকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে বিবিধ-প্রকার রচনায় তিনি যেমন ছিলেন খ্যাতিমান, তেমনি ছিলেন রূপে-গুণে অনন্য-সাধারণ। কেবলমাত্র সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, রঙ্গালয় ও নাট্যাভিনয় বিষয়েও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহিত তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে 'ভারতী' গোষ্ঠীর বহু সাহিত্যিক শিশির-কুমারের নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় অধুনা আমাদের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হলেও, পরিণত ও অপরিণত উভয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্য যে সকল গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ তিনি করে গিয়েছেন, এবং বিশেষভাবে জাপানী গল্পের ছায়া অবলম্বনে যে ক'টি রূপকথা লিখেছেন তার তুলনা হয় না। ছোট ও বড়দের গল্প-প্রবন্ধ ছাড়া জীবনী গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। এদিক থেকে 'ভারতীয় বিদুষী' মণিলালের একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কল্পকথা', 'মনে মনে', 'জাপানী ফানুষ', 'মহুয়া', 'আলপনা', 'স্বপ্নভূমি', 'ভূতুড়ে কান্ড', 'জলছবি', 'কায়া-হীনের কাহিনী' প্রভৃতিগুলি উল্লেখযোগ্য।

সুরুচি ও সংস্কৃতির ধারক মণিলালের লেখার হাত ছিল ভারী মিষ্টি। যে বিষয়েই তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানেই তাঁর ভাব ও ভাষার মাধুর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে ঝলমলিয়ে উঠেছে।

১২৯৪ সালে তাঁর জন্ম হয় এবং মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে দুটি সন্তান রেখে তিনি দেহত্যাগ করেন। সাহিত্যিক স্বর্গত মোহন-লাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং অন্যজন শ্রীশোভনলাল বোলপুরে বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে গ্রন্থাগারিক হিসাবে সংশ্লিষ্ট। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়দের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর শহরে এবং তিনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর পিতার নাম অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

'ভারতী'র আড্ডা ছাড়া 'সান্ধ্য সমিতি' নামে মণিলালের একটি সাহিত্যিক সমিতি ছিল এবং তিনি নিজেই ছিলেন সেই সমিতির সভাপতি। তাঁর পরলোকগমনে নানা পত্রিকায় নানা ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়।

এখানে উল্লিখিত 'মণিলাল-স্মৃতি' নামক রচনাটি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। রচনাটি ১৩৩৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'কালি-কলমে' প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা রচনাটির অংশবিশেষ প্রকাশ করলাম।

মণিলাল-স্মৃতি

কথায় বলে 'যেন রাজপুত্তুর'। মণিলাল ঠিক তেমনি ছিলেন। তাঁর সুশ্রী চেহারা ও সুরুচিসম্মত পরিচ্ছন্ন বেশভূষা জনতার মধ্যেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; সুপুরুষ বলিলে যাহা বুঝায় তিনি সর্বাংশে তাহাই ছিলেন। সুস্থ সুন্দর দেহে সুকুমার অথচ বলিষ্ঠ মনে সংযত শোভন ব্যবহারে বিনয়নম্র ভাষণে তাঁর এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহাকে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর শিক্ষা ও সহবৎ ছিল উচ্চাঙ্গের—যে কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের অনুকরণ যোগ্য।

মণিলালের সঙ্গে পরিচয় হয় উনিশ বছর পূর্বে। (অর্থাৎ ১৩১৬ সালের কথাই ধরা উচিত, কারণ ১৩৩৫ সালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই নিবন্ধ লিখিত হয়।) প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁর বয়স তখন বাইশ-তেইশের বেশি নয়। সেই সবে জাপান লইয়া সাহিত্যের আসরে নামিয়াছি। সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছে। তিনি তখন 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক।

পরিচয়ের দিনই কিনা স্মরণ নাই, তবে তার কয়েকদিন পরে নিশ্চয়ই মণিলালের আহ্বানে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে উপস্থিত হই। তিনি তখন ঐ পুস্তকালয়ের অর্ধেক অংশীদার ছিলেন। স্বরচিত একতাড়া বই লইয়া সুন্দর হস্তাক্ষরে নাম লিখিয়া তিনি আমাকে উপহার দিলেন। সেই অপ্রত্যাশিত সৌজন্য ও প্রীতির পরিচয়ে আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির পর বুঝিয়াছিলাম, বিস্ময়ের কোন হেতু ছিল না। তাঁর স্বভাবই ছিল এইরূপ।

অল্পকালের মধ্যে চারুচন্দ্র ও মণি-লালের অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে আমিও স্থান পাইলাম। শিবনারায়ণ দাসের গলির মাথায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের (অধুনা বিধান-সরণি) উপরের বড়ো বাড়ির নীচের তলায় তখন 'কান্তিক প্রেস' ছিল। মণিলাল ছিলেন ঐ ছাপাখানার মালিক। সেখানে প্রত্যহ অপরাহ্নে আমরা মিলিত হইতাম। গল্প-লেখকদের ব্যতীত নিয়মিত হাজির হইতেন কবি সত্যেন্দ্র, ঔপন্যাসিক সৌরীন্দ্রমোহন ও চারুচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রের সতীর্থ-সুহৃদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীও মধ্যে মধ্যে আসিতেন। বিদ্যাসাগর জীবনী-প্রণেতা স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় নিকটেই থাকিতেন, তাঁরও দেখা প্রায় মিলিত।

এই বৈঠক নিছক সাহিত্য-বৈঠক ছিল। সেখানে আলাপ-আলোচনা ও পাঠ চলিত। গল্প পড়িতেন প্রধানত মণিলাল ও চারুচন্দ্র, মাঝে মাঝে সৌরীন্দ্র। সত্যেন্দ্র প্রায় প্রত্যহই গ্রীষ্মকাল ব্যতীত—কবিতা শুনাইতেন। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে পথের ধারের বারান্দায় বেঞ্চি টানিয়া আমরা বসিতাম, বর্ষাকালে অপ্রশস্ত ঘরের মধ্যে চা ও বিবিধ মালমসলাসহ টাটকা মুড়ির সাহায্যে বৈঠক রীতিমত জমিয়া উঠিত। গ্রীষ্মাধিক্য ঘটিলে বৈঠকের সভ্যবৃন্দ সন্ধ্যার পর পদব্রজে গোলদীঘিতে উপস্থিত হইতেন। দীঘির ওপারের রাস্তায় কয়েকজন ভদ্রসন্তান ঘোলের সরবতের দোকান খুলিয়াছিলেন। তেমন মুখরোচক পানীয় শহরের আর কোথাও মিলিত কিনা সন্দেহ। সেখানে প্রত্যেকে সরবৎ পান করিয়া বাগানে ঢুকিয়া নিরিবিলি কোথাও বসিতাম। তারপর নিয়মিত আলোচনা বা পাঠ সুরু হইত। মনে পড়ে মণিলাল সেখানে কয়েকটি রচনা পড়িয়াছিলেন, তার মধ্যে ছিল রুশ-লেখক শেখভ ও তুর্গেনিভের গল্পের কয়েকটি অনুবাদ।।

একদিন সন্ধ্যায় সদলবলে গোলদীঘি অভিমুখে চলিয়াছি। আমাদের ঠিক সম্মুখে এক অজানা ভদ্রলোক মনের আনন্দে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়াছেন। তাঁর বেপরোয়া আনন্দ-প্রকাশে যে পশ্চাদ্বর্তী পথিকের ক্ষতির সম্ভাবনা সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। মণিলাল তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন এবং হঠাৎ একসময় ঘুরন্ত ছড়ি যেই পিছনপানে আসিয়াছে অমনি খপ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। সচকিত বিস্মিতভাবে ছড়ির মালিক ঘাড় ফিরাইলে মণিলাল কহিলেন—বাড়ি গিয়া লাঠি খেলিবেন রাস্তায় নয়। ভদ্র-লোকে অপ্রস্তুতের একশেষ, মুখ দিয়া আর কথা সরিল না।

তখন ঠনঠনে কালীতলায় স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁদের বাড়িতে দু'বেলা বৈঠক বসিত।...বাগচি-বৈঠকে মণিলাল নিয়মিত বসিতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু একরকম নীরব

থাকিতে পারিতেন না, মণিলাল ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। তিনি মিতভাষী ছিলেন, বোধকরি সেই কারণেই তাঁহার মুখ দিয়া বাজে কথা বাহির হইত না। এই অতি-ভাষণের যুগেও এমন মানুষ আছে, যাহারা বিশ্বাস করে 'সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন'। মণিলাল নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন ছিলেন।...

কার্তিক প্রেস হরিতকী বাগানে (বর্তমানে যে অংশ কৈলাস বসু স্ট্রীট) উঠিয়া যাইবার পর মণিলাল ও সৌরীন্দ্র 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। সেই বাড়িতে তেতলায় পথের ধারের প্রশস্ত ঘরখানি রীতিমত বৈঠকখানায় পরিণত হইল। কিছুরই অভাব নাই। ফরাস বিছানা, ইলেকট্রিক আলো ও পাখা, আসবাবপত্র মায় একটি অর্গ্যান পর্যন্ত। নিত্যনূতন সভ্যের আমদানী হইতে লাগিল। ছোট বড় সাহিত্যিক, কবি, আর্টিস্ট, গায়ক, কেহই বাদ পড়িলেন না। হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর, নরেন্দ্র দেব, চারু রায় প্রভৃতি নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগিলেন। পরে আসিলেন কবি মোহিতলাল, করুণানিধান, কিরণধন, গিরিজাকুমার প্রভৃতি। অন্যান্য সাহিত্যিক ও শিল্পীরও মাঝে মাঝে আবির্ভাব হইত, যেমন, শরৎবাবু (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) বা আর্টিস্ট অসিতকুমার বা কবি যতীন্দ্রমোহন।

লেখা, পড়া, আলোচনা, গান, অতিথি-সমাগমে 'ভারতী'র বৈঠক অবিলম্বে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। আসল বৈঠক সন্ধ্যার কাছা-কাছি সুরু হইলেও প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত যে-কোন সময়ে সভ্যগণ নিজ নিজ ইচ্ছা, প্রয়োজন ও অবসর অনুযায়ী হাজির হইতেন।...বৈঠকখানার মালিক যে আমরা নই গৃহস্বামীর ঔদার্যে সে-কথা সব সময় মনে থাকিত না।

বেশ চলিতেছিল, অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া রসভঙ্গ করিল। কয়েকদিনের পীড়ায় মণি-লালের পত্নী-বিয়োগ ঘটিল। মণিলাল বাহিরে যেমন ছিলেন, তেমনি রহিলেন, তেমনি মিষ্ট কথা, শিষ্ট ব্যবহার, উদার আতিথেয়তা, কিন্তু ভিতরটা কোথায় যেন জখম হইয়া গেল। ক্রমে লক্ষ্য করিলাম তিনি নিরুদ্যম নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছেন, কোন কিছুতেই আর আসক্তি নাই, এমন কি সাহিত্য রচনাও তাঁর থামিয়া গেল। ছাপাখানা হস্তান্তরিত করিলেন, 'ভারতী'র সম্পাদকতা ত্যাগ করিলেন, সবকিছুর সহিত বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এই বৈরাগ্যের যুগে শিশিরকুমারের সহিত বন্ধুত্ব এবং বাংলার রঙ্গালয়ের সহিত তাঁর সংশ্রবের সূচনা।

* * *

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর মণিলাল প্রধানত রঙ্গালয়ের উন্নতির চেষ্টা করেই কাটিয়েছিলেন এবং এই জন্যে তাঁর সাহিত্য-সাধনা বড় কম ক্ষুন্ন হয়নি। মঞ্চশিল্পের উন্নতির জন্য তিনি কার্যক্ষেত্রকে সংকীর্ণ না রেখে নিজের উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন রঙ্গালয়ের বন্ধু, ডাক এলে তিনি সকল রঙ্গালয়েই গিয়ে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতেন। শিশিরকুমার কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার পরিত্যাগ করলে পর তার অবস্থা হয় অত্যন্ত অসহায়। সে-সময়ে ম্যাডান কোম্পানীর আহ্বানে তিনি গিয়ে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর অধ্যক্ষতায় ও শিক্ষকতায় কয়েকখানি নাটক বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। প্রতিভাধান সঙ্গীত-শিল্পী স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে নাট্যজগতে সর্বপ্রথমে তিনিই আবিষ্কার করেন এবং প্রধানত তাঁর জন্যেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে (বর্তমানে স্বর্গত) ঐ সময়েই রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

উচ্চশ্রেণীর নৃত্য-পরিকল্পনায় বর্তমানে বাংলা রঙ্গালয়ে মণিলালের কোন প্রতি-দ্বন্দ্বী নেই। তাঁর পরিকল্পিত নাচগুলি ভাবের সুষমায়, রসরূপের মাধুর্যে, কল্পনার ঐশ্বর্যে ও আর্টের সূক্ষ্মতায় বাংলা রঙ্গা-লয়ে যুগান্তর আনয়ন করেছে। 'সীতা'র 'রূপসায়রের দোদুল দোলে' গানের সঙ্গে নাচ এবং স্টারের 'ফুল্লরা'র অধিকাংশ নাচ এ-বিভাগে তাঁর অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেবে। এছাড়া আরও কোন কোন রঙ্গালয়ের অসংখ্য নৃত্য তাঁর পরামর্শে উন্নত হয়ে উঠেছিল।

রঙ্গালয়ের জন্য তিনি যে কি-রকম হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতেন, তাও উল্লেখ-যোগ্য। [illegible] করে [illegible] তাঁকে সতেরো আঠারো ঘণ্টা ধরেও পরিশ্রম করতে দেখেছি। তাঁর এই পরিশ্রম কত অযোগ্য লোককে লাভবান করে তুলেছে, কিন্তু বিনিময়ে তিনি নিজে কোনদিন কিছু প্রার্থনা করেননি। যখন কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের ভার নিয়ে-ছিলেন, ম্যাডান কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তখন তাঁকে স্বেচ্ছায় মাসিক কয়েকশত টাকা করে পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই কান পাতেন নি।

মণিলালের শেষ গ্রন্থ 'মৃত্যুর মুক্তি' এই রঙ্গালয়-যুগে রচিত। তাঁর ছোট ও বড়দের জন্য লেখা গল্পে ও অনুবাদে যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাই, 'মৃত্যুর মুক্তি' গীতি-নাট্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এমন অপরূপ রচনা যে-কোন সাহিত্যের গৌরব।

তাঁর সাহিত্যচর্চার আরম্ভ হয় কৈশোরে। বিদ্যাচর্চা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, ব্যায়ামেরও চর্চা করিয়াছিলেন। বীরাষ্টমী উৎসবের আদি যুগে তিনি অসিচালনা ও লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। রন্ধনেও তাঁর পটুত্ব ছিল, বনভোজন উপলক্ষে একাধিকবার সে প্রমাণ পাইয়াছি।"

—[illegible]

অঙ্গনা

পর্বতারোহণ : প্রদর্শনী

অজানাকে জানার এবং অদেখাকে দেখার দুর্বার আকর্ষণ মানুষের চিরন্তনের। সেই অজানা আর অদেখাকে দেখতে মানুষ উত্তাল সমুদ্র, নিবিড় বন, তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে বারম্বার পদার্পণ করতে চেয়েছে। কখন বা সেই পদার্পণ সাফল্য এনে দিয়েছে, কখনো বা ব্যর্থ হ'য়ে নব-উদ্যমে পুনরায় অভিযান চালিয়েছে। জয়ী মানুষকে হতেই হবে। তাই কলম্বাসের অর্ণবপোত অজানা দেশ জয় করেছিল, তাই এভারেস্ট শৃঙ্গে মানুষের বিজয়-পতাকা সগর্বে উড্ডীন হয়েছে। চাঁদ আজ মানুষের নাগালের মধ্যে।

ঋক্ বেদে বর্ণিত আছে দেবরাজ ইন্দ্র একসময় পর্বতরাজি এবং দুরন্ত পাহাড়ী নদীকে সমুদ্রবক্ষে ধাবিত হবার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তখন এই পর্বতের ডানা ছিল এবং ইচ্ছেমত ডানা দিয়ে উড়তে পারতো। ডানা দিয়ে উড়তে উড়তে একসময় সে পৃথিবীপৃষ্ঠে টলমল করছিল আর ডানাগুলো মেঘের মত তার অঙ্গশোভা বর্ধন করতে লাগলো। এমনি করেই সৃষ্টি হ'ল পরম রমণীয় রূপে, রসে, গন্ধে ভরা গিরিরাজ।

গিরিরাজ হিমালয়ে দেবতাদের বাস। দেবালয় আর বিগ্রহের সমারোহ। প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রীর দল হিমালয়ের দেবদর্শনে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে শহুরে জীবন, জনপদ, সুখসম্পদ বঞ্চিত করে বিপদসঙ্কুল বরফাবৃত পর্বতে বারবার আরোহণ করেছে। উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গকে জয় করার বাসনায় পর্বতারোহীর দল মাঝে মাঝেই পর্বত অভিযানে ছুটে চলেছে।

পর্বত অভিযানে বহুদিন পর্যন্ত পুরুষেরাই এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু বর্তমানে মেয়েরাও এব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। গত ৫ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে পর্বতারোহণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির এক মনোরম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দূতাগার, পথিকৃৎ (উইমেন ক্লাইমবারস্ অ্যাসোসিয়েশন) প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা তাদের বিভিন্ন অভিযানের আলোকচিত্র, ম্যাপ, আরোহণের যাবতীয় সংগ্রহ দিয়ে এই প্রদর্শনীটি অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে।
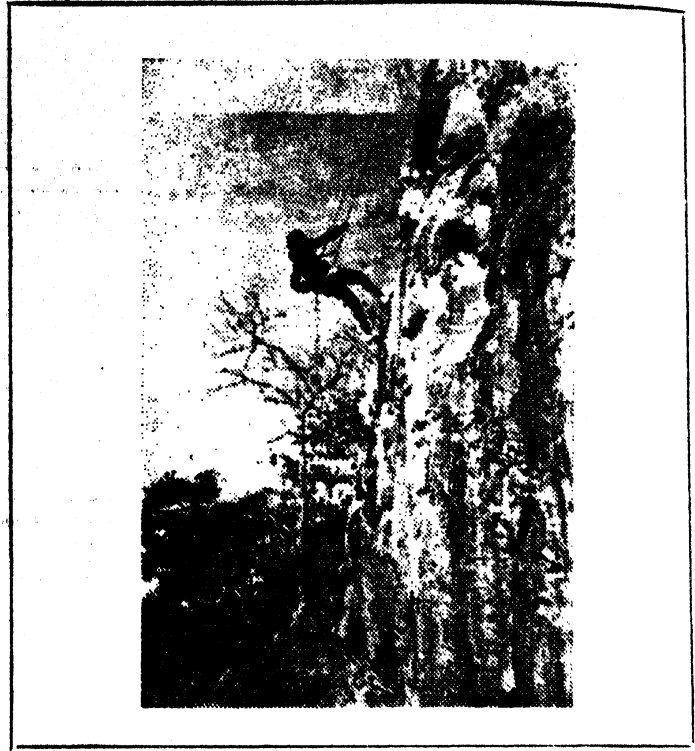
১৯৬৭ খৃঃ পথিকৃৎ মহিলা পর্বতারোহী সংস্থা অর্থাৎ একমাত্র মহিলা সংস্থার জন্ম হয়। মহিলা সংস্থাটির সর্বপ্রথম অভিযান রোনৃটি শিখর জয়। এর উচ্চতা ১৯,৮৯৩ ফিট। এই বিজয়ে সদস্যা সংখ্যা ছিলেন আটজন। মহিলা ডাক্তারের অভাবে তাঁরা একজন পুরুষ ডাক্তারকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই রোনৃটি শিখর অভিযান সমাপ্ত করতে তাঁদের প্রায় একমাস সময় লেগেছিল।

প্রদর্শনী কক্ষে আমি পথিকৃৎ-এর সম্পাদিকা ও দলনেত্রী মিস দীপালী সিন্‌হাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'এই যে মহিলা অভিযান করেছেন এতে সরকার ও অন্যান্য সব সংস্থার কতটা সহযোগিতা পেয়েছিলেন?'

আমার প্রশ্ন শুনে মিস্ সিন্‌হা বেশ আশাহতের সুরে বললেন, 'অনেক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে আমরা একরকম দৃঢ়সংকল্প করেই এই দুর্জয় অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলাম। সরকারী সাহায্যের অতি অল্পই আমরা ভাগীদার হতে পেরেছিলাম। বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিগত সাহায্যের ওপরেই আমাদের আর্থিক ও অন্যান্য চাহিদার অনেকটাই পূরণ হয়েছে।

'পাহাড়ে ওঠার সময়ে মেয়েরা সাধারণতঃ কতটা ওজন বহন করতে পারে অর্থাৎ কতটা ওজন বহন করতে সক্ষম?'

'তা প্রায় ধরুন পনেরো থেকে কুড়ি কেজি নিয়ে আমরা নিজেরাই ওপরে উঠতে পারি। তার মধ্যে আমাদের স্লিপিং-ব্যাগ, জলের বোতল, জামা-কাপড়, টয়লেটিং-এর কিছু উপকরণ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র থাকে। বাকিটা শেরপারাই বহন করে।'

'শিখরের কাছাকাছি এসে শিখরে ওঠার জন্য সকলেই নিশ্চয় অত্যন্ত আগ্রহী। সেক্ষেত্রে দলনেত্রী কাদের পাঠাবেন?'

'পাহাড়ে উঠে শিখরে ওঠার বাসনা দলের সকলেরই থাকে তবুও দৈহিক পটুতার ওপরে ক'জন উঠবেন তা দলনেত্রীই নির্দেশ করবেন। সবচেয়ে বড় কথা চূড়ায় যিনিই উঠুন সাফল্য কিন্তু গোটা দলের।'

'অভিযানে যেসব মেয়েরা অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের কিভাবে নির্বাচন করা হয়, ট্রেণিং প্রাপ্ত তো অনেক মেয়ে রয়েছেন?'

'সাহসী এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা যেতে রাজি এবং দলের স্বার্থে খাটতে পারবেন তাঁদেরই অভিযানে দলভুক্ত করা হয়।'

রোনটি শিখর জয়ের উপহারস্বরূপ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে সিলভার কাসকেট দিয়ে দলটিকে অভিনন্দিত করেছেন।

১৯৬৯ খৃঃ পথিকৃৎ-এর পরবর্তী অভিযান বড়শিগরী। এর উচ্চতা ১১,৭৬০ ফিট। এবারের সদস্য সংখ্যা একজন ডাক্তারসহ সাতজন। শিখরে আরোহণ করেছিলেন চারজন। বড়শিগরীতে এই মহিলা অভিযাত্রী দলটিই সর্বপ্রথম পদার্পণ করেছে।

১৯৭১ খৃঃ এই সংস্থার পরবর্তী অভিযান ছোটা শিগরী। শোনা যায় এক সময় এই কাছাকাছি অঞ্চলে ভারত ও তিব্বতের লোকেদের মধ্যে গোপনে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, এই ছোট শিগরীতে যাবার পথে পাঁচটি খরস্রোতা নালাকে অতিক্রম করতে হয়। এই খরস্রোতা একটি নালায় পড়ে শ্রীমতী সুজয়া গুহ পরলোকগমন করেন।

মানালি থেকে লাদাক যেতে যে পথ রয়েছে সেখানে বাতাল নামে একটা জায়গায় শ্রীমতী সুজয়া গুহর একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৭০ খৃঃ পথিকৃৎগোষ্ঠী কুলু হিমালয় অঞ্চলে (উচ্চতা ১৬০০০ ফিট) অভিযানের জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালান।

প্রদর্শনীর আলোকচিত্রগুলির মধ্যে হিমালয়ের বিভিন্ন জাতি, তাদের কর্মময় জীবন, গাছপালা, বিশেষ করে রূপকুণ্ডের ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিশূল পর্বতের হিমবাহের প্রান্তবর্তী 'রূপকুণ্ড' নামক স্থানে কিছু মানুষের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। আরও পাওয়া গেছে সেই মানুষের ব্যবহৃত লাঠি, বাসন-কোসনের টুকরো, জুতো, শাঁখের অলঙ্কার ইত্যাদি। প্রদর্শনীতে এসবগুলোই দেখানো হয়েছে। কুণ্ডটি বছরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবৃত থাকে। প্রবাদ আছে এরা ছিল তীর্থযাত্রী। নন্দাদেবীর অর্থাৎ গৌরী-দেবীর পুজো দিতে এরা 'ত্রিশূল' নামক স্থানে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ঝড়ঝঞ্ঝায় এদের মৃত্যু হয়।

আরও একটি চলতি প্রবাদ রয়েছে কুমায়ুনের রাজা যশোদয়াল সিং সৈন্য সামন্ত, সভাসদ নিয়ে হেমকুণ্ডে তীর্থে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর গর্ভবতী রাণী। পথিমধ্যে রাণীর একটি সন্তানের জন্ম হয়। এই পাপে হিমালয় দেবতার রাগে তুষার, ঝড়জলে সকলের মৃত্যু হয়। আনুমানিক এ কঙ্কালগুলো ছশো বছর আগের। এখনও তীর্থযাত্রী বা অভিযাত্রী দল গেলে সালঙ্কারা বহু নারী, পুরুষ ও শিশুদের কঙ্কাল দেখতে পাবেন।

পর্বতারোহীদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক, দস্তানা, দড়ি, বরফের কুড়াল, বাতাস প্রতিরোধক কোট, দড়ির মই, কাটুম-কুটুম, তাঁবু প্রভৃতি দিয়েও প্রদর্শনী কক্ষ সজ্জিত হয়েছিল। জিওলজি-ক্যাল সার্ভে, নৃতত্ত্ব বিভাগ, দূতাগার, পর্বত অভিযাত্রী সংঘ, হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট সকলেই এই প্রদর্শনীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কাটুম-কুটুম-এর বিচিত্র ভঙ্গী দর্শক সাধারণের কাছে বেশ উপভোগ্য।

মিস্ সিন্‌হাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'পর্বত অভিযানে মেয়েরা কেমন উৎসাহী?'

মিস্ সিন্‌হা বললেন, 'উৎসাহের তো কমতি কারো নেই। এই কলকাতাতেই প্রায় একশো ট্রেনিংপ্রাপ্ত মেয়ে আছে। কিন্তু পাহাড়ে যাবার কথা হলেই অনেকে পিছিয়ে পড়েন। অনেকে নানা অসুবিধায় পাহাড় ছাড়া করেন।'

ওঁর কথা থেকে মনে হল ট্রেনিং নিতে আগ্রহী হলেও জীবনের ঝুঁকি নিতে বোধহয় অনেকেই অগ্রণী নন।

'শুশুনিয়া পাহাড়ে আপনাদের যে ট্রেণিং সেন্টার রয়েছে তাতে শিক্ষার্থিনীদের ভীড় কেমন?'

'উৎসাহী শিক্ষার্থিনীদের অভাব কিন্তু আমরা দেখছি না।'

উৎসাহ, উদ্দীপনা নিশ্চয়ই আছে নইলে সভ্যজগতের বাইরে অসীম কৌতূহলে বরফের রাজ্যে মরণকে উপেক্ষা করে এরা এগিয়ে যেত না। বললাম, 'প্রচণ্ড তুষার-পাতে বা বড় বড় পাথর যখন পাহাড় গড়িয়ে নীচে পড়ে অথবা প্রচণ্ড প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েছেন তখন আপনাদের মানসিক অবস্থাটা কেমন হয়েছে? ধরুন শিখরের কয়েক'শ গজ দূরে এসে থমকে দাঁড়াতে হল।'

'এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো অভিযাত্রীদের নিত্যকালের সাথী। বিপদের মুহূর্তে চিন্তিত হলেও দমে যাওয়ার কথা একটুও চিন্তা করতে পারি না। এখন আমরা-নারীরা পুরুষের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি সেখানে পিছিয়ে পড়ার কথা ভাবা যায় না।'

বললাম, 'এই প্রদর্শন সম্বন্ধে দর্শকের কৌতূহল কেমন?'

মিস্ সিন্‌হা হতাশ সুরে বললেন, 'দর্শকের সংখ্যা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। তাছাড়া মেয়েদের এঘরে উঁকি দিয়ে গেলেও ভেতরে ঢুকে দেখার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই।'

প্রদর্শনী কক্ষটি যেভাবে সাজানো হয়েছিল সেটা সত্যিই দর্শকের কৌতূহলের উদ্রেক করে। আমার উপস্থিতির সময়-টুকুতে বেশী ভীড় না হলে যারা এসে-ছিলেন তাঁরা কিন্তু বিস্ময়ভরা দৃষ্টি ও অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

—অঞ্জলি চৌধুরী

সেই শিলঙে আবার এলাম।

যে শিলঙে বসে একদিন দেখতাম শৈলস্বপ্ন, গভীর রাতের নির্জনতায় শুনতাম পাইন বনে বনে বাতাসের বন্যার কলকল্লোল। যে শিলঙে আমার দীর্ঘ অনাদৃত, অবহেলিত জীবনের ধূসর রিক্ত ডালা ভরিয়ে দিয়েছিল রক্তিম প্রণয়পুষ্পের স্তবকে স্তবকে। আবার যে শিলঙের মেঘমন্দ্রিত মল্লার রাগিণীর ধারাবর্ষণের সাথে আমার বেদনাহত অন্তরের অশ্রুধারা মিশে গিয়েছিল এক হয়ে। সেই শিলঙে আবার ফিরলাম এবারে অনেক দূর থেকে অনেক সাগর পেরিয়ে, চারটি মহাদেশের মাটি ছুঁয়ে, নানা শহর-বন্দর স্পর্শ করে আবার দাঁড়ালাম শিলঙের সেই দীর্ঘোন্নত পাইনশ্রেণীর তলায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম, সরল গাছের সেই অম্লকটু আঘ্রাণ, কুহেলিকা মিশ্রিত বাতাসের সেই মৃদু হিমস্পর্শ, বিদেশে বিগত এক যুগ যেন মুহূর্তের মধ্যে অলীক হয়ে গেল, পরম নিশ্চিন্তে আমি চোখ বুজলাম। মনে হ'ল, যেন এইখানেই থাকি, এইখানেই আছি, আর কোথাও যেন যাই নি, এই শৈলাবাস পরিত্যাগ করে কোনোদিন, এইখানেই আমার অপরিবর্তিত অমর আত্মার আবাস সেই অশ্রু-বিক্ষুব্ধ দিনগুলি থেকে, যখন তিনটি মেয়েকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন-মিনার।

প্রথমে এসেছিল শ্রীমতী। গৌরাঙ্গী, ভ্রমরকৃষ্ণ কালো দুটি চোখ। সুডৌল গ্রীবার একপাশ দিয়ে নেমে আসা উদ্যত সর্পিনীর মতো বেণী। শ্রীমতী ছিলো আমারই সহ-কর্মিণী। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতাম তার সেই বেণী যেন সাপের মতোই তার ঘাড়ের এখানে ওখানে দুলছে, আছড়ে পড়ছে সামনে পিছনে। দেখতে দেখতে যেন সম্মোহনের ঘোর লাগতো। তখন যেন একরকম জোর করেই চোখ ফিরিয়ে কাজে মন দিতাম। এইভাবেই আড় চোখে তাকাতে তাকাতেই একদিন চারচোখের মিলন হোল। শ্রীমতী তাকালো আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে। কতক্ষণ নির্নিমেষে আমরা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম জানি না। একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে শ্রীমতী শুধালো

—কি দেখছেন?

বললাম,—তোমাকে।

শ্রীমতী একটু হেসে ঘাড় কাত করে আবার তার টাইপরাইটারের ওপরে ঝুঁকে পড়লো। সর্পিণীর মতো তার বেণী—ফণা তুলে পিছন থেকে ঘুরে এলো সামনের দিকে।

সেদিন বিকেলে অফিস ছুটির পর শ্রীমতী ডাকলো আমায়।

—আজ সন্ধ্যায় কোনো কাজ আছে কি?

—না তো।

—চলুন তাহলে, এই সামনের ওয়ার্ড লেক থেকে বেরিয়ে আসি।

ওয়ার্ড লেক। শিলঙের একটি বিউটি স্পট। আমার অফিসঘরের জানলা দিয়ে দেখতাম তার নীল নিথর নিস্তরঙ্গ জল, যার ওপরে ছায়া পড়েছে দেবদারু ও পাইন গাছগুলির। যার জলপ্রান্ত আলোকিত হয়ে আছে বহু বর্ণালী পুষ্পের প্রতিবিম্বতে। অপরাহ্ন বেলায় ঝিরঝিরে বাতাসের দোলায় সে লেকের জল কাঁপে থরো থরো।

সেই ওয়ার্ড লেকে গেলাম শ্রীমতীর সঙ্গে। সেই সন্ধ্যায় তার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। তবে মনে আছে, যখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল, ত্রিকোণাকৃতি পাইনশীর্ষে অপরূপ মায়াময় চাঁদ উঠলো, তখন আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম লেকের সেই ছোট্ট পোলটির ওপরে পাশাপাশি। আমাদের [illegible] রুপালী [illegible] আমাদের দুটি হৃদয়ের তীব্র কামনা-[illegible]। সেই পুষ্প-প্রতিবিম্বের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝি আমরা তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। না-বলা যে বাণী উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আমাদের দুজনের অবরুদ্ধ কণ্ঠে, শ্রীমতী একসময় তাকে দিল ভাষায় অভিব্যক্তি।

সেই প্রথম আমার কাছে এক কুমারী মনের প্রেম-নিবেদন। আকাশ থেকে নেমে আসা রুপালী বন্যায় আমাদের অকুণ্ঠ অবগাহন।

তারপর থেকে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম শ্রীমতীর মাঝে। রোজ অফিস ছুটির পর আমরা দুজনে হাত-ধরাধরি করে নেমে যেতুম প্রথম ওয়ার্ড লেকে, তারপর সেখান থেকে দুজনে চলে যেতুম লোকালয় থেকে দূরে ঘন বনানীর নির্জনতায়, যেখানে নীরবতা ভঙ্গ করত শুধু পাহাড়ী ঝর্ণার উচ্ছল কলকল ধ্বনি। সেখানে একসময় আমাদের পথচলা, হাসি কথা গান সব ফুরিয়ে যেতো, তখন শুধু অনুভব করতাম অরূপণ ও উদার প্রকৃতির কোলে বসে পরস্পরের সুনিবিড় উষ্ণ সান্নিধ্য। আমরা যে এক সুনিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিলাম, সে বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। আমাদের বন্ধুমহলও এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিলো।

এমন সময় প্রণয়-দিগন্তের সীমানায় দেখা দিলো ঝড়ের ইশারা। আমাকে চলে যেতে হল দিল্লী মাস দুয়েকের জন্যে। শ্রীমতীর চিঠি পেতাম নিয়মিত, আমিও লিখতাম। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার যে স্বপ্ন, তারও ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলাম দিল্লীতেই, কারণ সেখানেই তখন মা-বাবা থাকতেন। তবুও যখন শিলঙে ফিরলাম, দেখলাম আমাদের দুজনকে কেন্দ্র করে যে সমান্তরাল রেখা, তা রূপ নিয়েছে এক ত্রিভুজের। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভাব হয়েছে আর এক পুরুষের। আশ্চর্যের কথা, আমি তাকে চোখে দেখিনি কোনোদিন। শ্রীমতীও প্রথমে সব কিছু অস্বীকার করতো। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তার আচরণে পার্থক্য। অফিসের অছিলায় আমার সঙ্গ সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস।

অফিসের ছুটির [illegible] চুপচাপ বসে থাকতা[illegible] ফায়ারপ্লেসে জ্বেলে [illegible] সেই আগুনের ছোঁয়া লাগতো আমার অন্তরে। শ্রীমতীর চারিত্রতা, তার ভ্রমণে অসম্মতি, সব কিছুই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতো যে আমাদের দুজনের মাঝখানে নেমে এসেছে যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের ব্যবধান। তারপর এক সময় শ্রীমতী ঘর ছেড়ে চলে যেতো। অপসৃয়মান তার ছায়া-মূর্তির পানে তাকিয়ে আমি শুধু জ্বলতাম এক নিষ্ফল কামনার বহ্নিশিখায়।

শ্রীমতী আমাকে কোনোদিন কিছু বলে নি। জেনেছিলাম কোনো বন্ধুর কাছে সেই অজ্ঞাত পুরুষের অস্তিত্ব, যে আমার প্রেয়সীর হৃদয় থেকে আমাকে সরিয়ে নির্বিবাদে সেখানে নিজের স্থান করে নিয়েছে। এক একবার মনে হতো, দিল্লী আমি না গেলেই হয়তো ভালো করতাম। পরক্ষণেই ভাবতাম, না, এই হয়তো ভালো হলো। এই ই যদি হবার ছিল, তাহলে কোনো না কোনোদিন তো হতই। কিন্তু মনকে যতোই প্রবোধ বাক্যচাতুর্যে ভোলাতে চেষ্টা করি না কেন, অন্তরের দাবদাহে নিরন্তর দগ্ধ হতে লাগলাম আমি। না পাওয়ার চাইতে পেয়ে হারানোর বেদনা যে কতখানি অসহনীয় তা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম আমি।

লোকলজ্জা ও বেদনার জ্বালা এড়াতে আমি আত্মগোপন করলাম নিজের মধ্যে। কর্মক্ষেত্রের বাইরে কিছুদিন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করলাম। শিলঙের শীতরিক্ত প্রকৃতির দৈন্যের মাঝে আমি অন্তরের দৈন্য মিলিয়ে যেন একাত্মবোধ করতাম। শ্রীমতী চলে গিয়েছিল চাকরি ছেড়ে, তার নবলব্ধ প্রেমিকের মাঝে ঘর বাঁধবারই প্রত্যাশায় বুঝি। তাকে বিস্মৃত হবার জন্যে নিজেকে ক্রমে পরিব্যাপ্ত করেছিলাম নানা কর্ম-ব্যস্ততার মাঝে। কিন্তু শ্রীমতী কি সহজে ভুলবার?

শীতের শেষে যখন শিলঙের পথে পথে রক্তপলাশ ফুটলো, আমার হৃদয়ে অনুভব করলাম যেন তারই জ্বালাময়ী উষ্ণতা। বুঝলাম, শ্রীমতীর হাতে জ্বালানো অগ্নি-শিখা আজো সেখানে জ্বলছে অনির্বাণ। সেদিন নিজের মনেই গেয়েছিলাম—'রোদন-ভরা এ বসন্ত, সখি, কখনো আসে নি বুঝি আগে, মোর বিরহ-বেদনা রাঙালো কিংশুক রক্তিম রাগে।'

অবসর সময়ে রাজনীতি ধরলাম। সঙ্গীত, নাটক, কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। কিন্তু কোথায়, শ্রীমতীর হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পেলাম না কোনোখানেই। দিবাস্বপ্নে, গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে সেই বিগত দিনগুলির কথা আমার মনে ভিড় করে আসতো। সবুজের কান ঢেকে যাওয়া পাইনের বন-ছায়ায় আমাদের চুপিচুপি কথা কওয়া যেন আবার মুখর হয়ে উঠতো অতন্দ্র প্রহরে। [illegible] কান পেতে শুনতাম [illegible] যেন কার পদধ্বনি। [illegible] কত নিদ্রাবিহীন রাত।

শেষে দেখলাম, আর কোনো উপায় নেই। আমাকে শিলঙ ছেড়ে চলে যেতেই হবে। এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

আমার সেই সংঘাতময় মুহূর্তে যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝে সেতু রচনা করেছিল, আর একটি মেয়ে। নাম তার শ্যামলী।

নৃত্য-পটিয়সী সংগীত-নিপুণা বিদুষী মানস-মেয়ে শ্যামলী। আলাপ আমার তার সঙ্গে কৃষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমেই। শ্রীমতীকে হারানোর দুঃসহ বেদনায় যখন আপন গৃহকোণে আত্মগোপন করেছিলাম, তখন শ্যামলী আসতো আমার কাছে আগামী কোনো নৃত্যনাট্য বা নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা নিয়ে। ওর সঙ্গে কথায় কথায়, গল্পে গল্পে বিস্মৃত হতাম আত্ম-গ্লানি, মুছে ফেলতাম অন্তরের কালিমা। শ্যামলীর কাছে স্বীকৃতি পেতাম নিজের পৌরুষের ও ব্যক্তিত্বের। আমার ও শ্রীমতীর মধ্যে যা ঘটেছিল তা শ্যামলী জানতো কিনা সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করিনি কোনোদিন। তবে সে তার দরদী মন নিয়ে যেভাবে আমার কাছে এগিয়ে আসতো তাতে মনে হতো আমার পূর্ব-ইতিহাস বোধকরি তার অবিদিত নেই।

সেই কৃষ্ণাঙ্গী, তন্বী, মাথায় একরাশ কুঞ্চিত কেশদামের অধিকারিণী শ্যামলী। একটি পরিচিতা মেয়ে ছাড়া যাকে আর কিছু ভাবতে পারিনি কোনোদিন, সেই শ্যামলীর জন্যে একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি প্রতীক্ষা করতে শুরু করেছি। ও সময় মতো না এলে যেন চঞ্চল হয়ে উঠতাম। প্রথমে ভাবতাম এ বুঝি আমার নিঃসঙ্গ মনের সংগকামনা মাত্র। কিন্তু সে যে তার চাইতে গভীরতর কিছু তা উপলব্ধি করলাম আমার জীবনের সেই অবিস্মরণীয় রাতটিতে।

আমাদের আলাপ-আলোচনার পর আমি শ্যামলীকে সন্ধ্যার পর প্রায়ই তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতাম। লাবান পল্লীর উপর দিয়ে ঘন পাইনশ্রেণী ভেদ করে একা শুঁড়িপথের আকারে যে রাস্তাটি সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে সুগভীর বনানির মধ্যে হারিয়ে গেছে—আবার বেরিয়ে এসেছে অপার মোগার অঞ্চলে সেই জনহীন দীর্ঘ বনপথে পদক্ষেপ পড়তো আমাদের দুজনের। কেবল কচিৎ দু' একজন খাসি বা জয়ন্তীয়া কাঠুরেকে ওপথে আনাগোনা করতে দেখেছি। সেদিন শ্যামলী এলো

বেশ একটু বেলা করেই। তারপর একটি নতুন নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। এক সময় কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বললুম—আজ আর নয় শ্যামলী অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়ী চল এখুনি। নইলে আবার ঐ অন্ধকার পথে যেতে তোমার ভয় করবে!

শ্যামলী রহস্যময় হাসি হেসে বললে—কেন, আজ পূর্ণিমার রাত না?

তার সেই হাসির অর্থ বুঝেছিলাম আরো কিছুক্ষণ পরে। শিলঙের পাহাড়ে পাইনবনে মেঘহীন জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। ঝিলমিল চাঁদোয়ার গালিচাপাতা পথে পথে পায়ে পায়ে আমরা চললুম। পথের পাশে একটু উন্মুক্ত স্থান চোখে পড়লো, যেখান থেকে নীচের শিলঙ শহরের আলোর ঝিকিমিকি দেখা যায়। সামনেই একটি দীর্ঘ ঋজু সরল গাছ, তার গায়ে হেলান দিয়ে দণ্ডায়মান আমি। শ্যামলীকে বললাম, দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নিই। শ্যামলী এগিয়ে এলো আমার কাছে, খুব কাছে। আমি আঘ্রাণ পেলাম তার কেশের মৃদু উষ্ণ সৌরভের। অস্পষ্টভাবে দেখলাম তার দীর্ঘায়ত নয়নের দুই তারায় এক অতন্দ্র গভীর দৃষ্টি, যা আমার দু চোখে নিবদ্ধ। তারপরে কি হলো জানি না। শুধু মুহূর্ত পরে দেখলাম শ্যামলীকে আমার সুনিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে।

সেই অবিস্মরণীয় রাতে ঐভাবে আমাদের কত পল কত প্রহর কেটেছিল জানি না। সম্বিৎ ফিরেছিল, যখন শ্যামলী ধীরে ধীরে আমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—

—অনেক রাত হল। চল, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে?

বাধা দিয়ে বলতে গিয়েছিলাম—কিন্তু শ্যামলী—

শ্যামলী তার চম্পকাঙ্গুলী আমার মুখে ঠেকিয়ে বলেছিল—

—চুপ, আর কোনো কথা নয়, এবার বাড়ী চল।

বাকি পথ সে আর আমাকে কোনো কথা বলতে দেয় নি। আর আমার মন-সমুদ্রে উঠেছিল ঘূর্ণিঝড়। সৃষ্টি করেছিল উত্তাল তরঙ্গের। আর সেই তরঙ্গ আমার মানস-তটে আছড়ে পড়ে যেন শতসহস্র চূর্ণ ঊর্মির জন্ম দিয়েছিল। সেই আঘাতে খানখান হয়ে গিয়েছিল আমার অন্তরের একাগ্রতা, যেন দিকভ্রান্ত হয়ে আমি হয়েছিলাম দিশাহারা।

কিন্তু বড় অদ্ভুত মেয়ে ছিল এই শ্যামলী। কিছুতেই ধরা দিতো না সে আমার কাছে। শুধু বলতো—আমার সান্নিধ্য তোমার শিল্পমনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, তোমার মধ্যে—সাধারণ মানুষের দুর্বলতা এনে, এ তো আমি চাই নি।

বলেছিলাম—পঙ্গুত্ব নয়, অনুপ্রেরণা পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।

ঘাড় দুলিয়ে শ্যামলী বলতো—তাহলে তোমার মধ্যে এ দুর্বলতা আসে কেন?

—কিসের দুর্বলতা?

—আমাকে একান্তভাবে পাবার জন্যে। এইভাবেই আমার সান্নিধ্য হতে সরে যেতো শ্যামলী। কিন্তু ওর সঙ্গে শিলঙে কত নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করলাম, কতো সঙ্গীতের আসর বসালাম, তার ঠিক নেই। শ্যামলীর ঘনিষ্ঠতায় ক্রমে বিস্মৃত হলুম শ্রীমতীর স্বপ্নিল স্মৃতি। এক মানসিক অপমৃত্যু ও এক নতুন জীবনের মাঝে এক সেতু রচনা করে শ্যামলী যে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল এপারের মরু থেকে ওপারের শ্যামলিমায়, তা বুঝেছিলাম অনেককাল পরে, বহুদূরে প্রবাসে। কিন্তু শ্যামলী ছিল আমার কাছে স্বাতীনক্ষত্রের মতোই, দুর্লভ অথচ পরম সান্ত্বনা স্বরূপ।

সে যখন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো, তখন আমি শিলঙের শিল্প-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, নৃত্যগীত ও নাটক সমারোহের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তখন। শ্যামলী যে আমাকে সেতু পার করে সরে যাচ্ছে, তা উপলব্ধি করার সময় নেই তখন। কিন্তু সরে গেলেও আমার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ছিল শ্যামলী, সহযোগিতা করেছে সে অকুণ্ঠভাবে। আমার ডাক আসতো নানা স্থান থেকে, শ্যামলীকে দেখতাম সর্বদা আমার আশেপাশে। তখন কি আর জানতাম যে শ্যামলী ছিল সেই জাতের মেয়ে যে কোনোদিন কারুর কাছে বন্ধন স্বীকার করে না?

দূরে নক্ষত্রের মতোই দুর্লভ হয়ে রইলো শ্যামলী আমার কাছে, কিন্তু আশ্চর্য, তাকে কেন্দ্র করেই আমি যেন ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হলাম শ্রীমতীকে পেয়ে হারানোর দুঃসহ বেদনা, অন্তরের জ্বালাময়ী দাবদাহ ক্রমে প্রশমিত হলো শ্যামলীর স্নিগ্ধ সাহচর্যের বারি-সিঞ্চনে।

সেই শিলঙে আবার এলাম প্রায় এক বছর পরে। এই সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে বহু জল বয়ে গেল জীবন-সাঁকোর তলা দিয়ে। শিলঙ থেকে বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলাম প্রথমে লক্ষ্ণৌ, তারপর দিল্লী, সেখান থেকে খাসা সুযোগ পেয়েছিলাম সুদূর আমেরিকার এক সরকারী কাজের। প্রথমে মেয়াদ ছিল দু বছরের, তবে একবার বিদেশে গেলে সচরাচর যা হয়, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। দু বছরের জায়গায় আজ তাই ওদেশে প্রায় ১২ বছর হতে চললো। এই প্রথম এলাম শিলঙে তারপর দিনকয়েকের জন্যে। ছুটি অন্তে আবার সাত সাগরে পাড়ি জমাতে হবে।

শ্রীমতী ও শ্যামলী হয়তো আছে এই শিলঙেই। কে জানে? এতোদিনে নিশ্চয়ই তারা দুজন অপর পুরুষের সহগামিনী। তা হোক্‌গে দেখা করতে নিশ্চয়ই কোনো বাধা থাকবে না। মার্কিন মুল্লুকে এক-যুগব্যাপী আমার জীবনধর্মকেই বোধহয় পাল্টে দিয়েছে। কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুক মন আমার হয়ে উঠেছে কঠোর বাস্তবধর্মী। সেই মেঘমায়াময় দ্বিপ্রহরে সরল গাছের অল্পকটু আঘ্রাণ নিতে নিতে নিমীলিত নেত্রে ভাবলাম, খোঁজ নিয়ে দেখাই যাক না এই দুটি মেয়ের, যাদের কেন্দ্র করে একদিন আমার জীবনে ঝড়ের সূচনা হয়েছিল।

পাইন বনের নিভৃত নীড়ান্তরাল থেকে হোটেলে ফিরলাম। ফোন করলাম আমার পুরোনো বন্ধু বর্তমানে এক উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে রাম গোস্বামীকে। রাম আমার কণ্ঠস্বরে অবাক।

—আরে তুমি হঠাৎ শিলঙে উদয় হলে কবে?

—এই তো, এলাম তোমাদের দেশে হাওয়া বদলাতে।

—কেন, আমেরিকার জলহাওয়ায় অরুচি ধরে যাচ্ছিল বুঝি?

বললুম—কতকটা সেইরকমই। এখন কাজের কথা শোনো। দু একদিন মাত্র শিলঙে থাকছি। আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই। ভালো কথা—শ্রীমতী ও শ্যামলীর খবর জানো কিছু?

রাম তার পরিচিত উচ্চকণ্ঠে হাসলো।

—ও! এই তোমার কাজের কথা। কেন, এতো মার্কিন সুন্দরীদের সঙ্গে প্রেম করেও শিলঙের এই নগণ্য মেয়েদুটিকে ভুলতে পারোনি দেখছি!

বাধা দিয়ে বললাম—ঠাট্টা রাখো রাম। আজকে বিকেলে ওদের কাছে আমায় কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যেতে পারো?

—নিশ্চয়ই। তবে স্বামীপুত্রকন্যাসহ তারা নিশ্চিন্তে ঘর করছে—এখন তুমি এভাবে—

—তুমি যাবে কিনা তাই-ই বলো।

—আলবৎ যাব। মার্কিন দেশ থেকে এলে, আর আমি তোমার জন্যে এটুকু করতে পারবো না? তুমি ৫টার পর তৈরী থেকো, আমি তোমায় পিক-আপ করে নিয়ে যাবো।

—থ্যাংক য়ু রাম,—বলে রিসিভার ছেড়ে দিলাম।

সেই সন্ধ্যায় রাম তার গাড়ী নিয়ে হাজির। বললে—আমার সঙ্গে তোমার যা বোঝাপড়া সে আর একদিন হবেখন, আজ হাতে সময় বেশী নেই, চল, এরই মধ্যে তোমায় তোমার প্রাক্তন প্রেমিকাদের কাছে নিয়ে যাই।

—ওরা তাহলে সত্যিই শিলঙে?

—আর যাবে কোথায়? তুমি তো অন্ততঃ একটিকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারতে? তা তো আর করলে না।

বলতে গেলাম—কিন্তু আমি তো—

কিন্তু আর বললাম না। চুপচাপ গাড়ীতে বসে রইলাম। পুলিশ বাজার, বড়-বাজারের জনারণ্য পেরিয়ে রামের গাড়ী ছুটলো আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে। একপ্রান্তের এক খাসীপল্লীর কিনারায় সে থামলো। বললে, এর বেশী আর গাড়ী যাবে না। সরু পথে হাঁটা দিতে হবে।

দুজনে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। অস্তোন্মুখ সূর্যের রাঙা আলো দূর পাহাড়ের পাইনশ্রেণীশীর্ষে সিঁদুর বুলিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সরল ও দেবদারু গাছের মাথায় মাথায় আগুন ধরানো, আকাশের রক্তিম মেঘস্তূপ হতে সোনা-ঝরানো ও পথের পাশে পাশে রক্তপলাশ ফোটানো এইরকম সন্ধ্যাগুলিতেই আমি বহুদিন আগে শিলঙ পাহাড়ের নির্জন পথে পথে হাত ধরাধরি করে বেড়াতাম শ্রীমতীর সঙ্গে।

ছোট বাগানঘেরা একতলা একটি বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রাম দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে একটি মহিলার মুখ উঁকি মারলো। আমাদের দেখেই ঘোমটা টেনে দিলেন উনি। রাম বললো—দেখ, কাকে এনেছি ধরে। চিনতে পারলে না?

মহিলা ঘোমটা সরালেন। চমকে উঠলাম। মুখ দিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বেরিয়ে এল—শ্রীমতী!

যে মুখ ছিল মার্বেলের মতো মসৃণ, সে মুখ আজ রেখাঙ্কিত। সর্পিণীর মতো উদ্যত বেণী আজ খর্ব হয়ে অবহেলায় এক-পাশে পড়ে আছে। পরণে ধূসর পুরানো শাড়ী, প্রায় নিরাভরণ সাজসজ্জা, তিন পুত্র-কন্যার জননী শ্রীমতী আমাকে দেখে ম্লান হেসে বললো—আসুন, কবে এলেন?

এই কি সেই শ্রীমতী, যার জন্যে আমার অন্তরের অতৃপ্ত কামনা ধিকিধিকি নিরন্তর জ্বলেছে একদিন? যাকে নিয়ে সুগভীর সুষুপ্তির ঘোরে স্বপ্ন দেখা ফুরায় নি আজো?

বসলাম আমি ও রাম শ্রীমতীর কাছে কতক্ষণ। আমার এককালীন প্রতিদ্বন্দ্বী, যিনি একদিন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আমার মানসীকে, যাঁকে কোনোদিন চোখে দেখিনি, তাঁর দেখা মিললো না। তিনি বাইরে। ছেলে-মেয়েগুলি একে একে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। বড়টির বয়েস বছর বারো হবে।

তারপর রাম আমাকে নিয়ে উঠে পড়লো।

বললাম—আজ আসি, শ্রীমতী।

তেমনি ম্লান হাসি।

—আসুন। শিলঙে এলে আবার দেখা করবেন। আমেরিকায় ফিরে কিন্তু আমাদের মনে রাখবেন।

ফেরার পথে রাম হাসলো। বললো—বুঝতে পারছি, আশ্চর্য হয়েছ, ধাক্কাও খেয়েছে। মানুষ বিধ্বস্ত হয় কালে। কত বছর হয়ে গেছে জানো?

রামেরই কথা প্রতিধ্বনিত করে যেন পাইন গাছের সারিতে হু-হু করে দীর্ঘ-শ্বাস উঠলো।

রাম বললো—কী হে। শ্যামলীকে দেখবে?

এর পর আর ইচ্ছে ছিল না। তবুও বললাম, চল।

আবার গাড়ী ছুটলো ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে মোখারের পথে। পিছনে সেই বড় পাহাড়টির মাথায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে মেঘদল। হয়তো বৃষ্টি নামবে। ঝিকমিক আলো জ্বলে উঠেছে বাড়ীগুলিতে।

মোখার পল্লীর একপাশে একটি পথে ঢুকে তৃতীয় বাড়ীটার সামনে গাড়ী দাঁড় করালো রাম। দরজা খুলে বললো—এসো।

নিরিবিলি পাড়ায় একটি নিভৃত বাড়ীতে আবার দরজায় টোকা। আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম। রমাকে বললম, তুমি শুধু বলো এক বন্ধু এসেছে।

দরজা খুললো। উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা।

—আরে, আপনি!

শ্যামলীরই গলা বটে। রাম হেসে বললো, তোমার এক পুরানো বন্ধু এসেছেন।

—কে? রজতবাবু নাকি?

এগিয়ে গেলাম। সেই শ্যামলী। সেই হাসি। কে বলে মানুষ বিধ্বস্ত হয় কালে? দুজনে ঘরে গিয়ে বসলাম।

রাম জিজ্ঞেস করলো—কর্তা কোথায়?

শ্যামলী হেসে বললো—আর কোথায়! রোজ সন্ধ্যায় যেখানে যায়, সেই পার্টি অফিসে।

রাম বললো—বিকাশ এখন তার পার্টির একজন ফুলটাইম কর্মী।

সেই শ্যামলী আগের চেয়ে বোধহয় একটু মোটা হয়েছে। মুখ-চোখ একটু ফোলা ফোলা। আট মাসের একটি কন্যা সন্তান কোলে। কিন্তু সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি আজো তেমনি। তেমনি মুখের হাসি ও তাকানোর ভঙ্গী। নেই শুধু আগের সেই চাপল্য। সেই অকারণে খিলখিল করে হেসে ওঠা ও ঘাড় দোলানো।

আমরা তিনজন বসে থাকি। এককালে তিন বন্ধু ছিলাম আমরা, মনে হয় এখনো আছি। কত সংগীতের আসর বসালাম আমরা, কত নৃত্যনাট্য ও নাটক মঞ্চস্থ করলাম। সেই সব কথাই আমরা বলি। শুধু বলি না, আমার অন্তরের মর্মকথা—আমার জীবনের ধূসর মরুতে অমৃতবারি সিঞ্চন করে যে শ্যামলিমা সৃষ্টি করেছিল শ্যামলী সে কথা, সেতু রচনা করে আমাকে দুঃখনিশার প্রান্ত থেকে এক নব প্রভাতের সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিল সে কথা।

কিন্তু আমরা তিনজনেই জানি যে অমৃত সে-সব কথা আজ অশ্রুতভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে আমাদের মন থেকে।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দ। শিলং-এর সেই খামখেয়ালী বৃষ্টি।

আমি, রাম ও শ্যামলী। দু-একটি টুকরো কথা মাঝে মাঝে। এখানে ওখানে একটু হাসির অভ্রকণিকা ছিটিয়ে দেওয়া। বাকিটুকু বোধহয় মনে মনে স্মৃতির রোমন্থন। এক সময় উঠে দাঁড়াল রাম। বলে—অনেক রাত হলো, যেতে হবে বহুদূরে পথ। ভাবলাম সত্যিই তো পথিক আমি, যেতে হবে বহুদূরে পথ, যে পথ বিস্তৃত সাতসাগর পেরিয়ে।

আসার সময় মনে হলো শ্যামলী একা, যেন ভীষণ নিঃসঙ্গ সে। হয়তো খুশী হয়নি এ বিয়েতে।

ফেরার পথে রাম জিজ্ঞেস করলো—কেমন দেখলে?

বললাম — জানি না।

—তাই তো বলছিলাম, এদের একটিকে তুমি অন্তত আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারতে।

গাড়ী দাঁড়ালো আমার হোটেলের সমানে। আমি দরজা খুলে নামবার জন্যে পা বাড়িয়ে রামের দিকে ফিরে বললাম—

রাম, শিলঙে তোমার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তুমি তো সবই জানো, তবে আর আজ একথা বলছ কেন

স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে রাম হেসে বললো—আরে, ঠাট্টা করছিলাম তোমার সঙ্গে হে, তাও বুঝলে না। বছর পনেরো আগে এই শিলঙের তিনটি মেয়ে তোমার জীবনে ঝড় তুলেছিল—তার একটিকে তো নিয়ে গেছ। বাই বাই। কাল দেখা হবে!

রাম গাড়ী ঘুরিয়ে চলে গেল।

গাড়ীর পিছনের অপসরমান রক্তিম আলোকবিন্দুদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হ'ল—রাম তার শেষের কথাগুলি না বললে আমার তিন-কন্যার কাহিনী অসম্পূর্ণই থেকে যেতো।

উজ্জ্বলা। এসেছিল শ্যামলীর পরে আমার জীবনে এক নতুন ঝটিকাবর্তের সৃষ্টি করে। তিন-কন্যার মধ্যে তাকেই বধূ নিয়ে গেলাম ওয়াশিংটনে। রামের এই অভ্রান্ত কথাগুলির মধ্যেই তার মূল্যের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে।

আবার ঝিরঝির বৃষ্টি। শিলঙের মেঘের অহেতুক খামখেয়ালীপনা। তাড়াতাড়ি হোটেলে ঢুকলাম।

সাতদিনের শুভাশুভ

২৪শে মার্চ থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকার ফল সাধারণভাবে নীচে দেওয়া হোল ঃ

মেষঃ বেকার লোক কাজের সুযোগ পেতে পারেন। সম্পদ-সম্পত্তি সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা। আয় ভাল। ব্যবসায়ে উন্নতির লক্ষণ আছে। কর্মক্ষেত্র মোটের ওপর ভাল। কিন্তু শারীরিক সুস্থতা বিঘ্নিত হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্র সুবিধার নয়। মহিলাদের পক্ষে বেশ ভাল সময়। শুভ তারিখগুলো ২৬, ২৮, ২৯ মার্চ।

বৃষ ঃ শারীরিক কষ্টভোগের লক্ষণ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র এক প্রকার। আর্থিক অনটন ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও কোন দুশ্চিন্তা সপ্তাহ শেষে থাকছে না। ব্যবসায়ে প্রভূত সাফল্য লাভের লক্ষণ আছে। সম্পদ-সম্পত্তির ব্যাপারে মামলা থাকলে তার রায় আপনার অনুকূলে যাবে। কর্মক্ষেত্র শুভ। মহিলাদের পারিবারিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। শুভ তারিখঃ ২৪, ২৯ মার্চ।

মিথুনঃ শরীরটা সুবিধার নয়। পারিবারিক অস্বস্তি, ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ঘটতে পারে। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকছে। ব্যবসায়ে শত্রুতার লক্ষণ আছে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতার লক্ষণ আছে। কিন্তু কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। মহিলাদের পক্ষে সময়টা চলনসই। শুভ তারিখঃ ২৬, ২৮ মার্চ।

কর্কটঃ আর্থিক উন্নতির প্রভূত সম্ভাবনা। ব্যবসায় মোটের ওপর ভাল। নতুন জায়গা-জমি কেনা, ঘরবাড়ী তৈরীর সম্ভাবনা আছে। কাজকর্মে স্বস্তি ও সুখ্যাতির লক্ষণ আছে। শরীর এক প্রকার। পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। মহিলাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা। শুভ তারিখ ঃ ২৪, ২৬, ২৯ মার্চ।

সিংহঃ শরীর ক্রমশ ভাল হবে। মানসিক উন্নতির লক্ষণ আছে। আয় এক প্রকার। ব্যবসায়ে উন্নতির লক্ষণ আছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, স্থানান্তরে গমনের শুভ সম্ভাবনা আছে। মহিলাদের মানসিক অস্বস্তি কমবে। শুভ তারিখ ঃ ২৪, ২৬, ২৯ মার্চ।

কন্যাঃ শরীরটা মাঝে মাঝেই খারাপ হতে পারে। পারিবারিক অস্বস্তি, উদ্বেগ থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্র চলনসই। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে বাধা বা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় এক প্রকার। সম্পদ-সম্পত্তির ব্যাপারে গোলমাল ও মামলার লক্ষণ আছে। কর্মক্ষেত্র সুবিধার নয়। মহিলাদের মন চঞ্চল থাকবে। শুভ তারিখঃ ২৪, ২৬, ২৯ মার্চ

তুলাঃ শরীরটা খুব ভাল নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। ব্যয়াধিক্যের চাপ বাড়বে; ব্যবসায়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। কাজকর্ম ভালই চলবে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা আশাপ্রদ নয়। শুভ তারিখঃ ২৬, ২৮, ২৯ মার্চ।

বৃশ্চিকঃ মানসিক অস্বস্তি ও শারীরিক অশান্তি ক্রমশ কমবে। আর্থিক ক্ষেত্র আগের তুলনায় এখন ভাল। বকেয়া অর্থ আদায় হতে পারে। ব্যবসায় মোটের উপর ভাল। কাজকর্মে মর্যাদা বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভের লক্ষণ আছে। মহিলাদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা। শুভ তারিখঃ ২৪, ২৬, ২৮ মার্চ।

ধনুঃ শরীর এক প্রকার। মাঝে মাঝে অস্বস্তি, বায়ুর চাপ, নিদ্রাহীনতায় ভোগ হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রেও অস্বস্তির ভাব থাকছে। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখঃ ২৪, ২৬, ২৮ মার্চ।

মকরঃ শরীর সুবিধার নয়। মাঝে মাঝে অসুস্থতার ভাব থাকবে। পারিবারিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। অবশ্য তা ক্রমশ কমবে। আর্থিক দুশ্চিন্তা প্রবল হতে পারে। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ আছে। মহিলাদের মানসিক উন্নতির যোগ আছে। শুভ তারিখঃ ২৪, ২৭, ২৮ মার্চ।

কুম্ভঃ মানসিক অস্বস্তি থাকবে। বায়ুর চাপ, ব্যথা-বেদনা, চোখের পীড়ায় ভোগ হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্র মন্দ নয়। কিন্তু ব্যবসায় সুবিধার নয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ। মহিলাদের মানসিক আনন্দ বৃদ্ধির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখঃ ২৪, ২৬, ২৮ মার্চ।

মীন ঃ শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক ক্ষেত্র সুখের হবে। আয় ভাল। ব্যবসায়ে সাফল্যের যোগ প্রবল। নতুন জায়গা-জমি, বাড়ী সংগ্রহের লক্ষণ আছে। কাজ-কর্ম মন্দ নয়। মহিলাদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ ঃ ২৪, ২৬, ২৮ মার্চ।

—শুক্রাচার্য

পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর

নিভা ঘোষ (ওয়ারসালিগঞ্জ)—স্বামীর কোষ্ঠী পাঠাবেন।

শ্রীকান্ত জেন (কলিকাতা ৫)—আগামী বৎসরে পাবার যোগ আছে।

তুষারকান্তি সিংহ (কলি-১৯)—৩৫ বৎসর বয়সের পর সুসময় শুরু। ৫·১৬ রতি গোমেদ বক্ষ ধারণ করতে পারেন।

অমরকুমার মুখার্জি (কলি-৫)—৩৫ বৎসর বয়সের পর ঈপ্সিত ফল পেতে পারেন।

কল্যাণ মিত্র (ব্যারাকপুর)—আগামী মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন। পাশ করা সম্ভব।

বিমলকুমার চৌধুরী (কলি-৪৩)—৪৪ বৎসরে সম্ভাবনা আছে।

ভাস্কর সরকার (কলি-৩৪)—আগামী জুলাই মাসের পর ভালো সময় শুরু হবে।

ভাস্কর ব্যানার্জি (কলি-১৪)—প্রবল বাধা আছে। অংশীদার হিসেবেই সম্ভব।

গৌতম বসু (কলি-৫০)—২৪ বৎসর বয়সে।

পূর্ণিমা মুখার্জি—ভালো।

লক্ষ্মী রায় (রহড়া)—১৭ এবং ১৯ বৎসর বয়সে যোগ আছে।

সুরেন্দ্রনাথ সিংহ (জামসেদপুর-১)—১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে হওয়ার যোগ।

তপেন রায়—আগামী জুন মাস থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। ঋণ শোধে দেরী হওয়া সম্ভব।

সুবোধ আচার্য চৌধুরী (কলি-১৯)—৫৩ বৎসর বয়সের পর ভালো হওয়া সম্ভব।

চিত্রালী সরকার (আলিপুর)—২৪ বছর বয়সে সম্ভব।

সুদীপা মুখার্জি (কলি-৯)—আশানুরূপ লাভে বাধা আছে।

অসিতবরণ সরকার (কলি-৩২)—আগামী জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

কার্তিক রায় (কলি-৩৭)—১৯৭৪ সালে উন্নতিসহ পরিবর্তন সম্ভব।

নিত্যানন্দ কীর্তি (কলি-৬)—আনুমানিক ৬৭ বৎসর। শেষ জীবন মোটের উপর ভালো।

বাবুল দাশগুপ্ত—বৃশ্চিক রাশি, কুম্ভ লগ্ন।

সুজিতকুমার দে (কলি-১২)—জন্ম-সন, তারিখ ও সময় পাঠাবেন।

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম........

জন্ম, সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও

লগ্ন...... ......

আপনার প্রশ্ন..........

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায়, খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন]

প্রেক্ষাগৃহ

ঠগিনী/ সন্ধ্যা রায়, পরিচালনা : তরুণ মজুমদার। —ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

(১) জঙ্গলমে মঙ্গল (হিন্দী)

কিরণ প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'জঙ্গলমে মঙ্গল' 'অভিশপ্ত চম্বল'-এর মতোই লোকালয় থেকে দূরে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে মঙ্গল সিং নামধারী কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দারের কাহিনী নয়। ছবির নাম দেখে যাঁরা ছবিটি থেকে কোনো লোমহর্ষক ঘটনা আশা করবেন কিংবা ছবিটি আরও পাঁচটা নগণ্য হিন্দী ছবিরই সমগোত্রীয় ভেবে একে বর্জন করবেন, তাঁরা প্রকাণ্ড ভুল করবেন। প্রচুর অসম্ভাব্যতা এবং অবাস্তবতা সত্ত্বেও ছবিটি শতকরা একশো ভাগই উপভোগ্য তো বটেই, তার ওপর এতে আছে আমাদের ছাত্রসমাজ সম্পর্কে এমন সব খোলা কথা, যা আমাদের শাসককুল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকসম্প্রদায় ও গুরুজনমন্য ব্যক্তিদের চৈতন্যোদয়ে সাহায্য করবে। অবসরপ্রাপ্ত আর্মি মেজর, কলেজ প্রিন্সিপ্যাল প্রোফেসার দাস যখন সরকারী কর্মচারীকে বলেন, 'রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে ছাত্রসমাজকে যখন তখন রাজনীতিতে টেনে আনেন। কিন্তু যখন ছাত্রসমাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদেরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন তাঁরা তাদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার জন্যে পরামর্শ দেন, তখন প্রেক্ষাগৃহ উল্লসিত দর্শকদের করতালিধ্বনিতে সরব হয়ে ওঠে। এছাড়াও বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে কিছু নীতিবাগীশ শিক্ষক ও গুরুজনের আরোপিত বাধানিষেধ সম্পর্কে প্রোফেসর প্রাণের অম্লমধুর মন্তব্য দর্শককুলের মধ্যে খুশীর জোয়ার বইয়ে দেয়। বলে রাখা দরকার যে, এক প্রোফেসরের অধীনে নটি ছাত্র এবং এক মহিলা-প্রোফেসরের সঙ্গে সমসংখ্যক ছাত্রীর একই বনাঞ্চলে উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক শিক্ষামূলক ভ্রমণে আসাকে উপলক্ষ্য করেই চিত্রকাহিনীটি গড়ে উঠেছে। ছবিটির আর একদিকে আছে খল দুর্বৃত্ত জমিদারের অন্যায় জমি গ্রাসের বিরুদ্ধে বঞ্চিত প্রজাদের বিক্ষোভ এবং ছাত্রবৃন্দের তার শরীক হওয়া এবং এ ব্যাপারে এক কৃত্রিম ভূতের সহায়তায় কফিনের ভিতর রেখে পুরোনো মূর্তি পাচারের চেষ্টায় জমিদারের তাঁর বিপক্ষীয়দের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করা।

ছবির শুরু থেকেই দর্শককে খুশী করবার দিকে প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তাটিয়ার প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। কার্টুনে পরিচয়লিপি দর্শকের দৃষ্টি ও মন, দুইকেই আকৃষ্ট করবার মতো। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুই প্রোফেসরের মানসিক জগতে বসন্তের আবির্ভাব ঘটিত দৃশ্যটি। এই রোমান্টিক দৃশ্যটি পরিকল্পনা ও প্রয়োগ—উভয় দিক দিয়েই অভিনব ও সম্মোহনসৃষ্টিকারী।

আর আছে অসামান্য চরিত্রাভিনেতা প্রাণের বৈচিত্র্যময় নাট্যনৈপুণ্য। তিনি প্রোফেসর দাসের মিলিটারী ডিসিপ্লিনের কড়া মেজাজের অভিনয়ে যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, একটি মেয়েলী ধরনধারণ-বিশিষ্ট ছাত্রের ভূমিকাতেও তেমনই অনবদ্য উপভোগ্যতা আনতে পেরেছেন। সবচেয়ে কৌতুককর হয়েছে মেয়েদের ছদ্মবেশে তাঁর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহ সংলাপকথন ও নৃত্যসহ গান : অদা আয়ো ওয়াফা আয়ো। বললে অনুচিত হবে না যে, মমতা বেশে প্রাণই এই 'জঙ্গলমে মঙ্গল' ছবির প্রাণ। এঁর বিপরীতে গার্লস কলেজের বোটানির ছাত্রীদের অভিভাবিকা প্রোফেসর লক্ষ্মীর ভূমিকায় সোনিয়া সাহনীও প্রথমে কড়া ধাতের পুরুষ-বিদ্বেষী রূপে এবং সর্পদংশনাশঙ্কায় ভীত হয়ে প্রো: দাসকে জড়িয়ে ধরবার পরে ক্রমেই প্রেমবিগলিতভাবে সুনিপুণ চরিত্রচিত্রণ করেছেন। অল্পবয়স্কা সোমিরা সাহনীর কলেজ প্রোফেসরের রূপসজ্জা প্রশংসনীয়। ন'জোড়া ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তিনটি জোড়কে পরিচালক দর্শকদের সামনে বেশী করে হাজির করে-

ছেন এবং এ'রা হচ্ছেন ছাত্রবেশী প্রাণ, কিরণকুমার, নরেন্দ্রনাথ— রীণা রায়, জয়শ্রী টি ও মীনা টি। এ'রা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষেও যেমন, ভালোবাসাতেও তেমন—দর্শকবৃন্দকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। ছবির শেষাংশে 'ভূত' ধরার ব্যাপারে চরিত্রগুলি যে সাহসিকতা এবং অদম্য উদ্যমের পরিচয় দিতে বাধ্য হয়, তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন এ'রা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কপাটি খেলা প্রভৃতি বহু কৌতুককর দৃশ্য অত্যন্ত সুঅভিনীত। জমিদারের নির্যাতিত প্রজা বেশে বলরাজ সাহনী তাঁর সহজাত নাটনৈপুণ্য দেখাতে ত্রুটি করেননি। এছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় পেন্টাল, চন্দ্রশেখর, কৃষণ ধাওয়ান, চমন পুরী, ভরত কাপুর, জগদীশরাজ, গুলসান বাওরা, পম্মা খান্না, মীনা রায় প্রভৃতি যথোচিত সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রচুর প্রশংসনীয়। ব্রজেন্দ্র গৌর লিখিত সংলাপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ হচ্ছে এর সঙ্গীতাংশ। হসরত জয়পুরী ও নীরজ রচিত সাতখানি গানেই শঙ্কর-জয়কিষেণের সার্থক সুরারোপ এবং আশা ভোঁসলে, ঊষা মঙ্গেশকর, মোহাম্মদ রফি ও কিশোরকুমারের কণ্ঠ যে আশ্চর্য ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে, তাতে দর্শকবৃন্দ মোহিত না হয়ে পারেন না। কিরণকুমারের মুখে কিশোরকুমারের গাওয়া 'তুম কিতনো খুবসুরত হো ইয় মেরে দিলসে পুছো' গানটি যেমন কখনই ভোলা যায় না, তেমনই ভোলা যায় না স্ত্রী-বেশে প্রাণের মুখে আশা ভোঁসলের গাওয়া 'অদা আয়ো ওয়াফা আয়ো' গীতটিকেও।

কিরণ প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং রাজেন্দ্র ভাটিয়া প্রযোজিত-পরিচালিত ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত 'জঙ্গলমে মঙ্গল' নানা দিক দিয়ে একটি অসাধারণ উপভোগ্য চিত্র।

(২) জ্যোত জলে (হিন্দী)

সুপ্রা ফিল্মস নিবেদিত কে এইচ ভুবা ও বসন্তকুমার গোনি প্রযোজিত এবং সত্যেন বসু পরিচালিত সাদা-কালো রংয়ের ছবি 'জ্যোত জলে' যে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, এ-বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। বর্তমান যুগে সারা পৃথিবী জুড়ে অশান্ত ছাত্র ও যুবকদল চিরাচরিত নিয়মকানুন, রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা জানাবার জন্যে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে উন্মত্ততার পরিচয় দিচ্ছে, তাথেকে তাদের নিরস্ত করে প্রকৃত সত্যপথে তাদের পরিচালিত করতে কেউই যে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসছেন না, একথাও অবিসংবাদীভাবে সত্য। আজ প্রয়োজন ছিল মহাত্মা গান্ধী বা মার্টিন লুথার কিংয়ের মতো সত্যাশ্রয়ী জননেতার, যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছাত্র ও যুবসমাজের সামনে প্রকৃত জীবনাদর্শকে তুলে ধরতে পারতেন।

'জ্যোত জলে' বা প্রদীপ্ত জ্যোতির নায়ক ডাক্তার নারায়ণ গুপ্ত মহাত্মা গান্ধী বা মার্টিন লুথার কিংয়ের আদর্শপ্রণোদিত এক অহিংসবাদী ও সত্যপথাবলম্বী ব্যক্তি। তাঁর পল্লীস্থ রামু ও তার অনুগত কিশোর সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতায় যখন সকলেই উত্যক্ত তখন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে তিনি প্রথমে গেলেন শিক্ষকদের কাছে এর প্রতিবিধানের পথান্বেষণের জন্য এবং সাক্ষাৎ করলেন রামুর বাপমায়ের সঙ্গে। রামুর মা যদিও বিবেচক ও সহানুভূতিশীল, কিন্তু ওর বাবা হচ্ছেন অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত —বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মদ্যপান করতে এবং জুয়া খেলতে তাঁর একটুও বাধে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত ডাক্তার গুপ্তকে একাই ওদের সংশোধনের কাজে প্রবৃত্ত হতে হল। ডাঃ গুপ্ত দেখতে পেলেন, রামুর মধ্যে এমন গুণ লুক্কায়িত আছে, যা দুর্লভ এবং যার বলে সে একদিন দেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু একগুঁয়ে রামু যেন ডাঃ গুপ্তের সঙ্গে শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর। সে তাঁকে আঘাত করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি। এই সময় রামু পুলিশের বিষনজরে পড়ে। ডাঃ গুপ্ত কিন্তু পুলিসকে রামুর বিরুদ্ধে কোনো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে চান এবং নিজে প্রায়োপবেশন শুরু করেন রামুকে অসৎপথ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে। রামু কি শেষ পর্যন্ত নিজের স্বভাব পরিবর্তন করেছিল এবং ডাক্তার গুপ্তের অনুগত হয়েছিল, এর উত্তর দিয়েছে ছবির শেষ কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য।

কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যরচয়িতা নবেন্দু ঘোষ ছাত্র ও যুবসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শনের চেষ্টায় যে কাহিনীটি দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন, তার বিভিন্ন পরিস্থিতি রচনা ও বিস্তারে প্রচুর অসঙ্গতি এবং অবাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। কিশোর দলের কথা বলতে গিয়ে একজন বয়স্ক লোককে মাতাল ও জুয়াড়ী দেখিয়ে তার প্রতি দর্শক মনোযোগকে আকর্ষণ করা, 'ধান ভানতে শিবের গীত'-এর সামিল হয়েছে। ফলে, কাহিনীটি কোথাও বিশ্বাস্য রূপ পায়নি এবং দর্শককে ওর সঙ্গে একাত্ম করে তুলতে একান্তভাবেই অসমর্থ হয়েছে।

আজেই ডাক্তার নারায়ণ রাওয়ের ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্যের আন্তরিক অভিনয়টিও অন্তরস্পর্শী হয়ে উঠতে পারেনি। যে যাদুস্পর্শে একটি চরিত্র বাস্তব হয়ে ওঠে, সেই মোক্ষম জিনিসটিরই অভাব থেকে গেছে। এবং এর জন্যে দায়ী কিশোর উচ্ছৃঙ্খলতা বিষয়ে কাহিনীকার ও পরিচালকের সম্যক গভীর জ্ঞানের অভাব। বরং তরুণ বসু গৃহীত মদ্যপ ও জুয়াড়ী চরিত্রটি ঢের বিশ্বস্তভাবে অঙ্কিত; যদিও আগেই বলেছি, এই চরিত্রটি মূল বক্তব্যের পক্ষে প্রায় অপ্রয়োজনীয়। নিরূপা রায় অভিনীত মায়ের চরিত্রটিও হৃদয়গ্রাহী। বালক রামু বেশে মহাবীর যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় সীতা, সাহু মোদক, কৃষণ ধাওয়ান, অসিত সেন, পরদেশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির বিভিন্ন কলাকৌশলের মধ্যে সাদাকালো ফোটোগ্রাফী আরও উন্নত পর্যায়ের হওয়া উচিত ছিল। গোবিন্দ মুনীশ লিখিত সাতটি গান আছে ছবিতে। কিন্তু কোনো গানই ছবির সঙ্গে এমনভাবে অঙ্গীভূত হতে পারেনি, যাতে তাকে অপরিত্যাজ্য মনে করা যেতে পারে। ওরই মধ্যে মান্না দে প্রমুখ গীত 'সচ্চাই কী রাহ চলে তো, ডর কী কোই বাত নহী' গানটি কিছুটা হৃদয়কে স্পর্শ করে।

উচ্চ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়াটাই সুপ্রা ফিল্মস নিবেদিত ও সত্যেন বসু পরিচালিত 'জ্যোত জলে' ছবির একমাত্র সার্থকতা।

স্টুডিও সংবাদ

সলিল দত্তের পরবর্তী ছবি 'সেই চোখ'

জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান চিত্র-পরিচালক সলিল দত্তের পরবর্তী ছবিটির নাম হলো 'সেই চোখ'। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুভ বাংলা নববর্ষে শুরু হবে। ছবিটির নায়ক হবেন উত্তমকুমার।

নির্মীয়মান চিত্র 'বিন্দুর ছেলে'—

এস এস প্রোডাকসন্স নিবেদিত, সুনীল রায় প্রযোজিত 'বিন্দুর ছেলে' ছবির প্রথম পর্বের দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সমাপ্ত হয়েছে। ঐ পর্বের শুটিংয়ে অংশ নেন মাধবী চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, অসিতবরণ এবং পদ্মা দেবী। এ মাসের ২১ থেকে ৩০ মার্চ শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের দৃশ্য গ্রহণ। ঐ শিল্পীরা ছাড়া ঐ সময়ে শুটিংয়ে আর যাঁরা অংশ নেবেন তাঁরা হলেন সন্ধ্যারাণী, নির্মলকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস ও প্রেমাংশু বসু। বিকাশ রায়কৃত চিত্রনাট্যের পরিচালনার ভার নিয়েছেন গুরু বাগচী এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানে সুর

দেবেন কালীপদ সেন। ছবিখানির পরি-বেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন মেগ পিকচার্স।

আশ্রয়-ভ্রমর

তানাকা চিত্রমের প্রথম ছবি অজিত গাঙ্গুলী রচিত ও পরিচালিত 'আশ্রয়-ভ্রমর'-এর চিত্রগ্রহণ কাজ দ্রুত গতিতে নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওতে এগিয়ে চলেছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে নচিকেতা ঘোষের সুরে নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন—মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুষমা দাশগুপ্ত ও সুরকার নচিকেতা ঘোষ স্বয়ং। রামানন্দ সেনগুপ্ত এর চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন। অন্যান্য চরিত্র-লিপিতে আছেন কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, অনুপ-কুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, বিদ্যা রাও, অরুণ চৌধুরী ও নবাগত কৌশিক বসু প্রভৃতি। ছবিখানি সমাপ্তির পথে।

মুক্তিপথে নিশিকন্যা

শতরূপা পিকচার্সের নাচে-গানে-ভরা অনবদ্য প্রেমকাব্য কথা সাহিত্যিক বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত 'নিশিকন্যা' শীগগীর রাধা পূর্ণ ও অন্যত্র মুক্তিলাভ করবে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সুধীন দাশগুপ্তের সুর ছবির এক বিশেষ সম্পদ। নৃত্য পরিচালনা করেছেন শক্তি নাগ। সৌমিত্র ও মিঠু ছবির প্রধান জুটি। অন্যান্য চরিত্রে আছেন, রুমা গুহ ঠাকুরতা, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা, তরুণ, ভানু, দিলীপ রায় প্রভৃতি। শতরূপা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিখানির পরিবেশক।

অচেনা অতিথি

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন দাস পরিচালিত সারা প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি সুখেন দাস রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'অচেনা অতিথি'র চিত্রগ্রহণ কাজ সমাপ্তি প্রায়। অজয় দাসের সংগীত পরিচালনায় মান্না দে ও মৃণাল চক্রবর্তীর গান রেকর্ডিং হয়ে গেছে। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—স্বরূপ দত্ত, অজয় গাঙ্গুলী, সুখেন দাস, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখার্জী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন সাধু, অজয় ভট্টাচার্য, মেনকা দেবী, রত্না ঘোষাল, জয়শ্রী রায়, মাঃ অনিল রেখী ও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে শমিত ভঞ্জ। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

রাধা-পূর্ণ ও অন্যত্র আসছে : আমি সিরাজের বেগম

মানিক রায় প্রযোজিত শ্রীপারাবত রচিত ও সুশীল মুখার্জী পরিচালিত—এম আর প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'আমি সিরাজের বেগম' রাধা-পূর্ণ ও অন্যত্র মুক্তি প্রতীক্ষায়। ব রায় ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন।

সুর দিয়েছেন অনিল বাগচী। বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় এ ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, বাসবী নন্দী, দিলীপ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমা দাস, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও বোম্বের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী অলকা প্রভৃতি।

মুক্তি প্রতীক্ষায় শজারুর কাঁটা

মঞ্জু দে প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন শজারুর কাঁটা কলিকাতা ও শহরতলীর অনেকগুলি চিত্রগৃহে এই মাসেই মুক্তিলাভ করবে। প্রখ্যাত লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী মঞ্জু দে। চিত্রনাট্যও তাঁরই রচনা। প্রয়োগকৌশল ও কাহিনীর বৈচিত্র্যে ছবিখানি চলচ্চিত্র মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

'শেষ বিচার'-এর চিত্রগ্রহণ

'শেষ বিচার' ছবির দ্বিতীয় পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ গেল ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। সুখেন দাসের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

গীত রচনা ও সুরসৃষ্টিতে আছেন—সুধীন দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিল সরকার ও সুধীর খাঁ।

চরিত্র-চিত্রণে আছেন—উত্তমকুমার, অজয় ভৌমিক, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, মণি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী দেবী, শিখেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর গুহ ও নবাগত সৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জে কে ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

রবি ঘোষ এবং বিশ্বজিৎ। দীনেন গুপ্ত পরিচালিত প্রান্তরেখা চিত্রে।

মঞ্চাভিনয়

কালিন্দী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটক সম্প্রতি বিশ্বরূপার মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন মিনারাল এ্যান্ড মেটাল ট্রেডিং কর্পোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন শ্রীপ্রণত ঘোষ। শ্রীঘোষের শৈল্পিক নিষ্ঠা ও শিল্পীদের প্রাণময় চরিত্রচিত্রণ—এই দুই-ই সামগ্রিক প্রযোজনাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

পৃথ্বীরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্র রায়', অরুণ শীর 'অচিন্ত্য', প্রণত ঘোষের 'রামেশ্বর', দিলীপ দাশগুপ্তের "মিঃ মুখার্জি", মণিময় ঘোষের 'যোগেশ', রাজলক্ষ্মী দেবীর সুনীতি, আশা বসুর 'সারি' প্রায় প্রতিটি দর্শককেই মুগ্ধ করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন কাশীনাথ ঘোষ, অংশুমান প্রামাণিক, মমতা চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়, তড়িৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ রায়, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, পীতাম্বর দাস, মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বলহরি মল্লিক, পরেশ দাস, বীণা দাস।

ডক্টরস ক্লাবের "দ্বীপান্তর" : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তর' নাটকটির আবেদন যে এখনো স্তিমিত হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ সেদিন অনেক প্রোজ্জ্বলতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আকাদমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। ডক্টরস ক্লাবের (রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল) শিল্পীরা নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রকেই সপ্রতিভ করে তুলতে পেরেছিলেন মঞ্চের আলোয়।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র, বাণী সেনগুপ্ত, কাজল মুখার্জি, সত্যপদ সিংহ, পবিত্র ঘোষ, শঙ্কর সেন, রানী ব্যানার্জি, বীথি গাঙ্গুলী, অতুলানন্দ দাশগুপ্ত, মিলন মজুমদার, সুজিৎ ঘোষ, নীহার রায়চৌধুরী, অনিল ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন, দুলাল দত্ত, দিব্যেন্দু গোপ।

আগামী অনুষ্ঠান :

শিল্পমেটের 'আবৃত্ত দর্শনিক' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে আগামী ৩০ মার্চ মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে সন্ধ্যা সাতটায়।

জ্যাকিনসন্স রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা আগামী ৩০ মার্চ মিনার্ভায় অভিনয় করবেন দিলীপ মৌলিকের 'ছায়া ছায়া আলো' নাটকটি। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীগোপেন বসু।

তিনটি সুঅভিনীত নাটক : হাওড়া বকলতলার নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি তিনটি নাটক পরিবেশন করে স্থানীয় দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। নাটক তিনটি হোল সন্তোষ দত্তের 'সবুজ মন হলদে চোখ', শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'অনশন ভঙ্গ' ও দীপ্তিকুমার শীলের 'উত্তম পুরুষ'। নাটক তিনটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন তপন গুহ, গোপাল বসু, অমুল্যশঙ্কর রায়, অশোক সাধুখাঁ, তরুণ গুহ, সব্যসাচী বসু, রাজেন্দ্রকুমার শীল, কল্যাণ দে, অতনু মুখার্জি, চন্দন দাস, সতীনাথ চ্যাটার্জি, সন্দীপ গুহ, শম্ভু সরকার।

মহারাজ নন্দকুমার : ক্যালকাটা ক্লাব স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা কয়েকদিন আগে মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকটি পরিবেশন করলেন "রবীন্দ্র সদন" মঞ্চে। ক্লাবের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায়। সুঅভিনীত এই নাটকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অংশ নেন নবকুমার মুখোপাধ্যায় (নন্দকুমার), অনীত বন্দ্যোপাধ্যায় (হেস্টিংস), রথীন চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস), স্বপন চট্টোপাধ্যায় (মীরকাশেম), প্রভাত চট্টোপাধ্যায় (কামালউদ্দিন), সুকেশ চক্রবর্তী (ক্রেভারিং), শঙ্কর মুখোপাধ্যায় (জগৎ শেঠ), আরতি ঘোষ (লুৎফা), রমা গুহ (ক্ষমা), বেবী ঘোষ (মণিবেগম)।

মুক্তাঙ্গনে 'হা হা স্বদেশ' : দক্ষিণ কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা হলো 'নাট্যায়ন'। আগামী ২৬ মার্চ তাঁরা অভিনয় করবেন 'হা হা স্বদেশ'। বর্তমান সমাজের নিত্য দ্বন্দ্ব টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত মনুষ্যমানুষীর অভিজ্ঞতাকে নিয়ে লেখা তরুণ নাট্যকার অনিল দে-র এই নাটকটি পরিচালনাও করছেন স্বয়ং তিনি।

স্টার থিয়েটারের নতুন নাটক 'বিদ্রোহী নায়ক'

নাট্যশালার গোড়ার যুগের এক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটকটা রচিত হয়েছে। নাটকে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আছেন—নাট্যকার পরিচালক উপেন দাস। উপেন দাসের পিতা শ্রীনাথ দাস, বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু, ক্লারিন্ডার

মনোমোহন ঘোষ, [illegible] পণ্ডিত, [illegible] গণেশচন্দ্র, [illegible] [illegible] মহাত্মা শিশির [illegible] এবং আরও [illegible]। ইংবং বেংগলের মধ্যে [illegible] [illegible] ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। [illegible] [illegible] নাটের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ নাট্যশালাকে লোকশিক্ষার হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করে-ছিলেন। ইংরেজ সরকার [illegible] দাস পরি-চালিত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কন্ঠরোধ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হন। একটার পর একটা নাটক বন্ধ করে দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সহসা একদিন হানা দিয়ে উপেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল এবং [illegible] বিশিষ্ট শিল্পীকে গ্রেপ্তার করেন ও পরে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করেন। যে আইন বংগ-রঙ্গমঞ্চের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত সুদীর্ঘকাল চেপে বসেছিল। 'বিদ্রোহী নায়ক' নাটকে গোড়ার যুগের নাট্যশালার সংগ্রামের কাহিনী এবং সে সময়-কার সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থার কথা বিশেষভাবে বিধৃত করা হয়েছে। দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব প্রভৃতিও সেই যুগোপযোগী করার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকটি রচনা ও পরিকল্পনা করেছেন—নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণে আছেন অনিল বসু, সুর-কার শচীন বসু, এবং গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী রাধেশ্যাম মাস্কারিয়া এবং প্রযোজক শিশির মল্লিক নাটকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন শ্রীনাথ দাস : অজিত বন্দ্যো, উপেন দাস : সবিতাব্রত দত্ত, বিদ্যাসাগর : শৈলেন মুখো, শিশির ঘোষ : প্রেমাংশু বসু, অমৃতলাল : শিবেন বন্দ্যো, শিবনাথ শাস্ত্রী : কালিদাস গাঙ্গুলী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ : সতীশ ভট্টা, সুরেন্দ্রনাথ : সুখেন দাস, দত্তবাবু : শ্যাম লাহা, রমণীসুন্দরী : অপর্ণা দেবী, সৌরভিনী : সুব্রতা চট্টো, মনোমোহিনী : বাসন্তী চট্টো, জগত্তারিণী : নীলিমা দাস, কাদম্বিনী : গীতা দে, রাজকুমারী : মেনকা দাস, গোলাপসুন্দরী : হিমানী গাঙ্গুলী, ক্ষেত্রমণি : কল্পনা মুখো, সৌরভিনীর দিদি : প্রিয়া চট্টো। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে পঞ্চানন ভট্টা, করুণা বন্দ্যো, প্রীতি মজুমদার, অশ্রু ভট্টা সুশীল চক্র., সুশীল দে, তাপস চট্টো, সৈকত পাকড়াশী, গোপাল সিংহরায়, পঙ্কজ ভট্টা, অলক দাশগুপ্ত, সুশীল বসু, কার্তিক চট্টো, রণীন বসু, বিষ্ণু সেন, শান্তি দাশ-গুপ্ত, বীরেন দাস, শৈলেন ভট্টা ও আরও অনেকে।

সুদর্শনম গোষ্ঠীর 'নিতাই গড়গড়ির বউ' : অহেতুক সন্দেহে সমাজের কাঠামোটি কিভাবে ভেঙে যায়, আর অকারণ কৌতূহলে সংসারে কতটা ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'নিতাই গড়গড়ির বউ' নাটকে। নাটকটি বয়েজ ওন হলে নিয়মিত অভিনয় করছেন সুদর্শনম গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

নাটকটির কাহিনী [illegible] এক দম্পতিকে [illegible] [illegible] [illegible] যে অভ্রান্ত [illegible] গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন মনোজ মিত্র, কুমার [illegible], বাসুদেব ঘোষ, সমীর মুখোপাধ্যায়, সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমা বিশ্বাস, রত্না ঘোষ।

মাঙ্গলিকের 'গাধা' ও 'শাশুড়ী ফেরার' : দুটি মজার নাটক সম্প্রতি মুক্তাঙ্গন মঞ্চে পরিবেশন করলেন মাঙ্গলিক সংস্থার শিল্পীরা। দুটি নাটকের নাম হোল বাদল দে'র 'গাধা' ও কাজল ঘোষের 'শাশুড়ী ফেরার'।

প্রাণোচ্ছল হাসির অনেক খোরাক 'গাধা' নাটকে আছে, তবে হাসিই এই নাটকের শেষ কথা নয়। সমাপ্তির মুখে এ নাটক বেশ ভাবিয়ে তোলে আমাদের। নাট্য-নির্দেশক প্রদীপ কুণ্ডু তাঁর শৈল্পিক মানসিকতার যথেষ্ট পরিচয় রাখতে পেরে-ছেন অনেক মুহূর্তেই। এ নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় সপ্রতিভ অভিনয় করে-ছেন প্রদীপ কুণ্ডু, বাদল দে, সমীর বিশ্বাস।

মজার মজার অনেক ঘটনা পেরিয়ে যখন ক্লাইমাক্সে গিয়ে পৌঁছেছে, তখনই অপূর্ব গতিবেগসমৃদ্ধ হয়েছে 'শাশুড়ী ফেরার' নাটকটি। এর জন্য অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী রাখেন কাজল ঘোষ। তিনিই এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্বও সাফল্যের সঙ্গে বহন করেছেন। নাটকটির টিম-ওয়ার্ক হয়েছে অটুট। 'গণেশ' ও 'সুজিত' চরিত্রে প্রদীপ কুণ্ডু ও সমীর বিশ্বাসের অভিনয় হয়েছে অসাধারণ। 'নীরেনবাবু' চরিত্রটিও কাজল ঘোষের অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন লীলা ভট্টাচার্য, সন্তোষ মজুমদার ও বিনয় গুপ্ত।

রঙমহলে 'তথাস্তু'

স্কটীশ চার্চ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখো-পাধ্যায় স্কটীশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের (ফর্মার স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়ে-শন-এর) সভ্যসভ্যাদের বার্ষিক অভিনয়ের জন্যে প্রতি বছরই একখানি করে নাটক লিখে আসছেন গেল বারো-তেরো বছর ধরে। রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠী দ্বারা পূর্বে অভিনীত 'অনর্থ'-এর মতো বর্তমানে অভিনীত 'তথাস্তু'-ও ঐ কারণে অধ্যাপক শ্রীমুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত হয়ে ঐ ছাত্র পরিষদের সভ্যসভ্যাগণ দ্বারা ইতিপূর্বেই ঐ রঙমহলে রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হয়ে গেছে বছরখানেক আগে এবং আমরা যথাসময়ে ঐ অভিনয় সম্পর্কিত বিবরণ 'অমৃত'-এর প্রেক্ষাগৃহ [illegible] পেশ করেছি। রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠী [illegible] নাটকখানিকে তাঁদের অভিনয়ের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন এবং তাঁদের এই বাছাই যে ভ্রান্ত নয়, তা যাঁরাই তাঁদের অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। তাঁদের নিবেদিত 'তথাস্তু' পূর্বে অভিনীত নাটকের একেবারে কার্বন-কপি না হলেও বর্ণিত কাহিনী ও নাট্যকারের বক্তব্য পরিবর্তন-পরিবর্জন-পরিবর্ধন সত্ত্বেও একই থেকে গেছে। 'তথাস্তু' নাটকের মাধ্যমে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় নূতন পাত্রে পুরাতন পানীয় পরিবেশন করেছেন। গুরুজনের মনোনীত পাত্র বা পাত্রীকে বিবাহ করতে গররাজী মেয়ে বা ছেলে নিজের পছন্দমত ছেলে বা মেয়েকে বিবাহ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে যে, তার গুরুজন ঐ ছেলে বা মেয়ের সঙ্গেই বিবাহের ব্যবস্থা করছিলেন। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত উজ্জ্বলতম প্রহসন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। নূতনত্বের মধ্যে আলোচ্য নাটকে পাত্রী ও পাত্রের পিতারা যথাক্রমে খ্যাতিমান অশ্লীল সাহিত্যলেখক ও মফস্বল থেকে বিধানসভাতে নির্বাচিত জনৈক এম-এল-এ। এম-এল-এ-টিকে নাট্যকার যথার্থই একটি পরম উপভোগ্য 'মাল'-এ পরিণত করতে পেরেছেন; তবে তার মুখের বহু ভুল ইংরাজীকে বেশ কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। পিতৃরচিত উপন্যাসের নায়িকার আদর্শে ঔপন্যাসিকের কন্যার নিজেকে তৈরী করা আদৌ অসম্ভব নয়; কিন্তু তথাকথিত অশ্লীল সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকেরা নিজেদের রচনার জন্যে অনুশোচনায় মগ্ন, এমন ঘটনা বঙ্গীয়

সাহিত্যজগতে কখনও ঘটেছে কি? আধুনিক যুগের জনপ্রিয় লেখকেরা এ-বিষয়ে আলোকপাত করলে খুশী হব। যাই হোক, নাটকের দ্বিতীয়ার্ধের একটি দৃশ্যে অনুশোচনারত সুবিমলকে আমাদের তেমন ভালো লাগেনি। এবং বিসদৃশ লেগেছে মালবাবুর প্রাকৃতিক তাড়নায় পীড়িত হওয়ার পরিস্থিতিটি।

হাস্যরসপ্রধান নাটকাভিনয়ে রঙমহল শিল্পিগোষ্ঠীর যে সুনাম আছে, 'তথাস্তু'র অভিনয়ে তা আরও বর্ধিত হয়েছে বলেই মনে করি। সাহিত্যিক সুবিমল সান্যালের বন্ধু ভণ্ডপণ্ডিত, স্ত্রী-শাসিত উকীল শশীভূষণের ভূমিকায় হরিধন মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অঙ্গভঙ্গী ও বাচনগুণে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে হুল্লোড় জমিয়ে তুলতে শশীভূষণের উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুবিমলের ভূমিকায় অমরনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সাহিত্যিকের রূপটিকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। রচনার তাগিদ দেবার জন্যে সাময়িকভাবে নিযুক্ত দামোদরের ভূমিকায় মিণ্টু চক্রবর্তীর প্রদীপ্ত অভিনয় রীতিমত উপভোগ্য। 'এম-এল-এ' গণনাথ বেশে মৃণাল মুখোপাধ্যায়ও বিন্দুমাত্র কম উপভোগ্য নন। রোমাণ্টিক নায়ক শান্তনুর ভূমিকায় দিলীপ হালদার আরও স্বচ্ছন্দ হলে ভালো হত। স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে আধুনিকা তরুণী রীণার ভূমিকায় ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাণচঞ্চল। শুচিবাইগ্রস্তা, জবরদস্ত বড়দির ভূমিকায় সরযূ দেবী বাঙালীর ঘরের একটি প্রাচীন ব্যক্তিত্বের প্রতীক। সুবিমলের সুশীলা স্ত্রী সুষমাবেশে ছন্দা দেবী মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ বধূর জীবন্ত নিদর্শন। অপরাপর ভূমিকায় অজিত চট্টোপাধ্যায় ধীমান চক্রবর্তী শম্ভু ভট্টাচার্য সুজিত দাশ মানস ঘোষ বাসুদেব পাল দিলীপ মৌলিক কার্তিক সরকার সমরজিৎ গুহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সীমা দে নন্দিতা রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

কি অভিনেতা, কি অভিনেত্রী—বর্তমান যুগের শিল্পীরা নৃত্য ও গীতের চর্চা আদৌ করেন না বললেই চলে। অথচ অভিনয় জগতে একটি হাওয়া পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটতে চলেছে সেদিকে সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি গেছে কি? দর্শক রুচি স্বতই পরিবর্তনশীল: দর্শক আবার শুনতে চাইছেন ভালো গান দেখতে চাইছেন ছন্দোময় নৃত্য। রীণার ভূমিকায় ছন্দা চট্টোপাধ্যায় যে-গান গেয়েছেন, তাকে বড়জোর গান গাইবার একটি আপ্রাণ প্রচেষ্টা বা গানের অ্যাপোলজির বেশী কিছু বলতে পারি না। দৃশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সুর-আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন শৈলেশ রায়, তার প্রশংসা করি।

পরলোকে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীহেমেন গাঙ্গুলী

বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীহেমেন গাংগুলী ১৯ মার্চ রাঁচীতে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

তাঁর ৪৭ বছর বয়স হয়েছিল। তিনি স্ত্রী, মা, এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

তিনি বহু চলচ্চিত্রের প্রযোজক ছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের নাম ক্ষুধিত পাষাণ, মমতা, সাগিনা মাহাতো।

সুপরিকল্পিত দৃশ্যপট সমন্বয়ে রঙমহলের শিল্পিগোষ্ঠী অভিনীত 'তথাস্তু' দেখে দর্শকরা পুরো তিনঘণ্টা ধরে রূঢ় বাস্তব জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে প্রাণখোলা হাসির স্রোতে যে গা-ভাসিয়ে দিতে পারবেন, এ-কথা আমরা হলফ করে বলতে পারি।

সংবর্ত অভিনীত 'দশমী'

'দশমী'র নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক সুনীল দাশ বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত কিনা জানিনা। কিন্তু বাঙালী ছাত্রসমাজ যে আজ স্বাধীন চিন্তার জগতে মৃত এবং তাদের ভবিষ্যৎ যে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন সে-বিষয়ে তাঁর মন জাগ্রত। এবং যে-রাজনৈতিক মতবাদেই তিনি বিশ্বাসী হোন না কেন, তাঁর মন যে হিন্দু-ধর্মের সংস্কারমুক্ত নয় তার প্রমাণ তাঁর নাটকের নামকরণের মধ্যেই নিহিত। এবং তাঁর নাট্যকাহিনীর চূড়ান্ত ক্ষণটির জন্যে তিনি বিজয়াদশমীর অপরাহ্ণ কালটিকেই যে বেছে নিয়েছেন, তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

'দশমী'র মধ্যে নাট্যকার শ্রীদাশ বলতে চেয়েছেন আজ আমরা যে যে-ভাবেই জীবনযাপন করি না কেন নিজেদের আহারে বিহারে দৈনন্দিন জীবনযাপনে যতই রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চাই না কেন রাজনীতি কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার কোনো উপায় নেই। এই যখন অবস্থা, তখন নিতান্ত নির্জীব, অপদার্থের মতো বৃথা সময়ক্ষেপ না করে বাঁচার মতো বাঁচবার জন্যে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাই শ্রেয় নয় কি?

অয়ন, মণিময়, শঙ্কু ও বিক্রম—এরা চারজনই ক্লেদাক্ত পৃথিবী থেকে দূরে থেকে আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীতের চর্চার মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ওদের দলে যোগ দিয়েছিল এণাক্ষী নামে একটি মেয়ে, যাকে যুগলকিশোর নামে এক যুবক—যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করত, সে অমোঘভাবে আকর্ষণ করত। যুগের সঙ্গে এণাক্ষীর মেলামেশাকে অয়ন একেবারেই পছন্দ করত না: কারণ অত্যন্ত সঙ্গোপনে—সে মনে মনে এণাকে ভালোবাসত। কিন্তু এণাক্ষী অয়নকে বন্ধুরূপে দেখলেও তার মন পড়েছিল যুগের ওপর। অতএব ঈর্ষান্বিত অয়ন যুগের বিরুদ্ধদলভুক্ত বিদ্যুৎ দত্তকে যুগের গতিবিধি সংক্রান্ত সংবাদটি জানিয়ে দিল এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যুগলকিশোর হল নিহত। মণিময়ও যুগকে সাময়িকভাবে তার প্রার্থিত আশ্রয় দেয়নি। তাই যুগের মৃত্যু-সংবাদে নিজের সবচেয়ে প্রিয়জনের মৃত্যুতে এণাক্ষী হল শোকাচ্ছন্ন এবং অয়ন ও মণিময় এই মৃত্যুতে তাদেরও অংশ আছে জেনে হল মর্মাহত। শঙ্কু, বিক্রম ও দর্শনের অধ্যাপক-পুত্র তাপসও যুগের এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে নির্লিপ্ততার অপরাধে অপরাধী বোধ করতে লাগল। কিন্তু যুগ মরেনি, সে মরতে পারে না,—এই সংবাদ সকলকে সাময়িকভাবে খুশী করলেও যুগযন্ত্রণার হাত থেকে তাদের অব্যাহতি নেই, এই কঠোর সত্য তারা অনুভব করল মর্মে মর্মে। নাটকে অনুপস্থিত যুবকের 'যুগ' নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাচনে, ভঙ্গীতে ভূমিকাটিকে সার্থক করে তুলেছেন অয়ন-এর চরিত্রাভিনেতা অনিমেষ গাঙ্গুলী। গৌতম দের বিক্রম বলিষ্ঠ অভিনয়ের নিদর্শন। শঙ্কুরূপী সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বাচন ত্রুটিপূর্ণ। মণিময় বেশে সন্দ্বিত বসুর অভিনয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করা গেলেও তাঁ বাচনও ত্রুটিমুক্ত নয়। দর্শনের অধ্যাপকপু তাপসের ভূমিকায় রবীন মৈত্র ভূমিকা সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেননি নাটকের একমাত্র স্ত্রী চরিত্র এণাক্ষী ভূমিকায় সমর্পিতা বসু ব্যক্তিত্বের অধি কারিণী হলেও ভূমিকাটিতে প্রাণের স্পন্দ আনতে পারেননি।

নীতীশ রায় দ্বারা সুপরিকল্পিত ম বিভিন্ন দেশের লোকসঙ্গীতগুলি অভি নবত্বের স্বাদ এনেছিল। 'দশমী'র নাট্যাভি সামগ্রিকভাবে যুগের হতাশাকে সক্রিয়ভা দূর করবার আহ্বান জানাতে সম হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

মদনমোহন লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব : গত ১০ মার্চ, রামমোহন লাইব্রেরী হলে মদনমোহন লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলাচরণ ও 'কথাকলি' দ্বারা গীত বেদ-সংগীতের পর অমর বসু সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। সম্পাদক সুনীলকুমার ঘোষ গত ৫০ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনাকালে বলেন যে, এই সুবর্ণ জয়ন্তীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁর অগাধ পান্ডিত্য, বৈপ্লবিক কর্মরাগ সর্বজনবিদিত। তাঁর একটি চিরস্থায়ী স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব তুলে ধরা। তিনি বলেন যে, যুগ-যুগান্তর ধরে আমাদের যেটুকু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে বেঁচে আছে তা কেবল হাজার হাজার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান নেতারা এইটি উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। কেননা, গভর্নমেন্ট থেকে নামমাত্র সাহায্য এঁদের দেওয়া হয় এবং কর্পোরেশন গত ১৯৬৪ থেকে কিছুই দেন না। নিজেদের চাঁদাই নির্ভর। এই উপলক্ষে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমেরিকা, ইংলন্ড ও রাশিয়ায় লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে—তাতে দেখা যায় যে ঐসব দেশে তাঁরা নাগরিক পিছু বৎসরে ৩০।৩৫ টাকা খরচ করেন এবং সে বিষয়ে যথাযোগ্য আইনও রয়েছে। সে তুলনায় আমরা শিশু এবং এখানে মাথাপিছু এক পয়সাও খরচ হয় কিনা সন্দেহ। সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসুস্থতাবশতঃ অনুপস্থিত থাকায় তাঁর লেখা 'গ্রন্থাগার ও সমাজ' পড়ে শোনানো হয়। বনফুল 'গ্রন্থাগার ও সাহিত্য' সম্বন্ধে ভাষণ দেন—সেটিও স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রাধারমণ মিত্র ডাঃ দত্তর সম্বন্ধে সম্পাদকের প্রস্তাব সমর্থন করেন। সত্যেন্দ্র বসু মহাশয় বলেন যে, লাইব্রেরীগুলির ব্যাপারে আমরা আজও শিশু এবং পিছিয়েও আছি অনেকটা; এ ব্যাপারে কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন। ডাঃ দত্তের স্মৃতি রক্ষার সম্বন্ধে বলেন যে, একটি উপদেষ্টা সমিতি করে যত্র গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের ভবনে অথবা কালী সিংহী পার্কে; যেখানে একটি পরিত্যক্ত স্নানাগার বহু অন্দর যাবৎ পড়ে রয়েছে, সেটি মদনমোহন লাইব্রেরীকে দিলে তাঁরা যৌথভাবে ডাঃ দত্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং একটি ভূপেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, যা গবেষণা কেন্দ্র রূপান্তরিত হবে, তা করতে প্রস্তুত আছেন। এ দাবী জোরদার করা প্রয়োজন এবং এঁদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা সমিতিও গঠিত হয়। [illegible] সুজিত মিত্র ও [illegible] সংগীত এবং [illegible] [illegible]।

মূকাভিনয় : সম্প্রতি টালিগঞ্জের স্থানীয় যুবকবৃন্দ আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর অপূর্ব কয়েকটি ফিচার চোর, পরীক্ষা প্রহসন, আমরা বস্তিতে চাই পরিবেশন করেন। শিল্পী শ্যামলেন্দু অত্যন্ত যত্ন-সহকারে প্রতিটি ফিচারকে উপস্থিত করতে পেরেছেন। অভিব্যক্তির প্রকাশ নিখুঁত। নীরব অভিনয়ের মাধ্যমে মানবজীবনের বিভিন্ন উপলব্ধিকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য সেদিন তিনি দর্শকদের অকুণ্ঠ অভি-নন্দন লাভ করেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ অভিনয় :

সম্প্রতি রংমহলে জুলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা অভিনয় করলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের পট-ভূমিকায় রচিত নাটক 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। উৎপল দত্তের মূল যাত্রাধর্মী নাটকটি থিয়েটারের রূপে পরিচালিত করেন স্নেহময় রায়চৌধুরী।

জীতেন দত্তর ডায়ার খুবই দর্শনীয় অভিনয়। তাঁর অভিনয় দর্শকমনে ছাপ ফেলেছিল। অর্জন সিং মুসাফিরের চরিত্রে দীপক সেনগুপ্ত সংযত অভিনয় করেছেন। হরদয়াল এক স্নেহময় পিতা। পুত্রের প্রতি টান আবার পুত্রবধূর দুর্নামের বেদনা রাঘব ভট্টাচার্যের অভিনয়ে সুন্দর ফুটে উঠেছে। চন্দ্রলাল মিল শ্রমিক, পতাগত প্রাণ—স্ত্রীর দুর্নামে পাগল—ভালবাসায় উন্মাদ চরিত্রটি শুভেন্দু ভট্টাচার্য ভালো এঁকেছেন। বিপ্লবী বন্ধু ফেরৎ দুই সৈনিক মকবুল আর সুরজিৎ—স্বপন রায় ও সন্তোষ দাস দর্শক মনে আশা ও বেদনা জাগিয়েছেন। ওডায়ার, আর্ভিং, টমসন, ডেন চরিত্রে যথাক্রমে সুজিত চক্রবর্তী, তারাপদ ভট্টাচার্য, সুকুমার ব্যানার্জী ও রাজকুমার কাফকার চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রে গুরবচন (সত্য দাস), উধম সিং (দিলীপ ঘোষ), রাত্তো (বি রায়), গিরিধারীলাল (গণেশ পাল) কানাইয়ালাল (খগেন সরকার), কিচলু (চিত্ত সাহা) ভালোই। মহিলা চরিত্রে কাজল চ্যাটার্জী, দীপালি চক্রবর্তী এবং শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জির অভিনয়ে দর্শকরা অভিভূত হন। আবহ-সংগীত (পরিচালক ঘনশ্যাম পাইন) পরি-চালনা ছবির উপযোগী হয়েছে।

[illegible] পরিচালিত সারা বাংলা [illegible] একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৯৭৩ :

প্রযোজনা : ১ম ইউ টি সি (হাওড়া)—[illegible], ২য় [illegible] (ইছাপুর)—[illegible] [illegible] [illegible], ৩য় [illegible] ([illegible])—[illegible] [illegible], ৪র্থ [illegible] (ইছাপুর)—[illegible]। [illegible] (কলিকাতা)—[illegible] [illegible]। [illegible] ১ম (হাসির) [illegible] (কলিকাতা)—[illegible] [illegible]। পরিচালনা : ১ম [illegible] ঘোষ (ইউ টি সি), ২য় [illegible] মণ্ডল (সম-কালীন)। অভিনয় : ১ম বিনোদ লাহিড়ী ([illegible]/প্রান্তিক), ২য় রবীন্দ্র-[illegible] ([illegible]/সন্তোষ)। অভি-নেত্রী : ১ম বিন্দু গোস্বামী (ইউ টি সি), ২য় তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রেক্ষণ), ৩য় স্বপন চ্যাটার্জি (সমকালীন)। (হাসির) ১ম সরোজ রায় (নটসেনা)। চরিত্রাভিনেতা: ১ম প্রশান্ত চ্যাটার্জি (স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ/হালিশহর), ২য় বিশ্বনাথ ঘোষ (জাগৃতি/আতপুর)। (হাসির) ১ম তারক কুণ্ডু (পুরোধা/কাঁচড়াপাড়া)। অভিনেত্রী : ১ম বেলা সরকার (প্রেক্ষণ), ২য় মিত্রা দে (প্রান্তিক)। শিশু অভিনেতা : সুধীর গোস্বামী (সম্মিলনী নাট্য সংস্থা/বরিষা)। সংগীত : টি আর এস রিক্রিয়েশন ক্লাব (কলিকাতা) 'তৃতীয় কণ্ঠ'। আলো : ময়ূরাক্ষী (আসানসোল) 'দালাল'। দৃশ্য ও সাজ-সজ্জা : অনুপ রায় (নিশ্চুপ/শ্যামনগর) 'টোপ'।

রবীন্দ্র সদনে দুঃস্থিদের বিচিত্রানুষ্ঠান

ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফর দি ব্লাইন্ড-এর সভাপতি শ্রীমতী গীতা বাসু জানাচ্ছেন যে অন্ধদের সাহায্যার্থে আগামী ২৫ মার্চ কলকাতার রবীন্দ্র সদনে সকাল ১০টায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অন্ধশিল্পীরা এই বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে। এবং বহুরূপী নাট্য সংস্থার চেয়ার-ডেক-টিক নাটক মঞ্চস্থ হবে। সভাপতি শ্রীমতী বাসু জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন।

একটি সুপরিকল্পিত জাতীয় শিশু উৎসব

'ভাই-বোনেদের আসরে' শতাধিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবারও জাতির স্মরণীয় দিন ২৩শে থেকে ২৬শে জানুয়ারী চার দিনব্যাপী সুন্দরভাবে সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোনারপুরে শিশু-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এবারের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, ব্রতচারী নৃত্য, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা, [illegible] [illegible] [illegible] দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা [illegible] পুরুর প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] সম্বর্ধনা।

[illegible]

রোত নং ১৮/রেহানা সুলতান

মিলাপ/শত্রুঘ্ন সিনহা

বোম্বাই থেকে

গত মাসে এই নিয়ে তিনটি ছ
সেন্সরের খড়্গে জবাই হল। হিন্দী ছ
'প্রভাত', মালায়লম ছবি 'মিস্টার সুন্দরী
আর তামিল ছবি 'দেবিনাথ লক্ষ্মী'। এ
আগেই 'কিমৎ' নামে আর একটি হিন্দ
ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে
হিংসা ও যৌনতা নিরোধ সম্পর্কে অধ
বিজ্ঞাপিত সরকারী নীতি অনুসরণ করে
নাকি এই খড়্গাঘাত। সাধু উদ্দেশ্য সন্দে
নেই। তবে কতগুলি হঠকারিতা প্রযোজ
পরিচালকদের রীতিমত বিপন্ন ক
তুলেছে।

প্রথমত, সেন্সার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ
নীতি অনুসরণ করছেন তা ঠিক বো
যাচ্ছে না। যে দৃশ্য একটি ছবিতে দো
দোষে দুষ্ট বলে ওঁদের মনে হয় নামীদা
নির্মাতাদের তৈরি সেই সব দৃশ্য সম্বা
ছবি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসে বসে দেখেন
তার তারিফ করেন। সাধারণত

বাজেটের ছবিগুলিতেই খরা খরশান হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ নীতি রোজই বদল হচ্ছে। ভাল; আমরা স্থবির নই, এটা তারই প্রমাণ। প্রতিদিন চিন্তা করছি ও নীতি বদল করে যাচ্ছি, এটা প্রাণের লক্ষণ। কিন্তু ছবিগুলোর পরিকল্পনা থেকে প্রস্তুতি পর্যন্ত খানিকটা সময় তো লাগে। নীতিটা যদি মাঝখানে কোথাও বা ছবি শেষ হলে নির্দিষ্ট হয় তবে তো নির্মাতাদের ফাঁপরে পড়তে হয়। ইতিমধ্যে যে দশ থেকে চল্লিশ লাখ দিয়ে যা করার করা হয়ে গেছে। খেতে বসার পর যদি আপনি ঠাকুরকে বলেন—আমি ভেবে দেখেছি আমি নুন, মশলা খাবো না, গুরুদেব বারণ করেছেন—তাহলে তো বিপদ! এটা আগে বললে রাঁধুনি না হয় ব্যবস্থা করতে পারত। হিংসা, যৌনতা, চলবে না এই সদিচ্ছা পরবর্তীকালের ছবিগুলোতে প্রয়োগ করে ধর্মরক্ষা করলেই হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা যে ইতিমধ্যে ফেঁসে আছে তার কি হবে?

তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে: নৈতিবাচক এই নীতি দিয়ে সমাজ কতটা লাভবান হচ্ছে? কি কি করা উচিত নয়, গুরুর এই নির্দেশের তালিকা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে—তাতে লাভ কি হয়েছে? তাহলে আমাদের ছবি হবে কি নিয়ে?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, এই যে মহাসমারোহে বিদেশী ছবির ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, তার নব্বই ভাগ ছবিই কি চরম যৌনতা ও হিংসার প্রতিচ্ছবির নমুনা নয়। আমাদের মত এত ভদ্র, অহিংস, অযৌন দেশে তবে এ বেলেল্লাপনা আনা হচ্ছে কেন? সরকারী উদ্যোগে তৈরি ফিল্ম ফাইনান্সের বেশীর ভাগ ছবিতে, অন্তত কয়েকটিতে তো অতি প্রকটভাবেই স্নানের ঘরের দৃশ্য, বিছানাতে নিরাবরণা প্রিয়তমাকে অঙ্কলগ্নাও দেখছি—এই যা হচ্ছে কেন? এই ভণ্ডামীরও অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

যেদিন কাগজে গুজরাল সাহেবের বক্তৃতা বেরিয়েছে, সেদিনই ছোট ছোট খবর আছে এখানকার কাগজে।

কুড়ি বছর বয়সের মা আন্নাবাই তার দেড় বছর বয়সের ছেলের গলা রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছেন—বোম্বাইয়ের জোগেশ্বরীতে। অভাবের তাড়নায় বিরক্ত হয়ে।

উনিশ বছরের একটি কলেজের মেয়েকে দাদারের কিং জর্জ স্কুলের নিকটবর্তী এক ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আসামী চন্দ্রকান্ত সাবন্ত এই দুঃস্থা মেয়েটিকে পাপ দেহ-ব্যবসায় নিয়োগ করেছিল।

এতো দুটো সেদিনকার খবর। যা কাগজে বেরিয়েছে। আমরা জানি, এমনি হাজার হাজার ঘটনা আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত ঘটছে। ছবির পর্দায় আমরা যত ভালমানুষই সাজবার চেষ্টা করি না কেন, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না। সত্যি কথা সাহস করে বলতে হবে। আর এ কথা নিশ্চিত, কেবলমাত্র সিনেমা থিয়েটারকে অহিংস, অযৌন করে রাখলে এ দেশ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবার নয়।

* * *

যৌনতা সম্বন্ধীয় ছবির সঙ্গে ইদানীং কালে যে পরিচালকের নাম সবচেয়ে বেশী জড়িত তাঁর নাম, বাবুরাম ইশারা। সেন্সরকে বিব্রত করতে ইশারার চেয়ে বেশী সক্ষম বোধহয় আর কেউ নন। মাত্র তিন বছরে ইশারা তৈরি করেছেন ন'টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি। এর মধ্যে একমাত্র 'মান যাইয়ে' ছাড়া আটটি ছবিরই কাহিনীকার ইশারা স্বয়ং নিজে। স্টুডিওর বাইরে কম খরচে ছবি তোলায় ইশারার জুড়ি মেলা ভার। তাঁর বেশীর ভাগ ছবিই আউটডোরে মাত্র দিন তিরিশেকের স্যুটিংএ সম্পন্ন।

সেন্সর অবশ্য ইশারাকে একেবারে নিস্তার দেননি। ইশারার ধারণা তাঁর ছবিগুলি সবই সামাজিক সমস্যার ভিত্তিতে নির্মিত। তথাপি সেন্সর বিরূপ। তাঁর দুটি ছবি 'সোসাইটি' এবং 'ইয়ে সচ হ্যায়'কে তাঁরা ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেছেন। 'সোসাইটি'তে ইশারা দেখিয়েছেন, এক ডাক্তার তাঁর রোগিণীর চিকিৎসায় যৌনতার আশ্রয় নিয়ে তাকে সারিয়ে তুলেছেন। 'ইয়ে সচ হ্যায়' ছবিটিতে ভ্রূণহত্যার পক্ষে ইশারা ওকালতি করেছেন।

ইশারা পরিচালিত 'মন তেরা তন মেরা' এবং 'এক নজর' ব্যবসায়িক সাফল্য না পেলেও তাঁর প্রথম ছবি 'চেতনা' এবং পরে 'জরুরত'-এর বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্য তা অনেকাংশে পুষিয়ে দিয়েছে। একথা পুরোপুরি অনস্বীকার্য নয় যে, অনেক নায়িকাই ইশারার চোখে পড়ায় সচেষ্ট কারণ অবশ্যই রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন। অভিনেত্রী নন্দার ক্ষেত্রে অবশ্য তা ভিন্ন হতে পারে। নন্দা, ইশারার আগামী ছবি 'নয়া নেশা'র নায়িকা। কথায় কথায় নন্দা সেদিন জানালেন তাঁর ঐ ছবির ভূমিকায় নগ্নতা তো নেই-ই এমনকি 'সাহসী' কিছু করার জন্যেও ইশারা তাঁকে অনুরোধ জানান নি।

* * *

বোম্বাইতে সরকারের তরফ থেকে এক সপ্তাহব্যাপী এক পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর সাতটি ছবির মধ্যে ছ'টিকেই সেন্সর 'এ' মার্কায় ভূষিত করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর পরিচালক রেফ হুফ এ ব্যাপারে ভারতীয় সেন্সর বোর্ডের সমালোচনা করেন। বোম্বাইতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ভারতীয় সেন্সর অকারণে এত কড়া নীতি অবলম্বন করছেন। তিনি বলেন সবকটি ছবি কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের প্রদর্শন করার মত এমন কিছু নয়। পশ্চিম জার্মানীতে সকলেই এই ছবিগুলি দেখতে পেয়েছেন। এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ছবিগুলি উপভোগ করার থেকে বঞ্চিত হয়নি। পরিচালক হুফ অবশ্য স্বীকার করেন যে পশ্চিম জার্মানীতে এখন ক্রমশ বেশী ছবি যৌনতা এবং অপরাধমূলক কাহিনীর ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে।

অংগার/যোগিতাবলী

সংশ্লিষ্ট মহলে আবার অসন্তোষ। অর্থ দপ্তর কাঁচা ফিল্মের আমদানির ওপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করেছেন। মিটার-প্রতি ১৫ পয়সার জায়গায় ৫০ পয়সা ধার্য করা হয়েছে শুল্কের হার' অর্থাৎ প্রতি হাজার ফুটের নেগেটিভ রোলে শুল্ক লাগবে ১৪১-৬৫ টাকা এবং পজিটিভে ১৫৭-১৭। ভারতে প্রতি বছরে কাঁচা ফিল্ম আমদানী হয় আড়াই লক্ষ রোল।

প্রযোজক মহল জানান এমনিতেই টিকিট-লব্ধ অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ চলে যায় সরকার এবং এক্সিবিটরদের গহ্বরে, বাকী ২০ ভাগের ওপর প্রযোজক, পরিচালক এবং চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহলের নির্ভর করে চলতে হয়। ফলতঃ মাত্র শতকরা ১০ ভাগ ছবি পায় ব্যবসায়িক সাফল্য, ১০ ভাগ কোনমতে খরচ-খরচা পুষিয়ে নেয়, ২০ ভাগ ছবির প্রযোজককে অল্পস্বল্প ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, বাকি শতকরা ৬০ ভাগের ভাগ্যে থাকে চরম ব্যবসায়িক অসাফল্য।

এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার কে এ আব্বাস তো ক্ষোভের সঙ্গে বলেন—কম বাজেটে ছবি করার বোধহয় এইখানেই ইতি। মাত্র ডজন দুয়েক প্রযোজকের আর কিছু সংখ্যক চিত্রতারকার আর্থিক প্রাচুর্য যদি সরকারের মনে এই ধারণা এনে দেয় যে, চিত্রনির্মাতারা সব টাকার ওপরে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, তাহলে তা হবে খুবই ভুল এবং দুঃখজনক। তাঁর মতে—বড় বাজেটের

ছবির নির্মাতারা একসঙ্গে অনেক রোল নিয়ে, ফলে তাঁরা কোনমতে মানিয়ে নিতে পারছেন, কিন্তু ছোট বাজেটের ছবির নির্মাতাদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় নিতান্তই দুর্ভোগ। অথচ কম বাজেটের ছবির নির্মাতারাই তুলনামূলকভাবে সমাজসচেতন এবং শিল্পসম্মত ছবি করতে অনেক বেশী মনোযোগী। তাছাড়াও বড়লোকের আছে বাড়ি, গাড়ি, টেলিভিশন, নাইট ক্লাব, ককটেল পার্টি—এক কথায় চিত্তবিনোদনের উপাদানের অন্ত নেই। কিন্তু গরীবের পক্ষে সিনেমা ছাড়া আর কিছুই নেই। আব্বাসের মতে, সরকারের উচিত বড় বাজেটের ছবির প্রযোজকদের ওপর শুল্ক ধার্য করে ছোট বাজেটের চিত্রনির্মাতাদের বর্ধিত শুল্কের হাত থেকে রেহাই দেওয়া। প্রায় আব্বাস সাহেবের কথায় পুনরাবৃত্তি করে মারাঠী ফিল্মের ব্যবসায়িক মহামণ্ডলের এক মুখপাত্র বলেন, "কম খরচের ছবিগুলির এমনিতেই দুর্ভোগের অন্ত নেই, তার ওপরে মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘায়ের মত বর্ধিত শুল্কের হারের ঠেলায় তার প্রায় মরণদশা।' ইণ্ডিয়ান ডকুমেণ্টারী প্রোডিউসারস আসোসিয়েশনের সভাপতি গোবর্ধনদাস আগরওয়াল বলেন—স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করায় বাধ সাধল এই বর্ধিত শুল্কের হার।

সবচেয়ে বড় সমস্যার কথা যে, প্রায় ৪০০ ছবি এখন নির্মীয়মান। এইসব ছবি প্রস্তুতির পথে বিভিন্নভাবে আছে। ইতিমধ্যেই পরিবেশকের কাছে দাম নির্ধারণ করা হয়ে গেছে। ফলে দাম বাড়াবার আর কোন উপায়ই নেই। অথচ প্রযোজকদের বাড়তি ব্যয়ভার বহন করতে হবে। ইম্পার সভাপতি আই এস জোহর এবং ডি রামানুজম এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রীকে। আই এস জোহর বলেন, এই শুল্কের বৃদ্ধি শতকরা প্রায় তিরিশ ভাগ প্রযোজকের চিত্র নির্মাণে ছেদ টেনে দেবে।

* * *

খ্যাতনামা চিত্রনির্মাতা মহেশ কাউল মারা গেলেন। চিত্রজগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রায় সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের। চিত্রপরিচালক হিসেবে বহু অর্থ উপার্জন করলেও মৃত্যুকালে তাঁর নিজের কোন গাড়ি পর্যন্ত তৈরি করে উঠতে পারেন নি। লব্ধ অর্থ তাঁর সহকর্মী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে তিনি হাসিমুখে ভাগ করে নিয়েছেন। স্ত্রী, দশ বছরের ছোট্ট ছেলে, আর সাত বছরের মেয়েকে রেখে তিনি মারা যান।

ব্যক্তিগত জীবনে কাউল ছিলেন অভিনেতা অশোককুমার ও কিশোর সাহুর সহপাঠী। ইংরিজি বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, উর্দু, সংস্কৃত—এই সাতটি ভাষায় সমান পারদর্শী। সুপণ্ডিত তিনি, পড়া ছিল তাঁর একমাত্র নেশা। মারা যাবার সময় তাঁর লাইব্রেরীতে ছিল প্রায় ২০ হাজার বই।

দেবকী বসুর কাছে শিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করেন কাউল। পরে আলমতে-কর পরিচালিত 'মহাত্মা বিদুর' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। ক্রমে প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতা বাবুরাও পেন্তলের সংস্পর্শে আসেন। প্রসঙ্গতঃ পেন্তল ভি শান্তারাম-এরও গুরু।

অধুনা খ্যাতনামা অনেক চিত্রাভিনেতাই কাউলের কাছে ঋণী। রাজকাপুরে কাউল পরিচালিত 'গোপীনাথ' চিত্রে অভিনয় করেই প্রথম খ্যাতির মুখ দেখেন। 'জীবন জ্যোতি' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন শাম্মী কাপুর ও চাঁদ ওসমানীকে। 'অভিমান'-এ আসেন মেহমুদ। এ-ছবিতে তিনি গ্লিস অথবা ক্রেন ব্যবহার না করেও সমান এফেক্ট এনেছিলেন। 'তালাক' ছবিতে প্রথম সুযোগ পান কামিনী কদম রাজেন্দ্রকুমারের বিপরীতে। রাজেন্দ্রকুমার পান বিপুল জনপ্রিয়তা। 'প্যার কি প্যাস' ছবিতে হানি ইরাণী মাত্র আড়াই বছর বয়সে অভিনয়ের সুযোগ পান। 'সওতেলা ভাই' সম্পর্কে এখনো অনেকে বলেন, গুরু দত্ত এই ছবিতে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেন। 'হাম কাঁহা যা রহে হ্যায়' ছবিতে মঞ্চজগৎ থেকে চিত্রজগতে নিয়ে আসেন সঞ্জীবকুমারকে। সঞ্জীবকুমার সম্বন্ধে কাউল খুব উচ্চাশা পোষণ করতেন। ছবিটি বিশেষ কারণে শেষ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। 'সপ্নো কা সওদাগর' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান হেমা মালিনী ও রূপেশকুমার। তাঁর সর্বশেষ ছবি 'অগ্নিরেখা' অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যান। এই ছবিতে ভরত পুরস্কারপ্রাপ্ত সঞ্জীবকুমার আবার অভিনয়ের সুযোগ পান। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন উর্বশী পুরস্কার বিজয়িনী সারদা। পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জি এই ছবির সম্পাদনার ভার নিয়েছেন। কাউল সাহেব মারা যাওয়ায় ছবির বাকী কাজ তিনিই সম্পন্ন করেন। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

অভিনেতা হিসেবেও মহেশ কাউল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 'তেরে মেরে স্বপ্নে' ও 'কাগজ কে ফুল' ছবিতে তাঁর অভিনয়ের কথা এখনো অনেকে মনে করেন।

পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট তাঁকে প্রায়ই শিল্প, অভিনয় এবং পরিচালনা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানাতেন। কাউল ফিল্ম ইনস্টিটিউটে যোগাভ্যাসের প্রচলন করেন। তাঁর ধারণা ছিল নিজেকে জানা একজন অভিনেতার পক্ষে অপরিহার্য এবং নিজেকে জানার পক্ষে যোগাভ্যাস। ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের মধ্যে সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পী ও কলাকুশলী নির্ণয় করতে তাঁকে ইনস্টিটিউট ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি ছবি করতে অনুরোধ জানান। তিনি তৈরি করেন 'রাখী রাখী'। ঐ ছবিতে তাঁর কাছে কাজ করতে পাওয়ায় রাধা সালুজা নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

—পুরন্দর

সংস্কৃতি সংসদের রজতজয়ন্তী উৎসব : সংস্কৃতি সংসদের রজতজয়ন্তীর প্রথম উৎসব ছিল—রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর। রবীন্দ্রসদনে এবার ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের।

প্রধান আকর্ষণ নিঃসন্দেহে শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের গান। ইনি শুরু করেন রায়সী কানাড়া রাগ। বিলম্বিত অঙ্গে ধীরগতিতে প্রথমে একটি, তারপর দুটি, পরে তিনটি এমনিভাবে সুবিন্যস্ত স্বরবিস্তারে তানের মালা গেঁথে গেঁথে শিল্পী যখন রচনা করে চলেছিলেন রাগের ধ্রুপদী কাঠামো। সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন শান্ত গম্ভীরভাবে সমাহিত হয়ে গেল। তারপর যখন দ্রুতের পর্যায় এল—নানান লয়, ছন্দ, গতি ও তান বৈচিত্র্যের ওঠাপড়ায় যেন এক বর্ণসমৃদ্ধ সুরের আকাশ ব্যাপ্ত হয়েছিল। বিস্মিত হতে হল যে কোন পর্দা থেকে, যে কোনো মাত্রা থেকে যে কোন মুহূর্তে অফুরন্ত তানের— অনায়াস সৃষ্টি দেখে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কল্পনার এমন অভিনব মিলন দুর্লভ। তারাণা—সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসী গতির — তারফেরতার চরম মুহূর্তেও এতটুকু সুরাবিচ্যুতি ঘটেনি। মাধুর্য ও তেজ, সুর ও তালের এই ভারসাম্যই সুনন্দার সেদিনের অনুষ্ঠানকে এমন চিত্তগ্রাহী করে তোলে। একটি ভজন গেয়ে ইনি অনুষ্ঠান শেষ করেন। ওস্তাদ কেরামত খাঁর তবলা অনুষ্ঠান সাফল্যে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বাসুদেব চক্রবর্তীর হার্মোনিয়ম সঙ্গত শিল্পীর সঙ্গে সুন্দর সহযোগিতা করে।

সারেঙ্গীতে ছিলেন বাচ্চালাল মিশ্র।

উদীয়মান তরুণশিল্পী পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের গানে শিক্ষা, রেওয়াজ মেজাজ সবই ছিল। কিন্তু যে বস্তুটি না থাকার জন্য তাঁর অনুষ্ঠান মনে দাগ কাটতে পারে নি সেটি হোল সংযম ও ভারসাম্যের অভাব। এঁর সঙ্গে বাজানো

অনিল পালিতের তবলা সংগত ভাল লাগল।

সর্বশেষ শিল্পী শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের সরোদ। রাগ কৌশিকী কানাড়া। আপন বাদনশৈলীতে পরিবেশিত অনুষ্ঠানে ইনি নিজস্ব মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবলা সংগতে ছিলেন একটি কিশোর শিল্পী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। রাধিকাবাবু এই তরুণ শিল্পীকে বাজাবার প্রচুর অবকাশ দিয়েছেন আর ইনি সে সুযোগের মর্যাদাও রেখেছেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুযোগ্য শিষ্য অনিন্দ্যর ঠেকার স্পষ্টতা, রেলা ও তেহাই-এ অনুশীলনী প্রশংসা করবার মতই।

পাতিপুকুর শিক্ষা সংসদের পঞ্চম-বার্ষিক অনুষ্ঠান : স্বল্প পরিসরে, ক্ষুদ্রায়তনী পরিকল্পনায় এবং স্বেচ্ছা কর্মীদের অবসরের শ্রমে গড়ে-ওঠা পাতিপুকুর শিক্ষা সংসদ পাঁচ বছরে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে গত ২৫ ফেব্রুয়ারী সকালে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সহায় সম্বলহীন শিশুদের শিক্ষাদানের একটি সার্থক নমুনা এই অনুষ্ঠানে পেশ করা হয়।

শৈলেন ঘোষ রচিত ঈষৎ সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' গীতিনাট্যে শিশুশিল্পীরা সত্যিকারের নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন। পরিচালিকা মালতী সেনগুপ্তর সুররচনা প্রশংসা করবার মত। সংগীত, নাটক ছাড়া অঙ্কনশিল্পও যে এই শিশু শিক্ষার্থীদের যত্ন করে শেখানো হয়ে থাকে, তারই পরিচয় ছিল স্মারকগ্রন্থের প্রচ্ছদপটে শিশুদের আঁকা ছবিতে।

জনপ্রিয় কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী সর্বশ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, মায়া সেন, ঋতু গুহ, গীতা ঘটক, অর্ঘ্য সেন—বিনা পারিশ্রমিকে গান গেয়ে এঁদের মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল এই যে এই অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ শিক্ষা সংসদের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে।

শৈলেন্দ্রনাথ আঢ্য স্মৃতি সংগীত সম্মেলন : সম্প্রতি হাওড়া মিউজিক একাডেমী আয়োজিত শৈলেন্দ্রনাথ আঢ্য স্মৃতি সংগীত সম্মেলনে একটি উচ্চাঙ্গ সংগীতাসর উদ্বোধন করেন সংগীতরসিক পাহাড়ী সান্যাল। সরস সুন্দর ভাষণে শ্রীসান্যাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানান।

একাডেমীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেয়াল পরিবেশন করেন অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মুখোপাধ্যায় ও তন্দ্রা পাল।

কাঞ্চন পাঠকের শিষ্য দিলীপ মুখোপাধ্যায় গীত নিধুবাবু শ্রীধর কথকের দুটি গান "মনে মনে কাতর", 'কি করে ......' ও একটি শ্যামাসংগীত 'বড় আশা ...... —মনে রাখবার মত এই কারণে

অচেনা অতিথি/সুখেন দাস এবং জয়শ্রী রায়। —ফটো : অমৃত

যে তিনখানি গানে অতীতের একটি হারিয়ে-যাওয়া যুগ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরের প্রধান আকর্ষণ চিন্ময় লাহিড়ীর কণ্ঠে পরিবেশিত 'মধুবন্তী' রাগের খেয়াল। শক্তিশালী কণ্ঠে বিস্তারের তানের সৌষ্ঠব ও লয়ের চমক সব মিলে শিল্পীর মুন্সীয়ানা ও পরিবেশন কারিগরী প্রথম থেকে শেষ অবধি শ্রোতাদের চুম্বকের মত আকৃষ্ট করে রেখেছিলো। সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীলাহিড়ী পুত্র শ্যামল লাহিড়ী।

অনুষ্ঠানের শেষে শিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য সেতার হেমবেহাগ ও পিলু-ঠুংরি বাজিয়ে অনুষ্ঠানের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটান।

'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' চিত্রকে এইচ-এম-ভি'র রজত রেকর্ড উপহার : দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেকটর মিঃ এ কে সুদ 'নবকেতন'-এর হিন্দি ছবি 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'-এর গান এইচ-এম-ভি রেকর্ডে অসামান্য জনপ্রিয় হওয়ায় ছবির প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা দেব আনন্দ, সংগীত-পরিচালক রাহুল দেববর্মণ, নেপথ্য গায়িকা আশা ভোঁসলে এবং গীতকার আনন্দ বকসীকে রৌপ্য নির্মিত রেকর্ড উপহার দেন। সম্প্রতি বোম্বাই-এ সান এন স্যান্ড হোটেলে এইচ-এম-ভি আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের চিত্রজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। প্রযোজক দেব আনন্দের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে মিঃ সুদ আশা প্রকাশ করেন যে, দেব আনন্দের পরবর্তী ছবি 'শরীফ বদমাশ' এবং 'হীরা পান্না'-র গানও অনুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

ইন্দ্রাণী রহমান ও তাঁর নৃত্য সম্প্রদায় : রবীন্দ্র সদনে নারী সেবা সংঘ পরিচালিত ইন্দ্রাণী রহমান ও তাঁর নৃত্য

সম্প্রদায়ের নৃত্য এক রসসমৃদ্ধ অনুষ্ঠান।

পাঁচ বছর আগে দেখেছিলাম ইন্দ্রাণীর ভারতনাট্যম। কিন্তু কালের আঁচড় একটুকুও ম্লান করতে পারে নি তাঁর রূপ অথবা নৃত্যের দীপ্তিকে। এ সবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে পরিণত শিল্পভাবনার সৃষ্টির প্রেরণা—তাই এবারের নাচ আরো আকর্ষণীয়, আরো ভাবনিবিড়।

আগে দেখেছিলাম তাঁর একক নৃত্য—এবারে তাঁর সাথীশিল্পীরূপে এসেছিলেন কয়েকজন নৃত্যকুশলী শিল্পী। ভারতনাট্যম ও কুচিপুরীতে রাজা রেড্ডী আর কথক নৃত্যে দুর্গালাল ও দেবীলাল।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের পটভূমিকায় সমসাময়িক কালের পরিবর্তনশীল লীলার চকিত আভাস ইন্দ্রাণী রচিত নৃত্যগুলি যেন মায়াময় করে তুলেছিলো।

'আলারিপু' দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা। ইন্দ্রাণী পরিকল্পিত এবং ইন্দ্রাণী ও রাজা রেড্ডী রূপায়িত এই অংশ নৃত্তের এক দীপ্ত রূপ। অভিনয় এখানে গৌণ দেহ ও হস্তের ভঙ্গী, মুদ্রা ও ছন্দগতির রেখাচিত্র পূর্ণাঙ্গরূপে পৌঁছেছিল রাজা রেড্ডীর পুরুষোচিত ওজস ও ইন্দ্রাণীর নারীলাবণ্যর শিল্পসুন্দর মিলনে।

আলারিপুর পর ছিল রাগম, তানম ও পল্লবী। 'আনন্দভৈরব' রাগাশ্রয়ী এই নৃত্যে সঙ্গীতের ভাবের প্রাধান্য দেওয়ায় এক শান্ত, মধুর রসে দর্শকচিত্ত যখন সিক্ত ঠিক সেই মুহূর্তেই 'তানিঅবর্তনম'-এর চমকপ্রদ শিহরণের অভিজ্ঞতা এল নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতিযোগিতামূলক উত্তর প্রত্যুত্তরের কৌতুক ও লাস্যে। এই রসসৃষ্টির জন্য সমান কৃতিত্বের দাবীদার নৃত্যরচয়িতা ইন্দ্রাণী রহমান।

ইন্দ্রাণীর একক নৃত্যগুলির মধ্যে 'মন্দুকাশব্দম' (কুচিপুরী) ও তিল্লানা (ভারতনাট্যম) উপভোগের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে।

প্রথমটি নৃত্য, নাট্য ও নৃত্তের সমাবেশে দর্শকচিত্তকে বিভিন্ন রসের শরিক করে তোলে—দ্বিতীয়টিতে নূপুর নিক্কণ যেন কবিতা হয়ে উঠেছিল গতি ও লাবণ্যের মিলনে।

পাখোয়াজ ও তবলা বাদনরত দুর্গালাল ও দেবীলালের কথক নৃত্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে স্বাদবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে।

পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স : পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

সম্পাদকীয় ভাষণে শ্রীসতীন সেন বলেন, আজকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশে অবিশ্বাস ও সন্দেহই প্রবল হয়ে উঠেছে। এই আবহাওয়া থেকে মনকে মুক্ত করতে পারে সঙ্গীত। তাই শত বাধার মধ্যেও প্রতি বছর একটি করে

আবার পেরিয়ে / মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : তপন সিংহ। ফটো : অমৃত

সঙ্গীত সম্মেলন নিবেদন আমাদের অবশ্যকর্তব্যের অঙ্গীভূত।

এ বছরের সঙ্গীতানুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীতে পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণ্ঠসঙ্গীতে সঙ্গীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়কের অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে সম্মেলনের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণের মধ্যেই পড়ে।

প্রথমেই নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ধরেন 'যোগিয়া কালাংড়া'। রাগের অন্তর্লীন উদাস বৈরাগ্যর আলম্বন বিভাগের ফাঁকে ফাঁকে অভিমান-মধুর অশ্রুজল ভেজানো মা রে সা র সেই শ্রুতিগুঞ্জনের রেশ সারা প্রেক্ষাগৃহকে যেন কোমল ব্যঞ্জনায় অনুরণিত করে তুলেছিল। রাগের ভাবমাধুর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিল্পী তান, লয়কারী তথা আঙ্গিক দক্ষতা প্রদর্শনের চাঞ্চল্যকে সংহত রেখে বিস্তার অঙ্গের ওপর জোর দিয়েছিলেন বলেই তাঁর বাজনা এমন মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

আলাউদ্দিন ঘরানার এক সুবিন্যস্ত রূপ মেলে ধরেন শ্রীমতী পূরণরাণী। তবে দরবারী কানাড়ার আলাপের চেয়ে পাহাড়ী ঝিঁঝিটের গৎই জমে উঠেছিল বেশী।

মণিলাল নাগের সেতার বাদন মুগ্ধ করেছিল 'দেশ' রাগের ভাববিশ্লেষণে যথাযথ অলংকারের শিল্পসম্মত প্রয়োগনৈপুণ্যে।

ধ্যানেশ খাঁ পরিবেশিত 'রাগেশ্রী' পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। দেবী চট্টোপাধ্যায়ের সেতার বাদনে তানের অঙ্গাবিশেষ প্রশংসা করবার মত। শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক আরম্ভ করেন 'চন্দ্রকোষ'। তারসপ্তক প্রধান এই রাগের আবেগমধুর বিস্তার তানের বৈচিত্র্য ও বাহার যে উজ্জ্বল পরিবেশ রচনা করেছিল সে উচ্ছ্বাস যখন স্থিতধী হয়ে 'ভজ গোবিন্দ'র ভক্তিনম্র বিনতিতে দাঁড়াল শ্রোতাদের চিত্ত তখন কূলে কূলে ভরে উঠেছে।

জিতেন্দ্র অভিষেকী আগের অনুষ্ঠানগুলিতে যে মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছিলেন এবারের অনুষ্ঠানের ছন্দ তার সঙ্গে মিলল না। 'পূরিয়া' রাগের বিলম্বিত বিস্তার তার কাছে প্রত্যাশিত মানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তানের সঙ্গে চাঞ্চল্য এসে পড়ায় 'পূরিয়া'র নিস্পৃহ বৈরাগ্যের ভাব দানা বেঁধে উঠতে পারে নি।

পণ্ডিত যশরাজের 'ললিত' ও 'ভটিয়া'র সুপরিবেশিত। তার আগে আমীর খাঁ ও বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গায়নশৈলী সমন্বয়ের প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে সার্থক রূপ পেয়েছে।

তরুণ শিল্পী রুক্মাবাঈ সেনগুপ্তর 'কলাবতী' রাগ সু-গীত।

নৃত্যে উড়িষ্যার শিল্পী শ্রীমতী সংযুক্তা পানিগ্রাহী 'দশাবতার', 'যুগ্মদ্বন্দ্ব', 'রঙ্গপ্রণাম' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র ছন্দরূপে কাব্যসৌন্দর্য ও কলানৈপুণ্যের কয়েকটি চিত্তগ্রাহী মুহূর্তের সৃষ্টি করেন। সমান আকর্ষণীয় ছিল তার সঙ্গীতয়াবৃন্দ, বিশেষ করে কণ্ঠসঙ্গীতে রঘুনাথ পানিগ্রাহী।

বাংলার শিল্পী চিত্রেশ দাস ও মায়া চট্টোপাধ্যায় উভয়ের কথক নৃত্যই দর্শকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত করতালি পেয়েছেন একজনের সপ্রতিভ ও সুসংবদ্ধ নৃত্যশৈলী—অপরের আঙ্গিকদক্ষতা ও অধ্যবসায়লব্ধ সুকঠিন অংশ বিশেষের স্বচ্ছন্দ উপস্থাপনা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথক নৃত্য শিল্পীদের ঢং-এ গাওয়া মায়া চট্টোপাধ্যায়ের ঠুংরী নিছক অনুকরণই নয়। এর মধ্যে শিল্পীর শ্রম ও অনুশীলনের স্বাক্ষর লক্ষ্য করবার মতই।

—চিত্রাঙ্গদা

দর্শক

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

গত ১০ মার্চ থেকে বোম্বাইয়ে ৩৮তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলগুলি চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে। গত চার বছরের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাবের খেলা পড়েছে 'এ' গ্রুপে। পাঞ্জাব একারও চ্যাম্পিয়ান হলে তারা উপর্যুপরি ৫ বার এবং মোট ১৫ বার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করবে। বাংলার খেলা পড়েছে 'বি' গ্রুপে। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলটি প্রতিযোগিতা থেকে শেষপর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ, ছাত্রদের মাথার ওপর এখন বিভিন্ন পরীক্ষার খাঁড়া ঝুলছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষে শক্তিশালী দল তৈরী করা সম্ভব নয়।

১৯৭৩ সালের এই জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক। আগামী আগস্ট মাসে আমস্টারডামে যে বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার আসর বসবে, তার কথা মনে রেখে এই জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা দেখে ভারতীয় হকি দল গঠন করার প্রস্তুতি আরম্ভ হবে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালে আমস্টারডামের মাটিতেই ভারত হকি খেলায় প্রথম অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল এবং সেই সময় থেকে অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় মোট ৭বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি জয় ৬বার) স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড করে। অলিম্পিক গেমসে ভারত শেষ স্বর্ণপদক পেয়েছিল ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৮ সাল থেকে ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থানে নেমে গেছে—১৯৬৮ সালের অলিম্পিকে ভারতের স্থান ৩য় (১ম পাকিস্তান এবং ২য় অস্ট্রেলিয়া), ১৯৭১ সালের প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান ৩য় (পাকিস্তান ১ম ও স্পেন ২য়) এবং ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতের স্থান ৩য় (পশ্চিম জার্মানী ১ম এবং পাকিস্তান ২য়)। ভারতের এই অবনতির জন্যে ভারতীয় হকির কর্মকর্তারাই প্রধানত দায়ী। কর্মকর্তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্যেই ভারতের বিভিন্ন খেলাধুলায় আজকের এই হাঁড়ির হাল।

রোহন কানহাই

ডগ ওয়াল্টার্স

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ

ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভালে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ২৪৩ রান উঠেছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে দুই ভাই—ইয়ান এবং গ্রেগ চ্যাপেল দলের ১২৯ রান তুলে দিয়েছিলেন ১৪৪ মিনিটের খেলায়। গ্রেগ চ্যাপেলের ১০৬ রানে ছিল ১০টা বাউণ্ডারী। এই নিয়ে তিনি তাঁর ১৫টি টেস্টে ৪টে সেঞ্চুরী করলেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান ১৩১ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লর্ডস, ১৯৭২)।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩২৪ রানের মাথায় শেষ হয়। উইকেটকিপার রডনি মার্শ ৭৮ রান করে আউট হন। ১ম টেস্টে তিনি ৯৭ রান তুলেছিলেন, মাত্র ৩ রানের জন্যে শতরান পূর্ণ করতে পারেননি। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের একটা উইকেট পড়ে ৫২ রান উঠেছিল। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ার ফলে ১৪০ মিনিট দেরীতে খেলা আরম্ভ হয়েছিল।

তৃতীয় দিনেও বৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ৪৫ মিনিটের খেলা মাঠে মারা যায়। এইদিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসে ২৪১ রান (৫ উইকেটে) দাঁড়ায়। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫টা উইকেট হাতে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩২৪ রানের থেকে ৮৩ রানের পেছনে থাকে। ফ্রেডারিকসের দুর্ভাগ্য মাত্র ২ রানের জন্যে তাঁর সেঞ্চুরী হয়নি।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৩৯১ রানের মাথায় শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৩২৪ রানের থেকে ৬৭ রানে এগিয়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক রোহন কানহাই ১০৫ রান ক'রে আউট হন। তিনি ১৯৫ মিনিট খেলে তাঁর শতরান পূর্ণ করেন (বাউণ্ডারী ১১ এবং ওভার-বাউণ্ডারী ১)। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এটি রোহনের ১৪শ সেঞ্চুরী। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩য়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে কানহাই এবং মারে ২১০ মিনিট খেলে দলের ১৬৫ রান সংগ্রহ করেন। এই রান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। পূর্ব রেকর্ড ১৩৮ রান (ক্লাইড ওয়ালকট এবং কলী স্মিথ, জামাইকা, ১৯৫৫)। কানহাইয়ের ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি ডেরেক মারে শতরান পূর্ণ করতে পারেননি, তিনি ৯০ রানের মাথায় আউট হন।

চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের ১টা উইকেট পড়ে ৮৪ রান উঠেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে চা-পানের পর ১০ মিনিট খেলে অস্ট্রেলিয়া তাদের ২য় ইনিংসের ৩০০ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অসমাপ্ত তৃতীয় উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল এবং ডগ ওয়াল্টার্স দলের ১৯৩ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। দুজনেই সেঞ্চুরী করেছিলেন—চ্যাপেল নট আউট ১০৬ রান এবং ওয়াল্টার্স নট আউট ১০২ রান। টেস্ট খেলায় ইয়ান চ্যাপেলের এটি ৯ম সেঞ্চুরী, অপরদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৩য় সেঞ্চুরী। ডগ ওয়াল্টার্স এই নিয়ে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৯টি সেঞ্চুরী করলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ৫ম সেঞ্চুরী। এখানে উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৮-৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে

ওয়াল্টার্স ৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে মোট যে ৬৯১ রান (গড় ৯১৬·৫০) সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে ৪টে সেঞ্চুরী ছিল। এই সিরিজেই সিড্‌নির ৫ম টেস্টে ওয়াল্টার্স ২৪২ ও ১০৩ রান করার সূত্রে একটি টেস্ট খেলায় ডাবল সেঞ্চুরী এবং সেঞ্চুরী করার প্রথম নজির সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে ওয়াল্টার্সের এই বিশ্ব রেকর্ডকে স্পর্শ করেছেন একমাত্র খেলোয়াড় ভারতের সুনীল গাভাস্কার—ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরই বিপক্ষে ১৯৭১ সালে পোর্ট অব স্পেনের ৫ম টেস্টে ১২৪ ও ২২০ রান করে।

পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০০ মিনিটের খেলার সময় হাতে নিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। এই সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৩৪ রান সংগ্রহ কোন মতেই সম্ভব নয় জেনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তার কোন চেষ্টাই করেনি। তাদের ২য় ইনিংসের ৩৬ রানের মাথায় খেলা শেষ হলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩২৪ রান (গ্রেগ চ্যাপেল ১০৬, ইয়ান চ্যাপেল ৭২ এবং রডনি মার্শ ৭৮ রান। বয়েস ৬৮ রানে ৩, হোল্ডার ৪৯ রানে ২, উইলেট ৭৯ রানে ২ এবং গিবস ৭৯ রানে ২ উইকেট)

● ৩০০ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কিথ স্ট্যাকপোল ৫৩, ইয়ান চ্যাপেল নট আউট ১০৬ এবং ডগ ওয়াল্টার্স নট আউট ১০২ রান)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৯১ রান (রয় ফ্রেডারিক্স ৯৮, রোহন কানহাই ১০৫ এবং ডেরিক মারে ৯০ রান। ম্যাক্স ওয়াকার ৯৭ রানে ৫ এবং জেনার ৬৫ রানে ৩ উইকেট)

● ৩৬ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

গত ১৩ মার্চ তারিখে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভের আগে অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের সমাধি-স্থলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসেন। ছ' বছর আগে (১৯৬৭) এই ১৩ মার্চ তারিখেই স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল জামাইকায় পরলোকগমন করেছিলেন। তাঁর জন্ম বারবাদোজে ১৯২৪ সালের ১ আগস্ট।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজে স্যার ওরেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন। এই সিরিজে ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় উভয় দলেরই মোট রান-সংখ্যা সমান দাঁড়ায়। খেলায় এরকম অবস্থা দাঁড়ালে বলা হয় 'টাই' ম্যাচ। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলায় 'টাই' ম্যাচের সংখ্যা এই একটিই। ফ্রাঙ্ক ওরেল ছিলেন প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলার একজন বড় সমর্থক। তাঁর সম্মানার্থে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজ থেকে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজে 'ওরেল কাপ' পুরস্কার চালু করেছে। ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক ম্যাচ জয়ের সূত্রে অস্ট্রেলিয়া প্রথম 'ওরেল কাপ' জয়ের গৌরব লাভ করে। ফ্রাঙ্ক ওরেল স্বহস্তে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোর হাতে 'ওরেল কাপটি' তুলে দিয়েছিলেন। যাঁর নামে পুরস্কার তিনিই বিজয়ী দলকে স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করছেন এই রকম নজির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দ্বিতীয় নেই।

স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের জন্ম বারবাদোজের সেণ্ট মাইকেলে, ১৯২৪ সালের ১ আগস্ট। তিনি তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৪৭ সালে। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যে তিনটি টেস্ট সিরিজ খেলেছিল তার ফলাফল দাঁড়ায় : ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১—২ খেলায় (ড্র ২) হার, ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের বিপক্ষে ৫—০ খেলায় 'রাবার' জয় এবং ১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয়ের সূত্রে প্রথম উইসডেন ট্রফি জয়। তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৫১, মোট রান ৩,৮৬০ (গড় ৪৯·৪৮), এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৬১ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মানচেস্টার, ১৯৫০) এবং সেঞ্চুরী ৯টি। ক্রিকেট খেলার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৬৪ সালে তাঁকে ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় 'স্যার' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল মৃত্যুর দু'মাস আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের টেস্ট খেলা উপলক্ষে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে দর্শকদের আসন অলংকৃত করেছিলেন।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

আগামী ৫ই এপ্রিল থেকে যুগোস্লাভিয়ার সারাজেভো শহরে ৩২তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসবে। পুরুষদের সোয়েথলিং কাপের খেলায় গতবারের বিজয়ী প্রজাতন্ত্রী চীন ১নং পর্যায়ের 'এ' গ্রুপে এবং মেয়েদের কোর্বিলোন কাপের খেলায় গতবারের বিজয়ী জাপান ১নং পর্যায়ের 'এ' গ্রুপে খেলবে। ভারতের খেলা পড়েছে পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের ২নং পর্যায়ের 'বি' গ্রুপে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৭ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
পরিবহন—২ পয়সা
মোট—৫২ পয়সা

Friday, 30th March, 1973 শুক্রবার, ১৬ চৈত্র, ১৩৭৯ .52 Paise

সূচীপত্র

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

শহীদ স্মৃতিবাসরে উপেক্ষিত 'প্রফুল্লচন্দ্র' প্রসঙ্গে

আমার প্রতিবাদ-পত্রের প্রতিবাদে পুলকেশ দে সরকারের প্রতিবাদপত্র (২৩।২) পড়ে বিস্মিত হলাম। পুলকেশবাবু কেন যে আমার পত্রটি বিদ্বেষপ্রসূত বলে অভিহিত করলেন তা বুঝলাম না। আমার পত্র যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ করতে চেয়েছিলাম তাতে যদি কোথাও ব্যর্থ হয়ে তাঁকে অযথা হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রচেষ্টা হয়ে থাকে তবে তাঁর কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম। তবে পুলকেশবাবু লিখেছেন তাঁর 'সকল তথ্যের সূত্র কোথাও আক্ষরিক অনুবাদও অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে। কিন্তু কেবলমাত্র অমৃতবাজার পত্রিকা দেখলেই তো চলে না, তার সঙ্গে 'বেঙ্গলী' 'সঞ্জীবনী' 'স্টেটসম্যান' এবং বই-এরও তো সংযোগ রাখতে হয়। তিনি যে প্রশ্নসমূহ রেখেছেন তার উত্তর তিনি জানেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে লিখতে হল কারণ জনসমক্ষে রেখেছেন। কাজের চাপে উত্তর দিতে দেরী হল।

আমি লিখেছিলাম বোমা একটাই ফেটেছে। তার প্রমাণস্বরূপ অমৃতবাজার পত্রিকার উদ্ধৃতি তুলে ধরেছিলাম। তিনি মন্তব্য করেছেন 'কেউ কেউ বলেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ দুটি শব্দ শোনা গেছে'। কেউ কেউ *বলতেন পুলকেশবাবু কাদের কথা বলছেন? আমার তথ্যসংগ্রহশালায় আমি তো এরকম কারো মন্তব্য চোখে দেখিনি। আমার সংগ্রহশালায় আমি যা পেয়েছি তা তুলে ধরলাম।*

> 'At the time they had in their possession three revolvers and one bomb. Evidently if the bomb had failed in its purpose, they would have to take recourse to the use of the revolvers to complete their job.' (The Roll of Honour—K. C. Ghosh. P.—161)

এবার বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা উপেন্দ্রনাথ সেনের পরবর্তীকালে লেখা 'ক্ষুদিরাম' নিবন্ধ থেকে তুলে ধরছি।

"ইংরাজী ১৯০৮ সাল,... ... ৩০শে এপ্রিল, অমাবস্যা। রাত্রি প্রায় আটটার সময় একটা ভীষণ শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। ...আমরা প্রত্যূষে কাছারি আসিয়া শুনিলাম, রাত্রে জজ কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে বোমা ফেলিয়া কাহারা পলাইয়া গিয়াছে।" (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫৪, পৃষ্ঠা-৫২০)। উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় যে একটা ভীষণ শব্দের উল্লেখ করেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় একাধিক নয়। আর তাছাড়া পরদিন মাঠ থেকে যে একটা টিনের কৌটো পাওয়া গিয়েছিল সেটি একটি বোমা রাখার পক্ষেই উপযুক্ত, দুটি নয়।

পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে যে দ্বন্দ্বের অবতারণা তার সমাধান করতে গিয়ে চোখে পড়ল, বারীনবাবু যে দুটি রিভলবারের কথা লিখেছিলেন তা ঠিক। আসলে ৩রা মে ও ২৩শে মে তারিখে ক্ষুদিরাম যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে, ক্ষুদিরামের কাছে ছিল দুটি রিভলবার এবং প্রফুল্লচন্দ্রর কাছে ছিল একটি ব্রাউনিং পিস্তল।

"গঙ্গা-স্নানও নির্বিঘ্নে হল, রিভলবার ও পরিচ্ছদ হাতছাড়া হয়নি, গোয়েন্দা কাহিনীর মতই চমকপ্রদ।" সত্যি চমকপ্রদ। এসব তথ্য তিনি পেলেন কোথা থেকে?

এবার পুলকেশবাবুর শেষ প্রশ্ন। কে বোমা ছুঁড়েছিলেন? ক্ষুদিরাম না, প্রফুল্ল চাকী? ক্ষুদিরাম! ক্ষুদিরাম শুক্রবার, ১লা মে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ সি উডম্যান সাহেবের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে কিছুটা তুলে ধরছি। 'একখানা গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।' (সঞ্জীবনী : ৭ই মে : ১৯০৮)। অবশ্য এ বিবৃতি প্রফুল্ল চাকীকে সব রকম বিপদ থেকে আড়াল করে রাখবার জন্য। কিন্তু ২৩শে মে তারিখে দায়রা আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ই বি বার্থাউডের কাছে যে বিবৃতি দিলেন তাতে সম্পূর্ণ নতুন সুর। ১লা ও ৩রা মে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু কই তাতে তো তিনি কনফেস করলেন না যে তিনি বোমা ছোঁড়েন নি। ছুঁড়েছিলেন প্রফুল্ল চাকী। এবার কয়েকটি বই-এর সাহায্য নিচ্ছি।

> 'The psychological movement arrived and Khudiram ran deliberately towards the cairrage and poising the bomb in his outstretched arm above the head threw it with full force at the carriage which he believed to have been carrying Kingsford in its hold.' (The Roll of Honour—K. C. Ghosh P.—161)

"মিসেস ও মিস কেনেডি যে বোমার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন, সে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন ক্ষুদিরাম।" (ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—গোপাল ভৌমিক। পৃঃ ৭৩) সুতরাং এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে বোমাটা ক্ষুদিরাম ছুঁড়েছিলেন?

কানাইলালের পাশে সত্যেন বসু, ক্ষুদিরামের পাশে প্রফুল্ল চাকী উপেক্ষিত হওয়ায় পুলকেশবাবুর আক্ষেপের কারণ বুঝতে পেরেছি। এ আক্ষেপ আমারও। কিন্তু তাই বলে প্রফুল্লের চরিত্র তুলে ধরতে ক্ষুদিরামকে 'mere puppet' করে দেওয়া উচিত নয়। পুলকেশবাবুর প্রবন্ধটা পড়লে ক্ষুদিরামকে 'puppet' মনে হয় না কি?

পরিশেষে পুলকেশবাবুর সঙ্গে আমি একমত, আর 'বাদানুবাদ নয়, আসুন সহযোগিতা করে বাংলা তথা ভারত বিপ্লববাদের নৈর্ব্যক্তিক বস্তু ঐতিহাসিক তথ্যগুলো কুড়োই তবে আবার এই চিঠিটাকে বিদ্বেষপ্রসূত বলে নিশ্চয় অভিহিত করবেন না।

স্বপনকুমার ঘোষ
বারুইপুর, ২৪ পরগণা

ছাতনা নামের উদ্ভব প্রসঙ্গে

বাঁকুড়ার প্রত্নসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাকালে লেখক এক স্থানে বলেছেন 'ছাতনার বোলপুখুরিয়া নামক পুষ্করিণীটির উল্লেখ না করলে ছাতনাবাসীরা অবশ্যই ক্ষুণ্ন হবেন। তাঁর আশংকা সত্যি। বহু কিংবদন্তী বিজড়িত গ্রামের অতি পবিত্র এই পুষ্করিণীটির কথা বাদ দিলে ছাতনা সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য তাঁর 'একদা ছাতিম গাছের প্রচুর্য ছিল সেখানে তাই থেকে ছাতনা নামের উদ্ভব'—একথায় বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ছাতনা নামের উদ্ভব 'ছাত্রিনানগর' থেকে। এ প্রসঙ্গে ছাতনা চণ্ডীদাস বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সামন্তভূমের ইতিবৃত্ত' থেকে উল্লেখ করছি যে ১৯০৮ সালের ও মলি সাহেবের বিবরণ (I.S.S O'Mally in the Gazetter of the Bankura District 1908) ছাতনা ফাঁড়ির এলাকাধীন সমস্ত স্থানকে সামন্তভূম বলে স্বীকার করে। জনৈক শঙ্খ রায় এই সামন্তভূমের প্রতিষ্ঠাতা। বোলপুকুরের পশ্চিমতীরে তাঁর রাজধানী ছিল। *এই দুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী সামন্তদের কোনও একজনের কন্যার সঙ্গে তীর্থগামী জনৈক ক্ষত্রিয় রাজপুত যুবকের বিয়ে হয় এবং এই ক্ষত্রিয় যুবককে রাজকার্য পরিচালনার ভার দেন। তখন থেকে সামন্তভূমে ক্ষত্রিয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামন্তভূমের নাম হয় ক্ষত্রিয়দের নগর বা 'ছাত্রিনানগর'। তার থেকেই হয়েছে আজকের ছাতনা।* এই রাজবংশের রাজা হাম্বির উত্তর রায়ের আমলে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস বাসুলীদেবীর পুরোহিত নিযুক্ত হন।

আরও একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না যে যদিও বড়ু চণ্ডীদাসের স্মৃতি-বিজড়িত বাসুলির মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তবু রাজদরবারে প্রায় ১০৭ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত নতুন বাসুলীর মন্দিরটি ও এই মন্দিরের গায়ে অপূর্বসুন্দর টেরাকোটাগুলি দেখে মন্দিরপ্রেমিক মাত্রেই খুশী হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দিলীপকুমার পাত্র
ঝালা, আসানসোল

সম্পাদকীয়
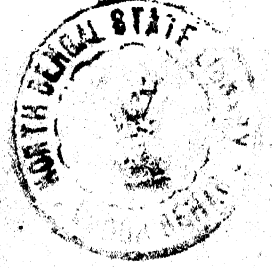
আসামে শিক্ষার্থীদের ফেরার প্রশ্ন

আসাম থেকে সংখ্যালঘু বাঙালী শিক্ষার্থীরা গত ভাষাদাঙ্গার সময় সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। এখনো তারা সেখানে ফিরে যেতে পারে নি। এটা খুবই দুঃখের কথা যে, ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্যে ভারতেরই নাগরিক এই সংখ্যালঘু বাংলাভাষীরা যেতে পারছে না, শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারছে না। আসামের মুখ্যমন্ত্রী একজন বিচক্ষণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। তিনি এই ছাত্রদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু আসামের উগ্রপন্থীরা বাধা দিচ্ছে। কিছু ছাত্র মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে সেখানে গিয়েও হিংস, লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের তিনজন মন্ত্রী, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীসন্তোষ রায় ও শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে আসামে গিয়েছিলেন সেখানকার অবস্থা দেখবার জন্য। সংখ্যালঘু বাঙালী ছাত্রদের ফেরার মতো অনুকূল আবহাওয়া তৈরি হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। একদা উপদ্রুত নওগাঁ, শিবসাগর, জোড়হাট প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের আশ্বাস দিয়েছেন অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। বাঙালী ছাত্ররা নির্ভয়ে আসামে ফিরে যেতে পারে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। খুবই আনন্দের কথা। সংখ্যালঘুরা নির্ভয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?

কিন্তু সত্যিই কি অবস্থা অনুকূল? আসাম মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য কাছাড়ের নেতা শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হবার আগে সংখ্যালঘু ছাত্ররা আসামে যেতে পারে না। আসলে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত না হলে সংখ্যালঘুদের ভয় কাটবে না, আসামেরও তাতে ক্ষতি। এ ভয় শুধু বাংলাভাষীদেরই নয়, সমতলে উপজাতিদেরও। আসাম বিধানসভায় বোড়ো নেতা শ্রীচরণ নারজারির বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভাষাসমস্যা সমাধানের জন্য আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া একটি প্রস্তাব দিয়েছেন বিবেচনার জন্য। তিনি বলেছেন, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়ার পাশাপাশি ইংরেজিতে পড়াশোনা চলবে। গৌহাটিতে তো দশ বছর ইংরেজি বহাল থাকছেই। এতে সংখ্যালঘুদের দাবি মানা হল বলে প্রস্তাবকের মত। কাছাড়ের বাংলাভাষীরা কি এতে স্বস্তি পাবেন? কাছাড় মুখ্যত বাংলাভাষী। তাদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এই বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছিলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইংরেজির পাশাপাশি অসমীয়া থাকুক, কিন্তু গোটা আসামে ইংরেজি থাকুক অনির্দিষ্টকালের জন্য। এটি একটি সঙ্গত প্রস্তাব। এতে অসমীয়ার দাবি স্বীকৃত এবং সংখ্যালঘুদের ন্যূনতম দাবিরও স্বীকৃতি। দুঃখের বিষয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উগ্রপন্থীরা এর কোনোটাই মানতে চাইছে না। আসামের মুখ্যমন্ত্রীও কার্যত নিরুপায়। দল রাখতে গেলে তাঁকে ডিব্রুগড় ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবেই সায় দিতে হয়। যে প্রশ্ন আসামের বহুভাষী অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে তার নিয়ন্ত্রণের ভার দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। আসামের স্বার্থে এ-প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে আসামের নেতাদের, তাঁর বিধানসভার সদস্যদের এবং আসামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের মুখ্য ব্যক্তিদের।

আমরা বার বার একথাই বলছি, আসামের ভাষাপ্রশ্ন শুধুমাত্র সেখানকার সংখ্যাগুরুদের খেয়াল-মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। বহুভাষী ভারতকে সামগ্রিক জাতীয় দৃষ্টি থেকে এ প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। প্রসঙ্গত আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের উল্লেখ করতে পারি। সেখানকার একাধিক অঙ্গরাজ্য দ্বিভাষী। সেখানে কোনো একটি ভাষা, তা যদি সংখ্যাগুরুদের ভাষা হয়, অপর ভাষাভাষীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। একে অপরের ভাষা শিখবে স্বেচ্ছায়, শিক্ষার ও জীবিকার তাগিদে। কিন্তু মাতৃভাষা হরণ করার মতো মূঢ়তা তারা দেখায় নি। তার জন্যই বহুভাষী ও বহুজাতিক সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ একটি শক্তিশালী জাতি মহাসংঘ। তার শক্তির বনিয়াদ পাকা। এ থেকে ভারতের শিক্ষণীয় আছে অনেক কিছু। ভাষা নিয়ে বিরোধ করে আমরা শক্তির অপচয় করছি। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি দিচ্ছি দুর্বল করে। সুতরাং আমাদের মুষ্টিমেয় অন্ধভাষাপ্রেমীর খেয়াল চরিতার্থ না করে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এর সমাধানের ভার নিজের হাতে নেওয়া। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শহীদ ভগৎ সিংয়ের পূর্বপুরুষের গ্রাম খাটকার কলানে (পাঞ্জাবে) এক বিরাট জনসভায় ভগৎ সিংয়ের শহীদ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভগৎ সিংয়ের মা শ্রীমতী বিদ্যা ওয়াতিকে শ্রীমতী গান্ধী একটি পুষ্পস্তবক উপহার দিচ্ছেন।

দেশে বিদেশে

"প্রবাসী আমেরিকানদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি আরামে থাকেন, আমেরিকান হিসাবে যাঁরা সবচেয়ে বেশি আত্মসচেতন, যে দেশে বাস করেন সেদেশের অধিবাসীরা যাঁদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষ পোষণ করেন তাঁরা হলেন সেই ৩৬,০০০ মার্কিণ নাগরিক যাঁরা...৫৫৩ বর্গমাইল এলাকায় বাস করেন ও কাজ করেন। স্থলসেনা বাহিনীর সাতটি ঘাঁটি দুইটি বিমানঘাঁটি ও একটি নৌঘাঁটিতে দশ হাজার মার্কিণ সৈন্য মোতায়েন আছে।"

৫৫৩ বর্গমাইল আয়তনের এই এলাকা হচ্ছে পানামা খাল ও তার দুই ধারে প্রায় দশ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল—যেটি "ক্যানাল জোন" নামে পরিচিত। "ক্যানাল জোন" সম্পর্কে উপরে উদ্ধৃত রিপোর্ট ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকারই "টাইম" সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

ভৌগোলিক দিক থেকে "ক্যানাল জোন" হচ্ছে পানামা সাধারণতন্ত্রের অংশ, যদিও এলাকাটি সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে রয়েছে। মধ্য আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পানামা—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়ও অতিশয় নগণ্য। লোকসংখ্যা মাত্র ১৬ লক্ষ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দেশও তার বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধে এসেছে। এবং এসে বড় সংবাদ তৈরি করেছে। বিরোধের মূল বিষয়—ঐ "ক্যানাল জোন"।

ঐ বিরোধের কথা পরে হবে। এখন "ক্যানাল জোন"-এর কথায় ফিরে আসা যাক। ঐ ক্যানাল জোন হচ্ছে মধ্য আমেরিকার বুকে একটুকরো ইয়াঙ্কি ভূমি। (পানামানিয়ানরা অবশ্য "ইয়াঙ্কি" কথাটা ব্যবহার করে না। আমেরিকানদের সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করতে হলে তারা বলে 'গ্রিঙ্গো'। বলে: 'একমাত্র ভাল গ্রিঙ্গো হচ্ছে মরা গ্রিঙ্গো।' এই "গ্রিঙ্গো" কথাটা শুধু পানামাতেই চালু নয়, যেসব দেশের মানুষ স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন অথবা ফিলিপিনসের মত যেসব দেশের মানুষের মধ্যে স্প্যানিশ রক্ত আছে সেসব দেশেও "গ্রিঙ্গো" কথাটির প্রচলন আছে। এমনকি খাস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও স্প্যানিশ-আমেরিকান সংখ্যালঘুরা এই শব্দ ব্যবহার করেন।) এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধু যে তাঁদের এলাকার বাইরের পানামানিয়ানদের সঙ্গে মেশেন না তাই নয়, এই অঞ্চলের ভিতর আমেরিকান ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ বৈষম্য করা হয়। একদিকে ক্যানাল জোনের মধ্যে অবস্থিত বালবোয়া, ক্রিস্টোবল প্রভৃতি শহর, অন্যদিকে পানামার রাজধানী পানামা সিটি, কোলোন প্রভৃতি শহর। সীমারেখার এপারে আর ওপারে এই শহরগুলির মধ্যে আকাশ আর পাতালের ব্যবধান। একদিকে চরম দারিদ্র্য, বস্তি, নোংরামি, অন্যদিকে পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো শহর, নৌবিহারের ক্লাব, নতুন মডেলের গাড়ি। দুই এলাকার মধ্যে যে বেড়া রয়েছে তার সঙ্গে বার্লিন প্রাচীরের তুলনা দেয় পানামানিয়ানরা। "ক্যানাল জোনের" মধ্যেও অহরহ পানামানিয়ানদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারা প্রভু আর কারা দাস। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত

ডাক্তারের বাৎসরিক বেতন ১২,৫০০০ ডলার। আর তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর বাৎসরিক বেতন ১৯০০০ ডলার। কারণ ডাক্তার পানামানিয়ান আর তাঁর সহকারী আমেরিকান। জল খাওয়ার জায়গা, শৌচাগার ইত্যাদিও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকান ও পানামানিয়ানদের জন্য আলাদা ছিল। 'সোনালি' শৌচাগার শুধু আমেরিকানদের জন্য নির্দিষ্ট "রুপালি" শৌচাগার পানামানিয়ানদের জন্য। এক সময়ে পানামা ক্যানাল কোম্পানি তাঁদের আমেরিকান কর্মচারীদের স্বর্ণমুদ্রায় আর পানামানিয়ান কর্মচারীদের রৌপ্যমুদ্রায় বেতন দিতেন। সেই ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করে এসেছে এই 'সোনালি' ও 'রুপালি'র বৈষম্য।

প্যানামার বুকে এই মার্কিণ উপনিবেশের পত্তন হয়েছিল ১৯০৩ সালে। পানামা খাল তখন কাগজে-কলমে একটি পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী খাল তৈরি করার কাজে নামার আগে আমেরিকা কলম্বিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করতে চাইল। চুক্তির দ্বারা আমেরিকা খাল ও তার দুই ধারের এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চাইল। কিন্তু কলম্বিয়া এই নিয়ে টালবাহনা করতে থাকল। তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উস্কানিতে কলম্বিয়ার একটি অংশ বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ঐ স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম হল পানামা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পানামা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যা চাইছিল তা-ই পেয়ে গেল। এর ১১ বছর বাদে পানামা খাল চালু হল।

১৯০৩ সালের চুক্তিতে পানামা খাল ও খাল অঞ্চলের উপর আমেরিকার অধিকারের কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। আমেরিকার বক্তব্য হচ্ছে, এই চুক্তির দ্বারা তাকে ঐ অঞ্চলের চিরস্থায়ী অধিকার দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে, লাটিন আমেরিকার দেশগুলি অনেক বেশি আত্মসচেতন হয়েছে। আমেরিকার আধিপত্য ও মার্কিণ পুঁজির শোষণ তারা আর বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে রাজি নয়। কিউবার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে। পেরু তার পেট্রোলিয়াম শিল্প থেকে এবং চিলি তার তামার খনি থেকে আমেরিকান পুঁজিকে হটিয়ে দিয়ে পথ দেখিয়েছে। বৃটেন ও ফ্রান্সের হাত থেকে সুয়েজ খালের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মিশর যে লড়াই করেছে সেই

দৃষ্টান্তও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সামনে আছে। সুতরাং খুব স্বাভাবিক-ভাবেই পানামার এই মার্কিণ উপ-নিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। সেদেশের মানুষ ১৯০৩ সালের চুক্তি বাতিল করে দিয়ে পানামা খাল সম্পর্কে আমেরিকার সংগে নতুন চুক্তির দাবী জানাচ্ছে।

গত ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে পানামানিয়ান-দের বিক্ষোভ অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। খাল এলাকার অন্তর্ভুক্ত বালবোয়া শহরে একটি আমেরিকান বালক তার স্কুল বাড়িতে আমেরিকান পতাকা তোলে। খাল এলাকার বাইরে পানামা-নিয়নরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আমেরিকান পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়। পরে আমেরিকান সেনা-বাহিনীকেও ডেকে আনা হয়। কদিন ধরে প্রচন্ড দাংগাহাংগামা চলে। চারজন মার্কিণ সৈন্যসহ মোট ২৫ জন মারা যান, আরও বহু আহত হন। এই ঘটনার পর পানামা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূট-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯০৩ সালের অসম চুক্তি সংশোধনের দাবী জানিয়ে পানামা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্বারস্থ হয়। আমেরিকা "অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস" নামক সংস্থার হাতে এই বিষয়ে মধ্যস্থতার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। "অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে গড়া সংস্থা। এই সংস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগত মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির আধিপত্য। পানামা-আমেরিকা বিরোধে মধ্যস্থতার ভার এই সংস্থার উপর অর্পণ করার ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। সংস্থার উদ্যোগে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু দীর্ঘ নয় বছরেও পানামা সুবিচার পায় নি।

এই নয় বছরের মধ্যে পানামা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, দুই দেশেই সরকারের বদল হয়েছে। পানামায় প্রেসিডেন্ট রোবের্তো এফ চিয়ারির জায়গায় এসে-ছেন সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল ওমর টোরিওস। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসি-ডেন্ট জনসনের জায়গায় এসেছেন প্রেসি-ডেন্ট নিক্সন। কিন্তু পানামার সংগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ যে জায়গায় ছিল সে জায়গায়ই রয়ে গেছে। আমে-রিকার কথা হচ্ছে, পানামার বক্তব্য শুনতে ও এবিষয়ে আলোচনা করতে সে প্রস্তুত, এমন কি ১৯০৩ সালের চুক্তির জায়গায় নতুন চুক্তি করতেও সে রাজি, কিন্ত খাল অঞ্চলে পানামার সার্বভৌম অধিকার আগেভাগে মেনে নিয়ে আলোচনায় বসতে অথবা পানামা খাল পরিচালনা বা সেখান-কার প্রতিরক্ষার অধিকার ছেড়ে দিতে সে প্রস্তুত নয়। এই সর্তে পানামা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কেন আলোচনা হলে পানামা বড় জোর যতটুকু সুবিধা লাভ করতে পারে তা হল :—(১) খালে ও তার দুপাশের জমিতে আমেরিকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে আমেরিকা পানামার সংগে নতুন চুক্তি করতে পারে। এবং (২) খাল থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় তাতে পানামার অংশ কিছুটা বাড়তে পারে। (এখন এই রাজস্বের বেশির ভাগই নিয়ে যায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। পানামা তার প্রাপ্য অংশ বাড়াবার দাবি করায় ১৯৫৯ সালে দুবার সেখানে দারুণ দাংগাহাংগামা হয়েছিল।)

অথচ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বলছে, আজকের ক্ষেপণাস্ত্রের দিনে প্রতিরক্ষার দিক থেকে পানামা খালের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। তাছাড়া, বলা হচ্ছে, আজকাল জাহাজ চলাচল যে পরি-মাণে বেড়েছে এবং সমুদ্রগামী জাহাজ-গুলির আয়তন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে পানামা খাল দিয়ে কাজ চালান ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। পানামা খালের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, এই খাল দিয়ে জাহাজ পার করার আগে তিন প্রস্থ লকগেটের সাহায্যে জল আটকে জাহাজকে সমুদ্র সমতলের ৮৫ ফুট উপরে তুলতে হয়। এতে সময় লাগে এবং এক সংগে বেশি জাহাজ পার করান যায় না। এই কারণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিছুকাল যাবৎ বলে আসছে যে, ক্রমবর্ধমান জাহাজ চলা-চলের সংগে তাল রাখার জন্য এখনই পানামা খালের বিকল্প আর একটি খালের দ্বারা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করার কথা ভাবা দরকার। এই নতুন খালের লেভেল আর মহাসাগরের লেভেল এক হবে, বর্তমান খালের মত জটিল লকগেটের ব্যবস্থা তাতে থাকবে না। আমেরিকা এই বিকল্প খাল খোঁড়ার জন্য এমনকি পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্য নেওয়ার কথাও বিবেচনা করছে জানিয়েছে।

এই বিকল্প খাল কোথায় কাটা হবে সেবিষয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনস্থির করে নি। তবে সে মেক্সিকো থেকে কলম্বিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করছে বলে বিভিন্ন সময়ে জানি-য়েছে। বর্তমান খাল নিয়ে পানামা যাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বেশি দরদস্তুর করতে না পারে সেজন্যই হয়ত মধ্যে মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বিকল্প খালের কথাটা ফলাও করে প্রচার করেছে। কিন্তু বিকল্পটি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য যে আমেরিকান কমিশন গঠিত হয়েছিল তাঁরা ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে রিপোর্ট দিয়ে পানামাতেই বিকল্প খালটি তৈরি করার সুপারিশ করেছেন। নতুন খালের জন্য কমিশন যে স্থান নির্বাচন করেছেন সেটি বর্তমান খালের সমান্তরাল ও তার প্রায় দশ মাইল দূরে।

নয় বছর পরে পানামা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই বিরোধের প্রসঙ্গটি আবার রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদের সামনে এসেছিল। এসেছিল পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে। এই বিশেষ অধিবেশন হচ্ছিল পানামার রাজধানী পানামা সিটিতে। সভাপতিত্ব করছিলেন পরিষদের এই মাসের সভাপতি, পানামারই প্রতিনিধি আকিলিনো বয়েড।

স্বস্তি পরিষদের এই বিশেষ অধি-বেশনে পানামা পৃথিবীর ছোট বড় অন্যান্য অনেক দেশের সাহায্য নিয়ে সুবিচার আদায় করার চেষ্টা করেছিল। চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া পানামাকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধি সমর সেন বলেছেন, "পানামাকে তার দেশের সর্বত্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য আমেরিকা (১৯০৩ সালের) চুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে।" সোভিয়েট রাশিয়া ল্যাটিন আমেরিকাকে পারমাণবিক অস্ত্র-মুক্ত অঞ্চলরূপে ঘোষণা করার ও মার্কিণ সামরিক ঘাটি ভেংগে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু কোন দাবিই টেকে নি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিটো প্রয়োগের ফলে। মার্কিণ প্রতিনিধি জন স্কালি সাফ কথায় জানিয়ে দিয়েছেন পানামা খালের উপর তার অধিকার ছাড়তে আমেরিকা রাজি নয়। (অথচ, ১৯৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ খালের উপর তাদের অধিকার বজায় রাখার যে চেষ্টা করেছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার বিরোধিতা করেছিল।) পানামা তার অধিকার আদায় করার জন্য স্বস্তি পরিষদকে ব্যবহার করছে বলে স্কালি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। পরিষদের সভাপতি বয়েড নিজে "ক্যানাল জোনে" মার্কিণ শাসনকর্তাদের বর্ণ-বৈষম্য নীতির সমালোচনা করেছেন, এটাও পরিষদ সভাপতির উপযুক্ত কাজ হয় নি বলে মার্কিণ প্রতিনিধি গোস্সা করেছেন।

স্বস্তি পরিষদের এই হস্তক্ষেপের পরও পানামা-যুক্তরাষ্ট্র বিরোধ যথা-পূর্বম্ রয়ে গেল। আর একবার প্রমাণ হল বড় রাষ্ট্রের মাৎস্যন্যায় থেকে ছোট রাষ্ট্রকে বাঁচাবার ক্ষমতা রাষ্ট্রসংঘের নেই।

২৪-৩-৭৩ পুণ্ডরীক

কালকের দিনটা

সকালে সাধারণত যে সময় উঠি, আজ তার অনেক আগেই চোখ খুললাম। সমস্ত রাত কাল বড় ক্ষোভে আর অস্বস্তিতে কেটেছে। এক একটা দিন থাকে না, কি যেন ঘটে যায়। অকিঞ্চিৎকর, খুবই তুচ্ছ কোন ঘটনা, অথচ সটান গিয়ে খসিয়ে ফেলে বিস্মৃতির পলেস্তেরা; দেওয়া ক্ষতমুখ—টনটনিয়ে ওঠে জায়গাটা। সব কেমন একাকার হয়ে যায়। কালকের দিনটা আমার সেরকম ছিল।

'কে কে দেখতে যাবে বল বাহাদুর ছেলে'। ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় ঘোষণাকারীর ভঙ্গীতে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম আমি। 'আমি যাবো দিদি'। —'আমি যাবো' —'দিদি আমি'। —'আমি দিদি'। একই সঙ্গে একই সোৎসাহী আবেদন আমার দুটিমাত্র কানে সর্বাগ্রে পেঁাছে দেবার এই আন্তরিক প্রচেষ্টায় দুহাতে কান চেপে ধরতে হয়েছিল আমাকে। —'চুপ, চু-উ-প, পাশে ক্লাস হচ্ছে, বসে পড়ো সব।' মেজাজী দিদিমণি বলে স্কুলে মজুদির কিছু নাম (সু এবং কু) আছে। ধুপধাপ করে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। শুধু অধীর অস্থির ভাবে মাথার ওপর নাচতে লাগল কতগুলো হাত। চকচকে দৃষ্টি সবার।

এই বয়সটাই এমনি, না? এই দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত। সহজ, অনায়াস, নিষ্পাপ, আবেগময়। অজস্র আকাশের তলায়—খোলা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে যেমন ভালো লাগে—এদের কাছে এলে আমার তেমন কোন অনুভব জাগে। অথচ এদের মুখ শুকনোর কারণ আমিই হলাম। হেডমাস্টারমশাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। —'এটা তো শহরের স্কুল নয় মুখার্জী। গ্রামের লোকেরা ছেলেমেয়েদের সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়াটা ভাল চোখে দেখবে না।'

—'কিন্তু দেখুন, যে কোন এডুকেশা-ন্যাল ইনস্টিটিউশনেই তো এধরনের ব্যবস্থা থাকে। আপনি তার বাইরে তো যাচ্ছেন না। কবে থেকে আমাকে ধরেছে ওরা। এত আশা করে আছে।'

হেডমাস্টার অসহায় মুখে টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারীর দিকে তাকালেন। এ ভদ্রলোকের আবার বাংলা বাই আছে। বক্তৃতার ঢঙে আরম্ভ করলেন—'প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে সুচিন্তিত কিন্তু পরিবেশ ও

পারিপার্শ্বিকতা যখন সহপাঠগ্রামিক কার্যাবলীর অনুকূলে নয়'—

কথাটা আর শেষ করতে দিলাম না আমি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—'ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমি এদিক দিয়ে ভাবিনি। ওদের বলে দেবো বরং যে টিকিট পাওয়া যায়নি।'

'কিছু মনে করবেন না'—হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন হেডমাস্টার। মুষড়ে ওরা পড়বে ঠিকই—তবে ছেলেমানুষতো, আবার ঝেড়েও ফেলবে।'

বাইরের লম্বা টানা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। শিশুরা কি আমাদের মত, এই হিসেবকষা, ঝুনো ভোঁতা মানুষদের মত সবকিছু ঝেড়ে ফেলে। আমরা বয়স্করা তো সৎ এবং অসৎ যত পরস্পরবিরোধী বৃত্তি মিলিয়ে মিশিয়ে জটিলতায় জারিয়ে বেঁচে থাকার টক নুন ঝাল মিষ্টি চাটনী বানাই মাত্র। তবু কোন কোন সময় আসে, সময় অথবা দিন বা মুহূর্ত, আমরা আ-র পারি না। অমনি বুকের তলা থেকে লাফিয়ে ওঠে শৈশব। একমাত্র শিশুরাই যে প্রত্যেকটি অনুভূতি-ইচ্ছে, বোধের স্বতন্ত্র এবং বিশুদ্ধ স্বাদ গ্রহণে সক্ষম। কে বলতে পারে ঐ যে দুষ্টুমিষ্টি ছেলেটা, জন্মের আগেই যার বাপকে সাপে কেটেছে আর যার মা বাবুদের বাড়ী খেটে ছেলেকে ইস্কুলে পড়াচ্ছে সেই দুখীরাম বড় হয়ে দুমুঠো খেতে পরতে পাওয়ার মতও কোন কাজ পাবে কিনা! কিম্বা ঐ যে সবুজ ধানের শীষের মত মেয়েটো—দু চোখ ভর্তি যার ভালবাসা-আশা-স্বপ্ন, ও যার প্রতি সমর্পিতা হবে সে ওকে ব্যবহার করে ফেলে যাবে কিনা। কিম্বা ঐ যে উদয়চাঁদ—সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভীক, নির্লোভ বলে এই বয়সেই যার খ্যাতি—তাকেই পরবর্তী জীবনে দুর্নীতি, স্বৈরাচার, ভীরুতা আর লোভের সঙ্গে আপোষ করে চলতে হবে কিনা।

তা না হলে সেই বছর এগারোর মেয়েটাকে আমি দেখতে পেলাম কেন? অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে। কাঁদছে আর ভাবছে এই বুঝি মা ফিরে এল—মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে বলবে—'পুজোর দিনে এত কাঁদে নাকি? যা দৌড়ে চলে যা। মুখটা মুছে নে।' কিম্বা মাসীমাও তো আসতে পারেন—'কই রে মঞ্জু, তোর হল।' কিছু হয়নি ওসব, কেউ আসেনি। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বোধহয় আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। অথচ কারণটাতো খুব সামান্য ছিল। এদের এই 'বাহাদুর ছেলে' দেখতে না পাবার চেয়েও সামান্য। মনে আছে সেদিন নবমীর সন্ধ্যে। প্যান্ডেলে চুপচাপ বসে আরতি দেখছিলাম। পাড়ার এক মাসীমা এসে বলেছিলেন—'সব জীপে করে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি—যাবি নাকি তুই।' উজ্জ্বল চোখে আমি ঘাড় কাৎ করেছিলাম। কার্তিকের সেই হিমহিম সন্ধ্যেতে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁফাতে আমি বাড়ী এসেছিলাম। মা বাড়ী ছিলেন না। হয়তো প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি পরিপাটি চুল আবার আঁচড়ে—পাউডার মেখে—জামা বদলে বাবার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বাবা কাগজ থেকে মুখ তুলেছিলেন। আমি বলেছিলাম—'বাবা আমি ঠাকুর দেখতে যাবো মাসীমাদের সঙ্গে?'

'কোথায়'? —বাবা প্রশ্ন করেছিলেন।

'কোলকাতায়।'

'না।' —বাবা আবার কাগজে মনোযোগী হয়েছিলেন।

'যাই না বাবা, গাড়ী করে তো যাবো!'

বাবা কোন উত্তর দেননি। আমি আবার ডেকেছিলাম—'বাবা'।

—আঃ—বিরক্ত কোরো না—যাও'—বাবা প্রায় ধমকে উঠেছিলেন:

আমি ঘর থেকে চলে এসেছিলাম। আসলে ছোটবেলা থেকেই তো আমি খুব একলা। আমার পিঠোপিঠি কোন ভাই নেই, বোন নেই। পাড়াতেও সমবয়সী কোন বন্ধু ছিল না। আর তখনকার ঢাকুরিয়াও তো এখনকার মত ছিল না। বাসরুট, পাঁচটা ব্যাংক, দুটো পেট্রোল পাম্প, বিশাল কংক্রীট ব্রীজ, ফ্লুরোসেন্ট আলোওয়ালা ঢাকুরিয়া ছিল না, তখন ঢাকুরিয়া ছিল একটা শহরতলী। এই সবের জন্য, আর হয়তো খানিকটা স্বভাবের জন্যেও, আমি চাপা মেয়ে ছিলাম। আশাভঙ্গে, অপমানে, অভিমানে, আপশোষে আমি যে সেদিন কি কষ্ট পেয়েছিলাম—কত যে কেঁদেছিলাম—দুহাত জোড় করে মা দুর্গাকে ডেকেছিলাম—আমার যেন যাওয়া হয়, আমার যেন যাওয়া হয়, আমার যেন যাওয়া হয়! হায়রে, কে জানে সেই এগারো বছরের আমি, নবমীপুজোর সেই সন্ধ্যেতে, আমার সবচেয়ে সুন্দর ফ্রকটা পরে, আলোর রোশনাই, ঢাকের বাদ্যি, মাইকের জোর জোর গান আর সাজগোজ ভীড়ের মধ্যে ঘুরেফিরে কোন্ পরমানন্দ লাভ করতাম? —তারপর! বয়সতো খালি বেড়েই গেল। বয়সতো খালি বেড়েই যায়। অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে ওঠে। তবু অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে আমার সেই নির্জন অসহায় কান্না আমি শুনতে পাই। আসলে আনন্দ বড় আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। হাসিখুশী উল্লাসের সময়গুলোতে আমরা অতীত ভবিষ্যৎ কিছু মনে রাখি না। কিন্তু দুঃখ এক আশ্চর্য অনুষঙ্গের শেকলে বাঁধা। এক দুঃখ অপর দুঃখকে মনে করিয়ে দেবেই। কিম্বা জীবনভোর আমরা একটাই দুঃখ পাই, পেতে থাকি।

—মঞ্জু মুখোপাধ্যায়
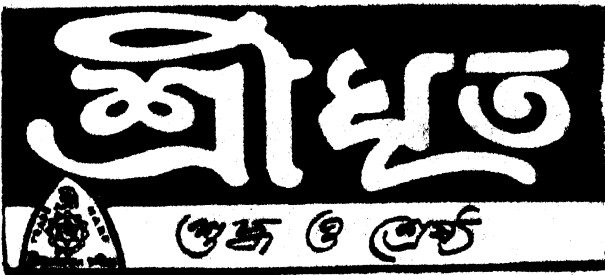
চিরকাল এড়ানো স্বভাব ॥ কিরণ দে

অবশ্য লোকটি ভীরু, ঝঞ্ঝাট হ্যাংগাম চিরকাল এড়ানো স্বভাব,
বীরত্ব মহত্ত্ব সবই জীবনের দুই পাশে কেটে ফেলে যায়।
নির্ঝঞ্ঝাট কল্পনায় ভয় নেই, বাস্তবের অভিজ্ঞ প্রভাব
প্রত্যহ সে দূরে রাখে কর্মের সকালে আর দুপুরে, সন্ধ্যায়,—
রাত্রেই সে মুক্তমনা, অন্ধকার সব ডাকে দেয় সে জবাব।

অথচ লোকটা কিছু দুষ্ট নয়, শুধু নিরাপত্তা রক্তে মর্মে,
সাহস সে মনে মানে, মনে-প্রাণে জানে বরাভয়।
বুদ্ধি তথা কল্পনায়, মুখ এঁটে হাত-পা সে টেনেছে স্বধর্মে—
স্থূলে দীর্ঘজীবনের গোড়াগোড়ায় ধৃতরাষ্ট্র, শোনো হে সঞ্জয়,
স্বধর্ম বা পরধর্ম দুইই সত্য, মগ্ন যদি হও নিজ কর্মে।

পতিব্রতা গান্ধারীকে জানাই নি একেবারে নই দৃষ্টিহারা,
যদিও হয়েছে ইচ্ছা ওষ্ঠাগত, চোখে মুখে বরাঙ্গের করি জয়গান,
অথচ চকিত চোখে নিভৃত শয্যায় দেখেছি সে পার্বত্য দু নয়নের ধারা,
কোনোদিন অক্ষিতারা মেলে রেখে জানাই নি নারীকে সম্মান।

—ওরাই কি এক-ন্যূন শতপদ্ম? নীলাকাশে ও কি লক্ষ তারা?
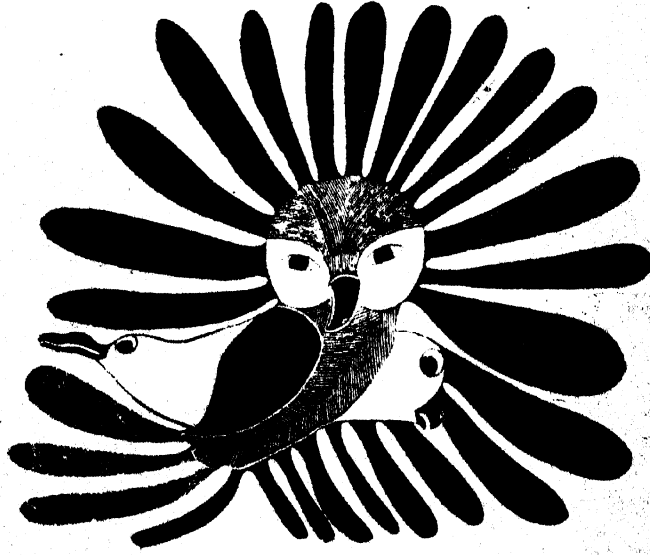
এস্কিমোদের শিল্প-প্রতিভা ও চেতনা

প্রণবেশ চক্রবর্তী

'এস্কিমো' নামে যে মানবগোষ্ঠী আধুনিক বিশ্বের স্পর্শ বাঁচিয়ে মেরু-জগতে আজও এক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল রচনা করে রেখেছে, তাদের জীবনযাত্রা বা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং ধূসর। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আধুনিক পৃথিবীর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, মহাদেশ বা মহাসাগরের সীমা-বন্ধনটাও ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে চলেছে, তবুও মেরু-তুষারের আড়ালে যে জীবন-স্পন্দন সঞ্চারিত, যে আশা-আকাঙ্ক্ষার ও সৃষ্টি-সংহারের গতি-প্রকৃতি প্রবাহিত সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল নিতান্তই সীমিত। এস্কিমোদের নাম হয়ত বহুশ্রুত, ওদের বরফ-ঘরের কথাও হয়ত জানা, জানি ওদের স্লেজ গাড়ীর বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যদি বলি, এই মেরু-জগতের শীতলতায় শিল্প-কর্মের সৃজনশীল উত্তাপ ওদের মনেও উন্দামতা জ্বালিয়ে রেখেছে, তবেই বিস্মিত হতে হবে। তাই না? অথচ বাস্তবে দেখা গেছে যে, সেই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এস্কিমোরাও বহির্বিশ্বের অজ্ঞান্তেই শিল্প-প্রতিভার অসাধারণ দিক্-চিহ্ন স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে।

এস্কিমোরা নিজেদের বলে থাকে ইন্যুট, যার সোজা অর্থ হল "মানুষ"। উত্তর মেরু অঞ্চলের সাইবেরিয়া থেকে গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এরা স্থায়ী বাসিন্দা। সরকারীভাবে এদের কোন আদম-সুমারি না হলেও, বেসরকারী হিসেব থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে এই মানবগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় ষাট হাজার এবং এর মধ্যে বারো হাজার হচ্ছে কানাডার অধিবাসী। কানাডা অঞ্চলের এস্কিমোদের জীবন-ধারনের মূল উপায়ই হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী শিকার করা। এই সামুদ্রিক মাছ বা প্রাণিরাই এস্কিমোদের খাদ্য হিসেবে মাংস যোগান দেয়, আলো জ্বালা এবং উত্তাপ সৃষ্টির জন্য তেল সরবরাহ করে এবং পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরীর জন্য চামড়া দান করে থাকে। স্লেজ কুকুর তাদের গাড়ী টানার কাজে লাগে। আর বরফের চাঁই দিয়ে ইগলু নামে ঘর তৈরী হয়। ব্যস, এতেই ওরা পরমানন্দে জীবন কাটিয়ে দেয়। মাঝখানে শীতের ফাঁক দিয়ে কয়েক-দিনের জন্য গরমকাল এসে ওদের জীবনে উঁকি দিয়েই বিদায় নেয়। ঐ কটা দিনই উৎসবের দিন। ইগলু ছেড়ে তাঁবুতে বস-বাসের সময়। বর্শা দিয়ে মাছ শিকারের উৎসব।

ওদের জীবনে যখন দিনের আলো দেখা দেয়, তখন সেই আলো একটানা প্রবাহিত হয়, আবার যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে, তখন সীমাহীন অন্ধকার ওদের অস্তিত্বকে ঢেকে রাখে। আলোতে বা আঁধারে ওদের জীবন ঘিরে শুধুই বরফ, শুধুই উলঙ্গ পাথর, শুধুই সামুদ্রিক জীব আর শুধুই নিজের পরিজন। এই পরিবেশের কোন পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম নেই, নেই ভিন্ন কোন জীবনের স্বাদ। তবে এরই মধ্যে তারা শিল্পী, তারা স্রষ্টা। প্রতিটি মানুষই জীবন মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে চায়, নিজের ক্রিয়াগুলি মননের পরিচয়কে অক্ষয় করে রাখতে চায়, কৃষ্টি ও শিল্পের মাধ্যমে অতিবাহিত অস্তিত্বকে স্থায়ী করতে চায়, এস্কিমোদের জীবনধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ওরাও এই চিরন্তন মানবসমাজ থেকে এ ব্যাপারে আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়। বরং একাত্ম। হাজার বছরের পুরানো পাথর কিংবা হাতে এস্কিমোদের শিল্প-চেতনার স্বাক্ষর আজও খুঁজে পাওয়া যায়। আঁকাবাঁকা চিহ্ন, বিভিন্ন ধাঁচের আকৃতি এবং খোদাই করা বিভিন্ন নকসা দেখে মনে হয়, এসবের মাধ্যমেই বোধহয় তারা কোন ঐশ্বরিক সাধনা কিংবা কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনন্দের উৎসসন্ধানে নিয়োজিত ছিল। তাদের প্রতিদিনের সরল অনাড়ম্বর জীবন-চেহারা যেন এ সকল খোদাই করা নকসার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। জীবন-ধারণের সীমাবদ্ধতা যে চেতনার ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে পারে নি, তা এই সকল অসংস্কৃত চিত্রকল্পের ভাবানুভূতিতেই প্রমাণিত। একদিকে যেমন ঈশ্বর-চেতনা (নাম হয়ত আলাদা) তাদের মধ্যে শিল্প-প্রেরণা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে তেমনি অশুভ-শক্তির বিরুদ্ধে ভীতি-ত্রস্ত মানসিকতার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে ছবির রেখায়। পলায়মান শিকারকে নিহত করার জন্য শিকারীর যে উন্মাদনা সেটা ছবির সাহায্যে প্রকাশ করে তুষার-শিল্পী অশুভ শক্তির হাত থেকে স্বর্গীয় ত্রাণের আকৃতিই যেন ফুটিয়ে তুলেছেন।

সভ্যজগতের উৎসুক দৃষ্টি এই অনাঘ্রাত জীবন-সম্পদের দিকে সাম্প্রতিককালে আকৃষ্ট হয়েছে। গত কুড়ি বছর ধরে শ্বেতকায় সমাজ এস্কিমোদের শিল্প-কর্ম সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছেন। আজকের পৃথিবী হয়ত বিস্ময়াবিষ্ট চোখে এদের শিল্পকর্মের দিকে তাকাবে, কোন অভিজ্ঞ সমালোচক হয়ত এই শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই নূতন কোন ধারা-প্রবর্তনের ইঙ্গিত আবিষ্কার করে উল্লসিত হয়ে উঠবেন, আবার কোন ব্যবসাদার হয়ত এগুলোকেই পুঁজি করে দুনিয়ার হাটে পসরা জমাতে সচেষ্ট হয়ে উঠতে নানা ফন্দী ফিকিরের আশ্রয় নেবেন। অথচ, এস্কিমোদের জীবন-যাত্রা যে সরলতায় বিধৃত, এদের শিল্প-চেতনা তা থেকে একেবারেই বিচ্যুত নয়। ছবির বিষয়বস্তু তাদের পরিচিত

পেচক পরিবার

পরিমণ্ডলের সার্থক প্রতিনিধি। 'সীল' মাছ, তুষার-ভল্লুক, মেরু-পাখী এবং সামুদ্রিক মাছ অনেক খোদাইকরা চিত্রের মধ্যেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এসবই তাদের জীবন-সঙ্গী। প্রাত্যাহিক জীবনের ঘটনা এবং পরিবেশ রেখায় রেখায় বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। আদিম মানুষ পাথরে বা পাহাড়ে খোদাই করে নিজের মনের অনুভূতিকে প্রকাশ করেই আদি শিল্প-চেতনার সূত্রপাত করেছিল। আর সেই শিল্প-সূত্র থেকে বিবর্তনের ধারা বহন করে আজকের পরিণত শিল্প-স্বাক্ষর রচিত হয়েছে। এস্কিমোদের শিল্প-ভাবনার উৎস সন্ধান করতে হলে ঠিক একইভাবে হাজার বছরের অতীত ইতিহাসে যেতে হবে।

অতি সম্প্রতি কানাডায় এস্কিমোদের জীবনধারা সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে সুখের কথা। এই গবেষণার সদ্য-লব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় যে, এস্কিমোদের উৎপত্তি অতি-প্রাচীন। খৃষ্টে-পূর্ব আড়াই হাজার বছর আগেও এস্কিমোদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই মানবগোষ্ঠী বেরিং প্রণালী অতিক্রম করে সাইবেরিয়া থেকে উত্তর আমেরিকায় এসেছিল এবং তাদের চেহারাগত গঠন-প্রকৃতি দেখে মনে হয় যে তারা মোঙ্গলদের সগোত্রীয়। আধুনিক জীবনধারার স্পর্শে এসে তারা আজ বর্শার বিকল্প হিসেবে রাইফেল ব্যবহার করতেও শিখেছে। পরিবেশের উপযোগী করে কায়াক নামে তারা যে ডিঙি সামুদ্রিক প্রবাহে ব্যবহার করে, তা এক অভিনব ব্যাপার। কাঠের কাঠামোতে চামড়া দিয়ে মুড়ে তারা শিকার ধরার জন্য এই ডিঙি নির্মাণ করে এবং এতে একজন চলাচল করতে পারে, অথচ, ডুবে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। নিজেদের মধ্যে সংঘাত বা সংঘর্ষে জড়িয়ে এরা শক্তিক্ষয় করে দুর্বল হতে শেখেনি, বরং শান্ত পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েই এরা বাঁচতে চায়। এখানেই আমাদের মত সভ্য মানুষের সঙ্গে ওদের মৌলিক পার্থক্য। ওদের শিল্পকর্মে সেই শান্ত জীবনযাত্রার প্রতিফলনই পরিব্যাপ্ত। কানাডার উত্তরাংশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছ' হাজার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এস্কিমোদের জগৎ এবং শ্বেতকায় মানুষ এই মহাদেশে পদার্পণ করার অনেক আগেই এরা এখানে বসবাস করছিল। আজ যে সকল গবেষক ওদের শিল্প আবিষ্কার করে কৃতিত্ব দাবী করছেন, তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে এই শিল্প-সৃষ্টি সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে বিশিষ্ট, এটা আধুনিক কোন ঘটনা নয়। এছাড়া প্রথম যে সকল শ্বেতকায় মিশনারী ও ব্যবসায়ী এই মহাদেশে এসেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিকথা ও অভিজ্ঞতায় এস্কিমোদের শিল্প-চেতনার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। Claude Levi Strauss তাঁর এক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : কোন এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি বা কৃষ্টির অঙ্গীকৃত হওয়াটা এমনই প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিণতি যে তা দেখে সেই প্রাকৃতিক

আদিমতার স্বাদ পাওয়া যায়। এস্কিমো শিল্পের মধ্যেও যে প্রাণ-প্রাচুর্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটা তথাকথিত অন্যান্য আদিমতার সমগোত্রীয় বলেই চিহ্নিত। আদিম মানবগোষ্ঠীর শিল্প-ভাবনা কোনরকম তাত্ত্বিক বা এ্যাকাডেমিক নিয়ম মেনে অনুসৃত হয় নি, কিংবা কোনরকম হিসেব-নিকেশের গণ্ডীতেও আবদ্ধ হয় নি, বরং এদের শিল্প-মাধ্যমকে এরা নিজেদের বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভীতি প্রকাশের কাজেই ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে কোনপ্রকার "আর্টিফিসিয়াল টেকনিকের" প্রশ্রয় নেই।

কিছুদিন আগে কানাডীয় দূতাবাসের উদ্যোগে এ দেশের এস্কিমোদের গ্রাফিক শিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। গত কুড়ি বছর ধরে সেই তুষার-জগতে যে শিল্পকর্ম রচিত হয়েছে, তা উক্ত প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছিল। পাথর-খোদাই বা ভাস্কর্য এখানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। যদিও এস্কিমোরা ভাস্কর্য-শিল্পে হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, তবু এখানে সাম্প্রতিক নব-চেতনার নিদর্শনই তুলে ধরা হয়েছিল। এস্কিমোদের আধুনিক সৃষ্টিশীলতা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ এটা কোন আকস্মিক প্রয়াস নয়। শুধুমাত্র এদের ভিন্ন পন্থা ও স্বতন্ত্র ভঙ্গী দেখে অবাক হতে হয়। পাথরের বুকে হাতির দাঁতে এবং হাড়ের মধ্যে এদের শিল্পদক্ষতার স্বাক্ষর নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। আদিম শিল্পশৈলীর সগোত্রীয় হয়েও তারা আজ আধুনিকতার ধ্যানধারণা থেকে বিচ্যুত নয়, বরং একাত্ম হওয়ার প্রয়াসী। তবুও দুর্বোধ্যতার দায় থেকে এরা মুক্ত। সহজ ভঙ্গীতে পরিচিত জগৎ ও প্রতিদিনের জীবনই এরা রেখায়-লেখায় তুলে ধরেছে। *জলের শিকার, ক্যারিবু শিকার বা অতি-*

লৌকিক চেতনার প্রকাশ এদের শিল্পের বিষয়। সেদিক থেকে এরা সেই আদিমতার ঐতিহ্যবাহী। এদের শিল্প-ধর্ম 'রিয়ালিস্টিক' বিমূর্ত বা সমবিমূর্ত রীতিতে এরা দক্ষ নয় বলেই হয়ত অনেকের নাসিকা কুঞ্চিত হতে পারে। প্রতীকের ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্পর্কে এরা আদৌ আগ্রহী নয়, বরং সোজাসুজি ছবি আঁকার দিকেই এদের ঝোঁক। প্রকৃতির স্বচ্ছ ক্যানভাসে এরা যা প্রত্যক্ষ করেছে, মনের তুলিতে তাই এঁকেছে। সেদিক থেকেই লৌকিক শিল্প বা আদিম শিল্পের ছাপ এতটা স্পষ্ট।

বাফিন দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের ডোরসেট প্রণালীর এস্কিমোরা বেশ কিছুটা আধুনিক খোদাই কাজের স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৫১ সালে শ্রীজেমস হাউস্টন এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করার সময় এস্কিমো শিল্পীদের আধুনিক খোদাই কাজের সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। শিকার করাই যাদের একমাত্র জীবিকা এবং কাজ, তারাও শ্রীহাউস্টনের নির্দেশমত নূতন করে খোদাই-শিল্পকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। কানাডা সরকার এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সমবায় সমিতি গড়েছেন এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বা বরফ-ঝড়ের দীর্ঘায়িত সময়ে এস্কিমোরা এই সমবায় সমিতিতে এসেই অবসর কাটায়। সেসময় তারা নিজেদের শিকার-অভিজ্ঞতা যেমন আলোচনা করে, তেমনি নিজেদের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারাও বিনিময় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে খোদাই কাজে নিযুক্ত এস্কিমোদের মধ্যে অর্ধেকই স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকের দক্ষতাই সমধিক প্রমাণিত। ওদের ধারণা, মেয়েরা অলৌকিক সত্তা বা অতীন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তাই তাদের সৃজনশীল চিন্তাধারা ব্যাপক ও গভীর, *এরকম একজন নারী-শিল্পী কেনোজুয়াক।*

তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে কল্পনাপ্রবণতা যেমন সোচ্চার, তেমনি মানুষ-পাখীর অস্তিত্ব কিংবা জলদেবতার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই শিল্পী একটানা দশ বছর ধরে তাঁর শিল্পের রসদ সংগ্রহ করেছেন স্বীয় কল্পনার মুক্তাঙ্গন থেকে এবং স্বপ্নের বিস্তীর্ণ জগৎ থেকে। বাস্তবের প্রাত্যহিকতা থেকে তিনি মুক্ত তাই, তাঁর শিল্প-সৃষ্টি ভিন্নস্বাদের পরিচায়ক।

আরেকজন বৃদ্ধ-শিল্পী, নাম 'পার'। গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি নাকি শিকারী-জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। তবুও কিন্তু তিনি বাস্তবের আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাই, তাঁর শিল্পে প্রকৃতির আবির্ভাব স্পষ্ট, নিজের পরিবার ও নাতী-নাতনীর আনাগোনা ব্যাপ্ত এবং সমবয়সীর মৃত্যু-বেদনা বিধৃত। তাঁর জীবনে সময়ের গতিবেগ স্তব্ধ হয়ে গেছে, অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শিল্পই তাঁর কাছে একমাত্র অবলম্বন এবং একমাত্র প্রত্যক্ষ সত্য। আজ তিনি শিল্প-কর্মের দৌলতেই জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন এবং পূর্বজীবনের ফেলে আসা স্মৃতির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এস্কিমো-শিল্পের মূলে বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করলে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে তারা সবকিছুকে খুঁটিয়ে দেখার এক অসাধারণ শক্তির অধিকারী। যা কিছু সাধারণ বা স্বাভাবিক বলে মনে হয়, তার মধ্যেই তারা অসাধারণের সন্ধান পেয়েছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী বরফ-রাজ্যের শীতলতায় বাস করেও তারা এই দর্শনের শক্তিতেই নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে *রেখেছে, বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে।*

আজ এস্কিমোদের জগতে শহুরে সভ্য বিশ্বের ছোঁয়া এসে লেগেছে এবং এর *অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের জীবন-যাত্রা, আচার-আচরণ ও শিল্পকর্মও নানাভাবে* প্রভাবান্বিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রভাবে কি তাদের স্বকীয় শিল্প-বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না? এতকাল প্রাণের স্পর্শে যে শিল্পকর্ম একটা বিশেষ জগতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত, তা কি আজ বহির্জগতের প্রভাবে স্বাভাবিকত্ব হারাতে বসেনি? এতে শিল্পের মানও বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। আত্মমগ্ন শিল্পী খ্যাতি-অখ্যাতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে এবং ব্যবসায়িক দরদামের গণ্ডী অতিক্রম করে শুধুমাত্র আনন্দের জন্য যে সৃষ্টির সাধনা চালিয়ে যায়, তা পরিপূর্ণ শিল্পকর্মে সহজেই পরিণত হয়। এস্কিমোদের আধুনিক গ্রাফিক আর্ট টেকনিক্যাল দিক থেকে হয়ত উন্নত হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রাণের ছোঁয়া থেকে কি বঞ্চিত হচ্ছে না? সন্ধানী মানুষের কাছে এটা একটা পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয় হতে পারে।

কেনোজুয়াক

বুকের মধ্যে কান্না

আইভি রাহা

় রাগ রাগ মুখ নিয়ে কুন্তল বাড়ি ফলো। বাড়ি মানে ওদের ঘরে। গায়ের মাটা খুলে টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিল াকির ওপর। কোমরের দু পাশে হাত খে মা'র সামনে এসে দাঁড়ালো।

—তোমরা ভেবেছ কি? আমাকে কি ড়ি ছাড়া করে ছাড়বে?

মেঝেতে ছড়িয়ে বসে কুন্তলের মা াগজ কেটে ঠোঙা তৈরী করছিলো। 'ন্তলের মুখের দিকে চোখ ফেরালো।

একটুও উত্তেজিত না হয়ে বললো— ক তোমাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেছে? ার থেকেই বা কোন উপকারটা কোরছ? 'পয়সা রোজগার করে এনে দিচ্ছ? লজ্জা করে না তোমার?'

কুন্তলের রাগটা কুঁকড়ে গেল। কিন্তু ও সেটা বাইরে প্রকাশ হতে দিল না। গলায় আরও বেশী জোর এনে বললো— 'ওকে আমি একদিন ঠিক খুন কোরব। এই বলে রাখলাম। তার জন্যে যদি জেলে যেতে হয় সে-ও আচ্ছা-উঃ! একেবারে অসহ্য করে তুলেছে...

কথাটা বলে ও খোলা দরজার বাইরে তাকালো। ওর ঘর থেকে এখন বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ও বুঝতে পারলো অনেকগুলো চোখের দৃষ্টিতে বিদ্ধ হতে হবে ওকে; এখন বেরোলেই। কুন্তল জানে এখন এদিক ওদিকের ঘর থেকে উঁকি দিচ্ছে অনেকে। ওর চীৎকার কানে গেছে সকলের। এ সময় কুন্তলের সামনে এসে 'কি হয়েছে' একথা জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো নেই। একমাত্র মৌ ছাড়া। মৌ আগে এইসব চীৎকার চেঁচামেচি শুনলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো। কুন্তলের সামনে এসে ওকে চোখের ইশারায় শাসন কোরত। চুপ কোরতে বলতো কুন্তলকে। কুন্তল চেঁচামেচি কোরলে মৌ-এরই অস্বস্তি হোত বেশী। অন্য কেউ এ নিয়ে মন্তব্য কোরলে ওরই খারাপ লাগতো। কিন্তু এখন আর মৌ আসে না। বরং সে-ও আজকাল পুতুলের মা, মালতী বৌদিদের পাশে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করে। বাজে কথা বলে।

বাজে কথা ও কুন্তলের মুখের, ওপরই বলে। সেদিন যেমন ও কুন্তলের উপর রেগে উঠে বিশ্রীভাবে কথা বললো।

এমন কিছু ঘটনা নয়। কুন্তল বাইরে থেকে আসছিল। বিকেলের রোদ তখন গড়িয়ে গেছে গলির মুখের তিনতলা বাড়িটার ওপারে। অন্ধকারটা একটু একটু করে জমাট বাঁধছে গলির মধ্যে। সেই ফিকে ফিকে অন্ধকারের মধ্যে কলের সামনে কুন্তল ওদের দেখলো। খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হাসছে। কুন্তল প্রথমে ভেবেছিল অন্য কেউ। কাছে এসে ওর ভুল ভাঙল। না—ঠিকই দেখেছে ও। মৌ আর অজয়। কুন্তল পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়ে আড় চোখে দেখলো অজয়ের একখানা হাত মৌ-এর গলার পাশ দিয়ে লতিয়ে আছে।

পরের দিন সকালে যখন উমার কাছে শ্যাম্পু না কি চাইতে এসেছিল মৌ, তখন কুন্তল ওকে কাছে ডাকলো।

—তুমি কাল সন্ধ্যাবেলা অমন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অজয়-এর সঙ্গে গল্প করছিলে কেন? কতদিন না বলেছি তোমাকে—ছেলেটা ভাল না। ওর সঙ্গে অত......

ওর সঙ্গে অত...? কুন্তলের মুখ থেকে কথাটা ছিনিয়ে নিল মৌ। কি?—ওর সঙ্গে অত কথা বলব না? কেন? কেন কথা বলবো না শুনি? কথা বললে কি আমার জাত যাবে? বেশী বেশী একেবারে। ওনার সঙ্গে ছাড়া যেন আর আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারব না। হুঁ। বেশ করেছি কথা বলেছি। নিজের বোন কি করছে? সেখানে শাসন করার মুরোদ নেই। উনি এসেছেন আমাকে শাসন করতে। একেবারে ফুঁসে উঠলো মৌ।

কুন্তলের মধ্যে একটা অসহায় রাগ জ্বলন্ত আগুন হয়ে ওকে দগ্ধ করে। কুন্তল ভাবে। অনেক ভাবে। কি করা যায়। কি কোরবে ও তবে।

অনেকদিন পর সেদিন অতসীদির সঙ্গে কুন্তলের রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। কেমন আছিস জিজ্ঞেস না করে অতসীদি প্রথমেই বললো—হ্যাঁরে কুন্তল উমাটাকে ধমকাতে পারিস না? কি আরম্ভ করেছে বলতো? তুই কি কিছুই খোঁজ রাখিস না?

খোঁজ কুন্তল রাখে। সব বুঝতেও পারে। নতুন শাড়িখানা গুছিয়ে পরে, ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে যখন উমাকে বেরোতে দেখে তখন কুন্তলের ইচ্ছে করে ওর চুলের মুঠিটা ধরে...

কিন্তু কুন্তল পারে না। ওর ভয় করে। ভীষণ ভয় করে। ভয় করে উমা যদি হঠাৎ সেই ছোটবেলার মত ঘাড়টা বাঁদিকে একটু হেলিয়ে কঠিন গলায় বলে বসে—বেশ করেছি। আমি যা করছি বেশ করছি। কি করেছ তুমি আমার জন্যে? সম্মান নিয়ে বাঁচবার পথ করে দিয়েছ? লেখাপড়া শিখিয়েছ? কি করেছ? বল, কি করেছ?

এমনি সব অনেক কথা মুখস্থ বলার মত করে বলে যাবে উমা। কুন্তল জানে। আর জানে বলেই উমার সামনে ওকে কিছু বলে না। বলে উমা যখন বাড়ি থাকে না তখন। মা'র কাছে। তখনই কুন্তলের চীৎকার, চেঁচামেচি, রাগ সব কিছু। আর ও কখনও শুধু উমাকে কিছু বলে না। বলে—'তোমরা' 'তোমাদের'। মাকেও জড়ায় উমার সঙ্গে।

কিন্তু মনে মনে ভীষণ কষ্ট হয় কুন্তলের। উমাটা এমন করে কেন? এই সমীর... স্যান্টা। ধুৎ। বিশ্রী লাগে। ওর জন্যেই তো মৌটা......। আগে তো এমন ছিল না ও। উমার জন্যেই......। উমাকে দেখেই মৌটা কেমন বদলে যাচ্ছে। উচিত অনুচিতের মূল্যমানটা ওর কাছে অন্য চেহারা নিচ্ছে।

কুন্তল সব বুঝতে পারে। কিন্তু তবু পারে না। কিছুতেই পারে না মৌ-এর কাছে না এসে। মৌ-এর শরীরটা কি নরম। ওর চোখ দুটো টানা নয়। ছোট ছোট। কিন্তু ও যখন চোখে কাজল দিয়ে কেমন একরকম আলাদাভাবে কুন্তলের দিকে তাকায়, তখন কুন্তলের সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে আসে। শরীরের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা আস্তে আস্তে কেমন সুখ হয়ে যায়। মৌ-এর টোল খাওয়া গাল, মসৃণ চিবুক, গলা, আধ-ফোটা বুক আর কোমরের খাঁজে বার বার চোখ রাখে কুন্তল। ওর বুকের ভেতর থেকে একটা চীৎকার ওঠে। আমার—আমার, মৌ আমার। সম্পূর্ণ আমার। কুন্তলের বুকের ভেতরের চীৎকার কেউ শুনতে পায় না। শুধু কুন্তল শোনে নিজেই।

গুমোট বাতাস চাপা একখানা ঘরের ভ্যাপসা গরমে রাত্রে যখন ঘুম আসতে চায় না, তখন ও মনে মনে কেবল মৌকে ভাবে। ওর মনটা মৌকে কাছে পেতে চেয়ে যখন উথাল পাতাল করে তখন আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে মৌ—মৌ। এই মৌ...মৌ...ও...উ।

ঘুম না আসা জ্বালা ধরা চোখ দুটোতে একটু একটু করে শান্তি নেমে আসে। ছটফটে নেংটি ইঁদুরগুলো পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কুন্তলের আর রাগ হয় না।

এই মৌ। যার কথা ভাবলে কুন্তলের সারা আকাশটা আলো হয়ে যায়। যার জন্যে সুদাম, স্যান্টাদের এড়িয়ে বিমল-বাবুর কাছে যাওয়া-আসা করছে কুন্তল ওঁদের ল্যাম্প-এর কারখানায় একটা চাকার পাবার আশায়। মৌকে কাছে ধরে রাখবার জন্যেই তো... কুন্তল অন্য রকম, আলাদা, —সুদাম, স্যান্টা, রবিদের থেকে আলাদা হতে চায়।

লম্বা বেণীটাকে বুকের কাছে এনে আঙুলে জড়াতে জড়াতে সকালবেলাতেই মৌ কুন্তলদের ঘরে এল। কুন্তল তখনও ঘরের মেঝেতে মাদুরের ওপর আড় হয়ে শুয়ে।

মৌ কুন্তলের কোল ঘেঁসে বসে পড়লো।

—এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাক কেন বলতো? শাসনের ভঙ্গীতে বললো মৌ। কুন্তলের মিষ্টি লাগলো বেশ। ও হাসলো।

—এই শুনেছ, রূপশ্রীতে না একটা দারুণ বই এসেছে। ভীষণ ভাল।

—তুমি কি করে জানলে?

—ওমা! পুতুল-বৌদিরা কাল গিয়েছিলো যে। ওরাই তো বলছিল।—এই যাবে দেখতে? চল না আজকে যাই।

কুন্তল অনেকক্ষণ মৌ-এর আগ্রহে চকচকে করা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। ওর ভীষণ ইচ্ছে কোরল মৌ-এর টসটসে মুখখানা দুহাতে ধরে, সকাল বেলার ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটোর মধ্যে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে চুমু খায়।

—বারে, কথা বলছো না কেন?

মৌ অস্থির হয়।

—যাবে না দেখতে? জানো, অজয়দা বলছিল......

চমকে উঠলো কুন্তল।—কি কি বলছিল অজয়? কাকে বলছিল?

—কাকে আবার বলবে? আমাকে বলছিল।

—কি......কি বলছিল?

ওই সিনেমার কথা। আমি পুতুল-বৌদির ঘরে গিয়েছিলাম। ও তখন ওখানেই ছিলো। আমি ছবিটা দেখিনি শুনে বলছিল—'যাবে দেখতে? চল না।'

—তুমি কি বললে?

কুন্তল কেমন ছটফটিয়ে উঠলো নিজের মধ্যে।

—ধ্যাৎ! ওর সঙ্গে কে যাবে। ও যা...ভীষণ অসভ্য...দূর ছেড়ে দাও ওর কথা। তুমি আজ যাবে কিনা তাই বল। লক্ষ্মীটি আজই চল। ললিতারা আজকে দেখবে। ওরা এসে কাল......। না না আমরাও আজ যাব। মৌ আদুরে বেড়ালের মত এলিয়ে পড়লো যেন।

কুন্তল চিন্তা কোরল।— আজ। আজ এত বেলায় কি আর টিকিট পাওয়া যাবে। তার চেয়ে কাল যাব। ঠিক যাব কাল।

টিকিটের কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। সত্যি কথাটা অন্য। সেটা বলতে ইচ্ছে কোরল না কুন্তলের। পৌরুষে লাগলো।

ও মৌ-এর নীচের ঠোঁটটা দু-আঙুলে ধরে একটু চাপ দিল।

মৌ মাথা ঝাঁকিয়ে মুখটা সরিয়ে নিল।

মৌ চলে যাবার পর কুন্তলও উঠে পড়লো। মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে রাস্তায় বেরোল। মৌকে এখনি কিছু বলেনি ও। ইচ্ছে করেই বলেনি। রাস্তায় বেরিয়ে পকেটে হাত দিল কুন্তল। কালকে সুদামের কাছ থেকে নেওয়া টাকাটার আট আনা মাত্র পড়ে আছে। বাকি আট আনায় কি কি করেছে ও মনে করবার চেষ্টা কোরল। চার আনা দিয়ে মাকে ডাল কিনে দিয়েছিল মনে আছে। ভাতের পাশে শাক-পাতা দিয়ে রান্না করা কি একটা ঘ্যাটমত রেখে মা যখন থালাটা বাড়িয়ে দেয় কুন্তলের সামনে তখন কুন্তলের রাগে গা জ্বলে যায়। কিন্তু ও কিছু বলতে পারে না: কুন্তল জানে, মা ওর বলাটাই চায়। কুন্তল কথা না বলে ভাতগুলো খেয়ে নেয়। এই ভাত জোটাতেই ধোৎ শালার লাইফ হয়েছে। নুন জোটেতো ভাত জোটে না। ভাত জোটে তো......

তখনই ও ভেবেছে সুদামের কাছে যেতে হবে। অনেকদিন ওদের কাছে যাওয়া হয়নি। ওদের কাছে যেতে কুন্তলের একটুও ভাল লাগে না। ওই কালো, রবি, সুদাম, স্যাণ্টাকে ও মনে মনে ঘেন্না করে। স্যাণ্টা সেদিন বিশ্রীভাবে একটা চোখ মটকে বলেছিল—কি গুরু শুনছি নাকি কি সব লটঘট......তা কাকে ফাঁসাচ্ছো বাওবা? একটু ভাগ-টাগ......মানে পেসাদ-টেসাদ এদিকে ছাড়। চাখি। কুন্তল দাঁতে দাঁত চেপে তখন তাকিয়েছিলো স্যাণ্টার দিকে। ও ভেবেছিল একটা ঘুসি মেরে এখুনি যদি স্যাণ্টার দাঁতগুলো ফেলে দিতে পারে। না হলে নাকটা ফাটিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে। কিন্তু এখনই ও এমন যদি কিছু করতে যায়......রবি, কালো নিশ্চয় ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কুন্তল জানে শুধু কাজের সুবিধের জন্যে ওকে দলে রেখেছে সুদামরা। না হলে কুন্তল যে ওদের থেকে একটু অন্য রকম, আলাদা—সেটা কালো, রবি, স্যাণ্টা—ওরা বুঝতে পারে। আর বুঝতে পেরে মনে মনে জ্বলে। মাঝে মাঝে কেমন খুনীর মত চোখে কুন্তলের দিকে তাকায় ওরা। এসব ভেবেই কুন্তল কখনও মনের ঘেন্নাটাকে প্রকাশ হতে দেয় না। যেমন তখনও দিল না। কিছুই কোরল না কুন্তল। রবি, কালো, সুদাম—সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখটা একবার ঘুরিয়ে আনলো। তারপর, কথাটায় ও যেন খুব মজা পেয়েছে এমন করে হাসলো। অন্য প্রসঙ্গ এনে কথাটা চাপা দিল।

এ ছাড়া কুন্তলের উপায় নেই। কুন্তলকে যে ওদের কাছে আসতেই হবে। মারামারি করে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে তো ওর চলবে না।

সুদামের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত একটা টাকা নিয়ে এসেছিল কুন্তল। টাকাটা সুদাম সহজে দেয়নি। মৌ-কে নিয়ে অনেক মস্করা করেছিল। বলেছিল—এখানে নিয়ে আয় না মাইরি একদিন। দেখি। কুন্তলের কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল তবু ওটা যেন কোন কথাই নয়, এমনিভাবে বলেছিল—ধোৎ। ওসব বাজে কথা বাদ দে তো। একটা টাকা ছাড় দেখি। শালার ঘাটি খেয়ে খেয়ে পেটে একেবারে চড়া পড়ে গেল। পকেট একেবারে গড়ের মাঠ।

—ইস কে আমার নবাব পুত্তুর এলেন রে। টাকা একেবারে খোলামকুচি। উনি এসে চাইলেন আর......

—মালের সন্ধান টন্ধান করেছিস কিছু? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিল সুদাম।

—না—আমি—মানে...। কুন্তল আমতা আমতা করে উত্তর খুঁজেছিল। আসলে কুন্তল মালের সন্ধান করার চেয়ে বিমল-বাবুর কাছে চাকরির জন্যে হাঁটাহাটি করাটাকেই বেশী পছন্দ করেছিল কদিন ধরে। সে কথা সুদামকে বলা যায় না।

—তা করবে কেন—সুদাম রেগে উঠেছিল। আমরা লাইফ হেল করে তল্লাস চালাব আর উনি......হুঁঃ। ওসব ছাড়ো চাঁদ। আমাদের সঙ্গে যদি কাজ করতে চাও তাহলে...ওসব রঙবাজী ছাড়।

কুন্তল নিজের ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যেই দাঁড়িয়ে থেকে টাকাটা নিয়েছিল। ওর থেকেই চার আনা খরচ করে মাকে ডাল কিনে দিয়েছে। আর চার আনা... আর চার আনা...কি যে কোরল...সিগারেট খেয়েছে? না—বাস ভাড়া দিয়েছে। বিমল-বাবুর বাড়ি যাবার সময়। বাকি আট আনা পয়সা আছে পকেটে। একটা আধুলি। মুঠোর মধ্যে একবার চেপে ধরলো কুন্তল আধুলিটা। মনে মনে হিসেব কোরল—এতে আরও কত পয়সা যোগ কোরলে দুখানা টিকিট হবে। দূর। এখনও অনেক পয়সা লাগবে। অনেক পয়সা।

কুন্তল ভাবলো উমার কাছে চেয়ে দেখবে। ওর কাছে নিশ্চয় আছে। না—ওর কাছে চাওয়া যাবে না। চাইতে পারবে না কুন্তল। মা'র কাছে ঠোঙা বিক্রীর টাকা... যদি...অসম্ভব। তা হয় না।

অনেক ভেবে কুন্তল সুদামের কাছেই গেল। আস্তানায় নয়। সুদামের বাড়িতে। বড় রাস্তা ছেড়ে অন্ধকার গলি।

—আরে কি ব্যাপার, গুরু যে। একেবারে বাড়িতে। সুদাম দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো। চেক লুঙ্গি আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে, কাচের গ্লাসে চা খাচ্ছিল সুদাম। চায়ের গেলাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল। কুন্তলের গলায় হাতটা

পেঁছিয়ে নিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে সদ্দ গলির মুখটায় চলে এল।

—তারপর খবর পেয়েছিস? রবি গিয়েছিলো তোর ওখানে? —প্রশ্ন শুনে মুখ ঘোরালো কুন্তল।

—রবি! কই, যায়নি তো। কিসের খবর?

—আরে বাবা আমাদের আর কিসের খবর থাকবে। বার খবরে পেট চলছে।

কুন্তল অকারণে কেন জানি চমকে উঠলো।

যাক গে রাত্তিরে আসছো তো? রবি আর কালো ওদিকটা ম্যানেজ কোরবে। তোমার আর স্যাণ্টার ওপর মাল খালাসের ভার। দেরী কোর না আসতে। শালার আজ আবার পূর্ণিমা।

—কিন্তু সুদাম; আমি...মানে আমাকে আজ বাদ দে না। আমার একটা অন্য কাজ ছিল। সেই জন্যেই তোর কাছে এসেছিলাম।

—অন্য কাজ মানে? তোর আবার অন্য কাজটা কি? যা—যা বাজে বকিস না। এখন বাড়ি যা। রাত্তিরে ডেরায় যাস।

কুন্তল এবার মরিয়া। —শোন সুদাম আমার পক্ষে আজ যাওয়া সম্ভব নয়। আমার একটা অন্য কাজ। ...ভীষণ দরকারী...তুই আমাকে কটা টাকা দে কাইণ্ডলি। আমি তোকে পরে শোধ...... বিশ্বাস কর।

—তাহলে কাজটার কি হবে শুনি? সুদাম গম্ভীর হোল।

—তোরা এবার যা হোক করে চালিয়ে নে। আমি পরে নিশ্চয়...প্লিজ সুদাম।

—ঠিক আছে যেও না। তবে বখরা নিতে এস না যেন।

—কিন্তু টাকাটা? টাকাটা দে...ওই জন্যেই তো...

—কি ব্যাপার হঠাৎ এত টাকার দরকার হচ্ছে কেন? কিছু নামাতে... টামাতে...সুদামের বিশ্রী ইঙ্গিতে কুন্তলের চোখমুখ গরম হয়ে উঠলো। তবু সংযত হয়ে বললো—পরে বলবো। এখন একটু তাড়া আছে রে। সুদাম কুন্তলের কথা কানেই তুললো না।

—তোর বোন উমা তো একেবারে লক্ষীরাণী হয়ে বসেছে। সমরীকে ছেড়ে এখন আবার স্যাণ্টাকে...আমি তো স্যাণ্টাকে বলেছি চালিয়ে যা চালিয়ে যা। যদ্দিন পারিস। এখন তোর দিন পড়েছে। যা পারিস করে নে। কমল তো পয়সার অভাবে রিজেক্ট হয়েছে। সমীরের কাছ থেকে তবু কিছু ঝাড়া যাচ্ছিল। সে শালারও নাকি শুনি কারখানা লক-আউট। —তা যা বলিস, তোর বোনের কিন্তু ক্ষ্যামতা আছে।

কুন্তল দাঁত বার করে হাসলো। সুদামকে একরকম ঠেলতে ঠেলতে ওর বাড়ির দিকে নিয়ে গেল। টাকাটা নিল।

ফিরে আসতে আসতে ও বার বার পকেটে হাত দিল। টাকাগুলোকে মুঠোর মধ্যে চাপলো। একটা অসহায় রাগে সুদামকে মনে মনে গালাগাল দিল। একবার ওর মনে হয়েছিল টাকাটা না নিয়েই চলে আসে। কিন্তু......কিন্তু......'এই শুনেছ রূপশ্রীতে একটা ছবি এসেছে? দারুণ যাবে দেখতে? চল না লক্ষ্মীটি।' ...একটু মুহূর্তের জন্যে মৌ কেমন আপনজন হয়ে গেল। আদুরে গলায় কথা বললে মৌকে খুব কাছের মনে হয়। কি ভীষণ অপরূপ লাগে ওর চোখ দুটো। —কত সামান্য ওর চাওয়া। —সেটুকুও কুন্তল যদি...সত্যি: কি অপদার্থ ও। নিশ্চয় ভাববে মৌ মনে মনে।

না টাকা ওকে নিতেই হবে। মৌ-এর চোখ দুটোতে একটা খুশি চমকে দিতে হবে। ওর একটা ইচ্ছেকে অন্তত সত্যি কোরতে হবে।

পকেটে হাত দিয়ে টাকাগুলো আর একবার অনুভব কোরল কুন্তল। হলে গিয়ে দুখানা টিকিট কাটলো। হলুদ রঙ টিকিট দুখানা মেলে নিয়ে দেখলো কিছুক্ষণ। ফেরত পয়সাগুলো পকেটে চালান করে দিয়ে ভাবলো সিনেমা দেখার পর মৌ-কে নিয়ে কোথাও চা খেতে হবে। মৌ সেদিন ওকে ভীষণ অপ্রস্তুতে ফেলেছিল।

ভিকটোরিয়া থেকে ফেরার সময় ধর্মতলায় যখন ওরা বাস পালটাবার জন্যে নেমেছিল তখন মৌ আবদার ধরলো—'এই চল না কোথাও একটু চা খাই।'

কুন্তলের বুকটা কেঁপে উঠেছিল। ও ফেরার ভাড়াটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলেছিল—তাড়াতাড়ি বাসে ওঠ। ভীড় হয়ে যাবে।

পরে অবশ্য কুন্তলের খারাপ লেগেছিল। কেমন মায়া হয়েছিল মৌ-এর ওপর।

বাড়ি ফেরার আগে কুন্তলের মনে হলো একবার বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করে যায়। উনি নিশ্চয় কারখানার চাকরি একে করে দেবেন। ইলেকশনের সময় বিমলবাবুর জন্যে অনেক খেটেছে কুন্তল। সে কথা কি আর উনি ভুলে যাবেন?

বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা হলো না কুন্তলের। মনটা খারাপ হয়ে গেল। অবশ্য বিকেলের একটা আনন্দের পাওনার ভাবনা ওর দুঃখটাকে স্থায়ী হতে দিল না বেশীক্ষণ।

অনেকদিন পর স্নান কোরতে যাবার সময় উমার সাবানটা নিয়ে গেল কুন্তল। ভাত খেতে বসে অন্যদিনের মত খারাপ লাগলো না ওর। একটু ঘুমিয়ে নেবার কথা ভাবলো। ছটার সময় শো। না—মৌকে আগে কিছু বলবে না। পাঁচটার সময় রেডি হতে বলবে। তারপর একেবারে হলে নিয়ে গিয়ে চমকে দেবে। খুব মজা হবে। মৌ জানতে চাইলে খুব গম্ভীর হয়ে বলবে—ওর বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে।

গলিতে কলে বাসনপত্তর ধোয়ানোর আওয়াজে কুন্তলের ঘুম ভেঙে গেল। চারটে বেজে গেছে। কলে গিয়ে মুখ হাত ধুলো। গামছায় মুখটা মুছতে মুছতে উঠোন পেরিয়ে মৌ-দের ঘরের সামনে গেল।

মৌ-কে ডাকতেই ওর মা বেরিয়ে এল—ওমা কুন্তল? কি গো?

—মৌ কোথায় মাসীমা? একটু ডাকুন না।

—মৌ? মৌ তো ঘরে নেই বাবা।

—ঘরে নেই? পদ্মফুলবৌদির ঘরে বুঝি?

—না—না। পদ্মফুলবৌদির ঘরে না।

—তবে কোথায়? কোথায় গেছে? কুন্তল অস্থির।

—মৌ তো সিনেমায় গেছে। সেই দুপুরে।

সিনেমায়। মৌ সিনেমায় গেছে?

কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না কুন্তলের।

—কার সঙ্গে যাবে সিনেমায়? না—না: সিনেমায় যাবে কি? আপনি বোধহয় ঠিক জানেন না। মৌ-এর যাবার নয়: কথাটা

যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইল কুন্তল।

মৌ-এর মা অবাক। —শোন ছেলের কথা। আমি জানবো না কেন? অজয় এসে ওকে নিয়ে গেল যে। অজয় ওভারটাইম করে এ মাসে অনেকগুলো টাকা পেয়েছে না? একেবারে টিকিট কিনে এনে হাজির। ওই যে রূপশ্রীতে একটা বই হচ্ছে ওইটা দেখতেই বোধহয়...

কুন্তল ভাবলো: এরাই উমার জন্যে ভীষণ চিন্তিত আর উতলা হয় না? কিন্তু মৌ? —মৌ গেল সিনেমা দেখতে? কুন্তলের বিস্মিত প্রশ্নটা কেমন আর্তনাদের মত শোনায়।

—ওমা যাবে না কেন?

আশ্চর্য! মৌ-এর মার কাছে প্রশ্নটা ভীষণ অবান্তর লাগলো। সেইভাবেই উনি গলার স্বরটাকে তুললেন।

কুন্তল কপালের দুপাশে আঙুল রেখে জোরে চাপ দিল। ওর বুকের মধ্যের জমানো কান্নাটা গলার কাছে উঠে আসতে চাইলো।

অনেকদিন পর ছোটবেলার বন্ধু, স্কুলের ভীষণ ভাল ছেলে অভিজিৎকে দেখে যেমন হয়েছিল। উমার দিকে তাকালে মাঝে মাঝে যেমন হয়। ঠিক তেমনি। তেমনি কান্না।

অভিজিৎ। কি উজ্জ্বল একটা স্বপ্ন। আশায় মোড়া নিটোল ভবিষ্যৎ। বৌ-বাজারের কাছে কি বিশ্রী ধরনের দুটো ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। কুন্তলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কুন্তলকে দেখে ও বললো আরে তুই। অনেকদিন পরে।...কোথায় যাচ্ছিস?

কুন্তল উত্তর দেবার আগেই অভিজিৎ-এর সঙ্গের ছেলে দুটো ওকে কি ইশারা কোরল। চোখে চোখে।

অভিজিৎ চকিতে রাস্তার ওপারে তাকালো। কুন্তলকে একটু ধাক্কা দিয়ে বললো—এই তুই এখন এখান থেকে চলে যা।

—কেন? কুন্তল কেমন অবাক হয়।

—যা বলছি শোন। এখুনি আমাদের একটা কেস আছে। গোলমাল হতে পারে। বিপদে পড়বি।

—কেস! সে আবার কি?

—ও তুই বুঝবি না। ওই যে ওদিকে দেখ। কালো ব্যাগ হাতে...দেখেছিস?

—হ্যাঁ। একজন ভদ্রলোক। কুন্তল সহজ।

ভদ্রলোক এখুনি এদিকে আসছেন। মেয়ের বিয়ের জন্যে গয়না কিনতে আসছেন।— ওঁকেই...মানে...ভারমুক্ত আর কি।

—[illegible] তোরা ছিনতাই করবি?

—ছিনতাই-ছিনতাই বলে ব্যাপারটাকে [illegible] ছিছিক্কার কেন বল তো? তুই [illegible] হর্মোন দেখাচ্ছি। [illegible] [illegible]

—[illegible] এ তুই কি [illegible]?—

কুন্তলের গলার স্বরটা কান্নার মত হয়ে গেল। অভিজিৎ তখন সঙ্গীদের সঙ্গে দূরে সরে গেছে।

কুন্তলের ভীষন কষ্ট হোল। ভীষণ কষ্ট। ও নিজেও তখন সুদামদের দলে। কিন্তু তবু...অভিজিৎ। অভিজিৎ কেন? ওর যে অনেক সম্ভাবনা ছিল।

কুন্তল আর ভাবতে পারে না। মৌ, উমা, অভিজিৎ সকলে—ওরা সকলে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। ওরা যেন ঘূরপাক খেতে খেতে নীচে নামছে। আর ওরা ওপরে উঠতে পারছে না। চাইছেও না আর। ওরা এখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে শুধু নামবে। নামবে...নামবে...নামবে...একা একা নয়। আসলে ওরা খুব ক্লান্ত। তাই একা নামতে পারছে না। উমা, সুদাম, মৌ অভিজিৎ...সকলে সকলের হাত ধরেছে। উমা নামবে মৌকে নিয়ে। সুদাম অভিজিৎকে নিয়ে. অভিজিৎ...কুন্তলকে, ...কুন্তল...উমা ...মৌ...সুদাম...অভিজিৎ...।

কতকগুলো ধারালো চক্র হয়ে নামগুলো কুন্তলের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো এক-প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে।

টিকিট দুটো পকেট থেকে বার করে মুঠোর মধ্যে মোচড়ালো কুন্তল। একটু বেশী দামের টিকিট কেটেছিল ও। সুদাম টাকাটা দেবার সময় কিসব যেন বলেছিল। কুন্তল মনে করবার চেষ্টা করলো। মনে করবার চেষ্টা কোরল বিমলবাবুর কথা। অনেক হাঁটাহাঁটি করেছে ও। তবু কিছু হোল না। বিমলবাবু বোধহয় ওকে নিজেদের কারখানায় চাকরি দিতে চান না। তাই ঘোরাচ্ছেন। আসলে ওর কিসসু হবে না। চেষ্টা কোরলেও না। কিছুতেই না।

কুন্তলের ঠোঁটের কোণে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটলো। মনে পড়লো ছোটবেলায় শোনা যক্ষের ধনের গল্প। চারিদিকে অনেক টাকা অনেক মোহর কিন্তু যক্ষের তাতে কোন অধিকার নেই। সে শুধু নীরব দর্শক। না খেয়ে সে শুকিয়ে মারে যাবে, কিন্তু তবু......

জীবনকে বুঝতে হলে, অভ্যাসের ও সংস্কারের
বেড়া ডিঙোতে হলে বই চাই,
সব রকমের এবং আরো বই পড়া চাই।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অপরূপ প্রেমকথা

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের রোম নগরী। প্রখ্যাত শিল্পী দেলেক্লুজ সেই কালে রোমে থাকতেন। তিনি অতি ধীর ও সুস্থির পুরুষ। বন্ধুদের সঙ্গে শিল্প ও দর্শনের সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেই সময় কাটাতে বেশী আগ্রহ তাঁর। ভদ্র ও সুস্থমনের মানুষ, সমাজের প্রতি তাই কিঞ্চিৎ নিস্পৃহ, নিরাসক্ত।

একদিন তাঁর কাছে আহ্বান এলো বন্ধু জাঁ জ্যাকোস এমপীয়ারের। মাদাম রিকামায়ের-এর দলে তিনি সবে প্যারিস থেকে ফিরেছেন। এই মহিলার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড অনুরাগের কথাও দেলেক্লুজ জানতেন। বন্ধুর অনুরোধ—পত্রপাঠ চলে এসো।

এই অনুরোধ পালন করতে হল। বন্ধুর এই উৎকট রোমান্টিক আবেগ স্বয়ং পছন্দ না করলেও মাদাম রিকামায়ের পরিমণ্ডলে পেঁৗছে তাঁর সহজ সৌন্দর্যের মনোহারিত্ব তাঁকে অভিভূত করল। মাদামের পারিপার্শ্বিকতা যেন স্বপ্নের সপ্তম স্বর্গ। এর সঙ্গে আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল যা অভাবিত, তা হল মাদামের বোনঝি এমেলি সিভ্ওকটের প্রেমে তিনি আকুল হলেন।

এতকাল যে ব্যক্তি নিজের মানসিকতা ও প্রখর প্রজ্ঞার গর্ব করেছেন, বরাবর আপনাকে নব-উদ্ভূত রোমান্টিকবাদের বিরোধী মনে করেছেন, তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়লেন প্রেমের জটিল জালে।

এই প্রেমকাহিনী ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমপীয়ারের মাদাম রিকামায়েরকে নিয়ে প্রেমের ব্যাপার ইতিয়েন-জাঁ দেলেক্লুজ ভাবিবংশীয়দের জন্য জার্নাল ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। এই কাহিনীর মধ্যে আছে প্রহসনের রস তথাপি অতিশয় মনোজ্ঞ এবং হৃদয়গ্রাহী। এই সন্দেহ পাঠকের মনে জাগে যে হয়ত এমেলি ও তার মাসি মাদাম রিকামায়ের বেচারী দেলেক্লুজকে নিয়ে তার পিছনে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছেন। এমন একটি মানুষের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের জন্য তাঁরা পরে লজ্জা-বোধ করেছেন কিনা কে জানে। যদি তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব হত যে ইতিয়েন-জাঁ দেলেক্লুজ উত্তরকালের জন্য কি অপরূপ অন্তরঙ্গ চিত্র এঁকে গেলেন তাহলে হয়ত কৃতজ্ঞতা বোধ করতেন।

ইতিয়েন-জাঁ দেলেক্লুজের জার্নাল ও চিঠিপত্র সম্প্রতি ফ্রান্সে লুই দেস্তার-নেসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছুকাল আগে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক জেরার্ড হপকিন্স। ইংরাজী অনুবাদটির নাম 'টু লাভার্স ইন রোম' এবং এই গ্রন্থের প্রকাশক আঁদ্রে ডয়েটস্।

যে দুটি রোমান্স এই গ্রন্থে বিধৃত করা হয়েছে তা পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রায় সমকালের ঘটনা। একটি ঘটনা ইতিয়েন-জাঁ দেলেক্লুজকে নিয়ে।

দেলেক্লুজ ছিলেন চিত্রশিল্পী ও সমালোচক। দেলেক্লুজ প্রথম দর্শনেই এমেলি সিভ্ওকটকে ভালোবেসেছিলেন। মাদাম রিকামেয়ারের এই প্রেম উন্মাদ হলে' জাঁ-জ্যাকোস এমপীয়ের। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল দেলেক্লুজের জার্নাল ও চিঠিপত্রের নির্বাচিত অংশবিশেষ। এসব চিঠিপত্রের অধিকাংশ পূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

পাণ্ডুলিপি যিনি সংকলন করেন তিনি প্রকৃত নামগুলি সযত্নে চেপে গিয়েছিলেন, সেই জায়গায় অন্য নাম, নামের আদ্যাক্ষর ইত্যাদি দিয়েছিলেন।

দেলেক্লুজ শুধু যে উনিশ শতকের মাপকাঠি অনুসারে একজন 'জেন্টেলম্যান' ছিলেন তা নয়, সবদিক থেকেই তিনি ভদ্র মানুষ ছিলেন। এইসব জার্নাল ও চিঠিপত্র প্রকাশের কোনো বাসনা তাঁর ছিল না। অন্তত নিজের জীবদ্দশায় এসব গোপনীয় তথ্যাবলী প্রকাশ করতে তিনি চাননি। জনসমক্ষে আপনাকে বা অপরকে টেনে আনার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না।

তাঁর Souvenirs de Soix. ante Ans বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে তিনি জার্নাল বা চিঠিপত্রের অনেক অন্তরঙ্গ অংশ বর্জন করেছিলেন। এর পরের বছরই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাবাবেগপূর্ণ স্বীকারোক্তি তিনি অপ্রকাশিত রেখেছিলেন। তিনি মামজেল জুলিয়েন দা লইয়নে' যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং তার মধ্যে যে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল সমালোচক সাঁৎবভো তার উচ্চ প্রশংসা করেন।

'টু লাভার্স ইন রোমের' মধ্যে অনুভূতি ও আবেগের যে বিশ্লেষণ আছে বর্তমান যুগেও তার আকর্ষণ কমেনি। সেদিন যা সত্য ছিল আজো তা সত্য। অষ্টাদশ লুই-এর আমলের মাদাম রিকামায়ের তাঁর জীবনের শেষের দিকে যে 'সলোঁ' রেখেছিলেন—ভদ্রসমাজের কাছে তা আদর্শস্থল। তার মধ্যে জাগতিক সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। প্যারিস থেকে এই সমাজ যেন 'রোমে' উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। রোমক সমাজের সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগ দিলেও এইসব মানুষ যেন বিশিষ্ট এক বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী। ইতালীয় আচার আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেকালে ফরাসী সামাজিকতার সঙ্গে অনেক পার্থক্য ছিল ইতালীয় সমাজজীবনে।

ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেন—মাদাম রিকামায়ের উজ্জ্বল জীবনকথা সকলের জানা। এমপায়ার ও রেস্টোরেশন পিরিয়ডে তাঁর কথা সবাই জানত। তিনি যখন ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রোমে এলেন তখন তাঁর বয়স ছেচল্লিশ বছর। ভাবাবেগে বিচলিত যৌবন

এমেলির স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় তিনি রোমে এসেছিলেন।' মাদাম লেনোরমা তাঁর স্যুভেনির স্যুর মাদাম রিকামায়েরে' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

'বোনঝির ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার মাদাম রিকামেয়ারের রোম আগমনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ বটে তবে অন্য আরও কারণ ছিল। মঁসিয়ে দ্য সাতোব্রিয়াঁ সে সময় বাহ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মঁসিয়ে দ্য মন্টমরেন্সির স্থলে বসেছিলেন। মাদাম রিকামায়েরের প্রীতির রাজ্যে এই দুজনেরই উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে উভয় বন্ধুর মধ্যে যে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু হল তাতে মাদাম বিশেষ বেদনা বোধ করেন। নিজে এই তাঁর মতভেদ মেটানোর চেষ্টা করে এর ফলাফলে তিনি নিষ্ঠুরভাবে আহত হয়েছিলেন... তাঁর মন ভেঙে পড়েছিল। এ ছাড়া একজন প্রখ্যাত লেখক যে এইভাবে ক্ষমতার লোভে জড়িয়ে পড়বেন, এ ভেবে তিনি গভীর বিস্ময় বোধ করেন। তিনি ভেবেছিলেন, এবং ঠিকই অনুমান করেছিলেন, যে তাঁর অনুপস্থিতিতে উভয়ের মধ্যে হয়ত একটা শান্ত প্রভাব আনবে...'

এমিলি সিভওকটের তখনও অনেক কম বয়স। ১৮১০ খৃস্টাব্দে মাদাম তাকে দত্তক গ্রহণ করেন। এর কয়েক মাস পরে তার জননীর মৃত্যু হয়, তাই মাসির কাছেই আশ্রয় নেয় এমিলি। মাসি মেয়েটিকে সমাজের উপযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন। ও'রা যখন ইতালী ত্যাগ করেন তখন এমিলির বয়স মাত্র একুশ বছর।

জাঁ-জ্যাকোস এমপীয়র তখন বয়সে তরুণ, ১৮০০ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম। তবে যে ভূমিকার জন্য তিনি নির্বাচিত সেই ভূমিকায় তিনি ভালোই করেছেন বলতে হবে। মাদামকে ১লা জানুয়ারী ১৮২০ খৃস্টাব্দে এমপীয়র দেখলেন একটি শাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায়। এমপীয়ার লিখেছেন—এই পোশাকে তিনি যে মাধুরী প্রকাশ করেছিলেন তার জন্য জীবন আমাকে প্রস্তুত করে নি।' তিনি অচিরাৎ তাঁর প্রেমে পড়লেন। মাসি প্রথমটায় ভেবেছিলেন তরুণ এমপীয়ার বুঝি তাঁর বোনঝির প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু একদিন এমপিয়ার ঘোষণা করল—না, ওর জন্য নয়—' এই বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রোম যাত্রার কিছু পূর্বে এই নাটকের এই দৃশ্যটি অভিনীত হয়।

১৮২৪ খৃস্টাব্দে দেলেকলুজের বয়স তেতাল্লিশ। ডেভিডের কাছে তিনি চিত্রশিল্প শিখেছিলেন এবং ১৮০৮ খৃস্টাব্দে 'সলো'তে একটি স্বর্ণ পদকে সম্মানিত হন। ১৮১৪ খৃস্টাব্দ নাগাদ তিনি তুলি ছেড়ে কলম ধরেন। 'জুর্নাল দেস দেবাটস' পত্রিকায় তিনি ছিলেন কলাসমালোচক। সেকালের সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েন এবং 'রোমান্টিক বনাম ক্লাসিকস'-এর দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করেন। এই সূত্রে সাহিত্য-ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে। নিজের শিল্পকর্ম ছাড়া, এই স্বীকৃতি তাঁকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে।

রু স্যাবানার ছয়তলার ঘরটিতে ১৮১৯ থেকে ...১৮৩০-এর শেষ পর্যন্ত প্রতি রবিবার দেলেকলুজ কিছু বন্ধুদের আমন্ত্রণ করতেন। এ'দের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল, মেজাজ, রুচি, মতামত সব বিষয়েই অমিল থাকত, এ'রা কেউ ক্লাসিকের পক্ষপাতি অপর দিকে অন্য সবাই রোমান্টিক। কেউ বুরবনদের প্রতি অনুরক্ত আর বাকী অধিকাংশই এই সাম্রাজ্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তবে এক জায়গায় সকলের মিল, সবাই শিল্প ও সাহিত্য ধর্মের অনুরাগী ভক্ত। দেলেকলুজের বাড়ির এই সমাবেশে তিনি সকলকে অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে অনুমতি দিতেন, ফরাসী সাহিত্য, বিদেশী সাহিত্য এমন কি রাজনীতি পর্যন্ত।

এই গোষ্ঠীর প্রাণ-পুরুষ ছিলেন স্তাঁদাল। তিনি তাঁর 'স্যুভেনিরস দ্য ইগোতিসমে' নামক গ্রন্থে দেলেকলুজের আসরে প্রথমবারকার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন :

'এক রবিবার বেলা দুটোর সময় আমাকে মঁসিয়ে দ্য'এতাং-এর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হল, এই এক অসুবিধাজনক সময়ে তিনি দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। ৯৫টি সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম, কারণ এখানেই এই ছয়তলায় তাঁর একাডেমির আসর বসে......

আমি কি চোখে এই সমাবেশকে দেখেছি তা ভাষায় অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলতে পারা কঠিন হবে। ঠিক এমন কোন আসর আগে দেখি নি—এর চেয়ে উচ্চাঙ্গের শুধু নয়, এর সঙ্গে তুলনীয় কিছু আর দেখি নি। প্রথম দর্শনে যেমন তার পরবর্তী কালে (তার অস্তিত্বের তিন থেকে চার বছরের মধ্যে) প্রায় কুড়িবার এখানে গেছি এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি, তবু আমার সপ্রশংস ভঙ্গীর মাত্রা সমান রয়ে গেছে।

ভলতেয়ার, মলিয়ের এবং কুরিয়ারের দেশেই শুধু এমন আসর সম্ভব। এই দেলেকলুজের ভবনেই এক স্মরণীয় দিনে (১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৫)—স্তাঁদাল উচ্চ কণ্ঠে কাবিক ট্রাজেডি ও মিলন বিষয়ক তাঁর পুস্তিকার ('রেসিনে এণ্ড সেকসপীয়ার') দ্বিতীয় অংশ পাঠ করেন। ভিকতর হ্যুগোর 'প্রেফেস দ্য ক্রমওয়েল' প্রকাশের চার বছর আগে ১৮২৩ খৃস্টাব্দে এই পুস্তিকার প্রথমাংশ লিখিত হয়।

দেলেকলুজ কেন তাঁর পরিবারবর্গ এবং প্যারিস ছেড়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ তিনি 'স্যুভেনিরে' প্রকাশ করেছেন। 'জুর্ণাল দ্য ডেবাটস' পত্রিকার পরিচালক বেরতিন ভ্রাতৃদ্বয়ের সামনে একদিন তিনি সখেদে বলেন—'আমার ইতালী দেখা হয় নি। বেরতিন দ্য ভোকস তখন বলেন—তাহলে সেখানে যাও না কেন? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বললেন—'তাই ত! যাও না। তুমি সেখান থেকে সেদেশ বিষয়ে মতামত পাঠাবে আমাদের কাছে। ইতিয়েন এই কথায় আনন্দে ও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন। স্যুভেনিরে দেলেকলুজ সর্বদাই আপনাকে 'ইতিয়েন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন।

১৮২৩-এর ৮ই জুন তারিখে তিনি প্রথম 'ইতালী থেকে লেখা চিঠি' নামক পত্রাবলী পাঠাতে শুরু করেন। এই পত্রগুলি জনৈক 'প্যারিসবাসী'র উদ্দেশে লিখিত। বলা বাহুল্য এই প্যারিসবাসী ভদ্রলোক হলেন বেরতিন দ্য ভোকস। এই সব চিঠিতে ভার্জিলের কবিতার একটি লাইন উদ্ধৃত দেওয়া থাকত। পরে এই

ন্যাচারালিটিকেই তিনি আপন জীবনের 'মটো' বা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন।

মানবকে ঈশ্বর অবিমিশ্র সুখের অধিকারী করেন না। ঠিক এই জায়গায় কাহিনীর সূত্রপাত।

দেলেকল্যুজ তাঁর প্রথম চিঠিতে বেঞ্জিন দা ভোকসকে লিখেছেন—'আমি রোমে অতিশয় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি।' এই পত্রেই তিনি মাদাম রিকামেয়ারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন জ্যাঁ-জ্যাকোস এমপিয়ার মারফৎ।

গ্রন্থ শেষ হয়েছে মাদাম রিকামেয়ারের সঙ্গে এক মনোরম সন্ধ্যা অতিবাহনের বৃত্তান্ত দিয়ে। সেদিনকার তারিখ ১৫ই জানুয়ারী ১৮২৭।

সেকালের সমাজ জীবন এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবনের এক সুললিত কাহিনী 'টু লাভার্স ইন রোম'। এর মধ্যে যেমন বিয়োগান্ত দিক আছে তেমনই আছে হাস্যকর পরিবেশের সরস বর্ণনা।

'টু লাভার্স ইন রোম' এই কারণে একটি স্মরণীয় জার্নাল ও বিগত শতকের এক প্রামান্য দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে।

—অভয়ংকর

TWO LOVERS IN ROME: From the Journals and Letters of ETIENNE-JEAN DELECLUZE, Translated by GERARD HOPKINS, Published by ANDRE DEUTSCH SOHO SQUARE LONDON W 1. Price 30 shillings only

শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ কমিটি

আর খুব দূরে নয়। সামনেই ১৯৭৫ সাল। অপরাজেয় কথাশিল্পীর জন্মশতবর্ষ। এবং তাকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই চারদিকে চলছে তোড়জোড়। গঠিত হচ্ছে নানান কমিটি।

সম্প্রতি তৈরি হয়েছে শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ রাজ্য কমিটি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে আলোচনাও চলে অনেকক্ষণ, ২১ মার্চ বিধানসভা ভবনে। মুখ্যমন্ত্রীই হলেন নবগঠিত কমিটির চেয়ারম্যান। কার্যকরী সভাপতি শ্রীমনোজ বসু। সাধারণ সম্পাদক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। যুগ্ম সম্পাদক হলেন শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর ঘোষ ও শ্রীভবানী সিংহ রায়। কমিটির দপ্তর হয়েছে ১৬৩ আহিরিটোলা স্ট্রীট কলকাতা-৫-এ।

রবিবাসরে আলোচনা

গত ১৮ মার্চ এক মনোজ্ঞ আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন রবিবাসর সংস্থা। বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব আবদুল শোভান খাঁ চৌধুরী ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে এই অধিবেশনে উপস্থিত। মর্মস্পর্শী ভাষায় দিলেন ভাষণ। ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির স্মৃতিই মন্থন করলেন আবেগদীপ্ত কণ্ঠে। শোনালেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রবীন্দ্রানুরাগের কথা। বাংলাদেশের জাগরণে রবীন্দ্র প্রভাব। আলোচনায় অংশ নিলেন বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী প্রেমেন্দ্র মিত্র, জরাসন্ধ, অশোককুমার সরকার, কুমারেশ ঘোষ, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ইলা পালচৌধুরী প্রমুখ।

দক্ষিণ আফ্রিকার কবিকণ্ঠ

কিছুকাল আগে বেরিয়েছে একটি কাব্যসংকলন। সুন্দর ছাপা এই ঝকঝকে বইখানার নাম 'সেভেন সাউথ আফ্রিকান পোয়েটস'। আফ্রিকান রাইটার্স সিরিজের ৬৪ সংখ্যক গ্রন্থ এটি।

এই সংকলনের একমাত্র ডেনিস ব্রুটাস ও কেয়োরাপিটাস কগোসিটসাইল ছাড়া বাকি ৫ জন কবিরই আজ পর্যন্ত কোনো একক গ্রন্থ বেরোয়নি। এবং এঁরা হলেন ডলার ব্রাণ্ড, আই চুনারা, সি কে ড্রাইভার, তিমোথি হোমস, আর্থার নর্টজে।

প্রথম কবি হলেন ডলার ব্রাণ্ড। জন্মেছিলেন কেপটাউনে। সেখানেই তাঁর লেখাপড়া। কবি ব্রাণ্ড কিন্তু জ্যাজ-পিয়ানোবাদক এবং সুরস্রষ্টা হিসাবেই অনেক বেশি পরিচিত। এবং তাঁর কর্মস্থল হল কেপটাউন ও জোহানসবার্গ। এক ছোট্ট সঙ্গীতশিল্পী দলের সঙ্গে ১৯৬০-এ যান তিনি ইউরোপে। সুইজারল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় করেন প্রোগ্রাম। এর ছ' বছর বাদে আবার যান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশে ফিরে আসেন ১৯৬৮-তে। মাত্র সাত-আট বছর ধরে লিখছেন কবিতা।

ডেনিস ব্রুটাস জন্মেছিলেন রোডেশিয়ায়, ১৯২৪-এ। ১৯৪৭-এ ফোর্ট হেয়ার থেকে হন স্নাতক। রাজনৈতিক কারণে এঁর জীবন বহুবার হয়েছিল বিপর্যস্ত। নজরবন্দী করে রাখা হয় তাঁকে। ১৯৬৬-তে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়তে হয় তাঁকে। এরপর ঘুরলেন নানান দেশে। শুধু কবিই নন, ব্রুটাস একজন ক্রীড়াবিদও। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ বিরোধী অলিম্পিক কমিটির সভাপতি। এ পর্যন্ত বেরিয়েছে তাঁর দুটি কাব্যসংকলন, 'সিরেনস, নাকেলস বুটস' এবং 'লেটার্স টু মার্থা'। আফ্রিকা, ইউরোপ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও নিয়মিত প্রকাশিত হয় ডেনিস ব্রুটাসের কবিতা। অনূদিত হয়েছে অনেক ভাষায়।

আই চুনারা জন্মেছিলেন ট্রান্সভালের রুডেপুর্টে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্নাতক কবি একসময় রসায়ন নিয়ে করতেন গবেষণা। শুধু কবিতাই নয়, সংখ্যাহীন স্মরণীয় ছোট গল্পও তিনি লিখেছেন।

সি, জে, ড্রাইভারও এসেছেন ট্রান্সভাল থেকে ১৯৬৩-৬৪-তে ছিলেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকান স্টুডেন্টস-এর সভাপতি। রাজনৈতিক কারণে ছিলেন কিছুদিন অন্তরীণ। পরে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়তে বাধ্য হন, চলে যান ইংলণ্ডে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'এলিজি ফর এ রেভুল্যশনারি' বেরোয় ১৯৬৯-এ। পরের বছরই বেরোয় তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সেণ্ড ওয়ার ইন আওয়ার টাইম, ও লর্ড'।

তিমোথি হোমস-এর বয়স এখন মাত্র ত্রিশ। জোহান্সবার্গের মানুষ। 'কন্টাক্ট' পত্রিকার ছিলেন একসময় সহকারী সম্পাদক।

কগোসিটসাইলের বয়স তেত্রিশ। এ পর্যন্ত তাঁর দুটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়—'স্পিরিটস আনচেণ্ড' এবং 'কুমু মেজাব'।

আর্থার নর্ফকে পোর্ট এলিজাবেথে জন্মেছিলেন। বয়সের দিক থেকে ইনিও তরুণ। ১৯৬২-তে কবিতার জন্য পুরস্কৃতও হন।

এক কথায় 'সেভেন সাউথ আফ্রিকান পোয়েটস'-এ পাওয়া যাবে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন কবিকণ্ঠ।

ব্রিটিশ লেখক পুরস্কৃত

সম্প্রতি ব্রিটিশ লেখক ও নাট্য-প্রযোজক পিটার ব্রুক পেয়েছেন শেকসপিয়র পুরস্কার। নগদ পঁচিশ হাজার মার্কের এই পুরস্কার দেন এফ-ভি-এস ফাউন্ডেশন অব হামবুর্গ।

ইভান ওলব্রাখট স্মরণে

এ বছরটায় তেমন জাঁকজমক হয়নি। হয়েছিল গত বছরই। বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই তাঁকে স্মরণ করেছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিকরা।

অবশ্য এবারকার প্রাগের অনুষ্ঠানটি ছোট হলেও ছিল আকর্ষণীয়। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতের সব নামী-দামী ব্যক্তিত্ব। আলোচনা করলেন তাঁর সম্পর্কে। অর্থাৎ বর্তমান শতকের চেক-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ ইভান ওলব্রাখট সম্পর্কে। বলাই বাহুল্য, ওলব্রাখটের আসল নাম ছিল কামিল সেমান।

ওলব্রাখট জন্মেছিলেন ১৮২০-এর ৬ জানুয়ারি। বাবা ছিলেন খ্যাতনামা রিয়ালিস্ট লেখক। আনটাল স্টাসেক। অল্প বয়সেই ওলব্রাখটের নেশা জেগেছিল সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে। এর কিছুকালের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে। এঁদের সংবাদপত্র পডেনিকে লিস্টেতে শুরু করলেন সাংবাদিকতা। ছিলেন ১৯০৯ থেকে '১৬ অব্দি। তারপর যোগ দিলেন 'প্রাভো লিডুতে'। এখানে কাটল তাঁর চার বছর। ১৯২০-এ যান সোভিয়েত রাশিয়ায় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ২য় অধিবেশনে যোগ দিতে। সেখান থেকে ফিরে সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন 'রুদে প্রাভো'য়।

সাংবাদিকতার কাজের ফাঁকে-ফাঁকেই চলত তাঁর সাহিত্য সাধনা। পরপর কিছু গল্প ও উপন্যাস লিখে ফেলেন। প্রথম ছোট গল্পের সংকলন 'দ্য ব্যাড লোনলি ওয়ানস' বেরোয় ১৯১৩-য়। অন্ধ মানুষের জীবন নিয়ে লিখলেন উপন্যাস, 'দ্য ডার্কেস্ট অব প্রিজনস' (১৯১৬) আর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে নিয়ে রচনা করলেন 'দ্য স্ট্রেঞ্জ ফ্রেন্ডশিপ অব দ্য অ্যাক্টর জেসেনিয়াস'। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এ। রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠল 'পিকচারস ফ্রম কনটেম্পোরারি রাশিয়া'য়। ১৯২৮-এ লিখলেন 'প্রলেতারিয়ান আনা'। বাস্তববাদী উপন্যাস হিসেবে আজো এটি চেকোস্লোভাকিয়ার প্রথম সারির স্মরণীয়। ১৯৩০-এ লেখেন 'দ্য মিরর উইথ এ গ্রাটিং'। এতে রয়েছে সাংবাদিকতার স্বাদ। 'নিকোলা সুহা রবার' বেরোয় ১৯৩৩-এ। লোককাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে এর উপকরণ। এটিও ওলব্রাখটের আরেক স্মরণীয় সৃষ্টি। এই উপন্যাসের কাহিনী কোন কোন সময় স্মরণ করিয়ে দিতে পারে আমাদের রঘু ডাকাতের কাহিনী। এটিই তোলে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন। সবশুদ্ধ ২০টি সংস্করণ আজ পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে যায় এই উপন্যাসটির। এর কয়েক বছর বাদে বেরল 'দ্য কনকারার' উপন্যাস।

নমামি (গল্প সংকলন)। জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। শ্যামা প্রকাশনী, চাকদহ, নদীয়া। দশ টাকা।

স্বর্গত জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত 'নমামি' গ্রন্থটি পাঠকমহলে যে অতি পরিচিত, তা এর বর্তমান চতুর্থ সংস্করণটি হাতে আসায় বোঝা গেল। তেরশ আটান্ন সালে তৃতীয় প্রকাশের পর দীর্ঘ কুড়ি বছর বাদে এর চতুর্থ প্রকাশের ব্যবস্থায় স্বভাবতই স্বীকার করতে হয়, গ্রন্থটি দেশপ্রেমিক স্বভাবী পাঠকদের কাছে আদর পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন চমৎকার সরল কাহিনী একমাত্র জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর মতো ব্যক্তির হাতেই রচিত হওয়া সম্ভব ছিল বলে মনে হয়, কারণ জিতেশচন্দ্র নিজে নামকরা বিপ্লবী ও স্বাধীনতাপ্রেমী ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সভ্য, কয়েকটি পত্রপত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী এই বিপ্লবী লেখক আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলিতে যে স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা স্বাভাবিকই দেশপ্রেম ও বিপ্লব ভাবনায় শিহরিত করে। ইতিহাস, জীবনকথা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অগ্নিযুগের রোমাঞ্চ কাহিনীগুলিকে যেভাবে শৈল্পিক কল্পনায় সাহিত্যরূপ দিয়েছেন জিতেশচন্দ্র, তা বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী রাজনৈতিক ও সমাজমানসিক জীবনের মূল্যবান পাথেয় হয়ে উঠেছে।

অরণ্যের জমি জমিদারী (উপন্যাস)। প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী। মার্গেশ প্রকাশন, মানস সরোবর, পোঃ— নিশ্চিন্দাপুর ... শ্রীরামপুর, হুগলী।

অরণ্যের জমি জমিদারী ... কিছু ঐতিহাসিক এবং কিছু ...

কাহিনী ভিত্তিক রচনা। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন নানা দিক থেকে বিধ্বস্ত, ঘাতাহত। এ জীবনের অভিজ্ঞতা, সমস্যা নানা বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল। লেখক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী অত্যন্ত শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক ভ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সেই মধ্যবিত্ত জীবন অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মানবিকতাবোধ এ কাহিনীর মূল কেন্দ্রে স্থিত। ইতিহাসের সত্যকে, তাঁর সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলিকে কাল্পনিক মানবরসে জীবন্ত করেছেন। ইতিহাস অংশে আছে বিগত অর্ধ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার পরিচয়। একজন ব্রতচারী শিক্ষকের জীবনই এই কাহিনীর মূলে চিত্রিত। চরিত্রের মধ্যে অমূল্যবাবু, জহরাবাঈ, চন্দন, কমলা, দেবেনবাবু, ইন্দ্রনাথবাবু ইত্যাদি ছোট-বড় চরিত্র সুঅঙ্কিত। কাহিনীটি গতিপ্রাণ, সরস এবং সুখপাঠ্য। একটি মহৎ আদর্শ এ উপন্যাসে ঘোষিত হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকের শিল্প ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

ময়না : নির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায়। যোগমায়া, ১৬২।৭।১, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫। পাঁচ টাকা।

বইটি কাদের জন্য? ছোটদের, না বড়দের? বোধহয়, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া স্বয়ং লেখকের পক্ষেও অসম্ভব। কেননা, এ বইয়ের পাঠক সবাই। ছোটরাও। বড়রাও। যেমন, অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা'। নির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায় এ বইটি লিখেছেন সব বয়সী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য।

প্রকৃতপক্ষে, এর কোনো সুনির্দিষ্ট কাহিনী নেই। গল্পও নেই। কিন্তু ছবি আছে অজস্র। ভাষার ছবি। তুলির ছবি। যেন দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে ওঠে। মিলিয়ে যায়। তেমনি ঘটনার পর ঘটনা।

একটা সূক্ষ্ম লৌকিক অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায় লেখকের বর্ণনায়। বাংলাদেশের দেশজ সত্তার অন্তঃপরিচয়কে তুলে ধরেছেন তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে। অতীত-বর্তমানের ঘটনাশ্রয়ী চিত্রের বৃত্তবিন্যাসে। অবশ্য অনেকগুলি ঘটনারই কোনো সাধারণ অর্থ নেই। আছে প্রতীকী অর্থ।

এ বইয়ের প্রধান চরিত্র ময়না। সে দেখেছে নকসী-কাঁথায় হাতী, ঘোড়া, রাজা, সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্র, বাঘের হাসি, ময়নার দাঁত—আরো কত কি! এমন কি, শহর কলকাতা, খালাসীটোলা, কুঁড়েঘর, আক্রান্ত শিশুর মুখও তার নজর এড়ায়নি।

নির্মলবাবু ময়নার চোখ দিয়ে যা দেখেছেন, সেইসব দৃশ্য ও ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে, আমাদের বিশ্বাস, সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাই তৃপ্তি পাবেন। অর্পিত, চিত্রভানু, গজেন্দ্র ও নীরদ মজুমদারের আঁকা ছবিগুলি তো অপূর্ব।

মনোরমার জীবন-চিত্র—প্রথম খণ্ড। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। অধ্যয়ন। কলিকাতা-১২। মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। ওই সময় গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং বহু গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু গ্রন্থের লেখক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার আকস্মিক দেহরক্ষায় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হয়নি।

দুষ্প্রাপ্য সদ্‌গ্রন্থ প্রচারে ব্রতী শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষের সচেষ্ট প্রয়াসে গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশলাভ করেছে।

এক ধর্মপ্রাণা মহীয়সী নারী, যিনি সাধারণ অর্থে শিক্ষিতা না হয়েও শুদ্ধচিত্ত এবং স্বচ্ছ দৃষ্টির মাধ্যমে ধর্ম, ন্যায়, নীতি, আদর্শের উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিলেন, তাঁরই আলোক-উজ্জ্বল দিব্যজীবনের কাহিনী 'মনোরমার জীবনচিত্র'। —'একটি কুলবধূ সংসারধর্ম পালন করিয়া নানাপ্রকার ঝঞ্চাট ও অভাবের মধ্যে কেমন করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, মনোরমা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়াছিলেন।'

কেবল ধর্মপ্রাণ পাঠকের কাছেই নয়, সাধারণ কৌতূহলী পাঠকের কাছেও গ্রন্থখানির আবেদন গভীর। আধুনিক পাঠকের কাছে একটি অভিনব জগৎ বলে বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নয়।

কাহিনী বিন্যাসে লেখক গভীর আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া গ্রন্থখানিতে লেখকের ধর্মবোধের সঙ্গে সুরুচি ও সূক্ষ্ম মননের স্বাক্ষরও বর্তমান।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ধারা প্রগতি (ফাল্গুন ১৩৭৯)—সম্পাদক শেখ আমানুল্লা। চিংড়িপোতা, পোঃ পশ্চিম রামেশ্বরপুর, ২৪ পরগণা। ষাট পয়সা।

পত্রিকাটি বেরুচ্ছে উদাসী পুরুষদের উদ্যোগে। ঢাকা, বোম্বাই, ত্রিপুরা, লণ্ডনেও প্রতিনিধি রেখেছেন। গোলাপী কাগজে কবিতা-প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ছাপতেও ভুল করেন নি। লিখেছেন মুরুধর বৈরাগী, হাসিবুল হক, দুর্গাদাস সরকার, উল্টোমিঞা—এমনি আরো অনেকে। লেখাগুলি অনেকের ভালো লাগবে।

কথা ও কবিতা : সম্পাদক গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। এক টাকা।

নির্মলকুমার বসু ও 'আশ্রম-কথা প্রসঙ্গ' শীর্ষক লেখা দুটো সময়োপযোগী। রমাপ্রসাদ চন্দ সম্পর্কে লিখেছেন হারাধন দত্ত। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন, অমিয় মুখোপাধ্যায়, সলিলকৃষ্ণ দত্ত, আনন্দ বাগচী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, ষষ্ঠী দে, দেবপ্রসাদ সিংহ, রবি গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুনীল দাস।

অভিনয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '৭২)—সম্পাদক : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রোজিনা প্রেস। ১৩১ হরিশ মুখার্জী রোড। কলকাতা-২৬। দাম দু'টাকা।

নাটক ও মঞ্চ বিষয়ক পত্রিকা 'অভিনয়ের' নিয়মিত আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাধারণত এই জাতীয় পত্রিকা খুব বেশীদিন প্রকাশ পায় না। 'অভিনয়' পত্রিকায় মঞ্চাভিনয়, যাত্রাভিনয় সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা করা হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ নাট্যশালা পর্যায়ে মূল্যবান আলোচনা করছেন শিশির বসু।

চিত্রভাষ—সম্পাদক জ্যোতি পাঠক এবং গৌরীশঙ্কর রায়। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। ৬১ লেনিন সরণী। কলকাতা-১৩।

চিত্রভাষের বর্তমান সংখ্যাটি কলকাতা-৭১ বিশেষ সংখ্যা হিসাবে বেরিয়েছে। প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা সঙ্কলনে সংখ্যার আকর্ষণ বেড়েছে।

সংলাপ : সম্পাদক অরুণ রায় সরস্বতী। খাটুরা, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

সংখ্যাটি সন্তোষকুমার ঘোষের উদ্দেশে নিবেদিত। সন্তোষকুমার ঘোষের ওপরে দু'একটি সংক্ষিপ্ত রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য রচনার উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, সত্য গুহ, দেবকুমার ঘোষ, শচীন দত্ত, শংকর দাশগুপ্ত, সুভাষ চক্রবর্তী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকজন।

অঙ্কুরণ (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক : রমানাথ ভট্টাচার্য। ১৮১, উম্পালাড, শিলং। এক টাকা।

কবিতা লিখেছেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শান্তিপদ ব্রহ্মচারী, পীযূষ রাউত, অমিতাভ দাস, বরুণ সিংহ, দিলীপ লস্কর, বরুণকান্তি দাস, সুকুমার বাগচী, নিত্যানন্দ দাশগুপ্ত, রমানাথ ভট্টাচার্য, বিশ্ব মিত্র ও পীযূষকান্তি ধর। প্রবন্ধগুলি গতানুগতিক' লিখেছেন দিবাকর সেন, রমানাথ ভট্টাচার্য ও প্রশান্তজ্যোতি দাস।

জাহ্নবী : সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহা। ৯এ, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিঃ-৩।

প্রচ্ছদে মুদ্রিত শ্রীঅরবিন্দের ছবিটি চমৎকার। সংখ্যাটি বেরিয়েছে অরবিন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে। লিখেছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত, পশুপতি ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, রাজেশ্বর শ, শ্রীমন্তকুমার জানা, অসিত মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নির্মল দত্ত, সলিল মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী এবং কয়েকজন। অরবিন্দ-জিজ্ঞাসুদের কাছে পত্রিকাটি মূল্যবান ও সংগ্রহযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

॥১১॥

ঠিক করেছিলাম মেজদাকে চিঠি লিখে আমার অগ্রগতির খবর জানাবো।

তাই মাকে রোজ খোসামোদ করছিলাম, 'মা তুমি যেদিন কলকাতায় চিঠি দেবে, আমি তার সংগে একটু দেবো।'

দাদা আদৌ চিঠি লিখতে পারে না, লেখেও না। যা কিছু খবরাখবর দেওয়ার দায়িত্ব মেজদার।

দাদা লেখে না, কাজেই দাদার কাছে কেউ প্রত্যাশাও করে না। মার মুখেও কোনোদিন দাদা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ শোনা যায় না। বরং মেজদা দু'দিন চারদিন দেরী করে ফেললেই মা রাগ করতে থাকেন, 'এতো কি কাজ বাবা তাই একখানা পোস্টো-কার্ড ফেলে দু লাইন খবর দিতে পারিস না? বুড়ো মা-বাপ চিন্তা ভাবনা করছে তা ভাবিস না?'

অভিযোগের সময় মা অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও সম্বোধন করে কথা বলেন, এ মার চিরকালের অভ্যাস। আর দরকারের সময় মা বাপকে 'বুড়ো' বানাতে দ্বিধা করেন না।

মা আমায় টাঙিয়ে টাঙিয়ে রাখছেন, 'রোস আমারটা এখনো লেখা হয়নি। এই বৃহৎ গুষ্ঠির সংসারে মাথা-ঠাণ্ডা করে একটা কাগজ-কলম নিয়ে বসা যায়? দেখি আজই যদি পারি—'

কিন্তু পেরে আর উঠছেন না।

সেই পারে ওঠার আগেই মেজদার আর একটা চিঠি এসে গেল।

অপ্রত্যাশিত।

কিন্তু শুধু কি চিঠিটাই অপ্রত্যাশিত?

চিঠির ভিতরকার বিষয়বস্তু?

সেটা কি প্রত্যাশার মধ্যে ছিল?

এ চিঠি আমাদেরও নয়, মাকেও নয়, বাবাকে লেখা।

বাবাকে বড় একটা কখনো বিচলিত হতে দেখিনি। সেই একবার দিদির বাড়াবাড়ি অসুখের সময় দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। এবার দেখলাম ওই চিঠিটা পাওয়ায়।

বাবাকে বন্ধুর আড্ডা থেকে চলে এসে সোজা দোতলায় উঠে এসে পায়চারি করতে দেখলাম।

চিঠিখানা দু'-তিনবার খুলে খুলে দেখে, হঠাৎ বললেন, 'সুনী তোদের মাকে একবার ডেকে দে তো।'

এটাও অপ্রত্যাশিত।

এতোদিন এখানে আসা হয়েছে কোনো-দিন বাবাকে দেখিনি মাকে ডেকে দিতে বলতে।

মা ভয় খেয়ে বললেন, 'কেন রে?'

'জানি না। মেজদার কী চিঠি এসেছে—'

'ওমা তাই না কি?'

মা ভয় খেলেন, 'চিঠি আসার সঙ্গে ডাকার কী সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে না পেয়ে, 'তা ডাকবার কী হলো! ডাকবার কী হলো! হে মা দুর্গা—'

বলতে বলতে চলে এলেন।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয়। আমাদের মা ঠাকুমাদের জীবনে কী সহজ বিশ্বাসের আসনেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ঈশ্বর ওঁদের কাছে এক পরম সত্যের আশ্রয়।

তা তিনি দুর্গা কালী শিব বিষ্ণু গোপাল সর্বেশ্বর যে মূর্তিতেই হোন।

'তিনি আছেন' এটাই বিশ্বাসের মূল কথা, 'তিনি আমায় রক্ষা করছেন,' এটাই বিশ্বাসের শেষ কথা।

সৌভাগ্য এলেও তাঁকে স্মরণ, বিপদ এলেও তাঁকে স্মরণ। তিনি আমায় দেখতে পাচ্ছেন, তিনি আমায় দেখছেন।

এ নির্ভরতা ছিল ওদের মজ্জাগত সংস্কারে।

আমরা এ নির্ভরতা হারিয়েছি।

এই সহজ সরল বিশ্বাসের আসন থেকে ঈশ্বরকে বিতাড়িত করে দিয়ে, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি।

হাতড়ে তো বেড়াতেই হবে। তাঁকে যে চাই।

তিনি হারিয়ে গেলে 'আমি কোথায় আছি?'

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে আবিষ্কার করা যাবে?

মার কাছে ঈশ্বর ছিলেন সেই নিশ্চিত সত্যের মূর্তিতে। যাঁর ডাকনাম 'দুর্গা'।

দুর্গাকে ডাকতে ডাকতে মা দোতলায় চলে এলেন, বাবাকে দেখে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ গো কী হয়েছে?'

বাবা একবার মার দিকে তাকিয়ে, কিছু না বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা নীচে যাও।'

এবার ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলাম।

বাবার মুখ থেকে এরকম আদেশ কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। বাবা চাইতেন ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে কাছেই থাকুক।

বরং মা অনেক সময় বলেছেন 'কী হাঁ করে বসে বসে বড়দের কথা গিলছিস। যা না ওদিকে যা না।'

বাবা অসন্তুষ্ট হতেন।

বলতেন, 'ছেলেরা যদি সর্বদা পান্তুয়া রসগোল্লার মতো রসালো গল্প করে, অমনিই হাঁ করে। রস না পেলে উঠে যাবে, শুনতে আসবে না। সাবধানটা নিজেকেই হতে হয় নবো, শাসনটা সর্বাগ্রে নিজেকেই করতে হয়। আড়বুঝো এলোমেলো শাসন ছিলের কাছ করে।'

সেই বাবা আজ নিজেই আমাদের চলে যেতে আদেশ দিলেন।

চলে গেলাম।

কিন্তু ভয়ে চলার ভঙ্গীতে শিথিলতা এসেছিল, তাই সিঁড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই বাবার শিথিল কণ্ঠের একটা অস্ফুট উচ্চারণ শুনতে পেলাম, 'চারু!'

চারু!

চারু!

এ নামে কাকে ডাকছেন বাবা?

বহুকাল আগের বিস্মৃতে থাকার সেই চারুহাসিনী দেবীকে?

বুক দুড়দুড় করে উঠলো, তোক-তাক বুজে নেমে এলাম।

কী আছে ওই চিঠিতে?

যার জন্যে বাবা সেই বহুযুগের ওপারে পেঁাছে গিয়ে অমন ব্যাকুল গলায় ডেকে উঠলেন চারু?

বাবার সেই 'ওবাড়ি'তে কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে? দাদাদের কি কোনো বিপদ হয়েছে?

একথা ভাবতে গিয়ে হাত-পা ছেড়ে এলো। তাহলে বিপদটা দাদার। মেজদা তো চিঠি লিখেছে।...হঠাৎ মনে পড়লো চরকাটা দাদা আমাকেও কাটতে বলেছিল।

'আমার জন্যেই এতো জ্বালা! আমার জন্যেই সব বিপদ, সব কষ্ট। আমিই যতো নষ্টের মূল!' লালচে লালচে মুখ, উস্কো-খুস্কো চুল মলিন কন্ঠ দিদি আবেগের গলায় বলে, 'আমিই সব অনিষ্টের কারণ!'

কাতর হয়ে বলি, 'তুই আবার কী দোষ করলি দিদি?'

'আমি না হোক আমার ভাগ্য।'

দিদি আরো মলিন গলায় বলে, 'আমার গানের জন্যেই তো বাড়িওলা অমন করলো। অতো সুন্দর বাড়িটা ছাড়তে হলো! আমার অসুখের জন্যেই এখানে আসতে হলো, দাদারা একা কলকাতায় রইলো।...রুচি রে, আমি যদি ওই টাইফয়েডে মরে যেতাম!'

বহুদিন পরে, ছেলেবেলার মত দিদিকে একটা ধাক্কা মেরে বললাম 'চুপ কর।'

কিন্তু ধমক দিয়ে কি নিয়তি এড়ানো যায়? দিদি মরলো।

সেই গঙ্গাস্নানের দিন।

দিদি ডুবকুব দিতে পারে না, বালির চড়ায় বসে ঘটির গঙ্গাজলে মাথা ভেজাচ্ছিল, তবু দিদি ডুবে মলো।

সকাল থেকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল সেদিন, অন্ধকারের ছায়া ঘোচেনি তখনো, কনকনে হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিলেও, সেই শেষরাত্রি থেকেই যে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল, সেটাই এক অনাস্বাদিত সুখের স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছিল।

আমরা গরম জামা এঁটে, গায়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে প্রস্তুত হলেও, গঙ্গাস্নানের প্রস্তুতিও ছিল তার সঙ্গে। চান করার মতো শাড়ী গামছা, শিশিতে তেল।

বড়জ্যাঠা নীচে থেকে হাঁক দিলেন, 'সাধন গাড়ী নিয়ে এসে গেছে।'

সকলে দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে গেলাম।

চকমিলোনো বাড়ি, দুদিকে দুটো সিঁড়ি। এদিকটায় আমাদের থাকতে দিয়েছেন অন্য একদিকে বড়জ্যাঠার সংসার, একদিকে নতুনকাকার। আমাদের নিজের কাকা জ্যেঠা-দের ভাগের ঘরগুলোয় ওই বীণাবৌদি কল্যাণীবৌদিরা শোয়। বড়জ্যাঠার একার অংশে তিন পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে কুলোয় না।

আমাদের ওই দাদারা একেবারেই র‍্যাবিশ।

বিদ্যে সাধ্যির বালাই নেই, না কথার ছিরি না আচার আচরণের ছিরি। একদিনের জন্যে ডেকে কথা কয়নি আমাদের সঙ্গে।

বাবা যখন ডেকে কথা বলেছেন, দু-এক কথা বলেই সরে পড়েছে। একজন না কি 'কাঞ্চনতলা জুনিয়ার স্কুলের' মাস্টার আর দুজন কী তা জানি না।

বৌগুলোর কিন্তু স্ফূর্তির অভাব দেখি না।

সাধন গাড়ি এনেছে শুনে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে দুদ্দাড়িয়েই নামলো। যদিও বৌমানুষ, তবে পুরনো বাড়ির দুদিক চাপা সিঁড়িতে পা ফেললেই শব্দ হয়।

কাল থেকে 'গাড়ী গাড়ী' শুনছি এসে দেখি ও হরি গরু গাড়ী। দেখে থ' হয়ে যাই। গরুরগাড়ীতে চড়তে হবে।

তা শুনলাম অনেকখানি বালির চড়া ভাঙতে হবে, গরু ছাড়া আর কারো সাধ্য নয় সেটা।

কিন্তু নীরোপিসি? বাবার পিসিমা? বড়জ্যেঠি?

তাঁরা ভাঙাবেন।

তাঁরা তো গরীয়সী!

তাঁরা কোন কালে বেরিয়ে গেছেন, এতো-ক্ষণে অর্ধেকটা রাস্তা পার করলেন হয়তো। শুধু তাঁরাই নয়। পাড়ার আরো অনেক গিন্নী গেছেন দল বেঁধে। এই রকমই যান ওঁরা।

গরুরগাড়ী দেখে মার মুখও শুকিয়ে গেল।

বললেন, 'গায়ে খুব ব্যথা হয় না রে নতুনবৌ?'

নতুন খুড়ি মায়াদয়া না করে বলেন, 'তা' আর বলতে। রাস্তার যা ছিরি! তবে হাঁটার মতন ততো নয়। বাববাঃ হেঁটে গেলে সর্বাঙ্গ আড়রে ওঠে। পা ফুলে ঢোল হয়ে যায়।'

'হেঁটে গিয়েছিস কখনো?'

মা অবাক হয়ে তাকাল।

'কতো!' নতুন খুড়ি একটু বাঁকা হাসি হেসে বলেন, 'এবার তোমার দৌলতে গাড়ী-বেশীর ভাগই তো হেঁটে যাওয়ার ব্যবস্থা। শীতকালে তো তবু ভালো, নীলের উপোস, দশহারা মহাঅষ্টমী, এসব দিনে? গরম বালির তাতে পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়।'

গরম বালিতে হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়।

গাঙ্গুলীবাড়ির বৌয়ের।

যে গাঙ্গুলীরা নাকি গ্রামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। 'বড়লোক' বলে যাদের খ্যাতি আছে।

তাতে কী?

মেয়েমানুষ যে!

মেয়েমানুষ কষ্ট করবে এই নিয়ম। জগতের কোনো আরাম আয়েস সুবিধে তাদের জন্যে নয়। আদি অন্তকাল এটাই চলে আসছে।

মেয়েমানুষের জন্যে সোনাদানা গহনা কাপড় আছে, কিন্তু সুবিধে, স্বাচ্ছন্দ? কখনই নয়।

এ দৃষ্টিভঙ্গী বড়লোক গরীব লোক নির্বিশেষে।

মেয়েমানুষরা নিজেরাই এর পৃষ্ঠপোষক।

কই পাড়াগাঁ বলে তো বেটাছেলেরা খালি পায়ে ঘুরছেন না। তাঁরা তো দিব্যি চটি পরছেন খড়ম পরছেন।

কলকাতাতেও অবিশ্যি ইস্কুলের মেয়ে-টেয়ে ছাড়া, গেরস্ত ঘরের গিন্নী বৌ-টৌদের জুতো পরার রেওয়াজ তেমন ছিল না তখন। তবু আমার মনে হলো, পা বাঁচাতে জুতোটা পরলেই কী মহাপাতক হবে?

মরুক গে, যাদের যা বুদ্ধি।

বাবা যতই বলুন, 'এরাই তোমাদের প্রকৃত আপনজন।' যতই বলুন 'এদের সঙ্গে তাল মেলাতে চেষ্টা কোরো! চেষ্টা আর ইচ্ছে দুটো থাকলেই সব সহজ হয়ে যায়।' আমি কিন্তু দস্তুরমতো পর ভাবি এদের।

অনেক কিছুই তফাৎ।

'আপন' ভাবলেই তো হয় না।

তবে ভবিষ্যতে কী আছে কে জানে। বিয়ে হয়ে হয়তো এমনি একটা গন্ডগ্রামে এসে পড়তে হবে।

যাক ও ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই। জন্মে কখনো গরুরগাড়ী চড়িনি, আপাততঃ সেই হিসেবে বেশ একটা রোমাঞ্চ লাগছিল।

দিদিও বললো, 'বেশ মজা লাগবে না রে?'

সাধন আর তার ভাই দুজনে দুটো গাড়ী এনেছে।

দুটো গাড়ীতে ঠিক মতো গুছিয়ে বসতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগলো। একটা গাড়ীতে মা আমি দিদি বীণাবৌদি, আর ওর বর। আর একটা গাড়ীতে ফুলি খুলি কল্যাণীবৌদি নতুন খুড়িমা কল্যাণীবৌদির বর অর্থাৎ নিয়ম সূত্রে আমাদের দাদা।

আরও ছিল বিন্দাবন নিতাই বিহঙ্গ গোপাল। ওরা দু গাড়ীতে গুঁজে গেজে উঠে পড়লো।

একজন বৌদি যাবে না, তার কোলে কচি ছেলে, তার কাছে বাড়ির আরো সব কচি ছেলেদের জিম্মা করে রেখে যাওয়া হলো। রীতিমত অভিযান।

নতুনকাকা এই সব গুছিয়ে তুলিয়ে টুলিয়ে গাড়ী রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে ছন-

ঘুনিয়ে হেঁটে গেলেন। বড়জ্যাঠা যাবেন না, সবাই গেলে সর্বেশ্বরের পুজোর ত্রুটি হবে। তবে এতো লোক যখন হেঁটে যাচ্ছে, সবাই যখন হেঁটে যায় মনে হবে গঙ্গা খুব দূরে নয়।

শীতের ভোরে গ্রামের পথের আশ্চর্য-সুন্দর একটা মাদকতা আছে। একেবারে জন-মানবহীন পথ, দূরে দূরে কুঁড়েবাড়ি যেন ছবির গায়ে ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ওই সাধন কোম্পানীর পরু তাড়ানোর কেমন একরকম 'হেই হেই' শব্দ। তার সঙ্গে গরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।......মনে হলো কোথায় যেন চলে গেছি।

দিদি বললো, 'ভাগ্যিস আমরা এখানে এসেছিলাম রুচি, তা নইলে তো এসব দেখতে পেতাম না।'...আমি নীরব অনু-ভূতিতে সায় দিই।

সমুদ্রের বিশাল সৌন্দর্য নয়, হিমালয়ের বিরাট মহিমা নয়, কুলু কাশ্মীর সিমলা শিলং দার্জিলিং মুসৌরীর অপরূপ দৃশ্য নয়, 'পদ্মার বুকে বোট নয়, গঙ্গার বুকে নৌকো নয়, তুচ্ছ এক পল্লীগ্রামের মেঠো-পথে গোযান সম্বলিত অভিযান। তবু আবেগ কিছু কম নেই, আনন্দে কিছু ঘাটতি নেই।

চড়ার বালিতে চাকা পুঁতে পুঁতে আর টেনে টেনে আমাদের গাড়ী দুটো যখন পৌঁছলো, তখন পদাতিকদের স্নান পর্ব সারা হয়ে গেছে।

বাবার পিসিমা ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'এতোক্ষণ এসে পেঁছিনো হলো তোমাদের? কখন রওনা দিয়েছিলে? ...বেলা চড়চড়িয়ে উঠলো! যখনি শুনেছি সাধনের গাড়ী, তখনই বুঝেছি, এই হবে। চনচনিয়ে হেঁটে চলে এলে এতোক্ষণে ফেরার সময় হয়ে যেতো। ...ন্যাও এখন সব জনে জনে ছান করো।...এই নিতাই, বিহঙ্গ, গোপাল, তোরা যেন আবার ইজের ভিজোতে বসিসনে। ছেড়ে রেখে রেখে এক একটা ডুব দে নে। মেয়েরা, এক একখানা গামছা এনেছিস তো? ও বাবা আমার বুড়ো একটা করে দশহাত শাড়ী। ওই ভিজোতে হবে? অবাক করলি যে তোরা? ফুলি ঝুলি, তোরাও বুঝি কলকেতার ফ্যাসান শিখলি? ন্যাও এখন ভিজে কাপড়ের বোঝা কে বয় দেখো! গাড়ী ভারী হয়ে যাবে।'

লজ্জার আইন এ'দের এমন প্রবল যে মাথার ঘোমটার তলা দিয়ে নাকের আগা দেখা গেলে অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু খোলাঘাটে গামছার বিধান! আশ্চর্য্য বটে।

আর ওই সাত-আট ন বছরের ছেলেগুলোও অম্লান মুখে জন্মমুহূর্তের পোষাক পরে গটগটিয়ে জলে নেমে গেল।

ওমা একে একে সবাই নেমে যাচ্ছে, আমরাই তিনজন বোবার মতন দাঁড়িয়ে আছি। মা আমি দিদি।

নীরোপিসি বল্লেন, 'কিলো, তোরা তিন মায়ে ঝিয়ে সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি যে ডুব দিতে জানিস না?'

সত্যিই জানি না।

স্বীকার করতেই হয়।

নীরোপিসি হেসেই খুন। বলেন, 'ন্যাড়ার আমাদের বরাত ভালো। তা আয় ঘাটের ধারে বোস, ঘটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে মাথা ভিজিয়ে দিই।......মাকে নিয়ে পড়লেন নীরোপিসি ঘটি নিয়ে।

যারা যারা শুনতে পেলো হি হি করে হেসে উঠলো।

বাঙালীঘরের মেয়ে, হিন্দুর মেয়ে গঙ্গায় ডুব দিতে জানে না এমন অনাসৃষ্টি কথা এরা কেউ কখনো শোনেনি।

দিদি চিরদিনই অভিমানী, দিদি যে এই সব কথা শুনে অভিমানে খানখান হয়ে জলে নামতে গেছে তা কেউ দেখেনি।

ছেলেগুলো গা মুছে মুছে, সেই ছেড়ে রাখা ইজের জামাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পরছে, মহিলারা চুল ঝাড়ছেন ভিজে কাপড় নিংড়োচ্ছেন, নানা গল্পে ঘাট মুখরিত।

কার যেন গলা শুনতে পাচ্ছি—খোড় মোচা সজনে খাড়া তোমাদের কিনে খেতে হয় নমামী? হাসবো না কাঁদবো? আঁ? নিমপাতাটি পর্যন্ত সেই হাবাতে কলকেতায় এতো মধু?'

প্রসঙ্গের সময় অসময় নেই এ'দের! মৃতদেহ সামনে রেখেও এ'রা বিয়েবাড়ির গল্প করতে পারেন। কারো বাসরে বসে মরণের গল্প

যাকগে—আমি তখন হাঁ করে দেখছি—চড়ার ওপর দিয়ে কে গটগট করে হেঁটে আসছে ঠিক বাল্মীকি মুনির মত?

এখানে কি এইরকম লোক অনেক আছে?

কাছে এসে পড়াতে অবাক।

অন্য কেউ নয়, বাল্মীকি মুনিই।

কিন্তু তিনি কোন উপায়ে? আমরা বেরিয়ে আসার সময় তো মঙ্গল আরতি শুরু করছিলেন উনি। আকাশে উড়ে এলেন?

কিন্তু ওনার সঙ্গে কে?

লবকুশের একজন না কি?

না হলে ও'র সঙ্গে সঙ্গে কেন? অবিশ্যি যুবকবয়স তা হতে বাধা কি? লবকুশ কি চিরকালই বালক ছিল? যুবক হয়ে ওঠেনি কোনোদিন?

কিন্তু সত্যি কে?

চেহারাটা যেন বড্ড বেশী রকমের সুন্দর। পুরুষমানুষের পক্ষে অন্যায় রকম ফর্সা। এখানের ছেলে বলে মনেই হচ্ছে না। এখানে ফর্সাদেরও কেমন তামাটে ভাব।

সত্যি বলতে—চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেও বেশ ভাল করেই দেখে নিচ্ছিলাম।

লম্বা কোঁচা ধুতি, গায়ে গরম কাপড়ের পাঞ্জাবি, তার উপর শাল জড়ানো, এ সাজ এখানের নয়, এ নিশ্চয় অন্য কোনোখানের। এখানে তো দামী সাজ হলো ধুতির ওপর গরম কোট তার সঙ্গে শাল। গলায় কম্ফর্টার পায়ে মোজা এবং ফিতে বাঁধা জুতো।

নাঃ ও লোক এখানের নয়।

বাল্মীকি মুনির কোনো ছাত্রটাত্র নয় তো? উনি তো শুনি সংস্কৃত পড়ান।

আচ্ছা ঠাকুরমশাই এতে তাড়াতাড়ি এসে পড়লেন কী করে? হেঁটেই তো এলেন দেখলাম।

গ্রামের লোকের আর কিছু না থাক হাঁটবার শক্তিটা খুব আছে। ওই 'ছেলেটা'ও নিশ্চয় তাই এসেছে। কিন্তু ও তো এখানের নয়।

ভগবান জানেন কেন তখন ওই ছেলেটাকে নিয়েই গবেষণা চালাচ্ছিলাম, হঠাৎ খুব একটা হৈ চৈ উঠল, 'সুনী? সুনী? একা নেমেছিল?......ডুব দিতে জানে না তবু নামতে গিয়েছিল?'..

মার তীব্র কান্নার শব্দ পেলাম, 'সুনী! সুনী! ওমা আমি কেন মরতে অন্যমনা হলাম গো—আমি কেন এলাম গো।'

ছুটে ওদিকে চলে গেলাম।

গাড়ীতে আসতে আসতে দিদি বলেছিল 'তুষ গোবর দিয়ে আবার ব্রত। দূর! আমি কক্ষণো ও ব্রত করবো না।'

'না করতে চাইলে সবাই বকে ভূত ভাগিয়ে দেবে না?'

'দিক। খাবো বকুনি। জন্মে কখনো কোনো ব্রত করলাম না, জীবনে এই প্রথম, তার মালমশলা কিনা তুষ গোবর! গোবরে আমি জীবনে হাত দিয়েছি?'

দিদির কথার মধ্যে এমন জোর বেশী দেখিনি, তাই অবাক হয়েছিলাম একটু।

দিদি বলেছিল, 'করি তো এই বোশেখ থেকে মহাদেব পুজো করবো।'

মহাদেব পুজোর উদ্দেশ্য নিয়ে কল্যাণী-বৌদি একটু ঠাট্টা করেছিল।

দিদি লজ্জা পেয়েছিল, কিন্তু গায়ে মাখেনি।

দিদি নিজের প্রতিজ্ঞা রাখলো।

ওই তুষ গোবরের ব্রতটা আর করতে হলো না তাকে। বিরাট একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পেল দিদি।

বাবার পিসিমা বেশ কড়াচড়া গলায় বলেছিলেন, 'আগেই বুঝেছিলাম বেয়ে ওদের হবে না। মায়ে-ঝিয়ে তিনজনাই বিরূপ। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, বিরূপচিত্ত নিয়ে হয় না।'

আরো সবাই বলতে থাকে—

'কিন্তু ডুব দিতে যখন জানে না, তখন কোন সাহসে একা নাইতে নেমে ছিল সুনী—তাই কারুর হাতটা ধরে নাম?'

'আর কিছু নয় তেজ।......দেখতে ভাল মানুষ, ভেতরে ভেতরে খুব তেজী।...এই যে একটু খোঁটা দেওয়া হয়েছিল ডুব দিতে জানে না বলে, তাই তেজ করে নামা হয়েছিল।'

'...তা তেজ দেখানোর ফলটা হাতে হাতে ফললো।...সাধে কি আর বলে দর্পহারী মধুসূদন'। তিনি সব সইতে পারেন, দর্পটি সইতে পারেন না।'

কথাই চলছে। অজস্র কথা। যে যতো পারে কথা বলছে।

গোলেমালে অনেক সময় গিয়েছিল।

সাধন আর তার ভাই আবার যখন গাড়ীতে গরু জুতলো, তখন রোদ চড়চড় করছে। শীতকাল তাই রক্ষে। পায়ে হাঁটারা আগেই এগিয়ে গেছেন। কতোক্ষণ আর দেরী করবেন? ছিষ্টি সংসারের কাজ পড়ে নেই?

যারা গাড়ীতে এলো মন্তব্যগুলো তাদের। সারা পথটা তারা গাঙ্গুলীবাড়ীর ন' কর্তা রমেশ গাঙ্গুলীর সুনীতি নামের মেয়েটার সমালোচনায় পথ মুখরিত করতে করতে এলো।

সমালোচনার সুযোগ পেলে কে ছাড়ে? এমন একটা মউকা পেয়ে কেউ ছাড়তে রাজী হল না।

যাঁরা আগেই হেঁটে চলে এসেছিলেন, তাঁরাও বাড়ি এসে সুনীতি নামের মেয়েটার তেজ, দুঃসাহস আর অবিমৃষ্যকারিতার কাহিনী বিশদ বর্ণনায় বিবৃত করে ফেলেছিলেন ততক্ষণে। আমরা যখন হেঁটমুন্ডে এসে সদরে দাঁড়ালাম, তখন বাবা আর জ্যাঠামশাই এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

ও'দের মুখ থমথমে।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি তোকে বলেছিলাম ন্যাড়া, সঙ্গে যা।' গেলে এমনটা হতো না।'

বাবা ক্ষীণগলায় বললেন, 'আমিই কি আটকাতে পারতাম?'

'তা বটে। মেয়ের মধ্যে কী ভাবের খেলা চলছে কে বুঝবে?' আর কিছুই নয়, নিয়তিই দুর্মতি হয়ে এসে দাঁড়ায়।'

তারপর বললেন, 'আমারই যাওয়া উচিত ছিল। ভটচায খুড়ো যখন আরতি সেরে এগোলেন, তখন একবার মনেও হয়েছিল, তারপর ভাবলাম মেজবৌমা বাড়িতে রয়েছে, কাচ্চাবাচ্চাও রয়েছে কটা, সবাই বেরিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। অবিশ্যি সবই ভুল। কে কাকে রক্ষা করবার বড়াই করতে পারে? তিনি যা মতলব করে রাখেন সেটাই ঘটে।'

ওই ভটচায খুড়োর সূত্রে কখন যে সেই ছেলেটার কথা এসে পড়েছিল। দিদির প্রসঙ্গ ভুলে সবাই ওর কথাই শুরু করলো। শুনলাম ছেলেটা ওঁর সম্পর্কে নাতি, ভাগ্নীর ছেলে। বহরমপুর কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে, হঠাৎ কী খেয়ালে ওই দাদুর কাছে এসে হাজির হয়েছে 'সংস্কৃত শিখবো' বলে।

গতকাল মাত্র এসেছে, দাদু গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন দেখে ওরও শখ হলো। গিয়ে এই বিপত্তি। শহুরে ছেলে হাঁটতে ভয় পায়নি?

মোটেই না, খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ বরাবর এইসবে প্রাইজ পাওয়া ছেলে যে।

তা রূপ বটে একখানা!

হবে না কেন, মা যে ডাকসাইটে রূপসী।

নাম কি ছেলেটার?

নামটিও ভালো 'আনন্দময়'।

বড়জ্যাঠা জিগ্যেস করলেন, 'কতোদিন থাকবে এখানে?'

বাল্মীকিমুনি কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'মহারাজের যতোদিন ইচ্ছে হবে। বেজায় খেয়ালী যে ছোঁড়া! ওর মা ওকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরে।...লেখাপড়ায় এতো মাথা, তবু 'খেলা খেলা' করে পাগল! ওর মা-বাপ তো বলে, ওই খেলার বাতিক মাথায় না ঢুকলে আনন্দ নির্ঘাৎ সব একজামিনে ফার্স্ট হতো। পড়ায় এতো কম সময় দিয়েও এতো নম্বর পেয়েছে।'

তা ওই ছেলে নাকি বলে, 'শুধু পড়ার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কী এতো লাভ? এসবও কী একটা বিদ্যে নয়? জীবনেও তো কতো পরীক্ষা আসে, আসবে, সর্বদিকে চৌকশ না হলে সে পরীক্ষায় পাশ হবো কী করে?'

'কিন্তু ভটচায খুড়োর তো একার সংসার, স্বপাক হবিষ্যির ব্যবস্থা, ওই সোনার চাঁদ ছেলেটির খাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে?'

বললেন বাবার পিসিমা।

বড়জ্যাঠা বললেন, 'আমি তো দরাজ আর্জি পেশ করেছিলাম, যে ক'দিন থাকবে এখানেই ব্যবস্থা হোক। উনি রাজী হলেন না। বললেন, একটা দুস্থ গরীব বামুনের ছেলেকে ডেকে রাঁধিয়ে নেবেন।

যে ছেলেটাকে নিয়ে আমি গবেষণা চালাচ্ছিলাম, দেখলাম তার সম্পর্কে সবাই গবেষণা চালাচ্ছে।

তার মানে এদের এই নিস্তরঙ্গ স্তিমিত জীবনে উত্তাপের আর উৎসাহের জন্যে শুধু তো নিজেদেরই কণ্ঠরোল। মাঝে মাঝে অন্য কোনোখান থেকে কেউ এসে আবির্ভূত হলে একটা নতুন প্রসঙ্গে উত্তাপ উৎসাহ পাওয়া যায়।

যেমন হয়েছিল আমরা আসার প্রথম প্রথম।

আমাদের সম্পর্কে অগাধ কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এসেছে সবাই। সেই সঙ্গে কলকাতা সম্পর্কেও।

কলকাতায় যে কল টিপলে জল পাওয়া যায়, এই পরম সুখের বিষয়টি নিয়ে বিস্ময় এবং আনন্দ নিয়ে প্রশ্ন করার লোক ছিল তখনও। গিন্নীরা যাদের—দুলেবৌ, মুগীবৌ, গয়লামেয়ে, নাপতেমেয়ে বলে অভিহিত করতেন তারাই এই বিস্ময় কৌতূহল নিয়ে ছুটে এসেছে।

কলকাতাকে ওরা প্রশ্নোত্তরের মধ্যে অনুভব করতে চাইতো। কলকাতা ওদের কাছে স্বপ্নপুরী।

'দুলেবৌ' নামের মহিলাটি একদিন বলেছিল, 'শুনতে পাই আমার ননদাইয়ের ভাগিনপোত নাকি একবার কলকেতায় গেছিল খেটে খাবে এই আশায়। তা থাকতে পারলনি। বলে 'উপায়' হলি কী হবে, সকল দব্যি যদি কিনে খেতে হয় তো লাভটা হলো কোতায়? ......তবে হ্যাঁ, দেশ বটে একখান। ইন্দর-ভুবন। তা বারোমাস, তেমন ঠাঁই বাস করতে গা ছমছম করে না ন'বৌদিদি?'

একথাও শুনেছি, 'কলকাতায় নাকি বামুন শুদ্দুরে ভেদ নেই ন'ঠাকরোণ? বামুনে নাকি শুদ্দুরের হাতে ভাত খায়?'

অবিশ্যি এগুলো ওই দুলেবৌ মুগীবৌ কোম্পানীরই প্রশ্ন। কিন্তু ওরাই তো এঁদের নিকটতম প্রতিবেশী, ওরাই তো সংখ্যায় বেশী। ওদের সঙ্গ সাহচর্যেই দিন কাটাতে হয় গাঙ্গুলীবাড়ি মুখুজ্যেবাড়িদের।

যাক এখন আবার একটা নতুন প্রসঙ্গ হলো দিদি।

ন বাবুর মস্ত আইবুড়ো বড় মেয়ে।

যার মা তাকে এখনো চোদ্দর গন্ডীতে ভরে রেখে দিতে চাইলেও (সব মেয়েরাই যা চায়) কোন না জোলো সত্তেরো।

কে জানে তার এই ডুবে যাওয়াটা দৈবের ঘটনা, না ইচ্ছাকৃত। নিজের মনের মধ্যে সন্দেহের লেশ না থাকলেও, অন্যের মনের মধ্যে সন্দেহ চারিয়ে বেড়ায় মজে রহস্যময় ভাষায় কথা বলতে ভালবাসেন বড়-জ্যোঠি।......

উনিই অনুযোগ করলেন, 'এখনকার সব বড় বড় আইবুড়ো মেয়ে, মনের মতিগতি কখন কী হয়।'

কিন্তু না বলেও অনেকটা বলায় আর্ট বেশ আয়ত্ত এঁর।

কাউকে কাসতে দেখলেই উনি চিন্তিত-কণ্ঠে বলেন, 'কাসিটা কেমন ভাল ঠেকছে না—'

কারুর গায়ে দুটো মশার কামড় দেখলেই উনি তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করে বলে ওঠেন, 'কী জানি বাবা চাদ্দিকে যা শেতলার যা কৃপা শুরু হয়েছে—'

কারুর মাথার যন্ত্রণা দেখলেই মনে পড়িয়ে দেন, মাথার যন্ত্রণা 'সন্ন্যাস রোগে'র পূর্বলক্ষণ।

অতএব দিদির এতোবড়ো ব্যাপারে এটুকু আর করবেন না?

এইসব কথাবার্তার মধ্যে নতুনকাকা এসে পড়লেন, 'এই মার সেই মার' করতে করতে। 'মেয়েছেলের' দায়দায়িত্ব নিয়ে যে পুরুষ পথে বেরোয় সে যে একের নম্বরের আহাম্মুখ, এই তীব্র সত্যটি ঘোষণা করতে করতে উনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন, 'এ কাজ আর নয়।'

ওদিকে মা ঘরের মধ্যে বসে আছেন চোরের অধম হয়ে। মাকেই তো সবাই দোষ দিচ্ছে।

গঙ্গাস্নানে যাবার আমোদ-আহ্লাদ উৎসাহ সব কোথায় উপে গেছে।

হঠাৎ আমারও দিদির ওপর ভারী রাগ হয়ে গেল।

যতো ঝঞ্ঝাটের কারণই তো ও।

ও যদি ওই দুর্মতি না করতো, এতো কান্ড ঘটতো? এতো লজ্জা, এতো দুঃখ আর এতো সমালোচনা!

সত্যিই তো, যার যা ক্ষমতা নেই, তার তা করতে যাওয়ার দুঃসাহস কেন?

কিন্তু এখন তো আর ওকে বলা যাচ্ছে না সেকথা। (ক্রমশঃ)

গ্রহান্তরের মানুষ

শচীন্দ্রনাথ বসু

অন্য জগতে মানুষ আছে কিনা এ প্রশ্ন আজ সবার মনে। কিন্তু বিষয়টা নতুন নয়। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দে রোমক কবি লুক্রেশিয়াস লিখেছিলেন, "আমরা মানতে বাধ্য যে অন্যান্য অঞ্চলে অন্যান্য পৃথিবী আছে, এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ ও পশুও আছে" কোপার্নিকাসের শিষ্য সন্ন্যাসী জোর্ডানো ব্রুনো বললেন অসংখ্য পৃথিবী অসংখ্য সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে এবং এইসব জগতে প্রাণীও আছে। মধ্যযুগের ইয়োরোপে এই ধরনের ধর্মবিরোধী বিশ্বাসের ক্ষমা ছিল না, তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়।

আজ অনেকের বিশ্বাস দূর জগতের বুদ্ধিমান প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে, এখনও আসছে—কয়েক বছর আগে প্রায়ই গুজব শোনা যেত এদের বাহন উড়ন্ত চাকি বা উফো দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এসব খবর এত বেড়ে যায় যে যুক্তরাষ্ট্রে এ নিয়ে এক বৈজ্ঞানিক তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা মেলে কোনওরকম প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং কয়েকটি বিবরণ অমীমাংসিত হলেও তাদের সঙ্গে অপার্থিব জীবের সম্পর্ক নেই। অবশ্য গ্রহান্তরের আগন্তুক এযাবৎ প্রমাণসাপেক্ষ থাকলেও বিজ্ঞানীরা অনেকেই দূর জগতে শুধু হীন প্রাণী নয় বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। আধুনিক তথ্য বিবেচনা করে এ সম্বন্ধে শুক্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতিকে নিয়ে তাঁরা অনেক জল্পনা করেছেন—এইসব গ্রহ এখন প্রাণশূন্য হলেও হয়তো অতীতে প্রাণের সাড়া পেয়েছে। আমেরিকার ম্যারিনার যানগুলি মঙ্গলে বহু শুকনো নালার ছবি তুলে পাঠিয়েছে, সম্ভবত সেগুলি জলস্রোতের সৃষ্টি; পৃথিবীতে অবশ্য জল প্রাণের আবশ্যিক উপাদান। বর্তমান কর্মসূচী অনুসারে ভবিষ্যতে রকেট যান (বা মানুষ) মঙ্গলে প্রাণের আরও প্রত্যক্ষ চিহ্ন খুঁজবে। এই ধরনের গবেষণার জন্য বহির্জীববিদ্যা নামে এক নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সৌর জগতে এক পার্থিব মানুষ ছাড়া অন্য কোনও রকম বুদ্ধিমান প্রাণীর সম্ভাবনা খুবই কম।

মহাকাশ পাড়ি সম্ভব হওয়াতে বহির্জগতে প্রাণ সম্বন্ধে এত কৌতূহল জেগেছে, কিন্তু বিজ্ঞানীর উৎসাহের বড় কারণ গ্রহ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণার বর্জন। দূরচারী গ্রহদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে বস্তু ছিটকে গিয়েছে, তা ক্রমে গ্রহে পরিণত হয়েছে—এই ছিল প্রাক্তন ধারণা; এমন সংঘাত অতি বিরল ও আকস্মিক ঘটনা হতে বাধ্য। কিন্তু নক্ষত্র সৃষ্টির সময়ে যদি একই আদি বস্তু জমে গ্রহ হয় (যেমন বর্তমান বিশ্বাস) তবে সাধারণ তারার গ্রহ না থাকাই অস্বাভাবিক। এবং গ্রহ যত বেশী তত বেশী প্রাণের সম্ভাবনা। আমাদের ছায়াপথ নীহারিকায় ১০,০০০ কোটি তারা, এইরকম আরও ১০,০০০ কোটি নীহারিকা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের জানা অংশটুকুর মধ্যেই। জ্যোতির্বিদের সাধারণ হিসাব অনুসারে ছায়াপথেই অন্তত ৫০০০ কোটি গ্রহ আছে, এবং বছর কুড়ি আগে বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ হার্লো শাপলি অনুমান করেছিলেন এই নীহারিকায় অন্তত দশ কোটি তারায় উন্নত শ্রেণীর প্রাণের উপযুক্ত গ্রহ থাকতে পারে। আর এক বৈজ্ঞানিক লেখকের মতে সংখ্যাটা ৬০ কোটির কাছাকাছি, তার মধ্যে পঞ্চাশটি আছে আমাদের ১০০ আলোকবর্ষের মধ্যে। আলোর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল, আলো এক বছরে যতটা যায় অর্থাৎ এক আলোকবর্ষ হল জ্যোতিলোকে দূরত্বের মাপকাঠি।) ১৯৭১ সালে সোভিয়েট আরমেনিয়ায় বিশ্বের জ্যোতির্বিদরা এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত হল যে ছায়াপথে এখন এক থেকে দশ লক্ষ উন্নত বৈজ্ঞানিক সভ্যতা আছে।

এই ধরনের হিসাব খুব সুনিশ্চিত হতে পারে না, তবে তা সম্পূর্ণ আন্দাজী নয়। প্রাণ থাকতে হলে যে অবস্থাগুলির যোগাযোগ দরকার তা অনুমান করা চলে। অধিকাংশ তারাকে ঘিরে কাছে বা দূরে এমন একটি মন্ডল আছে যেখানে বিভিন্ন অবস্থার সংযোগ প্রাণের উপযোগী হতে পারে; অর্থাৎ সেই অঞ্চলের গ্রহে জল তরল অবস্থায় থাকা সম্ভব, গ্যাসের আবহ ধরে রাখা সম্ভব, তারার থেকে যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া সম্ভব ইত্যাদি। গ্রহ খুব ছোট হলে প্রাণোপযোগী মন্ডলটাও হবে সংকীর্ণ; আবার বেশী বড় হলে এত তাড়াতাড়ি সে তেজী 'লাল দানব' রূপ ধারণ করবে যে গ্রহে প্রাণের অভিব্যক্তি শুরু হতে যে সময়টা দরকার তা পাওয়া যাবে না।

বৃহত্তম দূরবীনেও নিকটতম তারার গ্রহ দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু পরোক্ষ ইঙ্গিত কিছু পাওয়া গিয়েছে। মাত্র ছয় আলোকবর্ষ দূরে আছে বার্নার্ডের তারা; চলার পথে তার নড়চড়া দেখে জ্যোতির্বিদরা স্থির করেছেন এর জন্য দায়ী দুই প্রদক্ষিণরত গ্রহের মাধ্যাকর্ষীয় টান, বৃহস্পতি ও শনির মত তারা বৃহদাকার। যেমন সূর্যের তেমন এরও আরও ছোট গ্রহ হয়তো আছে, টান দুর্বল বলে ধরা পড়ছে না। ১৯৬৯ সালের এক খবর অনুসারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে স্প্রাউল মানমন্দিরে এক জ্যোতির্বিদ [illegible] অনুসন্ধানে ষাটটি নিকটবর্তী তারার মধ্যে সাতটির অদৃশ্য তারা ধরতে পেরেছেন, কিন্তু কোনওটিই প্রাণের উপযোগী নয়। ১১ আলোকবর্ষ দূরে ৬১—সিগনি তারার একটি গ্রহ আছে, আমাদের পাঁচ বছরে সে তাকে একবার প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ তার বছর আমাদের পাঁচ গুণ দীর্ঘ।

সম্প্রতি রেডিও দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশে একের পর এক কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার হয়েছে, তাতে বিশ্ব জগতে প্রাণের সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। তারায় তারায় যে অপরিমেয় দূরত্ব তা বস্তুশূন্য নয়, সেখানে হাইড্রোজেন পরমাণু ছাড়াও জল বাষ্প, কারবন মনকসাইড, অ্যামোনিয়া, ফর্মিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল ইত্যাদি জটিল থেকে জটিলতর অণু ধরা পড়েছে। পৃথিবীর আবহে যেসব গ্যাস থেকে প্রাণের উদ্ভব সন্দেহ করা হয় তাদের সঙ্গে এগুলির মিল দেখা যায়, কারবন নাইট্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন এই মৌলিক পদার্থগুলি সবই এদের মধ্যে বর্তমান।

তাছাড়া, উল্কাতে অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কারও উৎসাহজনক, কারণ পার্থিব প্রাণীদেহের অপরিহার্য অঙ্গ প্রোটিন কয়েক রকম অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। উপরন্তু সম্প্রতি উল্কাখন্ডে এমন কতগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গিয়েছে যা রসায়নের ভাষায় 'দক্ষিণপন্থী', এদের উৎপত্তি সম্ভবত বহির্বিশ্বে কারণ পৃথিবীতে এই অ্যাসিডগুলির রূপ 'বামপন্থী'।

শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কর্মী মহাকাশে আবিষ্কৃত চারটি বস্তু (অ্যামোনিয়া, মিথাইল অ্যালকোহল, ফর্মালডিহাইড ও ফর্মিক অ্যাসিড) মিশিয়ে তাদের উপর অতিবেগনি রশ্মি ফেলে কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড বানিয়েছেন যা আমাদের প্রোটিনে থাকা প্রাণধারণের পক্ষে অপরিহার্য। মিশ্রিত গ্যাসগুলিতে জলের চিহ্নমাত্র ছিল না, তার থেকে এই কথা উঠেছে যে অন্য গ্রহে হয়তো জলের বদলে তরল অ্যামোনিয়া কাজ করে। পার্থিব প্রাণীদেহে জৈব বস্তুগুলি জলে গুলে যায়, তাতে পারস্পরিক প্রক্রিয়া সহজ হয়, কিন্তু অ্যামোনিয়ার দ্রাবক শক্তি ও অন্যান্য গুণ অনেকটা জলেরই মত। কথাটা নতুন নয়, ১৯৬৪ সালে বিখ্যাত জীববিৎ জে বি এস হলডেন বলেন জলের বদলে তরল অ্যামোনিয়ার উপরও জৈব রসায়ন গড়ে উঠতে পারে।

দক্ষিণপন্থী অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত জীবশ্রেণী কল্পনা করা যায় যারা পার্থিব প্রাণীর অনুরূপ হলেও বিভিন্ন —অনেকটা আয়নার ছায়া যেমন। রাসায়নিক সাদৃশ্যের সূত্র ধরে কারবনের বিকল্পে সিলিকন ও সেলিনিয়াম ধাতু প্রস্তাবিত হয়েছে। কেউ কেউ এমন দূরকল্পনাও কল্পনা করেছেন যে, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড জলের কাজ করছে, অন্য গ্রহের বাতাস ক্লোরিন

গ্যাসের তৈরি; প্রথমটি আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক বিষ, দ্বিতীয়টির ছোঁয়া লাগলে গা পুড়ে যায়। অক্সিজেনশূন্য বাতাস কল্পনা করা অত কঠিন নয়, কারণ পৃথিবীতেই প্রথম প্রাণীদের তা দরকার ছিল না, বরং তা ছিল মারাত্মক। যাই হক এটা ঠিক যে ভিন্ন রাসায়নিক ভিত্তিতে গড়া প্রাণীরা হবে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন. মহাকাশের অভিযাত্রী যদি কোথাও গিয়ে তাদের মুখোমুখি হয় তবে তাদের মনে হবে উদ্ভট, ভয়ঙ্কর বা কদর্য; কিন্তু এইসব পার্থিব সংস্কারের বশে পালিয়ে গেলে চলবে না. হয়তো তাদের বুদ্ধি বা স্বাভাবিক মিষ্টতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

কিন্তু এরকম সাক্ষাতের সম্ভাবনা কতটুকু? পৃথিবীর থেকে মুক্তি পেতে যে বেগ দরকার (ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল) সেই বেগে আমাদের যান ছুটলেও নিকটতম প্রাণোপযোগী তারায় পৌঁছাতে লাগবে আড়াই লক্ষ বছরের বেশী। কিন্তু রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে অথবা দেহের তাপ খুব নিচে নামিয়ে শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি এত মৃদু মন্থর করে দেওয়া যায় যাতে মানুষ বার্ধক্যের দিকে এগোবে অনেক ধীরে, অর্থাৎ তার আয়ু বেড়ে যাবে অনেক গুণ। মহাকাশের নাবিকদের হয়তো এইরকম ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে বহুকালের মত তারপর পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগে তারা জেগে উঠবে।

আর এক সম্ভাবনা আছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বে। আলোর ৯৯ শতাংশ বেগে ছুটলে ১০'৪ আলোকবর্ষ দূরে প্রোসায়ন তারায় গিয়ে ফিরে আসতে লাগবে ২১ বছর, কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসারে যাত্রীর বয়স বাড়বে মোটে তিন বছর, তার ঘড়িও তাই বলবে। অনুরূপ বেগে ছায়াপথের বাইরে অ্যানড্রমিডা নীহারিকা ঘুরে আসতে জ্যোতির্লোকের নাবিকদের বয়স বাড়বে মোটে ৫৫ বছর—ফিরে এসে তারা হয়তো দেখবে ৪০ লক্ষাধিক বছর প্রাচীন পৃথিবীতে তখন মানুষই নেই, থাকলেও এই আশ্চর্য কীর্তি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু মানুষবাহী যান এতটা বা এর তুল্য দ্রুতি কোন শক্তিতে পাবে, প্রায় আলোর পাখায় ভর করে কি করে চলবে তা এখনও কল্পনা করা যায় না।

যা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত হতে পারে তা হল দূর জগতের মানুষের সংগে বার্তার যোগ। হয়তো লেজার বা রেডিও / রাডার এদের উদ্দেশ্যে সংকেত বহন করে নিয়ে যাবে। লেজার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক আবিষ্কার এক শ্রেণীর দৃশ্যগোচর আলো. তার রশ্মি সমান্তরাল ও সংহত বলে তীক্ষ্ণতা ও শক্তি অসাধারণ। যেসব তারার প্রাণোপযোগী গ্রহ থাকতে পারে তাদের মধ্যে নিকটতম দুটি (এপ্‌সিলন এরিডানি ও টাউ সেটি) আছে দশ আলোকবর্ষের অল্প বেশী দূরে. লেজার বা রেডিও বার্তার জবাব আসতে প্রায় ২১ বছর লাগবে, এবং হিসাবে দেখা গিয়েছে যে এই পরিধির মধ্যে সংকেত পাঠিয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা দশ লক্ষে এক। যারা অতিজ্ঞানী তারা হয়তো জবাব দেওয়াও দরকার মনে করবে না। অনেকের মতে এমন চেষ্টার চেয়ে বরং অন্যদের বার্তার প্রতি কান পেতে থাকাই বেশী লাভজনক হবে। আরমেনিয়ার অনুষ্ঠিত উপরোক্ত আন্তর্জাতিক সভা এক বাক্যে এই প্রচেষ্টার সমর্থন করেছে, সেখানে রুশরা খবর প্রকাশ করে তাদের রেডিও দূরবীন এখনই পঞ্চাশটি নিকট তারার দিকে কান খাড়া করে অনুসন্ধানরত। যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ সাইক্লপস উদ্যোগের আলোচনা চলছে। অবশ্য এইরকম অনুসন্ধানে নিয়মিত সংকেত পেয়ে এর আগেই আমেরিকা ও রাশিয়ায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, পরে দেখা গেল প্রথমটি আসছে এক গোপন রাডার পরীক্ষার থেকে দ্বিতীয়টি এক কোআজার থেকে। ইংরেজ জ্যোতির্বিদরা যখন প্রথম পালসারের রেডিও ধ্বনি শুনলেন তখন তাও দূর গ্রহের বার্তা বলে সন্দেহ করা হয়। (কোআজার ও পালসার সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত বিভিন্ন শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক।)

মহাকাশের ভাষা কি হবে? কি করে এক গ্রহের বাসিন্দা অন্য গ্রহে তার কথা বোঝাবে? হয়তো প্রথম সম্ভাবনাটি হবে সংখ্যার ধারা, এবং তা জানানো হবে সহজ টেলিগ্রাফীয় সংকেতে। আলাপের প্রাথমিক বিষয়টি হবে এমন সব জ্যোতিষ্ক যা দুটি জগৎ থেকেই দেখা যায়। এইরকম জ্যোতিষ্কের ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি ও আলোর দ্যুতির কালের মাপকাঠি বলে ধরা যেতে পারে, কারণ তা সবার কাছেই সমান।

চিত্ররূপী বাণী পাঠানোও সম্ভব হতে পারে। টেলিগ্রাফের ভাষায় বিন্দু ও রেখা দরকার মত সাজানো হবে, একটি উজ্জ্বল আর একটি অনুজ্জ্বল অংশের জন্য। দুটিতে মিলে সাদা কালো এক মূর্তি পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে এক পরীক্ষায় এমন এক বাণী কয়েকটি বিজ্ঞানীকে পাঠানো হয়েছিল, অনেকেই অতি অল্পসময়ে বিন্দু ও রেখা স্থান যথাযথ সাজিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ মর্মোদ্ধার করেছিলেন। মর্ম এই যে এক তারার চতুর্থ গ্রহে আছে এক দ্বিপদ জাতির বাস তাদের দুই লিংগ; তারা মহাকাশ বিহার শিখেছে, প্রতিবেশী গ্রহে গিয়ে সেখানে মাছের মত সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কার করেছে। এই মানুষরা সাড়ে সাত ফুট লম্বা তাদের হাতে ছয় আঙুল, এমনি আরও কিছু কিছু খবর।

দূর গ্রহের বার্তা যদি ধরা পড়ে তো তার একটা কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মহাকাশে দিকে দিকে দূরে দূরে যারা বাণী পাঠাবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রগতি সভ্যতা সংস্কৃতি হয়তো আমাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীন ও অগ্রসর। তারা হয়তো অনেক আগেই আমাদের বর্তমান দুরূহ সমস্যাগুলির সমাধান করেছে—যেমন জনবৃদ্ধি যুদ্ধ-বিগ্রহ কলুষিত জল স্থল বাতাস। কল্পনার রাশ একটু ছেড়ে দিলে আশা করা যায় সেই জ্ঞানের ভাগ পেয়ে আমরা উপকৃত হব।

রচনাটি লেখকের 'বিশ্ব বিচিত্র' বইয়ের এক অধ্যায়; বইখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

আমরা গড়ে তুলি

বেলেঘাটা ছাত্র সংসদ

যৌবনশক্তিকে আহ্বান জানিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'। সেই সবুজ নবীন সজীব প্রাণের প্রয়াস এ যুগে ছাত্র সংগঠন বা সংস্থার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু ছাত্র সংস্থার প্রতি আজ সাধারণ মানুষের মনে একটা তাচ্ছিল্যমিশ্রিত নীরব অবজ্ঞা বাসা বেঁধে আছে। এর প্রধান কারণ, সমাজসেবার নেপথ্য কেন্দ্রস্থলে রাজনীতির অধিষ্ঠান। রাজনীতির উদ্দেশ্য যত উদার আর মহৎই হোক, বিশুদ্ধ সমাজসেবার মত তা কখনই নিরপেক্ষ সর্বজনীন ও সার্বভৌম নয়। কিন্তু রাজনীতিকে দূরে রেখে সমাজকল্যাণের সুমহান আদর্শকে ব্রত করে আজও যে সব ছাত্র সংস্থা নীরবে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে, 'বেলেঘাটা ছাত্র সংসদ' তাদের মধ্যে অন্যতম।

'বেলেঘাটা ছাত্র সংসদ' অরাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক সমাজকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রাকমুহূর্তে ১৯৪৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী মাত্র ৭৫ খানি বই নিয়ে এই গ্রন্থাগারের জন্ম। প্রথম দশ বছর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাড়ীতে গ্রন্থাগারটি ছিল। স্থানাভাব মেটাতে একটি অগ্নিদগ্ধ গোয়ালঘর সংস্কার করে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয় মাত্র দুশো গজ দূরে। কিন্তু বস্তি পরিবৃত অনুন্নত এই অঞ্চলে দারিদ্র্য অশিক্ষা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে শুধু গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই আন্দোলন করলেই চলবে না, চাই শিক্ষা, চাই স্বাস্থ্য। তাই মুক্ত ও প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে স্থানীয় যুবক শিক্ষক অধ্যাপক চিকিৎসকদের সাহায্য ও সহযোগিতায় সমাজসেবার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে মূলমন্ত্র করে গ্রন্থাগারটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়—জন্ম নেয় প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাপ্তবয়স্ক মাধ্যমিক নৈশ বিদ্যালয় (পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত), সঙ্গীত ও নৃত্যের কলেজ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত), আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, সমাজসেবা-কেন্দ্র, ক্রীড়া বিভাগ ইত্যাদি। বর্তমানে এ সবকিছুই একটি ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে আর কোন ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালিত ছাত্র সংস্থা আছে কিনা জানি না। এই ট্রাস্ট বোর্ড এবং সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার, রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সহকারী সভাপতি ও প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ অজিতকুমার বসু, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ পি সি বসুমল্লিক, ডাঃ নীহার মুন্সী, শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী প্রমুখ। এই প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর সদস্য।

ব্যাপক আর বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা; সর্বাঙ্গীণ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। স্কুল, কলেজ, রঙ্গালয়, গ্রন্থাগার, সেবাকেন্দ্র সব কিছুকেই একটি বিরাট কমপাউন্ডের গণ্ডীর মধ্যে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এঁরা। কিন্তু আজ অসম্পূর্ণ ইচ্ছার কাঠামোটুকু ১৩০ নম্বর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের ওপর ইঁট বার করা কঙ্কালসার নবজাতদেহ নিয়ে সুসভ্যতার আলোকের প্রতি বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করছে। অর্থাভাবে এটি আজ প্রগতিমূলক চিন্তাধারার দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে।

কিন্তু ইচ্ছা যখন সুতীব্র হয়, প্রয়াস হয় দুর্বার, মহান, তখন কোন বাধাই প্রতিবন্ধক হতে পারে না। বেলেঘাটা ছাত্র সংসদের ক্ষেত্রেও তা হয়নি। নিজস্ব বাড়ীর একতলার অসম্পূর্ণ রঙ্গালয়ে আপাতত কাঠের পার্টিশন দিয়ে নিয়মিত ক্লাস চলছে সকালে এবং দুপুরে: আবার সন্ধ্যেবেলায় সেখানেই নাচ এবং গানের কলেজী শিক্ষাক্রম অনুশীলনের আয়োজন হয়। দোতলা এবং তিনতলায় বিজ্ঞানের ল্যাবোরেটারী, ক্লাসঘর, অফিস ইত্যাদি। কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে এখানে উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে কলা, বাণিজ্য ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের বিশেষ ব্যবস্থা। গতবারের পাশের হারও শতকরা ৬৫ ভাগ। প্রাপ্তবয়স্ক মাধ্যমিক নৈশ বিদ্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। দরিদ্র, শ্রমজীবী অথবা বিদ্যোৎসাহী ছেলেরাই এখানে স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত পড়বার সুযোগ পেয়ে থাকেন। বহু অফিসের পিয়ন বেয়ারা দারোয়ান প্রভৃতি এখান থেকে পাশ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, চাকরী জীবনে উন্নতি করেছেন। কিন্তু মাত্র ১৫০ জন ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় প্রতি বছর স্থানাভাবে বহু দরখাস্তকারীকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে।

বিরাট এই কর্মকাণ্ডের আয়োজনকে নিজস্ব বাড়ীর দশ কাঠার সীমানায় বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। মোট দু হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে স্থান দিতে পেছন দিকের আর একটি বাড়ী ভাড়া করতে হয়েছে; সেখানে আয়োজন করতে হয় প্রাথমিক বিভাগের ছেলেমেয়েদের জন্যে সকালে ও দুপুরে পড়বার ব্যবস্থা।

শুধু প্রাথমিক বিভাগের জন্যেই নয়, গ্রন্থাগারের জন্যও একটি বড় ঘর ভাড়া করতে হয়েছে এবং তার মধ্যেই গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, কিশোর গ্রন্থাগার এবং অবৈতনিক পাঠকক্ষের ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারে বাংলা বই-এর সংখ্যা ৬ হাজার

ইংরেজী বই ৩,৫০০, বিশ্বের অন্যান্য ভাষার বই ৩০০ মত। এছাড়া পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৫০০, কিছু কিছু প্রাচীন পত্র-পত্রিকাও আছে। এখানকার মাসিক চাঁদা ৭০ পয়সা, ডিপোজিট ৩্ টাকা। খোলা থাকে সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে নটা এবং বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে আটটা। আঞ্চলিক সদস্য ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কিছু কম নয়। কিন্তু স্কুলের জন্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার আছে, এর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিশোর গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হয় কিশোরদের দ্বারা। এ'রা 'পূর্ব কলকাতা কিশোর সম্মেলন'ও আহ্বান করে থাকে। এই গ্রন্থাগারের চাঁদা ৩৫ পয়সা, গ্রন্থসংখ্যা ইংরেজী বাংলা মিলিয়ে ১২০০ খানা।

অবৈতনিক পাঠককে দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিক ইত্যাদি রাখা হয়। বই কেনবার জন্যে পৌরসভা বা রাজ্য সরকার কেউই আর্থিক সাহায্য করেন না। এখানকার গ্রন্থাগার কর্মীর মোট সংখ্যা দশ, এরা অবৈতনিক ছাত্রকর্মী।

এই আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অধীনে ৫টি সহায়ক গ্রন্থাগার আছে এবং তাদের সভ্যদের আদান-প্রদানের জন্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বই ধার দেবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

পাঠচক্র বিভাগ জনশিক্ষা প্রচার এবং নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি-প্রবন্ধ-বিতর্ক-ছোটগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

এই গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একটু অভিনব। এই প্রসঙ্গে ট্রাস্ট বোর্ডের সহ-সভাপতি শ্রীকৃষ্ণপদ সমাজদার এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীকমলেন্দু মিত্র জানালেন, (১) গ্রন্থাগারের মধ্যে বিশ্বের প্রত্যেক দেশকে সর্বতোভাবে চিনিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকবে। সেজন্যে প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ইত্যাদি মানচিত্র তুলে ধরা হবে, সেই দেশের পরিবেশ নিখুঁতভাবে রচনা করা হবে, যার ফলে দর্শকেরা চোখের সামনে প্রত্যেকটি দেশকে সামগ্রিকভাবে দেখতে পাবে, মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে। (২) গ্রামোফোন রেকর্ডের একটি লাইব্রেরী করার পরিকল্পনাও এ'দের আছে। সেজন্যে থাকবে গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার এবং প্রখ্যাত মনীষীদের বক্তৃতা, ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রেকর্ড, প্রাচীন সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের রেকর্ড প্রভৃতি। টাকা ডিপোজিট রেখে সদস্যরা বাড়ীতে রেকর্ড ইস্যু করতে পারবেন। (৩) এছাড়া থাকবে একটি প্রকাশনী বিভাগ ও প্রেস।

কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন বর্তমানের কয়েকটি সমস্যা সমাধান বা অতিক্রম করা। এর মধ্যে প্রধানতম হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ এবং তার সুদ। এই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বাড়ী তৈরীর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন সাহায্য না দিয়ে সুদ সমেত পরিশোধযোগ্য ঋণ দিয়েছেন ৫০ হাজার টাকা। এই টাকায় দোতলার অর্ধেক এবং তিনতলাটি সম্পূর্ণ করা গেছে। এই ঋণ এবং তার সুদ গত দশ বছর যাবৎ এ'রা শোধ করতে পারছেন না। রাজ্য সরকার যদি সহৃদয়তার সঙ্গে এই ঋণ মকুব করেন, তবে ছাত্র প্রতিষ্ঠানটি এক বিরাট বোঝা থেকে অব্যাহতি পায়।

মঞ্চ সমেত রঙ্গালয় নির্মাণের জন্যে এ'রা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থসাহায্য আবেদন করে দরখাস্ত করেছিলেন এবং সেই দরখাস্তটি ইতিপূর্বেই রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 'নট প্রাইমারিলি এ কালচারাল অরগানাইজেশন' এই অজুহাত দেখিয়ে দরখাস্তটি বাতিল করেছেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, ইউনেস্কোর হেড কোয়ার্টার প্যারিস থেকে 'কো-অর্ডিনেটিং কমিটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ভলানট্যারি সারভিস' সংস্থা বেলেঘাটা ছাত্র সংসদকে বিশ্বের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের কাছে 'কালচারাল অরগানাইজেশন' বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ তো কাজির বিচার! তা না হলে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত নৃত্য ও সঙ্গীতের কলেজকে ভারতীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতির আওতা থেকে বাদ দেবার কি হেতু থাকতে পারে? এই ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ নথিপত্র পাঠিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। আমরা আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকার এবার ভালভাবে ব্যাপারটি বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

কিন্তু সমস্যার এখানেই শেষ নয়। ইউনেস্কোর সদস্যরা এখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে আসতে চাইছেন। এ'রা বহুদিন ধরে তাঁদের ঠেকিয়ে রেখেছেন। কারণ প্লাস্টারবিহীন কঙ্কালসার বাড়ীটা আর ভেতরকার কাঠের পার্টিশন করা ঘরগুলো দেখলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। অথচ সরকার এ'দের সমস্যার সমাধান করতে পারেন অনায়াসেই। এ'রা তালুক বা মুলুক কিছুই চান না। মহাদেবের মত সামান্য কিছু বিল্বপত্রের প্রত্যাশী, আর একটু সহানুভূতির। ট্রাস্ট বোর্ডের আয়োজন যতটা বৃহৎ, প্রয়োজন বা চাহিদা সে অনুপাতে ততটা জটিল নয়। এ'দের নিজস্ব জমি আছে অসম্পূর্ণ তিনতলা বাড়ী আছে, আর আছে পাঁচতলার ভিত। এখানকার প্রধানতম সমস্যা হল গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। গৃহনির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলে গ্রন্থাগার, প্রাথমিক বিভাগ ইত্যাদিকে শুধু একটি বাড়ীর মধ্যে সুসংবদ্ধই করা যাবে না, সেই সঙ্গে বছরে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি টাকা ভাড়া বাবদ বাঁচানো যাবে। মঞ্চ সমেত রঙ্গালয় নির্মাণ শেষ হলে শুধু এই অঞ্চলের একটি অভাবই মিটবে না, ট্রাস্ট-বোর্ডের একটি স্থায়ী আয়েরও পথ সুগম হবে। প্রেস এবং প্রকাশন বিভাগ গড়ে উঠলে অর্থসমস্যার সুরাহা করা যাবে। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করছে তিনতলাকে পাঁচতলা করার ওপর। আর গৃহনির্মাণের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার ওপর।

বাড়ী তৈরীর জন্যে এই ট্রাস্ট বোর্ডকে কেন্দ্র ২৫ হাজার টাকা দিয়েছেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন খাতে এককালীন মোট ৩০ হাজার টাকা দিয়েছেন। কিন্তু এই জাতীয় বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও ভারত সরকারের অরবিন্দ শতবার্ষিকী ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকেও এই বস্তি পরিবৃত বেলেঘাটা অঞ্চলের ছাত্র সংসদের জন্যে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

এছাড়া রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন-এর পক্ষ থেকেও এই গ্রন্থাগারকে (এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগারকে) সাহায্য করা যেতে পারে। ফাউণ্ডেশনের হাতে ৫০ লক্ষ টাকা আছে এবং এক বছর হল এর জন্ম হয়েছে। কিন্তু কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে তাঁরা কি করছেন, সেটা দেবা ন জানন্তি। সুতরাং এ'দের কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে ফাউণ্ডেশনের অফিস এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এর ডিরেক্টর। বেলেঘাটা ছাত্র সংসদকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বই বা আসবাব কেনবার জন্যে কোন সাহায্য দিচ্ছেন না। সুতরাং লাইব্রেরীর উন্নতির জন্যে এই অর্থের প্রতি এ'দের দাবী যথেষ্ট।

গৃহনির্মাণের অর্থসাহায্য ছাড়াও নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রসারে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারেন।

ভারতবর্ষের মত দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যা একটি বড় সমস্যা; বিশেষত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। কিন্তু পূর্ব কলকাতার অনগ্রসর অঞ্চলের এই ছাত্র প্রতিষ্ঠানটি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, তবে সরকারের পক্ষে এই বহুমুখী প্রতিষ্ঠানটি চিরকালই বোঝা হয়ে থাকবে। সুতরাং অর্থনৈতিক সমস্যাকে সরকারী আর্থিক সাহায্য দিয়ে পূরণ করলে শুধু অভিযোগের বোঝাই লাঘব হবে না, একটি মহান শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে প্রাণ সঞ্চার করা যাবে। এ'দের প্রচেষ্টা মহান ছিল বলেই স্বর্গত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গোপনে অনুসন্ধান করবার পর ছাত্র সংসদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অসম্পূর্ণ সংসদ আজ অবহেলিত।

—সুশান্তকুমার মিত্র

মনের খবর

স্বপ্ন—(৩)

আমরা স্বপ্ন দেখি কেন সে সম্বন্ধে পূর্বসূরীদের মতবাদ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেছি। স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদ সম্বন্ধে এবার কিছু বলতে চেষ্টা করি। এ বিষয় বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে এই যে ফ্রয়েডের আগে যাঁরা স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন চার্বাক ও বিভিন্ন বেদ উপনিষদে এবং গীতা ও দর্শনশাস্ত্রে এবং বিদেশের সক্রেটিস, প্লেটো এরিসটটল প্রভৃতি দার্শনিকগণ, স্বপ্নের কারণ হিসেবে মনের উদ্দীপনা, অপূর্ণ ইচ্ছার চাপ ইত্যাদি কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, স্বপ্নকে নানারকম ভাগে ভাগ করেছেন, সবই ঠিক কিন্তু কি করে স্বপ্নকে বিচার করে তার প্রকৃত অর্থ বোঝা যাবে সেই প্রণালী সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বে বলেছি এদেশে ও ইউরোপ প্রভৃতি দেশে রাজাদের দরবারে স্বপ্ন বিচার করে দেখবার জন্য বিশেষ পণ্ডিত থাকতেন। তাঁদের বিশেষ কাজ ছিল রাজা যে স্বপ্ন দেখবেন তার অর্থ নির্ণয় করে, স্বপ্নের শুভাশুভ ফল বিচার করা ও সেই মত কোথাও শুভ কাজে যাওয়া না-যাওয়া ঠিক করা। অশুভ লক্ষণ দেখা গেলে তার প্রতিকারকল্পে উপযুক্ত যজ্ঞ বা অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থার উপদেশ দেওয়া। আজকাল পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে, সে ধরনের দরবারও আর নেই। তবু স্বপ্ন বিচার করা আজও নানাখানে নানারকম চলছে। বিশেষ করে, মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ করাতে হলে স্বপ্নের অর্থ বিচার করা তো এক প্রধান কাজ বলে গণ্য হয়ে আছে। স্বপ্ন বিষয় ফ্রয়েডের বিচারপদ্ধতি, স্বপ্ন বিশ্লেষণ ও স্বপ্ন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের প্রকাশ এমন এক মূল্যবান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে যা তাঁর পূর্বে আর পাওয়া যায়নি। এই স্বপ্ন বিশ্লেষণকে ফ্রয়েড নিজেই তাঁর প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণবাদে এক অতি উচ্চ প্রধান স্থান দিয়ে গেছেন।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন মূলত আমাদের অবদমিত নানা কামনা বাসনার পূরণের এক মানস চেষ্টা বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের জীবনে কতরকমের কত ইচ্ছাই তো মনে জাগে যার খুব সামান্য অংশই বাস্তবে পূরণ হওয়া সম্ভব হয়। বাকি সবই অপূর্ণ থেকে যায়। তাদের মধ্যে কোনো ইচ্ছার জোর বেশী আর কোনো ইচ্ছার জোর কম থাকে। যে ইচ্ছা আমাদের বেশী প্রবল হয় তার সঙ্গে মনের শক্তির পরিমাণও বেশী যুক্ত হয়ে যায়। সেই শক্তি যদি বাইরের জগতে এসে ইচ্ছার পূরণ করাতে না পারে তবে তা মনের মধ্যে নানারকমের আন্দোলন সৃষ্টি করতে থাকে। অনেক সময়ই এই আন্দোলনের সঙ্গে অন্য আরও এক বা একাধিক সমগোত্রীয় কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে ঐ আদি ইচ্ছাশক্তিকে আরও জোরদার করে তোলে। ফলে যদি, মনের যে প্রহরীর কথা আগে বলেছি, সেই প্রহরীর বাধা উড়িয়ে দিয়ে বাইরে আমাদের সংজ্ঞানে প্রকাশ পেয়ে যায় তবে আমাদের নানারকম সমস্যাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অবাঞ্ছিত নানা ইচ্ছা যদি এসে সংজ্ঞান মনকে দখল করে নেয় তাহলে আমাদের সহজ কাজে বাধা পড়ে। আমাদের নীতিবোধ, ধর্মবোধ ইত্যাদিতে ঘা দেয়। তাই তাদের আবার অবদমন করতে অহং উঠে-পড়ে লেগে যায় আর আমাদের অদস তাতে অহমের সহায়ক হয়ে মিলেমিশে কাজ করে জোরালো ইচ্ছাকে অবদমিত করে। কিন্তু তাতেও সব সময় রেহাই পাওয়া যায় না। ঐ অবদমিত ইচ্ছা আমাদের ঘুমের সময়, মনের প্রহরী যখন ঝিমিয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়, তখন (ঐ ইচ্ছা) নানা রূপ বদল করে, কখনও বা নিজরূপেই স্বপ্ন হয়ে সংজ্ঞান মনে বেরিয়ে আসে। সুতরাং স্বপ্নের মূলে আমাদেরই এক বা একাধিক ইচ্ছা কাজ করে থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ স্বপ্নই কেমন অর্থহীন এলোমেলো আজগুবি রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েড বলেন, এই যে রূপ বদল করা হয় তার প্রধান কারণই হল প্রহরীর কাছে ধরা না দেওয়া। অর্থাৎ প্রহরীকে প্রকৃত ইচ্ছাটা বুঝতে না দিয়ে তাকে বহুরূপীর মত রূপ বদল করে তাকে ফাঁকি দিয়ে ইচ্ছা তার কাজ যতটা সম্ভব হাসিল করে নেয়। এই হল আমাদের স্বপ্ন। আগে বলেছি যে যদিও আমরা স্বপ্ন 'দেখি' বলি তবু স্বপ্নের মধ্যে আমাদের কোন দেখা ছাড়াও শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি অন্যান্য সব ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিরও প্রকাশ পাওয়া যায়। তবু দৃশ্যপটই অধিকাংশ স্বপ্নের বেশীর ভাগ জুড়ে থাকে বলে আমরা স্বপ্নকে 'দেখি' বলেই বর্ণনা করে থাকি।

অনেকে মনে করেন স্বপ্ন বুঝি আমাদের নির্জ্ঞান স্তরের বিষয়। এ ধারণা ভুল। স্বপ্নে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা আমাদের সংজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে যায়, যদিও সে স্বপ্ন আমরা ঘুমের মধ্যেই দেখে থাকি। মনে রাখতে হবে একবার যা মনের কাছে ধরা দিল তাই সংজ্ঞানের বিষয় হল। স্বপ্ন আমরা জানতে পারি—অনুভব করতে

পারি, সুতরাং তা সংজ্ঞান স্তরে উঠে এসেছে। নির্জ্ঞানে যা থাকে, যা আছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি না,—বিশেষ প্রথায় তা অনুমান করতে পারি মাত্র, এইজন্যই তার নাম নির্জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং স্বপ্নে যা প্রকাশ পেলো তা সংজ্ঞান মনে উঠে এসেছে বলা হয়, যদিও স্বপ্ন দেখার অবস্থাটা আমাদের সাধারণ সজ্ঞান অবস্থা নয়। এই প্রসঙ্গে দু একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। এক হল, আমাদের স্বপ্নে দেখা বিষয় অনেক সময়ই ঘুম ভাঙবার পরে আর মনে থাকে না। এ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। কোনো সময় সবটা স্বপ্নই হারিয়ে যায়, এমনও হয় আংশিক কিছু মনেও থাকে। সবটা স্বপ্ন ঠিক ঠিক মনে রাখা খুব কমই সম্ভব হয়। স্বপ্নের যা ভুলে যাই সে অংশের ইচ্ছার প্রকাশটাকে অহং আবার অবদমিত করে বলেই তা আমাদের কাছে হারিয়ে যায়। কোনো অংশ সামান্য অবদমনের ফলে আসংজ্ঞানের স্তরে থেকে যায়। চেষ্টা করতে থাকলে হঠাৎ এক সময় স্বপ্নের সে অংশ আবার মনে পড়ে যায়। মন একদিকে নিজের ইচ্ছার চাপটাকে প্রকাশ করে কমিয়ে দিতে যেমন চায় তেমনি আবার সেই প্রকাশের চেষ্টাকেও নানাভাবে বাধা দিতে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই মনের এই দ্বন্দ্ব বিরোধের চেষ্টা চলতে থাকে। ইচ্ছা ও তার প্রতিরোধ এই দুই শক্তির মধ্যে কে কখন জয়ী হয় তার উপরই স্বপ্ন দেখা বা অবদমিত ইচ্ছার স্বপ্ন না-দেখা নির্ভর করে। আরেকটা কথা এই যে প্রায় সব স্বপ্নই উপর্যুক্ত উভয় বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়ার ফল।

ফ্রয়েড স্বপ্নকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। যে রূপ নিয়ে স্বপ্ন প্রকাশ পায় তার নাম দিয়েছেন স্বপ্নের ব্যক্তাধেয় (ম্যানিফেস্ট কনটেন্ট) আর যে ইচ্ছা সেই ব্যক্তাধেয়র অন্তরালে থেকে স্বপ্ন সৃষ্টি করে তার নাম দিয়েছেন স্বপ্নের অস্ফুটাধেয় বা লীন অংশ (লেটেন্ট কনটেন্ট)। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে এই অস্ফুটাধেয়ের মধ্যে নিহিত ইচ্ছাকে জানতে পারলেই ঠিকমত স্বপ্ন বোঝা হল।

স্বপ্নকে ফ্রয়েড একদিকে যেমন মনের ইচ্ছা পূরক বলে গণ্য করেছেন অন্যদিকে একে তিনি নিদ্রারক্ষক (গার্ডিয়ান অব স্লিপ) বলেও চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই মতের অনেক বিরোধী আছেন। তাঁদের আপত্তির কারণকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁরা বলেন, স্বপ্নকে নিদ্রারক্ষক বলা ঠিক হয় না—তার কারণ স্বপ্ন দেখার পরে অনেক সময়ই আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। একথা যে সত্যি তা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে সবাই বলতে পারি। তাঁদের আপত্তির উত্তরে ফ্রয়েড বলেন, হাঁ, স্বপ্ন দেখে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় তা ঠিক, কিন্তু আসল ব্যাপার হল, নিদ্রাভঙ্গ না-করে স্বপ্নের মাধ্যমে মনের আন্দোলনের চাপ কমিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। সব সময় মনের সে চেষ্টা সফল হয় না বটে, কিন্তু মনের সে চেষ্টা যে চলতে থাকে একথাও ঠিক। স্বপ্নকে আরো একটা দিক থেকে নিদ্রারক্ষক বলা যেতে পারে। নির্জ্ঞানের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলির চাপ যখন প্রবল হয় তখন যদি তার কিছু চাপ কোনো উপায়ে, ইচ্ছার অন্তত আংশিক পূরণেও, কমিয়ে আনা না যায় তবে ঘুমিয়ে থাকা এমন কি ঘুমোনোই অসম্ভব হতো। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে বটে কিন্তু একটু পরে বা তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব হয়। সাধারণ স্বপ্নের ক্ষেত্রেই একথা বলা হয়। এমন স্বপ্নও আছে যা দেখে এত বেশী উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তা, ভয় ইত্যাদি হয় যে আর কিছুতেই সহজে ঘুম আসতে চায় না। সেরকম স্বপ্ন কম। সাধারণভাবে বলতে গেলে বেশ সহজেই বলতে পারা যায় যে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলেও আমরা আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারি, আর তার কারণ হল এই যে নির্জ্ঞান মনে যে-ইচ্ছার চাপ রুদ্ধে বেড়ে উঠে কৌশলে স্বপ্নের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত আংশিক পূরণ করিয়ে নিতে পারে, তা যদি করা সম্ভব না হত, তবে নির্জ্ঞান মনের আন্দোলনের চাপ বেড়ে গিয়ে অহমকে আর স্থির থাকতে দিত না। ফলে আমাদের আর ঘুমোনই সম্ভব হত না। ব্যবস্থাটা কতকটা এইরকম—মুখবন্ধ কেটলির ভেতরের জল যদি বেশী উত্তপ্ত হয়ে ভেতরে সঙ্গত সীমার বেশী চাপ দিতে থাকে তবে কেটলির ঢাকনা লাফাতে থাকে, আর সেই সুযোগে ভেতরের বাষ্প বেরিয়ে গিয়ে চাপ কমিয়ে দেয়। তখন আবার কেটলি শান্ত হয়, যদিও ভেতরে তার আন্দোলন চলতেই থাকে। আবার চাপ বাড়লে আবার তার বেরুবার পথ করতে চায়। তা-না করতে পারলে কেটলি ফেটে যেতে পারে। যেমন কোনো কোনো সময় বয়লার ফেটে যায়। আমাদের মনেরও যদি এই অন্তর্চাপ কমানোর উপায় না থাকতো তবে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব হত না। মন তখন ভেঙে পড়ত। মনের ভেঙে পড়াকেই মানসিক ব্যাধি বলা যায়। এই ভাঙার কমবেশী আছে। কখন বা ফাটল ধরিয়ে কিছু চাপ কমিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় আবার কখন চাপের ফলে বেশী ভাঙন দেখা দেয়। মানসিক রোগেরও অনেক রকম আছে, রোগের প্রকোপের কম বেশীও আছে।

ফ্রয়েড স্বপ্নকেও একরকমের মানসিক রোগ বলেছেন। কথাটা একটু তলিয়ে দেখবার দরকার আছে। তা না হলে অনেকেরই এতে আপত্তি দেখা দেবে। কেই বা নিজেকে মানসিক রোগগ্রস্ত মনে করতে চায়। একটু ভেবে দেখলে তবু আমাদের মানতেই হবে স্বপ্নে আমরা যে সব কাণ্ড করি, যেমন লাফঝাঁপ দিই, লণ্ডভণ্ড করি, যেসব ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ, সমাজবিরুদ্ধ কার্য, নীতিবিরুদ্ধ ক্রিয়া অতি সহজে করি, যেমন অসঙ্গত অবাস্তব চিন্তা করি, অসম্ভব অবস্থা রচনা করি তা আমাদের সুস্থ মনে কখনই সম্ভব হয় না। এ বিষয় আমরা শিশুর মত আচরণ স্বপ্নে করে থাকি। জন্মের পরে শিশুর যেমন বাস্তব জ্ঞান প্রায় কিছুই থাকে না, ভাল মন্দর জ্ঞানও তাই তার থাকা সম্ভব হয় না; উচিত অনুচিত, সম্ভব অসম্ভব, সঙ্গত অসঙ্গত ইত্যাদি কোনও বোধই তার তখন থাকে না। সে যেমন মূলত তার সামান্য ইচ্ছার তাড়নায় চালিত হয়—

স্বপ্নেও আমাদের মন অনেক পরিমাণে সেই রকম স্তরের ব্যবহারই করে। তবু এই আমাদের স্বপ্ন রচনার স্তর আর শিশুর মানসাবস্থা একেবারে এক নয়। আমাদের জীবনে অর্জিত নানা অভিজ্ঞতা, নানা কল্পনা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছার পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদার রকমের পরিবর্তন ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের অহমের শক্তি ও আত্মসংগঠনের ক্ষমতা ইত্যাদিরও অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই দুই শক্তি, সহজশক্তি ও তা দমন, অবদমন বা পরিচালনার শক্তির, বিরোধের পরিণাম ফল, সদ্যজাত শিশুর মানসিক অবস্থার মত আর হতে পারে না। একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আমরা যত বয়স্কই হই না কেন, আমাদের নানা শিশুসুলভ ইচ্ছা, মনের কোণে, নির্জ্ঞানে থেকেই যায়। আর স্বপ্নে সেইসব ইচ্ছার পুরো প্রকাশ না ঘটলেও, সে সব ইচ্ছা আমাদের অনেক স্বপ্নেই, হয়ত বা সব স্বপ্নেই কিছু কিছু মিশে থাকে। স্বপ্নের নানা আজগুবি ব্যাপার এই শিশু-মনের প্রভাবেই সম্ভব হয়। বলা যায়—সব স্বপ্নের সঙ্গেই আমাদের শিশুমনের কিছু উপাদান থেকে যায়। এখন এই জেগে থাকা অবস্থায় যদি কোনো বয়স্ক লোক শিশুর মত আচরণ করতে থাকে তাঁকে আর যাই হোক মানসিক সুস্থ অবস্থায় আছেন বলা যাবে না। অবশ্য ছোট নাতি-নাতনীর সঙ্গে দাদু দিদুর ব্যবহারে তাদের সাথে খেলায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কথায় ভাষায় ইত্যাদি নানা বিষয়—যা দেখা যায় তাকে মানসিক অসুস্থতার পর্যায়ে ফেলা যাবে না। কারণ বড়দের সেই আচরণ একান্তই ইচ্ছাকৃত এবং নিজেদের ইচ্ছানুসারে যখন তখন সেই আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার সহজ স্বাভাবিকযোগ্য আচরণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ও নিজ আয়ত্তাধীন। মানসিক রোগের লক্ষণ রোগীর নিজের আয়ত্তাধীনে থাকে না। সুতরাং দাদু দিদুদের শিশুর মত আচরণকে মানসিক রোগ বলা যাবে না। কিন্তু স্বপ্নে আমরা যা করি তার উপর আমাদের তো হাত থাকে না। স্বপ্ন তার নিজের পথেই চলে। আর স্বপ্নাবস্থায় মন যে অসঙ্গত কাণ্ড ঘটাতে থাকে তাকে অনেক সময়ই সুস্থ মানসিক অবস্থার পরিচায়ক বলা চলে না। সাধারণত একথা ঠিক হলেও মনে রাখতে হবে যে এমন স্বপ্নও কিছু কিছু দেখা যায় যাতে অস্বাভাবিক কিছু থাকে না। তবু বাস্তবে যা আদৌ ঘটছে না স্বপ্নে যখন তাই ঘটছে দেখে মন বিশ্বাস করে চলে, সেই অবস্থাকে স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা বলা যায় না। যেমন মনে করা যাক—একজন স্বপ্ন দেখলেন তিনি ট্রেনে করে দিল্লী যাচ্ছেন, এই স্বপ্নের মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই, আপাতদৃষ্টিতে শিশুভাবেরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু বিছানায় শুয়ে থেকে ঘুমের ঘোরে কেউ যদি ঐ স্বপ্ন দেখে আর স্বপ্নে দেখা অবস্থাটা অর্থাৎ ট্রেনে যাওয়ার ঘটনাটা সত্যিই ঘটছে বলে বিশ্বাস করতে থাকে তবে সেই অবস্থাটাকে সুস্থ মানসিক অবস্থা বলা যায় না। ঘুম ভাঙলেই অবশ্য তিনি আবার বাস্তব অবস্থায় ফিরে আসেন। তবু স্বপ্ন দেখার সময়টুকু তাঁর সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দেয় না। সেই জন্যই স্বপ্নাবস্থাকে একপ্রকারের বাতুলতা (সাইকোসিস) বলে ফ্রয়েড বলেছেন। স্বপ্ন সকলেই দেখে আর তা অতি স্বল্পকাল স্থায়ী বলে তাকে রোগ বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মানসিক রোগে যে বিশেষ বিশেষ রকমের স্বপ্ন রোগী দেখে একথাও অভিজ্ঞ মনোবিদগণ জানেন। —এই স্বপ্ন দেখার সঙ্গে দিবা-স্বপ্নেরও কিছু মিল আছে। দিবাস্বপ্ন আমরা যে কল্পনায় স্বপ্ন রচনা করি—তার মধ্যেও আমরা ডুবে যাই, নানা অসঙ্গত অবস্থার অবতারণা করে নিজেদের ইচ্ছা মেটাই। এখানেও ঐ বাতুলতার লক্ষণ কিছু দেখা যায়। কিন্তু তার পরিমাণ ও বাস্তব পারিপার্শ্বিকতা স্বপ্নাবস্থার থেকে পৃথক, এবং দিবাস্বপ্নের মধ্যে আমাদের অহমের প্রভাব অনেক বেশী থাকে। আমরা নিজেদের খুশিমত যতো ইচ্ছে কল্পনা করে যেতে পারি, বাস্তব স্বপ্নে যা সম্ভব হয় না। সুতরাং দিবাস্বপ্নে যা আমাদের দৈনন্দিন কল্পনায় অবাস্তবতা কিছু থাকলেও তাকে স্বপ্নের স্তরের বাতুলতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। আর সকলের মধ্যে যে লক্ষণ থাকে তাকে সামাজিকভাবে রোগ পর্যায়ে সাধারণত ফেলা হয় না। এই বিচারেও স্বপ্ন সকলেই দেখে বলে, স্বপ্ন দেখাকে বাতুলতা বলা হয় না। বরং এমন যদি দেখা যায় যে কেউ একজন সত্য সত্যই স্বপ্ন দেখে না তবে তাকেই রোগগ্রস্ত, অন্তত অস্বাভাবিক মানুষ, বলা হবে। একেবারে স্বপ্ন না-দেখে মানসিক স্বাস্থ্য রাখাও সম্ভব নয়। স্বপ্নের মাধ্যমে মনের চাপা বৃত্তিগুলির সামান্য কিছুও যদি বেরুতে না পারে তবে মনের সহজ ক্রিয়ার বিকার দেখা দেবে। যোগী মহাযোগীদের কথা জানি না। সাধারণ মানুষের পক্ষে উক্ত অবস্থায় বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাবে বলা যায়। নানারকম পরীক্ষা করে নিদ্রিতের চোখের মণির আন্দোলন থেকে—স্বপ্ন দেখার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। আর দেখা গেছে ঘুমের মধ্যে মানুষের চোখের মণি কিছুক্ষণ বাদে বাদেই আন্দোলিত হয়। যার সেরকম হয় না, যদিও এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, বা যাদের এই সঞ্চালন খুব কম হয় তারা মানসিক সুস্থ নয়।

আরেকটা বিষয় উল্লেখ করে এই নিবন্ধ শেষ করব। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন, প্রত্যেক স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন দেখার দিনের জাগ্রত জীবনের কিছু না কিছু ঘটনার চিন্তার বা অনুভূতির অংশ বিদ্যমান থাকে। স্বপ্নের এই অংশকে ফ্রয়েড দিনাবশিষ্ট (ডে রেসিডিউ) বলেছেন। এই দিনাবশিষ্ট বা অন্য কোনও ঘটনা ইত্যাদি যা স্বপ্ন জাগায় তাকে স্বপ্নোদ্দীপক (ড্রিম এক্সাইটার বা ড্রিম ইনস্টি-গেটার) নাম দিয়েছেন। স্বপ্নো-দ্দীপকের অর্থ এই যে সেই রকম ঘটনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মনের নির্জ্ঞান স্তরে নাড়া পড়ে যায় আর তার ফলেই স্বপ্ন রচিত হয়। সুযোগ বুঝে ঘুমের সময় সেই স্বপ্ন দেখা দেয়। কথাটা যেভাবে বলা হল তাতে একটু ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে। ঠিক করে বলতে হলে বলা উচিত যে আমাদের নির্জ্ঞান মনে যে সব বৃত্তি পূরণের জন্য চেষ্টা করে চলেছে, তারা নিজেদের মধ্যে যেমন দল পাকাতে থাকে বা সমগোত্রীয় বৃত্তিগত ইচ্ছাগুলি যেমন একত্র হয় মনঃসমীক্ষণে দেখা যায়, তেমনই দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিক কোনও ঘটনা, চিন্তা, ইত্যাদিকে আশ্রয় করে নির্জ্ঞানের ইচ্ছাগুলি স্বপ্নরূপে দেখা দেয়। সেইজন্যে একে স্বপ্নোদ্দীপক বলা হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

—তরুণচন্দ্র সিংহ

নদীয়া

বঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাস, ধর্ম বা সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রেই নদীয়ার ভূমিকাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অতি সংক্ষিপ্ত-সার ইতিহাসেও নদীয়া তার স্থান করে নেবে। এমন দাবি বোধ হয় এই রাজ্যের আর কোন জেলার পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

১২০৩ খৃস্টাব্দে অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইখতিয়ারুদ্দিন বখতিয়ার খলজি বণিকের ছদ্মবেশে নবদ্বীপে প্রবেশ করে অতর্কিত আক্রমণে লক্ষ্মণ সেনের শাসনের অবসান ঘটালে বঙ্গে হিন্দু শাসনের অবসান ও মুস্লিম শাসনের সূচনা হয়। আবার ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে এই জেলারই অপর এক প্রান্তে পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজের পরাজয় হলে ভারতে মুস্লিম শাসনের পরিসমাপ্তি ও ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়।

কিন্তু শুধু এই পরাজয়ের অবমাননা ও কলঙ্কময় বিশ্বাসঘাতকতার দুঃসহ স্মৃতি বহন করেই নদীয়ার শতাব্দীর পর শতাব্দী-কাল অতিক্রান্ত হয়নি। প্রায় পঞ্চ শতাব্দী পূর্বে এই জেলার মাটিতে যে চাঁদের উদয় হয় তার অমিয়কিরণে স্নিগ্ধ সুন্দর হয়েছে সারা দেশ। ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-ক্ষেত্র নদীয়া, এই মধুর স্মৃতি, এই পুণ্যের সঞ্চয় নদীয়াবাসীর সব দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে দেয়, এই জেলায় জন্ম সার্থক বলে মনে হয় তার।

তারপর আদিকবি কৃত্তিবাস, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, সাধক রামপ্রসাদ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সারস্বত সাধনার শ্রীক্ষেত্রই বা কোন জেলা হতে পেরেছে? এমন মধুর সুললিত ভাষার দাবিই বা কোন জেলা করতে পারে? এই জেলার ভাষাই সকল বাঙলার সব বাঙালির 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা'রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষার প্রবর্তক 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী, নদীয়ার ভাষাকেই বাঙালির ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। 'বীরবল' বলেছেন—আমার ভাষার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।... লিখিত ভাষার সঙ্গে আমি এই কৃষ্ণনগরেই প্রথম পরিচিত হই।

এই মধুর বোলের আশীর্বাদেই নদীয়ার অগণিত মানুষ কাব্য সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধি ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আদি কবি কৃত্তিবাসে যে সুরধুনীর সূচনা তা যুগে যুগে আরও গাঢ়, গভীর ও বেগবতী হয়েছে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, চণ্ডী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মীর মোসারফ হোসেন, নিরুপমা দেবী, রাজশেখর বসু প্রমুখ কবি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক প্রবন্ধকারদের সারস্বত সাধনায়।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, সরপুরিয়া বা শান্তিপুরের তাঁতের শাড়ির মতো নদীয়ার সাহিত্য বলে আলাদা কিছু থাকার কথা নয়, কিন্তু একথা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না যে নদীয়ার ভাষা ও সাহিত্য মানসই ব্যাপকতা লাভ করে বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। আর সে উত্তরণে নদীয়াবাসীদের ভূমিকাই সর্বাগ্রগণ্য।

এই প্রসঙ্গে তাঁরাও স্মর্তব্য, যাঁরা নদীয়াবাসী না হয়েও নদীয়ায় বসে কাব্য সরস্বতীর সেবা করেছেন। মহারাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভাকবিরূপে কাব্য ও সঙ্গীত রচনা করেছেন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিলাইদহে বসে কাব্য রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথ, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য জীবনের সূচনা হয়েছে কৃষ্ণনগরে, রাণাঘাটে রাজ-কর্মচারীরূপে অবস্থানকালে কাব্য রচনা করেছেন নবীন সেন—সেখানে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটেছে নবীন কবির সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের, আর কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল লিখেছেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'শিকল পরা ছল' প্রমুখ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি।

নদীয়ার আকাশে বাতাসে একদা কাব্যের অনুরণন শোনা যেত। কিন্তু বিদ্রোহী কবি

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ

যে জেলায় বসে শিকল ছেঁড়ার গান লিখেছিলেন, শিকল ছেঁড়ার লড়াইয়েও সে জেলার মানুষ পিছিয়ে ছিল না। নদীয়ার নীল বিদ্রোহের ইতিহাসই অমরত্ব লাভ করেছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকে। অসহযোগ আন্দোলন, খাজনাবন্ধ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন—সব কিছুতেই নদীয়ার মানুষদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। নদীয়ার মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তান, দুর্জয় দুঃসাহসী বীর বাঘাযতীনের অকৃপণ আত্মদান একদা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল। নদীয়ার আর এক বেপরোয়া ভবঘুরে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

কিন্তু এ ইতিহাস অখণ্ড নদীয়ার, আজকের খণ্ডিত ক্লিষ্ট নদীয়া তার স্মৃতিবাহী মাত্র। ভাগ্যের বিরূপতায় সর্বহারার মতো, দীনাতিদীন নদীয়া আজ তার ঐশ্বর্যময় অতীত স্মরণ করে সান্ত্বনা পেতে চায়। আজকের ধূলিমলিন নদীয়ার শহরগুলির সংস্কারহীন জীর্ণ পথ দিয়ে চলতে চলতে অতীতের নদীয়ার কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন কি সেই সুন্দর সমৃদ্ধ গদ্যের ভাষাও পথচলতি খুব কম মানুষের মুখেই শুনতে পাওয়া যাবে। এসিরিয়া ব্যাবিলনের সভ্যতার মতো, প্রাচীন নদীয়া হারিয়ে গেছে আজকের রূঢ় বাস্তবের মধ্যে।

কিন্তু প্রাচীন নদীয়ার স্বতন্ত্র সত্তা কত প্রাচীন? কবে থেকে, আর কেনই বা এই ভূখণ্ডটুকুর নাম নদীয়া [illegible] কাব্যময় মধুর নাম সে পেল কোন সূত্র থেকে?—এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজ পর্যন্ত কোন সূত্র থেকে মেলেনি। হয়ত একদা অগণিত নদীনালায় এই ভূখণ্ডটুকু আচ্ছাদিত ছিল বলেই তার নাম 'নদীয়া' হয়। কিংবা হয়ত নবদ্বীপ নাম থেকেই নদীয়া নামের উদ্ভব। নদীয়ার অধিকাংশ নদীই আজ মৃতপ্রায় অথবা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন; নবদ্বীপ গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে নদীয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নদী আর নবদ্বীপ বাদ দিলে নদীয়া অর্থহীন।

নবদ্বীপই নদীয়ার প্রথম পরিচিত স্থান। বৌদ্ধধর্মী পালরাজাদের শাসনকালে নবদ্বীপ ও তার সমীপবর্তী অঞ্চলে সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। নবদ্বীপ থেকে মাইল চারেক পূর্বে কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ সড়কের ধারে 'সুবর্ণ বিহার' নামে যে গ্রামটি আছে, সেটি হয়ত একদা একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। কিন্তু পালরাজাদের শাসনের শেষে সেনরাজাদের শাসনকালে বঙ্গে আবার হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন হয় এবং গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ সেনরাজাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বল্লাল সেন (শাসনকাল ১১৫৮-৭৯ খৃঃ) প্রথম নবদ্বীপে প্রাসাদ নির্মাণ করেন ও দীঘি খনন করেন। এখন বামুনপুকুর গ্রামে অবস্থিত বল্লাল সেনের সেই রাজপ্রাসাদের জীর্ণাবশেষ 'বল্লাল ঢিবি' নামে পরিচিত। তারই অদূরে আছে বল্লাল দীঘি। কিন্তু পুণ্যস্থান নবদ্বীপ গৌড়রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে বল্লাল সেনের পুত্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে (শাসনকাল ১১৭৯-১২০৫ খৃঃ)। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে অবস্থান করতে থাকায় অনতিবিলম্বে নবদ্বীপ একটি জনবহুল শহরে পরিণত হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় সম্ভবত ১২০৩ খৃঃ বখতিয়ার খলজির অতর্কিত আক্রমণে নবদ্বীপ জয় করলে লক্ষ্মণ সেন রাজধানী ছেড়ে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন এবং নবদ্বীপের প্রাধান্যও

[illegible]
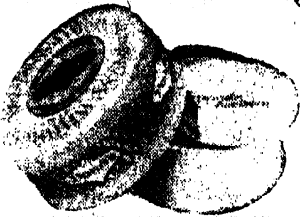
সাময়িকভাবে লোপ পায়। দিল্লীর দাস বংশীয় সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের শাসনকালে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসারে নবদ্বীপ ও তার সমীপবর্তী অঞ্চল সপ্তগ্রাম সরকারের (প্রদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের শাসনকালে বর্তমান নদীয়ার অধিকাংশ প্রতিপত্তিশালী বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম, প্রতাপাদিত্যের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল, এবং প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতি মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন সে সময় বর্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলের ভূস্বামী দেবপাল মোগলশক্তির বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পক্ষে যোগ দিলেও অপর প্রভাবশালী ভূস্বামী ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের পক্ষে যোগ দেন। ঐ সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ১৬০৬ খৃঃ চোদ্দটি পরগণার জমিদারি লাভ করেন। নবদ্বীপের অদূরে, বর্তমানে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মাটিয়ারি নামক স্থানে হয় ভবানন্দের রাজধানী।

ভবানন্দের পৌত্র রাঘব মাটিয়ারি থেকে রেউই নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে নতুন রাজধানীর নাম হয় কৃষ্ণনগর। তখন থেকেই কৃষ্ণনগর নদীয়ার সদর এবং এই প্রশাসনিক গুরুত্ব লাভের জন্য কৃষ্ণনগর নদীয়ার প্রাচীনতম শহর নবদ্বীপ অপেক্ষা অধিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। তবে নবদ্বীপ সেদিনের মতো আজও কৃষ্ণনগরের চেয়ে অধিক জনবহুল শহর।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। গোপালভাঁড়, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, সাধক রামপ্রসাদ, জগদ্ধাত্রী পুজো, পলাশির যুদ্ধ ইত্যাদি মিলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রায় কিংবদন্তীর রাজায় রূপান্তরিত করেছে। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম এবং ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র আঠেরো বছর বয়সে তিনি পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর শাসন দায়িত্ব নির্বাহের পর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে মহারাজার রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে গঙ্গাসাগরের ধার ও 'পূর্ব সীমা ধূল্যাপুর বড়-গঙ্গা পার।' সমগ্র জমিদারি ৮৪টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং তার আয় ছিল বছরে পঁচিশ লক্ষ টাকা। মহারাজা যেমন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, সাধক রামপ্রসাদকে এনে কৃষ্ণনগরের রাজসভা অলংকৃত করেন, তেমনই নাটোর থেকে আনেন কয়েকজন মৃৎশিল্পীকে যাঁদের জন্য পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের খ্যাতি জগৎময় ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজারও প্রবর্তক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে দিল্লীর বাদশাহকে সমর্থন করে ভবানন্দ মজুমদার যেমন পুরস্কারস্বরূপ বিশাল জমিদারি লাভ করেন, ভবানন্দের বংশধর কৃষ্ণচন্দ্রও তেমনই পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে মিরজাফর, উমিচাঁদের মতো ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়ে ইংরেজ সরকারের বিশেষ অনুকম্পা লাভ করেন। মোগল দরবার থেকে যে জমিদার বংশ 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন, ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তাঁরা পেলেন 'মহারাজা' উপাধি। অবশ্য সিরাজ বিরোধী, আর সকলের মতোই, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ইতিহাসের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাননি। খাজনা আদায়ে গাফিলতির অভিযোগে নবাব মিরকাশিম মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে একবার বন্দী করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী শিবচন্দ্রের আমলে, ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিকল্পনায় ১৭৮৭ সালে নদীয়া নামে একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠন করা হয়। সে সময় পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অনেক স্থান নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯৩ সালে বসিরহাট ও তার সন্নিকটবর্তী বহু স্থান নদীয়া থেকে নিয়ে যশোরের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং আনারপুর মৌজা যায় চব্বিশ পরগণায়। ১৭৯৫ সালে নদীয়ার আর একবার অঙ্গচ্ছেদ করে খণ্ডিত অংশ দিয়ে বর্ধমান ও হুগলির পুষ্টি সাধন করা হয়। পরের বছর কতকগুলি স্থান সংযুক্ত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে। ১৮৩৪ সালে নদীয়ার বহু স্থান নিয়ে চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমা গঠন করা হয়। এইভাবে যোগ বিয়োগের ফলে ১৮৭১ সালে নদীয়ার আয়তন হয় ৩,৪১৪ বর্গ মাইল। কিন্তু তার পরেও নদীয়ার অঙ্গচ্ছেদ চলে এবং ১৮৮২ সালে বনগ্রাম মহকুমাকে যশোরের সঙ্গে এবং ১৮৮৮ সালে অগ্রদ্বীপকে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৭৩ সালে, ভৌগোলিক অবস্থিতির কথা বিবেচনা করে নবদ্বীপকেও বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, কিন্তু নদীয়ার সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা বিবেচনা করে পরের বছরেই নবদ্বীপকে আবার নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৮৮ থেকে ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট পর্যন্ত নদীয়ার আয়তন অপরিবর্তিত ছিল এবং সে আয়তনের পরিমাণ ছিল ২৮০০ বর্গমাইল। ঐ সময় নদীয়ায় মহকুমা ছিল পাঁচটি—কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, মেহেরপুর, চুয়াডাঙা ও কুষ্টিয়া। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভাগ হলে নদীয়া বিভাজনও অনিবার্য হয়।

র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড অনুসারে বিভক্ত নদীয়ার দুটি মহকুমা কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙা সম্পূর্ণ এবং করিমপুর ও তেহট্ট থানা বাদে মেহেরপুর পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে নদীয়ার প্রায় ১২৮৫ বর্গ মাইল স্থান ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কবিতীর্থ শিলাইদহ, বাঘা যতীনের জন্মগ্রাম কয়া প্রভৃতি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলি আর নদীয়ার অংশ থাকে না। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে এবং তার মৃত্যুক্ষণে ভূমিষ্ঠ হয়েছে নবরাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাই হারিয়ে যাওয়া সব অংশের সঙ্গে নদীয়া আবার নতুন করে আত্মীয় বন্ধন স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত নদীয়ার অংশটুকু প্রথমে নদীয়া নামে অভিহিত হতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া নবদ্বীপ নাম গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নদীয়া অনতিবিলম্বে কুষ্টিয়া নাম নেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও নবদ্বীপ নাম বাতিল করে আবার নদীয়া নাম নেয়। র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড অনুসারে নদীয়া বিভক্ত হলেও পরে নদীয়ার করিমপুর থানা ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার সীমানা নিয়ে কিছু মতভেদ ঘটে। ১৯৫০ সালে বাগে কমিশনের রায় অনুসারে ঐ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। ১৯৭১ সালে করিমপুর থানার দুটি মৌজা—টলটলি ও পরাশপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই সব যোগ-বিয়োগের শেষে, ১৯৭১ সালে সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে নদীয়ার আয়তন দাঁড়ায় ১৫১৫ বর্গমাইল (৩,৯২৬ বর্গ-কিলোমিটার)। এই খণ্ডিত নদীয়াই এই রচনার আলোচ্য বিষয়।

ভৌগোলিক পরিচয়

সার্ভেয়র জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার হিসাব অনুসারে নদীয়ার আয়তন ১৫২৭ বর্গমাইল এবং সেন্সাস কমিটির সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে ১৫১৫ মাইল। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল্যান্ড রেকর্ডস দপ্তরের হিসাব অনুসারে ১৫০৯ বর্গ মাইল। এই রকম হিসাববৈষম্য পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে আছে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর-পূর্বে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া। পশ্চিমের সীমানা নির্ধারণ করেছে ভাগীরথী নদী, শুধু নবদ্বীপ ও তার সমীপবর্তী কিছু অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে থেকেও নদীয়ার অংশ। জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে দিক ঘিরে আছে চব্বিশ পরগণা। জেলাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান।

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে নদীয়া জেলার উচ্চতা ৪৬ ফুট। সম্পূর্ণ সমতল এই জেলার আবহাওয়ায় বৈচিত্র্য খুবই কম। তবে জেলার প্রায় মাঝ বরাবর কর্কট ক্রান্তি রেখা চলে গেছে বলে অবহাওয়ায় কিছুটা চরম ভাব দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে যেমন গরম, শীতকালে তেমনই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে কালবৈশাখী প্রায়ই হয় এবং তাতে গ্রীষ্মের ফল আম, লিচুর ক্ষতি হয় অত্যন্ত বেশী। জেলার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড়পড়তা হার প্রায় ৫২ ইঞ্চি, অনাবৃষ্টি চলে একটানা দীর্ঘদিন এবং তা শেষ হয় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে। ১৯০০ সালের

২০ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরে একদিনে সাড়ে এগারো ইঞ্চিরও বেশী বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

জেলার মাটির বেশী ভাগই তৈরী হয়েছে অগণিত নদীবাহিত পলিমাটিতে। কিন্তু বালির ভাগ বেশী হওয়ায় মাটি উর্বরা নয়। জলসেচের ব্যবস্থা ভাল না থাকায় এতদিন ফসলও ভাল হত না। আউশ ও রবিশস্যই নদীয়ার প্রধান ফসল। নদীয়ার ভূগর্ভস্থ জলস্তর খুব নীচে নয়, সেকারণে কৃষির জল পাওয়াও কঠিন নয়। অগভীর নলকূপ, কূপ প্রভৃতির সাহায্যে নদীয়ায় চাষের জলের অভাব দূর করা যায়।

জেলার পশ্চিমাঞ্চলে, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী কালিগঞ্জ ও তেহট্ট থানার জমি 'কালান্তর' জমি নামে পরিচিত। ঐ জমির মাটির রং একটু কালো এবং এলাকাটিও একটু নীচু। আবহাওয়া অনকূল হলে কালান্তর জমিতে আমনের ফলন খুব ভাল হয়। কিন্তু এলাকাটি প্রায় জলে ডুবে থাকে বলে শরৎ বা শীতের ফসল সেখানে ভাল হয় না। জলনিকাশের ব্যবস্থা হলে কালান্তর জমিকে তেফসলা করে তোলা যায়।

নদীয়ার অধিকাংশ নদী সৃষ্টি হয়েছে পদ্মা অথবা গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে। পলিমাটিতে নদীর খাত ভরে গেলে নদীর স্রোতধারা অপেক্ষাকৃত ঢালু দিকে সরে যায়। এইভাবে নদী সরে সরে নদীয়ার নতুন মাটি তৈরী হয়েছে, নদীগুলিরও গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। তারপর পলিমাটির চাপে অথবা মূলস্রোত থেকে অনেক দূর সরে যাওয়ার জন্য যেসব নদী চলার শক্তি হারিয়েছে তারা হয় ধীরে ধীরে অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে নয়ত বদ্ধ জলায় পরিণত হয়েছে।

নদীয়ার প্রধান নদী হল ভাগীরথী। পলাশীর কাছে গঙ্গার এই ধারা নদীয়ায় প্রবেশ করেছে এবং জেলার পশ্চিম সীমান্ত রচনা করে নবদ্বীপের কাছে এসে জলঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ঐ সঙ্গম থেকে ভাগীরথীর নাম হুগলী নদী। জেলার মধ্যে ভাগীরথী নদী কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, কৃষ্ণনগর থানার পশ্চিমাংশ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, চাকদা ও কল্যাণী থানার সীমানা স্পর্শ করেছে। নদীয়া জেলার মধ্যে একমাত্র নবদ্বীপ শহর ও তৎসংলগ্ন দুটি ছোট গ্রামসহ নবদ্বীপ থানা ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। নদীয়ার নদীগুলির মধ্যে একমাত্র ভাগীরথীর গতিপথ খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। তবে ১৮২৫ সালে নদীটি আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে আসায় তার গভীরতা হ্রাস পায় এবং বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠ মন্দির
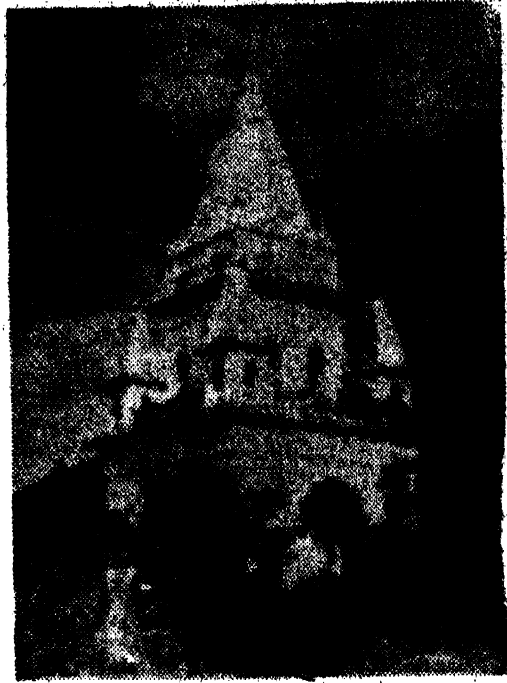
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নদী জলঙ্গী উত্তর সীমান্তে পদ্মা থেকে নির্গত হয়ে জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকের অনেকখানি সীমানা চিহ্নিত করে তেহট্টর কয়েক মাইল উত্তর জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। তারপর কৃষ্ণনগর শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাত মাইল পশ্চিমে গিয়ে স্বরূপগঞ্জের ঘাটে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে জলঙ্গী 'খোড়ে' নামেই অধিক পরিচিত। স্বরূপগঞ্জের ঘাটে যেখানে খোড়ের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ধারা ভাগীরথীর ঘোলা জলে মিলিত হয়েছে, সেই সঙ্গমের দীর্ঘ সুস্পষ্ট জলরেখাটি নয়নমুগ্ধকর। জলঙ্গী অনেক দিন বড় নৌকা ও স্টীমার চলার উপযোগী ছিল। কিন্তু ১৮৩২ সালের বন্যায় নদীর গতিপথ পাঁচ মাইল উত্তরে সরে যাওয়ায় তার গভীরতা হ্রাস পায়। তবে ত্রিশ বছর আগেও বর্ষার সময় খোড়ে নদীতে স্টীমার আসত। এখন বর্ষার সময় দুকূল ভাসানো ছাড়া খোড়ের আর কোন কাজ নেই।

মাথাভাঙা নদীও বেরিয়েছে পদ্মা থেকে, যেখান থেকে জলঙ্গী বেরিয়েছে তার দশ মাইল নীচে থেকে। নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে হাটবোয়ালিয়ার কাছে এসে মাথা ভেঙে দু ভাগ হয়েছে। ঐ দু ভাগের একটি 'কুমার' বা 'পাঙাশি' নাম নিয়ে আলমডাঙা হয়ে নদীয়া অতিক্রম করে যশোরে প্রবেশ করেছে। অপর শাখাটি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলে চুয়াডাঙা হয়ে কৃষ্ণগঞ্জে পৌঁছেছে। সেখানে নদীটি আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে গেছে। পশ্চিমমুখী নদীটির নাম চূর্ণী আর দক্ষিণ-পূর্বগামী শাখাটির নাম ইছামতী।

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে পংখের কারুকার্য ও রাজরাজেশ্বরী মূর্তি।
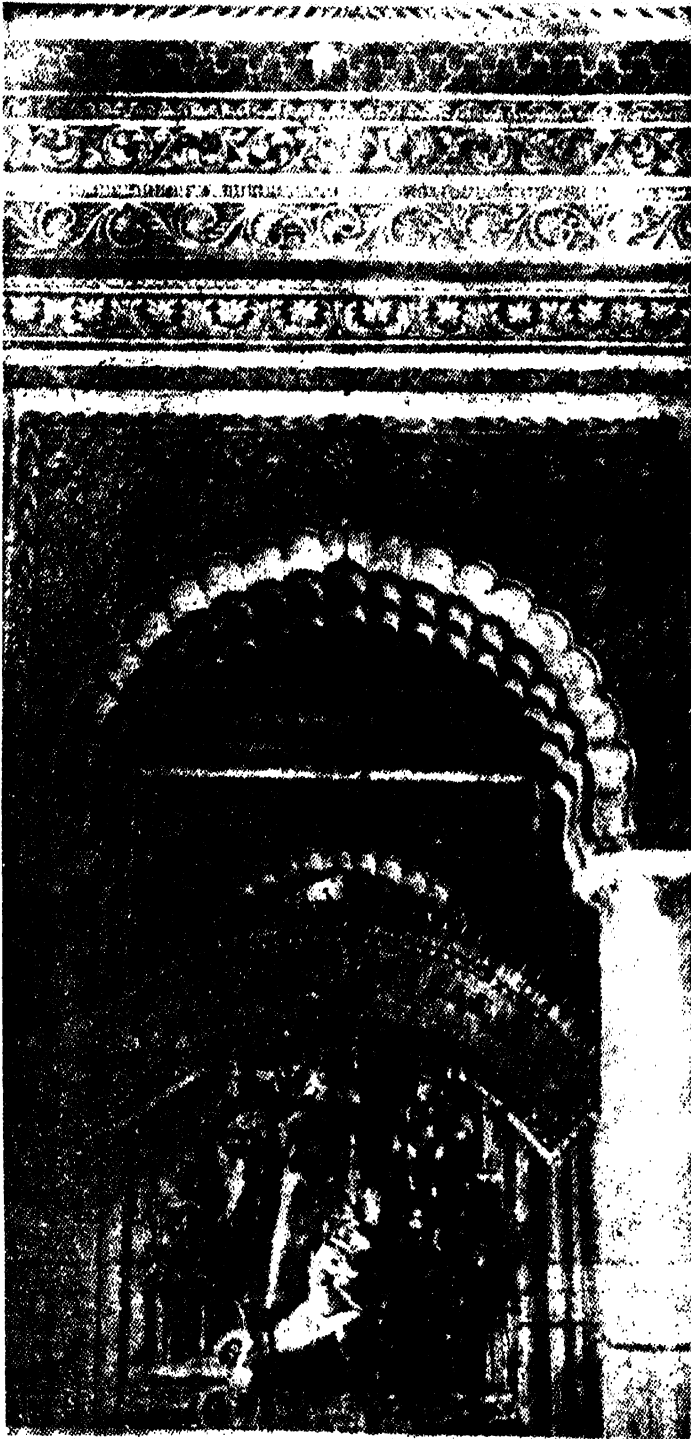
চূর্ণী দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে হাঁসখালি ও রাণাঘাট ছুঁয়ে শান্তিপুর ও [illegible] মাঝ দিয়ে হুগলী নদীতে গিয়ে মিশেছে। মৈত্র মহাশয় কবে চুর্ণী নদী-তীরের প্রেমিকে চোখের জলে ভাসিয়ে সন্ধ্যাকালে সাগরসংগমে যাত্রা করেছিলেন জানি না, কিন্তু নদীটির অস্তিত্ব বোধহয় রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ আগেও ছিল না। কারণ ১৭৭২ সালে অর্থাৎ রাজা রামমোহনের জন্মকালে, রেনেল-এর মানচিত্রে চুর্ণী নদীর অস্তিত্ব মেলে না।

ইছামতী নদীটি কৃষ্ণগঞ্জ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ও ঐদিকে নদীয়ার কিছুটা সীমানা চিহ্নিত করে চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমায় প্রবেশ করেছে।

ভৈরব একদা নদীয়ার একটি গুরুত্ব-পূর্ণ নদী ছিল, কিন্তু এখন সেটি একটি মরানদী। জলঙ্গী ও চুর্ণীর মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী অঞ্জনা শাখা নদীটিও আজ অস্তিত্বহীন। ইছামতীর নিম্নাংশ থেকে যমুনা নির্গত হয়ে মদনপুরের কাছে গিয়ে হুগলীতে পড়েছে। এই শাখা নদীটিও এখন মুমূর্ষু।

ফরাক্কায় বাঁধ বেঁধে গঙ্গার জল খাল কেটে ভাগীরথীতে প্রবেশ করানোর পরি-কল্পনা যেদিন কার্যকরী হবে সেদিন নদীয়ার নদীগুলি পুনরায় প্রাণশক্তি ফিরে পাবে। আর নদীয়ার নদীগুলি জলে পূর্ণ হলে তবেই সেগুলি আবার নাব্য হতে পারে এবং ব্যাপকভাবে সেচের কাজে লাগতে পারে।

নদীপ্রধান নদীয়ার অনেকগুলি নদী রুদ্ধস্রোত হওয়ায়, মজে-যাওয়ায় ও ভূমি-কম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জেলার বিভিন্ন অংশে বহু খাল-বিল ও হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে কৃষ্ণনগর মহ-কুমায় উল্লেখযোগ্য হল—ভীমপুর বিল, কালিঙ্গ বিল, ট্যাংরা বিল, ডিগরি বিল, দুমরি বিল, দোগাছি বিল, পাঞ্জনা বিল, পাগলাচণ্ডীর দহ, ভালুকা বিল, হুরথালি বিল ও হাঁসডাঙা বিল। আর রাণাঘাট মহকুমার খালবিলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—অঞ্জনা খাল, আমদা বিল, ওথিমিল বিল, কুলিয়া বিল, চামটা বিল, ছিনিকি বিল, ঝকরি বিল, ডোমরা বিল, তারাপুর বিল, নিঝোর খাল, প্রিয়নগর বাওর, বাগের খাল, হরিপুর খাল প্রভৃতি। বেশীর ভাগ খালেই বর্ষাকালে জল থাকে না। শীতকালে অনেক বিলের ধারে দূরদেশের পাখির সমাবেশ হয়। আগে অনেক বেশী আসত, এখন শিকারীদের ভয়ে আর জঙ্গল কেটে বসত গড়ে ওঠায় পাখিরা আসতে চায় না।

নদীয়ার শহরগুলিতেও দু-এক দশক আগে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি দেখা যেত, গৃহস্থের বাগানে গন্ধরাজ ডালিম, বাতাবী লেবুর গাছে দোয়েলপাখি পুচ্ছ নাচিয়ে নির্ভয়ে কূজন করত। কিন্তু সেসব দিন কোথায় হারিয়ে গেছে, জনবসতির বিস্তারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে ঝোপঝাড়, আর সেই সঙ্গে পক্ষীকুল। পলাশীর প্রান্তরে একদা ঝাঁকে ঝাঁকে ভরুই পাখি দেখা যেত, তাদের মারা ও ধরা শিকারীদের একদা বিশেষ উল্লাসের বিষয় ছিল। ফাঁদ পেতেও ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা হত ঐ পাখিদের। এই ব্যাপক হত্যালীলার ফলে ভরুই পাখি ঐ তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে। জেলার দক্ষিণ দিকে বর্ষার শেষে ও শীতের শুরুতে কাদাখোঁচা পাখির

(স্নাইপ) সমাবেশ দেখা যায়। শীতকালে বুনো হাঁস উড়ে আসে জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে। শিকারীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে তিতির পাখি এখনও ওড়ে জেলার এখানে-ওখানে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভাগীরথীর তীরে জনবিরল বনভূমিতে বাঘ দেখা যেত। পরে এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে বাঘের সন্ধান মিলেছে। কিন্তু এখন জেলা সম্পূর্ণরূপে বাঘশূন্য। তবে নেকড়ে আছে অনেক গ্রামের জঙ্গলগুলিতে এবং গৃহস্থের গরু-ছাগল মেরে তারা অনেক উৎপাত করে। বুনো শুয়োর দেখা যায় শিকারপুর কুঠির কাছে। শিয়াল, খরগোস, শজারু প্রভৃতি প্রাণী জেলার বন-জঙ্গলে এখনও দেখা যায়। একদা কালোমুখ হনুমানের ভীষণ উপদ্রব ছিল কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য শহরগুলিতে। দল বেঁধে তারা হানা দিত গৃহস্থের আম লিচুর বাগানে, ছাদে শুকোতে দেওয়া বাড়ি আমসত্ত্ব মুহূর্তের মধ্যে লোপাট করে ফেলত। দলবদ্ধভাবে হানা দেওয়ার সময় বাড়ির মেয়েদের তারা থোড়াই কেয়ার করত। কিন্তু জনবসতির বিস্তার ও বিশেষ করে বৈদ্যুতিক তারের জন্য ঐ দুর্ধর্ষ দস্যুর দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

জেলায় নতুন করে বনভূমি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণী রক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। বেথুয়াডহরির বনে নেকড়ে, বুনো শুয়োর, শজারু, হরিণ আর নানা জাতের পাখি আশ্রয় নিচ্ছে।

(২)

নদীয়া জেলায় দুটি মহকুমা—কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট। তবে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর (সদর) মহকুমাকে উত্তর সদর ও দক্ষিণ সদর—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

জেলায় থানা আছে ১৩টি। উত্তর সদর মহকুমার থানা— নাকাসিপাড়া, কালিগঞ্জ, তেহট্ট, করিমপুর, দক্ষিণ সদর মহকুমার থানা—কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, চাপড়া ও কৃষ্ণগঞ্জ; আর রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত হল রাণাঘাট, চাকদা, হরিণঘাট, হাঁসখালি ও শান্তিপুর।

থানাগুলির মধ্যে করিমপুর বৃহত্তম, আয়তন ১৭৪ বর্গমাইল; আর নবদ্বীপ ক্ষুদ্রতম, আয়তন ৪০ বর্গমাইল। সর্বাধিক লোকের বাস রানাঘাট থানায়, প্রায় দু লক্ষ বাহান্ন হাজার; আর সবচেয়ে কম লোক বাস করে কৃষ্ণগঞ্জ থানায়, মাত্র বাহান্ন হাজার।

জেলায় উন্নয়ন ব্লক আছে ১৬টি; অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ও গ্রাম পঞ্চায়েত যথাক্রমে ৮৩ ও ৫৩৭টি।

জেলায় শহর আছে ১২টি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আছে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, রানাঘাট, বীরনগর, চাকদা ও শান্তিপুরে এই ছয়টি শহরে। তাহেরপুর, গয়েশপুরে, কাঁটাগঞ্জ ও গোকুলপুরে সরকারী কলোনী, কল্যাণী, বগুলা ও ফুলিয়া—রাণাঘাট মহকুমার এই ছয়টি জনপদ '৭১ সালের জনগণনায় শহর বলে স্বীকৃতি লাভ করলেও ঐসব স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি নেই। শহরগুলির মধ্যে নবদ্বীপের লোকসংখ্যা সর্বাধিক, প্রায় ১৪ হাজার; আর ফুলিয়া শহরে সবচেয়ে কম, প্রায় চার হাজার।

পরের সপ্তাহে

নদীয়ার মানুষ

কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয় ১৮৬৪ সালে এবং শান্তিপুরে তার পরের বছর, ১৮৬৫ সালে। নবদ্বীপ ও বীরনগরে মিউনিসিপ্যালিটি হয় ১৮৬৯ সালে এবং চাকদায় ১৮৮৬ সালে। এর মধ্যে বীরনগর ও চাকদা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ছিল প্রায় জনমানবহীন পরিত্যক্ত স্থান, কোনমতেই তারা শহর পদবাচ্য ছিল না। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের মানুষের দলে দলে আগমনে এই শহর দুটি নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়েছে।

জেলার মোট মৌজার (গ্রাম) সংখ্যা ১২৮২, আর ১০১টি মৌজা জনহীন।

১৯৭১ সালের গণনা অনুসারে জেলায় ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৩৯ জন (মোট লোকসংখ্যার ১৯ শতাংশ) বারোটি শহরে বাস করে আর ১৮ লক্ষ ১০ হাজার ২৮৩ জন বাস করে ১২৮২টি মৌজায়।

জাগুলি (হরিণঘাটা), করিমপুর, মাজদিয়া, আড়ংঘাটা, মদনপুর, স্বরূপগঞ্জ, তাহেলা, বেথুয়াডহরি, গাদিগাছা, চাপড়া, বদকুল্লা, মিরাবাজার, দেবগ্রাম প্রভৃতি জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনকালের হিসেব

হাত পাতলেই কি...?

হাত পাতলেই মাথা বিকোবে, বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। উক্তিটি অনেকের মত আমারও মনে গেঁথে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবি পরমপুরুষের এই বিখ্যাত প্রবচন পূর্ণসত্যের মর্যাদা পেতে পারে কি? ভূয়োদর্শনলব্ধ তিনি থেকে আমরা সকলেই জানি যে কোর্ট-কাছারি-সংঘ-প্রতিষ্ঠান-সংস্থায় এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বেশ কিছু লোক মাথা বিকনোর ভাবনার পরিবর্তে মাথা কেনবার ভাব দেখিয়ে সোজাসুজি হাত পেতে বসে থাকে, আর অপর এক দল লোক সেই হাতে ভয়ে বা ভক্তিতে কিছু কিছু সমর্পণ করেই যায়। অনেক সময় সমর্পণ করে কৃতার্থই হয়। আবার ধরুন বিভিন্ন বারোয়ারী পুজোর সময় যখন পাড়া-বেপাড়া থেকে ছেলে-ছোকরার দল এসে আপনার কাছে হাত পাতে তখন কি মাথা বিকোবার কোন লক্ষণ তাদের মধ্যে থাকে কি? বরং যেন করুণাপরবশ হয়ে আপনাকে অল্পেই রেহাই দিচ্ছে—এই ভাব নিয়ে অধিকাংশ সময় তারা আপনার সম্মুখীন হয় আর আপনিও কোন রকমে যেন একটা রফা করতে পারলেই বেঁচে যান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: ইটস এ প্রিভিলেজ টু বি চ্যারিটেবল—এই প্রসঙ্গে এই উক্তিটাই বারবার মনে পড়ে। অতএব, হাত পাতলেই সব সময় মাথা বিকোয় না।

অবশ্য পরমপুরুষের প্রবচনের যাথার্থ্য বিচার এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল আমাদের মত শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করা—দেখা যে অঙ্গরাজ্যগুলো যখন কেন্দ্রের কাছে হাত পাতে বা পাততে বাধ্য হয় তখন তারা প্রার্থী না দাবিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাদের এই ভূমিকার স্বরূপ নির্ধারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ভূমিকাই হল বিভিন্ন আন্দোলন এবং আপারগতার অজুহাতের প্রসূতি-ভবন। 'রাজ্যের হাতে অধিক অর্থ দিতে হবে'—বিগত নির্বাচনের আগে এই প্রচার যে বিশেষ জোরালো হয়ে উঠেছিল তা নিশ্চয় সবারই মনে আছে। আবার এও অনেকে জানেন যে যখন রাজ্যের কার্যসম্পাদনে ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন মুখপাত্রদের কাছ থেকে সেই রেডিমেড জবাব পাওয়া যায়: কি করব, কেন্দ্র যে টাকা দিতে রাজী হয়নি। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধিও প্রসঙ্গত এবং অপ্রসঙ্গত বারবার এই জবাবটিরই পুনরুক্তি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দাবিও জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক ন্যায়বিচারসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস-পরিচালিত সরকারের অর্থমন্ত্রীরাও এই দাবি জানাতে কুণ্ঠিত হন নি। তবে স্বাভাবিক কারণেই অত জোরালো ভাষায় নয়। একদিক দিয়ে অবশ্য এঁদের দাবিই বেশী জোরালো হওয়া উচিত ছিল, কারণ এঁরা সকলেই ঘাটতি বাজেট পেশ করে কেন্দ্রের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়েছেন। অপরদিকে অ-কংগ্রেসী সরকারের অধীনে তামিলনাড়ুর বাজেটই একমাত্র উদ্বৃত্ত বাজেট।

বিভিন্ন রাজ্যের ঘাটতি বাজেট:

ভারতে অঙ্গরাজ্যের বর্তমান সংখ্যা ২১। লেখার সময় পর্যন্ত ডজনখানেক রাজ্যসরকারের বাজেট বেরিয়েছিল। একটি ছাড়া অন্য সব রাজ্যেরই ঘাটতি বাজেট—এ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ ঘাটতি বাজেট পেশ করা অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে একরকম রীতিতেই দাঁড়িয়ে গেছে। যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল যে এ বছর যেন অধিকাংশ রাজ্যের বাজেটেই ঘাটতির পরিমাণ বেশী এবং কোথা থেকে এই ঘাটতি মেটানো হবে তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই নেই। তবে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অবশ্যই আছে: কেন্দ্রের কাছ থেকে ঐ ঘাটতি মেটানোর জন্যে বেশী টাকা দাবি করা হবে। আরও উদ্দেশ্য বোধ হয় ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে রাজ্যের আর্থিক অসচ্ছলতার চিত্র ভালো করে ফুটিয়ে তোলা যাতে কমিশন 'প্রয়োজনীয়তার নীতি'র ওপর আরও একটু গুরুত্ব আরোপ করে বণ্টনযোগ্য রাজস্বের কিছুটা বেশী অংশ বরাদ্দের সুপারিশ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য করে। যেমন, কেরল সরকারের ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে ৩১ কোটি টাকা ঘাটতি ধরা হয়েছে। বর্তমানে আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের বণ্টনযোগ্য অংশের মধ্যে কেরল পায় ৩-৮৩ শতাংশ, আর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের বণ্টনযোগ্য অংশ থেকে পায় ৪-২৮ শতাংশ। এর ওপর অবশ্য আছে সাহায্যস্বরূপ অনুদান বা গ্র্যান্টস-ইন-এড এবং অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের অংশ। এই সব সূত্রে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ যত বাড়বে কেরলের পক্ষে নিশ্চয়ই তত ভাল। এবং বাড়াবার বা কমাবার আসল মালিক কেন্দ্রীয় সরকার হলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অন্যূন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিযুক্ত অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে। বর্তমানে ষষ্ঠ অর্থ কমিশন তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। অন্যান্যের সঙ্গে বাজেট-ঘাটতির পরিমাণও সংগৃহীত তথ্যভুক্ত হবে, যে তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বা আরও সঙ্ক্ষেপভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নিয়মিত বাজেট ঘাটতির দরুন ১০টি রাজ্য সাহায্যস্বরূপ অনুদান পেয়ে থাকে।

অতএব, ঘাটতি বাজেট পেশ করা ফলপ্রদায়ী পন্থাও হতে পারে। কোন কোন রাজ্যের ঘাটতির পরিমাণ দেখে আমার অন্তত তাই মনে হয়েছে। ধারণা সত্য হলে পদ্ধতিটি সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। টসে যেমন কখনই দু' পক্ষ জিততে পারে না তেমনি কেন্দ্র-সংগৃহীত বণ্টনযোগ্য কররাজস্বের ভাগ সব রাজ্যই বেশী পেতে পারে না—এক রাজ্যের অংশ বাড়লে অন্য এক বা একাধিক রাজ্যের অংশ কমতে বাধ্য। সাহায্যস্বরূপ অনুদানের প্রশ্ন অবশ্য কিছুটা ভিন্ন, কিন্তু তা কি কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতার দ্যোতক নয়? এই নির্ভরশীলতা কি ঠিক যুক্তরাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? বিষয়টি আবার রাজনৈতিক আন্দোলনের এবং সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার প্রসারের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই পরিণতি নিশ্চয়ই কাম্য নয়। তাই এখন থেকেই আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় রদবদল সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। এবং এই কাজে অগ্রসর হবার জন্যে বর্তমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা দরকার।

কয়েকটি সাধারণ নীতি:

বর্তমান অবস্থার বিবরণ দেওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ প্রকৃতি বিচারে ভারত অন্যতম যুক্তরাষ্ট্র বলেই গণ্য। যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা—এ ডুয়্যাল পলিটি বলে অভিহিত করা হয়। এই রকম শাসন-ব্যবস্থায় থাকে একটি কেন্দ্রীয় বা সমগ্র দেশের সরকার আর কয়েকটি দেশের অংশসমূহের সরকার। এই দু' ধরনের সরকারের মধ্যে শাসনবিষয়ক এবং অন্যান্য ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা এমনভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয় যাতে একে

অপরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্য উভয়কেই নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে ধরে নেওয়া হয়। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হলে উভয় সরকারের ক্ষেত্রেই নিজস্ব কর্তব্য পালনের জন্যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকা চাই। যেখানে আঞ্চলিক সরকারকে অর্থের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাত পাততে হয় সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক আর্থিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোকে রাজস্বপ্রাপ্তির পৃথক পৃথক সূত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। একে বলা হয় স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের নীতি (প্রিন্সিপল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অর অটোনমি)। দ্বিতীয়ত দেখা হয়, প্রত্যেক সরকারেরই আয়ের পরিমাণ যেন পর্যাপ্ত হয়। সুতরাং পর্যাপ্তি (এ্যাডিকোয়েন্সি) হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার দ্বিতীয় সাধারণ নীতি। অপর দিকে অবশ্য প্রশাসনিক সুবিধার প্রশ্নও রয়েছে। যাতে কর আদায়ে ব্যয় সংক্ষেপ হয়, যাতে করদাতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় এবং যাতে কর ধার্যের ব্যাপারে সমতার নীতিকে মোটামুটি মেনে চলা সম্ভব হয় তার জন্যে কয়েকটি কর সংগ্রহের ভার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর, কিন্তু ঐসব কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব হয় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে না হয় অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। যেমন, আমাদের দেশে আয়কর অন্তঃশুল্ক প্রভৃতি সংগ্রহের ভার কেন্দ্রের ওপর কিন্তু সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টিত হয়। এবং বস্ত্র চিনি ও তামাক এই তিনটি দ্রব্যের ওপর পূর্বের বিক্রয় করের পরিবর্তে যে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়েছে তা সংগ্রহের ভার কেন্দ্রের ওপর থাকলেও সংগৃহীত অর্থের সমস্তটাই বণ্টিত হয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পর্যাপ্তি এবং প্রশাসনিক সুবিধার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় ব্যবস্থার প্রাথমিক নীতি—আর্থিক স্বাতন্ত্র্যকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করা অপরিহার্য। কিন্তু যতটা ঠিক অপরিহার্য তার বেশী ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা করলে ভুল করা হবে—এইটেই আমাদের বক্তব্য। উদাহরণস্বরূপ পর্যাপ্তির নীতির দরুণ কেন্দ্র থেকে অঙ্গরাজ্যগুলোকে অর্থসাহায্য বা অনুদানের উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি সব যুক্তরাষ্ট্রেই এই রকম অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই অনুদান সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক—কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। ভারতে কিন্তু অনুদান অনেকাংশে অর্থ কমিশনের সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যেমন, পূর্বেই বলেছি যে, পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বর্তমানে ১০টি রাজ্য মোট ৬৩৮ কোটি টাকা পেয়ে থাকে। কারণ, কমিশনের মতে এই ১০টি রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয় এবং ফলে নিয়মিত বাজেট ঘাটতির আশংকা রয়েছে। কমিশনের এই অভিমত ও সুপারিশ কেন্দ্র মেনে নিয়েছে, কিন্তু নাও মানতে পারত বা অংশত সুপারিশের পরিবর্তনও করতে পারত। অতএব, ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ আর্থিক অবস্থা যদি সন্তোষজনক না হয় তবে কেন্দ্রের কাছে হাত পাতো, এবং কেন্দ্র যথাসম্ভব সহানুভূতির সঙ্গে অভাব-অভিযোগের বিচার-বিবেচনা করে অনুদানের মাধ্যমে তোমার বিপদ ত্রাণের ব্যবস্থা করবে। এর থেকে কি আমাদের সেই পূর্ব ধারণা যে বাজেট ঘাটতি দেখিয়ে যতই আর্থিক অসচ্ছলতার চিত্র তুলে ধরা হবে ততই বেশী অনুদানপ্রাপ্তির আশা থাকবে—তার সমর্থন পাওয়া যায় না? কিন্তু কেন্দ্র থেকে অনুদানের পরিমাণ যতই অধিক হবে রাজ্যের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ততই ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য—এটাও স্মরণ রাখা উচিত।

আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা ঃ

ব্রিটিশ আমলের কাঠামো মোটামুটি বজায় রেখে বর্তমান সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে যে রাজস্ব বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ভাবে দেওয়া যেতে পারে ঃ

(ক) বাণিজ্য শুল্ক, কোম্পানী আয়-কর বা কর্পোরেশনের ট্যাক্স। (কৃষি দান ছাড়া) সম্পদ-কর প্রভৃতি কররাজস্ব ধার্য, সংগ্রহ ও ভোগের অনন্য অধিকার কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন সরকারের।

খ। অনুরূপভাবে ভূমিরাজস্ব, কৃষি-আয়কর, বিক্রয়কর প্রভৃতির ওপর একক অধিকার অঙ্গরাজ্যের।

গ। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত স্ট্যাম্পকর ইত্যাদি কয়েকটি কর আছে যা ধার্য করে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্য সরকার।

ঘ। আবার অকৃষি সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকার কর, সম্পত্তিকর বা এস্টেট ডিউটি, রেলপথে যাত্রীর ওপর কর প্রভৃতি ধার্য ও সংগ্রহ করে কেন্দ্র কিন্তু সংগৃহীত অর্থ দেওয়া হয় রাজ্যগুলোকে।

ঙ। কৃষি থেকে আয় ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত আয়ের ওপর কর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হয় এবং ঐ অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়।

চ। ওষুধপত্র ও প্রসাধনদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের ওপর অন্তঃশুল্ক (উৎপাদন শুল্কও বলা হয়) ধার্য ও সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু কেন্দ্র ঐ অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারে—দিতে যে হবে এমন কোন কথা নেই।

ছ। এছাড়া আছে কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলোকে অর্থ সাহায্য বা অনুদান। এই অনুদান আবার দুরকমের ঃ নির্দিষ্ট অনুদান এবং সাধারণ অনুদান। নির্দিষ্ট অনুদান হল তপশীলী উপজাতি এবং তপশীলী অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্যে। এই উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার যদি অনুমোদন করে তবেই এই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পাওয়া যাবে।

সাধারণ অনুদান সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে, সংসদ যে সব রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করবে মাত্র সেই সব রাজ্যকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হবে।

রাজস্ব বণ্টনের প্রকৃতি ঃ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের বিচার-বিবেচনার ওপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য রাজস্ব ভাগাভাগি, অর্থসাহায্যের নীতি ও পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করে থাকে অর্থ কমিশন। কিন্তু অর্থ কমিশনের সুপারিশ যে বাধ্যতামূলক নয় তা আগেই বলা হয়েছে। মোট কথা, ভারতে রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা বিশেষ কেন্দ্রপ্রবণ—আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হলেও আসলে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করবার ঝোঁক অতি প্রবল এবং এই ঝোঁকের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই গতি অবশ্য বিশ্বজনীন—সব যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। যুদ্ধ ও যুদ্ধের আতংক, শিল্পগত কলা-কৌশল এবং পরিবহনের উন্নতি, অর্থনৈতিক সংকট, বিশ্ব-রাজনীতির নতুন রূপ, রাষ্ট্রের সমাজকল্যাণ কাজকর্মের প্রসার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সব যুক্তরাষ্ট্রেই

মাটির সাক্ষী। ফটো : প্রফুল্ল মিত্র

কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তুলছে। এর দরুন আর্থিক ক্ষমতাও ক্রমশ কেন্দ্রের হাতে গিয়ে পড়ছে।

তবুও কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গ-রাজ্যগুলো যতটা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে ভারতে তা কল্পনাও করা যায় না। তাই এদেশে রাজস্ব বণ্টন ব্যাপারে বেশ কিছুটা আধিক্য বর্জনের—অর্থাৎ বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কেন্দ্রপ্রবণতার অপরিহার্যতা স্মরণ রেখেও রাজ্যগুলোর আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর আর কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশন :

অন্যান্যের মধ্যে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের ওপর। কমিশন বিভিন্ন রাজ্যে আর্থিক স্থিতিশীলতা কিভাবে আনা যায় তা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখবে। হয়ত এই পরীক্ষার পর আয়-কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক প্রভৃতির বণ্টন এবং সাধারণ অনুদান সম্পর্কে আরও উদার ব্যবস্থার সুপারিশ করবে। এর ফলে রাজ্য-গুলোর প্রাপ্তির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দুর্মূল্য ভাতা বাড়ার মত অস্থায়ী বিত্তপ্রসাদ ঘটবে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে রাজ্যগুলো কেন্দ্র থেকে আগের চেয়ে ১৪০০ কোটি টাকার মত বেশী পাচ্ছে। কিন্তু হাত পাতা কমেছে কি? কমলে ষষ্ঠ অর্থ কমিশনকে রাজ্য সরকার সমূহের আর্থিক স্থিতিশীলতার বিষয়টি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে বলা হত না।

রাজ্য সরকারের আর্থিক স্থিতিশীলতা :

রাজ্য সরকার সমূহের আয়-ব্যয়ে স্থিতিশীলতা যদি সত্যিই আনতে হয় তবে অর্থ কমিশনের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে তা সম্ভব হবে না। এ পর্যন্ত পাঁচটি অর্থ কমিশন ক্রমাগত রাজ্যগুলোর অংশ বাড়িয়ে গিয়েছে। প্রথমে আয়কর থেকে সংগৃহীত অর্থের ৫০ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত, পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়ে এখন দেওয়া হয় ৭৫ শতাংশ। তৃতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাত্র ৩৫টি জিনিসের ওপর অন্তঃশুল্কের ২০ ভাগ রাজ্যগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হত। এখন করা হয় সব জিনিসের ওপর অন্তঃশুল্কের। এছাড়া ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে বিশেষ অন্তঃশুল্কের ২০ শতাংশ রাজ্যগুলোকে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ অনুদানের পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। তবুও কিন্তু রাজ্যগুলোর সেই চিরন্তন পেনির অভাব—ইন্টারন্যাল ল্যাক অব পেন্স—মোচন হচ্ছে না। ফলে কেন্দ্রের কাছে হাত পাতাও কমে নি।

অতএব প্রয়োজন হল রাজস্ব-বণ্টন ব্যবস্থার রদবদল করা। এর জন্যে প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধনও করা যেতে পারে। মোট কথা, রাজ্যগুলোকে যথাসম্ভব আর্থিক স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের হাতে সম্প্রসারণশীল রাজস্ব সূত্র সমর্পণ করতে হবে। সাধারণ অনুদানের ব্যবস্থা যদি রাখতেই হবে তবে তাকে প্রতিষ্ঠিত প্রথার—এস্টাব্লিসড কনভেনসনের—রূপ দিতে হবে, যাতে রাজ্যগুলো বুঝতে পারে যে এই পরিমাণ টাকা তারা পাবেই। এই নির্দিষ্ট অর্থাগমের সম্ভাবনাই রাজ্যে আর্থিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করবে। কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকার তখন ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়েরই প্রাথমিক নীতি অনুসারে আয় বুঝে ব্যয় করতে চেষ্টা করবে—ঘাটতি বাজেট দেখিয়ে অর্থ কমিশনের মন ভেজাতে বা কেন্দ্রের কাছে হাত পাততে বড় একটা যাবে না।

উপসংহার :

হাত পাতা মানেই যে মাথা বিকনো নয় তা শুরুতেই বলেছি। ব্যাপারটা নির্ভর করে পাত পাতার ধরনের ওপর। পুজোর চাঁদা তোলার মত অনেক সময় রাজ্যগুলোও কেন্দ্রের কাছে চোখ রাঙিয়ে হাত পাততে পারে। দাবি মত অর্থ না দিলে 'দেখে নেব' বলে শাসাতেও পারে। দাবি যে মানা হচ্ছে না এ ধারণা মোটামুটি সব রাজ্যের। তবে কোন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ঘোষণা, কোন ক্ষেত্রে বা মৃদু গুঞ্জন। এই মৃদু গুঞ্জনই আবার অবস্থাবিশেষে সুস্পষ্ট ঘোষণায় রূপ নিতে পারে। রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ-কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ—কোন দিক থেকেই এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। দেশের বৃহত্তর এবং দীর্ঘকালীন স্বার্থে তাই ব্যবস্থার রদবদলের চিন্তা অনস্বীকার্য।

—শান্তিকাম মুখোপাধ্যায়

(১৬)

সকালবেলা মালুকে পাঠিয়েছিলাম দীপচাঁদের দোকানে রসদ আনতে। ও গেছে অনেকক্ষণ। রোদ বেশ তেতে উঠেছে। আমি গাছতলায় বসে, ব্রেকফাস্ট খাবার পর চিঠি লিখছিলাম এমন সময় লালির ছোট মেয়ে দৌড়ে এসে খবর দিল মালুকে ধরে কারা যেন খুব মারছে পিছনের মহুয়াতলার মাঠে।

লেখা ফেলে যতজোরে পারি দৌড়ে গেলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে লালিও দৌড়ে এল উদভ্রান্তের মত। হাসান রান্নাঘরে পেঁয়াজ কাটছিল, পেঁয়াজ কাটা ছুরি হাতে ও-ও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল।

আমরা পিছনের উঁচু ডাঙায় উঠে, একটা ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করলাম।

মালু অনেক দূরে ছিল। যে-মাঠে একসময় সর্ষেক্ষেত হলুদ হয়ে থাকত, এখন তা ফাঁকা, বিবাগী। বড় বড় ঝাঁকড়া মহুয়াগাছগুলোর নীচে অতবড় টাঁড়টা বুকের বুকের উপর পিটিসের এলোমেলো ঝোপ নিয়ে সকালের রোদে ধু-ধু দাঁড়িয়ে আছে।

দূরে দেখা গেল মালু আর বুধাই এদিকে হেঁটে আসছে। ওদের পিছনে সেই সাদা ভুতুড়ে বাড়ির কাছে একটা জটলা মত। দূর থেকে চেঁচামেচি ভেসে আসছে।

মারামারি যা হবার তা শেষ হয়ে গেছে তখন।

লালি ও হাসান মালুর দিকে দৌড়ে গেল। আমি ঢিপিটাতে দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ওরা এলে ব্যাপারটা জানা গেল।

মালুর একজোড়া হালের বলদ আছে। খরার সময় ওর খুব অভাব হওয়াতে বছর-খানেক আগে ও এখানের একজন লোকের কাছে বলদদুটো জমা রেখে একশ তিরিশ টাকা ধার নিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই টাকার মধ্যে আশী টাকা সে শোধ করে দেবার পর পঞ্চায়েতে দরবার করে ওর বলদ দুটো ফেরত নিয়ে এসেছিল। কথা ছিল, বাকি পঞ্চাশ টাকাও সে শোধ করে দেবে। কিন্তু সব কথা রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মালুর পক্ষে ত সম্ভবই ছিল না।

হাটে-মাঠে যখনি মালুকে সেই লোকটি ও তার জোয়ান ছেলে দেখতে পেত তখনি গালাগালি করত। কিন্তু মালু মাথায় পাগড়ি ঝুলিয়ে, গায়ে গন্ডারের চামড়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াত। ইচ্ছা থাকলে যে সে টাকাটা দিয়ে দিতে পারত না তা নয়, কিন্তু চট্ করে পারত না। সঞ্চয় বলতে, ওদের কিছুই থাকে না, তাই পঞ্চাশ টাকা দেওয়া মুখের কথা নয়।

কিন্তু তবুও প্রতি শুক্রবার মহুয়া খাওয়া মালুর ঠিকই ছিল। গালাগালি খাওয়ার পর বোধহয় মহুয়ার নেশাটা আরো জমত ভাল।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল। ওদের কর্তব্য ছিল গালাগালি দেওয়া এবং মালুর কর্তব্য ছিল তা ডান-কান দিয়ে শুনে বাঁ-কান দিয়ে বের করে দেওয়া। এই নিষ্পাপ প্রক্রিয়ায় একপক্ষের গলার জোর বৃদ্ধি এবং অন্য পক্ষের শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি কারোরই হচ্ছিল না। গোলমাল বাঁধল যখন হাটের মধ্যে সেই লোকটির জোয়ান ছেলে বুধাইর শাড়ি ধরে টানাটানি করতে লাগল। এরকম দু-তিনবার নাকি হয়েছিল। বধির মালুকে কিছু বলে লাভ নেই জেনে, ওরাও মেয়েটাকে নিয়ে পড়েছিল। হাটে হাঁড়ি-ভাঙার মত, হাটে ইজ্জৎ-নষ্ট করার অসাধু অভিপ্রায়ে ওরা নাকি দু-তিনদিন অমন করেছিল। কিন্তু জায়গাটা হাট বলে এবং ব্যাপারটার মধ্যে ভয়-দেখানোর ইচ্ছাটা যত প্রবল ছিল, প্রবৃত্তিটা তত ছিল না বলে, এবং বুধাইও ব্যাপারটা 'ইটস্ অল ইন দা গেম' বলে নেওয়াতে এত কিছু করেও মালুর কাছ থেকে টাকা ওরা ফেরত পায়নি।

তাই আজ মালুকে পথে একলা পেয়ে বাপ-বেটা মিলে ওকে বেদম প্রহার করেছিল।

মালুর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, রক্ত বেরোয়নি বটে কিন্তু ভীষণ মার খেয়েছে ও। মাথার পাশে, রগের কাছে রীতিমত ফুলে উঠেছে। এবং মালু এমন-ভাবে হাঁটছে যে মনে হচ্ছে ও মহুয়া খেয়েছে। সরল সাদা-মাটা নির্বিরোধী লোকটা ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় একেবারে হক-চকিয়ে গেছে।

এর প্রতিকার কিছু একটা করা উচিত। প্রতিকারটা কিভাবে করা যায় তাই ভাব-ছিলাম। এর যোগ্য প্রতিকার হত, যদি ওদের টাকাটা শোধ দেওয়ার পর, মালুকে ওরা যেমন করে মেরেছে ওদের তেমন করে হাতের সুখ করে মারা যেত। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় আমার বদরক্তের দোষে। মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে জন্মে আমরা বই পড়তে শিখেছি, মনের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তা কাগজে কলমে ফুলঝুরির মত উৎসারিত করতে শিখেছি। কিন্তু যাদের কাছে আমাদের এই ধরনের প্রতিবাদের কোনো দাম নেই, কোনো ফল নেই, তাদের কাছে এরকম প্রতিবাদ হাস্যকর ভীরুতা ছাড়া কিছুই নয়। তারা যেমন লাঠি দু' হাতে ধরে কারো মাথায় সশব্দে বসানোকে তাদের অধিকারের সুস্থ বিকাশ বলে মনে করে, দুহাতে লাঠি ধরে তাদের মাথায় মেরেই শুধু তাদের তেমন শিক্ষা দেওয়া যায়। সেটাই তাদের একমাত্র শিক্ষা। অন্য কোনো ভাষা তারা বোঝে না।

যাই হোক, হাসানকে তক্ষুনি পাঠালাম যারা মালুকে মেরেছে তাদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বলতে। দেখা করতে বললেই যে তারা দেখা করবে এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। কারণ আমি সেকালের জমিদার বা একালের এম-এল-এ নই, আমি কারোরই বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না। আর ক্ষতিই যদি কেউ কারু না করতে পারে —না-করার ক্ষমতা রাখে, ত তাকে মানে কোন

বোকা লোকে? ক্ষমতা মানেই আজকাল ক্ষতি করার ক্ষমতা।

কিন্তু হাসান এসে বলল যে, তারা আসছে আমার সংগে দেখা করতে।

বুঝলাম লোকগুলো আর যাই হোক্, বোকা নয়। তারা আমাকে কোনোরকম খাতির বা সম্মান করে বলে মোটেই আসছে না—তাদের সিক্সথ্ সেন্সে তারা বুঝে গেছে যে আমি যখন বাড়ির মালির সংগে অন্য লোকের ঝগড়ায় নাক গলিয়েছি তখন আর একটা মাত্র মানে হতে পারে। মানে হচ্ছে, মালুর ধার আমি শোধ করে দেব।

মালুকে কোডোপাইরীন খাইয়ে, গরম চা খাইয়ে সুস্থ করলাম।

কিছুক্ষণ পর ওরা দুজনে এবং ওদের সঙ্গীর আরো কজন লোক এসে হাজির হল গেটের সামনে।

ওদের ভিতরে আসতে বললাম।

দেখলাম, খুব শক্ত-সমর্থ চেহারার লোক দুটি।

হাসান বলল, এরা হাসানের খুবই পরিচিত। অথচ হাসানের সংগে এদের চেহারা ও কথাবার্তার কোনো মিল নেই। হাসান শান্ত, সভ্য এবং বিনয়ী—এবং এই লোক-দুটো উদ্ধত, উগ্র এবং দুর্বিনীত।

লোকদুটো এসে কোমরে হাত-দিয়ে দাঁড়াল. শুধোল. কিসের জন্যে তাদের ডাকা হয়েছে? যেন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে, এমন ভাব ঝরে পড়ল ওদের গলার স্বরে।

আমি বললাম, তোমরা ওকে মারলে কেন?

ওরা বলল, সেটা আমাদের ব্যাপার।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

যারা সকলের কাছ থেকেই ভদ্র-সভ্য ব্যবহার করে, পায় ও প্রত্যাশা করে, তারা যখন কারো কাছ থেকে নিষ্প্রয়োজনীয় খারাপ ব্যবহার ও অধিকারহীন ঔদ্ধত্যের ধাক্কা খায় তখন তাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকই কুঁকড়ে যায়—হয়ত মনে ভাবে, এই খারাপদের সংগে নিজেকে সমান করে কি হবে? তাতে নিজের সম্মানই নষ্ট হবে শুধু।

কিন্তু সুকুমার বোস চিরদিনই এইসব সিচুয়েশান দারুণভাবে রেলিশ করে এসেছে।

অসুখের পর, অনেকদিন নিরামিষ, ঘটনাহীন নিস্তরঙ্গ জীবনের পর হঠাৎ ভারী আনন্দ হল। মনে হল, অনেকদিন পর আমি একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র নিছক শারীরিক শক্তির ক্রুড নগ্ন প্রকাশের বিরুদ্ধে মুখো-মুখি দাঁড়াবার একটা সুযোগ পেলাম।

আমি বললাম, মালুর কাছে তোমাদের কত টাকা পাওনা আছে?

ওরা বলল, ছিল পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু সুদে বেড়ে একশ পঞ্চাশ টাকা হয়েছে।

আমি অবাক গলায় বললাম, এক বছরে পঞ্চাশ টাকা সুদে বেড়ে একশ পঞ্চাশ টাকা হয় না।

ছেলেটা কোমরে হাত দিয়ে বলল, হয়। এখানের এইরকমই নিয়ম। এখানে এইরকমই হয়ে থাকে।

বললাম, মালু যদি টাকা শোধ না দিতে পারে?

তবে ওকে মারব, আবার মারব; দরকার হলে জান নিয়ে নেব।

অবাক হয়ে বললাম, জান নিয়ে নেবে? পুলিশ নেই?

ওরা হাসল। বলল, পুলিশ ত খিদিরপুরে থাকে। আসতে আসতে, খবর পাঠাতে পাঠাতে, অনেক ঘণ্টা। তাছাড়া কেউ কাউকে সাক্ষী রেখে ত খুন করবে না। ওসব পুলিশ-ফুলিশের ভয় আমরা পাই না—ওসব আপনাদের জন্যে, ভদ্রলোকদের জন্যে। আমরা ছোটলোক।

ওদের বললাম, শোনো, পুলিশের ভয় আমিও পাই না। তোমরা যদি নিজেদের ছোটলোক বলে বাহাদুরী করতে চাও ত জেনে রাখ, আমিও ছোটলোক। ভদ্রলোকের সংগে ভদ্রলোক; ছোটলোকের সংগে ছোট-লোক।

ইতিমধ্যে লালি কি একটা কাজে এদিকে এসেছিল।

ওকে দেখতে পেয়েই ছেলেটা একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল।

গালাগালি দিতেই আমার মধ্যের গোপন প্রতিবাদকারী মানুষটা তার নিরুদ্ধ উৎস থেকে চকিত ফোয়ারার মত বাইরে এল। আমার অজানিতে আমার ডান হাতটা উপরে উঠে গিয়ে একটা প্রচণ্ড থাপ্পর হয়ে ছোকরাটার গালে পড়ল।

বদমাইস ছোকরা একবার চমকে উঠল, তারপরই বুনো শুয়োরের মত রাগে ফুলে উঠে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল।

যে দশ-পনেরো জন লোক আমাকে ঘিরে ছিল তারা এমন বেড়াতে-আসা ছিপছিপে, চশমাপরা ভদ্রলোকের কাছ থেকে এতবড় একটা ছোটলোকী কর্ম আশা করেনি।

তারা সকলেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, এখানে দাঁড়াও। আমি টাকা নিয়ে আসছি।

লোকগুলো স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল।
আমি ভিতর থেকে পঁচাত্তরটা টাকা এনে খুড়োর হাতে দিলাম।

বললাম, পঞ্চাশ টাকা ধার; পঁচিশ টাকা সুদ, এটাই বেশী। এর বেশী এক পয়সাও পাবে না। আমি সালিশী করতে ডেকেছি তোমাদের শুধু এই জন্যেই, তোমাদের বেশী দেব না।

তারপর বললাম, এই টাকা নিয়ে চলে যাও। ভবিষ্যতে, এদের গায়ে হাত দিও না। যদি দাও ত বুঝবে যে আমিও তোমাদেরই মত থানা-পুলিশে বিশ্বাস করি না। তোমরা যদি করতে, তাহলে হয়ত করতাম। তোমরা যখন না করাটাকে বাহাদুরী বলে মনে কর, আমিও তাই করি। শুধু একটা কথা জেনে যাও যে, যদি আমার কথা না-শোনো তবে পরিণাম ভাল হবে না। তখন জানতে পাবে যে, আমি তোমাদের চেয়েও বড় ছোটলোক; বুঝেছ?

লোকগুলো চলে গেল। ছোকরাটা যাওয়ার সময় বার বার আমার দিকে পিছন ফিরে দেখতে লাগল।

ওরা চলে যেতে লালি দৌড়ে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবু এমন কেন করলেন? আমাদের জন্যে আপনি কেন এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন? আমাদের এরকমই জীবন। এইরকম গালাগালি, মারামারির মধ্যেই আমরা ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, এইসব অসম্মান আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। এর জন্যে যদি আপনার কোনো বিপদ হয় তাহলে কি হবে? তাছাড়া কোনো সাহেব, কোনো বাবুরাই ত এমন করে আমাদের ছোটলোকদের ঝগড়ায় নিজেরা জড়ান না, কোথাওই জড়ান না, তাহলে আপনি কেন জড়ালেন?

আমি হাসলাম। বললাম, আমি ভদ্রলোক তোমাকে কে বলল? ভদ্রলোক কাকে বলে? তারপর লালিকে আমার জন্যে একটু চা নিয়ে আসতে বললাম।

হাসান এসে চুপ করে হাতের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে।
ওর সাদা উর্দির উপরে পেয়ারাগাছের কালো ছায়া কাটাকুটি করছিল। ওর কাঁচা-পাকা দাড়িতে রোদ পড়েছিল। হাসান

বলল, ঐ ছোকরাটা গুণ্ডা, কাজটা আপনি ভাল করলেন না।

আমি হাসলাম, বললাম, তুমি আমাকে ভেবেছ কি? আমিও কি কম গুণ্ডা? আমার নাম সুকুমার গুণ্ডা। এক গুণ্ডা অন্য গুণ্ডাকে কি করবে?

ওরা চলে গেলে, আমার ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। সকালের রোদ, ছায়া, পাখির ডাক, চতুর্দিকের এই সুস্থ সবুজ শান্তি আমাকে বলতে লাগল, 'ঠিক করেছ সুকুমার, তুমি ঠিক করেছ'।

অনেক অনেকদিন পর এই প্রারশই বেঠিক জীবনে একটা যথার্থ ঠিক করায়, আমার মনের মধ্যের ছেলেমানুষ মনটা আনন্দে হাততালি দিয়ে আমাকে বাহবা দিতে লাগল।

ডান হাতের পাতাটা তখনও জ্বলছিল। থাপ্পড়টা সত্যিই প্রচণ্ড জোরে মেরেছিলাম। আমার হাতে এত জোর কিভাবে এল নিজেই তা ভেবে পেলাম না। হাতের পাতাটা তুলে চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

লালি যখন চা নিয়ে এল, লালিকে শুধোলাম, ঐ লোকগুলো কোথায় থাকে?

লালি বলল, স্টেশানে যাবার পথের পাশেই ওদের বাড়ি। তাইত মালুকে ওরা পথের পাশে পেয়ে অমন মারল।

আমি বললাম, ঠিক আছে। এখন তুমি যাও।

চা খেতে খেতে হঠাৎ আমার ভয় ভয় করতে লাগল। যা একটু আগে করলাম, করে ফেললাম, সেটা ভাল করলাম না বলে মনে হতে লাগল।

হয়ত চিরদিনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে একাই দাঁড়াতে হয়। আজকাল ত নিশ্চয়ই। এবং আজকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে বুক-কাঁপে না এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়।

হঠাৎই রোদে বসে বসে চা খেতে খেতে আমার শীত করতে লাগল। বুঝতে পারলাম যে আমার ভয় করছে, ভয় করতে শুরু করেছে।

ভয় একবার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করলে দেখতে দেখতে তা অতিকায় রূপ নেয়, সে যে-ভয়ই হোক না কেন? তাই ভয়কে বড় হবার আগেই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

চা-শেষ করে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম, পিছনের গেট খুলে সেই মহুয়াতলার মাঠের দিকে চললাম।

আমার গন্তব্য ছিলো না। গন্তব্য ছিল ভয়ের বিপরীত মুখে।

গাছগুলো পেরিয়ে ঘরগুলোর পাশের রাস্তায় পড়লাম। আর একটু এগোলেই ওদের বস্তী। ভূতুড়ে বাড়িটা পেরিয়ে যখন ওদের বস্তীর পাশে এসেছি, তখন পথে কাউকে দেখলাম না। যখন একেবারে বস্তীর সামনে চলে এসেছি তখন হঠাৎ সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল।

ও একটি বছর দেড়েকের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে উঠোনে একটি কাঠের গুঁড়ির উপর বসে ছিল। আমাকে দেখেই ও চমকে উঠল—মনে হল ও দাঁড়িয়ে উঠবে অথবা দৌড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে আঘাত করবে। ওর চোখে আগুন জ্বলছিল।

আমি যেন ওকে দেখিইনি এমন ভাবে রাস্তা ধরে এগোতে থাকলাম। আমার চোখ ছেলেটার চোখে লেগে রইল। আমি যখন ওদের উঠোনের সীমানা প্রায় পেরিয়ে এসেছি, হঠাৎ আমার মনে হল, আমার বুকের অস্বস্তিকর ভয়টা হঠাৎ আমার বুক ছেড়ে উধাও হয়ে যেন ঐ ছেলেটির বুকেই সেঁধিয়ে গেল।

ছেলেটা চোখ নামিয়ে নিল, নিয়ে যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি, এইভাবে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

এই নিঃশব্দ, অপ্রচারিত ভয় জয়ের খবর আর কেউ জানল না।

কেবল আমি জানলাম এবং আমাকে সে ভয় পাইয়েছিল সে জানল।

অতদূর যখন এলামই, তখন ভাবলাম স্টেশানে একবার ঢু মেরে যাই।

স্টেশানে পৌঁছেই দেখি সেখানে হুলুস্থুলু কাণ্ড। আজ নাকি স্টেশান ইন্সপেকশান হবে। তাই এত তোড়জোড়।

সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। পয়েন্টসম্যান, গ্যাংম্যান সকলে একেবারে ঝকঝকে তকতকে পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কি মাস্টারমশাইও লুঙ্গি গেঞ্জী ছেড়ে, বোতাম-আঁটা কোট প্যান্ট পরে ব্যস্ত হয়ে আছেন। পানিপাঁড়ের জলের মগও ঝকঝকে করে মাজা হয়েছে। স্টেশান ঘরের ভিতরে সব ছবির মত। সিংবাবু ফোন ধরে কোন স্টেশানকে যেন ক্রমাগত ডেকে চলেছেন আকুল হয়ে,—পত্রাতু বা বাড়কাকানা। মাঝে মাঝে তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে—ম্যাকলাসকি, ম্যাকলাসকি, ম্যাকলাসকি।

মিসেস কার্নির দোকানও আজ ঝকঝক করছে। মাটির খুরি, কপা-ডিম সমস্ত গোছানো রয়েছে। ছেলেগুলো, যারা সিঙাড়া চপ ভাজে তারাও সব জামা-কাপড় কেচে পরেছে।

মিসেস কার্নিও একটা হালকা গোলাপি গাউন পরে, ওর ভাল একটা জুতো পরে, পিছনে হাত দিয়ে, সংকটে-পড়া হিটলারের মত পিছনে হাত দিয়ে প্ল্যাটফর্মে দোকানের সামনে পায়চারী করছেন।

বাড়কাকানার দিক থেকে একটা কয়লা-বোঝাই ডিজেল এঞ্জিনে-টানা মালগাড়ি এসে দাঁড়াল। ওয়াটারিং-পয়েন্টের কাছে তার মুখ রইল—আর তার লম্বা কয়েরী শরীরটা বিছিয়ে রইল ঐদিকের ক্যাবিন পর্যন্ত। এই ডিজেল-গুলো এমন নিঃশব্দে চলে যে, যতক্ষণ না কাছে চলে আসে ততক্ষণ বোঝাই যায় না যে এল।

এখানের নীচু কাঁকর-ফেলা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ডিজেল ট্রেনের দিকে চাইলে মনে হয় এক সারি একতলা কয়েরী বাড়িকে টেনে নিয়ে একটা দোতলা বাড়ি চলে যাচ্ছে। এরা সব সময় হুইসেলও বাজায় না। যখন বাজায় তখন মনে হয় মোঘলা দুপুরের কোনো বিরহী বাইসন বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই ধাতব দীর্ঘশ্বাসের শব্দ চারিদিকের বন পাহাড়ে অনুরণিত হয়ে ফেরে।

আউটার পয়েন্ট ছাড়িয়ে বরাবর বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে চাট্টি নদীর ব্রিজ পড়ে। তার পাশে চাট্টি নদীর দহ। সাহেব-দের যখন খুব রবরবা ছিল তখন এখানে সাঁতার কাটতে এবং পিকনিক করতে আসতো সাহেব-মেমেরা। এখন বড় একটা কেউ আসে না।

এই নদীর কাছেই একটা গুহার মধ্যে ভালুক ছানার ফটো তুলতে সাহায্য করতে গিয়ে গ্রাপ্ সাহেবকে ভালুকে জখম করেছিল। তাঁর বন্ধু ক্যামেরা নিয়ে গেছিলেন, উনি বন্দুক নিয়ে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। যখন দুজনেই গুহার দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়েছিলেন, ভালুক তখন পিছন থেকে এসে ওঁকে আক্রমণ করে জখম করে দেয়। কয়েকমাস ওঁকে হাস-পাতালে থাকতে হয়েছিল।

মিসেস কার্নিকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। উনি কাছে আসতেই বললাম, কি হল? এত চিন্তা কিসের?

মিসেস কার্নিকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

উনি টেনে টেনে বললেন, আমার এই দোকান এখানে থাকুক তা অনেকেই চায় না। অনেক ব্যবসায়ী আমার নামে মিথ্যা-মিথ্যি কমপ্লেন করেছেন যাতে আমার ভেণ্ডর-লাইসেন্সটি বাতিল হয়ে যায়। অথচ কি করে যে আমি চালাই তা আমিই জানি। এই বাজারে রাঁচী থেকে ময়দা জোগাড় করতে হয়—তারপর রুটি বানিয়ে বিস্কিট বানিয়ে বাড়ি বাড়ি [illegible]

তাও কোনোরকমে চলে যাচ্ছে একমাত্র খিলাড়ির কারখানার জন্যে।

আমি শুধোলাম, কেন? কারখানার জন্যে আপনার কি লাভ?

উনি বললেন, বাঃ, কারখানার ক্যান্টিনে নিয়মিত রুটি দিই যে, আমি। সপ্তাহে একদিন করে নিজে যাই পেমেণ্ট আনতে। আমি ত একসময়ই একা, আমার খুঁটি ত কেউ নেই, পয়সার জোরও নেই, তাই আমাকে কোনো অজুহাতে এখান থেকে উঠিয়ে দিতে পারলে কোনো ব্যবসায়ী এই স্টলে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা করতে পারে। ভগবান ছাড়া আমার সহায় কেউই নেই।

দেখতে দেখতে সারা স্টেশানে একটা হৈ হৈ রব উঠল। দেখবার মত দৃশ্য। দূরে থেকে একটা ট্রলি আসতে দেখা গেল।

ট্রলির উপর লাল-নীল ছাতা। কুলীরা এক একবার নেমে পড়ে ঠেলছে এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় তড়াক করে লাফিয়ে পিছনে উঠে পড়ছে।

খাকি হাফ-প্যাণ্ট পরা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক শোলার টুপী মাথায় দিয়ে ট্রলি থেকে নামলেন—তার সঙ্গে রোগা রোগা দুজন ভদ্রলোক।

পরে আরো দুটো ট্রলি এল পর পর। ট্রলিগুলো সবই ডালটনগঞ্জের দিক থেকে এল। এঁরা কারা আমি জানি না, তবে এঁরা যে রেলের অফিসার তা বুঝলাম।

মাস্টারমশাই এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডসেক করলেন, এ-এস-এমরা সকলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ওঁদের কি সব দেখালেন। শুনলাম, এঁদের মধ্যে একজন খুব বড় অফিসার—কাছাকাছি কোন বড় স্টেশানে সেলুন-এ আছেন। সারাদিন ইন্সপেকশান করছেন এ অঞ্চলের স্টেশানগুলো।

ওঁরা স্টেশান-রুমের মধ্যে ঢুকে কিসব কাগজ-পত্র চেক করলেন।

আমি মিসেস কার্নির দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে এইসব সাংঘাতিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিলাম। যাঁরা ইন্সপেকশান করছিলেন—এই ছোট্ট ছবির মত জঙ্গল-ঘেরা স্টেশানটি তাঁদের মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল এঁরা প্রত্যেকে এক একজন জেনারাল রোমেল—মরুভূমির মধ্যে যেন ট্যাঙ্ক-বাহিনী ইন্সপেকট করছেন।

ওঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিই বোধহয় বড়সাহেব। তাঁর মুখ দেখে তাঁকে বিলক্ষণ ভদ্রলোকই মনে হচ্ছিল। মিসেস কার্নির দোকানের সামনে ওঁরা যখন এলেন তখনও আমি উঠে দাঁড়ালাম না দেখে ওঁদের মধ্যে একজন বেশ কটমটে চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমার খুব মজা লাগল। আমি শুধু ওঁর কেন, আমি যে কোনো লোকেরই চাকরী করি না, আমি যে স্ব-নিয়োজিত একজন কর্মচারী একথা মনে পড়ে খুব ভাল লাগল। চাকরী, সে যতবড় চাকরীই হোক, তা চাকরীই, তাতে গ্লানি থাকেই—এ জীবনে সেই গ্লানি থেকে যে মুক্তি পেয়ে গেছি এ কথাটা নতুন করে মনে হয়ে ভাল লাগল।

সেই ভদ্রলোক চোখে চোখ পড়তেই হাসলেন, বললেন, ভাল?

আমিও হাসলাম, বললাম ভালো।

অথচ উনি আমাকে চেনেন না এবং আমিও ওঁকে চিনি না। এবং আমিও ঘাস খাই না যেহেতু এবং উনিও খান না তাই আমরা দুজনেই বুঝতে পারছিলাম উনি এবং আমি সেই সময়ে ঐখানে কি করতে এসেছি।

মনে হল, এমনি কোনো সুন্দর রোদ ঝলমল সকালে কাউকে না চিনলেও, কারো কাছে কোনো কাজ না থাকলেও, একজন চেয়ে থাকলে এবং অন্যজনের কাজ ছেড়ে চোখ তোলার মত অবকাশ থাকলে নিশ্চয়ই এমনি করে 'ভালো' বলা উচিত। ইংরিজী 'হ্যালো'র চেয়ে আমাদের ভাল অনেক ভাল।

মনে মনে ভদ্রলোকের তারিফ করছিলাম। কারণ ভদ্রলোক এতবড় অফিসার হয়ে গিয়েও এখনও ভদ্রলোকই আছেন। এমনটি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

সঙ্গের অন্য দুজন অফিসার প্যাণ্টের থলিয়া-সমান দু' পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁদের চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বেশ খিদে পেয়ে গেছে। ওঁরা আর এই ইন্স-পেকশানের ঝামেলায় থাকতে রাজী নন।

ওদিকের বড় স্টেশানে মুরগী রান্না হয়েছে, কনট্রাকটরেরা সব দেব-দর্শনের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—খাতির, খিদমদগারী, হুজোর, সেলাম ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সকাল থেকে ট্রলি চড়ে খিদে পেয়েছে খুব, পালামৌর স্বাস্থ্যকর হাওয়া লেগেছে চোখে মুখে, ঢের হয়েছে কাজ-কাজ খেলা, এখন ফিরে গিয়ে কোল্ড-বীয়ার খেয়ে হাপুস-হুপুস করে মুরগীর ঝোল আর ভাত খাবেন ওঁরা, তা না, বড়সাহেবের কাজ আর ফুরোয় না।

ওঁরা চলে যাবার সময় সেই ভদ্রলোক আবার হাসলেন। এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। উনি বড়সাহেব বলে নন, ভদ্রলোক বলে।

ওঁরা যেমন এসেছিলেন, তেমন লাউ-গড়-গড় গাড়িতে করে চলে যেতেই সমস্ত স্টেশান আবার আগের রূপে ফিরে পেল। মেয়ে দেখতে এসে বরপক্ষের লোকজন বিস্তর মিষ্টি-সিঙ্গাড়া লুচি-মাংস ধ্বংস করে চলে যাবার পরক্ষণেই মেয়ের বাড়ির বসবার ঘরের অবস্থা যেরকম হয়, ঠিক তেমন

মিসেস কার্নি, ওঁরা চলে যেতেই, দু' হাতে আমার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, তোমার সঙ্গে যে বড়সাহেবের এত খাতির জানতাম না। তুমি আজ এখানে ঠিক এই সময়ে না এসে পড়লে কি হত জানি না। থ্যাঙ্ক-উ সো মাচ্, মাই বয়, উ্য ডোণ্ট নো, হাউ গ্রেটফুল আই এ্যাম।

আমি কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না।

মিসেস কার্নি বললেন, বড়সাহেব বলছিলেন, তোমার ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই—তুমি ভাল করে দোকানটা চালাও—যত ভাল করে পারো—তবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে কোরো। আমি যতদিন আছি, তোমার উপর যাতে অন্যায় না হয়, দেখব। কথা দিলাম। এই অবধি বলেই, মিসেস কার্নি তাঁর ছোট্ট নরম ফুলের মত হাত দুটো দিয়ে আমার হাত আবার জড়িয়ে ধরলেন।

দেখলাম, তাঁর চোখের কোণা দুটি চিকচিক করছে—দুঃখে নয়, স্বস্তির আনন্দে।

আমি অনেকক্ষণ সেই সাহসী যুবতী-বৃদ্ধার হাত দুখানি আমার হাতে ধরে থাকলাম—অনেকদিন আগে এক রাতে লণ্ঠনের আলোর সামনে বসে শোনা অনেক কথা মনে পড়ে গেল।

আমার হাতে হাত রেখে মিসেস কার্নির এখন কি ঘুমিয়ে থাকা অতীতের অন্ধ কার্নিসাহেবের কথা মনে হচ্ছিল?

যখন স্টেশান থেকে চলে এলাম তখন মাস্টারমশাইকে দেখলাম না। ভালোমানুষ ঢিলে-ঢালা মাস্টারমশাই-এর তলপেটে মাড় দিয়ে ইস্ত্রী করা ট্রাউজারের অত্যাচার আর বুঝি সহ্য হচ্ছিল না। উনি নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে আবার লুঙ্গি গেঞ্জী পরে স্বাভাবিক হচ্ছেন।

আজকে স্টেশানে শৈলনকে একবারও চোখে পড়ল না। শুনলাম ও টোড়িতে গেছে কাজে।

ফেরার পথে পোস্ট-অফিস ঘুরে গেলাম।

ছুটির লেখা একটা চিঠি ছিল।

ঠিক করলাম, চিঠিটা ফেরার সময় ঝর্ণাতলায়, পাথরের উপর বসে পড়ব, মনে হবে, ছুটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। রোদ এসে কাটাকুটি খেলছে ওর উজ্জ্বল তরুণ অপাপবিদ্ধ মুখে— আর ও ওর অনাবিল মনের সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলছে।

মিসেস কার্নিকে সত্যি কথাটা বলিনি, বলিনি যে তাঁদের বড়সাহেবকে আমি চিনি না। যদি আমার এই সত্য গোপনের জন্যে তাঁর মনের শান্তি দৃঢ় হয়, তাহলে সেটা না বলা ভাল।

আজকের দিনটা খুব লাকি দিন বলে মনে হচ্ছে। কেন? তা যাঁরা কুষ্টিটুষ্টি গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরাই হয়ত বলতে পারতেন।

দেখতে দেখতে ঝর্ণাটার কাছে এসে পৌঁছলাম।

ঝর্ণায় নেমে পথের ডানদিকে ঝর্ণার ভিতরে ঢুকে গেলাম, গিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে একটা পাথরে বসে ছুটির চিঠিটি খুললাম।

ছুটি লিখেছে,

সুকুদা, দিন চারেক আগে ভোরের দিকে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছিল আমার।

আমি দেখলাম, আপনি আমার ঘরে আমার খাটের সামনের চেয়ারে বসে আছেন। একটা সাদা ট্রাউজার আর নীলরঙা টেনিস খেলার গেঞ্জী পরে আছেন আপনি। আপনি আমাকে কি যেন জরুরী কথা বলতে এসেছেন।

আমি খাটের উপর সামনে দু'পা মুড়ে দুহাতে আমার পা-জড়িয়ে বসে আছি আপনার দিকে চেয়ে।

আপনি বলছেন, দ্যাখো ছুটি, তোমাকে আমি ভালবাসি। একথা অস্বীকার করার নয় যে, তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে চিরদিন ভালবাসব। কিন্তু ছুটি, তুমি যা আমার কাছে চাও, তা আমি তোমাকে কখনও দিতে পারব না।

এই অবধি বলার পরই দেখলাম, আপনি মুখ নীচু করে ফেললেন, যেন আপনার এ কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

সে কথা শুনতে আমার কষ্ট হয়েছিল কি হয়নি সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

আমি মুখ তুলে বলেছিলাম, কেন? তাছাড়া, আমি আপনার কাছে ভালোবাসা ছাড়া আর কী চেয়েছি বলে আপনার ধারণা? আমি ত কখনও আপনার কাছ থেকে আর কিছু চাই নি, এমনকি স্ত্রী হিসেবে সামাজিক সম্মানটুকুও চাই নি। আপনার সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে, শুধু আপনার জন্যেই আপনাকে চেয়েছি। এ ছাড়া আর ত কিছু আমার চাইবার ছিল না।

আপনি বললেন, সে কথা নয়। আমি শরীরের কথা বলছি। আমার প্রতি রমা ট্রু, আমি ওর প্রতি আনট্রুফুল হতে পারি না। কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, ভালবাসব।

আমি বললাম, ভালবাসার এমন শব-ব্যবচ্ছেদের কথা ত আমার জানা ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না কাউকে ভালবাসলে তাকে শুধু মনের ভালবাসাই বাসা যায়, শরীরের ভালোবাসা থেকে আলাদা করে। যে বলে, কাউকে শারীরিকভাবে না চেয়ে শুধু মনে মনে চেয়েই কেউ সার্থক হয়, সে মিথ্যা কথা বলে। আপনাকে কোনদিন আমার সামনে দেবদাসের অভিনয় করতে হবে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি। আমি দেবদাসের ভালোবাসায় বিশ্বাস করি না। সেই সব পার্বতীদের যুগ চলে গেছে। যদি আমি কাউকে ভালোবাসি ত তাকে পুরো-পুরি ভালবাসি। স্বামীর ঘরের ভাঁড়ার সামলে ধন্যা-ন্য সতীলক্ষ্মীর মহিমা কুড়িয়ে আমার মত প্রেমিকের শবের উপর আছড়ে পড়ে আমি কারো সমবেদনা বা সহানুভূতি চাই না। আমি যা চাই, যতটুকু চাই, তা এই জীবনে, এই যৌবনেই চাই।

আপনি বললেন, তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। বললাম, ভবিষ্যতে আপনি আমার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ না রাখলেই আমি কৃতার্থ হব। রমাদিকে শরীরের ভালবাসা বাসবেন, আর আমাকে মনের এমন একটা হাস্যকর অবিশ্বাস্য অনিশ্চয়তা-ভরা ভবিষ্যৎ-এ ভর করে আমি জীবনে বাঁচতে চাই না। আপনাকে আগেও বলেছি যে, অতীত বা ভবিষ্যতে আমি বিশ্বাস করি না, কখনও করব না। আমি শুধু বর্তমানে বিশ্বাসী।

আপনি তবুও বললেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ; ভুল বুঝেছ, আমার কিছু বলার নেই।

এই বলে, আপনি উঠে চলে গেলেন। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আমি উঠে তিন-চার গ্লাস জল খেলাম, বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিলাম, তবুও আমার ঘুম আসল না।

সকালের আলো যখন ফুটল তখন খুব ভাল লাগল একথা জেনে যে, যা শুনলাম, যা বললাম, সবই স্বপ্নের মধ্যে, সবই একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

সুকুদা, আমাকে আমি যতখানি আত্ম-নির্ভর ও স্বাবলম্বী বলে জানতাম, আমি বোধহয় ততখানি নই। এই স্বপ্নটা আমাকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, সাইক্লোনের মত আমার পুরোনো ও গর্বময় বিশ্বাসের মহীরুহগুলোকে এমন করে উপড়ে দিয়ে গেছে যে, আপনাকে এ চিঠি না লিখে পারছি না।

আপনি কেমন আছেন? এই মুহূর্তে কি করছেন? এ চিঠি পড়েই আমাকে জানাবেন।

আমার কেবলি মনে হচ্ছে, এ স্বপ্ন কেন দেখলাম। মনে হচ্ছে, এ দুঃস্বপ্ন যদি কখনও সত্যি হয়, তাহলে সেদিন আমি কি ভাবে সেই সত্যকে গ্রহণ করব? আমার মধ্যে এমন জোর কি আছে? এমন শক্তি কি আছে যে, কাউকে ছাড়াই, কারো ভালোবাসা ছাড়াই আমি এই শীতার্ত পৃথিবীতে একা একা বাঁচতে পারব?

নিজের কোনো-কিছু সম্বন্ধে আমার কোনোদিনও ভয় ছিলো না। আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমি একজন আধুনিক আত্মনির্ভরশীল নিজেতে-নিজে-সম্পূর্ণ মেয়ে। আমাকেও কি কারো দানের উপর, কারো খেয়ালী দয়ার উপর নির্ভর করে বাঁচতে হবে? তেমন করে কি কখনও আমি বাঁচতে পারব? জানি না।

আমার বড় ভয় করে সুকুদা, আমার বড় ভয় করে।

আপনি এর মধ্যে হাতে সময় নিয়ে একদিন রাঁচীতে আসবেন। আপনার মুখোমুখী বসে অনেকক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছে করে। অনেক কথা জমা হয়ে আছে।

ইতি আপনার ভয়-পাওয়া ছুটি।

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

গত ১ চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে বিদগ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়। মূল সভাপতি সত্তরটি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শহরের বিশিষ্ট সুধিবৃন্দ ও বিদ্বজ্জন এই অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে অন্নদাশঙ্করকে মাল্যভূষিত ও উপঢৌকনাদি প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত অন্নদাশঙ্করের গুণভাষণে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতার মাধ্যমে সভাস্থল মুখর কোরে তোলেন। অনুষ্ঠানে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলা রায়ও সর্বক্ষণ তাঁর পাশে সমুপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন-সংগীত, বরেণ্যবরণ, মঙ্গলাচরণ, উদ্বোধনী ভাষণ, স্বাগত সম্ভাষণ, মানপত্র পাঠ, মূল সভাপতির ভাষণ প্রভৃতির পর এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয় সম্পাদকের ধন্যবাদান্তে। এই সংবর্ধনা সমিতির মূল সভাপতি ছিলেন সুকুমার সেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কর্ম-পরিষদের সভাপতি ছিলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং সম্পাদক কেশব দে।

এই উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদপটে অন্নদাশঙ্করের একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র ও 'আমার জীবনদর্শন' নামক তাঁর নিজের একটি তথ্যবহুল ও পরিচ্ছন্ন রচনাসহ আরও কয়েকজন যথা, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল মজুমদার, সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ রচনায় অন্নদাশঙ্করের সাহিত্য-প্রতিভার বিভিন্ন দিক ভাস্বর হয়ে ওঠে। উক্ত পুস্তিকায় অন্নদাশঙ্করের গ্রন্থসূচীটি এই পুস্তিকায় অন্যতম মূল্যবান সংযোজন।

এই স্মারক-পুস্তিকার রচনাগুলি পড়তে পড়তে ১৩৩৫ সালের 'কালি-কলম' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদিলীপকুমার রায়ের একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে যায়। সম্ভবত অন্নদাশঙ্করের গুণবিচারের দিক থেকে এটি একটি প্রাথমিক উল্লেখযোগ্য রচনা। সেকালে অবশ্য অন্নদাশঙ্করের মাত্র সামান্য কয়েকখানি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে এবং সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বর্তমানের ন্যায় ব্যাপকভাবে তখনও আমাদের সমক্ষে প্রকটিত হয়নি। তাছাড়া অন্নদাশঙ্করের অন্যতম সৃষ্টি, কাব্যের দিকটিও এই আলোচনায় এড়িয়ে যায়নি।

শ্রীদিলীপকুমারের উক্ত রচনাটি অত্যন্ত দীর্ঘ। আমরা তার অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করলাম। প্রবন্ধটির নাম : অন্নদাশঙ্কর ও 'তারুণ্য'।

> "No man, indeed, can write anything that matters, who is not a hero at heart, even though to the people who pass him in the street or know him in the house he may seem as gentle as any dove.
>
> Havelock Ellis-Dance of life-Art of Writing.

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে', 'তারুণ্য', 'মনে মনে' প্রভৃতি লেখা পড়তে পড়তে উপরোক্ত কথাগুলি স্বতঃই মনে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হয় ভিতরকার 'হিরো'টিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

অন্নদাশঙ্কর কিছুদিন আগে 'আত্মশক্তিতে লিখেছিলেন একটি বড় খাঁটি কথা— যে, সব স্রষ্টার গোড়াকার বলবার কথা হচ্ছে—আমি নিজেকে দিতে চাই, সত্যগ্রহীতার—আমি গ্রহণ করলাম।

•

বাস্তবিক অন্নদাশঙ্করের 'পথে-প্রবাসে' যেদিন প্রথম চোখে পড়ে, সেদিন বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর গুণীর লেখা যে শ্রেণীর গুণী চিরদিনই কথা ব'লে এসেছে ও পাঁচজনে শুনতে বাধ্য হয়ে এসেছে।

তাঁর 'তারুণ্য' বইখানি পড়তে পড়তে যে-কথা বিশেষ করে মনে হয়েছিল সেটি এই যে, তারুণ্যই এঁর একমাত্র সম্বল নয়: এঁর হাতে আছে সত্য আয়ুধ—বাণীর লেখনী, সদারোষকষায়িতনেত্র সমালোচকের হৃৎস্তম্ভনকারী অগ্নিদৃষ্টিমাত্র নয়।

তারপর অন্নদাশঙ্করের 'মনে মনে' পড়ি 'কালি-কলমে'। তখনও মনে হয়েছিল যে, তরুণদের স্বপক্ষে এত ভাল ওকালতি এ-হেন সাবলীল ভঙ্গীতে যেন আর কেউই এ-অবধি করেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর এ-ওকালতি পড়ে যেন আর একবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম এই স্বীকৃত সত্যটি যে নিন্দামুখর হয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় চট করে নাম হলেও, কোন কিছুর মধ্যে সত্যিকার গুণ গ্রহণ করতে পারাটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর ক্ষমতা।

তাই অন্নদাশঙ্কর তাঁর সৎসাহসের জন্যে নিরপেক্ষ রসগ্রাহীমাত্রেরই এত বেশী ধন্যবাদার্হ বিশেষ করে এই জন্যে যে তাঁর প্রতিপক্ষ মেঘান্তরাল থেকে যুদ্ধ করা সত্তেও তাঁর বাণ ব্যর্থ হয়নি; সে-বাণ যে শব্দভেদী হতে জানে!

কিন্ত এই বাদানুবাদের কথা থাকুক। তার্কিক হওয়াটা ভাল বটে ও ভাল তর্ক করতে পারাটা অনেক সময়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ দিয়ে থাকে এ-কথাও সত্য।— কিন্ত সত্যসৃষ্টির রস—অন্যান্তরের জিনিস।

অন্নদাশঙ্করের সর্বোচ্চ কৃতিত্ব এই যে তিনি শুধু ভাল তার্কিক নন—বড় স্রষ্টাও। তাই আনন্দ হয় যে এমন আর একজন কলাকারুবিৎ আজ বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। আশা করি 'হল এ আরম্ভ যদি—হবে ইহা নিরবধি' —তিনি কাব্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও গল্পাদি লিখে আমাদের রসোপচারে সমৃদ্ধি দান করবেন।

তাঁর ওপরে এ-ভরসা রাখার আমাদের কারণ আছে। কারণ তাঁর লেখার যেমন আছে ধার, তেমনি আছে ভার; যেমন আছে দৃষ্টি, তেমনি আছে শক্তি; যেমন আছে সৌকুমার্য, তেমনি আছে সারবত্তা। য়ুরোপ সম্বন্ধে কোন লোকের ভ্রমণকাহিনী পড়ে আজ অবধি এত আনন্দ পেয়েছি কিনা সন্দেহ। ছোট ছোট ঘটনা থেকে সারবান্ সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতাও তাঁর মুগ্ধকরী।

মনে হয় কী চমৎকার দেখার ক্ষমতা, দেখতে জানলে সামান্য নিদর্শন থেকেও মানুষ কতখানিই না জানতে পারে! অতুলনীয় সূক্ষ্মদ্রষ্টা শরৎচন্দ্রের কথা মনে হয়। তবে অন্নদাশঙ্করের দর্শন অন্য শ্রেণীর।

•

'কিন্তু তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীরই মানুষ নন। তিনি শুধু বলেন যেন এই কথা—'আমার নিজের কপালে কোন লেবলই মারতে চাই না, কেননা আমি কোন কিছু প্রমাণ করবার জন্যেই জীবনকে দেখতে চাই না—কোন কিছু নিহিত সংস্কারের সমর্থন খোঁজার জন্যে বেড়িয়ে বেড়াই না। আমি চাই খোলা মন নিয়ে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা কুড়োতে ও সেই আলোতে সোনা-সত্যের পরখ করতে। এ-বিচারে আমার কাছে স্বদেশ-বিদেশ নেই, সুনীতি-দুর্নীতি নেই, আচার-অনাচার নেই। আছে শুধু জিজ্ঞাসু মনের সবুজ পট ও তার ওপর বাইরের ঘটনা ও ভিতরের অভিজ্ঞতার নিত্যনতুন ছাপ।'

বলা বাহুল্য যে এ-শ্রেণীর মানুষেরই ভ্রমণ সার্থক। এঁরাই দেখতে জানেন।

কিন্তু হলে হবে কি এ-শ্রেণীর মন বড় বিরল, শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই। চলতি সংস্কারকে বুদ্ধি দিয়ে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে চলা সহজ, কিন্তু স্বতঃপক্ষপাতী মনকে সংস্কারমুক্ত করে সত্যগ্রহণের উপযোগী করতে পারাটা নির্ভর করে—অনেকখানি সত্যানুসন্ধিৎসার ওপর, অনেকখানি নিরভিমানতার ওপর, অনেকখানি পৌরুষের ওপর।

•

আর মনটার মধ্যে ঐশ্বর্য থাকলে যে ভ্রমণে সে-ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি দশ গুণ হয়ে ওঠে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় অন্নদাশঙ্করের নানা লেখায়, বিশেষ করে তাঁর 'পথে-প্রবাসে'র নানান ঝকঝকে মন্তব্যে, নির্ভীক সত্যদর্শনে ও মুক্ত সমালোচনায়।

উদাহরণ বহু দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু তাতে প্রবন্ধের কলেবর অনর্থক

স্ফীত করে তোলা হবে বলে 'পথে-প্রবাসে'র মাত্র দুটি জায়গা থেকে উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হব।

সেকাল ও একাল সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি য়ুরোপ ভ্রমণে কী সুন্দর রূপ নিয়েছে—যখন তিনি বলছেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে সেকালের প্রেম ও সতীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমতঃ প্রেম যে চিরস্থায়ী এমনকি দীর্ঘস্থায়ী হবেই এমন কোন কথা নেই। বিবাহের সময় এখনকার তরুণ-তরুণীরা তাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার মত গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করে না যে যাবজ্জীবন পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেই। প্রতিজ্ঞা যদিও বা বাঁধা নিয়ম মেনে করে, তবু লঘুভাবেই করে, মুখে যা বলে মনে তা বলে না। মনে মনে যোগ করে দেয়—'আশা করি'। যেক্ষেত্রে ডিভোর্স যত সুলভ, সেক্ষেত্রে লঘুভাব তত বেশী।'

সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ বলছেন, 'এই লঘুভাবটা না থাকলে মানুষ ভয়ে আধ-মরা হয়ে যেতো। কেননা এখন তো বিবাহ পিতামাতার নির্ব্বন্ধে নয় যে ভুলের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভগবানকে ডেকে আশ্বস্ত হবে। নির্ব্বন্ধ যখন নিজেরি, তখন ভুলের দায়িত্ব নিজেরি। একদিনের ভুলের জন্য চিরজীবন প্রায়শ্চিত্ত করা অসহ্য।'

•

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে কথা হাজারই অনবদ্য ও বেদসম্মত হোক্ না কেন তার পিছনে স্রষ্টার দেখা মিলতেই পারে না যদি বক্তার আত্মাই ঝিমুতে থাকে, কাজেই যখন পণ্ডিত-মহাশয়ের মুখে শুনি 'সদা সত্য কথা বলিবে' গতানুগতিকের মুখে শুনি 'জননী জন্মভূমিশ্চ' ইত্যাদি, তখনও মনটা আমাদের বেজে ওঠে না। কিন্তু যখন শুনি, 'দেহকে ভোগ করতে হয়, ভোগের উপরে যা উদ্বৃত্ত থাকে তারি নাম ত্যাগ। সূর্য্যের পক্ষে যেমন জ্বালার উদ্বৃত্ত জ্যোতি, আত্মার পক্ষে তেমনি 'দেহ' মনের রূপ।... মহাত্মাজী যে মহাত্মা হয়ে উঠলেন এই তাঁর ত্যাগ। তিনি তাঁর কাপড় থেকে ক' ইঞ্চি বাদ দিলেন, তাঁর ভাত থেকে ক' মুঠো বাদ দিলেন—এসব জেনে আমাদের কাজ নেই। আমরা যেমন সূর্য্যের ঘরোয়া জমা-খরচের হিসেব রাখিনে, তেমনি মহাত্মাজীরো ঘরোয়া লাভ-লোকসানের হিসাব রাখবো না, মানুষের ইতিহাসে তাঁকে আমরা পাবো জ্বালাময় প্রক্রিয়ায় নয় জ্যোতির্ম্ময় রূপে।' (যতি ও সতী, তারুণ্য—৫৯ পৃষ্ঠা)—তখন মনটা তার সহস্র দল মেলে হেসে ওঠে—তা এখানে কথাটায় আমরা সায় দিই বা না দিই।

•

যে নাচতে জানে তার বেতালে পা পড়ে না। তাই একদিকে যেমন যার মধ্যে একটা সত্য ব্যক্তিস্বরূপ ফুটে উঠেছে সে একদম বাজে কথা বলতে পারে না, তেমনি অপর দিকে যে-বাণীর মধ্যে প্রাণশক্তি আছে, সে-বাণী কখনো এমন লোকের মুখ হতে উচ্চারিত হতে পারে না যার মধ্যে আত্মার রূপ ফুটে ওঠবার অবকাশ পায়নি। তাছাড়া কোন কথার সত্যতার অনুপাতেই যে আমরা তাতে সাড়া দিই তা ত' নয়—তার মধ্যেকার স্পন্দমান শক্তির অনুপাতেই আমরা তাকে গ্রহণ করি। তাই শুধু আমাদের মতন তরুণরাই সাড়া দেবে তা নয়, বিয়ুগ্ধমতাবলম্বীও একটু না একটু সাড়া দেবেই যখন তারা এ-কথার পিছনে সত্য প্রাণের পরশটি পাবে যে :—

"তার (অর্থাৎ বুদ্ধ জাতির) সব সাধনাই যখন 'মিনিমাম'-এর সাধনা, তখন তার চরিত্রের সাধনাও যে 'মিনিমাম'-এর সাধনা হবে এর সন্দেহ নেই। তাই পুরুষের চূড়ান্ত যতিত্ব নারীর চূড়ান্ত সতীত্ব। দুটোই দেহগত দুটোই দৈর্ব্বনির্ভর। পুরুষ তার দেহটাকে যতো রকমে পারে নিগ্রহ করে তার চরিত্র বাঁচায় এবং শেষ পর্য্যন্ত যদি বাঁচাতে না পারে তবে তার বারো বৎসরের তপস্যা এক মুহূর্ত্তে ব্যর্থ হয়ে যায়। নারী তার দেহটাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে যতোই অসংযত হোক তার সতীধর্ম্মে বাধে না, এমন কি সে স্বামী যদি অপর নারীর স্বামী হয়ে থাকে। কিন্তু সে নিজে অপর পুরুষের স্ত্রী হওয়া দূরের কথা আপন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি অপর পুরুষের দ্বারা স্পৃষ্টা বা দৃষ্টা হয় তবে তৎক্ষণাৎ হাঁড়ির ভাতের মতো ঘর থেকে ফেলা যায় নর্দ্দামায়। মৃত্যু পর্য্যন্ত সতী নামটা বাঁচিয়ে রাখা নারীর কীর্ত্তি নয়, ভাগ্য।১ তবে এ নিয়ে এত জাঁক কেন? কারণ যে দৈবের বর্ষণে হাত চলে না, সে-দৈবের প্রসাদ পেলে জাঁক করাটা আতিবৃদ্ধের অভ্যাস।" (যতি ও সতী, তারুণ্য, ৫৯ পৃষ্ঠা)

•

তরুণ বয়সেই তিনি তাঁর নানা সমালোচনাদিতে যে বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় তিনি যে তাঁর পরম উপভোগ্য রসসৃষ্টির অসামান্য শক্তি দেখিয়েছেন; ও সর্ব্বোপরি,—তাঁর বিচিত্র, জিজ্ঞাসু ও সদাসজাগ চিত্তের যে মনোজ্ঞ ছবি তিনি তাঁর নানা নিবন্ধে ও কবিতায় ইতিমধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে তাঁর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ আশা পোষণ করা স্বাভাবিক।

এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে অন্নদাশঙ্করের কবিতা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—যদিও তাঁর অতি অল্প কবিতাই এ-অবধি প্রকাশিত হয়েছে। তবু—

তাঁর কবিতা যেন একটু বেশি আধ-নিমীলিত চাওয়া, যেন একটু বেশি মিষ্টিক। অথচ কবিতায় মিষ্টিসিজিমের নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়। তার মূল্য খুবই আছে। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তার আবার বিপদও আছে। খুব গভীর অনুভূতির জগতের বারতা ভাষায় দিতে গেলে মানুষ একটু মিষ্টিক হয়ে পড়েই—ভাষা সে-সব জগতের একটু আভাষের বেশি বহন করে এনে দিতে পারে না বলে'। কিন্তু মনের অনুভূতিগুলির উপর অনেক সময়ে একটু কড়া পাহারা রাখা মন্দ নয়। তাতে কবিতার সহজ শ্লথতা ও আধ-জাগা-আধ-ঘুমন্তগোছের নেশার ঘোরটা একটু কাটে। এ নেশাটা যে নেহাৎ মন্দ তাও নয়। তবে নেশার ধর্ম্ম এই যে তা বড় পেয়ে বসে। ফলে হয় এই যে যা সহজে প্রকাশনীয় তাও মানুষ বড় ঘুরিয়ে বলতে যায়। মিষ্টিসিজিমের ক্ষেত্রে এ ঘুরিয়ে বলার লোভ আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে দু'চারটি মিষ্ট কথা ও মামুলি উদাসাত্মক গাঁথুনিতে কানটা আমাদের অনেক সময়ে চট্ করে প্রবঞ্চিত হয় ও বোঝা যায় না যে বক্তব্য বিশেষ কিছুই নেই। কাজেই মিষ্টিসিজিম বা অস্পষ্টতা খুব উচ্চাঙ্গের না হলে কাব্য দূষণীয় বলে মনে করা হয়ত অসঙ্গত নয়।... কিন্তু তাঁর দু' একটি কবিতা সুন্দর—যেমন তাঁর 'সুখ শেষের গান' (ভারতবর্ষ : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫) বা 'কার চুম্বন কাহারে দিয়াছি' (কালি-কলম : কার্ত্তিক, ১৩৩৫) কবিতা।

'সুখ শেষের গানে' মানবমনের একটা ধরা-ছোঁয়া-যায়-না এমন উদাস সুর তার শান্ত আভা নিয়ে বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে। প্রেমনত দীর্ঘপল্লব কালোচোখের মিলন সুখের মাঝেও বড় ব্যথা-ভরা উদাস-বিরহের ছন্দগীতি এ! বন্ধনের মাঝে মুক্তির উজ্জ্বল কামনা, পাওয়ার মাঝে অতৃপ্তির সুধা, চপল নৃত্যছন্দের মাঝে গভীর সুরের পলাতক জ্যোতির বিজলী-পাত, ও সব শেষে বিকচ জীবনের চকিত হাসির মধ্যেও ঝরার দীর্ঘশ্বাস।...

•

প্রেমের গতি বহু বিচিত্র। যাঁদের কল্পনাদীন মন প্রেমের একনিষ্ঠ বিকাশ ছাড়া অন্য সবরকম স্ফূর্ত্তিকে 'নরকস্য দ্বারং' মনে করে থাকেন, তাঁদের কাছে সম্ভবতঃ এ শ্রেণীর কবিতার কোন আবেদনই থাকবে না। কিন্তু জীবনের শত অসঙ্গতির পরিহাস, প্রেমের মালার করুণ প্রত্যাখ্যানের বেদনা, হৃদয়ের মানা-না-মানার ব্যথা, নিবিড় অনুকম্পা সত্ত্বেও প্রেমের ডালি ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে যাওয়ার বিদায়-অশ্রু, অথচ প্রতি নূতন প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের বিদ্যুৎ-চকিত মুহূর্ত্তেও অতীত প্রেমের বেদনা-মধুর স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস—এসব যাঁরা কল্পনা করতে পারেন, তাঁরা এ কবিতাটির মধ্যে একটা নূতন সুর পাবেন বলে ভরসা হয়।" পাছে বাইরের দুনিয়ার ছোঁয়াচ লাগে সে জন্যে আমাদের সতীশিরোমণিদেরও এত ভয়।

—ক্ষপণক

১। কথাটা যে বস্তুত সত্য তার একটা প্রমাণ আমাদের সতী নারীরাই বলে থাকেন, 'মরবে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই।' সতীত্বের জোরের পুরুষের

শাকসব্জি ও দানাশস্য থেকে তৈরী কৃত্রিম মাংস। আঁশ-আঁশ চেহারার এই মাংস যে কোন আকারে তৈরি হতে পারে।

সকলেই জানেন, বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ছে। এখন ৩৫০ কোটি, বাড়তে বাড়তে একুশ শতকের গোড়ার দিকে হবে ৬৫০ কোটি—অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। এমন কি এখনো বিশ্বের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ দারুণ খাদ্যাভাবের মধ্যে রয়েছে। এ-অবস্থায় আগামী শতকে ৬৫০ কোটি মানুষকে খাওয়ানো গুরুতর একটি সমস্যার আকার নিতে বাধ্য।

সমস্যাটা এখনই কম গুরুতর নয়। আমাদের দেশের কথা বাদ দেওয়া যাক, যেখানে প্রায় ৫৫ কোটি মানুষের অধিকাংশই সারা দিনে দুটো ভাত বা দুটো রুটি জোটাতেও পারে না, যেখানে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য তো স্বপ্নের বিষয়। এমন কি জাপানের মতো দেশও—যেখানে প্রতি বছরে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি টন চাল উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে—খাদ্যে উদ্বৃত্ত নয়। এই জাপানকেও প্রতি বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ টন গম ও ২৪ লক্ষ টন সয়াবীন আমদানী করতে হয়। তাছাড়া আমদানীকৃত খাদ্যের তালিকায় সম্প্রতি নতুন যুক্ত হয়েছে মাংস। কিছুকাল আগেও জাপানীদের প্রধান খাদ্য ছিল দানাশস্য, গত কয়েক বছর ধরে পশুজাত খাদ্যের ওপরে জাপানীদের ক্রমবর্ধমান ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে জাপানকে প্রতি বছরে বিদেশ থেকে হাজার পনেরো টনের মতো মাংসও আমদানী করতে হয়।

এই ঘাটতি মেটাতে জাপানে কৃত্রিম মাংস তৈরি করার জন্য বিরাট একটা প্রচেষ্টা চলছে। কৃত্রিম মাংস—কথাটা শুনতেও অদ্ভুত লাগে। তবুও, প্রকৃত মাংসের গুণ-সম্পন্ন কোনো খাদ্য যদি মানুষ তার নিজের হাত লাগিয়ে তৈরি করে নিতে পারে—প্রকৃতির কারখানায় নয়, মানুষের নিজের—তাহলে সেটা অবশ্যই কৃত্রিম মাংস। জাপানের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা থেকে কৃত্রিম মাংস তৈরি করা সংক্রান্ত কিছু খবর বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

কৃত্রিম মাংস তৈরি হচ্ছে প্রধানত দুটি উপায়ে ঃ এক, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি খনিজ উপকরণ থেকে ; দুই, গম সয়াবীন ইত্যাদি দানা শস্য থেকে। দ্বিতীয় উপায়ে কৃত্রিম মাংস তৈরি করা প্রথম উপায়ের চেয়ে বেশ কিছুটা অগ্রসর।

খনিজ উপকরণ থেকে

বলা বাহুল্য, খনিজ উপকরণ থেকে (যথা, পেট্রোলিয়ম থেকে) প্রোটিন বার করা অপেক্ষাকৃত শক্ত, যতোটা না দানাশস্য বা শাকসব্জি থেকে। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত শক্ত উপায়ের ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টির খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের গবে-ষকরা, অধ্যাপক হিসাতেরু মিৎসুদার নেতৃত্বে।

অধ্যাপক মিৎসুদা হচ্ছেন খাদ্যবিজ্ঞানে বিশ্ববিখ্যাত একজন বিশেষজ্ঞ, বহু সম্মানে ভূষিত। যেমন, ভিটামিন বি-টু সংশ্লেষণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য লাভ করেছেন জাপান ভিটামিন আকাডেমি পুরস্কার, নিবিড় ধান উদ্ভাবনের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রাযুক্তিক বোর্ড অধিকারিকের পুরস্কার, ক্লোরেলা থেকে খাদ্য তৈরি করায় গবেষণার জন্য জাপান ডায়েটেটিক খাদ্য আকাডেমির পুরস্কার। খনিজ উপকরণ থেকে প্রোটিন নিষ্কাশন—বহু কৃতিত্বের অধিকারী এই বিজ্ঞানীর নবতম অতুলনীয় কৃতিত্ব।

পদ্ধতির অতি সরল একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অধ্যাপক মিৎসুদা ও

কৃত্রিম মাংস—কৃত্রিম প্রোটিন

স্কাইল্যাব

ধূমপান ও ক্যানসার

তাঁর গবেষক সহকর্মীরা দেখলেন, পেট্রো-লিয়মে যে প্যারাফিন থাকে তাতে ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন হয় আর এই ব্যাকটিরিয়ায় পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণ উচ্চগুণসম্পন্ন প্রোটিন। এ থেকেই তাঁদের পদ্ধতির উদ্ভব—ব্যাকটিরিয়া উৎপন্ন করে প্রোটিন লাভ। তবুও সমস্যা থেকে যায়। শুধু প্রোটিন পেলেই চলে না, খাদ্য হিসেবে সেটি গ্রহণীয় হওয়া চাই। দেখা গেল ব্যাকটিরিয়ার কোষ-প্রাচীর হজম করার পক্ষে বড্ডোই কঠিন আর খোদ ব্যাকটিরিয়ার এমন এক তীব্র গন্ধ যে খাদ্য হিসেবে পাতে দেওয়ার অযোগ্য। আরো গবেষণা চালিয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তরলীকৃত ইউরিয়া ব্যবহার করে ব্যাকটিরিয়ার কোষ-প্রাচীর ভাঙলেন এবং উচ্চমাত্রার পুষ্টিকর এক স্বাদহীন বর্ণহীন প্রোটিন তৈরি করতে সমর্থ হলেন।

এই সাফল্য সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা গোড়ার দিকে সন্দিহান ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানিতে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য তৈরির ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছিল, কিন্তু সাফল্য লাভ হয়নি। তাই গোড়ার দিকের সন্দেহ। জাপানী বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্ব যে অসাধারণ সেটা এ-কারণে অবশ্য স্বীকার্য।

ইতিমধ্যে জাপানের কয়েকটি পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পসংস্থা শিল্পগতভাবে পেট্রোলিয়ম থেকে প্রোটিন উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়ে বসেছেন। এমন সব কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে বছরে ১০,০০০ টন প্রোটিন উৎপন্ন হবে। গোড়ার দিকেই এই প্রোটিনকে সরাসরি মানুষের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়তো চলবে না, কেন না কিছু সমস্যা এখনো থেকে গিয়েছে। তবে এই প্রোটিনের সাহায্যে অন্য খাদ্যকে অবশ্যই প্রোটিনযুক্ত করা চলবে। তাও মস্ত লাভ।

স্বীকার করতেই হয়, খনিজ উপকরণ থেকে শিল্পগতভাবে প্রোটিন উৎপাদনে জাপান বিশ্বে অগ্রস্থানীয়।

গবেষণাগারে পরীক্ষারত বিশ্বখ্যাত খাদ্য বিজ্ঞানী ডঃ হিসাতেরু মিৎসুদা। সম্প্রতি তাঁর পরিচালনায় জাপানের কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকালটির খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের গবেষকরা। পেট্রোলিয়ম থেকে কৃত্রিম মাংস তৈরি করছেন।

কৃত্রিম মাংসে তৈরী নানাধরনের খাদ্য। দেখে মনে হয় আসল মাংসের তৈরি খাদ্যের চেয়েও সুস্বাদু, নয়নমনোহর তো বটেই।

কৃত্রিম মাংস তৈরির প্রক্রিয়া

বাজারে বিক্রির জন্য কৃত্রিম মাংস।

শাকসব্জি ও দানাশস্য থেকে

জাপানে তেল চাটনি মিস্টান্ন ময়দা ইত্যাদির উৎপাদকদের মধ্যে জনাকুড়ি সংস্থা শাকসবজি ও দানাশস্য থেকে কৃত্রিম মাংস তৈরি করায় হাত দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই প্রচুর পরিমাণে সয়াবীন বা গম ব্যবহার করতে হয়। আনুষঙ্গিক হিসেবে যা পাওয়া যায় সেগুলোকেই তাঁরা ব্যবহার করছেন প্রোটিন তৈরি করার জন্য। পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু, ধরে নেওয়া চলে, কৃত্রিম মাংস তৈরী হচ্ছে সয়াবীন বা গম থেকে নিষ্কাশিত প্রোটিন ঘনীভূত করে। তার পরে চলে রাসায়নিক উপায়ে প্রক্রিয়ণ। চূড়ান্ত রূপটি হয় লম্বা লম্বা আঁশযুক্ত ফালি কিম্বা কুঁচি কুঁচি টুকরোয়। যে-সব কারখানায় কৃত্রিম মাংস তৈরী হচ্ছে সেখানকার কর্মচারীদের খাওয়ার সময়ে কৃত্রিম মাংসের হ্যামবুর্গ স্টীক ও অনুরূপ অন্যান্য খাদ্য দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীরা ধরতেই পারে নি মাংস আসল নয়, কৃত্রিম। কৃত্রিম মাংসের সুবিধে এই যে তার দাম আসল মাংসের (শুয়োরের) দামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ. কৃত্রিম মাংসকে যে-কোন আকার দেওয়া চলে এবং যেটা সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ মাংসের চেয়ে কৃত্রিম মাংসে স্নেহপদার্থ কম। করোনারির অসুখের ভয়ে যাঁরা মাংস খেতে চান না, তাঁরাও নির্ভয়ে কৃত্রিম মাংস খেয়ে যেতে পারেন।

বলা হয়েছে, কৃত্রিম মাংসকে হুবহু আসল মাংসের মতো করে তোলার জন্য এখনো কতকগুলো প্রক্রিয়ণগত প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা চলছে। যেমন, আসল মাংস যতোখানি দাঁতে লাগে কৃত্রিম মাংসকেও ততোখানি লাগানো, আসল মাংসের গন্ধ ও স্বাদ কৃত্রিম মাংসে আনা, ইত্যাদি। জাপানের বাজারে এই কৃত্রিম মাংস বিক্রি হচ্ছে আঁশ-আঁশ দানা-দানা ও চাকা-চাকা আকারে। তারপরে বাড়িতে খাওয়ার জন্য তৈরী করার সময়ে এই কৃত্রিম মাংসকে যে-কোন আকার দেওয়া চলে। এমন এক নিখুঁত ব্যাপার যে, ভোজনবিলাসীও এখন আর চট করে ধরতে পারেন না কোনটি আসল মাংস আর কোনটি কৃত্রিম।

কৃত্রিম মাংস তৈরী হওয়ার মতো উপকরণ আমাদের দেশেও প্রচুর। মাঝে শোনা গিয়েছিল ঘাসে নাকি প্রচুর প্রোটিন আর তাই নিয়ে গবেষণা চলছে। এখনো কোথাও কোন গবেষণা চলছে কিনা, আমার জানা নেই। তবে একথা ঠিক, এই দুর্ভিক্ষের দেশে বিশেষ জরুরী ভিত্তিতেই গবেষণাটি চলা উচিত। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, ফলন অবশ্যই বাড়ানো চাই, সেই সঙ্গে কৃত্রিম খাদ্যের উৎপাদনও।

স্কাইল্যাব
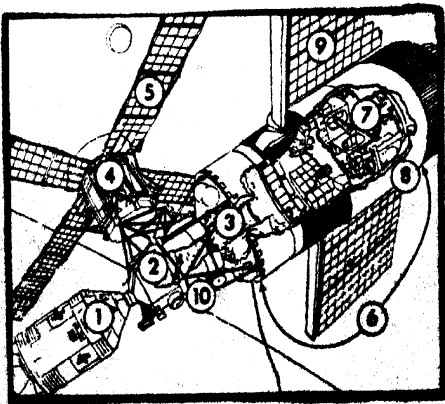
অ্যাপোলো পর্যায়ের চন্দ্র-অভিযান শেষ হয়েছে, পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে মানুষ পা দিয়েছে চাঁদের মাটিতে। এবারে শুরু হচ্ছে ভিন্ন ধরনের এক মহাকাশ অভিযান ও গবেষণা। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে স্থাপিত হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপরিক্রমারত আমেরিকার প্রথম স্পেস-স্টেশন 'স্কাইল্যাব'। তারপরের আট মাসে তিনজন করে নভশ্চরের তিনটি দল পর্যায়ক্রমে এই গবেষণাগারে গিয়ে থাকবেন ও কাজ করবেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণের বিষয় হবে আমাদের এই পৃথিবী, সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক।

স্কাইল্যাব আকারে হবে অতি বৃহৎ—তিন বেডরুমের সম্পূর্ণ এক বাড়ির

সমান। থাকার ও কাজ করার জায়গা ২৮০ ঘনমিটার মাপের। বেডরুম ছাড়াও থাকবে শাওয়ার সমেত বাথরুম, কিচেন ও বৃহৎ একটি ল্যাবরেটরি। থাকবে ডাইনিং টেবিল, ফ্রীজ ও ভাঁড়ার রাখার জায়গা। বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য জানলা। অনেক-গুলো দূরবীক্ষণযন্ত্র সমেত প্রচুর যন্ত্রপাতি। পৃথিবীর ধনসম্পদ সম্পর্কিত পরীক্ষাকার্য চালাবার জন্য ইলেকট্রনিক অনুধাবক।

সূর্য নক্ষত্র ও পৃথিবী সম্পর্কে আরো জ্ঞানলাভের জন্য স্কাইল্যাবের নভশ্চররা পঞ্চাশটিরও অধিক পরীক্ষাকার্য চালাবেন। তার মধ্যে একটি পরীক্ষাকার্যের তদন্তের বিষয়—ভারতের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এই বিশেষ পরীক্ষা-কার্যটির পরিকল্পনা করেছেন আমেদা-বাদের ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংগঠনের গবেষক ডঃ পি রাম পিশারতি।

স্কাইল্যাবের নভশ্চররা আরো যে-সব পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছেন তা থেকে জানা যাবে ফসলের সম্ভাবনা, ফলনের পরিমাপ, জলের ব্যবস্থাপনা, উদ্ভিদের রোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য। সমুদ্রবিজ্ঞানী, জল-বিজ্ঞানী, ভূবিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদদের তাঁরা জানাতে পারবেন প্রচুর নতুন খবর। বলা হয়েছে, পৃথিবীর জীবনযাত্রার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করাই হবে স্কাইল্যাবের উদ্দেশ্য।

এই সঙ্গে প্রকাশিত স্কাইল্যাবের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে (১) কম্যান্ড ও সার্ভিস মডিউল, (২) ডকিং ব্যবস্থা, (৩) এয়ারলক মডিউল, (৪, ৫, ৯) সৌর গবেষণার জন্য দূরবীক্ষণযন্ত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থা, (৬) কারখানা, (৭) নভশ্চরদের থাকার জায়গা, (৮) উল্কাকণার বেড়া ও (১০) পৃথিবীর সম্পদ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় গত ৫ই মার্চ তারিখে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দূরবীক্ষণযন্ত্রটি চালু হল। এটি স্থাপিত হয়েছে কিট পীক জাতীয় মানমন্দিরে, আরশির ব্যাস ১৫৮ ইঞ্চি বা ৪০০ সেন্টি-মিটার। এটির সাহায্যে পৃথিবী থেকে কয়েক শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের বস্তুকেও দেখা যাবে ও তার আলোকচিত্র নেওয়া যাবে (আলোর বেগ সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ২,৯৮,০০০ কিলো-মিটার, এই বেগে এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্বকে বলা হয় আলোকবর্ষ)। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে পাঁচ বছর, খরচ পড়েছে ১ কোটি ডলার (সাড়ে সাত কোটি টাকা)। দূষিত বাতাস থেকে মুক্ত মরুভূমি এলাকায় সমুদ্রতল থেকে ৬,৯০০ ফুট (২,০০০ মিটার) উঁচু পর্বতের চূড়োয় ১৮৫ ফুট (৫৫-৫ মিটার) উঁচু ভবনে এই দূরবীক্ষণযন্ত্রটি স্থাপিত।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সৌর শক্তি

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য থেকে পৃথিবীতে অজস্র বৈদ্যুতিক তেজ সরবরাহ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাসা (ন্যাশনাল এরোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) চারজন গবেষককে নিয়ে একটি পর্যবেক্ষক-দল গঠন করেছেন।

প্রাযুক্তিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা করার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে ২২,৩০০ মাইল বা ৩৫,৮৯০ কিলোমিটার উঁচুতে একটি উপগ্রহ স্থাপন করা হবে। এই বিশেষ উচ্চতায় থাকার দরুণ এই উপ-গ্রহটির পৃথিবীর চারদিকে এক পাক ঘুরতে যত সময় লাগবে তা হবে পৃথিবীর নিজের অক্ষের চার দিকে এক পাক ঘোরার সময়ের (অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা) সমান। ফলে পৃথিবী থেকে তাকালে মনে হবে উপগ্রহটি যেন স্থির। এটিকে স্থাপন করা হবে বিশেষ একটি ভৌগোলিক এলাকার ওপরে। এটি হবে একটি সৌর পাওয়ার স্টেশন, এখানে সৌর তেজ রূপান্তরিত হবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে। মাইক্রো ওয়েভ বীমের সাহায্যে এই বৈদ্যুতিক শক্তি এসে পৌঁছবে পৃথিবীর গ্রাহক স্টেশনে, সেখান থেকে প্রচলিত উপায়ে অন্যত্র।

পরে, সৌরতেজ থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে দেখা হবে কোন পদ্ধতিটি সব-চেয়ে সুবিধের।

ধূমপান ও ক্যানসার

ধূমপানের সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী কিছু নতুন কথা শুনিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, যে-সব পরিবর্তনের ফলে ক্যানসার হয় তার বিরুদ্ধে কোষকে রক্ষা করে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড সেটি সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ক্ষতিটি সাধন করে অ্যাসিটাল-ডিহাইড নামে একটি গ্যাস। তামাকের মধ্যে যে শর্করা থাকে তা পুড়লে এই গ্যাস তৈরি হয়।

এ-কারণে দেখা যায়, যে-তামাকে শর্করার মাত্রা কম সেই তামাকের ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যানসারও কম। শর্করার মাত্রা বেশি হলে ক্যানসারও বেশি।

যতো বেশি সংখ্যক সিগারেট খাওয়া হয়, ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ততো বেশি। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিলেও ক্যানসার-প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

গবেষক বিজ্ঞানী দুজনের নাম মাইকেল ফেনার ও জেমস ব্রাডেন। আরো গবেষণার জন্য শীঘ্রই তাঁরা ইউরোপের একদল গবেষক বিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।

—জয়ন্তকান্ত

একটি প্রাচীন জনপদ

ত্রিপুরা বসু

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণা থানায় চন্দ্রকোণা একটি প্রাচীন জনপদ। মেদিনীপুর শহর থেকে ঘাটাল-মেদিনীপুর রোড ধরে বাসে গিয়ে যে-কোন সময়ে এই প্রাচীন ও ক্ষুদ্র শহরের 'বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি'র অসংখ্য কারুকার্যখচিত বিভিন্ন রীতির প্রস্তর ও ইষ্টকের দেব-মন্দির, ঠাকুরবাড়ী, বৈষ্ণব মঠ, মুসলমান পীরদের আস্তানা, প্রস্তরের অসংখ্য মূর্তি, শিলালিপি, সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, পরিখা বেষ্টিত প্রাচীন ঢিপি, রাজা-রাজড়াদের ধ্বংসপ্রাপ্ত অসংখ্য অট্টালিকা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। ঘাটাল-মেদিনীপুর পীচ রোড এই শহরটির উপর দিয়ে চলে গেছে। প্রাচীন দিনের কথা বাদ দিলে বর্তমানে এই বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন জনপদটির আয়তন ৬-৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১০,০০০। অধিবাসীরা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান। জনপদটির চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে দ্বিশতাধিক মন্দির। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে লক্ষ্মণের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রকেতুকে শ্রীরামচন্দ্র এই চন্দ্রকোণা জনপদের (প্রাচীন নাম 'চন্দ্রকান্তা' বা 'চন্দ্রানগরী') অধিকার দান করেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই চন্দ্রকেতুই চন্দ্রকোণা রাজ্যের আদি নরপতি। কারও কারও মতে ইনি 'কেতু' বংশের মানুষ ছিলেন। এঁর বংশধররা জয়কেতু, পুষ্পকেতু, ২য় চন্দ্রকেতু ক্রমান্বয়ে এ-রাজ্য শাসন করেন। কেতু বংশের শেষ রাজা ২য় চন্দ্রকেতুর রাজত্বকালে সোলেমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের অত্যাচারে কেতুসম্রাট কর্তৃক পরিশোভিত চন্দ্রকোণার অনেক সুরম্য বস্তুসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। পরে গৌড়রাজ হুসেন শাহ্ এ-রাজ্য দখল করে নেন। এ-সময় চন্দ্রকোণা রাজ্য উত্তরে শিলাবতী ও দক্ষিণে কংসাবতী নদী পর্যন্ত, পূর্বে মণ্ডলঘাট ও পশ্চিমে বকডিহি পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রকোণার 'নেড়া' বা 'রাঢ়া দেউল' ছিল বাংলা ও উড়িষ্যার সীমারেখা।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাত্রাকালে (১৪৮৫ খৃঃ) চন্দ্রকোণার কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করেন। ১৫৫৬ খৃঃ মোগল পাঠান সংঘর্ষকালে চৌহান বংশীয় বীর ভানুসিংহ এখানে এসে কেতুবংশীয় রাজাদের ৮০ বর্গমাইল এলাকা দখল করে নেন। হরিভানু, মিত্রভানু, সূর্যভানু, সমসেন, রঘুনাথ প্রভৃতি রাজা দীর্ঘকাল এ-রাজ্য শাসন করেন। এঁদের আমলে চন্দ্রকোণা নগরীর চার পাশে পরিখা খনন করা হয়। পূর্বে ভৈরবপুরের পীর ফটক, পশ্চিমে লালগড় ও রামগড়ের মধ্যস্থ 'বড় দরজা', উত্তরে 'হনুমান দরজা' ও দক্ষিণে 'জোমরডাঙ্গা দরজা'—এই চারটি ছিল চন্দ্রকোণার প্রবেশদ্বার।

সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যখন (১৫৯৬ খৃঃ) পাঠান দমন করতে এ-দেশে আসেন তখন রঘুনাথগড়াধিপতি রঘুনাথ সিংহের সঙ্গে তাঁর প্রবল সংঘর্ষ ঘটে। রঘুনাথ সিংহ ও ভানরাজ হরিভান সিংহ উভয়েই মানসিংহের নিকট পরাজিত হন। এ-সময়কার ৬০।৭০ বৎসরের চন্দ্রকোণার ইতিহাস নানা দুর্যোগের ঘনঘটায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংস্কৃতির অবলুপ্তির ছায়ায় হতাশাকাতর। ১৭৬০ খৃঃ ২৭ মে সন্ধির সর্তানুসারে নবাব মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে কয়েকটি চাকলার অধিকার ছেড়ে দেয়। ঐ সময়ের হিসাব থেকে জানা যায় বহু পূর্ব থেকে মেদিনীপুর জেলার বকডিহি, ব্রাহ্মণভূম, বরদা, চন্দ্রকোণা, চেতুয়া, জাহানাবাদ, মণ্ডলঘাট, ভুরশুট প্রভৃতি পরগণা চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত ছিল। যাই হোক, ১৬৯৪ খৃঃ সম্রাট আওরঙ্গজীব প্রদত্ত এক ফরমানে চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায় বর্ধমান পরগণার জমিদারী ও সমগ্র চাকলা বর্ধমানের সরকারী রাজস্ব আদায়ের ভার লাভ করেন। চন্দ্রকোণাধিপতি চন্দ্রভান ও বরদারাজ শোভা সিংহ কয়েক বৎসরের রাজস্ব বাকী ফেলেন। আসাম সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত 'বাহারিস্তন-ই-ঘায়েবী' অনুসারে জানা যায়, ১৭শ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদেশে যে বিদ্রোহাগ্নি ধূমায়িত হয় তা শতকের শেষে প্রকট হয়: ১৬৯৬ খৃঃ ২য় রঘুনাথ সিংহ, চন্দ্রভান সিংহ, পাঠানসর্দার রহিম খাঁ ও চেৎবরদারাজ শোভা সিংহ একত্রে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়ের মোগলপ্রীতি অবসানের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ-বিদ্রোহে রাজা কৃষ্ণরাম নিহত হন। রাজা শোভা সিংহ রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে পতিত হয়ে মারা যান। কৃষ্ণরাম-পুত্র জগৎরাম বর্ধমানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তীকালে কীর্তিচাঁদ, চিত্রসেন, তিলকচন্দ্র, তেজচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিরা বর্ধমান রাজ্য শাসন করেন। ১৭৩১ খৃঃ রাজা কীর্তিচাঁদ রঘুনাথ সিংহকে পরাস্ত করে চন্দ্রকোণা রাজ্য দখল কালে নগরের রামগড়, লালগড়, রঘুনাথগড়, বারদুয়ারী ইত্যাদি ধ্বংস করেন। ভানবংশের সকলে নিহত হয়। ১৭৩৪ খৃঃ বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের মোহরাঙ্কিত সনদ অনুসারে রাজা কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোণা বরদা ও চেতুয়া পরগণার জায়গীর লাভ করেন। এই হোল চন্দ্রকোণা রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

চন্দ্রকোণা নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে নির্মিত অসংখ্য মন্দির মসজিদের অনেকগুলিই আজ অবলুপ্ত। তবু 'বাহান্ন বাজার তিপান্ন গলি'র এই প্রাচীন জনপদটির রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণকালে নজরে পড়বে কালের সঙ্গে সংগ্রামে কোনমতে টিঁকে থাকা নানা ধরনের অজস্র মন্দির ও দেবালয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হোল জগমোহনসমন্বিত টেরাকোটাসজ্জিত পশ্চিমমুখী পঞ্চরত্নের শিবমন্দির (ইন্দ্রাসবাজার), পুরুষোত্তমপুরের ত্রয়োদশরত্ন দক্ষিণমুখী শিবালয়, রঘুনাথপুরের পার্বতীনাথ শিবের সপ্তদশরত্ন মন্দির, অযোধ্যাপল্লীতে বর্ধমান-রাজের 'রঘুনাথবাড়ী' নামক বৃহৎ ঠাকুরবাড়ীর রঘুনাথ লালজীউ, দক্ষিণাকালী, বটুকভৈরবী দুর্গা, রামেশ্বর শিব ও হনুমানের সুবৃহৎ মন্দিরসমূহ, রামগড়ের রাজভাসে রঘুনাথ জীউ-এর ভগ্নমন্দির, 'কুঞ্জবিহারী বেড়ে' কুঞ্জবিহারী গোস্বামীর সমাধিমন্দির, গোঁসাইবাজারে প্রেমসখী গোস্বামীর প্রাচীন সমাধিমন্দির, মল্লেশ্বরপুর গ্রামে রাজা খয়েরমল্ল প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর জীউ-এর ঠাকুরবাড়ী, বারদুয়ারী মহলের পশ্চিমদিকে বৌদ্ধযুগে নির্মিত জোড়বাংলা মন্দির, দক্ষিণবাজারে শান্তিনাথ শিবের মন্দির, মিত্রসেনপুরে রানী লক্ষ্মণাবতী প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির, বৈকুণ্ঠপুরে চৌহানরাজপত্নী প্রতিষ্ঠিত গোপীমোহন জীউ-এর মন্দির, বালাগ্রামের বালাবুড়ীর মন্দির ও বসন্তপুরে ভৈরবীর মন্দির প্রভৃতি। প্রস্তরনির্মিত কারুকার্য খচিত ও সুনিপুণ স্থাপত্যরীতির অসংখ্য মন্দির ছাড়াও রামগড়ে নানক সম্প্রদায়ের মঠ, জয়ন্তীপুরে মাধবাচার্যের অস্থল, রঘুনাথগড় নয়াগড়ের রামানুজ সম্প্রদায়ের 'বড় অস্থল,' নরহরিপুরে রামানন্দী সম্প্রদায়ের 'সেজ অস্থল,' দাশদহে নাগা সম্প্রদায়ের প্রাচীন মন্দির, লালবাজারে রাধারসিক জীউ-এর পাট, পুরুষোত্তমপুরের শ্রীভাগবতাশ্রম, পলাশচাবড়ীর ত্রিবেণীদাস মহারাজের আশ্রম, গোঁসাইবাজারে ফতেখাঁর কবরস্থান, পিয়ারডাঙ্গায় হজরত সৈয়দ শাহ্ ঈশা পীরের আস্তানা প্রভৃতি চন্দ্রকোণা জনপদের সু-প্রাচীন ইতিহাসের মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

বিস্মৃতপ্রায় এই জনপদের শিল্প-সাহিত্য ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য একদা সারা দেশের গর্বের বস্তু ছিল। এখানকার তাঁত-শিল্প, পিতলের দ্রব্য নির্মাণ শিল্প, তুরি-ভেরি-শিঙ্গা প্রভৃতির নির্মাণ কৌশল, পাখোয়াজ ও তবলা শিল্প, মৃৎ-শিল্প প্রভৃতির ধারাস্রোত বর্তমানে শুষ্কপ্রায়। সমকালীন কবির কাব্যে চন্দ্রকোণার প্রশংসার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। বর্ধমানের রাজসভার সুকণ্ঠ গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রকোণার মানুষ ছিলেন। চন্দ্রকোণার জ্ঞানপ্রধান মনীষী ও চন্দ্রকোণার বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের সংগ্রাহক

শ্রীরাধারমণ সিংহের নিকট রক্ষিত 'রসভক্তি-চন্দ্রিকা,' 'রাধারসমঞ্জরী', 'জাতিবাহনের পালা', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'কামশাস্ত্র', 'ভক্তিচিন্তামণি', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'পুরুদক্ষিণা', 'চৈতন্যমঙ্গল,' 'মহাভারত,' 'রামায়ণ' প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথির পৃষ্ঠিকায় প্রাচীন চন্দ্রকোণার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু সন্ধান মেলে। বস্তুতঃ পুরাতত্ত্বের দৃষ্টি কোণ থেকে এ প্রাচীন নগরীর মূল্য অসীম। এখানকার লাল ল্যাটারাইট মাটির অভ্যন্তরে বিস্মৃত চন্দ্রকোণার অবলুপ্ত করুণ কাহিনী নিদ্রায় শায়িত। কত রাজা-জমিদারের দাম্ভিকতা, কত প্রজার চোখের জল, কত ব্যর্থতা ও রিক্ততার দীর্ঘশ্বাস যে চন্দ্রকোণার পরিত্যক্ত জনহীনপ্রায় গড়গুলিতে বিক্ষিপ্ত তার ইয়ত্তা নেই। পুরাতত্ত্বের তরুণ কর্মী ও চন্দ্রকোণার অধিবাসী শ্রীকানাই দীর্ঘাঙ্গী অশেষ শ্রম স্বীকার করে চন্দ্রকোণার হারানো ইতিহাসের অনেকাংশ 'ভগ্ন দেউলের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে নথিবদ্ধ করার প্রাথমিক প্রয়াসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

চন্দ্রকোণায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন দেবালয় প্রাঙ্গণে রক্ষিত ও বৃক্ষতলে দেবতারূপে পূজিত বিভিন্ন মূল্যবান শিলালেখ, জৈন ও বৌদ্ধমূর্তি, প্রস্তর খোদিত দেব-দেবীর মূর্তি প্রভৃতির উপর সুষ্ঠু গবেষণার কাজ হলে এ-দেশের আরো কত অজ্ঞাত ইতিহাসের অধ্যায় জনসমক্ষে স্থাপিত হবে নিঃসন্দেহে। কুমারগঞ্জ বাজারের নিকট অশ্বত্থতলে পূজিত ভগ্ন জৈন প্রস্তরমূর্তি, গোঁসাই বাজারের নবকুঞ্জের ডাঙ্গা থেকে প্রাপ্ত জৈনমূর্তি শ্রীরাধারমণ সিংহের নিকট রক্ষিত অষ্ট ধাতু নির্মিত বৌদ্ধমূর্তি, বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ধর্মশিলা, অযোধ্যাপল্লীর ঠাকুরবাড়ীতে রক্ষিত পার্শীলিপি বিশিষ্ট পাঁচ ফুট লম্বা একটি লোহ কামান, গোস্বামী পুষ্করিণীর পাড়ে স্থাপিত লিপিযুক্ত সমাধি মন্দিরসমূহ, বিভিন্ন দেবমন্দিরের প্রাচীন লিপিফলক, পলাশচাবড়ী বিষ্ণুমন্দির প্রাঙ্গণে রক্ষিত ক্ষেত্রপালের ষড়ভুজ মূর্তি ও বিভিন্ন সময়ে চন্দ্রকোণার মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য প্রত্নবস্তুসমূহ চন্দ্রকোণার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান। রঘুনাথপুরের বর্ধনবাটিতে রক্ষিত একটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি রক্ষিত আছে। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রকোণার বিভিন্ন স্থানের কয়েকটি দীর্ঘ শিলালিপি উধৃত করলাম।

'শাকেন্দীবরশ্ববভূমে রঘুবদ্দুবটেশাবান
স্নানযাত্রা
বৃন্দাতোষ্যৈক শ্রীকপিধনসূর্যাটি
বাদাম্বাসালয়াদীন
কৃপৌ শ্বো বারিগেহানাদ্দপলময়
নবীয়ান বৃত্যাপকাষ্ঠীং
সীতাকুণ্ডস্য ঘট্টে নরপতি
সুকৃতি শ্রীজুতস্তেজচন্দ্রঃ।।

রঘুনাথের শ্রীমন্দির রম্য মনোহর।
লালজীর শ্রীমন্দির হনুমন্তঘর।।
ভোগালয় ধনালয় নাট্যমাগার।
বৃন্দাখেশ্ম রাসবেশ্ম পাকগৃহ আর।
বাদ্যগৃহ প্রস্তর প্রাচীন যুগ্ম কূপ।
স্নানগৃহ সীতাকুণ্ড অট্ট অপরূপ।।
ধনবেশ্ম রাসগৃহের বারাণ্ডা যুগল।
স্বারিগৃহ পাড়িসব প্রস্তুতি সকল।।
চন্দ্রকোণায় রঘুনাথ যদুনাথ প্রীতে।
বর্ধমানাধিনিনাৎ॰ বিষ্ণুতেজগতে।।
নবোজ্জ্বল করিলেন নৃপ চক্রবর্তী।
শ্রীল তেজচন্দ্র নৃপ ধরাধৌত কীর্তি।।
শিবাঙ্কী শিবাস্য সিন্ধু শশী ইতিশকে।
অংগনায় অংশুমান একবিংশতিকে।।
সন ১২৩৮।'

(অযোধ্যাপল্লী ঠাকুরবাড়ীর॰ফটকের লিপি)

লালগড় থেকে আনীত এ লালজীউ মন্দিরের বারান্দায় রক্ষিত ৩ ফুঃ × ২ ফুট প্রস্তরখণ্ডের লিপি ঃ—

'শুভমস্তু সকাব্দা ১৫৭৭। শাকেহসামুনিবানেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে: তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে আরম্ভোহস্য বভুবহ।। হরিনারায়ণ ভূপস্য পত্নী শ্রীলক্ষণাবতী শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীতৈ নবরত্নমিদং দদৌ।। রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দ রসিকা শ্রীবীরজনোর্বধুক্যাতা শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরাজাত্মজা মাতা শ্রীযুত মিত্রসেন নৃপতের্বিখ্যাতকীর্তেক্ষতৌ শ্রীনারায়ণমল্লভূপভগিনী রম্যাং দদৌ মন্দিরং।। গিরিধারিপদাম্বুজে নবরত্নমিদং শুভং নির্মায় বহু যত্নেন সমর্পিতবতীমুদা।। পৌরাণিক— শ্রীমহন চক্রবর্তী। গোকুল দাস।।'

'নবকুঞ্জের ডাঙ্গা' থেকে প্রাপ্ত জৈনতীর্থঙ্কর মূর্তির অপর পার্শ্বের লিপি ঃ—

'শাকে য বাণ বাণ শশধর সহিতে
মাসিবাষাঢ় সংঘে
শ্রীমৎশ্যামপদারবিন্দ যুগলস্যাশাং
গৃহীত্বামুদা।।
তৎ প্রীতৈব দর্শান্বিবেদ
জনয়েনাকারিতন্মন্দিরং
শ্রীমৎ শ্রীমধুসূদনেন কৃতিনা
দামোদর যত্নতঃ।।
শক ১৫৫০ সম্বৎ ১৬৮৫।।' •

চন্দ্রকোণা থানার সম্মুখে অবস্থিত নিমাইচরণ দাস প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর মন্দিরের লিপি ঃ—

'৭ শ্রীশ্রীরাধাবল্লব জীউ ঠাকুর স্মরণম্
শুভমস্তু শকাব্দা ১৭০২।১।৩০
শ্রীনিমাশ্রিত চরণ দাষ দস্ত সন ১১৮৭
সাল তারিখ ৩ মাঘঃ।।'

মিত্রসেনপুরের শান্তিনাথ শিবমন্দিরের লিপি ঃ

'ভক্তৈর্দুর্ভমিদং যত্নৈর্বরতঃশ্রীমন্দিরং
মিত্রসেনপুরেষু শ্রীশ্রীশান্তিনাথ
শিবায়নে ১২৩৫ সাল।।'

বর্ধমানরাজ মিত্রসেন প্রদত্ত অমূল্যচরণবিদ্যাভূষণ কর্তৃক লিপিকৃত) ১০৭৬ সালের একটি আমলনামা ঃ—

'রামজী সহায়।

বটে কোল করাবদা হ্যায় শ্রীমহারাজা শ্রীরাজা মিত্রসেনজী কথ্নোথ কবুলিয়াৎ রঘুনাথ চক্রবর্তী পৌরাণিককা বেটা গোবর্ধন চক্রবর্তীনে পরগণে মানাকা জলপান ধর্মাসন সম্বরন খানদান যো কর্মকরে তিস্যো জলদান মাত্তার লেগা হাম কই দিয়া ত্রিসন্ধ্যা আশীষ দে পরম সুখ সো ভোগ কর আসে তোমরে বাপকী যো স্ত্রী ও' সন্তায়া হ্যায় সবদিনকি অধিকার সো তুম আমল কলে এহি করারকে দিয়ামিতি শাওনবদি ১৩শ সন ১০৭৬ সাল আগে ধর্মাসনকী ভুজাকা।'

পরিশেষে শ্রীকানাই দীর্ঘাঙ্গীর ভাষায় বলি, "মৃত তটিনীর শুষ্ক গর্ভের মতো বিলুপ্ত সভ্যতার অস্থিচূর্ণবাহী এই প্রাচীন জনপদ, একদা যার বক্ষে শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শিখ ইসলাম ও খৃষ্ট প্রভৃতি বহুধর্মের মিলন সাধিত হয়েছিল, যেখানের তন্তু, রেশম ও পট্টবস্ত্র, লাড়, কাংস, শঙ্খ, তাম্র, মৃৎ, হীরা, মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণালংকার ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি শিল্পে, যে মাটি বীরপ্রসবিনী, যে শহর একদিন সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা এবং জীবন সাধনার প্রাণকেন্দ্র ছিলো।"

ভ্রমণবিলাসী মাত্রেই মেদিনীপুর অথবা ঘাটাল শহর থেকে বাসযোগে এই চন্দ্রকোণায় এসে এখানকার অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শনসমূহ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। মেদিনীপুরের এই বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন জনপদটির নাম হয়তো পুরাতাত্ত্বিকের কাছে অজানা নয়, তবে অনেক সাধারণ মানুষই এর নাম পর্যন্ত জানেন না। একটি সভ্যতার চরম বিকাশ কিভাবে এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তা সবকিছু চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা দুষ্কর। চন্দ্রকোণা শহরের লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে পথিককে কতবার যে নানা পুরাবস্তুর সামনে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে, তার ইয়ত্তা নেই। পুরাকালীন ইতিহাসের একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের রহস্য রোমাঞ্চিত অগুণতি কাহিনী শেষবারের মতো উজাড় করে বলে দেবার জন্যই যেন ওরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে পথ চেয়ে আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—অধুনালুপ্ত 'মেদিনীবাণী' পত্রিকার মৃগাঙ্কনাথ রায়ের রচনাবলী, শ্রীরাধারমণ সিংহ সংগৃহীত তথ্যাদি, 'ভগ্ন দেউলের ইতিবৃত্ত'—কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী,
"Statistical Accounts of Bengal"—Hunter, "Bengal Past and Present" (Vol. I).

দুটো মরা বককে দু' বগলে বগলদাবা করে শশধর মাহাতো ঝরণাডাঙ্গার পথ ধরেছিল। যাবে গোকুলপুরের দিকে। কাঁধে ঝোলানো মান্দাতা আমলের গাদা বন্দুকটা। বারুদ ঠেসে রাখা আছে ওতে। এ সময়টায় শশধর ওটা প্রস্তুতই রাখে। অনেকটা পথ অন্ধকার মাড়িয়ে ফিরতে হয় তাকে। কখন কার সাক্ষাৎ মেলে তার ঠিক কি! এ সময়টায় আবার মাঝে মাঝে নেকড়ের উপদ্রব হয়। আনমনে চলছিল শশধর। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। জ্যোৎস্নায় আলোয় মাখামাখি হয়ে আছে কাঁসাইয়ের চর। স্পষ্ট নজর হচ্ছে শশধরের। উত্তর থেকে দক্ষিণে হাঁটছে ওরা। কাঁসাইয়ের চরে দ্রুত পা ফেলে ওরা এদিকেই আসছে। নির্ঘাৎ চিনে ফেলেছে শশধর। একজন মেয়ে অন্য জন পুরুষ। মেয়েটাকে তো আলবাৎ চিনেছে সে। পুরুষটাকেও চিনতে পারবে হয়তো। এখনও অনেক দূরত্বে আছে বলে চিনছে না। মেয়েটাকে চিনেছে শশধর অনায়াসে তার হাঁটার ধরণে। এ ধরণ যে তার কাছে নিতান্তই চেনা।

যতই ভুলতে চেষ্টা করুক শশধর, তার বরাত তাকে ভুলতে দেবে না। ভুলতে দেবে না শান্তির মুখখানাকে। আর তার মাছের মতো ঠান্ডা চোখ দুটোকে। আজও চোখ বুজলেই শশধর স্পষ্ট দেখতে পায়। লাল ডুরে শাড়িতে শরীর জড়িয়ে কাঁচ পোকার টিপ পরে সে বসে আছে। শশধরের পাশে। এমনি জ্যোৎস্নার রাতে। এই কাঁসাই নদীর চরে। নরম জ্যোৎস্নার মতো শান্তির সে সৌন্দর্য অনেক রাত পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে দেখেও শশধরের আশ মিটত না। তারপর এক সময় ওরা উঠত। হিম ভেজা মাটিতে পা ফেলে ঝরণাডাঙ্গার ঝোপঝাড় মাড়িয়ে যে যার ঘরে ফিরত। এই ফাগুনেই ঘরে আনবে শান্তিকে শশধরের দিক থেকে এই রকমই প্রায় ঠিকঠাক। তখন কি জানত শশধর শান্তির মধ্যে অত শয়তানী। ওই ঠান্ডা চোখে অত ষড়যন্ত্র। [illegible]

ভৈরবকে তার মনে ধরেছে। তার [illegible] পালাবার ফিকির তার মাথায় ঘুরছে। শশধরের বন্ধু কেনারাম অবশ্য অনেক আগেই এই রকম একটা আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল। শশধর কানে নেয় নি। কেননা এসব কথা সে ভাবতেই পারে না। ভাবতে গেলেই শান্তির চোখ দুটো মনে পড়ে। শান্ত শীতল চোখ দুটো। শশধর মাহাতো চিন্তাই করতে পারে না শান্তি অন্য কাউকে ভালবাসে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাই-ই হয়েছিল। ভৈরবের সঙ্গেই শান্তি নিরুদ্দেশ হয়েছিল। শশধরও তার চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিল সেইদিনই। সারা দিন চুপ করে বসেছিল কাঁসাইয়ের নির্জন চরে। কখন এক জোড়া বক নেমেছিল জলে। ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে খুব অন্তরঙ্গ হচ্ছিল। ঠিক তখনই যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল শশধরের। কঠিন হয়েছিল চোখ

দুটো। শরীরের মধ্যে জেগে উঠেছিল একটা দারুণ হিংস্রতা। অতর্কিতে একটা পাথর ছুঁড়েছিল শশধর। তার পরই মেয়ে বকটার ডানা ঝটপটানি আর পুরুষ বকটার মাথার ওপরে পাক খাওয়া এবং উড়ে পালানোটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল সে। দিব্যি একটা পরিতৃপ্তির আনন্দ যেন তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল।

দিন দুয়েক পরে শশধর নেমে এসেছিল কাঁসাইয়ের চরে। একেবারে 'পাখ মারার' বেশে। কাঁসাইয়ের অল্প অল্প জল যেখানে তির তির করে বইছিল সেখানে পুঁতে দিয়েছিল মেকী পাখ-পাখালির শরীরগুলো। মরা বক আর হাঁসের পালক দিয়ে এগুলো সে তৈরী করেছে এই ক'দিন। তারপর পাতা দিয়ে তৈরী ঢালটার মাঝের ফুটোয় চোখ রেখে উবু হয়ে বসেছিল চরের মাটিতে। কাঁধে ঝোলানো ছিল হরিহর মাহাতোর গাদা বন্দুকটা। হরিহর ছিল শশধরের ঠাকুর্দা। কবে কোথায় নাকি হরিহর মাহাতো ইংরেজদের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করেছিল। মরেও ছিল নাকি ইংরেজদের সঙ্গেই সংগ্রাম করতে করতে। এসব অবশ্য শশধর ভালো মতো জানে না। এক সময় মেকী পাখ-পাখালির টানে বক নেমেছিল। নেমেছিল বালি হাঁসের ঝাঁক। ওরা নিশ্চিন্তে চোখ রাখছিল ওদের শিকারের দিকে। ভোর ভোরের শির শিরে হাওয়ায় ওদের পালক কাঁপছিল। এদিকে পাতার ঢাল সামনে রেখে বন্দুক উঁচিয়ে শশধর চোখ রাখছিল ওর শিকারের দিকে। তারপর ঢালের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে একেবারে ওদের কাছাকাছি। তারপরই গাদা বন্দুকটার শব্দ। আহত পাখীটার খানিক ছটফটানি। ভীত পাখীগুলোর আর্তনাদ করতে করতে উড়ে যাওয়া। তাজা রক্ত গলে স্বচ্ছ কাঁসাইয়ের জলের রং লাল। এমনিভাবে রক্ত দেখে দেখে কেমন যেন একটা নেশা ধরছিল শশধরের। কাঁসাইয়ের চরে ধবধবে শরীরের বকগুলো ঠোঁট মিলিয়ে কাছাকাছি হলেই মেয়ে-পাখীটার রক্ত দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠত শশধর। সেই নেশাতেই ভোর না হতেই ছুটে আসত কাঁসাইয়ের চরে। পাতার ঢালে শরীর লুকিয়ে বন্দুক তাক করত। সেই কেনারামই একদিন খবরটা এনেছিল। শান্তি ফিরে এসেছে। ভৈরব পালিয়েছে শান্তিকে ছেড়ে দিয়ে। কোলকাতায় আবার নাকি কাকে বিয়ে করেছে। ইতিমধ্যে একটা ছেলেও নাকি হয়েছে শান্তির। কেনারাম সঠিক কিছু বলতে পারে নি তবে বলেছে শান্তি নাকি খারাপ পথে নেমেছে। ছোট বাজারের বিমল ডাক্তারের কাছে আছে এখন। কেনারামের কাছে সব শুনেছিল শশধর শুনেছিল। কথাগুলোয় বিশ্বাস রাখতে মন চাইছিল না।

মেয়েটাকে চিনেই ঘাপটি মেরেছিল শশধর। ঝাঁকড়া ঝোপের আড়ালে। আর সেখানে বসে বসেই এতক্ষণ অতীতের মধ্যে ডুব দিয়েছিল। কথার শব্দে চমক ভাঙল শশধরের। মেয়ে মানুষের গলা। ওরা অনেক কাছে এসে গেছে। বক দুটোকে মাটিতে ফেলে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেছে শশধর। সারা শরীরে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বুকের ভেতর একটা অস্থির উত্তেজনা। একটা আনচান করা ভাব। ওরা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। একেবারে শশধরের কাছাকাছি। ছোঁয়াছুঁয়ির দূরত্বে। ঝোপের ফাঁক ফোকরে শিকারী চোখ রেখে শশধর সব দেখছে। মেয়ে মানুষটার রং কালো ঠোঁট, পুরুষ্টু বুক, রঙীন শাড়ী সব। এক সময় তার গায়ের গন্ধও নিয়েছে শ্বাস টেনে। পুরুষ মানুষটাকে এবার চিনেছে শশধর মেদিনীপুর শহরের ছোট বাজারের ডাক্তারই বটে। ডাক্তার গুহ। মানুষটাকে খুব চেনে শশধর। মাঝবয়সী এই লোকটা টাকার লোভ দেখিয়ে বহু মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেছে। মানুষ তো নয় একটা আস্ত জানোয়ার। লোকটা মেয়ে মানুষটার হাত ধরে আছে। খুব কাছাকাছি থেকে বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে হাঁটছে ওরা। একেবারে যেন গায়ে গায়ে মিলিয়ে যেতে চাইছে। এক সময় ওরা শশধরকে খুব কাছাকাছি থেকে অতিক্রম করে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। এখনও ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শশধর। ওদের ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট নজর হচ্ছে চরের বালিতে।

এক সময় উঠলো শশধর। দু বগলে উঠলো সেই মরা বক দুটো। কাঁধে ঝুলে রইল প্রস্তুত গাদা বন্দুকটা। বকের মতো সাবধানী পা ফেলে ঝোপের আড়ালে শরীর লুকিয়ে সরু পথটা দিয়ে ওদের অনুসরণ করে চললো সে। হিম হিম হাওয়ার মধ্যেও শশধর বেশ ঘামছিল। চরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা এক সময় বাঁক নিলে। হাঁটতে লাগলো কাঁসাইয়ের তীরের ঘন ঝোপের ওদিকটায়। এক সময় মিলিয়ে গেল ওরা। অত্যন্ত সাবধানী পা ফেলে শশধরও এক সময় পৌঁছে গেল ওদের প্রায় কাছাকাছি। ডান পাশের একটা ঝাঁকড়া ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। বন্দুক ধরা রইল তাক করে। ধবধবে জ্যোৎস্নায় চোখের সামনে কী সব দেখছে শশধর। চোখ দুটো রগড়ে নিল হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। নাঃ ঠিকই দেখছে সে। চার ধার জনমানবহীন। নিস্তব্ধ। এখানে ওখানে শুধু পোকামাকড়ের ডাক। ঝিঁঝিঁর শব্দ। শেয়ালের হুক্কা হুয়া। এসব শব্দ চার পাশে। দূরে এদিকে ওদিকে। ঝোপের মধ্যে বসে নির্জন কাঁসাইয়ের তীরে শশধর এখন নিজের বুকের ধুকপুকি যন্ত্রটার ধুকপুকুনি স্পষ্ট শুনছে। আর চোখের সামনে কি সব দেখছে। ওরা ক্রমশই ঘন হচ্ছে। পুরুষ মানুষটা মেয়েটাকে ঘিরে ফেলছে আলিঙ্গনে। ওদের দেখে এক সময় শশধরের মনে হল যেন একটা মেয়ে বক আর একটা পুরুষ বক। কাঁসাইয়ের চরের নির্জনতায় খুব কাছাকাছি হয়েছে। আচমকা সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে গেল শশধরের। দারুণ একটা প্রতিহিংসার ভাব তাকে মুহূর্তে যেন কেমন অন্যরকম করে দিলে। কাঁধে ঝোলানো যন্ত্রটায় হাত পড়লো তার। একটা আকস্মিক ঘোরের মধ্যে সেটাকে সে চালু করে দিলে। পাখ-পাখালী মারার সময় কখনও কখনও বদ মেজাজী হয়ে উঠত যন্ত্রটা। বেয়াদপী শুরু করত। কোনো কাজ হত না। পাখ-পাখালীরা উড়ে পালাত। দাঁতে দাঁত চেপে শশধর বন্দুকটা এবং তার চোদ্দ পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করত তখন। আজ কিন্তু কোনো গোঁয়ার্তুমি করে নি যন্ত্রটা। সোজা ছুটে গিয়ে ঘা দিয়েছে মেয়ে মানুষটাকে। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করার অবকাশ দিয়েছে মাত্র। যে জানোয়ারটা এতক্ষণ মেয়ে মানুষটার খুব কাছাকাছি ছিল মুহূর্তে সে উঠে পড়ে দিয়েছে এক ছুট। একেবারে ঝোপ ঝাপ মাড়িয়ে ঝরণাডাঙ্গার ওপাশে। যেমন করে মেয়ে বকটা গুলি খেয়ে ডানা ঝাপটাতে থাকলে পুরুষ বকটা মরীয়া হয়ে উড়ে পালায়। একটু চেষ্টা করলেই শশধর আধবুড়ো ডাক্তারকে ধরতে পারত। কিম্বা বন্দুক তাক করতে পারত। কিন্তু পুরুষ বক শশধর কোনোদিন শিকার করে না। বেশ খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে এক সময় উঠেছিল শশধর। দু বগলে দুটো মরা বক। পটপট করে সেগুলোর পালক ছিঁড়ে শূন্যে উড়িয়ে দিচ্ছিল। তারপর সেই বিতাকাঙ্খার হাসিটা হেসে মৃতদেহটা ঘিরে ঘুরতে শুরু করেছিল। এক সময় দেহটা তুলে এনে রেখেছিল কাঁসাইয়ের চরে ঠিক ঝরণাডাঙ্গার কোনাকুণি। ধবধবে জ্যোৎস্নায় উবু হয়ে পড়ে আলোয় স্নান করছিল সেটা। এদিকে রাত বাড়ছিল। ডেলি পাসেঞ্জার নিয়ে রাতের শেষ লোক্যালটা এইমাত্র খড়গপুর থেকে ফিরল। অল্প অল্প হিম পড়ছে বোধহয়। মাঠময় স্যাতসেঁতে ভাব। দূরে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের আলোটা দেখা যাচ্ছে। মেদিনীপুর গেট বাজারের আলোগুলোও অস্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছিল। কাঁসাইয়ের পুলের ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাওয়ার শব্দ বাতাসে পাক খেতে খেতে ভেসে আসছে। শশধর তখনও সমানে নাচছিল। মরা বক দুটো বগলে। গা ময় রক্ত। মাঝখানে মৃতদেহটা। এক সময় শশধর মাহাতো নাচ বন্ধ করলে। মরা বক দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিলে দূরে। তারপর মেয়েমানুষটার বুকের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁসাইয়ের চরে তখন রাত্রি গম্ভীর হয়েছে। /

অঙ্গনা

সমাজ সেবায় উইমেনস্ কো-অর্ডিনেটিং কাউনসিল

গত ২১শে মার্চ কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে উইমেনস্ কো-অরডিনেটিং কাউনসিল কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় মহিলারা দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন।

পরিবারের আহারাদি পরিচালনার গুরু দায়িত্ব মহিলাদের ওপরে ন্যস্ত। সেক্ষেত্রে বর্তমান খাদ্যদ্রব্যের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধিতে মহিলারাই অধিক বিব্রত ও চিন্তিত। তার ওপর রয়েছে খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের চোরা কারবারী। এই ভেজাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে দিনের পর দিন মানুষের জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রায়ই শোনা যায় কোন কোন অঞ্চলে ভেজাল, দূষিত খাদ্য গ্রহণে কেউ অকালে প্রাণ দিয়েছেন নয়তো গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শরীরের পুষ্টির জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন, অথচ সেই খাদ্য খেয়েই অপুষ্টিজনোচিত রোগে লোকে ভুগছে। সমাজের এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। কো-অরডিনেটিং কাউন্সিলের মহিলারা স্থানে স্থানে সভাসমিতির মাধ্যমে জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে চাইছেন। বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুনসী, ডাঃ কে পি ঘোষ ভেজাল খাদ্যে চোখের এবং সাধারণভাবে শরীরের ওপর কী বিষময় কুফল সঞ্চারিত হয় তা তথ্য দিয়ে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে মহিলাদের ভাবনা অনেক, কারণ শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এছাড়া মহিলাদের তরফ থেকে ক্রেতাদের অধিক মূল্যে দ্রব্য কেনা থেকে বিরত করা, মাছ, মাংস, ডাল তেল অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলিকে সরকার নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করা, রেশনের মূল্যে চিনি সংগ্রহ, বিবাহাদি উৎসবে ভোগ্য-পণ্যের বাহুল্য বর্জন করা, অসাধু ব্যবসায়ীদের দমন প্রভৃতি ব্যাপারে জন-সাধারণকে সচেতন করা ইত্যাদির জন্যে বিভিন্ন স্থানে মিটিং ডাকা হয়েছে।

উইমেনস কো-অর্ডিনেটিং কাউনসিলের সভানেত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁদের পূর্ববর্তী নানাবিধ সমাজ-সেবামূলক কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পেরেছিলাম। এই সংস্থার কার্যা-বলী দীর্ঘদিনের। সমাজসেবা ও এক আদর্শ সুখী জীবন গড়ে তোলাই এদের মহান ব্রত। বহু শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, যুবক, যুবতী একযোগে এই সংস্থাকে সমৃদ্ধ করেছেন। উইমেনস কো-অরডিনেটিং কাউন-সিলের বিয়াল্লিশটি সংস্থার তরফ থেকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।

ভারত-চীন, ভারত-পাকিস্থানের যুদ্ধে ত্রাণকার্যে এই সংস্থা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিপন্ন ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষকে ডাক্তার, নার্স দিয়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। পুজোর উৎসবে জোয়ানদের উপহার পাঠিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের সিভিল ডিফেন্সে ট্রেনিং দেওয়ার কাজে এঁরাও অনেক অগ্রণী।

খরা এবং বন্যা ত্রাণেও এই সংস্থার সদস্যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। উত্তর বাংলার ভয়াবহ প্লাবনের সময় বন্যার্তদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র সরবরাহের সুবন্দোবস্ত এই সংস্থার তরফ থেকে করা হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১০ই অকটোবর অনেক অসুবিধার ঝুঁকি নিয়ে ভারত সেবা সংঘের সঙ্গে একই দিনে তাঁরা সেবাকার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে এই মহিলা সংস্থার আবেদনে নানাদিক থেকে অনেক সাহায্য এসে পৌঁছেছিল বন্যার্তদের জন্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কলকাতার বিভিন্ন মহিলা সংস্থা, অস্ট্রেলিয়ার উইমেনস এসোসিয়েশন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

গত বাংলাদেশ ও পাকিস্থানের যুদ্ধে বাংলাদেশের সীমান্তে বিশেষ করে চাঁদপাড়ার ক্যাম্পে এই সংস্থার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীর বর্বর আক্রমণে ও অত্যাচারে দুঃস্থ ও অসহায় নরনারী যাঁরা পালিয়ে [illegible] এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেসব [illegible] হ্যাণ্ডিক্রাফটসের সুযোগ-সুবিধা, [illegible] জন্য দুধ সরবরাহ, কাপড়-চোপড়ের যোগান, ওষুধপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কাজে এই সংস্থা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। চাঁদপাড়াতে যে মেডিক্যাল সেণ্টার খোলা হয়েছিল সেখানে ডাক্তার, নার্স ও ওষুধপত্রসহ একটি ভ্রাম্যমাণ ভ্যান ছিল যা শত শত লোকের প্রাণরক্ষা করেছিল। কলেরার মত রোগের মোকাবিলা করাতে এই ভ্রাম্যমাণ ভ্যানটির দ্বারা অনেক জীবন রক্ষা হয়েছিল।

যুদ্ধ চলাকালে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ইউ এন এর কাছে এই সংস্থার আবেদন ছিল বাংলাদেশের নিরীহ এবং নিরস্ত্র লোকেদের ওপর গোলাগুলি বন্ধের জন্য পাকিস্থানকে চাপ দেওয়া, দরকারবোধে ইউ এন এর শক্তির সাহায্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ ও অন্যান্য সংস্থাকে বাংলাদেশে ত্রাণকার্যে অগ্রসর হতে সাহায্য করা, পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ থেকে অন্যান্য দেশকে বিরত করা। মহিলা সংস্থার তরফ থেকে এই আবেদনটির মূল্য অনেক।

এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় দমদম ও ব্যারাকপুর এয়ারপোর্টে পাইলটদের জন্য ক্যাণ্টিন চালু করা এই সংস্থার একটি শুভ প্রচেষ্টা। শ্রীমতী রায় কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'যুদ্ধকালে যেসব পাইলটরা বাংলাদেশে যাতায়াত করতেন তাঁদের আহারের উদ্দেশ্যেই এই ক্যাণ্টিন খোলান হয়েছিল। এমনও হয়েছে কোন কোন পাইলট লাঞ্চ খেয়ে বাংলাদেশে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা আর ফিরে আসেন নি।

পূর্ববর্তী জনহিতকর কাজের মত তাঁদের বর্তমান জনস্বার্থের সপক্ষে আন্দোলনও সফল হবে এটা তাঁদের বিশ্বাস। সংস্থার মহিলারা উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা মিটিং করে জনসাধারণের চেতনা জাগাবেন। তাঁদের অনুরোধ করবেন, ভেজাল খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, দরকার মত মাছ, মাংস বর্জন করেও আন্দোলন চালাতে। বিবাহ বা উৎসবের বাড়ীতে অতিথি নিমন্ত্রণ ও অপচয় বন্ধ করতে অনুরোধ জানাবেন। যাঁরা এতে [illegible] সুবিধা না পাওয়া যায় তবে সেই অনুষ্ঠানের বাড়ীতে সংস্থার সদস্যারা উপস্থিত থাকবেন।

[illegible] রায় বললেন, জরুরী অবস্থার [illegible] থেকে এই সংস্থা সব সময়ই উদ্যোগী। বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে আমরা জরুরী অবস্থা মনে করছি। [illegible] মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে আমরা আবেদন করছি যাতে ভেজাল খাদ্যের আসল অপরাধী ধরা পড়ে এবং তার শুধুমাত্র অর্থদণ্ডই নয়, তার সঙ্গে প্রকৃত অপরাধীর হাজতবাস করানোরও যেন ব্যবস্থা হয়।

—অঞ্জলি চৌধুরী

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস

গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের নারী প্রগতির যুগে এই মহিলা দিবসের গুরুত্ব অনেকখানি। সমাজতান্ত্রিক সব দেশগুলিতে এই দিনটি বিশেষ উৎসবের সঙ্গে পালন করা হয়।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে শপথ গ্রহণ করা হয় নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ আর যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামের বোনেদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সোভিয়েত সহ দুনিয়ার সকল সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দেশের বোনেদের অভিনন্দন জানানো হয়।

সোভিয়েতে তখন জারের শাসন। ১৯১৩ সাল। জারের শাসনে দেশের জনগণ শোষণ, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য জর্জরিত ছিল। এই নিপীড়ন, শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ও সমাজে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সোভিয়েতের মহিলা সংস্থা ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখনকার দিনে এই মহিলা সংস্থাকে সরকারের অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

পর বৎসর ১৯১৪ সাল আয়োজন চলল ৮ মার্চ উদ্‌যাপন করার। কিন্তু সরকার পক্ষ অনমনীয় মহিলা দিবসের আয়োজনকে ব্যর্থ করার প্রয়াসে সরকার বড় বড় নেতাদের বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। এই দমননীতিতে মহিলাদের মনোবল, আত্মপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হল। মহিলা সংস্থা সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা ও অনশন ধর্মঘট করে সরকারকে বন্দীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য করালো। এ দিকে মহিলা সংস্থার গোপন সংগ্রামও অব্যাহত রইল।

১৯১৭ সাল অবহেলিত, উপেক্ষিত, নিপীড়িত জনগণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হল। শুরু হল শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। গণ-অভ্যুত্থানের জয়-জয়কার। মহান অকটোবর বিপ্লবে সোভিয়েতের লাঞ্ছিত মানুষেরা পেল মুক্তি, নারী সমাজের সমঅধিকার ঘোষিত হল। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে সূচিত হল স্বাধীনতা। সোভিয়েত দেশে এই ৮ মার্চ ছুটির দিন। আনন্দের এই দিনটিতে বিশ্বের দিকে দিকে সংগ্রামী বোনেদের ও নিপীড়িত মহিলাদের তাঁরা জানান সংহতি। আর প্রার্থনা জানান সুখ-শান্তি, আহার, শিক্ষা সব মিলিয়ে এক সুন্দর ও নির্বিঘ্ন জীবন গড়ে তোলার।

৮ মার্চ তারিখে ভারতসভা হলে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পঃ বঙ্গ কমিটির আয়োজনে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস পালন করা হয়। সেই সভায় মেয়েদের স্বাধীনতা, অধিকার ও তাঁদের উত্তরসূরীদের সুখী জীবনের আশার কামনা করে নানা বক্তৃতা করা হয়। সভায় গরীবী হটাও, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, ভিয়েতনামে শান্তি চুক্তি করার দাবীতে এক প্রস্তাব নেওয়া হয়।

সাতদিনের শুভাশুভ

৩১শে মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত যে সপ্তাহ সেই সপ্তাহের ফলাফল স্বাভাবিকভাবে বলা হচ্ছে জন্মরাশি হিসাবে।

মেষ : শনি, বৃহস্পতি ও রবির অবস্থান সুবিধার নয়। শারীরিক অস্বস্তি, পারিবারিক অসুবিধার লক্ষণ আছে। আর্থিকক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। ব্যবসায় অনুকূল। ঘরবাড়ী তৈরী সুরু হতে পারে। কাজকর্ম একপ্রকার। মেয়েদের মানসিক আনন্দ-বৃদ্ধির যোগ আছে।

বৃষ : বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রের শুভ প্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করবেন। শরীর চলনসই। আর্থিকক্ষেত্র শুভ, পুরান পাওনা এখন পেতে পারেন। নূতন লগ্নির সম্ভাবনা ও সাফল্য আছে। কাজকর্মে মর্যাদা বৃদ্ধি ও সাফল্যের যোগ প্রবল। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে।

মিথুন : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক দুশ্চিন্তার আভাষ আছে। ব্যয়াধিক্য, অর্থক্ষতি ও ঋণ শোধের চাপ অত্যাধিক হতে পারে। কিন্তু এই সব অসুবিধা দূর হবে। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে মোটের উপর ভাল ফল পাবেন। মেয়েদের মানসিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে।

কর্কট : অনুকূল গ্রহসন্নিবেশ। আশাপ্রদ ফল পাবেন। শরীরটা অবশ্য খুব ভাল নয়। পেটের রোগে, জ্বরে সামান্য ভোগ হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ে আলস্যতার ভাব আসতে পারে। কাজকর্ম মোটের উপর ভাল। মেয়েদের পক্ষে সময়টা চলনসই।

সিংহ : শারীরিক অসুস্থতার ভাব থাকলে তা ক্রমশ কমবে। পারিবারিক ক্ষেত্র স্বাভাবিক ও অনুকূল। কিন্তু আয়, ব্যয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বাধা বা শত্রুতা হলেও সাফল্য নিশ্চিত। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল।

কন্যা : শরীরটা সুবিধার নয়। রক্তচাপ বৃদ্ধি, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতিতে ভোগ হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কলহ দেখা দিতে পারে। আয় ভাল। ব্যবসায়, সুবিধার নয়। কর্মক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তনের লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে নানাবিধ উদ্বেগের লক্ষণ আছে।

তুলা : পেটের পীড়ায় ভোগ হতে পারে। পারিবারিক ব্যাপারে, স্ত্রী-সন্তানের ব্যাপারে উদ্বেগ ও উত্তেজনার লক্ষণ আছে। আয় ভাল। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। অবশ্য আপনার দুশ্চিন্তা দূর হবে। মেয়েদের পক্ষে আচরণে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

বৃশ্চিক : শারীরিক উন্নতির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে উন্নতি ও শুভ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিকক্ষেত্র চলনসই। ব্যবসায় ক্ষয়-ক্ষতির লক্ষণ আছে। কর্মক্ষেত্রে কিছু শত্রুতার লক্ষণ আছে। মেয়েদের শারীরিক উন্নতির লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল।

ধনু : শারীরিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। শত্রুতাজনিত মানসিক দুশ্চিন্তার আভাষ আছে। আয় সুবিধার নয়। ব্যবসায়ে ক্ষয়ক্ষতির লক্ষণ আছে। কর্মক্ষেত্র চলনসই। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়।

মকর : শরীরটা ভাল যাবে না। মাঝে মাঝে শারীরিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি ও স্বস্তির আশা কম। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। আয় একপ্রকার। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কাজকর্ম অনুকূল। মেয়েদের পক্ষে সময়টা চলনসই।

কুম্ভ : শরীরের প্রতি যত্ন নিতেই হবে। চোখের, পেটের পীড়ায় ভোগ হতে পারে। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় মোটের উপর ভাল। কাজকর্মে শত্রুতার লক্ষণ আছে। মেয়েদের মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতে পারে।

মীন : শরীর ও মন চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। আয় ভাল। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়।

—শুক্রাচার্য

প্রশ্নের উত্তর

সুধা রায়চৌধুরী—৩৬ বৎসর বয়সের পর কিছুটা উপশম হবে। ৪-৫ রতি হলদে পোকরাজ পরুন।

আরতি ঘোষাল—আশানুরূপ পর্যাপ্ত পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

শমী গুপ্ত—জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

শান্তুগোপাল ভট্টাচার্য—যোগ্যতানুসারে উন্নতিতে বাধা আসতে পারে।

আশুতোষ রায় (এম, পি)—স্ত্রীর কোষ্ঠী পাঠাবেন।

কনকা সেনগুপ্ত (কলি-১৯)—ধনু রাশি, সিংহ লগ্ন।

স্মৃতি মুখার্জি—উচ্চশিক্ষায় বাধা প্রাপ্তি সম্ভাবনা।

রথীন্দ্রমোহন বণিক (মুর্শিদাবাদ)—পারিপার্শ্বিক ব্যবসা হিসাবে চালাতে পারেন।

সুধাংশু মুখোপাধ্যায়—জন্ম-সন তারিখ ও সময় পাঠাবেন।

হৃষীকেশ মুখার্জি—আপনার পক্ষে মুক্তা ও প্রবাল রত্ন ধারণীয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (কাঁচরাপাড়া)—কন্যা রাশি, নরগণ, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র।

রমলা চক্রবর্তী (দুর্গাপুর)—জন্ম-তারিখ ও সময় পাঠান।

সুশীল সেনগুপ্ত (রাঙামাটি)—আগামী বৈশাখ থেকে আষাঢ়ের মধ্যে সম্ভব।

রজত মুখার্জি (যাদবপুর)—আগামী জুলাই মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

বিদ্যুৎবরণ দাস (কলি-৩)—শীঘ্রই ব্যবসার যোগ আছে। হলে সফল হবেন।

অরুণ মুখোপাধ্যায়—জন্ম-তারিখ ও সময় জানাবেন।

রামনৃসিংহ চ্যাটার্জি (বর্ধমান)—অবসর গ্রহণের পর গৃহেই থাকবেন।

গৌরী মিত্র—লেখাপড়া মধ্যমপ্রকার। ভাগ্য মেধার ওপর ভালো।

কৃষ্ণা নাগ—কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। উচ্চশিক্ষার যোগ আছে।

শুক্লা নাগ—জন্ম-সন জানাবেন।

দেবলীলা গাঙ্গুলী—জন্ম দিনে, না রাত্রে জানাবেন।

দিলীপ কুণ্ডু (আসানসোল)—২৭ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব। কিন্তু এখানে হবে কিনা সন্দেহ।

লক্ষ্মণনারায়ণ মুখার্জি : মেয়ের জন্ম-কুণ্ডলী চাই। ১৯৭৫ সালে গৃহাদি হবার যোগ আছে।

কুসুম তরফদার : সম্ভাবনা কম।

অভিজিৎ লাহিড়ী : সম্ভাবনা কম।

সুকুমার সিংহ : আগামী জুলাই মাসের মধ্যে পদোন্নতির যোগ আছে। অক্টোবর মাসের পর বাসগৃহ সমস্যার সমাধানে সম্ভব।

দীপক সেনগুপ্ত : ১৯৭৪ সালে সম্ভাবনা আছে।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ (কলি-৩৩) : ব্যক্তিগতভাবে উত্তর জানান সম্ভব না।

এম এ তৈয়ব মিঞা (বাংলাদেশ) : জন্ম-সময় পাঠাবেন।

নীলা সান্যাল (বম্বে) : ১৬ বর্ষ বয়সের পর আরোগ্যের সম্ভাবনা।

রত্না রায় (কলি-৩৫) : জন্ম-সন-তারিখ-সময় পাঠাবেন।

রবিরঞ্জন সান্যাল (বম্বে) : কেতু-র দশাতে আপনার কোন বিপর্যয় ঘটবে না। তবে সন্তানজনিত দুশ্চিন্তা থাকবে।

অমিতাভ দাস : ১৯৭৪ সালে।

চন্দ্রকান্ত দাস : বর্তমান মধ্যম। ভবিষ্যৎ ভাল। ৫-৬ রতি গোমেদ রত্ন ধারণীয়।

সুতপা সান্যাল : দেড় বছর পর্যন্ত স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ভবিষ্যৎ ভাগ্য ভাল।

বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বাস্থ্যের জন্য গোমেদ রত্ন ধারণীয়। মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

হরিশংকর পাল : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠান।

প্রণবকুমার সেনগুপ্ত : জন্ম সাল পরিষ্কার করে লিখবেন।

সুব্রত সান্যাল : ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর ভাগ্যকর্ম ও আর্থিক উন্নতির যোগ। প্রবাল রত্ন ধারণীয়।

অর্পণা বোস : বৃশ্চিক রাশি। ১৯ অথবা ২১ বর্ষ বয়সে।

সুজাতা বোস : ৩২ বর্ষ বয়স থেকে।

বিমল চ্যাটার্জি : ৫-৬ রতি গোমেদ এবং ৩-৪ রতি ইন্দ্রনীলা ধারণীয়। ৩২ বর্ষ বয়সে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা।

সুচেতা মৈত্র : ২৫ বর্ষ বয়সে সম্ভব। স্বামী চাকুরিজীবি হবে।

কণাদ ভট্টাচার্য (নিউদিল্লী): বর্তমান সময় বিশেষ অনুকূল নয়।

সুশীল ধর : ২৩ বর্ষ বয়সে সম্ভব। পাত্র এঞ্জিনীয়ার হবে।

হারাধন চক্রবর্তী : ২৭ বর্ষ বয়সে পদোন্নতি। ২৭ অথবা ২৯ বর্ষ বয়সে সম্ভব।

অমিতাভ গুপ্ত : মীন রাশি। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। আন্দাজ ৬৮ বর্ষ।

সোমনাথ মিত্র : বাধাপূর্বক হবার যোগ আছে।

অভিজিৎ সেনগুপ্ত : কুম্ভরাশি। প্রথম আড়াই বৎসর স্বাস্থ্য ভাল না। আনুমানিক ৬৬ বৎসর।

নারায়ণচন্দ্র সাহা : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠান।

গৌতম দাস : পাশ করার সম্ভাবনা আছে।

অমলেন্দু কুণ্ডু : ৩৮ বর্ষ বয়সের পর সম্ভাবনা আছে।

আশীষ চ্যাটার্জি : ৪২ বর্ষ বয়স থেকে উন্নতি। ৫-৬ রতি গোমেদ ধারণীয়।

লক্ষ্মণকুমার জানা (মেদিনীপুর) : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ... ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ... ...

আপনার প্রশ্ন ... ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায় খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন।]

প্রয়োগ কৌশলের নৈকট্যে আজকের যাত্রা আর থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্যের ব্যবধানটুকু এসে ঠেকেছে শুধু মঞ্চে। মঞ্চের নৃত্য বা চলচ্চিত্রের আগ্রাসী প্রভাবে পড়ে যাত্রা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে—ভবিষ্যতে হয়ত দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদও থাকবে না—এ আশঙ্কা অভিযোগ আজ অনেকেরই। এ আশঙ্কা সঙ্গত, যাত্রার চরিত্র নষ্ট হওয়ার উদ্বেগও খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় একদা যাকে আঁকড়ে ধরে গড়ে উঠেছিল একটি শিল্প, আবহমান কাল ধরেই কি সে আবর্তিত হবে সেই একই বিন্দুতে। যদি তাই হয়, তবে চলার ছন্দ যায় হারিয়ে কাঁধে এসে ভর করে বার্ধক্যতার এক দুঃসহ যন্ত্রণা। অতএব সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত পারিপার্শ্বিকতাকে মেনে নিয়ে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে সামনের দিকে চলা। মনে রাখতে হবে গ্রহণ বর্জনের পথে সমন্বয় ঘটাতে না পারলে প্রদীপ্ত হওয়ার চেয়ে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। প্রসংগত বলতে হয়, আমাদের মন প্রায়শই আচ্ছন্ন থাকে একটিমাত্র বিশেষ ভাবনায়। তাই প্রগতি বলতে প্রায়ই আমরা বুঝি সনাতনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এগিয়ে যাওয়াকে, আর ঐতিহ্য আমাদের কাছে বর্তমানের দিকে পিছন ফিরে শুধুমাত্র অতীতের কেন্দ্রতে ঘুরপাক খাওয়া। একারণেই সামান্য পরিবর্তনেও আমরা হায় হায় করে উঠি ঐতিহ্য নষ্টের ভয়ে আর উন্মাদতায় পেছনে ছুটে অতীতের শুভ সুন্দরকেও সেকেলে বলে নাক সিঁটকে নিজেদের বিপ্লবী প্রগতিশীলতায় পুলকিত হই।

যাক সে কথা, যাত্রা ও মঞ্চের সাদৃশ্যের প্রশ্নে উভয়ের পারস্পরিক প্রভাবের কথাও বলতে হয়। সে কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটা জিনিস আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে তা হোল যাত্রা ও মঞ্চ একে অন্যকে ছাড়া পরিপূর্ণ নয়। পূর্বাচার্যদের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে, অতীত ভারতে মঞ্চ নাটকের অস্তিত্ব থাকলেও আজকের মঞ্চের উদ্ভব হয়েছে পাশ্চাত্যের অনুকরণে। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিক মঞ্চ তার যাত্রা শুরু করলেও স্বীয় ঐতিহ্যের প্রভাব সে সম্পূর্ণভাবে এড়াতে পারেনি। তাই সে যুগের উল্লেখ্য নাটকাবলী প্রায় সবই অনুবাদ (সে অনুবাদ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের)। 'রত্নাবলী' 'শকুন্তলা' 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতি তারই নিদর্শন। শুধু তাই নয় সে যুগ থেকেই মঞ্চ ও যাত্রা পরস্পরের যাত্রা পথকে করেছে আলোকিত—সাহায্য করেছে চলার পথে।

ভারতীয় নাটকের ধারাবাহিকতার ইতিহাস অনুসরণ করলে একটা সত্য প্রমাণিত হয়, সম্পূর্ণ তিনটি পৃথক স্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে আজকের মঞ্চ নাটক—যার ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। পূর্ববর্তী সে স্তর তিনটি হোল কথকতা যাত্রা মঞ্চ। বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে দেখা গেছে কথকতার অস্তিত্বই সুপ্রাচীন। এই কথকতা থেকেই কালে সৃষ্টি হয়েছে যাত্রা। বেদকেই প্রাচীনতার মাপকাঠি ধরলে দেখা যাবে, ঋক্ বেদ শতপথ ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য উপনিষদে কথকতার উল্লেখ রয়েছে। তুলনায় ঋক বেদের দশম মণ্ডলের সংবাদসূক্তে নাটকের অস্তিত্বের কথা কিছুটা কষ্টকল্পিত। তা ছাড়া ব্যষ্টিনির্ভর শিল্প কথকতা থেকে সমষ্টিনির্ভর শিল্প যাত্রার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে গণশিল্প যাত্রারই পাশাপাশি দেখা দেয় মঞ্চের—যা নিছক বুর্জোয়া রাজারাজড়াদের দরবার কেন্দ্রিক হওয়ায় একদিন চলে যায় অবলুপ্তির পথে। পরে অবশ্য পাশ্চাত্য আদর্শে ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে শুরু হয় আধুনিক মঞ্চের যাত্রা। এবং সাজসজ্জা রূপসজ্জা পাল্টে না উঠলে এ মঞ্চও হয়ত অতীতের মতই একদিন চলে যেত ক্ষয়ের পথে।

যাত্রা ও আধুনিক নাটকের উদ্ভবের পটভূমিকা স্মরণ রেখে যাত্রার ওপর নাটকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। আজকের যাত্রায় নাটকের প্রভাব ব্যাপকতর হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই যাত্রার যখন রূপান্তর ঘটছে সে সময় থেকেই তাতে নাটকের ছায়া এসে পড়তে থাকে। অবশ্য অনেক সময় আবার যাত্রার প্রতিফলিত ছায়াতলে নাটকও পেয়েছে ক্ষণিক বিশ্রামের অবসর—নতুন পথের ইঙ্গিত।

সে সময় যখন কালীয়দমন বা কালিয়দমনে যাত্রা 'নন্দবিদায়' 'নলদময়ন্তী' 'বিদ্যাসুন্দর' ইত্যাদি নতুন যাত্রায় রূপান্তরিত হয়ে পৌনঃপৌনিকতা ও এক ঘেঁয়েমি কাটানোর চেষ্টা করছে, সে সময় পাশ্চাত্য আদর্শে নবোদ্ভূত নাটকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রায় একই আবর্তন। প্রথমে 'ডিসগাইস' ও 'আর ইজ দি বেস্ট ডকটর' এর অনুবাদকে আশ্রয় করে বর্তমানকালের মঞ্চ উদ্বোধন হলেও পরে তা শুধু সংস্কৃত নাটক অনুবাদ সর্বস্ব হয়ে পড়ে। এমনি সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ঘটে এক যুগান্তর। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হতে থাকে 'শর্মিষ্ঠা' 'কৃষ্ণকুমারী' ইত্যাদি নাটক ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ইত্যাদি প্রহসন।

রূপ্যতাই মঞ্চে পরিবেশিত হলো দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ' বা শুধু নাটকের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই এক বিস্ময় নয় সাধারণ রঙ্গালয়ের আবির্ভাবকেও করল ত্বরান্বিত এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এটিও হলো প্রথম নাটক।

এর কাহিনী বা রচনাকৌশলের প্রভাব যাত্রার সরাসরি এসে না পড়লেও জনজীবনের বিকাশের ঐ যুগে যাত্রার এক বিরাট রূপান্তর ঘটে। এর আগে যুগ প্রভাবে ও শিক্ষিত শ্রেণীর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে যাত্রার মধ্যে ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করেছিল রুচিহীনতা ও অশ্লীলতা। ক্রমে এই রুচিহীনতা সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করল যাত্রাকে। ফলে তা শুধু শিক্ষিত শ্রেণীরই সমর্থন হারালো না, মহিলাদের পর্যন্ত যাত্রা দেখা নিষিদ্ধ হলো। এ অবস্থায় কৃষ্ণযাত্রাকে পরিশুদ্ধ করে তাকে সাধারণের কাছে আবার মর্যাদার আসনে বসাবার জন্য এগিয়ে এলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮ খৃঃ) তাঁর 'দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্র বিলাস' 'স্বপ্নবিলাস' প্রভৃতি পালা নিয়ে। রচনার শ্লীলতা ও বৈদগ্ধতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কৃষ্ণকমল নিজেও পেলেন সম্মান। কিন্তু যাত্রা পেলো না তার হৃত আসন। এই অবস্থায় যাত্রার পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন অনেকেই। পুরোনো যাত্রার পরিবর্তে নৃত্য ও গীত বহুল নতুন যাত্রার সৃষ্টি হয় অনেক আগেই। তবু তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

এই অবস্থায় ১৮৬৪-৬৫ খৃঃ সৃষ্টি হয় গীতাভিনয়ের। বাংলা মঞ্চের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত গীতাভিনয়ে যুক্ত হল কৃষ্ণযাত্রার গীত, নতুন যাত্রার নৃত্য এবং নাটকের সংলাপ। গীতাভিনয়ের প্রতি আলোচনার আকর্ষণ গেল বেড়ে। এ পর্বের আলোচনায় একটা জিনিস স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা নাটকই তার আঙ্গিক প্রয়োগরীতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশী। শুধু মঞ্চনাটকের রচনাশৈলীতে অনুপ্রাণিত হওয়াই নয় সরাসরিভাবে মঞ্চের বহু সফল নাটক শুধু বেশ কিছু গীতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েও পরিবেশিত হতে থাকে একাধিক গীতাভিনয়। এ পর্যায়ে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা' রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বনে হরিমোহন কর্মকারের 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' মাইকেল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' ইত্যাদির উল্লেখ করতে হয়।

গীতাভিনয়ের স্বর্ণযুগ সূচিত হয় মতিলাল রায়কে কেন্দ্র করেই। তাঁর পালাগুলিতে কথকতার বিলম্বিত ও বিস্তারিত ঢংটি থাকলেও তা ছিল স্বচ্ছ। নাটকীয়তাও এইসব পালায় যথেষ্ট দানা বেঁধে ওঠায় তা জনমনোরঞ্জনেও সমর্থ হয়। প্রায় এই সময়ই মঞ্চে পৌরাণিক নাটকের সূচনা করেন মনোমোহন বসু এবং তাঁরই আদর্শে মতিলাল পৌরাণিক পালা রচনার হাত দিলেও পরে দেখা গেছে মনোমোহনও মতি রায়ের যাত্রা পালার প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে এড়াতে পারেননি। পূর্বসূত্রে বলা যায় মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়ের হাতে পৌরাণিক মঞ্চ নাটকের জন্ম হলেও প্রকৃত পক্ষে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন গিরিশচন্দ্র। তিনি শুধু মতি রায়ের সমসাময়িকই নন ব্যক্তিগত সুহৃদও বটে। উভয়ের রচনারীতি ভিন্ন হলেও রসের দিক থেকে গিরিশচন্দ্র সম্ভবত মতি রায়েরই অনুগামী। 'গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিতে যে ভক্তিরসের প্রাচুর্য আছে, তা নিঃসন্দেহে মতিলাল রায়ের যাত্রার প্রভাব সঞ্জাত।' (যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য)।

মঞ্চের পৌরাণিক নাটকের আদর্শে রচিত যাত্রা পালাগুলি বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে মঞ্চ নাটকগুলিকে এত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতো যে সেগুলিকে মনে হতো দৃশ্যপট ব্যতিরেকে নৃত্য-গীতবহুল মঞ্চের নাটক। কিন্তু একসময় এই গীতাভিনয়েরও ক্ষেত্রে এলো পরিবর্তনের ঢেউ। মঞ্চের মতই সময় সংক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও গীতের সংখ্যা কমতে থাকে। সংলাপ, সংঘাত ও পরিবেশ সৃষ্টিতে যাত্রা ক্রমেই নাটককে অনুসরণ করতে থাকে। সেই অনুসরণের সূত্রেই একদিন (১৯১৩-১৯১৪ খৃঃ মধ্যে) সৃষ্টি হয় থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির। ব্রজেন্দ্রনাথ সাহাই সম্ভবত এর প্রবর্তক। যাত্রা ও মঞ্চ এলো আরো কাছাকাছি।

মঞ্চের প্রভাবে রচিত সে সব পালার 'থিয়েটার' চরিত্র ঘটনার সংহতি বা পারস্পরিক সম্পর্ক ও সময়সীমার অভাবের কথা বাদ দিলে এগুলিকে নাটক থেকে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। সেই সময় থেকেই যাত্রার ওপর নাটকের প্রভাব এত গভীর হতে থাকে যে আজ তার পক্ষে তাকে কোনমতেই এড়ানো সম্ভব নয়।

১৯৪০-৪১ খৃঃ থেকে নাটকের ক্ষেত্রে নবনাট্য আন্দোলনের প্রবাহ বইতে শুরু করে। এসময়কার প্রভাব কিন্তু যাত্রায় অনুপস্থিত। সে সময় দেশ বিভাগ জনিত হতাশায় সম্ভবত যাত্রা কাল্পনিক পালাগুলিকে আশ্রয় করে একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নবনাট্যর প্রতিক্রিয়া যাত্রায় দেখা যায় অনেক পরে—১৯৬০-৬১ নাগাদ। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ চেষ্টা করলেও এই প্রথম দেখা গেল যাত্রা গোষ্ঠীগতভাবে কাল্পনিকভাবে সরিয়ে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শুধু কাহিনী নয়, চরিত্রগুলিও রাজরাজড়ার খোলস ছেড়ে সাধারণ কাপড় জামা, প্যান্ট-সার্ট পরে আসরে উপস্থিত হতে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ বেদনা, সংগ্রাম হতাশা আশেপাশের দুর্নীতি অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার সেসব পালা মঞ্চের আদর্শে সীমাবদ্ধ হয় তিন থেকে সাড়ে তিনঘণ্টায়। অংক প্রথা তুলে দিয়ে পালা রচিত হতে থাকে শুধু কতকগুলি দৃশ্যে। নাটকের অনুকরণেই আজকের যাত্রা থেকে দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলি নির্বাসিত, অতিনাটকীয়তাও প্রায় অপসৃয়মান। পরিবর্তে এসেছে জীবনধর্মী কাটাকাটা ছোট ছোট সংলাপ। ফলে অতীতে শুধু সংলাপের মধ্যে দিয়ে যেসব দৃশ্যরূপ ফুটিয়ে তোলা হতো, আজকের যাত্রায় তা অনুপস্থিত। এছাড়া মঞ্চের বহু সফল নাট্যকার পালা রচনায় হাত দেওয়ায় যাত্রাপালাগুলিকে মঞ্চনাটক থেকে অভিন্ন করা আজ প্রায় অসম্ভব।

ছন্দ বিন্যাস পরিবেশনরীতি সংলাপ সংযোজনা আলোকসম্পাত প্রভৃতি সব দিক থেকেই যাত্রা ও মঞ্চ আজ মুখোমুখি। যুগের আবর্তনেই এটা সম্ভব হয়েছে সত্য—কিন্তু এর প্রস্তুতি চলছে নীরবে নিভৃতে—বহুদিন থেকে। সে কারণেই আজকের যাত্রায় নাটকের প্রভাবআধিক্যে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। এতদিন নাটককে অনুকরণ করেও যাত্রা যদি তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে টিকে থাকতে পারে তবে ভবিষ্যতেও তা থাকবে—এ আশ্বাসে প্রত্যয় রাখা যায়।

রৌদ্রছায়া/উত্তমকুমার এবং অঞ্জনা ভৌমিক
পরিচালনা : শচীন অধিকারী

প্রেক্ষাগৃহ

হেমেন গাঙ্গুলী স্মরণে

মৃত্যুর আকস্মিকতা এবং অস্বাভাবিকতা সময় সময় এমনই মর্মস্তুদ হয় যে, মানুষ স্তব্ধ, স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। সম্পূর্ণ আচম্বিতে যখন হেমেন গাঙ্গুলীর মৃত্যুসংবাদ শুনলুম, তখন সমস্ত শরীর এমন অবশ হয়ে গেল যে, মনে হল, হৃদয়ের স্পন্দন যেন ক্ষণেকের জন্যে থেমে গেল। এই তো, গেল মাঘী পূর্ণিমার দিন, ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা লোকটি বাংলার চলচ্চিত্রজগতের গণ্যমান্য-বরেণ্যদের উপস্থিতিতে তাঁর নবগঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান রূপশ্রী পিকচার্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' অবলম্বনে ছবিটির মহরৎ করলেন তাঁর পূজ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়ানন্দ ভারতীর সাক্ষাৎ আশীর্বাদধন্য হয়ে। তখন কি স্বপ্নেও কারও মনে হয়েছিল, মাত্র এক মাস বাদে, ১৯ মার্চ তারিখে, যে-দিন ঐ 'চতুরঙ্গ'-এর প্রথম শুটিং হবে টালিগঞ্জে, সেই দিনই বিকালে নিতান্ত অতর্কিতে তিনি প্রাণ হারাবেন তাঁর রাঁচির অট্টালিকা-প্রাঙ্গণে স্থিত এক কূপের মধ্যে পতিত হয়ে?

মাত্র ৫৯ বছর বয়সে শ্রীগাঙ্গুলীর অপমৃত্যু ঘটিয়ে নিষ্ঠুর নিয়তির কি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল জানি না, কিন্তু বাংলার চলচ্চিত্রজগৎ যে নিতান্ত অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। কারণ, এমন সর্বাংশে সার্থক প্রযোজক 'কোটিকে গোটিক' মেলে। সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানের সঙ্গে যিনি প্রয়োজনীয় অর্থের শুভ সম্মেলন ঘটাতে পারেন, তাঁকেই আমরা বলি সার্থক প্রযোজক। বহু লোকই জানেন না, হেমেন গাঙ্গুলী ছিলেন একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। তাই চিত্রপ্রযোজনার কাজে তাঁর থেকে যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান আমরা সম্প্রতিকালে পাইনি। এবং নিকট ভবিষ্যতে পাব বলেও মনে করি না।

রায়বাহাদুর শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর একমাত্র পুত্র হেমেন্দ্রনাথ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম হবার পরে এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে যখন প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তখন তাঁর অধ্যাপকরাও বিস্মিত না হয়ে পারেননি। কিন্তু আরও বিস্ময় তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দু-এক বছরের মধ্যে প্যারিসে ফরাসী সাহিত্যের পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে বসলেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও ফরাসী সাহিত্যের কৃতী ছাত্র বিভিন্ন ভাষায় কবিতা রচনা করে সাহিত্যিক মহলে অর্জন করলেন ভূয়সী সুখ্যাতি। মধ্যে মধ্যেই তিনি কবি-সম্মেলন আহ্বান করে যেমন বহু কবির মুখের কবিতা আবৃত্তি শোনবার সুযোগ খুঁজতেন, তেমনই নিজের রচনা পাঠ করেও তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত শুনতে চাইতেন। বলা বাহুল্য, বিদগ্ধজনের অভিমত তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠত অধিকাংশ সময়েই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর যে একটি সহজাত প্রণয় ছিল, তার সাক্ষ্য বহন করে তাঁর রাঁচির অট্টালিকাস্থিত বিরাট লাইব্রেরীটি। 'ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে'—এই প্রবাদ বাক্য তাঁর ক্ষেত্রে ধনবান ও জ্ঞানবানকে একই ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল।

শ্রীগাঙ্গুলীর পিতা শচীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যবসায়ী। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুত্রও ব্যবসায় শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে-ব্যবসায় হচ্ছে রসশিল্পের ব্যবসায়—চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ব্যবসায়। ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' দ্বারা ভূষিত হল। তিনি একযোগে চালাতে লাগলেন চিত্র-প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনীর ব্যবসায়। রাঁচিতে 'প্লাজা', 'রূপশ্রী' ও 'রতন'—তিনটি চিত্রগৃহের মালিক তিনি। ইস্টার্ন সার্কিট ও রূপশ্রী পিকচার্স—এই দুটি পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের প্রথমটির তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং দ্বিতীয়টির মালিক। তাঁর দ্বিতীয় প্রযোজনা
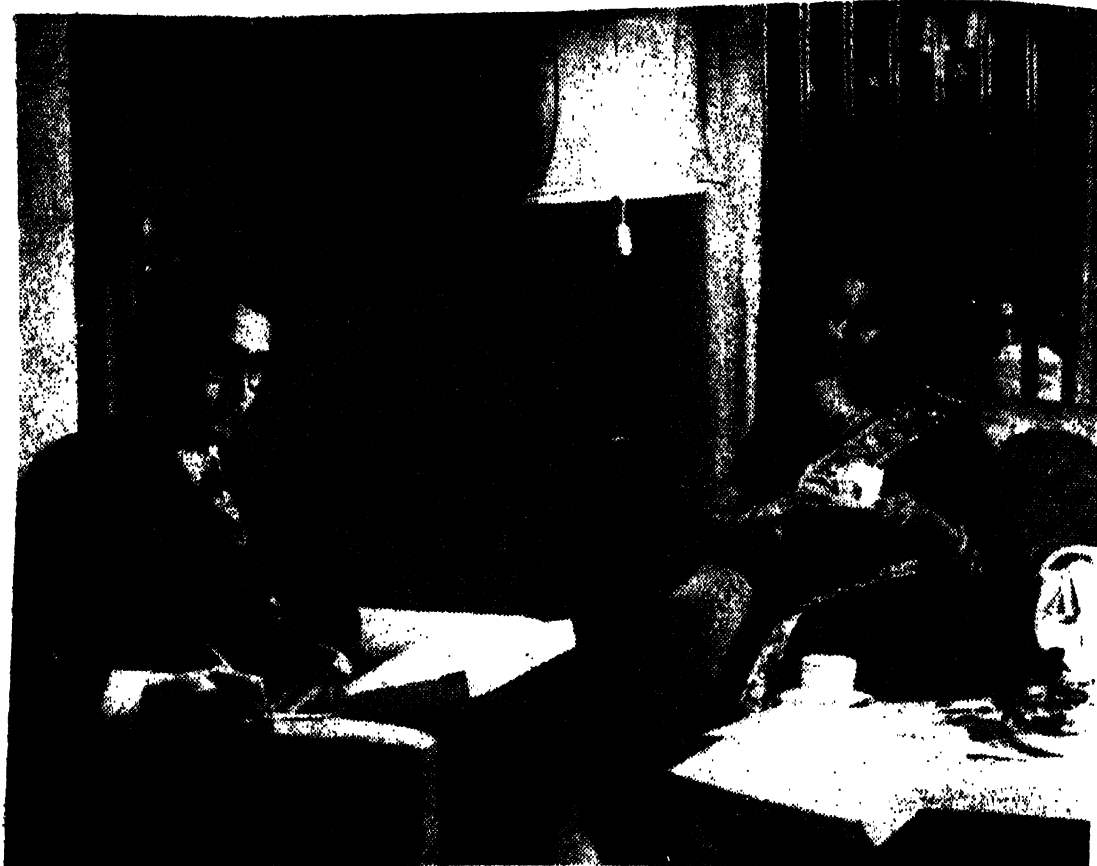
হুয়ারে খুঁজি। জি/দীপঙ্কর ও মাধবী চক্রবর্তী। পরিচালনা ঃ স্বদেশ সরকার
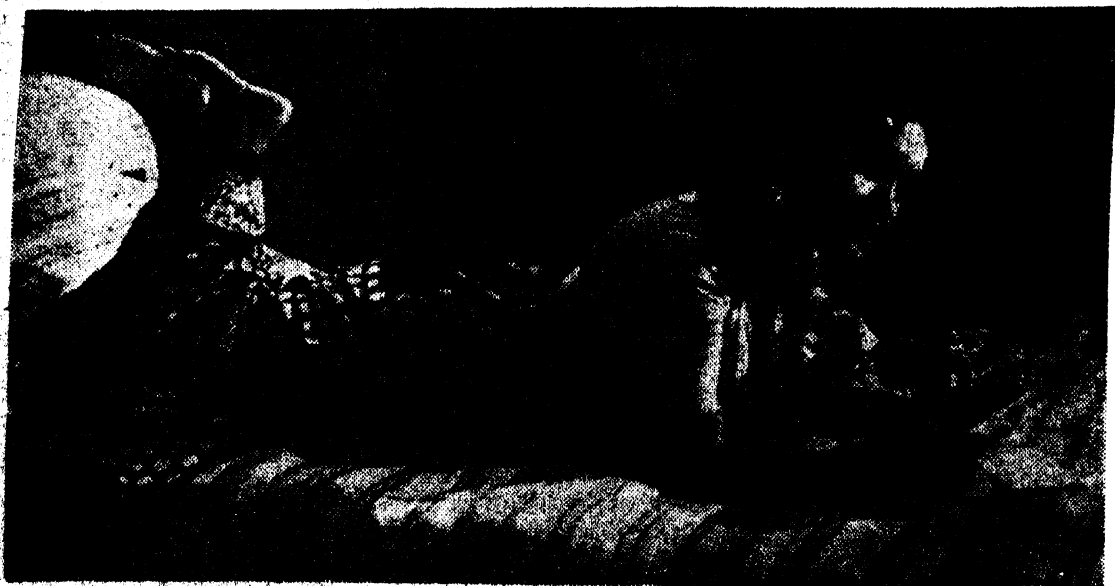
অগ্নিভ্রমর/সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা ঃ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

নিশিকন্যা/মিঠু এবং সৌমিত্র
পরিচালনা : আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

যদুবংশ/অপর্ণা সেন এবং উত্তমকুমার। পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী

'সাগিনা মাহাতো' দিলীপকুমারকে বাংলা ছবির নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর স্বরচিত গান 'তিরি তিরি চলেরে' আজও আমাদের কানে ঝংকার তুলছে। 'সাগিনা মাহাতো'র হিন্দী সংস্করণটির শুটিংয়ের শেষ পর্বটি এখনও বাকী। আর তাঁর ধ্যানের ছবি 'চতুরঙ্গ'-র মাত্র একদিন শুটিং হয়েছে। এমনই সময়ে বিধির অমোঘ বিধানে তিনি অকস্মাৎ বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সামান্য মাত্র জানবার যাঁদের সুযোগ ঘটেছিল, তাঁরাও এক বাক্যে স্বীকার করবেন, এমন বহু-দ্যুতিমণ্ডিত মানুষ পৃথিবীতে এক-আধটাই জন্মায়। তাই তাঁদের মধ্যে কেউ হঠাৎ যদি মধ্যপথেই মিলিয়ে যান, তখন তাঁদের চোখের সামনে বিরাজ করতে থাকে এক বিরাট শূন্যতা।

চিত্র-সমালোচনা

আঁধার পেরিয়ে (বাংলা) ঃ

সত্যসন্ধা প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং তপন সিংহ দ্বারা চিত্রনাট্যায়িত ও পরিচালিত 'আঁধার পেরিয়ে' ছায়াছবির কাহিনীকার চিত্তরঞ্জন মাইতির মূল রচনাটি পাঠ করবার সুযোগ আমাদের হয়নি। কাজেই ছবির পর্দায় কাহিনীর যে-রূপ দেখেছি, তার সঙ্গে মূলের কোনো পার্থক্য আছে কিনা এবং থাকলেও তা কোথায় ও কতোখানি, সে-বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা আমাদের পক্ষে এখনই সম্ভব নয়।

ছবির মাধ্যমে যে-কাহিনী প্রত্যক্ষ করেছি, তার মূল সুরটি বেদনাসিক্ত। একটি বিবাহিত নারীর চোখের জ্যোতি নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাপিত হওয়ার পরে বেচারা নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজের মনকে কোনো মতেই খাপ খাওয়াতে না পেরে, বোধ করি, স্বামীকে নিজের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যদিও জানা ছিল, চোখের রোগের জন্যেই মেয়েটি 'এক্সার ছোলেটস'-এর চাকরীটি খুইয়েছিল কুমারী জীবনেই, তবু শান্তনু ও কাজল পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহিত হবার ক্ষণটিতে যা তারপরেও কোনোদিনই ভাবতে পারেনি যে, কাজল একেবারেই অন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই অপ্রত্যাশিত অন্ধত্ব কাজলের কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল এবং শান্তনুর অজস্র সান্ত্বনাবাক্য সত্বেও সে ক্ষণেকের জন্যেও বিশ্বাস করতে পারেনি যে, একটি অন্ধ স্ত্রীকে জীবনের সাথী করে শান্তনুর মতো প্রাণোচ্ছল তরুণ সুখী মন নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার শান্তনুকে অন্ধ কাজলই তাগিদ দিয়ে নিয়ে গেল মানালীর তুষারধবল পার্বত্যপরিবেশে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ফোটো তুলে যাতে সে কিছুটা আনন্দের স্বাদ পায়। ওদের সান্নিধ্যে এসে পড়ল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তরুণী স্বাতী, সুন্দরী স্বাতী। কাজল বেশ বুঝল, স্বাতীর অমোঘ আকর্ষণ থেকে শান্তনু তফাতে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং তা বুঝেই সে নিজের সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা শুরু করল শান্তনুকে স্বাতীর সঙ্গে ভ্রমণে উৎসাহিত করে, তাকে শেষপর্যন্ত বরফের রাজ্য 'রোটাং পাস'-এ বেড়াতে যেতে বাধ্য করে।—ছলনাময়ী নিয়তি ওদের দিনে দিনে মানালীতে ফিরে আসতে দিল না—রাত্রির জন্যে ওরা পথেই আটকে রইল। এবং এই অবসরে কাজল তার অন্ধকারময় জীবনের অবসান ঘটাবার জন্যে চরম পথ বেছে নিল।

যে-মানুষ জন্মান্ধ নয়, জীবনে আলোর সমারোহে যে অভ্যস্ত, সে যদি একদিন সহসা তার চোখের দৃষ্টিকে হারিয়ে ফেলে, তাহলে অবধারিতভাবেই সে প্রচণ্ড আঘাত পায় অন্তত দিন কয়েকের জন্যে। বিশেষ করে সে যদি একটি সদ্য-বিবাহিতা তরুণী হয়, তাহলে তার এই আকস্মিক অন্ধত্বকে সে ঈশ্বরের অভিসম্পাত বলেও জ্ঞান করতে পারে এবং এ-অবস্থায় তার নিজেকে স্বামীর গলগ্রহ মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এও সত্যি, মুখে যাই বলুক না কেন, দুঃসহ অন্ধত্বের নিঃসহায় অবস্থায় স্ত্রীর একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে স্বামী এবং যতদিন না স্ত্রী তার অন্ধ অবস্থার জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, ততদিন স্বামীকে ঐ স্ত্রীর ছায়ার মতো ঘুরতে হয় তাকে প্রতিনিয়ত সাহচর্য দিয়ে। অন্ধত্বের সঙ্গে যখনও পর্যন্ত বন্ধুত্ব করতে পারেনি স্ত্রী, তখনই যদি স্বামী স্ত্রীকে সেই বাঞ্ছিত সাহচর্য না দিয়ে কোনো উচ্ছলতাভরা সুন্দরী তরুণীর সাহচর্য কামনা করে, তাহলে সেই স্বামীকে আমরা কোনোদিনই অভিনন্দিত করি না, বরং সময়ে সময়ে তাকে আমরা নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়ে থাকি। 'আঁধার পেরিয়ে'র শান্তনুর স্বাতীর সঙ্গে সামান্য মেলামেশাকেও যদি দর্শকরা ভালো চোখে না দেখেন, তাহলে তাঁদের আমরা দোষ দিতে পারি না। অন্ধ কাজল কি শান্তনুর জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছিল যে, সে প্রতিকারের পথ খুঁজতে স্বাতীর অভিমুখী হয়েছিল?

মূল কাহিনীর সঙ্গে আছে ছবির প্রথমাংশে 'স্বদেশ' পত্রিকার কার্যালয় সম্পর্কিত পরিবেশ এবং শেষাংশে মানালীর পথে চারটি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় যুবকের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি হাল্কা পরিবেশ। আরও আছে কিছু মাস্তান এবং এক চিত্রতারকা। কিছুটা হাল্কা হাসির ছোঁয়াচ, কিছুটা বৈচিত্র্য আনবারই উদ্দেশ্যে এদের আমদানি।

ছবিতে সামগ্রিক অভিনয় উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। নায়িকা কাজলের ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তীর অভিনয় আন্তরিকতাপূর্ণ ও ভাবসমৃদ্ধ। নায়ক শান্তনু বেশে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটিকে স্বাভাবিক ও প্রত্যয়নিষ্ঠ করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাতীর ভূমিকাটিতে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় যতদূর সম্ভব প্রাণবন্ত করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন। একটি বিকৃত উন্মাদের চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। সম্পাদক জয়ন্তের ভূমিকাটিকে অনিল চট্টোপাধ্যায় সুন্দর বাচনভঙ্গীর সহায়তায় উপভোগ্য করে তুলেছেন। চিন্ময় রায়, শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় রায়চৌধুরী ও সত্য মজুমদার—এই চারজন শিল্পী চারটি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় অভিযাত্রীরূপে ছবির হাল্কা দিকটি জমিয়ে রেখেছেন। অপরাপর ভূমিকায় নির্মলকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, রুণু মিত্র প্রমুখের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। মানালীর পর্বটি অঙ্গীন। এবং সেই কারণে এই অংশটি অধিকতর আকর্ষণীয়। সম্পাদনায় কাহিনীর [illegible] রক্ষা করা হয়েছে।

ছবির সংগীতাংশ সুপ্রযোজিত। কণ্ঠ-সঙ্গীতগুলি সুগীত।

কমল মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত, সত্য-সুধা প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং তপন সিংহ পরিচালিত 'আঁধার পেরিয়ে' দর্শনীয়।

—নান্দীকার

মঞ্চাভিনয়

সন্ধিক্ষণের 'জমিদার দর্পণ' : বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে যে সব নাটক অভিনীত হয়েছে, তার প্রায় সব ক'টাই বোধ হয় পুরনো নাটক —কখনো সে নাটক তদানীন্তনকালের সমাজ চিত্র তুলে ধরেছে, কখনো তা আবার সমসাময়িক যুগের কোন প্রতিচ্ছবি না হয়ে শুধু অভিনয় দীপ্তিতেই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই ধারায় 'সন্ধিক্ষণ' প্রযোজিত 'জমিদার দর্পণ' নিঃসন্দেহে একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত নির্বাচন। মীর মোশারফ হোসেনের ১২৭৯ সালে রচিত এই বলিষ্ঠ জীবনধর্মী নাটককে মঞ্চের আলোয় তুলে ধরে 'সন্ধিক্ষণে'র শিল্পীরা তাদের নাট্যচেতনার আন্তরিকতাকে প্রত্যাশিত গম্ভীরতায় মূর্ত করে যে তুলতে পেরেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের সমাজের ব্যবস্থা একশো বছর আগে কোন ধারায় বয়ে চলতো, তারই একটি ছবি বোধ হয় 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। সমাজে যে অত্যাচারের প্লাবন এসেছিল কোন এক সময়ে তা শুধু নীলকর সাহেবদের অমানুষিকতা থেকেই আসেনি, লাঞ্ছনার ইতিকথায় বেশ খানিকটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল তৎকালীন অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর। তখনকার দিনের অত্যাচারের বীভৎস, ভয়ংকর অথচ নিদারুণভাবে বাস্তব ছবিটি মঞ্চের আলোয় সুস্পষ্ট করে তোলার দিকে সন্ধিক্ষণের শিল্পী ও নির্দেশকের প্রবণতা ছিল বেশী। অবশ্য এ প্রবণতা খুব সঙ্গত কারণেই এসেছে।

নাটকটির মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা সংলাপ এসে সামগ্রিক গতিবেগকে হয়তো কোথাও কোথাও শিথিল করে দিয়েছে। আর একটু সম্পাদনায় এই শৈথিল্য দূরে সরে যাবে এবং নাটকটি হবে আরো তীব্র গতিবেগ-সম্পন্ন। তবে নাট্য নির্দেশক গৌরকৃষ্ণ ভদ্রের মুন্সিয়ানা বারবার তারিফ করার মতো। জোনাল এ্যাকটিং, আলো ছায়ার কম্পন, এবং কয়েকটি অসম্ভব নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করার ব্যাপারে শ্রীভদ্রের শৈল্পিক নিষ্ঠা সবিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। তিনিই ছিলেন মূল চরিত্রাভিনেতা। নাটকের আকর্ষণটিকে তাই তিনিই রেখে-ছিলেন সজীব করে। নারীলোভী, ধূর্ত, অজ্ঞ মূর্খমান জমিদারের যে চরিত্রটি তিনি মঞ্চের আলোয় তুলে ধরেছেন, তা এক কথায় অপূর্ব।

অন্যান্য যাঁরা ভালো অভিনয় করে নাটকটির গতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সামনের দিকে তাঁরা হোলেন অরুণ মুখার্জী, রাম ভট্টাচার্য, রথীন্দ্র ঘোষ, অজিত প্রামানিক, মাধব চ্যাটার্জি, স্বপ্না মিত্র, চৈতালী রায়, নমিতা মণ্ডল। রূপসজ্জায় পরিবেশিত এই আবহসঙ্গীত ও আলোক সম্পাতে ছিলেন পুষ্পেন সেন ও অজিত মিত্র।

সকালের জন্য : বালী পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রযোজনায় সম্প্রতি সালকিয়া 'শশীমহলে' 'সকালের জন্য' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল। নাট্য নির্দেশনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন বিজলীমোহন মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিপ্রসাদ গোস্বামী, প্রশান্ত চক্রবর্তী, মদন রায়, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাবীর পলসন, রঞ্জিত গোস্বামী, বিকাশ মৈত্র, চন্দ্রমোহন পাল, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্র অধিকারী, বিশ্বনাথ দাঁ।

মঞ্চসজ্জায় সুরুচি শৈল্পিক মনের পরিচয় রাখেন আকাশরঞ্জন পারিয়াল। সঙ্গীত পরিচালনা করেন লক্ষণ গাঙ্গুলী।

অবশেষে ও আমার দুটি নায়ক : শিবপুর নবদূত সংঘের সদস্যরা সম্প্রতি শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী মঞ্চে দুটি নাটক পরিবেশন করে দর্শকসাধারণের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। নাটক দুটি হোল 'অবশেষে' ও 'আমার দুটি নায়ক'। বৈশিষ্ট্যদীপ্ত চরিত্র চিত্রণের জন্য যাঁরা নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হোলেন সমর মোদক, সুকুমার নাগ, বিজয় মোদক, অনিল বিঠা, প্রবোধ রায়, বাবলা দাস ও দিলীপ মোদক। নাটক দুটি পরিচালনা করেন শঙ্করলাল ব্যানার্জী ও বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত।

[illegible] চক্রবর্তী এবং [illegible]। বিশ্বনুর হেসে। পরিচালনা ঃ শংকর বাগচি।

ফটো ঃ অমৃত

মৌচোর ঃ নাটকের বক্তব্য যদি গভীর হয়, এবং শিল্পীদের অভিনয়ে যদি প্রাণময়তা থাকে, তাহোলে বহু অভিনীত হোলেও সে নাটক তার আকর্ষণ হারায় না। সেদিন স্টার রংগমঞ্চে এই সত্যটিকেই দৃঢ়তার সংগে প্রতিষ্ঠা করলেন সি-আরও-স্টাফ অফ আই সি আই গ্রুপ অফ কোম্পানীর কর্মী শিল্পীরা। নাটকের নাম মৌচোর নাট্যকার হোলেন সলিল সেন। সুন্দরবনের আঠারো-ভাটি অঞ্চলের যে মানুষগুলোকে শ্রীসেন নাটকের মধ্যে এনেছেন, তাকেই মঞ্চের আলোয় অসাধারণ বাস্তবতায় উজ্জ্বল করে তোলাই এই প্রযোজনা। এর জন্য কৃতিত্ব যেমন শিল্পীদের, তেমনি নির্দেশকের নিষ্ঠাও প্রশংসার দাবী রাখে। এই নির্দেশনার দায়িত্ব দক্ষতার সংগে পালন করেছেন শ্রীপাচু বিশ্বাস। প্রয়োগ পরিকল্পনায় তাঁর শৈল্পিক চাতুর্য সত্যি অভিনন্দনযোগ্য।

সু-অভিনীত নাটকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন পাঁচু বিশ্বাস, শচীন ব্যানার্জী বিজন মিত্র, সুধীন বসু, সুজিত আঢ্য, কুমার ভাদুড়ী, কৃষ্ণধন হালদার, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, গোতম চৌধুরী, প্রতিমা পাল, অজন্তা মিত্র, মেনকা দেবী।

। নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ।

ইছাপুরে 'অনুশীলনী' আয়োজিত ৫ বার্ষিক একাংক নাটক প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার স্বীকৃতি পেয়েছে 'নো-এনট্রী' নাটক। পরিবেশন করেছেন উত্তরপাড়ার 'আমরা' গোষ্ঠী। দ্বিতীয় 'ছন্নছাড়া' (শ্বেতাকারী কলকাতা); তৃতীয়—'আঠারো বছরের যৌবন' (এল-এম-এ সি. নৈহাটী) ও 'গোপন রক্তের কোজাগরী' (টেলরুম রিক্রিয়েশন ক্লাব, ইছাপুর।) শ্রেষ্ঠ পরিচালক—রাধারমণ ঘোষ, 'শতাব্দীর পদাবলী—ইউ-টি-সি, হাওড়া। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি—(১ম) গোপন রক্তের কোজাগরী—দীপক গোস্বামী, (২য়) 'ছন্নছাড়া—দীপক সেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—তিমির বন্দোপাধ্যায়—(শ্রেষ্ঠ নাট্যসংস্থা ইছাপুর), শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—বেলা সরকার (প্রেক্ষণ)।

কালিন্দী অভিনয় ঃ

নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনীর দক্ষিণ কলকাতা শাখার সভ্যারা তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের কালিন্দী অভিনয় করেন আকাদমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে ২২ মার্চ। এক সময় আমাদের মঞ্চে এবং যাত্রায় নারী ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষেরা। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় জগতে মহিলাদের [illegible]। মহিলা শিল্পীরা [illegible] অভিনয় [illegible]। [illegible] কালিন্দী অভিনয়। অভিনেত্রীদের [illegible] পায়নি। [illegible] দর্শক মনে [illegible]। [illegible] সাধনা [illegible] রায় রমা দাশগুপ্ত এবং আরতি চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য যাঁরা অভিনয় করেন গীতা মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী [illegible] চৌধুরী, কল্যাণী রায়, অর্চনা ভট্টাচার্য, চন্দ্রিমা সেন, কনক মানি, প্রীতি সেন, প্রভাতী মজুমদার, মণিমালা চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ভট্টাচার্য, জিনিয়া বোস, শুক্লা রায় চৌধুরী এবং পুষ্পিতা বিশ্বাস, স্বপ্না বন্দোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী এবং কস্তুরী রায়। সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়।

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার ঃ ১১ মার্চ হাইন্ড মার্স মঞ্চে (কাঁচড়াপাড়া) মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত ক্যাপ্টেন হুররা অভিনয় করেন সভ্যবৃন্দ। নাটকের বিষয়-বস্তু কাল্পনিক হলেও দর্শকদের বুঝতে কষ্ট হয় নি। সমগ্র অভিনয় দর্শকদের মনে রেখাপাত করেছে। অংশ গ্রহণ করেন কালিপদ ভৌমিক, ভজন গুপ্ত, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনায় ছিলেন সুধীর বন্দোপাধ্যায়।

দুই মহল অভিনয় ঃ গত ১০ মার্চ রঙ্গনা গৃহে 'দুই মহল' অভিনয় করেন আর এম এস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা। সামগ্রিক অভিনয় দর্শক মনে রেখাপাত করেছে। অংশ গ্রহণ করেন হেমন্ত ঘোষ, শংকর সরকার, কাজল ব্যানার্জি ও রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নির্দেশনায় ছিলেন বিভূতি চট্টোপাধ্যায়।

স্ট্রীট বেগার অভিনীত ঃ সালিখা ছাত্র ব্যায়াম সমিতির সভ্যরা সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে শশীমণ্ডল রঙ্গমঞ্চে 'স্ট্রীট বেগার' নাটকটি সাফল্যের সাথে অভিনয় করেন। সু-অভিনীত নাটকটির কয়েকটি উল্লেখ্য ভূমিকায় ছিলেন নিমাই দাস, শান্তি মিত্র, শেখরলাল বসাক, দেবশ্রী মিত্র, কাশীনাথ পাত্রাল প্রভৃতি। সমগ্র নাটকটি পরিচালনা করেন তপন ধর।

কুলটি সম্মিলনীর একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা

গেল ৩, ৪ ও ৫ মার্চ তিনদিন সন্ধ্যায় কুলটি সম্মিলনীর উদ্যোগে যে বার্ষিক একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা হয়ে গেল, তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন পনেরোটি নাট্য সংস্থা। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা নির্বাচিত হয়েছে আসানসোল চেলিডাঙার নাটকে নাট্য সংস্থা অভিনীত 'নাটকে'। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সিন্ধির দি নিউ লিটল থিয়েট্রিকাল গ্রুপ অভিনীত 'যাদুকর'। শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটক হচ্ছে সুব্রত দাশমাল রচিত 'নাটকে'। শ্রেষ্ঠ পরিচালক বিবেচিত হয়েছেন সুব্রত দাশমাল। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েছেন কুলটি নবীন সংঘ অভিনীত 'নিহতের নাম'-এ শচীপতির ভূমিকাভিনেতা অরুণকুমার গোস্বামী। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ—সুব্রত দাশমাল। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-অভিনেতা 'যাদুকর'-এ 'জগৎশিল্পর কাকা' চরিত্রাভিনেতা কার্তিক মজুমদার। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শিল্পীচক্র অভিনীত 'অপূর্ণ' [illegible]-এ কল্যাণী

চক্রবর্তী। দ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠা হয়েছেন আসান-সোলের বিমূর্ত 'ক' নাট্য সংস্থা অভিনীত 'হারাধনের দশটি ছেলেতে' স্বপ্না শী। শ্রেষ্ঠা শিশু অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছে কুলটি তরুণ সংঘের প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ'-এ লোক্তার চরিত্রাভিনেত্রী মমতা ঘোষ।

ফাঁস : ইনসপেকটোরেট অফ ইলেক-ট্রনিকস-এর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি সম্প্রতি পরিবেশিত হোল। শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্যের অপূর্ব নির্দেশনায় সমগ্র প্রযোজনাটি অসাধারণ সাফল্য লাভ করে।

নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র পাল, সুবোধ ভট্টাচার্য, গোপাল ঘোষ, জে সি দত্ত, কে ডি গাংগুলী, এস সি সেন, এস কে পৈয়ালী, এন কে আচার্য, এস কে মুখার্জি, এন এস গায়েংগার, অজন্তা চৌধুরী, ইরা মিত্র।

বিবিধ সংবাদ

ভারত-রুমানিয়া মৈত্রী সমিতির উদ্বোধন : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রুমানিয়ার রাষ্ট্রদূত পিটার তানাসিয়ে ভারত-রুমানিয়া মৈত্রী সমিতির উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমাজতান্ত্রিক রুমানিয়ার সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রটি তুলে ধরেন এবং আন্ত-র্জাতিক রাজনীতিতে রুমানিয়ার বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য বর্ণনা করেন। তাছাড়া ভারত ও রুমানিয়ার মধ্যে কারিগরী সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বিগত দশকে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত-রুমানিয়া মৈত্রী সমিতি আগামী দিনে ঐ সংগে সম্প্রীতির বন্ধনকেও দৃঢ় করে তুলবে বলে আশা করেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ এ এম ও গণি এম-এল-এ এবং অধ্যাপক সুনীল কর। সমিতির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূতকে একটি বিশেষ স্মারক উপহার দেওয়া হয়।

গড়িয়াহাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সম্প্রতি গড়িয়াহাট ফ্রেন্ডস সপ এসো-সিয়েশনের সৌজন্যে একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানু-ষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রোতাদের প্রশংসাধন্য এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী-দের মধ্যে ছিলেন অমল মুখোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, বুদ্ধ রক্ষিত, আর কে রাজু, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, ডেসডি মোনা ও সম্প্রদায় এবং রবীন্দ্রসংগীতে আশিস মুখোপাধ্যায়। সংগতে সহযোগিতা করেন কানাই ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান পরিচালনার কৃতিত্ব দুলাল সরকারের।

দিশারী পুরস্কার : নাট্য-সাংবাদিক ও সংগীত-সমালোচকদের বিচারে অপেশাদার নাটক, পেশাদার যাত্রা ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের দিশারী পুরস্কারে যাঁরা সম্মানিত হবেন, সেই সব সংস্থা ও

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও রঞ্জু মিত্র। গ্রহণ। পরিচালনা : বলাই সেন। ফটো : অমৃত
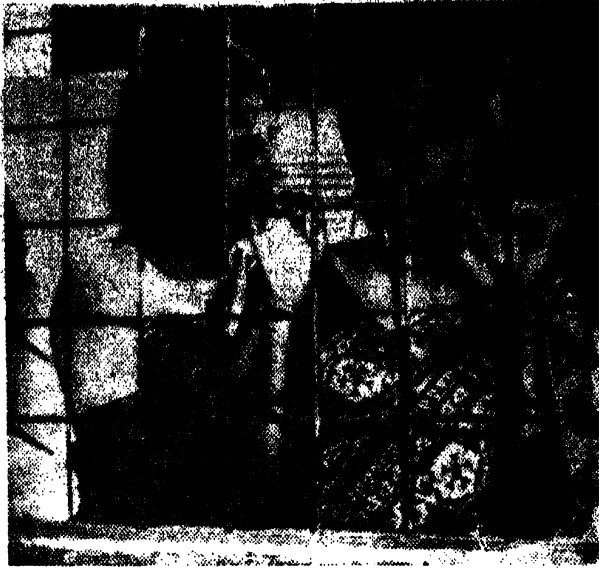
শিল্পীদের নাম ঘোষিত হয়েছে ৩ ফেব্রুয়ারী। বিজয়ীদের নাম—নাটক : **শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা :** 'অজগর' কালচারাল সেমিনার **শ্রেষ্ঠ নাট্যকার :** প্রবীর মুখোপাধ্যায় (অভিনয় দর্পণ)। **শ্রেষ্ঠ পরিচালক :** সমর মুখোপাধ্যায় (অজগর)। **শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক :** দেবকী বন্দোপাধ্যায় (সেই বৃদ্ধ) কায়ানট। **শ্রেষ্ঠ আলোকশিল্পী :** বিমল দাস। **শ্রেষ্ঠ অভিনেতা :** সলিল পাল (অজগর)। **শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা :** রণজিৎ গাংগুলী (শ্রীমতী দ্রৌপদী) কোরাস। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি (শ্রীমতী দ্রৌপদী)। **শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী :** স্বপ্না মিত্র 'বিদ্রোহী নজরুল' চারণদল।

যাত্রা—**শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা :** 'ভক্তকবীর' নিউ প্রভাস অপেরা। **শ্রেষ্ঠ নাট্যকার :** আগন্তুক (নিহত গোলাপ)। **শ্রেষ্ঠ পরি-চালক :** শেখর গাংগুলী (জানোয়ার) লোকনাট্য। **শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক :** পঞ্চানন মিত্র। **শ্রেষ্ঠ আলোকশিল্পী :** বাদল চক্রবর্তী (জানোয়ার)। **শ্রেষ্ঠ অভিনেতা :** স্বপনকুমার (সপ্তপদী) স্বপন অপেরা। **শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা :** মোহন চট্টোপাধ্যায় (ভুলি নাই) নিউ গণেশ অপেরা। **শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা :** শিব ভট্টাচার্য (এবার ভদ্রতের পালা) তরুণ অপেরা। **শ্রেষ্ঠ গায়ক : বলাই** হালদার (বেগম মেরী বিশ্বাস) ভারতী অপেরা। **শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী :** জয়শ্রী বড়াল (মেজবৌ) নিউ প্রভাস অপেরা। **শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী :** বন্দনা দেবী (ভুলি নাই)। **উচ্চাংগ-সংগীত :** শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসংগীত শিল্পী : মানস চক্রবর্তী ও তৃপ্তি চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ সেতারশিল্পী : ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য। শ্রেষ্ঠ সরোদশিল্পী : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক : মন্ময় ধর। শ্রেষ্ঠ তবলাশিল্পী : রমেন চট্টোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ সারেঙ্গীশিল্পী : রমেন মিশ্র। **শ্রেষ্ঠ কত্থক নৃত্যশিল্পী :** বন্দনা সেন। শ্রেষ্ঠ **ভরতনাট্যমশিল্পী :** গীতা মাসহোত্রা।

বিশিষ্ট মার্কিন পিয়ানোশিল্পী কলকাতায় বিশিষ্ট মার্কিন পিয়ানো-বাদিকা শার্লট হোয়াইট ১০ মার্চ ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিক ভবনে এক অনুষ্ঠানে পিয়ানো বাজান। ব্যাখ, শপিন ও র‍্যাভেলের সুরসৃষ্টি শ্রীমতী হোয়াইটের অনুষ্ঠানে শোনা যায়। ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিক এবং ইন্ডো আমেরিকান সোসাইটির যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করা হয়।

শার্লট হোয়াইট নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রিচার্ড সিগালের কাছে পিয়ানো বাজানো শিক্ষা করেন। প্রখ্যাত পিয়ানোবাদক জোসেফ লেভিন ও তাঁর স্ত্রী রোসিনার কাছেও শার্লট পিয়ানো শেখেন।

শ্রীমতী হোয়াইট পিয়ানো বাজনা প্রতি-যোগিতায় ৪০০ প্রতিযোগীর মধ্যে জয়লাভ করে বলডউইন স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। তিনি বস্টন শিল্পী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পী হিসাবে পিয়ানো বাজিয়ে-ছেন। তিনি ফরডাম বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যান-হাটান স্কুল অব মিউজিক এবং হেনরী স্ট্রীট সেটলমেন্ট মিউজিক স্কুলে সংগীত শিক্ষাদানও করেছেন।

জাপানে কে লাল-এর যাদুপ্রদর্শনী : গত ৫ জানুয়ারী জাপানের টোকিও শহরে বিশ্ব বিখ্যাত ভারতীয় যাদুকর কে লাল তাঁর ম্যাজিক প্রদর্শনী শুরু করেন এবং প্রতি-দিন দুটি করে প্রদর্শনী পরিবেশন করে ওসাকা নারা প্রভৃতি শহরে বিশেষ জন-প্রিয়তা অর্জন করেন। যাদুকর কে লাল-এর এটা দ্বিতীয়বার জাপান সফর। প্রথম সফর করেন ১৯৬৯ খৃঃ জাপান ছাড়া তিনি আফ্রিকা, মিডল ইস্ট, কুয়েত, নাইরোবী ও মরিশাস সফর করেন তার যাদুপ্রদর্শনী নিয়ে। এই [illegible] তিনি ১৯৬৯-[illegible],

অপর্ণা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বিলেত ফেরৎ। পরিচালনা : চিদানন্দ দাশগুপ্ত
ফটো : অমৃত

৪০ টন যাদুসামগ্রী, বহু রংবেরং-এর দৃশ্যপট সহ ১৯ জন সুদক্ষ সহকারী সাথে নিয়েছেন। কে লাল জাপানের বিভিন্ন শহরে পাঁচ মাস ধরে সফর করবেন তার মায়াজাল প্রদর্শনী নিয়ে।

কোন্নগর উদয়াচল সংঘ : নাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে হুগলী জেলার মধ্যে কোন্নগর উদয়াচল সংঘ যেমন একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী, তেমনি বিভিন্ন সংগীতালেখ্য পরিবেশনেও এই সংস্থার ভূমিকা স্মরণযোগ্য। গত ১১ মার্চ এই সংস্থা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ উৎসব উপলক্ষ্যে নিবেদন করেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' সংগীতালেখ্য। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ রচনা ও পরিচালনার গুণে এবং দিলীপ দের অপূর্ব সংগীত পরিচালনায় একটি স্মরণযোগ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থনায় বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্র মিত্র। কণ্ঠসংগীতে সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, রুণু চক্রবর্তী, শিখা কর, সুনীতা সরকার, ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দে, সমীর সরকার, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, তুষার চক্রবর্তী। যন্ত্রসংগীতে সর্বশ্রী সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্র চক্রবর্তী।

পুরুলিয়া রাধাকুঞ্জের দোল উৎসবে বিরাট সংগীতানুষ্ঠান : শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী বিরজানন্দ ভারতী (শ্রীশ্রীক্ষ্যাপা মনোহর ঠাকুর) প্রতিষ্ঠিত মনোহর সেবাশ্রম সঙ্ঘের পুরুলিয়ার রাধাকুঞ্জে এবার গত ১৬ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত দোল উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন ধরে এক বিরাট সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এবারের আকর্ষণ ছিল ভারতীয় বাউল সংগীতের এক মনোরম সংগীত সম্মেলন। এই সম্মেলন চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। নবীন-প্রবীণ বহু বাউল নরনারী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই দলে যাঁরা প্রায় দশ সহস্রাধিক শ্রোতার মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে বাউল পঞ্চানন মুখার্জি, সুধানন্দ গোস্বামী ও শ্রীমতী হাসি গোস্বামীর নাম করবার মত।

এছাড়া পালা কীর্তনে বাঁকুড়ার বিখ্যাত পালা কীর্তনীয়া রঙ্গলাল দল ও তাঁর সম্প্রদায়, বীরভূমের মানিক ঘোষ ও তাঁর দল বিশেষ মনমাতানো পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সবশেষে পুরুলিয়া জেলার বেলানগরের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছৌ নৃত্য সুধী দর্শকদের পরিতৃপ্ত করে।

প্রাচীন বাংলা গানের আসর : গত ১৮ মার্চ দোলযাত্রার দিন ভারত গণতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে প্রাচীন বাংলা গানের এক সার্থক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। চন্দননগরের বিখ্যাত গায়ক বিপ্রদাস নন্দী প্রাচীন বাংলা সংগীত বিশেষ করে টপ্পা সংগীতের উৎপত্তি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দানের পর রাজা রামমোহন রচিত ভক্তিমূলক সংগীত, সরিমিয়ার টপ্পা, নিধুবাবুর টপ্পা, গোবিন্দ অধিকারীর টপ্পাসহ বহু অপ্রচলিত বাংলা ধ্রুপদ সংগীত পরিবেশন করেন। বহুলব্ধ প্রতিষ্ঠিত সংগীত শিল্পী ও সংগীতরসিক বিপ্রদাসবাবুর সংগীত শুনে মুগ্ধ হন। প্রাচীন বাংলা সংগীতের প্রতি নব-অনুরাগের লক্ষণ উক্ত সংগীতের আসরে পরিলক্ষিত হয়।

সুরসভার বসন্ত উৎসব : সুরসভার শিল্পীরা ১১ মার্চ বিড়লা আকাদেমি হলে বসন্ত উৎসব পরিবেশন করেন। নামী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা মিত্র। তা ছাড়া অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন তরুণ ও নবাগত। এঁদের দিয়েও যে একটি সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর সংগীতানুষ্ঠান হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সুরসভার বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও হিমাংশু দত্ত, নজরুল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি সুরকারের গান অনুষ্ঠানে স্থান পায়। যার জন্য সংগীতানুষ্ঠানটি বিশেষ বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সুচিত্রা মিত্র তাঁর স্বাভাবিক সুরেলা কণ্ঠে দুটি গান শোনান 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে' ও 'দিনের পরে দিন যে গেল'। এর পর নবাগত শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় লক্ষ্মী গুপ্তের। তাঁর মিষ্টি গলায় 'চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়' (নজরুল) ও 'রাতের ময়ূর' (হিমাংশু দত্ত) গান দুটি এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। বীথি দাস, সুজাতা সেন ও রবীন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সুন্দর। উমা করের কণ্ঠে সুরকার হিমাংশু দত্তের দুটি গান 'ফাগুনের বাঁশীখানি' ও 'নতুন ফাগুনে যবে' উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। শিপ্রা ভট্টাচার্যের অতুলপ্রসাদী ও মন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতও সকলের মন জয় করে নেন। আরতি দত্তের 'মিছে মায়ারই ফুলডের' (সুধীরলাল) ও রত্না গুপ্তের 'আজি রজনী শেষে' (হিমাংশু দত্ত) বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। চারজন শিশুশিল্পী মধুমন্তী মৈত্র, তপতী বাররী, মৌসুমী দাস ও সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় এঁরা গেয়েছেন 'ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে রঙের ঝরণা' রবীন্দ্রসংগীত। এঁদের গান শুনে শ্রোতৃমন আনন্দ রসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মণিদীপা শ্যামের নজরুলগীতি প্রশংসনীয়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুষমা ঘোষ, মঞ্জুশ্রী গাঙ্গুলী, স্নিগ্ধা গুহ, স্বপ্না বসু, দীপ্তি ভট্টশালী ও গৌর বসাক। সংগতে ও যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, দুলাল ভট্টাচার্য, স্বপন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, অমৃতলাল রায় ও ভোলানাথ সাহা। সংগীত-পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী।

নিখিল বঙ্গ বিতর্ক প্রতিযোগিতা :— স্টুডেন্টস কর্ণার পরিচালিত নিখিল বঙ্গ বিতর্ক প্রতিযোগিতা আগামী ৮ এপ্রিল '৭৩ শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। বিতর্কের বিষয় বর্তমান 'শিক্ষা বিপর্যয়ের মূলেই সমাজ বিপর্যয়'। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের ৩১ মার্চ '৭৩ মধ্যে অমিত বিশ্বাস (৩-বি শ্যাম স্কোয়ার ইস্ট কলি-৩)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সংশোধন

৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅরুণ মিত্রের 'সাহিত্যে অনুবাদের সমস্যা' আলোচনায় কয়েকটি মারাত্মক মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। ৫১৩ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে 'আনাবেস' স্থলে পড়তে হবে 'আনাবাজ'। ৫১৩ পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে সু-সাহিত্যের স্থলে 'অ-সাহিত্যের' এবং 'অর্থ-চারিত্রের' স্থলে পড়তে হবে 'অর্ধ-চারিত্রের'। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

দর্শক

অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

ওয়েম্বলের 'এম্পায়ার পুলে' আয়োজিত ৬৩তম অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার ২৩ বছরের ইঞ্জিনিয়ার-ছাত্র রুডি হার্টোনো পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি ৬বার (১৯৬৮-৭৩) সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। তাঁর আগে উপর্যুপরি ছয়বার পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান কোন খেলোয়াড় হননি। উপর্যুপরি পাঁচবার (১৯২৫-২৯) সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডের ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে রুডি হার্টোনো প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে মাত্র ১৮ বছর বয়সে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। তিনিই পুরুষ বিভাগে সর্বকনিষ্ঠ সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান। আগামী বছর তিনি সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড ভাঙবেন। বর্তমানে তিনি এবং ডেনমার্কের আরল্যান্ড কপস্ মোট ছয়বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে যুগ্মভাবে সর্বাধিকবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ডের অংশীদার।

এবছর পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ারই খেলোয়াড় ছিলেন ৩ জন এবং অপরজন ডেনমার্কের। এক দিকের সেমি-ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার অবাছাই খেলোয়াড় ক্রিশ্চিয়ান হান্দিনেতা প্রতিযোগিতার যুগ্ম শীর্ষস্থানীয় এস প্রিকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে রুডি হার্টোনো স্বদেশের জুন জুনকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন রুডি হার্টোনো এবং ডেনমার্কের এস প্রি। হার্টোনো শেষপর্যন্ত খেতাব জয়ী হয়ে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন। অপরদিকে প্রি অপ্রত্যাশিতভাবে সেমি-ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় ইন্দোনেশিয়ার ক্রিশ্চিয়ান হান্দিনেতার কাছে হেরে যান। ফলে দর্শকদের হার্টোনো বনাম প্রির ফাইনাল খেলা দেখা মাঠে মারা গেল।

মেয়েদের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকাতেও শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন দুজন—সুইডেনের ইভা টুইডবার্গ এবং জাপানের হিরো য়ুকি। এঁরা ফাইনালে উঠতে পারেননি। ১৯৬৮ ও ১৯৭১ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান টুইডবার্গ কোয়ার্টার-

রুডি হার্টোনো

ফাইনালে ডেনমার্কের কোপেনের কাছে হেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অপরদিকে ১৯৬৯ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হিরো য়ুকি সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডের গিলিয়ানের কাছে পরাজিত হন। এবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে যেমন দুজন খেলোয়াড়ই ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার, তেমনি মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলেছিলেন ইংল্যান্ডেরই দুজন খেলোয়াড়—দীর্ঘ ৩৫ বছরে এই প্রথম নজির যে একই বছরের সিঙ্গলস ফাইনালে ইংল্যান্ডের দুজন খেলোয়াড় পরস্পর খেললেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে পাঁচজন ভারতীয় খেলোয়াড় খেলেছিলেন। এঁদের মধ্যে আমাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রকাশ পাড় কোন দ্বিতীয় রাউন্ডে সুইডেনের জনসনের কাছে হেরে যান। বাকি চারজন—দীনেশ খান্না, সুরেশ গোয়েল, দীপু ঘোষ ও রমন ঘোষ প্রথম রাউন্ডের খেলাতেই বিদায় নিয়েছিলেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—৪ ও ১৫—২ পয়েন্টে স্বদেশের ক্রিশ্চিয়ান হান্দিনেতাকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৬ বার খেতাব জয়ী হন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : মার্গারেট বেক (ইংল্যান্ড) ১১—৮ ও ১১—০ পয়েন্টে স্বদেশের গিলিয়ান গিলক্সকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ক্রিশ্চিয়ান এবং চন্দ্র (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১ ও ১৫—৭ পয়েন্টে স্বদেশের জুন এবং ওয়াজুদীকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার খেতাব জয়ী হন।

মহিলাদের ডাবলস : মাচিকো আইজাওয়া এবং এতসুকো তাকেনাকা (জাপান) ইংল্যান্ডের মার্গারেট বেক এবং গিলিয়ান গিলক্সকে পরাজিত করেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় চারটি খেতাবের মধ্যে এশিয়া মহাদেশের দুটি দেশ তিনটি খেতাব পেয়েছে—পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে ইন্দোনেশিয়া এবং মেয়েদের ডাবলসে জাপান। মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাবটি পেয়েছে ইংল্যান্ড। প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া, জাপান এবং ইংল্যান্ড—এই তিনটি দেশের খেলোয়াড়রাই খেলেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া এবং মেয়েদের সিঙ্গলস [illegible] —ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রাই পরস্পর খেলে নিজ নিজ দেশের প্রাধান্য বিস্তার করেন।

রুডি হার্টোনোর রেকর্ড

ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্টোনো কিভাবে উপর্যুপরি ৬ বার (১৯৬৮-৭৩) ফাইনালে [illegible]-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিক বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছেন, তা নীচে দেওয়া হল। এখানে উল্লেখ্য, হার্টোনো তাঁর উপর্যুপরি ৬ বারের ফাইনালে স্বদেশেরই বিভিন্ন খেলোয়াড়ের বিপক্ষে খেলেছেন ৩ বার, ডেনমার্কের এস প্রির বিপক্ষে ২ বার এবং মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়ের বিপক্ষে ১ বার।

১৯৬৮ সালের ফাইনাল :
১৮ বছরের স্কুল-ছাত্র রুডি হার্টোনো ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েন্টে তান আইক হুয়াংকে (মালয়েশিয়া) পরাজিত করে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সব থেকে কম বয়সে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন।

১৯৬৯ সালের ফাইনালে :
রুডি হার্টোনো ১৫—১ ও ১৫—৮ পয়েন্টে দার্মাদিকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

১৯৭০ সালের ফাইনাল :
রুডি হার্টোনো ১৫—৭ ও ১৫—৮ পয়েন্টে এস প্রি-কে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

১৯৭১ সালের ফাইনাল :
রুডি হার্টোনো ১৫—১ ও ১৫—৫ পয়েন্টে মুলজাদীকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

১৯৭২ সালের ফাইনাল :
রুডি হার্টোনো ১৫—৯ ও ১৫—৪ পয়েন্টে এস প্রি-কে (ডেনমার্ক) দ্বিতীয়বার পরাজিত করার সূত্রে ফ্রাঙ্ক ডেভলিনের উপর্যুপরি ৫ বার (১৯২৫-২৯) সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন।

১৯৭৩ সালের ফাইনাল :
রুডি হার্টোনো ১৫—৪ ও ১৫—২ পয়েন্টে স্বদেশের ক্রিশ্চিয়ান হান্দিনেতাকে পরাজিত করে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার (৬ বার) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন এবং সেই সঙ্গে ডেনমার্কের আর-

ল্যান্ড কাপসের মোট সর্বাধিকবার (৬ বার) সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন।

এশিয়ান রেকর্ড

এশিয়ান খেলোয়াড়দের পক্ষে প্রথম সিঙ্গলস খেতাব জয়—পুরুষ বিভাগে ওয়াং পেং সুন (মালয়েশিয়া) ১৯৫০ সালে এবং মহিলা বিভাগে হিরো মুকি (জাপান) ১৯৬৯ সালে।

একই বছরে এশিয়া মহাদেশের পক্ষে পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়—১৯৬৯ সালে রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) এবং কুমারী হিরো মুকি (জাপান)

রঞ্জি ট্রফি

কোয়ার্টার ফাইনাল

পুণায় রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্র ৯ উইকেটে বাংলাকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

প্রথম দিনে মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২২১ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম উইকেটের জুটিতে চোহান এবং এম এস গুপ্তে ১২৮ রান তুলে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। বাংলা যদি প্রথম দিনের খেলায় ৬টা সহজ 'ক্যাচ' মাটিতে না ফেলে দিত, তাহলে খেলার অবস্থা বাংলার অনুকূলে যেত। বাংলার মিডিয়াম পেস বোলার সুব্রত গুহ একাই তিনটে 'ক্যাচ' ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৫৪৭ (৯ উইকেটে)। এই দিন তারা আরও ৪টে উইকেট হারিয়ে পূর্ব দিনের ২২১ রানের সঙ্গে ৩২৬ রান যোগ করে। আগের দিন অধিনায়ক চাঁদু বোরদে ৩৮ রান করে নট আউট ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি ২০৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর এই ২০৭ রান তুলতে ৪০৯ মিনিট সময় লাগে, বাউন্ডারী করেন ২৬টা এবং ওভার বাউন্ডারী ১টা। ৭ম উইকেটের জুটিতে নিকি সালদানা (৯৩ রান) এবং বোরদে ১৫৫ মিনিটের খেলায় দলের ১৬৭ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র ব্যাট করেনি। পূর্ব দিনের ১ম ইনিংসের ৫৪৭ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এরপর বাংলার ১ম ইনিংস ২৫৪ রানের মাথায় পড়ে গেলে তারা ২৯৩ রানের পিছনে পড়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং একটা উইকেট খুইয়ে ৪৩ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে বাংলার ২য় ইনিংস ২৯৭ রানের মাথায় শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৫ রান তুলতে মহারাষ্ট্র ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং এক উইকেটের বিনিময়ে আট রান তুলে ৯ উইকেটে জয়ী হয়।

সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্র খেলবে তামিলনাড়ুর সঙ্গে।

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্থান

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

সিন্ধুর হায়দরাবাদে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা ড্র গেছে।

প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে ২৮৮ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ডেনিস অ্যামিস (১৫৮ রান) এবং কিথ ফ্লেচার (৭৮ রান) দলের ১৬৮ রান তুলেছিলেন। ডেনিস অ্যামিস তাঁর সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় ১৫৮ রানে ২৭টা বাউন্ডারী করেছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। অপর দিকে পাকিস্তানের বিপক্ষেও দ্বিতীয়।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ৪৮৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন ইংল্যান্ড তাদের বাকি ৩টা উইকেটে ১৯৯ রান যোগ করেছিল। দশম উইকেটের জুটিতে পোকক এবং আন্ডারউড যে ৫৫ রান তুলেছিলেন তা পাকিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ১০ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান তাদের ইনিংসের ১০টা উইকেটই জমা রেখে রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে পাকিস্তানের ১ম ইনিংসে ২৬৬ রান দাঁড়ায় উইকেটে। মুস্তাক মহম্মদ ৯৩ এবং আসিফ ইকবাল ৬১ রান করে অপরাজিত থাকে প্রকৃতপক্ষে মুস্তাক মহম্মদ পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৫৬৯ রান দাঁড়ায় (৯ উইকেটে)। ৫ম উইকেটের জুটিতে আসিফ ইকবাল (৬৮ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ ২০৫ মিনিটে দলের ১৫৩ রান তুলেছিলেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইন্তিখাব আলম (১ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ (১৫৭ রান) দলের যে ১৪৫ রান তুলেছিলেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান।

পঞ্চম দিনে পাকিস্তান ২০ মিঃ খেলে তাদের ১ম ইনিংসের ৫৬৯ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। তারা ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস এর ৪৮৭ রানের থেকে ৮২ রানে এগিয়ে যায়।

ইংল্যান্ড ৮২ রানের পিছনে পড়ে ইনিংস খেলতে নামে। তাদের খেলার সূচনা মোটেই সুবিধের হয়নি, কোন রান করার আগেই তাদের দুটো উইকেট পড়ে যায়। ৫ম উইকেট পড়েছিল ৭৭ রানের মাথায়। দলের এই সংকটকালে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে টনি গ্রিগ (৬৪ রান) এবং অ্যালান নট (নট আউট ৬৩ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের ১১২ রান তুলে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের ২১৮ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলা শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ৪৮৭ রান (ডেনিস অ্যামিস ১৫৮, ফ্লেচার ৭৮ এবং নট ৭১ রান। মুস্তাক মহম্মদ ৯৩ রানে ৪ এবং ইন্তিখাব আলম ১৩৭ রানে ৪ উইকেট)।

ও ২১৮ রান (৬ উইকেটে। গ্রিগ ৬৪ এবং নট নট-আউট ৬৩ রান। ইন্তিখাব ৬৪ রানে ৩ উইকেট)।

পাকিস্তান : ৫৬৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মুস্তাক মহম্মদ ১৫৭, আসিফ ইকবাল ৬৮ এবং ইন্তিখাব আলম ১২৮ রান। পোকক ১৬৯ রানে ৫ এবং গিফোর্ড ১১১ রানে ৩ উইকেট)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০৫
ষাণ্মাসিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১২শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৮ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা

Friday, 6th April, 1973 শুক্রবার, ২৩ চৈত্র, ১৩৭৯ .50 Paise

সূচীপত্র

Oatine

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅশোক চৌধুরী

কৌশিশ প্রসঙ্গে আমরা

অমৃতে প্রকাশিত 'কোশিশ' হিন্দী ছবির সমালোচনা (৪৫ সংখ্যা) পড়ে খুব ব্যথিত হয়েছি। আমি ও বন্ধুবর্গ সস্ত্রীক (আমরা সকলেই মূকবধির) গত রবিবার (৪-৩-৭৩) সন্ধ্যায় বিশেষ কৌতূহল নিয়ে 'কোশিশ' দেখে এলাম। 'কোশিশ' হিন্দী ছবির অযথা নাটকীয়তা ও যুক্তিহীনতায় স্তম্ভিত। এবং এ জাতীয় রুচিবিরুদ্ধ, অসত্য ও অসম্ভব ঘটনা সংবলিত ছবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত মনে করি। এবং চিত্রায়িত কাহিনীর যুক্তিহীন কতকগুলি দিকের উল্লেখ করছি। (১) শুরুতে নিদ্রিত নায়িকার (আরতি) ঘরে তাঁর দুর্বৃত্ত ভাই কানুর প্রবেশ। সে বাক্স নামাতে গিয়ে বেকায়দায় সশব্দে তা মেঝের উপর ফেলেছিল, ফলে যে ভাইব্রেশন হয় সেটা নিদ্রিত মূক বধিরদের নিদ্রাভঙ্গের পক্ষেই যথেষ্ট নয় কি? (২) আমরা অর্থাৎ মূকবধিররা লিখিত লিস্ট নিয়ে পরিচিত দোকানদারদের দেখিয়ে কেনা-কাটা করি। পরিচিত দোকানদাররাও মূক-বধিরদের প্রতি সহানুভূতিশীল। (৩) মূক-বধির নায়িকা আরতির মূকবধির বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যেভাবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অক্ষরজ্ঞান আরম্ভ করেন তাও আমাদের পক্ষে অভাবনীয়। বাস্তব ক্ষেত্রে মূকবধির বিদ্যালয়ে অনেকে ৬।৭ বৎসর বয়সে ভর্তি হয়ে অক্ষরজ্ঞান ও কথা বলতে শেখে। তবে উচ্চারণে অনিবার্যভাবে একটু বিকৃতি থেকে যায়। বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে সংসারের নানা কাজ করতে করতে আরতির পক্ষে গৃহকর্মনিপুণা হতে কোন বাধা নেই। তবে তিনি কোন দিন কথা বলতে পারবেন না এবং অক্ষরজ্ঞান হবেই না বলা চলে। (৪) বিবাহের পরে হরি ও আরতির সংসারে কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা প্রতিবেশীর থাকা উচিত। কাজেই তাঁদের প্রথম শিশু সন্তানের যেভাবে মৃত্যু ঘটানো হলো তা একেবারেই যুক্তিহীন। (৫) নায়কের সাইকেল চুরি যাওয়ার পর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া উচিত। কিন্তু 'কোশিশ'এ হরিকে একেবারে নির্বান্ধব দেখানো হলো। (৬) হরি যেমন নাটকীয়ভাবে ছাপাখানায় চাকরি পেলেন তেমনটি কখনোই আমাদের বেলায় ঘটে না। চাকরি পাওয়ার আগে আমাদেরও ছাপাখানায় কাজ হাতেকলমে শিখতে হয়। (৭) হরির উপরওয়ালা তো তাঁর মূকবধির মেয়েকে বোম্বেতে ইংরেজী মিডিয়ম মূক বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পারতেন। এমন কি বিদেশে কোনো মূকবধির বিদ্যালয়ে পাঠাবার সঙ্গতিও আছে। এতদিনে তাঁর মেয়ে ইংরেজীতে কথা বলতে পারতো ও স্মার্ট হতো। অথচ 'কোশিশ'-এর শেষে তাও দেখানো হলো না। মেয়েকে নির্বাকই দেখানো হলো, কেন? (৮) 'কোশিশ'-এর মধ্যভাগে হরি ও আরতি যেভাবে সাইকেলের হর্ণ ও টেলিফোন নিয়ে হাস্যকর কাণ্ড করেছেন তা অবাস্তব। কেননা, সাইকেলের হর্ণ ও টেলিফোন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল মিটে যায় শৈশবকালেই।

'কোশিশ' দেখে অধিকাংশ দর্শক আমাদের অর্থাৎ মূকবধিরদের সম্বন্ধে একটা খুব ভুল ধারণা নিয়ে আসবেন একথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। মূকবধিরদের জীবন ও সমস্যা নিয়ে তোলা বিদেশের ছবিগুলো দেখেছিলাম। তাতে কোথাও অসঙ্গতি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিদেশের পরিচালকরা সবদিক দেখে-শুনে বিবেচনা করে ছবি তৈরী করেন। আমাদের অনেকেই করেন তাঁদের খেয়াল-খুশী মতো। এতে আমরা খুবই ব্যথিত হই।

সুমন দত্ত
কলকাতা-১১

শিল্প সাহিত্যের সমন্বয়

শিল্প-সাহিত্যের সমন্বয় সম্ভব কিনা— এ বিষয়ে আমাদের দেশে সংশয় দেখা দিলেও, বিদেশে তাই নিয়ে কখনো বিতর্ক হয়নি। ফ্রান্সে কবি সাহিত্যিকরা আন্দোলনে নেমেছেন শিল্পীদের নিয়ে। রাশিয়াতেও তাই। তাহলে আমাদের দেশে হবে না কেন? আমাদের দেশে কি তাহলে, ভাববিপ্লব ঘটেনি? না, সেরকম কিছু করাটা অসম্ভব? স্বীকার করি, শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের ব্যবধান আছে, মাধ্যমের দিক থেকে। শিল্পী তুলিকে সম্বল করেন, সাহিত্যিকের কাছে ভাষাই হল প্রধান আশ্রয়। কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা যায় যে, বিষয়ের মৌলভাবনায় উভয়েই একই সমতলের বাসিন্দা?

অতীতের দিকে চোখ ফেরালে দেখি, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন করে অজস্র ছবি এঁকেছেন শিল্পীরা। অনেক ভাস্কর্যও তৈরী হয়েছে পুরা-কাহিনীকে ভিত্তি করে। তাহলে আজকের যুগের শিল্পীরাই বা কেন সাহিত্যিকদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন?

আমাদের দেশে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের প্রাচীন নজীর আছে। কিউবিক রীতির দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। কেবল, অনুশীলন ও অনুসন্ধানের অভাবে আমরা সে খবর রাখি না। আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে শিল্পীদের যোগাযোগ নেই। কেন? কি কারণে ঘটছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর এখনই আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। আপনারা আধুনিক শিল্পের খবরাখবর ছাপেন, চিত্র প্রদর্শনীর সমালোচনা করেন— কিন্তু এ বিষয়টাকে নিয়ে কি কোনো আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না? এ ব্যাপারে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও পাঠক-পাঠিকাদের মনস্ক হতে অনুরোধ করি।

অনুরূপ ভৌমিক
চন্দননগর।

পার্ল বাক নিয়ে

সদ্য পরলোকগত প্রখ্যাত মার্কিন লেখিকা পার্ল বাক প্রসঙ্গে 'অমৃতে' (১৬ মার্চ, ১৯৭৩) শুভঙ্কর পাঠকের মনোগ্রাহী আলোচনাটি পড়লাম। পার্ল বাকের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে লেখক 'অল মেন আর ব্রাদার্স'-এর নাম উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এ-গ্রন্থটি পার্ল বাকের কোনো মৌলিক লেখা নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি বিখ্যাত ক্লাসিক চীনা উপন্যাস 'শুই হু চুয়ান'-এর ইংরেজী অনুবাদ। সুতরাং পার্ল বাকের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি তালিকায় এ গ্রন্থের উল্লেখ থাকা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

কামাল হোসেন
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ

গত ২১শে পৌষ মুদ্রিত ৩৫ সংখ্যা-র 'অমৃত' পত্রিকায় মনোজিৎ বসু রচিত 'পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ' পাঠ করে সবিশেষ আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করলাম। বিশেষতঃ আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসী বাঙালীরা আমাদের নিজের দেশে যে কত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে ও কত ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান আছে, তার খবর রাখি না। ট্যুরিস্টরা যেমন ভারতবর্ষে এলে মনে করে পশ্চিমবঙ্গ না দেখলেও চলে, তেমনি আমরা যখন দিল্লী থেকে ছুটিতে কলকাতায় যাই, তখন ভাবি কলকাতার চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কী দেখাবো ছেলেমেয়েদের? কিন্তু তাদের নিজের দেশকে জানতে হলে তার অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছোন দরকার। বিশেষ করে আমরা তো সঠিকভাবে জানি না কোথায় বাস রিজার্ভ করতে হয়, কোথায় সস্তায় হোটেল পাওয়া যায়। তাদের ঠিকানা পর্যন্ত মনোজিৎ বসু লিখে খুবই উপকার করেছেন। প্রত্যেকটি জায়গায় প্রাতরাশ থেকে শুরু করে নৈশ আহারের মূল্য জানিয়ে আমাদের কোথায় কত খরচ হতে পারে তারও আনুমানিক হিসাব করে দিয়েছেন।

তবে তিনি একস্থানে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করেছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'কিংবদন্তী এই যে এই দেউড়িতেই মীরণের হাতে প্রাণত্যাগ করতে হয় হতভাগ্য নবাব সিরাজকে।' আমার যতদূর মনে হয় সিরাজকে মীরণ হত্যা করেননি, মহম্মদি বেগ নামক এক ব্যক্তি হত্যা করেছিল।

অমিয় [illegible]
[illegible]

সম্পাদকীয়

দলত্যাগ বন্ধের জন্য আইন

প্রথমে ওড়িশা এবং তারপর মণিপুর মন্ত্রিসভা দলত্যাগের কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হল। ওড়িশায় ছিল কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা, মণিপুর মন্ত্রিসভা ছিল কংগ্রেস বিরোধীদের একটি জোটের দ্বারা পরিচালিত। দুটি রাজ্যেই দলত্যাগীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। পাল্টা দলত্যাগে মন্ত্রিসভার পতনও ঘটল। এর কোনোটাই অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং এইভাবে যে মন্ত্রিসভা টিকে ছিল সেটাই আশ্চর্য মনে হবে। দুটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়েছে। ওড়িশায় নতুন নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। মণিপুরে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হয় নি। এই অনিশ্চয়তার প্রধান কারণ বিধানসভার সদস্যদের দলত্যাগ। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের এটা একটা নতুন উৎপাত। ১৯৬৭ সালের পর এই উৎপাত বিভিন্ন রাজ্যে দেখা দেয়। কোনো কোনো রাজ্যে এমন অবস্থা হয় যে, সকাল বেলা এক দলের সদস্য বিকেল বেলা অন্য দলে নাম লেখালেন। হরিয়ানার একজন রাজনীতিবিদ এদের নাম দিয়েছিলেন আয়ারাম ও গয়ারাম। মন্ত্রিত্বের লোভে সদস্যদের দল ভাঙানো সহজ হয়ে ওঠে। কারণ, কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে তাকে বিভিন্ন দলের ওপর নির্ভর করতে হয়। তখনি শুরু হয় দরকষাকষি। এতে নীতির কোনো বালাই থাকে না। এম এল এ হয়ে যায় রাজনৈতিক দাবা খেলার ঘুঁটির মতো। এখন আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে এইভাবে দল ভাঙাভাঙি করে মন্ত্রিত্ব গঠন বা মন্ত্রিসভা পতনের সার্থকতা কি? এর দ্বারা কি সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌল নীতিকেই হত্যা করা হচ্ছে না? এক সময়ে এ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মিলিত হয়ে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি করেছিল যে, দলত্যাগীদের তারা কেউ উৎসাহ দেবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোনো সুফল দেখা দেয় নি। কোনো দলই এই নীতি পালন করে নি। তার ফলে আবার বিভিন্ন রাজ্যে এই নিন্দনীয় দলত্যাগ চলছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ তার সংবিধানে এ বিষয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থা করেছে। কোনো সদস্য জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার পর নীতিগত কারণে যদি দলত্যাগ করেন তাহলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে সংসদের সদস্যপদ ত্যাগ করে আবার নতুন নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হবে। এই হল সেখানকার বিধান। সুস্থ সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই রকম একটা রীতির প্রয়োজনীয়তা আছে।

সম্প্রতি আমাদের সংসদেও দলত্যাগ বন্ধের জন্য আইন প্রণয়নের কথা আলোচিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ জানিয়েছেন যে, বিধানসভার ভিতরে দলত্যাগ বন্ধের জন্য সরকার আইন প্রণয়নের বিষয় চিন্তা করছেন। সংসদের বর্তমান অধিবেশনেই এ সম্পর্কে বিল আনা হবে। স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা ছাড়া কোনো সরকারের পক্ষে জনকল্যাণমূলক কাজ করা অসম্ভব। আজকের ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে তার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত স্থায়ী সরকার। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে ঘন ঘন ব্যয়বহুল নির্বাচন অনুষ্ঠান একটা বিলাসিতার তুল্য। অথচ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হলে কোনো দলই নিশ্চিন্ত মনে পাঁচ বছর কাজ করতে পারে না। ইন্দিরাজী নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে স্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে। ভারতের জনসাধারণ আজ সরকারের দিকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। দারিদ্র্য দূর করার এই মহৎ প্রচেষ্টায় জনসাধারণ সর্বতোভাবে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার জন্য চাই স্থায়ী সরকার। আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা কিম্বা উগ্রতার দোহাই দিয়ে নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করলে তাঁদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। জনসাধারণকেও তাই বিচার বিবেচনা করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। দলত্যাগ বন্ধ হলে গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। সরকার এ সম্পর্কে কোনো রকম দ্বিধা না করে অবিলম্বে নীতিহীন রাজনীতিবিদদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে ভারতে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটাবেন, এটাই দেশবাসী আশা করে।

গ্রীষ্মের 'দাবদাহ' শুরু হতে না হতেই চিড়িয়াখানায় ভালুক জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে তপ্তদেহ শীতল করছে।

দেশে বিদেশে

আগামী বছর ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা আছে। যেসব রাজ্যে নির্বাচন হবে সেগুলির মধ্যে আছে উত্তরপ্রদেশ, কেরল, সম্ভবত ওড়িশা এবং হয়ত অন্ধ্র। এগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্ব লাভ করবে উত্তর প্রদেশের নির্বাচন। উত্তরপ্রদেশ বলতে গেলে ভারতবর্ষের রাজনীতির ভরকেন্দ্র। এটি প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্যও বটে। এখানকার নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, ১৯৭৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের উপর তার প্রভাব যে অনেকখানি পড়বে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

●

উত্তর প্রদেশের ঐ আগামী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস নেতারা ইতিমধ্যে কয়েকটি দুর্লক্ষণের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন যেগুলি তাঁদের ভাবিত করে তুলেছে।

প্রথম দুর্লক্ষণ হল বোম্বাই কর্পোরেশন নির্বাচনের ফল। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। বিদায়ী পৌরসভায় কংগ্রেসের যেখানে ১৪০টির মধ্যে ৬১টি আসন ছিল সেখানে এবারকার নির্বাচনের পর তার আসন সংখ্যা কমে ৪৫এ এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও যেটা কংগ্রেসের পক্ষে ভাবনার কথা সেটা হল, এই নির্বাচনে শিবসেনা দল তার আগেকার শক্তি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে পৌরসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের স্থান লাভ করেছে এবং মুসলিম লীগ ও জনসংঘ এই দুই দলই তাদের শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়েছে। বিদায়ী পৌরসভায় মাত্র ২ জন মুসলিম লীগ সদস্য ছিলেন, নতুন পৌরসভায় মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ১৬। জনসংঘ সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে ৬-এর জায়গায় ১৫ হয়েছে।

বোম্বাইয়ে এই নির্বাচনের পিছু পিছু এসেছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এবং 'বন্দে মাতরম' গানের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর মুসলমানদের তীব্র আন্দোলন। মহারাষ্ট্র সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শারদ পাওয়ার বিধানসভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে, কিছু ছেলে যখন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিচ্ছিল তখন মুসলিম লীগের একটি মিছিল থেকে ঐ ছেলেগুলির উপর হামলা করা হয় এবং ঐ ঘটনা থেকেই গত ১১ মার্চ বোম্বাইয়ের কামাতিপুরা অঞ্চলে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল।

কংগ্রেসের পক্ষে দ্বিতীয় আর একটি দুর্লক্ষণের ছায়া দেখা দিয়েছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে ঘিরে। গত বছর গৃহীত এই আইনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, এই যুক্তিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ ঐ আইনের সংশোধন দাবী করছেন। এই দাবী আদায়ের জন্য একটি সর্বভারতীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির উদ্যোগে সপ্তাহ দুয়েক আগে দিল্লীতে যে সম্মেলন হয়ে গেল সেই সম্মেলন থেকে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেন সমস্ত সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন করেন এবং আগামী নির্বাচনগুলিতে যেন কংগ্রেসকে ভোট না দেন। ঐ সম্মেলনের শেষে কমিটির মুখপাত্র ডাঃ এ জে ফরিদি বলেছেন, তাঁদের এই লড়াইয়ে তাঁরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন। তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে সংগঠন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, ভারতীয় ক্রান্তি দল, [illegible]

পার্টি সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রভৃতি দল এই ব্যাপারে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত এই আন্দোলন কংগ্রেসের পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের, এবং বিশেষভাবে উত্তরপ্রদেশের মুসলিম রাজনীতির একটা নাড়ীর যোগ দীর্ঘকাল আগে থেকেই ছিল। সেই যোগ এখনও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি। উত্তর প্রদেশে মুসলমান ভোটদাতার হার প্রায় ২৫ শতাংশ। ৪২৫টি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ১২৫টিতে মুসলমান ভোটাররাই তাঁদের ভোটের দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে স্থির করে দেবেন। কংগ্রেস যদি মুসলমানদের ভোট না পায় তাহলে তার পক্ষে এই নির্বাচনে জেতা কঠিন হবে।

কংগ্রেসের দিক থেকে তৃতীয় আর একটি দুর্লক্ষণ এই যে, ভারতীয় জনসংঘ উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী আসরে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে। এই নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এবার জনসঙ্ঘের অধিবেশন উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মুসলমান ও হরিজনদের ভোট কুড়োবার আশায় ঐ অধিবেশনে জনসঙ্ঘের নেতারা নিজেদের ঐসব সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে উপস্থিত করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। কানপুর অধিবেশনে দলের যে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে তাতে এই প্রথম দুজন তপশীলী ও একজন তপশীলভুক্ত উপজাতির সদস্যকে স্থান দেওয়া হয়েছে। দুজন তপশীলী সদস্যের একজনকে নেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশ থেকে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আন্দোলনে জনসঙ্ঘের সমর্থন না থাকলেও তারা এই আন্দোলনের বিরোধিতাও করছে না। এমন কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আলিগড় আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে ভারতীয় জনসঙ্ঘের একটা প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়াও থাকা বিচিত্র নয়। লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে দিল্লীতে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম সমিতির নেতা ডাঃ ফরিদি জানিয়েছেন যে, তাঁদের এই আন্দোলনে তাঁরা অন্যান্য দলের সঙ্গে জনসঙ্ঘের সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ১১টি দাঙ্গা হয়েছে বলে ডাঃ ফরিদি অভিযোগ করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই ব্যাপারে জনসঙ্ঘকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই সব দাঙ্গার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুলিশের।

এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর হল এই যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অত্যুৎসাহী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যে জনসঙ্ঘের গৈরিক টুপি মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যেমন মুসলিম রাজনীতিকে দানা বাঁধাবার চেষ্টা চলছে তেমনি উত্তরপ্রদেশের আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসঙ্ঘ তাদের শক্ত ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। কংগ্রেস ও সি পি আই-এর সাহায্য নিয়ে উপাচার্য ডঃ কে এল শ্রীমালী এই ঘাঁটি ভাঙবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। এখানে জনসঙ্ঘ সমর্থন পাচ্ছে প্রধানত রাজনারায়ণ গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রী দলের।

* * *

প্রধানমন্ত্রী নিজে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করার সময় এইসব প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দলের হয়ে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করেছেন।

লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসকর্মীর এক সভায় শ্রীমতী গান্ধী বোম্বাই কর্পোরেশনের নির্বাচনের উল্লেখ করে বলেছেন যে, বোম্বাইয়ের মত উত্তরপ্রদেশেও যাতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোট না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। জনসভায় তিনি বলেছেন যে, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে মহাজোট গঠিত হয়েছিল তার তুলনায় ১৯৭৪ সালে বৃহত্তর জোট খাড়া করা হবে বলে অনুমান করা যায়। এবার এমন কি জনসঙ্ঘ ও সি পি এম-এর মত দুটি পরস্পরবিরোধী পার্টিও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাত মেলাচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেছেন যে, জনসঙ্ঘ মুসলমানদের সুরে কথা বলছে, এটা ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস।

কংগ্রেস যখন একদিকে ১৯৭৪ সালে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের দিকে নজর রেখে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে একভাবে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামছে তখন মুসলিম ও হরিজনদের অভিযোগ দূর করার জন্য কংগ্রেসকে কতকগুলি বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে সম্প্রতি মুসলমান ও হরিজনদের উপর অত্যাচারের অনেকগুলি অভিযোগ উঠেছে। কিছুদিন আগে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে যখন প্রশ্নটি ওঠে তখন মুখ্যমন্ত্রীরা স্থির করেন যে, এই সব ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের ঐ সিদ্ধান্তের পর গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করার জন্য দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ নারায়ণকে উত্তর প্রদেশে পাঠান হয়। একই সময়ে ঘোষণা করা হয় যে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোকদের উপর নির্যাতনের ঘটনাগুলি সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য পুলিশের পৃথক একজন ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেলকে ভার দেওয়া হচ্ছে। এই সম্পর্কে পুলিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সেই বিষয়েও এই ডি-আই-জি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

কিন্তু যে প্রশ্নটি নিয়ে উত্তর প্রদেশের মুসলিম জনমতকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করার চেষ্টা হচ্ছে সেটি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় আইন সম্পর্কে কংগ্রেস এখন দ্বিধাগ্রস্ত। কংগ্রেসের ভিতরকার বামপন্থী অংশ এই আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে। কিন্তু দলের আর একটি বড় অংশ বিশেষ করে মুসলিম এম-পিরা, এই আইন সংশোধন করে মুসলমানদের আশংকা দূর করাই সমীচীন বলে মনে করেছেন। এই মতভেদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ভিতরও আছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসান (যিনি নিজে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন) ১৯৭২ সালে গৃহীত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অপরিবর্তিত রাখতে চান। অপরপক্ষে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ এই বিষয়ে একটা আপোষ-মীমাংসার নীতির পক্ষপাতী। গত ১৬ মার্চ লখনৌতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের দাবী নাকচ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই আইন সংশোধন বা প্রত্যাহারের দাবী যাঁরা করছেন তাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি চান না অথবা এই প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রীকরণ বা তার মধ্যে সংখ্যালঘুদের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা করতে চান না, এই দাবী নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু সর্বশেষ সংবাদ হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখছেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত এই আইনের সংশোধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম চরিত্র অক্ষুন্ন রাখার আশ্বাস দিতে পারেন।

* * *

লোকসভায় সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সিমলা চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে কার্যকর রূপ দেওয়ার জন্য ভারত এখন উদ্যোগী হতে পারে। ভারত সরকার ঠিক কি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেন নি এবং ইতিমধ্যে ভারত সরকারের কার্যকলাপ থেকেও বোঝা যায়নি যে তাঁরা ঠিক কিভাবে উদ্যোগী হতে চাইছেন।

বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর এখন উপমহাদেশে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ভারতের দিক থেকে কোন সংশয়ই ছিল না, এবং এই নির্বাচনের জন্য সিমলা চুক্তি সম্পর্কে ভারতের কোন সিদ্ধান্ত যে আটকে ছিল তা নয়। বরং বাংলাদেশের নির্বাচনের অজুহাতে হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি বলেছিলেন, ঐ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন। সুতরাং এখন যদি কারও উদ্যোগ নেওয়ার সময় হয়ে থাকে তাহলে সেই সময় হয়েছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ভারতের নয়।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যদি এই উদ্যোগটুকু গ্রহণ করতেন, তাহলে আজ তাঁকে এই বলে আক্ষেপ করতে হত না যে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের মধ্যে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। তিনি যদি বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিতেন, তাহলেই ভারতের হাতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হতে পারত। ভুট্টো তা না করে বারবার আহ্বান জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় আর একবার তাঁর সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে বসুন। অথচ, সিমলা চুক্তিতে স্পষ্ট করেই বলা আছে, দ্বিতীয় আর একটি শীর্ষ-সম্মেলনের আগে দুই দেশের সরকারি অফিসাররা মিলে বৈঠক করবেন।

এই অবস্থায় ভারত সরকার নতুন কি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন? কোন কোন মহল থেকে এইরকম একটা জল্পনা শোনা যাচ্ছে যে, শিবিরে আটক যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ভারত কিছু করতে পারে।

একথা ঠিক যে, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য নয়াদিল্লীর উপর দেশের বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে চাপ আসছে। পাকিস্তান এই নিয়ে সারা পৃথিবীতে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। অনেক দেশ পাকিস্তানের এই প্রচার অভিযানে ভুলে প্রশ্নটিকে নিছক মানবিক সমস্যা হিসাবেই দেখছে। অথচ, তারা আরও দুটি মানবিক সমস্যার দিকে একেবারেই দৃষ্টি দিচ্ছে না। মানবিক কারণে যদি পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়া উচিত হয় তাহলে পাকিস্তানে আটকে পড়ে যাওয়া বাঙালীদেরও দেশে ফিরতে দেওয়া উচিত এবং বাংলাদেশের যেসব অবাঙালী অধিবাসী পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করেছে তাদের পাকিস্তানে যেতে দেওয়া উচিত। কিন্তু পিণ্ডির নেতারা বাঙালীদের ছাড়তে রাজি নয়, বাংলাদেশের অবাঙালীদের পাকিস্তানী বলে গ্রহণ করতেও রাজি নন। কিন্তু তা নিয়ে পাকিস্তানকে বিশ্বের দরবারে বিশেষ কোন কথা শুনতে হচ্ছে না।

অপরপক্ষে, ভারতের ভিতরে বিভিন্ন মহল থেকে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের, অন্ততপক্ষে যাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ নেই তাঁদের, ছেড়ে দেওয়ার দাবী জানান হচ্ছে। অকালী দল বলেছে যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়ে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার, যাতে অকালীরা পাকিস্তানে অবস্থিত তীর্থস্থানগুলি দেখতে যেতে পারেন। সি-পি-এম এবং সি-পি-এম-এর দুয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্যও যুদ্ধাপরাধীদের বাদ দিয়ে অন্য যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। এই যুদ্ধবন্দীদের দরুন ভারত সরকারকে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তার কথা তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

এইসব আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারত সরকার কি যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছেন?

কিন্তু বিষয়টি একটু ভালভাবে বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে, এবিষয়ে ভারত সরকার এককভাবে বিশেষ কিছু করতে পারেন না। ভারতবর্ষ যদি চায়ও যে, সে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেবে তাহলেও সেটা সে বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়া করতে পারবে না। বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়া ভারত এই বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে মীমাংসা করবে না বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন সেই প্রতিশ্রুতি খেলাপ করা মানে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে অস্বীকার করা। বাংলাদেশ যাতে এতে রাজি হয় সেজন্য ভারতবর্ষ হয়ত ঢাকাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এ-ব্যাপারে ভারতবর্ষকে খুব সাবধানে চলতে হবে যাতে ভারতবর্ষ বাংলাদেশের উপর চাপ দিচ্ছে, এমন একটা ধারণার সৃষ্টি না হয়। আর তাছাড়া, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালীদের প্রশ্ন উহ্য রেখে পাকিস্তানী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া মানে ঐ প্রশ্নটির মীমাংসা করার একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে দেওয়া। বাংলাদেশকে সেই সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া ভারতের পক্ষে কি সম্ভব?

২৯-৩-৭৩ —[illegible]

কালকের দিনটা

কাল বিকেলে, বহুদিন পরে, আবার হাওড়া ব্রীজের ওপর অস্বাভাবিক জ্যাম। মনে হয়েছিল, পুলের জ্যাম প্রবল স্রোতের মত গড়িয়ে নেমে গেছে পোস্তার দিকে, বড়বাজারের কাছে হ্যারিসন রোডে আর ডানদিকে ট্রাম-লাইন বরাবর। আমাদের দোতলা বাসটার চারপাশে ট্রাম-বাস ট্যাক্সি, রিকসা। ব্রীজের ওপর সব কিছু স্থির, অনড় দাঁড়িয়ে। ইতস্তত চীৎকার, কোলাহল, ব্যস্ততা, দ্রুততা। সময়টা এমন ছিল, সমস্ত অফিস ছুটি হয়ে গেছে তখন।

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আমার। হাওড়া থেকে কলকাতায় ফিরছি। ক্রমশ একটানা বসে থাকার অস্বস্তি থেকে শেষে অসহায় নির্বিকার হয়ে বসেছিলাম। হেঁটে যাওয়া যেত, কিন্তু একটুও ভাল লাগছিল না। পাহাড়ের গা বেয়ে নদীর স্রোত যেমন করে বড় বড় পাথরের পাশ কাটিয়ে এদিক-ওদিক করে গড়িয়ে পড়তে থাকে অনায়াসে ব্রীজের ওপর চারপাশে তেমনি করে অগণিত লোক-জনের স্রোত এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বয়ে চলেছে।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ তারই মধ্যে একবার, দুবার, তিনবার চোখে পড়তেই যেন মনের মধ্যেই লাফিয়ে উঠলাম, 'আরে! মুকুন্দবাবু না। আমাদের মাস্টারমশাই! এত বুড়ো বয়সেও কলকাতায় আসেন!' চকিতে আমার অন্যমনস্কতা ছুটে গেল। বাসের দোতলায় ছ-সাতজন ছাড়া কেউ নেই। সব কখন নেমে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। আমিও নীচে নেমে মাস্টারমশাইকে লক্ষ্য করে দ্রুত এগোতে চেষ্টা করলাম।

জনস্রোতে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে এসে পিছন থেকে জোরে ডাকলাম, 'স্যার!' শুনতে পেলেন না। আরও কাছে প্রায় সামনে গিয়ে দাঁড়াব এবং প্রণাম করব এই ভেবে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'স্যার। আপনি!'

মানুষটি থমকে ঈষৎ পাশ ফিরে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ, দীর্ঘ চেহারা, ভঙ্গি একটু অবনত, কৃশকায়। মাথার ঝাঁকড়া চুল প্রায় সব পেকে এসেছে। বাঁ-হাতে ভারী ঝোলানো একটা ব্যাগ। সম্ভবত বই ও অন্যান্য কিছু আছে। ডান হাতে ছাতা। হাঁটুর নীচে পর্যন্ত কাপড়। হাতের গলার শিরা স্পষ্ট, নীল,—কোঁচকানো চামড়ার সঙ্গে রেখা ফুটেছে।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। মুকুন্দবাবু নন! আমাদের সেই ইংরিজির মাস্টার নন!'

বীরেন্দ্র দত্ত

'মাফ করবেন, আমি আমাদের পুরনো একজন মাস্টারমশাই ভেবেছিলাম। অনেকদিন দেখিনি তো!'

থেমে-থাকা ভদ্রলোক বুঝতে পেরে ঈষৎ হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। এরকম ভুল অবশ্য আমার প্রায়ই হয়, হয়েছেও। একবার কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসের সিঁড়িতে একজনকে 'আরে অমল। বহুদিন পরে এখানে। কেমন আছিস!' বলে কাছে গিয়ে নির্বিকার মুখ দেখে ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। শিয়ালদা স্টেশনে একজনকে বন্ধু তপনের ইমকাম ট্যাক্স অফিসে আলাপ-হওয়া, মালদা থেকে সদ্য ট্রান্সফার্ড হয়ে আসা মিত্রমশায় ভেবে কথা বলতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছিলাম। এই সেদিন এক সিনেমা হলে আগের সিটে প্রথমবেলা আর তার স্ত্রী ও শ্যালিকাদের অন্ধকারে দেখে পুলকিত হয়ে হাফ টাইমের অবসরে মজা করব ভেবে নীরব থেকে পরে আমার পাশে বসা স্ত্রীর কাছে বোকা বনে গিয়েছিলাম।

কিন্তু কালকের মাস্টারমশাই ভুল হওয়ার মুহূর্তের ঘটনাটা আমাকে হঠাৎ যেন কোন এক স্মৃতির গভীরে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ভীষণ ভালবাসতেন মুকুন্দবাবু আমাদের। যত্ন করে পড়াতেন। আমরা যেমন ভয় পেতাম, ভালবাসতাম তারও অনেক বেশী। তাই ভয় সত্যিকারের ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়ে উঠেছিল। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে ক্রমশ গ্রামকে ভুলে গেছি। কলকাতা রাক্ষসীর মত। জীবনের দায়িত্ব ব্যস্ততা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে আমাকে গ্রাস

করে নিয়েছে, একদিন আমার প্রিয়তম মাস্টারমশাই-এর কথাও ভুলে গেলাম।

এই সব ভাবতে ভাবতে কাল বন্ধুদের আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরে কেন যেন ছটফট করছি। ছোটভাইকে ঘটনাটা বলতে বলল, 'মুকুন্দবাবু তো কবে মারা গেছেন, তুমি জান না?' সত্যি আমি জানি না। কাল রাতে বিছানায় শুয়ে অসম্ভব অনিদ্রার মধ্যে অন্ধকার ঘরে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গ্রামে শেষ দেখা হওয়ার ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল।

স্কুল প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে শেষ গ্রামে গিয়েছিলাম। দীর্ঘকাল রোগভোগে শয্যাশায়ী হয়ে থাকায় মাস্টারমশাই আসতে পারেননি। আশ্চর্যভাবে আমার স্কুলের তিন বন্ধু; সুধাংশু, বাসুদেব, অবনীর সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমরা চারজন মুকুন্দবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির। গিয়ে দেখি, মেঝের পাতা মোটা বিছানায় মাস্টারমশাই চিত হয়ে শুয়ে। চেহারা শীর্ণ মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। এত বয়সেও চোখে চশমা নিতে হয়নি মাস্টারমশাইকে। আমরা সামনে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই মাস্টারমশাই বললেন, 'এসো, কে বাবা তোমরা!'

'মাস্টারমশাই আমরা। আমি, বাসুদেব, সুধাংশু, অবনী। চিনতে পারছেন?'

আমাদের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠলেন, 'ও, সেই পঞ্চপাণ্ডব! আরে! এতদিন পরে কত বড় হয়েছিস, কত সম্মান পেয়েছিস তোরা! আয়, বোস! তোদের আবার চিনতে পারব না!' মাস্টারমশাই-এর ক্লান্ত মুখ চোখ যেন জ্বলছে। একটু থেমে ডাকলেন, 'শক্তি'। শক্তি মাস্টারমশাই-এর ছোট কিশোর পুত্র। 'মাদুরটা পেতে দে। বসবে।'

সকলে বসতে বসতে আমি অবাক হয়ে বললাম 'মাস্টারমশাই, এতদিন পরেও সত্যি সত্যি আমাদের চিনতে পেরেছেন! সেই কবে আমরা স্কুল ছেড়েছি! চেহারায় কত বদলে গেছি আমরা!'

মাস্টারমশাই হাসলেন। 'তোদের একটা জিনিস দেখাই দ্যাখ। শক্তি, দেয়াল থেকে ওই ছবিটা নিয়ে আয় তো।' কুটির মুখির মত শক্তির নোংরা জল গড়িয়ে পড়ার দাগ চার দেয়ালে। শক্তি ছবিটা নিয়ে এল। ধুলো, ঝুল, ময়লা ড্যাম্প লেগে ছবির কাচ ফ্রেম কালো। ভাল করে ঝেড়ে-মুছে শক্তি আমার হাতে দিল ছবিটা। আমি মাস্টারমশাইকে দিতে যাচ্ছি, উনি বললেন, 'ভাল করে দ্যাখ, ছবিটা চিনতে পারিস কিনা।'

আমরা চারজনেই ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। কালো কার্ডবোর্ড দিয়ে বাঁধানো একটা ফটো। ফটোটার চারপাশ হলদে। মাঝখানটা একেবারে সাদা। আমরা কিছু বুঝতে না পেরে মাস্টারমশাই-এর দিকে তাকালাম।

'চিনতে পারছিস না? দে আমায়। এগিয়ে আয়।' ছবিটা ওঁর হাতে দিয়ে এগিয়ে যেতে উনি বললেন, 'এই দ্যাখ। এটা তোদের ছবি। প্রশান্ত রে! তোদের ক্লাশের বন্ধু। তোদের স্কুল ছাড়ার শেষদিনে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে তোদের পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে একটা ফটো তুলেছিল! মনে আছে। এক কপি আমাকে দিয়েছিল। বাঁধিয়ে রেখেছি। এখানে দ্যাখ' এই বলে কাঁপা-কাঁপা আঙুলে ছুঁয়ে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'এই যে চেয়ারে আমি একা বসে। সবার পিছনে ইস্কুলের দারোয়ানের ঘরটা। আর এই যে তুই, বীরেন—এখানে দাঁড়িয়ে আছিস তোর ঠিক পাশেই বাসুদেব দাঁড়িয়ে! দেখতে পাচ্ছিস? আর এই একেবারে এপাশে সুধাংশু, ওর পাশে অবনী! তোদের দুজোড়ার মাঝখানে ঠিক আমার পিছনে প্রমোদটা দাঁড়িয়ে আছে। কি ডানপিটে আর বুদ্ধিমান ছিল ছেলেটা! অকালে ছেলেটা মারা গেল! বলেই মাস্টারমশাই চুপ করলেন। সারা ঘরে রুদ্ধশ্বাস থমথমে। একটু পরে বললেন, 'নে, ধর এটা ভাল করে দ্যাখ এবার। তোদের একটা পাণ্ডব নেই বলেই তোদের একটু চিনতে দেরী হয়েছে। আর তোরা নিজেদেরই চিনতে পারছিস না? আমাকে চিনিয়ে দিতে হল, এ্যাঁ!' ভিজে গলায় মাস্টারমশাই বুকের অনেক গভীরে একটা জায়গা থেকে সামনে বসে থাকা চারজন পনেরো-ষোলো বছরের কিশোরকে যেন ধমক দিলেন।

আমরা চারজন আবার ছবিটার দিকে তাকালাম। কোথাও কোন প্রতিকৃতি নেই। অথচ আমরা চারজনেই অনুভব করলাম সত্যি সেইদিন সেই মুহূর্তে আমরা পাঁচজন ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রমোদ গ্রামেই ক্যানসারে মারা গেছে। আমরা মাস্টারমশাই-এর দিকে তাকালাম। মাস্টারমশাই স্থির ক্লান্ত দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। দুচোখে চাপা জল।

কাল রাতে বিছানায় শুয়ে এক রহস্যময় যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এসব মনে পড়ছিল। আমি একটা কলেজে মাস্টারী করি। এখনকার ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে আগে কতবার ভেবেছি, এরা বেরিয়ে গেলে আমাকে চিনতে পারবে? আমরা কি এখনকার ছেলেদের কাছে সেদিনও থাকতে পারব? কাল রাতে নতুন করে কথাটা ভেবেছি, আর চোখের সামনে একটা ফ্রেম-বাঁধানো ছবি দেখেছি যাতে আমরা চারজন স্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছি, নেই প্রমোদ, নেই মাস্টারমশাই। শুধু একটা চেয়ার স্পষ্ট হয়ে আছে। চেয়ার শূন্য!

কাল রাতে একটা সাদা-ধূসর ছবি ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই অনুভূতির সুরে আমার রক্ত-শিরা-সমস্ত এমন এক শান্তিকে বাজিয়ে দিয়েছে যা থেকে আজও মুক্তি পাচ্ছি না। কোনদিন পাব কিনা জানি না।

ঝিপঝিপে অন্ধকার গাছের ছায়ায় জোনাকি চমকে ওঠে। শীতের বাতাস হু-হু শ্বাস ফেলে যায়। দূরে বাস রাস্তা থেকে ভারী ট্রাকের গর্জন ভেসে আসে কমুহূর্ত অন্তর। এমন কিছু রাত না, তবু আকাশ কেমন কালচে গম্ভীর, আবহাওয়া নির্জীব, নির্জন। এরকম নৈঃশব্দ্যের জন্যেই জুতোর স্বল্পতম শব্দটুকুও ঠিক কানে গেছে মার। ডাকতে হল না নিজেই দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল। হঠাৎ কিরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় মধ্যে পড়ে গেল ঝুমা। মা ইচ্ছে করেই আলো জ্বালেনি। রাস্তার ইলেকট্রিক বাল্বের ক্ষীয়মাণ রশ্মিতে আবছা হয়ে থাকা মায়ের শরীরের রেখার মধ্যে কেবল জ্বলজ্বলে চোখ দুটো এক পলক চেয়ে পড়ল ঝুমার। একটা কিছু বলবে মা, এত রাত হল কেন অথবা তোর বাবা ভীষণ রেগে রয়েছেন, এরকম একটা কিছু ঝুমা আশা করছিল, কিন্তু সেসব কিছুই না, মা কোন কৈফিয়ৎই চাইল না, নির্লিপ্ত নৈঃশব্দ্যে সরে দাঁড়িয়ে শুধু ভেতরে যাবার জায়গা করে দিল। শ্লথপায়ে বাড়ীতে ঢুকে এল ঝুমা সরু সদরের প্যাসেজটা পেরিয়ে এসে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। এক এক সময় এমন পরিস্থিতি আসে, যখন নিজের ঘরবাড়ী, পরিমণ্ডল এমনকি নিজস্ব অস্তিত্বটাকেও অনেক দূরের, অনতিপরিচিত মনে হয়। শহরতলীর রাত যেন ফাঁকা মাঠ, গাছপালা আর পানাপুকুর ছুঁয়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রলম্বিত ঝিঁঝির ডাকে ক্রমশ ঘন গম্ভীর হয়ে আসছে। দালানের আলো জ্বালতেই ফাটল [illegible] কোণে উঁচু [illegible] বোগেনভেলিয়ার লতার [illegible] ফুলগুলি ঝিকমিক করে উঠল। পায়ের নীচে উঠোনটাকে লাল নতুন সিমেন্ট। বাঁ পাশে দাদা-বৌদির ঘর বন্ধ, সিঁড়ির অন্ধকারে, টিকটিকিটা নিশ্চয় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। টিকটিকির মুখটা মনে পড়তেই [illegible] বুক থেকে হালকা হয়ে [illegible]। ডান পাশের রান্না [illegible] তালা লাগানো। এক নজর তাকিয়ে [illegible] সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ঝুমা।

—খাবি না? মা সিঁড়ির তলায় [illegible] থেকে ডাকল। অর্থাৎ এ কমুহূর্ত মা তার পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবগতিক লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ কিরকম [illegible]

বিরক্তিতে সারা মন ছেয়ে গেল ঝুমার। বিশ্রী একটা অসহজ পরিস্থিতি কেবলই যেন জড়িয়ে ধরছে তাকে ইদানীং। একটু চাপা রূঢ় স্বরেই উত্তর দিল সে,

—না, আমি খেয়েই এসেছি। এবং বলতে বলতেই সে দ্রুত পায়ে দোতলায় উঠে এল। নীচে রান্নাঘরে চাবিতালা লাগাবার শব্দ পাওয়া গেল, সুতরাং মাও সম্ভবত আজ রাতটা উপোসী থেকে গেল। থাকুক, ঝুমা অত সবার মন জুগিয়ে থাকতে পারবে না। বাবার দরজা খোলা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে চলে এল একেবারে। নিজের ঘর, ঝুমা অন্ধকারেই ঠোঁট বেঁকাল, তাসের ঘর। শব্দ করে সুইচ টিপল, ওর মানে হল যেখানে যা কিছু আঁধার সব এই মুহূর্তেই উদ্ভাসিত করে দেবে। উজ্জ্বল শাদা আলোয় প্রথমেই বিছানার দিকে তাকাল ঝুমা। গলা পর্যন্ত গাঢ় সবুজ চাদরের পটভূমিকায় রমার ফর্সা মুখটা ফুটে রয়েছে, অন্য সময় হলে ঝুমা ভাবত ঘন সবুজ পাতার ঝোপে একটা গোলাপ, ছোট বোনের প্রতি অসীম স্নেহবশতই অবশ্য হয়ত ওকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তথ্যটা ওকেই জানিয়ে দিত, কিন্তু আজ আর সেসব মনে এল না। উজ্জ্বল আলোর নীচে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে বড় করে শ্বাস নিল ঝুমা। এক পাল্লা কাঁচ লাগানো পুরনো আলমারির আয়নায় নিজের পুরোপুরি অস্তিত্বটাকে স্থির চোখে তাকিয়ে দেখল। ভীড়ের বাসে দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে নতুন শাড়ীতে ভাঁজ পড়েছে। কপালে কটি খুচরো রুক্ষ চুল। চোখের কাজলে ক্লান্তির দাগ। রঙের উজ্জ্বল ভাবটা এই মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়ে কেমন যেন কালোই মনে হচ্ছে। এই শ্যামল রঙ নিয়েই ঝুমার মনে চাপা দুঃখ, বস্তুত ঝুমা বেশ একটু আত্মসচেতন মেয়ে, হয়ত প্রায় সব মেয়ে তাই। আমার বর্ণটা যদি রমার মতন হত, শরীরে ক্লান্তি ও মনে বিরক্তি নিয়েও আড়চোখে রমার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকাল ঝুমা, ভাবল, তাহলে নিজেকে আরো সুখী ভাবতে পারতাম। তাহলে...তাহলে...পেছনে না তাকিয়েও মায়ের নিঃশব্দ পদসঞ্চার টের পেল ঝুমা। খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে গায়ের ওপর হালকা করে রাখা স্কার্ফটা খুলে নিয়ে ভাঁজ করতে সুরু করল।

—কি যে সমস্ত জানলাগুলো বন্ধ করে রাখে, ঘুমন্ত রমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করল ঝুমা, অসহ্য গুমোট ভরে গেছে ঘরের মধ্যে। বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে গিয়ে পুবের জানলাটাকে শব্দ করে খুলে দিল।

—একটু পরে বন্ধ করে দিস, সারারাত মাথার কাছে জানলা খোলা থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে। ঝুমা মায়ের কথায় সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। ঘরের কোণে আলনার কাছে দাঁড়িয়ে শাড়ী বদলে নিল। মা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল সম্ভবত ওর সাড়াশব্দ পাবার জন্যে। তারপর কিছুটা অধৈর্য হয়েই যেন বলল,

—তোর আজকাল কি হয়েছে বলত খুকি? তোর রকম-সকম কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

—যা বুঝছ না, সেটা বোঝবার জন্যেই বা এত কষ্ট পাচ্ছ কেন? ঝুমা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের বিনুনি খুলতে ব্যস্ত হল।

—আশ্চর্য, মার কণ্ঠস্বরে দুঃখমেশানো বিস্ময় প্রস্ফুট হল, যতক্ষণ তুই আমাদের কাছে আছিস, ততক্ষণ তোর ভালমন্দ দেখব না, বুঝব না?

ঝুমা খোলা চুল পিঠে মেলে খোলা জানলাটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মার সপ্রশ্ন সবিস্ময় চোখের দৃষ্টি তার চুল পিঠ ভেদ করে যেন পাঁজরের ভেতর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছে, এরকম মনে হল ঝুমার। সামনে নীচে নিদ্রিত পথ, মলিন বিজলীর আলো কুয়াশার পর্দার অভ্যন্তর থেকে একটা ঘোলাটে আস্তরণ চারিদিকে বিছিয়ে দিয়েছে। কদাচিত রাত-জাগা কুকুর ডেকে উঠছে কোথায়। অসংস্কৃত, এবড়োখেবড়ো রাস্তার দুপাশে জলাজমিতে ঝোপঝাড় গাছপালার অস্তিত্ব ভুতুড়ে, ছায়াময়। মাথার উপর ঘর, থমথমে হয়ে থাকা অপার্থিব আকাশ।

—সত্যি বলতে কি, ঝুমা এবার ফিরে দাঁড়াল মায়ের কাছে, আমার জন্যে ভাববার এমন কিছুই কারণ ঘটেনি মা। আমি খুব সহজ স্বাভাবিকভাবেই আছি, হাসছি, চলছি, কথাবার্তা বলছি। তোমরা শুধু শুধু একটা মনগড়া দুঃখ নিয়ে আমার দিনগুলোকেও যেন অতিষ্ঠ করে তুলেছ। অদ্ভুত সব ধারণা দিয়ে আমাকে বিচার করছ। এসব আমার পক্ষে সত্যিই অসহ্য মনে হচ্ছে।

—তাই যেন হয়, আমাদের মনগড়া দুঃখের ধারণাটাকে তুই যেন ভেঙে দিতেই পারিস খুকু। মা বড় করে শ্বাস ফেলল। পুরু লেন্সের চশমার কাঁচের আড়ালে তার চোখদুটো দুর্বোধ্য মনে হল। ঝুমা ততক্ষণে খাটের ওপর এসে বসেছে, মার থেকে খানিক দূরত্ব রেখে। সামান্য কৌতুকের মেজাজে বলল,

—কই জিজ্ঞেস করলে না তো, এত রাত হল কেন ফিরতে, কোথায় খেলাম, কি খেলাম, আগে হলে তো কতো বকুনিও দিতে বেশ কিছু।

—যেখানেই যাস, যখনই ফিরিস, তোর তো উচিত বাড়ীতে জানিয়ে যাওয়া। মা সামান্য অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল, মাথার ওপর যখন একজন লোকও অন্তত রয়েছে, তোর ভালমন্দের জন্যে সেই দায়ী হবে তো শেষপর্যন্ত।

—কে, বাবার কথা বলছ, ঝুমা হাত উলটে গলায় বিরক্তি ও ব্যঙ্গের শব্দ করল। হ্যাঁ, মাথার ওপর উনি নিশ্চয়ই আছেন, যেহেতু আজকাল এক সেকেণ্ডের জন্যে আমার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করে না তাঁর, ডেকে দুটো কথা বলতেও বিরক্তি হয়।

—এই চুপ চুপ, মা ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁটে আঙুল ঠেকাল, পাশের ঘরে জেগে রয়েছে মানুষটা। অন্ধকার কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে পড়ে আছে কাঠের মতন। ও যে তোর ভবিষ্যৎ ভেবেই এমন নির্জীব আধমরা হয়ে উঠেছে, সেকথা কেন বুঝিস না তুই। দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস একবার। এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপিয়ে উঠেছিল মা।

—কে মা, ঝুমার গলা খরখরে শোনাল, আমি কি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই? আমার ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত নয়। বলতে বলতে ঝুমা বিছানা থেকে উঠে ঋজু ভঙ্গিতে মার মুখোমুখি দাঁড়াল। মা কপলক স্থির চোখে মেয়ের মুখভাব নিরীক্ষণ করল, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় সিদ্ধান্ত জানাল,

—মেয়েদের পা দুটো সব সময়ই ভাসে থাকুক, যতক্ষণ না শক্ত একটা জমি পায়, দুটো শক্ত পায়ের ওপর নির্ভর না করে।

ঝুমা হাই তুলল, শরীরে আলস্যের ভঙ্গি করল, ক্লান্ত গলায় বলল,

—শুতে দেবে, না সারারাত বকবক করবে ঐরকম। অনেকটা বাস জার্নি করেছি, দারুণ টায়ার্ড।

—সত্যি কথা তোর সহ্য হয় না আজকাল খুকু, মার ক্ষুব্ধ গলা শোনা গেল।

—বেশ, তুমি এখন চুপচাপ গিয়ে দুটো খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী হয়ে। খিদের জন্যে তোমার মেজাজ ভাল নেই।

—খুব হয়েছে, তুমি আর দয়া করে দরদ দেখিও না মার ওপর।

—কি আশ্চর্য, দরকার হলে একদিন বাইরে খেয়ে আসারও স্বাধীনতা নেই আমার, ঝুমা হঠাৎ উষ্ণ হয়ে উঠল, তার-জন্যে সারারাত উপোস করে থাকবে একজন। অদ্ভুত অসহ্য অবস্থা তো। ঝুমা ছটফটিয়ে ঘরের ও-প্রান্ত থেকে ঘুরে এল একবার, ফিরে দেখল মা নিঃসাড়ে বেরিয়ে গেছে কখন। ক্লান্ত শরীরে, মাথার মধ্যিখানে কি রকম যন্ত্রণা বোধ করল এতক্ষণে ঝুমা। অস্থির হাতে আলোটা নিবিয়ে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। একেবারে পাশটিতে বোন রুমা ঘুমিয়ে, নিঃশব্দ, নিরুদ্বেগ। কি নিশ্চিন্ত স্বপ্নের ঘুম ওর, ঝুমা ঈর্ষাবোধ করল, পাশে শুয়ে একটা অস্থির যন্ত্রণা ছটফটিয়ে মরছে, তার সামান্যতম আঁচও লাগছে না ওর মন্থর শ্বাস-প্রশ্বাসে। হোক কতদিন থাকবে আর এমন আকণ্ঠ নিশ্ছিদ্র ঘুম! ঝুমাও এমন ছিল একদিন, আদুরে, লোভী, অভিমানী আর ভাবনাবিহীন হালকা পাখীর মতন, নরম শরীর, উত্তপ্ত বুক আর ভীরু লজ্জা। আসলে সকলকেই স্বপ্ন হারাতে হয়, জটিলতার সহস্র পাকে এমনি দৃষ্টিহীন ঘুরে মরতে হয় প্রত্যেককে, নিজের মনের স্বপ্ন, প্রত্যাশা আর ভুল ভাঙার শিকার হতে হয়, সব শয্যাই একদিন না একদিন এমনি কণ্টক হয়।

রুমা ঘুমের মধ্যে ওপাশ ফিরল, চাদরটা ভালকরে মুড়ে নিল শরীরে, অন্ধকারের মধ্যেই টের পেল ঝুমা। আজ রাত্রে আর সুস্থির ঘুমোতে পারবে না, সেটা আন্দাজ করে শ্বাস ফেলল ও। বস্তুত এমনি নির্লিপ্ত নিশ্ছিদ্র ঘুম ওকে অনেকদিন থেকেই পরিত্যাগ করেছে। ইদানীং অনেক ক্লান্ত বিনিদ্র রজনী যায়, পরদিনের জন্যে চোখের কোলে দাগ থাকে, হাতে পায়ে শৈথিল্য থাকে, প্রায়শই মেজাজ সমতা হারায়। এজন্য সকলে কি ভাবে কে জানে। ভাবে মনোজ নামের সেই লোকটির কথা, যে নাকি ঝুমার সমস্ত অতীত পটভূমিকাটাকে জুড়ে এখনো সদর্পে বিদ্যমান। উঃ, মনোজ—কটি মাত্র বর্ণের মিলনে তৈরী কোন নাম যে এত সুতীব্র, তীক্ষ্ণধার হয়ে কাজের মধ্যে বিঁধতে পারে, তা আগে ঝুমার কখনো ধারণা ছিল না। সময়কে যদি মুছে দেওয়া সম্ভব হতো তাহলে বুঝি পৃথিবীর সব কাজি একত্রিত করে

ঝুমা নিজের বগত কয়েক বছরের জীবনটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। এসব ভাবতে ভাবতে ঝুমা অন্ধকারেই বিছানা থেকে উঠে পড়ল। হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের ওপর ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটাকে খুঁজতে লাগল।......

—জল দাও একটু, দেবাংশু হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ঝুমার দিকে এবং পরমুহূর্তেই গ্লাসসুদ্ধ ঝুমার হাত ধরে ফেলল। সুর করে ডাকল—ঝুমঝুমি।

—এই, কি হচ্ছে ছেলেমানুষি, ঝুমা সন্ত্রস্তে এদিক ওদিক চাইল। ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে জল ছলকে পড়ল দুজনের হাতে, ঝুমার শাড়ীতে।

—কি করলে বলত।

—কিছু না, ছলকে পড়া জলটা হয়তো মনের সিম্বল। যেটা একটু নাড়াচাড়া পেলেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে স্পর্শের নাগালে যেতে চায়।

—কাব্য থাক এখন, ঝুমার কান লালচে হয়ে উঠলেও, আশ্চর্য এখনো ঝুমা রাশ করতে পারে, গলায় সতেজ ভাব রাখল মনটা কি এমনি তরল বস্তু নাকি।

—সব সময় নয়, ঋতুভেদে। যেমন শীতে বরফ কঠিন, আবার উষ্ণতায় প্রস্রবণ। খুব সপ্রতিভ গলায় উত্তর দিল দেবাংশু।

সে সময় ঝুমা কাছে দূরে, সবুজ গাছপালা, সোনালী রোদ্দুর আর উড়ন্ত পাখী দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

—কি, আর কিছু বললে না যে? জিজ্ঞেস করল দেবাংশু।

—কি বলব, ঝুমা ওয়াটার বটলের মুখে গ্লাসটা ভরে বন্ধ করছিল।

—মন সম্বন্ধে কোন তাত্ত্বিক বিষয়।

—মন নিয়ে ছেলেখেলা করার বয়স আমার গেছে দেবাংশু। ঈষৎ গম্ভীর মুখে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিল ঝুমা, যেন এখনি উঠতে হবে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক না।

—ওহ্ ডিয়ার—দেবাংশু অলস ভঙ্গীতে ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে কনুইয়ে ভর করে শুয়ে পড়ল।

—এ কি লম্বা হয়ে শুচ্ছ যে, ঝুমা শঙ্কিত প্রশ্ন করল। ফিরতে হবে না?

—মেজাজটা যেন হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূরে চলে এসেছে ঝুমঝুমি, যেখান থেকে হঠাৎ কারোর ফেরাটা খুব সহজ নয়। দেবাংশু হাই তুলল।

—একদিনেই তোমার ভীষণ স্পর্ধা বেড়ে গেল দেখছি। ঝুমা ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে শাসন করল।

—স্পর্ধাটা বাড়বারই জিনিষ, দমে থাকার নয়। দেবাংশু সিগারেট ধরাল।

—ইস, সবাইকার মাঝখান থেকে একলা না চলে এলেই হত, এমন পাগলের পাল্লায় পড়তাম না তাহলে। ঝুমা হতাশ ভঙ্গী করল। দেবাংশু ওকে কটাক্ষে দেখে হাসল, স্বচ্ছ কৌতুকে। ওর দাঁতগুলি সুন্দর, ঝকঝকে, বস্তুত ওর সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন সব সময় ঝকঝকে মাজাঘষা, ছিলে পরানো ধনুকের মত ও সর্বদা টানটান, সতেজ। নরম স্পর্শকাতর রোদ্দুরে, ঝুমার দৃষ্টি ও শরীরের অনেক কাছাকাছি চলে আসা এই যুবকটিকে লক্ষ্য করল সামান্যক্ষণ, হঠাৎ ভাল লাগিয়ে দেবার মতন, আচমকা কাছে চলে আসার মতন ক্ষমতা এই ছেলেটির আছে, মনে মনে স্বীকার করল ঝুমা, সে ক্ষমতা ওর সহজাতই হোক বা স্বেচ্ছা-আরোপিতই হোক। না হলে আজকের অমন দারুণ পিকনিক আর হৈ চৈ-এর মেলা থেকে হঠাৎ নিজের অজান্তেই এরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে এই একক ছেলেটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবার জন্যে পালিয়ে আসবে কেন। এবং একথা ভাবতে গিয়ে এতক্ষণে নিজের অভ্যন্তরে তাকাবার সুযোগ পেল ঝুমা। সত্যিই তো। কেনই বা এই স্বল্পকাল পরিচিত, অনাত্মীয় যুবকটিকে এতখানি অধিকার দিল ঝুমা, বন্ধুত্বের, অথবা ভাললাগার অথবা—অথবা কি, সেটা ভাবতে গিয়ে কান গরম হল ওর। চোখের সামনে সবুজ ঘাস, সযত্ন পরিচর্যার ফুল, গাছগাছালি ও চলমান সুসজ্জিত সব মানুষের রঙ ফিকে হতে সুরু করল।

—কি ভাবছ, অমন অন্যমনস্ক হয়ে? মাথার নীচে হাত রেখে চিত হয়ে শুয়েছিল দেবাংশু, ঝুমার সাড়াশব্দহীন মুখের দিকে তাকিয়ে এবার প্রশ্ন করল।

—কি ভাবব আর। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, সেই চিন্তাই এখন প্রবল।

—অসম্ভব। দেবাংশু অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল। আজ তোমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে পিকনিকে যাবার কথা নিশ্চয়ই বাড়ীতে বলে এসেছ। অতএব মনে হয়, একটু আধটু দেরী হলে মা অবশ্যই চিন্তা করবেন না।

—এটা কি পিকনিক? ঝুমা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। একটা অনাত্মীয় ছেলের সঙ্গে শীতের দুপুরে একদম একা মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা বাড়ীর পক্ষে খুবই সুখদায়ক ব্যাপার, তাই না?

ঝুমা ভেবেছিল দেবাংশু সুক্ষ্মভাবে আঘাত পাবে খানিকটা, নিজের হঠকারিতার জন্যে সঙ্কুচিত হবে, কিন্তু সে তার ধার-কাছ দিয়েও গেল না, সোৎসাহে বলল,

—কেন, দুজনের পিকনিক কি পিকনিক নয়? আমরা হৈ চৈ করে রাঁধিনি, চিৎকার করে বেসুরো গান ধরিনি, তাই বলে কি আমরা নিরানন্দ? আমরা খেয়ালখুশি মত হাঁটলাম, খেলাম, ঘাসের ওপর গড়াগড়ি করে গল্প করলাম, আর ... আর, নরম রোদ্দুরে, পাখীর গানের সুরে মনের অনেক কাছাকাছি চলে এলাম। দেবাংশুর গলা শেষের দিকে ভারি হয়ে এল ক্রমশ।

—উঃ দেবাংশু, তুমি আজ মন নিয়ে বড় চীৎকার শুরু করেছ।

—নিজের বুকের ভেতর তাকিয়ে দেখ তো ঝুমঝুমি, সেখানেও কি আজ অসম্ভব গোলমাল শুরু হয়ে যায়নি?

—তুমি আমাকে ঝুমঝুমি বলে ডাকবে না, ঝুমা মুখ কঠিন করল। রগের শিরা দুটো স্ফীত হচ্ছিল ওর।

দেবাংশু উঠে বসল। রোদ পড়ে আসা নরম আলোয় ঝুমার মুখের রেখা, বসে থাকার ঋজু ভঙ্গি কপলক তাকিয়ে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে বলল,

—গতকাল বিকেল থেকে তুমি আমায় বন্ধুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছ, ঘনিষ্ঠতার অধিকার দিয়েছ, আমি কি এরই মধ্যে সে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছি? কি জানি, মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে কম আয়ত্ত করতে পারে।

—তোমার মুণ্ডু। ঝুমা ঠোঁট ওলটালো, গভীর গভীর সব তত্ত্বকথা পরে আলোচনা হবে, এখন ওঠো তো, বেলা পড়ে এল। পাখীর ঝাঁক ওড়া দিগন্তে চোখ ঘুরিয়ে আনল ঝুমা, বলল, অনেক দূরে পৌঁছতে হবে আমাকে, শীগগির বাসে তুলে দেবে এসো।

অবশ্যই তৎক্ষণাৎ বাসে উঠে পড়তে পারেনি ঝুমা। দেবাংশু চায়নি বলে। দেবাংশুর সঙ্গ ক্রমশ আমাকে মোহগ্রস্ত করে তুলছে, ঝুমা মনে মনে ভেবেছিল কারণ যে মুহূর্তে দেবাংশু বলেছে, আজ রাতের খাওয়াটা তোমার হাত থেকে খাব, সেই মুহূর্তেই ঝুমা রাজী না হয়ে পারেনি। রেস্তোরার পর্দাঢাকা কেবিনে দেবাংশু আর বিশেষ কথা বলেনি, খাওয়াদাওয়ার ব্যস্ত থেকেছে। সেই আপাতব্যস্ততার মধ্যে ও কোন গভীর চিন্তার মগ্ন, সেটা ঝুমা উপলব্ধি করছিল। এবং সেই গভীরতার ছোঁয়াচে ঝুমার বুকের মধ্যে হঠাৎ ছমছম করে উঠেছিল। বস্তুত দেবাংশু নামের এই চটপটে, সুদর্শন, চপলমতি যুবকের কাছ থেকে শুধু যেন লঘু আচরণ আর সরল ভাবনাহীন প্রগল্ভতাই প্রাপ্য বলে মনে হয়, নিভৃত

উপলব্ধি থেকে উৎসারিত কোন অর্থব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের আশঙ্কায় তাই সবটা সময় কাঁটা হয়ে ছিল ঝুমা।

...অনেকক্ষণ চোখ মেলে থাকতে থাকতে ঘরের বিস্তৃত অন্ধকার ক্রমশ ফিকে আর তরল হয়ে আসছিল। এখন ঝুমার সামনে অনায়াসে রঙ-চটা কড়িকাঠ, আলমারির সরু লম্বা চকচকে আয়না ও আয়না প্রতিফলিত ঘরের সব আসবাবগুলিও স্পষ্টত দৃশ্যমান হচ্ছিল। একটানা অনেকক্ষণ ঘুমের নিবিড় প্রত্যাশায় থেকেও বঞ্চিত হয়েছে ঝুমা, এখন সারা শরীর জুড়ে গ্লানি আর ক্রোধ। সমস্ত উপশিরাগুলি পর্যন্ত ধনুকের ছিলার মতন টানটান। মনের এরকম ক্ষোভ আর আক্রোশের সময়টাকে বড় ভয় লাগে ঝুমার। এ সময়ই সেই অবাঞ্ছিত লোকটার স্থির দুটো চোখ বড় জ্বালাতন করে তাকে। মনোজ নামের অতি চরম স্বভাবের সেই লোকটা, যে কখনো বিপর্যস্ত হয় না, অন্যায় ক্ষমা করে না, ভালবাসায় এতটুকু পর্যন্ত বিচলিত হয় না।

পাশে নড়াচড়ার শব্দে চমকে ফিরে তাকাল ঝুমা। ওর আত্মগত চিন্তার মধ্যে রমার অস্তিত্বটাকে ভুলেই ছিল এতক্ষণ। মনোজ ঘুমের মধ্যে কখনো এরকম ছটফট করত না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঝুমার, কি নিশ্চিন্ত সুকঠিন নিদ্রা ছিল ওর। পাশে শুয়ে অন্য একটা শরীর মন কত রাত বিতৃষ্ণায়, বিরক্তিতে, বিনিদ্রায় ছটফট করেছে, সেটা কোনদিন চোখে পড়েনি তার। অথবা প্রয়োজন বোধ করেনি। কি জ্বালা—ঝুমা কণ্টকশয্যা ছেড়ে উঠে বসল আবার। এই কঠিন অতন্দ্র রাতে সেই অসহ্য অস্পৃশ্য লোকটার স্মৃতিতে উৎপীড়িত হবার মতন বোকামি আর কি হতে পারে! ঘরের হাওয়ার শীতের চাদর বিছিয়ে যাচ্ছে অলক্ষ্য সরীসৃপের মতন। মা বলেছিল জানলাটা বন্ধ করে দিতে, নাহলে ঠান্ডা লাগবে। কতদিন আর খুকী করে রাখবে মেয়েদের! ঠোঁট বেঁকিয়ে নিঃশব্দে বিদ্রুপের হাসি হাসল ঝুমা। আসলে এমনি সব মায়েদের জন্যেই মেয়েদের জীবন অমন ধাক্কা খায় প্রতি-পদে! জীবনধারণের স্তরে স্তরে এরা এমন কোমল সব আস্তরণ মেলে রাখে, পায়ের নীচে এমন মখমল কার্পেট বিছিয়ে দেয় এবং পরবর্তীকালে এমন নিরাবরণ পৃথিবীতে নগণ্য করে ছেড়ে দেয় যে, তখন পায়ের নীচে কাঁটাগুলি অতীব সুক্ষ্ম হয়ে বিঁধতে থাকে, জীবনের এলোমেলো [illegible] তাকিয়ে [illegible]।

[illegible]

ভেসে আসা নিরবচ্ছিন্ন দুর্বোধ্য গানের গুনগুনানির মতন। ঝুমা ক্লান্ত হাতে খোলা চুল জড়িয়ে নিয়ে জানলার কাছে সরে গেল। শহরতলীর গা ছমছম করা বিষণ্ণ শীতের রাত। বর্ণহীন আকাশে রূপোলী রঙের স্থির শান্ত কটি নক্ষত্র। নির্বিষ সাপের মত এবড়ো-খেবড়ো জনহীন সরু পথ, সামনের মাঠে গাছপালার বিলীয়মান অস্তিত্বের মধ্যে ইতস্তত জোনাকির চকমকি। মলিন লালচে আলোগুলি কুয়াশার পর্দার আড়ালে মৃত চোখের মত ঘোলাটে আর বীভৎস। দূরের বাস রাস্তা থেকে কদাচিত ভারী ট্রাকের গর্জন ভেসে আসছে। ঝুমার সর্বাঙ্গে শীতের শিরশিরানি, তবু ওর জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছা হল না। যেন জানলাটা বন্ধ করলেই এখুনি আরো নিশ্ছিদ্র গভীরতর অন্ধকারে ডুবে যাবে এই ঘর, আর সেই বিশাল পরিব্যাপ্ত আঁধার স্রোতে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরো কঠিন যুদ্ধে ঝুমাকে বিক্ষত হতে হবে।

যুদ্ধ? কিসের যুদ্ধ? যেন নিজের সঙ্গে মোকাবিলা করতেই মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল ঝুমা। চকচকে আয়নার পটভূমিকায় শুধু একটা প্রেতায়িত শরীরের রেখা। ঝুমা চেয়ে চেয়ে দেখল খানিকক্ষণ। যেন অন্য একটা শরীর দেখছে, অদ্ভুত, অপরিচিত কোন অস্তিত্ব যেন। এই শরীর যে বহুব্যবহৃত, এই মন যে অনায়াস-জীর্ণ সে সত্যটা এইক্ষণে স্বীকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এই অবয়বের অধিকারী যে মেয়েটি, ঝুমা ভাবল, সে চিরকাল পাখী হয়ে থাকতে চেয়েছে। সূর্যকরোজ্জ্বল সকালে সতেজ বৃক্ষের সবুজ ডালে বসে আপন খেয়ালে গান গেয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু মনোজ তো সেরকম মুগ্ধ বনস্পতি হতে চাইল না, ও শুধু নীরবে, ঠান্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিত উপায়ে ঝুমার অস্তিত্বটাকে প্রতিক্ষণে নিংড়ে নিয়েছে, নিজের প্রখর অধিকারবোধকে সোচ্চার করে রেখেছে সর্বদা। ঝুমার ভাললাগা, মন্দলাগা, চাওয়া না চাওয়ার কোন মূল্যেই ছিল না ওর কাছে। অথচ মনোজ বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ, আলাপী এবং সুপ্রতিষ্ঠার জোরে সমাদৃত। আর কদিনের মধ্যেই আমি মনোজের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবো, ঝুমা মনে মনে উচ্চারণ করল, সম্পূর্ণ একক, স্বাধীন। আমার শরীর মনের বৃন্ত থেকে মনোজ নামের গ্রন্থিটি চিরকালের জন্য অপসারিত হবে। কতদিন থেকে এরকম [illegible] ঝুমা, আহ্। অকারণেই ঘরময় [illegible] পায়চারি করে এল ঝুমা। কানের [illegible] কণ্ঠের মুগ্ধ হাসি [illegible] দেবাংশুর [illegible] কৌতুক, সব যেন জোনাকির

মতন এই অন্ধকারে ঝকমক করে উঠল চোখের সামনে। হ্যাঁ, দেবাংশুকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে এখন। প্রণব, ইন্দ্রনীল, অনেক ছেলেকেই তো দেখল ঝুমা, স্বেচ্ছায় মেলামেশা করল। অনেক সুযোগ ছিল, একই অফিসে, এক সেকশনে চাকরী করার জন্য, তবু সকলাকেই শেষপর্যন্ত কেমন যেন সুবিধাবাদী মনে হল ঝুমার। ওর যে একজন স্বামী ছিল বা এখন পর্যন্ত আছে, সেকথা ওরা সবসময় মনে করিয়ে দিয়েছে এবং তৎসত্ত্বেও সুযোগের প্রত্যাশায় থেকেছে সর্বদা। ওদের চোখে কখনো কখনো পরস্বাপহরণের চৌর্যবৃত্তি লক্ষ্য করেছে ঝুমা। ওহ্, ওদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছু আপাতত ঝুমার মনে আসছে না। সে তুলনায় দেবাংশু অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। হোক না সামান্য লঘুস্বভাবের। নিশ্চয়ই ঝুমার সঙ্গে মনে মনে কোথায় একটা অচ্ছেদ্য বাঁধন পড়ে গেছে ওর। নইলে ইন্দ্রনীলের মাধ্যমে সেদিনের পরিচিত দেবাংশু স্বল্পকালের মধ্যেই ঝুমার অমন কাছাকাছি চলে আসবে কেন? নিজের পুরনো জগৎ, পুরনো বন্ধুবান্ধবীদের ছেড়ে?

—আঃ, অনেকক্ষণ অন্ধকারে সয়ে-যাওয়া চোখ আলোর ছটায় ধাঁধিয়ে উঠল প্রথমে, চোখে হাত ঢাকা অবস্থায় ঝুমা চাপাস্বরে প্রায় গর্জন করে উঠল, কি হচ্ছে, রাতদুপুরে এরকম জ্বালাচ্ছ কেন বলত মা?

—চুপ, অত শব্দ করিস না। তোর বাবা একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন। মার গলায় ক্ষোভ ও বিরক্তির স্পষ্ট আভাস।

—তো তুমিও ঘুমোলেই পারতে। ঝুমা খুব নিরীহ গলা করল।

—পেটের মেয়ে শত্রু হলে কেউ ঘুমোতে পারে খুকু?

ঝুমা এতক্ষণে চোখ থেকে হাত নামিয়েছে। খোলা চুলে মুখের দুপাশ ঢাকা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,

—সত্যি মা, এমনভাবে যে তোমাদের সকলকার শত্রু হয়ে যাব, তোমাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেব, তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

—তুই ছেলেমানুষ খুকু, তোর ওপর আমাদের কারো কোনো রাগ নেই, মা আদরের গলায় বলল। কাছে সরে এসে ঝুমার গভীর কালো চুলে হাত বোলাল।

—মিথ্যে কথা। তুমি বাবা বৌদি এমন কি আমার অত শ্রদ্ধার পাত্র দাদা পর্যন্ত সহজ করে কথা বলে না আর আমার সঙ্গে, ঝুমার গলায় কান্না এসে গেল।

—তুই বুঝিস না, কতবড় চিন্তা আমাদের বুকে পাথর হয়ে রয়েছে, তোর শুকনো মুখখানা দেখে। আপনজনকে নিজের হাতে পর করে দিলে কি অবস্থা হয় তার প্রমাণ তো তোর চেহারাতেই রয়েছে খুকু।

—আপনজন! ঝুমা ফোঁস করে উঠল, সেই লোকটার কথা উচ্চারণ করতে তো বারণ করেছি তোমাদের, মা।

—পাগল! মা হাসল। উচ্চারণ না করলেই কি ভেতর থেকে সে উবে যায়, সে যে এখনো আমাদের আদরের জিনিস হয়ে আছে রে। যতই অবিচার করুক, অন্যায় করুক, তাকে আমরা অস্বীকার করব না।

—বাঃ, ঝুমা ব্যঙ্গে হাসল, সক্রোধে ঠোঁট কামড়াল। এরা এখনো সেই অর্বাচীনটার সঙ্গে ঝুমার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রেখেছে।

একটা কথা শুনবি খুকু।

—বল, ঝুমা আয়নার কাছে সরে গেল।

—মনোজকে অনেক করে তোর দাদা একবার আসতে বলেছে, যদি সময় হয় তার, আগামীকাল হয়ত আসতে পারে সে, সে-সময় তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিস খুকু। এটা আমাদের সবাইকার অনুরোধ।

আয়নার ভেতর দিয়ে অবাক বিস্ময়ে মার দিকে চেয়ে ছিল ঝুমা, যেন কথাগুলির অর্থ সে ভাল করে বুঝছিল না।

—তোমরা তাকে আসতে বলেছ? এখানে? ছাড়া ছাড়া, অসংলগ্নভাবে উচ্চারণ করল ঝুমা।

—হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি তোর জীবনে ও ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই, কোন মেয়েরই থাকে না।

মার গলায় অভূতপূর্ব দৃঢ়তা বেজে উঠছিল। একটা অস্পষ্ট আলোয় মায়ের চওড়া সিঁদুর-মাখা সিঁথি, চলমাপরা চোখ ঝকঝক করছিল।

—তোমরা সব জেনেশুনে, আমার একটা চন্ডালের জন্যে...একটা দুকূলপ্লাবী নৈরাশ্যের স্রোতে ঝুমার চারিধার আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। দ্রুতপায়ে জানলার কাছে সরে এসে নিজেকে সামলাল ঝুমা। বাইরে তখন শেষরাতের অন্ধকার কুয়াশা জড়ানো সদ্য ঘুমভাঙা পাখীর অস্ফুট কাকলি কোন সুদূর থেকে শীতল বাতাসে ভেসে আসছে। নিস্তব্ধ আকাশ, শান্ত শীতের ভোর মথিত করে ট্রেনের অস্পষ্ট শব্দ দূরান্তে মিলিয়ে গেল। ঝুমার গালে শুকিয়ে আসা জলের দাগ তখন অনন্ত প্রশ্নের আনাগোনা।

তাম্রফলক

লাস্যময়ী নারীমূর্তি

ইতিহাসের দেউল পোতা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্বভারত ও দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর পুরোপলীয়, নবোপলীয় ও তাম্রোপলীয় সভ্যতার সঙ্গে বঙ্গভূমির পশ্চিম সীমান্তের অসমতল অঞ্চলের আদিম মানব বসতির যে গভীর সংযোগ ছিল, সম্প্রতি অজয়, কুনর, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, শীলাবতী, দামোদর প্রভৃতি নদনদীর উপত্যকায় আবিষ্কৃত বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি খুব সম্ভবত তা নির্দেশ করে। এমন কি অনেকের মতে সীমান্ত বাংলার এই প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে পূর্বভারত ও দক্ষিণ ভারতের সমকালীন ও সমধর্মী বৃহত্তর সংস্কৃতিবলয়ের একটি প্রান্তিক বিস্তারণ মাত্র। পুরোপলীয় ও নবোপলীয় সভ্যতার সন্ধিক্ষণে সীমান্ত বাংলার এই প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির একটি ধারা প্রাচীন সরস্বতী নদীর উভয় কূলের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে উপকূল বঙ্গ পর্যন্ত যে প্রসারিত হয়েছিল, প্রাচীন সরস্বতী নদীখাতে প্রবাহিত বর্তমান ভাগীরথীর পূর্বতীরে সম্প্রতি আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রত্নস্থলের বিবিধ প্রস্তরায়ুধ ও অন্যান্য পুরাবস্তুগুলি তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে। বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক অজয় উপত্যকা সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র তথাকথিত পাণ্ডুরাজার ঢিবির বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার বর্তমান ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত দেউলপোতায় প্রাপ্ত অনুরূপ দ্রব্যগুলির গভীর সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা যায় যে, সুদূর পুরোপলীয়, নবোপলীয় ও তাম্রোপলীয় যুগে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অসমতল অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের অন্ততপক্ষে নদীর তীর ধরে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত যাতায়াত ছিল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা সদর থেকে দেউলপোতার দূরত্ব প্রায় ছয় কিলোমিটার। ডায়মণ্ড হারবার কাকদ্বীপ বাস টারমিনাসের পাশে গঙ্গার খালের লোহার পুল পেরিয়ে বাঁ হাতের ছোট রাস্তা ধরে ফকিরচাঁদ কলেজের পাশ দিয়ে ভাগীরথীর উঁচু পাড় ধরে পশ্চিম দিকে একটানা প্রায় চার কিলোমিটারের পথ দেউলপোতা। বর্ষাকালে কলেজের পর থেকে আগাগোড়া পথটি কর্দমাক্ত ও নগরবাসীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

দেউলপোতা অঞ্চল এককালে প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কস্তু সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার ফলে নবাবী আমল থেকে এ পথে ভাগীরথীর প্রবাহকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পথে সমুদ্রাভিমুখে চালনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেউলপোতা বলতে নদীর তীর থেকে প্রায় দু-শ গজ দূরে শ্মশান বটবৃক্ষে শোভিত অসংখ্য খোলাকুচি ও প্রাচীন ইঁটের ভগ্নাংশ বিক্ষিপ্ত একটি উঁচু ঢিবিকেই বুঝায়। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকেরা সাধারণত দেউলপোতা বলতে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে চিহ্নিত করে থাকেন। এ অঞ্চল নদীর পাড় ধরে দেউলপোতা ঢিবি থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পক্ষে ঢিবিটির সন্নিহিত আবদালপুর, ঘোষের চক, প্রভৃতি স্থানগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

হরিনারায়ণপুরের মত দেউলপোতা অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হল পুরাবস্তু বিলুণ্ঠিত নদীতট। প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার নদীতট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অজস্র বিক্ষিপ্ত খোলাকুচির মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে বিস্ময়কর সব পুরাবস্তু। ভাঁটার সময় যখন নদীর জল তীর থেকে অনেকটা নেমে যায়, তখন সে কর্দমাক্ত অঞ্চলেও পাওয়া যায় প্রাচীনকালের মানব বসতির আশ্চর্য সব নিদর্শন। এ অঞ্চলের কোথাও কোথাও নদীর ধারে পাড়ের তটে ভূমির একটা বিশেষ বালুকাময় স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রস্তর যুগের আদিম মানুষের ব্যবহৃত বিচিত্র সব প্রস্তরায়ুধ, তাম্রোপলীয় যুগের কিছু কিছু নিদর্শন ও সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর তথাকথিত সমতুল্য কিছু কিছু পুরাবস্তু। নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের ও আদিম-মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় দেউলপোতার এই আবিষ্কারগুলি নিশ্চিতভাবে যুগান্তকারী উপাদান। পুরাবস্তু বিলুণ্ঠিত নদীতট ছাড়া আবদালপুর, ঘোষের চক প্রভৃতি গ্রামের জলাশয় খনন বা সংস্কারের কালেও কিছু কিছু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এগুলির মধ্যে অধিকাংশই সুঙ্গ, কুষাণ ও আরও পরবর্তী সময়কালের। এ অঞ্চলের আরেকটি প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল পূর্বকথিত

দেউলপোতা ঢিবিটি। বহুদূর থেকে ভাগীরথী তীরে বিশাল বটবৃক্ষশোভিত উঁচু ঢিবিটি সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢিবিটির চারপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র খোলাকুচি ও প্রাচীন ইঁটের ভগ্নাংশ। ঢিবিটির মাথায় বিশালাকৃতি একটি বটবৃক্ষ। দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে নির্জন নদীতীরে বটের ঘনছায়া পথিকের দেহক্লান্তি দূর করে, হৃদয়ে প্রশান্তি আনে ও ক্ষণিকের জন্য নিতান্ত গৃহী মনকেও বিবাগী করে তোলে। বটবৃক্ষটির নিচে প্রোথিত আছে কালো পাথরের বিরাট একটি প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাংশ। প্রস্তর খণ্ডটির ভূমির উপরের অংশটি প্রায় দেড় মিটার উঁচু, নিম্নাংশটি বড়ভুজাকৃতি। খুব সম্ভবত এটি একাদশ বা দ্বাদশ শতকের কোন প্রাচীন মন্দিরের অংশ। স্থানীয় অধিবাসীদের কেউ কেউ এটিকে বর্তমানে শিবলিঙ্গ জ্ঞানে সেবা করে থাকেন। অনেকের ধারণা ঢিবিটি খনন করালে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অথবা কোন প্রাচীন ইমারতের নিদর্শন আবিষ্কৃত হবে। তবে ঢিবিটির অবস্থান ও অন্যান্য চিহ্ন দর্শনে মনে হয় এ স্থানে খননকার্য চালালে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে পারে। বিস্তীর্ণ নদীতট, বিচিত্র ভূমিস্তর, পঙ্কিল জলাশয়, উঁচু ঢিবি আর বিস্ময়কর সব পুরাবস্তু মিলে দেউলপোতা নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গের আদিম মানব সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার একটি বিরাট সম্ভাবনা।

বড়ই পরিতাপের বিষয় দেউলপোতা অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিচিত্র ও বিস্ময়কর সব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হলেও এ অঞ্চলে আজ পর্যন্তও বিজ্ঞানভিত্তিক কোন খননকার্য, ভূমিস্তর বিন্যাস নির্ণয় করণে ভূতাত্ত্বিক কোন গবেষণা অথবা বিভিন্ন স্তরের মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। অথচ প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এ তথ্যগুলি অপরিহার্য। এ বিষয়ে বিভিন্ন মহলের যে উৎসাহ দেখা গিয়েছে তা নিতান্তই মামুলি ধরনের। নদীর ধসে পড়া তটে হঠাৎ করে আবিষ্কৃত (চান্স ফাইণ্ডস) প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের কিছু কিছু পুরাবস্তু, তথাকথিত 'এক্সপ্লোরেশনে' সংগ্রহ করে, সেগুলি সাধারণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অথবা মধ্যপ্রাচ্যের প্রাগৈতিহাসিক মানব সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সঙ্গে এগুলির, কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত গভীর সাদৃশ্যের অনুসিদ্ধান্ত করে এ সকল বিভিন্ন মহল গৌরবময় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের বহুল প্রচারিত কৃতিত্বে নিতান্ত আত্মতুষ্টিতেই মগ্ন আছেন। অথচ হরিনারায়ণপুরের মত একদিন হয়ত ভাগীরথীর জলস্রোত প্রাগৈতিহাসিক দেউলপোতার সকল নিদর্শনকেই নিমজ্জিত করবে।

তবে নিয়মানুগ ভূতাত্ত্বিক কোনো গবেষণা না হলেও গত কয়েক বছর যাবৎ দেউলপোতার নদীতটে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইঁটখোলার কাজে অত্যন্ত গভীর স্তর পর্যন্ত মৃত্তিকা উৎসরণের যে কাজ চলেছে, অথবা জলসেচের বা জলাশয় খননের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে গভীর মৃত্তিকা স্তরের যে পরিচয় দীর্ঘদিন কষ্টসাধ্য অনুসন্ধান করে লাভ করা গিয়েছে তা নিয়ে এ অঞ্চলের ভূমিস্তর বিন্যাসের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

দেউলপোতার নদীতট সংলগ্ন অঞ্চলের ভূমিপৃষ্ঠে বর্তমান আবাসিক স্তর হতে প্রায় আড়াই-তিন মিটার গভীরে গাঢ় ধূসর বর্ণের পলিস্তর পাওয়া গেছে। এ স্তরের ঘনত্ব কোথাও কোথাও দুই থেকে আড়াই মিটার পর্যন্ত। গাঢ় ধূসর বর্ণের এই পলিস্তরের নিচেই একটি গুরুত্বপূর্ণ আশ্চর্যজনক স্তরের সন্ধান মিলেছে। স্তরটি সমগ্র অঞ্চলের ভূমিস্তরে অবিচ্ছিন্নভাবে নেই। কতগুলি বিচ্ছিন্ন এলাকায় এ স্তরের সন্ধান মিলেছে। স্তরটি ঘনত্ব দুই থেকে তিন মিটার পর্যন্ত। এ স্তরের পলি অত্যন্ত মিহি। বর্ণ খুব হালকা ধূসর বর্ণের। রাসায়নিক পরীক্ষা করে এ তৃতীয় স্তরের মৃত্তিকায় ফসফেট অর্থাৎ অধাতব মৌলপদার্থ ফসফরাস ঘটিত আম্লিক লবণের প্রাচুর্য দেখা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের মৃত্তিকা অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের প্রাচীন মানব বসতি স্থল নির্দেশ করে। তৃতীয় মৃত্তিকা স্তরের পরের স্তরটিও যে কোন গবেষককে বিস্মিত করে। এ চতুর্থ স্তরটিও বিচ্ছিন্নভাবে নদীতট অঞ্চলের প্রায় সমতলে কয়েকটি স্থানে দেখা গেছে। স্তরটি মাঝারি-দানা বালুকাময়। নদীর ধসে পড়া তটে বিচ্ছিন্ন এই বালুকাস্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে দেউলপোতার প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও ক্ষুদ্রপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন আয়ুধগুলি। বালুকাময় স্তরের নিচে পাওয়া গেছে ক্ষুদ্র কঙ্করময় আরেকটি মৃত্তিকাস্তর। এ ধরনের মৃত্তিকাস্তর মাটির অনেক গভীরে হরিনারায়ণপুরেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ স্তরে জীবজন্তুর কংকালের কিছু প্রস্তরিভূত অস্থি, শিলীভূত করোটি আবিষ্কৃত হয়েছে। দেউলপোতা অঞ্চলের ভূমিস্তরের এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রায় আট বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের বিভিন্ন কতগুলি স্থানের মৃত্তিকাস্তর পরীক্ষা করে।

দেউলপোতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পুরাবস্তুগুলি থেকে এ অঞ্চলে আদিম মানব সংস্কৃতির স্তরভেদের বিশ্লেষণ করা কিছুটা জটিল গবেষণার কাজ। প্রাপ্তপুরাবস্তুগুলি সাধারণত কোন নিয়মানুগ খননকার্যে উদ্ধার করা হয়নি। নদীর ধসে পড়া তটে বিভিন্ন বিচিত্র সব পুরাবস্তুগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গে অন্যান্য প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলির সঙ্গে এগুলির তুলনামূলক বিচার করে অথবা পুরাবস্তুগুলির গড়ন ও শ্রেণীভেদ বিশ্লেষণ করে এ অঞ্চলের প্রাচীন মানব সভ্যতার স্তর বিন্যাসের একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করা যেতে পারে।

দেউলপোতা থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম আয়ুধগুলি প্লিস্টোসিন পর্বের অন্তিমকালীন বলে অনেকে মনে করেন। এ সময়ে হয়ত মধ্য ভারত ও পূর্ব ভারতের আদিম মানব সংস্কৃতি পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অসমতল অঞ্চলের নদীপথ ধরে ধীরে ধীরে উপকূল বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তী সময় কালের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভিতর কতগুলি নিশ্চিতভাবে নবোপলীয় ও কতগুলি ক্ষুদ্রোপলীয় সংস্কৃতির নিদর্শন। এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের মধ্যে এ দুটি সংস্কৃতি স্তরের নিদর্শনই অধিক সংখ্যায় পাওয়া গেছে। নবোপলীয় ও ক্ষুদ্রোপলীয় যুগের এ সকল আয়ুধগুলির সঙ্গে অজয় উপত্যকা সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সমকালীন ও সমধর্মী আয়ুধের মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক সাদৃশ্য আছে। তবে সম্প্রতিকালে দেউলপোতা বা অজয় উপত্যকা সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পর্কিত কিছু কিছু আলোচনায় যে দৃষ্টিকোণে এ সাদৃশ্যগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে তা নিতান্তই অযৌক্তিক।

দেউলপোতা অঞ্চলের সবচেয়ে বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন মানব সংস্কৃতির যে নিদর্শন সকল আবিষ্কৃত হয়েছে, তা হল তাম্রোপলীয় যুগের। এ সংস্কৃতি খুব সম্ভবত ধলভূমের প্রাচীন তাম্রখনি অঞ্চল থেকেই এতদূর প্রসারিত হয়েছিল। রূপনারায়ণ, অজয় ও বর্তমান ভাগীরথী বা লুপ্ত সরস্বতী নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চলের বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য ও সংযোগ বিশেষ লক্ষণীয়। আলোচিত স্তরগুলি ছাড়াও দেউলপোতায় পরবর্তী সংস্কৃতির স্তর মৌর্য, সুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল প্রভৃতি ঐতিহাসিক কালেও কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরোপলীয়, নবোপলীয়, ক্ষুদ্রোপলীয় ও তাম্রোপলীয় যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মত পরবর্তীকালের নিদর্শনগুলিও সমান চমকপ্রদ ও মূল্যবান।

পুরোপলীয় যুগের যে সকল আয়ুধ দেউলপোতা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই রূপান্তরিত শিলা বা স্ফটিক শিলায় নির্মিত। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে রূপান্তরিত শিলার ব্যবহারই অধিক। এ ছাড়াও দু-একটি গ্রানাইট শিলায় পুরোপলীয় আয়ুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ যুগের বিভিন্ন প্রকার আয়ুধের মধ্যে আছে হস্ত কুঠার, [illegible], ছেদক, ফলক, ছিদ্রকারী ফলক ইত্যাদি। আয়ুধগুলি নিরীক্ষা করে মনে হয় এগুলি নিতান্ত অপটু কারিগরের হাতেরই নির্মাণ। আয়ুধগুলি পরিকল্পনাবিহীন [illegible], [illegible] ক্ষেত্রের [illegible] আয়ুধ গায়ে গভীর ও বিক্ষিপ্ত খোদাই চিহ্ন লক্ষণীয়। আয়ুধগুলির পরিকল্পনা প্রায় ক্ষেত্রেই বিক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য। তবে দু-একটি আয়ুধের প্রান্তিক উৎক্ষেপণ তীক্ষ্ণ ও আয়ুধের গায়ে দ্বিতীয় পর্যায় [illegible] চিহ্ন বিদ্যমান।

দেউলপোতা অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরায়ুধের মধ্যে পুরোপলীয়

অপেক্ষা নবোপলীয় ও ক্ষুদ্রোপলীয় নিদর্শনের সংখ্যাই অধিক। নবোপলীয় আয়ুধগুলি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ বা ঘোর ধূসর বর্ণের একপ্রকার আগ্নেয় শিলা বা ব্যাসল্ট দ্বারা নির্মিত। তবে দু-একটি কটা বাদামী রংয়ের প্রস্তরায়ুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। নবোপলীয় আয়ুধের মধ্যে রয়েছে কুঠার ফলক, গদা ফলক, পেষক, বাটালি বা সমতলকারী ফলক। এগুলি উৎকৃষ্ট কারিগরি দক্ষতার নিদর্শন। আয়ুধগুলির গাত্র সাধারণত বেশ মসৃণ, পরিসীমাকৃতি সুষম, আয়ুধের বেধ ফলকের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমহ্রাসমান। দু-একটি আয়ুধের ফলক থেকে উৎসারিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্তাকার হাতল বিশেষ লক্ষণীয়। কোন কোন আয়ুধের গায়ে দীর্ঘকাল ব্যবহারের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

ক্ষুদ্রোপলীয় আয়ুধগুলি অধিকাংশই নিষ্প্রভ বর্ণের একপ্রকার কঠিন স্ফটিক শিলা নির্মিত। তবে এগুলি নির্মাণে কিছু কিছু মূল্যবান প্রস্তরের ব্যবহারও দেখা যায়। আয়ুধগুলির অধিকাংশই প্রাক-জ্যামিতিক আকৃতির। এগুলির মধ্যে আছে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ফলক, ছিদ্রযুক্ত সমায়ত ফলক, ক্ষুদ্রবর্শাকৃতি ফলক, ডিম্বাকার মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, ক্ষুদ্রাকৃতি তীক্ষ্ম ছেদক ও মসৃণপ্রায় তরবারি আকৃতির কিছু ফলক। দু-একটি আয়ুধের কারিগরি দক্ষতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এ ধরনের আয়ুধের মধ্যগ শিরা থেকে উভয় পার্শ্বে সমভাবে আয়ুধের বিস্তার ক্রমহ্রাসমান রেখে তীক্ষ্ম প্রান্তিকে ফলকায়িত হয়েছে।

আলোচিত আয়ুধগুলির সঙ্গে আরও কয়েকটি ভিন্ন ধরনের বিচিত্র আয়ুধের সন্ধান দেউলপোতায় পাওয়া গেছে। যার সমীক্ষা এক্ষেত্রে নিতান্তই প্রয়োজন। এ ধরনের বিচিত্র আয়ুধের মধ্যে আছে কয়েকটি অস্থি-আয়ুধ, দু-একটি শিলীভূত দারু-আয়ুধ। অনেকের মতে এ ধরনের অস্থি-আয়ুধের সন্ধান লাভ ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে খুবই বিরল এবং তাঁদের মতে এগুলি সাধারণত প্রাগৈতিহাসিক বন্য প্রাণী শিকারী মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত আয়ুধ। কিন্তু অনুসিদ্ধান্ত দুটি আরও গবেষণা সাপেক্ষ। পরবর্তী সময়কালে অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীরও অস্থি-আয়ুধ ব্যবহারের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত অস্থি-আয়ুধের সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। দেউলপোতায় আবিষ্কৃত অস্থি-অয়ুধের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এগুলির আকৃতি মাঝারি ধরনের। আয়ুধগুলি সাধারণত জলপ্রাণী, বিবিধ পশু ও বৃহদাকৃতি বিহঙ্গের বক্ষপিঞ্জরাস্থি, কশেরুকা বা অংসফলক নির্মিত। এগুলির মধ্যে কয়েকটি আয়ুধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃহৎ কোন সামুদ্রিক মৎস্যের নিম্ন কশেরুকা খণ্ড থেকে নির্মিত কচ, বৃহদাকৃতি পশুর পিঞ্জরাস্থি থেকে নির্মিত প্রায় তিন সেন্টিমিটার প্রশস্থ ও প্রায় পনের সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরবারি আকৃতি ফলক। ফলকটি দৈর্ঘ্যে উভল পরিসীমায় করাত সদৃশ্য দন্ত উৎকীর্ণ চিহ্ন। ক্ষীণবেধ যুক্ত প্রায় চার সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও যোল সেন্টিমিটার দীর্ঘ সমায়ত একটি অস্থি-ফলক—ফলকটির দুই প্রান্তসীমায় পাঁচ

শীলমোহরের প্রতিরূপ

মিলি মিটার ব্যাস যুক্ত ছিদ্র; প্রায় চব্বিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ তীক্ষ্ম ফলক যুক্ত অস্থি-বাটালি, বৃহৎ পক্ষী অস্থি নির্মিত সুক্ষ্ম তীক্ষ্ম ছিদ্রকারী আয়ুধ ও কয়েকটি সুক্ষ্ম অস্থি শলাকা, পশুশৃঙ্গ নির্মিত দু-একটি আয়ুধ। আয়ুধের প্রান্তে করাত বা বাটালির কর্তন চিহ্ন লক্ষণীয়। অস্থি-আয়ুধের সঙ্গে দু-একটি শিলীভূত দারু আয়ুধের সন্ধানও পাওয়া গেছে। দারু আয়ুধের আকৃতি ক্ষুদ্র বর্শাফলকের মত। এ ধরনের শিলীভূত দারু আয়ুধের সন্ধান অজয় উপত্যকার কয়েকটি প্রত্নস্থলেও আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক দেউলপোতায় প্রাপ্ত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল তাম্রোএবীয় যুগের নিদর্শন-গুলি—তাম্র নির্মিত বিচিত্র কয়েকটি পুরা-বস্তু, আয়ুধ ও পাত্রের ভগ্নাংশ; বিচিত্র বর্ণের ও আকৃতির দগ্ধমৃত্তিকা পাত্র, লাক্ষা, সাজিকা বা দগ্ধমৃত্তিকা নির্মিত কয়েকটি শীল ও শীলমোহর ও কিছু টেরাকোটা মূর্তি পুতুল। বর্তমান আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে এগুলির বিশদ ও তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর নয়। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুরাবস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। তাম্রযুগীয় বস্তুগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য একটি মাস্তুল বিশিষ্ট, অক্ষি গোলক জাতীয় প্রতীক চিহ্ন অঙ্কিত, সমুদ্রযানের অতি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। একটি ভগ্ন তাম্র-ফলকের মধ্যে দ্বিপরিসরাকৃতি, নিরাবরণ, অলঙ্কার ভূষিতা উৎকীর্ণা নারীমূর্তি। তাম্র নির্মিত 'গুবরি পোকা পৃষ্ঠাকৃতি' যুগ্ম কবচ। খুব সম্ভবত ব্রোঞ্জ নির্মিত বর্তুলাকার—এক পৃষ্ঠে আদিম মানবের প্রতিকৃতি ও অপর পৃষ্ঠে সমান্তরাল বিলেখ যুক্ত ক্ষুদ্র মুদ্রা। তাম্র নির্মিত বাটালির ভগ্নাংশ ও ঊর্ধ্বগামী রেখাংকিত তাম্র বা ব্রোঞ্জ নির্মিত ভগ্ন পাত্রের স্কন্ধ বেড়। মৃৎ-পাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিচিত্র কলসভাণ্ড, কোশীপত্র, ভৃঙ্গার বা প্রবাহ নালীযুক্ত মৃৎ ভাণ্ড, উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র ইত্যাদি। টেরাকোটা মূর্তি পুতুলের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনন্তস্বরূপা অতিরিক্ত মৃত্তিকা সংযোজনে গঠিত জটাজুটধারিণী মাতৃকা মূর্তি, কয়েকটি বিচিত্র গড়ন ও আকৃতির ক্ষুদ্রকায় পশু মূর্তি ও মনুষ্য মূর্তি। শীল ও শীলমোহরের মধ্যে কতক-গুলি রৈসিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত বিচিত্র নকসাযুক্ত মনুষ্য বা অদ্ভুত পশুমূর্তি।

প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরাবস্তু ছাড়াও দেউলপোতায় পরবর্তী সময়কালের অসংখ্য বিচিত্র নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে। এ সকল নিদর্শন সাধারণভাবে নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গের অন্যান্য প্রত্নস্থল হরিনারায়ণপুর, আটঘরা, চন্দ্রকেতুগড়, বোড়াল, হরিহরপুর বা নামাজ-গড় আবিষ্কৃত পুরাবস্তুগুলির সমতুল্য। এগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি টেরাকোটা যক্ষ-যক্ষিণীমূর্তি, সূর্য, অগ্নি, কুবের, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও মেষ, হস্তী, বৃষ প্রভৃতি পশুর মোটিফযুক্ত ক্রীড়নক, বিচিত্র অলংকার ভূষিতা টেরাকোটা নারীমূর্তি, কয়েকটি বিজাতীয় মুখাকৃতিযুক্ত পুরুষ ও নারী মূর্তি; ধূসর, রক্তাভ ও কৃষ্ণবর্ণের কিছু বিচিত্র গড়ন ও রেখাংকিত পাত্র, অসংখ্য বিচিত্রবর্ণ ও আকৃতির বিডস বা পুঁতি দানা, বেশ কয়েকটি লিপিযুক্ত পাঞ্জা জাতীয় শীল ও শীলমোহর, কিছু চিত্র উৎকীর্ণ প্রস্তর ফলক ও প্রস্তর ভাস্কর্যের কিছু সাধারণ নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যা চিহ্নযুক্ত মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল নিদর্শনগুলির অধিকাংশই সুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পরবর্তী সময় কালের। বিভিন্ন পুরাবস্তুগুলিতে বিভিন্নকালের শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দৃষ্টিকোণে দেউলপোতায় আবিষ্কৃত বিস্ময়কর পুরাবস্তু সংক্রান্ত তথ্যান্বেষণ এখনও রয়েছে নিতান্ত প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু কিছু আলোচনায় দেউলপোতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়কালের বিচিত্র কয়েকটি পুরা-বস্তুর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাগৈতিহাসিক মিনোঅ্যান সংস্কৃতির, সুপ্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতির অথবা পূর্ব, দক্ষিণপূর্ব বা মধ্য-পূর্ব এশিয়ার হোয়াবিন ব্যাক সোন, সমরোঙ সেন, পিরক, য়ুনান প্রভৃতি প্রস্তর-যুগীয় সংস্কৃতির প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের তুলনামূলক সমীক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক দেউলপোতার সঙ্গে এসব প্রাচীন সংস্কৃতির একটি নিকট ও গভীর সম্পর্কের অনু-সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুসিদ্ধান্ত মৌলিক সাদৃশ্য বা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কখনও কখনও এ ধরনের সাদৃশ্য নির্ণয়ে 'যেন তেন প্রকারেন' অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা ইদানীংকালে কোন কোন পুরাতাত্ত্বিক মহলে দেখা যায়। ফলে এসব 'রোমান্টিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা' অনেক সময় অরণ্যের দুর্গম নির্জনে ভগ্ন পরিত্যক্ত কোম্পানী আমলের ইমারতের ভিত্তিভূমিকে প্রাচীন যুগের দুর্গ অথবা ঐতিহাসিক কালের বরাহহস্থিকে মানব সভ্যতার প্লিস্টোসিন পর্বের সম-সাময়িক-কালের হায়নার দন্তপ্রকোষ্ঠ বলে আবিষ্কার করে থাকেন। তাই, মধ্যপ্রাচ্যের বা পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে দেউলপোতার আদিম মানব সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগের কাহিনীটির বস্তুগত আলোচনা প্রয়োজন।

দেউলপোতায় আবিষ্কৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রাচীন মানব সভ্যতার সঙ্গে সুদূর অতীতে এ অঞ্চলের গভীর সংযোগের কথা নির্দেশ করে বলে পুরাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। এ স্থানে প্রাপ্ত তাম্র বা ব্রোঞ্জ নির্মিত যুগ্ম কবচটি প্রাচীন মিশরের স্কারাব মাদুলির সমতুল্য। স্কারাব মাদুলি সাধারণত ছিল একশ্রেণী পতঙ্গ দেহের মাদুলি। এগুলির আকৃতি ছিল অনেকটা 'গুবরি পোকার গুটির পৃষ্ঠাকৃতি। দেউলপোতায় আবিষ্কৃত যুগ্ম কবচটিও এই শ্রেণীর। তবে কবচটির অবতল পার্শ্বে দুটি ক্ষুদ্রাকায় পরিবেষ্টনী বলয়ের জন্য কোনো প্রকার লিপি উৎকীর্ণ করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও এ অঞ্চলে কতগুলি বিচিত্র প্রবাহ নালীযুক্ত পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাগৈতিহাসিক মিনোঅ্যান সংস্কৃতির অনুরূপ পাত্রের গভীর ও নিকট সাদৃশ্য আছে বলে অনেকে মনে করেন। এ সকল পুরাতাত্ত্বিকদের মতে এ পাত্রগুলি প্রাচীন মিনোঅ্যান সংস্কৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত একপ্রকার জলপাই তৈল পৃথকিকরণকারি পাত্র সদৃশ। কিন্তু আবার অন্যদের মতে এ ধরনের অনুমান অত্যন্ত কষ্টকল্প। তাঁদের মতে দেউলপোতায় প্রাপ্ত এ পাত্রগুলিকে একপ্রকার ভৃঙ্গারের আদিম সংস্করণ বলা যেতে পারে। তবে দেউলপোতায় আবিষ্কৃত একটি দীর্ঘ স্কন্ধযুক্ত ক্ষীণবেধ রেখাংকিত ধূসর বর্ণের পাত্রের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসে ব্যবহৃত অনুরূপ পাত্রের বিস্ময়কর সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়।

দেউলপোতায় প্রাপ্ত ক্ষুদ্র বৃত্তাকার রোঞ্জ নির্মিত মুদ্রাটিও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে এ অঞ্চলের সংযোগের কাহিনী নির্দেশ করে। মুদ্রাটির একপার্শ্বে একটি আদিম মানবের প্রাকৃতি উৎকীর্ণ ও বিপরীত পার্শ্বে সমান্তরাল বিলেখ চিহ্ন। ভারতের প্রাচীন মুদ্রা গবেষণায় এটির আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রাটির সঙ্গে লিডিয়া ও আয়োনিয়ার খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকের মুদ্রার গভীর সাদৃশ্য আছে। অনেকে মনে করেন এ মুদ্রাটি নিশ্চিতভাবে ভারতের প্রাক-খৃষ্টীয় যুগের মুদ্রা ও এটি ভারতীয় অঙ্ক চিহ্নযুক্ত মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীন। তাই পুরাতাত্ত্বিকদের মতে মুদ্রাটির আবিষ্কার এ অঞ্চলের সঙ্গে রোম গ্রীসের প্রাক-উৎকর্ষ যুগের সমকালীন ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতির সংযোগ নির্দেশ করে। দেউলপোতায় প্রাপ্ত বৃহৎ সামুদ্রিক মৎসের নিম্ন কশেরুকা খণ্ড হতে নির্মিত একপ্রকার কবচের সঙ্গে ক্রীট বা লাইগারিয়ার প্রত্যাশ্মর বা নবাশ্মরকালীন সংস্কৃতির অনুরূপ বস্তুর তুলনা করা হয়ে থাকে। প্রাচীন মানব সংস্কৃতিতে এই ধরনের অস্থি কবচ সংশ্লিষ্ট আধভৌতিক বিশ্বাসের উল্লেখও কোন কোন মহলে করা হয়। তবে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রাপ্ত আদিম মানব সংস্কৃতির প্রাপ্ত বিচিত্র পুরাবস্তুগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে সাধারণভাবে বলা চলে এই জাতীয় অস্থি নির্মিত কবচ বা অন্য প্রকার অস্থি আয়ুধের ব্যবহার কম-বেশী বেশ কিছু আদিম মানব সংস্কৃতিতেই দেখা যায়। তাই, দেউলপোতায় প্রাপ্ত কবচটির সঙ্গে ক্রীট বা লাইগেরিয়ায় প্রাপ্ত অনুরূপ বস্তুর তুলনা করে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সংযোগের অনুসিদ্ধান্ত করা কর্তব্য যুক্তিযুক্ত তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে দেউলপোতায় আবিষ্কৃত কয়েকটি টেরাকোটা নারী মূর্তি ও পুরুষ মূর্তির মুখাকৃতি, কেশ বিন্যাস ও বস্ত্রাদি পরিধানের রীতিতে সুস্পষ্টভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতির বিশেষভাবে মিনোআ্যান ও মিশরীয় প্রভাব লক্ষণীয়। এ সকল বিভিন্ন তথ্য আলোচনা করে অনুমিত হয় খুব সম্ভবত তাম্র-প্রস্তর যুগে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার এ অঞ্চলের সঙ্গে প্রাচীন ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের মানব বসতির গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার সংগে দেউলপোতা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার একটি নিবিড় সংযোগের অনুসিদ্ধান্ত করেই এ সকল পুরাতাত্ত্বিকেরা ক্ষান্ত হননি। তাঁদের অনেকে আবার দেউল-পোতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি কালের আয়ুধগুলির সংগে পূর্ব এশিয়ায় আবিষ্কৃত সম-সাময়িক কাল ও অনুরূপ সংস্কৃতির আয়ুধগুলির তুলনামূলক আলোচনা প্রসংগে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কালে পশ্চিম ভারত ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আদিম মানবগোষ্ঠীর প্রচরণের অনুসিদ্ধান্ত করে থাকেন। এমন কি অনেকে এ অনুসিদ্ধান্তকে আরও বিশ্লেষণ করে দেউলপোতায় বা অজয় উপত্যকা সভ্যতায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন সংস্কৃতি কালের প্রস্তর আয়ুধগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম ভারতের মধ্যে আদিম মানবের আলোচিত প্রচরণের মধ্যবর্তী যোগ চিহ্ন বলও মত পোষণ করেন। কখনও আবার পিগট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমতও এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে এ সকল বিভিন্ন অঞ্চলের প্রস্তরায়ুধের মধ্যে আকৃতি-গত বা ব্যবহারগত যত সাদৃশ্যই আবিষ্কারের চেষ্টা হোক, এ সকল বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সংযোগের কাহিনী সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এ বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ ভাবনার আলোচনা প্রয়োজন।

আজ পর্যন্তও বাংলার অসমতল পশ্চিম ও সমতল উপকূল অঞ্চলসমূহের প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন প্রস্তর সংস্কৃতির বিবর্তনের সমীক্ষা কোনপ্রকার আঞ্চলিক ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা আদিম মানবগোষ্ঠীর সামাজিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের পট-ভূমিকায় করা হয়নি। তুলনামূলক ভাবে উত্তর ও পূর্ব এশিয়ার এসকল বর্তমান বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রাচীন প্রস্তর সংস্কৃতির যেটুকু সাদৃশ্য বা প্রচরণের অনু-সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাও মূলত পাশ্চাত্য পরিভাষার ভিত্তিতেই বিশ্লেষিত হয়েছে। তার ফলে দুটি ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি বিশ্লে-ষণে একই সাংস্কৃতিক সূত্র ব্যবহারের ফলে অনুসিদ্ধান্তগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু নবো-পলীয়, ক্ষুদ্রোপলীয় বা তাম্রোপলীয় সংস্কৃতির প্রস্তরায়ুধের সঙ্গে সমকালীন অথচ অন্য জাতীয় যেসকল পুরাবস্তু বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয়েছে বলে সংবাদ নেই। দেউল-পোতো বা অজয় উপত্যকা সভ্যতার প্রত্নস্থল-সমূহে প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধগুলি গভীরভাবে নিরীক্ষা করে মনে হয় আয়ুধগুলিতে কোন বিশেষ প্রস্তর-সংস্কৃতির প্রান্তিক বিস্তারণের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাই, এ প্রস্তর আয়ুধ-গুলিকে মধ্য ভারত ও পূর্ব এশিয়ার আদিম প্রস্তর সংস্কৃতির প্রচরণের মধ্যবর্তী অঞ্চলের চিহ্ন বলে অনুসিদ্ধান্ত করা কতটা যুক্তি-যুক্ত তা গভীর গবেষণার বিষয়।

(আলোকচিত্র : 'নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা ইতিহাস অনুসন্ধান প্রকল্প'-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

আয়নায় করেছি হত্যা আয়নার শরীর ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

জন্মেছি এখানে। তবু, এই ঘরে, কোনো আয়না কোনোদিন
দেখিনি, দেখি না।
যেন আছি আন্দামানে। নাকি অন্য দ্বীপে নির্বাসিত?
পৌত্তলিক নই বলে, বানাইনি তোমারও প্রতিমা।
আছি এমনি সংশয়ে পীড়িত।

সারাদিন একা থাকি। ক্ষমা করি, নিজেকে ও নিজের ইচ্ছাকে।
বন্ধুরা মোহান্ত ভাবে। মোহান্তের নামাবলী পরে
কখনো নিজেকে আমি
অতর্কিতে ছদ্মনামে ডাকি।
এরকমই ভুল হয়, নাকি ভুলই সত্য হয়, সত্য হয়ে থাকে?
আয়নায় দেখিনি আমি, তোমাকে না, কখনো একাকী।

সেবার প্রথম রাতে, ভুল করে, শত্রুনারী ভেবে
আশ্চর্য পশুর হাতে
তোমাকে দিয়েছি উপহার।
ছিল কি কল্পনা তাতে? ছিল বুঝি? তুমি সবই দেখেছ নীরবে,
কোথাও ফুলসজ্জা নেই, শয্যা যেন তীব্র হাহাকার।
এরকমই ভুল হয়, অন্ধকারে সব ভুল, সত্য হয়ে থাকে।
রক্তে শুধু শোনা যায় পশুর চিৎকার।

সারাদিন কেটেছিল, একা ঘরে, বারান্দায়, ছিলাম অস্থির।
তোমাকে ডেকেছি আমি,
অনুপমা, একবার আজ রাতে আয়না হয়ে এসো।
তুমি কথা রেখেছিলে। আমি এক উজ্জ্বল নদীর
আয়নায় দেখেছি মুখ। দেখা? সে কী আশ্চর্য দুঃসহ!
আয়নায় করেছি হত্যা,
নিজেকে না, আয়নারই শরীর।

বিকল্প ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমাকে সেতুর মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে,
কেউ জলস্রোতে মুখ ঢাকে
এবং অনর্গল কথা বলায়—
অথচ যার দাঁড়িয়ে থাকার কথা সে নয়।

আমার অহঙ্কার মুখ নিচু করে
(যেন একলা-রমণীর পায়ে অচেনা পুরুষ)
এবং কথা শোনে:
অবাধ্য আমি সারা বসন্ত পোষমানা কুকুর—
কিন্তু যার জন্য সে নয়।

কুহেলী হ্রদের অস্পষ্ট ঘূর্ণীর মধ্যে
কেউ আমাকে ডাক দেয়
এবং আমার মূর্খতার উপর তুড়ি মারে,
ঝড় ডেকে আনে ঈশান কোণ থেকে যেন যাদুকর;
আমি বাহবা দিতে যাই, পারি না,
দেখি নারকেলের ছোবড়া ছিটিয়ে আছে জিভের শিকড়ে—
নিজেকে মনে হয় অন্য কেউ।

মন্দিরে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় সন্ধ্যাসংগীতের মধ্য দিয়ে
কিন্তু স্তব পাঠ করি অন্য দেবীর, অন্য এক মুক্তাহারের
দিকে তাকিয়ে।

আমাকে কেউ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়,
কিন্তু লক্ষ্যভ্রংশেই আমার সুখ—
তাই অন্য কোনো লক্ষ্য ভেদ ক'রে বসি অন্য কোনো প্রহরে।
আমায় কেউ চোখের জলের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়;
দ্রোণীভারে নত চিত্রিত রমণীর দিকে তাকিয়ে বলি—
'বলে দিয়ে যাও তুমি কি অন্য কোনো নারী?'—
কোনো উত্তর আসে না।

আমার চতুর্দিকে কেবলি বিকল্প
শুধু আমারি কোনো বিকল্প দেখি না,
তাই কেবলি অন্য কিছু করে বসি
অন্য কারো জন্য—
অথচ যার জন্য সে নয়।

ভেতরের চোখে ॥

গিরিধারী কুণ্ডু

ভুলগুলো মিছিমিছি মিলিয়ে
টলটলে সময়ের কি ভোগান্তি!
হাতের মুঠোয় চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে
নোনা শরীর গড়ায় ক্রোধ নিয়ে।

হে অপরাধী যৌবন আমার!
শীতল নীল চোখ খোলস ছেড়ে
রাঙামুখীর প্রেমপত্র নেয় হাতে,
জাদু জড়ানো ইশারা আর খোঁজে না সে।

স্মৃতির মাঠে নামে আদরের বৃষ্টি;
খুঁতে ভরা নিরাপদ খুনের দাগ
আবছা হয়ে হয়ে হারিয়ে যায়।
তবু—
মুঠোমুঠো চুল ছিঁড়ে
ভুলগুলো মিলিয়ে দেখি,
আর্ত বিলাপে মুখর মন।
তীব্র স্মৃতির বাজনা ভেতরের চোখে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরকিশোর জীবনসন্ধানী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পর প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি শোক-প্রশস্তি লিখেছিলেন—

'যে দলের মধ্যেই তিনি থাকুন, সমস্ত দলের ঊর্ধ্বে তিনি সেই নিঃসঙ্গ সরল অতিকায় একাগ্র উদ্দাম চির-কিশোর জীবন-সন্ধানী—মাঝারি মানুষের তৈরি জগতে পায়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে নির্বোধ আত্ম-তৃপ্তির সঙ্গে অবিরাম যুঝে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অকালে যাকে বিদায় নিতে হয়।'

এর পর তিনি একটি প্রশ্ন দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন—'অকালে অকৃতার্থরূপে বিদায় নিলেও আমাদের জীবনবোধের ভুয়ো আত্মপ্রসাদের ভিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বেশ একটু নাড়িয়ে যায় না কী?' মানিক সত্যই আমাদের জীবনবোধের ভুয়ো আত্মপ্রসাদের ভিত টলিয়ে দিতে পেরেছিলেন অনায়াসে। সেই কারণেই বাংলা সাহিত্যের জগতে তিনি সাত রাজার ধন মানিক হয়ে আছেন। একক এবং অনন্য।

মানিকের মৃত্যুর পর অনেকগুলি বছর পার হয়ে গেল। তেমন শোকের একাধিকসভা হয়নি তো। এমন কি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে কোনো পুরস্কার বা ঐ জাতীয় কিছু। তথাপি মানিক অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন আজো।

জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়ের বস্তু। ডাঃ সরোজমোহন মিত্র অশেষ শ্রদ্ধা ও শ্রম সহকারে মানিকের জীবন ও সাহিত্যের এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন তাঁর কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। আজ পর্যন্ত বোধহয় মানিক প্রসঙ্গে এত বিস্তারিত আলোচনা আর হয়নি। ডাঃ মিত্র নানা তথ্য এবং মানিকের অজস্র রচনার সাহায্যে এই গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণ্য তথ্য গ্রন্থে পরিণত করেছেন। এজন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

এই গ্রন্থে লেখক ডাঃ মিত্র বলেছেন।

'মানিক সম্পর্কে যত পড়েছি, যত জেনেছি ততই মনে হয়েছে মানিক সম্পর্কে সমস্ত মতামতই আংশিক এবং আপেক্ষিক। কারণ কেউ-ই মানিকের জীবন ও সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়ের খবর রাখেন না। সেজন্য মানিকের সাহিত্য কৃতিত্বে সমালোচকরা বিমূঢ় হয়েছেন।'

অনেকটা অন্ধের হস্তীদর্শনের বিবরণের মত নানা দিক থেকে নানা ধরনের বিচার হয়েছে। এর মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে বেশী, আসল মূল্যায়ণে যথার্থই তেমন প্রয়াস হয়নি। এই গ্রন্থের লেখক মানিকের জীবন ও সাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে পরিবেশনের প্রচেষ্টা করেছেন এবং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় তাঁর সে ব্রত সার্থক হয়েছে।

লেখকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সুবিশাল কর্মজগৎ জড়িত। লেখক তাই 'নানা মতের ও নানা পথের' মানুষের সাহায্য গ্রহণে তিল তিল করে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, একটি মানুষের পরিপূর্ণ চিত্র আঁকতে বসে সুবিধাজনকভাবে যথেচ্ছ যেমন গ্রহণ করেননি, তেমনই বর্জনও করেননি। যেখানে যেমনটি প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে সেই তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। এই দিক থেকে তিনি একটি আদর্শ স্থাপন করলেন একথা বলা যায়।

লেখক স্বীকার করেছেন, 'অনেক উপাদান নষ্ট হয়ে গেছে ও নির্ভরযোগ্য অনেক মানুষের পরলোকগমন ঘটেছে।

একথা সত্য। যদি আরও পূর্বে এই কাজে হাত পড়ত, তাহলে হয়ত অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেত।

লেখক সমগ্র গ্রন্থটি ছয়টি পরিচ্ছেদে সাজিয়েছেন। প্রথমাংশ 'জীবন ও সাহিত্য-মূর্তি' স্বাভাবিক কারণেই এই গ্রন্থের ১৪৩টি পৃষ্ঠা অধিকার করেছে। বাকী পরিচ্ছেদগুলিতে মানিকের ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস, কিশোর সাহিত্য ও রচনা-সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থারম্ভে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে মানিকের 'প্রথম কবিতা'র কাহিনী থেকে। তিনি লিখেছিলেন—

'পদ্মায় যে ডিঙ্গি চালায়,
মেদিনীপুরের শক্ত মাটি চষে
বোম্বে থেকে কলকাতাতে
লাখো চাকা ঘোরায়,
উদয়াস্ত লাখো কলম পেশে
বুঝতে যেন পারছি
তাদের ফাঁসে আটক গলার ঐকতান
অনুভব করছি ব্যাহত জীবন-কামনার
উজ্জ্বল তাপ
সূর্যালোকের মত।'

মানিকের পিতৃদেব ছিলেন সেটেলমেন্ট অফিসের কর্মী, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। আগের দিনের মাপকাঠিতে নেহাৎ অস্বচ্ছল পরিবার নয়। মানিকের অন্য ভায়েরা বেশ কৃতী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

মানিকের শিক্ষার ব্যবস্থাও তাঁরা যথাযোগ্যভাবে করেছিলেন। মানিক নিজেই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের কাছে বলেছিলেন—

'প্রথম শিক্ষা কোথাও বাঁধাবাঁধি নিয়মে হয়নি। কখনো মহিষাদলে, কখনও টাঙ্গাইলে, কখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সমস্ত স্কুল-জীবনটাই ছন্নছাড়া। ক্লাসের পড়া খুব ভাল লাগত না। খেলায় ঝোঁক ছিল বেশী। মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠত। কখনও বা একা বসে চিন্তা করতাম।'

মানিক অত্যন্ত অশান্ত মনের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি অতি অল্পবয়সে (যখন ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্র) তখনও তাঁর এই অস্থির অশান্ত মনের পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু তথাপি কোথায় একটা শৃঙ্খলা ছিল, নিয়মানুবর্তিতার বাঁধা রাস্তা মানিককে মানতে হয়েছে। তার ইঙ্গিত পরিমলবাবুকে বলা উপরি উদ্ধৃত কথার শেষের দিকে পাওয়া যায়—'কখনও বা একা একা বসে চিন্তা করতাম।'

এই চিন্তাটুকুই তার সারাজীবনের সাধনা। এই চিন্তার ফসলই প্রায় অর্ধ-শতাধিক গ্রন্থ। বাঁধাধরা রীতির বিরোধী হলেও মাঝে মাঝে মানিক অত্যন্ত শান্ত সমাহিত থাকতেন। যেন ধ্যানস্থ সাধক। এইখানেই তাঁর সাহিত্যিক সাফল্যের রহস্যের চাবিকাঠি আছে মনে করি। তাই রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা মানিকের কাছে অভিনব কাব্য মনে হয়েছে। 'কোথাও ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই' এ-কথা বলেছেন মানিক।

অথচ এই মানিক জীবনের শেষ মুহূর্তে দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার চাপে লিখেছেন—

'মায়ের দয়া, দয়া চেয়েছি, দয়া পেয়েছি বহুবার। নিতে পারিনি, কাজে লাগাতে পারিনি, ভুল করেছি। একবার নয়, বারবার। হাত শূন্য, কোথাও পাওনা নেই। কাতরভাবে মাকে ডাকছি—২।১ দিনের মধ্যে হঠাৎ অনুবাদ বা সংকলন বাবদ টাকা এসে গেল। সামলে চললে আর মুস্কিলে পড়তাম না। কিন্তু আমার বাঁকা হিসাব।

সব নিয়মে ঘটেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য যোগাযোগ। চোখে অন্ধকার দেখছি, মার কাছে আর একবার দয়া চাইছি—চেনা লোক ডেকে নিয়ে...বাবদ ন'শো টাকা পাইয়ে দিল। এরকম অনেকবার হয়েছে।'

মন্দির মনে এনে মাকে ডাকতাম, বলতাম—মন্দির নয় মা, ওই মন্দিরে মানুষ যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময়ী মায়ের পূজো করে সেই মাকেই প্রণাম করছি। কতকরা ছুঁচিবাই এসে গিয়েছিল। তবু মা দয়া করেছেন। দয়া চাইলে দয়া পাওয়া যায়।'

(পৃঃ ১২৪)

ডায়েরীর এই অংশটুকু সুদীর্ঘ। সামান্য অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে লেখকের সেই সময়কার মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হল। ঠিক যে মুহূর্তের কথা এই ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ সেই কালটি বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কিছু জ্ঞান আছে। মানিকের সেই সময়ের অবস্থার কথা বেশ ভালভাবেই জানতাম। মানিক সেই সময়টা নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। তখন ঘরে-বাইরে ভীষণ সঙ্কটের কাল চলছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও কি সচেতন মন ছিল, কি সজীব ছিল মানিকের চিন্তাধারা সেকথা ভেবে অন্তরে বিস্ময় জাগে।

ডাঃ মিত্র সমগ্র চিত্রটি তুলে ধরেছেন। মানিক জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য ও ব্যর্থতা তিনি পাশাপাশি ধরেছেন। বিশেষ কোনো মন্তব্য নেই। কোন মতামত আরোপের চেষ্টা নেই। সমগ্র মানুষটিকে যেমন পেয়েছেন তেমনই ধরে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। এইখানেই লেখক হিসাবে তিনি সততার পরিচয় দিয়েছেন।

জীবনী অংশের মতই অধিকতর মূল্যবান সাহিত্যকথার বিশদ আলোচনা। ডাঃ মিত্র মানিকের সব রকমের রচনা যা প্রকাশিত ও আবিষ্কৃত তার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্লেষণ করেছেন ও সমকালীন ইতিহাস দিয়েছেন। মানিকের কবিতা বিষয়ক অধ্যায়টি বিশেষ কৌতূহলপ্রদ কারণ এই বিভাগে মানিকের দান সম্পর্কে বাঙালী পাঠক যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না।

পরিশিষ্ট অংশটিও সুদীর্ঘ। ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে ডাঃ মিত্রের এই গ্রন্থটি একটি আকর গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

—অভয়ঙ্কর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ও সাহিত্য। সরোজমোহন মিত্র, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ। ১১এ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ঃ ১২·৫০ টাকা মাত্র।

অথ রবিবাসর কথা

সাহিত্য আলোচনা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 'রবিবাসর' এক আশ্চর্য নাম। স্মরণীয় সংস্থা। দেখতে দেখতে চলছে এখন তার ৪০ বছর। গত ২৫ মার্চ বসেছিল তাদের উনবিংশতি অধিবেশন। এই বৈঠকটি নানা কারণেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রবিবাসরের প্রবীণতম সদস্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ যখন ১৯০৭ সালে প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার বাঁধানো ফাইল সভায় উপস্থিত করে ঐ কাগজ এবং শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে বহু অজানা অথচ মূল্যবান তথ্যে ভরা একটি ইংরেজি ও বাংলা নিবন্ধ পাঠ করেন তখন সকলেই বিস্মিত, বিমুগ্ধ। এই ঐতিহাসিক দলিলটি সংরক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়েও উপস্থিত অনেককে ভাবিত হতে দেখা যায়।

এছাড়া, এই অধিবেশনেই একটি গল্প পড়লেন বনফুল। আরেকটি গল্প পড়লেন বিভূতিভূষণ গুপ্ত। কবিতা পড়লেন হরপ্রসাদ মিত্র, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বেলা দেবী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্রিতা গুপ্ত, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করলেন দক্ষিণ ভারতীয় কবি কুমারন সম্পর্কে।

দুর্গাপুরে সাহিত্য সংস্থা

দিনটি শনিবার। ২৪ মার্চ। দুর্গাপুরের বেনাচিতি প্রজেক্ট প্রেস ভবনে একে একে এলেন অনেকেই। গোটা শিল্পাঞ্চলটির কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা হলেন উপস্থিত। এলেন সাহিত্যানুরাগীরাও। বেশ ভাবগম্ভীর পরিবেশ। শুরু হল সভা। সাধারণ সাহিত্য-সভা। পৌরোহিত্য করলেন বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবী করুণাপ্রসাদ চৌধুরী। আলোচনা করলেন অনেকেই। মৃণাল বণিক, আনীশ কল্যাণ, দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন দেব, আশুতোষ চক্রবর্তী, শম্ভু মিত্র প্রমুখ সব তরুণ লেখকই নানান বিষয়ের মধ্যেও সব-চেয়ে জোর দিলেন একটি দিকে। বললেন, 'দুর্গাপুর সাহিত্য পরিষদ' গঠনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়। আনা হল প্রস্তাব। এর অনুকূলে গৃহীত হলো সিদ্ধান্তও। কমল মিত্রকে সভাপতি এবং দিলীপ সরকার, মৃণাল বণিক, সব্যসাচী বিশ্বাস ও কৃষ্ণেন্দু বণিককে সম্পাদক নির্বাচিত করে সভা থেকেই দুর্গাপুর সাহিত্য পরিষদের কার্য-নির্বাহক কমিটি গঠন করা হল।

সোভিয়েত লেখকদের নতুন কাগজ

কিছুদিন আগে সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন একটি নতুন পর্যালোচনামূলক সংকলন পত্রিকা বের করেছেন। কাগজটির নাম 'লিতেরাতুরনাইয়া ওবোজারনিয়ে'। সোভিয়েত লেখক সংঘের সুপরিচিত সংবাদ-সাপ্তাহিক 'লিতেরাতুরনাইয়া গাজেতা'র পর এই রিভিউ পত্রিকাটি সোভিয়েত পাঠক সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে মোট ১৪,০০০ পত্র-পত্রিকা বেরোয়। তার সংগে যুক্ত হল এই নতুন কাগজটি। এই মাসিক পত্রটি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের সার, গ্রন্থপঞ্জী ও পর্যা-লোচনা প্রকাশ করছে। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে এ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে ২৫ লাখ বই মোট চার হাজার কোটি কপিতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসংগত, সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৪৫টি ভাষায় বই বেরোয়। এর মধ্যে ৮৯টি ভাষা হল সোভিয়েত জাতি-অধিজাতিসমূহের ভাষা। বিপ্লবের আগে পর্যন্ত যেসব সংখ্যালঘু জাতির বর্ণমালা ছিল না, এখন তাদের নিজস্ব সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা যথেষ্ট। যেমন, ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মোলদাভিয়া, কির্ঘিজ, তুর্কমেন, বসাখির বুরিয়াত, তুভানিয়ান প্রভৃতি ভাষায় একটিও বই বেরোয়নি। আর এখন এই সব ভাষায় লাখ লাখ কপিতে বই ছাপা হয়।

এবং জানা যায়, আজকের সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা ধরণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৬০,০০০। এই সব গ্রন্থাগারই সকলের জন্য খোলা। তাছাড়া প্রায় প্রতি পরিবারেরই রয়েছে নিজস্ব গ্রন্থ সংগ্রহ। এরকম পারি-বারিক গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যাও কয়েক হাজার। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, প্রতিটি সোভিয়েত পরিবারই বছরে গড়ে ১২ থেকে ১৫টি করে বই নিয়মিত কেনে।

পশ্চিম জার্মানির খবর

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকে রয়েছে আন্তর্জাতিক 'পেন' ক্লাবের শাখা। এর সংগে চলছে এখন অনেক জার্মান লেখকেরই মন কষাকষি। কিছুটা তারই প্রতিবাদে মুক্ত জার্মান লেখক সংস্থা গড়তে চলেছেন নতুন সংগঠন অর্থাৎ লেখক পরিষদ।

এফ-ডি-এ-র সভাপতি ভেরনার ফান ডেমা বোরগ বলেছেন, বাভারিয়া থেকে ফ্রি জার্মান অথরস অ্যাসোসিয়েশন এখন সম্প্রসারিত হবে সমগ্র দেশেই। এই সংগঠনের অনেক দায়িত্ববান লেখকই যোগ দিতে পারেন লেখক পরিষদে। এবং অনেকে আশা করছেন এই প্রস্তাবিত পরিষদের অনুকরণে ইউ-রোপের অন্যান্য দেশেও নতুন লেখক সংস্থা গড়ে উঠতে পারে। কেননা, অনেকেই 'পেন' সংস্থার প্রতি বর্তমানে কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

পঞ্চাশ বছরে হাঙ্গেরিয়ান কবি

বর্তমান সময়ের অন্যতম খ্যাতিমান কবি হলেন ইস্তভান কোরমোস। থাকেন বুদাপেস্টে। কাজ করেন এক প্রকাশনা সংস্থায়। সম্পাদনা করেন দ্য জেমস অব হাঙ্গেরিয়ান লিটারেচার এবং দ্য জেমস অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচর। হাঙ্গেরিয়ান এই কবি সম্প্রতি পা দিলেন পঞ্চাশ বছরে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ। শিশু সাহিত্যেও ইস্তভান খ্যাতিমান।

কলকাতায় ফরাসী লেখক

বিশিষ্ট ফরাসী লেখক ও চলচ্চিত্র সমালোচক মিঃ মরিস নাদো সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। গত ২৫ মার্চ সন্ধ্যায়, সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন কর্তৃক ১০ হিন্দুস্থান রোডে আয়োজিত এক সভায় কলকাতার বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কবি লেখকদের সঙ্গে মিলিত হন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। তিনি উপস্থিত কবি লেখকদের সঙ্গে অতিথি লেখকের পরিচয় করিয়ে দেন।

ফরাসী গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই আন্দোলনের সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের কোনও যোগাযোগ না থাকায় তা এরই মধ্যে স্তিমিত হয়ে এসেছে। মনে হয়, গল্প উপন্যাস আবার একটা নতুন মোড় নেবে। কবিতা খুবই ভালো লেখা হচ্ছে। কিন্তু সমালোচকের অভাব দেখা যাচ্ছে। ফরাসী সাহিত্যে নিগ্রো লেখকদের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'বহু নিগ্রো লেখক ফরাসী ভাষায় লিখে, ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং করছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, নিগ্রো লেখকদের চেয়ে আলজেরিয়ান লেখকদের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে বেশি। জাঁ পল সার্ত্র সম্বন্ধে বলেন—'তিনি মৌলিক সাহিত্য রচনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা নিয়েই ব্যস্ত।' তিনি প্রসংগতঃ জানান যে লুই আরাগ তাঁর এই প্রবীণ বয়সে লম্বা চুল আর রঙ্গীন জামা-কাপড় পড়তে শুরু করেছেন হিপিদের মত।

আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সতীকান্ত গুহ, কমলকুমার মজুমদার, লীলা রায়, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার বিশ্বাস, শান্তিকুমার ঘোষ, সুভাষ সিংহ ও আশিস সান্যাল।

কাৰ্ত্তিক তুষারকান্তি ঘোষ

প্রথমে কলকাতা। তারপর রাঁচী। এবার বার্ণপুরে বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছেন অমৃত ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। সর্বত্রই তাঁকে ঘিরে শোনা যাচ্ছে নানারকম জল্পনাকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মরা শরীরেও যেন পুনরায় জোয়ারের বান ডেকেছে। সবাই খুশি। অনেকদিন পর, যোগ্য লোকের নেতৃত্বে এই সম্মেলন বুঝি তার হারানো গৌরবকে ফিরে পেতে চাইছে।

অবশ্য শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ অল্প কথার মানুষ। কথার চেয়ে কাজকেই বড় বলে মনে করেন। তাঁর কাছে, বৃহত্তম স্বপ্নের ব্যর্থতার চেয়ে ক্ষুদ্রতর কাজের সাফল্যটাই অধিকতর কাম্য। এবং একথা বিশ্বাস করেন বলেই বোধহয়, বড় বড় আইডিয়ার কথা প্রচার না করে, তিনি আইডিয়ার বাস্তবতাকে আগে যাচাই করে নেন, সকলের মতামতকে শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেন। তার-পর যা বাস্তবে সম্ভব, সেই কাজে নিজেও অংশ গ্রহণ করেন, অন্যকেও সক্রিয় হতে পরামর্শ দেন।

গত ২৫ মার্চ বার্ণপুর মহিলা-মঙ্গল সভার উদ্যোগে আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভায় তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা উপলব্ধি করে। শ্রীযুক্ত ঘোষ উপস্থিত সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একটা উজ্জ্বল অতীত ছিল। নানা কারণে আমরা সেই উত্তরাধিকারের মর্যাদা রক্ষায় শৈথিল্য দেখিয়েছি। কিন্তু আর নয়। এবার সকলকে সচেতন হতে হবে। মনস্ক হতে হবে। শ্রীযুক্ত ঘোষের বিশ্বাস, সকলের সহযোগিতায় নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন আবার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঐ সভায় ভাষণ দেবার সময়, শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ প্রতিটি শব্দই উচ্চারণ করে-ছিলেন ধীরে ধীরে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে। কলকাতায় প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভাগুলির স্মৃতিও হয়তো তাঁকে প্রাণিত করেছিল। সাহস জুগিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার প্রখ্যাত লেখকেরা তাঁর কাছে আবেদন জানিয়ে-ছিলেন, যেন তাঁর নেতৃত্বে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের শরীরে তারুণ্য সঞ্চারিত হয়।

তুষারবাবু সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং মনোযোগী পুরুষ। সাংবাদিক ও সাহিত্যরসিক। দেশের মানুষ কি চায়, না চায়—কি তাদের প্রয়োজন?—সবই জেনে-ছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। তরুণদের সংগে আলাপ করে। প্রবীণের সংগে পরামর্শ করে। এবং একথাও বুঝেছেন, বয়সের তারুণ্যই একমাত্র সজীবতার লক্ষণ নয়, সৃজনশীলতার মধ্যেই সাহিত্যের প্রকৃত মুক্তি। সেজন্যেই, বর্তমানের প্রতি আগ্রহ দেখাতে গিয়ে তিনি ঐতিহ্যবিচ্যুত হতে অনিচ্ছুক।

মহিলা মঙ্গল সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের উদ্দেশ করে বলেন, বাংলা সাহিত্য কেবল বর্ত-মানের সীমানায় আবদ্ধ নয়। তার একটা ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। সে-কথা ভুললে আমাদের চলবে না। অনেক দিনের সাধনায় আমরা এতদূর এগিয়েছি। আরো এগোতে হবে। সেজন্যেই, শুধু সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। পুরোনো বাংলা সাহিত্যের সংরক্ষণেও উদ্যোগী হতে হবে।

বোধহয়, তিনি একথাই বোঝাতে চান যে, সাম্প্রতিক সাহিত্য বস্তুটাও সব সময় সাম্প্রতিক থাকে না। একদিন অতীতের বস্তু হয়ে যায়। আজ যেটাকে আমরা আধুনিক বলি, কাল সেটাই ক্রমশ গত-কালের বিষয়ে পরিণত হবে। কাজেই, নতুন রচনাগুলোর মধ্য দিয়ে কেবল পুরনোকে বিদায় জানানোর কথা ওঠে না। তাকে রক্ষা করার প্রশ্নটিও দায়িত্বশীল হতে ইঙ্গিত করে। বিদেশের আধুনিক কবি-সাহিত্যিকরা ভাববিপ্লব ঘটিয়েছেন পুরাকাহিনীর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে। আমরা যদি সে-কথাটি উপলব্ধি না করি, তাহলে নিজেদেরও সর্বনাশ করব। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছেও অপরাধী সাব্যস্ত হব। সে-কারণে আধুনিক

সাহিত্যের অনুশীলন ও চর্চা দরকার, সে-কারণেই প্রাচীন সাহিত্যের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে।

তুষারবাবুর আবেদনের নিহিতার্থ উপলব্ধি করে সকলেই চমৎকৃত হন। তখন যদি কেউ তাঁকে প্রশ্ন করতেন, তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা কিভাবে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কাজে অংশ গ্রহণ করবেন?

তাহলে হয়তো তুষারবাবু উত্তর দিতেন, এই তো আমরা নবীনেরা-প্রবীণেরা কেমন করে পাশাপাশি আছি, ঠিক তেমনিভাবেই তাঁরাও সৃজনশীলতার মধ্য দিয়েই সাহিত্যের সঙ্গী হবেন। কেননা, তরুণের তারুণ্যকে তো কখনো উপেক্ষা করা যায় না। তাঁরা যে-শক্তি নিয়ে সৃষ্টি করছেন, সেই শক্তি নিয়েই নিজের এবং পূর্বকালের সৃষ্টিকেও সমান মর্যাদায় রক্ষা করবেন। গতকালের তরুণেরা ছিলেন বলেই আজকের তরুণেরা আছেন। আগামীকালের তরুণেরা এমনি করেই অতীতকে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন নবীন-প্রবীণের এমনি একটি মিলনক্ষেত্র।

মহিলামণ্ডল সভা আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভার আগে, শ্রীযুক্ত ঘোষ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ণপুর শাখার সভায় সভাপতিত্ব করেন। সেখানেও তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

ঐ সভায় উদ্বোধনী ভাষণে ইসকোর জেনারেল ম্যানেজার ও বার্ণপুর শাখা সাহিত্য সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক শ্রীনীহাররঞ্জন দত্ত বলেন, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন আজ ভারতীয় বাঙালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন নিখিল বিশ্ব বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পরিণত হবে।

তুষারবাবুর নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা রেখেই তিনি এই উক্তি করেন।

কবি ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর কাছে শ্রীতুষারকান্তি কেবল রাজা কিংবা রাজপুত্র নয়, সম্রাট বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শরীরে যৌবনের উত্তাপ লেগেছে তিনি সভাপতি হওয়ার পরেই। এই সম্মেলনের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি দাবী করেন, রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্‌'কে যখন জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন বাংলাভাষাকে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে না কেন? দেশ এগিয়ে চলেছে। অথচ, বাংলাভাষা ও পশ্চিমবঙ্গ ক্রমাগত পশ্চাদগামী। এই সম্মেলনকে বাঙালী ও বাংলা ভাষার উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যাপক সরোজ বসুর কণ্ঠেও শোনা যায় দক্ষিণাবাবুর কথারই জোরালো সমর্থন। তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালীরা ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের অসুবিধাও অনেক। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাভাষার প্রচারে ও প্রসারে মনোযোগী হতে হবে। লক্ষ্ণৌয়ের মতো ভারতের যেসব শহরে বিপুল সংখ্যক বাঙালী রয়েছে, সেইসব জায়গায় বাংলাভাষা পঠনপাঠনের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। এ ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই।

বার্ণপুর শাখার সম্পাদক শ্রীঅনাদিবরণ মুখোপাধ্যায় অনুভব করেন, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ যেন একটি বনস্পতি। তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, বাঙালী ও বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত ঘোষ একটি আশ্রয়ের মতো। তিনি উভয়েরই অভিভাবক।

এই সভায় সম্মেলনের মুখপত্র 'সম্মেলনী' প্রকাশের জন্য শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রী[illegible] রুদ্র, শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী, শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীলময় ঘোষকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা উপসমিতি গঠিত হয়।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

বিস্মৃতির স্বেদবিন্দু (কাব্যগ্রন্থ) — পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ভারবি, ১৩।১, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। তিন টাকা।

যেন দূর দেশের, দূর কালের একটি জগতে প্রত্যাবর্তিত ও ভ্রাম্যমাণ একজন কবিকে দেখা যায়, এই কাব্যগ্রন্থের যতিচিহ্নহীন পংক্তির প্রবহমানতায়। বাংলাদেশ কিংবা ভারতের নৈসর্গিক লোকালয় এবং নাগরিক পরিবেশ ঠিক এমনটি নয়। সম্ভবত, পৃথিবীর কোনো দেশেই আর এরকম জনপদ নেই।

আসলে পবিত্র মুখোপাধ্যায় স্বপ্নদার্শনিক। অতীতে-বিস্মৃত ও স্বেদাকাঙ্ক্ষী থেকে আহৃত যে-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন এই কাব্যগ্রন্থে তা মূলতঃ স্বপ্নময় এবং

[illegible] বা নিশি-পাওয়া মানুষের [illegible] মতো প্রশ্ন হয়।

এই কাব্যগ্রন্থের শরীর নির্মাণে তিনি মেঘাপাহাড়, স্তোত্র, পুরোহিত, দেবতা, নর্তকী, উপত্যকা, দ্রাক্ষালতা, মেষপাল, রাজহংস, ট্রট, গর্দভ প্রভৃতি শব্দ ও চিত্রের অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন—দীর্ঘতম পংক্তির—স্বগতোক্তির স্বপ্নময়তার। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র মুখোপাধ্যায় আমাদের আচ্ছন্ন করেন বেশী। ভাবিতও করেন কম না।

যখন তিনি বলেন, সরল যেথায় চলতে চায় না আমার পা। প্রতিবাদের দুঃখ চায় পুনর্মেল'—তখন তাঁর ভাষাও শানিত হবে ওঠে—জিহ্বার আগুন ধরে যায়। এবং হৃদপিণ্ডকে উপলব্ধি করেন মজ্জমান জাহাজের কম্পাসের মতো।

বস্তুত পবিত্র মুখোপাধ্যায় যন্ত্রণাকাতর, অতীতে সম্মোহিত, উদাসীন, ক্রুদ্ধ এবং প্রথাবিরোধী। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রচলিত কণ্ঠস্বরকে তিনি অস্বীকার ও উপেক্ষা করতে চান বলেই ভিন্নতর পরিমণ্ডলে বিচরণশীল। নস্টালজিয়ার প্রচ্ছন্ন আর্তিও লক্ষ্য করা যায় এই কাব্যগ্রন্থে। একমাত্র জীবনানন্দ দাশ ছাড়া, ইদানীংকালে এত বিপুল পরিমাণ প্যাস্টোরাল ইমেজ আরো কবিতায় লক্ষ্য করা যায়নি।

তবু পবিত্র মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দ নন। সম্ভবত তাঁর অনুরাগীও নন। ঐতিহ্যকে মান্য করেই তিনি ঐতিহ্যবিরোধী। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি অনেক তরুণ কবিকে চিন্তিত ও প্রাণিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা, মনেপ্রাণেই তিনি কবি এবং আন্তরিক।

রং-ঝুরি (উপন্যাস)—রেখা মজুমদার। গ্রীণল্যাণ্ড প্রেস, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

'রং-ঝুরি' একটি চা-বাগানের নাম। উত্তরাঞ্চলে যেসব চা-বাগান আছে তাদের মধ্যে এই নামের চা-বাগানটিকেই প্রধান প্রেক্ষাপট করে লেখিকা শ্রীরেখা মজুমদার বর্তমান উপন্যাসটি লিখেছেন। রং-ঝুরির ম্যানেজার অজিতেশ। সে এই কাহিনীর নায়ক। যোগ্য স্ত্রী রাণীকে পাশে নিয়ে অজিতেশ রং-ঝুরির বাগানকে বেলবা সন্তানের মত আপন করে রাখতে চায়। তাই বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে তার আত্মীয়সুলভ আন্তরিকতা, মমত্ববোধ। অজিতেশকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও অন্যান্য বহু চরিত্র ঘটনা এ উপন্যাসে ভিড় জমিয়েছে। উপন্যাসে লটি মিস্ত্রীর কাহিনী মর্মস্পর্শক। তার স্বামী 'বব' চা-বাগানের [illegible] জেতে স্ত্রীর সম্মান বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। সান্ত্বনা মুখার্জী চরিত্রটি সু-অঙ্কিত। সান্ত্বনার সেবাময়ী চরিত্রচিত্র আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। একটি আঞ্চলিক জীবনযাত্রা, তার সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে লেখিকা যে নিপুণ লেখনীতে পাঠকদের কাছে এনেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসারযোগ্য।

পাম্পাস লা প্লাতা—কমল তরফদার। মানস প্রকাশনী। ৬৪, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

'রাত্রির টানেল থেকে' ও 'সন্নিহিত কোণ'-এর পর কমল তরফদারের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পাম্পাস লা প্লাতা'। সমকালীন কবিকুলে কমল তরফদার কবি-স্বভাবের দিক থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। অন্ততঃ বর্তমান গ্রন্থে কবির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 'পাম্পাস লা প্লাতা'র বিভিন্ন কবিতার পটভূমি রচিত হয়েছে স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকার নরনারীকে কেন্দ্র করে। অবশ্য অনুভূতির সূক্ষ্মতম স্তরে পৌঁছে গভীরতম কোন সত্য উপলব্ধি কবির কাব্যের বিষয় নয়। কবি মূলত রোমান্টিক। 'বুকের ভিতরে নীল চোখ'-এ—'বুকের ভিতরে নীল চোখ/সাদা দুটো বিন্দু প্রেমে স্পষ্ট হয়:। বুকের ভিতরে যন্ত্রণা, প্রেমের যন্ত্রণা সব/অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে মাথা থেকে বেরে এসে/জমা হয়, নীল চোখে কিরণ।' প্রেম, ভালবাসা, মানবতাবোধ জাতীয় মহৎ মানবিক অনুভূতির স্নিগ্ধ কিরণে পাম্পাস লা প্লাতার কবিতাগুলি উজ্জ্বল, সুন্দর, সজীব।

প্লাবিত নিসর্গে নিষাদ।পূর্ণেন্দু মৈত্র। টাইমস ডিস্ট্রিবিউটরস, ৮বি, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীপূর্ণেন্দু মৈত্র আধুনিক কবিতার আসরে দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন। বর্তমান গ্রন্থটি কবির ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মোট সাঁইত্রিশটি ছোট-বড় কবিতার সঙ্কলন। লেখক বইয়ের শেষে একটি কাব্যনাট্য যুক্ত করেছেন 'এখন অন্ধকার এবং আমি'। তাঁর কবিতাবলী ও কাব্যনাট্য পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবি নিজেকে নানাভাবে নাড়াচাড়া করেছেন কাব্যিক অনুভূতির গভীরে। নানাভাবে কবিসত্তার পরিচয় রেখেছেন কবিতাগুলিতে। কোথাও প্রেম কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বা গোপন দুঃখ, আবার কখনো বা অদ্ভুত যোজন দূর থেকে ঢাকার মধ্যেকার স্পন্দিত উল্লাসে কবির গোপনতম মনটিকে ছোঁয়া যায়। কাব্যনাট্যটিও সুলিখিত।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ধোঁয়াশা : সম্পাদক মিলন দাস ও নন্দ সেন। ৭ অভয় হালদার লেন, কলি:-১৩। পঞ্চাশ পয়সা।

ধোঁয়াশা নতুন পত্রিকা। সময়ের অসুখ বুকে নিয়ে বেরিয়েছে। সম্পাদকদের ভাষায়, এ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, 'অনেক কষ্টে জোগাড় করা হার্ডওয়ারের বিজ্ঞাপনের পাশে কলজে-ছেঁড়া কবিতার কয়েকটা পংক্তি।' লিখেছেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়, রণধীর নাগ, প্রশান্ত রায়, প্রদীপ চক্রবর্তী, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, মিলন দাস এবং কয়েকজন।

অন্যমনে (রামকিঙ্কর সংখ্যা) —সম্পাদক সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিসকুমার সান্যাল। ১৭-এম, ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২। এক টাকা।

শিল্প সম্পর্কিত পত্রিকা বাংলায় তেমন বেরোয় না। অন্যমনেও নয়। এ সংখ্যাটি বেরিয়েছে শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ বিশেষ সংখ্যারূপে। রীতিমতো বিস্ময়কর ঘটনা। অজস্র ভাস্কর্যের প্রতিলিপিসহ, স্মৃতিকথা ও আলোচনায় সংখ্যাটি মূল্যবান। লিখেছেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শর্বরী রায়চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, গণেশ পাইন, শঙ্খ চৌধুরী, প্রভাস সেন, কাঞ্চন চক্রবর্তী, পরিতোষ সেন ও অমিতাভ চৌধুরী। রামকিঙ্করের নিজের লেখা 'আমার কথা' সংখ্যাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।

Rupambara|Vol. 2. No. 12, January 1970|International Poetry Number|Editor. Swadesh Bharati; 22 B. Pratapaditya Road Cal-26, India.

'রূপাম্বরা' একটি আন্তর্জাতিক কাব্য সংকলন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যাটির বিশেষ সঙ্কলন সম্পাদনা ও লেখক পরিচিতি দক্ষতার পরিচায়ক। লেখক সূচীর মধ্যে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়া, ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জাপানী, ভারত ইত্যাদি পৃথিবীর ষোলোটি ছোটবড় রাষ্ট্রের কবিদের কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড, পি ব্রেইন কস্ক, ড্যানিয়া পেতকোভা, কমলা দাস, বরিস রাথমিন, ম্যাক্কো ডেনেভ্স্কি, সালভাতোর কোয়াসিমোদো ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি আলোচ্য সঙ্কলন গ্রন্থের মূল্যবান অংশ। সাম্প্রতিককালের বিখ্যাত অথচ পরীক্ষামূলক কবিতাগুলিকে সঙ্কলন করে এবং সেগুলির সরল, স্বচ্ছ যথাযথ অনুবাদ করে সম্পাদক ও অনুবাদক সহৃদয় বিশ্বসাহিত্য রস-পিপাসু পাঠকদের প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। সঙ্কলনটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং কবি, কাব্যরসপিপাসু ও আধুনিক কবিতার গবেষকদের পক্ষে গ্রন্থটি সংগ্রহ করে রাখার মতো।

॥ ১২ ॥

দিদি গেল।

মুখরামী করে গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়ে পা পিছলে মলেও, মা গঙ্গা তো দিদিকে ফেরৎই দিয়ে দিয়েছিলেন, তবু দিদি ডুবে মলো।

ডুবে মলো গঙ্গায় নয়, যমুনায়।

তার মানে শেষরক্ষা হল না।

যুগে যুগে শ্রীরাধাদের যা গতি হয়, দিদির তাই হলো।

কিন্তু দিদির কপালেই কি যতো কিছু ঘটে! আশ্চর্য্যি বাবা!

কোথায় আমি বেচারী লুকিয়ে আম-বাগানে গিয়ে মরীয়া হয়ে কবিতা মুখস্থ করে চলেছি, প্রেমের কবিতার রসে ডগমগ হচ্ছি, এবং এই 'পল্লবঘন আম্রকানন' গ্রাম-বাংলাই যে প্রেমে পড়বার পক্ষে যথার্থ ঠাঁই সে বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছি, আর প্রেমে পড়ে বসলো দিদি।

অথচ দিদি একমনে চটের আসন বুনছিল, আর তুলোর কুকুর বানাচ্ছিল।

তাহলে? কপাল ছাড়া আর কি?

এখন যমুনার ঢেউ দিদির প্রাণে, বাঁশীর ডাক দিদির কানে।

ব্যাপারটার সূচনা সেই গঙ্গা। সেদিন গঙ্গার ঘাটে যখন 'সুনী সুনী' করে ঘাট তোলপাড়ানো রব উঠলো, কেউ খেয়াল করেনি তক্ষুণি, অথবা তার আগেই বাল্মীকি মুনির সেই সোনার কার্তিক নাতিটি গায়ের দামী শাল খুলে বালির চত্বরে নিক্ষেপ করে আর সার্জের পাঞ্জাবি কাদায় ফেলে দিয়ে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

খেয়াল হলো তখন, যখন চীৎকাররত দর্শনার্থীদের একেবারে চোখের সামনে ভিজে ধুতি লপ্‌লপাতে লপ্‌লপাতে শ্রীমান হীরো জলকন্যাকে বুকে সাপটে ধরে জল থেকে উঠে এসে লোক-লোচনের সামনে নামিয়ে দিল।

ধরে বসে নাটক।

লোকে লোকারণ্য ঘাট, তার মাঝখানে এই নাট্যাভিনয়।

যারা হারানিধি ফিরে পেলো, যাদের ডুবো নৌকো উদ্ধার হলো, তাদের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু আর সব লোকেরা?

তারা এই নাটক দেখে শিহরিত হবে না?

প্রথমে একবার শিহরিত হয়েছিল তারা জলজ্যান্ত মেয়েটাকে চোখের সামনে থেকে মা-গঙ্গার কোলে তলিয়ে যেতে দেখে, দ্বিতীয়বার শিহরিত হলো এই দৃশ্যে।

প্রথমটায় তবু তারস্বরে চেঁচিয়ে অন্তর-ভার লাঘব করা গিয়েছিল, কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্বে যে তারও উপায় নেই।

গিন্নী মহিলারা অবশ্য গাঙ্গুলীবাড়ীর কান বাঁচাবার চিন্তা না করেই উচ্চস্বরে ফিসফিস করতে লাগলেন, 'কী কেলেঙ্কার? কী কেলেঙ্কার! ওই জোয়ান ছেলে, আর এই যুবতী আইবুড়ো মেয়ে। মেয়ের কোথাকার কাপড় কোথায় তার ঠিক নেই। ছি-ছি! যোগে চান করতে এসে এ-কি দুর্যোগ!'

কেউ একজন বলতে চেষ্টা করেছিলেন, 'তবু জ্যাকেট পেটিকোট অঙ্গে নিয়েই ডুব দিতে গেছলো, তাই রক্ষে—' কিন্তু তাঁর চেষ্টাকে কেউ দাঁড়াতে দিলো না।

ওই বুকে সাপটে ধরার দৃশ্যটা কি চোখে সহ্য করার মতো?

তাও যদি মরণ-বাঁচন কিছু ঘটতো, তো সয়ে যাওয়া চলতো, কিন্তু এতো কিছুই হল না। খানিকটা চক্ষু মুদে পড়ে থেকেই তো চোখ খুললেন মেয়ে!...সমা-লোচনা না করে পারবে লোকে?

ওই বেহায়া ছেলেটা তো আরো কতো লটঘট করলো মেয়েটাকে নিয়ে, নিজের শাল গায়ে চাপা দিয়ে দিলো, চোখ খুললো তবে সরে গেল।

মুখে অবিশ্যি 'ধন্যি ধন্যি' করতে হয়েছে সবাইকে, সোনার কার্তিক যে ঈশ্বরপ্রেরিত হয়েই হঠাৎ এসে পড়েছিল এবং নবাবপুর শতজন্মের পুণ্যফলে তার মেয়েটার ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চোখে পড়েছিল মেয়েটা ডুবেছে, এ ঘটনা ভগবান ছাড়া আর কে ঘটাতে পারে?

ভাগ্যিস! ভাগ্যিস! ভাগ্যিস।

এই শব্দে গঙ্গার ঘাট মুখরিত হয়ে উঠেছিল, ভগবানের কৃপার পারাপার খুঁজে পাচ্ছিলো না সবাই।

মার কথা বাদ দিলেও, মহা মহা গিন্নীদেরও তো মাথা ঘুরে গিয়েছিল! বাবার পিসিমা তো এর আগেই হাতের ঘটিটা ঠাঁই ঠাঁই করে নিজের কপালে ঠুকে উচ্চরবে কাঁদছিলেন, 'হে সর্বেশ্বর, আমি কেন মরতে নিয়ে এলাম ওদের। ন্যাড়াকে আমি কোন মুখে মুখ দেখাবো!'

তা মুখ দেখানোর সমস্যাটাই যেন সবচেয়ে প্রধান। মাও তো ছুটে গঙ্গায় ধরে চলে যাচ্ছিলেন, 'ওগো আমায় ছেড়ে দাও, আমিও সুনীর সঙ্গে গঙ্গায় ডুবি, ফিরে গিয়ে এ মুখ দেখাবো কী করে?'

তা এতো বড়ো জমকালো আসরটায় নাটকটা যেন খুলে গেল। স্রেফ একাঙ্কিকায় পরিণত হলো। এমন কি পেটে জলও খানিকটা বেশী ঢুকে পড়বার অবকাশ পায় নি।

তার মানে প্রথম থেকেই নজর ছিল সোনার কার্তিকের ওই সোনার প্রতিমেটির দিকে।

অবিশ্যি লোকটা মিথ্যুক নয়, স্বীকার করেছিল সে কথা।

বলেছিল, 'যখনি ইনি গুটি গুটি জলের দিকে এগোচ্ছিলেন, তখনই আমার চোখ পড়ে গিয়েছিল, আর সন্দেহ হয়েছিল জলে নামার অভ্যাস নেই বোধ হয়।'

তা চোখে তো পড়বেই।

দিদি যে চোখে পড়বার মতই মেয়ে।

এ কি আর আমি?

বাড়ি ফিরিয়ে এনে গরম দুধটুধ খাইয়ে দিদিকে তো শুইয়ে রাখা হলো একবেলা, এক কবরেজমশাই এসে নাড়ীটা

দেখলেন এবং দু-চার দিন ভারী কাজটাজ করতে দিতে বারণ করলেন। শুনে আমরা হাসলাম। বাবা-মা আমি।

এখানে আমাদের কাজই নেই তা ভারী কাজ!

কলকাতায় তবু বাবার জন্যে পান সাজা ছিল, ছাতের কাপড় তুলে এনে গোছানো ছিল, ঝি না এলে ঘর ঝাড়া, বামুনদি না এলে মার রান্নায় সাহায্য করা, সর্বোপরি মেজদার ফরমাস খাটা, এসব ছিল। এখানে ওসব কিছুরই বালাই নেই।

এখানে ডাবর ডাবর পান সেজে তোলে বৌয়েরা, তাতে সাহায্য করতে যাওয়া রকমারি।

এ বাড়িতে নাকি এক একজনের এক এক রকম পান লাগে। কারো চুন কম, কারো খয়ের বাদ, কারো ডুমো সুপুরি, কারো কুচো সুপুরি। কেউ বা পানে মৌরী চান, কেউ মৌরী দু চক্ষের বিষ দেখেন।

ওই সব আলাদা ব্যাপারের মধ্যে কে নাক গলাতে যাবে বাবা?

কাচা কাপড়চোপড়?

সে তো আমাদের মতো অনিন্দ্য বস্ত্র-ধারিণীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আর ঝি রাঁধুনী কামাইয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

গোটা চার ঝিকে সর্বদা ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, জানি না তারা কে কোন ডিপার্টমেন্টের, তবে মনে হয় বংশানুক্রমে আছে। জনা দুই কাজ-কর্ম সেরে বড় গামলায় আর পাঁচজনের মতো ভাত ডাল চচ্চড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যায় সপরিবারে খেতে, জন তিন এখানেই থাকে, খায় শোয়। বোধহয় তাদের কেউ কোথাও নেই। ওদের মধ্যে দুজন আবার মা-মেয়ে। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ওদের 'পিসি' এবং 'দিদি' বলে ডাকে, তদুপযুক্তই ভয় সমীহ করে। তারাও ছেলে-পুলেদের শাসন করতে ছাড়ে না।

আর আশ্চর্য এই বাড়ির গিন্নী-মহিলারা ছুঁৎমার্গের ব্যাপারে ওদের থেকে শত যোজন দূরে থাকলেও, ব্যবহারে নিকট আত্মীয়ের মর্যাদা দেন। একজনকে তো বলেনও ঠাকুরঝি!

ওদের মধ্যে একজন তো প্রায় গিন্নী-দেরই একজন। মোটাসোটা কালোকোলো চেহারা, পরণে সরু নরুন পাড় ধুতি, গলায় ঝকঝকে সোনার মোটা বিছেহার, যে রকম একগাছা হার ভাগ্যলে এ যুগে একটা গেরস্তর মেয়ের বিয়ের পুরো গহনা হয়ে যায়।......হাতের নীচের দিকটা ন্যাড়া, ওপর হাতে গোলাপ পাতা প্যাটার্নের তাগা। হাতের ওপর পিঠে উল্কি দিয়ে 'নাম' নাম লেখা।

নাম চণ্ডী।

উপযুক্ত নাম।

মেজাজে শুধু চণ্ডী নয়, রণচণ্ডী।

তার মেজাজে কর্তারা পর্যন্ত তটস্থ।

বড়জ্যাঠার যে দুজন জ্ঞাতি ভাই এক বাড়িতেই ভিন্ন হাঁড়ি, এদিকে বিশেষ উঁকি মারেন না, তাঁদের এলাকায় গিয়েও চণ্ডী কটকট করে কথা শুনিয়ে আসে। গলা তুলে বলে, 'চণ্ডী হচ্ছে চাষী কৈবর্তের মেয়ে হক কথা বলতে বাপকে ডরায় না।' বলে, 'বলি সন্দেশবরের সঙ্গেও দেইজীপনা?... আলুতি দেখতে আসতে বেজায় ধরে? বেশী অংখার ভাল নয় বৌদিদি!'

চণ্ডী বাড়ির হেড্ ঝি।

তার শাসনে অন্যান্য অধস্তনেরা রীতি-মত শাসিত।

চণ্ডী বাড়ির গোয়ালাকে ধমকায়, মাছ জোগান দিতে আসা জেলেনীকে ধমকায়, উঠোন ঝেঁটুনীকে ধমকায়, দরকার পড়লে গিন্নীদেরও ধমকায়।

আড়ালে বড়জ্যেঠি, নতুনখুড়ি এবং বাবার পিসিমা গজগজ করেন, 'মাগীর অহঙ্কার যেন দিন দিন বাড়ছে। হাতে মাথা কাটছে লোকের।'

কিন্তু চণ্ডীকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় একথা কেউ ভাবতে পারে না। আর একটি বুড়ো আছে ঠাকুরবাড়িতে। সে হচ্ছে কেবলমাত্র ঠাকুর বাড়ির ভৃত্য। ঠাকুরের বাসনগুলি মাজা ছাড়া আর সব করে সে। ঠাকুরের ঘর-দালান পরিষ্কার করা ফুলজল ফেলা, টানা পাখার দড়িটানা, ঠাকুরের বিছানা পত্র কাচা এবং শুকিয়ে তোলা, ঠাকুরের নতুন ধুতি কেনা হলে চুনট করে রাখা, যাবতীয় কাজ তার।

সে নাকি সেই যোগেন্দ্রচন্দ্রের আমলের। বর্তমান কর্তাদের তুমি তুমি করে কথা বলে, আর কুচোকাচা থেকে শুরু করে বড়বড় বিবাহিত ছেলেদের পর্যন্ত 'তুই তোকারি' করে। বাড়িসুদ্ধ সবাই বলে জ্যাঠা।... বাপও বলে জ্যাঠা, ছেলেও বলে জ্যাঠা।

ওই জ্যাঠা আর চণ্ডী হচ্ছে গাঙ্গুলী-বাড়ির অচ্ছেদ্য অংশ। একজন চাষী কৈবর্ত একজন কুমোর।

আরো কত রকমেরই যে লোকজন আছে এঁদের। মেয়ে পুরুষ।

এতজন যে কি করে কে জানে।

তবে এতদিন থাকতে থাকতে বুঝেছি, নীরোপিসিই ওদের আসল আশ্রয়স্থল। নীরোপিসিই বাড়ির কাউকে মনে আনবার অবকাশ দেন না ওরা ঝি-চাকর। একশো কাজের মধ্যেও নীরোপিসি কোথা থেকে না কোথা থেকে গলা তুলে খোঁজ করেন, 'হ্যাঁ গো এরা জলপাণি পেয়েছে? জ্যাঠা চণ্ডী, সুখদা, শ্যামা, বসন্ত, ননী? পায়নি? বলি কেন? এখনো পায়নি কেন? সূর্যিদেব যে চড়চড়িয়ে মাথা আকাশে উঠলেন। ওইটুকু আর কারুর ফুরসৎ হয়নি?'

রেগে রেগে নিজেই দিতে বসেন, এক-পালি করে মুড়ি, এক ডালা গুড় আর এক-মুঠো করে ফুলুরি। এই ফুলুরিটি নিত্য সকালবেলা ভাজা হয় এদেরই জন্যে। এক সঙ্গে ছোলা সিদ্ধ কলাই সিদ্ধ।

ওদের জন্যে ব্যস্ততাই বেশী।

কেউ কেউ এটাকে 'বাড়াবাড়ি' বলে অভিহিত করে বসে। সে কথা নীরোপিসির কানে গেলে (কানে তো যাবেই। বোধ সংসারের এই একটি পরম গুণ, প্রতিটি কথা প্রত্যেকের কানে গিয়ে পৌঁছবেই।) নীরো-পিসি তাঁর তিক্ত অম্ল নানা ভাষায় তাকে বুঝিয়ে ছাড়বেন কথাটা সে কতো গর্হিত বলে ফেলেছে।

গৃহপালিত বিগ্রহ, গৃহপালিত পশু আর গৃহপালিত দাসদাসী, এরা যে একই পর্যায়ভুক্ত, একথা নীরোপিসি শুধু কথার কথা হিসেবেই বলেন না, অন্তরে বিশ্বাস রাখেন। এবং এরা ক্ষুণ্ণ হলে, গেরস্তর অকল্যাণ ঘটে এ বিশ্বাস ঘটিয়ে ছাড়েন।

এহেন বাড়িতে অন্য জায়গা থেকে আসা একটা কিশোরী মেয়ের কাজ কর্ম করবার খাঁজ কোথায়? তায় আবার ভারী কাজ।

কিছুই না।

দিদিকে তাই সাতদিন ধরে প্রায় শুইয়েই রাখা হলো। অতএব দিদি সেই চকিত সুখস্পর্শের স্মৃতি রোমন্থনের অগাধ অবসর পেয়ে গেল।

আর যার কেন না চোখকে ফাঁকি দিক আমার চোখকে ফাঁকি দেবে, এমন সাধ্য সুনীতি গাঙ্গুলীর নেই।

ওর প্রতিটি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস যে আমার চেনা।

ওর প্রতিটি অভিব্যক্তি যে আমার বোধগম্য। আর ওর মস্তির গতি যে আমার নখ-দর্পণে।

এক কথায় আমার মনোদর্পণে দিদির পুরো ছাপটাই স্পষ্ট ফুটে উঠলো।

বুঝলাম দিদি গেছে।

মেজদার এক বন্ধুকে সামান্য দুটো গান শুনিয়ে আর প্রশংসা পেয়েই দিদি মরেছিল, আর এবার এই দারুণ ব্যাপার!

মরে ভূত হয়ে যাবে তার আর বিচিত্র কি?

অবিশ্যি এক হিসেবে দিদির কাজটা নিয়মমাফিকই হয়েছে। প্রাণদাতাকে প্রাণ সমর্পণ করে বসবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

গল্প উপন্যাসের আইনে প্রাণরক্ষকই প্রাণভক্ষক হয়। কিন্তু ব্যাপারটা আমার পছন্দসই হচ্ছে না। 'প্রেমে পড়া' একটা রোমান্সময় কল্পনা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবে যে ব্যাপারটা রীতিমত গোলমালের সৃষ্টিকর্তা তাতেও তো সন্দেহ নেই।

জেনেশুনেই ইচ্ছে হচ্ছে দিদিকে সাবধান করে দিই, বলি, দিদি একবার খেতে খেতে মরে গেছিল, আর ও পাড়ায় পড়িসনে। মনটাকে খেলায় সিন্দুকে তালা মেরে চুপচাপ বসে থাক, যখন ন্যাজ নাড়িয়ে জুটবে, সিন্দুক খুলে তার হাতে তুলে দিস।'

কিন্তু হঠাৎ করে বলতেও পারছি না।

একটা রোমান্স পরিবেশ না হলে, যেন অভাবিত আনন্দের মতো লাগবে না?

হয়তো কেঁদে কেটে একাক্কা করবে।

কাঁদবেই।

এখন যে অবস্থা সেই পুরোনো সাহিত্যের মতো—

'নিবিড় রজনী অতি ঘোর ঘন—
আসার আশায় থাকি—
চঞ্চল মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।'

অথচ মনে করছে কেউ বুঝতে পারছে না।

ধরা পড়ে গেলে কান্না সামলাতে পারবে না। আমার মতো ডাকাবুকো তো নয়।

তা 'আঁখি' পরিতৃপ্ত না হোক শ্রবণটা হচ্ছে। ক'দিন ধরে বাড়িতে কেবল ওই কথারই চাষ হচ্ছে।

গাঙ্গুলীদের কলকাতাবাসী ন'বাবু, যিনি নাকি যুগ-যুগান্তর পরে দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন, তাঁর মেয়ে গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল, এ একটা জবর খবর! সেই খবরের খাবার খাওয়ার আশায় ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবাই ছুটে আসছে।

মেয়ে পুরুষ সবাই।

পুরুষরা বৈঠকখানায়, তার হ্যাপা সামলাচ্ছেন কর্তারা, কিন্তু অন্তঃপুরচারিণী-দের মোহাড়া তো অন্তঃপুরচারিণীদেরই নিতে হচ্ছে।

প্রত্যেককেই পুঙ্খানুপুঙ্খ করে বলতে হচ্ছে কোন অবস্থায় ওই হ'তে পারতো' দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। বাবার পিসিমা তো সেই প্রস্তাবের সূচনা থেকে, সাহেব ড্রাক-যুগলের গাড়ির ভাড়ার অঙ্ক পর্যন্ত নিখুঁত দিয়ে সমস্ত কাহিনীটি বিবৃত্ত করছেন তার সঙ্গে মেয়ের অবিমৃষ্যকারিতার কথাও হচ্ছে, এবং 'কান টানলে মাথা আসে' নিয়মে ভট্টাচার্যমশাইয়ের গুণধর নাতি আনন্দময়ের প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে।

এমন গুণের ছেলে হয় না, ছেলের প্রথম ছেলে, যেমন রূপখানি, তেমনি গুণের নিধি।

শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে।

যাবেই তো, একা ওই সুরবালা দেবীটিই তো নয়, সব দেবীই তো এ কাহিনী কথনে অংশগ্রহণ করছেন।

আর এসব কথা কানে গেলেই দিদির চোখে ঘনছায়া নেমে আসে, মুখে আলো ফুটে ওঠে।

আর বুকের মধ্যেটা?

দেখতে না পেলেও ধরতে পারি থর-থরাচ্ছে।

তা সে যা হবার হচ্ছিল, কাল করলো বাবার কৃতজ্ঞতাবোধ।

বাবা বললেন, ভটচায খুড়োর নাতি এতোবড়ো উপকারটা করলো, ওকে বাড়িতে ডেকে একটু আদর আপ্যায়ন করা উচিত। তুমি কি বল নীরোদি?'

নীরোদি অবলীলায় বললেন, 'আমি আবার নতুন কি বলবো রে ন্যাড়া? তোরা এ নিয়ে কেউ মুখে রা করছিস না দেখে অবাক হয়ে হয়ে হাজারির দোকান থেকে এক হাঁড়ি ছানার জিলিপি দিয়ে এলাম কাল।'

বাবা তো হাঁ।

'দিয়ে আসা হয়ে গেছে? কই বলনি তো?'

নীরোপিসি হুশ করে একটা কাক তাড়িয়ে বলেন, 'বামুনের ছেলেকে একটু মিষ্টি দেবো, তার আবার বলাবলির কি আছে? পাড়া জানাবো নাকি? খুড়োই পাড়া জানিয়ে বেড়াচ্ছেন কিনা তাই ভাবনা।

বাবা বললেন, 'কি বললো ছেলেটি?'

নীরোপিসি হেসে উঠে বলেন, 'আমুদে ছেলে। বললো 'আহা ওইটুকুর বদলে যদি এমন এক হাঁড়ি ছানার জিলিপি জোটে হাতের কাছে যে কটাকে পাওয়া যায়, ঠেলে জলে ফেলে দিয়ে চুবিয়ে তুলে আনতে রাজী আছি।'

বাবা হা হা করে হেসে উঠলেন, 'বেশ কথাবার্তা তো!'

আমারও শুনে লোকটার ওপর সত্যি বলতে একটু ছেন্দাই হলো।

বোকার মতো যে 'না না, একি একি এসব কেন'—করেনি এটা ভালো।

দিদি বসেছিল দাওয়ার ওপর পাতা সেই আদি অকৃত্রিম তক্তাপোষটির ওপর আমরা দাওয়ার ধারে পা ঝুলিয়ে, দিদির দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম।

যা ভেবেছি তাই, মুখ একেবারে দুধে-আলতা।

ততোক্ষণে বাবাতে আর নীরোপিসিতে পরামর্শ হচ্ছে, মিষ্টি দেওয়া হয়েছে হোক, ব্রাহ্মণ বাড়িতে ওটা তো যখন তখন দেওয়া যায়—সন্দেশ না দিয়ে না হয় ছানার জিলিপি। তার জন্যে বাড়িতে এনে আপ্যায়ন করার প্রস্তাবটা নাকচ করার কিছু নেই, ওটা হোক।

শুনে মাও খুব উৎসাহিত।

বললেন সেদিন সেই দুঃসময়ে ভাল করে তাকিয়েও দেখিনি। আহা আর একটু দেরি হলেতো...

দিদির বুকটা নির্ঘাৎ ধড়াস ধড়াস করে উঠলো।

আমি মনে মনে বললাম, 'আচ্ছা তোমরা ভালো করে দেখার সাধ মেটাও দেখো আরও কে সে সাধ মেটায়। বুঝো ঠ্যালা—শেষটায়।'

মেয়ের জীবনরক্ষকের ব্যাপারে মা দেখছি বেশ উদারপন্থী হয়ে গেছেন।

নিঘ্যস বলতে পারি, কলকাতার বাড়ি হলে এ উদারতায় সাহস করতেন না। সেখানে চার দেয়ালের খুপরির মধ্যে বাইরের কাউকে ডাকতে গেলেই ভয় হয় বুঝি কি হতে কি হয়ে ওই দেয়ালটাই ভেঙে পড়বে।

এখানে সে ভয় নেই।

এখানে অনেকখানি আকাশ, অনেকটা বাতাস, অনেক দেয়ালের নকসা। তাছাড়া প্রধান কথা এখানে পৃষ্ঠবল।

এখানে বাবা বাড়ির ন' ছেলে 'ন্যাড়া' মাত্র। যাবতীয় দায়িত্ব ওপরওলাদের। ও'রা দেখবেন, ও'রা রক্ষা করবেন।

ও'দের উপস্থিতিই পরম ভরসা।

আর এ'দের?

এ'দের এমনিতে যতোই লজ্জার ঘটা থাক, শহরের মতো অতো আব্রু প্রথা নেই। ......পথে ঘাটে মেয়ে ছেলেদের তো দেখা-সাক্ষাৎ ঘটছেই।

অবিশ্যি ঝি বৌ-'কে আগলানো গিন্নী-দের একটা কাজ পথে বেরোলে সর্বদাই সঙ্গে থাকেন, তবু সর্বত্র নিয়েও যান, এটা ঠিক।

পিসিমা ঠাকুমাই অবশ্য এই কর্মভার মাথায় তুলে নিয়ে রেখেছেন, সধবা গিন্নীরা বুড়ো হলেও তাঁদের ওপর ভরসা করা হয় না। তাঁরা তো দেশের মেয়ে নয়, বৌ।

বড়জ্যেঠি এবং সেই আলাদা হয়ে যাওয়া জ্যেঠিরাও কোথাও যেতে হলে এসে বলেন, 'ঠাকুরঝি তুমি সময় করে নিয়ে যাও তো একটু যাওয়া হয়।'

ঠাকুরঝির সর্বত্র ছাড়পত্র।

ঠাকুরঝি পুরুষের বাবা।

'নীরো সঙ্গে আছে? ঠিক আছে।'

সবাই নিশ্চিন্ত। তা সে মেলাতলাতেই হোক আর হাটতলাতেই হোক। পাড়া ঝেঁটিয়ে মেয়ে বৌ মেলায় যায়, অগ্রভাগে নীরোঠাকরঝি শেষভাগে চণ্ডী।

দুশ্চিন্তার প্রশ্নই ওঠে না আর।

এই পৃষ্ঠবলের ভরসায় উদার হলেন ও'রা।

তার মানে ছাইচাপা আগুনে বাতাস দিলেন, খাল কেটে কুমীর আনলেন।

আনুন, আমার কি?

বাবা আর নীরোপিসি বাল্মীকি মুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। দাদু নাতি দুজনকেই নেমন্তন্ন করলেন।

দাদু অবিশ্যি স্বপাকে খান।

তাতে কিছু না। বারোমাসই নাকি ব্রাহ্মণভোজনের প্রয়োজন পড়লে ওনাকে নেমন্তন্ন করা হয়। তার সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণও থাকেন কিছু। ব্রত-টত সারার সময় ব্রাহ্মণভোজন করাতেই হয়। আর সে সব তো লেগেই আছে।

এই তো সাবিত্রী ... ... উদ্যাপনের পালা আসছে। তা ছাড়া আরো কত কী হচ্ছে।

নিজেরা তো বাবা ব্রাহ্মণই, নিজেরা পরিতোষ করে খেয়ে নিলেই হয়? তা নয় পুরোহিত জাতীয় ব্রাহ্মণ চাই। তা এ'দের ভটচায খুড়ো (সার্বজনীন খুড়ো) নাকি রীতিমত রাঁধিয়ে। রান্নার জোগাড় বন্দোবস্ত করে দিলে উনি নাকি দশ-কুড়ি জন ব্রাহ্মণের রান্না অনায়াসে রেঁধে দিতে পারেন।

দেওয়া হয় সেটা।

হবিষ্য ঘর গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে মুছে ভোগের ঘরের বাসনটাসন মজুত করে রাখা হয়।

আর জিনিসপত্র?

তার তো আর অপ্রাচুর্য নেই।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক, এখনো কলকাতার কড়ি ফেললে বাঘের দুধ মেলার' গৌরব হ্রাস হয় নি।

আর গ্রামে? বাসমতী গোবিন্দভোগ চাল, সরতোলা গাওয়া ঘি, বটের আটার মত দুধ, ঘরে কাটানো ছানা, ঘরে পাতানো ছুরি-কাটা দই। এসব তো নিশ্চিত লভ্য।

তাছাড়া পুকুরে জাল ফেললেই মাছ, ময়রার দোকানে অর্ডার দিলেই নির্ভেজাল ছানা ক্ষীর ঘি চিনির খাবার। মোটকথা, যাদের ভালমন্দ খাদ্য খাওয়ার অধিকার আছে তারা অনায়াসেই পেতো সেটা। পয়সা টাকা হাতে করে ঘুরে বেড়াতে হতো না।

অতএব ভটচায খুড়োর জন্যে আমিষ-বিহীন রাজকীয় ব্যবস্থার জোগাড় রাখা হবে।

আর তাঁর নাতি? সে নাকি সাত্ত্বিক, তার ব্যবস্থা এদিকে। জামাই আদরই হবে আশা করা যাচ্ছে।

ও'রা অভিযানে বেরিয়ে গেলে, দিদির দিকে তাকিয়ে দেখি, দিদি কোথা থেকে খানিকটা শাড়ী ছেঁড়া লাল পাড় টেনে এনে সেটা চিরে চিরে সুতো বার করছে।

এসব সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই হয়, চটের আসন বোনা হয়। তাই ছোট মেয়ে-দের এই একটা কাজ আছে। যে যখন পারে সুতো তুলে রাখে, সময়ে কাজে লাগবে।

কাঁথা সেলাই তো এদের বারমেসে কাজ। বড় বড় কাঁথা।

আমি গিয়ে কাছে বসতেই দিদি খানিকটা পাড় আমার দিকে এগিয়ে দিল। অর্থাৎ আমিও কাজে যোগ দিই।

আমার দু' চক্ষের বিষ ওই সব কাড়ে কর্ম। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললাম, 'আমাকে দিতে হবে না। আমার তো মন বসাবার দরকার নেই।'

দিদি চমকে উঠে বললো, 'তার মানে?'

বললাম, 'মানেটা ভর্ত ভাব বসে বসে। আমি শুধু বলতে চাই এই সব কুঁড়ে কাজগুলো মনোচাঞ্চল্যের ওষুধ।'

দিদি রেগে রেগে বললো, 'তুই বড্ড পাকা ভায়ে যাচ্ছিস।'

'দিদি, একেই বলে, পাড়াকা কথা সত্তায় মাঝে, যার কথা তার জ্ঞান যাচ্ছে।'

দিদি ভয় ভয় মুখে বললো 'তোর কথার আমি মানে বুঝতে পারছি না যাচ্ছি।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'মানে বুঝতে পারবি পরশু।'

দিদি কিছু বলার আগে কুটনোর ঘর থেকে বাবার পিসিমা বলে উঠলেন, 'এতো হাসি কী নিয়ে রে?'

আমি বললাম, 'কিছু না ঠাকুমা এমনি।'

ঠাকুমা অতো সহজে ভোলবার মেয়ে নয়, 'এমনি আবার হাসি কী লা?' বলে তিনি হাতের আঙুলে জড়ানো খোড়ের সুতো ছাড়াতে ছাড়াতে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'অ!' শুধু দুই বোনে হাসাহাসি? কেন কী নিয়ে? গাঁইয়া ভূতেদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে বুঝি?'

তাড়াতাড়ি আরো হেসে বলে উঠি 'কী যে বলেন ঠাকুমা! হাসছি দিদির কাণ্ড দেখে। পাড়টা এতো সরু সরু করে চিরেছে, সুতোগুলো ছিঁড়েই যাচ্ছে—'

ঠাকুমা ঈষৎ আশ্বস্ত গলায় বলেন, 'হরে কেষ্ট! এই নিয়ে এতো হাসি? তা অতো গলা তুলে হাসা ঠিক নয় ভাই। মেয়েমানুষের উচ্চহাসি সর্বনাশী। গলা ছেড়ে হাসবে পুরুষছেলেরা।'

ঠাকুমা আমাদের জানার জন্যেই এসব বলেন বুঝি। কলকাতার মেয়ে বেহায়া বলে পাছে আমাদের নিন্দে হয় তাই এই সাবধান।

এমনিতে তো তলে তলে মার আর আমাদের দুই বোনের সে নাম রটে গেছেই। এঁদের লজ্জার মাপকাঠির সঙ্গে আমাদের মাপকাঠি মেলে না।

অথচ মা সে কথা টের পান না।

মা নিঃশঙ্কচিত্তে আছেন।

তা নইলে মা কিনা এমন কাণ্ড করেন।

বাল্মীকি মুনির নাতিকে যখন খাওয়াতে বসানো হয়েছে তখন মা সেখানে এসে বসেন।

বসবেন ঠাকুমা, বসবেন বড়জ্যেঠিমা, বসবেন নীরোদি! মা বৌমানুষ, মার কী দরকার বাইরের বেটাছেলের সঙ্গে কথা বলতে আসার?

তা সে নিয়ম যে মা একেবারেই জানেন না তাও তো নয়। ইদানীং দাদারা বড় হয়ে ওঠার পর দাদাদের বন্ধুদের সামনেও তো মা বেরুতেন না।

মেজদা রেগে উঠতো, বলতো, 'মা ওরা ডাকতে এলে তুমি দরজার আড়াল থেকে কথা বল কেন?'

আর এখন মা নিজেই দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বসলেন। দাদার বন্ধুদের চেয়ে বড় বৈ ছোট নয় এই ছেলেটা।

তার মানে মেয়ের প্রাণরক্ষকের কাছে নিজে মুখে কৃতজ্ঞতা জানানোর ইচ্ছে। কিন্তু মুখ আর খুলবেন কী করে? বাবা বলে, জ্যাঠামশাই বলে।

তবুও উপস্থিতিটাই খানিকটা।

যদিও বড়জ্যোঠিমার পিছনে মাথার ঘোমটা টেনে এমনভাবে বসেছিলেন যে বোঝাই যাচ্ছিল না এই মানুষটাই আসল। তবে নীরোপিসি একবার 'ইনট্রোডিউসে'র পদ্ধতিতে বলে দিয়েছিলেন 'এই যে আনন্দ সুনীতির মা সেই অবধি তোমাকে আর ভগবানকে 'এক' দেখছে।'

'ওঃ তাই!'

আনন্দময় তখনো ভাতে হাত দেয়নি, বেশ সপ্রতিভভাবে হেসে ওঠে, 'এবারে বুঝেছি। আয়োজন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে ভাবছিলাম ব্যাপারটা কী। এখন বুঝলাম ব্যাপার। ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মেরে দিতে পারেন তিনি কিন্তু আসলে তো ভগবান নই, তাই এই অন্নকূটের পাহাড়ে হাত দেবার সাহস হচ্ছে না।'

এরপর অবশ্য সমবেত কণ্ঠে একটা 'হাঁ-হাঁ' ধ্বনি উঠলো, এবং ওই বাটিগুলো বাটি সম্বলিত অন্নব্যঞ্জনটি যে 'এমন কিছুই নয়—' সেটাই বোঝানো হতে থাকলো ওকে।

তবে বোঝবার ছেলে নয়, হাত গুটিয়েই বসে থাকলো, যতক্ষণ না আলাদা একটা থালা এনে ওর উপযুক্ত কিছু কিছু তুলে দেওয়া হয়।

বাবা অবশ্য একবার বলেছিলেন, 'তা' পরিমাণটা একটু কমিয়েই দাও পিসিমা, পাঁচ রকম রয়েছে—'

বাচাল ছেলেটা বলে উঠলো 'পাঁচে একটা শূন্য বসিয়ে বলুন মামা, না হলে মনে হবে আপনি গণিতে কাঁচা।'

মামা! শুনে আমি থ।

বড়দের সঙ্গে এইভাবে বাঁধুনী দিয়ে কথা!

তা' বলে আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম না। দালানের পাশধারে যে জানালাটার ওধারে রান্নাঘরের চাতাল, সেই জানলায়

যারা ভীড় করে উঁকি মারছিল, আমি তাদের দলে ছিলাম।

বাড়ি শুদ্ধ সবাই যদি ভীড় করে, আমার আবার লজ্জা কিসের?

নতুনখুড়িমা, বৌদিরা সকলের থেকে আমি লম্বা বলে। (যার জন্যে আমার 'তাল-গাছ' আখ্যা) পিছনে দাঁড়িয়েও আমার অসুবিধে হচ্ছিল না। খোকার মতো ঠেলা-ঢৌঁলাও করতে হচ্ছিল না।

বাবার পিসিমা বলে উঠলেন, 'এ আবার এতো কী বাবা, ইদিকে যা রান্না হয়েছে তার সঙ্গে নিরিমিষ ঘরের 'পদ'গুলো একটু-আধটু—তোমারই দাদামশাইয়ের হাতের রান্না।'

ও বললো, 'দুদিকের সব পদ সামলাতে হলে যে চতুষ্পদ হতে হয় দিদিমা। ঠাকুর অথবা কুকুর—শুধু এই দুজনের পক্ষেই এতে সাহস করে দাঁষ্ট দেওয়া সম্ভব।'

উঃ কী পাকা পাকা কথা রে বাবা!

জেঠামশাই অবশ্য তখন গল্প ফাঁদলেন তিনি ছেলেবেলায় কী পরিমাণ খেতে পারতেন। 'লোহা খেয়ে হজম করতাম বুঝলে হে, এতো তোমায় কী বা বড় মাছের মুড়ো দেওয়া হয়েছে বড়জোর চার-পাঁচের। আমি তো আট-দশ সের মাছের মুড়ো অনায়াসে খেয়ে ফেলেছি।'

তারপর কথা উঠলো, এ দিগরে কবে কোথায় কে কী রকম 'খাইয়ে' পুরুষ ছিল।

কে না কি একা একটা আস্ত পাঁঠার মাংস উড়িয়ে দিতে পারতো, কে পুরো আস্ত একটা বড় কাঁঠাল খেতে পারতো, কে কবে নাকি বাজি রেখে জল না খেয়ে ছ সের রসগোল্লা খেয়েছিল, এই সব কাহিনী।

আনন্দময় তথাপি হাত গুটিয়ে।

বলে কিনা, 'ও দিদিমা, আপনারা—মুনকে রঘুর গল্প ফাঁদলেও আমি লজ্জা পাব না। এতো জিনিসে হাত দিয়ে নষ্ট করতে রাজী নই। উঃ কে জানতো এতো আদর তোলা ছিল আমার জন্যে।'

বড়জেঠিমা ফস করে বলে বসলেন,' তুমি যা করেছো বাছা, তার তুলনায় এ আর কী সত্যি!'

এমন বোকার মত (গুরুজনরা ক্ষমা করবেন) লাগলো কথাটা।

আনন্দময় হেসে উঠলো। এমন সুযোগ ছাড়ে কখনো?

প্রথমে বললো, 'কেন। বলুন তো কী ব্যাপার? কী করেছি?'

'শোনো কথা—।' তখন জেঠিমা বলে উঠলো, 'কী করেছো? একটা মেয়ের প্রাণ রক্ষে করেছো না?'

জেঠিমার এখন বাইরের ছেলের সঙ্গে কথা বলার ছাড়পত্র আছে, তাই।

ওমা বাক্যবাগীশ ছেলেটা কাউকেই ছেড়ে কথা কয় না, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'ও বাবা! প্রাণরক্ষা। তা শুনতে তো বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু আগে যদি জানতাম কারো প্রাণরক্ষা করতে যাওয়ার অপরাধে নিজের প্রাণটি বিসর্জন দিতে হবে, কে যেতো সে কাজে হাত দিতে।'

তারপর বেশ কিছু বাদ-বিতণ্ডা চললো ওই 'মাল' কমানো নিয়ে, এবং ছেলেটা সমানেই বাকচাতুরী করে গেল, অবশেষে নীরোপিসি একটা থালা এনে সব ম্যানেজ করলেন। ওনাকে তো আবার বাল্মীকি মুনির 'স্বপাকের' ব্যাপারে তদারকি করতে হচ্ছে। তাই এঘর ওঘর ছুটোছুটি করছেন।

নীরোপিসিই বললেন, 'তা' সত্যি, এক-জনের পক্ষে একটু বেশীই দেওয়া হয়ে গেছে। আর ছেলে কিছুতেই যখন হাত দিতে চাইছে না—।'

শেষ পর্যন্ত সিকির সিকি রাখলো।

তা রাখুক। যা রইলো সেটাও কম নয়। সেটাও পারলো না সব। তবে পুকুরে জাল ফেলানো সদ্য টাটকা মাছের মুড়োটা যে অস্পর্শিত অবস্থায় তুলিয়ে দিল, এতেই সবাই মর্মাহত হলেন।
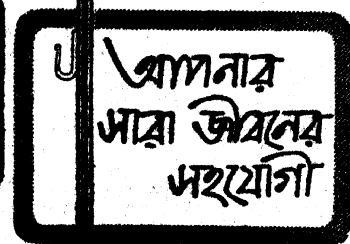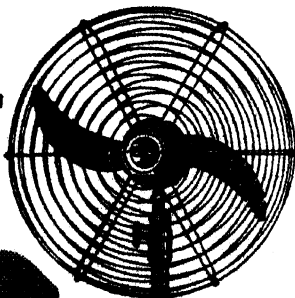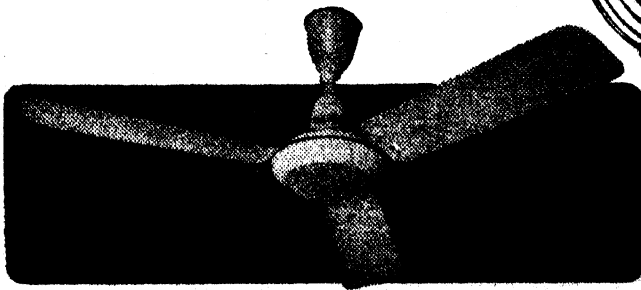
কিন্তু কী করবে বেচারা, ওর নাকি পাতের পাশে মাছের মাথা দেখলেই নিজের মাথা ঝিমঝিম করে।

অকালপক্ক আমি মনে মনে বললাম, 'আহা মরে যাই! এদিকে যে একটা জলজ্যান্ত মেয়ের মাথা খেয়ে বসে আছো তা হুঁশ আছে?'

কৃতজ্ঞতার ঋণশোধের অভিসন্ধিতে নেমন্তন্ন করে লোকটাকে সত্যিই হাড়জ্বালান করা হয়েছিল সেদিন। তবু খাওয়ার পর যা দারুণ জব্দ করা হলো, সেটা ওর ধারণার বাইরে ছিল।

তাই হয়তো তখন আর মুখে বাক্য সরলো না ওর। প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা।

যখন খেয়ে উঠেছে, বাবা, বলে উঠলেন, 'কই সুনী কোথায় গেল? তাকে তো দেখছি না। (যেন আমাকেই খুব দেখছেন)। তার একবার এসে একটা প্রণাম করে যাওয়া উচিত।...সুনী—'

বাবার এই চিন্তাটা যে আকস্মিক তা বোঝা গেল। না হলে আগে থেকে বলে রাখতেন।...

রাখেননি।

কাজেই বাবার এই আকস্মিক চিন্তাটা প্রায় আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতই হলো, উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর।

বড়জ্যাঠা সে বজ্রাঘাতের ঘা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বললেন, 'আহা সে বেচারীকে আবার লজ্জায় ফেলা কেন?'

বড়জেঠি বললেন, 'ঠাকুরপোর এক অনাছিষ্টি কথা, সুনী আবার কী করতে—'

বাবার পিসিমা বললেন, 'শোনো কথা, সে আবার কী পেন্নাম করতে আসবে?'

আর স্বয়ং নাটের গুরুটি বললেন, 'না না। এসব করলে আমি কিন্তু পালাবো।'

এই প্রথম অপ্রতিভ হতে দেখলাম ওকে।

তৎসত্ত্বেও বাবা বেশ দৃঢ় গলায় বললেন, 'না না। এটা ওর করা উচিত। জীবনদাতাকে প্রণাম জানাবে এতে লজ্জার কী আছে? সন্তানকে উচিত কর্তব্য শেখানো তো মা-বাপেরও কর্তব্য। সুনী, এদিকে আয়। এই সুনী, সুনীতি!'

'সুনীতি' বলে ডাকা মানেই আদেশ।

দিদি কতক্ষণ বসে থাকতে পারবে বাবার আদেশ অমান্য করে?

সবাই কালীবর্ণ মুখে বসে রইলেন, শেষে বড়জ্যাঠা 'যাই দেখি খুড়োর ওদিকে কতদূর'—বলে কেটে পড়লেন। বোধকরি এই কেলেঙ্কারি দেখবার পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে।

মা একবার ঘোমটার মধ্যে নড়ে উঠলেন, ভগবান জানেন সমর্থনে না অসমর্থনে! বাবা কোনো দিকে তাকালেন না, আর একবার শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'সুনী কাকি এদিকে নেই? বুঁচি দিদিকে ডেকে দে তো।'

(ক্রমশঃ)

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহ্যের অধিকারী। ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে বাংলাদেশের অবদান ছিল নবজাগরণের চিন্তা-চেতনা সংকল্প-ভাবধারার ভগীরথরূপে। এই সর্বতোমুখী বিবর্তনের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা নগরীর বিশিষ্ট ভূমিকা। এই নগরীর সুশিক্ষিত সমাজের চিন্তা ও পরিকল্পনা সমগ্র দেশকে প্লাবিত করতো এক দুর্দমনীয় আত্মিক প্রেরণায়, বিকশিত করতো স্বপ্নকে সাধের বাস্তবতায়।

জাতীয় জীবনের জাগরণের এই পুণ্য লগ্নে দেশ যখন সর্বাত্মক সাধনায় নিমগ্ন, তখন কলকাতার অন্যতম প্রাচীন সমৃদ্ধ অঞ্চল তালতলা পল্লী তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে যুগোপযোগী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছিল তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী।

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী উত্তর ও মধ্য কলকাতায় বর্তমানে জীবিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এর আগে যে কয়েকটা গ্রন্থাগারের উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলো হয় বিলুপ্ত হয়েছে, নয় অন্য কোন গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিশে গেছে। বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের সূচনাপর্বের ইতিহাস অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যুর ইতিহাস। কোনো পূর্বসূরী বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের সামগ্রিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাননি বলে আমরা জানতে পারি না কত স্বপ্ন অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে, কত মহান প্রয়াস হয়েছে বিফল। গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে চাই সাধনা, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন দুশ্চর তপশ্চর্যার। বহু কর্মীর নীরব আত্মোৎসর্গে উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের যে স্বপ্নের ইতিহাস আজও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৮২ খৃঃ), বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী (১৮৮৩ খৃঃ), চৈতন্য লাইব্রেরী (১৮৮৯ খৃঃ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৮৯৩) প্রভৃতি গ্রন্থাগার তাদেরই অন্যতম।

স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যানুরাগী যুবকের তিন বছরের প্রয়াস ও প্রচেষ্টার পর ১৮৮২ সালের শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এ ব্যাপারে শ্রীপ্রমথনাথ মিত্রের উদ্যমই ছিল সর্বাধিক। অর্থ সংগ্রহ করে ৫০।৬০খানা বই কিনে গ্রন্থাগারের সূচনা হয় ৪৮ নম্বর নিয়োগীপুকুর লেনের ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে। গ্রন্থাগারের প্রথম সভাপতি হলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আজীবন সভাপতি ছিলেন) আর সম্পাদক হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এক বছর পরে স্থানাভাব মেটাতে ৩।১ নিয়োগীপুকুর ওয়েস্ট লেনের ৺তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাড়ীর একখানা ঘর বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দেন। তখন পাড়ার অভিভাবকেরাও তরুণদের প্রচেষ্টাকে সুষ্ঠুরূপ দিতে এগিয়ে আসেন।

গোড়ার দিকে গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা ছিল অস্বচ্ছল। সেই দুর্দিনে গ্রন্থাগারকে পুস্তকদান ও গ্রন্থ সংগ্রহ করে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা হলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ সেন, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ এফ এম আবদার রহমান সরোজবাসিনী দেবী প্রমুখ। হিতবাদী ও বসুমতী পত্রিকা দুটি পরবর্তীকালে বিনামূল্যে পাওয়া গিয়েছিল। দানবীর ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অর্থ, আসবাবপত্র ও বই দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এইভাবে বহুজনের সাহায্যপুষ্ট দানে এবং কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবায় গ্রন্থাগার দিনে-দিনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। স্থানাভাব মেটাতে ১৮৮৭ সালে বর্তমান

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী

গ্রন্থাগারের দক্ষিণাংশে শ্রীশ্রী'রাধাকান্ত জীউর দেবোত্তর জমির ওপর গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়।

'১৮৯৪ সালে যুক্তপ্রদেশের স্বনামধন্যা মাতাজী কলকাতায় এসে হিন্দু আদর্শানুসারী স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে মনোযোগী হন। মাতাজীর আদর্শে এবং গ্রন্থাগার পরিচালকবর্গের সহযোগিতায় পাঠাগারের এক অংশে মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হয়। এইভাবে গ্রন্থাগার ও পাঠশালা শিক্ষার দুটি কেন্দ্র পাশাপাশি চলতে থাকে। কিন্তু দঃখের বিষয় আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যে বার-তের বছর পর পাঠশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় 'প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন' নামে এখানে একটি সাহিত্য-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল, আর গ্রন্থাগার পরিণত হয়েছিল মধ্য কলকাতায় এক বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে।

গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। তাই নিজস্ব গ্রন্থাগারভবন নির্মাণের জন্যে 'রাধাকান্ত জীউর দেবোত্তর সম্পত্তির একটা অংশ সেবাইত নরেন্দ্রনাথ কুমারের কাছ থেকে বার্ষিক এক টাকা খাজনায় নেওয়া হয়। ১৯০৯ সালে গৃহনির্মাণ আরম্ভ করে ১৯১২ সালে তা শেষ হয়।

এ ব্যাপারে 'তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'নীলমণি মুখোপাধ্যায়, 'হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, 'পরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'অতুলচন্দ্র রায় ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও বার লাইব্রেরীর আইনজীবীদের অর্থানুকূল্য এবং ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের আশাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০১ সালে এপ্রিলের বার্ষিক সভায় গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী রচিত হয়। ১৯২৯ সালের 'সারস্বত সম্মিলনী' ব্যাপক আকারে ১৯৩৩ সালে 'কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনী'তে পরিণত হয়। বড়দিনের ছুটিতে কুমারসিং হলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে চারদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান হত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনুষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৪ সালে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ভ্রাতৃদ্বয় উমাচরণ, অভয়চরণ পাঁচুকালী সাহা পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে ৬৬২০" টাকার বিনিময়ে পাঠাগারের জমিটি কিনে গ্রন্থাগারকে দান করেন। ১৯৫৭ সালে পুরনো একতলা বাড়ী ভেঙে আধুনিক ধরনের দোতলা বাড়ী নির্মিত হয়। ১২বি, নিয়োগীপুকুর লেনে এই অভিজাত ঐতিহ্যসম্পন্ন গ্রন্থাগারটি অবস্থিত বলে কলকাতা পৌরসভা এই রাস্তার নাম বদল করে রাখেন 'তালতলা লাইব্রেরী রো'। ১৯৩২ সালে শিশুমন বিকাশের জন্যে বালক বিভাগ স্থাপিত হয়। পরে এই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'মুকুল বিভাগ'।

৩০, ৩০বি, ৩৯ এবং ৩৯বি নম্বর প্রাইভেট বাসে যাতায়াত করলে দেখা যাবে ৫৬ নম্বর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের দক্ষিণ দিকের বুক চিরে যে সরু রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে, তার নাম কিছুদিন আগেও ছিল নিয়োগীপুকুর লেন, বর্তমানে তালতলা লাইব্রেরী রো। মৌলালির মোড় থেকে এখানে হেঁটে আসতে সময় লাগে পাঁচ মিনিট, আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে দুই মিনিট।

এই সরু রাস্তায় প্রবেশ করলে সামনেই দেখা যাবে গ্রন্থাগার—দু-মহলা, কাঠামো পরিব্যাপ্ত নিজস্ব সুন্দর দোতলা বাড়ী। যার একতলায় লেনডিং সেকশন আর সংবাদপত্র পড়বার অবৈতনিক কক্ষ এবং দোতলায় রেফারেন্স বই বা পুরনো সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা পড়বার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যাবতীয় দৈনিক সংবাদপত্রই এক বছর পর্যন্ত এখানে রাখা হয়। বই থাকে একতলায় র‍্যাকে, দোতলায় আলমারিতে। এই লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠকক্ষ খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছটা থেকে আটটা এবং বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। সোমবার সম্পূর্ণ বন্ধ। অবৈতনিক পাঠকক্ষে দুবেলায় আসেন ৫০।৬০ জন পাঠক। ইংরেজী বাংলা ছোট-বড়দের মিলিয়ে এখানে রাখা হয় ৬টি দৈনিক, ২৫টি সাপ্তাহিক-মাসিক-পাক্ষিক এবং বিভিন্ন বার্ষিক সংখ্যাগুলি।

বড়দের গ্রন্থাগারের চাঁদা মাসিক এক টাকা, বহু আজীবন সদস্য সমেত মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬২জন বাংলা গ্রন্থের

সংখ্যা ১৯,২৯৫খানা, আর ইংরেজী বই ৫,৭৫৬টি। তবে উপন্যাস পাঠকের সংখ্যাই বেশি। ক্যাটালগিং ব্যবস্থা লেখক অনুযায়ী এবং ক্লোজ একসেস্ ব্যবস্থানুযায়ী বই ইস্যু করা হয়।

মুকুল বিভাগ (৫ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত) খোলা থাকে শুধু বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত। এই বিভাগের চাঁদা ২৫ পয়সা, সদস্য সংখ্যা ৫৯০ জন, বাংলা গ্রন্থ সংখ্যা ৪,২৩৮খানা, আর ইংরেজী বই আনুমানিক দুশো।

এই মুকুল বিভাগের সদস্যদের জন্যে আছে একটি ছবি সেন্টার। সেখানে অঙ্কন ও হস্তশিল্প শেখানো হয়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ বছরে ৩৫০্ টাকা দিয়ে থাকেন। প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের বার্ষিক চিত্র ও হস্তশিল্পের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের আঁকা নানা ছবি ও ডিজাইন সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ছোট-গল্প, কবিতা ইত্যাদি সংকলিত বাঁধান বার্ষিক পত্রিকা সংখ্যাটি সত্যি দেখবার মত। এই বিভাগের দেওয়াল-পত্রিকাটিও রেখা ও লেখায় সমৃদ্ধ।

এঁরা প্রতি বছর জুলাই মাসে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের জন্যে। আর হয় সদস্যদের বার্ষিক বনভোজন। এ ছাড়া শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে মুকুল বিভাগের জন্যে।

এখানকার গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ১৩ জন। তার মধ্যে ৮জন অবৈতনিক এবং পাঁচজনকে নামমাত্র হাতখরচ দেওয়া হয়।

১৮ থেকে ২৩জনের পরিচালকমণ্ডলী গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর সংখ্যা ২০জন। গ্রন্থাগারের বর্তমান সভাপতি শ্রীবিজয় সিং নাহার, কর্মসচিব শ্রীঅশোকনাথ ঘোষাল এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবশঙ্কর নাগ।

গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধানতম হল আর্থিক সমস্যা। কলকাতা পৌরসভা অর্থ সাহায্য বন্ধ করেছেন গত দশ বছর, উপরন্তু গ্রন্থাগারটি বরাবরই করমুক্ত থাকা সত্ত্বেও অতি সম্প্রতি ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে বকেয়া কর দাবী করে বিল পাঠিয়েছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বছরে মাত্র একশত টাকা অনুদান দিয়ে থাকেন। আর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ ছবি সেন্টারকে বছরে ৩৫০্ টাকা নিয়মিতভাবে দিয়ে আসছেন। সদস্যদের চাঁদাই গ্রন্থাগারের আয়ের প্রধানতম পথ। এঁরা নিজস্ব বাড়ী তৈরী করেছেন প্রতিবেশী ও জনগণের কাছ থেকে ডোনেশন নিয়ে। দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছাকর্মীর অভাবে গ্রন্থাগার চালানো দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। তৃতীয়ত বই কেনবার অর্থ এবং গ্রন্থ সংরক্ষণের অর্থাভাব খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই অর্থাভাবের জন্যেই ক্যাটালগের বই ছাপানো হচ্ছে না।

গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ করলেন গভর্ণিং বডির সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, স্থানাভাব এখন মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে, অথচ তিনতলা তোলবার আইনগত বাধা আছে যথেষ্ট। এই অবস্থায় কলকাতা কর্পোরেশন যদি এসবেসটস সিট দিয়ে তিনতলায় আচ্ছাদন গড়ে তোলবার অনুমতি দেন, তবে আপাতত স্থান-সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যাবে। তাছাড়া যদি উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, তবে একটি টেক্সটবুক লাইব্রেরী গড়ে তোলবার পরিকল্পনাও এঁদের আছে।

আজকের পাবলিক লাইব্রেরী বাংলা দেশের গ্রন্থসম্ভারের প্রাচীনতর নাজর, ঐতিহ্যের প্রতীক, আর শিক্ষার্থীর পরম-তীর্থ হওয়া সত্ত্বেও আজ কোনমতে মান-আন আভিজাত্য বাঁচিয়ে চলেছে। একানব্বই বছরের প্রবীণ মূর্তি নিয়ে এক শতাব্দীর কূলে এসে দাঁড়িয়ে অঙ্গুল সমরাধারকে প্রত্যক্ষ করছে, উপলব্ধি করছে আধুনিক যুগের নির্মম জটিল উপেক্ষাকে। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর রাজকীয় অর্থহীন শব্দগুলো আজ মিউজিয়মের সম্পদ বিশেষ, সভামঞ্চে করতালি প্রতিধ্বনির প্রচণ্ড উপাদান! আমাদের জাতীয় জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমরা মুখে যা বলি তা করি না, যা করি তা বলি না। এই বলা আর করার পর্যায়ে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি নির্বাসিত, নিক্ষিপ্ত। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ আজ যতটা সচেতন, সরকারী মহল ঠিক ততটাই উদাসীন। ফলে যে দেশে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয় সে দেশে 'নীরব মহাপ্রাণের' আবাসস্থল নিয়ে সরবে মাতামাতি করার মত মত্ততা সরকারী আমলাদের কাছে পাগলামোরই নামান্তর হয়তো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, 'কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে' যা বন্ধ, তাকে অজ্ঞানতার শৃঙ্খলে চির-আবদ্ধ করে রাখলে ক্ষতি কার?—সরকারের? বর্তমান জনসাধারণের? দেশের কৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতির? ভাবী যুগের? হয়তো বা তার চেয়েও বেশি কিছুর।

—সুশান্তকুমার মিত্র

স্বপ্ন—(৪)

বহু যুগ ধরে স্বপ্ন সম্বন্ধে মানুষের যে নানা রকমের ধারণা চলে আসছে আর স্বপ্নের অর্থ বোঝবার জন্যে কম-বেশী সুসভ্য ও আদিম অধিবাসী প্রায় সকলের মধ্যেই যে চেষ্টা অনেক কাল ধরেই চলে আসছে সেকথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বোঝবার কোনও পদ্ধতির, বিশেষ করে কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উল্লেখ কোনও প্রাচীন বইতে পাওয়া যায় না। যদিও কোন রকম স্বপ্নে কি বোঝায় তার বিস্তারিত ফর্দ পাওয়া যায় অনেক জাতির মধ্যেই। ফ্রয়েড প্রথম স্বপ্ন ব্যাখ্যা করবার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে স্বপ্নের অর্থ বোঝবার সুবিধে করে দিয়েছেন। ফ্রয়েড এই বিষয়ে পথিকৃৎ। তিনি বহু স্বপ্ন তাঁর অবাধ ভাবানুষঙ্গ (ফ্রি এসোসিয়েশন) প্রণালীতে সমীক্ষণ করে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ তার নিহিতার্থ জানবার কৌশল পেয়েছেন। সেই থেকে জানতে পেরেছেন স্বপ্নের যা বক্তব্য (ম্যানিফেস্ট কন্টেন্ট) আর যে গূঢ় ইচ্ছা নির্জ্ঞান মনে থেকে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। নানা রকমের যে সব ইচ্ছা জাগ্রতাবস্থায় সমাজ, ধর্ম নীতি, বা অন্যান্য স্বার্থের বিঘ্নকর বলে পূরণ করা সম্ভব হয় না সে ইচ্ছাগুলিকে অহং অবদমিত করে আবার নির্জ্ঞান স্তরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ঘুমের মধ্যে যখন সেই অবদমিত ইচ্ছা স্বপ্নের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় তখনও মূল ইচ্ছার সহজ পূরণ অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। এর কারণ ঘুমের মধ্যেও আমাদের অহং কিছু পরিমাণে সজাগ থেকে কাজ করে যায়। কিন্তু অহং ঘুমের সময় পুরোপুরি সজাগ থাকে না বলে তার প্রহরার কাজেও কিছু শিথিলতা দেখা দেয়। এই শিথিলতার সুযোগ নিয়েই অবদমিত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে স্বপ্ন রচনার মাধ্যমে। স্বপ্ন বাস্তব নয়, বাস্তবের মতন অবস্থা মনে রচিত হয়। সেই মানস রচনার কতকগুলি নিয়ম ফ্রয়েড দেখতে পেয়েছেন। বৃত্তির বা ইচ্ছার সহজ প্রকাশে অহং বাধা দেয় বলেই সহজ পথ এড়িয়ে নানা রকম অদল-বদল করে স্বপ্নের আসল অর্থ যাতে সহজে ধরা না পড়ে সেই ব্যবস্থা মন করে থাকে। ফ্রয়েড এই স্বপ্ন গঠনের [illegible] (ড্রিম ওয়ার্ক") এই সব ক্রিয়ার দ্বারাই স্বপ্নকে নানা রকমে ভেঙে-চুরে দুর্বোধ্য রূপ দিয়ে প্রকাশ করে মন।

স্বপ্নক্রিয়া বলতে ফ্রয়েড প্রধানত কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন, যথা—

(১) সংক্ষেপণ (কনডেনসেশান), (২) অভিক্রান্তি (ডিসপ্লেসমেন্ট), (৩) নাট্টন (ড্রামাটাইজেশান), (৪) বিরুদ্ধ দ্যোতনা (একস্প্রেশান বাই অপোজিট), (৫) প্রতীক পরিণতি (সিম্বলাইজেশান), (৬) রূপারণ (পিকটোরিয়াল মোডিফিকেশান অর ভিস্যুয়ালাইজেশান)। এ ছাড়াও ছোটখাট আরও কয়টি স্বপ্নক্রিয়া আছে। তাদের আর পৃথক উল্লেখ প্রয়োজন হবে না, কারণ যে ছয় রকমের প্রধান স্বপ্নক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই অন্যগুলিকে অনেকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

উপরে উল্লেখের ক্রমানুসারে এক একটি স্বপ্নক্রিয়ার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। তা না হলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে না। প্রথমে সংক্ষেপণ ক্রিয়া দিয়েই শুরু করা যাক। সংক্ষেপণ শব্দের সাধারণ অর্থ হল কোনও কিছু বিস্তৃত বিষয়, বস্তুকে, প্রণালী ইত্যাদিকে সংক্ষেপ করে দেওয়া। মনে রাখতে হবে একদিকে আমাদের স্বপ্ন দেখার সময়টুকু অতি কম, যদিও এক এক সময় মনে হতে পারে যে, সারা রাত স্বপ্ন দেখা হয়েছে। আসলে তা সত্যি নয়, বহু স্বপ্ন অবশ্য এক রাত্রে দেখা যেতে পারে কিন্তু একটি স্বপ্ন সারা রাত ধরে দেখা যায় না। অল্প একটু দেখিয়ে তারই মধ্যে অনেক মজার সুবিধে মন নেয়। তা ছাড়া [illegible] না থাকে? [illegible] মনে হয় [illegible] মন যে [illegible] অবস্থায় [illegible] দুঃখকর স্বপ্নে এই অবস্থা হয়। একজন স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁকে যেন এক অতি বিস্তৃত মরুভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একবার তাঁর মনে হচ্ছে সাহারার মরুভূমি আবার মনে হচ্ছে হয়ত গোবি মরুভূমি, কখনও তাঁর মনে হচ্ছে এই ভারতবর্ষেরই কোনও এক বিশাল মরুভূমিতে তিনি রয়েছেন। রোদের তাপে বালু গরম হয়ে উঠেছে। তার উপর দিয়ে অতিকষ্টে তাঁকে চলতে হচ্ছে, মরুভূমি পার হয়ে তাঁর আশ্রয় পেতে হবে। জল নেই, খাদ্য নেই, অনেক দিন এই অনাহারে, তৃষ্ণায় তিনি ক্লান্ত হয়ে অতিকষ্টে পা টেনে টেনে চলেছেন। বালুতে পা বসে যায় তা তুলে আর এক পা চলতে যেন বুক ফেটে যাবার জোগাড়। চলার যেন আর শেষ হচ্ছে না—ইত্যাদি! এই যে বহুদিন ধরে চলার অনুভূতি তাঁর স্বপ্নে হচ্ছে প্রকৃত অবস্থায় সবটুকু স্বপ্ন হয়ত দুই-তিন সেকেণ্ডের মধ্যে দেখা হয়ে গেছে। এই রকম আরও অনেক স্বপ্নের কথা বলা যায় যেখানে সময় বা কালের পরিমাণ অনেক বেশী বলে মনে হয়। মন দ্রুত কাজ করে বলেই এমন বোধ হয়। অবশ্য এর অন্য অর্থও থাকে। আমরা আবার আমাদের আলোচ্য সংক্ষেপণ বিষয়ে ফিরে আসি। স্বপ্নে আমরা কি সংক্ষেপণ করতে চাই? আবার বলি, মনে রাখতে হবে সব রকমের স্বপ্নক্রিয়ার উদ্দেশ্যই হল স্বপ্নকে বিকৃত করা (ড্রিম ডিসটরশন) যাতে কারে সহজ বৃত্তির প্রকাশ সহজে ধরা না পড়ে। স্বপ্নে নানা ভাব প্রকাশ পায়।

দুর্বোধ্য করবার জন্য। মন যেন এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিকে এক এক সময় কেমন এক রকমের জোট পাকিয়ে দেয়, যার ফলে কোনও ভাবটাই আর স্পষ্ট করে ধরা যায় না। অথবা একটা যে কোনও ভাবকে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করে তুলে তার আড়ালে আরও অন্য কোনভাবে মিশিয়ে দিয়ে অবস্থাটা ঘোলাটে অস্পষ্ট বা জটিল করে তোলা হয়। যেমন একজনের স্বপ্ন হল—তাঁর ছেলে মারা গেছে। মৃতদেহ খাটুলিতে শোয়ানো রয়েছে, শাদা চাদর দিয়ে ঢাকা, কেবল মুখটা অনাবৃত রয়েছে। বাইরে থেকে এসে ছেলের মৃতদেহ দেখে তাঁর যেন বিশেষ কোন অনুভূতি জাগল না। একবার তিনি যেন ভাবলেন যাই জামা-কাপড়টা পাল্টে আসি, একটু পরেই যেন নুয়ে পড়ে ছেলের মুখটা দেখলেন, হাতে যেন কি একটা ছিল সেটা দিয়ে হঠাৎ যেন কি লিখছেন কাগজে নয় মাটির উপরেই। সঙ্গে সঙ্গে সব যেন কেমন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল, তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেও তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না ছেলের মৃত্যু দেখে তাঁর মনের ভাব কি হয়েছিল। যেন কোনও অনুভূতি হয় নি। কোনও ভাবই তাঁর মনে জাগে নি। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে জানা গেল—এক দিকে তিনি ছেলেকে খুব ভালবাসেন, তাঁর কোন দুঃখ-কষ্ট তিনি সইতে পারেন না। অন্য দিকে ছেলে দূরদেশে চাকরীর জন্য চলে গেছে বলে তাঁর দুঃখ খুব আছে। কিন্তু সংসারে অর্থের প্রয়োজন আর ছেলেরও জীবনে উন্নতির আশা কোনটাই তিনি ছাড়তে পারছেন না। এই সমস্যায় পড়ে এক এক সময় তাঁর মনে হয়েছে ছেলেপিলে না থাকাই ভাল। ওরা চিরকাল কেবল দুঃখের কারণ হয়ে আসে। মরে গেলে তবে আর আশা করবার থাকবে না—তাই ওদের না-থাকাই ভাল। ছেলের সঙ্গে তাঁর কিছু মতবিরোধ এক বিষয়ে হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে ছেলে বড় হয়েছে এখন আর বাপের শাসন মানে না—ইচ্ছে করে সুবিধে পেলে বেশ কয়েক ঘা তাকে বসিয়ে দেবেন।

অন্ততঃ মনে মনে এমন ভাবনাও তাঁর সময় সময় এসেছে। এই সব ভাবগুলি তাঁর মনে থেকে স্বপ্নের মৃত সন্তান সম্বন্ধে নিজের মনোভাব ঠিক স্পষ্ট হতে দেয় নি—যদিও ছেলের মৃত্যু-ইচ্ছা সফল করিয়ে নিয়েছে মন, তবু তাঁর যে অনুভূতি কিছু স্পষ্ট হল না তার সম্বন্ধে বলেছিলেন—মরা শরীর দেখলাম বটে কিন্তু আমার ছেলেরই মৃতদেহ কিনা ঠিক যেন বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল ছেলেরই দেহ আবার কেমন যেন অনুভব করছিলাম—মরাটা যেন তেমন কিছু নয় ইত্যাদি। যদিও স্বপ্নে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে—তাঁর আক্রোশ তৃপ্ত হয়েছে তবু আক্রোশের অনুভূতি বা ভাব স্বপ্নে ছিল না—। ভালবাসা বা দুঃখের ভাবও তাঁর মনে তখন জাগেও নি। কিন্তু স্বপ্ন বিশ্লেষণের সময় কিন্তু তাঁর নানা রকমের ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। ছেলের মৃত্যু তিনি চান একথাও তিনি সহজে মানতে রাজি হন নি। কিন্তু স্বপ্নের ভাবানুষঙ্গ থেকে যখন তুলে ধরে তাঁকে দেখানো হল তখন এক সময় তিনি স্বীকার করেছেন রাগের মাথায় তিনি ছেলের মরে যাওয়াই ভাল এমন কথা মনে করেছেন। এমন কি একদিন দেবতার কাছে ছেলের মৃত্যু-কামনা করে, প্রার্থনাও জানিয়েছেন। এত কথা স্বপ্নে না দেখে তিনি সামান্য ভাবলেশহীন ছবি দেখলেন। বিভিন্ন মনোভাব এইভাবে জড়িয়ে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। তিনি পরে বলেছেন, রাগের মাথায় যা বলেছেন তা সত্যি নয়, তিনি ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসেন—ছেলে না থাকলে তিনি বাঁচবেন না ইত্যাদি।

ভাব (আইডিয়া), প্রক্ষোভ (ইমোশান) ছাড়াও বাক্য ও রূপের ক্ষেত্রেও স্বপ্নে সংক্ষেপণ ক্রিয়া কাজ করে। যেমন একজন স্বপ্ন দেখলেন তাঁর আপিসের বেয়ারা ঘরে ঢুকে সেলাম করে বলল 'অসঙ্গবাবু দেখা করতে এসেছেন।' নাম শুনে কে যে দেখা করতে এসেছেন বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে ডাকতে বলতেই ঘুম ভেঙে গেল। ঐ নামের কোন পরিচিত লোক তাঁর মনে এলো না। সারাদিন স্বপ্নটার অর্থ বুঝতে পারেন নি। ভাবানুষঙ্গ থেকে পরে জানা যায় যে ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু কাজে অসীমবাবু ও আয়েঙ্গারবাবু নামে দুজন কদিন আগে দেখা করতে আসেন। তাঁদের কয় দিন বাদে এসে খবর নিতে বলে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন ব্যবসায়ে এঁদের সুনাম নেই। ফলে এই জুটিকে তাঁর পছন্দ হয় নি। এঁদের সঙ্গে ব্যবসায় লিপ্ত হতে তাঁর ইচ্ছে নেই। তাঁরা আবার এলে পরে কিভাবে কথা বলবেন এই সব নিয়ে মনে মনে কিছু জল্পনা-কল্পনা করছেন। স্বপ্নে 'অসঙ্গবাবু' নামটা অসীম ও আয়েঙ্গারের দুই অংশ জুড়ে মিশ্রিত করে এক নতুন নাম তৈরী করা হয়েছে। আর অসঙ্গ ঐ নামটার মধ্যে এঁদের সঙ্গে সঙ্গ না করার ইঙ্গিতটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই রকম সংক্ষেপণ ক্রিয়া রূপায়ণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিই। এক যুবক রোগী স্বপ্নে দেখল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে এক পার্কের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে—রাস্তা দিয়েই ঘুরে বেড়াবে কি পার্কে গিয়ে বসে থাকবে। ঠিক করল পার্কেই গিয়ে বসবে। কিন্তু তখনও কিছু দিনের আলো আছে—একটু পরে পার্কে যাবে। পাশের এক দোকানে ঢুকে এটা-ওটা প্রয়োজনের জিনিস কিনে বেরিয়ে আসতেই মনে হল তার বান্ধবী 'মি—' যদি পার্কে আসে তবে বেশ ভাল হয়। তার বাড়ী খুব দূরে নয়, হয়ত সে বেড়াতে পার্কে আসতেও পারে। মনে হতেই তাড়াতাড়ি পার্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে যখন পার্কে ঢুকতে যাবে তখন রাস্তার আলো জ্বলে গেছে কিছু লোক পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছে। সে যখন দরজাটা পার হয়ে পার্কে ঢুকেছে কাছেই কে একজন অদ্ভুত চেহারার লোক তার দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন হাসছে। কিন্তু তার চোখে যেন রাগ ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা মাথায় এক গোছা টিকি, গায়ে জামার উপর কাঁধে চাদর, হাতে একটা বড় লম্বা লাঠি। লোকটিকে দেখে তার যেমন অবাক লাগল তেমনি কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটি কেন অমন করে হাসছে। কি চায়? গুন্ডা নাকি! মনে হতেই ভয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঐ চেহারার মানুষ সে কোনদিন দেখে নি। অনেক চেষ্টা করেও লোকটিকে চিনতে পারে নি। ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙা থেকে সারাদিন অস্বস্তিতে কাটিয়েছে। ঘুরে ঘুরে মনে হচ্ছে হয়ত এটা কোনও বিপদের সংকেত। হয়ত কিছু একটা অকল্যাণ ঘটবে। বাড়ীতে মাকে বলেছে সবাই যেন সাবধানে থাকে কিছু একটা অমঙ্গল খুব শিগগিরই ঘটবে। শুনে মা তাকে বারে বারে কারণ জানতে চেয়েছেন—কেন সে ও-কথা বলছে কিন্তু রোগী কেবল বলেছে 'অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।' সমীক্ষণ করে জানতে পারা গেছে ঐ চেহারার কোনও মানুষকে সে চেনে না সত্য, কিন্তু চেহারাটার সঙ্গে তার বাবার চেহারার কোথায় যেন একটু মিল আছে। ঠিক কোথায় যে মিল তা প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে ভাবানুষঙ্গে ধরা পড়েছে সেই লোকটির লম্বা-চওড়া চেহারাটার সঙ্গে তার বাবার চেহারার কিছু মিল আছে কিন্তু তার বাবা তত মোটা নন, আর তাঁর মাথায় কোনোদিন টিকি ছিল না—এখনও নেই। লাঠি তিনি কোনদিন ব্যবহার করেন না। টিকির কথা বলতে গিয়ে তার মনে পড়ে গেল ইস্কুলে পড়বার সময় যে সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন তাঁর মাথায় খুব মোটা টিকি ছিল। বেশ গোলগাল চেহারা। সংস্কৃত তার আদৌ ভাল লাগত না। লেখাপড়ায় অমন দেখতে

বিশ্রী। আর ঐ শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সমাস, সন্ধি নিয়ে তার মাথা গুলিয়ে যেতো। ক্লাসের পড়া বলতে প্রায়ই ভুল হতো। সেজন্য পণ্ডিতমশায়ের শাসন পোহাতে হয়েছে। তিনি গম্ভীর চেহারার মানুষ ছিলেন কিন্তু চেহারাটা স্বপ্নে দেখা মানুষটির মত অমন ভয়ঙ্কর নয়। চোখের চাহনিও তেমন ক্রোধীর মত ছিল না। কারো চেহারার সঙ্গেই স্বপ্নের লোকটির চেহারা মিলছে না। হঠাৎ হাতের লম্বা লাঠিটার কথা মনে হতেই বলল—ঐ পার্কের যে দারোয়ান ছিল—কিছুদিন আগে, তার হাতে ঐরকম একটা লাঠি থাকতো। তার চেহারাও ছিল স্বপ্নে-দেখা লোকটির মত কালো আর হিংস্র। সে যখন হাসতো, তখন মনে হতো হঠাৎ বুঝি মেরে বসবে। লোকটাকে তার বরাবরই খারাপ লাগতো। এক সময় সে নিজেই বলে উঠলো—স্বপ্নের লোকটার সঙ্গে তার বাবা, পণ্ডিতমশায় আর ঐ পার্কের দারোয়ানটার মেশানো চেহারা হলে ঠিক মিলে যায়। সমীক্ষণ করে আরো জানা যায় যে যে বান্ধবীর সঙ্গে পার্কে দেখা হওয়ার কথা ভেবেছিল—মনে মনে তাকে সে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করে। কিন্তু স্পষ্ট করে সে-কথা সে মেয়েটিকে বলতে পারছে না। কারণ, সে জানে তার বাবা সে বিয়েতে কিছুতেই মত দেবেন না। অসবর্ণ বিয়েতে তাদের পরিবারের যে তীব্র আপত্তি আছে তা সে অন্যদের সম্বন্ধে বাড়ীতে আলাপ-আলোচনা যা হয় তাই থেকে জানতে পেরেছে। পণ্ডিতমশায়ও ধর্মপরায়ণ লোক, তিনি এসব অসামাজিক বিয়েকে দুর্নীতি বলে মনে করবেন এই তার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর নিয়মনিষ্ঠা আর চরিত্রের দৃঢ়তার সম্বন্ধে রোগী জানে। নিয়মনিষ্ঠা না হলে তিনি রাগ করতেন। তাই পড়া তৈরী না করে ক্লাসে গেলে তিনি শাসন করতেন। আর সেই পার্কের দারোয়ানটা। ওটা তো একটা গোঁয়ার মোষের মত! একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে হোঁৎকা স্বভাবের লোক। দারোয়ানের চাকরি পেয়ে গায়ে জামা পরে হাতে লম্বা লাঠি নিয়ে এমন ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় —যেন সে-ই পার্কের মালিক! একদিনের কথা মনে পড়ে, অনেক দিন আগে, মাথার ব্যথা হওয়ায় সন্ধ্যের পর একটু দেরী করেই সে পার্কে বসেছিল। চোখ বন্ধ করেই বসেছিল। এক সময় একটু তন্দ্রার মত এসেছে আর অমনি সেই দারোয়ানটা অন্ধকারে তার সামনে লাঠি ঠুকে এসে দাঁড়িয়ে সেই বিকৃত হাসির ভঙ্গী করে হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, এত রাত্রে এই পার্কে একা বসে কি করা হচ্ছে? কোনও মতলব আছে নাকি? তাড়া লাগিয়ে বলেছিল, ভদ্দর আদমি এইসব কাম ভাল না—হাম? তন্দ্রা ভেঙ্গে সে চমকে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে ঐ লোকটাকে দেখে আর কিছু বলতে পারেনি। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসে। মনে তার ভয় হয়েছিল—লোকটা কি করতে কি করে। স্বপ্নে দেখা লোকটির গায়ে যে চাদর দেখেছিল, সেটার সঙ্গে তার বাবার গায়ের একটা চাদরের মিল মনে পড়ছিল। কিন্তু সেই চাদরটা কিছুদিন হল আর তার বাবাকে ব্যবহার করতে সে দেখে না। ছিঁড়ে গেছে কিনা জানে না। তবে ঐ চাদরটা কাঁধে ফেলে বেরুলে তাঁকে খুব ভারিক্কি ভারিক্কি দেখাতো।

আরও অনেক বিষয় তার ভাবানুষঙ্গ থেকে জানতে পারা গেছে। কিন্তু তার আলোচনা এখানে দরকার হবে না। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা গেছে যে রোগীর ঐ বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে মনে যে বাধা ভয়-ভাবনা জেগেছিল বা মনের মধ্যে থেকে গোপনে কাজ করেছিল, সেইগুলিরই মিলিত রূপ স্বপ্নে-দেখা লোকটির চেহারায় ধরা দিয়েছে। বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার পেছনে যে বিয়ের ইচ্ছে তার মনে আছে, সেই ইচ্ছে পূরণের পথে তার যে তিন রকমের বাধা তার মনে আছে সেই সবের একত্রিত রূপায়ণ ঐ স্বপ্নে-দেখা লোকটির সৃষ্টিতে সম্ভব হয়েছে।

এই সংক্ষেপণ ক্রিয়ার উদাহরণ অনেক আছে। কেবল স্বপ্ন সৃষ্টিতেই যে মন তার এই ক্রিয়ার আশ্রয় নেয় তা কিন্তু নয়। আমাদের ব্যবহৃত বহু ঠাট্টা-কৌতুকের মধ্যেও মনের এই সংক্ষেপণ ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা উদ্ভট শব্দ বলা হয়ে যায়। অথবা কথা বলতে ভুল হয়ে যায়। লেখার মধ্যেও ঐরকম ভুল অর্থহীন শব্দ লেখা হয়ে যায় ইত্যাদির অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। এছাড়া সাময়িক অশান্তির নানা নতুন শব্দ রচনায়, বিশেষ যোগ-প্রকাশে এবং কোনো কোনো আচরণেও এই সংক্ষেপণ ক্রিয়ার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এই সংক্ষেপণ ক্রিয়া মন কেবল স্বপ্নের মধ্যেই প্রয়োগ করে এমন নয়। এটা একটা মনের সাধারণ কৌশল, যখন যে-ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ প্রয়োজন বোধ করে মন, তখনই এর প্রয়োগের চেষ্টা করে। সব সময় সে-চেষ্টা সমান সার্থক হয় তা নয়। সংক্ষেপণের চেষ্টা আংশিক ব্যর্থ হয় তাও দেখা যায়। মন তখন তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে যেন ভালমানুষ সাজতে চায়। স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ, যুক্তিগত ইচ্ছার স্বরূপ, যাতে সংজ্ঞানে প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টাতেই মন এই সংক্ষেপণ ক্রিয়া প্রয়োগ করে। কিন্তু স্বপ্নে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা বিষয়ের অংশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়, সেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে, স্বপ্ন দেখার সময় বা ঘুম ভাঙার পরে, স্বপ্নদ্রষ্টা কিছু কিছু তার ইঙ্গিত বুঝতে পারে। অর্থাৎ যে গোপনতার জন্যে এই কৌশলের সাহায্য মন নেয় তা সব সময় পুরোপুরি সফল হয় না। ঠাট্টা ইত্যাদির মধ্যে তো সংক্ষেপণ সত্ত্বেও তার প্রকৃত অর্থের ইঙ্গিত বুঝতে পারা যায়। তা না হলে ঠাট্টাকে আর ঠাট্টা বলে বুঝতেই পারা যাবে না। তখন সেটা হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াবে।

তরুণচন্দ্র সিংহ

শ্যামচাঁদের মন্দির শান্তিপুর

নদীয়া—(২)

পূর্বের কয়েক দশকের লোকগণনার হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের যে অংশটুকু নিয়ে বর্তমান নদীয়া, তার লোকসংখ্যা কোনদিনই খুব বেশী ছিল না। কয়েক দশক ধরে এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় একই থেকেছে, কখনো দশ বছরের ব্যবধানে লোক না বেড়ে কমতে দেখা গেছে। তার প্রধান কারণ ছিল জেলার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে, শহর গেছে জনশূন্য হয়ে। কৃষ্ণনগর শান্তিপুর-বীরনগরের মতো একদা বর্ধিষ্ণু শহরগুলি ম্যালেরিয়া রোগের জন্যই জনহীন হয়ে যায়।

১৮৮১ সালে বর্তমান নদীয়ার লোকসংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৮ হাজার, কিন্তু দশ বছর বাদে, ১৮৯১ সালে ঐ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার। আরও দশ বছর বাদে দেখা যায়, নদীয়ার লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটে ঐ ৭ লক্ষ ৭৩ হাজারেই থেকে গেছে। ১৯২১ সালে নদীয়ার লোকসংখ্যা আবার বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়ে হয় ৭ লক্ষ ১১ হাজার, ১৯৩১ সালেও নদীয়ার লোকসংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ২২ হাজার যা ছিল তার চল্লিশ বছর আগের লোকসংখ্যার চেয়েও কম। তারপর ১৯৪১ সালে, স্বাধীনতার আগের শেষ গণনায় দেখা যায়, নদীয়ার লোকসংখ্যা হঠাৎ কিছুটা বেড়ে ৮ লক্ষ ৪০ হাজার হয়েছে। যদিও ঐ সংখ্যার সঙ্গে ১৮৮১ সালের লোকসংখ্যার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না, তবু ঐ পূর্ব দশকের তুলনায় হঠাৎ লাফ খানেক লোকবৃদ্ধিকে সেদিন অস্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালের লোক-গণনা হয়েছিল দারুণ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে সেকারণে জেলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ই সেদিন যতটা সম্ভব নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে জেলার জনস্বাস্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল সেটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়েছিল।

কিন্তু আরও দশ বছর বাদে, ১৯৫১ সালে জেলার লোকসংখ্যা প্রায় দেড় গুণ বেড়ে যে ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার হয়েছিল সেটা কোন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ছিল না। কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ও সেই সঙ্গে নদীয়া বিভক্ত হওয়ার পর নদীয়ার অপরাংশ ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে দলে দলে লোক নদীয়ায় এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে।

নদীয়ার ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৫০জন মুসলমান ১৯৪৭-৫১ সালে পূর্ববঙ্গে চলে যায়। পরে অবশ্য তাদের মধ্যে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫৯৫জন ফিরে আসে। পশ্চিমবঙ্গের আর কোন জেলা থেকে এত বেশি মুসলমান দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে চলে যায়নি। অপরদিকে, ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪৭-৫১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে মোট ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৬২ জন উদ্বাস্তু নদীয়ায় এসে নদীয়ার নিজস্ব ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ২২৫ জন লোকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোট ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার লোক হয়। মুখ্যত মুসলমানদের দেশত্যাগের জন্যই নদীয়ার নিজস্ব লোকসংখ্যা পূর্ব দশকের তুলনায় প্রায় দুই লক্ষ হ্রাস পায়। লোকসংখ্যার এই হিসাবগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, নদীয়ার বর্তমান লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু।

১৯৭১ সালে নদীয়ার লোকসংখ্যা ছিল ২২,২৯,০২২। তার মধ্যে পুরুষ ১১,৪৩,৩৬৭ এবং নারী ১০,৮৫,৬৫৫। অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৫০। ৬১—৭১ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে লোকবৃদ্ধির হার ২৭-২ শতাংশ, কিন্তু নদীয়ায় লোক বেড়েছে ৩০ শতাংশ হারে। বলা বাহুল্য অবিরাম ধারায় উদ্বাস্তু আগমনই এই অস্বাভাবিক লোক বৃদ্ধির কারণ। '৭১ সালে ২২ লক্ষ ২৯ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ১২ হাজার ছিল পূর্ববঙ্গের মানুষ। জেলার গয়েশপুর, চাটাগঞ্জ, গোকুলপুর, তাহেরপুর, ধোশবাস মণ্ডলা, ফুলিয়াপুর প্রভৃতি নতুন জনপদগুলি সম্পূর্ণরূপে উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ।

নদীয়া আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ জেলা হলেও লোকসংখ্যার তালিকায় অষ্টম স্থানাধিকারী। রাজ্যের ৪-৪৭ শতাংশ স্থান নিয়ে নদীয়া কিন্তু এখানে বাস করে রাজ্যের ৫-০২ শতাংশ লোক। ১৯৬১ সালে নদীয়ার প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনত্ব ছিল ৮৩৭, যখন পশ্চিমবঙ্গের ছিল ৩৯১; দশ বছর বাদে, পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব হল ৫০৭, নদীয়ায় তখন প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৫৬৮ জনের বাস ছিল।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক অত্যাচার শুরু হলে সেখানকার ১২ লক্ষ লোক নদীয়ায় এসে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের মৃত্যু ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পরেই ঐ উদ্বাস্তুরা দলে দলে স্বদেশে ফিরে যায়।

নদীয়ার মানুষ মুখ্যত হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী। জেলার শতকরা প্রায় ৭৬ জন হিন্দু ও ২৩জন মুসলমান। অবশিষ্ট এক শতাংশের বেশি ভাগ খৃষ্টধর্মী। এছাড়া শিখ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের লোক আছেন কয়েকজন করে। সদর মহকুমার চাপড়া থানায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান। কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে কম। খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোকদের অধিকাংশের বাস কৃষ্ণনগর ও চাপড়া থানায়। জেলার লোকসংখ্যার শতকরা ২৬জন তপশিলি ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের।

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে নদীয়ায় মুসলমানের সংখ্যা ৫,২০,৫৭১ যার মধ্যে পুরুষ ২,৬৫,৯৯৭ এবং নারী ২,৫৪,৭৭৪। ঠিক হিসাবে জেলার মোট লোকসংখ্যার ২৩·৩৪ শতাংশ মুসলমান। নদীয়ায় শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য ; অধিকাংশই সুন্নি এবং কিছু মোহম্মদী সম্প্রদায়ের। নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে সাড়ম্বরে ঈদ মহরম ইত্যাদি ঐসলামিক পর্ব পালিত হয়ে থাকে। জেলায় প্রাচীন মসজিদও আছে অনেকগুলি। এছাড়া পীরের দরগা ত আছেই যেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পুজো দিয়ে থাকে।

নদীয়ার মুসলমানসমাজে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবাগ্রগণ্য হলেন 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা মরমী লেখক মীর মোসারফ হোসেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং জীবনভোর সাহিত্য-সাধনার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সুলেখক মুন্সী মোজাম্মেল হকের জন্ম শান্তিপুরে। 'শাহনামা' অনুবাদ ক'রে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। স্যার আজিজুল হক নদীয়ার আর এক সুখ্যাত সন্তান। তাঁরও জন্ম শান্তিপুরে। কিন্তু কর্মজীবনের সূচনা কৃষ্ণনগরে। অবিভক্ত বঙ্গের মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ভারতের লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য প্রভৃতি নানা সম্মানজনক পদ তিনি লাভ করেন এবং সকল ক্ষেত্রেই যোগ্যতার পরিচয় দেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও নদীয়ার বহু মুসলমান অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশপ্রেমের পুরস্কার-স্বরূপ নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

১৯৭১ সালে জেলায় খৃষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ১৬,৩৩৭। তাঁরা ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইংরেজ শাসনকালে জেলায় খৃষ্টধর্মের প্রচার শুরু হয়। প্রথমে ১৮১১ সালে প্রোটেষ্টান্ট যাজকরা কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, চাপড়া প্রভৃতি স্থানে মিশন স্থাপন করেন। ১৮৩৪ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে সেন্ট জনস সি এম এস স্কুল স্থাপিত হয়। নদীয়ায় প্রথম চার্চ নির্মিত হয় ১৮৩৮ সালে, ভবেরপাড়া গ্রামে। কৃষ্ণনগর ও চাপড়ায় প্রোটেষ্টান্ট চার্চ স্থাপিত হয় ১৮৪১ খৃঃ। ১৮৪৩ সালে জেলায় খৃষ্টধর্মীর সংখ্যা ছিল ৩,৯০২। জেলায় ক্যাথলিকদের প্রচার শুরু হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ১৯০১ সালে অবিভক্ত নদীয়ার ভারতীয় খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল—৭৮৪০, যার মধ্যে ক্যাথলিক ছিলেন ২,১২৫ এবং প্রোটেষ্টান্ট ৫,৭১৫। ইংরেজ শাসনকালে জেলায় প্রোটেষ্টান্টদেরই প্রতিপত্তি বেশি ছিল। কিন্তু এখন প্রোটেষ্টান্ট প্রভাব ক্ষীয়মান, এবং ক্যাথলিকদের খুবই বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। জেলায় অনেক প্রোটেষ্টান্ট ক্যাথলিক হয়ে যাচ্ছেন এমন খবরও আছে।

জেলায় শিক্ষাবিস্তারে, অনাথ পালনে, আর্তের সেবায় খৃষ্টান মিশনারিদের অবদান উল্লেখযোগ্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জেলার খৃষ্টধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইছামতী নদীর তীরবর্তী নাথপুর গ্রামে ১৮৬১ সালে এই দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষটির জন্ম হয়। তিনি নিজেই অল্পবয়সে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নেন। যৌবনে এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত ব্রেজিলে স্থিতি লাভ করেন। তাঁর সামরিক কৃতিত্বের জন্য ব্রেজিল সরকারই তাঁকে কর্ণেল উপাধি দেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ব্রেজিলে তাঁর মৃত্যু হয়।

নদীয়ায় একদা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা হয়। প্রথম যুগে ব্রাহ্মরা নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নদীয়ায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহী হন। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও চাকদায় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ি ও আরও কয়েকজন যুবক কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শান্তিপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রথম উদ্যোগী হন ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে শান্তিপুরে তথা সমগ্র নদীয়ার ব্রাহ্মধর্মের প্রচার নব প্রেরণা লাভ করে। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলে জেলায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহ লোপ পায়। ১৮৯১ সালের লোকগণনায় মাত্র জেলার মোট ৫৩জন নিজেদের ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেন। জেলায় ব্রাহ্মউপাসনালয়গুলি এখনও আছে, কিন্তু অনেক জায়গায় সেগুলির দুয়ার প্রায় সারা বছরই বন্ধ থাকে।

জেলায় জৈনধর্মাবলম্বী যে ক'জন মুষ্টিমেয় লোক আছেন, বলা বাহুল্য, তাঁরা সকলেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। তবে অনেক পুরুষ ধরে এখানে বাস করে সম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে গেছেন এমন মাড়োয়ারির সংখ্যাও কম নয়।

নদীয়ার যে ১৬,৯৩,০০৬জন লোক ১৯৭১ সালে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে তপশিলি সম্প্রদায়ের লোক ছিল ৪৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৮৯জন এবং তপশিলি উপজাতীদের সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ৭৯৯। জেলায় লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি তপশিলি সম্প্রদায়ের বা তপশিলি উপজাতীয়। উপজাতীয়দের প্রায় সকলেই সাঁওতাল। অবশিষ্ট সকলে ওরাঁও।

তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে বাগদি, চামার ধোবা, কালিয়া কৈবর্ত, ঝালো মালো বা মালো, মুচি, নমশূদ্র পাটনি পোদ, রাজবংশী প্রভৃতি।

জেলার সুপরিচিত হিন্দু পরিবারগুলির মধ্যে নদীয়ার রাজবংশই প্রাচীনতম। এই রাজবংশের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ ছিলেন রাজা আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ থেকে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের একজন। আদিশূরের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী যদি সত্য হয় তবে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা

দিগনগরে রাঘবেশ্বর মন্দির

শিবনিবাসের মন্দির

ভট্টনারায়ণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক। তিনি রাজা আদিশূরের দান না গ্রহণ করে স্বীয় অর্থে কয়েকটি গ্রাম কেনেন যা পরবর্তী কালে ভবানন্দ মজুমদার নামে খ্যাত দুর্গাদাস, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ বংশধরদের দক্ষতায় ও বিচক্ষণতায় একটি স্বাধীন রাজ্যোপম বিশাল জমিদারির রূপ ধারণ করে।

কিন্তু নদীয়া যাঁর জন্য ধন্য তিনি রাজা না হয়েও রাজার-রাজা, তিনি নররূপে মাত্র পঞ্চশতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত হলেও প্রকৃতপক্ষে অনাদ্যন্তেরই অংশ। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী, এক ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের রাঙা পায়ের প্রথম ছাপ পড়ে এই নদীয়ার মাটিতে। শুধু প্রেমধর্ম প্রচারের জন্যই নয়, তাঁর দিব্য-জীবনালোকে বঙ্গভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন যেভাবে উদ্ভাসিত হয় তার জন্যও সকল পুণ্যহৃদয় সংস্কৃতিবান ব্যক্তির তিনি পূজ্য। তাঁর প্রেমের বাণী আজ সারা বিশ্বে নন্দিত, তাঁর ভালবাসার পথেই সমস্যাক্লিষ্ট বিশ্বের দিশাহারা মানুষ মুক্তি পেতে চাইছে। মরা মরা থেকেই রাম রাম আর সেই রাম নামে দস্যু রত্নাকরের মহাকবি বাল্মীকিতে উত্তরণ। তেমনই আজ কিছুটা উপহাস ও কৌতুকচ্ছলে যে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' বাণীতে বিশ্ব সোচ্চার, সেই বাণীই বিশ্বকে মুক্তির ও শান্তির পথ দেখাবে একদিন।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে যে বৈষ্ণব-সাহিত্য গড়ে ওঠে তাতে নদীয়ার সন্তান মাধবাচার্য, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, কুলিয়া গ্রামের বংশীবদন প্রেমদাস, কাঁচড়াপাড়ার সেন শিবানন্দ, বলরাম দাস প্রমুখের অবদান আলোচনার অবকাশ এই প্রবন্ধে নেই।

এর পর স্মরণ করি আদি কবি কৃত্তিবাসকে। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবারে শান্তিপুরের অদূরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শুধু বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদই তিনি করেন নি, তাতে তরণী সেনের মতো বীর ও দেশপ্রেমী চরিত্রের সংযোজনও করেছেন, যাতে কবির বাঙালি মানসের সংশয়াতীত পরিচয় মেলে। কবির কাছে বাঙালি জাতির ঋণ অমেয়।

দুর্ধর্ষ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির জন্ম নবদ্বীপে এবং তিনি নিমাই পণ্ডিতের সমকালীন। নব্য ন্যায়ের পণ্ডিত, মিথিলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে মিথিলায় অধ্যয়নকালে সামান্য লক্ষণাঘটিত বিচারে পরাজিত করেছিলেন। তারপর মিথিলা থেকে কোন পুঁথি নকল করে আনা নিষিদ্ধ ছিল বলে রঘুনাথ সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র মুখস্থ করে নবদ্বীপে ফিরে আসেন এবং নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা শুরু করেন। একমাত্র অলোক প্রতিভাধর নিমাই পণ্ডিত ছাড়া আর কারও কাছে রঘুনাথ তর্কে পরাস্ত হননি।

ন্যায়শাস্ত্রের আর এক অবিস্মরণীয় পণ্ডিত বুনো রামনাথ নবদ্বীপের কাছেই এক জনশূন্যপ্রায় স্থানে একটি টোল স্থাপন করেন। এই আত্মভোলা শিক্ষাব্রতী শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যই নয়, তাঁর সর্বপ্রলোভনমুক্ত নিঃস্ব নিরাভরণ জীবনযাত্রার জন্যও সুখ্যাত। শিক্ষাব্রতীদের সর্বকালের আদর্শ বুনো রামনাথ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বাংলা গদ্য-পদ্যে যে নবযুগের সূচনা হয় সেই যুগসূচকদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমান কাঁচরাপাড়ার অদূরবর্তী কাঞ্চনপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। কবি, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিকরূপে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালির কাছে অবিস্মরণীয়। ভারতে ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের কৃতিত্ব ঈশ্বর গুপ্তের। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের সঙ্গী 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' কবিতার রচয়িতা মদনমোহন তর্কালঙ্কারও নদীয়ার মানুষ। ১৮১৭ সালে নদীয়ার বিল্ব গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে, বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের কাজে মদনমোহনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের একপ পরের লোক, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ১৮৩১ সালে নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যুগান্তকারী নীলদর্পণ নাটক ছাড়াও বহু নাটক ও প্রহসন লিখে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে স্বীয় নাম সুপ্রতিষ্ঠিত

বীরনগরের জোড়বাংলা মন্দিরের টেরাকোটা

করে গেছেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান নাট্যকার জীবনের নাট্যশালা থেকে অন্তর্ধান করেন।

১৮৬৩ সালে কৃষ্ণনগরে বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গ-সাহিত্যের তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। অগণিত দেশাত্মবোধক গান ও নাটকের রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকৃতি পর্যালোচনার অবকাশ এই প্রবন্ধে নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রখ্যাত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ মৃত্যু হলে ভারতবর্ষ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত হয়, সেই জলধর সেনও নদীয়ার লোক।

জলধর সেনের জন্ম ১৮৬০ সালে অবিভক্ত নদীয়ার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) কুমারখালি গ্রামে। বহু গ্রন্থের রচয়িতা জলধর সেনের 'রামায়ণী কথা' প্রমুখ কয়েকটি গ্রন্থ একদা অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাহিত্যক্ষেত্রে ও পত্র-পত্রিকার জগতে জলধর সেনের মত সদাশয়, সহৃদয় ও শুভকরা শতভাগ ভদ্রজন খুব বেশি আসেননি।

অবিভক্ত নদীয়ায় জন্মগ্রহণকারী আর এক খ্যাতনামা লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় ১৮৬৯ সালে মেহেরপুর গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরপাঠ্য ইংরেজি রহস্য উপন্যাস অনুবাদেই তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান। তাঁর অনূদিত রবার্ট ব্লেকের দুঃসাহসিক গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি পাঠকালে রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হননি এমন গল্প উপন্যাস পাঠক এ-রাজ্যে খুব বেশি নেই। গোয়েন্দা-কাহিনী অনুবাদ ছাড়াও মূলগ্রন্থ তিনি অনেক রচনা করেছেন। কিন্তু দীনেন্দ্রকুমার স্মরণীয় আরও একটি কারণে। দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের পর শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে যখন বরদার ইংরেজির অধ্যাপকরূপে কর্ম-জীবনের সূচনা করেন তখন বাংলা ভাষায় একেবারেই কথা বলতে পারতেন না। সেই সময় দীনেন্দ্রকুমার তাঁকে বাংলা ভাষা শেখাতে বরদায় যান। ১৯৪৩ সালে, নদীয়া দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আগেই দীনেন্দ্রকুমার স্বগ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় প্রবন্ধ রচনার জন্য খ্যাত জগদানন্দ রায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে অনতিবিলম্বে তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন ও শান্তিনিকেতনে চলে যান। সুন্দর সচ্ছন্দ ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা ক'রে তিনি হাতে-কলমে প্রমাণ করেন যে, কোন বিষয়ের পক্ষেই বাংলাভাষা দুর্বল বা দীন নয়।

রবীন্দ্রযুগে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাবিত হয়েও যাঁরা কাব্য-খ্যাতি অর্জন করেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচি তাঁদের অন্যতম। নদীয়ার যমশেরপুর গ্রামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন বাগচির জন্ম। দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন এই কবি জীবনের অধিকাংশ সময় স্বগ্রামেই অবস্থান করেছেন। তাঁর কবিতায় 'সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে, পড়ে আছে শুধু গড়'—প্রভৃতি ছত্রগুলি বাংলা ভাষায় প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

আর এক নদীয়ার মানুষ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদ, রূঢ় বাস্তব ও দুঃখ-বাদকে কাব্যের বিষয় ক'রে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অনস্বীকার্য আসন লাভ করেছেন। কর্ম-জীবনে ইঞ্জিনীয়ার, কবি যতীন্দ্রনাথের জন্ম শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে। এই কবিরও বহু ছত্র, যেমন 'চেরাপুঞ্জির থেকে একখানি মেঘ ধরে দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?' বাঙালি কাব্য-রসিকদের মুখে মুখে ঘুরেছে।

এই প্রসঙ্গে শান্তিপুরের মানুষ, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্মর্তব্য। সরল নিরাভরণ ভাষায় কাব্যের আবেগ সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা ছিল কবি করুণানিধানের। আশুতোষ বিয়োগে কবির রচনা 'আশিল ঝঞ্ঝা কালবৈশাখী বাংলা অন্ধকার'—একবার যিনি পড়েছেন তাঁর পক্ষে আর ভোলা সম্ভব নয়।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নদীয়ার অব-দানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বীর-বিপ্লবী বাঘা যতীনের কথা বলতে হয়। কৃষ্ণনগরেই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ১৯১৫ সালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার বুড়িবালাম নদীর তীরে ইংরেজের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে বীরের মৃত্যুবরণ ক'রে যতীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামকে [illegible] অনুপ্রাণিত করেন তার তুলনা অন্য [illegible] নেই। যতীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালির নন সারা ভারতের গৌরব।

পরের সংখ্যায় গ্রন্থসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন নদীয়ার আর এক সন্তান লালমোহন ঘোষ। ১৮৪৯ সালে কৃষ্ণ-নগরে লালমোহন ঘোষের জন্ম হয়। বাগ্মী-রূপে তিনি ইংলণ্ডেও খ্যাতিলাভ করেন। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লালমোহন।

তাঁর অনুজ ও কবি মধুসূদনের বিশিষ্ট সুহৃদ মনমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগরের নানা সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে কৃষ্ণনগরে মনমোহন ঘোষের মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে তাঁর বাসভবনেই কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল স্থানান্তরিত হয়।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনকালের হিসেব

ধনেপুত্রে (১)

কালের বিচিত্র গতি :

মহাভারতের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যযাতির জয়ার উপাখ্যানে এসে থেমে গেলাম। এই কয়টি লাইন বার বার না পড়ে পারলাম না: 'দেবযানী বললেন, 'অধর্মের কাছে ধর্ম পরাজিত হয়েছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করেছে। পিতা, রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করেছেন আর দুর্ভাগা আমাকে দুই পুত্র দিয়েছেন। ইনি ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত। কিন্তু আমার মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন।'

শুক্র ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ, আমার উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দুর্জয় জরা 'তোমাকে আক্রমণ করবে।' (রাজশেখর বসুর সারানুবাদ)

এই অংশটা বার বার পড়বার কারণ, এর আগেই চোখ বোলাচ্ছিলাম ১৯৭১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনের ওপর আর ভাবছিলাম আমাদের দেশে জনবিস্ফোরণ সংক্রান্ত সমস্যার কথা। ১৯৬১—৭১ এই দশ বছরের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০·৮৭ কোটি বা ২৪·৮ শতাংশ এবং জনসংখ্যার আয়তন দাঁড়িয়েছে ৫৪·৭৯ কোটিতে। ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৭০ কোটির মত। সুতরাং ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান ৭৫ কোটি জনসংখ্যা সমন্বিত চীনের পরই—অর্থাৎ ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ, যদিও ভৌগোলিক আয়তনের দিক দিয়ে পৃথিবীতে ভারতের স্থান সপ্তম। বিগত দশকে (১৯৬১—৭১) ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ২·৫ শতাংশ বা পূর্ববর্তী দশকের (১৯৫১—৬১) তুলনায় ০·৪ শতাংশ বেশী পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হঠাৎ এই রকম বেড়ে যাওয়াতে অনেকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। অনুমান করা হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এইভাবে চললে ১৯৮১ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৭০ কোটির ওপরে এবং এই বিশ শতক অতিক্রান্ত হবার আগেই জনসংখ্যা ১০০ কোটিকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এই সব পরিসংখ্যানপ্রসূত আতঙ্কের ছায়া আমার ওপরও পড়েছিল। টেবিলের উপর উল্টে রাখা এক সাময়িকপত্রের চতুর্থ কভারে 'লাল ত্রিকোণের' বিজ্ঞাপনও নজরে পড়ল : দুটির বেশী এখন আর নয়, তিনটির বেশী কখনই নয়।

মনের বিভীষিকা দূর করবার জন্যেই মহাভারতখানা খুলেছিলাম। কোনখানটা পড়ব ঠিক করতে না পেরে পাতাই উল্টে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম শুক্রাচার্যের কাছে রাজা যযাতির বিরুদ্ধে দেবযানীর অভিযোগে এসে। ভেবে দেখলাম, দেবযানীর অভিযোগ নতুন কিছু নয়—এ হল এক-জনের জন্যে আরেকজনের ক্ষেত্রে সেই চিরন্তন আশীর্বাদ—'ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর'—ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ। দেবযানী রাজমহিষী হয়েছিলেন, পুত্রবতীও হয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ধারণার মত ধনৈশ্বর্যের ধারণাও আপেক্ষিক বলে দেবযানী যখন দেখলেন যে, তাঁর দুটি পুত্র কিন্তু সপত্নী শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র, তখন তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে পারলেন না। এখন প্রশ্ন, দেবযানী আপেক্ষিকতার মানদণ্ডে নিজেকে লক্ষ্মীহীনা বলে মনে করলেন কেন? কারণ সম্পূর্ণই সমাজবিদ্যাগত — সোসিওলজিক্যাল। মহাভারতের দিনের সমাজে পুত্রকেই সম্পদ বা সম্পদের উৎস বলে গণ্য করা হত। সুতরাং পুত্রসন্তানের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভাল। প্রকৃতির বিধানে পুত্রসন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে (অনেক সময় অকাম্য মনে হলেও) কন্যাসন্তানের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। আবার কন্যাসন্তানের প্রয়োজনীয় সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া শেষ পর্যন্ত পুত্রসন্তানের সংখ্যার পর্যাপ্ত বৃদ্ধি কোনমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং মোট ফল দাঁড়ায় জনসংখ্যা-বৃদ্ধি। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিই ছিল শুধু মহাভারতের যুগে নয়—তার অনেক পরের যুগেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঈপ্সিত লক্ষ্য আর আজ তা পরিণত হয়েছে অভিশাপে। তাই ভাবি কালের কি বিচিত্র গতি।

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

অতীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যে ছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঈপ্সিত লক্ষ্য তার কারণ সহজেই অনুমেয়। কৃষি পশুপালন ইত্যাদি ভিত্তিক জনগোষ্ঠী মানবিক শ্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য। উপরন্তু যুদ্ধবিগ্রহও এই রকম জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে—আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয়েরই প্রয়োজনে তারা যুদ্ধবিগ্রহের পথে না চলে পারে না। এই অবস্থায় পুত্রসন্তান যে সম্পদ বা সম্পদের উৎস বলে গণ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগেও লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডে ১৮০১ সালের আগে সরকারী তত্ত্বাবধানে কোন জনগণনার ব্যবস্থা করা হয় নি। এর আগে অবশ্য বেসরকারী প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডে জনসংখ্যার আয়তন সম্বন্ধে ধারণার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথের সময়ই ডক্টর রিচার্ড প্রাইস নামে এক ভদ্রলোক বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রমাণের প্রচেষ্টা করেছিলেন যে, তিন দশকের মধ্যে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই তথ্যের ফলে প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট (ইয়াংগার) এত শঙ্কিত হয়েছিলেন যে, তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্যের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন পাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। পিট মনে করতেন যে, মোট জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে দেশ ততই সমৃদ্ধির পথে এগোবে। সুতরাং যে দম্পতি যতবেশী সন্তান-সন্ততির পিতামাতা, জাতীয় সমৃদ্ধিতে সেই দম্পতির দান তত বেশী। কিন্তু বিশেষ 'সন্তান-ভাতার' ব্যবস্থা না করলে দরিদ্র জনগণ পরিবারকে সম্প্রসারিত করতে চাইবে না। অতএব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য বা 'সন্তান-ভাতার' ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

বর্তমান দিনে আমাদের কাছে পিটের এই যুক্তি হাসির খোরাকই যোগায়, কিন্তু যখন প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগানের অভাবের দরুন শিল্পপ্রসার ব্যাহত হয় কিংবা চাহিদার তুলনায় স্বল্প শ্রমের যোগান দিয়ে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে টানাটানি চলে, তখন এইরকম যুক্তির অবতারণা করা মোটেই অসম্ভব নয়। এমনকি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরও ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত বলে মনে করা হত। মোট কথা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস দুই-ই অবস্থাবিশেষে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার যেমন কোন ক্ষেত্রেই দ্রব্যমূল্যস্তরের হ্রাস কাম্য বিবেচিত হয় না, তেমনি ভারতের ন্যায় অতি জনবহুল দেশও চায় না যে, জনসংখ্যার আয়তন খানিকটা কমুক। এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, ১৯২১ সালের জনগণনার ফলে দেখা গিয়েছিল, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে সামান্য পরিমাণ—মাত্র ০·৩৫ শতাংশ হ্রাস

পেয়েছে। (এ পর্যন্ত এই একবারই এই রকম ঘটেছে।) এর থেকে তখন অনেকে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, জাতি হিসেবে ভারতীয়রা পৃথিবী থেকে হয়ত লুপ্ত হতে যাচ্ছে। আজ এই আশঙ্কার কথা শুনলে হাসি পায় না কি? অতএব, জনসংখ্যার আয়তন হ্রাস মোটেই কাম্য নয়, কাম্য হল আয়তনের স্থিতাবস্থা এবং তা সম্ভব না হলে বৃদ্ধির হারকে সীমিতকরণ। অবশ্য এই কাম্য বা আদর্শ বিশ্বজনীন নয়, অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশ এই প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেনি বা তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করে না। এদের দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত বিভীষিকার উদ্ভব ঘটে মুনাফামূলক সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটির দরুন। সুতরাং যে সমাজ-ব্যবস্থা মুনাফামূলক নয়, জনসংখ্যাকে সীমিত রাখবার কোন প্রয়োজনীয়তাই তার নেই।

যাই হোক, জনসংখ্যাকে সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তার ধারণা জগৎ লাভ করে আঠার-উনিশ শতকের এক অর্থনীতিবিদের কাছে। ইনি হলেন রেভারেণ্ড টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪)। মাঝখানে এঁকে 'ভুয়ো দার্শনিক' বলে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাঁরই প্রেত বর্তমানে আবার জগতের বৃহত্তর অংশের ঘাড়ে চেপেছে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা, নারীর সন্তানধারণ ক্ষমতার হ্রাস ঘটানো ইত্যাদি নামে ঝাড়ফুঁক তুকতাকের বিরাম নেই। এতে ফল যে কিছু হচ্ছে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু মানব-কল্যাণের ব্যাপক মাপকাঠিতে বিচার করলে এই ফল কতদূর কাম্য তা অবশ্যই বিচার করা প্রয়োজন এবং বিচার করা হবে আমাদেরই দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। তার আগে ম্যালথাসের তত্ত্বের সঙ্গে একটু পরিচয় করা যাক।

টমাস রবার্ট ম্যালথাস :

ম্যালথাসের যুগ ও জগৎ উভয়ই ছিল আশাবাদে ভরা—অগ্রগতি যে ঘটছে এবং ঘটবে মানুষ তা ধরে নিয়েছিল। রিচার্ড প্রাইসের তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা যদি হ্রাস পেতে থাকে, তবে এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনমত বৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে, কারণ বর্তমান জনসংখ্যা জাতীয় সম্পদের অন্যতম প্রধান উৎস—অ্যান ইম্পর্টাণ্ট সোরস্ অফ ন্যাশনাল ওয়েলথ্। কেকটা যেদিক দিয়েই কাটা হোক না কেন, সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী ধারণা নির্ভর করছে মোট সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির ওপর। অন্যভাবে বলতে গেলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে ভবিষ্যতে সমস্যা হয়ে উঠতে পারে, এরকম কোন ধারণাই তখন ছিল না এবং ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকেই অগ্রগতির সূচক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

এই আশাবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছিল উইলিয়াম গডউইনের (১৭৫৬-১৮৩৬) দৃষ্টিভঙ্গিতে। বর্তমান অবস্থাকে তিনি মোটেই সমর্থন করেননি। যে অবস্থায় দারিদ্র্য বিশেষ প্রকট, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বর্তমান, অপরাধপ্রবণতা অতি প্রবল—সে অবস্থাকে কি করে সমর্থন করা যায়? কিন্তু এ-অবস্থা যে থাকবে না—থাকতে পারে না, সে-বিষয়ে গডউইনের ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'পলিটিক্যাল জাসটিস্' গ্রন্থে তিনি দূর ভবিষ্যতে এমন এক অবস্থার উদ্ভবের কল্পনা করেছেন যেখানে 'মুষ্টিমেয় ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্রের অস্তিত্ব থাকবে না... থাকবে না যুদ্ধবিগ্রহ অপরাধ এবং ফলে বিচার-ব্যবস্থা এবং সরকারের প্রয়োজনীয়তা। এছাড়া সব আধিব্যাধি দুঃখ-দুর্দশা হতাশা-দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতিও অতীতের বস্তুতে পরিণত হবে।' কল্পরাজ্যের এক অপূর্ব চিত্র সন্দেহ নেই। ঠিক এই কল্পরাজ্যের ধারণা নয়, এর একটি উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশেষ বিতর্কের বিষয়। উপাদানটিকে সংক্ষেপে 'চূড়ান্ত নৈরাজ্যবাদী সমভোগবাদ'—দি মোস্ট থরোগোয়িং অ্যানারকিক্ কমিউনিজম—বলে বর্ণনা করা যায়। গডউইন কল্পনা করেছিলেন যে, তাঁর কল্পরাজ্যে শুধু ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিই বিলুপ্ত হবে না, বিবাহের অনুষ্ঠানও সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে এবং ফলে নরনারীর যৌন সম্পর্ক নির্ধারিত হবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভিত্তিতে।

মহার্ঘ বলে (দাম ছিল তিন গিনি করে) 'পলিটিক্যাল জাসটিস্' কখনই বহুপঠিত হয়নি, তবে অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বৈঠকখানায় বসে গডউইনের চমকপ্রদ ধারণার আলোচনা করা ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্যতম বিলাসে পরিণত হয়েছিল।

এই রকম একটি আলোচনাকেন্দ্র ছিল অ্যালবেরী হাউস বলে এক ক্যাপাটে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ী। ভদ্রলোকের নাম ড্যানিয়েল ম্যালথাস যাঁর সঙ্গে ডেভিড হিউম এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো উভয়েরই বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ 'ভদ্রলোকদের' মত ড্যানিয়েল ম্যালথাসেরও বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ ছাড়া উপভোগ্য বিষয় আর ছিল না, এবং সুবিধে পেলেই তিনি তাঁর প্রতিভাবান পুত্রকে আলোচনায় আহবান করতেন। তাঁর এই পুত্রই হলেন টমাস রবার্ট ম্যালথাস। রুশোর শিষ্য ড্যানিয়েল ম্যালথাস গডউইনের ধ্যানধারণার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্নই ছিলেন এবং মনে করতেন যে, গডউইনের কল্পরাজ্য সম্পূর্ণ যুক্তিবাদসম্মত। পুত্র রবার্টের ধারণা কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত—তৎকালীন অবস্থা এবং ভবিষ্যতের কল্পরাজ্যের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব তিনি সম্পূর্ণভাবে অনুভব করেছিলেন। পিতার মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রত্যয় উৎপাদন করবার জন্যে রবার্ট তাঁর আপত্তিগুলো বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন যা পড়ে ড্যানিয়েল ম্যালথাস এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি রবার্টকে ঐ পাণ্ডুলিপি ছাপিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এর ফলেই ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হয় এক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের ৫৫

হাজার শব্দের এক নিবন্ধ গ্রন্থ। নামটা কিন্তু জব্বর : অ্যান এস্‌সে অন দি প্রিন্সিপল্‌ অফ পপুলেশান অ্যাজ ইট অ্যাফেক্‌টস দি ফিউচ্যার ইমপ্রুভমেন্ট অফ সোসাইটি। জব্বর নামের জন্যে নয়, ম্যালথাসের যুক্তির ধাক্কায় অনতিবিলম্বেই গডউইনের পলিটিক্যাল জাস্টিস্‌ প্রসূত বা অনুরূপ আশাবাদের সৌধ একবারে ভূমিসাৎ হয়ে পড়ে। কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই ম্যালথাস আশাবাদীদের পায়ের তলা থেকে মসৃণ গালচে টেনে নিয়ে তাদের দাঁড় করিয়ে দেন বিভীষিকার মুখোমুখি।

ম্যালথাসের এস্‌সে অন পপুলেশন বা জনসংখ্যার ওপর রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, প্রকৃতিগত কারণে জনসংখ্যার পক্ষে জীবনধারণের সর্বপ্রয়োজনীয় উপকরণকে অতিক্রম করবার প্রবণতা সকল সময়েই বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রজনন-প্রেরণা এত প্রবল যে অকল্পনীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি অগ্রগতির কোন স্বপ্নকেই সফল হতে দেবে না, বরং সকল সময়ই মানুষকে জীবন-সংকটের সম্মুখীন করে রাখবে। আমরা যে গডউইন-কল্পিত বা অন্য কোন ইউটোপিয়ার দিকে এগুচ্ছি, এ-ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। বরং সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে হবে মানবজাতি ক্রমবর্ধমান হারে অন্নসংস্থানের চিরন্তন অভিশাপে অভিশপ্ত। প্রকৃতি মোটেই বদান্য নয়—কত খোঁড়াখুঁড়ি করি' তবে অন্নকণা পেতে হয়, কিন্তু যতই খোঁড়াখুঁড়ি করা যাক না কেন, বুভুক্ষার তুলনায় শস্যাঙ্কুরের সাড়া সব সময়ই স্পন্দ মনে হবে। যদি কোন সময় পর্যাপ্ত মনে হয়, তবে তা অতি ক্ষণস্থায়ী ভারসাম্যের দ্যোতক, কারণ কয়েক বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা তার জীবনধারণের উপকরণকে অতিক্রম করবে। তখন দেখা দেবে, অর্ধাহার অনাহার দারিদ্র্য অপুষ্টিজনিত ব্যাধি মহামারী এবং হানাহানি।

ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব পড়বার পরই কার্লাইল অর্থনীতিক নিরানন্দময় শাস্ত্র—দি ডিসম্যাল সায়েন্স আখ্যা দেন এবং গডউইন অভিযোগ করেন যে, ম্যালথাস শত শত প্রগতিবিশ্বাসীকে প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত করেছেন।

ম্যালথাসের তত্ত্বের তাৎপর্য :

ম্যালথাসের তত্ত্বের তাৎপর্য হল যে, মানুষের জীবনযাত্রার উপকরণ কখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থায় যে-কোন উন্নয়নের ফল ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। যেমন আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি 'যুগান্তকারী' ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিক ফলপ্রসূ মাত্র—তাদের কার্যকারিতা কখনই দীর্ঘস্থায়ী নয়। অতএব, মাত্র উদ্ভাবনের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না, জনসংখ্যাকে সীমিত রাখার সর্বপ্রচেষ্টাই করতে হবে।

ম্যালথাসের নৈরাশ্যবাদী তত্ত্ব ইয়োরোপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কারণ ছিল অভূতপূর্ব উদ্ভাবন এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রসার। একদিকে যেমন শিল্পপ্রসার, যান্ত্রিক কৃষি, পরিবহণের উন্নয়নের ফলে উৎপাদনের হার কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং অপরদিকে তেমনি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার একাংশকে বিভিন্ন উপনিবেশে সরিয়ে দেবার সুযোগও পাওয়া গিয়েছিল। এর ওপর ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে বর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে উপকরণের ব্যবস্থা করারও অসুবিধে হয়নি। পরিশেষে যুদ্ধে লোকক্ষয়ের জন্যে জনসংখ্যা কতটা বাড়তে পারত, ততটা বাড়েনি।

আমাদের মত উপনিবেশ এবং স্বাধীন অনগ্রসর দেশে তখন স্বাস্থ্যবিধির দুর্দশা এবং বিভিন্ন ব্যাধির প্রকোপের দরুণ প্রতি বছর জনসংখ্যার একটা মোটা অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সুতরাং ম্যালথাসের তত্ত্বের শিক্ষা মানুষ ঠিক লাভ করেনি, বরং ম্যালথাসকে ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভুয়ো দার্শনিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এই ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও সেদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল, কিন্তু আজ আবার ম্যালথাস তাঁর আসন পুনরুদ্ধার করে জাঁকিয়ে বসেছেন। বিভিন্ন দেশে ক্রমাগত বৃহত্তর আকারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধিরোধের ব্যাপক প্রচেষ্টা একদা অস্বীকৃত রেভারেন্ড টমাস রবার্ট ম্যালথাসকে সম্পূর্ণ স্বীকার করাই প্রমাণিত করে। এই স্বীকৃতি হয়ত অপরিহার্য ছিল, কিন্তু জনসংখ্যা সীমিত করার যে বিভিন্ন ব্যবস্থা আমাদের ন্যায় দেশে অবলম্বিত হচ্ছে তার সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে—যেমন তাদের ব্যবহার ও জনসংখ্যার গুণগত দিকের ওপর তাদের ফলাফল ইত্যাদি।

যে প্রসঙ্গ নিয়ে সমীক্ষা শুরু করেছিলাম, তার পুনরুক্তি করা যেতে পারে। দেবযানীর অভিযোগ হল শর্মিষ্ঠা তাঁর দাসী হয়েও তিন পুত্রের জননী, কিন্তু রাজা যযাতি তাঁকে দুটি মাত্র পুত্র দান করেছেন। সুতরাং ধার্মিক হয়েও রাজা অধর্মের কাজ করেছেন। সমাজবিদ্যার দিক দিয়ে অভিযোগটির বোধহয় একটি অন্য তাৎপর্য আছে—জনসংখ্যা (বা পুরুষের সন্তান-সংখ্যা) বাড়ছে কিন্তু অকাম্য প্রান্তে—অ্যাট দি রং এন্ড। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির ফলেও এই অকাম্য প্রান্তে বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এবং ফলে ইউজেনিক্স-এর নির্দেশ ব্যর্থ হতে পারে। এই সব বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব পরবর্তী সংখ্যায়।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব গুহ

একটু উষ্ণতার জন্যে

উপন্যাস

(১৭)

বিকেলবেলা হেঁটে ফিরে এসে ছুটিকে চিঠি লিখতে বসলাম।

ছুটি,

আজ বিকেলে একা একা হাঁটতে গেছিলাম জঙ্গলের পথে। জঙ্গলের পথে একা একা হাঁটার মত এমন আনন্দ আর কিছু নেই। সঙ্গে অন্য লোক থাকলে তার সঙ্গে কথা বলতে হয়, মনোযোগ নষ্ট হয়। মন ভরে, চোখ ভরে আমরা প্রেমিকা, আমার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রেমিকাকে দেখা যায় না, তাকে প্রেম নিবেদন করা যায় না।

প্রকৃতিই আমার একমাত্র প্রেমিকা যে, আমাকে শুধু আনন্দই দিয়েছে, দুঃখ দেয়নি কোনোরকম, তাই ত মাঝে মাঝে প্রকৃতির ছায়ায় এসে নিজের মনের যত রক্তাক্ত ক্ষত আছে সেগুলোকে সারিয়ে তুলি।

পথটা চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উঁচু নীচু। বিকেলের ম্লান সোনা রোদ এসে তার সোনার আঙুল ছুঁইয়েছে বনের নরম কোমল সবুজ গায়ে। যেখানে যেখানে জঙ্গল ফাঁকা, সেখানে চোখ পৌঁছয় দূরের পাহাড়ে—উপত্যকা পেরিয়ে সবুজ ঢাল গড়িয়ে গিয়ে আবার উঁচু হয়ে পাহাড়ে মিশে গেছে।

এখানে ওখানে পায়ে-চলা শুঁড়িপথ লাল মাটির পথ বুড়ো মানুষের উধাও ভাবনার মত নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে জঙ্গলের গভীরে। ইচ্ছে করে, এই সমস্ত পথই যদি আমার জানা থাকত তাহলে কি ভালোই না হত। তাহলে সমস্ত গন্তব্যেই যাওয়া যেত নির্ভুল ঠিকানা চিনে। কিন্তু জীবনের শুঁড়ি পথগুলোর মতই জঙ্গলের শুঁড়ি পথগুলোও সব চেনা যায় না। জানা হয়ে ওঠে না—চোখে পড়ে কোনো ওঁরাও যুবতী লাল শাড়ি পরে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে এসে পৌঁছেছে শুঁড়ি পথ বেয়ে বড় রাস্তায়, কোথাও বা দেখা যায় কোনো বিবশ বৃদ্ধ সমস্ত নতমুখে বিধ্বস্ত করবে বলে [illegible] কঠিন সংস্কারের কালো কুৎসিত কুঠার হাতে অন্য কোনো শুঁড়ি পথে মিলিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তা ছেড়ে।

কত কী ভাবনা ভীড় করে আসে মাথায়, কত কি ভাবনা দানা বাঁধে, গুঁড়িয়ে যায়, আবার দানা বেঁধে ওঠে। কত সুখ-স্মৃতি মনে পড়ে যায়, কত অতীতের আরক্ত কথা, ভাবনায় অজানা ভবিষ্যৎ কোনো হলুদ পাখির মত ডুবন্ত সূর্যকে ধাওয়া করে হারিয়ে যায় জঙ্গলের শরীরে—তাকে ভাল করে দেখার আগে, বোঝার আগেই।

হাঁটতে হাঁটতে পথটা যেখানে একটা টিলার উপরে এসে উঠেছে সেখানে উঠে আসতেই সমস্ত কান, সমস্ত ইন্দ্রিয়, দুঃখে ভরে গেল—চতুর্দিকের তিতিরের কান্নায়।

অনেকদিন আগে রমাপদ চৌধুরীর একটা গল্প পড়েছিলাম, নাম 'তিতির কান্নার মাঠ'। তুমি কি গল্পটা পড়েছ? না পড়লে, গল্পটা পড়ে নিও—রমাপদবাবুর কোনো-না-কোনো গল্প-সংগ্রহের বইয়ে এ গল্প নিশ্চয়ই স্থান পেয়েছে।

যখনি কোনো তিতির কান্নার মাঠে একা একা এমনি কোনো নির্জন ম্লান বিকেলে এসে দাঁড়াই এমনি আমার ঐ গল্পটার কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকের বুকের ভিতরেই একটা তিতির কান্নার মাঠ আছে—সেখানে শুধুই বোবা প্রতিকারহীন প্রাত্যহিক কান্না—যে মাঠে দাঁড়িয়ে [illegible] উজ্জ্বল অথচ অনিশ্চিত জীবনকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু তিতির কান্নার মাঠ পেরিয়ে ঐ টিলা ছাড়িয়ে নেমেছি। দেখি সামনেই ডানদিকে একটি সবুজ মাঠ—কি সব ফসল লেগেছে তাতে—অসময়ে। রোদের সোনা বনের সবুজে মিশে এক দারুণ ছবির সৃষ্টি হয়েছে। এই মাঠ দেখেই আবার বাঁচতে ইচ্ছে করে [illegible] আমাদের চলা উচিত আমাদের বাঁচা উচিত।

[illegible] আমার [illegible] মনে হয় এখানে দুঃখও আছে, আনন্দও আছে, মৃত্যুও আছে জীবনও আছে, আশাও আছে নিরাশাও আছে। প্রকৃতির মত করে আর কোনো প্রেমিকা আমাদের শেখাতে পারে না, এমনকি ছুটিও নাঃ যে, জীবনের চরম ও পরম মানে ও গন্তব্য হচ্ছে একটু উষ্ণতা, সমস্ত শীতার্ত মুহূর্ত সত্ত্বেও, নীচতা, হীনতা স্বার্থপরতা, ঈর্ষা সব সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকা উচিত—বেঁচে থাকা উচিত এই জন্যেই যে, প্রত্যেক তিতির কান্নার মাঠের পরেই একটি সবুজ-সোনার ঢাল থাকে। মনে পড়ে যায় যে, জীবনে আনন্দ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সুখও নয়, এই দুঃখ, এই একাকীত্ব, এই মনে মনে আত্মহননের অনুক্ষণ চিন্তা পেরিয়ে এলে আবার আনন্দের উষ্ণ হাতে হাত রাখা যায়। কিন্তু শুধু কিছুক্ষণের জন্যেই। তবু এত দুঃখ, এত গ্লানি এত অনিশ্চয়তার মাঝে আনন্দই, একমাত্র আনন্দই নীরবে বিরাজ করে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে একমাত্র এক অমোঘ অনাবিল আনন্দই বাঁশী বাজায়।

হঠাৎ একটা অচেনা পাখি ডাক দিতে দিতে, সে ডাক আমার সমস্ত মন, সমস্ত মনের কেন্দ্রবিন্দুকে চমকিয়ে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। হারিয়ে যাবার আগে এ গাছে একবার ও-গাছে একবার বসে বসে তার ছোট্ট ঠোঁটে এক বিরাট আনন্দের আভাস বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমার খুব ইচ্ছে করতে লাগল—তুমি যদি এখন আমার পাশে থাকতে। তোমার ছিপছিপে তন্বী সুগন্ধি শরীর তোমার কেয়াফুলের গন্ধ-ভরা মন, তোমার ভেজা-ভেজা মিষ্টি নরম ঠোঁট তোমার [illegible]-মত কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি নিয়ে তুমি যদি আমার পাশে এই মুহূর্তে থাকতে। যদি থাকতে, তাহলে বিশ্বাস করো, কোনো কথা বলতাম না তোমার সঙ্গে, তোমাকে হাত ছুঁতেও বলতাম না [illegible] তোমার পাশে পাশে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে

অমৃক তোমার দিকে চাইতাম আর ভাবতাম আশায় ভরে যেতাম।

আমি তখন নিশ্চয় করে জানতাম যে, আমি মিসেস কার্ল নই, প্যাট অ্যাসাকিন নই, আমি মিস্টার বয়েলাস নই, এমনকি পরশপাথর খুঁজে-বেড়ানো অশান্ত, অবুঝ কৈশোরের যন্ত্রণায় লাবও নই। অন্তরে বুঝতে পেতাম যে, আমি একা নই, আমার সমস্ত অস্তিত্ব সার্থক তোমার অস্তিত্বে।

তুমি যদি পাশে থাকতে, তবে তোমাকে কোনো স্থূলভাবে পেতে চাইতাম না, মনে মনে পাওয়া ছাড়া। তোমার শারীরিক অস্তিত্ব আমার মানসিক সত্তাকে এক দারুণ সুগন্ধি জৈবিক বনজগন্ধভরা হাওয়াতে ভরিয়ে দিত। বনের মত বনজ ও শারীরিক স্থূলতা আর কিছুই নেই, আবার বনের মত মনজ ও মানসিক সূক্ষ্মতাও আর কিছু নেই। যারা বনকে দু চোখ ভরে দেখেছে, দেখতে চেয়েছে, যারা হৃদয় ভরে বনকে পেয়েছে তারাই একথা স্বীকার করবে।

ছুটি, ও আমার জন্মজন্মের ভালো-বাসার ছুটি, তুমি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছ, কিন্তু আমারও তোমাকে অনেক কিছু শেখাবার আছে।

আমি আইনজ্ঞ বলে তোমাকে জুরিস-প্রুডেন্স বা কনস্টিটিউশ্যানাল আইন শেখাবার মত মূর্খ আমি নই। কারণ আমার চেয়ে বড় আইনজ্ঞ, বড় ব্যারিস্টার লক্ষ লক্ষ আছে। পৃথিবীর সবচাইতে বড় ব্যারিস্টারের রাজত্বও হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বড় বড় খিলানওয়ালা থমথমে বাড়িগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—সেই রাজত্বে কোনো গর্ব নেই, সে রাজত্ব লাবুর রাজত্বের চেয়েও দরিদ্র—। কিন্তু আমি সে রাজত্বের রাজা নই, রাজা হতে চাইনি। আমি আমার বনের রাজা, আমার মনের রাজা। এ রাজত্ব কোনো গম্বুজ-খিলানে, কোনো তকমাধারী আর্দালীর সেলামে সীমিত নয়—এ রাজত্ব দিগন্ত অবধি ছড়ানো আছে—কত ফুল, কত পাখি, কত প্রজাপতি, কত কাঁচপোকা কত পাহাড়, কত নদী, কত লতা, কত গাছ। এ রাজত্বর সীমানা অসীম।

আমার ছাত্রী হবে তুমি ছুটি? তোমার হাত ধরে বনে বনে ঘুরে তোমাকে কত কি শেখাব আমি, কত পাখির নাম, কত ঘাসফুলের নাম, কত কাঁচপোকার নাম। আমি তোমার মত নোট-বই মুখস্ত করে তুমি যেমন ছাত্রীদের পড়াও তেমন করে পড়াব না, আমি তোমাকে বনের পথের পা ফেলে ফেলে, পাখির গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, সূর্য ওঠা এবং সূর্য ডোবার ঘড়ির দিকে চোখ রেখে পড়াব।

আমার ছাত্রী হলে তুমি জানবে, একদিন নিশ্চয়ই জানবে যে বইয়ের মধ্যে কোনোদিনও কিছু লেখা থাকে না, লেখা যায় না যা শাশ্বত, যা চিরস্থায়ী যা তীব্র সত্য, সেই সব চিরকালীন জানা শুধু আছে বনের মধ্যে, তোমার আমার মনের মধ্যে।

তোমার সুন্দর লতানো নারী শরীর, আমার স্বয়ম্ভর ঋজু পুরুষ শরীর, তোমার শারীরিক আর্তি, আমার শারীরিক আর্তি, তোমার মনের দুঃখ এবং আনন্দ মেশা গোঙানী, আমার মনের মন্টাজ এ সমস্তই আমাদের প্রকৃতিই দিয়েছে। প্রকৃতির চেয়ে বড় এনসাইক্লোপিডিয়া কখনও কোনো দেশে হবে না। এর মধ্যেই সব প্রশ্ন, জীবনের সব উত্তর, এর মধ্যেই জ্বালা, এর মধ্যেই নিবৃত্তি, এর মধ্যেই উদ্দাম অশান্ততা আবার এর মধ্যেই সমাধি।

কি ছুটি? তুমি আমার পড়ুয়া হবে?

দ্যাখো কি বলব বলে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলাম, আর কি বলতে বসেছি।

তোমাকে আজ চিঠি লেখার প্রধান কারণ ছিল তোমাকে জানানো যে, রমা এসেছিল আমার কাছে সবান্ধবে।

তোমাকে একটা কথা বলা দরকার যে রমার এবারের ব্যবহার আমাকে অবাক করেছে।

ও আমার কাছে এসেছিল সাদা পতাকা উড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, বুঝতে পারছি না, আমার কি করা উচিত।

তুমি তোমার চিঠিতে তোমার স্বপ্নের কথা লিখেছিলে। আমার ও চিঠি পড়ে খুব অবাক লেগেছে। তাহলে বোধহয় এখনও টেলিপ্যাথী বলে কিছু আছে।

তোমাকে মিথ্যা বলব না, কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে মিথ্যাকে বা ভানকে আশ্রয় করে জীবনে কিছু পাওয়া যায়। পাওয়া যে যায় না, তা নয়, কিন্তু তা নিতান্তই মেকী, স্বল্পস্থায়ী; তাতে আনন্দ নেই। যে-কোনো গভীর আনন্দই গভীর দুঃখ থেকে জন্মায়। গভীরতা না থাকলে দুঃখ বা সুখ কোনোদিনই তেমন করে নিজেকে আচ্ছন্ন করে না বলেই মনে হয়। অন্তরের আচ্ছন্নতার মধ্যেই যদি না বাঁচলাম, জীবনকে সুখে বা দুঃখে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ধরেই যদি না বাঁচলাম, তবে জীবন ত একটা সাড়ে-ছ-আনার নীলামি অভিজ্ঞতার পীড়াক। জীবন ত তা নয়। আমার তোমার কারো জীবনই তা নয়।

রমা আমাকে বলল, আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসিনি, নাকি ভালবাসতে পারিনি। এ কথাটা আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। সত্যিই কি তাই? তাই-ই যদি হয়, তাহলে ত কারো কাছেই আমার কিছু পাবার নেই।

রমা তোমার সম্বন্ধে কতগুলো কথা বলেছে। সে কথাগুলো খারাপ নয়, তোমার চারিত্রিক গভীরতা সম্বন্ধে ওর যা অনুমান ও তাই-ই বলেছে। আজকালকার অনেকের বয়েছে। সে-কথা কি তা তোমাকে নাইই বা বললাম। রমাই ঠিক না তুমিই ঠিক একদিন তা জানা যাবেই হয়ত, এও জানা যাবে যে, তোমরা দুজনেই ঠিক, কেবল আমিই বেঠিক।

তুমি যে কথা স্বপ্নে শুনেছ, সে কথা অবচেতনে আমি তোমাকে যে বলিনি তা নয়। তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল। বার-বার মনে হচ্ছিল, তবে কি আমিই ভুল করলাম? আমার প্রতি ওর উদাসীনতা, ওর খারাপ ব্যবহার, ওর শীতলতা সবই কি এক উষ্ণ ভালোবাসারই এক অভিমানী প্রকাশ? তাও কি সম্ভব? আমিই কি ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলাম?

আবার ভাবলাম, অসম্ভবই বা কি? সব মানুষ ত একরকম নয়, একরকম নয় তাদের অভিব্যক্তির প্রকাশ, তাদের মনের স্বরূপ। ভাবলাম, রমা যে-ভাবে আজ নিজেকে প্রতিভাত করেছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে রমার প্রতি আমি কি অবিচার করব না? অন্যায় করব না? তার প্রতি অন্যায় করে, তার সত্যিকারের ভালবাসা পদদলিত করে আমি যদি তোমাকে নিয়ে সুখী হতে চাই তাহলে কি আমি সুখী হব? তাহলে কি আমি তোমাদের দুজনের প্রতিই অন্যায় করব না? অন্যকে দুঃখ দিয়ে কি কখনও সুখী হওয়া যায়? সত্যিকারের সুখী?

আমি জানি, তুমি কি বলবে। তুমি বলবে যে, অন্য কাউকে দুঃখী না করে এ পৃথিবীতে কেউই কখনও সুখী হয়নি। সুখী হতে হলে জীবনে একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই। তুমি বলবে যে, সুখ কেউই কাউকে হাত বাড়িয়ে দেয় না। আজকের দিনে দাঁতে-দাঁত চেপে লড়ে নিজের সুখ নিজেকেই কেড়ে নিতে হয় অন্যের অনিচ্ছুক হাত থেকে। যে তা না করে, সে মরে।

আমি জানি, আমার এ চিঠি পড়ে তুমি কি ভাববে; কি করবে।

কিন্তু বিশ্বাস করো, তুমি অন্য-কেউ হলে এ কথা অকপটে তাকে লিখতে পারতাম না। সে আমাকে ভুল বুঝত, ভাবত, লোকটা কি দুর্বল? লোকটার কোনো মতি-স্থির নেই, কোনো চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই, লোকটা নিজের সিদ্ধান্তের পাশে নিজে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারে না সেই সিদ্ধান্তকে বাঁচাবার জন্যে।

কিন্তু আমি জানি, তুমি তা ভাববে না। কারণ, তোমার বয়স অল্প হলেও তোমার মনের গভীরতা তোমার দ্বিগুণ বয়সী মেয়েদেরও নেই। তুমি আমার যথার্থ বন্ধু। তোমার মন এবং আমার মনের সমতা আছে বলেই তোমাকে আমার এই বহুমুখী মনের সব কথা বলা যায়, সব [illegible] দেখানো যায়— কারণ আমি বুঝেছি যে তুমি এই অন্তরের আনাচ-কানাচের [illegible] আমার আপন মনকে চিনতে পেরেছ। [illegible]

আমার মনে হয় এই [illegible] তোমাকে সত্যি কথা না বললে আমার মনে [illegible]

থাকি নিঃসঙ্গ [illegible] হব। সে অপবাদ তুমি নিশ্চয়ই আমায় করবে না।

আমি এও জানি যে, তুমি আমাকে ভালোবেসে—তোমার অল্পবয়সী জীবনে কতখানি ঝুঁকি নিয়েছ, কতখানি স্বার্থ-ত্যাগ করেছ, এই পরশ্রীকাতর পরনিন্দায় মুখর সমাজে তুমি নিজেকে কতখানি ক্ষতি-গ্রস্ত করেছ—এবং যা করেছ সব আমারই জন্যে—। সমাজে তোমার কোনো স্বীকৃতি নেই, হবে না (রমা যদি ডাইভোর্স না দেয়) তা জেনেও, শুধু আমার জন্যেই তুমি তোমার সব দাবী ত্যাগ করেছ, শুধু আমারই জন্যে।

এ যে আমার কতবড় প্রাপ্তি, কত বড় গর্ব তা তোমাকে মুখে কোনোদিনও না বললেও তুমি নিশ্চয়ই আমার চোখের ভাষায় তা অন্তরে নিরন্তর বুঝেছ।

এই প্রাপ্তির মধ্যে অনেক দায়িত্ব আছে। তোমার প্রতি আমার অনেক দায়িত্বও জন্মে গেছে। সে দায়িত্ব তুমি কখনও চাপাওনি, কিন্তু সম্পর্কের নিকটতায় সে দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণে আপনা থেকেই আমার উপর বর্তেছে। হয়ত আমি দায়িত্ব-জ্ঞানহীন নই বলেও সে দায়িত্ব আপনা থেকে এসেছে।

তুমি সামান্য কটা টাকার জন্যে এই প্রবাসে চাকরী করবে, একথা আমার ভাবতেই খারাপ লাগে। তুমি জানো যে তুমি সারা মাস কষ্ট করে যা রোজগার করো, আমি কোর্টে গিয়ে যদি একবার মাত্রও দাঁড়াই তাহলেই তার পাঁচগুণ রোজগার করি। তবে, তুমি যদি আমার প্রিয়জন হও, তুমি যদি স্বীকার করো যে, আমি তোমাকে ভালো-বাসি এবং তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমাকে তোমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে কেন বঞ্চিত করো? আমার কি তাতে কষ্ট হয় না? তুমি কি আমার দিকটা কখনও ভেবে দেখোনি? ভালোবাসার জনের জন্যে কিছু করার, করতে পারার মত সুখ আর কি আছে? তুমি কি এ সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও।

আমার ইচ্ছা, তুমি এ চাকরী ছেড়ে দাও। তুমি কোলকাতায় ফিরে চল আমার সঙ্গে। তোমাকে প্রতি মাসে আমি এক হাজার করে টাকা দেব। তুমি আমার পার্সো-নাল সেক্রেটারীর কাজ করবে, আমার লেখা টাইপ করে দেবে, ফ্যান-মেইলের উত্তর দেবে, প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, লেখার প্রুফ দেখে দেবে।

তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান অত্যন্ত তীব্র, আর কেউ না জানুক আমি তা জানি, তাই তোমাকে বিনা-পরিশ্রমে টাকাটা দিতে চাই না। তাতে তোমারও সম্মান থাকবে আমারও আনন্দ হবে, স্বস্তি হবে।

কি? বলো ছুটি? কোলকাতা কবে [illegible] আমার চিঠি পাড় তুমি কি ভাবছ [illegible] কিন্তু তুমি আমাকে ভুল [illegible] এই হঠাৎ-আসায় আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এর প্রতি আমি অবিচার করলাম না ত?

কারো প্রতিই আমি অন্যায় করতে চাই না ছুটি—তুমিও নিশ্চয়ই চাওনা যে, আমি অন্যায় করি কারো প্রতি। তাই তোমার কাছে একটু সময় চাইছি। আশা করি আমাকে এই সময় তুমি দেবে। আশা করি, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। যদি মনে করো আমার এই ভাবনাটাও অন্যায়, তাহলে তোমার কাছে আগেই ক্ষমা চাইছি।

—ইতি তোমার সুকুমার।

চিঠিটা লিখে ফেলতে পেরে হালকা অনেকটা বোধ করলাম।

রমা চলে যাবার পর থেকে এবং ছুটির চিঠি পাবার পর থেকেই এ চিঠিটা লিখব লিখব করে লেখা হয়নি।

আমি নিজেকে সত্যিই বুঝতে পারি না।

যারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে, বুঝে ফেলেছে তাদের আমি ঈর্ষা করি। বোধহয় আমার মন অত্যন্ত নরম বলেই এত কষ্ট পাই, এত দ্বিধা এত দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ছটফট করি। লোকে বলে, পুরুষমানুষদের মন শক্ত হওয়া দরকার। কিন্তু শক্ত হওয়া দরকার তা জানার মধ্যে এবং শক্ত করার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। আর শক্ত করতে হলেও গোড়াটা যথেষ্ট শক্ত কিনা তাও যাচাই করে নেওয়া দরকার। সংশয়ের চোরাবালির উপরে শক্ত মনের কংক্রীটের ইমারত গড়লে তা যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। সেই বাইরের শক্ততা দুর্বলতারই নামান্তর।

আসলে আমি জীবনে এত স্বল্প-সংখ্যক মানুষের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চেয়েছি—ব্যক্তিগত জীবনে যে, সেটাই আমার কাল হয়েছে। রমাকে, এবং কিছুদিন হল ছুটিকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে জানিনি। অনেক জনকে জানায় আমি বিশ্বাস করিনি। জীবনটা এত ছোট, অবকাশের সময় এত কম যে, বেশী লোকের মধ্যে, বেশী লোকের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলে কোনো সম্পর্কেই গভীরভাবে উপভোগ বা উপলব্ধি করা যায় না বলেই সব সময় মনে হয়েছে।

আমার যা মনে হয় তা যে অন্য [illegible] মনে হবে [illegible] কোনো মানে নেই। আমি কেবল আমার নিজের অনুভূতির কথাই বলতে পারি। নিজেকেই জানতে পারলাম না, অন্যকে কেমন করে জানব?

বেশ ছিলাম, মনে মনে রমাকে সম্পূর্ণ-ভাবে বিসর্জন দিয়ে, মনে মনে ছুটিকে তার নতুন সিংহাসনে বসিয়ে মহা আনন্দে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ রমা এসে সব গোলমাল করে দিল।

আমাদের জীবনের প্রতিটি সম্পর্কই যেন হীরের টুকরোর মত। কোন দিক থেকে, কোন্ কোণ থেকে আলো পড়লে মনের সম্পর্কের কোন্ কোণে কোন্ রঙ কখন ঝিলমিলিয়ে ওঠে তা বোঝা শক্ত। রমাকে এতদিন একই আলোয়, একই কোণ থেকে দেখে তার মনের রঙ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে ফেলেছিলাম এবং সে ধারণা যে অভ্রান্ত সে কথাও মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম। হঠাৎ রমা নিজেকে এক অন্য কোণ থেকে প্রকাশ করে আমার পুরোনো জীবনটাকে বাতিল করে দিয়ে এবং নতুন জানাটাকেও নির্দ্বিধায় মানবার সুযোগ ও সময় না দিয়েই চলে গেল।

আমাকে এক নিদারুণ সমস্যার মধ্যে ফেলে গেল।

একবার রমার মুখ অন্যবার ছুটির মুখ আমার মনে বারে বারে ফিরতে থাকে এখন। রমার মুখের দিকে যখন তাকাই, তখন চোখে পড়ে আদরিণী, গর্বিতা এক আত্ম-বিশ্বাসী দাম্ভিক মুখ—সে মুখ আমার অনেক অবহেলায় বুঝি আজ কঠিন হয়ে গেছে। ছুটির মুখের দিকে চাইলে দেখি, অল্পবয়সের অপাপবিদ্ধ সরলতায় ভরা ভালোবাসায় জবজব তরুণ এক খুশীর মুখ, সে মুখের খানিক স্বর্ণলতার মত আমার মনের গাছকে পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে আছে—। এ কখনও কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতে পারেনি যে, আমার মনে ওর সম্বন্ধে এখনো কোনো দ্বিধা আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছা করছিল। কি করে এই সমস্যার সমাধান করব আমি জানি না। হয়ত রমাও আমার জীবনে সত্য ছিল এবং সত্য আছে এবং ছুটিও আমার জীবনে

সত্য—। কিন্তু সত্য বলে কোনো সত্যকে জানলেও একাধিক সত্যকে একই সঙ্গে গ্রহণ করার ক্ষমতা বা উপায় ত আমাদের নেই। তাই আমার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে. আমাকে জানতে হবে, কোন্ সত্যটা দুই সত্যের মধ্যে বড় সত্য। কোন্ সত্যের জন্যে অন্য সত্যকে বিসর্জন দেওয়া চলতে পারে। আমি জানি না, কবে কি করে এই আবিষ্কার সফল হবে।

চিঠিটা শেষ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাইরে ফিকে আলো, ঝোপঝাড়, ঝুপড়ি ঝুপড়ি অন্ধকার। আকাশময় ঝকঝকে তারা।

দূরের পথ দিয়ে কয়লা বোঝাই একটা ট্রাক চামার দিকে যাচ্ছে। ফারস্ট গীয়ারের গোঙানী শোনা যাচ্ছে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে টেইল লাইটের লাল আলো।

হঠাৎ চোখে পড়ল, হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে কে যেন গেট খুলে বাড়ির দিকে আসছে।

তাড়াতাড়ি বাইরের আলো জ্বালিয়ে খুলে দেখি মাস্টারমশাই।

এই পরোপকারী আপনভোলা লোকটি শীতে গ্রীষ্মে যারই যখন অসুখ করে তক্ষুনি রাতবিরেতে হোমিওপ্যাথির বাক্স বগলে করে বেরিয়ে পড়েন। কোনো আবেদনেই তাঁর 'না' নেই। এখানের কত লোক তাঁর ভরসায়ই থাকেন, তার ইয়ত্তা নেই।

মাস্টারমশাই বললেন, লাবুর খুব জ্বর—তাই একবার দেখে গেলাম। তারপর বললেন, বুঝলেন মশাই, আমার কিন্তু অবস্থা ভাল বলে মনে হল না। আমি এ দায়িত্ব একা নিতে চাই না। তাই আপনার কাছে এলাম।

আমি শুধালাম কত জ্বর?

জ্বর অনেক—। কিন্তু শুধু জ্বর জন্যেই নয়, বলছে, ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা—আমার ভয় হচ্ছে হয়ত বা মেনেনজাইটিস।

তাহলে কি হবে? আমি বললাম।

আপনি একবার চলুন। প্যাট সাহেবকে বলে কর্নেল সাহেবের গাড়ি করে যাতে ওকে মাদারের হাসপাতালে এক্ষুনি নিয়ে যাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

আমি মোটা কোটটা গায়ে চাপিয়ে মাস্টারমশাইর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

প্যাটকে ডাকতেই প্যাট আলো জ্বালিয়ে বাইরে এল। আমাদের বলল, তোমরা লাবুদের বাড়ি চলে যাও, আমি এক্ষুনি কর্নেল সাহেবের বাড়ি যাচ্ছি—ওঁর গাড়ির বন্দোবস্ত করতে।

প্যাটকে ডেকে নিয়ে কি কি করা উচিত তা ওকে বললাম।

মাস্টারমশাইর সঙ্গে যখন লাবুদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখি বাড়ির বাইরের মাঠে তিন চারটে খরগোশ কান-

উড়িয়ে শুটিক্ষেতের মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।
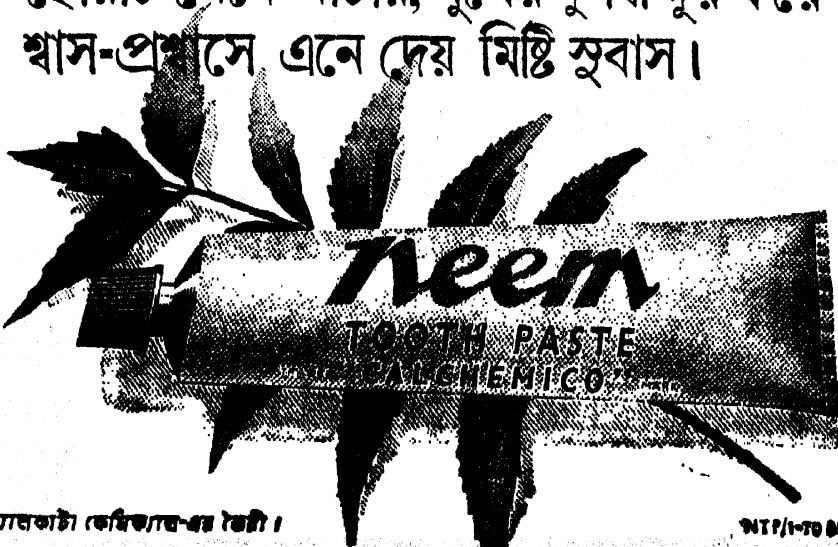
আলো দেখে ও আমাদের গলার আওয়াজ শুনে পালালো বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এসে ক্ষেত সাবাড় করবে বলে মনে হল।

মাস্টারমশাই বললেন, সহায় যখন থাকে না মানুষের, তখন খরগোশের মত প্রাণীও কতখানি ক্ষতি করতে পারে! এদের শুটিক্ষেত নষ্ট করা কি কম ক্ষতির? খরগোশ, শুয়োর, সজারু, ভালুক, এদের জ্বালায় ক্ষেতখামার করার উপায় আছে?

আমি বললাম, কেন? হরিণ শম্বর আসে না?

উনি বললেন, এখানের যত হরিণ শম্বর ছিল, সব সাহেবদের আর ওরাঁওদের পেটে। হাড় চুষেছে, মাস খেয়েছে, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়েছে।

আমরা দরজা ধাক্কা দিতেই লাবুর বড় ভাই ডাবু দরজা খুলে দিল, মুখে কিছু বলল না।

ভিতরের ঘরে আমি আগের দিন ঢুকিনি—এই প্রথম ঢুকলাম।

সমস্ত ঘরটায় দারিদ্র্য দাঁত বের করে আছে। মনে হচ্ছে সব কিছু গ্রাস করে ফেলবে, ফেলেছে। লাবুর মা লাবুর পাশে বসে আছেন সোজা একটি উজ্জ্বল প্রদীপ শিখার মত। মাথার কাছে কেরোসিনের একটা কুপী জ্বলছে। কুপীটা ওঁর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

আমি গিয়ে লাবুর মাথার কাছে দাঁড়ালাম। লাবুর চোখ বন্ধ। লাবু কোন কথা বলল না। বাইরের ঘরে বেঁধে-রাখা বাছুরটা জোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বাইরের ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে, শিশির পড়ার ফিসফিস শব্দের মধ্যে এবং ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ গরুর দীর্ঘশ্বাস কেমন অলুক্ষণে শোনাল।

জঙ্গল থেকে একটা হুতুম-পেঁচা দুর-গুম দুরগুম দুরগুম করে ডেকে উঠল। অকারণেই বুকটা ছমছম করে উঠল।

আমি লাবুর মার মুখের দিকে তাকালাম। সে মুখে কোন বৈকল্য নেই। যাঁরা অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে গেছেন, যাঁদের যেতে হয়, তাঁদের কাছে দুঃখের নতুন কোন অস্বাভাবিকতা বোধহয় থাকে না। আনন্দের মত দুঃখেরও একটা উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু এঁদের জীবনে সুখ বা দুঃখের কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। সমস্ত তরল অনুভূতিগুলো অন্তঃসলিলা হয়ে গেছে। আনন্দেও তাঁরা পাথর, দুঃখেও।

লাবু হঠাৎ বিড় বিড় করে কি বলে উঠল, বলল, চাঁদের পাহাড়, বলল, সাদা ঘোড়া, বলল, পাখিটা। বলেই, থেমে গেল।

আমি কি করব বুঝতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম, প্রত্যেকের জীবনেই এমন এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন অন্যের দুঃখ লাঘব করার কোন উপায় থাকে না, শুধু সেই দুঃখের ভাগীদার হওয়া যায় মাত্র। ঐটুকুই শুধু করা যায়, তার বেশী কিছু নয়।

আমি বললাম, আমাকে একটা খবর দিলেন না?

লাবুর মা বলল, খবর দেব কি বাবা—ঐ বেদেগুলোর জন্যেই এমন হল।

মাস্টারমশাই বললেন, বেদে কোথায়?

লাবুর মা বললেন, বেদেদের একটা দল এসে ইটিটিকারীর জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে যে। ছেলের রোজ সেখানে না গেলে নয়। ওখানে গিয়ে কি খায়, কি করে জানি না। ঐ নোংরা লোকগুলোর কাছে কেন যে ও যায় তাও জানি না।

দ্যাখো ত কোথা থেকে কি অসুখ বাধিয়ে এল। আমার আর ভাল লাগে না। একজন ত অনেক দিন আগেই ড্যাং ড্যাং করে চলে গেছেন— রেখে গেছেন আমার জন্যে যত চিন্তা, যত রাজ্যের কষ্ট। ভগবান আমাকে যে কেন নেন না তা ভগবানই জানেন। গত জন্মে যে কি পাপ করে-ছিলাম, জানি না বাবা। সত্যিই আমি এই সংসার আর টানতে পারি না। বড় ক্লান্ত লাগে আজকাল।

আমরা বসে থাকতে থাকতেই কর্ণেল সাহেবের এ্যাম্বাসাডর গাড়ি এল।

তাঁর ড্রাইভার, তিনি নিজে এবং প্যাট ভিতরে এল।

লাবুকে ভাল করে গরম কাপড়-জামা পরিয়ে কম্বল-ঢেকে গাড়ীর পিছনের সীটে তোলা হল।

লাবুর মা বললেন, আমিও যাব।

প্যাট একটুক্ষণ কি ভেবে বলল, বেশ ত! চলুন।

উনি একটা ছেঁড়া-নীলরঙা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম।

উনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, বললেন, কি দেখছ বাবা? এসব কিছু নয়। এ সবের জন্যে কোন কষ্ট নেই আমার—আমার শীত করে না আজকাল। কষ্ট শুধু এই ছেলেগুলোর জন্যে। ওদের ত এরকমভাবে মানুষ হবার কথা ছিল না।

আমিও গাড়ীতে উঠে বসলাম। কিন্তু প্যাট এবং কর্ণেল সাহেব আমাকে বকাবকি করে নামিয়ে দিলেন।

প্যাট আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, তুমি ত যা করবার করেছ। তোমার যাওয়ার কি দরকার? সঙ্গে গেলে কি বেশী ভালবাসা দেখান হবে? যা করার আমরা করব। তোমার টাকাটা খুব উপকারে লাগবে। আমি টাকা দিয়ে করতে পারি না গতরে করি যা পারি। তুমি টাকা দিয়ে পারো, করো। দুই-ই করা। দুই-ই সমান করা। কোনটা কোনটার চেয়ে খাট নয়। যাও, বাড়ি যাও।

লাবুর মা বললেন, বাবা যাও, তুমি বাড়ি যাও। আমার লাবু তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। তুমি ওকে কত কি দিয়েছ, কত জামা-কাপড়, কত খেলনা। তোমার দেওয়া চাইনীজ চেকারটা নিয়ে আমরা মায়ে-বেটাতে অবসর হলেই বসি। ও কি বলে জানো? আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, পৃথিবীতে তুমি ফার্স্ট, আর সুকুদা সেকেন্ড।

আমি ওকে শুধোই, কিসের ফার্স্ট, সেকেন্ড?

লাবু বলে, আমাকে ভালবাসার।

সকলেই হেসে উঠল মাসীমার কথা শুনে।

আমি বললাম, মাসীমা এখন নয়, সব গল্প পরে শুনব, তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যান।

ওরা চলে গেলে আমি ফিরে এলাম মাস্টারমশাইকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে।

লাবুর কথা ভাবছিলাম।

ছেলেটা ভুল বকছিল। ওর মুখটা মনে পড়ছিল। এক মাথা রুক্ষ চুল, বোঁজা চোখ, লাল ঠোঁট— ও বিড় বিড় করে বলে উঠেছিল, চাঁদের পাহাড়।

সাদা ঘোড়া।

পাখিটা।

লাবু কোন্ পাখির কথা বলছিল কে জানে?

মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছা করে জীবনটাকে ব্যাক গীয়ারে ফেলে আবার লাবুর বয়সে ফিরে যাই, তারপর আবার চাঁদের পাহাড়, সাদা ঘোড়া এবং পাখিদের জগতে প্রবেশ করি।

এই মন নিয়ে, আর এ জীবনে কখনও লাবুর জগতে পৌঁছতে পারব না। সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেছে।

কেন জানি না, আমার মন বলছিল, লাবুর কোন বিপদ হবে না, লাবু ঠিক ভাল হয়ে উঠবে।

ওর সঙ্গে যে আমার কথা হয়েছে এক-দিন ও আর আমি হাত ধরাধরি করে চাঁদের পাহাড়ে যাব।

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

'ভরতপুর যুদ্ধ' বিহারীলাল সরকার রচিত একখানি অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বিহারীলাল (১৮৫৫-১৯২১) 'বিদ্যাসাগর', 'শকুন্তলা রহস্য', 'ইংরেজের জয়', 'তীর্থভূমির' প্রভৃতি কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। 'ভরতপুর যুদ্ধ' ১৩১৩ সালে বঙ্গবাসী পত্রিকার ইলেকট্রো-মেসিন যন্ত্রে, ৩৮।২ ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এককালে ভরতপুর রাজপুতানা প্রদেশের রাজধানী ছিল। ইংরেজ আমলে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধিরূপে একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট ভরতপুর রাজ্য তত্ত্বাবধান করতেন। সে সময় ভরতপুরের উত্তর সীমানায় ছিল গুরগাঁও জেলা, পূর্ব সীমানায় মথুরা ও আগরা, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমানায় ঢোলপুর ও জয়পুর এবং পশ্চিম সীমানায় আলোয়ার রাজ্য।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ভরত রাজার নামানুসারে এই শহরের নামকরণ হয়। ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে জাঠ-জাতীয় রাজা বদনসিং এই ভরতপুর শহরের মধ্যে একটি অত্যন্ত গভীর পরিখা ও প্রাচীরসহ শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন। এই শহর আগরা ও আজমিরের মধ্যবর্তী পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই ভরতপুরে ইংরেজদের সংগে রণজিৎ সিংহের প্রবল যুদ্ধ হয়। এবং এই 'ভরতপুর যুদ্ধ' গ্রন্থ রচনায় বিহারীলাল হান্টার্স ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, এলিয়টস রেসেস অফ দি নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স অফ ইন্ডিয়া, টডস অ্যানেল্স অফ রাজস্থান, উইলসন্স হিস্ট্রী অফ বৃটীশ ইন্ডিয়া প্রভৃতি বহু গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন।

ভরতপুরের এই যুদ্ধে জাঠ জাতির প্রবল বিক্রম ও অতুল রণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটীশ সেনাপতি লর্ড লেককে উপর্যুপরি চারবার পরাভূত হতে হয় ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ১৮০৫ খৃস্টাব্দে এই যুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে দুর্গ অধিকারের জন্য। ইংরেজরা যখন এই দুর্গ আক্রমণ করে, তখন তার মধ্যে যে আট হাজার সৈন্য ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল জাঠ।*

এই যুদ্ধের ন্যায় ভারতীয় অন্য কোন যুদ্ধে ইংরেজদের যেমন এবংপ্রকার দুর্ভোগ, লাঞ্ছনা ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, তেমনি ইংরেজ সৈনিকরাও এই যুদ্ধে কোন সামরিক কৌশল বা শৌর্যবীর্যের যে পরিচয় দিতে পারেনি, সেটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। সেই সময় নাকি ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সিপাহীরা বলত, 'আমরা সকলেই দেখেছি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান পীতাম্বর হরি ভরতপুর রক্ষা করছেন।' তবে সিপাহীরা সত্যই বলুক আর মিথ্যাই বলুক, এটা ঠিকই যে, ভরতপুরবাসীরা ছিল কৃষ্ণভক্ত এবং এই জন্যই সম্ভবত ভরতপুর আজও 'ব্রজ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

আলোচ্য 'ভরতপুর যুদ্ধ' গ্রন্থখানির মধ্যে সাহিত্যসাধক বিহারীলাল পূর্বাপর সমূহ ঐতিহাসিক ঘটনার যে প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন, তা যেমন সুখপাঠ্য ও রোমাঞ্চকর, তেমনি ইতিহাসভিত্তিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

এই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, একজন সাধারণ বাঙালী কিভাবে ইংরেজ পক্ষে অসাধারণ বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখিয়ে তৎকালে জেনারেল পদে ভূষিত হয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে পাঠকবর্গকে অবহিত করার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা। এই ভদ্রলোকের নাম কালু ঘোষ, এবং তিনি আমাদের এই কলকাতারই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এই গ্রন্থের মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ পরিচ্ছেদ আছে। আমরা সেই পরিচ্ছেদটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

বিহারীলাল 'ভরতপুর যুদ্ধ' গ্রন্থের ভূমিকার মধ্যেও এই কালু ঘোষ, তথা কালীচরণ ঘোষ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আর একটি বিষয় বলিতে বাকি আছে। ভরতপুর যুদ্ধে হুগলীর আকনা গ্রামনিবাসী কালীচরণ ঘোষ একটা বিষম সঙ্কটে ব্রিটিশ-বাহিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি জেনারেল কালু ঘোষ বলিয়া পরিচিত। এই বিবরণ পাঠের প্রকৃত ফলশ্রুতি কি, জানি না; তবে এ বিবরণ বাঙ্গালীর নয়নান্তরালে থাকায় লাভ নাই; বরং সম্মুখে থাকিলে অলাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্বপুরুষের গৌরবগাথায় আত্মানন্দ নিশ্চিতই।'

অতঃপর কালু ঘোষের বিস্তারিত বিবরণ এখন 'ভরতপুর যুদ্ধ' গ্রন্থ থেকে বিবৃত করি—

জেনারেল কালু ঘোষ

"২০ বৎসর পরে ইংরেজ ভরতপুর অধিকার করেন। সে অধিকার ব্যাপারে বিষম সংঘর্ষ হইয়াছিল। সেই সংঘর্ষ দ্বিতীয় ভরতপুর যুদ্ধ নামে অভিহিত। সে যুদ্ধ বিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে প্রথম ভারত-পুর যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। ভরতপুর যুদ্ধে একজন বাঙ্গালী যেরূপ অপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়া, ইংরেজ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, সে সাহসের প্রমাণ ইতিহাসে চিরগাথা। কালু ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইংরেজ সৈন্যকে বড় রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাকে লোকে জেনারেল কালু ঘোষ বলিয়া জানে।

ইঁহার যথার্থ নাম কালীচরণ ঘোষ। ইনি কুল পরিচয়ে সহজ মুখ্য কাকুৎস্থ ঘোষের সন্তান, হুগলী-আকনার ঘোষ, মধ্যাংশে দ্বিতীয় পো, পর্যায়ে ১২। কলিকাতা সুকিয়া স্ট্রীটে ইহার বাস ছিল। একটা আক্রমণে ইংরেজ-সেনানী হত হন। সেনানী হত হওয়ায় এই সৈন্যদলও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কালীচরণ ঘোষ এই পলটনে কাজ করিতেন। ইহার বিবেচনা ও বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় রণকৌশলও ইহার জানা হইয়াছিল। ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে হতাবশিষ্ট পলটনের হাবিলদার, সুবেদার প্রভৃতি সেনানীরা আসিয়া ইহাকে বলিল, 'তবে আপনিই জেনারেলের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হুকুম দিন, আমরা যুদ্ধ করি, নতুবা

---

*কিন্তু উক্ত সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলিকে লর্ড লেক ভরতপুর দুর্গ বার বার আক্রমণ করেও অকৃতকার্য হয়ে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য দুর্গের মধ্যে ৮০ হাজার সৈন্য ছিল বলে মিথ্যাভাষণ করেন। অবশ্য এই ঘটনার পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৮২৬ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা দ্বিতীয় ভরতপুর যুদ্ধে এই পরাভবের প্রতিশোধ নিয়ে জয়লাভ করে।

সকলেই বৃথা মারা যাইব, দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে।' কালীবাবু তীক্ষ্ন বিচারে তাহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁবুর ভিতর হইতে 'জেনেরল' পদোচিত পোষাক পরিয়া আসিয়া, পলটন দুর্গটিকে রীতিমত পরিচালিত করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ভাগ্যক্রমে সে যুদ্ধে জয়লাভ হইল। সে যুদ্ধে জয় না হইলে, সে পর্যায়ে একটি লোকও বোধহয় ফিরিত না! তারপর যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে, বিচার বসিল। বিনা আদেশে জেনেরলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, কালী ঘোষ পরে বিচারে নীত হন। বিচারে তিনি দোষী হইলেন, বিচারকেরা বিচার করিয়া তাঁহার ৫০০্ টাকা অর্থদন্ড করিলেন। সামরিক ব্যবস্থানুসারে দন্ড হইল; কিন্তু কালু ঘোষ যে ইংরেজ সৈন্যকে রক্ষা করিলেন, তাহারও ত' পুরস্কার আছে। তাঁহার সে কার্য্যে কিরূপ পুরস্কার পাওয়া উচিত, তাহারও নির্দ্ধারণার্থে বিচার হইল। এবার বিচারে তাঁহার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দেওয়া হইল। ইংরেজরা তাঁহার অসীম সাহসের জন্য ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহাকে ৩০,০০০্ টাকা ও জেনেরল উপাধি দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জেনেরল উপাধি গবর্নমেন্ট হইতে পান নাই, লোকমুখে, রটনামাত্র।*

---

*বিশ্বকোষ, চতুর্থ ভাগের ৪১ পৃষ্ঠায়ও এই অংশটি যথাযথ উদ্ধৃত হয়েছে।

—লেখক

যে কোন শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে দু'দল মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একদল স্রষ্টা আর সবাই উপভোক্তা। কিন্তু স্রষ্টা কখন উপভোক্তা হন, কখনও বা কিছু উপভোক্তা স্রষ্টা। সমালোচকেরা উপভোক্তাদের দলেই পড়েন, স্রষ্টার দলে নয়। সমালোচক পদবাচ্য হবার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে নিজেকে বিশেষ ধরনের উপভোক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে হয়। অর্থাৎ সাধারণ উপভোক্তার তুলনায় সমালোচকের তাঁর বিশেষ শিল্পকলা সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে প্রখরতর এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিজাত অভিজ্ঞতাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার বিশ্লেষণ-বিবেচনা দিয়ে চিহ্নিত করার ক্ষমতা কথঞ্চিৎ বেশী করে তৈরী করতে হয়। কোন শিল্পবস্তু ভাল কি মন্দ তা রায়দান করা তার কর্তব্যের গৌণতম অংশ। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে শিল্পবস্তু কি বার্তা পৌঁছে দিতে চায়, বার্তাবহ শিল্পবস্তু কতটা সার্থকভাবে সেই বার্তা পৌঁছে দেয় বা দেয় না, বার্তাটি তাৎপর্যপূর্ণ কিনা এবং বার্তাবহ শিল্পবস্তু যথেষ্ট উদ্দীপক কিনা এসব তথ্য উপভোক্তা হিসাবে হৃদয়ঙ্গম করে তা ভাষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে অন্যান্য উপভোক্তাদের বুঝতে সাহায্য করাই সমালোচকের প্রাথমিক দায়িত্ব। দ্বিতীয় কর্তব্য শিল্পবস্তু স্রষ্টাকে তার কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করা। অর্থাৎ সমালোচক খানিকটা স্রষ্টা এবং উপভোক্তার মধ্যকার সেতুর মতন। সেতুর মতন সেতু হতে গেলে নড়বড়ে হলে চলে না। সমালোচককে তাঁর কর্তব্য ভালভাবে সম্পাদন করতে হলে শিল্প সম্বন্ধীয় দ্বৈতসমস্যাবলী অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে শিল্পের সাযুজ্যের এবং শিল্পবস্তু নির্মাণের নিজস্ব সর্তাবলী সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে ও অন্যদিকে শিল্পবস্তু উপভোগের সমস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উপভোক্তার উপভোগের অন্তরায়গুলি দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু ক'জন সমালোচক সেই প্রস্তুতি নিয়ে অবতীর্ণ হন? হাতে কাগজ, কলম, ভাষার উপর কিঞ্চিৎ দখল এবং পত্র-পত্রিকাদিতে লেখার সুযোগ থাকলেই কি সমালোচকের দায়িত্ব পালন করা যায়? ফলে অধিকাংশ সময়েই সমালোচনা দায়িত্ববান সমালোচনা হয় না। শিল্পকলা আয়ত্ব করার জন্য শিক্ষা নিতে হয়, কিন্তু সমালোচকদের যেহেতু কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে হয় না সেহেতু নিজের গরজে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার নৈতিক দায়িত্ব সমালোচকের ভাগ্যে বর্তায়। শেষ বিচারে সমালোচকেরা পরগাছা; শিল্প ও শিল্পী বিনা সমালোচকের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এই পরগাছা জাতীয় জীবদের নিজেদের অস্তিত্বকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হলে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার নৈতিক দায়িত্ব নিতেই হয়। সমালোচকরা যেহেতু পরগাছা জাতীয় জীব সেহেতু বিচারকের আসনে বসা তাঁদের সাজে না; তাঁদের কাজ বিশ্লেষণ করা, গবেষণা করা, বড়জোর সবিনয়ে উপভোগের অন্তরায় সম্বন্ধে আলোচনা করা। অবশ্য যেহেতু সমালোচক মূলত উপভোক্তা সেহেতু ভাল শিল্পবস্তু দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক খারাপ শিল্পবস্তু দেখে তার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করা বা নীরব থাকা।

কলকাতার শিল্প প্রদর্শনীর বাধ্যতামূলক দর্শক হিসাবে নিম্নমানের নকলনবীশি কাজ দেখতে দেখতে যদি কোন সমালোচক ক্লান্ত হয়ে পড়েন আর ঠিক সে শহরেই তিনি যদি এমন কোন প্রদর্শনী দেখেন যেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে তরুণশিল্পীদের কাজে কিছু ভাবনা চিন্তার ছাপ রয়েছে, রয়েছে নিজেদের মতন করে কাজ করার সদিচ্ছা, খানিকটা আত্মপ্রত্যয়জাত তরতাজাভাব, তবে সেই প্রদর্শনী দেখে যদি তিনি একটু বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেন তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট-এ অনুষ্ঠিত বিনোদ দাস, আনন্দ রায়, গীতা ভট্টাচার্য, বিশ্বপতি মাইতি এবং অশেষ

শিল্পী : কল্যাণ বসু

শিল্পী ঃ বিনোদবিহারী দাস
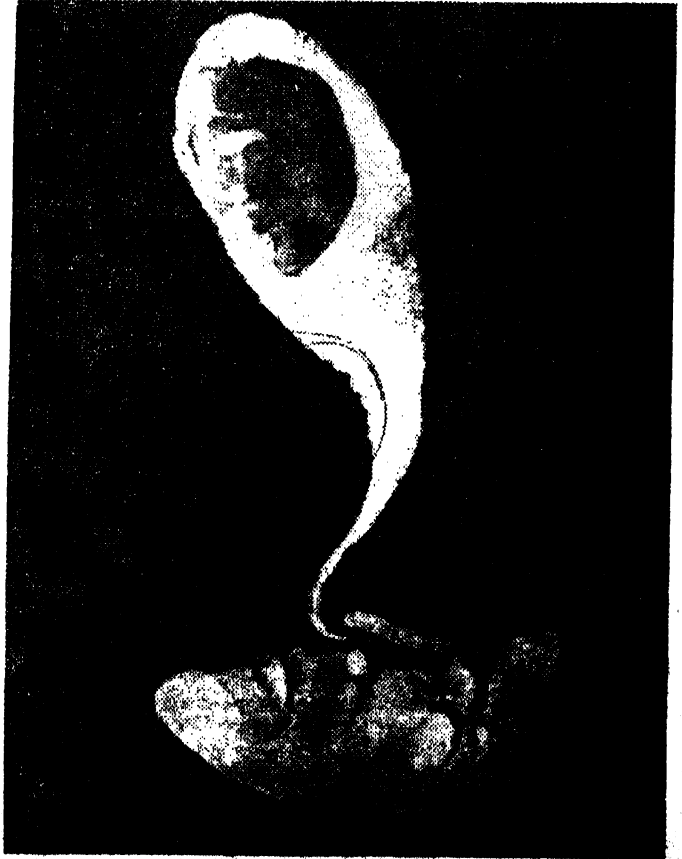
মিত্রর ছবির যৌথ প্রদর্শনী দেখে বর্তমান সমালোচক সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

বিনোদ দাস, আনন্দ রায়, গীতা ভট্টাচার্য এবং বিশ্বপতি মাইতির ছবিতে দৃষ্টিভঙ্গিজাত ভিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় মিল রয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রাথমিক অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছেন। বিনোদ দাস, মনে হয়, এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ আঙ্গিক প্রত্যয়ী। ওঁর ছবিতে বাহ্যজাগতিক বস্তু-সমূহ জ্যামিতিকতাধর্মী আকারে পরিণত হয় এবং জ্যামিতিক আকার সমূহ দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে বিন্যস্ত হয়ে নকশায় পরিণত হয়। একান্তভাবে দ্বিমাত্রিক নকশা হওয়া সত্ত্বেও রঙের গুণে অনেক সময়ে তাঁর রূপবন্ধগুলি খানিকটা ঘনত্ব পায় এবং ছবিতে স্থানে স্থানে গভীরতা আনে। তাঁর ছবির অন্যতম গুণ গতিশীল বক্রাকার রেখা অথবা রেখা-মাত্রিক রূপবন্ধের সঙ্গে পুঞ্জপ্রধান জ্যামিতিক রূপবন্ধের স্থিতিশীলতার দ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনা। এবং তাঁর ছবির অন্যতম দুর্বলতা তাঁর বর্ণপাতভঙ্গি আর কাজের অসম্পূর্ণ রুক্ষতা। আনন্দ রায় তাঁর ছবির জন্য কোন পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নেন না, তাঁর অভিব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য গড়ে তোলেন। আনুভূমিক-ভাবে ছবিকে বিভাজিত করে তিনি জনশূন্য এবং ভয়ানকভাবে সমাহিত প্রান্তর গড়ে তোলেন, সেই প্রান্তরে একটি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত অন্দর্যাজন কোনক্রমে সেই অন্ধ-কারাচ্ছন্ন প্রান্তরের গ্রাস থেকে নিজের আলোকিত অস্তিত্ব বজায় রাখে। চিত্র ক্ষেত্রকে দেশ করে তোলার এবং বর্ণকে অভিব্যক্তি সঞ্চারের কাজে ব্যবহার করার দক্ষতা আনন্দর করায়ত্ব। আনন্দ নবীন চিত্রকর, তাঁর কাজে নোলড, মুংক, কোখসকা প্রমুখ উত্তর ইউরোপীয় অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের যে প্রভাব দেখা যায় আশাকরি বয়সের সঙ্গে তিনি তা আত্মস্থ করে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। গীতা ভট্টাচার্য ও বিনোদ দাসের মতন পরিচিত দৃশ্যাবলীকে সরলীকৃত করে, জ্যামিতিক আকারের সমাহারে দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে নকশা গড়ে তোলেন। গীতার প্রধান অবলম্বন শহরের বাড়ী-ঘর, পার্ক, গাছ-পালা, রাস্তা, খাল, নালা, সেতু। গীতার ছবিতে রঙ এবং আলোর ব্যবহার দেখে মনে হয়, নকশা গড়ে তোলা তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যখন দেখি চিত্রক্ষেত্রের বেশীরভাগ অংশ জুড়ে অন্ধকার, গভীর এবং ধূসর বর্ণের জমাট দেয়াল আর দেয়ালের গায়ে দেয়ালের মধ্যকার দেয়ালের ভিতর দিয়ে তির্যকভাবে ভিতর থেকে আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, বা আলোকিত রাস্তা এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে আসছে, অথবা ব্রীজের তলা দিয়ে জলপথ প্রবাহিনী, তখন মনে হয় তিনি আলো-অন্ধকার, জড়-জৈবের এক রহস্যময় সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যেমন করেন গগনেন্দ্রনাথ এবং লাইয়োনেল ফাইনিঙ্গার। গীতার ছবিতে বিভিন্ন বহির্জাগতিক বস্তুর শৈলীকরণের মধ্যে খানিকটা বৈপরীত্য দেখা যায়। যেমন—বাড়ী যতটা আকার মাত্রিক জ্যামিতিকতা পায়, গাছ ততটা পায় না। ত্রিমাত্রিক প্রেক্ষিত রাখবেন কি রাখবেন না সে নিয়েও উনি খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। বিশ্বপতি মাইতির জগৎ পল্লীগ্রামের ঘর, বাড়ী, জল, নৌকা শিশু, নারী, পাখী, জলচর জীব, গৃহপালিত পশু-পাখী নিয়ে গড়ে উঠেছে। এ জগতের ঘর তাসের ঘরের মতন ঠুনকো, এঘর আশ্রয় দেয় না, জল শুধু জলজ উদ্ভিদ আর কীটের পক্ষেই প্রাণদায়ক কিন্তু মানুষ বা মানুষের হাতে তৈরী নৌযানের পক্ষে মারক। এ জগতে এমন কি নিষ্পাপ শিশুও অসহায়-ভাবে একক অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে। এ জগতে সব কিছু ক্যানসারের মতন জীবন্ত, ক্যানসারের মতনই হু-হু করে বেড়ে ওঠে

শিল্পী ঃ বিশ্বপতি মাইতি

আর প্রাণসংহারক হয়; প্রাণই প্রাণের সংহার করে। শিশুর পদযুগল তার শরীরের ভার বইতে পারে না; নিষ্পাপ ভারবাহী পশু নিজের শরীরের ও আরোপিত ভারের চাপে শ্লথ বিষাদে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। বিশ্বপতির ছবির রূপকল্পের সঙ্গে কিন্তু রঙের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। রঙ বড় পেলব। কখন কখনও রূপবন্ধের জ্যামিতিকতা অভিব্যক্তির প্রতিবন্ধক হয়।

সুনীলমাধব সেনের একক চিত্রকলা

সুনীলমাধব সেন বর্ষীয়ান চিত্রকর। তিনি বহুদিন থেকে চিত্রকর্মে লিপ্ত আছেন এবং তাঁর সমবয়সী পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকরদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে বেশী পরিশ্রমী এবং বহুপ্রসু। প্রদর্শনীতে ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে রচিত তাঁর বিয়াল্লিশটি ছবি স্থান পেয়েছিল।

ছবিগুলি নানা ধরনের, নানা জাতের। সুনীলমাধব নানান শিল্পভাষা, শৈলী এবং রীতিতে কাজ করেছেন। কখনও একই বছরে বিভিন্ন রীতিতে কাজ করেছেন, কখনও বা বহুদিনের ফেলে আসা শৈলীতে আবার ফিরে গেছেন। বিভিন্ন ঐতিহ্য থেকে পাওয়া শিল্পভাষা, শৈলী এবং রীতিকে নিজস্ব করে নেবার একটা প্রয়াসও দেখা যায়। কিন্তু সুনীলমাধবের ছবি থেকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোন ধারণা লাভ করা যায় না, বোঝা যায় না তিনি কেন বিভিন্ন শিল্পভাষা, শৈলী এবং রীতির শরণাপন্ন। আলংকারিকতা সুনীলমাধবের ছবির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেখান থেকে যা নিয়েছেন উনি তাকেই আলংকারিক করে তুলেছেন। পিকাসো, মাতিস, ক্লে, লেজের, মদিগলিয়ানী, মহেঞ্জোদড়ো, কালীঘাটের পট, উড়িষ্যার পট, যামিনী রায় সবাইকে নিয়ে তিনি আলঙ্কারিক নকশা গড়ে তুলেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের রেখা, টান, খোঁচা এবং রেখার পৌনঃপুনিক বিন্যাসে দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে বহির্জাগতিক দৃশ্যভিত্তিক রচনা গড়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু যেখানে তিনি রঙের পর্দা ব্যবহার করেছেন, যেখানে আলোছায়ার ভিত্তিতে ঘনশরীরবিশিষ্ট রূপবন্ধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন সেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সুনীলমাধবের অলঙ্কার প্রবণতা তাঁকে ঘর-সাজানো ছবির চিত্রকরে পরিণত করেছে।

বিকাশ ভট্টাচার্যের একক প্রদর্শনী

সাম্প্রতিককালে যে কয়জন তরুণশিল্পী তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের চিত্রকলা জগতে পশ্চিমবঙ্গের লুপ্ত সুনামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করেছেন বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। যে কোন ক্ষেত্রে সুনামের শীর্ষে উপনীত হতে হলে এবং সেখানে নিজের আসন স্থায়ী করতে হলে যে দক্ষতা প্রয়োজন, সে ক্ষমতা আসে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এবং বহু কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের খুব স্বল্প সংখ্যক চিত্রকর ও ভাস্কর সেই পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। বিকাশ সেই মুষ্টিমেয় চিত্রকরদের অন্যতম, যাঁরা পরিশ্রম এবং বহু কাজের মধ্য দিয়ে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছেন। তেল রঙ, মাধ্যমে বহির্জাগতিকবস্তুরূপানুসারী ড্রইং, আলোছায়ার ব্যবহারে ছবিতে বহির্জাগতিক বস্তুর ঘনত্ব আনয়ন এবং বহির্জগত অনুসারী ত্রিমাত্রিক প্রেক্ষিত রচনায় বিকাশ ঈর্ষণীয় ক্ষমতার অধিকারী।

কিন্তু পরিশ্রম বা কারিগরী দক্ষতাই কোন শিল্পীর কাজকে তাৎপর্যপূর্ণ করে না। দক্ষতা অন্যতম কাঙ্ক্ষিত গুণ সন্দেহ নেই, কিন্তু শিল্পবস্তুর শরীরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা দিতে এবং শিল্পশরীরকে বক্তব্যবাহী করে তুলতে যতটুকু বা যে-প্রকার দক্ষতা প্রয়োজন শুধুমাত্র সেটুকু বা সে-প্রকার দক্ষতাই শিল্পবিচারে অর্থময়। সুতরাং ড্রইং বা বর্ণপ্রয়োগের বা বিন্যাসের দক্ষতা বিচার শিল্পশরীর এবং বিষয় নিরপেক্ষ ভাবে হতে পারে না।

বিকাশ তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিচিত জগৎ থেকে রসদ সংগ্রহ করেন। এই কলকাতার বাড়ী ঘর দোর, রাস্তা ঘাট, অন্দর তাঁর ছবিতে তাদের বাস্তব বিশদে চিত্রিত হয়। কিন্তু না, পরিচিত দৃশ্য বা পরিচিত ঘটনাকে চিত্রিত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। আমাদের কলকাতার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী আমাদের কাছে কত অপরিচিত তা দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলাই বিকাশের উদ্দেশ্য। রূপবন্ধের সংস্থান গুণে তাঁর ছবিতে একটি আবদ্ধ বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়, ফলে চিত্রদেশ শ্বাসরোধকারী বদ্ধ-ক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে। কিন্তু বস্তুপূর্ণ বদ্ধক্ষেত্রও সমভূমিক এবং উচ্চাবচতাবিহীন হবার কারণে শূন্য ক্ষেত্র বলে প্রতীত হয়। এ-হেন পরিবেশে বিকাশ তাঁর ছবিতে মানুষকে স্থাপন করেন। অধিকাংশ সময়েই সেই মানুষ শ্বাসরোধকারী অজৈবিক জন-শূন্য নির্জনপুরীতে নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁর এই একক নিঃসঙ্গ মানুষরা কদাচিৎ সম্পূর্ণ সুন্দর মানুষ। তারা অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু। নিঃসঙ্গ পরিবেশে মানুষের ভেতরকার যে পশুটা বেরিয়ে আসতে চায়, বিকাশ যেন সে পশুটাকে দৃশ্যমান করে তোলেন। কিন্তু পশুটাকে দেখানোই বিকাশের উদ্দেশ্য নয়। বিকাশের সমস্ত উদ্দেশ্য যেন মানুষের অসহায়তা দেখানো। যে মানুষ তার ভিতরকার পশুটার জন্য মনুষ্যসমাজ থেকে নির্বাসিত, স্বপ্নদীর্ণ তার প্রতি করুণা উদ্রেক করাই যেন বিকাশের উদ্দেশ্য। বিকাশের ছবিতে সুন্দর মানুষেরও স্থান আছে। কিন্তু সেই সুন্দর মানুষ দেবীপ্রতিমায় রূপান্তরিত; সে মানুষ সম্পূর্ণ জান্তব নয়। যেন সে একটি আইডিয়া মাত্র যা জীবন্ত মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে কিন্তু ধরা দেয় না। এই জান্তব দেবীপ্রতিমার মধ্যে বিকাশ বিজিতি *femme fatale* র এক দেশজ প্রতীক খুঁজে পেয়েছেন (গগনেন্দ্রনাথের ছবিতেও আমরা একজন দেশজ *femme fatale* -এর সাক্ষাৎ পাই)।

কিন্তু এই সুন্দর দেব-মানবীও একক এ[বং] নিঃসঙ্গ, কিন্তু জ্ঞানী ও স্বাধীন—যত্র[তত্র] স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। বিকাশের ভাব[নায়] যখন যূথবদ্ধ মানুষ এসেছে তখন তা আর মানবিক বিশদে চিত্রিত হয়নি, হয়ে[ছে] ধোঁয়াটে জনারণ্য রূপে।

বিকাশ একান্তভাবে কলকাতা শহরে[র] শিল্পী। না, কলকাতার বাড়ী ঘর অন[্দর] তাঁর ছবিতে স্থান পায় বলেই তিনি কল[কাতার] শিল্পী নন। কলকাতার ইট, কা[ঠ,] পাথর, এঁদো গলির শ্বাসরোধকারী পা[রি]বেশে ব্যক্তিমানুষের জীবনের অসহায়ত[া,] নিষ্ঠুরতা, অপরাধবোধ, নিষ্ফল যূথবদ্ধত[া] এবং অপসৃয়মান সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিষা[দ] সম্পর্কে সচেতনতা তাঁকে কলকাতা[র] শিল্পী করে তুলেছে। পূর্বদেশীয় শিল্পে এমন কোন ঐতিহ্য নেই যা বাস্তব জীবনে[র] প্রাতিভাসিক রূপ এবং অপ্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বকে, জনারণ্যে শূন্যতার দ্বন্দ্বকে, জনারণ্যে নিঃসঙ্গতার দ্বন্দ্বকে, ভারসম্প[ন্ন] ভরাট জমির শূন্যতাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে পারে। অথচ আধুনিক ভারতীয় শহুরে জীবনে এসব সমস্যা বাস্তব সমস্যা। তাই এ[ই] জান্তব বাস্তব সমস্যাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে গিয়ে বিকাশ ইউরোপের সহধর্মী শিল্পী[দের] দের শিল্পকর্ম থেকে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা গ্রহ[ণ] করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি দেশের বাস্তবে দৃঢ়প্রোথিত সেহেতু শিক্ষাকে নিজস্বতা দান করতে তাঁকে কোন বে[গ] পেতে হয়নি। আর এখানেই বিকাশের সার্থকতার মূল রয়েছে।

বিকাশের প্রদর্শনীর আয়োজন করে-ছিলেন 'ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস।' অনস্বীকার্য যে বিকাশ গজদন্ত মিনারবাসী বিশুদ্ধ শিল্পের শিল্পী নন। দৃশ্যমান বাস্তব সম্পর্কে সমালোচনামূলক বক্তব্য, দৃশ্যমান বাস্তবের মানবিকতা বিরোধী অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য বিকাশের ছবির প্রাণস্বরূপ, ছবি সেই প্রাণের বহিরঙ্গ প্রকাশ।

আরও কয়েকটি প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্টে কল্যাণ বসু, নিমাই দাস এবং জিতেন দাসের একটি যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে প্রত্যেকের ছটি করে ছবি স্থান পেয়েছিল। সমস্ত প্রদর্শনীটির উপ-স্থাপনায় খানিকটা অ্যামেচারিশ ব্যাপার ছিল। অথচ প্রত্যেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রকর। প্রত্যেকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে পরিচিত দৃশ্যের রূপায়ণ করেছেন।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টে শ্রীমতী ধনবন্তীর কিছু প্যাস্টেল ও জলরঙে আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীমতী ধনবন্তী পণ্ডিচেরীর আশ্রমের বাসিন্দা। ও'র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী।

—প্রণবরঞ্জন রায়

আলোড়নের সময়ের মহান শিল্পী —লুকাস ক্রানাখ

লুকাস ক্রানাখ : আত্মপ্রতিকৃতি

সম্প্রতি কলকাতার আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনকক্ষে রেনেসাঁসের আলোড়নকারী মহান জার্মান শিল্পী লুকাস ক্রানাখের এক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। রেনেসাঁস যুগে প্রায় লুকাসের সমসাময়িক যেসব শিল্পী তাঁদের মধ্যে আলবেখ্‌ট দ্যুরের গ্রুনেভাল্ট ও হোলবাইনের নামই উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে অর্থাৎ জার্মান শিল্পের ইতিহাসে আলব্রেখ্‌ট দ্যুরের নামই আজ উল্লেখযোগ্য হলেও লুকাস ক্রানাখকে একদম উপেক্ষা করে দেখা যায় না। মোট ৫৬টি ছবির (তেলরঙ এবং কাঠখোদাই সমেত) এক মূল্যবান রত্নভাণ্ডারকে রসিকজনের সামনে উপস্থিত করেছিলেন—কলকাতাস্থ জি ডি আর কনস্যুলেট এবং ইন্দো জি ডি আর মৈত্রী সমিতি। এমন সাধু প্রচেষ্টার জন্য তাদের অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না।

১৯৭৩ সনের ৩ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত প্রদর্শনীটি খোলা ছিল। মহান শিল্পীর মৌলিক কাজ ছাড়াও আরো যে দুটি জিনিস দর্শকের চোখে পড়েছে তার প্রথমটি হল আসল ছবির অনুলিপি যা প্রিন্ট এক কথায় যাকে অসাধারণ বলা চলে। আর দ্বিতীয়টি হল ছবির ফ্রেমিং অথবা বাঁধাই সৌন্দর্যের দিক থেকে একটু নতুনত্ব ছিল বইকি। তিন খণ্ড প্লাইউডকে রঙ করে তার ওপর ছবি জুড়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ছবিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলায় শুধু আকর্ষণীয়ই নয়, নতুনত্বের চমক ছিল বৈকি।

তাঁর ছবিতে প্রকৃতি, প্রতিকৃতি, শিশু, যুবা ধর্ম এবং পুরাণ সম্পর্কিত কাজ ছাড়াও লুকাসের তুলিতে ধরা পড়েছিল খেটে-খাওয়া জন-মজুরের সুখ-দুঃখ আশা-হতাশার এমন কত বিচিত্র রূপ। তাই চার্চের নির্ধারিত সীমানা ছাড়িয়ে কখন যে তাঁর তুলি চলে গিয়েছিল খনি শ্রমিক এবং তার বৌয়ের প্রতিকৃতিতে তা হয়তো তিনিও জানতেন না। সামন্ততন্ত্রের সংকটের দিনে 'রিফর্মেশনই' ছিল অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সংস্কৃতির মূল মন্ত্র। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রিফর্মেশন প্রসঙ্গে বলেছেন—'ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব যার পরিণতিতে ১৫২৫-২৬ সনে 'কৃষক বিদ্রোহ' পরিণতিতেই 'সন্ধিকালের ঘটনা' বা মোড় ফেরা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে নিজেদের কথা বলবার ভাষা খুঁজে পেয়েছিল তা হল রিফর্মেশন প্রচারিত তার শাস্ত্রীয় নীতি। ১৫১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মার্টিন লুথার যখন রিফর্মেশনের আন্দোলন শুরু করেন লুকাস ক্রানাখই হয়ে ওঠেন তাঁর প্রধান প্রচারবিদ (ছবি আঁকার মাধ্যমে)। প্রতিষ্ঠা পায় প্রটেস্টান্ট শিল্প। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে বলকান পর্যন্ত যার প্রভাব পড়েছিল। কৃষক বিদ্রোহ খতম হবার পর একচেটিয়া ক্ষমতা এসে যায় জার্মানির অসংখ্য ক্ষুদে রাজন্যবর্গের ওপর। তাঁরাই রিফর্মেশনের ফলভোগ করতে শুরু করেন। দরবারে শিল্পী হিসাবে ক্রানাখ তখন ভীষণভাবেই সংযুক্ত। গোড়ার দিকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে রেনেসাঁসের বাস্তববাদী শিল্প যে গভীর সংকটে পড়েছিল তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর সৃজনশীল কর্মপদ্ধতি। পরিণতিতে আজকের রুচিকে চরিতার্থ করার 'অবক্ষয়ী ভোগসর্বস্বতা'।

১৪৭২ সালে ক্রানাখের ক্রোনাখ শহরে তাঁর জন্ম। শহরের নাম থেকেই তাঁর নাম। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন ভিটেনবের্ক-এ। বর্তমান জি ডি আর সমৃদ্ধিশালী শিল্পকেন্দ্র। জীবনের শেষ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন ভাইমারে। ভাইমারেই তিনি মারা যান।

শিল্পী ক্রানাখের সমাজ ও শিল্পের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, তা জানা গেল আলোড়নের সময়ের মহান চিত্রশিল্পীর মহান কলাকর্ম দেখে।

—শিপ্রা আদিত্য

সাইন

কলকাতার প্রথম বিদেশী থিয়েটার

পুরোন কোলকাতায় বিদেশী থিয়েটার

বাঙালীর যেমন কালীবাড়ী, ইংরেজের তেমনি থিয়েটার। ইংরেজ যেখানে থাকবে সেখানেই থিয়েটার খুলবে। মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'ইংরেজ সমাজ চিরকালই নাট্যামোদের অনুরাগী। আফ্রিকার শ্বাপদপূর্ণ বনভূমিতে হউক, আর উত্তরমেরুর তুষারাবৃত প্রদেশেই হউক, যেখানেই দশজন ইংরাজ আছেন সেখানেই, তাহাদিগের জন্য, একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, সমুদ্রবক্ষবাহী অর্ণবপোতেরও উপর তাহাদিগের অভিনয়ক্রিয়ার বিরাম হয় না। এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইতেই তাঁহারা নাট্যশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।' প্রকৃতপক্ষে তাই, জব চার্ণকের গড়া কোলকাতায় দলে দলে ইংরেজ এসে যখন নানা কর্মোপলক্ষে বাস করতে লাগল তখন থেকেই থিয়েটার গড়ে উঠতে থাকে। এমনি করেই কোলকাতায় ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল আঠার শতকের ঠিক মধ্যভাগে।

গোটা অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী কোলকাতায় ইংরেজী নাট্যশালাগুলি বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোলকাতায় বেশ কয়েকটি ইংরেজী নাট্যশালা ছিল। অভিনয়ও ছিল উচ্চমানের। ইংলণ্ড থেকে প্রথম না হোক অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ভাগ্য ফেরাতে ইংরেজ হঠাৎ-নবাবদের দেশে আসতেন। কিন্তু প্রথম যুগের রঙ্গালয়ে যে সকল নাটকগুলি অভিনীত হত সেগুলি ছিল মোটামুটি হালকা ধরণের। সিরীয়াস নয়। কিন্তু ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি কালে ইংরেজী নাট্যশালাগুলিতে শেক্সপীয়রের নাটকগুলি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হত—সমসাময়িক সংবাদপত্রে তার উল্লেখ আছে।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' কোলকাতার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনায় তিনি কোলকাতার এক রঙ্গালয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'বীরকীর্তি মনুমেন্ট পরশে গগন,
কলিকাতা-হ'তে রাজদণ্ড সুশোভন,
তার কাছে শোভে এক দরমার ঘর
গীতবাদ্য নাটলীলা তাহার ভিতর।'

দীনবন্ধুর 'সুরধুনী কাব্যের' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর, ১৮৭৬ খৃঃ, কিন্তু লিখিত হয়েছিল ৭১—

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলে ইংরেজী থিয়েটারের উল্লেখ আরও অনেক সমসাময়িক লেখায় দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রথম ইংরেজী থিয়েটার খোলা হয়েছিল দীনবন্ধুর নাটক 'নীলদর্পণের' অভিনয় দিয়ে আরম্ভিত 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামক বাংলার প্রথম পাবলিক থিয়েটারের প্রায় সওয়া শ' বছর আগে। নাম—দি প্লে হাউস অ্যান্ড ড্যানসিং হল; স্থান—লালবাজারের সন্নিকট, কাল—১৭৫০ খৃঃ। সমসাময়িক সংবাদপত্রে 'ওল্ড প্লে হাউস' বলে এর উল্লেখ আছে। চাঁদা তুলে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কোলকাতার দ্বিতীয় পাবলিক থিয়েটার খুলেছিলেন কয়েকজন ইংরেজ মিলে, নিজেদের ভিতর চাঁদা তুলে। বেশ চলছিল, কিন্তু গোলমাল বাঁধল নায়কের ভূমিকা কে নেবে তাই নিয়ে। সবাই চান নায়কের ভূমিকা। উইলিয়াম হিকি তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন যে, নায়কের ভূমিকা নিয়ে গোলমাল শেষ পর্যন্ত 'ডুয়েল' অবধি গড়াল। হাজার ত্রিশেক টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুকাল থিয়েটার বন্ধ রইল।

লেবেডফ যখন কোলকাতায় এলেন তখনও ইংরেজদের বেশ কয়েকটি থিয়েটার চলছিল। লেবেডফ ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করলেন। অভিনয়ের জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। কিন্তু কোলকাতার ইংরেজ থিয়েটারওয়ালারা রুশ এই ভদ্রলোককে পাত্তা দিলেন না। বরং নানাভাবে তাঁর প্রচেষ্টা বানচাল করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। কোলকাতা থেকে লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ভোরেনসভের কাছে সাহায্য চেয়ে লেবেডফ একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিখানির তারিখ ২৬ জুলাই, ১৭৯৭ খৃঃ। এই চিঠিতে ভোরেনসভের কাছে নিজের সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিয়ে লেবেডফ লিখেছেন, "এখানকার পরস্ত্রীকাতর নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ যদি আমাকে না ঠকাইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অর্থশালী হইতে পারিতাম। এখন আমি ইহাদের চক্রান্তের ফলে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছি।" লেবেডফ লিখেছেন যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাকে কোন নাট্য-

শালা ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। ফলে লেবেডফকে চারশত দর্শকের উপযোগী এক নাট্যশালা করে সেখানে তাঁর অনূদিত নাটকের অভিনয় করতে হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে আঠার শতকের শেষভাগেই কোলকাতায় বেশ কয়েকটি ইংরেজী নাট্যশালা ছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দু-একজন অভিনেতা পেশাদার হলেও, অধিকাংশই ছিলেন সৌখীন অভিনেতা। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য অভিজাত ইংরেজ নাটকাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। ফলে, ইংরেজী থিয়েটার শুধু যে প্রমোদকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু মাইকেল মধুসূদনের জীবনীতে লিখেছেন যে, কোলকাতার 'সাঁ-সুসি' থিয়েটারে যারা নাটকাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস হিমান উইলসন, ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্টকুলার, বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারী পার্কার, বোর্ডের সদস্য টরেন্স, ব্যারিস্টার হিউম প্রভৃতি। ভদ্র, অভিজাত এবং উচ্চপদস্থ কোম্পানী কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কোলকাতার ইংরেজী থিয়েটার বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল।

কোলকাতার থিয়েটার অবশ্য ছিল ধনী ইংরেজদের থিয়েটার। সাধারণ ইংরেজদের চড়া দর্শনী দিয়ে থিয়েটার দেখার ক্ষমতা ছিল না। লেবেডফ বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। তাঁর নাটকের দর্শকদের মধ্যে অবশ্য ইউরোপীয়রাও ছিলেন। নাটকাভিনয়ের যে বিজ্ঞপ্তি লেবেডফ সংবাদপত্রে দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে, টিকেটের মূল্য ছিল এই—

Boxes and Pit: Rs 8; Gallery Rs 4

(সিক্কা টাকার হিসাবে); দ্বিতীয় অভিনয়ের জন্য চাঁদা ঠিক হয়েছিল এক মোহর। 'ক্যালকাটা থিয়েটারের' প্রবেশমূল্য ছিল বক্স—১৬ টাকা ও ১২ টাকা, গ্যালারী—আট টাকা। দুইটি অভিনয়ের জন্য 'সিজন টিকেট', একজনের জন্য ৬৪ টাকা, গোটা পরিবারের ১২০ টাকা। এলিজাবেথ ফে কোলকাতা থেকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ লণ্ডনে তার বোনের কাছে যে চিঠি লেখেন, তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'সন্ধ্যেবেলা থিয়েটারে যাওয়ার চেয়ে ভালো সময় কাটানোর আর কিছু নেই। টাকা-পয়সার অভাব না থাকলে আমি কিন্তু একটা অভিনয় দেখাও বাদ দিতাম না। তবে একটি করে স্বর্ণমোহর প্রবেশ দক্ষিণা দিতে হয়। কয়েকঘণ্টার আমোদের জন্য এতটা মূল্য দেওয়া অসঙ্গত।' (সেকালের সমাচার। বিনয় ঘোষ)

(২)

১৬৯০ খৃঃ জব চার্ণক সুতানুটী গ্রামে স্থায়ীভাবে কুঠী স্থাপন করেন। তারও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর কোলকাতায় প্রথম বিলাতী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। ইংরেজ এল অথচ থিয়েটার এল না—এমনটি হবার কারণ কি? কারণ বোধহয় এই যে, কোলকাতা প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোলকাতা ও কোম্পানীর ওপর দিয়ে একের পর এক ঝড় গেছে। ১৬৯৬ খৃঃ শোভা সিংহের হাত থেকে জানমান বাঁচাবার জন্যে ইংরেজের প্রথম দুর্গ গড়ে ওঠে। সারা গাঙ্গেয় বাংলা তথা কোলকাতার তখন চরম আতঙ্ক ও উত্তেজনা। সে উত্তেজনা হ্রাস পাবার পর ইংরেজেরা সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। কোলকাতার প্রথম গীর্জা সেণ্ট জনস্ চার্চ নির্মিত হয় ১৭১৬ খৃঃ। স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় আরো কয়েক বছর পরে।

এই সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যাহত হল ১৭৩৭ খৃঃ প্রচণ্ড ঝড় ও ভূমিকম্পে। এই দৈবদুর্বিপাকে প্রাণ হারায় তিনলক্ষ মানুষ। ঘরবাড়ী গীর্জা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরে শুরু হল বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের হামলা। আবার সামাল সামাল রব পড়ে গেল কোলকাতায়। কাটা হল মারহাট্টা খাত। প্রাণ বাঁচানোই দায়, মাথায় উঠল রঙ্গ-তামাসা। ১৭৫৩ খৃঃ প্রথম থিয়েটার হল। কিন্তু তার প্রায় পর পরই সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ, আলিনগরের সন্ধি, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে ইংরেজরা নিশ্চিন্ত হল। নোতুন করে আবার সাংস্কৃতিক জীবনের চাহিদা জাগল। ১৭৬০ খৃঃ কোলকাতায় আরেকটি থিয়েটার স্থাপিত হল। এই বিলিতি থিয়েটারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চাঁদা তুলে। ইংরেজ ব্যবসায়ী, কোম্পানীর কর্মচারী প্রভৃতি একশত টাকা করে চাঁদা দিয়ে কোলকাতার এই থিয়েটারটির প্রতিষ্ঠা করলেন।

সেকালের কোলকাতা ও আশেপাশের কয়েকটি বিদেশী রঙ্গালয়ের নাম হল ক্যালকাটা থিয়েটার, হুইলার প্যালেস থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার, থিয়েটার বৈঠকখানা, দি এথেনিয়াম, দমদম থিয়েটার, চন্দননগর থিয়েটার প্রভৃতি। কোলকাতার আদি বিদেশী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল লালবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ক্যালকাটা থিয়েটার খোলা হয় বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পেছনে, আর এথেনিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সার্কুলার রোডে। এথেনিয়ামের মালিক ছিলেন মিঃ মরিস। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। ক্যালকাটা থিয়েটার ১৮০৮ খৃঃ বন্ধ হয়ে যায়। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে সাঁ সুসি থিয়েটারের খুব নাম-ডাক ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কোলকাতার চৌরঙ্গীতে একাধিক নাট্যশালা ছিল বলে মনে হয়। ১৮৩০ খৃঃ ১৫ জুলাই 'সমাচার চন্দ্রিকায়' লেখা হয়, 'গত ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার টৌন হলে চৌরঙ্গীর নৃত্যশালার অধ্যক্ষদিগের সাম্বৎসরিক সাধারণ সভা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক কথোপকথন হইয়া যাহা২ প্রয়োজনীয় ছিল তাহা স্থির হইয়াছে।' সমাচার চন্দ্রিকায় পরবর্তী এক সংখ্যায় দমদমের থিয়েটার সম্পর্কে লেখা হয়, 'আমরা জ্ঞাত হইলাম যে ২৬ জুলাই তারিখে দমদমার নৃত্যশালায় তামাসা হইয়াছিল গ্রীষ্মপ্রযুক্ত সকলে আসিতে পারেন নাই বোধ হইতেছে যে এবার অনায়াসে আসিতে পারেন' (সেকালের বাংলা সংবাদপত্র, শ্রীজয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)।

এই সমস্ত থিয়েটারেই সাধারণতঃ হাল্কা ধরনের নাটকের অভিনয় হত। নাট্যশিল্প চর্চা এই জাতীয় বিদেশী রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল হাল্কা প্রমোদ বিতরণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা।

সাঁসুসি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর। কিন্তু এই নাট্যশালা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সমস্ত থিয়েটারের দর্শকদের সকলেই ছিল ইউরোপীয়। সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকের প্রবেশাধিকার ছিল না। আর তা ছাড়া উচ্চপ্রবেশমূল্যের জন্য দেশীয় সাধারণ দর্শক এই সকল থিয়েটারে যাতায়াত করত না। যোগীন্দ্রনাথ বসু মাইকেল জীবন-চরিতে লিখেছেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত সামান্য কয়েকজন অভিজাত বাঙ্গালী এইসকল থিয়েটারে যেতে পারতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে চৌরঙ্গী থিয়েটারের অংশীদার ছিলেন।

কোলকাতায় আদি বিদেশী নাট্যশালা পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই স্থাপিত হলেও, যুদ্ধে জয়লাভের পরই প্রকৃতপক্ষে থিয়েটার নিয়মিতভাবে চালু হয়। 'সিরাজদ্দৌলার কলিকাতাধিকারের সময় ইংরাজদের সেণ্ট এন নামক গীর্জা নষ্ট হইয়াছিল। লালদিঘির স্কচ গীর্জার উত্তর-পশ্চিম দিকে চাঁদা করিয়া একটি থিয়েটার গৃহ করিয়াছিল, উহাতেই তখন উপাসনাকার্য সম্পন্ন হইত। পলাশীর যুদ্ধের জয়লাভের পর থিয়েটার বন্ধ রাখা অনুচিত বলিয়া গভর্ণরাদির মতানুসারে বলপূর্বক অন্যের গীর্জা অধিকার করা উচিত ঠিক হয়...।' (কলিকাতার কথা। প্রমথনাথ মল্লিক, কলিকাতা ১৯৩১, পৃঃ ১৫৪)। নামে থিয়েটার হলেও এই আদি নাট্যশালায় রীতিমত নাটকাভিনয় হত বলে বোধ হয় না।

(৩)

সেকালের কোলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়ে যে সকল নাটকের অভিনয় হত, তা ছিল নিতান্ত হাল্কা ধরনের। প্রত্যেক নাটকের সঙ্গেই আবার একটা করে 'ফার্সের' অভিনয় হত। ক্যালকাটা থিয়েটারে কি জাতীয় নাটকের অভিনয় হত নীচের তালিকায় তা দেখা যাবে এবং এ-থেকে বোঝা যাবে কোলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়ের দর্শকদের রুচির মান কেমন ছিল:—

ক্যালকাটা থিয়েটার

১৭৮০ খৃঃ ৩১ জানুয়ারী সোমবার—Comedy of the Beaux' Stratagem ও একখানি ফার্স

৩১ মার্চ—Comedy of Foundling 3 Like Master like Man.

৪, ১১ এপ্রিল—School of Scandal

১২, ১৯, ২১ আগস্ট— Tragedy on Maromet ও Citizen.
১৭৯৫ খৃঃ — Neck or Nothing
Trick upon Trick
The Farce of Barnaby Brittle.

সেকালের কোলকাতায় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ডুয়েল লড়তেন। ট্যাভার্ণে বসে বড়খানার আমন্ত্রিতগণ রুটী পাকিয়ে পরস্পরের দিকে তাক করে ছুঁড়তেন। সাহেবরা পালকী চড়তেন, দিবানিদ্রায় মগ্ন হতেন, নবাবদের মত আলবোলায় ধূমপান করতেন। গ্রাণ্ডের বাড়ীতে তার স্ত্রীর সংগে অবৈধ প্রণয়ের দায়ে ধরা পড়লেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। বিচারে ফ্রান্সিসের জরিমানা হল। কোলকাতার ইংরাজ কবি লিখলেন :

"A GRAND and a mighty affair to be sure Just to give a light PHILIP (fillip) to nature".

দাস ব্যবসাও চলেছে। ১৭৫৯ খৃঃ ২২ অক্টোবর একজন আর্মেনীয় লর্ড ক্লাইভের নিকট অভিযোগ করে যে লেঃ পেরী পারস্য উপসাগর থেকে একজন আর্মেনীয় স্ত্রীলোককে ক্রয় করে এবং তাকে পাটনায় নিয়ে আসে। তখনকার কোলকাতার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের অনাচার ও বিলাসিতার কথা ক্লাইভও স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"They ride upon prancing Arabian horses, and in palanquin and chaises, they keep seraglios, make entertainments and treat with champagne and claret

এই বিলাস ও ভোগসর্বস্ব ইংরেজদের কাছে নাটক কৌতুকই আকর্ষণীয় ছিল।

প্রথম প্রথম পুরুষেরাই সকল চরিত্রে অভিনয় করতেন। ১৮৪৫ খৃঃ ৮ মার্চ মিসেস ফে বিলাতে তাঁর ভগ্নীর কাছে এক চিঠিতে কোলকাতার থিয়েটারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে লেঃ নর্ফার একজন উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। তিনি এবং মিঃ ব্রাইড স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মিঃ র‍্যাণ্ডেল নামে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ও মঞ্চাধ্যক্ষ কোলকাতার রঙ্গালয়ের জন্য প্রথম অভিনেত্রী নিয়ে আসেন। এই অভিনেত্রীরা এসেছিলেন ইংলণ্ড থেকে এবং তাঁরা প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী না হলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রী ছিলেন এসম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কোলকাতার ইংরেজী রঙ্গালয়ে এ ঘটনা ছিল বিশেষ চাঞ্চল্যকর (বিনয় ঘোষের 'সংস্কৃতি সমাচার' দ্রষ্টব্য)।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে কোলকাতার ইংরেজী থিয়েটারগুলি বেশ জমে ওঠে। তৎকালে থিয়েটারে শেকসপীয়রের আবির্ভাব হয়েছে। শেকসপীয়রের অনেক নাটক তখনকার কোলকাতার বিভিন্ন ইংরেজী নাট্যশালায় অভিনীত হত। কোলকাতার সাঁসুসি থিয়েটারে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এই সাঁসুসি থিয়েটারের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের ইংরেজী নাটকাভিনয়ে উৎসাহ ও নির্দেশাদি দিয়েছেন। এই থিয়েটারের একজন ছিলেন মিঃ ক্লিঙ্গার। ১৮৫৩ খৃঃ ডেভিড হেয়ার একাডেমীর রঙ্গালয়ে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শেকসপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' যে অভিনয় করেছিল, সেই অভিনয়ের শিক্ষাদাতা ছিলেন মিঃ ক্লিঙ্গার। মিস ক্লারা এলিস নাম্নী একজন ইংরেজ অভিনেত্রী ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে অভিনয়-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। মিস এলিসের 'গড়ের মাঠের নৃত্যাগার' ছিল। ১৮৫৫ খৃঃ মিস এলিসের মৃত্যু হয়। মিসেস গ্রীগ্ নাম্নী আর এক ইংরেজ মহিলা ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'মার্চেন্ট অব ভেনিসের' দ্বিতীয় অভিনয়ে পোর্শিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

(৪)

মিসেস ফে তাঁর চিঠিতে কোলকাতার ইংরেজী থিয়েটারের কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন (২৬ মার্চ, ১৭৮১ খৃঃ) যে পেশাদার অভিনেতাদের অভিনয় করতে দেওয়া হত না। কিন্তু অভিনয় ছিল উচ্চমানের, যে কোন ইউরোপীয় স্টেজের সংগে তার তুলনা হতে পারত। তবে কেউই পরিচালকের নির্দেশে অভিনয় করতে রাজী হত না। সবাই নিজ নিজ ইচ্ছামত ভূমিকায় এবং নিজস্ব ঢংয়ে অভিনয় করত। তার ফলে ট্রাজেডী নাটকের অভিনয় দেখে প্রায়ই কমেডী অভিনয়ের মত হাসতে হত। মিসেস ফে 'ভেনিস প্রিজারভড্' নামে একটি নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন তার পত্রে।

ইংরেজী থিয়েটারে অভিনয়ের মান যেমনই হোক না কেন, বিদেশীদের এই সকল রঙ্গালয়ে ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখেই শিক্ষিত বাঙালীর হৃদয়ে সর্বপ্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অংশ বিশেষ অভিনীত হয়েছিল। বাঙালীর থিয়েটারে ইংরেজী নাটকের অভিনয় এই প্রথম (১৮৩১ খৃঃ)। পরবর্তীকালে কোলকাতার স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটক অভিনয়ের ধুম পড়ে যায়। হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্ররা একাধিকবার ইংরেজী নাটকের অভিনয় করেন। কোলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়ে ইংরেজী নাটক দেখবার সুযোগ সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ইংরেজী নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই পেয়েছেন। আধুনিক নাটক ও রঙ্গশালার চমৎকারিত্ব তাদের অভিভূত করেছিল এবং তাদের নাট্যসচেতন করে তুলেছিল। বাংলা রঙ্গালয়ের আবির্ভাবের মূলে এই চেতনা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৮৩৭ খৃঃ ২৯ মার্চ হিন্দু-কলেজের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে শেকসপীয়রের নাটকের অংশবিশেষ আবৃত্তি করা হয়। হেয়ার একাডেমীতে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অভিনীত হয় ১৮৫৩ খৃঃ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'ওথেলো' অভিনীত হয় ১৮৫৩ খৃঃ ২৬ মার্চ। এই বিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চে শেকসপীয়রের 'চতুর্থ হেনরী' নাটকেরও অভিনয় হয়েছিল।

ইংরেজী নাটক ও নাট্যশালা বাঙালীর হৃদয়ে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আবার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নাট্য-পরিচালকগণ প্রত্যক্ষভাবেও বাঙালীর নাট্য-চর্চায় সহায়তা করেছিলেন। মিঃ ক্লিঙ্গার, মিস এলিস, মিসেস গ্রীগ প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাঙালী যুবকদের ইংরেজী নাটকের অভিনয়ে ও রঙ্গালয় সজ্জার ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। হেয়ার একাডেমীতে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের অভিনয় প্রসংগে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন,...'বিদ্যাগারের মধ্যভাগে এক অতি উৎকৃষ্ট নাচঘর প্রস্তুত হইতেছে, কয়েকজন সুনিপুণ ইংরেজ অতি মনোহররূপে তাহা সাজাইতেছেন....।'

১৮৪০ খৃঃ রবীন্দ্রনাথের পিতৃব্য নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রসংগে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লেখেন যে, পূর্বের রঙ্গশালা স্থায়ী হয়নি; নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রচেষ্টা কতখানি সাফল্য লাভ করবে তা-ও নির্ভরশীল দর্শকদের ওপরে—

"but as the individual (an Englishman) with whom it has originated was for sometime connected with the Drury Lane Theatre, and who, we hear, is much esteemed for his histrionic attainments, we can reasonably entertain a hope that it would not altogether prove unsuccessful."

কোলকাতার এমনি এক বিদেশী রঙ্গালয়ে অভিনয় করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন এক বাঙালী অভিনেতা। তাঁর নাম বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য। সাঁ সুসি থিয়েটার উনিশ শতকের মধ্যভাগে কোলকাতার এক নামকরা ইংরেজী থিয়েটার। এই থিয়েটারে 'ওথেলো'র ভূমিকায় অভিনয় করে বৈষ্ণবচাঁদ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই ঘটনা শিক্ষিত বাঙালী সমাজের শ্লাঘার কারণ হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণবচাঁদের অভিনয়ের কথা লিখতে গিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন (২১ আগস্ট, ১৮৪৮ খৃঃ)· 'এতদ্দেশীয় নর্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোনরূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দিক হইতে ধন্য২ শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনিও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন...।'

বৈষ্ণবচাঁদের এই অভিনয় তৎকালীন বাঙালী সমাজে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় অভিনয় দর্শনে দর্শকদের আহ্বান জানিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' পরবর্তী এক সংখ্যায় লেখেন, 'গত নাটকের রজনী-যোগে যাহারা থিয়েটারে গমন করিতে পারেন নাই অদ্য তাহারা [illegible] কদাচ বিরত হইবেন না...। প্রথম উদ্যমে [illegible] সাহেবের সহিত স্বীয় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহাতে অনতিকালে তিনি যে একজন বিখ্যাত [illegible] [illegible] [illegible] কোন সন্দেহ নাই।'

এভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকতে সৌগতের খুবই খারাপ লাগছিল। মনে মনে সবিশেষ বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করছিল। এক-একটি ট্রাম এবং বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াতে উন্মুখ চোখ চেয়ে সীমা-প্রত্যাশিত দৃষ্টি ফেলছিল। সীমা আসছিল না।

সীমা আগে সাধারণতঃ এরকম দেরি করত না। আজকাল প্রায়ই করছে। কেন তা সৌগত বুঝে পেল না। তার মন উন্মনা হয়ে যাচ্ছিল। সে ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর বোলাচ্ছিল।

কথা ছিল, ঠিক তিনটের সময় সীমা তারাতলার মোড়ে বাস স্টপে আসবে। শনিবার দুপুর দুটোয় ওর ছুটি। ধর্মতলা থেকে তারাতলা আসতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়। অথচ পৌনে চারটা হতে চলল তার দেখা নেই। সৌগত যথাসময়েই এসেছে। সেই থেকে এপর্যন্ত পাঁচটা সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানো শেষ। সে সীমা না-আসার নানারকম কারণ খুঁজে পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। কিন্তু কোন আশঙ্কা কিংবা উদ্বেগ বোধ করছিল না। ভিতরে ভিতরে পুঞ্জীভূত ক্রোধ কেবলি ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। ভাবছিল, সীমা কেন যে বোঝে না—আমি এখন আর ছাত্র নয়। একজন অধ্যাপক। ছাত্র জীবনের মত আজকাল সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা শোভন নয়।

সৌগত ভেবে ভয় পেল, সে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যে-কোন ছাত্রের নজরে পড়ে যেতে পারে। ছাত্রটি এগিয়ে এসে হাজারো কথা জুড়তে পারে। আর সেই সময় যদি সীমা এসে যায় কাছে এসে হৃদয়গত সংলাপ সুরু করে—লজ্জার অন্ত থাকবে না। তার ব্যক্তিগত প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপার নিয়ে ছাত্রমহলে মুখরোচক সংবাদ হাসিঠাট্টা চলবে—তা সে ভাবতেই পারে না। সুতরাং সে স্থির সিদ্ধান্তে এল, আজকেই সীমাকে সমস্ত ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে।

সীমাকে কথাটা ঠিক কোন মেজাজে কেমন সুরে বলা যেতে পারে সৌগত অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে তার সাজগোছ করল। একসময় হাতঘড়িতে নজর পড়তে চমকে উঠল। ঘড়ির কাঁটাটা কখন যেন চুপিসাড়ে চার-এর ঘর পেরিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সৌগত এই মুহূর্তে কী করবে তা ভেবে পেল না। তীব্র মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে স্টপে এসে দাঁড়ানো ট্রামটার দিকে তাকাল। সীমা তাহলে সত্যিই এল। সৌগত একরাশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে মনে মনে জানত, দেরিতে হলেও সীমা শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত আসবে। কিন্তু সেই আসাটা যে এত দেরিতে তা আদপেই ভাবতে পারেনি। আগে জানলে সে নিজেও হয়ত আরো একটু দেরি করে আসত।

সীমা কাছে এসেই ব্যস্ততা দেখাল। সামনের রেস্তোরাঁ লক্ষ্য করে বলল আগে চল চা খেয়ে নেই। তারপর কোথাও যাওয়ার কথা ভাবা যাবে। কথাটা শেষ করেই সামনে পা বাড়াল। সৌগত কোন জবাব না দিয়ে চারপাশে সন্ধানী নজর বুলিয়ে নিল। তারপর সীমাকে লক্ষ্য করে সামনে রেস্তোরাঁর পথে পা বাড়াল।

ওরা দুজনে রেস্তোরাঁর সর্বশেষ কোণের কেবিনে পাশাপাশি বসল। তরুণ-বয়সী বেয়ারা ছেলেটা তড়িতে পর্দা টেনে দিল। ফ্যানের হাওয়ায় পর্দাটা ঈষৎ উড়ছিল। উড়ন্ত পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে টেবিলের লোকগুলোকে স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছিল। দু-এক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি হয়ত সীমাকে বেশিরকম বিদ্ধ করছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে আরো ভালভাবে পর্দাটা টেনে দিল। অতঃপর দুজনেই পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে সহজ হতে পারল।

সীমা সৌগতের গা-ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে কাঁধের ঝুলন্ত ব্যাগটা টেবিলে রাখল। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম এবং মুখের মালিন্য মুছে জিগ্যেস করল, তুমি কতক্ষণ হল এসেছো? প্রশ্নটার কোন উত্তর প্রত্যাশায় না-থেকে আগেভাগে কৈফিয়ৎ জুড়ল, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ট্রামে-বাসে যা ভিড়—উঠতেই পারছিলাম না।

সৌগত এ ধরনের কৈফিয়ৎ শুনে অভ্যস্ত। স্বভাবতই কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। নির্বাক গাম্ভীর্যে উদাসীনভাবে বসে রইল। সীমার দিকে ফিরেও তাকাল না। বরং এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সে যে ক্ষুব্ধ তা বোঝাবার মত আচরণ করতে থাকল।

সীমা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাঁ-হাতের তালুতে মুখ রেখে সৌগতের চোখে চোখ মেলাবার চেষ্টা করল। পারল না। ফলতঃ মুখ তুলে নিয়ে পাতলা ঠোঁটে হাসির ঝিলিক তুলে বলল, মহারাজ দেখছি খুবই চটেছেন। সে টেবিলে সন্টপট ঠুকে বেয়ারাকে জানান দিয়ে বলল, আগে বাপু চা খেয়ে নেই তারপর তোমার মান ভাঙাবার কথা ভাবা যাবে।

টেবিলের আওয়াজ শুনে বেয়ারা এল। সীমা মেনুকার্ড দেখে খাবারের অর্ডার দিল, দুটো কবিরাজী কাটলেট। একটু তাড়াতাড়ি।

বেয়ারা মাথা নেড়ে চলে গেল। সৌগত পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে যাচ্ছিল। সীমা বুঝতে পেরে হাতটা চেপে ধরে বলল, দাঁড়াও। সৌগত পকেটে হাত রেখেই সবিস্ময়ে থমকে গেল। সীমা তার ব্যাগের ভিতর থেকে এক প্যাকেট বিলিতী সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও খাও।

এসব নতুন কিছু নয়। ধনী বাপের একমাত্র কন্যা সীমার দৌলতে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই সৌগতের জুটে থাকে। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার প্রতীক হিসেবেই সে এ-সব বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে। তবু প্যাকেটটা হাতে নিয়ে খুলতে খুলতে বলল, কী দরকার ছিল মিছেমিছি এত দাম দিয়ে সিগারেট আনার?

—সে আমি বুঝবো। সীমা মুখ বাঁকিয়ে হাসল। সৌগত ততক্ষণে প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়েছে। দেশলাই জ্বালতে উদ্যোগী হতে সীমা ছোঁ মেরে দেশলাইটা কেড়ে নিল। নিজ হাতে একটা কাঠি জেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে দিতে জিগ্যেস করল, তোমার জন্মদিনে দেয়া সেই বিলিতী লাইটারটা কী হল?

একরাশ ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে সৌগত বলল, অনেকদিন হল ফুয়েল ফুরিয়ে গেছে।

—নতুন করে ভরোনি কেন?

—টাকার অভাবে হয়ে ওঠেনি।

—তাই বুঝি! সীমা তির্যক চেয়ে হাসল। ...কথাটা ... পারল না বলেই বলল, কেন মিছে কথা বলছো। এতটা অভাব তোমার এখনো হয়নি।

অভাবের কথাটা যে সত্যি সৌগত তা জোর দিয়ে বোঝাতে চাইল না। কেননা সে জানে, সীমা তার অর্থ-অসচ্ছলতা সাংসারিক দারিদ্র্যের দুঃখকষ্ট শুনতে শুনতে দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজেকে অপরাধী মনে করে। দুজনের বৈষম্যের দিকটা পাছে সৌগত টেনে আনে সেই ভয়ে নিজেকে আটপৌরে করে গুটিয়ে রাখে। নিয়ত সৌগতের মনের মত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে।

সীমা সৌগতের নীরবতায় কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ ম্লান হয়ে গেল। একরকম অকারণেই আর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল। কাঠিটা যতক্ষণ জ্বলল সেদিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকল। একসময় ম্লান মুখে বলল, তুমি যেন আজকাল কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছো।

বাকি কথাটা বলার আগেই বেয়ারা গলার আওয়াজ তুলে পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকলো। জলের গ্লাস, খাবারের প্লেট, কাঁটা চামচ ইত্যাদি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল। সীমা বলল, একটু বাদে চা দিয়ে যাবে।

বেয়ারা মাথা নেড়ে চলে গেল। সীমা প্লেটে সস ঢেলে সল্ট ছড়াতে ছড়াতে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। এক জায়গায় যেতে হবে।

—কোথায়? কাটলেটে আঁচড় কাটতে কাটতে সৌগত জিগ্যেস করল।

—দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

—যে-কোন জায়গাতেই কিন্তু আমাদের দুজনের যাওয়া চলে না।

—কেন?

—ভুলে যাচ্ছো কেন, আমি একজন অধ্যাপক। তাছাড়া আমরা আইনসম্মত বিবাহিত হলেও তোমার সিঁথিতে এখনো সিঁদুর পড়েনি। তোমার জেনে রাখা ভাল —সেজন্যেই তোমার জন্য রাস্তায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটাও আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

সীমা কিছুক্ষণ মনক্ষুন্ন হয়ে বসে থাকল। তারপর কাটলেট চিবোতে চিবোতে আর্দ্রগলায় বলল, আমি তো ইচ্ছে করে দেরি করিনি। বেশ, এবার থেকে আমিই আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকব। আরো কীসব বলবে ভাবছিল, কিন্তু দাঁতে ঠোঁট কেটে চেপে গেল। কাঁটায় গাঁথা টুকরো কাটলেট-টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, আজকালকার অধ্যাপকদের দেখছি তো! ছাত্রদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মোংরা হিন্দী সিনেমা কিংবা বিলিতী ব্লু সিরিজের ছবি দেখছে। হোটেল রেস্টুরেন্ট কফি-হাউসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাচ্ছে। বাজে আলোচনা করছে। বাংলার অধ্যাপক সাট প্যান্ট পরে বাংলা পড়াচ্ছে। আরো কত কী —সেসব ভাবতেও লজ্জা করে।

সীমার কথাগুলোর মধ্যে তীব্র কটাক্ষ ছিল। এসব কথাগুলো যে একেবারে মিথ্যে নয়, সৌগত তা জানে। কিন্তু এদের সংখ্যা কত? ...খুবই সীমিত। এই সীমিতের ... দেখে ... সীমা ... বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন, সে আদৌ আমল দিল না। সে তার রুচি আদর্শ ও নিষ্ঠা নিয়ে বাঁচতে চায়। বস্তুত সেজন্যেই এই সম্মানজনক বৃত্তিটা বেছে নেয়া। অল্প বেতনের অধ্যাপক হলেও সেটা তার অহং। একথা সীমা জেনেও কেন বুঝতে চায় না সৌগত তা ভেবে পেল না।

সৌগত বলল, কোন অধ্যাপক কী করেন জানি না। আমি কিন্তু এমন কিছু করতে চাই না যাতে ছাত্ররা অশ্রদ্ধা করার সুযোগ পাবে।

—আমিই কী তা চাই? চাই না বলেই তো নিজেকে তোমার মনের মত গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। দেখছো তো আজ কেমন তোমার মনের মত সেজে এসেছি।

আজকের দিনে সীমার ব্যতিক্রম সাজটা সৌগত অনেক আগেই দেখেছিল। কিন্তু তত্তটা খুঁটিয়ে দেখেনি। এই প্রথম দু-চোখ ভরে ওর শরীরটাকে অবিরত জরিপ করতে থাকল। লালপাড় সাদা শাড়ী পরেছে সীমা। সঙ্গে লাল ব্লাউজ। রেশমের মত একরাশ গভীর কালো চুলের দীর্ঘ বেণী কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। পুরুষ্টু কাজল টানা মুক্তোর মত দুটো চোখ। কপালে চন্দনের ছোট্ট টিপ। বাম হাতের মণিবন্ধে কালো বেল্টের ওপর ঘড়িটা। সমস্ত দেহে কোন অলংকারের বালাই নেই।

এসবই সৌগতের একান্ত পছন্দ। সীমা তা জানে। এমনি সাজেই মহাজাতি সদনের কোন এক অনুষ্ঠানে সৌগত সহপাঠিনী সীমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, দারুণ ভাল লাগছে তোমাকে। এত ভাল যে আমাকে পাগল করে দিচ্ছো।

সেই থেকে দুজনের প্রেম-প্রণয়-ভালবাসা।

সৌগত বলল, এই সাজে অফিস গিয়েছিলে? তোমার অফিস-বন্ধুরা কিছু বলল না?

—বলল।

—কী?

—বলল, তোকে এত বাধ্য, এত শান্ত, এত মিষ্টি, এর আগে আর কোনদিন দেখিনি।

—শুনে নিশ্চয়ই খুব খুশী হলে?

—না। আমার কেবলি তোমার কথাটা খুব বেশি করে মনে পড়ছিল। সেই যে তুমি বলেছিলে, সীমা তুমি আমাকে পাগল করে দিচ্ছো। একটু থেমে থেকে সীমা সৌগতের চোখে চোখ মিলিয়ে জিগ্যেস করল, কই আজতো কিছু বললে না।

—আজকে আমার ইচ্ছে হচ্ছে রক্তকরবীর রাজার মত বলি, তোমার গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারী ইচ্ছে করছে।

সীমা চোখের পাতা নাচিয়ে ভুরু কুঁচকে মৃদু হাসল। তারপর সৌগতের কাঁধে মাথা হেলিয়ে নীচু গলায় ফিস্ফিসিয়ে বলল, আস্তে বল। বাইরে লোকজন থাকতে পারে।

... ...

... বাইরে কোথাও ঘুরিয়েফিরিয়ে চলে যাই।

—কোথায়?

—অনেক দূরে কোথাও।

—কোথায়?

—তা তো জানি না।

সীমা মুখ দিয়ে মৃদু চুক চুক আওয়াজ করল। চোখে চোখ রাখল। দুজনেই কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিসঙ্গমে নির্বাক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। অনেক গভীর কিছু বুঝলো এবং বোঝালো।

বেয়ারা যথারীতি গলার আওয়াজ দিয়ে দু কাপ চা এনে দিতে সীমা বিল চাইল। বেয়ারা ফিরে এসে মৌরী ছড়ানো প্লেটে বিলটা রাখল। সীমা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিলে টাকার অঙ্কটা দেখে নিয়ে নিজের ব্যাগ থেকে বিলটা মিটিয়ে দিল। দুজনে তড়িঘড়ি রাস্তায় নেমে এসে দাঁড়াল।

সৌগত বলল, কোথায় যাবে?

—অনেক দূরে কোথাও নিরিবিলিতে।

সৌগত নতুন করে জায়গাটার নাম জিগ্যেস করার ফুরসত পেল না। তার আগেই সীমা সামনে এসে দাঁড়ানো প্রাইভেট বাসটায় উঠে পড়ল। সৌগতকেও উঠতে হল। বাসটায় খুব একটা ভিড় ছিল না। সীমা বসবার সুযোগ পেয়ে সৌগতের হাত থেকে ফোলিওটা চেয়ে নিয়ে কোলের ওপর রাখল।

বাস ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে — তারাতলা পেরিয়ে বজবজ রাস্তা ধরে। এই পর্যন্তই সৌগতের চেনা। তারপর অচেনা জগত—মফঃস্বলের পথ। সৌগত ঝুঁকে পড়ে দু ধারে ডাঙা জলা-জমি গাছ-গাছালি দেখতে থাকল। ইতস্ততঃ কিছু পুকুর ডোবা বাড়ী ঘরদোর দোকানপাট। স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘেরা মসৃণ পীচের রাস্তা। মাঝে মধ্যে কিছু লোকজনের দেখা মিলছে। পাখ-পাখালি হাঁস-মুরগী যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাস চলছে তো চলছেই। থামছে খুব কম। যাত্রীদের ওঠা-নামা সামান্য। পাঞ্জাবী কণ্ডাকটর কি যেন সব নাম হাঁকছে জায়গাগুলোর—রামপুর, মোল্লার গেট, সন্তোষপুর, চকমীর ডাকঘর—আরো কত কি যেন। অনেক সব বিদকুটে নাম। সে সব নাম সৌগতের মনে থাকছে না।

হঠাৎ সৌগতের টিকিট কাটার কথা মনে হল। সীমার দিকে ফিরে তাকাতে সে রহস্যময় হাসছিল। চঞ্চলা হরিণীর মত ইতিউতি তাকাচ্ছিল। সৌগত কিছুতেই বুঝতে পারছিল না তাকে কোন বনান্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বস্তুতঃ সেটা জানবার জন্যই সীমাকে টিকিটের কথা জিগ্যেস করল। সে হাতের টিকিটগুলো দেখিয়ে বোঝাতে চাইল, হয়ে গেছে।

স্বভাবতই নির্বাক থেকে আবার ঝুঁকে পড়ে প্রকৃতির মাঝে দৃষ্টি ছুটিয়ে দিল। এত সবুজ স্নিগ্ধতা কাকলি-মুখরিত নির্মেঘ আকাশ এবং মাটির গন্ধের স্বাদ সে অনেক কাল পরে পাচ্ছিল। স্বভাবতই মুগ্ধ অভিভূত হয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ বাসটা দম ছেড়ে দাঁড়াল। পাঞ্জাবী ড্রাইভার কর্কশ কণ্ঠে হাঁক দিয়ে কণ্ডাকটরকে কাছে ডাকল। একান্ত অনুগত কণ্ডাকটর ছুটে কাছে যেতে ওদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব সংক্ষিপ্ত কথা হল। কথা অন্তে কণ্ডাকটর ফিরে এসে একগাড়ী যাত্রীদের উদ্দেশ করে অশুদ্ধ বাংলায় যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, বাস বিকল, অতএব যে যার টিকিট দেখিয়ে বাকী অংশের ভাড়া ফেরত নিন।

সঙ্গে সঙ্গে ভরা-পেট বাসটা খালি হয়ে গেল। সীমা ততটা তৎপর না-থাকায় ওরা দুজনে সবশেষে নামল। ততক্ষণে কণ্ডাকটরকে ঘিরে একরাশ ভিড় জমে উঠেছে। সেই ভিড়ের ব্যূহ ভেদ করে জলদি প্রাপ্য ভাড়া ফেরৎ নেবার মত দক্ষতা সৌগতের ছিল না। সীমা সৌগতের পাশে এসে দাঁড়াল। সৌগত একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল এবং চার দিক নিরীক্ষণ করতে থাকল।

সৌগত জিগ্যেস করে জানল, জায়গাটার নাম নাকি বাটা মোড়। বজবজ থেকে ডান দিকে উঠতি বাটার নিজস্ব রাস্তা। দেখলে মনে হয় সবুজ পাড়ের একখানা কালো শাড়ী ক্রমশ ওপারের দিকে উঠে আকাশের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। সীমা বলল, এই যে ব্রীজটা দেখছো—এর নীচ দিয়ে রেল লাইন গেছে। ডান দিকে কলকাতা, বাঁয়ে বজবজ।

বজবজ রাস্তার ধারেই সংখ্যালঘুদের অপরিচ্ছন্ন কয়েকটা চায়ের দোকান। নিকট দূরে হালে তৈরী কিছু পাকা বাড়ি মানুষের বসতির নিদর্শন। যতদূর দৃষ্টি যায় ঘন গাছগাছালি পুকুর-ডোবা এবং মাঠ-প্রান্তর। সামনের ব্রীজটা পেরিয়ে রাস্তাটা ওপারে কোথায় চলে গেছে তা এপার থেকে বোঝার উপায় নেই। শুরুতেই রাস্তার মুখে একটা বিরাট হোর্ডিং। তাতে একগুচ্ছ বর্ণালী ফুল আঁকা। ওপরে ইংরেজী হরফে লেখা আমন্ত্রণলিপি, ওয়েলকাম টু বাটানগর।

সীমা বলল, তুমি কোনদিন বাটানগর এসেছো?

—না। আমরা কি তাহলে বাটানগরেই যাচ্ছি?

—হ্যাঁ তবে কারও বাড়ীতে নয়। তুমি হয়ত জান না, স্কুল জীবন পর্যন্ত সময়টা আমার এই বাটানগরেই কেটেছিল। ছেলেবেলা থেকেই এখানকার নদীর ধারটা আমার খুব ভাল লাগে। এখান থেকে চলে যাবার পরও কতবার বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে এসেছি। এখনও সেখানেই যাচ্ছি।

—কিন্তু সেটা আর কত দূরে?

—খুব একটা দূরে নয়। এই ব্রীজের ওপারে ছোট্ট শহরটার শেষ প্রান্তে।

সৌগত প্রস্তাব রাখল, বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। হেঁটে গেলে কেমন হয়?

সীমা সম্মতি জানিয়ে বলল, বেশ চল।

ওরা দুজনে পাশাপাশি যথেষ্ট অন্তরঙ্গতায় হাঁটতে থাকল। ব্রীজের ওপর থেকে বৃহত্তর বাটানগরের ছবিটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঢাল পথে সেই সবুজ পাড় শাড়ীর মত রাস্তাটা দু ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের সঙ্গে আলাপ করতে

[illegible] দূরে কোথায় গিয়ে মুখ লুকিয়েছে বোঝা যায় না।

সৌগত চলতে চলতে দু ধারে সাজানো পরিচ্ছন্ন কোয়ার্টার্স দেখছিল। রাস্তার দু ধারে ঝুঁকে-পড়া কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে অজস্র রক্ত-রঙীন ফুলের আলিঙ্গন। পড়ন্ত রোদ গড়িয়ে বিকেলের আবছায়া নেমে আসছে। দু ধারে মাঠ জুড়ে ক্লান্ত ঘাস জুড়ে মৃদু হাওয়ার আমেজ। নিঃশ্বাসে তার তপ্ত পরশ পাওয়া যাচ্ছিল। ঘরে-ফেরা পাখিদের এলোমেলো গুঞ্জন ভেসে আসছিল। দূরে পশ্চিমের আকাশে তখনো সিঁদুর ছড়ানো। সবে-মিলে সৌগতের বেশ ভাল লাগছিল।

সৌগত বিস্ময় মুগ্ধতা ও খুশীতে ক্রমশই উন্মন হয়ে পড়ছিল। এমন কি পাশে সীমার অস্তিত্ব পর্যন্ত সময় সময় ভুলে যাচ্ছিল। সীমা একনাগাড়ে কি সব বলে যাচ্ছিল। সৌগত সব কিছুর জবাব দেবার উৎসাহ পাচ্ছিল না। নিতান্তই বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে সীমার এক-আধটা কথার জবাব দিচ্ছিল। এবং সেগুলোও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শব্দের সমষ্টিতে। সেজন্য সীমা ক্রমশই মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ একটা ধূসর রংয়ের প্রাইভেট কার সৌগতের গায়ে-পড়া ভাব করে জোরে ব্রেক কষে দাঁড়াল। সৌগত বিরক্তিতে তাকাল। পরক্ষণেই পরম বিস্ময় ও অত্যুৎসাহে হেঁকে উঠল, কি আশ্চর্য, ভাস্কর তুই এখানে?

—কারখানার একটা জরুরী অর্ডার-সংক্রান্ত ব্যাপারে এসেছিলাম। কিন্তু তুই?

—জাস্ট বেড়াতে এসেছি। অধ্যাপক মানুষ, যেখানে-সেখানে তো যাওয়া চলে না। তাই লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে এখানেই এসে গেছি।

—ভালই হয়েছে। চল আমার সঙ্গে। কাছেই আমাদের ফ্যাক্টরী। সঙ্গেই আমার বাংলো।

কথাটা শেষ করেই ভাস্কর সীমাকে ইঙ্গিত করে চোখে সকৌতুক নীরব প্রশ্ন ফুটিয়ে তুলল। সীমার দিকে ফিরে তাকিয়ে সৌগত আলতো হেসে জবাব দিল, আমার স্ত্রী সীমা। এখনো আনুষ্ঠানিক বিয়েটা হয়ে ওঠে নি।

ভাস্কর করজোড়ে সীমাকে নমস্কার জানাল। সৌগত সীমাকে উদ্দেশ করে বলল, আমার ছাত্র-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। [illegible] আমার মুখে ওর কথা শুনেও থাকবে।

সীমা আগেই ভাস্করকে প্রতি-নমস্কার জানিয়েছিল। এবার কথা জুড়ল, আপনার কথা কিন্তু সত্যিই শুনেছি। আপনি তো ওদের কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন কিছু দিন?

—হ্যাঁ। সামান্য কয়েকটা দিন। তাতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ছাত্রদের ভয়ে এত সংযত ও সন্ত্রস্ত থাকতে হত তা আর বলবার নয়।

—সেটা কেমন? সীমা ইচ্ছে করেই জানা জবাবটা খুঁচিয়ে শুনতে চাইল।

—এই যেমন যতত্র যাওয়া চলে না। আবেগ অনুযায়ী বোহেমী কথা বলা যায় না। যে কোন বিচিত্রানুষ্ঠান এবং সিনেমায় যেতে পারতাম না। এমন কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা আলু-কাবলি পর্যন্ত খাওয়া যেত না—এরকম হাজারো অসুবিধা। তাছাড়া মাইনের অঙ্কের কথা তো বাদই দিলাম।

সীমা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, তাই বুঝি ভয় পেয়ে ছেড়ে দিলেন?

—ঠিক তাই।

সৌগত বলল, চাকরি নিয়ে সেই যে কোথায় উধাও হলি তারপর আজ পর্যন্ত কোন খবরই নেই।

—তুই আগে উঠে আয় তো। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না।

ভাস্কর দরজা খুলে সীমাকেও উঠে বসতে অনুরোধ জানাল গাড়ীতে। ওরা তিনজন পাশাপাশি বসে বজবজের দিকে এগিয়ে চলল।

ভাস্কর তীব্রগতিতে বেপরোয়া গাড়ী ড্রাইভ করছিল। ভারী ওজনের ট্রাক ও তেলের গাড়ীগুলোকে সহজেই ওভারটেক করে এগিয়ে যাচ্ছিল। সৌগত কিছুটা ভয় পেল। তবু ধরা দিল না। বলল, তোর হাত দেখছি খুবই পাকা। গাড়ীটা কত দিন আগে কিনেছিস?

—কিনি নি। আমাদের কোম্পানীর। নিজের বলতে খুব কম জিনিসই আছে। বাংলোর আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে ফ্রীজ ফ্যান অনেক কিছুই কোম্পানীর।

—বিয়ে করেছিস?

—গেলেই দেখতে পাবি। শুধু স্ত্রী নয়, ছয় মাসের একটি নবজাতক পুত্র সন্তানও আছে। ও দুটো কিন্তু কোম্পানীর নয়—একান্তই নিজস্ব।

শেষোক্ত কথাটায় ওরা তিনজনেই সোচ্চার হেসে উঠল। সীমা বলল, আপনি তো বেশ মজার কথা বলেন।

—আপনি বলছেন বটে, আমার স্ত্রী কিন্তু এসব লঘু কথা পছন্দ করে না। বলে, ফ্যাক্টরীতে কাজ করার ফলে আমার কথাবার্তা চালচলন খুবই যান্ত্রিক এবং অশালীন।

কথাটা শেষ করে ভাস্কর গম্ভীর হয়ে গেল। একটু বিষণ্ণ হল। এক সময় বেশ দক্ষতার সঙ্গে একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অপর হাতে সৌগতের দিকে বিলিতী সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল। দুজনেই একটা করে সিগারেট ঠোঁটে ঝোলাল। ভাস্কর তেমনি দক্ষতার সঙ্গে লাইটারের নীল আলো জ্বেলে দুজনের সিগারেটে আগুন ধরাল। জ্বলন্ত অবস্থায় লাইটার থেকে মৃদু একটা অর্কেস্ট্রার শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল। আগুনটা নিবিয়ে দিতে শব্দটাও মিলিয়ে গেল। ভাস্কর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমার স্ত্রী কী বলে জানিস? বলে কিনা ছাত্র পড়ানো কাজটা আমার আদৌ ছাড়া উচিত হয়নি।

—বটে! সৌগত আশ্চর্য হয়ে উচ্চারণ করল।

—দেখিস তোকে ওর খুব পছন্দ হবে। একে অধ্যাপক, তারপর ইদানীং কিছু লিখেটিকেও তোর বেশ নাম হয়েছে তো।

—ওসব প্রসঙ্গ তুলিস না। জানবে কী করে?

—জানতে কী আর বাকি আছে। কাগজে তোর লেখাটেকা দেখলে আমি গর্বের সঙ্গে দেখিয়ে বলতাম, জানো এই সৌগত বসু আমার বন্ধু। ব্যস ফল, হিতে বিপরীত। এখন দেখি অচেনা সৌগত বসুই ওর কাছে আমার চেয়ে ভাল।

—হঠাৎ কাছে পেয়ে এতটা রং লাগিয়ে কথা বলিস না। আমার সহ্যগুণ কম।

—বিশ্বাস করলি নাতো। এতটুকু রং লাগিয়ে বলছি না। আমার তো বরং ভয় হচ্ছে তোকে পেয়ে ওর বাড়াবাড়িতে সীমা-দেবী না শেষ পর্যন্ত চটে যান।

—আমাকে এতই ছেলেমানুষ ভাবছেন? এতক্ষণ পর কথা বলার সুযোগ পেয়ে সীমা আলতো করে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

—আপনাকে কিন্তু কিছু ভাববার অবকাশই পাইনি। প্লীজ ভুল বুঝবেন না। ভাস্কর যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিয়ে সিগারেটে শেষ টান দিল। শেষাংশ টুকরোটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে ডান-দিকে গাড়ীর বাঁক নিল। বলল, আমরা কিন্তু এসে গেছি।

খানিক দূরে একটা সুদৃশ্য বাংলোর কাছে এসে ভাস্কর [illegible] থামতে বলল। সৌগত এবং সীমা বাংলোর গেটের কাছে নেমে দাঁড়াতে ভাস্কর গ্যারেজে গাড়ী রাখতে গেল।

সৌগত [illegible] দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবির মত ভাস্করের ছোট্ট বাংলোটা দেখছিল। [illegible]

সবুজ ঘাসের লন। রং-বেরঙের বর্ণালী ফুলে সাজানো বাগান। লনে কিছু বেতের চেয়ার টেবিল। ছোটদের জন্য একটা দোলনা। ইতস্ততঃ সাজানো পাতাবাহার এবং অল্পবয়সী ঝাউগাছ। বাংলোর গা ঘেঁষে দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ। সামনে সিঁড়ির ধার থেকে গ্রিলের গা বেয়ে একটা মাধবীলতা ফুলগাছ বারান্দার ওপরে টালির ছাদে উঠে গেছে। বারান্দায় ঝুলন্ত কতকগুলো টবে অল্প দৈর্ঘ্যের মানিপ্লান্ট লতা ঝুলছে।

এরকম সাজানো সৌন্দর্য সমষ্টি দেখতে দেখতে সৌগত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তার দু'কামরা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বাসাবাড়ীর কথা ভাবছিল। ভাস্কর এসে বলল, কেমন লাগছে—বাংলোটা?

—অপূর্ব সুন্দর। সৌগতের পরিবর্তে সীমা উচ্ছ্বাসে জবাব দিল। ভাস্কর বলল, এখনো তো ভিতরটা দেখেননি। চলুন যাওয়া যাক। অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছেন।

ওরা তিনজনে লনের সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাংলোর ভিতরে গেল। ভাস্কর ওর ঘুমন্ত সন্তান, সাজানো ঘরদোর বৈঠকখানা এবং লাইব্রেরী দেখিয়ে বলল, তোরা একটু বোস, আমার স্ত্রীকে খবরটা দেই।

ভাস্কর ভিতরে যেতে সীমা দোলনায় ঘুমন্ত শিশুটির দিকে ঝুঁকে পড়ে স্বগতোক্তি করল, ভারী মিষ্টি দেখতে! সৌগত কোন কথা না বলে পায়চারি করতে করতে দু-একখানা বই টেনে দেখল। দেয়ালে টাঙানো দামী অয়েল পেইন্টিং শোকেসে সাজানো হরেক-রকম শিল্প সামগ্রী দেখতে দেখতে একসময় এ্যাকোরিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল। স্বচ্ছ জলের ভিতর রংবেরঙের একঝাঁক মাছ খেলছে। আলো ঝলমল জলের ভিতর কিছু লতাগুল্ম ও স্তূপীকৃত সিমেন্টের একটা কৃত্রিম পাহাড়। জলের উপরিভাগে কেবলই বুদবুদ উঠছে। সৌগত আনমনা হয়ে তার অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপরিচ্ছন্ন বই-এর র‍্যাক রেক্সিন কভার জড়ানো টেবিল, পায়াভাঙ্গা চেয়ার, শোবার তক্তপোশ ইত্যাদির করুণ চিত্র দেখল। সেই করুণে অবিবাহিত ভাইবোন প্রৌঢ় বাবা মাকে নিয়ে দারিদ্র্যে জর্জর সংসারের কথা ভাবল। একরাশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবিশেষ বিব্রত বোধ করল।

হঠাৎ ভাস্করের ডাকে চমক ভাঙল। ভাস্কর স্মিতহাস্যে আভিজাত্যের মাঝে ওর স্ত্রী তুহিনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরস্পর নমস্কার বিনিময় অন্তে তুহিনা বলল, আপনার লেখা আমি প্রায়ই পড়ি। ওর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

ওরা [illegible] সোফায় গা-এলিয়ে সহজ হয়ে বসল। প্রথমে উভয়ের [illegible] পরিচয় এবং [illegible] বিনিময় হল, পরে ক্রমশই নানা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় আলাপটা যখন দানা বেঁধে উঠছিল তখন একাধিক ডিসে সাজানো হরেক রকম জলখাবার এল। সৌগতের তরফ থেকে সম্মুখে উপস্থিত প্রভূত পরিমাণ খাবার সম্পর্কে পরিচিত পোশাকী কোন সংলাপ শোনা গেল না। বরং আনুষ্ঠানিক কোন অনুরোধের অপেক্ষায় না থেকে সে খাওয়া শুরু করল। জলখাবার খেতে খেতে সম্মিলিত চারটি কণ্ঠের আলাপ-আলোচনা ক্রমশঃ মধুর হাসি ঠাট্টা এবং রসিকতায় গড়াল। বেশ কিছুটা সময় উচ্ছ্বাস আনন্দে কেটে গেল। এক সময় ঘড়ির কাঁটায় চমক দিতে দিতে সীমা বলল, আমাদের কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।

কথাটা নির্দিষ্ট কারও উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়া না হলেও ভাস্কর হেসে নিয়ে জবাব দিল, অবশ্যই। আপনাদের অনেকটা পথ যেতে হবে বলেই মন চাইলেও বেশিক্ষণ ধরে রাখার চেষ্টা করবো না। চলুন, নদীর পারটা একটু ঘুরে আপনাদের বাস স্টপেজ পর্যন্ত পৌঁছে দেব।

বাইরে ততক্ষণে উপচে পড়া জ্যোৎস্না উঠেছে। নদীর দুকূলে জলে দুধের মতন আলোর বন্যা। মাঝ নদীতে দু-একখানা নৌকো ভাসছে। মাঝে মধ্যে পরিমিত ব্যবধানে জাহাজ চলায় সার্চলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। নদীর কূলে জেটি-এর ছলছলাৎ আওয়াজ। মৌন নিস্তব্ধ নিরিবিলিতে শব্দ বলতে ওইটুকু।

বাঁধের ওপর মাটির পথ ধরে ওরা চারজন কখনো একসঙ্গে কখনো আগে-পিছে হাঁটছিল। ভাস্কর এক আধটা নুড়ি কুড়িয়ে জলের ওপর ছুঁড়ে ফেলছিল। নুড়িগুলো জলে পড়ে মৃদু শব্দ তুলছিল। তুহিনা গুনগুন করে কী একটা পরিচিত গানের সুর ভাঁজছিল। তুহিনা প্রথম থেকেই সৌগতের পাশাপাশি একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে পা-পা ফেলছিল। সৌগত তিন-তিনটে কাঠি ঠুকে কিছুতেই সিগারেট ধরাতে পারছিল না। হাওয়ায় কাঠিগুলো নিভে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সিগারেটটা ধরালো। তুহিনাও দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করায় ওরা দু'জন ভাস্কর এবং সীমা থেকে কিছুটা ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ হাঁটার পর তুহিনা বলল সৌগতবাবু, আবার একদিন আসছেন তো?

—নিশ্চয়ই। ধোঁয়া উড়িয়ে সৌগত জবাব দিল।

—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

—কী?

—এতদূরে আপনি আবার আসবেন।

—তখন হয়ত এখনকার দূরত্বটা নাও থাকতে পারে।

তুহিনা মুখ তুলে সৌগতের দিকে তাকাল। আলতো হেসে পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। সৌগত একটু অপ্রস্তুত হয়ে কথা জুড়ল, আপনি কিন্তু আমার কথাটার দ্বিতীয় কোন অর্থ ধরবেন না। একটু আগে ভাস্কর বলছিল, ওদের ফ্যাক্টরীতে একজন ম্যানেজারের পোস্ট শিগগীর খালি হবে। আমি আসতে চাই কিনা জানতে চাইছিল। তাই—

—আপনি কী বললেন?

—ভেবে দেখবো বলেছি। আপনি কী বলেন—রাজী হয়ে যাব?

—না। কিছুতেই না। ওরকম ভুল করবেন না।

সৌগত একটা দৃঢ়তার সঙ্গে তুহিনার বাধা দেয়ার কোন অর্থ খুঁজে পেল না। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল ভুলটা দেখছেন কোথায়?

—এটা কী একটা লাইফ? অশিক্ষিত মজুর লেবার ক্লাসের লোকজন নিয়ে কাজ। ওরা সব সময়ই আমাদের ওদের শত্রু এবং শোষক ভাবে। আসল মালিক শিল্পপতি নিশ্চিন্তে থাকেন, ঝামেলা যত ওপরওলাদের মানুষদের। ভাস্করের লেখার আপনার মতন আর্টিস্টিক [illegible] লেখার জন্য [illegible]। একটু, [illegible] পর্যন্ত যেতে পেলেন না। আমাকে নিয়ে [illegible] দেয়ালে [illegible] তাই নোংরা পথ [illegible]।

—আমাদের বাড়ীটাও কিন্তু যতটা ভাবছেন আজকাল ততটা নির্ঝঞ্ঝাট নয়।

—তবু অন্ততঃ নিজের আদর্শ নীতি নিয়ে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ আছে। আপনার বন্ধুও আজকাল সেজন্যে মাঝে-মাঝে দুঃখ করে। কাজেই আপনি কোনমতেই অধ্যাপনা ছাড়বেন না—এটা আমার একান্ত অনুরোধ।

সৌগত তুহিনার কথাগুলো শুনতে শুনতে একটা গভীর আত্মসুখের কস্তুরী-গন্ধে বিভোর হয়ে পড়ছিল। এতকালের পুঞ্জীভূত সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্য যন্ত্রণা ক্রমশই ভুলে যাচ্ছিল। তৃপ্তির আমেজে বুকভরা একরাশ বাতাস নিয়ে হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। চাঁদের নরম আলোয় তুহিনার মুখের দিকে তাকাল। চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল। তুহিনা লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে বলল, আমরা কিন্তু বাস স্টপেজের কাছাকাছি এসে গেছি।

সৌগত কথাটার যথার্থ ইংগিত বুঝতে পারল। বাড়তি কোন কথায় না গিয়ে বাকীটা সংযত ও আত্মস্থ হয়ে হাঁটতে থাকল।

* * *

ভাস্কর এবং সীমা একটু আগেই বাস স্টপেজে এসে পৌঁছেছে। পিছনে কিছুটা সৌগত এবং তুহিনাকে ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসতে দেখে সীমা শেষবারের মত সৌগতের অজান্তে ভাস্করকে অনুরোধ জানাল, আপনি একটু চেষ্টা করে দেখবেন, ওর চাকরিটা যাতে আপনার এখানে হয়ে যায়। আমি ওকে ঠিক রাজী করিয়ে দেব।
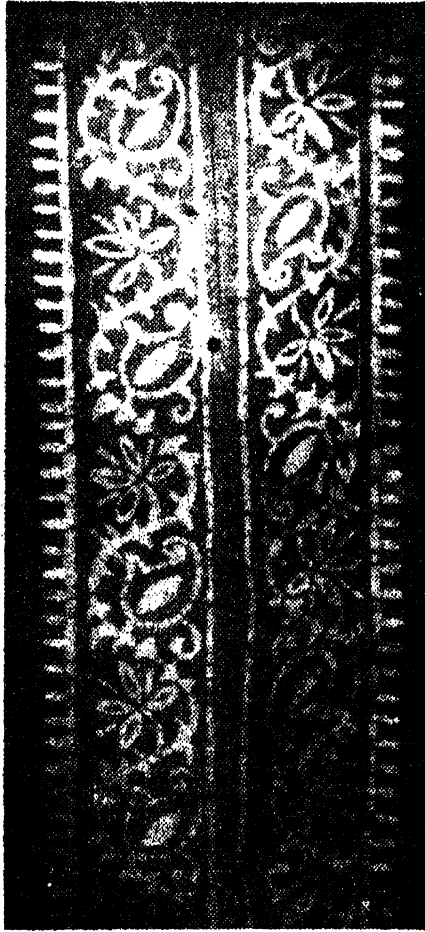
অঙ্গনা

বাটিক

শিল্পের এক সুন্দর বিকাশ বাটিক। বাটিকের চলন বহু দিন থেকেই চলে আসছে। তবু এর শিল্পমূল্য সামান্যও কমে নি। শুধু ব্যবহারিক জিনিসপত্র নয় বাটিকের ছবি রুচিশীল দর্শকমনকে আনন্দ দেয়। বাটিক তৈরীর গতানুগতিক পদ্ধতিতে একটু নতুনত্বের ছোঁয়া লাগলে সেটা আরও বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

বাটিকে একঘেয়ে ডিজাইন না করে একটু ক্র্যাক, কোথাও বা এক রং, সেই এক রং-এর মাঝে অসাবধান-মোটা বা সরু তুলির আঁচড় নিঃসন্দেহে গতানুগতিকতায় নতুনত্বের বৈচিত্র্য আনবে। ধরুন শাড়ীর আঁচল বা পাড়ে কোন রকম ডিজাইন না এঁকে ইচ্ছেমত মাঝে মাঝে মোম দিয়ে ঢেকে সাদা এবং দরকার মত হলুদ, লাল বা কালো রং রাখলে অল্প পরিশ্রমেই শাড়ীটা দেখতে উজ্জ্বল হবে। সেই সঙ্গে খরচও কিছু কমবে বৈকি। বাটিকের ডিজাইন করা যেমন সময়-সাপেক্ষ তেমনি পরিশ্রমের। সুতরাং এত সব বাদ দিয়ে যাতে অল্পায়াসে জিনিসটি চটকদারী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময় অল্প থাকলে কোন জিনিসে চকচকে বাটিক করতে হলে কিছু জায়গায় মোম লাগিয়ে বাকী জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রং রাখলে সেটা বেশ লোভনীয় হবে।

একটা শাড়ীর কথাই ধরা যাক। গোটা শাড়ীতে রং লাগানো শেষ হয়ে গেলে যদি মনে হয় কোথাও একটু লাল বা নীল হলে ভাল হয় তাহলে সেখানে তুলি দিয়েই স্বচ্ছন্দে একবার রং, একবার সল্ট লাগালেই রং-এর সেই অসম্পূর্ণতা পূর্ণ হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে একটু দক্ষ হাতের প্রয়োজন।

বাটিক করার জন্য কাপড়টি একটু উৎকৃষ্ট মানের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভাল আদ্দি, পিওর সিল্ক, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, কেমব্রিক কাপড় হলেই বাটিকের রং সুন্দর হয়। খসখসে অর্থাৎ খারাপ জমির কাপড়ে রং কখনোই ভাল হয় না। ভাল কাপড়ে রং-এর ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশী থাকে। বাটিক-করার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে কাপড়ে ডিজাইন আগে এঁকে নিতে হবে। সেই

ডিজাইন দেখে কোথায় সাদা বা অন্যান্য রং রাখা হবে সেটা ঠিক করে সেই মতো মোম লাগাতে হবে। ক্র্যাক করার জন্য প্যারাফিনই যথেষ্ট। ক্র্যাক করতে হলে ভাল কাপড়ের একদিকেই প্যারাফিন লাগাতে হবে। ডিজাইনের জন্য মোম দরকার এবং ডিজাইনের দু দিকেই মোম দেওয়া নিরাপদ।

মোমের তিন ভাগের এক ভাগ রজন দিয়ে ছোট একটা বাটিতে মোম গলাতে হবে। জনতা, স্টোভ, হ্যারিকেনের ওপরের চাকতি খুলে তাতে মোমের বাটি বসিয়ে ও আন্দাজ মতো আগুন কমিয়ে-বাড়িয়ে মোম গলাতে হবে। বেশী আঁচে মোম সহজেই জ্বলে উঠবে ও তুলি তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে। প্রথমত ডিজাইনের সাদা অংশ মোম দিয়ে ঢেকে ফেলতে হবে। এর পর রং ও সল্ট ডোবানোর আগে শাড়ী অথবা মোম লাগানো কাপড়টি মিনিট কুড়ি বা আধ ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে যাতে কাপড়টি পুরোপুরি জলে ডোবে। বেশী চাপ দিয়ে কাপড় ভেজালে মোম ভেঙে অত্যধিক ক্র্যাক হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

দুটি বড় বড় পাত্র পরিষ্কার জলপূর্ণ রাখতে হবে। আধ কাপ পরিমাণ কুটন্ত গরম জলে রং-এর চার ভাগের এক ভাগ কাস্টিক এবং রং-এর অর্ধেক মোনোপল সোপ ভাল করে চামচ দিয়ে গুলে নিতে হবে। এবার গোলা রং একটি জলের পাত্রে ঢালতে হবে। অপর জলের পাত্রে রং-এর দ্বিগুণ সল্ট ও তার তরল খাবার নুন ভাল করে গুলতে হবে। জল থেকে কাপড়টি তুলে প্রথমে রং গোলা জলে সেটা ডুবিয়ে তিন থেকে পাঁচ মিনিট রাখতে হবে। এর পর কাপড়টি তুলে সল্টের পাত্রে ডোবাতে হবে। রং আর সল্ট এ দুইয়ের মিলনেই বাটিকের রং হয়। সল্টের পাত্রেও কাপড়টি মিনিট তিনেক ডোবাতে হবে। বাটিকের রংটাকে অধিকতর গাঢ় করতে হলে রং ও সল্টের জলে আর দুয়েক আরও ডোবাতে হবে।

ফেলে দেওয়া অবশিষ্ট রং ও সল্টের জলে ছোটখাট রুমাল বা টুকরো কাপড় ডোবানো চলে।

খদ্দরের কাপড়ে ও আদ্দির কাপড়ে সব সময়ই একই মাপের হলেও রং-এর পার্থক্য হবে। কারণ মোটা কাপড়ে রং ও মোম দুটোই বেশী লাগবে। ভারী কাপড়ে বা পুরো কাপড়ে রং করতে হলে ক্র্যাক-এর চেয়ে রং পরিমাণে বেশী দিতে হবে। শাড়ী বা যে কোন কাপড় রং ও সল্টে ডোবানো শেষ হলে সানলাইট সাবানে সেটা কাচিয়ে মোম তুলে ফেলতে হবে। সাবানে সেদ্ধ হলে বাটিকের ডিজাইন পরিষ্কার বোঝা যাবে। মোম উঠে গেলে সেই কাপড়টি ঠাণ্ডা জলে কাচা করে ধুয়ে ধুয়ে
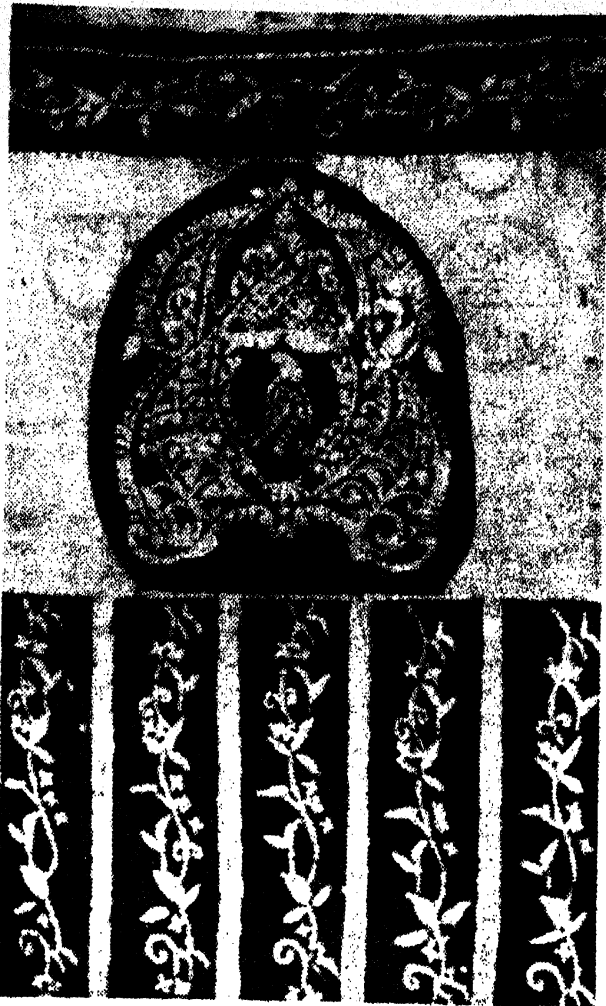
ধুয়ে মিনিট পাঁচ-সাত পাতি লেবুর রস বা মনোপল সোপের জলে ডুবিয়ে রাখলে রং অধিকতর উজ্জ্বল হয়।

একটি শাড়ীতে রং করতে হলে প্রথম রংটির পরিমাণ হবে ২০ গ্রাম, সেই অনুপাতে সল্ট হবে ৪০ গ্রাম। এই হিসেবে যতবার রং করা হবে ৫ গ্রাম রং বাড়ালে সল্ট বাড়বে ১০ গ্রাম করে।

যে কোন দোকানে গেলেই রং-এর চার্ট পাওয়া যাবে। তবুও নীচে কয়েকটি রং তৈরীর পদ্ধতি দেওয়া হল।

এম এন (রং)+জি পি সল্ট, এ এস (রং)+রু সল্ট (ন্যাক কালার), এ টি+রেড সল্ট, এ এল+রু সল্ট (বোটানী গ্রীন), এ টি+রু সল্ট (গেরুয়া) এম এন+জি পি সল্ট (মেরুন), এম এন+সি সল্ট (লালচে (মেরুন), এ এল এস ডব্লিউ+জি পি সল্ট (কালচে মেরুন), এ এল+জি পি সল্ট (লাইট মেরুন), এ এস+রু সল্ট (নীলাম্বরী), এম এন+রু সল্ট (ডিপ নীলাম্বরী), এ এল-এস [illegible] সল্ট (কালো) বি টি+রু সল্ট (ব্রাউন), বি টি+সি সল্ট (লাইট ব্রাউন)।

এ ছাড়া লাল রং-এর পরিমাণে একটু তারতম্য করলেও মন্দ হয় না।

এম এন (রং) ১৫ গ্রাম+আর সি (সল্ট) ২০ গ্রাম+জি সি (সল্ট) ১০ গ্রাম, এ এস (রং) ১০ গ্রাম+রু (সল্ট) ২০ গ্রাম, এম এস (রং) ৫ গ্রাম+আর সি (সল্ট) ১০ গ্রাম (ব্রাউন)।

—অঞ্জলি চৌধুরী

সাতদিনের শুভাশুভ

জন্মরাশির ভিত্তিতে ৭ এপ্রিল থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহের শুভাশুভ নীচে বলা হোল। এই সময়ে (৯ থেকে ১২ এপ্রিল) রবি ও শুক্র এবং বুধ স্থান পরিবর্তন করছে।

মেষ : প্রথমে রবি ও শুক্র, দ্বিতীয়ে শনি, তৃতীয়ে কেতু, নবমে রাহু, দশমে বৃহস্পতি, একাদশে মঙ্গল, দ্বাদশে বুধের অবস্থান। শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক প্রীতি ও শান্তি বজায় থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্র অনুকূল। ব্যবসায়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ঘর-বাড়ী বা গাড়ী সম্পদ লাভের যোগ আছে। মহিলাদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ৮, ৯, ১০ এপ্রিল।

বৃষ : প্রথমে শনি, দ্বিতীয়ে কেতু, অষ্টমে রাহু, নবমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, একাদশে বুধ, দ্বাদশে শুক্র ও রবি। শারীরিক উন্নতির যোগ প্রবল। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্র মোটের ওপর ভাল। ব্যবসায় চলনসই। ব্যয়াধিক্যের চাপ মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে। কাজকর্মে আশাপ্রদ সাফল্য নিশ্চিত। মহিলাদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩ এপ্রিল।

মিথুন : প্রথমে কেতু, সপ্তমে রাহু, অষ্টমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, দশমে বুধ, একাদশে শুক্র ও রবি, দ্বাদশে শনি। শরীর সুবিধার নয়। অবশ্য সপ্তাহ শেষে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির লক্ষণ আছে। আয় চলনসই। ব্যবসায়ে বাধা-বিপত্তি আসতে পারে। কাজকর্মে পদস্থ ক্ষমতাসীন ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে দুশ্চিন্তা অবশ্যম্ভাবী নয়। মহিলাদের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১০ এপ্রিল।

কর্কট : ষষ্ঠে রাহু, সপ্তমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, নবমে বুধ, দশমে শুক্র ও রবি, একাদশে শনি, দ্বাদশে কেতু। শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক দুশ্চিন্তার অভাব আছে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে অস্বাস্তির লক্ষণ আছে। আর্থিক ক্ষেত্র মন্দ নয়। কিন্তু ঋণশোধের চাপে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কাজকর্ম মোটের উপর ভাল যাবে। মহিলাদের পক্ষে পারিবারিক দুশ্চিন্তা ভোগের সম্ভাবনা আছে। শুভ তারিখ : ৮, ৯, ১১, ১২ এপ্রিল।

সিংহ : পঞ্চমে রাহু, ষষ্ঠে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, অষ্টমে বুধ, নবমে শুক্র ও রবি, দশমে শনি, একাদশে কেতু। শারীরিক উন্নতির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। আর্থিক ক্ষেত্রের জটিলতা দূর হবে। আর্থিক উন্নতি ও ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ আছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ এপ্রিল।

কন্যা : চতুর্থে রাহু, পঞ্চমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, সপ্তমে বুধ, অষ্টমে শুক্র ও রবি, নবমে শনি, দশমে কেতু। শরীরটা ভাল নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র সুবিধার নয়। আয় ও ব্যয় চলনসই। কিন্তু ঋণ-চিন্তা দূর হবে, ব্যয়াধিক্যের চাপ কমবে। ব্যবসায় একপ্রকার। কাজকর্ম চলনসই। মহিলাদের পক্ষে সময়টা মন্দ নয়। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১১ এপ্রিল।

তুলা : তৃতীয়ে রাহু, চতুর্থে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, ষষ্ঠে বুধ, সপ্তমে শুক্র ও রবি, অষ্টমে শনি, নবমে কেতু। শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্র সুবিধার নয়। ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হতে পারে। আয় মন্দ নয়। কিন্তু ব্যয়াধিক্যের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার লক্ষণ প্রবল। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কাজকর্ম চলনসই, কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের সঙ্গে মনো-মালিন্য দেখা দিতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১৩ এপ্রিল।

বৃশ্চিক : দ্বিতীয়ে রাহু, তৃতীয়ে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, পঞ্চমে বুধ, ষষ্ঠে শুক্র ও রবি, সপ্তমে শনি, অষ্টমে কেতু। স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল যাবে। পারিবারিক ক্ষেত্র গতানুগতিক। আর্থিক ক্ষেত্রে অসুবিধা হলেও বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়জনের সাহায্যে অসুবিধা দূর হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ে লাভ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, স্থানান্তরে গমন ইত্যাদির যোগ আছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। শুভ তারিখ : ৮, ৯, ১০, ১১ এপ্রিল।

ধনু : প্রথমে রাহু, দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, চতুর্থে বুধ, পঞ্চমে শুক্র ও রবি, ষষ্ঠে শনি, সপ্তমে কেতু। শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক দুশ্চিন্তা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সুখ্যাতি লাভের লক্ষণ আছে। মহিলাদের পক্ষে শরীরটা সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ এপ্রিল।

মকর : প্রথমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল, তৃতীয়ে বুধ, চতুর্থে শুক্র ও রবি, পঞ্চমে শনি, ষষ্ঠে কেতু, দ্বাদশে রাহু। শত্রুতা, ক্ষতিজনিত দুশ্চিন্তা এবং রোগভোগের লক্ষণ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র গতানুগতিক। ঋণশোধের চাপ বৃদ্ধির ফলে আর্থিক দুশ্চিন্তা দেখা দিতে পারে। অন্যথায় আয় একপ্রকার। ব্যবসায় মন্দ নয়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ আছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা চলনসই। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ এপ্রিল।

কুম্ভ : দ্বিতীয়ে বুধ, তৃতীয়ে শুক্র ও রবি, চতুর্থে শনি, পঞ্চমে কেতু, একাদশে রাহু, দ্বাদশে মঙ্গল। শরীরটা সুবিধার নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই।। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। আয় একপ্রকার। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে সামান্য উন্নতি হতে পারে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা চলনসই। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯ এপ্রিল।

মীন : প্রথমে বুধ দ্বিতীয়ে শুক্র ও রবি, তৃতীয়ে শনি, চতুর্থে কেতু, দশমে রাহু,

একাদশে বৃহস্পতি ও মঙ্গল। শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। আয় ভাল। ব্যবসায়ে লাভ হতে পারে। কাজকর্মে সাফল্যের যোগ প্রবল। মহিলাদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ৯, ১০ এপ্রিল।

—শুভাচার্য

প্রশ্নের উত্তর

জিনাত আরা রফিক (বাংলাদেশ) : ইচ্ছা থাকলে পারবেন।

উৎপলেন্দু পাল : ১৯৭৩ সালের শেষদিকে সম্ভব।

চুমা চ্যাটার্জি (সুকচর) : বিদ্যাস্থান ভাল। এম-এ হবার যোগ আছে। যাবে।

অর্ধেন্দুশেখর মুখার্জি : ব্যবসা না করাই ভাল। চাকরির চেষ্টা করুন।

ইন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সিংহ রাশি, সিংহ লগ্ন। অফিসার হবার যোগ আছে।

নগেন দত্ত এবং মৃদুল ভট্টাচার্য : জন্ম সন তারিখ ও সময় পাঠাবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত : চেষ্টা করে দেখুন।

মঞ্জুশ্রী দত্ত (শিলং-৪) : কুপন পাঠাবেন।

পার্থ রায়গুপ্ত (যাদবপুর) : ১৯৭৪ সালে কর্মস্থলে পরিবর্তন হতে পারে।

গৌরী দত্ত (মেঘালয়) : ২৩ বর্ষ বয়সে হওয়া সম্ভব। কৃতী পাত্র হবে।

অজানা গঙ্গোপাধ্যায় (বর্ধমান) : জন্ম সময় জানাবেন।

পীযূষ দে (আসাম) : আগামী জুলাই মাসের মধ্যে প্রবল যোগ আছে।

মোহাম্মদ শামীম রুমী (বাংলাদেশ) : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠান।

সৌমেন্দ্রকিরণ রায় : ৫২ বর্ষ বয়সের পর সুপরিবর্তন সম্ভব।

স্বপ্না মিত্র : জন্ম সময় জানাবেন।

[illegible] মুখার্জি : আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে সম্ভাবনা আছে। তবে ব্যবসা করা ভাল।

শঙ্করনারায়ণ কায়স্থ : বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।

সিদ্ধার্থশঙ্কর বিশ্বাস : দ্বিতীয় বিভাগে সম্ভব।

বিদ্যুৎ মুখার্জি : সম্ভাবনা কম।

দিলীপ চ্যাটার্জি : জন্ম সময় পাঠাবেন।

মিস্ এ. মিত্র : ২২ বর্ষ বয়সে সম্ভব। মধ্যম প্রকার।

সলিল অধিকারী : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠান।

বিজনকুমার দত্ত (বেহালা) : আগামী জুনের মধ্যে সম্ভাবনা আছে।

সুজিত সেন : ১৯৭৪ সালে সম্ভব।

ত্রিদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম সময় দেবেন।

দীপক সামন্ত (পাটনা) : বিদ্যায় বাধা আছে। চাকুরি প্রাপ্তি সম্ভব।

পার্থসারথী সেন (দমদম) : আগামী আগস্টের মধ্যে প্রবল যোগ।

বঙ্গলক্ষ্মী সামন্ত (পাটনা) : জন্ম সময় পাঠাবেন।

অসিতরঞ্জন ভৌমিক (বর্ধমান) : ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে সম্ভব।

কৃষ্ণবেণী (কলি-২) : হবে না।

শ্যামলেন্দু দাস (আসাম) : সম্ভাবনা কম।

ভি. বসু : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

মিসেস পি চ্যাটার্জি (বাঁকুড়া) : ১৯৭৪ সালে।

শুভাশিস ঘটক (বার্নপুর) : সম্ভাবনা কম।

জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

রেখা গিরি (বিহার) : সুস্থ পুত্র হওয়া সম্ভব।

স্বপ্না কর : পাশ করার যোগ। উচ্চ-শিক্ষায় বাধা আছে। ৩১ বর্ষ বয়সে সম্ভব।

দীপক দাস (বিহার) : দ্বিতীয় বিভাগে সম্ভব।

জ্যোতিপ্রকাশ বসু : ১৯৭৪ সালে মার্চের মধ্যে।

নির্মলেন্দু সেন : শেষের দিকে সম্ভব।

রুমা ঘোষ (নিউ আলিপুর) : আশানুরূপ না হওয়াই সম্ভব।

দীপককুমার রায় : আশা করা যায়।

সঞ্জীব ভট্টাচার্য (ত্রিপুরা) : ১৯৭৪ সালে সম্ভব। গোমেদ রত্ন ধারণে সুফল পাবেন।

কৃষ্ণা দত্ত (কলি-১৯) : সম্ভাবনা আছে।

সি পাল (দমদম) : কৃতকার্য হবার আশা কম।

মিতা দত্ত (কলি-১৯) : পাশের সম্ভাবনা আছে।

বিশ্বনাথ সাহা : আশা কম।

গীতা বাড়ুই : সম্ভাবনা কম।

প্রদীপ সেনগুপ্ত : জুন মাসের পর সম্ভব।

চন্দ্রাবতী দে : বিশেষ কিছু নেই।

প্রশান্ত সেনগুপ্ত : ৩৩ বর্ষ বয়সের পর উন্নতি সম্ভব।

সরোজ দাস (গৌহাটি) : আশা কম।

সুভাষ ব্যানার্জি (অন্ডাল) : সম্ভাবনা আছে।

দেবযানী নাগ (কাছাড়) : বেশী হবে না।

চিন্ময়ী রায় (হুগলী) : ১৩৮০ সালে সম্ভাবনা আছে।

দীপালি পাল (বিরাটি) : এবৎসর অনুকূল নয়।

মন্টুমোহন জানা (মেদিনীপুর) : আগামী আশ্বিনের মধ্যে উন্নতি সম্ভব।

নীলমণি নাথ (হাওড়া) : আশানুরূপ ফললাভে বাধা।

নির্মাল্য ঘোষ : ৩২ বর্ষ বয়স থেকে।

হরি সেনগুপ্ত : আগামী জুন মাসে সম্ভব।

শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্ত : ১৯৭৪ সালে জুন মাসে স্বাস্থ্যোন্নতি যোগ।

শিপ্রা দত্ত (কলি-১৯) : ২৭ বর্ষ বয়সের পর।

বিজয়ভূষণ পাল (বিরাটি) : আগামী জুনের মধ্যে সম্ভব।

ভারতী দে (চন্দননগর) : ৩৫ বর্ষ বয়স থেকে।

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত
প্রফুল্ল রায় রচিত
এক বিন্দু দুখ/নায়িকা জয়শ্রী সেন

নবেন্দু ঘোষ যে চিত্রনাট্যটি রচনা করেছেন, তাতে সুভাষ ও লক্ষ্মীর বাল্যকাল থেকে ওদের যৌবন পর্যন্ত বিধৃত। সুভাষের প্রতি লক্ষ্মীর ভালোবাসাকে, বোধকরি, চূড়ান্ত পর্যায়ে তোলবার জন্যেই সুভাষকে করা হয়েছে ভাবপ্রবণ, কবি। সে বিশ্বাস করে, সবরকম অভিজ্ঞতাই জীবনে থাকা উচিত। বিশিষ্ট আইনজীবী, পণ্ডিত দেওধর শর্মার সন্তান হয়েও সে তাই রঞ্জনের মতো অসৎ লোকের সঙ্গে মিশতে আদৌ লজ্জিত নয়। ছোট বোন লক্ষ্মীর প্রতি ভালোবাসার তার অভাব নেই, কিন্তু লক্ষ্মীর সুপরামর্শকে সে গ্রাহ্য করে না। সে রঞ্জনের কুসঙ্গে পড়ে স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যায় নাচগানে স্ফূর্তি পেতে, মদ্যপানও করে। কাজেই অর্থের প্রয়োজনে সে রঞ্জনের কাছ থেকে টাকা ধার করে। শেষ পর্যন্ত এমন সঙ্গীন অবস্থা হল যে, লক্ষ্মী যখন তার বাবার স্নেহের দান মোহনমালা স্বর্ণহার পরে শ্বশুরালয়ে গমনোদ্যত, ঠিক সেই সময়ে ঐ মোহনমালা তাকে খুলে দিতে হল রঞ্জনের হাতে দাদার ঋণ শোধ করবার জন্যে। সুভাষ [illegible] চেষ্টায় ঐ স্বর্ণহার উদ্ধার [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারল না—[illegible] [illegible] তৈরী [illegible] করে থেকে ছিনিয়ে নিল। সুভাষের তখন চৈতন্য ফিরে এল। সে কুণ্ঠিত হল না ঐ দুর্বৃত্তের ওপর কঠিন আঘাত হানতে স্বর্ণহারটি উদ্ধার করবার জন্যে। যখন সেই হার সে তার স্নেহের ভগ্নী লক্ষ্মীর কণ্ঠে পরিয়ে দিচ্ছে, তখন পুলিশ এল তাকে গ্রেপ্তার করতে হত্যার অপরাধে। কিন্তু বিশিষ্ট আইনজীবী দেওধর জানেন, তাঁর ছেলে সুভাষ ছাড়া পাবেই পাবে।

—ভাই সুভাষের প্রতি ছোট বোন লক্ষ্মীর অকৃত্রিম ভালোবাসাকে দর্শকদের মনে গেঁথে দেবার জন্যেই, বোধহয়, সম্ভব অসম্ভব বহু ঘটনার এমন ছড়াছড়ি। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠা ভগ্নীর অকৃত্রিম ভালোবাসা কি একছড়া স্বর্ণহার গলা থেকে লুকিয়ে খুলে দেওয়ার মধ্যেই পর্যবসিত হয়? এবং এরই জন্যে দাদাকে কুসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে? —ভাই-বোনের মধ্যে সহজাত যে-ভালোবাসা, তাকে [illegible] করবার জন্যে, তাকে যথার্থ মার্মিক আবেদনপূর্ণ করবার জন্য বাঙালী পরিচালক সত্যেন বসু এবং বাঙালী চিত্রনাট্যকার নবেন্দু ঘোষের নিকট হতে একটি [illegible], সম্ভাব্য, সৎ কাহিনীই আমরা আশা করেছিলুম। কিন্তু মনে হচ্ছে, [illegible] [illegible] [illegible] করে এবং হয়ত, অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত হয়ে ও'রা দুজনেই খাঁটি বোম্বাইয়া হয়ে উঠেছেন এবং ফলে আরও পাঁচজন সাধারণ বোম্বাই প্রযোজক-পরিচালকের মতো সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য ঘটনার ঘনঘটাপূর্ণ অ্যাকশন-প্রধান 'মেরে ভৈয়া' উপহার দিয়েছেন।

এই ছবিটিতে ভালো লাগবার মতো অভিনয় করেছেন নায়কের পিতা দেওধরের ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত। যদিও কঠিন নিয়মানুবর্তিতার জন্য পিতা বালক পুত্রের প্রতি কিছুটা পরুষ আচরণ করেছেন এবং সেটাকে কিছুটা বাড়াবাড়িও মনে হয়েছে, তবু অনুকূল পরিস্থিতিতে পিতার অন্তর্নিহিত স্নেহের দুয়ার খুলে দেওয়ার দৃশ্যে শ্রীগুপ্ত চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। নায়িকা—না, এ ছবিতে রোমাণ্টিক নায়িকা নেই—নায়িকার লক্ষ্মীর ভূমিকায় নাজিমা যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন ভ্রাতৃপ্রেমের দৃশ্যগুলিকে [illegible] [illegible] করে তোলবার জন্যে। সুভাষের চরিত্রে বিজয় অরোরা সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি ফুটিয়ে তোলবার দিকে আদৌ মনোসংযোগ করেছেন কিনা সন্দেহ। তিনি চরিত্রটির বেপরোয়া ভাবটির দিকেই নজর দিয়েছিলেন বেশী মাত্রায়। এবং [illegible] ও [illegible]

লক্ষ্মীবেশে মাস্টার সত্যজিৎ ও বেবী গৌরী যেটুকু অভিনয় করেছে, তা দর্শক-উপভোগ্য হয়েছে। লক্ষ্মীর স্বামী ও শাশুড়ীর ভূমিকায় যথাক্রমে সুরেশ জাভেরাল ও দুর্গা খোটে গৃহীত চরিত্রের রূপায় সুবিচার করেছেন। অপরাপর শিল্পীর করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না।

ছবির আলোকচিত্রের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণভাবে প্রশংসনীয়। ছবিতে তিনটি গান আছে, মনে হয়, একটিও না থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। পণ্ডিত জ্যোতিরীন্দ্রের সুর এবং মান্না দে ও লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া সত্ত্বেও গানগুলি দর্শকদের মনে কোনো রেখাপাত করতে পারেনি। বরং আবহসংগীত প্রশংসা পেতে পারে।

(৩) দরার (হিন্দী) :

গীতা প্রডাকসন-এর নিবেদন, শান্তি কুমার প্রযোজিত এবং বেদ রাহী লিখিত ও পরিচালিত 'দরার' রঙীন চিত্রটি যুদ্ধের বিপক্ষে আওয়াজ তুলেছে। পরম আনন্দে সদ্যবিবাহিত স্বামীস্ত্রী ঘর বেঁধেছে—দুজনে দুজনের প্রেমে বিভোর। স্ত্রী হল সন্তানসম্ভবা। ক্রমে দিন এগিয়ে এল সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার। এমন সময়ে শত্রুর আক্রমণ। গাঁয়ের লোক, যে যা পারল, অস্থাবর দ্রব্যাদি নিয়ে পালাতে লাগল। ওদিককার গাঁ থেকে দলে দলে ছুটছে—শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী। কিন্তু ঐ আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে ছেড়ে স্বামী যায় কি করে? —স্ত্রীকে সে অনুরোধ করে, কোনোক্রমে শক্তি সংগ্রহ করে কিছু দূরে পালিয়ে চল। কিন্তু স্ত্রীর আর সে ক্ষমতা নেই—তার প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ আরম্ভ হল। মৃত্যুভয়ভীত স্বামী স্ত্রীকে ছেড়েই দৌড় দিল। কিন্তু এসে গেল মুষলধারে বৃষ্টি দাঁড়াতে বাধ্য হল সে। এবং ঐ সময়ে এল বিবেকের দংশন। সে বৃষ্টি থামতে ফিরল নিজের ঘরে। বিনা সহায়তাতেই স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। আবার সব শান্ত। স্বামী দেখল—স্ত্রী আবার সুস্থ হয়েছে, নবজাতটিও হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু স্বামী ভাবল—সে তো মৃত। এমন অবস্থায় স্ত্রীকে নিরাপত্তার কোলে সমর্পণ করে সে তো অনায়াসেই পালিয়ে যাচ্ছিল। তার আর স্ত্রীর মাঝে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বুজিয়ে ফেলবার সামর্থ্য তার কৈ?

—ছোট্ট কাহিনীটি কিন্তু সুগ্রথিত নয়। বিবাহের পূর্বে প্রণয়ের অংশ বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। অথচ শত্রুর আক্রমণে যখন সমস্ত গ্রাম বিপন্ন এবং সকলে পলায়নপর, তখন কাহিনীটি অসংলগ্ন দৃশ্যে বিভক্ত হওয়ায় কোনোও গতিবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি। চিত্রনাট্য রচনায় দৃশ্যকে বিভিন্ন শটে ভাগ করা বিষয়ে এবং সমগ্রভাবে কাহিনীর উপস্থাপনায় যেন শিক্ষানবিসীর হাত সুপরিস্ফুট—অভিজ্ঞতার চিহ্নমাত্র নেই।

সবচেয়ে ছবিটির ব্যর্থতা কলা-কৌশলে। ইস্টম্যানকলারে ফোটোগ্রাফী যে এত বেশী নিকৃষ্ট হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ছবির মধ্যে প্রশংসনীয় হচ্ছে এর সংগীতাংশ। সংগীত-পরিচালক সুধীর ফড়কে কৃত সুর ছবির চারখানি গানকেই পরম উপভোগ্য করে তুলেছে।

অভিনয়ের মধ্যে ছবির নবাগতা নায়িকা রোহিণী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

নাট্যায়ন-এর 'হা' হা' স্বদেশ'

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'—মানুষের চিরকেলে এই দাবীটি আজো এদেশে যথার্থ সম্মান ও বিবেচনা লাভ করেনি। পরাধীন যুগে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হোত বিদেশী শাসকদের ঘাড়ে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালে কার কাছে জবাবদিহি চাইব? কারণ জবাব চাইলেই তো বিনিময়ে মিলবে কন্তাপচা ভাষণ, রং-চটা শ্লোগান আর কড়ি-বোঝাই প্রতিশ্রুতি। তাই বোধহয় বর্তমান শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের শেষভাগে একদল টাটকা সা-জোয়ান ছেলে ইতিকর্তব্য নিজেরাই স্থির করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সব ভাঙার 'খেলায়'—যাতে ভবিষ্যতে সত্যিই কিছু পাকাপোক্তভাবে গড়ে ওঠে।

'খেলা' শব্দটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি। কারণ গত ৪ঠা মার্চ মুক্তাঙ্গনে অমিল দে রচিত ও নাট্যায়ন প্রযোজিত 'হা' হা' স্বদেশ' নাটকটি দেখার পর আর গালভরা সংগ্রাম বা বিপ্লব শব্দগুলি লিখতে প্রবৃত্তি হোল না। যেসব ছেলে সেদিন মেতে উঠেছিল নতুনের আশায় তাদের অনেকেরই আজ ত্রিশঙ্কু অবস্থা—তারা ঘরেরও না, পরেরও না, মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হজম করছে।

সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার দুটি কারণে—১) তাঁর বিশ্লেষণ, পরিণতি যাই, অনেকটা সঠিক, ২) দলগত অভিনয় সার্থক।

দলগত অভিনয়ের সার্থকতা স্বীকার করেও দু-একজনের নাম উল্লেখ করা দরকার, যারা আগামী দিনের অভিনেতা হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করতে অনেকাংশেই সফল হয়েছেন তাঁরা, প্রধান চরিত্র 'বিপ্লবের' ভূমিকায় শুভাশিস ভট্টাচার্য, বাবা ও শিক্ষকের দ্বৈত ভূমিকায় নাট্যকার ও নির্দেশক অমিল দে এবং রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে সুব্রত ঘোষ।

এই নাটকের সাফল্যের অনেকটা দায়িত্ব বহন করেছেন মঞ্চনির্দেশক মন দত্ত ও সংগীত-নির্দেশক দেবাশীষ দাশগুপ্ত।

সংক্রান্তি নাট্যাভিনয় : গত ১৬ জানুয়ারী ১৯৭৩ সরণী (কলা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা) বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটকটি নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে এই নাটক এ'দের প্রথম প্রয়াস। নাটকটি পুরো হলেও এর পরিচালনা, প্রয়োগনৈপুণ্য এবং দলগত অভিনয়ের জন্য উপস্থিত নাট্যরসিকদের নিকট উচ্চ প্রশংসা পায়। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্যামল রায়। চরিত্রানুগ সু-অভিনয় করেন যথাক্রমে সত্যেন কাঞ্জিলাল, শিশির গুহ, চি মুখার্জি, শান্তি চক্রবর্তী, দীপক দাশগুপ্ত, অলোক হাজরা ও শ্যামল রায়। বাস্তবিক অপেশাদারী শিল্পী হিসাবে এ'দের অভিনয় বহু দিন মনে রাখবার মত। তাছাড়া অন্যাদের মধ্যে ছিলেন শঙ্কর নাথ, মন্মথ নাথ, মানস চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, সুকান্ত রায়, শৈলেন রায়চৌধুরী, অরুণ চ্যাটার্জি সত্য সিনহা ও নির্মলেন্দু পণ্ডিত।

দেবযানী : যে সকল নাট্যক ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চে এবং বিশেষ করে চলচ্চিত্রের রুপোলী পর্দায় পরিবেশিত হয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে তাকে যদি কোন নাট্যগোষ্ঠী একটি সাংস্কৃতিক প্রযোজনা হিসেবে উপস্থিত করতে চায় তাহলে তাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুই আছে। সুবিধা এই কারণে, যে মোটামুটি অভিনয় রীতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে থাকে শুধু তাকে অনুশীলন করে অনুসরণ করলেই চলে। আবার অসুবিধে এই প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে চরিত্র এই রূপদান করেছেন, তাঁদের সঙ্গে

সবার মনেই একটা ইমেজ থাকে। আর অভিনয়ে সেই ইমেজ যদি নষ্ট হয়, তাহলে সাধারণতঃ দর্শকদের প্রতিক্রিয়া খুব সুখকর হয় না। অবশ্য পূর্ববর্তী অভিনয় ভঙ্গিমাকে যে অনুসরণ করতে হবে সব সময়ে তা নয়। শিল্পীদের স্বকীয়তায় সেই সব চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের মনে নতুন করে ইমেজ সৃষ্টি হোতেও পারে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা শিল্পীর চরিত্র উপলব্ধি ও তাদের প্রকাশের ক্ষমতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এই কথাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে ভীড় করে আসছিল কয়েকদিন আগে স্টার থিয়েটারে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'দেবযানী' নাটকের অভিনয় দেখার সময়। নাটকটি পরিবেশন করেছিলেন ইস্টার্ণ রেলের ক্যাশ এন্ড পে রিক্রিয়েশন ক্লাব। ডাঃ গুপ্তের যে 'উত্তর ফাল্গুনী' উপন্যাসটি বাংলা ও হিন্দী উভয় চলচ্চিত্রেই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল, তাকে কেন্দ্র করেই 'দেবযানী' নাটকের সংঘাত গড়ে উঠেছে। দু'একটি জায়গা ছাড়া গল্পটি সেই একইভাবে এগিয়ে গিয়েছে, যেমন এগিয়ে গিয়েছিল ছবিতে। সুতরাং গল্পের গভীরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে নাট্যরূপে মাঝে মাঝে গতির বড়ো অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। নাটকের শুরুই হয়েছে অসম্ভব শ্লথ ভঙ্গিমায়।

অভিনয়ের ব্যাপারেও অনেক শৈথিল্য চোখে পড়েছে। মনীশ, 'সুপর্ণা', দেবযানী ও রাখাল ভট্টাচার্যের যে চরিত্রচিত্রণ আমাদের এখানকার দর্শকদের মনে গাঁথা আছে, তার কাছে এতটুকু পৌঁছতে তো পারেন নি কেউ। তা ছাড়া এই সব চরিত্র যে ভঙ্গিমা এবং যে প্রাণের সুরে অভিনীত হওয়া দরকার, এই সব চরিত্রের রূপকারদের প্রয়াসে তার ছোঁয়া খুব একটা ছিল বলে মনে করি না।

ব্যারিস্টার মণীশ রায়ের চরিত্রে বিষ্ণু ভট্টাচার্যকে মানিয়েছিল চমৎকার। কিন্তু চরিত্রের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি সব সময়ে। অন্তরের যে দুঃসহ যন্ত্রণা তাঁকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে, তার সীমাহীনতাকে শিল্পী প্রত্যাশিত আবেগে মঞ্চের আলোয় মূর্ত করে তুলতে পারেন নি। সঙ্গীতা করের 'দেবযানী' সম্পর্কেও এই কথা বলা যেতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে এই অসাধারণ একটি চরিত্রের প্রকাশকে আরো অনেক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কেন প্রাণময় করতে পারলেন না নির্দেশক। পরেশ চক্রবর্তী 'রাখাল ভট্টাচার্য' চরিত্রে স্টাইলটা এনেছিলেন ভালো, কিন্তু সংলাপ উচ্চারণ তাঁর বড়ো অস্পষ্ট। শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জির 'সুপর্ণা' মোটামুটিভাবে অভিনীত: অজিত ব্যানার্জির 'ইন্দ্রনীল' হয়েছে সর্বাংশে কৃত্রিম।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন লালমোহন [illegible], রণজিৎকুমার দাশগুপ্ত, গোপাল-[illegible], [illegible] মুখার্জি, শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, [illegible] চক্রবর্তী, দুলালচন্দ্র দত্ত, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সন্তোষ ব্যানার্জি, স্বপ্না মিত্র, বেবী ঘোষ, শাশ্বতী বাকচী।

নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন শ্রীরাম ভট্টাচার্য।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন সাহা এবং জগদীশচন্দ্র সরকার

নেশা : মানুষের বিচিত্রতম মানসিক স্পন্দনকে যেমন নানারকম গতিবেগসম্বন্ধ নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে গভীর সুরে মুখর করে তোলা যায়, তেমনি হাস্যরসের অনাবিল স্রোতেও সেই সংঘর্ষের প্রাণময়তাকে নাটকের মধ্যে ভাষা দেওয়া যায়। এ কথাই সেদিন হয়তো প্রমাণ করলেন বেনিয়াটোলা তরুণ সঙ্ঘের শিল্পীরা মিনার্ভা মঞ্চে তাঁদের নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে। নাটকের নাম 'নেশা', লিখেছেন শ্রীগোপাল চ্যাটার্জি। প্রয়োগপরিকল্পনার দায়িত্বও বহন করেন নাট্যকার স্বয়ং।

এঁদের দলগত অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হোল অটুট সংহতি। এবং এরই জন্য নাটকের গতি কখনো বিশেষ শ্লথ হয়ে পড়েনি। যাঁদের চরিত্রচিত্রণ আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁরা হোলেন সোমনাথ চক্রবর্তী (প্রতীক), রুণু ঘোষ (কাজল), অলোক পাল (তিনকড়ি), বন্দনা বিশ্বাস (মানসী), গোপাল চ্যাটার্জি (জীবন-কাকা)।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সত্য দে, প্রবীর চ্যাটার্জি, আশীষ মুখার্জি, বিকাশ দত্ত, সবিতা ব্যানার্জি, সুভাষ বর্ধন, অরুণ দাঁ, তপন ব্যানার্জি, পুলক কুণ্ডু, বিশ্বনাথ মণ্ডল, শিপ্রা চ্যাটার্জি।

ভক্ত হরিদাস : পূর্ব রেলের টি-আর-এস স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব (কারশেড)এর শিল্পীরা সম্প্রতি তাঁদের ষষ্ঠ বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে 'ভক্ত হরিদাস' নাটকের অভিনয় করলেন নেতাজী সুভাষ ইন্সটিটিউটে। সৌরীন্দ্রমোহন রচিত এ নাটকটি পরিচালনা করেন গৌতম চৌধুরী।

বিভিন্ন চরিত্রে অমলকুমার দাস, গৌতম চৌধুরী, প্রদীপ দাস, জনক দাস, প্রদ্যোৎ গুপ্ত, দিলীপ চক্রবর্তী, অমল দাশগুপ্ত, সুনীল ভট্টাচার্য, এস মুখার্জি, নির্মল মুখার্জি, দেবকুমার অধিকারী, এন জি বিশ্বাস, টাবা বসুমল্লিক, অনিমেষ ব্যানার্জি, বাবলু মজুমদার, প্রাণকৃষ্ণ দাস, দীনেন চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ পাল, নির্মল মজুমদার, অন্নপূর্ণা মুখার্জি, আলো ঘোষ, অঞ্জনা মুখার্জি, শীলা চক্রবর্তী।

এরিক রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'সংক্রান্তি' : শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক সম্প্রতি রঙ্গনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল। প্রযোজনা করলেন এরিক রিক্রিয়েশন ক্লাব। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করেন শ্রীভোলা দত্ত।

প্রায় প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। তবুও যাঁদের অভিনয় দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তাঁরা হোলেন অজয় ঘোষ (রতন), তপন রায়চৌধুরী (দয়ারাম), ধীমান চক্রবর্তী (শঙ্কর), দিলীপ চ্যাটার্জি (চন্দ্রমাধব), সুনীত চট্টোপাধ্যায় (রমাই), মমতা চ্যাটার্জি (সাঁত্রা), মায়া ঘোষ (দুর্গা), রাণু রায় (নিস্তারিণী) অনঙ্গ গুপ্ত (নায়েব)।

।। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ।।

চৈতালীর সর্বভারতীয় বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। যোগাযোগের ঠিকানা— বিদ্যুৎ সিংহ, জে-১২ সহরপুরা, সিন্দ্রী, ধানবাদ।

বিবিধ সংবাদ

রাষ্ট্রপতির পদক লাভ

সম্প্রতি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এক যৌথ অনুষ্ঠানে পুলিশ

বিভাগে অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেকটর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব-ইন্সপেকটর সুধাংশুমোহন সাহা ও সাব-ইন্সপেকটর জগদীশচন্দ্র সরকারকে রাষ্ট্রপতির পদক প্রদান করেন।

গীতাঞ্জলির ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন : ২৪ মার্চ সিঁথির নিকট গীতাঞ্জলির ২৬তম অধিবেশন হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দের মধ্যে মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা ঝরিয়া, মহারাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জিতকুমার ঘোষ অন্যতম। এছাড়া গীতাঞ্জলির শিল্পিবৃন্দের অনুষ্ঠানও মনোজ্ঞ হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক দীলিপকুমার বসু ও প্রাক্তন বিধানসভা অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুরাগীদের অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

যাদুকর উদয়শঙ্করের ম্যাজিক স্কোপ' : গত ২৭ ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে পূর্ব কলকাতার রোটারী ক্লাব ও উদয়ন ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাদুকর উদয়শঙ্করের 'ম্যাজিক স্কোপ' বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। উদীয়মান যাদুকর শঙ্করের যাদু প্রদর্শনের কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়।

যাদু, সঙ্গীত, নৃত্য ও হাস্য-কৌতুকের সমন্বয়ে সৃষ্ট 'ম্যাজিক স্কোপ' উদীয়মান যাদুকর উদয়শঙ্করের যাদু-জগতে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

উদীচীর শান্তিনিকেতন : ভারতীয় দর্শনের ওপর রচিত রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধগ্রন্থ একটি অমূল্য সম্পদ। এই রচনাগুলির মূল্য বক্তব্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে রবীন্দ্রনাথের 'শ্রাবণগাথা' গীতিনাট্যের আঙ্গিকে সুষ্ঠুভাবে নাট্যরূপ রচনা ও পরিচালনা করেন শৈলেশ ভড়। গত ২৫ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় এটি সুন্দরভাবে মঞ্চস্থ করেন 'উদীচী' ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। অভিনয়ে [illegible] মুখোপাধ্যায় ([illegible]), [illegible] ([illegible]) ও [illegible] [illegible] যথাযথভাবে রূপদান করেন। সঙ্গীতাংশে ছিলেন সুনন্দা রায়, গোপা চট্টোপাধ্যায়, তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিংহ, তপন ভট্টাচার্য, শঙ্করেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাদল চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ্য। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন সুবীর বসু (বাঁশি), প্রবীর রায় ও [illegible] মাইতি (গীটার) ও [illegible] প্রসাদ ([illegible])। উদীচীর [illegible] [illegible]

অঞ্জনা ভৌমিক / শেষ বিচার
পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

পাইকপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব : সি এ বি-র দ্বিতীয় বিভাগের লীগ এবং জুনিয়র নক-আউট চ্যাম্পিয়ন

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

তৃতীয় টেস্ট খেলা

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪৪ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে বর্তমান টেস্ট সিরিজে উপস্থিত ১-০ খেলায় এগিয়ে গেছে। ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিত ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে এই পরাজয় খুবই অপ্রত্যাশিত এই কারণে যে, শেষ দিনের খেলায় এক সময় যেখানে তাদের জয়লাভের জন্যে মাত্র ৬৬ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে জমা ছিল ৫টা উইকেট সেখানে তারা ঐ ৫ উইকেটে মাত্র ২১ রান তুলে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেছিল। তাদের আরও দুর্ভাগ্য যে, দলের অতি নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান লরেন্স রো খেলায় আহত হয়ে কোন ইনিংসেই ব্যাট করেন নি।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ৩০৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ডগ ওয়াল্টার্স সেঞ্চুরী (১১২ রান) করেছিলেন। এই নিয়ে তিনি টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ১৩টা সেঞ্চুরী করলেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে তাঁর এই ৬ষ্ঠ সেঞ্চুরী।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৩২ [illegible] শেষ হয়। এই দিন ৫০ [illegible] তারা বাকি [illegible] উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ২৪ রান যোগ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২১০ রান তুললে খেলার ভারসাম্য সমান দাঁড়ায়।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পরই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৮১ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৫২ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৪ রান সংগ্রহ করেছিল। ইয়ান চ্যাপেল ৬৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের মাথায় মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৭১ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়লাভের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যেখানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় জয়লাভের জন্যে ৩৩৪ রানের দরকার ছিল সেখানে তারা চতুর্থ দিনেই ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৮ রান তুলেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিন যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে তখন তারা জয়লাভের লক্ষ্য থেকে মাত্র ১৮৬ রান দূরে ছিল, এদিকে তাদের হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট। লাঞ্চের সময় তাদের রান দাঁড়ায় ২৬৮ (৪ উইকেটে)—জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৩৪ রান থেকে মাত্র ৬৬ রান দূরে, হাতে জমা ছয়টা উইকেট। কিন্তু লাঞ্চের পর বাকি পাঁচটা উইকেটে (যেহেতু লরেন্স রো খেলেন নি) তারা মাত্র ২১ রান তুলেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮৯ রানের মাথায় শেষ হয়—জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৩৪ রানের থেকে ৪৫ রান কম। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নাটকীয়ভাবে ৪৪ রানে হেরে যায়।

অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এই নিয়ে যে ৩৩টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়াল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৮, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৬ এবং খেলা ড্র ৮ এবং টাই [illegible]

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩২ রান (ওয়াল্টার্স ১১২, রেডপাথ ৬৬ এবং গ্রেগ চ্যাপেল ৫৬ রান। গিবস ৭৯ রানে ৩ এবং আলী ৮৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৮১ রান (রেডপাথ ৪৪ এবং ইয়ান চ্যাপেল ৯৭ রান। গিবস ১০২ রানে ৫ এবং উইলেট ৩৩ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২৮০ রান (কালীচরণ ৫৩, কানহাই ৫৬ এবং মারে ৪০ রান। টেরী জেনার ৯৮ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৮৯ রান (ফ্রেডারিক্স ৭৬ এবং কালীচরণ ৯১ রান। ওয়াকার ৪৩ রানে ৩ এবং ও'কিফ ৫৭ রানে ৪ উইকেট)

ব্যক্তিগত সাফল্য

সেঞ্চুরী করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ডগ ওয়াল্টার্স (১১২ রান)। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ইয়ান চ্যাপেল মাত্র ৩ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। অপর দিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কালীচরণের ৯১ রান ছিল দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান। গিবস ১৮১ রানে ৮টা উইকেট পেয়েছিলেন (৭৯ রানে ৩ এবং ১০২ রানে ৫ উইকেট)।

রঞ্জি ট্রফি

কোয়ার্টার ফাইনাল

১৯৭২-৭৩ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (রঞ্জি ট্রফি) কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার ফলাফল :

(১) বোম্বাই ৯ উইকেটে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করেছে।

(২) হায়দরাবাদ ১৯৬ রানে দিল্লীকে পরাজিত করেছে।

(৩) মহারাষ্ট্র ৯ উইকেটে বাংলাকে পরাজিত করেছে।

(৪) তামিলনাড়ু ১১০ রানে রেলওয়েকে পরাজিত করেছে।

মধ্যাঞ্চল ফাইনাল

[illegible] এপ্রিল থেকে [illegible]

ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদ বনাম বোম্বাইয়ের এবং পুনার নেহরু স্টেডিয়ামে মহারাষ্ট্র বনাম তামিলনাড়ুর চারদিনব্যাপী সেমি-ফাইনাল খেলা সুরু হবে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে ৩৭তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ডাবল লেগের ফাইনালে সার্ভিসেস ১—০ ও ১—১ গোলে রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে রঙ্গাস্বামী কাপ জয়ী হয়েছে। সার্ভিসেস দল এই নিয়ে ১১-বার ফাইনালে খেলে ৬ বার কাপ জয়ী হল (এর মধ্যে যুগ্ম বিজয়ী ২ বার)। আরও উল্লেখ্য, জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দলের বিপক্ষে সার্ভিসেস দলের জয় এই প্রথম। আগের চারবারের ফাইনালে রেলওয়ে সরাসরি ৪ বার জিতেছে এবং একবার (১৯৬৬ সালে) রেলওয়ে এবং সার্ভিসেস যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল।

লীগ পর্যায়ের খেলা

লীগ পর্যায়ের খেলায় 'এ' গ্রুপ থেকে গত চারবারের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাব ও মহীশূর, 'বি' গ্রুপ থেকে সার্ভিসেস ও উত্তর-প্রদেশ, 'সি' গ্রুপ থেকে বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ এবং 'ডি' গ্রুপ থেকে গতবারের রানার্স-আপ রেলওয়ে ও তামিলনাড়ু—এই ৮টি দল যথাক্রমে লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সূত্রে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। গতবারের সেমি-ফাইনালিস্ট বাংলা এবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি, যেহেতু তারা 'সি' গ্রুপের লীগের খেলায় ৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। বাংলার থেকে এক পয়েন্ট বেশী পেয়ে মধ্যপ্রদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

কোয়ার্টার ফাইনাল

কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় পাঞ্জাব, সার্ভিসেস, বোম্বাই এবং রেলওয়ে জয়ী হয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে পাঞ্জাব ১-০ গোলে উত্তরপ্রদেশকে, সার্ভিসেস ৭-৪ গোলে মহীশূরকে, বোম্বাই ৮-৬ গোলে তামিলনাড়ুকে এবং রেলওয়ে ৩-০ গোলে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে। সার্ভিসেস বনাম মহীশূরের খেলাটি ২-২ গোলে ড্র যায়। শেষ পর্যন্ত 'টাই-ব্রেকার' সাহায্যে খেলায় নিষ্পত্তি হয়। বোম্বাই বনাম তামিলনাড়ুর খেলারও নিষ্পত্তি হয় টাই-ব্রেকার সাহায্যে। অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও এই খেলাটি গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত ছিল।

সেমি-ফাইনাল

সার্ভিসেস দল ২-১ ও ০-০ গোলে গত চারবারের চ্যাম্পিয়ান পাঞ্জাবকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে রেলওয়ে ১-০ ও ১-১ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তান

তৃতীয় টেস্ট খেলা

করাচীতে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের শেষ তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটিও ড্র গেছে। ফলে এই দুই দেশের ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেল—সিরিজের তিনটি খেলাই ড্র। বর্তমানে এই দুই দেশের টেস্ট সিরিজ খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : টেস্ট সিরিজ খেলা ৭, ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৪বার, পাকিস্তানের 'রাবার' জয় ০ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ৩বার। এই ৭টি টেস্ট সিরিজের ২৪টি খেলার ফলাফল : ইংল্যাণ্ড জয় ৯, পাকিস্তানের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১৪।

প্রথম দিনে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ২০১ রান সংগ্রহ করেছিল। এই দিন পুরো সময় খেলা হয়নি। একশ্রেণীর দর্শকদের হামলায় খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৪০ মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। সাদিক মহম্মদ ৮৯ রান করে আউট হন এবং মজিদ খাঁ ৫০ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ৪৪৫ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। মজিদ খাঁ এবং মুস্তাক মহম্মদের খুবই দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ৯৯ রানের মাথায় আউট হয়ে যান—মাত্র এক রানের জন্যে সেঞ্চুরী করার গৌরব হাতছাড়া করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে মুস্তাক মহম্মদ এবং মজিদ খাঁ দলের ১২১ রান তুলেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড কোন উইকেট না-খুইয়ে ১০ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২২৩ (৪ উইকেটে)। ডেনিস অ্যামিস তাঁর নিজস্ব ৯৯ রানের মাথায় আউট হলে উপর্যুপরি ৩টি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। তিনি প্রথম টেস্টে ১১২ রান এবং দ্বিতীয় টেস্টে ১৫৮ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ফ্লেচার এবং অ্যামিস ১৭৬ মিনিট খেলে দলের ১৩০ রান যোগ করেছিলেন।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৮৬ রানের মাথায় শেষ হলে পাকিস্তান ৫৯ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ৫৫ রান সংগ্রহ করে। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টনি লুইস ৫ ঘণ্টা ব্যাট করে নিজস্ব ৮৮ রান তুলেছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৯ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার এক সময় মাত্র ২ রানের বিনিময়ে তাদের ৪টে উইকেট পড়ে যায়—১০৬ রানের মাথায় ৩টে উইকেট—৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এবং ১০৮ রানের মাথায় ৭ম উইকেট। লাঞ্চের আগে তিন ওভারের খেলায় পাকিস্তানের ৫টা উইকেট পড়ে গেলে খেলায় দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ইংল্যাণ্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে তখন খেলা শেষ হতে দু ঘণ্টা বাকি ছিল। এই দু ঘণ্টা সময়ে খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৫৯ রান সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭০ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ডের ৩০ রানের (১ উইকেটে) মাথায় যখন খেলোয়াড়রা জলপানে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় শ' পাঁচেক দর্শক মাঠে ঢুকে পিচ নষ্ট করে দেন। ফলে আর খেলা হয়নি।

১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র গেলেও ইংল্যাণ্ডের হাতেই কাল্পনিক 'রাবার' খেতাব থেকে গেল যেহেতু ইংল্যাণ্ড ইতিপূর্বে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়েছিল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

বিঃ দ্রঃ—উৎপাদন শুল্কের হার
(চাঁদার সহিত অবশ্য প্রেরণীয়)

বার্ষিক	টাকা ১.০৪
ষান্মাষিক	টাকা ০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা ০.২৬

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৩শ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৯ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা

Friday, 13th April, 1973 শুক্রবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৭৯ .50 Paise

সূচীপত্র

ওরিয়েন্ট
ORIENT
মজবুত
নিঃশব্দ
নির্ভরযোগ্য
ডেস্ক পাখা
ওরিয়েন্ট পাখা এমন সুন্দর ডিজাইনে তৈরী যে আধুনিক বাড়ী, অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাজসজ্জার সঙ্গে সুষমরূপে মানায়। আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে ওরিয়েন্ট পাখার সারিতে আছে—সীলিং, টেবল, ডেস্ক, স্ট্যাণ্ড, অল পারপাস এবং এক্সস্ট পাখাগুলি। ভারতের সবচেয়ে অভিজ্ঞ কারিগর দিয়ে পাখাগুলি তৈরী। এগুলি ভারতে এবং বিদেশে গুণের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সব পাখাতেই দু'বছরের গ্যারান্টি।
উচ্চগুণসম্পন্ন পাখা বলেই সবচেয়ে বেশী বিক্রী
স্ট্যাণ্ড পাখা
ডিলাক্স পাখা
অল পারপাস পাখা
ওরিয়েন্ট
পাখা
পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি
ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড, ৬, ঘোর বিবি লেন, কলিকাতা-৫৪
ফ্যাক্টরী : কলিকাতা এবং ফরিদাবাদ
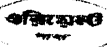
সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অমলানন্দ মুখার্জি

'প্রতিমা নির্মাণে' এ কোন ছেলে খেলা?

গত ৪০ সংখ্যা এবং ৪৪ সংখ্যা 'অমৃতে' উপরোক্ত বিষয়ে দুটি চিঠিই পড়েছি। ৪০ সংখ্যার পত্রলেখিকার পত্রে রয়েছে সংস্কারাচ্ছন্ন ঝাপসা দৃষ্টিভঙ্গী। ৪৪ সংখ্যার পত্রলেখিকার পত্রে আধুনিকতার উদ্ধত খড়্গ। দুটোর মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়—সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এখানে সোজাসুজি আমার কিছু বক্তব্য রাখছি।

পৃথিবী নিত্য পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনশীল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত প্রাণী মানুষ হিসাবে স্বভাবতই আমাদের শিল্পচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রতিনিয়তই রূপ বদল হচ্ছে। সেখানে মান্ধাতার আমলের সমাজ বা শাস্ত্রনীতিকে আঁকড়ে বসে থাকা চাঁদে যাওয়ার যুগের মানুষের পক্ষে অন্তত শোভা পায় না।

ধুন্দুলের খোসা, কলাপাতা বা সাপের চামড়া দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ শাস্ত্রসম্মত নয় বা শিল্পচেতনার অবক্ষয়তা প্রসঙ্গে শচীস্মিতা দেবী যে হতাশা প্রকাশ করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই হিন্দু শাস্ত্রে চন্দ্রদেবতা বা চাঁদ এক বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন। কিন্তু সেই দেবতার বুকে থাবলে যখন নীল আর্মস্ট্রং মাটি তুলে নিয়ে এলেন, তখন কি শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর সেই পরম সম্মানীয় বৈজ্ঞানিককে অভিশাপ দিয়েছিলেন? নাকি বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জগতের মানুষ হিসাবে তিনি তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন? তাহলে প্রতিমা নির্মাণের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে তিনি ছেলেখেলা কেন বলবেন? এও কি আমাদের শিল্পচেতনার একটি বিরাট এক্সপেরিমেন্ট নয়?

আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, বর্তমান শতাব্দীতে 'দেবতা' কথাটিই একটি অর্থহীন শব্দমাত্র। আমাদের বর্তমান ব্যস্ততাময় জীবনে পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দমূলক মেলামেশার সময় ও সুযোগ খুবই কম। তাই বাঙালী তার পুরাতন শাস্ত্রকে অনুসরণ করে শতানুগতিকতার বাইরে দুর্গা, কালী বা সরস্বতীকে উপলক্ষ করে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয় এবং মনের কিছু আনন্দঘন উপকরণ সংগ্রহ করে। সেই কারণে আজ তথাকথিত শাস্ত্রসম্মত পূজা-বিধি গৌণ। মুখ্য হল তার শিল্পসুষমা-মণ্ডিত ডেকরেশান, প্রতিমা নির্মাণের নতুনত্ব। এই নতুনত্ব নির্ভর করে এক্সপেরিমেন্টের উপর। এই এক্সপেরিমেন্টের ভিত্তিতেই বিশ্ব ইতিহাসে স্থান পায় নতুন কোন শিল্পী। সে শিল্পকর্ম যে কোন বিষয়ের ওপরেই হতে পারে।

এখানে আমি প্রতিমাদেবীর সঙ্গে একমত যে, 'শিল্পের স্বরূপ কোন শৃঙ্খলিত সংজ্ঞায় আবদ্ধ নয়।' সুতরাং হায় হায় রব না তুলে আসুন—সকলে মিলে আমরা

পুরাতনের খোলস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই নতুন শিল্পচেতনাকে স্বাগত জানাই যাতে এই শিল্পীরা তাদের প্রতিভাকে বিকশিত করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

এলা রায়
ভেহিকেল এস্টেট, জব্বলপুর—৯
মধ্যপ্রদেশ।

।। ২ ।।

গত ৪৪ সংখ্যা অমৃতে শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত (হাওড়া) 'প্রতিমা নির্মাণে এ কোন ছেলেখেলা' প্রসঙ্গে যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। তাঁর মতে মানুষের মনের নবীকরণ প্রবণতা নিতান্ত তাকে চঞ্চল ও অস্থির করে বলেই আধুনিক প্রতিমা নির্মাণ শিল্পে এই বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় অন্তত প্রতিমা নির্মাণ ব্যাপারে এই ধারণা যুক্তিহীন। এ শিল্প আর দশটা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মনেও নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণা জাগে ঠিকই। তখন এক দল লোকেদের 'গেল গেল' রবও শোনা যায়। কিছু দিন পূর্বে অমৃত পত্রিকায় চিত্র-পরিচালক শ্রীমৃণাল সেন তাঁর 'কলকাতা-৭১' চিত্র সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ছায়াচিত্র শিল্প এবং প্রতিমা নির্মাণ শিল্প এক নয়। যাঁরা এই ধরনের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন তাঁরা যদি শিল্প-চেতনা ও সৌন্দর্য ভাবনা বা শিল্প-সুষমার অধিকারী হন তাহলে প্রতিমা ছাড়া অন্য কিছুতেও তার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। প্রতিমা শিল্প আমাদের দেশে এক্সপেরিমেন্টের বিষয় না হওয়াই ভাল। শ্রীমতী দত্ত যে শুচিবায়ুগ্রস্তের কথা বলেছেন আমার মনে হয় সমস্ত পূজো ব্যাপারটাই তো তাই কিন্তু আমরা কি সেই পূজোকে বাদ দিতে পেরেছি? অথবা বাহ্যিক সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া পূজোর মূল আচার অনুষ্ঠানকে ত্যাগ করতে পেরেছি? পূজোর ব্যাপারে যখন আমরা এতটা প্রাচীনপন্থী তখন শুধু প্রতিমা নির্মাণ শিল্পে বিবর্তনের নামে এই ধরনের ছেলেখেলার কি কোন প্রয়োজন আছে?

প্রতিমা দত্ত
অজলরাসারডাম -হল্যান্ড।

লেখকদের কথা ভাববে কে?

৯ই মার্চ, ১৯৭৩-এর 'অমৃতে' শ্রীগৌতম চৌধুরীর 'লেখকদের কথা ভাববে কে' চিঠিটি পড়লাম। চিঠির বিষয়, উদ্দেশ্য এবং কয়েকটি মতামত পড়ে ভাল লাগল। কিন্তু পত্রলেখকের কয়েকটি [illegible] সম্পর্কে এবং বিষয়টি সম্পর্কে [illegible] নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে।

(১) গৌতমবাবু 'লেখকদের [illegible] গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিকদের [illegible] ছেন। কিন্তু বাংলাদেশে গল্পলেখক [illegible] প্রধানত ঔপন্যাসিকরা যত সম্মান পান [illegible] অণুমাত্র না হলেও কবি, প্রাব[illegible] নাট্যকার, সমালোচক, যাঁরা ছবি [illegible] তাঁরাও তো অবহেলিত বরং এই [illegible] দেশে সবচেয়ে বেশীই। তাঁরা জীবনে [illegible] কীর্তি রেখে গিয়েও যে সারা [illegible] অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশায় [illegible] সে কথা বলেন নি কেন?

(২) প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ লেখকদেরই জীবনের অসহায়তার কথা গৌত[illegible] তুলেছেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য 'প্রতিষ্ঠিত' কে প্রতিষ্ঠিত নন, এ [illegible] করবে কে? পাঠক সমাজ? কিন্তু গৌ[illegible] বাবু বোধ হয়, জানেন না, বাংলা[illegible] অ্যাভারেজ পাঠক—যাঁরা শতকরা প্রায় [illegible] জন, তাঁরা সৎ বুদ্ধিমান লেখককে [illegible] করে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ [illegible] লেখকদের গল্প-উপন্যাস পড়েন। [illegible] সত্যিকারের যিনি লেখক তিনি [illegible] সাধারণের সামনে আসতে পারছেন [illegible] 'সর্বসাধারণের স্বীকৃত' অর্থে প্রতিষ্ঠি[illegible] হওয়ায় তাঁর অর্থাভাগ্য এবং [illegible] কেমন যাবে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে [illegible] প্রয়োজন হয় না। সস্তা হাততালি [illegible] প্রতিষ্ঠিত লেখক ও সত্যিকারের [illegible] লিখে নীরব হওয়া লেখক কি একই [illegible] সাহায্য পাবেন?

(৩) লেখকদের মধ্যেও রাজ[illegible] ঢুকেছে নোংরাভাবে। গৌতমবাবু সরক[illegible] এগিয়ে আসতে বলেছেন দুর্দশা[illegible] লেখককে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু [illegible] লেখক যদি সে সময়কার সরকারের অ[illegible] না হন! যদি কোন এক গোপন [illegible] খেলায়, চমৎকার রাজনীতির পাশা[illegible] শিকার হন দুর্দশাগ্রস্ত লেখক, [illegible] বিচার করবে? দুর্গন্ধময় রাজনী[illegible] গোষ্ঠীতন্ত্র এখন লেখক গোষ্ঠীর [illegible] ক্যান্সার রোগ ঢুকিয়েছে। গৌতম[illegible] প্রস্তাব, উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু বিচা[illegible] ন্যায়দণ্ড কে হাতে নেবে? তাদের [illegible] বাছবে কে?

(৪) আমাদের দেশে শুধু [illegible] যে সংসার চালানো যায় না [illegible] প্রত্যেক লেখকই জানেন। সুতরাং [illegible] লেখক যদি চাকরী ছেড়ে লেখায় [illegible] নিয়োগ করেন, তা কি স্বেচ্ছায় কবর [illegible] নয়? যে দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত [illegible] সেদেশে পয়সা দিয়ে বই কিনে [illegible] পাঠক জুটবে কোথায়?

(৫) গৌতমবাবুই বলুন, বাংলা[illegible] কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক নাটক[illegible] সংখ্যা কম নয়। তাঁদের মধ্যে [illegible] অনেকেই। অনেকে খুব ভাল লেখেন, [illegible] পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন না গৌ[illegible]

ভুক্ত না হাওয়ায়, অথচ, দুর্দশাগ্রস্ত—এঁদের প্রতিষ্ঠার ও দুর্দশার বিচার কে করবে? সরকার যদিও বা সর্বক্ষণের জন্য লেখায় নিয়োজিত করার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেন, তাতে সুযোগসন্ধানীরা কি ঘোলা জল হয়ে ঢুকতে চাইবে না? রাজনীতি, গোষ্ঠীতন্ত্র, স্বজনপোষণের নোংরা স্রোতে কে তাকে সামলাতে এগিয়ে আসবে?

(৬) পরিশেষে আমার বক্তব্য, গৌতমবাবুর সদিচ্ছাকে আমি অভিনন্দিত করি। লেখকদের ভাবতে ও লিখতে সুযোগ দেওয়ার জন্য বিশ্রামাগার বা অ্যাসাইলাম গড়ার প্রস্তাব খুব ভাল প্রস্তাব। একমাত্র সরকারই এ কাজ করতে পারেন। চিকিৎসার জন্য সরকারী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' তো মত, 'সাহিত্য একাদেমী'ও বিতর্কের বাইরে নেই, সামান্য একটা লেখক সম্মেলন হলে ঈর্ষা, অভিমান, গালিগালাজ ইত্যাদিতে কাদা ওঠে, সেখানে আবার একটি 'জাতীয় লেখক সংস্থা' গড়ে কি আর একটা লেখকদের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির জায়গা বানাতে বলছেন? 'সকলেই লেখক নন, কেউ কেউ লেখক'—মুক্ত মনে এটা না মেনে নিলে এবং মানার মত সত্যিকারের মানুষ ও বিচারক না পাওয়া গেলে গৌতমবাবুর সমস্ত প্রস্তাব যে শূন্য হবে পরিশেষে তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সবচেয়ে দুঃখ, মতবিরোধ সত্ত্বেও সব লেখক বছরে একবারও একত্র হয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রগতির কথা ভাবেন না, ভাবেন লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের তথাকথিত অমরত্ব-বাসনার উপযোগী কাজ গোছাবার কথা!

বীরেন্দ্র দত্ত
হরিতকীবাগান লেন
কলকাতা—৬।

(২)

লেখকদের কথা ভাববে কে? স্বাদশ বর্ষের চুয়াল্লিশ সংখ্যায় এই শিরোনামায় পত্রটি পড়ে নিজের বক্তব্য কিছু জানাতে চাই। কোন কোন প্রতিষ্ঠিত লেখককে আমারও জানা আছে যাঁরা পাঠককুলের কাছে বিশেষ পরিচিত কিন্তু আর্থিক দৈন্যদশায় বিশেষ নিপীড়িত, দেশ স্বাধীন হবার পরে পঁচিশ বছর কেটে গেল, নানান উন্নতি অবনতির মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে যাওয়াই হয়ত এটাই নিয়ম। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে লেখকদের যে অবস্থায় দিন যাপন হত, আজো সেই অবস্থায় দিন যাপন করতে হচ্ছে। সরকার অনেক দিকে নজর দিয়েছেন কিন্তু এদিকে নজর দেননি মোটেই বলে আমার ধারণা। পঁচিশ বছর আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে দৈন্যদশার মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে দেখেছি, আজ আরেকজন শক্তিধর লেখককে সেই দৈন্যদশার মধ্যে দিন যাপন করতে দেখছি। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষে একথা ভাবতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ বোধ হচ্ছে। সরকার যদি এ ব্যাপারে আরো দীর্ঘদিন উদাসীন থাকেন, তা হলে এই লজ্জা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত দগদগে ঘায়ের মত সমাজের বুকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির ভিত শক্ত করতে হলে সরকারকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে, রুগ্ন লেখকদের জন্য সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার। কিন্তু রুগ্ন হয়ে পড়ার কারণে যদি আর্থিক অসাচ্ছল্য হয়, তবে যাতে লেখক রুগ্ন হয়ে না পড়েন আগে থেকেই তার বিহিত হওয়া দরকার।

এই প্রসঙ্গে দুঃস্থ লেখকদের জীবনের শেষ দিনগুলির কথাও এসে যায়। এই সেদিনও জনৈক শক্তিমান ও খ্যাতিমান লেখক আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যেতেন, যদি না এক আকস্মিক ঘটনায় আরেকজন লেখকের বিশেষ সহায়তা পেতেন। সেদিন যদি সত্যি দুর্ঘটনাটি ঘটে যেত তা হলে লজ্জার কী কোন সীমা থাকত? না কয়েকটি শোকসভার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এই কলঙ্ক ঘুচিয়ে নিতে পারতাম? সরকারকে আমরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে অনুরোধ জানাই। আর এই সঙ্গে যে সব প্রকাশক লেখকের বই বেচে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁদেরও এ ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা করতে অনুরোধ জানাই। আর লেখকবৃন্দ ত আছেনই। তা হলেই বোধ হয় একটি সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন গড়ে উঠতে পারে, যার দিকে তাকিয়ে লেখকবৃন্দ কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করতে পারেন।

এমন অনেক লেখক এখনো আছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে আকস্মিকতার কথা ভেবে আতঙ্কিত হন, অথবা একদা জনপ্রিয় লেখক হয়ত একদিন তাঁর জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হন না। সেই সময় তিনি অন্তত লেখক হিসেবে যদি আমাদের সমাজে বেঁচে থাকতে পারেন, যদি একটু ভরসা পান সমাজের কাছ থেকে তবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া আমাদের সার্থক হবে। নইলে নয়।

সুনীল গুহ
কলিকাতা-২।

(৩)

গত ৪৪ সংখ্যায় গৌতম চৌধুরীর 'লেখকদের কথা ভাববে কে' চিঠিখানা আমাকেও বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এই প্রসঙ্গেই দু-চারটে কথা বলতে চাই।

লেখার জন্যে চাকরী ছেড়েছেন, লেখার জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কিন্তু আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারেননি, সাংসারিক জীবনে ব্যর্থ এই শ্রেণীর বহু লেখকের কথা আমরা অনেকেই জানি। শিল্প সাহিত্যের জগতে এই শ্রেণীর লেখকদের অস্তিত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আর্থিক অসাফল্য, সাংসারিক ব্যর্থতা একজন লেখকের লেখার গুরুত্বের বিপর্যয় ঘটায়। অবশ্য উদাহরণ বহু আছে—দারিদ্র্য সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে বহু সাহিত্যিককে। দারিদ্র্যজাত দুঃখ লেখকের মনে যে বেদনার সৃষ্টি করে বেদনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। তবু বেশীর ভাগ ঘটনা ঘটে সম্পূর্ণ বিপরীত। দারিদ্র্য জর্জরিত লেখকের সৃজনীশক্তি ক্রমশ হয়ে যায়।

একজন প্রতিভাবান লেখক কেন সাফল্য লাভ করতে পারেন না এই উত্তরের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে ফলটার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য।

একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক আর্থিক জীবনে সফল হননি, সাং জীবনে ব্যর্থ, তাঁর অনেক দুঃখ য মধ্যেও একটা সান্ত্বনা কিছু আছে, সার্থক সৃষ্টির আনন্দ কিছু কিছু করেছেন। এই আনন্দ একজন শিল্পীর বড় প্রাপ্তি—অস্বীকার করার উপায় নেই

সাম্প্রতিক কালের লেখকরা, এখনো যাঁরা তরুণ বা যুবক—বা যৌ সীমা পেরিয়েছেন কেবল, সাহিত্য যাঁরা এখনো তরুণ, যাঁদের সামনে যৌবন এবং যৌবনোত্তর পরবর্তী সৃষ্টির মহত্তম সময়, এই সমস্ত লেখক অনেকেই কিন্তু বর্তমানে বিরাট সমস্যার মুখোমুখি।

এঁদের অনেকেই চাকরী করেন চাকরীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন নেই এমন অবশ্যই নয়। এঁ অবসর প্রাপ্ত বাবা, রুগ্না মা, অবিবা বোন, ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল ছোট আছে, এবং আছে স্বয়ং লেখকের ব্যা স্বপ্ন, ভবিষ্যতের আশা—কিন্তু যে একটা চাকরীর অভাবে এঁদের সংসার ব্যর্থ হতে চলেছে। এঁদের অনেকেই বয়েসে পৌঁছে গেছেন, সাংসারিক জ এঁরা হয়ত কোনদিনই সাফল্য লাভ ক পারবেন না। এই শ্রেণীর তরুণ লেখ যাঁরা মহৎ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে করেছিলেন সাহিত্য রচনা এঁদের স জগতেও অদূর ভবিষ্যতে নেমে আ বিপর্যয়।

সম্ভাবনাময় এই লেখকগণ অনে হয়ত বাংলা সাহিত্যে মহৎ কিছু স্বাক্ষর রেখে যেতে পারবেন না। সৃষ্টির আনন্দের স্বাদও পাবেন না দিন! একজন লেখকের জীবনে এর বড় ট্রাজেডী আর কী হতে পারে!

চণ্ডী ম
কলকাতা-

নববর্ষের অভিনন্দন

বাংলার শুভ নববর্ষে আমরা সকলকে জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার ও প্রীতি অভিনন্দন। বর্ষচক্রের আবর্তে পূণ্য বৈশাখ আবার আমাদের জীবনে সমুপস্থিত। তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে অমৃত তার সকল পাঠক-পাঠিকা ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা। আগামী বর্ষে সকলের জীবনে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি।

প্রাথমিক শিক্ষার দায়দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য নতুন কর ও শিক্ষাসেস প্রবর্তনের কথা ভাবছেন। আবশ্যিক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে আশা করি সকলেই স্বাগত জানাবেন। আমাদের সংবিধানেও বলা হয়েছিল যে, সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে রাজ্যে রাজ্যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কোনো রাজ্যেই সংবিধানের এই সংকল্প বা নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে আছে। অন্যান্য অনেক দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতে আজ আর অগ্রগামীর গৌরব দাবি করতে পারে না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা এক সময়ে ভারতে অগ্রণী ছিল। তাই আশা করা অন্যায় নয় যে, পশ্চিমবাংলা তার সেই গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হবে আন্তরিকতার সঙ্গে।

সর্বজনীন ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। বিপ্লবের আগে জারশাসিত রাশিয়ার অনেক অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থা ছিল শোচনীয়। কোনো কোনো এলাকায় অধিবাসীদের কোনো বর্ণমালাই ছিল না। শিক্ষার হারও ছিল অত্যন্ত কম, শতকরা ৪ মাত্র। সেই অবস্থা থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন লেনিনের আকস্মিক মৃত্যুর ১৪ বছরের মধ্যে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চালিয়ে রাশিয়ার মানুষকে সর্বজনীনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে সমর্থ হয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দেশরক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগামিতার জন্য সর্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শিক্ষাপ্রসারের কার্যক্রম তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। আরেকটি ক্ষুদ্র দেশ কিউবা। ১৯৫৮ সালে ফিদেল কাস্ত্রো ক্ষমতালাভের পর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাধ্য করা হয় গ্রামে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নিরক্ষরদের শিক্ষা দিতে। এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত বয়স্ক নিরক্ষরদের তারা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলে। আজ কিউবায় নিরক্ষরতা প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।

এই দৃষ্টান্ত থেকে কি আমাদের শিক্ষণীয় কিছু নেই? ২৫ বছর হল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সংকল্প কি আমরা পূরণ করতে পেরেছি? ব্যাপক নিরক্ষরতার দেশে আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে জনসাধারণ সচেতনভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অগ্রগতিতে সহায়তা করবে? কেন্দ্রীয় সরকার যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালের মধ্যে ছয় থেকে এগারো বছরের সকল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন রাজ্যে আরও অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বছরে। এই সংকল্প অভিনন্দনীয় সন্দেহ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার কাজে আর্থিক অসঙ্গতিই একমাত্র বাধা, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার হার যেভাবে বেড়েছে তা দেখলে কেউ বলবে না যে, শিক্ষার প্রতি এদেশের মানুষের অনুরাগ আছে কিংবা তার জন্য বাস্তবিকই অর্থের অভাব আছে। যে-রাজ্যে একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেখানে পাঁচটি-ছটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শত শত কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। উচ্চশিক্ষিত হাজার হাজার তরুণ প্রতি বৎসর বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন শিক্ষায়তন থেকে। অথচ সে তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই দেশে, নিরক্ষরতা এখনও এত ব্যাপক। এর কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গ্রামাঞ্চলের মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যে সমস্ত পরিবারে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করেনি তাদের নতুন করে শিক্ষার জন্য আগ্রহী করে তুলতে না পারলে সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন ব্যবস্থাকে সেজন্যই আমরা স্বাগত জানাই। অশিক্ষিত দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার নৈতিক দায়িত্ব শিক্ষিত শ্রেণীর। স্বচ্ছল, শিক্ষিত সমাজের ওপর শিক্ষাকর এবং শিক্ষাসেস প্রবর্তন সেই দায়িত্বেরই প্রতীক। এই রাজ্য নানা সমস্যায় জর্জরিত। অর্থাভাব তার মধ্যে অন্যতম। তবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণে আশা করি দেশবাসী কুণ্ঠিত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করে গেছেন। নিরক্ষর দেশবাসীর কুটিরে শিক্ষার প্রদীপশিখা জ্বালাবার জন্য তিনি যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন আজ তা অনুসরণ করবার দিন এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নতুন করের সাহায্যে যে অর্থ পাবেন তা যদি যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যয় হয় তাহলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালের মধ্যে কি আমরা এই রাজ্যে সর্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প পূরণ করতে পারব না? শুধু অর্থের অভাবেই যে এই দায়িত্ব এতদিন পালন করা যায়নি তা নয়। উদ্যম, সংগঠন ও নিষ্ঠার অভাবও তার জন্য কম দায়ী নয়। আমরা আশা করব, সরকার এবার প্রকৃত নিষ্ঠায় ও আন্তরিকতায় এই মহৎ সংকল্প সাধন করে দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হবে।

পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তের দ্বারা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এই মনোভাবই পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হল যে, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী ওজার পিছনে, আছেন। অন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধীরা [illegible] [illegible] শ্রীমতী [illegible] [illegible] প্রধান তাঁর [illegible] মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা [illegible] কৃষিমন্ত্রী আদানি ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জিনাভাই দর্জিকেই আপাতত তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন।

মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উরসকে উৎখাত করতে এগিয়ে এসেছেন মহীশূর থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসী এম-পি'রা। এই এম-পিরা দিল্লীতে একটি সভায় মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি আলাদা আলাদা করে প্রধানমন্ত্রীর [illegible] জানাবেন। এই গোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসাবে [illegible] (ইনি এতদিন মুখ্যমন্ত্রী উরসের সমর্থক বলে পরিচিত ছিলেন) বলেছেন যে, মহীশূর থেকে লোকসভায় নির্বাচিত ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই তাঁদের সঙ্গে আছেন।

গুজরাটের পরই অন্য যে রাজ্যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থা সঙ্গীন সেটা হল বিহার। আগামী ১৫ এপ্রিল সেখানে লোকসভার দুটি ও বিধানসভার একটি আসনে যে উপনির্বাচন হওয়ার কথা আছে সেই উপনির্বাচনের দরুন আপাতত কেন্দ্রীয় নেতাদের পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধটা চাপা দেওয়া আছে। কিন্তু ঐ সব নির্বাচন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার এই বিরোধ নিশ্চিত আত্মপ্রকাশ করবে। বিধানসভার ২৯ জন ও বিধান পরিষদের একজন কংগ্রেস সদস্য গত ২৫ মার্চ একটি সভায় মিলিত হয়ে রাজ্যের দলের নেতৃত্বের পরিবর্তন দাবী করেছেন। এদিকে, প্রাক্তন মন্ত্রী রামলক্ষ্মণ সিং যাদব কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শংকরদয়াল শর্মা ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদবকে জানিয়ে এসেছেন যে, বিহারের 'পরিস্থিতির ক্রমাবনতি' বন্ধ না হলে তাঁরা নেতৃত্বের পরিবর্তন চাইবেন।

বিহার মন্ত্রিসভার অভিভাবক হচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র। মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে তাঁর মন্ত্রিসভা তৈরী করেছেন শ্রীমিশ্রের নির্দেশ [illegible] লোকদের দিয়ে। এখন শ্রীপাণ্ডের নিজের ভাগ্যও নির্ভর করছে শ্রীমিশ্রের উপর।

কংগ্রেসের অন্যান্য যে সব মুখ্যমন্ত্রীকে দলের মধ্যে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ওয়াই এস পরমার।

রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের ভিতরকার এই সব বিরোধে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এর মধ্যে আদর্শগত বিরোধের চেয়ে ক্ষমতার লড়াইটাই বড়। দিল্লী থেকে সনদ দিয়ে যাঁদের মুখ্যমন্ত্রী করে পাঠান হয়েছিল তাঁরা কেউ কেউ ইতিমধ্যে নিজেদের রাজ্যে শত্রু তৈরী করছেন। উপর থেকে একজন নেতাকে চাপিয়ে দেওয়ায় যাঁরা অখুশী হয়েছিলেন অথচ নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাঁরা সাহস পান নি তাঁরা এখন কোথাও কোথাও মাথা তুলছেন। দ্বিতীয় আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হল এই যে, কংগ্রেস ভাগ হওয়ার পর যেসব সুযোগসন্ধানী রাতারাতি শ্রীমতী গান্ধীর দলে ভিড়ে আখের গুছোবার চেষ্টা ক ছিলেন তাঁরা কিছুদিন মাথা নীচু থাকার পর এখন আবার দলের মধ্যে গে গড়ে নিজেদের সুবিধা করে নেওয়ার ফি খুঁজছেন।

কংগ্রেসের নেতারা এই সমস্যা কিভ সামলান, তা এখন দেখার বিষয় হবে।

৫-৪-৭৩ —পাণ্ডব

সি এম ডি এ'র বছর ধরে কাজ : রাবোর্ণ রোড চওড়া হচ্ছে, ফুটপাথও উবে যাচ্ছে; পথচারীদের চলবার অবকাশ নেই।

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

দূরে, এ গল্পটা বাজে। আর ওটা তো একেবারে জলো আবেগে ভরপুর। হ্যাঁ, এ কবিতার শেষের দুটো লাইন চমৎকার। ওটা তো নেহাতই লাইন মেলানো পদ্য, একেবারে কবিতা পদবাচ্যই নয়।

দেবেন দত্তের সামনে কতগুলি পত্র-পত্রিকা ছড়ানো। পড়ছেন তিনি। কখনও থামছেন, কখনও নিঃশব্দে হাসছেন, উদাস গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন কখনও। বাইশ চব্বিশ বছর আগে প্রথম যৌবনে তিনি গল্প কবিতাগুলি লিখেছিলেন। তারপর তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধির রাজ্যে অনেক ওলট পালট হয়ে গেছে। পুরনো বিশ্বাস ভেঙে গেছে, নোতুন বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। তবুও লেখাগুলির ভেতর বাইশ চব্বিশ বছর আগের আশায়, আবেগে বিশ্বাসে, ভাল-বাসায় ভরাট বুক আর এক দেবেন দত্তকে আবিষ্কার করে হরিষে-বিষাদে মেশানো বিচিত্র এক অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করছেন তিনি। হঠাৎ কলেজ ম্যাগাজিনের কয়েকটি পাতা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন সুরেশ মল্লিকের লেখা প্রবন্ধ, ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ'। পড়লেন নিজের গল্পটি।

—দেবেন তোমার গল্পটি পড়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি—খুশি বললে কম বলা হবে আমি অভিভূত হয়েছি। তোমার ভেতর প্রচুর সম্ভাবনা আছে,—তুমি গল্প লেখা ছেড়ো না, ক্লাসসুদ্ধ ছেলের সামনে ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে বলেছিলেন বাংলার প্রফেসার কে. জি।

সুরেশ মল্লিক উঠে দাঁড়িয়েছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার প্রবন্ধটা পড়েছেন স্যার?

—হ্যাঁ

—কেমন লেগেছে?

—একথা অবিশ্যি স্বীকার করতে হবে যে তুমি প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছ। অনেক বইপত্র ঘেঁটেছো। কোটেশনে কোটেশনে প্রবন্ধটিকে কন্টকিত করেছ। তারও নিশ্চয়ই একটা দাম আছে। শ্রমের মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হবে। তবুও বলব লেখাটির মধ্যে কোন মৌলিকতা নেই। দেবেনের মধ্যে ওই জিনিসটি আছে। আছে চিন্তার স্বকীয়তা, উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য।

চুপসে যাওয়া বেলুনের মত সুরেশ মল্লিক এতটুকু হয়ে গিয়েছিল।

প্রফেসার কে. জি বলেছিলেন, দেবেন তুমি সাহিত্য ছেড়ো না।

দেখবে লেগে থাকলে একদিন তোমার উন্নতি হবেই হবে।

বিয়াল্লিশ বছরের দেবেন দত্তর মনের পর্দায় ফুটে উঠল কুড়ি বছর আগের এক ছবি। বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে তখন। আশানুরূপ না হলেও রেজাল্ট খারাপ করে নি দেবেন দত্ত। সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে দেবেন আর সুরেশ মল্লিক থার্ড। বন্ধুবান্ধবদের চায়ের আসরে সুরেশ মল্লিক হাসতে হাসতে বলেছে, এম-এতে দেবেনকে আমি হারাবই হারাব। দেবেন দত্ত হাসতে হাসতেই জবাব দিয়েছে, তোমার চ্যালেঞ্জ নিলাম। স্বপ্ন আর কামনায় তখন দেবেন দত্ত'র মনের দীঘি টইটম্বুর। আর মাত্র দুটি বছর এম-এ। তারপর অধ্যাপনা, গবেষণা, আর একটার পর একটা সৃষ্টি। বাড়িতেও খুশির হাওয়া। মা, ভাই, বোন সকলেই খুশি খুশি, হাসি হাসি। মা বললেন, কিরে এক পহর সন্দে করে বাড়ি ফিরলি যে! সেই কখন থেকে চা জলখাবার নিয়ে বসে আছি। খেতে বসল দেবেন রান্নাঘরে। মা, ভাই, বোন সকলেই চার-পাশে বসে। মা পরটাগুলো আবার একটু ঘি দিয়ে গরম করছিলেন। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে ম্যো ম্যো করছিল চারিদিক। দেবেন বললে, দাজদা থেকে একেবারে

খাঁটি ঘিতে ডবল প্রমোশন। ছোট বোন আভা বললে, শুধু ঘি। দেখো না আরও কত কী। তারপর মিষ্টির বাক্সটা দাদার সামনে খুলে ধরে বললে, বাবা আজ চল্লিশ টাকা খরচ করেছেন। অফিসের দু'চারজনকে নেমন্তন্ন করেছেন বাড়িতে।

দেবেন বললে, বাব্বা! বি-এ পাশ করতেই এত কদর! না জানি পরে কী হবে!

মা বললেন, হবে না! সারাটা জীবন তো উনি তোর মুখ চেয়েই সব কষ্ট সয়ে গেলেন। সংসারের অভাব-অভিযোগ নিয়ে রাগ করলে তো বরাবরই বলতেন যে দেবু বড় হোক, চাকরী করুক তোমার অভাব ঘুচবে। তা আজই বড় সাহেব কথা দিয়েছেন যে ওনার অফিসে তোকে একটা চাকরী দেবেন। উনি বলছিলেন, বড় সাহেবের যে কথা সেই কাজ। এই মাসের মধ্যেই তোর চাকরী হয়ে যাবে!

—চাকরী!

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, চাকরী। তোর বাবা বড় সাহেবকে অনেক আগেই ধরেছিলেন। তা বড়সাহেব বলেছিলেন আগে বি-এ-টা পাশ করুক, তারপর।

আভা বললে, মা, দাদা এত বড় একটা সুখবর বিশ্বাসই করতে পারছে না। দাদা, প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই কিন্তু আগে আমার জন্য একখানা শাড়ি... বাব্বা, শাড়ির অভাবে......

দেবেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, মা, আমি চাকরী করব না।

চাকরী করবি না কিরে! একটা চাকরীর জন্য লোকে মাথা কুটে মরছে, আর তুই কিনা চাকরী পেয়েও বলছিস চাকরী করবি না। লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস।

—না মা আমি কখনই অফিসে চাকরী করব না। বাবাকে তুমি এখনই বলে জানিয়ে দিও। দেবেন দত্তর সংক্ষিপ্ত অথচ কঠিন উত্তর।

পাশের ঘর থেকে সুবিমলবাবু সব শুনছিলেন। দেবেনের কথা শুনে কঠিন হয়ে উঠল মুখ। বললেন, কী বললে তুমি? চাকরী করবে না?

—না।

—তাহলে কী করবে?

—এম-এ পড়ব।

—তারপর? তারপর তো সেই চাকরীই করবে? চাকরীর জন্যই তো এত খরচ খরচা করে পড়াশুনো। দরখাস্ত টাইপ করিয়েই রেখেছি। শুধু একটা সই করে দেবে। তারপর কাল তোমায় বড়-সাহেবের কাছে নিয়ে যাব।

—না বাবা আমি কিছুতেই এখন চাকরী করব না।

একটা দুরন্ত ক্রোধে সুবিমলবাবুর প্রায় বাক রোধ হয়ে এল, শুধু বললেন, বেরিয়ে যাও তুমি বাড়ি থেকে, আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক পরদিন। বাবা অফিস যান নি। প্রেসারটা বেড়েছে। শুয়ে আছেন চুপচাপ। বেলা এগারটা নাগাদ ছোট ভাই অমু কাঁদিতে কাঁদিতে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এলো। মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে অমু, তুই পরীক্ষা না দিয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলে এলি কেন?

অমু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, চোখে দরদর জল, বললে, পরীক্ষা বসেছে। একটা কোশ্চেনের আধখানা মত লিখেছি, এমন সময় ইংরেজীর স্যার এক ঘর ছেলের সামনে আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, অমিয় তুমি এখুনি পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যাও। ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, বাইরে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে বাকি মাইনে চুকিয়ে না দিলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না, তা কি তুমি দেখ নি? সব জেনেশুনে পাঁচ পাঁচ মাসের মাইনে বাকি ফেলে চোরের মত পরীক্ষা দিতে এসেছ। বেরিয়ে যাও, এখুনি হল থেকে বেরিয়ে যাও।

মা চীৎকার করে উঠলেন, বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে! ঠিক করেছে তোদের ইংরেজীর স্যার! যে-বাপের মুরোদ নেই, সে-বাপের ছেলেকে ইস্কুলে পড়াবার সখ কেন? যা না, মাটি কাটগে যা, মোট বইগে যা, চায়ের দোকানে বয়গিরি করগে যা, গরীব বাপের ছেলেরা যা করে, তাই করগে যা!

সুবিমলবাবুর চোখমুখ আরক্ত, দুরন্ত ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আঃ বড়বৌ, চুপ কর।

আবার গলা ফাটিয়ে বড়বৌ বলে চীৎকার করা হচ্ছে! লজ্জা করে না! ছেলে ছেলে করে এতদিন তো তেঁদিয়ে যাচ্ছিলে! দেবু বড় হবে, দেবু চাকরী করবে। সংসারের সব দুঃখ ঘুচবে। দিল তো দেবু মুখে কালিকলা ঠেকিয়ে। ছেলের পয়সায় যে বাপ খেতে চায়, ছেলের পয়সার দিকে যে সব ভিখারী বাপ তাকিয়ে থাকে, তাদের ওই দশাই হয়।

আর একটু হলে কাঁপতে কাঁপতে সুবিমলবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। দেবেন চট করে ধরে ফেললো। শুইয়ে দিল বিছানায়।

অনেক, অনেকদিন পর দেবেন দত্ত যেন প্রফেসর কে. জি'র কথা স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছিলেন, তিনি বলছেন, দেবেন তুমি সাহিত্য ছেড়ো না, তোমার হবে।

দেবেন দত্ত মনে মনে বললেন, ছাড়ি নি স্যার, আমায় ছাড়িয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর কতগুলি কাতর অসহায় প্রাণীর অন্নদাতার ভূমিকায় আমায় নামতে হলো। সেই চাকরীই নিতে হলো। বসতে হলো বাবার চেয়ারেই। তারপর চারদিকের হিমেল হওয়ায় কখন যে নিভে গেলাম নিজেই জানি না।

—সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! আজ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মদিবস পালন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আজকের এ সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন শ্রদ্ধেয় ডকটর সুরেশ মল্লিক। ডকটর মল্লিক বাংলা তথা সারা ভারতে একটি সর্বজনবিদিত নাম নোতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়া বাতুলতা মাত্র। তিনি যে শুধু অধ্যাপনা করেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য অবদান মহাকবির প্রতিভা বিশ্লেষণে তিনি যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন সমগ্র বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। আরও একটি ঘোষণা। আমাদের অত্যন্ত ভাগ্যের কথা ও গর্বের কথা যে ডকটর মল্লিকের সঙ্গে আছেন তাঁরই সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী কাবেরী মল্লিক। এ অঞ্চলে একটি গ্রন্থাগারের অভাব বহুদিন অনুভূত হচ্ছে। আমাদের 'সবুজ সঙ্ঘে'র সভ্যদের দীর্ঘদিন পরিশ্রমের ফলে সে গ্রন্থাগার স্থাপন করার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। শ্রীমতী কাবেরী মল্লিক আজ তারই দ্বারোদ্ঘাটন করবেন।......

—থামুন মশায়, থামুন আপনারা সোজা করে বলুন। বলুন যে সুরেশ একটি ঘোরেল মাল। বলুন, সরকারি মহলেও ওর যথেষ্ট প্রভাব। তাই কতগুলি মিষ্টি শব্দের ঘুষ দিয়ে আপনারা ওর মারফৎ সরকারের ঘর থেকে আপনাদের ক্লাবের জন্য কিছু পয়সা হাতানোর চেষ্টা করছেন। বলুন না সত্যি কথাটা। রবীন্দ্র সাহিত্য, কাহিত্য বলে ভণ্ডামী করছেন কেন?

দেবেন দত্ত'র বুকের মধ্যে কথাগুলি নিঃশব্দে আছাড় খেল।

—কি হয়েছে তোমার? ফাংশান শুনতে এসে কেউ ওরকম মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে নাকি? তোমার কি সবই ভূতের কাণ্ড? পাঁচটা লোকে ভাববে কি? —সরমা বলেছে বিরক্তিভরে।

—মাথায় খুব যন্ত্রণা করছে। আমার ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। দেবেন দত্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন।

—তুমি যাবে যাও। আমি যাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত শুনে যাব। খাবার তৈরী আছে। ইচ্ছে করলে খেয়ে নিও।

সরমা বাড়ি ফিরেছে রাত এগারটায়। দেবেন তখন মশারীর তলায় কপট ঘুমে শব্দহীন। পাশের বাড়ির বৌটি জানলা গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে কেমন দেখলে দিদি ফাংশান?

—অপূর্ব, সরমা উত্তর দিলে।

—কাবেরী মল্লিককে দেখলে? কি দারুণ সুন্দরী বলো তো?

—কেন সুরেশ মল্লিকই বা কম কিসে? কেমন লম্বা চওড়া সুন্দর পুরুষমানুষের মত চেহারা। আর বক্তৃতাও করেন তেমনি। আচ্ছা একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছ?

—কি ?

—কাবেরী মল্লিকের কানের দুল জোড়া লক্ষ্য করেছ ? কি অপূর্ব একটা আভা ঠিকরে পড়ছিল বলো তো ?

—আরে ও তো হীরের দুল, আভা ঠিকরে পড়বে না !

—হীরে ! কি রকম দাম হবে ভাই !

—হীরে হিরের দাম আমরা কি করে জানবো বলো দিদি ! সে বরাত কি আমরা করেছি !

—যা বলেছো দিদি ! ওদেরই জীবন ! ওদেরই শিবপুজো সার্থক। আসতে আসতে মেয়েটাকে বলছিলাম যে বিয়ে দিলে তোর সুরেশ মল্লিকের মত নাম-করা কোন পয়সাওলা লোকের সঙ্গে বিয়ে দেব। জন্ম জন্ম আইবুড়ো থাকতে হয় তাও ভাল, তবু কেরাণীর সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে দেব না। ঘেন্না ধরে গেল, জীবনে একেবারে ঘেন্না ধরে গেল ভাই।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দ হলো। সারা সংসার এখন ঘুমে অচেতন। দেবেন দত্ত ঘরের মেঝেয় পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙাচোরা আরশিটার সামনে দাঁড়ালেন।

—এই বিশ্রী আরশিটা আমার টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে, একদিন বলেছিল সরমা।

—সবেধন নীলমণি তো ফুটো-ফাটা আরশিটা। ফেলে দিলে শ্রীমুখ দেখবে কিসে ? সরমার বিরক্তি দেবেন দত্ত উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন হাল্কা কথায়।

—থাম থাম আর রসিকতা করতে হবে না। যারই বাড়িতে যাই, দেখি প্রত্যেকেরই একটা ড্রেসিং টেবল আছে। আমার মত পোড়া-কপাল তো কারুরই দেখি না।

—তোমার মত নয়, তোমার থেকেও পোড়া-কপালে এদেশের শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ মানুষের। এদেশের কোটি কোটি মানুষ দুবেলা পেট পুরে খেতেই পায় না—ড্রেসিং টেবিল তো কল্পনারও বাইরে।

—থাম থাম, বড় বড় বুলি রাখ। যে সমস্ত পুরুষমানুষের কোন ক্ষমতা নেই, তারাই সব বড় বড় বুলির আড়ালে নিজের অপদার্থতা ঢেকে রাখে।

পাশের ঘরে সরমা ঘুমোচ্ছে। এ ঘর থেকে ও ঘর শুধু আধ-ভেজানো একটা পলকা দরজার ব্যবধান। কিন্তু কি দুস্তর ! দেবেন দত্ত ও ঘরে গেলেন। আলো জ্বালালেন। সরমা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। ওর এক পাশে ছোট ছেলে মায়ের বুকে হাত দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আর এক পাশে মেয়ে। খুব সন্তর্পণে সরমার বুকে হাত রাখলেন দেবেন দত্ত। অনেক, অনেকদিন পর যেন দেখছেন এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন দেবেন দত্ত সরমাকে। দৃষ্টি ফেললেন তার চোখে, বুকে, মুখে। দশ বছর আগেও সরমার শরীরে ছিল যৌবনের জোয়ার। এখন ভাটা। এখন যেন সে শীর্ণ, নদীটা কিছু ম্লান। ম্লান অথচ সুন্দর। ভোর-বেলার চাঁদের মত। মুদিত চোখে কাজলের রেখা। পাতলা দুটি ঠোঁটে হাল্কা গোলাপী আভা। বালিসে ছড়িয়ে পড়া এক রাশ কালো চুলের পটে আঁকা একখানি মুখে সান্ধ্য প্রসাধনের মিষ্টি অবশেষ। অত্যন্ত সন্তর্পণে সরমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন দেবেন দত্ত। মৃদু অথচ মিষ্টি একটা গন্ধ পেলেন। নিঃশ্বাস টেনে টেনে সে স্বাদু ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন আর নিমেষে চলে গেলেন বার বছর আগের আর এক রাতে। সেদিন সে বিহ্বল রাতে এমনি, ঠিক এমনি একটা গন্ধ তাঁর মনে আশ্চর্য এক মায়া ছড়িয়ে দিয়েছিল। ধমনীতে ধমনীতে রক্ত কণিকাগুলি নেচে উঠেছিল অসহ্য উল্লাসে। মনে পড়ে তোমার সরমা সে রাতের কথা ? মনে মনে বললেন দেবেন দত্ত। মনে পড়ে সরমা, বিয়ের বছরখানেক পরে তুমি আর আমি একদিন তোমার মামার বাড়ি যাচ্ছিলাম, মাঝে কি একটা স্টেশনে যান্ত্রিক গোলযোগে গাড়ি থেমে গেল, রাত তখন দুটো, বাইরে অঝোর ধরণ বৃষ্টি, হাওয়ার দুরন্ত দাপট, আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একটা লোকও নেই একেবারে ফাঁকা, দু'একজন তোমার আশ্চর্য শরীরের ওপর দৃষ্টি হেনে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছে, আমি জানলার পাল্লাগুলো তুলে দিলাম, দরজা বন্ধ করলাম, তুমি ভয় পেয়ে আমার পাশে ঘন হয়ে বসলে, আমি তোমায় জড়িয়ে ধরলাম—তুমি বললে নীচু স্বরে গাঢ় গলায় এই ! এই ! কি হচ্ছে ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ এই গাড়ির মধ্যে ! কি অসভ্য রে বাবা। ডাকাত কোথাকার ! সঙ্গীতের মত কি আশ্চর্য স্বাদ, স্বপ্নিল আর গাঢ় সব শব্দ সে রাত্রে তুমি আমায় উপহার দিয়েছিলে।

এই গভীর রাতে দেবেন দত্তর মনে হলো যেন তিনি এক ভিখারী। এক দীর্ঘ দগ্ধ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসে সরমার কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন,—সরমা ! এক অসহ্য রোদে আমি পুড়ে যাচ্ছি, আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা, তুমি আমায় একটু স্পর্শ দেবে ? একটু ঘ্রাণ ? দু'-একটা শব্দ ?

আস্তে আস্তে নাড়া দিলেন দেবেন দত্ত সরমাকে। সরমা চোখ খুলল। বিস্ময়ের মত তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর তার চোখে ফুটে উঠল এক রাশ রুক্ষতা, বললে,—সারাদিন তো এই পোড়া সংসারে হাড়ভাঙা খাটুনি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, তা রাতে যে একটু শান্তিতে ঘুমোব, তারও উপায় নেই। তোমাকে আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি যে রাত্তিরে তুমি খবরদার আমায় বিরক্ত করতে আসবে না। ফুর্তি করার ইচ্ছে থাকে তো অন্য জায়গা দেখ।

তীরে-বেঁধা পাখীর মত ছটফট করলেন দেবেন দত্ত কয়েক মুহূর্ত। তার-পর কী যেন হলো, একটা ক্রুদ্ধ হিংস্র ঝড় উঠলো দেবেন দত্ত-র রক্তের সমুদ্রে। একটা উত্তাল ভয়াল ঢেউয়ের মত তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সরমার শরীরের ওপর। বোতাম খুলতে গিয়ে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেললেন সরমার আঁট ব্লাউজটা।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল সরমা,—আঃ, এ কী করছ ! জানোয়ারের মত বুকে কামড়াচ্ছ কেন ? আঃ ছাড়।

দেবেন দত্ত বললেন,—দ্যাখ দ্যাখ প্রিয়া, এমন কাণ্ড কেউ কখনও দেখেনি,—দ্যাখ রীতিমত পুরুত ডেকে মন্তর-পড়া বৌয়ের ওপর আমি কী রকম পাশবিক অত্যাচার করছি। খবরের কাগজে বের করে দেবে নাকি ? এমন মজার কথা কিন্তু কেউ কখনও শোনেনি।

সরমা দেবেন দত্তর দিকে তাকাল। দেখল যে ওর চোখ দুটো কী একটা দুর্বোধ্য জ্বালায় বাঘের মত জ্বলছে।

ভয়ে চোখ বুজল সরমা।

গণপতি গণেশ

শিপ্রা আদিত্য

গণেশ সিদ্ধিদাতা বা সৌভাগ্যের দেবতা। ভারতীয় প্রধান দেবদেবীর মধ্যে গণেশ অন্যতম। অর্থাৎ হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে গণেশ পুজোর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। অবলুপ্তির বৌদ্ধধর্মে বহু হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে গণেশ পুজোর প্রচলন দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতবর্ষ ছাড়াও নেপাল, চীন, জাপান, তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাভা, বলিদ্বীপ, তুর্কীস্থানেও গণেশ পুজোর প্রচলন আছে।

পণ্ডিত মহলের বিশ্বাস—গণেশ দ্রাবিড় দেবতা। জানা যায় দ্রাবিড় সভ্যতায় আদিম ভারতে সূর্যের উপাসনা হত। বাহন মূষিকের উপর উপবিষ্ট গণেশ সূর্য দেবতার কোন এক প্রতীক। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মতে গণেশের পুজোর রীতি-নীতি দেখা যায়। সে অনুযায়ী গণেশের বিভিন্ন নামও পাওয়া যায়—সিদ্ধিদাতা, গণপতি, গজানন, লম্বোদর, সূর্যকর্ণ, একদন্ত, বিনায়ক, হেরম্ব, বিঘ্নেশ্বর, বিঘ্ন-দেহক, বাল গণপতি, নিরঞ্জন, বৃষভ ধ্বজ, গণনায়ক, ত্রিলোচন, মহানন্দ, ভক্তপ্রিয়। বিভিন্ন দেশে গণেশের নাম—

'তামিল নাম'—পিল্লেয়ার।
'তিব্বত'—ডগ্‌সা গস্‌-ব্দগ্‌।
'বর্মা'—মহা-পিয়েন্নে।
'মোগল'—তোৎখর-ওজল খখন।
'কাম্বোজ'—প্রাহ্‌ কেনেস্‌।
'চীন'—কুঅন্‌—পি তি এন্‌।
'জাপান'—শো-তেন্‌ বিনায়কসা,
কবম্‌জন্‌—শো।

গুপ্ত যুগের আগে গণেশের মূর্তি কোথায়ও দেখা যায় না। ভারতের সর্বত্র গণেশের মূর্তি পাওয়া যায়।

মাদ্রাজের চিদম্বরমে—এক বিরাট শিবমন্দিরে পাঁচটি মণ্ডপের একটিতে গণেশ মন্দির আছে।

রাজপুতনায়—উদয়পুরের চৈতোর গড়ে—গ্রামে নবম দশম শতকে নির্মিত গণেশ মন্দির আজও আছে।

মধ্যপ্রদেশের—সুরগুজায় রামগড় পাহাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন পাথরের এক দরজা আছে সেই দরজার মাথায় গণেশের মূর্তি আছে।

উড়িষ্যায়—রাজপুরের কাছে খণ্ডগিরি উদয়গিরি পাহাড়ের মাথায়ও গণেশের মন্দির আছে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের বহিরাংশের জঙ্ঘাদেশে পীঠমণ্ডির একটিতে কষ্টিপাথরে খোদাই এক অপূর্ব নৃত্যরত গণেশ আছে।

ত্রিচিনোপল্লির—পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট গণেশ মন্দির আছে।

বোম্বাইয়ে—চন্দোরপুর্গ পাহাড়ে জৈন গুহায় আছে গণপতির মূর্তি। তাছাড়া বোগবাদ উপত্যকায় বাগেশ্বরের এক মন্দিরেও গণপতির মূর্তি দেখা যায়। বোম্বাইর পুণা জেলায় চিনচোয়াড় গ্রামে বহু গণপতির মূর্তি রয়েছে। গ্রামটি গণপতি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বছর এই গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতে গণপতির মেলা বসে। সাতদিন ধরে সে উৎসব চলে। বোম্বাই এরণ্ডলেও একটি গণপতির মন্দির আছে। বোম্বাই-র তওগাঁও-তেও প্রাচীন গণপতির মন্দির দেখা যায়।

মগধে—বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নস্তূপ থেকেও গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে।

গয়া—বরাবর পাহাড়ের গায়ে খোদিত গণেশের মূর্তি পাওয়া যায়।

কাশ্মীরে—অবন্তীপুর গ্রামে অবন্তীশ্বর মন্দিরে গণপতির প্রাচীন মূর্তি দেখা যায়।

পূর্ব ভারতের—বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় অমন অপরূপ সুন্দর গণেশ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে।

উত্তর বাংলার—বরেন্দ্র ভূমি থেকে শুরু করে রাঢ় অঞ্চলের প্রান্ত দেশ পর্যন্ত এইসব বিচিত্র গণেশ মূর্তিগুলির প্রাপ্তিস্থান।

পশ্চিম বাংলার—পুরুলিয়ার বুধপুর অঞ্চলে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আজও অটুট অবস্থায় একটি অপূর্ব গণেশ মূর্তি দেখা যায়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় কোন এক জমিদার রামসাহী দেব ও তার ভাই অষ্ট শতকের শেষদিকে কয়েকটি গণেশ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার ভারতীয় সংগ্রহশালা, আশুতোষ সংগ্রহশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা থেকে শুরু করে পাটনা সংগ্রহশালা, বাংলাদেশের রাজসাহীর বরেন্দ্র সংগ্রহশালা, ইংল্যান্ডের বৃটিশ সংগ্রহশালায় প্রাচীন প্রতিমা সংগ্রহগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলা বা বাংলাদেশ থেকে পাওয়া বহু গণেশ মূর্তি সংগৃহীত আছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন গণেশ মূর্তি কোথাও—সমভঙ্গ, কোথাও ত্রিভঙ্গ, কোথাও চতুর্ভুজ কোথাও অষ্টভুজ। বৌদ্ধধর্মে গণপতির রূপ ভিন্ন। মূষিক বাহন, শ্বেত শুভ্র গজ মুখবিশিষ্ট ও চতুর্ভুজ। ডানদিকের দুহাতে ত্রিশূল ও মোদক আর বামদিকের দুহাতে পরশু ও মুলার ব্যবহার দেখা যায়। নৃত্যশীল গণেশের মূর্তি প্রধানত পূর্ব ভারত ও বাংলায় দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের নটরাজের অনুরূপ নৃত্যরত গণেশ মূর্তি, বাঙলার শিল্পীকুলের সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয়ই নয় কৃতিত্বও দাবী করে।

গণেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত।

শিব পুরাণে—গণেশের জন্ম ও উৎপত্তি সম্বন্ধে এক লোককাহিনী প্রচলিত আছে। বিবাহের পর শিব-পার্বতী কৈলাশ ধাম গমনের পর পার্বতী-সখী জয়া ও বিজয়ার পরামর্শে হাতে পদ্ম নিয়ে স্নান করলে গণেশ নামক সুকুমার পুত্র সৃষ্টি করেন, তারপর গণেশকে সুসজ্জিত করে হাতে একটি লাঠি দিয়ে কৈলাস পুরীর দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করেন। গণেশের প্রতি নির্দেশ ছিল পার্বতীর গৃহে যে কেউ প্রবেশ করতে এলেই গণেশ যেন তাকে বাধা দেয়। ইতিমধ্যে শিব কৈলাস পুরীতে এসে বালক দ্বাররক্ষী গণেশকে দেখে অবাক হয়ে যান। পার্বতীর আজ্ঞা অনুসারে গণেশ কিছুতেই পথ ছাড়বে না। সংঘর্ষ ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হল। প্রথম দফায় শিবের অনুচরেরা পরাস্ত হয়। শিবের অবস্থাও শোচনীয়। নারদ মারফত শিবের এমন দুরবস্থা শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির। গণেশের বিক্রমে দেবতারা হতবীর্য হয়ে পড়েন। এমনকি শিব নিজেও ছিন্নাঙ্গ হয়ে পড়েন, বিষ্ণু নিজেও নাজেহাল, ব্রহ্মার তো লাঞ্ছনার শেষ নেই। বিষ্ণু রাগে দুঃখে সুদর্শনচক্রে গণেশের মুণ্ডু কেটে ফেলেন। পার্বতী এ সংবাদ পাওয়া মাত্র খুব উত্তেজিত হয়ে ঘটনাস্থলে হাজির। এবং ক্রুদ্ধা পার্বতী সহস্র শক্তির সাহায্যে জগৎ সংহার করতে উদ্যত হন। অন্যান্য দেব প্রধান উপায়ান্তর না দেখে দেবীর নিকট স্তবে নিমগ্ন হন। অবশেষে পার্বতী আজ্ঞা করেন গণেশ যদি জীবিত হয় দেবতাদের পূজনীয় হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। অতঃপর শিবের নির্দেশে উত্তরদিকে নত মস্তক যে কোন জন্তুর মাথা আনবার জন্য দেবতারা বেরিয়ে পড়েন। প্রথমেই তারা একদন্ত এক হাতীর দেখা পায়। তারপর সেই হাতীর মাথা গণেশের কাঁধে জুড়ে দেওয়া হল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মন্ত্রে গজানন গণেশ আবার গাত্রোত্থান করলেন। সেই থেকেই সব পূজোর আগে গণেশ পূজোর প্রচলন শুরু হয়।

'লিঙ্গ পুরাণে'—

দৈত্যরাজদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য দেবতাদের অনুরোধে শিব গণেশ সৃষ্টি করেন। এখানে গণেশকে শিবেরই রূপান্তরিত পরিগ্রহ বলা হয়। শিব উমা গর্ভে গজানন গণপতি রূপ ধারণ করেন। ফলে উমা গণেশ জননী।

'বামন পুরাণে'—স্নানকালে গৌরী নিজ দেহমল থেকে চতুর্ভুজ গণেশের সৃষ্টি করেন। অতঃপর শিব সেখানে স্নান করতে এসে গণেশকে আবিষ্কার করেন। শিব পার্বতীর নায়ক হলেও ঘটনাচক্রে নায়ক ব্যতীত গণেশের জন্ম, শিব নাম দিলেন বিনায়ক।

'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে'—পার্বতী পুত্র কামনা করলে শিব পরিধেয় বস্ত্র থেকে গণেশকে সৃষ্টি করেন। পার্বতীর হাত থেকে নিয়ে শিব যখন গণেশকে আদর করছিলেন সে সময় হঠাৎ গণেশের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। দৈববাণীর ফলে শিবের অনুচরেরা অমরাবতী থেকে ইন্দ্রের হাতীর মাথা কেটে এনে বালক গণেশের দেহে জুড়ে দেয়। এইভাবেই গজাননের উৎপত্তি।

'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'—গণেশ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। পার্বতী পুণ্যক ব্রত অবলম্বন করায় শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেন। সকলেই পুত্র দেখে ধন্য ধন্য করেন। একমাত্র সূর্যতনয় শনি কোনদিকে না তাকিয়ে অধোমুখ থাকায় পার্বতী অনুরোধ করেন তার পুত্রকে দেখে আশীর্বাদ করতে। শনি অমঙ্গল আশঙ্কায় আপত্তি করেন। পার্বতী তাকে আশ্বাস দেন। অতঃপর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শনি গণেশের মুখ দেখবা মাত্র শিশুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেবাদিদেবকুলে শোকের ছায়া পড়ে যায়। বিপদ দেখে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গড়ুরে চড়ে পুষ্পভদ্রা তীরে চলে যান। তারপরে সুদর্শন চক্রের সাহায্যে কর্তিত এক হাতীর মুখ মৃত গণেশের কাঁধে জুড়ে দেন।

গণেশ পুনঃ জীবিত হন। এই হল মোট গণেশ উৎপত্তির বিভিন্ন প্রচলিত কাহিনী বা উপাখ্যান।

বিদেশে গণেশ পূজোর প্রচলন

'চীন'—চীন দেশে গণেশ পূজোর রীতি প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রবন্ধকার অ্যালিস গেটির লেখা থেকে জানা যায় পুরাকালে প্রধানত দুটি পথ দিয়েই গণেশ চীন দেশে প্রবেশ করেন।

(১) ভারতীয় পণ্ডিতরা গণেশ পূজো চীনে প্রচলন করেন। অথবা চীন দেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তীর্থ ভ্রমণ করে ফেরার পথে গণেশ পূজোর যোগাচার বা তান্ত্রিক-বিদ্যা এদেশ থেকে নিয়ে যান।

(২) দ্বিতীয় পথটি সম্বন্ধে জানা যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সমুদ্রপথে ভারত থেকে চীনে যাতায়াত করতেন। তারাই তন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্রাচার এবং 'বজ্রধাতু' 'গর্ভধাতু' নামক মহাযান সাধনায় দুটি মণ্ডল (রহস্যময়) প্রবর্তন করেন সেগুলির মধ্যে গণেশও ছিল। বর্তমান চীনেও এইরূপ রহস্যময় গণেশ পূজোর প্রচলন আছে।

চীনে জোড়া গণেশের মূর্তি দেখা যায়। চীনে প্রাচীন গণেশের মাত্র দুটি মূর্তি পাওয়া গেছে। একটি তুন-হুয়াঙের গুহা মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা। অন্যটি মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই মূর্তি দেওয়ালের গায়ে আঁকা গণেশের ছবি বা ভাস্কর্যগুলির মধ্যে গান্ধার, গুপ্ত বা ইরাণীয় ছাপ সুস্পষ্ট। ৬৬৪ খৃঃ সুয়েন-চাওই চীনের গণেশ মূর্তি ও তন্ত্রসম্মত গণেশ পূজোর সাক্ষর।

'জাপান'—খৃঃ নবম শতাব্দীর পর জাপানে গণেশ সংস্কৃতি প্রবেশ লাভ করে। জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষু কোবো দাইসি মহাবৈরোচন সূত্রের শুভাকর সিংহকৃত চীনা অনুবাদের পুঁথি পান। সেই পুঁথির মর্মার্থ উদ্ধার করতে না পেরে কোবোদাইসি চীনে যান। চীনের অসাধারণ পণ্ডিত হুই-কুও পুঁথির মর্মার্থ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। সেই মর্মার্থই বিনায়ক মণ্ডল অর্থাৎ গণেশ সংস্কৃতি। এইভাবেই জাপানে গণেশের প্রচলন হয়।

'তিব্বত'—তিব্বতে বোন-পো ধর্মের প্রচলন ছিল। অনেকের মতে এই বোন-পো ধর্মের সঙ্গে সভ্যতা বা সংস্কৃতির কোন সম্পর্কই ছিল না। সুতরাং যোগাচার বা শক্তিপূজোর প্রভাব তিব্বতীদের মধ্যে যথেষ্টভাবে প্রচলিত হয়। তিব্বতীয় 'যব-যম' মূর্তি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিব্বতীয় 'যব-যম' মূর্তিতে কোথাও কোথাও শক্তিসহ হস্তিমুণ্ড বিশিষ্ট দেবতাকে দেখা যায়। এরূপ মূর্তি যে গণেশেরই তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এছাড়া, সিংহলে বৌদ্ধশাস্ত্রে গণনাথের যেরূপ বর্ণনা আছে তা হুবহু গণেশ মূর্তির সঙ্গে মিল দেখা যায়।

এ থেকেই ধরা যায় সিংহলেও গণেশ পূজোর প্রচলন আছে।

এতং পূজাং প্রবঃকৃত্বা পশ্চাৎ পূজ্য বয়ং নরৈঃ'। অর্থাৎ সর্বাগ্রে গণেশ বন্দনা। প্রাচীন সাহিত্য ও মূর্তি তত্ত্বে আমরা গণপতি গণেশকে দেখতে পাই বিভিন্ন অবস্থায়। 'গণদিগের অধিপতি বলে 'গণপতি'।

নববর্ষ

শিল্পীর চোখে
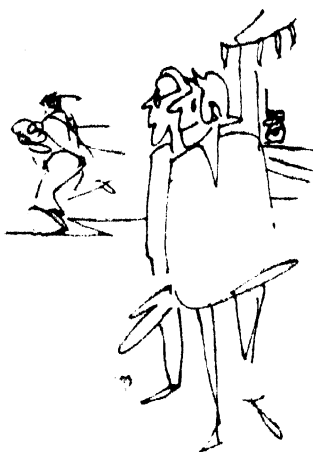
শিল্পী: নিতাই ঘোষ

কালকের দিনটা

কাল বাংলাদেশ থেকে আগত মামাবাবুর সংগে দেখা হওয়ার পর থেকেই কালকের দিনটা অন্যদিন থেকে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট হয়ে উঠল, আমার দিনলিপির খাতায় কালকের তারিখটার নীচে লাল কালির একটা দাগ পড়ল।

মামাবাবু অবশ্য আমার আপন কেউ নয়, আমার তরুণ বন্ধু অধ্যাপক কুঞ্জবিহারী কুণ্ডুর মামাবাবু, আসলে তার স্ত্রী অমিয়ার মাতুল।

মানিকতলা কলেজের ফ্ল্যাটবাড়িতে কুঞ্জর ওখানে হামেশাই আমি যাই, স্বাভাবিক প্রীতি ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ ওর সুসজ্জিত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। ঐ গ্রন্থাগারের বহু গ্রন্থ আমার অনেক প্রয়োজন মিটিয়েছে। কালও গিয়েছিলাম একটা প্রয়োজনেরই তাগিদে। লাইব্রেরী ঘরে বসে সবে কুঞ্জর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছি এমন সময় পাশের ঘর থেকে একটা মিষ্টি গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ কানে এল :

গুড়ুক গুড়ুক শুনছি যে—কি ব্যাপার ?

কুঞ্জ মৃদু হেসে বললে, বাংলাদেশ থেকে মামাবাবু এসেছেন, অমিয়ার মামা, তাবা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন।

একবার এ ঘরে আসেন না ?

কেন, তামাক ইচ্ছে করেন নাকি, না বাংলাদেশের খবর শুনবেন ?

দুই-ই, তুমি মামাবাবুকে একবার নিয়ে এস এ ঘরে।

কুঞ্জ তখনই গিয়ে মামাবাবুকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে এল। কুঞ্জ গিয়ে ওঁকে কি বলেছে, কিছু বলেছে কিনা জানি না, মামাবাবু দেখি হুঁকো হাতে করেই এসে হাজির হলেন। গায়ে একটা ফতুয়া, গলায় মোটা তুলসীর মালা, কপালে শাদা তিলক।

নমস্কার করলাম, তিনি প্রতিনমস্কার করে বললেন, কি ? হবে ? তামাক খাবেন ?

মন্দ কি, কতকাল খাই না।

শুনে উঠে দাঁড়ালেন মামাবাবু : দাঁড়ান, জল পালটে ভাল করে সেজে আনি।

মিনিট পাঁচেক পরে কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে মামাবাবু যখন আবার ফিরে এলেন অম্বুরীর খোশবায়ে তখন ঘর একেবারে ভরে গেল। কল্কেটায় একটা টিনের ছেঁদাওয়ালা ঢাকনী বসিয়ে দিলেন মামাবাবু। হুঁকোটা দেখি আবার বেশ পরিষ্কার করে নতুন করে ধোয়া। মামাবাবু হুঁকোটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নেন, টানেন।

গ্রাম্য হুঁকা, বাংলাদেশের যে অঞ্চলের মানুষ ছিলাম, মামাবাবুর মুখে সেই অঞ্চলের ভাষা শুনে মনে হল যেন বাংলারই কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের বৈঠকখানায় বসে আছি। হুঁকোয় গুড়ুক গুড়ুক করে সুখটান দিতে দিতে বললাম, মামাবাবুর বাড়ী—

খোকসা—জানিপুর।

আরে—আমরাও যে ঐ পথ দিয়েই বাড়ি যা'তাম : গড়াই, কালীগাং, কুমোর—কুমোরের ধারেই ছিল আমাগোর বাড়ি !'

কোন গাঁয় ?

গ্রামের নাম শুনলি কি আপনি চিনবেন : শ্রীকোল, নাম শুনিছেন কোনদিন ?

এবার বিস্ময় ফুটে উঠল মামাবাবুর মুখে : শ্রীকোল !...ক'ন কি—শ্রীকোল চেনব না ! ওখানে গেছি যে আমরা সপরিবারে, নৌকো করে গেছি, আমাগোর ওদিককার আরও কত লোক গেছে রামা ধোপাকে দেখতি, তার ওখানকার ধুলো নিতি, তার চরণধুলো নিতি।...আপনার গাঁ সেই রামা-ধোপার শ্রীকোল ত ?

হ্যাঁ, তাই।—কোনরকমে উত্তরটা দিলাম বটে, কিন্তু মন তখন আমার বিস্ময়ের অতলে : রামা ধোপাই তাহলে আমাদের গ্রামকে বিখ্যাত করে গেছে। অথচ চীনা এবং ফরাসী ভাষায় দিগগজ বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর স্বর্গত প্রবোধচন্দ্র বাগচীও ত আমাদের গ্রামেরই লোক ছিলেন, তাঁর নাম ত মামাবাবু করলেন না।

দেখিছেন অবশ্যি আপনি রামা সাধুরে—একেবারে ছেলেবেলার থে, তার অনেক কথাই নিশ্চয় জানেন, কিছু কিছু শোনান না। বেশ আগ্রহের সংগেই বলে উঠলেন মামাবাবু।

মামাবাবুর অনুরোধে শোনাতে হল তাঁকে রামার কথা। বলতে গিয়ে পারম্পর্য রক্ষায় রাখতে পারি নি ঘটনার ; যখন যে কথাটা মনে পড়েছে বলেছি। অনেক কথা—ফেরার পথে, বাড়ি এসে, খাবার সময়, শুয়ে শুয়ে ঘুমোবার আগে মনে পড়েছে। মোট-কথা মামাবাবুর মুখে রামার নাম শোনার পর কাল সারাদিন রামার স্মৃতি নিয়েই কাটিয়েছি :

রামা আমাদের গ্রামেরই ধোপার ছেলে। যখন থেকে ওকে আমি চিনি তখন ওর বয়স বছর তিরিশেক হবে, আমার বড় জোর দশ। ও আর ওর দাদা উদ্ধব আর দশজনার মত আমাদেরও কাপড় কাচত, বেশ সুন্দর পরিপাটি করেই কাচত।

মজবুত একহারা চেহারা, শ্যামবর্ণ, পরিচ্ছন্ন বেশবাস, মাথায় অল্প একটু লম্বা চুল, স্বল্প গোঁফদাড়ি। এছাড়া সুকণ্ঠ। আমার বাল্যস্মৃতিতে এই মূর্তিতেই রামার প্রথম আবির্ভাব। শুনতাম রামা নাকি একটু সাধু সাধু, অর্থাৎ সাধুর দলে মেশে, একটু আধটু গাঁজাও নাকি খায়।

গ্রামের হাটে লাঙল কাঁধে করে রামা ধোলাই কাপড়ের বোঝা নিয়ে যেত, ফিরবার পথে রামা গান গাইতে গাইতে ফিরত—কীর্তন, দেহতত্ত্ব অথবা ভাব। মাঝে মাঝে কেন না জানি —ঘুম ভেঙে যেত তার গান শুনে। আবেগ আর গভীর দরদে ভরা মধুর কণ্ঠ—আমার শিশু মনকেও কেমন উদাস করে দিত।

কিছুকাল পরে শুনলাম রামা পাগল হয়ে গেছে, কাজকর্ম আর কিছু করতে পারে না, কেবল গান গায় : ঠাকুরের গান, দেহতত্ত্ব।

এই সময় রামাকে দেখতে পেলাম একদিন গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিতের বাড়ির মচ্ছবে। খেতে বসেছে। আমরা ছোটরাও অনেকে বসেছি। খাবার আগে রামা হঠাৎ বলে উঠল : অনেক সাধু-সন্ত ত আইছেন,—আমার একটা কথার উত্তর দিতি হবি।

অনেকেই কৌতুকে হেসে বলল, কি কথা কি কথা, বলো ?

আপনারা শুদ্ধ হবার জন্য মন্ত্র পড়েন—অপবিত্রঃ পবিত্রঃ বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ, —পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলে যে অপবিত্র আছে সে যেন পবিত্র হল, কিন্তু যে পবিত্র আছে সে আবার কি পবিত্র হবে ?

শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন, উত্তর দিলেন না কেউ। আমি তখন বালক হলেও কিন্তু আমার মনে হয়েছিল —এ ত পাগলের মত কথা নয়।

এই সময়েরই আর একদিনের কথা : আমরা ছেলো মাঠে ফুটবল খেলছি, রামা

এসে দাঁড়িয়েছে। আমি সেদিন গোল-পাড়ে রামাকে কাছে পেয়ে বললাম, ও রাম, এতকাল আছ কেমন তুমি?

ও উত্তর দিলে, আছি তোমাগোর ফুট-বলের মত।

সে আবার কি?

যে পায় সেই একটা লাথি মারে।

বয়স অল্প হলেও [illegible]—বাড়ির লোকেদের অনাদরে—তাচ্ছিল্যের কথাই রামা [illegible]।

কিছুদিন পর শুনলাম রাম পুরো পাগলই হয়ে গেছে: হঠাৎ হঠাৎ করে বর্ষার ভরা গাঙে ঝাঁপ দেয়, ভেসে ওঠে গিয়ে ঐখানে গ্রামের শ্মশানে। সেখানে ভিজে কাপড়েই বসে থাকে।

বাড়ির লোক ধরে আনে বাড়িতে, চৌকি দেয়—একটু ফাঁক পেলেই রামা আবার শ্মশানে পালিয়ে যায়। কিছুতেই বাড়িতে রাখা যায় না। কথা বলে না কারো সঙ্গে।

রামা বিবাহিত। বউ সুন্দরী, স্বাস্থ্য-বতী। রামাকে জোর করে ধরে এনে বউ-এর [illegible] শোবার ঘরে রেখে দরজায় তালা লাগিয়েও দেওয়া হয়েছে। সকালে দেখা যায়—ঘরের বেড়া ভেঙে রামা পালিয়েছে সেই শ্মশানে।

খাওয়া-দাওয়া এক রকম বন্ধ বললেই হয়। খুব খিদে পেলে কোন কথা না বলে কলাগাছ থেকে একটা পাতা কেটে নিয়ে এসে উঠোনের এক কোণে বসে, খাওয়া হলেই অমনি আবার সেই শ্মশানে। সেখানে পিছনে পা মুড়ে অনেকটা বীরাসনের ভঙ্গীতে নদীর দিকে মুখ করে কখনও নিমীলিত কখনও উন্মীলিত চোখে বসে ধ্যান করে।

কথা বলে না রামা কারো সঙ্গে। দিন যায়, খাওয়াও কমতে কমতে শেষে একরকম অনশন মতই হয়ে দাঁড়াল। খেতে নিজেদের বাড়িতে আর যায় না, দুই তিনদিন পর একদিন কলাপাতা নিয়ে অন্য যে কোন বাড়ির উঠোনে গিয়ে বসে। শেষে আহার আরও সীমিত হয়: সাত আট দিন এবং আরও পরে পনের দিন পর পর কোন সংগৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে অন্নভিক্ষায় বসত রামা।

এই একমাত্র খাওয়ার দিন খাওয়ার সময় আর প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় ছাড়া শ্মশা-নের যে জায়গাটায় বসত—সেই জায়গা অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় তার আসন ছেড়ে সে আর উঠত না। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে, বর্ষার অবি-শ্রান্ত জলধারা, পৌষ-মাঘের প্রচণ্ড শীত তাকে আসনচ্যুত করতে পারেনি। বর্ষার জলে ভেজা কটীবাস তার হাওয়াবাতাস রৌদ্রে শুকিয়েছে, বাস পরিবর্তন করেনি রামা, দ্বিতীয় বাস রাখেওনি। উত্তমাঙ্গ চিরনগ্ন, শীতকালেও।

বড় হয়ে কলেজ হোস্টেল বা কর্মস্থান কলকাতা যাবার জন্য নৌকাযোগে মাগুরো থেকে গ্রামে ফিরবার সময় গ্রামের শ্মশানে এই দীন তপস্বীকে দেখে সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়েছি। দেখতাম রামার মাথায় তখন জটা, দেহ অস্থিচর্মসার কিন্তু দুই চোখে এক অপার্থিব দীপ্তি—অবশ্য খোলা থাকলে।

রামার এই তপস্যার কথা চারিদিক ছড়িয়ে পড়লে অনেক দূরে থেকেও নৌকা-যোগে লোক আসতে সুরু করে। তার সাম-নের ধুলো নিয়ে শুনি অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত হয়েছে, অনেকের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।

এই সময় ওর সামনে সিধে পড়তে সুরু করে: সিকি, আধুলি টাকা পয়সার সঙ্গে নানা খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র।

এইসব জিনিসের লোভে ওর স্ত্রী শ্মশানের ঠিক উপরেরই এক বটগাছ তলায় এক কুঁড়ে তৈরী করে গৈরিক পরে সন্ন্যা-সিনী সেজে আস্তানা নেয়।

সাধক রামা এইটাই বোধহয় বরদাস্ত করতে পারেনি। ১৯৪১-৪২ সালে ইভা-কুয়েশনের সময় সপরিবারে গ্রামে গিয়ে শুনি—কয়েক মাস আগে রামা সাধু দেহত্যাগ করেছে। দেহত্যাগ বলছি এই জন্যে যে মৃত্যুর আগে না কি সে মৌন ভঙ্গ করে বলেছে, অমুক তিথির অমুক সময়—আমি চলে যাচ্ছি;—আর ঠিক সেই সময়েই তার মৃত্যু হয়েছে—আর সে মৃত্যু কোন অসুখ-বিসুখে নয়।

আর একটা কথা শুনে আশ্চর্য হলাম যে, তার দেহত্যাগের পর তার স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যে মহোৎসব হয় তাতে সমাজের উচ্চ নীচ বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় দুই হাজার লোক এক সঙ্গে বসে পংক্তিভোজন করেছেন। মাগুরো মহকুমার যে অঞ্চলে আমা-দের বাস ছিল সে অঞ্চলে যে এ রকম ঘটনা একটা ঘটে যেতে পারে তা কেউ আগে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না; এমন সংস্কারবদ্ধ প্রাচীনপন্থী ছিল ওখানকার সমাজ। শুনলাম অনেক মুসলমানও স্বেচ্ছায় এ মচ্ছবে যোগদান করেছিলেন; কারণ তাদেরও অনেকে রামাকে একজন পীর বলেই মনে করতেন।

কুঞ্জর রামাবাবের মুখে উচ্চারিত সামান্য দুটি কথা যেন কাল আমায় মনে করিয়ে দিয়ে গেল, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে—রামায়ণ মহাভারতীয় যুগের মত তপস্যা এ যুগেও সম্ভব, আর আমাদের জীবনও এক-দিক দিয়ে ধন্য যে এমন একজন তপস্বীকে আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

—তারাপদ রাহা

যুধিষ্ঠিরের কুকুর ।। অনীতা গুপ্ত

এক হিংস্র শীতের রাতে,
আমি কয়েকটি দরজায় গিয়ে
করাঘাত করেছিলাম।

প্রথম দরজাটি খুলে
অপ্রসন্ন মানুষটি বলেছিল
'আমার ঘর ছোট, তোমার জায়গা হবে না।'

দ্বিতীয় বাড়ির গৃহকর্তা
নিদ্রাতুর চোখ তুলে উত্তর দিয়েছিল
'স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে আরামে আছি
আমাকে তুমি বিরক্ত কোর না।'

তৃতীয় দরজাটি খুলে নিদ্রাহীন গৃহস্থটি বললো
'এখন আমি খুব ব্যস্ত,
কাল ভোরে আমার অনেক কাজ।'

রাস্তায় নেমে দেখলাম
খড়কুটোয় আগুন জ্বালিয়ে
দেহাতী মানুষেরা গোল হয়ে বসে,
হাত-পা গরম করে নিচ্ছে।
আমার খুব ইচ্ছে করছিল
আগুনের তাপে শরীর সেঁকে নিতে,
কিন্তু ভিনদেশী মানুষ বলে ওরা আমাকে ভয় পেল।

নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে
পিছন ফিরে দেখতে পেলাম
একটি কুকুর আমাকে অনুসরণ করে আসছে,
রাস্তার আলোতে তাকে দেখে চিনতে পারলাম।
আজ সকালে চায়ের দোকানে বসে
পাঁউরুটি খাবার সময়,
আমার রুটির আধখানা দিয়েছিলাম
ঐ কদর্য কুকুরটিকে।

দময়ন্তী এইবার ।। তুষার রায়

নদীর বাঁকের কাছে অকস্মাৎ থমকে যায় হাওয়া
এইটুকু লিখে আমি চমকে উঠি, ভাবি
কি যেন কোথাও কার সঙ্গে দেখা হবে, কেন
অথবা এমন ভাবনা কেন এলো, যাতে
নদীর বাঁকের কাছে থমকে যাবে হাওয়া,
তুলনারহিত ঈন রূপ, অন্ধকার, নাকি সে তোমারি চুল
কেশরাশি, ভ্রূভঙ্গে যৌবন ভাঙে বাঁধ, নাকি
অপরাধ অনেক করেছি আমি কবিতায়, ক্ষমা কোরো,
আচমকা এটি কি চুম্বনে ছিলো, নাকি প্রেম
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা তুমি আমূল বিঁধিয়ে দিলে, দেখো
এইবার ভালোবাসা ফিটফাট, সুগন্ধি কুসুমে
এসো দুজনেই লক্ষ্য করি দুজনের স্থির চাঁদমারী
দ্যাখো, আবাল্য আর্ধকাতক আমি এক অস্থির পুরুষ।

বারবার ফিরিয়ে দিয়েছো তুমি, জানো নাকি
বহুবার মৎস চক্ষু আমিই বিঁধেছি লক্ষ্য, কবিতায়—
বারবার ছাজন নকল নল নিয়েছে তোমার মালা
জ্বালামুখ চেপে আমি গম্ভীর পাহাড়, বেশ বসে আছি
দময়ন্তী এইবার চেনো তুমি সঠিক রাজাকে।

ত্রিকোণ ।। অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিবর্গকে যাবে না বেলা প্রতিশ্রুত শব্দের সম্ভারে
শূন্য মাঠে ধান নেই ও-বাড়ীটা কার
নীরব গাম্ভীর্য নিয়ে অত্যন্ত হৃদয়তার
মধ্যে এই প্রশ্নটিই চিরকাল জিজ্ঞাসার
মতো বেঁচে থাকে
ত্রিবর্গকে যাবে না বেলা শূন্য মাঠে মধ্যিখানে ও-বাড়ীটা কার
জাননা সত্যিই তুমি? জাননা? জাননা?

বস্তুত পড়ন্ত রোদ নির্নিমেষ ঝুঁকি নিয়ে
বড়ো ভালবাসে বিষণ্ণতা
যেমন তারের মধ্যে চিরকাল বার্তা বহে যায়
সুখের দুঃখের হাসি ঝরে পড়ে অশ্রুস্নান মুখে
যেমন স্বচ্ছতা কাঁচ প্রকৃত দৃষ্টিতে থাকে সাবেক প্রভায়
রোদ্দুরে একলা থেকে সমস্তই দেখেছিলে তুমি
দেখনি? সত্যিই তুমি দেখনি? দেখনি?

ত্রিবর্গকে যাবে না বেলা কোনোদিন-ই যায়নি কখনো
যেমন জানেনি কেউ
শূন্য মাঠে মধ্যরাতে একাকিনী ও-বাড়ীটা কার

যামিনী রায়

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
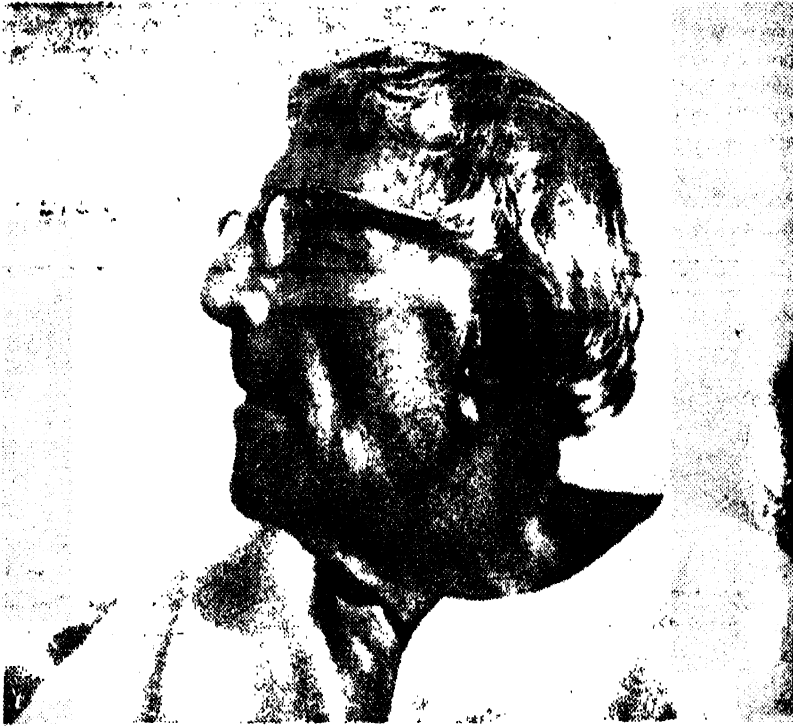
আশ্চর্য মানুষ ছিলেন যামিনী রায়। সহজ সারল্যের প্রতীক। বাস্তবিকই তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে যিনি শিল্পী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন, তিনি ওরকম নিরহংকার ও সরল কি করে হন। আসল কথা বোধহয় এই যে শিল্পের সাধনাকেই তিনি সারাজীবন বড় করে দেখেছেন, খ্যাতি ও প্রচারকে নয়।

তিনি অবশ্য সাধারণ একটি সংগতিশীল পরিবারে এবং সাধারণ পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন। ১৮৮৮ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। পিতা রামতারণ রায়চৌধুরী প্রথম জীবনে সরকারী রাজস্ব বিভাগে চাকুরী করতেন। চাকুরী জীবনে তিনি সন্তুষ্ট না হওয়ায় পদত্যাগ করেন এবং পৈত্রিক বাসভূমিতে ফিরে আসেন। গ্রামে ফিরে তিনি জমিজমার দেখা শোনাতে আত্ম-নিয়োগ করেন। দেশের মাটিকে তিনি 'মা' বলতেন এবং তাঁর মতে দেশের মাটিকে শুধু ভালবাসলেই হবে না, তাকে মাতৃজ্ঞান করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাহলে মাটির কাছ থেকে মায়ের মত স্নেহ পাওয়া যাবে। তিনি মনে করতেন যে কৃষিকাজে নিযুক্ত হলেই যে তাকে শিক্ষাদীক্ষা বর্জন করতে হবে এবং জ্ঞানলাভে তার আর কোন প্রয়োজন নেই—একথা মোটেই ঠিক নয়। তিনি ১৯০১ সাল থেকে তুলার চাষ শুরু করেন এবং খদ্দরের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। কৃষিকাজে দক্ষতা ছাড়া তিনি নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। আঙুলের সাহায্যে তিনি সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। এইরকম পিতার সন্তান যামিনী রায়। তিনি বাবার কাছ থেকে কেবল যে ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাই নয়, দেশের মাটিকে ভালবাসতেও শিখে-ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে দেশের নিজস্ব ধারা অবলম্বন করে এমন অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল, যার মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও প্রতিভাত।

দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল তাঁর অন্তরে। দেশমাতার প্রতি এবং দেশের শিল্প সংস্কৃতির প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ ছিল, তার মূলে ছিল তাঁর পিতার আদর্শ। ছোটবেলা থেকেই শিল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং ছবি আঁকা ও মাটির মূর্তি গড়ায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

স্কুলের বাঁধাধরা ছকে তাঁর লেখাপড়া খুব বেশী দূরে এগোয়নি।

যামিনীবাবুর কাছে তাঁর ছোটবেলায় দেশে কেমন পরিবেশ ছিল তার গল্প যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা আজও ভুলতে পারেননি তাঁর কথা। সেসময় গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপের আসর ছিল, সেখানে সকাল সন্ধ্যায় এসে জমা হোত ছেলে-বুড়ো সবাই। সন্ধ্যার আগমন ঘোষণা করে বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজাতো, মেয়েরা গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে দিয়ে প্রণাম করতো আর কামনা করতো সংসারের সুখশান্তি আর সকলের মঙ্গল। পুজোপার্বণে, ব্রতকথায়, পাঁচালীগানে, সারা রাতের যাত্রার আসরে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেত। লক্ষ্মীর সরা, কৃষ্ণলীলার পট, গণেশ জননীর চালচিত্র প্রভৃতি সবকিছুই যেন একটা সুরে গাঁথা ছিল এবং জীবনকে ভরাট করে রাখত।

যামিনী রায়ের ছোটবেলায় দেখা এই জীবন ও তার পটভূমি সারাজীবন তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর জীবনেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিল্পের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ এবং তার চর্চায় তাঁর দক্ষতা দেখে তাঁর বড়ভাই বাবার কিছুটা অমতে তাঁকে কোলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। ই বি হ্যাভেল সাহেব তখন ঐ স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে পার্সি ব্রাউন সাহেব অধ্যক্ষ হন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি নিজে
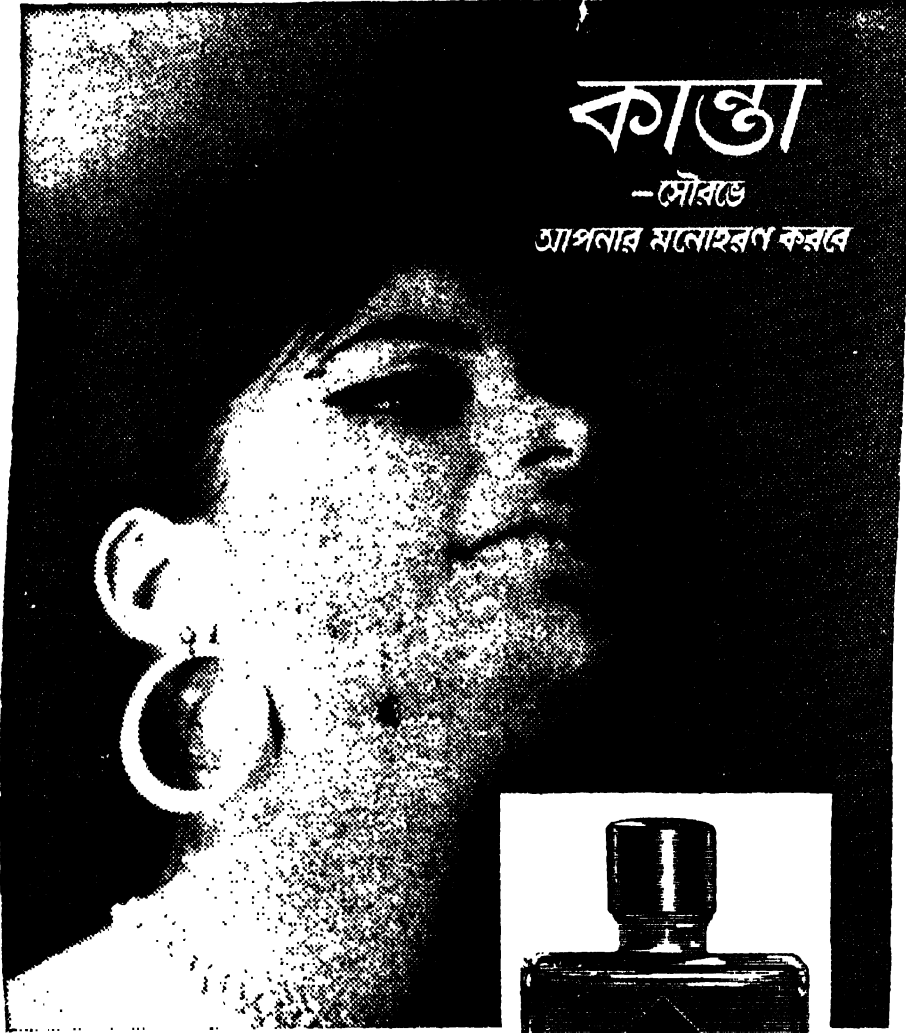
ভারতীয় চিত্রশিল্পে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ চাকুরী ছেড়ে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যাই হোক আর্ট স্কুলের শিক্ষায় যামিনী রায়ের মন ভরেনি। এখানেই তাঁর শিল্প শিক্ষার শেষও হয়নি। তিনি তাঁর গ্রামে ফিরে বনজঙ্গলের পরিবেশে একটি কুটির তৈরী করে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন। গ্রাম্য বালিকা বা সাঁওতাল বালিকাকে বিষয়বস্তু করে তিনি এইখানে কয়েকটি ছবি আঁকেন যেগুলি পরে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

তাঁর জীবনকে একটি সংগ্রামের ইতিহাস বলা যায়। বহু কিছুর সঙ্গেই তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে—দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম, শিল্পরীতি ও প্রকাশভঙ্গী নিয়ে নিজের মনের সঙ্গে সংগ্রাম এবং তারপর নানা পরীক্ষানিরীক্ষা এবং প্রথমদিকে নানা বিরূপ সমালোচনার সঙ্গে সংগ্রাম। সংগ্রামে তিনি অবশ্য জয়ী হয়েছিলেন, এটিই আনন্দের বিষয়।

কর্মজীবনে তাঁর অভিজ্ঞতা আশ্চর্য বৈচিত্র্যে ভরা। এলাহাবাদে তিনি কিছুদিন জনৈক জার্মান বিশেষজ্ঞের সঙ্গে রঙিন ছাপার কাজ করেন। কলকাতার জীবিকার জন্য তিনি গরাণহাটায় এনগ্রেভিং-এ রং দেওয়ার কাজ এবং লিথোগ্রাফির ছাপা কাজ করেছেন। একটি ইহুদী ব্যবসায়ীর জন্য তিনি শতকরা দশ-বারো আনা হিসাবে পোস্টকার্ড রং করতেন। কাপড়ের দোকানে বিক্রেতার কাজেও তিনি সাহায্য করেছেন. কাপড়ের পাড়ের ডিজাইন দেখবার জন্যে। দীর্ঘদিন কোলকাতার থিয়েটারগুলির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তিনি দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, মেক আপ প্রভৃতি দেখে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিভিন্ন ধরনের পেশায় ও কাজকর্মের মাধ্যমে তিনি জীবনের নানাদিক নানাভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিছুদিন নানা ধরনের কাজকর্মে নিযুক্ত থাকার পর তিনি চিত্রাঙ্কন শিল্পের দিকে ফিরে আসেন এবং জীবিকার্জনের জন্য এই শিল্পকেই অবলম্বন করেন। তখন তিনি পাশ্চাত্য শিল্পরীতিতে রিয়ালিস্টিক ধরনের পোর্ট্রেট আঁকতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এই রীতিতে ছবি এঁকে তিনি মনের দিক থেকে বেশ আনন্দলাভ করতেন না, কারণ তাঁর মনে হোত যে বিদেশী শিল্পরীতির মাধ্যমে নিজেকে ঠিকমত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই শিল্পরীতি নিয়ে তাঁর মনে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। সচেতনার কোন আলোকে আমাদের দেশের সেই খাঁটি রূপ ও গড়ন ফুটে উঠবে—এই হোল তখন তাঁর একমাত্র সাধনা। তিনি তাঁর শিল্পে আনতে চাইলেন সমস্ত বাংলাদেশের রঙ, সমস্ত বাংলাদেশের মন। সেজন্যই তিনি দেশীয় রীতিতে ছবি

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজী
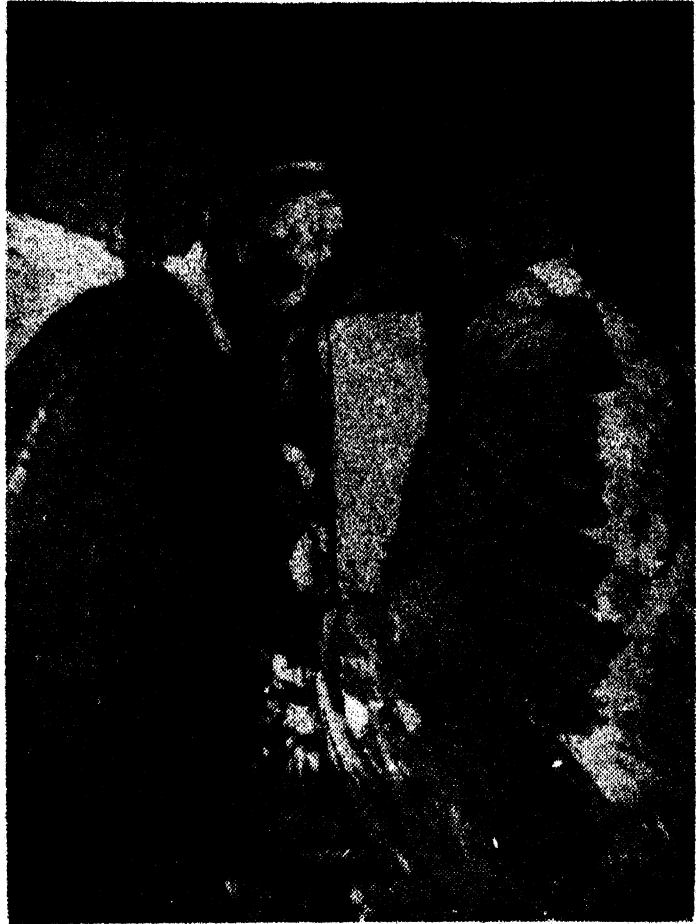
আঁকতে শুরু করে নানারকম পরীক্ষা করতে শুরু করেন। কিন্তু মনের মত একটি রীতি বা ধারা তখনও তিনি স্থির করে উঠতে পারছিলেন না। মনের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম চলছিল আর সেইসঙ্গে চলছিল আর্থিক সংকটের সঙ্গেও সংগ্রাম। ১৯২২ সাল থেকে ১৪।১৫ বছর ধরে সংগ্রাম করে তিনি বাংলার গ্রামে প্রচলিত লোকশিল্পের ঐতিহ্যের মধ্যে সরল, সংবদ্ধ অথচ প্রাণবন্ত, গভীর ও প্রামাণ্য একটি চিত্ররীতির সন্ধান পান এবং সেই রীতিকে অবলম্বন করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল একটি ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে তাঁর ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী হয়। এর কয়েক বছর পরে তিনি শিল্পরসিকদের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হন। এবং ক্রমশ তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হতে থাকে। প্রথমে তাঁকে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা এবং সেইসঙ্গে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি সে সব কিছু সহ্য করে তাঁর নতুন শিল্পসাধনায় অটল রইলেন। তাঁর সাধনার স্বীকৃতি লাভে এবং খ্যাতির প্রসারে তিনি বিচলিত হন নি। একই রকম নিষ্ঠা, অনুরাগ ও অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি শিল্পসাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। শরীর যত-

যামিনী রায়ের আঁকা ছবি

যামিনী রায়ের আঁকা ছবি

দিন তাঁর ভাল ছিল, সৃষ্টির গতিকে তিনি থামতে দেন নি।
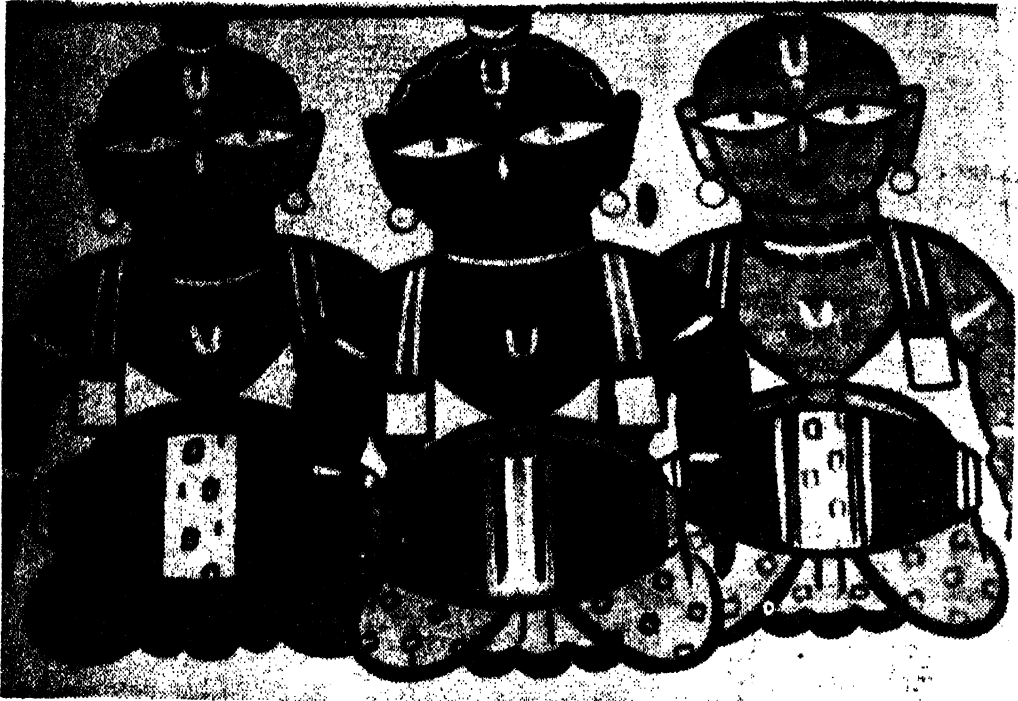
যামিনী রায়—এই নামটি বাংলা তথা ভারতের সীমানা অতিক্রম করে পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত দেশগুলির শিল্পরসিকদের কাছে অনুরাগ ও শ্রদ্ধামিশ্রিত একটি নাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রুচিবান ব্যক্তিরা সাগ্রহে তাঁর চিত্র সংগ্রহ করেছেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন শান্ত ও আত্মস্থ। তিনি কথা বলতেন কম এবং ধীরে ধীরে বলতেন। যে গুণের দ্বারা পরকে সহজে আপন করে নেওয়া যায় তিনি সেই দুর্লভ গুণটির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সহজ। তাঁর স্টুডিয়োয় গেলে বিশেষভাবে চোখে পড়ত একদিকে আসবাবপত্রহীন নিরাভরণতা আর একদিকে তাঁর শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য। ঘরে আসবাবপত্র বা পর্দা না থাকায় তাঁর ছবিগুলি হয়ে উঠেছিল সজীব ও সপ্রকাশিত। তাঁর যশ ও খ্যাতি সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন ছিলেন না। তিনি বলতেন—'আম গাছ মিষ্টি ফল দেয়; কিন্তু সে কি জানে কিভাবে সে লোককে আনন্দ দিচ্ছে।' এই একটি বাক্যেই মানুষ যামিনী রায়ের মনের ছবি অনেকটা বোঝা যায়। সত্যি কথা বলতে কি আজকের দিনে এমন মানুষ পাওয়া সহজ নয়। একজন মহৎ ব্যক্তিকে সম্প্রতি হারিয়ে আমাদের যে ক্ষতি হল, তা অপূরণীয় বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। ✦

কোলাজ

রাধু গোস্বামী

একজিবিশনটা পেছনে রেখে সামনের খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালাম। গ্রীষ্মের বিকেল: ময়দানে ফুরফুরে করে হাওয়া বইছে। নানা রঙবেরঙের পোশাকপরা স্ত্রী-পুরুষ ছোট-বড় ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ অলসভাবে হেঁটে, শিশুরা এবং ওদের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মা-বাপেরা ছুটোছুটি হুটোপুটি করে সমস্ত জায়গাটাকে মেলায় পরিণত করেছে। স্বর্গোদ্যান দেখিনি। ওখানে কী কচিকাচা ছুটন্ত শিশু আছে? অথচ এ জায়গাটা আর কিছুক্ষণ পরেই নরকোদ্যানের রূপ নেবে। ময়দানের এপাশে ওপাশে, গাছের আড়ালে আড়ালে প্রাইভেট কার, ট্যাক্সিগুলো এসে থেমে থাকবে। ব্যবসায়ী, আধা-ব্যবসায়ী, নতুন নামা রূপোপজীবীরা এসে পার্টি ধরবে। ওদের দালালরা ওদেরকে সাহায্য করবে। নাভির নীচের জগতের ক্ষুধার তাড়নায় তাড়িত মানুষেরা এসে ভীড় করবে। যেন ওদের জীবনে এই জৈবিক ক্ষুধা ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই। মাঠের ভেতরে, পূতিগন্ধময় নর্দমার ধারে ওরা সবাই যুগল হয়ে আশ্রয় নেবে। ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। তবু বিকেলটা আমার ভাল লাগছে। পেটে অবশ্য কিছু নেই। নাড়িভুঁড়িগুলো হজম করার পদ্ধতি জানা থাকলে, আপাততঃ কাজটা তাই দিয়ে সারতাম। সারাদিনে পেটে যে একেবারে কিছু পড়েনি তা নয়। কিছু বাদাম। দুটো শশা। কলের জল। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে রোজই ঘুরি। আজও সারাদিন ঘুরে শেষে একজিবিশন। বন্ধুর প্রেজেন্ট-করা 'গেস্ট-কার্ড'। অবশ্য ভীড়ও নেই একজিবিশনে। প্রথমদিন বলেই কার্ডের প্রয়োজন। একেবারে আর্ট একজিবিশন। অজস্র ছবি। জলরঙ, তেলরঙ, গ্রাফিক আর স্কেচের ছড়াছড়ি। অল্পখ্যাত, উদীয়মান শিল্পীদের আঁকা ছবি। বন্ধু ওয়ালিমারও ছবি আছে গ্যালারীতে। ও না এসে আমায় আসতে বলেছিল। অনেক কষ্টে ছবির ভীড়ে ওর ছবি খুঁজে পেয়েছিলাম। এমনিতেই ওর ছবির মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। টাঙানো ছবিটা দেখে তো আমি অবাক! হিজিবিজি, নানা সব টুকরো টাকরা কাগজ, ছবি, কোথাও তুলির দু-একটা আঁচড়—সব মিলিয়ে কিম্ভূতকিমাকার দুর্বোধ্য কী একটা বস্তু সাইত্রিশ নম্বরের ছবিটা।

আমার পাশের এক ভদ্রলোকের তন্ময়তার ব্যাঘাত ঘটিয়ে ডেকেছিলাম, 'মাফ করবেন, আপনার ছবি এখানে আছে কি? মানে আপনি ছবিটবি আঁকেন?' ভদ্রলোক প্রশ্নটা

প্রায় থতমত খেয়ে গেলেন যেন—'না, মানে হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?'—'এই সাইত্রিশ নম্বরের ছবিটা ঠিক ধরতে পারছি না।'—'ওঃ এটা ? এটা একটা কোলাজ।—সে তো দ্যাখ-শনেই দেখা যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক তাঁর কাঁধের ব্যাগটা সামনে নিয়ে বললেন,—'শিল্পীর বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয়। তবু যে কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। আর থাকার কারণও কোন এক বিষয়ে তাঁর মনে জমে ওঠা বিক্ষোভ। হাজার রকম সমস্যা, হাজার রকম আনন্দদান.স্মৃতি, হাজার রকম অবাক হয়ে যাওয়া—সব মিলেমিশে শিল্পীর মনে একাকার হয়ে যায়। তবু দেখুন, একটু ভাল করে লক্ষ্য করুন। সবগুলোর মধ্যে কেমন একটা সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য রয়েছে। এটা, আমার মতে, একটা প্রথম শ্রেণীর কোলাজ। সচরাচর এরকম কোলাজ চোখে পড়ে না।'

মাথা নেড়ে বোঝার ভান করে বললাম—'আপনার ছবি কোনটা ?' সাগ্রহ উত্তর এল—'ঐ উনিশ নম্বরের ছবিটা আমার। তেলরঙ-এর। দাম রেখেছি আটশ'। ওটা একটা......

ভদ্রলোকের কথা আর শোনা হয়নি। ততক্ষণে বন্দরের আঁকা ছবিটা দেখতে শুরু করে দিয়েছিলাম। সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেতাজীর ছবি। সেই পরিচিত রূপ, চিৎকার করে দেশবাসীকে ডেকে বলছেন 'দিল্লী চলো'। ঠিক মাঝামাঝি নয়, একটু ডানদিকে, উপর নীচে মাঝামাঝি। তাঁর একটু উপরে পদ্মমুখী রক্তজবার মধ্যে শ্যামা মায়ের শান্ত স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল। তাঁর দুপাশে রামকৃষ্ণ সারদা আসনে। একটু দূরে বিবেকানন্দ, বুকে হাত রাখা। ছোট্ট ছবি স্বামীজীর। প্রায় নেতাজীকে কেন্দ্র করেই পুরো কাজটায় ভিন্ন ভিন্ন দিনের ভিন্ন ভিন্ন খবরের কাগজের টুকরো, হেডলাইন, অসমাপ্ত সংবাদ অপ্রধান অংশ, কাটা ছবি ইত্যাদি : "Blow Hot Blow Cold ....'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' (বড় হরফ) 'লোটাস প্রত্যহ ২॥ ৫৸, ৯'—দিদি আর পিসীমা গিয়েছিলেন, সামান্য অংশ দেখেই তাঁরা হল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। হলের ম্যানেজার, এমনকি দারোয়ানের পর্যন্ত চৌদ্দগুষ্টির মুণ্ডুপাত করে বাড়ী ফিরেছিলেন।......

'হলদিয়া বন্দরের কাজ অগ্রগতির পথে।' তার পাশেই 'স্থায়ী সরকার গঠন করুন।' 'সিমলায় শেষ মুহূর্তে শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য। রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটে চুক্তি স্বাক্ষরিত।' 'বাংলাদেশে সারা বাংলা সাহিত্য মেলার প্রতিনিধি দল।' 'শিল্পী যামিনী রায় পরলোকে।' আর কত টুকরো টুকরো কাগজ। কোথাও উত্তমকুমারের ছবি, কোথাও বিশ্বজিৎ-হেমা মালিনী। সত্যজিৎ রায় পুরস্কার নিচ্ছেন। সরকারী ভবনের ফটোর টুকরো। পেন্সিলে আঁকা নগ্ন নারীর আবক্ষ মূর্তি একপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা জুড়ে। এদিক ওদিক ট্রাম, বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি ঠেলা ইত্যাদির মাঝখানে কোন এক শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রামের নিটোল ছবি। পাশে ভরাট নদী। আরও কত কী। সব কি মনে থাকে ?

যতক্ষণ একজিবিশানটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম প্রায় সমস্ত ছবিগুলোই আমায়
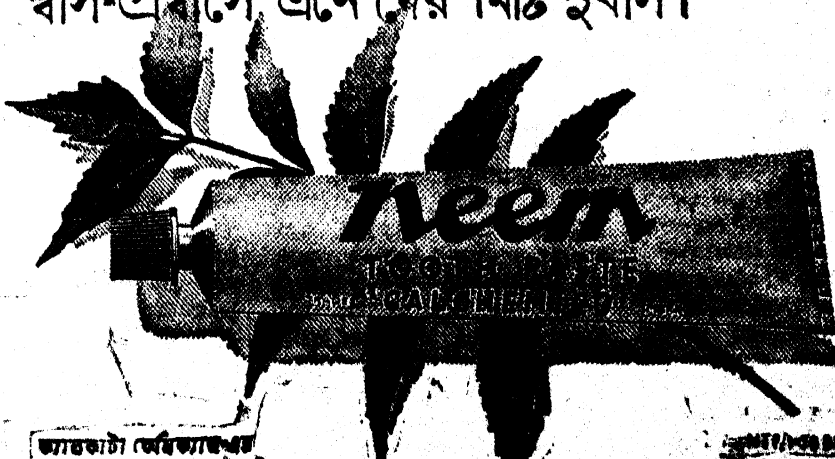
সুখসঙ্গ দিয়েছিল। এখন নিজেকে বেশ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। খিদেও পেয়েছে যথেষ্ট। পেটপুরে জল খেয়ে খিদেটাকে বেশীক্ষণ প্রতিরোধ করে রাখা যায় না। সামনে ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা কমে এসেছে। ফুটফুটে বছর চারেক বয়েসের একটা ছেলে বল নিয়ে খেলছে! বলটা আমার কাছে এসে পড়তেই লুকিয়ে ফেলি। বাচ্চাটা কাছে এসে নিভীক আবেদন রাখে—'এই, এই বলটা দাও না। দাও না বলটা—আ।' 'কেন আমি খেলব না।' —'হ্যাঁ, তুমিও খেলো। এসো না একসঙ্গে খেলি।'

বলটা ফেরত না দিয়ে পারি না। বল ছুড়ে ছুড়ে খেলা শুরু হয় আমাদের। এক ভদ্রমহিলা খেলাটা জমে উঠতে না উঠতেই ওকে নিয়ে যান—চল বাপী, বাড়ি চল।' দূরে দাঁড়িয়ে আছে বোধকরি ওর বাবা। এখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সূর্য সারা দিনের কর্মকাণ্ডের পর পৃথিবীর সীমন্তে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছেন। এরপর ঘোমটা টেনে দিয়ে বিদায় নেবেন। এটাকে নাকি গোধূলি বলে। গোধূলি শব্দটা মনে এলেই বা কেউ উচ্চারণ করলেই মনে পড়ে রত্নাকে। এক বছর আগেও আমার ছিল রত্না। তখন আমার চাকরি ছিল। মনের মধ্যে দখিনা পবন বইত। ওর দু চোখে সমুদ্র দেখে দেখে ডুবুরী হয়ে যেতাম। চাকরিটা থাকলে রত্নাও থাকত। এখনও দখিনা পবন বইতে পারত আমার মনে। এখনও সমুদ্রদর্শন লাভ ঘটত। গোধূলিও ভাল লাগত। হয়তো বা ঐ ফুটফুটে ছেলেটার মত আমাদেরও খোকন আসত। একান্ত আমাদের খোকন! বল ছুড়ে ছুড়ে খেলার মাঝখানেই কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। চাকরি নেই। রত্না নেই। খোকন নেই। ফুরফুরে হাওয়ার বিকেলও নেই নিজস্ব। সব পরের। অন্তত রত্না থাকতে পারত। অনেকের তো থাকেও। প্রেমের বিয়ে বলেই বোধহয় ছেড়ে যেতে পারল। পাশ্চাত্য সভ্যতার অশিক্ষা। আগে এল, মানে লাভ, পরে এম, মানে ম্যারেজ। ওসব দেশে চলে। আমাদের শিক্ষা, আগে ব—বিবাহ, পরে ভ—ভালবাসা। আমাদের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর খুশিমত ছাড়াছাড়ি নেই। স্ত্রী ভুবনমায়ারও স্বামীসঙ্গিনী হন পূর্ব-জীবনে রাজচক্রবর্তীর দুলালী থাকা সত্ত্বেও। আর ওদের? দাবী আব্দার মেটাতে পারলে না বা অনেকদিন একসঙ্গে ঘর করে একঘেয়েমি লাগল—ছেড়ে চলে গেল। স্ত্রীরও তো তোমারই মতন সমান স্বাধীনতা।

—'এই যে দাদা, শুনছেন?'

আরে! আমি খেয়ালই করিনি। পৃথিবী তখন ঘোমটার নীচে মুখ লুকিয়েছে। রাত এসেছে চুপিসাড়ে। কবিরা বলেন রজনী, যামিনী, নন্দু আবার যোগ করেন শব্দ। যত্তোসব ন্যাকা ন্যাকা বচন। পেট না চললে ওসব ফুঃ। এতক্ষণে আমার পাশে একটি মেয়ে বসে পড়েছে। আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই। যুবতী এবং রূপসী হবে হয়তো। অন্ধকারে বোঝা যায় না। উঠতে গেলাম। হাতে টান পড়ল,

—'প্লিইজ'। বসুন না। সন্ধ্যেটা মাটি করবেন না। আমার দুটো কথা শুনুন দয়া করে। ভয় নেই।

—কি কথা? আর আমায়ই বা শোনাবেন কেন আপনার কথা? কি সম্পর্ক—

—প্লিইজ্ শুনুন। দয়া করে শুনুন, বড় দুঃখী আমি। আপনার কাছে বলছি, আপনার মধ্যে দয়ামায়া আছে, আপনিই বুঝবেন আমার কথা—

—আপনি আমাকে চেনেন নাকি?

—না চিনলেই বা ক্ষতি কী?

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। আমার হাত ছুঁয়ে ওর হাতটা নড়াচড়া করল। অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে চাইলাম। ও বলল—কিছু বুঝতে পারছেন না?

বুঝলাম। পাশে সেন্টের গন্ধ। অফিস-পাড়ায় মাঝে মাঝে ছোট শিশিতে বিক্রী হয়। সেন্টের গন্ধটা তাই চেনা চেনা। 'চার আনা চার আনা' হাঁকে হকার। চারদিকে থোক থোক অন্ধকার। অজস্র তারার একটাও নেই। মেঘে পুরো আকাশটায় রাত্রির প্রভাব, চারদিকেও। মেয়েটির হৃদস্পন্দনের শব্দ কাছাকাছি হয়, ঘ্রাণটা কাছাকাছি হয়। বুঝতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। পকেট আমার—। গড়ের মাঠে বসে গড়ের মাঠ কথাটা নাই বা মনে মনে উপমা হিসেবে ব্যবহার করলাম। কিছু মানুষ কর্মক্লান্ত দেহগুলো টেনে টেনে বাড়ীর দিকে চলছে। ওদেরই কারো কটূক্তি—'শালা চাকরি বাকরি চলে যাচ্ছে, দেশে বেকার দিন দিন বেড়েই চলেছে, আর এখানে রাজ্যের কপোত কপোতীরা -যত্তোসব।' হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে এল আমার—'এসবও পেটের জন্য।' ব্যস, তেড়ে এল মারতে ওরা। আমার পেছনে অসংখ্য ঢেউ। ঢেউয়ের আগে আমি। মেয়েটা একা অসহায় অথবা নতুন সঙ্গীর সঙ্গে মাঠের ঘাসে জীবিকার খেলা খেলছে। এয়ারকন্ডিশান আজকের মত বন্ধ হয়ে গেছে। কোলাজটাও বন্ধ দরজার মধ্যে অন্যান্য ছবি-গুলোর সঙ্গে অবাক বিস্ময়ে জনহীন পরিবেশ অনুভব করছে। আমি অন্ধকার পেরিয়ে আলোর কাছাকাছি প্রায়। সাবধান কমে যাচ্ছে। হাত উঁচু করা স্ট্যাচুটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, আমি আলোর কাছাকাছিই প্রায়, স্ট্যাচুটা আসছে। কোলাজটা পড়ে রইল অনেক দূরের বন্ধ ঘরে।

একালের কবিতা

মণীন্দ্র রায়

একালের কবিতার বিষয়ে অনেকেরই খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই। অথচ একালের এই আধুনিক কবিতার বয়স হল প্রায় পঞ্চাশ বছর, আর শুধু লিটল ম্যাগাজিনে নয়, বড় কাগজগুলোতে পর্যন্ত আধুনিক কবিতা ছাড়া অন্য কবিতা দেখা যায় না। এই পরস্পর বিরোধিতার কারণ কি? আমরা কি মনে যা ভাবছি, তার কাজে যা করছি, এ দুই ব্যাপারের মধ্যে মিল রাখতে পারছি না? অর্থাৎ আমরা কি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অসাধু হয়ে পড়েছি? আমার মনে হয় তা মোটেই নয়। একালের কবিতা আমাদের পছন্দসই নয়, তর্কের খাতিরে যদি এটা আমরা ধরেও নিই, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যে কবিতা একালের নয় অর্থাৎ চিরকালের, কিম্বা আগেকার ধরণে লেখা, সে কবিতা কি আমাদের ভালো লাগে? আগেকার দিনে আগেকার পদ্ধতিতে লেখা কবিতা নিশ্চয়ই আমাদের ভালো লাগে, তার কারণ রয়েছে আমাদের ঐতিহ্যপ্রীতির মধ্যে; কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল এই যে, একালে যদি আগেকার ধরণে কবিতা কেউ লেখেন সে কবিতা কি আমাদের ভালো লাগবে? না, লাগবে না। আর এর প্রমাণ হল এই যে, আগেকার ধরণে কবিতা লিখে যদি কেউ আমাদের ভালো লাগাতে পারতেন তো তা তিনি নিশ্চয়ই করতেন, আমাদের অনুমতির জন্যে বসে থাকতেন না। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি, তা কেউই করছেন না, অর্থাৎ কিনা, করতে পারছেন না। কাজেই ধরে নিতে হবে, একালে ঠিক একালের মতো কবিতা ছাড়া অন্য রকম কবিতা লেখা সম্ভব নয় বলেই একালের ধরণে কবিতা লেখা হচ্ছে। আর এইটেই ঐতিহাসিক সত্য। এলিঅটের ভাষায় বলা যায়, every age gets the poetry it deserves.

প্রত্যেক যুগই তার যোগ্যতা অনুযায়ী কবিতা পায়। একালের কবিতা যদি আমাদের আনন্দ না দিতে পারে, 'যদি' কথাটা কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, তবে তার কারণ রয়েছে সমাজতন্ত্রের গভীরে। কবিদের তা নিয়ে দোষ দিতে গেলে সে হবে কাজীর বিচারের মতো।

কিন্তু আমার মনে হয়, একালের কবিতা ভালো লাগে না, এরকম একটা ঢালাও উক্তি করতে যাওয়াটাই ভুল। আসলে বোধহয় ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এইরকম যে, আধুনিক কবিতার যাঁরা পথিকৃৎ, অর্থাৎ তিরিশের প্রবীণ কবি এবং পরের যুগে, অর্থাৎ চল্লিশের অনতিপ্রবীণ কবিরা যা লিখেছেন বা লিখছেন সে কবিতাগুলো আমাদের মোটামুটি ভালোই লাগে, কিন্তু পঞ্চাশ এবং তার পরবর্তীকালের কবিতার বিষয়ে আমাদের অভ্যর্থনা এখনো অকুণ্ঠ নয়।

এর তিন রকম কারণ হতে পারে।

প্রথম ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। যে কবিতা দীর্ঘকাল ধরে চোখের সামনে থাকে তার সঙ্গে এক-ধরনের জানাশোনা গড়ে ওঠে এবং 'কমিউনিকেশান' অনেক সহজ হয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতা এর সব থেকে বড় উদাহরণ। মনে পড়ে, যখন তিনি আজকের সর্বজন পরিচিত তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতাগুলো লিখছিলেন, তখন সমকালের এক মাসিক পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে বছরের পর বছর কী অক্লান্ত ঠাট্টা-ইয়ার্কিই না করা হয়েছে। তেমনি বিরূপ অভ্যর্থনা জুটেছে বিষ্ণু দে-রও, যিনি এবার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন।

দ্বিতীয় কারণ, খুবই বিনয়ের সঙ্গে এটা স্বীকার করাই ভালো যে, একেবারে হাল আমলে, এমন কি তার বেশ কিছু আগে থেকে, ধরুন, দশ-পনের বছর ধরেও যাঁরা লিখছেন, তাঁদেরও মধ্যে এমন কোনো বড় কবির সাক্ষাৎ এখনো মেলে নি, যিনি বা যাঁরা জীবনানন্দ দাশ কি বিষ্ণু দে-র অনুরূপ মহত্ত্বের অধিকারী। এরও কারণ বোধহয় খানিকটা ঐতিহাসিক। রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাবের মধ্যে বাস করে বলতে গেলে তাঁর প্রতিভার প্রায় সুবর্ণ-যুগেই, সেকালের যে-তরুণ কবিরা নতুন পথের নতুন ভাবের কবিতা দিয়ে আন্দোলন শুরু করতে পেরেছেন, তাঁরা কালধর্মকে স্বীকার করে নিতে পেরেছিলেন বলেই তা পেরেছিলেন।

বিষয়টি একটু আলোচনা করে দেখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূলে চাবিকাঠি বলতে যদি কোনো কিছুকে বলা যায় তো চোখ ফেরাতে হয় আনন্দবাদ বা রসবাদের দিকে। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি জন্ম-রোমান্টিক এবং রসতীর্থ পথের পথিক। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় 'ওয়েস্টল্যাণ্ডের' রিক্ততা ঠিক অতো তীব্রভাবে না হলেও আমাদের সমাজেও তার ছায়া ফেলেছিল। তারই সঙ্গে ছিল, এক-দিকে রুশ বিপ্লবের আশাবাদ এবং অন্য-দিকে পরদেশী শাসনের নির্যাতন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই ছিলেন সমাজের সব থেকে বেশী শিক্ষিত অংশ, এবং যাঁরা ছিলেন বেকার, তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ আর হতাশা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের; তাঁদের কাছে 'আনন্দ' ব্যাপারটা ঈষৎ ধোঁয়ার মতো মনে হওয়া বিচিত্র ছিল না। অবিশ্যি কথা উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথও এই সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন, আর তা ছিলেন বলেই তিনি লিখেছেন দুরিশণ কেরাণীকে নিয়ে কবিতা। হ্যাঁ, তা
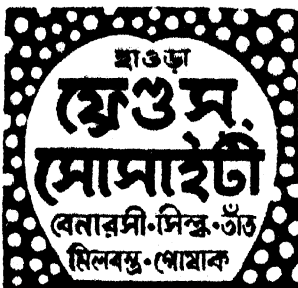
লিখেছেন, আর সেখানে কাঁঠালের ভূতি এবং মরা বেড়ালের ছানার কথাও আছে; সকলেই আমরা জানি কী অপূর্ব সেই 'বাঁশি' কবিতাটি; কিন্তু সব কিছুর শেষে সব কিছুর ওপরে জেগে আছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ, আর তাই তিনি বাঁশির সুরের টানে হরিপদ কেরাণীকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন আকবর বাদশার সঙ্গে। বাস্তবে কিন্তু হরিপদ কেরাণীরা কোনোভাবেই আকবর বাদশার সঙ্গে মিলতে পারছিল না, এমন কি 'বাঁশি' শোনার জগতেও নয়। একেবারে একটা ঘটনাগত দৃষ্টান্ত দিয়েই বলতে পারা যায়, সেকালের সেই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স যা প্রতি বছর শীতের সময় অনুষ্ঠিত হত চৌরঙ্গীপাড়ার কোনো সম্ভ্রান্ত সিনেমা হলে, সেখানে আমাদের মতো খরের সঙ্গীত-পিপাসু লোকেদের পক্ষে ভিতরে ঢোকার ছাড়পত্র জোগাড় করা সহজ ছিল না এবং বেশির ভাগই আমরা ফুটপাতে খবরের কাগজ বিছিয়ে তার ওপর র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে হলের বাইরে লাগানো লাউডস্পীকারে কান পেতে থাকতাম সারারাত। কিন্তু এতো দফাওয়ারি বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ সেকালের সমাজমানসে যে মূল্যবোধের দিক থেকে একটা তোলপাড় চলছিল তা আমরা সকলেই জানি। আর তারই কাব্যস্বীকৃতি পেলাম আমরা প্রথমে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে, এবং পরে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের মধ্যে। সেকালের এই যুগ পরিবর্তনের অন্তঃসারকে ধরতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা বড় কবি হতে পেরেছিলেন। কিন্তু একেবারে হাল আমলের কবিরা সেটা তেমনভাবে পারছেন না কিম্বা তা পারা সম্ভব হচ্ছে না বলেই পারছেন না; আর সেই জন্যেই এঁরা এঁদের মহৎ পূর্বসূরীদের মতো বড় কৃতিত্বেরও অধিকারী হতে পারছেন না।

কিন্তু কেন একালের তরুণ কবিরা তা পারছেন না? এই কেন-র জবাব খুঁজতে গেলেই এসে পড়ে আমরা একটু আগে ঐ যে তিন রকমের কারণের কথা বলেছি তারই শেষ কারণটির মধ্যে। এই তিন নম্বর কারণ হল, একালের সমাজমানসের অভূতপূর্ব পরস্পর-বিরোধিতা এবং জটিলতা।

কিন্তু এ আলোচনায় জড়িয়ে পড়ার আগে আরেকটা মৌল ব্যাপারের ফয়সালা হওয়া দরকার।

অনেকেরই ধারণা আছে, একালের কবিতা বা সেকালের কবিতা, এসব কালবাচক উক্তি কবিতার বেলায় অচল। কেননা, ওঁরা বলেন কবিতা চিরকালের বস্তু; যে-কবিতা শাশ্বত নয় সে-কবিতা কবিতাই নয়। সবিনয়েই স্বীকার করব শাশ্বত কথাটার প্রয়োগ আমাকে ঘাবড়ে দেয় অল্পবিস্তর। কেননা, আমি তো জানি, আর আপনারাও নিশ্চয়ই জানেন, সংসারে কিছুই শাশ্বত নয়, সবই তুলনামূলক এবং আপেক্ষিক। এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী ছিল না, তারপর এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী থাকলেও তাতে মানুষ ছিল না, এবং শোনা যায়, এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবী থাকবে এবং মানুষ থাকবে না, এবং তারপরে নাকি একটা সময়ে পৃথিবীও থাকবে না। আবার মানুষের জগতেও তো জানি, মানুষ এককালে গুহাতে বাস করতো, তখন তাদের সত্যিকারের কোনো ভাষাই ছিল না, তারপর ভাষা যদি বা এল তৈরি হল না লিপি, এবং লিপির আবিষ্কারের পরেও প্রায় হাজার খানেক বছর ছিল তা প্রাথমিক পর্যায়েই, তাতে কবিতা রচনা করার কোন কথাই ওঠেনি তখনো। কাজেই শাশ্বত কথাটার প্রয়োগের সীমা হাজার চারেক বছরের বাইরে নয়, আর এই চার হাজার বছর ধরেও মানব সভ্যতার প্রতি পর্যায়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাব্যজগতেও ঘটেছে কতোই না রূপবৈচিত্র্য। এবং শুধু রূপের দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও ঘটেছে কতো রূপান্তর। আসলে মূল্যবোধ ও জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রকমটি ঘটাই তো ছিল স্বাভাবিক। সেইজন্যেই ইসকাইলাস আর শেকসপীয়ার দুজনের বাহনই নাটক হওয়া সত্ত্বেও জীবন ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের কতোই না আলাদা। গ্রীক নাট্যকারের চোখে মানুষের জীবনে ট্রাজেডির কারণ তার নেমেসিস, বা অদৃষ্ট, যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে এবং ক্ষমাহীন ও ক্রূর। এবং মানুষ যতো চেষ্টাই করুক তার অভিশাপ ও পীড়ন থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু শেকসপীয়ারের চোখে, মানুষের জীবনে ট্রাজেডির কারণ মানুষ নিজেই। শেক-

পীরান্দেল্লোর কাছে Characte. is destiny নিজের চরিত্রই মানুষের নিজের নিয়তি। যেমন ম্যাকবেথের ট্রাজেডি ঘটেছে তারই চরিত্রের অসংযত উচ্চাশার চক্রান্তে, হ্যামলেটের ট্রাজেডি ঘটেছে তার নিজস্ব চরিত্রগত উভচারিতা এবং সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার ফলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাইরের চেহারাতে তো বটেই এমন কি অন্তঃসত্তার দিক থেকেও কবিতার চিরকালীনতা খানিকটা মনগড়া ব্যাপার। কিম্বা বলা যায় এই চিরকালীনতার ওজোর তুলি আমরা নিজেদেরই পিছিয়ে পড়া মনোভাবকে চাপা দেবার জন্যে। আমরা এক ধরণের কবিতা পড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি এবং নতুনকে বোঝার জন্যে তার দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে যে পথশ্রম তাতে গা বাঁচিয়ে চলতে চাই। কিন্তু আমাদের এই মানসিক জড়তার জন্যে জীবন তো থেমে থাকবে না। নতুন পথে নতুন দিনের স্বপ্নের দিকে সে এগিয়ে যাবেই। না বললেও চলে, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, প্রতিদিনের চলমান জীবন থেকে কবিতার নির্যাস সংগ্রহ করা জীবনব্যাপী সাধনার বিষয়। কবির এই দুশ্চর সাধনার ফলকে আত্মস্থ করতে হলে পাঠকেরও বেশ খানিকটা প্রস্তুতির দরকার বই কি। সেভাবে নিজেকে তৈরি করতে না পেরে শুধু চিরকালীনতার দোহাই দিয়ে চলা, আত্মপ্রতারণার মতোই করুণ ব্যাপার, এটা যেন ভুলে না যাই।

কিন্তু যা বলছিলাম। একালের সমাজমানসের অভূতপূর্ব পরস্পর বিরোধিতা এবং জটিলতার কথা। আর এরই ফলে একালের কবিরা কেমন করে খণ্ডিত সিদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছেন তার কথা।

আমি বিশ্বাস করি, যতো ঘুরপথেই হোক, আর যতো অদৃশ্যই মনে হোক, যে কোনো শিল্পরূপের মতোই কবিতার সঙ্গে সমাজের যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। একটু আগে ইসকাইলাসের নাটকে নিয়তিবাদের কথা বলেছি।* সেই সময়কার সমাজে যখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়নি, এবং মানুষ মোটামুটি প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নকের মতো বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, তখনকার সেই পেগান ধর্মবিশ্বাসের জগতে নেমেসিসের ধারণা অনিবার্যই ছিল গ্রীক নাট্যকারদের কাছে। কিন্তু প্রায় হাজার বছর পরে শেকসপীয়ারের সময়ে মানুষ সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তের কেন্দ্র-স্থলে দাঁড়িয়ে নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হয়েছে, নিজের দুর্বলতাকেও চিনতে পারছে, এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল যন্ত্র বিপ্লবের ফলে রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ ভাবধারাগুলোকেও কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে। তখন তার চোখ ফিরেছে নিজের দিকে, এবং মানুষ নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে তার স্রষ্টা এবং নিয়তি হিসেবে। এই আত্মবিশ্বাস এবং সচেতনতা অবশ্যই সেকালের সমাজমানস এবং যুগচেতনারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আজ ১৯৭৩-এ দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, আজকের যা সমাজমানস এবং যুগচেতনা সেটা এমন একটা ওলট-পালটের মধ্যে আটকা পড়ে আছে যে এর ভেতর থেকে কবিতার নির্যাস ছেঁকে তোলা খুবই শক্ত ব্যাপার। আমি নিজে কিঞ্চিৎ লেখাটেখার চেষ্টা করি বলে কবিতার বিষয়ে আমার খুবই একটা কৌতূহল আছে। সাধ্যমতো দেশ-বিদেশের কবিতাও ইংরেজি অনুবাদের মারফৎ পড়ার চেষ্টা করে থাকি মাঝে মাঝে। আমি বলতে পারি না, ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা ভাষাতে তো নয়ই, পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে এমন তরুণ কবি কে আছেন যিনি নেরুদা, প্যাস, জীবনানন্দ দাশ কি বিষ্ণু দের সমান ক্ষমতার অধিকারী? এমন কি অ্যালেন গিনসবার্গ বা ইয়েভতুশেঙ্কোর মতোও তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি নিয়ে কবিতা লিখছেন কেউ? না, আমার অন্তত চোখে পড়েনি। এবং এটা যে সম্ভব হচ্ছে না, তা কেবল কবিদেরই আপেক্ষিক খর্বতার জন্যে নয়, তার বেশ কতকগুলো বাস্তব কারণও আছে। কিন্তু প্রশ্নটাকে ভালো করে বিচার করতে হলে সময়ে কুলোবে না, এবং আমার সাধ্যেও নয়। কেননা, বিষয়টি আসলে সমাজতত্ত্বের। কিন্তু ব্যাপক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি, আজকে আমরা যে সময়টার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করছি তাকে বলা যেতে পারে, বিরাট একটা যুগসন্ধির কাল। একদিকে বিজ্ঞান এবং প্রয়োগবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতিতে অণুর রহস্য কেন্দ্র থেকে মহাকাশের সীমানা পর্যন্ত উন্মোচিত হয়ে গেছে আমাদের চোখের সামনে, অন্যদিকে মানুষের বাস্তব জীবনে রয়ে গেছে অপরিসীম দারিদ্র্য ক্ষুধা এবং পরস্পরের অবিশ্বাস, লোভ, হিংসা এবং দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ মানুষের মনীষা তার সামনে যে উন্নততর মহৎ জীবনের ব্যাপ্তি এনে দিচ্ছে, তার বাস্তব জীবন সেই মহৎ সাধনার উপযুক্ত হতে পারছে না। এর ফলে ক্রমেই তার জীবনে নেমে আসছে পরস্পর-বিরোধী উভচারিতার দ্বন্দ্ব, আর এই জন্যেই সে সামনে এগোতে পারছে না, ঘুরপাক খাচ্ছে একই বৃত্তে। আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে এই যে, বাষ্প ও বিদ্যুৎ শক্তিকে ব্যবহার করে আমরা যেমন প্রথম যন্ত্রবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছিলাম, যার ফলে আমরা লাভ করেছি শেকসপীয়ার এবং গ্যেটেকে, আজ আবার আমরা পরমাণু শক্তিকে অবলম্বন করে দ্বিতীয় যন্ত্রবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হতে চলেছি। স্বভাবতই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমস্যাটা আরো জটিল, কেননা পরমাণু শক্তি ব্যবহারের স্বপ্নটা আমাদের আছে, কিন্তু বাস্তবে এখানো বিদ্যুৎশক্তিকেই ভালোভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কিন্তু সে যাই হোক, গোটা পৃথিবীর যা সমস্যা, যতো ঘুরপথেই হোক, সে সমস্যা আমাদেরও। আমরা পুরনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে আছি বলে নতুন যুগের মূল্যবোধকে ব্যবহার করে একালের উপযুক্ত নতুন কবিতা লিখে উঠতে পারছি না। আর এর কারণটা আসলে সামাজিক।

কিন্তু তাই বলে একালে ভালো কবিতা একেবারেই লেখা হচ্ছে না তা মোটেই নয়। আমি বরং জোর দিয়ে এই কথাই বলব একালে অনেক ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে, এবং এমন কবিতাও লেখা হচ্ছে যা একক কবিতা হিসেবে ধরলে উৎকর্ষের দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর। বিশেষ করে যখন মনে রাখি, আজকের এই বিরূপ পরিবেশে কবিতা লেখাটাই কতো কঠিন, তখন এঁদের সিদ্ধিতে আমি গর্ব বোধ না করে পারি না। বাস্তবকে অনেক দিক থেকে আক্রমণ করছেন এঁরা, ছন্দো-ভাষার অপরিসীম নমনীয়তা ঘটাতে পেরেছেন, এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করব, আধুনিক বাংলা কবিতার বাকরীতিতেও দ্বিতীয়বার পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছেন এঁরা, কৃতিত্বে এঁদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একজন বয়স্ক সহযাত্রী হিসেবে আমি অন্তত ভরসা রাখি, এঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবেন, যাঁর কবিতা পাঠ করে আবেগের সঙ্গেই আমরা উচ্চারণ করতে পারব, এরই জন্যে এতোদিন বেঁচে থাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কথা-কথা-কথা

আত্মজীবনীগুলিতে আত্মজীবনীর রচয়িতারা অনেক কথাই বলে যান কোনো কথা না বলে। সুতরাং আত্মজীবনীর মধ্যে আত্মকথা পাওয়ার আশায় কলাকৌশল দিয়ে পাঠক আত্মজীবনী পাঠ করতে বসেন। কিছু পাওয়া যাবে আর হয়ত কিছুই পাওয়া যাবে না এমন সংশয় আমাদের পাঠকচিত্তের কৌতূহলকে যেন দমন না করে।

জীবনকে জানা সহজ কর্ম নয়। আমরা সাধারণত যেটুকু জানি এবং যা বুঝি মনে করি তা সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু জানি বা শিক্ষা করি তা অন্তর্মুখী, কথায় তা প্রকাশ করার প্রয়াস করলে কিছু রূপান্তর ঘটবেই। বিশেষত সৃজনীমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। জীবনসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সত্যটুকু পরিবেশন করা হচ্ছে তা নয়, আবার জীবনের ক্ষেত্রে হয়ত সঠিক ভাবে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে কিছুই নেই।

তথাপি আমরা যদি সাময়িকভাবে গ্রন্থাদির অস্তিত্ব এবং জীবন প্রসঙ্গে তারা কি বাণী বহন করে ইত্যাদি বিস্মৃত হই তা হলেও বলা যাবে না জীবনের অসংস্কৃত অংশ আমাদের সবধরনের শিক্ষা দেয়। জীবন নিরন্তর পরিবর্তনশীল এবং সর্বদাই অনির্ণীত পদার্থ আমাদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হিসাব-নিকাশকে বানচাল করে দেয়। বিজ্ঞান বিশ্বাসী মানুষের জীবনেও এমন ঘটে থাকে।

অতীত বর্তমানকে সাহায্য করে না, আর একটি বিশেষ কালের ভাবধারা এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের জীবনের অপর অংশে প্রয়োগ করতে গেলে দেখা যাবে তার সত্যতার অপলাপ ঘটেছে। আন্তরিকতা এবং প্রজ্ঞা এই দিক থেকে বিশেষ সাহায্যকর বলা যায় না।

বই সব নয় একথা মেনে নিলেও বলতে হয় মানুষের জীবনকে ভ্রান্ত পথে চালিত করলেও সেই বই মানুষের জীবনের গতিপথে প্রচণ্ড সহায়ক। জীবনের গঠনে বই সাহায্য করে। জীবনকে পথপ্রদর্শন করে আবার হয়ত বিকশিত করে তোলে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে জাঁ-পল সার্ত্র-র প্রথম জীবনের কথা ধরা যাক। জাঁ-পল সার্ত্র লিখিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রায় ন' বছর আগে প্যারিসে প্রকাশিত হয় এবং কিছুকাল পরে টীন হোয়াইট কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন হ্যামিস হ্যামিলটন নামক লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক। এই গ্রন্থটির কথা মাঝে মাঝে উল্লিখিত হলেও তেমন বিস্তারিত আলোচনা হয়নি।

এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে সার্ত্র বলেছেন যে জীবন সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু মনোভঙ্গী এবং ধারণা জীবনের অপর প্রান্তে পৌঁছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে। বালক বয়সে তিনি পড়েছেন প্রচুর এবং স্বাভাবিকভাবেই এই পড়াশোনার ফলেই তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছিল।

সার্ত্র লিখেছেন গ্রন্থারম্ভে—

'বই দিয়ে আমি আমার জীবন শুরু করেছি, এবং নিঃসন্দেহে শেষও করব, বই দিয়ে। আমার মাতামহের পাঠকক্ষের চারদিকে বই থই থই, বছরে মাত্র একবার, অকটোবর মাসের ছুটিতে ছাড়া সে সব বই-এর ধুলো সাফ করা নিষিদ্ধ ছিল। আমার অক্ষরজ্ঞানের আগেই আমি এইসব খাড়া করা পাথরকে পবিত্র মনে করেছি। কেউ সোজা, কেউ হেলে আছে, কেউ বা দুটি বই-এর মাঝে পড়ে সেতু রচনা করেছে লাইব্রেরীর সেলফের ওপর কিংবা যেন প্রাচীনকালের স্মৃতিস্তম্ভের বীথিকার মত সাজানো। আমি বুঝেছিলাম যে আমাদের পারিবারিক সৌভাগ্য এই বই-এর মধ্যেই নির্ভরশীল। ওরা সবগুলিই যেন সমান, আর আমি সেই ক্ষুদ্র দেবস্থানে ঘুরে বেড়াতাম, তার চারপাশে প্রাচীনকালের স্মৃতিস্তম্ভ। এরা আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখেছে, আর এদের স্থায়িত্ব আমাকে আমার অতীতের মতোই শান্ত এক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দান করেছিল। 'আমি গোপনে সেইসব বই স্পর্শ করতাম, তাদের ধুলোয় আমার করতলকে সম্মানিত করতাম, কিন্তু ওসব দিয়ে কি যে করতে হয় সে ধারণা আমার ছিল না আর প্রতিদিনই আমি এমন এক উৎসবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম যার অর্থ আমাকে এড়িয়ে যেত; আমার মাতামহ (অতি কদাকার, সাধারণত আমার মাতামহী তাঁর দস্তানার বোতাম পর্যন্ত এঁটে দিতেন) এইসব সাংস্কৃতিক পবিত্র বস্তুকে ব্রতী পুরোহিতের মত নিষ্ঠায় তিনি নাড়াচাড়া করতেন।

এই পরিবেশে শৈশব কেটেছে সার্ত্রের। মাতামহ ও মাতামহীর পাঠবৃত্তির কথা তিনি বলেছেন। মাতামহ নিজভাবে বই ঘাঁটতেন, সহসা মধ্যপথে বইটি খুলতেন যেন ঠিক জায়গাটাই পেয়েছেন। বালক সার্ত্র-র বাসনা হত শামুকের মত এইসব বইগুলির বুকে চিরে দেখেন ভিতরে কি আছে। মাতামহী মাঝে মাঝে কতকগুলি বই-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন—'জানো, এসব তোমার দাদুর লেখা বই।' পরম গৌরবের বস্তু।

সার্ত্র বলেছেন—আমার মানসিক গঠন ছিল প্লেটোনিস্ট, আমি তাই জ্ঞান থেকে সরে গিয়ে উদ্দেশ্যের সন্ধান করেছি। বস্তুর চেয়ে আইডিয়া আমার কাছে অধিকতর বাস্তব মনে হয়েছে। কারণ ওরাই সর্বপ্রথম আমাকে দান করেছে—এবং তারা বস্তু বিশেষের মত আমার কাছে এসেছে। আমি বই-এর মধ্যে দেখেছি বিশ্বজগৎ তাকে হজম করেছি, শ্রেণীভুক্ত করেছি, লেবেল এঁটেছি এবং পড়েছি—আমাকে তা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। গ্রন্থ মাধ্যমে প্রাপ্ত আমার অভিজ্ঞতার বিপর্যয় আর প্রকৃত বাস্তব অবস্থার কণ্টকময় কঠিন পথ আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। এর ফলে যে আদর্শবাদ গড়ে উঠেছিল ত্রিশ বছর লেগেছে তা ভুলে যেতে।'

গোড়ার দিকে সার্ত্র যা পড়তেন এবং এবং যা কিছু হজম করতেন তাতে তিনি উৎপীড়িত বোধ করতেন, কারণ গ্রন্থে বর্ণিত জীবনকেই তিনি বাস্তব জীবন বলে গ্রহণ করতেন। নর-নারী বিষয়ে তিনি প্রচুর জেনেছিলেন। গ্রন্থোক্ত বহু চরিত্র বিষয়ে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। লোক-

জনকে অদ্ভুত ধরণের আচরণ করতে দেখে তিনি সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। নর-নারী অপ্রত্যাশিত ভাবে জেগে ওঠে, তারপর পরস্পরকে ভালোবাসে, কলহ করে এবং হত্যা করে। এই সব চিন্তা সার্ত্রকে বিশেষ বিভ্রান্ত করে যখন তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে স্বগতোক্তি করলেন—'এসব তাহলে এই। এর মধ্যে যা শুধু উত্তম তাই গ্রহণ করতে হবে। আমার বয়স অতি কাঁচা —আমি সবটাই ভুল বুঝেছি।'

জাঁ-বাপ্তিস্তে সার্ত্র ছিলেন পিতৃদেব। সার্ত্র যখন সামান্য শিশু তখন তাঁর মৃত্যু হয়। নিজে ছিলেন নৌ-কর্মী, তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল পুত্র যেন নৌ-বিভাগে কাজ না করে। তিনি নাবিক জীবনের কষ্টের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সোয়াইৎসার পরিবারে সার্ত্র তাঁর সমগ্র বাল্যজীবন কাটিয়েছেন। তাঁরাই শিশু সার্ত্র-র চিন্তাধারা অন্যদিকে প্রবাহিত করেছেন। সোয়াইৎসার পরিবারের অধিকাংশ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার।

অ্যানী-মারী চেয়েছিলেন তাঁর কন্যা-সন্তান হোক। সেইভাবেই পুত্রসন্তানটিকে মানুষ করছিলেন। যেন একটি মেয়ে। নিজের শৈশবে যা কিছু পান নি, যে সব বস্তুর অভাব ছিল সন্তানকে তিনি তাই দিয়েছেন। সার্ত্র বাল্যকালে বড় ছোট-খাটো ছিলেন বহরে। আর সব শিশুদের অনুপাতে মাথায় ছোট। মাথায় বড় বড় চুল, কপাল-কাঁধ বেয়ে লুটিয়ে পড়ত।

তারপর একদিন দাদু তার নাতিটিকে সঙ্গে নিয়ে নাপিতের দোকানে গেলেন, বললেন—বেশ ছোট করে ছেঁটে দাও। নাতিটির মেয়ে মেয়ে আকৃতি তাঁর মোটেই ভালো লাগত না। মেয়েলি ধাঁচের চুলের পারিপাট্য নষ্ট হওয়ায় জননী কিন্তু ভারী ক্ষুণ্ণ হলেন।

তরুণ সার্ত্র-র জীবনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে দিল বই। বই আর বই। বই-এর সমুদ্রে বিচরণ করে তিনি বেড়ে উঠেছেন বড়ো হয়েছেন।

কিন্তু এসব যদি না হত, তাহলে কি তিনি অন্যরকম হতেন? তিনি কি জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর যোগ্য কোনো রকম আদর্শবাদ আশ্রয় না করে বড়ো হতেন? জীবনের জটিলতাকে তার নিরাবরণ ও নিরাভরণ রূপে দেখতেন?

একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁর জীবন হয়ত একটু অন্যরকম হত। তিনি যদি নৌ-বাহিনীতে যোগ দিতেন, অনেক দেশ ভ্রমণ করতেন, অনেক রকম মানুষের সংস্পর্শে আসতেন। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তেন। যদি ইঞ্জিনিয়ার হতেন তাহলে তার মনে স্বপ্ন থাকত, আবার সেই সঙ্গে, সেই স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হত কর্মজীবন। এর চেয়ে অধিকতর আর কিছু? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বলা যায়, তিনি কি প্রথম জীবনেই প্রজ্ঞার দিক থেকে পরিণতি লাভ করতেন? নিজের হাতে নিজের জীবনের ও অপরের জীবনের গোপন চাবিকাঠি ধরতে পারতেন?

আদর্শবাদ এবং মোহমুক্তি এই উভয় বস্তুই অনুভবের শক্তিকে তীব্রতর করে তোলে। মানুষের বোধ এবং বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করে। সার্ত্র হয়ত তাঁর লেখনীকে তরবারি হিসাবে ব্যবহার করতেন না। তিনি কখনই কোনো এক বিশেষ কারণের জন্য লড়তেন না, যা তিনি অন্যায় এবং ভ্রান্ত মনে করেছেন তার বিরুদ্ধে জেহাদ করতেন না। তবে একথাও সত্য যে তিনি 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতি না মেনে 'আর্ট ফর ওন সেক'—অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনেই শিল্প মেনে নিতেন, বলতেন না 'আর্ট ফর পারপাস নাই—'। কোনো একটি বিষয় নিয়ে লড়াই করা এক বস্তু—জীবনের গভীরতম প্রশ্নে মুখ দেওয়া আরেক বস্তু। তাকে প্রকাশ করা, তার চরম অভিব্যক্তি অন্য বস্তু। কিন্তু আদর্শবাদের একটি স্তর অতিক্রম করে তারপর মোহমুক্তি—এক কথায় বলা যায় অভিজ্ঞতা আহরণ। [illegible] আর কিছু নয়। এই অতি আশ্চর্য গ্রন্থের বিষয় দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়।

—অভয়ঙ্কর

WORDS (Les-Mots): By JEAN-PAUL SARTRE: Translated by TONY WHITE. Published by HAMISH HAMILTON (London): Price 25 Shillings:

অরবিন্দের জীবনালেখ্য

উনিশ শ' বাহাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বাঙালীকে তথা সমগ্র ভারতবাসীকে আর একজন মনীষীর জন্মশতবার্ষিকীর কথা স্মরণ করায়—তিনি হলেন শ্রীঅরবিন্দ। মনে পড়ে আটাত্তর বছর বয়সে উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে ছয় ডিসেম্বর তারিখে তিনি যখন পণ্ডিচেরীতে দেহরক্ষা করেন, তখন সারা পৃথিবীর মানুষ সে খবরে বিস্ময়বোধ ও শ্রদ্ধা-স্মরণ না করে পারে নি। কারণ তিন দিন তাঁর দেহে মৃত্যু সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মের অন্যতম ব্যত্যয় ঘটেছিল। শ্রীঅরবিন্দের দেহে পচন ধরেনি।

কোন সত্য অলৌকিক ঘটনা তাতে প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হয়, কর্মযোগী অরবিন্দ নিজ চেতনা তথা বিশ্বচেতনায় প্রমূর্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভগবানের মধ্যে নিজেকে ও চতুর্দিকের আধারকে ভগবতী করতে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের দেহে যে 'অতি মানসের জ্যোতি' ছিল, তা মূলত, শ্রীমার ভাষায় 'সুপ্রামেন্টাল লাইট'। শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষ পূর্তির বছরে তাঁর মৃত্যু তথা নতুন করে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরাট কর্মজীবন ও দিব্যজীবনও স্মৃতির মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উঠে আসে।

প্রতিটি বাঙালী আজ শ্রীঅরবিন্দের কথা ভাবছেন, তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন চিরকালের বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে। 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থটি রচনা করে শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত সুহৃদগোপাল দত্ত জন্মশতবর্ষ পূর্তির মহান দায়িত্ব পালনে কিছুটা সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে রচনাটি ধারাবাহিকভাবে যখন সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনি, রচনাটি নানাভাবে প্রশংসিত হয়। গ্রন্থরূপে পাওয়ার পর নতুন-পুরাতন সব পাঠককেই বাড়তি কিছু দেওয়ার অধিকার রাখে। প্রকাশিত গ্রন্থটিতে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের উপযুক্ত শিষ্য নলিনীকান্ত গুপ্তের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে, আর আছে বিজ্ঞান-সাধক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, দর্শনাচার্য ডকটর ভবেশচন্দ্র চৌধুরীর 'পুনরীক্ষণ' অধ্যায়। এই দুটি মূল্যবান অংশ ছাড়াও গ্রন্থের উল্লেখ্য 'পরিশিষ্ট' অংশ, শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত সাধারণ পাঠকের ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান অংশ মনে হবে।

বর্তমান গ্রন্থটিতে বালক শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমা, ইয়ার্ডলে নর্টন, চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দের দিব্যমূর্তি, মহাপ্রয়াণে শ্রীঅরবিন্দ, সমাধি মন্দির, পণ্ডিচেরীর অরোভিল ইত্যাদি সংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থকারদ্বয় শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ আটাত্তর বছর বয়সের জীবনকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্র নামে চিহ্নিত করে আলোচনা করেছেন। আলোচনাগুলি বিস্তৃত, বিজ্ঞান-সম্মত এবং অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ। আলিপুর বোমা মামলার বহু লুপ্তপ্রায় তথ্যকে ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষায় সর্ব-প্রথম পরিবেশন করে আলোচ্য দুই গ্রন্থকার সহৃদয় পাঠকদের কাছে অভিনন্দনযোগ্য হয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ জীবনের এক কোটিতে কর্মজীবন তথা রাজনৈতিক জীবনের অসাধারণ ঐশ্বর্যের উল্লাস, আর এক কোটিতে তাঁর ভাবজীবন তথা দিব্য-জীবনজাত আত্মার উল্লাস। এক কোটিতে মানুষ অরবিন্দ, আর এক কোটিতে ঋষি অরবিন্দ।

কিন্তু এই ঋষি অরবিন্দ মানুষ থেকে পৃথক নন। মানবদেহেই দিব্যজীবনকে জাগ্রত করে এক অসাধারণ অধ্যাত্মশক্তিকে প্রমাণ করে গেছেন তিনি। সে প্রমাণ মানবজীবন বিবিক্ত নয়। একথা ঠিক, জন্ম থেকেই শ্রীঅরবিন্দ নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এই 'নৈর্ব্যক্তিকতা লাভের আসল পদ্ধতি হল ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন বা ব্যক্তির দিব্যতা অর্জন', 'নৈর্ব্যক্তিকতা লাভের পরিণতি হল দিব্যতা লাভ—ঊর্ধ্ব থেকে পরম-ব্যক্তির ভগবানের অবতরণ অথবা অন্তরে ভগবানের আবির্ভাব।' অরবিন্দ এ কাজ করে ছিলেন বলেই তিনি চেতনার প্রভাবে বিশ্বজীবনের চূড়ান্ত পরিণতিতে যে 'চিন্ময় পুরুষ', তাকে মানুষী লীলার সঙ্গে যোগ করিয়ে-ছেন। তাই তাঁর কাছে পার্থিব জীবন হয়ে উঠেছে দিব্যজীবন।

এই শেষোক্ত দিব্য ভাবনার কথা 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থের লেখকদ্বয় 'পণ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রীঅরবিন্দ, 'বিজ্ঞানময় শ্রীঅরবিন্দ', মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' ইত্যাদি মোট চারটি পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের প্রথম চারটি প্রবন্ধে—'আবির্ভাব', 'নৈষ্কর্ম্য এবং লোক সংগ্রহ', 'যোগাশ্রমের একটি বছর' এবং 'প্রাক-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত'—এগুলির মধ্যে অরবিন্দের বিপ্লবাত্মক কর্মজীবনের তথা রাজনীতি সচেতনতা ও সক্রিয়তা, সর্বোপরি স্বাজাত্য-বোধ ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির অভীপ্সার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

বস্তুত শ্রীঅরবিন্দ এযুগের একজন বিশিষ্ট বাঙালী রাজনৈতিক নেতা, যোগী ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁর জীবন পরিক্রমায় প্রথম সাত বছর হল 'বাল্য পর্ব', পরবর্তী তের বছর হল 'বরোদা পর্ব', 'বাংলাপর্ব'

হল পরবর্তী কাল থেকে পণ্ডিচেরী যাত্রার সূচনা কাল পর্যন্ত শেষ চার বছরের পরিধি। শেষজীবন হল পণ্ডিচেরী পর্ব—অর্থাৎ জীবনের দীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়। জীবনের প্রথমদিকে আঠার শ' তিরানব্বই সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলেত থেকে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে অধ্যাপক হিসেবে চাকরী নেন শ্রীঅরবিন্দ। এখানেই অরবিন্দ মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের প্রকৃত নেতা পুণার ঠাকুর সাহেবের কাছে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। অরবিন্দই বাঙালী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য 'যতীন্দ্র উপাধ্যায়' ছদ্মনামে গায়কোয়াড়ের সৈন্যদলে প্রবেশে সাহায্য করেন। তাই বারীন্দ্রকে নিয়ে বিপ্লবী দল গড়া, উনিশ শ' পাঁচে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ এবং পরে বরোদার চাকরী ছাড়া—এ সমস্তই রাজনীতির বিরাটপুরুষ অরবিন্দের প্রথম জীবনের ঘটনা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখকদ্বয় সংক্ষেপে অরবিন্দের এই কর্মজীবনের কথা বলে উনিশ শ' আট সালের মে মাসে আলিপুর বোমা সংক্রান্ত বিখ্যাত ষড়যন্ত্রের কথায় চলে এসেছেন। এই অংশে সেই বিখ্যাত মামলার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন তথ্য সমৃদ্ধ রচনার মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত কর্মময়তার মধ্যে অরবিন্দ কিভাবে গোপনে দিব্যজীবন ভাবনায় অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন তাও উল্লেখ করেছেন।

বোমার মামলা থেকে মুক্ত অরবিন্দ সনাতন ধর্মপ্রচার ও জাতীয় দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ইংরিজি সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন' ও বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' সম্পাদনা শুরু করেন। এই জাতীয় সক্রিয়তার কিছু পরেই অন্তরের নির্দেশে রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে যান এবং ক্রমশ যোগসাধনার মধ্যে তাঁর মানসকর্মকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। ফ্রান্স থেকে আসেন শ্রীমা মীরা (মাদাম পল রিশার) এবং এই যোগসাধনায় শিষ্যা হন।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে সেই দিব্যজীবনের চমৎকার বর্ণনা আছে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপনায় শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন অধ্যাত্মচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং তাঁর কাছে এটাই ছিল যোগসাধনার মূল্য লক্ষ্য। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকদ্বয় সেই দিব্যজীবনের মহত্তম গরিমাকে সহজ সরল ভাষায় উপস্থিত করেছেন।

অরবিন্দের বিখ্যাত 'দি লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থে তাঁর দিব্যজীবন সাধনার কথা আছে এবং অতি মানসিক অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে জীবনের সমন্বয় কিভাবে হবে, তার স্পষ্ট পরিচয় আছে, 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে সেই দুরূহ জীবন-ভাবনাটি অত্যন্ত মধু সরল ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'শ্রীঅরবিন্দের চেতনার অংশপর্ব প্রকৃতি এবং চূড়ান্ত পরিণতি সম্ভব করে তোলবার জন্যে তিনি আছেন এবং থাকবেন মনস্পতিরূপে। সেদিক থেকে রচনাটির নামকরণ উপযুক্ত হয়েছে।'

গ্রন্থের শেষে রচনাকারদ্বয়ের পরিচিতি থেকে জানা যায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞানের ডকটরেট অধ্যাপক এবং শ্রীযুক্ত সুহৃদগোপাল দত্ত কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ বিচক্ষণ অ্যাডভোকেট। এঁদের নিষ্ঠা, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা, বিচারক্ষমতা ও অধ্যাত্মবক্তব্যকে সহজ সরল গভীরতম অনুভূতির রসে সঞ্জীবিত করে ব্যক্ত করার ক্ষমতা রচনাগ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। রচনার বিষয়গুলির নির্বাচন, সাজানো এবং পরিবেশন-নৈপুণ্য যথেষ্ট ধীশক্তির পরিচায়ক। এমন সহজ সরল ভাষায় দুরূহ বিষয়কে পরিবেশন করে লেখকদ্বয় অরবিন্দের জন্মশতবর্ষ স্মরণে যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের মাধ্যমে তা নিঃসন্দেহে স্বভাবী পাঠকের পক্ষে অভিনন্দনযোগ্য। —বীরেন্দ্র দত্ত

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ। সুকুমার বসু ও সুহৃদগোপাল দত্ত। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-১৮। বারো টাকা।

নিখিল বঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলন

গত ৭ ও ৮ এপ্রিল শিশু সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নিখিল বঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলন। এটা ছিল চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন। মূল সভাপতি ছিলেন প্রবীণ লেখক জরাসন্ধ। শিশু সাহিত্যের সমস্যা, বর্তমান অবস্থা এবং আরো নানান দিক নিয়ে আলোচনা করলেন ধীরেন্দ্রলাল ধর, সুকমল দাশগুপ্ত সুশীল দাস, শৈল চক্রবর্তী, জয়ন্ত বসু প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। এই উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক হিসেবে ১৩৭৫ ও ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ভুবনেশ্বরী পদক দেওয়া হয় যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও লীলা মজুমদারকে।

এই সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও বেশ মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে কবির লড়াই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী স্মৃতিসভা

গত ৩১শে মার্চ মহাবোধি সোসাইটি হলে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক নারেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। সভায় 'সরোজকুমার রায়চৌধুরীর প্রসঙ্গে' বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা

করেন শিবরাম চক্রবর্তী, বিমল কর, কুমারেশ ঘোষ, অখিল নিয়োগী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রমুখ। সরোজ স্মৃতি পুরস্কার পান—তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সরোজ স্মৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান দুই আহ্বায়ক জীবন সরকার ও লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইনে স্মরণে

দিনটি বৃহস্পতিবার। ৫ এপ্রিল। কলেজ স্ট্রিটের ভারত গণতান্ত্রিক জার্মানির মৈত্রী সমিতি ভবনে একে একে এলেন অনেকেই। এলেন প্রবীণ থেকে অনেক তরুণ কবিই। উপস্থিত হলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগীরা। জমজমাট মৈত্রী-কক্ষ। বেশ ভাবগম্ভীর পরিবেশ। শুরু হল সভা। জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিশ হাইনে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকরা করলেন আলোচনা। জানালেন শ্রদ্ধা। হাইনের ১৭৫তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষেই আয়োজিত হয়েছিল হাইনে-সন্ধ্যাটি।

হাইনরিশ হাইনে নিজেই নিজের সম্পর্কে এক সময় বলেছিলেন : 'আমিই হচ্ছি রোমান্টিক যুগের শেষ কবি। একদিকে পুরনো ধারার জার্মান গীতি-কবিতা আমার সঙ্গেই যাবে যেমন শেষ হয়ে, তেমনি অন্যদিকে আমিই খুলে দিয়েছি জার্মান গীতিকবিতার নব-রূপায়ণের উজ্জ্বল সরণী।' আর ভারত-বাসীর কাছে হাইনে ছিলেন অনেকটা ঘরের লোক। তাঁর কবিতার একদিকে মিষ্টি মেজাজ, অন্যদিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝ; মানবিকতা ও মানবমুক্তির জন্যে আর্তি; ভারততত্ত্বে গভীর মনীষা ও কবিতায় ভারতীয় প্রতীক-চিত্রকল্প-পৌরাণিক ঘটনার আকছার ব্যবহার ও উল্লেখই তাঁকে করে দিয়েছিল আমাদের আপনজন।

৫ এপ্রিলের সান্ধ্য-আলোচনায় সেই মেজাজটাই প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠল বিভিন্ন বক্তার কণ্ঠস্বরে। গল্পলেখক চিত্তরঞ্জন ঘোষ বললেন : 'রবীন্দ্রনাথই প্রথম হাইনের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন। তার পর থেকে হাইনের অনুবাদ চলে আসছে আজো। তরুণতর কবিরাও এগিয়ে এসেছেন ভাষান্তরের কাজে।' জি ডি আরের কলকাতাস্থ নতুন কন্সাল ডঃ হাইডরিশ জানালেন, গণতান্ত্রিক জার্মানি সরকার কেমন শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সঙ্গে হাইনে রচনাবলী প্রকাশ করেছেন রক্ষা করেছেন হাইনের স্মৃতি। কবি তরুণ সান্যাল বললেন উনিশ শতকে যে নব-জাগরণ ও শিল্পবিকাশ চলছিল হাইনে তার গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রেখে যে কবিতা লেখেন তা দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সহায়ক হয়। তাঁর কবিতা নতুন মানবিক আবেদনে ছিল ভরা।' অধ্যাপক লেমান পড়লেন হাইনে সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ। অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন সিদ্ধেশ্বর সেন, চিত্ত ঘোষ, ধনঞ্জয় দাশ, রত্নেশ্বর হাজরা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, করুণাসিন্ধু দে, ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণব পরিডা, মিহির রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। একেবারে সরস ভঙ্গিতে, ঘরোয়া মেজাজে হাইনের চরিত্র ও কবি-ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি তুলে ধরেন তিনি। উল্লেখ করেন কোন অর্থে হাইনরিশ হাইনে যথার্থ আধুনিক। স্মরণ করেন কার্ল মার্কসের সঙ্গে হাইনের বন্ধুত্বের কথা। পরিশেষে হাইনের একটি কবিতার অনুবাদ তিনি আবৃত্তি করে শোনান।

অনুরূপ আরেকটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। সম্প্রতি মাকসম্যুলার ভবন অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ডঃ ওলাও আবৃত্তি করে শোনান হাইনের দুটি কবিতা জার্মান ভাষায়। পরে শ্রীনীহার ভট্টাচার্য ঐ কবিতা দুটির অনুবাদ পড়ে শোনান। অবশেষে সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়।

বন্যার পর বাড়ি ফেরা (গল্প সংকলন)। সমীর রক্ষিত। চিত্রক, ৭৫, পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা—৯। পাঁচ টাকা।

তরুণ গল্পকার শ্রীসমীর রক্ষিত বর্তমানে বাংলা গল্প পাঠকদের কাছে একটি অতিপরিচিত নাম। তিনি তাঁর 'খড়্গ' নামের গল্পটি কলকাতার একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ করে যেভাবে অবলীলায় স্বভাবী ও 'অ্যাভারেজ' পাঠকের অনেক কাছে আসতে পেরেছেন, তা-ই প্রমাণ করে, তিনি ছোট গল্পে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বন্যার পরে বাড়ি ফেরা' প্রকাশিত হওয়ায় আমরা তাঁকে সামগ্রিকভাবে একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকার হিসেবে বুঝতে পেরেছি।

কারণ এই গল্পগ্রন্থে যে নয়টি গল্প সংযোজিত, সেগুলির প্রত্যেকটিই লেখকের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা. অভিজ্ঞতাকে শিল্পিত করার অবধারিত শক্তির পরিচয় বহন করছে। সংকলনে 'খড়্গ' গল্পটি আছে, আরও আছে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'বেলা অবেলা', 'বাপটা ছেলেটা', 'আঙ্কিক নিয়মে' 'দ্বিতীয় ধরিত্রী' এবং নাম গল্পটি।

সমীরবাবু তাঁর গল্পে নিঃসন্দেহে আধুনিক এবং আজকের মানুষের ভিড়ে তিনিও যে একজন, তা স্পষ্ট প্রমাণ করেছেন গ্রন্থের সামগ্রিক ভাবনায়. তা না হলে নিমু, ইন্দ্র, শ্যামল-ভানুদের মত চরিত্র আঁকেন কি করে? গোবিন্দকে চিনেছি, তেমনি লেখক ইন্দ্রকে চিনিয়েছেন স্পষ্ট করে সেই সরল তার বাবার অভিজ্ঞতা আশা-আকাঙ্ক্ষা বাবার সঙ্গে ইন্দ্রর মিল-অমিল এবং পরিণামে বাবার জন্য ইন্দ্রর ভাবনা গোপন অন্তর্মুখী চেতনার উদ্বোধন যেনবা আমাদের মত সমস্ত মধ্যবিত্ত যুবক ও যুবকদের পিতার চিরকালের সম্পর্কের কথা হয়ে ওঠে।

সমীরবাবুর গল্পের এইরকমই পরিণামী ব্যঞ্জনা ও ব্যঞ্জনার বিশাল বিস্তৃতি। 'খড়্গ' গল্পে বিসর্জনের পরিবেশে যখন নৌকার ওপর ঠাকুরের মধ্যে অসুরের হাত থেকে 'খড়্গ কেড়ে নিয়ে বীরু উদ্দাম ঢাকের তালে নাচতে লেগেছে'—তখনকার উল্লাস ও বিষাদময়তা সঙ্গে সঙ্গে গোটা গল্পে বীরুর আত্মচিন্তার দর্পণকে বার বার যেন সামনে ধরে। সমগ্র গল্পের মধ্যে বীরুর চরিত্র-ন্যায় যেভাবে 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' ও বর্তমানের অণুভাবনায় জড়িয়ে একটি সমাজ-সচেতন ও আত্মসুখ ভাবনার গল্পকে রচনা করেছে, তা অত্যন্ত ক্ষমতা-সম্পন্ন লেখককে আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে।

'স্টেশনে দাঁড়িয়ে' গল্পের বকুলকে যেমন আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না, তেমনি পারি না 'বেলা অবেলা'র সনাতনকে। 'আঙ্কিক নিয়মে'র অজয়, 'প্রলয় গুপ্ত', কৌশিকের কথা সমীরবাবু আমাদের কিছুতেই ভুলতে দেননি—কারণ লেখকের চরিত্রগুলিকে যথাযথ করার ক্ষমতা। গ্রন্থের নামগল্পটি সম্ভবত লেখকের গল্প রচনার ক্ষমতার অন্যতম দলিল। সমীরবাবু মধ্যবিত্ত মানুষ, কিন্তু তাদের দারিদ্র্যই সব কথা নয়, তার সূত্রে যুবকযুবতীর মনের গভীরের প্রতিক্রিয়াকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রাখতে জানেন যা এখনকার ছোটগল্পের অন্যতম স্বভাব। গল্পের ভাষা সমীরবাবু চরিত্রের স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন। তাই তাঁর বিষয় ও বলার ভঙ্গি অনবদ্য নিয়মে একাত্ম।

বলার আছে (গল্প সংকলন)। রমানাথ রায়। এই দশক, ৫১, ষষ্ঠীতলা রোড, কলকাতা—১১। তিন টাকা।

সম্প্রতি প্রকাশিত রমানাথ রায়ের 'বলার আছে' গল্প সংকলন গ্রন্থটি সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় গল্প সংকলন।

রমানাথ রায় একটি প্রথাবিরোধী গল্প পত্রিকা 'এই দশক'-এর সঙ্গে পত্রিকার জন্মকাল থেকেই জড়িত। দীর্ঘকাল ধরে বুদ্ধিজীবী পাঠক কাহিনী, ঘটনা, অন্ত-চমক দেওয়া গল্প পড়ে ক্লান্ত। তাই ছোট-গল্পে গল্পহীনতাকে লক্ষ্য রেখে রমানাথ রায় ও অন্যান্য কিছু তরুণ বন্ধু গল্প লিখতে শুরু করেন। যে কোন পরীক্ষা—তা যদি সুস্থ সবল আন্তরিকতার অনুসারী হয়, অভিনন্দনযোগ্য। আলোচ্য লেখক অবশ্যই তাঁর কয়েকটি গল্পে গল্পকে বাদ দিয়ে গল্প রচনা করে শিল্পী-স্বভাবের অভিনব পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

• সংকলনে মোট ষোলোটি ছোটগল্প আছে এবং বাস্তবিকই তারা আকারে একেবারেই ছোটগল্প। এককালে 'বনফুল' গল্পের এজাতীয় ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করে-ছিলেন। তাঁর পরীক্ষা স্বভাবী পাঠকের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি পেয়েছে। রমানাথের কয়েকটি গল্প যেমন—'বিশ্রাম', 'গন্ধ' 'ট্যাবলেট', 'কথা', 'কান্না' ইত্যাদি আকারে পরীক্ষামূলকভাবেই ছোট হয়ে গেছে।

কিন্তু কেন এত ছোট—এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে হবে। কারণটা বোধহয় গল্পের প্রতীক-প্রতিম বিষয় ও ভাষা। ছোটগল্পে প্রতীক ইতস্তত ছড়িয়ে থাকত আগে, বা একটা প্রতীক নানা চরিত্র ও ঘটনায় ভেঙে গিয়ে একটা বড় বা ছোট গল্পে ব্যঞ্জনা পেতো। রমানাথ রায় যে ধরনের গল্প লিখছেন, তাতে প্রতীকী ব্যঞ্জনা এমন এক সংক্ষিপ্ততা গ্রহণ করে, ভাষা এমন এক দ্রুততা, বিদ্যুচ্চমক দীপ্তি, ক্ষিপ্রতা ও বৃহৎ কথার অণু-ব্যঞ্জনায় স্পষ্ট হয়, যার জন্যে গল্প ছোট হয়ে যায়।

রমানাথ রায় আদৌ প্রচলিত গল্প বলতে বসেননি। এমন কি, হালআমলে অধিকাংশ গল্প যেভাবে লেখা হয় ক্ষমতাবান তরুণদের হাতে, সেভাবেও নয়। তাঁর গল্পে এক বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দ ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি আছে। এই পুনরাবৃত্তি কখনো গভানুগতিক স্বভাব বোঝাতে কখনো প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চ করতে, কখনো বা গল্পের চরিত্রের কল্পনাকে প্রতীকত্ব দান করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। রমানাথ বোধহয় [illegible] ও প্রতীকী স্বভাব এইভাবে [illegible]। গল্প কবিতার কাছাকাছি চলে আসে।

'বলার আছে' 'তত্ত্বপোষ' ইত্যাদি গল্পে এসবের পরিচয় আছে। কিন্তু রমানাথ রায় বর্তমান অবক্ষয়িত পৃথিবীকে ভোলেননি, আজকের মানুষ, তাদের মন-প্রাণ, অভাবকে ভোলেননি। তার প্রমাণ আছে 'জ্বলে কলকাতা' ইত্যাদি কয়েকটি গল্পে। 'আগুনের ভিতর দিয়ে আমি ছুটতে লাগলাম।'—এই পরিণামী বাক্যে রমানাথ রায় সম্ভবত গল্পের নায়কের ক্রোধ অসহায়তা ইত্যাদি বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু পুরোটাই প্রতীক দিয়ে বাঁধা।

গদ্যে কবিত্ব আছে, চালাকি আছে প্রতীক ব্যবহারে রমানাথের ক্ষমতা আছে যথেষ্ট। গল্পকে কাব্যময় প্রতীকত্বে নিয়ে গিয়ে এক অভিনব রূপ দিতে সচেষ্ট রমানাথ রায়। কিন্তু এই জাতীয় পরীক্ষা গল্পকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে ভেবে শঙ্কিত হতে হয়।

সোনালী ঢেউ (কাব্য সংকলন)। শঙ্কর দাস। প্রকাশক বিষ্ণুপদ পাঠক, ২১২ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা—৭। আড়াই টাকা।

শ্রীশঙ্কর দাস যে একজন নতুন অপরিণত কবি, তা তাঁর 'সোনালী ঢেউ' গ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই প্রমাণ করে। আলোচ্য কবির ধারণা বোধহয় কবিতা লেখা সহজসাধ্য। কবিতাগুলিতে না আছে ছন্দের মাত্রাজ্ঞান, না আছে সূক্ষ্ম অনু-ভূতির চমক ও কাব্যময় কল্পনার ছিটেফোঁটা। সমাজজীবনের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে হাস্যকর কবিভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

অক্ষরের পরিচয়ে মানুষ (প্রবন্ধ)। রমেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী। কো-অপারেটিভ পাব-লিশার্স' পুতুণ্ড বিল্ডিংস 'গায়াল-টুলি, হুগলী। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'অক্ষরের পরিচয়ে মানুষ' পুস্তিকাটি আকারে ছোট কিন্তু লেখক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মানুষের ভাষা ও তাঁরহিতে ভাব সংক্রান্ত বিষয়ের মননধর্মী ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ। লেখক মানুষের কর্মকে একমাত্র বিচারের নিরিখ ধরেছেন। এবং সেই সূত্রে মানুষের ভাষায় কর্তা, কর্ম ইত্যাদির ব্যাকরণের বক্তব্যকে নানা অধ্যায়ে রেখেছেন সরস অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে। 'সূচনা—মানুষ', মানসিক ক্রিয়া' 'শারীরিক ভাব' 'মানুষ শব্দ' 'মানুষ সম্পূর্ণ' এবং 'উপসংহার'—এই ছয়টি ছোট ছোট অধ্যায়ে সাজিয়ে মানুষের স্বভাব ও ভাষার যোগ-বিয়োগের কথা আলোচনা করেছেন। তার ভাষা ও নিয়মনিষ্ঠ লেখা প্রশংসার যোগ্য।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও কৃষক শ্রমিক। সুখময় চক্রবর্তী। প্রকাশক : ভূমিহারা কৃষক পরিষদ পক্ষে শেখ ইউনুস আলি, গ্রাম দস্তুরা, পোঃ মজিলহাট, ২৪-পরগণা। মূল্য যথাক্রমে পঞ্চাশ পয়সা ও এক টাকা।

'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও কৃষক' এবং 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও শ্রমিক'—এই দুটি পুস্তিকার লেখক হলেন সুখময় চক্রবর্তী। পুস্তিকা দুটি আকারে ছোট হলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক

সমাজবাদের আদর্শে কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদির নির্দেশ সুনিপুণ যুক্তির সঙ্গে স্পষ্ট করে। লেখকের মতে ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমাজ তথা বিশ্বের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে এক নূতন প্রয়াস যা য়ুরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশ ও রুশ-চীন ও পূর্ব ইউ-রোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই বক্তব্য ও ভারতের কৃষক এবং শ্রমিকদের অবস্থা, তাদের অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি সুন্দর, সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কৃত্তিবাস [যুগ্ম সংখ্যা]—সম্পাদক সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। দেড় টাকা।

কিছুকাল আগেও বাংলা কবিতা-আন্দোলনে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ভূমিকা ছিল অসামান্য। ছিলো টান টান কবিতা ও কিছু গদ্য রচনা নিয়ে পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের কবিদের অন্যতম মুখপত্র। বহু কবিতার কাগজের জীবনে যা হয়, কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রেও আলাদা কিছু ঘটেনি। ফলে, কাগজটি বারবার বন্ধ হয়েছে। আবার বেরিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সম্পাদক বদলও কম হয়নি। বর্তমানে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত নিয়েছেন সম্পাদনার ভার।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে নবীন-প্রবীণ কবির রচনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বিতর্কিত প্রবন্ধ-আলোচনাও জায়গা করে নিয়েছে। যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন অম্লান দত্ত, সুনীল রায়, মণীন্দ্র রায়, শঙ্খ ঘোষ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, আলোক সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত, শিশির ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু পালিত, বেলাল চৌধুরী, রেবারতি মিত্র প্রমুখ।

কৃত্তিবাস কৃত্তিবাসই। একালের কাব্য আন্দোলনে তার স্থান, ভূমিকা তর্কাতীত। এবং নিঃসন্দেহেই অভিনন্দনযোগ্য।

আমাদের ত্রিপুরা (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা)। সম্পাদক—অনিলধন ভট্টাচার্য। ১৮এ, ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলকাতা-১২। পাঁচাত্তর পয়সা।

ত্রিপুরার অতীতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা আছে, যা বর্তমানের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। অবশ্য বৃহত্তর ত্রিপুরার অনেকটাই এখন বাংলাদেশে। ত্রিপুরার আছে পার্বত্যজাতিগুলো। আলোচ্য সংখ্যাগুলিতে অতীত-বর্তমানের ত্রিপুরার ওপর প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও স্মৃতিচারণমূলক রচনা লিখেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত, সুনীতি ঘোষ, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, সত্যরঞ্জন বসু, অজিতকুমার দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য, রাসমোহন চক্রবর্তী, দীনেশ চৌধুরী, জগদীশ রায়চৌধুরী, নিবারণ চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ দত্ত, সারদাচরণ রায়-চৌধুরী এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটি মূল্যবান। অনুসন্ধিৎসুদের কাছে সংগ্রহ-যোগ্য বিবেচিত হবে।

সপ্তর্ষি (দ্বিতীয় সংখ্যা—১৩৭৯)। সম্পাদক—ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় বাটা নগর, ২৪-পরগণা। এক টাকা।

সপ্তর্ষির ষোড়শ বর্ষের কার্তিক-পৌষ সংকলনটি নানা কারণে উল্লেখ্য। পরিশীলিত রুচি ও প্রজ্ঞার কারণেই সপ্তর্ষি পত্রিকাটি সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে আদরণীয়। মূলত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচ্য পত্রিকার বর্তমান সংকলনে উল্লেখযোগ্য রচনা হল স্বর্গত কথা-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান' উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন—রবিশেখর সেনগুপ্ত। এছাড়া এ-পত্রিকার মূল্যবান সম্পদ হল সন্তোষকুমার ঘোষের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ইত্যাদির কবিতা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি ভাল গল্প। পত্রিকাটি নানা কারণে সংগ্রহযোগ্য। অন্যান্য দুটি গল্প রচনা করেছেন আশা দেবী, নমিতা জানা। পত্রিকাটি এর আগের সুনাম যথাযথ রাখতে পেরেছে।

লোকায়ত (তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) সম্পাদক—দীনেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামা-পদ প্রামাণিক, বাদল ভট্টাচার্য। ১১।২৩, অশোক এভিন্যু দুর্গাপুর-৪, বর্ধমান। এক টাকা।

দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি মূলত কবিতা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের ত্রৈমাসিক। কিন্তু এতে কবিতাও ছাপা হয়েছে। পত্রিকার উদ্দেশ্য মহৎ—এ 'শান্তি, সাম্য ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং সাম্প্র-দায়িকতা ও অশ্লীলতার বিপক্ষে সোচ্চার'। বর্তমান সংখ্যার লেখকসূচীতে আছেন কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায়, কালিপদ কোঙার, মালতী মালিক, সুভাষ ভদ্র ইত্যাদি প্রবীণ ও তরুণ কবি এবং প্রবন্ধকার। গোপাল পালের জীবনা-নন্দের 'রূপসী বাংলা'-র আলোচনাটি মূল্যবান।

মাঝি : সম্পাদক—প্রশান্ত রায়। ২৮বি, সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা ৬। পঁচিশ পয়সা।

পঞ্চাশসংখ্যাহীন ছোটপত্রিকা। সম্পা-দকের আন্তরিকতার ছাপ আছে প্রতি পাতাতেই। এ-সংখ্যায় লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিশির ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস, হরিপদ দে, বিশ্বনাথ ঘোষ, কওসর জামাল, বাদল মজুমদার, জীবন সরকার, বিশ্বব চন্দ্র ও আরো কয়েকজন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় নিবন্ধের সঙ্গে ছাপা শালতোলা নৌকার ছবিটি বাংলাদেশের নৌকাবাইচের অনুষঙ্গকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্যাহ্ন (৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)। সম্পাদক—শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সুখেন্দু ভট্টাচার্য। ৬৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ১। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

'মধ্যাহ্ন' একটি রুচিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি মূল্যবান রচনা। পত্রিকাটিতে অশোক মুখোপাধ্যায় অনূদিত বের্টোল্ট ব্রেসটের 'নাজীর বিচার' একাঙ্কটি প্রকাশিত হয়েছে। এই একাঙ্ক ইতিমধ্যে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছে। এছাড়া রুশগোর্কিয়ার গল্পের অনুবাদ, মার্ক টোয়েন-এর একটি দিকের আলোচনা, বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গে 'দিবারাত্রির কাব্যে'র বিচার, লোকসাহিত্য প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের ছোটগল্প; কবিতাও পরিচয় পত্রিকার উল্লেখ্য অংশ হয়ে আছে। লেখকসূচীতে আরো আছে, সরল চক্রবর্তী, অরুণ মণ্ডল, সুবীর মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ হাজরা ইত্যাদির নাম। কতুত পত্রিকাটি সুসম্পাদিত।

নাম নেই (ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৭৯)। সম্পাদকমণ্ডলী — উত্তরণ গোষ্ঠী। ৩২।৩, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা ৪০।

'নাম নেই' একটি সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি কাঁচা-পাকা লেখার সংকলন। গল্প লিখেছেন নির্মলেন্দু গৌতম, তারা-জ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অমীর গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি। কবিদের মধ্যে আছেন ফউজিয়া সৈয়দ মুরশী, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীর ঘোষাল, ইসমাত মির্জা ইত্যাদি। প্রবন্ধ লিখেছেন নরেশ সাহা। অনুবাদে আছেন বারিদবরণ গুহ—অনুবাদের বিষয় বার্নার্ড শ'-এর 'আর্মস অ্যাণ্ড দি ম্যান'। পত্রিকাটি পাঠকদের তৃপ্ত করবে। বাদল রায়ের গল্পটি উল্লেখযোগ্য এবং সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

চারপাশ : নির্দেশক দেবকুমার বসু। সম্পাদক দেবব্রত মল্লিক। ৯।৩, টেমার লেন, কলকাতা ৯। পঁচাত্তর পয়সা।

এ সংখ্যায় লিখেছেন প্রণবেন্দু চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, সুব্রত রুদ্র, মানিক চক্রবর্তী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু মজুমদার, নির্মল ভট্টাচার্য, হোমেন্দ্র মজুমদার, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, প্রভাত দেব ও চন্দন মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদশিল্পীর ভাবনা। আত্মবিশ্বাসী। মুক্তিযুদ্ধের কল্পনা ও অন্যের অন্যায় অত্যাচারের ..... গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

উপন্যাস

।। ১৩ ।।

দিদি আমার হাতটা চেপে ধরে শুকনো মুখে বললো, 'তুই আমার সঙ্গে চ—'

আমি মুচকে হেসে বললাম, 'আমি কেন বাবা? আমার তো কেউ জীবনরক্ষা করতে আসেনি যে সেলাম ঠুকতে যাবো।'

দিদি তবু বললো, 'একা যেতে ভয় ভয় করছে রে—বাবা যে কেন ছাই এইসব—'

দিদির পরিস্থিতিতে পড়লে আমার কী অবস্থা হতো জানি না, এখন দিব্যি আমোদের হাসি হেসে বললাম, 'কারুর হাত ধরে পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হবে, তোকে কনে দেখানো হচ্ছে।'

'ধ্যাৎ!'

'সত্যি তাই বলছি। আমি যদি তুই হতাম, দিব্যি ডাঁটের সঙ্গে গিয়ে একটা সেলাম ঠুকে বলতাম, 'আপনার দয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আপনি সেদিন দয়া করে উদ্ধার না করলে এতোদিনে শ্যাওড়াগাছে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকতে হতো স্যর—'

'তোরই ডোবা উচিত ছিলো—'

বলে রাগ রাগ ভাবে আমার হাতটা ঠেলে দিয়ে দিদি ধপ্ করে ওঘরে গিয়ে ঢুকলো, এবং ঘরে যাঁরা যাঁরা বড় ছিলেন তাঁদের একধার করে ঢীপ ঢীপ করে প্রণাম করে নিয়ে আসল আসামীর পায়ের কাছে মাথাটা ঠুকে, বাবার কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালো।

দেখো কাণ্ড!

এই বাবু চুকতে পাচ্ছিলেন না আবার দাঁড়িয়ে পড়া হলো। অবাক বাবা!

আর হঠাৎ সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে আনন্দময়বাবু বেশ খোলা গলায় বলে উঠলেন, 'সাঁতার না শিখে কক্ষনো জলে নামতে যাবেন না বুঝলেন? আজিকেই তো শুভ্রুর রয়েছে যতোদিন অভ্যেস শিখে নিন না।'

এতো বড়ো ছেলের এতোবড়ো মেয়েকে ডেকে কথা বলা? এ কী অনাচার! তার ওপর আবার 'আপনি' করে।

মেমসাহেব নাকি?

বাবার এই 'সন্তানকে উচিত কর্তব্য শেখানো' নিয়ে ঘরে বাইরে যা একখানি চাপা' হাসির গুঞ্জন চলতে লাগলো সে আর বলবার নয়।

আইবুড়ো মেয়েকে কেউ 'আপনি' করে কথা বলছে, এমন দৃশ্য এখানে নাকি কেউ দেখেনি।

ভটচায খুড়োর নাতির গুণের 'পারা' অনেকখানি নেমে গেল হঠাৎ।

নমস্কার করেছে করেছে, তুই অতো বড়ো মেয়েকে ডেকে কথা কইতে গেলি কী বলে? তা আবার বিলিতি কেতায় আপনি আজ্ঞে করে। ফাজিলকেন্ট আর কি।

জানলার আড়ালে নতুন খুড়ি তাঁর ভাসুরপো বৌদের গায়ে হেসে ঢলে পড়লেন, ভাসুরপো বৌরা আঁচলে মুখ চেপে খুকখুক করতে করতে কাসতেই শুরু করে দিলে।

বাবার পিসিমা গনগন করতে করতে বললেন, 'আর কিছু নয় শহুরে চাল। জনে

ভাবছিলাম ন্যাড়া ওসব চালচলতিতে নেই, তা দেখছি যা ভেবেছিলাম তা নয়।'

এতোদিনের সদাচরণজনিত সঞ্চিত শুভফল বাবা এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তের ভুলে হারিয়ে বসলেন।

বড়জ্যাঠা না কি বলেছেন, 'এ সব দৃষ্টান্তে বাড়ির অন্য মেয়েরা দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।'

শোনামাত্রই চকিতে আমার সেই পোড়ো শিবমন্দিরের চাতালটাকে মনে পড়ে গেল।

হায় অবোধ জ্যেঠতাত!

শুধু 'পণ্ডবক্তা' নীরো পিসি বললেন, 'এতোটুকুকে এতোখানি করে সবাই মিলে আর গজালি করিসনে বাবা! ন্যাড়ারও মুখ্যুমি। জানে তো গাঁয়ে ঘরে সবেতেই তিল থেকে তাল হয়, এসব না করলেই হতো। ও ভাবলো কিতজ্ঞতা প্রকাশ সভ্যতা। একই আচার-আচরণ যে কোনোখানে সভ্যতা, কোনোখানে অসভ্যতা, সে জ্ঞান নেই।'

অর্থাৎ বাবাকে সমর্থন করেও, অসমর্থন করলেন তাঁর বুদ্ধিহীনতাকে।

তবু আসলটি বাকি ছিল।

নতুনকাকা বাড়ি ছিলেন না।

কোনখানে যেন গিয়েছিলেন খাজনা আদায় করতে।

বাড়ি ফিরে গলায় ব্যথার কারণে আদা লবঙ্গ দেওয়া মিছরী মরিচের গরম শরবৎ পান করতে করতে সমস্ত ব্যাপারটি আনুপূর্বিক শুনে, ভাঙা বসা স্বর-যন্ত্রটিকে যতটা সম্ভব চাগিয়ে বলে উঠলেন, 'বাড়িতে তাহলে আজ একখানি নাটক পালা হলো? তা বেশ ভালই জমেছিল কেমন?...কিন্তু এই ছাগলছি দাদা এ মেয়েদের বিয়ে দেবেন কোথায়? আমার তো মনে হয় এদের উপযুক্ত পাত্তর খুঁজতে ব্রাহ্মসমাজে যেতে হবে।'

বাবার কানে পৌঁছবার জন্যেই যে এমন উচ্চরোল তাতে আর সন্দেহ কী!

কিন্তু বাবাকে কেউ ডেকে কিছু না বললে বাবা সে কথার উত্তর দেন না, এ আমাদের জানা। এমন কি মার কথাতেও না।

মার তো চিরদিনের অভ্যেস দেয়ালকে শুনিয়ে কথা বলা, আর সেই কথাগুলি বাবার উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত। কিন্তু বাবা কোনোদিন তার উত্তর দেন না।

বলে বলে ক্লান্ত হয়ে মা হঠাৎ এক সময় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এই যে এতোক্ষণ মুখে খড়ি উঠিয়ে বকে মরছি, তার একটার উত্তর দিতে নেই? এতো অগ্রাহ্য?'

বাবা তখন যেন আকাশ থেকে পড়েন। বলেন, 'আমার উত্তর দেবার কথা ছিল না কি? আমাকে বলছিলে? আমি ভাবলাম দেয়ালকে বলছো।'

মা রাগ করে বলেন, 'তা তাই বলছি। তোমাকে বলা আর দেয়ালকে বলা সমান।'

বাবা হেসে ওঠেন, 'তবে আর বৃথা শক্তিক্ষয় কর কেন? এই শরীরটা কতো কষ্ট করে একটু শক্তি সঞ্চয় করে, সেটা কী বৃথা অপচয় করার জন্যে?'

অতএব নতুনকাকার এই বৃথা শক্তি-ক্ষয়ের ব্যাপারটাকে বৃথাই থাকতে দিলেন।

নতুনকাকা আর একটু গলা চড়ালেন, 'তবু তো মেয়েদের বিলিতি ইস্কুলে পড়াননি, তাতেই এই। আমার এক পিসতুতো শালা বড়ো চাকুরে, সে তার মেয়েকে বিলিতি ইস্কুলে দিয়ে পড়াচ্ছে। তবু তার মেয়েকে দেখগে। যেমনি সভ্য, তেমনি নম্র, তেমনি—!'

ঘরের মধ্যে মা ফুঁসতে থাকেন, 'যে যা ইচ্ছে বলে যাবে, আর তুমি শুনবে বসে বসে?'

বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'যা ইচ্ছে বলবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। ভগবান যখন প্রত্যেককে একটা করে নিজস্ব মুখ দিয়েছেন।'

'তা তোমাকেও দিয়েছেন।'

'দিলেই কি তার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে হবে?'

'বেশ তা হলে সবাই বলে পার পেয়ে যাক।'

'যাক না। গায়ে তো ফোসকা পড়ছে না?'

'মনেও ফোসকা পড়ে।'

'ওটা মনের দুর্বলতা।' বাবা হাসলেন, 'জোরালো মনের গায়ে ফোসকা পড়ে না।'

মা তখন অন্য কথা ধরলেন, 'নিজের আত্মীয়স্বজনকে তো ভালই জানো, তোমারই বা এতো বাড়াবাড়ি করতে যাওয়া কেন?'

বাবা বললেন, 'বাড়াবাড়ি কিছুই নয়, যেটুকু করা উচিত সেটুকুই করেছি।'

এই সময় নতুন কাকা মিছরী-মরিচের গেলাসটি হাতে করে আর একটু এগিয়ে এসে গলা তুলে বললেন, 'নদা বাড়ি নেই বুঝি?'

প্রশ্নটা শূন্যেই নিক্ষিপ্ত হলো।

কারণ 'নদা' ডাকলে ডাকটার মধ্যে যে সুর থাকা উচিত ছিল তা নেই। তবু নদা শব্দটা আছে, এবং দরজার কাছ বরাবর।

অতএব বাবার আর দেয়াল হয়ে থাকা চললো না।

বাবা বেরিয়ে এসে নরম গলায় বললেন, 'হ্যাঁ রে আছি তো। বলবি কিছু?'

নতুন কাকা এই শান্ত মূর্তির সামনে একটু কেমন থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, 'না, মানে বলবার কিছু নেই। তোমার তোমা টৌমা বলছিল, বাড়িতে না কি একটা ঘটনা ঘটেছে তাই—'

বলে ফেলেই যে নতুনকাকা মনে মনে নিজের গালে নিজে চড় মারলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। কারণ ভাগনীটা ততটুকুতাই সকলের দুর্বল হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম বাবা বোধহয় একটু অবাকের ভানে বলবেন কী ঘটনা, কোন ঘটনা, কিন্তু বাবা তা বললেন না, বাবা ওটাই অন্যভাবে উপস্থাপিত করলেন।

বললেন 'ঘটনার মধ্যে তো ওই আনন্দময়ের ব্যাপারটা, সুনীকে ওর সামনে ডেকে বলায়, যা নিয়ে মেয়েমহলে মহা-সোরগোল। তুইও কি সেইটার কথাই বলছিস?'

নতুনকাকা স্রেফ নিভে গেলেন।

আর সেই নেভা মুখে হঠাৎ [illegible] একটুকরো আলো জেলে বলে উঠলেন, 'আরে রাম কহো! ও কথা আমি শুনিওনি। শুনেছিলাম ভটচায খুড়ো নাকি নিরামিষ ঘরের সব রান্না নিজে রেঁধেছেন. দশ বারোটা পদ, আর এমন ফাস্টোকেলাশ নাকি রেঁধেছেন—'

বাবা হেসে উঠে বললেন, 'তাই বুঝি? শুনলাম বটে ভটচায খুড়ো স্বপাকে খান [illegible] ওনাকে খেতে বললেই রান্নার ভার ওঁর ঘাড়ে চাপে। ভালো রাঁধিয়ে বুঝি?'

নতুনকাকা মহোৎসাহে বললেন, 'ভালো বলে ভালো. একেবারে একস-পার্ট! তুমি যদি ওঁর হাতের মোকার ডালনা খাও একবার, জীবনে ভুলতে পারবে না।'

বাবা আরো হেসে বললেন, 'তবে তো খেতেই হবে একদিন। অনেক গুণ' আছে মানুষটির।'

'আছে বলে আছে!'

নতুনকাকা প্রসঙ্গটাকে একেবারে ওদের ভটচায খুড়োর দিকে প্রবাহিত করে দিলেন।

'অতো বড়ো একটা পণ্ডিত লোক. কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করা, কাশীর পণ্ডিতদের কাছে নানা শাস্ত্র শিখে আসা, পণ্ডিত সমাজের একজন সমাজজানিত লোক. দেখলে বুঝতে পারবে তুমি? পারবে না। যেমনি নিরহংকার তেমনি নিরভিমান। আর কী পরোপকারী! এদিকে আবার সদাহাস্য। [illegible] মানুষ একটি। নাতিটা যদি ওঁর গুণের একশো ভাগের এক ভাগও পায় তো বলবো তরে গেল।'

কেবলমাত্র ভটচায [illegible] জন্যেই বাড়ালেন, না নাতিকে [illegible] জন্যেই এতোটা [illegible], ঠিক বুঝলাম না।

তবে এই [illegible], কোনোদিন নতুনকাকার মুখে ওঁদের ওই সার্বজনীন ভটচায খুড়োর এমন প্রশস্তি শুনিনি।

ভটচায খুড়োর [illegible] নাম সেইদিন শুনলাম. [illegible] ভট্টাচার্য।

গ্রামের চাষাভুষো [illegible] গয়লারা না কি নারায়ণ [illegible] বলতে প্রাণ [illegible] উনিই না কি ওদের মাতাপিতা বন্ধু ভ্রাতা।

তাছাড়া রোগে বদ্যি, নিদান কালে গুরু।

একবার দুলে পাড়ায় মা শেতলার কৃপার কিছু আধিক্য ঘটেছিল, নারাণ ঠাকুর তাঁর হোমিওপ্যাথি গৃহচিকিৎসার বাক্সটি নিয়ে তাদের ঘরে ঘরে ঘুরে ওষুধ দিয়ে বেড়িয়েছিলেন।

মা শীতলার দয়ার ওপর নাকি ওষুধ প্রয়োগ নিষেধ। চিরকালের সংস্কারে ওরা গোড়ার দিকে কেউ ওষুধ খেতে চায়নি, ভয় পেয়েছে, কিন্তু উনি তাতে পিছিয়ে আসেননি।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে যখন রাজী করাতে পারেননি তখন নাকি বলেছেন, 'তোদের যা কিছু পাপ হবে, সব পাপের ভার নিচ্ছি আমি! সেই পাপে 'মা' আমায় কৃপা করেন না অকৃপা করেন দ্যাখ।'

তা অকৃপাই করলেন মা।

ওই বসন্ত অধ্যুষিত স্বাস্থ্যবিধির জ্ঞানরহিত দুলে পাড়ায় অনবরত ঘুরে ঘুরেও দিব্যি টাটকা রয়ে গেলেন রাজনারায়ণ।

এ ছাড়া ওদের সর্ববিধ রোগ ব্যাধিতেই উনি আছেন, এবং ওঁর গৃহচিকিৎসার বাক্সটি আছে।

এতোদিন এসেছি, নতুনকাকা যে এমন আকর্ষণীয় ভাবায় গল্প বলতে পারেন, তা জানা ছিলো না। জানা ছিলো না পার্টগুহরের পুরোহিত সার্বজনীন খুড়োর এতো গল্প আছে।

কোন মন্ত্রেই যে এটা ঘটলো।

নতুনকাকা চলে গেলে মা বলে উঠলেন, 'নতুন ঠাকুরপোর হঠাৎ যে অন্য মূর্তি!'

বাবা একটু হাসলেন, 'মানুষের মধ্যে অনেক মূর্তির বাস থাকে বৌ, ভেবে বুঝে উচিত ঘরের দরজা খুলতে হয়।'

সেদিনটা তো ওইভাবে গেল, গর্জনের উপযুক্ত বর্ষণ হলো না, কিন্তু কে জানতো পরের দিনের জন্যে আরো কত ঘটনা তোলা ছিল।

পরদিন সকালে আবার সেই আসামীর আবির্ভাব।

ও'দের ভটচায খুড়ো বলে পাঠিয়েছেন, আজ যেন বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের দুপুরে ভাত চড়ানো না হয়, তিনি পাড়াসুদ্ধ ছেলেপুলেকে জুটিয়ে নিয়ে সিংহীদের বাগানে চড়ুইভাতি করাতে যাবেন। আমার নাকি বাবাকেও যেতে হবে মেয়েদের নিয়ে, বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

শুনে তো আমরা হাঁ।

এই তো কাল এক কাণ্ড থেকে উদ্ধার পাওয়া গেছে, আবার আজ।

দিদি ঘরের মধ্যে চাপা গলায় বলে উঠলো, 'তুই যাবি যা, আমি কিছুতেই যাবো না। আমি কি ছেলেপুলের মধ্যে?'

'বাবাও অবশ্য তা নয়।'

'সে বাবা বুঝবেন। এ আবার কী শখ। না বাবা না। বাবার দেশে এসে বেশ শিক্ষা হয়েছে আমার।'

আমি হেসে ফেলে বলি, 'দিদিরে এ তোর পেটে খিদে মুখে লাজ। যাবার জন্যে তো ওড়বার ডানা তুলেই রয়েছিস। ওই হীরোটি এসেছে শুনেই তোর যা মুখের চেহারা হলো—'

দিদি গম্ভীর হবার খুব চেষ্টা করে বললো, 'দেখ ছুটকি দিন দিন তুই এতো পাকা হচ্ছিস সামলানো দরকার। এরকম করলে যাকে বলে দেব।'

আমি বেপরোয়া গলায় বললাম, 'দিগে যা বলে। কী নিয়ে পাকামী করেছি সেটাও বলিস।'

'খুব পাকা হয়ে গেছিস তুই—'

'তা গেছি হয়তো। নইলে আমার কেন প্রাণে এতো আহ্লাদ হচ্ছে একটু হুল্লোড়ের সম্ভাবনা পাচ্ছো বলে।'

'করগে যা হুল্লোড়। আমি ওর মধ্যে নেই। পুরুতঠাকুরের আবার চড়ুইভাতি করে জন্মে শুনিনি।'

কথাটা সত্যি, জন্মে না শোনারই

কিন্তু ইনি না কি করেন। ওনাদের কথোপকথনের সারাংশ থেকে বুঝতে পারলাম সেটা।

নিজেরা কথা কইলেও উৎকর্ণ ছিলাম তো?

না দেখলেও টের পাচ্ছিলাম শ্রীযুক্ত আনন্দময় এসে বসেছেন সেই বারোয়ারি তক্তপোষে। তাঁকে ঘিরে সংসার সদস্যরা।

ক্রমেই বুঝেছি এই দালানটিই এঁদের 'ডাইনিং-কাম-ড্রইংরুম', আর ওই চাউশ তক্তপোষটি একাধারে সোফা-কৌচ কেদারা চেয়ার ডিভ্যান।

বৃহৎ কাষ্ঠে নাকি দোষ নেই। তাই ওই এক আধারেই সাধারণের সঙ্গে অসাধারণের অর্থাৎ শুদ্ধাচারিণীরা তাঁদের 'কেটে' কাপড় সমেত উপবেশন করেন।

আনন্দময়ের নিবেদন শেষ হওয়া মাত্র বাবা হেসে উঠলেন, 'ভটচায্যিমশাই চড়ুইভাতি করতে যাবেন? বল কী? এটা দ্বিতীয় শৈশবের দাবি নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে নীরোপিসির কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'ওমা এ তো উনি বরাবর করে আসছেন। অবিশ্যি এখানে থাকলে। কাঞ্চনতলার সবাই জানে—পোষ মাসের কোনো একদিন ভটচায্যিমশাই পাড়াসুদ্ধু ছেলেপুলেকে নিয়ে কোনোখানে চড়ুইভাতি করতে যাবেন। এ ওঁর একটা আমোদ। বলেন, 'আমার বাকি কী বাল-নারায়ণ পুজো।'

বাবা বললেন, 'তাই না কি? এতো বেশ। ভারি আমুদে লোক তো! কিন্তু আমাকে কেন? আমি কি ছেলেপুলের দলে?'

'ওমা তাতে কী?' নীরোপিসি বলেন, দু' একবার তো আমরাও গেছি। একবার

তো গঙ্গার চড়ায় গিয়ে বনভোজন। পাড়ার ছেলে বুড়ো কতোজন যে যাওয়া হলো? অসুবিধেও কিছু নেই, গঙ্গাতীরে, আর সমস্ত গঙ্গাজলে, ছোঁয়াছুঁতের কিছু নেই। একদিকে দুটো উনুন কেটে হুহু করে কাঠ জেলে খিচুড়ি চাপলো, আর একদিকে একটা উনুনে আলুরদম পোরের ভাজা, আর কাঁচা পেঁপের অম্বল। ...সত্যি সে যা আহ্লাদ হয়েছিলরে ন্যাড়া! খেয়ে যে এমন আহ্লাদ হয় তা আগে কখনো জানিনি।... আরও একবার 'পোড়া তালগাছের মাঠে' করেছিলেন। অতো লোক না হলেও অনেকে গেছি আমরা। উনি নিজে বাঁধলেন। সে অবিশ্যি অনেকদিন আগের কথা, তখন আরো শক্তিসামর্থ্য ছিল। খুব বলশালী মানুষ তো! এখন এই কাছে-পিঠে কোথাও করেন, কুচোকাচাদের নিয়ে, তবে বড়রাও কেউ কেউ যায় বৈকি। ...নবকুমার তো যাবেই যাবে ফি বছর।'

'নবকুমার?'

'নবকুমার কে জানিস না? রায়বাড়ির ঘরজামাই। বৌ মরে গেছে কোনকালে, কিন্তু শ্বশুরের বাড়িটি ছাড়লো না লোকটা। বেজায় কাজিৎকর্মা! নবকুমার এসে হাজির না হলে গাঁয়ে কারুর কোনো কাজ উঠবে না। তা ভাত পৈতে বিয়েই হোক আর ছাদ্দ শান্তি মড়া তোলাই হোক। এই যে কাজটি করেন ভটচায মশাই, তার অধিকাংশ হ্যাপাই তো সামলায় ওই নবকুমার।'

বাবা বললেন, 'শুনে বেশ ভাল লাগছে এসেছি পর্যন্ত কেবল তো বাড়িতেই খাচ্ছি, শুচ্ছি। কোথাও তো যাওয়া হয়নি। সেই সিংহীদের বাগান কোথায়?'

'সে ওই উত্তরধারে। তোর মনে নেই? খুব ছোটবেলায় বরদা সিংহীর বাগান থেকে জাম কুড়োতে যেতিস। তা তুই হয়তো তখন নেহাৎ ছোট, মেতে শিখিসনি। একবারের ঝড়ে জাম গাছটা পড়ে গেল।'

'ওরা কেউ থাকে না?'

'কে থাকবে? সব তো মরে হেজে পয়লট্ট। দৌত্তুর বংশ হচ্ছে ওয়ারিশান, তারা নাকি মীরাটে না কোথায় থাকে, খোঁজও নেয় না খবরও করে না আসেও না। অত বড়ো অট্টালিকা পড়ে পড়ে ভূমিসাৎ হচ্ছে, আর সেই বিরাট বাগানের ফলপাকুড় পাঁচভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে।'

বাবা বললেন, 'আচ্ছা বাড়িটার গেটের দুধারে কি সেপাইয়ের মতন দুটো মূর্তি ছিল?'

নীরোপিসি মহোৎসাহে বললেন, 'হ্যাঁ তো। মনে পড়েছে তাহলে? তা সে সব বোধহয় ভেঙেচুরে তমাশিত হয়ে গেছে।'

যেতে পারে। সে তো আজকের কথা নয়। মেজদা সেজদা ওদের পা 'বেয়ে' বেয়ে কাঁধে চড়তো—মনে পড়ছে একটু একটু—' বাবা হাসলেন, 'এযাবৎ আরো কত পা ওদের কাঁধে পড়েছে তার ঠিক কি!'

আনন্দময় বললো, 'তাহলে যাচ্ছেন তো? পিসিমা, আপনার ওপর ভার রইলো সবাইকে গুছিয়ে পাঠিয়ে দেবার।'

ঠাকুমা অর্থাৎ বাবার পিসিমা বোধহয় কোনো কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তবে শুনেছেন সব। আবির্ভাব ঘটলো তাঁর।

এসব আমরা খাবার ঘরের পাশের ঘরটা থেকেই টের পেলাম।

ঠাকুমা বললেন, 'খুড়োর আর বাতিক গেল না। এখনো এসব ভালো লাগে?'

আনন্দময় হেসে বললো, 'লাগে তো দেখছি।'

'তা যাবে, কুচোকাচারা যাবে।'

'কুচোকাচা' শব্দটার উপর বেশ জোর দিলেন ঠাকুমা।

বাবা কিন্তু ওঁর পলিটিকসকে নস্যাৎ করে বলে উঠলেন, 'শুধু কুচোকাচা কি পিসিমা, ধাড়ির তো চাল আজ নেওয়া বারণ। আমাকে বিশেষ করে বলেছেন মেয়েদের সঙ্গে যেতে।'

ঠাকুমা আকাশ থেকে পড়লেন।

'মেয়েদের সঙ্গে কার মেয়েদের সঙ্গে?

'কার মেয়ে? এটা কী কথা হলো পিসিমা? আমার মেয়েদেরই সঙ্গে। বাড়ির সব ছেলে-মেয়েরাই তো যাচ্ছে।'

ঠাকুমা প্রায় স্তম্ভিতভাবে বলেন, 'সুনী বাচিও যাবে?'

আনন্দময়টা এমন বেহায়া চট করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ নিশ্চয়। দাদু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। বললেন 'ওরা এখানে কখনো থাকে না, ভাগ্যক্রমে এবারে যখন রয়েছে—'

ঠাকুমা আর থাকতে পারলেন না, 'রয়েছে বলেই যাবে? বুড়ো আইবুড়ো মেয়ে—'

আনন্দময় আর হাসলো না, বললো, 'সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমাকে যা বলে দিয়েছেন তাই বললাম। দূত অবধ্য এই ভরসা।'

ঠাকুমা বললেন, 'হ্যাঁ লা নীরি, বড় বড় মেয়েরাও বনভোজনে যাবে?'

নীরোপিসি বললেন, 'ঠাকুরমশাই যখন বলেছেন, যাবে বৈ কি মা।'

ঠাকুমা রেগে বললেন, 'বেশ ন্যাড়ার মেয়েরা শহুরে মেয়ে ওরাই যাক, ঝুনি ফুলি যাবে না।'

হঠাৎ বাবার রীতিমত দৃঢ় স্বর শোনা গেল, 'সবাই যাবে। আমি নিয়ে যাবো।'

বাবার এই কণ্ঠস্বর বুঝিয়ে দিল, বাবা এখানে বহিরাগত নয়, এ বাড়ির ভাল-মন্দের দায়িত্ব সম্পর্কে তার বোধ আছে।

আনন্দময় বললো, 'তাহলে চলি, আরো অনেক বাড়ি যেতে হবে।'

বাবা বললেন, 'বোলো দাদুকে সবাই যাবো।'

(ক্রমশঃ)

এই আমাদের দেশ

নদীয়া (৩)

প্রত্নসম্পদ ও লোকসংস্কৃতি

মধ্য ও আধুনিক কালের রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে অথবা ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নদীয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হলেও যথার্থ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে নদীয়া অর্বাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কাল অথবা মৌর্য-শুঙ্গ-গুপ্ত যুগ ত অনেক দূরের কথা, পালরাজাদের শাসনকালের কোন কীর্তিচিহ্নও নদীয়ায় পাওয়া যায়নি। একদা নদীজালে আবৃত্ত এই জেলার পলিমাটির পাঁজরে কোন প্রাচীন সভ্যতার জীর্ণাবশেষ লুকিয়ে আছে কিনা জানিনা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত নদীয়ার ইতিহাসের সূচনা সেন-রাজাদের শাসনকালের ওদিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না।

নদীয়ার প্রথম উল্লেখ মেলে বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়ের ইতিবৃত্ত রচয়িতা মিন-হাজুদ্দিনের ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লেখা 'তবকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে। মিনহাজের গ্রন্থে নদীয়া উল্লেখিত হয়েছে 'নোদিয়াহ' নামে; এর তিন শতাব্দী পরে মোগল সম্রাট আকবরের দরবারের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের রচনাতেও লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের রাজধানীরূপে 'নোদিয়াহ' নামের উল্লেখ মেলে।

নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে পূজিত অনেকগুলি মূর্তির গঠন, অনেক স্থানের নাম—যেমন সুবর্ণবিহার, এবং অনেক লোকউৎসব ও পূজাপার্বণের লক্ষণ দেখে অনুমান করা হয়, পালরাজাদের শাসনকালে নবদ্বীপসহ নদীয়ার বিভিন্ন স্থান বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত ছিল। তারপর সেনরাজাদের শাসনকালে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটলে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিগুলিই হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত হয় এবং গঙ্গাসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্তী নবদ্বীপ হয় পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

সেনবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষেরা মহীশূরের অধিবাসী এবং তাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বঙ্গদেশে ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন। সামন্ত সেনের পৌত্র ও সার্বভৌম সেনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮) নবদ্বীপকে তাঁর রাজ্যের রাজধানী করেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৮৫) নবদ্বীপ এক প্রাসাদনগরীরূপে গড়ে ওঠে। তারপর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে, সম্ভবত ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, মহম্মদ ঘুরির অনুচর ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি অতর্কিত আক্রমণে নবদ্বীপ জয় করলে নিরুপায় লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন।

বখতিয়ার খলজির নবদ্বীপ জয়ের সাতান্ন বছর পরে ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মিন-হাজুদ্দিনের 'তবকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যাতে প্রাসাদপুরী 'নোদিয়াহ'র সমৃদ্ধির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আছে, মিনহাজুদ্দিন লক্ষ্মণ সেনকে 'রায় লখমনিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন গঙ্গাতীর-বর্তী তাঁর প্রাসাদ ছিল বিশাল। নবদ্বীপের অদূরবর্তী অরণ্যভূমির বর্ণনাও মিনহাজের গ্রন্থে আছে, যেখানে বখতিয়ারের সৈন্য-বাহিনী আত্মগোপন করে ছিল।

বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের আমলের প্রাসাদময় সমৃদ্ধ নবদ্বীপ কয়েক শতাব্দী আগে ভাগীরথীর গর্ভে তলিয়ে গেছে, সে সমৃদ্ধির স্মৃতি হয়ে আজও পড়ে আছে বল্লাল ঢিবি ও বল্লাল দীঘি। গঙ্গার তীরেই ছিল বল্লাল প্রাসাদ যা এখন বল্লাল ঢিবিতে পর্যবসিত। ১৮৬৩ সালে গঙ্গা গতি পরিবর্তন করার বল্লাল ঢিবি গঙ্গা থেকে দূরে সরে এসেছে। প্রায় বিশ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠেছিল বল্লাল সেনের প্রাসাদ। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে আছে বল্লাল সেনের ভগ্নপ্রাসাদের বহু পাথর ও স্তম্ভ কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৮৭২ সালে এক স্থানীয় মোল্লাসাহেবের উদ্যোগে বল্লালঢিবিতে খননকার্য চালানো হয় এবং তখন ঐ ঢিবির অভ্যন্তর থেকে কয়েকটি মারাকোষ, একটি বাক্সের মধ্যে শাল ও রেশমি কাপড়ের টুকরো ও কয়েকটি রূপোর মুদ্রা পাওয়া যায়।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর তিনশো বছর পরে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। গোবিন্দ দাসের কড়চা অনুসারে বল্লাল সেনের প্রাসাদ ভাঙাচোরা অবস্থায় তখনো টিঁকে ছিল এবং বল্লাল দীঘিতে স্নান করতেন শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীরা। গোবিন্দ দাস লিখছেন :

> প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়।
> কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সাগর।।
> বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
> ভাঙ্গাচুরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে।।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন কোন প্রাসাদ বা স্তম্ভের অস্তিত্বও নদীয়ায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরজন্য বিদেশী আক্রমণ বা ভাগীরথীর ভাঙাগড়া কতটা দায়ী তা বলা কঠিন। গঙ্গার বারবার গতি পরিবর্তনের জন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়াও আজ অসম্ভব।

নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার (মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে তিনি 'রাজা' ও 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন) সম্রাটের আনুকূল্যে বিস্তীর্ণ এলাকার ভূস্বত্ব লাভ করে, বর্তমানে কৃষ্ণনগর

বগড়ার জগন্নাথদেবের বিগ্রহ

থানার অন্তর্গত মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় মাটিয়ারিতে অনেক প্রাসাদ নির্মিত হয়। আজ সাড়ে তিনশ বছর পরে কিছু ইঁটের স্তূপ মাটিয়ারির সেই প্রসাদময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে।

কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে সংরক্ষিত আছে পলাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি কামান, যেগুলি লর্ড ক্লাইভ উপহার দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। এছাড়া নদীয়ায় উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্মারক আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।

নদীয়ার মন্দিরগুলির মধ্যে চাকদা থানার অন্তর্গত পালপাড়ার চার চালা মন্দিরটি প্রাচীনতম। মন্দিরটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ কিছু উপস্থাপিত করা যায় না, কিন্তু মন্দিরটির সামনের দিকের পোড়ামাটির কাজ, তার ইঁটের গঠন, রং, অলঙ্করণের বিষয়বস্তু ইত্যাদি পরিদৃষ্টে মনে হয় মন্দিরটি অন্তত পাঁচশ বছরের পুরানো, অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সমকালীন। এ অনুমান নির্ভুল হলে, এই মন্দিরটির মতো প্রাচীন আর কোন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন নদীয়ায় নেই।

নদীয়ার অধিকাংশ মন্দিরই নির্মিত হয়েছে নদীয়ার মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়; সেকারণে নদীয়ার কোন মন্দিরই তিনশ কি সাড়ে তিনশ বছরের অধিক প্রাচীন নয়। নদীয়ার রাজবংশের প্রথম 'রাজা' ভবানন্দ যেসব প্রাসাদ বা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, মাটিয়ারিতে তার সামান্য জীর্ণাবশেষ ছাড়া কোথাও কিছু মেলে না। ভবানন্দের পৌত্র রাঘব মন্দির নির্মাণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁর আমলে যেসব মন্দির নির্মিত হয় তার মধ্যে ১৬৬৯ সালে দিগনগরে প্রতিষ্ঠিত রাঘবেশ্বরের মন্দিরটি শিল্পকার্যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। শান্তিপুরের জলেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে দিগনগরের মন্দিরটির কারুকার্যে সাদৃশ্য থাকায় জলেশ্বরের মন্দিরটিও রাঘবের প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় মাটিয়ারিতে যে রুদ্রেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তার সঙ্গেও দিগনগরের মন্দিরের সাদৃশ্য আছে। শান্তিপুরের কাছে বাগআঁচড়া গ্রামে চাঁদ রায় নামে এক ব্যক্তি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আটচালা ধাঁচের একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। বাগদেবীর বিলের ধারে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি এখন বট অশ্বত্থ গাছের চাপে প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কিন্তু কারুকার্যে বৈশিষ্ট্যময় এই মন্দিরটি অবশ্যই সংরক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তিন শতাধিক বর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তি নদীয়ায় দুটি তিনটির বেশি নেই। নদীয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল তেহট্টে কৃষ্ণরায় প্রতিষ্ঠিত জোড়বাংলা ও বীরনগরে মুস্তৌফিদের প্রতিষ্ঠিত জোড়বাংলা ধাঁচের মন্দির। কৃষ্ণরায় প্রতিষ্ঠিত রাধারমণদেবের মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দ। মন্দিরটির গায়ের পোড়ামাটির অলঙ্করণ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। শান্তিপুরে আটচালা ধাঁচের গোকুলচাঁদের মন্দিরটিও সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেলার বিভিন্ন স্থানে মন্দির গড়ার কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখান মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি প্রচলিত 'চালা' শৈলী সম্পূর্ণ বর্জন করেন এবং টেরাকোটার কাজ বা অন্য কোন ধরনের নক্সাও তাঁর পরিকল্পিত মন্দিরগুলিতে স্থান পায় না। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের মন্দিরগুলি সব সরল, ঋজু এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যশৈলী প্রভাবিত। কৃষ্ণচন্দ্র অনুসৃত মন্দির স্থাপত্যশৈলীর উজ্জ্বলতম নিদর্শন হল ১৭৫৪ সালে শিবনিবাসে প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরের মন্দির, যা স্থানীয় লোকেদের কাছে বড়ো শিবের মন্দির নামে পরিচিত। শিবনিবাসে আরও কয়েকটি মন্দির ছাড়াও কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপপথে আমঘাটার নিকটবর্তী গঙ্গাবাসে হরিহরের মন্দির, আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মন্দির প্রভৃতি কয়েকটি দেবস্থান মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেও ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরের শ্যামচাঁদপাড়ায় শ্যামচাঁদের মন্দির ও ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ার অদূরবর্তী কাঞ্চনপল্লীতে কৃষ্ণরায়ের মন্দির ভিন্ন রীতিতে নির্মিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্তীকালে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নদীয়ায় বিভিন্ন স্থানে নির্মিত মন্দিরগুলিতে আবার পূর্বকালের 'চালা' ও 'রত্ন'শৈলী অনুসৃত হতে দেখা যায়।

নদীয়ার মসজিদগুলির মধ্যে শান্তিপুরের তোপখানা মসজিদ প্রাচীনতম। এটি মোগলসম্রাট ঔরংজেবের আমলে, ১৭০৫ সালে নির্মিত হয়। মসজিদটির নির্মাতা ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ। মায়াপুরের বামনপুকুরে চাঁদকাজির যে সমাধি আছে, সেটিও সম্ভবত চারশ' বছরের পুরানো। চাঁদকাজি ছিলেন চৈতন্যদেবের সমকালীন, সুলতান হুসেন শাহের শিক্ষাগুরু। চাঁদকাজির সমাধিতে কিছু কিছু হিন্দু ধর্ম-প্রভাবিত নকসা অঙ্কিত পাথরখণ্ড দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, অদূরবর্তী বল্লালপ্রাসাদ থেকে (যা এখন বল্লালঢিবিতে পরিণত) সেগুলি সমাধির অলংকরণের জন্য সংগৃহীত হয়েছিল। চাঁদকাজির সমাধিতে যে একটি গুলঞ্চ গাছ আছে, সেটি সমাধির সমকালীন প্রাচীন বলে মনে করা হয়। কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাটিয়ারির 'মল্লিক গস'-এর দর্গাটি প্রাচীন ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। দর্গাটি কত প্রাচীন বলা কঠিন, তবে যে-পীরের নামে এই দর্গা, সেই হজরত সাউ মুলুকে গোজ নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের (১৬০৬) সমকালীন ছিলেন বলে জানা যায়। দর্গার বারান্দার থামগুলি পাথরের তৈরি এবং বারান্দা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে পীরের সমাধি দেখা যায়। মাটিয়ারি গ্রামের একটি মসজিদও সুপ্রাচীন। নদীয়া-চব্বিশ পরগণার সীমান্তবর্তী বাগের মসজিদ আর একটি প্রাচীন মুস্লিম স্থাপত্যের নিদর্শন।

নদীয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হয় ইংরেজ শাসনের সূচনাকালে, সেকারণে জেলার কোন গীর্জাই খুব প্রাচীন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গীর্জাগুলির সুউচ্চ ঋজু

everest/257b/PP ben
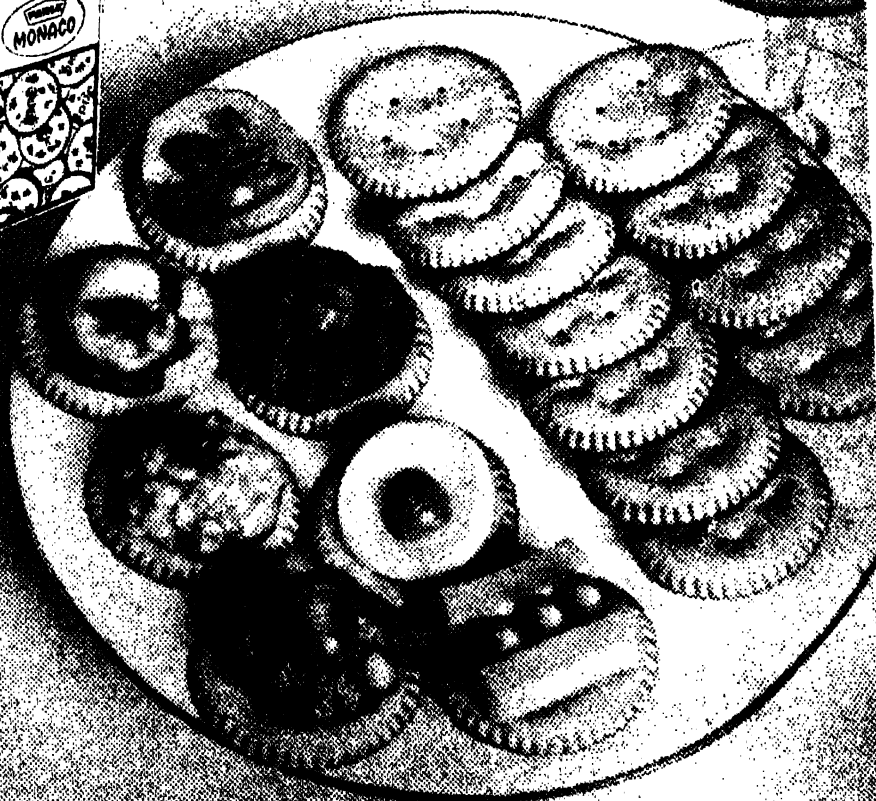
গঠন, গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি ও ভাবগম্ভীর পরিবেশ সকলেরই দৃষ্টিমন আকর্ষণ করে। জেলার প্রাচীনতম গীর্জাটি প্রোটেস্টান্ট মতাবলম্বী খৃষ্টানদের, সেটি নির্মিত হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বর্তমান মুজিবনগরের অদূরবর্তী ভবেরপাড়া গ্রামে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর ও চাপড়ায় প্রোটেস্টান্ট চার্চ নির্মিত হয়। কৃষ্ণনগরে রোমান ক্যাথলিকদের চার্চ নির্মিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। বিশালতায় ও কর্মব্যস্ততার কৃষ্ণনগর রোমান ক্যাথলিক চার্চ এখন সদা জমজমাট।

স্থানীয় লোকধর্ম

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তিতে নানা উপধর্মের শাখা-প্রশাখা নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করে। সে উপসম্প্রদায়গুলি হল বাউল, ন্যাড়া-নেড়ী, কর্তাভজা, সহজিয়া, গৌরবাদী, দরবেশ সাঁই, সাহেবধনী প্রভৃতি। এদের মধ্যে সাঁই, দরবেশ, সাহেবধনী প্রভৃতি কয়েকটি উপসম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারায় ঐশলামিক দর্শনের প্রভাব আছে। সহজভাবে হৃদয়ের ভক্তি-ভালবাসা দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্য লাভই সব ধর্মীয় চিন্তাধারার মূল কথা।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পীঠস্থান হল বর্তমান কল্যাণীর নিকটবর্তী ঘোষপাড়া। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের জন্ম ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে। উলা গ্রামে (বীরনগর) মহাদেব বারুই নামে এক ব্যক্তি পানের বরোজের মধ্যে একটি পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পান। তিনিই আউলে বা আউলচাঁদ। বড় হয়ে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আউলচাঁদ সংসার ত্যাগ করেন এবং মাত্র সাতাশ বছর বয়সে ধর্মগুরুরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আউলচাঁদ প্রচারিত ধর্মীয় চিন্তাধারার সঙ্গে বৈষ্ণব আধ্যাত্ম সাধনার সম্পর্ক থাকলেও, এই মতাবলম্বীদের কাছে ঈশ্বর কোন নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত নন। কৃষ্ণ, গৌর, কালী, খোদা, গড ইত্যাদি যে-কোন নামে তাঁরা ভগবানকে ডাকেন এবং সকল গানে-গাথায় কথকথায় ঈশ্বরকে 'কর্তা' নামে সম্বোধন করেন। সে কারণে আউলচাঁদের অনুগামীরা কর্তাভজার দল নামেই বেশি পরিচিত। ১৭৬৯-'৭০ সালে আউলচাঁদের মৃত্যু হলে তাঁর শিষ্য রামশরণ পাল হন দলের প্রধান গুরু। রামশরণ পালের বাস্তুভিটা ছিল ঘোষপাড়ায় এবং ঐ গৃহে রামশরণের স্ত্রী একটি ডালিম গাছের নীচে সিদ্ধিলাভ করেন। রামশরণের স্ত্রী ভক্তদের কাছে সতী-মা নামে অভিহিত। যে ডালিম গাছের নীচে সতী-মা সিদ্ধিলাভ করেন, সেটি এখনও আছে, এবং সতীমার সিদ্ধিলাভের দিনে ঘোষপাড়ায় প্রতি বছর বড় মেলা হয়। সে মেলা ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা নামে খ্যাত। কর্তা-ভজা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা একদা কলকাতার অভিজাত সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। খিদিরপুরের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্ভবত রামশরণ পালের শিষ্য ছিলেন।

বামনপুকুরে চাঁদকাজীর সমাধির ওপর ৫০০ বছরের প্রাচীন গোলকচাঁপা বৃক্ষ

নদীয়ার মেহেরপুর অঞ্চলে বলরাম হাড়ি বা বলাহাড়ি নামে এক নিরক্ষর ও ঘোর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী একদা এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। ঐ সম্প্রদায় বলাহাড়ি বা বলরামী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এক সময়ে ঐ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নাকি বিশ হাজার অতিক্রম করেছিল। দেশ বিভাগের পর বলরামী সম্প্রদায়ের নতুন ঘাঁটি হয়েছে তেহট্টের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম।

দেবদেবী ও পূজা পার্বণ

নদীয়ায় স্থানীয় দেব-দেবীদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য দে-পাড়ার নৃসিংহদেব। দেবপল্লী বা দেবপাড়া থেকে দেপাড়া নামের উদ্ভব। দেপাড়ার নৃসিংহদেব মূর্তিটি কষ্টি-পাথরের এবং প্রায় চার ফুট উঁচু। নৃসিংহাবতাররূপে দণ্ডায়মান নারায়ণ, অঙ্কে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও পদতলে ভক্ত প্রহ্লাদ—হিরণ্যকশিপু বধোদ্যত নৃসিংহদেবের এই মূর্তি কত শতাব্দী ধরে পুণ্য স্থান দেবপল্লীতে পূজিত হয়ে আসছে তা বলা যায় না। সম্ভবত সেন রাজাদের শাসনকালে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব নৃসিংহদেব মূর্তি দর্শনে দেপাড়ায় এসেছিলেন। সেই পুণ্য আবির্ভাবের স্মরণে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে দেপাড়ার দেবস্থানে উৎসব হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র প্রায় দুশ বছর আগে একবার নৃসিংহদেব মন্দিরের সংস্কার করেন। পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের আজ্ঞায় আর একবার মন্দিরটির সংস্কার হয়। জন-বসতির চাপে মন্দিরটির শান্ত সুন্দর আরণ্যক পরিবেশ আজ আর নেই। কিন্তু কৃষ্ণনগর থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই দেবস্থানটিতে ভক্তের নিয়মিত সমাবেশ অব্যাহতই আছে। অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ মানতরক্ষা ইত্যাদি অনুষ্ঠান নৃসিংহদেব তলায় হয়ে থাকে।

শান্তিপুরের অদূরবর্তী সু-প্রাচীন পল্লী বাগআঁচড়া গ্রামে আছে বাগ্‌দেবী-মার মন্দির। বাগ্‌দেবীর কোন মূর্তি নেই, ঘট পুজো হয়। এখানে নিয়মিত ভক্তের সমাগম হয়।

চাকদা থানার মথুরাগাছি গ্রামে আছে খেদাই ঠাকুর। একটি নিম গাছের নীচে বাঁধানো জায়গায় খেদাই ঠাকুরের পুজো হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তি খেদাই ঠাকুরের বড় পুজোর সময়, সে সময় ঠাকুরের কাছে পাঁঠা, ভেড়া পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। নিয়মিত পুজো হয় শনি মঙ্গলবারে। খেদাই ঠাকুর আসলে মনসা, এবং সর্পদংশন থেকে রক্ষার পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ঠাকুরের কাছে পুজো দেওয়া হয়। নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামে খেদাই ঠাকুরের পুজোর প্রচলন আছে। ব্রাহ্মণী নামেও খেদাই ঠাকুরের পুজো হয়।

জগদ্ধাত্রী যদিও স্থানীয় দেব-দেবীর পর্যায়ভুক্ত নন, তবুও কৃষ্ণনগরেই দেবীর পুজার ব্যাপক প্রচলন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠ-পোষকতায় কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজো প্রসার লাভ করে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী এই যে, নবাব মিরকাশিমের বন্দী-শালা থেকে মুক্তি লাভের পর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পুত্র শিবচন্দ্র যখন কৃষ্ণ-নগরে প্রত্যাবর্তন করেন তখন দুর্গাপুজোর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বৎসরান্তে দেবী পুজোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত মহা-রাজা ঐ সময় জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো ঐ দৈব স্বপ্নাদেশেরই ফলশ্রুতি।

কৃষ্ণনগরে বারোদোলের মেলাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এত বড় মেলা নদীয়ায় আর হয় না, পশ্চিমবঙ্গেও এমন জাঁকজমক-পূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী মেলা বিরল। অন্তত দু'শ বছর আগে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এই মেলা প্রবর্তিত হয়। মেলা শুরু হয় চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে এবং উৎসব অনুষ্ঠান চলে তিনদিন। ভাঙা মেলা চলে আরও মাস খানেক। কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে মেলা বসে এবং নদীয়ার মহারাজাদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থানের বারোটি বিগ্রহ ঐ সময় রাজবাড়িতে আনা হয় এবং তিনদিন তিন বেশে ঐ বিগ্রহগুলির পুজো হয়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পই মেলার প্রধান আকর্ষণ, তাছাড়া ধামা, কাঠা, হাতা খুন্তি ঘটি ঘড়া প্রভৃতি গৃহস্থালির সরঞ্জামের ব্যাপক কেনাবেচাও মেলায় হয়। একদা রাজবাড়ির হাতি হরিণ প্রভৃতিও মেলায় সমাগতদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। জমিদারি প্রথা লোপ পাওয়ার পর বারোদোলের মেলার আকর্ষণ কমে গেছে।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাস উৎসব ও মেলা শুধু এই জেলার নয়, পশ্চিমবঙ্গেরও দুটি বড় মেলা। রাস উৎসব বৈষ্ণবদের উৎসব হলেও নবদ্বীপে রাস উৎসবের সময় ভদ্রকালী, কৃষ্ণকালী, রণচণ্ডী, বড়-শ্যামা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে শক্তির পুজো হয় এবং সম্ভবত বৈষ্ণব প্রভাব কমে করার জন্যই একদা প্রভাবশালী শাক্তদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় রাসের সময় ব্যাপকভাবে শক্তি-পুজো চালু হয়। ফলে নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের রাস উৎসব শাক্তদের ধুমধড়াক্কার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। নবদ্বীপে রাস উৎসবের প্রতিটি মূর্তি বিরাট করে নির্মাণ করা হয়। চারদিন উৎসব চলার পর যেদিন বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু মূর্তিগুলি নিয়ে পথে মিছিল করা হয়, সেদিন নবদ্বীপের পথে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না।

শান্তিপুরের রাস উৎসব কিন্তু মুখ্যত বৈষ্ণবদেরই। শান্তিপুরের রাস উৎসব প্রায় আড়াইশ' বছরের প্রাচীন। বিভিন্ন গোস্বামী বাড়ির রাধাকৃষ্ণ মূর্তি নিয়ে শান্তিপুরের রাস উৎসব। তবে একই সঙ্গে কালী-পুজোর প্রচলনও হয়েছে বেশ কিছুকাল আগে। চতুর্থ দিনে ভাঙা রাসের মিছিল

তোপখানা মসজিদ, শান্তিপুর

জল হওয়ার সময় ঐ কালীমূর্তিগুলি বিসর্জন দেওয়া হয়। শান্তিপুরের ভাঙা রাসের বর্ণাঢ্য মিছিল দেখতেও দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে। শান্তিপুরের রাসের মিছিলে রাধাকৃষ্ণের নানা বিগ্রহ থাকে আর তার ফাঁকে ফাঁকে চলে ময়ূরপঙ্খী নৌকা, পুতুলনাচ আর রাধিকা ও গোপিনীবেশে ছোট ছোট সুন্দরী সুসজ্জিতা মেয়েকে নিয়ে চতুর্দোলা। শান্তিপুরের রাসের মেলা দেখার সুযোগ যে-কোন ব্যক্তির একটি মনোরম অভিজ্ঞতা।

হরিণঘাটা থানায় একটি গ্রাম আছে, তার নাম বিরহী। এমন নামের একটি গ্রাম শুধু বৈষ্ণবভাবে বিভোর নদীয়াতেই থাকা সম্ভব। ঐ গ্রামে প্রায় পাঁচশ' বছর আগে এক বৈষ্ণবসাধক মদনগোপালের বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও পূজা শুরু করেন। মদনগোপাল আগে একাই ছিলেন এবং সে-কারণে রাধার বিরহে তিনি কাতর হন। ঐ বিরহের স্মরণেই গ্রামের নাম বিরহী। পরে একসময় রাধাকে এনে মদনগোপালের পাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিরহী গ্রামে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন একটি সুন্দর উৎসব পালিত হয়। যেসব বোনের ভাই নেই বা অনুপস্থিত, তারা মদনগোপালের কপালে ফোঁটা দিয়ে ভাইদের কল্যাণের জন্য মদনগোপালের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু এমন সুন্দর কল্যাণকর একটি অনুষ্ঠানের সার্থকতা সীমিত হয়ে আছে অব্রাহ্মণ ললনারা মদনমোহনকে স্পর্শের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকায়। ঠাকুরদালানের প্রবেশপথের দেওয়ালে ফোঁটা দিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভাইফোঁটা উপলক্ষে এমন একটি উৎসব ও বড় মেলা পশ্চিমবঙ্গে কমই হয়।

[illegible] স্টেশনের অদূরবর্তী [illegible] গ্রাম, বৈষ্ণবদের একটি তীর্থক্ষেত্র। [illegible] কৃপাপ্রাপ্ত [illegible] [illegible]

জগদীশ পণ্ডিত এই গ্রামে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা উপলক্ষে এখানে বড় মেলা হয়। জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব দিবস, পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিকেও যশড়ায় মেলা বসে।

কাঁচড়াপাড়ার অদূরবর্তী কুলিয়ার পাট বৈষ্ণবদের আর একটি পুণ্যস্থান। শ্রীচৈতন্য-দেবের পাদস্পর্শ এই গ্রামও লাভ করেছে। তিনি এখানে বৈষ্ণবনিন্দুক পণ্ডিত দেবা-নন্দর অপরাধ ক্ষমা করেন বলে এই গ্রামের অপর নাম অপরাধভঞ্জন পাট। এখানে একটি মন্দিরে গৌর-নিতাইর মূর্তির নিত্যপূজো হয় এবং প্রতি বছর অঘ্রাণ মাসের কৃষ্ণা-একাদশী তিথিতে কুলিয়ার পাটে তিনদিন-ব্যাপী উৎসব শুরু হয় ও মেলা বসে।

উলা বীরনগরে উলাইচণ্ডীর মেলা বসে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায়। পুজো ও মেলা চলে তিন দিন। সুপ্রাচীন এই পুজো ও মেলাটিকে ঘিরে নানা কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। উৎসবটি বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত এমন কথাও শোনা যায়।

ঈদ, মহরম প্রভৃতি প্রধান মুশ্লিম পর্বগুলি জেলায় বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণনগর থানায় সোনাডাঙা গ্রামে মহরমের মেলা প্রসিদ্ধ। মহরম মাসের ৭ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় লাঠি খেলা হয়। ১০ তারিখে গ্রামের মানিকপীরের তলায় লাঠি খেলা দেখতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোক আসে। এখানকার মহরম উৎসবটি প্রায় তিনশ' বছরের প্রাচীন। এছাড়া কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি শহরগুলিতেও মহরম সাড়ম্বরে পালিত হয়। মহরমের সময় কৃষ্ণনগরের কারবালা প্রান্তর উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এছাড়া সারা জেলায় ছড়িয়ে আছে নানা পীরের স্থান; সেগুলিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসব অনুষ্ঠান

হয়ে থাকে। যেমন ফকিরপাড়ার আমড়াপাড়ায় প্রতি পৌষ-সংক্রান্তিতে [illegible] পীরের দরগায় উৎসব হয় ও সেই উপলক্ষে মেলা বসে। রাণাঘাটের [illegible] মাঘ-মাসের শ্রীপঞ্চমীতে হয় গোরা [illegible] পীরের উৎসব, হবিবপুরে মীর মহম্মদ ফকিরের স্মরণোৎসবও হয় ঐ একই দিনে। হবিব-পুরে পীরের স্থানে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মানত করে। চাকদা থানার শ্রীনগর গ্রামে গাজি সাহেবের স্থানে মেলা বসে মাঘী-পূর্ণিমায়। [illegible] গ্রামে প্রতি বছর ১৩ ফাল্গুন সত্যপীরের ও পৌষ সংক্রান্তিতে মানিকপীরের উৎসব হয়। গ্রামকে আপদবিপদ থেকে রক্ষা করা, গোমড়ক দূর করা, বাঘের উৎপাত বন্ধ করা, সর্পদংশন থেকে রক্ষা করা, নানারকম মনোবাঞ্ছা পূরণ করা ইত্যাদির প্রার্থনা জানিয়ে পীরের স্থানগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই পুজো দেয়, কাঁচা [illegible] মাটির ঘোড়া, সিন্নি ইত্যাদি দিয়ে মানত রক্ষা করে।

নদীয়ায় খৃষ্টধর্মীদেরও কয়েকটি উৎসব ও মেলা আছে। বড়দিনের সময় কৃষ্ণনগরে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রাঙ্গণে যে মেলা বসে তাতে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ হয়। চাপড়ার প্রোটেস্টান্ট চার্চের উদ্যোগে বড়দিনের মেলা চালু হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। এখন চাপড়ার বড়দিনের মেলা একটি বিরাট উৎসব। সেখানে ঐ সময় নানা শিল্প ও কৃষিজাত পণ্য প্রদর্শনী, গৃহপালিত পশুপাখির প্রদর্শনী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। বাইবেল প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন প্রমোদানুষ্ঠানে মেলাক্ষেত্র মুখরিত হয়।

এটি মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রভাব কিনা জানি না, তবে নদীয়ায় সব ধর্মীয় উৎসবই লোকউৎসব। কোন সম্প্রদায়ের উৎসবই নিষেধের বেড়াজালে অপরকে দূরে ঠেলে রাখে না।

তীর্থস্থান, সংস্কৃতি-কেন্দ্র

এ-আলোচনায় প্রথমেই নবদ্বীপের নাম করতে হয়। সেনরাজাদের শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত এই নগরীর বয়স অন্তত আটশ' বছর। আদি নবদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনের ফলে আদি নবদ্বীপ লুপ্ত হয় এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে নতুন নবদ্বীপ গড়ে ওঠে। এই মতের সমর্থকরা বলেন, বর্তমান মায়াপুরই আদি নবদ্বীপ এবং চৈতন্যদেব সেখানেই ভূমিষ্ঠ হন। শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] [illegible]

আগেই সংস্কৃত ও বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে নবদ্বীপ খ্যাত ছিল। দূর দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে নবদ্বীপে যাঁরা অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার জন্য আসেন, তাঁদের মধ্যে হলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি উদয়নাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে ঐসব পণ্ডিতরা নবদ্বীপে আসেন। স্থানীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন বাসুদেব সার্বভৌম। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট তন্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতির সারস্বত অবদানেও নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার জন্যও নবদ্বীপ খ্যাত। কিন্তু নবদ্বীপ পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে ভগবান শ্রীচৈতন্যের পবিত্র স্পর্শে। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি চৈতন্যদেব নদীয়ায় ভূমিষ্ঠ হন। তখন থেকেই নবদ্বীপ বৃন্দাবনের মত তীর্থক্ষেত্র। অগণিত মন্দির, মঠ ও দেবস্থান গড়ে ওঠে সারা নবদ্বীপে। নবদ্বীপে বৈষ্ণব আখড়াগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তোতারাম বাবাজির আখড়া, সিদ্ধ চৈতন্যদাসের আখড়া, সিদ্ধ জগন্নাথ দাসের আখড়া, নৃসিংহদেবের আখড়া, শ্রীবাস অঙ্গন প্রভৃতি। মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বুড়োশিবতলা, নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিদ্যজ্জননী বা পোড়ামাতলা, ভবতারিণীর মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রভৃতি। বহু প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন টোল এখনও নবদ্বীপে আছে।

নবদ্বীপের অদূরে শ্রীধাম মায়াপুর বৈষ্ণবদের আর এক তীর্থক্ষেত্র। মায়াপুরকে যেসব বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলে মনে করেন তাঁদের উদ্যোগে মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা বিশ্বে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য মায়াপুরই এখন অধিক তৎপর।

শান্তিপুরের অদূরবর্তী ফুলিয়া গ্রামের খ্যাতি আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানরূপে। ফুলিয়া মহাপ্রভুর অনুগামী যবন হরিদাসেরও সাধনপীঠ। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে যাবার পথে ফুলিয়ায় হরিদাসের আশ্রমে পদার্পণ করেন। সুতরাং কবিতীর্থ ফুলিয়া পুণ্য বৈষ্ণবতীর্থও বটে।

শান্তিপুর এই জেলার আর এক প্রাচীন শহর, সংস্কৃতি কেন্দ্র ও তীর্থস্থান। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের মতে শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের সাধনাতেই শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। তারপর শ্রীচৈতন্যদেব বহুবার শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে এসে শান্তিপুরের মাটি পবিত্র করেন। শান্তিপুর পরবর্তীকালে কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। শান্তিপুরেও একদা সংস্কৃত শিক্ষার বহু টোল ছিল। নবদ্বীপ চৈতন্যদেবের জন্মস্থান হলেও শান্তিপুরেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বেশি, যেটা উত্তর স্থানের রাসমেলা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শান্তিপুরের ধর্মজীবন এখনও গোস্বামী প্রভাবিত। শ্যামচাঁদের মন্দির, গোকুলচাঁদের মন্দির, জলেশ্বরের মন্দির শান্তিপুরের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির অন্যতম। তবে শান্তিপুরের সর্বাধিক খ্যাতি তার বস্ত্রশিল্পের জন্য।

নদীয়ার আর একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম উলা পরবর্তীকালে বীরনগর নামে খ্যাত হয়। উলুবনের জঙ্গল কেটে গ্রামটির প্রতিষ্ঠা হয় বলে তার নাম উলা।

পরের সংখ্যায়
অগ্রগতি ও সম্ভাবনা

আর এক মতে উলাইচণ্ডী দেবীর নাম থেকে উলা নামের উদ্ভব। উলা যে একদা সমৃদ্ধ স্থান ছিল তা সেখানকার অগণিত ভগ্ন অট্টালিকা, বিশাল দীঘি ও ভগ্ন মন্দিরের সারি দেখলেই বোঝা যায়। ১৮৬৯ সালে বীরনগরে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার জন্য পরবর্তীকালে শহরটি জনহীন পরিত্যক্ত স্থানে পরিণত হয়। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু আগমনে বীরনগর আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চূর্ণী নদীর তীরবর্তী রাণাঘাট জেলার অন্যতম প্রাচীন শহর। রনা ডাকাতের ঘাঁটি থেকে রাণাঘাট নামের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। এই মহকুমা শহরটি বড় রেল জংশন হিসাবে খ্যাত এবং ১৮৬৪ সালে এখানে পৌরসভা গঠিত হয়। সঙ্গীতসাধনার একটি বড় কেন্দ্ররূপে রাণাঘাটের একদা বিশেষ খ্যাতি ছিল।

কলকাতা থেকে মাত্র আটান্ন মাইল দূরে অবস্থিত কল্যাণী আধুনিক পরিকল্পিত নগরীগুলির অন্যতম। প্রশস্ত রাস্তাঘাট, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, কলকারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নিয়ে একটি সম্ভাবনাময় শহররূপে কল্যাণী ক্রমশঃ গড়ে উঠছে।

কৃষ্ণনগর নদীয়া জেলার প্রধান শহর ও প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্র। জলঙ্গী তীরবর্তী এই স্থানটির পূর্বনাম রেউই। রেউই ছিল গোপজাতিপ্রধান একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নদীয়ার রাজা রাঘব মাটিয়ারি থেকে রেউই গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ভগবান কৃষ্ণের নামানুসারে রেউইর নাম হয় কৃষ্ণনগর। শ্রীকৃষ্ণের উপাসক স্থানীয় গোপজাতিকে খুশি করতেই বোধহয় রাজা রাঘব ঐ নামটি পছন্দ করেন। রাঘবের রাজত্বকাল ১৬৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং কৃষ্ণনগর, মোটামুটি হিসাবে তিনশ বছরের প্রাচীন শহর। কৃষ্ণনগরের বর্তমান রাজবাড়ি নির্মাণ করেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, এবং ঐ বাড়িতে বসে কাব্য রচনা করেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও সাধক রামপ্রসাদ। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার কেন্দ্ররূপে, বাঘা যতীন, লালমোহন ঘোষ, মনমোহন ঘোষ প্রমুখের কর্মকেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে। কৃষ্ণনগরের প্রধান স্কুল ও কলেজগুলি এবং পাবলিক লাইব্রেরি শতাধিক বর্ষ পূর্বের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার অনন্য অননুকরণীয় মৃৎশিল্প। মাটির পুতুল, সরপুরিয়া, সরভাজা আর জগদ্ধাত্রী পুজো—এই নিয়ে আজকের কৃষ্ণনগর।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন—(৫)

এর আগের পর্যায়ে কয়েকটি মূল অপকারিতা (ড্রীম ওয়ার্ক) সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে সংক্ষেপণ (কনডেনসেশান) সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। আরও অনেক কথাই সে সম্বন্ধে বলা যায়, বলার আছেও অনেক, কিন্তু আমাদের এই নিবন্ধে এত বেশী বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন হবে না। মোটামুটি স্বপ্ন কি করে বোঝা যায় তারই কিছু বৈজ্ঞানিক উপায়ের কথা বলা এই লেখার উদ্দেশ্য। সুতরাং সংক্ষেপণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে এখনকার মত তাই থাকুক। পরে যদি কিছু আরও বলা দরকার হয় তখন বলা যাবে। এখন স্বপ্ন বিকৃতিকরণের ব্যাপারে স্বপ্ন-ক্রিয়ার আর একটি প্রকারের সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। পূর্ব পর্যায়ে দ্বিতীয় প্রকরণের নাম দেওয়া হয়েছে অভিক্রান্তি (ডিসপ্লেসমেন্ট)। শব্দার্থ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এতে কোনও কিছুকে তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখা বা এইরকম কিছু ঘটা বোঝায়। আসল বিষয়টাও তাই-ই। এই অভিক্রান্তির অনেক রকমফের আছে। প্রথম ধরা যাক এমন একটা স্বপ্ন যার মাথামুণ্ড কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যেমন ধরুন একটা স্বপ্ন—যেন সাইকেল চড়ে আপিসে যাচ্ছি, কিন্তু সাইকেলটা রাস্তার পাশের বড় বড় গাছের মাথার উপর দিয়ে চলেছে। মোটরগাড়ীতে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি যেন সেটা হোটেল। একটা পাখী যেন ঘরের মধ্যে ঢুকে আকাশে সশব্দে উড়ে গেল। সিনেমার হলে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে কি লিখছি আর সেই সময় ঝনঝন করে কি যেন ভেঙে পড়ল স্বপ্নও ভেঙে গেল। এমন স্বপ্নের অর্থ বোঝা কঠিন। স্বপ্নদ্রষ্টার ভাবানুষাদ নিয়ে যা জানা গেল তা থেকে স্বপ্নটার অর্থ দাঁড়ায়—স্বপ্নদ্রষ্টা—ক-বাবুর অবস্থা তেমন ভাল না। তাঁর পরিচিত বন্ধুদের অনেকেই ভাল কাজ করেন, ভাল অবস্থা করেছেন—দিব্যি আরাম করে নিজের নিজের মোটরগাড়ীতে আপিসে যাতায়াত করেন। একজন তো বেশ বড় ব্যবসা করেন। বহু টাকার মালিক—ইচ্ছে মত হোটেল রেস্তোরায় খানাপিনা করেন, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ান ইত্যাদি। ক-বাবু যে রাত্রে ঐ স্বপ্ন দেখেন তার আগের দিন সাইকেলে আপিসে যাবার সময় বহু মোটর-গাড়ীর সারির মধ্যে আটকা পড়ে যান। অদূরে একজন বড় গাড়ীতে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। তাঁকে তাঁর সেই ব্যবসায়ী বন্ধু বলে মনে হচ্ছিল। বড় বড় গাড়ী-ওয়ালারা রাস্তা আটকে আছে, এগোনো যাচ্ছে না। তখন উড়ে চলে যাবার কথা মনে হচ্ছিল। আপিসে বসে কাজ করতে করতে মনে হচ্ছিল যদি ওদের মত (বড়লোক বন্ধুদের মত) অবস্থা হতো, তবে গাড়ী করে আপিসে এসে একটু কাজ দেখে হোটেলে খেয়ে, সিনেমা দেখে, বাড়ী যেতেন। আর মাঝে মাঝে উড়োজাহাজে দেশবিদেশে বেড়াতে যেতেন। সেদিন অন্যমনস্ক হয়ে হাত নাড়তে গিয়ে আপিসের টেবিলে রাখা জলের গেলাসটা হাত লেগে পড়ে ভেঙে যায়। তাতে ক-বাবুর বিরক্তি বোধ হয়েছিল। স্বপ্নে ক-বাবুর সেই সংস্কারের কিছুটা পূরণ হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে আরও যে ভোগ ইচ্ছা ধরা পড়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। এই সারাংশ থেকে স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারা যায়। আগে যা অবোধ্য ছিল এখন তা বোঝা গেল। এর মধ্যে অভিক্রান্তির পরিচয় একটু দিয়ে রাখি। স্বপ্নে গাছের উপর দিয়ে সাইকেল চালানো ব্যাপারটা নেহাৎ আজগুবি বলে স্বপ্নে সেটা অস্পষ্টভাবে দেখা গেছে। ক-বাবু নিজেও বলছিলেন, 'ওটা একেবারে বাজে উদ্ভট স্বপ্ন।' কিন্তু তাঁর ভাবানুষঙ্গ থেকে জানা গেল—ঐ বড়লোক গাড়ী-ওয়ালাদের উপর টেক্কা মেরে সবার আগে যাবার যে ইচ্ছা সেটা ঐ দৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে ঐটাই স্বপ্নের মূল কথা। ক-বাবুর যে হীনতা-বোধ তাঁকে পীড়া দেয় সেই হীনতাবোধ তিনি স্বীকার করতে পারেন না। স্বপ্নের মধ্যে তাই সকলকে হারিয়ে দিয়ে সবার আগে গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার ক্ষমতা দেখিয়ে তাঁর সবার উপরে বড় হবার ইচ্ছেটার পূরণ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নে এই অংশটাই খুব অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্য অংশগুলি এরচেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে; নজর তাঁর সেই দিকেই পড়েছিল। বন্ধুর সঙ্গে গাড়ীতে গল্প করতে করতে খাওয়ার বিষয় বলতে গিয়ে ক-বাবুর মনে হয়েছিল গাড়ীটা তাঁর নিজের। বন্ধুকে তিনি আপিসে যাবার সময় 'লিফট' দিচ্ছেন। যেন নিজের বড়ত্ব দেখানো হচ্ছে। স্বপ্নে হোটেলে খাওয়াটাও তাঁর সেই বড়লোক বন্ধুকে যেন দেখিয়ে দেওয়া যে তিনিও ইচ্ছে করলেই অমন হোটেলে যেতে পারেন আর ঐরকম তিনি গিয়ে থাকেন। আপিসের কাজ তাঁর সেদিন আরও বিষময় হয়েছিল। বড় চাকুরে হলে না কাজ করলেও চলে যেতো। একবার আপিসে গিয়ে পরে হোটেল সিনেমা করে ঘুরে বেড়ালেই বেশ চলবে, এই মনোভাব তাঁর ছিল। পাখীটা ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে চলে গেল। ক-বাবু যেন উড়োজাহাজে করে, ঘরের মধ্যে থেকেই, কোথাও উড়ে চলে গেলেন। পাখীটা একটা উড়োজাহাজ মনে হল। যেন তাঁকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। এতেও তাঁর প্রাধান্য প্রমাণিত হচ্ছে। আর সিনেমায় বসে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা নিজের কর্ম-ব্যস্ততা ও প্রাধান্য যেমন হচ্ছে তেমনই আবার আপিসের কাজ যে কিছুই নয়, যেখানে সেখানে বসে এমনকি সিনেমায় বসেও কাজ চুকিয়ে সই করে দিলেই চলবে হয় এই ভাবটাও প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বপ্নের মধ্যে যে ভাবটা প্রধান সেইটাই অপ্রধান করা হল এক্ষেত্রে—অতিরঞ্জন গাছের উপর দিয়ে চালানো, পাখী ঘরে ঢুকে আবার

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

এই ঘটনার পারম্পর্য বিকৃত হতে দেখা যায়। বোঝবার সুবিধের জন্যে সহজ উদাহরণই নেওয়া হয়েছে। একই ঘটনা ঘটবার মধ্যে আরও কয়েক রকমের ঘটনার অংশ এসে যুক্ত হয়ে বিষয়টাকে দুর্বোধ্য করে তোলে।

আরেক রকমের অভিক্রান্তির একটা উদাহরণ দিই। নীতি দেবী কলেজে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপের ছাত্রী। বাড়ীর আদুরে মেয়ে। কলেজেও ভাল ব্যবহারের জন্য শিক্ষক ও অন্যান্য সহপাঠীদের মোটামুটি প্রিয়। স্বপ্নে দেখলেন—কলেজের পরে ক্যানটিনে বসে কয়েকজনের সঙ্গে কিছু খেয়ে গল্প করতে করতে বেশ দেরী হয়ে গেছে। তখন নীতি দেবী তাঁর একজন সহাধ্যায়ীর সঙ্গে বাড়ীর পথে হাঁটতে শুরু করলেন, সঙ্গের মেয়েটির বাড়ীও তাঁদের বাড়ীর কাছেই এক মোড়ের নিকটে। যে পথে চলেছেন সে পথটা চেনা কিন্তু কেমন যেন অচেনা অচেনা লাগছে। দুজনে কথা বলতে বলতে চলেছেন। রাস্তার দু-ধারের সব বাড়ী তাঁর দেখে দেখে অতি চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু স্বপ্নে দেখা বাড়ীগুলো যেন ঠিক ঠিক স্থানে নেই তবু যেন সব ঠিক আছে এই রকম একটা ভাব মনে হচ্ছিল। (এক খানে খানিকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে)। খুব চেনা কিন্তু তবু যেন অচেনা অচেনা কিছু লাগছে। সেদিকে মন না দিয়ে বাড়ীর কাছে এসে বন্ধুটিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়ীতে ঢুকতেই ঘুম ভেঙে গেল। এই ছোট্ট স্বপ্নের অভিক্রান্তি কোথায় তা বুঝতে হলে নীতি দেবীর নিজের জীবনকথার কিছু জানা দরকার। নীতি দেবীর এম-এ পরীক্ষা হয়ে গেলে তাঁর বিয়ে দেওয়া হবে একথা প্রায় ঠিক হয়েই আছে। বাপ-মা দেখেশুনে ভাল পাত্রও ঠিক করে রেখেছেন, অপেক্ষা কেবল পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাওয়ার। নীতি দেবীর সে বিয়েতে সম্মতি ছিল। কিন্তু কিছুকাল ধরে একটু অসুবিধে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর জীবনে আর একটি যুবক হঠাৎ কেমন করে ধূমকেতুর মত এসে উদয় হয়েছে। কেবল তাই নয় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মনকে দিয়েছে নাড়া আর হৃদয়কেও দিয়েছে দোলা। সমস্যাটা তাই একটু জটিল হয়ে উঠেছে। নিজে থেকে বাড়ীতে কিছু বলা একেবারে অসম্ভব, তার ওপর বেশ কিছুদিন আগে থেকে ঠিক করে রাখা বিয়ের সম্বন্ধ, তাও সহজে নাকচ করা যায় না। ফলে অবস্থাটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। স্বপ্নে দেখা যে পথ ধরে নীতি দেবী বাড়ী ফিরছিলেন সে পথটা তাঁর প্রতিদিনের বাড়ী ফেরার পথ নয়। সে পথটার বাড়ীগুলো যেন তাঁদের রাস্তার বাড়ীর সঙ্গে তাঁর জন্যে স্থির করা ভাবী-শ্বশুরবাড়ীর রাস্তার কয়েকটা বাড়ী এসে গেছে। স্বপ্নে দেখা ফাঁকা জায়গাটার কথা তিনি আগে বলেন নি। পরে তাঁর মনে হয়েছে যেন একটা ফাঁকা জায়গা ছিল—আবার মনে হল ফাঁকা নয় বোধ হয়, তিনি ঠিক লক্ষ্য করেন নি। স্বপ্ন বিশ্লেষণে জানা যায় নীতি দেবী স্বপ্নের যে অংশটা বেশী অমনোযোগী হয়ে বাদ দিয়েছিলেন আর পরেও তাঁর স্মৃতিতে ঠিক ধরা পড়ছিল না—ভাবানুষঙ্গ দিতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে গেল সেই ফাঁকা জায়গাটার আশপাশে যে বাড়ী রয়েছে তা তাঁর চেনা। তাঁর সেই ভাবী শ্বশুরবাড়ীর দুপাশের বাড়ী সেগুলো। যেটা স্বপ্নে বাদ পড়ে গেছে সেটাই তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়ী বলে মনে হতে লাগলো। স্বপ্নের অর্থটা কি দাঁড়ালো তা তাঁর নিজের মনেই তখন আভাসে ধরা দিয়েছিল। তিনি একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, "কী কাণ্ড!" স্বপ্নের সবচেয়ে মূল্যবান অংশটুকু থেকেই মন যেন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল—নিজের ইচ্ছেটাকে গোপন রাখবার জন্যেই। এই যে বিশেষকে অতিসাধারণ করে দেওয়া এও অভিক্রান্তির এক কৌশল। এ যেন আসল কথাটা গোপন করবার জন্যে অন্য কথার জোরদার অবতারণা করার মত ব্যাপার।

এছাড়া আরও অন্য রকমফের আছে। ইস্কুলে পরীক্ষার সময় এমন প্রশ্ন দেওয়া হতো, যাতে পদটার কিছু অংশ লেখা থাকত, আর বাকি কিছু অংশ ফাঁকা রাখা হতো। প্রতি লাইনে এমন দুটো একটা কথা বাদ রেখে দেওয়া হতো। সেই ফাঁকা জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে দিতে হতো। ফলে আগে যে লেখার কোনো মানেই হচ্ছিল না সে লেখায়, শব্দ প্রয়োগ করায়, লেখাটার অর্থ বোঝা গেল। স্বপ্নেও সেই রকম কোনো কোনো অংশ যেন স্বপ্নে বাদ পড়ে যায়, বা সময় সময় এমন উদ্ভট শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার কোনও আভিধানিক অর্থ হয় না। এরকম শব্দ প্রয়োগে কখনও সংক্ষেপণ, কখনও অভিক্রান্তির ক্রিয়া আবার সময় সময় এই দুই প্রক্রিয়ারই প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

আর এক রকমের অভিক্রান্তি ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব। আমাদের অনেক বিষয়, অবস্থা, অনেক ঘটনা, স্থান বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা রকমের ভাবানুষঙ্গ যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন কারো নাম বা চেহারা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্রোধ, ঘৃণা, অবহেলা ইত্যাদি ভাব মনে আসে। উদাহরণ বেশী দেওয়া দরকার হয় না। বাঘ বলতেই ভয়ঙ্কর, হিংস্র ইত্যাদি। ভূত বলতেই ভয়, আবার অন্ধকারের সঙ্গে ভূত প্রেতের ভয় আমাদের মনে জড়িয়ে আছে। এই রকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। মেয়েদের শাদা শাড়ীর সঙ্গে বৈধব্যবোধ জড়িত হয়ে আছে। রং সম্বন্ধে এমন নানা ভাবের যোগ লক্ষ্য করে, বিশেষ করে ভারতীয় চিত্রকলায়, এক এক ভাবের প্রকাশের জন্যে এক এক রং ব্যবহার করা হয়েছে। কমবেশী সব দেশেই এই রকম বিশেষ ভাবপ্রকাশের জন্য রংয়ের ব্যবহার করা হয়। সেই রকম মনের ভাব প্রকাশের জন্য চিত্রী যেমন ছবি এঁকে ভাব ব্যক্ত করেন, কবি যেমন কাব্যের মধ্যে বর্ণনায় ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করেন, স্বপ্ন রচনায় মন সেই সকল কৌশলের মাধ্যমে নিজের গূঢ় বাসনার প্রকাশ করে থাকে। এই যে ভাবের প্রকাশের জন্য সোজাসুজি ভাবটা না প্রকাশ করে তার বদলে এমন একটা অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকের রচনা করে, এটাকেও এক রকমের অভিক্রান্তির ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা চলে। বিশেষ করে যখন কোনও একটা বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করতে সোজাসুজি তার চিত্র না এঁকে তার সঙ্গে ভাবানুষঙ্গে যুক্ত, অপর কোনও ব্যক্তি, স্থান ঘটনা ইত্যাদির কোনও কিছু স্বপ্নে প্রকাশ করে মূল ইচ্ছেটাকে গোপন করা এবং সেই সঙ্গে আংশিক প্রকাশ করাও হয়। এও অভিক্রান্তি ক্রিয়ার ফল। আর একটা স্বপ্ন উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করব। রামবাবু স্বপ্নে দেখলেন পশ্চিমের আকাশে সোনালী রং ছেয়ে গেছে। খোলা বাগানের এক পাশে একটা বড় লতার কেয়ারী শাদা ফুলে একেবারে ভরে আছে। বাতাস তার গন্ধে ভরপুর। তাঁর কেমন যেন অদ্ভুত একটা আবেশের মত অনুভূতি হল। মনে একটু ব্যথার বোধে ঘুম ভেঙে গেল। এমন সুন্দর পরিবেশে কেন তাঁর মন ভার-ভার বোধ হচ্ছে কিছু বুঝতে পারলেন না। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানা গেল রামবাবুর সোনালী রং খুব ভাল লাগে। এক সময় ঐ সোনালী রংয়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ করে কামজ ঘটনার যোগ হয়ে যায়। যাকে কেন্দ্র করে এই মনোভাব তাঁর জাগে প্রথম দেখার সময় যেন তার হাতে শাদা ফুলের মালা জড়ানো ছিল। তারপর কিছুদিন মেলামেশা চলে, কিন্তু এক সময় সেই মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে সে চলে যায়। এতে রামবাবুর মনে আঘাত লেগেছিল। সেই আঘাত ভুলতে তিনি সচেষ্ট হয়ে এক সময় সে ঘটনা ভুলেও যান, অন্ততঃ তার সঙ্গে সংযুক্ত আবেগ কমে যায়। স্বপ্নে তাঁর সেই আঘাতের বেদনা—আকাশের রং আর গাছের ফুলে ধরা হয়ে রইল, যদিও প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই, আছে কেবল তাঁর নিজের ভাবের।

—ডক্টর শরচ্চন্দ্র সিংহ

দিনকালের হিসেব

ধনেপুত্রে— (২)

দিনকালের হিসেবে লিখতে গিয়ে চার্লস ডিকেন্স-বর্ণিত আঠার শতকের শেষের দিকের ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের অবস্থাই মনে পড়ছিল ঃ 'এর চেয়ে সুদিন আগে আর হয়নি; এর চেয়ে দুর্দিনও বোধহয় দেখা যায়নি। এটা ছিল বিজ্ঞতার যুগ, আবার এটাই ছিল চরম মূর্খতার যুগ...এই যুগে বসন্তের হাওয়ার মত আশাবাদ অনেককেই উৎফুল্ল করে তুলেছিল, আবার প্রচণ্ড শীতের মত অবসাদও অনেককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।' (এ টেল অফ টু সিটিজ)।

ভেবে দেখুন, আমাদের দেশে আজকের দিনের অবস্থাটা ঠিক এই রকম নয় কি? প্রশাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে শক্তিশালী সরকার আজ কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যুদ্ধক্ষেত্রে পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করার পর আমাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি দেশ তাদের চিরাচরিত বিদ্বেষ বা বৈরীভাব ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে মিতালি করতে চায় বলে মনে হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে এবং আরও বৃহত্তর পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্ব পুরোদমে চলছে, সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণের জন্যে বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ ও বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ইত্যাদি। এই অবস্থায় অনেকের মধ্যে যে আশাবাদ জমাট বেঁধে উঠবে এবং চিত্তপ্রসাদ ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কি। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কথা ধরলে দেখা যায়, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন যখন ঘটছে, কৃষি শিল্প ও পরিবহনের পর্যাপ্ত উন্নয়নের ব্যবস্থা যখন হচ্ছে—টেলিভিশন যখন আসছে এবং পাতাল রেলের কাজ যখন এগুচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে যখন বৈদ্যুতিক শক্তি পৌঁছে যাচ্ছে, পাকা সড়ক বানানো হচ্ছে, স্কুল-কলেজ হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে—এককথায় পূর্ণতর জীবনের চিহ্ন যখন চোখের সামনে রয়েছে তখন উৎফুল্ল হবার কারণ আছে বৈকি।

এবার চিত্রের অপর দিকটা দেখা যাক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদিকেও আছে বৃদ্ধি—দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ধনবৈষম্যবৃদ্ধি, বেকারত্ববৃদ্ধি এবং প্রজাবৃদ্ধি। এই চতুর্মুখী বৃদ্ধির চাপে সমাজের বৃহদংশের এক রকম নাভিশ্বাস উঠেছে, যদিও বা অপরাংশ মনের সুখে মজিয়া পড়িয়া চলেছে।

ঠিক এই রকম অবস্থাতেই জন্মেছিলেন টমাস রবার্ট ম্যালথাস এবং তাঁর বিখ্যাত জনসংখ্যাতত্ত্ব বহুলাংশে ভূয়োদর্শনজাত। অতএব তিনি যে নৈরাশ্যবাদী হবেন এবং তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হবার পরই অর্থনীতি যে নিরানন্দময় শাস্ত্র বলে অভিহিত হতে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? এবং আমরাও যদি নৈরাশ্যবাদী, অবসাদগ্রস্ত হই তাতেও অবাক হবার বিশেষ কিছু নেই নিশ্চয়।

অবশ্য নৈরাশ্য বা অবসাদের চিত্রাঙ্কন এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল উক্ত চতুর্মুখী বৃদ্ধির একটি বিশেষ দিকের পর্যালোচনা। দিকটি হল প্রজাবৃদ্ধি বা জনসংখ্যাবৃদ্ধি। আমাদের মত দেশের পরিস্থিতিতে এই পর্যালোচনা আলোকসম্পাত ও উদ্দেশ্যসাধন—উভয় দিক দিয়েই যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্বন্ধে ইঙ্গিত আগের সংখ্যায় দেবার চেষ্টা করেছি।

জনসংখ্যার দুটি দিক ঃ

মোটামুটিভাবে বলা যায়, জনসংখ্যার দুটি দিক আছে ঃ (ক) পরিমাণগত দিক এবং (খ) গুণগত দিক। পরিমাণগত দিক বলতে বোঝায় একদিকে জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধি এবং অপরদিকে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ককে। গুণগত দিকের উপাদান হল বিভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য—শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মশক্তি সাহিত্যসংস্কৃতি মননশীলতা ইত্যাদি সব কিছু। অতএব জনসংখ্যার গুণগত দিকের পর্যালোচনায় হিউম্যান ক্যাপিটাল বা মানব-মূলধনেও বিনিয়োগের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে—দেখতে হবে যে বিভিন্ন পর্যায়ে মানবশক্তির প্রয়োজনীয়তা কত, শিক্ষা-পরিকল্পনায় যে ব্যয় করা হচ্ছে তার থেকে কতটা ফল আশা করা যায়, দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা কি হওয়া উচিত, ইত্যাদি। প্রথমে আমাদের দেশের জনসংখ্যার পরিমাণগত দিকের আলোচনাই করা যাক।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ

পরিমাণগত দিকের বিচার করা হয় জনসংখ্যার সঙ্গে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা করে। জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত হলে পরিমাণগত দিক থেকে কোন সমস্যাই নেই। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ১.৩ কোটি; সেই তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ এত প্রচুর যে সমস্যা হল পর্যাপ্ত ব্যবহারের। অপর দিকে ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ পরিমাণে প্রভূত হলেও জনসংখ্যার আয়তন বিপুল এবং সৃষ্টির হার অত্যধিক বলে ঐ সব সম্পদের মাথাপিছু প্রাপ্তির পরিমাণ এত অল্প যে শুধু অস্ট্রেলিয়া কেন যে-কোন উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আঁতকে উঠতে হয়। (বিচারে অস্ট্রেলিয়া বোধহয় ঠিক উন্নত দেশের পর্যায়ে পড়ে না—অস্ট্রেলিয়া মধ্যবর্তী (ইন্টারমিডিয়েট) গোষ্ঠীভুক্ত।) ফলে

দেখা দিয়েছে জনসংখ্যার পরিমাণগত প্রকট সমস্যা। এই সমস্যাকেই সাধারণত জনাধিক্যের সমস্যা' (দি প্রবলেম অফ ওভার-পপুলেশন) বলে অভিহিত করা হয়। আরও ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে, ভারতের জনসংখ্যার আয়তন ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এত বেশী যে অদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করে পারা যায় না। এই উৎকণ্ঠাই অভিহিত হয়েছে জনাধিক্যের সমস্যা বলে।

অবশ্য উৎকণ্ঠার কারণ যে আছে তা অনস্বীকার্য। বিগত দুই দশকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে উন্নয়ন-প্রচেষ্টার হিসেব-নিকেশ করে দেখা যায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কোনমতে তাল রাখতে পেরেছে মাত্র, এবং মাঝে মাঝে ঐ ভারসাম্য ভেঙে পড়বার মত অবস্থাও হয়েছে। ক্রমাগত যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বড়জোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপূরক হয়েছে, সামাজিক মূলধন-গঠন বা জীবনযাত্রার মানে বিশেষ প্রতিফলিত হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে আবার বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ার দরুনই বেকার-সমস্যা এত তীব্র আকার ধারণ করেছে—বলা যায় সংকটে পরিণত হয়েছে।

তথ্য ও পরিসংখ্যান :

অবস্থার বিশ্লেষণে কিছুটা তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম চৌদ্দ বছরে (১৯৫১-৬৫) ১২,০০০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় প্রায় ৬৪ শতাংশ, কিন্তু জনসংখ্যার অভাবিত বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় মাত্র ২৬ শতাংশ। এর পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্থার ঘটে অবনতি—১৯৬৫-৬৬ সালে মাথাপিছু আয় একরকম ১৯৬০-৬১ সালের স্তরেই থেকে যায়। পরবর্তী চার বছরে অবশ্য সামান্য বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দেখা গেলেও গতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। ১৯৬৯-৭০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৯ টাকা বা মাসিক ২৮ টাকার মত। এছাড়া আমার ২২ কোটি লোক ছিল দারিদ্র্য রেখার নীচে। অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ জীবনধারণের জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভোগ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এই [illegible] সালেও অবস্থার [illegible]।

খাদ্য-সমস্যার প্রকট রূপে ধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিরই ফল। কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব এবং বিবিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৭০-৭১ সালে খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২১০ কোটি টাকার মত। কিছুকাল আগেও আমাদের বছরে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হ'ত। খাদ্য আমদানির অপরিহার্যতা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পত্তির ওপর এক বিরাট চাপ—এর দরুনই প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্য এবং শিল্প-কলাকৌশল আমদানী করা সম্ভব হচ্ছে না। খাদ্য-সমস্যার দরুন আবার মাথাপিছু খাদ্যের যোগানও হ্রাস পাচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে (১৯৫৬) মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যপ্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৪৪৫ গ্রাম, আজ তা কমে ৪৩০ গ্রামে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র তপশ্চারণ ছাড়া বোধহয় প্রাণটাকে দেহের মধ্যে বেশীদিন ধরে রাখা যাবে না।

সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে বর্তমান বছর বা ১৯৭৩-৭৪ সালের শেষে নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২'৩ কোটিতে। এই হিসেব সম্পূর্ণ মূল্যহীন, কারণ এতে পড়ুয়াদের মধ্যে কর্মপ্রার্থীদের এবং জাতবৃত্তি ইত্যাদি ছাড়তে ব্যগ্র ব্যক্তিদের ধরা হয় নি। মোট কথা, সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে যা ধারণা করা যায় বেকার-সমস্যার অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিরও অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে ভোগ্যদ্রব্যের যোগান চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না, এবং ফলে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্তর আরও ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান-ব্যবস্থা ইত্যাদি সামাজিক মূলধন (সোস্যাল ক্যাপিটাল) গঠনের ক্ষেত্রেও দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। যেমন, ১৯৫১-৬৬ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও ৭ কোটির মত শিশু শিক্ষার যে কোন রকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ এইরকম বঞ্চিত হতভাগ্যের অনুপাত মোটামুটি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

উন্নয়নের প্রাথমিক প্রভাব :

প্রথম প্রথম অবশ্য এইরকমই হয়—অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাথমিক পর্যায়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধিই ঘটায়। জনস্বাস্থ্যোন্নয়ন অর্থনৈতিক

না কখনো ছিল, না পাবেন—এমন
সাদা
সাবানের তুলনায়
১½ গুণ
বেশী কাপড় ধোয়
সাবানের তুলনায় অর্ধেক
মেহনত—দু'গুণ পরিষ্কার—
তা সে জল যে ধরণেরই হোক।
NEW!
det
detergent washing cake
ডেট কেক
আরেকটি উৎকৃষ্ট ডেট উৎপাদন : নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট পাউডার—
সাদা কিম্বা নীল : কাপড় ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে। রঙীন কাপড় সবচেয়ে উজ্জ্বল ক'রে।
কাপড় আর হাতের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।
Shilpi HPMA-38a/72 Ben
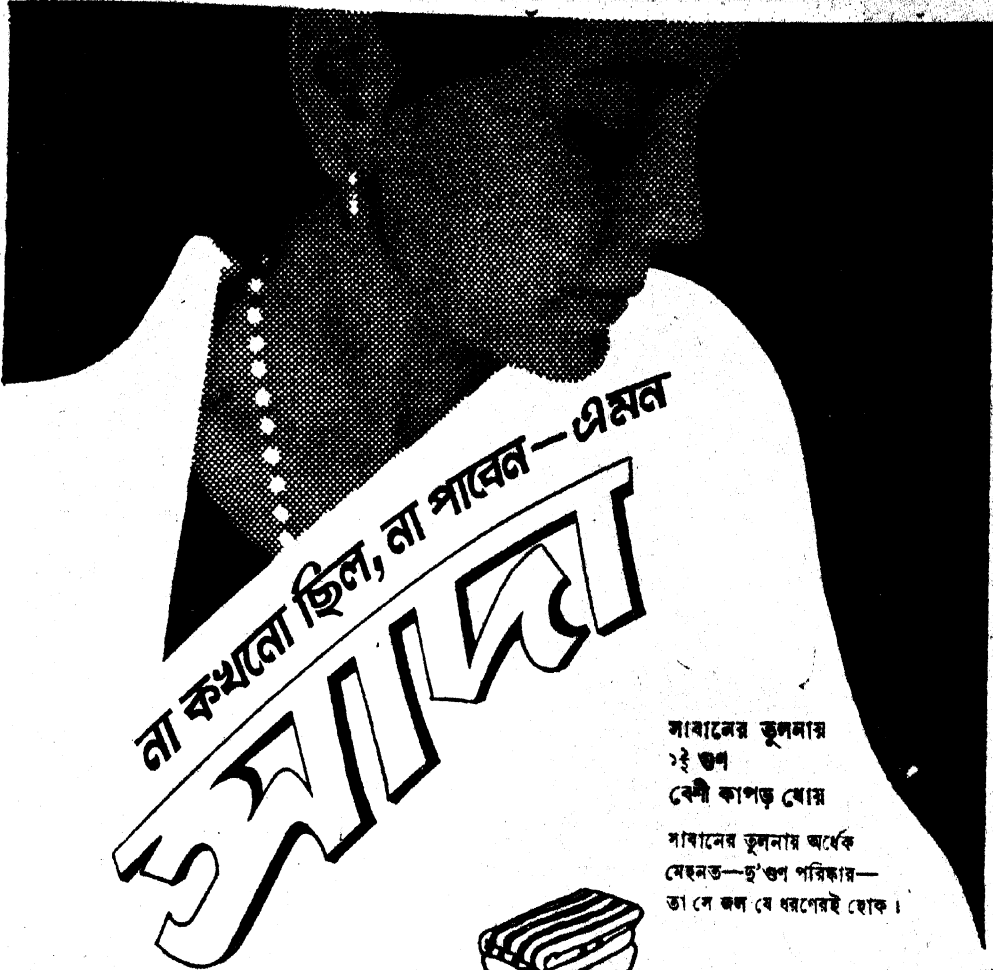
উন্নয়নের অন্যতম অঙ্গ। এর দরুন মৃত্যুর হার হ্রাস পায় কিন্তু জন্মের হার বিশেষ কমে না। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগের চেয়ে বেশীই হয়। প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হলে —অর্থাৎ বেশ কিছুটা উন্নয়নের পর—জন্মের হার হ্রাসের জন্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে শুরু করে। আমাদের ভরসা এখানেই, কিন্তু ব্যাপার হল যে যাকে ঠিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে তা ঠিক সম্ভব হচ্ছে না—যেটুকু উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটছে তা কোন কাম্য পরিবর্তন সূচিত করছে না। কিন্তু এই পরিবর্তনই যে আশার আলোর অগ্রদূত তা ভুললে চলবে না।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও প্রত্যাশা :

বিষয়টির আরও একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সম্প্রসারণের ফলে অর্থ-ব্যবস্থায় যে কাম্য পরিবর্তন ঘটে সংক্ষেপে তাকেই অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন বলে অভিহিত করা হয়। আমাদের মত দেশে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি আমরা পর্যাপ্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজন মত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব করে জীবন-যাত্রার স্তর (লেভল অফ লিভিং) এবং জীবনযাত্রার মানকে কিছুটা তুলতে পারি তবে কিছুদিন পরই জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত সমস্যাগুলো পিছু হটতে শুরু করবে।

এই প্রত্যাশার মূলে আছে একাধিক তত্ত্ব-গত কারণ। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে নতুন ধরনের উপভোগের জন্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ফলে আনন্দের উৎস হিসেবে বৃহৎ পরিবারের গুরুত্ব কমে যায়। সন্তান-সন্ততিদের সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখবার ইচ্ছাও বৃহদায়তন পরিবারের প্রতি-বন্ধক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে নগরীকরণ ঘটে থাকে তাও পরিবার সম্প্রসারিত হবার পথে প্রতিবন্ধকতা করে থাকে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনপ্রসূত নারীজাতির মুক্তিও পরিবারকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন রাখতে সহায়তা করে। এই ধরনের সামাজিক পরিবেশে বিবাহের বয়স স্বাভাবিকভাবেই পেছিয়ে যায় এবং দেখা যায় যে শেষপর্যন্ত অনেকেই উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। এইসব কারণেই উন্নত দেশে জন্মহার হ্রাস পায় এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি আয়ত্তের মধ্যে আসে।

কিছুদিন থেকে আমাদের জন্মহার হ্রাস পেয়ে চলেছে কিন্তু আমরা এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত বলে মৃত্যু-হার হ্রাস পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়াই কাম্য—গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য এবং সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ, কিন্তু এর ফলে অন্তত স্বল্পকালীন ভিত্তিতে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। সমস্যার মোকাবিলায় পরিবার পরি-কল্পনার আন্দোলন গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই আন্দোলনের ওপর উত্তরোত্তর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতের মত বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল এবং সংখ্যাধিক নিরক্ষর জনগণ (১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ২৯·৩৪ শতাংশ) সমন্বিত দেশে এই আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে কি? তাই জন্মহার কমলেও সর্বস্তরে এবং সর্বস্থলে কমেনি। কমেছে নগরাঞ্চলের আবহাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে। কিন্তু জনসংখ্যার এই অংশের জন্যে পরিবার পরিকল্পনার জন্যে আন্দোলন চালাবার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কারণ পরিবার পরিকল্পনার প্রয়ো-জনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে তারা মোটামুটি সচেতন। যারা সচেতন নয় জন-গণের সেই অংশের মধ্যে আবার আন্দোলনও বিশেষ কার্যকর নয়। তাই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে এবং ঘটছে অকাম্য প্রান্তে—অ্যাট দি রং এন্ড।

সুতরাং অনেকের অভিমত হল যে পরি-বার পরিকল্পনার আন্দোলনকে যদি সার্থক করে তুলতে হয় তবে শিক্ষাপ্রসার এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-ব্যবস্থাকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। নচেৎ পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত আন্দোলনের পিছনে ব্যয়ের একটা মোটা অংশ অপব্যয় বলেই গণ্য হবে এবং জনসংখ্যা বিপুল হারে বাড়তে বাড়তে সবকিছুকে বানচাল করে দেবে। তখন আমাদের চূড়ান্ত ভরসার স্থল হবে অবিমিশ্র হতাশা।

দুরতিক্রম্য চক্র :

এখানেই সৃষ্টি হয়েছে এক দুরতিক্রম্য চক্রের। বিপুল হারে বর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে অস্তিত্ব বজায় রাখার ন্যূনতম উপাদান যোগাতেই পরিকল্পনার বিনিয়োগের অধি-কাংশ নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে শিক্ষাপ্রসার এবং অন্যান্য সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রতি অপরিহার্য দৃষ্টি দেওয়া মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ এইসব ব্যবস্থা ছাড়া পরিকল্পনার কার্যক্রম—বা আরও ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা পরিকল্পনা বা পপুলেশন প্ল্যানিং সার্থক হতে পারে না। এর জন্যে আবার প্রয়োজন হল বর্ধমান হারে বিনিয়োগ-ব্যবস্থার, যে অর্থের অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতএব ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায় : যে দেশে দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে তার পক্ষে জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা ছাড়া বাঁচবার পথ নেই। কিন্তু দেশে যদি অধিকাংশের ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় জীবন-ধারণের পক্ষেই পর্যাপ্ত না হয় তাহলে সঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কি করে?

এই দুরতিক্রম্য চক্র সম্পর্কে ভেদের উপায় কেউই নির্দেশ করতে পারেন নি, তবে ভোগ-সঞ্চয়-বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্কের রদবদলের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু কিভাবে রদবদল করা হবে সেটাও আর এক সমস্যা, যাকে বলা যায় অনুপাত-নির্ধারণের সমস্যা—দি প্রবলেম অফ প্রোপোরশানস। এ সমস্যার গুরুত্ব হল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্যে। যেখানে বাচ এর করে শাসনাসনে অধিষ্ঠিত হতে হয় সেখানে ইচ্ছামত রদবদলের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবুও বলা যায়, বিচারবুদ্ধি ও ঐকান্তিকতা এবং বোধহয় কিছুটা সাহসিকতা নিয়ে অগ্রসর হলে নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে সুফল ফলবে।

গুণগত দিক :

বলা হয়েছে, ব্যাপক সামাজিক দৃষ্টি-কোণ থেকে পরিবার পরিকল্পনা জনসংখ্যা পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু বিষয়টিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে সেইহেতু শুধু জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমানই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাতে জন-সংখ্যার গুণগত উন্নতি ঘটে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এই গুণগত উৎকর্ষসাধনের প্রচেষ্টাকে মানবশক্তি-পরিকল্পনা—ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং বলে অভিহিত করা যায়। এর মধ্যে আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মশক্তি উৎসাহ-উদ্দীপনা সংস্কৃতি—সব কিছু। 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর'—এই আশীর্বাদের তাৎপর্য এই নয় যে সম্পদের অধিকারী (বা অধিকারিণী) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু পুত্রেরও জনক (বা জননী) হও, আসল তাৎপর্য হল সুসন্তানেরও জনকজননী হও। দেবযানী যযাতির সঙ্গে উপবনে বেড়াতে বেড়াতে তিনটি 'দেবকুমারতুল্য' বালককে নির্ভয়ে খেলা করতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ছিলেন। যদি দেবকুমার-বালকদের না দেখে 'অসুরতনয়তুল্য' অথবা ক্ষীণকায় ব্যাধিগ্রস্ত বালকদের দেখতেন তবে ঈর্ষান্বিত হতেন কি? 'শত পুত্রের' বর আজ আমরা চাই না কিন্তু যে দো বা তিন বাচ্চার আকাঙ্ক্ষা করি কামনা করি তারা যেন সব দিক দিয়ে সুসন্তান হয়। জাতির ক্ষেত্রেও আকাঙ্ক্ষা কি অনুরূপ হওয়া উচিত নয়? প্রত্যেক দম্পতিরই দুটি বা তিনটি বাচ্চা কি রকমের হচ্ছে সেটা কি ভাববার কথা নয়? শুধু সমাজবিদ্যা নয়, অর্থনীতি রাজনীতি প্রভৃতি সকল সামাজিক শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিষয়টি গুরুত্বে সমধিক। অতএব, জনসংখ্যার গুণগত দিকের ওপর ফলাফল বিচার করে তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম প্রণয়ন ও গ্রহণ করা উচিত। জনসংখ্যা-পরিকল্পনার এ পরিমিতকরণই মানবশক্তি-পরিকল্পনা নামে অভিহিত। এ সম্পর্কে আলোচনা করব পরবর্তী সংখ্যায় এবং করব আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যা

(১৮)

আমার অবকাশের স্বাধীনতার দিন ফুরিয়ে আসছে। শাগগীরী কোলকাতা ফিরতে হবে। ফিরে গিয়ে ধরাচূড়া পরে সারাদিন দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আবার সওয়াল করতে হবে।

জজসাহেবদের মুখের দিকে তাকিয়ে আইনের পোকা বাছতে হবে। বুঝতে হবে, কোনদিন কোন জজসাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে সকালে।

এসব অকথ্য ও অলিখিত কথা মুখ দেখে বুঝে নিয়ে তাঁদের মেজাজ বুঝে সওয়াল করতে হবে।

আসলে এটাই স্বাভাবিক। জজসাহেব হলেও তাঁরাও আমাদেরই মত মানুষ। জজীয়তির কোট চাপালেই সেই মানুষটা কিছু বদলে যান না—তাঁরা সেই কালো গাউনের নীচে সাদামাটা মানুষ থেকে যান। সেটাই একমাত্র ভরসার কারণ।

যেদিন জজসাহেবের মেজাজ খারাপ থাকবে সেদিন জজসাহেব কিছু শুনতে চাইবেন না, কিছুক্ষণ শুনেই বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বলবেন, 'লিসন্ মিস্টার বোস, আই হ্যাভ বীন থ্রু দা বেঞ্চ এন্ড দা বার ফর আ কনসিডারেবল টাইম। টেল আস্ ইফ ইউ হ্যাভ এনীথিং নিউ টু টেল।'

সেদিনও হাসতে হাসতে এমন মুখ করে পুরোনো কথাগুলোই এমনভাবে বলতে হবে, যেন একেবারে নতুন শোনায়।

আসলে নতুন কথা কিছু নেই বলার মত, নতুন করে হয়ত বলার আছে। নতুন কথা বলা, মক্কেলরা, কৌঁসুলিরা এবং জজ-সাহেবরাও বোধহয় কেউই পছন্দ করেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছিলেন, 'আইন? সে ত তামাশামাত্র, বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।' অথচ তিনি নিজে হাকিম ছিলেন। এমন সৎ হাকিম হয়ত আরো অনেকে আছেন কিন্তু কোর্টে বসে তাঁদের সকলকেই জজীয়তীই করতে হয়। অন্য কিছু করা জজসাহেবদের মানায় না।

খোখো ঘোষ সেদিন পর্যন্ত আমাদের দলে ছিল। সত্যি কথা বলতে কি ওকে আমার কোনোদিনও পছন্দ হতো না। পছন্দ হতো না এই কারণে যে ওর পান্ডিত্য থাকলেও ওর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কৌঁসুলী-সুলভ পরিশীলন ও পরিশ্রুতি ছিল না। কোর্ট-ক্রাফট জানা ছিল না। ওর ডিমেনর ছিলো না—ও শুধু গাঁক গাঁক করে কলে-পড়া শুয়োরের মত চেঁচাত আর বেচারী জজসাহেবদের মাথায় সাইটেশনের হাতুড়ি মারত। সে কারণেই ওকে কখনও প্রথম সারির কৌঁসুলী বলে আমি মানতে রাজী ছিলাম না। কিন্তু এ জগতে, 'নাথিং সাকসীডস লাইক সাকসেস।' আমি ওকে মানি আর নাইই মানি, খোখো ঘোষের পশার ছিল জমজমাট।

খোখো ঘোষ এখন জজসাহেব।

দুঃখের কথা এই যে, এখন থেকে রোজ খোখোকে 'ইওর লর্ডশিপ' বলে সম্বোধন করে ওর সমস্ত লম্ফ-ঝম্প ওর সমস্ত শূন্য পান্ডিত্যমন্যতাকে নীরবে হাসিমুখে সহ্য করতে হবে। বলতে হবে, 'মাই লর্ড, আই কোয়াইট সী ইউর পয়েন্ট, মোস্ট এ্যাবাবলি আই শ্যাডনট বীন এবল্ টু মেক মাইসেল্ফ ক্লিয়ার টু ইউ।' তা করতে হবে, কারণ নইলে মক্কেল হেরে গেলে আমিও হেরে যাব। তাই মক্কেলকে জেতাতে, খোখোর কাছে আমার মাথানীচু করে দাঁড়াতেই হবে।

পয়সা রোজগার করতে হলে মাথানীচু করতেই হয়। সত্যি সত্যিই হোক কি অন্তিমঃ করেই হোক যে যত বেশী রোজগার করে তার মাথা তত বেশী নোয়াতে হয়—যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। তবে আমাদের মাথা কারো পায়ে শারীরিকভাবে নোয়াতে হয় না, তবে, নিজের আদর্শ ও আত্মাভিমানকে ছোট করে নিজেকে নীচু করতে হয়। সেটা একটা দারুণ কষ্টকর অভিজ্ঞতা। যার আত্মাভিমান

যত বেশী, মায়াকে এই কষ্টটা তত বেশী করে বাজে। জীবনবেদের ছলে মাথা নোয়াতেও বাজে।

কোলকাতায় ফেরার কথা আমি ভাবতে চাই না। ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। এখানের ঘননীল আকাশ, রোদ্দুরে স্নিগ্ধ-শান্তিতে শুয়ে-থাকা পাহাড়, বন, চরে-বেড়ানো গরু মোষের গলায় ঘণ্টার টুংটাং টুংটুং মৃদু আওয়াজ, কোনো ছোট পাখির চিকন গলায় ডাক, সব আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় যে কোলকাতাটাই সত্যি, এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জের এই জগৎটাই মিথ্যা। একজন পাকা এস্‌কেপিস্টের মত বারে বারেই দায়িত্ব ছেড়ে, টেনশান ছেড়ে, গলার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে আমি জংগলে পালিয়ে আসি। কিন্তু কে যেন আমাকে ধরে আবার খোঁয়াড়ে পুরে দেয়, গলায় দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার জোয়ালে জুড়ে দেয়।

যে তা করে, সে কে? সে ত আমার বুকের মধ্যেই বাস করে, সে ত আমারই মনের একটা হিসাবী স্থূল অংশ। তবুও তার কাছ থেকে আমার এ জন্মে নিস্তার নেই। কেন?

সেদিন শেষ দুপুরবেলা জংগলে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

দুপুরের ঝকঝকে রোদে বনপাহাড় হাসছিল। দুপুরের শীতের বনের গায়ের একটা বিশেষ গন্ধ আছে। বিয়ের পর মায়ার গায়ে যেরকম গন্ধ পেতাম। মনে হত, একটা অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পৃথিবী শুধু আমার—শুধু আমারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে। এই দুপুরের নিস্তব্ধ, গন্ধগন্ধে কীট-পোকা-ওড়া জংগলে এলে সেইসব পুরোনো শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ সবকিছু মনে পড়ে যায়। কেন জানি না, লতায় পাতায়, ঝরা-ফুলে, উড়ে-যাওয়া পাখির ডানায় চুমু খেতে ইচ্ছে করে। সমস্ত দুপুরের বনকে ছুঁটের

কবোষ্ণ বুকের মত আমার মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে ইচ্ছা করে—একান্ত মালিকানায়। এই আশ্চর্য সবুজ শালীন সৌন্দর্যের ভাগ আমার জন্য কাউকেই দিতে ইচ্ছে করে না। ভীষণ স্বার্থপরের মত আমার একারই করে রাখতে ইচ্ছা করে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে আনমনে লাবুর সেই ডেরায় পৌঁছে গেছিলাম জানি না। ওখানে পৌঁছতেই লাবুর কথা মনে পড়ল। লাবু এখনও মান্দারে। আমি মাঝে একদিন গিয়ে দেখে এসেছিলাম ওকে। এখন ভাল আছে। আরও দিন চারেক লাগবে ভাল হয়ে উঠতে।

লাবুর অসুখে আমি যে কিছু করতে পেরেছি তার জন্যে আমার খুব আনন্দ হয়। কষ্ট করে, রাত দুটো অবধি লাইব্রেরীতে বসে পরদিন সারাবেলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে মেহনতের রোজগার—সেই মেহনতের টাকা কোনো যোগ্য কাজে লাগলে মন ভরে ওঠে।

মিস্টার বয়েলসকে আমি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা দিচ্ছি প্যাটের মাধ্যমে। এতে আমার যে কী আনন্দ হয় তা কি বলব। আমি জানি, উনি বেশীদিন বাঁচবেন না—তাই একজন মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে হাসিমুখে রওয়ানা করানোর মধ্যে একটা দারুণ গায়ে-কাঁটা-দেওয়া আনন্দ পাই।

এ যুগে জন্মেও আমি খুবই সেকেলে রয়ে গেছি। আমি ভগবানে গভীরভাবে বিশ্বাস করি। তাঁর উপর কোনোরকম ভরসা রাখি না বা তাঁর কাছে কিছু চাই না, কিন্তু আমাদের উপরে যে একজন অবিসংবাদী কেউ আছেনই তা নিশ্চয় করে বুঝতে পারি। তাঁর কাছে হাততালি পাবার জন্যে আমি কিছুই করি না, পরজন্মের সুখের ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামের জন্যেও নয়। করতে ভাল লাগে, তাই করি।

আমার সাহেব বন্ধুরা বলে, 'ইউ আর এ মিসফিট ইন দিস ওয়ার্ল্ড।' আমার বক্তব্য কিন্তু ওদের কখনও বুঝিয়ে বলিনি। ওরা কি করে জানবে, তারা-ভরা আকাশের নীচে গভীর জংগলের মধ্যে মাচায় বা হঠাৎ কোনো তারা-খসে যাওয়া দেখলে কেমন মনে হয়। সেই সব অন্ধকার রাতের স্তব্ধতার মধ্যে বসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করে চারপাশের এই পণ্ডিতপ্রবর মানুষদের পোকার চেয়ে একটুও বড় বলে মনে হয় না। ওদের বুঝিয়ে বলা যায় না, যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর সভ্যতার সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্বর চিরসত্যের কোনো সংঘাত নেই।

হাঁটতে হাঁটতে এসে লাবুর গুহার উপরে উঠে এলাম।

পাথরটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, যেমন করে ঢুকেছিলাম লাবুর সঙ্গে, তেমন করে।

ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম।

উপরের পাথরটা সরাতেই আলোয় ভরে গেল গুহাটা।

ভিতরে সাদা পাথরের উপর কাঠ কয়লা দিয়ে লাবু লিখেছে—১। মা ২। সুকুদা।

তারপর আমার নামটা কেটে তার পাশে লিখেছে, নুড়ানি। তারপর তিন নম্বর দিয়ে আবার আমার নাম লিখেছে।

গুহাটার মধ্যে এক কোনায় একটা মেয়েদের লালরঙা চুল-বাঁধা ফিতে, একটা ভাংগা ছোট আয়না এবং হলুদ-রঙা কাঁচা কাঠের একটা মেয়েদের চুল আঁচড়াবার কাঁকই পড়ে আছে।

ফিতেটা তুলে ধরে দেখলাম, ফিতেটা নতুন নয়, ব্যবহার করে করে নোংরা হয়ে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। কাঁকইতে কতগুলো সোনালি রঙা লম্বা লম্বা চুল লেগে আছে।

লাবুর চুল বাদামী, সোনালি নয়; এবং এত লম্বাও নয়। এ নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের চুল।

ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল। শম্বর বা বড় হরিণ দ্রুত দৌড়ে এলে যেমন আওয়াজ হয় খুরের, তেমন আওয়াজ।

উপরের ফুটো দিয়ে জংগলের যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আওয়াজটা একেবারে কাছে এসে গেল, এসে থেমে গেল।

অবাক হয়ে দেখলাম, বড় বড় লোম-ওয়ালা একটা সাদা টাট্টু ঘোড়ার উপর একটি রুক্ষ বেদেনী মেয়ে বসে আছে।

তার বয়স বেশী নয়—বড় জোর চোদ্দ পনেরো। গায়ের রঙ খুব তামাটে—দুদিকে দুই বিনুনী—সোনালি চুলে ভরা, একটা হলুদ রঙের জামা এবং কয়েরী ঘাঘরা পরা। ঘোড়াটার পিঠে মেয়েটি একদিকে দু'পা দিয়ে বসেছিল।

ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ে কান নাড়াচ্ছিল।

দুপুরের রোদ তার বড় বড় লোম-ওয়ালা সাদা শরীরে পিছলে যাচ্ছিল।

ঘোড়াটা নাক দিয়ে একবার ঘোঁত ঘোঁত করে শব্দ করল। ঐ শব্দে ভয় পেয়ে আশে-পাশের গাছের ছায়ায় বসে-থাকা একদল টুই পাখি একসঙ্গে পিট্টি-টুই, পাঁটি-টুই করে উড়ে কতগুলো সবুজ পুঁটলির মত সবুজতর জংগলের পট-ভূমিতে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ মেয়েটি ডাকল, আকুল ভাংগা গলায়, লাবু; লাবু!

আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটা

দৌড়ে এল। দৌড়বার সময় ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘাঘরাটা ফুলে উঠে দুলতে লাগল। আর ওর সোনালি বেণী দুটো ওর পেছনে সমান্তরালভাবে উড়তে লাগল।

খালি পায়ে মেয়েটা পাথর টপকে টপকে পাহাড়ি ছাগলের মত এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে আসতেই দেখলাম, মেয়েটার হাতে কাঁচা শালপাতায় মোড়া কি যেন আছে। হয়ত কোনো খাবার টাবার হবে।

যখন খুব কাছে এসেছে ও তখন আমি হামাগুড়ি দিয়ে গুহার বাইরে এলাম—কারণ তা না হলে গুহার মধ্যে ও চলে এসে লাবুকে না দেখে আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই ভয় পেত।

আমি বেরিয়ে গুহার উপরে উঠতেই মেয়েটা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই ভয়ে বিস্ময়ে হাতের জিনিসটা ফেলে দিয়ে ও আবার [illegible] সুন্দর পায়ের আওয়াজ দিয়ে [illegible] এক দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় উঠল।

তারপর দু'পা একদিকে দিয়ে বসে ও সেই অবাক জংগলে এত জোরে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সেই ঝকঝকে রোদ্দুরের আলো ভরা সাদা ঘোড়ায় চড়ে [illegible]

যত বেশী, তাকে এই কষ্টটা তত বেশী করে বাজে। অফিসারের ছলে মাথা নোয়াতেও বাজে।

কোলকাতায় ফেরার কথা আমি ভাবতে চাই না। ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। এখানের ঘননীল আকাশ, রোদ্দুরে স্নিগ্ধ-শান্তিতে শুয়ে-থাকা পাহাড়, বন, চরে-বেড়ানো গরু মোষের গলার ঘণ্টার ঢুংগুং ঢুংশব্দের মধুর আওয়াজ, কোনো ছোট পাখির চিকন গলার ডাক, সব আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় যে কোলকাতাটাই সত্যি, এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জের এই জগৎটাই মিথ্যা। একজন পাকা এসকেপিস্টের মত বারে বারেই দারিদ্র ছেড়ে, টেনশান ছেড়ে, গলার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে আমি জঙ্গলে পালিয়ে আসি। কিন্তু কে যেন আমাকে ধরে আবার খোঁয়াড়ে পুরে দেয়, গলায় দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার জোয়ালে জুড়ে দেয়।

যে তা করে, সে কে? সে ত আমার বুকের মধ্যেই বাস করে, সে ত আমারই মনের একটা হিসাবী স্থূল অংশ। তবুও তার কাছ থেকে আমার এ জন্মে নিস্তার নেই। কেন?

সেদিন শেষ দুপুরবেলা জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

দুপুরের ঝকমকে রোদে বনপাহাড় হাসছিল। দুপুরের শীতের বনের গায়ের একটা বিশেষ গন্ধ আছে। বিয়ের পর রমার গায়ে যেরকম গন্ধ পেতাম। মনে হত, একটা অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পৃথিবী শুধু আমার—শুধু আমারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে। এই দুপুরের নিস্তব্ধ, গুনগুন কাঁচ-পোকা-ওড়া জঙ্গলে এলে সেইসব পুরোনো শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ সবকিছু মনে পড়ে যায়। কেন জানি না, লতায় লতায়, ঝরা-ফুলে, উড়ে-যাওয়া পাখির ডানায় চুমু খেতে ইচ্ছে করে। সমস্ত দুপুরের বনকে ছুটের

কবোষ্ণ বুকের মত আমার মুঠোর মধ্যে ধরে থাকতে ইচ্ছা করে—একান্ত মালিকানায়। এই আশ্চর্য সবুজ শালীন সৌন্দর্যের ভাগ আমার অন্য কাউকেই দিতে ইচ্ছে করে না। ভীষণ স্বার্থপরের মত আমার একারই করে রাখতে ইচ্ছা করে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে অন্যমনস্কে লাবুর সেই ডেরায় পৌঁছে গেছিলাম জানি না। ওখানে পৌঁছতেই লাবুর কথা মনে পড়ল। লাবু এখনও মান্দারে। আমি মাঝে একদিন গিয়ে দেখে এসেছিলাম ওকে। এখন ভাল আছে। আরও দিন চারেক লাগবে ভাল হয়ে উঠতে।

লাবুর অসুখে আমি যে কিছু করতে পেরেছি তার জন্যে আমার খুব আনন্দ হয়। কষ্ট করে, রাত দুটো অবধি লাইব্রেরীতে বসে পরদিন সারাবেলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে মেহনতের রোজগার—সেই মেহনতের টাকা কোনো যোগ্য কাজে লাগলে মন ভরে ওঠে।

মিস্টার বয়েলসকে আমি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা দিচ্ছি প্যাটের মাধ্যমে। এতে আমার যে কী আনন্দ হয় তা কি বলব। আমি জানি, উনি বেশীদিন বাঁচবেন না—তাই একজন মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে হাসিমুখে রওয়ানা করানোর মধ্যে একটা দারুণ গায়ে-কাঁটা-দেওয়া আনন্দ পাই।

এ যুগে জন্মেও আমি খুবই সেকেলে রয়ে গেছি। আমি ভগবানে গভীরভাবে বিশ্বাস করি। তাঁর উপর কোনোরকম ভরসা রাখি না বা তাঁর কাছে কিছু চাই না, কিন্তু আমাদের উপরে যে একজন অবিসংবাদী কেউ আছেনই তা নিশ্চয় করে বুঝতে পারি। তাঁর কাছে হাততালি পাবার জন্যে আমি কিছুই করি না, পরজন্মের সুখের ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামের জন্যেও নয়। করতে ভাল লাগে, তাই করি।

আমার সাহেব বন্ধুরা বলে, 'ঊ আর এ মিসফিট ইন দিস ওয়ার্ল্ড।' আমার বক্তব্য কিন্তু ওদের কখনও বুঝিয়ে বলিনি। ওরা কি করে জানবে, তারা-ভরা আকাশের নীচে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাচায় বা হঠাৎ কোনো তারা-খসে যাওয়া দেখলে কেমন মনে হয়। সেই সব অন্ধকার রাতের স্তব্ধতার মধ্যে বসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করে চারপাশের এই পণ্ডিতপ্রবর মানুষদের পোকার চেয়ে একটুও বড় বলে মনে হয় না। ওদের বুঝিয়ে বলা যায় না, যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর সভ্যতার সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্বর চিরসত্যের কোনো সংঘাত নেই।

হাঁটতে হাঁটতে এসে লাবুর গুহার উপরে উঠে এলাম।

পাথরটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, যেমন করে ঢুকেছিলাম লাবুর সঙ্গে, তেমন করে।

ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম।

উপরের পাথরটা সরাতেই আলোয় ভরে গেল গুহাটা।

দেখি, সাদা পাথরের উপর কাঠ কয়লা দিয়ে লাবু লিখেছে—১। মা ২। শংকুদা।

তারপর আমার নামটা কেটে তার পাশে লিখেছে, নুড়ানি। তারপর তিন নম্বর দিয়ে আবার আমার নাম লিখেছে।

গুহাটার মধ্যে এক কোনায় একটা মেয়েদের লালরঙা চুল-বাঁধা ফিতে, একটা ভাঙা ছোট আয়না এবং হলুদ-রঙা কাঁচা কাঠের একটা মেয়েদের চুল আঁচড়াবার কাঁকই পড়ে আছে।

ফিতেটা তুলে ধরে দেখলাম, ফিতেটা নতুন নয়, ব্যবহার করে করে নোংরা হয়ে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। কাঁকইতে কতগুলো সোনালি রঙা লম্বা লম্বা চুল লেগে আছে।

লাবুর চুল বাদামী, সোনালি নয়; এবং এত লম্বাও নয়। এ নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের চুল।

ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল। শম্বর বা বড় হরিণ দ্রুত দৌড়ে এলে যেমন আওয়াজ হয় খুরের, তেমন আওয়াজ।

উপরের ফুটো দিয়ে জঙ্গলের যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আওয়াজটা একেবারে কাছে এসে গেল, এসে থেমে গেল।

অবাক হয়ে দেখলাম, বড় বড় লোম-ওয়ালা একটা সাদা টাট্টু ঘোড়ার উপর একটি রুক্ষ বেদেনী মেয়ে বসে আছে।

তার বয়স বেশী নয়—বড় জোর চোদ্দ পনেরো। গায়ের রঙ খুব তামাটে—দুদিকে দুই বিনুনী—সোনালি চুলে ভরা, একটা হলুদ রঙের জামা এবং কালো ঘাঘরা পরা। ঘোড়াটার পিঠে মেয়েটি একইদিকে দু'পা দিয়ে বসেছিল।

ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ে কান নাড়ছিল।

দুপুরের রোদ তার বড় বড় লোম-ওয়ালা সাদা শরীরে পিছলে যাচ্ছিল।

ঘোড়াটা নাক দিয়ে একবার ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে শব্দ করল। ঐ শব্দে ভয় পেয়ে আশে-পাশের শালের চাঁদোয়ায় বসে-থাকা একদল টুই পাখি একসঙ্গে পিটা-টুই, পীটি-টুই করে উড়ে কতগুলো সবুজ পুঁটকির মত সবুজতর জঙ্গলের পট-ভূমিতে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ মেয়েটি ডাকল, ভাঙা ভাঙা গলায়, লাব্বু; লাব্বু।

আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটা তড়াক করে লাফিয়ে নেমে, ঘোড়াটাকে [illegible]

দৌড়ে এল। দৌড়বার সময় ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘাঘরাটা ফুলে উঠে দুলতে লাগল। আর ওর সোনালি বেণী দুটো ওর পেছনে সমান্তরালভাবে উড়তে লাগল।

খালি পায়ে মেয়েটা পাথর টপকে টপকে পাহাড়ি ছাগলের মত এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে আসতেই দেখলাম, মেয়েটার হাতে কাঁচা শালপাতায় মোড়া কি যেন আছে। হয়ত কোনো খাবার টাবার হবে।

যখন খুব কাছে এসেছে ও তখন আমি হামাগুড়ি দিয়ে গুহার বাইরে এলাম—কারণ তা না হলে গুহার মধ্যে ও চলে এসে লাবুকে না দেখে আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই ভয় পেত।

আমি বেরিয়ে গুহার উপরে উঠতেই মেয়েটা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই ভয়ে বিস্ময়ে হাতের জিনিসটা ফেলে দিয়ে ও আবার ঘাঘরা উড়িয়ে তার বাদামী সুন্দর পায়ের আভাষ দিয়ে বেণী দুলিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় উঠল।

তারপর দু'পা একদিকে দিয়ে বসে ও সেই অবাক জঙ্গলে এত জোরে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সেই ঝকঝকে রোদ্দুরের মধ্যে তার সাদা ঘোড়ায় চড়ে চলে-যাওয়াটা একটা

হুলোর নিশানা অন্তত আমার চোখে লেগে রইল।

এতক্ষণ জেনে বুঝলাম যে, এই নতুনানী—এর লাবুর ভালোবাসার জিম্মে আমাকে পরাভূত করে আমার পায়ের উপরে হত্যার অনুসন্ধান করবে।

ইটাটিকারীর জঙ্গল কোন্ দিকে, কতদূরে: তা আমি জানি না। এই বেদেরা কি ভাষা বলে তাও আমি জানি না। মেয়েটি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ডাকছিল লাব্বু, লাব্বু, করে লাবুকে। বেদেদের ভাষা নিশ্চয়ই হিন্দীও নয়, বাংলাও নয়। তবে লাবু এবং মেয়েটি যে ভাষায় দুজনে দুজনের মনে পৌঁছেছে, সেটা কোনো ভাষাবিদের এক্তিয়ারে নয়; সেটা চোখের ভাষা। অথবা হৃদয়ের।

লাবু ভাল হয়ে উঠলে লাবুর সঙ্গেই একদিন এই বেদেদের আস্তানায় যাওয়া যাবে।

কচি শালপাতায় মুড়িয়ে মেয়েটি লাবুর জন্যে কি এনেছিল দূর থেকে তা বোঝা গেল না।

আমি নেমে গিয়ে শালপাতার আবরণ ভেদ করে আবিষ্কার করলাম।

দেখি খুব মোটা একটা রুটি। এরকম রুটি আমরা খাই না। দেখতে অনেকটা পাটনাই বাখরখানী রুটির মত। আর সঙ্গে একটা ঝলসানো তিতির।

এর গ্রান্ডায় কোনো খাবারই নষ্ট হয় না। তাই আমি লাবুকে রাজপ্রাসাদ ভাল করে বন্ধ করে ফেরার সময় লাবুদের বাড়ি গিয়ে লাবুর ভাই ভাবুকে ওগুলো দিলাম, বললাম তুমি খেও। আর লাবু এলেই লাবুকে বলো যে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে আসব। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।

আর কিছু বলা গেল না। লাবু যখন আমার নাম এখনও ওর ভালোবাসার জিম্মে রেখেছে, তখন ওর প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার উচিত হবে না ভাবলাম।

ফেরবার সময়, কেবলি মেয়েটির নামটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। নুড়ানী; নুড়ানী।

লাবুর জন্যেও যে এই বনে পাহাড়ে নুড়ানীর মত একজন বেদেনী সমব্যথী থাকতে পারে তা আজ ঐ গুহায় না গেলে ত বিশ্বাস করতাম না, বিশ্বাস করতে চাইতামও না।

লাবুর গুহা থেকে বেরিয়ে কিছুদূরে আমার পথ হুঁশ হল যে পথ হারিয়ে ফেলেছি জঙ্গলে।

একটা বড় সেগুন গাছের নীচে এসে আমার ডানদিকে মোড় নেবার কথা ছিল, কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্যে তা নিতে ভুলে যাওয়ায় এখন একেবারে অচেনা এক বনে এসে পড়েছি।

সূর্যের দিকে চেয়ে কোন দিকে গেলে আমার বড় রাস্তায় গিয়ে উঠব তার একটা আন্দাজ করে নিয়ে এগোতে লাগলাম আস্তে আস্তে। এখনও বেলা আছে অনেক। ভাবনার মত কিছু হয়নি।

বেশ অনেকক্ষণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটার পর হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা বাড়ি। রঙ-চটা শ্যাওলাধরা জরাজীর্ণ একটা বাড়ি।

বাড়িটা ডালপালার আড়ালে ছিল বলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। বাড়িটার পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছিল।

আরো একটু এগোতেই হঠাৎ চিনতে পারলাম বাড়িটাকে। মিস্টার রয়েলসের বাড়ি। আমি পিছন দিক থেকে আসার জন্যে প্রথমে বুঝতে পারি নি। বাড়িটার কাছে এসেও তাতে কোনো প্রাণের আভাস দেখতে পেলাম না, গতবারের মতন।

কিন্তু কিচেনটা পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ কানে গেল কে যেন তীক্ষ্ণ অথচ ঘুম ঘুম গলায় কার সঙ্গে কথা বলছে। তখনও চিনতে পারিনি মিস্টার রয়েলসের গলা বলে।

বাড়িটার দৈর্ঘ্য পেরিয়ে সামনের বারান্দার পাশে এসেই চমকে গেলাম। আমি রাবার-সোলের জুতো পরে হাঁটছিলাম—বাড়ির আশে-পাশে শুকনো পাতাও ছিলো না—তাই আমার পায়ের শব্দ বোধহয় কারুরই কানে যায় নি। চমকে গেলাম এই জন্যে যে, বৃদ্ধ অনর্গল একা একা বৃদ্ধা লুসির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন।

লুসি মিস্টার রয়েলসের সেই ক্ষয়ে-যাওয়া ইজিচেয়ারের পাশে তাঁর পায়ের কাছে বসে আছে। মিস্টার রয়েলস ও লুসি, দুজনের চোখই বিকেলের ম্লান জঙ্গলের দিকে। ওঁদের কাছে শুধু আমার অস্তিত্ব কেন, ওঁদের পিঠের পিছনে যে প্রাণবন্ত সজীব সশব্দ সুন্দর সবুজ পৃথিবীটা আছে সে সম্বন্ধে ওঁরা দুজনেই যেন সচেতন নয়। অথবা সচেতনভাবে অচেতন। দুজনের চোখই দিনশেষের ক্ষয়িষ্ণু গোধূলির পূবের আকাশে।

বৃদ্ধের কোলের উপর ছোট্ট একটা বই, বৃদ্ধ পড়ছিলেন, যেন লুসিকে শোনবার জন্যেই—

"We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. The Lord gave and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord".

বৃদ্ধ এই অবধি পড়ে থেমে গেলেন, তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

আমার পা সরছিল না। ঐ কথাগুলোর তীক্ষ্ণ গভীরতা, ঐ পরিবেশে মৃত্যুপথ-যাত্রী এক বৃদ্ধ মানুষ এবং বৃদ্ধা বোবা কুকুরীর করুণ অসহায় অস্তিত্বের সামনে

দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থাতে [illegible] যেন কি এক ব্যথা-তুর তাঁর [illegible] আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃদ্ধ আবার পড়তে লাগলেন,

"Man that is born of a woman hath but a short time to live, and is full of misery. He cometh up and is cut down, like a flower; he fleeth as it were a shadow, and never continueth in one stay.
In the midst of life we are in death......."

এই অবধি পড়া হতেই লুসি হঠাৎ পাশ ফিরে তাকাল, তাকিয়েই আমাকে দেখতে পেয়ে ক্ষীণ ভুক্‌ ভুক্‌ স্বরে ডেকে উঠল।

মিস্টার বয়েলস মুখটা ঘোরালেন। মনে হল, মুখটা ঘোরাতে যেন তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগল। উনি বললেন, ও, ইটস ইউ। কাম, কাম ইন মাই গুড ইয়াং ফ্রেন্ড।'

আমি বারান্দায় উঠে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, এটা কি বই? কি পড়ছিলেন আপনি?

মিস্টার বয়েলস বললেন, এটা বাইবেল।

কি পড়ছিলেন আপনি?

পড়ছিলাম, 'দা অর্ডার ফর দা ব্যোরিয়াল অফ দা ডেড্‌।'

কেন জানি না, হঠাৎ আমার গা শিউরে উঠল।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই মিস্টার বয়েলস্‌ বললেন, তোমার জন্যে একটু চা করি।

আমি না, না করে ওঠার সংগে উনি বললেন, আমিও খাব, তোমার একার জন্যে কষ্ট ত করছি না। এই সময়ই ত চিরদিন চা খাই।

বাইবেলটাকে চেয়ারের উপরে রেখে উনি খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ভিতরে গেলেন। লুসিও ও'র সংগে সংগে গেল।

বইটা খুলে নিয়ে দেখলাম, পেজ-মার্ক দেওয়া আছে জায়গাটাতে। সত্যিই একটা আলাদা চ্যাপটার—'দা অর্ডার ফর দা ব্যোরিয়াল অফ দা ডেড্‌'।

বইটির পাতা উল্টে পড়তে পড়তে দেখলাম, কতগুলো জায়গায় আন্ডারলাইন করা আছে।

আমি ভিতরে গিয়ে চায়ের সেই ক্যাক্‌টাস-কাটা ট্রেটাকে নিয়ে বারান্দায় এলাম।

তারপর ভিতর থেকে একটা চেয়ারও নিয়ে এলাম।

চা বানালাম। মিস্টার বয়েলসকে দিলে, নিজে নিলাম।

চা খেতে খেতে বললাম, আপনি এসব পড়ছেন কেন? তাড়া কিসের? তাছাড়া যে মারা যায় তার জন্যে ত এসব নয়। যাঁরা তাঁকে কবর দেবেন, তাঁদেরই বলবার ও গাইবার জন্যে।

মিস্টার বয়েলস হাসলেন।

সেই বিকেলে তাঁর হাসি অদ্ভুত দেখাল।

উনি বললেন, কাল রাতে একটা দারুণ স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, যমদূত একটা কালো আলখাল্লা পরে এসে হাতে একটা দাবার ছক নিয়ে এসে বলছে, আমার সঙ্গে দাবা খেলতে হবে তোমার।

আমি তাকে জিগেস করলাম, খেলে কি হবে?

সে বলল, খেলে কিছু হবে না। কিসেই বা কি হয়? সমস্ত জীবনটাই যেমন মিছিমিছি খেলা খেললে; তেমনই খেলবে। এত খেলা ত খেললে সারা জীবন, দারুণ সীরিয়াসলি খেললে। খেলে কি হল? কিছুতেই কিছু হয় না, তবু ত সকলে খেলে এবং এমনভাবে খেলে যেন খেলাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ—খেলার সার্থকতা বা বিফলতার মধ্যেই মানুষের অমরত্ব। সব বাজে, সব মিছিমিছি খেলা; এবার এসো শুরু করি।

আমি অবাক গলায় বললাম, আশ্চর্য! ঠিক এরকম একটা ঘটনা বার্গম্যানের একটা ফিল্মে দেখেছিলাম—সমুদ্রের পাড়ে একটা পাথরের উপর বসে ফিল্মের নায়ক মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলছে।

কোথায় দেখেছিলে? মিস্টার বয়েলস শুধোলেন।

আমি বললাম, অনেকদিন আগে কোলকাতায় দেখেছিলাম, বার্গম্যানের ছবি, একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে।

যাই হোক আপনি কি করলেন? খেললেন?

হ্যাঁ। খেললাম। বললেন, মিস্টার বয়েলস।

তারপরই বললেন, এবং হেরে গেলাম। হেরে যেতেই, যমদূত ছক গুটিয়ে উঠে পড়ে বলল, আমার এবার যেতে হবে, অনেক খেলা খেলতে হবে—মিছিমিছি। তৈরী থেকো: ফিরে আসছি।

আমি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। কথা বললাম না কোনো। তারপর বললাম, আপনি তাহলে ভাবছেন আপনার এখনি যেতে হবে।

এক্ষনি অথবা যখনি ডাক আসে। মিস্টার বয়েলস বললেন।

আমি বললাম, সত্যি করে বলুন ত, আপনার এই নির্লিপ্তি কি সত্যি? সত্যিই কি আপনি মরলে দুঃখী হন? মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি সত্যিই কি এমন উদাসীন?

উনি বললেন, [illegible] হই, কিন্তু আমাদের [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] হচ্ছে [illegible] [illegible] সত্যিই [illegible] সান্ত্বনা—আর্থ টু আর্থ, অ্যাশেস টু অ্যাশেস ডাস্ট টু ডাস্ট: [illegible]

স্যার্টেন হোপ অফ দা রেসারেকসান টু এটার্নাল লাইফ'।

কেন জানি না, মিস্টার বোস, এই শেষ প্রহরে আমার মন কেবলই বলছে—বারে বারেই বলছে; সব মিথ্যে কথা। রেজারেক-শান বলে কিছুই নেই, আমাদের প্রত্যেকের, আমার তোমার, আমাদের একটাই এবং একমাত্র একটাই জীবন। আমার মোম গলে গেছে। তোমার মোম এখনও নতুন। তাই তুমিও ফুরিয়ে যাবার আগে একটা কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি—। এই জীবনে কখনও ভুলেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু কোরো না। যা মন থেকে, হৃদয় থেকে করতে না চাও, তা কখনও কোরো না। কারো কথাই শুনো না, বিবেকের না, সমাজের না, এমনকি বাইবেলেরও না।

আর একটা কথা; জীবনে যা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বোধ দ্বারা বিবেচনা করে করেছ, করে ফেলেছ; কখনও তা নিয়ে আপসোস কোরো না। যাই করো না কেন, যা করেছ, তার জন্যে কারো কাছে ক্ষমা চেও না; নিজেকে অভিশাপ দিও না। যা করেছ, তা ঠিকই করেছ বলে মনে কোরো। সব সময় মনে কোরো।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

তারপর বললাম, আপনি আপনার এই ফুরিয়ে-যাওয়ার বাবদে এতই নিশ্চিত জেনে একটা কথা জিগ্‌গেস করতে খুব ইচ্ছা করছে আপনাকে। জবাব দেবেন?

বল, বল; বলে ফেল নির্দ্বিধায়। মিস্টার বয়েলস বললেন।

আমি শুধোলাম, জীবনের শেষ সীমায় এসে আমাদের এই জীবনটাকে আপনার কেমন মনে হয়? এই অভিজ্ঞতাকে জীবনেরই আর অন্য কোনও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা যায় কি? সেরকম কোনো তুলনা কি মনে আসে জীবনের শেষে এসে?

মিস্টার বয়েলস আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, একথা আমিও অনেকবার ভেবেছি, মনে মনে এ প্রশ্ন নিয়ে অনেক নাড়া-চাড়াও করেছি, কিন্তু কখনও কেউ এমন করে জিগ্‌গেস করেনি বলে জবাব দেওয়া হয়নি। ভাবনাটাও দানা বাঁধেনি। বোধহয় ঠিক ভাবে বলতে পারব না। তবে আমার যা মনে হয়েছে, বলছি। আমার সঙ্গে, কি অন্য কারো সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতার মিল নাও থাকতে পারে। তবে আমার কথা সেদিনই মিলিয়ে দেখতে পারবে, যেদিন তুমি আমার আজকের অবস্থায় পৌঁছবে। তার আগে আমার কথা যাচাই করার সুযোগ পাবে না কোনো।

এই অবধি বলে উনি থেমে গেলেন। চায়ের কাপটা কাঁপা-কাঁপা হাতে নামিয়ে রেখে বললেন, আমার মনে হয় কি জানো যে, জীবন একটা সমুদ্রের মত—বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত—আবর্তময়। জীবন মত্ততায় ভরা ঢেউয়ের সমুদ্র, ঢেউ, তারপর ঢেউ তারপর আরো ঢেউ। এখানে অনেক ফেনা ভুবেখাওয়া পাথরে আছড়ে-পড়া আকার আশ্চর্য-নীল—শান্তও কখনও কখনও। সত্যিই জীবন একটা দারুণ গোলমেলে নোনা-স্বাদে ভরা দুরন্ত অভিজ্ঞতা। আর আমরা, আমরা এই টুকরো টুকরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ সেই সমুদ্রের বুকে-ওড়া ছোট নরম সাদা সী-গালেদের মত। আমরা সমুদ্রকে ভয় পাই; আবার ভয় পাইও না। আমরা ছোট অথচ তবু বারে বারে সমুদ্রে ছোঁ মারি। কখনও মাছ পাই; কখনও বা পাই না, কখনও বা সমুদ্রপারের গুহার নীড়ে ফিরতে পারি; কখনও না ঝড়ে-পড়ে জলে পড়ি ডানা-ভেঙে। অথচ তবুও, আমরা সীগালেদের মতই। তাই উষ্ণ হোক, শীতল হোক মাতাল হোক, শান্ত হোক, সমুদ্রই আমাদের জীবন—এই জীবনের জন্যেই আমাদের আকুতি, কান্না; আমাদের সমস্ত প্রার্থনা। এই জীবনকেই আমাদের ঘৃণা, আমাদের ভালবাসা, এর মধ্যেই বার বার ছোঁ-মেরে নামা, বারেবার কাছে এসেই আবার দূরে উড়ে যাওয়া।

আমার মনে হয় না, যে এক-জীবনে জীবনের এই অতল সুনীল তলে কি আছে তা কেউ বুঝে যেতে পারে। বোঝা শেষ হয় না বলেই বোধহয়, সমুদ্রের নোনা-স্বাদ, হু হু হাওয়া ছেড়ে অন্য অজানা গন্তব্যে যেতে, যাবার সময় ভারী ভয় করে। মনে ভয় হয় যাবার দিনে, যে, এই বুঝি শেষ—আর বুঝি কখনও ফেরা হবে না। তখন, কেবল সেই শেষের দিনেই বার বার মনে হয়, তবে কেন এ সমুদ্রে মনের সুখে অবগাহন চান করলাম না, কেন যা চেয়ে-ছিলাম তাকে তেমন করে চাইলাম না, যা চাইনি তাকে তেমন করে লাথি মারলাম না; কেন মিথ্যে রেসারেকশানের মোহে পড়ে এই জীবন, এই একটাই রহস্যময় সুন্দর ও বীভৎস জীবনকে ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে উপভোগ করতে করতে পাড়ি দিলাম না। সারা জীবন কিসের ভয়, কিসের সংকোচ, কিসের দ্বিধা নিয়ে, কোন মিথ্যা পুণ্যের লোভে নিজেকে এমন করে ঠকালাম?

এই অবধি বলে, মিস্টার বয়েলস আমার দিকে তাকালেন। উনি হাঁপাচ্ছিলেন।

একটু পর উনি বললেন, কি জানি ঠিক বললাম কিনা। ভয় হচ্ছে, বানিয়ে বললাম না ত?

আরো অনেকক্ষণ আমি ওখানে বসে রইলাম।

একটা ভয়াবহ বিষণ্ণতা আমাকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার জীবন ভয় করতে লাগল, এই বুঝি কালো-আলখাল্লা-পরা যমদূত ফিরে এসে আমাকেও গাধা খোঁজে ধরে।

মৃত্যুর শমন যার উপর জারী হয়ে গেছে, তেমন কারো মুখোমুখী বসে থাকা বড় অস্বস্তিকর। আমার জীবনের পরম, শেষ ও অমোঘ সত্যকে সামনাসামনি দেখতে আমার ভয় করছিল।" আমি কেন ভুল করে এখানে এসে পড়লাম এই বিকেলে, কেবল তাই-ই ভাবছিলাম।

মিস্টার বয়েলস, বারান্দার এক কোনায় রাখা কানা-উঁচু থালায় লুসিকে গরম চা ঢেলে দিলেন। লুসি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে চক্‌চকিয়ে সেই চা খেতে লাগল তার কুৎসিত জিভটা বের করে।

আমি বললাম, আমি এবার উঠব।

মিস্টার বয়েলস বললেন, এসো। থ্যাংক উ্য ফর কামিং। প্যাটকে বোলো আমার জন্যে যেন কোলকাতার চ্যারিটেবল ট্রাস্টএ তদ্বির না করে। মনে হয়, আর কারো চ্যারিটিরই আমার দরকার হবে না।

আমি যখন উঠে আসছি, তখন উনি তাঁর শীর্ণ রগ-উঁচু, হাড়-বের-করা ঠান্ডা হাতে আমার হাত ধরে বললেন, থ্যাংক উ্য মাই বয়, থ্যাংক উ্য ফর এভরীথিং উ্য হ্যাভ ডান্ ফর মী। আই ওনলি উইশ, আই ওয়্যার ডেড্ আ লং এগো। থ্যাংক উ্য ফর দা লিটল ওয়ার্মথ এট দা কোল্ডেস্ট আওয়ার"।

আমি হেঁটে আসছিলাম মিস্টার বয়েলসএর বাড়ি থেকে বেরিয়ে।

সূর্য ডুবে গেছে।

পশ্চিমাকাশে একটা ম্লান আলোর আভা ঝুলে রয়েছে শুধু।

পাখিরা ডাক দিতে দিতে যে যার নীড়ে ফিরেছে, গরু মোষেরা গলার ঘন্টা দুলিয়ে পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে ফিরে গেছে ওঁরাও রাখাল ছেলেদের সঙ্গে যে যার গ্রামে—। এখন উষ্ণতা শেষ হয়ে গেছে—। এখন শীত ঃ শীতের বেলা এখন থেকে।

দূরে থেকে চামার লাল মাটির পথটা দেখা যাচ্ছিল। মধ্যে একফালি টাঁড়।

পাটকিলে টাঁড়ের শেষে ফ্যাকাশে লাল পথটা একটা অতিকায় সরীসৃপের মত শুয়ে আছে নির্জীব।

হঠাৎ ঐখানে এক মুহূর্তের জন্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটি দিনের মৃত্যু ও একটি রাতের জন্মের ক্ষণিক পরিসরে আমি মাথার মধ্যে এক সুস্ত সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস শুনতে পেলাম।

এখন সব পাখি নেমে গেছে। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে প্রকৃতির সমস্ত শরীর। এই মুহূর্তটুকু পেরিয়ে গেলেই ঝিঁঝিরা ডেকে উঠবে, রাত-চরা পাখিরা বুকের মধ্যে চমক তুলে চমকে চমকে ডেকে বেড়াবে পাহাড়তলিতে। শুধু এখন এই ক্ষণটিতে; সমস্ত জীবন স্তব্ধ, অনিশ্চিত।

হঠাৎ এই উষ্ণতা ও শীতার্তার মধ্যবর্তী শূন্য মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আমাকে বলল, একটা দিন ঝরে গেল, একটা ফুল ঝরে গেল। বলে উঠল, যতদিন বাঁচো, প্রাণপণভাবে বাঁচো, বাঁচার মত বাঁচো, বেঁচে থাকো, প্রতিটি মুহূর্তে বাঁচো ঃ হাঁটার জন্যেই শ্লথপায়ে হেঁটো না—কোনো এক বা একাধিক গন্তব্য খুঁজে নিয়ে সেদিকে প্রাণপণ দৌড়োও। বেলা ফুরিয়ে আসছে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে ঃ তাড়াতাড়ি দৌড়োও।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, পরমুহূর্তেই আমি দৌড়চ্ছি—অন্য দিকে, বিপরীত দিকে—যে দিকে মৃত্যু নেই, মিস্টার রয়েলস-এর মত কোটরগত-চক্ষু [illegible]—যমদূতের দাবা-খেলার সঙ্গী কেউ নেই—যেদিকে অন্ধকার নেই।

দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে দেখলাম দূ—রে আলো দেখা যাচ্ছে। কোনো সাহেববাড়ির আলো। দেখলাম একটা আলোকিত বাড়ি—বুকের মধ্যে অনুভব করলাম, সেখানে ঘরের মধ্যে উষ্ণতা, ঘরের মধ্যে ভালোবাসা; একজন প্রেমিক পুরুষ, একজন প্রেমিকা নারী; সেখানে জীবন। বাইরে শীত। বাইরে অন্ধকার। আমি জোরে সেদিকে, আলোর দিকে, দৌড়ে চললাম।

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ
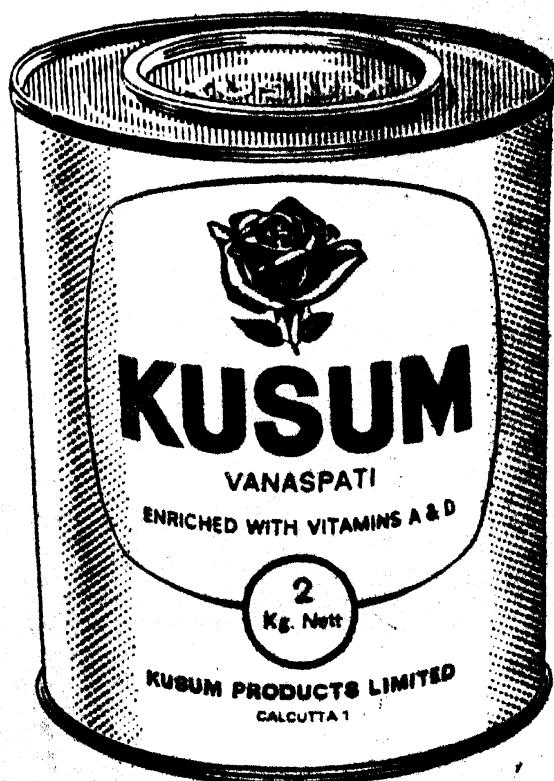
অতীতে যে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ে সারা কলকাতা তথা বাংলাদেশ একদিন মুখর হয়ে উঠেছিল, ইউরোপের বহু ভাষায় যে গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল, এবং যে গ্রন্থ সম্বন্ধে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একবার বলেছিলেন, 'এ সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই।' সেই সুখ্যাত নাটক রচনা করেন রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর। নীলকর সাহেবদের অকথিত অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে লেখা এই বিয়োগান্ত নাটক 'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর প্রথম রচনা হলেও, তিনি 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'নবীন তপস্বিনী', 'কমলে কামিনী', 'সুরধুনী কাব্য', 'দ্বাদশ কবিতা', 'লীলাবতী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও রচনা করেন।

দীনবন্ধু মিত্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছিলেন অভিন্নহৃদয় অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি 'প্রভাকর' নামক তৎকালীন একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল 'গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র'। তিনি সেই নাম পরিবর্তন করে, কলকাতার স্কুলে পড়বার সময়, দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। বাল্যকালে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করেও, ভবিষ্যতে তিনি যে প্রভূত নাম যশ প্রভৃতি ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তা তাঁর জীবনের ঘটনাবলীই প্রমাণ করে।

এই চৈত্র মাসেই (১২৩৬) দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১২৮০ সালে।

তাঁর মৃত্যুর প্রায় ২৫ বৎসর পরে, ১৩০৫ সালের 'প্রদীপ' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় তাঁর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেটির অংশবিশেষ আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। বহু তথ্য-সম্বলিত এই প্রবন্ধ ৭৫ বৎসর পূর্বে একজন কবি, সাহিত্যিক ও নাটককারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি অপূর্ব নিদর্শন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

'১২৩৬ সালে চৈত্র মাসে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। যমুনানদীবেষ্টিত চৌবেড়িয়া গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন। তিনি গ্রামস্থ পাঠশালায় পুত্রের লেখাপড়া সমাপ্ত হইলে, তাঁহাকে এক জমিদারী সেরেস্তায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। বালক দীনবন্ধু পিতার ভয়ে কিছুদিন সেই চাকরী করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিখিবার জন্য তাঁহার মন নিতান্তই ব্যাকুল হইতে লাগিল। তাঁহার সমবয়স্ক পাঠশালার সহপাঠিগণ অনেক পূর্বেই লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল। এই সকল কারণে দীনবন্ধুর চাকরী বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তিনি স্বীয় পিতৃদেবের অমতে চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পনের কিম্বা ষোল বৎসর হইবেক।

তৎকালে কলিকাতায় তাঁর পিতৃব্যের এক বাসা ছিল। তিনি তথায় আসিয়া পিতৃব্যপুত্রগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং কষ্টে দিনপাত করিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে পালাক্রমে রন্ধনকার্যও করিতে হইত। কিন্তু তিনি অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

•

কলিকাতায় আসিয়া স্কুলে ভর্তি হইবার সময় তিনি একটি নূতন রকমের কার্য্য করেন। শৈশবে তাঁহার পিতা নামকরণ করেন তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র। দীনবন্ধু, পিতৃদত্ত গন্ধর্ব-নারায়ণ নাম পরিত্যাগ করিয়া নিজের পছন্দমত দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন এবং স্কুলের খাতায় ঐ নাম লিখাইয়া দেন।...

কলিকাতায় তিনি প্রথমে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লং সাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। লং সাহেব তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। কিন্তু তখন দুইজনের কেহই জানিতেন না যে তাঁহাদিগের নাম ভবিষ্যতে একই ঘটনাসূত্রে একত্রীভূত হইবেক। লং সাহেবের স্কুল হইতে দীনবন্ধু মাসিক দুই টাকা মাহিনায় এক স্কুলে ভর্তি হয়েন। স্কুলের মাহিনা তাঁহাকে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা লইয়া সংগ্রহ করিতে হইত। সেই স্কুল হইতে তিনি জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দু কলেজে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন ও সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েন।...

পাঠদশা হইতেই দীনবন্ধু বাঙ্গালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত পত্রিকাসমূহে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, 'প্রভাকরে' দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষভাবে আদৃত হইবার সম্ভাবনা, দীনবন্ধুবাবুর পুত্রগণ বহু যত্নে সেই সকল কবিতার উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।'...

•

তাঁহার চাকুরীর বিষয় বিশেষ বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার শীঘ্র পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার উপরিওয়ালা সিভিলিয়ান সাহেবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান

ও আরব্ধ করিয়াছেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট লুসাই যুদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। [illegible] করিবার জন্য দীনবন্ধু [illegible] গমন করিতে [illegible] অনেক [illegible] বাঙ্গালীর নিন্দা [illegible] যে তাঁহারা বিপদসংকুল [illegible] তাঁহারা সহজে অগ্রসর হয়েন না, কিন্তু দীনবন্ধুবাবু যেরূপ তৎপরতার সহিত ও নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর এই অপবাদ বিমোচন করিতে সক্ষম। লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমনের পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ...তিনি আঠার বৎসর মাত্র চাকরী করিয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে তাঁহার পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

দীনবন্ধুবাবুর চাকরী সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না, কিন্তু রাজকার্য্যানুরোধে তাঁহাকে যেরূপ পরিভ্রমণ করিতে হইত, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হইবে কেন না তাঁহার নাটকের চরিত্র বৈচিত্র্যের সহিত ইহা কতকাংশে সংশ্লিষ্ট। আমরা এক্ষণে তাহার একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিব। একদিন তিনি পালকী করিয়া এক গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলেন। অদূরে এক ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকখানায় কতিপয় ভদ্রলোক সমবেত দেখিয়া, বেহারাকে তথায় পালকী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পালকী তথায় পৌঁছিলে, তিনি পালকী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। বেহারা তাঁহার বাক্স তাঁহার সমীপে রাখিয়া দিল। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া এক বিশেষ দরকারী রিপোর্টের অবশিষ্টাংশ নিবিষ্টচিত্তে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে পাত হইয়াছে। সকলে গাত্রোত্থান করিলেন, দীনবন্ধুও সেই সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া একটি পাত দখল করিলেন, সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ভোজনান্তে কথাবার্ত্তা কহিতে দীনবন্ধু স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। গৃহস্বামী তাঁহার এই অযাচিতভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।...

একবার এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে একটি হাস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছে। সমবেত ভদ্র ব্যক্তিগণ নীলদর্পণের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন নীলকুঠীর দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি দীনবন্ধুবাবুকে চিনিতেন না, সুতরাং দেওয়ানী ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, পুস্তকের ঘটনা এবং বর্ণনাগুলি এমনি ঠিক ঠিক হইয়াছে, যেন বোধহয় 'শা—' আমাদের কুঠীর ভিতরে বসিয়া পুস্তক লিখিয়াছে। এই বাক্যের পর গৃহস্বামী দেওয়ান মহাশয়কে দীনবন্ধুবাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। দেওয়ান অত্যন্ত অপ্রতিভ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছেন দেখিয়া গ্রন্থকার বলিলেন যে, 'মহাশয় আপনার গালাগালি আমার বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। কারণ আপনার গালাগালিতে [illegible] [illegible] চিহ্নিত রহিয়াছে।' দেওয়ান মহাশয় আর উত্তর করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তিনি লুসাই যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে মণিপুর, কাছাড়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ ইতিহাস সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই

সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ তাঁহার শেষ নাটক "কমলে-কামিনী'। রাজকার্য্যানুরোধে নানা দেশ পরিভ্রমণে তিনি যে বহুদিগদর্শী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা অমূল্য হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ পরিভ্রমণের ক্লেশ ও শ্রান্তি তাঁহার শরীর ভগ্ন হইবার একটি কারণ।... দীনবন্ধুবাবুর স্বাস্থ্যবিষয়ে তাহাই ঘটিয়াছিল। চল্লিশ বৎসরের কিছু পরেই তাঁহাকে বহুমূত্র রোগে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং তদানুষঙ্গিক বিস্ফোটকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন শরীর হইয়া চুয়াল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন ১লা নভেম্বর, ১৮৭৩ শনিবার। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। তৎপরে যথাক্রমে নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বাদশ কবিতা ও কমলে কামিনী প্রকাশিত হয়।... তিনি স্বীয় পুস্তক মধ্যে বন্ধুগণের নাম প্রবেশ করাইবার সুবিধা পাইলে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। 'জামাই বারিকের' জামাইগণের তালিকায় তাঁহার খ্যাতনামা বন্ধু সকলের নাম সন্নিবিষ্ট আছে। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা 'নবীন তপস্বিনী'তে দেখিতে পাই।

'যদবধি হাঁদাপেট হেরেছি নয়নে,
পূর্ণচন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।'

এই কবিতার শেষ চরণে সাধারণ পাঠক পূর্ণচন্দ্র অর্থে পূর্ণিমার চাঁদ ও কার্ত্তিকের অর্থে ষড়ানন বুঝিয়া থাকেন। অর্থ অতি সুসঙ্গত হয়, কিন্তু কবি পূর্ণচন্দ্র ও কার্ত্তিকেয় শব্দদ্বয়ে তাঁহার অপরূপ-রূপলাবণ্যসম্পন্ন সুন্দরকান্তি বন্ধু কৃষ্ণনগর রাজবংশের দৌহিত্র বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় এবং স্বনামখ্যাত ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত প্রণেতা বাবু কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে কোন কোন স্থলে জীবন্ত ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাক্য অবিকল প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং কোন স্থলে মর্ম্ম ঠিক রাখিয়া ভাষাগত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন।...

এক্ষণে তিনি কি প্রকার লোক ছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। স্বভাবতই লোকের মনে হইবে যে, দীনবন্ধুবাবু কৌতুকপ্রিয় হাস্যরসের অবতারস্বরূপ, আমোদপ্রমোদপরায়ণ হইয়া সরলান্তকরণে প্রাণ ভরিয়া হাসিতেন এবং লোককে হাসাইতেন। একথা সত্য হইলেও একদেশদর্শী। কারণ তিনি যেমন হাসিতে ও হাসাইতে জানিতেন, সেইরূপ কাঁদিতে ও কাঁদাইতেও জানিতেন।... নীলকর-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিজের দুঃখের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন এবং নয়নাসারে লেখনী অভিষিক্ত করিয়া 'নীলদর্পণ' রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে কাঁদাইয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন মনুষ্য জীবন শুধু ক্রন্দনের জন্য নহে, তাই হাস্যরসের প্রকৃত ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দেশে হাসির স্রোত প্রবাহিত করিতেন। তাঁহার গ্রন্থে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জীবনেও তাহাই লক্ষিত হয়। কপটতা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে। সমাজ মধ্যে কপটতা দেখিলেই তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

অগ্রেই তাঁহার হাস্যরসপটুতার কথা বলা হইয়াছে। এই হাস্যরসপটুতার গুণে তিনি সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান পাঠক-মণ্ডলীর অনেকেই পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরস কথোপকথনের বিষয় অবগত আছেন। একদিন কোন বন্ধুর বৈঠকখানায় বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেছিলেন, এমন সময় দীনবন্ধুবাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিলেন, 'এই যে আমার ভায়া এসেচেন, এইবার আমি অবসর গ্রহণ করি' এবং দীনবন্ধুকে আসর ছাড়িয়া দিলেন।...

বঙ্কিমবাবু বলিতেন যে, দীনবন্ধু সকলেরই সহিত হাসিতামাসা করিতেন। কাছাড় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্কিমবাবুকে এক জোড়া কাছাড়ের নির্ম্মিত চর্ম্মবিহীন বস্ত্রের জুতা পাঠাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে কেবল এই কয়েকটি কথা ছিল, 'কেমন জুতা!' বঙ্কিমচন্দ্র জুতা ও পত্র একসঙ্গে পাইয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবু আরও বলিতেন যে, মুন্সেফ এবং ডেপুটি সংক্রান্ত হাস্যজনক গল্পের ভাণ্ডার দীনবন্ধুর সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত।

* * *

দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব এক্ষণে সাহিত্যের অঙ্গীভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুইজনে অকৃত্রিম প্রণয় ছিল। দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে 'নবীন তপস্বিনী' উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে 'মৃণালিনী' উৎসর্গ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে নিরস্ত হইতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র এতই শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে, বঙ্গদর্শনে দীনবন্ধু সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে পারেন নাই। অনেকেই ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল এবং সেই কারণেই বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' প্রবন্ধে এই বিষয়ের কতকটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর প্রেম, ভালবাসা, প্রণয় বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়পটে এরূপ উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত ছিল যে, তিনি স্থির করিলেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। ইহা হইতে আনন্দমঠের অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি। যদি বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করা যায়, তবে বলা যাইতে পারে, আনন্দমঠের উৎসর্গ বাঙ্গলা সাহিত্যের "In memariam'

অনেকেই বঙ্কিমবাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, আনন্দমঠের উৎসর্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্ষণভিন্ন সুহৃদ' দীনবন্ধুর পবিত্র স্মৃতি কল্পিত করিয়াছেন। দীনবন্ধুবাবুর তৃতীয় পুত্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, এম. এ. বি. এল বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'অঞ্জলিদান' নামক শোক-কবিতায় আনন্দমঠের উৎসর্গের এইরূপ সুন্দররূপে ও সহৃদয়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

* * *

জীবন-সখার১ তার২ প্রাণের ক্রন্দন
শুনিল কেবল সেই অন্তর্যামী জন;
সেই ব্যথা, সে হৃদয়ে গাঢ় রেখাময়;
সেই প্রেম সে সখার ভুলিবার নয়।
তাই কত বর্ষ পরে, দাঁড়ায়ে যখন
আনন্দমঠের দ্বারে, গীতিময় প্রাণ,
ল'য়ে ভক্তি-গীতিময় কুসুম চন্দন
করি সপ্ত কোটি প্রাণে বেগে বহমান
এক প্রাণ জীবনের তড়িৎ প্রবলা,
গেয়েছিল মহাগীত, আনন্দে অধীর
সুজলা, সুফলা সেই অনন্ত-শ্যামলা
স্বর্গাদপি গরীয়সী মহাজননীর;
তখন অপর দিকে ডাকিল হৃদয়
'ক্ষণভিন্নসৌহৃদ' সে জীবনসখায়
অমর প্রেমের এই মহা দিগ্বিজয়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে এ সম্বন্ধ কভু না ফুরায়।

দুইজনেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আবার একত্রে মিলিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিরাশি চিরকালের জন্য বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান রহিল।'

১। দীনবন্ধু ২। বঙ্কিমচন্দ্র

—ক্ষপণক

* উকুনের বংশবৃদ্ধিতে বিস্ফোরণ
* বধির ও মূকদের জগৎ

উকুনের দুরন্ত বংশবৃদ্ধিকে একজন বিজ্ঞান-লেখক বিস্ফোরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে উকুন নিয়ে বিশেষ কোনো গবেষণা হচ্ছে না। ফলে এবিষয়ে যেমন কোনো প্রচার নেই, তেমনি নেই উকুন থেকে নিস্তার পাবার ফলপ্রসূ কোনো উপায়ের সন্ধান। এ-অবস্থায় মানুষের মাথার চুল অতি সহজেই হয়ে উঠেছে উকুনের আনন্দময় ডেরা এবং মানুষের রক্ত শোষণ করে ও মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে উকুন ঝাড়েবংশে বাড়ছে, বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ডভাবে। লেখকের মতে, বিশেষ করে পশ্চিমের দেশগুলিতে, উকুন-অধ্যুষিত মাথা নাকি অগুণতি। সমস্যা নাকি এমনই ভয়াবহ যে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় তার একটা বিহিতের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, উকুনের সমস্যা আমাদের দেশেও কম প্রকট তা বলা চলে না। তবে আমাদের কাছে উকুনের সমস্যা কোনো সমস্যারূপেই গণ্য নয়। উকুনের সঙ্গে সহাবস্থান করে চলতেই আমরা অভ্যস্ত। তবুও পশ্চিমী গবেষণার ফল ভোগ করতে বাধা নেই, অতএব বিজ্ঞান-লেখকের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করছি।

উকুনের প্রতি অবজ্ঞা শুরু হয়েছে ১৯৪৪ সাল থেকে, যুদ্ধ যখন শেষ হবার মুখে। তারপরে আর উকুন নিয়ে গবেষণার জন্য বা উকুন মারবার পথের সন্ধান করার জন্য, সরকারী অর্থবরাদ্দের কথা শোনা যায়নি। যুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের বিশেষ করে নারী সৈনিকদের মাথার চুলে উকুনের বাসা হওয়াটা কাম্য ছিল না, তাই উকুনের বাসা না হতে দেবার বা উকুনের বাসা ভাঙবার জন্য উদ্যোগও ছিল প্রচুর—অর্থাৎ অর্থ বরাদ্দ ও প্রচার দুই-ই ছিল। যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই দুয়ের কোনোটাই আর থাকল না।

সৈনিকরা ঘরে ফিরল বটে কিন্তু উকুন থেকে মুক্ত হয়ে নয়। বরং দেখা গেল, উকুনের যেন আরও বাড়-বাড়ন্তের দিন। কীটনাশক শক্তিধর ওষুধ আবিষ্কৃত হল প্রচুর কিন্তু অন্যান্য অনেক কীটপতঙ্গের মতো উকুনেরও কীটনাশক ওষুধ (ডি ডি টি ইত্যাদি) হজম করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে বিশেষ দেরি হল না। গোণাগুণতি একটি কি দুটি ওষুধ এখনো হয়তো পাওয়া যেতে পারে যা এখনো পর্যন্ত উকুনের পক্ষে মারাত্মক থাকতে পেরেছে। কিন্তু একপক্ষে (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায়) যদি নিষ্ক্রিয়তা থাকে তাহলে অন্যপক্ষে (অর্থাৎ উকুনের বংশবৃদ্ধিতে) কোনো বাধাই শেষপর্যন্ত বাধা হিসেবে টিঁকতে পারে না।

বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যেখানে উকুনের মতো বিশ্বচারী জীব। অতি অনায়াসে উকুন গোটা বিশ্বে চরে বেড়াতে পারে। চরে বা চড়ে, কেননা সেজন্যে চাই অন্ততপক্ষে এক-গাছা চুল ও বিপরীত লিঙ্গের দুটি ডিম। এটুকু হলেই মাথা থেকে মাথায় পরিক্রমা শুরু। সরাসরি সংস্পর্শ হলে তো কথাই নেই, তা ভালোবাসার জন্যেই হোক বা লড়াই করার জন্যেই হোক। সরাসরি সংস্পর্শ না হলেও চলে—ট্রাম বা বাস বা ট্রেন বা প্লেনের বসার আসনের ভূমিকা এক্ষেত্রে মধ্যবর্তীর।

আবার মুশকিল এই যে, যদিও মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় কিন্তু স্বীকার করতে দারুণ লজ্জা। আমার মাথায় উকুনের বাসা হয়েছে—অপরিণত শিশু ছাড়া আর কারও মুখে এমন কথা শোনা যায় না। আড়ালে কিন্তু সমানে চলতে থাকে তিনটি ক্রিয়া—সাবান দিয়ে মাথা ঘষা, জল দিয়ে মাথা ধোয়া, চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানো। তাতে মাথার উকুনের বিপত্তি ঘটার কোনো কারণ নেই—মাথা ঘষায় ও মাথা ধোয়ায় তো নিশ্চয়-ই নয়, মাথা-আঁচড়ানোয় (যদি প্রবল হয়) কখনো কখনো স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে মাত্র।

খাটো চুলের চেয়ে লম্বা চুল উকুনের বাসা হওয়ার পক্ষে প্রশস্ত—এ ধারণা ভুল। স্নান না করলে উকুন হয়—এ ধারণাও ভুল। চুল খাটো হোক বা লম্বা হোক ধৌত হোক বা অধৌত হোক—উকুন সমান অনায়াসে সব জায়গাতেই অধিষ্ঠিত হতে পারে। ফিটফাট মাজাঘষা মাথাওলা বাবুকে রেহাই দেবে, উকুন এমন পাত্রই নয়। আবার ফিটফাট মাজাঘষা মাথাওলা বাবু হতে পারলেই উকুন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—তাও নয়। ডাক্তারের কাছে না গিয়ে যারা শুধু জল সাবান ও চিরুনি অবলম্বন করে উকুন তাড়াতে চান—মনস্তাপ ছাড়া আর কিছুই তাদের প্রাপ্য হয় না।

অনেকের ধারণা, স্কুলের ছেলেমেয়েরাই মাথায় উকুন বয়ে নিয়ে আসে। লণ্ডনের কয়েকটি স্কুলে সমীক্ষা নিয়ে দেখা গিয়েছে (আমাদের দেশে এ-বিষয়ে কোনো সমীক্ষা নেওয়া হয় না, সমীক্ষার কোনো প্রয়োজন আছে তাও মনে করা হয় না), স্কুলে থাকা-কালীন ডাক্তারী চিকিৎসায় উকুন নির্বংশ করার পরদিনই কোনো ছেলে বা মেয়ে আবার মাথাভর্তি উকুন নিয়ে স্কুলে এসেছে। অর্থাৎ উৎসটি অন্যত্র এবং তা সবসময়ে চিকিৎসার নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডের স্কুলগুলোতে নাকি দশ লক্ষ ছেলেমেয়ের মাথায় উকুনের বাসা। এ-হিসেব একজন ডাক্তারের। সরকারী হিসেবে আরো কম—আড়াই লক্ষ। আমাদের দেশে এমন হিসেবের কথা ভাবা যায় না। ইংলণ্ডেই যদি দশ লক্ষ হয় তো আমাদের দেশে কত কোটি? আর স্কুলের বাইরে যে-সব ছেলে-মেয়ে রয়েছে তাদের মধ্যেই বা কত?

উকুন সম্পর্কিত সমীক্ষায় একটি বিষয় লক্ষণীয়। চার থেকে পাঁচ বছর বয়সের ছেলেদের মাথায় ও পাঁচ থেকে ছ' বছর বয়সের ছেলেদের মাথায় উকুন সবচেয়ে বেশি। বারো পেরোলে উকুনওলা মাথা কম, আরো পরে না-থাকার মতো।

উকুন নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারটি অস্বস্তিকর হতে বাধ্য। উকুনকে যদি ঠিক-মতো বংশবৃদ্ধি করতে হয় তাহলে তার আটাশ দিনের জীবনে প্রতি তিনঘন্টা অন্তর মানুষের রক্তপান ঘটা দরকার। কাজেই উকুন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁরা যদি নিজেদের মাথায় উকুন না পোষেন, তবে ব্যাপারটা অনুধাবন করা শক্ত।

যতোদূর জানা গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত দুটি ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা উকুনের নেই। একটি ম্যালাথিয়ান (Malathion) অপরটি কারবেরীল (Carbaryl)। এই দুটি ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা উকুন যেদিন পাবে সেদিন আর উকুন থেকে রেহাই পাবার জন্য মাথার চুল কামিয়ে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

কপিরাইট কনভেনশনে সোভিয়েতের স্বাক্ষর

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে আগামী ২৭শে মে তারিখে বিশ্বজনীন কপিরাইট কনভেনশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাক্ষর করবে। সারা বিশ্বের লেখকদের কাছে এটি সুখবর। এতকাল প্রকাশিত হয়ে এসেছে—সে-বাবদ গ্রন্থকার বা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গ্রন্থকার বা প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে বহু গ্রন্থ প্রকাশক অর্থমূল্য কিছুই পাননি। এই অবস্থা শেষ হতে চলেছে। 'মির' প্রকাশ-ভবন থেকে ইতিমধ্যেই অনেক গ্রন্থকারের কাছে এই মর্মে চিঠি এসেছে যে অতঃপর তাঁদের গ্রন্থ প্রথানুযায়ী সম্মতি নিয়ে ও সম্মানমূল্য দিয়ে প্রকাশিত হবে।

বধির ও মূকদের জগৎ

সম্প্রতি আমাদের দেশে বিকলাঙ্গদের নিয়ে কিছু সভাসমিতি হয়ে গেল। বক্তৃতায় সবাই বললেন যে বিকলাঙ্গরা করুণার প্রত্যাশী নয়, তারা চায় স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে থাকতে, তাদের জন্য চাই স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবিকার সংস্থান, ইত্যাদি। এতদুপলক্ষে বিকলাঙ্গদের খেলা-ধূলোর আসরও বসানো হয়েছিল। সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পরে খবরের কাগজে চিঠি লিখে একজন এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে-ছিলেন যে বিকলাঙ্গদের নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো কথা শোনা গেল বটে কিন্তু বধির ও মূকদের কথা কেউ কিছু বললেন না — তারা যেন মর্ত্যলোকের মধ্যেই নয়। আমাদের দেশে যারা বিকলাঙ্গ নয়, এমনকি তাদের পক্ষেও স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে থাকা শক্ত। তার ওপরে বিকলাঙ্গদের জন্যেও কিছু করা যাবে এমন আশা কম। কিন্তু কী করা যায় তার একটা ছবি সোভিয়েত প্রচারদপ্তর প্রচারিত একটি প্রবন্ধের মারফৎ আমাদের হাতে এসেছে। প্রবন্ধটি বধির ও মূকদের সম্পর্কে, যাদের সংখ্যা আমাদের দেশেও বড়ো কম নয় এবং যাদের আমরা মানুষ হিসেবে প্রায় বাতিলের দলে ফেলে রেখেছি। এই প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করতে চাই।

বিশ্বের বধির মানুষের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। তারা বাস করে দুই নিঃশব্দ জগতে—একটি তাদের নিজস্ব জগৎ, অপরটি চার দিকের। এই দুই নিঃশব্দ জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলাটা প্রকৃতির এক কঠোরতম পরীক্ষা। বিশ্বের সাড়ে তিন কোটি বধির মানুষ যে-পরীক্ষার সম্মুখীন।

সোভিয়েত দেশে বধিরদের মনস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষকরা মনে করেন, বধিরদের শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত যতোদূর সম্ভব সবচেয়ে কম বয়স থেকে। শিক্ষাদানের দায়িত্ব যেমন বাপ-মায়ের, তেমনি বিশেষ বিদ্যালয়ের।

ওডেসা টেলিভিশন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ-শিল্পী ভ্লাদিমির নাজারভ এক্ষেত্রে একজন অগ্রণী। তাঁর মেয়ে ওলিয়া জন্ম থেকেই বধির। ন'মাস বয়স হতেই মেয়েকে শেখাতে শুরু করলেন নাজারভ। মেয়েকে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলা—এটাই ছিল গোড়ার সমস্যা। নাজারভ করলেন কি টুকরো-টাকরা জিনিস নিয়ে মেয়ের সঙ্গে খেলা শুরু করে দিলেন। তারপরে তাঁর মাথায় একটা আইডিয়া এল। মেয়েকে একটা বেলুন ধরিয়ে দিলেন। বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন কম্পন জাগিয়ে তুলতে লাগল বেলুনে। ওলিয়া তা অনুভব করতে শিখল।

কিছুদিনের মধ্যেই ঘরের সমস্ত জিনিস-পত্র চেনা হয়ে গেল ওলিয়ার—এক-একটি চিহ্ন নিয়ে এক-একটি জিনিস, তার নাম সমেত। এমনিভাবে চিহ্ন শিখতে শিখতে ওলিয়া পড়তে শিখল, লিখতেও—অন্য ছেলেমেয়েরা যে-বয়সে পড়তে ও লিখতে শেখে তার চেয়ে কম বয়সেই। তারপরে শুরু হল যেটি ছিল সবচেয়ে শক্ত কাজ—ঠোঁটের ভঙ্গিমা দেখে মুখের কথা পড়তে শেখা ও উচ্চারণ করা।

তারপরে ওলিয়া যেদিন মুখে উচ্চারণ করে বলতে পারল—'মা'—বাপ-মায়ের আনন্দ আর ধরে না। নাজারভ মেয়ের সঙ্গে এমন আচরণ করেন যেন মেয়ে তাঁর অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুর মতোই। কোনো একটা জিনিস দেখিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বলতে শুরু করেন জিনিসটা কী। যেমন 'এটা একটা বল', তারপরে বর্ণনা—'এটা একটা লাল বল', ইত্যাদি।

ওলিয়ার বয়স এখন পাঁচ। সে পড়তে পারে, লিখতে পারে, একটু-আধটু অঙ্ক কষতেও। শুধু তাই নয়, কথা বলতে পারে, ঠোঁটের ভঙ্গিমা দেখে অন্য লোকের মুখের কথা পড়তেও পারে। মনের দিক থেকে তার বয়সের অন্য ছেলেমেয়ের চেয়ে সে বেশি পরিণত।

আজকের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাজারেরও বেশি বাপ-মা নাজারভ পদ্ধতিতে বধির ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তবে প্রত্যেক শহরে আছে বিশেষ কিণ্ডার-গার্টেন, অধিকাংশ বধির ও মূক ছেলেমেয়ে সেখানেই শিক্ষা পায়। কিণ্ডারগার্টেনে চার বছর কাটলেই স্কুলে ভর্তি হবার জন্য তারা তৈরী।

কোন স্কুলে তারা ভর্তি হবে তা নির্ভর করে তাদের বাপ-মায়ের ইচ্ছার ওপরে ও তাদের বধিরতার মাত্রার ওপরে। বিশেষ বিদ্যালয় আছে দু-ধরনের—এক, যারা জন্ম থেকেই বধির তাদের জন্য; দুই, যারা খুব অল্প শোনে বা জন্মের পরে বধির হয়েছে তাদের জন্য। কোন ছেলেমেয়ে কোন স্কুলে পড়লে সবচেয়ে উন্নতি করতে পারবে তা সুপারিশ করে থাকেন চিকিৎসক ও শিক্ষকের একটি মণ্ডলী।

এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলো সাধারণত আবাসিক ধরনের, ছেলেমেয়েরা এখানে পুরো

সম্ভাহ বা পড়ার শিক্ষাকাল থাকতে পারে। বাপ-মাকে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য কিছু খরচ করতে হয় না, সবই বিনামূল্যে। তবে পাঠ্যবিষয় অভিন্ন—সাধারণ ছেলে-মেয়েদের বেলায় যা, বধির ছেলেমেয়েদের বেলাতেও তাই।

তবে বধির ছেলেমেয়েকে দিনে দু-ঘন্টা অতিরিক্ত পাঠ নিতে হয় 'ধ্বনি ল্যাবরেটরিতে'। সেখানে তারা কথা বলতে শেখে। অনেক বাপ-মা চান বধির ছেলেমেয়েকে সাধারণ স্কুলে পড়াতে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাও সম্ভব।

আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের কলেজগুলোতে বধির ছেলেমেয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা অনাগ্রহ ছিল। কিন্তু ট্রেডইউনিয়ন ও উচ্চতর শিক্ষা-মন্ত্রকের চাপে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন যে-কোনো কলেজে বধিররা শিক্ষা নিতে পারে। তবে তার আগে বধিরদেরও সাধারণ ছাত্রদের মতো একই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে আসতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বধির ছেলে-মেয়েরা জন্মের সময় থেকেই বিশেষ বৃত্তি পেয়ে থাকে। তার ওপরে পড়ার সময়ে আছে অতিরিক্ত বৃত্তি—সাধারণ ছেলেমেয়েদের বেলায় যতো তার অর্ধেক পরিমাণ। ছাত্রাবাসে সবচেয়ে আগে থাকার সুযোগ পায় বধিররা। কোনো কলেজে বধির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে সেখানে তাদের জন্যে বিশেষ 'দোভাষী' বা শিক্ষক নিযুক্ত হন।

লেনিনগ্রাদের কাছে শুধু বধিরদের জন্য একটি কলেজ আছে। সেখানে শিক্ষণীয় বিষয় —আইন ও গ্রাফিক শিল্প।

কল-কারখানাতেও বধির ও মূকেরা যে আধুনিক জটিল প্রক্রিয়াগুলো রপ্ত করতে পারেন, সোভিয়েত অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ রয়েছে। এই দেশে কুড়িটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন ২,৫০০ বধির ও মূক। তাঁদের মধ্যে দশভাগের ন' ভাগই দক্ষ শ্রমিক।

মস্কোর ইলীচ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করেন ২০০জন বধির ও মূক। তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য আছে একটি হিতসাধন কমিটি।

কোনো কারখানায় যদি ২০জন বা তার বেশি বধির ও মূক নিযুক্ত হন তাহলে সেখানে তাঁদের জন্য অতি অবশ্যই একজন শিক্ষকও নিযুক্ত করতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বধির ও মূকেরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থপতি, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক, আইনবিদ ইত্যাদি সকল মহলে তাঁদের পাওয়া যেতে পারে।

এমনি একজন হচ্ছেন ভালেন্তিন দ্মিত্রিয়েভ। শিল্পগত ডিজাইনে অনার্স ডিগ্রী তিনি পাশ করেন, পরে ভাষাতত্ত্বে আগ্রহী হন। বিশেষ করে ফরাসী ভাষায় তাঁর দখল প্রচুর। প্রচুর ফরাসী কবিতা ও নাটক অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে তিনি সোভিয়েত লেখক সংঘের সদস্য।

মস্কোতে আছে বধির ও মূকদের নিজস্ব থিয়েটার। অভিনেতারা সকলেই বধির ও মূক। নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহের আসন-সংখ্যা ৮০০। শুনলে অবাক হতে হবে যে এই বধির ও মূকদের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ নাটকের মধ্যে আছে শেকস্পীয়রের 'টুয়েলফথ নাইট' এবং গোর্কি অস্ত্রোভস্কি ও শিলারের নাটক। বধির ও মূকদের অপর একটি থিয়েটার রয়েছে ইউক্রেনে।

অ্যাপোলো-১৭ অভিযানে
কমলারঙের চাঁদশিলা

অ্যাপোলো-১৭ অভিযানে চাঁদের মাটিতে পা দেবার পরে নভশ্চর শ্মিট ও সেরনান কমলা রঙের শিলা দেখতে পেয়েছিলেন। তখন এ-নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে চাঁদের মাটি থেকে জল পাওয়া যাবে ইত্যাদি। এখন বিশ্লেষণের পরে জানা গিয়েছে, এই শিলা নিয়ে সোরগোল তোলার কোনো কারণ নেই। শিলাটি অভিনব কিছু নয়, চাঁদের অন্যান্য শিলার মতোই।

এই শিলার বয়সও (৩৭০ কোটি বছর) চাঁদের অন্যান্য শিলার মতো। লোহঘটিত অক্সাইড এই শিলায় পাওয়া যায়নি (যা ভাবা হয়েছিল), পাওয়া গিয়েছে কাঁচের দানা। রঙীন কাঁচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে শর্টি গহ্বর থেকে পাওয়া এই কমলা রঙের শিলাটি গঠিত। ৩৭০ কোটি বছর আগে তৈরি হয়ে নিশ্চয়ই মাটির গভীরে চাপা পড়ে ছিল, যার ফলে মহা-জাগতিক রশ্মি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে উল্কাপিন্ডের আঘাতে মাটি ওলোটপালোট হয়ে যাবার সময়ে নিচের শিলা ওপরে উঠে এসেছে।

অ্যাপোলো-১৭ চাঁদের যে অংশে অবতরণ করেছিল সেখানকার মাটি ছিল কালো ধুলোর মতো। শর্টি গহ্বরে পরিখা খোঁড়ার পরে মাটির রঙ হয়েছিল হাল্কা ধূসর। আর নভশ্চরদের তোলা আলোকচিত্রে দেখা গিয়েছে, শর্টি গহ্বরের এলাকার চার-দিকে ছড়িয়ে আছে কমলা রঙের মাটি।

—অয়স্কান্ত

পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রস্তাব কিভাবে সমর্থনীয় হতে পারে? এ-দেশ কি গার্গী-মৈত্রেয়ী-দময়ন্তীর দেশ নয়?

তবে কিনা অমৃতপুত্রের দেশে আজ ঘোর দুর্দিন। স্বেচ্ছাচারের তরঙ্গ অনেক আয়ায়তনকেই ধূলিসাৎ করেছে, বিবাহ ও দাম্পত্যের উপরেও তার ছায়াপাত না হয়ে যায় কোথায়? প্রাজ্ঞেরা যাই বলুন, ডিভোর্স এদেশে এসেছে—এবং থাকতে এসেছে। বিবাহ এক পবিত্র বন্ধন, ডিভোর্সের অধিকার, মানেই তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার'—প্রাচীনপন্থীদের এই নির্দেশের উত্তরে তরুণ-তরুণী বলতে ছাড়ছে না : 'ব্যর্থ বিয়ের জের টানতে বাধ্য করে আমাদের গোটা জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্রকে কে দিল?'

প্রেমজ-সূত্রে বা চিরাচরিত ব্যবস্থাপনা—বিবাহের কারণ যাই হোক না কেন, আজন্ম একটি ভুলের জের টেনে সততার পরাকাষ্ঠা দেখাতে আর রাজী নয় কেউ। অন্তর্বেদে ক্ষতবিক্ষত দুটি হৃদয়ের জোড়াতালি দিয়ে অভিনয় করার স্বপক্ষে আর কেউ ভোট দেবেন না। সবাই, সমস্যা সমাধানের পথ বাৎলাতে আদালতের দরজা দেখিয়ে দেবেন। আদালতের শরণাপন্ন হনও অনেকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এদের সংখ্যা সীমিত। এর কারণ কি? 'ডিভোর্স' শব্দটি অতি সহজে উচ্চারিত হলেও সমগ্র ঘটনা অত অনায়াসসাধ্য নয়। বিভিন্ন পর্যায়ে সহস্র বিধিনিষেধের মারপ্যাঁচ উত্তীর্ণ হয়ে তবেই না নিষ্কৃতি। তার উপর সমাজ তাদেরকে এখনও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে, মেনে নিতে চায় না। এর ফলে, অনেক অসুখী জীবন পুনরায় সুস্থ ও সহজ জীবনযাপনের আশা একেবারেই ত্যাগ করে। দুষ্ট আইন, ও দুর্ভাগ্যের দোহাই পেড়ে সময় কাটায়।

কোনো এক শিল্পোদ্যোগের মাঝারি-তলার অফিসার তরুণ, সুদর্শন বোস সাহেবের অভিভাবকেরা মোটা-দরের পণ আদায় করে, ঈর্ষাজনক যৌতুক নিয়ে অনুরূপ পরিবারের কন্যার সঙ্গে ছেলের গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। কিছুদিন পরে এক হাট লোকের সামনে নানা অসুবিধার অজুহাতে বধূ স্বামীকে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করল তারও পরে—দেখা গেল সুখী, সুশৃঙ্খল জীবনের কোনো স্বপ্নই মেয়েটির মনে প্রশ্রয় পায় না। বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে সে নিতান্ত অপারগ—এ-কথা সোজাসুজি জানিয়ে দেয় স্বামীকে। অতএব, আর একসঙ্গে থাকা যায় না। কিন্তু চাইলেই ডিভোর্স হচ্ছে কোথায়? এখনও মেয়েটি সমান নির্বিকার। কাজেই ছেলেটি আদালতের আশ্রয় প্রার্থনা করেও একতরফা কোনো সুস্পষ্ট সমাধানে পৌঁছতে পারে না। তিনি বিয়ে করে চুল ছিঁড়ছেন—ডিভোর্স পাওয়া কি এতই ঝকমারি?

মিসেস দাস নিতান্ত সাদামাটা ভদ্রমহিলা। চারটি ছেলেমেয়ে সমেত সংসারটিকে মাতাল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর কবল থেকে অতিকষ্টে বাঁচিয়ে রাখেন। বিবাহ-বিচ্ছেদই কেবল এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু সনাতন হিন্দু বিবাহধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করলে সমাজে সম্মানীয় স্থান পাবেন কি?

দাম্পত্য বন্ধন যখন চিড় খায়, স্ত্রী-পুরুষ হয় সামাজিক মান বাঁচাতে আজীবন আপনাপন ভূমিকায় অভিনয় চালিয়ে যান অথবা, আদালতের দ্বারদেশে গিয়ে দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটান। কিন্তু ডিভোর্সপ্রাপ্তা মেয়েরা ভারতীয় সামাজিক কাঠামোয় খাপ খাওয়াতে পারেন কি নিজেদের?

বিচ্ছিন্ন রমণী অন্যের ঘরণীরূপে সুখী ও সসম্মানে স্থিতা—এরকম ঘটনা আকছার ঘটে না। এক ঘর ভেঙে অন্য ঘরের লক্ষ্মী হবেই—এই সিদ্ধান্ত চট করে মেনে নেয় না সমাজ। দুঃসহ একাকীত্ব, নিরাপত্তার অভাব ও সামাজিক বিড়ম্বনা—এই ত্রিশূলে অহরহ বিদ্ধ করে তাদেরকে।

প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল, মিশুকে মেয়ে নর্মদা, ডিভোর্সের মারপ্যাঁচ কাটিয়ে স্বাবলম্বী ও মুক্ত। বিচ্ছেদ সম্পর্কে তার মতামত কিন্তু স্পষ্ট—'ডিভোর্স কোনো সমস্যার আশু সমাধান করতে পারে না—পারে শুধু সম্পর্ক জটিলতর করে তুলতে।' নতুন করে ঘর বাঁধবার আশা আছে কিনা এ-প্রশ্ন করতে বলল : 'নাঃ, বেশ আছি। নিঃসঙ্গতা ভোলবার জন্য গান শুনি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অনর্গল বক-বক করি, পার্টিতে যাই। চাকরি করি ঐ মোটামুটি ভালই। চলে যাচ্ছে। নতুন করে প্রেম? আজ্ঞে হাঁ, প্রেমিকের দল এক তুড়ি দিলে জুটে যায়—কিন্তু বন্ধনের ফাঁস পরতে কেউ রাজী হয় না। আমি যে ডিভোর্সড। শুধুমাত্র আনন্দসঙ্গিনী।'

২৫ বছরের ব্রীড়াবনতা, সুন্দরী আনোয়ারার পক্ষে জীবন অত সহজ নয়। খানদানী, পর্দানশীন ঘরের মেয়ে হয়েও ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো সম্পন্ন [illegible] আনোয়ারাকে উচ্চ-সামাজিকতায় অভ্যস্ত করতে স্বামী [illegible] কেটে, স্বল্পাচ্ছাদিতা হয়েও মদ্যপ স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে রোধ করতে পারল না। শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে বাঁচবার জন্য আশ্রয় খুঁজতে হল উদ্ধারাশ্রমে। বিধর্মীর পাণিগ্রহণ করে মুসলমান সমাজে সে অনাদৃতা। মদ্যপ স্বামী অথবা ডিভোর্স—অন্যতর পথ তার কাছে খোলা নেই।

স্ত্রী-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, স্বাধিকার বোধ মেয়েদের অসুখী বিবাহের অবসানে বিচ্ছেদের কথা ভাবতে উৎসাহ জোগায়। সমাজের তর্জনী আস্ফালনে ভীতা না হয়ে সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার সুযোগ গ্রহণ করেন উপেক্ষিতা স্ত্রী। তবে যে আইনের আশ্রয় অনেক ক্ষেত্রে কাম্য, সেই বিচ্ছেদবিধি বড় জটিল। যে-মুহূর্তে অবস্থা অসহনীয়, সে-মুহূর্তে বিচ্ছেদ সহজলভ্য নয়। সাময়িক পৃথকীকরণ, উভয়পক্ষের মতৈক্য— এইভাবে কয়েক বছর জের টেনে অবশেষে ডিভোর্স। এক-পক্ষ যদি নির্বিকার থাকেন, তাহলে অপরপক্ষের ইচ্ছাতেই শুধু বিচ্ছেদ মঞ্জুর হবে না। তার ওপর আছে ক্ষতিপূরণের অঙ্কের হিসেব-নিকেশ। এত ঝামেলা পুইয়ে আদালতের নির্দেশ পেতে পেতে দেখা যায়, দু' পক্ষই জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ।

আইনজ্ঞদের মতে, ধনী পরিবার ডিভোর্স নিতে সহজে রাজী হয় না। কারণ, অর্থনৈতিক। এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ হাতছাড়া হবার ভয়ে বধূকে ব্যভিচারিণী হতেও পরামর্শ দেন অনেকে। অনেক ক্ষেত্রে খোরপোষ দেবার সামর্থ্য না থাকায় স্বামী টালবাহানা করেন।

তবে, অধুনা, মেয়েরা স্পষ্ট সীমারেখা মেনে চলতে চান। আর্থিক ব্যাপারে মেয়েরা আজকাল আর অত গুরুত্ব দিতে চান না। কারণ, আত্মিক বন্ধন যেখানে ছিন্ন, আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক না থাকাই সেক্ষেত্রে সম্মানীয়। তবে অসহায়া, পরনির্ভরশীল মেয়েদের কথা আলাদা।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শী, খৃষ্টানদের জন্য পৃথক পৃথক আইন রচনায় কোনো প্রয়োজন আছে কি? আইনের ওপর ধর্মানুশাসনের খবরদারি বন্ধ হলে সব সম্প্রদায়ের মেয়েরাই সমান সুবিধা ভোগ করতে পারে।

আর, কাউকে [illegible] ধরেই, অযথা কালক্ষেপ না করে, সুচিন্তিত দ্রুত সমাধানের সহায়ক আইন চালু হলে—দুটি জীবন আবার হয়তো নতুন করে সুন্দরভাবে বাঁচবার তাগিদ অনুভব করবে, স্বপ্ন দেখবে ভবিষ্যৎ সুখী জীবনের, পৃথিবীর বায়ু আর বিষাক্ত মনে হবে না।

—এণা ভট্টাচার্য

থেকে কাষ্ঠখণ্ডটিকে উদ্দেশ্য করে আমরা গাই :

তুমি কত বিরাট আর মহান
তোমার জন্যে অপেক্ষারত
দীপ্ত গৌরব আর সম্মান
ছায়াময় নিভৃত সুন্দর নিলয়।
গাঁয়ের দিকে চলো, আপন আবাসে
চলো সমুদ্র মৎস্যের দ্রুততায়
বিপরীত স্রোতের উজান ঠেলে
চলো দ্রুত পুচ্ছচালনায় নিজ নিকেতনে
তোমার জন্যে অপেক্ষারত
ছায়াময় নিভৃত সুন্দর নিলয়।।

কথা বলতে বলতে আমরা পাহাড়ের উপরের ছোট্ট গ্রামের সবচেয়ে উঁচু বাড়ী নাগাযুবাদের মোরাঙ্গের কাছে এসে গেছি। মোরাঙ্গের অদূরে তৃণাচ্ছাদিত চালের নীচে বিরাট কলেবর দীর্ঘ একখণ্ড বৃক্ষ-কাণ্ড। গোলাকৃতি কাণ্ডের মাঝে লম্বালম্বি খানিকটা গর্ত করে প্রয়োজন-মতো তুলে নেওয়া হয়েছে, কাঙ্ক্ষিত শব্দ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। বৃক্ষখণ্ডটির উপর নানারকম নাগা-নকসা। এই হল নাগাদের 'লগ-ড্রাম'।

আমি কিজোংকে জিজ্ঞেস করলুম, মোরাঙ্গের কাছাকাছি 'লগ-ড্রাম' রাখবার কি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে?

নিশ্চয়ই, উত্তর দিলে কিজোং। অগ্নি-কাণ্ডের দুর্ঘটনায় মোরাঙ্গ-যুবাদের সর্ব-প্রথম কর্তব্য হবে—'লগ-ড্রাম'কে অবিকৃত-ভাবে রক্ষা করা। যদি এই কাষ্ঠ-দুন্দুভির গায়ে অল্পমাত্র আঁচও লাগে তার প্রতিরোধক হিসেবে গ্রাম-দেবতার উদ্দেশ্যে একটি মোরগ উৎসর্গ করতে হয়।

তোমাদের সামাজিক জীবনে এই কাষ্ঠ-দুন্দুভির প্রয়োজনীয়তা কি?

অনেক, শংকর, অনেক। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সূচনা এই ড্রাম বাজিয়ে গ্রাম-বাসীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্কেত প্রথম ধ্বনিত হয় এই ড্রামের মাধ্যমেই।

আর কিছু?

হ্যাঁ, তাছাড়া হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড, ধনী ব্যক্তির মৃত্যু, বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি সবই ড্রামধ্বনির মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাসীদের জানানো হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বা দুর্যোগ, যেমন—দুর্ভিক্ষ, ঝড় প্রভৃতি দুর্দৈবের সময় 'লগ-ড্রামে'র উদ্দেশ্যে পুজো নিবেদিত হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস—তাতে অশুভ শক্তির অবসান ঘটে।

এই কাষ্ঠ-দুন্দুভিকে নিশ্চয়ই নানা ধরনের শব্দ সৃষ্টি করা যায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। সবচেয়ে বড় দুটি কাঠি দিয়ে বাজানো হয় ড্রামের দুই প্রান্তে। এই বৃহৎ কাষ্ঠ-দণ্ড দিয়ে বাজালে শব্দ ওঠে—ডোম-ডোম; তাই একে বলা হয় 'ডমডোম'। আরেকটি কাঠি 'ক্রুং-ডোক' শব্দ সৃষ্টি করে। 'টোক' ধ্বনি ওঠে, অন্য এক কাঠির আঘাতে : ডোক টোক—টোক টোক। আর চতুর্থ কাঠি—ডং-ডং।

যদি চারটি কাঠি দিয়েই একসঙ্গে বাজানো হয়?

তাহলে সৃষ্টি হয় চমৎকার ধ্বনি-মাধুর্যের, এবং তা শোনা যায় অতি দূর স্থান থেকেও। অতীতে এই সমবেত ধ্বনি লহরী আধুনিক কালের সাইরেনের কাজ করত।

কিজোং, একটু আগে তুমি বলছিলে যে প্রাকৃতিক দুর্দৈবের সময় লগ-ড্রামের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা আর পুজো নিবেদন করা হয়। উপাচার নিবেদনের সঙ্গে আর কি কোনো অনুষ্ঠান আছে নাকি?

তখন এক ধরনের গান গাওয়া হয় সমবেত কণ্ঠে। ছেলেবেলায় একবার সবার সঙ্গে আমিও এই ধরনের একটা গান গেয়েছিলাম।

আমরা 'লগ-ড্রামে'র কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, ইতিমধ্যে মোরাঙ্গের কিছু আও-যুবা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কিজোং তাদের বুঝিয়ে দিলে আমরা অনিষ্টকারী নই; নই শত্রুপক্ষের লোক, শুধু পরিদর্শক, নির্দোষ কৌতূহলী। তারপরই এসে গেল 'মধু', পান-সুপুরি।

কিজোং 'মধু' পান করতে লাগল, আমি শুধু একখণ্ড সুপুরি মুখে পুরে দিলাম। কিন্তু এমন মাথা ঘুরতে লাগল—ফেলে দিলাম তাড়াতাড়ি। কিজোং আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। বলল, একটুকরো নাগা-সুপুরি মুখে দিয়েই তোমার মাথা ঘুরতে লাগল! অতীতে এমন দিন ছিল যে গ্রামে নবাগন্তুক ব্যক্তির শুধু মাথাই ঘুরত না—কোনো বিশেষ দিনে এলে মাথাটাই রেখে যেতে হতো কাষ্ঠ-দুন্দুভির কাছে। সে শত্রু বা মিত্রপক্ষ যে-দলেরই লোক হোক না কেন।

শুনে আমার মাথা আরো ঘুরছে! সে-ব্যাপারটা আবার কেমন ছিল, কিজোং?

যদি 'কাষ্ঠ-দুন্দুভি' প্রতিষ্ঠার দিনে গ্রামে হঠাৎ কোন বহিরাগত ব্যক্তি এসে পড়ত—সে শত্রু বা মিত্র যেই হোক, প্রাচীন প্রথানুযায়ী তার স্কন্ধচ্যুত মস্তকটিই উৎসর্গ করা হতো নবপ্রতিষ্ঠিত ড্রামের বেদীমূলে। এটি ছিল একটি অত্যন্ত শুভ সূচনা! যদি হঠাৎ-আসা কোন হতভাগ্যের মুণ্ড না পাওয়া যেত—তবে মোরাঙ্গ-যুবারা কোথাও না কোথাও থেকে অন্তত একটি নরমুণ্ড শিকার করে এনে ড্রামের কাছে নিবেদন করত। না হলে ড্রামের চারপাশে ঘিরে থাকত অশুভ বেড়া—তা ভেঙে একে প্রতিষ্ঠা করা যেত না—যতক্ষণ [illegible] সফল হচ্ছে।

বাপ্ রে! কীসব প্রথা ছিল তোমাদের: এখন আর নিশ্চয়ই নেই এইরকম প্রাণঘাতী প্রথা।

জানি না, টুয়েনসাংগের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে-ঘেরা গ্রামে কি হচ্ছে।

দুজনেই একটু চুপ করে রইলাম। আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনাচ্ছে, তাতে যেন আদিম যুগের বন্যতার আভাস। মনে হচ্ছে—হঠাৎ চারদিক থেকে যদি ঘিরে আসে বর্শা হাতে কোমরে দাও গম্ভীর অরণ্যবাসী নাগার দল, আর সহসা ভূলুণ্ঠিত হয় মস্তকটি তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কী অদ্ভুত নিস্তব্ধতা! একটা পাখি বা জন্তুর ডাকও শোনা যাচ্ছে না। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ—ঘনীভূত অন্ধকার অরণ্যে একমাত্র জীবনের সাড়া।

নিস্তব্ধতা ভেঙে পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে কিজোংকে জিজ্ঞেস করলুম—আমাদের সমতলভূমিতে যেমন রয়েছে চামড়ায় ছাওয়া ঢাক তাকি তোমাদের মধ্যে প্রচলিত নেই?

হ্যাঁ, এখন চামড়ায় দুদিক মোড়া ছোট ঢাক মোরাঙ্গে আছে—তাও মোরাঙ্গের সমস্ত অধিবাসীর সমবেত সম্পত্তি। প্রত্যেক বছর উৎসব অনুষ্ঠানের আগে তা মেরামত করা হয়। চামড়া দিয়ে মুড়ে দেবার মধ্যেও ছোট-খাট অনুষ্ঠান আছে।

বলো তো শুনি।

ঢাকের দুদিক মুড়ে দেবার আগে এর মধ্যে পুরে দেওয়া হয় সম্প্রদায়ের সুকণ্ঠ গায়কের গৃহ থেকে আনা কিছু চাল আর বাঘমৃগের দাঁত। বিশ্বাস—এই ঢাকের শব্দে থাকবে গায়কের মিষ্ট স্বর আর হরিণের ডাকের তীব্রতা—যা অনেকদূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যাবে। সাধারণত নৃত্য-উৎসবে আর ধনীর মৃত্যু সংবাদ জানাবার জন্যে এই ঢাক ব্যবহৃত হয়। ক্ষেতে বীজ বপন ও ফসল তোলার মধ্যবর্তী সময়ে ঢাক বাজানো নিষিদ্ধ। কারণ ধরণী তখন অন্তর্বত্নী। শস্যের হানি ঘটাতে পারে অসময়ের ঢাকের গম্ভীর ধ্বনি। তবে বুঝতেই পারছ—এইসব নিয়ম আজকাল আর কঠিনভাবে মেনে চলা হয় না। আচ্ছা, ড্রাম-প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করা যাক। আমাদের মোয়াৎসু উৎসব তো এসে গেছে। নিজের চোখেই আমাদের উৎসব অনুষ্ঠান দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে যাবে। চলো এবার ফিরি।

তারপর ফিরে এলাম কিজোংদের বাড়ী। ফিরে আসবার বিবরণ দিয়ে তোমার আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। এমনিতেই চিঠি আজ দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু আরাধনা, 'লগ-ড্রামে'র কথা শুনতে তোমার কি ভালো লাগেনি? আমার কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছিল। আও-নাগাদের দুটো গানও তোমায় আজ শুনিয়ে দিলাম। দেখা যাক, কিজোংদের মোয়াৎসু উৎসব কেমন। পরের চিঠিতে জানাব তোমায়। চিঠি দিতে দেরি হলে রাগ করো না যেন।

মোরাঙ্গ—অবিবাহিত নাগা-যুবকদের 'ডরমিটরি'।

পরমেশ পালিত এককালের বিরাট ব্যবসায়ী ও কর্মবীর নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর একক প্রচেষ্টায় গড়া 'গন্ধমাদন পারফিউমারি' আজ ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কিন্তু নিজে তিনি বেকার পংক্তিভুক্ত। বেকারদের মতই দু-হাতে অসীম সময় ঠেলে ঠেলে বিরক্তি ধরে যাচ্ছে তাঁর। রোগা হওয়া শরীরে বেঢপ জামার মত ঢলঢলে, ঢিলেঢালা সময় নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে অনবরত। কাজের মানুষের মত চিরকাল কাজ দিয়েই সময়কে মেপে মেপে অভ্যস্থ ছিলেন। অথচ এখন যেন কোনখানেই তাঁর জন্যে কাজের নামগন্ধ ছিটে-ফোঁটা নেই। 'গন্ধমাদন পারফিউমারির' সমস্ত ভার তাঁর ছেলেরাই গ্রহণ করেছে এবং মোটামুটি ভালই চালাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকর্তা হিসেবে এটুকু অবকাশ আমরণই তাঁর পাওনা। কিন্তু সময় যে সময়-মত অনভ্যাসী মানুষের বুকের ওপর হাঁটু চেপে বসে সেটা যেন আগে জানতেন না পরমেশবাবু।

গন্ধদ্রব্য তাঁর জীবনে মাদকদ্রব্যের মত নেশা হয়ে জড়িয়ে গেছে। পুরনো গন্ধকে বাঁচিয়ে রাখা এবং নতুন গন্ধকে আবিষ্কার করার আনন্দ যেন তাঁর রক্তের অংশ। তাই অবসরপ্রাপ্ত একাহি সময়টাকে নানান গন্ধে ভাগ করে নিয়ে ভোগ করতে চান, করেন।

তাঁর মতে মানুষের জীবনে কোনও একটা বিশেষ গন্ধের স্থায়িত্ব নেই। শাদা তুলোর মত তাকে যে-কোন সুখের বা দুঃখের, আনন্দের বা বিষাদের, ভয়ের বা সংশয়ের গন্ধে চুবিয়ে রাখা যায়। ডুবিয়ে তোলা সম্ভব।

গন্ধমাদন পারফিউমারিতে গন্ধ বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণায় একদা বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতি ছিল তাঁর। সোজা নাক তাঁর চোখ বেঁধে নাকের সামনে যে-কোন ফুল ফল তরিতরকারি মাছ মাংস দুধ দই ইত্যাদি ধরলে বস্তুটি কী এবং সেটা বাসি না টাটকা খাঁটি না ভেজাল তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারতেন। বহু বিখ্যাত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে এই ধরনের পরীক্ষামূলক অভিমতের জন্যে তাঁর ডাক আসত।

পরমেশবাবুর বিশ্বাস, গন্ধ বিষয়ক ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে চাই তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি এবং স্মরণশক্তি। গন্ধ মাত্রেই এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া। এবং গন্ধ শুধু সত্তার অংশ নয়, জীবনের অভিপ্রকাশ। 'মানব-মনে গন্ধের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব' নামে এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়ে তিনি নিত্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে করতে বিস্মিত পুলকিত এবং অভিভূত হয়ে পড়ছেন দিন-দিন। পরিবারের প্রত্যেকের চেহারায়, চরিত্রে এবং শরীরে তিনি স্পষ্ট পৃথক গন্ধ খুঁজে পান। কারো বা স্বচ্ছ সরল হাল্কা,

কারো গভীর গোপন, জটিল। পাশবিক, মানবিক, প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক, ঐশ্বরিক এমনি সব নানা বিভাগ নানান স্তরে চিহ্নিত।

আজ সকালেও পরমেশবাবু নিজের লেখার কাজে হাত দিয়েছেন এবং সোৎসাহে এগিয়ে চলেছেন নতুন এক সূক্ষ্ম অনুভাবনার প্রেরণায়। গন্ধের যে সেক্স আছে এটা তাঁর কাছে আজই প্রথম ধরা পড়ল। এবং বয়সও আছে। নারী-পুরুষ, যুবতী-বৃদ্ধা, বালক-কিশোর সকলের চেহারা যেমন এক নয়, তেমনি তাদের গন্ধেরও বিস্তর প্রভেদ। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে করতে হঠাৎ-ই একটা বিশ্রী বোটকা গন্ধ নাকে আসতেই চোখটা আপনা থেকেই দরজার দিকে চলে গেল। পরমেশবাবু বটুক দত্তকে দেখতে পেলেন। সারা ঘরে গন্ধটা ইথারের মত ছড়িয়ে পড়ল। পরমেশবাবু নাক কুঁচ[illegible]। বটুক দত্ত এককালে 'গন্ধমাদন পার[illegible]রের' সেলস ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী ছিলেন। গন্ধদ্রব্যে ভেজাল মেলানো এবং চোরাপথে চালান করার অপরাধে পরমেশবাবু তাঁকে বরখাস্ত করে ছিলেন চাকরি থেকে। বহুকাল বটুক দত্ত পরমেশবাবুর [illegible] আসতে সাহস করতেন না। আজ [illegible] মনে করে পুনরাগমন হওয়ার [illegible]। নাকে দীর্ঘ একটা [illegible]ন তিনি। ছুঁচোর গায়ের [illegible] আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে[illegible] ঘরের বাতাসে। টেবিলের ওপর রাখা একঝাড় মাথা-ওঁচানো রজনীগন্ধার গন্ধও কেমন চাপা পড়ে যাচ্ছে বলে সন্দেহ হল তাঁর। এবিষয়ে তাঁর বই-এ আর একটা চ্যাপটার সংযোগ করতে হবে চিন্তা করলেন। সুগন্ধের ওপর দুর্গন্ধের জবরদখলী প্রভাব ব্যাপারে তাঁর আর সন্দেহ রইল না।

বটুক দত্ত হেঁ হেঁ করে হেসে নমস্কার করলেন। বললেন, 'বই লিখছেন শুনেছি, বেশ বেশ আর এখন অবসরপ্রাপ্ত জীবনে করবেনটাই বা কি। তা' পারফিউমারির চার্জ পুরোপুরি ছেলেদের ওপর ছেড়ে দিলেন নাকি? চালাতে পারছে তো আপনার মতন?'

'হুঁ'। চশমার ফাঁক দিয়ে বটুক দত্তের থ্যাবড়া নাক আর কুটকুটে চোখের ওপর এক ঝলক বিরক্তি হেনে পরমেশবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

—'তা' আপনি হঠাৎ কী মনে করে?'

—'এই আমার নাতির পাকা দেখা শনিবার দিন, আপনাকে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে কিন্তু...'

দাঁতহীন ফোকলা মাড়ি দেখিয়ে হাসলেন বটুক দত্ত।

—'আমি আর কোথাও যাই-টাইনে আজকাল। কিছু খাওয়া-টাওয়া সহ্য হয় না আর...' পরমেশবাবু লেখার দিকে মন দেবার ভঙ্গি করলেন।

বটুক দত্ত আমতা-আমতা করে উঠে পড়লেন। নড়বড়ে পায়ে মুষিকের মতই দ্রুত প্রস্থান করলেন।

ঘরের আবহাওয়াটা এইবার রজনীগন্ধার ফিলটারে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে বলে মনে হল পরমেশবাবুর। আবার লেখায় হাত দিয়েছেন, জানালা দিয়ে এক ঝলক বিষন্ন গন্ধ ভেসে এসে অন্যমনস্ক করে দিলে তাঁকে। ওদিকের ঘরে স্ত্রী নির্মলা থাকেন। দীর্ঘকাল ধরে শয্যাশায়ী। বাত, ব্লাডপ্রেসার, ডায়েবেটিস নানারকম রোগ কখনো বাড়ে, কখনো কমে। পরমেশবাবু বড় একটা ওঘরে যান না। কিন্তু ওঘর থেকে ভেসে আসা সব গন্ধই তাঁর চেনা। নানারকম গন্ধের সংমিশ্রণ। ফুলের ফলের, ওভালটিনের, ধূপের, ওষুধের, ফিনাইলের, ওডিকলোনের। গন্ধ শুঁকেই পরমেশবাবু জানতে পারেন ও-ঘরে কখন কে আসছে, যাচ্ছে। ছেলেরা, বৌরা, নাতি-নাতনী, চাকরবাকর ডাক্তার নার্স থেকে গুরুদেব নির্লেপানন্দ পর্যন্ত। প্রায় নির্ভুলভাবে। আজ সকাল থেকেই ওঘরে অনেক লোকের আনাগোনা, ফিসফাস। অনেক স্বর, অনেক গন্ধ। সব ছাপিয়ে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট গন্ধ তাঁর নাকে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মৃত্যুর গন্ধ...শ্মশানের গন্ধ। একবারও ওঘরে না গিয়েও পরমেশবাবু নিজেকে একটা বিয়োগান্ত দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে খুব শীগগিরই ঘরের বিভিন্ন গন্ধকে পরাস্ত করে মৃত্যু তার বিশাল থাবা পেতে জাঁকিয়ে বসে পড়বে। জিভ দিয়ে চেটে চেটে শুষে নেবে জীবনের অস্তিত্ব।

পরমেশবাবুর স্মৃতির জগৎ এখন আর দৃষ্টিগ্রাহ্য অথবা শ্রবণ-নির্ভর নয়। ঘ্রাণ-স্পর্শী। বিগত দিনের অনেক স্মৃতিই তিনি গন্ধের মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। তাঁর শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে মায়ের মুখ জড়িয়ে আছে চাঁপা কলা দিয়ে মাখা দুধ-ভাতের গন্ধে। বাবার কথা মনে পড়লেই এখনো নাকে তামাকের কড়া গন্ধ ধাক্কা দিয়ে যায়। মেজ বৌঠান শোভাময়ী পরমেশবাবুর সবচেয়ে প্রিয় ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। আজো জবাকুসুম তেলের শিশির ছিপি খুললে মুগান্তের ওপার থেকে তিনি যেন হাত বাড়িয়ে দেন। পরমেশবাবুর মাঝে মাঝে মনে হয় সংসারের সমস্ত মানুষ যেন কী করে টের পেয়ে গেছে যে তিনি গন্ধের জহুরী। যখনি যে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছে তার ব্যক্তিসত্তার কিছুটা গন্ধ গচ্ছিত রেখে গেছে তাঁর ঝুলিতে। মিষ্টি তেতো ঝাঁঝালো কটু, রকমারি গন্ধের মাধুকরী বৃত্তি নিয়েছেন তিনি। সঞ্চয় করে চলেছেন দুর্লভ ডাক টিকিটের মতন। কখনো কখনো নিজেকেই এক গন্ধমাদন পর্বত বলে মনে হয় তাঁর। যে পর্বত ঘেঁটে ঘেঁটে আজো চলেছে বিশল্যকরণীর সন্ধান।

দৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, প্রাণশক্তি নিস্তেজ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি উত্তরোত্তর সতেজ, সক্রিয়। আজকাল কোনও ঘটনাকে মনে করতে হলে গন্ধের নাড়ি টিপতে হয়। এমন কি কোন ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বাহ্নেই তিনি তার অস্পষ্ট গন্ধের ইশারা পেয়ে যান। অবশ্য একথা তিনি কাউকে বলেন না, তারা হয়ত পাগলই ভেবে বসবে।

—'দাদুমণি, চুপচাপ বসে বসে কী করছ?' ঘরে ঢুকলো নাতনী তুলসী। বছর দশেকের ফুটফুটে মেয়েটা ভীষণ ছটফটে। একটা স্নিগ্ধ শুচিতার গন্ধে নাকটা অজান্তেই সচেতন হয়ে উঠেছে পরমেশবাবুর।

—'তুলুদিদি কখন এলে ভাই?' হাত বাড়িয়ে একমুঠো সজীবতাকে ছুঁয়ে দিলেন তিনি। মেয়েটার তাজার টাটের মত মাজা মাজা গায়ের রঙে পুজো-পুজো গন্ধ পেলেন। যেন সত্যিসত্যি একমুঠো তুলসীপাতা। ওর সাত বছরের ভাই চন্দনও এসেছে পেছন-পেছন। হাতে একটা সুতো-বাঁধা গঙ্গা ফড়িং। চন্দনের মুখটা দুধের বাটির মত গোল। রং শাদা ফর্সা। ওকেও ধরবার জন্যে হাত বাড়ালেন

পরমেশবাবু, কিন্তু পারলেন না। ও নিজেই এক ফড়িঙের মত উড়ে পালালো। ঘরে একটা ঝাঁঝ-ঝাঁঝ গন্ধের আমেজ ছড়িয়ে গেল। নাকটা টেনে টেনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করলেন পরমেশবাবু।...মৃত্যুর গন্ধের ওপর অনেকের জন্যে জেগে উঠেছে জীবনের গন্ধ।

—দাদুমণি তুমি ওঘরে যাবে না? দিদার অসুখ খুব বেড়ে গেছে জানো? তুলসী মুখখানা খুব দুঃখ-দুঃখ করে বল্লে।

—হুঁ'—নির্বিকার মুখ করে পরমেশবাবু বিষাদকে পাশ কাটাতে চাইলেন, 'তোমার মা আসেনি তুলু দিদি?'

—'হ্যাঁ' মাথাটা কাত করে চোখ বড় বড় করলে তুলসী।

—'মা বাপী ঠাম্মা সকালে এসেছে। দিদা যে আজ মরে যাবে দাদু—'

—'বাঃ তাই জন্যে'? হেসে ফেল্লেন পরমেশবাবু।

ঘরের মধ্যে অনেক শালুক ফুল আর বাতাবি লেবুর ঘ্রাণ কচি ঘাস আর রোদ্দুরের মতন ছেয়ে গেছে।

বল্লেন, 'তোমার ঠাম্মাকে একবার পাঠিয়ে দাও না ভাই, একটু গপ্পো করব।'

—'ঠাম্মা এখন আসবেই না', চোখ গোল করে বল্লে তুলসী। 'ঠাম্মা দিদাকে খু-উ-ব ভালবাসত কিনা তাই কাঁদছে।'

—'ভালবাসলে কাঁদতে হয় বুঝি?' এবার শব্দ করেই হেসে ফেল্লেন। বল্লেন, তুমিও তো আমায় খু-উ-ব ভালোবাসো তবে কাঁদছ না কেন?'

—'বাঃ তুমি কি মরে গেছ নাকি? জ্যান্ত মানুষের জন্যে কেউ কাঁদে বুঝি?' খুব চালাক-চালাক কথা বলতে পরার খুশীতে ঠিকরে উঠল তুলসী।

গন্ধরাজ ফুলের গায়ে-বসা কেন্নোর মতন যেন টোকা দিয়ে একটা বিশ্রী ব্যথাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন পরমেশ। চোখ নাচিয়ে বল্লেন, 'আমি মরে গেলে ফের কী করে বুঝব তুমি আমাকে কত ভালোবাসো? তখন তো তোমার কান্না-টান্না কিছু দেখতেই পাব না আমি। তাহলে?'

তুলসীকে খুব চিন্তিত দেখালো। গম্ভীর মুখে বল্লে, 'একবারটিও দেখতে পারবে না তুমি? এট্টুসখানি চোখ খুলে'?

হাসির কথা কিন্তু সেটা নয় তবু বুকের বাঁ ধারে একটা যন্ত্রণা চিন চিন করে উঠল। পরমেশবাবু ভাবলেন মৃত্যু জীবনের সব কোণগুলোই কত সহজে দখল করে নেয়, নিতে পারে। তুলসীর মত তাজা সবুজ সুগন্ধী মেয়েটাও একদিন তার দিদিমার মতন হলদে, খয়েরি হয়ে দুমড়ে, কুঁকড়ে গুঁড়িয়ে যাবে। গন্ধটা কিছুকাল বাতাসে জড়িয়ে থাকবে তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়বে স্মৃতির মধ্যে। একটা যন্ত্রণা আচমকা মাছের মতন ঘাই মারলে তাঁর শরীরে। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের এক অদৃশ্য যোগসূত্র অনুভব করে বিস্ময়োৎফুল্ল হলেন। তুলসীর আর নির্মলার মুখ যেন মুহূর্তের জন্যে একাকার হয়ে গেল।

হঠাৎ নির্মলাকে ভালো করে আর একবার দেখবার তীব্র পিপাসা বোধ করলেন। চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করলেন। নির্মলার নিতান্ত সাধারণ শরীরের কাঠামোটাকে মনের মধ্যে ভাসিয়ে তুললেন জলের মধ্যে বিসর্জনের প্রতিমার মতন। সাধারণ হয়েও খুব সাধারণ যেন ছিল না নির্মলা। শরীরের প্রত্যন্তে, হৃদয়ের গোপন ফোকরে কোথাও একটা অলৌকিক গন্ধ বহন করে বেড়াত যেন। তার স্বেদ অশ্রু রক্তের মধ্যে ক্ষরিত হত, বিকীরিত হত। সে গন্ধ ভালবাসার না বিশ্বাসের বলতে পারবেন না পরমেশ, কিন্তু সেই গন্ধকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল তাঁকে দীর্ঘদিনের সাহচর্যে, সাধনায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো প্রগাঢ় আরো ঘনবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ভেতর বাইরের অভেদাত্মক। পরমেশবাবু দেখেছেন বয়স কারুর কারুর ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত মাধুর্যকে ম্লান করে দেয়। হয় গন্ধ উড়ে যায় নয় বিকৃত হয়ে ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে মদের আস্তরণ পড়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখা দামী মদের মত আরো বেশী স্বাদু হয়ে ওঠে। নির্মলা হয়ত বাইরে থেকে ম্লান হয়ে গিয়েছিল, যৌবনের উজ্জ্বলতা উচ্ছলতা আর ছিল না, কিন্তু দেহের আড়ালে কোথাও যেন অদৃশ্য মধু চাক বেঁধে জমে উঠেছিল দিন দিন। যার ছোঁয়া জীবনের সবখানে আশ্চর্য রসমণ্ডিত করে দিয়েছিল। সে যেন এক নির্জন ফুলের নির্বাক আত্মনিবেদনের গন্ধ। নির্মলার নিভৃত সৌরভের একটা আলাদা স্বাদ আলাদা সম্মোহ ধরা পড়েছিল তাঁর কাছে। অবশ্য গোড়াতেই নয়, দীর্ঘদিন পরে। যে গন্ধ বিগত চল্লিশ বছরেও মরে যেতে পারেনি। নির্মলার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে গিয়েও তাঁকে কাছে আসা যেতে পারত ঐ গন্ধের সূত্র ধরে। পরমেশবাবু এই মুহূর্তে এই দুর্লভ প্রাপ্তির জন্যে হাঁটু পেতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া সমীচীন হবে কিনা ভাবতে ভাবতে, [illegible] ঘরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন [illegible] সঙ্গে শ্মশান-আঁতুড়—বাসরে [illegible] জীবন ও মৃ[illegible] নির্মলার ঘেঁষে যোজন [illegible] স্মৃতির মত ছড়িয়ে পড়ল। ক্লোরোফর্মের মত তীব্র সম্মোহক প্রতিক্রিয়ায় তাঁর স্নায়ুশিরা অবশ হয়ে এল। বৃষ্টির মতন নির্মলার ঘ্রাণ তাঁকে ভিজিয়ে দিতে থাকল। তিনি বুঝতে পারলেন নির্মলাই তাঁকে বিশল্যকরণীর সন্ধান দিতে পারতো, হয়ত দিয়েও ছিল, তিনি সজাগ থাকতে ধরতে পারেননি। ঘরের বাইরের সমস্ত গন্ধকে ছাপিয়ে যে গন্ধটা এ মুহূর্তে তীব্রতর হয়ে উঠছে তা নির্মলার শরীরের না হৃদয়ের গন্ধ সনাক্ত করতে না পেরে তিনি চোখ বুজে ফেল্লেন।

সাতদিনের শুভাশুভ

জন্মরাশির ভিত্তিতে ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহের শুভাশুভ নীচে দেওয়া হোল।

মেষ : অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা নক্ষত্রের বা মেষ লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। আপনার কাজকর্মে, পারিবারিক জীবনে কোন বিশেষ আশা বা বাসনা এখন পূর্ণতা লাভ করবে। আর্থিক ক্ষেত্র অনুকূল। ব্যবসায়ে ততটা সাড়া নাও পেতে পারেন। শরীর একপ্রকার। ছেলেমেয়েদের উন্নতির লক্ষণ আছে। মহিলাদের শারীরিক উন্নতির যোগ আছে। শুভ তারিখ [illegible], ১৬, ১৯ এপ্রিল।

বৃষ : কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা নক্ষত্র বা বৃষ লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। আর্থিক ক্ষেত্র ক্রমশ ভাল হচ্ছে। ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন. নতুন লগ্নির সুযোগ আসতে পারে। ভূমি বা সম্পদ-সম্পত্তির ব্যাপারে সপ্তাহের শেষে ভাল ফল পাবেন। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। শরীর চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। মহিলাদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ১৫, ১৬, ১৮ এপ্রিল।

মিথুন : মৃগশিরা, অনুরাধা, পুনর্বসু নক্ষত্র বা মিথুন লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। কাজকর্মে দায়িত্ব বৃদ্ধি বা স্থানান্তরে শুভ বদলী হওয়ার লক্ষণ আছে। আর্থিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। ব্যবসায় মন্দ নয়। শরীর সুবিধার নয়। মহিলাদের পক্ষে পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। শুভ তারিখ : ১৪, ১৬, ১৮, ১৯ এপ্রিল।

কর্কট : পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা নক্ষত্রে বা কর্কট লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। আর্থিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। ব্যবসায় নতুন শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। প্রতিযোগিতা-মূলক কাজকর্মে, পড়াশুনায় সপ্তাহ শেষে শুভ ফল পাবেন। শারীরিক ও পারিবারিক উন্নতির যোগ আছে। মহিলাদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ১৯ এপ্রিল।

সিংহ : মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র বা সিংহ লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। বিবিধ কাজকর্মে বা আর্থিক চাপে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে সবকিছু কেটে যাবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ প্রবল। কাজ-কর্মে খ্যাতির লক্ষণ আছে। মহিলাদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ : ১৫, ১৬, ১৯ এপ্রিল।

কন্যা : উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা নক্ষত্র বা কন্যা লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। পারিবারিক উন্নতি. কাজকর্মে সুখ্যাতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শরীর একপ্রকার। আয় চলন-সই। মহিলাদের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। শুভ তারিখ : ১৪, ১৫, ১৭, ১৮ এপ্রিল।

তুলা : চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা নক্ষত্র বা তুলা লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। আর্থিক উন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা। শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্ম ভালই চলবে। শত্রুতার অবসান ঘটবে। মহিলাদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ ১৪, ১৫, ১৯ এপ্রিল।

বৃশ্চিক : বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বা বৃশ্চিক লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। আর্থিক ক্ষেত্র চলনসই। কাজকর্মে সাফল্য, চাকরীতে পদোন্নতির যোগ প্রবল। ব্যবসায় শুভ। শরীর মোটের উপর চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্র মন্দ নয়। মহিলাদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ এপ্রিল।

ধনু : মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র বা ধনু লগ্নের জাতক-জাতিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন। কাজকর্মে বাধাবিপত্তি, শত্রুতা দূর হবে। শরীর চলনসই। পারিবারিক উন্নতির সম্ভাবনা। মহিলাদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ১৪, ১৫, ১৮, ১৯ এপ্রিল।

মকর : উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, অভিজিৎ নক্ষত্র বা মকর লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। কাজকর্মে সাফল্য, শত্রুতার অবসানের লক্ষণ আছে। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্মে মান মর্যাদা বাড়বে। আর্থিক ক্ষেত্র চলনসই। শরীর মন্দ নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। মহিলাদের পক্ষে ভাল সময়। শুভ তারিখ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৯ এপ্রিল।

কুম্ভ : অভিজিৎ, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র বা কুম্ভ লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। শারীরিক বা পারিবারিক উন্নতি সেরকম লক্ষিত না হলেও আর্থিক ও কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতির লক্ষণ আছে। ব্যবসায় শুভ। মহিলাদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ১৪, ১৫. ১৬, ১৭ এপ্রিল।

মীন : পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী নক্ষত্র বা মীন লগ্নের জাতক-জাতিকার পক্ষে প্রযোজ্য। শরীর ভাল, পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। কাজকর্মে মর্যাদা পাবেন। ব্যবসায় চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্র মন্দ নয়। মহিলাদের মানসিক উন্নতির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ১৪, ১৬, ১৮ এপ্রিল।

—শুভাচার্য

প্রশ্নের উত্তর

প্রদীপ দেব (হালতু)—আগামী বৎসরে পাওয়ার সম্ভাবনা।

আশীষ সিকদার—আগামী জুন মাসের মধ্যে পাওয়ার প্রবল যোগ।

সুজন দাস (গৌহাটি)—কন্যারাশি।

সুদর্শন দাশগুপ্ত (দিল্লী)—পাশের সম্ভাবনা প্রবল।

কৌশিক মুখার্জি (ঝাড়গ্রাম)—ইঞ্জিনীয়ারিং-এ সম্ভাবনা বেশী।

দুলালী মজুমদার—স্বামীর কোষ্ঠী প্রয়োজন।

দীপংকর মুখার্জি—১৯৭৪ সালে সম্ভাবনা প্রবল।

বিনায়ক বোস (জলপাইগুড়ি)—আপনার জন্ম সময় ও স্ত্রীর কোষ্ঠী পাঠান।

সৈয়দ মোহাম্মেদউদ্দীন (ঢাকা)—মকর রাশি। ২৭ অথবা ২৯ বর্ষ বয়সে সম্ভব।

অরূপ কানুনগো (মুর্শিদাবাদ)—পাশের সম্ভাবনা প্রবল। ১৯৭৩ সালেই চাকরীর যোগ আছে।

কল্যাণ ঘোষ (মধ্যমগ্রাম)—স্ত্রীর কোষ্ঠী প্রয়োজন।

টুলু সুর (জামসেদপুর)—জন্মসময় প্রয়োজন।

চণ্ডীদাস ব্যানার্জি (বাঁকুড়া)—ভালই যাবে। হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দেবব্রত চ্যাটার্জি (নাগপুর)—আশা কম।

মঞ্জুলা (জামসেদপুর)—১৩৮০ সালে সম্ভব। দাম্পত্য জীবন সুখের।

সুব্রত বসু—মকর রাশি, মিথুন লগ্ন। ব্যবসায় উন্নতি তবে পারিপার্শ্বিক চাকরী থাকা সম্ভব।

ম, ব (কলিকাতা)—জন্ম সন তারিখ সময় প্রয়োজন।

গীতশ্রী দত্তচৌধুরী—আশানুরূপ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এস, মিত্র (বারুইপুর)—১৯৭৩ সালে সম্ভাবনা আছে।

শ্রীবিশ্বাস—১৩৮০ সালে এখানেই হওয়ার সম্ভাবনা।

পংকজ বর্মণ (বর্ধমান)—জন্ম সকালে না বিকালে জানাবেন।

নীরেন্দ্র ভৌমিক (বরানগর)—১৩৮০ সালে প্রবল যোগ।

মলিন ঘোষ (বালি)—সুফল সম্ভব। ১৯৭৪ সালে চাকরী পাওয়ার যোগ।

দেবকুমার মুখার্জি (আসানসোল)—জন্ম সাল ও সময় পাঠাবেন।

সৌমেন পাল—আগামী জুন মাসের মধ্যে সম্ভাবনা বেশী।

সুধা দাস—জন্মসন তারিখ সময় জানাবেন।

জহরলাল দাস—২৭ বৎসর বয়স থেকে সচ্ছলতা আসবে।

আশীষকুমার মুখার্জি (গড়বেতিয়া)—জন্মসন তারিখ সময় পাঠাবেন।

অরূপ লাহা—পরীক্ষার সাফল্য এবং ১৯৭৩ সালের শেষে চাকুরী সম্ভব।

চিত্রা মুখার্জি—আশানুরূপ ফল লাভে বাধা আছে।

রত্না ভট্টাচার্য (দমদম)—১৯৭৩ সালেই অধ্যাপনা বিষয়ক চাকুরীর সম্ভাবনা।

জি, সেন (হাওড়া)—আগামী বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে সম্ভাবনা আছে। সুখেরই হবে।

গায়ত্রী (টিটাগড়)—১৩৮০ সালের শেষার্ধে সম্ভাবনা আছে।

প্রতিমা দে—স্বামীর কোষ্ঠী প্রয়োজন।

তপতী সেন—২১ অথবা ২৩ বছর বয়সে সম্ভব।

প্রকাশকদের প্রতি

আগামী ১১ মে, অমৃতের নববর্ষ সংখ্যায় এক বছরের গ্রন্থপঞ্জী ছাপা হচ্ছে। ১৩৭৯ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত বইগুলি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে, প্রকাশিত-গ্রন্থের বিবরণ পাঠাবার জন্য, প্রকাশকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—১৩৮০ সাল থেকে আর্থিক সচ্ছলতা [illegible]

মিস ডি, ব্যানা[illegible] বয়সে সম্ভব।

পীযূষকান্তি সেন—[illegible] সময় জানাবেন।

লিপি দাস—মিথুন রাশি। মিথুন লগ্ন।

কমলা গোল—৩৪ বছর বয়সে সম্ভব তবে প্রবল বাধা আসতে পারে।

ছন্দনাম (ধানবাদ)—আশা কম।

অনুপ গুহ—১৩৮০ সালে সম্ভব। আর্থিক শুভ।

অশোক সেনগুপ্ত—১৯৭৪ সালে সম্ভব।

খোকা (নদীয়া)—২৬ অথবা ২৮ বছর বয়সে।

মীনাক্ষী—পাশ করার ব্যাপারে সন্দেহ আছে তবে চাকরী পেতে পারেন।

মণীন্দ্র ভট্টাচার্য (কাহাড়)—১৯৭৩ সালেই সম্ভাবনা। ভাল।

রীণা চক্রবর্তী—ফল ভাল হওয়ার আশা কম। ৩৩ বছর বয়সের পর।

স্নেহশোভনা রক্ষিত—আগামী জুন মাসের মধ্যে পেতে পারেন।

গৌতম দাস (কলি-৪২)—আশা কম। মিথুন লগ্ন।

শ্যামল কর্মকার—আশা না করাই ভাল।

শিখা সেন (যাদবপুর)—আশানুরূপ হবে কিনা সন্দেহ।

কাকলি দাস (হাওড়া)—মীন রাশি। তুলা লগ্ন।

খগেন দাস (আসাম)—পাশ করার যোগ আছে। বাধা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার সম্ভাবনা আছে।

অনুকূল রায়—অহেতুক ঝামেলায় সম্ভাবনা আছে।

বনবালা সেনগুপ্ত (কটক)—১৯৭৩ সালেই পারবেন মনে হয়।

মলি রায়—বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ১৩৮০ সালে হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বম্বে)—মীন রাশি। বৃষলগ্ন। আগামী বছর বদলীর সম্ভাবনা আছে।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত (দিল্লী)—১৯৭৩ সালের প্রথমার্ধে সম্ভব।

সায়ন চক্রবর্তী (বম্বে)—সিংহ রাশি, মেষ লগ্ন, উচ্চশিক্ষিত হওয়ার যোগ আছে।

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ... ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ... ...

আপনার প্রশ্ন ... ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায় খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন।]

প্রেক্ষাগৃহ

ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানীর চলচ্চিত্রোৎসব

ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী অনুসারে সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন শহরে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর (পশ্চিম জার্মানীর) একটি সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৭৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীতে এই উৎসব শুরু হয়ে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গা ঘুরে এসেছিল কলকাতায়। ২৩ মার্চ, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার লাইট হাউস সিনেমায় এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ. এল. ডায়াস। যে-সাতটি কাহিনী-চিত্র এই উপলক্ষে প্রদর্শিত হয়ে গেল, তার মধ্যে একমাত্র "ট্যাটু" ছবিখানি পূর্বে দেখানো হয়েছিল, বাকি ছ'খানিই কলকাতায় এই প্রথম দেখানো হল। "পার্গেটারি" ছবিটি ছাড়া প্রতিটিতেই "এ" মার্কা—অর্থাৎ প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য, এই পরিচিতি থাকার জন্যে ছবিগুলি দেখবার জন্যে দর্শকদের আগ্রহের সীমা ছিল না। অগ্রিম বিক্রয় শুরু হবার দিনেই সপ্তাহব্যাপী কুড়িটি—উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের কোনও প্রবেশপত্র সাধারণে্য বিক্রীত হয় নি—প্রদর্শনীর টিকিট নিঃশেষিত হয়ে যায়। না, একটি দেশের শিল্পসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে নূতন অভিজ্ঞতা-লাভের আনন্দ উপভোগের জন্যে দর্শকদের এই আগ্রহ নয়, 'এ' মার্কার পশ্চাতে যৌন ব্যাপার বা নগ্নতা সম্পর্কীয় যে-প্রতিশ্রুতি

[illegible]
[illegible]
ফটো: [illegible] দত্ত।

আছে, তারই আকর্ষণে দর্শক-সাধারণের মধ্যে এই হুড়োহুড়ি।

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী বা পশ্চিম জার্মানীর তরুণ পরিচালকদের তৈরী এই অতি-আধুনিক ছবিগুলিতে—অধিকাংশ ছবিই ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে নির্মিত —যৌনব্যাপারটাকে [illegible] নিতান্ত অপ্রয়োজনেই যেন মাত্র দর্শক-আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই স্থান দেওয়া হয়েছে। ধরুন, "ডেডলক" ছবিটির কথা। স্যুটকেশের মধ্যে রাখা প্রচুর নোটের তাড়া কে হাতাতে পারবে, তাই নিয়ে যখন দেহের শক্তি ও মস্তিষ্কের চতুরালির লড়াই চলেছে চার্লস ডাম্প ও কিড-এর মধ্যে, তখন নির্জনতার অবকাশে শীর্ণ ডাম্প-কন্যার নিজেকে ও কিডকে বিবস্ত্র করে কিডের দেহ ধরে দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে ক্রমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার দৃশ্যটি কি এতই প্রয়োজনীয় ছিল?

১৯৬২-র ফেব্রুয়ারীতে অষ্টম ওবার-হাউজেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রোৎসবে যে-সব তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক "বাবাদের চলচ্চিত্রকে দূর করে দেবার" যে-প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তারই সফল পরিণতি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিল ভী. শ্লোয়েনডর্ফ-এর 'এস. পি. স্যামোমিনার 'ক্লোজড় সিজন ফর ফক্সেস' এবং এ. ক্লুগে-এর 'ইয়েসটারডে গার্ল'। সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে তরুণ পরিচালকরা ইতালীয় নিও-রিয়ালিজম ও ফরাসী নিউ ওয়েভ-এর আদর্শকে সামনে রেখে চলচ্চিত্রসৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়। একদিকে তারা বিধ্বংসী দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত, অন্যদিকে তারা সনাতন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচণ্ড বিদ্রোহী। শাসকগোষ্ঠী ও কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের দারুণ অনাস্থা, সামাজিক নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে যা-কিছু রীতি-নীতি, আইনকানুন, তাকেই অমান্য করবার প্রতি তাদের দুরন্ত ঝোঁক এবং সেই সঙ্গে যৌবনযন্ত্রণা—একে ভালোবাসাই বলুন, আর যাই বলুন—দ্বারা তারা অতিমাত্রায় পীড়িত। মানুষের মুখ আজ বিকৃত, নৈরাশ্যের ভারে সে আজ অবনমিত। এরই প্রতিফলন আজ পশ্চিম জার্মানীর তরুণ পরিচালকদের সৃষ্ট সকল চলচ্চিত্রে।

উদ্বোধনী চিত্র "দি ক্যাপ্টেন" একটি ব্যঙ্গাত্মক হাসির ছবি। বরাবর মাল-জাহাজ চালিয়ে এসেছে; হঠাৎ ক্যাপ্টেন এব্‌সকে বলা হল, যাত্রীবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে। পুরাতন নিয়মতান্ত্রিক আদর্শমাফিক চলতে গিয়ে স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত যাত্রীদের সামাল দিতে এব্‌স্‌ হল নাজেহাল। কিন্তু প্রলোভন জয় করবার বাহাদুরী দেখিয়ে ক্যাপ্টেন শুধু যে তার 'জুলিয়া' জাহাজেরই আদর্শ চালক হিসেবে নাম কিনলেন, তাই নয়, স্নায়ুরোগগ্রস্ত যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য রাখতেও তাঁর বাহাদুরী প্রশংসিত হল। ক্যাপ্টেন হিসেবে হিঞ্জ রুহমান-এর অভিনয় অবিস্মরণীয়।

রাইনহার্ড হাউফ পরিচালিত "মাথিয়াস নিজেল" একটি দুঃখী পরিবারের ওপর শাসকগোষ্ঠীর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছে। ১৯০০ সালের কাছাকাছি নিজেল পরিবার মিউনিক এবং আগস্ট-বুর্গের মাঝামাঝি একটি জায়গায় একটি পরিত্যক্ত কারখানাবাড়ীতে বাস করত। তারা ছিল একটি বহিরাগত পরিবার এবং একজন বিখ্যাত ডাকাতের আত্মীয়। তারা সুযোগ পেলে মজুরের কাজ করত; [illegible] সময়ে বনের জন্তুজানোয়ার মেরে প্রাণধারণ করত। কিন্তু সংরক্ষিত বনভূমিতে প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ থাকায় তাদের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তারা একে একে সকলেই পুলিশের হস্তে নিহত হয়েছিল। সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীর সাহায্যে তোলা এই চিত্রকাহিনীটি নির্মম বাস্তবতা দ্বারা চিহ্নিত। হ্যাসেনস্টিনের ক্যামেরা রাইনহার্ড হাউফ-এর শিল্পভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছে।

ভকার শ্লোয়েনডর্ফ পরিচালিত "সাডেন রিচনেস অব দি পুওর পিপল অব কোমবাক" ছবির নামেই কাহিনীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়। সাতজন গরীব নিঃস্ব চাষী আর কোনও রকমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে না পেরে সরকারী রাজস্ব বয়ে-নিয়ে-যাওয়া গাড়ী লুট করতে বদ্ধপরিকর হয়। কিন্তু বারে বারে ওরা ব্যর্থ হয় সাহসের ও সংঘবদ্ধতার অভাবে। ষষ্ঠবারে ওরা যখন তাদের চেষ্টায় সফল হল, তখন ওদের ওপর নেমে এল সরকারী নির্যাতন। অনুসন্ধানের ফলে যাদেরই আর্থিক উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেল, তাদের প্রত্যে[illegible] গ্রেপ্তার করা হল। ওদের ওপর ন[illegible]ত্রের দোহাই ইত্যাদি প্রয়োগ ক[illegible]ছ থেকে অন্যায় কবুল ক[illegible]এবং ওরা অনুশোচনায় দগ্ধ[illegible]র মঞ্চে আরোহণ করল। এ[illegible] আত্মহত্যা করে পরিত্রাণ পেল [illegible]তে পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন অনুশাসন উদ্ধার করে

বলা হয়েছে, ধনীর নির্দেশেই গ্রন্থখানি রচিত; নইলে তাদের দোহাই পেড়ে "গরিবকে তার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে বলা হতো না।" আজ পর্যন্ত খৃস্টান জগতের [illegible] চলচ্চিত্র বা অপর কোনো শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমে এত বড়ো কথা বলা হয়নি [illegible] আমাদের [illegible]।

"আই লাভ ইউ, আই কিল ইউ" নামক রঙীন ছবিতে সনাতন প্রথা ও রীতিনীতি ভঙ্গের এক রূপক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এমন একটি সমাজ দেখানো হয়েছে, যেখানে [illegible] অপরিমিত ব্যবহারে কোনও [illegible] পুরুষ-নারীতে যৌন-সংসর্গ [illegible] একটি সাধারণ ব্যাপার, এমনকি [illegible] পুরুষে আসঙ্গলিপ্সাও দোষের নয়। এমন সমাজে বালক-বালিকাদের শিক্ষাগুরু শিক্ষকত্তা থেকে অন্যায় পশু-হত্যায় আনন্দলাভ করে। একজন আসল শিকারীর চেয়েও ঘৃণ্য হয়ে পড়ে। পরিচালক উয় ব্র্যান্ডনার সম্ভবত 'যুদ্ধোত্তর' পশ্চিম জার্মানীর নৈতিক অধঃপতনের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন।

আজকের দিনে সমস্ত মানবসমাজের ভবিষ্যৎ ব্যক্তির দায়িত্বশীলতার ওপর নির্ভরশীল এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্যে যে-কোনও বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়—এই কথাই বলতে চেয়েছেন "পার্গেটরি" ছবির পরিচালক হ্যারো সেনফ্ট। ডেনিয়েল হার্টম্যান নামে একটি যুবককে পুলিশ আফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সাহায্যে সে অতীতে ফিরে যাচ্ছে বারংবার। সে দেখছে, হঠাৎ একজন লোককে জোর করে মোটরে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে ছুটে গেল ব্যাপারটা জানতে। একটি মেয়ে তাকে জানাল, রাজনৈতিক বিরোধের জন্যেই আরেফকে অপহরণ করা হয়েছে। ওরা ছুটল ওকে উদ্ধার করতে। কিন্তু উদ্ধার করবার পরে ডানিয়েলের মনে প্রশ্ন জাগল, কাজটা সঙ্গত হয়েছে কিনা। এবং ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল, আরেফের এক আততায়ীকে সে নিজেই হত্যা করেছে। তখন পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর উপায় রইল না। ছবির সমাপ্তি হয়েছে হিংস্রতার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে এবং বলা হয়েছে মানুষকে রক্ষা করবার দায়িত্ব মানুষেরই ওপর।

জোহানেস শাফ পরিচালিত "ট্যাটু" ছবিতে একটি অনাথ আশ্রমে পালিত কিশোর এক ধনীগৃহে গিয়ে যখন দেখল, তার ধনী আশ্রয়দাতা তার প্রীতি অযথা দয়া প্রকাশ করছেন, তখন সে হয়ে উঠল বিদ্রোহী। এতো স্নেহ নয়, এ যে স্রেফ দয়া এই চিন্তা তাকে উন্মাদ করে তুলল। এরপর যখন সে দেখল, ওরই মতো একটি কিশোরীকেও তিনি পালন করছেন দয়া প্রকাশ করবার জন্যে এবং তাকে ওর সান্নিধ্য থেকে তিনি দূরে রাখতে চান, ওদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের পথে তিনি হয়ে দাঁড়ান অন্তরায়, তখন ক্ষেপে গিয়ে ও তাঁকে খুন করে মুক্তির স্বাদ অনুভব করে।

অর্থের লোভে মানুষ কতখানি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তারই এক বিচিত্র ছবি তুলে ধরেছেন পরিচালক রোলান্ড ক্লিক তাঁর 'ডেডলক' ছবির মাধ্যমে। বালুকা ও প্রস্তরে ভরা প্রেতপুরী ডেডলকের আশ্চর্য পট-ভূমিতে তিনটি পুরুষ—দুটি খুনে ডাকাত, অ্যান্টনি সানসাইন ও কিড এবং স্বর্ণখনির প্রৌঢ় শ্রমিক চার্লস ডাম্প এবং দুটি নারী—এক, যৌনবুভুক্ষু প্রৌঢ়া ও দুই, ডাম্প-এর বিশীর্ণা যুবতী কন্যা—এই পাঁচজনকে আশ্রয় করে লালসা, স্বন্দ্ব, হিংসা, প্রেম, কামের তাড়না প্রভৃতির যে-বিচিত্র পরিবেশ রচিত হয়েছে, তা রুদ্ধ নিশ্বাসে দর্শনীয়। ছবিটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বৈচিত্র্যে ভরা এবং পটভূমিকা অপূর্ব। ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে আশ্চর্য সাহায্য পেয়েছেন পরিচালক ক্লিক।

এই ছবিগুলি বর্তমান পশ্চিম জার্মানীর চিন্তাধারা জানতে ও বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে বলেই মনে করি।

—নান্দীকর

স্টুডিও সংবাদ

'বিলেত ফেরৎ' আসছে

সাংবাদিক ও [illegible] দাশগুপ্ত [illegible] 'বিলেত ফেরৎ' শীঘ্রই [illegible] দেশ প্রত্যাগত তিনজন ভারতীয় যুবকের তিনটি অভিনব কাহিনী এ ছবির বিষয়বস্তু। পারস্পরিক যোগসূত্র না থাকলেও দেশের মাটিতে এই তিন যুবকের যে বিচিত্র মানসিকতা চিত্রায়িত করা হয়েছে, তা হাস্য-রসের সৃষ্টি করলেও এর পরোক্ষ বেদনা দর্শকেরা উপেক্ষা করতে পারবেন না।

তিনটি কাহিনীর তিনটি যুবকের চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার। এঁদের সংগে রয়েছেন অপর্ণা সেন, শ্যামল ঘোষ, কৃষ্ণ কুণ্ডু, মণি শ্রীমানী, হাইড ওলাউ এবং নবাগতা সোহাগ [illegible]। তাছাড়া এ ছবির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর সংগে পৃথক পৃথকভাবে জড়িয়ে রয়েছে একটি ষাঁড়, একটি গাধা এবং বেশ কিছু পরিমাণ রক্ত।

'বিলেত ফেরৎ' ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা ও সুর সংযোজনার দায়িত্ব পালন করেছেন পরিচালক দাশগুপ্ত স্বয়ং। আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন ধ্রুব বসু।

ফুলেশ্বরী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছোট গল্প অবলম্বনে পরিচালক তরুণ মজুমদার যে-চিত্রনাট্যটি রচনা করেছেন, তাই পর্দায় রূপান্তরিত হবে 'ফুলেশ্বরী' নামে। দয়া-শঙ্কর সুলতানিয়া প্রযোজিত এই ছবির কাহিনীটি ট্রেনে কয়লা সরবরাহকারী অর্জুন বৈরাগীর ফুলি নামে কালকেত্তরা মেয়েটিকে ঘিরে রচিত হয়েছে। গীতিবহুল এই প্রেমের ছবিটিতে থাকবে কবিগান, তরজা ও লোকসংগীত। নামভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায় এবং অন্যান্য ভূমিকায় অনুপ-কুমার, শমিত ভঞ্জ, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, সুলতা চৌধুরী, রীণা ঘোষ, হরিধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা। মুকুল দত্ত রচিত গানে সুরসংযোগ করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির বহির্দৃশ্যগুলি বীরভূম এবং উড়িষ্যায় তোলা হবে।

'গ্রহণ' ছবির কাজ শুরু : বলাই সেন পরিচালিত এবং চিত্রনাট্যায়িত ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'গ্রহণ' ছবির কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতার অফিস পাড়ায় এবং অন্যান্য জায়গায় ছবির বেশ কিছু দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের বেকারত্বকে কেন্দ্র করে মুখ্যত এই ছবির কাহিনী। এই মাসের মাঝামাঝি দ্বিতীয় পর্যায়ের শুটিং শুরু হবে এবং সেই সঙ্গে ছবির একটা বড় অংশের কাজও শেষ হবে। স্বরূপ দত্ত, রবি ঘোষ, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অপ্রতী দেবী, বৃন্দ মিত্র ছাড়াও আরও বহু নতুন এবং পুরনো মুখ ছবিতে দেখা যাবে।
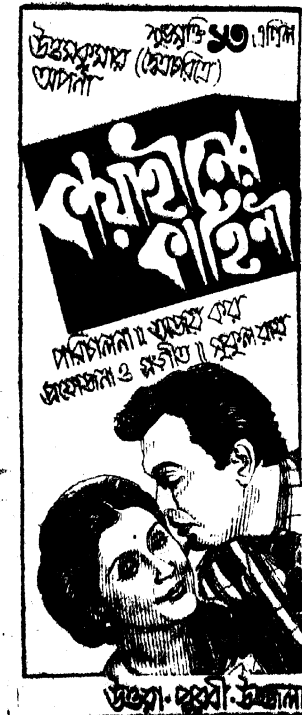
কায়াহীনের কাহিনী
উত্তমকুমার এবং অপর্ণা সেন

সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তপন সিংহ এবং ক্যামেরায় বিমল মুখোপাধ্যায়।

কায়াহীনের কাহিনী

মুকুল রায় প্রোডাকসানের প্রথম ছবি, অজয় কর পরিচালিত 'কায়াহীনের কাহিনী' বর্তমানে সম্পাদকের টেবিলে। নবেন্দু ঘোষ রচিত কাহিনীকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন সলিল সেন। উত্তরা, পূরবী এবং উজ্জ্বলাতে মুক্তি প্রতীক্ষিত, পিয়ালী পিকচার্স পরিবেশিত এই ছবিটিতে শ্বেতভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার এবং তাঁকে সহযোগিতা করছেন অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, চন্দ্রাবতী দেবী, বাসবী নন্দী ও সুলতা চৌধুরী। প্রযোজক মুকুল রায় নিজেই করেছেন সঙ্গীত পরিচালনা এবং আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন বিশু চক্রবর্তী।

ছায়া ও ছবি প্রোডাকসন্স-এর 'ঠগিনী'

পরিচালক তরুণ মজুমদার সুবোধ ঘোষ রচিত কাহিনী অবলম্বনে 'ঠগিনী' চিত্রটির সকল কাজ শেষ করেছেন। অর্থ, ক্ষমতা ও যৌন ব্যাপারের পটভূমিকায় মানুষের প্রেম ও প্রতিহিংসাকে আশ্রয় করে এর কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, দুই বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র প্রমুখ শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটিতে সুর যোজনা করেছেন।

ভ্রম সংশোধন

'নিশিকন্যা' ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ 'অশ্রুজল' নামে একটি ছোট গল্প অবলম্বনে। না, 'আঁখজল' হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি বড়োগল্প। এই ভুলের জন্যে আমরা লজ্জিত।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

স্টারে 'বিদ্রোহী নায়ক'

'বিদ্রোহী নায়ক'-এর অভিনয় সম্পর্কে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নাট্যামোদীদের অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বর্তমানে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শততম বর্ষ চলেছে। তাঁরা দুঃখের সঙ্গে একথাও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বঙ্গ নাট্যশালার শতবর্ষের জীবনযাত্রার গৌরবময় ঘটনাকে বাঙালীর যে-আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা উচিত ছিল, তা আমরা পালন করিনি। ও'রা কারণের উল্লেখ করেননি। কিন্তু আমরা জানি, বাঙালীর ঐক্যবোধের অভাব, ঐতিহ্য সম্পর্কে নিস্পৃহতা এবং সর্বোপরি সরকারী ঔদাসীন্য এত বড়ো একটা গৌরবময় ঘটনাকে জাতীয় মর্যাদায় পালিত হতে দেয়নি। এবং আমরা স্থিরনিশ্চয়, আমাদের উত্তরপুরুষেরা শতবর্ষ পালনে আমাদের এই চরম উপেক্ষাকে কোনোদিনই ক্ষমা করবে না।

স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে, তাঁরা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের গৌরবময় এই শততম বর্ষে এমন একখানি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, যার কাহিনীর মাধ্যমে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের শহর কলকাতার একটি জীবন্ত ছবির সম্মুখীন হবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছি। বৌবাজার-মলঙ্গা লেনের কাছাকাছি আর একটি রাস্তা আছে, যার নাম হচ্ছে শ্রীনাথ দাস লেন। এই শ্রীনাথ দাস ছিলেন একজন বিখ্যাত উকীল এবং কলকাতা শহরের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। এ'রই জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ হচ্ছেন স্টারের নাট্যকার ও পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখিত নবতম নাটক 'বিদ্রোহী নায়ক'-এর নায়ক। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন চিন্তায় কর্মে একজন পুরোদস্তুর বিপ্লবী এবং তাঁর রক্ষণশীল পিতার ঠিক বিপরীতপন্থী। বি-এ পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হবার পরেই তিনি গিয়েছিলেন ইংলণ্ড পিরে ব্যারিস্টারী পড়তে। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়ায় তিনি হলেন লেখক, [illegible] এবং র‍্যাডিক্যাল দলের [illegible] দেশের স্বাধীনতার [illegible] তাঁর বন্ধু শিবনাথ [illegible] করেন। [illegible] মৃত্যুর পরে তিনি এক উচ্চ-[illegible] পরিবারের বিধবা কন্যা সৌরভীকে বিবাহ [illegible] একটি লেখা বিধবা বিবাহ এবং [illegible] বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এর [illegible] উপেন্দ্রনাথের মনে ধারণা জন্মায়, [illegible] হচ্ছে লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার; [illegible] দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে যতখানি না [illegible] হয়, তার থেকে ঢের বেশী প্রচার চালানো যায় রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বন্ধু, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সহায়তায় ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার-এর ডিরেক্টার হন। রঙ্গা-লয়ের অভিনেত্রীরা সেযুগে বারাঙ্গনা সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভূত হত। উপেন্দ্রনাথের মতে তদ এদের এই কলংকমুক্ত করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়া কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সহ নিরোধিতা সত্ত্বেও গোলাপসুন্দরী নামে একজন অভিনেত্রীর গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামক অভিনেতার সংগে বিবাহ দেন ১৮৭২-এর ৩নং আইন অনু-সারে। উপেন্দ্রনাথ রচিত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকটি অশ্লীল এই অজুহাতে পুলিশ উপেন্দ্রনাথ সহ অমৃতলাল বসু প্রমুখ দশ-জনকে থিয়েটার চলার সময়েই গ্রেপ্তার

আমি সিরাজের বেগম
বিশ্বজিৎ এবং সন্ধ্যা রায়।
পরিচালনা: সুশীল মুখোপাধ্যায়।

করেন। নিম্ন আদালতে উপেন্দ্রনাথ এবং অমৃতলালের একমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অবশ্য গণেশচন্দ্র চন্দ্রের চেষ্টায় মনোমোহন ঘোষ, তারক পালিত, মিঃ ব্রানসন প্রমুখ ব্যারিস্টার আসামীপক্ষ সমর্থন করে হাইকোর্টের আপীল মোকদ্দমায় এঁদের বেকসুর খালাস করিয়ে আনেন। এই সময় থেকেই উপেন্দ্রনাথ মানসিক চিন্তা ও প্রচুর পরিশ্রমের ফলে গুরুতরভাবে পীড়িত অবস্থায় বন্ধু শিবনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং এই সময়েই পিতাপুত্রের আবার মিলন ঘটে শিবনাথ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ চেষ্টায়। এটা হচ্ছে ১৮৭৬ সালের ঘটনা।—এরপরে উপেন্দ্রনাথ সুস্থ হন এবং ওঁর পিতা ওঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। যতদূর মনে হয় উনি কিন্তু ব্যারিস্টারীতে কৃতকার্য না হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং আবার কিছুদিন থিয়েটার নিয়ে মেতে ওঠেন। বাংলা ১৩০২ সালে (ইংরাজী ১৮৯৫) তাঁর দেহান্ত হয়। বাংলা ১২৫৫ সালে উপেন্দ্রনাথের জন্ম।

নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত বি-এ পাশ করবার পরে উপেন্দ্রনাথের বিলাতে যাবার ইচ্ছা বাধা পাওয়ায় পিতাপুত্রে যে বিরোধ সেই ঘটনা দিয়ে নাটকের আরম্ভ করেছেন এবং পুত্রের রোগশয্যায় পিতার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। নাটকে শ্রীনাথ দাস, তাঁর সহধর্মিণী, তাঁর চার পুত্র উপেন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী, শ্রীনাথের বন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উপেন্দ্রনাথের দুই বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী ও মহাত্মা শিশির কুমার ছাড়াও অমৃতলাল বসু, গণেশচন্দ্র চন্দ্র ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ তারক পালিত প্রভৃতি চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যায় এবং এঁদের সঙ্গে আছেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্প্রদায় প্রভৃতি।

—উপেন্দ্রনাথের চরিত্র যে প্রচুর নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না, নাট্যকার শ্রীগুপ্তও যে সেগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন, সে কথাও অনস্বীকার্য। নাটককে সম্ভাব্যভাবে সীমিত রাখবার জন্যে শ্রীগুপ্ত বহুস্থলে নাট্যক্রিয়াকে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত না করে তার বর্ণনাত্মক দৃশ্য সংযোজন করেছেন: কিন্তু তার ফলে দর্শকমনে প্রতিক্রিয়া বা ইমপ্যাক্টটি যথেষ্ট কমে যাচ্ছে কিনা সেটা শ্রীগুপ্তকে বিবেচনা করে দেখতে বলি।

'বিদ্রোহী নায়ক' নাট্যাভিনয়ের প্রধান গুণ হচ্ছে এর সামগ্রিক অভিনয়। [illegible] করে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি ছোটবড় চরিত্রের মধ্যে প্রতিটি চরিত্র এমন নিখুঁতভাবে অভিনীত

হওয়া যে কোনও নাট্যসম্প্রদায়ের পক্ষে শ্লাঘার কথা। এবং ওরই মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে রূপশীল শ্রীনাথ দাসের ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদৃষ্টপূর্ব ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়। মিথ্যাচরিত আচার ও প্রথার [illegible] আত্মত্যাগে তিনি দৃঢ়[illegible] [illegible] কোথায় [illegible]। আবার শেষ দৃশ্যে পুত্রদের রক্তধারা যেখানে দৃশ্যমান বন্যার আকারে প্রকাশিত হয়, সেখানেও তিনি অসামান্য। শ্রীনাথ দাসের ভূমিকাভিনয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নটজীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। বিপ্লবীমনা উপেন্দ্রনাথের চরিত্রটিকে সবিতাব্রত দত্ত সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্তব্য নির্ধারণে স্থিরচিত্ত উপেন্দ্রনাথের চরিত্র বর্তমান যুগের যুবনেতাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যথার্থই উপেন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মনোভাবকে সবিতাব্রত যে চমৎকার ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁকে আধুনিক যুবনেতাদের অন্যতম বলেই বোধ হয়। শ্রীনাথ দাসের অপর তিন পুত্র—জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকায় যথাক্রমে সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুখেন দাস ও সৈকত পাকড়াশীর অভিনয়ও চরিত্রানুযায়ী সুন্দর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পী সুখেন দাস শ্রীনাথ দাসেরই বংশের সন্তান। অপরাপর পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে বিদ্যাসাগর, শিবনাথ, শিশিরকুমার, অমৃতলাল বসু, দত্তবাবু, ত্রিলোচন লোধ ও গোষ্ঠবিহারীর ভূমিকায় যথাক্রমে শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গাঙ্গুলী, প্রেমাংশু বসু, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সুনীল চক্রবর্তী ও গোপাল সিংহ রায়ের।

স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় অভিনীত সৌরভিনীর (সৌরভী?) চরিত্রটি আন্তরিকতাগুণে অন্তরস্পর্শী। সুন্দর বাচন ও সংবেদনশীল অভিনয়ে সুব্রতা আজ প্রথম সারির মঞ্চশিল্পী। উপেন দাসের প্রথমা স্ত্রী মনোমোহিনীর ছোট্ট অথচ সুমিষ্ট ভূমিকাটিতে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সারল্যোজ্জ্বল অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে। তাঁর কণ্ঠের 'অন্তরযামী মম অন্তরে রহ' গানটি রবীন্দ্র সুরে গীত হয়ে আনন্দ দিয়েছে। রমণীসুন্দরী—শ্রীনাথের স্ত্রীবেশে অপর্ণা দেবী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করেছেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মেয়েদের দর্শকদের জমিয়ে রেখেছিলেন নাচে, গানে, ভঙ্গীতে ও বাচনে গীতা দে, নীলিমা দাস, শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, মেনকা দাস, কল্পনা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী। গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয় মঞ্চে পুলিশের আবির্ভাব এবং উপেন্দ্রনাথ প্রমুখকে গ্রেপ্তারের দৃশ্যটি প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

সু-পরিকল্পিত দৃশ্যপট যুগোপযোগী নৃত্যগীত এবং অন্যান্য উপাদানের সামগ্রিক ভূমিকায় স্টার থিয়েটারের নবতম নাট্যোপহার [illegible] 'বিদ্রোহী' নাটককে একটি বাস্তব সমাজচিত্ররূপে দর্শক-অভিনন্দনযোগ্য করে তুলেছে।

নাগকন্যা ছবির সেটে উত্তমকুমার এবং শৈলেন মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা: দিলীপ মুখোপাধ্যায়। ফটো: অমৃত

প্রফুল্ল নাট্যাভিনয় : স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন (কলকাতা) স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা ৬ষ্ঠ বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের চিরনতুন নাটক 'প্রফুল্ল' মঞ্চস্থ করে গত ইংরাজী ১২ মার্চ স্টার রঙ্গমঞ্চে।

প্রধান অতিথি প্রখ্যাত নাট্যামোদী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রফুল্ল নাটক উপস্থাপনার গুরুত্ব এবং রসিক শ্রোতৃবৃন্দের কাছে তাঁর বহুমুখী অভিজ্ঞতার কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা দেন।

প্রথমেই মনে পড়ে মোহনলাল মুখোপাধ্যায় (যোগেশ) তিনি চরিত্রের ব্যথা-বেদনা অন্তর্দ্বন্দ্ব স্ত্রীর প্রতি গভীর আসক্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। দেবীপ্রসাদ ব্যানার্জি (রমেশ), হারাধন ব্যানার্জি (পীতাম্বর), দিলীপ ঘোষ (মদন), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (ভজহরি) তাঁদের অভিনীত নিজ নিজ চরিত্রের প্রতি সমুচিত মর্যাদা দান করেন। সমীরণ সেনের (সুরেশ) অভিনয় সুন্দর ও সাবলীল। এঁদের পরে যাঁদের অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ তাঁরা হলেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় (কাঙালীচরণ) ও রাণু রায় (জগমণি), মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (উমাসুন্দরী) ও অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (জ্ঞানদা)। দীপা হালদারের (প্রফুল্ল) কাছে আরো বেশী প্রত্যাশা ছিল। এছাড়া নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন অখিল চক্রবর্তী (শিবনাথ), অনিল কুণ্ডু (দেওয়ান), সুনীল মাল (ইন্সপেক্টর), গিরিধারী কুণ্ডু (জমাদার), দেবকুমার মৈত্র (মেট), মহীতোষ বসু ও রঞ্জিৎ গুপ্ত (ব্যাপারীগণ), রণেন সাহা, পরিমল রায় ও গোপীনাথ [illegible] (কয়েদী-গণ), দেবেশ সেন (দারোয়ান), গোপাল দাস (শান্তি) ও বিশ্ব[illegible] চক্রবর্তী (ডাক্তার), কল্যাণ মুখোপাধ্যায়

(আদম) ও অনিন্দ্যা দেবীর (মাতালিনী) অনবদ্য।

বিশু চট্টোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু সম্পাদনা ও নির্দেশনায় এস টি এস শিল্পী গোষ্ঠী অভিনীত 'প্রফুল্ল' একটি সার্থক নাট্যাভিনয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

শৌভনিকের নতুন নাটক

মোহন রাকেশ রচিত 'আধে অধুরে' নাটকের অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিভা অগ্রবাল প্রদত্ত বাংলা রূপটিকে মঞ্চস্থ করবেন শৌভনিক সম্প্রদায় আসছে ১ বৈশাখ, ১৩৮০, ইংরাজী ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৩, শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টার মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। নির্দেশনা ও প্রধান ভূমিকায় আছেন কৃষ্ণ কুণ্ডু। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কাজল মুখোপাধ্যায় বাণী বর্মা, প্রণতি মজুমদার ও ভূপাল মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন ভাস্কর মিত্র।

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চেই "বেগম মেরী বিশ্বাস" অভিনয় করা অল্প সাহসের কাজ নয়। কিন্তু এই সাহসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন ভারত সরকারের টাঁকশালের এ্যাসিসট্যান্ট বুলিয়ন কীপার্স রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ গেল ১৯ মার্চ, সোমবার সন্ধ্যায়। অবশ্য এঁদের যে সর্বপ্রকারে উৎসাহ দিয়েছিলেন বিশ্বরূপার কর্ণধার রাসবিহারী সরকার স্বয়ং, এ-কথা ওঁদের কর্তৃপক্ষ সানন্দে স্বীকার করেছেন বক্তৃতার মাধ্যমে এবং স্মারক পুস্তিকাতে (যেখানে প্রধান পরামর্শদাতারূপে শ্রীসরকারের নাম মুদ্রিত)। অফিসের অভিনয়ে যে-বিশেষত্ব সচরাচর দৃষ্টগোচর হয়ে থাকে, এই অভিনয়েও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। অর্থাৎ পুরুষ-ভূমিকাগুলি থেকে স্ত্রী-ভূমিকাগুলি সুন্দর-ভাবে অভিনীত। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বড় বৌরাণীর ভূমিকায় রুবী দত্ত: বাচনে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশে তিনি সুনিপুণা। লুৎফার ভূমিকায় বিপাশা গোস্বামী যথোচিত আবেগসঞ্চারে সক্ষম হয়েছেন। নায়িকা মরালী বেশে মীরা চক্রবর্তী ভূমিকার বৈচিত্র্যময় রূপকে প্রকাশিত করতে পেরেছেন। ছোট বৌরাণীর ভূমিকায় ছবি তালুকদারও যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছেন। নানী বেগমের ভূমিকাভিনেত্রী বেলা দেবী বার্ধক্য সত্ত্বেও স্বীয় দক্ষতা প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। পুরুষদের অভিনয়ে নূতন ও পুরাতন দুটি ধারাই প্রত্যক্ষ করা গেল। ক্লাইভ ও নবাব বেশে যথাক্রমে রামদাস মুখোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ পুরাতন-পন্থী সুরেলা অভিনয়ের নজীর রেখে নিজেদের পারদর্শিতা প্রকাশ করেছেন। অপর দিকে কান্ত সরকার এবং উদ্ধব দাস বেশে যথাক্রমে দেবকুমার ঘোষ ও তিমির চক্রবর্তী নব্যভঙ্গীর বাহক। রামপ্রসাদরূপী অরুণ চৌধুরী ও তিমির চক্রবর্তীর কণ্ঠে গানগুলি সাধারণভাবে সুশ্রাব্য। অন্যান্য ভূমিকায় কেউ বা ভালো, কেউ বা মন্দ নয়।

'আদাকার' নাট্যসংস্থা

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে হিন্দী নাট্য-সংস্থা 'আদাকারে' ভূমিষ্ঠ হয় হিন্দী নাট্য-জগতে প্রাণের সঞ্চার করবার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। 'আদাকার'-এর কর্তৃপক্ষের মতে কলকাতা শহরই হচ্ছে হিন্দী ভাষাভাষীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান এবং এই শহরে হিন্দী নাট্যআন্দোলনকে যদি জোরদার করা না যায়, তাহলে হিন্দী নাট্য-জগতের উন্নতি অসম্ভব। এবং কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন, হিন্দী নাটকের মান এবং হিন্দী অভিনয়ের দর্শকদের রুচি উন্নত করতে হলে পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় রচিত সার্থক নাটকের হিন্দী রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে, উপযুক্ত আঙ্গিকের সাহায্যে মঞ্চস্থ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্যে গেল ছ বছরের মধ্যে আদাকার' ইংরাজী, বাংলা, মারাঠী, কানাড়ী ও গুজরাটী ভাষায় রচিত নাটকের অনুবাদের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় লিখিত নাটকও মঞ্চস্থ করেছে। সুখের কথা ১৯৭২-এর ২৫ মার্চ থেকে 'অ্যাকসমুলোর ভবন' রঙ্গমঞ্চে প্রতি শনিবার নিয়মিতভাবে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সংস্থা একটি ক্রমবর্ধমান রসিক দর্শক সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। 'আদাকার' আশা করে যে, তার এই মহৎ প্রয়াস সরকারী বা বেসরকারী কোনো রকম সাহায্য ব্যতিরেকেই পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হবে। আজ পর্যন্ত এঁরা অন্ততঃ ১৯টি নাটককে মঞ্চস্থ করেছেন এবং তার মধ্যে কয়েকটিতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এঁদের 'খামোশ, আদালত জারি হ্যায়' নাটকটি অন্ততঃ চল্লিশ রাত্রি অভিনীত হয়েছে। আমরা সংস্থাটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

পথিকগোষ্ঠীর অভিনয় : সম্প্রতি কুলপীস্থ পথিকগোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে সুদীপ্ত রায়ের 'ইরম্মদ', বাবলু দাশগুপ্তের 'কেন এই অবক্ষয়' এবং রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'কালো মাটির কান্না' এই তিনটি একাঙ্ক নাটক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। উক্ত নাটক তিনটিতে গোষ্ঠীর সভ্যগণ দলগত অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। নাটক তিনটি পরিচালনা করেন বাণীপ্রসাদ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে সম্প্রতি রামকিশোরপুর গুরুদাস স্মৃতি পাঠাগার কর্তৃক আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতি-যোগিতায় কুলপীস্থ পথিকগোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ, শ্রীবাণীপ্রসাদের সুনির্দেশনায় শচীন ভট্টাচার্যের 'শিকার' নাটকটি অভিনয় করে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন।

কিশলয়ের 'দ্বিতীয় পৃথিবী' : চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলাতে গিয়ে প্রশ্নমথিত বিশ শতকের এই জটিল জীবনের পথ-পরিক্রমায় বারবার আমরা ক্লান্ত হচ্ছি, যন্ত্রণায় রক্ত ঝরছে অবিরাম। কিন্তু তবু কি আমরা থামছি? না। নতুনতর শপথের এক উদ্দীপ্ত বাণী নিয়ে দ্বিতীয় পৃথিবী গড়ে তোলার কর্মোন্মাদনায় আবার আমরা উদ্বেল হয়ে উঠছি। মঞ্চের আলোকিত মুহূর্তের শেষ প্রহরে একটি কণ্ঠে বিঘোষিত হোল—আমরা এই পৃথিবী ভাঙবো, গড়ে তুলবো দ্বিতীয় পৃথিবী। চলমান মানব জীবনের দৃপ্ত সত্যের সঙ্গে যেন মিলে গেল একই সুরে সেই কণ্ঠ।

নাটকের নাম 'দ্বিতীয় পৃথিবী'। স্রষ্টা সমরেশ ঘোষ। গড়ে তোলার জন্য প্রয়াসের মেলবন্ধন করেছেন 'কিশলয়ে'র শিল্পীরা। অসহনীয় দারিদ্র্যের মর্মান্তিক ক্রুরতায় কিভাবে ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু হয়, তাকে কেন্দ্র করেই মূর্ত হয়ে উঠেছে এ নাটকের সংলাপ আর সংঘাত। এ নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে নেই কোন সুপরিকল্পিত প্লট। মধ্যবিত্ত জীবনের জ্বালাযন্ত্রণায় নিপীড়িত কয়েকটি চরিত্র শুনিয়েছে তাদের সংগ্রামের কথা, শুনিয়েছে তাদের চেয়ে না পাওয়ার কথা। জীবনের গবেষণা করতে গিয়ে লেখক শ্রীহীন গোস্বামী বেছে নিয়েছেন এইসব চরিত্রকেই, বিশ্লেষণ করেছেন এদের আসল চেহারাকে। তারপর শেষ মুহূর্তে ইনিই শুনিয়েছেন আবার নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে চলার সংকল্পের কথা।

নাটকটির সামগ্রিক রসোপলব্ধির পর একটি কথাই বারবার মনে হয়েছে, গবেষক শ্রীহীন গোস্বামীর মঞ্চে উপস্থিতি কি খুব প্রয়োজন ছিল? যদি নেপথ্য কণ্ঠেই তাঁর নির্দেশ এবং সংকল্পের কথা উচ্চারিত হত, তাহলে আরো গভীরতর এবং ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ হত না কি নাটকটি। ধরেও তো নেওয়া যেতে পারে শ্রীহীন গোস্বামীর কোন শারীরিক অস্তিত্ব নেই, সে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে একটা গাইডিং স্পিরিট-এর মতো কাজ করছে। মনে হয় এ ব্যাপারে নাট্যকারের দ্বিতীয়বার চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আর একটি কথা। নাট্যকার যে শপথের বাণী শ্রীহীন গোস্বামীর কণ্ঠে দিয়েছেন, সমবেতভাবে সেই বাণীর পুনরাবৃত্তি মঞ্চে উপস্থিত পরিশ্রান্ত মানুষগুলোর মুখে উচ্চারিত বা ভঙ্গিমায় প্রোজ্জ্বল না হয়ে উঠলে, নাটকের শেষ কথা কি নতুন সংকল্প নেওয়ার উদ্দীপনায় ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে? তবে এ ব্যাপারটা সম্পর্কে চিন্তা নাট্যনির্দেশকের মনেও স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

নাটকের প্রতিটি চরিত্র যেমনভাবে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও তার নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে, ঠিক তেমনিভাবে দেশনেতা অকিঞ্চনের কথা বলা হয়নি। কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টিতে নাট্যকার শ্রীসমরেশ ঘোষের মুন্সিয়ানার পরিচয় মিলিছে। সংলাপও হয়েছে মাঝে মাঝে খুব হৃদয়গ্রাহী। বিশেষ করে অধ্যাপক কল্যাণ চৌধুরী ও ছাত্রী অঞ্জনা সরকারের সংলাপে লিরিকের ব্যবহার আমাদের মনকে করেছে আপ্লুত।

এবারে প্রযোজনার কথা। নির্দেশক সত্য গোস্বামী নিষ্ঠার সঙ্গে ভেবেছেন

নতুনতর উপায়ে প্রয়োগ পরিকল্পনার কথা, তার নজীর প্রযোজনার কয়েকটি স্তরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটটিও তিনি সাজিয়েছেন চমৎকার, আলোকসম্পাতেও দু'একটি জায়গায় তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্যের ছোঁয়া মেলে। নাটকের শেষে একটি আলোর বৃত্তে একই-জায়গায় চরিত্রগুলোকে এনে তাদের মর্মান্তিক জীবন সত্য উচ্চারণ করানো হয়েছে। কিন্তু মঞ্চের বিভিন্ন জোনে বিভিন্ন চরিত্র এসে যদি তাদের পরাজয়ের কথা শোনাতো, তাহলে ব্যাপকতা ও গভীরতা দুইই বাড়তো বলে মনে হয়। নাটকের শেষ মুহূর্তের কথা আগেই বলেছি।

প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা। তবে প্রথম প্রযোজনার স্বাভাবিক কিছু শৈথিল্য তো থাকবেই। গবেষক লেখক শ্রীহীন গোস্বামীর ব্যক্তিত্বকে মঞ্চে প্রত্যাশিত ভঙ্গিমায় মূর্ত করে তুলেছেন শ্রীবাসুদেব পাল। তবে তাঁর পোশাক সম্পর্কে নির্দেশকের একটু অন্যরকম চিন্তা-করা উচিত ছিল। অপূর্ব অভিনয় করেছেন ছাত্র সতীশের ভূমিকায় ধীমান চক্রবর্তী। কৌতুকাভিনেতা হিসেবেই শ্রীচক্রবর্তীর খ্যাতি, কিন্তু সেদিন তিনি প্রমাণ করলেন যন্ত্রণার অভিব্যক্তিতেও তিনি সমান পটু। একটা বিশেষ টাইপ-এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানী 'অভিজিৎ'কে সপ্রতিভ করে তুলেছেন শ্রীসমরজিৎ দে। শ্রীতুষার ব্যানার্জির 'কল্যাণ চৌধুরী' ও বীথি গাঙ্গুলীর 'অঞ্জনা সরকার'ও দুটি মরমী চরিত্রচিত্রণ। সুশীল মিত্রের শিক্ষক 'রামকমলে' ও জিতেন ভৌমিকের 'কেষ্ট-বাবু'ও রয়েছে সার্থক। সুগায়ক প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর গানের চেয়ে ভালো লেগেছে অভিনয়। সুর মাধুর্যেই শ্রীব্রহ্মচারীর খ্যাতি ছিল, এখন সংলাপেও তাঁর নৈপুণ্য পেলো প্রতিষ্ঠা। বুড়িমা নারায়ণীর মর্মযন্ত্রণা চমৎকার ফুটিয়েছেন দীপালী ঘোষ। তবে অভিনেতা নিরাপদের ভূমিকায় শ্রীনির্মল চ্যাটার্জি আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি। বোধহয় ঠিক একই কথা বলা যায় দেশ-নেতা 'অকিঞ্চনে'র ভূমিকায় শ্রীঅমরেশ দত্তের অভিনয় সম্পর্কে। বেণীমাধব মুখার্জির "পটল" সমগ্র নাটকে বেশ একটা রিলিফ-এর কাজ করেছে। আবহসঙ্গীতে ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ দে।

সবশেষে একটি কথা। 'মঞ্জরী অপেরা' নাটক প্রযোজনা করে 'কিশলয়' নাট্যানু-রাগীদের যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছিল, 'দ্বিতীয় পৃথিবী'কে সেই সীমায় উন্নীত করতে গেলে নাটকে আরো গতি আনতে হবে, সে গতি যেমন থাকবে সংলাপ উচ্চারণে, তেমনই আনতে হবে অভিব্যক্তিতে।

ম্যাকিনন্‌স রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'ছায়া ছায়া আলো' : আজকাল সব সময়ে অফিস ক্লাবের নাটক যে সেই পুরনো প্রচলিত ধারাই অনুসরণ করছে, তা নয়। মাঝে মাঝে স্বাদসম্পন্ন নাটকের প্রযোজনা উপস্থিত করে, অফিস ক্লাবের শিল্পীরা নাট্যচর্চায় নিজেদের নিষ্ঠা ও গভীরতার পরিচয় রাখছেন। এমনি একটি পরিচয় সেদিন চিহ্নিত হোল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। নাটকের নাম ছিল 'ছায়া ছায়া আলো'। গোর্কীর একটি নাটক অবলম্বন করে এটি লিখেছেন শ্রীদিলীপ মৌলিক। পরিবেশন করলেন ম্যাকিনন্‌স রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা।

একটি সেটে পরিবেশিত এই নতুন স্বাদের নাটকটির প্রয়োগ পরিকল্পনায় মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন শ্রীগোপেন বসু। কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর পরিণত শৈল্পিক মানসই স্পষ্টতা পেয়েছে। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁরা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন তাঁরা হোলেন প্রকাশ দাস (প্রকাশ), গোপেন বসু (লোকটি), মুরলী মজুমদার (কাঙালী), অলোক সেন (সুবীর), সবিতা মুখার্জি (অসীমা)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন শান্তি দত্ত, প্রতাপ চ্যাটার্জি, ভূপেন চ্যাটার্জি, গোবিন্দ মুখার্জি, আরতি ঘোষ, মীনা দাস।

ক্ষুধা : বিধায়ক ভট্টাচার্যের মঞ্চসফল নাটক 'ক্ষুধা'কে সেদিন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে প্রত্যাশিত সফলতায় রসোত্তীর্ণ করে তুললেন বেণী স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসো-সিয়েশনের শিল্পীরা। হারু বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন পংকজ গুপ্ত, বিমল দে, বিজন সিনহা, সন্তোষ চক্রবর্তী, হরিহর ব্যানার্জি, দুলাল দে, রাধাকান্ত মৈত্র, নিমাই ব্যানার্জি, শ্যামল মুখার্জি, অরূপ চৌধুরী, বঙ্কিম ঘোষ, প্রদীপ সেন, কানাই ব্যানার্জি, রবীন দত্ত, বিজিৎ সান্যাল, শান্তি ঘোষ, জ্যোৎস্না দাস, মেনকা ব্যানার্জি, চৈতালী রায়, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী।

দুই পুরুষ : শ' ওয়ালেস ইনস্টি-টিউটের সভ্যগণ সম্প্রতি তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয় করলেন রবীন্দ্র সদনে। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন দেবনারায়ণ শর্মা। সুঅভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন মনমোহন ঘোষ (মহাভারত), সুশান্ত মিত্র (নুটুবিহারী), কিরনাথ কর, পঞ্চানন চ্যাটার্জি, নিশাপদ মুখার্জি, পাঁচু-গোপাল চক্রবর্তী, কল্যাণ মুখার্জি, রমেন চন্দ্র, অজিত খাসনবীশ, সুনীল বসু, সুশীল কোলে, অরুণ ঘোষ, গীতা নাগ, মঞ্জুশ্রী বোস, অলকা গাঙ্গুলী, আরতি ঘোষ।

শক্তি সামন্তর অনুরাগ চিত্রে মৌসুমী চ্যাটার্জি

টিপু সুলতান : এমকো জেনারেল ইনডাস্ট্রিজ ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি রঙমহলে 'টিপু সুলতান' নাটকটি পরিবেশিত হোল। শিল্পীদের সাবলীল অভিনয়ে সামগ্রিক প্রযোজনাটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সুধাংশু সরকার, অজিত পাল, বলরাম ঘোষ, কাশীনাথ সাহা, চয়ন সরকার, বিমলেন্দু সিংহ, দিলীপ ভট্টাচার্য, গোপাল নন্দী, মমতা মণ্ডল, প্রকাশ মান্না, সমরেন্দ্র সরকার, কানাই কেয়া, রতন সরকার, সুনীল মল্লিক, মানিক সরকার, শাশ্বতী রায়, আরতি ঘোষ ও কান্তা ভট্টাচার্য।

বিবিধ সংবাদ

শিক্ষামূলক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

গেল ২৫ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সারা ভারতে যে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের পথকে প্রশস্ত করা। অন্তত তিরিশ লক্ষ বালক-বালিকার জন্য এই উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই উপলক্ষে ১২৩টি দেশের শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হবে বিভিন্ন চিত্রগৃহে এবং অপরাপর কেন্দ্রে।

বড়গাছিয়াতে মদন কুণ্ডু : গত ৩০ মার্চ বড়গাছিয়া (হাওড়া)তে বিকাশ মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত যাদুকর মদন কুণ্ডুর ইন্দ্রজাল। প্রায় ৬ হাজার দর্শকের সামনে মদন কুণ্ডু ও তাঁর দলবল এক আকর্ষণীয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেন। শহর এবং গ্রাম ও গ্রামান্তর থেকে আসা দর্শকদের সামনে মদন কুণ্ডু দেখান স্পুটনিক শূন্যে উড়ে যাচ্ছে, লাল নীল কাগজের রং মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে যাচ্ছে, সুন্দরী কন্যা হাওয়াতে ভেসে দর্শকদের নমস্কার জানাচ্ছে ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানে মদন কুণ্ডুর যে দুজন সহকারী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন তাঁরা হলেন গৌতম খাঁ এবং মধুসূদন কুণ্ডু।

সোদপুরে যাত্রা-উৎসব

সোদপুরের (২৪ পরগণা) যুবসংস্থা ঃ 'সংহতি' পাঠাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা-জগতের সেরা তিন দলের সহযোগিতায় আগামী ১৩ (শুক্রবার) ১৪ (শনিবার) ও ১৫ (রবিবার) এপ্রিল রাত ৮টায় যথাক্রমে 'গোপাল ভাঁড়', 'সন্ন্যাসীর তরবারি' 'হিটলার' পালা দিয়ে তিন দিনব্যাপী যাত্রা-উৎসবের আয়োজন করেছেন সোদপুর গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেটের সেন্ট্রাল পার্কে।

প্রতিযোগিতা : ইছাপুর অর্ডন্যান্স ক্লাবের পরিচালনায় তৃতীয় বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা আগামী ২৬শে মে থেকে শুরু হোচ্ছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২২শে এপ্রিল। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক, অর্ডন্যান্স ক্লাব, স্টেশন রোড, ইছাপুর, ২৪ পরগণা।

বাসু চ্যাটার্জি তাঁর নতুন ছবি 'উস পার'-এর জন্যে মৌসুমী চ্যাটার্জি ও বিনোদ মেহরাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। মৌসুমীর হাতে এখন অনেক ছবি। বাসু চ্যাটার্জি ছাড়াও শক্তি সামন্ত বা রাজ খোসলার মত নামীদামী পরিচালকের ছবিতে অভিনয় করার জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ। বাসু চ্যাটার্জির এই নতুন ছবিতে মৌসুমী-বিনোদ ছাড়াও আছেন পদ্মা খান্না ও জালাল আগা। শচীনদেব বর্মনের সুরে যোগেশ লিখিত একটি গান ইতিমধ্যেই লতা মঙ্গেশকর-এর কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়ে গেছে। ছবির চিত্রগ্রহণ করবেন কে কে মহাজন। জিতন ফিল্মসের ব্যানারে এই ছবিটি শীঘ্রই সেট-এ যাবে। প্রসঙ্গতঃ বাসু চ্যাটার্জি তাঁর আগের ছবি 'রজনীগন্ধা'র কাজও শেষ করে ফেলেছেন। রজনীগন্ধার মুখ্য ভূমিকায় আছেন বিদ্যা সিং ও দীনেশ ঠাকুর।

অসিত সেন পরিচালিত 'আনোখা দান' মুক্তি পেল। স্বর্গত অভিনেতা তরুণ বোস অভিনীত শেষ ছবি 'আনোখা দান'। তরুণবাবুর মৃত্যুর আজ প্রায় এক বছর পর এই ছবি মুক্তি পেল। তরুণবাবু বিমল রায় প্রোডাকসন্সের সব ছবিতেই অংশ গ্রহণ করেছেন। এল বি ফিল্মসের সব ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। 'আনোখা দান' তাঁর অভিনীত এল বি ফিল্মসের শেষ ছবি। যোগেশ এবং গুলজার রচিত এই ছবির গানগুলিতে সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ করেছেন এল বি লছমন।

জলসা

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানের আসরে : ক্লাব আয়োজিত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানের আসরের তৃতীয় পর্ব সম্প্রতি সম্পন্ন হল।

কবিগুরুর 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' দিয়ে গানের শুরু। তারপর অনুজ কবি নজরুল (কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান), প্রণব রায়, অনিল ভট্টাচার্য এবং তারও পরের যুগের পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ ভট্টাচার্য, গৌরীপ্রসন্ন, শ্যামল গুপ্ত ও সুনীলবরণের গানও তাঁর পরিবেশন তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুরকারদের মধ্যে ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, সুবল দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, দেবেশ বাগচী, নির্মল ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও রতু মুখোপাধ্যায়। শিল্পীর স্বরচিত কথা ও সুরের গানও শোনা গেছে।

গানগুলি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগ-পরিবর্তন ও সুরের নকশার পরিবর্তনের ছন্দটিও শিল্পী শ্রোতাদের মর্মে পৌঁছে দেন। অনুভূত হয় বিভিন্ন গীতিকার ও সুরকারের বিচিত্র আবেগের দোলা। কিন্তু সব গানকে ছাপিয়ে উঠেছিল অনিল ভট্টাচার্যের কথা ও নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে গাওয়া 'আমায় তুমি ভুলতে পার'—যার মধ্যে 'যাবার বেলায়' 'মধুর অভিমানের করুণ রেশ মধুরভাবেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ার্ধে ছিল শ্যামাসঙ্গীত। এখানে ফাগুন দিনের উজ্জ্বলতা হয়ে ইষ্ট-দেবীর আত্মনিবেদনের কিনারে লুটিয়ে পড়ে।

আর এই দু-এর সম্মিলনে পাওয়া যায় পূর্ণাঙ্গ শিল্পী সত্তাটিকে, তাই উপভোগের পাত্রও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেরী হয় নি।

ঘরোয়া সঙ্গীতানুষ্ঠান : এক ঘরোয়া গানের আসরে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রতিমা ব্রহ্মচারী ও মন্দিরা ব্রহ্মচারী। এই দুই শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় শ্রোতারা মুগ্ধ হন। পরে উদীয়মান সেতারশিল্পী নান্টু গুহমল্লিক, সেতারে রাগ 'ঝিঁঝিট' ও পরে পিলু ঠুমরী বাজিয়ে আসর শেষ করেন। সেতারে মিড়ের কাজ ও বেয়াজী হাতের তান ও ঝালা তাদের আনন্দ দেয়।

সুর বাহারের বসন্ত উৎসব : সম্প্রতি সুর বাহার সঙ্গীত সংস্থার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের মিলিত প্রচেষ্টায় কসবায় এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়। প্রায় অর্ধশতাধিক কণ্ঠে 'ওরে গৃহবাসী খোল দুয়ার খোলা' 'ফাগুনের নবীন আনন্দে' প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে বসন্তের আবাহন জানান হয়। একক ও দ্বৈতকণ্ঠে সন্ধ্যা সাহা, রঞ্জু দে, শ্রীলা রায়, উর্মিলা দত্ত ও ধীরা রায় রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও অন্যান্যদের বসন্তের গান গেয়ে শোনান। গীটার ও সেতারে পিলু ধুন বাজিয়ে শোনান তাপস পাল, গীতা দে ও স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়। সঙ্গতে অংশগ্রহণ করেন তরুণ রায়, দেবব্রত বসু, গৌরীপ্রসাদ দাস ও শংকর আচার্য। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুনীল সাহা ও কৃষ্ণা সমদ্দার।

তান-তরঙ্গের অনুষ্ঠান : গত ২৪-৩-৭৩ ৪এ পাম এভিনিউ, 'তান-তরঙ্গ' সংগীত-সমাজের মাসিক অধিবেশন হয়। ভারত-প্রসিদ্ধ সরোদবাদক, শ্রীউমর খাঁ সংগীত পরিচালনা করেন। এই আসরে বিপ্রদাস নন্দী মধ্যমান তালে দুটি টপ্পা (খাম্বাজ রাগে) পরিবেশন করেন। পরে বেগম জব্বর সাহেবা সুরবাহারে মলুহা-কেদার রাগের আলাপ ও সেতারে ঐ রাগে ও কাফীতে গৎ বাজান। সর্বশেষ শিল্পী বাংলার প্রসিদ্ধ গায়ক, শ্রীকালিদাস সান্যাল মহাশয়, 'সাজগিরি' রাগে খ্যাল ও হোরী ঠুমরী গাহেন। বিশিষ্ট অতিথিরা সংগীতে আনন্দ পান। সংগতে সাহায্য করেন সর্বশ্রী মহম্মদ এসলাম, ভবানীপ্রসাদ ঘোষ ও জিতেন্দ্রনাথ নাগ।

—চিত্রাঙ্গদা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি

পুণের নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত রঞ্জি ট্রফি জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে তামিলনাড়ু দারুণ উত্তেজনার মধ্যে ২৪ রানে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। মহারাষ্ট্রের পক্ষে এই পরাজয় খুবই অপ্রত্যাশিত। এখানে উল্লেখ্য, তামিলনাড়ু ৫ বছর পরে ফাইনালে উঠলো।

প্রথম দিনের ২৮৩ মিনিটের খেলায় তামিলনাড়ুর প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪০ রানের মাথায় শেষ হলে মহারাষ্ট্র বাকি সময়ে প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে মহারাষ্ট্রের প্রথম ইনিংস ২২৭ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৮৭ রানে এগিয়ে যায়, এবং বাকি সময়ে তামিলনাড়ু দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১০৮ রান তুলেছিল। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সূচনা খুবই আলগা হয়েছিল, ৭৮ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়।

তৃতীয় দিনে তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৭ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তারা দ্বিতীয় ইনিংসের বাকি ৫টা উইকেটে পূর্বদিনের ১০৮ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৭৯ রান যোগ করেছিল। মহারাষ্ট্র জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২১ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে। তাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩১ মিনিটে মাত্র ৯৬ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়। প্রধানত তামিলনাড়ুর অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘবনের বোলিংয়ে মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংসের এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়। ৭২ রানের মাথায় তাদের ৪টে উইকেট পড়েছিল—৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম উইকেট। ভেঙ্কটরাঘবন খেলায় ৮টা উইকেট পেয়েছিলেন ১১৯ রানে (৭৫ রানে ৪ এবং ৩৪ রানে ৪)।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

১৯৭৩ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা ১৮টা খেলায় ৩১টা গোল দিয়ে একটাও গোল খায়নি। ইতিপূর্বে ইস্টবেঙ্গল ৫ বার প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল—১৯৬০, ১৯৬১ (কাস্টমসের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী), ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সালে। গত চার বছরের (১৯৬৯-৭২) লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের থেকে ১ পয়েন্ট কম সংগ্রহ করে রানার্স-আপ হয়েছে—১৮টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট। এবারের লীগের খেলায় অপরাজিত সম্মান লাভ করেছে এই তিনটি দল—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং এন্টালী এ সি। চূড়ান্ত লীগ তালিকায় এন্টালী এ সি-র স্থান ৫ম। কিন্তু তারা ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলা ড্র করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিভাগের হকি লীগ

১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় 'রেঞ্জার্স' এবং টাউন ক্লাব যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সূত্রে আগামী বছর থেকে প্রথম বিভাগে খেলবে। রেঞ্জার্স দ্বিতীয় বিভাগের সমস্ত খেলাতেই জয়ী হয়েছে।

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

কার্ডিফে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ড পুরুষ এবং মহিলাদের দলগত অনুষ্ঠানে খেতাব জয়ী হয়েছে। পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ইংল্যান্ড ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে এবং মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ইংল্যান্ড ৩-১ খেলায় কানাডাকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, দু বছর আগে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সাতটি খেতাবই (দলগত বিভাগের ২টি এবং ব্যক্তিগত বিভাগের ৫টি) ইংল্যান্ড জয়ী হয়ে অটুট প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছিল।

লীগ পর্যায়ের খেলা

পুরুষ বিভাগের লীগ পর্যায়ের খেলায় 'এ' গ্রুপে ইংল্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপে ভারতবর্ষ অপরাজিত অবস্থায় প্রথম স্থান লাভ করে ফাইনালে উঠেছিল। ইংল্যান্ড এবং ভারতবর্ষ লীগের সাতটি খেলাতেই জিতেছিল।

মহিলা বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল 'এ' গ্রুপে ইংল্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপে কানাডা। লীগের সাতটি খেলাতেই তারা জিতেছিল। ভারতবর্ষ তার শেষ খেলায় কানাডার কাছে ১-৩ খেলায় হেরে যাওয়াতে ফাইনালে উঠতে পারেনি। ভারতবর্ষ ৩-০ খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ৩য় স্থান লাভ করে।

দলগত বিভাগের চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ : ১ম ইংল্যান্ড, ২য় ভারতবর্ষ, ৩য় অস্ট্রেলিয়া

মহিলা বিভাগ : ১ম ইংল্যান্ড, ২য় কানাডা, ৩য় ভারতবর্ষ

ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি খেতাব জয়ের সূত্রে ইংল্যান্ড উপর্যুপরি দুবার এই প্রতিযোগিতায় ৭টি খেতাবই জয়ী হল। দু বছর আগে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী ট্রেভর টেলর এবং মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী শ্রীমতী জিল হ্যামারসলী এবারও সিঙ্গলস খেতাব জয় করেছেন। ব্যক্তিগত বিভাগের চারটিতে—পুরুষদের সিঙ্গলস, মেয়েদের সিঙ্গলস, মেয়েদের ডাবলস এবং মিকস্‌ড ডাবলস ফাইনালে শুধু ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় কেউ 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেননি। দুটি করে খেতাব জয়ী হয়েছেন ট্রেভর টেলর (পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস) এবং শ্রীমতী জিল হ্যামারসলী (মেয়েদের সিঙ্গলস ও ডাবলস)। তিনটি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন একমাত্র শ্রীমতী কে ম্যাথিউজ (সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিকস্‌ড ডাবলস)। তিনি শেষ পর্যন্ত ডি নীলের সহযোগিতায় মিকস্‌ড ডাবলস খেতাব পেয়েছেন।

কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড বোট রেস

১৯৭৩ সালের ১১৯তম কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোট রেস প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ১৩ লেংথে অক্সফোর্ডকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৬ বার (১৯৬৮—৭৩) খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেসের উদ্বোধন ১৮২৯ সালে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কয়েক বছর বোট রেসের আসর বসে নি। লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত টেমস নদীর জলে এই বার্ষিক বোট রেসের আসর বসে। প্রতিযোগিতার দূরত্ব ৪ মাইল ৩৭৪ গজ—পুটনী ব্রিজ থেকে মর্টলেক পর্যন্ত। প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ১১৯ বছরের ইতিহাসে মাত্র একবার 'ডেড হিট' হয়েছে, ১৮৭৭ সালে। কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বার্ষিক বোট রেস ইংল্যান্ডের এক বিরাট জাতীয় উৎসব—ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয়তায় অতুলনীয়।

বর্তমানে এই বোট রেসের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : কেম্ব্রিজের জয় ৬৭ বার অক্সফোর্ডের জয় ৫১ বার এবং 'ডেড হিট' (অমীমাংসিত) ১ বার (১৮৭৭ সাল)।

অধিনায়কদের সেঞ্চুরী

১৯৭৩ সালের গত অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২য় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক রোহন কানহাই (১০৫ রান) এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক

ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব আয়োজিত ১৯৭২ সালের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়দের পুরস্কারবিতরণী অনুষ্ঠানঃ স্কুলের সেরা খেলোয়াড় প্রবীর বসু, শ্রীতেজেশ সোম, শ্রীগোষ্ঠপাল এবং বড়দের সেরা খেলোয়াড় মোহন সিং (ইস্টবেঙ্গল)

সেঞ্চুরী করেছিলেন তা সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একই খেলায় উভয় দলের অধিনায়কের সেঞ্চুরী করার একাদশ নজির। একই টেস্ট খেলায় উভয় দলের অধিনায়কের সেঞ্চুরী করার প্রথম নজির গড়েছিলেন ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ডারবানে ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হার্বার্ট উইলিয়াম টেলর (১০৯ রান) এবং ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জন উইলিয়াম হেনরী টাইলার ডগলাস (১১৯ রান)।

একই টেস্ট খেলায় উভয় দলের অধিনায়কের সেঞ্চুরী করার নজির এ পর্যন্ত যে ১১ বার হয়েছে তার হিসাব ঃ ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ৪ বার, ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলায় ৩ বার, ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলায় ১ বার, অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলায় ২ বার এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ডের টেস্ট খেলায় ১ বার। মাঠ ভিত্তিক হিসাবঃ লর্ডসে ৩ বার, ডারবানে ২ বার, ম্যাঞ্চেস্টার ২ বার, জোহানেসবার্গে ১ বার, কিংস্টনে ১ বার, সিডনীতে ১ বার এবং ব্রিজটাউনে ১ বার। একই টেস্ট খেলায় উভয় দলেরই অধিনায়ক দ্বিশত রান করেছেন এমন নজির নেই। তবে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ওয়াল্টার হ্যামন্ডের ২৪০ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, লর্ডস, ১৯৩৮) এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আর বি সিম্পসনের ৩১১ রান (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৬৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বছরের সেরা পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড়

সদ্য প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিশ্রুত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জিতে ১৯৭২ সালের সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে যে পাঁচজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন অস্ট্রেলিয়ারই এই চারজন খেলোয়াড়—ডেনিস লিলি (বোলার), বব ম্যাসী (বোলার), কিথ স্ট্যাকপোল (ব্যাটসম্যান) এবং গ্রেগ চ্যাপেল (ব্যাটসম্যান)। তালিকার পঞ্চম খেলোয়াড় হলেন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো।

ডেনিস লিলি ৩১টি উইকেট পাওয়ার সূত্রে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। তাছাড়া ইংল্যান্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেন। বব ম্যাসী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ২৩টি উইকেট পাওয়ার সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন। তাছাড়া ১৯৭২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় বব ম্যাসী ১৬টি উইকেট নিয়ে (৮৪ রানে ৮ ও ৫৩ রানে ৮) খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার 'বিশ্বরেকর্ড' করেন। কিথ স্ট্যাকপোল মোট ৪৮৫ রান করার সূত্রে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করার রেকর্ড করেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে গ্রেগ চ্যাপেল মোট ৩৮৩ রান (গড় ৪৮-৫৫) এবং ২টি সেঞ্চুরী (১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী) করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো মোট ২৪টি উইকেট পাওয়ার সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জিকায় এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ৮ জন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় 'বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়' তালিকায় স্থান পেয়েছেন।

১৮৯৭ঃ কে এস রঞ্জিৎ সিংজী
১৯৩০ ঃ কে এস দলীপ সিংজী
১৯৩২ ঃ পতৌদির নবাব (বড়)
১৯৩৩ ঃ সি কে নাইডু
১৯৩৭ ঃ বিজয় মার্চেন্ট
১৯৪০ ঃ ভিনু মানকাদ
১৯৬৮ ঃ পতৌদির নবাব (ছোট)
১৯৭২ ঃ বি এস চন্দ্রশেখর

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সিতারা ৩৪
সাইজ ২-৭
১২·৯৫

কুমকুম ৩১
সাইজ ২-৭
১৫·৯৫

গরমে চলুন হালকা পায়ে

বাটার চপ্পলগুলির নকশাই এমন যাতে হাওয়া খেলতে পায়, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ। সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন—দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি...আসুন না, একবার প'রে দেখুন।

Bata